













# প্রবাসী, ৫৯শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৬

সূচীপত্র

কাণ্ডিক-১৮৩

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীমদ্রামায়ণ	...	৫০১	শ্রীকৃষ্ণায়ণ বহু	...	৩৪৩
—ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	...	৫০১	—একটি স্মৃতি (কবিতা)	...	৩৪৩
স্বাধীনতা	...	২১০	—দীর্ঘপথ (কবিতা)	...	৩৪৩
—মানসিক রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য	...	২১০	শ্রীকল্যাণী কর	...	৬১১
—মানসিক ব্যাধি	...	২১০	—বন-হরিণী (গল্প)	...	৬১১
অনিলকুমার আচার্য	...	২০০	শ্রীকান্ত রায়	...	৩০৭
—একজন অজ্ঞাত মহিলা কবি	...	২০০	—প্রয়োজনের সীমা (গল্প)	...	৩০৭
—কালীপ্রসন্ন সিংহ	...	৬৮৬	শ্রীকালিকারঞ্জন কাম্বুজ	...	১৭, ১৪৬
অনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	১৬৮	—ঐতিহাসিক আচার্য বচনাথ সরকার	...	১৭, ১৪৬
—চাতক (কবিতা)	...	১৬৮	ডক্টর শ্রীকালিদাস নাপ	...	৩১
অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭১৭	—তীব্রত ও ভারত (সচিত্র)	...	৩১
—কামনা (কবিতা)	...	৭১৭	শ্রীকালিদাস রায়	...	৬১৩
অমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	১৫৮	—কবিতার দিন (কবিতা)	...	৬১৩
—পাবনের প্রাণ (গল্প)	...	১৫৮	—কালিদাসের উদ্দেশ্যে (কবিতা)	...	৬১৩
অমলেন্দু ঘোষ	...	৫০২	—দীপলিখা (কবিতা)	...	৬১৩
—আরীগান	...	৫০২	—বিরহিণী (কবিতা)	...	৬১৩
অমিতাকুমারী বহু	...	১১০	শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত	...	৬১৩
—দীপাবলি	...	১১০	—অন্ধ আখির কৃষ্ণ কৃষ্ণ (কবিতা)	...	৬১৩
ব সেন	...	৬২০	—ডুবুরি (কবিতা)	...	৬১৩
—মটো (গল্প)	...	৬২০	—দিব্য আখির রশ্মি কৃষ্ণ (কবিতা)	...	৬১৩
বাহা	...	৬২৩	—ভারতের সংস্কৃতি	...	৬১৩
বাহা (কবিতা)	...	৬২৩	—ঐ (আলোচনা)	...	৬১৩
প্রসাদ সেনগুপ্ত	...	৬২৭	শ্রীকালীচরণ ঘোষ	...	৬২৫
—প্রসাদ সরকার ও বেকার-সমস্যা	...	৬২৭	—ঘটনা ও রটনা	...	৬২৫
—রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও শিল্প-বাণিজ্য	...	৬২৭	—ভারতে জনসমস্যার রূপ	...	৬২৫
—জন-ব্যবসায় দাখল ও পুনর্লব্ধী কর্পোরেশনের ব্যর্থতা	...	৬২৭	শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	...	৬২৫
মুখোপাধ্যায়	...	১৬৮	—অন্ধ আকাশ (উপন্যাস)	...	৬২৫, ২২২, ৩৪৫, ৪৮৩, ৬০১, ৭১৮
—বেদনা (কবিতা)	...	১৬৮	শ্রীকুমারজ্ঞান বসিক	...	৭৪৬
—গুপ্ত	...	৬২৬	—দণ্ডকারণ (কবিতা)	...	৭৪৬
—দাঁশার মুক্তা (কবিতা)	...	৬২৬	—বস্ত্রা ১৯৫২ (কবিতা)	...	৭৪৬
—জীবা (কবিতা)	...	৬৪০	শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী	...	৪২২
—গব সান্তাল	...	৬৫২	—ছায়ার তীর্থ (কবিতা)	...	৪২২
—জি কি (কবিতা)	...	২৮০	শ্রীকৃত্তী সোম	...	৪২৮
—জর নেমা (কবিতা)	...	২৮০	—মণিহালার জেতে (কবিতা)	...	৪২৮
—জী	...	৬৪০	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়	...	৪৫২
—জীব্য কবি রবীন্দ্রনাথ	...	৬৪০	—রূপধর্মিক নিকিটন ও মধ্যযুগের ভারত	...	৪৫২
—জহাঙ্গীর (কবিতা)	...	১০১	শ্রীকৃষ্ণন দে	...	৮৪
—জৈবী	...	৪২৬	—শান্তি (নাটক)	...	৮৪
—জিকা বহু (কবিতা)	...	৪২৬	শ্রীকীর্ত্তন হাইতি	...	৪৭২
—জয়গী (কবিতা)	...	৪৩	—সমবায় ও অসুখান	...	৪৭২
—মুখোপাধ্যায়	...	৬১০	শ্রীসৌভাগ্য সেন	...	৪৭৭
—মিলে (কবিতা)	...	৬১০	—শিল্পী চিত্রশিল্পী চৌধুরী (সচিত্র)	...	৪৭৭
—ম	...	৩৭২	অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	...	২৬
—মহম্মদ	...	৩৭২	—শ্রীকৃত্তন গঠনে মুখোপাধ্যায়	...	২৬

শ্রীচৈতন্য দেবী		শ্রীশ্রীকুমার দত্ত	
—অলস মায় (উপজ্ঞাস)	...	—বিধা	...
শ্রীভাষ্কর চক্রবর্তী		—ভালবাসা (কবিতা)	...
—আধুনিকপূর্ব যুগের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি	...	শ্রীশ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়	
—উড়িয়ার সংস্কৃত চর্চা	...	—ধলভূম	...
শ্রীতপসী চট্টোপাধ্যায়		শ্রীশ্রীমকুমার চক্রবর্তী	
—পুঁতিম (কবিতা)	...	—মরহো	...
—সোনার তরীর 'দুই পাখী' আর মহম্মদের 'বন্দিনী'	...	শ্রীমগলাধর মজুমদার	
শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ		—অধিকার ও অনধিকার	...
—শীত (কবিতা)	...	শ্রীবিকাশকান্ত রায়চৌধুরী	
শ্রীদিলীপকুমার রায়		—একাঙ্কিকা	...
—মুরলীধর (কবিতা)		শ্রীবিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত		—ঠাকুরকবি স্মরণে	...
—কী পাইনি ? (কবিতা)	...	—বসন্তে (কবিতা)	...
—তমসার কুল (কবিতা)	...	—শেষ মিনতি (কবিতা)	...
অধ্যাপক শ্রীহুগোমোহন ভট্টাচার্য		শ্রীবিনায়ক সান্থান	
—অশুভের উত্তর	...	—শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ	...
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র		শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
—ছুটি	...	—লালসকা (উপজ্ঞাস)	...
—পাড়াপাড়ার কথা	৩৩০, ৪৫২, ৫২৮, ৭৩০	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
—বস্তা	...	—বো-রাগীর ঘাট (গল্প)	...
শ্রীদেবদাস মুখোপাধ্যায়		শ্রীবিধনাথ দাস	
—মহাজন (গল্প)	...	—ক্যাম্পে	...
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		শ্রীবিষ্ণুদত্ত চট্টোপাধ্যায়	
—চিতোর নগরের প্রাচীন ইতিহাস	...	—জীবনে আকস্মিকতা	...
শ্রীদিক্শিতা ভরদ্বাজ		শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	
—নিরুপমার প্রেম (কবিতা)	...	—একদিন (কবিতা)	...
—বাক্য (কবিতা)	...	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী		—ফতেপুর দিগ্রি	...
—জীবনের পাতা স্বরে যায় (কবিতা)	...	শ্রীবেলা দাশগুপ্ত	
—তবু দেখে সে তোমার আঁচ (কবিতা)	...	—বাঁপার বাটল ও বাটল গান সংক্ষেপে করেকটি বক্তব্য	...
—মকতুমি কি মুখে বাঁচিবা আছে (কবিতা)	...	শ্রীবেলা দেবী	
শ্রীদিলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়		—ভপেন্দ্র-স্মৃতি	...
—বরক শিক্ষা-আন্দোলন ও মৃত্যুর চট্টোপাধ্যায়	...	শ্রীএজমাদব ভট্টাচার্য	
শ্রীদারিদ্র চক্রবর্তী		—সীতার ভয় (কবিতা)	...
—মাথ (গল্প)	...	শ্রীভারতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্রীদারিদ্র চৌধুরী		—বিশ্বকোষ উপজাতি বোডো	...
—জীবনচর্চা বনাম সাহিত্যচর্চা	...	শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	
—ব্রাহ্মণীর সংলাপ	...	—বিদেশী নামের বাংলা প্রতিরূপ	...
শ্রীদুর্জয়প্রসাদ ভট্টাচার্য		শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	
—ভারতের সংস্কৃতি (আলোচনা)	...	—খাজুরাহো	...
শ্রীদুর্জয়প্রসাদ মুখোপাধ্যায়		শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়	
—বিধ কুড়িয়েলা	...	—জটায়ু জীলে (মিহি)	...
শ্রীদুর্জয় দেবী		শ্রীমদুর্জয় চট্টোপাধ্যায়	
—উপনিষদসংগ্রহ (কবিতা)	...	—এম্মী (কবিতা)	...
—মরণ (কবিতা)	...	—মৃগ (কবিতা)	...
—সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ স্মরণে (কবিতা)	...	শ্রীমদোরজন গুপ্ত	
—হৃদপাত (গল্প)	...	—চরক-সংহিতার কথা	...
শ্রীদুর্জয়প্রসাদ ভট্টাচার্য		শ্রীমায়ী বহু (রাহ)	
—বিদ্যাচল (কবিতা)	...	—জীবন দোলনা (কবিতা)	...

লেখকগণ ও প্রকাশকের তালিকা

—শিকরিত্রী (গল্প)	...	৭৭	—সিনেমা ও বাঙ্গালেশ	...	৩৭৮
ঈশ্বরকুমার সেন	...		ঈশ্বরবংশের মজুমদার	...	
—ব্রিনরনী (গল্প)	...	৪৪১	—চোরকাটা (গল্প)	...	৫৩৭
ঈশ্বরীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	...		ঈসজ্ঞা দেবী	...	
—আসছে ভালো সময় (কবিতা)	...	৩৭৬	—হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২৯
—বর্তমান বাংলা (কবিতা)	...	২০৭	ঈসত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	
—হালকা পুষ্টনের আক্রমণ (কবিতা)	...	৩২৫	—মা (কবিতা)	...	৩৩৯
ডক্টর ঈশ্বরীন্দ্রবিমল চৌধুরী	...		ঈসত্যেন সিংহ	...	
—বঙ্গীয় মহামুণ্ডের প্রতিভাবতার শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি	...	৪৩৬	—বেগমপী (গল্প)	...	৭২৭
ঈশ্বরীন্দ্রমোহন দত্ত	...		ঈসত্যেন্দ্রকুমার অধিকারী	...	
—আমাদের অভাব	...	৮২	—তোমার কলে নদী (কবিতা)	...	৭১৪
—অর্ন্তজ্ঞানে নৌকার অভাব	...	২৩৯	—দুসর গোখুরী (কবিতা)	...	৪১৭
—রমনা	...	৭২৪	—বন্ধন (গল্প)	...	১০২
ঈশোপনাথ মুখোপাধ্যায়	...		ঈসদ্যা রায়	...	
—রাষ্ট্রের দণ্ডনীর মৌলিক উদ্দেশ্য	...	৫৬১	—বুড়ো শিবের গাজন আর টে পী	...	৬৮৯
ঈশ্বরনাথ মলিক	...		ঈসমর বহু	...	
—কালিদাস-সাহিত্যে 'জম্বুদ্বীপ' ও 'পূর্বাত্যম'	...	৪২৭	—ইদ্র (গল্প)	...	১৬৯
ঈশ্বরখিন মিত্র	...		—মোন অতীত (গল্প)	...	৭১১
—মধ্যবিন্দু	...	৪২৭	ঈসরদাচরণ চক্রবর্তী	...	
ঈশ্বরীন্দ্রনাথ দাস	...		—খাতশস্ত্র বুদ্ধি ও গ্রামে কুটির-শিল্প	...	১৩১
—ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য	...	৭৬১	ঈসীতা দেবী	...	
ঈশ্বরনা চৌধুরী (ডক্টর)	...		—শেফিঃ গোষ্ঠ (গল্প)	...	২৮১
—শঙ্কর-দর্শনে জ্ঞান-কর্ষ-সমুদ্রবাস	...	৭১৫	ঈশ্বরময় সরকার	...	
—শঙ্করমতে সাধন : কর্ষ	৪২, ২১৮, ৩৩৭, ৪৩৪		—ঘাটপুঞ্জা	...	৪২৪
—শঙ্করমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক	...	৫৮৯	—দীপালীর পরে	...	২২০
অধ্যাপক ঈশ্বরমণিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...		ঈশ্বরজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	
—মুর্শিদাবাদ পরিভ্রম	...	৭৪৬	—অশৌচিক	...	৩৪৪
ঈশ্বরমণি মুখোপাধ্যায়	...		ডক্টর ঈশ্বরধীরকুমার নন্দী	...	
—কাংশন (গল্প)	...	৪০৫	—শিল্পে প্রয়োজনবাদ	...	১৬৫
—হারানো পথ (গল্প)	...	৩৫	ঈশ্বরধীরচন্দ্র মজুমদার	...	
ঈশ্বরীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	...		—ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ	...	২৭৩
—সগড়া (গল্প)	...	৭৫৬	ঈশ্বরধীরচন্দ্র রাহা	...	
ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...		—মেকি (গল্প)	...	৪৩০
—ওড়িশা শাস্ত্র সাহিত্য	...	৪২	ঈশ্বরবোধ বহু	...	
ঈশান্তলীল দাশ	...		—গঙ্গালাভ (গল্প)	...	৩৬১
—উপন্যাস (কবিতা)	...	৯০	ঈশ্বরেশচন্দ্র রায়, শাস্ত্রী	...	
ঈশিবদাস চৌধুরী	...		—উপনিষদের কথা	...	৬৫৭
—ঐহ্যগারের সামাজিক দায়িত্ব ও আমাদের পরিকল্পনা	...	৩৫৩	ঈশ্বরেশ বিশ্বাস	...	
ঈশ্বরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...		—কবিকে (কবিতা)	...	৪২৪
—সাবর্ণ চৌধুরীবংশের আদিকথা	...	৬০৭	ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	
ঈশ্বরেন্দ্রকুমার লাহা	...		—গোশ্বামী তুলসীদাস ও 'রামচরিতমানস'	...	৭৫৪
—চিরন্তন (কবিতা)	...	৪৮	ঈশ্বরিশদ গুহ	...	
ঈশ্বরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	...		—যক্ষের প্রতি (কবিতা)	...	৪৩৪
—কবি কেমন ? (কবিতা)	...	৭৬	ঈশ্বরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	
ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	...		—বকুলগন্ধে (গল্প)	...	৩১২
—মহর্ষি (কবিতা)	...	৪৫৬	ডক্টর ঈশ্বরেন্দ্রনাথ রায়	...	
ঈসজলকুমার চট্টোপাধ্যায়	...		—সাইরেন (গল্প)	...	৬৬৫
—শশাঙ্ক পণ্ডিতের পাঠশালা (গল্প)	...	২১৪	ঈশ্বাসিরাশি দেবী	...	
ঈসত্যীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	...		—শান্তি, সাধনা (কবিতা)	...	৩৬৪
—আধুনিক বাংলার মনোজগৎ	...	১১৮	ঈশ্বরেন্দ্রনাথ দাস	...	
—বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক-চর্চা ও বাঙ্গালেশ	...	৪৯২	—উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী মহিলা পণ্ডিতা রমাবাই	...	৪৪৫
—বাঙ্গালার আধুনিক তরুণ-তরুণী	...	২২৭	—সরস্বতী (সচিত্র)	...	৭৩৭
			—বিগিনবিহারী মেধাবী	...	

# বিষয়-সূচী

অধিকার ও অনধিকার—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৪০	চোরকাটা (গল্প)—ঈশ্বরবংশের মজুমদার	৪৮
অনুত্তর উত্তরচরিত—অধ্যাপক হুগোবোহন ভট্টাচার্য	১৩৪	ছায়ার তীর (কবিতা)—ঈকান্তানন্দ বাগচী	৪৫
অন্ধ আকাশ (উপন্যাস)—		চুট—ঈদেবেল্লাথ মিত্র	৫
ঈশ্বরলাল দাশগুপ্ত	৪৫, ২২২, ৩৪৫, ৪৮৩, ৬০১, ৭১৮	ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরলাল দাস	৭৫
অন্ধ আখির কুক কুহন (কবিতা)—ঈকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত	৫৫	জটীর আলো (সচিত্র)—	
অলসবারা (উপন্যাস)—ঈতিহাস দেবী	২৪	ঈশ্বরলালদাস রায়	৬৬, ১৮২, ৩১৭, ৪৭০, ৫৭৮, ৬২
অলৌকিক—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৪৪	জন্মদিনে (কবিতা)—ঈউমিলা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬১
আধুনিকপূর্ণ যুগের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি—ঈতিহাস রচয়িতা	২১	জারী গান—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৫০
আধুনিক বাংলার মনোজগৎ—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১১৮	জীবনচর্চা বনাম সাহিত্যচর্চা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪০
আমাদের অভাব—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৮২	জীবন দোলনা (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৮
আর্তভাষে নৌকার অভাব—ঈ	২৩৯	জীবনে আকর্ষণিকতা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৫
আলোচনা—	৭৫১	জীবনের পাঠ্য বই (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২
আসছে ভালো সময় (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৭৬	কগড়া (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭৫
ইছুর (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৬৯	ঠাকুর কবি স্মরণে—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১২
উপনিষৎবালা (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৪, ১২৯, ৬০৬	ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার—	৩৭
উপনিষদের কথা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৫৭	ডুবুরি (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৪
উপেন্দ্র-স্মৃতি—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭৪৯	তবু দেখে সে তোমার আঁখি (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৩
উড়িয়া সংস্কৃত চর্চা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২০৮	তমসার ফুল (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭৫
উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী মহিলা পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী—		তিসত ও ভারত (সচিত্র)—উত্তর ঈকালিদাস নাগ	৫
ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৫৬৫	তোমার কুলে নদী (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭১
উপনিষৎ (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২৩	ত্রয়ী (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৩
একজন অজ্ঞাত মহিলা কবি—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২০০	ত্রিভুজ (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৪
একটি স্মৃতি (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৪৩	দশকারণ্য (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭৪
একদিন (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৫৮	দ্বিধা আখির কুক কুহন (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২৫
একাত্মিক—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৮৫	নিরিহা বিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন ও শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান—	
ঐতিহাসিক আচার্য বহুনাথ সরকার—		ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৭
ঈকালিদাস কায়স্থ	১৭, ১৪৫	দীপশিখা (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪০
ওড়িয়া শাস্ত্র সাহিত্য—উত্তর ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪২	দীপাধিতা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১১
হবিকে (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৫২৪	দীপালীর পরে—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২২
হবি কেমন? (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭৬	দীর্ঘপথ (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৬
হবিতার দিন (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬১৩	দ্রুতশাস্ত্র স্মৃতি (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬২
চান্দা (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭১৭	দেশ-বিদেশের কথা	১২৮, ২৫২, ৩৮৩, ৫১১, ৬৩৯, ৭৫
চালিদাস সাহিত্যে 'জ্ঞানভর' ও 'পূর্ণাভাষ'—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪২৭	ধিবা (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৩
চালিদাসের উদ্দেশ্যে (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩০	ধলভূম—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৬
কালীপ্রসন্ন সিংহ—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৮৬	ধূসর গোপাল (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪১
কি পাইনি (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৭৬	নিরুপমা প্রেম (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৬
কলীয় সরকার ও বেকার-সমস্যা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬২৭	পান্থ (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৫
ক্যাপে—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬৩১	পাবনের প্রাণ (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৫
কতি কি (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৫৫২	পাড়ারগল্পের কথা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৩৩, ৪৫২, ৫২৮, ৭১
কাজুলাহো—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩২২	পুস্তক পরিচয়—	১২৬, ২৪৩, ৩৭৮, ৫০৯, ৬৩৫, ৭৭
কলকাতা বুক ও প্রামে কলকাতা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৩১	পূর্ণতম (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬২
কলকাতা (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৬১	পেরিগো (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২৫
সামান্যী ভুলসীদাস ও 'রামচরিতমানস'—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৭৫৪	প্রতীক্ষা (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৫
ঐশ্বরলাল কায়স্থ	৩৫৩	প্রভাসের মিত্র (সচিত্র)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৫
টেনা ও রটনা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৫২৫	প্রভাসের সীমা (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৫
বাইপুল—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬২৪	কটো (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৬২
বক সংহিতার কথা—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৫৩	কতপূর দিকি—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৫
চতক (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	১৬৮	ফালন (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৫
চিত্তোর নগরের প্রাচীন ইতিহাস—উত্তর ঈশ্বরলাল কায়স্থ	২৩৩	বকুলগন্ধে (গল্প)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৫
চিরন্তন (কবিতা)—ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৪৮	বকুল নগরের প্রতীকবতর ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৫
		উত্তর ঈশ্বরলাল কায়স্থ	৩৫

বন-কবিতা (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	৩১১	মেকি (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	৩১০
বন্ধন (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	১০২	বৃণ (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	১০৪
বজা—ঈশ্বরদাস কব	...	২২০	মোঁন অতীত (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	১১১
বজা ১৯৫১ (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৩০০	বন্ধন প্রতি (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	১০৪
বর্তমান বাংলা (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	২০৭	রমনা—ঈশ্বরদাস কব	...	১২৪
বর্ধার কবি রবীন্দ্রনাথ—ঈশ্বরদাস কব	...	৩৪০	রাষ্ট্রের দণ্ডনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য—ঈশ্বরদাস কব	...	১০১
বসন্তে (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	১৮৮	রূপধর্মিক নিকট ও মধ্যযুগের ভারত—		
বসন্ত শিলা আন্দোলন ও হুম্মার চট্টোপাধ্যায়—			ঈশ্বরদাস কব	...	১০১
ঈশ্বরদাস কব	...	১২০	লালসকা (উপন্যাস)—		
বাঙালীর সংলাপ—ঈশ্বরদাস কব	...	২৮	ঈশ্বরদাস কব	১৭, ১৭৭, ২২৫, ৪১৮, ৫৫০, ৬৮১	
বারোয়ার সংস্কৃতি-চর্চা ও বাংলাদেশ—ঈশ্বরদাস কব	...	১২২	শব্দ-মতে : জ্ঞান-কর্ম-সম্ভববাদ—		
বাংলার আধুনিক তরুণ-তরুণী—ঈশ্বরদাস কব	...	২২৭	উত্তর ঈশ্বরদাস কব	...	১১৫
বাংলার বাউল ও বাউল গান সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য—			শব্দমতে সাধন : কর্ম—উত্তর ঈশ্বরদাস কব	৪২, ২১৮, ৩০৭, ৫০৪	
ঈশ্বরদাস কব	...	৬১৪	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১৮২
বালিকা বধূ (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	২৬৪	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	২০
বিদেশী নামের বাংলা প্রতিরূপ—ঈশ্বরদাস কব	...	৩০৪	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	৪১২
বিজ্ঞান (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৭২৬	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	২১৪
বিপিনবিহারী মেধাবী—ঈশ্বরদাস কব	...	৭০৭	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	৩৬৫
বিবিধ প্রসঙ্গ—	১, ১২২, ২৫৭, ৩৮৫, ৫১০, ৬৪১		শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	৮৪
বিরহিণী (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	২৮২	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১৭
বিধ কবিমেলা—ঈশ্বরদাস কব	...	৭৪০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
বিশ্বত্ৰয় উপজাতি বোডো—ঈশ্বরদাস কব	...	৬৪০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
বুড়োশিবের গাজন আর টেঙ্গী—ঈশ্বরদাস কব	...	৭২৭	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
বেগমপরি (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	২৫	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
বৌ-রাণীর ঘাট (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	২৭০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ—ঈশ্বরদাস কব	...	১০৫	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—ঈশ্বরদাস কব	...	৩২৭	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
ভারতে জনসংখ্যার রূপ—ঈশ্বরদাস কব	...	৫২২	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
ভারতের সংস্কৃতি—ঈশ্বরদাস কব	...	৭৫১	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
ঈশ্বরদাস কব	...	৭৫	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
ভালবাসা (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৪২৮	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মণিমালায় জন্ম (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৪২২	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মধ্যবিত্ত—ঈশ্বরদাস কব	...	৩৬৫	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মরকো—ঈশ্বরদাস কব	...	২৮০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মরণ (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৬৮০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মরুভূমি কি হুঁশে বাঁচিয়া আছে (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	১০১	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মহাকাশ (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৫৬৫	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মহাজল (গল্প)—ঈশ্বরদাস কব	...	৩০২	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মা (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	২১০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মানসিক রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য—ঈশ্বরদাস কব	...	৬০০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মানসিক স্বাস্থ্য—	ঈ		শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মূলধর (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৫৬০	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মূলধারার পরিচয়—ঈশ্বরদাস কব	...	৭৪৬	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮
মূলধর (কবিতা)—ঈশ্বরদাস কব	...	৪৫৬	শব্দমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক—ঈ	...	১০৮



## বিবিধ প্রসঙ্গ

অলকোর্ড অভিধান পাকিস্তানে নিষিদ্ধ  
অতি বর্ণে মাসুকের অবস্থা  
অথ চক্র ও চক্রী সমাচার  
অসুস্থত্রেণী কাহারো?  
অপচর বিষয়ে অজ্ঞতা, না উদাসীনতা?  
অপরাধমূলক চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ  
অব্যবস্থার খাতাকলে ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীরা  
আগরতলায় সেন্টাল এম্বুলেন্স-ইউনিট  
আটক-চিনি ঘরে তুলিতে খাগ-দণ্ডের অসম্মতি  
আততায়ীর গুলীতে বন্দরনায়কের মৃত্যু  
আকগান-ভারত মৈত্রী  
আবার ঐও ট্রাক রোডে দুর্ঘটনা  
আবার জলদহা  
আমেরিকায় ভারতীয় তাঁতজাত ব্রোয়ার চাহিদা  
আয়ুর্বেদীয়, চিকিৎসা ও তাহার ভেষজগুণ  
উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন সঙ্কট  
উল্লেখ্যতাই কি স্বাধীনতা?  
উন্নয়নের হটগোলে প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ  
উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ  
উপেক্ষনাথ গঙ্গোপাধ্যায়  
উড়িষ্যাকে লইয়া পশ্চিমবঙ্গের ঋণাঞ্চল গঠন  
উড়িষ্যার চাউল গেল কোথায়?  
এই চীনা লোকটি কে?  
কর্মী আছে কাজ নাই  
কক্ষে নিরোগে পক্ষপাতিত্ব  
করিমগঞ্জ হাসপাতাল  
কলিকাতা কর্পোরেশনের কলঙ্ক  
কলিকাতা শহরে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ  
কলিকাতার চীনা গুপ্তচর এবং গোপন খাতি  
কসবার সাংস্কৃতিক অগ্রগতি-মণ্ডলে অগ্রিকাণ্ড  
কানপুরে পুলিশের গুলীবর্ষণ  
কুমারী আরতি সাহার চ্যানেল অতিক্রম  
কুম্ভমেলার শোচনীয় পুনরাবর্তি  
কেন্দ্রীয় বাজেট  
কেরলার ভোটমুখে ইউনাইটেড ফ্রন্ট  
কুশলভের মুখে নতুন শান্তির বাণী  
কিতিমোহন চৌধুরী  
খাদ্যসম্পদ ও তাহার সমাধান  
গণতন্ত্র আজ কোন্ পথে?  
গৃহনির্মাণ সমস্যার মধ্যস্থিত পরিবার  
গোয়ালার অভ্যাচার  
ঐও ট্রাক রোডের আংশিক সংস্কার কাজে সরকার  
চক্রলোক-অভিযানে রাশিয়ার সাফল্য  
চলন্ত ট্রেনে আবার ডাকাতি

...	৯	চীনা না দিতে পারায় ছুরিকাঘাত	...	১৩৬
...	৭	চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নতুন বিপ্লব	...	৬২৪
...	৬১৩	চিনির দয় বৃদ্ধির কারণ কি?	...	৩৯৮
...	৬৬৬	চীন ও বিশ্বশান্তি	...	৬৪১
...	৬৭১	চীনা মানচিত্রে ভারতীয় এলাকা	...	১২
...	৬৬০	ছাত্রদের নৈতিক পতন ও তাহার মূল উৎস কোথায়?	...	৬১৯
...	৬৬	জলীপুর্ন যন্ত্রা-হাসপাতাল	...	১৪১
...	১৫	জনগণের সহিত পুলিশের সন্ধ	...	৬৪৩
...	১৪	ডঃ জন মাথাই	...	১৪৩
...	১২	জমিদারী বিলোপ সংশোধনী আইন	...	২৬১
...	১০	জাল পাসপোর্ট-প্রসার কারখানা আবিষ্কার	...	২৬৬
...	৬৬২	'জাল-ভেজাল' নাটকের পুনরুত্থান	...	৩৯৪
...	৩৯৮	ট্রেন-ডাকাতি রোধকল্পে উত্তরপ্রদেশ সরকার	...	৬৬০
...	১৩	ডাকাতের দলে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক	...	২৬৪
...	১৪	তাঁত-শিল্প এবং অস্ত্রাস্ত্র শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ	...	৬২২
...	৬৪৮	দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষাজ বিদ্রোহ	...	২৬৫
...	১৩৬	দণ্ডকারণ্য বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ	...	৬৬৪
...	৬৪৫	দণ্ডকারণ্যে বিশ্বাস অবহেলাওয়ার স্থিতি	...	১৩৯
...	৬৪৬	দর্শন ও বিজ্ঞান	...	৩৯৬
...	৬২৮	দরিদ্র দেশে মধ্যবিত্তের বিলাস	...	৬৪৮
...	৩৯৪	দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণে নতুন ব্যবস্থা	...	১৫২
...	৬৪৪	দলীপ সিং	...	২৭১
...	২৬৯	দামোদরের চতুর্থ বীধ উদ্বোধন	...	৩৯২
...	১৫	দিবালোকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড	...	১৩৭
...	৭	দ্রষ্টাপুর্ন ইম্পাত-কারখানার চাহুরির জটিল গ্রহিণী মৌচন	...	৬৬২
...	১৪১	দুর্ঘটনার সুরঙ্গ	...	৬২০
...	৬	দুর্নীতি দমনে অক্ষমতা	...	৬২৩
...	৩৯৪	দুর্নীতি দমনে ট্রাইব্যুনাল	...	৬৪৩
...	২৬৯	দুর্নীতির কবলে মিলজাত বস্ত্র	...	৬৬০
...	৬৪৩	দেব-দেবীর নামে খেলা	...	২৬৬
...	১৪০	দেশ কি অরাজক?	...	৬২৩
...	১৬	নব জাগরণ কামনা	...	১
...	৯	নয়াদিল্লীতে বিশ্ব কৃষিক্ষেত্র	...	৬২৬
...	৬৪৫	নিঃ ভাঃ বন্ধ সাহিত্য। সম্মেলনে স্বীকৃতিস্বরূপ চক্রবর্তী	...	৩৯৯
...	৬১৪	নতুন চুক্তিতে পাকিস্তান	...	১৩১
...	১০	পণপ্রদান-নিবারণী বিল	...	২৬৪
...	৬৪৬	পর্যায়িত-মুক্ত আর একটি দেশ	...	৩৯৬
...	৪	'পশ্চিমবঙ্গ' নামের অর্থোত্তিকতা	...	২৬৪
...	৩৯১	পশ্চিম বাংলার খাদ্যসম্পদ	...	২
...	১৩৫	পশ্চিম বাংলার বাজেট বিশ্লেষণে সুখামবী	...	৬৪৭
...	৬২৭	পাকিস্তানের সহিত নতুন বাণিজ্য-চুক্তি	...	৩৯৩
...	৬	পাগলাঘাট। করলানদীর উপর পুল	...	১৫
...	১১	পাল মেটে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার	...	২৬৮
...	৩৯৫	পালিতপুর-বন্ধের তা রোড	...	১৪২

## বিবিধ গ্রন্থ

পূরাকীর্তি সম্বন্ধে সরকারের অবহেলা	৩৯৩	সরকারে ভ্রাতৃবৎ কৃষিকৰ্ম ও জলোচ্ছাস	৬৫১
পুলিসের কর্তব্য-শৈথিল্য সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কঠোর নতব্য	৩৯২	সহানুগী হুগার দেবী	৩৯৯
পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার সমাজ-জীবন বিপন্ন	২৬১	মহিলা বাতীসের অভিযোগ	১৪২
পুলকের ভাৱে শিক্ষা-মানের অবনতি	৬৪৯	মাইক, লাউডস্পীকার	১৪
পুলকের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট বিষয়ে রাষ্ট্রপতি	৩৯৩	মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনে সরকার	৩৯৮
পোষ্টমাষ্টারের জিদ	৬৫৫	মাধ্যমিক শিক্ষা-লিঙ্কগে গলদ	৫
প্রতিরক্ষার অর্থ কি ?	২৫৭	মানবাত্মিক আদর্শবাদ সম্বন্ধে আইসেনহাওয়ার	৩৮৬
প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৯৯	মাগুয়ের আয়ু ও বিব	১৩৯
প্রশ্ন	১২৯	মিল-বজের দুর্ঘটনা	৫১৯
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় নতুন প্রচেষ্টা	৫২১	যত্নাধ সরকারের অনুল্য প্রচাণ	৩৫৩
বস্তার প্রতিকার কি ?	১৩৪	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন	৩৯০
বস্তার প্রতিরোধ	১৩৩	কৃত্তপ্রচেষ্টায় এলুমিনিয়াম কারখানা	১৩
বর্ণ-বিষেবী ইতালিন বেরারিংয়ের আর একটা দিক	১০	রাজনীতির চক্রান্তে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদল	২
বর্তমান কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সভাপতি	৫১৪	রাজ্যসভায় চীন বিতর্ক	২৬৬
বর্তমানে বিক্ষুব্ধ আমসমূহ	১৫	রাষ্ট্রসভ্য কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ	১৩১
বাজার হইতে চিনি উদ্ধাও হইল কাহার দোষে ?	৫১৬	রোগ ও তাহার প্রতিকার	৩৮৫
বারাসতের সদর রাস্তা	১৪১	রোগ-চিকিৎসায় মধু	৫২৫
বালকের বীরত্ব	১৩৮	রেলপথে দুর্নীতি প্রতিকারে রেল-কর্তৃপক্ষ	১৩৭
বালা-বিহারের সংযোগরক্ষাকারী বরাকর সেতু	৩৯৫	রেল-যাত্রীদের দুর্ভোগ	২৬২
বালুরঘাট সদর অপসারণের চেষ্টা	১৪২	লরী-চালনার ফলে গোবিন্দপুরে দুর্ঘটনা	৫২৪
বাস ও নামাল ভ্রমিক	৫২৭	শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ কোথায় ?	৫২৫
বাস দুর্ঘটনার কারণ ও তাহার প্রতিকার	২৬৫	শিক্ষা-ব্যাপারে গলদ কোথায় ?	১৩৫
বিজ্ঞানশিক্ষায় নতুন ব্যবস্থা	৬৫০	শিশু-রক্ষায় আইন প্রবর্তন	২৬২
বিজ্ঞানাগর কলেজের শতবার্ষিকী	৩৯৭	শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৫
বিধানসভায় তাণ্ডব নৃত্য	২	সনৎকুমার রায়চৌধুরী	২৭১
ডাঃ বি. পট্টভাটী সীতারামায়	৩৯৯	সমবায় খামার	১৩২
বিশেষ ক্রষ্টব্য	১৬	সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৮৭
বিশ্বজ্যোতিষ উপাচার্যপদে শ্রীহরীশঙ্কর দাশ	১৪৩	সরকার অবহেলিত গ্রাম	৩৫৫
বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে শ্রীনেহরু	৩৮৯	সরকার ও কাটকাবাজী	৫১৭
বিহারে হিন্দী প্রবর্তনে নতুন জুলুম	২৬২	সরকারী অর্থের অপচয়	২৫২
বেকারদের কণ্ঠীয় শ্রীনেহরু	১৪০	সরকারী টাকার অপচয়ে মেডিকেল স্টোঁস	৬৪৪
বেলঘরিয়ায় নারী ডাকাত	১৩৭	সর্বাধিক প্রাচীন গৃহস্থ আবিষ্কৃত	১৪৫
ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অসৎ আচরণ	৫২১	সাধারণ পরিষদে তিব্বত প্রসঙ্গ	১৫
ভাগীরথীর ভাঙন	৫২৭	সাধ-রেজিষ্টার আপিস	৬৪৫
ভারত-চীন সীমানা বিরোধ	৩৮৮	সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে জাপান	১৩
ভারত-গ্যাকিহান স্বরাষ্ট্রবহী সম্মেলন	১২	সুরেন্দ্রনাথের বাসভবন	৫২৮
ভারতবর্ষে মার্শাল ভরশিলক	৫১৫	সৈয়দ ফজল আলী	১৬
ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু	৫২৩	হুগমার্কেটে গুণ্ডা কর্তৃক ভ্রমস্থিলা লাঞ্চিত	৩৯৫
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য	৮	হাওড়া স্টেশনে দুর্ঘটনার ব্যবস্থা	৬
ভাষাতত্ত্বিক রাজ্যগঠন	১৩৮	হাসপাতাল ও জনগণের স্বাস্থ্য	৫২৭
(অধ্যাপক) সম্বন্ধমোহন বসু	১৪৩	হাসপাতাল হইতে নবজাত শিশু লইয়া কুকুর উদ্ধাও	৩৯৭
		হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী	৫২৮

# চিত্রসূচী

## রঙীন চিত্র

অর্জুনাবির—ঈনন্দলাল বহু  
আজান—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর  
আশ্বিনিনাথ—ঈপ্রভাত নিমোগী  
কালী—চিত্তামণি কর  
জলসর—ঈবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী  
ফোলনচাঁপা—ঈনন্দলাল বহু  
ফোলপূর্ণিমা—ঈসেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী  
পত্রলিখন—ঈশিবশঙ্কর কুহু  
পাহাড়তলী—ঈপকানন রায়  
প্রতীক—ঈসত্যেন্দ্রনাথ লাহা  
সেফলকার—ঈপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
সন্ধ্যা-প্রদীপ—ঈনন্দলাল বহু  
সাপু—ঈঅসিতরঞ্জন বহু

## একবর্ণ চিত্র

অধ্যক্ষ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অভিনেতৃবর্গ  
আগ্রাহার্জ্যের দেওয়ান-ই-খাসে মজলিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী  
কঙ্কাকুমারীতে ১৯২২ সনের শেষ স্তব্ধতা  
কুলভাগীর মনালি শহরের একটি মনোরম দৃশ্য  
কেনাকাচো—ফটো : ঈপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়  
ক্রুশ্চভের বিদ্যার-সংস্করণ আইসেনহাওয়ার  
খররোহে—ফটো : ঈরমেন বাগচী  
গঙ্গাতীরে— ঐ  
জটার জালে চিত্রাবলী—

—জলকনকা

—পৌরীকুণ্ড

—শিপুলকুটির পথ

—বদরিনাথ—দূর থেকে

—বিকটপঙ্খ

—শেষ পদ্মপূর্তা

জ্যোৎস্নামাবিহিত মঠ—শিল্পী : ঈচিত্রনিভা চৌধুরী

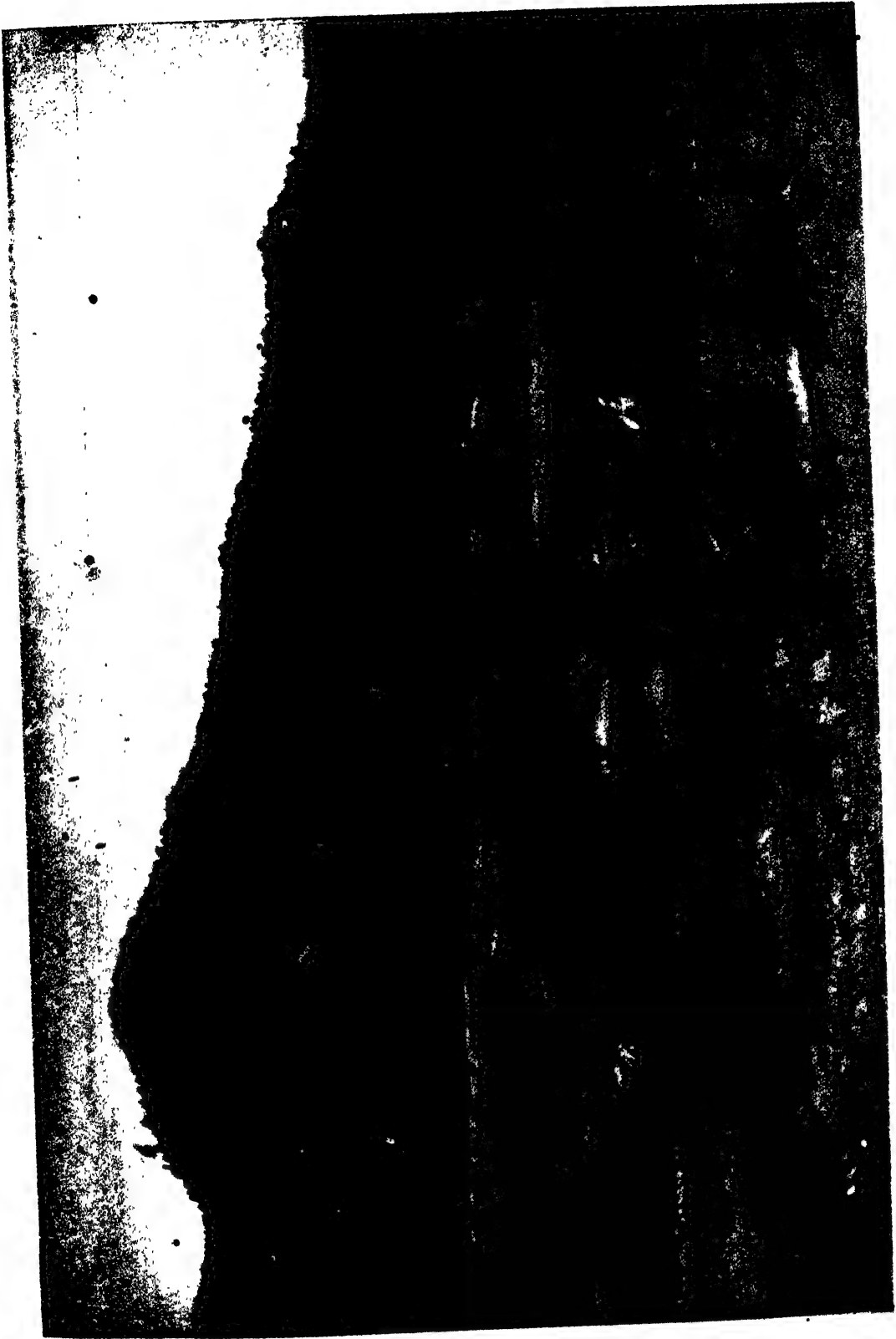
ডাল থেকে প্রভাত—ঈনগর—ফটো : ঈসচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডিব্রুত ও ভারত চিত্রাবলী—

—সুতন দলাই লামা

—ডিব্রুতের একটি বুদ্ধের বিহার

...	৩২	তুবারশুহী (হুইজারল্যাও) - ফটো : ঈসচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৮১
...	৩২	থাই লোকনৃত্য	...	৫৫৩
...	১৭৭	দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ	...	২০৮
...	৩২৯	হুই বোন - ফটো : ঈশান্তকু চট্টোপাধ্যায়	...	২৯৬
...	৫৬	নিউইয়র্ক-প্রদর্শনীতে ভারতীয় তাঁতশিল্প	...	৫৫৩
...	২৫৭	নিউদিল্লীতে অভ্যাগতাদেহ সহিত আইসেনহাওয়ার	...	৪২৫
...	৭০৪	নির্জনে—ফটো : ঈরমেন বাগচী	...	৫৭
...	৫৮৫	নৃত্যশিল্পী বৈজয়ন্তীমালা প্যারিসে অনুষ্ঠিত নৃত্য-প্রদর্শনীতে	...	১২৯
...	৫১৩	পঞ্চাবে পশু-প্রদর্শনী	...	২০৯
...	১	পরিবহন সমস্যার সমাধান - ফটো : ঈঅমল সেনগুপ্ত	...	১২২
...	৬৪১	পর্বত-দুহিতা—ফটো : ঈসচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৪২৪
...	৩৮৫	পহেলগাওয়ের একটি মনোরম দৃশ্য—ঈনগর—ঐ	...	৪২৪
...	৪৬৫	পাহাড়ী মেয়ে - ফটো : ঈশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৫১৩
...	১২২	প্রভাময়ী মিত্র	...	৩৭২
...	২৫২	প্রাসাদ-উত্তান - কাশ্মীর—ফটো : ঈসচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৬৬১
...	২০৯	প্রাসাদ-তোরণ (বাকিংহাম) - ফটো : ঈসচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৮১
...	৫৫২	কলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণ	...	৫৩৮
...	৮০	বন্দিনী - ফটো : ঈসোরেন মুন্সী	...	৫৭
...	১	ভারতীয় পাল্লিমেন্ট অভিসংগে আইসেনহাওয়ার	...	৪২৫
...	২২৭	মনোবোগ - ফটো : ঈহরীকেশ ভট্টাচার্য	...	৬৮০
...	৩৮৫	মমতা - ঐ	...	৬৮০
...	২২৭	মাছধরা—ফটো : ঈরমেন বাগচী	...	৬৮৫
...	৪৭১	মাতা-পিতার সঙ্গে সপ্তমবর্ষীয় রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা	...	৫৪৯
...	৩২১	মালাবার থেকে বোম্বে - ফটো : ঈপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
...	৫৭৮	মীরটের সন্নিকটে গ্রামবাসীরা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া এই রাস্তা	...	৮০
...	৫৭৮	তৈয়ারি করিয়াছে	...	৬৮১
...	৬৯৯	রবার-নির্গাস নিষ্কাশনে কেরেলার রমণী	...	২৯৬
...	৬৭	রাখালিয়া ফটো : ঈরামকিন্দর সিংহ	...	৫৫২
...	১৮৯	রাজহাটের মন্ড-প্রান্তরে	...	৬৮১
...	৪৫৮	রাজহাটে রাস্তা নির্মাণে পুরুষ ও স্ত্রী কন্দিদল	...	২৯৪
...	৬৮১	রামহাগল—ঈঅনিলকুমার দে	...	৫১৫
...	৩২	লুকাচুরি খেলা—ফটো : ঈশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়	...	২৫
...	৩০, ৩৩	ঈনেহর ও আইসেনহাওয়ার	...	২৫৫
...	৩২	সত্যকিন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৭৫
...	৩০, ৩৩	হেমলতা ঠাকুর—শিল্পী : ঈচিত্রনিভা চৌধুরী	...	৪৭৫



যদিও এসে ক'লক'ত

১৯৭১

পাঠ্যক্রম  
দ্বিতীয় ভাগ



কেনাচে,

দশোঃ পরমলচন্দ্র মথোপাধ্যায়



ইলাবার থেকে বোম্বে

দশোঃ পরমলচন্দ্র মথোপাধ্যায়

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়েমাস্য বলহীনেন লভ্যঃ”

১৯১৯ সাল  
২য় খণ্ড

কাহিনী, ১৩৬৬

১৯১৯ সাল

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### নবজাগরণ কামনা

শাশ্বত বাক্যাদির একান্ত নিজস্ব উৎসব। এই উৎসবে সকল ভগ্নিত হইতে জাগরণ এবং পরে শক্তির পূজার, বাঙালী তাহার সমস্ত বংশের চৈতন্য-প্রাণি দূর করিবার চেষ্টা করে—অন্ততঃ পক্ষে তাহাট্ট এই উৎসবের মূল প্রেরণা ছিল। অকালবোধনের পূর্ণ সজ্জা, নিখুঁত ব্যাখ্যা, নানানভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু তরল ও ক্রান্তি দেহ মনে নূতন চেহারা এবং নবীন জাগৃতি ও শক্তির আবাহন বোধ হয় তাহ সব কয়টিতেই আছে, নচেৎ এই পূজা বাঙালীর কাছে এরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিত্য নূতন ও প্রাণময়ী হইয়া থাকিত না।

এমন বাঙালীর জীবনে একটি নূতন বিশেষ্যের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইহাও প্রধান লক্ষণ হইল, বার্ষিকতার স্বীকৃতি এবং সেইজন্য উদ্ভাসিত ও শক্তিশালীনের আকোশ ও আশঙ্কান। এই আকোশের ও আশঙ্কানের বহিঃকরণ—নষ্ট করায় ও ভাঙিবার প্রবল স্পৃহা। “আমার যখন কিছুটা থাকিবে না তখন অস্ত্রের থাকে কেন? আমি যখন কিছুটা গড়িতে পারিব না তখন অস্ত্রের গঠনের কাজ থাকিবে কেন?” এইরূপ যুক্তি এবং এই স্পৃহার পরিণাম বিনাশ ও ধ্বংস, কেননা শক্তিময় বাহ্যতা তাহার এইরূপ স্পৃহাকে প্রসঙ্গ কখনই দিবে না, উপরন্তু যদি শক্তির সহিত বৃত্তির যোগ থাকে তবে ঐ বার্ষিকতার অভিশপ্ত দোকমপটিকে আরও বর্ধিত ও সর্বিংহারা করিবার ক্ষেপিতে চেষ্টা হইবে। আজ বাঙালীর জীবনে এই আশঙ্কা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে।

অবশ্য একথা আমরা বহুবার পূর্বেও লিখিয়াছি। কিন্তু সপ্রমাণ দেখিতেছি একদল পণ্ডিত লোক দেশের এই নিয়গতির নানা অপকরণ ব্যাখ্যা দিতেছেন এবং কেহ কেহ আরও আশঙ্কা প্রতিকারের উপায়ও নির্দেশ করিতেছেন। এই সকল ব্যাখ্যার মূলে ইতিহাসের অভিন্ন বৈকল্য ও নির্দেশের মূলে মানবদেহের সকল নীতির অশলাপ আমরা দেখিতে পাই।

পণ্ডিতজনের কুটকলের দ্বারা বাহাই হউক, দেশের ও দেশের

অবস্থার অবনতি হইতেছে তাহা কি অস্বীকার করা যায়? “ইহাট্ট কালের গহি, ইহাট্ট যুগধর্ম”—এই কথা স্বীকার করিয়া কপাল চাপড়াইলে বা নিজের বুদ্ধিবিচারের ক্ষমতা বিসর্জন দিয়া পরের উজ্জিতে ধ্বংসলীলার নাটিলে কি কোনও উন্নতি, কোনও প্রতিকার সম্ভব? অতএব এই প্রশ্ন প্রত্যেকের নিজ নিজকে করা প্রয়োজন হইয়াছে মনে হয়। কপট তাত্ত্বিক বা বিচারহীন ঐতিহাসিকের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিলে তা বার্ষিকতা ও শক্তিশালীতার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ইহা কি ঐতিহাসিক সত্য নহে যে, ঐ স্বীকৃতির পরিণাম দাসত্ব ও বিনাশ?

এই অল্পদিন পূর্বেও এই মহানগরীতে ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলিতেছিল। আমাদের পক্ষ সমীচীনতা যে, যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল সেই ভাবে উহা বাড়িতে পার নাই। উহা কেন হইয়াছিল, কারণ দোষে ধ্বংসের আশঙ্কা জন্মিয়া উঠিয়াছিল, এই লইয়া তব চলিতেছে। তকের অবতারণা যাহারা করিয়াছেন তাহারা একথা কোথাও বলেন নাই যে, তাহারা এই রাষ্ট্রনৈতিক জুয়ার চালে যাহাদের দাবাবড়ে হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাদের এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিলিপ্ত নিরীহ জনসাধারণের যে ক্ষতি হইল সে বিষয়ে তাহারা কখনও চিন্তামাত্র করিয়াছিলেন কিনা, জুয়ার চাল চালিবার পূর্বে। বৎস বৃত্তিতত্ত্বের ধরনে একথাই মনে হয়, তাহারা আশা করিয়াছিলেন যে এইরূপই ঘটবে।

জাহাঙ্গীর মনোভাবের বিশ্লেষণ কাজ নাই এখন, প্রয়োজন শুধু দেশের লোকের চৈতন্যোদয়ের। শূন্যলীয়ার আমাদের সন্মাপেক্ষা কাম্য চৈতন্যের উদয়, বাহাতে বাঙালী পুঙ্খবশ মত নিজ বিচারবুদ্ধি বিবেচনার নিজের ও নিজ সম্মান-সম্মতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া চলিতে পারে। আমাদের সম্মান-সম্মতির যথো এক অংশ শুধু যে নিজের দাসত্ববরণ করিতেছে তাহা নহে, তাহাদের, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করিতেছে।

কর্তৃপক্ষের অশেষ দোষ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু “নিজের নাক কাটিয়া পরের বাত্মা ভুল” বুদ্ধিমানের কার্য নহে, একথা যেন এই শাসনীয়ের শুভকণ্ঠে আমাদের বোধগম্য হয়।

## বিধানসভায় তাণ্ডব-নৃত্য

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গত ২১শে সেপ্টেম্বর যে কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল, তাহাতে লজ্জায় সকলেরই মাথা হেঁট হইবে। এতদিন অপ্রাপ্তবয়স্করা পরীক্ষায় হলে চেয়ার-বেঞ্চ-ডেস্ক-টেবিল ভাঙিয়াছে, কালিয় দোয়াত ছুড়িয়াছে, খাতাপত্র ছিড়িয়াছে। চাক্ষুণ্যে এই আচরণে আমরা বহুবার নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু আজ প্রাপ্ত-বয়স্কদের এই আচরণ নিন্দ্যও অযোগ্য। অথচ ইঁদারাই পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যের অভিভাবক, জন-প্রতিনিধি। রাজ্যের আইনকানুন রচনায় মহান দায়িত্বও ইঁদারের উপর। কেবল দায়িত্ব নয়, উহা পালনের জন্য এই সকল পশ্চিমবঙ্গ বিখ্যাতদের প্রত্যেককে জন-সাধারণের অর্থ হইতে মোটা হারে মাসোকায়া, ভাতা প্রভৃতি দিতে হয়। সম্ভাব্যতার কথা আর তুলিব না, বিধানসভায় জন-প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের যে রেকর্ড ইঁদারা স্থাপন করিলেন তাহার তুলনা আর কোথাও নাই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বাদ-বিতণ্ডার সুযোগ বঞ্চিত থাকে, গুরুতর বিষয় লইয়া বিতর্কও উপস্থিত হইতে পারে। রাজ-নীতিতে বাদ-প্রতিবাদ হওয়াও স্বাভাবিক, এক পক্ষ অপরা পক্ষের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তর পর্যন্ত ঘটিলে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু আপত্তি সেইখানেই উঠিবে, যেখানে মারামারি, গালাগালি, জুতা এবং লোহনও ছোড়ার মত নোংরাই হয়। এইরূপ বিতর্ক-মঞ্চ লইয়া রাজ্য করা চলে না। ভ্রমতা ও শালীনতার যেটুকু শিক্ষা নাগরিকসমাজেই আছে, তাহার বিদ্যুৎ নিবারণও এই সব রাজনীতি ধুরন্ধরদের আচরণে দেখা যায় নাই। অথচ ইঁদারাই পশ্চিমবঙ্গের ভাগা-বিভাতা। ইঁদারাই অপরকে রীতি-নীতির বড় বড় উপদেশ দিয়া থাকেন। আজ যে আচরণের নিদর্শন তাঁহারা দাখিল করিলেন, তাহার কলঙ্ক বৃদ্ধি কোন দিনই দোঁত হইবে না। সবচেয়ে অশোভ্য, পার্লামেন্টারী রীতিনীতির মর্যাদার যুগে জুতা মারিতেও ইঁদারের লজ্জা হয় নাই। ইঁদারাই আবার পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক বিপণ্য দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস করেন।

এদেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিপণ্য হইলে, জন-সাধারণের বিদ্যুৎ লাভ হইবে না, ইঁদা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। পূর্ব-পাকিস্থানের বিধানসভার সদস্যগণ যে বণতাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন এবং বাহ্যিক ফলে হতভাগা ডেপুটি স্পীকারের প্রাণ পর্যন্ত যায়, তাহার পরিণাম কি হইয়াছে তাহাও কাহারও অজ্ঞাত নয়। আমরা বিচার তাহাদেরদি, আজ যে সেই বিচারের কালিমা সংশ্লিষ্ট হইয়া নিজেদেরই মুখে পড়িতেছে! সবচেয়ে দুঃখের কথা, জেলেদের সম্মুখে যে আদর্শ তাঁহারা দাখিল করিলেন, তাহার বিষয় প্রতিক্রিয়া আগামীকালের সমাজ-জীবনকে পর্যন্ত কলুষিত করিবে। প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁহাদের সর্ব্বদা দি।

## রাজনীতির চক্রান্তে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদল

যুগধর্মে রাজনীতিই আজ সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের জন্য একসময় এই রাজনীতির প্রয়োজন ছিল, তখন ইহা কাহারও অশ্রদের হয় নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দলীয় রাজনীতির প্রয়োজন হইত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজ-জীবনের সকলক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? একে ত আজাদের দেশে এই দলীয় রাজনীতি রাষ্ট্র-পরিচালনার সুস্থ ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, তার পর যদি সেই অপরিণত এবং অপরিণামদর্শী দলীয় রাজনীতি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পৌর-ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে অধিকার করিয়া বসে, তাহা হইলে আদর্শ-বিজাট কত ঘটিবেই।

দেখিতেছি, স্কুল-বোর্ডে সদস্য নির্বাচন ব্যাপারেও সেই দলীয় চক্রান্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এখন কথা হইল, স্কুল-বোর্ডের উপর প্রকৃত কাজের সংহত দলীয় রাজনীতির কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তদ্ব্যবধান করার কাজ স্কুল-বোর্ডের। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, প্রজা-সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের সহিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। শিক্ষা বিষয়ে যাহারা অভিজ্ঞ এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সত্যসত্যই উৎসাহী তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যাজ ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই।

অথচ যজ্ঞা এই, দলীয় রাজনীতির বন্দ বন্ড বাড়িতেছে, জন-কল্যাণমূলক লোকস্বার্থ প্রতিষ্ঠানগুলি ততই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মে হীনোতি ও বিশৃঙ্খলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ কর্ণায়েণের সভা আর ময়দানের মিটিং-এ পার্থক্য নাই—না উদ্দেশ্য, না আচরণে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই রাজনীতির অভিমান আরও গভীর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে। শিক্ষকের সঙ্গে আজ ছাত্রদলও আসিয়া ভিড়িয়াছে। অবশ্য তাহারা আসিতেছে না, তাহাদের দলে টানা হইতেছে আপন আপন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। অপরিণতবুদ্ধি বালক, না বুদ্ধি উত্তমনার বেশে ঝাপটিয়া পড়িতেছে—কিন্তু এ সর্বনাশ যাহারা করিতেছেন, তাহারা কি একবারও ভাবিতেছেন না, দেশের কত বড় অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিতেছেন!

বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক সঙ্কল্প এবং প্রয়াস রোধ করা যাইবে না জানি। কিন্তু দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং আচরণ সংযত করা অসম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আর কিছু না হইক, অন্তত-পক্ষে শিক্ষা ও জনকল্যাণের অজ্ঞাত উত্তোগ যাহাতে দলীয় রাজ-নীতির কুক্ষিগত না হয় তাহার জন্য সুপরিচালিতভাবে চেষ্টা করা উচিত।

## পশ্চিম বাংলার খাড়া-সমস্যা

পশ্চিম বাংলার খাড়াশক্তির অভাব আজ নূতন নয়, ভারত বিভাগের পর হইতেই এই সমস্যা লাগিয়া আছে। পূর্ববঙ্গ হইতে

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের আগমন, ভারত বিভাগের ফলে অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ কৃষিজমিই পাকিস্তানের অল্পভুক্তিকরণ প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গের খাজ-উৎপাদনে ঘাটতি প্রায় চিরস্থায়ী ঘাটতিতে পরিণত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া খাজ-ঘাটতি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সমস্যা সমাধানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যায়ইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের খাজশস্যের ঘাটতির ফলে এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ প্রায় স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে তাহা সর্বজনবিদিত।

বাংলা দেশে চাউলের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাধারণ চাউলের মূল্য সাধারণতঃ ৩০ ৩৫ টাকাতৈই থাকে। বাংলা দেশে গরীব লোকদের মধ্যে অনেকেরই চাউলের অতিরিক্ত মূল্যের জন্য ছোলায় ছাতু খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে চাউলের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে বেসরকারী দোকান এবং সরকারী দোকানসমূহ হইতে চাউল বলিয়া যে জিনিস সংবহন করা হয় তাহা পুরোপুরি খাট চাউল নহে, ইহা কঁকড় মিশ্রিত চাউল। আমাদের মিশ্র অর্থনীতিতে চাউলেরও খাটরূপ গিয়া মিশ্ররূপ আসিয়া পড়িয়াছে। চাউলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি এবং কঁকড়-মিশ্রণ ইত্যাদি অত্যাচার প্রতীয়মান করে। এই প্রদেশে খাজমন্ত্রীর হিসাব অনুসারে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ টন। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের আইনপরিষদের কতিপয় কংগ্রেসী সভ্য পশ্চিম-বঙ্গ সফর দিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন যে, এই প্রদেশে চাউল নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং ঘাটতি হওয়ার কারণ কিছু নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই সাফাই গাওয়া স্বপ্নেও পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় পরিমাণে চাউল পাবনা যাইতেছে না এবং বাতাও পাবনা যাইতেছে তাহার মূল্য এত অত্যধিক যে, তাহা সাধারণলোকের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে।

কেন্দ্রীয় খাজমন্ত্রী শ্রী পাতিলও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এবং স্তব্ধ বাংলা দেশেও খাজের প্রকৃত কোনও অভাব নাই; যে অভাব দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ বিতরণ-বৈষম্যের দরুণ। ভারতের এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে প্রয়োজন অনুসারে খাজ-শস্যের আমদানী-রপ্তানী করা হয় না এবং তাহার ফলে কোথাও খাজশস্যের প্রাচুর্য এবং কোথাও ঘাটতি দেখা যায়। অবশ্য সর্ব-ভারতীয় প্রয়োজন অনেক বেশী, তাহাতে ঘাটতি দেখা যায় এবং সেই ঘাটতি পূরণ করা হয় বিদেশ হইতে আমদানী দ্বারা। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে ভারতে যে ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিক সেই পরিমাণে খাজশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না।

১৯৫২ সনে বর্ষ জনসংখ্যায় সূচী দ্বারা হয় একশত, তাহা হইলে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সনে এই সূচীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৮-এ, ১৯৫২ সনে ভারতে লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি, আর বর্তমানে হইয়াছে ৪০ কোটি। ১৯৫২ সনে কর্তৃত্ব জমির পরিমাণ-

সূচী ছিল ১০০, আর ১৯৫২ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ১০৮-এ। ১৯৫২ সনের তুলনায় খাজশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের সূচী ১৯৫১ সনে মাত্র ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে মোট খাজশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬ হইতে ৭ কোটি টনের মধ্যে নির্দিষ্ট আছে; ১৯৬৬ সনের মধ্যে খাজশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ ১১ কোটি টন হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ ঘাটতির পরিমাণ আরও অধিক হইবে।

বাংলা দেশে ১৯৫২ সনের পর হইতেই খাজশস্যের উৎপাদন মাত্র সাত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু এই সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫ হইতে ২০ শতাংশ হইয়াছে, স্তব্ধ পশ্চিমবঙ্গ চিরন্তনভাবেই একটি ঘাটতি-প্রদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং চাউল সংবহনের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে অসহ্য প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। বাংলা দেশের খাজ-ঘাটতির প্রধান কারণ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প উৎপাদন এবং বাতা উৎপাদন হয় তাহার বিতরণে কল্যাণ, অসংযত ও অকর্মণ্যতা দেখা যায়। বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহার খাজমন্ত্রী প্রশংসায় পঞ্চমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন যে, বাংলা দেশের খাজ সঙ্কলন করা দুষ্কর ব্যাপার এবং কোনও খাজমন্ত্রীর পক্ষেই তাহা সহজসাধ্য হইবে না। কিন্তু ডাঃ রায়ের প্রশংসাতে বাংলা দেশের খাজ সংবহন কিংবা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য, এবং ডাঃ রায় নিজের স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিম বাংলার খাজমন্ত্রী নিজের দায়িত্বে কিছু করেন নাই, তিনি বাতা কিছু করিয়াছেন তাহা সমগ্র ক্যাবিনেটের সম্মতিতে, অর্থাৎ ডাঃ রায়ের দায়িত্বে।

সহজ কথায় পশ্চিম বাংলার খাজ-সমস্যার জন্য শুধু খাজমন্ত্রীই দায়ী নহেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং সমগ্র ক্যাবিনেটই এই পদস্থিতির জন্য দায়ী। গত বার বৎসর ধরিয়া তাহারা এই প্রদেশের খাজ-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই, ইহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। মুখ্যমন্ত্রী জেএর গলায় বলিয়াছেন, চাউলের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাজারে চাউলের মূল্য সেরূপ হ্রাস পায় নাই, বরং কোথায়ও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রদেশকে খাজশস্যে স্বাবলম্বী করা কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব, এবং সেই দায়িত্বে ইহারা ইহাদের দীর্ঘস্থিতির পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত আবাদী জমি পতিত পড়িয়া আছে সেই সমস্ত জমিকে চাষের আওতার আনিবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বড় বড় জোতদার ও আভুতদাররা যে চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছে এবং বাজারে ছাড়িতেছে না সে সবকে কর্তৃপক্ষ কোনও কঠোর পন্থা অবলম্বন করেন নাই। চাউলের কলের উপর লেভী-প্রথা আরোপ করা উচিত ছিল, তাহাও করা হয় নাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও তাহার অপসারণ রহস্ত-জনক বলিয়া মনে হয়। যখন চাউলের মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই পড়তির দিকে ছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যবসায়ীগণকে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির বিষয়ে সহায়তা



করিয়াছেন। তাঁহাদের জানা উচিত ছিল, চাউলের উৎপাদন এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া নৃশা নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে কালো-বাজারের সমৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অভাব ঘটিতে বাধ্য।

গত বারো বৎসরে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীগণের পঞ্চাশত উৎপাদনের জন্ত কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাকে কার্যকরী করিবার জন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে নিবন্ধে অল্পসঙ্কলন হওয়া প্রয়োজন। শুধু গাউন বিভাগ নহে, খাদ্য এবং মৎস্যবিভাগ সম্বন্ধে তদন্ত অতি অবশ্য হওয়া প্রয়োজন, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দুইটি বিভাগই বহু প্রকার কলঙ্কে কলঙ্কিত। শুধু আইনপরিষদের সংযোগবিহীন ব্যবস্থা ইহাদের কাব্যতৎপরতার অভাব ঢাকা দেওয়া বাইবে না। সুন্দরবন এলাকা বাংলা দেশের শস্যগাংর বলিয়াই অভিহিত হয়, কিন্তু সেই সুন্দরবন এলাকা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃত্তি ফলে প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ চাষী এখন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। এ বৎসর অবশ্য অতিবৃষ্টি ফলে আবাদীশস্য নষ্ট হইয়া বাগার সঞ্চাবনা আছে। কাঁচি মহকুমার জুনপুট এলাকার সমুদ্রতটে তাহার তাহার বিঘা আবাদযোগ্য জমি পতিত পড়িয়া আছে। এই জমিসমূহকে বাঁধা নিষ্কর অধীনে বাসিয়া ভাগচাষী দ্বারা চাষ করাইতে পারে।

জমিদারী প্রথা লোপ করিবার ফলে যে সকল জমি দাষ্টের করায়ত্ত হইয়াছে সেগুলিকে খাসমহালের অধীনে রাখিয়া ভাগ-চাষের ব্যবস্থার চাষ করাইলে প্রাদেশিক সরকারের উৎপাদনের উপরও বিরাট কর্তৃত্ব আসিয়া বাইবে এবং তাহার ফলে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সুবিধা হইবে।

### খাদ্য-সমস্যা ও তাহার সমাধান

কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী জি. এস. কে. পাতিল বলিয়াছেন, “খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা সম্পর্কে ভীতিবোধই খাদ্য-সঙ্কটের কারণ।”

সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, এই মন্তব্যকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ ইহা ত অস্বীকার করা যায় না, প্রতি বৎসরই ঠিক যে সময়ে বতরু কৃষ্টি দরকার, সে সময়ে ঠিক ততটুকুই বৃষ্টি হইবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ অমূল্য থাকিবে, ইহা আশা করাই অসম্ভব। পৃথিবীর কোথাও তাহা ঘটে না, ঘটিতে পারেও না। বহু বৎসর ধরিয়া আবহাওয়ার গতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অস্বাভাবিক দু'একটি বৎসর ছাড়া প্রায় প্রতি বৎসরই দেশের এক অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপদার ঘটিলে, অত্র অঞ্চলে প্রকৃতি শাস্ত থাকে। কাজেই এক অঞ্চলে ফলন হ্রাস পাইলে অত্র অঞ্চলের ফলন বৃদ্ধি দ্বারা সে ক্ষতি উন্মূল হইয়া যায়। সুতরাং সরবরাহ ব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিতে পারিলে, কোথাও ফলন হ্রাস হইলেও খাদ্য দুশ্চাপ্য হইবার কথা নয়। উক্ত অঞ্চলের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য ঘাটতি-অঞ্চলে পাঠাইয়া ভাষা দ্বারা বিক্রয়ের

ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এ সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইতে পারে। সুতরাং জি. পাতিল সত্যই বলিয়াছেন যে, গত কয়েক বৎসর বাৎসরিক নিয়মিত খাদ্য-সঙ্কট মানুষের হৃদয়ই স্পষ্ট। দেশের প্রত্যেকটি লোক সংভাবে চলিলে ইহা হইত না। কিন্তু বিপদ হইয়াছে এখানেই—মানুষ আজ ভিন্ন পথে চলিয়াছে। এই ঘটনা ও সরবরাহ-ব্যবস্থার ক্রটির জটিল মনুষ্য আজ ভিন্নরূপ ভাবে সূচক করিয়াছে। উৎপন্ন ফল যা ভাষা দ্বারা বিক্রয় হইবে, ইহাতে কাঁচাও আসা নাই। ভবিষ্যতে দর চড়িবার আশঙ্কায় সম্পন্ন চাষী যথাসম্ভব বেশী ফল বিক্রয় রাখে, ধনী গৃহস্থ স্বাভাবিক ক্রয়ের তুলনায় বেশী খাদ্য কিনিয়া ভাড়ায়ে মজুত করে জোতদার-আড়তদার-পাইকার এবং খুচরা ব্যবসায়ীরাও ধরিয়া লয় যে, রাষ্ট্রের পক্ষে ভাষা দ্বারা ন্যূনতম চাহিদা পূরণের উপযোগী ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, সেজন্য বৎসরের শেষ দিকে দর চড়িবেই। সুতরাং তাহাও হয় নিজেই গোলায়, না হয় দান দিয়া অপরের মাথকতে খাদ্যপ্রত্য প্রকৃত্ত বাজার হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ফলে, এই সব মিলিত চেষ্টায় বাজারে আর মাল পাওয়া যায় না। সরকারী ভাবগতিক দেখিয়াও তাহাদের আর আস্থা ন'ই। নতুবা প্রতি বৎসরই আশঙ্ক-স্ফারণ মাস হইতে খাদ্যপ্রত্যের দর চড়াইবার ব্যাপারে তাঁহারা নিজের ও অসহায় লোকের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন কেন? প্রধানতঃ আস্থার অভাবেই অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সরকারপ্রণেয় মন হইতে এই সব ভয় দূর করিতে পারিলে উন্নতি অবশ্যস্বাভাবিক।

জি.পাতিল আর একটি মন্তব্য বাড়া করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা একমত নই। তিনি বলিয়াছেন, দেশে সব বস্তু পাওয়াই পর্যাপ্ত অবস্থায় আছে। ইহা তাঁহার কল্পনামাত্র। তুণ, মাংস, মাছ, তৈল, বৃত, টাটকা ফল প্রভৃতি যোগ-প্রতিযোগিতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি যে অত্যন্ত বেশী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং চাউল, গম, ডাইল প্রভৃতি মূল খাদ্যশস্যগুলিও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে করার কারণ নাই। খাদ্য-ঘাটতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারদর চড়িয়া যায়, ফলে অধিকাংশ লোক খোঁরাকীতে শস্তের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। সেজন্য মোট বিক্রয়ের পরিমাণও কমিয়া যায়। অতএব স্বাভাবিক চাহিদার ভিত্তিতে বৎসরের প্রথম দিকে যে ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল, কয়েক মাস বাৎসরিক পাইকারী হায়ে কম খাওয়ার জন্ত, বৎসরের শেষে ঘাটতির পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে অনেক কম দাঁড়ায়। কথাটা সহজ করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায়, ফলন হ্রাসের জন্ত যে ঘাটতি পড়ে, মূল্যবৃদ্ধিতেও কম খাওয়ার জন্ত সে ঘাটতি উন্মূল হইয়া আসে। সুতরাং সমস্যাটি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায় যে, দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত থাকা সম্ভব নয়। ১৯৫৫ সনের শেষ হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত খাদ্যপ্রত্যের দর ক্রমশঃ চড়িয়াছে। সুতরাং নিছক অর্থভাবেই জন্ত ক্রেতারা খাওয়া কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরের শেষে খাদ্যপ্রত্য

মজুত থাকায় কথা। এক বৎসর বা দুই বৎসর পর্যন্ত মজুতদার-  
দলের পক্ষে পুরাণো গম-চাউল প্রভৃতি আটক করিয়া রাখা অসম্ভব  
না হইতেও পারে। কিন্তু গত পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসরই  
বিক্রয় দ্রাসের জন্য মজুত খাদ্যশস্য এইভাবে আটক করিয়া রাখা  
হইয়াছে—এ ধারণা অসম্ভব। আর নতুন খাদ্য-সচিবের ধারণাই  
যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় উঠিবে যে, এই পাঁচ বৎসরের মজুত  
শস্য কোথায়? এ পরিমাণ ফসল মজুত রাখার জন্য গুদাম  
বা সামর্থ্য মজুতদারদলেরই নাই। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব থাকিলে  
নিশ্চয়ই বাস্তবে দেখা যাইত।

খাদ্য-পরিবহনায় সর্বাধিক বড় দুটি ঘটনাকে সমগ্র জনগণ  
ও বাপকতা ভালকি করিয়া দেখিবার ঈর্ষা জনসাধারণের  
মনোবল বর্ধন করিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকৃত  
অবস্থা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা উচিত ছিল,  
একদিন এ নাকি ধরা পড়িবেই। এক দৈনিক উপাধন বৃদ্ধি,  
অন্যদিকে জায়া দার ও জায়াভাবে বর্ধনের ব্যবস্থা ইহা যে সমস্ত-  
সমাধানের স্থায়ী ও অনিশ্চিত উপায় সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই।  
সুতরাং সর্বাধিক আশ্রয় নতুন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে,  
উপাধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জায়া বর্ধন ও সহনযোগ্য কোন রীতিতে  
করা যায়

### আটক-চিনি ঘরে তুলিতে খাদ্য-দপ্তরের অসম্মতি

কিছুকাল আগে চিনি-চালান নিয়ন্ত্রণ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যে  
দশ তাজার মণ চিনি পশ্চিমবঙ্গ হটতে গোটাটিতে পাঠান হইতে-  
ছিল, এনকোর্সমেন্ট পুলিশ স্টেট চিনি আটক করে। কিন্তু পরে  
নাকি প্রায় দুই, সেট দশ তাজার মণ চিনির কি ব্যবস্থা করা  
হইবে? মায়ালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা গুদামে রাখিয়া দিলে  
নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, চিনির অভাবে জনসাধারণের  
বহু অসুবিধা হইবে। চীক প্রেসিডেন্সী-ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিলেন  
যে, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-ডাইরেক্টরেট উহা বাজারদে বিক্রয়ের ব্যবস্থা  
করুন। কিন্তু খাদ্য-ডাইরেক্টরেট জানাইয়াছেন, বর্তমান মাসের  
প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এনকোর্সমেন্ট পুলিশ খুব কম পরিমাণ মাল  
তুলিতে পারিয়াছেন। দশ তাজার মণ চিনি ত অল্প জিনিস নয়।  
খাদ্য-দপ্তরও তৎপরতার সহিত উহার ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থা করিতে  
অপার্য। ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, যদি খাদ্য-দপ্তরই চিনির  
জার অত্যাধিক খাদ্যবস্তুর ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে কে  
পারিবে? সে বাতাই হউক, এখন আটক-করা চিনির কি দশা  
হইবে? অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট জামিনে মুক্ত আসামীকেই তাহার  
স্বীকৃত ৩২ টাকা মণ মদ্যে সমস্ত চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।  
এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা কোটে জমা দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।  
ম্যাজিস্ট্রেট এই সমস্তা যেভাবে সমাধান করা সম্ভব, তাহা  
করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে, খাদ্য-দপ্তর সর্বদে। তাঁহারা  
চীক এতটা নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলেন কেন? কারগতঃ এই সব  
বিভাগের কোন তৎপরতাট এই কার্যে প্রকাশ পায় নাই।  
ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কৌশলে এড়াইয়া  
গিয়াছেন। যেখানে তাঁহাদেরই এ বিষয়ে করণীয় ছিল। ইহা  
আগাগোড়াই বহুশ্রমক।

### মাধ্যমিক শিক্ষা-শিক্ষণে গলদ

বাঙালীর সমাজ-জীবন আজ সমস্তর ভাবে অক্ষত। একটির  
পর একটি সমস্তা আসিয়া জড়ো হইতেছে। সমাধান কিছুই  
হইতেছে না। মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্তাও ক্রমশঃ জটিল আকার  
ধারণ করিতেছে। শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক-সরকার এই চার শ্রেণীর  
মুখ্য প্রতীক যদি বৎসরের পর বৎসর পণ্ড্রমে পরিণত হয়, তবে  
তাঁহাদের মতাদর্শ সমাজের আসিয়া পড়ে। এই জরই প্রয়োজন,  
শিক্ষা সমস্তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা। নহিলে সমাজ-জীবন  
ভাঙিয়া পড়িবে।

এই শিক্ষা-সমস্তার দুইটি দিক আছে। এক, শিক্ষণ-সংক্রান্ত,  
অপর, পরীক্ষা-সংক্রান্ত। যে ভাবে বৎসরের পর বৎসর অসুতীর্ণ  
বিভাগীয় সংস্থা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহাতেই মনে হয়,  
শিক্ষা-শিক্ষণ ব্যবস্থার গলদ কোথায় রহিয়াছে। সকল দিক  
বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা অস্বীকার করা  
যায় না, আমাদের শিক্ষার মান নিম্নাভিমুখী। দেশবাসী এই  
যে ধীশক্তির অপর তঁহা দেখিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ জ্রীমালী  
উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। শিক্ষা-প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করা  
সত্ত্বেও অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা কমিতেছে না দেখিয়া তিনি  
বিম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু মুক্তহস্তে ব্যয় করিলেই যদি সমস্তার  
সমাধান হইত, তাহা হইলে আরও কিছু অর্থব্যয় করিলেই গোল  
মিটিয়া বাইত। শিক্ষার মান উন্নত করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন  
অস্বস্তি আছে, কিন্তু আরও বেশী প্রয়োজন সেই অর্থের  
সমাবহাদের।

গোল বাধিয়াছে সেইখানেই। শিক্ষা-সংস্থার কথা প্রায়ই  
উঠে। কিন্তু সংস্থার করিতে হইলে বাতা বাধা করা প্রয়োজন,  
সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট পথ তাঁহারা বাধিয়া দিতে পারেন নাই।  
ঘটা করিয়া কমিটি বসিয়াছে, তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়  
হইতেছে, সুবৃহৎ রিপোর্ট রচিত হইয়াছে, কিন্তু কাজ কি হইল?

পরীক্ষা-বিজ্ঞাট সর্বদেও জ্রীমালী স্বীকার করিয়াছেন, গুণনা-  
করনাই হইয়াছে, উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। অসুসন্ধান করিলে  
দেখা বাইবে, ইহার মূলেও রহিয়াছে সেই প্রশাসনিক শৈথিল্য।  
শিক্ষা-সচিব অভিযোগ করিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডগুলির  
সহিত বাস্তব শিক্ষা-অপত্তের সম্পর্ক নাই। কারণ তাঁহারা সে  
বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল নহেন। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে

প্রশ্ন উঠে, এই অর্থহীন সংস্থাগুলির অভ্যন্তর কেন সরকারী আমুকুল্যে বজায় থাকিতেছে? একথা জীবালীর নিশ্চয়ই অজানা নয়, যাকাতা আমলের যে পরীক্ষা-পদ্ধতি আজও এ দেশে প্রচলিত আছে তাহা প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। হুঁজায়া, আমরা আজও সেই বাঁধা ছকে চলিতেছি। ইহার জন্ত দায়ী কে? এই প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে প্রতিভাবান যোগ্য সমাদর হয় না, মননশীলতাও বিকাশ হয় না। ঠিক অনুরূপ কথাই হবীন্দ্রনাথ বহুবাব বলিয়াছেন।

জীবালী অনেক কথাই বলিয়াছেন, শুধু দোষ ক্রটির কথা বলিলেই ত সমস্তই সমাধান হইবে না। তাঁহার ভাষণের মধ্যে পথ-নির্দেশ কোথায়? আমরা যে এখন সেই পথই খুঁজিয়া মরিতেছি।

### কলিকাতা কর্পোরেশনের কলঙ্ক

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, কলিকাতার মত মহানগরীর সৌন্দর্য্য কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না। এমনকি শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত যাবতীয় ময়লা অপসারণ করিবেন, পথে-ঘাটে নিষ্কাশন ত্যাগও বন্ধ করিবেন। তাহার আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। হতাশার কারণ আর কিছুই নহে, কালক্রমে এই শহরের যে সব দোষ-ক্রটির সংশোধন হইবে বলিয়া তাঁহাদের আশা ছিল, অনেক কাল কাটিবার পরেও আজ দেখা যাইতেছে যে, তাহার ভিলমাত্র সংশোধনও সম্ভব হয় নাই। সংশোধন হয় নাই বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে, বরং বলা উচিত যে, দোষ-ক্রটির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আজও দেখিতেছি, গলিতে গলিতে ডাষ্টবিন উপচাটরা জঙ্গাল জমে, রাস্তায় বাতির অভাব, মারী খার মড়কে আতঙ্কের সীমা নষ্ট, পানীর জলের অভাব উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, বৃষ্টির জলে ঘর-বাড়ী ধসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু দোষ দিব কাহাকে? দোষ হিসাবে মুক্ত যে তাঁহারা নন! সংবাদপত্রের কলমে যে সংবাদটি বাত্মি হইয়াছে তাহা তাঁহাদের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে। হিসাবে গরমিল হয়ত অনেকই হয়, কিন্তু ইহা যে ইচ্ছাকৃত। টাকার অঙ্ক বড় সোজা নহে—২৭ লক্ষ টাকার মত বিরাট একটা অঙ্ক। ইহা কিভাবে কোথায় উধাও হইল, তাহার কিনারা করিতেও আজ তাঁহাদের গলদঘর্ম্ম হইতে হইতেছে। অভিযোগ সামান্য নহে। যে প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালন ব্যবস্থার সহিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, সে প্রতিষ্ঠানে এত বড় নোংরামি মন্থাস্তিক! যদিও মেয়র আশাস দিয়াছেন, তদন্ত হইবে।

হয়ত হইবে। কিন্তু যাহারা সদিচ্ছাবশতঃ শহরের 'নোংরা' উচ্ছেদ করিতে তৎপর, তাঁহাদের ঘরের নোংরা যদি বাহিরে প্রকট হইয়া প্রকাশ পায়, তবে অপরের চরিত্র শোধনে কি করিয়া তাঁহারা আগাইয়া আসিবেন? যাতাল যদি বদ বন্ধ করিবার আন্দোলন

করে, তবে কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? জানি না, তাঁহাদের ভিতরের আবর্তন কবে ঘূর্ণ হইবে।

### হাওড়া ষ্টেশনে দুধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা

গত ১৫ই আগস্ট হটতে হাওড়া ষ্টেশনে বাত্মীদের সুবিধার জন্য একটি দুধের দোকান খোলা হইয়াছে। বাংলা দেশে সর্কাপেকা বৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন এই হাওড়া। প্রত্যাহ অসংখ্য বাত্মী এই ষ্টেশন হটতে যাতায়াত করে। শিশু, যোগী ও অন্যান্য বাত্মীর দুধের প্রয়োজন সেখানে বিশেষভাবেই থাকিবার কথা। ষ্টেশনে দুধ পাইবার নিশ্চয়তা থাকিলে বাত্মীদেরও একটা দুঃখনার অবসান হয়। তাহার এই কল্যাণকর কন্ডে ত্রী হইয়াছেন তাঁহারা ধন্যবাদ। ইহার এক পাউণ্ড ও আদ পাউণ্ডের বোতল বরফ-আলমারীতে রাখিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক পাউণ্ডের বোতল ৪১ নয়া পয়সা এবং আদ পাউণ্ডের দাম ১২ নয়া পয়সা। শুনা যাইতেছে, দৈনিক একশত টাকার উপর এই দুধ বিক্রয় হইতেছে। জিনিস পাওয়া যায় অনিলে লোকের ক্রয়ের আশ্রয়ও বাড়ি। স্ত্রীরা বিক্রয়ের পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে যে আরও বাড়িবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রতি ষ্টেশন-প্রাঙ্গণেই দুধ বিক্রয় হয়। ইহার পরিবর্তে দুধ বিক্রয় করিলে শিশুরা খাটয়া পাচে—বিক্রয়ও কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখি কি? একপ ব্যবস্থা পশ্চিমের যে কোন ষ্টেশনেই বহিষ্কৃত দেখিয়াছি।

### গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের আংশিক সংস্কার কাজে সরকার

গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের একটি অংশ বিশেষ—হবিবপুর-বামনগোলা সড়কের নির্মাণ-কার্য্য শুরু হইয়াছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে। কিন্তু আজও তাহা শেষ হয় নাই। এ সম্বন্ধে ২৫শে সেপ্টেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বড় মজার কথা বলিয়াছেন। আমরা নিজে কিছু না বলিয়া, সেই অংশটি তুলিয়া দিতেছি। "এক মাইল রাস্তার উন্নতি বিধানে যদি এক বৎসর সময় লাগে, তবে হাজার মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা বানাইতে কত বৎসর লাগিবে? গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের নির্মাতা শের শাহকে যদি এই প্রশ্ন করা হইত, তবে তাঁহার স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না যে, অন্তত হাজার বৎসর লাগিবে। শের শাহ কিন্তু অতটা সময় লন নাই। ভারতের শাসন ভার হাতে পাইবামাত্র পাঁচ বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঐ সামান্য সময়ের মধ্যেই গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের মত এত দীর্ঘ একটা সড়ক তিনি তৈয়ারি করিয়া গিয়াছেন। পূর্তিবিজ্ঞানের তখনও এত উন্নতি ঘটে নাই, কিন্তু তৎসময়েও এই অসাধা সাধন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তাহার কারণ হয়ত এই যে, তিনি ছিলেন কালের মানুষ, কাঁকা কথার তাঁহার আস্থা ছিল না। তা

যদি থাকিত, তবে সহস্র মাইল দীর্ঘ একটা রাস্তা বানাইবার আগে তিনিও হয়ত একটা সহস্রশালা পরিকল্পনা রচনার জাতিয়া যাইতেন। কথাটা অকারণে বলি নাই। মালদহ জেলার হবিষ-পুয়-বামনগোলা সড়কের উন্নতি-বিধানের কাজ শুরু হইয়াছিল সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে। সে কাজ এখনও চলিতেছে। আরও কতদিন যে চলিবে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আমাদের উপজাতি-কল্যাণ মন্ত্রী জীড়পতি মজুমদার মহাশয়ও সে-বিষয়ে খুব জোর দিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। এখন শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন যে, এত বৎসর ধরিয়া বাহ্যিক উন্নতি-সাধনের কাজ চলিতেছে, সেই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য মাত্র তের মাইল। এবং কাজ যদিও শেষ হয় নাই, পাঁচ লক্ষাধিক টাকা কিন্তু ইতি-মধ্যেই খরচ করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলিতে চািন না। শুধু এটুকু বলিলেই, বর্ষেই হইবে যে, কতপক্ষে ব্রহ্মসীতার স্বেচছিত অমলাতম্বী ও ঠিকাদারী তনুতির বাধনটা কয়েই শক্ত হইয়া উঠিতেছে। এ বন্ধন যদি এখনও ছিন্ন করা না হয়, উন্নয়নের সমস্ত পরিকল্পনাট তব এক অর্থহীন পদক্ষেপে পরিণত হইবে।”

উহার পর টাকা নিশ্চয়াজন।

### অতি বর্ষণে মানুষের অবস্থা

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির অভাব, অথচ বৃষ্টি দাপটে পশ্চিমবঙ্গের অজ্ঞাত স্থানে বিস্তীর্ণ এলাকার গেল গেল রব উঠিয়াছে। গ্রাম, মাঠ, ভাসিয়া যাউতেছে, বাধ ভাঙিতেছে, ঘর-বাড়ী ধসিয়া পড়িতেছে, জলে ডুবিয়া এবং ঘর চাপা পড়িয়া মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। এক কথায় প্রকৃতি এবারে প্রসঙ্গীয়ার মাতিয়াছেন। এবারে প্রচুর শত্রু ঘরে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে আশা-ভরসাও সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। কারণ, প্রচুর ধানের জমি এখনও জলে ডুবিয়া আছে।

কিন্তু দুর্গতি, দুর্গতিই। প্রকৃতিকে দাঙ্গা করিয়া লাভ নাই, অদৃষ্টকে ঘিকার দেওয়া সমানই অর্থহীন। প্রকৃতির বিরূপতায় সঞ্চিত মানাইয়া লইয়া অথবা যুদ্ধ করিয়াই গড়িয়া উঠে জনপদ, শহর ও নগর। এই বিশাল শূন্যতায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি যখন দিকে দিকে অপ্রতিহত তখন কলিকাতা মহানগরীও প্রাবনের পীড়নে বিপদাশঙ্ক। পল্লী-অঞ্চলের অসহায় অসহা বুঝিতে পারি, কিন্তু কলিকাতায় যত মহানগরীর ত সেক্ষণ হইবার কথা নয়। কেন এতদূর হয়? প্রায়ই দেখা যায়, অতি বর্ষণ হইলেই কলিকাতায় অনেক অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়, নিকাশী-ব্যবস্থার গলদই ইহার প্রধান কারণ। অতি-বর্ষণের ফলে অভ্যর্কিত বিশাল ঘটনায়ে, এমন ওজস্ব পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তৃরা নিশ্চয়ই দেখাইতে পারেন না। কারণ গলদ বহুদিনের। অব্যবস্থা এমন যে, জল-নিকাশের সামান্য বাধা বন্দোবস্ত আছে তাহাও ঠিকমত চলে না। বর্ষণের প্রথম পর্বেই কর্পোরেশনের তিনটি পালিশ্ব টেননের প্রায় নাতিশাস

উঠে। যেসব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পালিশ্ব টেননগুলি চালু থাকিলে নগরীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতখানি জলময় হইতে পারিত না। পরঃপ্রণালীর অংকুরনা নিকাশন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও সেই সমান গাফিলতি। আড়াইশতের বেশী লোক নাকি এই কাজ করিবার জন্য বহাল আছে, অথচ ডেপুটি মেয়র বলিতেছেন, ইহাদের মধ্যে পিতকরা কুড়িজনকে খোঁজ মেলে কাজের সময়, বাকি বাবা তাদের অজিৎ মাতিনার খাতার।

শুনিয়াছিলাম, ভারত-সরকার কলিকাতার এই জল-নিকাশী ব্যবস্থা-উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সে টাকার কি ভাবে তাঁহারা সদ্যব্যবহার করিলেন জানি না। কাজ যে হয় নাই, তাহা ত দেখিতেছিই।

যদিও স্বীকার করি, বৃহত্তর কলিকাতার জল-নিকাশনের সমস্ত খুবই জটিল, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্তৃদের আলস্য ও উদাসীনতার ব্যাপারটা আরও নির্যাশাজনক। জল সরবরাহ ও নিকাশন বোর্ড গঠনের একটি পরিকল্পনার কথা অনেক দিন হইতেই শুনা যাইতেছে। তাহারই বা কি হইল?

এই সব পরিকল্পনার কথা শুনিয়া শুনিয়া জনসংসারণ আজ এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্তমানে কোন কথাই আর তাহারা বিশ্বাস করিতে চাে না।

মহানগরীর চতুর্দিকে যে সব নতুন উপনগর ও উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির জলনিকাশনের স্বন্দোবস্ত করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজ যে দুর্গতি হুই হইয়াছে তাহার কারণ, বৃহত্তর কলিকাতার নগর-বিকাশ সম্পর্কে সরকার কোনরূপ পরিকল্পনা করেন নাই, এমনকি জল-নিকাশনের স্বাভাবিক বন্দোবস্ত সামান্য বাধা কিছু ছিল তাহা সংরক্ষণের জন্য আইনসম্মত ব্যবস্থা পন্থায় অবলম্বন করেন নাই। খাল, বিল, মজিয়াছে, জল-নিগমে উপযুক্ত জাহাজগুলি পর্যাপ্ত বেগল হইয়াছে, পরিকল্পনাহীনভাবে যন্ত্রতন্ত্র ফ্যান্টী চবঃ উদ্যোগ উপনিবেশ গড়িয়া উঠার সমগ্র বৃহত্তর কলিকাতা ভিড়ে ঠাসাঠাসি পক্ষকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই অসহনীয় অস্বাস্থ্যকর এবং অস্বচ্ছ পরিবেশ যে মহানগরীর জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা রচনা ও বক্ষা করিবার পক্ষে বিঘ্ন বাধা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পৌরকর্তৃরা তাহা নিশ্চয়ই জানেন। তাহারা ইহাও জানেন, এই অবস্থায় প্রতিবার অসংখ্য মৃত্যু, জানি না, কবে তাঁহারা সত্য সত্যই প্রতিকারে উদ্যোগী হইবেন।

### কর্মে নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব

অনেকেই বলেন, বঙালীরা অসম্মিত। একথা সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ দেখা গিয়াছে, বহু যুবক আসানসোল ও দুর্গাপুর এলাকার প্রমোদে কাজে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্যতায় পরিচর দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, এসব অঞ্চলে আরও বহুলোকের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কর্ম-নিয়োগ সম্বন্ধে নিয়োগ-

কণ্ডাদের পক্ষশাসিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এই নিরোগের ব্যাপারে যদি বিশেষ লক্ষ্য না রাখা হয় তাহা হইলে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। পক্ষপাতি পবিত্রকল্পের প্রত্যেক রাজ্যই কণ্ডের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, এবং বৃহৎ পবিত্রকল্পগুলিতে উচ্চ কারিগরী জ্ঞানের কাজ ছাড়া অল্প সব কাজেই স্থানীয় বা সেট রাজ্যের অধিবাসীরাই কাজ পাইতেছে। সেখানে অজ্ঞাত রাজ্যের অধিবাসীদের প্রবেশের সুযোগ নাই বলিলেও বোধহয় অস্বীকার করা হইবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বা বেসরকারী কাজে ত বটেই, বৃহৎ পবিত্রকল্পগুলিতেও বাঙালীদের দ্বারা দাবী একান্ত অসঙ্গতভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। সরকার মাঝে মাঝে সদিচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে সরকারী, আধ-সরকারী বা বেসরকারী নিরোগ-কর্তৃদেব এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার কথা জানাইতেছেন, কিন্তু কার্যতঃ কোন দৃষ্টিই হইতেছে না। দুর্গাপুর, আসানসোল বাঙালীর কণ্ডের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, একথা উল্লেখ্য প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে লোক নিরোগ করা হইতেছে, তাহার কিছু কিছু পরিচয় সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙালী কণ্ডপ্রার্থীদের কোণঠাসা করিয়া বাহিবার চেষ্টার অভিযোগও আজ নূতন নহে। দুর্গাপুরের আশেপাশে যে সকল বেসরকারী ব্যবসা গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে কত ভাগ বাঙালী কাজ করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে সংখ্যা গণনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক রাজ্যই বিভিন্ন কণ্ডে সেই রাজ্যের অধিবাসীদের সুযোগদানে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন প্রবল। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে বাহিরে কণ্ডের সুযোগও যেমন অপ্রত্যাশিতরূপে সঞ্চিত হইয়াছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও তাহাদের ক্রয়সঙ্গত দাবী একান্ত অসঙ্গতভাবে অগ্রাহ্য করা হইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, কলে-কারখানায়, সড়কগারী অকিসে যেভাবেই হউক বাঙালী তাহার সংগ্রহণ সুযোগেও সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা যেমন জমির অল্পপাতে অত্যধিক তেমনি কণ্ডের সুযোগও অজ্ঞাত রাজ্য অপেক্ষা বহু সঞ্চিত। সুতরাং বাংলার বাঙালীকে অধিক সংখ্যায় কণ্ডে নিরোগ করিলে প্রাদেশিক সক্ষমতার প্রশ্ন উঠে না কিংবা কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের কথাও উঠে না। বাঙালীর বেকারসমস্যা ভয়াবহ, সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের প্রশ্নও সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। বাহিরে বাঙালীর যদি কণ্ডের অবাধ সুযোগ থাকিত কিংবা তাহাদের কথা বাহিরের রাজ্য ভাবিত তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। বিভিন্ন রাজ্যে নিজ অধিবাসীদের প্রয়োজনে যদি বাঙালীর সুযোগ সঞ্চিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এই রাজ্যের নিজ প্রয়োজনে তাহাদের আপন লোকদের নিরোগের প্রশ্ন ভাবাই কি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক নহে? প্রতিযোগিতায় কথাই যদি প্রধান হইত তবে বাংলার বাহিরে অবশ্যই বাঙালীর সুযোগ এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইত না। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী অবশ্য বলিয়াছেন,

বাঙালী যুবকদের বেন তাহাদের ক্রয়সঙ্গত কণ্ডের অংশ হইতে বঞ্চিত করা না হয়। বাঙালীর কণ্ড-সমস্যা এমন এক সঙ্কটের মুখে আসিয়াছে যে, এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ রাজ্যের আন্দোলন, উত্তেজনা, বিক্ষোভ ইত্যাদিও যে সেট বেকারসমস্যারই বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

অবশ্য সেট সঙ্গে একথাও আমাদের মাজ অস্বীকার করিলে চলিবে না, কণ্ডে নিষ্ঠা বলিয়া কোন বস্তুর বর্তমান বাঙালী যুবকের মধ্যে নাই। কালক্ষেপে তাহাদের ফাঁকি দিবার স্পৃহাই প্রবল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহার দল গড়িতে আনে, ধর্মঘট করিবার বিভিন্ন কৌশল তাহাদের অধিগত। এই অসদ্বৃত্তির জন্যই বাঙালী আর উপেক্ষিত। অথচ ইহা পূর্বে ছিল না। সেদিন যোগ্যতার বাঙালীই ছিল শ্রেষ্ঠ। কেন এইরূপ হইল? ইহাও একরূপ নৈতিক পতন। বাঙালীকে আজ ভুলিতে হইবে, কোঁচা ছলাইয়া কাজ করিবার দিন আর নাই। আজ পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জন করিবার দিন আসিয়াছে। যন্ত্রের যুগে প্রত্যেকটি মানুষ আজ শ্রমিক। দৃষ্টি আমাদের সেইদিকে না কিরাইলে জাতির কল্যাণ নাই।

### ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগতের ঘাটতি হইতেছে এবং এই বিষয়ে ভারতের কর্তৃপক্ষ তথা জন-সাধারণ উভয়েই চিন্তিত। কয়েক মাস পূর্বেও ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের মুখেই সন্মুখীন হইয়াছিল, সেই সঙ্কট এখন কিছুটা প্রশমিত হইলেও বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় নাই। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে সঙ্কটের প্রধান কারণ—বঙ্গালী ড্রাস ও আমদানী বৃদ্ধি। ১৯৫৫ সনে ভারতের বঙ্গালী ড্রাস পরিমাণ ছিল ৬০৮ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৯ কোটিতে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৫৭ সনে ভারতের বঙ্গালী ড্রাস পার ৬১০ কোটি টাকার এবং ১৯৫৮ সনে আমাদের বঙ্গালী ড্রাস ৫৭৪ কোটি টাকার নামিয়া আসে। ১৯৫৯ সনের অবস্থাও বিশেষ কিছু আশাশ্রয় নয়।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, চলিত বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ২৬৬ কোটি টাকার ড্রাস বঙ্গালী হইয়াছে, অর্থাৎ সারা বৎসরে বঙ্গালী ড্রাস পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকার উপরে উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। পূর্বে ভারতের বঙ্গালী ড্রাস পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মত এবং আমদানীও হইত প্রায় ঐ পরিমাণ মূল্যের ড্রাস। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১১০০ কোটি টাকার উপরে উঠিয়াছে, আর বঙ্গালী ড্রাস পরিমাণ ড্রাস পাইয়া ৬০০ কোটি টাকার নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। ঘাটতি-বাণিজ্যের অর্থ পবিত্রকল্পের প্রগতিতে রাখ টানিতে হয় কারণ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনীয় শিল্প-মূলধন আমদানী

করা সম্ভবপর হইতেছে না এবং ব্যবহারিক জীবনের আমদানীকেও হ্রাস করিতে হইয়াছে, ফলে আভ্যন্তরিক মূল্যমানও বাড়তির মুখে চলিয়াছে।

ঘাটতি-বাণিজ্যের ফলে বাষ্ট্রকে ঘাটতি-ব্যয়ের সাহায্য লইতে হয় এবং তাহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়। প্রথম ছয় মাসে ডলার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং ইহাৎ মধ্যে কেবলমাত্র আমেরিকার মুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি হইয়াছে প্রায় ৩০ কোটি টাকার মত। কিন্তু আমাদেয় বহির্জাত বাণিজ্যে সব চেয়ে চিন্তাজনক ব্যাপার হইতেছে যে, মধ্য-ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ক্রমাগত ঘাটতি ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং এই ঘাটতির পরিমাণ অত্যধিক, কোন কোন বৎসর বাণিজ্যে এষ্ট দেশগুলির সহিত যে পরিমাণ ঘাটতি হয় তাহা মোট ঘাটতির প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়ায়। এই দেশগুলির মধ্যে আছে পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ, ঘাটতি অবশ্যই প্রধানতঃ পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যে।

এ বৎসর প্রথম ছয় মাসের বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ বস্ত্তানী করিয়াছে ২২ কোটি টাকার জ্বা, কিন্তু এই দেশসমূহ হইতে তাহার আমদানীর পরিমাণ হইতেছে ১৩ কোটি টাকার জ্বা, অর্থাৎ প্রথম ছয় মাসের বাণিজ্যে কেবলমাত্র এই পাঁচটি দেশের সহিতই ভারতের ঘাটতির পরিমাণ হইতেছে ৭১ কোটি টাকা। ভারতের গতামুগতিক বস্ত্তানী-বাণিজ্যে প্রধানতঃ চা, পাটজাত জ্বা ও বস্ত্ত প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের মোট বস্ত্তানী-বাণিজ্যের মধ্যে চায়ের অবদান হইতেছে ২৪.২ শতাংশ, পাটজাত জ্বার ১৮.৩ শতাংশ এবং সূতী বস্ত্তের অবদান হইতেছে ১৩ শতাংশ। কিন্তু গত বৎসর সূতী-পত্রের বস্ত্তানী হঠাৎ খুব হ্রাস পাইয়াছে। বস্ত্তানী বৃদ্ধির জন্য বহু প্রকার প্রস্তাব করা হইতেছে, সেইগুলিকে বধ্যাসম্ভব কর্ত্তৃপক্ষের গ্রহণ করা উচিত। অধিকন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রধান প্রধান সহরে, বধ্যা, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাস সহরে বস্ত্তানী সংস্থা (Export House) স্থাপন করা উচিত এবং এই সংস্থাসমূহ হইতে বিদেশীদের পক্ষে আমদানী-সহজসাধ্য হইবে।

### কুস্ত মেলার শোচনীয় পুনরাবৃত্তি

রাজকোটে যে দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে পাওয়া গেল, তাহা যেমনই ভয়াবহ তেমনই ক্ষয়-বিধাবক। এরূপ সম্মুখকৃত দুর্ঘটনা বোধ হয় একমাত্র ভারতেই সম্ভব। সেখানে সতের বৎসর বহুত্ব এক তরুণীর উপর দেবী ভবানী ভব করিয়াছেন এবং তরুণীট এক মেলায় স্থান করিয়া লইয়া দেবীত্বের আবরণে নাচিয়াছেন এবং নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়াছেন। দর্শনার্থীরা আট আনা হইতে এক টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়া এই দৈবী বিভূতির প্রকাশ দেখিবার জন্ত মেলায় ভিড় করিয়াছেন। দর্শনার্থীর কৌতুহল

এতই উদ্দাম হইয়া উঠে যে, ভীড়ের মধ্যে প্রচণ্ড হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে নিষ্ঠ হইয়া উনপঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। তিন জন আহতের অবস্থা সাম্ব্যতিক। অগ্রিম সত্য হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বাস্তব সত্য যে, ভক্তি, বিশ্বাস এবং পূণ্য কামনার মাজাহাড়া তাদ্ভ্যের ভারতীয় জনতার আচরণ প্রায় অনাচারে পরিণত হইয়া থাকে। উড়িষ্যাৎ নেপাল বাবার কাছে সর্ব্বযোগের শিকড়-বাকড় অনিতে গিয়া বিশ্বাসীর দল ঠিক এট রকমই ভিড় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে কলকাতায় অনেক লোকের প্রাণান্ত হয়। আরও কয়েক বৎসর পূর্বে প্রয়াগে কুস্তমেলার স্থানের কালেও ভিড়েরই বিভিন্ন উদ্বেগ ও বিগ্নম্বল আচরণের ফলে প্রায় পাঁচ শত নর-নারীর প্রাণ পদদলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।

এ কি উদ্দামদা! বাহার ফলে পবের প্রাণ এবং নিভেব প্রাণের প্রতিও সাধারণ দায়িত্ববোধটুকু ঘোলা হইয়া যায়। দেবতার নাম করিয়া যে-কোন বুদ্ধিকি দেখাইলেই তাহা একটা আধ্যাত্মিক কীর্ষি বলিয়া প্রচলিত হইবার সুযোগ যতদিন পাইতে থাকিবে, ততদিন রাজকোটের দুর্ঘটনার অনুরূপ অভিযাণ হইতে মানুষের মুক্তি নাই। অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাসের আতিশয্যে এত লোকের প্রাণ গেল, এই অতি-করণ এবং অতি-ভয়াবহ পরিণামের দৃষ্টান্ত যদি ভবিষ্যতেও পক্ষে শিক্ষার হয় এবং কুসংস্কারজনিত উদ্দামদা যদি সংবৃত হয় তবেই মঙ্গল। তবে সবকালের দিক হইতেও ইহার প্রতিবেদক-ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করা উচিত। যথেষ্ট নামে কু-সংস্কারকে তাহার যেন আর প্রসঙ্গ না দেন।

### অক্সফোর্ড অভিধান পাকিস্থানে নিষিদ্ধ

সম্প্রতি অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিক্সনারী বাহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাকিস্থানে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ অভিধানে নাকি পাকিস্থানকে ভারতের অংশ এবং স্বঃশাসিত মুসলিম রাজ্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর পাকিস্থান একটি স্বঃসম্পূর্ণ দেশ হইয়াছে, সুতরাং অভিধান-লিখিত সংবাদটি সত্য নহে। বিশেষ করিয়া পাকিস্থান বাহাদুরের সৃষ্টি, তাহাদের পুস্তকে এ ভুল হওয়া উচিত নয়। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা ঘাটতে পারে, এক দেশের পুস্তকাদিতে অপর দেশের দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও ভূগোলীয় তথ্য স্বাভাবিক কারণেই অনেক সময় ভ্রমাত্মক হয়। সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ায় গান্ধীজী সম্বন্ধে এইরূপ একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছিল ধর্ম্মসম্প্রদায়ী একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থে কোন মুসলিম পণ্ডিত লিখিয়াছেন, শতাব্দীর্থা তাহার অধৈবতবাদ এবং রামমোহন রায় তাহার ব্রহ্মতত্ত্ব ইসলাম হইতে পাইয়াছেন। চৈনিক সাইক্লোপিডিয়ায় বুদ্ধ জীবন ও বৌদ্ধধর্ম্মের যে অপরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তা কিছুদিন আগেই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ভুল ভুলই। ঐখ্য এবং শালীনতার সহিত তাহার সংশোধন বাহাতে হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পাকিস্থানের



ধাতুতে সে-বস্তুটি নাই। তাই শুধু অস্ত্রকোর্ড অভিযানই নয়, এরূপ বহু বই লইয়াই তাঁহারা অকারণে হৈ চৈ বাধান।

### আফগান-ভারত মৈত্রী

আফগানিস্থানে সন্ধর করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, ভারতের সহিত আফগানিস্থানের একটা আত্মিক বোণ আছে, বাহ্যিক কোন ক্রমেই আজ অধীকার করা যায় না। এই আফগানিস্থানের একটি প্রধান অংশ দুই অর্ধশতাব্দীতে পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের পাকিস্তান এই পাকিস্তানের দেশই মেরে। পূর্বে এ দেশের অধিবাসীরা ছিলেন হিন্দু এবং বৌদ্ধ। মুসলিম অভ্যুত্থানের পর ইহারা মুসলমান হন। এবং দেশও মুসলমানের অধিকারে আসে। এইখান হইতেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাটা মস্কাট বাবর ভারতবর্ষে আসেন। ইরান বা পারস্য তাহারও পূর্বে হইতে ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট। আফগানের একটি শাখা যখন পঞ্জাবে আসিয়া বসবাস শুরু করেন, তাহার পূর্বে আর একটি শাখা ইরানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। জরথুষ্ট্র উপাসকদের সহিত ভারতীয় আফগানের সাংস্কৃতিক ঐক্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে ছিল। পরে এই দেশও মুসলিম অধিকৃত হয় এবং অগ্নি-উপাসক পারস্যীদের একাংশ ভারতে চলিয়া আসেন। পরবর্তীকালে সুফী সাধকরা ইরান বা পারস্যে যে কাব্য ও দর্শন প্রচার করেন, তাহার সহিত ভারতীয় বেদান্ত ও বৈষ্ণবধর্মের গভীর ঐক্য লক্ষ্য করা যত। এশিয়ার মুক্তিকার পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আবির্ভাবে এটি সম্পর্কসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

আজ নূতন করিয়া সেইসব দেশের সঙ্গে ভারতের অন্তঃসঙ্গতা হইতেছে, ইহা খুবই আনন্দের কথা। এই রাজনৈতিক মৈত্রীর সঙ্গেই যেন সাংস্কৃতিক দিক হইতেও আমরা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হই। কারণ প্রকৃত মৈত্রী তাহাতেই।

### বর্ণ-বিদ্বেষী ইভলিন বেয়ারিংয়ের আর একটা দিক

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশ কেনিয়ার গবর্নর সার ইভলিন বেয়ারিং—যাঁহার সংবাদ জানিবার আশ্রয় হয় ত কাহারও নাই। কিন্তু যাঁহাদের জানিতে চাহি না, তাঁহারাও সময় সময় এমন একটি সংকাজ করিয়া বসেন, যাঁহা সংবাদ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ইভলিন বেয়ারিংয়ের ২০শে সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণের কথা। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে আরও দুই সপ্তাহ স্থগিত অধিষ্ঠিত থাকিবার আদেশ দিয়াছেন। অসুস্থতার জন্য ইভলিন মোশাসায় গিয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রোপকূলে একাকী বসিয়া সমুদ্র নিরীক্ষণ এবং স্বদেশে প্রত্যা-বর্তনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটি ভারতীয় বালিকা দোড়াইয়া আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করে। বলে, আমার দুই সঙ্গিনী সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বাইতেছে। দয়া করিয়া উহাদের প্রাণ রক্ষা করুন।

ইভলিন ভাসমান দুইটি দেহ দেখিতে পাইলেন। বাট বৎসরের বৃদ্ধ ইভলিন খেতকার হইয়াও, ভারতীয় বালিকার কাতর আবেগনে বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। প্রতিকূল শ্রোত এবং উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিমজ্জমান বালিকা-দুটিকে চুচুড়িতে ধরিয়া কুলের দিকে আঁসিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি অবসর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শিথিল মুষ্টি হইতে একটি বালিকা শ্লিষ্ট হইয়া উঠিয়া গেল। অপরাধকে তিনি প্রাণপণে ধরিয়া বাধিলেন বটে, কিন্তু নিজেরই অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় আর একজন ভ্রমণবৃত্ত প্রেতাঙ্গ—যাঁহার বয়স ৭০ বৎসর, সার ইভলিনের ঐ অসহ্য দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন এবং বালিকাসহ ইভলিনকে ডাঙার তুলিলেন।

সার ইভলিন নিজের জীবন বিপর করিয়া ভারতীয় বালিকার জীবন রক্ষার জন্য বাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবন-ইতিহাসে নূতন। কারণ বহু দুর্ভাগ্য তিনি ধারক। বর্ণ-বিদ্বেষী তাঁহাকে অমায়ুষ্য করিয়া তুলিয়াছে। জানি না, কোন দুর্ভাগ্য মুহূর্ত্তে এরূপ অ-মায়ুষ্যও সময় সময় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই চঞ্চল মুহূর্ত্তেই মনুষ্যের স্রষ্টা মানবতা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে সংকর্ষে প্রবৃত্ত করায়। নহিলে ইভলিন কি করিয়া এত সহজে সাদা-কালোর ভেদ তুলিতে পারিলেন! তবু তিনি বাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভগবান তাঁহাকে আরও সংকর্ষে নিয়োজিত করুন ইহাই প্রার্থনা।

### ক্লুশেভের মুখে নূতন শান্তির বাণী

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লুশেভ আমেরিকার রাষ্ট্রসভ্যের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা শুধু অভিনবই নয়, তাহার এই প্রস্তাবে সকলে বিশ্বাস হতবাক হইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—এরূপ কথা বহু হইয়াছে, কিন্তু তিনি এবারে যোদ্ধা শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। যুদ্ধবাদী কমুনিষ্ট রাষ্ট্রের মহানায়ক উপনিবেশীয় মহাসভ্যের কাজ-কাছি প্রায় পৌছিয়াছেন। উপনিবেশের পথম শান্তি লাভ করিতে হটলে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। এই সর্বস্ব ত্যাগের কথাই প্রায় তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথাই হইল, কৈপলাজ, আটম-বোমা, হাট্‌ডোজেন-বোমা সমস্ত পৃথিবী হইতে ঝাটাইয়া বিধার করিতে হইবে। কামান, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামগ্রী কিছুই থাকিতে পারিবে না—এমনকি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রণালয়গুলির পর্যায় দরম্মা বন্ধ করিতে হইবে। চার বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এইভাবে নিরাস্রব, বর্ণচন্দ্র-কবচ-কুণ্ডলহীন যদি হয় তবেই জগতে নিকির্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিবার জন্য ক্লুশেভ যে চূড়ান্ত নিবন্ধীকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যদিও সম্পূর্ণ নূতন নয়। একবার লিটভিনক লীগ অফ নেশনে এই কথাই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছেন আরও অনেক। যুগে যুগে বহু

জানী-ভনী-মনীষী হিংসার-উগ্রত এই পৃথিবীকে অল্প ভাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন—আশা করিয়াছেন, এমন দিন আসিবে যখন অস্ত্রের বনংকার শুরু হইবে, তবাবারি ভাঙ্গিয়া গড়া হইবে লাজলের কলক। শান্তিবাদীদের বাহা কল্পনামাত্র, মহাপরাক্রান্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আজ তাহাই বাস্তবে রূপ দিতে চাহিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, কে কতটা, কিভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানকাল হইতে এ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব লইয়া আলোচনা কম হয় নাই। বৈঠকের পর বৈঠক বার্থ হইয়াছে, পরমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাবটিতে পর্যাপ্ত বৃহৎ শক্তির একমত হইতে পূর্বদেয় নাই। ইহার কারণও স্পষ্ট। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। পরস্পর অবিশ্বাস যখন প্রচণ্ড এবং তাহার বাস্তব কারণগুলিও উপেক্ষাযোগ্য নয়, তখন উভয়পক্ষে শান্তি-কামনা আন্তরিক হইলেও, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধসম্পদ সর্বদা বিসর্জন দিয়া চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণের মুক্তি লইতে সাহসী হইবে কে? আর যদি কেহ অগ্রদণ্ড হয়, তবে তাহার সর্বদাই সন্দেহ থাকিবে, আমাকে কি দিয়া উদ্ধার ভিতরে ভিতরে অস্ত্র শানাইতেছে না? তাহাদের দুশ্চিন্তা হইলে যে কারণনার ট্রাক্টর তৈয়ারী হয় সেখানে টাক, বেখানে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হয় সেখানে পারমাণবিক বোমা তৈয়ারি করিতে বাধা কোথায়? কোথায় কোন রাষ্ট্রে কোন বৈজ্ঞানিক গোপনে কি বানাইতেছেন তাহার সন্ধান রাখিবে কে? সুতরাং এই অবিশ্বাসী মনই ক্রুশ্চেভের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে চাহিবে না। তিনিও কি অপরকে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিবেন?

অবশ্য যুক্তি দিয়া বিচার করিতে হইলে, ক্রুশ্চেভ যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নহে। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বৎসরে সাময়িক-ভাবে প্রায় এক শত লক্ষ-কোটি ডলার খরচ করেন। গত দশ বৎসরে সাময়িক-ভাবে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে পনের কোটি বাসভবন প্রস্তুত হইতে পারিত। বৃহৎ শক্তিগুলি সাময়িক-ভাবে অর্থব্যয় বন্ধ করিলে তাহার একটি অংশ মার্ক দ্বারা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় অগ্রসর অঞ্চলে নতুন জীবনের গোড়াপত্তন করা যায়।

এ বাণী ভারতের পক্ষে নতুন নয়। ইহা ভারতেরই নীতি। আমরা শুধু বিমিত্র হইয়াছি, ক্রুশ্চেভের মধ্যে সেই নীতি সংক্রান্ত হইতে দেখিয়া। বাহা হউক, আজ যদি ক্রুশ্চেভের প্রস্তাব অমুযায়ী অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও অস্ত্রের নিষ্কাশন এবং উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় তবে, অবিলম্বেই আমরা পৃথিবীতে এক নতুন অর্থনৈতিক যুগের দিকে বাজা করিতে পারি। জানি না, কাথাতঃ ইহা কতদূর অগ্রসর হইবে—কারণ, ইহা হইতেছে মহৎ আশ্বাসের কথা। কিন্তু আদর্শ লইয়াই ব্যক্তি বা জাতি বাঁচিয়া থাকে। আমরাও বাঁচিয়া থাকিব। কারণ, জানি, মানব-মহত্বের গতি শুরু হইবে না।

মাহুয একদিন যুদ্ধ ও হিংসার উর্ধ্বে উঠিবেই, ক্রুশ্চেভের কথা আজ বাস্তব-বিক্ষেপে উড়াইয়া দিলেও সেদিন ইহার মূল্য নিরূপিত হইবে।

## চন্দ্রলোক-অভিযানে রাশিয়ার সাফল্য

মাহুয এ পর্যন্ত অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছে। মাহুযের প্রতিভার কাছে মরুভূমি যেকলোক সমুদ্রগর্ভ আগ্নেয়গিরি-জলার আজ হার মানিয়াছে। এক্ষ-য়ে, টেলিভিশন, বেতার তাহাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। এমনকি বহু প্রায়-মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ আজ তাহার আয়ত্তে আসিয়াছে। দেশ-কালের সীমাকেও সে লঙ্ঘন করিয়াছে। কিন্তু বাহাই এ পর্যন্ত করিয়া থাকুক, তাহার সমস্ত ক্ষমতাই এতকাল পৃথিবীর জল, স্থল ও অন্তরীক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ সে পৃথিবী ছাড়াইয়া মহাশূন্যে পাড়ি জমাইয়া চন্দ্রলোক-মুখে অভিযান করিল।

যে চন্দ্রলোকে পৌঁছবার কথা এতকাল স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইত, তাহা যে কোন দিন বাস্তব-সত্যে পরিণত হইতে পারে তাহা কল্পনাবও বাহিবে ছিল। সেইজন্তই ১৯৫৯ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখটি মানবজাতির ইতিহাসে চিহ্নিতকরিত হইয়া থাকিবে। ঐ দিন সোভিয়েট রাশিয়ার মহাজাগতিক বকেট লুনিক-২ চন্দ্রলোকে পৌঁছিয়াছে। হুই লক্ষ ক্রিশ হাজার ছয় শত মাইল অতিক্রম করিয়া মাত্র চৌত্রিশ ঘণ্টায় ঐ বকেট চাঁদে হাজির হইয়াছে। এবং সবচেয়ে বিস্ময়, যে সময়-সূচী বাঁধিয়া ইহা ছাড়া হইয়াছিল, ঠিক ঐ সময়টিতেই লুনিক-২ তাহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে।

রাশিয়া এ পর্যন্ত এক এক করিয়া চারিটি স্পুটনিক শূন্যে উড়াইয়াছে এবং দ্বিতীয় স্পুটনিক হইতে জীবন্ত প্রাণী পাঠানোর পরীক্ষাও হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্বও এ ক্ষেত্রে কম নয়—তাহারও জীবন্ত বানর মহাশূন্যে পাঠাইয়া তাহাকে সশরীরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সর্বোচ্চ সাফল্যের জয়মালা অর্জন করিলেন। মার্কিন বকেট চাঁদের অনেকটা কাছাকাছি গিয়াও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইতে পারে নাই, আর রশ-বকেট চাঁদে সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতীক-সম্বলিত পতাকা প্রোথিত করিয়াছে।

এই অভাবনীয় ঘটনার উল্লসিত হইয়া ব্রিটিশ, মার্কিন, জাপান, ফরাসী, চেক, চীনা জাপানী দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরাই অভিনন্দন জানাইয়াছেন। একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, মাহুয যে অদূর-ভবিষ্যতে একদিন সশরীরে চন্দ্রলোকে পৌঁছিবে এই ঘটনার তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হইল।

এইবারে প্রয়োজন হইবে বকেটের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। বাহাতে সবচেয়ে চাঁদে গিয়া অংঘাত করার পরিবর্তে, চন্দ্রলোকের কাছাকাছি গিয়া বীরগতিতে আবর্তন করিতে করিতে সে অবতরণ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, লুনিক-২ যে সত্য সত্যই চাঁদে পৌঁছিয়াছে, তা কেমন করিয়া বোঝা গেল? তাহারা এই জন্তই বকেটের অভ্যন্তরে এমন-সব যন্ত্রপাতি সজ্জিবিষ্ট করিয়াছিলেন, বাহা



সাহায্যে সমগ্র স্বাভাবিক বেতার-মাধ্যমে সফলতাবর্তী পাওয়া যায়। আবও ব্যবস্থা করা ছিল, লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে আগে হইতে সফলতাবর্তী পরিবর্তিত হইতে হইতে চক্রকে স্পর্শ করা যাত্র সমস্ত আওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া বাইবে। এই বেতার মাধ্যমেই যেক্টের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সফল নিঃসংশয় হওয়া গিয়াছে। আজ রাশিয়ায় এই গোঁব সমগ্র 'মানবজাতিরই গোঁব। কারণ প্রতিভা দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সেখানে সে একাধা।

### ভারত-পাকিস্তান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

২১শে সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই সফল বাহা বলিয়াছেন, আমরা সেই অংশটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে. এম. শেখ এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ আগামী পক্ষকালের মধ্যে নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সমস্ত সফল আলোচনা করিবেন বলিয়া অল্প এখানে নির্ভরযোগ্য কুটনৈতিক মহলে জানা গিয়াছে।

উভয় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে এই প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকার গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পালাম বিমান বন্দরে নেহরু-আম্বর সাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ ফল, ঐ সময় উভয় নেতাই এক বিষয়ে একমত হন যে, সীমান্ত ঘটনা, বিশেষতঃ পূর্ব সীমান্তে প্রায়ই যে গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে তাহা বন্ধ করার জন্য তাহাদের এই আলোচনার পরেই মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল শেখ ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত একদিন আলোচনা করিবেন। তাহার পর তিনি শিলং অথবা ঢাকা সেখানে সীমান্ত গুলীবর্ষণ ও অস্ত্র বিবোধ সম্পর্কে ভারত ও পাক প্রতিনিধিদের আলোচনার স্থান হইলে সেখানে যাইবেন। ঢাকা অথবা শিলং যেখানেই বৈঠক হউক না কেন, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাহা হইবে। পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মহলের নিকট জানা যায় যে, এখনও বৈঠকের তারিখ স্থির হয় নাই। তবে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ নাগাদ বৈঠক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

### চীনা মানচিত্রে ভারতীয় এলাকা

২শে সেপ্টেম্বর 'বুসান্তর' পত্রিকা নিম্নোক্ত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :

"আজ ভারত সরকার মানচিত্র প্রচার করিয়া চীন মানচিত্রাঙ্কণে কারচুপি করিয়া কি পরিমাণ ভারতীয় এলাকা দখল করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। চীনা মানচিত্রে ৪২ হাজার বর্গমাইলের অধিক ভারতীয় এলাকা চীনের অধীনে দেখান হইয়াছে।

এই মানচিত্র প্রচার করিয়া ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন যে, ভারতীয় এলাকার আনুমানিক দাবী করিয়া ১৯৩০ সন

হইতে চীনা মানচিত্রগুলি প্রচারিত হইলেও ভারত সরকারের মানচিত্র ১৯৫৬ সনে চীনা স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত মানচিত্রের ভিত্তিতেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

আড়াই হাজার মাইলব্যাপী ভারত-ভিক্ত সীমান্তটি উত্তর-পশ্চিম কান্দীর হইতে ভারত, ত্রাঙ্ক এবং ত্রাঙ্কের টলু গিরিরাজের নিকট চীন এই তিনটি রাষ্ট্রের সীমান্ত সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রসারিত।

কান্দীর-ভিক্ত সীমান্তটি প্রায় ১১ শত মাইলব্যাপী প্রসারিত। ইহার মধ্যে ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৩ শত মাইল পাকিস্তান বে-আইনী ভাবে দখল করিয়া রাহিয়াছে।

চীনারা লাডাখের প্রায় ৬ হাজার বর্গমাইল এলাকার উপর নিলজ দাবী করিতেছে।

পঞ্জাব সীমান্তটি প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ। চীনারা এই সীমান্তে দুই একটি ছোট গ্রাম দাবী করিতেছে।

২০ মাইলব্যাপী হিমালয় প্রদেশ সীমান্ত লাইনও বিরোধ রহিয়াছে। চীন শিপকীর কিছু অংশ দাবী করিতেছে। চীন উত্তরপ্রদেশের ২২০ মাইল সীমান্তের প্রায় ৫০ বর্গমাইল এলাকা দাবী করিতেছে।

ভূটান হইতে ত্রাঙ্কের টলু গিরিরাজ পর্যন্ত ম্যাকমোহন লাইনটি ৭১০ মাইল প্রসারিত। এইখানেই চীনারা একটা বিরাট অঞ্চল প্রায় ৩১ হাজার বর্গমাইল এলাকা দাবী করিতেছে। চীনা মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর বেশির ভাগ অঞ্চল এবং আসামের একটা ছোট অংশ চীনের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হইয়াছে। চীনারা ভূটানের প্রায় ৩ শত বর্গমাইল এলাকা দাবী করিতেছে। ভারতের দাবী হইতেছে যে, ভারত ও ভিক্তের মধ্যে সীমান্তটি সুবিধিত বহু-প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। ভারতীয় এলাকার এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি অধিকার ত্যাগ করা যায় না। তবে ম্যাকমোহন লাইনের যে অংশ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয় নাই তাহা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করা বাইতে পারে। চীনা লাইন সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট সমর্থন এবং নেহরু লাইন সম্পর্কে নিষিদ্ধ ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ণ সমর্থনের ফলে দিল্লীর মনোভাব কঠোর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

### আততায়ীর গুলীতে বন্দরনায়কের মৃত্যু

সিংহলের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী এস. ডব্লিউ. আর. ডি. বন্দরনায়ক আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে তাঁহার বাসগৃহে জনৈক পীত-বেশধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতি নিকট পাল্লা হইতে পর পর ছয়বার গুলীবর্ষণ করে। তাঁহার তলপেটে ও হাতে মোট চারটি বুলেট বিদ্ধ হয়। রক্তাধুষিত অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে লওয়া হয় এবং তিনজন বিশিষ্ট সার্জন পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু তাঁহাকে

বাচাইবার সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং পরদিন ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সমগ্র সভ্যজগত স্তম্ভিত হইবে সন্দেহ নাই। তিন বৎসর আগে ১৯৫৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া, বন্দবনারক যখন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হইয়াছিলেন, তখন শুধু ভারতবর্ষ কেন, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের তিনি শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হইয়া সোভিয়েট রাশিয়া, নয়াগীন ইত্যাদির সঙ্গে ব্রিত্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যদিও ভিতরে অনেক গোলযোগই ছিল, তথা নিরুৎসাহের চেষ্টাও তিনি দীর্ঘে দীর্ঘে করিতেছিলেন। “কারণ বাহাই থাক, তাঁহাকে এইভাবে হত্যা করিবার কারণটি কিন্তু সুস্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ সংকটের সঙ্গে ইহাও কোন যোগসূত্র থাকিলেও থাকিতে পারে। তথাপি উল্লেখযোগ্য যে, সিংহল এই সর্বপ্রথম এমন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল এবং দ্বিতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য যে, হত্যাকারীরা বাহাকে ধৃত করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণিত। অহিংসার পূজারী হওয়া এমন হিংস্র খুনে হইয়া উঠিল কেন, তাহা আমরা জানি না। তবে ইহানীং আমরা দেখিতেছি যে, হিংস ও অহিংসার পূজারীদের মধ্যে কোন সীমারেখা থাকিতেছে না।

যাহা হউক, রাজনৈতিক মত-বৈষম্যের জন্য লোকের প্রাণ লগ্ন্যকে আমরা গতিত অপরাধ এবং অরণ্যক হিংস্র নীতি বলিয়া মনে করি।

### যুক্তপ্রচেষ্টায় এলুমিনিয়াম কারখানা

সংবাদটি ‘আমেরিকান রিপোর্টার’ পরিবেশন করিয়াছেন :

“ওকলাগা, ক্যালিফোর্নিয়া : কাইজার এলুমিনিয়াম এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন এবং ভারতের শিল্পপতি জি. ডি. বিজলায় মিলিত উদ্যোগে ভারতে এলুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি কাইজার কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান এডগার এক কাইজার এই সংবাদ ঘোষণা করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের নাম হিন্দুস্থান এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এটি স্থাপন করা হবে উত্তরপ্রদেশের বিহাঙ্গে। প্রতি বছর এই কারখানায় ২০ হাজার মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম উৎপাদন করা হবে।

এই কারখানার জন্য আনুমানিক প্রায় ৩ কোটি ডলার মূলধন বিনিয়োগ করা হবে এবং ইতিমধ্যেই হিন্দুস্থান এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন টাকা এবং ডলারে মিলিয়ে মোট ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্কে নিকট আবেদন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য

যে পরিমাণ মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য বেসরকারীভাবে এত অধিক মূলধন এর আগে বিনিয়োগ করা হয় নি। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার কাইজার কোম্পানী, বিজলা ব্রাদার্স এবং ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কাইজার কোম্পানীর হাতে থাকবে শতকরা ২৭টি সাধারণ শেয়ার, বাদ বাকী ৭৩টি শেয়ার ভারতীয়দের হাতে থাকবে। প্রেক্ষাগেল শেয়ারের সবটাই থাকবে ভারতীয়দের হাতে।

### আমেরিকায় ভারতীয় তাঁতজাত দ্রব্যের চাহিদা

‘আমেরিকান রিপোর্টার’ সংবাদটি দিতেছেন :

“সম্প্রতি মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের তাঁতবস্ত্রাদি যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহের কনমার্সেস লাভ করেছে। এই কনমার্সেস দেওয়া হয় সম্প্রতি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য-মেলায়। ভারতীয় তাঁতশিল্পের পক্ষ থেকে যে সব প্রতিনিধি ঐ বাণিজ্য মেলায় উপস্থিত ছিলেন, তারা এই কনমার্সেস সম্পর্কে বলেছেন যে, এর দ্বারা আমেরিকার প্রয়োজনের সম্পর্কে ঘর্ষা কোন ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও আমেরিকার চাহিদা মেটাবার পক্ষে ভারতবর্ষের বর্তমান সামর্থ্য যে সীমাবদ্ধ, সেটা বোঝা গেল।

প্রতিনিধিদল বলেছেন, তাঁতবস্ত্রাদি সরবরাহের পক্ষে প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, দেশে তাঁতের কাপড় বেশী পরিমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, উৎপাদন কেন্দ্রগুলিও দেশের বিভিন্ন ভাগেই এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কনমার্সেস মত মাল সরবরাহ করার পক্ষে অসুবিধা দেখা দেয়। এই সব কারণেই যে পরিমাণ মাল সরবরাহের কনমার্সেস শিকাগোর মেলায় পাওয়া গিয়েছিল, প্রতিনিধিগণ তার সবটা গ্রহণ করতে পারেন নি।

এ সব এবং অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় তাঁতশিল্পের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর (১৯৫৮) সাড়ে ১২ লক্ষ ডলার মূল্যের তাঁতবস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। আর বর্তমান বছরে ৩৫ লক্ষ ডলার মূল্যের তাঁতবস্ত্রাদি রপ্তানি হবে বলে আশা করা যায়।”

### সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে জাপান

সম্প্রতি জাপানে এবং প্রশান্ত মহাসাগর-এর উপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড়ের যে প্রলয়ঙ্কর ত্যাগের বহিরা গিয়াছে, তাহার ক্ষয়-ক্ষতির সম্পূর্ণ হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। এক জাপানেই ইতিমধ্যে আড়াই হাজারেরও অধিক লোক হত বা নিরুদ্ধিত হইয়াছে। ইহাও সহিত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ জুড়িয়া দিলে

ধ্বংসলীলার ভয়ঙ্কর রূপটির কিছুটা অনুমান করা যায়। দুই শত আটত্রিশটি জাহাজ ভুবিরাছে, ভাসিয়া গিয়াছে এক হাজারেও উপর এবং প্রায় দেড় হাজার জাহাজ আংশিক ভাবে ধ্বংস হইয়াছে। সেতু, সড়ক এবং রেলপথের ক্ষতিও কম হয় নাই। দুর্ভিক্ষাক-দৈবের উপর অবস্থা মানুষের হাত নাই। তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া নতুন উদ্যমে জাপানকে আবার আগাইয়া আনিতে হইবে তাহার গঠনকার্ণের ক্ষমতা, ইহা তাহারা ভাল করিয়াই জানে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত রূপের অভিজ্ঞতা অবশ্য তাহাদের এই প্রথম নয়। বহুবার প্রতিকূল প্রকৃতি প্রচণ্ড শক্তিতে তাহাদের আঘাত করিয়াছে। ভূমিকম্পে দেশ ধ্বংস হইয়াছে, আগ্নেয়িক বোমার তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে—তাহার পরও যে-জাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ভগবান তাহাদের এই বিপদে সেই শক্তি দান করুন।

### আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার ভেদভঙ্গ

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা আজও সরকারের স্বীকৃতি পাইল না। ইহা যেমনই হউক তেমনি অগোঁরবেদ। আয়ুর্বেদ ভারতেরই আবিষ্কৃত এবং ভারতের একটি গৌরবস্থানীয়। ভারতের চরক, সুশ্রুত, বাগভট প্রভৃতি ঋষিজন ব্যক্তিগণ যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি বর্তমানে পশ্চাত্য দেশসমূহেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। পশ্চাত্য চিকিৎসার অগ্রগতিকে আজ কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু আয়ুর্বেদীয় ঔষধের অত্যাশ্চর্য গুণও উপেক্ষণীয় নয়। তা ছাড়া ভারতের জল-মাটিতে ভারতীয় চিকিৎসার উপ-বাসিতা বিদেশেও স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য আলো-পাণ্ডির তুলনায় আয়ুর্বেদের স্থান আজ অনেক নামিয়া গিয়াছে। তাহার কারণও আছে। প্রথম কারণ, পশ্চাত্য দেশের সকল জিনিসের উপর আমাদের অহেতুক মোহ। দ্বিতীয় কারণ, বিদেশী রাজশক্তি কর্তৃক আয়ুর্বেদের উপেক্ষা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই উপেক্ষার কোন যুক্তিযুক্ততা থাকিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেন্ট যদি আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে দেশবাসী অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে চিকিৎসা ও রোগনিবারণের সুযোগ পাইবে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যোগ নিয়মের উহা এরূপ স্বল্পপ্রদ, যাহার ফলে দেশে আলোপ্যাথিক চিকিৎসার সহিত আয়ুর্বেদের সহ-অবস্থান চলিতে কোন বাধা নাই।

অবশ্য বলিতে দোষ নাই, প্রাচীন কবিবাজরাও ইহার অনেক-খানি ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহারা গবেষণার মনোবৃত্তি লইয়া ইহার উন্নতির কোন চেষ্টাই করেন নাই, বাহার ফলে পরবর্তী যুগে তথ্যের বী যুগকেই অন্ধকারেই হাতড়াইয়াছেন। অথচ আমাদেরই দেশে উপকরণ লইয়া, সোভিয়েট রাশিয়া কত সহজে গবেষণার পথ

গবেষণা করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৫৭ সনে সোভিয়েট উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের একটি দল ভারতে আসিয়া ভারতীয় আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে ব্যবহৃত ভেদভঙ্গসম্পন্ন গাছ-পাছড়া সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১৮০ বকম এই জাতীয় গাছ-লতা-শুষ্কও বীজ বা চারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তার পর হইতে সোভিয়েট দেশে এ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা-অনুশীলন চলিয়াছে।

দ্রুতকুমারী আর কুমারী-লতাকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে প্রয়োগ করা সম্পর্কে গবেষণা করিতে গিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, চারা অবস্থাতেই ইহাদের যোগ-নিবারণের ক্ষমতা থাকে সবচেয়ে বেশী। এইরূপে করবী আর ধুতুরা হইতে যথাক্রমে হৃদযোগের আর বায়ুযোগের ঔষধ তৈয়ারী করিয়াছেন। হাঁপানী নিবারণের খুব কার্যকরী ঔষধ তৈয়ারী করা হইয়াছে 'বেলফস' হইতে।

বিপাকক্রিয়া বা মেটাবোলিজমের ব্যাঘাত ঘটিলে নানারূপ চক্ষুরোগ দেখা দেয়। একথা ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই জানেন। এরূপক্ষেত্রে কিছুটা জাতীয় এক বকম জ্বরের রস হইতে ইহার চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। হৃদযোগা 'খবল'ও ইহাতে সাবিতেছে।

এই সমস্ত ঔষধই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আরও কতগুলি ঔষধ লইয়া তাঁহারা গবেষণার রত আছেন। তাঁহারা আশা করেন, একদিন এই ঔষধগুলি পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

### মাইক, লাউডস্পীকার

মাইক বা লাউডস্পীকারের প্রতাপ হইতে আমরা কবে মুক্ত হইব জানি না। কোন বকম পূজা-পার্বণ উপস্থিত হইলেই সাধারণ শাস্তিপ্রিয় নাগরিকের মনে ইহা কেমন একটা আতঙ্কের উজ্জেক করিয়া তুলিতেছে। গত বৎসর হইতে কলিকাতার পুলিস ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কতকটা ব্যবস্থা করিতেছে বটে, কিন্তু সত্বেও ব্যাধির মত ইহার প্রতাপ বকঃবল শহরে ও পল্লীতে গিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেখানে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কোন-রূপ ব্যবস্থা হইতেছে না। দুর্গাপূজার সময় চার-পাঁচ দিন অনবরত মাইক চলে এবং ঐ ঐ অঞ্চলবাসী জনসাধারণের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। পূজাযজ্ঞের পার্বণে কোন গৃহে যদি যোগী থাকে তবে মাইক বা লাউডস্পীকারের অবিরাম চীৎকার হেতু তাহার ভবলীলা সাজ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া তোলা হয়। সামান্ত পূজা-পার্বণেও এই মাইক একটি অতীব অবাঞ্ছনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু পূজা-পার্বণই বা বলি কেন, বিবাহে, বোঁতাতে, অন্নপ্রাশনে,

উপনয়ন-সূত্রে সকল ব্যাপারেই মাইক নিষেধ প্রতাপ বিস্তার করিতেছে। স্বদেশীয় গীতবাহ, ঢাক-ঢোল-কঁাসি কি রাসাতলে গেল? শাসন-কর্তৃপক্ষ শুধু নয়, জনসাধারণকেও এই অস্বস্তিকর শাস্তিনাশক মাইকেয় দোষাশ্রা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে তৎপর হইতে হইবে।

### আগরতলায় সেন্ট্রাল এম্বুলেন্স-ইউনিট

এম্বুলেন্স ব্যবহার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় মক্কেলের রোগীদের প্রায়ই চিকিৎসা-বিভাগে ঘটে। ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল আঞ্চলিক পরিষদের নিকট হস্তান্তরের পর ভি, এম হাসপাতালের এম্বুলেন্স আগরতলা হইতে ৫ মাইলের মধ্যে যাতায়াত করে। পরিষদের নিকট মাত্র একটি এম্বুলেন্স আছে কিন্তু জটিল নিয়ম-কানুনে এম্বুলেন্স পাড়ী পাওয়া এক সমস্যা হইয়া পড়ায়। ইহা ছাড়া একটি এম্বুলেন্স দ্বারা সমগ্র ত্রিপুরার চাহিদা মিটিতেও পারে না। এখানেই চিকিৎসার কগণ মনে করেন যে, ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক আগরতলায় একটি সেন্ট্রাল এম্বুলেন্স ইউনিট স্থাপিত হইলে এম্বুলেন্স সংস্থাও সমাধান সম্ভব।

ত্রিপুরার 'সেবক' পত্রিকার উক্ত সংবাদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কারণ সমাজ-কল্যাণ কার্যে ইহা অপরিহার্য অঙ্গ।

### বর্ধমানের বিধ্বস্ত গ্রামসমূহ

দামোদরের দক্ষিণ তীরস্থ বঙ্গবিধ্বস্ত অঞ্চলের বর্ধমান শহরের সমন্বয় হইতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ দায়রা ধানার হিজলনা ইউনিয়নে এ পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য পাঠানো হয় নাই। অবিলম্বে এই ইউনিয়নে সরকারী সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া আশাস দেওয়া হইয়াছিল। বঙ্গবিধ্বস্ত হইবার পর দশ দিন পরেও সেখানে কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই। এই ইউনিয়নের বেলসর, কয়রাপুর, মাজুখাড়া, বজ্রীও গ্রাম বিশেষভাবে বঙ্গবিধ্বস্ত হইয়াছে এবং অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশকেই অর্ধাহারে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এই ধানার অঞ্চল ও গোতান ইউনিয়ন আংশিক প্রাবৃত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সরকারী সাহায্যকারী দল পাঠানো হইয়াছে। দায়রা ধানার বঙ্গবিধ্বস্ত অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র হিজলনা ইউনিয়নকেই সাহায্য দেওয়া হয় নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট বৃদ্ধসমূহের উক্ত ইউনিয়নের বর্ধমান কথা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন।

'দামোদর' এই সংবাদটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

### পাগলাঘাটা করলানদীর উপর পুল

জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকা জানাইতেছেন :

বারপেটিয়ায় পাগলাঘাটা করলানদীর উপরে একটি পুল তৈরির প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী অনুভূত হইতেছে। এই অঞ্চলের নান্দুয়ার চয়, তুলসী চয়, কাছারপাচ, মৌরাসারী, খোদাগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় শত লোকের এই পুলটির অভাবে নানা অসুবিধার পড়িতে হয়। এই অঞ্চলের হেলথ সেন্টারের সুযোগ লইতে হইলে প্রত্যেককেই মালিভিটা বাইতে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অনেক ঘুরিয়া ওয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে হয়। পাগলাঘাটে পুল তৈরি হইলে মাত্র দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই হেলথ সেন্টারে যাওয়া বাইবে। আমবা জানিলায় জেলা সমাহর্তা মহাশয় এই পুলটি তৈরির আশ্বাস গত এক বৎসর আগে দিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যাধিক কোন ফল ফলে নাই।

### কম্মী আছে কাজ নাই

বর্ধমানের 'দামোদর' বলিতেছেন :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে গত ৫ মাস ব্যবত প্রায় ১০০ জনকে ডি, ডি, এইচ বিজ্ঞান হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহাদের বেতন ৫৫ টাকা হইতে ৭৫ টাকা পর্যন্ত। তাহাদের কোন ডিউটি ঠিক করিয়া পাঠানো হয় নাই বলিয়া তাহারা বসিয়া আছে। গত ৪ মাস ধরিয়া প্রায় ৩০ জন মহিলা আরও পাঠান হইয়াছে, তাহাদেরও কোন ডিউটি নাই। হাসপাতালে বাগান করিবার জন্য ৮টি মালী আছে তাহাদের বেতন মাসিক ৭৫ টাকা কিন্তু বাগান ঘুরে থাকুক, হাসপাতাল প্রান্তরের চোবকাটাও পরিচর্য করা হয় না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গত ২৩শে আগষ্ট হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন তখন দেখা যায় অধিকাংশ ঔষধই নাই।

### সাধারণ পরিষদে তিব্বত প্রসঙ্গ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :

'নিউইয়র্ক, ২৮শে সেপ্টেম্বর—ওয়ার্কিংহাল মহলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অল্প রাজ্যে আয়ারল্যান্ড ও মালয় যুক্তভাবে তিব্বত পরিদর্শিত সম্প্রদায় সাধারণ পরিষদে বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।'

এই মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, আয়ারল্যান্ড এবং মালয়ের প্রতিনিধির আনুষ্ঠানিক ভাবে সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট উপরোক্ত মর্মে অনুবোধ জানাইয়াছেন। আগামীকলা আয়ারল্যান্ড এবং মালয় কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তপ্রস্তাবের বিবরণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা বাইতেছে।

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ সাধারণ পরিষদে তিব্বত প্রসঙ্গ উত্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়া-

ছিলেন, সে সম্পর্কে আশাশুভরূপ সমর্থন পাওয়া যায় নাই। আর্যল'ও এবং মালয়ের প্রতিনিধিরা এই প্রসঙ্গ লইয়া বর্তমানে আর অগ্রসর হইবেন না বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল মনে করিতেছেন।

### কুমারী আরতি সাহার চ্যানেল অতিক্রম

উনিশ বৎসর বয়স্কা ছাত্রী কুমারী আরতি সাহা ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ক্রম হইতে ইংলণ্ডের পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি শুধু এশিয়ায় প্রথম মহিলা হিসাবে গোঁবব অর্জন করিলেন না, বরং হিসাবেও তিনি সর্বকনিষ্ঠা সাতার। ইহার পথপ্রদর্শক ক্যাপ্টেন হাটিনসন প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, কুমারী আরতি যে প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যে চ্যানেল অতিক্রম করিয়াছেন, ইতিপূর্বে আমি এইরূপ দেখি নাই। ইহা আরতির পক্ষে কম গোঁববের কথা নহে। আমরা ভারতবাসী হিসাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

### সৈয়দ ফজল আলী

আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলীর মৃত্যুতে ভারতের একজন প্রবীণ বিচক্ষণ আইনবিদ্যারদের জীবনাবসান হইল। তাঁহার কীর্তি বহুপ্রসারিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যপাল হিসাবেও তিনি আসামে বাইবার পূর্বে উড়িষ্যায় দুই বৎসর রাজ্যপালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারও পূর্বে তিনি বরাবর বিশেষ গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ বহু সম্মানিত পদের কর্তব্যপালনে নিজের প্রতিভা, কর্তব্যক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া ক্রমোন্নতির দীর্ঘ পৌছিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ছাপরা ও পাটনার ব্যারিষ্টাররূপে কর্তব্যজীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সনে তাঁহাকে পাটনা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি নিয়োগ করা হয় এবং উহার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সনে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার কর্তব্যক্ষেত্র ক্রমশঃ আরও উর্ধ্বে এবং আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। ভারতের কেডারেল কোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের জজরূপে তিনি সাত বৎসরকাল বিচার-বিভাগীয় উচ্চতনপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ভারতের এই প্রবীণ, বিচক্ষণ রাজ্যপালের মৃত্যুসংবাদে ভারতবাসী যাজেট মর্মান্বিত।

### শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৭৩ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোক-গমন করিয়াছেন। যে অর্থে আমরা সাহিত্যসেবী বা সাহিত্য-সাধক বলিয়া থাকি, শৌরীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা তাহা পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাসী সত্যসত্যই একজন সাধক লন্ডান হারাইলেন।

শৌরীন্দ্রনাথ পাবনা জেলার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু মূর্খিনাবাদ

জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত কাশিমবাজারকেই তিনি জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যসাধনা এই কাশিমবাজারেই সূত্র হয় এবং তাঁহার অধিকাংশ রচনাই এই কাশিমবাজারে বসিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার প্রচুর কবিতা প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'র ছিলেন তিনি একজন নিয়মিত লেখক। বর্তমান সংখ্যায়ও অন্তত তাঁহার একটি কবিতা প্রকাশ করিলাম।

তিনি সত্যাকার সাধকের মত কবিতা লিখিয়াই বাইতেন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও, পুস্তকাকারে প্রীত কবিবার বাসনা তাঁহাতে অত্যন্ত কমই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'পদ্মবাস' নামে তাঁহার একখানি কবিতার বট বহু বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার আর একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয় 'বান্দী'র আশ্রয়' নামে। তিনি অমায়িক ও বহুবৎসল ছিলেন। সাহিত্যিক বন্ধুদের নানা ভাবে সাহায্য করিতেও তিনি বদ্ধ লইতেন। তিনি শেষ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য লাভ করেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয়-বিরোগের বাধা অনুভব করিতেছি।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসে "প্রবাসী" ৬০তম বৎসরে পদার্পণ করিবে। দীর্ঘকাল ধাবং ইহা বঙ্গভারতীয় সেবার নানাভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই বৎসরটি আমাদের নিকট বড়ই জ্ঞানবীর্য। এ সময়ে আমরা বিগত ষাট বৎসরে কতদূর চিন্তায় ও কার্যে অগ্রসর হইয়াছি প্রবাসীর কাইল-গুলি পরিদৃষ্টে তাহার সন্মুখে সম্যক্ ধাবণা জন্মিতে পারে।

আমরা এই কার্যের প্রথম ধাপস্বরূপ বিগত বৃষের বিবিধ লেখক ও মনীষীর রচনা হইতে কিছু কিছু পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইব। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীর উৎকৃষ্ট চিত্রসমূহ হইতে কোন কোনটি আমরা পুনরায় প্রকাশিত করিব। বর্তমান সংখ্যায়ই পাঠক-পাঠিকা আমাদের এই প্রবন্ধের পরিচয়গ্রন্থ দুইখানি চিত্র পুনর্মুদ্রিত দেখিতে পাইবেন।

প্রবাসীতে যে-সব রচনা প্রকাশিত হইত, লিখন-শৈলী, বাচন-ভঙ্গী এবং ভাষা-পারিপাট্য গুণে তাহার অনেকগুলিই এ বৃষের পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ প্রিয়দানযোগ্য। এই সকল হইতে কিছু কিছু পুনর্মুদ্রিত হইলে প্রবীণ পাঠক-পাঠিকাগণও পূর্ব-স্মৃতি অনেকটা জাগরুক করিয়া তুলিতে পারিবেন। আমাদের এই প্রবন্ধ আশা করি সকলেরই তৃপ্তিপ্রদ হইবে।

### পূজার ছুটি

শ্রাবণের পূজা উপলক্ষে 'প্রবাসী'-কর্তৃক আগামী ২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা কার্তিক (২১শে অক্টোবর) বৃহবার পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সন্মুখে রাখিয়া আপিস খুলিবার পথ করা হইবে।

কর্তৃপক্ষ, প্রবাসী

## ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

“উৎপত্তিতে অস্তিত্ব বা কোইপি মে সমানর্থ্যম্।

কালোহরম্ নিববধি বিপুলো চ পৃথ্বা ॥”

১

কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কটক অধিবেশনে শাখা-সভাপতি হিসাবে আমি গতাহুগতিক এক অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলাম। সভার পরে আমার ঘরে গিয়া এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বন্ধু সযস স্নেহের ভঙ্গিতে মন্তব্য করিলেন, আপনার অভিভাষণ শুনিয়া ধারণা হইল যেন ভারতবর্ষে একজন মাত্র ঐতিহাসিক আছেন! অনবধানতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বন্ধুবরের ক্ষোভ দূর করিলাম বটে, কিন্তু মন্তব্যটা মনের উপর দাগ কাটিয়া গেল। এইরূপ অভিভাষণ গবেষক ও উদ্যমান ঐতিহাসিকগণের নামোল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিবার রীতি অস্বাভাবিক শাখার সভাপতিরা পালন করিয়াছেন, আমি করিলাম না কেন? সভা-মঞ্জলিসে-আড্ডায় অভিভাষণে বন্ধুমহলে যুক্তবিশ্বাসনা কিংবা পরস্পর গাত্রকুণ্ডন একটা সামাজিক প্রথা বটে, কিন্তু আসলে ইহা একটি নৈতিক ব্যাধি। কাহাকেও উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ঐতিহাসিক হিসাবে বিতায় ব্যক্তির নামোল্লেখ কুরিতে গেলেই আমাকে লইয়া তেঁঞিশ কোটি দেবতার বন্দনা করিতে হয়; এই দায় এড়াইতে গিয়া আমি হয়ত অনেকের আশাভঙ্গ করিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে ইংরেজী শব্দের তজ্জমা “ইতিহাস” ও “ঐতিহাসিক” যত্রতত্র বাংলায় প্রয়োগ হইলেও ইহার দ্বারা ইতিহাস ও ঐতিহাসিককে খরঁ করা হয় না কি? লোকে ভ্রমতাব খাতিবে আমাকেও ঐতিহাসিক বলে, আমিও দণ্ড করিয়া মাঝে মাঝে নিজেকে ঐতিহাসিক বলিয়া থাকি; কিন্তু এই গৌরব আমার জাতি প্রাপ্য কি? ইহার পরে আমি নিজের বহিঃগুলি বিতায়বার পড়িয়া দেখিলাম কোনটাই আধুনিক পণ্ডিতসমাজে গ্রহণীয় “ইতিহাস”-সংজ্ঞার পর্যায়ে উঠে নাই, প্রকৃত ঐতিহাসিকের যে সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া উচিত উহার পরিচয় আমার পুস্তকে নাই। আমি গবেষণামূলক জীবন-চরিত্র (biography) লিখিয়াছি, “ইতিহাস” লিখি নাই। এই যুগে Carlyle ঐতিহাসিক নহেন; “শূর-পূজা”ও ইতিহাস নহে।

আবুল ফজলের “আকবরনামা” অল্প লেখকগণের “নামা”র মত শুধু জীবনী হইলে তিনিও ঐতিহাসিক সমাজে স্থান পাইতেন না, আমি ত দূরের কথা। Trevelyan সাহেব “Garibaldi” লিখিয়া ঐতিহাসিক হইতে পারেন নাই; “Social History of England” পুস্তক তাঁহাকে এই গৌরবের যথার্থ অধিকারী করিয়াছে। বিরাট ইতিহাস না লিখিয়াও শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের আসন পাওয়া যায়—যথা Lord Acton; যেহেতু প্রতিভা বলে তিনি ইতিহাসের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত কারণেই Toynbee আধুনিক যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

ঘরে বাহিরে সকলেই যদুনাথকে ঐতিহাসিক বলিয়া সমীহ করে; সুতরাং তিনিই আমাদের মাপকাঠি। তাঁহার রূপায় আমি কত বড় ঐতিহাসিক হইয়াছি বুঝিবার জন্য মাপিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া মেরুদণ্ড শোকা করিলেও মাথা গুরুজীব কোমর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না! অস্বাভাবিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণকে পরলোক হইতে আমন্ত্রণ করিয়া (আমার নম্র অধ্যাপকবর্গ ব্যতীত) পাশে দাঁড় করাইয়া দেখিলাম সকলেই যেন তাঁহার বগলের নীচে! ইহা দৃষ্টিভ্রম না মতিভ্রম?

২

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে আচার্য যদুনাথের এক প্রাক্তন ছাত্র এবং লক্ষপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের পিছনে পড়িয়া গুরুজী জীবনটাই মাটি করিলেন; আকবরের ইতিহাস লিখিলে পরিশ্রমটা সার্থক হইত, বহির কাটতিও বেশী হইত। মাটির গুণে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিলেও কথাটা হাঁ জী, হাঁ জী করিয়া হজম করিলাম, কোন অনর্থ ঘটে নাই। ১৯২০ ইংরেজীতে গুরুজী হইতে বিদ্যায় লওয়ার সময় আচার্য যদুনাথ বলিয়া দিয়াছিলেন, যে যাহা বলে শুধু “হাঁ জী, হাঁ জী” করিয়া শুনিয়া বাইবে, তর্ক করিবে না। তাঁহার আদেশ অবিচারে যথাসামর্থ্য পালন করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে সব দিক রক্ষা হইয়াছে। যাহা হোক, তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন, বিপক্ষের কথা অপ্রিয় হইলেও উপেক্ষা করিবে না, যৌতভাবে উহার গুরুত্ব বিবেচনা করিবে। • এই



জন্ম আমি উক্ত মন্তব্য গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলাম, উহাতে বহি কাটতির পাটোয়ারি বুড়িটা বাহ ছিল, বাকী অংশ আংশিক সত্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আমার মনে প্রশ্ন জাগিল। যত্নাথ আকবরের ইতিহাস না লিখিয়া আওরঙ্গজেবের ইতিহাস লিখিতে গেলেন কেন? তাঁহার ইতিহাসচর্চায় দ্বারা দেশ ও জাতি কতটুকু উপকৃত হইয়াছে? আকবরের ইতিহাস লিখিলে আচাৰ্য্য যত্নাথ দেশ তথা জাতির কী কল্যাণ সাধন করিতেন, এবং আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনার দ্বারা কোন অকল্যাণ করিয়াছেন—ইহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

আকবরের ইতিহাস পড়িয়া দেখিলাম, সে যুগে গণ-বেশতা নাই, দেশ নাই, জাতি (nation) নাই। আকবরের অলোকসামান্য রাজত্বপ্রতিভা, “নবরত্ন”-বন্দিতা সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, শত্রুদের নীতিনিয়ন্ত্রিত শ্রায়ণও যে দেশে জাতিগঠনে বিফল হইয়াছে, ঐতিহাসিক আবুল ফজলের অপরিমেয় বিদ্যা, জুহুজ্ঞা লেখনী এবং ভাবার জলদ-নির্ঘেষ যে সমাজের বিচারব্যক্তিকে উজ্জ্বল করিতে পারে না, সে ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে আচাৰ্য্য যত্নাথ আকবরের ইতিহাস লিখিয়া কাহার উপকার করিতেম?

ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের অসফল স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করিবে বলিয়া কেহ কেহ আশা করেন, যেহেতু পণ্ডিত জবাহরলালজী হরত অজ্ঞাতসারে আকবরের পথেই চলিয়াছেন। যাহাকে আমরা “জাতি” বলিয়া ভ্রম করিতেছি, ইহা আকবর-জবাহরলালজীর কাম্য সেই মহাজাতি নহে। বর্তমান ভারতীয় জাতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এখনও সংকীর্ণবুদ্ধি সম্প্রদায়-সহস্রের সাময়িক ঐক্য এবং মৌখিক ঐক্য; এই জন্তই পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে আন্দোলনের nationalism এর মুখোপের আড়ালে regionalism, casteism, communalism-এর নরমুদ্রি দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পরিস্থিতি দেখিয়া স্বাধীনতার দিনেই ভারত-মাতা শরশয্যা লইয়-ছেন; তাঁহার বক্ষপত্রের উভয় পার্শ্বে অর্ধবিদ্ধ শাগিত ছুরিকা, উরুদের মধ্যে মায়াবী বাতাপী-ইরল, অঙ্গে অহিংস-চিক্রিত নামাবলী। আকবরের রাজত্বে ভারতীয় মহাজাতি পায়ের উপর ভর করিয়া না ঠাঁড়াইতেই হিন্দু মুসলমান মারাঠি গলা টিপিয়া মাঝিয়াছে। এই পাপে হিন্দুজাতি আলমগীর-খানী রৌববে পড়িয়াছে, মুসলমান মোগল সাম্রাজ্য হারাইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান বেড় শত বৎসরের অধিক বিলাতী লাজল টানিয়া বক্তবমন করিয়াছে। আকবরের অসাকল্যের পরিণাম আওরঙ্গজেব, আওরঙ্গজেবের অসাকল্যের পরিণাম

মোগল সাম্রাজ্যের অবশান। এই শিক্ষা আওরঙ্গজেবের ইতিহাসেই পাওয়া যায়, আকবরের ইতিহাসে নহে।

আকবরের ইতিহাস নুতন করিয়া লিখিবার অবকাশ এবং প্রয়োজনীয়তা নাই—এই কথা মোল্লা সমাজ বলিতে পারে, কেননা সত্যমিথ্যা বাহ্য কিছু আকবর সম্বন্ধে বলিবার ছিল, সে যুগের ধর্মপ্রাণ মোল্লা আবহুল কাদেব বদায়ুনী প্রাণ খুলিয়া বলিয়া গিয়াছেন! বদায়ুনী আকবরবংশী দরবারের ইমাম ছিলেন। বাদশার কাফেরী খেয়াল দেখিয়া তিনি চাকরি ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি মনের দুঃখে বলিয়াছেন, হার হার ইসলাম গেল; আরবী ও মৌলবীর পাট উঠিয়াছে, মসজিদ আত্মাবল হইয়াছে; আলা হকরত হুকুমজারি করিয়াছেন, তোমরা গুরু জবাই করিতে পারিবে না, গাইয়ের গোস্ত খাইতে পারিবে না, বরং গোমূত্র পান কর! প্রকাণ্ডেই হকরত বশুলাহর নিশ্চয় করিয়া গরিবার সময় আকবরের বন্ধু কবি ফৈজী জলাভক্ত রোগীর শ্রায় কুকুরের ডাক ডাকিয়াছিলেন; আকবর কি করিয়াছিলেন স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। আকবরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখিয়া বদায়ুনী মুসলমান সাধক ও বিদ্বানগণের জীবনী (Muntakhabut Tuarikh, Vol-III) সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছিলেন; যেহেতু আকবরবংশী দরবারের পায়ণ্ড (লুচ: : Luchchaha-i-Zamana)-দ্বিগের কথা লিখিয়া লেখনী কলুণিত করাই পাপ! মুহূর্ণমুহূর্ণ আকবর আল্লার নাম লইয়াছিলেন কিনা এই বিষয়ে মোল্লাপন্থীগণের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল, হরত অশোভন গুজবও রটনাছিল; না-হয় আবুল ফজলের মৃত্যুর পর লিখিত “আকবর-নামা”র উপ-সংহারে আকবর কলমা পাঠ করিয়াছিলেন, এই কথা ফলাও করিয়া লিখিবার কারণ কি ছিল?

যাহা হোক, আকবরের নাম লইলে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান আকসোপ করেন, আওরঙ্গজেবের নাম করিয়া আল্লার “দোয়া” কামনা করেন। মোল্লাশাসিত মুসলমান-সমাজ হিন্দু-বোঁবা আকবরকে “একবর” করিয়াছেন, — দেখানে তিনি আবুল ফজলের সহিত দোজখের ইস্তেজার (অপেক্ষা) করিতেছেন। প্রমাণ? পাকিস্তানে মুসলমানের স্বয়ং এবং লামাপন্থী বুদ্ধি চেঙ্গি খাঁর নামেও জাতীয় উৎসবে তোরণ নির্মিত হয়, আকবরের জন্ম নহে। উদারচেতা সুপণ্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অহুগত দেশপ্রেমিক অসংখ্যক মুসলমান ব্যতীত ছনিয়ার বাহবাকী মুসলমান সকলেই কি অবুধ? এই বিচার মুসলমানই করিতে পারে, অমুসলমানের সাধ্য নহে। আকবরের প্রতি শিকিত-অশিকিত মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশের এই আক্রোশ কেন? স্বাধীনতা হারাইলে হিন্দু

যেমন বিদ্যাপ কবিবার অধিকার আছে, মুসলমান এবং ইংরেজকে গালাগালি দিয়া নিজের ঘোষ ঢাকিবার প্রয়াস আছে, হিন্দুস্থানের মৌবদী বাদশাহী হারাইয়া মুসলমানেরও মতিচ্ছন্ন হইবার অধিকার আছে। মুসলমান মনে করে আকবর বাদশাহর মত পাপী জালিম দজ্জাল মুসলমানের দরে জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতে মুসলমান আধিপত্য কখনও ধ্বংস হইত না। ইতিহাসে এই কথা উড়াইয়া দিতে পারে না। শরিয়তের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তুর্কী-তোগলক-শাঠান সাম্রাজ্যকে নিজের খেয়ালে নতুন ছাঁচে ঢালাই করিতে গিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যের কবর তিনিই খনন করিয়াছিলেন, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ঐ সাম্রাজ্যকে আবার বিশুদ্ধ ইসলাম ও শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যম করিয়াছেন; আকবর যে গাছের মূল শিকড় কাটিয়া দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব উহাকে কেমন করিয়া বাঁচাইবেন? বাদশাহ হইয়া আকবর স্বয়ং মুসলমান সমাজে বিরাট কুদৃষ্টান্ত; বোকা নাই, নমাজ নাই, কখনও কপালে ভিলক, কখনও এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া সূর্যের সহস্রনাম পাঠ। তিনি মুসলমানের জাতি অধিকারে হিন্দুকে শরীক করিয়া দিলেন, পক্ষান্তরানে হিন্দুকে শরিয়তবিরোধী অধিকার দিয়াছিলেন, জিজিয়া কর বহিত করিয়া এবং দরবারে মনসবদার হিসাবে রাজপুতকে মোগল-পাঠানের মাথাব উপর বসাইয়া হিন্দুর হাতে মুসলমান রাজ্য তুলিয়া দিলেন। মূলতানী আমলে মন্দির ভাঙ্গা হিন্দুর গা-সহা হইয়া গিয়াছিল, আকবরের রাজত্বে মথুরা ও অজন্তা স্থানে মন্দির বানাইবার হিড়ক পড়িয়া গেল, মসজিদগুলি সংস্কারের অভাবে চামচিকার আস্তানা হইল। মোট কথা, হিন্দুর টিকির জন্য আকবরের বতটুকু বৎস ছিল, মুসলমানের দাড়ির (অর্থাৎ ইজ্জত) জন্য উহার অর্ধেকও ছিল না। আকবরের পুকে হিন্দুর চৌদ্দপুরুষ বিনা ওজরে জিজিয়া কর দিয়া আসিতেছিল, আকবর হইতে তিনপুরুষের পর আওরঙ্গজেব যখন জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করিলেন তখন হিন্দুরা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইল কেন? ইহা মাহুকের স্বভাব, কথায় বলে, “দিয়া দান হরণে, গতি নাই মরণে”। ইংরেজ এই ভুল করিয়াই ভারতবর্ষ হারাইয়াছে। ভারতীয়েরা না চাইতেই ইংরেজ বিবিধ উপকার ভারতের উপর বর্ষণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার ক্ষুধা ভীততর করিয়াছিল; লর্ড রিপনের আমলে ইংরেজ প্রভুত্বের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, উহার নিমিত্ত ইংরেজকে উহার আদর্শচ্যুত হইতে হইল; লর্ড কার্জন ভাল সামলাইতে পারিলেন না, ব্রিটেনিয়ার সিংহাসন টলিল। আওরঙ্গজেব ইতিহাস লেখা বন্ধ করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার চোখে ইতিহাসই

অনিষ্টের মূল। বস্তুতঃপক্ষে আবুল ফজলের ঐশ্বর্য্য ছায়ায় থাকি খাঁর আওরঙ্গজেব চিত্রিত না হইলে হিন্দুর চোখে আওরঙ্গজেবকে মন্দ দেখাইত না, অথবা কবির ভাষায় বলিতে হয়:

“বোলে বুলে দিবসের অকলে গোদুলি;  
যতই তমসা বলে বোধ হয় মনে। না থাকিলে  
রবি বিশ্বনয়ন পুস্তলী, দিবা বলে বোধ হ’ত নিশার তুলনে।  
স্বাধীন অপক্ষপাতী আৰ্য্য রাজ্যপরে তেমতি যবন রাজ্য;  
স্বজাতি-প্রবণ। সন্দেহ হইত কিনা বাবণ যুগিত  
রামের ছায়ায় যদি না হ’ত চিত্রিত (পলাশীর যুদ্ধ)  
[মুন্সবোশ টীকা করিয়া রসভঙ্গ করা হইল না।]

৩

সনাতনী হিন্দুর চোখে মুসলমানের ইতিহাস পড়িলে আওরঙ্গজেবকে বলিতে হয় “ভাতৃহত্যা পিতৃঘেণী পাপী আওরঙ্গজেব”। আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া শরিয়তের আয়নার শিবাজীকে দেখিয়াছিলেন, “শিবাজী দস্যু, শিবাজী ভদ্র”। উভয় সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু ইতিহাস নহে—অন্ধের হস্তিধ্বনি।

হিন্দু ও মুসলমানের ভুলের নীচে দুইটি চোখ ব্যতীত উপরে অজ্ঞাতস্থানে আর একটি চোখ সূষ্টিকণ্ঠা লুকাইয়া রাখিয়াছেন—উহাই প্রজ্ঞাচক্ষু, বাহ্য দ্বারা সত্যের স্বরূপ ধর্শন হয়, ঐ প্রজ্ঞাচক্ষু জাতির স্বাধীনতার দ্বিনে ঈশ্বরীভূত হয়, দাসত্বে অন্ধ হইয়া যায়। এই স্বাধীনতা লগ্ন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সর্ববিধ সহজ সংস্কার হইতে বৃদ্ধি ও বিচারের যুক্তি। এইরূপ মুক্তপুরুষই ইতিহাস-চক্রার পূর্ণ অধিকারী। পরাশ্রিতা কাব্যলক্ষী অন্ততঃস্বাধীন প্রিয়বদ্য (কালিদাসের “প্রিয়বদ্য” নয়); পরাশ্রিতা ইতিহাস-সবস্বতী সাক্ষাৎ কুমতি। দুর্জয় অনধিকারীকে আশ্রয় করিয়া ভণ্ড ভক্তকে দ্রুত নিয়তির পথে বসাইবার জন্য দুটা সবস্বতী বরপ্রদা হইয়া থাকেন। ইতিহাস-সবস্বতী স্বয়ং অনাসক্তা নির্বিকার সেবাপরায়ণা পরিব্রাজিকা, সত্য-সুন্দরের উপাসিকা; মানবী করুণার ভিনি বাণভট্টের “মহাশেতা”, কিরাতাজ্জনীর “জ্যোতস্বী” নহেন কিংবা মধুসূদনের “জনা”ও নহেন। প্রকৃত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক বেশকালনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারযুক্ত, —মতবাদের সংঘর্ষ এবং বাহবাস্ফোটনের বহু উর্দ্ধে। ইতিহাসের ধর্ম্মাধিকরণে হিন্দু ও স্বাক্ষরের “ব্যক্ত”, “বক্র”, “অধিবল” ও “অভিব্যক্তি” বাগাড়ম্বর মূল্য বিচারধারাকে প্রভাবিত করিতে পারে না। এই জন্যই মনে হয় হিন্দুর মহাভারত আধুনিক সংস্কারদ্বারা ইতিহাস না হইলেও, কল্পিত কিংবা বাস্তব “বেদব্যাস” একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।



ইতিহাসের বিধ্বংস দর্শন তিনিই করিয়াছেন। ঐ রূপ আমাদের ধারণার অতীত, গীতার “মহাকাল”কে শিবরূপে কল্পনা করিলে ইতিহাসরূপী মহাকালের বন্দনা কালিদাসের ধীর উদাস্ত ভাষায় করিতে হয় :

“যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টৃবান্ধা বিধিহৃতম যা হবি ধ্বাচ হোজৌ।

য়ে ধে কালং বিধন্ত ক্রতিবিষয়ন্তগা য়া স্থিত্যব্যাপ্য বিধম্।”

শক্তি দেখিতে পায় নির্বিকার শব্দরূপী মহাদেবের বৃকের উপর মহাকালীর তাণ্ডব এই ইতিহাসের আদিপর্ব, যিনি বৃকের মত শয়ান রহিয়াছেন তিনি আকাশরূপী মহাব্যোম, ধ্বনিরূপে বাহক ও ধারক এবং “সর্বান্ আভ্য তিষ্ঠতি”; তিনি স্বয়ং নির্ভণ, কিন্তু যিনি নৃত্যপরায়ণ, তিনিই সন্তান-প্রকৃতি, তিনিই ইতিহাসের প্রত্যক্ষমূর্তি। এই ইতিহাস দেবতার ইতিহাস নহে। দেবতার ইতিহাস নাই; ইতিহাস শুনিলে দেবতা রাগ করিবেন, যেহেতু এই ইতিহাসে অশুরের নিকট পরাজয়ের ঘনি আছে, দেবতার ছল-কপটতা আছে। ইতিহাসস্বরূপা মহাকালীর দেহে দেবতার কোন অবদান নাই; শুরোক্তম “অ-সুর”গণই ইতিহাসস্রষ্টা (makers of history), এই জন্তই তাঁহার গলায় “অ-সুরের” মুণ্ডমালা। দেবতার মুণ্ড উহাতে স্থান পাইলে পঙ্কানন কিংবা চতুর্ভুজ মুণ্ড দুই-একটা থাকিত। সৃষ্টির আদি হইতে এই মুণ্ডমালা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া চলিয়াছে। এই মুণ্ডমালায় গাঁধিবার জন্ত দেবী যজ্ঞনাথ-ববীন্দ্রনাথের মাথা লইতে পারেন, লেখক ও পাঠকের মাথা লইবেন না। অতীতে যে সমস্ত শূরবীর দেশ কিংবা জাতির মান রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কীৰ্ত্তিবাহু দ্বিগম্বীর কটির কঙ্কিত হস্ত-মেথলায় স্থান পাইয়াছে, আমরা তাঁহাদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছি, তবুও ভক্তির অর্থ্য দিয়া আসিতেছি। ইতিহাসের এই বিভীষিকাময়ী বিরাট রূপ জীবন-সায়াকে আচার্য্য যজ্ঞনাথকে অভিভূত করিয়াছিল, তখন তাঁহার গ্রন্থ মহাশয়ান, তাঁহার ভিতরে বাহিরে অনির্বাণ চিত্ত। এই সময়ে তিনি বৃকের রক্ত দিয়া Fall of the Mughal Empire (চারি খণ্ডে) লিখিয়া গিয়াছেন। এই মোগল মহাভারত শেষ করিয়া যজ্ঞনাথ সর্বস্বসাইকে লিখিয়া-ছিলেন :

Oh this your 86th birthday, I have given the finishing touch to the last chapter of my “Fall of the Mughal Empire” and sent it to the press. Its subject is even more truly the fall of the Maratha Empire.

I can say that I have written it, not with ink, but with my heart's blood. In saying so, I am not thinking of the personal sorrows and

anxieties—which have clouded the evening of my day, nor of the minute study and exhausting labour that had to be devoted to the subject....—but of subject-matter of the last chapters,—the imbecility and vices of our rulers, the cowardice of their generals, and the selfish treachery of their ministers. It is a tale which makes every true son of India hang his head down in shame....

[Calcutta 29, 15th May, 1950, quoted from p. 265 “Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar”, Panjab University, 1958].

Gibbon এমনই বৃকের রক্ত দিয়া তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire লিখিয়াছিলেন, রোমীয় সভ্যতা এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ইয়োৰোপ এ জন্তই এই মহান ইতিহাসকে বৃকে করিয়া রাখিয়াছিল, এখন মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে।

৪

ব্যক্তিগত কোন বিষয় আচার্য্য যজ্ঞনাথ কখনও কাহাকে জানিতে দিতেন না; সুতরাং এই সমস্ত প্রশ্ন তাঁহার কাছে আমরা উত্থাপন করিবার চুপোহস করি নাই। ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু হিসাবে কার্য্যপরিপূর্য্য এবং এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গালাদেশে ঐতিহাসিক গবেষণার গতি বিচার করিয়া যজ্ঞনাথের মুসলমান ইতিহাসচর্চার আগ্রহ সন্দেহ মোটাশুটি একটা অনুমান আমরা হয় ত করিতে পারি।

কটকের বাসায় আচার্য্য যজ্ঞনাথের পুরনো কাগজপত্র বাড়িয়া শুড়াইবার সময় একটা ভীর্ণ বাঙালি খুলিয়া দেখিলাম, উহার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসমূলক তাঁহার ঠাতে আঁকা ম্যাপ এবং Cunningham-এর Geography of Ancient India হইতে উদ্ধৃত পেন্সিলের নোট। ফাদি লিখিবার পূর্বে সংস্কৃত তিনি ভাল বকম পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব পড়ার স্বপ্ন শুড়াইবার সময় কালিদাস ভবভূতি ভারবি ও ভট্টনারায়ণের কাব্য বাংলা অক্ষরে দ্বন্দ্ব-চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণের সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ ঐ ঘরে পাওয়া গিয়াছে। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম প্রতি পৃষ্ঠায় এমন নোট লিখিয়াছেন, ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে এমন চমৎকার parallel passage উদ্ধৃত করিয়াছেন যেন উহা সংস্কৃত ক্লাস পড়াইবার জন্ত প্রস্তুতি। আমার মনে হয় তিনিও প্রথমে প্রাচীন ভারত বিষয়ক গবেষণার দিকে রুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন; পরে তিনি উহা ত্যাগ করিলেন কেন? ঐ সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বুদ্ধ ভাণ্ডারকরের কৃতিত্ব মধ্যম্নিন রেখায় পৌঁছিয়াছে, প্রাচীন

ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতর এবং উদীয়মান গবেষণাগণের ভিড়ও বেশী, কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থা হইতে যদুনাথের পক্ষাৎ অপসরণের কারণ নয়। “নূতন কিছু” পাওয়ার সম্ভাবনা প্রাচীন ভারত অপেক্ষা মুসলমান ইতিহাসে বেশী; একটা তাম্রশাসন একটি মুদ্রা কিংবা পুঁথি পাওয়া গেলে প্রাচীন ভারতের ময়দানে কাড়াকাড়ি পড়ে, লড়াই শুরু হয়। হবিলুটের বাতাসায় সম্ভ্রষ্ট হওয়ার ব্যক্তি যদুনাথ ছিলেন না; তাঁহার প্রতিভা, উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্ভবতঃ নাদিরশাহী জুটের আশায় ময়ূরসিংহাসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল।

উদারচেতা মহানুভব সম্রাট আকবরকে উপেক্ষা করিয়া আওরঙ্গজেবকে যদুনাথ তাঁহার সংকল্পিত ইতিহাস মহাকাব্যের নায়করূপে বরণ করিলেন কেন? খুলদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহা যেন ত্রীকণকে গোণ করিয়া মজুমদার দুর্ঘোষান মুখ্য উল্টা মহাভারত সৃষ্টির প্রয়াস। আসল কথা, আকবরের ইতিহাসে হাত দিলে “নূতন কিছু” পাইবার সম্ভাবনা ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই সময়ে বেভারিজ সম্প্রতি বাবর-জামুয়ুন সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বাবরের দিনচর্যা জলধনের জামুয়ুননামা ও আকবরনামার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরী, তুলু-ই-জাহাঙ্গীরী, বদায়ুনীর Muntakhab-ut-Tauarikh তখন ইংরেজীতে অনুবাদ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে; লঙ্কোর নবলকিশোর প্রেস প্রায় অধিকাংশ বিখ্যাত ফার্সি ইতিহাসের মূল পুঁথি ছাপা শেষ করিয়াছিলেন, আকবর সম্বন্ধে নূতন কাঁচা মাল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ঐ সময়ে V. A. Smith-এর মত যদুনাথ বড়জোর একখানা সুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক হইতে রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার গবেষণার আয়োজন ও পরিকল্পনা ছিল রহস্তর। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে থাকি খাঁর Muntakhab-ul-Lubabikh ব্যতীত অজ্ঞাত পুঁথি তখনও প্রায় অজ্ঞাতবাসেই ছিল। আওরঙ্গজেবকে মশাবর্ণে চিত্রিত করিবার সম্বন্ধ এদেশে ও বিলাতে একমাত্র থাকি খাঁ। যদুনাথ ইতিহাসচর্চা আরম্ভ করিবার পূর্বেই আকবর বাদশাহ দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকের কাছে সুবিচারেরও অধিক পাইয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার পিতা অবিচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসও হইতে অবিচার করিয়াছে—এই জন্তই নবীন ঐতিহাসিক আলমগীর বাদশাহর আপীল মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে William Irvine মৌগল দরবারের দৈনিক সংবাদ-তালিকা (Akhbarat-i-darbar-i mauia) সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যদুনাথের পত্রালাপ ছিল, এই সমস্ত আনন্দের কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া অনন্তমুখাপেক্ষী

এবং অভিনব ইতিহাস রচনা করিবার সুযোগ যদুনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।\* এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না।

৫

শ্রদ্ধা এবং সহৃদয়তা না থাকিলে ইতিহাসে সত্যের সন্ধান কেহ পায় না। আচার্য্য যদুনাথ শুধু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনা করেন নাই, আওরঙ্গজেবকে তিনি প্রায় শাহজাহানের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে ছিল স্নেহ, ভয়, বিশ্বাস ও চিন্তার ছায়া। মাতা মমতাজ এবং জননী প্রতিনিধি জ্যোতা ভগ্নী জাহানারা ব্যতীত স্বভাবগুণে আওরঙ্গজেব তৃতীয় ব্যক্তির নিকট অনাবিল স্নেহের পাত্র হইতে পারেন নাই—পিতার নিকটেও নহে। এতেন আওরঙ্গজেবকে লইয়া ঐতিহাসিক যদুনাথ এক সম্রাট শাহজাহানের স্তায় বিব্রত হইয়াছেন। চক্ৰবর্তীকে ঐতিহাসিক করা করেন নাই, দরদ দেখাইয়াছেন। এই বিরোগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কে আওরঙ্গজেবের উপর নিয়তির নিম্নম পরিশোধ তাঁহাকে শাহজাহানের মতই ব্যাকুল ও স্তম্ভিত করিয়াছে। এই জন্তই হইতে যদুনাথের গ্রন্থে ইতিহাসের কঠোরতা ও সাহিত্য মাধুর্যের মনোহর সমাবেশ।

আওরঙ্গজেবের প্রমাণ বিচারমূলক ইতিহাস রচনা অতি দুর্লভ। প্রথমতঃ আচার্য্য যদুনাথের অপূর্ণ সংগ্রহের পূর্বে এই ইতিহাসের উপাদান দেশ-বিদেশে স্থান-অস্থানে অজ্ঞাত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং এখনও কিছু কিছু এভাবেই আছে। দ্বিতীয়তঃ, উপাদানের আয়তনে আকবর-শাহী ইতিহাস বড়জোর গজায়মুনা-সঙ্গম, কিন্তু আলমগীর-শাহী ইতিহাস সূন্দরবনের জঙ্গল ও চর-বহুল সাগর-সঙ্গম, যেখানে শতধারা জাহ্নবীর খাত অতি বিপদসঙ্কুল। এই ইতিহাস অত্যন্ত বিতণ্ডামূলক, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তি লিখিত বিবরণ প্রায়শঃ পরস্পরবিরোধী।

“I began my apprenticeship in the history workshop with a study of the fall of Tipu Sultan. It was written in 1891, when my only sources were printed English books...but no unprinted record, no original Persian or Marathi authority.”—Bengal Past and Present, Jubilee, Number, 1957; p. 1.

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ M. A. পাশ করেন নাই; কিন্তু উক্ত উক্তি হইতে বুঝা যায় তাঁহার গবেষণার পরিকল্পনার ‘নূতন কিছু’ আবিষ্কার ছিল প্রধান লক্ষ্য, ইংরেজ লিখিত ইতিহাস কিবা ইংরেজী অনুবাদের চর্কিতচর্কণ নহে। আকবর সম্বন্ধে গবেষণা করিলে তাঁহাকে প্রায় অমূল্য সম্রাটের সম্মুখীন হইতে হইত।

পুঁথি হাতে আগিলেই গবেষকের কাজ হাসিল হয় না, ইহার পর আরম্ভ হয় পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের ফৌজদারী ভেরা—আবুল কজল, বহুমানীক খাঁ এবং আলমগীরনামা লেখক সাকি মুস্তায়েদ খাঁ, ঈশ্বরদাস-ভীমসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ যেন এক একজন কাঠগড়ার আসামী! এই কাঠগড়ায় একদিন আচার্য্য বহুনাথকেও দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার শিষ্য প্রশ্নবাগণ তাঁহাকে জেরা হইতে রেহাই দিবে না! ইতিহাসের আদালতে গুরু-শিষ্য বাপ বেটার ষাতির নাই, যে ষাতির করিয়া হাক্কা জেরা করিবে সে কুশিষ্য, কুপুত্র। এই ভুলই বহুনাথ স্বয়ং প্রথমে নিজের জেরা নিজেই করিয়াছেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে জবাবের স্বপক্ষে দলিল-পত্র সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের আপীল বিচার করেন আন্তর্জাতিক বিশ্ব-আদালত—যেখানে দেশ ও জাতি-নিরপেক্ষ মনস্বী বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী চূড়ান্ত রায় দিয়া থাকেন, এই আপীল অনন্তকাল যুগে যুগে চলিতে থাকিবে, বাহু সত্য উহাই আশ্বনে পুড়িয়া সোনা থাকিবে, ওকালতী খাপ্লাবাকি ভাবার চটক ভাবের ধরে চুরির মাল সব ছাই হইয়া যাইবে।

৬

দেশের লোকের ভাবগতিক দৃষ্টিয়া মনে হয় আচার্য্য বহুনাথের নিপুল আয়াস শুধু পণ্ডিত্য, ভাষ্য দূতাহুতি; দেশের হিন্দু মুসলমান, মারাঠা-রাজপুত-শিখ বহুনাথের History of Aurangzeb কিংবা Fall of the Mughal Empire পড়িয়া শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে অভিভূত হইতে পারে কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না, পাঠক আশাভঙ্গ ও বিরক্তির ভাব লইয়া ইতিহাস হইতে পলাইবার পথ পোঁজে। হিন্দু যোগে বহুনাথ তৃতীয় আওরঙ্গজেব। বাদশাহ হিন্দুর অগ্নি কাষ্য করিয়াছিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিক এ হেন ব্যক্তির উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া হিন্দুর কাটা ঘায়ে হৃদয়ের ছিটা দিয়াছেন। বহুনাথ মোগল দরবারের সাম্রাজ্যবাদ প্রচারক, জাতীয় ঐতিহাসিক নহেন, জাতির মুক্তি ও দেশের স্বাধীনতার জন্য বাহারা ধর্ম্মদোষী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি স্বদেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, জনশ্রুতি এবং জাতির বাণী (৭) উপেক্ষা করিয়া আলমগীরশাহী সূণ্য ও শুদ্ধতোর সহিত ইহাদিগকে তিনি বিজোহী হস্তা বলিয়াছেন। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক এই সুযোগে দেশপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রচার করিতেছেন, মুসলমানের ইতিহাসকে অত্রান্ত মনে করিয়া বহুনাথ ভুল করিয়াছেন, মহাবাহু সঙ্গৃহীত দলিলপত্র বাহা তাঁহার মনঃপুত হয় নাই উহা তিনি গ্রহণ করেন নাই, রাজপুতানার চারণ যে ইতিহাসকে তাক্কা

রাখিয়াছে উহা তিনি কবির বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। শিখজাতির ইতিহাসের প্রতি তিনি তত্ত্বমান নহেন, ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর বিদ্বানগণের চৈতন্যসম্পাদন তক ও বিচার-বুদ্ধির স্বাভাবিক বহির্ভূত নহে; জাতি-বোপণ করিতে গিয়া রামচন্দ্র হরধনু তল করিয়াছিলেন, কিন্তু ঢেঁকিতে “গুণ” দিতে পারেন নাই। শিক্ষাদীক্ষায় অধিকতর উন্নত এবং উদার হিন্দুসমাজ যদি মনেপ্রাণে বহুনাথের ইতিহাসকে অভিনন্দিত করিতে না পারে তবে “প্রগতি”-বিরোধী সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বহুনাথের গবেষণার কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছে? ইংরেজী শিক্ষিত বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণায় সুনিপুণ কোন মুসলমানের যে কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল বহুনাথের পূর্বে কেহ ঐ কাজ করেন নাই, অথচ বাদশাহী হারাঁতয়া মুসলমানের যত দৃষ্ণ ও অভিমান হয় নাই, ইংরেজ পণ্ডিতগণ Elphinstone এর সময় হইতে Elliot ও Dowson পর্য্যন্ত মুসলমান ইতিহাসের যে মুক্তি লগতের সম্মুখে অনারত করিয়াছেন উহাই তাঁহাদের পক্ষে সমদিক পৌড়াহারক হইয়াছিল। বহুনাথের History of Aurangzeb এর প্রথম দুইখণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষিত মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ আশঙ্ক ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, কেননা আওরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার পিতা যে সুবিচার করেন নাই ঐতিহাসিকের কাছে উহা অন্ততঃ আংশিক ভাবে পাইয়াছেন। ঐ ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড (রাষ্ট্রনীতি, গণ্যসংস্কার, মন্দিরক্ষয়, হিন্দু বিধাতন বর্ণনা) বাহির হওয়ার পর শিক্ষিত মুসলমান সমাজও অগ্নিশর্মা হইয়া প্রতিবাদ বরণ করিতে লাগিলেন, বহুনাথ কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে অচল অটল এবং অন্ধ উগ্রার প্রতি উদাসীন। মৌলানাবা দেরিলেন কাকের হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়াছে। তাঁহাদের কতোয়া অচল, স্তব্ধতা তোবা তোবা করিয়া সরিয়া পড়িলেন, বহুনাথ দ্বিগুণ উৎসাহে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত (১৬৫৮-৮১) প্রথম সংস্করণ (১৯১৬ ইং) হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড (১৬৪৪-১৬৮৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯১৯ ইং) প্রকাশ করিলেন। এইবার আফজল খাঁ-বখ, শায়েস্তা খাঁর পুনা শিবিরে শিবাজীর কীৰ্ত্তি এবং দাক্ষিণাত্যে বিজয় অভিযানের পালা। এই খণ্ড পড়িয়া মুসলমান সমাজ প্রমাদ গণিল, অথচ বহুনাথের অভ্যুদয় বিপুল সম্ভাবনামুক্ত বৃত্তিতে পড়িয়া তাঁহার ইংরেজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণ প্রশংসা-মুগ্ধ হইলেন। বুদ্ধ ঐতিহাসিক Beveridge সাহেব পুস্তকের সমালোচনায় লিখিলেন :

Jadunath Sarkar may be called primus in Indis as the user of Persian authorities for the

history of India. He might also be styled as the Bengali Gibbon...The account of Aurangzib in the 3rd and 4th volumes is exceptionally good. (History, 1922)।

বেভারিজ সাহেব জিজ্ঞাস্তা মেজাজে লোককে মাপিয়া মাপিয়া প্রশংসা করিতেন। বহু বৎসর এই দেশে থাকিয়া আওরঙ্গজেবের উপর মুসলমানের মমতাবু কথা তিনি জানিতেন, তবুও যদুনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিলেন কেন? যদুনাথ এমন গীতাঞ্জলী লিখেন নাই যাহা ভারতবাসী প্রতীচ্যের জ্ঞানাজ্ঞানশলাকা প্রয়োগ ব্যতীত বর্ণিত হইতে পারে নাই, কিংবা না বুঝিবার ভাণ করিয়াছিল। আসল কথা, মহাবাহু জয় করিতে না পারিলেও আওরঙ্গজেব একজন আদর্শচরিত্র বীর এবং পীর হিসাবে মুসলমানের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। যতদিন রামায়ণ থাকিবে ততদিন যেমন রাম থাকিবেন, তেমনি যতদিন শরিয়ত থাকিবে ততদিন আওরঙ্গজেবও থাকিবেন। “সুধাপ্রভব” রঘুবংশীয়গণ “আমনোঃ বশ্মনিঃ পুরম্” হইয়া যদি কাণ্ডিমান হইয়া থাকেন, শরিয়ত হইতে সূচ্যগ্রত্যুত না হইয়া আলমগীর “জিন্দা পীর” হইবেন না কেন? মন্দিরনিষ্কাশণ ও মূর্তিপূজা হিন্দুর ধর্ম, মন্দির ও মূর্তিধ্বংস অঙ্গরূপ বিধানে মুসলমানের ধর্ম। ইহার মধ্যে কোনটা ধর্ম এবং কোনটা অধর্ম কে বিচার করিবে? রাম রাক্ষস মারিয়া যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন এই জন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম, নতুবা রাক্ষসধর্মই আধ্যাত্মিক ধর্ম হইত এবং বস্তুতঃ হইয়াছিল।

মুসলমান শাসকগণের মধ্যে আদর্শ মুসলমান হিসাবে প্রথম চারিজন স্মরণীয় খলিফা এবং উম্মায় বংশের দ্বিতীয়। ওমরের পরেই বিজ্ঞা ও চরিত্রগুণে আওরঙ্গজেবের স্থান। আওরঙ্গজেব এক হিসাবে অমর, আকবর মরিয়া গিয়াছেন। ভারতের ভিতরে-বাহিরে যেখানে শরিয়তের প্রতি অচল-নিষ্ঠা আছে সেখানেই আওরঙ্গজেব আছেন এবং থাকিবেন, কিন্তু আকবর কোথায়? হিন্দুস্থানে দ্বিতীয় আকবরের উদ্বোধন পথ আওরঙ্গজেব চিরদিনের মত বন্ধ করিয়াছেন। খলিফা হারুণ অল রশিদের পুত্র মামুন আকবরের বহু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যুক্তিবাদী মোতাজিলি ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ক্ষেত্রেপুত্র সিন্ধীর ইবাদতখানার স্তায় ধর্মের খোলাখাছ এবং ইমামগণের যুগপাত হইত। আকবরের মত মামুনের সিংহাসনও স্নেহের জন্ত বন্ধ পাইয়াছিল, উগ্র শরিয়তপন্থীগণ মামুনকে বলিত কাকেরের খলিফা (Commander of the unbelievers)। মোল্লার বিচারে আকবর মুসলমানের কেহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন বজ্জাল (Anti-Christ), যে-ইমামের উমাম। আকবরের স্মৃতি ধ্বংস

করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন শাহ উলৌল্লাহ। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মুজাদ্দিদ-ই-সানী এবং ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান জগতে মোল্লাশাসিত সমাজের প্রাধান্তের বিরুদ্ধে কেহ দণ্ডায়মান হয় নাই, বরং আওরঙ্গজেবের সন্তা “ওহাবী” সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদ আবদুল ওহাবকে আশ্রয় করিয়া অধর্ম ও অনাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধর্ম-আন্দোলনের চেউ পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করিয়াছিল এবং অজ্ঞাত অনর্থ যাহা ঘটয়াছিল উহা ইতিহাসের বিষয়-ভূত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে অবশেষে তুরস্ক সাম্রাজ্যে নব্যতুর্কী চল গঠিত হইল, যুগ্মত্বা কামাল পাশা রাষ্ট্রপটন ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে আকবরকে হার মানাইলেন, কিন্তু মোল্লার চল সহজে হার মানেন নাই। ইসলাম ও খেলাফতকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার হিন্দুস্থানী মুসলমানের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন, কাউ স্বরূপ কংগ্রেসী হিন্দুবা খেলাফত রক্ষার জন্য কোমর বাঁধিয়া মুসলমানগণের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিল। হিন্দু মুসলমানের সেই একপট মিলনের দৃষ্ট্য যে দেখে নাই সে আর কখনও দেখিবে না। আমার পরমবৈকল্য জ্ঞাতিভাই তখন মুসলমান বাড়ীতে পিঠা খাইয়া “খেলাফত জিন্দাবাদ” ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তা মাতাইয়াছে।

উদারনৈতিক ইংরেজ এতদিন আকবরশাহী চালে চলিয়াছিলেন, কিন্তু এই মিলনের পরিণাম ভাবিয়া তাঁহার এই দেশে আওরঙ্গজেব খুঁজিতে লাগিলেন, ইশারা পাইয়া হাজার আওরঙ্গজেব Music before mosque ধ্বনি তুলিয়া স্বতন্ত্র চল গঠন করিল এবং এইভাবে বিলাতী ঈশ্বরধর্ম ইঙ্গিতে জিন্দা-ভোমের হস্তে ভারতীয় কংগ্রেস-জরাসন্ধের শোচনীয় দশাশ্রান্ত হইল, বাহবা কী ক’হাও অজানা নাই।

তুরস্ক ব্যতীত অজ্ঞাত মুসলমান রাজ্যে নব্যতুর্কী “আকবর”গণ শাহজাদা দ্বারার শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রমাণ কাগলের আমানউল্লা এবং ইরানের রেজা শাহ পেলুহবা।

৭

আওরঙ্গজেব বর্তমানেও ইতিহাসগত ভারত সম্রাট নহেন, তিনি একটি বিশেষ ভাবধারার (ideology) তেজস্বী প্রতীক। সুতরাং কোন অমুসলমান মুহু মস্তিষ্কে মুসলমানের ঐতিকর আওরঙ্গজেবের ইতিহাস লিখিতে পারিবে না, তবে নামের বাক্যে মোটা দাম দিলে ঐতিহাসিকও পাওয়া যায়। বাহা হোক, ভারতীয় মুসলমানগণ এই বিষয়ে

নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। বহু বৎসর পূর্বে মোলানা শিবলী উদ্‌ভাষার যত্নাধীন মত খণ্ডন করিয়া এক উদ্‌ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য যত্নাধীন বহু হিসাবে মোলানা সাহেব আমার নমস্কার, তাঁহার ঋতিবে যত্নাধীন স্থানে স্থানে লেখনী সংযত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়, সুতরাং তাঁহার লেখার সমালোচনা করিবার বিদ্যা ও বৈরাগ্যই আমার নিকট হইতে কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না, কয়েক বৎসর পূর্বে Zahir-ud-din Faruqi, Anrangzib and His Times প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর অঞ্চল ভারতের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের পাঠ্যভালিকা হইতে আচার্য্য যত্নাধীন বহি বাহু দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবণ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, শেষের দিকে পরীক্ষক হিসাবেও যত্নাধীন নাম প্রস্তাব করিবার হুঁসাহস লাহোরে কেহ করে নাই। বর্তমান পাকিস্থান কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুগুণ উদার ও গুণগ্রাহী। আলিগড়ের অধ্যাপক রহমান (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলর Sir A. F. Rahman) ছাত্রসমাজে পাঠ্য বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি যত্নাধীন গুণগ্রাহী ছিলেন, তবে যথার্থিতি বোঝা নমাজ করিতেন বলিয়া মোল্লার হল তাঁহাকে সমীহ করিত, তাঁহার মতামতকে যত্নাধীন শ্রদ্ধা করিতেন—যথা শিবাজী-আফজল বিষয়ক বিতণ্ডা।

আচার্য্য যত্নাধীন বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর ছাপাইয়া অযোগ্যকে অনুগ্রহীত করিতেন না, এবং আমাদের অসহিষ্ণুতাকে তিরস্কার করিতেন। ইহা যেন সেই তার প্রেম :

অগাধ জল-সকারী নিকারী ন চ বোহিতঃ।

গণ্ডুখ জলমাত্রেণ শকরী ফরফরায়তে।

এমন লেখকের অভাব নাই যাহারা অপরিচিত থাকে অপেক্ষা গালাগালি খাইয়া পরিচিত হওয়া প্রাথমিক মনে করেন। ইহারা চতুর ব্যক্তি, বাজারের খবর রাখেন যে বহির বত নিম্না ছাপার অক্ষরে বাহির হয় উহার কাটতি ততই বাড়িয়া যায়। কর্তমানে ইহাই যুগধর্ম।

প্রাচীন ভারতে নর-দেব এবং অর্ধাচীন ভারতে গং দেবতাই পণ্ডিতের পিণ্ডহাতী তথা পাণ্ডিত্যের বিচারক মানুষ ও দেবতা। অপ্রিয়সত্য শুনিতে আগ্রহীল নহে অঞ্চল প্রকৃত ইতিহাসে “হিতং মনোহারি চ দুর্লভং ২৮ঃ” আমাদের “সর্বমঙ্গল-মঙ্গলা” রাষ্ট্রকে (Welfare State) রূপায়িত করিবার জন্ত সম্প্রতি জাতিগঠনধর্মী সাহিত্যে প্রয়োজন হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, যথেষ্টসংখ্যায় মার্কানার সাহিত্যিক উৎপাদন করিবার জন্ত দিল্লী কি অজ্ঞা এককি সর্ববিদ্যাপ্রসবিনী কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে, সত্যমিথ্য খোদাতালা জানেন।

অঞ্চল ভারত যণ্ডিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের জন্ত মুসলমান যুগের দুই গুণ ইতিহাস লোকশিক্ষার জন্ত নতুন পদ্ধতিতে রচনার পরি করন গ্রহীত হইয়াছে শুনা যায়। সর্বমঙ্গলার রূপা ভারতীয় গণতন্ত্রে ইতিহাসের অবস্থা আরও অধিকতর শোচনীয়। অপ্রিয়সত্যের অপলাপ করিয়া মিলন-প্রশংসা রচনা করিলেও বেহাই পাণ্ডুরা ষাইবে না। গোবের উপর বিস্ফোটের ত্রায় আমাদের ইতিহাসে নানাবিধ ism ব মতবাদ ক্রমশঃ প্রকট হইতেছে, যে ism দিল্লীর মশনদ দখল করিবে, ধুঁট ইতিহাসিক উহার পিছনে দাঁড়াইয়া ডাক ছাড়িবে, “জয়, মায়ের জয়!”। বর্তমান বুদ্ধিজীবী ও “শাকাহারি” (নতুবা “অহিংস” হয় না) সরকার চিত্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, কাহাকেও চটাইবার প্রবৃত্তিও নাই, হিম্মতও নাই। এমন অবস্থায় সংস্কৃত “প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্” নাটকের মত সর্বদর্শন এবং সর্ববিধ ismএর চমৎকার সমন্বয় করিয়া রাষ্ট্রভাষায় একখান ইতিহাসিক নাটক যিনি লিখিতে পারিবেন তিনিই জাতীয় ইতিহাসিকের গোবর লাভ করিবেন, যেহেতু পূর্বতন ইতিহাসিকগণ জাতির মনের উপর দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া বহিয়াছেন। বর্তমানে খুল-কলেজে সরকার কর্তৃক অগ্রয়োদিত ইতিহাস-পুস্তকে যাহা থাকিবে উহাই আদি-অষ্টত্রিম ইতিহাস।

(আগামী সংখ্যায় সমাপা)



## বৌ-রাণীর ঘাট

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ঘাট্টে এসে দেখি খেঁরা বন্ধ হয়ে গেছে।

কতকটকেনেও নেই আসা, রাত হয়ে যাচ্ছে, বর্ষাকাল, নদীতে বজ্র।। কিন্তু প্রয়োজনটা বড় বেশি, তাই রেবিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, 'তেমন বুঝি ত ছোট নৌকাটা ছেড়ে পাড়ি-গরু পার করবার ক্র্যাটটা খুলিয়ে নোব, হা নিতে চায় ঘাটোয়ার তার জন্তে। আমি আসছি অনেক দূর থেকে, জায়গাটা সম্পূর্ণ অজানা। অজানা জায়গা সন্ধানে যখন একটা আশঙ্কা থাকে, তেমনি আবার মনে হয় কোন-না-কোন দিক থেকে একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে। সম্ভা পাবে মিন্টে যেতে। একই অনিশ্চয়তার দুটো দিক ধার কি, আমি এদিকটায় ভরসা করে বেরিয়েছি। অবশ্য প্রয়োজনটা খুব বেশি বলেই। গাং পেরিয়ে ওপারের শেষ বাশটা যদি না ধরতে পারি ত খুবই কতি হবে।

প্রশ্ন ছিল খেঁরা খুলতে চাইবে কি চাইবে না। এ একেবারে মূল-হাভাত। ঘাটের ঢালা-ঘরটায় রাতিমত ঢালা কোলানো, লোকজন কেউ নেই কোথাও।

কিরতেই বাচ্ছিলাম, এপারের শেষ বাশটা এখনও হাতে রয়েছে, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল—এমনও ত হতে পারে যে, এরা খেঁরে আসতে গেছে। কোথায়, কত দূরে তার কোনও আশঙ্কা পাচ্ছি না, এদিককার বাস থেকে নেমে আমার প্রায় মাইল খানেক আসতে হয়েছে, এর মধ্যে কোন গ্রাম চোখে পড়ে নি, তবু মনে হ'ল খানিকটা দেখেই গাই। হাতঘড়িতে দেখলাম পৌনে আটটা হয়েছে, পা গালিয়ে গেলে মিনিট বোল-সত্তর মধ্য গিয়ে পড়তে পারব, গাড়ে আটটার এদিককার শেষ বাস, মিনিট কুড়ি স্বচ্ছন্দে ধপতে পারি।

ঢালাটা ভীষের একটা প্রকাণ্ড অখণ্ড গাছের নীচে। অনেকগুলো শেকড় সে মাটি থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, মোটা দেখে তার একটার ওপর বসলাম। জ্যোৎস্না পক্ষ, সপ্তমী কি অষ্টমী তিথি হবে। আকাশে একটা পাতলা মেঘের আভরণ রয়েছে, বার জন্ত জ্যোৎস্নাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে খুলতে পার নি। একটা যে হালকা হাওয়া রয়েছে তাতে আবার নীচের স্তরে মাঝে মাঝে ঝণ্ড মেঘের খুণ উড়িয়ে এনে চাঁদ ঢেকে ফেলে জ্যোৎস্নাটাকে

এক-একবার আরণ অস্বচ্ছ করে ফেলছে। সামনে ভরা গাং, শব্দের মধ্যে মাথার ওপর অস্বপ্নাভার পৎপতানি, আর থেকে থেকে তাঁদের কোলে হালকা ঢেউয়ের ছলাং ছলাং।

একটু অশ্রমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সামনেই যে সমস্তাটা রয়েছে সেটাও মন থেকে মুছে গেছে কখন, হঠাৎ খেয়াল হ'তে হাতটা উলটে দেখি আর মাত্র মিনিট-বারো বাকি। ছোটো ভিন্ন ত আর উপায় নেই। কোঁকের ওপর উঠেই পড়েছিলাম, হঠাৎ সন্ত মনটা যেন বিকল্প হয়ে উঠল—তার মধ্যে ক্রান্তি ছিল, এতটা পথ হাঁটা শু অত্যাশ নেই, নিজের অনুষ্ঠের ওপর বিরক্তি ছিল, আর ছিল এই পোড়া কাব্যে পাণ্ডয়ার ওপর। এমন নাকালে পড়েও লোকে জ্যোৎস্না, আর ভরা নদী আর নিশ্চরতার মধ্যে ডুবে থাকতে পারে, না, পারা উচিত ?

অবশ্য নিজের ওপর এই অভিমানটুকু কণিক। তবে দেখলাম—এ তবু যা হোক খানিকটা আশা—এরা যদিই এসে পড়ে। তা ভিন্ন—নদীর তীর, গাছতলা, যা হোক একটা আস্তানা ত, ওদিকে বাস যদি ছেড়ে গেল—আর যাবেই—তা হলে একেবারে নিরাশ্রয়।

অনিশ্চয়তার পেছনে ছোটোর উৎসাহও নেই আর। আবার বসে পড়লাম।

রাত এগিয়ে চলল। দৃশ্যটার ওপর মনটাকে আবার বসাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝা। মাঝে মাঝে বড়ির দিকে চেয়ে যখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হয়েছে, মনে হ'ল যেন একটা নতুন সমস্তা এগিয়ে আসছে। চাঁদ অনেকখানি নেমে গিয়ে জ্যোৎস্নাটা আরও পাতলা হয়েছে এসেছিল, তার ওপর ঝণ্ড মেঘগুলোও যেন ক্রমে জোড়া লেগে যেতে লাগল। হাওয়াটাও বেড়ে উঠেছে। একটা চুর্খোণ গুঠবার সব লক্ষণ এক এক করে ফুটে উঠতে লাগল।

এর ওপর, অস্বীকার করব না, গভীর রাতে একা এই রকম একটা নির্জন জায়গায় নিরুপায় ভাবে বসে থাকবার যে অস্বস্তি—আরণ ঠিক করে বলতে গেলে, যে একটা অহেতুক ভয়, সেটা ধীরে ধীরে মনটা আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। মনে হতে লাগল, এ জায়গাটা যেন ছেড়ে যাওয়াই ভালো, মনে হতে লাগল, এর চেয়ে পথ ধরে সমস্ত রাত যদি



চলাও যায়, তাতে অন্তত এই অশক্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

উঠে পড়েছি, এমন সময় দেখি হাত পঞ্চাশেক তকাত্তে একটি লোক এই দিকে চলে আসছে। ঐ চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ দুটি পড়ার বুকটা ছ্যাৎ করেই উঠেছিল। তার পরেই কিন্তু সাহসটা বেশ ভালভাবেই ফিরে এল।

আর একটু এগিয়েও এসেছে। দেখলাম বেশ জোয়ান, হাতে একটা বড় লাঠি, চলেও আসছে বেশ খাড়া চালে। আরও কয়েক পা এগুলে আরও খুঁটিনাটি চোখে পড়ল। একটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা লাল রঙের আচকান গোছেব জামা পড়া, কোমরটা কিছু দিয়ে বাঁধা, আর মাথার একটা লাল হালকা পাগড়ি। দেখলেই মনে হবে যেন কোন জমিদারের পেরাঙ্গা।

সাহস ফিরে এলেও, বরং আরও বেড়ে গেলেও কিন্তু হঠাৎ এ রকম জায়গায় এ ধরনের লোকের আবির্ভাবে যে একটু বিস্মিত হয়ে গেছি, তার জন্তে ওকে কোন প্রশ্ন করার কথাটা মনেই উঠল না প্রথমটা। এদিকে সম্পূর্ণ না হোক, আমার শরীরের কতকটা অন্তত অশক্তগুঁড়ির আড়ালে পড়ে যাওয়ার লোকটাও নিশ্চয় আমার দেখতে পার নি। খানিকটা তফাৎ থেকেই তালা বন্ধ দেখে ঘুরেছে। আমি ডাকলাম—“ওহে শোন।”

লোকটা দাঁড়াল না। হাওয়ার সনদনানিটা বেড়েছে, শুনতে পার নি নিশ্চয়, আমি জোরে হাঁক দিলাম। বেশ দ্রুত পেরাঙ্গামার্কী চাল, অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তবু যেমন জোরে ডেকেছি, কানে না যাওয়ার কথা মোটেই নয়। হঠাৎ আমার বাড়ির ঝিটার কথা মনে পড়ে গেল, যদি পেছন ফিরল ত ঢাক পিটোলেও তার সঙ্গে আর কোম সন্দ্বন্দ নেই কারুর।...কিন্তু এত কালা যে সে জমিদারের পেরাঙ্গাগিরি করে কি করে? এই চিন্তাটুকুর মধ্যে লোকটা আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, আমি চকিত হয়ে উঠে পড়লাম, ভেবে দেখলাম, জমিদারের কাজ কি করে চলে সে জমিদারের ভাবনা, আমার এখন দরকার ওর অনুসরণ করা। বেশি আশা না রেখে এবার বেশ যুক্তকণ্ঠেই ডাক দিলাম একটা। কোন ফল না হওয়ার নিঃশব্দ হলাম—আমার আশ্চর্যটা ভুল নয়। বেশ জোরেই পা চালিয়ে দিলাম। যেতে যেতেই ব্যাপারটা যে কি হওয়া সম্ভব তারও একটা ধারণা গড়ে দিলাম নিজের মনে। জমিদারের পেরাঙ্গাই যে, তাতে কোন সন্দ্বন্দ নেই। মনিব একাই হোক বা সাজপাজ সঙ্গে করেই হোক কোথাও বাবেন রাজে, খেয়ার কি অবস্থা দেখতে, কিবা হরত খেরা তোয়ের রাখতেই লোক পাঠিয়েছেন, অবস্থাটা দেখে নিরে মিণোট হওয়ার জন্তে কিরছে ভাড়া-

তাড়ি।...ব্যাপারটা ঠিক এই হোক, কিবা এই ধরনের কি হোক, আমি যে একটা আশ্রয় পাব, লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়ব, এই চিন্তায় বেশ লঘু পদক্ষেপেই এগিয়ে চললাম। জমিদার যদি লোক পাঠিয়ে মাঝিমালাদেব ধরিয়ে আনিবে নৌকা খোলবার ব্যবস্থা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ফিরে এসে পাব হওয়া যাবে, অন্তথা কাছারিবাড়ির এককোণে রাত কাটাবার জন্তে একটু জায়গা পাওয়া যাবেই। যে কাছিনীটা দাঁড় করিয়েছি তাতে যেখানে যেখানে খুঁত বা অসদৃশি আছে, পূরণ করতে করতে এগিয়ে চললাম।

আমরা সোজাই বাড়ি খেয়াঘাটের বাস্তা ধরে, যেটা বাসের বড় পিচঢালা সড়কটার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। লোকটার সঙ্গে গোড়ায় আমার প্রায় পঞ্চাশ গজের তফাৎ ছিল, চলতে আরম্ভ করে আমি সেটাকে প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত কমিয়ে এনে ছেড়ে দিয়েছি। ভেবে দেখলাম সামনে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি এই যথেষ্ট। কালা মানুষ, একেবারে বন্ধ কালা, পাশাপাশি হয়ে লাভ নেই ত। ঐ প্রভেদ রেখে চলেছি, প্রায় বাস্তার মাঝামাঝি যখন এসে পড়েছি, লোকটা হঠাৎ ডাইনে ঘুরল। একটা ষট্কা লাগল, কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষণিক। ভেবে দেখলাম—এ বাস্তার ত সমস্তটাই দেখা হয়ে গেছে, কোথাও গ্রাম বা মহাল-টানা বাড়ি নেই কোন, তা হলে পাশের দিকেই, দূরে বা কাছে, কোথাও কিছু রয়েছে। চিন্তার মধ্যেই আমিও ঐখানটার এসে পড়লাম। খেয়ার এটা হাতপাতেক চওড়া কাঁচা বাস্তা। এসে দেখলাম এটাও ঠিক ঐ ধরনের, তবে তকাতের মধ্যে এটার মত বেশ চালু নয়। দু’দিকে বন আগাছা আর সমস্ত বাস্তাটাই দুর্বাশালে আচ্ছন্ন দেখে মনে হয় যেন নিতান্তই কালভজ্রে কেউ চলে এ পথে। একটু থমকে পড়তে হ’লই, কিন্তু সেটাও খুব ক্ষণিক। হাতে শুধু লাঠি থাকলে যে ভয়টা অন্তত এই পথ-পরিবর্তনে আসতে পারত, সেটা মনে উঁকি মেয়েই চলে গেল। ভেবে দেখলাম, লেঠের বা সে রকম কিছু হলে জমিদারী পেরাঙ্গার কোমরবাঁধা লাল আচকান আর মাথার পাগড়ি নিশ্চয় থাকত না। প্রায় ইতস্তত না করেই আমিও ঢুকে পড়লাম বাস্তাটার।

দেখছি, বাস্তাটা সোজা না গিয়ে বেশ খানিকটা কোণা-কুণি, বেন নদীটা লক্ষ্য করেই চলেছে। একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। ইতিমধ্যে হাওয়াটা আরও জোর হয়েছে এবং যেখটা গাঢ়তর হয়ে আকাশের সেই পাতলা আন্তরণটা একেবারেই কেলেছে ঢেকে। জ্যোৎস্নার আভাটা রয়েছে এখনও, তবে যুযুঁর মত একেবারেই পাণ্ডুর।

বেশ বুঝি, নদীর দিকেই চলেছি আবাব, এবং আরও

খানিকটা এগিয়ে মনে হ'ল দুবে, একটা বড় কি গাছের নীচে একটা বেন বাড়ির আদল। এও মনে হ'ল, এদিকটা পথের হ'বারে যেমন আগাছা ক্রমেই চাপ বেঁধে আসছিল, ওখানটার গিয়ে খানিকটা জায়গা নিয়ে বেশ একটু বেন পরিষ্কার। বাড়ির আদলটা আর একটু স্পষ্ট হ'ল—হ'পাশে হ'খানা ঘর, মাঝখানটার বারান্দা। আমার আন্দাজটুকু আরও খানিকটা পূর্ণ হয়ে উঠেছে—এসেই পড়লাম জমিদার হেউড়ির কটকে, এমন সময় পেয়াহাটাও বারান্দায় পড়ল উঠ।

একটু পরেই আমিও গেলাম পৌঁছে।

দেখি, হালকা জ্যোৎস্না—যা অন্ধকারেরই সামিল হয়ে উঠেছে—দৃষ্টিবিন্দু করিয়েছে। হেউড়ি-টেউড়ি কিছু নয়। নিতান্তই বিচ্ছিন্ন হ'খানি মাঝারি সাইজের ঘর আর মাঝখানে একটু বারান্দা।

বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে ওদিকটাও দেখলাম। ঘর দুটা নদীর ধারেই। বারান্দার নীচে থেকেই বারান্দা-বরাবর চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে নদীতে। এ জায়গাটা উঁচু, যার জন্তে বেশ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায় বাটটা। কিন্তু ঐ কথা, হ'ধারে আগাছা চেপে আসছে, আর কেমন একটা পরিত্যক্ত, অপরিচ্ছন্ন ভাব, যা দেখে মনে হয়, বাস্তবতার মত বাটও যদি লোকে সরেই ত সে নিতান্ত কালভঞ্জে।

এদিকটা দেখা শেষ হতে আমার লোকটার কথা মনে হ'ল। দেখি, উঠে আসতে বাঁ দিকে যে ঘরটা তার মাঝখানে, দোরের সামনাসামনি গায়ে একটা চাধর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে, খুব সম্ভব কোমরে সেটা জড়ানো ছিল। বাস থেকে নেমে পর্যন্তই একটা স্নায়বিক উত্তেজনা চলেছে আমার, ক্রমে বেড়েও গেছে। ওকে দেখেই যেন খেয়াল হ'ল, হাওয়ার বেশ একটু শীতের ভাব এসে গেছে। শান্তিটাও হঠাৎ যেন বেশি করে ঘিরে এল। কিন্তু এরকম একটা ভূনহীন জায়গার ওর মত বেপরোয়া হয়ে শোয়াও ত যায় না। ঠিক করলাম বারান্দাতে বসেই বাটটা কাটিয়ে দোব। এই সময় কিন্তু মেঘগর্জনের সঙ্গে গোটাকতক বিদ্যুৎ খেলে বাওয়া দেখলাম—পারিপার্শ্বিকের দিক থেকে ঘর-গুলার অবস্থা যতটা ধারাপ আন্দাজ করা গিয়েছিল, ততটা ত নয়ই, বরং বেশ পরিচ্ছন্নই। তবু একেবারে ভেতরের দিকে না গিয়ে ভেতর-বাহিরের মধ্যে কতকটা যেন বন্ধ করে ধরজা থেকে হাতখানেক গিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়লাম। বারান্দাটা চওড়া নয়, বারান্দার বসলে বৃষ্টি নামলে ছাট থেকে বন্ধা পাওয়া বাবে না।

সিকের চাধরটা কাঁধ থেকে নামিয়ে চড়িয়ে নিলাম গায়ে। একটি নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছি, একটি লোক রয়েছে, শশজই,

নিশ্চিতভাব সঙ্গে বেশ একটা আরামের ভাবই। মনটাকে অধিকার করে নিল ধীরে ধীরে। ক্রমে, আমাদের, অর্থাৎ লেখক-সম্প্রদায়ের যে—কি বলব, জয়া ব্যাধি? সেটি ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে লাগল, বাস ছাড়া থেকে আরম্ভ করে—আকাশ-বাতাস, নদী-পথ-বাট মিলিয়ে আককের বাতের যে রোম্যান্স সেটার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে যেন তলিয়ে যেতে লাগলাম।...বুঝলাম, সমস্ত রাত এভাবে বসে থাক। চলবে না, তবু আসন্ন নিদ্রাকে যতক্ষণ সম্ভব ঠেলে ঠেলে রেখে দুর্যোগময় এই আকস্মিক রাত্রিটিকে যতটা সম্ভব মনের মধ্যে সঞ্চার করে নিতেই হবে।

আমার আন্দাজ বা মনগড়া কাহিনীটা ঠিকই আছে। লোকটা যাক্সিল ঘুরে রিপোর্ট দিতে, তার পর আকাশের অবস্থা দেখে স্থির করে নিয়েছে, আর প্রয়োজন হবে না। আশ্রয়টা জানাই, ঘুরে চলে এসেছে।

ঝড় বেড়েই চলেছে এবং একভাবে বসে থাকতে না পেরে আমিও পেয়াহাটার মত একসময় চাধরটা মুড়ি দিয়ে দরজার সামনে শুয়ে পড়েছি, এদিককার এইটুকুই মনে আছে। ঘুমিয়ে পড়তে অল্পই সময় লেগে থাকবে, নিদ্রাটা হয়েছিলও গভীর, হঠাৎ ভেঙে গিয়ে একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

উঠে বসলাম একটা খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ কিছুই আর বাকি নেই, সঙ্গে একটা মত্ত কলরোল, সব মিলিয়ে সমস্ত জায়গাটাকে মগ্নিত করে তুলেছে। কিন্তু এ সবের জন্তে মনটা তোয়েবই ছিল, যা আমার বিন্মিত এবং অভিভূত করে ফেলল তা সম্পূর্ণ এক অস্ত্র ধরনের ব্যাপার, যা বিশ্বাস এবং উপলব্ধি করতেই সেই সত্তোখিত অবস্থায় বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

সেই পেয়াহাটা নেই, কিন্তু সমস্ত জায়গাটা লোক, লক্ষ্য, সান্না, পেয়াহায় ভরে গেছে। সবাই সাজগোজ করা, অনেকের ওর চেয়েও ভালো, কাকুর হাতে আশাপোটা, কাকুর কোমরে মখমল ঢাকা তরোয়ালের খাপ, একজনের পিঠে বন্ধুক আর টোটার বেষ্ট দেখে মনে হ'ল রাজা-জমিদার গোছের কেউ কোন একটা বড় উৎসবে কোথাও চলেছে। খুব একটা ব্যস্ত ভাব। বাঁশের বাতার মাধার ফলকে বসানো আগেকার ধরনের গোটাকতক মশাল, তারই আলোয় সব আনাগোনা করছে। কেউ বাচ্ছে নদীর দিকে নেমে, কেউ আসছে উঠে। গতিবিধি লক্ষ্য করেই একটু সামনে রুঁকে গলাটা বাড়িয়ে দেখি নদীতে পাশাপাশি হ'খানা বজরা। তার একখানা বেশ ভাল করে সাজানো মনে হ'ল দুব থেকে। লোকগুলার আমার দিকে দৃকপাত নেই দেখে কোন প্রশ্ন করব কিনা, করলে এত ব্যস্ততার মধ্যে কাকে



ডেকে করব মনে মনে ভাবছি, এমন সময় সেই উগ্রগামী জনশ্রোতে একটা যেন নতুন ভোড় নামল এবং উট্টোদিকে ঘুরে দেখি আরও লোকলব্ধের মধ্যে আগে-পেছনে করে ছ'খানি পালকি এসে পৌঁছল। সামনেরটা খোলা, তাগ্লাম-গোছেব, পেছনেরটা মথমলের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। প্রত্যেকটাতে লাল বনাতের উদ্দিপরা আটজন করে বেরাৱা, তার বাবান্দার নীচে ছোট্টোকে পাশাপাশি নামিয়ে রাখতে তাগ্লাম থেকে আরোহীটি নেমে বাবান্দার উঠলেন। বয়স কম করে ধরলেও সন্তরের নীচে হবে না, শরীরটা খুব দুর্বল বলে মনে হয় না বয়সের অল্পপাতে, তবে সামনে বেশ ব্লকে এসেছে। এদিকে আগাগোড়া লাল বেশম আর মথমলের পোশাকে সজ্জিত, মোড়াই বলা ঠিক, মাথায় পালক গৌজা একটা রাঙা বেশমের পাগড়ি।

পালকি নামাবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাপর মিলিয়ে সমস্ত দলটা স্তুবিভক্ত হয়ে আগে-পেছনে-পাশে, যার হাতে যা রয়েছে প্রথমত বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঢাকা পালকির পাশে পাশে চামর নিয়ে দুটি স্ত্রীলোক হেঁটে হেঁটে আসছিল, তাদের একজন ঘেরাটোপের মুখটা টেনে ধরেছে, একটি পায়জোর-পরা রাঙা প. অর্ধেকটাও বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে, এমন সময় নদীর দিকে হঠাৎ একটা তুন্ড কোলাহল উঠল।

আমি এগিয়ে এসে চৌকাঠের পাশে বসেই সব দেখে-ছিলাম। বাড়ি কি দিয়ে দাঁধ সেখানে রীতিমত একটা লড়াই বেধে গেছে। দু'ব থেকে যতটা আন্দাজ করতে পারলাম, গোটা চার-পাঁচ লক্ষা ছিপ-গোছেব নৌকা হঠাৎ বজরা ছুটোর ওপর এসে পড়েছে। এত বাড়ে বাইরে থেকে আশা সম্ভব নয়, নিশ্চয় একেবারেই কাছে নদীর কোন ঝাড়িতে লুকিয়ে এই অবসরটার জন্ত প্রতীক্ষা করছিল, একেবারে বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আকাশের ঐ অবস্থা, নদী উজ্জাল, আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে বাজরা আর ছিপগুলো, তার ওপর ঐ কান্ড। মশালের আলোয় দেখছি লাঠি-তরোয়ালে মাথামাখি, চোট খেয়ে লোকেরা বাজরা থেকে ছিটকে পড়ছে জলে, এক-একবার গাধা বন্ডকের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে যাচ্ছে খানিকটা করে, আবার মশালের আলোয়, বিদ্যাতের বালকে সেই উৎকট দৃশ্য।

এদিকে ঘুরে চাইলাম। সব শুধু, যেন জমাট বেঁধে পালকি ছটাকে ঘিরে যার হাতে যা আছে শুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন ভাবে যে, বাবান্দার নীচে পালকি ছুটা আর দেখাই যাচ্ছে না।...কিন্তু, অন্তত আরোহী নিয়ে পালকি ছুটা ত সরিয়ে দেওয়া উচিত।

আমার দিকে কেউ দৃকপাত না করলেও, নিজের মনেন উত্তেজনাতেই পরামর্শ দিতে যাব এমন সময় দেখি ওরাও যেন এই ধরনেরই একটা প্ল্যান আঁটছিল, বিধিমতই বোল বেরাৱার কাঁধে ছোট্টো পালকি পড়ল উঠে এবং সমস্ত দলটা বিভক্ত হয়ে গিয়ে অর্ধেকগুলো নদীর দিকে যুথ করে প্রতিরোধের জন্ত দাঁড়াল এবং অর্ধেকগুলো উট্টোদিকে। তার পর পালকি ছুটা ছলে উঠেছে, বিতীয় দলটাও পা বাড়িয়েছে, দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেল। নদীর দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, অবশ্য বাড়-বাঁধা রয়েছেই, তবে ওখানকার লড়াইটা গেছে ধেমে, দেখলাম প্রায় জনপতিশেক লোক লাঠি-সড়কি নিয়ে মশালের আলোয় সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ছুটে আসছে। সামনে একজন যুবা, হাত তুলে কি বলল, বাড়ের দোলায় মনে হ'ল “ধামবে!” বলে একটা হুকুম। এদিকেও বাড়ের দোলায় মধ্যে কার যেন মুহুর্তের হুকুমে—মনে হ'ল বুদ্ধেরই—পালকির দলটা গেল ধেমে।

এর পর শুধু একটা নিশ্চয় অভিনয়, বাড়ের দোলায় মধ্যেই ইঙ্গিতের সঙ্গে হয়ত এক-আধটুকু জড়ানো কথা। লড়াই বগড়া আর একেবারেই নেই। পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে যুকের ঐ রকম একটা তজনী ঠানো ইঙ্গিত আর কথার পর শুধু তাগ্লামটা উঠল আর পালকিটাকে ছেড়ে এদিক-কার সমস্ত দলটা তাগ্লামের পেছন পেছন চলল। দাঁধের হ'লজন ছিলই, যুবক একটু এগিয়ে গিয়ে ঐ রকম ইঙ্গিতে কি বলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সমস্ত শরীরটা শাড়িতে গহনায় বলমল, মুখটা একটা খুব পাতলা বেশমের উড়ুনি দিয়ে ঘোমটার আকারে ঢাকা। হঠাৎ এমন একটা উদ্বেগপূর্ণ মুহুর্ত এসে গেছে, আমার মনে হ'ল বাড়-বাঁধার সেই উৎকট শব্দ পর্যন্ত লুপ্ত, শুধু এরা দু'জনে কিশোর একটা প্রতীক্ষার পরস্পরের সামনাসামনি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা উৎকণ্ঠিত মুহুর্ত, তার পরেই মেয়েটি ধীরে ধীরে রতনচূর-পরা ছুটি হাত দিয়ে মুখের অবগুষ্ঠনটা তুলে ধরে চাইল যুকের দিকে। সে যুখের মধ্যে এমন একটা সহজ অন্তরঙ্গতার ভাব রয়েছে যাতে মনে হ'ল ওরা পূর্ব থেকে পরিচিত এবং ওদের দু'জনের রচিত একটি পরিকল্পনা যেন এইমাত্র সফল হয়ে শেষ হ'ল।

একটি নতুন কাহিনীর আভাস কুটি কুটি করছে আমার মনে, এমন সময় দৃশ্যপট আবার হঠাৎ গেল পালটে।

যুবকটি এক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরেছে, হঠাৎ একটা বন্ডকের আওয়াজের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটির পারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়-বাঁধা-বস্ত্রের সাথে আবার সেই নারকীয় কলরোল। কিন্তু বাজের

ধোঁয়ায় ছোট আয়গাটা এমন ভাবে জেছে যে, ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বোঝাবার জো নেই। শুধু যেন হঠাৎ দ্বিগুণিত বাক্স-বস্ত্রপাতের শব্দের সঙ্গে চুটা। দলের সংঘর্ষ বনবনা! মার মার! কাট কাট!...সব ভেদ করে আরও গাঢ় বন্দুকের শব্দ, সব লুপ্ত করে আরও বাক্সের ধোঁয়া...

ওদিকে আমার আর এইটুকুই মনে আছে যে, এক সময় এক মুহূর্তেই যেন হঠাৎ সবটুকুতে একটা ছেদ পড়ে গিয়েছিল, একটা স্ফলতি সিনেমা, হঠাৎ কারেন্ট বন্ধ হলে বা রোল কেটে গেলে যেমন যায় মাঝপথে থেমে। পরে বুঝতে পারলাম, মনের ওপর আর চাপ সহ্য করতে না পেরে অচৈতন্য হয়ে পড়ি।

চৈতন্যটা ফিরেও এল আঁপন হতেই। হাতবড়িটা উলটে দেখলাম চারটে বেজে মিনিট ছয়-সাত হয়েছে। নদীর ওপারে চক্রবালের খানিকটা উর্ধ্ব শূকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করতে। একটা বেশ দিগ্বিরিতে হাওয়া বইছে, নদীর জলে শান্ত বীচিভঙ্গি।

রাত্রে যেন কিছু একটা হয়েছিল এখানে! চেষ্টা করে করে স্মৃতিটাকে স্পষ্ট করে আনছি, রাত্রেই তাগুনের চিহ্ন আচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজছি জলে-স্থলে, এমন সময় অস্পষ্ট আলোয় দেখি যেন জন চার লোক পথ দিয়ে এই দিকে এগিয়ে আসছে, একজনের হাতে একটা লণ্ঠন। আর একটু আসতে বুঝলাম আমার বন্ধু, বাকি তিন জন ওরই লোক। ধর থেকেই দেখছিলাম, বেরিয়ে আসতে তাড়াহাড়াই এগিয়ে এসে একটু বিম্বিত হয়েই মুখের পানে চাইলেন, যেন কি লক্ষ্য করলেন, তার পর প্রশ্ন করলেন—“তুমি এখানে—বৌরাণীর ঘাটে হঠাৎ কি করে এলে?”

“বৌরাণীর ঘাট!” বেশ বিম্বিত ভাবেই প্রশ্ন করলাম আমি।

আবার ক্ষণমাত্র লক্ষ্য করে দেখলেন যেন। প্রশ্ন আরম্ভ করেছিলেন—“রাতিবে তুমি কিছু...”

মধ্যেই থেমে গিয়ে বললেন—“খাক, সে হবে’ধন। এটুকু হেঁটে যেতে পারবে? জিপটার একটু কি বিগড়ে গেছে এই ভেমাধায় এসে, ড্রাইভার ঠিক করছে, এক্ষুনি হয়ে যাবে।”

গিয়ে দেখলাম ঠিকই হয়ে গেছে। বাসার দিকে ছুটল জিপ। যেতে যেতে গল্প হ’ল। ওঁরটা সংক্ষিপ্ত। বড়-বড়ার লজ্জাই এক আয়গার আটকে গিয়ে রাত প্রায় একটার সময় ‘ট্যুর’ (Tour) থেকে ফিরে গুললেন আমি এসেছিলাম, ওকে না পেয়ে এবং বিশেষ কাজ থাকার সামনের বাস ধরেই বেরিয়ে পড়ি, রাত্রেই থেরা পেরিয়ে ওপারে চলে যাব বলে।

উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এসে দেখেন খোঁয়ায় লোক নেই, তবে নৌকা আর ক্র্যাট দুটাই এপারে বাঁধা দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হন। কিন্তু আমি গেলাম কোথায় তা হলে? ফাঁকা জায়গা, খোঁজাখুঁজি করবার কিছুই নেই। তবুও খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে যাবেন এমন সময় বৌরাণীর ঘাটের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। এইখানেই কাছাকাছি কোথায় আছে। এর সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী যখন শুনেছেন, একবার দেখে যাওয়াই ভাল।

“কিম্বদন্তীটা কি?”—আমি প্রশ্ন করলাম।

উনি আবার সেই ভাবে একবার লক্ষ্য করে নিয়ে প্রতি-প্রশ্ন করলেন—“রাতিবে কিছু দেখেছ তুমি?”

জিপ এগিয়ে চলেছে পাকা রাস্তার উঠে। আকাশ অল্প স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। আমি সেই বধির পেয়াবার আসা থেকে নিয়ে সবটুকু বলে গেলাম।

শুনে বললেন—“সবটুকুই ত মিলে যাচ্ছে।” আবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—“আশ্চর্য, সামলেছ ত থকসটা। যদিও এও ঠিক যে, কিছু থেকেই গেছে বাকি।”

প্রশ্ন করলাম—“স্বপ্ন ছিল না? কিছুই ত চিহ্ন নেই সে সন্দেহ?”

বললেন—“স্বপ্ন মোটেই নয়, তা হলে আমার শোনা গল্পের সঙ্গে ছবছ মিলবে কি করে? পেয়াবা এসে ঘাট থেকে নিঃশব্দে ডেকে নিয়ে যাওয়া—ও কালা! নয় মোটেই—তার পর খুড়ো-কমিটারের ভাইপোর জন্তে মেয়ে দেখতে গিয়ে—নিজের জন্তে লুপ্ত করে পেয়াবাটে নিয়ে আসা...হ্যাঁ, বিয়ে হয়নি তখনও, মেটা বলে রাখি—ওদের বরের বেওয়াজ হচ্ছে মেয়েকে আনিয়ে নিজের এখানেই বিয়ে করা। খুড়ো দেখতে গিয়ে নিজেই নিয়ে আসছিল, ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে। তার পর তুমি লেখক মানুষ, অতটা দেখলেও বাকিটা নিজেই স্বজন করে নিতে পেরেছ নিশ্চয়। ভাইপো বসন্ত রায় নয়, ছেড়েই দিয়েছিল খুড়োকে। খুড়ো কিন্তু ভুলতে পারল না। চলবল নিয়ে ফিরে যাওয়ায় সময় কল টিপে দিয়ে গেল। সেই যে গাঢ় বন্দুক আর টোটার বেন্ট আঁটা সাজীটাকে দেখেছিলে, সেই গোলমালে নিঃশব্দে তোমার সামনের ঘরটার চুকে পড়েছিল, ভাল বুঝে কাজ সেবে ছিল।”

“মেয়েটি?...সে তা হলে খুড়োবই...”

“না, তাই ত বলছিলাম—তুমি খাভাটা মোটাশুটি সামলে গেলেও শেষ বন্ধা হয় নি। বৃদ্ধকে ওরা সরিয়ে দিয়েছিল। মেয়েকে কিন্তু নিয়ে যেতে পারে নি, কিম্বা যায় নি সে

নিজেই। ওই ঘাটেই সেই রাতে চিতা জালানো হয় যুবকের, মেয়েটি সহস্রতা হয়।...মনে রেখ, সেই কোন গাছ। বন্ধুকের যুগের ঘটনা। এটেই তখন খেয়াবাট ছিল, এখন আশান, খেয়াবাট এখিকে সরে এসেছে।”

খানিকটা নিঃশব্দে চললাম আমরা, তার পর বন্ধু বললেন—“যাই হোক মাঝখান থেকে খুব একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিলে।...আমি চেষ্টা করব যাতে শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে পারি...অ-ভ্যাঙ্কাল সত্যীদাহের চিত্র একটা।”

আমি বিষয়ে একেবারে ঘুরে চাইলাম, একেবারে কতকগুলো প্রশ্ন করে ফেললাম—“বল কি! তুমি দেখবে! এসব একটা ভৌতিক ব্যাপার। আবার হবে নাকি?”

বন্ধু বললেন—“আধিভৌতিক বল, ঠিক হবে। ভৌতিক বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হ’ল তাহের নিয়মকানুন অনুযায়ী তোমার বাড়ি না মটকে বসে বসে তোমাকে তোমাশা দেখতে দিত? আসল কথা—আজকাল যেমন বলছে—ওসবগুলো ত আর কিছুই নয়, ইথার বা অতিশূন্য বায়ুস্তরে

একটা ছাপ। ঠিক সিনেমার রীলে ছাপের মতই—একসময় ঘটনাগুলো সত্যি ঘটছিল বা ঘটানো হয়েছিল, তার পর অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করলেই আবার অন্তভাবে ঘটবে। এসব ব্যাপারের অনুকূল অবস্থা, সেই দিনের মত একটা বিদ্যুৎ রাত, যত সে রাতের কাছাকাছি হবে ততই পুনরুত্থান হয় হবে স্পষ্ট এবং জোরালো।”

বললাম—“পড়ি এমন সব কথা মাঝে মাঝে, কিন্তু নিজের চোখে যা দেখলাম তার পর আর ওসব নতুন নতুন খিয়োরী বিশ্বাস করতে মন চায় না।”

তাদের কচি রোদটা ভিপের পাশ দিয়ে গিয়ে এসে পড়েছে। বন্ধু একটা সিগারেটের টিন কাটছিলেন, শেষ হলে একটা বেব করে আমার হাতে দিলেন, তার পর একটা নিজের ঠোটে চেপে ধরে একবার আকাশের দিকে চেয়ে বললেন—“করবে বিশ্বাস, দিনটা আর একটু এগুতে দাও।”

দেখলাইটা জেলে এগিয়ে ধরে বললেন—“নাও, ধরিয়ে নাও।”

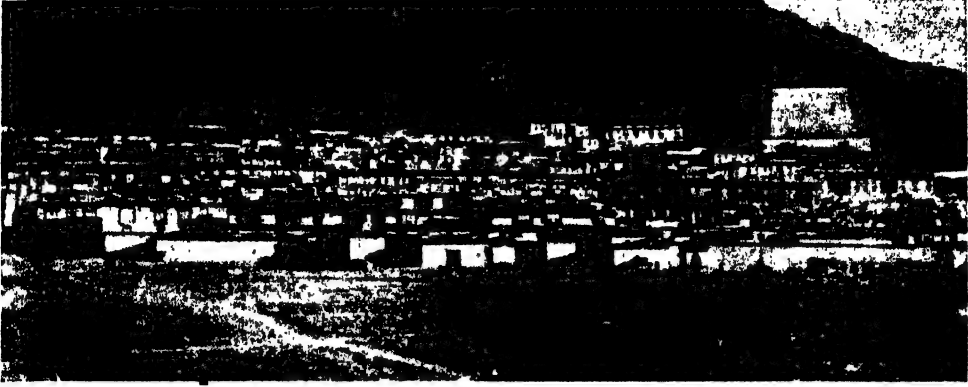
## কালিদাসের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

বহু শত বর্ষ আগে ওগো মহাকবি  
আকিরাছ স্বপ্নপটে হৃদয়ের ছবি,  
সেদিনের বসুমতী লভিগাছে কত রূপান্তর  
সেদিনের পুর, পল্লী, জনপদ, শস্ত্রের প্রান্তর,  
পথ, বাট, বাসগৃহ বিবর্তিত নব রূপ লাভে।  
প্রকৃতি কেবল আছে সেই একই ভাবে।  
বিহগ কুন্ডন আর কুন্ডন সৌরভ,  
সমীরণে মর্মবিরিত গুল্লব পল্লব,  
অরণ্য, তটিনী, শৈল বিরাজিছে সমানই স্তূতলে,  
রবিচন্দ্রে তাবাবলী একই ভাবে গগন উজ্জলে।  
বসন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম। বয়সার মেঘ  
সমানই জাগর আলো হৃদয় আবেগ।  
মানুষের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, আচরণ,  
সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, অশন, বসন—  
সবই আজ বিবর্তিত।

নারী-নরে হৃদয়ের মিল  
সেই মুগ্ধ প্রেমলীলা ক্ষুদ্র শুধু নয় এক ডিল।  
বিবহ, মিলন-তৃষা, রূপমোহ, মান, অভিসার  
একই ধারা ধরি করে আলো চিন্তে রসের সঞ্চার।

প্রকৃতি ও প্রেম এই দু’য়ে তুমি কবিতা আশ্রয়  
বিকশিত করেছিলে শতবলে কমল-হৃদয়।  
প্রকৃতিতে করেছিলে অসীমের দূতী  
সঁপিলে তাহারে তুমি দ্বিবা বার্তা প্রেমের আকৃতি।  
নিত্য-চিরন্তন যাহা শুধু তার গীত  
গেয়ে গেলে তাই তুমি সর্ব-যুগ-জিৎ,  
তাই আলো বহুকাল ব্যবধানে বিংশ শতাব্দীতে  
রসমুগ্ধ হই ভব গীতে।



তিব্বতের একটি বৃহত্তর বিহার

## তিব্বত ও ভারত

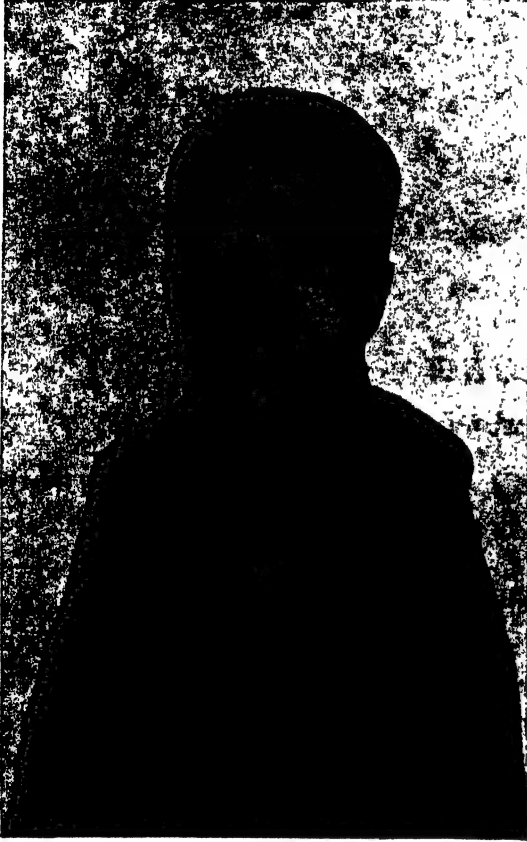
ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম-ভাগ বাহু ছিলে বাকী থাকে মধ্য-এশিয়া, তার উত্তরে কিউন্ লুঙ চীনা পর্বতমালা ও দক্ষিণে ভারতের হিমালয়। এই হিমোত্তর (Trans-Himalaya) অঞ্চলে আমাদের কারবার সবচেয়ে বেশী তিব্বতীদেরই সঙ্গে যদিও পাশ্চাত্যজাতিরা নাম দিয়েছেন Forbidden land—দুপ্রবেশ দেশ। অথচ দুই সহস্রাব্দিক বছর ধরে ভারত ও চীন এই তিব্বত তথা মধ্য এশিয়া (বা চীনা তুর্কীস্থান) অতিবাহন করে নিজ নিজ ভাষা ও সভ্যতার আদানপ্রদান করে এসেছে।

বৈদিক যুগের শেষে যখন রামায়ণ ও মহাভারতের ভৌগোলিক নামগুলি দেখা যায় তার মধ্যে পাই বিশাল হিমালয় দেশ ও যক্ষ, কিন্নর, কিরাত, কাষোজাদি জাতি, যারা আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। ভারতের বৌদ্ধ পরিভ্রাজক হয়ে—কান্তপ মাতঙ্গ ও ধর্মবজ্র—এই মধ্য এশিয়া দিয়ে ক্ষুদ্র চীনে ধর্মপ্রচার করেছিলেন (খ্রীঃ ১ম শতক) চীনা বৌদ্ধতিক্ষু কা-হিয়েন তেমনি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই পথেই পশ্চিম-তিব্বত ও কাশ্মীরে দিয়ে ভারতে তীর্থযাত্রা করে যান ও প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী লিখে যান। সেই গুপ্তযুগের কবিশত্রুটি কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বিবহী-রক্ষের ‘অলকাপুরী’র যে অপূর্ণ বর্ণনা করেছেন হরত সেটি ভৌগোলিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত (পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদের এই মত—“উৎসব সঙ্কেত” নামটাকা জটিল)। শত্রুটি হর্ষবর্জনের কল্যাণমিত্র হিউএন্ সাঙ (৬৩০-৪৫) প্রায় ১৫ বছর ধরে

ভারতে ও প্রত্যন্ত দেশে পরিভ্রমণ করে যে তথ্যপূর্ণ বিবরণী লিখে গেছেন তাঁর সাহায্যে প্রথম স্পষ্টভাবে আমরা তিব্বতকে জানি। তিব্বতী শত্রুটি প্রোচন্-গম্বোর ছিল দুই মহিষী—নেপাল ও চীনের দুই রাজকুমারী। তাত্ত্বিক হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগাচার মিশ্রণে তিব্বতের ভূত-প্রেত পূজক (Bon Cult)-দের মধ্যে মহাযান-মার্গী Lamaism প্রচাবে সাহায্য করেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে (৭০০-৭৫০) তিব্বতের ধর্মশোক শত্রুটি প্রোং-লেব-বচন, তিনি বহু চীনা পণ্ডিত আমদানী এবং সেই সঙ্গে নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার প্রসিদ্ধ আচার্য্য শাস্ত্ররক্ষিত ও তাঁর সহকর্মী কমল শীল, পদ্মসম্ভব (উড়িষ্যা), প্রভৃতিকে সাহরে তিব্বতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রচারের কীষ্টি তিব্বতী ভক্তেরা সাহরে লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রসিদ্ধ বাঙালী পরিভ্রাজক শরৎচন্দ্র দাস তাঁর “Indian Pandits in the Land of Snow” ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকাটির মধ্যমে তা প্রচার করে গেছেন (১৮৮০—১৯০০)। তাঁর সাহায্যে ও স্তার আগুতোয়ের উৎসাহে পণ্ডিত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যভূষণ তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে বৌদ্ধ জ্ঞানদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেই কাজ অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত প্রমুখ বাঙালী পণ্ডিতেরা গবেষণা করে প্রচারিত করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর যুগে তিব্বতে বিভ্রাট সূত্র হবার পূর্বেই মূল্যবান গিলগীট পুঁথি (Gilgit mss) সংগ্রহ ও প্রকাশিত করেছেন। শ্রুত তিব্বতে চীনারা হানা দিলেই পাশ্চমে লাদাকী (Ladak)

বৌদ্ধধর্ম সাহায্যে তিব্বতীরা স্বাভাবিক বজায় রেখেছে। সেজন্য সিংকিয়ানের মত লাদাক অধিকারও চীনা রাষ্ট্রনীতির এক প্রধান লক্ষ্য। অথচ লাদাক এখন ভারত তথা কাম্বোজের অন্তর্গত এবং লাদাকী বৌদ্ধধর্ম ধর্মগুরু—চীনা মঠাধীন নয় পরন্তু হালাই লামা।



হুন হালাই লামা

(জ: প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ ৫৬২-১৩)

ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রচারের আগে সেদেশে ছিল প্রেতপন্থী Bon মার্গ। পরে ক্রমশঃ তিব্বতী বৌদ্ধ মঠে ছোট্ট থা-পা ও মিলা-বে-পা প্রভৃতি সাধকদের প্রভাব বিস্তার হয়। ফলে চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ (১২৫০—৮) (চেংকি-শের বংশধর) ভারতীয় বৌদ্ধধর্মালম্বিকদের অপেক্ষা তিব্বতী লামাদেরই গুরুত্ব বরণ করেন। তার পর (১৩০০—১৪০০) তুর্কীমোঙ্গলজাতি প্রধানতঃ মুসলমান ধর্মই গ্রহণ করে, কিন্তু তবু আধুনিক মঙ্গোলিয় বৌদ্ধমঠের পত্তিতরা আজও তিব্বতে বাস করে অধ্যয়ন ও প্রচার করে চলেছেন।

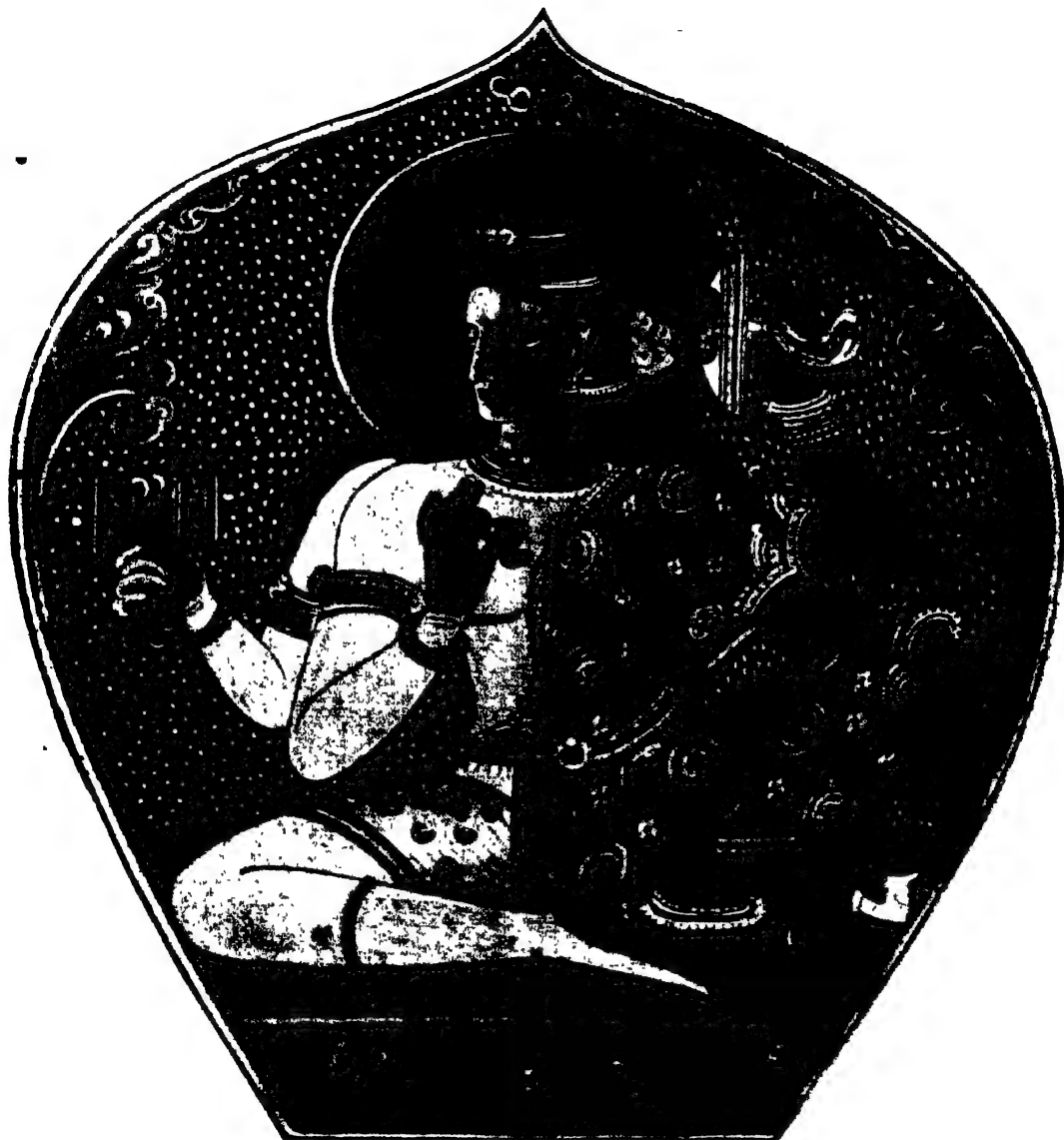
তাদের ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের আজ একই সমস্যা, কারণ প্রবল চীনরাষ্ট্র আজ কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার প্রভাবে ধর্মবিরোধী।

অথচ ভারত-তিব্বতের, তথা এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু মূল্যবান তথ্য তিব্বতের মঠে মন্দিরে ও পুঁথির মধ্যে সুরক্ষিত আছে। পাছে সেগুলি (কম্যুনিষ্টদের অমান্যের) নষ্ট হয় "সেলক্স, শুধু ভারতীয় নয় পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও পণ্ডিতমণ্ডলী উদ্বিগ্ন।" সুদূর হাঙ্গেরী থেকে পবিত্র তিব্বত প্রবেশ করেন Csoma deKoros এবং অতুলনীয় শ্রম ও সাধনায় তিব্বতী মহাকোষ (২৩ লক্ষ শ্লোক) (১) কাজুর বা বুদ্বাটন সংগ্রহ এবং (২) ভুজার বা ভাষা ও শাস্ত্রানুবাদ বাংলায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে উপহার দেন। তাঁদের Bengal Govt. এর চেম্বার প্রথম তিব্বতী অভিধান ও নিবন্ধাদি পত্রিকার প্রকাশ হয় (১৮৩২—৪২)।

এই বিরাট তিব্বতী গ্রন্থমালা কাঠকলকে খোদাই করে ছাপান পঞ্চম হালাই লামা স্মৃতি সাগর (১৬১৬—৮)। সেই যুগে তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথ এক মূল্যবান ইতিহাসও রচনা করেন। তিব্বতী লিপির ভিত্তি প্রধানতঃ বাংলা তথা পূর্বভারতীয়; সে তথ্য মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত থেকে দীপকর ত্রিভুজেনের রচনাধিতে প্রমাণিত হয়েছে। তিব্বতী লিপি ও শিল্পকলায় পালযুগের বাংলার প্রভাব সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

চীন ও ভারতের সঙ্গে যেমন তিব্বতের (Sino-Tibetar) বহু যুগব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ তেমনি লিপিজানহীন বহু অসভ্য (Tibeto Burman) জাতির সঙ্গে আজও আত্মীয়ের গভীর যোগ আছে। এদের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার অমূল্য প্রাণিত বিশাল ব্রহ্মদেশ, ভূটান, শিকিম এবং নেপালও যুক্ত আছে। তিব্বতে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে তার ফলে পূর্ব ও উত্তর ভারতের অনেক জনসংঘ বিক্ষুব্ধ ও হয়ত বিপ্লবের বজ্রায় রূপান্তরিত হবে। এই যুগসঙ্কটে তাই প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ (পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গীয়) বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ ও সজাগ হয়ে কূটনীতির অমূল্যদ্রব্য করতে হবে।

অনেকের ধারণা নেই যে মোঙ্গল-মানচু সম্রাটদের যুগ থেকেই পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান জাতিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপান, চীন থেকে সূত্র করে ১৬৬১ সনে ক্যাথলিক মিশন তিব্বতে স্থাপন করে। লামা তখন থেকে পাশ্চাত্যদের প্রচার-কেন্দ্র। আজ সেখানে ইউরোপ-আমেরিকার লোক যেমন, তেমনি কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার এবং চীনও হাজির। পূর্ব-ভারতের নাগাদেশ ও নেপাল থেকে ভূটান-শিকিম-নেপাল পর্যন্ত আজ চীন-যুগ্মবর্ত্তে পড়েছে। ১৯২২ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপালী (গোর্খা)দের সঙ্গে তিব্বতীদের যুদ্ধ



অর্দ্ধনারীথর  
ত্রীনন্দলাল বসু  
( আশ্বিন ১৩৪২ চইতে পুনর্মুদ্রিত )





ভিকারের একটি বৃহত্তর বিহার

পাশে, কলে ভারতীয়দের চেয়ে নেপাল রাষ্ট্র ভিকারে কূট  
নতিক (extra territorial) অধিকার পায়। কিন্তু শান্তি  
গাপনের সময় উভয়ে (চীন ভিকার) চীন সম্রাটের মধ্যবর্তিতা  
গীকার করে। ১৮২০ সনে সীমান্ত নির্দেশ ও ব্যবসাহুতি  
বেছিল চীন ও ভিকারের মধ্যে। কিন্তু হলাই লামা (Tsar  
-তাইগু) রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগে ব্যক্তি দ্বারা ইংরেজ  
স্বাধীন হয় এক-কালে চীন-জাপান (৮১১) ও ক্রম জাপান  
১২০৪) যুদ্ধের পরই ক্যাপ্টেন ইয়ংজাংব্যাণ্ডের নেতৃত্ব  
দেয় ভারতীয় পৈত্র কর্তৃক লামা অধিকার ও নতুন সন্ধি  
হয়েছিল।

১৯১২ সনে মানচু রাজবংশকে ভাঙিত করে চীনা  
গণতন্ত্র (Republic) স্থাপিত হয় এবং চীনা আক্রমণ  
ভিকারীরা প্রতিরোধ করায় ভারতে প্রথম ১৯১৭ সনের  
"সিমলা চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু চীনা প্রতিনিধিরা  
"স্বাক্ষর" করতে ভুলে যান। সেই ১৯১৮ সনে আবার  
দুই সংঘর্ষ থেকে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত ভিকার কু-গার্মিষ্টাং-  
চীনাধের সঙ্গে বনিয় চলেছিল। তেমনি হলাইলামা  
ও পঞ্চন-লামাধের ভিতর ছোটখাট বিভেদ দেখা দিলেও  
চীনরাষ্ট্র ভিকারের স্বাভাবিক মোটে উপর স্বীকার করে  
এগেছে। ১৯৩৩ সনে জরোদর্শন হলাইলামার মৃত্যুতে বিজেট  
গামরিক ভাবে বস্তুপরিচালনা করেন। পশ্চিম চীনের-  
তিরাংগাই অঞ্চলে বর্তমান চতুর্দিক হলাইলামাকে শিশু বৃদ্ধ-  
রূপে আবিষ্কার করা হয়, এবং সেই ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৯

পর্যন্ত বর্তমান হলাইলামা তাঁর মাত্র ২৫ বছরের জীবনেই  
বেন এক "যুগান্তর" দেখে গেলেন।

১৯৪৯ সনে মাউ ৯-সেপ্টেম্বর নেতৃত্ব কন্মুনিষ্ট চীন এক  
নতুন যুগ বেন শুরু করেছে। ১৯৫০ কেক্সারীতে ভিকার  
চেয়েছিল, স্বাধীন ভারতের সাহায্যে, নব্য চীন-নেতাদের সঙ্গে  
মিলতে, কিন্তু তাঁরা সেই অক্টোবর মাসেই সশস্ত্র ভিকারে  
প্রবেশ করে বসেন। ষা হোক ১৯৫১ (২-শে মে) কিছু  
মিটমাট হ'ল কলে পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষার সম্পর্কিত গ্রহণ  
করল চীন। এবং ভিকার অসুস্থি পেল আন্তর্জাতিক  
স্বাভাব্য। কিন্তু চীনা সেনানায়ক লাসাতে স্বাভাব্যে  
বলে গেলেন এবং ১৯৫৩ সন থেকে চীনা পররাষ্ট্রদূত  
এককভাবে ভিকারী-বিভাগ পরিচালনা শুরু করেন।  
ভারতরাষ্ট্রের বার বার তাগিদে ১৯৫৩ সনে 'Atlas of  
Chinese People Republic' (মানচিত্র) দেখান হয়  
(১৯৪৮ সং হইতে ছাপা) ভারতের প্রায় ৩০০০০ বর্গমাইল  
ভূভাগ চীনে চুকেছে। ঠিক তাই দেখা গেল ১৯৫৪ সনের  
শোভিগ্রেট মানচিত্রে। সুতরাং শোভিগ্রেট রাশিয়ারও একে  
অসুস্থি ছিল মনে হয়। ১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে  
"পঞ্চম চুক্তি" নামে এক সর্ব চীন স্বৈচ্ছায় ভারতের সঙ্গে  
স্বাক্ষর করে, তার চতুর্থ দফার দ্বিধা:

"There will be peaceful co existence with  
neighbouring countries and development of fair  
commercial and trading relations with them,



on the bases of equality, mutual benefit and respect for territory and sovereignty.”

এই চুক্তির প্রায় ৪০ বছর আগে ১৯১৪ সনে সিমলা-বৈঠকে ম্যাকমোহন সীমারেখা টানা হয়েছিল। তাতে তখনকার চীনা প্রতিনিধি সই করেন নাই, এখনও সেটা স্বীকৃত হ'ল না; অর্থাৎ মৌখিক মিষ্টভাষা প্রয়োগ করলেও ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত কোন নতুন মানচিত্রাদি দেখাতে চীনরাষ্ট্র রাজী হলেন না। ইতিমধ্যে পণ্ডিত নেহরু নেপাল ও ভূটান নিজে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও সিকিম রাষ্ট্রকে (কাম্পৌয়ের মত) অর্ধস্বাধা্য করেছেন। অথচ ১৯৫৪ সনের সর্ব্ব অমুসারে চীনের সঙ্গে প্রায় সমস্ত হিমালয়ের রাষ্ট্র:গাষ্ঠী—বখা নেপাল, সিকিম, ভূটান ও উত্তর-ব্রহ্ম সীমান্ত এখনও অনির্দিষ্ট। ১৯৫৮ সনের নবেম্বর মাসে চীন প্রকাশ্যে ভারতকে আহ্বান করে—চুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা—প্রতিবেশী দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে—সুনির্দিষ্ট করে কেলতে। কিন্তু ডিলেখবে নয়াদিল্লী থেকে জানান হয় যে, আমদের সীমান্ত (ম্যাকমোহন লাইন) জানাই আছে এবং সেটা নতুন করে বিচার্য্যবীন নয় (will not be subject to negotiation).

হলাইলামার হেহরকী ৭ ফুট লম্বা তিরুতা Khamba। ঝাঝা-জাতি প্রবল লড়িয়ে জাতি এবং ১৯৫৫ সন থেকে পিকিঙের কর্তারা ঝাঝাদের পশ্চিমে কোণঠাসা করে তাহের অঞ্চলে চীনারাষ্ট্র বহু চীন যুবক Pioneerদের উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগেন। ১৯৫৮ সনের জুলাই মাসে নেপালী পত্রিকা “কল্পনা”র প্রকাশ পায় যে, অনেক ঝাঝারা তিরুত ছেড়ে নেপালে প্রবেশ

করছে—১০০ মাইল রাজ্য পাব হয়ে। এদেরই জাতিরা হচ্ছে এতাদেরই বিজয়ী ডেমজিংয়ের সমগোত্রিয়।

১৯৫৯ মার্চ মাসেই আমরা ধবর পাই যে, পূর্ব তিরুতে খাম এলাকার চীনাহের বিরুদ্ধে বিজ্রোহের আশুন অলোছে, তখন হলাইলামা ২৪ বছর পূর্ণ করেছেন ও সপরিবারে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ক্রমশঃ লাসা থেকে অতি গোপনীয় গিরিসঙ্কট ও গ্রাম এবং জগুপথ বেয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমনি অবস্থায় আর এক হলাইলামা পূর্বে ভারতেই আশ্রয় নেন এবং তাঁর প্রতাপক লামা চীনে আশ্রয় নিয়েছিলেন—যেমন পাঞ্জনলামা আজও নিয়ে আছেন। কত ধনবস্ত্র নিয়ে তাঁরা তিরুত ত্যাগ করেছেন সেটা আমাদের অজ্ঞাত। শুধু এইটুকু স্পষ্ট যে, আশ্রয় হিলেও, পণ্ডিত নেহরু হলাইলামার হলকে প্রবাসী-রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্য্যাদা দেন নি এবং জাতিসঙ্ঘের সামনে তাঁর জবানী শোনাতে ভারতীয় কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করে নি। এর পরিণাম কোথায় কেউ বলতে পারে না—হয় ত ইউ-এন-ও বৈঠকে এ মাসে কিছু স্পষ্ট হবে। শুধু এই আমরা জানি, চীনা কুনলুন পর্ব্বতের নীচে ও হিমালয়ের উত্তরে প্রায় ৪,৭০,০০০ বর্গমাইল বিশাল তিরুত দেশ স্বাভাব্য হারিয়ে চীনের কবলে চলে গেল। চীনাহেরই ১৯৫৩ (৩০শে জুন) সেনসস অনুসারে প্রায় ৬০,০০,০০০ লক্ষ তিরুতীয় জীবনমরণ সংগ্রাম যেন এক নতুন ও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। এই বিপ্লব থেকে এশিয়ার তম্পা সাম্রাজ্য যুদ্ধের আশুন না লাগে—এই প্রার্থনাই প্রত্যেক শান্তিপ্রেম জাতির প্রাণে লাগছে।

## উপনিষদ মাল।

### শ্রীপুঙ্গ দেবা

সায়মাঝা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা স্রুতেন।  
যমেইব বৃগুতে তেন লভ্য স্তুতৈব আত্ম। বিরূতে তম্বং স্বাং।  
কথায় শোনার তাঁরে নাহি পাই মেধা মানে দেখা হার  
হরা করে যদি নিকটে সে এসে নিজে খুলে দেয় দার  
আপনি বরণ করি যাবে লন  
বরুপে লভিয়া যন্ত সে জন  
অন্তরে লভি কামনার বন সেই ত তাঁহাবে পায়  
তাঁহাবে পাইব এমন সাধনা কি আছে মোদের হায় ?

(কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বকী ২৩ শ্লোক)

না বিরতো হৃদয়িতান্নাশান্তো নসমাহিতঃ  
না শান্ত মানসো বাহপি প্রজ্ঞানে নৈমাশ্রুয়াং ॥  
লোভ ক্রোধ মোহ ভোগ স্রুখে রত মন যাব অনুকণ  
পায় না সেজন লভিতে তাঁহাবে সেই জন অভুলন  
শুধু জ্ঞান দিয়ে পাওয়া নাহি যায়  
বিজ্ঞা বৃদ্ধি বিফল সেধায়  
নিবমল আর পুত পবিত্র কামনা হীন যে জন  
তাঁহাব দ্বয়ে নিজ কুপা বলে আবির্ভূত যে হন।

(কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বকী ২৪ শ্লোক)



পাঁচ ক্রোশ পথ এমন কিছু দূর নয়—পায়ের-ঠাটা মাহুষের পক্ষে এ পাড়া ও পাড়া। মাঝখানে নদী থাকলেও বা কথা ছিল। নদী ত নয়ই—তেমন নামকরা খালবিলও নয়—অকুল সমুদ্র রচনা করেছে শুধু ধানক্ষেত। ক্রোশের পর ক্রোশ—আদি-অন্তহীন ক্ষেত—বর্ষার জল পেয়ে শ্রামল হতে হতে শরতে হিল্লোলময় শব্দহীন সমুদ্র হয়ে ওঠে। হেমন্তে সে সমুদ্র সোনা বৎ ধরে আর হয়ে-পড়া শস্যমঞ্জীর বাতাসের কোল খেয়ে তোলে মুহু আশুগন্ধ—যা নাকি লক্ষ্মীর চরণ-নৃপুণের ঝঙ্কার বলে পরম শ্রদ্ধায় ও আনন্দে কান পেতে শোনে চাষাভাইয়েরা। শীতের মাঠে সবুজত্ব থাকে না—সোনালী রঙের চিত্র হরণ করে না, কিন্তু মাঠের এখানে-ওখানে পোয়াল কেওলা বিচালীর বাশি ও চূড়াবৃত্তি ধানের ভূপ মনকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুখমায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কত সীধ—কত আনন্দ, ছোটখাটো কত না ছবির ভাঙ-গড়া। পুরাতন চালে নূতন খড়ের ছাউনি, ছেলে বলদ কিংবা গুরুবতী গাড়ী কেনা, নবায়, বাবোয়ালি পূজা গাছনপর্ক, ছেলেমেয়েদের বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন, রূপার শৈলী খাড়ু, খেজুরছড়ি খাড়ী, জোতজাকাল—কত না ছবি—অকুণ্ডল এদের মিছিল। নতুন ধানের সঙ্গে এরাও নূতন হয়ে, বিচিত্র হয়ে আসে প্রতিবারই।

শিবুর জীবনেও এরা এসেছে বহুবার। সব বায়েই যে সব সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে তা নয়, নিরাশার অগ্নি-উত্তাপও নইতে হয়েছে কতবার। মনে মনে তখন হয় ত প্রতিজ্ঞা করেছে—বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা আর করবে না—

ধারকর্জ মচাপাপ। কিন্তু ধান পাকলে জমি যেমন স্বর্ণ-ভূষণা সীমন্তিনীর গোবৎ লাভ করে—তার ছোঁয়া লেগে মনেতেও তখন নানা রঙের আলপনা আঁকা শুরু হয়। মনে হয়—এটা চাই—ওটা চাই। এমনি এক লক্ষল দিনে মজলার বিয়েটা হাতে পেরেছে শিবু। একটু উঁচু ঘরে—শহরই সেবেছে শুভকাষাটি। একটু দূরও বা সে গ্রাম।

শিবু ভাবে কি এমন দূর—পাঁচ ক্রোশই ত। নদী বা খাল পেরুতে হয় না—দ্বিগন্তজোড়া মাঠের আল ধরে চলে গেছে সেই পথ। অনেকখানি গিয়ে বাঁক নিয়েছে একটা বাঁধের গোড়ায়। সে ছাড়িয়ে আরও ক্রোশ খানেক গেলে তবে সে গ্রাম। বেশ বড় গ্রাম—গণ্ডগ্রামই। গ্রামের মধ্যে মাঠ নেই, চালাঘর কম, কাছার জলে মাখামাখি নয় রাস্তা-ঘাট। ধান-চাল বেচতে গিয়ে যেমন অমজমাট লাগে গরুর, তেমন মাহুষজন, কোঠাবাড়ী, হোকানপসারে গিজগিজ করে না জারগাটা—তবু সেটা উল্লাস উল্লাস মাঠের মাঝখানে রাস্তাচিহ্নে, লাল ভেরেণ্ডার বেড়া ফেরা ধানকরেক চালাঘরের গ্রামও নয়। এখানে জরাজীর্ণ কোঠাবদই বেশী—সবই প্রায় পঁচিলঘেরা। আম-জামের গাছে—অন্ধকার ছায়া ছায়া উঠোন; কোন ঘরের কেওলালে চুণবালির গলজারা নাই—কোনটা বা বর্ষার জলে কালো হয়ে গেছে। ইটের ইয়ারং; শ্রী নাই সৌন্দর্য নাই, মাঠ আছে গ্রামের শেষে। সে মাঠে মা লক্ষ্মী প্রতিবারই আসেন না। বেবার আসেন—সেবার পোষানে চেপে গ্রামের মধ্যে ঢোকেন না—জল ধান দূর শহরে—বেখানে ধানের কল আছে। সেই গ্রামাণ্ডে

তীব্র অকর্ষণীয় কাণ্ডটি সম্পূর্ণ হলে সেই পোষানে চেপেই তিনি গভীরে গিয়ে ওঠেন। তার পর বেল-দীয়ার-মৌকার চেপে কোথায় যে ছোটেন কেউ জানে না, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে কিয়ে আসেন সিন্দুকে। খাওয়া-পরা, সাধ-আজ্ঞা, দার-অদার সব কিছুই মেটে তীব্র হোলতে, তাঁকে হুঁচোখ ভরে দেখাব সাধ শুধু মেটে না।

মজলার চোখে এই মুষ্টিটা ভারি জাড়া জাড়া ঠেকে। সবই আছে—তবু কখন ফাঁকা ফাঁকা।

একদিন শুধিরেছিল স্বামী বজ্রচরণকে, ইয়া গা, একটা ধানের মতাই নেই বাড়ীতে, চেনাকেল নেই—ধান তানা কোটা হয় কমনে? কমনেই বা ক্ষুদ্রত কর?

বজ্রচরণ বলেছিল, ভগবৎ হাওয়ায় কি দরকার! আমা-দেয় এখানে নগদানগরি কারবার। গ্রামে বড় বড় দোকান আছে বখনই ইচ্ছে—তা কিবা দিন কিবা রাত্তির, পরশা কেললেই মাল।

মজলা অবাক হয়ে বলেছিল, রাত্তিরপুয়ে ধর যদি আস্ত কুটুম কেউ এল—

হেসে কেলচে বজ্রচরণ ময়রা দোকান আছে—মুড়ি-মুড়কি, গজা, পকান—এতেই দিব্যি চলে যায়।

বিশ্বর কাটেনি মজলার—অবাক হয়ে তাবে—এই উঠনে! জিনিসপত্রের কি করে যে কি হয়—

বাগ আসে মাঝে মাঝে—মেয়ের তন্তুতল্লাস করতে। কখনও ধামায় করে কিছু লাল আর মোটা আউস চাল; কখনও কেতের আলু, কুমড়া খিঙে, ধুঁধুল। কখনও বা গামছার বেধে পৌষপার্বণের আসুক-পিঠে হাতে কুলিয়ে কিংবা রথের মেলার কেনা প্রকাণ্ড একটা কাঠাল কাঁধের উপর কলে।

মজলা জিনিস বেধে আজ্ঞাধরে ডগমগ হয়ে বলে, আঃ! কতকাল যে লাল চালের ভাত খাইনি, কি সোন্দর কাঠাল! কুমড়া-আলু বুঝি ভুঁইয়ের? নাবি কসল দেখছি। কতটা জমিতে এবার নাজল দিয়েছ বাবা?

সে অনেক—অনেক—। তার গল্প কি সহজে কুরোতে চায়। একজন বাছর হয়ে ওঠে—অজ্ঞান শ্রবণময় হয়ে সেই সুখ পান করে। চৈত্রেয় রেলার যে মাথার উপরে প্রথর হয়ে ওঠে সে বোধ কাবও থাকে না।

ও ধর থেকে শাওড়ী হাঁকেন, বউমা—শোন ইদিকে। মাছুষটা হাল্লাস হয়ে এল—হাতপা ধোবার জল জাও—হ'ল বা পাখা দিয়ে ধানিকটা বাতাস কর, কুটুমকে জল খাওয়াও—তোমার গল্প শুনলেই কি ওনার পেট ভরবে! চোপবদিন হয়েছে—বলে বলে গল্প করো'ধন।

অপ্রতিভ হয়ে বলে মজলা, আ! আমার কপাল—যেহেবে চড়চড় করে উঠল! হাতবুখ খোঙলে বাবা।

শিব বলে, বোস না বে—এত তাড়া কেন? বেয়াল বুঝি জলযোগ করিয়েই বাম্বতোন ভোজনের কল-পিত্তেশী? নিজের বসিকতার উচ্ছাস্ত করে ওঠে শিব।

আড়াল থেকে জবাব আসে, বাম্বতোন ভোজনে অপবন ছাড়া সুখ ত নেই। বেয়াইকে বল বউমা, ছুচি-মেঙা-মেঠাই-মেঙরা কোথায় পাব—বা কবন শাকজর। কাঙালের বাড়ী এসব পাতে দিয়ে কে আর নিশ্চিন্ত থাকে। বেয়াই! বলি নুজাটের নেখন ত ওগাবার নয়।

বাবা বতকণ থাকে এমনি হাঙ্গপরিহাসে সময়টা কাটে ভাল। চলে গেলেই বজ্র ফাঁকা ফাঁক ঠেকে। হাজারটা জিনিস দিয়েও সে ফাঁক ভরানো যায় না।

মোটা মোটা কাটা লাল চাল শুধু আহাৰ্য্যে স্বাদ আনে না—অতি-পরিচিত পুরাতন মাটির স্পর্শটুকু ধরে দেয়। খিঙে ধুঁধুলের সঙ্গে আসে গাব ভেবেও-মাংসচত-যেহা একটা ককককে তকতকে নিকানো উঠান—যাব একধারে হাওয়া-সমেত হুঁধানা খড়ের চালের ধর আর একধারে পাট-কাপাটির বেড়া দেওয়া বাগানবর আর গোয়ালঘর পাশাপাশি। গোয়ালের কোলে কালিমত একটু জায়গা—তার ওপাশে চৌকিশালা। ছোটবড় সব চালেতেই চাল-কুমড়োর খোপ। কান্তিকের হিমেল হাওয়ার কুমড়া পাতা কাঁপে মেয়ে আশুকনো হয়ে আসে—আর কুমড়াগুলিতে কে যেন খড়ি মাথিয়ে বোঝ পোয়াতে শুইয়ে রাখে চালের সন্ধ্যায়। পশ্চিমে ঝাঁকড়া ডালিমগাছের লাল টুকটুক কলগুলি অন্ন হাওয়ার হোল খেতে থাকে—যেন অবুঝ খোকার সামনে লাল কুমকুমি নেড়ে সোহাগ জানায় তার মা, আর সঙ্গে সঙ্গে গোয়াল থেকে বাড়া গাইটা ডাকে, হাম্—মা। নতুন বাছুর হলে গাই-হোরানোর সময় সুবভিতা এমনি করে ডাকে নন্দিনীদেব—কি প্রাণজুড়ানো মিষ্টি ডাক।

বাছুরও জবাব দেয়, মাগো—মা!

ওরে মুণ্ডলি, কঁড়ে নিয়ে ঝট করে আর ত। যে হামাল বাছুর—না ধরলে একার সাধ্যি কি ছব-হোয়াই।

বাই মা। ধড়মড় করে উঠে পড়ে মজলা।

যেমন ওঠা অমনি স্বপ্নের ছায়া কোথায় মিলিয়ে যায়।

শাওড়ী ডাকছেন, গোয়াল! এসেছে ছব দিতে—ঘটটা নিয়ে ছবটুকু নাও গে ত বউমা—আমার আবার হাত ভোড়া!

মনটা ছ ছ করে ওঠে। এই কালগাই বুঝি কষ্টিন হয়ে বুকে চেপে বইল—আর একটা কাল কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে। বাবা এমন কাজ কেন করলেন! অজ

চাষাগায়ের, মেয়ে কেন শহরে এল। তারের ঘরে এ বকম কাজ ক'টাই বা হয়েছে!

পোড়া অদৃষ্টের বোণাবোণটা কেনন করেই বটেছিল যেন।

হেঙ্গারীর মাঠে এক লগ্নে এক পাচ বিঘে জমি, পাশেই একটা কালিমত বাওড়—বর্ষায় যে জলটুকু জমিয়ে রাখে—বর্ষাশেষে সেটুকু ছেঁচে-কুটে নিতে পারলে আশপাশের জমি-গুলি হয় সবু। আখিন-কাভিকের আকাশ রূপণ হলেও জমির মালিকের মুখ শুকোর না। দেবতা যদি বর্ষণ কর ভাল, না হাও পান্দ্রম বাড়বে, ফসলের শেড চলবে ঠিকই। সেই সোনা-ফলানো জমি কিনতে একদিন যজ্ঞীচরণ এসেছিল এই গ্রামে।

পাশেই শিবুর জমি—যা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ তার শব্দেই সুরু। জমির বৃত্তান্ত জানতে জানতে আকাশ আর মাটি তেতে উঠল। যজ্ঞীচরণ বললে, দেখ কাণ্ড, ভাবলাম আজ মেঘ মেঘ আছে, জমিটা দেখেই আসি—তা স্মৃতির বোধের দাপটা একবার দেখেন। মেঘভাঙ্গা বোধ কিনা, বোক কত!

তা নাই বা গেলে এবেল—গরামেই ত এসেছ, মাঠের মাধ্যমানে ত বাস বাঁধ নি। চান-আহার করে খানিকটা নিজে দিয়ে বোধ পড়লে বাড়ী বাবা না হয়। শিবু হেসে বলল।

তা কি করে হয়—মাথা চুলকোতে লাগল যজ্ঞীচরণ।

কেনে হয় না—আলবৎ হয়। কণ্ঠে জোর দিয়ে বলল শিবু। ভরজুকের আহার করে না গেলে গেরামের অকল্যাণ হয় না? ভালা বুদ্ধি ত দেখছি। বলি ক'বিঘে তুই চব? ক'খানা নাঙ্গল? ক'জোড়া হেলে গরু? শেষায় বেন থক দিয়ে উঠল শিবু। তার মধ্যে অবশ্য উজাপ কম—স্নেহের ছায়াটুকুই বুকের তল্যর এশে জমে।

লাঙ্গল-গরু? হো হো করে হেসে উঠল যজ্ঞীচরণ। বলে, মোটে মা বাঁধে না তপ্ত আর পাক্তা! তা ছাড়বেন না বখন চলেন আপনার আশ্রয়েই অন্ততঃ আহার করিগে। পড়ন্ত বেলার যাত্রা করব—আজ ওখানে একটা মিটিন আছে কিনা।

মিটিন? কিলের মিটিন? শিবু শুধোর।

এই আমাদের জমিরেরতের বা আর, ধরেন খেটেখুটে চাষাবাস করলেও ত পেটে ভাত আর পরনে ট্যানা জোটে না—সব হই ত নেপোর মাঝে—এই সব কথা শহর থেকে এসে ওনারা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে ভায়। বলে, বার লাঙ্গল

তার জমি। কেউ ট্যানের ওপর ট্যান তুলে নবায়ী করবে—কেউ না খেয়ে শুকিয়ে মরবে—এ পৃথিবীতে তা নাকি আর চলচে না। কোথার কোন্ দেশে নাকি আইন হয়েছে—বার লাঙ্গল তার জমি। বোঝেন টালা। এ বেন পাড়ীর ওপর নাও—কখনো-বা নাওয়ের ওপর পাড়ী।

এমনি করে আলাপ জমিয়ে ওরা ঘরে ফিরল।

মঙ্গলা তখন পেতে নিয়ে লাল নটেব ক্ষেতে উবু হয়ে বসে নটেলাক তুলছিল। নতুন মানুষটাকে নিয়ে আগড় ঠেলে হাসতে হাসতে বাবা চুকল বাড়ীতে। লোকটাও হাসছিল। হাসির আগুয়াজটা নতুন, ধরনটা ভারি মিষ্ট। হাত নেড়ে আর বাড় হুলিয়ে সেই হাসি আঁজও চোখ বুজে দেখতে পায় মঙ্গলা।

মুঙলি বে, ভাল করে শাপ ভোল ঝিঙে-উজ্জ্ব বা আছে উটকে-পাটকে আন—অতিথ এনেছি।

অতিথ মঙ্গলার পানে চেয়ে হেসেছিল। বলেছিল, আপনার কস্তে বুঝি মোড়লমশায়?

শিবু ত মহা খুশী। মোড়ল না হলেও ও যেভাবে তাকে মাস্ত করল...ওর মত ভাল লোক পৃথিবীতে আছে নাকি! বাড় নেড়ে হাসিমুখে বলল, হাঁ, কস্তেই বটে—আমার মাজননো। কি বুদ্ধি? আর উপ (রূপ)? দেখছ ত, হস্তেলের মত অং—যেন হুগগো পিতিমে।

চাষার ঘরে বংটা উজ্জ্বলই। গৌরী না হোক—উজ্জ্বল গ্রামবর্গের মেয়ে। মুখে-চোখে লাভণ্য আছে। বেশবাস বা অঙ্গরাগে সে লাভণ্য কিছু অগোছালো হলেও গ্রামের মানুষের চোখে ত্রুটিহীন। প্রশ্নদৃষ্টিতে আরও বারকয়েক ওর দিকে চেয়েছিল যজ্ঞীচরণ। মঙ্গলার দৃষ্টি তখন লাল নটে ক্ষেতের মধ্যে সঁধিয়েছে। ওই নটেলাকেরই রঙ ঘরেছে মুখ-খানিতে।

তার পর জমি দেখার উপলক্ষ্যে আরও হ'বার এসেছিল ও। হ'বারই হুপুয়ের বোধ চড়া হয়েছিল, শিবু টেনে এনেছিল ওর বাড়ীতে, আর এই সুযোগে ধীরে ধীরে কোন্ অদৃষ্ট সূতোর রঙের মাজা দিয়ে খবদার করে তুলেছিলেন সেই অচেনা বিধাতা, ধীর রূপায়—কত না অর্থন বটে এ পৃথিবীতে।

তার পরে? তার পরেও একটু ছিল। আনন্দ আর বেদনা মেশানো ছোট্ট একটু ঘটনা—যা ব শব্দে প্রথম পরিচয় ঘটল নতুন দেশে পা বাড়ার কণটিতে।

মাগের আঁচলে মুখ লুকিয়ে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল মঙ্গলা। তেরো বছরের মেয়ে, জান হয়ে পর্যন্ত এই ঘাটি আর এই আকাশের কোলে মাস্তব। সবকের সমস্ত ছিল

তার চারদিকে—আজ বুঝি সেই সমুদ্র পার হবার আরোজন।

গল্পর গাড়ীতে চেপে চোখের জল মুছতে মুছতে চলেছে। হু'পাশে অক্লান্ত মাঠ। বৈশাখে অখণ্ড আর জীলগাছে চিকন চিকন নবম পাতা হাওয়ায় কাঁপছে—চবা ভূঁইয়ে পড়েছে কঠিন বোধ। মাঠের এখানে-ওখানে আধগুকনো উচ্ছেলতার ঝোপ—বেগুনের মরাগাছ। শুধু কুমড়ো আর কাঁকড়ের লতা ফুল-ফলে ভূঁইয়ের রূপকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। হু'পাশের আলগুলো রোগজীর্ণ মানুষের পাঁজরের মোটা মোটা হাড়ের মত ঠেলে উঠছে ভূমিমাতার দেহ থেকে। কৃষ্ণ জমি—তবু এর কত শোভা—কি স্নেহ! মাঠের পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখের জল শুকোর নি মজলার।

তার পর গ্রাম। এমন চেহারাও হয় গ্রামের। গাছ-পাছালি আছে—ঝোপঝাড় আছে—আছে পাঁচিলঘেরা বাড়ীঘর। কেমন যেন টুকরো টুকরো বেরূপ চেহারা! চোখের সামনে কতটুকু বা জমি—মাথার উপরে আকাশই বা কতটুকু। গ্রামের কোলে বিল-বাঁওর নেই—যার এক দিকে গড়ানে ঢালু জমি আর একদিকে মাঠের আঁচল বিছানো। সেই তিরতিরে জলে পল্লপাতা, শালুক-সাপলারা চকচকিয়ে ওঠে, শ্রাওলার আঁশটে মিষ্টিগন্ধ ভেসে বেড়ায় আর পায়ে তলায় তকতকে বালির মেঝে। আশ্চর্য্য জল! জলে ডুব দিয়ে চোখ চাইলে প্রায় স্পষ্ট দেখা যায় সব—নিজের দেহটা, মুখের সামনে হাত নাড়লে ক'টা আঙুল রয়েছে তাও। আর এখানে কত পথ ঘুরে যাও এঁধো পুকুরে, শ্রাওলা-পিছল ভাঙা খানায় নামো পা টিপে টিপে—আর জলের বর্ণ যে এমন হয়—এই প্রথম দেখলে মজল।

নেয়ে ঘুরে সর্বাঙ্গে ভিজে কাপড় জড়িয়ে এক গলা ঘোমটা টেনে নননের পাছু পাছু বাড়ী ফিরে আসা—যেন জেলখানার কয়েদীকে কোট থেকে জেলে ফিরিয়ে আনা হ'ল। অনেক দিন আগেকার কথা—শহরে একবার যায় হোলের মেলা দেখতে গিয়ে বাবা জেলখানার উঁচু পাঁচিল-ওরালা বাড়ীটা দেখিয়েছিল। হুপুবে কোর্টের ধার দিয়ে বেতে বেতে দেখেছিল কয়েদীভক্তি জেলের গাড়ী। গাড়ীর জালতির কাঁকে অনেক হাত আর চোখ—অবাক হয়ে জাকিয়ে-থাকা চোখ।

বাবা বলেছিল, এনারা জেলখানার লোক। কোর্টে যাওয়ায় বিতে বাছে থাকিমের কাছে—কোর্ট হয়ে গেলে

অবশ্য ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এসেছিল—এখানে এসে লেটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এ বাড়ীতেও পাঁচিল—ওপিঠে কিছু দেখা যায় না।

এটা করতে নেই, অমন করে জোরে জোরে হেসো না, শব্দ করে চলো না, উঁচু হয়ে বসো না। মাথার কাপড়টা তুলে দাও, ভান্নরের সঙ্গে কথা কয়ো না, গুরুজনের সামনে হাসতে নেই, কাপতে নেই, ছুটেতে নেই—পরাসে পরাসে ভাত তুলতে নেই মুখে...পাঁচিল ক্রমশঃই উঁচু হয়ে ওঠে। মজল ছটফট করে। হুপুবে আধো-অন্ধকার ধরে মানুষ পেতে, সবাই বখন বিশ্রাম কবে—ওর চোখ তখন শাসনের জালার জলেপুড়ে যায়। 'ভাবে—এত শান্তিও লেখা ছিল কপালে।

শান্তি অবশ্য সবটাই নয়। বাড়িতে পাঁচিল মুছে যায়—অন্ধকারে দিকপ্রান্তর এক হয়। বগীচরণের কোলের কাছে নিবিড় হবামাত্র বেহনা-আলা নিমেষে জুড়িয়ে যায়। ফিসফিস করে গল্প করে বগীচরণ—হু'চোখের পাতা এক না করে সেই গল্প শোনে মজল।

কিন্তু সে কতটুকু ব! ভোরে কাক-কোকিল ডাকতে না ডাকতে চগীচরণ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। বলে, এই বেলা না বেরুলে গজের হাটে পৌঁছতে পারব না। প্রথম মণ্ডকার মাল কিনতে না পারলে অনেক ভোগাভি, অনেক লোকসান।

জমি এতদেব বংশামাত্রই আছে—ধানের গোলা নেই একটিও। জমির ফসল গোলায় ওঠে—না—হাটেবাজারে ব্যাপারী মহাজনের হাত কেবাকিরি হয়ে ওঠে গল্পর গাড়ীতে, নৌকায়, সম্রাতি লরীর চলন হয়েছে। এরা এক পা খুলো আর ট্যাকভন্টি টাকা নিয়ে হাসিমুখে ফেরে বাড়ী। কোন কোন বার সন্তানামের চুলের কিত্তে, কাঁটা, গিন্টির গহনা, থামা-কুলো-বীট বা কলাই-এলুমিনিয়ামের বাসন নিয়ে বাড়ী ফেরে। সেইগুলি নিয়ে এ বাড়ীর মানুষদের কি আনন্দ, কিস্তি কলকল, গলগল কথা!

আনন্দের প্রকাশ বাপের বাড়ীতেও দেখেছে মজল। অগ্রহারণে সে উৎসব সূত্র হয় নতুন চালের নবায় দিয়ে—শেব পৌষ সংক্রান্তি আর উত্তরপনিত (উত্তরারণ)। তখন চাল কোটার ধুম—সারাবাত হমাধম পাড় পড়ে ত্রেকিতে। নতুন খেজুর শুড় আসে থল থেকে, নৌকা-বোবাই নারকোল আসে পুথ থেকে। কেতের ভিল অকল্য তখনই কাড়া হয় না—কলসীর মধ্যে জাকড়ার পুঁচিল-বাঁধা পেল বারের পুরনো ভিল বার কবেম না। সন্ধ্যা থেকে স্বাস্ত হুপুৰ পড়তে পড়তে

বউমা—কাপড়গুলো কারে সেধ করা আছে একটু  
আছড়ে কেচো ত।

কোথার কাচবে এগুলো? একটিও বিল-বাঁওড় নেই  
যে, তার অটল জলের কিনারায় পাঠা পেতে আছাড় মারবে  
কাপড়ে। এখানে তোলা জলে কোনরকমে কাবটা বার  
করে দেওয়া চলে, কাপড়গুলো তেমন করে জলে ডুবিয়ে  
হু'হাতে রগড়ে রগড়ে জলের উপরেই লম্বা করে ছড়িয়ে  
দেওয়ার সুযোগ কই। এরা তা বুঝবে না—শুধু বলবে,  
বোয়ের হাত্তেবুঝি জোর নেই? এমন করে খণ্ডবাক্যের  
অপবন করতে হয়? কারের জলটাও ভাল করে তুলতে  
শেখনি?

কাজ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা—খাওয়া নিয়েও তাই। ওমা,  
এত ভরকারি পড়ে বইল, তাত সব উঠে গেল? পাঁচখানা  
ব্যঞ্জন তবে বাঁধলাম কার জন্তে গো?

কিন্তু পাঁচখানা ব্যঞ্জন বাঁধবার ঘরকারই বা কি?  
কলারের ডাল, আলু ভাতে—এই ত যথেষ্ট। তার উপর  
একটু বহি মাছের টক হ'ল ত কোথায় লাগে নিমন্ত্রণ-বাড়ী।  
এই সামান্য উপকরণেই এক খোয়া ভাত উঠে যায়—এত  
ভরকারি পাতে দেওয়াই বা কেন?

যজ্ঞচরণ মাঝে মাঝে বলে, ভরকারিই বহি না খেলে ত  
খাওয়ার ভোগ কি। আমরা মাছের ডালনা কি কাল ভাল-  
বাসি, তোমাদের টক না হলে চলে না।

মজলা বলে, টক খেলে জিহ্বার সোয়াধ খোলে—চাচ্ছি  
বেশী ভাত ওঠে।

যজ্ঞচরণ হো হো করে হেসে ওঠে।

একথা-সেকথার পর কোনদিন বা আসল কথা তোলে  
মজলা, তা আমাকে কবে পাঠাচ্ছ বাগের বাড়ীতে?

কেন—কেন, মন কেমন করছে বুঝি মায়ের জন্তে?

আহা—কি বুঝি কেমন করতে নেই। তা বাই বল,  
এবার গেলে আর শীগগির আসিচি নে।

যজ্ঞচরণ ওকে হু'হাত দিয়ে কাছে টানতে টানতে বলে,  
ধাক্কা দাও পারবে?

যজ্ঞচরণের মুখে মুখ ভাঁজে স্পষ্ট জবাব দেয়

দুর্জি? জোর করে ওর মুখখানা তুলে ধরবার  
করতে যজ্ঞচরণ বলে, উঃ! কি পাথর প্রাণ

হঠাৎ বাহুবল্লভ শিথিল হ'ল—যজ্ঞচরণের রক্ত হবে  
চমকে উঠল মজলা। কি—কি বললি? আমরা পাষণ্ড?  
নিদ্র?!

কথাটা রহস্যহলেই বলেছিল মজলা। সে যে যজ্ঞচরণকে  
এমন ভাবে অপ্রভাব করবে ভাবতেই পারেনি। কিন্তু কথায়  
বলে, হাতের টিল আর মুখের কথা—বার হলে কিরিয়ে  
আনা কঠিনই। তবু চেষ্টা করল কিরিয়ে আনতে। মজলা  
নয়ম গলায় বলল, তা এত রাগ কেনে? কথার পুঠে কথা  
বললেই মানুষ তাই হয়ে যায়?

যায়। ধমধমে গলায় বলল যজ্ঞচরণ। একদিন-আধ-  
দিন নয় বছর-বছর শুনলাম ওকথা। আমি জানি, আমাদের  
কাউকে ভোর ভাল লাগে না। আমাদের কথা ভাল  
নয়, রীতি-ব্যভার ভাল নয়। আমাদের জমি-জিরে নেই,  
খালবিল নেই।...

মজলা ত অবাক! এসবের অভাববোধ মনকে পীড়া  
দেয় বটে, তবু সে অভাব ত সর্বক্ষণ মনে লেগে থাকে না।  
আজন্মের অভ্যাগ—ছাড়া কঠিন; তা নিয়ে গুঁতগুঁতুনি  
মানুষের স্বভাব। অভিযোগ হয় ত ওঠে তার থেকেই,  
কিন্তু সেইটাই ত সত্য নয়। দিনের খানিকটা সময় ওগুলো  
মনকে অশান্ত করে পরকণ্ঠেই এখানকার আদরবয়ের  
প্রলেপও ত পড়ে কতমুখে। রাজ্রিতে যজ্ঞচরণের নিবিড়  
সঙ্গলাভ করে সে বেধনা নিঃশেষেই মুছে যায়। অন্ধকারে  
এ বাড়ীর পাঁচিল থাকে না, বিধিনিষেধ মাথা তোলে না,  
এই ঘরের নুতন রীতি নুতন ব্যবস্থা অপব ঘরের বলে বোধ  
হয় না। এদের সঙ্গে নিজের যোগসূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।  
একদিন এই সংসার তার নিজের খুশীমত...কিন্তু যখন তেহ-  
রেখা এমনি করে মুছে যায়—তখন সেই মারাবী রাজ্রি-  
কালেই ঝড় উঠল কেন এমন করে?

এক নাগাড়ে বলেই চলেছে যজ্ঞচরণ। বলতে বলতে  
চড়ে উঠেছে গলায় স্বর। বাস্পাচ্ছন্ন মনের ঘন ধোঁয়া তেজ  
করে আঙনের শিখা যেন হপহপ করে জলে উঠেছে।  
উত্তেজনার বিছানায় উঠে বসেছে যজ্ঞচরণ। বলছে গলা  
চড়িয়ে, মহা অজ্ঞার করেছি তোকে চাবী-গাঁ থেকে এনে।  
তোদের উদ্যম মাঠই ভাল—পাঁচিলের আবরক গছ হবে  
কেন! মোটা চালের ভাতে বাঁধের রুচি তাঁদের মুখে সস্ত  
চাল রোচে কখনও? খড়ের চালে বিস্তির জল চুঁইয়ে হেঁকা  
কাঁধা বিছিয়ে দেয়—বাইবেই আদাম করে ঘুম মাদিল—  
তোদের কোটাঘরে ভক্তাপোশে ভাল শয্যের ঘুম হবে কেন?  
ইলুত কি ঘুমে যায়?



জনতে জনতে মজলার হুঁচোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়তে লাগল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল ও।

ওর কান্নার শব্দে বঞ্জীচরণের হাঁস হ'ল। হঠাৎ ক্রোধের মাত্রা নেমে যেতেই নিজে কেমন অসহায় বোধ হ'ল। ব্যাপারটা ষটেছিল মুহূর্তে। আদর-সোহাগের পথ ধরে এলেছিল অভিমান—তারই পিছনে ঝাঁড়িয়েছিল এক চণ্ডাল। সেই চণ্ডালের কীর্তি দেখে বঞ্জীচরণ মর্ম্মাহত হয়ে খানিক শুদ্ধ হয়ে বইল। তার পর মজলার একখানা হাত টেনে নিয়ে নরম গলায় বলল, অ্যাই ঙ্গাধ—কান্নার কি হ'ল! ক্রোধ না চণ্ডাল! অ্যাই ঙ্গাধ—আবার কাঁদে।

বাও। এক ঝটকায় বঞ্জীচরণের হাতখানা ঠেলে দিয়ে লম্বার অপরাধান্তে সরে গেল মজলা।

বঞ্জীচরণ এগিয়ে এল সোঁদিকে। আরও নরম গলায় বলল, তুই বললি এক কথা—আমিও বললাম। মাইবি বলছি, তোরা ওপর রাগ করে—

সরো। এক লাকে চোকি থেকে মাটিতে নামল মজলা। বলল, আর সোহাগে কাজ নেই।

স্বল্পবাক মেয়েটির এমন দুর্জয় ক্রোধ প্রত্যাশা করে নি বঞ্জীচরণ। উজ্জাপোশে কাঠ-মেবে বসে বইল সে, মজলার দিকে এগুতে সাহস করল না।

মজলা মেয়ের বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তার পর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল—সকালের আলোর ধর ভরে গেছে, বঞ্জীচরণ ধরে নেই।

বাক্সির ব্যাপারটা যে কারও অজানা নেই—সেটা বাইরে বেরিয়েই টের পেল মজলা।

ছোট ননদ জয়া বলল, কি গো বৌদিদি, কাল রাতে নাকি ঘুমোও নি? চোপবরাত ঝগড়া করেছ দাদার সঙ্গে? কে বলল?

কেন, আমরা কি কানে কালা, না অন্ধ? দাদা মুখ ভার করে বলে গেল, তোদের খাওয়াদাওয়া হলে একখানা গরুর গাড়ী ডাকিয়ে দিল—থনা বেন ওকে কলমিডাকার ঘেঁষে আসে।

এ সংবাদে মনে মনে খুশী হ'ল মজলা। আহা—সুমতি হোক এদের। এই রাগ বেন আরও কিছুক্ষণ থাকে, অন্তত কলমিডাকার না বাওয়া পর্যন্ত।

কথা গারে না মেখে বলল, পুকুরঘাটে যাবে ত ছোট ঠাকুরবাঁধ?

পুকুর। ওবে যাণ রে—তায় চেয়ে জল এনে দেই—এই

ধেমেরই মুখ-হাত ধোও—এড়া কাপড় কাচকোচ। জয়া করকরিয়ে চলে যায় আর কি।

না—বাটে চল। ওর সামনে এসে দাঁড়াল মজলা।

জয়া হেসে ফেলল। বলল, যেতে পারি তোমার সঙ্গে যদি কালকে রাত্তিরে কি কুক্কক্কতর বাধিয়েছিলে সব বল।

কুক্কক্কতর? তোমার দাদাই ত যতনটের গোড়া। আজ ক'বছর কলমিডাকার বাইনি বল ত? যেতে ইচ্ছে করে না?

ওয়া মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। বলল, আহা, কি কষ্ট গো! তা যাবেই ত একদিন—এ মাসে না হয় ও মাসে। জোড়া মাসে যেতে আছে নাকি? মা-ই ত বলছিল কাল—

নুতন আনন্দে মজলার দেহ শিরশির করে উঠল। বলল, লম্বাটি—পুকুরঘাটে চল।

সারাদিন বাইরে বাইরে বইল বঞ্জীচরণ—বাক্সিতেও বাড়ী ফিরল না। মজলা অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিল। সোবার-ধরে হারিকেনটার দম কমিয়ে ভাবছিল, সত্যিই কি রাগ করে চলে গেল ও। কি এমন কথা বলেছিল... আশ্চর্য্য—আজ সকালের শুভ সংবাদ রাতের ক্রোধ-অভিমান ব্যাধার চিরুমাত্রা বাধেনি মনে। এখন কেবল মনে হচ্ছে, ফিরে আসুক বঞ্জীচরণ—হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে শুভ সংবাদটুকুর ভাগ দিয়ে হালকা হোক মজলা। দুঃখটুকু—তার হয়ে ব্যর্থ জন্মায় না মনে, আনন্দও ভাগ করে দিতে না পারলে তারই হয়ে ওঠে।

পরের দিনও ফিরল না বঞ্জীচরণ, তার পরের দিনও না। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে বাধে—না শুধিয়েও স্থির হয়ে পারছে না। একসময় জয়াকে বলল, তোমার দাদার দি আড়েল দেখ, আজ তিনদিন—

জয়া একটু অবাক হ'ল। বলল, সেকি তোমার বটে যায় নি? ও মা—আমার কি হবে? তাই আগেভায়ে ব্যবস্থা করে গেছে তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবার বেন আমরা গরুর গাড়ী ডাকিয়ে এ কাজটা করতে পারতাম না।

মজলা চুপ করে বইল। জয়া আপনমনেই বল-নতুন মুগকলাই উঠেছে—ধান উঠেছে—মাল পত্ত করবে গেছে সেই কোন্ মুগুকে! হুঁচাবদিনের খেয়া শু নর, মা-ভোরই হয় ত...

মাস-ভোরই বাড়ী এল না বঞ্জীচরণ, একদিনের জট





নয়। শাওড়ী প্রতিদিনই গজগজ করেন, এমন ত দেখি নি বাপু কোনকালে। আগে ত হুয়ায় ছুটো দিনও আসত—এখন কি এমন কেনাকাটার খুম যে একটুও ফুরসৎ হয় না। সবই কি অনাছিটি! বউটা আজ বাধে কাল বাপের বাড়ী যাবে—ভেঁজি কি একবার আসা উচিত নয়?

এদিকে মজলারও কম রাগ হয় নি। একে ত খুঁড়-বাড়ীকে ভাল চোখে দেখতে পারে নি কোনদিন, তার উপর যে মানুষটির ভরসায় এখানে থাকা সেও তুচ্ছ একটা কারণে এমন অবুধ হয়ে উঠল। একটুও ভাল লাগছে না এখানে, প্রতিদিন মন যেন বেঁধে ঠেঁঙাচ্ছে মজলাকে। সে স্থির করল—এরা দিন স্থির করবার আগেই কোনমতে বাবাকে একটা খবর পাঠিয়ে ~~কমিডাক্স~~ চলে যাবে। বত নীত্র হয় চলে যাবে। একদিন একটা যুনিথ ছেলেকে চারটে পরস্যা দিয়ে বললে, দেখ, বাবাকে বলবি নীগসির যেন গাড়ী নিয়ে আসে, আমি কমিডাক্স যাব—বুঝলি?

খবর পেয়ে পরের দিনই শিবু এসে পড়ল। একেবারে গাড়ী নিয়েই হাজির।

শাওড়ী সামান্ত আপত্তি তুললেন—মজলা মুখ গৌজ করে যইল। জয়া বলল, মা, কেন ছুই হুজ বাধা দিয়ে—বৌদির গুজকভাড়া পণ—যাবেই।

আনি না বাপু কালের ধারা—যা খুশী করুক গে। বউী এলে কি বলব তাকে।

জয়া বলল, আমাদের আবার কথা—যা বলবার ওরাই কলবে'খন। হালা কি আর না জানে কিছু।

এমনি অপ্রীতিকর পরিবেশকে গ্রাহ্য করল না মজলা। শাওড়ীকে প্রশ্নাম করে গাড়ীতে গিয়ে বলল।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল গাড়ী। সেই নীমারীন

অব্যবহিত মাঠ—মাথার উপরে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে অকুদন্ত আকাশ। মাথের দিনেও কেতের ফসল একেবারে নিঃশেষ হয় নি—ছোলা-মটর-সবধে-তিসির-নীল-হলুদ সবুজ রঙের লম্বা গালিচা বিছানো ছ'ধারে তার মাঝখান দিয়ে ক্যাচ-কোঁচ শব্দে চলেছে গোয়ান। শিবু একটানা বকে চলেছে। কত বছরের জমা করা কত কথা, কত গল্প অনর্গল বলে যাচ্ছে—ভারমহুর গাড়ীর মত সংকিশ্প্ত 'হু'-'হু' দিয়ে যাচ্ছে মজলা। মন তার মাঠেও নাই, আকাশেও নাই—না কমিডাক্স—না খালিসপুরে। সে কোথাও যে উধাও হয়েছে—নাম-না-জানা একটি গঞ্জে—যেখানে চাষী ব্যাপারীর ভিড় ঠেলে ঠেলে একটি মানুষ জুপাকার মুগকলাই ধান চালের কিনারায় কিনারায় সন্ধানী-দৃষ্টি কলে ঘুরছে। হৈ হৈ হট্টপোল হাটের—তার মধ্যেও স্বরটি তার ম্পষ্ট, কি মোড়ল কলকুটো হাচবা না, মহাজনের মত বাঁধি রাখবা বুঝি? বোঝ না ত ঠ্যালা বাজারঘরে বিশ্বাস কি—এই ওঠে, এই নামে। তার পর হো হো কবে প্রাণমাতান হাসি, আনিস বউ, ভয় দেখিয়ে না দিলে মালের দর ত কমবে না দিকি পরস্যা, ছুনিয়ার সবাই সেয়ানা বে—সবাই সেয়ানা, আমরাই বা বোকা!

হাশির রেস অনবরত বেজে চলল কানের কাছে। ছুনিয়ার সবাই সেয়ানা—বোকা শুধু আমরা। অর্থাৎ বয়ীচরণ আর মজলা। হানিঠাটার মাঝখানে বারো শুধু শুধু ঝড় তোলে—শুধু শুধু কথা কাটাকাটি—মান-অভিমান, রাগগোসা করে—শুধু শুধু অশান্তি আর অনাস্থি—তারা বোকা নয় ত কি?

বুকের ভিতরটার মোচড় দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কি যেন বলতে গেল মজলা, বাবা কি মনে করবে ভেবে জোর করবেই সেটা বুকের মধ্যে ঠেলে দিলে। এই চেঁচটার মজলার সারাদেহ ধর ধর করে কেঁপে উঠল—একটা অশ্রুট গোষ্ঠানীর মত শব্দ বার হ'ল।

গাড়োয়ানের পিছনেই বসেছিল শিবু—তার পিছনে মঙ্গলা। সামনের দিকে চেয়ে আপন আনন্দে গল্প করছিল শিবু। অসুট শব্দে পিছন ফিরে চেয়ে বলল, কিবে, কি হ'ল? ঝাঁকুনি লাগল বুঝি? রসিহ ভাই, একটু আঙু আঙু গাড়ী চালাও—এই আলের পথটা ভাবি বিচ্ছিরি।

ততক্ষণে মনঃস্থির করে ফেলেছে মঙ্গলা। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বলল, না বাবা, গাড়ী ঘোরাতে বল, একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

শিবু অবাক হ'ল ওর কথায়। এতখানি পথ এগিয়ে এসে সেই তুচ্ছ জিনিসটার কথা মনে পড়ল যুঙলীর। নাঃ, মেয়ে দেখছি ছেলেমানুষই আছে—মাথায় বাড়লে কি হবে! পিছন ফিরে এসে বলল, কি একটা তুচ্ছ জিনিস—তার জন্তে এতভা পথ উজিয়ে যেতে হবে! যুক্তোবি কাণ্ড! কালই আমি ওনাধের কাছ থেকে চেয়ে আনব'খুন!

না বাবা, গাড়ী ফেরাও। কারা-তেজা করুণ কণ্ঠ মর মঙ্গলার, জিহ্ব ধরলে ওর মায়ের গলার খর যেমন ভারী আর ঝারালো হয় আর ধমধম করে, যুক্তি দিয়ে অনুন্নয় করে কিংবা ধমক দিয়েও সে শুব বহলানো যায় না—তেমনি অনমনীয় শ্রুবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে মঙ্গলা। ওর হুই হাঁটু যুড়ে বসবার খুজু ভক্তিতে কেমন একটা কঠিন ভাব। মুখখানা ফিরিয়েছে গাড়ীর পিছন দিকে। দুটিটা আটকে রয়েছে সেই দিকেই—যেখানে মাঠের শেষে ফালিমত লুক্ক একটি পথ গ্রামের উঁচু জমিন বরাবর কাঁকড়া অখণ্ডগাছটার তলায় একরাশ আগাছার জড়লে হারিয়ে গেছে।

গাড়ীর মুখ ওই দিকেই ঘুরল। মঙ্গলাও ঘুরে বলল সামনে। অশ্বখের ছায়াভরা কোলে লতাগুন্ডের কোলে-ঢাকা গ্রামযুগ্মীন পথটাকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব এবার মঙ্গলারই।

## শঙ্কর-মতে “সাধন” : কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(১)

পূর্ব কয়েকটি সংখ্যায়, শঙ্কর মতে মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মোক্ষকেই যদি মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় বা পন্থা কি? মোক্ষলাভের একরূপ উপায় বা পন্থাকেই বলা হয় “সাধন” বা সিদ্ধির উপায় বা পন্থা। সেজন্য “সাধন” ব্যতীত “সিদ্ধি” অসম্ভব। এই কারণে, শঙ্কর-বেদান্তেও “সাধন” সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

সাধারণতঃ, ভারতীয়-বর্ণনে তিনটি “সাধন” বিষয় বলা হয়—এদের সম্বন্ধিত নাম “ত্রি-মার্গ”। এই তিনটি হ'ল কর্ম-মার্গ, ভক্তি-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ।

প্রথমেই কর্ম-মার্গের কথা ধরা যাক। কর্ম হ'ল শ্রেণীব: সকাম ও নিকাম। কল লাভের ইচ্ছায় যে কর্ম করা হয়, তা হ'ল “সকাম-কর্ম” কিন্তু যে কর্ম সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে, কলভোগের কোন কামনা না রেখে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে করা হয়, তা “নিকাম-কর্ম”। মোক্ষ-পথে নিকাম-কর্মের বাই বুল্য থাকুক না কেন, সকাম-কর্ম যে সম্পূর্ণরূপে মোক্ষবিরোধী, তা সর্বজনবিদিত সত্য। সেজন্য ব্রহ্মসূত্রের “চতুঃশ্লোকী” শেষ শ্লোকে (১-১-৪), শঙ্কর এই

বিষয়ে, অর্থাৎ কর্ম যে ব্রহ্মলাভের উপায় নয়, অথবা ব্রহ্ম যে কর্মাক্ত নয়, তা অতি বিশদভাবে, যুক্তি-সহকারে আলোচনা করেছেন।

এক্ষেত্রে মীমাংসা মতবাদ এই যে,—

“প্রতিপত্তি-বিধিবিষয়তয়েব শাস্ত্রেন ব্রহ্ম সমর্প্যতে।”

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

অর্থাৎ, শাস্ত্রে ব্রহ্ম কর্মবিধি বা উপাসনবিধির অঙ্গরূপেই নির্দিষ্ট হয়েছেন।

এই মীমাংসা মতবাদানুসারে, শাস্ত্রের উক্ত্যই হ'ল ব্রহ্ম-জননের পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত করা, এবং পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা। সেজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিই হ'ল শাস্ত্রের মূল কথা।

“প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-প্রয়োজনত্বাৎ শাস্ত্রম্।”

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

সেজন্যই শাস্ত্রে নানারূপ বিধি ও নিষেধ আছে। বিধি অনুসারে, লোকে বিবিধ পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হন; নিষেধ অনুসারে, তাঁরা বিবিধ পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হন। এই ভাবে মীমাংসা মতানুসারে, বিধি ও নিষেধই হ'ল শাস্ত্রের মূল বিষয়-বস্তু, অথবা, জনগণকে শুভকর্মে প্রবৃত্ত বা অন্তত কর্ম থেকে নিবৃত্ত করাই হ'ল শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য, কেবলমাত্র

পূর্ব-নিদ্ধ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান নয়। একরূপে, বস্তু-জ্ঞানপ্রদায়ী নয়, একমাত্র কৰ্ম-প্রচোদনাই হ'ল শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ভিত্তি।

অবশ্য কোন কোন স্থলে বিধি-নিষেধমূলক বাক্য ব্যতীতও কেবল বস্তু-বিষয়ক বাক্যও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মীমাংসা-মতে, সেই সকল বাক্য, বিধিরই অঙ্গমাত্র। শাস্ত্রে বিধি-নিষেধ মুখে একরূপ বস্তুর বিষয়ে স্থলবিশেষে উল্লেখ করা হয়, বা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। এই সকল অজ্ঞাত বস্তুর ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যেহেতু অজ্ঞাত্যই সেই বিধি-নিষেধের অর্থই বোধগম্য হবুে না। কেবল এই কারণেই শাস্ত্র মধ্যে মধ্যে ঐ সকল সম্বন্ধে বিবৃতিদান করেছেন। যেমন, শাস্ত্রে একটি বিধি আছে : 'যুগে পশু আবদ্ধ করবে।' 'যুগ' কি পদার্থ, তা সাধারণ জনের জানা সম্ভব নয়। সেজন্য শাস্ত্র এই বিধির অঙ্গরূপেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'যুগ অষ্টাঙ্গীকৃত (অষ্টকোণবিশিষ্ট) কাষ্ঠ'। শাস্ত্রে অধিকাংশই বিধি-নিষেধ-মূলক বাক্য থাকলেও যে কয়েকটি বিধি-নিষেধ-বহির্ভূত বাক্য আছে, তা এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

সেজন্য মীমাংসা মতে, বেদান্ত-শাস্ত্রও বিধি-নিষেধ-পর। অতএব বেদের কৰ্ম-কাণ্ডে যেসকল স্বর্গকামিগণের জন্য অগ্নিহোত্রাদি বজ্রীয় কৰ্মের বিধি আছে, বেদের জ্ঞানকাণ্ডেও সেসকল মোক্ষকামিগণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিধি আছে।

"সতি চ বিধি-পরত্বে, যথা স্বর্গাদি কামস্তাগ্নিহোত্রাদি—সাধনং বিষীয়তে, এবমহুত-কামস্ত ব্রহ্মজ্ঞানং বিষীয়ত ইতি যুক্তম।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষা, ১-১-৪)।

অবশ্য কৰ্মকাণ্ডের বিষয়-বস্তু 'ধর্ম' বা উৎপাদ্য কৰ্ম, জ্ঞান-কাণ্ডের বিষয়বস্তু 'ব্রহ্ম' বা নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম। তা সত্ত্বেও মীমাংসা-মতে, কৰ্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য-বস্তু হ'ল একই, অর্থাৎ, বিধি-নিষেধ—সে বিধি নিষেধ ধর্ম সম্বন্ধেই হোক, বা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই হোক। সেজন্য, জ্ঞান-কাণ্ড বা বেদান্ত-শাস্ত্রেও অসংখ্য বিধি আছে। যথা :

"আত্মা বা অবে জটীয়াঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২-৪-৫)

"য অপহতপাপা, দোহংষেভ্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৮-৭-১, ৩)

"আত্মন্যেবোপাসীত।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ১-৪-৭)

"আত্মানমেব লোকযুপাসীত।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ১-৪-১৫)

"ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মেব তবতি।" (মুক্তকোপনিষদ, ৩-২-২)

"আত্মকে দর্শন করবে।"

"যিনি পাপবিবাহিত, তাঁকেই অধেষণ করবে, জানতে ইচ্ছা করবে।"

"আত্মাই ব্রহ্ম—এই ভাবে উপাসনা করবে।"

"আত্মাকেই লোকরূপে উপাসনা করবে।"

"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন।"

একরূপ বিধি-বাক্য থেকে বস্তুই মনে প্রসন্ন উঠে : 'আত্মা-কি?' 'ব্রহ্ম কি?' ইত্যাদি। আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক বেদান্ত-বাক্যসমূহ এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপই মাত্র। যেমন : 'ব্রহ্ম নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, নিত্যাত্ম, অনিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, বিজ্ঞানবান ও আনন্দস্বরূপ,' ইত্যাদি। একরূপ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত মোক্ষফল লাভ হয়। সেজন্য মীমাংসা মতে, জ্ঞান-কাণ্ডে বা বেদান্ত-শাস্ত্রে আত্মা ও ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল বাক্য আছে, তা স্বয়ং বিধিমূলক না হলেও ব্রহ্মোপাসনা-বিধির অঙ্গরূপেই গৃহ্য হয়েছে। সেজন্য কৰ্ম-কাণ্ডের যুগাদির স্বরূপ ব্যাখ্যাকারী বাক্যসমূহ, এবং জ্ঞান-কাণ্ডের আত্মাব্রহ্মাদির স্বরূপব্যাখ্যাকারী বাক্যসমূহ একই শ্রেণীর ও একই উদ্দেশ্য-প্রসূত।

বস্তুতঃ মীমাংসা-মতে, বিধি-নিষেধ বজ্জিত, (Non-Injective) কেবলমাত্র বস্তু-স্বরূপ প্রকাশক (Categorical) বাক্যসমূহ নিরর্থক—যথা : 'বস্তুমতী মণ্ডবীপা', 'রাজা গমন করেছেন' প্রভৃতি। একই ভাবে, যদি ব্রহ্মস্বরূপ-বোধক বেদান্ত বাক্যসমূহও পূর্বেক্ত প্রকারে উপাসনা-বিধির অঙ্গ না হ'ত, তাহলে তা সকলই সমভাবে নিরর্থক ও নিশ্চর্যজন হয়ে পড়ত। ব্রহ্মস্বরূপ-বোধক বাক্যের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয়, এবং সেজন্য তা নিরর্থক ও নিশ্চর্যজন নয়—এ কথাও বলা চলে না। কারণ, দেখা যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপ 'শ্রবণ' মাত্রেই মোক্ষলাভ হয় না, সংসার-ভ্রম বিদূরিত হয় না, পূর্বের সংসারিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। বেদান্ত-মতেও 'শ্রবণের' পর 'মনন' ও 'নিদ্রিধ্যাসনের' সমান প্রয়োজন।

সেজন্য, মীমাংসা মতে, ধর্মের দ্বারা ব্রহ্মও কর্তব্যতা—ধর্ম-লাভ হয় সাধারণ যাগযজ্ঞাদিরূপ কৰ্ম সম্পাদন দ্বারা, ব্রহ্মলাভ হয় উপাসনাদিরূপ কৰ্ম-সম্পাদন দ্বারা—এইমাত্র প্রভেদ।

কিন্তু উপরের এই মীমাংসা মতবাদ শব্দ পুর্নানুপুঙ্খ-রূপে খণ্ডন করেছেন তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (১-১-৪)।

প্রথমতঃ, শব্দ বলেছেন যে, কৰ্ম বা ধর্মফল ও ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের মধ্যে মূলভূত প্রভেদ। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হ'ল শাস্ত্রানুসারী শারীরিক, মানসিক ও বাচিক বিহিত কৰ্ম। যেমন 'গমন' শারীরিক কৰ্ম, 'চিন্তন' মানসিক কৰ্ম, 'কথন' বাচিক-কৰ্ম। 'অধর্ম' হ'ল শাস্ত্র-বিরোধী হিংসা-প্রমুখ নিবিদ্ধ-কৰ্ম। একরূপ 'ধর্ম' বা পুণ্যকৰ্ম এবং 'অধর্ম' বা পাপ-কৰ্মের ফলেই সকলে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। এই সুখ-দুঃখ যে সর্বক্ষেত্রে সমান নয়, কিন্তু ক্ষেত্রভেদে, তাহের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে, তা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য। সুতরাং সুখ-দুঃখের তারতম্য আছে বলে তাহের কারণ কৰ্মেরও

ভাবতম্য আছে ; কর্মের ভাবতম্য আছে বলে, তাহের কারণ কর্তারও অধিকার সামর্থ্যাদির ভাবতম্য আছে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। যেমন, সন্তোষোপাসক দেবদান-পছান্দ-সারী, পুণ্যকরী পিতৃদান-পছান্দসারী। এইভাবে কর্মকারী জীবের প্রত্যেকেরই অসীম পরিমাণে সুখ-দুঃখভোগ অনিবার্য।

সেজন্য মোক্ষ যদি পূর্বোক্ত-প্রকারে, কর্ম বা ধর্মেরই ফল হয়, তাহলে মোক্ষে ও সুখ-দুঃখের ভাবতম্য থাকি অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু, পূর্বে বা বলা হয়েছে, মুক্তপুরুষ শরীরাত্মমানশূন্য বলে, তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বেই বা বলা হয়েছে, কর্মের ফল হ'ল অনিত্য—অর্থাৎ, যা পূর্বেই উৎপন্ন বা সিদ্ধ ছিল না, তাই উৎপাদন বা সিদ্ধ করা। কিন্তু মোক্ষ নিত্য। সেজন্য মোক্ষ কোন প্রকারেই কর্মের দ্বারা উৎপাদ্য বা লভ্য হতে পারে না।

“অতস্তু ব্রহ্ম যন্তোয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা।”

( ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪ )।

‘মোক্ষই’ হলেন ‘ব্রহ্ম’, যাঁর বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্তই বেদান্ত-শাস্ত্র আরম্ভ হয়েছে।

“অতো ন কর্তব্য-শেষতেন ব্রহ্মোপদেশঃ যুক্তঃ।”

( ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪ )

সেজন্য ব্রহ্মোপদেশকে কর্ম-বিধির অঙ্গরূপে গ্রহণ করা অস্বীকৃত।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ ক্রিয়া বা কর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথমে প্রাপ্তব্য বস্তু ও তার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান হয় ; তৎপরে সেই জ্ঞানানুসারে কর্ম করলে সেই বস্তুটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ, এ স্থলে জ্ঞান ও প্রাপ্তির মধ্যে কর্মের প্রয়োজন। কিন্তু মোক্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞান বা উপলব্ধি হওয়া মাত্রই বস্তু জীব মুক্ত হন, অথবা, স্বীয় নিত্য মুক্তধরূপ প্রত্যক্ষ করেন। অপর কোন কর্ম বা অস্ত্র কিছুই স্থান বা অবকাশ এতে নেই।

“ঐশ্বর্যো ব্রহ্মবিজ্ঞানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যো মধ্যে তৎ-কর্তৃকং কার্যাস্তরং বায়রন্তি।

ব্রহ্মদর্শন—সর্বাশ্রয়ভাবোর্মধ্যে কর্তব্যাস্তরং বায়রণ্যো-দাহার্যম্।” ( ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪ )।

অর্থাৎ, ঐতি ব্রহ্মজ্ঞানোদয় এবং মোক্ষলাভের মধ্যে অস্ত্র কোন কার্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। এরূপে ব্রহ্মদর্শন ও সর্বাশ্রয়ভাবের মধ্যে অস্ত্র কোন কর্তব্য-কর্ম নেই।

উদাহরণ দিয়ে, শব্দ বলছেন যে,—‘তিষ্ঠন্ গায়তি’, ‘ঐ ব্যক্তি হস্তায়মান হয়ে গান করছেন’ বললে বোঝা যায় যে,

হস্তায়মান হওয়া ও ‘গান করার’ মধ্যে অস্ত্র কোন কার্য নেই—অথবা ‘হস্তায়মান হওয়া’ ও ‘গান করা’ একই শব্দে যুগপৎ সম্পাদিত হচ্ছে। সমভাবে, অজ্ঞান নিবারণ বা ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ এবং মোক্ষলাভও একই শব্দে যুগপৎ সম্পাদিত হচ্ছে।

চতুর্থতঃ, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানও মোক্ষের সৃষ্টি করে না, যেহেতু জীব নিত্যমুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান কেবল অজ্ঞান-কারণই অপসারিত করে। সুতরাং এই দিক থেকেও মোক্ষ উৎপাদ্য নয়।

পঞ্চমতঃ, ব্রহ্ম ও আত্মার যে একত্ব জ্ঞানকে মোক্ষের সাধক বলা হয়েছে, তা শুদ্ধ জ্ঞানই মাত্র, অভেদোপাসনারূপ কর্ম নয়। অভেদোপাসনা চতুর্বিধ : সম্পৎ, অধ্যাস, সংবর্গ এবং সংস্কার। উদাহরণ নিম্নলিখিতরূপ :

মনোবৃত্তিও অসংখ্য, বিশ্বদেবতাও অসংখ্য। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মনকে বিশ্বদেবতারূপে ধ্যানের নাম সম্পৎ উপাসনা। এক্ষেত্রে মনের অপেক্ষা বিশ্বদেবতার উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়, এবং মন ও বিশ্বদেবতার মধ্যে প্রভেদজ্ঞানও যেন সামান্য অনুবর্তন করে।

মন, আদিত্য প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে ধ্যানের নাম অধ্যাস বা প্রতীক উপাসনা। এক্ষেত্রে ব্রহ্মের অপেক্ষা মন, আদিত্য প্রভৃতির উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়, এবং মন প্রভৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও প্রভেদজ্ঞান থাকে না।

বায়ু প্রলয়কালে অগ্নি প্রভৃতির সংহার করে। প্রাণও সূক্ষ্মকালে বাক্ প্রভৃতির সংহার করে। এই ক্রিয়া সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রাণকে বায়ুরূপে ধ্যানের নাম সংবর্গ-ধ্যান।

মনের সংস্কারের জন্ত মনকে ~~নেতৃত্ব~~নেতৃত্বরূপে ধ্যানের নাম সংস্কার উপাসনা।

ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ সম্পৎ ও অধ্যাস উপাসনার জ্ঞায় গুণগত সাদৃশ্যমূলক নয়, সংবর্গ উপাসনার জ্ঞায় ক্রিয়াগত সাদৃশ্যমূলকও নয়, সংস্কার উপাসনার জ্ঞায় আত্মার সংস্কারের জন্তও নয়—কারণ, এই অভেদ সত্যই পরিপূর্ণ, বাস্তব অভেদ সাদৃশ্যমাত্রই নয়, এবং সেজন্য সংস্কারের কোন প্রায়ও এ স্থলে নেই।

এরূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জ্ঞানই মাত্র ; উপাসনারূপ কর্ম নয়।

“অতো ন পুরুষব্যাপারতত্ত্বা ব্রহ্মবিজ্ঞা, কিং তহি ? প্রত্যক্ষাধি-প্রমাণ-বিষয়-বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্বেব। এবংভূতত চ ব্রহ্মণস্তজ্-জ্ঞানস্ত বা ন কয়াচিৎ যুক্ত্যা শক্যা কার্যাত্ম-প্রবেশঃ কল্পয়িতুম্।” ( ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ১-১-৪ )

সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞান পুরুষের কর্মের বা ইচ্ছার অধীন নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষাধি প্রমাণগম্য বস্তু বৈরূপ বস্তুধরূপেরই অধীন, সেরূপ ব্রহ্মবস্তুর অধীন। এরূপে, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানকে কোন যুক্তির দ্বারাই কর্মাক বলে কল্পনা করা যায় না।

## অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১৬

আজ ভোরবেলা ঠিকাদারের ছাউনিতে বাইবার তাকানো, কুকিয়া ধীরে-সুস্থে কাজ করে। ভিগকা বলে, “কি গো, আজ কাজে বাব নে?”

কুকিয়া জবাব দেয়, “গোবিন্দ মহাতোব কোঠাঘরে মাটি দেওয়া হয়ে গেছে, আর কাজ নাই।”

একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া তিলকা চোখ বোঁজে, তাহার শরীর ইদানীং এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও পারে না। সারাদিন একটু অর গায়ে লাগিয়া থাকে, না লাগিয়া, না ঘুমাইয়া একটু দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মত তার দিন কাটে।

ঘরের স্বল্প কাজ শেষ হইয়া গেলে কুকিয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না, দোর গোড়ায় চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। বেলা বাড়িয়া চলে, জ্যেষ্ঠের প্রচণ্ড রোদে পৃথিবী তাতিয়া ওঠে, মাঝে মাঝে গরম বাতাস ধূলা উড়াইয়া ছ ছ করিয়া বহিয়া যায়। গাছের ডালে কোন পাখীর শাড়া পর্বন্ত পাওয়া যায় না। দোর গোড়ায় বসিয়া কুকিয়া আকাশপাতাল কত কথা ভাবে। সুখিনীয়া হৈল তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত মমতাহীন বলিয়া মনে হয়, সেখানে আপন বলিয়া তাহার কেহ নাই। কে যেন নির্দয়ভাবে তাহাকে পিছন হইতে একটা মহা বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কেহ তাহাকে রক্ষা করিবে না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথার ভিতরটা হঠাৎ যেন গরম হইয়া ওঠে, সে আর চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

ঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কুকিয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসে। গ্রামের পথে লোক নাই, কাজের লোক কাজে গিয়াছে, বাহ্যিকের কাজ নাই তাহার। এই প্রচণ্ড রোদে কেহ বাহির হয় না। যে বাহার ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করে। কুকিয়া নির্জন পথ ধরিয়া চলে, তাহার কোন দিক-স্থির নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। বাতাসে তাহার হেঁড়া-ময়লা আঁচলটুকু মাথার উপর হইতে পড়িয়া যায়, কুক চুল উড়িয়া যুখে-চোখে আসিয়া পড়ে, সে ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, মজুরার বাড়ী পার হইয়া, সবুজ বাড়ী পার হইয়া, পাঁড়ে টোলা পার হইয়া কুকিয়া

গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পড়ে। অদূরে কয়েকটা আনগাছ, তাহার নীচে শুটিকয়েক শীর্ণ ছেলেমেয়ে কাঁচা আমের সন্ধানে ঘুরিতেছে, কুকিয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে গাছের ডালপালা খটখট খায়, একটি-দুটি কাঁচা আম খসিয়া পড়ে, ছেলেমেয়ের দল ছুটিয়া গিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা কুড়াইয়া নেয়। কুকিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াবে, তার পবে আবার বধন বাতাসের ঝাপটার কাঁচা আম খসিয়া পড়ে, কুকিয়া ছুটিয়া গিয়া সকলের আগে কুড়াইয়া নেয়। ছেলেমেয়ের দল আপত্তি করে, দুই-একজন পালিও দেয়, কুকিয়া তাহা গ্রাহ্য করে না, নিলিপ্তভাবে শিশুদের সম্পত্তি হিনাইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধে, তার পবে আবার চলিতে শুরু করে।

গ্রামের পথ জলহীন ছোট পুকুরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সেইখানে গোবিন্দ মহাতোব বাড়ী, বড় বড় কোঠাঘর, তিন-তিনটে করিয়া আঙিনা। গোবিন্দ মহাতো বড় লোক, গ্রামের ভাল ভাল ধানক্ষেতগুলি তাহার, হাজার মণ ধান হয়। ধানে ধান বাড়ায়, গোবিন্দ মহাতো এক মণ ধান ধার দিয়া বড় মণ ধান আদায় করে। এই সূত্রে ধান ধার লইবার লোকেরও অভাব নাই, কেননা, গ্রামের দু’চার জন গৃহস্থ ছাড়া আর সকলের সামান্য ক্ষেতে বা কপল হয় তাহাতে কষ্টেসুটে তিন মাস চলে, বাকি নয় মাসের খাত্তের ক্ষত ধার করিতে ও বিদেশে গিয়া কাজ করিতে হয়। কুকিয়া গোবিন্দ মহাতোব বড় বড় ঘরগুলির পাশ দিয়া বাইতে বাইতে হঠাৎ থামিয়া যায়, ঘরের দেওয়ালের উপর হাত রাখিয়া চূপ করিয়া দাঁড়ায়। এই দেওয়ালের ওপাশে বড় বড় বাঁশের বেড়ে ধান রাখা আছে তাহা সে জানে, সেই পুঞ্জীভূত ধান যেন চুষকের মত তাহাকে টানিতে থাকে। তাহার ঘরে একটি খানও নাই, অথচ এই ঘরে এক হাত চণ্ডা একটা মাটির দেওয়ালের ব্যবথানে জুপাকার ধান পড়িয়া আছে, গৃহবাসীর সে ধানে কোন প্রয়োজন নাই। ইহার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারে না, এ যেন সব হিসাবের বাইরে। বড়ো গোবিন্দ মহাতোকে সে এতদিন যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার প্রতি একটা বিবেচ কুকিয়ায় মনে ঘনাইয়া ওঠে। সে মনে মনে গোবিন্দ

মহত্বকে প্রায় করে, "তোমার এত ধান আছে, আমার একটাও নাই কেন?"

গোবিন্দ তাহার কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। কুকিয়া কেলিয়া যায়, পথ হইতে একটা পাথর তুলিয়া লইয়া দেওয়ালের গায়ে বাবে বাবে ঠুকিতে থাকে, একটা প্রকাণ্ড অভয়ারকে বেন আঘাত করিয়া শাস্তি দিতে চায়।

এক ঝাপটা পরম বাতাস আসিয়া কুকিয়াকে ঠেলিয়া কেল, সে আবার আগাইয়া চলে। প্রচণ্ড বোঝে গ্রামের জনহীন গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সে বাড়ী কেবে। টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিয়া সে মাটিতে শুইয়া পড়ে।

১৭

এক একটা দিন অতিকটে যায় আর কুকিয়ার চিন্তা বেন ক্রমে এলোমেলো হইয়া আসে, সহজ ভাবে সে আর ভাবিতে পারে না। ছুই বেলা ষাণ্ডয়া ছাড়িয়া একবেলা ষাণ্ডয়া ধরে, এক বেলাও শেষে আধ পেট, তার পরে তিলকা আর পরসাদেব জন্তে ছুটি ভাত বা একটু মাঝার লপদী বাঁধিয়া দিয়া নিজে উপবাস করে। শরীর তাহার শুকাইতে থাকে।

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আষাঢ় আসে, গরম বেন আরও বাড়িয়া যায়। আকাশে মেঘ নাই, সকাল হইতে জ্বর করিয়া প্রচণ্ড গরম বাতাস সন্ধ্যা পর্যন্ত পাগলের মত দাপাদাপি করিয়া কেবে। ভূপরে স্বামী আর পুত্র যখন গ্রামের অবসাদে ঘুমাইয়া পড়ে, কুকিয়া তখন আবার পথে বাহির হইয়া আসে। গ্রামের জনশূন্য গলিপথ দিয়া সে চলে, উত্তপ্ত কঁকরে তাহার পা পুড়িয়া গেলেও সেদিকে খেয়াল নাই, উদ্বেগজনিত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিতে ঘুরিতে সে গোবিন্দ মহত্বের বাড়ীর পাশে আসিয়া পড়ে। মহত্বের ঘান-বোকাই ঘরগুলি বেন তাহাকে টানিয়া আনে। নাগালের বাহিরে শিকার থাকিলে হিংস্র জানোয়ার যেমন তাহার চারিদিকে অনবরত পাক দিতে থাকে, কুকিয়া ঠিক সেই ভাবে গোবিন্দ মহত্বের বাড়ী বেটন করিয়া ঘুরপাক খায়। ক্রমে তাহার পা ছুটি ক্লান্ত হইয়া আসে, সে ঘরের দাওয়াতে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়ে। বসিয়া বসিয়া সে ভাবে, তাহার খালি পেটে যখন দুই দিন ধরিয়া এক দানা অন্ন নাই তখন ঐ ভূপীকৃত ঘান গোবিন্দ মহত্বের ঘরে বেড়বন্দী হইয়া কেন পড়িয়া থাকে? এ 'কেন'র উত্তর নাই, এ বেন একটা গোলকধাঁস, বাহিরে আসিবার পথ আছে কিন্তু খুঁজিলে পাওয়া যায় না। চোখ দুটি বুঁজিয়া সে বসিয়া ভাবে। ক্রমে

তাহার নর্দাঙ্গে একটা আরাম নামিয়া আসে, মনে হয় কে বেন তাহাকে ঘোষ হইতে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে, কি শীতল সে বাতাস! চোখে তাহার তন্দ্রা নামিয়া আসে।

হঠাৎ মেঘের ডাকে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়, চোখ খুলিয়া দেখে পশ্চিমের আকাশ জুড়িয়া কালো মেঘ বনাইয়া আসিয়াছে। কুকিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়ায়, অবাক হইয়া জলভরা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে। গাঁয়ের ভিতর ততক্ষণ একটা কলরব উঠিয়াছে। বে মেঘের জন্তে সকলে দিন গণিয়াছে সে আজ উপস্থিত। পশ্চিম দিগন্ত-রেখা হইতে একপান্না কালো মেঘ ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া সমস্ত আকাশটা ছাইয়া কেল। পৃথিবীর বুক জুড়িয়া ছায়া পড়ে, বহুদিনের জ্বর যেন একমুহূর্তে ছাড়িয়া যায়। বহুদূর হইতে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ক্রমশঃ আগাইয়া আসে, গাছেব ডালপালা দুই-একবার কাঁপিয়া ওঠে। হঠাৎ অরণ্যকে মথিত করিয়া, ধূলারশি উড়াইয়া দানবের মত প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসে, আকাশ চিরিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, কড়কড় করিয়া আওয়াজ হয়। কুকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে, "আঁধি, আঁধি, আঁধি আসছে।" তার পরে ঘরের দিকে দৌড়ায়।

গ্রামের পথে এখন বহু লোক ছুটাছুটি করে। ধূলা-বালিতে চোখে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, বাতাসের দাপটে কাত করিয়া কেলিতে চায়। কুকিয়া কোনমতে আসিয়া আড়িনায় ঢোকে। পরসাদ ~~কাঁচা~~ উঠিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিতেছে, তিলকা কণকণে ডাকিতেছে, "কোথায় গেলি গো?"

ছেলেকে কোলে তুলিয়া কুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তিলকা বলে, "কি হল গো?"

কুকিয়া তিলকার মুখের কাছে বুঁকিয়া পড়িয়া বলে, "আঁধি এল, মেঘ করেছে খুব, বিষ্টি হবে।"

তিলকা বলে, "তাই বল, তাই দেহটা এমন জুড়িয়ে গেল।"

কুকিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আঁধির ভাণ্ডব নৃত্য দেখে। নদীর বালি হাওয়ার দাপটে উড়িয়া চলিয়াছে, চারিদিক প্রায় অন্ধকার, মনে হয় যেন সন্ধ্যা লাগিয়া আসিয়াছে। সামনের আমগাছটা পাগলের মত ডালপালা নাড়িতেছে। মাঝে মাঝে চোখ-ঝলগান বিদ্যুৎ চমকিয়া ওঠে, তার পরে কানে ডালা লাগাইয়া বাজ পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে ঝড় কমিয়া আসে, টপটপ করিয়া ছ'চাব কৌটা বৃষ্টি পড়ে। এক বলক ঠাণ্ডা বাতাস আসে; বৃষ্টির



কৌটা আরও গাঢ় পড়িতে থাকে। হঠাৎ ছড়মুড় করিয়া কে যেন আঙিনায় ঢুকিয়া ছুটিয়া যাবের দেওয়ালের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। ভয় পাইয়া কুকিয়া বলে, “কে—কে গো?”

মাথার পাগড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া হাসিয়া লোকটা জবাব দেয়, “আমি গুলবা।”

“তুমি এখানে কেন এলে গো?” প্রশ্ন করে কুকিয়া।

পাগড়িটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গুলবা বলে, “পথে বিষ্টি এল, তোমার আঙিনার দরজা খোলা দেখে একটু দাঁড়াতে এলাম। তবুও বেশ ভিজে গেছি গো।”

কুকিয়া আর কথা কয় না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গুলবা কুকিয়ার দিকে চাহিয়া বলে, “তোমাকে কয়েকদিন দেখি নি পরশাদের মা, চেহারাটা তোমার কেমন হয়ে গেছে কেন গো?”

কুকিয়া বৃষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে, জবাব দেয় না। গুলবা দরদেব সঙ্গে বলে, “বড্ড শুকিয়ে গেছে।”

হঠাৎ কুকিয়া গুলবার খুব কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, চাপা গলায় বলে, “আমায় পাঁচটা টাকা দেবে গো?”

গুলবা অবাক হইয়া কুকিয়ার মুখের দিকে তাকায়, এমন ভাবে তাহাকে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ও বাচিয়া টাকা চাহিতে কোনদিন দেখে নাই। একগাল হাসিয়া বলে, “তুমি চাইলেই ত আমি দিই পরশাদের মা, তুমিই ত আমাকে পর ভাব, নিতে চাও না।”

কুকিয়া বলে, “তুমি এনে দাও আমি নেব।”

গুলবা সরিয়া আসিয়া একেবারে কুকিয়ার গা বেঁধিয়া দাঁড়ায়। কুকিয়া আবার বলে, “হাও নাগো, এনে দাও।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।” বলে গুলবা, তার পরে পাগড়ির কাপড়টা মাথায় চাপাইয়া ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া যায়।

বৃষ্টিবেশ চাপিয়া আসে। সামনের আমগাছ ক্রমশঃ বাপসা হইয়া ওঠে। ক্রান্ত ত্বিভ ধরণী একটা পরম পবিত্র আবেশে যেন মগ্ন হইয়া যায়। ভিজিতে ভিজিতে

গুলবা ফিরিয়া আসে, ধূতির খুঁট হইতে পাঁচটা টাকা খুলিয়া কুকিয়ার হাতে দিয়া বলে, “তুমি জান না গো, তোমার জন্তে আমি কত ভাবি, তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক কেটে যায়।”

কুকিয়া জবাব দেয় না, টাকা কয়টা আঁচলে বাঁধিয়া রাখে।

গুলবা বলে, “তোমার সব কষ্ট আমি বুঝ করে দেব পরশাদের মা। তুমি শুধু আমার পানে একটু চাও।”

কুকিয়া ছোট্ট একটি “হঁ” বলে।

গুলবা এবার কুকিয়ার হাতখানা ধরে, কুকিয়া কোন আপত্তি করে না, নির্লিপ্তের মত বুকের দিকে তাকাইয়া থাকে। গুলবা তাহাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিতে চায়; কিন্তু কুকিয়া এবার সরিয়া যায়, বলে, “হাত ছেড়ে দাও।”

গুলবা তাহার হাত ছাড়ে না, কানের কাছে মুখ লইয়া বলে, “হ্যাঁ গো, তোমার কি একটুও মমতা নেই! আমি তোমার জন্তে সব করব, আমার রোজগারের সব পরশা তোমাকে দেব, গহনাতো তোমার গা ভরে দেব।”

কুকিয়া মুখ তুলিয়া গুলবার দিকে তাকায়, গুলবা তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারে না, তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কুকিয়া গুলবাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পারিয়া ওঠে না—কাতরভাবে বলে, “না গো, এমনধারা করো না, আজ আমার ষেতে দাও—তুমি কাল আবার এস।”

গুলবার চোখ চুটি হিঙ্গ্র জানোয়ারের মত জলজল করিয়া জলিতে থাকে, কুকিয়ার কথায় সে কান দেয় না, তাহার শীর্ণমুখে চুমা বাইতে চায়। কুকিয়া এইবার একটা খটকা মারিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া নেয়, তাড়াতাড়ি ধরে কুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

বৃষ্টি অঝোরে পড়িতে থাকে, গুলবা অনেকক্ষণ দরজার পাশটিতে ঠুং পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু কুকিয়া আর বাহিরে আসে না। অবশেষে ভিজিতে ভিজিতে সে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

ক্রমশঃ



## চিরন্তন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চলেছ তোমরা কত দূর ? কহ, চলেছ সে কোন্‌খানে ?  
দূর, বহু দূর চলেছি আমরা সত্যের সন্ধানে ।  
মেথিলে চিনিবে ? পেয়েছ কি তবে সত্যের পরিচয় ?  
কেহ বলে, বেন জানি মনে হয়, কেহ বলে, নয় নয় ।

জানি জানি জানি বহু আমার, জীবনে বেধনা আছে,  
আনন্দ সে কি গ্লান হয়ে যাবে হৃৎকান্দন কাহে ?  
অশ্রু-হাসির সঙ্গমে রাজে জীবন-তীর্থ বৃষ্টি,  
তারি বহুর পথে পথে ফিরি তীর্থদেবতা খুঁজি ।

সকলি সত্য বাহা কিছু আছে, কেহ বলে সব মায়ী,  
আলো বলি বাবে নির্দেশ করে, কেহ বলে তাবে ছায়ী ।  
তবু বলে, শোন—বিশ্বের পানে চাও বাস্তব-ভাবে,  
এরা বলে, হেথা স্বপ্ন সকলি, সত্য কোথায় পাবে ?

এই সংসারে থাকে না কিছুই, ন'বে যায় চ'লে যায়,  
অমৃতের তাই সন্ধানে কেবল মর্ত্য-মানব হায় ।  
চল-চঞ্চল জীবনে যে করে চির-অবিনশ্বর  
সে-ই কি সত্য ? তারি তবে এত তৃপ্তি কি অন্তর ?

ঐক্য-বাবসান ভাবনার পিছে ছুটে চলি দিন-রামি,  
মনের নাগাল পাই না কিছুতে, ক্লান্ত—ক্লান্ত আমি ।  
কার কথা শুনি, কার কথা রাখি, কিসে হই নির্ভর ?  
কি-বা বখাৰ্খ, কিই-বা অলৌক, কে করে বিনির্গম ?

শাপ্ত ডেকে কয়, হা-বে বুড় তুই কবির নে মিছে ছল,  
ভক্তজনেরা যে পথে চলেছে সেই পথ ধ'রে চল ।  
বিচার-আচারে কি-বা কাজ বল, ছেড়ে দাও সব ভান,  
তুমি কি জান না সত্য সে এক, দত্যই ভগবান ।

প্রাকৃত-জন্মেবে পুছিয়া কি হবে, প্রাকৃত কথা কি জানে ?  
সে কথা শিখিতে আগ্রহে চাহি বিশেষজ্ঞের পানে ।  
বা কিছু তথ্য তাহাই সত্য, কহিল বৈজ্ঞানিক,  
পরীক্ষা করি গ্রহণ করিও তুল-নয় বাহা ঠিক ।

কবিরে শুধাই, তুমি যে ঋষ্ঠী, উষ্মেল মোব মন,  
পেয়েছ বহু তুমি কোন্‌পথে সত্যের দর্শন ?  
সুন্দর বাহা তাই ত সত্য, সত্যই সুন্দর,  
এইটুকু জানা, কহে কবি, জেনে কি হবে অন্তঃপর ?

মোহ-আবরণ খসিল না তবু, আশা মিটিল না তার,  
প্রকৃতির নানা নিয়ম জানিলে জীবনে কি জানা যায় ?  
বাসনা-বেধনা দিয়া সে যে গড়া, জীবন হৃৎকমর,  
উদ্ধাবেরী কহে, কর আগে সেই হৃৎকমরে জয় ।

আমি বলি, তবু আরো কিছু আছে শেখ-আশ্রয়—আশা  
ধরায় মানুষবে অমর করেছে সে যে, প্রিয়, ভালবাসা ।  
ঐতি—সুন্দরে করে সুন্দর, আনে অক্ষয় ক্ষেম,  
অনেক তুগিয়া ঠেকিয়া শিখেছি, সত্য শুধুই প্রেম ।



## ওড়িয়া শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত.

শাক্ত ধর্ম, শাক্ত ধর্মন ও শাক্ত উপাখ্যানাদি বাঙলা সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি। এই প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কৌতূহল জাগে, বাঙলায় প্রতিবেশী সাহিত্য—বিশেষ করিয়া ওড়িয়া, মৈথিলী এবং অসমীয়া সাহিত্যে এই শাক্ত প্রভাব কিতাবে প্রতিকলিত হইয়াছে।

এখানে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতেছি। ওড়িয়া সাহিত্যের আবর্তিত কিন্তু শাক্ত প্রভাব লইয়া, যদিও পরবর্তীকালের ওড়িয়া সাহিত্যে শাক্ত প্রভাব অতি ক্ষীণ, কিছুসংখ্যক হরগৌরী সঙ্কীর্তন লৌকিক উপাখ্যান ও গীতিতেই ইহা নিবদ্ধ। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য কবি পঞ্চদশ শতকের শূজমণি সারলা দাস। ইহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি যে, ইনি নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কবি, সারলা দেবীর প্রপায়ে তাঁহার মধ্যে কবিত্বের স্ফূরণ। তাঁহার ‘চণ্ডী-পুরাণ’ গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শুণ্ড প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য বলিয়াই নয়, ‘চণ্ডী-পুরাণে’ বর্ণিত বিষয়ের অভিনবত্বের জন্তও কাব্যখানির কৌতূহলী পাঠকের ‘মিফটে’ একটি বিশেষ মূল্য আছে।

চণ্ডী-কাহিনীর ভিতরে কবিকল্পনা ও লৌকিক কাহিনীর মিশ্রণ যে কতখানি ঘটিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ওড়িয়া কবি সারলা দাসের রচিত ‘চণ্ডী-পুরাণ’ কাব্য। সারলা দাস হইলেন সারলা চণ্ডীর দাস। ‘সারলা’ ‘সারদা’ বা ‘সারদা’ শব্দ হইতে জাত; চণ্ডী-পুরাণে দেবীর নাম হিসাবে ‘সারলা’ এবং ‘সারদা’ দুইটি বানানই পাওয়া যায়, কবির নামের বানানও ‘সারলা দাস’ এবং ‘সারদা দাস’ উভয় রূপেই পাওয়া যায়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের কবিশ্রমের জায় এই কবিত্ব যথেষ্ট দেবীর নিকট হইতে কাব্য-রচনার নির্দেশ পাইয়াছিলেন এবং ‘নিশিবে প্রসন্ন তাই বাহা যে কহই। অক্ষণ প্রকাশে মুই তা সব লেখই ॥’ সারলা দাস নিজেকে বাব বাব শূজমণি বলিয়াছেন, এবং বাব বাব বলিয়াছেন, তিনি অপণ্ডিত নিরক্ষর। বস্তুতঃ তাঁহার রচিত ‘চণ্ডী-পুরাণ’ পড়িলে মনে হয়, মার্কণ্ডের চণ্ডীর সহিত তাঁহার কোনও প্রত্যক পরিচয় ছিল না; লোকমুখে তিনি দেবী-কর্তৃক অনুব নিধনের যে সব কাহিনী শুনিয়াছেন তাহাকে

পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া তিনি একটা রূপ দান করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, সপ্তভয়ে ভীত পরীক্ষিৎ রাজাই (পরীক্ষ রাজা) এই কাহিনীর বক্তা, ব্যাসমুত শুকদেব দুনিই এই সর্বাঙ্গ-নাশিনী কাহিনীর বক্তা। এই কাহিনীর মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি যে, বোগনিজার নিম্ন নীয়ারণের শক্তি-স্বরূপা দেবী হইলেন ‘বাক্যদেবী’ বা সরস্বতী। নারায়ণ বোগবলে ‘অনাদি মাহেশ্বরী বাক্যদেবীর কোলে’ গুইয়াছিলেন; অত্যন্ত ক্ষুদ্র সেই ধবলাঙ্গী বাক্য-দেবীকে দেখিয়া মধুকৈটভ ছই বৈত্যা শূদ্রাব আকাঙ্ক্ষায় দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। সরস্বতী দেবী বিক্ষুব্ধ শরণ লইলে বিষ্ণু আশ্রিত হইয়া অনুবদর নিধন করিলেন। মহিষাসুর-নিধনের জন্তও দেবগণ ‘বাক্যদেবী’রই শরণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রার্থনা করিয়াছিল—‘প্রভুদেব বোগনিজা ভাদ্র আগে মাতা’। তখন দেবী তাঁহার বীণা বজাইয়া নারায়ণের নিজা ভাঙাইলেন:

অজপা লয় কারণ তানমান মেলা।

সপ্তসুরেবে বীণা গুলি অবলা ॥

শেষে অবশ্য দেখি ক্রুদ্ধ দেবভাগ্যের যুগজাত অনল বিগ্রহীভূত হইয়াই দেবীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন—তিনিই চণ্ডিকা। কিন্তু এই চণ্ডিকাও যখন রণোন্মত্তা হইয়া অনুবের প্রতি ধাবিতা হইলেন তখনও ‘ধবল কামাকী সে যে কপূর-বরণা’।

উড়িয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে সরস্বতী দেবীরই মহা-দেবীত্বের কোনও স্থানীয় প্রবাদ-কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া এই ‘বাক্যদেবী’র কাহিনী ওড়িয়া উদ্ভিত হইয়াছে মনে হয়। প্রাচীন সরস্বতী দেবীও স্থানে স্থানে সিংহবাহনা। বাগ-দেবীর সিংহরূপ কাহিনী বৈদিক সাহিত্যেই প্রসিদ্ধ। এই বৈদিক কাহিনীর পরিণতিতেই পরবর্তীকালের মহাদেবী ‘সিংহ-বাহনা’ রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া একটি মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। পুরাণ-তত্ত্বাবিধে সরস্বতী ও হর্গা-চণ্ডীর ঐক্য বহুধাবণিত দেখা যায়।

সারলা দাসের ‘চণ্ডী-পুরাণ’-বর্ণিত দেবীকর্তৃক অনুব-নিধনের কেন্দ্রে রহিয়াছে মহিষাসুর—শুভ নিওভ, চণ্ড-যুগ, বক্তবীজ (এখানে বক্তবীজ) প্রভৃতি সব অনুবই মহিষাসুরের

সাহিত্য বৃক্ষ। মহিষাসুরই রত্ননিরিতে অবস্থিতা দেবীর রূপ  
কেনিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। এই মহিষাসুরের উৎপত্তির  
দীর্ঘ লৌকিক কাহিনীর বর্ণনা বহিরাছে। অসুররাজ কপিল-  
সিংহের সুবতী স্ত্রী অসুররাজের শূদ্রাবতরে গলাইয়া সিংহল  
রীপে গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় সেখানে সমরাজের  
স্বাধীন মহিষ তাহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া কামোন্মত্ত  
হইয়া তাহার সহিত 'শূদ্রাব শুভ্রিল'। তখন মহিষবীরে  
অসুররাজী 'নিরখী'র গর্ভে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার  
নামঃ 'মহিষ' এবং অসুরের বৃদ্ধ ( 'মহিষের বৃদ্ধ গোটি শরীর  
মহুবা' )। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, ভারতবর্ষের

পূর্বাঞ্চলে যে মহিষাসুরের প্রসিদ্ধি তাহার মহিষের দেহ—  
মহুষের বৃদ্ধ ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বহুস্থলে প্রচলিত  
মহিষাসুরের মূর্তি হইল নরদেহে মহিষ মূর্তি ; মহাবলী-  
পুরম্-এবং এই আত্মীয় মহিষাসুরমূর্তি প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে  
প্রচলিত গজানন, হরগ্রীব, নৃসিংহ, বারাহী প্রভৃতির মূর্তি  
কল্পনা দক্ষিণ দেশে প্রচলিত এই মহিষাসুর মূর্তি-কল্পনাই  
পরিপোষক। মহিষমুখধারী একটি অসুরের প্রাথমিক কল্পনা  
হইতেই কি পরবর্তীকালে অসুরের মহিষ-মূর্তি ধারণের  
উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে ?

বাহ্যাহোক, অসুররাজ কপিলসিংহ ভার্যাকে ধুঁজিতে  
ধুঁজিতে সিংহলদ্বীপে গিয়া এই মহিষাসুর পুত্রসহ ভার্যার  
সন্ধান পাইল। অসুররাজ পুত্রকে ত্যাগ করিলেন না,  
তাহাকে পালন করিয়া দ্বর্ষ অস্ত্রধারী করিয়া তুলিল। এই  
মহিষাসুর দীর্ঘকাল নিরাহারী হইয়া ত্রুষ্কার বরলাভের জন্য  
তপস্তা করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই বরলাভ করিয়াছিল,  
কোনও পুত্রঃস্বর হস্তে তাহার নিধন হইবে না। নারীর  
হস্তে নিহত হইবার শঙ্কা তাহার চিত্তে তখন জাগেই নাই।

সারলা দাসের 'চণ্ডী-পুরাণে' সকল অসুরেরই দীর্ঘ বংশ-  
তালিকা পাওয়া যায়। তাহাদের উৎপত্তি—বৃদ্ধি—এমনকি  
বিবাহাদিও বিস্তৃত বর্ণনা ( স্থান, মাস, পক্ষ, বার, তিথি,  
নক্ষত্র প্রভৃতি সব সহ ) পাওয়া যায়। অসুরকল্পা কান্তি  
মালায় স্বয়ংবর লইয়া অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ  
বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ এবং সব  
যুদ্ধবর্ণনাই অভ্যস্ত লৌকিক। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই,  
অসুরের অভ্যাচাবে পীড়িতা হইয়া শুধু দেবগণই বার বার  
দেবীর শরণ গ্রহণ করেন নাই, অসুরভার সহনে অসমর্থ।  
পৃথিবীও বহুবার হীনা রূপ গ্রহণ করিয়া দেবীর শরণ  
গ্রহণ করিয়াছিল। দেবী অসুরের নিকটে যে তাঁহার শক্তি-  
রূপীকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাকে ঠিক 'চণ্ডী' গ্রন্থের  
প্রতিদেবী বলিতে পারি না, অনেকটা লৌকিক। অসুরের  
প্রতি দেবী বলিতেছেন :

আবে আবে জাতকালে দাক্ষিণ্য রূপ হেউ ।  
বুঝকালে ভাৰ্য্য রূপে রতিবধ হেউ ।  
অন্তকালে হেউ পুণ কালিকা বৃষতি ।  
বহন কর' সকল পেলই বহতি ।  
আদি অন্ত মধ্য আক্ষমানকর নাহি' ।  
সমস্ত কর' আক্ষকু কেহ ন জানই ।  
অন্তকালে যুদ্ধকর করীউ উতপন্ন ।  
অন্তকালে সমস্তকু করিউ তক্ষণ ।  
অজ্ঞান মুখশ্রী ন জান মন্দ বাই ।

• আক্ষে যে পদম যোগিনী আদি মহামায়ী ॥১

যুদ্ধ-প্রদক্ষে দেবীর সহচরিনী রূপে বহু দেবী, ডাকিনী-  
যোগিনী প্রভৃতির উল্লেখ পাই ; এই তালিকায় সারলা দাস  
উড়িয়া অঞ্চলে তৎকালে প্রচলিত দেবী-উপদেবীগণের নাম  
আর প্রায় বাকী রাখেন নাই। দূর্গাদেবী নিজেই কেন  
কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কবি অভ্যস্ত স্থূল  
লৌকিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দূর্গাদেবী যখন  
কোনও প্রকারেই মহিষাসুরকে বধ করিতে পারিতেছিলেন  
না তখন তাঁহার এক সহচরিনী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন :

এ বেশ ছাড়ি তু বিবশন রূপ ধর ।

মহিমা বশ হেউ' ভব দেবি তোহর ॥

দেবী তাই 'বিবশনা হইলে কেশ বাস মুকুল'। বিবশনা  
দেবীকে দেখিতে পাইয়া অসুর বিমোহিত হইল—দূর্বল  
মুহুর্তে দেবী তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

সারলা দাসের এই 'চণ্ডী-পুরাণে'র প্রায়- তাঁহার রচিত  
আর একখানি কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা হইল  
'বিলঙ্কা-রামায়ণ'। এই বিলঙ্কা-রামায়ণে কবি সীতাকেই  
বাল্মকীশ্রীমণী ভয়ঙ্করী দেবীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন,  
লক্ষ্মণেরা রাবণ তাঁহা কর্তৃকই বিনিহত হইয়াছিল।

সাহিত্য হিসাবে কবি সারলা দাসের সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল  
তাঁহার রচিত মহাভারত। এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও  
কবি বলিয়াছেন যে, সারলা দেবীর আজ্ঞায় এবং প্রণাদেই  
এই গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

সারলা চণ্ডী নাম অটাই বেই দেবী ।

তাহার দাস যু' যে সারলা দাস কবি ।

প্রসঙ্গে আজ্ঞা মোতে হেলে সে শাকন্তরী ।

লভ তু বশ মহাভারত গ্রন্থ কবি ।

শুনিণ বৃষজনে ন ধর আনমন ।

মুহে পণ্ডিত যু'হে স্বভাবে মুখ'জন ॥২

১। চিত্তাবলি গ্রন্থাক পরিপূর্ণা দ্বারা প্রকাশিত, কটক ।

২। উড়িয়া সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কিন্তু এই নারী-জালের পথে সমগ্র মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে আর কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্তকবি দেখিতে পাই । তাহার ঐতিহাসিক কারণও বহিরাছে । উড়িয়ায় জগন্নাথ<sup>১</sup>দেবকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আস্তে আস্তে যখন জনপ্রিয় হইয়া সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছিল যে, শাক্তধর্ম আর কোনও জনস্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই । ষোড়শ শতক হইতে আবার উড়িয়ায় হাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল প্রভাব পড়িল, ফলে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মই রাম-কৃষ্ণ-জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাযুক্ত বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পড়িল । উড়িয়ায় নাথধর্মের যে একটা প্রবল প্রভাব ছিল তাহাও দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণবমতের মধ্যেই রূপান্তরিত হইয়া গেল । সুতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পাখিৰ সাহিত্যে প্রধান ভাবে গড়িয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত—অর্থাৎ ষোড়শ শতক পর্যন্ত ওড়িয়া সাহিত্যের বামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অল্প সাহিত্য হইল মূলভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য । ষোড়শ শতকের কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদেব জন্ত প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি ‘তুলাভিগা’ নামে হর-পার্বতী সংবাদেব একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।

‘তুলাভিগা’ শব্দের অর্থ তুলা পৌরী ; তুলা যেমন পিঞ্জিয়া পিঞ্জিয়া ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও কট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই স্থিতিবিষয়ক সকল তত্ত্বকে তুলা-পৌরীর দ্বারা পিঞ্জিয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে (তুলনীয় চন্দ্র-দাস, তুলা ধুনি ধুনি আশুবে আশু ইত্যাদি) । এখানে প্রমুখতম পার্বতী, উত্তরে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ঈশ্বর মহাদেব । ভক্তিট হইল তন্ত্র ও যোগ-প্রস্থাবির প্রসিদ্ধ ভক্তি, সেসব স্থানেও পার্বতী জিজ্ঞাসু, মহাদেব তত্ত্বব্যাখ্যাকরণ । বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও এই বীতি, ভগবতী প্রজ্ঞার জিজ্ঞাসা—ভগবান্ বজ্রগন্ধ বা বজ্রধ্ববের মৌমাংস<sup>২</sup> । এখানে আরওই দেখি :

পার্বতী বসি একদিনে । কহন্তি বসি শিব-সন্নিধানে ।  
হে প্রভু কল্পনা-সাগর । কেমন্তে হইলা সংসার ।  
তাহার তত্ত্ব মোহে কহ । বেগে খণ্ডিব ভব-মোহ ।  
উত্তরে মহাদেব বলিলেন :  
কহিবা শুন গো পার্বতী । মহাশূন্য হেলা জ্যোতি ।  
জ্যোতিরু শূলরূপ হেলা । শূলক বিন্দু প্রকাশিলা ।  
বিন্দুক অর্ধমাত্রা জাত । তাওহঁ ঠাঁকার সন্তুত ।  
ঠাঁকার ব্রহ্মজগত । শুন পার্বতী হেই চিন্ত ।  
তুনি পার্বতী তোম হেলে । ঈশ্বর-চরণে পড়িলে ।

মহাশূন্য হইতে হইল জ্যোতি, জ্যোতি হইতেই হইল শূলরূপ শূল হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে অর্ধমাত্রা, তাহার পরে ঠাঁকার, ঠাঁকার-ব্রহ্ম হইতেই জগৎ ।

ইহাতে আদিশক্তি পার্বতীর মনের সংশয় দূরিত না, ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্ত তিনি বিশ্বনাথের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন । বিশ্বনাথ বলিলেন :

শুন মোহর প্রিয়তমা । তোতে কহিবা তুলাভিগা ।  
জানকু ন কহন্তি মুহি । তু মোব পঞ্চপ্রাণ সহি ।  
অণাকার যে জ্যোতিরূপ । সেটাবে নাই<sup>৩</sup> বৈষ্ণরূপ ।  
ধূম্রবর্ণর প্রায়ে দিশে । অঙ্ককারটি সে প্রকাশে ।  
ব্রহ্মাণ্ড অঙ্ককার হোই । জ্যোতিরূপে সংহরই ।

সেখান হইতেই জন্মিল ঠাঁকার, ঠাঁকার হইতেই জগৎ । অর্থাৎ অশক্যব্রহ্ম হইতে ঠাঁকারূপ নিম্নক-অশক্যব্রহ্মক শক্য-ব্রহ্মের উৎপত্তি—তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি । পার্বতীর পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই ঠাঁকার উৎপত্তির আরও বর্ণনা দিলেন । এই ঠাঁকার হইতে আবার ‘ক্রী’ বীজ জাত হইল, ‘ক্রী’ হইতে ‘শ্রী’, ‘শ্রী’ হইতে ‘শ্রী’ জাত হইল । আবার ক্রী হইতে কৃষ্ণ, শ্রী হইতে রাম, শ্রী হইতে রম্য জাত হইল । ইহাবাই, শব্দ, দ্রব্য ও তম এই ত্রিগুণ । শ্রী-পুরুষতত্ত্বের আলোচনার বলা হইয়াছে :

শ্রী পুরুষ এবে শুন । কহিবা তোতে বুঝাইন ।  
শ্রীটি পুরুষ বোলাই । শ্রীরবীজটি বাধা হোই ।  
শ্রীর বীজ যে সব জান । বড় অঙ্কর এবে শুন ।  
কু অঙ্কর গোটি পুরুষ । ফটি যে শ্রীরীক সদৃশ ।  
বা অঙ্কর শ্রীরী কহি । ম অঙ্কর পুরুষ বোলাই ।  
ফটি যে হোইলা অণ্ডির । বে অঙ্কর যে শ্রীরী সার ।  
ইত্যাদি ।

কিন্তু এই তুলাভিগা ব্যতীত সমস্ত মধ্যযুগে বাঙলা দেশে তখন বহুসংখ্যক মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকা-মঙ্গলাদি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে—তখন দেবীর কোনও রূপকে অবলম্বন করিয়াই ওড়িয়া সাহিত্যে আর কোনও কাব্য-কবিতা গড়িয়া ওঠে নাই । তবে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্য মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য হইলেও মধ্যযুগের বাঙলা শাক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলির সহিত এক বিষয়ে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের একটা বিশেষ মিল দেখিতে পাই । বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে, বিশেষ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং কালিকা-মঙ্গল দেখিতে পাই নায়ক বা নায়িকা যখনই কোনও মহাবিপদে পতিত হইয়াছে তখনই দেবীর একটি

১ । ওড়িয়া-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা । বিশ্ববিদ্যালয়

‘চৌতিশা’ ভব করিয়াছেন। ক-কারাহিক্রমে বাঙলা ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে চৌত্রিশটি বলিয়া ধরা হয়; ক-কারাহিক্রমে শব্দমালার বোঝানাতেই এই ভুতি সাধিত হয় বলিয়াই এই ভুক্তিকে ‘চৌতিশা’ বলা হয়। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথমাবধিই এই ‘চৌতিশা’ কাব্যশৈলীর একটা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করি। বাঙলা সাহিত্যের চৌতিশা প্রায় সবই শক্তি দেবীকে অবলম্বন করিয়া (বৈষ্ণবও সামান্ত কিছু কিছু আছে)। ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্য যুগের চৌতিশা দেবীকে অবলম্বন করিয়া নহে—বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার—বিশেষ করিয়া রাম ও কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্যের এই চৌতিশার মধ্যে আদি চৌতিশা নামে প্রসিদ্ধ ‘বজ্রাধাস’ বা বৎসধাস (?) রচিত ‘কলসা চৌতিশা’; ইহা উড়িয়াযোবনা উমার সহিত বুড়া বর শিবের বিবাহ লইয়া রচিত। এই ‘বজ্রাধাস’ কে বা কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না; তবে ‘কলসা’র উল্লেখ সাবলা দাসের মহাভারতের একটি পর্বে পাওয়া যায় বলিয়া অতিব্রত মহাস্তি এম-এ মহাশয় বজ্রাধাসের এই ‘কলসা চৌত্রিশা’কে চতুর্দশ শতকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ‘কলসা’ রাগে গীত বলিয়া এই চৌতিশা ‘কলসা চৌতিশা’ নামে খ্যাত। প্রারম্ভেই দেখিতে পাই :

কহন্তি কামিনী শুন হেমন্ত তুলনি ।  
কাছ ববে বরিলে তুস্তব পিতামনি ॥  
তুল তুল গোত্রআদি নাহি জান তার ।  
কনক বেদীয়ে বুঢ়া বসিছি মধ্যর ॥  
খুং খুং খাস সাহাসেন পেলু অছি খই ।  
খর নিখাস বুঢ়ার মাথ লাগে তুই ।  
খতিআ বোগির সঙ্গে নাহি বান তার ।  
খতিআ বলব বুঢ়া বাকিছি পাখর ॥

অতি প্রগণ্ডা কামিনীটি শিবের শুণু বৃদ্ধ রূপ নয়—এমন একটি অস্বাভাবিক জুগুপ্সিত রূপের বর্ণনা করিল যে, মহাদেবের এতখানি জুগুপ্সিত রূপের বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাড়াযুখে কোক্‌লা দাঁত, কোটরাগত ময়লাভরা চোখ, মুখ হইতে লাল পড়ে, মাথায় ক্লক জটা, কানে খাটো, গারে ছাইমাথা, সর্পের আভরণ,—এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা আছে গৌরীর কপালে! এ যে একেবারে :

রুলি হোই কিংকি হোই পড়ুছি চুলাই ।  
কিঅ কি নাভুনী প্রায়ে দিশিবু গো তুহি ॥

যে বকম রুলিয়া কিমাইয়া চলিয়া পড়িতেছে তাহাতে উমাকে ত ইহার পাশে বেঁধাইবে মেরে কি নাভুনীর মত ।

যাত্রিকালে একদল দেখিলে ত তরে প্রাণই উড়িয়া বাইত !  
কোন ঠেকের পাল্লার পড়িয়াছেন হেমন্তরাজ (হিমালয়)—সেই হেতু সর্বনাশ হইল ‘হেমন্ত তুলনি’র। তলপতা করিয়া লাভ হইল এই দিন-তিথারী বোগী। আড়ালের কাঁক হইতে বুড়া বর দেখিল মারে-ঝিরে; বৃহিত হইয়া পড়িল উমা; দাসীরা আসিয়া ধরিয়া তুলিল। হরহর বচনে উমার মা বলিল, ‘মন স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই বোঁবনে কেন জীবন দিবে ?’ উত্তরে উমা ল্পট বলিয়া দিল :

হুইনি করি কহছি শুন মোর মারে ।  
হস্তে জিরিণ ধরিণ পলগই পারে ।  
হরিত্র হৌন বুঢ়াকু বেবে মোতে ধেবু ।  
হুই নয়নরে মোক মরণ দেখিবু ॥

গোলমাল শুনিয়া গিরিরাজ নিজে আসিয়া বলিলেন, ‘ধর্ম-পুণ্যকালে কল্যা কল্লহ রোহন !’ ক্লষিয়া গিরিরাজী বলিলেন, নিলাজ বুড়াকে করিয়াছ আমার স্তম্ভরী কস্তার বর ! মারে-ঝিরে হুই জনে একসঙ্গে বিব খাইয়া মরিব। ‘কথা শুনিয়া গিরিরাজ গেলেন চট্টিয়া, না জানিয়া-শুনিয়া বত গোলমাল। শিবের মহিমা কেহ জান ?

বিচার ন কর মাএ কিএ হুই তুস্তে ।  
বিকল মনক ছাড় কহঅছু আন্তে ।  
ত্রকা বিকু দেবতাএ ছতি তাস্তু বেতি ।  
বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পুণ্যে অতি র্তি ॥  
ভাল পটে লেখন বা করিছি বিধাতা ।  
ভল ভাগ্যবন্ত গৌরী আস্তব হুহিতা ॥

তখন লাগিয়া গেল বিবাহের বত জলাহলি শব্দধ্বনি। একটি একটি করিয়া মহানন্দে পালিত হইল বত আচার-অমুঠান। সজ্জিত করা হইল গৌরীকে বিবিধ রসে, বস্ত্রে, অমুলেপনে, তাহার পর ‘বরকু সে দশজন ভোলি ব-ইলে’; কিন্তু ছড়েভিড়ে বুড়া বর একেবারে ‘খাসু খাসু গলা বুহী’—কাশিতে কাশিতে বুহীই গেল। বাহা হোক, শেষ পর্বত বিবাহ হইয়া গেল, দেবতার মা-বাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন, সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জুয়াখেলা আরম্ভ করিলেন, তাহার পরে মধুশয্যা। তখন কিন্তু ‘শোভা পাউহুতি হুই রতি-কামদেব’।

হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দেখি ।  
হাস্ত কল্লহতি সহী সঙ্গাতুলী দেখি ॥  
সকলে চউটি সারি কাহখেলি গলে ।  
হাস্ত অষ্টমঙ্গলা উচ্চব শারলে ॥

কিতিপতি ঠাকুর সে কলিলা সে হিতি ।

কুজবুদ্ধি বজ্জালাস কলসা পড়তি ।।

হর-গৌরীকে লইয়া এই জাতীয় কিছু কিছু কবিতা ওড়িয়া লোক-সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। উক্তই কুজ-বিহারী হাস-সম্পাদিত ওড়িয়ায় ‘পন্নীনীতি সঙ্করন’ প্রথম ভাগে গ্রাম্য কৃষকরূপে হর পার্বতীর একটি চিত্র দেখিতে পাই। শিব মাঠে চাষ করিতে গিয়াছেন, পার্বতীর কথা ছিল অতি সকাল সকাল শিবের জন্ত মাঠে খাবার লইয়া যাওয়া। মাঠে খাবার লইয়া যাইতে পার্বতীর একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শিবঠাকুরের একটু মেজাজ চড়িয়া গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াখণ্ডটি :

রাত্র বাউঁ বাউঁ উঠিলে পার্বতী ।

যমুনা নদীবে স্রাহান করতি ।।

গিরাগি পত্তর পঞ্চগোটি হনা ।

আধ-নিষ করি বাড়িলে ঘোঁটনা ।

পাট পিঙ্কি পাট উপুগণ ঢেলে ।

চন্দ্রাবলী পাট চিমুলা বোড়িলে ।

ঘোঁটনা ধরি পার্বতী বউল মোলে টিয়া ।

তা দেখি ঈশ্বর হল কলে টিয়া ।

“কিল ঘোঁটনা উছুর ।”

“জান না কি প্রভু গিলাক জ্ঞান ?”

পরে হেউ অধে লাগিলা মহা গোল ।

ঈশ্বর ধইলে পার্বতীক বাল ।

ছিড়ি-ছিড়ি-নন্দে কি চউরী ।

হুহুবি চিনা মাল বে ।

পার্বতী কাকে কিছু অবহেলা করেন নাই, রাত্র থাকিতে থাকিতেই উঠিয়া গিয়া যমুনা নদীতে স্নান করিয়া আসিয়াছেন। গিরাগি-পাতা দিয়া পাচটি ‘হনা’ (চোড়) তৈয়ারি করিয়া নিলেন—তাহাতে সাঝাইয়া লইলেন আম,নিমের সব খাবার। একখানা শাড়ী পরিলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন—আর একখানা দিয়া মাথার ‘বিড়া’ করিয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী একটি বকুল-গাছের নীচে দাঁড়াইলেন, পার্বতীকে দেখিয়া শিবঠাকুরও তাঁহার হাল খামাইলেন। পার্বতী সাধ্যমত তাড়াতাড়ি করিলেও সব জোপাড়-বস্ত্র করিয়া বাহির হইতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, শিব চটিয়া গিয়া বলিলেন,—‘কি গো, খাবার আনিতে এত দেরী কেন ?’ সব মাতারাই একরূপ কেত্রে সাধারণভাবে যে অছিল। দিয়া থাকেন মা পার্বতীও উপস্থিত-তে তাহাই করিলেন, তিনি বলিলেন,—‘জান না কি প্রভু

বাজ্জাঘের জ্ঞান ?’ কিন্তু কুখ্যার জ্ঞোঘাত শিব কি আর এ কথাতেই মানেন ? এক আধ কথাতেই মহা গোল লাগিয়া গেল,—শিব ধপ করিয়া ধরিলেন পার্বতীর চুল। ধোঁপার কিতা ছিঁড়িবার উপক্রম—‘দুসরি (হ-কেবত) চিনা মাল’ও ছিঁড়িবার উপক্রম। কৃষক-কৃষাণীর একটি নিৰ্ম্মিত বাস্তব ছবি।

ডাঃ কুজবিহারী হাস-সম্পাদিত ‘পন্নীনীতি সঙ্করন’র দ্বিতীয় ভাগে আর একটি হর গৌরী উপাখ্যান দেখিতে পাই ওড়িয়াবাসীদের আর একটি সাধারণ সমস্তা লইয়া। সমুজ্জের কূলেই অনেক পন্নী, সমুজ্জের ভাঁবের বালি বাতাসে উড়িয়া আসে—কিছুদিনের মধ্যে বাড়ির ঘরগুলি ‘বালু’তে ‘পোতা’ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যদি এ বিষয়ে সূর্যবাই অবহিত হইয়া বালি সরাইয়া গৃহ রক্ষা করেন তবেই ঊষায়—নতুবা বিষম বিপদ। শিব ত ভোলানাথ পুরুষ—বাড়ীঘরের কোনও ধোঁজখবরই রাখেন না, এদিকে বালু পড়িয়া পড়িয়া ঘরের ত ‘পোতা’ হইবার অবস্থা।

দিনকু দিন বালি অপোচর ।

দিনকু দিন বড়ই অপার ।

পাচেরী ডেই পাট অপণাবে ।

পাধ পাধ করি পুরে গভীরাবে ।

খরাবেলে বালি পিটই ঝাঙ্কি ।

চালুখিলে গোড় পড়ই ভাজি ।

হুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাতিয়া চলে কাহার সাধ্য ! বাড়ির লোকজনও সব পার্বতীর নিকট অভিযোগ জানাইতে লাগিল, নিজেরও ছুড়োপের নাই শেষ। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মা খেপিয়া গেলেন, মুখ নীচু করিয়া ক্রট হইয়া বসিয়া রহিলেন, আর হাসীদের বসিয়া দিলেন—‘আজ আর আমার ঘরে খাবার হইবে না ।’

এতক বিচারি দেবী পার্বতী ।

কৃষি বসিআস্তি বহন পোতি ।

হাসীকু বইলে হর ঘরী ।

আজি মো পুরে নোহিব ঘটনি ।

ইতিমধ্যে শিব বাড়ি আসিয়া উপস্থিত—কাবার কোপীন, বিভূতি ভূষণ, হাতের অন্তের ইলি, ব্রহ্মে চড়িয়া দেব ত্রিলোচন বীরেন্দ্রের আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত করিলেনই না, বরক অভ্যর্থনাকে কোপ করিয়া কিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

কোপে গউরা বসিছন্তি হটি ।

∴ ∴ ∴ লোকনাথকু ন অইলে পাছোটি ।

ত্রিলোচন বসিলেন, কিছু একটা ঘটনা আছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ করিয়াছেন। একরূপ কেত্রে স্বামীঘের কন্নীর কি শিবের তাহা জানা আছে, তিনি নানাপ্রকার চাইবাঁকে

১ পত্ৰ পূজন, ঐশ্বর্যবস্ত্র বোহাতি বর্জক সম্পাদিত, গাতি প্রহালা ।

পৌরীর জ্যোৎস্বহিতে শীতল জল ঢালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিব বলিলেন :

কি লো গউরি তোর বিরল মন।

কি অবা ন দেখি খন বসন।

জগজ্জ্যোতিষী সৃষ্টি করতা।

মৈষমবহিনী শিব-হৃদিতা।

অনুর সংসারি বধিছু সৃষ্টি।

সবু দেবতা কলে পুষ্যসৃষ্টি।

সবু দেবতাই চরণে তোর।

বর দেইগলে অমরপুর।

সুখতি বজ্র হু সুখরা ককর।

সকল সঙ্কট উদ্ধারি ধর।

অন্ধ ভাগিলে দেউ চক্ষুধান।

অপুত্রি লোককু দেউ নন্দন।

হরিত্র লোককু কুবেব ককর।

বধিলে ছব গছ ককর হার।

কাহিঁকি বসিছু মউন হোই।

তোব বুদ্ধি কি ত উপায় নাহিঁ।

এইরূপে ত্রিলোচন বধন বহুত চাটুবাণ্য বলিলেন তখন পৌরী প্রসন্ন হইলেন ; ঘনধ্বাস ছাড়িয়া বামচক্ষু ডলিয়া মুখ তুলিয়া অভিমানের সুরে অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন শিবের কাছে,—মনের কথা সবই তোমার গোচর, তবু কেন এত ছাঁদ ? দুবের লোকে কত বেদনা জানায়—তাহাদের নিস্তার কর, কিন্তু যবের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, শুধু বজ্র-বস করিয়া দিন কাটাইতেছ। যবের কথায় ত তুমি কিছুই লাগ না, কিন্তু বালি পড়িয়া পুণী যে এখন ‘পোতা’ হইবার উপক্রম তাহাব খোজ বাধ কি ? পার্বতী অভিমানে ভৎসনা করিয়া বলিলেন :

সবু চড়েইব দেখ ববত।

বসা খোজুধান্তি অনববত।

বসা ন ধাউ সে কেউ বেবস্থা।

তুমু গিনা কিছি ন লগে চিন্তা।

বনের বত পাখী—তাহাদেরও দিনচর্যা দেখ, অনববত তাহারা বাসা খোজে। বাসা থাকিবে না এ কেমন ব্যবস্থা ? কিন্তু এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই চিন্তা।

পার্বতী এইখানেই ধামিলেন না, আরও যা দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন, দিক্কার দিতে লাগিলেন নিজের নারী-ভাগ্যকে ; বলিলেন, এমন বর কেন জুটল আমার কপালে—চিরদিন একাকিনীই সামলাইতে হইল সব। বাকল-বহন পড়িয়া কলমুলাহারে অরণ্যে বসিয়া বাজিদিন যবের অস্ত তপস্তা করিয়াছিলাম, তাহার কলই এই কলিয়াছে।

এতটা আবার শিবের সহ হইল না, বলিলেন—আমায় বরে পড়িয়া তোমায় এত চিন্তা ও কোত ! তবে :

কটাল হেলা গো গ্রাম নৃপতি।

তাহাবি কিল্পা নোহিলু যুবতী।

সর্বাঙ্গে হুঅন্ত বস্ত্রভূষণ।

মোটাং দেবী পাইলু কণ।

কহিবু বেদে হাতপত্র দেবা।

অস্ত বর বাছি ছল লো বিভা।

কেটাল হইয়াছে গ্রাম-নৃপতি, কেন তাহার যুবতী হইলে না ? সর্বাঙ্গে বস্ত্রভূষণ থাকিত, আমার কাছে শুধু কষ্ট পাইলে। যদি বল ত হাতপত্র (বিবাহবিচ্ছেদের পত্র) দিব, তখন অস্ত বর বাছিয়া বিবাহ করিও।

শুনিয়া দেবী লজ্জিতা হইলেন। মহাদেবও মরম হইয়া বলিলেন, বালি বালি করিয়া চিন্তা করিতেছ, বালির ব্যবস্থা আমি কালই করিব। সকল সেবককে শিব ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন,—দেখ, দেবী পার্বতী বড় কোপ করিয়াছেন, বালির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমরা :

টোকাই কুন্ডাই শিউলি বেতা।

বলি বোহিবা কু হেছ শকতা।

সিংহ ভয়াক্র পোখবী সবি কি।

বালি বোহি যিবা দিন চারি কি।

“টোকাই কুন্ডাই শিউলি বেতা”—যাহাতে যাহাতে করিয়া বালি বহন করা যায় সব লইয়া আশিয়া সিংহভয়্যাব হইতে পুকুরের পথ পর্যন্ত দিন চারিও মধ্যে সব বালি সবাইতে যাইব। শিবের আজ্ঞা পাইয়া রজনী প্রভাতে স্নান সারিয়া এবং বাহার বাহা কিছু নিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাডাকি করিয়া জড় হইল। কড়া লাগিল না কড়ি লাগিল না—দেখিতে দেখিতে সব বালি পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগিল :

ভোগ পাঅন্তি ঈশ্বর-পার্বতী।

ভোগ সারি করি কলে ভোজন।

ভোজন করি কলে আকমন।

তজ্জ চটাইলে বিড়িয়াপান।

বিড়িয়াপানকু খট নুপাতী।

হবব হোইলে দেবী পার্বতী।

হব-পার্বতীক পদে শরণ।

দোষ ক্ষমা কর সৃষ্টি কারণ।

গাইলা লোককু বৈকুণ্ঠ বাস।

শুনিল লোক পাণ বিব নাশ।

হব-পার্বতীও এই লীলা-শ্রবণে আমাদেবও পাপনাশ না হোক মনের আনন্দ বহিত হোক।



# অন্ধ আখির কক্ষ কুসুম—

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

ধাক্ এ-রজনী

ধাক্ বেন মণি-মালায় মতন

গাঁথা এ-রতন

কণ্ঠান্তরণে গাঁথু ধাক্—

স্বতির সপ্তনরীর দীপ্ত-মিহির

ভিমিরে ডুবে ধাক্ ।

সাইবার বাহা,—পাইবার নহে—

ধাক্‌বার নহে চলে ধাক্—

ওয়ে,—ধাক্‌বার বাহা শুধু ধাক্ ।

রিম্‌ কিম্‌ করে আঁধার রজনী

বেপথু বন্ধে কান পেতে গণি

প্রতি পদ চার ছন্দ তাহার

মর্মে পশিছে শ্রবণপথে,

এসেছে রজনী, তামসী রজনী

প্রায়শী রজনী মানস বধে ।

ধাক্ এ-রজনী, ধাক্‌ দিনমণি

শিশিরের মুখে অরুণ বরনী

উষার লোহিত লাজ রজনী

—প্রসন্ন করি রেখে ধাক্—

সাইবার বাহা, পাইবার নহে—

ধাক্‌বার নহে,—রাখিবার নহে

যক্ষের মত বন্ধেতে বহে

হয় মাটি নয় হবে ধাক্ ।

ওয়ে,—সাইবার বাহা, ধাক্‌বার নহে

যেতে যে তাহারে চলে ধাক্—

সাইবার নহে, ধাক্‌বার বাহা—

নিবিড় বাধনে বেঁধে রাখ ।

ঘটে যে ঘটনা তাহার ঘটনা করা সে মিছে

অঘটন-পটীরণী এ তামসী সবার পিছে ।

মসৌজ্জ্বল পটভূমিকায়

আলোকের রেখা লেখা দেখা যায়,

দ্বিধা তামস তামসলগ্নানি স্ফুটিয়া উঠে—

নহে শতদল, সহস্রদল,

কালিরহহের পক্ষপটে ।

কক্ষ কেশব, কক্ষ পলাশ

কক্ষ পরাগ উড়ে রাশেবাশ

উর্দ্ধে পুগন ভয়ায় পবন পাগড়ি টুটে

ধাক্ এ-রজনী বাঁধা হয়ে ধাক্—

বাবজীবন বৃন্ত টুটে—

চিব মুহূর্ত গাঁথা হয়ে ধাক্

কালিরহহের মর্ষপটে ।

নিশার ভিমির প্রাঙ্কে উষার

অগ্নিশিখায় পলিলে তুষার

পিরি কক্ষয় বজ্র বিহারি

গৈরিক ধারা বয়ে ধাক্

( তাহে ) যায় নাকো বাধা জেনে রাখ ।

অন্ধ নিশ্চল পুরাণো পাষণ

খুণ ধরা হাড় হবে খান্-খান্

ভয় নাই নাই—ভয় নাই তবু

ভয় ভাবনায় কেন জবুধবু ?

সিদ্ধুর মাঝে লয় হয়ে বাবি

বিস্ময় মত পলকে,—

উর্দ্ধ আঁধার,—নীল পারাবার

নিখিল ভূ-লোকে ছ্যালোকে,

( তার ) মিলাবি মিলন-পলকে ।

কি হবে ? তা হবে যা হবার হবে

কিটিয়া দাঁড়াবি জীবন-আহবে

উর্দ্ধ ললাটে বীর গৌরবে

চিব নির্ভয় হয়ে ধাক্—

( ওয়ে ) ভাঙিবার বাহা—ভাঙিবেই তাহা

নিঃশেষে ভেঙে-চুরে ধাক্ ।

গড়িবার বাহা গড়িয়া উঠিবে

অগদলন পাথর টুটিবে

বটের আঁকুরে প্রাণ উঁকি দিবে

চেতনার চঞ্চল,—

আঁধারে হাতাড়ি বাহু বাড়াইবে

ভঞ্জন যত পাখীরা আসিবে

পথের পথিকে ছায়া পসারিবে

পাখীবে পক্ষ কল ।



শাখার শাখার শ্রামল পত্র

ঝরাবে ঝঞ্জাবাত—

নিহাষ অনল নিবারে বাহুল

বরষিবে দিবাবাত ।

বটের আঁকুর বেঁচে থাক

পানী উড়ে যায় উড়ে থাক

( শুধু ) থাকিবার বাহা স্থাপুয় মতন

অচলারতন হত থাক

( বত ) বৃক পাবাণ পড়ে থাক ।

পাটলিপুত্র—আজি সে কুত্র ?

ইন্দ্রপ্রস্থ নাহি থাক—

( শুধু ) থাকিবার বাহা ভূ-তলে অভলে

এই পৃথিবীর স্থতির নিতলে

ঢাকা থাক ।

তবু এ-রজনী নহে নশ্বর

নহে ‘নশ্রাৎ’ কাল-কলেবর

তাহার কেশের কালিমার লেশ-

টুকু অবিনশ্বর

( আজি ) যে রজনী যায়, বৃকে বেধে যায়

ভিলক লিখিয়া নত নীলিমায়

যাতের তারকা দিবসে লুকায়

সুচতুর নিশাচর ।

ডাই । নৃত্য নৃপুয় বাজারে ছ’পায়

আবার লক্ষ্য্য বধন বনায়

মিট্ মিট্ করে ডাইনী তাকায়

মরে নাকো জেনে রাধ ।

( ভরে ) সেই রজনীর কাজল পরেছি চক্রে

( ডাই ) বৃহ লকায়ে নিহুতে আসি অলক্ষ্য্যে

নিতি ) নিশীথিনী আসি কহে বহন্ত বৃহ থাক,

( ভনি ) তার পরচার ধমনী আমার

রক্তে লাগায় সাত পাক ।

ধাক্ এ-রজনী

ধাক্ যেম মণিমালায় মতন

গাঁধা এ-রতন

কণ্ঠান্তরণে গাঁধা থাক—

স্থতির সপ্তনরীর দীপ্ত মিহির

তিমিরে জুবে থাক ।

সেই মোর লাধা, সে মোর প্রেরণী

অনৌম আকাশে মালা গাঁথে বসি

সে-মালা আমারে পরাইবে বালা

সেই পরকালে শুনে রাধ,—

অসহ বিরহে সে সহ-মরণে

মরিবে আমার জেনে রাধ ।

( এই ) বৃহ আলোক বহু বাচাল

কবি পরিহার হবে মহাকাল

দ্বিবা তিমির অঞ্জন দ্বিরে

জাগাইয়া দিবে চিরকাল

( সে যে ) এই রজনীর চোখের কাজল

আমার মনন করিবে লজল

অসিত বরণ নিকর কথিত ছ-কূলে

তাহার আঁচল দ্বিরিবে আমার

দ্বিষণের মোহ ফুরুলে ।

মুক্তকেশীর চিকুবেব মাঝে

মেঘ-ডব্বরে ডব্বরু বাজে

নিবিড় তিমির পরিমণ্ডিত পরিবেষ্টিত ধরা

তিমিরে তিমির ভরা—

কুক কুসুম-সুধমা-সুযতি-বতলে পাগল করা ।

বা’ কিছু গভীর বা’ কিছু গ্রহন—

চির বহন্তে ভাসে মগন

জীবনের আগে মৃত্যুর পথে—

অবাক্ত মনস গম্য,

হেথায় মিলায় সকল বর্ণ

বুধাই মণি-মাণিক্য বর্ণ

বেধায় নির্বাণ লভিয়া পুরাণ

পায় তমিস্র রম্য,—

সেখা, আলোকের প্রবেশ নিষেধ

প্রবেশিলে নয় ক্রম্য ।

( ডাই ) আলো যায় থাক—কালোটুকু থাক

বাইবার বাহা সব চলে থাক

বাইবার নহে থাকিবার বাহা

ডাই শুধু পড়ে থাক

( শুধু ) অন্ধ আঁধির কুক কুসুম

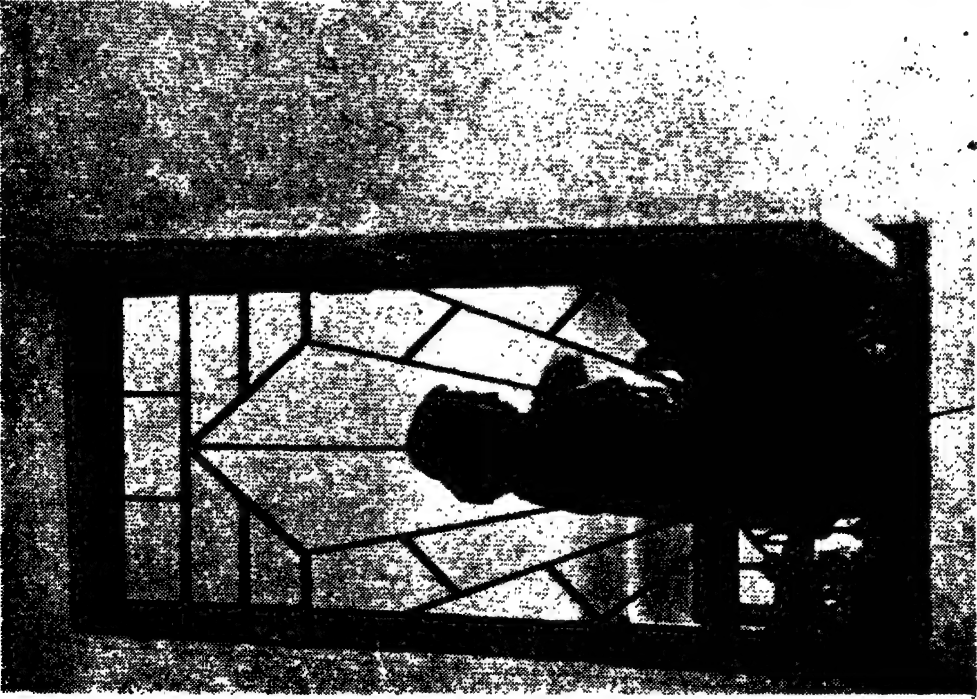
এই রজনীটি থাক ।



কালী

শ্রীচন্দ্র মণি কল

( কাহিনী ১৮৪৫ চইতে পুনর্মুদ্রিত )



বন্ধিনী

কবিতা : সৌরেন মুনসী



নির্ভানে

কবিতা : বাগন বাগচী

# লালমহা

শ্রীবিভূতিভূষণ  
শ্রীশ্রী

শ্রীমতী এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া' থেকে বেরিয়ে এলেও মন থেকে ধানিক পূর্বের ঘটনাগুলিকে বিদায় করতে সক্ষম হ'ল না।  
বারে বারে তার মনে হতে লাগল যে, কেমন করে সে সুখাদার সঙ্গে এতখানি রুচি ব্যবহার করতে পারল। অথচ এই সুখাদাকে সে কত শ্রদ্ধা করত। এ শ্রদ্ধা তিনি এমন পান নি। কিন্তু মাসের পথ মাস, বছরের পর বছর ধরে তিনি যা প্রজ্ঞান করেছিলেন, কত স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই তা খুঁয়ে বসলেন। বটমানের স্বপ্ন অতীতের সব কিছু একেবারে ধুয়ে-মুছে দিল। এতটুকু অসুস্থতা কেউ দেখাতে রাজী নয়। তার নিজের ব্যবহারেই আজ এ কথা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

কিন্তু কেন? কিসের জগৎ সুখাদা আজ এই পথে নেমে এলেন? কি এর কারণ? মানুষের জীবনের পটপরিবর্তন ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে দেবতা এমন দানবে রূপান্তরিত হবে! শেষ পর্যন্ত ভুলুয়া সর্দারের মেয়েকে—শ্রীমতী নিজের মনে কথা করে উঠল, সে কোন অজায় করে নি বরং সুখাদাকে প্রসন্ন দিলেই অজায়কে প্রতিপালন করা হ'ত। হীরের আংটিটা ফেরত দিতে পেরে সে খুশী হয়েছিল। আজ ক'দিন ধরেই ওটা একটা খিঁসিহ বোঝা হয়ে তার মনের উপর চেপে বসেছিল। আজ সে বাধা নামিয়ে দিতে পেরে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শ্রীমতী পায় পায় তার শরন কক্ষে এসে উপস্থিত হ'ল। মনটা গর বড় চুল্লি হয়ে উঠেছে। ঠিক এই মুহুর্তে তার বারে বারে ডাক্তার বাবুর কথা মনে পড়ছে। দিন কয়েক ধরে তিনি এ মুখোষ নি। ইতিমধ্যে দু'দিন টেলিফোন করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

কেউ বলে, এমন মাঝে মাঝে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। ডাক্তার-বাবু ছানাপোনা কি কম মনে করেছেন বৌদিরাণী? ওদের পাঁ পোষাতেই ডাক্তারবাবু ফকির।

শ্রীমতী বিম্বিতকণ্ঠে বলল, আজ নতুন কথা শোনাতে কেউ। সব কথা এর আগে কখনও শোনাও নি ত?

কেউ এক মুখ হেসে কৃতার্থকণ্ঠে জানাল, আমরা চাকর-বাকর ছ'। জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলতে নেই। নইলে ডাক্তার বাবু হাসপাতালের কথা কে না জানে?

শ্রীমতী প্রশ্ন করে, হাসপাতালের সঙ্গে ছানাপোনার সম্বন্ধ কি কেউ?

কেউ হেঁ হেঁ করে ধানিক হেসে বলল, অজ্ঞে ওখানে যাঁরা আসেন-যান উনি তাঁদেরকে ছানাপোনা বলেন। ওদের চিকিৎসা-পত্র ডাক্তারবাবু নিজের পরসার করেন।

শ্রীমতী পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কত বড় হাসপাতাল কেউ?

কেউ জবাব দিল, বড় আর হবে কেমন করে? চিকিৎসা করে ত আর পরসা পান না।

শ্রীমতী বিম্বিতকণ্ঠে বলল, পরসা পান না মানে!

জিব কেটে কেউ জবাব দিল, পরসা নেন না যে—উন্টে দিয়ে আসেন। গরীব ছেলের জগৎ আবার একটা খুল করে নিয়েছেন।

শ্রীমতী হেসে বলল, তোমাদের ডাক্তারবাবু তা হলে অনেক পরসা আছে বল।

কেউ বলল, আজ্ঞে তা ত জানি না। তবে ডাক্তারবাবুর দিলটা খুব বড়। আমাদের বাবুও তাঁকে খুব মান্তি করেন।

শ্রীমতী হাসি মুখে বলে, করেন বৃদ্ধি? আচ্ছা কেউ, তোমাদের ডাক্তারবাবু থাকেন কোথায়?

কেউ গভীরভাবে ম'থা নাড়তে নাড়তে জবাব দেয়, ঐ এক মস্ত দোষ ডাক্তারবাবুর। তিনি বস্তীতে থাকেন। বস্ত সব পূবে বাংলার বেদান লোকগুলির সঙ্গে। আমাদের বাবু কি এখানে থাকবার জগৎ কম খোশামোদ করেছেন! উনি পূবে বাঙলার লোক কিনা। বড় গোঁ। সং জবাব দিলেন, তোমাদের দালান কোঠায় আমার কাজ নেই।

শ্রীমতী বলল, ওখানেই বৃদ্ধি ডাক্তারবাবুর হাসপাতাল আর খুল?

নইলে আর কোথায়? কিন্তু বৌদিরাণী, হলে হবে কি বস্তী—বেজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কেউ মুহুর্তে বলল।

শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে কতদূরে ডাক্তারবাবুর বস্তী-বাড়ী কেউ?

জবাব দিতে গিয়ে মুখ তুলেই কেউ ধামল। তার দৃষ্টি অসুস্থবর্ণ করে শ্রীমতী লেবল অদূরে নিঃশব্দে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তারবাবু। শ্রীমতীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি হেসে

বললেন, ডাক্তার বাবু বস্ত্রীবাড়ীর খোঁজ করছিলেন কেন মা ? ওসব  
যায়গা ত তোমাদের জন্যে নয় মা ।

কে বলে ওকথা কাকাবাবু । বরং এঁটেই আমার উপযুক্ত  
স্থান । একটুখানি হেসে শ্রীমতী বলল, কথাটা তা নয় । খোঁজ  
নিজিলাম আপনার । আজ তিন চার দিনের মধ্যে একবারও দেখা  
দিলেন না । ডাক্তার বলে অস্থির বিষয় হতে পায়বে না এমন ত  
কোন কথা নেই—

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে খানিক অভিমান ফুটে উঠল । ডাক্তার-  
বাবুর কানেও তা স্পষ্ট ধরা পড়ল । ভালই লাগল তাঁর । তিনি  
সহাস্তে বললেন, এ বুড়োর ভক্ত তুমি এত ভাবতে শুরু করেছ মা—  
এতটা কি সম্ভব হবে আমার ।

শ্রীমতী কোন জবাব দিল না ।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, ভবিষ্যতে ক্রটি দেখলে সংশোধন  
করে দিও মা ।

শ্রীমতী লজ্জা পেল । মুহূর্তে বলল, ও আমার কি কথা  
কাকাবাবু । ক্রটি আমার কোথায় হ'ল আপনার, আসলে আমারই  
ভাল লাগছিল না । তার উপর আমাদের বাগানের মালী-বউয়ের  
বক্ত অস্থির । মালী এসে কঁদে পড়ল ।

ডাক্তারবাবু সহসা গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, বোকা লোক-  
গুলির কি রেবে ঢেকে চলবার উপায় আছে মা । কিন্তু ভাবছিলাম  
চাকরিটি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারব কিনা ? বে কড়া মনিব ।

শ্রীমতী মুহূর্তে বলল, এ কথা বলছেন কেন কাকাবাবু !

ডাক্তারবাবু তেমনি গাঙ্গীরা বজায় রেখে বললেন, আজ মালী-  
বউ, কাল খোপা-বউ, পরশু ডাইকারের শাদা, তার পরে দেখা দেবে  
পাড়াপড়সীর পালা । এত ঝামেলা পোহাতে গিয়ে হয় ত রুটিন-  
বাধা কাজে দেখা দেবে অবহেলা । শেষ পর্যন্ত চাকরিটি ধোয়াব  
না ত ?

এতক্ষণে শ্রীমতী যেন কিছু আশঙ্কিত করতে পেরেছে । সে  
হেসে বলল, খোয়াতে হয় আপনি খোয়াবেন । তার জগে আমার  
অন্ত ভাবনা নেই ।

ডাক্তারবাবুও সে হাসিতে যোগ দিলেন । বললেন, তুমি ত  
আমার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী মা ।

ঠাট্টার কথা নয় কাকাবাবু । শ্রীমতী বলল, নিতান্ত বিপদে না  
পড়লে আপনাকে বাস্তব করব না । আপনার যে কত কাজ সে কি  
আমি জানি না মনে কবেছেন ? তা ছাড়া বহু কথা চিন্তা করতে  
গেলে কাজের চেয়ে নিজের মনকেই র্ত্তন দিয়ে বসব । আমাদের  
ঘার কতটুকু সাধ্য ।

ডাক্তারবাবু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, এটা একটা কথাই  
নয় শ্রীমা । মানুষই মানুষের কথা ভেবে থাকে । নইলে  
নিজের কাছেও সময়তে কৈফিয়ৎ দিতে হয় । কিন্তু সাবধান,  
নিজেকে ভুল করেও প্রকাশ কর না । বিশেষ করে তোমার  
দুর্লভতা । তা হলেই ভীড় লমবে । যার প্রয়োজন আছে সেও

আসবে, যার নেই সেও ভিড় বাড়াবে । কিন্তু আর না, চল যাই,  
তোমার মালী-বৌকে একবার দেখে আসি গিয়ে ।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, তাই বলে হুলো-পায়ে যাবেন—একটু-  
ক্ষণ বসে গেলে হ'ত না ?

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, না মা, তা হলে বসেও শান্তি  
পাব না । যখন বসব তখন বসবার মত করেই বসব ।

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আপনি বড়  
ভাল কাকাবাবু ।

ডাক্তারবাবু সঙ্গেহে বললেন, তুমি নিজে ভাল বলেই এ কথা  
বলতে পেরেছ । আমি ত বরং তোমার মালি বৌকে এড়িয়ে যেতেই  
চেষ্টেছিলাম । কিন্তু তুমিই যেতে দিলে না । নাও এবারে চল ।

চলতে চলতে শ্রীমতী বলল, এখন মনে হচ্ছে গরজ আপনারই  
বেশী, কিন্তু প্রস্তুতিও তুমিই অমন করে উঠলেন কেন ?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, ওটা অভ্যাসের দোষ ।  
মনে বাই থাক না কেন মুখে তার প্রকাশ ঘটলেই আর বাঁচবার  
কোন উপায় থাকবে না । বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁদের কি-এর  
জোরে আত্মরক্ষা করেন, আর আমাদের মত অধ্যাত্মদের করতে  
হয় মুখের জোরে ।

শ্রীমতী শ্রদ্ধা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, আপনি কিন্তু এদের গোষ্ঠীর  
কেউ নন কাকাবাবু ।

ডাক্তারবাবু শ্রাণ খুলে হেসে বললেন, না মা, এটা ঠিক কথা  
বল নি । নাম চাই, পরমা চাই, আত্মরক্ষার জন্য রূঢ় কথা বলি,  
তবুও তুমি এ কথা বলবে ? তিনি আর একদফা হেসে উঠলেন ।

মালিবৌর সামান্ত জ্বর । যদি বুকে আছে, কিন্তু তার লজ্জা  
বাস্তব হবার কিছুই নেই ।

অলক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে শ্রীমতী পুনরায় তার  
শয়নকক্ষে ফিরে এল । বলল, আপনার খুব তাড়া নেইত  
কাকাবাবু ।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, তাড়া থাকলেই কি তুমি  
আমার এখন যেতে দেবে ?

শ্রীমতী জবাব দিল, আপনার কাজের ক্ষতি করে ধবে রাখব—  
এই কি আপনি মনে করেন ?

ডাক্তারবাবু স্নেহ-কোমলকণ্ঠে কথাটা সংশোধন করে নিয়ে  
বললেন, উল্টো করে বলা হয়েছে মা । আমার বলা উচিত ছিল  
যে, কাজের তাড়া আমার যতই থাক একবার এসে যখন পড়েছি  
তখন অত সহজে কি চলে যেতে পারি ?

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, কথাটা আমার সব সময় মনে থাকবে ।  
বলেই হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবু জুতোর কিতে খুলতে শুরু করে  
দিল ।

ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন না । বরং পঞ্চম তৃপ্তির সঙ্গে পা  
ছাঁচানি এগিয়ে দিলেন ।

জুতো জোড়া খুলে বাইরে রেখে এসে শ্রীমতী বলল, আমি

কিবে না আসা পর্যন্ত একটু বিশ্রাম করে নিন। দেখি হবে না আমার। শ্রীমতী দ্রুত পদে পদ ছেড়ে চলে গেল। এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘরোয়া কলেবরে কিবে এসে সলজ্জ-হাসিতে মুখ উজ্জাসিত করে বলল, একটু দেখি হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু স্নেহে বললেন, তা একটু হয়েছে, কিন্তু তুমি অমন করে নেয়ে উঠলে কেমন করে?

শ্রীমতী মুহূর্তে বলল, এ বাড়ীর নিয়ম কানুনের গুণ্ডি ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। আপনাকে আমি ঠাকুর চাকরের হাতের সিনিস খাওয়ার পরে পাব না। উঠুন। বাথ রুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, তা না হয় উঠলাম, কিন্তু আমাকে যে খাওয়ার পরেই হবে তার কি কথা আছে?

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত বলল, তা কেমন করে হবে? আপনি যে খেতে ভালবাসেন।

ডাক্তারবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, বিশেষ করে তোমার হাতের ব্যাথা। এ বুড়োকে তুমি ঠিক চিনেছ মা। এতটুকু ভুল কর নি। বলেই তিনি বাথরুমের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

কিবে এসে খাবার আয়োজন দেখে ডাক্তারবাবু উৎকলিত হয়ে বললেন, আয়োজন দেখছি নিতান্ত কম কর নি তুমি।

শ্রীমতী মিস্তি করে একটু হাসল, জবাব দিল না। বস্তুতঃ আয়োজন সত্যিই কম করে নি শ্রীমতী। এমন কি ডাক্তারবাবুর প্রিয় খাদ্যও দু'একটি ব্যবস্থা করতে সে ভুল করে নি।

ডাক্তারবাবু সহসা একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন, শ্রীমতীর তাড়িৎ এড়াল না। এমন কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক সময় তিনি গেলেন তাকালেন। বললেন, মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। দেহ বলে, আর পারি না। সে বিশ্রাম চায়। কিন্তু এ চোখ রাতিয়ে কি বলে জান?...

শ্রীমতী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, না।

ডাক্তারবাবু বলেন, মন বলে এটি কর না। কর্তব্যে বাদ দিলে দেহও টিকবে না—মনও বাঁচবে না। তার চেয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও। ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। মন সব ছেড়ে-ছুড়ে গাময় মায়ের আশ্রয়ে চলে আসতে চায়।

শ্রীমতী উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, তা হলে আমিও বেঁচে পাই কাকাবাবু। পৃথিবীটা বড় আজব স্থান। একজন খোজে রাজ—আর একজন খোজে বিশ্রাম। আপনার খানিকটা বোঝা আমাকে বইতে দেবেন? এমনি করে তুয়ে-গড়িয়ে সময় আমার যায় কাটতে চায় না কাকাবাবু। এমনি করে মানুষ কখনও চেষ্টা পাবে কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু বলেন, কাজের অভাব আছে নাকি? কত কাজ মিস চাও?

শ্রীমতী বলল, আমি অভাবের কথা বলছি না। এখানে আমার চেয়ে লোক বেশি তাই—

ডাক্তারবাবু হেসে উঠে বললেন, তাদের ঠিকভাবে চালানও একটা মন্তব্য কাকাবাবু।

শ্রীমতী মুহূর্তে বলল, তার ক্ষেত্রে আবার এক নতুন হাউস-কীপার এসেছেন। এখানের এই অনাবশ্যক ভিড়ের মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি কাকাবাবু। নিজেকে বড় অসহায়—বড় বেমানান মনে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রেই আমি আপনার কাজে সাহায্য করতে চাইছি। আমি কাজ পেলে বেঁচে যাব।

ডাক্তারবাবু সহাস্তে বললেন, কাজের অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছ বাকি?

শ্রীমতী মুখের হেসে বলল, অবর্ণনীয় কষ্ট কাকাবাবু—কিন্তু এসব কথা পরে হবে, আপনি আগে খেতে স্নান করুন। নইলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু বাধা ছেলেদের মত খাওয়ার মন দিলেন। পরে পর খানকয়েক লুচি ও গোটা কয়েক মিস্তি গলাধকরণ করে পুনরায় মুখ তুলে কিছু বলবার উপক্রম করতেই শ্রীমতী শাসনের ভঙ্গীতে বলল, উহ, আগে খাওয়া তার পরে কথা—

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, কথা বলতে বলতে না খেলে এত খাবার উঠবে না যে মা।

ডাক্তারবাবু কথা বলায় ধরনে শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, তা হলে না হয় গল্প করতে করতেই খান। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ করে খেতে হবে সে কথাও আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি।

দরজার পাশ থেকে নবনিযুক্ত হাউস-কীপার সবে গেল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়তেই ডাক্তারবাবু বললেন, উনিই তোমাদের হাউস-কীপার বাকি? উনি চান কি?

শ্রীমতী অগ্রাহ্য করে বলল, সেটা উনিই ভাল জানেন। ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

ডাক্তারবাবু সায় দিয়ে বললেন, ওটা না থাকাই ভাল মা। তাতে মনও ভাল থাকে মাথাও হালকা থাকে। তাই বলে চোখ বুজে কোন-কিছুকে অবজ্ঞা করাও উচিত না। সময় মত সাবধান হতে পারলে অনেক অভিযুক্ত হুঁচকনা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আমার কথাটা মনে রেখ।

বাথরুম—শ্রীমতী দ্রুতজ্ঞকণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু আপনি একে-বারেই কথা বাত্বছেন না কাকাবাবু। শুধু গল্পই করছেন, থাচ্ছেন না কিছু।

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, ওটা বয়েসের দোষ মা। বলেই তিনি পুনরায় আহায়ে মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ হাত এবং মুখের কাজ একসঙ্গে চলতে লাগল। সহসা একটা কথা মনে পড়তেই তিনি খাওয়া বন্ধ করে বললেন, কথায় কথায় আসল কথাটাই তুলে বসে আছি। তখন থেকেই কথাটা বার বার মনে হয়েছে। একে একটা বোগাবোগ বলা যেতে পারে—অর্থাৎ কার্যকারণে ইচ্ছা-পূরণের পথে রয়েছে মন্তব্য অন্তরায়—

শ্রীমতী বিমিতকণ্ঠে বলল, কিসের বোগাবোগ কাকাবাবু ?  
অন্তরায়টাই বা কি ?

ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি খুজে বেড়াচ্ছ কাজ আর আমি  
পাচ্ছি না কাজের লোক। অথচ তোমাকে আমি ডেকে নিতে  
পারছি না।

শ্রীমতী বলল, কেন পারেন না ? বাধা কোথায় ?

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন,  
তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মত এবং পথ এক নয় একথা আজ আমার  
কাছে আর অজানা নয়। কিন্তু তবুও আমার আশা আছে যে,  
এই বিপরীতমুখি দুটি ধারা একদিন একই বিন্দুতে গিয়ে মিলবে—  
শ্রীমতীর মুখে বড় বিচিত্র একটুকরো হাসি ফুটে উঠল, এ  
অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে কাকাবাবু ?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী। আমার কথাটা  
তোমার বোঝা উচিত ছিল। গতি-পথকে একটু একটু করে বাঁকা  
করতে থাক তা হলেই বিন্দুটির সন্ধান পাবে। নইলে অনন্ত কাল  
থয়ে চলেও ধামতে আর পারবে না। যত কিছু দেখবার যত কিছু  
অন্বেষণ করার তার থেকে বঞ্চিত হয়েই একটা জীবন কেটে যাবে।  
জীবনে সমস্তা যেমন আছে—সমাধানও আছে। বহুরের পর  
বহুর যারা লড়াই করে তারা শুধু উত্তেজনার স্বাদটাই পেয়ে থাকে—  
শান্তির নয়।

শ্রীমতী সহসা বেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। বলল, আপনার  
কথাগুলি ঘুমের মত নয় কিন্তু মুক্তি নেই—বড় একতরফা কথা।

পাগলী মা। ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে উঠল, তিনি  
বললেন, তুমি ঠিক বলেছ মা। আমিও মুক্তির লড়াই করতে  
বসি নি। আমি আমার মাকে তার সত্যিকার উপযুক্ত স্থানে দেখতে  
চাই। রাতে বিদে পেলে অস্কেচে হাত পেতে এসে ঝাঁপাতে  
পারি—কিন্তু শ্রীমা, তোমার ঐ হাউস-কীপারটি এমন চোরের মত  
আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন বলতে পার ?

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর বদলে গেল। সে বলল, জানি না। তবে  
মনে হয় এটাও ওর কাজের একটা অংশ। ওর মত ওকে চলতে  
দিন। এক সময় আপনিই খেমে যাবে।

ডাক্তারবাবু ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাহিরে তা  
প্রকাশ পেল না। সে ত দেখতেই পাচ্ছি, তিনি বললেন, কিন্তু  
অন্তহর শেষ পর্য্যন্ত মাথা ধারাপ হয়ে গেল নাকি ? ঘরে-বাইরে  
কোথাও যে আর বন্ধু কেউ থাকবে না। তুমি শুধু একটা দিক  
চিন্তা করছ, কিন্তু আমি ভাবছি এতে যে শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেই  
সবচেয়ে অসুখী হবে এটাও অতঃস্বাবু বোঝে না ?

শ্রীমতী অস্তমনস্ব ভাবে বলল, আপনাকে ত খুব শ্রদ্ধা করেন  
শুনতে পাই—

ডাক্তারবাবু একটু হাসলেন, বললেন, বহু লোকের কাছে  
বহুবার শোনা কথা। কিন্তু বিশ্বাস করে এক পা এগুতে পারি

নি। অতঃস্বাবু যত বড় ধনী তার চেয়েও বেশী খেরালী। খেরাল  
হলে তিনি শ্রদ্ধাও করতে পারেন আবার খেরালের বশে ছুড়ে কেলে  
দিতেও তার আটকায় না।

একটু খেমে তিনি পুনরায় বললেন, আজ আর বসব না মা,  
মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী বলল, তা হোক, তবুও আপনাকে বসতেই হবে। আমি  
না আসা পর্য্যন্ত চলে যাবেন না যেন। সে ক্রত প্রস্থান করল।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে বসে আছেন। কোন দিকে তাঁর হাঁস  
নেই। হাউস-কীপার পুনরায় দেখা দিল। হঠাৎ ডাক্তারবাবু  
দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তিনি একটু নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে  
বসলেন। মনে মনে তিনি রীতিমত শক্তিত হয়ে উঠেছেন।  
কোথার জল কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভাবতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি-  
বোধ করছিলেন। এমনি সজাগ-প্রহরার কোন সহজ অর্থ তিনি  
খুঁজে পেলেন না। 'তানকান-আগরওগালা চক্র' অতঃস্বাবু এতদিনের  
অভ্যাস জীবনযাত্রাকে সম্মুখে নাড়া দিয়েছে এ খবর তিনি পেরেছেন,  
কিন্তু তাই বলে ঘরের প্রবন্ধাওয়ারকে এমন করে বিস্তৃত করে তুলতে  
সে অগ্রণী হ'ল কিসের জগা !

ডাক্তারবাবু হাউস-কীপারকে আহ্বান জানালেন। সে ঘরে  
আসতেই ডাক্তারবাবু তাকে প্রশ্ন করলেন, কতদিন হ'ল তুমি বহাল  
হয়েছ ? তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করছিলেন।

মুহু জবাব এল, দিন সাতেক হয়েছ—

ডাক্তারবাবু সোজা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ বুঝি সকলের  
উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ?

পুনরায় জবাব এল, আপনি বা খুশী অহুমান করে নিতে  
পারেন—

তার উত্তর দেবার ধরনে ডাক্তারবাবু সাবধান হলেন। বললেন,  
আমি এ বাড়ীর ডাক্তার। যখন-তখন আসা-যাওয়া করতে হয়,  
তাই শব্দাশব্দ নিচ্ছি। তোমার নামটি কি, বলবে কি ?

একটু হেসে মেরেটি জবাব দিল, মিত্রা রায়।

ডাক্তারবাবু মোলায়েমকণ্ঠে বললেন, সুন্দর নাম তোমার।  
মিত্রা রায়। এর আগেও বুঝি এ কাজ তুমি করেছ ?

মিত্রা জবাব দিল, না, এই প্রথম। আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস  
করবার নেই বোধ হয়। আমার অনেক কাজ—যাই।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বুঝি।  
তোমার অনেক কাজ। কাজের মেয়ে তুমি। আচ্ছা যাও।

মিত্রা চলে যেতে শ্রীমতী এসে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞেস করল,  
মিত্রার খবরাখবর নিচ্ছিলেন বুঝি ?

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, নেবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু  
বাপার কি শ্রীমা, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি ?

শ্রীমতী সহজ ভাবেই বলল, হ্যাঁ কাকাবাবু। আপনার সঙ্গে  
আজ হাসপাতাল দেখতে যাব।



ডাক্তারবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, অতঃপর যবে কেবল সময় হয়েছে যা। এই সময় তোমার চলে যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে?

শ্রীমতী বলল, তার জঙ্গে আমার ভাববার কিছু নেই। চাকর-বাকর আছে, হাউস-কীপার মিত্রা বার রয়েছে। প্রয়োজন হ'লে আরও নতুন লোক পাওয়া যাবে। আমাকে আমার মত করে ক'টাদিন চলতে দিন কাকারাবু—

ডাক্তারবাবু অসম্মত হয়ে পড়লেন। বিষয় খোঁজা এই মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে অনেকগামি উদ্ধৃতি গিয়েছে। যে প্রশ্ন তৃতীয় ব্যক্তি হয়েও তার মনে জেগেছে তা শ্রীমতীর মনে বহু পূর্বে দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তাই হয়ত আঘাতকে আঘাত দিয়েই ঐতিহ্যের ব্যবস্থা করতে চাইছে সে।

শ্রীমতী পুনরায় তাগিদ দিতেই ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যাবেই যখন চল মা'। হয়ত এরই আজ প্রয়োজন আছে।

১৮

শ্রীমতী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেড়িয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই অতঃপর ফিরে এল। মিত্রা তার আবশ্যকীয় কাপড়-চোপড় এগিয়ে দিয়ে মৃতকণ্ঠে জানাল, বৌদিবাণী আপনাদের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বার হয়ে গেছেন। খবরটা আপনাকে দিয়ে দিতে বলে গেছেন।

অতঃপর জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কোথায় আবার গেলেন? ডাক্তারবাবু কখন এসেছিলেন?

মিত্রা বলল, ঘণ্টা দুই আগে তিনি এসেছিলেন। বৌদিবাণী তাঁর খাতির-বড়ো কোন জট রাখেন নি। একটু খেমে, একটু ইতস্ততঃ করে পুনশ্চ বলল, আপনি কিন্তু অমথ্য আমাকে যথেষ্টেন। মিথ্যা আপনার টাকা খরচ হবে। হাউস-কীপারের আপনার কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।

অতঃপর একটু হেসে বলল, কিন্তু তোমার ত প্রয়োজন আছে মিত্রা।

মিত্রা মৃতকণ্ঠে জবাব দিল, আমার প্রয়োজন আছে বলেই আপনি অকারণে দেবেন কেন? তা ছাড়া কাজ না করে হাত পেতে টাকা নিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

অতঃপর জবাব দিল, নতুন কথা শোনো মিত্রা। কাজ যা যা করে না তারাই সব সময় দাবি করে—এইটাই ত এতদিন দেখে এসেছি।

মিত্রা বলল, আপনি কি দেখেছেন পেটা আমার জানার কথা নয়। আমি যেটা অনুভব করেছি তাই আপনাকে বললাম।

অতঃপর বলল, ওটা তোমার ভাববার কথা নয় মিত্রা। তোমাকে কখন কোন প্রয়োজনে আমি ব্যবহার করব তা তোমার দেখবার প্রয়োজন নেই। কাজ আপনি দেখা দেবে।

মিত্রার মুখে গানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি।

অতঃপর বলল, তোমাকে নিয়ে আসায় ডানকান-আগারওয়াল

মনে করেছিলে কর্মক্ষেত্রে এটা তোমার অবনতি, কিন্তু আমি মনে করি তোমার পদোন্নতি হয়েছে। তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাকে ওদের নোংরা বড়বস্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কথাটা আমার সব সময় মনে আছে মিত্রা।

মিত্রা বিনয়ানতকণ্ঠে বলল, আমার একান্ত হৃদনে আপনি আমাকে চাকরি দিয়ে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আর আমি করেছি আমার কর্তব্য।

অতঃপর হেসে বলল, অতঃপর তোমাকে মিথ্যা অনুগ্রহ দেখায় নি মিত্রা। তার প্রমাণ তুমি নিজেই। হিসেব সে খুব ভাল বোঝে।

মিত্রা সশঙ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার ভান করে প্রফুল্লকণ্ঠে জবাব দিল, নষ্টলে আর এত বড় ব্যবসা চালাচ্ছেন কেমন করে!

অতঃপর খুশী হয়ে বলল, সবটাই আমার কৃতিত্ব নয় মিত্রা, তোমার মত আমার আরও কয়েকজন হিতৈষী কর্মচারী আছে বলেই বেঁচে আছি। এমনি কবেই দুনিয়াটা চলে। নইলে দুদিনেই বসাতলে যেত। কিন্তু তোমার চরিত্র এখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে।

মিত্রা কোন জবাব দিল না। একটুখানি হাসল।

অতঃপর বলল, হাসির কথা নয় মিত্রা।

মিত্রা বলল, আমিও আপনার একজন সাধারণ কর্মচারী। অভাবের জন্ত চাকরি করতে এসেছি। অভাব মিটে যাবে এ আশাও যখন মনের মধ্যে আছে—

কথার মাঝে খেমে মিত্রা দ্রুত প্রস্থান করল এবং অলক্ষণে মতো ফিরে এসে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে বলল, না কেউ নয়। আপনার কেউ ওখানে দাঁড়িয়েছিল।

কথাটা গ্রাহ্যে মতো না এনে অতঃপর বলল, আমার অনেক দিনের চাকর—খুব চিত্তাকর্ষকী।

মিত্রা বলল, সত্যি কথা। আপনার উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। আপনার হিতাকর্ষকী দেখছি সংখ্যায় অনেক।

অতঃপর তার কথাটা যেন গুনতে পার নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে অজ প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, তোমাদের দেশ কোথায় মিত্রা?

মিত্রা একটু যেন চমকে উঠেছে মনে হ'ল। সে বলল, সে পাঠ চুকে-বুকে গেছে।

অতঃপর বলল, অর্থাৎ পূর্ব-বাংলায়। কিন্তু কোথায় ছিল সেইটেই আমার জিজ্ঞাসা।

মিত্রা বলল, ফরিদপুর কোটালিপাড়া। কিন্তু আজ আবার নতুন করে এ প্রশ্ন কেন স্মার?

অতঃপর একটুখানি হেসে পুনরায় বলল, এর আগেও জিজ্ঞেস করেছি বুঝি? মনে নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা। শোন হাউস-কীপার, এখুনি কেটকে ডেকে আমার আপিস-ঘর খুলে দিতে বল।

মিত্রা স্টিজেন্স কবল আপনি কি এখনি—

তাকে বাধা দিয়ে অতম বলল, প্রশ্ন কর না। যা বলছি তাই কর। ওদের সঙ্গে আমার আজ শেষ হিসেব-নিকসের দিন। ককটেলের নেমস্তন্ন করেছি। হ্যাঁ...আচ্ছা মিত্রা দেবী, হঠাৎ তুমি এদের গ্রাস থেকে অতমকে বাঁচাতে গেলে কেন, আমায় বলবে কি?

মিত্রা সচলকণ্ঠে বলল, ওটা এখনও আমি ভেবে দেখি নি। তবে ওদের অসঙ্গত চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচাবার কথাটা যে মনে এসেছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

অতম পরিহাসের চলে বলল, অথচ এর পছন্দে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই না?

মিত্রা সাবধানতা অবলম্বন করল। বলল, উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ কেউ করে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অতম হেসে উঠে বলল, ভাল, ভাল। তুমিও দেখছি বেশ চমৎকার শুদ্ধি দিয়ে কথা বলতে জান তোমার পড়াশুনা কতদূর মিত্রা?

মিত্রা বিব্রতকণ্ঠে বলল, খুবই সামান্য। আমার আবেদন-পত্রে সে কথা লেখা আছে।

অতম তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করে তাতে বারকয়েক টান দিয়ে বলল, তুমি জানিয়েছিলে বটে, কিন্তু আমাদের আগারওয়ালা আর ডানকান বলে ওটা মিথ্যা।

মিত্রার চোখ-মুখে বিবস্ত্রের চিহ্ন ফুটে উঠলেও সে সংবতকণ্ঠে বলল, আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন আর?

অতম জবাব না দিয়ে পার্টা প্রশ্ন করল, এ কথা বলবারই বা অর্থ কি মিত্রা দেবী?

মিত্রা মুহূর্তে বলল, কথাটা আমার নয়—যারা বলেছে তাহাই আপনার প্রাক্তন সঠিক জবাব দিতে পারবে।

অতম বলল, আরও অনেক আপত্তিকর কুস্ত্রী ইঙ্গিত করেছে।

মিত্রা ভিতরে কৈপে উঠলেও প্রকাশে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এ কথা ওরা বলতে পারে অতমবাবু। ওরা যে বোকা নয় বুদ্ধিমান এইটাই আর একবার জানা গেল। আপনাকে বাজিয়ে দেখছে। সাবধান হয়ে তাদের নাড়াচাড়া করবেন, এটা আমার অনুরোধ।

অতম মুহূর্তে হেসে বলল, তোমার অনুরোধটা সমরোপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই। ওরা একটা-কিছু অগ্রহান করে নিচ্ছে—সেইটাই বাচাই করে দেখছে। এ অভিযোগ তাহাই প্রতিক্রিয়া।

প্রসন্ন হাসিতে মিত্রার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, আপনি আমাকে বাঁচালেন। বলতে বলতেই সহসা খেমে সে কেঁপে উঠকণ্ঠে ডাকল, কেঁপে উপস্থিত হতে তাকে অতমের আদেশ জানিয়ে দিল।

কেঁপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতম বলল, জান মিত্রা, মানুষকে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই—করেও শাস্তি নেই।

মিত্রা প্রশ্ন করল, এ কথা কেন?

অতম বলল, বিশ্বাসভঙ্গের অসংখ্য নজির আমার আশেপাশে রয়েছে বলেই এ কথা বলছি। কথাটা পুরোপুরি শেষ না করেই সে আচমকা অল্প কথায় ফিরে গেল, আচ্ছা মিত্রা, তোমাকে আমার এখানে আসবার আগে আর কোথাও দেখেছি কি?

এই ধরনের কথাবার্তায় মিত্রা অস্থিতবোধ করছিল, কিন্তু প্রকাশে বধ্যচক্র শাস্তকণ্ঠে জবাব দিল, এ কথার জবাব আপনিই ভাল দিতে পারবেন।

অতম বলল, তুমি ঠিক বলেছ মিত্রা। আমার মনে হয় তোমাকে আমি ঘুমের ঘোরে কোথাও দেখেছি। তাই প্রকাশ্য দিনের আলোয় ঠিক...

মিত্রা কথার মাঝে তাকে ধামিয়ে দিয়ে হেসে উঠল। পর-মুহূর্তেই গভীরকণ্ঠে বলল, আপনার মনের মধ্যে সন্দেহ বাসা বেঁধেছে তাই ঘুমিয়ে দেবেন স্বপ্ন, জেগে উঠে দেখেন তাহাই বিভীষিকা।

অতম বার কয়েক মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই মিত্রা। বিশ্বাস কাউকেই আমি পুরো করতে শিখি নি।

মুহূর্তে মিত্রা বলল, যাদের আপনি বিশ্বাস করেন না তাদের আপনার চলার পথ থেকে সরিয়ে দেন না কেন?

এটা কালের কথা হ'ল না মিত্রা—অতম বলল, তা হলে নিতান্তই একক জীবন কাটাতে হয় যে। যা একেবারে অসম্ভব। মানুষ কখনও তা পারে না।

মিত্রা মুহূর্তে বলল, বুঝতে পারলাম না।

অতম হেসে বলল, বুঝতে না পারার মত এটা কি শক্ত কথা মিত্রা?

মিত্রা ধীরে ধীরে বলতে থাকে, সত্যিই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি এত স্পষ্ট বলেই বলছি। এর পরেও কেউ বিশ্বস্তভাবে আপনার স্বার্থ রক্ষা করে চলবে বলে কি আপনি মনে করেন আর?

পারি বৈ কি মিত্রা দেবী, অতম হাসিমুখে বলল, যারা সত্যিই বিশ্বস্ত তারা আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। ওরা সব আলাদা স্রোতের মানুষ।

আর যারা তা নয়? মিত্রা বলল।

অতম বলল, যারা বিশ্বস্ত নয় তাদের কথা বলছ ত মিত্রা? তাদের আমি আরও ভাল করে চিনি। না বোঝার ভান করে পাশে থেকে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। দিনরাত খোসামোদ করে চলে, কিন্তু এমন মজা যে, জেনে-শুনেও সহজে এদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—নিতান্ত প্রাণের দায় না হলে।

মিত্রা সন্ধ্যা খাপছাড়া ভাবে বলে বলল, আপনি ত তা হলে  
আপনার স্ত্রীকেও বিশ্বাস করেন না—

অতঃ হো হো করে হেসে উঠল। তার হাসির বজায় মিত্রায়  
কথাটা প্রায় ভেসে গেল। সে গভীরভাবে বলল, প্রশ্নটা অত্যন্ত  
অপ্রাসঙ্গিক আর অসঙ্গত হলেও উত্তরটা জেনে নাও মিত্রা রায়।  
অতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাউকেই এক ভিল বিশ্বাস করে না।  
তুমি এখন যেতে পার। তোমাকে আর আমার দরকার নেই  
এখন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাই।

মিত্রা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতঃ চোখ বুজে সোকার উপর নিঃশব্দে বসে আছে। ভাব-  
ছিল নিজের আচরণের কথা। মিত্রায় মত একটা মেয়ের সঙ্গে  
কিসের জগৎ সে এ ভাবে আলোচনায় যোগ দিল? ডানকান-  
আগরওয়ালা চতুর্দিক সন্ধান সে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাই বলে সে  
হানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলছে নাকি? একে আরও ঢের বেশি  
সমাধি করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। একজনকে কাছে যে বিশ্বাস  
গাঙতে পেরেছে প্রয়োজন চলে যে, সে তার একজনকেও ছেড়ে  
থাকবে না একথা তার বোঝা উচিত। এই কথাটাই সে  
প্রকারান্তরে মিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

ডানকান আগরওয়ালার তার বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা আজ  
তখন নয়। তবে আজকের প্রয়োজন তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।  
আজ তারা ঈদরকলে ঘরা পড়েছে। অতঃ জানে, ছুটে না এসে  
তাদের উপায় নেই। এক কথায় সিংহাসনচ্যুতি তারা মেনে নেবে  
।। নেওয়া সম্ভব নয়। তারা প্রাণপণে মুক্ত করবে। অতঃ  
এর জট প্রস্তুত হয়েই আছে।

অতঃ চিন্তার সূত্র ছিড়ে গেল। জীমতী ফিরে এসেছে।  
অতঃ দেখেও দেখল না। কথাও কইল না।

জীমতীই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?  
অতঃ জবাব দিল, তুমি চলে যাবার পরেই—এই ঘণ্টা-তিনেক  
বে।

জীমতী কথাটা গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে ততই অতঃ তাকে  
বলে বলল, ডানকানবাবু এ বাড়ীর কাম্বাচী আর তুমি গৃহিণী, এ  
খাটা তুমি সব সময় ভুলে যাস।

জীমতীর মুগ্ধভাব কঠিন হয়ে উঠল। সে একবার ঘূরে দাঁড়িয়ে  
ততঃকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, তোমার উদ্দেশ্য কি?

অতঃ শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, একটুও অস্পষ্ট নয় যে, না  
আমি ভান করছি। তুমি এখন যেতে পার।

তার কথায় ধরেন জীমতী প্রায় অলে উঠতে গিয়েও আত্মসম্বরণ  
হল এবং আর একবার তার পানে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে ঘর ছেড়ে  
ল গেল।

অতঃ যেন অকাহণেই মেঝের কারপেটে তার জুতা ঘষছে।

কেউ এসে ডানকান-আগরওয়ালার আগমন সংবাদ দিতে  
ততঃ উঠে দাঁড়িয়ে শিব দিতে দিতে বাইরের পথে পা বাড়াল।

১৭

ডানকান এবং আগরওয়ালার সত্যিই ছুটে এসেছে। সন্ধ্যা  
শিব দেওয়া বন্ধ করে অতঃ কেউকে জিজ্ঞেস করল, ওদের ঘর খুলে  
বসিয়ে এসেছ ত?

তাদের ভিতরে ঢুকতে দেয় নি দরওয়ান—কেউ জানাল।

অতঃ মুখে খানিক হাসি ফুটে উঠল। কারখানা থেকে তাড়া  
খেয়ে এসেছে। অতঃ নিজেকে নিজে বলল।

কেউ বলল, তা হলে কি করছ আপনাব?

হুঁকুম! এর পরেও কি ওরা চলে যাবে নি? অতঃ জিজ্ঞেস  
করল।

আজ্ঞে না, ওরা দেখা না করে যাবে না। তাই ত আপনাকে  
পর দিতে এলাম। কেউ বলল।

বলেন ত ঘর খুলে বসাই—

অতঃ সাপের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তাই করে কেউ! আমার  
এতদিনের পুংনো পাটনার, তাদের এভাবে দরওয়ান অপমান  
করল কেন জান তুমি?

আজ্ঞে তাকে নাকি আপনিই হুঁকুম দিয়ে এসেছেন? কেউ  
চোখে বিশ্বাস।

অতঃ বলল, তা নিয়েছিলাম—

অতঃ অশ্রুমনস্কভাবে লক্ষ্য করে পুনরায় কেউ বলল, তা হলে  
কি ওদের ঘর খুলে দেব?

নাও—আমি একটু পরে আসছি। অতঃ হুঁকুম নিতেই কেউ  
এত চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে মিত্রা এসে  
উপস্থিত হল। সে কোনপ্রকার ভূমিকা না করে বলল, আপনি  
কি ওদের—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অতঃ বলল, আদর করে বসাতে  
বলে দিলাম। ভয় নেই, ওদের বিষয়টা ভেঙে দিয়েছি। যত  
খুশী আদর করলেও—

সময় পেলে আবার বিষয়টা গজাতে পারবে আর। তাকে  
বাধা দিয়ে মিত্রা বলল।

অতঃ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, তা পারে, যদি সময় পায়।  
কিন্তু তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে মিত্রা। অতঃ  
ভাল।

মিত্রা চুপ করে থাকে।

অতঃ পুনরায় বলে, বাবে নাকি আমার সঙ্গে ওদের অভিযান  
জানাতে?

মিত্রা চমকে উঠল।

অতঃ হেসে বলল, থাক তোমাকে বেতে হবে না। দুই থেকেই  
না হয় ওদের অভিযানের বহরটা দেখে আসবে চল।

অতঃ এগিয়ে চলল।

ডানকান এবং আগরওয়ালাকে বসিয়ে কেউ বিনীতকণ্ঠে  
বলল, আমাদের দরওয়ানটা একেবারে বুনা। খান্নী লোকের

সম্মান দিচ্ছে জানে না শেঠ সাহেব : আমার সাহেব আপনাদের খাতির-বন্ধ করতে বলেছেন। সোডা, হুইচ্চি আনব কি ?

ডানকান ক্রিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, আমরা তোমার সাহেবকে চাই। হুইচ্চি, সোডা নয়। বেরাকুক কোথাকার।

তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অতমু এসে ঘরে প্রবেশ করল। শাঙ্ক-ধীরকণ্ঠে বলল, ডানকান সাহেব বোধহয় ভুলে গেছেন যে, কেউ আমার চাকর আপনার নয়। কথাটা ভুলেও কোনদিন ভুলবেন না।

ডানকান এবং আগারওয়ালার হুঁজোরা চোখই একসঙ্গে জ্বলে উঠে পরমুহূর্তে নিভে গেল। অতমুর সাবধানী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়লেও সে প্রকাশে একটি কথাও না বলে হৃৎপদে এগিয়ে গিয়ে একখানি চেয়ার দখল করল।

কথা বলল আগারওয়ালার, ডানকান হয়ত মাথা ঠিক রেখে কথা বলতে পারে নি অতমুবার। আপনারই চাকর যদি আপনাকে বাড়ীতে চুকতে বাধা দেয় তা হলে আপনার মনের অবস্থাতা কেমন হয় তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

অতমু কঠিনকণ্ঠে বলল, তা হলে সে চাকরকে চাবুক মেয়ে নিজেই পথ করে নিতে আমি একবিন্দু থিথা করতাম না। কিন্তু পরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করতে গিয়ে গলাধাক্কা খেলে সে স্বপমান নিঃশব্দে হজম করা ছাড়া উপায় কি আগারওয়ালার সাহেব !

ডানকান পুনরায় মেজাজ দেখিয়ে বলল, আপনার এই বেআইনী কাজের জন্ত অমুতাপ করতে হবে।

অতমু উত্তাপহীন-কণ্ঠে বলল, বেআইনী কাজের জন্ত সকলেরই অমুতাপ করা উচিত। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন সাহেব। বেআইনী লোভ আপনাদের বঞ্চিত করেছে এই কথাটা মনে রেখে ভবিষ্যতে পথ চলবেন।

ডানকান পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠতেই তাকে ধামিয়ে দিয়ে আগারওয়ালার ঘীরে ঘীরে বলল, আপনি বড় গোলমালে কণ্ঠা বলছেন বাবু সাহেব। এ বড় তাজবের কথা। আমরা জানলাম না অশচ রাতারাতি কারবারে অধিকার হারালাম। জিজ্ঞেস করতে পারি কি আমাদের জায়সঙ্গত অধিকার থেকে হঠাৎ দেবার ক্ষমতা আপনাকে কে দিল ?

অতমু ভাবলেন হীন চোখে তাদের পানে তাকিয়ে সাপের মত হিস হিস করে বলল, এ প্রশ্নটা নিজেদের করুন। জবাব খুঁজে পেতে দেবি হবে না।

ডানকান বৈধাভাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। চাঁৎকার করে বলল, ভগ্নমীর একটি শেষ আছে। চলে এস আগারওয়ালার। আমাদের প্রস্নেহ কেমন করে জবাব আদায় করে নিতে হয় তা দেখে নেব। গায়ের জোরে হুনিয়া চলে না।

অতমু বরকের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ডানকান সাহেব। আমার ধারণা ছিল কারখানা থেকে তাড়া খেয়ে তোমাদের চৈতন্য হবে, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের

গায়ের চামড়া ঢের বেশি মোটা। কিন্তু শেষ বাবের মত শুনে যাও যে, সে চামড়া ভেদ করবার মত বুলেট আমার কাছে বহু আছে বলেই তোমাদের মুখোমুখী দাঁড়াবার আয়োজন করেছি।

অতমু ধামল, তার কথার আঘাতে ওদের মুখের চেহারায় কতখানি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সে পুনরায় বলতে শুরু করল, তোমাদের বন্ধুর মত বিশ্বাস করে-ছিলাম, তাই আমার ব্যবসায় অংশীদার হতে পেরেছিলাম। তাই বলে তোমাদের কারবারের মালিক হতে দিতে আমি পারি না। আমার সামগ্র্য বেতনের একজন কন্সটারীর বটটুকু সততা আছে তোমাদের মধ্যে সেটুকুও নেই। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ সাহেব ?

ডানকান পুনরায় চাঁৎকার করে উঠল, Don't talk nonsense।

অতমু ডানকানের রাগ দেখে হাসল। কোন জবাব দিল না। আগারওয়ালার ডানকানকে নিয়ে বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করল। তাকে ইঙ্গিতে বাদামুবাদ করতে নিষেধ করলেও সে ধামাতে পারল না। ডানকান ক্ষীপ্তের জায় বলে উঠল, দুটো বাজে কথা বলে আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন মনে করে থাকলে আপনিও মারাত্মক ভুল করেছেন।

অতমুর মুখে অবজার হাসি দেখা দিল। সে বলল, তুমি আবার আমাকে হাসালে সাহেব। তোমাদের এত বড় ক্রিম-বোজগারের পথটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল আর তোমরা চুপ করে থাকবে, এ কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। আমিও তা করি নি। আর তার জন্তে তৈরী হয়েই আছি। তোমাদের জাল জুরাড়ির প্রত্যেকটি নজির আমার কাছে আছে। খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। তোমাদের সায়োস্তা করতে তার যে কোন একটাই যথেষ্ট।

অতমু আর একবার তেঁসে উঠল। ওকি আগারওয়ালার সাহেব ! তোমার মুখটা অত কাল হয়ে উঠল কেন ? ভয় নেই, তোমাদের জাল ধরিয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু নিজেদের জালে যদি তোমরা ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড় আমি তোমাদের মুক্ত করতে পারব না এই কথাটাই জানিয়ে দিলাম। ডানকান, তুমি একটু বেশি চেঁচামেচি করছিলে। ওটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ সে তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান।

ডানকান তথাপি চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আবার বলছি, আমরা চুপ করে থাকব মনে করলে ভুল করেছেন।

অতমু হেসে বলল, ডানকান সাহেব কি ভয় দেখাতে চেষ্টা করছেন ?

ডানকান উত্তপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, ও কাজ আপনিই ভাল পারেন।

অতমু থমক দিল, খাম ডানকান সাহেব। স্পর্ধা তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ, বাবুদের বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।

কেউ কাছাকাছি কোথাও ছিল, ছুটে এল।

অতঃ পুনরায় বলল, এর পূর্বেও যদি তোমাদের কিছু বলবার থাকে আদালতের মারফৎ জানিও। জবাব পাবে। এবারে তোমরা যেতে পার।

ডানকান এবং আগরওয়ালা নিশ্চয়ে বেবিয়ে গেল। কেউ ওদের সঙ্গে গেল।

ওরা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই অতঃ তার পাইপে অগ্নি-সংযোগ করল, এবং চোখ বুজে টানতে শুরু করল।

ডানকানগুট্টিকে সে বিতাহিত করেছে। গুরুতর তাদের অপরাধ। অজ্ঞার ভাবে সেয়ায় ছড়িয়ে অতঃকে তারা উদ্বেদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেক এগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। অতঃর ভক্ত তৈরী দড়িয় কাস অজ্ঞাটিক ওদেরই গলায় আটকে গেছে। টানাটানি করতে গেলে নিজেদেরই মৃত্যু ডেকে আনবে।

সময় থাকতে মিত্রা অতঃকে সাবধান করে দিয়েছে। ডাক্তারও করেছিল। একবার নয়, বহুবার, কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারে নি। মিত্রাকেও সে অবিশ্বাস করতেই চেয়েছিল। সে হাতে কবে নিয়ে এল প্রমাণ। অতঃর বিশ্বাস সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই মেয়েটিকে ডানকান-আগরওয়ালার অমুরোবেই মাথা হয়েছিল। আর দশটা সাধারণ কর্মচারীর চেয়ে ওকে আলাদা চোখে সে কোন দিন দেখে নি। হলোই বা সে মেয়ে।

পাইপের ধোরা কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে শূণ্যের পথে ভেসে চলেছে। আর তারই আবর্তের মধ্যে সহসা এসে মিত্রা দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে। এই দুই-ভেঁ মিত্রা আর সাধারণ নয়। বরং একটু বিশেষভাবেই অসাধারণ মনে হচ্ছে। ওর হাসির মধ্যে একটা দৃঢ়-সঙ্গ। মিত্রা আজ তার কাছে অনঙ্গ।

অতঃ পুনরায় জোরে পাইপে টান দিয়ে একরায় ধোরা শূণ্যে নিক্ষেপ করল। ডানকান চলে গেছে। চলে গেছে আগরওয়াল। ডানকানের বুদ্ধিটা একটু মোটা। আগরওয়াল সতর্ক। তাই সে কথা বাড়ায় নি। গোলমালের স্বত্বেও সন্ধান পেয়েই ধেয়ে গেছে।

মিত্রাকে ওরা চেয়ারে বসিয়েছিল। সে ওদের পথে বসিয়েছে। ডানকান-আগরওয়ালকে কটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসে কেউ খবরটা অতঃকে দিল, বলল, ওরা খুব গালমন্দ করছিল।

অতঃ জবাব দিল, আমি জানি—সে পুনরায় চোপ বন্ধ কবে খুঁপানে আত্মনিয়োগ করল।

আরও কিছু সময় নিশ্চয়ে অপেক্ষা করে কেউ পুনরায় বলল, আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন?

অতঃ চোখ না খুলেই জবাব দিল, হুঁ—তুমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যাও কেউ। আজ আর কেউ যেন আমাকে বিস্তৃত করতে আসে না।

কেউ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেই লঘু পদে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল মিত্রা। মার্ক্সার মত নিশ্চয় তার গতি। শুনেও না পাবারই কথা, তাই অতঃর মূহু আহ্বানে সে চমকে উঠল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস মিত্রা। অতঃ চোখ বুজেই বলল, তুমি যে আশে পাশেই উপস্থিত থাকবে তা আমি জানতাম। কিছুক্ষণ মিত্রার মুখে কোন কথা যোগাল না।

অতঃ অত্যন্ত মুহুকে বলল, খুব অবাক হয়ে গেছ বুঝি?

মিত্রা তথাপি নিরুত্তর।

অতঃ বলতে থাকে, খুব ভয় পেয়ে গেছিলে তুমি। ওরা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে একটুও বাজে কথা বলে নি।

মিত্রা এতক্ষণে মুখ খুলল, আমার সঙ্গে আমি ভাবি নি সত্য।

ভারী আশ্চর্য কথা শোনালে মিত্রা, অতঃ হেসে উঠে বলল, তা হ'লে ওখানে লুকিয়ে ছিলে কেন মিত্রা দেবী? আর এত হুঁড়বনায় পড়েছিলে কার স্রষ্টা?

মিত্রা সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ডানকান-আগরওয়ালকে ভয় পাচ্ছিলাম। তারা এত সহজে চলে যাবে আমি ভাবতে পারি নি।

অতঃ তার পাইপে পুনরায় গোটাকয়েক টান দিয়ে হেসে বলল, শোন মিত্রা—আমার ঠাকুর্দা ছিলেন জমিদার। এক ছটাক জমির স্রষ্টা হাসতে হাসতে গোটাকয়েক কাঁচা মাথা দেহ থেকে নামিয়ে দিতে কোন দিন বিধা করেন নি। আমার অবস্থা জমিদারী নেই, কিন্তু দেহে সেট একই রকম বইছে। তাছাড়া আমার বা কিছু শিকা তা তাঁরই কাছে হয়েছে। কথাটা শুনে রাগ।

ক্রমশঃ



## জটীর জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

( ১২ )

নীচেই প্রস্তরকলকে স্পষ্ট লেখা আছে—ত্রিযুগী পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উপরে মন্দির পর্যন্ত পথের দূরত্ব তিন মাইল। সে পথ নীচের বাজী-সড়কের মত অত প্রশস্ত ও মন্থন নয়। লোকজন আর ছাগল-মেঘের পারের তাগিদে স্রষ্ট হইয়াছে সেই পাকদণ্ডী পথ; ওর স্থিতিও সেই সব পারেরই তাক্‌নায়। কেনার পথের অধিকাংশ বাজীই অতিরিক্ত চড়াই ভাঙবার কষ্ট এড়াবার জন্য বৈকল্পিকভাবে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরকে এড়িয়ে বান বলে সবকালের তেমন নজরও নেই এই পথটুকুর দিকে।

অমনি পাকদণ্ডী পথ আছে উপর থেকে বিপরীত দিক দিয়ে শোণপ্রয়াগের পুলের মুখে নীচের এই বাজী-সড়কের সঙ্গে জংশন পর্যন্ত। তারও দূরত্ব ঐ তিন মাইল। অঙ্কের হিসাবে মোট ছয় মাইল হলেও নীচের বাজী-সড়ক দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে ঠিক অতটা দূরত্ব এড়ান যায় না—মাইল দুয়েক হাঁটতেই হয়।

তাই কবেছিলাম আমি—আগের দিন যেমন বলেছিলাম গঙ্গোত্রীকে, পর দিন কাজেও তেমন। ত্রিযুগীনারায়ণকে মাথায় ঘেঁষে পাহাড়ের কোন্‌র বেরে বেরে উত্তরাই পথে সোজা এগিয়ে গেলাম গৌরীকুণ্ডের দিকে। মাইল চারেক অতিরিক্ত চড়াই-উত্তরাই পথ চলবার ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পেল আমার ক্লান্ত দেহ।

তবু মনে মনে লাভ-লোকসানের হিসাব গতিয়ে দেখি—ঠিক, লাভের ঘরে তেমন কিছু নজর পড়ছে না ত! শোণপ্রয়াগ পর্যন্ত উত্তরাই পথ। গতি তাতে দ্রুততর হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিশ্রম কিছু কম হয় না। তার পর শোণপ্রয়াগের পুল পার হবার পরেই চড়াই শুরু হ'ল। কঠিন চড়াই এটি। ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াইকে এড়িয়ে এসেছি বলেই বুঝি কেনার পথের এই গৌরীশৃঙ্গ তার প্রতিশোধ নিতে চায়। পথের প্রকৃতিও বদলে গিয়েছে এ পারে। শোণপ্রয়াগ পর্যন্ত নিবিড় বন ছিল। এপারে পথের দু'পাশে বন-স্পৃহিত পরিবর্তে দেখছি লম্বা লম্বা এক রকম ঘাস। আর চার দিক থেকেই বেন পাহাড়গুলি এগিয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরছে। এদিকেও গভীর বাদ আমার দক্ষিণে। থেকে থেকেই শূলবিন্দু অঙ্গদেব দেহের মত মল্লিকানীর বিপুল, কুটিল জলধারা চোখে পড়ছে। কিন্তু অদৃষ্ট হয়েছে মল্লিকানীর বিশাল উপত্যকা। ওপারের পাহাড় এখন অনেক কাছে মনে হয়। পারের নীচের পথও ক্রমশঃই সরু হয়ে আসছে। গঙ্গা দুই বাজ প্রান্ত পাথুরে পথে সম্ভরণে পা কেলে হাতের লাঠির ঠক ঠক শব্দ শুনে অতি কষ্টে পথ চলতে চলতে বেশ বুঝতে পারছি যে, এ কালের উন্নত স্থপতি-

বিভাগ হাব মেনেছে এই মাসল হিমালয়ের কাছে। বেকে বসে-ছেন গিরিবাণ—সড়ক বানাবার জন্য আর সূচ্যত্র ভূমিও তিনি ছেড়ে দেবেন না।

আসল কথা, ভূমিই এখানে নেই, বা কেটেকুটে সড়ক তৈরি করবে বাস্তবকার। শোণপ্রয়াগের পুল পার হয়েই দেখেছিলাম এক পাহাড়ী কিশোরকে। জলের ধারে সে খুঁড়ছে খানিকটা জায়গা, তার পর পাথর বেছে বেছে মাটি ভরছে একটি ছোট খুঁড়িতে। ঐ মাটি সে শিঁটে করে বের নিয়ে বাবে গৌরীকুণ্ডে। আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলেছিল যে, উপরে মাটি পাওয়া যায় না বলেই তার মূনির তাকে পাঠিয়েছে নীচে থেকে মাটি নিয়ে যেতে।

তখন বিশ্বাস হয় নি ছেলেটির কথার। কিন্তু যত উপরে উঠছি ততই বুঝতে পারছি যে, একবর্ণও মিথ্যা বলে নি সে। গৌরীকুণ্ডের পথে পাহাড় পাহাড়ই। ওর মধ্যে মাটি যদি থাকেও ত স্বর্গের মাটি তা—মর্ত্যের মাছুষের কোন কাজেই লাগবে না।

কঠিন পথ পারের নীচে, কঠিন চড়াই ভেঙে উপরে উঠছি। ত্রিযুগীনারায়ণকে এড়িয়ে এসে কি যে লাভ হ'ল তা বুঝতেই পারছি না।

দেহের শ্রান্তির চেয়েও মনের অবসাদ বেশী।

বোঝাই ত বেশীর ভাগ পথ একা একাই চলেছি আমি। কিন্তু আজ নিজেকে আমার বেন বড় বেশী নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

কেবল নিঃসঙ্গ নয়, নিজেকে বেন পরিত্যক্ত বোধ করলাম তাঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেই। রামপুর থেকে মাইল-খানেক পথ একসঙ্গেই এগেছিলাম। হানি-গল্পে বেশ কেটেছিল সময়টুকু কিন্তু ত্রিযুগী-পাহাড়ের পাদদেশে আসতেই তাল কেটে গেল।

আমি যে উপরে যাব না তা বুঝি এতক্ষণে বিশ্বাস করেন নি গঙ্গোত্রী। যখন অবিশ্বাস করবার উপায় আর থাকল না তখন ক্ষুর হলেন তিনি। কিন্তু মায়ে-ঝিয়ে তাঁরা হাসিমুখেই বিদায় নিলেন আমার কাছ থেকে।

খুবই স্বাভাবিক তাঁদের পক্ষে—তাঁরা আমার পথের সাথী বই ত নন। তবু বেন অপ্রত্যাশিত আমার কাছে। একটা বেন যোচ্ছ লাগল আমার বুকের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম জিতেনের মুখের দিকে—সে ত আমার নিজের দলের লোক, আমার লক্ষ্য-ভাই। বেশ খানিকটা প্রত্যাশা নিয়েই বললাম তাকে, তোমার না গেলে হয় না, জিতেন?

কিন্তু তুমি কেবল বিরক্ত নয় সে, একটু বেন ফটও। উত্তরে সে বললে, এখন না গেলে আর কি সুযোগ পাব কোন দিন ?

কি উত্তর দেব। উত্তরের জন্ত অপেক্ষাও করল না জিতেন ; তার তব করে উপরে উঠে গেল সে। মিনিট দুয়ের মতোই চক্রবর্তীকে নিয়ে ওদের চার জনের দলটি একটি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনে তাকিয়ে দেখি যে, আমার পথ একেবারেই অনশ্রু—আমাদের কুলিরাও গোঁরীকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

জানি কে, ঘটাক্ষরক পরেই গোঁরীকুণ্ডে আবার দেখা হবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই। তবু মনটা আমার উদাস হয়ে গেল।

আগেও ত পথে নামবার পরেই কতবারি ছাড়াছাড়ি হয়েছে আমাদের। কিন্তু ভিন্নপ্রকৃতি আত্মকের ঘটনার। ইতিপূর্বে পথের টানেই ছিটকে পড়েছি আমরা, কিন্তু একই পথের আগে বা পিছে। আজ ওঁরা গেলেন তেমন দীর্ঘ না হলেও একেবারে ভিন্ন এক পথে, অজ্ঞ এক আকর্ষণে—যার তুলনায় আমার টানের জোর অনেক কম। সুতরাং এবারের ছাড়াছাড়িটা স্থল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে একেবারে আমার মনের গোড়ায় গিয়ে ছা দিয়েছে বেন।

থেকে থেকেই মুন্সীর কথা মনে পড়ছে আমার—দল তাদের ভেঙে গিয়েছে বলে কি হুঃ আর হুঃবনা মুন্সীর। তুলনায় আমাদের ছাড়াছাড়িটা সাময়িক। তবু ঘটনাটিকে সহজ বলে মানতে চার না আমার মন।

হুঃ করছে সে, না অভিমান ? ঠিক ধরতে পারি না। একবার ভাবছি, ওরা ত্রিযুগীনারায়ণকে ছেড়ে আমার সঙ্গে এলেন না কেন ? পরকণ্ঠেই মনে হচ্ছে যে, আমিই ভুল করেছি ওঁদের সঙ্গে না গিয়ে।

মনের বীণার সুর ও মোটা হুটি তার একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বলেই আসল সুরটিকে সঠিক ধরা যাচ্ছে না।

কিন্তু নিঃসঙ্গতার অমুভূতি আমার নিভুল। গোপন মনের কোন স্পন্দন বেরে স্পন্দন না জানি কোন আশাভঙ্গের বেদনা তার সঙ্গে মিশেছে বলেই আজ ভীতের সে অমুভূতি।

দার্শনিক হতে চেষ্টা করলাম একবার। ভাবলাম যে, মহাপ্রাণের পথে যখন চলেছি তখন নিঃসঙ্গ হয়েছি বলে হুঃ করব কেন ? কিন্তু বুধা চেষ্টা ! আমি বুধিত্তির নই। আর সত্যিই মহাপ্রাণের বাজীও ত নই আমি। দৈহিক কষ্ট ও মনের হুঃ থেকে নিষ্কৃতি পাব কেন আমি।

তবে শক্তি পেরেছিলাম নিশ্চয়ই এই হুঃ পথে নিঃসঙ্গ বাজাও আমার সম্পূর্ণ করবার ; কিছু সাধুনা এবং ক্ষতিপূরণও।

তেমন দীর্ঘ নয় নির্দিষ্ট পথটুকু—মাইল দুয়েরও কম। আর এই পথেই ত রয়েছে শোণ-প্রয়াগের কুলস্থলিও। তা থেকে যে লক্ষ



বিকট পথ

লক্ষ জলকণা ছিটকে এসে পড়ল আমার মুখ ও মাথা, তার দ্বিধ প্রলেপ কি মনের গায়েও কিছুটা না লেগে পারে।

কিছু সাধুনা পেলাম আরও একটি উৎস থেকে।

শোণ-প্রয়াগের পূর্বের কাছে বাহাহর আর ছত্রী বিশ্বাস করতে বসেছিল। আমি ওখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আমার কাঁধের ব্যুটি এক বকম টেনেই নামিয়ে নিল বাহাহর। নিরেই সে ওটাকে বেঁধে ফেলল তার নিজের মোটের সঙ্গে। সবচেয়ে প্রতিবাদ করবার সুযোগই পেলাম না আমি ; প্রায় অভিভাবকের কর্তৃত্বের স্বরেই সে বললে, ওপায়ে কঠিন চড়াই আছে বাবুজী। নিজে হালকা না হলে আপনি চলতে পারবেন কেন।

কিন্তু ওতেই শেষ নয়।

আমি মুখ চোখে শোণ-গঙ্গার অভিসারবাতী দর্শন করছি বুঝে আমাকে ওখানে বেঁধেই ওরা হুঃজনে এগিয়ে গিয়েছিল। পরে আমি চড়াই পথে মাইল ষাণেক চলবার পথ দেখি যে, বাহাহর পথের ধারে শিলাখণ্ডের উপর একা বসে রয়েছে।

বোঝা নিয়ে চড়াই ভাঙতে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? মোলারেম সবচেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

কিন্তু সবচেয়ে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল বাহাহর নই বাবুজী।

তবে এখানে বসে আছিস কেন ?

আপনি যে একা একা আসছেন।

চমকে উঠলাম—থবা পড়ে গিয়েছি নাকি বাহাহরের চোখে।

কিন্তু তখনই আবার কানে এল তার কথা, বড় কঠিন পথ এ দিকটাতে। আপনি বাবুজী, আমার কাঁধে উঠে বসুন।



বলে কি বাহাদুর। বোকা ত আছেই ওর পিঠে, তার উপর ঠিক থাকে আঁটি ত হব না আমি—রোগা হলেও ত একশো পাউণ্ডের কাছাকাছি আমার ওজন। সেই আমাকেও সে তার সোয়ামবী বোকার উপরে তুলে নিতে চাচ্ছে। সবিস্ময়ে আমি বললাম, বলিস কি যে! এত ভার তুই বইতে পারবি কেন?

আগের মতই আত্মবিশ্বাস তার, সনির্বন্ধ অনুরোধও, খুব পারব বাবু।

আমি বললাম, পারলেও তা করতে বাবি কেন তুই?

হাঁটতে যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

ভাষা হলনাময়ী, কিন্তু গলায় স্বর আর চোখের দৃষ্টি ত মিথ্যা দিয়ে কলুষিত হয় না। আর চিত্র বা মঞ্চের অভিনেতাও নয় এই পূর্বতসজ্জান অসভ্য বাহাদুর। কিছুতেই মনে করতে পারি না আমি যে, তার মনের আসলভাব মুখে প্রকাশ করে নি সে। চোখের দর্শনে ওর মনটাকেও যে স্পষ্ট দেখছি আমি।

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটি দোলা লাগল আমার—তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

তথাপি আমার অনুরোধ করে বাহাদুর, আ বাইয়ে বাবু।

উত্তরে বা আমার বলা উচিত ছিল তা বলতে পারলাম না। বরং ধমক দিলাম তাকে, দূর বোকা। আমি তোব কাঁধে চাপলে দু'জনেই গড়িয়ে পড়ে মাঝা বাব যে!

তুনে নিরাশ হ'ল বাহাদুর। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে, তা হলে, বাবুজী, আমার আগে আগে কাছাকাছি চলুন আপনি, যাতে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি আপনাকে।

তাই চললাম বাকি পথটুকু। মাইল দুয়েক মোটে দূরত্ব। তবু খেমে এবং বসে বিশ্রাম করলাম বার কয়েক। আর অমনি এক বিশ্রামের কাকেই দেখলাম সেই কুকুরটিকে।

আকস্মিক দর্শন। মনে হ'ল যেন মাটি ফুড়ে উঠেছে। খুব বড় নয়, দেহের তুলনার মুখটা তার আরও ছোট—প্রায় কচি শিশুর মুখে মতই কাঁচা ও কোমল মনে হয়। কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন তার, আর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ছোট ছোট দুটি চোখে। সারা গায়েই লম্বা লম্বা লোম, আগাগোড়া কালো। প্রায় দুই ইঞ্চি প্রশস্ত ইম্প্রান্তের স্বকলক বকলস আট করে বাঁধা আছে তার গলায়। হঠাৎ ওকে কাছে দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি।

কিন্তু বাহাদুর বুঝিয়ে বললে। উপরে কোন মেঘপালকেদ পতপাল চয়ে বেড়াচ্ছে হয়ত। তারই পোষা পাহারাওয়াল কুকুর এটি—নীচের পথে মানুষের সাদা পেরে নেমে এসেছে। অথবা গোঁরীকুণ্ড থেকেও এগিয়ে আসতে পারে—সরকারী কুকুর আছে সেখানে, আছে কোন কোন চটিওয়ালারও। সব চটিতেই থাকে এমন কুকুর। রাজে চটি পাহারা দেয় তারা, দিনের বেলায় মুনবের ছাগল-মোষ পাহাড়ের উপর চরতে গেলে সঙ্গে গিয়ে তাদের খবরদারি করে। বাবার পতপালকের প্রয়োজনে তাড়াও খাটে এই সব কুকুর।

নেকড়ে বা চিতাবাঘের চেয়েও নাকি তীক্ষ্ণ এদের দাঁত, গায়ের জোরও কম নয়।

ঐ 'বাঘ' শব্দটির প্রভাবই নিশ্চয়ই—বিদ্যাকৌশ্লের মত আমার মনে পড়ে গেল অনেক বৎসর পূর্বে রুদ্ধ নিখাসে বা পড়েছিলাম সেই ক্রিম করবেটের বইতে রুজপ্রয়াগের মানুষখেন্দো চিতাবাঘের প্রায় অলৌকিক কুকৌশলগাথা। আশ্চর্য্য! সেই রুজপ্রয়াগ অতিক্রম করে গাড়োয়াল জিলায় কত বনের ভিতর দিয়ে অনেক সময় একা একা চলতে চলতেও একদিনও সে কাহিনী বা বাঘের ভয় একবারও মনে জাগে নি কেন? সে বাঘটা 'বে অবশেষে মারা পড়েছিল তা নিশ্চিত জানি বলেই অমন তামসিক বিশ্বাস আমার, না মন আমার সুদূর আশ্বাসের প্রসাদ পেয়েছে অল্প কোন উৎস থেকে?

এখন মনে পড়বার পরেও, করবেটের সেই শয়তান বাঘটাকে কল্পনার চোখে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে দেখতেও হালকা কোঁতুহলের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, বাঘ-টাঘ আছে নাকি এ সব পাহাড়ে?

আমারই মত নির্ভর বাহাদুরও। সে হেসে উত্তর দিল : উপরের জঙ্গলে থাকে তারা। ছোট ছোট জানোয়ার সব। মানুষের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। কুকুরের সঙ্গে লড়াই হলে হেরে যায়, মারা পড়ে।

আশ্চর্য হবার মতই খবর। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমার সন্দেহ বুঝতে পেরে নিজেই বুঝিয়ে বললে বাহাদুর।

ঐ যে বকলস আছে কুকুরের গলায়, নেকড়ের দাঁত তা ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু কুকুরের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি চক্কর নিমেষে নেকড়ের গলায় মাংস ভেদ করে ঢুকে যাবে। তাছাড়া, নেকড়ে বা চিতা আসে একক, কুকুর থাকে জোড়া জোড়া। একটি নেকড়ে বা চিতা বত বলবানই হোক না কেন, দুটি কুকুরের সঙ্গে লড়ে সে হ্রিততে পারবে কেন; তাই পালিয়ে যদি সে বাঁচতে না পারে তবে কুকুরের সঙ্গে মৃত্যু তার অনিবার্য্য।

কিন্তু অত বড় বোকা যে কুকুর, সে দেখতে অত শাস্ত কেন? বাহাদুরের মুখে গল্প শুনবার পর আমার কুকুরটির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেরে আছে বটে, তবে দৃষ্টিতে তার একটুও হিংস্রতা নেই।

তবু সজ্জ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, এটা কামড়াবে না ত?

না, বাবুজী, হেসে উত্তর দিল বাহাদুর : দিনের বেলায় কাউকে কিছু বলে না ওরা। আর বাজীকে রাজেও চিনতে পারে।

সত্যই নিরীহ জীব মনে হচ্ছে কুকুরটিকে। আমবা উঠে চলতে আরম্ভ করবার পর দেখি যে, পোষা কুকুরের মতই ওটি আমার পিছনে পিছনে আসছে।

আবার পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের কাহিনী মনে পড়ে গেল আমার। ভুল করেছিলাম তখন। বুদ্ধিগতির ত সে রাজার একে-

যায়ে নিঃসঙ্গ কখনও হন নি—একটি কুকুর স্বর্ণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল।

মনে পড়বার পথেই আরও ভাল লেগেছিল কুকুরটিকে। কিন্তু এখনই পিছন ফিরে আর দেখতে পেলাম না তাকে। কোন দিকে কোন দিকে যে গেল সে, তা বাতাসদ্বারা বলতে পারে না।

একটু ক্ষুধা হয়েছিলাম বই কি! কিন্তু মিনিট দশেক পর অভ্যাস মত আবারও পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি—কুকুরটি আমার পিছনে না থাকুক, হাতের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভবিষ্যতী বীরবাহাদুর আমার অনুসরণ করছে।

আবার চকিত বিহীনপুত্রি আমার মনে। চোখের সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও সেই কুকুরটিকে এখন আমার আরও বেশী ভাল লাগছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে আমার মঙ্গল কামনায় আমাকে তার অনুসরণ না করলেও চলে।

এ পথের সর্বত্রই দেখছি যে, চট্টের এলাকায় চুকলেই প্রতিটি দোকান থেকেই সাদর সম্ভাষণ কানে আসে। গৌরীকুণ্ডের মন্ডার্ভনা পেলাম বসতি এলাকায় চুকবার আগেই।

বেশ সজ্জা ও সম্পন্ন রূপ গৌরীকুণ্ডের। গুপ্তকালী ছাড়বার পর এমন আর চোখে পড়ে নি। শহর বলেই মনে হয়। অনেক-ভাল বাড়ী, সব কখনাই পাকা। আরও বৈশিষ্ট্য গৌরীকুণ্ডের—এই থাকে বসতি এটি। যে পথে হেঁটে এলাম সেই পথ দেখি উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেট পথ থেকেই একটি শাখা বের হয়ে গিয়েছে নীচের থাকের ভিতর দিয়ে। ঘরবাড়ীর সংখ্যা সীচেই বেশী। খগলামেলা একটি চত্বরও উপর থেকেই চোখে পড়ল সেখানে, যা ধন্যশাসার প্রাঙ্গণও হতে পারে, আবার বাজারও। কোন দিকে যাব ঠিক করতে না পেরে ধমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই মোড়ে।

আর সেখানেই আমার মুখোমুখি ধমকে দাঁড়ালেন যিনি হন হন করে উপর থেকে নীচে, মানে রামপুরের দিকে যাক্ষিলেন—ব্রুঠাম, দীর্ঘ দেহ, তেমন উজ্জ্বল না হলেও গৌরবর্ণ, গায়ে স্ত্রীর কামিজ, হাতে তার লাঠি নেই দেখেই বুঝলাম যে, তিনি আমাদের মত বিদেশী যাত্রী নন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ত বাঙালী—কলকাতা থেকে আসছেন?

ভাষা বাংলা, কিন্তু উচ্চারণে একটু আড় আছে। আমি বাড়ী নেড়ে স্বীকার করা মাত্রই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য নাকি আপনি?

চট্টোয়ালদেব সম্ভাষণের মাদুর্য্য নেই তার কথায়। কেমন যেন জেবার স্বর। চোখের দৃষ্টিতে তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা রয়েছে বলেই যেন তার স্বরটা অত বেশী কানে লাগল আমার। ঈষৎ বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, কেন, বলুন ত?

উত্তর তৎক্ষণাৎ আমার কথার পিঠেই : আমার নাম মহাদেব-

প্রসাদ। রামকৃষ্ণ মিশনের পাণ্ডা কি না আমি, তাই, জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে। বলতে বলতে হাসলেন তিনি।

হাসলাম আমিও—পাণ্ডা না হলে কি আর অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে কারও চোখে, এমন জেহা করে কেউ! তবে খুশীও হয়েছি। গুপ্তকালীতে চক্রবর্তের সঙ্গে যখন রফা হয় আমাদের তখনই দ্বিতেনের মুখে শুনে মহাদেবপ্রসাদ উপাধ্যায়ের নামটা আমার মনে গাথা হয়ে গিয়েছিল। কেদারনাথের পাণ্ডা ইনি। কেদারে পৌছবার পূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে এখন খুশী হব বই কি!

এর পর সহজভাবেই কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। বললাম তাঁকে চক্রবর্তের কথাও—প্রশংসার সুরেই বললাম। সত্যি কিটু উপকার ত আমার পেয়েছি তার কাছে। দ্বিতেনদের সঙ্গে জিহ্মপাণ্ডাড়ে উঠে গিয়েছে চক্রবর্ত; তাদের সঙ্গেই সেও এখানে এল বলে।

কিন্তু মহাদেবপ্রসাদ দেখি একটু যেন ক্ষুধা। ক্ষুধা কঠেই তিনি বললেন, হরিদ্বার থেকে বাবুজী একখানা যদি চিঠি লিখে দ্বিতেন আমাকে তা হলে এত আগে কেদার থেকে নেমে আসতাম না আমি। তবু কোন ভাবনা নেই আপনাদের। আজ এখান থেকেই আমার গোমস্তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে আপনাদের উপযুক্ত যত্ন-সম্পন্ন করবে—আমি ওখানে না থাকলেও কোন কষ্ট হবে না আপনাদের। ক'জন আছেন আপনারা? নাম বলুন ত।

তখনই টুকে নিলেন তিনি। শুধুই কি তাই! নীচের থাকে ঠিক গৌরীকুণ্ডের ধারে ভাল একখানা চটিতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন; বার বার ছ'সিয়ার করে দিলেন চটিওয়ালাকে যাতে আমার বা আমার দলের কারও কোন অসুবিধা না হয়।

বিদায় নেবার আগে মহাদেবপ্রসাদ সতর্ক করে দিলেন আমাকে, অনেক বেলা যদি থাকেও তবু, বাবু আজ এখান থেকে যাত্রা করবেন না। সামনে পথ মোটে সাত মাইল হলে কি হবে, এইটুকুই হ'ল কেদারের বিকট পন্থ।

শুনে আসছি কথটা কলকাতা ছাড়বার আগে থেকেই। শেষের এই পথটুকু সঙ্ঘর্ষে আমার একাধিক অভিজ্ঞ বন্ধু বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন আমাকে। সেই সব স্মরণ করে বিজের হাসি হেসেই আমি বললাম,—না, পাণ্ডাজী, আজ ত যাবই না, কালও একদিনে সবটা পথ চলবার ইচ্ছা নেই আমার। রামোদ্বারতে রাজিবাস করব।

শুনে তৎক্ষণাৎ সার দিলেন মহাদেবপ্রসাদ, তাই ভাল বাবু। শবীহ, মন দুই-ই ভাল থাকবে তাতে। আর তাড়াহুড়ো করে যাবার দরকারই বা কি? কেদার-বদরীতে বহু পড়তে এখনও ঢের দেবি।

গঙ্গোত্রীর তাড়াতেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তা—সেদিন রামপুর থেকে খুব ভোরে যাত্রা করেছিলাম। স্ত্রত্যং পথে অতুলক জায়গায় বিশ্রাম করে খীর-মহুদগতিতে এগিয়ে এলেও বেশ সকাল

সকাল গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গিয়েছি। তিনিসপত্র শুকিয়ে রাখবার পর ঘড়িতে দেখি যে তখনও দশটা বাজে নি।

আমি যে এখানে এসে পৌঁছতে দেখি হবে ওদেব। তাড়াতাড়ি বাজা চাপাবার দরকার নেই। সুতরাং আমার আয়োজনও আমার চলল মনঃসংগতিতেই।

আমি যে চটিতে আছি তার সামনেই আসল গৌরীকুণ্ড—এখানেই নাকি ঋতুস্নান করেছিলেন গৌরী। কেবল নামে নয়, আসলেও এটি কুণ্ডই। হাত দশেক হয়ত লম্বা, চওড়াও তেমন। ঠিক কাণার কাণার না হলোও প্রায় পরিপূর্ণ। বাজী-সড়কের গা ঘেঁষে অবস্থিত ওব। সেই সড়ক ভেদ করে উপরে পাছাড থেকে কুণ্ড পর্যন্ত কোন নল নিয়ে আসা হয়েছে কি না কে-জানেন। কিন্তু এদিক থেকে বাঁধের মত উচু সড়কের নীচের দিকে ফুটো ও নল দুই-ই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সেই মল দিয়ে অনবরত জল পড়ছে কুণ্ডের মধ্যে। পড়ন্ত জল দেখতে সাধারণ জলের মতই, কিন্তু কুণ্ডের জল হলদেটে। ঐ বড়টাই আরও একটু ঘন হয়ে দুধের সরের মত কুণ্ডের জলের উপর এখানে-সেখানে ভাসছে এবং মলমের মত লেগে আছে নলের মুখে। ঠাণ্ডা জল। সব মিলিয়ে গৌরীকুণ্ড পল্লীবাংলার পানাপচা বিড়কির ডোবার মত।

বাজী'র, বিশেষতঃ সখা ও কুমারী মেয়েরা নাকি পরম ভক্তিতে এই গৌরীকুণ্ডে অবগাহন স্নান করে। কিন্তু সেদিন ঐ কুণ্ডে একজন স্নানার্থীও চোখে পড়ল না আমার। আমি নিজে ঐ জলে স্নান করবার কথা ভাবতেও পারি না। সুতরাং এগিয়ে গেলাম উক্তরে তপ্তকুণ্ডের দিকে। সেটিও ঐ নীচের থাকেই, বেশী দূরেও নয়।

কোন অদৃষ্ট উৎস থেকে যেন এই কুণ্ডেও জল আসছে। ওদিকে ঠাণ্ডা কুণ্ডে যেমন, এই কুণ্ডেও গারেও তেমন দেখা যাচ্ছে একটি নলের মুখ। তবে এ জল গরম; এ কুণ্ড আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এর পরিবেশও ঢেব বেশী পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ। গুপ্ত-কানীতে যেমন দেখেছিলাম তেমন চকমিলান গঠন এখানেও। প্রাক্কণের ঠিক মাঝখানে কুণ্ড। পায়ে গৌরীদেবীর মন্দির। স্ত্রী-পুরুষ ক'জন বাজী দেখলাম স্নান করতে এসে কুণ্ডের চারিদিকে ছড়িয়ে বসেছে। মাহাশ্বেয়ার কথা বলতে পারি না, জনপ্রিয়তা দেখলাম এই তপ্তকুণ্ডেরই বেশী।

আর হবেই বা না কেন। একে ত এ কুণ্ডের জল পরিষ্কার সাদা, তার আবার উষ্ণ সে জল। ছয় হাজার ফুটেরও বেশী উচু এই গৌরীকুণ্ড বসতি। বেশ শীত এখানে। ঘবে গিয়ে গারের জামা ছাড়বার পর কাপুনি ধরেছিল। কুণ্ডের প্রাক্কণে চনচনে বোধ আছে বলেই আতঙ্ক-গা হতে পেরেছি এখন। এহেন জায়গায় একেবারে নিখরচায় ও বিনা পরিশ্রমে বত খুশী গরম জল বদি পাওয়া যায় তবে তার কদর হবে বই কি! আমি ত তপ্তকুণ্ডের খবর পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু বড় গরম ঐ কুণ্ডের জল। পায়ে বসে ডান হাতের

আঙ্গুল ক'টি জলে ডোবাতেই এমন ছেঁকা লাগল যে; চমকে হাত টেনে নিলাম। তার পর বখনই চেষ্টা করি তখনই ঐ একই অভিজ্ঞতা। অত তপ্ত জলের কুণ্ডের মধ্যে নেবে ছুব দিয়ে যে স্নান করা যায় তা আমার বিশ্বাসই হয় না। মন্দিরের পূজারী অভয় দিল আমাকে, উৎসাহও দিল। কিন্তু সাহস হয় না আমার। আধ ঘণ্টাখানেক ওখানে বসে থেকেও ছুব দিতে দেখলাম না এক-জনকেও। যে দু'একজনকে বাজী বলে মনে হচ্ছিল তারাও দেখি ঘটি ডুবিয়ে জল তুলে তাই অল্প অল্প পায়ে ঢালছে।

ততক্ষণে আমার কানে অজ্ঞ একটি নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছেছে। সেই পরিচিত গর্জনধ্বনি মন্মাকিনীর। শুনলাম যে খুব কাছেই আছেন তিনি। আমার দেখি যে সত্যিই তাই। কুণ্ড থেকে দু'মিনিটেরও পথ নয়। আর তেমন ঝাড়াও নয় পার। অজ্ঞত যেমন দেখেছি এখানেও তেমন ভয়ঙ্কর রূপ মূল ধারায়। কিন্তু তা তাঁর থেকে অনেক দূরে। পারের কাছে ছোটবড় অসংখ্য শিশাখণ্ডের গা ঘেঁষে বা উপর দিয়ে লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে সেই মন্মাকিনীরই যে জল ছুটে চলেছে তাতে তীব্র গতি থাকলেও গভীরতা মোটেই নেই। পারের গোড়ালি পর্যন্ত সেই জলে ডুবিয়ে কোন একখানি শিলাসনে নির্ভয়ে বসে তোয়ালে ভিজিয়ে গা বগড়ানো যায় এখানে, ঘটি ভরে জল তুলে মাথায় ঢালা যায়।

তপ্তকুণ্ডের জল বত গরম মন্মাকিনীর জল তত ঠাণ্ডা। এ জলেও আঙ্গুল ডুবিয়েই একেবারে বিপরীত কারণে তৎক্ষণাৎ হাত টেনে নিয়েছিলাম। তবু দেখি যে, মন্মাকিনী আমার টানছেন। টানের চেয়েও বেশী। সেই যে কনখলের গঙ্গায় একটি ডুব দেবার পরেই গঙ্গা-স্নানের নেশা লেগেছিল আমার, এ সেই নেশা। কুণ্ড-চটি ছাড়বার পর এ ক'দিন মাঝে মাঝে মন্মাকিনীর দর্শন পেলেও স্পর্শ আর পাই নি। আজ তা লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাতাল হয়ে উঠল আমার মন। এক নিমেষেই শীতের ভয়, নিউয়োরিনিয়ার ভয় দুই-ই কাটিয়ে উঠল তা।

অবগাহন স্নান নয়, তবু তাতেই পরম তৃপ্তি। ক্লান্ত দেহ ও ক্লিষ্ট মন আমার সজীবিত হয়ে উঠল যেন। গঙ্গার প্রসাদ বলব নাকি একে! বাই হউক, এ বাজার গঙ্গাস্নানের আনন্দ নিঃসংশয়ে আমার এক পরম লাভ।

১০

‘ভূক্ষে ভোজ্যতে চৈব’। শাস্ত্রমতে খাওয়ার মত খাওয়ানোও প্রীতির লক্ষণ। আগের দিন পূজোজ্ঞী আমাদের জন্ত ভাত-ভাত রেখে রেখেছিলেন। আজ তাদের জন্তও রেখে রাখলাম আমি। অতিমিত্ত কেবল ভাল। বাহাহয় অনেক খুজলেও এক চিলতে সজিও সংগ্রহ করতে পারে নি।

রান্না শেষ করে আমি বখন বারান্দার এসে বসলাম তখনও রোদ ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিভে গেল তা। মেঘে মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। গুরু গুরু গর্জন কানে এল কয়েকবার। তারপর কম কম বৃষ্টি শুরু হ'ল।

এ আর ক্রি দেখছেন।—বললেন চটিওয়াল শেঠী : বরক  
ড়া যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে কি সুখে আমরা এখানে  
কি। দেখতে দেখতে সব ঢেকে যায়—পথ-ঘাট আর ঘরের  
লের মত গাছপালাও সালা হয়ে যায়।

সে সব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা নয় শেঠীর কাছে। সশক  
ব্রহ্মে ছুই মুক্ত কর লগাটে ঠেকিয়ে নিজের কথা বাখা। নিজের  
আরেন তিনি : সবই কেনারনাথজীর লীলা। প্রলয়ের দেবতা তিনি  
—সব কিছু তখনই করে দেন। তাতেই তার আনন্দ।

সম্পূর্ণ শাস্ত্রমুখত শেঠীর ঐ কথা। আর প্রবল উত্তেজক  
তি ও বলনায়। নটরাজের রূপ মনে পড়ে গেল আমার ; মনে  
ল গুরুদেবের গানের ছুঁ একটি কলিও—‘প্রলয় নাচন নাচলে বখন  
পান ভুলে, নটরাজ, হে নটরাজ’—

তবে মাটির মানুষ আমি—স্বর্গ থেকে তখনই মর্ত্যে নেমে এল  
আমার মন। ভাবামুখে গঙ্গোত্রীকেও মনে পড়ে গেল। গুরু-  
দেবের মন : কিছু কিছু পড়েছেন তিনি, অথবা অল্প কেউ তাকে  
ড়ে গুনিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন এখানে তিনি উপস্থিত  
কলে সুরে না পাবি, কবিতার ছন্দে ঐ গানপানি গুনিয়ে দিতাম  
গকে।

তখন কি আর জানি যে, আমাদের দলটিকে নিয়েও নটরাজের  
কৌতুকলীলা শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই যে তাল কেটে গিয়েছিল তারপর আসর আর তেমন  
মল না।

শেষ বেলায় কিরে এলেন তাঁরা। কিন্তু একা চক্রবর্তী ছাড়া  
আর কাউকে বেন চেনাই যায় না।

গারে বর্ধিত টালিয়েও ভিজে চোল সকলেই ; পায়ের জুতা ও  
গায়ে অতিরিক্ত কাপার প্রলেপ। মুখে চোখে কালি পড়েছে।  
হাট নিশ্চয় চোখ দুটিকে মনে হচ্ছে দৃষ্টি একেবারেই নেই—  
গঙ্গোত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি। জিতেনের  
খের ভাব অশ্রুস্র ; আর কেমন বেন উদাস দৃষ্টি তার চোখে।

একটু সজীবতা যা আছে একা ঐ গঙ্গোত্রীর মনেই। তাই  
ঠ মুখেও অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, খুব শিক্ষা হ’ল  
জ। ভিজতে ভিজতে কেবলই মনে হয়েছে যে পকেদের  
জো অনবিকার প্রবেশ করে আছেন যে নারায়ণ তাঁকেই আগে  
ন করতে গিয়েছি বলে রুট কেনারনাথ আমাদের সাজা দিচ্ছেন।

আসলে অহুতগু তিনি অল্প কারণে—বুঝা জননীর জন্ম রায়-  
রেই কান্ডি ভাড়া করেন নি বলে। তখনই তিনি ঘোষণা  
রলেন যে অতঃপর মাকে তিনি এক পাও হাটতে দেবেন না।

জিতেনের মুখ ভায় হয়েছে নৈরাশ্য। মনের মত কিছুই  
থতে পার নি সে, কারণ নীচেও যেমন উপরেও তাই।

আপনিই, মণিলা, বুদ্ধিমান—এই প্রথম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার  
রল সে : একেবারে অনর্থক হেঁটেছি অতিরিক্ত ছয় মাইল পথ।  
প্রথম বলেই স্নানিও বোধ করছি বেশী।

সুতরাং আশা করেছিলাম আমি যে বিশ্রাম করবায়, সুযোগ  
পেলে জিতেন ছাড়বে না তা। এবং সেই জন্মই বুঝার একটু অব-  
জ্ঞ ভাব দেখে পরদিন ভোবে গঙ্গোত্রী বখন আমাদের ঘরে এসে  
বললেন যে, সে দিনটা তাঁরা গৌরীকুণ্ডে বিশ্রাম করতে চান তখন  
আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে বললাম, বেশ  
ত। তীর্থবাসের কালটা আমাদের আরও চকিত ঘটনা বাড়বে  
তাতে।

কিন্তু কস করে স্বীকার করে বলল জিতেন : না, মণিলা, আর  
দেখ করতে মন চায় না আমার।

কেন হে ?—বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তর না দিয়ে আগের কথাই পুনরাবৃত্তি করল জিতেন :

• ভাল লাগছে না।

একে ত অসামাজিক সঙ্গ জিতেনের ; তার উপর বলবার  
ধরনটাও তার রুচ। শুনে অপ্রতিভের একশেষ আমি।

কিন্তু গঙ্গোত্রী মুচকি হেসে বললেন, কালই ত ভাইয়া জিগুগী  
পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম  
আমরা যে কেনারনাথ দর্শন করবার জন্ম গুর মন বাতুল হয়েছি !  
তা বেশ ত। এগিয়ে বান আপনাতা বরং কেনায়ে গিয়ে আমাদের  
জন্ম অপেক্ষা করবেন।

তবু লজ্জা যায় না আমার। ওদের মা ও মেয়েকে সহস্রাঙ্গী  
হিসাবে পাবার জন্ম আমরাই আশ্রয় প্রকাশ করেছিলাম বৌ।  
অচ্ছ বুঝাকে অসুস্থ জেনেও একটি দিন মাত্রও অপেক্ষা করতে চায়  
না জিতেন। ততক্ষণে পায় পিঠি বাঁধতে শুরু করেছে সে। তার  
মুখের ভাবও দেখি অসাধারণ রকমের গভীর। আর একবার তাকে  
অনুরোধ করতে সাহস হ’ল না আমার। নিজের লজ্জা ঢাকবার  
জন্ম উত্তরে গঙ্গোত্রীকে আমি বললাম, না, যা ; কেনারে পৌছবার  
আগেই আবার দেখা হবে আমাদের। কলকাতা থেকেই ঠিক  
করে এসেছি আমি যে রামোয়ারা চটিতে রাজিবাস করতে হবে শেষ  
পরীক্ষাটা পাশ করবার মত শক্তি সফর করবার জন্ম। সুতরাং  
আজ সেই পর্যন্ত গিয়েই আমাদের হাঁটা শেষ। কাল সকালেও  
সেখানেই তোমাদের জন্ম অপেক্ষা করব আমরা।

বলতে বলতে আড়চোখে জিতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে-  
ছিলাম। পাছে জিতেন প্রতিবাদ করে সেই ভয়। তা সে করল  
না দেখে মনে মনে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

এবার আসল কেনারের পথ—সত্যি “বিকট” পথ।

পথ বলে মনেই হয় না। খাঁজ-কাটা থাকলে বলতে পারতাম  
যে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। একতলা থেকে দোতলায়,  
দোতলা থেকে তিনতলায়—উপর থেকে আরও উপরে। আর তা  
কলকাতার নয়, কান্দির বিশ্বনাথ গলিতে প্রাসাদের মত কোন একটা  
বাড়ীতে—তেমনই ঘেরা, তেমনই সজীর্ণ, তেমনই কঠিন, তেমনই  
বাড়াই পথ। কিন্তু থাপ নেই ; তাই পিঠিই হামাগুড়ি দিয়ে

পাহাড়ে উঠছে। আগাগোড়া পাথরের পাহাড় এদিকে। উপরে পাহালা খুবই কম; পায়ের কাছে ঘাস বা গুল্মের মত বা আছে তাও মনে হয় বেন পাথর। উতরাই আর নেই, এবার একটানা চড়াই। এ পথও যদি আর সব পার্বত্য পথের মতই ঘুরে ঘুরে গিয়ে থাকে তবে তা বুঝবার জো নেই। সমস্ত মনোযোগই ত নিজের পা-দুখানির দিকে—সামনে দু-তিন হাতের বেশী দেখাই যায় না। সেটুকু গতি সর্বত্রই দেখছি উচ্চমুখী।

মানসিক, দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকটি অবস্থাই সন্তুপনীয় প্রতিকূল। তবু এ ব্যতীত এ সন্তুপনীয় গতি আমার—মানে, পাঁচ-সাত পা চলবার পথেই ধমক দাঁড়াতে হচ্ছে। কারণ, হয় পা ভেঙে আসছে, নয় দম বন্ধ হবার উপক্রম। ক্রমাগত লজ্জ বা মিছরি টুকরা মুখে পুরেও শুকনো জিভ আর তালু সময় রাখতে পারছি নে। এত দুঃখেও হাসি পাচ্ছে আজ—গত কদিন চড়াই ভাঙতে যে কষ্ট পেয়েছি তাহেই কষ্ট মনে করেছি বলে।

শুনি যে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পথের উপরেই পুরু হয়ে বরফ পড়ে থাকে—কোথাও পাথরের মতই শক্ত কোথাও আবার নইএর মত কালা কালা, কিন্তু সর্বত্রই স্বগুণে তুষার নীতল। সাথে কি আর বিকট পহু বলে একে।

সেই আবিষ্কার আবার আজ সকালেও করেছিল বাহাদুর—আমাকেও সে তার পিঠে তুলে নেবে। ধমক পেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে, তা হলে বাবুজী, ঘোড়ার চেপে চলুন আপনি—সামনে বড়ই কঠিন পথ।

‘কঠিন’ পথ কথাটা শুনে শুনে সঙ্কলিত কঠিন হয়েছে আমার—বত কষ্টই হউক না কেন, পায়ে হেঁটেই এ পথ অতিক্রম করব আমি। স্মরণ্য বাহাদুরের বিকল প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেছিলাম।

তাই শুনেই বাহাদুর বললে, ঘোড়ার ভাড়া আমার মজুরি থেকে কেটে নেবেন বাবু।

তার ডাবডেবে চোখ দুটির দিকে চেয়ে কথা তার অবিচল করতে পারি নি বলেই এবার আর মুখ ফুটে প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি তার অমুরোধ। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে আমি অটুট থেকে হেঁটেই বওনা হয়েছিলাম গৌরীকুণ্ড থেকে।

খানিকটা চলবার পরেই বেশ বৃষ্টিতে পারলাম যে আমার মনের একটা অংশ এখন হার হার করে অমৃত্যু করছে।

পঞ্চপাগুনের মহাপ্রস্থানের কাহিনী আবার পুনঃ পুনঃ মনে পড়ছে আমার—দ্রোণী থেকে শুরু করে পাঁচ জনের পতন যে হয়েছিল তা নিশ্চয়ই এই শেষের সাত মাইলের মধ্যে।

৬০০০ ফুট লেগা দেখেছিলাম গৌরীকুণ্ডে ঢুকবার মুখে। এবার ৭০০০ ফুটের নিশানা চোখে পড়ল। কেদার দেখি ওখান থেকে ৬ মাইল। মানে, দুবছর হিসাবে যে পথটুকু এক মাইলেরও কম সেইটুকুই আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে পুরা ১০০০ ফুট। কোতুলনী হয়ে ঘড়ি দেখলাম—এটুকু পথ আসতে আমার লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা।

আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, সড়ক থেকে ‘কিছুটা উপরে ভাঙা ভাঙা একখানি কুটির। কাছেই নেড়া নেড়া একটি গাছ। ঘরের চাল আর গাছের ডালে ডালে দেখি ছোট ছোট অসংখ্য জীর্ণ কাপড়ের টুকরা ঝুলছে।

মামুদের থাকবার ঘর নয়, ভৈরবের মন্দির। চীংবাসা ভৈরব। মন্দিরের সামনেই একখানি পাথরের উপর জিতেন বসে রয়েছে। কেমন যেন উদ্ভাসিত দৃষ্টি তার চোখে।

বোধ করি মন্দিরের পুরোহিতই হবেন তিনি যিনি বুঝিয়ে বললেন আমাকে।

‘কেদারক্ষেত্রের দ্বারপাল চীংবাসা ভৈরব। তাঁকে পূজার সঙ্কট করে তাঁর অমৃত্যু লাভ করতে পারলে তবেই কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যাবে।

এত যার ক্ষমতা, কি দিয়ে সঙ্কট করতে হবে তাঁকে?

উত্তর হল : জীর্ণ চীংবাসা—ইনি যে চীংবাসা ভৈরব।

তাই গাছের ডালে ডালে ঝুলছে ঐ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডগুলি।

নিজের দৈহিক অবস্থার তাগিদেই হবে, মাথায় আমার একটা ব্যাথা এসে গেল ভক্তের কাছে এমন শক্ত ভৈরবের অত তুচ্ছ দাবি।

জিতেনকে উদ্দেশ্য করে হেসে বললাম আমি : গায়ের কাপড় ত ছার, হালকা হবার জন্য দেহটিকেই ত এখানে ছুড়ে কেলে দিতে ইচ্ছে হয়। আর এই দুর্গম পথে এতদিন হেঁটে আসবার পর পরিবেশ বস্ত্র চীং হবে না ত কি?

কিন্তু পরিহাসের দ্বার দিয়েও গেল না জিতেন। রীতিমত গভীর স্বরে সে বললে, না মনিদা। আমার মনে হয় যে, পূজার এই যে অসাধারণ উপকরণের দাবি এখানে, অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তার। ভোগের সর্বশেষে উপকরণের সঙ্গে লজ্জাটুকুও এই ভৈরবের চরণে উৎসর্গ করতে না পারলে কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যায় না—তিনি যে সর্বভোগী শিব।

শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম আমি : ব্যাপার কি, জিতেন? এত সব তত্ত্বকথা তোমার মনে আসছে কেন?

অল্প একটু হেসে জিতেন উত্তর দিল : আসবে না? কত উপরে উঠে এসেছি একবার ভাবুন ত।

বলেই উঠে দাঁড়াল সে। পরক্ষণেই অগ্রগতি তার। আমি তার অনুসরণ করছি কি না, দেখবার জন্য একবারও পিছন ফিরে তাকান না সে।

বাহাদুরেরও চোখ এড়ায় নি। নিজের মোট পিঠে তুলে নেবার পূর্বক ক্ষুরকণ্ঠে সে বললে, ছোট্ট বাবুজী ন মালুম কিসলিয়ে উলাস হো গয়া।

কেদারপথের শেষ চটি রামোয়ারা। ৮০০০ ফুট উচুতে মনাকিনীর পারে স্বর্ণপদিসা, চালু, পাথর জাতের জমির উপর চার-পাঁচখানা চালা ঘর ও একখানি মাঝে দ্বিতল কাঠের বড় বাড়ী।

নিবাস নিকে এ পথে শেখ বিজ্ঞান হান ক্রান্ত বাজীদেহ। চার মাইলেরও কিছু কম পথ পাকা। সাত্বে তিন ঘণ্টার অতিক্রম করে সেই অর্ধমৃত অবস্থাতেও এই ভেবে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস কেললাম আমি যে, অন্ততঃ সে দিনের মত চলা আশ্বাসের শেষ হয়েছে।

অষ্টক ঠিক তখনই জিতেন বললে, এখানে গুনছি যে হুৎঘে সন্ধ্যা আটায় কটিও কিনতে পাওয়া যায়। একটু বিশ্রাম করবার পর তাই কিছু খেয়ে চলুন যাওয়া বাক। বেলা তো এখন বায়টাও বাজে নি, আট সামনে পথ বাকি আছে মোটে তিন মাইল।

পরিহাস মনে করতে চেষ্টাও পারি ন—জিতেনের মুখের ভাবে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সঙ্গে কেমন যেন এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে।

তথাপি পরিহাসের স্বরেই আমি বললাম, এত তাড়া কেন, জিতেন? কেদারনাথ ত উড়ে যাচ্ছেন না। একদিন পরে গেলেও ঠিকই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।

কিন্তু ভজিতেও সে-পরিহাসে যোগ দিল না জিতেন। বহু আগের চেষ্টাও গভীর স্বরেই সে বললে, আমি এগিরেই যেতে চাই, যদিও। বেশ দয় আছে আমার।

আমি তখন বিরক্ত হয়ে বললাম, কিন্তু আমার নেই। আজ আর এক পাও হাঁটতে পারব না আমি।

বৃহ চটিওয়ালার আমাকেই সমর্থন করল। জিতেনকে উদ্দেশ্য করে সে বললে, সামনে আরও বিকট চড়াই আছে, বাবুজী। তাছাড়া বৈকালের দিকে ঝড়ঝড়ির ভয়ও খুব। ভাল হয় আজ এখানেই থেকে গেলে। কেদারনাথজীর চূড়া ত এখন থেকেও দেখা যায়—ঐ সামনে ডাকালেই হ'ল।

হস্তসঙ্কেতে দেখিয়েও দিল সে। সত্যিই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একাধিক বনক-ঢাকা পূর্বতন্থ। যোগ নেই, তবু ঝলমল করছে নির্মল গুজ্জরা।

জিতেনও সেই দিকে তাকিয়েছে। দেখে অমুনরের কোমল চোখেই আমি আবার তাকে বললাম, পাগলামি কর না জিতেন। আজ সন্ধ্যাবেলার কেদারে গিরে পৌঁছানোর চেয়ে কাল সকালের দিকে সেখানে পৌঁছনো ঢের ভাল হবে। ভাল সাথীও পাব কাল সকালে—গোজীরাও ত ভোবেই গৌরীকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে আসবেন।

জিতেন কোন উত্তর দিল না দেখে ভাবলাম যে একটু বুঝি বয়স হয়েছে তার ঘন। পুতরাং অপেক্ষাকৃত আশঙ্ক হয়ে যালপত্র নিয়ে আমি আর বাহাহু উপরে গেলাম ভাল একখানি ঘর দখল করবার উদ্দেশ্যে।

আপাততঃ কোন প্রতিবোধিতা নেই। তবে এ সব চটিতে ঐতিহাসিকতার সন্ধানকে সর্বগাই মনে না রাখলে অনেক সময়ই নগরক বাজীর হুজুগের সীমা থাকে না, কেন না যে কোন

সময়েই যে কোন দিক থেকেই এক বা একাধিক ঝাকঝাজী এসে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

তবে নির্বাচনের ক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ এই বাহোয়াহাতে। উপরে হুখানামাত্র ঘর। সিঁড়ির কাছেই ঘরখানাকে ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র রেখে ভিতরের ঘরখানাই দখল করলাম আমার।

বেশ বড় ঘর। রান্নার জন্য উত্তর দিকে সারি সারি উনান পাতা থাকলেও শোবার জন্য জায়গার অভাব মনে হয় না। কেবল তিন জনের জন্য জায়গা ত অচেনা দক্ষিণ দিকে সজ্জা হলোও ঢালা বারান্দাও আছে। সেখানে দাঁড়ালে নীচে মন্ডাকিনীর ধারা একটু দূরে হলোও স্পষ্ট দেখা যায়। আর বেশ খানিকটা দূরপর্ষদও। নীচে মন্ডাকিনী রয়েছে বললেই দুপারে দুসারী পাহাড়ের মাঝখানটা স্বভাবতঃই কাঁকা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগত পাহাড়ের প্রাকার দেখবার পর এখন খানিকটা কাঁকা জায়গা চোখে পড়তেই মনের সেই ইং-ধরা ভাবটা অনেক কমে গেল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য বস্তু। বারান্দার বাবার দরজা মাত্র ঐ একটি। উত্তর দিকের দেয়ালে গবাক্ষের মত যে দু'একটি জানালা আছে তা দেখলাম বন্ধ রয়েছে। বন্ধ ঘরের পাতলা অন্ধকারে পরস্পরের মুখও ভাল দেখা যায় না।

তবু বাহাহু তার অভ্যস্ত হস্তে ঝোলা থেকে দরকারী জিনিসগুলি বেব করে কেলল। নীচের দোকান থেকে সঙা করবার পর জানটাও বাতে সেবে আসতে পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এক সঙ্গে গুছিয়ে নিল সে।

কিন্তু জিতেন ত জিনিস নয়। দূর থেকেই দেখি যে সে ঐ চারের দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পরচোরী করছে। আমি কাছে আসতেই সে বললে, আমি চলি যদিও।

গুনে স্তম্ভিত আমি, মুখে কথাই ফুঁল না আমার।

জিতেনই আবার বললে, এত ক'হে এসেও পথে আটক থাকতে যেন চায় না আমার।

দৃঢ় সঙ্কল্পে স্পষ্ট ছাপ তার মুখের উপর, অমুনরে কোন কল হবে না বুঝে আমিও দৃঢ় হয়ে বললাম, আমি আজ যেতে পারব না। —যাব না।

ক্রুদ্ধ মনে কয়েছিলাম আমি আমার ঐ বোষণকে। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তা। উত্তরে জিতেন বললে, আপনারা এখানেই থাকুন, আমি একাই যাব।

পাশের পাড়াড়টার মতই যেন স্তূড়, অনড় সঙ্কল্প তার। আমার প্রতিটি মুক্তিই তুড়ি মেখে উড়িয়ে দিল সে।

—বাহাহুকে ছেড়ে দেব না আমি। এখানে তুমি বিতীর কুলী কোথায় পাবে?

আমার কুলীর দরকার নেই।

তোমার জিনিসপত্র তুমি নিজে বহে নিতে পারবে?

বহে কেন নেব? সব আপনাদের কাছেই থাকবে।



কিন্তু কেন্দরে যে দারুণ শীত। বাত্রে সেখানে লেপতোষক কোষায় পাবে তুমি ?

পাণ্ডার চটিতে কিছু পাওয়া যাবে আশা করি। তাতেই আমার চলবে।

ভাবিত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম জিতেনের সুখের দিকে। তারপর অপেক্ষাকৃত নব্বয় স্নেহে বললাম, তোমার সব কথাই না হয় বুঝলাম এবং মানলাম। কিন্তু এই দুস্তর পথে তোমাকে আমি একা একা ছেড়ে দিই কেমন করে ? পথে তোমার কোন বিপদ যদি হয়।

তুনে অদ্ভুত এক টুকরা হাসি কুটে উঠল জিতেনের গুণ্ঠগ্রাস্তে, আমার সুখের দিকে চেয়েই সে বললে, বিপদ যদি হয় তা হলে, যদিও, কাছে থাকলেই আপনি কি তা ঠেকাতে পারবেন ?

আশ্চর্য্য! কথা, হাসি, আচার ও আচরণে জিতেনকে জিতেন বলে আমি যেন আর চিনতেই পারছি নে। আমার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তার অজুহাত তুলে তাকে আর একবার অহুরোধ করতে প্রবৃত্তিই হ'ল না আমার।

আমি সতাই চলে গেল জিতেন। ঐ নির্ভর যত খাড়া চড়াই পথেও লম্বা লম্বা পা কেলে একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অতাবনীর এই ঘটনার একেবারে দমে গিয়েছে আমার মন। হঠাৎ কাশে এল বৃদ্ধ চটিওয়ালার শাস্ত, গভীর কণ্ঠস্বর : কিংব যত কিত্তিরে, বাবুজী। উনহোনে কেনারনাথজীক পুকার তুনা হোপা।

হতেও পারে। কিন্তু আমার যে মাহুবেব মন। এখন বিরক্তির চেয়ে জিতেনের জন্ত উবেগই তার বেশী। সতাই তেমন কোন অঘটন যদি ঘটে, কলকাতার কিরে গিয়ে সুরমার কাছে কি কৈকিয়ৎ দেব।

অবস্থা সবই আজ প্রতিকূল। পথ চলতে চলতে অত ঘাম হচ্ছিল। কিন্তু এখানে দারুণ শীত। ঠিক যেন না হলেও রোদ্-রোদ্ ভাব ছিল এতক্ষণ, কিন্তু জিতেন চলে যাবার পরেই আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। এ বাত্মার এই প্রথমবার বাহাদুরকে বললাম আমার গারে তেল মাখিয়ে দিতে—আশা যে ডলাইমালাইতে শীত ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু লাভ কিছুই হ'ল না। তেল মাখা শেষ হতেই মনে হ'ল যে আমার খালি গারে কারা যেন অনবরত বরফের চুচ ফোটাচ্ছে। গ্রান করবার জন্ত নীচে মন্ডাকিনী পর্যন্ত যেতে সাহসই হ'ল না। চটির প্রাক্ষণেই একটি জলের কল ছিল। তাই থেকেই এক বালতি জল নিয়ে কাকদ্বান করলাম। আর আমি ঐ কলতলার ধাকতেই বৃষ্টি নামল।

বড় বড় কোঁটা গারে মুখে এসে পড়ছে আমার। তা তহল কল না কঠিন শিলা, চোখ বুজে সঠিক বোঝা যায় না।

উপরে গিয়ে গরম জায়া ও পায়জায়া পথেও কোন আরাহই

পাই নে। পুরু কবলের আসনে বসে অশীতিপর বৃদ্ধের মতই মাথাটা হুই হাঁটুর কাছাকাছি এনেও ঠক ঠক করে কাঁপছে। হাতের আঙ্গুলগুলি অবশ। একটু স্বস্তি অহুত্তর করলাম দাঁউ দাঁউ করে উনান জলে উঠবার পর।

হাজার জন্ত আজ আর একটুও উৎসাহ নেই আমার। বাহাদুরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে জিতেনের কথাই কেবল ভাবছি। এই বৃষ্টিতে আশ্বত্থকার জন্ত কি করছে সে। মাথা নোঁজবার জন্ত একটু আশ্রয় যদি সে পায়ও তবু সঙ্গে সঙ্গে সজেই আগুন না পেলে নিজেই যে সে বরফ হয়ে যাবে।

খস্টা হরেক একটানা বৃষ্টি চলল। এর মধ্যে খাওয়াও হয়ে গেল আমার। খাওয়া জন্ত বিবাদ থিচুড়ী।

খাওয়ার পর দক্ষিণের বায়ান্দার স্মিরেছিলাম হাতমুখ ধোবার জন্ত। তখনই দেখলাম সেই বৃশ্ত—তখনই কাণ্ড আর একটা।

আগের বার বায়ান্দার এসে মন্ডাকিনীকে দেখেছিলাম যেন স্ত্রাবল পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এখন সেই স্ত্রাব মনে হ'ল যেন শুভ্র—নিখর নয়, হেলেহুলে নাচছে। নীচের আকাশে হালকা মেঘ দেখা যায় না বলে সেদিন বরাসুগ্রাঘের চটির বায়ান্দার দাঁড়িয়ে মনে মনে হুখে কবেছিলাম। আজ সেই কোভ মিটেবে নাকি! কিন্তু চোখের দৃষ্টি বশাস্তব তীক্ষ্ণ করে সেই দিকে তাকিয়ে ঐ সঙ্করশীল শুভ্রতাকে মেঘ আর মনে হয় না। মনে হ'ল যে, ক্রমেই যেন বড় হচ্ছে তা; আর এগিয়ে আসছে আমাদেবই এই ঘরখানার দিকে। দেবতে দেখতে মন্ডাকিনীর ধারাই কেবল নয়, এখন গভীর খণের সবটাই সেই শুভ্রতাব আবরণে ঢাকা পড়ে গেল; ঢাকা পড়ল হু-পাঘেরই পাহাড়ও। তার পরেই দেখি যে, ঠিক আমার সামনেই ঐ পুঞ্জীভূত শুভ্রতা।

বিস্মিত হয়ে দেখেছিলাম। কিন্তু তখনই ঘরের ভিতর থেকে বাহাদুরের উদ্ভিন্নকণ্ঠেব সতকবাণী কানে এল আহার—হ শিয়ার হো বাইরে, বাবুজী।

খাওয়া ছেড়েই পরমুহূর্তেই ছুটে বায়ান্দার চলে এল বাহাদুর। ধামের সঙ্গে দড়ি বেঁধে যে সব কাপড়-চোপার শুকাতে দিয়েছিল সে তা কিপ্রহস্তে সংগ্রহ করে ভিতরে নিয়ে গেল; তার পর আমাকেও সে হাত ধবে টেনে নিয়ে দরজা-বন্ধ করে দিল।

ঐ উদ্ভূত শুভ্রতা মুক্ত দ্বারপথে ঘরের মধ্যে যদি ঢুকে যায় তা হলে আমাদেব বিছানাপত্র একেবারে ভিজ্ঞে না গেলেও অদ্ভুত: সে ব্যাজে ব্যবহাভেব অবোপা হয়ে যাবে।

কুরাশার রাজ-সংস্কার! আর হু-চার ধাপ এগোলেই ঐ জিনিসই ডুবায়-বড় হতে পারে। ওর আক্রমণ থেকে আশ্বত্থকার জন্তই এখন হুগের যত গঠন এনিকের ঘরবাড়ীর—অত:ছোট আর অত কমসংখ্যক দরজা-জানালা তাতে।

একক আক্রমণ নয়। বড় ঘরের মধ্যে বসেও বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমার বৃষ্টি নেবেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার উদ্ভূতের ধাবে গিয়ে বললাম।



তবে বৈকাল পাঁচটা নাপান সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নীচে গিয়ে দেখি যে, কাছাকাছি পাহাড়গুলির চূড়ায় বিকিমিকি যেন। বৃদ্ধ চটিওয়ারা পথম সমাদরে এক গ্লাস পথম চা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের চূড়া নির্দেশ করে বললে, দেখিয়ে বাবু, অতী বর্ক'গিরা। ঔষ দো-চার যোজ মে রহ'পরতী গিয়নে লগে পা।

বরক আমিও দেখলাম। কিন্তু আমার মনের চোখের সামনে ভেসে উঠল জিতেনের মুখখানি। তবে বৃক কাঁপছে আমার। সে ত আরও হাজারি দুই ফুট উপরে উঠেছে। আজ সেখানেও বরক পড়ে নি ত—জিতেনের গারে, মাথায়?

খুব ভোবে কোন দিনই খুব ভাতে না আমার। কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম। জিতেনের অস্ত্র হুচিভা ত ছিলই, তার উপর আবার সাক্ষণ শীত। রাত্রে লেপ গারে দিয়েও স্নানিয়া হয় নি। স্নতরা উঠলাম সকালেই। উঠেই বাহাদুরকে বললাম, সব বেঁধেছে দে রাজার অস্ত্র তৈরী হতে।

গঙ্গোত্রীদের অস্ত্র অপেক্ষা করবার বৈধা আর আমার নেই। গতকাল জিতেন যদি কেনারনাথের 'পুকার' শুনে থাকে তবে আমি আজ যেন জিতেনের 'পুকার' শুনিছি—সামনের পথে কোথায় বৃকি বরক চাপা পড়ে কাতরকণ্ঠে সে আমার ডাকছে।

তথাপি প্রাতঃকৃত্য শেষে তৈরী হতে বেলা সাতটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে চক্রধর ওখানে এসে উপস্থিত। তার মুখে সংবাদ শেলাম যে, সেদিনও গঙ্গোত্রীদের আসা হচ্ছে না।

বাঁচা গেল তা হলে—তাদের অস্ত্র অপেক্ষা করি নি বলে কৈফির্য আর দিতে হবে না। এক দিকে নিশ্চিন্ত হয়েই রাজা বসলাম।

রায়োরারাত্রে পৌছবার আগেই স্বর্গাবোহণ নামের একটি ছোট চটি দেখেছিলাম। কিন্তু এ আমি স্বর্গে বাচ্ছি না বমালয়ে।

হামাগুড়ি দেওয়া আর নয়, এবার যেন গাছে চড়ছি। প্রতি-বারেই সামনের পা পড়ছে প্রায় ফুটখানেক উচুতে। তবে পাখরের মহীকুহ এটি—পাখরের ভালপালা ছড়িয়ে যেন আকাশে উঠে গিয়েছে। উজ্জ্বল জ্বন্তের তৃণওজ্ঞও আর বড় চোখে পড়ে না।

হ'মিনিট চলবার পরেই পাখরের ফলকে ৮০০০ ফুট লেখা দেখেছিলাম। '২০০০' ফুট চোখে যখন পড়ল তখন বড়ির কাঁটা দেখি দেড় ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে।

আর ওখানেই বৃষ্টি নামল—মুঘলধারার।

সেই বৃষ্টি মাথায় করে পাহাড়ে চড়ছি। চক্রধর ক্রমাগত আশ্বাস ও উৎসাহ দিচ্ছে। শুনে মনে জোর পাই বই কি। কিন্তু পা দুটি ত আমার রক্ত-মাংসের—তা আর চলতে চায় না। পাঁচ-দশ পা গিয়েই ধমকে দাঁড়াই, লাঠিতে ভর দিয়ে দম নিই, তারপর আবার চলতে থাকি।

রূপক নয়, এখন আকরিক অর্থেই প্রায় শতকপতি আমার।

তবু ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠলাম। আরও ঘণ্টাখানেক পর ১১,০০০ ফুট।

ততক্ষণে বৃষ্টির বেগ অনেক বেড়েছে। তবে চক্রধর আশ্বাস দিয়ে বললে যে, চড়াই ওখানেই শেষ—মালভূমিতে পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

চমকে উঠলাম। পারের কাছাকাছি সত্যই সমতল। তবু বিশ্বাস হয় না। ঘন কুয়াশা ভেদ করে সামনে দৃষ্টি খুব বেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় না। কিন্তু আমার কাছাকাছি ডাইনে-বায়ে ত দেখছি সত্যই কাকা। কোথায় গেল পাখাণকারার সেই নিববজ্জির দেয়াল? তবে কি সত্যই সশরীরে স্বর্গে উঠে এসেছি।

কথন:

## ভালবাসা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

চিরদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করো,  
অমৃতের পুত্র-কন্তা, তাই কবি-প্রাণ  
ভালবাসা দিতে আজ ভয়ে জড়োসড়ো—  
বৃথা অন্বেষণ করো মনের বিজ্ঞান!

বস্ত্র হতে ছিঁড়ে নিয়ে নিষ্কলঙ্ক ফুল,  
রূপ-রস-গন্ধ চূষে শেষে অনাহারে  
কেলে দাঁও খুলো মাঝে। একের এ ভুল,  
কণমোহ, লালসায় অস্ত্রে বৃথা মরে।

জানি সব, সব বৃকি; তবু এও জানি—  
'ভালবাসা তোমাদের দ্বিগে যেতে হয়।  
অনেক ব্যাধার পরও হৃদয়ের বাণী  
ছড়াতেই মুখ; তা যে রাখবার নয়।

তাই কি অমৃত সব বিলে পবে তুলে  
ব্যথা দাঁও, অথ পাও, তবু বাও তুলে?

## কবি কেমন ?

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কবি নহে কোনো বলের সত্য  
আলাদা তাহার পথ,  
তার পথ বহি স্বয়ং সে চলে  
সে যে মহাপর্যন্ত ।  
দূর থেকে তাকে দেখে পাছেরা  
বক্ষে সর্বজন,  
সে যে এক মনে গান গেয়ে চলে  
ভেঙ্গে সব বন্ধন ।  
দলগত কোনো মতবাদে কবি  
বন্দী নহে ত কভু,  
সব বল আর সকল মানুষ  
পূজা দেয় তারে তবু ।  
তার লেখা পড়ি কোনো বল যদি  
ভাবে—কবি আমাদেরি,  
তা হ'লে তাদের মস্ত সে জুল  
কোনো গভীরে ঘেরি—  
কবি কোনোদিন খণ্ডিত হয়ে  
করে নাকো বিচরণ,  
কোনো মতবাদে করে না সে কভু  
আত্ম সমর্পণ ।  
নিজেরি কেন্দ্রে নিজে সে স্থির  
সবারি বার্তা বহি—  
কবি চলে সদা, যে চিরমুক্ত  
কবি সে তাহারে কহি ।  
বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মতে  
তোমরা সকলে হাঁটো,  
কবি যদি হোত দলেরি সত্য  
সে যে হত অতি খাটো ।  
তবু বলিব যে সে যেমনই হোক  
কবি যে সাম্যবাদী,

সারা পৃথিবীর সকল মানুষে  
বুকে সে রেখেছে বাঁধি :  
তার জ্বরের প্রাকগতলে  
খোলা মিলনের দ্বার,  
জাতি ও ধর্ম তার বুকে এসে  
হয়ে গেছে একাকার ।  
রাজনীতি তার বঁহু উর্দ্ধর  
সব ফুলে গাঁধি মালা,  
ভেদনীতি ছেদি সাজায় সে নিতি  
মহাজীবনের ডালা ।  
সব মানুষের ঐক্যের বেদ  
তাহার সাম্যবাদ,  
ভেদের কুসুমের সাম্যের মালা  
অমৃতের সংবাদ ।  
নিত্য-নতুন প্রগতির পথে  
তাহার যাত্রা চলে,  
সব মানুষের জীবন সত্য  
বক্ষে তাহার জলে ।  
সকল জনের কবি সে যে তাই  
সবারি মহাশ্বর,  
সবারি মনের কথা কয় সে যে  
অনন্ত জনতার ।  
তাই সে যে তাই সকলের বড়ো  
উর্দ্ধে তাহার শির,  
বিচরণ তার সহস্র পথে  
মুক্ত এ পৃথিবীর ।  
অভিনন্দনে আর অপমানে  
খোড়াই গ্রাহ তার,  
তাহারে বিরক্তি সারা এ জ্বন  
কবিত্তে নয়কার ।

মৃত্যুর অনতিকালপূর্বে কবি এই কবিতাটি পাঠাইয়া ছিলেন । তাই যনে হয়, ইকাই তাহার শেষ রচনা ।



মানমনে পথ চলছিল। পায়ের নিচে ছোট একটা পাথরকুটির ধাবাতে পড়ে বেতেই সাধলে নিল। এমন হয় না কোনদিন। শুধু আজ। আজ যেন মনটাকে কিছুতেই বাঁধতে পারছিল না। ষোল বছরের একটানা একঘেয়ে স্তর হঠাৎ বদলে যাওয়ার ঘরতে পারছিল না আজ।

সীতারাম ঘোষ ঠোট থেকে বেবোবার মুখে সেই মল্লিহটা। 'ছাঃ হ'ল হাতটাকে একবার কপালে ছুঁইয়ে নেয়। কোনদিন। হয় নি আজ তা হতে দেখে ওড়িয়া পুরোহিতটাও তাকিয়ে থাকে। পাশে একটা পানের দোকান। দোকানের বাড়িটাকে ঝাং দেখতে হ'ল। আজ হাতেই ঘড়ি ছিল। তাই ওদিকে চাকতে হ'ল না। পান-দোকানীও তাই তাকিয়ে থাকে।

এইটুকু পথ। আমহাট্ট ঠোটটুকু পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী বাড়ির মোড়ো স্থল। চেনা পথ, চেনা জন। একদিনের নয়, ষাট পাঁচ বছরের। তবুও আজ যেন অচেনা লাগে। নতুন লাগে। সামনেই স্থলের গেট—“মনোরমা বালিকা বিদ্যালয়।” গটের সামনে পা দিতেই দারোয়ান তাকিয়ে দেখে। হিন্দুস্থানী এই দারোয়ানের চোখেও সে নতুন। চোখে চোখ পড়তেই বলে, 'নমস্কে দিদিমণি।' বিনিময়ে কপালে হাত ঠেকাতে হয়। সব তুন। সকলের চোখে বিষয়, সে বিষয় নিজের মনেও।

গেটটুকু পায় হতেই এককালি লন। সেটা পায় হলেই ক্লাব-ঘরের আগে একটু দরদালাল মত। সেখানে ঝাড়িয়ে একপাল মরে একসাথে হেসে উঠল, 'এই দিদিমণি।'

প্রত্যহরে একটু হাসি। তার পর সোজা আশিস ক্রমে চুকে ডা। যেখানে নমিতা, বেলা, বমা, বলনা, শিপ্রাদি গা এলিয়ে বসে আছে।

ছায়ায় দেখেই একসাথে লাকিয়ে উঠল, 'হ্যালো মিস, তুমি মিসেস দার, শুভ মর্নিং!'

নমিতা নামের যোগা যেহেট উঠে এসে একেবারে জড়িয়ে ধলে, 'ইস ছায়াদিকে কি অদ্ভুত লাগছে দেখ।'

বমা একটু মুচকি হেসে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন মানে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অবশ্য তোকে নয়, মিঃ অমৃতোব দায়কে। বিনি সত্য সত্য ছায়ানাথী একটি কুমারীকে গেজেটেড করেছেন এবং সাথে সাথে নিজেও গেজেটেড হয়েছেন।'

'তার পর কি ধরবে?' এগিয়ে এলেন শিপ্রাদি। শিপ্রাদিই ওদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিতা। তাই দিদির সম্মান পেয়েছেন। হু ছেলেও আছে। স্বামী বেশ ভাল চাকরি করেন। শিপ্রাদিকে কতবার বলেছেন চাকরি ছেড়ে দিতে। কিন্তু কিছুতেই রাজি হন নি। কারণ চাকরি কথা তাঁর পেশা নয়, নেশা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়ানোর যে একটা চাকি আছে এ কথা তিনি স্বামীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বেলা বরসে ছোট। বলল, 'ছায়া, তোমাকে কিন্তু খুব প্রমত্ত লাগছে।'

একমাস ছুটির পর ছায়ার জীবনে পরিবর্তন হয়েছে অনেক-খানি। আর সকলে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। সেই নমিতা, মুখচোরা স্বভাব। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমিকের চিঠি পড়ে। কারও চোখে পড়লে চোখ-মুখ ক্যাকাশে হয়ে ওঠে। অনেক সীড়াগীড়ি কবেও কেউ ওর প্রেমিক সব্বন্ধে একটিও কথা শুনতে পার নি।

বেলা বরসে ছোট। তাই উচ্ছলতার যেন উপচে পড়ে। একদণ্ড কথা না করে থাকতে পায় না। শিপ্রাদি ঠাটা করে বলেন, 'বেলা স্বামীকে তুমি জালিয়ে রাখবি। বেচারা খেতেখুটে আশিস থেকে কিয়েও তোমার মুখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

বমা যেহেট বড় বেশী সজাগ। একটু প্রচ্ছন্ন গর্বও যেন মনে পোষণ করে। কাবও সঙ্গে বেশী কথা বলে না। নিজের সব্বন্ধে

এত বেশী সচেতন যে, কেউ কিছু বললে ঘুরিয়ে আকর্ষণ করতে ছাড়ে না। ও নাকি কবে এক ইঞ্জিনিয়ারকে ভালবাসত। বিলেত থেকে কিরে এসে বিয়ে করবে এই কথা বলে সেই যে সে চলে গেছে আর আসে নি। বসে অবশ্য মনে মনে ঐ রকম একটা আশা পোষণ করে আছে।

চুঃখ হয় কলনার জন্মে। প্রেমের বার্থ হয়ে ও যেন জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেছে। জীবন সবচেয়ে ওর মন হত্যাশায় ভরা। হাসে খুব কম। বয়স হতে চলল। বলে, 'বিয়ে করব না।'

জরেনি: হিগোটি দিয়ে ক্লাশ নিতে গেল ছাত্রী। সেই ক্লাশ। সেই কচি কচি পরিচিত মুখ। অসীম কোঁতুহলে ভরা। ছাত্রদায় পরিবর্তনে ওদেরও চোখেমুখে বিস্ময়। বিস্ময় তার নিজেরও। এই সব শিশু আজ যেন নতুন হয়ে ধরা পড়ল তার চোখে। আগে সে ছিল সব চেয়ে কড়া আর বদমাশী। আজ যেন সব থেকে সহজ হয়ে ধরা দিতে ইচ্ছা করছে। বাকেরই শাসন করতে বাক সে, আজ তার চোখেমুখে স্নেহ-মাখানো কোমলতা ফুটে উঠছে।

সাদে ন'টার ক্লাস শেষ হতেই মেরেয়া আবার ওকে জড়িয়ে ধরল, 'কি ভাই, খাওয়াটা কবে হচ্ছে। একেবারে কাকি দিচ্ছন। ত? না কতটিকে একেবারে লুকিয়ে রাখতে চাও, পাছে খোয়া যায়।'

ছাত্রী একটু হাসল। বলল, 'তাই ত বলি খাওয়ানটা যার খাওয়াটাও তারই আতিথেয় সম্পন্ন হলে চলত না?'

'এক্সপেন্ট, নাইস প্রস্তাব। ম্যারেক সেরিয়নি। কবে হচ্ছে তা হলে?'

'কাল জানাব', বলে বেরিয়ে এসে ছাত্রী।

অল্প দিন ফুলের ছুটির পর পনের মিনিট কি আধ ঘণ্টা আজ্ঞা জমতে বেশ ভালই লাগত। কিন্তু আজ যেন কিসের একটা আকর্ষণ তাকে কেবলই ঘরমুখো করতে লাগল। অমৃতোবের আশি কেরবার আগেই তাকে পৌঁছাতে হবে। একবার দেখা হওয়া চাই।

ফুল থেকে বেরিয়ে তাকাতাড়ি চলতে লাগল ছাত্রী। মন কিসের আমেজে যেন ভরপুর। অমৃতোবকে কেমন করে স্মৃতি করা যায়? কেমন করে তার মনটাকে সম্পূর্ণ করে কেড়ে নেওয়া যায়। শুধু এই চিন্তা। অমৃতোব তাকে ভালবেসেছে। ক্রম-ক্রমের মত তার উচ্চ-ধ্রুব জীবনে এনেছে শান্তির কল-বারা। নেশা লাগিয়েছে তার মনে প্রাণে, এমন কি দেহেও। গত রাতের নেশা আজও তার মনে জড়িয়ে রয়েছে। জীবনে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছে অমৃতোব।

চান-খাওয়া সেয়ে অমৃতোব বিশ্রাম করছিল। দশটার বেবতে হবে। ছাত্রী জন্তপদে ঘরে ঢুকল।

অমৃতোব বলল, 'বাক, আমি ভাবলাম ছোট ছোট ছাত্রদের পেয়ে শিক্ষয়িত্রী বোধ হয় তার বুড়ো ছাত্রের কথা ভুলে গেল।'

ভির্বা ক দৃষ্টিতে একবার তাকাল ছাত্রী। বলল, 'বুড়ো ছাত্র

যে ক্লাশের বেড়া ডিঙাতে পারে না, তাকে একটু শাস্তি দেওয়া ভাল। বাক শোন, আজ অকিস থেকে তাকাতাড়ি কিরবে। আজ একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে।'

'কিসের প্রোগ্রাম? সিনেমা থিয়েটার না আর কিছু?'

'ওসব নয়। আসছে যোববার ফুল-বাছবীনের একটা ভোজ দিতে হবে ভাল করে।'

'ও হরি, তাই বল।' তা এর জন্মে তাকাতাড়ির দরকারটা কি। হবিবার আসতে ত এখনও ছ'টা দিন বাকী।'

'বাও ইয়ারকি কম না। অকিসের দেবী হয়ে গেল।' সবে-মাত্র টেনে ধরা হাতটা ছেড়ে দিয়ে অমৃতোব একটু হাসল। ছাত্রীরও মুখখানা সিঁদুর হয়ে উঠল।

সত্যি সত্যিই অমৃতোব মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে বখন আশি বেরিয়ে গেল ছাত্রীর মনটাও বিবর্তিত ভাবে গেল। সারা দুপুরটা তাকে একা একা কাটাতে হবে। এতদিন একটা নয়, বহু দুপুর ত সে একা একা কাটিয়েছে। কিন্তু এ রকম একক নিঃসঙ্গতা ত কখনও বোধ করে নি। আজ অমৃতোবকে ছাড়া একটা মুহূর্তও তার কাছে একান্ত অসম্ভব। অমৃতোব যে তার সমস্ত কিছুকে এমন করে বললে দেবে, সে কলনাই করেনি।

সকাল সকাল অমৃতোব কিরল আশি থেকে। নিঃসীম নিম্নকতা থেকে ছাত্রীও যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচল। চারটের পর থেকে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বসেছিল। প্রতিটি মুহূর্তকে গুনে চলছিল। কখনও বিরক্তি কখনও বা অহেতুক শঙ্কা। এত দিন শিক্ষয়িত্রী থেকে হুঁ থেকে বাদের সে দেখেছে, বাদের ভালবাসাকে করুণা করে এসেছে আজ তাদেরই পে একজন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধি বা থেকে ছাত্রী বঞ্চিত ছিল।

অকিস থেকে কিরে এসে গানের আরাটা খুলে ফেলল অমৃতোব। দেওয়ালের আলনার টাঙিয়ে রাখল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাপরে ট্রামে বাসে বা ভিড়, তাতে বউয়ের কথা বেধে সময়মত করে কেবা যে কি কষ্টকর তা এত দিনে ঠিক ঠিক বুঝলাম।'

ছাত্রী জানে অমৃতোব পরিভ্রান্ত। তাই ছাত্রী কাপড়টাকে নিয়ে পাট করতে করতে বলল, 'আগে একটু জিরিয়ে নাও। তার পর একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা বাবে। পার্কে কিবা মরদানে।'

অমৃতোব বলল, বেশী জিরিয়ে লাভ নেই। কারণ এ ঘর ঘরে বসে জুড়াবে না সহজে। তার চেয়ে চা চা খেব করে চল বেরিয়ে পড়া বাক।'

অমৃতোবের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে বাওয়া। এও এক নতুন ধরনের স্বাদ। একজন স্তম্ভন বুকের পাশে পাশে ছাত্রী বেড়িয়ে বেড়াবে। কত লোক তাকিয়ে দেখবে। কেউ কেউ ছ'একটা মন্তব্যও ছুড়বে ওদের প্রতি ইঙ্গিত করে। যদিও তাবা স্বামী স্ত্রী, তবুও এই বেড়ানোর মধ্যে সেই প্রেমিক-প্রেমিকার ঘোষাল আছে। লজ্জা করে, কোন ছাত্রীর সামনে যদি পড়ে যায়! একটু একটু বেরেয়া

হয়ত হাসবে? না তার চেয়ে ময়দানেই বাওয়া ভাল। অমৃতোষকে বলতেই বলল, 'তখান'।

মৌন ঘেরের মত শহরের আভিজাত্যকে এড়িয়ে নিয়ালার বসে আছে ইন্ডেনপার্ডেনটা। এখানে এখনও সবুজ রঙের সঙ্গে দেখা হয়। দু'একটা প্রাণের কথা বলার স্বত্তি আছে। বাসের উপর ক্রমাল বিছিয়ে বসতে বসতে অমৃতোষ বলল, 'এখনও এদিকটার এলে প্রাপ্ততরে একটু নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।'।

ছায়া সার দিল, 'সত্যি শহরটাকে বেন বুড়ো হাঁপানি যোগীর মত মনে হয়।' খাস টানছে আর ছাড়তে কেবল।

অমৃতোষ বলল, 'তারপর, স্থলে গিয়ে কেমন মনে হ'ল?'।

ছায়া বলল, 'একটু নতুন নতুন লাগল। জান—আমাদের জীবনটাকে সবাই সুখী দেখতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করে দেখতে পাবে না। অভ্যস্ত জীবনব্যতীরা বাইরে গেলে আমরা হলাম দর্শনীয়। সাদা শাড়ী, চওড়া লাল কিংবা কালো পাড়। চোখে সাধারণ চশমা আটা। সাদা সিঁচি আর পায়ে এককোড়া ড্রাগেন্স। এই ত আমাদের লেবেল আটা জীবন। হোজ গড়িয়ে গড়িয়ে স্থলে বাও আর এস। যদি কখনও ব্যতিক্রম ঘটলে কোথাও বেড়াতে বাও ত লাগবে ঘৃণিকটু। সিনেমা থিয়েটারগুলো ছাড়া একচেটে করে নিয়েছে। দিদিমণিদের দেখলে তাদের অবস্থা বাড়ে। ক্লাবে-সোসাইটিতে আমরা বেমানান। একমাত্র প্রাইজ ডিগ্রিবিউশন সভা ছাড়া আমরা সর্বত্র বেমানান খাপছাড়া।'।

অমৃতোষ একটু হাসল। আলোর গা বেয়ে আঁধার নামছিল। ছায়ায় মুখখানায় উপর বহুদিনের এটে দেওয়া এক কারুণ্য অমৃতোষের চোখকে স্পীড়িত করতে লাগল। হঠাৎ সেদিনের ছবিটা তেমে উঠল চোখের সামনে, বৈদ্যন বজুর জী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'ইনি আমার বান্ধবী ছায়া মুখার্জী। আর জী অমৃতোষ মায়।'।

সাধারণ সুখী চেহারা। দুটো চোখ কারুণ্যে ভরা। হাত স্থলে নব্বাধ করতে গিয়ে অমৃতোষ দেখেছিল অসহায় একখানা সুখ। বিক্ষম্ত যৌবন, জীবনের হতাশার স্রাভ মন।

নব্বাধ করে অমৃতোষ বলল, 'খুশী হলো আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। দেখুন, আপনারা শিকরিত্তী জীবনটা আবার বড় ভাল লাগে।'।

মিতহাস্তে ছায়ায় মুখখানা আরও করুণ মনে হ'ল। বলল, 'হুঁ থেকে নদীকে মনে হয় বড় উজ্জল। কিন্তু ভিতরে তার অস্ত্র কায়াল লুকিয়ে থাকে জানেন কি?'।

অমৃত লাগল কথাগুলো। অমৃতোষ মুক্ত হবে একটু তাকিয়ে বইল। একটু নিস্তব্ধতার পর বলল, 'বোধ হয় তাই। তবে কি জানেন আদর্শ আছে ত?'।

'ওইটুকু মূল অমৃতোষ বাবু। শুধু আদর্শ নিয়ে কি জীবনের সব কাক ত্যনো যায়?'।

আরও কি কি কথা হয়েছিল অমৃতোষের মনে পড়ে না। শুধু

মনে পড়ে ও চলে বাওয়ার পর বহুপতী বলেছিল, 'সেইটি বড় ভাল।'।

তারপর অনেকদিন আর দেখার সুযোগ হয় নি। বহুদিন পরে দেখা হ'ল একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশনে। একপাল ছাত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল ছায়া। অমৃতোষ গিয়েছিল বহুদেব সঙ্গে। দেখা হতেই একটু হাসি। বহুদেব থেকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কেমন আছেন?'।

'ভাল, আপনি কেমন?'

'এল, ওখানে যান না বে?'।

'সময় পাই না একটুও। এই ত দেখুন না ছেলে চ্যানোর কাজ আমাদের। অবকাশ কই? আসুন না একদিন আমাদের বাসায়।'।

অমৃতোষ চাইছিল এমনি একটা আহ্বান। ছায়াকে তার যতখানি ভাল লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লেগেছে তার শিকরিত্তী জীবনকে। তাই জানবার আগ্রহে সে সাদবে গ্রহণ করল আশ্রয়। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে লিখে নিল ঠিকানাটা। তারপর...

চমক ভাবিয়ে জিজ্ঞাসা করল ছায়া, 'কি ভাবছে?'

'ভাবছি আমাদের প্রথম পরিচয়টা।' অমৃতোষ পকেট থেকে বেদ করল একটা সিগারেট। ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'বল এবার তোমাদের স্থলের গল্প। তোমাদের সেই মেয়েটির খবর কি, যে তার ছেলেবেলার প্রেমিকের পথ চেয়ে বসে আছে।'।

'কল্পনা ত, আহা বেচারার কথা ভাবলেও দুঃখ হয়। কারও সঙ্গে বেশী যেনে না। কথা বলে না। মাঝে মাঝে অভ্যন্তর হয়ে বসে থাকে। মেয়েরা ভালবেসে এমনি করেই ত মরে।'। কটাক্ষপাত করল অমৃতোষকে।

অমৃতোষ বুঝতে পারল। বুঝতে পেয়ে একটু হাসল প্রথমে। পরে হাঙ্কা করে বলল, 'মেয়েরা আবার ভালবাসল কবে? আমার মনে হয় ভালবাসার অভিনয়ে তাদের সমকক্ষ নেই। মেয়েদের মৃত্যুটা দেখেছ, তার কারণ সেটা বড় স্থল, পুরুষের মৃত্যু ত দেখনি। সেটা খুব সুন্দর কিনা। এত সুন্দর যে চোখ দিয়ে দেখার উপায় নেই।'।

'খাক খাক হয়েছে, কথা বলতে তোমরা পারদর্শী তা আমরা জানি। তবে ঐ পঙ্খ'।

অমৃতোষ বুঝল কথাটা ছায়াকে আঘাত করেছে। তাই একটু হাঙ্কা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। ছায়ায় একখানা হাত মৃদোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'সত্যি বলত, ছেলেবেলার তুমি কাউকে ভালবাসতে?'

অকস্মাৎ এমনি প্রশ্ন করার ছায়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বইল। উত্তরের অপেক্ষা না করেই অমৃতোষ বলতে লাগল, আমি বাসতাম। বড় লাভুক ছিল সে। সামনে এসে কিছুতেই

কাঁড়তে চাইত না। বতই ডাকি না, দুয় থেকে কথা বলে সরে যেতে চাইত। ভাবতাম ওটা ওর স্বভাব। কিন্তু আশ্চর্য্য একটা দিনের জন্তেও বুঝতে পারি নি সে আমাকে ভালবাসত না। আমাকে পছন্দ করত না একটুও। নিজের ভুল একদিন নিজের কাছে থাকা পড়তেই চাবুকের আঘাত ধরে অপরাধী যেমন কাঁদতে পারে না অথচ বেদনাকে চেপে রাখতে কষ্ট হয় আমার অবস্থা হয়েছিল সেই রকম।

ওরা আমাদেরই বাসায় ভাড়াটে ছিল। শেষে ওর বাবা বলি হয়ে বাওয়ার বাসা ছেড়ে দিয়ে উঠে গেল। বাওয়ার সময় মেয়েটাকে ডেকে বলতে চেয়েছিলাম মনের কথা, শোনে নি। সেখানেই যদি ইতি হ'ত ত বাঁচতাম। পাঁচ বছর বাদে আমার তাকে দেখলাম কলকাতায় পার্কে। আমার আলাপ হ'ল। বাসায় ঠিকানা নিয়ে ওদের নতুন বাসায় গেলাম। ওর বাবা আমাকে খুব ভালবাসত। মাকে কোনদিন দেখি নি। বাসাতে একটা পুরোনো বি ছিল। সেও আমাকে খুব ভালবাসত ও আমাকে দেখেই বলল, 'এই যে দাদাবাবু, বছরদিন পরে আপনাকে দেখলাম। বা-দাদারা ভাল আছেন ত?'

বললাম, 'সব ভাল, কাকাবাবু কই?'

'বাসায় নেই, এখন হাসপাতালে গেছেন। দিদিমনি আছেন ডেকে দেব।'

কাকাবাবু বাসায় নেই শুনে কি হুবুঁড়ি চাপল। ভিতরে চুপতেই সে বলল, 'এই যে আসুন, বাবা ত নেই।'

বললাম, 'জানি, নেই। তোমার সঙ্গে বসে ততক্ষণ গল্প করি একটু। উঃ কতদিন পরে যে দেখলাম।' এতটুকু দিবা বা ইতস্ততঃ না করেই সেদিন পুরানো ভালবাসার স্মৃতি একবার বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। বেশীক্ষণ নিজেকে সংবত রাখতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে তার একখানা হাত চেপে ধরলাম। ছাড়াবার চেষ্টা করতেই টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য্য, তার নরম হাতটা যে আমার গালে অতখানি কর্কশ হয়ে বাজবে জানতাম না। কালিদ্রুথ নিয়ে বেরিয়ে আসব কি-টা সেই সময় চা নিয়ে এল। বললাম, 'চা খাব না, কাকাবাবু এলে বল আমার কথা।'

হঠাৎ এতখানি ব্যস্ততার কারণ বুঝতে না পেয়ে সে একটুখানি ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইল। ও কি করছিল চেয়ে দেখার প্রবৃত্তি আর হয় নি। মুখ নিচু করে বেরিয়ে এলাম।

অনেকদিন আর গুণে হই নি। হাস ভিনেক পরে বাসায় ঠিকানার আমার নামে এল চিঠিখানা। তারই লেখা। সেদিনের সেই রুঢ় ব্যবহারের জন্তে অজস্র ক্ষমা প্রার্থনা। কাকাবাবুর শরীর খারাপ। আমাকে একবার যেতেই হবে। ওদু কাকাবাবুর জন্তে নয়, তার জন্তেও তার বিশেষ অমুহোষ।

বীভৎস ক্ষতটাকে চেপে রাখতে পারি নি। চিঠিখানা পড়বার পর সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠল স্পষ্টতর হয়ে। কেবলই বনে

হ'ল সে আমার যুগা করে। তাই সে চিঠির এতটুকুও মূল্য দিই নি সেদিন।

সেখানেও শেষ হ'ল না। আমার কিছুদিন পরে দেখা হ'ল। সে তখন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। যাতায় উপরে দেখা হতেই সে প্রথমে কথা বলল। চেহারার কথাবার্তার সেই উগ্রতা নেই। বরং কিসের ভাবে বেন হয়ে পড়েছে সব উগ্র অহংকার। কঠম্বরে নেই সে তীব্রতা। 'হু' একটা কথায় ঝাঁকে আত্মীয়স্ব স্বত যাতায় উপরে হাত চেপে ধরল, 'তোমাকে একবার আসতেই হবে।'

'বা ছুয়ে শপথ করলাম বাওয়ার। সব অভিমান ত্যাগ করে একদিন হাজির হলাম সেই বাসায়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকাবাবু, কই, কেমন আছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তিনি নেই।'

এই ছোট্ট কথাটি আমাকে তখন ভেঙ্গে ও ড়িয়ে চুওয়ার করে দিয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ অসহায় লোকটা আমাকে কত ভালবাসত! সুভার আগে বোধহয় দেখতে চেয়েছিল। নিজেকে আর ধবে রাখতে পারলাম না। তার একখানা হাত চেপে ধবে বললাম, 'কেন আর একখানা চিঠি লিখলে না?'

নির্জিকায়ভাবে সে উত্তর দিল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে না।'

সেইদিনই তার মুখে ওনলাম, কাকাবাবু যারা বাওয়ার হাস-খানেক আগে হাসপাতাল থেকে কিরে এসেছিল কাকীরা দীর্ঘকাল ক্ষয়বোপে ভোগার পর। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। পারে হাত দিয়ে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'বৈতে থাক বাবা। তোমার নাম প্রায় শুনি খুব সুখে।'

তার পয়ের ইতিহাস আরও করুণ, আরও বেদনায়র। জানতাম না যে, যারের শরীরে যে বোগের বীজাণু ছিল তা আমার মেয়ের দেহে এসে বাসা বেঁধেছে। যে দিন জানতে পারলাম সে দিন আমিই ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে রেখে এলাম। কিন্তু কাকীমাকে ধবে রাখতে পারলাম না। নিজেকে সবকিছুর জন্তে দায়ী করে কয়েক দিন পরে তিনি আত্মহত্যা করলেন। সংবাদ পেয়ে সে আমার হাত ধবে কেঁদে কেঁদে। বললাম, 'সবই নির্যতি। ভয় কি? আমি ত রয়েছি তোমার কাছে কাছে।'

অনেক কষ্টে এক দিন তাকে সাহিরে তুলতে সফল হলাম। তার পর নিজের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা পালন করতে চাইলাম। কিন্তু কি জানি সে কিছুতেই রাজি হতে চাইল না। আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ এক দিন সে কোথায় চলে গেল। চিঠি লিখেছিল একখানা ঠিকানা না দিয়ে, '...তুমি যদি বিয়ে না কর ত আমি আত্মহত্যা করব।'

অমুতোষের অব্যক্ত যে ইতিহাস বার বার ছায়া তনতে চায়নি সেটা যে এতখানি করুণ, বেদনায়র তা কি জানত? অতীতের কাহিনী বলতে বলতে তন্দর হয়ে বাওয়া অমুতোষ বেন ছায়া



কলু ভাণ্ডারী'র মনালি শহরের একটি মনো'রম দৃশ্য



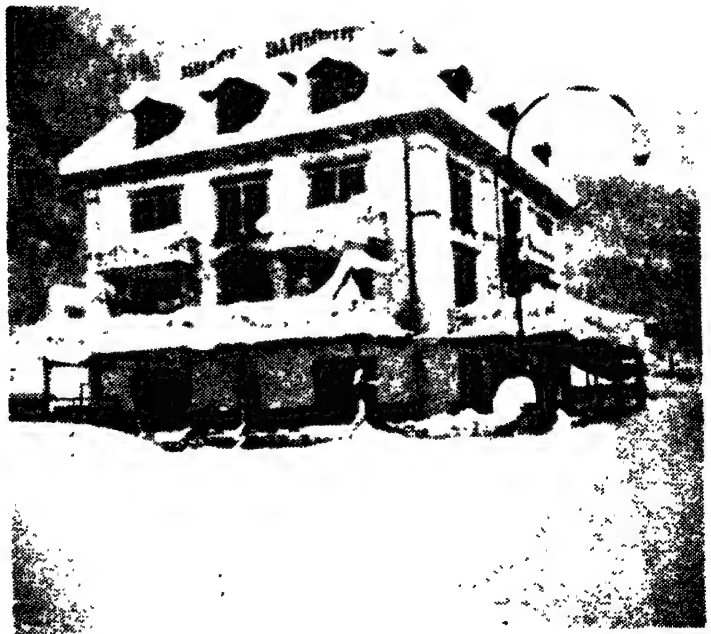
উত্তর প্রদেশে মীরাতের সন্নিকটে গ্রামবাসীরা নিজে'রাই চেষ্টা করিয়া এই রাস্তা তৈয়ারি করিয়াছে





আশাদ-তোরাণ ( বাঁকিমহাম প্যালেস )

ফটো : সচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়



ভূমারপুরী ( সুইজারল্যান্ড )

ফটো : সচিত্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

খে নতুন করে ধরা দিল। হেলেনটিকে কেঁপেই তাঁর প্রথম মনে  
নুতল বা-বাগর। কিন্তু সে আবারও ওকে যে একখানি বিকৃত  
রছিল তা জানত না। তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এল  
অন্তোবের সৃষ্টিটা। আর অন্ধকার হয়ে এল ওদের চোখের  
মনে। সবুজ রঙের কঁকে কঁকে সোনালী বালবগুলো জলছিল  
এন অসংখ্য জীবনের স্রুটি। ছায়া একটু সরে এসে অহুতোবের  
তথ্যনা চেপে ধরে বলল, 'আমি ত ওজ্ঞতে চাইনি তোমার  
তীতকে।'

দার্পনিকের মত চোখ ঝাড়িয়ে বলল অহুতোব, 'নিজেব কতটা  
জামাক দেখিয়ে রাখলাম ছায়া। যদি পায় ত সেটাকে সারিয়ে  
তালার চোঁটা কর।'

বাসার কিংবতে সে দিন একটু রাত হয়ে গেল। কিংবে এসে  
'জনে হ'জনের দিকে চেয়ে ভাবল কতু অসহায়।

পর দিন ফুলে গিয়ে ছায়া সকলকে নিমন্ত্রণ করল। শিপ্রাদি  
ষ্টা কবে বলল, 'রান্নাটা কিন্তু মিস রায়েব নিজেব হাতের হলে  
গল হয়।'

ছায়াও একটু ঠাট্টা কবে বলল 'কেন, ও হাতের হলে বুঝি  
গল লাগবে না। বাক শিপ্রাদি, তোমরা কিন্তু হ'জনে নিমন্ত্রিত।  
বমন করে হোক উনিটিকে পাকড়ে আনতে হবে, বুঝলে? ওদিন  
গানের একটা প্রোগ্রাম রাখা হবে বলছিল।'

গানের কথা হতেই সকলে কলনার দিকে তাকাল। ওদের  
থো সেই একমাত্র ভাল গান জানে। ছায়া গিয়ে ওর হাত ধরে  
লল, 'সত্যি ভাই, ওদিনকার গানের আসরে আমাদের মুখ রাখতে  
মি। ওর অনেক বজুবাকব আসবে আপিস থেকে। হ' একজন  
য়াকি মেডিও-আর্টিষ্ট আছে। তবে আমরা সিগর বে, তোমরা  
লা সকলকে চার্ম করতে পারবে।

কলনা স্বভাবতই লাজুক। আত্মপ্রশংসার কুকড়ে এতটুকু হয়ে  
গেল। বলল, 'দেখি ভাই, চোঁটা কবব তোমাদের আসরে বোগ  
দিতে। তবে জান ত আমার শরীর ভাল নয়, গাইতে পারব কিনা  
হলতে পারি না।'

'স্নাচ্ছা সে বা হয় হবে ভাই, তুমি অবশ্যই আসবে।'

আসর বলল রবিবারের সন্ধ্যায়। অনেকেই এল। আপিস  
থেকে অহুতোবের সাত-আট জন বন্ধু এল। সকলের সঙ্গে পরিচয়  
হ'ল ছায়ায়। তার নিজের বন্ধুগণও সবাই এক এক কবে এল।  
শিপ্রাদি এল স্বামীর সঙ্গে ছোট হেলেনটিকে নিয়ে। এসেই জিজ্ঞাসা  
লল, 'ওরা সব এসেছে—কলনা?'

হেলেনটিকে কোল থেকে নিয়ে একটু আদর করে ছায়া বললে, সে  
ও এসেছে। তবে কলনা কেন বে দেবী করছে বৃকতে পারছি না।

পরিচয় বিনিময় শেষ হ'ল। আসর জমে উঠল।  
অহুতোবের বন্ধুরা গাইল। শিপ্রাদির স্বামীও গাইল। রমা  
সেতার বাজাল। বেলা গান গাইল বন্ধ নয়। কিন্তু কলনা কই?  
এল না। শিপ্রাদি বলল, 'আচ্ছা বেয়ে বাবা! এত কবে বলা হ'ল।'

রমা বলল, 'ও রমাবরই এইরকম।'

বেলা বিজ্ঞান করে বলল, বোধহয় তার প্রেমিক এতদিন পরে  
কিয়ে এসেছে তাই গান শোনাচ্ছে।'

নরিতা একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'অসুখ-বিসুখ হঠাৎ  
একটা কিছু হতেও ত পারে।'

সার দিল ছায়া মাথা নেড়ে। সব কথার কঁকে তার মনটা  
কি একটা আশঙ্কার খচ করে উঠল। সে জানে সকলের অলঙ্কে  
ঐ মেয়েটার জন্তে একটা অচেতনক বেদনা তার মধ্যে জমা ছিল।  
সে যে কতখানি অসহায় তা ছায়া বুঝত। বার্ষ প্রেমের বে জালা  
নিয়ে মেয়েটা ঘুরে বেড়ায় তার খানিকটা উপলব্ধি করতে পারে  
সে। তবুও অহুতোবের রাখতে একবারও এল না।

আসর শেষ হয়ে গেল। এক এক কবে সবাই চলে গেল।  
ছায়াও মনটা বিয়গ হয়ে বইল কলনার জন্তে। রাতে অহুতোবকে  
বলল, 'জান, আজ সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে কলনার জন্তে। বেচারা  
একবারও এল না। সেই যে বার গল্প বলেছিলেন তোমাকে।

রাত্রির একটা আবেগ আছে। আর তা সবকিছুকেই ঢেকে  
রাখে। অহুতোবের ক্যাকাশে ভাবটা তাই ঢাকা ছিল ছায়ায়  
সামনে। বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে ছায়া যেটা উপলব্ধি করতে পারে  
নি, অহুতোবের পাশে বিছানায় শুয়ে সেটাও তার উপলব্ধির বাইরে  
পড়ে বইল।

পরদিন সকালে ফুলে বাওয়ার পথে ভাবছিল ছায়া, 'কলনার  
সত্যি হ'ল কি?'

ফুলে গিয়েই সে স, 'কলনা ফুলে আসে নি।'

সকলেই ভাবল 'নিশ্চয় কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। শেষে  
শিপ্রাদি স্বপ্নন আসল-ধববটা দিল তখন সকলেই চমকে উঠল।  
কলনা শনিবার দিন সবাই চলে বাওয়ার পর ফুল-কমিটির সেক্ষে-  
টারি বড়ীতে রেঞ্জিনেশন লেটার দিয়ে গিয়েছিল। শিক্রিয়ত্রীর  
পেশা তার নাকি ভাল লাগছিল না।

ধববটা শুনেই পদম্পর মুখের দিকে তাকিয়ে বইল। বার্ষ  
প্রেমের জালায় কলনা যে এইরকম একটা কিছু করবে একথা কেউ  
ভাবে নি।

তবুও একটা আশঙ্কা অমূলক হলেও কেউ মন থেকে ত্যাগে  
পারল না। খেয়ালের বশে মেয়েটা যদি আত্মহত্যা করে  
বসে।

সেই মুহূর্তে ছায়ায় মুখখানা ক্যাকাশে পাণ্ডুর হয়ে গেল।  
সকলের সামনে ঝাঁড়িয়ে সে সকলকে ছাড়িয়ে একটু পতীয়ভাবে কি  
একটা ভাববার চোঁটা করল। সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব জমা বইল তার  
মনে, কলনার বাওয়ার আগে একটা প্রণামও করতে পারল না।  
অজ্ঞতঃ অহুতোবের কাছে কৈকিয়ৎ দিতে পারত। নিজের অজ্ঞাত  
অপরাধের ভার হয়ত একটু লাঘব করে নেওয়া যেত। কিন্তু তার  
আগেই সে চলে গেল। আর এই চলে বাওয়াটা অহুতোবের  
মত ছায়ায় কাছেও বড় ঘটনা হয়ে বেঁচে বইল।

# আমাদের অভাব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

চারিদিকে আমাদের অভাব-অনটনের কথা শুনিতে পাই। বেশী ভাগই 'তেল-হুন-লকড়ি'র অভাবের কথা, ইহা মোচনের ভার নেতারা লইয়াছেন। এ সবকে কোন কথা বলিব না। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বাংলা ভাষায় যে যে বইয়ের অভাব অনুভব করিয়াছি, তাহার সবকে স্থায়ী পাঠকগণকে কিছু নিবেদন করিব। আমাদের মত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও এই অভাবের কথা বলিতে অনিরাছি।

এইরূপ বহু বিষয়ে অভাব থাকিলেও সম্প্রতি অভাব মোচনের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে এই চেষ্টার প্রথম প্রথম ক্রটি, ভুল-ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা থাকিলেও ভবিষ্যতে এই সব ক্রটি, ভুল-ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা দূর হইবে—ইহার জন্য চাই সমবেত প্রচেষ্টা ও বর্ধেই অর্থ ব্যয় এবং আশ্রয়ী কর্ম্ম।

আমাদের পৌরাণিক-অভিধান ছিল না। আমরা, বাহায়া পাঠ্যবস্তুর ঠাকুরমা, দ্বিদিমার অমুরোধে-উপবোধে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পাঠ করিয়াছি, ভাসাভাসা ভাবে পৌরাণিক চরিত্রাদির কথা মনে থাকিলেও, যথার্থভাবে চরিত্রাদির বৈশিষ্ট্য বা সমস্ত কাব্যাবলী মনে নাই। আমরা পৌরাণিক অভিধানের অভাব অনুভব করিতাম। আর বাহাদুর, বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগের কলেজী শিক্ষিতদের, এইরূপ রামায়ণ-মহাভারতাদির সহিত পরিচয় নাই, তাঁহারা ত অভাব আরও অনুভব করিয়াছেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুবীরচন্দ্র সরকার মহাশয় এইরূপ একখানি ছোট পৌরাণিক অভিধান সকলন করিয়া আমাদের অভাব বহুলাংশে দূর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও সর্কাজসুন্দর হয় নাই—আশাকরি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি যে যে বিষয়ে ক্রটি আছে তাহা দূর করিবেন। আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য তাহাতে যে যে বিষয় নাই, বা যে যে বিষয়ে অসম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে তাহা তাঁহাকে জানান। তিনি অবিধানে কতকগুলি দেব-দেবীর ছবি দিয়াছেন, ইহাপেক্ষা আরও ভাল ছবির সন্ধান পাইলে তাঁহাকে পাঠান। দেব-দেবীর বিভিন্ন ধ্যানও আবশ্যিক।

আশার কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একটি ভায়ত-কোষ বাংলার প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহারা সহকারী অর্থ-সাহায্য পাইবেন। সমবেত চেষ্টায় এই ভায়ত-কোষ বাহাতে সর্কাজসুন্দর হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ভায়ত-কোষ বাংলার আমাদের একটি গুরুতর অভাব দূর করিবে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের সহিত, বিশেষ করিয়া পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়, ভাসা-ভাসা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে হাজার বছরেরও পূর্বে। তখন ভাষার কি রূপ ছিল? বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে বাংলা পদ বা পদের রূপ কি রকম?

বাক্য-বিভাগ কিরূপ? বিভিন্ন যুগের শব্দের রূপ, বাক-ভঙ্গি, ভাব-প্রকাশের রীতিই বা কিরূপ ছিল? সহজে জানিবার উপায় নাই।

এই বিষয়ে ইংরেজী manual of literature-এর অমুরূপ একখানি এক হাজার-এক হাজার পাতার সকলন-গ্রন্থ, বাহাতে চর্চাপদ হইতে দ্ব্যস্ত্রনাথ অবধি বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনার বা কাব্যের বেশ বড় বড় উদ্ধৃতি টিমনীসহ থাকিবে, এবং প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক লেখকের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে, বিশদ সূচীপত্রসহ যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার ছাত্রদের ত বটেই, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকেরও বহু কাজে আসিলে। বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় নিবিড় হইবে। এই সঙ্গে যদি প্রাচীন বাংলা শব্দের অর্থ বর্তমান যুগের বাংলার দেওয়া থাকে ত আরও ভাল হয়।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিকল্পে যুগে যুগে বহু লেখক পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহাদের সময় ও পরিচয় আমরা জানি না। এবং ইহারা এক এক জনে কি কি বই লিখিয়াছেন তাহাও জানি না। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের প্রধান প্রধান বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখার সবকে উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহাদের সব লেখার উল্লেখ নাই ও তাহা থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে dictionary of English [French ইত্যাদি] literature-এর অমুরূপ একখানি ছোট একখণ্ড তিন-চারি শত পৃষ্ঠার বই হইলে চলে। উনবিংশ শতাব্দীর বহু লেখক সবকে ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ খানিকটা কাজ আগাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ সবকে হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় বহুতথ্যপূর্ণ জীবনী-কোষ লিখিয়াছেন। আরও দুই-চারি জন কিছু কিছু কাজ করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে সহজেই একটি বাংলা সাহিত্যের অভিধান সকলিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

বাংলার বহু দাতা, ধনী, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন ও তাঁহাদের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বহু বাদ্যলী সাধক তাঁহাদের সাধনার কল জাতিকে দিয়া গিয়াছেন। এই সব প্রখ্যাত বাংলার জীবনী-কোষ থাকা জাতির আত্ম-সম্মানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বঙ্কিমবাবু বেহন সাহিত্য-জগতে সত্রাট, তেজমনি বাবসা-জগতে স্বর্গীয় শ্রম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসা-জগতে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রম নীলরতন সরকার, আইনজ্ঞ হিসাবে শ্রম রাসবিহারী ঘোষ, দানবীর হিসাবে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্রম তারকনাথ পালিত জজ হিসাবে “কাল দোয়ারী” বা প্রথম দায়কানাথ মিত্র, বৈজ্ঞানিক হিসাবে জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যেরনাথ সাহা, যিরেটাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শরৎ-চন্দ্র ঘোষ (ছাত্তাব্যবহৌজ), ভূবন নিরোগী, নট হিসাবে অমর দত্ত, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতির জীবনী একত্রে সংক্ষেপে পাইলে জাতির উপকার হয়। এইরূপ জীবনী-কোষ সকলন করা কি

সাধা ? শিক্ষিত বাঙালী একটু সমবেত চেষ্টা করিলেই সহজে এই কার্য সম্পন্ন হয় ।

ইংরাজীতে বহু dictionary of references ও quotations আছে । আমাদের পাঠ্যাবস্থায় ইংরাজী সাহিত্যের সহিত নির্দিষ্ট পরিচয়ের জন্য আমরা Brewer-এর বই দেখিতাম । এনিলার “এ যে বগীবিন্দ্রি যুগড়া দেখিতছি ।” এই বগীই বা ক ? বিন্দ্রিই বা কে ? দীনবন্ধু মিত্রের কোন লেখায় এই বগী-বন্দীর কথা আছে তাহা জানি না । এক ভদ্রলোক বলিলেন যে, ইংরাজ লেখক থাকার বুলিয়াছেন, “A pleasing face is a perpetual letter of recommendation.” অপর এক ভদ্রলোক বলিলেন, “কেন বন্ধিমবাবুও বলিয়াছেন ‘সুন্দর মুখের পত্রিক্ত হয়।’ কোন বইয়ে বন্ধিমবাবু বলিয়াছেন জানি না—ব্রজাসা করিতেও সাহস হইল না । একখানি বাংলা বেকারেলের উদ্ধৃতির অভিধান থাকিলে আমার পক্ষে বুঝা ও উদ্ধৃতিটি কোথা হইতে লওয়া খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য হইত ।

প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহ বাহির হইয়াছে । কিন্তু প্রবাদের সংপত্তি, অর্থ, তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সুসংগত কোনও বই আমাদের চোখে পড়ে নাই । হস্তত আমাদেবের অজ্ঞতা বশতঃই চোখে পড়ে নাই । কিন্তু এইরূপ পুস্তকের অভাব আমরা অনুভব করিয়াছি । “নবাব তক্তচাঁদ বাহাদুরের” অর্থ কি ? নবাববা সাধারণতঃ অত্যন্ত বিলাসী, গাধিন ও অমিতব্যয়ী । বহুমানের মহারাজাদিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর সম্বন্ধে বহু “অমিতব্যয়ের, সখের গল্প প্রচলিত আছে । গওয়ান খবর দিল ১০০,০০০ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় জমিদারী জোলাম হইবে, তেজচাঁদ বাহাদুর তখন লালমুনিয়ার শিশু শুনিতে-হন, পাছে তাহার ব্যাঘাত হয়—এ জন্য বলিলেন, ‘কথা বন্ধ কর, ‘লাল ঘাবড়াইবে।’ ইত্যাদি ইত্যাদি । ‘বাবু ত বাবু ছকু বাবু’, ছকু বাবু বাড়ীতে বহু ঝাড়-লঠন ও দেওয়ালদারি । বাবু গিয়ানার গিয়াছেন । ফরাসেরা ঝাড় মুছিতে মুছিতে একটি ঝাড় গাভিয়া ফেলিল, খুন খুন করিয়া মিঠা শব্দ হইল । ছকু বাবু বজ্রাসা করিলেন কিসের শব্দ । ভয়ে কেহ কথা বলে না । পরে খুন শুনিলেন ঝাড় গাভিয়া বাওয়াতে এইরূপ খুন খুন মিঠা শব্দ ইয়াছে, তখন আর একটি ঝাড় গাভিয়া ফেলিতে ছকু দিলেন—হাতে তিনি ভাল করিয়া মিঠা শব্দের তারিক করিতে পারেন । এইরূপ একটি প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহ বিশেষ আবশ্যক ।

তারিখের অভিধান নাই আমাদের । আমরা চাই তারিখের অভিধান বাহাতে পৃথিবীর, বিশেষ করিয়া ভারতের ও বাংলার টনার সুবিভক্ত বিবরণ থাকিবে । প্রথমে ভারতে প্রচলিত নান বৎসরের আয়ত ও পরিচয় থাকিবে ও কি করিয়া এই সব বৎসরের তারিখ ইংরাজী বৎসরে পরিণত করিতে পারি তাহার বিবরণ ও হিসাব থাকিবে । যেমন হিজরী বৎসরকে ইংরাজী ষ্টাঙ্গে সহজে কি করিয়া পরিণত করিতে পারা যায়—ইত্যাদি থাকিবে । তাহার পর ঘটনার তারিখ থাকিবে, এ সম্বন্ধে বিমত

থাকিলে সর্বপ্রথমে আগেকার ( বা পরের ) তারিখ দিয়া পাদ-টীকার অপর মতটিও দিতে হইবে ।

যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিন্দু মতে ৩১০০ খ্রীঃ পূঃ-এ ঘটয়াছিল । বন্ধিমবাবুর মতে ১৪৫০ খ্রীঃ পূঃ, আবার কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ-এ ঘটয়াছিল । সবকটি তারিখই দিতে হইবে ।

শকরাচার্যের জন্মসময় ও কাল লইয়া এইরূপ মতভেদ আছে । সবকটি মতই দিতে হইবে । এইরূপ না দিলে ইহার কার্যকারিতা কমিয়া যাইবে ।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইতিহাস দিতে হইবে । যেমন শকরাচার্য চারিটি মঠ স্থাপন করেন । প্রত্যেক মঠের জগদগুরু ছিল । কোন কারণে ৩০০৪০০ বৎসর আগে যোশীমঠের জগদগুরু-পদ লুপ্ত হইয়া যায় । পুনরায় বিশ বৎসর আগে নূতন পর্ধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দ প্রথম জগদগুরু হইলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর কয়পজ্জী জগদগুরু হইয়াছেন । এইরূপ ইতিহাস বা বিবরণ থাকা চাই । নচেৎ কার্যকারিতা কম হইবে ।

দ্বিতীয় বাহাদুরদের আগাগোড়া তালিকা মায় বাহাদুরী তারিখসহ থাকিবে । বাংলার সুলতান ও নবাবদিগের তালিকাও থাকিবে । কিন্তু গুজরাটের সুলতান বা নবাবদের তালিকা না থাকিলেও চলিবে ।

আজ যদি জিজ্ঞাসা করি, গজনবী ও বোমবেশ চক্রবর্তী কোন দিন হইতে কোন দিন মন্ত্রী করিয়াছিলেন ? অনেকই, এমন কি পাকা সাংবাদিকদিগকেও মাথা চুলকাইতে হইবে । অথচ মাত্র ৩০ ৩৫ বৎসরের আগেকার ব্যাপার । মন্ত্রীদের মন্ত্রীদের তালিকা থাকিবে ।

বন্দোী আন্দোলনের বিশিষ্ট তারিখগুলিও থাকিবে, যেমন, ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সনের মিটিং, ১৯০৮ সনের মে মাসে প্রথম বোমা পড়া, আলিপুর বোমার মামলা ইত্যাদি ।

গিরিয়ার হুইবার যুদ্ধ হইয়াছিল । প্রথম বারে নবাব আলিবর্দী খা নবাব সরকার খাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার মনদ দখল করেন । দ্বিতীয়বার ইংরেজ নবাব মীরকাসিমকে পরাজিত করেন । একটি বাংলার ইতিহাসের, অপরটি ভারতের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা । হুইটিই থাকা চাই । পক্ষান্তরে নবাব বাঙ্গাস খানের বোহিলাদের সহিত যুদ্ধের কলাকল, তারিখ বা স্থানের প্রয়োজন নাই ।

এইরূপ একটি ৫০০,৬০০ পাতায় তারিখের অভিধান থাকিলে কাজের খুব সুবিধা হয় । এ বিষয়ে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া জাতিব কি করা উচিত, কাহাকে গিয়া করান উচিত, চিন্তা করিলে জাতিব বহু উপকার হইবে বলিয়া মনে করি ।

আরও অনেক বিষয়ে অভাব আছে, যেমন, সমার্থবোধক ও বিপরীতার্থবোধক শব্দের অভিধান, বাংলা শব্দের thesarus প্রভৃতি । আশাকরি, কালক্রমে এই সব অভাব শীঘ্রই দূর হইবে । ( বিশদ ঐতিহাসিক মানচিত্রেরও অভাব আছে, বাহা আছে তাহা সুস্পষ্ট ) —ইহা অনেকটা নির্ভর করে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্রমের উপর ।

## শান্তি

(একাক্ষিকা নাটক)

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[ শহরতলীর এক সঙ্গীর্ণ অন্ধকার পথ। পথের দুই পাশে কয়েকখানি ছোট-বড় পুথান বাড়ী। বড়-জলের সন্ধ্যা। সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রায় সকল বাড়ীরই দরজাজানালা বন্ধ। শুধু একটি ছোট একতলা বাড়ীর জানালা দিয়া খানিকটা আলো জনহীন কক্ষমাজ রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিহাতের কলক, বাজের হুকার ও প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ। এই ছোট একতলার বাতিরের ঘরে— ]

হৈমবতী। জানলা দুটো ভাল করে বন্ধ করে দে পাহু। রাস্তার দিকের দরজাটার খিল দিয়ে দে।

প্রতিমা। সত্যি মা, আজকের রাতটা কি ভয়ানক! ঝড় যেন বাড়ীওর কাঁপিয়ে তুলছে, শুনছ না?

হৈমবতী। শুনছি, সব শুনছি। আজকের এই ভয়ানক রাতটাই আমার বড় আপন পাতু, বড় আপন। আজকের তারিখটা মনে আছে ত স্বদেশ?

স্বদেশ। আজ ২৫শে শ্রাবণ।

হৈমবতী। এ তারিখ যেন তোদের ড'ভাইবোনের বুক চিরদিন অগুনের অন্ধরে লেখা থাকে। আজ সাত বছর ধরে এই দিনটাকেই সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে পুণ্যতিথি ভেবে মনে মনে পূজা করে এসেছি। সাত বছর আগে এই তারিখেই ভোর পাঁচটার ভোদের বাবা—

(একটা মালাশোভিত তৈলচিত্রে এক যুবকের দীপ্ত মুখ দেখা গেল, প্রতিমা ও স্বদেশ ধীরে ধীরে তৈলচিত্রের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল)।

স্বদেশ। মা, আবার বাবার কথা বল।

হৈমবতী। বলব বৈ কি বাবা, বলার কি আর শেষ আছে রে! শুধু কি আমি বলি, দেশের সকলে আজও তাঁরই কথা বলেন। এতবড় নির্ভীক বীর এ দেশে ক'জন জন্মেছেন? কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন তাঁর কথা চুপি চুপি বলতে হ'ত, পাছে চাবপাশের দেওয়াল তা শুনে পায়।

(হৈমবতীর মাথাটা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তার পর তিনি যেন তন্ত্রাঙ্কুরের মত বলিতে লাগিলেন—)

সে রাত ছিল কালো মেঘে ভরা। নদীতে তুফান মেগেছে, ঝড়ের বেগে সামনের প্রণবীগাছগুলো হুয়ে পড়ছে, বাজের শব্দে আকাশ যেন কেটে চৌচৌর হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সময়ে তুপুর রাতে নদী পার হয়ে ভিক্তে-কাপড়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরের জানালায় কাছে। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে বাজিলাম,

তিনি বললেন, “খামি এসেছি হেম।” আমি ভাড়াভাড়ি দরজা খুলে দিতেই ঝড়ো-হাওয়ার সঙ্গে তিনি ঘরের ভেতর চুকলেন। আমি দরজার খিল দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “এতদিন কোথায় ছিলে? এ ঝড়-জলের রাতে কোথা থেকে এলে? হাতে তোমার বিভলভার কেন? কি করে এসেছ তুমি?” তিনি হেসে হাতের বিভলভারটা বিছানায় একপাশে রেখে বললেন, “বে লালমুখ বিদেশীরা কতকগুলো দেশজোড়ী বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে আমাদের জম্মভূমি এই ভারতবর্ষের উপর নির্যাতন আর শোষণ চালায় তাদেরই দু'জনকে আজ একটু আগে শেষ করে এসেছি হেম। কালই ভোরে এখান থেকে অনেক খুবে চলে যাচ্ছি—এ আমার এখনকার নিরুদ্দেশ যাত্রা। শুধু আজকের রাতটা এখানে থাকব। গোয়েন্দার দল হযত পিছু নিয়েছে। আজ শুধু তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি হেম। হযত এটা আমার নিদারুণ ভুল, তবুও কত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে শেষ দেখা দেগতে এসেছি জান?” আমি তাঁর হাতে একখানা শুকনো কাপড় দিয়ে কঁদে কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন, “কানছ কেন হেম? এই ত আমাদের দুর্গম পথ।” আমি বললাম, “থাক না কেন এখানে ক'দিন। অনেকদিন পরে ত এলে!” তিনি শুধু একটু স্নান হাঙ্গি হাসলেন, বললেন—“তা'হয় না, আমাকে যে কাল ভোরে যেতেই হবে!

(হঠাৎ হৈমবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষুর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল)।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা,—মা,—মাগো!

(হৈমবতী হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন)

হৈমবতী। ভোরবেলার হঠাৎ কিসের কোলাহল আর দরজায় থাকা শুনে চমকে বিছানা থেকে উঠে দেখি, তিনি বিভলভার হাতে নিয়ে জানালায় কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দারুণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি জানালায় কাক দিয়ে দেখি বন্দুকহাতে পুলিশের বড় একটা দল আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তিনি আমাকে দেখে আর একটা বিভলভার আমার হাতে দিয়ে বললেন, “তোমাকেও ত আমি বিভলভার ছুড়তে শিখিয়েছি হেম, এ বিপদের সময় তুমি আমার সাধী হও।” আমিও তাঁর দেওয়া বিভলভার হাতে নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজা ভেঙে প্রথম যারা ঘরে চুকল, তাদের মধ্যে আহত হ'ল জন-চায়েক। একটু শিহিরে গেল তারা। এবার তিনি আমার হাত থেকে বিভলভারটা কেড়ে নিয়ে শুধু

বিদায় হেঁ।" এই কথা দুটি বলে হুঁহাতে বিভলভার চালাতে লাগতে পথে বের হলেন। তাঁর সে বীরমূর্তি এখনও বেন চোখের মনে ভাসছে! পুলিশের বল তখন ভয়ে কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। একটা গাছের তলা দিয়ে ছুটে বাবার সময় একজন পুলিশ অফিসার হঠাৎ আড়াল থেকে তাঁর মাথায় একটা পাথর ছুড়ে পরে, তিনি আহত হয়ে টলতে টলতে সেইখানে পড়ে বান।

( হৈমবতী হুই হাতে মুগ ঢাকিয়া ফু পাইয়া উঠিলেন। )

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা,—মা,—মাগো!

( হৈমবতী বীরে বীরে মুগ তুলিলেন ও গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন। )

হৈমবতী। তার পরের কথা অতি সংক্ষিপ্ত। চলল তাঁর ইচ্ছার অভিনয়। প্রমাণের কি গোলমালে আমি পেলাম মুক্তি; কিন্তু তাঁর হ'ল চরম শাস্তি। সুনাম, দাক্ষিণীয়াতনেও তিনি ধীর দলের কোন কথা পুলিশের কাছে বলেন নি। আত্মকের মনটা সেই পুণ্যতিথি—যেদিন স্বাস্থ্যের মকে দাঁড়িয়ে তিনি শেষ প্রণাম জানিয়ে গেলেন দেশমাতাকে।

( হৈমবতী একদৃষ্টে স্বামীর তৈলচিত্রের দিকে চাভিয়া গেলেন। তাঁহার হুই চক্ষু দিয়া জলধার বরিয়া পড়িতে লাগিল )

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—

হৈমবতী। তার পর দেশে আর টিকতে পারলাম না। তাঁর দীর্ঘ বসে আমার উপর কি কম নির্ধ্যাতন চলেছিল! তাদের ম'জনকে নিয়ে কতজায়গা ঘুরে শেষে এসেছি এখানে। সেও মাতৃ ক'বছর হ'ল! কিন্তু যে পুলিশ অফিসার তাঁর মাথায় পাথর ছুড়ে মেরে তবু তাঁকে ধরতে পেরেছিল সেই লোকটার মুখ কোনদিন ভুলব না। আদালতে তার মুখখানা বেশ ভাল করেই দেখেছি—তার কপালে লম্বাভাবে একটা বড় কাটা দাগ আছে। রামটাও জানতে পেরেছিলাম, ইনসপেক্টার যত বিখ্যাস।

( হৈমবতীর চক্ষুধর বেন জলিয়া উঠিল। )

প্রতিমা। মা, মাগো, রাত যে বাড়ছে, তুমি কিছু খাও, লামাটা দিন উপোস করে আছ।

হৈমবতী। তুলিস না পীতু, আজ আমি জলম্পর্শ করি না। শুধু আজকের দিনটা। আজ আমার বড় পুণ্য দিন। তোমাদের বাবার আত্মোৎসর্গের পবিত্র দিন। যাও স্বদেশ, যাও পীতু, তোমরা কিছু খেয়ে নাও। রাত যে বাড়ছে।

স্বদেশ ও প্রতিমা। আমাদেরও আজ খিদে নেই মা।

হৈমবতী। তবে চুপ করে আমার কাছটিতে বোস।

প্রতিমা। সুনহু মা, বড়ের বেগ আরও কত বেড়ে চলেছে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

( দরজা-জানালা বেন কাঁপিতে লাগিল। নিকটেই বাতখর কোথাও বাজ পড়িল। )

প্রতিমা। কি ভয়ানক বড়-জলের রাত মা!

( হঠাৎ দরজার ধাক্কা ও কড়ানোড়ার শব্দ )

হৈমবতী। কে? কে?

( বাহির হুইতে চিংকার করিয়া কে বেন বলিল, 'কে আছেন, একটু আশ্রয় দিন, বড়-জলের মধ্যে বড়ই বিপদে পড়েছি। আমি ভত্রলোক, বড়-জল খামলেই চলে যাব। কিছুক্ষণের জন্য একটু আশ্রয় দিন।' )

স্বদেশ। খুলব মা?

প্রতিমা। না স্বদেশ, খুল না, ওকে অস্ত্র কোথাও যেতে বল। কি বল মা?

( পুনরায় ভয়ানক বজ্রধ্বনি শোনা গেল। বাহিরের আগন্তুক দরজার ধাক্কা দিয়া চিংকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'একটু আশ্রয় দিন।' )

প্রতিমা। ( দরজার নিকটে গিয়া উঠে:স্বরে ) অস্ত্র কোথাও যান, দরজা খুলব না।

( বাহিরের আগন্তুক পুনরায় চিংকার করিয়া বলিল, 'একটু আশ্রয় দিন আমাদের, আমি ভত্রলোক।' )

হৈমবতী। নিশ্চয়ই বড়-জলে খুবই বিপদে পড়েছেন ভত্রলোক। আচ্ছা, দরজা খুলে দাও স্বদেশ।

( স্বদেশ দরজা খুলিতেই সর্বোদে জলসিক্ত বেনকোট-ঢাকা, মাথায় বেনক্যাপ কপাল পর্যন্ত টানা, খাকি প্যান্টপরা একটি লোক দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বড়ের বেগে দরজার দাক দিয়া এক ঝাপটা বৃষ্টিধারা মেঝের খানিকটা ভিজাইয়া দিল। হৈমবতী ইঙ্গিতে তাহাকে দরজার পাশের একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। লোকটি যেখানে বসিল সে স্থান হুইতে তৈলচিত্রটিকে ভাল দেখা যায় না। লোকটি বসিল কিন্তু গায়ে বেনকোট বা মাথায় বেনক্যাপ খুলিল না। )

আগন্তুক। নমস্কার, অশেষ ধন্যবাদ! বড়-জল একটু খামলেই চলে যাব। আপনাদের দরজার কথা—

হৈমবতী। থাক, থাক, ও সব থাক। আপনায় ওভারকোট আর টুপি খুলে ফেলে একটু স্বচ্ছন্দে বসুন।

আগন্তুক। এসব আর খুলব না। একটু শীত-শীত বোধ করছি। বড়জল একটু খামলেই ত চলে বাছি।

হৈমবতী। আপনি এ দিকে থাকেন না বৃথি? এমন বড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এ যাত্রা—

আগন্তুক। ( মুহু হাসিয়া ) বাধ্য না হইলে ইচ্ছে করে কি এ দুর্ব্যোগে কেউ বেবোয়? কি করব বলুন, চাকরির দারে বাধ্য হয়েই বেবোতে হয়েছে।

হৈমবতী। ( প্রতিমার দিকে কিরিয়া ) উনি এখন আমাদের অতিথি। যাও প্রতিমা, ভত্রলোকের জন্য একটু চা করে আন।

আগন্তুক। না, ন', ও সব থাক।

হৈমবতী। আপনি ভত্রলোক, এ দুর্ব্যোগে আমাদের বাড়ীতে

এসেছেন, আপনার এতে সন্কেচ করবার কিছু নেই। বাও প্রতিমা।

(প্রতিমা ভিতরের দ্বারপথে চলিয়া গেল।)

আগন্তুক। এ ছুটি বৃষ্টি আপনার ছেলেমেয়ে?

হৈমবতী। হাঁ, এর নাম স্বদেশ, ওর নাম প্রতিমা।

আগন্তুক। তুমি কোন্ ক্লাসে পড় স্বদেশ?

স্বদেশ। ক্লাস সেভেন।

আগন্তুক। আর তোমার দিদি প্রতিমা?

স্বদেশ। দিদি আর পড়ে না।

হৈমবতী। প্রতিমা গত বৎসর জ্বল ফাইনাল পাশ করেছে, কলেজের খরচ ত আর কম নয়, তাই আর পড়াতে পারি নি ওকে।

আগন্তুক। ওঃ! তা আপনার আত্মীয়-স্বজনের কোন সাহায্য?

(হৈমবতীর মুখ গভীর হইয়া উঠিল। তিনি আগন্তুকের কথায় কোন উত্তর দিলেন না।)

আগন্তুক। মাপ করবেন, কথাটা বলে আমি হয়ত অস্মার করেছি।

হৈমবতী। যাক সে কথা, কিন্তু আমার মনে হয়, রাত্রে এ ঝড়-বৃষ্টিতেও বেকালে আপনাকে বেকতে হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কোন বিশেষ জরুরী কাজ আছে আপনার।

আগন্তুক। জরুরী ত বটেই, অবশ্য আপনাকে বলতে বাধ্য নেই আমার, একজন পলাতক আসামীর খোঁজেই—

(হৈমবতীর মুখে কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল ও ওষ্ঠাধর দুটোংগবদ্ধ হইল।)

হৈমবতী। আপনি তা হলে পুলিশের লোক?

আগন্তুক। অনেকদিন ধরে ত এ কাজ করছি, তবে আর বেকদিন নয়।

(হৈমবতী দ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রতিমা চায়ের কাপ হাতে লইয়া হৈমবতীর পাশ দিয়া আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইতেই সহসা হৈমবতীর আকস্মিক হস্ত-সঞ্চালনে চায়ের কাপ মাটিতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল ও চা মেয়ের হুড়াইয়া পড়িল।)

প্রতিমা। এ কি করলে মা, চা-টা যে সব পড়ে গেল!

হৈমবতী। (জ্ঞান হারি হারিয়া) হঠাৎ হাতটা নড়ে উঠল কিনা।

প্রতিমা। আবার চা করে আনছি।

আগন্তুক। না, না, থাক। আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না প্রতিমা। তা ছাড়া, এ ঘরটা দেখছি বেশ গরম, চা না খেলেও চলে।

হৈমবতী। থাক প্রতিমা, উনি এখন বায়ণ করছেন—

(আগন্তুক এবার তাঁর ওভারকোট, বেনকাপ ও কোম্বের পিন্ডল সমেত বেচুটি খুলিয়া পার্শ্বের টিপরের উপর

রাখিলেন। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, হৈমবতী তাঁহার কপালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।)

স্বদেশ। মা।

(হৈমবতী কোন উত্তর দিলেন না। বাহিরে প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি ও প্রবল ঝড়ের শব্দ। ঘরের মধ্যে দেওয়াল-ঘড়িতে টং টং করিয়া ন'টা বাজিল।)

স্বদেশ। মা, ন'টা বাজল। বাবার ছবির সামনে এখন সেই গানটা গাইব?

হৈমবতী। ওঃ! তুলেই বাড়িলাম সে কথা। 'আজকের দিনে সে গান যে গাইতেই হবে। গাও স্বদেশ প্রতিমা সে গান গাও।

(স্বদেশ ও প্রতিমা তাহাদের বাবার তৈলচিত্রের সম্মুখে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া ঐকান্তিক গাহিতে লাগিল।)

গান

রক্ত-পিচ্ছিল মোদের পথ,

অগ্নিবজ্র মোদের মথ,

আমরা যে চলি কণ্টক দলি'

দানবজুটি করি না ভয়!

মৃত্যুর পথে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়!

টুটে যাবে যত কারা-নিগড়,

সমে যাবে যত গ্রানি-পাথর,

মোদের রক্ত হবে অলঙ্কার

মায়ের চরণে স্তম্ভিচর!

মৃত্যুর পথে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়!

উজ্জ্বল মোরা রচি নিশান,

ঝঞ্ঝার তালে গাহি যে গান,

সমুদ্রাগর-বুর্গি-ভূকানে

মোদের এ পথে জাগে প্রাণ!

মৃত্যুর পথে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়!

ফাঁসীর মঞ্চে বাক-না প্রাণ,

সার্থক হবে আত্মদান!

করিব রক্ত-প্রদীপ-শিখার

অর্ঘ্য মোদের বহিম্বর!

মৃত্যুর পথে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়।

(গান শেষ হইলে স্বদেশ ও প্রতিমা নতবস্ত্রকে তাহাদের বাবার তৈলচিত্রকে প্রণাম করিয়া হৈমবতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।)

আগন্তুক। (ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে) এ গান কোথায় শিখলে স্বদেশ, প্রতিমা?



স্বদেশ। এ গান বাবার রচনা, মায় কাছে শিখেছি।

আগন্তুক। এ গানের মানে জান? কাকে লক্ষ্য করে এ গান রচিত হয়েছে বলতে পার?

স্বদেশ। পারি। বাবা আমাদের দেশকে পরাধীন করে বেখেছে, সেই ইংরেজ শাসকদের আর বাবা এ দেশের লোক হরেরও ইংরেজদের দলে মিশে দেশত্যাগীত করছে, তাদেরই উদ্দেশ্যে এ গান।

আগন্তুক। বটে! শোন, এ গান আর কোনদিন গেরো না। এতে কত বিপদ আছে জান?

স্বদেশ। কেন গাইব না? আমি বিপদকে ভয় করি না।

আগন্তুক। আর তুমি প্রতিমা?

প্রতিমা। (দৃষ্ট কণ্ঠে) আমিও করি না।

আগন্তুক। তোমরা বিপদকে ভয় কর না বললে ত বিপদ তোমাদের ছাড়বে না। কেন নিজেদের কিশোর জীবন এমন ভাবে নষ্ট করতে চাও? (হৈমবতীর দিকে ফিরিয়া) আর আপনিও কি আপনার ছেলেমেয়ের এ গান গাওয়া সমর্থন করেন?

হৈমবতী। (শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে) কেন করব না বলুন, এ গান যে আমার স্বামীর রচনা, তাঁর জীবনের মন্ত্র! এবই আহ্বানে তিনি যে প্রাণ দিয়েছেন!

আগন্তুক। প্রাণ দিয়েছেন? বটে! তা হলে ত দেখতে হ'ল কে সেই দেশভক্ত মহাপুরুষ!

(হৈমবতীর ললাটে জুঁকি দেখা দিল, স্বদেশ ও প্রতিমা দৃষ্ট মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আগন্তুক তৈলচিত্রের সম্মুখে গেলেন ও চমকিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময়ে হৈমবতী দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া টিপয়ের উপর হইতে আগন্তুকের পিছলের বেন্টটি তুলিয়া লইয়া পুনরায় নিজ স্থানে আসিয়া বসিলেন।)

হৈমবতী। এবার ঠিক চিনতে পেরেছেন, কি বলেন?

(আগন্তুক জুঁকিত করিয়া তৈলচিত্রের দিকে অলক্ষ্য চাহিয়া থাকিয়া হৈমবতীর দিকে মুখ ফিরাইলেন।)

হৈমবতী। আমিও এবার আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। সেই কপালের লম্বা কাটা দাগ, সেই মুণ, সেই ক্ষুধার্ত নেকড়ের চুটি! ইনসপেক্টার বহু বিশ্বাসকে কি আমি এ জীবনে ভুলতে পারি?

আগন্তুক। (চমকিত হইয়া) আপনি আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন, আর আমিও এবার আপনাকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল করি নি। কিন্তু বহু বিশ্বাস একদিন তার চাকুরির কর্তব্য করেছিল এবং আজও এখানে সে তাই করবে। এতে কি আমাকে অপরাধী করতে পারেন আপনি?

হৈমবতী। (শান্ত অথচ গাঢ় স্বরে) না, না, অপরাধী আপনি শুধু আমার কাছে নন, দেশের কাছে, ইতিহাসের কাছে, জগতের কাছে আপনার কি মূল্য তা জানেন? আপনার এ কলঙ্ক সাত-সাগরের জলেও যে ধুয়ে বাবে না ইনসপেক্টার বহু বিশ্বাস। হরত তাঁরা দেশকে স্বাধীন করতে পারতেন, কিন্তু পারেন নি শুধু

আপনাদের মত করেকজন দেশত্যাগী বিশ্বাসঘাতকের জন্ত। আপনারা বিদেশী শাসকদের সহায় না হলে, সাধ্য কি তারা এ দেশ বজ্রপণ্ড করে! আপনারা শুধু দেশের কলঙ্ক নন, দেশের শত্রুও বটে।

আগন্তুক। এ সব কথা আমাকে বলবার সাহস আপনার এল কোথা থেকে?

হৈমবতী। (উচ্চ হাসি হাসিয়া) এ সাহস কোথা থেকে পেরেছি, এখনও কি সেটা বুঝতে পারেন নি ইনসপেক্টার বহু বিশ্বাস?

আগন্তুক। বেশ, আপনার এ আচরণের কি কল, সেটা আপনি এখনই টের পাবেন।

(হৈমবতী আবার উচ্চশাস্ত্র করিয়া উঠিলেন। আগন্তুক দ্রুতপদে নিজের চেয়ারের কাছে আসিয়াই শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন)

আগন্তুক। আমার রিভলভার ও বেন্ট কোথায় গেল? আমার রিভলভার?

হৈমবতী। বেন্টটা এই এখানে মাটিতে পড়ে আছে, আর আপনার রিভলভার, এই দেখুন, এসেছে আমার হাতে। দেবেছি এর ছ'টা চেয়ারই টোটাভিতি। আমি যে রিভলভার চালাতে পারি এ পরিচয় আপনি সাত বছর আগেও একদিন পেরেছিলেন। এ শিক্ষা দিয়েছিলেন আমার স্বামী। আজ হরত সেটা কাজে লাগতেও পারে।

আগন্তুক। (শঙ্কিত কণ্ঠে) আপনার উদ্দেশ্য কি?

হৈমবতী। অতি সহজ ও অতি সরল। আজ আমার স্বামীর মৃত্যুদিন। অতি পুণ্যতিথি আমার কাছে। এ তিথিতে তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্ত হরত এ রিভলভারের একটু প্রয়োজন হতে পারে।

আগন্তুক। আপনি আমাকে খুন করতে চান?

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—

হৈমবতী। তোরা ও ঘরে যা স্বদেশ পীতু, এখন এখানে থাকবার দরকার নেই তোদের।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা, মা, আমরা যাব না মা—এখানেই থাকব—

হৈমবতী। না, না, তোরা ও ঘরে যা—যা বলছি—

(স্বদেশ ও প্রতিমা ধীরে ধীরে আগন্তুকের দিকে চাহিতে চাহিতে ভিতরের ঘরে গেল।)

হৈমবতী। রিভলভারের মুখ আর আমার নজর ঠিক আপনার দিকেই আছে ইনসপেক্টার। অস্ত্র চেষ্টা কিছু করবেন না। আজ আমার বড় পুণ্যদিন, বড় পুণ্যতিথি।

আগন্তুক। মনে রাখবেন, আপনার মত সামান্ত এক নারীকে নিষ্পেষিত করতে মহাপরাক্রান্ত ইংরেজ সরকার এখনও বলহীন হন নি।

হৈমবতী। বাঃ, বাঃ, চমৎকার রাজভক্তি ত আপনার, ইনসপেক্টার।

আগন্তুক। এখনও বলছি, আপনি আমার বিভলভার ফিরিয়ে দিন। নইলে—

হৈমবতী। কি, খামলেন কেন? বলুন। জগৎ জামুক—এক সামান্য নারীর হাতে ইনস্পেক্টার বহু বিশ্বাসের বিভলভার কেমন করে গেল! কত গৌরবের সে কথা বলুন ত!

আগন্তুক। (দ্রবং দ্রুত স্বরে) আমি আমার বলছি, আমার বিভলভার ফিরিয়ে দিন—আমি এখনই চলে বাচ্ছি।

হৈমবতী। কিন্তু বাবার আগে শরীরে কিছু স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাবেন না ইনস্পেক্টার?—যেমন ধরুন—(বিভলভার উদ্ধত করিলেন।)

আগন্তুক। না, না, খামুন, খামুন। আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন?

হৈমবতী। সেটা কি আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয় আপনার? গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার স্বামীর মাথার একদিন পাখর ছুড়ে ঘেঁষেছিলেন আপনি। তিনি অজ্ঞান হয়ে বাবার পর তাঁকে ধরে শেষে তাঁর কাঁসীর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আপনি করেছিলেন। আজ আমি তাঁর স্ত্রী হয়ে যদি তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নি, সেটা কি আমার পক্ষে অসম্ভব হবে?

আগন্তুক। (কি বেন চিন্তা করিয়া) এর পরিণাম কি হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছেন? আপনার সম্ভান দু'টি—এ অসফল স্বদেশ ও প্রতিমা—ওদের ভয়াবহ পরিণামও কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

হৈমবতী। চমৎকার কথা বলেছেন ইনস্পেক্টার, চমৎকার! বেশ দয়বহু সেন্টিমেন্ট। কিন্তু ও অস্ত্রে আমাকে কাবু করতে পারবেন না। (আগন্তুককে তীব্রভাবে লক্ষ্য করিয়া) সাবধান! আর একটুও নড়বার কি এগোবার চেষ্টা করবেন না! ঠিক এ' কোণে দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখেছেন ত, আমার বিভলভার বেড়ি।

আগন্তুক। আপনি আমার বিভলভার ফিরিয়ে দিন, আমি এখনই চলে বাচ্ছি। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি ভবিষ্যতে আপনাদের কোন বিপদে ফেলব না।

হৈমবতী। আর যদি না দি, আপনাকে যদি এই ঘরের কোণে গুলী করে মারি?

আগন্তুক। আমাকে মেরে আপনি কি আপনাদের বাঁচাতে পারবেন? এতে আপনার পক্ষে আমার উপর প্রতিশোধ লওয়া ছাড়া সত্যি কি কোন লাভ হবে?

হৈমবতী। লাভ শুধু আমার একলায় নয়, ভবিষ্যতে যাঁরা স্বাধীনতা লাভের দুর্গমপথে এগিয়ে আসবেন, তাঁদেরও। তাই আপনার মত একজন দেশের শত্রুকে পথ থেকে সরানো বিশেষ প্রয়োজন।

আগন্তুক। কিন্তু মনে রাখবেন, এক বহু বিশ্বাসের আরগার তখন অনেক বহু বিশ্বাস এগিয়ে আসতে পারে।

হৈমবতী। তা জানি, সেটা এ দেশেরই দুর্ভাগ্য।

আগন্তুক। সত্যি কি আপনি আমাকে হত্যা করতে চান?

হৈমবতী। হাঁ চাই, এবং তা এখনই—এই নগেই। নিন, মরবার জন্তে প্রস্তুত হন। (বিভলভার উদ্ধত করিয়া) এক—দুই—তকি! অত কাঁপছেন কেন? বিস্ফারিত চোখ দু'টিতে সব আতঙ্ক এনে ফেলেছেন দেখছি! মরবার সাহসও আপনার নেই? কিন্তু ভেবে দেখুন, যাঁরা দেশের জগৎ কাঁসীরকে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মুখে ছিল হাসি, মৃত্যুর প্রতি ছিল উপেক্ষা—একটুও কাঁপেন নি তাঁরা। কাঁসীর বন্ধু ছিল তাঁদের জয়মাল্য। আর সেই দেশেরই মানুষ হয়ে, আপনি?—বিক আপনাকে!

আগন্তুক। (মুখে করুণ ভাব আনিয়া ও স্বর কোমল করিয়া) আমি আমার নিজের জন্তে তাই না, মরবার সাহস আমার আছে। কিন্তু তাবছি আমার ছেলেমেয়ের জন্তে। তাদেরও বয়স ঠিক এ' স্বদেশ ও প্রতিমার মত। আর তাবছি, আমার সাক্ষী রুগা স্ত্রীর কথা। যোগে অসম্ভব, চিন্তার কাতর, একান্ত অসহায় এক ককালসার নারীমূর্তি, বাক্যে ডাক্তার শেষ জবাব দিয়ে গেছেন, যে প্রতি মুহূর্তে মরণের আগে অস্তিমশব্যায় গুরে আমার শেষ দর্শনের আশার তার করুণ বিহ্বল চোখ দু'টি মেলে চেয়ে আছে আমারই পথের পানে।

হৈমবতী। কিন্তু ভেবে দেখুন, এ সব কথা কি আপনি অপরের পক্ষেও কখনও ভেবে দেখেছিলেন?

আগন্তুক। আমি সেজন্ত দারুণ অসুস্থ, হাঁ, অসুশোচনীয় আন্তর আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। আজ আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, এ পাপ-চাকরি এই নগেই ছাড়লাম। আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, হাঁ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমি দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্তে এই মহান বিপ্লবীদের লে বোগ দিয়ে দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত স্বর্গাদপি গম্যমী জননী-জন্মভূমির মুক্তিযজ্ঞে আহুতি দেব। আমি দেশের এই মাটি ছুঁয়ে, ভগবানের নামে শপথ করে প্রতিজ্ঞা করছি, এ চাকরী ছাড়লাম। আপনি বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্ত থেকে আমি বিপ্লবী। আপনার স্বর্গীয় স্বামীই আমার গুরু, তাঁর মন্ত্রই আমার ইষ্টমন্ত্র। আর যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তবে এই আমি আমার বুক পেতে দিচ্ছি, আমাকে হত্যা করুন, হাঁ, নির্ধনভাবে হত্যা করুন, আমি প্রস্তুত।

হৈমবতী। আপনি যে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন, তার প্রমাণ কি?

আগন্তুক। প্রমাণ চান? বেশ, এই আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম, আমাকে হত্যা করুন। এব' চেষ্টাও প্রমাণ চান আপনি? তবে দেখুন, আপনার সামনেই আত্মহত্যা করে আমার এ পাপ প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি! দিন ও বিভলভার আমার হাতে, আমি নিজের হাতে, আপনার চোখের সামনে আমার বক্ষঃস্থল গুলীবিন্দু করে প্রমাণ দি, যে আমি প্রাণ দিতে পারি। দিন ও বিভলভার আমার হাতে দিন, দেখুন এ পাপ জীবনের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

হৈমবতী। (বাহাদুরি হাসিয়া) বিভলভার আপনায় হাতে কিরিয়ে দিলে সেটা যে তখনই আমারই দিকে যুধ কেবাতে পাবে, সেটা জানতে আমার একটুও বিলম্ব হয় না ইনস্পেক্টার। কিন্তু আপনি ভুলবানের নাম নিয়ে জননী-জগদ্বির যটি ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, চাকরী ছেড়ে বিপ্লবী হয়ে দেশের মুক্তিসংগ্রামে কাজে বাপিয়ে পড়বেন।

আগন্তুক। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন এ দেশে শ্রাণ থাকবে মহাবিপ্লবী হয়ে সে প্রতিজ্ঞা আমি অকরে অকরে পালন করব।

হৈমবতী। আমার ভাগ্যে যা হবার হয়েছে। কিন্তু আমি আর একজন রুগা সাক্ষীকে মরণের আগে বিধবা করতে চাই না।

আগন্তুক। আপনায় এ দয়ার কথা আমাকে বিপ্লবের কাজে নতন প্রেরণা এনে দেবে।

হৈমবতী। মনে থাকে যেন আপনায় প্রতিজ্ঞার কথা। এই নিন আপনায় বেণ্ট আর বিভলভার। টোটাগুলো আমি কিন্তু সব খুলে নিছি। এগুলো থাকলে এটা দিয়ে আপনি হয়ত অশ্রুশোণায় আত্মহত্যাও করতে পারেন। বান, আর মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, এখনই চলে বান, বান—(ভয়ানক বজ্রধ্বনি) বান—বান—

(জন্মে বেণ্ট, টোটাশুভ বিভলভার ও যেনকোট লইয়া হৈমবতীর দিকে চাহিতে চাহিতে ঘর খুলিয়া আগন্তুক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। হৈমবতী নিজ হস্তে ঘর বন্ধ করিয়া দিলেন।)

প্রতিমা ও স্বদেশ। (দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া) মা—মা

হৈমবতী। কেন রে?

প্রতিমা। ও চলে পেল মা?

স্বদেশ। ওকে ছেড়ে দিলে মা?

হৈমবতী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ও মুহূর্ত হাসিয়া) হাঁ নিরেছি। কেন যে দিলায় তা জানি না। (স্বায়ীর তৈলচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আকুলভাবে সেইদিকে চাহিয়া)—ওগো, তুমি আমার কমা কর, আমি পারি নি, আমি পারি নি—আমি তোমার অবোগা, আমি পারি নি—(হৈমবতীর চক্রে অশ্রুধারা বরিয়া পড়িল ও আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।)

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—মাগো—

হৈমবতী। (তৈলচিহ্নের দিকে সেইভাবে চাহিয়া থাকিয়া) আমাকে শান্তি দাও, ওগো, আমাকে শান্তি দাও,—আমি পারি নি, আমি পারি নি।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—অমন কব না মা—একটু স্থির হও।

হৈমবতী। হয়ত ভুলই করেছি। কিন্তু এ আমি কি করলাম! আজ তোমার মৃত্যুর পূর্ণাতিথিতে মুহূর্তের দুর্কলতার যজ্ঞে তোমার স্মৃতিতর্পণ করতে পারলাম না। অপরাধীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম! তুমি আমাকে কমা কর,—ওগো আমাকে কমা কর।

না পার, আমাকে শান্তি দাও,—আমাকে শান্তি দাও,—আমাকে শান্তি দাও!—

(হৈমবতী কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। স্বদেশ ও প্রতিমা তাঁহাকে তুলিয়া একখানি চেয়ারে বসাইল।)

প্রতিমা। মা, যা হবার হয়েছে, এখন একটু শান্ত হও, এ সব আর ভেব না মা, তুমি ছাড়া আমাদের কে আর আছে?

স্বদেশ। তুমি অমন করলে আমরা কি কব মা?

হৈমবতী। (সম্মুখে প্রতিমা ও স্বদেশের মাথার হাত বুলাইয়া) যাত যে অনেক হ'ল, তোমরা এখন শোওগে যাও। আমি একটু পরে যাবি।

প্রতিমা। তোমার ডেডে যাব না মা।

স্বদেশ। আমি আজ সারারাত তোমার কাছেই থাকব মা।

হৈমবতী। (বাহাদুরি হাসিয়া) আজ কি আর আমার চোখে যুধ আসে যে! বাইরের বড়-জল এবার বুঝি খেয়ে গেছে, কিন্তু সে সব এখন আমার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। জানালা দুটি এবার খুলে দে পীতু।

(প্রতিমা জানালা খুলিতে গিয়া চমকিয়া ছুটয়া আসিল।)

প্রতিমা। মা,—মা,—পুলিস,—একপাড়ী পুলিস!

(সঙ্গে সঙ্গে দরজার ভীষণ আঘাত। বাহির হইতে তীব্র কণ্ঠ কঠোর শোনা গেল,—“দরজা খুলুন শীগগির—”)

হৈমবতী। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে) দরজা খুলে দাও স্বদেশ।

(ঘর খুলিতেই বিভলভার হস্তে ইলপেক্টার বহু বিষাস, তৎসঙ্গে একজন ফেন্ট হ্রাট মাথায়, দাড়ি-গোপ কামানো লম্বাকৃতি সাহেব, হুঁজন পুলিস অফিসার ও জন ভরেক পাগায়াওয়ালা প্রবেশ করিল।)

বহুবিধাস। There she stands! She is a dangerous terrorist.

সাহেব। I see. You may arrest her.

প্রতিমা ও স্বদেশ। মা—মা—(হৈমবতীকে জড়াইয়া ধরিল)

প্রথম অফিসার। চলুন আমাদের সঙ্গে। আপনি একজন বিপ্লবী বলে আমরা আপনাকে গ্যারেট করলাম।

দ্বিতীয় অফিসার। আপনি বিভলভার দিয়ে ইলপেক্টার বিষাসকে হত্যা করতে উত্তত হয়েছিলেন। It was an attempt to murder a police officer. আর দেখী কববেন না, চলুন—

হৈমবতী। ঠিকই বলেছেন আপনারা। চলুন, যাবি।

প্রথম অফিসার। But the boy and the girl, Sir?

সাহেব। What's their offence?

বহুবিধাস। They also sang a seditious song,— song of bloodshed, fire and thunder!

সাহেব। Where's the seditious song ? Seize it atonce.

বহু বিশ্বাস। Can't seize, Sir. It is in their memory.

সাহেব। ( বহু হানিয়া ) That's all right.

হৈমবতী। একটিবার আয়ার স্বামীর ছবির কাছে যেতে দিন,—একটিবার।

বহু বিশ্বাস। না, না, ওসব আঁকার আর চলবে না। চলুন আয়ারদের সঙ্গে—

সাহেব। I say Biswas, let the house be searched atonce, and let her see her husband's portrait for the last time. But don't forget to remove the portrait from the wall and take it with you.

বহু বিশ্বাস। Yes, sir ( হৈমবতীর প্রতি ) বান আপনি আপনার স্বামীর ছবির কাছে।

হৈমবতী। ( বীয়ে বীয়ে স্বামীর চিত্রের নিকটে গেলেন ও গলার অঙ্কল দিয়া অঙ্কগিত চক্রে সে চিত্রকে প্রণাম করিলেন।

স্বদেশ ও প্রতিমা শাস্তভাবে তাঁহার হুই পার্শ্বে আসিয়া ঝাঁড়াইল ও প্রণাম করিল। হৈমবতী আবেগকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন ) ওগো, আরি একটু আগে তোমার কাছে শান্তি চেয়েছিলাম, এবার তা পেরেছি। যন হালকা হয়ে গেল আয়ার। একটা অঙ্গুল পাখর এতক্ষণ বুকের ওপর বসেছিল, এখন সেটা সরে গেল, আরি আজ আমার অপরাধের শাস্তি চেয়েছিলাম, এখন সে শাস্তি এসেছে। আজ যে আয়ার অতি বড় পুণ্যতিথি, আজ কি আরি শান্তি না নিয়ে থাকতে পারি? আশীর্বাদ কর, যেন আয়ার তোমারই দৌরবয়স নায়েব উপযুক্ত হই। বিদায়, ওগো বিদায়—

হৈমবতীর মাথা ছবির নিচে হুঁকিয়া পড়িল। )

স্বদেশ ও প্রতিমা। যা,—মাগো,—

সাহেব। No more waste of time. Lead her to the van, Take also the boy and the girl

বহু বিশ্বাস। Yes, sir. চলুন—

হৈমবতী। ( বীয়ে বীয়ে স্বদেশ ও প্রতিমার হাত বরিয়া বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে )—বন্ধে মাতরম্।

স্বদেশ ও প্রতিমা। বন্ধে মাতরম্।

[ বীয়ে বীয়ে ববনিকা নামিয়া আসিল ]

## জীবনের পাতা বারে যায়

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা বারে যায়।

অতীত দ্বিগন্ত কথা কয়ে ওঠে,

শ্রান্ত-দ্বিবেশের অশ্রু আঁজিনায় ॥

কুসুমের দীর্ঘশ্বাস মালার ককাল আছে জুড়ে,

সপিল বাণেশ্বর ধোঁয়া—সে জল-তৃষ্ণিকা,

ওঠে বুঝি মক্ক-বক্ক হুঁড়ে,

দ্বিক-ভ্রান্ত নিশিভাক, শোনে হায় যেদিকে তাকায়।

ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা বারে যায় ॥

হায়... কতটুকু এই ইতিহাস ?

মনে হয়, সব মিলে একটি নিশাস।

জোছনার ঢেউ নাচে, অনন্ত এ আকাশ-গঙ্গায়,

চকোর চকোরী উড়ে উড়ে মরে,—আর,

ফটিকের জল বুঝি চায় ;

ফটিকের জল ? শুধুই বাঁপট—হায় পাখায় পাখায়।

ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা বারে যায় ॥

# আধুনিকপূর্ব যুগের প্রাথমিক শিক্ষাগততা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল বলিতে পারি না। পরবর্তী যুগ সম্পর্কেও বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় বলিয়া জানি না। তাই যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামে আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় লিখিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন কালের না হউক, আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালের অভ্যাস তত্ত্বার মধ্যে পাওয়া বাইবে সম্ভব নাই।

পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেদের বিজ্ঞান বা হাতেখড়ি হইত। শুভদিনে হাতে ধরিয়া খড়ি দিয়া পাথরের খালার ছেলেকে প্রথম বর্ণমালা লেখান হইত। ইহারই নাম হাতেখড়ি। এই উপলক্ষে দেবপুত্রা এবং ছোটখাট একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ছেলেকে লিখিতে দেওয়া বা লিখিতে শেখান হইত না। হাতেখড়ির পর বীরে বীরে লেখান হইত। লেখার উপরকরণ ছিল তালপাতা। তাল গাছের পাতা কাটিয়া জলে ভিজাইয়া পচান হইত—তার পর উহা শুকাইয়া আট বাঁধিয়া তুলিয়া রাখা হইত। কয়েকটি পাতায় প্রথমে লোহার শিক দিয়া অ আ প্রকৃতি স্বরবর্ণ এবং পরে ক খ প্রকৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের দাগ কাটিয়া দেওয়া হইত। শিককে সেই দাগের উপর দিয়া হাতে ধরিয়া লিখিতে শেখান হইত। হাত যত্ন হইয়া গেলে অস্ত্রের বিনা সাহায্যে অক্ষরের উপর দিয়া কালি বুলাইতে হইত। ইহার নাম ছিল ‘খাড়া’ (দাগ কাটা) লেখা। খাড়া লেখা অভ্যাস হইলে ‘আখাড়া’ লেখা অভ্যাস করিতে হইত—তখন আর পাতায় উপর দাগ কাটিয়া দেওয়া হইত না। তবে প্রতিটি বর্ণ লিখিবার সময় চীংকার করিয়া তাহার নাম ও বর্ণনা আবৃত্তি করিতে হইত। বখা, আকাড়িয়া আকি\* কাঁকুড়িয়া ‘ক’, বগা ‘খ’ ল্যাঙা ‘গ’ ইত্যাদি। মুখ বুজিয়া লেখা বিশেষ নিদ্বার বিষয় ছিল, এইরূপে লেখার অভ্যাস হইলে বানান লেখা শেখান হইত। এই সময় আর হাতে ধরিয়া লেখান বা খাড়া পাতায় লেখার প্রয়োজন হইত না। একখানি পাতায় নমুনা লিখিয়া দেওয়া হইত এবং তাহা দেখিয়া লিখিতে

হইত। একের পর এক ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এক একটি স্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া লিখিতে হইত। যেমন ক কা কি কী কু কু কু কে কে কো কৌ কং কঃ। ও ঐ বাদে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এইরূপে স্বরবর্ণ যোগ করিয়া বানান লেখা অভ্যাস করিতে হইত। ইহাতে প্রতিদিন অনেকটা সময় লাগিত। বানান শেষ হইলে কলা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ শেখান হইত। ককায়ের সাহায্যে যোগগুলির এইরূপ নামকরণ করা হইত—কা (কেয়), ক্র (কেয়), ক (কেন), ক (কেল), ক (কুয়), ক (কুম), ক (আক), ক (আক), ক (আক)। প্রথম সাতটি কলা ব ও ঐ ভিন্ন প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লিখিতে হইত। যেমন, কা খা গা ঘা ইত্যাদি। ‘আক’ কলার অনুমানিকের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের বর্ণের যোগ এবং ‘আক’ কলার বিবিধ যোগ (বখা, ক খ দগ দঘ দশ দহ দজ দঝ দট প্রভৃতি) লেখান হইত। বানান ও কলা লেখার সময় যোগগুলি বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইত। বখা, ‘ক-এ আকারে কা ইত্যাদি। বিবিধ বর্ণ যোগে যে সমস্ত বিভিন্ন অক্ষর বা ছাঁদের অক্ষর (হ, ক্র, ক্র প্রভৃতি) গঠিত হয় এই সময় সেইগুলিও শেখান হইত। কলার পরের পথ্যার নাম লেখা। নিজের পিতা পিতামহের, আত্মীয়-স্বজনের, পাড়া-প্রতিবেশীর, বন্ধুবান্ধবের নাম লিখিয়া বর্ণপরিচয় সম্পূর্ণ করা হইত। প্রথমে নামের বানান বলিয়া দেওয়া হইত। ক্রমশঃ আর বলিয়া দেওয়ার বা জানিয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইত না। নাম লেখাই তাল পাতায় লেখা চরম পথ্যার।

ইহার পর কলাপাতার বা চিৎখার অঙ্ক লেখা। খাওয়ার পাতা যে পরিমাণের হয় তাহার অর্ধ পরিমাণ অংশে শতকিয়া, কড়াকিয়া, গুণাকিয়া প্রকৃতি লেখা হইত। পরের দিনের ব্যবহার্য কলাপাতা আগের দিন বৈকালে সংগ্রহ করিয়া কাটিয়া রাখিতে হইত। ইহা তাল পাতার মত দিনের পর দিন ব্যবহার করা চলে না।

কলাপাতার পরে কাগজ ব্যবহারের সুযোগ জুটিত। এই সুযোগ লাভ করা একটা যত্নবদ্ধ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হইত। কাগজে লেখার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত বই ব্যবহারের সূত্রপাত হইত। এখনকার মত নানা বইয়ের সূত্রপাত বই ও খাতা তখন ছিল না। ‘শিওবোধক’ নামে একখানি বই তখন খুব প্রচলিত ছিল। তাহাতে নানা বিষয়ের সমাবেশ ছিল। হলুদ বা তাম্রাভীর রঙের বড় আকারের কাগজ কিনিয়া চার ভাঁজ করিয়া খাতা বাঁধিয়া তাহাতে লাইন টানিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিতে হইত। সাধা যত্নের কাগজ ব্যবহার করা ঐক

\* বর্ণমালার আদিতে ‘আজি’ ছিল একটি মাজলিক চিহ্নবিশেষ (৩৭)। বর্ণমালার সংখ্যা ছিল ৫০, ১৬টি স্বরবর্ণ (স্বকর ও ৯ কারের দীর্ঘ ও অমুখার বিসর্গ সহ) ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ক সহ)। ব, ড, ঢ, ঙ, ৮ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে ধরা হইত না। একটি ছড়া ছিল—‘চৌজি অক্ষর বার কলা তার নাম জী ককলা’ ইহার অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। কলার মধ্যেও ‘খ’ যোগ ও ‘অ’ যোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সলজ কলার শেষে বলা হইত সিদ্ধি অঙ্কে সিদ্ধি।

প্রকার নিবিড় ছিল—কায়দা তাহাতে চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা। ছোট কয়লা লেখা নিম্ননীর ছিল—তাহাতে হাতের অক্ষর ভাল হয় না। ঘরে তৈয়ারী কালি ও হাতে-কাটা কলম ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। ভালপাতার লেখার সময় মা-ই সাধারণতঃ কালি-কলম তৈয়ার করিয়া দিতেন। দোয়াত বা শিতলের ছোট ঘটিতে কালি রাখা হইত—কালিতে কাকড়া ভিজান থাকিত। তাহাতে কলমে আঘাত লাগিত না। বাস্তার হাঁড়ির পিছনের ভূষা কালি, নারিকেলের ছোবড়া পোড়ান গুড়া প্রভৃতি জলে গুলিয়া কালি তৈয়ারি করিয়া লওয়া হইত। কালি প্রায়ই পাতলা হইয়া বাইত এবং কলম দিয়া বার বার খুঁটিয়া উঠা ঘন করিবার চেষ্টা করা হইত। এই প্রসঙ্গে এইরূপ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারিত হইত—

কালি ঘুটি কালি ঘুটি

সংস্কৃতীর বরে।

বার দোয়াতের ঘন কালি

মোর দোয়াতে পড়ে।

বাঁশের ককি বা খাগ কাটিয়া কলম তৈয়ারি করা হইত। কাগজে লিখিবার সময় হাঙ্গের পালকের তৈয়ারী কলম ব্যবহার করা হইত। নিবের কলম ব্যবহার করা চলিত না। প্রথম দিকে কলম সম্বন্ধ হাত দিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া লিখিতে হইত। ইহার নাম ‘মুঠ কলমে’ লেখা। অনেকে বৃদ্ধ বয়সেও মুঠ-কলমে লিখিতেন এবং খাগের-ককির বা পালকের কলম ব্যবহার করিতেন—নিবের কলম তাহার আদৌ পছন্দ করিতেন না।

শৈশবে লেখার উপরই বেশী ভ্রম দেওয়া হইত—পড়ার দিকে তেমন নজর দেওয়া হইত না। অবশ্য মুখে মুখে অনেক জিনিস শেখান হইত। প্রাচীনরা দক্ষার সময় বাড়ীর ছেলেদের একত্র করিয়া ‘নাম স্লোক’ শিখাইতেন। পিতৃব্য ও মাতৃব্যের পূর্ব-পুরুষদের এবং অজ্ঞাত আত্মীয়-স্বজনদের নাম বলা হইত এবং ছেলেরা তাহার পুনরাবৃত্তি করিত। এভাবে কতকগুলি স্লোক ও তাহার অর্থ মুগ্ধ করান হইত। যেমন, পুত্র শব্দের অর্থ কি, পুত্রের কর্তব্য কি, নামের পূর্বে স্ত্রী বলা হয় কেন, সপ্ত মাতা ও পঞ্চ পিতা কি প্রভৃতি। প্রাচীনরা ছেলেমেয়েদের কাছে নানারূপ গল্প বলিতেন। বিভিন্ন ধরণের রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের গল্প, নানা বিষয়ের ছড়া—তাহারা এইভাবেই শিখিত। কখনও কখনও একটু বয়স ছেলেরা রামায়ণ-মহাভারত পড়িত—এবাড়ীর ওবাড়ীর মেয়েরা মিলিয়া তারা শুনিতেন। শিশুরা সব সময়ই গল্প শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। তবে দিনের বেলা এটরূপ গল্প বলা নিবিড় ছিল, বলা হইত দিনের বেলা গল্প বলিলে মায়ার বাড়ীর হাঁড়ি কাটিয়া যায়। রাত্রিতে কাজকর্ম বিশেষ থাকিত না—তাই তখন গল্প বলিবার সময়। শিশুদেরও রাত্রি পড়ার প্রচলন তখনও হয় নাই।

কাগজে লেখা অভ্যাস করার সময় চিঠি, দলিলপত্র লিখিতে

শেখান হইত। চিঠির আয়ত ও শেষ কিরূপ হইবে—কাহাকে কিরূপ পাঠ লিখিতে হইবে—শিয়োনারা কিরূপ হইবে প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি ভালভাবে শিখিতে হইত। চিঠি লেখার সামান্য ত্রুটি ধরা পড়িলে নিন্দা হইত। এখনকার মত বাহা খুঁসি লেখা তখনকার দিনে বরদাঙ্গ করা হইত না। এই জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষিত লোকেও সাধারণ কাজকর্ম সূত্রেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

অন্ধ খুব বেশী শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ বোপ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের সঙ্গে সঙ্গে শুভকরের আখ্যানগুলি ভালভাবে শিখিতে হইত—নামতা মুগ্ধ করিতে হইত। ইহাতে মুখে মুখেও হিসাবপত্র করিবার সুবিধা হইত। এখন খাতা-পেন্সিল না লইলে অতি সাধারণ হিসাবও অনেকে করিতে পারেন না। অন্ধ কবিবার জ্ঞান স্নেট ব্যবহার করা হইত। ভিজা কাকড়া সঙ্গে থাকিত। তাহার দ্বারা অপ্রয়োজনীয় অংশ মুছিয়া ফেলা হইত। মাঝে মাঝে স্নেট ভিজাইয়া কাঠ-করলা দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইত।

কাহারও ঘরের বারান্দার, চত্বীমণ্ডপ বা আটচালার পাঠশালা বসিত। পাঠশালার জ্ঞান স্বতন্ত্র ঘর খুব কমই দেখা বাইত। গুরু-মহাশয়কে ‘মশায়’ বলা হইত। পিতা-পুত্র এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পৌত্র পর্যন্ত একই মশায়ের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। গুরু মহাশয়ের সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের শ্রেণীর লোক হইতেন। ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয় খুব কমই দেখা বাইত। পাঠশালায় এখনকার মত শ্রেণীবিভাগ ছিল না। ছাত্রদের বিবরণ ও পরিচয় দিতে হইলে খাড়া লেখে, আখাড়া লেখে, বানান লেখে—এইরূপ বলা হইত। অকারণে কেহ পাঠশালায় না গেলে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা ছিল। নানা-রকম কঠোর শাস্তির প্রচলন ছিল। বৌদ্ধের মধ্যে চিৎ হইয়া শুইয়া দুই পা উচু করিয়া পায়ে পড়িত হইতে হাত মাথার কাছে আনিয়া দুই কান ধরিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকার নাম ছিল ‘সূর্যচিৎ’। মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীতে বসিয়াই সামান্য লেখা-পড়া শিখিত। কচিং দুই-এক জন পাঠশালায় আসিত। শিশু-কাল হইতেই তাহাদের গৃহকর্ম ভাল করিয়া শিখিতে হইত এবং বাড়ীর গৃহিণীদের কাজে সাহায্য করিতে হইত। অল্প বয়সেই বিবাহ হইত বলিয়া বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ তাহাদের ছিল না। শিশুকাল হইতেই তাহাদের গৃহকর্মের প্রতি আগ্রহ দেখা বাইত। উচ্চশিক্ষা না থাকিলেও সাধারণ লেখাপড়া অনেকেই জানিতেন। বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষা তখন পুরুষের মধ্যেও ব্যাপক ছিল না। নাম সহি করিতে পারেন না এরূপ পুরুষ ভদ্র-গৃহস্থের মধ্যেও দেখা বাইত না এমন নয়। শুদ্ধভাবে নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না, এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বেশীর ভাগই অতি-সাধারণ ভাবে শিক্ষালাভ করিতেন। সাধারণ গভী ছাড়াইবার বোপাতা বা দৌভাগ্য বাহাদের ছিল

তাঁহারা টোলে চুকিয়া ব্যাকরণের কিছু অংশ পড়িতেন। প্রকৃত পণ্ডিতের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। অনেকেই সন্ধি, শব্দ বা বড় জোর খাত্ত পর্যন্ত পড়িয়াই পড়া সাজ করিতেন। কেহ কেহ পৌরোহিত্য বা গুরুগিণি করিবার জন্য ধর্মকার্য অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি শিখিতেন—গুরুব কাছে পূজার্কন্যাস পদ্ধতির পাঠ লইতেন—চণ্ডীপাঠ অভ্যাস করিতেন। কেহ কেহ টিকুজি কোষ্ঠী দেখিতে ও প্রস্তুত করিতে শিখিতেন। বৈজ্ঞান্য ঐষণ প্রস্তুত করার প্রণালী ও উহার প্রয়োগের নিয়ম শিখিতেন—নাড়ী-বিজ্ঞান চর্চা করিতেন। গভীরভাবে শাস্ত্র আলোচনা করিতে খুব বেশী লোক অগ্রসর হইতেন না। অথচ তখনকার দিনে পড়া বায়সাধ্য ছিলনা। গুরুকে বেতন দিতে হইত না—খাকা-খাঁওয়ার খরচ লাগিত না। এমন কি মাঝে মাঝে পৌরোহিত্য কার্যের ঘাটা বা গুরুব সহচর-হিসাবে ছাত্রবিদ্যার রূপে কিছু কিছু অন্নও যে না হইত এমন নয়।

জ্ঞান প্রভৃতি কঠিন বিষয় যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের ভ বিশেষ আদর ছিল। তথাপি এ সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল মনে হয় না। টোলের শিক্ষার পরিধিও তাই অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই কোনক্রমে চিরাচরিতভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত—উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় একটা দেখা বাইত না। অবশ্য খুব বড় হইবার সুযোগও তখন সুলভ ছিল না। তাই কালচলা-গোছের শিক্ষারই লোকে সন্তুষ্ট থাকিতেন। আজ সুযোগ বাড়িয়াছে—তাই শিক্ষার আগ্রহও বাড়িয়াছে। তবে প্রকৃত শিক্ষা-লাভের আকাঙ্ক্ষা—একজ্ঞ শ্রম ও নিষ্ঠা এখনও আশামূরূপ বলা যায় না। অবশ্য, আগেকার তুলনায় শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে—বাবস্থা সুন্দরতর হইয়াছে।

## শরৎরাণী

শ্রীউর্মিলা দেবী

ওগো আমার স্বপ্নে-দেখা মেয়ে,  
আসবে বলে জানিয়েছিলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।  
শঙ্খ-ধবল রংটি তোমার কাজলকালো চুল  
চাপার কলি আঙুলগুলি গাল ছুটি তুলতুল।

সেদিন হতে রই যে পথ চেয়ে।  
জানি না ত আসবে তুমি কোন্ পথটি বেয়ে ?  
এলে তুমি শরৎপ্রাতে শিউলী-ঝরা পথে !  
প্রথম উবার স্বর্ণগড়া সূর্য্যকিরণ রথে।

ওগো আমার স্বপ্নে-দেখা সই।  
তোমার দেবার মতন রতন কিছুই আমার নাই।  
শোনা রূপা বসন ভূষণ তোমার ছুটি করে  
দেখছি চেয়ে দিচ্ছে সবাই কতই ধরে পয়ে।

আমি শুধুই গাঁথছি কথার মালা  
শিউলী ফুলের মালার সাথে পরিয়ে দেব বালা  
আমার প্রাণের হরষ-পরশ রইল তাহার সাথে  
ধস্ত হবে তৃপ্ত হবে ভেঁমার দুষ্টি পাতে।

## উর্নাত

শ্রীশান্তশীল দাশ

জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় : ভবু জাল বুনি ;  
আসবে কি সে জীবন কোন দিন ?

ভবু দিন গুণি।

ছেঁড়া জাল জোড়া দিতে ভাল লাগে,  
ভাল লাগে এক একটি করে  
দিন গুণে গুণে চলা প্রতীক্ষার পথ ধরে ধরে।  
সে পথ অনেক পথ, হোক না তা, কিবা আসে যায় ;  
এ মন কি শেষ পথ চায় ?

চায় না তো—পথ চলে আর পান গায় :  
হাসি আর কান্নার স্রু মোটা ছুটো তারে-  
বাঁধা সেই স্রব ভেসে যায়।

অনেক অনেক দূর। আর সেই ছেঁড়া জাল  
কোন মতে জোড়া লাগে, টেনে টেনে চলে কিছুকাল।  
আবার আবার ছেঁড়ে।

এমনি তো দিন কাটে বেশ :

কাল গুণে, জাল বুনে—হোক পথ শেষ, শেষে



## অলস মায়া

### শ্রীচিত্রিত্র দেবী

কিন্তু, আবার বিধা জগে কুফার। প্রেম নাকি লুকিয়ে রাখা যায় না, কবি বা বলছেন তা সত্যি, “গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।” কিন্তু শুধু আলো ত হয় না। আলোর শিঞ্জন আছে আগুন, সে যে পুড়িয়ে মারে। কুণার্ভ অগ্নি সর্ব প্রাস করতে চায়। কুফা যদি নিকেকে প্রস্রব খেয় তবে তার প্রেম কি শুধু হাতটুকু ধরেই ক্ষান্ত থাকতে চাইবে?—না, না, আলোর মূলে আছে আগুন, আর প্রেমের মূলে আছে কাম। একটুতে তার তৃপ্তি নেই। আগুনের মত বাতাসে উড়ে উড়ে সে কেবলই একটা থেকে আর একটার বিস্তৃত হয়ে যায়। তার লালারিত রসনা সমস্ত স্নানকে চেটে চেটে কুঁসিত করে তুলছে। ওই ত তার বীভৎস মুখটা কুফা দেখতে পাচ্ছে নিজের মধ্যে। না, না, ওই লেভী হাক্সটার দাবি মানবে না কুফা। লোলুপ মুঠি দিয়ে যে আত্মাকেও পিবে কেসতে চায়। পবিত্রকে করে কলঙ্কিত—ওই ত তার সামনে শুয়ে আছে পবিত্র পুরুষ দেহ। কবিরা কেন বলেন শুধু নারীদেহ পবিত্র। পুরুষ কি পবিত্র নয়? স্নান নয়? নারীও ত পুরুষকে কম কলঙ্কিত করে না—এই ত একটু আগে কুফা নিজেই তাই করছিল। চোখের জল দিয়ে, ভাবের মায়া দিয়ে কুফা নিজেই ত মোহ রচনা করেছিল—টেনে নিয়েছিল কুমারের করুণা—যে করুণা প্রেমের সহোদর। যদিও কুফা নিজের অজ্ঞাতে না জেনেই করেছিল বা করবার, যুব বেমন প্রণের আবেগে না জেনেই পঞ্চম ধরে, কোকিল বেমন না জেনেই ডেকে ডেকে মরে, মাকড়সা বেমন জাল বুনে যায়, তবু সবটাই কি না জেনে? কে বলে পুরুষই শুধু প্রতারক? তাকে প্রতারক করে তোলে মেয়েরাই। মেয়েরাই ত ভোলায় বেশী। পুরুষই ত ভোলে—সে যে ভোলানাথ।—এই ত মেরী ডিকসন একে ভুলিয়েছে। তার পরে কুফা নিজেই কি আবার ভোলাতে এল নাকি? কেন এল কুফা—কেন এল ওয় দিকে উদ্গুহ হয়ে? এখন কি করবে কুফা, কি করবে? কিন্তু কুফারই বা শেষ কি? ওর যে উপার ছিল না? কারা সব যেন কানাকানি করল, চুপি চুপি ইসারায় সবাই মিলে হাসাহাসি করল, বাতাসে বাতাসে যেন সব ঝুঁটল—ওই তোর বর, ওই তোর বর। তাই ত কুফা চোখ মেলে তাকিয়েছিল, আড়ালে আড়ালে চুপি চুপি, চুপি করে করে মেলেছিল। কিন্তু তখন ত সত্যি প্রেমে পড়ে নি। আজ যখন জানল যে, ও আর তার সব নয়, কোনদিন হবার সম্ভাবনাও নেই, তখনই কেন এমন হ’ল, বায় বায় কেন ওয় মুখের দিকে দৃষ্টি ছুটে যায়?

কি স্নান পায়ের হাং কালা ত নয়ই, কয়দাও নয়। একেই

বোধহয় বলে মন্ব-চিকণ। কুফা এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল, এ বর্ণ শুধু মেয়েদের নয়—পুরুষেও আছে। এ রঙের কি আশ্চর্য্য মহিমা, শাস্ত, গভীর অথচ কেমন মুহূ-কোমল, কি স্নান চওড়া কপাল, আর তাতে পাছের পাতার সঙ্গে সূর্যের আলোর কেমন ছায়া ঢাকা ঢাকা খেলা। “আর তার নীচেই কালো তুরুর কোলে হুই বোজা চোখের আশ্চর্য্য শাস্তি। পাড়া নাকের নীচে তাস্তবর্ণ অধরের দৃঢ়ত্ব দেখা। আর কঠিন চিবুকের তীক্ষ্ণ ভঙ্গি। লাল টাইটা চিলে হয়ে এক পাশে আখগোলা ভাবে বুলছে। ডোরাকাটা বিলাতী শাটের গলার বোতাম খোলা। তার ভিতর দিয়ে লোমশ বুকের একাংশ আর গেক্তীর একটু সামা জাল দেখা যাচ্ছে।

এই সমস্তই কুফা দেখছে। ছি ছি, এ সে করছে কি? নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যে পুরুষ বুঝোছে, সে মেয়ে হয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। একোন দৃষ্টি তার চোখে? এবই নাম কি কামনা? মাগো মা? কোথায় তুমি? কোথায় তোমার সব বড় বড় উপদেশ? তোমার কুফা এ কি করছে? জেনে-শুনে, শব্দপুঙ্খের দিকে লোভের দৃষ্টি হানছে। না, কুফা এত নীচে নেবে বাবে না। এমন করে হারিয়ে কেলেবে না নিজে। ছিনিয়ে নিয়ে বাবে নিজেকে নিজের হাত থেকে। এখন, এই দণ্ডে, আর এক মুহূর্তও দেবী করবে না। আন্তে নিজের ব্যাগটা তুলে নিল কুফা। ঝিনঝিন-ধবে-বাওয়া পা কষ্টে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু সেই স্বল্পমাত্র আওয়াজেই থডমড় করে উঠে বসল কুমার। —“ইস অনেকটা ঘুমিয়েছি।” ঘড়ি দেখে বলল,—“পনেরো মিনিটেরও বেশী, কেন তুলে দাও নি কুফা? এই প্রথম বিলেতে ট্রেন কেল করব। আর সে তোমারই জেজ।”

নিজেব পোর্টফোলিওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কুমার। আবার কুফা তুলে গেল। আবার একটু হেসে, একটু মাথা নেড়ে, ছোট্ট একটু মায়াজাল রচনা করে, বলল,—“বাবে! ঘুমোলে আপনি আর দোষ হ’ল আমার? এমনি মেয়েদের কপাল বটে, দোষ করে পুরুষ, আর দায় চাপে মেয়েদের যাচ্ছে।”

—একটু ঘুমিয়েই কুমারের ক্রান্তি যেন অনেক করে গেছে। খুব তাড়া একটা হাসি হেসে কুমার বলল,—“হঠাৎ চুপি চুপি পা টিপে টিপে কেন পালাচ্ছিলে কুফা, তোমার ত আর ট্রেন যিস করার ভর নেই?”

—“নাঃ, পালাই নি ত?” হঠাৎ মিথ্যে বললে কুফা,—“বলে

বসে পায়ে কিংখি ধরে বাচ্ছিল, তাই উঠে একটু পারচারী করব ভাবছিলাম।”

—“ওরে বাবা, এসব জায়গার একা একা পারচারী করা মোটেই সুবিধের নয়। এখানে চারিদিকে একবারে—‘থ্রেমের কাঁদ পাতা ভুবনে—কে কোথা বসি’ লড়ে কে জানে’ দেখছ না?” বলে কুমার, চারিদিকে একবার তাকাল। মাঠ ততক্ষণে অনেক কাঁকা হয়ে গেছে।

কুকা বললে,—“দেখছি বই কি, আপনি বতরুণ যন্ত্র হয়ে গল্প বলছিলেন, ততক্ষণ কানে আপনার কথা শুনছিলাম বটে, কিন্তু চোখে ত এই সবই দেখছিলাম, চোখ-কান দুইই অকুপাইড ছিল।”

কুমার আবার একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ কিরিয়ে নিল। কুকা বুঝল, ওর কথা বলার ক্ষমতা মুক্ত করেছে কুমারকে। বাকি নেহাৎ সবলা বালিকা বলে, ভাবত, তাকে হঠাৎ এ বকম বাকপটরসী হতে নেপে, অবাক হয়ে গেছে।

কুকা আবারের সুরে বললে,—“চলতে চলতে আপনার গল্পটা শেষ করুন না।”

কুমার বললে,—“গল্প ত আর বেশী বাকী নেই। আচ্ছা, তা হলে শেখটুকু বলি, বলতে ইচ্ছে করছে আমার। ধৈর্য ধরে বকবাকনি শুনচ বলে যন্ত্রবাদ।”

এর দস্তরে কুকা শুধু তার বড় চোখ বড় করে মারের দিকে তাকাল।

কুমার বললে,—“সেই অন্ধকার ঘরে বসে, একমাত্র মেহেরি সন্ধান পাবার বাসনাটিকে মনোর মধ্যে রেখে, আর সবজ্ঞ ভাবনা মন থেকে দূর করে দিতে ব্যগ্র হয়ে বইলাম। বীরে বীরে আমার শরীর অবশ হয়ে এল। ডান হাতটা বাধা করতে লাগল, হাতটা যেন কাঁধ থেকে খসে পড়ে যাবে, তার পয়ে সেই বাধাটা ঘাড়ের মধ্যে উঠে টন টন করতে লাগল, তার পয়ে বাঁ হাতটা। ক্রমে এমন হ’ল যেন দুটো হাতই খসে পড়ে যাবে, তার পয়ে সেই বাধাটা ঘাড়ের মধ্যে উঠে টন টন করতে লাগল। আমি কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে বইলাম। ইতিমধ্যে কখন যে ওরা ঘরে ঢুকে ব্যাগিঙ-ট্যাগিঙ ঝাইয়ে আমাকে চাক্ষু করেছিল মনেও নেই। জান হলে ওরা বললে, ‘কি হ’ল? আমি বললাম, ‘কিছু না।’

—‘সে কি? একেবারে কিছুই না? যা জানতে চেয়েছিলে, পাও নি?’

—“আমি বললাম, ‘না’। শুনে ওরা মুখ চাওরা-চাওরি করল, বলল, ‘পারবে পারবে, আজই জানতে পারবে দেখ।’

—“আমি যখন ওদের ওখান থেকে বেরলাম, প্রায় দশটা বেজে গেছে। মাথাটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। যেন মস্ত একটা শূন্য দেহের উপরে টল মল করছে, আর পেটের মধ্যে অলছে চনচন কিরে।”

শুনে কুমার বুকের মধ্যে কুলে কুলে উঠল। —আহা যে। কাল সন্ধ্যাবেলা, কুকা যখন পরিপাটি সেজে, কুমারের জন্তে প্রতীক্ষা

করেছিল, তখন কুমারের মুহূর্তগুলি এই বেবনার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিল।

কুমার বললে,—“পকেটে বেশী পরসাদ ছিল না। রাত দশটার প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক দূরে একটা ছোট বেস্তোর খুঁজে বাব করলাম। তারা তখন বন্ধ করব করব ভাবছে। আমার দেখে বিবস্ত্র হ’ল। বললে, ‘তুমি একটু থরগোসের কোল আছে।’ তাই চাপ ত এনে দিতে পারি।”

—বলে আছি হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুর উঠল। আমি টেবিলের উপরে কুমুড়ের ৩২ দিয়ে, দুই মুঠোর মধ্যে মাথা রাখলাম। বীরে বীরে সব যেন কেমন একরকম হয়ে গেল। আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম মেহেরি সেটখানে টলস্থিত আছে, আমার পাশে, আমার খুব কাছে। ওর সারিখা আমার যেন ঘিরে আছে। আমার মনে হ’ল, আমি চোঁচিয়ে ডাকলাম, ‘মেহেরি মেহেরি’। আমি যেন মেহেরি বললে, ‘কি কি?’

—“আমি বললাম, ‘তুমি কোথায়?’”

—“সে বগলে, ‘এই ত আমি তে স্ব’র পাশে।’

—“একি কাণ্ড। মেহেরি মেহেরি মেহেরি।”

—“এই যে, এই যে, এই যে। ঘর ভরে উঠল মেহেরি হাসিতে। আমি পাগলের মত মুগ্ধ তুলে তাকলাম। শূন্য ঘর শুধু মেহেরি আভাস ভরে নিয়ে চূপ করে আছে।”

ওরা চলতে চলতে বাগানের গেটের কাছে এসে পড়েছিল। কুকা সেখানে একটু থেমে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এটুকু না দাঁড়িয়ে সে পারল না। সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কুমার বললে,—“এই বাখা কি করবে তুমি?”

কুকা চোখ মেলাল, তরুণ সূচনার অনেক হালকা হয়ে এল ওর মনোর ভাব। বলল,—“এই বাখা ত খুবই মোজা। আপনার আড়াত ঘন্টার একমিষ্ট চিন্তা মেহেরিকে আপনার কাছে মুগ্ধ করে তুলেছিল। সেটুকুই এই মাংসা সৃষ্টি। মেহেরি ভরত সেই সময় দিবা বসে কাকর সঙ্গে সিনেমা দেখছিল। কিংবা স্ট্রেক ঘুমুচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই টেরও পায় নি যে, রাত দশটার এক বেস্তোরার বসে থরগোসের কাবীর জন্তে অপেক্ষা করতে করতে আপনি তাকে নিয়ে একটা ধ্যানলোক সৃষ্টি করে বসেছেন। অবশ্য আপনার মনোর মধ্যে সে বাস্তব হয়ে দাঁটেছিল।

—“কিন্তু সে আপনারই মনোর রচনা। সত্যিই মেহেরি কখনো ওভাবে ওখানে অসুখে পায় না, মরে গেলোও না। মৃত-আত্মার উপস্থিতিও আমি বিশ্বাস করি না। তা মেহেরি ত বেঁচেই আছে, যখন বসেছেন, সে বিয়ে করেছে।”

—“তা সত্যি”, ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে ঘাড় নাড়ে কুমার,—“কিন্তু কুকা, তুমি ব্যাপারটা একেবারে হালকা করে নিলে। সত্যি, আমি কিন্তু কখনও ভাবি নি যে, তুমি এইরকম ভাবে কথা বলতে পার। তোমাকে দেখে মনে হয় এত নরম-সরম—”

—“এখন দেখছেন নেহাৎ অভটাই অবলা-সবলা নয়,” বলেই অস্থির হয়ে উঠল কুকা। ওর দেহের মধ্যে কিসের যেন অস্থিরতা ওকে অসহিষ্ণু করে তুলল। হঠাৎ কুকা বলে উঠল, —“এ সব থাক, আসল কথা বলুন? কি করে জানলেন যে, যেহী আবার বিয়ে করেছে?”

—“আহা তাই ত বলতে চাইছি, তুমি বলতে দিচ্ছ কই?”

—“আমি? আচ্ছা অপরাধ স্বীকার, এবার বলুন।”

আচ্ছা শোন, কুমার বললে, —“আমি তখন ভাবলাম, এ কি হ’ল, আমি ত যেহীকে চাই নি, শুধু তার সন্ধান চেয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধান ত পেলাম না, তার বদলে মিনিট দুয়ের মধ্যে তাকেই পেলাম। এর অর্থ কি? এই সব ভাবতে ভাবতে, পকেট থেকে পাস বার করে আমি তার মধ্যে থেকে যেহীর ছবিটা বার করে নিয়ে টেবিলের উপরে রেখে দেবছি, আর কি বে ভাবছি, তা জানি না। এমন সময় লোক দুটোর একজন টেবিলে কাঁটাছুরি সাজাতে এল। টেবিলের উপরে ছবিটি দেখে তীব্র চোখে তাকিয়ে থেকে ভাঙা ভাঙা গুহুগুহে গলায় অশ্লীল উচ্চারণে বললে, ‘আই নো দিস গল’। তাই নাকি?”

—“আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম, ‘বলত এম নাকি?’”

—“ওর নাম? যেহী—যেহী—যেহী। কি আবার মনে পড়ছে না। তবে সবাই ওকে যেহী বলে ডাকত মনে আছে।”

—“সবাই—কে?”

‘সবাই, মানে ওর বন্ধুরা।’

—“বন্ধুরা কে?”

‘তুমি পাগল।’ লোকটা বললে ‘যেহী প্রত্যেক শনিবার এখানে খেতে আসত। আর জান,’ লোকটি বললে, ‘এইখানেই ওর সঙ্গে আমার ভাবের দেখা হ’ল।’

—“কে তোমার ভায়ে?”

‘আমার ভায়ে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার।’ বুড়ো বললে, ‘স্বাট...কি যেন একটা উপাধি বললে, ‘আমার মনে নেই।’ বললে, ‘সে ত গেছে তোমাদের দেশে বাঁধ বাঁধার কাজে।’

—“আমি বললাম, ‘তার সঙ্গে যেহীর সম্পর্ক কি?’”

‘দাম্পত্য সঙ্গ।’ বুড়া হাসলে, ‘সে যে ওর স্বামী।’

—“স্বামী? যেহী বিয়ে করেছে?”

‘নিশ্চয়ই, আমারই বোনের ছেলেকে। আমার বোন যে-সে নয়। অনেক টাকার মালিক তার স্বামী। আর ছেলে ত রীতি-মত বিখ্যাত। সে যে হঠাৎ এমন করে বিয়ে করবে, তা আমরা ভাবতেও পারি নি। কিন্তু স্বাট বলত ও যেহীকে বিয়ে করেছে বলার চেয়ে যেহী ওকে বিয়ে করেছে বলাই ঠিক। কারণ প্রেমের প্রথম টানটা যেহীর দিক থেকেই এসেছে।’

সেই মুহূর্তে আবার যেহীকে অমুভব করলাম কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যেহীর টান এড়ান কত শক্ত। যেহী বা চার, তা সে নেবেই। কিন্তু হঠাৎ একে চাইল কেন যেহী সে ত এত

খেলো নয়। তবে এটা কি আমার উপরে ক্রোধেরই এটা আর একটা পরিণতি? নাকি আমার প্রেম ওকে প্রেম চাইতে শিখিয়েছিল। প্রেম ছাড়া ও হয়ত বাচতেই পারছিল না। এত কথা তখন অবশ্য আমার মনে হয় নি। শুধু মাথা ঝিম ঝিম করছিল। বুড়া অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। আমার কানে ভাল করে তার শব্দগুলোও পৌঁছাচ্ছিল না। হঠাৎ কানে এল বুড়ো বলছে, যেহী কিন্তু তোমাদের দেশটাকে ভালবাসত। স্বাট বলত, ভারতবর্ষ দেখার সব মেহীর এত বেশী, যে আমার এক এক সময় সন্দেহ হয়।’ ভারতে বাবার লোভেই হয়ত—যেহী আমাকে ভাগ্যবশেছে।”

—‘বাকি থব থব পাওয়া গেল, বার জন্তে এত সাধনা, অবশেষে তা সিদ্ধ হ’ল। বার জন্তে এত উতলা হয়েছিলাম তা এক মুহূর্তে জানা হয়ে গেল বাসি থব থবের মত। পরসোসেব খোল গলা দিয়ে নামল না। দায় রেখে জলেয় গেলাসটা ঢক ঢক করে শেষ করে আমি বেরিয়ে এলাম। লোকটি সংশ্লিষ্ট দৃষ্টি যেনে তাকিয়ে রইল।’

—“বাইরে এসে দেখি, আকাশে যেন উৎসব লেগে গেছে। পূর্ণ জ্যোৎস্না থব থব করতে করতে রূপো ছড়িয়েছে। চারিদিকে ঢালছে যেন রূপের স্রাব—নাকি স্রবলোকের মদ, বা থেলে স্রবলোক-কুংসিতে ভেদ ঘুচে যায়। নইলে কালো-কুন্ডলি বড় বড় বাড়ীগুলি চাদের আলোয় অমন অপার্থিব মাদ্যময় হয়ে পড়ে কি করে বল ত। আমার হঠাৎ এত ভাল লাগতে লাগল কুকা, বহুদিনের মনের ভার যেন কেমন করে হালকা হয়ে গেল। গাছের মাথার মাথার ঝিকঝিকে জ্যোৎস্নার স্বপ্ন। গাছ ঢালা নেহাৎই বাস্তব মোটা বাস্তবতা যেন নন্দনকাননের পথ। আর তার মধ্যে সম্মিলিত হয়ে উঠছে বসন্তের বাতাস। সেই পথ, সেই বাতাস যেন আমাকে নতুন জীবন এনে দিল। ঘুরে ঘুরে অনেক হেঁটে প্রাণভরে বৃক্ষের মধ্যে খোলা হাওয়া পুরে নিয়ে আমি বাড়ী কিয়ে এলাম।”

কুকা মনে মনে বললে,—‘সেই সময়ে আমি তোমাকে দেখে অভিমানে কেঁদেছিলাম।’

কুমার বললে, “যদি এসে দেখি কে আমার জন্তে পুজি, বিকিট আর এক গেলাস জ্বালা দিয়ে রেখে গেছে। ঠিক বুঝলাম, এ রম্যার কাজ। খেয়ে নিয়ে পোশাক-টোশাক ছেড়ে বিছানার ওপরে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিষাতে বাব, হঠাৎ তাকের উপর থেকে যেহীর ছবিটা পড়ে গেল আমার বিছানায়। কি আশ্চর্য! ছবিটা পড়ল কি করে? তুলে নিয়ে দেখি ওয় ট্যাণ্ডটা পুরোখো হয়ে ছিড়ে নড়বড় করছে। এতদিন খেলাই করি নি। ছবিটা দেখতে দেখতে আর সন্ধ্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে অমনি ঘুরে চোখ ভরে এলো কিছুতে ঘুমতে পারলাম না। ভোরের দিকে একটু ঘুমতে পেরেছি।”

হঠাৎ কুকা মুখ কিরিয়ে বললে,—“আজ ত ঠৈন কেল করলেন, বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিন না এখন। কাল সকালের ঠৈন

গেলেই ত হবে।” বাগ খুলে দরজার চাবি বার করলে কৃষ্ণ।

—“না না, তা কি হয়, আজকেই যেতে হবে। আর একটা ট্রেন আছে রাত এগারটায়। ট্রেনের জলুনিতে আরাম করে ঘুম, আর স্বপ্ন দেখব।”

কৃষ্ণার চোখের দিকে চেয়ে কুমার হাসল। বলল,—“কৃষ্ণা!”

—“কি?” চমকে মুখ তুলে তাকাল কৃষ্ণ।

ওদ চোখে চোখ মেখে হাসল কুমার। বলল,—“কৃষ্ণা, মেঘের সঙ্গে আরও একটা ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি মুগ আঁজ আমার স্বপ্নে স্বপ্নে ভাসবে।”

তুনে কৃষ্ণা দমজা খুলে এক ছুটে ভিতরে চলে গেল। আর সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে কুমার ভাবল, ও অমন করে পালাল কেন?

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

## ছুটি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটি প্রাকালে শ্রদ্ধের ও শ্রমণীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “প্রবাসী” মাধ্যমে ছাত্রদের আহ্বান করিয়া ছুটিতে তাহাদের কতব্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ দিতেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া তৎকালীন বহু গ্রামীণ ছাত্র নিজেরা ত উপকৃত হইয়াছেন, গ্রামেবও বহু উপকার করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জায় সম্পাদকও নাই, সেই প্রকার উদাত্ত এবং শিক্ষণীয় উপদেশও নাই। তখনও রাজনীতি কম ছিল না, এবং তিনিও কম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। “প্রবাসী” ও “মার্গ বিভিউ” রাজনীতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। তখনকার ইংরেজ শাসকবর্গ এই দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন তেমন ভয়ও করিতেন। রাজনীতির মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও রামানন্দ বাবু পাড়াগাঁর কথা চিন্তা করিতেন, ছাত্রদের পাড়াগাঁর উন্নতিমূলক উপদেশ দিতেন—তিনি জানিতেন পাড়াগাঁর উন্নতি ব্যতীত রাজনীতি পূর্ণতা লাভ করে না।

বাহা শুটক, মহান ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূজার ছুটির প্রাকালে আমি গ্রামীণ ছাত্রদের প্রতি পাড়াগাঁর উন্নতিমূলক কয়েকটি সহজ কথা বলিতেছি। পল্লীগ্রামে বর্তমানে নেতার অভাব, পূর্ণসকালের চণ্ডীমণ্ডপও নাই, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গ্রামের মোড়ল মহাশয়দের সহিত গ্রামের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের আলোচনাও নাই, গ্রামের দলাদলির, মনোমালিজেব, অভিযোগ ইত্যাদির আপোষে নিমগ্নও নাই। বর্তমান সময়ে ছাত্রদেরই সেই নেতা বা মোড়ল মহাশয়দের স্থান অধিকার করিতে হইবে। গ্রামা বাদ-বিসবাদ, দলাদলির মীমাংসার উপরেই সর্বাঙ্গীন গঠনমূলক সর্বপ্রকার পরিকল্পনা প্রধানতঃ নির্ভর করে।

পাড়াগাঁয়ের বাস্তব-ঘাট, নদী-নালা, বন-জঙ্গলের সংস্কার বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য নহে। দরকার কেবল পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা অনুসারে কার্যপ্রণালী গঠন এবং সহবুদ্ধতা। ছাত্রগণ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া ছোটখাটো পরিকল্পনার পুস্তক ক্রয়িতে পারেন। কৃষিই গ্রামের প্রধান পেশা এবং কৃষকই গ্রামের মেরুদণ্ড। সুতরাং কৃষির ও কৃষকের উন্নতিই গ্রামের প্রধান ও প্রথম কাজ। কৃষক তথাকথিত শিক্ষিত নহে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান, অবুর নহে, তাহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তাহার দৃষ্টি হইয়া তাহাকে বুঝাইলে সে বুঝিবে। এমন অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে বাহা গ্রহণ করিলে কৃষকের ও কৃষির উন্নতি হইবে, যেমন গোবর সংরক্ষণ, কম্পোষ্ট মার প্রস্তুত, জ্বালানীর জঙ্গ গোবরের অপচয় নিবারণ, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে তরিতরকারির বাগান, বীজ সংরক্ষণ, ইত্যাদি। এই সকল কাজ ব্যয়সাপেক্ষ নহে, কষ্টসাধ্যও নহে। স্থানীয় সরকারী কৃষি-কম্পোজারী সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ছাত্রগণ এই সকল কাজে অবহিত হইয়া কৃষকদিগকে এই সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। ইহার ফলে সরকারী কম্পোজারীগণ সচেতন ও অধিকতর কতব্যপরায়ণ হইবে।

আজকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই, প্রত্যেক দলের প্রতি আমার নিবেদন গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কোন দলাদলি থাকা উচিত নয়, we should stand on a common platform irrespective of our political creeds for all-round development of our villages.

# বাঙালীর সংলাপ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আধুনিক বাঙালীর কথোপকথনের ধারা ও বাক্যবীতি সম্বন্ধে আমার কিংবা বক্তব্য আছে। সামাজিক জন্মায়ত্তে, বৈঠকী আলাপ-আলোচনায়, দেখা-সাফাতের কালে কুশল-বিনিময় পর্কে, ছই বা তিন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কথাব্যবহার সচরাচর যে ধরনের বাক্যের ব্যবহার হয় তা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস এবং সে সব তথ্যের সব কটিই যে সমান প্রীতিকর এমন নাও হতে পারে।

আমার নিজের ধারণা, বাঙালীর সংলাপ কোন কোন দিক থেকে বিশেষ ভাবেই ক্ষুণ্ণ। এই ক্ষুণ্ণের সংশোধনের প্রয়োজন আছে। জাতীয় আত্মমর্যাদা ও স্বাভাবিক সুনামের যুগ চেষ্টাই আমাদের কথোপকথন বীতিতে কিংবা অঙ্গ-বঙ্গ-চরিত্র আবশ্যিক। তাতে যদি আমাদের প্রচলিত ভাবের কাঠামোরও কিছু পরিবর্তন সাধন করতে হয় তাহলেও পেছপা হলে চলবে না। আমাদের কথোপকথন আমাদের স্বীকৃত ভাষা-রীতিকে অনুসরণ করে গঠিত, আবার আমাদের ভাষা-রীতির উপর আমাদের কথোপকথনের ভঙ্গিমার ছাপ গিয়ে পড়ে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনবরত আমাদের ভাষা-রীতির বদল হয়ে চলেছে। কখনও কলমের কথা মুখে আসে, কখনও মুখের কথা কলমের ডগায় গিয়ে বসে। সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে এই দেওয়া-নেওয়া যে অবিমিশ্র শুভফলস্বরূপ হচ্ছে এমন কথা ভাবতে পারলে স্থায়ী হওয়া যেত, কিন্তু ভাববার যৌক্তিকতা নেই। আমাদের সংলাপ প্রভুত পরিমাণে মাজিত ও উন্নত হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

অনেকেরই নিকট এই প্রবন্ধের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অভিনব বলে মনে হবে। লেখকও এই অভিনবত্বের বিষয়ে সচেতন। কিন্তু লেখক নাচার। সূত্রপাতে অনেক কথাটি অভিনব বলে মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, নিছক নূতনত্ব-স্পৃহা বা মৌলিকত্বের ক্ষুধাই তাদের উৎসভূমি না হতে পারে, তাদের অনেক কটিরই পশ্চাতে সত্যের পটভূমি থাকা সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্যের পিছনে যেমন এক পটভূমি বিলম্বিত রয়েছে বলে লেখকের দ্বিধা বিদ্যমান। বক্তব্যটি স্বীকার করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু বক্তব্যটি অস্বীকার করা প্রমুখ। ওটি পাঠক সম্বন্ধে উপস্থিত করার পিছনে জাতিকল্যাণ ভিন্ন অল্প কোন মনো-ভাবই লেখকের মনে সঞ্চিত নেই সে-কথা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা দরকার।

ইউরোপীয়দের মধ্যে একটা রীতি আছে, আলাপ-আলোচনা কালে কখনও উপস্থিত জনদের সম্বন্ধে কোনরূপ ইঙ্গিতাত্মক কথা

ব্যবহার করতে নেই। যেখানে কয়েক ব্যক্তি সামাজিক মিলনোদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন সেখানে এমন কোন বাক্য ব্যবহার শিষ্টাচারসম্মত নয় যার প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন অর্থে উপস্থিত জনদের কারও উপর কোনরূপ কটাক্ষ প্রকাশ পায়। Present company কে বাদ দিয়েই এ সব স্থলে আলাপ পরিচালনা করা নিয়ম।

কিন্তু আমাদের কথাব্যবহার সব উল্টা চাল। ঠেস দিয়ে কথা বলা আমাদের একটা জাতিগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে বললেও চলে। আলাপ-আলোচনায় উপস্থিত জনদের মধ্যে কাউকে প্রচ্ছন্ন সম্বোধনাত্মক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা ঘায়েল করতে পারলে আমরা যেন আর কিছু চাই না। আমাদের ধারণা, এতে আশা-দেয় বাক্পূর্ততা প্রকাশ পায়, উপস্থিত ব্যক্তির কোণস প্রকাশ পায়, কিন্তু এটি যে নিতান্ত শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ সে কথা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব।

যদি বলেন অমুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রমুখ কটু বাক্য বক্তা কর্তৃক বর্ষা-আন্তরিক ভাবে অমুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করেছেন, উল্লিখিত কাউকে অঘাত দেওয়া তাঁর মনোগত অভিপ্রায় না হতে পারে। সে স্থলে বলব, সেটিও শিষ্ট রীতি নয়। বর্ষার্থ কচিবান ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি এমনতর বাক্য ব্যবহার থেকে সতত বিবর্ত থাকেন। আমাদের মনোভাব খাই হোক, একটি জন্মায়ত্ত বা বৈঠকের মধ্যে আমরা এমন কোন বাক্য ব্যবহার করতে পারি না যা উপস্থিত জনদের কানে গিয়ে খট করে বাজে বা যার নিহিতার্থ নিতান্ত ক্ষৌণ বা হৃদয় ভাবে গিয়েও উপস্থিত জনকে আঘাত করে। ঐতিহ্যবাহী কর্ণপাড়াধারক কথার একটা অংশই আবেদন আছে। তা অল্পখা প্রকৃত হাসি-গল্পে মুখর একটি আত্মার আনন্দকে চকিতে বিশ্বাদ করে দিতে পারে। দিয়েও থাকে। সেইজন্য দাবী সত্যিকার অমুভূতিশীল ব্যক্তি তাঁরা সক্ষম হই প্রীতিকর কথা দিয়ে বৈঠকী যেজাজকে সজীব রাখবার পক্ষপাতী। এমনকি পরচর্চার বেলায়ও তাঁরা কখনও সীমা লঙ্ঘন করেন না। শুনি পরচর্চা নাকি আড়ার প্রাণ। কিন্তু সৌজন্যবান শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তিত্বা ভানেন ও মানেন যে, পরচর্চা পয়েই চর্চা, তা একটা নির্দোষ বাসন, তার মধ্যে উপস্থিত জনদের চর্চাব্যবস্থাপনা করলে—তা সে যত হৃদয় ভাবেই হোক—আবহাওয়া ঘুলিয়ে উঠতে মুহূর্তেকের বিলম্ব হয় না।

আর আন্তরিকতার প্রস্নেই বা নিঃসন্দেহ হই কি করে। অনেকে ইচ্ছা করেই অপরের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতাত্মক বা স্বেচ্ছাশ্রমিক বাক্য ব্যবহার করেন। 'ল্যাং' ঘেরে কথা বলা এদের একটি

হতাব। বঁকে যেবে বোঁকে শেখানয় মত এরা অম্লপন্থিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন ঠিকই কিন্তু বক্তব্যের উদ্দিষ্ট থাকে উপস্থিত জনদেরই কেউ না কেউ এবং বক্তব্যের সেই অভিপ্রেত সঙ্কেত অজ্ঞেয়া যাতে ধরতে পারে সে বিষয়েও এদের চেষ্টা গোপন থাকে না।

বলাই বাহুল্য, এ বকম আচরণ অতীব গাঁহিত। দৃষ্ট ব্যক্তির কদাপি এরকম আচরণের দ্বারা আত্মবিস্ময়না ঘটান না। নিজের প্রতি তাঁরা যে সম্মান আশা করেন তাঁরা পরকেও সমান সম্মান দিয়ে থাকেন। ভালমাহুবিষয়কু নিজে সবটাই দখল করে অপরের ভাগে ত্রাঙ্কিল্যের হাড়গোব ছুড়ে ফেলার নীতিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আর তা বিশ্বাস করেন না বসেই নিছক শ্লেষাত্মক বাক্যের দ্বারাও অপরের চিহ্নিত করবার কথা তাঁরা ভাবতে প'রেন না। তাঁদের মনন-মানসিকতা আর কচিটাই এত উচ্চ স্তরে বঁধা যে, পারম্পরিক বিবেচ্য, পারম্পরিক প্রতিযোগিতা আর বুদ্ধিবিকারের আবহাওয়ার সংস্পর্শমাত্রে তাঁদের মন পাড়িত হয়। তাঁদের নিজের মনে যে গ্রানি নেই, সেই গ্রানির অস্তিত্ব তাঁরা অপরের মধ্যেও কল্পনা করতে প'রেন না। কল্পনা করতে কষ্টানুব্র করেন।

কিন্তু এ সমাজের ধরন-ধারনই আলাদা। একটা অম্লপন্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া চারিদিকে নিত্য বিরাজমান। প্রতিটি মানুষ তাল-চৌকটিকির সম্পর্কে অভ্যস্ত নন, অধচসমাজের প্রচলিত আচরণবিধি অম্বারী তাঁদের প্রায়শঃ তুল-বোঝাবুঝির বলি হতে হয়। যে অর্থে যে বাক্য তাঁরা প্রয়োগ করেন নি, বিপরীত পক্ষের অথবা প্রতিযোগিতাসুলভ মনোভাবের জঙ্ক তাঁদের সেই বাক্যে সেই অর্থ আরোপ করা হয় এবং ফলে তাঁদের উপর অথবা প্রতিঘাত এসে পড়ে। পুনরায় বলি, চেন দিয়ে কথা বলা আমাদের একটি জাতীয় কু-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেয়ানাদের এতে অম্ববিধা হয় না, কেননা সেয়ানার-সেয়ানার কোলাকুলি এই উপায়েই বোধ হয় ভাল জন্মে; অম্ববিধা বত ভালমাহুকের। ভাল-মাহু কি করে জানবেন যে অপর পক্ষ তাল-চৌকটিকির ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝেন না এবং এই ভাষা ব্যবহারের জঙ্ক সর্বদাই আঙ বাঙিয়ে আছেন? আমাদের হিংসাতার ত শুধু কখনেই নয়, আচরণেই নয়, বাক্য-ব্যবহারেও আমরা হিংসাতার করতে ছাড়ি না।

মুষ্টিগ হয়ছে সধুত্বপরাণ ব্যক্তির নিয়ে। তারা এরকম তাল-চৌকটিকির সম্পর্কে অভ্যস্ত নন, অধচসমাজের প্রচলিত আচরণবিধি অম্বারী তাঁদের প্রায়শঃ তুল-বোঝাবুঝির বলি হতে হয়। যে অর্থে যে বাক্য তাঁরা প্রয়োগ করেন নি, বিপরীত পক্ষের অথবা প্রতিযোগিতাসুলভ মনোভাবের জঙ্ক তাঁদের সেই বাক্যে সেই অর্থ আরোপ করা হয় এবং ফলে তাঁদের উপর অথবা প্রতিঘাত এসে পড়ে। পুনরায় বলি, চেন দিয়ে কথা বলা আমাদের একটি জাতীয় কু-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেয়ানাদের এতে অম্ববিধা হয় না, কেননা সেয়ানার-সেয়ানার কোলাকুলি এই উপায়েই বোধ হয় ভাল জন্মে; অম্ববিধা বত ভালমাহুকের। ভাল-মাহু কি করে জানবেন যে অপর পক্ষ তাল-চৌকটিকির ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝেন না এবং এই ভাষা ব্যবহারের জঙ্ক সর্বদাই আঙ বাঙিয়ে আছেন? আমাদের হিংসাতার ত শুধু কখনেই নয়, আচরণেই নয়, বাক্য-ব্যবহারেও আমরা হিংসাতার করতে ছাড়ি না।

বলা বাহুল্য, আমাদের এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটতে হবে। তা নইলে অম্বহীন দ্বাত-প্রতিঘাতে সমাজে শুধু বিষই উথলে উঠতে

থাকবে, সমাজের কর্মশক্তি যথার্থ চালনা হবে না। অকারণ তুল-বোঝাবুঝির ছট-চক্কের আবর্তনে শক্তির কত যে অপচয় হয় তা বলে বোঝান যায় না। বাঙালীর সামাজিক ব্যবহার কথাবার্তা ও সংলাপ চৌকটিকিতেই কেবল তৃপ্তিবোধ করে এ আমাদের পক্ষে মোটেই জ্ঞানীয় বিষয় নয়। মাহুকের মানবীয় মর্যাদায় ও ব্যক্তি-স্বাভিমান্য সহজাত আস্থা ও সম্মমবোধ যে-কোন সমাজের সামাজিক স্থিতির একেবারে গোড়ার কথা। মাহুকে মাহুকে সেই সম্মমই যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে কিসের উপর আমরা আমাদের সমাজকে ঠাঁড় করাব? সমাজ এগিয়ে চলবে কোন প্রেরণার উপর ভর করে?

কেউ কেউ সংলাপের শ্লেষাত্মক বা ইঙ্গিতাত্মক প্রয়োগ সমর্থন করেন এই বুদ্ধিতে যে, নিরুদ্দিষ্ট অচিহ্নিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে কথা বলা হয়েছে তা নিজের গায়ে না মাপলেই হয়, অপরের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কটুক্তি বা শ্লেষবাক্য নিজের উপর টেনে নিয়ে বিচলিত বোধ করবার কোন মানে হয় না। এই ভাবে কথার কথার যদি সংলাপের রাশ টেনে ধরতে হয় ত কোনপ্রকার সামাজিক কথাবার্তাই সম্ভবে না।

উপরের কথাগুলির মধ্যে যে কিছু পরিমাণ যুক্তি নেই তা নয়। তবে তার উপর এই যে, আমরা সংলাপ-আলোচনায় যে-কোন প্রকার কটুক্তি-প্রয়োগেরই বিরোধী, প্রত্যেক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই হটক, আর পরোক্ষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই হটক। যে-কোন প্রকার অ-শালীন কথাই কানে খট করে এসে বাজে। সকলের হয়ত বাজে না, কিন্তু যাদের ক'ট পরিমার্জিত, শব্দমনস্কতা প্রবল, নিরন্তর স্মরণ-বাক্য প্রয়োগে যাদের রসনা বিশেষভাবে ক'ষত, তাঁদের পক্ষে এ-জাতীয় অতিমাত্রাভিজ্ঞতা ব্যক্তিবিকই পাড়াহারক। বর্ষায়সী বিষয়্য শুচিবাইয়ের মত এটাকে কুল-মাঠরী কচিবাই বলে মনে করলে তুল করা হবে। এ কচির বাই নয়, এ কচির দাবী।

অনেকের আবার উপস্থিত জনকে লক্ষ্য করে নিখুঁত রসিকতা করবার অভ্যাস আছে। এ অভ্যাসও কতকটা সূচিত হলে সমাজের পক্ষে তার কল ভাল বই মন্দ হবে না। রসিকতা ভাল, তা যদি নিখুঁত হাতারসের উৎস থেকে উৎসারিত হয় তবে আরও ভাল, তা বলে মিছরি ছুরির ধারে ধারালো রসিকতা ভাল নয়, অন্ততঃ সামাজিক আলাপ-সংলাপের বেলায় ত নয়ই। সাতিতো বক্তোক্তি (wit), পরিহাস (humor), শ্লেষ ও বাঙ্গ খুবই উপভোগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি এই তরবারির খেলা ঘন-ঘন চলতে থাকে তা হলে আবহাওয়া অতিয়েই দূষিত হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। নিখুঁত হাতপ্রসূত রসরসিকতা আর শব্দালঙ্কারজাত ব্যক্তোক্তি এক জাতের বস্তু নয়। প্রথমটিকে বাক্য উদ্দেশ্য করে রসিকতা করা হয় সে-ও তা উপভোগ করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপভোগ বিমুখতার পরিণত হয়। রসিকতার নামে বাঙ্গ করিতে গিয়ে কত সময়ে যে হিতে-বিপরীত কল হয় তার অভিজ্ঞতা বোধ

হয় প্রায় সকলেরই আছে। আসল কথা, 'হিউমার' আর 'উইট'র মধ্যে তফাৎটো জানা দরকার, নয় ত সমাজ-ব্যবহারে বিপত্তি ঘনিষে ওঠা আশ্চর্য নয়। অবোধবাবু নামক এক অতিরিক্ত সজ্জাবিলাসী ভদ্রলোককে যখন বসিকতায় ছিল 'ঘোষবাবু' বলে বর্ণনা করা হয় তখন ত হয় নির্মল হাস্যবসের চুটীস্ব, কিন্তু যখন এই বিশেষ বাবুটিকে লক্ষ্য করে সাধারণ ভাবে বাবু-সমাজের উপর কটাক্ষ ক্ষেপ পূর্বক এক ছোটখাট বক্তৃতা ইচ্ছা হয়ে থাকে তখন তা শোভনতায় সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তার মধ্যে তিক্ততার স্বাদ এসে পড়ে। কোন সমাক্দর্শী রুচিবান ব্যক্তিই এ রকম বাক্যব্যবহারের অনুমোদন করবেন বলে মনে হয় না। এই-জাতীয় বাক্যব্যবহার তিক্ততাসঞ্চারী বলেই তা থেকে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত থাকে উচিত।

ইউরোপীয় সমাজে কথার পৃষ্ঠে কথা বোঝনা করে আঘাত-প্রতিঘাতমূলক উত্তর-প্রত্যুত্তরের খেলা খেলবার বেওয়ার্জ আছে। ইংলণ্ডের উক্ত জনসন এই বিভাগ পটু ছিলেন। কিন্তু এই বিভাগও মাত্রাহীন অমূল্যলীন ভাল নয়। তাতে মনোমালিঙ্গের সঞ্চার হতে পারে, হয়েও থাকে। যিনি ক্ষিপ্ততার সঙ্গে উত্তরের পৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর দান করতে পারেন আমরা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি, প্রত্যুত্তরমতিত্ব ও সক্রিয়তার প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু সব সময়েই যে তাঁর প্রত্যুত্তরের (retort) বৌদ্ধিকতা আছে এমন নাও হতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধির অতিরিক্ত সঙ্গাগতার একটা মুষ্টি এই যে, তা কেবলই মানুষকে আঘাত-প্রতিঘাতে প্ররোচিত করে, তাকে ছিন্ন হয়ে থাকতে দেয় না। কাতিকে বাক্যের দ্বারা কাবু করতে না পারলে মনে হয় বদনা-সঞ্চালনপটুত্বের শক্তি বুঝা গেল। পরকে জ্বক বা অপমান করাতেই যে বাক্যক্ষমতার উল্লাস, সে রকম ক্ষিপ্ততার অপেক্ষা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জড়তা অনেক ভাল। সমাজে সংসারে দুই বুদ্ধির চতুর্দিকে জয়জয়কার; শুভবুদ্ধি আর সংবুদ্ধিরই বড় অভাব। বাক্যব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটু বেশী পরিমাণে যদি শুভবুদ্ধির অমূল্যলীন হ'ত তা হলে আমরা অনেক বিপত্তির হাত থেকে বেঁচে যেতাম।

আমাদের পারম্পরিক কুশল-বিনিময়ের সংস্কারের মধ্যেও আজকাল অনেক রকমের খাদ ঢুক গেছে। দেখা হলে নমস্কার-প্রতিনমস্কার সাধারণ সৌজন্তের একটি অঙ্গ, কিন্তু এখন সৌজন্তের ব্যত্যয় পদে পদে চোখে পড়ে। ক্ষমতাবান বলে যার আত্মাভিমান আছে, অপরকে ছোট ভেবে যিনি এক প্রকারের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব-সুখ অনুভব করেন, তিনি কচিং কখনও অপরের নমস্কারের প্রতিদান দেন। এই অবহেলা অজ্ঞানত্বতার ফল মোটেই নয় বরং একে অতি-মনস্কতার ফল বলা যেতে পারে। স্বীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা থেকেই এই পরিকল্পিত গুণানীকৃত্য উদ্ভব।

এত গেল আচরণগত বিচ্যুতি, বাক্যব্যবহারেও কত রকমের অপূর্ণতার সন্ধান মেলে। রাস্তায় দেখা হতে কেউ যদি

অপরকে নিতান্ত খোলা মনে জিজ্ঞাসা করেন 'কি খবর?' এবং তার বদলে জবাব পান 'আপনার কি খবর?' তা হলে এই পাণ্ডা প্রশ্নের সম্ভাবণে অসৌজন্তই সূচিত হয়। কিবা 'কি, ভাল আছেন ত?' এই নির্দোষ প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি জবাব দেন 'ভাল না থাকবার কোন কারণ নেই', সেটাও সৌজন্তের সূক্ষ্ম বাতায়। প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া বা হু হাঁ বলে কথা সায়া—এও শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যাপার। শিষ্টাচারের এ রকম বিকার যে কত চোখে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই।

ইংলণ্ডীয় সমাজে প্রতি কথার 'থ্যাক ইউ', 'থ্রিজ' 'কাইওলি' প্রকৃতি শব্দের ব্যবহারের চলন আছে। বস্তুতঃ এই খাতে ইংলণ্ডীয় লোকেরা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়িই করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের এই অতি-সৌজন্ত সময় সময় বিজ্ঞপেরও লক্ষ্য হয়। কিন্তু সামাজিক ব্যবহারকে সুস্থ, মন্থণ ও স্নিগ্ধ করে তুলতে হলে এ রকম ব্যবহারের যে প্রয়োজন আছে তা বোধ হয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ সব সৌজন্তমূলক শব্দ যদিও নিতান্তই আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাদের ভিতর আন্তরিকতা তেমন নেই, তা হলেও তাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। হোক এ সৌজন্ত কতকটা লোক দেখান, হোক তা হৃদয়তাপহীন, তাতে যদি লোক-ব্যবহার সুরুচির সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারা যায় সেটাই বা কি কম লাভ! আমাদের সমাজ-ব্যবহারে অবশ্য এই অতি-সৌজন্ত অনুকরণের কথা কেউ বলবে না, তবে কথায়-বার্তায় আলোচনা-আলোচনায় কোন রকম সৌজন্তেরই কোন রকম বাল্যই থাকবে না সেই বা কি কথা। 'পছো আপ' জাতীয় উত্তর-ভারতীয় আমীরী সহবৎ অমর্য কলহ নাট বা অমূল্যলীন কবলাম, তা বলে সহবৎ চম্ভার প্রয়োজন অসিদ্ধ হয়ে যায় না। অতি-বুদ্ধির পথে আমরা নাট গেলাম, প্রতিতিমসাতাড়িত আর প্রত্যাঘাতপরায়ণ হয়ে অপরকে জ্বক করবার মতলবে চৈদ দিয়ে কথা আমরা না-ই বললাম আমাদের আর একটু সরল বুদ্ধির বশ হতে দোষ কি। কথার পৃষ্ঠে কথা বচনার দক্ষতার বুদ্ধির চাতুর্য প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু মানুষের মানবীয় মর্যাদার অপকৃষ ঘটিয়ে এ চাতুর্যের সুনাম ক্রয়ের কোন অর্থ হয় না।

সংসারে যারা কৃতী পুরুষ বলে লোকধ্বজন তাঁরা কেউ আঘাত-পরায়ণ নন, তাঁরা সারল্যের প্রতীক। মহত্বের একটা লক্ষণই হ'ল সারল্য। মাঝারী ও মানুষী মনের মানুষেরাই শুধু কথায় কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন এবং অপর পক্ষে প্রতিযোগিতা অহুমান করে সুরুতেই পাহাড়া কষিতে থাকেন। মহত্বের এমন রীতি নয়। তিনি নিজে সরল বলে সবাইকেই সরল ভাবতে তিনি অভ্যস্ত। 'আপ ভালো ত জগৎ ভালো।' পর পক্ষের আক্রমণ আশঙ্কা করে তিনি সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন না, কাজেই অপর পক্ষকে জুঁসই কথায় মারপ্যাঁচে ঘায়েল করবার জন্ত তাঁর অকারণ তড়পাবারও কোন প্রয়োজন হয় না। কারও বিরুদ্ধে তাঁর যদি কিছু বক্তব্য থাকে তবে তিনি তা সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাঁর



সামান্য সামান্যই-বলেন, তার জন্য অল্পপস্থিত তৃতীয় এক ব্যক্তিকে  
বাড়া করবার তাঁর প্রয়োজন হয় না। উপস্থিত ব্যক্তিকে সরাসরি  
সমালোচনা করবার বদলে অল্পপস্থিত তৃতীয় এক ব্যক্তির (প্রায়শঃ  
সে ব্যক্তি কল্পিত) বকলমে সে কাজ সেবে গায়ের ঝাল বাড়বার  
এই-যে চেষ্টা, তার চেয়ে কাপুরুষতা ও শূন্যতা কিছু হতে পারে  
না। কিন্তু যার আছে তিনি মুখের উপরই বলেন, ঝাঝ পথের  
আশ্রয় তিনি নেন না। তাতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। বেনামীতে  
পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কারও বিরুদ্ধে কটাক্ষ করার মতই এ জিনিস  
অশ্রদ্ধেয়। আত্মজলের অশ্রু জাঁদাই নেন যাদের সংস্কারস্বরূপ  
স্বাক্ষরবিহীন রচনার দ্বারা কুসংস্কৃতির আর অল্পপস্থিত ব্যক্তির

উদ্দেশ্যে শব্দনিক্ষেপ দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা  
একই প্রকারের অভাবাত। কচিবান ব্যক্তির আচরণে ঐশ্বর্যতর  
বৈকল্য কখনও প্রকাশ পায় না।

বাঙালীকে তার এই আচরণ সংশোধন করতে হবে। বাংলা  
সাহিত্যের লিখিত রূপের অসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মত তার বাচনিক রূপও  
অসমৃদ্ধ সসৃদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন। কলমেব ভাষাকে  
শাণিত করলেই চল না। মুখের ভাষারও সংস্কার চাই। আমাদের  
মৌখিক বাক্যসৌন্দর্য শুধু মুখের কথাই হবে না, স্রুণের কথাও হবে—  
এ না হলে মুখের কথার কোন দাম নেই।

## মহাকাশ

শ্রীউমা দেবী

হৃদয়ে পৃথিবীর রঙ বারো বারের মুখে যায়—

নতুন ফসলে পুনরায়

তবে যায় বারে বারে সময়ের ক্ষেত,

দুস কোটে—পাতা করে—দেহের নক্ষত্র

বয়ে আনে নতুন ইঙ্গিত জনে জনে

মানব ও মানবীর মনে।

এখানে হৃদয় ফেলে বেদনার্দ্র বাসনার সুরভি নিঃশ্বাস—

শমুদ্রের ঢেউ লেগে বালুতে ভেগে ওঠে

অভিমান-গূঢ় হতাশাস,

নগ্ন ইচ্ছা ছুঁড়ে ফেলে বহুস্তর অলৌক শাসন,

উদ্বাস্ত বিবশ ক্ষণে পেতে চায় স্নেহ-উদ্বর্তন;

—সময়ের উত্তপ্ত কটাহে

পরিপাক দৃঢ়তায় হয়তো বা পায় কোনো

রূপান্তর মর্যাস্তিক দ্বায়ে।

তবু হৃদয়ের আছে কোনো এক প্রশান্ত-আকাশ,

ধানের মুহূর্তে শুধু যায় নেত্র তারকার জাগে

তার আলোক-আভাস,

ইন্দ্রধনু রঙগুলি লুপ্তি পায় মেঘের স্রনীলে।

মনের অর্পণ খুলে দিলে

শমস্ত বস্তুনা আর সজীব সেখানে এসে শুদ্ধ হয়ে যায়—

তারার-বহুদ-ভাড়া ছায়াপথ নদীটিও প্রবাহ হারায়।

সে আকাশ আনে অবসর—

ধানের মুহূর্তে-পাওয়া শান্ত শুদ্ধ একটি প্রহর।

তবু যেন মনে হয় আরো আছে কোনো এক

মহতী পৃথিবী কিংবা অস্ত্র মহাকাশ

সেখানে এ হৃদয়ের পৃথিবী-আকাশ মিলে

পায় কোনো জীবনের অস্ত্র এক অকুল আভাস।

শুদ্ধতা ও কলরব যেখানে হয়তো অস্ত্র অর্থ খুঁজে পায়,

আলোক ও অন্ধকার বিরোধ হারায়।

সব গান সব রঙ সমস্ত সৌরভ কোনো ধ্যানশাস্ত্র

নিবিড় নিশ্চল অবকাশে

পেয়ে যায় জীবনের অতীত বিস্তৃতিকে হয়তো বা

অস্ত্র কেনো মহতী-পৃথিবী কিংবা অস্ত্র মহাকাশে।

## বন্ধন

### শ্রীমন্তোষকুমার অধিকারী

টাগোর টাউনের জেট হলও সবচেয়ে সুন্দর যে বাড়ীটি সেই বাড়ীটাই ভাড়া পেয়ে গেল ওরা। ওরা মানে মনোজ আর তার স্ত্রী এনাঙ্কী। বাড়ীটার সামনে পাক, দু' পাশে রাস্তা। একদিকে ঝালি জমি। ঘরের সামনে একটুকরো বাগান। চৌহদ্দে একটু ছাত—ঘর ছাতে ঘেরা বারান্দা। সামনের রাস্তার লোক চলাচল খুব কম। যেমনটা চেয়েছিল এনাঙ্কী ও মনোজ ঠিক তেমনটাই, কিম্বা হয়ত তার চেয়েও বেশী।

পূর্বোপরি বাঙালী পাড়া এটা। চেনাপরিচয় হতে দেবী হওয়া উচিত নয়। অতীতঃ পাড়ার সকলেই চিনে ফেলল ওদের দু'জনকে। এমন অপূর্ণ সুন্দর একজোড়া নয়নারী বড় কম চোখে পড়ে। যেমন বলিষ্ঠ অথচ কমনীয় চেহারা মনোজের তেমন তরী ও মধুর গঠন এনাঙ্কীর। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে বায় বাঁধের ধারে, কিম্বা জহরলাল নেহরু রোড ধরে বাটলার মার্কেট পার হয়ে গঙ্গার দিকে, অথবা লাউদার রোড দিয়েই জর্জ টাউনের গা-ঘেঁষা কারও বাড়ীতে হয়ত। মনোজের ব্যবসার যদি ভুল হয় ত এনাঙ্কীর চরিত্র মাধুৰ্য্যপূর্ণ। মনোজ যতটা বিনীত ও নিরঙ্কর, এনাঙ্কী তার চেয়েও বেশী। মনোজ এসেছে দশনের অধ্যাপক হয়ে। এনাঙ্কীর বাবা বারাণসীর একজন নামকরা ব্যবসায়ী। অর্থের অশ্রদ্ধাঙ্কল্য ওদের নেই। আর নেই বিনয়ের অভাব।

সকলেই মুগ্ধ। সুখী দম্পতীর এমন অপূর্ণ উদাহরণ হঠাৎ চোখে পড়ে না।

কিন্তু যে আকাশ নীল দেখায় তারও অন্তরালে থাকে জলভরা জীবনের মেঘ। পরিচ্ছন্ন চৈতন্যের দিনে পলকে দেখা দেয় কাল-বৈশাখীর ধূলিঝড়। মনোজ ও এনাঙ্কীর ব্যবহারিক জীবনের আড়ালে এমন কিছুটা ব্যতিক্রমও থেকে গেছে।

সেদিন ওদের বেড়াতে যাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে প্রায়। প্রসাধন শেষ করে সম্ভ্রান্ত এনাঙ্কী বর্ষন মনোজের বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল তখনও তার তৈরী হতে অনেক দেবী। মনোজ টেবিলে বসে লিখে চলেছে। চোখ না তুলেই বলল, একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি।

মনোজের চুল এলোমেলো। কপালটা ঘামে ভিজল। সমস্ত শরীরে ব্যস্ততা। এনাঙ্কী জানে ও গল্প লিখেছে। এখন ওকে বিরক্ত করা অমুচিত। আঙুলে আঙুলে নিজের কমাল দিয়ে ওর

কপালেয় ঘামটা মুছিয়ে দিল এনাঙ্কী। তার পর পাখাটা খুলে দিয়ে পাশে বসল।

মিনিট পনেরো পবে লেখা শেষ হ'ল। প্যাঁড়টা চাপা দিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মনোজ। তার পর জামাটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, উঃ! বড্ড দেবী হয়ে গেল। চল, চল!

—না।

এনাঙ্কী শব্দ হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, গল্পটা না শুনে নড়ব না। তুমি পড়, আমি শুনি।

—পড়ে শুনবে। এখন দেবী হয়ে গেছে। ওঠো।

এনাঙ্কীর হাত থেকে প্যাঁড়টা কেড়ে নিয়ে সরিয়ে রাখল মনোজ। তার পর ঘরের বাইরে এসে বলল, কি হ'ল, এস?

কিন্তু এনাঙ্কীর মুখে ততক্ষণে মেঘের কালোছায়া। তীক্ষ্ণ বাজের সুরে বলল সে, আমি না হয়ে যদি লভিকা। হতাম, তা হলে তুমি গল্পটা সরিয়ে রাখতে না নিশ্চয়ই।

আশ্চর্য হয়ে গেল মনোজ। লভিকা তাদের প্রতিবেশী বানার্জি সাহেবের মেয়ে। বি, এ পড়ছে। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগ আছে। তাই মাঝে মাঝে আসছে সাহিত্য আলোচনা করতে।

মনোজ ঘরের মধ্যে ফিরে এল। তার পর ওর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, তোমার কথাটার মানে?

—মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তোমার নিশ্চয়ই আছে।

মনোজকে পাশ কাটিয়ে এনাঙ্কী বেড়িয়ে গেল। আর মনোজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে দু'জনে বেশ হাসিমুখেই বসল। মনোজকে মাখন-কুটি দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে বলল এনাঙ্কী,—তোমার গল্পটা পড়ে কেলেছি কিন্তু।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল মনোজ, কেমন লাগল বল ত?

—ভারী সুন্দর। কি করে যে তুমি লেখ...? আচ্ছা ঐ যে মাষ্টার মশাইটি তাঁর ছাত্রীর প্রেমে পড়লেন—ওকি সম্ভব? বয়েসের ত অনেক তফাত। ছাত্রীটিও তার মাষ্টার মশাইকে ভালবেসে ফেলল—সত্যি সত্যিই কি অমন হয়?

মনোজ ভারিকি-চালে হাসল একটু। বলল, প্রায়ই হচ্ছে। মাহুকের মন বড় বিচির। প্রেয় সব সময়ে বয়েসের হিসেব করে চলে না।

চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে কি বেন ভাবতে লাগল এনাঙ্কী

তার পর হঠাৎ বলল, তা হলে তুমিও ত লভিকার প্রেমে পড়তে পার ? ও কিন্তু তোমার দিকে যে ভাবে তাকায়, মনে হয় গিলে ধাবে। তুমি কথা বললেই নিলজ্জের মত চেয়ে থাকে। তুমি বাপু ওদের বাড়ী আর বেয়ো না।

মনোজ আশ্চর্য হয়ে গেল এনাক্ষীর কথা শুনে। একটু তিরস্কারের সুরে বলল, তোমার মন বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে এনা।

এনাক্ষী চা-য়েষ কাপ টেবিলে রেখে চেয়ে রইল মনোজের মুখের দিকে। তার পর হঠাৎ বলে উঠল, তোমার গায়ে এত বাজল কেন বল ত? ভিতরে পাপ না থাকলে মানুষ এমন করে রাগে না।

—পাপ ?

মনোজ চাপা গর্জন করে উঠল, আমি তোমার মত ইতর নই।

—কে ইতর তা বোঝাই যাচ্ছে।

এনাক্ষী উঠে গেল ঘর থেকে।

সেদিন ছুটির বার ছিল। দুপুরের ভাত বেড়ে এনাক্ষী ডাক দিল মনোজকে। কিন্তু মনোজ উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এনাক্ষী ঘরে এসে দেখল—মনোজ চেয়ারে শুকু হয়ে বসে আছে। পিঠে হাত দিয়ে ডাকল এনাক্ষী, ধাবে চল। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

মনোজ উত্তর দিল না। এনাক্ষী এবার ওর চুলের মধ্যে আঙ্গুল ঘসতে ঘসতে বলল, তুমি বড় ছেলেমানুষের মত রাগ কর। স্বামী-স্ত্রীতে কত কথা-কাটাকাটি হয়। রাগ করে না খেয়ে কতক্ষণ থাকবে ? চল লক্ষ্মীটি।

মনোজ এবারে উঠে এল। হুঁজনে একসঙ্গে খেতে বসল। সেদিন হুঁজনে এক সঙ্গেই আবার বেড়াতে গেল। কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করল, কাল দেখি নি যে ?

উত্তর দিল এনাক্ষীই, একটু মাথা ধরেছিল আমার। উনি আর বেরুবেন না কিছুতেই। সারাটা বিকেল আমাদের শুইয়ে রেখে উনিও পাশে বসে রইলেন।

—সত্যিই, কি আশ্চর্য স্থলী ওরা ?

সকলে বলাবলি করে। ওরাও ভাবে, ওরা স্থলী বই কি। রাজ্যে ঘরের সবুজ আলোটা জ্বলে রাখে এনাক্ষী। শুয়ে শুয়ে বিছানায় মাঝখানকার পাশবালিশটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দেয় সে। তার পর মনোজের বুকের কাছে মাথা এনে মুহূর্তের কলে তুমি শুখু আমার।

একটি অল্প বয়সী মেয়ে ওদের বাড়ীতে সব সময়ে থেকে কাজ করে। বাসার সবকিছু কাজ ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে এনাক্ষী নিশ্চিন্ত। এমনকি ওদের রান্নাটাও সে প্রায়ই চালিয়ে দেয়। তার ওপর সংসারের ভার দিয়ে ওরা হুঁজনে বেড়াতে যায়। বায়

কখনও কাকামো ব্রীজ, কখনও বা থসকবাগে। আবার কোনদিন পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়েটির নাম মুরা। ভারী কুস্তিবিজ্ঞ আর বিশ্বাসী। এ বকম একটা লোক পাওয়াও ভাগ্যের কথা। মনোজ সেই কথাই বলছিল এনাক্ষীকে। কিন্তু এনাক্ষী হঠাৎ গভীরভাবে বলে উঠল, তাই বলে ওর সঙ্গে তুমি যে হাসাহাসি কর—এটাও দেখতে বড় খারাপ লাগে।

—তার মানে ?

মনোজ প্রায় চমকে উঠল। আমি হাসাহাসি করি মানে ?

এনাক্ষী ঠিক তেমনি ভাবেই বলল, আমি দেখেছি, তুমি ওকে দেখলেই ওর দিকে চেয়ে হাস আর মুরাও তোমায় দেখলেই কিছু কিছু করে হাসে।

মনোজ ভেবে পেল না কি উত্তর দেবে সে। শুধু বলল, তুমি অত্যন্ত মিথোবাদী আর নীচ। তুমি নিজেও বোধহয় বোক না যে, তুমি কি বল।

—আমি ঠিকই বুঝি। ও নেতান্য় খুকী নয়। পুরুষ তার মেয়ে হ'ল কিনা আশুন আর যি।

হঠাৎ মনোজ বোমার মত কেটে পড়ল। অত্যন্ত ছোটলোকের বংশে তোমার জন্ম। অশিক্ষিত, হীন তুমি।

এনাক্ষী উঠে দাঁড়াল। ক্রোধে তার মুখ-চোপ হিংস্র ও কুটিল হয়ে উঠেছে। মুখ বিকৃত করে সে বলল, হ্যাঁ। তবে আমার বংশে কেউ পুত্র-বামুন ছিল না। পনের বাড়ী বাড়ীও কেউ বুরে বেড়ায় নি।

এবার মনোজকে কুংসিত আখাত দিয়েছে এনাক্ষী। মনোজ রাগে কাপতে কাপতে বলে উঠল, তুমি দূর চও আমার সামনে থেকে। যাও, তোমার বড়লোক বাপের কাছে গিয়ে থাকগে।

এবার কুটিল একটা হাসির রেখা দেখা দিল এনাক্ষীর ঠোঁটে। তার শূন্য মুখ পলকে কুংসিত হয়ে উঠেছে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে সে বলল, তা হলে তোমার বেশ স্তবধে হয় বুঝি ? রাজ্যেও মুরাকে থাকতে বলবে ?

হুঁজনে হুঁজনের দিকে হিংস্র, বিভৎস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টি অমানবিক।

গোটা এলাকাবাদ শহরটা টহল দিয়ে গুয়ে বেড়াল মনোজ। সেই বিকেল থেকে রাত এগারোটা অবধি। রাতের শীতল বাতাসে ঠাণ্ডা মনে হ'ল মাথাটা। হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিতে জড়িয়ে এল পা। রাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ওর আবার মনে পড়ল এনাক্ষীর কথা। সে অশিক্ষিত ও কটুভাষী সত্য—কিন্তু শুধু তাকে ভালবাসে বলেই এমন-খারাপ ব্যবহার সে করে। নইলে অশ্রু সঞ্চে বাবচায়ে এমন ককশ ত সে কখনও নয়।

তবুও বাড়ীতে পা দিয়েই মনটা আবার বিষয়ে উঠল।

মনোজ নীরস মুখে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। তার পর জামাটা খুলে রেখে তার বসবার ঘরের আবাম-কেনারার হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল।

এনাক্কী ডাকল এসে—থাবে চল। কোন উত্তর দিল না মনোজ। এনাক্কী আবার ডাকল। তার পর কাছে এসে হাত রাখল ওর মাথার। বলল, থাবে চল, লক্ষ্মীটি।

মনোজ উত্তর দিল না তবুও। আর এনাক্কী এবারে ওর পা ধরে বলল, থাবে চল লক্ষ্মীটি। আমি মাপ চাচ্ছি। মাপ করবে না আমাকে?

রাগ জল হয়ে গেল মনোজের। এনাক্কীর হাত ধরে বলল, চল।

দেখতে দেখতে মনোজের প্যাতি এলাহাবাদের বাড়ালীমহলে ছড়িয়ে পড়ল। সে যে কথা-সাহিত্যিক, তার গল্প কলকাতার কাগজে ছাপা হয়, এটাই বথেষ্ট। বিভিন্ন সভাসমিতি থেকে ডাক আসতে লাগল মনোজ ও এনাক্কীর। এমনকি তরুণদের মহলে এনাক্কীর প্রতিপত্তিই বেশী দেখা গেল। এনাক্কী ত একদিন বলেই ফেলল, তুমি স্বীকার কর বা নাই কর, তোমার সমাদর কিন্তু আমার লজ্জাই বাড়ছে নব্বো বোধ।

মনোজ হাসতে হাসতে বলল, স্বীকার করছি।

কয়েকদিন পরের কথা। কলেজের ছেলেদা একটি বাংলা নাটক অভিনয় করছে। ঐ উপলক্ষে একটি ছোট অস্থানও আছে। সভার সভাপতি মনোজ মুখোপাধ্যায়। ছেলেদের অমুরোধে শ্রীমতী মুখার্জী প্রধান অতিথি।

সকো ছটায় অস্থান। সাড়ে পাঁচটার ছেলেদা এল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে বাবে বলে। কিন্তু এনাক্কী তখনও ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মনোজ ততক্ষণ তার অভিভাষণ তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল, তাই সে খেয়াল করে নি মুন্নাখ অস্থপস্থিতি। এখন এসে তাড়া দিল, কি আশ্চর্য! সময় হয়ে গিয়েছে, ওরা এসে তাড়া দিচ্ছে আর তুমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছ? চল তাড়া তাড়ি।

এনাক্কী লজ্জিতভাবে তাকাল। সত্যিই দেবী হয়ে গেল। কিন্তু আমার ত এখনও রাজ্যের কাজ বাকী। তা ছাড়া আমার গা-খোঁয়াও হয় নি। আমার ত বাওরা হবে না আজ।

—বাওরা হবে না? মনোজ কুন্তলধরে বলল, মুন্না কি আজ দিন বেছে কামাই করল?

—ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মুন্না? মনোজ বিস্মিত হয়ে চাইল এনাক্কীর দিকে। বলল, কেন? হয়েছিল কি?

এনাক্কী কোন কথা না বলে উঠে গেল। তার পর টেবিল থেকে ভাঙ্গ-করা একটা কাগজ এনে মনোজের চোপের সামনে ধরল। দু'দিনের পুরণো খবরের কাগজ। মনোজ পড়ল, আইন-

আদালতের সংবাদের তলায় ছোট্ট একটি খবর : 'এক তরুণ গৃহ-কর্ত্তী গৃহে তাঁর স্ত্রীর অস্থপস্থিতির স্বযোগে তরুণী পরিচারিকার স্ত্রীলতাহানি করিয়াছেন...ইত্যাদি।

মনোজ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। তার পর বলল, এর মানে?

এনাক্কী ভারি কিসে বলল, রাগ কর না তুমি। কথার বলে, পুরুষের মন না মতি। আগে থেকে সাবধান থাকাই ভাল।

সেদিন রাতে মনোজ কিরল প্রায় রাত বারোটা নাগাদ।

এনাক্কী এসে জিজ্ঞেস করল, এত দেবী হ'ল?

মনোজের মনে হ'ল একটা সাপ খেন হিস হিস করে উঠল।

কোন উত্তর না দিয়ে সে ঘরের ভেতরে এসে ফিরে দাঁড়াল। তার পর এনাক্কীর মুখের ওপরেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

অনেকক্ষণ ধরে দরজার ধাক্কা দিল এনাক্কী। অনেকবার সে ডাকল। কিন্তু স্তব্ধ-নিঃশব্দ হয়ে বলে রইল মনোজ। তার পর একসময়ে চেয়ারের বসে বসেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর-বাত্তির দিকে ঘুম ভাঙতেই মনে হ'ল সর্ব্বাঙ্গে মশার দংশন-জালা! অসহ্য গরমে ভেপসে উঠেছে শরীর। মনোজ উঠে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে আসছে জোৎস্নার একটু রেখা। দরজা খুলে ফেলল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত হয়ে পেছিয়ে এল।

দরজার চৌকাঠে মাথা বেধে অগোছালো বেশে বাবান্দার মেজাজে ওয়েই বুমোচ্ছে এনাক্কী। মনোজ দেখল আকাশ ভরে ছড়িয়ে রয়েছে চাঁদের আলো। এনাক্কীকে অতিক্রম করে মনোজ বেলাং-এর ধারে দাঁড়াল। শেখ-বাত্তের অদ্ভুত পৃথিবীকে দেখে তার মনে হ'ল—মাছুয় পৃথিবীর মত জটিল, আর হৃদয় আকাশের মত হৃগম।

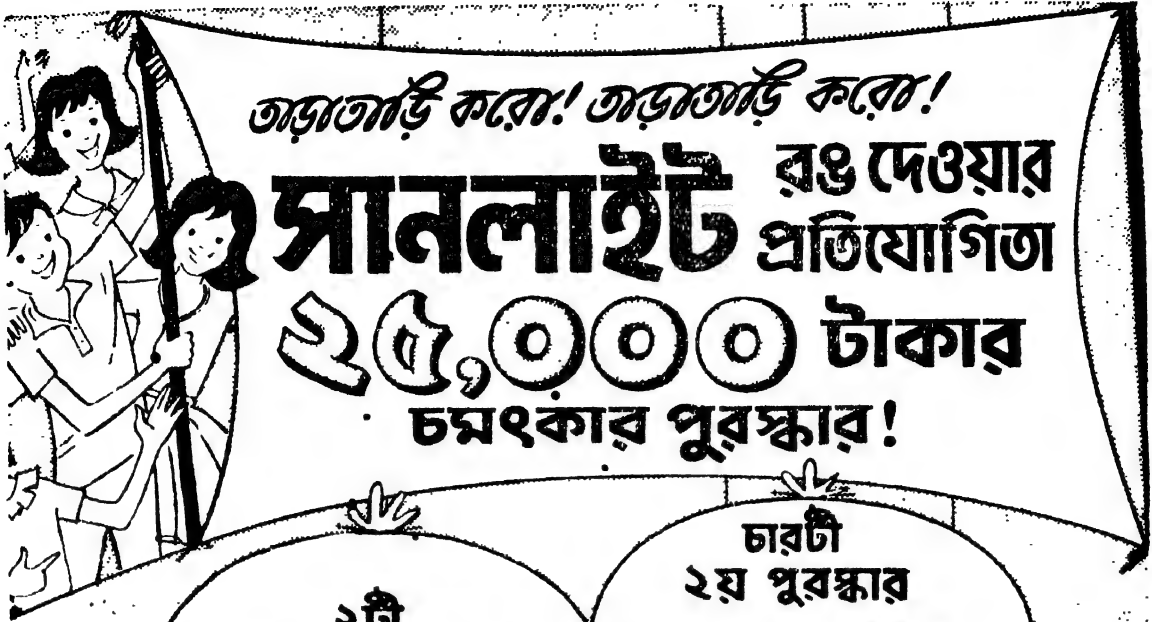
বাগারাগিরি পালাটা এবারে বেশীদিন ধরেই চলল। সকালে না খেয়েই কলেজ গেল। রাতে ফিরে এসেই শুয়ে পড়ল। এনাক্কী এসে ডাকল একবার—থাবে না?

—না। সুম্পষ্ট উত্তর এল তার কাছ থেকে। পরের দিন সকালেও যখন মনোজ না খেয়েই কলেজ গেল, তখন আর থাকতে পারল না এনাক্কী। নিজেই বেরিয়ে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল কাশীতে। আসতে লিখল তার ছোট ভাইকে।

সেদিন ফিরে এসে অক্ষকান ছাতে মনোজ চূপচাপ বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে এনাক্কীও এসে বসল কাছে। বলল, অধীরকে আসতে বলে 'তার' করেছি। তুমি ত আর আমাকে সহ্য করতে পারছ না। ভাবছি কিছুদিন ঘুরে আসি।

উত্তর দিল না মনোজ। শুধু বুঝল সে, তাদের দাম্পত্য-জীবনের শেকল ছিড়ে যাচ্ছে। বন্দর থেকে নোভর ভুলে নিচ্ছে জাহাজ।

এনাক্কী আবার বলল, মাস দুই বোধহয় থাকব বাবার কাছে।



তড়াতাড়ি করো! তড়াতাড়ি করো!

# সানলাইট প্রতিযোগিতা

## ২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

২ টি

প্রথম পুরস্কার

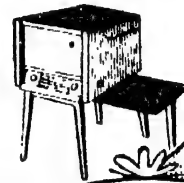
৪,০০০ টাকার  
ডেভার সারা ভারত  
প্রমদ বা নগদ  
৪,০০০ টাকা



চারটি

২য় পুরস্কার

এইচ.এম. ডি.  
রেডিওগ্রাম



৬ টি

৩য় পুরস্কার

মার্কী অল  
ওয়েভ রেডিও  
এবং একটি  
করে হিন্দু প্রায়সডর  
সাইকেল



২,০০০

অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার



রঙের বায়  
বা  
তল পুতুল



অভিভাবকরা: আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটি মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পাবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত। এই দুটি বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্যান্য পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

তড়াতাড়ি করো

শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

বিশেষভাবে আপনাদের সানলাইট কিচটার কাচ থেকে আবেশের নিয়ম আনুন। প্রতিটি সানলাইটের একটি প্রকার চাঁদ আছে যেতে আপনাদের ছেলেমেয়েদের রঙ লাগাতে হবে। ১৫ বকম রঙ তাদের ইচ্ছা যাবতীয় করতে পারবে।



অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

হিন্দুস্থান লিভার লি., কর্তৃক প্রস্তুত।

S/9-X62 BQ

একা একা ত ভালই লাগবে তোমার। মুন্নাকে ডেকে ব্যবস্থা করে নাও। সেই ত রান্না করে দিতে পারবে।

‘এনাকী উঠে গেল।

সকালের ট্রেনে এল অধীর, এনাকীর ছোট ভাই। আর এনাকী যখন শুড়িয়ে দিচ্ছে মনোজের একক-বাসের ব্যবস্থাকে, ঠিক সেই সময়ে বিকেলের ট্রেনে এসে পৌঁছাল মনোজের পিসভূত বোন রমা আর তার বন্ধু সুলতা।

সুলতা...কলকাতার এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে। কিন্তু মনোজের সচপাটিনী। পুরানো দিনের স্মৃতি পলকে ধরা দিল। মনোজ ভীষণ খুসী হয়ে উঠল। আর রমা ত অত্যন্ত আমুদে মেয়ে। হাসিতে গালেতে সে নিমেষে ভরিয়ে তুলল বাড়ী।

সুলতা...নামটা মনে মনে আবৃত্তি করছিল এনাকী। হঠাৎ মনে পড়ল এট ত সেই মেয়ে—বাকে এক সময়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল মনোজ।

রমা, এনাকী আর সুলতা তিন জনের মিলিত হাসি-গানে বাড়ীর আবহাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অধীর—এনাকীর ছোট ভাই। মনোজ অনেক দিন পর শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

রাত্রে উপরের ছোট ঘরটার শুতে গেল মনোজ। নীচের ঘরে তখন ওরা চায় জনে তাস খেলছে—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ঘরের দরজার দ্বারা পড়ল। আর এনাকী এসে বলল মনোজের পারের কাছে।

অন্ধকারের মধ্যে চূপচাপ বসে বসে এনাকী। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাস করে বলল, আমি চলে যাচ্ছি বলেই কি তুমি ওদের আনিয়েছ ?

—তুমি চলে যাচ্ছ বলে ?

মনোজ আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, ওদের আসার খবর আমি কিছুই জানতাম না। আমাকে কিছুই জানায় নি ওরা।

অন্ধকারে বোকা গেল না এনাকীর মুখে ভাব। কিন্তু সে নিঃশব্দে উঠে গেল ঘর থেকে।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মনোজের। তার মনে হ’ল কে যেন এসে লড়িয়ে ধরেছে তার হৃদয়। চকিতে উঠে বলল সে। চোখের জলে সিক্ত হয়ে উঠেছে তার দেহ। উপড়-হয়ে-পড়া এনাকীকে হুই হাতে সে তুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু এনাকী তার হুই পারের মধ্যে মুখ শুঙ্গে ফোপাতে লাগল। বলল, আমার তুমি তাড়িয়ে দিও না। আমি পারব না ঘুরে গিয়ে থাকতে। আমার তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

মনোজ এবার জোর করে টেনে তুলল তাকে। তার পর বুকের কাছে ধরে বলল, না, তুমি যেও না, এ বাড়ী ত তোমার, তুমি বাবে কেন এনাকী ?

পরের দিন সকালে একাই ফিরে গেল অধীর। তার কলেজ কামাই হচ্ছে।

সে দিন বিকেলেই কলেজ থেকে ফিরে তখন মনোজ যে ঘরায়া চলে যাচ্ছে সন্ধ্যার ট্রেনেই।

আশ্চর্য হয়ে গেল সে। এ যকম কথা ছিল না। ঘরায়া যেন কয়েক দিন এখানে থাকবে বলে ঠিক করেছিল।

রমার সঙ্গ প্রফুল্ল মুখ ঝুং গম্ভীর। সে বলল, অনেক কাজ আছে কলকাতার। চলে যাওয়াই ভাল মনোজনা।

মনোজ বলল, তাই বলে আজই বাবে কেন ? কাল-পরও গেলেই চলবে।

সুলতা এগিয়ে এল এবারে। বলল, না, চলবে না। অনেক ক্ষতি হয়ে বাবে আজ না গেলে। যেতে আমাদের হবেই আজকে।

সন্ধ্যার ট্রেনে ওদের তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখল মনোজ যে, এনাকী আজ অনেকদিন পর সেজেসজে অপেক্ষা করছে, তার মুখ প্রফুল্ল।

মনোজ গম্ভীর মুখে বলল, ওরা চলে গেল কেন ?

—আমি কেমন করে জানব ?

এনাকী হাক’ শুরে বলল, কিন্তু মনোজ বিবর ও বিবস্ত কণে বলল, তুমি যেতে বলেছ ওদের ?

এবার সহজ অথচ কঠিন কণে বলল এনাকী,—হ্যাঁ বলেছি, কেন বলব না ? শত্রুকে ঘরে নিয়ে কে বাস করতে পারে ? সুলতার খবর আমি সব জানি, ঐ ত তোমাকে আমার হাতে দিচ্ছে না।

রাগে হুংগে উদ্ভাস হয়ে মনোজ এনাকীর হাত চেপে ধরল, আর এনাকী আশ্চর্য শান্তকণে বলল, আমি জানতাম তুমি ওকে ভালোবাস, কিন্তু ওর জন্যে তুমি আমাকে মারবে ? আমি ত তোমার স্ত্রী, আমাকে ত বিয়ে করেছ তুমি।

মনোজের হাতের মুঠি আন্তে আন্তে শিথিল হয়ে গেল। এনাকীর চোখ সাপের মত স্থির, শীতল অথচ তীক্ষ্ণ।

আকাশে তখন ঘুর ঘুর মেঘ জমে উঠেছে। এলোমেলো বাতাসের কাপড় গাছ-পাতা কাঁপছে ধব ধব করে। বৃষ্টি আসবে হয় ত। শীতের বৃষ্টি।

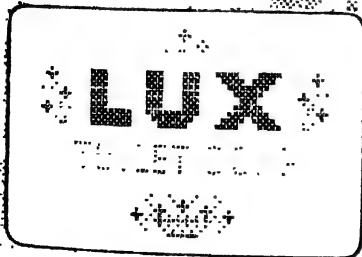
মনোজ তার দৃষ্টিতে অসহন ঘৃণা আর অকৃত অসহায়তা নিয়ে জ্বল হয়ে চেয়ে বইল শুধু।

এনাকী যে তার স্ত্রী—তাকে নিয়েই ত পাড়ি দিতে হবে এই পৃথিবীর জীবন-সমুদ্র। কিন্তু এই বন্ধনই কি অনাদিকাল থেকে কামনা করে এসেছে মানুষ ?

# আপনার জন্য

## চিত্রতারকার মত মধুর লাবণ্য

কানজি আনন্দের  
টেলিভিশন "খান" -  
চিত্রের হৃদয় আনন্দ



সুতিই সুন্দর লাবণ্যই মেয়েদের সৌন্দর্যের আসল কারন হতে পারে। মীনাকুমারী বলেন “আমি লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যেই আমার লাবণ্যের চর্চা করি। লাক্সের সরের মত মোলায়েম ফেনা আমার ত্বকে নিখুঁত রাখে।” এটা আপনিও দেখতে পারেন কেমন করে লাক্সের ফেনা আপনার লাবণ্যে একটা মধুর উজ্জলতা এনে দেয়। লাক্স আপনার লাবণ্যের, সৌন্দর্যের জন্ত ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্থান লিডার লিঃ, কল্কট প্রস্তুত।

LTS/12-X52 BG



# শিল্প-ব্যবসায় দাদন ও পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের ব্যর্থতা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

পুনর্লগ্নী কর্পোরেশন স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৮ সনের জুন মাসে। বিগত ২৩শে মার্চ বসেছে শ্রী এইচ. ডি. আর. আরেক্সার কর্পোরেশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। শ্রী আরেক্সার হলেন রিচার্ড ব্যাক অব ইণ্ডিয়ার গভর্নর এবং পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। শ্রী আরেক্সার বলেছেন, আড়াই বৎসর আগে এই পুনর্লগ্নী কর্পোরেশন স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যে উচ্চ আশা পোষণ করা গিয়েছিল সে আশা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি, যদিও কর্পোরেশনের কার্যে অগ্রগতি ঠিক অসন্তোষজনক নয়। অর্থাৎ তিনি ব্যসেতে চেয়েছেন, কর্পোরেশন কর্তৃক প্রাপ্ত টাকা বত তাড়াতাড়ি ব্যয়িত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল আসলে সেটা হয় নি। তাছাড়া শ্রী আরেক্সার কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে কোন আশার বাণী শুনাতে পাবেন নি। বরঞ্চ তাঁর গোটা ভাবনের ভিতর যেন একটা হতাশার সুর শ্রবিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, কি কারণবশতঃ অল্প দিনের মধ্যে বরাদ্দ টাকা নিঃশেষ হবার আশা বার্ষিকতার পর্যাবসিত হয়েছে। পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী আরেক্সার অবশ্য কারণ প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। জানি না, তাঁর প্রদর্শিত কারণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সকলে আশঙ্কিত হবেন কি না। তিনি বলেছেন, বিগত ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশে শিল্প-প্রসারের জন্য জোর দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সনের পরে শিল্পপ্রসারের তৎপরতা কমে গেছে। যে সব কারণবশতঃ শিল্প-প্রসার ব্যাহত হয়েছে সে সব কারণের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি অন্যতম। এই ঘাটতির দরুন বাতির থেকে প্রয়োজনীয় বস্ত্রপাতি, কলকক্স ইত্যাদি আমদানী হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ শ্রী আরেক্সার যে কথাটি বলতে চাইছেন সে কথাটি হ'ল এই যে, শিল্পপ্রসারের তৎপরতা হ্রাস পাবার দরুন অল্পসময়ের মধ্যে বরাদ্দ টাকা নিঃশেষ হবার আশা বার্ষিক হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে দেখার বিষয় হ'ল, শ্রী আরেক্সার যা বলেছেন সেটা ভারতের সত্যিকারের অবস্থা বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য কি না। কেন ভারতে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের কাজ থেকে ঋণ নেবার আশ্রয় দেখা যায় নি, সেটা পরীক্ষা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, যে পদ্ধতি এবং সর্বোত্তম অমুদ্রার ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে সে পদ্ধতি এবং সর্বোত্তম যেন পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। অল্প কোন কারণ প্রদর্শন করার আগে শ্রী আরেক্সারের উচিত ছিল এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা। অথচ তিনি অগ্রদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। জনমতকে বিভ্রান্ত

করার চেষ্টা তাঁর ভাবনের মধ্যে নেই, একথা জোর করে বলা যা কিনা সম্ভব। এক্ষেত্রে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের প্রশ্ন ভাবনের কঠোর সমালোচনা করার কারণ হ'ল এই যে আজকের দিনে আমাদের দেশে কোন বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোককে বুঝাবার দরকার করে না, ঋণলাভের যোগ্য এমন একশত প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশে আছে, যাদের মধ্যে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের জায়গা বরাদ্দ ছাড়া কোটি টাকা বিলি করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। অথচ বরাদ্দ টাকার মোটা অংশ বিলি করা সম্ভবপর হয় নি, যদিও মূল ধনের অভাব রয়েছে। কাজেই অভাব রয়েছে, অথচ টাকা বিলি করা হয় নি, এটা নিশ্চয় অসুস্থ ব্যাপার। সম্পূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে যেখানে আসল গলদ রয়েছে সেখানে শ্রী আরেক্সার হাত দেন নি সম্প্রতি প্রকাশিত পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের রিপোর্টটি অধ্যয়ন করতে মনে হয়, যে সব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিলিকারী ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সুনজরে পড়ে নি সে সব প্রতিষ্ঠানের কপালে ঋণ জুটে নি এছাড়া নয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাবার কোন প্রশ্নই উঠে না আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের দাদনযোগ্য তহবিলের মোট পরিমাণ হ'ল ছাড়া কোটি টাকা। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিগত ১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এক কোটি আটাত্তর লক্ষ টাকা দাদন মঞ্জুর হয়েছিল এবং পরবর্তী পৌনে তিন মাসে আরও পর্যায়টি লক্ষ টাকা দাদন মঞ্জুর হয়েছে বলা হয়েছে, এটা বিলি করা হবে আটটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজেই অসুস্থত ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা গলদ রয়েছেটা সত্যি গুরুতর।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে শিল্প দাদন দেবার জন্য কতকগুলি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সব সংস্থা পিছনে রয়েছে সরকারী প্রেরণা এবং আনুকূল্য। এখানে অবশ্য আমরা কেবলমাত্র পুনর্লগ্নী সংস্থার কথা বলছি। এই সংস্থা মাঝারি শিল্পে ঋণ দেবার জন্য গঠিত হয়েছে। ঋণ দেবার সংস্থা কোথা হতে টাকা পাবেন এবং কিভাবে ঋণ দেওয়া হবে সম্পর্কে সংক্ষেপে হ'ল একটা কথা বলা দরকার।

আমাদের হয়ত জানা আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে কল্টিবলী হারে দায় পরিশোধের সর্বোত্তম ভারতে পণ্য প্রেরণ করেছেন। এই পণ্যের মূল্য বাবদ ভারতে যে টাকা আয় হয়েছে সে টাকা থেকে ছাড়া কোটি টাকা পুনর্লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে মাঝারি আকারে শিল্পে কর্তৃক দিবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য কেবলমাত্র কতকগুলি নির্দিষ্ট অমুদ্রায়িত ব্যাঙ্ক এই ছাড়া কোটি টাকা

বিলি করতে পারবেন। তবে কতদিন পর্যন্ত ঋণের মেয়াদ থাকবে, ঋণ নিতে হলে কিপ্রকার সুদ এবং জামিন প্রয়োজন হবে এবং কোন্ শ্রেণীর শিল্পে ঋণ দেওয়া যাবে সেটা পুনর্লগ্নী সংস্থা ঠিক করে দিবেন। অবশ্য কোন কর্তৃপক্ষী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃ পাবার সত্যিকারের যোগ্যতা আছে কি না সেটা নিরূপণ করবেন একমাত্র কর্তৃবিলিকারী ব্যক্তি। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যদি কোন কর্তৃপক্ষী প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃবিলিকারী ব্যক্তিকে পরিচালকবৃন্দ স্ৰীতির চোখে না দেখেন তা হলে সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃ পাবার আশা নেই বুললেই চলে। তাছাড়া একথা কোন ব্যক্তিকে হয়ত বুঝিয়ে বলার দরকারও নেই যে, সহজে কোন নয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যাক্সের কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি পাবেন না। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি এবং এখনও করছি, ভারতে সমস্তপ্রকার শিল্প-ব্যবসায় বুল-ধনের অভাব তীব্র ভাবে অনুভূত হচ্ছে। অবশ্য এই অভাব কেবল-মাত্র ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। তবে শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হ'ল এই যে, যে ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশে শিল্প-ব্যবসায় মোট লগ্নীর একটা বিরাট অংশ ব্যাক্স এবং অজ্ঞাত ধরণের দান-সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা যায় সে ক্ষেত্রে ভারতে আগে এই ভাবে লগ্নী সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই ছিল না এবং যেটুকু ব্যবস্থা ছিল সেটুকু অতি নগণ্য। হয়ত মুচুম্বেয় লোকের পক্ষে নিজ-দের সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে শিল্প-ব্যবসা চালান সম্ভবপর। কিন্তু পৃথিবীর সমস্তই দেখতে পাচ্ছি, শিল্প-ব্যবসা চলছে কচ্ছের উপর নির্ভর করে। যে দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজার থেকে ঋণ পাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে সে দেশই আজকের দিনে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই পটভূমিকায় আমাদের বিচার করে দেখতে হবে ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দান পাবার কতটা সুযোগ আছে। সুযোগ আজও সীমাবদ্ধ। দান পাবার সুব্যবস্থা আজও হয় নি। এগনও বেশীরা ভাগ কারবারের পক্ষে লগ্নী সুদে ঋণ পাওয়া কষ্টকর। আবার কচ্ছের কিস্তিগুলিও খুব অসুবিধা-জনক। এ ছাড়া ব্যাক্সের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যদিও প্রয়োজনীয় বস্ত্রপাতি ক্রয় করার পক্ষে এই ঋণ একান্ত দরকার। এর কারণ হ'ল এই যে, ব্যাক্সের আমানতী অর্থের বিরাট অংশ এমন সম্পত্তিতে লগ্নী রাখা দরকার যেটা যে কোন সময় নগদে পরিবর্তনের উপযোগী। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, মোট স্থিতের যে অংশ দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী হিসাবে দেওয়া চলে—সেটা অতি নগণ্য। তাই বলে এই প্রকার লগ্নী পাওয়া সহজ—এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। যে সব কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাক্সের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে সব কারবারের মালিকদের বন্ধুত্ব আছে একমাত্র সে সব কারবারই চর ত কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী কর্তৃ পেয়ে থাকে। নয়া কারবারীর পক্ষে এই প্রকার কর্তৃ পাবার আশা নেই বুললেই চলে। কাজেই দেখা

যাচ্ছে, স্বাধীন ভারতেও নয়া কারবারীদের অসুবিধা অল্প নেই। অতীতের মত আজও ভারতের শিল্প-ব্যবসা সমস্তা কর্তৃরিত। এ ছাড়া দান দেবার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও যাকে যাকে শোনা যায়।

বিজ্ঞান ব্যাক্সের গভর্নর স্রী এইচ. ভি. আর. আরেজার একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিবার সময় এই মর্মে আশা ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতীয় ব্যাক্সগুলি শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতিতে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে কর্তৃ দিবার সর্তাদি উন্নয়নে সাহসিকতার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু ব্রিটেনের ব্যাক্স ব্যবসার পথ অনুসরণ করে ভারতীয় ব্যাক্সি ব্যবসা অগ্রসর হয়েছিল সেহেতু নিরাপদ ধরনের ঋণ দিবার পথ অনুসৃত হতে দেখা গিয়েছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যবস্থা চোখে পড়ে সেটা অল্প ধরনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোন ব্যক্তি সুচিন্তিত শিল্প-পরিবর্তন কাষাকর্ষী করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন তা হলে ব্যাক্সের কাছ থেকে ঋণ পেতে তাঁর অসুবিধা হয় না এবং পরিবর্তনের উন্নতি সম্ভবপর করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য দিবারও ব্যবস্থা আছে।

প্রচারিত খবরে প্রকাশ, শিল্পে ঋণদান ও লগ্নী কর্পোরেশন এবং পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের কাষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে উভয় সংস্থার মধ্যে আলোপ-আলোচনা চলছে। স্রী আরেজারও আলোপ-আলোচনা চলার খবর সমর্থন করেছেন। তিনি বসেতে নিম্নেই বলেছেন—

“Discussions have been initiated between the Industrial Credit and Investment Corporation of India and the Refinance Corporation for a closer working relationship so that the resources available between us may be more effectively utilized for the benefit of the country's economy. Discussions have also been initiated with the International Finance Corporation and the Commonwealth Finance Development Company to negotiate, in particular cases, for the provision of the necessary foreign exchange for schemes for which the rupee finance, in part or wholly, would be provided by the Refinance Corporation.”

যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সব আলোপ-আলোচনা শুরু হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কি বকম আয়োজন এবং চেষ্টা চলছে সেটা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকব।

# দীপাষিভা

## শ্রীঅমিতাকুমারী বহু

ভারতের জনসাধারণ নানাবিধ ব্রত, পূজাপালি ও উৎসবে সমাজকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এসব সার্বজনীন উৎসবের সঙ্গে দেব-দেবী সংক্রান্ত বহু সুন্দর স্মরণ কাহিনীও জড়িত আছে। ভারতের সব প্রদেশে হিন্দু জনসাধারণ যে সমস্ত উৎসব বিশেষভাবে পালন করে তার মধ্যে দশরা, দেওয়ালী ও হোলী প্রধান। আবার এ তিনটির মধ্যে বহুস্থানে দেওয়ালী উৎসবই বিশেষ করে সার্বজনপ্রিয়। এ উৎসব আবালবৃদ্ধবর্ণিতার প্রাণে এক উজ্জল আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়। হিমাচল থেকে শুরু করে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ আলোমালার বসন্তল করে ওঠে। সর্বসম্প্রদায়ের হিন্দু এ উৎসব পরম উৎসাহে পালন করে, নিজ নিজ গৃহ প্রদীপ জালিয়ে সাজায়, বাজী পোড়ায়, অমাবস্তার নিবিড় কালো আকাশ লালে লাল হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশে এই উৎসবকে দীপাষিভা, দক্ষিণ-ভারতে দীপাবলী এবং সর্বত্র দেওয়ালী বলে থাকে। বাংলা দেশে দীপাষিভা একটি বিশেষ পূজার দিন। অষ্টান্ত দেশে এদিনে লক্ষ্মীপূজা হয়, বাংলা দেশে শ্রামাপূজা হয়। বারা শাস্ত্র তারা গভীররাত্রে শ্রামামায়ের পূজা নিষ্ঠাসহকারে করে, শ্রামাবিবয়ক পান-কীর্তন ইত্যাদিতে ভক্তরা বিভোর হয়ে থাকে। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এদিনে পূর্বপূর্বের উদ্দেশে স্নানতর্পণ করে, সন্ধ্যার কলাগাছের বাকলের চৌক্যার প্রদীপ জালিয়ে নদীতে বা নীঘিতে ভাসিয়ে দেয়। তা ছাড়া রাত্রে আকাশ-প্রদীপ জালানো হয়, কেউ কেউ সারা কার্তিক মাস প্রতি রাত্রে আকাশ-প্রদীপ জালায়।

বাংলা দেশে ঘরদোর লেপপুড়ে বন্ধবন্ধে করে তোলে। কেউ কেউ বাড়ীর সামনে কলাগাছ পুতে বাংলার চাঁচর দিগে সুন্দর করে তোয়দখার তৈরি করে। বাড়ীর বালক-বালিকারা কয়েকদিন আগে থেকেই কাগজের শেকল ও নিশান তৈরি করে বেণে দেওয়ালী দিনে বাড়ী সাজায়। মেয়েরা আর বুড়ীরা ছেড়া ছাকড়া দিয়ে সলতে তৈরি করে রাশি রাশি। ছেলেরা যে-বার বাড়ীকে সুন্দর করে আলোমালার সাজাবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করে। ছানের কাগিশে, আলিসায় চড়ে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ বসিয়ে, সন্ধ্যা হওয়া মাত্রই তাতে তেল ঢেলে সলতে ভিজিয়ে প্রদীপ জালায়। দেখতে দেখতে বাড়ী বাড়ী আলো জলে উঠে। সুৎ-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর সমস্ত শহর একটা কল্যাণকর-মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

আজকাল অবশ্য অনেক ধনী গৃহে মাটির প্রদীপের বদলে বঙ্ক-বেরঙের বালব লাগিয়ে সমস্ত গৃহ বৈজ্ঞানিক আলোতে উদ্ভাসিত

করে তোলা হয়। মদে হয়, বাল্যে আমরা কাগজের শেকল ও নিশান বানিয়ে, সলতে পাকিয়ে, ভাইবোনে মিলে কাড়াকাড়ি করে প্রদীপে তেল ঢেলেছি, আলো জালিয়েছি, মনে যে উত্তেজনা ও আনন্দ পেয়েছি, আজকালকার অনেক ছেলেমেয়েরা সুইচ টিপে বালব জালিয়ে বাড়ী উজ্জল করে বোধ হয় সে আনন্দের এক কণাও অনুভব করতে পারে না।

দেওয়ালীতে দশ ঘরে ঘাটির প্রদীপ জালিয়ে উৎসব করার কি মূল কাণ্ড সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী চলিত আছে। কেউ কেউ বলে, লক্ষ্মী ধ্বংস করে সীতা উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র অংবাধায় কিংবে এলে তাঁর রাজ্যাভিষেক হ'ল, সমস্ত রাজ্যে আনন্দের স্রোত বইল। প্রতিগৃহ, বাস্তাবাট, দীপমালার উজ্জল হয়ে উঠল। শ্রীরামচন্দ্রের সেই স্মৃতি রাখবার জন্তে প্রতিবৎসর দীপ জালানো হয়। হুম্মান-ভক্তরা বলে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সেবক ও ভক্ত পবননন্দন বানর-রাজ হুম্মানেব জন্মদিন বলে তাঁরা এদিনে প্রদীপ জালিয়ে এ উৎসব করে।

গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্য এদিনে রাজ্যারোহণ করেন ও সেদিন থেকে নতুন বৎসর শুরু হয়, তাকে সন্ধ্যা বলে।

ঐশ্বর্ঘ্যের দেবী লক্ষ্মী দেওয়ালী দিনে সর্বত্র পূজিতা হন। কেউ কেউ বিশ্বাস করে দেওয়ালী দিনেই লক্ষ্মীনারায়ণের শুভবিবাহ হয়েছিল। তাই ভক্তরা পরম আনন্দে দেওয়ালী উৎসব পালন করে।

জৈনরা এই দিনকে মহাবীরের নির্কীর্ণ দিবস বলে বিশেষ আড়ম্বর করে ও প্রদীপ জালায়।

অমৃতসরে দেওয়ালী দিন শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে অপূর্ণ আলোকসজ্জা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক পল্লব ও আশেপাশের স্থান থেকে এসে অমৃতসরে ভিড় করে। এইদিনে শিখদের বর্ষ শুক্ক হরপোবিন্দেব জন্মদিন। তাই শিখরা খুব আড়ম্বর করে উৎসব করে, প্রদীপ জালিয়ে বাড়ীঘর উজ্জল করে তোলে।

পুরাণে নাকি বর্ণিত আছে যে, চার বর্ষের জন্ত ভগবান বিষ্ণু চারটি বিশেষ উৎসব নির্দেশ করে দেন। যথা : ব্রাহ্মণের জন্ত শ্রাবণী, ( নতুন উপবীত গ্রহণ ও উপনয়ন ) ক্ষত্রিয়ের জন্ত দশরা, বৈশ্যের জন্ত দেওয়ালী এবং শূত্রের জন্ত হোলী। কিন্তু এই বিধি থাকা সত্ত্বেও শ্রাবণী উৎসবটি ছাড়া বাকি তিনটে উৎসবই সকলে পালন করে। তবে দেওয়ালী উৎসবে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের আড়ম্বরটা সত্যি বেশী থাকে। তারা দেওয়ালী দিনে লক্ষ্মীদেবীর

.....  
**দিনের পর দিন প্রতিদিন...**  
 .....



## **রেক্সোনা সাবান**

**আপনার ত্বকে  
আরও সুন্দর করে**

যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন-  
 আপনার ত্বক ক্ষয় হতে যাবে না, অনেক মাসের মতো দেখাবে  
 ভাল। কারণ, রেক্সোনা সাবান ক্যাডিলিন নামের  
 কয়েকটি শেলেব এর বিশেষ সামগ্রিক যা আপনার  
 লাগ্ন্যকে সুন্দর করে শেলেব এবং আপনার ত্বককে  
 সুস্থ রাখে। রেক্সোনা সাবান মত দেখা মানুষ দেখবেন  
 আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

**আপনার সৌন্দর্যের জন্যে...রেক্সোনা**



রেক্সোনা, প্রো, লি, অটোম্যাট পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার, লি, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

RP. 159 - X52 96

পূজা বিশেষ জাকজমকে করে। লক্ষ্মীর কৃপা পেলে রাতারাতি ভাগ্য কিংবদন্তি, সে সবকিছু একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে।

এক রাজা তাঁর চার ঘরে। একদিন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তারা কার ভাগ্যে যায়। তিনটি ঘরে রাজাকে খুশী করবার জন্য খোসামোদ করে বলল, তারা রাজার ভাগ্যে যায়। শুধু ছোট ঘরে বললে দেবতার দয়ায় যায়। রাজা রাগ করে ছোট রাজ-কাজকে এক গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিদায় দিলেন। রাজকন্যা এই তার ভাগ্যলিপি জেনে সন্তুষ্ট মনে গরীব ব্রাহ্মণ-স্বামীর সঙ্গে তার কুঁড়েঘরে চলে গেল। ব্রাহ্মণ দোয়ে দোয়ে ঘুরে ভিক্ষা করে যা আনে রাজকন্যা তাই রাখে, এ ভাবে দিন কাটে। একদিন ব্রাহ্মণ কিছুই পেল না, পথে চলতে চলতে একটা মরা সাপ দেখে কুড়িয়ে নিল, বন্দিই বা তা কোন কাজে লাগে। রাজকন্যা মরা সাপ আবার কি কাজে লাগে বলে সাপটাকে ঘরের পেছনে কেলে দিল।

ইতিমধ্যে সেদিন ঐ রাজার রাজা দীঘিতে স্নান করতে নাযলেন, আর গলার বহুমূল্য রত্নহার খুলে রাখলেন সিঁড়ির উপর। একটা চিল উড়তে উড়তে এসে হঠাৎ ছোঁ মেবে হারটা নিয়ে পালিয়ে গেল। তাড়া করেও চিলটার কাছ থেকে হার পাওয়া গেল না। চিলটা উড়তে উড়তে ব্রাহ্মণের বাড়ীর কাছে এসে মরা সাপটা দেখে হারগাছা কেলে সাপটা নিয়ে উড়ে চলে গেল। রাজকন্যাও রত্নহার এনে তুলে রেখে দিলেন।

রাজা চেড়া শিটতে বললেন, যে এই রত্নহার খুঁজে এনে দেবে তাকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া হবে। রাজার এই ঘোষণা শুনে রাজকন্যা ব্রাহ্মণের হাতে হার দিয়ে শিখিয়ে দিল রাজার কাছে কি পুঙ্খবাহু চাইবে। ব্রাহ্মণ হারগাছা নিয়ে সাহসে ভর করে রাজবাড়ীতে চলল। রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে বখাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্বাদ করে হারগাছা বের করে দিল। রাজা তাঁর বহুমূল্য হারানো হার পেয়ে এত খুশী হলেন, বললেন ব্রাহ্মণ তোমার কি পুঙ্খবাহু চাই বল? ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে বললে, মহারাজ! আমার একটা সামান্য ভিক্ষা যে, আমার স্ত্রী রাজে কারও গৃহে, এমন কি রাজপ্রাসাদেও যেন আলো জ্বালান না হয়, শুধু আমার কুঁড়ে ঘরে আলো জ্বলবে।

মহারাজ ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন তাই হবে।

দীপাঘিতা এল, রাজার আদেশে কেউ আলো জ্বালতে পারল না, সমস্ত পুরী অন্ধকার। শুধু রাজকন্যা তার কুঁড়ে ঘরখানা লেপে পুছে তততত করে, সারি সারি মাটির প্রদীপ জালিয়ে কুঁড়ে ঘরখানা উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঘরের ভেতরে লক্ষ্মীর আসন স্থল্য করে পাতা। গভীর রাত্রে লক্ষ্মীঠাকরুন স্বর্গ থেকে তাঁর বাহন পেঁচায় চড়ে বসে নেমে এলেন। এসে দেখেন, এত বড় রাজপুরী ছুটছুটি অন্ধকার, কোথাও এক কেটা আলো নেই, সারা রাজ্য অস্বাভাবিক অন্ধকারে ডুবে আছে। অসন্তুষ্ট মনে লক্ষ্মী চলতে চলতে রাজ্যের

এক দিকে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে সারি সারি মাটির প্রদীপ জ্বলছে দেখে ঘরের ভিতর ঢুক পড়লেন। দেখতে পেলেন, রাজকন্যা আর ব্রাহ্মণ অতি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পূজা করছে। তা দেখে দেবী অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বর দিলেন। লক্ষ্মীর আশীর্বাদে রাতারাতি তাদের ভাগ্য কিংবদন্তি, তারা রাজঐশ্বর্য লাভ করে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল।

এ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী জনসাধারণ অল্পবিস্তর বিশ্বাস করে। তাই রাজকন্যার মত নিজ নিজ ভাগ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবার জন্য গৃহলক্ষ্মীবা দেবী লক্ষ্মীকে দেওয়ালী দিনে অতি নিষ্ঠা-সহকারে আরাধনা করে। ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী তাঁর মোহিনী মৃষ্টিতে হাতে কমল নিয়ে প্রস্তুতি পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দুপাল ভূজ টুজ হয়ে আলু ঐশ্বর্য বিতরণের জন্য। কিন্তু দেবী সহজে মানুষের হাতে ধরা দেন না, বহু সাধাসাধনা করতে হয় তবে দেবীর কৃপা মিলে। তাই ভারতের প্রায় সর্বত্র দেওয়ালী উপলক্ষে সমস্ত পাকাবাদী চুপকাম করা হয়, গৃহের বস আবর্জনা, নোভরা-ভাঙা জিনিস বজ্রন করে চারিদিক নিষ্কল শুচি করে তোলে—নারীরা যে বার গৃহের সামনে অঙ্গিনায় নিপুণ হাতে বাংগোলী দিতে থাকে। বংবংয়ের শুড়া দিয়ে নানা বকরের নস্রা ও চিত্র করাকে বাংগোলী বলে। এক বাংলা দেশেই শুধু পিটুলী গোলা দিয়ে আঙ্গনা ঝাঁকে, তা ছাড়া সর্বত্র শুড়া দিয়ে বাংগোলী দেয়, এটা নারীদের একটি স্তম্ভ্য বিজ্ঞা। লক্ষ্মীর মূর্তি বা চিত্রকে ষোড়শোপচায়ে পূজা করা হয়, লক্ষ্মীর সামনে দেওয়ালী দিন রূপার টাকা স্তম্ভ্যকারে হলুদ ও সিন্দূর লাগিয়ে রেখে দেয়।

শরৎকালে আনন্দময়ী মায়ের আগমনে যেমন বাঙালীর গৃহে আনন্দের সাড়া পড়ে তেমনি মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, উত্তর ভারতে ও অন্যান্য প্রদেশে দেওয়ালী উৎসবে প্রতি গৃহে আনন্দের ছাট বসে যায়। কোথাও কোথাও তিন দিন কোথাও বা পাঁচ দিন ধরে দেওয়ালীর উৎসব চলে ও একে লোকেরা ছোট দেওয়ালী ও বড় দেওয়ালী বলে। এই পাঁচ দিনেই পাঁচটি কাহিনী আছে। প্রথম দিনকে তারা ধন জয়োদশী বলে, এ দিন ব্যবসায়ীদের নতুন বৎসর আরম্ভ হয়, পুণ্য হিসাবনিকাশ করে নতুন খাতা শুরু করে।

দ্বিতীয় দিন হ'ল নরক চতুর্দশী, এর কাহিনী হ'ল নরকাসুর অতি প্রতাপশালী অসুরবাজ ছিল, তার অত্যাচারে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। তখন দেবতাদের অসুরবোনে ভগবান বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করেন। সূতায় পূর্বে নরকাসুর তার শেখ প্রার্থনা জানায়, যে ভগবান, বহু পুণ্য কলে আজ তোমার হাতে আমার মৃত্যু ঘটবে, তুমি আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার হাতে আমার মৃত্যু এই আনন্দের দিনটা যেন সবাই চিরদিন স্মরণ করে প্রতি গৃহে আলো দেয়। ভগবান তথাস্থ বলে নরকাসুরকে বধ করেন। সেই থেকে প্রতি বৎসর লোকেরা এ দিনে ঘরে ঘরে প্রদীপ জালিয়ে এ ঘটনাকে স্মরণ করে।

না, না!  
এ 'ডালডা' নয়!  
'ডালডা' কখনও খোলা  
অবস্থায় বিক্রী হয় না!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা  
টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যই এতে কোনও খুলো  
মশলা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা  
হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা'  
কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য  
ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও  
½ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা'!  
এর হলেদে টিনের ওপোর  
খেজুর গাছের ছবি দেখলে  
সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম।  
আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য অক্ষিত  
রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা  
বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম তেড়াল বা দোষগুক্ত  
হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে  
রাগবেন সেই সব খাবারের  
প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর  
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।



মহীশূর টেটে সোমনাথপুরের কেশব মন্দিরে বিষ্ণু এবং নরকা-  
সুরের তীর্থস্থ প্রস্তর-মূর্তিতে খোদাই করা আছে। তৃতীয় দিন  
হ'ল বড় দেওয়ালী, সূর্যোদয়ের পূর্বে পরিবারের সবাই গারে ও  
যাখার সর্বাক্ষে তেল মেখে স্নান করে, তারা বিশ্বাস করে এই দিনে  
এই তেল-স্নান গঙ্গা-স্নানের সমতুল্য হয়। পানাস্তে সবাই নতুন  
কাপড় পরে মণ্ডামিঠাই খায়। বন্ধুবান্ধবের বাড়ী বেড়ায়। আয়োদ,  
আজাদ করে, সন্ধ্যার প্রদীপমালায় বাড়ী সাজায়, বাজী পোড়ায়।  
দেওয়ালী রাতে সবাই অল্পবিস্তর জুয়া খেলে, তারা বিশ্বাস করে,  
দেওয়ালীর দিন জুয়া খেললে দেবী লক্ষী প্রসন্ন হন। এই জুয়া  
খেলা নিয়েও একটি কাহিনী রচিত হয়েছে।

এক বর্ষার দিনে শিব-পার্কতী পাশা খেলতে বসলেন বাজী  
বেধে। ছোটখাট জিনিস বাজী বেধে খেলতে খেলতে প্রতিবারই  
হেয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত কৈলাস পর্বত বাজী বেধে তাও  
হারালেন। তখন শিব মহা অসন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা নদীর তীরে তপস্বীর  
জায় বাস করতে লাগলেন। শিব-পার্কতীর দুই পুত্র কার্তিক-  
গণেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কার্তিক পিতার পক্ষ সমর্থন করে  
পার্কতীর সঙ্গে পাশা খেলতে বসে একে একে শিবের বাজীর জিনিস  
পুনরুদ্ধার করলেন। তা দেখে গণেশ মায়ের পক্ষ নিয়ে খেলতে  
বসলেন এবং আবার সব জিনিস জিতে মায়ের পারের নীচে  
রাখলেন।

তখন দেবতারা দেখলেন, এ ত মহা বিপদ, শিব-পার্কতীর  
কলহে সব রসাতলে বাবে। তারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন, তখন বিষ্ণু  
আবার শিব-পার্কতীকে খেলতে বসিয়ে দিলেন। আর নিজে  
গোপনে শিবের পাশা ঘুটি হয়ে শিবকে খেলার জিতিয়ে দিলেন।  
এবার পার্কতী গেলেন মহা চটে। তখন নারদমুনি ঘটনাস্থলে  
এসে উপস্থিত হয়ে দেবদম্পতির মধ্যে মিলন ঘটালেন। এই  
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেওয়ালীতে বাজী বেধে জুয়াখেলা  
অমুষ্ঠানের একটা অঙ্গ হয়েছে, অল্প দিনে অবশ্য জুয়াখেলা  
নিষিদ্ধ।

চতুর্থ দিনে গোবর্ধন পূজা হয়। একবার মথুরার গোপদের  
উপর দেবরাজ ইন্দ্র কোন কারণে ক্রোধ হয়ে অতিবৃষ্টি দিয়ে তাদের  
শাস্তি দিলেন। ব্রজবাসীদের দুঃখ ও অসুবিধার সীমা রহল না।  
তখন ঐক্যবদ্ধ ব্রজবাসীদের রক্ষা করতে ও ইন্দ্রের দণ্ডচূর্ণ করতে এক  
অমূল্য দিয়ে গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করে রাখলেন। গোপালবা  
বজা থেকে রক্ষা পেল। এই জ্ঞত গোবর্ধনের পূজা হয়। মহীশূর  
টেটের এক মন্দিরের দেয়ালগায়ে ঐক্যের গিরিগোবর্ধন  
উত্তোলনের নানা চিত্র খোদিত আছে।

পঞ্চম দিনে ভ্রাতৃধিতীয়া সর্বজাই দেওয়ালীর উৎসবকে  
প্রাণবন্ত করে তোলে বালকবালিকায়া ও নারীয়া। মহাবাদ্ধে  
নবযাত্রা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নারী ও বালক-বালিকাদের  
মধ্যে বিশেষ চাকলা দেয়া যায়। উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে  
কর্মব্যস্ততা সাড়া পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় দর্জিররা ধংসবং-এর

ক্রক-জায়া, সার্ট-প্যাণ্ট তৈরি করতে বসে। যেমনি শিশুদের মত  
বাজী পোড়ার ও নতুন পোষাক পরবার আগ্রহ তেমনি যেয়েদে  
নানা বকম সুস্বাদু খাদ্যাদ্র্য তৈরি করবার ঘট। নিঃস্বস্ত দুই  
মশলা গুড়ো করবার শব্দে মুগ্ধিত হয়ে উঠে। খুব ভোরে  
উঠে বোঁরা যাঁতাতে ডাল ও গম পিষতে থাকে, আর দাঁতে দাঁ  
চেপে সরু গলায় গাল গাইতে থাকে। ওদেশে বন্ধুবান্ধ  
আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী বাড়ী ভ্রমের খালা পাঠাবার নিয়ম আছে  
একদিনে নানা বকম মিষ্টমণ্ডা তৈরি করা অসম্ভব, তাই দেওয়ালী  
দশ-পনের দিন পূর্বে থেকেই বোঁররা মণ্ডামিঠাই তৈরি করে  
বসে যায়। আমাদের দেশের বিশেষ সুখাচ্ছ ছানার সন্দেশ  
মসগোলা, পানতোয়া, চমচম এরা জানে না কিন্তু তার বদলে এ  
তৈরি করে চিঙড়া, কাহুলা, কড়বোলে, সেউ আরও নানারক  
মুখরোচক খাদ্য।

দেওয়ালীর আগে লোকেদের একটানা জীবনের গতি  
বেশ একটু চাকলা আসে, দেওয়ালী উপলক্ষে স্কুল-কলেজ, আপি  
ছুটি হয়। শহরে গ্রামে কেনাবেচার ধুম লেগে যায়। শহরে  
এমন কি গ্রামেও দোকানগুলি নানাবিধ জ্বাসজ্বাবে পূর্ণ হয়ে উঠে  
কাঁচের আলমারীগুলি নানারূপ জামাকাপড়ে ভর্তি ত হয়ই কি  
বিশেষ করে নানারূপ সুগন্ধি তেল, আন্তর, পটকাবাজী ও না  
বকমারী বাজীতে ঠাসা থাকে। ওদেশে দেওয়ালী ও ভাইকোটো  
নতুন সুগন্ধি তেল মেখে স্নান করা একটা বিশেষ স্নান। ভোরে  
আলো কোটবার আগেই ঘরে ঘরে তেল মেখে স্নানপর্ব শেষ কা  
নতুন বস্ত্র পরিধান করা এই অমুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ  
দোকানগুলি সুসজ্জিত মা ও ছেলেমেয়েতে পূর্ণ থাকে। ছে  
মেয়েরা দুহাত বোঁঝাই করে অজস্র বাজী, সুগন্ধি তেল, আ  
মায়েরা শাড়ী জামা কিনে মনোব আনন্দে ঘরে ফিরে।

দেওয়ালী উৎসবে আলো জালানই হচ্ছে আসল আনন্দ  
বাড়ী বাড়ী, নগরে নগরে আলোমালা পরানো যেমন বাংলা দে  
তেমনি মহারাষ্ট্রে, কোন বৈষম্য নেই। কিন্তু বোঁঝাইতে বা  
পোড়ানোর বা হিড়িক দেখেছি এমনটা আর কোথাও দেখে  
পাই না। দেওয়ালীর চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই শেষ রা  
সুখনিদ্রা ভেঙ্গে হার পটকাবাজীর কট কট আওয়াজে। আর পট  
বাজীর সে কান-খালাপালা-করা আওয়াজ শেষ হয় ভাইকোটো  
উৎসবের পর। এক বোঁঝাইতেই হাজার হাজার টাকার পট  
বাজী বিক্রী হয় আর তা ছাড়া আরও কত স্তন্য স্তন্য বা  
বে আছে তার ঠিক নেই। বাংলা দেশ ছাড়া অল্প আয় এ  
বিশেষত্ব—বাড়ী বাড়ী খালাভরা মিষ্ট পাঠানো। কোলাপুর রা  
দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দেবী মহাস্বামীজীর মন্দিরে সেদিন ধনী দ  
নির্কিশেবে বহু লোকই 'তাউ' (খালা) নিয়ে যায়। মন্দি  
দেবীকে মিষ্ট দেওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী তা  
পাঠান হয়, আর প্রত্যেক বাড়ীতে এত নাড়ু ও মিষ্ট আসে  
যেবে শেষ করা যায় না। সুগৃহিণীরা তা সমস্তে রক্ষা করে, এ



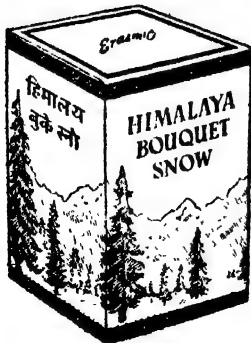


# অশ্রু সৌন্দর্যের জন্য...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

অনাধন



শ্রদ্ধ এবং অগন্ধ হিমালয় বোকে সৌ আপনার

স্বককে মৃদু এবং মোলায়েম রাখে। মধুমনের মত হিমালয় বোকে টয়লেট

পাউডার আপনার লাবণ্যর স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে

ঝড়িয়ে তোলে।

## হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার



উৎসবের পরেও বহুদিন পর্যন্ত বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগতদের সেই রিটি চায়ের সঙ্গে দেওয়া হয়। অনেক সময় এই নান্দ্র্য স্থানীয় এত দীর্ঘকালব্যাপী হয় যে, তা খেতে গিয়ে দাঁত ভালবার উপক্রম হয়।

কোলাপুরে দেওয়ালী জলুঘটা একটু বেশী, কয়েক বৎসর পূর্বে রাজপ্রাসাদ তিনটির বা আলোকসজ্জা দেখেছি তার তুলনা নেই। কোলাপুর আর মহীশূরে দেখেছি দেওয়ালীর সময় রাজপ্রাসাদ-গুলিতে সামান্য অস্তর করে করে রংবেরং-এর বালব লাগিয়ে প্রাসাদের প্রত্যেকটি রেখাকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়, আর অন্ধকারে সে প্রাসাদগুলি আলোমালার ঝলমল করে মায়াময়ী হয়ে যায়। অপূর্ণ আলোকসজ্জার সজ্জিত মহীশূরের রাজপ্রাসাদকে লোকেরা গোন্ধন প্যালেস বলে।

দিল্লীতে দেওয়ালীর আলোকসজ্জার বৈশিষ্ট্য নেই, কারণ, পনেরই আগষ্ট, ২৬শে জাম্বুয়ারী, এবং সময় সময় বিশিষ্ট রাজা ও প্রতিনিধিদের আগমনে প্রেসিডেন্ট ভবন, পার্লামেন্ট হাউস সেক্রেটারিয়েট ও বহু সরকারী ভবন এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষগুলি লাল-নীল, সবুজ-হলদে ইত্যাদি নানা রংবেরং-এর বালব দ্বারা সজ্জিত হয়ে পরীমাজের সৃষ্টি করে। ইণ্ডিয়া গেটের স্তূপকং কোয়ার্টারগুলো নিতাই বড়ী আলোমালা পরে মোহিনীমূর্তিতে লক্ষ্যকে আকৃষ্ট করে। দিল্লীর অধিবাসীদের নয়ন-ঝলনানো আলোমালায় অভ্যস্ত দৃষ্টি দেওয়ালীর মৃৎপ্রদীপের অথবা মোমবাতির স্নিগ্ধ আভার বৈশিষ্ট্য দেখতে পায় না।

দিল্লীর আশেপাশের মথুরা বৃন্দাবনে, এবং গ্রায়গুলিতে অধিবাসীরা পরম উৎসাহে দেওয়ালীর উৎসব করে। তারা তিন দিন ধরে দেওয়ালী উৎসবে আলো জালায়। প্রথম দিন হ'ল ছোট দেওয়ালী, সেদিন বাড়ী বাড়ী গুধু পাচটি প্রদীপ জালায়। দ্বিতীয় দিন হ'ল বড় দেওয়ালী, সেদিন গৃহাঙ্গনে একটি প্রদীপ সারারাত জালিয়ে রাখে, পরের দিন সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর সেদিন বে-বার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বহুসংখ্যক প্রদীপ জালিয়ে ঘরের শোভা বাড়ায়। বড় দেওয়ালীর গভীর রাত্রে লক্ষ্মীপূজা হয়, লক্ষ্মীর সামনে এক'শ এক টাকা খেঁকে স্তব্ব করে যে বত পারে হাজার রূপের টাকা স্তব্ব পাকুতি করে রাখে, তাতে হলুদ ও সিন্দূর লাগায়। বাদের এত রূপের টাকা নেই তারা পরিবাহেব নারীদের রূপের অলঙ্কার যথা গলাব হাঁহুলী হার, হাতের কঙ্কন ইত্যাদি বেপে বোড়শোপাচারে লক্ষ্মীপূজা করে।

তৃতীয় দিনে গোবর্ধনপূজা হয়। সকালবেলা পুরুষ-লোকেরা গোবর দিয়ে বড় করে ঐকৃষ্ণের মূর্তি বানায়। এই পূজা পাড়ার পাড়ায় দলবদ্ধ হয়ে একত্রে করে। গোবর মূর্তির পাশে মাখন ভোলবার ঘুটনি, চাল কোটার মূল ও গরু তাড়াবার একটি লাঠি রাখে। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হলে রাত্রে নয়-দশটার সময় পুরুষ-লোকেরা গোবর্ধনপূজা করে। রুটিতে ঘি ও চিনি মেখে ঘুটি বানিয়ে মূর্তির মুখে উপর রাখে, পাশে মাটির ভাঙে পানীয় জল

দেয়, আর এক পাশে ঘি-এর প্রদীপ জালায়। ঐধারীতি পূর্ণের করে পুরুষরা সবাই মিলে মূর্তি করে নাচ-পান করে, গানে নার হ'ল হিরো।

হিরোরে যে হিরো, অথরয়ে এক বোঝরি  
জললেবে এক বোঝরি, জিসরে ভইস পাঁচশ  
টিকেওয়ালী ছাটলেও, জিসকা হুখ মিঠাস।

হিরোরে হিরো, আকাশে এক বাসের ঝোপ, জললেও এ-  
বাসের ঝোপ, তাতে পঞ্চাশ মোব আছে। তা খেঁকে এক মো-  
বেছে নাও, যাব কপালে সাদা চাঁদের টিকা আছে; আর তারই হু-  
মিঠে হয়।

এভাবে বহুধরনের হস্তরসযুক্ত নৃত্যগীত করে সারারাত তার আমোদ-আহ্লাদ করে। ভোরে নারীরা গোবর্ধন মূর্তি ভে-  
গোবর দিয়ে ঘুটে তৈরী করে এবং বারা বারা একত্রে হয়ে পুন্ড  
করেছিল, তাদের প্রত্যেকের বাঁধীতে একটি একটি ঘুটে দি-  
আসে। তার পর ভাইদোজ উৎসব করে দেওয়ালী পূর্ণ সমা-  
করে।

দেওয়ালীর অমাবস্তা রাতে লক্ষ্মীপূজার পূর্বে রাত বারোটাতে  
তারা নিজ নিজ শিশুসন্তানের মঙ্গলার্থে কিছু কিছু তুফতাক করে  
একটা মৃৎ পাণ্ডে ফুল, সাতরকমের মিঠাই, পুরী, ক্ষীর, হালুয়া বা :  
ঘরে তৈরী হয় তা সাজিয়ে নিয়ে চৌরাস্তার বেধে আসে, পাণ্ডে  
একটি প্রদীপ জালিয়ে রাখে, পরদিন ভোরে হয় সে নৈবেদ্য কাচে  
কুকুয়ে খায়, নয়ত ঝাড়ুদার নিয়ে যায়। এই প্রকরণের নাম  
'গৈনিক'।

সুদূর নেপালও দেওয়ালী এবং লক্ষ্মীপূজা বিশেষ আড়ম্ব-  
অনুষ্ঠিত হয়। নেপালীরা পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব করে :  
দেওয়ালীকে পঞ্চক বলে। তবে তাদের পূজার বৈশিষ্ট্য আছে  
তারা জীবজন্তুকেও দেওয়ালী উৎসবে বিশেষ যত্ন ও আদর দেখায়।

প্রথম দিনে তারা গরুপূজা করে। সবংসা গাভীর কপাটে  
চণ্ডা করে সিন্দূর লেপে তাতে আবীর-মাখা চাল ও ধান বসি-  
দেয়। তার পর লাথ বাড়িয়ে মল্লপাঠ করে যথাবিহিত পূ-  
করে, খুব ভাল করে ধাওয়ায়। সন্ধ্যার ঠোঙাতে প্রদীপ জালি-  
তাদের পবিত্র নদী বাগমতী নদী বা তাব লাখা বিষ্ণুমতী নদী-  
ভাসিয়ে দেয়। সাবি সাবি প্রদীপ আলোশিখা নিয়ে ভাস-  
ভাসতে চলে, যে পর্যন্ত-না চেউ-এর দোলায় জলের নীচে তলি-  
যায়।

দ্বিতীয় দিনে তারা কাক ভোজন করায়। বাড়ীর গৃহিনী-  
সকালে নানারূপ রান্না করে বাড়ীর সামনে অনেকগুলো গাছে  
পাতা ছিড়ে বিছিয়ে দেয় ও তার উপর সেই পক্ক পরিবেশন ক-  
কাকদের জন্য। এই দিনে তারা কোন উচ্ছিন্ন কাককে খেতে দে-  
না। মহাসমারোহে কাকের দল ভোজনপর্ব সমাধা করে।

তৃতীয় দিন হ'ল আসল দেওয়ালী, সেদিন প্রাতে কুকুয়ে  
সমাদর করা হয়। কুকুয়ে দেখে নানা রঙবেরঙে চিত্রিত কর

হয়। গলার ফুলের মালা পরিয়ে দেয় এবং বস্ত্র করে ভাল ভাল খাবার খেতে দেয়। সেদিন কুকুরের প্রতি কেউ দুর্ভাবহার করে না।

দেওয়ালী দিন সাব্বা শহরে আনন্দের বজ্রা ছুটে, বিশেষ করে কাটমুণ্ড শহরে। এদিন বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করেন, তাতে লোকের বত দুঃখকষ্ট, অমঙ্গল দূর হয়ে যায়, তাই সবাই আনন্দোৎসব করে। রাত্রে লোকজকে লক্ষ্মীপূজা হয় এবং বাজী বেধে খুব জ্বাখেলার ধুম পড়ে যায়।

চতুর্থ দিন প্রাতে আবার গুরুপূজা হয়। এদিনের উৎসব বিশেষ করে বলিরাজের ক্ষত্র। মহারাষ্ট্রে এদিন বলিরাজের পূজা হয়। দৈত্যরাজ বলি অতি পরাক্রমশালী ছিলেন। ইনি দেবতাদের বৃদ্ধে পরাজিত করে ত্রিভুবনেও অধীশ্বর হন তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বামন অবতাররূপে ক্ষমগ্রহণ করেন। দৈত্যরাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে বামনদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন, অসুররাজ তথাস্ত ব বলেন। বামন এক পা স্বর্গে আর এক পা মর্ত্যে রাখেন, নার্ভিনিগত তৃতীয় পা রাখবার ক্ষম স্থান চাইতে বলিরাজ নিজের মস্তক অবনত করে দিলেন। তখন বামন বিষ্ণুর তৃতীয় পা বলিরাজের মস্তকে রেখে তাকে পাতালে প্রবেশ করিয়ে দেন। এ ভাবে চাতুরী করে বিষ্ণু বলিকে রাজ্যচ্যুত করলেন। ধার্মিক বলিরাজ বংশের অন্তঃ একদিনও যেন নিজরাজ্যে ফিরে আসতে পারেন বিষ্ণুর কাছে এই প্রার্থনা করেন ও বিষ্ণু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ

করেন। সেই থেকে প্রতি বৎসর বলিরাজ এইদিনটিতে নিজরাজ্যে ফিরে আসেন এ ধারণার বশীভূত হয়ে সকলে আনন্দ-উৎসব করে। মহারাষ্ট্রের নারীরা আটা বা গোবর দিয়ে বলিরাজের মূর্তি গড়ে পূজা করে।

নানাস্থানের আদিবাসীরাও দেওয়ালী উৎসব করে। তারা শস্তক্ষেতে, মাঠে ঘাটে প্রদীপ জালিয়ে অপদেবতা তাড়ায়। যারা বাতৃকর ও ডাইনী, তারা নানারূপ তুচ্ছতাক করে। শ্মশানে ও কবরস্থানে গিয়ে তারা মন্তস্তম্ব করে ভূতপ্রেতকে বশীভূত করে। তাদের দেবতা পূজা করেও নানারূপ নৃত্যগীত করে।

দেওয়ালী উপলক্ষে নানাস্থানে নৃত্যগীত হয়। উত্তর ভারতে অস্ট্রীয় গোয়ালাদের নাচ বড় সুন্দর। তারা পায়ে খুঁশুর বেঁধে হাতে ধাঁশু নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সাজে এবং অতি সুন্দর নৃত্য করে। রাজস্থানে নারীরা নানা রংবেরঙের ঘাঘরা ওড়নার সজ্জিত হয়ে কুমুদ নৃত্য করে। রাজস্থানী পুরুষ ও নারীদের তৎসংগীত-নৃত্য অতি চমৎকার।

প্রদীপমালায় বাড়ী সাজিয়ে, বাজী পুড়িয়ে নানা নৃত্যগীতি, ও আনন্দ উচ্ছাসের ভিত্তর দিয়ে লোকেরা দেওয়ালী উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন করে। দেওয়ালীর পর দ্বিতীয়াতে ভাইকোটো বা ভাইদোজ উৎসব হয়। বোনরা ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘ-জীবন কামনা করে, নববস্ত্র উপহার দেয় সুগন্ধ খাওয়ায়, একটি অতি সুন্দর মাসলিক অনুষ্ঠানের ভিত্তর দিয়ে হিন্দুদের সার্বজনীন শবৎকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

**ডায়া-পের্সিন**

হজমশক্তি  
বজায় রেখে  
স্বাস্থ্যের  
উন্নতি করে

ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

# আধুনিক বাংলার মনোজগৎ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্ত জিহ্বা বংসরের মধ্যে বাঙালীর আত্মবিশ্বাস অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার কল অনিবার্যরূপে দেখা দিয়াছে অশনে, বসনে, সমাজে, ব্যবহারে—সর্বত্রই। অন্ধ প্রগতি-সুন্দরী আজ এ জাতির চালক। তাহার সঙ্গে সে কোন নিকরদেশ-বাত্রা করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার সময় নাই। পথের ধারে আছে বহুজন কুলের সমাবেশ, তার গন্ধ না থাকুক—আছে মনোহর রঙ। আর আছে রাশি রাশি সবস কল; তার রূপের বাহার বসের বিকৃতিকে চাকিয়া রাখিয়াছে।

এই ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসের মূল কোথায় তাহার সন্ধান আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার নব-ভাবধারায় প্রাবৃত হইয়াছিল। সে ভাবধারার ভগ্নীত্বের দল ছিল মুষ্টিমেয়। তাহাদের ছিল সংস্কার-বর্জনের সাধনা। অক্ষতমলা পাব হইয়া নূতন আলোকের সন্ধান করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় ভগ্নীত্বের দল সে সাধনার সিঁড়িলাভও করিয়াছিলেন। এই নূতন আলোকের কলপ্রাবনে তাহাদের আত্মবিশ্বাস ঘটে নাই; কারণ সে বিশ্বাস ঘটিয়াছিল তাহার বহু পূর্বেই। এ প্রাবন বখন আসে তখন না ছিল তাহাদের জ্ঞানের তপস্রা, না ছিল তাহাদের আত্মবল। কাজেই এ নব-ভাবধারাকে প্রথমেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন নির্বিরোধে, নির্বিরোধে। ক্রমে বিচারের সময় আসিল, বিশেষ করিয়া ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রে। সে বিচার, বিতর্কে তাহাদের লুপ্ত আত্মবোধ কিরিয়া আসিল অনেকাংশে। পাশ্চাত্যের নূতন আলোকেই সে বিচার, বিশ্লেষণ চলিল। কিন্তু সে তরঙ্গের আঘাত, সে নব অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধ রহিল সমাজের শুধু একটি মাত্র প্রগতিশীল স্তরে। দেশের জনসাধারণের কাছে সে আলোক সূর্যালোক হইয়াই রহিল, উহাকে গৃহ-প্রদীপের কাজে লাগানো গেল না।

করাসী বিপ্লবের ভাবধারায় তখন সমগ্র ইউরোপ আত্মসচেতন। দিকে দিকে সাম্রাজ্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান। ইংরেজি শিক্ষার স্রোতে পশ্চিম হইতে দে সকল সাম্রাজ্যী ভাসিয়া আসিল তাহার মধ্যে এই সাম্রাজ্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়গান অন্ততম। এ জয়গান দেশের চারিদিকে ঘোষিত হইল। সাম্রাজ্যিক সমাজ এ গানের ভাবে ও ভাষায় মুগ্ধ হইয়া ইহার তালে তালে পা কেলিয়া চলিল।

ভাবরূপের সাধনা বাঙালীর চিরকালের। কারণ বাহাই হউক, ইহা তাহার কুলগত আচার। সে সাধনার প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী নিজের দেশকে ইংলণ্ডেরই একটি ছোটখাট সংস্করণে পরি-বর্তিত করিতে বাসনা করিল। সমাজে ও রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য রূপের

হইল সূত্রপাত। এ ভাবধারায় দ্বন্দ্ব করিতে গিয়া কেহ কেহ অগাধ জলে পড়িয়া তলাইয়া গেল। কিন্তু বেশীর ভাগই যে ভেলা ধরিয়া রক্ষা পাইল তাহার কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন দাস। সে অল্প কথা।

সমাজ তখন পল্লী-কেন্দ্রিক। একদিকে গুরু-পুরোহিত-তন্ত্রের 'তামসিকতা' অন্ধমূর্তি বিচারহীন আচারের মায়াজাল। কিন্তু মৈত্রী তখনও বাংলাদেশ হইতে নির্বাসিত হয় নাই। অপরের জন্য দুঃখ-বরণ করিবার শক্তি তখনও নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই; আর হয় নাই পয়ের দুঃখে অশ্রুপাতের অভাব। দারিদ্র্য, দুঃখ, বিবেক সম্বন্ধে অল্পমাত্র মৈত্রীর সহযোগে পল্লী-জীবনে মোটামুটি সাম্যেরও অভাব ছিল না। কাজেই এই ভাবকোলাহলের মধ্যে যে ধ্বনি প্রথম হইয়া উঠিল তাহা স্বাধীনতার।

ক্রমে সে ধ্বনি কোলাহলে পরিণত হইল। হইবার কারণও ছিল। শিক্ষার সঙ্গে জাগ্রত হইল আত্মবোধ। সে আত্মবোধের সঙ্গে সংঘাত লাগিল বিজয়ী বিদেশীর ঔদ্ধত্যের। রাষ্ট্রের বেদীতে স্বাধীনতা দেবীর প্রতিষ্ঠা হইল। দেশের সাহিত্য ও কলাশিল্প সে দেবীর মন্দিরে শম্মবন্দ্যধ্বনি করিয়া তাহার বোধন আরম্ভ করিল। বহুমুখী দেশমাতৃকায় যে কল্যাণময়ী মূর্তি কল্পনা করিলেন তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন স্বাধীনতা। বাংলার জল, বাংলার মাটি পুণ্য ধূত হইয়া গেল।

কিন্তু ভাবরূপের পূজারী বাংলা শুধু পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। সে বিপ্লবের স্বপ্নও দেখিল। সে স্বপ্নকে সাধক করিতে গিয়া সজীবিত হইল তার ক্ষান্তেজ। বাংলার যুবক সে তেজ-প্রভার লাভ করিল অমরজ্ঞ বীৰ্য ও তিত্তিকা। দেশ প্রেমত ছিল না। তাই বিপ্লবের ধারা একটি মাত্র সূক্ষ্ম খাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু বিপ্লবী বাংলার যুবকের দল যে আদর্শ স্থাপন করিল তাহাতে অগ্রগত প্রদেশ আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না। মহৎ কাজের জন্য দুঃখবরণ দেশের পক্ষে সহজ হইয়া আসিল।

তাহার পর আসিল দেশের স্বাধীনতা। আদর্শবাদী বাংলার কল্পনায় সে স্বাধীনতার হয়ত পুরোপুরি মূল্য দেওয়া হইল না। কিন্তু রাষ্ট্রের এই বন্ধন-মুক্তিকে ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইল। কিন্তু এ স্বাধীনতার আদর্শে প্রাণ-মন ভরিয়া উঠিল না। কল্পনায় স্বাধীনতার যে কল্যাণময়ী রূপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল, বাস্তবের সঙ্গে তাহার মিল রহিল কই? যে জলধারা তাহার কুলপ্রাবনে সাম্রাজ্য প্রাবৃত করিয়া বাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সে বেন শীতের ধারা নদীর হস্ত শীর্ণ-

অত্যাশ্চর্য  
কাপড় কাচার  
পাউডার



মূল্যঃ  
বড় প্যাকেট ১০ টাকা ১২ ন. প.  
সাপোর্ট সাইজ ৫ টাকা ১২ ন. প.  
(স্থানীয় কর ছাড়া)

নীল  
**সার্ফ**

**অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে**

জলে, ফেণার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীত করে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন  
কোথাও এক সমুদ্র!  
আপনি কখনও ডানতেন না যে এত সহজে কাপড়  
কাটা যায়! বেশী পরিচরন নেই এতে! সার্ফ জামাকাপড় কাচা  
মানে এটি সহজ এটিয়া: চেডানো, চেপা এবং থোওয়া মানেই  
আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাদা,  
এত সুন্দর উজ্জ্বল করে! সাট, চামর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু  
কাচার জন্মেই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোণা—ঠাণ্ডা বা গরম

আপনি কখনও পাননি আপনার পয়সার মতো এত চমৎ-  
কারভাবে নিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা  
মেনে নেবেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন

**সার্ফে জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!**

SU. 25-X62 BQ

বিশ্ববাস লিটার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

ধারায় বহিতে লাগিল। হৃৎধার হৃৎযোচন হইল কই? অস্ফা-  
ভাব, অশিক্ষা ও অকসঙ্কার হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হইল  
কই?

জোয়ারের জলগ্লাবনে দেশের ঝাল, নালা, ডোবা ভরিয়া একা-  
কার হইয়া বাইবার কথা, তাহা হইল না। স্বাধীনতার সঙ্গে  
সাম্য আসিল না। বরং বাহাদেব সঙ্গে প্রভেদ কম ছিল তাহাদেব  
সঙ্গে প্রভেদ বেশ বাড়িয়া গেল। দেশবিভাগের ফলে খানা, নালা  
ডোবার সংখ্যা হইল অগণিত। তাহাতে কর্মস জমিল প্রচুর;  
দুর্গন্ধ বিব-বাম্পে চারিদিক ভরিয়া গেল। স্বাধীনতার পরে সাম্যের  
দাবী প্রথম হইয়া উঠিল। সে সাম্যের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন নাই।  
সে সাম্য আদর্শবাদের সাম্য নহে; তাহার জন্ম আত্মপরায়ণতার  
মধ্যে। ভাবপ্রবণ বাংলা আজ সেই মৈত্রী-হীন সাম্যকে পুজার  
বেদীতে বসাইয়াছে। জড়বাদেব মধ্যে আদর্শবাদের মূর্তি খুজিয়া  
কিহিতেছে।

পাশ্চাত্যের 'সাম্য ও স্বাধীনতা'বাদের সঙ্গে সেখানকার  
প্রতিটি মানুষের দাবী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তি-স্বাধীনতা  
তাহার স্বর্গবাণী। আত্মপরায়ণতা তাহার মূলমন্ত্র। প্রতিটি মানুষ  
তার নিজের জন্ত মুখ আহরণ করিবে। প্রতিটি মানুষের জীবন  
তার নিজের; সে যেভাবে ইচ্ছা ইহা যাপন করিতে পারে।  
অশনে, বসনে, ভাবে, ব্যবহারে, শিক্ষায় তার নিজের মতে চলিবার  
দাবী অগ্রগণ্য। এ দাবী শুধু মৈত্রী-বন্ধনেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে  
নচেৎ উহাকে যোগ্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। আর  
সীমাবদ্ধ না হইলে এই উৎকট ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী বর্করতারই  
নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল। একথা পাশ্চাত্যের মনীষীগণ বুঝিয়া-  
ছিলেন। আর তাহা বুঝিয়াই সাম্যের সঙ্গে মৈত্রীকে এক আসনে  
বসাইয়াছেন। আর বসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৈত্রী-  
প্রাধান্তে সাম্যকে বেশে রাশিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক  
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে  
যে নিছক আত্মপরায়ণতা এদেশে আমদানি হইয়াছে তাহা বাংলার  
কাছে বড় লোভনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। এ ব্যক্তি-স্বাধীনতা-  
রূপ দেবী-পুজার ঐশ্বর্যলাভের সম্ভাবনা প্রচুর। ফলও আশা  
পাওয়া যায়। আত্মপ্রত্যয়ী পুত্র-কন্যা আজ পিতামাতাকে সাম্য-  
বন্ধনে বাঁধিতে চায়—মৈত্রী-বন্ধনে নহে। স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী,  
আত্মীয়-স্বজন সকলেই সাম্যবাদী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই  
উৎকট আত্মাভিমান প্রচণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে। ভূমিও মানুষ, আমিও  
মানুষ; আমার জীবন আমার, তোমার জীবন তোমার। কে

কাহার তোরাকা রাণে? এ চিন্তা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে  
দেখা দিয়াছে। ফলে, পরিবারে, সমাজে, জীবনে সর্বত্রই নানারূপ  
সংঘাত। মৈত্রীহীন সাম্য পিতা-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী,  
বন্ধু-বান্ধবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। স্বামী-স্ত্রীর মৈত্রী-বন্ধনও  
শিথিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার গৌরবে পুত্র পিতার নিকট তাঁহার  
সুখস্বাস্থ্যল্যোব দাবী ত্যাগ করিতেছে। পুত্রকে তাহার পিতার  
প্রতি কর্তব্য শ্রবণ কহাইয়া দিলে কেহ নাই। এই ব্যক্তিগত  
জড়বাদ বা দেহাত্মবাদে সাধা দেশ ভরপুর।

এই উগ্র ব্যক্তিতাবাদকে বাংলা দেশ আজ ব্যক্তি-বাদ বলিয়া  
কুলংকরিতেছে। পাশ্চাত্যের সৃষ্টি ব্যক্তিতা-বাদ। উহার উপরেই  
দেশের সভ্যতা ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সে সভ্যতার, সে সমাজের  
দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্য সভ্যতা, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।  
এ দেশের পুঞ্জি ব্যক্তি-বাদ। এখানে ব্যক্তি সমাজকে, সভ্যতাকে  
মাত্র করিয়া আপন শক্তিতে নব নব ভাব রচনা করে। সমাজকে,  
সভ্যতাকে সে অতিক্রম করিয়া, পদদলিত করিয়া বাইতে পারে না।  
এই ব্যক্তি-কর্তব্য ও দাবীর সামঞ্জস্য করিয়া লয়, আত্মাভিমানকে  
সমুচিত করিয়া আনে আর মহৎ আদর্শের জন্ত স্বার্থকে বলি দিতে  
দিয়া বোধ করে না। ব্যক্তি-আদর্শবাদকে সবচেয়ে বক্ষা করিয়া  
চলে, তাহাকে হত্যা করে না।

কিন্তু ব্যক্তিতা-বাদ আত্মপরায়ণতারই নামান্তর। পদে পদে  
সে মৈত্রীকে আঘাত করে; বন্ধনকে শিথিল করিতে চেষ্টা করে।  
দেহাত্মবৃত্তি কোনও কথায় তাহার মন বসে না, জড়জগতের  
বাহিরে তাহার দৃষ্টি বাইতে পারে না। কোন আদর্শের খাব সে  
ধারে না। তাই তার আকর্ষণও অতিশয় তীব্র।

আধুনিক বাঙালীর মন আজ এই দুই বিবে জর্জর। এক-  
দিকে মৈত্রীহীন সাম্যবাদ অগ্নিদিকে ব্যক্তিতা-বাদ। নীচু উচুর  
সমান হইতে চাহিতেছে কণ্ঠের দ্বারা নয়, শুধু বাক্যের দ্বারা।  
দরদের সাম্য তাহার কাম্য নয়; কাম্য সংঘাতেব সাম্য। অপর  
দিকে ব্যক্তি-কর্তব্য তুলিয়াছে, ব্যক্তিতার মোহে। বতদিন স্বাধীনতার  
প্রচেষ্টা বাঙালীর চরমাদর্শ ছিল, ততদিন এই সকল ভাবরূপের  
সাধনার তার মন বসে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বে মহতাদর্শের  
প্রেরণা তাহাকে এতদিন চালনা করিয়াছে তাহা কি সহসা অস্তিত  
হইয়াছে? এই ব্যক্তিতা-বাদের মোহে ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে  
ইংরেজী শিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রতিরোধ  
হইয়াছিল আত্মচেতনার মধ্যে। সে আত্মচেতনার পন্থা ত সেই  
পুণাতন আদর্শবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল। এই দৃষ্টি, এই সংঘাত,  
এই বিচ্ছেদ, এই বিভেদ দূর করিবার জন্ত বাঙালীকে আবার  
আত্মহ হইতে হইবে।

# দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যান্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে  
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? মাড়ীর ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার  
আঙ্গুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে  
দিন তারপর আস্তে আস্তে শিশুর মাড়ীতে মালিশ করে দিন  
এবং ভাড়াভাড়ী ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও হৃদয়  
শিশুদের প্রিয়। এটা বিস্তৃত এবং গৃহকক্ষে, গৃহস্থ হিসাবে, এসময়নে  
ও নানানরকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের  
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

P.M.C

**বিনামূল্যে**

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটি ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান :  
হিন্দুস্থান লিটার লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং ৪০২, বোম্বে ৬।

আমাকে অন্তর্গত করে পিরামীড ব্র্যান্ড গ্লিসারীনের গৃহকক্ষে ব্যবহার  
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার গৃহস্থের দোকানের নাম ও ঠিকানা

---



---



---

PYG. 13-X30 BG

ডিস্ট্রিবিউটরস : অফি. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লি. কলিকাতা, বোম্বে, দিল্লী, ব্রহ্মাবত



## ঠাকুরকবি স্মরণে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৬

আজকের এই দিনটিতে সমুদ্রের এপারে-ওপারে অসংখ্য নবনারী কবিকে ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছে। স্মরণ করছে—কারণ তাঁর লেখা পড়ে অনেক মানুষ সংশয়ের অন্ধকারে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে, কত আশাহত প্রাণ তমসাক্ষর দিগন্তে নূতন উষার আলো দেখেছে, কত ভাবপ্রবণ তরুণ নির্ভরনে তাঁর কবিতা উচ্চারণ করে যজ্ঞের মধ্যে অমৃতব করছে নব-জীবনের স্পন্দন, কত শোকাক্ত হৃদয় তাঁর অমর সঙ্গীতকলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে আশ্বাস সাধনা।

২২শে শ্রাবণ আবার ঘুরে গেল। অনেক বছর আগে শ্রাবণের এই দিনটিতে আমাদের মাঝখানে থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু কবি ত চিরকালের। তাঁর ত কখনও মৃত্যু হতে পারে না। আমাদের মনটা যে তাঁরই হাতে গড়া। আর সত্যিকারের বাঁচা ত মন দিয়েই বাঁচা। বৃক্ষ-লতা পত্র-পক্ষী—কে বেঁচে নেই? কিন্তু তাদের বাঁচা আর মানুষের বাঁচা—এ দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মনের জীবনই মানুষকে স্বাভাব্য দান করেছে। জীবজগতে একমাত্র মানুষই জানে, কি করে মন দিয়ে বাঁচতে হয়।

বিশ শতাব্দীতে তরুণ ভারতবর্ষের মনে যারা নব বসন্তের সবুজ রক্ত ধরিয়েছেন, তার চিত্রলোকে এনেছেন লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া, তার আত্মাকে করেছেন বিপ্লবমুখী, তার দৃষ্টিভঙ্গিমায়ে এনে-ছেন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিশ্চয়ই অগ্রদূত বলতে পারি। গান্ধীজী যাকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন তিনি সত্য সত্যই নবীন ভারতের রণগুরু ছিলেন। অন্ধকারের সমস্ত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করবার প্রেরণা তিনিই আমাদের যুগিয়েছেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, সমাজের দোহাই দিয়ে, রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে কর্তব্যের মুখোমুখি নানা রকমের অজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যে অত্যাচার দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তমস্ফলনি।

সমস্ত রকমের নিরর্থক অশুশাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই যে অভিযানের দৃপ্ত সূত্র—এই অভিযানের প্রেরণা এসেছে মানুষের প্রতি প্রাণের অপরিমেয় প্রজ্ঞা থেকে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এমন একটি আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন যা পরিপূর্ণ ছিল উপনিষদের উদার ভাবধারায়। আশৈশব উপনিষদের অমৃত পান করে ধীর মনের জীবন গড়ে উঠেছিল তাঁর উপলব্ধিতে ঐক্যই যে জীবনের পথম সত্য বলে প্রতিভাত হবে—এতে বিন্মিত হবারকি

আছে? বেদান্তে ধ্যানের যে মন্ত্রগুলি রয়েছে তাদের সার্থকতা ত আমাদের মনের ভেদবুদ্ধিকে দূর্ব করায়। যাকে আমরা সাধনা বলি সে হচ্ছে বিশ্বের সকলের সঙ্গে যোগের সাধনা। এই সাধনায় কবির সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আত্মপর্যবেকের শেষের দিকটায় দেখছি এক জায়গায় লেখা রয়েছে : “নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারিদিকে দাবিত হয়েছিল। সংসারের নিয়মকে ভেঙেছি, তাকে মানতেও চেষ্টা করেছি, মুচের মত তাকে উচ্ছ্বাস কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখানে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে ‘আমার মন’ যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।” ( আত্মপর্যবেকের রবীন্দ্রনাথ )

বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগই যে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মূল সত্য—এই কথাটি উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কত সাধক, কত কবি, কত না বিচিত্র ভঙ্গিমায়ে প্রকাশ করে গেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ভারতবর্ষীয় আত্মার এই চিরকালের বাণী। ‘শিক্ষা’র তপোবন প্রবন্ধে জাতীয় সভ্যতার এ বৈশিষ্ট্যের কথা অননুক্রমণীয় ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন :

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সংহততা নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড় মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিপিলের সঙ্গে যোগে ; এই যোগ অত্যাধিক দূর্ব করে বিনম্র হয়।”

বিশ্বজাগতিকতার এই পরম সত্যের উপলব্ধি থেকেই কবিকর্ত্তে সঞ্চিত হয়েছে :

এস হে আধা, এস অনাধা,  
চিন্দুযুগলমান।  
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,  
এসো এসো খ্রীষ্টান।  
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি কবি’ মন  
যহা হাত সবাকার,  
এসো! চে পতিত, করো অপনীত  
সব অপমান ভার।

আজকের এই বাইশে শ্রাবণে কবির মৃত্যুতিথিতে আমাদেরিগকে হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে সেই মূলকথাটি যা গতো এবং পতো, বিচিত্র রচনার মধ্যে নানা ভঙ্গিতে কবি বাধ বার আমাদেরিগকে

তুলিয়ে গেছেন। কি সেই মূলকথা? আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি :

“ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জানে অশেষতত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কষ্টে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে বে উদ্ভার তপস্বী গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্বী আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মতো এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাধিকভাবে, সাধকভাবে।”

প্রাতিদ্বন্দ্বিনির্দেশে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একেবারে এই জীবন্ত অনুভূতি থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্য হয়েছে বিপ্লবধর্মী। প্রতিবেশীকে যেখানে আমরা আশ্রয় ভালবাসি সেখানে সেই ভালবাসার জীবন্ত অনুভূতি বাক্যের শৃঙ্গগর্ভ উচ্ছাসের মধ্যে কখনও নিঃশেষিত হতে পারে না। সেই প্রেমের অনিবাধ্য প্রকাশ রূপে কষ্টের মধ্যে। মানুষের সম্মানে হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ তাই কখনও নিঃশব্দে সহ করেন নি।

পঞ্জাবে ডারায়ের অমায়ূষিক নৃশংসতার প্রতিবাদে ‘নাইট উপাধি প্রথম যিনি ভাগ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। মহাটানের উপরে জাপানের আক্রমণ নিয়ে জাপানী কবি নোবুজির সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত পত্র-বিনিময় ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক পত্রগুলির মধ্যে মানবপ্রীতির কি উদার সুর এবং বর্করতার বিরুদ্ধে কি তীব্র প্রতিবাদের শব্দনাথ। অস্পৃশ্যতার মধ্যে যে অমায়ূষিক ক্ষয়হীনতা রয়েছে—সেই ক্ষয়হীনতাকেও কি তিনি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিশ্বাস করতেন : মানুষের মধ্যে যারা অধর্মের চেষ্টেও অধম এবং দীনের থেকেও দীন তাদেরও জীবনের এমন একটি মূল্য আছে যার কোন পরিমাণ করা যায় না। বুদ্ধির এবং গায়ের জোরে আত্মকেন্দ্রিক পুরুষ যেখানে নাবীকে মানুষের মর্যাদা না দিয়ে তাকে খেলাঘরের পুতুল বানাবার চেষ্টা করেছে সেখানেও সেই বর্করতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে একই প্রতিবাদের সুর। নাবীর উপরে আজ পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র চলে এসেছে সারা পৃথিবী জুড়ে সুদীর্ঘকাল ধরে—রবীন্দ্রনাথের



রকমাস্বিতাস্ব

স্বাদে ও

ভুগে

অতুলনীয়।

লিলির লজেন্স

ছেলেমেয়েদের প্রিয়।

‘স্বীয় পত্র’ প্রস্তুত-সেই জুলুমের উপরে কি ভীষণ কথাবাত করা হয়েছে। ‘যোগাযোগ’ উপভাস্থানিতে হঠাৎ নবাব মধুসূদন ষোষাল আপন সহধর্মিণী কুমুদিনীকে নারীর স্বধায়া দিতে অস্বীকার করেছে। তার কাছে টাকাই সব—মামুলের জীবনের কোন দায় নেই। নারীর উপরে পুরুষের এই গর্বোদ্ধত অবিচার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে নির্মম আঘাত পেয়েছে—এমন আঘাত এ যুগে আর কোন সাহিত্যিকের কাছ থেকে পেয়েছে বলে আমরা জানিনে।

‘মুক্তকবরী’তে বঙ্গপুত্রীর রাজা সোনার নেশার পাগল। মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে সোনার তালের উপরে তাল জমাতে ব্যস্ত। এ কাজে মামুলের লক্ষ্য। রাজা গাঁয়ের মামুলবলিকে তাই বস্ত্র-হিসাবে ব্যবহার করছে নিজের ঐশ্বর্যকে স্ত পাকার কববার জন্তে। দরিদ্রের দারিদ্র্যের উপরে রাজার ঐশ্বর্য। সে ঐশ্বর্যের মূলে জ্বরহীন শোষণ অর্থাৎ জবজবতম হিংসা। এ শোষণকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নি। বঙ্গপুত্রীর নিজের শাস্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মানসকথা ‘নন্দিনী’ বহন করে এনেছে বিপ্লবের ঝড়। সেই ঝড়ের ঝাপটায় বঙ্গপুত্রীর শাসনসৌধ শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে গেছে।

‘মুক্তধরা’ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে রাজস্রোতের স্তব। বৈরাগী পাড়ার পাড়ার উৎপীড়িত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে অত্যাচারী রাজাকে খাজনা না দেবার জন্তে। ইংরেজ-গর্ভিত রাজা যন্ত্ররাজ বিদ্রুপিত করে মজবুত বাঁধ বেঁধেছিল মুক্তধারার জল থেকে পূর-রাজ্যের নিরীহ জনসাধারণকে বঞ্চিত কববার জন্তে বাতে তারা নিকপার হয়ে রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। এ জুলুমের বিরুদ্ধে সুব্রাজ অভিজিৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং সেই বাঁধ ভেঙে দিয়েছে নিজেকে বলি দিয়ে।

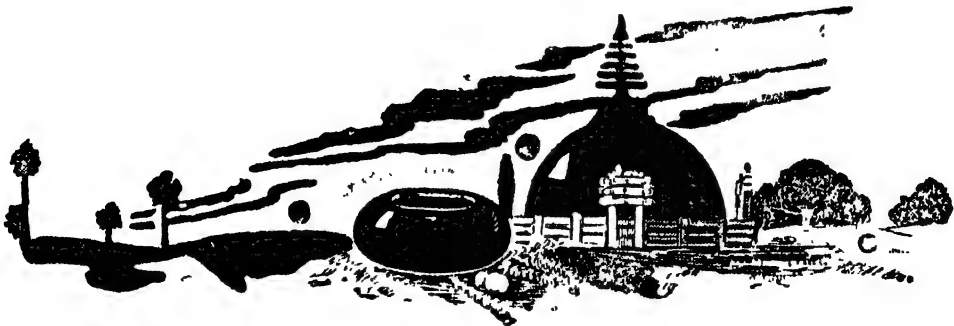
যে রবীন্দ্রনাথ সর্বদেশের সর্বকালের মানুষকে ভালবাসে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ক্ষমতার সর্ববিধ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, যে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে দেশে দেশে উৎপীড়িত মানুষ শিকল ভাঙার প্রেরণা পেয়েছে এবং অত্যাচারীরা শিউরে উঠেছে আতঙ্কে, সেই রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা বিশেষ করে স্মরণ করব। অনেক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে আমরা স্বাধীনতা

লাভ করেছি। এ স্বাধীনতা অটুট থাকবে যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যীভাব অগ্নান থাকে। কারণ পশ্চাত্যকে ভালবাসে যারা তারা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই থাকবে অপরাধের। যেখানে একের জন্তে হাজার জন হাসিমুখে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত সেখানে কি কোন বিপদ ঘটতে পারে।

সব বড় সাহিত্যেই একটি কাজ হচ্ছে : সমস্ত মানুষই যে মূলতঃ এক—এই পরম সত্যকে প্রকাশ করা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করলে আমাদের হৃদয় থেকে বেদবুদ্ধি দূর হয়ে বাবে, আমাদের প্রাণ সম্প্রসারিত হবে, যে মানুষের সঙ্গে আমাদের আচারগত, ধর্মগত, জাতিগত, বর্ণগত প্রভেদ আছে তার সঙ্গেও একটা মৌলিক আত্মীয়তা আমরা অনুভব করতে পারব।

আজকের এই বিশেষ শতাব্দীর পৃথিবীতে ‘টেক্‌নলজি’র দৌলতে ভৌগোলিক দূরত্ব এখন অতিক্রান্ত অপস্রিয়মান, মানুষ এখন মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন একটা কথা বিশেষ করে ভাববার দিন এসেছে। কথটা হচ্ছে : বহুশক্তিকে আশ্রয় করে এই যে বিভিন্ন দেশের মানুষের পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসা—এ নৈকট্য ত নিতান্তই দৈহিক নৈকট্য। শরীর শরীরের নিকটে এল কিন্তু মনের সঙ্গে মনের কোন ঘনিষ্ঠতা হ’ল না, পরস্পরের মধ্যে ভাবের কোন বিনিময় ঘটল না—এমন একটা অবস্থাকে আমরা কখনোই সম্ভাবজনক বলতে পারি নে। তাই ‘টেক্‌নলজি’ যে জাগতিক পরিস্থিতি আজ ঘটিয়েছে তার মধ্যে কল্যাণের আলো আনতে হলে কবিকে চাই যার লেখনীর মুখে থাকে স্বর্গের আগুন—যে আগুনের আভার মানুষ মানুষকে চিনতে পারে আত্মীয় বলে, ভাই বলে, একই স্রষ্টা-স্রষ্টার সমান অঙ্গীকার বলে। রবীন্দ্রনাথ সেই অমর কবি যার বাঁশীতে বেজে উঠেছে, ‘নমি নবদেবতাবে।’ জাতিধর্মনির্কিশেবে সবার দেশের সকল কালের মানুষকে তিনি দেবতাব সম্মান দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।\*

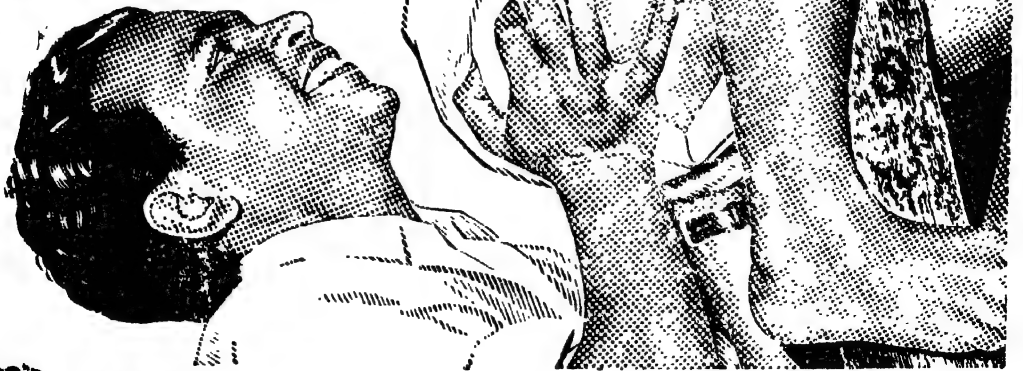
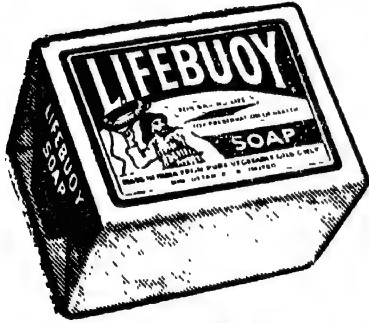
\* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজতে।



যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

খেলাধুলাই বলুন বা কাজকর্মই  
বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে  
নিরাপদ নয় । আর ময়লা বহন  
করে রোগের বীজানু বা সবসময়  
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-  
কর । লাইফবয় সাবান এই  
বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে  
দেয় এক আপনার স্বাস্থ্য  
সুরক্ষিত রাখে ।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান  
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—  
এটি আপনাকে এত ব্যবহারে করে তোলে ।



# পুস্তক পরিচয়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রশ্ন ও উত্তর—  
পাবলিকেশন্স ডিভিশন, গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া দ্বারা প্রকাশিত।  
মূল্য ৪০ নয়া পয়সা, পৃষ্ঠা ১১৪।

প্রশ্নোত্তরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও ফলাফল  
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজকাল বিষয়টি পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত হইয়াছে  
সুতরাং শিক্ষার্থীরাও ইহা না জানিলে চলে না। সাধারণ লোকেরও

পরিকল্পনার কার্যাদি প্রতিদিনই চোখে পড়ে। সুতরাং এই বিষয়ে  
দেশে লোক যতটা ওয়াকিবহাল হয় ততটাই মজল। শেষ পর্যন্ত  
গণসাহায্য ব্যতীত পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সফলতা কিছুতেই সম্ভব  
নহে—বিশেষতঃ গণতন্ত্রী ভারতে। প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থ প্রচার-  
এছের খুবই প্রয়োজন। ইহার বিপুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আনন্দ ডিঃসবে

## ক, হোডের

প্রসারিত সামগ্রী








ক, হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪

হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা—স্বামী বিজ্ঞানবানন্দগিবি।

দত্যাশ্রম, হাকারিবাগ থেকে প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা, পকাশ  
নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা ৪৫১।

ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত পটভূমিকার গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের মনোজ্ঞ-  
আলোচনা করেছেন। ধর্মই যে বিশ্বসংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে,  
ধর্মো ধরাধারক, স্ক্রুতিব এই গভীর জ্ঞানগর্ভ বাণীটি গ্রন্থকার আশ্রয়  
করেছেন। ধর্মের এই ব্যাপ্তিগত অর্থটি গ্রহণ করলে ধর্মগত  
আলোচনা মাত্বেই নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং কৃষ্টিগত জীবনের  
সকল বিষয়ের সম্যক আলোচনার সমর্থক হয়ে পড়ে। তুই  
আলোচ্য গ্রন্থগানির স্রবহুত কলেবরে গ্রন্থকার হিন্দু আধ্যাত্মিক এবং  
নৈতিক জীবনের উৎকর্ষের এবং আদর্শের বিস্তৃত আলোচনা করে-  
ছেন। ধর্মের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের উৎপত্তি-  
বিষয়ক আলোচনার বললেন যে, সকল ধর্মের প্রাতিষ্ঠাতা আছে।  
হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠাতা নেই : এই ধর্মের উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট। তুই  
এই ধর্মকে সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম বলা হয়। এই ধর্মের চারটি  
দিক—তত্ত্ব এবং সাধনা। এই তত্ত্বের স্রবিস্তৃত আলোচনা করতে  
গিয়ে গ্রন্থকার হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের সরল এবং প্রাঞ্জল আলোচনা  
করেছেন। বেদ, উত্তিহাস, পুরাণ, আগম, যজ্ঞদর্শন ও স্মৃতি-  
সাহিত্যের তৎকথা আলোচিত হয়েছে। সাধনা পন্থার আলোচনার  
নানাবিধ যোগপদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে : হঠযোগ, রাজ-  
যোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগের ব্যাপ্যায় গ্রন্থকার যে মননশক্তি  
এবং ভাব্যকরণের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা সহজলভ্য নয়। এ  
ছাড়া বৈদিক কথ্য, স্মার্তকথ্য, পৌরাণিক কথ্য ও তাত্ত্বিক কথ্যেরও  
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু-সমাজে যে বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি  
ধীরে ধীরে আপনার মূল সমাজের গভীরে অমুপ্রবেশ করিয়ে দিল  
তার আলোচনাও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বৈদিক উপাসনা,  
পৌরাণিক উপাসনা এবং তাত্ত্বিক উপাসনার মতকথা গ্রন্থকার সহজ-  
বোধ্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থের প্রথম নয়টি অধ্যায়ে  
গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রবিধির বিভিন্ন তথ্য এবং তত্ত্বাদির  
পর্যালোচনা করে দশম অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক  
পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার অমরা তুলনা-  
মূলক ধর্মালোচনার সূত্র আবিষ্কারে সকল হই। গ্রন্থকারের

আলোচনা এক দিকে যেমন তথ্যমুগ্ন অত্র দিকে তেমনি সহজ ও  
প্রাঞ্জল। আমরা গ্রন্থগানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

স্বর্গ—শ্রীমদ্বোধ বসু। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, বাসবিহারী  
আভিনিউ, কলিকাতা—২। মূল্য দুই টাকা।

আকারে ছোট বলিয়া নয়, 'স্বর্গ'কে একখানি উপজাস না  
বলিয়া বড় গল্প বলাই ভাল। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য  
দ্বিরা লেপক একটি সরস গল্প বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী চামেলী  
কৌতুকময়ী। স্বামীকে রাগাইয়া খুনশুটি করিয়া সদা-চকলা  
চামেলী তাহার ঐ ছোট সংসারটিতে স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই  
স্বর্গই মানুষ কামনা করে, কিন্তু কোথায় সেখানে চামেলী।  
চামেলীর মত স্ত্রী ত সকলের ভাগো জোটে না। স্ত্রী-ভাগ্য  
সকলেই কুলীন। মানুষের এই যে আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা,  
ইহাও লেখকের বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। লেপক আর একটি  
গুণে পাঠক মনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেটি হইল তাহার সরস  
'ভাষালগ'।

কিন্তু একটানা মিলনের আনন্দে প্রেম পূর্ণ হয় না। সেখানে  
প্রয়োজন হয় বিরহের। অর্থাৎ বিচ্ছেদ ছাড়া মিলন সম্পূর্ণ নয়।  
সেই কারণেই গ্রন্থকার তাহার গল্পটিকে দুটি ভাগে ভাগ করিয়া-  
ছেন। একটি মিলনে সম্পূর্ণ, একটি বিচ্ছেদে। গ্রন্থকারকে এই  
জ্ঞান এখানে অতি কঠোর হইতে হইয়াছে। নিশ্চয়তাবে চামেলীকে  
প্রশান্ত বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়াছেন। সাধারণ ভাবে দেখিতে  
গেলে পাঠকের প্রতি গ্রন্থকার অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা  
না করিলে প্রেম পূর্ণতা লাভ করিত না। শ্রীকৃষ্ণ-রাধাকেও এই  
বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইয়াছে, রামের বিরহ ত আজীবন। প্রশান্ত  
এই কারণে জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গল্পের বিষয়বস্তু বিশেষ-কিছু নাই। কথার বাহুতে তিনি  
পাঠককে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। পড়িতে ভাল লাগে, পড়িতে  
বসিলে আর উঠা যায় না—আলোচনাক্ষেত্রে এই ত বড় কথা।  
বইখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই  
বিশ্বাস।

শ্রীগোতম সেন



ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାପନ

କଳାକାର: ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା



ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାମ୍ପାସେ ଉତ୍ତମ ନୂତନ-୧୨୩-୧୨୪

ଆବୃତ୍ତି: ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା



# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নারায়ণ! বলহীনেন লভাঃ”

৯ শতাব্দী  
২২ খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

২২ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### প্রশ্ন

লিখিবাব সময় খবর প্রকাশিত হইল যে, লাদকে চীনায়া নশ্বজন বন্দী ভারতীয় পুলিশ এবং চীনায়েদে আক্রমণে নিহত নয় জন পুলিশের মৃতদেহ “হটপ্রিং” নামক স্থানে ভারতীয় সীমান্ত পুলিশের এক দলের হস্তে প্রত্যাপণ করিয়াছে।

আরও খবর পাওয়া গেল যে, “ভারতীয়” কম্যান্ডি পাটি গোপনে বহু তরুণবর্তক ও সলা-পরামর্শ করিবার পরে, মীরাটে তাহাদের “জাতীয়” পরিষদের সম্মেলনে, এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বৈধা ক্রীপে মাকমোহন লাইনকে স্বীকার করা হইয়াছে। পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে বলা হইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলের “চিরাগত সীমারেখাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে” ভারত সরকারের এই নীতি সমর্থন বিধেয়। বলা বাহুল্য চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের ভূমণী স্ততিবাদ ও প্রশংসা করা হইয়াছে এবং চীনকে কোথায়ও আক্রমণকারী বা অস্ত্র কোন হিসাবে অভিযুক্ত করা হয় নাই। পণ্ডিত নেহরুর এই সঙ্কটকালীন অবস্থায় যে “স্কোটভুক্ত” না হওয়ার নীতি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন এবং যুদ্ধের উত্থাদনার বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও প্রশংসা করা হইয়াছে।

সেই সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পণ্ডিত নেহরুকে তাঁহার জয়দিনে যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাও বিবরণ পাওয়া গেল। তাহাতে শুভেচ্ছার মধ্যে আছে “আপনি পূর্ণ উজ্জয়ে ও স্বেচ্ছায় ভারতের স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও শক্তি এবং চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তির প্রচেষ্টার আরও মূল্যবান সহায়তা করিবেন।”

আমরাও সর্বপ্রথমে পণ্ডিত নেহরুকে তাঁহার সন্তর বৎসর পূর্বে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। তার পর প্রশ্ন এই যে এর পর কি?

পুলিস—জীবন্ত ও মৃত—কিরিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ যে অপসৃত জমির দখল তাহার এক ছটাকও কিরিয়া পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিত নেহরুর নিষ্ক্রিয়তার অভিনন্দন অপহরণকারীদের মুখপাত্রের নিকট হইতে এবং তাহাদের “সমর্থক” অর্থাৎ জহাঙ্গির-উম্মীদারের ঐতিহ্যবাহী-দিগেব—মুখপাত্রগণের নিকট হইতে। তার পর?

স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও মৈত্রী বলিতে মিঃ চৌ-এন-লাই কি বুঝেন তাহাও জানা দরকার। পিকিং হইতে সম্প্রতি প্রত্যাগত এক ভারতীয়ের বিবৃতিতে শুনিতেছি যে, চীন এখন নেপাল, ভূটান, সিকিম ও দার্জিলিং অঞ্চলকে “লিবারেট”—অর্থাৎ স্বাধীনতা দান করিতে দৃঢ়বদ্ধ। ইতিপূর্বে ত্রিসত সম্প্রদায় শোনা হইয়াছে যে, তিব্বতের হাঙ্গামা ঐ স্বাধীনতা দানেই ব্যাপার, তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সন্তানদের কল্যাণ মতে, বাঁচো, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। শোনা যায়, তিব্বতে স্বাধীনতা-বিদ্রোহী মুখের সংখ্যা অত্যধিক এবং তাহাদের “স্ববীভূত” কবায় লোকসংখ্যা কিছু বেশী করিয়া বাইতেছে। “সমৃদ্ধি” পদার্থটা সব দেশে ও সব ভাষায় একই, তবে সেই সমৃদ্ধি কাহার অধিকারে থাকিবে এই প্রশ্ন। মৈত্রী ও শান্তির পূর্ণরূপ দেখা যায় আশানে ও কববস্থানে। সন্তোষ যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই হইয়া গেল।

সমগ্র জগতে, সময়ে ও অসময়ে, পাত্রে ও অপাত্রে আমরা অহিংসা, পঞ্চাঙ্গ, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদির গীত গাহিয়া শুনাইয়াছি। জগতে আমাদের সভ্যতার গুণগান প্রথমে আমরাই করিয়াছি এবং বহন বান্ধু চীনা প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই আন্তরিকতার আরও উদ্ভাবনী দিলেন তখন “হিন্দী-চীনা ভাই ভাই” শব্দে আমরা গগন বিদারিত করিয়াছি। আজ সেই “হিন্দী-চীনা ভাই ভাই” শব্দ শুধু শোনা যায় চীনায়েদে পঞ্চমবাহিনীর মুখে। এখনও কি সময় হয় নাই আমাদের চোখের দুপী খুলিয়া ফেলিবার?

ভারতের প্রায় সত্ত্ব বৎসরের পরাজয়ের ও পরাধীনতার ইতিহাস ত আজিকার এই মুহূর্ত, এই বাস্তবজ্ঞানহীনতারই পূর্ব-কালের ইতিহাস। অহিংসা, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বশান্তি এসকল বাণী ত সেই ২৫০০ বৎসর পূর্বেরকারই বিনয়ের অনুশীলন। তাহার পর আসিয়াছিল বহির্জগতের সকল শক্তির, সকল প্রতিরক্ষার উপায় সম্পর্কে উদাসীনতা। আমরা তখনও কোন “শক্তিজোটে”র অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। কলে, বাগিরের শত্রু ঘরের শত্রুর সঙ্গে নির্বিবাদে যত্নবদ্ধ করিয়া আমাদের পরাজিত করে। তখন বাহিরের শত্রুও এখন সহায়ক ছিল আমাদের ভিতরের বিশ্বাসঘাতকের দল এবং এই ইতিহাসের ধারা ত ১৯৪২ সনের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সম্পূর্ণভাবে দেখা দিয়াছিল। তবে আজ কি সময় হয় নাই চৈতন্য উদয়ের ?

পঞ্চাশের কোনটু আজ অটুট রাখিয়াছেন আমাদের প্রতিবেদী ? পদম্পরের ভৌগোলিক ও ঐচ্ছিক আধিক্যকে ব্যবহারিক স্বীকৃতি দেবার, অক্রমশাস্ত্রক মুখাবর্তিত, পদম্পরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে নিশিগ্ধ থাকি, সঙ্গোপিতা এবং শান্তির সহিত জগতে বসবাস, এই ক পঞ্চাশের নীতিপত্রক। পাঁচ বৎসর পূর্বে এই নীতিই আমরা জগতে প্রচার করিয়াছিলাম সকল যুদ্ধের সকল বিরোধের মধ্যস্থ মচৌষণ রূপে। আজ সে নীতি কোথায় ?

আজ জগতে দুই চলিয়াছে নিরন্তরকরণের। এই মহান আদর্শের কথা তুলিয়াছেন সোভিয়েটের বর্ণনার ত্রুটিশ্চেত তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সন্ধিতান হইবার কোনই কারণ নাই, কেননা তিনি সোভিয়েট বিলিয়াছেন যে, আজ যুদ্ধ মানে জগতে শুধু মানবত্বের অবলম্বন নয়, হুজুমাত্তিরও প্রায় অবলম্বন, কেননা দুই সপ্তক জোটের উভয়েই অধিকারে সমস্ত সভ্যজগত ধ্বংসকারী অস্ত্র বহিরাছে। স্তবরাং যুদ্ধ মানেই দুই পক্ষেরই বিনাশ। ত্রুটিশ্চেত একথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন এবং একথা যে সত্য সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ মানে দুই পক্ষেরই এক-সঙ্গে অস্ত্রত্যাগ। নচেৎ শেষের দিকে যাহার হস্তে ঐ অস্ত্র থাকিবে সে ভবনবিধ্বর্তী হইবেই অস্ত্র পক্ষ নিশ্চিন্ত হইবার জন্য পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইবে, যেভাবে জাপান পরাজয় স্বীকার করে হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিধ্বংসের পর।

এই অস্ত্রই আজ তাঁহা মার্কিনগোষ্ঠীর মনে সন্দেহ জাগিয়াছে টোনেস কার্যকলাপে। এলা নবেম্বর “নিউট্রন বোম্ব” সেই অস্ত্র সম্পর্কেই তেঁকে চিহ্নিয়াছেন :

“এশিয়া ভূমিখণ্ডে কম্যুনিষ্ট নীতি আজ কয়েক মাস ধায় এক প্রচলিত হইয়া বহিরাছে। এনিকে প্রধানমন্ত্রী ত্রুটিশ্চেত মধ্য-বাণী শুনাইতেছেন সকল দলটির পরিষ্কৃতির শান্তিময় সমাধানের, অস্ত্রদিকে সেখানকার (এশিয়ার) পরিষ্কৃতিতে না মায়ুগা না আনোলক, কিছুই দেখা যায় না।”

“সোভিয়েট স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, লাগেমে জাতিসংঘ কোনও

পরিদর্শক নিয়োগ করা তাঁহারা চাহেন না। চীন ও ভারতের মধ্যে মনব্যাক্ষিতে তাঁহারা দুঃখিত একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় কম্যুনিষ্ট ‘লেনিনেন ও কথাবার্তা’ আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা সহিতে পারে না : ভারত সশ্রদ্ধে পিকিংকে যে কোনও সতর্কীকরণ বা সমাধানবাণী মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহারও কোন আভাস এখনও পাওয়া যায় নাই।”

“পিকিং ত কোনও প্রকার স্মরণস্মৃত ব্যবহারের পরিচয় দেয় নাই। যেভাবে ভারতের চিঠির রুট জবাব দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূর্বপরিচালিত নিশ্চয়ই। ‘আচ্ছা, করো ভারতীয়ের মতদেহ আমরা কেবল দিতেছি, তোমরা কয়েক হাজার বর্মমাইল (ভারতীয়) ভূখণ্ড আমাদের ছাড়িয়া দাও’ এরূপ পত্রে নয়াগিল্লী পুলকিত না হওয়াই সম্ভব।”

“উপর যুগ্মে পাওয়া যায় না এই প্রশ্নের, ‘কেন ও কি কারণে?’ প্রতিবেদী ভারতীয়দিগকে এই ভাবে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়া পিকিংকে অধিকারী-বর্ণেরই বা সত্য কি এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্টমেবই বা কোন কাণ্ড মগ্নের হয় ? ভাল চীনারা কি মনে করে যে, এই ভাবে পণ্ডিত নেত্রকে অপমান ও কোণঠাসা করার কোনও লাভ আছে ? এ ভাবে এক বিরাট জাতিকে শত্রু করার কি স্থায়ী লাভ হইতে পারে চীনের ?”

“চীন এখানে শুধু বুদ্ধির প্রভাব দেখাইতেছে এবং সোভিয়েট সেটার গুরুত্ব আবেগ করিতে ইচ্ছুক নহে, বর্তমান পরিস্থিতির এই বিভাে করা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে। একদিকে “বন্ধুত্ব, যৈত্রী” এই সব কথা বলা হইতেছে, অজ্ঞানিক কাব্যতঃ এমন পন্থা লওয়া হইতেছে যাতেই স্থায়ী বিরোধ ও শত্রুতার বীজ বোপিত হয়। ভারত যদি কোন পক্ষভুক্ত না হইয়া কোনও জোটে না যায়, তবে পিকিংই লাভ। অল্প মাও ও চৌ দুই জনে ভারতকে এমন অবস্থায় ফেলিতেছে যে, তাহাকে আত্মরক্ষায় রক্ত অস্ত্রের সচিব ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই অবস্থায় ত্রুটিশ্চেত হাদিমুগে শান্তির আশা জানাইতেছেন। কোনও মানে হয় না এ সবেব।”

বুখিলাম, “কোনও মানে হয় না”, বুখিলাম না যে শুধু তত্ত্বকথার, স্তোত্রবাক্যে এবং শত শত মণ ছাপা “মাগা কাগজে” আমাদের প্রতিরক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের স্বাধীনতা, অর্থাৎ চঞ্জিণ কোটি ভারতীয়ের স্বাধিকার ও স্বাভাব্য বড়, না পণ্ডিত নেত্র এবং তাঁহার পরামর্শ-নাতাদিগের ব্রহ্মক্ষা বড়। যদি পণ্ডিত নেত্রের স্বদেশ-প্রেম সত্যই তাঁহার অস্বাভিমান হইতে বড় হয় তবে কথা বন্ধ করিয়া ভারত-রক্ষার ব্যবস্থা তিনি করুন। “হাম লড়্জে, হাম লড়্জে” এই চীংকার সভ্যজনাচিত না হইতে পারে। কিন্তু “হাম কভি নাঃ লড়্জে” এই চীংকার এখন শুধু হাশ্বকর নহে ইহা ক্রীতধর্মের পরিচায়ক। প্রশ্ন এই, কোনটা বড়, স্বাধীনতা না জিগীর ?

## রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ

গত ৩রা নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি সর্বসম্মত ভাবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে শান্তিকামী মানবসম্প্রদায় তাৎক্ষণিক স্বাগত জানাইবেন। বলা বাহুল্য, মিঃ ক্রাশেনকো পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন আশা ও আশঙ্কায় কণ্ঠ, বিষমতি সামরিকোন্নয়ন অস্বাভাবিক লাভ করিয়াছে। তবে কি ভাবে অনাবিলম্বেরে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-ক্রাস চিরদিনের মত দূর করা বাইবে পারে, তাহার উপযোগী কল্পনায় নিষ্ঠারূপের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এ কথা কেতাই অস্বীকার করিবেন না, যুদ্ধ মানব-সভ্যতার এক কলঙ্ক-স্বরূপ। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-শিল্পে-সংস্কৃতিতে মানবজাতির গত পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার সমৃদ্ধি বড় কম দখল করে নাই। আদিকালের কৃষি ও কুটির-শিল্প দিয়া যাত্রা শুরু করিয়া মানুষ আজ জলে, স্থলে, আকাশে তাহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাত্রা প্রথম যুগে, মধ্যযুগে মানুষের বহনকারী যন্ত্র ছিল, চারু তাহাও একে একে বাস্তব মুষ্টি হবিতোছে। এমন দিনেও মানুষের সেই আদিম প্রবৃত্তি! যাত্রার ফলে, তাহারই সৃষ্ট নগর, জনপদ, বন্দর, শিল্পালা সবকিছুই ধ্বংস হইবে। শান্তি যুগে যুগে মনস্বী, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত যুগেও বলিয়াছেন, অস্ত্রও বলিতেছেন। এই সেদিনও বৌদ্ধনাথ, গান্ধী, বলা, বাদেন্স বিজয়া প্রিয়াছেন, 'যুদ্ধ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।' প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এটি অস্ত্র-পরিত্যগের কথা একবার উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা অকৃত্যেই শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ইহার ভয়ঙ্কর রূপ। আজ মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, ধ্বংসের পথে কলাপ নাই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সময়ে মানুষের যে চতুর্কর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রধানতম অঙ্গ হইল, ভয়মুক্ত জীবন। এই ভয়মুক্ত, সহজ ও স্বচ্ছ জীবন পৃথিবীতে ততদিন আসিবে না, যতদিন যুদ্ধ-ক্রাস মানুষের সম্মুখে অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মত দোদুল্যমান থাকিবে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, ঈর্ষা ও বৈরিতার অবসানও হইবে না।

কিন্তু মানুষ যুদ্ধ করে কেন? যুদ্ধ বন্ধ করিলেই শুধু হইবে না, যে জগৎ যুদ্ধ করে সেই সঙ্গে তাহারও মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। পরদেশ কবলিত করিয়া স্বদেশের ভৌমিক সীমানা বৃদ্ধি করা, অস্ত্র দেশকে দখল ও পদানত করিয়া তাহার লুণ্ঠিত বিত্তে নিজ দেশের তহবিল স্ফীত করা, অস্ত্রকে ঘাড়ে ধরিয়া আপন মতের অনুবর্তী করা, অস্ত্র দেশকে অনগ্রসর রাখিয়া, তাহার বাজারে বাণিজ্যিক একাধিকার ভোগ করা, এইগুলিই হইল যুদ্ধের অবিস্মৃত কারণ। যাবদাশ্রয়গুলির মত এই মূলগত কারণগুলিরও

সর্বাত্মক অপসারণ প্রয়োজন এবং সেজন্য সময় বিশ্বব্যবস্থাই চালায় সাক্ষা দরকার।

## নূতন চুক্তিতে পাকিস্তান

ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত লইয়া যে বিরোধ, বোধহয় এবারে তাহার অবসান হইল। নূতন যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সর্বজনীন ভারতবর্ষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ করি, প্রকৃষ্টে স্বীকৃত করিলেও পাকিস্তান ভাগ করিয়াই জানে, ভারত কণ্টার আশ্রয় কখনও লয় না। কিন্তু পাকিস্তানের তাহার আচরণের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে, সত্যি সে সীমান্ত-বিরোধের নিষ্পত্তি চায়।

এতকাল ধরিয়া এসমস্ত বিরোধের অবসান যে ঘটে নাই তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাদের মিউইবার কোনও শান্তিপূর্ণ উপায় ছিল না। সীমান্ত অনারাসেট হইতে পারিত যদি পাকিস্তানের থাকিত প্রতিবেশী-প্রীতি, আন্তরিকতা ও ক্ষমতার প্রাতি অনুভব। কি কাস্মীর, কি পালের মল, কি দেলা-পাওনা, এখনকি সীমান্ত-রেখাও এত জটিল নহে যে, একটা বোকাপড়া হইতে পারিত না। হইতে অবশ্যই পারিত, কিন্তু পাকিস্তানের অপোষ-বিরোধী মনোবৃত্তিই ইহাদের জিয়াইয়া রাখিয়াছে। জানি না, এ মনোভাব এখনও তাহার সম্পূর্ণরূপে বহুজন করিতে পারিয়াছে কি না।

তবে পাকিস্তানের যে খানিকটা চৈতন্যোদয় হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। নহিলে টুকেরগ্রাম ছাড়িয়া দিতে সে রাজী হইত না এবং সুলীহ সীমানা চিহ্নিত করিতেও অগ্রসর হইত না।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এতদিন বাহা সে করিতে চাহে নাই আজ তাহার এই ধর্ম পরিবর্তনের কারণ কি? পাকিস্তানের বর্তমান কর্তার পেন্ডে-ট পেন্ডে খার সাম্প্রতিক উদ্ভিতে ইহার চিন্তা বহিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা বাইতেছে, ইহা তিব্বতের বর্তমান ঘটনাবলী ও চীনের ভারত-সীমান্ত লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া। আশুব খা মনে করেন, তিব্বত ও আফগানিস্তানের ঘটনার প্রমাণিত হয় যে, মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই উপমহাদেশ সামগ্রিক লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। অনারাসেই অনুমান করা বাইতে পারে, চীনের আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তিই আশুব খাকে বিচলিত করিয়াছে। আশুব খার নূতন নীতির ইহা অস্ত্রতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, টুকেরগ্রাম ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়া পাকিস্তান বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে মাত্র, ইহার মধ্যে কোন বদাগতা বা উদারতা নাই। কারণ টুকেরগ্রাম ভারতবর্ষ। সে অজ্ঞানভাবে দখল করিয়াছিল। এতদিনে সেই অজ্ঞানের অবসান ঘটিতে চলিয়াছে মাত্র। তাহা পর পাখাদিয়া অঞ্চল ও কুশিয়ারা নদী এলাকা সম্বন্ধে যে সীমান্ত হইয়াছে, তাহাও মানিয়া লওয়া চলে।

কিন্তু বাইতেছে, সুলীহ কোটে বেরবাড়ী লইয়া একটা মামলা

চলিতেছে। সুলীম কোর্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর হয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তবে অনুমান করা যাইতেছে যে, নেহরু-নুন চুক্তিতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাই কার্যতঃ হইবে। বেকরাড়ী ইউনিয়নের অর্ধাংশ বোধহয় এই নূতন চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থানেই যাইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা আঞ্চলিক অধিবাসীদের স্থানান্তরের বিষয়। পাকিস্থানের যে সকল উদ্বাস্তু বেকরাড়ী ও অজান্ত অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিতেছে তাহাদের দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হইতে হইবে। ইহার সমাধানই বা কোথায়? তবে স্তরের বিষয়, চুক্তিতে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে, উভয় দেশের মধ্যে বাহাতে কথায় কথায় বিরোধ, সম্বন্ধ দেখা দিতে না পারে সেজ্ঞা উভয় দেশের সীমাবেষ্য দেড়শত গজের মধ্যে কোন বন্দী-বাঁট স্থাপন করা চলিবে না। ইহাতে সীমান্তের উৎপাত, উপদ্রব লাঘবেরও সম্ভাবনা আছে। বাহাই হোক, পাকিস্থান যদি আন্তরিকভাবে ইহা পালন করিয়া যাইতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে উভয় দেশের বিরোধের কারণও যে দূর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আয়ুব খাঁ কাম্বোজের কথাও বলিয়াছেন। কাম্বোজ সম্বন্ধেও এইরূপ একটি সন্তুষ্ট সমাধান হইবে, আমরা নিশ্চয়ই ইহা ধরিয়া লইতে পারি।

### সমবায় খামার

ভারতবর্ষে সমবায় খামার কৃষি যৌথকৃষি-ব্যবস্থার প্রচলন সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ বাগানবাদ চলিতেছে। প্ল্যানিং কমিশন যৌথকৃষি-ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতী; এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে একেবারে নূতন নহে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে যৌথখামার-ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পণ্ডিত নেহরু যৌথকৃষির খুব পক্ষপাতী এবং মনে হয় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে যৌথকৃষি-ব্যবস্থা বাহাতে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যৌথখামারের বিরোধিতা করিতেছেন শ্রী মিহু মাসানী ও স্বতন্ত্রী দল। ইহাদের মতে গণ-তন্ত্রের ভিত্তি হইতেছে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা; এবং সমবায় কৃষি প্রচলন করিলে কৃষকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিবে না, বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের শ্রম নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার সমবায় কৃষির বিরোধিতা করিবার মানসে ইহার বিকৃত রূপও জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, যৌথকৃষির আওতায় কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ।

সম্প্রতি পণ্ডিত নেহরু এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যৌথকৃষির ব্যবস্থার দ্বারা যৌথমালিকানা প্রথা প্রচলন করা হইবে না; ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকিবে। যেকোনো নিজে ইচ্ছামুসারে যৌথকৃষি-ব্যবস্থার নিজের জমিকে সংযুক্ত করিব এবং ইচ্ছা করিলে ইহার বাহিরেও চলিয়া আসিতে

পারিবে। কিন্তু বিপক্ষদল যে কেন যৌথকৃষি-ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছেন তাহা বোঝা যাইতেছে না। ইহা শুধু প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচায়ক নহে, ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ভারতে প্রবল জনবৃদ্ধির চাণে খাদ্যশস্যে ঘাটতি একটানা পরিস্থিতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ভারতের জমিগুলির উৎপাদনশীলতা অজান্তে দেশের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

ভারতের জমিগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে গভীরতম আবাদ করা এবং তাহা সম্ভবপর যদি যান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়। যান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলির একত্রীকরণ প্রয়োজন, খণ্ডজমি ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার অভিপ্ৰায়রূপ। সুতরাং যৌথকৃষি-ব্যবস্থার দ্বারা খণ্ডজমিকে যদি বৃহত্তর এলাকার রূপান্তরিত করা যায় তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই। যে আপত্তি করা হইতেছে তাহার পিছনে আছে গোড়ামি, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্ব-কামনার ষড়্য। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা হইবে স্বাধীন কৃষক-দের স্বাধীন সংস্থা। ইহাতে কর্তৃপক্ষের প্রভাব ন্যূনমাত্র থাকিবে।

বিরোধীদের অজুহাত তুলিয়াছেন যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন, কারণ প্রতিযোগিতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কার্যকরী করিবার সুযোগ দেয় এবং প্রতিযোগিতা বিনা কৃষকদের স্বাধীনতা বজায় থাকিবে না। কিন্তু দ্বিচ্ছান্ত এই যে, ১৯৪৩ সনে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তখন ত চাষীদের প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার ছিল, কিন্তু তবু কেন তাহাদের কয়েক লক্ষকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ অমুসন্ধান কমিটির অভিমতে ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না, অভাব ছিল জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার। দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল খাদ্যশস্যের পরিবহন এবং বণ্টন বৈষম্য এবং সরকার সমস্ত চাউলই তখন খোলাবাজারে ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার বাজারেই সরকার চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন এবং চাউল বিক্রয় করিয়াছিলেন গরীব চাষীরা। পরে সেই চাউলের মূল্য বধন চার-পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায় তখন চাষীদের আর ক্রয় করার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তথাকথিত প্রতিযোগিতার সমাজে লাভবান তাই বাহা আর্থিক-ভিত্তিতে ও ক্ষমতার শক্তিশালী। সমাজে বাহারা দুর্বল ও গরীব তাহারা চিরকালই পদমলিত।

বাহারা আজ প্রতিযোগিতার সাফাই গাহিতেছেন তাহারাও বিশেষরূপে জানেন যে, প্রতিযোগিতার কাহার লাভবান হয়। বর্তমানে বাংলা দেশে যে চাউলের অভাব হইতেছে তাহার পিছনেও আছে প্রতিযোগিতার কুফল, বিভ্রাটী জোতদার ও আড়মলাররা বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখিয়াছে বাহার ফলে খোলাবাজারে চাউলের অভাব হইতেছে, অবশ্য ঘাটতি উৎপাদনও ইহার জন্য কিছু পরিমাণে দারী।

সম্ভার প্রধার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিবেচনাপূর্ণ চিন্তা করিতেছেন না, কিংবা ইহার তাৎপর্য বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। জনসাধারণের চাপে বহুদূর সম্ভব অমূল্য জমি বাড়া এতকাল পতিত পড়িয়া থাকিত, সে সমস্ত জমিকেও বর্তমানে চাষ-আবাদী করা হইতেছে। উর্বর জমির তুলনায় এই সকল অমূল্য জমিতে উৎপাদন খরচ বেশী হইতে বাধ্য। বহু অধিক পরিমাণে পতিত অমূল্য জমিকে চাষ-আবাদী করা হইবে শাক্ষাৎশ্রমে মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। সরকারী কুসমনামা জারী করিয়া শাক্ষেদ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয় এই কারণে যে, ব্যবসায়ীদের চোরাকারবারী ও ফাটকাবাজি বাতীত আর একটি ত্রিনিস ইহার প্রতিকূল এবং তাগা হইতেছে যে, প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচা বেশী।

এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রয়োজন সম্ভার কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলন এবং ইহার ফলে সকল জমিতে উৎপাদন খরচ গড়ে এক পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। মোভিয়েট বাশিয়ার যৌথকৃষি-ব্যবস্থার দ্বারা কৃষিজাত উৎপাদনকে এক মূল্যের পর্যায়ে রাখা সম্ভব হইয়াছে। যেখানে খরচ বেশী পড়ে সেখানে বাধু হইতে অমূল্যক সাহায্য দান করিয়া মূল্যের পর্যায় বস্ত্রের রাশা হয়। ভারতবর্ষে মোতি জমির প্রায় ৪৫ শতাংশ চাষ-আবাদযোগ্য, কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র ৫০ শতাংশ জমিতে চাষ করা হয়, বাকী জমিতে চাষ করা হয় না, কারণ ঐগুলি প্রান্তিক ও অমূল্যের জমি, এবং উহাতে আবাদী খরচা অধিক। সম্ভার কৃষিতে এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

### • বস্ত্রের প্রতিরোধ

দামোদর এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার বহু প্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং নিরোধ, পরিকল্পনা দুইটি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই—বস্ত্রের প্রাবল্য আজও অনিয়ন্ত্রিত। পূর্বেও কয়েকবার আমরা এই বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তাহাতে বলিয়াছিলাম যে, দামোদর পরিকল্পনার দ্বারাই বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নহে। যেদিনীপুর জেলার দুর্দান্ত কংসাবতী ও কেলগাই নদীর বস্ত্র ধংসলীলা প্রায় প্রতি বৎসরই ঘটে, কিন্তু নদীরা কিংবা মূর্শিদাবাদের মত অত সাংঘাতিক হয় না। এ বৎসরও তুলনামূলক ভাবে দেখা যায় যে, যেদিনীপুরের বস্ত্রের প্রাবল্য নদীরা ও মূর্শিদাবাদের বস্ত্রের তুলনায় অনেক কম। নবদ্বীপ ও মূর্শিদাবাদ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার আওতার পড়ে।

বস্ত্র অনিয়ন্ত্রিত হওয়া বাহ্যিক নহে। এবাবকার পশ্চিম বাংলার বস্ত্রের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কোটি টাকার সমান বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র টাকার মারফতেই বস্ত্রের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। মাহুষের জীবননাশ, সম্পত্তিহীন এবং শতনাশ টাকার দ্বারা পরিণত করা যায় না। বেলক লক লোক গৃহহীন হইয়াছে

তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই চাষী এবং তাহাদের গুনবাসিন না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অব্যবহার পরিণত হইয়া থাকিবে। কয়েক বৎসর ধরিয়াই বস্ত্রের ধংসলীলা চলিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েই এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। তাঁহারা প্রকৃতির উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্তমান নদী-পরিকল্পনাগুলি যথোচিত ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ অবশ্য জোর গলাতেই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। তাঁহারা বলেন যে, দামোদর পরিকল্পনা না থাকিলে অবস্থা আরও সাংঘাতিক হইত।

নদী পরিকল্পনাগুলি সফল হইয়াছে মাত্র কয়েক বৎসর এবং এই কয়েক বৎসর হইতেই বাংলা দেশের প্রকৃতিদেবী যেন অত্যন্ত ক্রুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপুর ব্যাঘ্রের হইতে বস্ত্রের মূখ্য জল ছাড়ায় বস্ত্রের দুর্দমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ইহা সাধারণ ধারণা। কর্তৃপক্ষ একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন বলিয়াছেন যে, এই অবস্থা ঘটিতে বাধ্য বস্ত্রের পর্যাপ্ত না আবিহওয়া আপিস হইতে আগমন করে সংবাদ আগে হইতে দেওয়া হইতেছে। বর্তমান দামোদর-পরিকল্পনা অনুসারে সাড়ে ছয় লক্ষ কুসেক পর্যাপ্ত জল ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু বর্তমান বৎসরে বস্ত্রের প্রাবল্য নাকি আট লক্ষ কুসেক পর্যাপ্ত উঠিয়াছিল, এবং এই পরিমাণ জলকে নিয়ন্ত্রণ করা নাকি বর্তমান দামোদর-পরিকল্পনার ক্ষমতার বাহিরে। কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, দামোদর পরিকল্পনায় আরও দুইটি ডাম নির্মাণ করিতে হইবে, তবে নাকি বিরাট জলপ্রোতকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইবে। এই দুইটি প্রস্তাবিত জলাধারের মধ্যে একটি হইবে আয়ারে এবং অপরটি হইবে বংকরের নিকট বুলপাহারী জলাধার।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে যে নদী-বিশেষজ্ঞ দল আসিয়াছিলেন তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুর্দান্তবতাব নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে পরিমাণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল সেই পরিমাণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। শুধু জলাধার নির্মাণ করিয়াই বস্ত্র নিরোধ করা যায় না।

বাংলা দেশের বর্তমান নদী-সমস্যা হইতেছে যে, নদীর জল আছে, কিন্তু নদী নাই। অর্থাৎ নদীর উৎস এলাকার পূর্বে যে পরিমাণ বাধিপাত হইত, বর্তমানেও তাহাই হইতেছে। কিন্তু এই বিরাট জলপ্রোত আজ বাইবে কোন পথ দিয়া? নদীগর্ভগুলি বর্তমানে ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জলের ঢল নাহিলেই বস্ত্রের প্রাবল্য হই কুল ছাপাইয়া উঠে। সারা বৎসর জলপ্রোত থাকিলে পলিমাটি ধুইয়া যায় এবং তাহাতে প্রকৃতি নিজেই যেন ডেজিয়ারের কাজ করে, এবং নদীগর্ভগুলি ভরাট হইলেও সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া বাইতে পারে না।

### বস্ত্র প্রতিকার কি ?

বাঁধ বাঁধিয়া যে বস্ত্র প্রতিবোধ করা যায় না, উপযুক্তি দুই-বায়ের বস্ত্র তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। জল-নিকাশের ব্যবস্থা না করিয়া তাহার গতি-পথকে রুদ্ধ করিয়া দিলে তাহা যে একদিন ক্ষীত হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই ধরা পড়িবার কথা। বাঁধ নির্মাণ করিবার পূর্বে কেন যে তাহার এই কথাটি ভলাইয়া দেগেন নাই ইহাই আশ্চর্য! দশ বৎসর পূর্বে পূর্বতন সেচ-মন্ত্রী জীভূপতি মজুমদার মহাশয় ঠিক এই কথাটি বলিয়াছিলেন, জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া তবে বাঁধ নির্মাণ কর। তখন সে কথাকে কেহ আমল দেন নাই। বাঁধ নির্মাণে গঙ্গা কোথায় বিভ্রমে হইয়াছে, আমরা সে কথা খাজ তুলিব না। যে ক্রটি আজ সমাধান চক্ষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহারই উল্লেখমাত্র করিতেছি।

বর্তমানে বঙ্গ-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী জীনেত্রজ বলিয়াছেন—‘বাঁধ নির্মাণের কথা শুনিলেই তাহার গায়ে জ্বালা ধরে। বঙ্গ-নিরস্ত্রের উপায় হইতেছে অতি ক্রান্ত জল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, জলপ্রবাহ রুদ্ধ করা নহে।’ দীর্ঘকালের অবহেলার মজিয়া যাওয়া নদীগুলি আর নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে, সেই পথ অন্ধ খুলিয়া দিয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত বাধিতেই হইবে, নহিলে বিপদ ঘটিবেই। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। বাঁধে জল ঠেকাইয়া বঙ্গ-নিবারণের চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে সহস্রাব্দ মনে হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির পরিচয় এমন যে, জলধারার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করিলে নূতন নূতন অশুবিধা ও বিপদ সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলার জলনিকাশী ব্যবস্থার মাস্তুলক বিপর্যয় সেইভাবেই ঘটিয়াছে এবং ইহার সামগ্রিক প্রতিকার সন্ধান না করিলে বিপর্যয় আবারও ঘটবে। নদী-নিরস্ত্রের অর্থ কেবল বাঁধ নির্মাণ নয়, বাল্যের সমস্ত নদ-নদী, নালা ও খাল দিয়া বাহাতে জলস্রোত স্বাভাবিকভাবে বহিতে পারে তাহার জঙ্গ সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা প্রয়োজন। দেয়ীতে হইলেও সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

অবশ্য ইহা ছাড়াও, বস্ত্র বিস্তৃতি ও তীব্রতার স্তর কারণও বহিয়াছে। বাঁধের মতই আরও শক্তভাবে জল সরিবার স্বাভাবিক পথ বোধ করিতেছে আমাদের রেলপথগুলি। যে উচ্চভূমির উপর এই রেল-লাইনগুলি অবস্থিত, তাহাতে নদী-নালায় স্বাভাবিক গতি অনেকস্থলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পশ্চিম বাংলার নানাস্থানে শিল্পপুত্রে জল-নিকাশী ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পরিকল্পনাহীনভাবে যেখানে-সেখানে জমির উচ্চতা বাড়াইয়া বাড়ী-ঘর নির্মাণের ফলে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে শিল্পনগরী গড়িয়া উঠিবার ফলে বস্ত্রের উপজব বৃদ্ধি পাওয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতকগুলি প্রতিবোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং বঙ্গ-নিরস্ত্রের সঙ্কলন। তাহার স্থির করেন, বৃহদায়তন বাঁধ অপেক্ষা ছোট ছোট বাঁধ দ্বারা

সুষ্ঠু জল নিকাশী ব্যবস্থা করা অনেক বেশী কলপ্রদ। ইহা ছাড়া, নগরপুত্রে কলে বহু জমি বাহা স্বাভাবিকভাবে জল শোষণ করিয়া লইত, তাহাদের অভাব পূরণ করিবার দরকার হয়। বাঁধ অপেক্ষাও স্বাভাবিক উদ্ভুক্ত জমির জল সরিবার ক্ষমতা বেশী। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি-সংরক্ষণ সংস্থা বস্ত্রাণীভূত অঞ্চলে যেখানে বস্ত্রা পরিমাণ সম্ভব উদ্ভুক্ত জমিতে গভীর মূলবিশিষ্ট ঘাস-লতা-শস্য এবং বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া জমির জল-সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন। ইহা দ্বারা অতি-বধনের ফলে প্রাবনের প্রকোপ বোধ করা সম্ভব হইয়াছে।

পূর্বে আমাদের দেশেও এই সুবিধাগুলি হিস বহায় ফলে বস্ত্র জল অতি-ক্ষীত হইবার সুযোগ পাইত না, কিন্তু এখন বৃক্ষাদি দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়ার বস্ত্র-বোধ ক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া জমিগুলিতে পূর্বে আঁকা-বাঁকা নালা কাটা থাকিত বাহার ফলে বস্ত্র জল উচ্ছসিত হইবার অবকাশ ছিল না—গতি বাহত হইত। সে অবকাশও বর্তমানে নাই। পূর্বে দেশের লোকই এই কাজগুলি করিত। বর্তমানের মতো সরকারের মুখ চাতিয়া তাহার থাকিত না। আপন প্রয়োজনে নিজেবাই তাহার প্রতিবিধান করিত। আজ তাহাদের এই পরমুখাপেক্ষিতাই দেশের সকল সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে।

সমস্যা যে আজ চূড়ান্ত বিপর্যয়কারী আকার লইয়াছে, তাহার সমাধান করাও বর্তমানে সম্ভবসাধ্য নয়। কারণ নদীগুলির পলিমাটি অপসারণ করিতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। শুধু ‘ড্রেজিং’-এর সাহায্যে এই সংস্কারসাধন সম্ভব নয় এবং তাহা বাধসাধ্যও। তা ছাড়া, উহাতে স্থায়ী ফলও বিশেষ হয় না। আর একটি উপায় হইতেছে, নদীকে তার প্রাচীর-ভূমি কিরাইয়া দেওয়া। পূর্ব-পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। সেখানে নদীকে বাঁধের দ্বারা গৃহীত করা হয় নাই। সেইজন্যই বস্ত্র সেখানে শত্রু না হইয়া বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই মনে হয়, বাঁধের পিছনে এখন আর কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া, তাহার কিছু অংশে নদীগুলির আংশিক সংস্কার করিলেও আশাহতরূপ ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু বস্ত্র-নিবোধের কোনও পরিকল্পনাই সার্থক হইবে না বস্ত্রপূর্ণ পথান্ত না মুমূর্ষু ভাগীদেখী পুনরুজ্জীবন লাভ করিতেছে। নামে বাঁধ হইলেও, ফরাকা বাঁধ পলি-অপসারণ কাজেই সহায়তা করিবে। ফরাকা বাঁধের আশ্রয় প্রয়োজন সেইজন্যই। গঙ্গার সহিত ভাগীরথীর সংযোগ বাধামুক্ত করা হইলে, পলিমাটির চাপে নদীখাত ভরাট হইয়া যাওয়ার বিপদ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। ব্যয়সাধ্য হইলেও, ভাগীরথী, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর স্বাভাবিক জলবাহন ক্ষমতা কিরাইয়া না আনিলে বস্ত্রের পৌনঃপৌনিক বিপদ হইতে নিভৃত পাওয়া যাইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে, পশ্চিম বাংলার বস্ত্র-নিবোধ অথবা নিরস্ত্রের প্রধান উপায় নদীপূর্ণের গভীরতা ও জলবাহন-ক্ষমতা বৃদ্ধি। ইহা ছাড়া প্রয়োজন, বাঁধ,



রেলপথ এবং শিল্প-পত্তনের কলে জল-নিকাশী ব্যবস্থার যে সকল নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলির অস্তিত্বপক্ষে আংশিক সাংগ্ৰহবিধান। সমস্তা নিঃসন্দেহে বৃহৎ, কিন্তু সামগ্রিক প্রতিবাদ-ব্যবস্থা ছাড়া আংশিক ও বিকল্প চেষ্টার পশ্চিম বাংলাকে সর্বনাশ: প্রাচ্যের বিপদ হইতে রক্ষা করা যাইবে না, এবারের বজা হইতে রাজা সরকার ও ভারত সরকার আশা করি তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

### গৃহনির্মাণ সমস্তায় মধ্যবিত্ত পরিবার

মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে গৃহনির্মাণ-সমস্তা আর একটি বড় সমস্তা। অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশেই এ সমস্তা অল্প বিস্তর দেখা দিয়াছে। ইহা পূর্বে ছিল না, বৃহৎ পরিবর্তী যুগে এই সঙ্কট ব্যাপক ভাবে দেখা যাইতেছে। অবশ্য তাহারাই এই সমস্তা মিটাইবার জ্ঞান সরকারী, বে-সরকারী চেষ্টাও করিতেছে। সেখানকার সমস্তা প্রধানতঃ গৃহনির্মাণের সরঞ্জামের অভাব—আর একটি বাধা, বিতরণী ব্যক্তি—সাহায্য ব্যবস্থায় বা শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে উৎসুক, তাহাদের ইহাতে মূলধন স্ফূর্তি করিবার অনিচ্ছা। আমাদের দেশে এ দুইটি সমস্তা ত আছেই, উপরন্তু রুচিয়াছে জনসাধারণের দারিদ্র্য। সরকার মূলত হইলে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় অনেকেরই নিম্ন গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন—অর্থদাম্যর্থও তাহাদের আছে। আর সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলে নিয়মিত ভাড়া দিয়া থাকিবার লোকও আছে বটেই। কিন্তু এ দেশে এক দিকে যেমন প্রয়োজনীয় সরকার অপ্রচুর ও দুশূল্য, আর এক দিকে তেমনিই অবিকাশ লোকেরই অর্থদগ্ধতা নাই। যার বানাইবার স্বপ্ন অনেকেরই দেখেন যৌবনে, কিন্তু জমিদার ও সরকারের উচ্চমূল্যের জ্ঞান সে স্বপ্ন কদাচিৎ সত্যে পরিণত হয়। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে গৃহ-নির্মাণের আশা—বিশেষ করিয়া শহর অঞ্চলে সন্দেহবাহিত।

স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার এই কলিকাতার লোকারণ্যে যে ভাবে বাস করে, তাহা অপেক্ষা বোধ করি বনবাসও ভাল। ইহার উপর পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্ভাস্ত আগমনের কলে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়াছে। একটি ছোট ঘরে একটি পরিবারের বাস এখন আর অস্বাভাবিক ঠেকে না। এমনকি একই ঘরে একাধিক পরিবারের বাসও বিরল নহে। স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসন্ন এখানে উঠিতেই পারে না। কোনও ক্রমে মুক্ত আকাশের বিস্তৃতি হইতে মাথা বাঁচাইয়া একটা আচ্ছাদনের নীচে রাজিবাগন করাই এখানে এক-মাত্র লক্ষ্য। ইহাতে প্রাণরক্ষা হয়ত হয়, কিন্তু না বাঁচে মান, না বাঁচে স্বাস্থ্য। এই ধ্বননের অসহনীয় অবস্থা কোন দেশেই কখনো নহে—কল্যাণবাহিনীর পক্ষে ইহা ছুপনের কলঙ্ক।

অবশ্য ভারত সরকার এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সঙ্কট দূর করিবার জ্ঞান অর্থসম্মেলন করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল অর্থসম্মেলন করিলেই ত চলিবে না, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই পরিকল্পনাকে সফল করিয়া

ভুলিতে হইলে, প্রথমতঃ জমির দর বাধিয়া দিতে হইবে বাজারে জমি লইয়া জুয়াখেলা না চলে। দ্বিতীয়তঃ, স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহনির্মাণ অর্থদানের নিয়ম বাস্তবায়ন করিতে হইবে, বাহাতে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের গৃহ-সমস্তা মিটাইতে পারে। তাহার জ্ঞান সূত্রে হারও কমাইতে হইবে এবং ঋণ পরিশোধের সহজসাধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ সব বিষয়ে সরকারের ইচ্ছা হয়ত আছে, কিন্তু সরকারের শুল্ক-পতিই একমাত্র বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

### শিক্ষা-ব্যাপারে গলদ কোথায় ?

শিক্ষার মান কি হওয়া উচিত এ লইয়া তর্কের আর অবসান নাই। সকলেই ভাবিতেছেন, কিন্তু কোন কুল-কিনারা পাইতেছেন না। অবশ্য শিক্ষাধিগণ কি ভাবিতেছে তাহা বলা কঠিন। শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ-বিচ্যুতি এবং অবনতির কতগুলি দিক অবশ্য সকলেরই চোখে পড়িতেছে। কিন্তু তাহার সমাধান কোন পথ ধরিয়া করা হইবে তাহাই বিবেচনার বিষয়। সমাজ-জীবনে জনীতি, আদর্শ-ভ্রষ্টতা এবং বিশৃঙ্খলা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীয়মান হয়, শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞা, বুদ্ধি এবং আচার-অচরণের সূহ ও স্বাভাবিক বিকাশ বাহাতে হয় তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়-সাহায্য-উন্নয়ন-কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ দেশমুখ এই সম্পর্কে কিছু মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষা-সঙ্কট বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছে। তবে ভাবতবর্ষে শিক্ষা-সঙ্কটের প্রকৃতি বিশেষভাবে জটিল। ইহার একটি প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে জীবন ও জীবিকার সমস্তাগুলি এখনও পূর্ণাঙ্গুরি থাপ খাইতেছে না। বাহারা উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে তাহারাও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত আশ্বাস পাইতেছে না। এই অনিশ্চয়তার সামাজিক এবং বৈবয়িক কারণগুলি সহজে এবং অবিলম্বে দূর করা যাইবে না। কাজেকাজেই ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা মানিয়া লইয়াই শিক্ষাধিগণকে বিজ্ঞাবুদ্ধি এবং দায়িত্বশীল আচার-অচরণ অনুশীলনে উত্তোষী হইতে হইবে।

এদেশে ইহা খুবই সত্য কথা। কথ-জীবনে সকলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত নয় বলিয়া শিক্ষাধিগণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে ইহা সঙ্গত নয়। দেশের ভবিষ্যৎ গড়িবার দায়িত্ব যুবক সম্প্রদায়ের। বর্তমান অবস্থার সহিত মানাইয়া লইয়া শিক্ষার সকলরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিলে শিক্ষার এত আয়োজন নিবর্থক হইবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে রাজনীতির প্রভাব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণকে যে পরিমাণ অসহিষ্ণু এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে, সেব্যপ জ্ঞান কোনও দেশে দেখা যায় না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈবয়িক সমস্তাগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানলাভ হওয়া প্রয়োজন—



অল্পকোর্ড, কেবলজে রাজনীতির চর্চা হয়, কিন্তু তাহারা ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। আমাদের দেশের ছেলেরা তাহাতেই জড়াইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার মান নামিয়া বাইবার ইহাই প্রধান কারণ। ইহাতে ছাত্রদের চিন্তা-বিস্কোভ ঘটবেই। শিক্ষার আরোজন এবং সুযোগ বতই বাড়ানো হটক না কেন, ছাত্র এবং শিক্ষকগণ এই সক্রিয় রাজনীতির সংস্পর্শ হইতে দূরে না থাকিলে উন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

প্রায়ই দেখা যায়, কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নগুলির নেতৃস্থ অনেককেই এমন সব গোষ্ঠীর কবলিত হয়, বাহারা সকলপ্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংবন্দের বিরোধী। এদিক হইতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ছাত্রগণের সহিত অধ্যাপক ও অধ্যাপকগণের সম্পর্ক কেবল ক্লাসে লেকচারদান ও বেতন আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকিলে শিক্ষার সত্তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না। মোটকথা, শিক্ষার পরিবেশ স্বস্থ ও স্বাভাবিক করা ব্যাপারে প্রধানতঃ শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের ভূমিকা ও উত্তোণের উপর ইহা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

### উচ্ছৃঙ্খলতাই কি স্বাধীনতা ?

দেশ স্বাধীন হইবার পর মানুষের চাল-চলন, বীতি নীতির এমন হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের সভ্য দেশের নাগরিক রূপে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। কিছুদিন পূর্বে বাকুইপুর রেল-স্টেশনে যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেল, আমাদের জন-মনস্তত্ত্বের গতি-প্রকৃতি বোঝার দিক হইতে তাহার গুরুত্ব অল্প নয়। একখানি লোকাল ট্রেন ঐদিন সকালে বাকুইপুরের কাছাকাছি পৌঁছালে, একজন টিকিট পরীক্ষক ট্রেনে উঠেন। দুই ব্যক্তি ইহাতে ভীত হইয়া—সম্ভবতঃ টিকিট না থাকার, চলন্ত গাড়ী হইতে ঝাপ দেন এবং নিকটবর্তী এক পুকুরে পড়িয়া যান। ঐহাদের একজনকে অচেতন অবস্থার জল হইতে উঠানো হয় এবং হাসপাতালে পথে তাহার মৃত্যু হয়। অপর ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ইহার পরই দুই শতাধিক মানুষের এক জনতা স্টেশন আক্রমণ করিয়া সেখানকার কর্মচারীদের মারপিট এবং হাঙ্গামা সুরু করে। পুলিশ আসিলে, পুলিশের উপরেও তাহারা আক্রমণ চালায়। ইহাতে তের-চৌদ্দজন লোক আহত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অবস্থা আরও আসে।

ইহা বলিতেও লজ্জা করে, ট্রেনে চাপির অথচ টিকিট করিব না—টিকিট চাহিতে আসিলেই মারপিট করিব, এই অজ্ঞার জুলুমকে কোন স্বস্থ ব্যক্তিই সহ্যমুভতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। গাড়ী হইতে ঝাপ দেওয়া এবং তাহার ফলে মৃত্যু দুঃখের হইলেও, সেজন্য চেকার বা রেল-কর্মচারীদের অপরাধ কোথায়? বৃত্তি কোথাও নাই। দুঃখের কথা, এই শ্রেণীর বৃত্তিহীন গুণমিহী আজকাল চলতি বেওয়াজে ধাঁড়াইয়াছে। কারণে অকারণে যেখানে সেখানে দল বাঁধিয়া হু-ছল্লোড় ও মারামারি করা, দোবী-নির্দোষ গ্রাফ না

করিয়া হাতের কাছেই সকলকে পাইকারী হায়ে প্রহার করা যেন প্রতিদিনের ঘটনা হইয়া পড়িতেছে। একথা বলিতেছি না যে, কোন ক্ষেত্রেই মানুষ সঙ্গত কারণে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন না। ভেদন ঘটনাও কখনও কখনও ঘটে এবং অসুচিত ও অ-নাগরিক সুলভ আচরণ হইলেও, তাহার তবু একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু বহুস্থলে এবং বেশীর ভাগ স্থলেই দেখা যায়, অজ্ঞার কবিবার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই যেন ছোট-বড় সব মানুষের লক্ষ্য হইতে চলিয়াছে। আমাদের সমাজ-মনস্তত্ত্ব যে নিতান্ত নীতিহীন ও উৎকেন্দ্রীক হইয়াছে, এমত ঘটনা তাহারই বেদনাদায়ক প্রমাণ এবং এই নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোত যদি রুদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন কিছুই ভবিষ্যৎ নাই। এই অপচিন্তিত মনুষ্যত্বের বিপাকই দেশ রসাতলে ঝাইবে।

### চাঁদা না দিতে পারায় ছুরিকাঘাত

পূর্বে দেখা যাইত, দুই-তিনটি বা তাহারও বেশী পাড়া মিলিয়া একটি বাঘোয়ারী পূজা করিত। এখন বাঘোয়ারীর স্থান অধিকার করিয়াছে সার্কসজানী পূজা। যেহেতু সার্কসজানীর, সেই হেতু সংখ্যামুপাতে ইহার আধিক্য দেখা যাইতেছে। ভক্তির আধিক্য সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। দলাদলি, বেধাবেধি, ক্ষুদ্রতরগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যাস্পৃহা ইত্যাদিই পূজার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ। ইহাতে পূজা হইতেছে না—পূজার নামে কয়েকদিন ধরিয়া দল-গোষ্ঠীর তাণ্ডব। কিন্তু তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইত না যদি চাঁদার দাবির অত্যাচায়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া না উঠিত। একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন বাঘোয়ারী পূজার জন্ত চাঁদা দিতে হইবে এবং সে চাঁদার পরিমাণও স্থির করিয়া দিবে, বাহারা চাঁদা আদায়কারী তাহারা। দাবি অনুযায়ী চাঁদা না দিলে অনেক রকমে নির্ধাতন সহিতে হয়, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই জুলুমবাজির পরিণতি কতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পারে, বরানগরের একটি ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে।

সংবাদপত্রে দেখা যায়, বরানগর গোপাললাল ঠাকুর রোডে কোন ব্যক্তির গৃহে আসিয়া কয়েকজন লোক বেলা প্রায় এগারটায় সময় কালীপূজার জন্ত পাঁচ টাকা চাঁদা দাবি করে। গৃহস্থানী তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলে, এক ব্যক্তি তাহাকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করে। অপর কয়েকজন বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া একটি জায়গায় পকেট হইতে কিছু টাকা হস্তগত করে। এমন সময় গৃহস্থের চাংকারে স্থানীয় লোকেরা ছুটিয়া আসাতে তাহারা বোমা পটকা ফেলিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা তিন ব্যক্তিকে ধরিয়া কেলেন। পরে পুলিশ আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সবই বুঝিলাম। শান্তিও হয়ত তাহাদের হইবে। কিন্তু চাঁদার জুলুমবাজী যদি এই পর্যায়ে পৌঁছায়, তবে স্থানীয় গৃহস্থ

ব্যক্তির সম্বন্ধে ভাবে ছিব কবিত হইবে, বারোয়ারী পূজার টাঙ্গা দেওয়া আরো উচিত হইবে কি না। গার্হস্থ্য জীবন পদে পদে তত্ত্বাবধি দ্বারা সম্রত হইবে, এ অবস্থা সত্যই অসহনীয়।

### বেলঘরিয়ায় নারী-ডাকাত

সমাজ আজ কোন্ ভাবে নারিয়া বাইতেছে, চিন্তা করিয়াও তাহার সঠিক নির্ণয় করা যায় না। এই দুর্ভাগ্যে নারীরাও আগাইয়া আসিতেছে এই সংবাদও কবে কবে পাওয়া বাইতেছে। পূর্বে নারীদ্বারা পুতলীবাঈয়ের নাম শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গলনাগের মধ্যে এতখানি পৌকর দেখা বাইবে, ইহা বলনা করিতেও বাধে। ঘটনাটি ঘটনাছে বেলঘরিয়ায়। গত পূজার বন্ধির দিন দিবাভাগে বতীন দাস কলোনীতে দুইজন নারী এক গৃহস্থ বাড়ীতে সহসা ঢুকিয়া পড়ে। বাড়ীতে তখন পুরুষ কেহ ছিল না। বাড়ীর গৃহিণী প্রশ্ন করিবার আগেই তাহারা ছোরা বাহির করিয়া চাৰি দিতে বলে। ভয়মহিলা অস্বীকার করিলে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া জোরপূর্বক চাৰি ছিনাইয়া লয় এবং নগদে ও জিনিসপত্রে আর চাৰি হাজার টাকা লইয়া যায়। মহিলাটি ভয়ে চীৎকার করিতেও পারেন নাই। এই নারী-ডাকাতদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ঘটনাটি শুকতর নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহার পশ্চাতে দেশের সমাজ-মনস্তত্ত্ব কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহার বৃহত্তর একটি সন্বেদ ঘনিষ্ঠাছে। পুলিশ ইহার কতটুকু দারিদ্ৰ্য লইতে পারে? সমাজের অভাবের যে ফাটল ধরিয়াছে—চিন্তা করিতে হইবে আমাদের সেইদিক দিয়াই। দেশকে বড় করার আগে আজ মানুষকে বড় করিতে হইবে। অমুখ্যাত দেশের মূল্য কোথায়?

### দিবালোকে নৃশংস হত্যাकाণ্ড

২৭শে কার্তিকের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে বাহা পড়িয়া বিম্মিত না হইয়া পারা যায় না। প্রকাশিত দিবালোকে দিল্লীর মত জায়গায় একজন নৃশংস হত্যাकाণ্ড অত্যন্তবাই বটে। সংবাদটি এইরূপ: “আজ (১২ই নবেম্বর) নয়া দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি নতুন কলোনীতে প্রকাশিত দিবালোকে এক নৃশংস ঘটনা ঘটয়াছে। ইহাতে এক দুর্বৃত্তের হস্তে তিন বংশের একটি শিশু নিহত ও তাহার তরুণী মাতা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। পুলিশের প্রবৃত্ত বিবরণে প্রকাশ, উক্ত দুর্বৃত্ত একজন যুবক; তাহার পরিধানে প্যাট ও শাট ছিল। সে বাড়ীর পিছন দিকের দরজার আঘাত করিলে পদ্মাবতী দরজা খুলিয়া দেন। সে বলে যে, সে একজন ‘প্লাবার’ মিস্ত্রী। সে পদ্মাবতীকে আরও বলে যে, জলের পাইপ বেধাঘত করার জন্য বাড়ীওয়ালা তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পদ্মাবতীর ইহাতে কোন সন্দেহ হয় নাই, কারণ জলের একটি পাইপ সত্যই খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য বাড়ীওয়ালা

তাহাকে পাঠাইতে পারেন। তিনি লোকটিকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন।

কিছুক্ষণ পরে লোকটি তাঁহাকে ডাকিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করে, কিন্তু ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল, সে সময় বাড়ীতে আর কেহ আছে কিনা তাহা জানা। পুলিশের বিবরণে আরও প্রকাশ যে, উক্ত দুর্বৃত্ত তাহার পর পদ্মাবতীকে একটি ঘরে লটরা যায় এবং ছোরা দেখাইয়া তাঁহার সোনার হার ও বালা ছিনাইয়া লয়।

তাহার পর উক্ত দুর্বৃত্ত তাঁহার নিকট ট্রান্সগুলির চাবিকাঠি দাবি করে। পদ্মাবতী চাবিকাঠি তাঁহার নিকট নাই বলিলে সে একটি ট্রান্স ভাঙিয়া ফেলে এবং তিন শত টাকার নোটের একটি বাণ্ডিল হস্তগত করে।

এই সময় শিশুটি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া কাদিতে থাকে।

‘কেমন করিয়া কারা ধামাইতে হয়, আমি জানি’—এই কথা বলিয়াই সে শিশুটির গলদেশে এক প্রকাণ্ড ছোরা প্রবেশ করাইয়া দেয়। শিশুটির বক্তাদুত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। মাতার সম্মুখে এই নৃশংস হত্যাकाণ্ড হয়। বাড়ীতে আর কেই ছিল না। প্রকাশ, মহিলাটি দুর্বৃত্তের পদতলে পড়িয়া সন্তানের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার করণ আবেদনে দুর্বৃত্ত কর্পাত করে নাই। তাহার পর পদ্মাবতীকে আক্রমণ করা হয়। দুর্বৃত্ত তাঁহার প্রাণদেহে, পৃষ্ঠে ও বাহুতে ছোরা মারে। তিনি ৫৬ জায়গায় ছোরাব আঘাতে আহত হন।

তিনি আততায়ীর কবল হইতে নিজেকে কোনক্রমে মুক্ত করিয়া বাড়ীর বাহিরে ছুটিয়া বান, কিন্তু সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করিতে তাঁহার কিছু সময় লাগে। ইহার অন্ততম কারণ, তিনি হিন্দুস্থানী জানেন না, তবে প্রধান কারণ হইতেছে ঐ অঞ্চলটিতে বসতি খুব বিরল; বাড়ীগুলি বহুদূরে অবস্থিত। হত্যাकाণ্ডের প্রায় শেষ ঘণ্টা পরে নয়াদিল্লী পুলিশের ক্রাইং স্টোরড ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং মহিলাকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। তাঁহার অবস্থা এক্ষণে বিপন্নরূপে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।”

দিন দিন বেকর অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে শান্তিতে বসবাস করা একরকম কঠিন হইয়া পড়িল। মানুষ কাহার উপর নির্ভর করিবে, যেখানে কোন নিরাপত্তাই আশাশ্রয় নয়। সমাজজীবন যদি এইভাবে নিরন্তর বিঘ্নিত হইতে থাকে তবে মানুষ দাঁড়ার কোথায়?

### রেলপথে দুর্নীতি প্রতিকারে রেল-কর্তৃপক্ষ

দুর্নীতি আজ সমাজজীবনে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, রেলের বাজী-গাড়ী, মালগাড়ী, শেড, পার্কেল আপিস ইত্যাদি হইতে অবিরত রেলের মালপত্র চুরি, রেলের বাজী-গাড়ীতে ডাকাতি ও খুন এবং রেলের মহিলা-গাড়ীর উপর দুর্কাবহার হইতেছে। ইহাতে রেল-কর্তৃপক্ষও বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। এই সব অনাচারের কিতাবে স্ত্রী প্রতিকার হইতে

পায়ে, সে বিষয়ে তাঁহারা দেশের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন।

রেল দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় সম্পত্তি। উহার ক্ষতি জাতিবৈহীন ক্ষতি। সে ক্ষেত্রে রেলের রাজী-গাড়ীতে যদি ডাকাতি ও খুন এবং মহিলা-রাজীর সন্ত্রাসহানি ঘটে, তাহা হইলে সকলেই রেলের ভ্রমণ করিতে ভয় পাইবে এবং রেলের রাজস্বহানি ঘটবে। সুতরাং রেলের এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু এই সব অনাচারের প্রতিকার-পন্থা কি হইতে পারে তাহাও ঐ সঙ্গে চিন্তা করা দরকার। এই জন্ত সর্বত্র প্রয়োজন জনসাধারণের সহযোগিতা। কারণ দেশের সর্বত্র নানা স্থানে রেলের মালপত্র একরূপ ভাবে ছড়াইয়া আছে বাহ্যিক কলে কোনও পুলিশী-ব্যবস্থা দ্বারা তাহার সম্যক প্রতিকার হইতে পারে না। কিন্তু কথা হইতেছে, জনসাধারণই বা কিভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারে? রেল যে সব দ্রুত মালপত্র চুরি করে, তাহারা সংবন্ধ এবং অনেক সময় রেলের প্রহরী ও অস্ত্রাস্ত্র-কর্মচারীদের সহিত তাহাদের বোগসাজস খাকে। তারপর কর্তৃপক্ষের নিকট দ্রুতগতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলে, অনেক সময়েই তাহারা ধরা পড়ে না এবং বরা পড়িলেও প্রায়ই তাহাদের শাস্তি হয় না। এ জন্য বাহারা দ্রুতগতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়। একরূপ অবস্থার জনসাধারণ রেলের নানা অনাচার দমনে কর্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে গিয়াও পিছাইয়া আসে। রেল-কর্তৃপক্ষও যে ইহা না জানেন এমন নয়। সুতরাং রেল-কর্তৃপক্ষই উচিত, আগে ঘর শায়েস্তা করা, না হইলে ইহার প্রতিকার কোন দিনই হইবে না।

### বালকের বীরত্ব

আন্দুলের একটি বালক নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া, অগ্নিকুণ্ড হইতে বরষ এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি তেলের গুদাম জ্বলিতেছিল, ভিতরে বিপন্ন পিতা, বাহিরে ক্রন্দনরতা তাহার কণ্ঠ। অসহায় মেয়েটি আতঙ্কিত চীৎকার করিতেছে—সেখানে বহু লোকই জমিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই ঐ অগ্নিকুণ্ড হইতে বন্ধকে বন্ধা করিতে আগাইয়া আসিল না। যে আসিল, সে নিতান্তই বালক। বরষে ঐ মেয়েটিই সমান হইবে। কিন্তু সে বিধবাত্ন না করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িল। সুখের বিষয়, তাহাকে আঙনে ধক্ক হইতে হয় নাই—বন্ধকে লইয়াই সে ফিরিয়াছে।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত অমূল্যবায়। দেশে নৈতিক চরিত্রের অবনতির দৃষ্টান্তও বহু রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে এমনি বহু গোপন উজ্জ্বল উদাহরণ। এ বীরত্বের পুরস্কার হয়ত কেহ দিবে না, কিন্তু মানুষের অন্তরে ইহাদের আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। একটি শিখা হইতে শত শত দীপ জ্বলান যায়, একটি

দৃষ্টান্ত হইতে সেইরূপ অসংখ্য লোক অমূল্যের পাইবে ইহাই আমরা আশা করি।

### ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠন

ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবি আজ নতুন নহে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর যখন তাঁহারা ক্রমতঃ অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন সে মনোভাব তাঁহাদের দূর হইয়া গেল। এই ব্যাপারে তাঁহাদের অনাগ্রহ যে কিরূপ প্রবল তাহা অজ্ঞবাজা গঠনে প্রথমে অসম্মতি ও পরে বাধ্য হইয়া সম্মতিদান হইতেই বুঝা যায়। অথচ ভাষার ভিত্তি যে রাজ্যগঠনের স্বাভাবিক ভিত্তি হওয়া উচিত তাহা দেশ-বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ ব্যক্তিই স্বীকার করেন। মহাত্মা গান্ধীও ইহা চাহিয়াছিলেন।

মাতৃভাষা মানুষের প্রিয়তম বস্তুগুলির মধ্যে একটি। স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শাসক-শক্তির খেয়াল যদি তাহাকে ভিন্নতর পরিবেশের সহিত সংযুক্ত করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে সেই ভাষাভাষীদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। সে প্রতিক্রিয়া যে অনেক সময় গুরুতর অবস্থাদেও সৃষ্টি করিতে পারে—সে অভিজ্ঞতা ভারত সরকারেরও গত কয় বৎসরে কম হয় নাই।

বিহারে অমূল্য ঘটনা ত লাগিয়াই আছে। শুনা বাইতেছে, চাণ্ডীল প্রকৃতি কতকগুলি এলাকার বাংলাভাষী অধিবাসীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে এবং অস্ত্রপ্রকাণ্ডে তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবন বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা হইতেছে। এ সংবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা চলে যে, ভাষাভিত্তিক সংগঠন দপ্তরের অ্যান্টিস্ট্যাট কমিশনার চাণ্ডীল, ইছাংগড় প্রকৃতি পাঁচটি অঞ্চলে এ সবকিছু সমজমিনে তদন্ত করিতে বাইতেছেন।

তদন্তের কলকল বাহা হইবে তাহা অনুমান করিয়া বলা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা অবশ্যই বলা চলে, এইসব অঞ্চলগুলিকে বাংলাভাষী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে বহু অপ্রীতিকর এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা দূর হইতে পারে। এই দিক হইতে চিন্তা করিয়াই কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার যখন ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্যের পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই বাংলা, উড়িষ্যা ও মিজোরাম কথাও ঐ প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। রাজ্য পুনর্গঠনের সময় বঙ্গভাষী তিন হাজার বর্গমাইল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বিহারের অন্তর্গত ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণা, পুণিরা, আগামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া ও কাছাড় এবং জিপুরার বাংলাভাষী-অধিবাসিত এগারো হাজার বর্গমাইল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাকী আছে। এই সব অঞ্চলের বাংলাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমস্ত লক্ষ হইবে। ভারত সরকার যখন ভাষার-ভিত্তিতে

বাহাই রাজ্য পুনর্গঠনের কথা চিন্তাই করিতেছেন তখন পশ্চিম-  
দ্র, উড়িষ্যা ও মিলিয়ার সঙ্গত দাবির বৌদ্ধিকতা উপলব্ধি করিয়া  
শ্রুতিকূল অবস্থার নিশ্চেষণ হইতে এইসব ভাবাবাদীদের রক্ষা  
নব্বেন, ইহাই সকলে আশা করে।

### দণ্ডকারণ্যে বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার সৃষ্টি

দণ্ডকারণ্য স্বত্বকে বিভিন্ন আলোচনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে  
হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। উদাহরণের প্রায়ই সেখানে  
পাঠানো হইতেছে, অথচ তাহার কিরিয়া আসিতে চাহিতেছে  
কেন? দু-এক দলের কথা নয়, সকলের যুগ্মেই একটা অসন্তোষ  
দখা যাইতেছে। কারণ নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। দণ্ডকারণ্যের  
ঐচ্ছল সম্ভাবনা স্বত্বকে সরকারী প্রচারকাণ্ডের ফলে শিবিরবাসী  
উদাহরণ যে সেখানে নব-ভীরনারত্বের জন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল,  
ইহা তাহাদের কথাতাই বুঝা যায়। তবে একথাও স্বীকার  
করিতে হইবে যে, জনমত তাহাদের সেই উৎসাহ-বর্ধনের প্রচুর  
প্রয়ত্ন করিয়াছিল। আজ যদি উদাহরণের মধ্যে অনাগ্রহ বা  
নিরাসাহের সরকার হইয়া থাকে, তবে দণ্ডকারণ্য স্বত্বকে সরকারী  
অ-ব্যবহার দ্বারা, এ কথা অপ্রীতিকর হইলেও বলিতে হইতেছে  
সরকারী সতর্কতা সম্বন্ধে দণ্ডকারণ্য-পরিবর্তন সম্পর্কে দুর্বোতি,  
বিশৃঙ্খলা ও অ-ব্যবহার যেসব উদ্বেগজনক সংবাদ নানা সময়ে  
প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা শিবিরবাসী উদাহরণের মনে  
দি দণ্ডকারণ্য-ভীতি এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে,  
তবে তাহাদের উপর সেজন্য দোষারোপ করা সঙ্গত হইবে না।  
দণ্ডকারণ্য ছাড়িয়া যেসব উদাহরণ চলিয়া আসিয়াছে, দণ্ডকারণ্য  
স্বত্বকে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টির তাহারও কিছু উপকরণ  
বাগাইয়াছে এ কথাও সত্য।

দণ্ডকারণ্য পরিবর্তন রূপায়ণের ব্যাপারে পরিচালক স্থানীয়  
শক্তিবর্গের মধ্যেই যে নানাপ্রকার বাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে এবং  
প্রধানতঃ তাহার ফলেই যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতেছে,  
সে কথা আজ গোপন নাই। এখন দলাদলি, বেবায়েরি, বাদ-  
বিসম্বাদ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহাতে পরিবর্তন  
মানচাল হইয়া বাইবার উপক্রম হইয়াছে। ওনা বাইতেছে,  
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-দপ্তরের সেক্রেটারী এই স্বত্বকে তদন্ত  
করিতেছেন।

এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দণ্ডকারণ্য-  
পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেখিতে দেশবাসী আগ্রহান্বিত। সততা ও  
নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য পরিচালিত হইলে সেখানে উদাহরণের সূত্র  
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হওয়ার কোনই কারণ নাই। যে পরি-  
বর্তনের সার্বক রূপায়ণের উপর সহস্র সহস্র ব্যক্তির স্বাভাবিক  
জীবনে হুপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির  
অকর্মণ্যতা, খেয়াল বা অনাচারের ফলে তাহা বার্থ হইয়া বাইবে,  
দেশবাসী তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

গলদ অনেক দিক দিয়াই চুকিয়াছে বাহা সর্বত্র হইতেছে,  
এখানেও তদন্তরূপ—কাজ হইতেছে না অথচ টাকা উড়িয়া  
যাইতেছে। জানি না, তদন্তের ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, কিন্তু  
সরকার কঠোর হইলে ইহার সূত্র সমাধান যে হইয়া বাইবে ইহা  
নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। সূত্র সম্পাদনের পথে বাহারা বাধা,  
তাঁহারা যত প্রভাবশালী ব্যক্তিই হউন, তাঁহাদের অপসারণে  
দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন যে সরকার পাইবেন, এ কথা জোর করিয়া  
বলা যায়।

### মানুষের আয়ু ও বিষ

জাল-ভেজালের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা যতই বাড়িতেছে,  
তাহাদের কঁাকির প্রক্রিয়াও সেই হারে বাড়িতেছে। পৌরসভার  
হেলথ অফিসারের বিরুদ্ধিতে তাহার সামান্য অভ্যাস পাওয়া যায়।  
তাঁহারা বলিতেছেন, গত তিন মাসের মধ্যে প্রায় চার শত আড়তে  
এবং কারখানার হান্না দিয়া সরিষা, সরিষার তেল, ঘি, মাখন, পম,  
মসলা ও চায়ের ৭০০টি নমুনা ভেজাল-সন্দেহে সংগ্রহ করিয়াছেন।  
বাসারনিকের বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রেই সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত  
হইয়াছে। দুই হাজার মণেরও উপর খাদ্যস্বা আটক করা  
হইয়াছে। ভেজালের শতকরা হার নাকি প্রায় আধাআধ।  
পুরাপুরি ভেজাল শুনিলেও লোকে বিশ্বাসিত হইত না। কারণ  
তাঁহারা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চোরাকারবার, কালো-  
বাজার, জিনিসের দুর্খল্যতা এবং দুস্তাপ্রাপ্তার মানুষ এমনিতেই  
নায়েহাল ও দিশেহারা হইয়া আছে। ভেজালের উপদ্রব বোঝার  
উপর শাকের আটি মাত্র।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য তবু ইহারা বাঁচিয়া আছে—নেহাং পরমাণু  
আছে বলিয়াই বাঁচিয়া আছে। আজ তাঁহারা নিরুপায়ের মত  
ইহাই ভাবিতে শিখিয়াছে, জিনিসটা খাটি নাই বা হইল, ভেজালটা  
অন্ততঃ যেন নির্ভেজাল হয়। অর্থাৎ দুধে জল থাকে থাকুক,  
জলটা নির্দোষ হইলেই হইল, যেন ডাক্তার না ডাকিতে হয়।  
আবার ডাক্তার ডাকিয়াও রক্ষা নাই—ওঁথো ভেজাল। খাদ্যস্বা  
তবু শুধু ভেজাল, ওঁথো বলায় অনেকগুলিই জাল। এই জাল-  
ভেজালের তথ্য পূর্বে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের  
ধরিবার জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাও অনেক করা হইয়াছে। কিন্তু  
ভেজালের যাত্রা কমিতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই  
চলিয়াছে।

প্রতিকারের উপায় চিন্তা অনেকেই করিতেছেন, কিন্তু সকল  
উপায়কে বার্থ করিয়া দিয়া তাহাদের অবাধ রাজত্ব চলিতেছে।  
পৌরসভার হেলথ অফিসার বলিতেছেন, গুরু পাণে লঘু দণ্ডের  
ব্যবস্থাই আমাদের কাল হইয়াছে। শাস্তির লক্ষ্য হইতেছে  
দুইটি। এক, অপরাধীর চরিত্র সংশোধন, দুই, অপরাধ নিবারণ।  
নামমাত্র সাজার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছে না।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তরের সচিব একটুখানি আশার বাণী  
ওনাইয়াছেন। ঔষধপত্রাদি সম্পর্কিত আইনটি 'এমনভাবে

সাশোধন করা হইবে বাহাতে শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। রাজ্য-সংকাহগুলিও নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও পাঠানো হইবে। আইন-মাজিক ওষধ তৈয়ারী হইতেছে কিনা দেখিবার জন্যও ইনসপেক্টর নিয়োগেও কথা চলিতেছে।

কিন্তু কথা হইতেছে, এইরূপ বিবিধ ব্যবস্থা বহুবার হইয়াছে। যে ব্যবস্থার কোন ফল হইবার নহে, প্রতিকারের নামে বিবিধ প্রক্রিয়া করিলেও কি তাহা বন্ধ হইয়া বাইবে ?

ইহা বন্ধ করিতে হইলে সরকার বাহা করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিতে হয় : সে দেশে ঠিক এইভাবেই ৬,৭০০ লোক বিধ-ক্রিয়ার কবলে পড়িবার পর, সরকার স্বাধীনায়নিকর অপরাধের জন্য সুপ্রদত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ-ব্যবস্থা এদেশে অনেকের হস্ত মনঃপূত হইবে না। তাহারাজ্যীয় বিচারের যুগে কিরিয়া বাইতে চাহিবেন না—সভ্যতার দোহাই দিবেন। কিন্তু কোন সভ্যদেশে আজও খাড়াব্রো বিধ মিশাইতেছে ? অপরাধ কাহার বেশি, যে-ব্যক্তি একদিনের লোকের প্রাণ চরণ করে তাহার না যে ব্যাধেরা অসংখ্য মানুষের জন্ত সুস্থ্য নিষ্ঠুর কাদ ঘটনা করিয়া রাখে তাহাদের। আজ হউক, কাল হউক, এ প্রবন্ধের ভাব সরকারকে দিতেই হইবে। আমাদের প্রশ্ন এই যে, একটি মাত্র হত্যার অপরাধে যে অপরাধী, তাহার জন্ত কাসিম ব্যবস্থা বহন এদেশে আজও বহাল আছে তখন এই ভেজাল দিয়া ব্যাপক হত্যার শাস্তি কি হওয়া উচিত ?

### কানপুরে পুলিশের গুলীবর্ষণ

কানপুরে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কারণে পুলিশের গুলীবর্ষণ এবং এই গুলীবর্ষণের ফলে ১১ জন লোক নিহত ও বহুলোক আহত হয়। উল্লিখিত জনতা পুলিশের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে, একটি সাং-পোষ্ট অপিসে আগুন জ্বালাইয়া দেয়, একখানি বাত্মহী বাস ও একটি পোষ্টাল ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করে। এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, আততায়ের মোট সংখ্যা ১০ জন, পুলিশ সহ ১৩৭। নিহতদের মধ্যে দুই জন কলেজের ছাত্র, একটি বালক ও ৪০ বৎসর বয়স্ক একজন মহিলা আছে। কালেক্টর গঙ্গাধার উপর জনতা ইট-পাটেকল ছুড়িতে থাকে। পুলিশ লাঠি চার্জ বহিরা এবং কাঁড়নে গ্যাস ছুড়িয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলে গুলী চালায়। যে উপলক্ষে এই ঘটনা ঘটয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, শহরে রটরা বার জনৈক বিবাহিতা মহিলাকে একজন হেড কনষ্টেবল খুঁশালা হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া ধানার ভিতর তাহার স্ত্রীলতা হানি করে। যে হেড কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনা হয়, তাহাকে তখনই সাসপেন্ড করিয়া হাজতে রাখা হয়। কিন্তু হেড কনষ্টেবলকে জনতার হস্তে অর্পণ করার জন্য জনতার পক্ষ হইতে দাবি জানান হয়। পুলিশ এই দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করার জন্য জনতা কিন্তু হইয়া উঠে। কানপুর শিল্প-অধ্যুষিত অঞ্চল, একবার কোন উপলক্ষে উচ্ছৃঙ্খল দৈন্য দিলে সহজেই উহা চাহিলিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে

এবং উত্তেজিত জনতা শাস্ত করা কঠিন হয়, যে ব্যাপারে ১১ জন লোক নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অভিশুর গুরুত্বপূর্ণ। আইন ও শৃঙ্খলা বন্ধার বাহারা নিরোজিত, তাহাদেরই একজন যদি একটি বিবাহিতা নারীর স্ত্রীলতা হানি করে, তাহা হইলে সে অভিযোগও গুরুতর। দিল্লীতে সম্প্রতি যে রাজ্যপাল সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে নিরস্ত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ বন্ধ করার কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। উহার কিছু পরেই কানপুরে পুলিশের এই গুলীবর্ষণের ঘটনা যেমন মধ্যস্থিত, তেমন শোচনীয়। সম্প্রতি একাধিক স্থানে একাধিকবার উত্তেজনা দেখা গিয়াছে, এবং হাঙ্গামার মধ্যে লুণ্ঠ-তর্কাত্মক চেষ্টাও হইয়াছে। প্রত্যেক বড় শহরে জনসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে জনতা একবার দলবদ্ধ ভাবে দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিলে তাহাকে ছত্রভঙ্গ করা কঠিন, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, উহাতে নিরীহ ব্যক্তিরাও মারা পড়ে। কানপুরেও যে তাহাই হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক কথা বার। প্রত্যেক গুলীবর্ষণের পরেই প্রশ্ন উঠে যে, নিরস্ত জনতার উপরে পুলিশের গুলীবর্ষণের অবসান হইবে কবে ? অস্ত্র নিকে এরূপ প্রশ্নও ভাবাত্মক যে, জনতা অল্পকালে এত অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হয় কেন ? কানপুরের ঘটনার উত্তেজনায় কারণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু সামাজিক অবস্থার মধ্যেই এমন এক প্রতিকূল আবহাওয়া বর্তিতেছে যে, প্রায় সকল মানুষের যবোই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান পর্যন্ত আজ অস্তিত্ব হইয়াছে।

### বেকারদের কথায় জীনেহক

বেকার-সমাজ যে আমাদের দেশে কি ব্যাপক আকার লইয়াছে তাহা হায়দরাবাদের একটি জনসভায় জীনেহকই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, বহু লোক তাহার নিকট যায় এবং চাকুরীর আর্থনা জানায়। কিন্তু তিনি কোথায় চাকুরী খুঁজিয়া পাইবেন ? একজন পিওন নিয়োগেরও ক্ষমতা তাহার নাই। কারণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যারকতে পিওন বাছাই হইয়া থাকে। সেই নির্বাচিত পিওনের মধ্য হইতেই তিনি কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন। তাহার আপিসে তিনি একজনও পিওন নিয়োগ করেন নাই। গবর্ণর বা রাষ্ট্রপুত্র নির্বাচনের ক্ষমতা তাহার অবশ্য আছে। কিন্তু বিভাগীয় চাকুরী-গুলিতেও বাধা-ধরা নিয়ম-কানুন আছে। জীনেহক যদিও ঠিক কথাই বলিয়াছেন, তথাপি সাধারণ লোক সে কথা মানিতে চাহিবে কেন। প্রধানমন্ত্রী যদি চাকুরী দিতে না পারেন তবে কে পারিবে ? শুধু প্রধানমন্ত্রী নহেন, যিনি বেখানে যে কোন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাদের সকলের নিকটেই বহু লোক কাজের জন্য গিয়া থাকেন। “যে কোন একটা কাজ দিন” এই কাতর আবেদন লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট হইতে প্রতিদিন যে কতবার শুনিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। জীনেহকই যদি বলেন, কোথায় কাজ খুঁজিয়া বাহির করিব, তবে অন্যোরা কি বলিতে পারে ? প্রধান-

মৃত্যুর নিকট আবেগন জানাইবার সুযোগ সকলের হয় না, কিন্তু সরকারী বেসরকারী যে সকল কর্তৃচরীর দ্বারা সকলের জন্য অব্যাহত তাঁহারা নিশ্চয়ই এই অমূল্যবোধের আতিশয্যে তাঁহারা অপেক্ষা বহু গুণ বেশী বিপন্ন। নিয়ম-কানুন তাঁহারা বাঁধা থাকিতে পারেন, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ত নিয়ম-কানুন মানিয়া দেখা দেয় না। তবে একটা কথা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সকলেই চাকুরী করিব এই মনোভাবী হ্রস্ব করিতে না পারিলে, কেহই কিছু করিয়া দিতে পারিবে না। এইজন্যই বাঙালীকে কেহাণী অপবাদ সত্ত্ব করিতে হইতেছে। জীবিকার জন্য উপায় আশাধরই অল্প বাছিয়া লইতে হইবে।

### জঙ্গাপুর বক্ষা-হাসপাতাল

২য়নাথগঞ্জে 'ভারতী' পত্রিকা জানাইতেছেন :

জঙ্গাপুর হাসপাতালে বক্ষা রোগীদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রচুর। কোন রোগী এখানে হাসপাতালে গেলে তাকে বহরমপুরে পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। বহরমপুর চেষ্টা ক্লিনিক হইতে পরীক্ষা হইলে তাহা বসিয়া দেওয়া হয়। রোগী সেই প্রেসক্রিপশন এখানকার হাসপাতালে দেখাইলে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ-ইন্জেকশনাদির জন্য বহরমপুরে লেখা হয়। বহরমপুর হইতে ঔষধ সংগ্রহ করা হইলে তবে রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। স্থানীয় হাসপাতাল শুষ্ক মধ্যবর্তী পোষ্ট অফিসের মত কাজ করে। এই সরকারী কাহনা-কানুনের দীর্ঘমুত্রী পথে ঔষধ আসিয়া পৌছাইতে অনেক দেরি হয়। তাহা ছাড়া, বহরমপুর হইতে কোন সময়েই চিকিৎসার পরিমাণ অসুবিধারী ঔষধ সংগ্রহ করা হয় না। বাঁহাকে বহরমপুর চেষ্টা ক্লিনিক হইতে কুড়িটি ইন্জেকশন লইতে বলা হয়, তাঁহার জন্য শেষ পর্যন্ত বহরমপুর হইতে এখানকার হাসপাতালে ছয়টি ইন্জেকশন হয়ত আসিয়া পৌছায়। ইহার কলে রোগীদের অসুবিধা হয়। আমরা চাই, বক্ষা রোগীদের চিকিৎসার যেন সরকারী দ্রুত পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষধ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

### বারাসতের সদর রাস্তা

'বারাসত' পত্রিকার এই সংবাদটির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পথের দ্রুতি মানুষকে বিপন্ন করে ইহা তাঁহাদের স্বপ্ন বাধা উচিত।

পূত চায় রাস ঘরিয়া অত্যধিক বৃষ্টিপাত বর্ষাজনিত কারণে বারাসত শহরের অল্পবিস্তর প্রায় সমস্ত পথের দ্রুতি হইয়াছে। যে সমস্ত পথের উপর দিয়া বাস, লরী প্রভৃতি ভারী যানবাহন চলাচল করে ইহার দ্রুতি খুবই বেশী হইয়াছে। পীচগুলি উঠিয়া গিয়াছে অথবা কাটিয়া গিয়াছে এবং পীচের পার্শ্ববর্তী উভয় দিক গভীর খাদে পরিণত হইয়াছে। এই খাদগুলি এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় নষ্ট করিয়াছে যে, দ্বিজ, সাইকেল কেন পারে-হাঁটা

পথিকের বিপদ যে কোন অসতর্ক মুহুর্তে ঘটতে পারে। যদিও বারাসত পৌরসভা বড় বড় গর্ত ও খাদের উপর কিছু কিছু মাটি ফেলিতেছেন কিন্তু এই ব্যবস্থা কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। কেন না বাস, লরী প্রভৃতি ভারী ভারী যানবাহনের চাকার চাপে আসল মাটি কয়েকদিনের মধ্যেই উঠিয়া বাটবে এবং বর্তমান ভিত্তি পথ একটু শুষ্ক হইলে ইহার দ্বারা ভীষণ ধূলার সৃষ্টি হইবে। প্রকৃতপক্ষে বর্ষায় স্মৃতিশ্রুত পথগুলির আমূল সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে। বারাসত পৌরসভার দৈনিক বাজার হইতে রেল গেট পর্যন্ত পথটার পীচ বাধাই আরও প্রশস্ত করা আবশ্যক। এই পথের উপর ব্যাথাকপুর বোড ও কুসনগর বোডের বিভিন্ন বাস চলাচল করে। হরিতলা হইতে রেল গেট পর্যন্ত কয়েক ফার্সং পথের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় এবং বিপজ্জনক হইয়াছে। দ্বিজা-চালকেরা পথের স্তম্ভ ভীষণ কষ্টভোগ করিতেছে এবং দ্বিজাগুলিও দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

### করিমগঞ্জ হাসপাতাল

করিমগঞ্জে 'যুগশক্তি' পত্রিকার এই সংবাদটি সত্য হইলে ইহার সম্বন্ধে প্রতিকার আবশ্যক।

করিমগঞ্জ হাসপাতালে রোগীদের আগমন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বর্তমানে যে সমস্ত কর্তৃচরী আছেন তাহাদের দ্বারা কাজ চালাইয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। হাসপাতালে স্থানভার হেতু বহু রোগীকে বাব'লার বাস করিতে অথবা ফিরিয়া বাইতে হইতেছে।

হাসপাতালের সম্প্রসাধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কথা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্তৃচরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এই হাসপাতালে একজন ডেসাও এবং আরও একজন কম্পাউণ্ডার নিয়োগ সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষ মহল হইতে যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল তাহাও এ পর্যন্ত পূরণ করা হয় নাই। তদুপরি লেডি ডাক্তারও বর্তমানে ডিক্রপেডে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং লেডি ডাক্তার ছাড়াই এখন হাসপাতাল চলিতেছে। প্রকাশ, এপিডেমিক ডাক্তার অল্প বয়সী হওয়ার হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে উক্ত পদে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। কলে, একজন মহকুমা মেডিকেল অফিসার ও আর একজন এসিষ্ট্যান্ট সার্জনকে দিয়া হাসপাতালের সমস্ত কাজ চলিতেছে। তার উপর বহিরাছে করিমগঞ্জ জেলের কাজ—মহকুমা মেডিকেল অফিসার জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

আরও একজন ডাক্তার, একাধিক কম্পাউণ্ডার, ডেসাও ও একাধিক নার্স এই হাসপাতালে অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। একজন হেলথ ভিজিটরও প্রয়োজন। লেডি ডাক্তার ছাড়া এই হাসপাতাল চলিতে পারে না। অবিলম্বে এখানে একজন লেডি ডাক্তার নিযুক্ত করার জন্য করিমগঞ্জবাসীর পক্ষ হইতে সরকারের কাছে দাবি জানাইতেছি।

করিমগঞ্জ হাসপাতালের সব অব্যবস্থা দূরীকরণ এবং সাংগঠনিক উন্নয়নকল্পে আসায় সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা বাইতেছে।



### বালুরঘাট সদর অপসারণের চেষ্টা

বালুরঘাট 'আজেরী' পত্রিকা নিয়ে সংবাদটি দিতেছেন :

গত ১২ বৎসরকাল হইল বালুরঘাটে জেলার সদর রহিয়াছে। কিছুকাল হইল বালুরঘাট হইতে জেলা সদর অপসারণের বিকল্পে ত্রুপল আন্দোলন হয়। তখন ডাঃ বার বিকল্প পন্থা হিসাবে জানাইয়া দেন যে, বালুরঘাটের উন্নয়ন ও বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করিয়া বালুরঘাট হইতে সদর শহর অপসারণ করা হইবে না।

এখন এক যুগ পূর্ব জেলা সদর অপসারণের কোন প্রসঙ্গই উঠে না। কিন্তু প্রবিশ্রুতি অমুখারী বালুরঘাটে কোনরূপ উন্নয়নমূলক কাজও এ যাবৎ কাল আরম্ভ হয় নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ বালুরঘাট মহকুমা হাসপাতালেই সদর হাসপাতালের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। কিন্তু যখন বালুরঘাট শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার তখনকার হাসপাতালে এখন পঞ্চাশ হাজার লোকের কিরূপ চিকিৎসাকাঙ্খা চলিতে পারে তাহা সহজেই অস্বপ্নের।

শৌভাগ্যের এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের শাসন চলিতেছে। বালুরঘাটের উন্নয়নের জন্ত ১৯৫০ সাল হইতে হেলপথ স্থাপনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়, কিন্তু সর্কাপেক্ষা বিষয়ের বিষয় এই যে, হেলপথ নির্মাণ পবিবলনাটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পবিবলনায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

### পালিতপুর-বক্শের তা রোড

বর্তমানের 'দামোদর' পত্রিকায় এই সংবাদটি উল্লেখযোগ্য। কারণ প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া এই রাস্তাটির মূল্য অনেকখানি। বর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

বর্তমান সদর থানার সরাইটিকর ইউনিয়নের অন্তর্গত মনগিয়া, পালিতপুর, নতুনগ্রাম, সিজপাড়া, দিউড়া প্রভৃতি গ্রামগুলির একত্রে বহির্গমনের পথ "পালিতপুর-বক্শের তা রোডটি" বর্তমান-কাটোয়া রাস্তার দেওয়ানদীঘি হইতে পালিতপুর পর্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটি বর্তমান জেলা বোর্ডের অধীন কিন্তু ১৩৬৫ সাল হইতে উক্ত রাস্তাটির কোনরূপ মেয়ামত হয় নাই। কলে গত বৎসর হইতে রাস্তাটির উপর কয়েকটি বৃহৎ ভাঙ্গন হইয়াছে। গ্রামগুলি হইতে দৈনিক বহু ছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিকে বর্তমান বাইতে হয়। তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই। পর্যবসিত ব্রিটিশ ভারতে কোন দিন রাস্তাটি মনুষ্য যাতায়াতের অসুপযুক্ত হয় নাই বলিয়া গ্রামগুলির অধিবাসীগণ এক মিলিত আবেদন জানাইয়াছেন।

### মহিলা যাত্রীদের অভিযোগ

সংবাদটি বাহির হইয়াছে জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকায়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

যে বাসটি জলপাইগুড়ি হইতে বারপল্ল বা বালুরঘাটে যার সেই

বাসটিতে যাত্রীদের যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। দুই-পাল্লার যাত্রীদের জন্য, বিশেষ ভাবে মহিলাদের জন্য পথের মাঝে মাঝে বিশ্রামাগার, পায়খানা ও প্রস্রাবাগার না থাকিলে মহিলা যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। বর্তমানে বেলে দেখা বাইতেছে কয়েকটি কামখাতে মিলিটারীগণ যাতায়াত করে এবং সাধারণ যাত্রীদের সেই কামখার ওঠা সম্ভব হয় না। এই অবস্থার যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানে বিশেষ অসুবিধা হয়। নর্থ ব্যাক এক্সপ্রেস, লক্ষ্মী, আমিন-গাঁও এক্সপ্রেস প্রকৃতি গাড়ীতে মিলিটারীদের জন্য আলাদা রিজার্ভ কামরা থাকার প্রয়োজন। তাহা হইলে সাধারণ যাত্রীগণেরও সুবিধা হয়—মিলিটারী চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে না। নতুবা প্রায়ই যে গণ-গোল হইতেছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

### দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণে নূতন ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় দলিল-দস্তাবেজ রক্ষার দপ্তর হইতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিটি এইরূপ : "ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক বহু প্রাচীন দলিল, চিঠিপত্র, হস্তলিখিত দ্রব্যাদি ভারতের নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়ানিয়া আছে। এই সকল দলিলাদিতে ভারতের অতীত যুগের বিষয়-বাপার সম্পর্কে আলোকসম্পাত করে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাতভাবে উহা ছড়ানিয়া থাকায় বা সর্বত্র বন্ধিত না হওয়ার উহা যে কোন সময় নষ্ট হইয়া বাইতে পারে। জাশনাল আর্কাইভস উহা বিভিন্ন স্থান হইতে একস্থানে মজুত ও রক্ষা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। একত্র তাঁহারা জনসাধারণকে অমরোপ জানাইতেছেন, ঐতিহাসিক মূল্য আছে এরূপ হলুদ হস্তলিখিত জিনিস, দলিল, ফরমান, নিশান, পরোয়ানা, সনদ ইত্যাদি যাহাদের নিকট আছে, তাঁহারা যেন নয়াদিল্লীর দলিল-রক্ষা-দপ্তরে উহা দান করেন। জাতীয় স্বার্থেই ইহা বিশেষ প্রয়োজন। দলিল-দপ্তর ইতিমধ্যে এরূপ দুই হাজার দলিলপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল্যবান তথ্যসম্বলিত জিনিস যদি কেহ দান করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বিক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলেও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সরকার উহা ক্রয় করিতে পারেন। দান বা বিক্রয় কিছুই করিতে যাহারা রাজী নহেন, অথচ তাঁহাদের জিনিস যদি প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহা হইলে সরকার অগত্যা সেই সকল দলিলের চিত্র রক্ষা করিবেন। যেচ্ছার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সকলেরই এই সকল অতি-মূল্যবান জিনিস জাতীয় দলিল-রক্ষাগারে দান করা উচিত। বহু প্রাচীন চিঠিপত্রাদি ইতিপূর্বে অস্বপ্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুণ্যতন জিনিস রক্ষা সম্পর্কে সকলে সমান আগ্রহশীল নহেন। এক পরিবারের কর্তব্য নিকট বাহা বিশেষ মূল্যবান, তাঁহার বংশধরের নিকট হয়ত উহা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। কোন জিনিসের কি মূল্য, তাহা অনেকে উপলব্ধিও করিতে পারেন না। জাতীয় দলিল-রক্ষাগারে উহা দান করিলে যেমন উহা সর্বত্র বন্ধিত হইবে, তেমনই ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেও



উহা স্বর্ণীয় হইয়া থাকিবে। এই কারণেই প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি-পত্র-নলিলাদি বাহা বাহার নিকট আছে তাহা সংগ্ৰহ দপ্তরে জানাইতে, দান বা বিক্রয় করিতে কিংবা উহার মাইকোস্কিফ করিয়া রাখিয়া দিতে আমরাও দেশবাসীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ, ইহা জাতীয় কর্তব্যেরই অঙ্গ।

### সর্বাধিক প্রাচীন গম্বুজ আবিষ্কৃত

ইন্ডার দরিয়ার তীরে শক উপজাতিগুলির প্রধানদের একটি কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর স্থাপত্যের ইতিহাসের সমস্ত গম্বুজের মধ্যে এই কবরের গম্বুজই সর্বাধিক প্রাচীন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পল্লিবন্দেয় কেরেসপণ্ডিং মেম্বর এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের নেতা সের্গেই তলস্তফ জানাইয়াছেন, এই নবাবিকৃত গম্বুজটি নির্মিত হইয়াছিল যোমের সর্বাধিক প্রাচীন গম্বুজওয়ালা ইমারতগুলি নির্মিত হওয়ার দুই তিন শত বৎসর পূর্বে। একতাল সোকেব এইরূপ ধারণা বহুস্থল ছিল যে, এই ধরনের ইমারত প্রথমে নির্মিত হয় রোমে, তার পর বাইজানটিনায়ে (প্রাচ্য যোম রাজ্যের রাজধানী কন্সটানটিনোপলে)। পরবর্তী যুগে এই স্থাপত্য-রীতিই এশিয়ার অমুকরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত কবর আবিষ্কৃত হওয়ার এই ধারণা এখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

### বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে শ্রীমদীরঞ্জন দাশ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে শ্রীমদীরঞ্জন দাশ বৃত্ত হইয়াছেন। এই পদে তাঁহার নিয়োগ অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। কিছুদিন ধরিয়া বিশ্বভারতীর মধ্যে স্কলারশিপ, কলহ, ক্ষমতার কাড়াকাড়ির জন্য যে বিশৃঙ্খলাবৎ সৃষ্টি হইয়াছিল শ্রীযুক্ত দাশের নিয়োগে এবার তাহার অবসান হইল। শ্রীযুক্ত দাশ এই বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগ। ইহার আদর্শ ও লক্ষ্য একদিন তাঁহারও জীবনানন্দের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। আজ দেশবাসীর অঙ্গ তাহাকেই সত্য করিয়া ভুলিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছে। উপাচার্য্য হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য মাসিক দেড় হাজার টাকা দক্ষিণা শ্রীদাশ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, ছাত্র ও কর্মী-কল্যাণের জন্য সমর্পণ করিবেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ ত্যাগব্রতে উৎসাহ হইয়া তিনি বিশ্বভারতীকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলুন এবং কবিগুরুর স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলুন—জাতির পক্ষ হইতে ইহা অপেক্ষা বড় লক্ষ্যার্থ্য আর নাই।

বিশ্বভারতীর কর্তৃত্ব লইয়া দীর্ঘদিন ভুল গোলমাল বাহা চলিতেছিল নতুন উপাচার্য্য প্রবীণ ব্যবহারজীবী এবং ভারতের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের বিনি একদা প্রধান ছিলেন, তাঁহার বিচার-বিবেচনার এইবারে গোলমালের মূল অপসারিত হইবে আমরা আশা করি।

### ডঃ জন মাথাই

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয়

অর্থমন্ত্রি ডঃ জন মাথাই বক্তৃতা ক্যালারোগে গত ২২ নবেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। ডঃ জন মাথাই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী জিছুড়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাস্ত্রাজ খ্রীষ্টান কলেজে কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র-জীবন শেষ করিয়া তিনি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এবং অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স হইতে তিনি ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ডঃ মাথাই মাস্ত্রাজ হাইকোর্টে আটনত্রীবি হিসাবে প্রবেশ করেন। তাহার পর তাঁহার দীর্ঘ-কর্ম জীবনের অনেক পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃ রাজনীতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিয়াছিল প্রায় জীবন-সাম্রাষ্ট্রে, জীবনের আরও নানাক্ষেত্রে—শিক্ষার, শিল্পে আর বাণিজ্যে—তীক্ষ্ণবী এই মানুষটির প্রতিভার প্রভাব বহন স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ডঃ মাথাইয়ের প্রধান পরিচর—এ যুগের তিনি এক অসামান্য অর্থ-নীতিবিদ। অর্থনীতির মৌল রহস্যগুলিকে তিনি অধিগত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যাপারে জ্ঞানার্জনই শুধু লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল আরও দূরপ্রসারী—ব্যবহারিক প্রয়োণের মাধ্যমে তাঁহার জ্ঞানকে তিনি কলপ্রসূ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শিল্প-জীবনে সেই জ্ঞানের প্রভাব যে কতখানি কলপ্রসূ হইয়াছে, সে কথা আজ কাহারও অজানা নাই। পরবর্তীকালে—স্বাধীনতালাভের পর, এদেশের রাজনৈতিক জীবনেও সেই সফলের অংশভাক্ত হইয়াছে। ডঃ মাথাইয়ের মৃত্যুতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন একটি আসন আজ শূন্য হইয়া গিয়াছে, অনতিকালের মধ্যে বাহা পূর্ণ হইবার নহে।

### অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু

প্রখ্যাত নাট্যকলা-বসিক, নটগুরু ও শিক্ষাত্রী অধ্যাপক মন্মথ-মোহন বসু গত ২৮শে আশ্বিন পরলোকগমন করিয়াছেন। বঙ্গ বঙ্গালয়ের সহিত অধ্যাপক বসুর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁহার এই লোকান্তর প্রাপ্তির কলে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি তথা সাহিত্য ও নাট্যকলার রাজ্য হইতে একজন প্রবীণ মনোবীর আসন শূন্য হইয়া গেল। স্কটশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি পরে স্কটশচার্চের অধ্যাপক হন এবং সুদীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। শিশিরকুমার ভাড়াড়ী, ডঃ ক্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র। বাংলা নাটক ও নাট্যালয়ের আদি যুগ হইতেই তিনি ইহার সহিত সংগ্ৰহিত ছিলেন এবং একাধারে নাট্যকার ও নাট্য-ব্যাখ্যাতা হিসাবে দেশে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। বাংলা নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ লেখেন। গির্দাশ-বক্তা হিসাবেও নাট্য-কলার উপর তিনি বর্ষেই নতুন আলোকপাত করেন। বার্ষিকো পর পর দুই পুত্রের পরলোক প্রাপ্তির পরও স্থির শাস্ত্র জ্ঞানতপস্বীর মত তিনি দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। একরূপ লোক বর্ষমান্নে বিরল।

## গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমবা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছি। আগামী ১লা অক্টোবর, ১৩৬৬ হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৬৭-এর মধ্যে লেখকগণ প্রেরিত গল্প লওয়া হইবে। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

- ১। নাম
- ২। ঠিকানা
- ৩। প্রেরণের তারিখ
- ৪। ইতিপূর্বে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।
- ৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামের পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার লক্ষ্য।

গল্পের গুণানুসারে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

- (ক) সর্বোৎকৃষ্ট গল্পের লক্ষ পুরস্কার একশত টাকা,
- (খ) পরবর্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির লক্ষ পুরস্কার পাঁচাত্তর টাকা,
- (গ) পরবর্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির লক্ষ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের লক্ষ পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার লক্ষ্য প্রদত্ত গল্প অন্ত কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা চায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্ত্র প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার কলাকল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কর্তব্যাক—“প্রবাসী”

# ঐতিহাসিক আচার্য্য যত্ননাথ সরকার

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কামুনগো

৮

Mommen বলিয়াছেন, ইতিহাস এক হিসাবে পবিত্র বাইবেল পুস্তক, পাশ্চাত্য ও শরতীন সমানভাবে উহা কাজে লাগাইতে পারে। স্বদেশী যুগে দেখিয়াছি খুনে বিপ্লবীর এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে “গীতা”, মুখে “বাসাংগি জীর্ণানি যথা বিহায়...”। এখন শুনিতেছি, Karl Marx-র বহু পূর্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ “সাম্যবাদ” (Socialism) প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভগ্ন ব্রাহ্মণ কায়মৌ স্বার্থের স্বাতিরে গীতার অপ-ব্যাখ্যা করিয়া নিজে ডুবিয়াছে, বেশ ও জাতিকে ডুবায়াছে। স্বদেশী “মহাসভা” গীতা আবৃত্তি করিয়া প্রমাণ করিতেছে অন্যায় “কংগ্রেস” স্বদেশী বৃষের অবশিষ্ট পাখানা ভাঙ্গিয়া বিয়াছে, জবাই করিতে ইতস্ততঃ করিবে না; ভগবান বলিয়াছেন, “চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টম্”, সেই সমাজ কোথায়? অজাতি বিজাতি বিবাহ করিয়া হিন্দু-সন্তান বর্ণসঙ্কর জন্মাইতেছে, কিন্তু “সঙ্করান্নবকায়েব চ...”; মুসলমানের ভোটের জোরে মুসলমানী দায়ভাগ হিন্দুর উপর চাপাইয়াছে, হিন্দুর মধ্যে বিশ্বাসী বিবাহ করিয়া বাপদাদার সম্পত্তির উপর কামড় বসাইবে। “হিন্দু ফাঁপড়ে পড়িয়া ভাবিতেছে, আজাদী বাধি, না হিন্দুয়ানি বাধি? পণ্ডিতজীর চেয়ে আওরঙ্গজেব খারাপ কি ছিল? ইহাই সনাতন মনোভাব,—গজাকে উত্তর-বাহিনী করিয়া গজাধরের জটাঙ্কলে পুনঃস্থাপনের প্রয়াস।

আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া আমরা কবিতা আওড়াইয়া মনকে প্রবেশ দিতেছি :

“দ্বিতীয় বাবর ভারতের বজ্রভূমে হইয়া উঠয়  
অতিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন। কিংবা  
অতিক্রমী পূর্ব বিমাত্রিকান্তার, দিল্লীর ভাঙার রাশি  
করিতে লুণ্ঠন ভীমবেগে দস্তা-প্রোত আনিবে না আর।”  
ভাল কথা, কিন্তু “বস্তানিয়া” কোথায়?

যাহারা কিছু হিসাবী তাহারা বলিবে, আমরা প্রতিবেশীর চেয়ে সংখ্যায় দশগুণেরও বেশী; আমাদের কোজ পাকিস্তানী কোজের চেয়ে তিন গুণ ভারি; তবে শীমান্তের এপারে বিপদ ছাগল অর্জেকের বেশী, ঐ পারে সব নেকড়ে বাঘ।

ঐতিহাসিক বলিবে পাণিপতে, খানওয়ার (বাবর-সংগ্রাম

সিংহের যুদ্ধ) হিন্দুস্থানী কোজ কি সংখ্যায় কম ছিল? অহিংসবাদী মনে করে আমাদের বৈষ্ণব রাষ্ট্র আমাদের মাথার উপর চরকা-চক্র ঘুরিতেছে, চক্রধারী বন্ধা করিবেন। শক্ত হতাশ হইয়া ভাবে, হিংসা ছাড়া মায়ের পুজা কেমন করিয়া হয়? ডাকাতি মন্দ কি? ইহা কাপুরুষের ভরসা, স্বাধীন জাতির বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি নহে।

নীতি শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, “উপায় চিন্ত্যন্তু প্রাজ্ঞঃ অপায়মপি চিন্তয়েৎ”; স্মৃতদাং চতুর্থ পাণিপত কিংবা দিল্লীর দশমদশা ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার মধ্যেই বহিয়াছে। ইতিহাস বসন্তের কোকিল নয়, ছদ্মবনের আশ্রয়। ঐতিহাসিক যত্ননাথ ভারতীয় রাষ্ট্রের “উপায়” এবং “অপায়” চিন্তা করিয়াছেন। শেষ-জীবনে তিনি ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাস রচনা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার পরে যত্ননাথের চিন্তার বিষয় ছিল কি করিয়া এই স্বাধীনতা বন্ধা পাইতে পারে, জাতিকে কি ভাবে প্রতিরক্ষা (Defence) সম্বন্ধীয় সমস্তার সমাধান করিতে হইবে, ভারতের আর্থ-শৈনিক কি ভাবে শিক্ষিত করা উচিত। তিনি এই সম্বন্ধে দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সামরিক বিভাগ একাধিকবার তাঁহাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিল, বক্তৃতা শুনিয়া পদস্থ সামরিক কর্মচারীগণ অবাক হইতেন যে একজন বেসামরিক নাগরিক যুদ্ধবিজ্ঞান (Military strategy) এত সূক্ষ্ম বিধ-গুলি কি করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন? যত্ননাথের লাইব্রেরীতে যুদ্ধবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ দেখিলে তাঁহাদের অবাক হওয়ার কারণ থাকিত না। আচাধ্য যত্ননাথ কুচকাওয়াজ না করিয়া মনে প্রাণে মেজাজে জঙ্গ-বাহাদুর ছিলেন, এই কথা অধিকাংশ লোক হয়ত জানেন না। পারিবারিক ব্যাপারেরও মিলিটারী ভূত যেন তাঁহার কাঁধে চাপিয়াছিল, এক জঙ্গী-জামাতা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শিঙ্গাপুরে তিনি বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুই পোত্র এবং এক ঘোহিত্রকে তবুও তিনি মিলিটারীতে পাঠাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। একদিন বেশ খোপ মেজাজে তিনি আমাকে বলিলেন, কালিকা, তুমি একটা ছেলেকেও মিলিটারীতে দিলে না? এ দেশের তিন ভাগের এক ভাগ লোক মিলিটারীতে না গেলে

সাধীনতা থাকিবে? তাঁহার অভিমত যেন আমার মতিন হলের মধ্যে অন্ততঃ একজন নিপাহী হয়। আমি সিয়া বলিলাম, এখন অহিংসার আমল, বাঙ্গালার শেষ বাব দিরাঙউর্দোলা (নাট্যাকাব্য) বাঙ্গালীর আদর্শ দেশ-প্রমিক, বলা হইয়াছে—

“প্রাণান্তে সমরক্ষেত্রে পশিব না আমি।

অবিবৃদ্ধ দেখিবে না নখাঙ্গ আমার।”

যত্নাথ শোক পাইয়াছেন, অনুশোচনা করেন নাই। ত্যাব এক বৎসর পূর্বে তাঁহার ছোট পৌত্র পুণ্য ছাউনিতে গার্টার-সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার খবর পাইয়া তিনি ধু বলিয়াছিলেন, বালক যুদ্ধ করিয়া মরিলে আমার লেশ-ত্র দুঃখ হইত না। বীর-যাক্স (Knight) আর কাহাকে লে?

যাহা হউক, প্রথম বয়সে সৈনিক কর্মচারী না হইলে ঐতিহাসিক Gibbon যেমন তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire এমন কৃতিত্বের সহিত সমাপ্ত রিতে পারিতেন না, সেই প্রকার পুস্তক পড়িয়া যুদ্ধ-বিজ্ঞান যুদ্ধ-সাহিত্য আগ্রস্ত করিতে না পারিলে আচার্য্য যত্নাথ ক-বহল History of Aurangzib (৫ খণ্ড) এবং Fall of the Mughal Empire রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন না। লোকে মনে করে যুদ্ধবিদ্যা বহি পড়ি বিদ্যাই, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস বলে, বহু যুদ্ধবিজয়ী বোহি-য়ার বিক্রোহী নেতা Countzisea জন্মাক ছিলেন, নিকাম-লমুলক (হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু-বাইয়াও পাক্ষীতে বসিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন, স্মৃতরাং কুশল ব্যক্তির বহি বুদ্ধি ও নিষ্ঠা থাকিলে অন্ততঃ অর্ধাভ-পালের যুদ্ধের চাল বুঝিবার মত বিশেষজ্ঞ হওয়া বড় কথা হে।

আচার্য্য যত্নাথ অপণ্ডিতের জন্য ইতিহাস লিখেন নাই, তিহাসে তিনি মত্তবাদী ছিলেন না, তত্ত্বদর্শী ছিলেন। রচিত ইতিহাসের মধ্যে “মালুম” যত্নাথকে খুঁজিয়া পাওয়া হজ নয়, জুইর কাছে মামলা বুঝাটয়া দিয়াই তিনি খালাস, হেতু ভ্রম উহার বেশী আইনতঃ কিছু বলিতে পারেন না, ঐতিহাসিক কিছু লিখিতে পারেন না। ইহার ব্যতিক্রম ইলেই ঐতিহাসিক স্ক্রুটিসম্পন্ন বিচক্ষণ পাঠকের কাছে পণ্ডিত মশাই, উকীল কিংবা মতলববাজ প্রচারকের ভায় বক্তিকর ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

৯

বেভারিজ সাহেব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে History পত্রিকায় আচার্য্য যত্নাথ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিছু অংশ

পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার পর যত্নাথ চৌত্রিণ বৎসর ইতিহাস চর্চা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক India of Aurangzib. Topography, Statistics প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। History of Aurangzib-এর শেষ খণ্ডে (vol. V, 1924) ঐতি-হাসিক যত্নাথ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি বিশ বৎসরে বাহা লিখিয়াছেন তাহা হয়ত কোন মেধাবী এবং অসাধারণ পরিশ্রমী ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু চত্বিণ পঞ্চাশ বৎসর লিখিতে পারিতেন, কিন্তু পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের প্রতিযোগিতার সীমার বাহিরে চলিয়া গেলেন, অথচ তখনও তাঁহার প্রতিভা মাত্র অর্ধশুট। শিবাজীর জীবন-চরিত (Shivaji and His Times, July 1919) রচনা বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের পক্ষে নিঃসন্দেহ একটি কঠিন পরীক্ষা, একেবারে “বর্গী”র ঢুকের উপর হামলা। বয়সে ও বুদ্ধিতে অগ্রজতুল্য রিয়াসৎকার দাও-বাহাদুর সরদেসাইর সহযোগিতা না পাইলে তিনি মোগল তোপধানা লইয়া মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-ভর্গে বিজয় পতাকা উড়াইতে পারিতেন না, হয়ত এই উত্তম সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের মত ঐতিহাসিক যত্নাথের অগন্তা-যাত্রা হইত। ব্যক্তি হিসাবে ঐতিহাসিক যত্নাথ আওরঙ্গ-জেবের দোষ-গুণ পাইয়াছিলেন। যত্নাথের “জিহ্ব” (Obstinacy) আওরঙ্গজেবের “জিহ্বের” স্তায় বাধা পাইলেই মারমুখী হইত, লাভ ক্ষতি বিচার করিত না; সম্রাটের এই জিহ্ব মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, ঐতি-হাসিক এই জিহ্ব পড়িলে সেই ধ্বংসের ইতিহাস বোধ হয় আর লিখিত হইত না, যদি তিনি সরদেসাইকে সহায় না পাইয়া একাকী মহারাষ্ট্রের ইতিহাস উদ্ধারের কার্যে আত্মোৎসর্গ করিতেন। কোন বিষয়ে আপোষ রক্ষা করা আওরঙ্গজেব এবং যত্নাথ উভয়ের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল, দুজনেই যাহা সত্য এবং বিবেকের বণী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতেন উহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহার সুরিখা-জনক সর্থে কাহারও সহিত সহজে আপোষ করেন নাই। আওরঙ্গজেবের চোখে যাহা কিছু শরিয়ত-বিরুদ্ধ উহাই “অসত্য” এবং এই “অসত্য” ধ্বংস করার আদেশ রসুলান্নাহর মারকত মুসলমানের কাছে আসিয়াছে। আচার্য্য যত্নাথের পীর না থাকিলেও “রসুল” ছিল, “শরিয়ত” ছিল। এই শরিয়তের “কম-রসুল” (রসুলান্নাহর পরচিহ্ন-জ্ঞাপক মসজিদ) কলিকাতা শহরে ওয়ায়েন হেষ্টিংসের আমলে স্থাপিত হইয়াছিল—পূর্বনাম Royal Asiatic Society of Bengal। এইখানে বিলাতী পণ্ডিতগণ এদেশের পণ্ডিত-

গণের চোখের ছানি কাটা আবশ্য করিয়াছিলেন, যেহেতু পণ্ডিতেরা “ইতিহাস” বস্তুটা দেখিতে পাইতেন না; অস্ত্রবিধ সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এই শরিয়ত যত্ননাথ ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য ইতিহাসের মাধ্যমে কবুল করিয়াছিলেন; ইহার বিলাতী নাম Scientific Method of Historical Research অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণা। এই শরিয়তের অনেক টীকাভাষ্য হইয়া গিয়াছে, এবং ইহাই ইতিহাস-চাষের অদ্বিতীয় পদ্ধতি বলিয়া সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব এবং যত্ননাথ উভয়েই স্ব স্ব শরিয়তে অকপট নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইহার ফলে এক দিকে হিন্দুর মাটি পাথরের মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের কার্য্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, অস্ত্র দিকে বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যযুগের ইতিহাসের নামে যে পুতুল-পুজা চলিতেছিল, এবং রাজনৈতিক প্রচারকগণ যে সমস্ত নূতন নূতন ইতিহাস-পুস্তিকা সৃষ্টি করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের নিত্য অপমান করিতেছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন যত্ননাথ। এই ‘অসত্যের’ বিরুদ্ধে বাদশাহী অভিযানে মথুরায় কেশবজী, গাবিন্দজী, যুগলকিশোরজীর মন্দির হইতে দক্ষিণে পাণ্ডুর-খুর, পশ্চিমে সোমনাথ, পূর্বে ঢাকা জেলার খামরাই গ্রামের বংশোদ্ভবের মন্দির হইতে মেহিনীপুর পর্য্যন্ত ছোট বড় সমস্ত মন্দির ধ্বংস হইল, গ্রহস্থ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ, পণ্ডিতের টোলও রহাই পাইল না।\*

এই মহৎ কার্য্য আওরঙ্গজেব অত্যন্ত নিশ্চিন্ত কূটনৈতিক কপটতা ও শাঠ্যের সহিত আবশ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আধুনিক শ্রেষ্ঠ হিন্দু ঐতিহাসিক দিয়াছেন শুধু মিরদাসের সন তারিখ। পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ আওরঙ্গজেবের এই কার্য্যের যেমন ইসলামীভাষ্য করিয়াছেন, যত্ননাথ কেবল উহারই ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন। এই উপায়ে ঐতিহাসিকের কোন ভাবাবেগ নাই, “আওরঙ্গজেবের শনিদৃষ্টি” (Aurangzeb's baleful eye) ব্যতীত কোন নিন্দা নাই, তিনি যেন “মোগলউচ্ছিষ্টভোজী পুট-লেবর” বাটোর হাড়ী শিশোদিয়া কচ্ছবাহ কুলের একজন বাদশাহী মনসবদার—বাহারা হিন্দুর ধ্বংসকার্য্যে মোগল ব্রাটের সহায়ক, হিন্দুর মন্দির-ধ্বংসে দৃশ্যের উদ্বাসীন ষক। শাস্ত্রানুরোধে হুকুমে বিজোহী বুকেলাবাজ কুবার

সিংহের পিতা বীরসিংহ দেবের নির্মিত ওরচা নগরীর বিশাল হিন্দু মন্দির চক্ষুর সন্মুখে ধ্বংস ও অপবিত্র হইতেছে দেখিয়াও যে সমস্ত বীরাগ্রগণ্য রাজপুত প্রভুভক্তিতে অবিলম্ব করিয়াছেন, যেন তাঁহারা ইংরেজী।\* ঐতিহাসিক যত্ননাথ হিন্দুর ছিদ্মনাম “বিরূপাক্ষ” হিন্দু নিন্দায় চতুর্ন্থ মুসলমানের বেলায় নিষ্ঠুর ব্রহ্ম সাজিয়াছেন বলিয়া কোন সমালোচক মন্তব্য করিলে উহা সাধারণ বুদ্ধিতে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না।

এইরূপ নির্বিকার মনোভাব লইয়া আওরঙ্গজেবের ‘ইতিহাস রচনা’ করিয়াও মুসলমান সমাজের উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল উহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কিছু পূর্বে আওরঙ্গজেবের কুখ্যাত Benaras Farman\* আবিষ্কার হইয়াছিল। উৎসাহী শিক্ষিত মুসলমানগণ ভাবিলেন, এইবার বৃদ্ধি আলমগীর বাদশার বদনাম ঘুচিল। আচার্য্য যত্ননাথ এই ফরমানের তারিখের অন্তর্ভুক্ত পাঠ শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ভাঙ্গা নৌকায় তলা ফুটা করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই ভাঙ্গা নৌকায় মুখ ও পা বাড়াইবে না, কিন্তু তাঁহার ভাবদশায় উহার মোহাই দিয়াই একজন মুসলমান আওরঙ্গজেবের সাক্ষী গাহিয়া

\* “It has been decided according to our Canon Law that long-standing temples should not be demolished, but no new temple be allowed to be built...Information has reached our...Court that certain persons have harassed the Hindu residents in Benares and its environs and certain Brahmins...further desire to remove from their ancient office. Therefore, our royal command is that you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere with or disturb the Brahmins and other Hindus resident in those places”—

Aurangzeb's “Benares farman” addressed to Abul Hassan, dated 28th February, 1659, granted through the mediation of Prince Muhammad Sultan. J. A. S. B. 1911, p 689, with many mistakes, notably about the date, which of (Jadunath) have corrected from a photograph of the farman.

জটব্য—History of Aurangzeb, vol. III, p, 281.

\* বিস্তারিত বিবরণের জন্য জটব্য, History of Aurangzeb, Appendix V. pp 280—285.

স্বাধীনতা থাকিবে? তাঁহার অভিপ্রায় যেন আমার ভিন ছেলের মধ্যে অন্ততঃ একজন সিপাহী হয়। আমি হাসিয়া বলিলাম, এখন অহিংসার আমল, বাঙ্গালার শেষ নবাব শিরাউদ্দৌলা ( নাট্যাকারে ) বাঙ্গালীর আদর্শ দেশ-প্রেমিক, বঙ্গা হইয়াছে—

“প্রাণান্তে সমরক্ষেত্রে পশিব না আমি।

অবিবৃদ্ধ দেখিবে না নখাঘ্র আমার।”

যতনাথ শোক পাইয়াছেন, অশুশোচনা করেন নাই। যত্নাব এক বৎসর পূর্বে তাঁহার ছোট পুত্র পুণা ছাউনিতে মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার খবর পাইয়া তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, বালক যুদ্ধ করিয়া মরিলে আমার লেশ-মাত্র দুঃখ হইত না। বীর-যাক্কা ( Knight ) আর কাহাকে বলে?

যাহা হউক, প্রথম বয়সে সৈনিক কর্মচারী না হইলে ঐতিহাসিক Gibbon যেমন তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire এমন কৃতিত্বের সহিত সমাপ্ত করিতে পারিতেন না, সেই প্রকার পুস্তক পড়িয়া যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-সাহিত্য আগ্রহ করিতে না পারিলে আচার্য্য যতনাথ যুদ্ধ-বহুল History of Aurangzib ( ৫ খণ্ড ) এবং Fall of the Mughal Empire রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন না। সোকে মনে করে যুদ্ধবিজ্ঞা বহি পড়া বিজ্ঞানই নয়, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস বলে, বহু যুদ্ধবিজ্ঞানী বোহিমিয়ার বিজ্ঞানী নেতা Countzisea ভ্রম্যাক ছিলেন, নিজাম-উলমুলক ( হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ) যুদ্ধ বয়সে চক্ষু হারা ইয়াও পাকীতে বসিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন, স্মৃতরাং চক্ষুহীন ব্যক্তির বহি বুদ্ধি ও নিষ্ঠা থাকিলে অন্ততঃ অতীত-কালের যুদ্ধের চাল বুঝিবার মত বিশেষজ্ঞ হওয়া বড় কথা নহে।

আচার্য্য যতনাথ অপণ্ডিতের জ্ঞাত ইতিহাস লিখেন নাই, ইতিহাসে তিনি মতবাদী ছিলেন না, তত্ত্ববাদী ছিলেন। স্বরচিত ইতিহাসের মধ্যে “মাতুল” যতনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, জুবার কাছে মামলা বুঝাইয়া দিয়াই তিনি খালাস, যেহেতু জজ উহার বৈধি আইনতঃ কিছু বলিতে পারেন না, ঐতিহাসিক কিছু লিখিতে পারেন না। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই ঐতিহাসিক সূক্ষ্মচিসম্পন্ন বিচক্ষণ পাঠকের কাছে “পণ্ডিত মশাই”, উকীল কিংবা মতলববাজ প্রচারকের দ্বারা বিবক্তিকর ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

৯

বেভাবিজ সাহেব ১২২২ খ্রীষ্টাব্দে History পত্রিকায় আচার্য্য যতনাথ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিছু অংশ

পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার পর যতনাথ চৌত্রিশ বৎসর ইতিহাস চর্চা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক India of Aurangzib. Topography, Statistics প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। History of Aurangzib-এর শেষ খণ্ডে ( vol. V, 1924 ) ঐতিহাসিক যতনাথ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি বিশ বৎসরে বাহা লিখিয়াছেন তাহা হয়ত কোন মেধাবী এবং অসাধারণ পরিশ্রমী ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু চত্বিশ পঞ্চাশ বৎসরে লিখিতে পারিতেন, কিন্তু পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের প্রতিযোগিতার সীমার বাহিরে চলিয়া গেলেন, অথচ তখনও তাঁহার প্রতিভা মাত্র অর্ধ-মুঠ। শিবাজীর জীবন-চরিত ( Shivaji and His Times, July 1919 ) রচনা বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের পক্ষে নিঃসন্দেহ একটি কঠিন পরীক্ষা, একেবারে “বর্গী”র বৃকের উপর হামলা। বয়সে ও বুদ্ধিতে অগ্রজতুল্য রায়সংকার দাও-বাহাদুর সরদেসাইর সহযোগিতা না পাইলে তিনি মোগল ভোপথানা লইয়া মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-ভূর্গে বিজয় পতাকা উড়াইতে পারিতেন না, হয়ত এই উত্তম সম্রাট আওরঙ্গজেবের দক্ষিণাত্য অভিযানের মত ঐতিহাসিক যতনাথের অগন্তা-যাত্রা হইত। ব্যক্তি হিসাবে ঐতিহাসিক যতনাথ আওরঙ্গজেবের দোষ-গুণ পাইয়াছিলেন। যতনাথের “জিহ্বা” ( Obstinacy ) আওরঙ্গজেবের “জিহ্বা” দ্বারা বাধা পাইলেই মারমুখী হইত, লাভ ক্ষতি বিচার করিত না; সম্রাটের এই জিহ্বা মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, ঐতিহাসিক এই জিহ্বা পড়িলে সেই ধ্বংসের ইতিহাস বোধ হয় আর লিখিত হইত না, যদি তিনি সরদেসাইকে সহায় না পাইয়া একাকী মহারাষ্ট্রের ইতিহাস উদ্ধারের কার্যে আত্মোৎসর্গ করিতেন। কোন বিষয়ে আপোষ রক্ষা করা আওরঙ্গজেব এবং যতনাথ উভয়ের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল, দুজনেই যাহা সত্য এবং বিবেকের বণী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতেন উহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত তাঁহারা সুবিধানকর সর্বত্র কাহারও সহিত সহজে আপোষ করেন নাই। আওরঙ্গজেবের চোখে যাহা কিছু শরিয়ত-বিরুদ্ধ উহাই “অসত্য” এবং এই “অসত্য” ধ্বংস করার আদেশ রমুল্লাহর মারকত মুসলমানের কাছে আসিয়াছে। আচার্য্য যতনাথের পীর না থাকিলেও “রমুল” ছিল, “শরিয়ত” ছিল। এই শরিয়তের “কদম-রমুল” ( রমুল্লাহর পবিত্র-জ্ঞাপক মসজিদ ) কলিকাতা শহরে ওয়ায়েন হেষ্টিংসের আমলে স্থাপিত হইয়াছিল—পূর্বনাম Royal Asiatic Society of Bengal। এইখানে বিলাতী পণ্ডিতগণ এদেশের পণ্ডিত-



পণের চোখের ছানি কাটা আবৃত্ত করিয়াছিলেন, যেহেতু পণ্ডিতেরা “ইতিহাস” বস্তুটা দেখিতে পাইতেন না; অতঃপর সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এই শরিয়ত যদুনাথ ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য ইতিহাসের মাধ্যমে কবুল করিয়াছিলেন; ইহার বিলাতী নাম Scientific Method of Historical Research অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণা। এই শরিয়তের অনেক টীকাভাষ্য হইয়া গিয়াছে, এবং ইহাই ইতিহাস-চাষের অদ্বিতীয় পদ্ধতি বলিয়া সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব এবং যদুনাথ উভয়েই স্ব স্ব শরিয়তে অকপট নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইহার ফলে এক দিকে হিন্দুর মাটি পাথরের মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের কার্য্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, অত্র দিকে বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যযুগের ইতিহাসের নামে যে পুতুল-পূজা চলিতেছিল, এবং রাজনৈতিক প্রচারকণ যে সমস্ত নূতন নূতন ইতিহাস-পুস্তিকা সৃষ্টি করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের নিত্য অপমান করিতেছিলেন, উহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন যদুনাথ। এই “অসত্যের” বিরুদ্ধে বাদশাহী অভিযানে মথুরায় কেশবজী গোবিন্দজী, যুগলকিশোরজীর মন্দির হইতে দক্ষিণে পাণ্ডুর-পুর, পশ্চিমে সোমনাথ, পূর্বে ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামের বংশাধারের মন্দির হইতে মেহিনীপুর পর্য্যন্ত ছোট বড় সমস্ত মন্দির ধ্বংস হইল, গ্রহস্থ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ, পণ্ডিতের টোলও বেরাই পাইল না।\*

এই মত কাৰ্য্য আওরঙ্গজেব অত্যন্ত নিশ্চিন্ত কূট-নৈতিক কপটতা ও শাঠ্যের সহিত আবৃত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আধুনিক শ্রেষ্ঠ হিন্দু ঐতিহাসিক দিয়াছেন শুধু মন্দিরধ্বংসের সন তারিখ। পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ আওরঙ্গজেবের এই কার্য্যের যেমন ইসলামীভাষ্য করিয়াছেন, যদুনাথ কেবল উহারই ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকের কোন ভাবাবেগ নাই, “আওরঙ্গজেবের শনিদৃষ্টি” ( Aurangzib's baleful eye ) ব্যতীত কোন নিন্দা নাই, তিনি যেন “মোগলউচ্ছিষ্টভোজী পুষ্ট-কলেবর” রাঠোর হাড়ী শিশোদ্বিয়া কচ্ছবাহ কুলের একজন বাদশাহী মনসবদার—বাহারা হিন্দুর ধমনকার্য্যে মোগল সম্রাটের সহায়ক, হিন্দুর মন্দির-ধ্বংসে দৃত্রের উদাসীন দর্শক। শাস্ত্রানুগত হুকুমে বিজোহী বুন্দেলারাজ জুবাব

সিংহের পিতা বীরসিংহ দেবের নির্মিত ওরচা নগরীর বিশাল হিন্দু মন্দির চক্ষুর সন্মুখে ধ্বংস ও অপবিত্র হইতেছে দেখিয়াও যে সমস্ত বীরাগ্রগণ্য রাজপুত প্রভুত্বভিতে অবিলম্ব ছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি তিনিই আবার তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, যেন তাঁহারাই পাপী।\* ঐতিহাসিক যদুনাথ হিন্দুর ছিদ্মনাশের “বিরূপাক্ষ” হিন্দুর নিন্দায় চতুর্নাম মুসলমানের বেলায় নিগূণ ব্রহ্ম সাজিয়াছেন বলিয়া কোন সমালোচক মন্তব্য করিলে উহা সাধারণ বুদ্ধিতে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না।

এইরূপ নির্বিকার মনোভাব লইয়া আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনা করিয়াও মুসলমান সমাজের উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল উহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কিছু পূর্বে আওরঙ্গজেবের কুখ্যাত Benaras Farman\* আবিষ্কার হইয়াছিল। উৎসাহী শিক্ষিত মুসলমানগণ ভাবিলেন, এইবার বুঝি আলমগীর বাদশার বহনাম ঘুটিল। আচার্য্য যদুনাথ এই ফরমানের তারিখের অন্তঃ পাঠ শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ভাঙ্গা নৌকার তলা ফুটা করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই ভাঙ্গা নৌকার মুখও পা বাড়াইবে না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় উহার হোহাই দিয়াই একজন মুসলমান আওরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ গাহিয়া

\* “It has been decided according to our Canon Law that long-standing temples should not be demolished, but no new temple be allowed to be built...Information has reached our...Court that certain persons have harassed the Hindu residents in Benares and its environs and certain Brahmins...further desire to remove from their ancient office. Therefore, our royal command is that you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere with or disturb the Brahmins and other Hindus resident in those places”—

Aurangzib's “Benares farman” addressed to Abul Hassan, dated 28th February, 1659, granted through the mediation of Prince Muhammed Sultan. J. A. S. R. 1911, p 689, with many mistakes, notably about the date, which of (Jadunath) have corrected from a photograph of the farman.

জট্টা—History of Aurangzib, vol. III, p, 281.

\* বিস্তারিত বিবরণের জন্য জট্টা, History of Aurangzib, Appendix V. pp 280—285.



প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হইয়াছেন, এবং তাঁহার বহিঃ শুধু লাহোর করাচী নয়, ভারতবর্ষের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং সুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক লেখক নূতন পথ ধরিয়া Benares farman এবং ঐ জাতীয় দলিলকে আওরঙ্গজেবের ধর্ম-নীতিকে “qualified toleration-র” পর্যায়ে উঠাইয়াছেন। শিক্ষকেরা এই বহিঃ যুগোপযোগী মনে করেন, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করে, কিন্তু ইতিহাসের সর্কনাশ হয়। কাশীর ব্রাহ্মণের প্রতি আওরঙ্গজেব কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিলেন মনে হয়, কেননা এই জাতীয় আরও দুইখানা farman পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে যত্নাধ আমল দেন নাই।

১০.

একবার আমি এই সমস্ত দলিল লইয়া আচার্য্য যত্নাধকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়া ধমক খাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, “করমান জারি করিবার তারিখে আওরঙ্গজেবের কি অবস্থা ছিল? বিশ্বনাথের মন্দির কোন্ বৎসর ধ্বংস করা হইয়াছিল? বাহারা ইতিহাস পড়ে তাহারেব কাণ্ডজ্ঞান থাকে।” যাহা হউক, আমার জবাব আমি পাইলাম, কিন্তু জবাবটা কি জানিবার জন্য যদি কাহারও আগ্রহ হয়, আমিও বলিতে পারি জিজ্ঞাসুর কাণ্ডজ্ঞান নাই! মোট কথা, যত্নাধের মাপে আমার কাণ্ডজ্ঞান হয় নাই, এবং এই কাণ্ডজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন। বেঙ্গল্যাস বলিয়া গিয়াছেন মগধদেশীয়গণ অর্কোক্তির দ্বারা বৃদ্ধিতে পারে, পাকালদেশীয় (গঙ্গা-যমুনার দোয়াববাসীগণ) ইজিত বা ইশারায় বৃদ্ধিতে পারে, অস্ত্র দেশীয়গণ পুরোক্তি দ্বারা এবং পার্শ্বভীয়গণ স্রোতের দ্বারা বৃদ্ধিতে পারে। তিনি পাটনায় বসিয়া “অর্কোক্তি” করিয়াছেন; সুতরাং যাহারা ভাত খায় তাহারা উন্টা বৃদ্ধিতে পারে, যব ছোলার ত কথাই নাই। ইতিহাস-বিমুখ দেশে ইতিহাস বুঝাইতে হইলে হাড়ডোর বা দরকার, অবনীন্দ্রনাথের তুলির পোচে কি হইবে? ব্যাপারটা ছিল নিম্নরূপ—

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের ভাগ্যাকাশে মেঘ কাটিয়া যায় নাই, শুষ্ক যুজের দুর্গে, পলাতক দারাব কোন সংবাদ নাই। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ মুলতান কাশী অধিকার করিয়া যুজেরেব দিকে অভিযান করিয়াছেন, পশ্চাতে দারাব

পূর্বতন সুবা এলাহাবাদের হিন্দু প্রজা। এই জন্য হিন্দুর প্রতি আওরঙ্গজেবের এই সাময়িক কুটিল উদারতা, কাশীর পাণ্ডাধিককে সন্তুষ্ট করিয়া হিন্দুকে ঠাণ্ডা রাখিবার প্রয়োজনীয়তা। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের Benares farman মারকত আওরঙ্গজেব স্বয়ং পুত্রকে জানানাইতেছেন, ইহা স্থির হইয়াছে যে, আমাদের শরিয়তের বিধান অনুসারে পুরাতন মন্দির ধ্বংস করা অনুচিত। ইহার দশ বৎসর পরে সেই শরিয়তের বিধান ভিগবাজী খাইয়া পুরাতন বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিবার ফতোয়া দিল কেন? মৌজ্জী রাজা জয়সিংহের মৃত্যুর পূর্বে শরিয়তের বিধান হিন্দুর জন্য যে রকম ছিল, মৃত্যুর পরে সেই রকম থাকিলে বিশ্বনাথ জ্ঞান বাপীতে লুকাইতেন না। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পূর্বে হিন্দুর উপর জিজিয়া কর চাপাইবার সাংস আওরঙ্গজেবের হয় নাই, মরিবার পরেই বাদশাহী ধর্মবুদ্ধি চাপা হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিধামত শরিয়তের ব্যাখ্যার জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব, না তাঁহার বিবেক দক্ষক সেখ্‌ উলু ইসলাম (ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা)।

অধুনা আবিস্কৃত অস্ত্র দুইটি ফরমান আরও দহস্তজনক। ১৬৬১ এবং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব কাশীবাসী ভগবন্ত গোসাঁই এবং রামজীবন গোসাঁইকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা সম্রাটের বিধিগত অক্ষয় সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য (For the continuation of our God-given Empire that is to last for ever) মনের শান্তি লইয়া প্রার্থনা করিতে পারেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক হাতে বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস অস্ত্র হাতে গোসাঁইকে ভূমিদানের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? গোসাঁইগণের স্থান কাশী নহে, গোকুল গোবর্দ্ধন, শৈবপ্রধান কাশীতে বৈষ্ণব গোসাঁই ভোষণের উদ্দেশ্য কি? সম্রাটের অক্ষয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য কাকেদের দোয়ার প্রয়োজন কেন হইল? আওরঙ্গজেবের যদি সত্যই বৈষ্ণবপ্রীতি থাকিত তাহা হইলে গোকুলস্থ গোস্বামীগণের কাছে আওরঙ্গজেব আমলের একখানি সনদও পাওয়া যায় নাই কেন? :

ঐতিহাসিক সন্দেহ করিবে এই গোসাঁইবয় হয়ত মোগল গুপ্তচর ছিল, কিংবা শৈব-বৈষ্ণবের বিবাদের আশ্বিন উস্কাইয়া হিন্দুর অগস্ত্যকে নিষ্ক্রিয় করিবার হীন অভিনয় এই পুণ্য কার্যের পশ্চাতে লুকাইয়াছিল। যাহা হউক, আকবর অপেক্ষা আওরঙ্গজেব এক হিসাবে

\* Zahiruddin Faruqi, Aurangzib and his Times.

† S. R. Sharma, The Making of Modern India (From A. D. 1526 to the present day)।

\* স্রষ্টব্য—S. R. Sharma, The Making of Modern India, p 105.

† স্রষ্টব্য—Javeri, Imperial Farmans.

অধিক ভাগ্যবান। সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধি—সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের চোখে একটি সুন্দর ইমারত মাত্র, দর্শনীয় তীর্থস্থান নহে। হিন্দুরা আওরঙ্গজেবের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আকবরের শবাধার খুঁড়িয়া তাঁহার অস্থি আন্ডনে পোড়াইয়াছিল, অপর পক্ষে আওরঙ্গজেবের মামুলী কবর ধর্মপ্রাণ মুসলমানের তীর্থস্থান। তাঁহার কবরের উপর রামতুলসীর গোড়া হিন্দু প্রণাম করিয়া জল ঢালে।\*

১১

ইতিহাস বর্ণিবার আগ্রহ অপেক্ষা “মানুষ”কে জানিবার আগ্রহ মানুষের মধ্যে প্রবলতর। ইষ্টির মধ্যে ভক্ত সৃষ্টিকর্তাকে দেখিতে চায়, সাহিত্য সমালোচকগণ কাব্যের মধ্যে কবিকে, রচনার মধ্যে রচয়িতাকে\* পরিবার আশায় বসিয়া থাকেন, প্রজাপতি তাড়াইয়া হয়বান হইয়া পড়েন। যদুনাথের ইতিহাসে ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎকার চলিত, অথচ লোকে বলে সামাজিক জীব হিসাবে যদুনাথ গোটা মানুষটাই সাক্ষাৎ আওরঙ্গজেব! ইহা বিরূপ জনশ্রুতি নয়, ইহার মধ্যে হয়ত কিছু সার্থকতা আছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আওরঙ্গজেব-ইতিহাসের যদুনাথ আওরঙ্গজেবের অন্তিম দশাব্দ বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

“The last years of Aurangzib were inexpressively sad . . . A sense of unutterable loneliness haunted the heart of Aurangzib in his old age. His puritan austerity had, at all times, chilled the advances of other men towards him, but its effect was intensified by the reputation of being a miracle-working saint. Men shrank in almost supernatural dread from one, who was above the joys and sorrows, weakness and pity of mortals, one who seemed to have hardly any element of common humanity in him, who lived in the world but did not seem to be of it. The genial human heart was not touched in others

by Aurangzib, and therefore his own heart's hunger could not be satisfied . . . .

His domestic life was darkened, as bereavements thickened round his closing in years . . . .”\*

ইহার ৩৪ বৎসর পরে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথের কি অবস্থা হইয়াছিল? উক্ত উদ্ধৃতিংশে আওরঙ্গজেবের জায়গায় “যদুনাথ” এবং saint-এর জায়গায় Historian বসাইয়া দিলে ইহাই আচার্য্য যদুনাথের অন্তিম দশাব্দ নির্ণূত ছবি হইয়া যায়। এই ভাষা ব্যতীত তাঁহার ভবিষ্যৎ ভীষনী লেখক গ্রন্থে উপসংহার লিখিবার জন্য অত্র ভাষা পাইবেন না। দীর্ঘ বিশ বৎসর ইতিহাসের মধ্যে আওরঙ্গজেবের সাহচর্য্য করিয়া যদুনাথ কি সম্রাটের দুর্ভাব নিয়তির কোপে পতিত হইলেন? উভয়ের মধ্যে এই মাত্র তফাৎ—আওরঙ্গজেব মানুষের সহানুভূতির জন্য আকুল হইয়াও নিরাশ হইয়া ছিলেন, যদুনাথ সহানুভূতিকে সর্ব্বক্ষে উপেক্ষা করিয়াছেন, না পাইবার পের তাঁহার হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে যদুনাথ তাঁহার একমাত্র ভ্রাতৃ পুত্র সন্তান সৎকারকে লিখিয়াছিলেন :

“আমি সংসারে নিত্যন্ত একক। আমার সুখ দুঃখের ভাগিদার কেহ নাই। আমি self-pity করিতে চাহি না বা কাহারও সহানুভূতি চাহি না।”†

ইহা বিরোগান্ত নাটকের নাটকীয় pose নহে, যদুনাথের আসল চিত্র। জীবন-মৃত্যুর খেলায় যদুনাথের চোখে কেহ জল দেখে নাই, শুনিয়াছে মৃতের সৎকারের জন্য অকম্পিত কণ্ঠে সেই আলমগীরশাহী হুকুম। এ হেন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি যুগাক্ষরে প্রকাশ করাও বিপজ্জনক ছিল। আসলে কিন্তু সুলতান বলবনের মত গুফজৌ মার খাইয়া মার চুরি করিতেন। এই বহুস্ত তাঁহার পড়ার বর শুছাইবার সময় টের পাইয়াছি। যেখানে কাহারও হাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই সেইখানে তাঁহার প্রত্যেক মৃত সন্তানের ছবি চিঠিপত্র তিনি লুকাইয়া রাখিতেন, সম্ভবতঃ রাজ্যে তিনি ঐগুলি দেখিয়ঃ প্রাণের হাহাকার মিটাইতেন, তখন বেলায় অত্র মূর্তি—মধ্যযুগে কর্ম্মফল সুলতানী মজল, কোথাও কোমলতার চিহ্ন নাই। জীবনের কোন অধ্যায়ে যদুনাথ

\* কারগুন (Eastern Architecture, vol. II) লিখিয়াছেন, আওরঙ্গজেবের কবরের উপর তুলসী গাছ জন্মায়, একবার তুলিয়া কেিলে আবার পজায়। গত বৎসর ঐতিহাসিক সঙ্কে আমার ছেলে ইতা সঙ্কে দেখিয়া আসিয়াছে। কবরের উপর তুলসী গাছ এখন সেবা বহু পায়। এই তুলসী বৈষ্ণবের প্রিয় কালতুলসী নহে, এই জাতীয় তুলসীকে পূর্ব্বকালে বলে “রামতুলসী” মুসলমানেরা বলে “বহমান” গাছ।

\* History of Aurangzib, vol. v, pp 248-49

† এই চিঠিখানা সন্তানবাবু ইংহাব বন্ধু ও ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত বীহেন্দ্রনাথ বসুকে দেখাইয়াছিলেন। আসল চিঠির খোঁজ পাওয়া যায় নাই; তবে উক্তভাষ্যের প্রত্যেকটি শব্দ যদুনাথের, এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ব্রজবাখালের “বংশীবট” ছিলেন না, তিনি উবরভূমির অন্তর্ভুক্তি অথচ গ্রাম্যমান শমী মহাক্রম; উহার কণ্ঠকাকৌশল কাণ্ড সহজ মানুষের পক্ষে অপ্রগ্রহ্য অথচ উহার উগ্র কুসুম-সুবতি চরাস্ত্রের পশিককে বিমোহিত কবিত, বেণু অমুকম্পাপবন ভাঙিত হইয়া সাহসী জিজ্ঞাসুর শিরে আশীর্বাদরূপে ববিত হইত। তাঁহার জীবন মহাত্মারতের স্বর্গারোহণ পর্বে তিনি ধৌর্কস্যবজ্জিত “বুধিষ্টিব”, স্থিরলক্ষ্যে নিবদ্ধ-দৃষ্টি, সহযাত্রীগণের মধ্যে কে কখন পড়িয়া গেল সেদিকে জ্রক্ষেপ নাই, শোক নাই, অগ্রগতির বিরাম নাই। লোকোত্তর মহামানবগণের ইহাই নিয়তি।

১২

পুণ্যাত্মা হিন্দু মনে করেন আওরঙ্গজেব স্বাধা-সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছেন; তবে ঐতিহাসিক ডুবিলেন কোন খাদে?

যদুনাথ কেমন করিয় শোক-হলাহল কণ্ঠে লইয়া নীল-কণ্ঠ হইলেন? আবাতে পর আবাতে ভাঙিয়া না পড়িয়া নিয়তির বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব ও যদুনাথ কোন শক্তিবলে কি ভরসায় আজীবন যুদ্ধ করিলেন? উত্তরের মধ্যে চরিত্রগত সামগ্র্য না থাকিলে যদুনাথ হয়ত বণে ভজ দিতেন। তাঁহারে দুর্জয় আশাবাদ, অসীম আত্মবিশ্বাস, অপরাধের পৌরুষ, “ভিত্যতে ন চ নম্যতে”—মনোবৃত্তি যেন বজ্রাঘাতে পতিত বিজ্রোহীর সেই দ্বারুণ বিজীগিষায়ুক্তি—বাহা লইয়া মিষ্টনের মহাকাব্য সৃষ্টি। শরতান অসত্যকে জয়মণ্ডিত করিবার জন্ত সত্যস্বরূপ আল্লাহ বিরুদ্ধে ছলে বলে কোণলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ধর্ম্ম আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগত জীবনে ইবলিসের (শরতানগোষ্ঠীর নেতা) সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, ধর্ম্ম (শরিয়ত) সংস্থাপকরূপে আল্লাহ খাতিবে “অপত্য” (কুদব) ধ্বংস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক যদুনাথ বোষণ করিলেন ইতিহাসে “অসত্যের” বিরুদ্ধে জেহাদ, এবং এই অসত্যের “মন্দির” “মসজিদ” এবং অনৈতিহাসিক অর্ধ-ঐতিহাসিক বীরপুত্রের পুত্তলিকাভাবের ও ভক্তির পুত্তলিকা মাটি-পাথরের পুতুল নহে। আওরঙ্গজেব বাহা করিয়াছেন তাহা যদুনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, উহা এখনও অলিখিত ইতিহাস। ঐতিহাসিকের ইতিহাস সাধারণতঃ আমবা তাঁহারের স্বরচিত আত্মজীবনী মধ্যেই অনুসন্ধান করিয়া থাকি। যদুনাথ স্বয়ং একটি Autobiography লিখিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় উহা না লিখিয়া ভালই করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব ও যদুনাথ অসাধারণ ব্যক্তি হইলেও মহাপুরুষ ছিলেন না, কেহই মহাত্মা গান্ধী নহেন, এবং মহাত্মা গান্ধীর মত অলৌকিক নৈতিক সাহস না থাকিলে কেহ প্রকৃত আত্মজীবনী লিখিতে

পারে না। ইহারা আত্মজীবনী লিখিলেও মানুষ হিসাবে থবা দিতেন কিনা সন্দেহ, অধিকন্তু দুইজনই আত্মজীবনী রচনা কার্যের বোধ্য ছিলেন না। আচার্য্য যদুনাথ আত্ম-বন্ধার জন্ত মনের প্রতি প্রেকোষ্ঠে এক একটি দ্বারুণ কপাট লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের মন-দুর্গে যোগলাই ঠাটে দেওয়ান ই-আম, দেওয়ান ই-খাস এবং শাহ-বুরুজ ছিল, শাহ-বুরুজের কাটক স্বয়ং সাম্রাজ্যের হুকুমের খুলিবার নহে—ভিতরে যিনি ছিলেন তিনি নিঃসঙ্গ বোয়ী। সমগ্র মানুষ হিসাবে যদুনাথকে জানিবার উপায় নাই, যেহেতু Dr. Johnson এর মত যদুনাথের Boswell ছিল না। বাহা-দ্বিগকে এক দিকে তিনি অতি নিকট রাখিয়া আনিতেন, অস্ত্র সর্ব দিক হইতে, তাঁহাদ্বিগকে ততোধিক দূরে রাখিতেন—Thus far and no farther।

১৩

“অসত্যের” বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের জীবনব্যাপী সংগ্রাম মুখ্যতঃ ধ্বংসাত্মক; তাঁহার স্বজনী-প্রতিভা ছিল না, থাকিলে যোগল সাম্রাজ্য এত সহসা ধ্বংস হইত না। যদুনাথ তাঁহার “জেহাদে” হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছেন; আওরঙ্গজেব মাটি পাথরের মূর্তি ধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু যদুনাথ ধ্বংস করিয়াছেন দুই সাম্রাজ্যভিত্তি-মানী জাতির ইতিহাসের আধারে কল্পনার আলোয় ঘেরা মধ্যযুগের ইতিহাস-স্রষ্টাগণের চারাপুত্তলিকা। মহারাষ্ট্র-জাতি, যুগপ্রবর্তক ছত্রপতি শিবাজীর প্রতি উৎকট ভক্তির আতিশয্যে শিবাজীর অবতারত্ব বোষণ; এবং “শিবতারতম” ইত্যাদি রচনা করিয়া তাঁহার “মহাযজ্ঞ” হরণ করিয়াছিল; যদুনাথের গবেষণা শিবাজীকে “মানুষ” করিয়াছে—যে মানুষের স্থান দেবতার বহু উর্দ্ধে—বাহারা অবতারবাহী কিংবা সাক্ষী পাহিবার “ঐতিহাসিক-উকীল” তাঁহার যদুনাথকে দ্বিতীয় আকজল ধাঁ মনে করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্র এখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ। অসত্যের উপাসনা এবং নিজের ছিত্র নিজের কাছে গোপন করিয়া কোন জাতির মজল হয় না—এই সত্য মহারাষ্ট্রসন্তান হিন্দুপাথ পাতসাহী হারা ইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

শিবাজীর সৃষ্টি শিবাজী অপেক্ষা মহত্তর। এইখানেই শিবাজীর মহাত্ম্য। এই সৃষ্টি স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্য নহে, বাহা আওরঙ্গজেব প্রথম আক্রমণেই ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন—এই সৃষ্টি স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত বীর মারাঠা জাতি—বাহার নিকট দ্বিজীশ্বর শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিয়া-ছিলেন, যে বিজয়দৃপ্ত জাতি “জয়, ভারতের জয়” এই মহা-মন্ত্রে উত্তর ভারতকে দীক্ষিত করিয়াছিল, যে জাতির বীরাজনাগণ নীতি ও শৌর্য্যে যোগলের প্রাণে আভ্যন্তরীণ

করিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি শিবাজীর যুগে যে ভবিষ্যৎবাণী শুনাইয়াছেন উহা শিবাজীর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই সফলতা লাভ করিয়াছিল :

“মহারাত্রি মহিলারা ভৈরবী রূপিনী ; প্রেমরস পরিহরি  
বরণরঞ্জে মাতি পাইবে উল্লাসে সবে, জয় ভারতের জয়।  
যথা এই মহামন্ত্র হইবে ধ্বনিত, আশ্বিন শৃঙ্খলভার  
পড়িবে খগিয়া তুষারশৃঙ্খল যথা দ্বিমাপ্তি করে।”

[ নবীনচন্দ্র—“রক্তমতী” ]

মহারাত্রি ইতিহাসের ব্যাখ্যানে আচার্য যছনাথ এবং তাঁহার অগ্রজপ্রতিম অন্তরঙ্গ বন্ধু “রাওবাহাদুর সরদেসাই স্থানে স্থানে সমান্তরাল ভাবেই চলিয়াছেন, অথচ একজন আর একজনের প্রতি ইঙ্গিত করেন নাই, মত বণ্ডনের চেষ্টা করেন নাই। উভয় মত কখনও যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। ইহা কি বন্ধুত্বের প্রতিবেদন বিবেকবিরুদ্ধ আপোষ রক্ষা? বিচারের বেলায় কাহাকেও রেহাই দেওয়ার শিক্ষা যছনাথের শিক্ষাগণ পায় নাই; সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। একবার সাহস করিয়া আচার্য যছনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন—“We have agreed to disagree agreeably”। ইহার বেশী কিছু তিনি বলেন নাই। প্রায় সমকক্ষ বিরুদ্ধ মতবাদীর প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও উদারতা নিন্দন্যেহে অতি প্রশংসনীয়; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই একজন ছাড়া অন্য সকল বিপক্ষের প্রতি যছনাথের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর এবং তাঁহার ভাষা শালীনতার বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াছে। ইতিহাসবিচারে কোমলকে কোমল না বলিয়া বিন্দু বলিলে সত্যের মধ্যাহ্ন রক্ষা হয় না। মহান্‌তাগী পণ্ডিত খাবে রাজওয়ার্ডে প্রমুখ ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহকারীগণ বহু পরিশ্রমে ভাল মন্দ পুরাতন কাগজের টুকরা যাত্রা যেখানে পাইয়াছেন ঐগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া সরদেসাই এবং যছনাথের ইতিহাস-চর্চার পথ সুগম করিয়াছিলেন। নিজের সংগ্রহের প্রতি অল্প মমতা মহাত্মা জাতির পক্ষে অতি স্বাভাবিক। যছনাথ বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ধারায় মহাত্মা ঐতিহাসিকগণের দেশ-প্রেমবঞ্জিত ভুল শিদ্ধান্ত এবং তাঁহাদের সংগৃহীত অনেকগুলি দলিলকে তুলানুনা করিয়া ছাড়িয়াছেন। এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে “হ কাগর কার মহত্মা আবে”র<sup>\*</sup> বল বিবোধীগণ করিয়াছিল। ইহার কড়া জবাব দেওয়ার আচার্য যছনাথের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে; কিন্তু ইহার জন্য ঐতি-

হাসিকগণের মধ্যে ব্যক্তিগত ভিত্ততা সৃষ্টির দায়িত্ব হইতে যছনাথ রেহাই পাইতে পারেন না।

যাহা হউক, সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদীর প্রতি যছনাথ একই নীতি (to disagree agreeably) অবলম্বন করিলে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হইত না, যাহা বিচারসহ নহে উহা কালের বাতাসে উড়িয়া বাইত।

১৪

আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছিলেন বাঙ্গালী ঠাকুর দেবতা; ঐতিহাসিক ধ্বংস করিয়াছেন বাঙ্গালীর মনগড়া প্রতাপাধিত্য। যে মোগলসেনানী স্বয়ং প্রতাপাধিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালার বিস্তারিত ইতিহাস Bahars tan-i-Ghaibi লিখিয়াছেন। ইহা একমাত্র যছনাথেরই আবিষ্কার। ইহার পর আমাদের “বঙ্গবীর”গণ সাধারণ বিদ্রোহীর পর্য্যয়ে নামিয়া আসিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিয়াও রেহাই পান নাই। এই ইতিহাস পাঠান ওসমানকে বাঙ্গালীর পূজ্য বীরের আসনে বসাইয়াছে। স্বদেশী যুগে দেশপ্রেমে মাতিয়ারা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দিরে আলোবন্দা পিরাজউল্লোহীর মনগড়া মূর্তি স্থাপন করিয়া ভক্তির অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছিল, যছনাথের গবেষণার আঘাতে ঐগুলি ভাঙিয়া পড়িয়াছে, উহাদের জায়গায় ঐ ইতিহাসের পাথরে গড়া আসল মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকের কোন ভাবাবেগ কিংবা বিদ্বেষ নাই। পলাশীর যুদ্ধে সিদাকের পরাজয় হয় নাই, পরাজিত হইয়াছে ধৃগধর্ম্মের কাছে অকল্যাণকর স্থবির সনাতনধর্ম্ম বা সামন্ততন্ত্র। ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :

“Ignoble as the life of Siraj-ud-daulah had been and tragic his end, among the public of his country, his memory had been redeemed by a woman's devotion and a poet's genius. For many years after his death, his widow Lutf-un-nisa Begam used to light a memorial lamp on his tomb every evening as long as she lived. The Bengali poet Nabin Ceandra Sen in his masterpiece *The Battle of Plassey* has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing his reader's tears for fallen greatness and blighted youth, . . .

When the sun dipped into the Ganges

\* অর্থাৎ এই কাগজ অত্যন্ত মহৎপূর্ণ।

behind the blood-red field of Plassey, on that fateful evening of June, did it symbolise the curtain dropping on the last scene of a tragic drama? Was that day followed by "a night of eternal gloom for India" . . . . ? Today the historian, looking backward over two centuries that have passed since then, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the like of which the world has not seen elsewhere. On the 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began.\*

যাঁহার এইরূপ সঙ্গদয়তা এবং সত্যনিষ্ঠা আছে, যিনি যুগজট্টা, যাঁহার দুর্বলুটি দ্বিগুণ প্রসারী এবং যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি "মহাভেদী", প্রজ্ঞার অগুরুপ যাঁহার ভাষা আছে, সাহিত্যের সুরাসারে রঞ্জিত যাঁহার বিষয়বস্তু রূপসঙ্গত পাঠককে বিমোহিত করে, তিনিই ঐতিহাসিক, বাদবাকী আমরা গবেষণামূলক বিবরণ লেখক (Chronicler)। আচার্য্য যদুনাথ কেবলমাত্র "India through the Ages" পুস্তিকা লিখিয়া গেলেও এই আসনের অধিকারী হইতেন, রঙ্গ-পরীক্ষক পদ্মগামণির আকার দেখিয়া উহার আভিজাত্য নির্ণয় করেন।

১২

বেতারিঙ্গ সাহেব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য যদুনাথকে Bengali Gibbon আখ্যা দিয়াছিলেন; তাও বাহাদুর সরদেসাই ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্বে Gibbon of India বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। যুগলমানযুগের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ইংরেজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণ যদুনাথকে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলিয়া প্রজ্ঞাগুলি দিয়াছেন—এই উক্তির সমর্থনে দলিল দাখিল করিতে গেলে রসভঙ্গ হয়, পরলোকগত আচার্য্যের আত্মার অবমাননা করা হয়। সরদেসাই প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মত গ্রহণ করিলে আমি অগ্নেই বেহাই পাইতাম বটে; কিন্তু লোকে আমাকে কালিদাসের ভাষায় "মৃত্যু পরপ্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি" বলিয়া গালাগালি দিলে জবাব কোথায়? ইতিহাসের রাজহর যজ্ঞে ভোগপ্রতিম সরদেসাই যদি যদুনাথকে প্রথম পূজা দেওয়ার আদেশ করেন তাহা হইলে হয় ত উহা শিশুপাল বধে পর্য্যবসিত হইতে পারে। যদি

বলা যায় যদুনাথ Gibbon নহেন, Macaulayও নহেন, "তিনিই তাঁহার মাত্র উপমা কেবল"—ইহা গুরুপূজা হইতে পারে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিচার হইবে না।

বস্তুতঃ পক্ষে গুরুপ্রতিম পূর্বাচার্য্যগণের যদুনাথ-প্রশস্তির মূল্যই বা কি? সরদেসাইর যুগে যদুনাথের প্রশংসা কোন আদালত আইনসম্মত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না; বরং দুমুখ বলিবে যদুনাথ সরদেসাইকে সপ্তম স্বর্গে চক্কাইয়া গিয়াছেন, সরদেসাই মহোৎসাহে যদুনাথকে নবম স্বর্গে উঠাইয়াছেন। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া "লঘুচেতা" সর্মালোচক হয় ত বলিবেন, যদুনাথ বর্তমানের মাপকাঠিতে স্বদেশ এবং স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন না, মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন ইংরেজ-সেবা ভারতবিন্দুক, তাঁহার ইতিহাস "জাতীয়" ইতিহাস নহে; সুতরাং বিলাতী ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে বাহবা দিবেই!

আচার্য্য যদুনাথকে কেঁহ কেঁহ ভারতীয় Gibbon কিংবা Macaulay বলিয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা স্মৃতির পরিচায়ক নহে, সত্যও নহে, যেহেতু উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক হিসাবে মিল অপেক্ষা অমিল চোখে বেশী পড়ে। Macaulay এবং Gibbon ইংরেজী ছাড়িয়া যদি ফরাসী ভাষায় ইতিহাস লিখিতেন তাহা হইলে উভ্যেব সহিত যদুনাথের তুলনা সুবিচার হইত। মাতৃভাষার মৃণাল হইতে অর্ধবিচ্ছিন্ন প্রতিভা-কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না, ফুটি ফুটি করিয়া ফোটে না। যদুনাথ যে যুগে ইতিহাস চর্চা করিয়াছেন সে যুগে Gibbon এবং Macaulay-র রচনা শ্রদ্ধা ও ঈর্ষার বস্ত্র হইলেও অননুকরনীয়, এবং আদর্শ হিসাবে "সনাতন" হইয়া গিয়াছিল। এই তিনজন ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুতরাং ভাষা এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীও বিভিন্ন এবং ব্যক্তিত্বের অগুরুপ স্বতন্ত্রত্বা। Macaulay কল্প মাত্রই যটোৎকট; দাড়ি পছাইবার পূর্বেই তিনি History of the World লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যদুনাথ জন্মিয়াছিলেন পরাধীন ভারতে, ইঙ্গ-বঙ্গ যুগের শেষ পাশ্বে, তাঁহার মনোবা পণ্ডিতকা, তিনি কি করিয়া Macaulay হইবেন? তাঁহার স্থান তিনি নিজেই করিয়া লইয়াছেন, তিনি গুরুনিরপেক্ষ নিঃপেক্ষ সাধক মহাভারতের একলব্য। Macaulay-এর কলম যোগল দরবারের নিপুণ শিল্পীর হস্ত তুলিকা নহে, উহা পরওয়ারের কুঠার। তাঁহার বাগ্মিতা Burke এর অনলপ্রাবী পৈরিক-প্রবাহ না হইলেও জালা-মুখী চঞ্চল অগ্নিনিধা, তাঁহার ভাষা ভরা বরষার পর্যন্ত-নির্য্যবী। যদুনাথের ভাষায় এই দারুণ দীর্ঘার-গতি

অল্পম বাক্য এবং অসংবদ্ধ পৌরুষ কোথায়। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক পক্ষাঙ্গে “কাহিনী” (মহা বিশেষ) কটু কথার মাহকতা কিংবা আছে, Macaulay-মার্কী ত্রাণের বাক্য কোথায়? বহুনাথের প্রথম বয়সের লেখার মধ্যে এবং “Economics of British India” পুস্তকের আক্রমণাত্মক অংশে Macaulay-র দেশ কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাসে নয়। Macaulay ছিলেন ব্যাবিষ্টার, যাহাকে বরিতেন তাহাকে পথে বসাইয়া ছাড়িতেন, Whig হইলে শূঁর নরম করিতেন। ঐতিহাসিক বহুনাথ শাস্ত্র সমাহিত-চিন্তা রাগবশে বজ্জিত বিচারক। Macaulay-র দোষজ সমালোচকগণের অভিযোগ,—তিনি চমৎকার ভাবে বলিয়াই খালাস (“describes but does not explain”), বুঝাইবার বালাই নাই; তাঁহার রচনায় চিন্তাশীলতা অপেক্ষা ভাষার ওজস্বিতা এবং পারিপাট্যই অধিক। উহার sweet allusiveness সাহিত্যরসিকগণকে তন্ময় করিয়া রাখে, ভাষার বিভ্রান্ত-ছটা পাঠককে স্তম্ভিত করে, কিন্তু ভাবিত করিয়া তোলে না। সাধারণ সূত্র (generalization) উদ্ভাবন করিবার ক্ষেত্রে Macaulay বেপরোয়া ছিলেন—যথা “...As civilization advances, poetry declines” (“Essay on Milton”)। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের বসন্তেনাথ কি করিয়া জন্মিলেন? এই বাতিক আমাদের দেশে Intellectual গণকে বর্তমানে পাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু বহুনাথ এক পা ফেলিয়া আর এক পারে সামনে কি আছে দেখিয়া লইতেন (কেবল কলিকাতার রাজ্য চলিবার সময় ছাড়া)। এইজন্য তিনি কাঁচা generalization-এর চোকা বালি এড়াইয় চলিয়াছেন।

Macaulay বলিয়া গিয়াছেন কাব্য দর্শনাধি শাস্ত্রে “পূর্ণতা” (perfection) লাভ বড় সম্ভব, কিন্তু ইতিহাসে উহা প্রায় অসম্ভব, যেহেতু “সাহিত্য” (Literature) এবং “বিজ্ঞান” (science) এই দুই প্রাতিপক্ষী সাত্ত্বিক্যের প্রত্যক্ষবাদী “ইতিহাস”-সামন্তের উত্তর সঙ্কট। সার্ক-ভৌমদেব দ্বাগীদার এই দুই মহাপ্রভুর মনঃপুত না হইলে ইতিহাস অনবধ্য ও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, এবং ঐতিহাসিককে “বোল কলার” পতিপূর্ণ (perfect) বলা বাইতে না। এই সূত্রে আদর্শ অগ্রবাণী Macaulay তাঁহার “History of England” লিখিয়াছিলেন। এই ইতিহাস পড়িয়া তাঁহার সমকালীন ইংরেজ সমাজের ইতিহাসে অক্লিষ্ট যোগ দূর হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ইতিহাস-বিশুধ কোন পাঠককে ইতিহাসের নেশা ধরাইবার জন্য এমন বস্ত্র আর আবিস্কৃত হয় নাই। দোষজ সমালোচকগণ বলেন Macaulay-র ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ নহে, বরং বিকলাঙ্গ, যেহেতু

তিনি “বিজ্ঞান” অপেক্ষা সাহিত্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহার শিক্ত বাজনৈতিক মতবাহকনিত পক্ষপাত-হুই।

যাহা হউক “বর্ণনা” (narrative) “রাষ্ট্রীয়” (political) ইতিহাসের প্রাণবস্ত। বর্ণনার সর্ববিধ ক্ষণে Macaulay-র রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক হিসাবে Macaulay সৰ্ব্বদে বলা হয়—“একোহি দোষ: গুণগরিপাতে...” তাঁহার measured accuracy, অর্থাৎ সঠিক সত্য সঠিক ভঙ্গনে প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেখা যায় না। দ্বিতীয় Macaulay ভারতবর্ষে দূরের কথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অগ্রাবধি তন্ময়-গ্রহণ করেন নাই। বহুনাথ সৰ্ব্বদে এই মাত্র বলা বাইতে পারে master of historical narrative হিসাবে বিশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে তিনি Macaulay-র স্থান কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়াছেন। M-A পাশ করিবার পর বহুনাথ স্বর্গীয় N.N. Ghosh (Editor, “Indian Mirror”) মহাশয়ের কাছে ইংরেজী লেখার জন্য শিক্ষানবীশী করিয়াছিলেন। N. N. Ghosh তখন উদীয়মান লেখকগণের যুবরকী—“Dr. Johnson”। বহুনাথ বলিতেন, এক বৎসর সাক্ষরদী করিবার পর একটি উপ-সম্পাদকীয় (Leaderette) যে দিন “Indian Mirror” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সে-দিন তাঁহার কি আনন্দ! Macaulay লিখিয়াছেন Sir Walter Scott-র ইংরেজী শুনিলে লন্ডনের মজুব মিত্রীর (London apprentice) হাসি পায়; বলা বাহুল্য এই apprentice স্বয়ং Macaulay! স্মরণ্য বহুনাথের ইংরেজী পড়িবার জন্য Macaulay যদি বাচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার রূপার উদ্ভেক হইত,—আমাদের ইংরেজী পড়িলে “Murder, Murder” চীৎকার ছাড়িয়া মুচ্ছা বাইতেন।

সাহিত্যানিষ্ঠী হিসাবে বহুনাথ Macaulay অপেক্ষা নিকট হইলেও বর্তমান যুগে ইতিহাসের সংজ্ঞা অনুসারে ঐতিহাসিক-মহাদেশী গণনার Macaulay অপেক্ষা বহুনাথ অর্ধেকশ্রেষ্ঠ :

১৬

গিবন্ এবং বহুনাথ সুবিশাল পটভূমির উপর শোকাবহ ও বৈচিত্রময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাযে ইতিহাসের নেশা উর্দ্ধগামী তাঁহারা ভাবিবেন, ইতিহাস ইংরেজের যেন পুরুষোত্তমের সমুদ্র নৈকতে বসিয়া নিদ্রা সন্ধ্যায় বজবাবিধির লহরী গণনা;—ক্রান্ত নাই, তৃপ্ত অবশ্য নাই, সমুদ্রে তরঙ্গ-চঞ্চল জীবনের উর্ধ্বান-পতনের অসুখে বেলা, অনন্দ ইতিহাস। দূরে বিগন্তের কোলে এই নীমাহীন অন্তহীন সমুদ্রযাত্রা যেন একখানা অতিকার



অৰ্ণবপোত বালুকাবন্ধনে আবদ্ধ, উদ্ধায়েব আশা নাই, অধিকন্তু সমুদ্রতটবর্তী কবলগ্রস্ত, উপরে, প্রকোষ্ঠে এবং পাটাতনে আহতের আর্দ্রমাত্র, অবলার ক্রন্দন, হুম্মার অট্টহাসি ও পাশবিক উল্লাস, হুম্মাগণের মধ্যে নানা বর্কর জাতি, টিউটন, গধ, হুণ, আরব (রোম-পক্ষে), কিংবা মারাঠা, জাতি, শিখ, পাঠান, ইংরেজ ( দিল্লী-পক্ষে ) ।

যাহা হউক, যদুনাথ Gibbon এর সমকক্ষ ঐতিহাসিক মনেন। এই কথার সংক্ষেপ প্রকাশ করিলে উক্ত ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হয়, কিন্তু পৃষ্ঠাপাঠ সব-দেখাই-ব কথা সরাসরি খারিজ করা যায় না। এইজন্য “ভারতীয় গিবন” এবং ইংরেজ Gibbon-এর সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা প্রীতিকর না হইলেও অপরিহার্য।

Edward Gibbon ( b. 1737 ) আচার্য যদুনাথের ( জন্ম ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭০ ) একশত তেত্রিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যদুনাথ অপেক্ষা ত্রিশ বৎসর কম ( d. 1794 ) পরমায়ু পাইয়াছিলেন। Gibbon বার বৎসর পরিভ্রম করিয়া ৬ খণ্ডে তাঁহার “Decline and Fall of the Roman Empire” (1776-1789AD) সমাপ্ত করিয়াছিলেন। যদুনাথ বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার “History of Aurangib” ৫ খণ্ডে শেষ করিয়াছিলেন এবং ১৮ বৎসরে Fall of the Mughal Empire (1932-1950) ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই দুই বৃহৎ ইতিহাস ব্যতীত যদুনাথ ইংরেজী-ছোট-বড় আরও ১২খানা পুস্তক লিখিয়াছেন, কানি ইতিহাস অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কয়েক শত ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অধিকন্তু বহু পরিভ্রমে এক বিশিষ্ট ইতিহাস গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মোট কথা পরিমাণে যদুনাথ Edward Gibbon অপেক্ষা ( ইংরেজী-কবাসী লেখা সমেত ) প্রায় চারি গুণ বেশী লিখিয়াছেন, এবং গবেষণার উৎকর্ষে তাঁহার লেখা Gibbon-এর লেখা হইতে অধিক মূল্যবান, যেহেতু যদুনাথ শতাধিক বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, এবং Gibbon এর উত্তরাধিকারের সহিত পরবর্তী শতাব্দী-সংক্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডার যদুনাথ পাইয়াছিলেন। যদুনাথ তবে Gibbon-এর সমকক্ষ হইতে পাবেন নাই কেন ? ইহার জন্ত মুখ্যতঃ দ্বারী যদুনাথের বেশ, যদুনাথের সমাজ।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ-র ( Revival of Learning ) পর হইতে ( ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ) Gibbon-র ঐতিহাসিক গবেষণার কাল পর্যন্ত তিনশত বৎসর কাল রোমের ইতিহাস উদ্ধায়েব জন্ত পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নবীন যৌবনের উদ্দীপনার কর্মতৎপর ছিল। Gibbon-র পূর্বেই তাঁহার সংকলিত ইতিহাসের কাঁচা মাল সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, রোমের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য-শিল্পকলা সম্বন্ধে গবেষণা

প্রৌঢ়বে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মের বিচারমূলক ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষদর্শী জাতি-সমূহের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। গিবন “গ্রন্থাগার-মুখ্য” গবেষক, তিনি নতুন মাল-মসলা সংগ্রহ করেন নাই। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইতিহাসের জল মিশ্রিত দুগ্ধসমূহে সঁতার কাটিয়াছেন। তাঁহার মানস-হংস উহা হইতে দ্রবকে পৃথক করিয়া জগতকে চমৎকৃত করিয়াছেন। রোমের প্রতি শ্রদ্ধাবান ইয়োয়োগের সঙ্কিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার কাছে বিশ্রুতভাবে উন্মুক্ত ছিল, অপর পক্ষে আচার্য যদুনাথকে হেথিলেই যোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিন্দু ও মুসলমান দেশীয় রাজ্যে “সামাল, সামাল” রব উঠিত, পশ্চাতে গুপ্তচর লাগিয়া থাকিত। যদুনাথ হমিবার পাত্র ছিলেন না, রাজত্ববর্গের মজ্জাগত পা-চাটা যোগলাই মনস্তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার প্রয়োজনীয় পুঁথির জন্ত আবেদন Sir Edward Gait প্রমুখ ইংরেজ বহুগণের সৌজন্যে দরবার বিশেষের রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে পৌঁছিত। সাহেবকে অধৈর্য কিছুই নাই, নবাব রাজা মহারাজা হস্তান্তর হইয়া ঐ সমস্ত পুঁথির নকল মর্যাদা চামড়ায় বাধাইয়া সাহেবকে নজর করিতেন, এবং ঐগুলি ছই-তিন হাত ঘুরিয়া যথা স্থানে আসিয়া পড়িত। এমন দেশে হঠাৎ Gibbon জন্মায় না। এই দেশের হিন্দু মুসলমান বন্ধের ধনের মত প্রাচীন দলিল লুকাইয়া রাখে, ব্রাহ্মণ অত্রাঙ্গকে কাগজ দেখায় না, মুসলমান অমুসলমানকে সহজে বিশ্বাস করে না—ইহা আচার্য যদুনাথের ভিত্তি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—অবশ্য উভয় সমাজের মুষ্টিমেয় উদারচেতা পণ্ডিতের এইরূপ সংকীর্ণতা ছিল না।

Gibbon এবং যদুনাথের মধ্যে চরিত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ইতিহাস-চর্চায় সাকল্য ইত্যাদির যে সমস্ত ক্ষেত্রে মিল ও অমিল মোটামুটি জানা যায়, ঐগুলি নিম্নরূপ :

১। Gibbon কয়েক পাতা অসম্পূর্ণ আত্মচরিত লিখিয়াছেন (Autobiography), উহার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত জীবনের “দ্বিগম্বর” সত্য ( Truth, nothing but naked truth )। এই জন্ত ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাস অপেক্ষা কম জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি নাকি দার্ভিক ছিলেন, তাহার মধ্যে আবাহনীয় “ছেলেমো” ছিল, ছই-একবার অকারণে মিথ্যা কথাও বলিয়াছেন। আত্মচরিত না লিখিয়াও যদুনাথ বেহাই পাইতে পাবেন নাই। “ছেলেমো” ও মিথ্যা ভাষণের অপবাদ তাঁহার শত্রুও দেয় নাই। তিনি জন্মাবধি বাশভারি এবং অভ্যস্ত মিতভারী ছিলেন বলিয়া অসত্য ভাষণের রক্ত ছিল না। যদুনাথ দার্ভিক বলিয়াই লোকে জানে, আমরাও জানি তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন



না, কিন্তু উহা ছিল পোষাকী স্বাভিকতা, আসল মাহুৎ অস্ত  
বকম। Gibbon সৰ্ব্বোচ্চ চূড়ান্ত ব্যয় দেওয়া হইয়াছে—  
"We admire, we commend, we like, but we can-  
not love the character of Edward (Gibbon)"\*

এই উক্তি যখনও সৰ্ব্বোচ্চ প্রযোজ্য। কেহ কেহ  
স্বয়ং করিয়া বাধ পুষিয়া থাকেন এবং বাধেরও সন্তানবাৎসল্য  
আছে, এই অস্ত্র বাধকে বিড়াল বলা যায় না।

২। রোমক সাম্রাজ্য কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের  
ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী মহাত্ম্যের না হইলেও ইতিহাস-  
"মহাকাব্য", চতুর্দশশতাব্দী কবিতা নয়। বাহায়া এইরূপ  
ইতিহাস-মহাকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সমকক্ষ না  
হইলেও সমানধর্মী, ইংরেজীতে বলা যায় Epic genius. শ্রম-  
শাপেক্ষ গবেষণা পুরাতন "আবজ্ঞানা"র ভূপ হইতে সত্যকে  
ভিল ভিল আহরণ করিয়া ঈদৃশ মহাকাব্যের উপাদান  
সংগ্রহ করিতে থাকে। ঐতিহাসিক কল্পনায় (Historical  
imagination) একনিষ্ঠ সাধক ইতিহাসের যে বিরাট রূপ  
প্রত্যক্ষ করেন উহার প্রতিচ্ছবি ঐতিহাসিকের মহান সৃজনী  
শক্তি, (constructive genius) মৃত-সঞ্জীবনী ভাষার  
বঙ্কার এবং সাবলীল রচনাশৈলীর প্রভাবে প্রাকৃত জনের  
অধিগম্য হইয়া থাকে।

৩। ইতিহাস প্রান্তরে সাহিত্য-শিল্প হিসাবে Gibbon-  
এর ইতিহাস ভারতীয় উপমায় "ভাস্করমহল", যখনও  
ইতিহাস "কুন্তল মিনার"। যখনও এই মিনারের উপর  
হইতে আশীর্ব্বানীরূপে শেষ আজান্ (call to prayer)  
দিয়া গিয়াছেন—

My message to my pupils and my pupils-  
pupils is one of hope. I bid them to be of  
good cheer, because the opportunities for carry-  
ing on scientific research in Indian history on  
the Indian soil are now unimaginably great,  
and the right atmosphere for this type of work  
has also been created around us...

Work in the right way, for the means are  
ready to hand and reward is sure.\*

"ইমাম" (guide) চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস

\* বইয়—"Biography" (Everyman's Series),  
Introduction by Oliphant Smeaton, p x.

\*Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar' (vol. 1,  
Panjab University, 1958

অবশ্যের মধ্যে অসহায় গবেষক বিশাহায়া হইলে তাঁহার  
অশরীরী বাণী শুনিতে পাইবে, "পথিক, তুমি পথ  
হারাইয়াছ ৭০০-মাস অমূল্য।" ইহাতে বলি পড়িবার আশঙ্কা  
নাই, উদ্ধারের আশা আছে।

৪। Gibbon তাঁহার Decline and Fall of the  
Roman Empire-এ আগাগোড়া অতুলনীয় শিল্পী  
(supreme artist), যখনও তাঁহার ইতিহাসে অস্ত্র  
ঐতিহাসিক। কেহ যেন মনে না করেন Gibbon  
ইতিহাসকে স্বর্ক করিয়াছেন, কিংবা যখনও ইতিহাসে  
ভাব-ভ্রান্তক উচ্চস্তরের সাহিত্য-কলা নাই, অস্বকরণ  
করিতে গেলেই ইহা টের পাওয়া যায়। Gibbon-এর সৃষ্টি  
য়েনস। যুগের বর্ণনাত্মক-সমৃদ্ধ চিত্রসারিকা বার্যাপুরী। এই  
চিত্রশালায় চিত্রসারিকা (gallery of portraits) নির্দ্বাক  
চলচ্চিত্রের স্তায় আনন্দ ও বিষয়ে পাঠকে অভিভূত করে।  
তাঁহার লেখনীর এই গুণ কিন্তু পরবর্তীকালের নিবল ঐতি-  
হাসিক সমালোচকগণ দোষ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

যখনও ইতিহাসে ছোট বড় সমস্ত চরিত্রগুলি ছবির  
মতই আঁকা, তবে তাঁহার ছবি বং-এর বাহু নয়, বলিষ্ঠ  
দেখার বাহায়া—যাহা শাস্তাহানের বাহায়া দরবারী চিত্র-  
শিল্পীগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। বং চড়াইতে গেলেই ইতিহাস  
খানিকটা ঢাকা পড়ে। পূর্ণ একশত বৎসর ইংরেজ জাতি  
Gibbon-এর ইতিহাসকে বুক করিয়া রাখিয়াছিল, এখন  
মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন। যখনও ইতিহাস বুক মাথায়  
রাখিবার বস্তু নয়, ইহা সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখিবার  
জিনিস। মধ্যযুগের গবেষকগণ যখনও ইতিহাসে "নুতন  
কিছু" আবিষ্কারের অস্ত্র নির্দেশ পাইবেন, নাট্যকার  
নাটকীয় চরিত্র পাইবেন, "অধুনাতন" (Modernism)  
অকুটি ধরিলে কিংবা উদ্ভাবনী-শক্তি শিথিল হইলে  
উপস্তাসিক "Fall of the Mughal Empire" গ্রন্থে চমৎকার  
ঐতিহাসিক উপস্তাসের প্রচুর মাল পাইবেন, ভারতবর্ষীয়  
যে কোন কুলের কোষ্ঠি বিচার করিতে গেলে যখনও ছাড়া  
গত্যন্তর নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রে "আন্তরঙ্গ্য-ভক্ত" কিংবা  
"মহুস্বতি"-র আতঙ্ক হইতে গণভক্তকে যদি বাঁচাইতে হয়  
তবে ঐতিহাসিক যখনও উপদেষ্টা মানিতে হইবে।

৫। Gibbon এবং আচার্য্য যখনও প্রতিপাদ্য  
বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বের পার্থক্য আছে। ঐতি-পূর্ব যুগের  
অর্ধ পৃথিবীব্যাপী রোমক সাম্রাজ্যের সহিত মোগল সাম্রাজ্যের  
তুলনা হয় না। সভ্যতার সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে  
মোগল সাম্রাজ্য রোমের তুলনায় বহু গুণে নিকট। রোম  
ইয়োবোপীয় সভ্যতাকে বাহা দিয়াছে দিল্লী তাহা ভারতীয়  
সভ্যতাকে দিতে পারে নাই। রোমের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার

অপেক্ষা ক্রমতঃ পতিতে খ্রীষ্টধর্ম রোমের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, রোম বস্তুতঃ পক্ষে লোপ পায় নাই, নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। মুসলমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় দশা অস্তরূপ। “বন্ধে মাতবরম্” ভীতিগ্রস্ত ইংরেজ ইম্পেরিয়ে রাজধানী পত্তন না করিলে দ্বিতী বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের রাজধানী হইত না, বর্তমান দ্বিতীয়ার মহানগর ভোগলকের মত কিছুকাল দ্বিতী-দৌলতাবাদের মধ্যে আনাগোনা করিয়া রাষ্ট্রের অষ্ট-ভৌগোলিক দিক হইতে ভরিপে নির্ভারিত কেন্দ্র স্থলে রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেন। Holy Roman Empire যে অর্থে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল বর্তমান ভারত-রাষ্ট্রে সে অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নয়।

প্রতিপাদ্য মহিমায় প্রবন্ধ মহত্ব হইয়া থাকে সুতরাং Gibbon-এর ইতিহাস যখনাথের এছ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এই কথা মানিতেই হইবে। Gibbon-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ধর্ম-রাজক সম্প্রদায় কেলিয়া উদ্ভিয়াছিল। তিনি নাকি খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি স্মরণ্য করবেন নাই, যখনাথের প্রতি হিন্দু মনোভাব অনুসরণ। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা তাঁহাদের নিন্দা না পরোক্ষ প্রশংসা (left-handed compliment) ?

৬। Gibbon এবং যখনাথ দুজনেই ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া এক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ (encyclopaedian task) আবস্ত করিয়াছিলেন এবং উহাতে পূর্ণাঙ্গতি দিয়া অক্ষর কীর্তিলভ করিয়াছিলেন, এইখানেই উহাদের মধ্যে মিল। Gibbon-এর উপর Western Church-র শনিদৃষ্টি ছিল। যাহার জন্ত তাঁহাকেও Vindication লিখিতে হইয়াছিল। যখনাথের উপর ছিল নবগ্রহের প্রকোপ। ঐতিহাসিকদ্বয় উহাতে বিচলিত না হইয়া স্থায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন, তবে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

Gibbon অপেক্ষা যখনাথের কার্য এক হিসাবে অধিক ফলপ্ৰসূত ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পত্তন ইংলণ্ডের ইতিহাস নহে; যে জাতি ঐ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, সেই জাতি Gibbon জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় তের শত বৎসর পূর্বে মরিয়া গিয়াছিল। “Fall of the Mughal Empire” কোন বৃত্ত জাতির ইতিহাস নহে, মোগল সাম্রাজ্য না থাকিলেও মুসলমান আছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বর্ণযুগ হিন্দুনাথ পাত-শাহীর অবসান হইলেও মারাঠা জাতি বিলক্ষণ জীবিত; “গুরু” না থাকিলেও শিখ আছে, ভরতপুত্রের স্মরণমূল-অবহিষ্ট শিখ মরিয়া গেলেও কাঠ মরিতে পারে না; ছত্রপাল বুদ্ধেলা নাই, কিন্তু বুদ্ধেলার জাত্যতিমান আছে; অমর-পরায়ণ নৌধ্যতিমানী রাজপুতগণ চারণ ব্যতীত কোন

ঐতিহাসিককে সমীহ করে নাই। আবদালী-মজিবুদ্দৌলা গিয়াছে কিন্তু ভারতের ভিতরে বাহিরে পাঠান নগণ্য মছে, দাক্ষিণাত্য তখনও আন্তঃদেশবৃত্তের পীঠস্থান।

Gibbon-এর সময় সমগ্র ইরোবোপের সুখীসমাজ রোমের প্রতি ভক্তিমান ছিল, রোমের প্রশংসা কিংবা নিন্দা ঐতিহাসিকের পক্ষে “অধিকন্তু ন বোধ্যয়ঃ” ছিল; অপর পক্ষে ঐতিহাসিক যখনাথকে ক্ষুব্ধের ধার কিংবা পুল-ই-সিরভের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ আচার্য্য যখনাথ বাকুদের কাবখানায় বসিয়াই ইতিহাস লিখিয়াছেন, এবং উহার উপর শাস্তিবারি নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। যখনাথ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন ভারতবর্ষে Gibbon and Fisher-এর মত ঐতিহাসিক নাই, পরে ক্রান্তিতে পাবেন।\*

১৭

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ত্য যাত্রার দিন আমি আচার্য্য যখনাথের সঙ্গে আবাসিক ছাত্ররূপে কটক গিয়াছিলাম। ঐখানে যাইয়া বুকিলাম গবেষণা আমার কাজ নহে। আমাকে কি করিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন না, অথচ প্রত্যাহ বিকালে বেড়াইবার সময় জিজ্ঞাসা করতেন, কাজ কত দূর? নতুন কিছু পাওয়া গেল? তিনি সকাল বেলা কতকগুলি বহি আমার টেবিলে রাখিয়া যাইতেন, ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা আমাকে অনুমান করিয়া লইতে হইত। মাঝে মাঝে মন বহি রাখিয়া যাইতেন, যেগুলির সহিত শের শাহ দূরের কথা হিন্দুস্থানের কোন সম্পর্ক নাই; যথা ইটালী এবং অস্ত্রাচ্চ দেশের বণবিজ্ঞানের ইতিহাস। ক্রমশঃ আমি সর্বভূক হইয়া পড়িলাম, কাবণ বিকালে মৌখিক পরীক্ষা। একখানা বহি কিছুতেই আমি হজম করিতে পারিলাম না। ইহা Gooch-এর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক “History and Historians of the Nineteenth Century”। উহার দুই অধ্যায় পড়িয়া আমি মাথায় হাত দিলাম, লেখক, উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু কিছুই বোধগম্য হইল না। ঐ বহির মধ্যে তখন পর্যন্ত আমার Macanlay, Gibbon, Grote, Mommsen ছাড়া অস্ত্র ঐতিহাসিকের নামগন্ধ আমার জানা ছিল না। এক সপ্তাহ পরে প্রসন্ন হইল, Gooch-এর মতে আদর্শ ঐতিহাসিক কে? আমি বলিলাম, Macanlay। তিনি হাসিয়া জেবা করিলেন কেন? ভাষায়

\* This is the general type of our [Research workers in India] work. . . . a full history of India can be constructed by some future synthetic genius like Gibbon or H.L.A. Fisher”. (Bengal Past and Present, Jubilee Number 1957)

কুব্জী কুটাইল “বাবের” প্রাঙ্ক করিতে চাও নাকি ? আমি আরও এক মাস সময় পাইলাম ; ইহার পরে আবার জেরা । এইবার প্রস্ত হইল, উৎকৃষ্ট শতাব্দীর ইতিহাসগোষ্ঠীর (“Schools of History”) মধ্যে কোন্ “School”র ধারা ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী ? তখন আমারও কিঞ্চিৎ স্বদেশী “ভোস্” ছিল, এবং আমি উহাই খুঁজিতেছিলাম ; সুতরাং আমি বলিয়া ফেলিলাম, Prussian School—বাহা নেপোলিয়নের পরদলিত জার্মান জাতিকে নেপোলিয়ন জয়ী করিয়াছে । যত্নাধেব যুগে একটু বিবর্তের ভাব দেখা গেল যেন তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে ; পরে তিনি গভীরভাবে বলিলেন, উহা ইতিহাস নয়, প্রচারমূলক সাহিত্য ; জার্মান জাতির উপর সালসার কাজ করিয়া ঐ ইতিহাস মরিয়া গিয়াছে কিন্তু উহার বিষ জাতির শরীরে আছে । আমি সব কথা না বুঝিলেও Prussian School-এর মোহ ত্যাগ করিলাম ।

ইহার কিছুদিন পরে যত্নাধ Ranke (“History of the Popes” প্রণেতা) সম্বন্ধে আমার কি ধারণা জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি বলিলাম, Ranke বড় কঠোর বিচারক ; তাঁহার আসন সকলের উপরে বটে, কিন্তু লেখা সহজে বুঝা যায় না, পড়িলে বক্ত গম্য হয় না । কয়েক দিন Ranke, Mommsen লইয়া আলোচনা চলিল, ইহাতেই বুঝিয়া লইলাম হাওয়ার কোন্ দিকে চলিয়াছে । Mommsen সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে “History of Rome” পড়িয়া আমি বাহা অনুম্মদ করিতে পারিয়াছিলাম উহাই বলিলাম ; Mommsen শ্রেষ্ঠ জার্মান পণ্ডিত, কিঞ্চিৎ কবাসী বিষয় আছে, বচন একেবারে পাখুর প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে Gibbon, Macaulayর মত সুপাঠ্য নয় । মোট কথা যত্নাধ Rankeর প্রাণ্ড ভক্তিমাত্র ছিলেন এবং তিনি Mommsen বোমের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন ভারতে মুসলমান যুগের ইতিহাসে অনুরূপ কার্য করিবার উচ্চ আশা পোষণ করিতেন ; কিন্তু পদমাত্রে কুলায় নাই । এই সমালোচনা লিখিতে না বলিলে যত্নাধেব বহি এই বরণে পড়িবার প্রয়োজন ছিল না, ঐতিহাসিক যত্নাধকে বুঝিবার প্রয়াস চইত না ।

১৮

আচার্য যত্নাধ মহান কৰ্ম্মযোগী ছিলেন । ইতিহাসকে কেবল করিয়া তিনি স্বকীয় কৰ্ম্মক্ষেত্রে স্থিতি করিয়াছিলেন,

ইতিহাস তাঁহাকে অতুল প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে, জীবনে আনন্দ দিয়াছে, শোকে শান্তি দিয়াছে । তাঁহার কৰ্ম্মকমতা অসাধারণ এবং কৰ্ম্মস্পৃহা ছিল অপূরণীয় । “খ্যাতি খ্যাতি” (Fame, more fame) করিয়া মহাবীর নেপে শিয়ন মরিয়া-ছিলেন ; “কাজ আরও কাজ” করিয়া যত্নাধ মরিলেন । দশ জনের মত হিন্দু নিজেব পদমাত্রে বেশী ঘেঁষিয়াছিলেন, এবং যত্নাধ পূর্বে এইজন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার দশবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন । এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক দলিল ও প্রাপ্য পুস্তকাদির সম্পাদনা ; Mommsen বোম ইতিহাসের যে বকম “Corpus” প্রকাশিত করিয়াছিলেন, মোগল ইতিহাসেরও তদনুরূপ “Corpus” সংকলন তাঁহার কামা ছিল । তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে অন্যান্য চারি হাজার “আখবাবাত” অর্থাৎ দিল্লী দরবারের দৈনিক সংবাদ-তালিকা আছে । এইগুলি ছাপাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল ; টাকা থাকিলে হয় ত করিয়া ফেলিতেন । বাহা করিয়া গিয়াছেন উহাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না ।

যত্নাধ মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া বলিতেন, ইতিহাসে আমি কি “সাক্ষ্য স্বরূপে” [ মারাঠা সেনাপতি ] কিংবা সুইডেনের রাজা দশম চার্লসের মত একটা ধুমকেতু হইয়া থাকিব—বাহার পশ্চাতে অন্ধকারের ধূস্রপুচ্ছ, মধ্যে গতিকে কণিক আলো, সম্মুখে মহাশূন্য পুড়িয়া তমস্বষ্টি বাহার পরিণাম ? তিনি ধুমকেতু না হওয়াতারা উহার বিচার তাঁহার দেশবাসীরা করিবে,—যে দেশ সরহেসাই-যত্নাধের ঐতিহাসিক গবেষণা-গৌরবে পাশ্চাত্যকে পঞ্চাশ বৎসর পিছনে ফেলিয়াছে । এই কৃতিত্বের ভাগ্যভাগি করিবার অপচেষ্টা আমরা করিব না ।

স্বাধীনতার অক্লণোদয়ে ইতিহাস-গগনে প্রভাতী-তারার জ্বলন্ত যত্নাধের অবির্ভাব হইয়াছিল ; সেই প্রভাতী তারার স্বকীয় শক্তিতে অসংখ্য তারকাপুঞ্জের কক্ষপথকে অবহেলা করিয়া ইতিহাস-অনুসন্ধিষুর দৃষ্টিপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আচার্য যত্নাধের বিত্তা “শুশিষ্য-পরিচরিতা” হইলে এত সহসা নিরাশা হইত না, তাঁহার “Military History of India” অসমাপ্ত থাকিত না । তাঁহার পরিত্যক্ত গাভীর শিষ্যগণ বংশধরগণ বাবহার করিয়া আশ্রয়লা করিবে ; উহাতে জ্যা বোপণ করিয়া কুরুক্ষেত্রজয়ী হইবার আশা নাই ।

## পাষাণের প্রাণ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনিমেষের জগতটা যুতহেহে ধেরা। সাধা, কালো, লাল—  
নানাপ্রকার পাথরে রচিত গ্রীক, বৌদ্ধ, হিন্দু দেবদেবী ও  
রাজা-রাজ্ঞার যুতহেহ, সৌন্দর্যের অবিনশ্বর ঐশ্বর্য,  
অতীতের মূর্ত সাক্ষী। বেদ-পুরাণ-তন্ত্র জাতকের বিপুল  
ভূতবের অভ্যন্তরে বিরাজ করেছ সুদূর অতীতের বিলুপ্ত  
হয়ে যাওয়া মানুষগুলি—অনিমেষের কাছে এরাই সত্য।  
বর্তমানকালের মানুষ অর্থাৎ যারা বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে  
অনিমেষের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তারা ত এখন  
পর্যন্ত গোটা মানুষ নয়, মানুষের ভগ্নাংশ। মানুষ মরে গেলে  
তবে সে গোটা বলে প্রমাণিত হবে। তারও বহু পরে, এবং  
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারলে তবে সে বস্তুতঃ  
সত্য হয়ে উঠবে। অতএব অনিমেষের কাছে বুদ্ধদেব সত্য,  
জুলিয়াস সীজার, কনকুলিয়াস বা কালিদাস সত্য, কিন্তু বহু,  
মধু সত্য নয়। তর্ক তুললে ভাষাকে একটু সংশোধন করে  
অনিমেষ বলে, অপত্য একথা জোর করে বলছি না, তবে  
বিচার্য্যবীন। এ বিচার শেষ হতে পাঁচশ, হাজার বা ছ’  
হাজার বছর লাগতে পারে। তোমরা প্রমাণিত হবে  
ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের হাতে, আমার কাছে তোমরা  
বুল্যহীন।

অতএব অনিমেষ মানুষের দিকে তাকাবার প্রয়োজন  
অনুভব করে না। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের শিল্পনৈপুণ্যে  
বিশ্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছে, অজস্র  
চিত্রকলায় মুগ্ধ হয়ে সে ড্যাভ ড্যাভ করে তাকিয়েছে, হিন্দু-  
স্থাপত্যের গগনচুম্বী বিরাটবে অভিজুত হয়ে সে হাঁ করে  
চেয়েছে, কিন্তু জীবিত মানুষের দিকে তাকাবার কথা তার  
কখনও মনে হয় নাই।

এ হেন অনিমেষ একদিন বিয়ে করল। মস্ত মস্ত ধিয়োরী  
আর অগণিত প্রমাণে-ঠাসা তার মগজে যে কখনও কোন  
রক্ত-মাংসে পড়া নারী স্থান পাবে, এটা অবিখ্যাত, বহিঃ  
পাথরের নারীরা চিরকালই তার মন হরণ করেছে। বহিঃ  
কালশ্রোতে উজান বহা সত্ত্ব হত তা হ’লে সে একুশি চতুর্থ  
শতাব্দীর মিথিলায় চলে যেত। সেখানে হাতে লীলা কমল  
এবং অলকে বালকুন্ডাহরিদ, লোঁচ ফুলের রেণুতে পাণ্ডুর-মুখ  
কামিনীর চঞ্চল কটাকে বিপর্য্যত হ’ত। কিন্তু বর্তমানের  
বাঁধব নারীকে সে কি বলে বিশ্বাস করবে? এদের বোঁপার

ফুলের মালা শুকোর, গরমকালে গা দিয়ে বাম বেবোর, অশ্রুধে  
এরা রোগা হয় এবং বার্কক্যে এদের চুল পাকে, চামড়া  
কুঞ্চিত হয়। অতীতের নারীরা সকলেই চির-বৌবনা।

• অথচ অনিমেষ যে অকস্মৎ বিয়ে করল, তার জন্ত দায়ী  
কে? দায়ী তার ঐ ঐতিহাসিক মগজই।

হাজিলিং-এ এক সন্ধ্যায় কোন এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ  
রক্ষা করতে গিয়ে অন্তর্গামী সূর্যের সোনালী কিরণে  
ঝলসানো পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউণ্ডে নীল শাড়ী-পরা এক  
অপূর্ব নারীর চিত্র দেখে সে জীবনে আর একবার ক্যাল  
ক্যাল করে, ড্যাভ ড্যাভ করে এবং হা করে তাকিয়ে ছিল।  
তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তার তথ্য-শিকারী  
ঐতিহাসিক মন উক্ত অসাধারণ আর্ট-স্পেসিমেণ্ট দখল  
করবার জন্ত প্রলুব্ধ হয়েছিল। কোন ঐতিহাসিকই কি  
এমন অবল্য সম্পন্ন হাতে পেলে হাতছাড়া করে? অনিমেষও  
করে নি, একেবারে বিয়ে করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

সুনন্দার কিন্তু মানুষটিকে অত্যন্ত ভাল লেগেছে।  
একেবারে আপন-ভোলা, সঙ্গশিব। তার এত দিনকার  
শিবপূজা বুঝি সার্থক হ’ল। অনিমেষ অধ্যয়ন ছাড়া আর  
কিছু জানে না। তার ছোট পড়ার ঘরের বিচিত্র পরিবেশে  
মানুষের চোখের আড়ালে মিশরের মমির মত সে স্বমহিমায়  
বিরাজ করে। সুনন্দা ঘর গোছায়, সংসার আগলায় এবং  
মাঝে মাঝে এসে স্বামীর পড়ার ঘরের ঐতিহাসিক নিম্নকতা  
ভাঙে।

একটু দুইমিও করে। পা টিপে টিপে এসে অনিমেষের  
চেয়ারের পিছনে দাঁড়ায়। তারপর হু’হাতের আঙ্গুল দিয়ে  
অনিমেষের হৃদয়িকার পাঁজরে স্নড়স্নড়ি দিতে চেষ্টা করে।  
অনিমেষের সমাধি ভাঙে।

“কে, সুনন্দা?” অনিমেষ প্রশ্ন করে।

“উঁহু,” সুনন্দা সামনে এসে দাঁড়ায়।—“ছয়েনসাত।”  
হাসতে হাসতে বলে।

অনিমেষ একাধি দৃষ্টিতে সুনন্দার মুখের দিকে চেয়ে  
থাকে।

“কি দেখছ?” সুনন্দা প্রশ্ন করে।

“তুমি বাস্তবিকই সুন্দর।” অভিজুতের মত অনিমেষ  
বলে ওঠে।—“অসাধারণ।”

“তাই নাকি ?” সুনন্দা উত্তর দেয়। “তোমার ওপর  
করনের চেয়েও ?” বলেই বিল বিল করে হেসে ওঠে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষুদ্র হয়ে অনিমেষ ভাবে,  
অত হাসে কেন সুনন্দা। একান্ত অর্থহীন হাসি, বা কালের  
ধোপে টিকবে না। কই, বুদ্ধদেবের মা তাঁর বাবাকে  
কাড়ুড়ু দিয়ে হাসাচ্ছেন, আর নিজে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন,  
এমন ছবি অজস্র তাঁর গায়ে সে কখনও দেখেছে বলে ত  
মনে পড়ে না। বব্বীপের প্রজ্ঞাপারমিতা কি লুভ্-  
মিউজিয়ামে বসে অনাদিকাল ধরে হি হি করে হাসছেন ?  
বই বন্ধ করে অনিমেষ একখানি ছবিয়ালবাম টেনে নেয়।  
পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ে—মোনালিসা। ই্যা,  
অনিমেষ ভাবে—বহি হাসতেই হয় তবে এমনি করে। গভীর  
বহুস্তম্ভ অতীন্দ্রি় হাসি, যেন মহাকালের ধরস্রোতের  
মাঝখানে একটি নিশ্চল অবিনশ্বর শতদল ফুটে আছে।  
সুনন্দার সৌন্দর্য্যও ত ইতিহাসের যে কোন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে  
তুলনীয়। তবে ও অমন বিকীভাবে হাসে কেন ? ও কি  
মোনালিসার মতন হাসতে পারে না ?

“দেখছ ?” সুনন্দার দিকে ফিরে ছবিটার দিকে আঙ্গুল  
প্রদর্শিত করে সে দেখায়।

“দেখছি।” গভীর ঔহাস্যভরে সুনন্দা জবাব দেয়।

“কি বকম দেখছ ?” অনিমেষ বহুস্তম্ভ করে প্রশ্ন করে।

“তুমি যেমন দেখছ, তেমনি। একটা মেয়ের ছবি, তার  
বেশী কি ?” নিঃসংশয়ভাবে সুনন্দা বলে।

“আর কিছু নয় ? কেন, হাসিটা ?” অনিমেষ হঠাৎ  
গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে।

“হাসিটা কি ?”

“জান, ওই হাসির অন্তরী ছবিটার এত কবর। ওই  
বকম হাসতে পেরেছিলেন বলেই ত ঐ মহিলাটি, পৃথিবী-  
বিখ্যাত হয়ে আছেন।” অনিমেষ উত্তেজিত ভাবে বলে।

“সত্যি নাকি ?” সুনন্দা হঠাৎ উৎসুক হয়ে ওঠে।

“কই, দেখি—” বলে ঝুঁকে পড়ে সে। “আচ্ছা দেখত”,  
অনিমেষের মুখখানি হুঁহাতে উঁচু করে ধরে বলে, দেখত,  
আমিও ঠিক এমনি ভাবে হাসতে পারি কিনা ? দেখ, লক্ষ্য  
কর, আমি হাসছি।” সুনন্দা গভীর ভাবে মোনালিসার মত  
হাসতে চেষ্টা করে হুঁ এক সেকেন্ড, কিন্তু তারপরেই বিল  
বিল করে হেসে ওঠে।

“না, তুমি একেবারেই হোপলেস।” চেয়ারে এলিয়ে  
পড়ে অনিমেষ। স্যালবামখানা টেনে নেয় সুনন্দা। পাতা  
ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে ধামে।

“এই, এটা কেমন বল না ?”

“ওটা মিল্যের তেনান বৃষ্টি।” উত্তেজিত ভাবে অনিমেষ  
বলে, “নারীদেহের সৌন্দর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।” বলে  
চোখ বুঁজে ভাববার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পরে বলে, “ওর  
ছটা হাতই ভেঙ্গে গেছে, না ?”

সুনন্দা দেখে বলে, “তাই ত মনে হচ্ছে।”

হঠাৎ অনিমেষ উজ্জল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, “কিন্তু ও  
তোমার চেয়ে সুন্দর নয়।”

“উহ, আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর।”

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে এবার অনিমেষ বলে, “তা হতেই  
পারে না।—তুমি সম্পূর্ণ নির্বৃত্ত, তোমার হুঁখানা হাতই  
আছে।”

অনিমেষের কথা সুনন্দার কানে যেন ঢুম করে বসুক  
মত আশঙ্ক্য করে। কিন্তু স্বাভাবিক হওয়ার জন্য সে  
হুঁহাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, “এ হুঁখানা কি তা  
হ’লে ? তোমাদের বইয়ের ভাষায় বলারী, না ?”

অনিমেষ একটু নড়ে চড়ে বসে। কেমন যেন একটা  
মাধকতা আছে সুনন্দার স্পর্শে,—দেহের বোমকুপের তিতর  
দিয়ে একটা অমুভূতি ঢুকে শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।  
একেই কি বলে শিহরণ ? আর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কেমন  
যেন একটা চুলবুলানি, একটা উদগত পুলক যেন গলাব মধ্য  
দিয়ে ঠেলে বের হতে চায়। এ ধরনের অমুভূতি অনিমেষের  
কাছে সম্পূর্ণ নতুন—ইতিহাস পাঠ করে এ বস্তু সে কখনও  
লাভ করে নাই। মোটের উপর বেশ ভালই লাগে, একটু  
যেন নেশার ভাব আছে এর মধ্যে।

বা হাতে সুনন্দার কটি বেঁধে নেয় সোহাগের সুরে সে  
বলে, “বাই বল সুনন্দা, তোমাকে কিন্তু ঘরের কোণে  
মানায় না।”

“কোথায় মানায় তা হ’লে ?”

“মিউজিয়ামে।” অনিমেষ উত্তর দেয়।

“আর তোমাকে চিড়িয়াখানায়, না ?” হেসে সুনন্দা  
প্রশ্ন করে, কিন্তু মনে মনে দারুণ অবজ্ঞাবোধ করে।

তবুও মোটের উপর ওদের দিনগুলি বেশ কাটে।  
অনিমেষের পাগলামিতে কখনও কখনও ছন্দপতন ঘটলেও  
সুনন্দা তার ছেলেমানুষী দিয়ে পাছপূরণ করে নেয়। কিন্তু  
ওদের যৌথ জীবনের মাঝখানে ইতিহাস-নামক প্রকান্ত  
একটি অশরীরী হানবের উপস্থিতিকে সুনন্দা একটু আতঙ্কের  
চোখেই দেখতে আরম্ভ করেছে আজকাল। অনিমেষ ওই  
হানবের কবলিত, আর সুনন্দার চেষ্টা ওকে মুক্ত করে  
স্বাভাবিক জীবনের আবহাওয়ার ফিরিয়ে আনা। অতিবিক্রম  
পড়ায় কলেই অনিমেষের কাছে অবাস্তব বাস্তবের রূপ

পরিগ্রহ করেছে। নইলে যাব এত প্রভাব প্রতিপত্তি, বিশ্ববিভাগের ছাত্র হিসাবে যাব তুলনা নাই, যাব পবেষণার প্রাঙ্গণায় পণ্ডিত-সমাজ যুগের, তার মস্তিষ্কের স্বৈর্য্য সন্ধে সন্দেহ যে করে সেই ত পাগল। তাই সুনন্দা মাঝে মাঝে ওর পড়ার ঘরে হানা দিয়ে ওকে অতীতের অন্ধকার গুহা থেকে বর্তমানের উজ্জল আলোতে টেনে আনবার চেষ্টা করে।

“বলত পরমভট্টারক, আমার হাতে কি?” বহুমুখি দেখিয়ে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে।

অনিমেঘ গভীর ভাবে নিবিষ্ট। ইহানিং একটি প্রশ্ন তার মনে বিশেষ করে জেগেছে। ইতিহাসে কাবা স্থান পায়? শুধু রাজা রাজড়াদের কাহিনী নিয়েই ত ইতিহাস নয়, এক কথায়, ইতিহাসে তাঁরাই স্থান পেয়েছেন যারা অসাধারণ। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হানিবল, সফ্রেটিন, কালিহাস, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি—এঁরা সকলে অসাধারণ বলেই ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

সুনন্দাও ত অসাধারণ। ওর সঙ্গে তুলনা হয় এমন সৌন্দর্য্য অনিমেঘ কোথাও দেখে নাই, বাস্তবে ত নয়ই, এমন কি আর্টেও নয়। ইতিহাসে ক্লিওপেট্রা বা মমতাজের পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্য। অনিমেঘের কি উচিত নয়, সুনন্দাকে তার প্রাণ্য দেওয়া?

সুনন্দার প্রশ্নের উত্তরে সে বিপর বোধ করে মাথা চুলকায়। তারপর বলিকতার উজ্জল হয়ে ওঠে।

“বোধহয় ঘোড়ার ডিম।” খুশী মনে বলে।

“উহ, হ’ল না। তুমি বুঝি আজকাল প্রাচীনকালের ঘোড়ার ডিম নিয়ে পবেষণা করছ?”

“তাহলে দিল্লীকা লাড্ডু।”

“সে ত খেয়ে পত্তাচ্ছ। ওটাও নয়। তবে, হ্যাঁ, খাবার জিনিসই বটে, চেখে দেখবে? তা হ’লে চোখ বুঁজে হাঁ কর—হ্যাঁ, হয়েছে। দেখ, যেন হাতটা আবার কামড়ে দিও না।”

অনিমেঘ মুখ বিকৃত করে বলল, “বাবাঃ, ভয়ানক টক। তাই ত, কুল পেলে কোথায়?”

“ওটা পল্লী টুটান খামেনের বড় পেয়াবের জিনিস কিনা।” সুনন্দা অভিশর গভীর হয়ে ডঠেছে। শীঘ্রই হাসির ঝড় উঠবে, তারই পূর্বাভাস। “পল্লী টুটান-খামেনের একেবারে খাস বাগিচার জিনিস, এক নম্বর পিরামিডে পাওয়া গেছে।”

“ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?”

“বাবো, ঠাট্টা হবে কেন?” সুনন্দা এবার হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। “প্রত্যেকেই যে বায় বিষয় নিয়ে

দিসার্চ করবে ত? তুমি করেন, ছালপচার, আর্কিটেকচার নিয়ে দিসার্চ করছ—ওগুলো তোমার বিষয়। আমি কলা, মূল্য, বেগুন নিয়ে দিসার্চ করি, ওগুলো আমার বিষয়।” সুনন্দা হুলে হুলে হাসতে থাকে।

সুনন্দার যুগের দিকে তাকিয়ে অনিমেঘের মনে হয়, অমনি ভাবে হাসি ঠাট্টা করলে, নড়ে চড়ে বেড়ালে সুনন্দাকে সত্যিই মানায় না। সুনন্দা যেন ওর আরাধ্যা, তাকে পূজা করেই ও খুশী। কিন্তু ভক্ত মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সামনে ভক্তিভাবে প্রণাম করছে এমন সময় বিগ্রহ যদি বেড়ী থেকে নেমে এসে ভক্তের কান কামড়ে দেন, তা হ’লে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়। এও যেন কতকটা সেই রকম।

অনিমেঘের মনে পড়ছে একদিনের কথা। সন্ধ্যার সময় ও সাধারণতঃ পড়ার ঘরেই কাটায়। সেদিন কি কারণে হঠাৎ ছোতলার ঘরে গিয়েছিল। ঘরে চোকবার আগেই তার চোখে পড়ল, সুনন্দা পশ্চিমের জানালায় ধারে চেরারে বসে আছে। কোলের উপর একখানি খোলা বই, কিন্তু চোখ সেদিকে নেই। সুনন্দা দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে। সন্ধ্যার বনায়মান বহুস্ত তার চোখে নিবিড় ভাবে ফুটে উঠেছে। অন্তঃস্বামী সূর্য্যব কিরণে তার খোলা চুলের একটা পাশ যেন কলসে যাচ্ছে। অর্ধ-প্রকাশিত দেহের প্রতিটি রেখায় শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে অলোছায়ার স্বন্দ খেলছে। সামান্য ফাঁক করা ঠোট দু’টি মাঝখানে দু’টি দাঁতের উজ্জল আভাস। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় হেসেছিল, তার বেশ এখনও মিলিয়ে যায় নি। অনিমেঘ শুক হয়ে গিয়েছিল। এ তার স্ত্রী নয়—এ যেন কুমারসম্বৎ কিংবা উত্তররামচরিত থেকে নেমে আসা একখানি জীবন্ত প্রতিম, যুগ যুগ ধরে যাব তপস্বী সে করে এসেছে। অনিমেঘ এতই ছায়া দেখে এসেছে অজ্ঞতার প্রাচীরে।

তাড়াতাড়ি সে নীচ নেমে গিয়েছিল ক্যামেরা আনবার জন্য। শিরীর স্বপ্ন এই রূপের সামান্য বেশও যদি ধরে রাখা যায়। কিন্তু কিসের এসে দেখল, সুনন্দা খাঁটা হাতে ঘর বাঁট দিচ্ছে। মুহূর্তমান স্রাবটি ক্লাইমেক্স।

অনিমেঘকে চেয়ে থাকতে দেখে সুনন্দার হাসি থেমে গেল। আবার সেই দৃষ্টি—একটা অজ্ঞাত ভয়ে প-টা শির শির করে ওঠে। ওহ দৃষ্টি-ত কেমন যেন একটা হিংস্রতা আছে। দীর্ঘ শক্তিভাবে তাই সে জিজ্ঞাসা করল, “কি দেখছ?”

“তোমাকে।” আবিষ্টের মত বলল অনিমেঘ।

“কেন?” আরও শক্ত হ’ল সুনন্দা।

“কেন, জিজ্ঞেস করছ?” উত্তেজিত ভাবে অনিমেঘ বলল, তুমি কি, তুমি নিজেই জান না। তুমি অসাধারণ।



ইতিহাসের পাতার ধাঁধা অমর হয়ে আছেন, তাঁরা সকলেই অসাধারণ। তোমাকে আমি যদি অবহেলার নষ্ট করে ফেলি তা হ'লে ভবিষ্যতের কাছে আমাকে অপরাধী হতে হবে।”

সন্মুখে স্বামীর হাত ধরে সুনন্দা বলল, “চল ছাতে বাই, বিকেল হয়ে এল। চা খাবে? আজকে তোমার জন্ম পুড়িং তৈরি করেছি। তুমি যে সেই মোব নাসাঁবী থেকে সুই-এর চাবাটা এনে দিয়েছিলে, সেটা এখন কত বড় ঝাড় হয়েছে দেখবে চল। ছ'চারটে ফুলও ফুটেছে। বেশী ফুটলে তোমাকে মালা গাঁখে দেব।”

“জাপানীরা ফুল খুব ভালবাসে। ওদের আর্টের হিষ্টি আলোচনা করলেই সেটা বোঝা যায়।” অনিমেষের মন্তব্য সুনন্দা কানে যেন স্মৃতিত খাপছের গর্জনের মত শোনাল।

“কৈ যদি তুমি আমার কাছে ইতিহাসের কথা বলবে তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব, নিশ্চয় গলায় দড়ি দেব, নয়ত ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব।” সুনন্দা প্রায় কঁদে ফেলল।

অনিমেষের মুখে কল্পন নিকুপায় ভাব ফুটে উঠল। “বা—বে, তুমি রাগ করলে সুনন্দা, সত্যি, আমি কখন কি যে বলে ফেলি। যাক, আর বলব না। কই আমার চা দিলে না ত?”

“চা তৈরি করে ক্রাফে রেখে এসেছি। ছাতে চল, পুড়িং আর ডিম স্ত্রাজা দিয়ে খাবে খন।” ছাতে যেতে যেতে আবহাওয়ার সুরে বলল, “এই শোন, আমার একটা কাকাতুরা কিনে দেবে? আমার অনেকদিন থেকে একটা কাকাতুরা পোষবার ভয়ানক সখ। সেই-বে দক্ষিণেশ্বরে দেখেছিলাম, ধবধবে সাধা, কি সুন্দর যে কথা বলে। সেই বকম, বুঝলে? ছাতের একটা পাশ তার দিয়ে বিবে দেব, সেখানে থাকবে। ভাল ভাল কথা শেখাব, রবিবার কবিতা।

“মোগলরা.....যাকগে।” অনিমেষ থেমে গেল।

“মোগলরা কি?”

“নাঃ, কিছু না। ওই দেখ, চিলটা কত উপরে উঠেছে। সত্যি, কাকাতুরা ভারি সুন্দর। আজই একবার মার্কেট ঘুরে আসব খন। সুনন্দা, লেকে বাবে?”

“নাঃ।” সুনন্দা বলল, “লেক আমার ভাল লাগে না।”

তা হ'লে হেঁদো, কিংবা কলেজ-কোয়ার, না হয় আউটরাম বাট? তোমার একটু বেড়ানো দরকার। ঘরের ভিতর থেকে থেকে শরীরটা যেন খাড়াপ হয়ে যাচ্ছে।

“কিছু না, আমার শরীর বেশ আছে। তুমি বরং চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে এস গে।”

“হ্যাঁ, আমি যাব, কিন্তু তুমিও যাবে। বাইরের লোকজন দেখলে মনটা প্রকুল হবে।”

“আমার মন বাড়ীতে চমৎকার থাকে।”

“না হয় অন্তে তোমাকে দেখবে, তাহের জন্ম বেক্রবে।”

“ওমা, সে কি গো!” অকৃত্রিম বিস্ময় সুনন্দার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। “অন্তে আমার দেখবে, সেজন্ম আমি বেক্রব?”

“হ্যাঁ, বেক্রবে, অন্তে দেখবে, সেজন্যই বেক্রবে।”

অনিমেষের মধ্যে সেই জানোয়ারটা আবার যেন জেগে উঠল।

“আমার মতে কোন আদর্শ জিনিসই কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। যা যুগ যুগ ধরে আলো বিতরণ করবে, যার পায়ের নীচে এসে দাঁড়ালে মানুষ যোগ, শোক, জরা সব ভুলে যাবে, যা সত্য শিব-সুন্দরের প্রতিভা, তা কাহারও একার নয়—সবার। তুমি এ পৃথিবীতে একটা বিরাট বিস্ময়, তোমার অসীম মহিমা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াও, লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে শিল্পীর হল, সাধকের হল। সেটা কি আমার কম গর্ব, সুনন্দা? আমি তোমার আবিষ্কারক, সেই হিসাবে আমার আত্মপ্রশংসা কি কম?”

“চা যে জুড়িয়ে গেল।” অনিমেষের গারে মুহু ধাক্কা দিয়ে সুনন্দা বলল, “খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ ডিম ভেজে নিয়ে আসি, তার পর আর এক কাপ তৈরি করে দেব।” বলে সে নীচে যাবার জন্ত পা বাড়াল।

অনিমেষ থপ করে তার শাড়ীর অঁচল ধরে কেলল, বলল, “দাঁড়াও, কথা আছে।”

“কথা?” আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সুনন্দা তাকাল।

“আমি ভাবছি” অনিমেষ বলল, “কি করে তোমাকে ইতিহাসে স্থায়ী করা যায়। তুমি ত জান না তুমি কি! তুমি...”

“ইঙ্গ প্রস্থের ধ্বংসাবশেষ—না না, অতটা অর্ধাচীন নই, আরও প্রাচীন, বোধহয় শুধামানবের পাথরের হাতিয়ার। অর্ধাৎ তোমার পি-এইচ-ডি'র উপকরণ, এই ত? তা হ'লে এক কাজ কর। আমাকে চট করে মেয়ে কেল। তার পর মাংস-টাংস সব বাহ্যিক অংশগুলো টেঁচে কেল ককালটা নিয়ে সোজা চল য়ো অক্সফোর্ড—।” সুনন্দা শেষের দিকে প্রায় রেগেই উঠল।

অনিমেষের মুখে শিশুর মত নিকুপায় ভাব ফুটে উঠল। বলল, “সত্যি সুনন্দা, ইতিহাস যেন আমার পিষে মারল। কি করি বল ত?”

“দাঁজলি চল। হাদার কাছে দিনকতক থেকে



আসব। শীতকালে হার্ডিলিং আমার খুব ভাল লাগে।  
হি হি শীত হাড়-কাপানো, দাঁত ঠক্ ঠক্, কবল আর  
আঙনের কুণ্ড। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায়, কুয়াশার  
মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চাষর মুড়ি দিয়ে ভুতের মত সব  
পাহাড়ের চূড়াগুলো।”

“আমার বোধহয় হার্ডিলিং যাওয়া হবে না। বোধহয়  
বেতে হবে হিষ্টি কংগ্রেসে, সেখানে আমাকে প্রবন্ধ পড়তে  
হবে।” অনিমেষ চিন্তিত মুখে বলল। এবার কিবে এসে  
ইতিহাস আলোচনা একেবারে ছেড়ে দেব। তার পর তুমি  
আর আমি হাজারাবাগ জেলার ছোট্ট একটা গ্রামে চলে যাব।  
পাহাড়-বেরা গ্রাম, উঁচু-নোচু লাল মাটি। কোন লোকজন  
নেই সেখানে—লোক মানে অবশ্য ভজ্রলোক। হুঁচার ঘর  
চাষী আছে, তার ক্ষেতে ভুট্টা আর কড়াইগুঁটি জন্মায়।  
আমাদের একখানা মাটির ঘর থাকবে, তার চারিদিকে শাল-  
বন আর সামনে ছোট্ট একখানি ক্ষেত, সেখানে আমি কাজ  
করব। জলের কল নেই কিন্তু, আছে ঝরণা, পাহাড়ের গা  
বেয়ে তর তর করে নেমে আসছে। তুমি বোঝ হুঁবেলা  
কলসী ভরে জল আনবে সেখান থেকে, পারবে না সুনন্দা?”

“নিশ্চয় পারব, খুব পারব।” উৎসাহে সুনন্দার চোখ  
ঝক্ ঝক্ করে উঠল।—“সত্যি, সে ভারি সুন্দর হবে। যাবে  
ত ঠিক? তুমি আবার যে মাহুস?”

“যাব বৈকি। তুমি না হয় তোমার দ্বারার ওখানে  
হার্ডিলিং গিয়ে থাকগে। লিখে দেব?”

“সে হবে’খন। সেজন্ত বাস্তব হতে হবে না। ব’ল, ডিম  
ভেজে আর চা তৈরি করে আনি। আকাশটা কি সুন্দর  
দেখাচ্ছে আজ, না?” চকল হাওয়ার মত লবুগতিতে  
সুনন্দা চলে গেল।

বোধে থেকে কিরবার পথে আর একবার অজন্তা ঘুরে  
এগেছে অনিমেষ। সেই অজন্তা না দেখলে শিল্পীরা পাগল  
হয়ে যায়, কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ভাবুকরা ধ্যানমগ্ন  
হয়। আর ঐতিহাসিকরা?...

“সুনন্দা, যারা অজন্তা দেখেনি তাদের জীবনই বৃথা।  
তোমার একবার নিয়ে যাব।”

“তার আগে তুমি গল্প বল, তাতেই আমার অর্ধেক  
দেখা হয়ে যাবে।”

অনিমেষের মুখের উপর যেন কোন নূতন আবিষ্কৃত গ্রহ  
থেকে পাণ্ডুর আলো নেমে এসেছে। এ যুগ যেন তার  
সামনে হাওয়ার মত মিলিয়ে গেছে, আর সেখানে এসে  
দাঁড়িয়েছে প্রাচীনকালের উজ্জয়িনী। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের  
হাজগতা, যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত শকমিথনে যুদ্ধযাত্রা করবেন,  
মগধীতে অদৌম উত্তেজনা। বধ, অশ ও পরাভিক বাহিনীর

বিপুল সমাবেশ। তদিকে শিপ্রানদীতীরে মধরপ্রান্তে এক  
হার্যদ্বিধ কুটারের প্রাঙ্গণে মাধবীকুন্ডে মহাকবি কালিদাস  
কাব্য রচনার ব্যাপৃত। রাজ্যের প্রান্তে পর্তুগাজে কোথিত  
চৈত্যাগৃহে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমবেত হয়েছেন। স্থবির উদাত্ত-  
কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। অজ্ঞ এক  
কক্ষে বৌদ্ধ-শিল্পীরা প্রাচীরগাত্রে বহুলেপ লেপন করছেন,  
চিত্র অঙ্কিত করতে হবে।

সুনন্দার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ বেন স্বপ্নের ঘোরে বলে  
চলল, “মুখে বলতে গেলে অজন্তাকে খাটো ফরা হয় সুনন্দা।  
যেখাঁ, ছন্দে, রঙের বিভ্রাসে প্রতিটি ছবিই বেন কালজয়ী।  
পঞ্চম শতাব্দীর প্রতিনিধি ওরা, আজ আমাদের চোখের  
সামনে থলে দ্বিয়েছে এক রূপের ভাঙার, সুনন্দার রাজ্য।  
সেখানে ওরা কুটে আছে, বিকশিত হয়ে আছে ওদের অপার  
মহিমায়, আর আমরা অদৌম বুদ্ধকা নিয়ে তাকিয়ে আছি  
ওদের দিকে, থাকবও চিরকাল।”

সুনন্দা শিউরে উঠল। আবার বুকি বাড়ে ভূত চেপেছে।  
নাঃ, অনিমেষকে নিয়ে ও আর পেরে ওঠে না।

“তোমার কিন্তু, যাই বল, শরীর খারাপ হয়ে গেছে।  
হবে না, এ-ত এক্কারসান্ সহ হয় কখনও? এখন কিছু-  
দিন পড়াগুলো একদম বন্ধ।” সুনন্দা বলল, “চল,  
হাজারাবাগ ঘুর আসি।”

“হাজারাবাগ যাওয়া এখন হবে না।” অনিমেষ বেন  
পাখর ছুঁড়ে মাগল।—“সুনন্দা, তোমার সেই কটোখানা  
আছে ত? আমি তুলিরেছিলাম,—সেই যে তুমি বসেছিলে  
পল্লাসনে, আর তোমার হাতে ছিল বর্ষচক্র-প্রবর্তন যুজ।  
কটোখানা দিও একবার, অয়েল পেন্টিং করা। আর্টিস্ট  
ঠিক করেছি, সাতশ’ টাকা নেবে। সামান্য টাকা, কিন্তু  
বহলে পাব—”

“না না, আমি দেব না, কিছুতেই দেব না, কটো দেব  
না।” সুনন্দা কেটে পড়ল। কটো আমি তেজে তড়িৎ  
ফেলব। আমি আর আমার ছবি একসঙ্গে এ বাড়িতে  
থাকতে পারবে না। তুমি যেদিন অয়েল পেন্টিং আনবে  
সেই দিনই আমি গলায় হুড়ি দেব।”

অনিমেষ ভয়ানক গভীর হয়ে গেছে। সুনন্দার একি  
ব্যবহার। তার প্রতি কাজে যেন বর্ত্তমান বাধার মত  
সুনন্দা। অনিমেষ বুঝে ওঠে না, ওর এত আপত্তি কেন।  
সুনন্দা অনিমেষের প্রাণে প্রেরণা এনেছে। সেজন্ত অনিমেষ  
সুনন্দার কাছে কৃতজ্ঞ। সহস্রবার সে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
করেছে। সুনন্দাকে অমর করে রাখবার জন্ত অনিমেষের  
এই যে প্রচেষ্টা, এর জন্ত তার অমৃতঃ আমদিত হওয়া  
উচিত। আজকের সুনন্দা কাল মরে যাবে, পরন্তু কে

তাকে স্বপ্ন করবে? প্রতিদিনই এই স্বপ্ন শব্দ-সহস্র লোক মরছে, কে তাদের স্বপ্ন রাখে? কিন্তু সুনন্দা ত তাদের একজন নয়, সে স্বপ্নহীন। অতএব তাকে স্বপ্ন করবে রাখাই উচিত। সাধারণ লোক অজ্ঞ, তারা সুনন্দাকে চিনবে কি করে? চিনেছে অনিমেব। তাই তাকে কালের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে বাচিয়ে রাখবার তার অনিমেবের উপরই অর্পিত হয়েছে। অতঃ সুনন্দা—। অনিমেব গরম হয়ে উঠল।

“সব ঠিক হইবে গেছে সুনন্দা, আপত্তি চলবে না। কেন তুমি এমনি কর আমার বাণী হিচ্ছ, বল ত? মনে রেখ, তোমার আমার মিলন একটা গ্যাক্সিডেন্ট নয়। তুমি ত অজ্ঞ যে-কোন লোকের হাতে পড়তে পারতে। ষেরে, ঘুমিয়ে, স্বপ্নের বশ বন্দা করে নাতিপুত্রের মুখ দেখে বুড়ো বয়সে নিমন্তলায় দেহ রাখতে পারতে। কিন্তু তা হয় নি কেন? কারণ সত্যেই নষ্ট হওয়ার জন্য তোমার সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের পাতায় তুমি অমর হয়ে থাকবে, কালের বৃকে অবিনশ্বব হয়ে ফুটে বইবে, এ জন্যই তোমার তার ঐতিহাসিকের হাতে পড়েছে। এতে তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত, অতঃ তুমি বাণী হিচ্ছ। কেন, কি তোমার আপত্তির কারণ?”

“তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না, ওগো, এ তোমার বোঝাবার নয়।” সুনন্দা এবার কান্নার তেজে পড়ল।

অনিমেব বিস্মিতভাবে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে বইল। সুনন্দার ব্যবহার বরাবরই তার কাছে দুজের, আজকেরটা একটা প্রহেলিকা। কিন্তু তার চোখের জলে সে ব্যথিত হ’ল।

“কিন্তু কেন, কেন তোমার এই আপত্তি? সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।” অনিমেব বলল, “অজ্ঞতার সেই সব ছবি দেখলে তুমি কিছুতেই আপত্তি করতে পারতে না। মা ও মেরে শাক্যবুদ্ধিকে ভিক্ষা দিচ্ছে। কি গভীর তাদের মুখের ভাব, সমস্ত জগতের কল্পনা যেন ওদের চোখে জমাট হয়ে আছে।”

“তুমি আমার কথা কর। ফটো বইল, তাকব না। আমি মরে বাওয়ার পর তোমার বা ইচ্ছা করো। তোমার জালাতন করবার জন্য আমি আর বেশীদিন বেঁচে থাকব না।”

অনিমেব চমকে উঠল।—“হিঃ সুনন্দা, ও কি কথা! আমি আর ছবির কথা কখনো বলব না। তুমি যে ও কথায় এত আঘাত পাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। থাকগে, চল সিনেমা দেখে আসি। ও সব বাক্যে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না, কি বল?”

হুই জন সিনেমা দেখে ফিরেছে। তবে চুকতে চুকতে অনিমেব হঠাৎ প্রস্থ করল, “ওই যে মেরেটা নারিকার পার্টে প্লে করল, ও দেখতে বেশ সুন্দর, না?”

“হাই, ও আবার সুন্দর। কপাল উঁচু।” সুনন্দা ঠোট উলটে ঘৃণা প্রকাশ করল।

“অবশ্য তোমার সঙ্গে তুলনা হয় না, হতেই পারে না। তা হলেও পর্দায় ওরকম কমই দেখা যায়।”

“এস এস, শোবে এস, অনেক রাত হয়েছে।” কাল সিনেমার কথা আলোচনা করা বাবে। বড্ড ঘুম পেয়েছে, তোমার পায় নি?”

“ভীষণ পেয়েছে।”

সুনন্দা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার উক দেহ সুস্থ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠছে-পড়ছে। ও বড্ড নরম, নয় কি? সিনেমার ওই মেরেটি সুন্দরী, কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে তুলনা হয় না। তবু লোকে ওকে দেখে, জানে, প্রশংসা করে। ই্যা, লোকে পূজা করে, হয়ত কোন শিল্পী তার তুলির ছকে ওর বন্দনা গান করে।

কি শিল্পী ওকে অমর করে রাখবে, আর ওর চেয়ে সহস্র গুণ রূপ নিয়ে সুনন্দা অনিমেবের ঘরের কোণে নিরুবেগে ঘুমাবে? অসম্ভব!

অনিমেব সুনন্দার কোন আপত্তি শুনে না, তাকে প্রচাণ করবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করবে।

সুনন্দা ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্তে, নিরুবেগে! অনিমেব আজকের রাতটা ঘুমাবে না, চেয়ে বসে কাটাবে।

ঘরটা এত নির্জন, কোন সাড়াশব্দ নেই, কেউ তাদের দেখছে না, সুনন্দাও অনিমেবকে দেখছে না। সুনন্দা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আবার ত সে জাগবে, আবার বাণী দেবে।

সুনন্দা এক ভগ্নানক ইদ্রিত করেছিল। সে ত প্রস্তুতই।

এ কি! অনিমেব সুনন্দাকে খুন করবে নাকি? কতি কি, এই ত সুযোগ। কেউ দেখবে না, সুনন্দাও জানতে পারবে না, কে তাকে খুন করল। ও মরলে অনিমেবের কষ্ট হবে। মানুষ হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে ওর একটা সত্তা ছিল। স্নেহে, প্রেমে, সেবার সে অনিমেবকে মুগ্ধ করেছিল। অনিমেবও মানুষ, সে স্বামী। সে-ও সুনন্দাকে গভীরভাবে ভালবাসে।

কিন্তু মহৎ আত্মত্বের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া উচিত। তার বদলে অনিমেব সুনন্দাকে চিরন্তন করে রাখবে। হোতলায় উঠবার সিঁড়ি বেধানে মোড় ঘুরেছে সেখানে সুনন্দার ঐতিক্রান্ত স্থাপিত হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-

নামার সময় দেখা বাবে—এই সুনন্দা, সৌন্দর্যের রাণী, কালের অলুপ্যনকে লঙ্ঘন করে তার অবিনশ্বর মহিমার হুতিমান হয়ে আছে।

এ-কি! অনিমেষ এ-কি করল? সুনন্দা নড়ে না, তার উষ্ণ দেহ নীতল হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার দেহের বৃহৎ ওঠা-নামা একেবারে থেমে গেছে। তার মুখে শুধু এক কোমল তীক্ষ্ণ হাসি।

“সুনন্দা, সুনন্দা, এই তোমার প্রকৃত স্বরূপ, তোমার চিরন্তন রূপ! তোমায় আজ পেয়েছি তোমার পূর্ণ বিকাশের মধ্যে। তুমি আজ কালজয়ী, অমর, সুনন্দা—” অনিমেষ পাগলের মত চিৎকার করে বিছানার উপর উঠে বসল।

সকালবেলাকার রোদ চকল শিশুর মত ধরের মধ্যে লুটোপুটি করেছে।

“তোমার চা যে জুড়িয়ে গেল, কত ঘুমুচ্ছ?” সুনন্দা বলে চুকল। রাশীকৃত ভিজে চুল ওর পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সকালবেলাই স্নান করে একখানা লাল শাড়ী পরেছে। স্নান করলে ওকে এত স্নান দেখায়!

“চল সুনন্দা, হাজারিবাগ যাই। আজই, বুঝলে? আর ঘেরী নয়। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।” ব্যগ্রভাবে অনিমেষ বলল।

## নিরুপমার প্রেম

শ্রীনিচিকেতা ভরদ্বাজ

এখনো অনেক দূরে—হুপুয়ের নির্জন নদীতে  
আকাজ্জারা গান গায়। চेतনার অনন্ত ভঙ্গীতে  
আমি তার মূর্তি গড়ি, যন্ত্রণার মোম  
গলে গলে পড়ে; আমি সাথী তার। যৌবনের হোম  
এরই নাম!—এই ছন্দে পৃথিবীর আকাশ-উচ্চারণ  
এই রক্তে পৃথিবীর প্রাণ আজো স্বপ্ন-সংসার।

আমি যে নেপথ্য-স্রুটি—শেষহীন পঞ্চাঙ্গ নাটকে;  
যন্ত্রণার তিলোত্তমা—তাই তুমি থাকবে আমার  
চিরকাল, কালার পাহাড়ে মন থাকুক উৎসব;  
আমার তুমার-গলা উৎস থেকে—নদীর কখনে  
এত গান! এ সুরের ও স্বরূপ আমার।

প্রত্যাহরে পরাজয়ে—যন্ত্রণার নির্মম কঠিন প্রস্তবে  
আমি যে ভাস্কর এক, বস্তুগত রহস্যের ডাকে

লোক-লজ্জা-স্বপ্ন-সাধে সত্যের ছেনি ধরে ধরে  
নিটোল নিভৃত মূর্তি—নিরুপম! লাবণ্যে গভীর  
গড়েছি তোমাকে আমি; রাত্রি-দিন তাও ত তোমাকে  
তোমার ছহাতে তুলে—আমি আজো শাশ্বত প্রেমিক।

এ প্রেম যন্ত্রণা দেবে; আকাজ্জারা পাবে নাকো নীড়  
উধাও অমর শূন্যে—তবু তারা কী যে সাহসিক...  
স্বপ্ন দেখে। অথচ সে জানে এই জীবনের অবে  
প্রেমের আরোগ্য নেই। লবণাক্ত সমুদ্রের ধরে  
কেবল ঢেউয়ের দোলা। ডানা-মেলা হাঁস—  
কুল নেই কোনোদিকে, বহুদূরে জীবনের ভিড়!  
তবু সে চলেছে একা রোদ বৃষ্টিঝড়ের প্রহরে—  
হয়তো তোমার রূপে প্রাণ হবে প্রথম উল্লাস!  
সামুদ্রিক পাখী তার জন্ম-মৃত্যু ঢেউয়ের উপরে  
আগ্নের আবেগে তবু ঋজু মন বিশ্বের বিশ্বাস।

## শিল্পে প্রয়োজনবাদ

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

বঙ্গীয় এক বাস্তবীকৃত আশ্রয় আনি, যার কথা রলা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই ভিত্তমহিলা তাঁর ব্যক্তিগত আবেগজীবনের সমস্ত সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন শেক্সপীরের ওথেলো নাটকের অভিনয় দেখে। নিম্পাপ ডেসডিমোনার মৃত্যুদণ্ড পরিণতি, দুঃস্বপ্ন আবেগ-প্রবণ ওথেলোর প্রেমোত্তপ্ততা ও তচ্ছনিত অশান্তিময় পরিণতি—এরা হয়ত কখন কখন ব্যবহারিক-জীবনে সত্য হয়। এই দুঃখজনক জীবননাট্যের কুশীলবেয়া হয়ত 'ওথেলো' নাটকের সার্থক অভিনয় দেখে তাঁদের আপন আপন ব্যক্তিগত সমস্ত সমাধানও কখন কখন পেয়ে বান, সে সত্য সত্যস্বীকৃত! তবে প্রশ্ন হ'ল এই যে, নরনারী বিশেষে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত সমাধানে পারগতাই কি ওথেলো নাটকের শিল্পমূল্য নির্ণয় করবে? আধুনিক শিল্প বিচার পদ্ধতিকে গ্রীস দেশের দার্শনিক-চিন্তা আজও কি আচ্ছন্ন করে রাখবে? ওথেলো নাটকে কুশীলবদের নাট্য-কুশলতায়, নাটকের ঘটনা-সংস্থানে, চরিত্রচিত্রণে এবং নাটকের রসধন পরিণতিতে আমরা মুগ্ধ এবং বিম্বিত হই, না আমরা অধেষণ করব কোথায় কোন্ মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ সমস্ত সমাধান করল এই নাটকের অভিনয়? নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারটুকু কোন্ মানদণ্ডকে আশ্রয় করবে? আমার রসতৃষ্ণা মিলেই কি আমি তাকে সার্থক শিল্প বলব? অথবা শিল্প আমার ব্যবহারিক প্রয়োজনে এলেই তাকে শিল্প হিসেবে সানন্দ-স্বীকৃতি দেব?

প্রয়োজনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে প্রয়োজন শিল্পীর আন্তর-প্রয়োজন নয়, যার উৎস কোন ব্যবহারিক জীবনবোধ, তা হ'ল বাহিরের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পের আত্মাত্মিক স্বভাবের কোন যোগ নেই। যেমন, ধরা যাক, রলা কবিত 'Peoples, Theatre'-এর কথা। সেখানে যে নাটকের অভিনয় হবে তার মধ্যে মানুষের স্বার্থের সংঘাত দেখান চলবে না। কেন না, তা মানুষে মানুষে এক প্রতিকার বিরোধী। এখানে নাটকের ঘটনা-সংস্থানকে মানবকল্যাণের জন্ত, শিল্পীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্পের প্রকৃতি নিরীত হচ্ছে শিল্পের আন্তর-প্রয়োজনে নয়, বাহিরের<sup>১</sup> জগতে

এক প্রতিকার মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে। এই প্রয়োজনটুকু বত বড়, বত মহৎই হোক না কেন, এটি শিল্পের প্রকৃতিবিরোধী। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের 'স্বরাটি' প্রকৃতিকে ক্লম করেছে। শিল্প আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পরতন্ত্রবশীভূত হয়ে পড়েছে। শিল্পচারিত্র্য বহির্জীবনের প্রয়োজনে ক্লম এবং ব্যাহত হচ্ছে। সুন্দরের প্রতিষ্ঠা শিল্পে ঘটল কি না তার বিচার হচ্ছে শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনের নিরিখে। শীতকালের সকাল বেলায় কাঁচা-সোনা বোদুবকে সুন্দর বলছি তার বর্ণসুখমার জন্ত নয়, তা শীত-ঋতুতাকে দূর করে দিয়ে শরীরকে উত্তপ্ত করে দিচ্ছে বলে। এ হ'ল প্রয়োজনবাদীদের মত। সুন্দরকে এঁরা ব্যবহারের তাবদার করে সৌন্দর্যের প্রকৃতিকে ধ্বংস করলেন। যে প্রয়োজন শিল্পীর অন্তরলোকের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনেই বস্তুার্থ শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। একেই শিল্প এবং কলা-রসিকেরা অপ্ৰয়োজনের প্রয়োজন বলেছেন। শিল্পীর প্রয়োজনে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এই লক্ষ্য-অনির্দিষ্টতা শিল্পীর প্রয়োজনকে ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক করেছে। শিল্পগত প্রয়োজনের কোন ধারণাও শিল্পীমানসে থাকে না। মহাদার্শনিক কান্টের মতে শিল্পের মূলে এই অপ্ৰয়োজনের প্রয়োজনে<sup>২</sup> প্রেরণা থাকে বলেই শিল্পানন্দ সর্বজনগামী হয়, তার আবেদন হয় সার্বিক কোন চিন্তাসিদ্ধ ভাবের (Reflective Idea) সহায়তা ব্যতিরেকেই। অর্থাৎ কান্টের মতে শিল্পের প্রয়োজনটুকু কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। এই রূপহীন প্রয়োজনটুকু কোন নির্দিষ্ট ভাবেকে আশ্রয় করে না বলেই আমাদের কল্পনা (imagination) এবং বোধ (understanding) রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারে। আমাদের সৌন্দর্য-বোধের মূলে রয়েছে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে আমাদের জ্ঞানবৃত্তির (cognitive faculties) অঙ্গগতি; সুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলি এই সম্বন্ধের এবং সঙ্গতির জন্য, বহির্জগতের অথবা অন্তরলোকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করল বলেই তাকে আমরা সুন্দর বলি না।

২ "In an aesthetic judgment the beautiful object is perceived as exhibiting a purposiveness without purpose, that is to say, a purposiveness without the representation of an end, without a concept of its nature. (Knox প্রণীত The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer, গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

১ দার্শনিকপ্রবর হিউম ও তাঁর Treatise of Human Nature গ্রন্থে শিল্পে প্রয়োজনবাদকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি তাঁর 'সংসারবাদকে নন্দনতবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি, এটা লক্ষ্য করার বিষয়।

ভাবতী নন্দনভবের লীলাধারণার প্রয়োজন-অতিরিক্ত এই বাস্তব-  
ইচ্ছা রয়েছে। স্বয়ং বিধাতা বধন লীলাধারণ হ'ল তখন বিশ্ব-  
ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়। বিধাতা বধন সৃষ্টীশীল হ'ল  
তখন কোন প্রয়োজন তাঁর সৃষ্টি কর্ত্ত্বের প্রেরণা জোগায় না। সৃষ্টি  
হ'ল তাঁর লীলা। লীলাধারণার সর্বপ্রয়োজন অস্বীকৃত। পাবী  
যে গান করে, তাকে লীলা বলব কিনা সে সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ  
আছে। যিথুন কালে পুরুষ-পাবীর নৃত্যগীত অল্পাধিক হয় স্ত্রী-  
পাবীকে আকৃষ্ট করবার জন্য, এ কথা পক্ষীতত্ত্ববিদেরা বলেন।  
একেকের নৃত্যগীতের পিছনে বাবতারগত প্রয়োজন রয়েছে। এটি  
প্রয়োজন যেটাতে গিয়ে শিল্পসৃষ্টি কখনই সম্ভব হবে না। যদি  
কখনও এমন দেখা যায় যে, শিল্পসৃষ্টি হয়েছে কোন প্রয়োজন যেটাতে  
গিয়ে, তখন বুঝতে হবে যে প্রয়োজন যেটানোর জন্য সৃষ্ট কর্ত্ত্ব শিল্প  
হয়ে উঠে নি, তা শিল্প হয়েছে শিল্পীর প্রকাশগুণে। শিল্পী যদি  
সত্য সত্যই কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হন, যে উদ্দেশ্য তাঁর শিল্পকর্মে  
জনক, তবে তা হ'ল রূপাভাব দূর করা, অর্থাৎ রূপসৃষ্টি করা। এই  
রূপসৃষ্টির তাগিদ আসে ভিতর থেকে, ভাববাহী দার্শনিকেরা বলেন  
যে, শিল্পীর এখা হ'ল ভাবকে (idea) তাঁর পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ  
করা। ভাব বধন জড় বস্তুর মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে তখন  
জড়বস্তুর জড়তার জড় ভাবের পূর্ণাঙ্গ এবং সম্যক প্রকাশ সম্ভব হয়  
না। শিল্পী প্রকৃতিতে ভাবের এই সম্পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন।  
তিনি প্রয়াস পান শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে এই ভাবকে পূর্ণতর মহিমায়  
প্রকাশ করতে। একে আমরা আন্তর-প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের  
প্রয়োজন বলতে পারি। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারণায় এই  
আন্তর-প্রয়োজন স্বীকৃত। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের প্রকৃতির সঙ্গে  
অসঙ্গত নয়। এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি শিল্পের প্রকৃতিকে সূর্য  
করে না। ভাববাহী দার্শনিকদের অল্পসংখ্যে অবনীন্দ্রনাথ বলেন  
যে, রূপাভাবই হ'ল একমাত্র প্রয়োজন, বা নন্দনভব স্বীকৃত হতে  
পারে। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পীর অগতে নিত্য-সত্য। এই  
প্রয়োজন কখনও যেতে না। শিল্পী বধন রূপসৃষ্টি করেন তখন এই  
প্রয়োজনের সাংসারিক এবং আংশিক পূর্ত্তি হয়। শিল্পীমনে আসে  
কণিকের তৃপ্তি এবং পূর্ণতার আনন্দ। এই তৃপ্তি এই আনন্দ  
একান্তই কণিকের। এর পরেই আবার সেই অতৃপ্তি শিল্পীমানসকে  
আচ্ছন্ন করে। এই অতৃপ্তিকে স্বর্গীয় অতৃপ্তি বা Divine Dis-  
content বলা হয়েছে। শিল্পী আবার সৃষ্টীশীলার যেতে ওঠেন।  
এক রূপ থেকে আর এক রূপ সৃষ্টি হয়। কবি নিরন্তর একরূপ থেকে  
অন্যরূপে বাওয়া-আসা করেন। সকাল পড়িয়ে বার দুপুরে, দুপুর  
সন্ধ্যার ভিখিত আলোর অবসিত হয়ে আসে। সন্ধ্যায় নিঃশব্দ  
অভিসার নিততি নীলধের দ্বারপ্রান্তে এসে ঘেঁষে বার। তবুও  
শিল্পীর রূপসৃষ্টি প্রয়াসের শেষ হয় না। তাঁর শিল্পীমানস নিত্য  
অশান্ত, সে অশান্তি নিত্য নূতন নূতন সৃষ্টির প্রত্যাশা সজ্জাত। নব  
নব সৃষ্টির প্রেরণা আসে পূর্বতন সৃষ্টির অপূর্ণতা থেকে। তাঁর  
শিল্পের অপূর্ণতা তাঁর কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ। হুঃখী বাহুবই কেবল

জানে হুঃখের দারুণতম বেদনা কোথায় রয়েছে? তেমনিধারা  
শিল্পী জানেন তাঁর বহুবলিত শিল্পকর্মে কোথায় ত্রুটি রয়েছে,  
কোথায় রয়েছে অপূর্ণতা, তাই ত বহীন্দ্রনাথের মত হঠাত্ত্বিকের  
আগামী সুগেব কবিকে আহ্বান করে হুঃখী বাহুবের মর্ষবেদনাটুকু  
উদ্ধার করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানাতে হয়। নিজ  
সৃষ্টিতে শিল্পী বধন এই অপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন তখন  
তাঁর চোখে সেই নিত্য-সত্য চিন্তেন রূপাভাবটুকু প্রকট হয়ে ওঠে।  
অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে, এই রূপাভাবটুকু হ'ল সমস্ত শিল্প-  
কর্মে জনক। যে মুহূর্ত্ত শিল্পীর জগৎ চৈতন্য এই রূপা-  
ভাবটুকু অল্পভূত হয় তখন তাঁর অন্তরে সৃষ্টি জ্বালা আগুন ধরায়।  
কবি এক স্বর্গীয় বেদনার কাতর হ'ল কবি অপূর্ণ উদ্বেগ ভরে  
সৃষ্টির-সম্ভাবনার অশান্ত, হয়ে ওঠেন। স্বর্গীয় মত তখন  
তাঁর মানসিক অবস্থা; সার্থক সৃষ্টিতে, 'সাময়িকের রচনায় এই  
অশান্তির শেষ হয়। সার্থকসৃষ্টি শিল্পীমানসে যে আনন্দে সৃষ্টি  
করে তা 'বিমল আনন্দ', এই আনন্দ কোন প্রয়োজন-সিদ্ধি আনন্দ  
নয়। এ আনন্দ ঈশ্বরগ্রাহ্য স্নেহ বস্ত-দর্শনের আনন্দ নয়; স্নেহ  
দ্বাস, ফুলের মৌগন্ধ, বীণার সুর, এরা ঈশ্বরগ্রাহ্য আনন্দ দেয়।  
এ আনন্দকে দার্শনিক কান্টের অল্পসংখ্যে আমরা 'বিমল আনন্দ'  
(pure joy) বলব না। বর্ণসম্বন্ধ, ফুলের গঠন, সুরের  
সংগতি এরা যে আনন্দ দেয় তা হ'ল 'বিমল আনন্দ'। এ আনন্দ  
নন্দনভাবিক, এ আনন্দই বর্ষা শিল্পকর্মজাত, যে শিল্পকর্মে স্নেহের  
নিত্য-প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক কান্টের এই 'বিমল আনন্দ' তত্ত্বটুকু  
হাবিসন এবং লর্ড কেম্বেসের নন্দনভাবিক ধারণাকে প্রভাবিত  
করেছিল। এঁদের 'স্বনির্ভর' (free) এবং 'পূরনির্ভর' (depend-  
ent) স্নেহের ধারণা বহুল পরিমাণে কান্ট-কথিত এই 'বিমল  
নন্দনভাবিক আনন্দের' তত্ত্ব থেকে গৃহীত। কান্ট-কথিত এই বিমল  
আনন্দ, শুধুমাত্র ঈশ্বরজাত আনন্দ নয়; 'নন্দনভাবিক আনন্দ'  
উপজাত হয় বধন বোধ (understanding) এবং কল্পনা  
(imagination) স্নেহের বসাদ্বাদনে নিয়োজিত হয়। এই  
বিমল আনন্দই সৌন্দর্যবাসাদ্বাদনের লক্ষ্য হয় তবে শিল্পকর্মে কোন  
প্রয়োজনের অধীন করা অসঙ্গত হবে। তাই কান্ট বলেন,  
শিল্পের প্রয়োজন হ'ল 'Zweckmassigkeit ohne zweck'  
অর্থাৎ 'অপ্রয়োজনের প্রয়োজন'।

শিল্পীমানসে যে রূপাভাব থেকে শিল্প সৃষ্টি হয় তা শিল্পীরনের  
নিত্য সফচর। এই অভাববোধটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা কখন কখন  
বাইরের জীবনের প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য করে প্রকট হয়। আয়রা  
যদি তখন বাইরের জীবনের এই উপলক্ষ্যটাকেই শিল্পসৃষ্টির মূল বা  
উৎস বলে ভুল কবি তা হলে বিচায় ভ্রান্ত হবে।<sup>৩</sup> কখন স্বর্ষ-

৩। "The true artist is indifferent to the materials and conditions imposed upon him. He accepts any conditions, so long as they can be used to express his will-to-form".

ভাবকে, কখন মানবপ্রিয়কে, কখন জীবের দয়াকে উপলক্ষ্য করে শিল্পীর শিল্প প্রেরণা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরভাস্কর্যের অপূর্ণ শিল্পকর্ম শুধুপাত্রের অলঙ্কার এবং ভাস্কর্যশিল্প রূপ পেয়েছিল যে-সব শিল্পীর হাতে তারা হস্ত বর্ষকে উপলক্ষ্য করে এইসব শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিল। যথোপযুক্ত বা বর্ষভাব শিল্পকর্ম নয়। সেই মহাভাবকে স্তম্ভরূপে প্রকাশ করতে পারলে তবেই তা শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রকাশটাই হ'ল শিল্পকর্ম, উপলক্ষ্যটাই নয়। এই শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে শিল্পের ব্যক্তিবিশিষ্টতা (deobjectification) ওপর। শিল্প-বৈরাগ্যের ওপর শিল্পকর্ম নির্ভরশীল। অর্থাৎ শিল্পীর অহংগত, তার ভালোলাগা, মন্দলাগা সবটাই যদি শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয় তা একান্তই একটি মানুষের কৃত্তিকাত্মক হয়ে পড়বে। যে শিল্প-বৈরাগ্যের কথা বলেছি তার দ্বারা এই শিল্পকর্ম চিহ্নিত হবে। বৈরাগ্যের স্তম্ভ-সিংহাসনে আটকে প্রতিষ্ঠা নিত্যকালের, তার অস্তিত্ব তার আবেদন সার্বিক হয়। শিল্পীমানসে এই বৈরাগ্যের অভাব ঘটলে শিল্প তার সার্বিক আবেদনে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠতে পারে না। তাই ত অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পকে সার্বিক করতে হলে শিল্পীর ইতিহাসভিত্তিক সার্বজনীন রুচির হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হবে। শিল্পের এই নির্বাক্তকরণ ঘটলে তবেই শিল্পী জীবনের সাময়িক প্রয়োজনকে, যাকে আমরা 'উপলক্ষ্য' বলেছি তাকে অনাবাস্যে উত্তীর্ণ করে যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'মহা' কাব্যগ্রন্থের কথা বলি। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত। ঐতিহ্য এবং ক্ষেত্রভাজনদের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে অনেকগুলি কবিতা কবি লিখেছিলেন। তাদের অনেকেই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তারা রসোত্তীর্ণ হ'ল তারা প্রয়োজন সাধন করেছে বলে রসোত্তীর্ণ হয় নি। প্রয়োজন সাধন 'ত' সকলেই করল, তবে যাত্র করেছি কবিতা রসোত্তীর্ণ হ'ল, একেমন কথা? তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে বলেই রসোত্তীর্ণ কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি, তারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে শিল্পীর সার্বিক-প্রকাশের প্রসঙ্গগুণে। তারা কালোত্তীর্ণ হ'ল শিল্পীর প্রকাশ-সাহায্যে। শিল্প হ'ল প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পবিদ মনীষীরা বললেন যে, ব্যবহারিক জীবনের, বাস্তবজীবনের কোন প্রয়োজন যেটানো শিল্পের কাজ নয়। যদি প্রয়োজন যেটানোর জন্যই কেউ শিল্প-সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন তা হলে প্রয়োজনটা বড় হয়ে উঠে শিল্পকে গ্রাস করবে; চাকরলা কারুকার্য (crafts) পর্যায়সত্ত্ব হবে, তাই অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে শিল্পের প্রয়োজনিক চাষিভাটুকু অস্বীকৃত। আমরা বলব যে প্রয়োজন শিল্পচৈতন্যকে উদ্বোধিত

করতে পারে। তবে সে প্রয়োজনশিষ্টের কোন সজ্ঞান নিশানা শিল্পীর শিল্পকার্যে থাকে না। তান পদ বাদে দুঃখে উদ্বোধিত চিত্র হয়ে 'পট্যাটো ইটাস' হবিথানি আঁকলেন তাঁরা সর্বকালের দুঃখী মানুষ। গানের সমকালীন দুঃখী মানুষদের দুঃখ-ব্যতিক্রম, আনন্দ-বেগনায় কোন চিহ্নই বইল না তাঁর সৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক গানের সমকালীন মানুষদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস আবিষ্কার করবে। সে কাজ শিল্পীর নয়। শিল্পবাসিক সর্বকালের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ প্রত্যক্ষ করবেন এই অনবদ্য চিত্রটিতে। এ চিত্র কোন হৃদয়বান মানুষকে সহজ সেবার্থ্যে উদ্বুদ্ধ করবে না। আর যদিও তা কবে তা হলেও তা শিল্পীর অভিপ্রেত নয়। আমাদের তত্ত্ব শিল্পকর্মে এক পাচ থেকে পাখীর আর এক পাছে উড়ে বাওয়ায় সলে তুলনা করা হয়েছে। শিল্পী আপন রচনা পথের কোন চিহ্নই রাখে না যেমন পাখী আকাশে আপন গমনপথের কোন চিহ্ন রেখে যায় না। শিল্পীর সাময়িক প্রয়োজনও শিল্পকর্মের কোথাও আপনার চিহ্ন রেখে যায় না। প্রয়োজনের তত্ত্বটুকু শিল্পকর্মের পক্ষে অনাবশ্যক। অতিবিকৃত, বুলগেরীয় ভাষায় Daskalov 'কোরীয় ছেলেদের' (Korean Children) শীর্ষক ভাস্কর্যকর্মে যে ভয়বিহ্বল মেয়ে এবং বৃদ্ধা হস্তপ্রতিভা বালকের চিত্র একেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য আমরা স্বীকার করি। আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিল্পকর্মের মূল্য সর্জন স্বীকৃত। জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ কোরীয় নাগরিকদের হৃদপ্রতিভার প্রতিক বৃষ্টি এই বালক। সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত দেশের অসহায়ত্বের প্রতিক বৃষ্টি ঐ ভয়বিহ্বল মেয়েটি, এই সার্বিক-শিল্পকর্মের রচনার সময় শিল্পীর নিজস্ব মনে তাঁর জাতীয় জীবনের সমগ্র দুঃখ-বেগন-নৈরাশ্র এবং তা উত্তীর্ণ হবার দুর্নিবার প্রতিজ্ঞা যে কাজ করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। তবু শিল্পকর্মের মধ্যে এই 'মহৎ প্রয়োজনটুকুর' বাজনা কোথাও নেই, তা শিল্পকর্মকে বাহ্যিক করে নি। রুশাণীর ভাষায় kaznovski'র একটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করি। তাঁর 'শ্রমবীর' Heroes of Labour শীর্ষক ভাস্কর্যকর্মে কোথাও শ্রমের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বাজনা নেই। এই সার্বিক-শিল্পটিতে 'শ্রম' এক অনির্কলনীয় মর্যাদা লাভ করেছে কেন না বর্ষাশ শিল্পীর হাতে শিল্পবস্তু (content) রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এই সার্বিক শিল্পসৃষ্টির জগতে প্রয়োজন নিত্য-অতিক্রান্ত।

পবন বাঁধা শিল্পকলাকে প্রয়োজনের দাসত্বে শুধু আবদ্ধ করে তার উপর চরম মূল্য আঘোপ করার চেষ্টা করলেন তাঁরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। এদের শিল্পকলা উদ্ভেদস্বরূপের কাছে শিল্পমূল্য বিকোর নি, ঐতিহাসিক এদের বার্ষ সৃষ্টিকে আবিষ্কার করেছেন, কলাবাসিক এই বার্ষতার ক্ষেত্রে এদের জ্ঞান শিল্প-দর্শনকে দায়ী করেছেন—এমনি দ্বারা বার্ষশিল্পীর দল হলেন রুশিয়ার 'purpose' গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

৪। Tamara Talbot Rice অণীত 'Russian Art' শীর্ষক গ্রন্থে।

[ Herbert Reed অণীত The Meaning of Art গ্রন্থ পৃ: ১১১ খণ্ডে ]

শিল্পীর প্রকাশেচ্ছাটাই বড় কথা। কি উপলক্ষ্যে প্রকাশটা ঘটল সেটা বড় কথা নয়, এটাই হার্বার্ট রীড বললেন।



ঊনবিংশ শতকে এদের অভ্যাসের সবকালীন বাহুবলের মধ্যে শিল্পশ্রীতি এবং শিল্পবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল, তবু এরা উত্তর যুগের সমালোচকের বিচারে নিষিদ্ধ হলেন, কেন না, এরা শিল্পকে নীতিগত এবং ব্যবহারগত প্রয়োজনের অধীন করেছিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আয়রা Nesterov, Vasnetsov, Vereschagin প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। উচ্চরের শিল্পীর শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েও Nesterov শিল্পলোকে অস্বাভাবিকতার অধিকারী হলেন না, কেন না, তাঁর শিল্পে আয়রা নীতি-প্রচারের একটা উদগ্র প্রয়াস লক্ষ্য করি। নীতিবিদের উদ্বাসিততা শিল্পীর শিল্পবোধকে ছাপিয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টির শিল্পমূল্য ন্যূনতা ঘটাল। Vereschagin ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অজস্র সৃষ্টি করলেন। প্যারিসে তাঁর শিল্প-

শিল্পী, ভারতবর্ষের শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় কিছুই কাজে এল না তাঁর। 'Purpose' গোষ্ঠীর শিল্পী হিসেবে তিনি শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনটাকে অস্বীকার না করে শিল্পকে বৃদ্ধির প্রচারের কাজে লাগালেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর শিল্পকর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু শিল্পকে প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে শিল্পের শাস্ত্র মূল্যের হানি হ'ল। শিল্প তাঁর স্বকীয় মূল্য হারিয়ে ফেলল। উত্তর যুগের বাহুবলের চোখে শিল্পীর প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিল। তাই, এঁরা কলারসিকের অভিনন্দন-ধন্য হলেন না। এদের শিল্পে 'ফাশ'টা বড় হয়ে উঠল না, 'প্রচারটা'ই বড় হয়ে উঠল। তাই এদের শিল্পকর্মে 'সৃষ্টিকর্মের' অসম্ভাব চোখে পড়ল। আর এই জন্যই ইতিহাস এদের শিল্পকর্মের শিল্পমূল্যকে অস্বীকার করল।

## সমবেদনা

### শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়

কান্নাকে রয়েছে ছুঁয়ে সাগরের জল  
পাহাড়ে বর্ণার খেলা সেও বুঝি অশীম ক্রন্দনে  
তোমার আঁখির থেকে বাবে অবিরাম ; কেন বল  
রোদ রেব মেঘলায় জড়িয়ে স্বপনে  
চাতকের কানে কানে কয়ে যাও কথা !  
আশীর্বাদ সে ত নয় জীবনে পাবার  
সুখের এষণা শুধু ছড়িয়েছে মনে ,  
অনেক করেছি ভুল কেউ ত জানেনা তার  
কোথায় ঠিকানা, কোথায় বেঁচেছি বর সেও ত স্বরণে  
চোরাবাঁলি হয়ে আজ অনেক গভীরে নিয়ে যায় ।  
এ ছোটো সবলরেখা ধরে যেখানে এসেছি আমি একা,  
এ ছোটো পথের মাঝে সেদিনের আলো  
একটু প্রত্যাশা নিয়ে কেন যে আসেনি, কেন বঁাকা  
পথ ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে সে জীবনের পুঞ্জীভূত কালো ;  
অদৃশ্য মুখের রেখা তাইত কাঁপছে ধরো ধরো ॥

## চাতক

### শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

কখনো কখনো কোন মেঘনীর রঙে—  
তোমার বিবর্ণ শাড়ি সুনীলবসনা,  
আমার চাতক-মন মেঘের স্বরণে,  
তোমা ঘেরি বিবহের মেঘ-দুত গড়ে ।  
উজ্জয়িনীপুবে নয়, ধূলার ধূসর—  
তোমার নগর-মনে কি বা অন্বেষণ ?  
কোন ট্রাম, বাস কিংবা পথেতে উষর  
হঠাৎ মেঘের সুর বৈশাখীর ঝড়ে ।  
বাঁকাভুরু চেয়ে দেখো অলিন্দ-আকাশ  
গাছে গাছে শিহরণ প্রাণের আবেগ !  
নগরীর শাখে শাখে নীলের প্রকাশ,  
হঠাৎ তোমার মন কি মায়ায় ভরে ।  
তুমিও কি ভুল করে মেঘ-শ্লোক পড়ো ?  
ভিজে চুলে ভিজে মনে হয়ে জড়োসড়ো ।



## ইদ্র

### শ্রীসমর বসু

বার না বার না কবেও শেষকালে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রাণতোষ। পরণে সেই ধুতি-পাজারী আর পায়ে তালতলার চটি। চাদরটা আজ আর সে নিতে পারে নি, কেননা নিতে গেলেই সে ধরা পড়ে যেত ইরানীর কাছে। চাদর কাঁধে না কলে বেখানে-সেখানে বাওয়া যায়। কিন্তু চাদর নিলেই বুঝতে হবে প্রাণতোষ সেখানেই গেছে—বেখানে বাওয়াটা আর সহ্য করতে পারে না ইরানী। এই একটি ব্যাপারেই ইরানীর অবস্থা হয়েছে প্রাণতোষ। আর এই একটি ব্যাপারকেই কেন্দ্র করে তাদের যুগল অস্তিত্বের দাবীখানে একটা কনফ্লিক্টের প্রাচীর খীর অঘটনপ্রতিরোধ্য গতিতে মাথা তুলতে সুরু করেছে। ইরানী এখন বুঝতে পারে—প্রাণতোষের মনের অতি সামান্য ভ্রমংশই একদিনে তার দখলে এসেছে। বাকী জায়গায় যে বসে আছে—রক্তে-মাংসে সে যদি তার সপত্নী হ'ত তা হলে না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা সে করতে পারত; কিন্তু তা এখন নয় তখন রাগ-অভিমান ছাড়া আর কি-ই বা করবে ইরানী? কিন্তু রাগ-অভিমান কবেও প্রাণতোষকে সে আটকাতে পারে নি। প্রাণতোষ আবার সেখানে গেছে, শুকিয়ে চুরিয়ে—ইরানীকে না জানিয়ে। কিরে এসে বিখ্যা কথা বলেছে প্রাণতোষ। ইরানীর কাছে এখন ধরা পড়ে গেছে তখন নিরাক্ষর মত হাসতে হাসতে ইরানীকে সাজুনা দেবার চেষ্টা করেছে প্রাণতোষ, কিন্তু মুখস্থটে একবারও বলে নি, আর সেখানে বাব না।

ইরানী আর পারে না। সন্ধ্যেরও একটা সীমা আছে। সর্বসম্বল খরিজীও মাঝে মাঝে কঁপে ওঠেন। কিন্তু কি-ই বা করবে ইরানী! ইরানী ভাবতেই পারে না, সাহিত্যসভায় এমন কি আকর্ষণীয় আছে বাব জন্তে—ইরানীর শত অজুহাদ, রাগ-অভিমান সব কিছুকে উপেক্ষা করতে পারে প্রাণতোষ। প্রাণতোষ লেখক নয়, সাহিত্য-সমালোচক নয়। এমনকি উঠতি বয়সে একটা কবিতাও লেখে নি সে। বিয়ের পরেই যে চিঠিগুলো ইরানীকে সে লিখেছিল তাতেও ছিল না একটুকরো ভাবোচ্ছাস। নেহাৎ সাংসারিক খবরাখবরের ঠাসবুনোনিতে চিঠিগুলো দীর্ঘ হয়ে উঠত। আর সেই সঙ্গে অভিযানে ফলে উঠত ইরানীর ঠোট দুটো। চিঠির পাতায় পাতা পাতা করে কি যেন খুঁজত ইরানী, কিন্তু কিছুই সে পেত না। বহুবার এই নিয়ে ঠাট্টা করত ওকে। ইনিরে-বিনিরে কত কথা বলত। ইরানী সব ঠিক বুঝতে পারত না—কিন্তু তবুও হাসলসিমে উঠত ওর চোখ দুটো। বহুবার বলত, বিয়েট লোহা

দিয়ে গড়া তোমার বয়েস নয়, একটুও যত্ন নেই। এমন লোককে নিয়ে কি কবে ঘর করবি তুই?

সে-সব কথা আজও মনে আছে ইরানীর। তাই ত সে বুঝতে পারে না—কি এমন যুগলুকোন আছে ঐ সাহিত্যসভায় বাব জন্তে এমন একটা বৈশিষ্ট্য মনও হাতাড়ি-পাতাড়ি করে ছোটে?

প্রাণতোষ যে সাহিত্যচক্রের সভ্য তাদের পান্থিক অধিবেশনে নিয়মিত হাজিরা তাকে দিতে হয়। তাছাড়া এখানে-সেখানে প্রায় প্রতি শনি-রবিবারেই বেরিয়ে যায় প্রাণতোষ। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক যে কোনও সভাসমিতিতে বিনা নিমন্ত্রণে সে গিয়ে হাজির হয়। কার্ড না থাকলেও কোনদিন তার কোনও অনুবিধা হয় নি। এ ত আর সংস্কৃতি বিচিন্দ্ৰাঘূর্ণন নয় যে, পেটের বাইরের জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। এ হ'ল অবিমিশ্র নির্ভেজাল সাহিত্যসভা। নামী-অনামী সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকদের জ্ঞান বিতরণীসভাও বলা যেতে পারে, স্তরায় জনসাধারণের হাঁকাহাঁকি, দাপাদানি সেখানে অনেক কম। তাই কার্ড না পেলেও কোনদিন কোনও অনুবিধায় পড়তে হয় নি প্রাণতোষকে।

পয় পয় এমনি অনেক শনিবার কেটে গেছে—ইরানীকে নিয়ে সিনেমার বাব বলেও যেতে পারে নি প্রাণতোষ। ইরানীও আর কিছু বলে না। সেদিনও ইরানীকে সে বলেছিল তৈরী হয়ে থেক, অফিস থেকে ফিরেই এগজিভিশন দেখতে বাব। তাই শুনে ইরানী হেসে উঠেছিল গিলগিল করে। হাসতে হাসতে হঠাৎ ককিয়ে উঠে ভিজে ছলছলে গলার বলেছিল—আজ যে আবার নীলিমাংকে নেমস্তন্ন করেছি, বিকলবেলার আসবে।

: তাই নাকি! তা হলে বেশ ভালই হবে। ভেবেছিলাম ভবানীপুর সাহিত্য-পরিষদের সভায় আজকে আর বাব না। তু তুমি এখন বহুকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তখন আর তাব মাঝে আমি থেকে ছাড়া বাধাই কেন, এ্যা, কি বল, তা হলে ভবানীপুরেই ঘুরে আসি।

: ভবানীপুর সাহিত্য-পরিষদ! ইরানীর কপালের উপর হুটো পাশাপাশি যেখান একটুকরো সন্দেহ যেন উকি দিলে।

: কি, চমকে উঠলে কেন? কোতুহলী প্রাণতোষের গলার অপরাধীর উৎসর্গ।

: না, এমনি, নামটা খুব জানা কিনা? একটু যেন সহজ, হবার চেষ্টা করল ইরানী। নীলিমাংকে না আসতে বললে তোমার

সঙ্গে আমিও যেতাম। সাহিত্যের কিছু না বুঝলেও বহুদিনের পুথিখোঁজ বন্ধুর সঙ্গে হরত দেখা হয়ে যেতে পারত।

: এ্যা, কে তোমার পুথিখোঁজ বন্ধু?

: ঐ পরিবর্ধের সম্পাদিকা সুমিত্রী হালদার।

: তাই নাকি। মিস হালদারের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। তা এতদিন ত সে-কথা বল নি।—হঠাৎ কেমন যেন অকস্মিক হয়ে উঠল প্রাণতোষ। কেমন যেন কক্ষ কর্ণ হয়ে উঠল ওর মুখে যেখাঙলো। ইরানী তা লক্ষ্য করেই বললে, এতদিন বললেই বা কি লাভ হ'ত তোমার? আমার ত মনে হয় একেবারে না বললেই বরঞ্চ ভাল ছিল।

: কেন? আতঙ্কিত প্রাণতোষের অস্থি কেটে পড়ল ওর গলায় যাবে।

: 'কেন'র উত্তর জলের মত পরিষ্কার। নিজের মনকে জিগ্যেস করলেই সে উত্তর মিলবে, আমি আর মুখ ফুটে সে-কথা বলে দেবের ভাগী হই কেন? ইরানীর ঠোঁটে মুহূর্তের হাসি অস্থির করে জ্বলল প্রাণতোষকে।

: থাকগে সে-কথা, একটা কথা জিগ্যেস করব? তু তুটোকে বধা সম্ভব কপালের উপর ঠেলে তুলে দিয়ে—ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে এক বিলিক হাসি ফুটিয়ে তুলে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রাণতোষের দিকে তাকাল ইরানী। প্রাণতোষ কিন্তু চুপ করেই রইল, চুপ করেই সে স্তব্ধ কয়ল ইরানীর এই হুঃসহ শ্বেষ। মিস হালদারের সঙ্গে আলাপ করে তুমি খুব আনন্দ পাও, না? আমার আনন্দ বহিষ্কৃত হয়—তা হলে তুমি তাকে নিশ্চয়ই বলেছ তোমার বিরোধী এখনও হয় নি।

: বাঃ, তুমি ত ঠিক ধরছ। মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হয়েও হাসতে হাসতে কথাগুলো বললে প্রাণতোষ। ভাবলে এর বেশী কিই বা চিন্তা করতে পারে ইরানী। অস্থিরকে অতিক্রম করে সুস্থ বিচার-শীল মনে সবকিছু বিশ্লেষণ করার মত মানসিক শক্তি ইরানীর কাছ থেকে কি করে আশা করা যায়? ছেলেমেয়েদের বর্নিষ্ঠ মেলা-মেশার তেতুগুলি অধেষণ করতে গেলে জৈব প্রবৃত্তির যে প্রাকৃত ছবিটা এদের চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে তাকে অতিক্রম করে আর একটু এগিয়ে বাবার দৃষ্টিশক্তি এদের নেই। পক্ষার উৎস সন্ধান করতে এরা তুলে যায়, এরা শুধু দেখে—কত জনপদের পয়ঃপ্রণালী বেয়ে কত নোঙরা আবর্জনা এসে পড়ছে গলায় বুক। নাক কুঁচকে এরা কিরে আসে, অবগাহন আর হয় না। প্রাণতোষ তাই রাগ করে না—হাসতে হাসতেই বলে—বর্ধন ধরেই কেলেছ—তখন না চাইলেও কৈফিয়ৎ আমাকে একটা দিতেই হবে।

: মিলেই যে আমাকে তা গুনতে হবে এমন কোনও চুক্তি কি আমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রে ছিল?

: ইরানীর মুখে হাসি নেই, চোখালের হাড়টা নয়স 'পালটাকেও যেন শক্ত করে তুলেছে। একটা কঠিন কথা বলবার ভ্রম কালো চোখ দুটো স্থির হয়ে এল। যে চোখের

দিকে চেয়ে প্রাণতোষ একদিন তুলে নিয়েছিল সমস্ত বিশ্বাস-সার, যে চোখ থেকে সব সময়ই ঝরে পড়ত সন্ধ্যাবনী সুধাবারা, যাগ্যাদর দৃষ্টি সে-চোখ পেল কোথা থেকে। অমন স্তব্ধ চললে মুখটাকে ঘিরে কেমন করে আশ্রয় করল বর্ধার কালো মেঘ। মুহূর্তের মধ্যে কত কথা ভেবে নিল প্রাণতোষ। মুহূর্তের মধ্যেই সে বুঝতে পারল অনেক দিনের অবরুদ্ধ অভিমান—বা উপেক্ষা পেরে পেরে ওর মনের কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে এখনই তা ফেঁট পড়বে মরে-বাওয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাংগভের মত। একটা বিস্তীর্ণ পরিহাসিত স্তব্ধ কন্যার ভ্রম মনকে সে আগে থেকেই তৈরি করে নিল। বললে, বিরুদ্ধ মন্ত্রে কি ছিল না ছিল সেটা তোমার জানার কথা নয়। কেন না মন্ত্র বা তা আমিই পাঠ করেছিলাম—তুমি তখন চুপ করেই ছিলে। তখন তোমার বলার কিছুই ছিল না—এখন যদি থাকে অনায়াসে তা তুমি বলতে পার।

প্রাণতোষের এই আশ্বাস পেরে শুরু করল ইরানী, আমার কথা হ'ল, আমার কোনও ক্ষতি না করে বা খুশী তুমি করতে পার। আমার প্রাণা মর্যাদাটুকু ক্ষুর না করে জানা মেলে তুমি উড়ে বেড়াতে পার নীল আকাশে। কিন্তু মনে রেখ, অমন হাজারো মিস হালদারের ছাত্রাপথ ঘুরেও কামনা তোমার মিটেবে না। কক্ষ্যুত উৎসাহ মত একদিন তুমি ঘসে পড়বে কঠিন স্মৃতিতে। তখন যেন আমাকে তোমার না প্রয়োজন হয়।' বন্ধুর ভিলে থেকে মুক্তি পাওয়া তীব্র মত দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইরানী। আর প্রাণতোষ বেবাক বোবা চোখে দেওয়ালে টাঙানো বিবাহ-বাসরে তোলা দম্পতীর ছবির দিকে চেয়ে রইল। একি! ইরানীও কথা বলতে জানে? ইরানীও জানে তাকে ভয় দেখাতে, তাকে শাসন করতে?

এর পরও অনেক দিন কেটে গেছে। নিরমিত ভাবেই প্রত্যেকটি সাহিত্যসভার উপস্থিত হয়েছ প্রাণতোষ। ইরানী বাবা শেষ নি—অনুযোগ জানার নি—অভিমানও করে নি। কাম্ব-কর্মে, কথার বার্তার কোথাও তার প্রকাশ পায় নি এতটুকু অসন্তোষের ছায়া। কিন্তু সেদিন আর পারল না ইরানী—যেদিন সন্ধ্যা-বেলায় দৃষ্টি পাজারী পয়ে বাইরে বেরোবার ভ্রমে প্রাণতোষ বর্ধন তৈরী হচ্ছিল, তখন হাতের কাজ কেলে রেখেও ইরানী ছুটে এল ওর সামনে।

: আজ তুমি কোথাও বেঘোতে পারবে না।

: কেন? আমার গতিবিধি নিয়ামক হবার অধিকার তোমার কে দিলে? এমন কোনও চুক্তি বিরুদ্ধে মন্ত্রে ছিল বলে আমার ত মনে হয় না।

: চুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আজ তুমি কোথাও যেতে পারবে না—এই আমি বলে দিলাম—সাধ্য থাকে বাও। ইরানীর বীর শাস্ত অঘটন ঘূর্ণ কঠে কি যে বেশান ছিল সেটা ঠিক না বুঝতে পারলেও মন্ত্রমুগ্ধের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল প্রাণতোষ। অনেক দিনের অনেক কথা তার মনে পড়ল—কিন্তু একবারও মনে

পড়ল না যে, অজ্ঞান তামের বিবরণ দিন। বনে পড়ল না—হ' বড়র আগে এমন এক সন্ধ্যার ইরানীর ডান হাতখানা নিজের বা হাতের মধ্যে চেপে ধরে সামনের পথে সে কেলেছিল প্রথম পদক্ষেপ। সেদিনের সে রাজ্যের উদ্দাম আনন্দের উচ্ছলতার এমনই সে আবিষ্টি করে পড়েছিল যে, তার স্বপ্ন ছিল না—বাক সে গ্রহণ করল বাকী জীবনের সঙ্গী হিসাবে তার নামের পথে নেই কোনও বিজ্ঞানবিরোধী কীপতম স্বীকৃতি। তার দেহের যেখান যেখান নব-যৌবন যে জীবন-প্রতি উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল, পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে আবেশ-তার বস্তু অথবা, বস্তু কপোলে—আর কালো চোখের সজ্জ চাহনিত—তাতেই মুগ্ধ হয়েছিল প্রাণতোষ। ইরানী বেশী লেখাপড়া জানে না, তাতে কি হয়েছে—ইরানী কাজ জানে—সংসারের বাস্তবী খুঁটিনাটি কাজ। ইরানী লিখতেও জানে, পড়তেও জানে—তবে সেটা নেহাত কাজ চলার মত—তা হোকপে তাতে কোনও হৃৎ নেই প্রাণতোষের, ইরানীর রূপ আছে—পাঁচ জনের কাছ গরু করার মত রূপ। পথের মনে ঈর্ষা আপানোর মত রূপ তার নেই; বাস আর কিছুটা চার না প্রাণতোষ।

বিন্দু জোয়ারের পবেও ভাঁটা আসে, পূর্ণিমার পরে বীর পতিতে এগিয়ে আসে নিশ্চয় নীরব রাতি। প্রাণতোষের জীবনেও এক দিন উদ্দমনা ঘুচ গেল। দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীতের সন্ধান করতে গিয়ে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল যে, সে ঠকেছে। মধ্যাহ্নিক ভাবে ঠকেছে। বস্তু-জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার আড়ালে মনশীলতার যে বিচরণ কেন্দ্র সেখানে সে নিভাস্ত সঙ্গী-হীন। সেই দিনটুকু সে বুঝতে পারল—ইরানীকে পাওয়ার মধ্যে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা তার থেলে নি। সেইদিনই তার শুরু হল পালিয়ে যাওয়া। যেমন করে খুল-পালিয়ে ছেলেবা মাঠে মাঠে খেলা করে, নদীতে সাতার দেয়, পথের পাছের ফল পেড়ে নিয়ে আসে। বালক-প্রবৃত্তির অতি স্বাভাবিক তাড়নার কঠিনতম শাস্তিকেও যেমন করে তারা উপেক্ষা করে—ঠিক তেমনি করেই প্রাণতোষের পলাতক মন ছুটে বেড়াতে শুরু করল প্রতিদিনের 'কটিন'কে অস্বীকার করে, ইরানীর কটুতিকে গায়ে না মেখে—ওর রাগ-অভিমানকে প্রাণ না করে।

বিবরণ পর কিছুদিন ধরে খুব সংসারী হয়ে পড়েছিল প্রাণতোষ। সে ভেবেছিল সংসারকে ভালবাসতে পারলেই ইরানী বুঝি খুব খুশী হবে। বিবরণ-বুদ্ধিতে মন দিলেই ওর নারী-মন পুলকিত হয়ে উঠবে—তাই সোনার কঁকনে সে ভয়ে দিয়েছিল ওর সোনার দেহ। শাড়ীর বিচিত্রতায় বিহ্বল করে তুলেছিল ওর মুগ্ধ মনকে। সেই প্রাণতোষের এই অদ্ভুত পরিবর্তন ইরানী তাই সহ্য করতে পারে নি। সম্পূর্ণ প্রাণতোষকে সে বুঝতে পারে নি। নিজেকে আড়ালে ঢেকে নিজের সর্বনাশই করেছে প্রাণতোষ। জীব কাছ নিজের অভ্যয়কে সে অর্গলব্ধ করে রেখেছিল—অন্তরে-বাইরে সে এক হতে পারে নি। আজ তাই তাদের মধ্যে পড়ে উঠেছে এই অসন্তোষ-সত্ত্ব ব্যাধান।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ইরানীর কণ্ঠে যে দুঃখ ব্যতিক্রমের উদ্ভতা প্রকাশ পেল—সে সাহস উল্লসিত করে উঠল ওর প্রতিটি উচ্চারণে—তাতে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল প্রাণতোষ। এ-ঘরে ও-ঘরে সে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল কিন্তু বাইরে আর বেরুতে পারল না। অসহায়ের মত একবার চেয়ে দেখল ইরানীকে—নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। তাকে ডাকতে পারল না প্রাণতোষ। অভ্যস্তিৎ যেমন বলে, তেমনি করে ডেকে বলতে পারল না 'আজ বেশী দেবী হবে না ইরা, বাব আর চলে আসব। না গেলে ভাল দেখার না। তা ছাড়া আজ একজন ভাল বন্ধু আসবেন।

জানালার পরানটা চেপে ধরে ঘরের আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে বইল প্রাণতোষ। ঘরের কোনও একটা কারখানার চিরনীর-ধোয়া পাক খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল, তার পর অনেকখানি জায়গা ছুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশের প্রান্তে...নাঃ, যেতেই হবে, বাতাসটান এই বড় ঘরের মধ্যে আর বসে থাকা চলে না। ধোয়ার ধোয়ার ভাবে গেছে—দোতল'-তিনতলার খুপতী-খুপতী ঘরগুলো। বাইরের বাতাস একটু চাই, একটু আলো, একটু...।

জানালার থেকে সবে এসে ঠাঁট্টা খুলে সিকের চানচটা বায় করে নিয়ে এল প্রাণতোষ। ইস—ভাঁজে ভাঁজে কেটেছে। কেমন করে চুকল ইহুটা। ইস! ইরানী—ইরা শুনহ? চানচটা বুক নিয়ে বিছানার এসে ভেঙে পড়ল প্রাণতোষ—সমস্ত শরীরে তার বিবরণ বিবরণ। হঠাৎ সে যেন ধরা পড়ে গেল তার নিজের কাছে। বুদ্ধির চর্চার মনের আহাব সংগ্রহ করতে গিয়ে দেহের বাহুতেই যে আরম্ভ হয়ে পড়েছিল প্রাণতোষ, এই রুঢ় সত্যটুকু ইরানী তার স্বাভাবিক নারী-মন দিয়েই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি প্রাণতোষের কঠিনবান বিদগ্ধ মন। যিস হালনাথের মনে সাহিত্যরস বত না ছিল, তার চেয়ে চের বেশী জীবনবস ছিল ওর দেহের লাভনো, ওর চোখের হাসিতে ওর কুমারী অঙ্গের প্রতিটি বেথায় কুরিয়ে-বাওয়া ইরানীতে হস্ত ক্লাস্তি বোধ করছিল প্রাণতোষ, তাই বোধ করি সে খুজেছিল নতুন আশ্রয়। চমকে উঠল প্রাণতোষ এই মুহূর্তে সে ধরা পড়ে গেল নিজের কাছে। মুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার করে নিজান মনের অপরাধকে খালন করার কোনও পথই সে আর খুঁজে পেল না।

: কি, ডাকছ কেন? খাটের পাশে এসে দাঁড়াল ইরানী।

: আর কোনদিনই কোথাও বাব না, কোথাও না।

: কেন গো যশাই এত বৈরাগ্য কেন?

: বৈরাগ্য নয়, এই দেখ চানচয়ের কি লগা হয়েছে।

: ওঃ, এই জন্তে? মুক হ'ল ইরানী। তা হলে চানচয়ের জন্তে! আমি যে অত করে বললাম। কোনও কথা না বলেই বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল ইরানী। খপ করে ওর হাতটা বুক টেনে নিল প্রাণতোষ। বলল, আমার অসতর্কতার স্ববোধ নিয়ে, বাস্তব মধ্যে চুকে পড়েছিল ইহুটা। প্রবাস্তব তাড়নার এমন

একটা সাধের জিনিস সে টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়ে চলে গেল। এ থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ইরানী ?

: ধরাতলে নরাধম বল আছে বস্তু—ওর মুখটা বৃকের মধ্যে চেপে ধরে বাকীটুকু আর বলতে দিল না প্রাণতোষ। নিজের প্রব্লেম উত্তর নিজেই সে দিল। বললে, নিজের অসাবধানতার ঠিক এখানে আর একটা ইহুয় আমার ডালাখোলা মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমারই এক সাধের ধূর জীবনকে সে-ও বেন

চেয়েছিল টুকরো টুকরো করে কেটে দিতে। কিন্তু আর তা সে পারবে না।

প্রাণতোষের বৃকের মধ্যে মাথা ঘেঁষে কানপোতে কি বেন ওনল ইরানী। তার পর সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বললে, বা পার তাই কেটে ইহুয় শুধু ছাড়বার করে না—কাটা-ছেঁড়া জিনিসও জোড়া দিতে জানে। প্রাণতোষও হেসে উঠল, বলল, ঠিক বলেছ।

## ফতেপুরসিক্রি

### শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ভীকু তীরের মত শীতের বাতাস গায়ে বিঁধছে। মাঘ মাস। সকাল ছ'টা। টিকেট কেটে ফতেপুরসিক্রিগামী বাসের আপাত রাসে চড়ে বসেছি। চম্পিশ হাইলের পাড়ি। এক পাশে আছে এক কাশে বাকড়ী, মাথার পাগড়ী ভক্তলোক। অপর পাশে হু'জন লালচে দাড়িমুখো মুসলমান। এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের। এদের গা থেকে একটা স্নিগ্ধ আত্মবোধ 'খুসবো' বেরোচ্ছে।

কুলধূর মত একটা পাতলা কুরাশার বোরখার সব কিছু ঢাকা পড়ে আছে এখনও। আঞ্জা দুর্গ সম্মুখে। কিন্তু কিছু ভাব স্পষ্ট দেখা বাচ্ছে না। শাহগজের ভেতর দিয়ে বাস চলল। কিছু পরে কুহেলী ভেল করে প্রভাত-সূর্য্যের মিঠি বোধ গায়ে পড়ে শৈত্যের কিছুটা লাঘব করলে।

'পাঁচ কুইয়ন,' 'শিরগিলানি' 'ইগ্গা মহল্লা,' 'শা এমংউখারি'ও 'মহল্লা'পৃথিবীনাথ অতিক্রম করে আঞ্জা নগরীর শেষ সীমা পাব হয়ে গেল বাস। অপরিচয়ের রাজ্য, তাই বিশেষ কিছু চোখে পড়লেই পাশের মুসলমান ভক্তলোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। হু'পাশে সর্বে ক্রান্ত, অড়হড় ক্রান্ত, পেয়ারা বাগান, কোথাও বা দুই মোটা ধানে বসান 'বাগতম্ব বিকাশ ক্ষেত্র' লেখা সাইন বোর্ড, বিকাশ ক্ষেত্র বোধ হয় সরকারী কৃষি ক্ষেত্রই হবে। দেশী পুলি সিস্টেমে বলদ সংযোগে অল তোলা হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রের জন্ত। তবু বলব, এখানে কসল ভাল কলে না।

একটা পুকুরের মাঝের জলটুকি দেখিয়ে মুসলমান ভক্তলোকদের জিজ্ঞাসা করলাম ওটায় সম্পর্ক। দাড়ি নেড়ে তাঁদের একজন বললেন, ও আকবর কা টাইর কা হোগা। আবতি সব বরবাদ হো গয়া। কতি আঁধারা, কতি উজালা এত হারাই, হার। কথা বলার সময় তাঁর হাত আর মুখ এক সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল।

সত্যি-মিথো বহু কাহিনীতে বিমণ্ডিত পথ। অতীত-বর্তমানের সামঞ্জস্য বিধান করবে কে? বা দেখি তাইই পরিচর জানতে ইচ্ছে

করে। সে পরিচর আজ আর দেবে কে? বন জঙ্গলে যে সব জায়গা ভরে উঠেছে বা যে সব চিবি চোখের সাথনে দেখছি হয় ত সে সবই ছিল এক দিন জন্ত অতীতের রাজ্যপাট।

বাস চলছে দ্রুত বেগে। মাঝে মাঝে হু'চাবটে গম্বুজ, আর অব্যব পাথরের পরিত্যক্ত বাড়ী নজরে পড়ছে। নজরে পড়ছে সাদা মাটির বৃকে উ কি-মেরে-খাকা লাল পাথর। দূরে দূরে ছোট-খাটো টিলা, কোথাও বা টিলার উপরে গড়ে-ওঠা গ্রাম, শিশু প হাড়, উটের পিঠে বোঝাই করা মাল, খজুরের পিঠের ঘুটের ছালা, ছোট ছোট দেহাতী গ্রামের পরিপাটি-অজনে বাঁধা ধানের নয়, ঘুটের মনাই। বোঝা বাচ্ছে এই সব গ্রামের গোপালনই হচ্ছে প্রধান উপজীবিকা। জালানী কাঠের অভাব এ পাশে, তাই ঘুটে সে সমস্তায় সমাধান করে। কোথাও কোথাও বাউ চায়াও চোখে পড়ল। এগুলিও ঐ একই উদ্দেশ্যে লাগানো হয়েছে। জলকুশিও দূরে নয়। তাই গোধানই বোধ হয় প্রধান ধন এ পাশের। এরা গরব বস্তু জানে। সূচি-শিল্প-সমৃদ্ধ কাঁধা দিয়ে এদের অঙ্গ ঢেকে যেবেছে। এ পাশের স্ত্রীমলী ধবলীয়াও বেশ দ্রুতপুষ্ট।

লাল পাথরের দেশ ফতেপুরসিক্রি। আনাচে-কানাচে লাল পাথর ছড়ানো এখানে। কোথাও লাল পাথরে কুরো বাঁধানো হয়েছে কোথাও ব্রানের বায়গা, কোথাও ক্ষেত্রের ঘেরা। হাইল-টোন থেকে মিল টোন পর্যন্ত সব লাল পাথরের।

আঞ্জা থেকে তিন হাইল দূরে 'পম্বোলি' গ্রামে প্রথম বাস ধামল। ঠেলা গাড়ীতে আনাজ বিক্রী হচ্ছে এখানে। টাটটুর পিঠে জালানী কাঠ বিক্রী হচ্ছে। মহাত্মারতের বুগের বিরাট বিরাট চাকাওয়াল গাড়ীতে গামলার আকারের শুড় চালান বাচ্ছে। ধর্মধমে খোঁরা জমে যে আকাশ প্রান্ত এতক্ষণ অভিযানী ঘেরের মত মুখ ভাব করে ছিল সে এখন দিবা হান্তময়ী হয়েছে।

আবার দশ হাইল দূরে 'মিটাকুর' গ্রামে বাস ধামল, গ্রামটি বড়,

অনেক ঘর-বাড়ী, ইট-পাথরের তৈরী একতলা, দোতলা বাড়ীও অনেক আছে এখানে। দোকানপাট, সজীর বাজারও আছে। উট চলেছে সারি সারি। তাদের গলা সজ্জিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে, পিঠের কুংসিত কুঁচগুলি নাচছে।

‘কোরাউলি’ গ্রাম পার হয়ে গেল বাস। রাজপুতানার প্রত্যন্ত প্রদেশ। পথে হুঁশ জন রাজপুত যেরে-পুরুষ নজরে পড়ছে। যেরেদের নাকে সোনার কদম ফুল, গলার সাতনহী, হাতে বালা, গারে ওড়না, পরণে মাঘরা—হলদে, লাল, জাকরানী রঙের, পায়ে চুমকী দেওয়া চটি। কোমরে রূপার বিছা, গালাব রঙীন চুড়ী হাতে। কারও কারও কাচের চুড়ীও আছে। এ হ’ল অভিজাত বা অবস্থাপন্ন রাজপুতানীর চিত্র। এ-পাশের যেরেদের কাঁখে কলসী নেই, আছে মাথার, তাও একটা নয়, তিন-চারটে। কলসী-গুলির আকার বড় থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। যেরেবা অক্লেশে ভারসাম্য বজায় রেখে জল ভরে নিয়ে চলেছে, আর ভরা গাগরী মাথার নিয়ে গরু মহিষ তাড়াচ্ছে অনায়াসে। এরা সত্যিই শক্তিরূপা। পথে হুঁচর জায়গায় দেখলাম রাজকীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়—সাইন বোর্ড লেখা আছে। এ পাশে আয়ুর্বেদকেও বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে, শুধু ডাক্তারীর উপর নির্ভর করেনি এরা। পথে পাগড়ি গাছ, চেরু গাছ, শিসম গাছ, পিলু গাছ চোখে পড়ল, সহসা লাল পাথরের প্রাচীর মাথা তুলে ধাঁড়াল। ঐ প্রাচীরই হ’ল কতপুস্তিকের বেষ্টনী। এক দিন ছ’ মাইল পরিধি জুড়ে এর বিস্তার ছিল। ছিল এগারটি প্রবেশ পথ। আজ তা নষ্ট হয়ে গেলেও বাসের প্রবেশ পথে তার কিছুটা অন্ততঃ সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে।

প্রবেশ করল পরিভ্রমক পারাণপুরীতে বাস। এখানে অগুপ্তি দোকানপাট নেই, হোটেল নেই, ক্লাব নেই, শুধু আছে একটি ডাক-বাংলো, হোটেলের প্রয়োজনও নেই। যারা দেখতে আসেন তাঁরা সন্ধ্যার পূর্বেই কিয়ে যান। আশ্রা থেকে প্রতি ঘণ্টার ঘণ্টার বাস ছাড়ে কতপুস্তিকের দিকে। আবার সকাল সাতটায় একটা ট্রেনও আছে। কাজেই বাওরা-আসার কোন কষ্ট নেই।

গুলার সিং পেটের বিপরীত দিকে বাস ধামল। সম্মুখে একটি উচু টিলা—ছোটখাটো পাহাড়ও বলা চলে। তার উপরে কতপুস্তিক সিকি হুর্গ গড়ে উঠেছিল। এই হুর্গ-টি এক পাশের কতপুস্তিক ও অপর পাশের সিকির যথো মিলন-মাখী বেঁধে দিয়েছে। পূর্বে কতপুস্তিক আর সিকি দুটি পাথর-নির্মিতের গ্রাম ছিল।

আকস্মিক যেন শান্তি নেই, সাতাশ বছর বয়েস হ’ল, কিন্তু সন্তান কই? কে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করবে? দাম্পিত্যে গুজরাটে বিব্রোহের আগুন। সেই আগুন নেভাতে ছুটলেন আকস্মিক। রাজ্য পথে ধামলেন কতপুস্তিকে। বন্দনা করলেন সাধু সেলিম চিদ্দিকে। আশীর্বাদ করলেন সাধু—যনসায়না পূর্ণ হবে। হ’লও তাই। বৃদ্ধ জয়লাভ করে আবার আকস্মিক সাধু সন্দর্শনে গেলেন। এবারও সাধু আশীর্বাদ করে

বললেন, যনসায়না পূর্ণ হবে। এর অর্থ বুঝতে পারলেন না আকস্মিক। আশ্রা কিয়ে এর অর্থ বুঝলেন, যখন ওনলেন, সন্তান-সন্তরা অথবা রাজকতা যোগাবাদি। তৎক্ষণাৎ আকস্মিক কিয়ে গিয়ে চিদ্দি সাহেবের চরণ বন্দনা করলেন। সেলিম চিদ্দি বেগমকে কতপুস্তিকে মাথতে উপদেশ দিলেন। গড়ে উঠল একটি প্রাসাদ। নাম হ’ল রঙমহল। এই রঙমহলে রইলেন যোগাবাদি। এই প্রাসাদেই ভূমিষ্ঠ হ’ল তাঁর সন্তান। নাম হ’ল তার—সাধু প্রসাদী বলে—‘সেলিম’। এর পর থেকেই কতপুস্তিকের ভাগ্যোদয়। তিন পাশে পাথরের দেওয়াল, এক পাশে কৃত্রিম হ্রদ দিয়ে সুরক্ষিত করে পুরী গড়া হ’ল। রাজধানী স্থানান্তরিত হ’ল কতপুস্তিকিতে। স্থানটি আকস্মিক-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত ছিল, তাই রাজনীতিক কারণেও এটি রাজধানী হবার যোগ্য হয়েছিল। কিন্তু এর সৌভাগ্যস্বার্থা যাত্রা বোল বছর দেড়োপায়ান ছিল। তার পর সূর্য্য গেল অস্তাচলে, কেবল ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ সাম্রাজ্যভাষ্যের পর এখানে প্রথম দরবার করেন।

বাস থেকে নামতেই একটি বিশ বাইশ বছরের গাইড সফর নিলে। সে দেখাবে সব কিছু আড়াই টাকার বিনিময়ে। নীচের একটি চারের দোকানে চা পান করে আমরা হুঁজনে উপরে উঠতে সুরু করলাম। কিছুটা টিলাব উপর চড়ে পাওয়া গেল সিড়ি।

নহবৎখানার দিক দিয়ে হুর্গে প্রবেশ করলাম আমরা। হুর্গ পড়ে আছে। হুর্গেশনন্দিনীবা নেই। এর প্রবেশ-পথ চারটি। হুঁটিতে হিন্দু স্থাপত্য, হুঁটিতে মুসলিম। সভা-পারকেরা এখান থেকে সজ্ঞাতের মাধ্যমে আনন্দ-বিবাহ মূর্ত্ত করে তুলতেন। শাহান শাহের আগমন, বিজয়লাভের বার্তা প্রভৃতিও এখান থেকেই ঘোষিত হ’ত।

এর পর তানসেনের প্রাসাদে এলাম, এখানে সজ্ঞাত-সদস্যতা মূর্ত্তি পেয়েছিলেন। কত রাগ-রাগিনী মূর্ত্ত হ’ত—রাজ সব মূর্ত্তিত।

মুজাখানার এলাম আমরা, গাইড দেয়ালে কোথায় আসরকি তৈরি হ’ত। ধ্রুসে পড়েছে এ সৌধটি।

সাধারণের বিচারালয় দেওয়ান-ই-আমে এলাম এবার। এর মাঝখানে সম্রাটের বসার স্থান; হুঁ পাশের পাথরের জালিঘেরা স্থানে বসতেন মহিলারা। সম্রাট থাকতেন উচুতে, নীচে ধাঁড়িয়ে বিচারপ্রার্থীরা আবেদন জানাত। এখানের দেওয়ান-ই-আম আশ্রা বা দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম অপেক্ষা নিতুই।

দেওয়ান-ই-খাসে এলে পৌছলাম আমরা। এ বিচারালয়টি বিশেষ জনের। এখানে বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতিও সংগঠিত হ’ত। বর্ষ সর্বাধিক তর্ক-বিতর্কে এ সৌধটি মুখর হয়ে উঠত। এর লাল পাথরের আটকোণে কেন্দ্রীয় ভিত্তিটি কারুশিল্পের অপূর্ণ নিদর্শন। এটি তুলনারহিত। এর উপরে কানিশ-ঘেরা চারিটি পথ। পথগুলি একত্রে মিলেছে একটি গোলাকার আকৃতিঘেরা গ্যালারির মত স্থানে। এখানে সম্রাট বসতেন। একতলায় মত উচু এটি, মজীরা বসতেন গ্যালারি সল্লর পথগুলিতে। সভা-

সদা থাকতেন প্রায় একতলা নীচের স্তম্ভঘেরা ঘেরে—তাদের যথায়। অসুখাচারী। তাঁরা কেউ হাজারী, কেউ পঁচাহাজারী, কেউ দশহাজারী মনসবদার। বিক্রমাদিত্যের মত আকবরেরও নবহত ছিল। তাঁরাও থাকতেন সভাতে। স্তম্ভটি একদম বৈজ্ঞানিক শিল্পকণ্ঠতার নিশ্চিত বে, যে-কোন স্থান হতেই সম্রাটকে স্পষ্ট দেখা যেত। এই প্রকারের স্তম্ভ জগতে আর দ্বিতীয় নেই।

দেওয়ান-ই-খাস হতে বেধিয়ে জ্যোতিষীয় 'চবুতরার' প্রবেশ করলাম আমরা। আকবর জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এক জন হিন্দু জ্যোতিষী থাকতেন এই 'চবুতরার'। তাঁর নির্দেশ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি কার্য করতেন সম্রাট।

এর পর 'পঁচিশী কোট' আর 'কানামাছি ডোঁ ডোঁ' খেলার স্থান দেখলাম। 'পঁচিশী কোটে' খুন্দারী সুরেশা তরুনীদের হাঁড় করিয়ে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলতেন সম্রাট। আর লুকোচুরি খেলা হত মহিলাদের সঙ্গে 'আব মি-চালি'তে।

এলাম খাসমহলে। একদিন এখানেই বাতাস অত্যন্ত-গোলাপের গন্ধে ভরপুর থাকত। সজীত উঠত এর কক্ষে কক্ষে। আজ 'নীলব রবাব, বীণা, মূরজ, মুঘলী'।

খাস-হল থেকে 'হাজ-ই-খাসে' এসে বসলাম আমরা। চার পাশ থেকে চারটি রাস্তা এসে মিশেছে এখানে। 'খাসে'র চারদিক জলে ভর্তি—এটি চার ভাগে বিভক্ত। মাঝখানে বসবার বারগা আছে। হাতী-কটকের 'পানিকা-আডান' থেকে জল আসত এই খাসে। এখানে বসে সজীত সাধনা করতেন তানসেন। সামনের প্রাসাদ থেকে গান শুনতেন আকবর। এইখানেই বৈজ্ঞ বাওয়ার সঙ্গে মিলন ঘটে তানসেনের। এই খাসের কক্ষগুলি সময় সময় টাকা দিয়ে ভরে ফেলা হত আর সেই টাকা আকবর গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। জাহাঙ্গীর ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা তাঁর আত্মকীর্তনীতে এই দানের উল্লেখ করেছেন।

হাজ-ই-খাসের সম্মুখে বাদশাহের শয়নকক্ষ। এর প্রাচীর চিত্রে পশি, গোলাপ, আঙ্গুর প্রভৃতির প্রতিকৃতি ছিল। শিশু-কালে 'হুৎপদীর' চিত্রটি বোধ হয় সেলিমের জন্ম-স্মারক চিত্র হিসেবে অঙ্কিত করানো হয়েছিল।

এর পরে আমরা বালিকা-বিদ্যালয় ভবনে এলাম। আকবর স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। নিজে নিরক্ষর হলেও তিনিই ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যামুগ্ধা। খাসমহল ও তুর্কীমহলের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে এই বিদ্যাতরুনটি।

পাশেই তুর্কীমহল। উজ্জ্বলী বেগমের জন্ম নিশ্চিত হয়েছিল এটি। আঙ্গুরলতার এ সৌধটিও দেওয়ালগুলি বহুদানেই চিত্রিত। কান্তসান সাহেব বলেছেন, শিল্প সৌন্দর্যে সমৃদ্ধতম এবং আকবরের স্থাপত্যরীতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এটি। আবার তিনি একথাও বলেছেন, একাধিক বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও রয়েছে এখানে। ইতালীয় পদ্ধতির ছাপ পড়েছে এখানেই শিল্পকর্মে। এর দেওয়াল-পাঞ্জের কিছু চিত্র ছুৎগার্মী ঔৎসুক্যে কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছিল। তিনি

এদের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। পণ্ড পক্ষী ছবি আঁকাতে নাকি পরগণার নিবেদ আছে। এখানেই শিল্প-সম্ভার ভায়ে ভায়াফাঙ্ক, কিছু বেন কুঁঠত। শিল্পী খেলা-খুশমত আপন মনে মাধুরী মিশিয়ে দু'একটি সাবলীল রূপের প্রতিমা রেখায়িত করেছেন। অমনি মনে পড়েছে সম্রাটের নির্দেশের কথা। তিনি সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাই বুঝি প্রাণের স্পর্শ পায় নি এখানেই কলাকৃতি। তবুও এখানেই শিল্প-শোভা মনলোভ। লর্ড কার্জন এখানেই 'অনেক ছবি পুনরুদ্ধার' ব্যবস্থা করেন।

'হামামে' এলাম। এই হামাম বা স্নানাগারটি আকবর তাঁর তুর্কী বেগমের জন্ম নিদর্শন করান। একটি ছোট বীণাকার মধ্য দিয়ে এর প্রবেশপথ। তপ্ত ও শীতল জলের কোয়ারার ব্যবস্থা ছিল এখানে।

এর পর দেখলাম দস্তখানা। এখানে সম্রাট নখিপত্র থাকত। এটি সম্রাটের শরণকক্ষের সন্নিকটে অবস্থিত। আকবর নিজে হিসেবপত্র দেখতেন, আর্জি শুনতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

এর পরের গম্বুজস্থান হল হাসপাতাল। বোড়শ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে যে হাসপাতাল ছিল তা কতপুষ্কির প্রমাণ করে দিয়েছে। হরত এ হাসপাতাল উন্নতধরনের ছিল না, তবু এর অস্তিত্ব উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় দিচ্ছে।

পাঁচতলা বাড়ী 'পাঁচমহলে' এলাম এবার। কতপুষ্কির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌধের মধ্যে এটি অগ্রতম। পরবর্তী কালে এটি সেকেন্দার আকবর-সমাধির আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি মৌল নয়, নকল। এখানে বৌদ্ধবিহারের অনুকরণ করা হয়েছে। সৌধটি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। স্তম্ভ এখানে অনেক। কিন্তু আশ্চর্যের, কোন দুটো স্তম্ভ একতরফের নয়। আকবরের সমাধিস্থান পদ্ধতির এটিও একটি নিদর্শন। এই সৌধে তিনি মুসলমান বেগমদের সৈন্য চাঁদ দেখায় ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু বেগমদের সূর্য্য প্রণামের ব্যবস্থা করেছেন, ক্রীষ্টান বিবিদের হাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সৌধটি কতপুষ্কির সর্বোচ্চ সৌধ, কাজেই খ্রীষ্টের তপ্ত দিনে এর সর্বোচ্চ মহলে বেগমসাহেবারা শীতল বায়ু শ্বেন করতেন।

পাঁচমহলের পর 'হাবেম'। এখানে অভ্যুপেক্ষিকার অপর্যায়-পদ্মা থাকতেন। একদিন মীনাবাজারের বেলা বসত এর চৌহদ্দির ভেতর। বিবিবাজার, বাঁদীবাজার জয়জয়ট হয়ে উঠত। কত মন দেওয়া-নেওয়া চলত এখানে। কত পুলক যোষাক, কত তবল হাসি, কত অভিমানের কত কৃত্রিম কান্না কান পাতলে হরত আজও শোনা বাবে এখানে। কত আনারকলির দীর্ঘবাস আজও আছাড় খেয়ে পড়েছে হাবেমের পাশাপাশি বন্ধে। অকস্মাৎ বাতাসের শব্দে সচকিত হয়ে অভ্যুপেক্ষের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল কত ব্যর্থ-বোঝা স্বপ্নকল্পার প্রেতাত্মা যেন তাদের প্রেমিককে খুঁজে



বেড়াচ্ছে আজও। তাদের অকৃত্রিম কামনা এখনও তাদের এই পাব্যাপনুগীতে বন্ধী করে রেখেছে, যেমন একদিন তারা বন্ধী ছিল বাঙ্গালারের শ্রমীক। চ'বিতার্থ করতে 'হাবনী' খোদা প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে। হাবের মর চ'খে ঝুলন্ত রেশমী বস্ত্র বদললে পর্দা, তার কাকে দেখা যেত কান্ধারী গালিচার উপর দিল্লীবা হাতে সূত্র র-পরা-পা চড়িয়ে বসে আছে কত মণিবাছ, কত পণিবাছ, কত চান্দ্রবাছ, দিল্লীবাচার বেগম, হীরাবাঈ। কিন্তু তারা সব পুতুল, প্রতিমা নয়, তাদের প্রাণ নেই। হয়ত শুধু একবার একটু মধুবাতি তাদের জীবনে এসেছিল। তার পর ভায় হার।

পাচমহলের দক্ষিণ দিকে আকবরের জীশান পত্নী য়ে'রিয়ম জামানী বেগমের সৌধ। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে একে বিয়ে করেন সম্রাট। সেনালী রঙে এ সৌধের দেওয়াল চিত্রিত ছিল, তাই এটির নাম ছিল 'সোনহেরা প্রাসাদ'। ফেরো'সব শ'হনামা চিত্র, হিন্দুদের পুরাণ চিত্র, খ্রীষ্ট-জীবনী-গল্প চিত্র প্রভৃতিতে প্রাসাদ-গাত্র অঙ্কিত ছিল। এখনও তোতার পিঠে চড়ে ঝাকা স্তম্ভবীর আলোখের অশ্লীল আভাস রয়েছে এই প্রাসাদের পশ্চিম দিকের বারান্দায়। আকবরের সূর্য-প্রীতির পরিচয় লেখা ছিল এই প্রাসাদে। আকবরের উদার মনোভাব এখানেই চরিত্র-চিত্র চিত্রণে পরিফুট হয়েছিল। ব্রিটিশ যুগে এখানে পি-ডাবলিউ-ডি-এর দপ্তর-খানা ছিল। ১৯০৫ সন থেকে সেটি উঠে যায় এবং দর্শকরা প্রবেশাধিকার লাভ করে।

যে'থবাঈয়ের প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। ক্ষুটোনোমুখ পদ্ম-কুঁড়ি, ঘণ্টা, হাব, মালা প্রভৃতির মধ্যে হিন্দু কারুশিল্পের আদর্শ এখানে প্রাচুর্য লাভ করেছে। যে'থপু'র রাজ-ন'কিনী পুত্রবধু য়ে'থবাঈয়ের জন্ত আকবর এটি ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করান। এইটিই এখানের সর্ববৃহৎ প্রাসাদ। এখানের দেওয়ালে ন'জুন মস্তীর প্রতিকৃতি আঁকা ছিল। লর্ড কার্জন এখানের শিল্পকৃতির সংরক্ষণ করেন। ব'নখাখী মূর্তিটি তাঁর নির্দেশে আঁকা হয়।

আমাদের এর পরের গন্তব্য স্থান হয়েছিল 'হাওয়ারাই-মহল'। নামই বলে দিচ্ছে এ প্রাসাদটি হাওয়া খাওয়ার জন্ত নির্মিত হয়েছিল। বিশ্রাম করতে লাগলাম এখানে আমরা। আশ্চর্য উদার আর মহিমান্বিত এই পাব্যাপনুরী। এর গায়ে কত জনা কত আঁচড় কাটছে। নির্ধম হাতে কত লোক একে নিহত নিপীড়ন করে যাচ্ছে। স্টেড-বুটেড কত তথাকথিত সাহেবের দল সদর্পে এর বুকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কৈ, এত একবারও অভিযোগ জানাচ্ছে না? একটুকুও মুখ ভাব করছে না, বরং ক্ষান্ত পথিককে অপার স্নেহে তারা শীতল আশ্রয় দিচ্ছে।

যে'থবাঈয়ের প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে বীরবলের প্রাসাদ। গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন মহেশ দাস, গোপাল ভাড়ে'র মত বসিক এবং তীক্ষ্ণবী সম্পন্ন ছিলেন তিনি। নিজের প্রতিভায় তিনি আকবর শাহকে সন্তুষ্ট করে মস্তীক লাভ করেন আর পদবী পান 'বীরবল'। আবার কবিও ছিলেন তিনি। তাঁর এই প্রাসাদ

তৈরী হয়েছিল ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। কেউ বলেন আকবর এটি তাঁর মহিমার বিকানীর রাজকল্পার জন্ত নির্মাণ করান। এখানে জয়লাভ করে তাঁর পুত্র দানিয়েল। পরে এটি বীরবলের বাসস্থান হয়।

এর পর আমরা পা বাড়লাম 'কবুতরখানার' দিকে। লোটন পায়রা, স্বরাজ পায়রা, পালখ-পা পায়রা—কত রকমের পায়রাই না ছিল এখানে।

চাতীশালা, ঘোড়াশালা, উটশালা—এ সব দেখলাম এর পর আর আকবর নিজে পশুপক্ষীদের তদারক করতেন। কোন সচিব যদি কোন পশুকে ঠিক মত বস্ত্র না করত তবে তাকে শাস্তি পেতে হ'ত। পশুর লড়াই করাতেন সম্রাট মাঝে মাঝে এবং সপার্বদ উপভোগ করতেন সেই লড়াই। আবুল ফজল বলে গেছেন ১২০০০ ঘোড়া ছিল কতেপুরসিদ্ধিতে। আমরা ১১০টি ঘোড়া বাঁধায় গোলপাখেরেব চক্ক দেখলাম ঘোড়াশালায়। হয়ত এ স্থানটি আকবরের বিশেষ প্রিয় ঘোড়াগুলির জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। অল্প সকল ঘোড়া রাখার জন্ত কোন বড় আস্তাবল ছিল। উটখানার ৫১টি উটরাখার স্থান দেখতে পেলাম। প্রতি বছর আকবর পশু-পালন প্রাতিযোগিতা করতেন এবং খেঁচ পশুপালককে; পুরস্কার দিতেন।

সহাইখানার এলাহ এবার। এখানে ষা'বৎ চরেক দেশের আগন্তুকরা। থাকত বালু'স সওরাগ'রের, থাকত মস্তীপু'রী বণিকের দল। সামনের বিশাল চত্বরে বাঁধা থাকত সারি সারি হাতী, উট, তেজী আরবী অশ্ব, চিতাবাঘ, কাকাজুয়া, টিরা, ময়না। আকবর পছন্দ মত পশুপক্ষী ক্রয় করতেন।

শে'ব প্রাঙ্গণে চত্বরে দাঁড়িয়ে 'হিব' মিনার' দেখলাম। এটি আকবরের প্রিয় হাতী হিরণের কবরের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। নকশি কুট উচু এটি। এর সাহা অল্পে কৃত্রিম হাতীর দাঁত সংযুক্ত করা আছে। এগুলিকে দূর থেকে লোহনসাকার মত মনে হয়। পূর্বে হায়েমের বিবিজানেরা পর্দা-ঘেরা পথে গিয়ে এই মিনারে চড়ে সামনের হু'দ'র নৌকা বাইট উপভোগ করতেন। আজ সে পথ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হু'দও শুকিয়ে গেছে।

পুরী হ'ল, প্রাসাদ হ'ল, অশ্বচ উপাসনার ব্যবস্থা থাকবে না, এত আর হতে পারে না। কাজেই 'জামাই মসজিদে'র জম্ম হ'ল ১৫৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে। পায়তের একটি মসজিদে'র অনুকরণে এটি তৈরী হয়েছিল। এর তিনটি গম্বুজ। তিন ভাগে বিভক্ত এ মসজিদ। সর্বশেষেব জালিবেগা আরগার মহিলাদের নামাজ পড়ার স্থান। এর 'নবাব-দরওয়াজা' কটক দিয়ে আকবর আগন্তে'ন নমাজ পড়তে।

মসজিদ সংলগ্ন একটি আরবী কলেজ ছিল। এখানে আরবী ভাষা ও কোরাণ শরিক পঠন-পার্টনের ব্যবস্থা ছিল।

কতেপুরসিদ্ধির সেবা সৌধ হ'ল 'সেখ সেলিম চিতিব' মসজিদে'র সমাধি সৌধ। এইটিই একমাত্র মার্সেলে'র তৈরী সৌধ কতেপুর-



সিঁড়ির, এর খুঁজ মার্কেলের জালি এবং ভক্ত, কানিসের বাঁকানো কাঁকড়া অতুলনীয়। ইৎমউর্দোলায় কাকতালির সঙ্গে এর এক রাজ ভুলনা সম্ভব। কিন্তু সে ভুলনাতেও এরই জ্যেষ্ঠ প্রতিপন্ন হবে। একটি মূল্যবান শ্রুতি-শিল্প-সমৃদ্ধ বস্ত্রগুণে আচ্ছাদিত আছে পীর চিন্তি সাহেবের সমাধি স্থানটি। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন পীর সাহেব। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এ সমাধি সৌধটি সমাপ্ত করান। এর দরওয়াজা আবলুস কাঠের। রমজানের অষ্টবিংশ দিবসে প্রতি বছর এখানে একটি মেলা হয়। অনেক বড়ো রমজী পীর সাহেবের 'দোয়া মাত্তে' আসেন এই রমজানের যেলায়। সাধারণের বিশ্বাস, ককির চিন্তি সাহেবের মেহেরবাগীতে সম্ভান লাভসেই। তাই অনেক ঘরেই চিন্তি সাহেবের সমাধি সৌধের মার্কেলের জালিতে জালিতে বেঁধে বায় বস্ত্রগুণ। কারসী ভাবার প্রশস্তি-কবিতা খোদাই করা আছে সমাধিগায়ে।

এর পর পাটু ডেখালে সেলিম চিন্তি সাহেবের নাতি নবাব ইসলাম খাঁর সমাধি। ইসলাম খাঁ ছিলেন আবুল ফজলের ভ্রাতাপতি, লাডলী বেগমের স্বামী। জাহাঙ্গীর তাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর সমাধির পাশে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সমাধি ছড়িয়ে রয়েছে। গুরু চিন্তির পত্নী জেনব বিধি বেখানের সমাধিতে শুয়ে আছেন, সে স্থানের নাম 'জেনানা বোকা'। এটি মহিলাদের পোহস্থান।

সর্বশেষে এলাম বুলান দরওয়াজাতে। এটি ভারতের সর্বোচ্চ সিংহদ্বার। শুধু ভারতের কেন, জগতের সর্বোচ্চ সিংহদ্বারদের অঙ্গভূত এটি। রাস্তা থেকে এটি ১৭৬ ফুট উচু। ১৬০২ সনে দক্ষিণাভ্যাস বিজয়ের স্মরণচিহ্নরূপে এটি কতেপুরী দুর্গে সংযোজিত হয়েছিল। তাই এটিকে বিজয় তোরণও বলা যায়। এই সিংহদ্বারে লেখা আছে : এ জগৎ পান্থশালা, কণিকের আবাস, অতএব

আজ্ঞাহকে স্রবণ কর। জানি না আকবরের জীবন-দর্শন এই লেখায় মধ্যে লুকিয়ে আছে কি না।

সিংহদ্বারটি নিজেই একটি প্রাসাদ। এর বহু কক্ষ। আকবরের সময় এই কক্ষগুলি লক্ষ্যবান। রূপে ব্যবহৃত হত। সিংহদ্বারের দ্বার দুটি লোহার অশ্ব-খুঁয়ে ভর্তি হয়ে আছে। কোন অশ্ব অনুস্থ হলে পড়লে এখানে মানত করা হয় লোহার খুঁয় দেবায়। সেই অশ্ব সেরে উঠলে মালিক লোহার খুঁয় লাগিয়ে দিয়ে বায় সিংহদ্বারের দরওয়াজাতে। এই প্রথা চলে আসছে আকবরের সময় হতে। এখানের সবচেয়ে বড় অশ্ব-খুরটি লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রদত্ত হয় ১৮২৫ সনে। এই সিংহদ্বারের একটা বিশেষ স্থান থেকে একশ্রেণীর লক্ষ প্রদানকারী লাকিয়ে পড়ে সিঁড়ির পাশের একটি কুপে। বলা বাহুল্য, দর্শকদের নিকট হতে টাকা-দিকে আদায় করার জন্যই এই তুঃসাহসিক কথ-অনুষ্ঠান।

শান্ত হয়ে 'বুলান' দরওয়াজাতে বসলাম। সমুখের বাগানে রাজ্যের অপার পায়ে দু'টি অট্টালিকা দেখা গেল। একটি আবুল ফজল সাহেবের, একটি কৈফীর আবাসস্থল ছিল। আকবরের 'বিবিধ বতনে'র মধ্যে ছিলেন এই দুই ভাই। আবুল ফজল ঐতিহাসিক। 'আকবরনামা', 'খাইন-ই-আকবরী', আর 'মকতুব-ই-আলামা'—লিখেছিলেন তিনি। কৈফী ছিলেন কবি ও রাজনীতিক। দৌতাকর্মে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন বহুবার।

পরিভ্রমণ হয়ে বসে রইলাম বুলান গেটের বাইরের 'করিডরে'। ভাবতে লাগলাম, কেনই বা আকবর এত অর্থ ব্যয়ে এ নগরী নির্মাণ করালেন, কেনই বা পরিত্যাগ করলেন একে। কেউ বলেন, জলাভাবের জন্য এখানের জীবনযাত্রা দুর্ভেদ্য হয়েছিল, কেউ বলেন, রাজনীতিক অবস্থা খোঁচাল হয়েছিল বলে আকবরকে লাহোরে রাজদরবার স্থাপন করতে হয়। জানিনে এ সম্রাটে খেয়াল কি না।

## কী পাইনি ?

ত্রিদিলাপ দাশগুপ্ত

কী খবর আর শোনাতে পাববে বনো ?  
বলার আগেই চোখের চাতক হয়ে ওঠে ছলোছলো !  
মেঘ নেই মোটে, তবু বে কেমন করে,  
শ্রাবণের বাবা করিয়ে কদম কোটালো মনের ঘরে !  
যোজ্ঞও নেই, ছায়ও দেখিনি মোটে  
তবু বনো দেখি চৈত্রেয় শেষে কী করে কুসুম কোটে ?  
আলো নেই তবু অমাবস্তায় দেখি—  
রূপোলী জ্যোৎস্না রাজকন্ডার পাল ছুঁয়ে গেল এ কী !

অন্ধকারের লেশটুকু আর নেই—

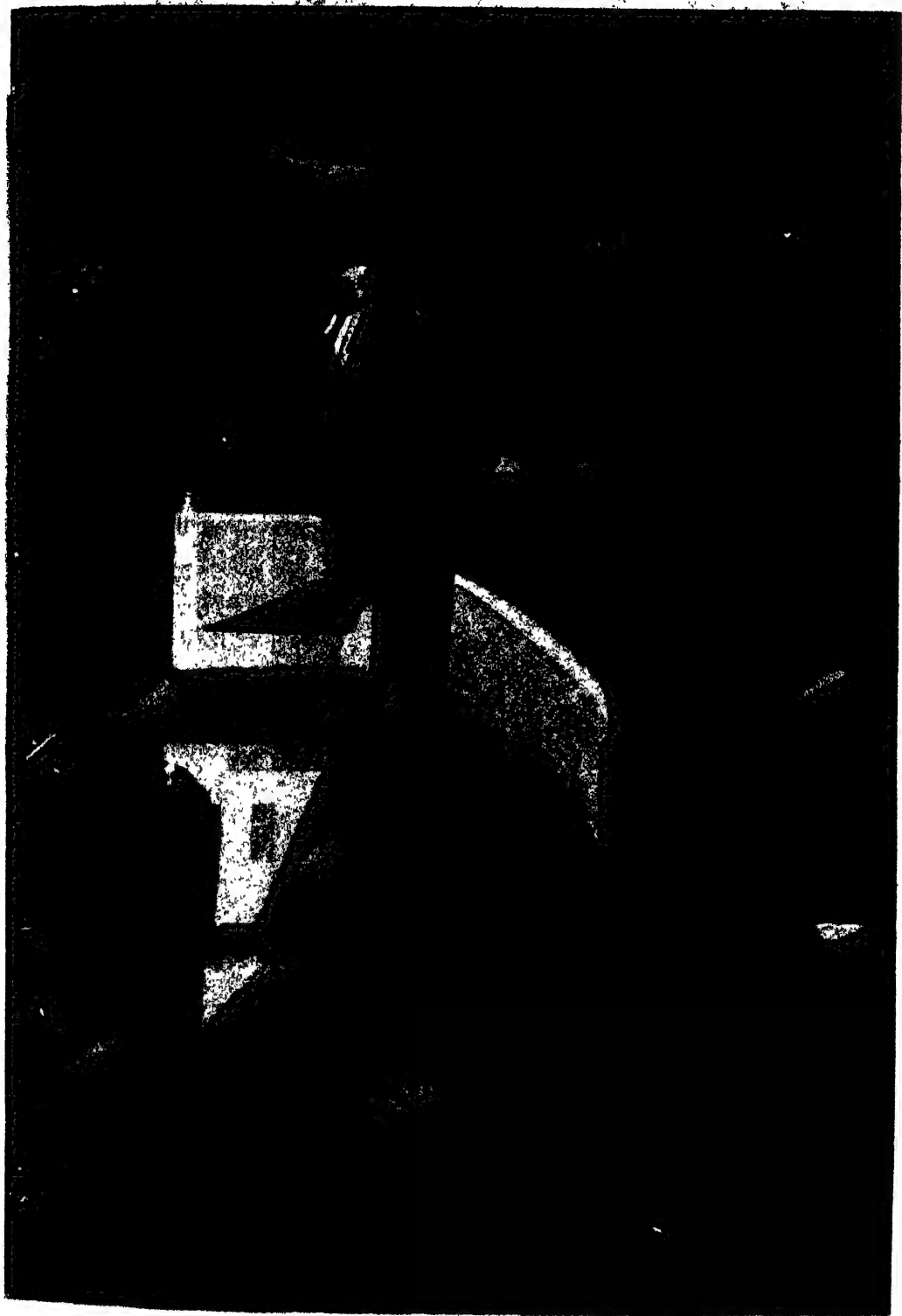
সূর্য ভোরণে কালো চোখ তবু জলে জলে উঠবেই !

স্বর্গ বলেও ধরাতো পড়ে নি আগে—

পৃথিবী শুধুই আরো কাছে বেন এসে গেছে অজুরাগে !

কী খবর ভূমি শোনাবে অবাধ করে ?

কতো ভূমি ডাকো যুগে যুগে এই আদারই নামটি ধরে !



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অজান  
পাশে নেত্রনাথ ঠাকুর

( মাঘ, ১৩৪১ হইতে পুনর্মুদ্রিত )



# লালমহালা

শ্রীমতী সত্য

১৮

লক্ষা অতঃপর যাব কাছের পেয়ে থাক না কেন ডানকান-আগরওয়ালা চক্ৰ তাকে বীতিমত বিব্রত এবং চিন্তিত কৃত্যে তুলেছে। আইনের দাহায্য তারা নেয় নি। এমনকি সামান্য সামান্যও এগিয়ে আসে নি। অথচ অষ্টগ্রহর তারা অতঃপক্ষে অনুসরণ করে ফিরছে। চোখে দেখা না গেলেও সে স্পষ্ট অনুভব করছে, কতগুলি অদৃশ্য ক্ষেত্র হুর্কোথা নাড়াচাড়া। অতঃপক্ষে ওদের যত বোকা আর সাধারণ ভেবেছিল তা ওরা নয়। বরং ঢের বেশী চতুর আর হিসরায়। দলকো থেকে নিজেনের কাজ করে চলেছে। অতঃপক্ষে ভাবিয়ে লেছে—শক্তির কবে তুলেছে।

যে শত্রুকে চোখে দেখা যায়—কাছে পাওয়া যায়, তাকে হস্ত চূর্ণ করাও সম্ভব, কিন্তু নাগালেয় বাইরে থেকে যায়। শত্রুতা করতে শুরু করেছে তাদের কেমন করে কারণ্য করবে অতঃপক্ষে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার বুদ্ধি তেমন খেলছে না। শুধু একটা অসহনীয় দৃষ্টিভঙ্গি লিনের পর দিন তার মনের উপর চেপে বসে অতঃপক্ষে হুর্কল করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কারণে সে চূর্ণ করে থাকে—অকারণে চীৎকার করে। তার আশেপাশে যাবা বুঝে বেড়ায় তারা কেউ বা বিম্বিত হয়, কেউ মুখ টিপে টিপে হাসে।

মিজা অতঃপক্ষেও ভক্তিতে বলে, আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন মনে হয়। আপনার কষ্টচোরীদের দাবিটাই বরং যেনে নিন। সব পোলমাল মিটে যাবে।

অতঃপক্ষে থমক দিল, ভবিষ্যতে একটু হিসেব করে কথা বল মিজা দেবী। আর তুলে যেও না যে কারখানার পরিচালক তুমি না আমি।

মিজা আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। যে কোন কারণেই হউক ইলানিং সে সব সময়ই অতঃপক্ষে তাকিয়ে রাখতে গার। অথচ তেতে উঠলেই সেখানে আর দাঁড়ায় না।

শ্রীমতী বলে, কাজটা তুমি ঠিক করছ না। যখন জানতে পেরেছ যে, ডানকান আর আগরওয়ালা এই পোলমালে ইকন যোগাচ্ছে তখন—

বাধা দিয়ে অতঃপক্ষে উক কঠে বলল, আমার কাকের মহালোচনা যা করলেই আমি খুশী হব।

শ্রীমতী সহজ কঠে বলল, মহালোচনা না হলে সংশোধন হয় না। তা ছাড়া একে মহালোচনা না ভেবে সম্প্রদায় বল ধরে নিতে পারছ না কেন?

অতঃপক্ষে অধৈর্য্য কঠে জবাব দিল, তোমার বাবার মাষ্টার-বিদ্রোহী বেশ আকর্ষণ করে নিয়েছে দেখছি, কিন্তু দয়া করে তুলে যেও না যে, আমি তোমার স্বামী—ছাত্র নই।

শ্রীমতী মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিয়ম কঠে বলল, সেটা আমার ভাগ্য। নইলে আপশোষের সীমা থাকত না। তুমি স্বামী-স্ত্রীর বাংলা অর্থও জান না।

অতঃপক্ষে গভীর হয়ে উঠল। একটা শক্ত কথা তার গোটের ভগ্নায় এসে পড়েছিল। অতি কঠে সামলে নিয়ে বাকা হেসে বলল, তোমার বাবা তাঁর মেরেকে বিয়ে না দিলেই ভাল করতেন। তা হলে তিনি লাভবান হতেন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী বিক্রমপূর্ণ কঠে বলল, তিনি ব্যবসায়ের নন—স্কুল-মাষ্টার। লাভ লোকসান কম বোঝেন। কিন্তু তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে যে, তোমার যত যদি তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি থাকত তা হলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হ'ত না।

একটু থেমে শ্রীমতী পুনরায় বলতে থাকে, কোন কথাই তুমি আমাকে বলতে চাও না। বলায় আবশ্যক আছে বলেও মনে কর না। তোমার অহঙ্কার তোমাকে অন্ধ করে বেঁচেছে, নইলে সহজ পথটা চোখে পড়ত। কিন্তু তোমার ইহজন্মেও চোখ ফুটেবে না। বাক্যের উপর দাঁড়িয়ে তুমি আগুন আলতে জান—জলের কথা একবার মনেও আসে না।

অতঃপক্ষে চোখে মুখে খানিক অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল। সে তাকিলোর ভক্তিতে বলল, জল ঢালা তুমি কাকে বলতে চাও আমি বুঝি না। তিল তিল যন্ত্রের বিনিময়ে বা কিছু এতদিন ধরে গড়ে তুলেছি 'তাকেই হ' হাতে বিনা বাধার বিলিয়ে দেওয়ার ক?

শ্রীমতী বলল, অংশ দেওয়ার নাম বিলিয়ে দেওয়া নয়। তোমার এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে যত ব্যস্তস্বপ্ন হয়েছিলে তার কতটুকু তোমার আর কতটুকু ওদের তার হিসেব করে দেখলে এ কথা এত সহজে তুমি বলতে পারতে না। ওদা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। এ কথা ভাববার দিন আজ এসেছে।

অতঃপক্ষে কঠিন কঠে বলল, বাধা হয়ে বসে তোমার যত

সমালোচনা করে তারাই একথা বলে থাকে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তুমি আমার জী নাকি আমার কারখানার মজুরদের সেক্রেটারী? তোমার কথাবার্তা অত্যন্ত বিপজ্জক হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী খানিক স্থিরদৃষ্টিতে অতঃপর মুখে পানে চেয়ে থেকে মুহূর্তে বলল, আমার ভুল হয়েছে। তোমাকে কিছু বলতে যাওয়া বুঝা। তুমি কুপায় পাত।

চলে যাবার জন্তে শ্রীমতী পা বাড়াতোই অতঃপর তাকে বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও। তার রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু হয়েছে। সে বাস্তব-মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, তোমার বাবার একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীমতী বুঝে দাঁড়াল।

অতঃপর বলতে থাকে, অবাধ্য ছাত্রকে বেত মেখে শাসন করাটা। আমার শাসন করি অবাধ্য ঘোড়াকে চাবুক মেরে।

শ্রীমতীও হুঁ চোখ জ্বলে উঠল। সে তীব্র ঘৃণা ভরে অতঃপর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতঃপর হো হো করে হেসে উঠল। শব্দটা শ্রীমতীকে ত্যাগ করে নিয়ে চলল। অতঃপর যেন আজ পাগল হয়ে গেছে। অতি সাধারণ আর সহজ কথাটাকেও সে বুঝতে চাইছে না। নিজের কথার গুরুত্বও সে নিজে বুঝতে পারছে না। শ্রীমতী এক প্রকার ছুটে ছুটে এসে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সন্দেহ দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার পর স্থিরভাবে চিন্তা করতে লাগল। বোকের বশে ঠান্ডা একটা-কিছু করে বসবার যত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে শ্রীমতী নয়। তাই বলে এত বড় অপমানকেও সে বহন করতে পারছিল না। এ বাড়ীতে প্রবেশ করবার পর একে একে সে তার বহু মত এবং পথকে ত্যাগ করেছে। ইচ্ছার হট্টক আর অনিচ্ছার হট্টক, এমনি এক মধ্যপন্থা বেছে নিয়ে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা সে করে আসছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলে...শ্রীমতী আর ভারতে পারছে না। তার মাথা ঘেঁষে মল মল করছে। এখানে আর একটি মুহূর্ত থাকতে তার মন চাটছে না। কিন্তু তার এত বড় পরাজয় বাবার বুকে কত বড় বে আঘাত করবে এই কথা ভাবতে গিয়ে তাকে বায়ে বায়ে চক্কেলি তাকাতে হচ্ছে। তা ছাড়া সর্বদা এতখানি পরাজয়ের গ্লানি মেখে অপরের কাছেই বা সে মুখ দেখাবে কেমন করে। তার পর...তার পর কেন...সেই কথাটাই তাকে আজ সর্বদা ভাবতে হচ্ছে। শ্রীমতী আজ আর একলা নয়। তার দেহকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে অতঃপর সন্তান। তার ত কোন অপরাধ নেই।

শ্রীমতী বাধ্যভাবে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধরে মাথার জলের ধারা দিল। তার পর কিংবে এসে কাপড় বদলে ডাইভারকে ডেকে গাড়ী নিয়ে বার হয়ে পড়ল।

গাড়ীর শব্দটা অতঃপর পরিচিত। সে উঠে গিয়ে জানালায়

কাছে দাঁড়াল। অদৃশ্যমান গাড়ী আর তার আরোহিনীর পানে চেয়ে চেয়ে তার হুঁচোখ উত্তেজনার জ্বলে উঠল। অতঃপর জানে কোথায় শ্রীমতী গেল। ডাক্তারের ওখানে আসা-যাওয়া কিছুদিন ধরে তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কথাটা ডাক্তারকে জানিয়ে দেবারও সময় হয়েছে। অতঃপর ঘরময় পাখিটার কবতে কবতে ভাবছিল।

মিত্রা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

অতঃপর দেখেও দেখল না।

মিত্রা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই অতঃপর দাকল, কতক্ষণ এসেছ?

এই মাত্র, মিত্রা জবাব দিল।

বাচ্চ কেন? বস। অতঃপর বলল, এবং নিজেও একটা সোফায় দেহ এলিয়ে দিল।

মিত্রা নিশ্চয়ই তার পাশের সোফায় উপবেশন করতেই অতঃপর সরাসরি বলল, তোমার বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি উপর আমার আস্থা আছে মিত্রা।

মিত্রা বলল, আপনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন...

অতঃপর কণ্ঠধরে পরিবর্তন দেখা দিল! সে বলল, তোমার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্বন্ধ নয় মিত্রা। তা ছাড়া অকারণে ঠাট্টা করাটা আমি পছন্দ করি না।

নিরীহ কণ্ঠে মিত্রা জবাব দিল, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে—

অতঃপর বলল, ডানকান-আগরওয়ালা-চক্র পূর্ণবেগে ঘুরতে শুরু করেছে মিত্রা। আমি তাদের চিরদিনের জন্য ধামিয়ে দিতে চাই।

মিত্রা বলল, চক্র যে সত্যিসত্যিই ঘুরতে শুরু করেছে তা আপনাকে কে বললে? আর যদি ঘুরতেও থাকে তাতেই বা ভয় পাবার কি আছে?

ভয়...অতঃপর যেন গর্জন করে উঠল।

মিত্রা একটু হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ ভয়—নইলে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না। আপনি বাগ করবেন না—সত্যি-সত্যিই আপনি এত ভয় পেয়েছেন যে, কাকুর ভাল কথাও আর ভাল মনে নিতে পারছেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন—বাইয়ের লোক, আপনায় একজন সাধারণ কর্মচারী, কিন্তু আপনি আপনার জীকেও অকারণে না হোক মল কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

খানিক চুপ করে থেকে অতঃপর বলল, জীব কথা থাক। তোমার কথা বল। আমি শুনব।

মিত্রার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। বলল, আমিও যদি আপনার জীব কথা ক'টাই আবার নতুন করে বলি তা হলে কি তা আপনার ভাল লাগবে? তিনি ত কিছু অজার বলেন নি।

অতঃপর পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, ভায়-অজারের কথা নয় মিত্রা। কিন্তু এইসব বস্তা-পটা অতি সাধারণ উপদেশ-শুলা শুনতে আমার ভাল লাগে না। নতুন কিছু শোনাতে পার? নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে পার তুমি? যাতে করে সবদিকে

একটা সামঞ্জস্য থাকে? তোমার প্রচুর বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, সেই সঙ্গে আছে সজাগ দৃষ্টি। একদিন তুমি আমাকে নিশ্চিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছ মিত্র। সেইজন্যই তোমাকে এত কথা বলছি। যদি গ্রন্থযোগ্য কোন পথ তোমার জানা থাকে আমাকে দেখিয়ে দাও।

মিত্রা শান্ত গলায় বলল, গ্রন্থযোগ্য কিনা সেটা বিচার করে দেখবে কে অতনু বাবু? আপনি নিজে ত? আমার মুন্সিল ত সেইখানে। আপনার মনের মত করে বলতে না পারলেই বাগ করবেন। তার চেয়ে আপনার পথ আপনিই দেখে নিন।

অতনু বলল, তোমার বক্তৃতাটা কি মিত্রা?

খুব সহজ অতনু বাবু। মিত্রা গভীর কণ্ঠে বলতে থাকে, আপনার জীবন যুক্তি আর অনুবোধকে যে ভাবে উপহাস আর অসম্মান দেখিয়ে উপেক্ষা করেছেন তার পরেও কি আপনি আশা করেন যে, আমার মত একজন নগণ্য কণ্ঠচোর আপনার কোন যুক্তি-পরিচয় দিতে পারে?

অতনু মুহূর্তে বলল, বার বার তুমি ঐ একটা কথা বলছ কেন মিত্রা? আমি ত তোমাকে ঠিক ও ভাবে দেখি না।

মিত্রা নিঃশব্দে বলল, সেটা আপনার অগ্রগতি। আজ দয়া করে মূল্য দিতেও পারেন, কাল ইচ্ছে করলে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতেও পারেন। আমার কাছে এ অগ্রগতির বখার্ব কোন মূল্য নেই অতনু বাবু।

অতনু পানিক স্থির দৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে চেয়ে থেকে মূঢ় কণ্ঠে বলে, আমি তোমার বক্তৃত্ত্বের দাবি করছি।

মিত্রা বলে, প্রভু-ভক্ত্যের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না অতনু বাবু। মাঝে একটা বস্তুর ভেদ থাকে যার। তা ছাড়া কেমন করে আপনার একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি? যে লোক জীবন বন্ধুত্বকে সহজ মনে মনে নিতে পারে না, তার মুখে একথা সত্যিই কি পরিহাসের মত শোনায় না?

অতনু বলে, আমাদের মধ্যের প্রত্যেকটি কথাই তুমি শুনেছ দেখছি।

মিত্রা জবাব দিল, আমার দুর্ভাগ্য, আপনার প্রত্যেকটি কথাই আমার কানে গেছে।

অতনু বলল, কথাগুলি অপরের শোনা বুলি—জীবন্তী শ্রেফ মুখস্থ বলে গেছে।

মিত্রা বলল, তাতেই বা ক্ষতি কি? ভাল ভাল কথা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিখি না অতনু বাবু—মেহনৎ করে শিখতে হয়।

অতনু উচ্চ হয়ে উঠেও সামলে নিয়ে বলল, তোমাদের সকলেরই দেখছি এক যোগ। সুযোগ পেলেই উপদেশ দিতে শুরু কর। ওটা একটু কম করে দিলে ক্ষতি কি?

মিত্রা বিমূষা না হয়ে সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, আপনি বা

খুশী বলতে পারেন, কিন্তু বারা আপনার বখার্ব হিতাকাঙ্ক্ষী তারা সব সময় এ কথা বলবে। আপনার দ্বী এবং ডাক্তার্যাবু—

বাধা দিয়ে অতনু বলল, তাদের কথা আমি জানিনে মিত্রা, কিন্তু তোমার সত্যিকার পরিচয় আমি পেরেছি বলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি।

মিত্রা মুহূর্তেই হেসে বলল, আপনার কি কখনও ভুল হতে পারে না? আপনি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলে আমাকে সত্যোচের মধ্যে ফেলছেন। তা ছাড়া এতবড় একটা সমস্ত্রাপূর্ণ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এত সহজে হয় না অতনু বাবু।

অতনু বলল, জীবন্তী কিন্তু কিছু না ভেবেই উপদেশ দিতে এগিয়ে এসেছিল মিত্রা।

মিত্রা বলল, তারা হয়ত অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলেন। আমাকে আপনি মাপ করুন। এ নিয়ে অনর্থক আমাকে প্রশ্ন না করে নিজেই ভেবে-চিন্তে একটা পথ আবিষ্কার করে নিন। সেইটেই হয়ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে। তবে আমাদের যুক্তিস্থলোকে নিছক কুযুক্তি ভেবে অজ্ঞার ভাবে বাতিল করে দেবেন না যেন।

বলেই কতকটা ঝাপছাড়া ভাবে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

অতনু বিম্বিত ভাবে তার চলার পথে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

১৯

আশ্চর্য! মিত্রা তার নিজের ব্যবহারে সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। এমনটি কেমন করে সম্ভব হ'ল তা সে নিজেও সঠিক ভেবে পেল না। যে কথাগুলি কথাপ্রসঙ্গে সে অতনুকে বলে এসে এইটেই কি তার মনের কথা? এ কথা সে বলতে চায় নি। কেউ যেন তাকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নিয়েছে। এ পথ তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ নয়। মিত্রা কি করতে চেয়েছিল আর কি সে করতে বসেছে।

আগরওয়ালার আর ডানকান তার দেহটাকে অপরিব্রজ করেছে। এই মূল্য দিয়েই তাকে মুক্তি ক্রয় করতে হয়েছিল। অতনু তার সর্বনাশ করতে গিয়েও কয়ে নি। ওদের হাতে ফেল দেখে নিজে সরে গিয়েছিল। আর ঐ দুই নরপণ্ড তার দেহটাকে ছিড়ে ছিড়ে খেয়েছে পদম পবিত্রস্থির সঙ্গে। এতবড় অজ্ঞায়কে এক যুদ্ধের জন্তও মিত্রা ভুলতে পারে নি। অতনুকেও সে একই দলভুক্ত করে বিচার করে যায় দিয়েছিল। ডানকান আর আগরওয়ালাকে আশ্রয় করেই সে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে—কিয়ে আঘাত করবার প্রত্যাশায়। তার পূর্ব সময় এবং সুযোগ বুঝে আঘাত ছেনেছো রাজ-সিংহাসন থেকে একেবারে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু এইখানেই মিত্রার খেয়ে বাবার কথা নয়। খেয়ে বাবার জন্ত সে আরম্ভ করে নি। তার বর্তমান অবস্থার জন্ত বাবা দায়ী তাদের একে একে চূর্ণ কববার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মিত্রা এই-সিংহসভ্যে প্রবেশ করেছিল। অতনুকেও সে ঘৃণা করে—সেই সঙ্গে

কিছুটা ভয় এবং শ্রদ্ধাও করে। তার অপরাধটাকে কিছুটা লম্বা করে দেখবার চেষ্টাও সে করে। কিন্তু ডানকান আর আগর-ওয়ারালকে শুধু ঘৃণাই করে। পেটের জ্বালায় ওদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। খুবলে খুবলে গারের মাংস তুলে নেয়। নেকড়েব মত লোভী আর শিরালের মত খুঁট ওরা। মাসের লোভ অতন্তর আছে। কিন্তু সে লোভের মধ্যেও একটা রাজকীর আভিজাত্য আছে। ক্ষুধা আছে হাংলামী নেই। যে শিকার একবারে ধরতে পারে না তাঁর পিছু নেওয়ার প্রোভন তার নেই। কথটা বতই দিন যাচ্ছে, মিত্রা ততই অস্থির করতে পারছে। তাই আবার করবার সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এই সামান্য ক'টা মাসের সান্নিধ্য মিত্রাকে ভিতরে ভিতরে অনেকখানি দুর্বল করে ফেলেছে। আর এই দুর্বলতার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ লুকিয়ে আছে এ কথাটাও আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এতদিন মিত্রার মধ্যে মুক্তি-বিচারের স্থান ছিল না। শুধু একদিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু ডানকান আর আগর-ওয়ারাল ধরাশায়ী হতে সে চলা বন্ধ করে ভাবতে শুরু করেছে এবং নিজের মনের এক আশ্চর্য রূপ দর্শনে স্তম্ভিত-বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেছে। এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অমৃত বলেই কি এতখানি বিবেক তাকে প্রদান করতে পারে নি!

মিত্রা আবার নতুন করে ভাবতে বসেছে। ভাবতে বসেছে তার ক্ষতির পরিমাণ কতখানি আর কতটুকু ক্ষতি সে তার পরিবর্তে করতে পেয়েছে। কতটুকু সে করতে পারত সেটা বড় কথা নয়। কতটুকু করেছে সেইটেই হিসেব সাপেক্ষ। অতন্তর খাবা গুটিয়ে নিয়েছিল তার অসহায় অবস্থা দেখে, কিন্তু তার পার্থক্যে নেকড়ে দুটো সুযোগ নিয়েছিল সেই অসহায় অবস্থার। আক্রান্ত উভয় দিক থেকেই সে হয়েছিল, আর না বুঝে, মিত্রা নেকড়ের গলবে গিয়ে ধরা দিল। যে স্তম্ভ দেহটাকে কেন্দ্র করে তায় জীবনে এত বড় একটা দুর্ঘটনা দেখা দিয়েছিল তাকেই শেষ পর্যন্ত সে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করল।

এক মুহূর্তে মিত্রা বদলে গেল। তার মুণ্ডার বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তার পুরানো ক্ষতস্থান থেকে আবার নতুন করে রক্ত-ক্ষরণ শুরু হয়েছে। মিত্রার স্বপ্ন-গড়া স্তম্ভ মন আর ফুলের মত নয়ম দেহটাকে নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলেছে। সে তুলনার মিত্রা ওদের কতটুকু ক্ষতি করতে পেয়েছে? মিত্রা নিজেকে নিজে ঘুরিয়ে-কিরিয়ে প্রশ্ন করে। ওরা প্রয়োজন মিটিয়ে চাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, ওরা নাকি শুধু অতন্তর ইচ্ছাকেই পূরণ করেছে। আসলে তারা আত্মবাহ মাত্র।

মিত্রা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরেছে—মুখে বোকার মত হেসেছে। প্রকাশ্যে আরও এগিয়ে গিয়ে অস্তবল হয়ে উঠেছে। ওরা কতিপূর্ণ করবার অজিয়ার তাকে অতন্তর কারখানার নিয়ে এসে চাকরী দিয়েছে। মিত্রা কৃতজ্ঞতা জানাবার ছলে নানাতাবে

তাদের প্রস্তুত করেছে। অস্তবলতার সুযোগ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছে। পরামর্শ মত কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তার পরে সুযোগ মত সে পাশ দিয়েছে, ওরা গড়িয়ে পড়েছে।

অতন্তর সঙ্গে সঙ্গোপনে দেখা করে ডানকান-আগরওয়ারাল বিধাসভার দলিলপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে এল মিত্রা। তাদের উদ্ধত কথা আর বিব দীত একটি আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। এইবার অতন্তর পালা। বাব স্তম্ভ মিত্রাকে আরও টের বেশী সতর্ক হয়ে এগোতে হয়েছে। পালেশ অস্তবল দুটো পেছে বটে, কিন্তু তারাও যে চুপ করে নেই তা সে টের পেয়েছে। তার প্রমাণ অতন্তর কারখানার বর্তমান অস্থির পরিণতি। মিত্রার দাবার ঘুটি অবশ্য এখানেও অসঙ্কে থেকে চলচল করেছে।...

কে—মিত্রা বেন ভয় পেয়েছে এমনভাবে আশ্বিনাদ করে উঠল।

আমি—সাতা দিয়ে অতন্তর দৃঢ় পদক্ষেপে এসে তার পাশে ঠাড়িয়ে বলল, কিন্তু তুমি এমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন বল ত?

মিত্রা বিব্রত কণ্ঠে বলল, আপনি এত রাতে আমার ঘরে...

বাধা দিয়ে শাস্ত হেসে অতন্তর জবাব দিল, কত আর রাত হবে মিত্রা? এই ত সবে রাতটা বাজল।

বা-র-টা...মিত্রার কণ্ঠে বিস্ময়, কিন্তু আপনি থুব অস্তর কাজ করেছেন অতন্তরবাব। আপনার স্ত্রীর চোখে পড়লে তিনি তুল বুঝতে পারেন।

নিলিগু কণ্ঠে অতন্তর জবাব দিল, খুবই স্বাভাবিক। তবে শুনে আশ্চর্য হতে পার তিনি এখনও কিবে আসেন নি। আর কিবলেও তোমার কাছে আমাকে আসতেই হ'ত।

একটু থেমে, একটু হেসে সে পুনরায় বলল, তেবে দেখলাম শত্রুই হউক, আর মিত্রাই হউক, তাকে মুখোমুখি পাওয়ারই জের। তোমার কি মত?

অতন্তর কথা বলার ধরনে ভিতরে ভিতরে মিত্রা দীতিমত অশ্রদ্ধি বোধ করলেও প্রকাশ্যে বধাসভার সংঘম বন্ধ করে সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ঠিক কথাই বলেছেন অতন্তরবাব। তাতে সহজ জিনিস অকারণে যোয়ালে হয়ে উঠতে পারে না।

অতন্তর হো হো করে হেসে উঠে বলল, আমার মনের কথা বলেছ তুমি। কথটা বুঝতে পেয়ে আর এক মুহূর্ত দেবী করি নি। থোলাখুলি তোমাকে বলবার জন্ত ছুটে এসেছি।

মিত্রা বিস্ময়ের ভান করে বলল, এত লোক থাকতে এ কথা আমাকে বলবার জন্ত কেন ছুটে এসেছেন ঠিক বুঝলাম না অতন্তরবাব!

বিচিত্র ধরনের থানিকটা হাসি অতন্তর মুখে ফুটে উঠল। সে সহজ কণ্ঠে বলল, বুঝতে তুমি ঠিকই পেয়েছ মিত্রা। আমি আমাদের এই এতদিন ধরে অভিনয় করে যাবার কথা বলছি। এবারে ওগুলো বাদ দিয়ে চললে কেমন হয়?

আলোচনার এই আকস্মিক পটপরিবর্তনে মিত্রা মুহূর্তেই লজ



বিহ্বল হয়ে পড়লেও অল্পেই সাবলে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কাকে আপনি অভিনয় বলছেন তাই ?

অতঃপূর্ব হেসে পুনরায় বলতে লাগল, তোমার-আমার লুকোচুরি খেলার কথা বলছি মিত্রা। তোমার একটু আগের কথাগুলোই যদি ধরা যায়—

মিত্রা ভাবলেনহীন কণ্ঠে বলল, আপনার আজ কি হয়েছে বলুন ত অতঃপূর্ব ? আপনি কি অসুস্থ ?

অতঃপূর্ব প্রশান্ত হেসে বলল, অসুস্থ—না মিত্রা, বরং আজকের মত সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে এর আগে কোন দিন তোমার সঙ্গ কখনো বলি নি। তুমি মিথ্যা চেষ্টা করছ। আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমার বক্তব্যটা সহজ আর খোলা মনে গ্রহণ করতে বিধা করছ। এইটাই স্বাভাবিক।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, ভাল কথা—না হয় আর একটু খোলাখুলি ভাবেই বলছি। শোন মিত্রা, অতঃপূর্ব যাকে একদিন দেখেছে তাকে কোনদিন ভোলে না। তোমাকেও আমি ভুলি নি। সামান্য একটু ভুল বুঝেছিলাম। তাই সুধয়ে নেবার চেষ্টা করছি। অতঃপূর্ব ! মিত্রা আন্তরিক করে উঠল।

অতঃপূর্ব হাসিমুখে বলতে থাকে, ভয় পেও না মিত্রা। যদিও ইতিপূর্বে একদিনের জন্তও তোমাকে আমি মিত্রা হিসেবে দেখি নি আর সব সময়ই তুমি আমার সঙ্গ প্রহরাধীনে ছিলে, তবুও আমি আজ বড় মতই তোমার কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে অতঃপূর্ব পুনরায় বলতে থাকে, চেরে চেরে দেখছি কি মিত্রা ? সত্যি বলছি তোমার মত আমিও তোমাকেই আমার কাছাকাছের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব বলেই আমার কাছাকাছের প্রবেশ অধিকার দিয়েছিলাম।

মিত্রা কম্পিত কণ্ঠে বলল, আপনার এসব কথার অর্থ ?

অতঃপূর্ব স্তব্ধ কণ্ঠে বলল, অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। তুমি কুটনীতির সাহায্যে দুর্জনের সারেশু করবার ব্রত নিয়েছিলে। আর আমি তোমার সাহায্যে নিজের পথ পরিষ্কার করেছি। জানকান আগারওয়ারালার ওপর আমারও নজর ছিল। ছিল না প্রামাণ্য দলিলপত্র।

এর পরে আর গোপন করবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সত্যের সুখোমুখি সোজা হয়ে মিত্রা ঠাণ্ডাল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, সেটা কি খুব অজ্ঞার করেছে অতঃপূর্ব ?

অতঃপূর্ব সহজ কণ্ঠে বলল, ভাব-অজ্ঞারের বিচার করবার ইচ্ছে আর আমার নেই মিত্রা। আমি শুধু বলতে চাই যে, একই অস্ত্রে সকল শ্রেণীর পতকে বলি দেওয়া যায় না। অস্ত্রের ধার এবং ভাব দুই পরীক্ষা করে নিতে হয়। সেইখানেই তোমার ভুল হয়ে গেছে।

সহসা মিত্রা বেন কপে উঠল, এ ভাবে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার অভ্যাসটা আপনি ছাড়ুন অতঃপূর্ব বাবু।

অতঃপূর্ব বলল, কিন্তু টিগটা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় তা হলে অস্ত্রতঃ প্রচেষ্টা বার্থ হয় নি এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে মিত্রা।

মিত্রা নিবীহ কণ্ঠে জবাব দিল, অভিনয় করতে আপনি নিবেদন করেছেন, আবার আপনিই নির্বিবাদে অভিনয় করে চলেছেন।

অতঃপূর্ব হাসিমুখে বলল, তোমার কি সত্যিই তাই মনে হচ্ছে মিত্রা ?

মিত্রা প্রতিবাদেই সুরে জবাব দিল, মনে হচ্ছে না অতঃপূর্ব—যা সত্যি, সেই কথাই আপনাকে জানিয়েছি।

অতঃপূর্ব অস্ত্রান কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল। তোমার কথা যে কত বড় মিথ্যা তা আমার চেয়েও তুমি বেশী জান। তোমার দেখে নেই মিত্রা। আমি হলেও তোমার পথেই চলতাম। কিন্তু আজ করতে পারাটা বরং সোজা, ধামতে পারাটা তত সোজা নয়। তুমি চর্যায় যাত্রাপথে থেমেছো—বার বার পিছন ফিরেও তাকাচ্ছ। আশেপাশের চোরা দোপে কতকটা বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েছ। খবর কথটা স্বীকার করতে পারছ না। তোমার জ্ঞান সত্যিই আমি চমকিত। তবে বা তুমি খুঁটিনাড়া তা কিয়দে দেবার সাধা আমার নেই। বড় জোর কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারি। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম মিত্রা, তোমার এই থেমে যাওয়াটা কি সত্যিই ধামা না সাময়িক বিরতি মাত্র ?

বক্তব্য মিত্রা আর কথা বলল না। নিঃশব্দে নতমুখে বসে কিছু চিন্তা করে যখন সে মুখ তুলে তাকাল তখন সে মুখে ভয়-ভাবনার পরিবর্তে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে স্থির-অবচলিত কণ্ঠে বলল, আমার মুখের কথাই কি আপনি আস্থা রাখতে পারবেন অতঃপূর্ব ? আর আমি ধামলেও আপনার পক্ষে ধামা কি সম্ভব হবে ?

অতঃপূর্ব বলল, তোমার কথা বল মিত্রা।

বড় কড়ম ভাবে একটু হেসে মিত্রা বলল, বুদ্ধির লড়াইতে আমি হেরে গেছি। তা ছাড়া আমার নিজের মনই আমাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। আমার এগুবার শক্তি ত নেই-ই, শিহিরে যাবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। নিজের বুদ্ধির অহংকার অনেক দূরে আমাকে টেনে নিয়ে গেছে অথচ ক্ষেত্রের পথ আমার জানা নেই। কোন বকমে আমার শ্রুত ফিরিয়ে আনতে পারেন অতঃপূর্ব ? বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে এক বিন্দু মিথ্যা বলছি না।

অতঃপূর্ব বলল, তোমার স্পষ্ট স্বীকৃতির জন্ত ধন্যবাদ। সেদিনে তুমি বাঁচবার জন্ত পালাতে চেয়েছিলে, কিন্তু বাঁচতে পার নি, আর আর্জ মরবার জন্ত ফাঁদে পা দিয়েও বেঁচে গেলে মিত্রা।

মিত্রা সহজ কণ্ঠে বলল, আপনার কথাগুলো ঠিক হ'ল না। আমাদের দু'জনের বেলায়ই ওটা সমান সত্য, কিন্তু আজ আবু এসব আলোচনা থাক। অনেক রাত হয়েছে। আপনি এবাবে যান।

অতঃপর বলল, এতক্ষণ ধরে শুধু বাজে কথা বলেই গেলাম। আসল কথা এখনও যে বলাই হয় নি মিত্রা।

মিত্রা অমনর করে বলল, এ আলোচনা একটি রাতের ভক্ত মূলত্ববী বাধা কি কিছুতেই সম্ভব নয়?

অতঃপর বলল, আজকের প্রাঙ্গণ কাল হয়ত সহস্র চেষ্টারও আর মনে আসবে না।

মিত্রা বলল, তা হলে ওটা একটা সমস্যা নয়। কিন্তু আপনি এবারে দয়া করে যান। আপনার স্ত্রী বহুক্ষণ ফিরে এগেছেন। আমাকে সস্ত্রম দেখাতে না পারেন ক্ষতি নেই, তা বলে নিজের কথা ভেবে দেখছেন না কেন?

অতঃপর মুহূর্তে বলল, যে অপূর্ণকে সস্ত্রম দেখাতে পারে না নিজের কথা তার মনেই আসতে পারে না। তবে বলছি যখন, যাচ্ছি। প্রাঙ্গণ কালকের ভক্তই তোলা থাক।

অতঃপর ধীর পদে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

২০

মিত্রার ঘর থেকে বার হয়ে এসে আপনি শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারে অতঃপর স্ত্রীমতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। স্ত্রীমতী তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতেই অতঃপর তাকে আহ্বান জানিয়ে প্রাঙ্গণ করল, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে দয়া করে বলবে কি? রাত এখন কটা তা জান?

স্ত্রীমতী কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, আমি জানি।

স্ত্রীমতীর উত্তর দেবার ধরনে অতঃপর আপাদমস্তক ছলে উঠল। সে স্নেহ করে বলল, এটা ভুলসেলেকের বাড়ী।

স্ত্রীমতী ক্ষতবিক্ষিত কণ্ঠে জবাব দিল, খুব আশ্চর্য্য কথা ত!

অতঃপর চীৎকার করে উঠল, তোমার সাহস দেখছি দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি এত বড় কথা বলতে পার...

বাধা দিয়ে স্ত্রীমতী বলল, বলবার দরকার কি যখন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চুকে যায়।

অতঃপর অবাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীমতীর মুখের পানে এক মুহূর্তে চেয়ে থেকে কথা কটি পুনরাবৃত্তি করল, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চুকে যায়...তার পরেই কীপ্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু ভিজেন্স করি, সূচরিতা স্ত্রীমতী এই রাত একটা পর্যন্ত কার নিকৃষ্ট কাটিয়ে এইমাত্র ফিরে এলে?

এই অঙ্গুলি ইঙ্গিতে স্ত্রীমতীর আপাদমস্তক ছলে উঠল। সে একবার অঙ্গুলি দৃষ্টিতে অতঃপর পানে চেয়ে দেখে অবজ্ঞাভবে পিছন ফিরে দাঁড়াল। কোন জবাব দেবার প্রবৃত্তি তার হ'ল না। বাগে কোভে অপমানে সে তখন কাঁপছিল।

অতঃপর পুনরায় গর্জ্জ উঠল, পিছন ফিরে দাঁড়ালেই ভেবেছি তুমি বেহাই পাবে? তা হলে আজও অতঃপরকে চেন নি?

স্ত্রীমতী তেমনি নীরব।

অতঃপর কীপ্তি ভাবে হেসে বলল, আজ এই মুহূর্ত থেকে এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিক্রান তোমার কাছে নিষিদ্ধ হ'ল। আর সেই সঙ্গে ডাক্তার সার্কেলের অঙ্গও উঠল।

স্ত্রীমতী পুনরায় ফিরে দাঁড়াল। দুপ্ত কণ্ঠে বলল, তোমার আর কিছু বলবার আছে কি? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রলাপ শুনবার মত আমার সময় নেই।

অতঃপর বাক্য করে বলল, অনেক দিন ধরেই তোমার সময়ের অকুলান হচ্ছে, তাই এখন থেকে যাতে প্রচুর সময় পাও তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলেই অতঃপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোঁরাতে শুরু করল।

স্ত্রীমতীর সারা মুখে কালি ঢেলে দিল। অতঃপর বলছিল, ই্যা! আপনাকেই আমার দরকার ডাক্তারবাবু। কাল থেকে আপনাকে আর দরকার নেই, আমার লিখিত চিঠি এবং আপনার প্রাণ্য কালই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সশব্দে টেলিফোনটা বেধে দিয়ে অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

স্ত্রীমতী অশ্রুত আত্মনাদ করে উঠল। অপরিণীত বাধার আর লজ্জায় সে একেবারে হয়ে পড়ল।

অতঃপর হিংস্র উল্লাসে হেসে উঠে বলল, আমার কথার আর কাজে কোন তফাৎ নেই, বুঝলে?

স্ত্রীমতী কেটে পড়ল, অর্থাৎ—

অতঃপর কণ্ঠে বলল, সেটা কাল সকাল থেকেই জানতে পারবে। তবুও শুনে রাগ—ঘরের বাইরে পা বাড়াবার চেষ্টা কর না। বাধা পাবে। আর সেটা কোল ভরফেরই সম্মানের হবে না।

স্ত্রীমতীর মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। সে অবজ্ঞাভবে বলল, হুঁম তুমি একটা কেন একশ'টা দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু সে হুঁম যেনে চলা না চলা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে, এ কথাটাও জেনে রাখ।

বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মিত্রার ঘরের দরজার পাশা দুটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল।

অতঃপর পাগলের মত খানিক একলা একলা হাসতে থাকে। তার পর এক সময় নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তার পাইপে অগ্নি সংযোগ করে উপযুপযী ধূম উদগীরণ করতে লাগল। ধোয়ার ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঐ ঘোঁরাব কুণ্ডলীর মধ্যে অতঃপর নিজেকে এক নতুন মস্তিতে দেখতে পেল। এ তার আর এক রূপ। অপরিণীত রাস্তাতে সে যেন ভেঙে পড়েছে। মুখের হাসিটাও অত্যন্ত বিবর। এত হুঁকলচিত্ত অতঃপর কোন দিন ছিল না। অতঃপর আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে—এ তার উত্থান না পতন।

নিঃশব্দ চিন্তার অবকাশে ধূমকাল অপসারিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার ঘরে-পড়া যনটাও অনেকখানি সজাগ হয়ে উঠেছে।

নিজের চেষ্টনাকে ধাক্কা দিয়ে অতন্ন আগিয়ে তুলল। দেয়াল-আলমারীর একটা গোশন অংশ থেকে সে ছইন্দির বোতল বাব করল। ভেঙে পড়লে তার চলবে না। তাকে আরও দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। আরও ঢের বেশী দৃঢ়। ঘরে বাইরে নিজেকে সে হাশাস্পদ করে তুলতে পারবে না।

বানিকটা নিরুস্মা ছইন্দির অতন্ন গলায় ঢেলে দিল। তার বস্ত্রের মধ্যে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

একবার সে শ্রীমতীর কক্ষ ধারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে হচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে শ্রীমতী কি করছে তার ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নেই। অতন্ন পুনরায় বানিকটা ছইন্দির তার গলায় ঢেলে দিল। নিজেকে সে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছে না। ঘুরে ফিরে শুধু একটা কথাই বাবে বাবে তার মনে হচ্ছে। কাজটা হয় ত সে ভাল করে নি। বড্ড বেশী এগিয়ে গেছে সে। এবং সম্ভবত নিতান্ত অকারণে।

অতন্ন পুনরায় ছইন্দির বোতলটা তুলে নিল।

আর পাশের ঘরে শ্রীমতী তখন তার দু'হাতের মধ্যে নিজের মাথাটা ঢেপে ধরে চুপ করে বসে আছে। তার মনের মধ্যে ক্ষণ-পূর্বের ঘটনাগুলি একের পর এক আনাগোনা করছে। কিন্তু কোন চাকলা নেই। নিজেকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সামলে নিয়েছে। তার ভবিষ্যৎ-কল্পনাপ্রসঙ্গও স্থির করে ফেলেছে। এমনি এক চক্ষু প্রকৃতির উচ্ছ্বল লোকের সঙ্গে ঘর-করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনকে গলা টিপে ঘেরে নেহের প্রয়োজন যেটাতে সে পারবে না। এখানকার সোনার খাঁচার মোহ আর তার নেই। সে মুক্তি চায়। অতন্নই সম্ভানকে শ্রীমতী পূর্বে ধারণ করেছে—তার দেহের রক্তমাংস দিয়ে তাকে পালন করে ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ তাকে দিতেই হবে। তার পর-হী! তার পর না হয় ভেবে দেখবে—না হয় সম্ভানের দাবীও সে ছেড়ে দেবে।...

অতন্ন সত্যিই কুপার পাত্র। নইলে তাকে উপলক্ষ্য করে ডাক্তারবাবুর মত একজন স্বার্থ শুভামুখ্যায়ীর সঙ্গে এমন অভ্যুদ্যোচিত ব্যবহার করতে তার আটকাত। যে লোক তার ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তায় অধীর হয়ে শ্রীমতীকে ডেকে পাঠিয়ে এতক্ষণ ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা করে স্থিরলক্ষ্যে পৌঁছিলেন তাঁকেই কিনা... শ্রীমতী আর ভাবতে পারে না। ভাবতে সে চায় না। শুধু দুঃখে আর লজ্জায় সে মরমে মরে গেল।

শ্রীমতী একটি আঁটাচি কেসের মধ্যে তার বাবার দেওয়া সোনার গহনা কথানি ভরে রাখল। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকা নিতেও সে তুল করল না। যদিও টাকাটা নেবার আগে সে বার বার ইতস্ততঃ করেছে। কিন্তু অতন্নর সম্ভানের জন্ত যে গুরুদায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে তার জন্ত টাকার প্রয়োজন হবে। স্তম্ভাং টাকা তাকে নিতেই হ'ল এবং কিছু বেশী পরিমাণেই নিল। অবশ্য এ টাকাটা অতন্নর তহবিল থেকে তাকে নিতে হয় নি। তাকেই

উপহার দেওয়া হয়েছিল আর শ্রীমতী খরচ না করে তা তুলে রেখে ছিল।

এ নিয়ে অতন্ন বহুবার তাকে ঠাট্টা করেছে। বলেছে, জমিয়ে রাখাটাই বড় কথা নয়, ব্যয় করতেও জানতে হয় শ্রীমতী। নইলে টাকার কোন দাম থাকে না।

কথাটা যেনে নিয়ে শ্রীমতী সৌন্দর্য হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, খুব সত্যিকথা বলেছি। গরীবের মেয়ে কিনা, তাই অকারণে খরচ করতে পারি না। আজ কিন্তু তার প্রয়োজনের কথাটা ভাবতে হচ্ছে। স্তম্ভাং টাকাটা তাকে নিতে হ'ল।

কত বড় নিরুজ্জ্বল! বাত দুপুরে মিষ্টি ঘর থেকে বার হয়ে এসে তার কাছে কৈকিয়ং চ'য় দেবী করে ফিরে আসবার জ্ঞ। অবাধা ঘোড়াকে তিনি নাকি চাবুক মেরে সায়েস্তা করেন। মানুষ যে ঘোড়া নয় এ কথাটা ভাববার মত উদ্বিগ্ন তার নেই। ঠাকুর-দাদার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল, তাই সময় মত জমিদারী বিক্রি করে নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জমিদার হলেন শিল্পপতি কিন্তু সাবেক দিনের তোগলকি মেজাজ সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন। অভ্যাস ভাগ্য করা সম্ভব হ'ল না। তাই পদে পদে এত মতবিরোধ আর গোলযোগের সৃষ্টি। তার উপর আবার শত্রুপক্ষ অদৃষ্ট থেকে ঘুটি চালছে।

শ্রীমতীর সপোন অমুযোগের উত্তরে ডাক্তারবাবু কথাকটি তাকে বলেছেন। উত্তেজিত না হতে উপদেশ দিয়েছেন—অতন্নর শুভাশুভ নিয়ে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ডাক্তারবাবু ওকে প্রাণপণে আগলে রাখতে চান। এই বিশ্বরকর আসক্তির পরিচয় শ্রীমতী তার বহু কাল্পনিক এবং ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখেছে। অবাক হয়েছে কিন্তু কোন্‌দায় যে এর প্রকৃত রহস্য তার সম্ভান আজও পারি নি।

আগামী প্রভাতের পূর্বেই তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। বাবার পূর্বে একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবার কথাটা মনে এল। শুধু একটিবার তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেবার জ্ঞ। কিন্তু দেখা করতে গেলে তার আর এখান থেকে চলে যাওয়া হবে না। তিনি বাধা দেবেন। শুধু বাধাই দেবেন না, শত্রু আগলে দাঁড়াবেন। কথাটা শ্রীমতী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।

শ্রীমতী উঠে গিয়ে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াল। চাপ চাপ অন্ধকার যেন বাড়ীখানাকে ঢেকে রেখেছে। কক্ষ পক্ষ। এই নিবেট অন্ধকারের সীমাহীন সমুদ্রের পানে সে তার দৃষ্টি মেলে ধরল। কোথাও কি এক বিন্দু আলো চোখে পড়ছে। তার মনের সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির একটা অবিচ্ছিন্ন মিল রয়েছে। অন্ধকার আর অন্ধকার! দুর্কিসংহ!

শ্রীমতীর বাবা হয়ত এই কাব্যগেই ভয় পেয়েছিলেন। বিধা-প্রস্তুত হয়েছিলেন। শিঙিয়ে বাবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

নিজের আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শ্রীমতীর মুখ থেকে তনবায়  
জন্ম আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী পারে নি। যার উৎকল  
একাগ্রতা আর নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের উজ্জ্বল ছবি তার মনেও  
রং ধরিয়েছিল। তার উপর শ্রীমতীর বিবাহ নিয়ে তার মা এবং  
বাবার মতান্তর এমন এক পর্যায় এসে উপস্থিত হয়েছিল যার জন্ম  
মাকে যেনে নিয়ে বাবাকে সঙ্কটমুক্ত করা ছাড়া আর কোন

উপায়ও ছিল না। আল তার জীবনের এই চরম সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে  
কে তাকে বুদ্ধি দেবে—কে দেবে তাকে সঠিক পথের সন্ধান?  
বাবাকে গিয়ে সে কি বলবে? যার কাছেই বা সে কি জবাবদিহি  
করবে...

অন্ধকার...বতদূর দৃষ্টি যার সব অন্ধকার!

ক্রমশঃ

## মৃগ

### শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

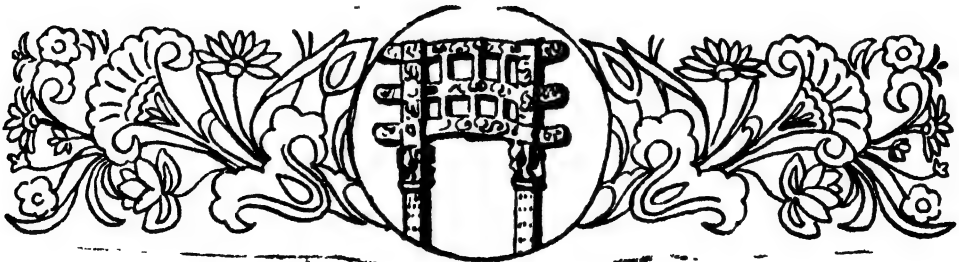
কস্তুরীর তীব্র গন্ধে শিকারী আহত,  
নাক দিয়ে টোপা-টোপা রক্ত ঝরে পড়ে।  
বিপদ জানাতে গিয়ে চিতালের ছোট লেজ নড়ে,  
জাভা ও তিস্ত-চীন-অরণ্যের টিলার উপরে  
ওরা ঝাণ্ডা অবস্থানে রত ॥

শিঙা দিয়ে বরষা সুরিয়ে ঝার—ওরা কচি বাস,  
তুচ্ছ করে এঙ্কিমো স্তম্ভাস।  
চোখের পলকে ওঠে কতবার গিরির মাধার,  
মুহূর্তে কখন নামে।—যখন আকাশ  
গোধূলির বৃত্তায়ে লাবণ্য পাঠায়।  
লাব্রাডোর-আলাস্কা আর ল্যান্স্যাণ্ড অঞ্চলে  
কখনো 'হাস্কল' বা 'কেরিবো'ও ওরা।

সোনালী বাহামী আর ডোরা।  
সাইবেরিয়ায় বনে-বনে চলে ॥

তিন মণ ওজন, আর শাখা-প্রশাখায়  
ওদের শিঙের বস্ত্র কখনো বদলায়।  
পুরুষের গলদেশে মাংসপিণ্ড বোলে,  
স্কুরে-স্কুরে আর্দ্রনাদ পাহাড়ে-জঙ্গলে—  
শিকারীর আগ্নেয়াস্ত্র অনিবার্য হলে।

কস্তুরীর গন্ধে হ'ল এ-বাতাস ভারী।  
মৃগচর্মে হবে ক্ষুণ্ণ, পবিত্র আসন।  
মাধার গুলিটা হবে এ-ভ্রমিৎকরের ভূষণ,  
শিঙা দিয়ে গড়া হবে সেতারের শোণিন সোনারী ॥



## একাঙ্কিকা

শ্রীবিকাশকান্তি রায় চৌধুরী

“কাব্যে নটকং রম্যম্।” নটক দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের একাকীভূত সমন্বয়। তাই কাব্যের এই রমণীয় রূপ-স্বষ্ট বড় কঠিন শিল্পকর্ম। পতিশীল মানবজীবনের কোন একটি স্থিতিমান কাব্য মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠবে। বিভিন্ন রুচি সামাজিকের নশ টান্দিয় পতিতপ্ত হইবে—তবেই নটক সঙ্গ সৃষ্টি। নটক তার আপন প্রাণধর্মের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। মঞ্চে সেই সাহিত্যের বিকাশ। অভিনয় নৈপুণ্যে নটকের নগ্ন কঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার করেন শিল্পী, কাহিনীকে রূপ দেবে সে বাস্তবের, নিরাতরণ্যকে রূপ-ঐশ্বর্যের। নটকের কাব্য-প্রেরণা কবিকর্ম বটে, কিন্তু নটক একক সৃষ্টি নয়, বোধ শিল্প। অর্থাৎ সাহিত্য বিচারে নটকের শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তার সার্থকতা যৎ পানপ্রদীপের আলোকে আপন রূপের মাধুরী বিকাশে, তার বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে এবং রূপকসায়। নাট্যকার, যৎ ও অভিনয়-শিল্প স্রষ্টা এই তিনের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ে। কেন না নটক মূলতঃ দৃশ্যকাব্য। এলিজাবেথ জু নটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সুন্দর কয়টি কথায়।

“Drama is the Creation and Representation of Life in terms of Theatre.”

নাট্যকার ভাবকে প্রাণ দেয়, অভিনেতা সেই প্রাণের ভাবকে রূপ দেয়, বঙ্গমঞ্চ সেই রূপের জীলাভূমি আর সামাজিকগণ সেই জীলাধৈরিক্রমের স্রষ্টা। এখন ভাবের স্বাক্ষরে বিনি প্রাণের প্রত্যক্ষ রূপান্তরিত করেন তিনি এই বোধ শিল্পের মূল এবং প্রধান আঁকড়। তিনি সাহিত্য-স্রষ্টা। নটকের সাহিত্য-স্বষ্ট ও ঘটনাবৈকল্য উৎকর্ষ বিশ্লেষণ করে বোটাছুটি একটি ছক বাঁধা হয়েছে পাঁচটি ভাগে নিয়ে। এই পাঁচটি পর্যায় হচ্ছে, ১। নটকীয় আখ্যান বা Plot; ২। ঘটনা প রম্পর্গ বা Action; ৩। চরিত্র-স্বষ্ট বা Characterisation; ৪। সংলাপ বা Dialogue এবং ৫। পরিবেশস্বষ্ট বা Local Colour.

আখ্যানভাগের ঘটনাপ্রবাহ ঠিক অমনি পাঁচটি অমুশাসনে শাসিত। অমুশাসনগুলি আবার পর্যায়ক্রমে নটকের কাঠামোতে সাজানো থাকে। (১) প্রারম্ভ Exposition; (২) প্রবাহ Growth of action; (৩) উৎকর্ষ Climax; (৪) গ্রহি-যোচন Falling action এবং (৫) শেষ পর্যায়ের পরিণতি বা Catastrophe.

প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় নটকে এই ক্রমপর্যায়ের অমুশাসন যত নটকের কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্ক সন্নিবেশ ছিল। বর্তমান শতাব্দীতে পর্যায়ক্রম বজায় রেখে প্রথমে পাঁচ

অঙ্কের নটক পেশাদার বঙ্গমঞ্চে প্রবর্তিত হ'ল। শেষ পর্যায় তিন অঙ্কের নটকেই পর্যায়ক্রম কোণল বহাল করা হয়েছে পেশাদার বঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাতে।

এ যুগের মানব কিন্তু পূর্বাবস্থার জীবনের প্রতিবিম্ব পূর্ণস্ফুট করার চাইতে খণ্ডিত জীবনের কোন একটি বিশেষ নটকীয়তা নিয়েই নিজের বসবোধকে পরিচালিত করতে পারলেই খুশী। জীবনের কোন একটি একক সমস্যা আর সেই বিশেষ সমস্যাটির গ্রহি যোচনের একটা ইঙ্গিত—এটুকুই তার ইম্পিট। পেশাদার বঙ্গমঞ্চ নিরপেক্ষ তাই একটা অতি আধুনিক প্রচেষ্টা চলেছে একাঙ্কিকা-স্বষ্ট আর তার রূপের পূর্বোদন্তর অমুশীলনের জন্তে।

পাঁচ অঙ্ক বা তিন অঙ্কের পূর্ণবৃত্ত নটকের সঙ্গে একাঙ্কিকায় প্রভেদ শুধু আকারগত এমন কথা ঠিক নয়। উভয়ের পার্থক্য আকারে নয় শুধু প্রকারে, প্রকৃতিতে এবং গঠনবীতিতে। একাঙ্কিকা তিন অঙ্কের পূর্ণবৃত্ত নটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়, কিংবা খুশীমত একাঙ্কিকাকে বাড়িয়ে তিন অঙ্কের নটকে রূপান্তর ঘটানও সম্ভব নয়। খণ্ডিত জীবনের কোন একটি সজ্ঞাতময় ঘটনার বিশেষ একটি আবেদন আধুনিক যুগমানসের নাট্যবস-শিলাস চরিতার্থ করার পক্ষে যথেষ্ট। একটিমাত্র ঘটনা একমুখী সজ্ঞাতের মাধ্যমে একটিমাত্র পরিণতি সৃষ্টি করবে। টর্জদাইটের আলো যেমন তার একবোধ্য আলোর উজ্জ্বল ছটার ক্ষুদ্র একটি গভীকে ভাস্বর করে তোলে একাঙ্কিকা ঠিক তেমনি তার নির্দিষ্ট পরিণতির পথটুকুকে আলোকিত করে। নটকের সুরুতেই সামাজিকগণের মনমানসে তাকে দোজাখুজি রেখাপাত করতে হবে। সেখানে কোন চর্যল প্রারম্ভের (Exposition) স্থান নেই, অকারণ সংলাপের অবকাশ নেই। লক্ষ্য থাকবে অবিভাজ্য নির্দিষ্ট, সেখানে বিধা, সংশয় বা জ্ঞান পক্ষপেয়ের বিলাস নেই। ঘটনা বিভাস হবে এমন নটকীয় যে, আপন কক্ষ থেকে বিচ্যুত হবার কোন আশঙ্কা থাকবে না। তার গতি হবে দ্রুত, তীরের কলায় যত দোজা লক্ষ্য-ভেলী গতি। একটিমাত্র বিশেষ পরিবেশ, ক্রমপ্রসারী অবিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্য, একটিমাত্র ভাবামুভূতি, সুনির্বাচিত বেগবান ঘটনার সন্ধান ও যাতপ্রতিঘাতের যথা দিয়ে একটি মাত্র চরিত্র তাকে চরম পরিণতিতে নিয়ে যাবে। পূর্ণবৃত্ত নটকের যত জ্ঞান ঘটনার বিভাসের দ্বারা মনুষ্য ক্রম পরিস্ফুটন এখানে সম্ভব নয়। স্বনিকা গুণার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাপ্রবাহ ষ নিয়ে পড়বে। বিভাংগর্ভ যেবে তার আসন্ন সম্ভাবনার কাহিনী যেন কম্পন, নারক চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি বহিরক্ষেয় ঘটনাপুঞ্জ ঘনগলিবিষ্ট—জঘাট দানাবাধা

যেদের প্রথম বর্ষের মতই। নাট্যকারকে এইটুকু সতর্ক হতে হবে যাতে পূর্ণ ইতিহাস বিবৃতির (Exposition) আভাস বেন পড়িষ্ট হয়, ঘটনাত্মক বেন সামাজিকগণের মনের উপর তার ক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ পায় আর চরিত্রসৃষ্টির মূলে বেন তার সামঞ্জস্য বসিত হয়।

একাঙ্কিকার আখ্যানভাগ কখন চরিত্রে, কখনও বা একটি ভাবকল্পনায়, কখনও বা হাস্যরসাত্মক সংস্থানে আবার কখনো বা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রসধন হয়ে উঠতে পারে। আখ্যানভাগের নাটকীয়তার দিক থেকে Joe Corrie-র "Hewers of coal," Norman McKinnel-এর "The Bishop's Candlesticks" Galsworthy-র "The Little man", David Scott Daniel-এর "The Queen and Mr. Shakespear", Maurice Baring-এর "The Rehearsal" চরিত্র প্রধান নাটক। বাংলাতে মদ্যধারার বিজ্ঞানগণ্য নাম করা যেতে পারে এই শ্রেণীর চরিত্র নাটক হিসাবে। গিরিশচন্দ্রের "বৃষকতু" ও "প্রজ্ঞাদ চরিত" চরিত্র-প্রধান একাঙ্কিকা। একাঙ্কিকাতে সাধারণতঃ একটিমাত্র চরিত্রই প্রধান। সুতরাং চরিত্রচিত্রণের কলা-কৌশলের উপর একাঙ্কিকার সাক্ষ্য পূর্ণবৃত্ত নাটকের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল। সৃষ্টি চরিত্র বাস্তবায়ন হওয়াই উচিত। সর্বগুণসম্বিত নায়ক ও সর্বদোষগুণ চরিত্র অতি প্রাকৃত নাটকের (Melodrama) বস্তু। চরিত্র-সৃষ্টিতে বখাসাধ্য বাস্তবতা ও মানবোচিত ভাব রক্ষা করাই সর্বতোভাবে অভিপ্রেত। John Hampden এই সম্পর্কে নাট্যকারকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, নাটকের অস্বাভাবিক নায়ককে আমেরিকান কথা বা Blood and Thunder Stories-এর অন্তর্ভুক্ত নাও। "Make your hero a human being in whom the audience will be interested."

সংলাপেই চরিত্রের প্রকাশ। Synge-এর মতে "In a good play every speech should be as fully flavoured as a nut or apple and such speeches cannot be written by anyone who works among people who have shut their lips on poetry."

Synge-এর "Riders to the Sea" বোধ হয় আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা। এই নাটকে নাট্যকার তাঁর সংলাপের তারা সংগ্রহ করেছেন সমুদ্র উপকূলের জেলে অথবা ডাবলিনের ভিগারিগীর গাথা থেকে। নীরস গজকে নাট্যকার তাঁর আপন প্রাতিভার রূপান্তরিত করেছেন কাব্যময় পদে। ভাবের অনবদ্য বাচন হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষা। পরিবেশ কল্পনার কাঠিনীর বৈচিত্র্য এবং কুশলতার, চরিত্ররূপায়ণের স্বচ্ছন্দতার কিংবা ভীষনের ভাবধর্মের বৈচিত্র্য "Riders to the Sea" আজও অপ্রতিদ্বন্দী। Frank Veran সংলাপের বাত্বকেই স্বীকার করে বলেছেন যে, "The primary magic of the theatre is the spoken

word." তবুও সংলাপ সম্পর্কে নাট্যকারকে এ কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে যে, সংলাপ চরিত্রবিকাশের শ্রেষ্ঠতম সহায় বটে, তবে সংলাপের মাধ্যমে চরিত্র বিশেষ পড়িষ্ট করে নাটক সৃষ্টি করা যায় না। সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘটমান চরিত্রবিকাশই নাটকের নির্দেশ।

পরিবেশ সৃষ্টিও (Local Colour) নাটকের শিল্পকর্মকে শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত করতে পারে। তার প্রমাণ আছে W. W. Jacobs-এর "The Monkey's Paw" নাটকে। Sergeant Major-এর চরিত্রে অভিলোকিক পরিবেশের শিহরণ এমনি ওভোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাতে নাটকের গতি ব্যাহত হওয়া ত দুবের কথা বরং রসধন ভাবটি বেন উপচে উঠেছে। Lady Gregory-র "The Rising of the Moon" অবিশিষ্ট চরিত্র-প্রধান নাটক, কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টির কুশলতার নাটকের প্রাণ নিহিত রয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আবার সামাজিক বা চরিত্রগত অসঙ্গতিকে যুগ্মবিজ্ঞপ বা লাইনায় দ্বারা হাস্যরসাত্মক সংস্থান সৃষ্টিতে Milne-এর "The Boy comes Home" অনবদ্য নাটকীয় স্রী লাভ করেছে।

একাঙ্কিকা নাটক ত বটে। তাই নাটক রচনার প্রচলিত ছকের বাহিরে সে পা দেয় নি। সেই পূর্বাভাব বিবৃতি—Galsworthy-র "The Little man," Clifford Bax-এর "The Poetasters" নাটকের পূর্বাভাবের অংশটি একাঙ্কিকার ধরনটিকে ভারী চমৎকার ভাবে পড়িষ্ট করেছে।

পূর্বাভাব বা পূর্ণ ইতিহাস বিবৃতির কৌশলটি এখানে এত স্বাভাবিক অথচ এমন চাতুর্ধ্যপূর্ণ যে বহনিকা সবে বাবার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিকগণের মন থেকে অজ্ঞাতাও দূর হয়। একাঙ্কিকা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলেই ঘটনার প্রবাহ বা growth of action-এর অবকাশ কম। Exposition এবং growth of action অর্থাৎ পূর্বাভাব এবং ঘটনাপ্রবাহ এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে একেব আলিঙ্গন থেকে অপরকে মুক্ত করা সম্ভব হয় না। তা না হউক, তাতে সূত্র শিল্পসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না এমন-কিছু।

এর পরেই কড়মুড় করে এসে পড়ে Climax বা পরিণতি। "The Allison's Lad" এবং Synge-এর "Riders to the Sea" নাটকে ক্ষুদ্র পরিণতিগুলি অনিবার্য গতিতে দুর্বীর বেগে নিয়ে এসেছে চরম পরিণতি। একাঙ্কিকাতেও একাঙ্কিক ক্ষুদ্র পরিণতির অবস্থান সম্ভব, কিন্তু তারাই শেষ নয়। তারা যিলিত হয়ে চরম পরিণতিকে চরমতম রূপ দেয় শেষ পর্যন্ত।

আবার প্রত্যাখ্যান (Denouncement) চরম পরিণতিকে এমন দ্রুত ভাবে অনুসরণ করে আসে যে, বহনিকা পতনের ঠিক আগের মুহূর্তটিকেই শুধু তার প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও নাটকের ঠিক এমনি পাঁচটি ভাগের উল্লেখ আছে। সেই পাঁচটি পর্বকে বলা হয় মুখ, প্রতিমুখ, মর্দ, বিমর্দ আর নির্বাহ।

একাঙ্কিকার প্রতিটি ভাবের অর্থবাহিনী ব্যাপক, স্থানীয় বহু বিস্তৃতির ইঙ্গিত। কবি Yeats একাঙ্কিকার সাক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন একটি কথার “Surprise...is what is necessary. Surprise and then more surprise and that is all.” Percival Wilde অবিজ্ঞি সংলাপের উপর জোর দিয়েছেন অনেকখানি। তাঁর মতে সংলাপ “creates atmosphere or reveals character or gives the illusion of real life.” Synge-এর অভিমত আগেই বলা হয়েছে বটে। তাঁর মতের আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি বলেছেন, “Like the other arts drama does not mere copy life; it selects and arranges the raw material which life provides, in order to recreate and interpret.” Chapin তাঁর সমালোচনার নাট্যরচনার প্রচলিত অমূল্যসনের গভীরে বদলাও করেন নি। সেই বিজ্ঞোহী মনোভাবের ছাপ রয়েছে তাঁর “Philosopher of Butter Biggins” নাটকে। কিন্তু Chapin ছিলেন জন্মপ্রতিভা—“A born dramatist who did not know how it was done but could do it”.

নাটক ঘটনাত্মক, দৃশ্যাত্মক—ভাবাত্মক নয়। কাজেই দৃশ্য-সকল চিত্রাবহার সৃষ্টি হতে পারে ঘটনাবিজ্ঞাস এমন পরিপাটি চরিত্র প্রয়োজন। Aristotle-এর ভাষায় “The poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities”.\* শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উদ্দেশ্য purposeless purpose অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে গোঁণ করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রসঙ্গকে সম্মুখে রেখে সামাজিকগণের মনকে প্রভাবিত করা। Ibsen-এর “The Dolls House” এই একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

একাঙ্কিকার রচনাশৈলী প্রসঙ্গে অনেকে ছোট গল্পের শিল্পরীতির অবতারণা করেন। সত্যিই, উভয়েই খণ্ডিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু উপজ্ঞাস আর পূর্ণাঙ্গ নাটকের শিল্পরীতি অনেকটা বিপরীত-ধর্মী। ছোট গল্প ও একাঙ্কিকার সেই মূলগত পার্থক্য বিজ্ঞান। উপজ্ঞাস পাঠ্য কাব্য, একাঙ্কিকা দৃশ্য কাব্য। ছোট গল্পের আবেদন মনঃপ্রসারী। দৃশ্যকাব্যের আবেদন প্রত্যক্ষ। নাটক হিসাবে একাঙ্কিকা বহুনিষ্ঠ বা তন্ময় (objective) এবং নৈর্ব্যক্তিক, উপজ্ঞাস বা ছোট গল্পে তন্ময়তাবেরই প্রাধান্য। নাটকের দৃশ্যপট সংযোজনায় নাটকের অনেক অকথিতবাহী মূর্তি হয়ে ওঠে; এমনকি অতি প্রাকৃত সংস্থানেও নাটকের ভাববস্তু এবং দৃশ্যপটের পরিবেশ প্রতিকলিত হয়। উপজ্ঞাস এই হিসেবে বর্ণনাময় হয়ে ওঠে।

বাংলা একাঙ্কিকা রচনার সংলাপেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু রচয়িতাদের এক কথা মনে রাখা উচিত যে, সংলাপই নাটক নয়, একাঙ্কিকা জীবনের কোন significant event বা idea-র বিশ্লেষণ বা বর্ণনা নয়, বিচার বা বিনির্দেশ নয়—উহা ঘটনাত্মক

দৃশ্যকাব্য—রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের তলে প্রদর্শন করাই উহার মূখ্য উদ্দেশ্য।

ইংরেজী সাহিত্যে অনেকগুলি একাঙ্কিকা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। Synge-এর “The Riders to the Sea”, Bennett-র “The Step Mother”, Galsworthy-এর “The Little Man”, Maurice Baring-এর “The Rehearsal”, Olive Conway-র “Becky Sharp”, Harold Brighouse-এর “The Price of Coal”, Bernard Gilbert-এর “The Old Bull”, Clifford Bax-এর “The Poetasters of is pahan”, Ferguson-এর “Cainbell of Kilmher”, Drinkwater-এর “X—O”, Chapin-এর “The Philosopher of Butter Biggins”, McKinnel-এর “The Bi-hop’s Candlesticks”, Lady Gregory-র “The Gaol Gate” Herman Ould-এর “Discovery”, Bernard Shaw-র “She Devil’s Disciple” J. M. Barrie-এর “Twelve Pound Look”, Masefield-এর “The Tragedy of Nan” Yeats-এর “The Land of Heart’s Desire”, Bottomley-র “Midsummer Elves”, Dunsany-র “The Golden Doom”, Houseman-এর “Little Plays of St. Francis” একাঙ্কিকা রচনার বিভিন্ন কল্যাণকালের এবং বিশিষ্ট শিল্পকর্মের অপূর্ণ নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যে মনঃপ্রসারী একাঙ্কিকা রচনার প্রাথমিক সৃষ্টি দাবি রাখেন। তা ছাড়া প্রবোধ মজুমদারের “গুণহারা”, বন-ফুলের “দশভান”, শিবরাম চক্রবর্তীর “চাঁকর তলে” ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের “নূতন তারা” উল্লেখযোগ্য রচনা। অবিজ্ঞি মনঃপ্রসারের “বিদ্যাংপর্য্য” এবং প্রবোধ মজুমদারের “গুণহারা” সার্থক সৃষ্টি। সম্প্রতিকালে প্রথম কর্তৃক ছয়খানি একাক নাটকের সঙ্কলন ছাড়াও আরও কয়েকখানি সঙ্কলন বাংলা একাঙ্কিকা রচনার প্রসায়ে যথেষ্ট উৎসাহের সৃচনা করেছে।

কথাপ্রসঙ্গে সেদিন নাট্যাচার্য্য শিখরকুমার ভাট্টজী মশায় ইংরেজী সাহিত্যের হ’ল একাঙ্কিকার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। Galsworthy-র “The Littleman” ছাড়াও আরও অনেকগুলি নাটকের অভিনয় তিনি দেখেছেন বাস ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ পথ্যারের শিল্পীগোষ্ঠীর অভিনয়। মকের কল্যাণকাল ও মঙ্গলজা হুই-ই ছিল মনোমুগ্ধকর। ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটকে মূগচিন্তের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন “Hewers of Coal” সেই সমস্তর জাতীয় রূপায়ণ এবং “The Littleman” তারই আত্মজাতিক ইঙ্গিত। আত্মকের ইংলণ্ডে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী দলগুলি একাঙ্কিকে প্রাধান্য না দিলেও ছাত্র এবং সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে একাঙ্কিকার সমাদর প্রচুর। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কিকার প্রচলনে অবিশি অহুবিধাও কম



নয়। নাট্যাচার্য্য নিজেও বখেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ পান নি বলে বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চ একাঙ্ক নাটকের পেশাদারী প্রচলন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয় বতামত দিতে পারেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বা অপেরা হাউসগুলি প্যারী মহা-নগরীতে যতখানি সমাদৃত হয় কলকাতার নাট্যজীবন তার তুলনায় অনেকখানি নীরব হ্রস্ব এবং স্থবির। প্যারীতে তবুও পরীক্ষা-

নিরীক্ষার প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একাঙ্ক নাটকের পেশাদারী চলন আজও খুব স্বচ্ছন্দ গতি এবং বিকৃতি লাভ করতে পায়ে নি। পেশা হিসাবে একাঙ্ককার প্রচলন সম্পর্কে তাই কোন স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করা এই মুহূর্ত্তে সম্ভব না হলেও একথা ঠিক যে একাঙ্ককার ভবিষ্যৎ অসামান্য—তা সে পেশাদারী এলাকার বাইরে হলেও।

## “জীবনদোলনা”

শ্রীমায়া বসু (রাহা)

কেটেছে অনেক বেলা,  
তবু কেন হয় শেষ হ'ল নাকে,  
মন দেয়া নেয়া খেলা !  
বাঁধিনি হিসাব কি যে পাই নাই,  
কাবে দিয়েছি কঁকি ;  
জীবন পাত্র পূর্ণ হয়নি  
রয়ে গেছে আরো বাকী।  
ক্ষুধিত হৃদয়ে পরম পিপাসা  
কতু মেটে নাকো হয়।  
জীবন হোলার ছলে ছলে মরি  
অলঙ্কিত হোলনার।

সে এক হোলনা দ্বিধাসম্ভর  
মোহ আর সংশয়  
সবে যেতে চাই—তার যুষ্টি হতে  
সে ত ছাড়িবার নয়।  
বাব বাব সে যে কাছে টেনে নেয়,  
ভাল বাসিবার ভাগে,  
কণকাল পরে কোথা ঠেলে দেয়,  
দূর হতে দূর পানে  
তবু কেন তারে পারিনি তুলিতে ?  
সে যে মোহময় ভুল ;  
জানি যবে যবে ফুটিবার শেষে,  
মোর মরশুমী ফুল।

তবু তারে নিয়ে নিজেবে ভোলাই,  
সাজাই কত না ছলে,  
আমার চিহ্ন রেখে যাই তার  
প্রতি হলে উপহলে  
তার পর যদি শুকায় সে ফুল  
যায় যদি থাক যাবে  
কণ সান্ত্বনা বহিব একাকী  
সারাটি জীবন ভরে।

ভুল কি শুধুই ভুল ? তার মাঝে  
কিছুই কি পাই নাই ?  
সে ভুলের ফুলে ভরেছে জীবন  
সে কথা ত ভুলি নাই।  
সেই পাওয়া মোর পরম প্রাপ্তি  
মনের গভীরে জানি  
চিরদিন ধরে জলে রবে তার  
অনিমিত্ত লিখাখানি।  
রবে নাকো কোন কঁকি  
ভুলের মধুতে পূর্ণ করেছি  
জীবনের মোঁচাক।



শেষ পরিপূর্ণতা

## জটীর জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১৪

কেন্দ্রাক্ষেত্র ।

এ জগতের কোন স্থান যেন নয় । অথবা গতিশীল জগতের পরিণত রূপ । গতির সমাধি অবস্থা । জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা যে মরণ তাইই অপূর্ণ রূপ যেন প্রত্যক্ষ করছি । শিবশঙ্করের অশ্বানচরী অভিধার তাৎপর্য এই প্রথম ক্ষণকাল হ'ল ।

পরম পবিত্র, চরম যোগের স্থান বলে যে অশ্বানের বন্দনা পান রচিত হয়েছে, এই বুঝি সেই অশ্বান । খানকরের ঘংবাড়ী পিছনে ফেলে মন্দিরের সামনে গিরে ঝাড়ালেই উদার, উন্মুক্ত কেন্দ্রাক্ষেত্রের বিস্তৃত রূপরীত্যায় উদাস গাভীর্বা মুহুর্তে মনকে অভিভূত করে । অত যে কঠিন পথের অত যে কঠোর পরিজ্ঞয়, এক নিমেষেই কোথায় গেল তা ? বিস্মৃতি নয়, মহামূল্য এক প্রাপ্তির উপলব্ধি । 'শ্রান্তপদে বস্তুসিক্ত বেশে' অবশেষে সত্য সত্যই শ্রান্তিহরা শান্তিলাভ করলাম ।

শ্রীতকালের তো কথাই নেই । একান্তিক্রমে ছয় মাস বন্ধ থাকবার পর বৈশাখ মাসে কেন্দ্রাক্ষেত্রের মন্দিরস্থার প্রথম স্বপ্ন উদ্ভূত করা হয় তখনও সর্বত্রই বরফ আর বরফ । কেন্দ্রাক্ষেত্রে তখন থাকে এক সর্বব্যাপী তীক্ষ্ণ শুষ্কতা—রক্তগিনি কেন্দ্রাক্ষেত্রের তখন যেন সমাধি অবস্থা । সে অপূর্ণপের দেখা পেলাম না

শরৎকালে । কাছাকাছি কোথাও এখন বরফের লেশমাত্রও নেই । তথাপি, অথবা বোধ করি সেই ভক্তই কেন্দ্রাক্ষেত্রের বিস্তৃত গাভীর্বা অত প্রশান্তি, অত চরিতার্থতার উপলব্ধি এনে দিল আমার মনে ।

কানী নাকি জগতের বাইরে । এ কালে কে মানবে সে কথা । অথচ কেন্দ্রাক্ষেত্রের স্বপ্নাতন এই মালভূমিটুকুকে আমার চেনা জগতেরই একটি অংশ বলে মানতেই চায় না মন । স্বপ্নের মন্ডাকিনী এই ভূমিটুকুকে চতুর্দিকেই হিমালয় পর্বতশ্রেণী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে একে স্বতন্ত্র এক সত্তা ও বিপুল গৌরব দিয়েছে ।

মন্ডাকিনীর ক্ষুটিকণ্ডল জলধার চরণের নৃপবের মতই কেন্দ্রাক্ষেত্রে বেটন করে রয়েছে । গর্জন আর নয় নৃপবেরই শিঞ্জন শুনি এখানে কেন্দ্রাক্ষেত্রের চরণাশ্রিতা মন্ডাকিনীর গতিছন্দে ।

সেই ত পাহাড়টই রয়েছে এই কেন্দ্রাক্ষেত্রেরও চারিদিকেই । উত্তরে বরফঢালা ঐ চূড়াগুলির কোন কোনটির উচ্চতা নাকি ২৪,০০০ ফুট । তবু বরফারার অমুভূতি এখানে একবারও মনে আসে না । এখান থেকে পাহাড়গুলি মনে হয় যেন অনেক দূরে । কেন্দ্রাক্ষেত্র মনে হয় যেন মুক্তভূমি । মুক্তিয সৌরভ এখানকার নির্মল বাতাসে । লঘু সেই বায়ু, লঘু হয়ে গিয়েছে যেন আমার নিজের বেহুও ।

ধরনী থেকে বিচ্ছিন্ন এই কেদারক্ষেত্রই তা হলে স্বর্গ !

তবে নন্দনকানন নয়, মহাতাপসের তপোভূমি। থা থা করছে মন্দিরের পিছন দিকটা। সেদিকে তাকালেই চোখের দৃষ্টি স্বতঃই স্থিতিত হয়ে আসে। বৈরাগ্যের উদাস সুর বেজে উঠে মনের বীণায়। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্ত নয়, নিবৃত্তি হয় এই বৈরাগীর স্বর্গে।

আশ্চর্য্য প্রতিসাম্য এই কেদারক্ষেত্রের গঠন ও অবস্থিতির—উত্তরে পর্বতমালায় বিরাট চালচিত্র ও দক্ষিণে প্রবেশপথের সঙ্গে কি বিস্ময়কর সঙ্গতি মুকুন্দার মন্দিরের মৌন নিমন্ত্রণের। বিশাল ভায়তের কোন কোণ থেকে অগণিত নরনারী শত-সহস্র বিভিন্ন পথ বেয়ে আসেন শ্রীকেশবনাথকে দর্শন করতে। হিমালয়ে যক্ষািনীর উপত্যকার প্রবেশ করবার পর কিন্তু একটাই মাত্র পথ তাঁদের সকলেই ভুলেই। আর কেদারের সেই বিকট শব্দের সমাপ্তি ঠিক কেদারনাথের এই মন্দিরের নিম্নতম সোপানে।

আশ্চর্য্য কল্পনার ততোধিক আশ্চর্য্য রূপায়ণ—সুদীর্ঘ ও সুকঠিন জীবনযাত্রায় বেন সার্থক সমাপ্তি মহামরণের বিগ্রহ শ্রীকেশবনাথকে আক্লিগ্ননেব তুহিন-নীতল পরিতৃপ্তিতে।

কোন মহাপুরুষের ধ্যাননেত্রে কেদারনাথের তীর্থস্বরূপ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, ইতিহাসের পাতায় তার অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাণ্ডুরা কেদারনাথকে বলেন স্বয়ং শিব। সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই, বিগ্রহ বলে যাকে এখানে পূজা করা হয় তা কোন গঠিত মূর্তি নয়, অজ্ঞাত বিপুলায়তন শিলাও নয় একথানা। কেদারনাথ ছোট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিলাময় পাহাড়—গঠন ও বিজ্ঞাসের বিস্ময়কর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে ষাংগেরালী প্রকৃতির অজ্ঞতম একটি সাধারণ সৃষ্টি। তবে মানুষের চোখে চমক লাগার মত, মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার মতই বিচিত্র ঐ গঠন ও বিজ্ঞাস। হয়ত সেইজন্তই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐ বিস্ময়কর আকস্মিক সৃষ্টি কোন আদিম মানবের চোখে অলৌকিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল, তার অন্তরে স্বীকৃত হয়েছিল ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বলে।

অনুমান করি যে, ইতিহাসপূর্ব যুগ থেকেই তুষারক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী এই প্রস্তর-দেবতা হিমালয়বাসী ও হিমালয়প্রবাসী নরনারীর কাছে পূজা পেয়ে আসছেন। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে সেই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই পুরাণে কেদারনাথের অত প্রশস্তি কীর্তিত হয়েচে। বৌদ্ধ যুগেও জান হয় নি কেদারনাথের মহিমা। হিন্দুর দেবতা তাঁর বিশিষ্ট অবস্থিতির জ্ঞাত ধার্মিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কি না কে জানে! বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে না হউক, বৌদ্ধের কাছে অত বাহ্যিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কি না কে জানে! বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে না হউক, বৌদ্ধের কাছে অত বাহ্যিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কি না কে জানে! বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে না হউক, বৌদ্ধের কাছে অত বাহ্যিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কি না কে জানে! বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে না হউক, বৌদ্ধের কাছে অত বাহ্যিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কি না কে জানে!

নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ আছে এ রকম ব্যাখ্যার বৌদ্ধিকতা

সম্বন্ধে। তবে কেউ প্রতিবাদ করবেন না যদি বলা হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের জীবদ্দশায় (৭৮৮-৮২০ খ্রিঃ?) বিপুল গৌরব ছিল এই দুর্গম কেদারতীর্থে। হয়ত সেই সঙ্গে কিছু অখ্যাতিও তার ছিল অজ্ঞতম বৌদ্ধতীর্থ অথবা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট হিন্দুতীর্থ হিসাবে। সন্দেহ নেই যে, ঐ রকম খ্যাতি বা অখ্যাতির টানে শিষ্য শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অন্ততঃ একবার কেদারক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। সেই পদার্থপূর্ণ তত্ত্ব মুহূর্তেই বর্তমান কেদারতীর্থের জন্ম।

ইংরেজীতে বলা হয় যে, মানুষের কল্পনার আশ্রয় লাগে। ঐ রূপকের সার্থক প্রয়োগ হবে শঙ্করাচার্য্য ও কেদারনাথের মিলন সম্পর্কে। কল্পনা ছিল শঙ্করাচার্য্যের—অত বড় করি ক'জন জন্মেছেন এ জগতে? তার এই কেদারনাথ নিঃসংশয়ে অগ্নি-কুলঙ্গ। উভয়ের সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে কেদারতীর্থ নামক কঠিন প্রস্তরভূমিতে বরকের অক্ষরে লেখা বর্তমান যুগের অতুলনীয় মহাকাব্য।

বলা হয় 'শঙ্করো শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'—শঙ্করাচার্য্যই সাক্ষাৎ শিব। সেই জ্ঞানযোগীর নিবিড়তম উপলব্ধি—চিদানন্দরূপঃ শিবোহং। তাঁর শিব সচ্চিদেকং ব্রহ্ম—মহাবোগী, নির্বিকার পুরুষ। প্রচলিত হিন্দুধর্মের উমা-মহেশ্বরকে অমুঠান হিসাবে বন্দনা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর ধ্যানের দেবতাকে খুঁজে পাননি তিনি কোন যুগলমূর্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর বা লিঙ্গ-বিগ্রহের মধ্যে। অনুমান করি যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, অদ্বৈতবাদী সিদ্ধপুরুষ সেই শঙ্করাচার্য্য ক্ষুদ্রচিত্তে সারা ভারত ভ্রমণ করবার পর এই কেদারক্ষেত্রে এসেই প্রথমে ভূজিত ও পরক্ষণেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, বোধ করি কেদার পাহাড়ের এই শিলাময় একক কোণের স্বয়ংরূপে মথোই তিনি তাঁর ধ্যানের সার্থক প্রতীক প্রত্যক্ষ করে কেদারক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ হিন্দু্য শ্রেষ্ঠতম তীর্থের মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের সব-চাওয়া ও সব-পাওয়ার শেষ হয় এই কেদারক্ষেত্রে। এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি। তাঁর সমাধিও হয়েছে এখানে—দেহজ্ঞানমুক্ত বোগীর উপযুক্ত অনাড়ম্বর নিয়লঙ্কার সমাধি।

মহাজ্ঞানী, মহাবোগী শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত জ্ঞান ও সকল স্বপ্ন বেন রূপায়িত হয়ে আছে এই কেদারক্ষেত্রে—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

অরূপের রূপ! দেখে আর তৃপ্তি হয় না চোখের।

জিতেনকে মোটেই খুঁজতে হয় নি। সে যে স্থানীয় থানায় জয়ানারের সঙ্গে গল্প করছিল তা হয়ত নিছক সময় কাটাবার জন্তই, আসলে আবারই পথ চেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমি পুল পায় হয়ে উপরে এসে উঠতেই তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। রূপ বা হয়েছে তার তা কি আর বলব! তবু তাকে দেখেই ভক্তি

নিঃশাস কেললাম আমি—বাক, তেমন কোন বিপদ ঘটে নি তা হলে।

তারই মুখে শুনলাম যে কষ্ট বা তার হয়েছিল তা ঐ পথেই। এখানে আসবার পর থেকে একরকম জামাই আগরেই আছে সে। জিতেনের পূর্বেই পাণ্ডা মহাদেবপ্রসাদের চিঠি এসে পৌঁছেছিল তার স্থানীয় গোমস্তা সত্যনারায়ণের হাতে। স্মৃত্যায় নিজের নাম প্রকাশ করে বলতে না বলতেই প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছুই পেয়েছে জিতেন—খাতা ও শয্যা ত বটেই, তার উপরে আবার গরম জল ও লোহায় কড়াতে গনগনে আগুন।

অবিশ্বাস করতে পারি নে, কেন না আমার জন্মও ঐ দিনের বেলাতেই দেখি লেপ-কঞ্চল এল; নীচের দোকান থেকে উপরে শোবার ঘরে এল গরম চা; খবর এল যে নীচে আমার স্নানের জন্ম গরম জলও প্রস্তুত হয়ে আছে।

আরও অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ আয়োজন—আমার দাঁত নেই জেনে একা আমারই জন্ম বিচুরি বাধা হয়েছে।

ডাল-ভাত বা বিচুরি বাধবার প্রথা নেই এখানে, কারণ কাঠ এখানে হস্তাশ্রয় এবং জল বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘি গুলিয়ে পুরি ভাজতে কাঠ ও সময় কম লাগে বলে সব বাড়ীই এখানে পুরি ও হালুয়া খায়। আমার জন্ম হু'ল্টাক সন্ন চাউল ও হু'ল্টাক কাঁচা মুগডালের বিচুরি বাধতে হালুইকরের উন্নতের আগুনেও ঝাড়া হু'ল্টা লেগে গেল। তবু খেতে বসে দেখি যে চাউল যেমন-তেমন ডাল একটিও সিদ্ধ হয় নি। তবু কৃতজ্ঞচিত্তে এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সেই বিচুরি আমি খেলাম সত্যনারায়ণের উন্নতের ধারে বসেই।

ইতিমধ্যে চক্রবর্তী ঐ দোকানে এসে আমারই মত উন্নতের ধারে জেকে বসেছিল। কি সে দেখলে আমার মুখের ভাবে, তা সেই জানে, তবে আমার পাণ্ডুর শেব হবার পর সে মুচকি হেসে বললে, অয় বোলিয়ে তো বাবুজী, হয়লোগ ক্যা আপলোগোঁকে লিয়ে কুহ নহী করতে হৈ ?

তার প্রশ্নের গূঢ় অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝতে না পেরে আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে মাথা হুলিয়ে হুলিয়ে আবার বললে, মনে করে দেখুন, বাবুজী, আপনারাও বলেছেন। আমাকে দেখে কি বিরক্তই না হয়েছিলেন আপনিও ? কুণ্ডলিতে একবার আপনাদের ঘর থেকে আমাকে ত হু'ল্টাক করে তাড়িয়েই দিচ্ছেছিলেন আপনায় ঐ মাঝী।

সহাস্ত মুখ চক্রবর্তীর, কঠিন তত্ত্বতা একেবারেই নেই। হয় তার অভিযোগের বলেও মনে হয় না। কিন্তু কথাটা ত তার মিথ্যা নয়। সত্য বলেই ওটা খোঁচার মত গিরে বিধল আমার মনে। লজ্জিত হয়ে বললাম, না ঠাকুর, তাড়িয়ে কেন দেব ? আমার ত ক্রিয়াকর্ম তেমন করি নে—তাই বলেছিলাম তোমাকে।

ও একই হ'ল,—বলতে বলতে হাসি বেন আরও ছড়িয়ে পড়ল চক্রবর্তীর সাধা মুখে : পাণ্ডাকে বাতে দক্ষিণা না দিতে হয় সেই

জন্মই ত ক্রিয়াকর্ম এড়িয়ে চলা। তা কত নি-ই আয়রা ? আর নিলেও কিছু কিছু সেবাও ত আয়রা করি। পথ দেখিয়ে আনাটা কি সোজা কাজ ? তা ছাড়াও ভাবুন ত একবার—আমার কাকা এখানে এই বাড়ীনিবাস যদি তৈরি করে না রাখতেন তবে এই বরফের দেশে এসে থাকতেন কোথায় আপনারা ?

অন্ত আশ্রয়ও আছে। কিন্তু সে কথা আমার মুখে এল না। হোটেলের আরামে আছি মহাদেব প্রসাদের বাড়ীনিবাসে যার জন্ম একটি পরসাদ দিতে হয় না। ঐ চক্রবর্তীর কাছেও কম সাহায্য আয়রা পাই নি পথে আসতে আসতে। সত্যই শ্রমের বোঝা তখন ভারী হয়ে উঠেছে আমার মনে। স্মৃত্যায় খোঁচা খেয়েও কুণ্ডলিত হয়ে বললাম, আর লজ্জা দিও না ঠাকুর। সত্যই তোমরা আমাদের অনেক উপকার করেছ। এ সব কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমার ও কথা শুনে উন্নত না হয়ে বেন বিমবদী হল চক্রবর্তীর মুখ। সেই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে মাথাটা হুলিয়ে হুলিয়ে সে বললে, কিন্তু আর চলবে না বাবুজী। বজ্রমানেবা সে কালে যেটা যেটা দক্ষিণা কাকাকে দিত বলেই এমন সব আয়োজন করতে পেরেছিলেন তিনি। সে সবই ত একালে উঠে গেল। এখন সবাই পাণ্ডার পিছনে লেগেছে—বেমন বাড়ীরা, তেমনি পবর্ষমেন্টও।

অনেক অভিমান ও অভিযোগ জমে আছে চক্রবর্তীর মনে। কারণ আছে বই কি ! একটু আগে নিজেই দেখে এসেছি আমি। কেনারনাথের মন্দিরে পাণ্ডা-পুরোহিতের প্রতাপ আর নেই—হাজার বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব্ব করা হয়েছে। পূজার উপকরণের নিয়ন্ত্রণ মূল্য ও দক্ষিণার পরিমাণ আজকাল নির্দিষ্ট। কেনারনাথের উদ্দেশ্যে বাড়ী বা উৎসর্গ করবে তা টাকা-পরসাদি হোক, আর সোনাধানাই হোক ফেলতে হবে সীলমোহর-করা বাস্তব মধ্যে। দাবিদাওরা আজকাল একেবারেই নেই। নিজেরই অভিজ্ঞতা আমার। পুরী, পরা বা মথুরা-বৃন্দাবনের তুলনায় কেনারনাথ মনে হয় বেন পাণ্ডাবর্জিত তীর্থ।

কেনার-বদরীনাথের মন্দিরে এ সব সংস্কারসাধিত হয়েছে অল্প কিছুদিন পূর্বে—পুনর্গঠিত মন্দির কমিটির চেষ্টায়। কমিটির কালোপযোগী পুনর্গঠন হয়েছে শিক্ষিত জনমতের চাপে। বাড়ীর উপর জোয়জুলুম যাতে না হয়, দেবতার ভোগ বা দক্ষিণা যাতে তাঁর মনুষ্যপার্থক্যের পেটে না যেতে পারে, ক্রমবর্ধমান দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্ধৃত্ত আর যাতে বাড়ীর কল্যাণমূলক কর্মে ব্যয় হয়, তারই জন্ম নানাবকম নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু কমিটি বোঝে না চক্রবর্তী। সে চেনে কেবল পবর্ষমেন্টকে। অজ্ঞ বেমন, দেবমন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রেও তেমনি তার কল্পিত ধর্মজ্ঞানহীন ষেজাচারী ও মহাপরাক্রান্ত এক পবর্ষমেন্টের দ্বারা হস্তাবেলপন চোখে পড়ে তার। হাজারকমের বিধি-নিষেধে

বেড়া তুলে সরকার পাণ্ডার অধিকার বর্ধন করেছে বলে ভীষ্ম অভিযোগ তার সরকারের বিরুদ্ধে।

তবু লড়াই করছি আমরা, একটু বেশ পক্ষের হয়েই আমাদের বললে চক্রবর্তী : কটির লড়াই আমাদের। আমরা সরকারকে বললাম, হয় আমাদের সকলকে চাকরি দাও, নয় ত পূর্ব-পুরুষের বৃত্তি চালাতে দাও আমাদের। শেষে আধাআধি বন্ধ। গবর্ণমেন্ট হান্দিয়ের উপর দখল নিয়েছে, আমাদের হাতে রয়েছে 'স্কল' দেবার অধিকার।

পরে কেনার থেকে বিদ্যায়ের প্রাকালে দেশেভিলাম স্কলদানের প্রক্রিয়া। তীর্থের কল নাকি দেবতার ভাণ্ডারে নেই; তা থাকে তীর্থগুরু পাণ্ডার এজিয়ারে। পাণ্ডা স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়ে মুখস্থে না বললে রাজী সে কল পেতে পারে না।

অজুত সেই স্কলদানের প্রক্রিয়া। ফুল, চন্দন এবং আরও কি কি বেশ খালার সাজিয়ে নিয়ে এল চক্রবর্তী। তার মধ্যে বা চোখে পড়বার মত তা বেশ মোটা কস্তুরের মালা একগাছা। সেই মালা দিয়ে আমার হ' হাত ভড়িয়ে বেঁধে চিবাচরিত পদ্ধতিতেই পরিচিত ছন্দের মন্ত্র পড়তে শুরু করেছিল সে—'উত্তরাংশে কেদারক্ষেত্রে...' ইত্যাদি। কিন্তু ষানিকটা এগিয়েই একেবারে ধেয়ে গেল চক্রবর্তী। চলতি পাড়ী অকস্মাৎ ব্রেটক কবে খামিয়ে দেওয়া আর কি। কলে পাড়ীর মধ্যে নিশ্চিন্ত আবেগীয় বে অবস্থা হয় আমারও তাই।

মন্ত্রের মোটা অর্থ হল তীর্থগুরু পাণ্ডার কাছে রাজী একটি জিজ্ঞাসা, আমার ক্রিয়াকর্ম সব নির্দোষ হয়েছে ত? সেই সঙ্গে একটি প্রার্থনাও—হে তীর্থগুরু, আমার তীর্থকল দাও। কিন্তু সেই কলের জন্তই মূল্য নিতে হয় পাণ্ডাকে—তার দক্ষিণা। সেই দক্ষিণার পরিমাণ রাজীকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়াই হ'ল ঐ বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

হুটিহাতই কস্তুরের মালা দিয়ে বাঁধা। দক্ষিণার পরিমাণ শুনে সন্তুষ্ট না হলে পাণ্ডা সে বন্ধন খুলে দেবে না—'স্কল' দান ত হুয়ের কথা। জোর করলে ছিড়ে কেলা বার না তেরন শক্ত নিশ্চরই নয় সেই কস্তুরের মালা। কিন্তু ঐ বন্ধন পরবার জন্ত পাণ্ডার দিকে নিজের হাত হু'খানি এগিয়ে দেবার তরুসতা বার আছে সে জোর করে ঐ মালা বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি কোথায় পাবে? হাত হুখানা বন্ধনমুক্ত হলেও পাণ্ডার কাছে ঋণমুক্তি হবে না অবশ্য রাজী। আর পাণ্ডা তার নিজস্ব 'স্কল' দান না করলে বার্থ হ'ল রাজীর তীর্থযাত্রা।

নিশ্চরই রাজীর উপর জুগুপ্স হতে পারে ঐ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। নয় কবাকবি নিশ্চরই হয়। তবে আমাদের বেলায় কিছুই হ'ল না।

হাতবাঁধা অবস্থায় মন্ত্রের গুঢ় অর্থ সবকিছু অকস্মাৎ সচেতন হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, চক্রবর্তী আমার মুখের দিকে চেরে ঘিটি

ঘিটি হাসছে। ও হাসি বুঝি সংক্রামক। হেসে ফেললাম আমিও। বললাম, বুকেসুকে তুমিই বল ঠাকুর—কত নিতে হবে?

হাসি খামিরে কেনন বেশ কক্ষণকণ্ঠে বললে চক্রবর্তী : বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করি বাবুজী। আর কতদূর থেকে হেঁটে এসেছি তাও ত নিজের চোখেই দেখেছেন আপনারা। পাঁচ-পাঁচটি টাকা দিন।

এ ছেন অমুনরকে জুগুপ্স হুয়ে থাক, দাবিই বা বলব কোন হিসাবে? আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলার। 'স্কলও' পেলাম সঙ্গে সঙ্গে—হ'লনের কাছে মোট দশটি টাকা পেয়েই চক্রবর্তীর মুখ দেখি খুসীতে ঝলমল করছে।

কিন্তু ওটা তত্নৈর দিনের ঘটনা। আমার কেনার প্রবাসের প্রথম দিনে সত্যানারায়ণের দোকানে বসে চক্রবর্তী 'গবর্ণমেন্টের' সঙ্গে পাণ্ডাসমাজের লড়াই ও শেষ পর্যন্ত আপোষ-বন্ধার কাহিনী আমাকে শুনিতে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, বলুন বাবুজী আপনিই বলুন—কি দোষ হয়েছে আমাদের? সাত পুরুষের বৃত্তি পেলে কি করে চলবে আমাদের?

ইতিপূর্বে পাণ্ডা-পুণ্ডারিতের পরগাছা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমি নিজেও ক্ষুব্ধতার কত বৃত্তিই না প্রয়োগ করেছি। কিন্তু সেদিন চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার একটিরও পুনরাবৃত্তি করতে পারলাম না আমি। বরং তখনই আমার মনে পড়ে গেল কটির, মানে জীবিকার জন্ত লড়াইয়ের আরও শত শত হুঁচক। সে লড়াই ত সকলেই করে আজকাল—কুলি-মজুরের মত তাঁতি-কুমোয় এবং কেরানী-শিক্ষক-সাংবাদিকেরাও। আজকাল কেবল বেতন বৃদ্ধির জন্তই ধর্মঘট ইত্যাদি শাণিত অজ্ঞের প্রয়োগ হয় না, চাকরি বজায় রাখবার জন্তও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম চলছে। কাজ না থাকলেও আপিস বা কারখানা ঢালু বাধতে হবে—এই দাবি নিয়ে কত আন্দোলনকেই ত সার্থক হতে দেখেছি। ঠিক সেই দাবিই চক্রবর্তী ও তার পাণ্ডাসমাজের। এরা পরজন্মজীবী হলেও দাবি তাদের বেঁচে থাকবার দাবি। তাকে আমি অসঙ্গত বলব কোন হিসাবে?

চূপ করেই ছিলাম। তথাপি চক্রবর্তীর উৎসাহে ভাটাই পড়ল দেখলাম। 'গবর্ণমেন্টের' বিরুদ্ধে বলতে বলতে উত্তেজনার লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। কিন্তু এখন দেখি সন্দ্বিষ্ট হুঁটি তার চোখ হুটিতে—বেন আমাদেরও সে তার প্রতিপক্ষ মনে করছে। কিন্তু একটু পরে সে ভাবটাও তার কেটে গেল, বিব্রততার দ্বন্দ্ব দ্বারা নেমে এল তার সন্দ্বিষ্ট চোখে। সে বললে, তবে, বাবুজী, গবর্ণমেন্টকে কত আর হুযব? যাকে যাকে মনে হয় বুঝি কেনারনাথজীই বিমুখ হয়েছেন আমাদের প্রতি। রাজীরাই ক্রিয়াকর্ম করতে চায় না এখন, 'স্কল' না পেলেও পরোয়া করে না। পথঘাট ভাল হবার পর রাজী ত কেনারে আসছে আগের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাণ্ডাকে কাছেও যেতে দেয় না—বলে যে কেবল দেখতেই এসেছে তাহা। পূজা করতে নয়।

একটু খেমে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিভাগ করে সে আবার বললে, পনর-বিশ বৎসর আগের এমন ছিল না বাবুজী। তখন কেদারের পাগুকে কেদারনাথজীর মতই ভক্তি করত বাজীরা, আর বাজীলীদের ভক্তি ছিল তখন সব চেয়ে বেশী।

উদাহরণ দিল চক্রবর্তী তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। তার বালাকালে সে তার পিতার সঙ্গে প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলা দেশে গিয়েছে বাজী সংগ্রহ করতে। সেখানে বজ্রমানের বাড়ীতে কেবল আতিথা নয়, পুণাই পেয়েছেন তার পিতা। স্পষ্ট মনে আছে চক্রবর্তীর যে, সেকালে ভক্তিমতী গৃহিণীরা নিজের হাতে পাণ্ডার চরণ প্রক্ষালন করে ভক্তিভাবে পাদোদক পান করতেন।

মনে আছে আমারও। আমার বালাকালে আমিও দেখেছি দেবতাজ্ঞানে গুরু পুরোহিতের পাদোদক পান করার দৃশ্য। স্তব্ধ চক্রবর্তীর মনের বেদনা বেশ অনুমান করতে পারলাম আমি। পাণ্ডা-পুরোহিতের সম্মান ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ প্রত্যক্ষ করেছে সে। স্তব্ধ বর্তমান লৌহযুগে প্রাচীন পদ্ধতিতে জীবন সংগ্রাম চালাতে গিয়ে পদে পদে পরাজয়ের বে দুঃখ ও গ্লানি তাকে পরিপাক করতে চলে তাকে অতীতের সেই স্বর্ণযুগের জন্ত মাঝে মাঝে সে কি দীর্ঘশ্বাস না কেলে পারে?

মন্দাকিনী কি টানেই যে টানছেন আমাকে—কোন বাধাই বাধা মনে হয় না। ১১.৭৫০ ফুট উচু এই কেদারক্ষেত্র। যে হোদটুকু ঊর্দ্ধে ছিল তাও নিভে গেল। স্থানীয় প্রত্যেকটি লোককেই দেখেছি কান-মাথা ঢেকে উল্লুনের ধারে বসে আশ্রয় পোষাতে। তবু আমি সত্যনারায়ণের দেওয়া হাতের কাছের গরম জল পারে ঠেলে শ'খানেক ফুট নীচে মন্দাকিনীর জলেই স্নান করতে গেলাম।

এখানে মোটেই ভয়ঙ্করী নয় মন্দাকিনী। প্রোত থাকলেও তরঙ্গ নেই, গভীরতা থাকলেও তেমন প্রহ নেই, গর্জন একটু থাকলেও কুটিল অংক একেবারেই নেই। কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল। বরফের মত জল নয়, এ বেন নির্জলা বরফ। কারণ স্পষ্ট। অত শীতেও বাজীর আশার ঘাটে যে পুরোহিত বসে ছিল সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমার নৈরিং দিল বাক সে বলে মন্দাকিনীর গঙ্গোত্রী, মানে উৎস। তা কেদারক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে বরফ ঢাকা একটি পর্বতশিখর। মনে হয় যে, মিনিট পনর লাগবে দেখানে হেঁটে যেতে। সেই বরফ গলেই ঘাটের এই জল হয়েছে। আঙ্গুল সে জলে ডোবালেই বেন অসাড় হয়ে যায়।

তবু সেই জলেই আমি স্নান করলাম আমার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে। অপরিষেয় পরিভুক্তি তাতে। সেই সঙ্গে গর্জও বোধ করছি—আর কিছু না হটক শীতকেও ভয় করেছি আমি।

কিন্তু পথকণ্ঠেই দর্পচূর্ণ। স্নানের পর প্রথম জামা-কাপড় বত সঙ্গে ছিল সব গারে চাপিয়েও নিষ্কার নেই। শীত আর বায় না। চুটে গিয়ে বললাম সত্যনারায়ণের উল্লুনের ধারে।

‘একা নামে বন্ধা নাই স্ত্রীর দোসর।’ একে ত প্রায় বায় হাজার ফুট উচু পাহাড়ের স্বাভাবিক শীত। তার সঙ্গে আবার বৃষ্টি। হাঁটাচলায় উপাধই নেই। সাঝাটা দিন আমার কাটল সেই উল্লুনের ধারে। রাতে ছ’খানা লেপ গারে দিয়েও ঘুমের জন্ত সে কি সাধা-সাধনা আমাদের।

কিন্তু পথদিন অটল ক্ষতিপূরণ।

পূর্বমুখে ঘর, পূর্বদিকেই জানালা। ভোরবেলার সেই জানালা গোলবাঘ পর নিজের চোখ টাটকেই বেন আর বিশ্বাস হয় না।

বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সাদা চূড়াগুলি আজ দেখি লালে লাল। কে বেন রাশি রাশি আঁধার মাথিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটি পাহাড়ের মাথার। স্তম্ভীকৃত সেই আঁধার-পাহাড় আর আকাশের মাঝখানের সবটা কাকই ভরে দিয়েছে।

ঘরে বসেই একটু পরে দেখলাম প্রকাণ্ড একখানি সোনার খালার মত সূর্য্য পাহাড় ডিঙির লাক্ষ্মিরে উঠে এল আমাদের দিকে।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দেখি যে কালকের দেখা ভয়ঙ্কর কেদারনাথ বেন এইমাত্র সোনার জলে স্নান করে উঠে এসেছেন। সোনালী জল ঝরে ঝরে পড়ছে তার অমল ধবল সিন্ধু দেহ থেকে।

সোনা বলমলে ঝবঝবে প্রভাত। বিবাসই হয় না যে, কাল বৃষ্টি মাথায় করে এই আয়গাটাতেই এসে উঠেছিলাম অথবা কাল যে অত বৃষ্টি হয়েছিল এখানে। আজ বৃষ্টি ত নেই-ই, এক ফোঁটা যেবও কোথাও নেই। নেই কুয়াশার সামান্য আভাসও। বায় হাজার ফুট উচুতে বায়ুয়ালে ধূল-বালি ত থাকতেই পারে না। বদিও বা কিছু ছিল তাও কালকের বৃষ্টিতে ধুয়ে নিষ্কিঙ্ক হয়েছে। স্তব্ধ শরতের সোনার বোদ আজ স্বরূপে ও সর্গোরবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ত বঙ্গদেশ নয়, স্রামল অঙ্গও নয় কেদার পাহাড়ের। কিন্তু সেই পাহাড়ই নিঃসংশয় ‘বলিছে অমল শোভাতে’। সেই সোনালী বোদে উচ্চাসিত হয়ে নীল আকাশ হয়েছে আরও নীল, উত্তরে সেই নীল ছোঁরা পর্বতশ্রেণীর শিখরে শুভ্র বরফ বেন আরও বেশী শুভ্র। কেদার পাহাড়ের স্বাভাবিক শিজলবর্ণও তরুণ সূর্য্যের সূর্য্য কিরণ সম্পাতে উজ্জলতর হয়েছে।

ঘরের মধ্যে কাঁপছিলাম, কিন্তু প্রাঙ্গণে নেমে আসবার পর তেমন শীত আর লাগে না।

এই লীলাই কেদারনাথজীর। নিজে উঠে এসে চারের গ্লাসটি আমার হাতে দিয়ে বললে সত্যনারায়ণ : বৃষ্টি হ’ল ত বৃষ্টিই, আবার বোদ হ’ল ত বেশ বোদ। তবে আজকের মত এত উজ্জল বোদ বড় একটা দেখা যায় না। আজ বৃষ্টি বিশেষ করে আপনাকেই আশীর্বাদ করছেন কেদারনাথজী। বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল সে।

কিন্তু জ্বিতেন দেখি আজও গভীর। উৎক্লেশ নয়, অস্থির সে।° দেখে একটু বিবস্ত্র হয়েই আমি বললাম, ব্যাপার কি জ্বিতেন?

কেদারনাথকী অত টানছিলেন তোমাকে, তবে এখানে এসেও এমন গোমড়া-মুখ কেন তোমার? এখন ত আমার মত বুড়োমানুষেরও নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তুনে কিন্তু শুকনো মতন একটু হেসে উত্তর দিল জিতেন : আমার, মনিলা, আরও একটু বেশী। ঐ বরফের চুড়ায় উঠবার ইচ্ছা আমার।

ইচ্ছা যে আমারও হয় না তা নয়। কিন্তু আমি জানি যে, তা অসাধ্য। শুভ্রাং মুচকি হেসে আমি বললাম, ও সাধটা আগামী জন্মের জন্য তোস! থাক। আপাততঃ আর একটু বং নীচেই বাওয়া থাক। চল, মন্ডাকিনীতে স্নান করে আসি।

কিন্তু তাকে রাজী নয় জিতেন। বরফ তাকে টানে, কিন্তু শীতকে তার ভয়। গায়ে জমা থুসতে হবে বলে গত কাল পর্যন্ত জলেও স্নান করে নি সে। অজ্ঞ ও আমার প্রস্তাব সে হেসে উড়িয়ে দিল।

( ১৫ )

প্রথমে চিনতেই পারি নি। এখন চিনতে পারলাম তখন মনে হয় বৃষ্টি দৃষ্টিভিন্ন আমার।

কি করে চিনব। কুলির পিঠে কাণ্ডিতে বিনি বসে আছেন তাঁর ত মুখই দেখা যায় না। আর সালোয়ার, কোট-টুপীপরা বেঁটে মতন যে মানুষটি ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে অবলীলাক্রমে অবতরণ করলেন, দু'থেকে কেমন করে আমি বুঝব যে তিনিই গঙ্গোত্রী।

কিন্তু গঙ্গোত্রী ঠিক চিনতে পেরেছেন আমাকে। পুল পার হয়ে আমার কাছে এসে সহাস্র মুখে সব সস্তাবণ তাঁর। তার পর উক্তর পক্ষেই সে কি আনন্দ!

সলজ্জ কৈকিয়তের সুর গঙ্গোত্রীর। সে কৈকিয়ৎ ঘোড়াটিকে জড়িয়ে, কেননা গঙ্গোত্রীর যে রথসাজের উপর বার বার আমার চোখ গিয়ে পড়ছে, তার প্রয়োজন ত হয়েছে ঐ ঘোড়ার চড়বাক জন্তই।

এবার বাহ্যের জন্তই এত দেরি হয়েছে তাঁদের। একটু ত আর উঠেছিল আমরা গোবীকুণ্ডে উপস্থিত থাকতেই। এখন পর্যন্ত সে জয়ের সম্পূর্ণ বিবাহ হয় নি। হাঁটবার শক্তি নেই বুদ্ধার। তাঁকে হাঁটতে দেবার ইচ্ছাও নেই গঙ্গোত্রীর। কিন্তু কেদারের অত কাছে আসবার পর দর্শন না করে কিরে ত বেতে পারেন না তাঁরা। তাই বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। দ্রুতগতিতে এসে দ্রুত-গতিতেই ফিরে যেতে হবে বলে দু'জনেই তাঁরা বাহন নিয়েছেন।

কৈকিয়ৎ দিতে দিতেই বাহাদুরের সঙ্গে করেকবার সহাস্র চোখোচোখি হয়েছে গঙ্গোত্রীর। কৈকিয়ৎ শেষ করেই আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হুম্যানটি দেখছি আপনার সঙ্গেই রয়েছে। তবে লজ্জমণ ভাইয়াকে দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

হেসে উত্তর দিলাম আমি : লজ্জণের যেমন স্বভাব। জানকী আমার সঙ্গে নেই বলেই তা কি বলতে পারে? আমার লজ্জ

ভাই কুটির পাহারা দিচ্ছে। সেখানে গেলেই তাকে দেখতে পাবে তুমি।

কিন্তু গঙ্গোত্রীরা আমার পাণ্ডার বাড়ীতে বা ধর্মশালার উঠবেন না। তাঁদের পরিচিত এক ভক্তলোক আছেন এখানে—সরকারী পোষ্ট-অফিসে বেতার-বার্তা বিভাগে কাজ করেন তিনি। তাঁর বাসাতেই গিয়ে উঠবেন তাঁরা।

আমি অগত্যা বাহাদুরকে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম বাসাটা চিনে আসবে। উদ্দেশ্য, আমি জিতেনকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে যাব।

কিন্তু কোথায় জিতেন? সে প্রশ্নে নেই, ঘরে নেই, এ তলাটে কোথাও তাঁকে দেখা গেল না। অগত্যা একাই আমি গেলাম যে বাড়ীতে গঙ্গোত্রীরা গিয়ে উঠেছেন।

গঙ্গোত্রী তাঁর জননীকে নিয়ে তখন ঢুকলেন গিয়ে স্নানঘর ঘরে। ওটি বার বাসা তিনিই সমাদর করে বসালেন আমাকে। শিক্ষিত ভক্তলোক তিনি। বয়স বেশী নয়। অমায়িক, মধুর ব্যবহার তাঁর। মাস পাঁচেক বাবং এখানে আছেন। অনেক খবর জানেন তিনি। তাঁরই মুখে কিছু কিছু শুনলাম এই কেদারক্ষেত্র ও তার পারিপার্শ্বিকের বিবরণ।

পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত নীচু যে পাহাড়টি তারই গায়ে পাকদণ্ডি পথে দেখা দেখা যায় কেনারক্ষেত্র থেকেও। সেই পথ বেয়ে অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক উপরে উঠে যায় শিলাভূময় খোজে। পাণ্ডুরাও যায় কোথায় নাকি ব্রহ্মকমল নামক এক বড়মহা যে ফুল ফোটে তাই কেদারবেশের পূজার জন্য আহরণ করতে। ঐ পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরালে পশ্চিম দিকে যে অসুখপ পাহাড় দেখা যায় তাও সহজগম্য। আর উত্তরে ঐ যে বরক-ঢাকা, আকাশ-ছোওয়া পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে তাও নাকি অগম্য নয়।

উত্তরে ঐ পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে বরফের উপর দিয়েই নাকি আসল মহাপ্রস্থানের পথ—স্বর্গারোহিনী শ্রোতস্থিনীর গতি-পথের ধারে ধারে তারই উৎসের দিকে। এ অঞ্চলের মানস-সর্বোবর আছে ঐ পর্বতশ্রেণীর পিছনে উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট এলাকা জুড়ে। কণা-তোলা সাপের মত তরঙ্গবিশুদ্ধ ভূমি, বলে 'বাসুকীতাল' তার নাম। উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে স্বর্গারোহণের পথ। সেই পথেই গিয়েছিলেন পাণ্ডবেরা, গিয়েছিলেন তাঁদেরই পদাঙ্ক অহুসরণ করে পবনভীকালে অগণিত মহাপ্রস্থানের বাজী। মরমেহটিকে জীর্ণবস্ত্রের মত বর্জন করবার উদ্দেশ্যে কেদারনাথের চরণতলে যারা আসেন, বিষয়বিরাগী, ব্রহ্মজ্ঞানী সেই সব বাজী মন্দিরে দর্শন-আলিঙ্গনশেষে কেদারনাথের মন্দির পরিক্রমা সমাপ্ত করে দলে দলে এগিয়ে গিয়েছেন ঐ চিরভূবায়ের দেশে স্বর্গারোহণের পথ ধরে। অত কঠিন পথে ক্ষুংপিপাসার কাতর দেহের পতন ত অনিবার্য। কেউ পা পিঠলে পড়ে মরেছেন, কেউ শীতে জমে গিয়ে, কেউ বা ভূবার ঝড়ে আক্রমণে বরফ চাপা পড়ে। যেহা-মৃত্যু সবট, তবু জ্বর ভেল আছে তার। মৃত্যু নিজে এগিয়ে এসে



বাকে গ্রহণ করে নি, তিনি নিজেরই গিরে ঝাপিয়ে পড়েছেন মৃত্যুর কোলে।

শুনলাম যে, ঐ পথেই আছে ভৈরবরম্প—ঐ সব পাহাড়েরই কোন একটি শিখর। তার পাদমূলে ব্রহ্মগুফা না ভৃগুপাত নামক গভীর এক গুহা। বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসে দেহত্যাগ করবার অদম্য বাসনার ঐটো সেদিন পর্যন্তও নাকি অনেক যাত্রী ঐ ভৈরবরম্প শিখরের উপর দাঁড়িয়ে ‘শিবোহং’ ‘শিবোহং’ বলতে বলতে ভৃগুপাত, না ব্রহ্মগুফার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সংকীর্ণী আদেশে কিছুদিন পূর্বে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে সাক্ষাৎ কৃতান্তের সেই কবাল মুণ্ডগুহা।

তাঁর মানে, রূপকথা নয় এসব কাহিনী। সত্যি, ঐই সেদিন পর্যন্তও ঐ বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার আত্মহত্যা করেছেন ঐই কেদার-তীর্থের কোন কোন যাত্রী।

শুনতে শুনতে গারে কাটা দিয়েছিল আমার। কিন্তু ‘আত্ম-হত্যা’ কথাটা মনে উঠতেই আমার চিন্তা ও কল্পনায় ছেদ পড়ল।

‘আত্মহত্যা’, না মৃত্যুবরণ? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বার মত মোটা মোটা গাছের ডাল বাড়ীর কাছেই অত থাকতেও বিশেষ একটা গুহাও মধ্যে ঝাপিয়ে পড়বার জন্ত দুর্গম পথে হাজার হাজার মাইল যারা হেঁটে আসতেন তাঁরা কি ‘আত্মহত্যা’ কবতেন ঐ মহাপ্রস্থানের পথে?

বেঁচে থাকবার জন্ত এত আত্মপূর্ণ আত্মদেহ। বৃদ্ধবয়সে আত্মীয়-পরিজনদের চক্ষুশূল হয়েও সংসারকে আমরা আঁকড়ে থাকতে চাই। আর তাঁরা সংসার ছেড়ে এগিয়ে যেতেন সন্ন্যাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। এসে পদ্ধতিতে জর কার? মৃত্যুর? না বিনি মরতেন তাঁরা?

ও কি উগ্রভতা! মন তাও মানতে চায় না। মনে পড়ে উত্তরাসনের সাক্ষাৎ, আমার সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই আমারই কত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যুগে যুগে আমারই মত বস্তুমানুষের কত নরনারীও ত সন্তানমুখে আগুনে ঝাপ দিয়েছেন, ঘাতকের খড়্গের নীচে মাথা পেতে দিয়েছেন, কাসির বজ্জুকে চুষন করেছেন, বুক পেতে দিয়েছেন গুলির মুখে, হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন কেউ খয়ের জন্ত, কেউ বা দেশের স্বাধীনতার জন্ত। ওগুলিকে যদি আত্মহত্যা না বলি, উগ্রভতা না বলি তবে মহাপ্রস্থানের পথে কেদারযাত্রীর মৃত্যুবরণকে ঐ ব্যাখ্যা দিয়ে ছোট কবর কোন হিসাবে?

শাশ্বত ঐ আবেগ। অজ্ঞাত: জীবনেরই সমবয়সী মানুষের মনে ঐ রোমাঞ্চকর মৃত্যুপ্রীতি। বার বার ভোল বদল করেও দেশে দেশে, যুগে যুগে ঐ একই উগ্রভতা জীবনের রক্তকে অহু-প্রবেশ করে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করেছে।

বুধা চেষ্টা অতি-সতর্ক মানুষের। ভৃগুপাত বা ব্রহ্মগুফাকে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না। মরার আগেও হ’বেলাই যারা মরে তেমন মানুষকে কোন দিনই টান দেয় নি ঐ

গুহা। আর বহু ভাণ্ডা বলে মহাসিদ্ধর ওপার থেকে ভেসে-আসা মহাজীবনের সঙ্গীত একবারও যার মনের কানে প্রবেশ করে তাঁর মহাপ্রস্থানের পথ পাথরের বেড়া তুলে বন্ধ করা যায় না।

থেকে থেকেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই আমরা। কেদারের উত্তরে মহাভারত যুগের মহাপ্রস্থানের পথ আজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ হয় নি দেবতাত্মা হিমালয়ের উন্নত আত্মবান। আজও ঐই হিমালয়ের দুর্দম আকর্ষণে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসে দুর্দম অভিবাত্রীদল। পাগল হয়ে ছুটে যায় তারা এক শিখর থেকে অঙ্গ শিখরে। অনেকেই কিরে আসে: কিন্তু কেউ কেউ কিরতে পারে না। তুষারের নীচে বা কোন গভীর গুহাও মধ্যে জীবনের অবসান হয় তাদের।

এরাও সেই পঞ্চপাণ্ডবেরই সগোত্র মহাপ্রস্থানের যাত্রী।

এ সব আমার মস্তিষ্কে চিন্তা। কিন্তু চিরন্তন কল্প রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে জ্বলিয়ে। শুনতে শুনতে বুক কাঁপছিল আমার। একটা দুসোখা আশঙ্কা আমার মনে—কি প্রেরণা আছে কেদার-নাথের ঐ ছোট্ট মন্দিরটির মধ্যে যা লাভ করে বস্তুমানুষের দুর্দম মানুষই মুহূর্তে মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে।

সেই জগুই গঙ্গোত্রীর শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেবে ভয় পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তিনি পূজা শেষ করে বেব হয়ে আসবার পর বেশ টংফুল লেংলাম ঠাঁর হোগলিষ্ট, জহালাহিত বিপ্লি মুখখানি।

উল্লসিতকণ্ঠেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি: পরম ধ্যানমগ্ন পেসার ভাই—বড় শান্তি। অভাগিনীকে বৃষ্টি দয়া করেছেন কেদারনাথজী।

গঙ্গোত্রীও দেখি উংফুল। আমাকে তিনি চুপি চুপি বললেন, আমি বাঁচলাম, চাচা। গত পাঁচ বছরের মধ্যে মাকে আমি এত খুশী কোন দিনই দেখি নি।

এবার কলাহারী বাবাকে দর্শন করতে যাবেন তাঁরা। মন্দিরের কাছেই পশ্চিম দিকে বাবার কুটির।

বোধ করি লছমন ঝোলাতেই কার কাছে যেন ওনোহুলাম ঐই কলাহারী বাবার কথা। সংসারীর তুলনার সন্ন্যাসীমাত্রই অসাধারণ। সন্ন্যাসীর মধ্যেও আবার অসাধারণ ঐ কলাহারী বাবা। কিছু আভাস রয়েছে তাঁর নামেরই। আগে নাকি কসল ছাড়া আর কিছুই যেতেন না তিনি। তার চেয়েও কঠিন পথিচর তাঁর বর্ডমানের। পত্রিাজক সন্ন্যাসী কেদারক্ষেত্র উপস্থিত হবার পর এ জায়গায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। শীতকালে প্রবল বরফপাত হয় ঐই কেদার পাহাড়ে—এত বেশী যে, ঘববাড়ী সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই বরফের নীচে। স্বয়ং কেদারনাথজীও যেনে নিরবেছেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই তখন কেদারক্ষেত্রে বাস করা সম্ভব নয়। তাই তিনিও শীতকালে ছুটি মেন তাঁর পাণ্ডা পুরোহিতকে।

মন্দিরে ঘর বন্ধ করে তাঁরাও তখন কয়েক হাজার ফুট নীচে নেমে বান আশ্রয়কার লভ।

বান না কেবল ঐ কলাহারী বাবা। শীতের ছর হাসও নিজের ঐ ছোট্ট কুটিরখানিতে একেবারে একাকী বাস করেন তিনি।

পতকাল সকালেই জিতেন একবার দেখে গিয়েছে কলাহারী বাবাকে। তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনে গিয়েছে তাঁর বিস্ময়কর জীবনযাত্রার কিছু কিছু কাহিনী। তার আবার কিছু কিছু জিতেন মাঝে বলেছিল আমাকে। কিছু খাল্য সঞ্চিত থাকে কলাহারী বাবার কুটিরে—থাকে প্রচুর কাঠ। বরফ পড়া শুরু হলে কুটিরের ঘর বন্ধ করে ধুনি জ্বলে তপশ্যায় মগ্ন হয়ে বান কলাহারী বাবা। বাইরে অবিরাম বরফ পড়তে থাকে। পুরু হয়ে জমে সেই বরফ তাঁর কুটিরের চালের উপর, নীচে দোরগোড়ার তাঁর বহির্গমনের পথ বন্ধ করে হাঁটু সমান, কোমর সমান উচু হয়ে। মাঝে মাঝে কলাহারী বাবা তাঁর ধুনির আগুন প্রয়োগ করে দোরগোড়ার সেই পুঞ্জীভূত বরফ গলিয়ে একটু পথ করে বাইরে বের হয়ে আসেন, খন্ডা-কোদালের সাহায্যে নিজের হাতেই বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করে নেন তাঁর কুটিরের সামনে ছোট্ট অঙ্গনটুকু, সরিয়ে দেন চালের উপরকার জমা বরফস্তপ বাতে বরফের ভারে চালখানি ভেঙে না পড়ে।

—একেবারে একা কেন থাকেন বাবা? জিতেন জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁকে।

শুনে নাকি গভীর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি : একা কেন থাকব! দোসব থাকেন কেদারনাথজী।

—তাহলেও এ সব কাজে আপনাকে সাহায্য করবার লজ্জা দু'একটি চেলা রাখেন না কেন?

উসসে সাধন-ভজনকা বিঘ্ন হোতা? হৈ।

সেই কলাহারী বাবা। আমি ভেবেছিলাম যে, অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন হবেন তিনি।

কিন্তু আসলে তা নয়। এখন অব্যাহিত ঘর তাঁর কুটিরের। সকলের সঙ্গেই কথা বলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেই প্রশ্নের উত্তর দেন। যা বলেন সবই তত্ত্বকথা। কিন্তু বলেন ঘরোয়া ভাষায়। সে ভাষা হিন্দী। কিন্তু শুনতে শুনতে আমার মনে হ'ল যে, ঐরামকৃষ্ণ কথাসুতের প্রতিক্ষণি শুনছি।

আমরা তাঁর কুটিরে গিয়ে চুকতেই কানে এল আমার যে একজনকে তিনি বলছেন, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, ধ্যান, ধারণা, এ ছাড়া আর ত পথ নেই বাবা। আর ও পথে চলতেও হবে তোমার নিজেকেই। আমি কেবল তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারি। আসল কাজটা বাপু তোমারই।

শান্ত, গভীর কণ্ঠস্বর কলাহারী বাবার, আর তাঁর মুখখানাও গভীর বতকণ ওখানে ছিলাম, হাসতে দেখলাম না তাঁকে। 'তবে ভ্রুকুটিও নেই সে মুখে। করুণাঘন মূর্তি।

অমলধবল বা গোঁড়কান্দি নয়। কালো বং। কিন্তু ছোটপুট

দেহ। মাথায় জটা ও মুখমণ্ডলে পাতলা শাড়িগোঁক আছে। অত বে শীত কেনাবে তবু তাঁর দেহে ভয় ছাড়া অস্ত কোন আবরণ নেই। কটিতে কিছু থাকলেও তা কোঁপীন জাতের—আসন করে বসেছেন বলে তাও চোখে পড়ে না। তাঁর সামনের নাতিগভীর খুনিতে কাঠের গুড়ি একটির এক মুখে দিখাইন গনগনে আগুন। খুব ধীরে ধীরে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে সেই কাঠ। কাঠের আগুন বলেই একটু খোয়াও আছে ঘরের মধ্যে। খুব স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ে না।

স্বয়ং কলাহারী বাবাও নন।

হয়ত ইচ্ছা করেই ঘরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন তিনি। মেঝে থেকে খানিকটা উচু বেদীর মত তাঁর আসন কুটিরের দক্ষিণ-পূর্বে কোণে। সেই আসনের উপর প্রায় দেহাল ঘেঁষে তিনি বসেন। তাঁর সামনে ঐ প্রকাণ্ড ধুনি তাঁকে পৃথক করে রাখে দর্শনাধীর্ষ ভীড় থেকে। ইচ্ছা করলেই ভক্ত পা চুরে প্রণাম করতে পারে না তাঁকে। গঙ্গোত্রী জননীও পারলেন না।

তাঁর নিশ্চিন্ত চোখে কলাহারী বাবাকে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছেন না তিনি। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর ক্ষুদ্রকণ্ঠে তিনি বললেন, আপকা দর্শন ভী ত নহী মিলহা হৈ, মহাশ্রাজী।

গভীর স্বরে উত্তর হ'ল : মুঝেকা ক্যা দেখে গী, মাতী। দর্শন কহো কেদারনাথজীকো।

মায়ের হয়ে মেয়েই বললেন, কেদারনাথজীকে দর্শন করেই আমরা আপনার কাছে এলাম, বাবা।

বেশ, বেশ—বলে উঠলেন কলাহারী বাবা : তব মস্তেমে ঘর লোট বায়ো। উনকা প্রসাদ ত মনমে জকর মিলা হোগা। অব হুসবেসে ক্যা মাতনা?

শুনেই গঙ্গোত্রী তাঁর জননীকে জড়িয়ে ধরলেন। কলাহারী বাবার মুখের কথাটাই যেন লুফে নিয়ে তিনি বললেন, শুনলে ত মা? বাবা তোমাকে বলছেন ঘরে ফিরে যেতে।

হ্যাঁ!—আবারও গভীর কণ্ঠ বেজে উঠল কলাহারী বাবার, ঘরে গিয়ে ভগবানের নাম কর। ভক্তি থাকলে নিজের ঘরে বসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বুদ্ধারই মনের কথা গুটি। তবু ঐ কথা শোনামাত্রই যেন বুকের মধ্যে তাঁর অবরুদ্ধ আবেগ উথলে উঠল। গাঢ় স্বরে তিনি বললেন, কিন্তু আমার সে ত বাবা, বুকল না ও কথা—আমাকে ছেড়ে, আটবুড়ো মেরেকে ছেড়ে, সংসার ছেড়েই চলে গেল।

কে?—জিজ্ঞাসা করলেন কলাহারী বাবা। একটু যেন বিহ্বল তাঁর কণ্ঠস্বর।

বুড়া উত্তরে বললেন, আমার স্বামী।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন গঙ্গোত্রী, না, বাবা। আমার মা জানেন না—সত্য কথা বুঝিয়ে বললেও উনি মানতে চান না তা। আমার বাবা সংসার ছেড়ে বান নি, মারা গিয়েছেন। ঠিক সেই স্বর গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে বা রামপুর চটিতে আঁধা শুনে-

ছিল। ঠিক এই বিষয়েই তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করার পর। বিষয়, বিপন্ন কণ্ঠস্বর। শুনেই গঙ্গোত্রীর জন্ত সমবেদনার শ্রোতার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে।

হঠাত তাই হয়েছিল সংসার-তাগী কলাহারী বাবারও। তিনি চিমটা দিয়ে ছাই রেখে ধূনির আগুন বধাসম্ভব উজ্জ্বল করে দিলেন। সেই আলোকে ক্রমশঃ মা ও মেয়ের মুখ দেখলেন তিনি বাবকে এবং তার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে নিজের স্বভাবসিদ্ধ গভীর স্বরে তিনি বললেন, দোনো এক হী বাত চৈ বেটা। ঔঃ, মায়ী, শোক করেন কী কোই বাতভী নহী। ঈশ্বর নে উনকো বোলা লিরা। সময় হেঁচনেসে ভুয়কোভী বোলা লেজে। তবতক ভুম খুশমেজাজসে অপনা কাম করতে রহো।

কথা বের হ'ল সাধুর মুখ থেকে। বিস্ময় বার উদ্দেশ্যে বলা তিনি সংসারী জীব—নারী এবং বৃদ্ধা। ও কথা শুনে কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার যে বাবা, বৃদ্ধ গাণি, ঘর খালি। কি কাজ করব আমি!

নাম কথ—কলাহারী বাবা উত্তরে বললেন, সাধুসম্ভব সেবা কর। তা হলেই ঘর-বৃদ্ধ সব ভরে উঠবে।

বলতে বলতে হাতের চিমটা দিয়ে জ্বলন্ত কাঠখানি আর এক বার রেখে দিলেন কলাহারী বাবা। সঙ্গে সঙ্গেই গনগনে আগুনের উজ্জ্বলতর নীপ্তিতে ঈশ্বর উজ্জাসিত হয়ে উঠল সাধুর মুখখানি। সে মুখ এতক্ষণ পর মোটামুটি চোখে পড়ে থাকবে বৃদ্ধার; তিনি অকস্মাৎ উজ্জাসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনায় চেয়ে বড় সাধু আমি আর কোথায় পাব, বাবা। আপনায়ই সেবা করব আমি। দয়া করে আমার ঘরে চশুন আপনি। না হয় এখানেই আপনায় কাছে থাকবার অনুমতি আমার দিন।

আমি ঠিক ঐ মুহূর্তেই একটু বা ঢকল দেখলাম কলাহারী বাবাকে। পিছন দিকে একটু সরে বসলেন তিনি; ধূনির আলোয় সাক্ষাৎ গতিপথ থেকে নিজের মুখখানি সরিয়ে নিয়ে যেন আগের চেয়েও গভীর স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, দেখছ না মায়ী? অন্ন-পূর্ণায় কোল থেকে ছিনিয়ে এনে কেনারনাংভী তাঁর নিজের দোসর করেছেন আমাকে। তিনিই আমার দেবশোনা করেন। আর কোন সেবায় আমার দরকারই নেই। যে চায় তার সেবা করগে ভূমি।

কে সে?—বৃদ্ধার কাতর কণ্ঠে এবার যেন ভঃস্রুকের রেশ।

কলাহারী বাবা উত্তর দিলেন, অপনা আখে খুলকয় দেখো—মিল যায়েগা। অব যায়ে মায়ী। খুশ রহো।

বিরক্তি না গোক, হুকুমের গুহ বাবাব শেষের কথাটাতে। বুদ্ধিমত্তী গঙ্গোত্রী আবার বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুনের স্রবে বললেন, বাবাব উপদেশ আদেশ দুই-ই ত ভূমি পেলে, মা। এখন প্রণাম কর বাবাকে। তার পর চল।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা যায় না কলাহারী বাবাকে—আগুনের পরিখা রয়েছে তাঁর তিন দিকেই। মাটিতেই মাথা

ঠেকিয়ে উদ্দেশ্যে তাঁকে আর একবার প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। তার পর ঘেঁষেব হাত ধরে ধীরে ধীরে বেব হয়ে গেলেন তিনি।

শোদেদি আমিও প্রণাম করলাম। আর একবার কলাহারী বাবাব মুহ, গভীর কণ্ঠস্বর কাণে এল আমার, খুশ রহো।

ইচ্ছা থাকলেও সে দিনটা কেনারক্ষেত্রেই থেকে বাবার উপায় ছিল না তাঁদের। গঙ্গোত্রীর ঘোড়াওয়ালা ক্রমাগত তাকে তাড়া দিচ্ছিল। প্রকৃতির তাড়না আরও প্রবল। একেই ত দুর্দান্ত সীত ওখানে—চনচনে হোদে দাঁড়িয়েও বৃদ্ধাকে শীতে কাঁপতে দেখেছিলাম। সেই হোদও নিভে গিয়েছে এখন। দুপুর হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাই বত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে চান তারা।

বিদায়ের পূর্বে বার বার হুঃপ করলেন গঙ্গোত্রী তাঁর 'ভাইয়া'র সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে। আমার মনে ক্ষোভের সঙ্গে একটু বিরক্তিও—জিতেন এখন উপস্থিত থাকলে তাঁর সঙ্গেই আমায়ও বওনা হতে পারতাম।

বিরক্তি আমার উদ্বেগ হয়ে উঠল তাঁদের বিদায় দেবার পর। তাই ত—জিতেন গেল কোথায়?

খোজ করতে করতে একটি সূত্র পাওয়া গেল—একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের যৌক্ত করেছিল জিতেন একাধিক স্থানীয় লোকের কাছে, যাকে সঙ্গে নিয়ে সে উত্তরের ঐ চিরভূমাদের দেশে যাত্রা করতে পারে।

অসম্ভব নয়। তার ঐ ইচ্ছা ইতিপূর্বে একাধিকবার জিতেন নিজেই আমাকে জানিয়েছে। তবু অল্প একজনের মুখে জিতেনের সেই পুরাতন অভিজ্ঞতার কথা নূতন করে জানবার পর ভয়ে আমার বুক কঁপে উঠল—পূর্বে যা আমি ভানতাম না, ইতিমধ্যে তা যে আমার ভানা হয়ে গিয়েছে! যা ছিল কেবলই পাহাড়, তা যে এখন আমার চোখেও স্বর্গারোহণের পথ—যার সঙ্গে এসে মিলেছে ভৈরবকল্প, ভৃগুপতি, ব্রহ্মগুহা ইত্যাদি পরলোকের সোজা পথগুলিও।

অতীতে যে দুর্দমনীয় আকর্ষণ শত শত কেনারবাড়ীকে ঐ আসল মহাপ্রস্থানের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেই চৌকক শক্তিই কোন অদৃশ্য পথে জিতেনের মনের উপর কাজ করছে না ত?

বাহাহুকে সঙ্গে নিয়ে শুধনই উত্তর দিকে বওনা হলাম আমি।

মন্দিরের পিছনে ক্ষেতের আলের মত সূর্য পায়ে-চলা-পথ আছে একটি। একেবেঁকে নীচের দিকে গতি তার। তেমন খাড়া অবস্থা নয়, তবে দৃঢ়তর। স্থানে স্থানে জল জমে রয়েছে, গুপ্তের মত বা ওখানে জমে পাথরের কাকে কাকে তাই পড়ে গিয়ে ভিন্ন-জাতের এক রকম কাণা হয়ে জমে আছে ও পথের সর্বত্রই।

অবিদ্যম বৃষ্টিতে শেওলা জমে পিছল হয়ে আছে প্রত্যেকখানা পাখরই। আর ততক্ষণে টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

অতি সজ্জর্ণণে পা টিপে টিপে চললাম হুঁশনে।

তবে খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত নয়। খানিকটা চলবার পরেই স্বয়ং মন্ডাকিনীই আমাদের গতিবোধ করলেন।

প্রথম দর্শনেই মন্ডাকিনী বলে তাকে চেনা যায় না এখানে। ওদিকের তুলনায় চওড়া বেশী, কিন্তু গভীরতা কম। খুব মৌসুম পেয়ে উপরের বদক বেশী পরিমাণে গললে অথবা খুব বেশী বৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই খুব ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেন ইনিও। তবে আপাততঃ দেখছি স্তল খুব কম। বালি এখানে নেই, তবে পরিমাণে বালুকণার মতই অসংখ্য ছোট-বড় শিলা ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যাক্রান্তে। এই মন্ডাকিনীর ন্যস্তিগভীর দোলনার মধ্যে।

স্বর্দবৃন্তের আকাষে সারা উত্তরদিকটা জুড়ে আছেন মন্ডাকিনী—আর চপ, মধু, ক্ষীর ইত্যাদি এসে পড়ছে তার মূখে। অর্থাৎ উত্তরের ঐ আকাশচুম্বী পরিস্রব্রতীয়া গা বেয়ে বেয়ে শতদারায় জল নেমে এসে মিশছে মন্ডাকিনীর জলের সঙ্গে। চুখগঙ্গা, মধুগঙ্গা ইত্যাদি নাম সেই সব ছোট বড় স্রোতস্থিনীর।

তবে জল ওপানে ঝাঁড়তে পারে না বলেই মোটেই গভীরতা নেই মন্ডাকিনীর, এষ্টা করলে পারজামা না ভিজিয়েও ওপারে যাওয়া যায়। সেই চেষ্টাই করেছিলাম আমি। কিন্তু পার হবার আর প্রয়োজন হ'ল না। পূর্বদিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যে জায়গায় মন্ডাকিনীকে দেখলাম—তুলনায় খুবই ক্ষীণকায়, সেখানেই জিহেনের দেখা পেয়ে গেলাম। সে কিন্তু স্তল পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছে।

উপরে কেশদহনাথের মন্দিরের সামনে ঝাঁড়িয়েই লক্ষ্য করেছিলাম আমি। উত্তর-পূর্ব কোণে বদক-ঢাকা দুটি গিরিশঙ্করের মাঝখানে আকৃতি ও বিজ্ঞানের বিষয়কর ব্যতিক্রম। নিকবকালো নীচের পাথরের খাড়া পাহাড় দু'দিকেই। কিন্তু উত্তরের মাঝখানে পিঙ্গলবর্ণ রাশি রাশি ভাঙা টালি যেন বিশৃঙ্খল ভাবে স্তপীকৃত হয়ে আছে। পরে যখন সুনলাম যে উপরের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুর হাঁ-করা মুণ্ডটাকে সংকায়ের হুকুমে পাখর দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন ভেবেছিলাম যে ঐ বুঝি দূর থেকে বয়ে আনা সেই সব পাথরের স্তপ—বুঝি হিমালয়ের কোলে ঐ বিচিত্র ব্যতিক্রম-টুকুই অতীতের সেই ভূতপাত বা ব্রহ্মগুপ্তকে চিহ্নিত করে রেখেছে। সেই ধারণাই আমার মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন দেখলাম যে, ওপারে সেই অংশটুকুই পাদমূলে ঝাঁড়িয়ে উপর দিকে চেয়ে আছে জিহেন।

প্রথমে বাহ্যদৃশ্যই দেখতে পেয়েছিল তাকে, সেই উল্লানের ঘরে বলে উঠল, ঐ যে ছোট্টা বাবুজী।

দেখেই আমিও যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে ডাকলাম, জিহেন, ও জিহেন।

ভাগ্য ভাল আমার, হুঁতিনবার ডাকবার পরেই সুনতে পেল সে।

আরও সৌভাগ্য যে, আমার ইসারা বুঝতে পেয়ে জিহেন তখনই এপায়ে চলে এল।

আমি তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই নিজেই সে বললে, দূর থেকে মণিমা মনে হয়েছিল আমার যে একটা কাকা জায়গায় বুঝি পাশের কোন একটা পাহাড়ের বড় একটা অংশ ভেঙে পড়ে স্তপ হয়ে আছে। কিন্তু আসলে দেখলাম যে, তা নয়। ভিন্ন যন্ত্রের একেবারে আলাদা একটি পাহাড় ওটি। দূর থেকে যে পাথরগুলিকে আলগা মনে হয়, তা কাছে গিয়ে দেখি বড় কুই মাছের আঁশের মত পাহাড়টার গায়েই আটকে রয়েছে।

আমার মনের সব কৌতূহল তখন একটি অস্পষ্ট, কিন্তু প্রবল আশঙ্কার নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। জিহেনকে আমি খুলে বলতেও পারি না সে আশঙ্কার কথা, পাছে আমার কথা শুনেই আরও বেশী ঝোক চাপে তার ঐ পাহাড়টাকে খুঁচিয়ে দেওয়ার জন্ত। এখন ভালয় ভালয় তাকে কিরিয়ে নিতে পারলে বাঁচি আমি। তাই ও প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র না করে আমি বললাম, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হরহান আমরা। বাহ্যদৃশ্যকেও ত কিছু বলে আসনি তুমি। কি করে বুঝবে যে, এই দিকে এসেছে?

কিন্তু আমার কথা যেন কানেই গেল না তার। সে মূণ কিরিয়ে আমার ঐ পাহাড়টার দিকে চেয়ে বললে, ওপরে ওঠবার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু পথ খুঁজে পেলাম না।

আমি তাড়াতাড়ি তার একখানা হাত চেপে ধরে বললাম, পথ খুঁজে পেলেই কি উঠতে পারব আমরা? আর পারলেও ওঠা উচিত নয়। ওপরে ত আর চটি নেই—গেলে থাকব কোথায়?

জিহেন প্রতিবাদ করল না দেখে আশঙ্ক হয়ে আমি আবার বললাম, চল ফিরে যাই। দেখছ না বৃষ্টি ক্রমেই বাড়ছে। এমন খোলা জায়গায় আর কিছুক্ষণ ভিললে আমরাও জমে বরক হয়ে যাব।

একরকম টেনেই কিরিয়ে নিয়ে এলাম তাকে।

হুঁতিন পব কিরবার পথে নালাচটিতে আমার ঐ প্রসঙ্গ উঠেছিল। স্থানীয় কার সঙ্গে যেন অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করবার পথ ঘরে ফিরে এসে বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই জিহেন বললে, শুনেছেন মণিমা! কেদারের পিছনের ঐ পাহাড়গুলির মধ্যে কোথায় নাকি একটি গুহা আছে। সেখানে রাজীরা তার মধ্যে লাকিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করত বলে গবর্ণমেন্ট নাকি সেটি বুজিয়ে দিয়েছে।

শুনেই ভাবামুখে সেদিনের সব কথা মনে পড়ে গেল আমার। হঠাৎ বুকটাও কেঁপে উঠল। জিহেনের মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ খবর আগে জানতে না তুমি? কেদারে গিয়ে শোন নি কারও মুখে?

বাড় নেড়ে অস্বীকার করল জিহেন। কিন্তু তার পরেই অদ

একটু হেসে সে বললে, ভাগিস জানা ছিল না। কেদারে গিয়ে যে বকম মনের অবস্থা হয়েছিল আমার তাতে ঐ শব্দ জানা থাকলে আমি নির্ভায়ে সে গুহাটিকে খুঁজে যেত কয়তাম।

আর তার পর বুঝি ঝাপিয়ে পড়তে তার মধ্যে ?

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে জিতেন উত্তর দিল, এগুন আর কি করে বলি তা ! ফাড়া থাকলেও তা কেটে গিয়েছে।

একটু ধেম্বে সে আবার বললে, ফাড়া সত্যি কেটে গিয়েছে যদি। নইলে কি অ'র জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণকে দর্শন করতে ছুটি।

জীবনের জয়যাত্রা।

কেদারক্ষেত্রে থাকতে থাকতেই রিজেও লক্ষ্য করেছিলেন আমি। ঐ ত কেদারনাথের দক্ষিণতীরী মন্দির ! তার উপরেও জীবন তার বিজয়বৈজয়ন্তী টুড়িয়েছে।

শঙ্করাচার্য্য কেদারনাথ ও তাঁর মন্দিরের সংস্কারসাধন করে-ছিলেন। কিন্তু শঙ্করের শঙ্করও উত্তিমধ্যে পুনরায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

সেই রাত্রে ঐকেদারেশ্বরের আয়তি দেখতে দেখতেই মনে হয়েছিল আমার যে, জীবের কাছে আবার হার মেনেছেন শিব।

ভাবদর্পক কেদার-শিলায়ই রাজবেশ এখন। যোগীশ্বরেরও পুষ্কারবেশ। শঙ্করাচার্য্যের উপাস্ত শিবকেও রাজার বেশে, ভোগীর বেশে সাজিয়ে তবে তাঁর আয়তি করা হয়। শীর্ষে এখন সোনার মুকুট তাঁর, গায়ে মহামূল্য কিংবাঁবের মণিমুক্তাশ্চিত উত্তরীর। তার উপর আবার ধরে ধরে মালা। অস্ত্রে কোন মন্দিরে যেমন, এখানেও তেমনি—ধূপ, দীপ, বাজনী ইত্যাদি দিয়ে পধ্যায়ক্রমে আয়তি করা হয় রাজরাজেশ্বররূপী বেদাংনাথের। গমগম শব্দে কাঁসদ-ঘণ্টা বাজে, স্তোত্রগান হয় পুঞ্জারী ও ভক্তবৃন্দেব সমবেত করে।

নির্বিকল্প সমাধিতে তৃপ্তি হয় না ভক্তের। সুষুপ্তি নয়, স্রুগুপ্তি বুদ্ধি অধিকতর কাম্য তার। চিদানন্দরূপী শিবকে বৈষ্ণবধাম্য ভগবানে রূপান্তরিত করেছে সে।

একালে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা আর নন এই কেদারনাথ ; তিনি এখন নবজীবনের প্রেরণা। শঙ্করাচার্য্য বজ্রীনাথে নিবজ্ঞান লাভ করে জীবনের শেষ পূজা করতে এসেছিলেন কেদারক্ষেত্রে। একালের বাজীরা কেদারনাথকে দর্শন কংবার পর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণের দেউলের উদ্দেশে যাত্রা করে।

আমরাও তাই করলাম পরদিন। নতুন যাত্রায় নতুন মন্ত্রে—  
জয় বদরীবিশালকী জয়।

ক্রমণঃ

## উপনিষদমালা

### শ্রীপুন্দ্রদেবী

( কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বন্ধী ১৩ শ্লোক )

যচ্ছৈববাণ্ড মনসী প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছৈজ্ঞ জ্ঞান আত্মনি।

জ্ঞানমাশ্রয়ি মহতি পিযচ্ছৈ তদযচ্ছৈচ্ছাস্ত আত্মনি ॥

সংযত কর ওগো চক্ল বাক্য বিলাস যত

মনের মাঝেতে লীন হয়ে থাক উচ্ছ্বাস শত শত

গুধু সেই জ্ঞান বক্ষ ভরিসা

পর্যাপ পাত্রে উঠে উপচিয়া

সে জ্ঞান প্রবাহে ধুয়ে মুছে যাবে বিধা সংশয় যত

কার্য্য কারণ বিকার বিহীন পরমাত্মাতে রত।

প্রাণ চেতনার নিরমল ধারা যাবে দিকে দিকে বয়ে

সে কি আনন্দ পরিপূর্ণতা যাবে তার সাধে লয়ে

ক্ষুদ্র তটিনী আর সেই নয়

মহা সাগরেতে পার সেই লয়

আপনার মাঝে আপনি মগন ক্ষমিয়াছে কলরব

সবার অভীত তাঁহারে পাইয়া পূর্ণ তাহার সব ॥

## একজন অজ্ঞাত মহিলা কবি

শ্রী অনিলকুমার আচার্য্য

‘জীবনে অনেক সাধ

সিরাছে বিকল হয়ে ।

অবৃত্ত বাসনা, আশা

তুফা এনেছে বয়ে ;

তাঁচাদের অভিবাতে

বাধিত ব্যাকুল প্রাণ,—

লেখনীর মুখে তাই

অঙ্ক করেছে দান ।’

এই বেদনা-করণ উক্তিতে যে কাব্যের(১) আদি থেকে অস্ত পর্বাঙ্ক বিধূ, সে কাব্যের ইতিহাস, বিশেষতঃ কবির জীবন-কাহিনী কোন অর্থেই নগণ্য নয় । বস্তুতঃ, এই একটি মাত্র বেদনা-ময় উক্তিই কবির সমস্ত জীবন ও কাব্য সাধনার মূল স্রষ্টা বিধূত । ‘বাধিতা গান’ কাব্যের প্রথমে আছে “এবার কবি”, “ববীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের লিখিত কবির জীবন-কাহিনী । কলিকাতা নগরীর এক বিভ্রান্তবাসী ব্রাহ্মণ পরিবারে চাকুলতার জন্ম হয় ১৯০৮ সালের ১৫ই কার্তিক তারিখে । সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বিখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও বহু ভাষাবিদ মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য সত্যশচন্দ্র বিভা-ভূষণ এম-এ, পি-এইচ-ডি সিদ্ধান্ত মহোদয়, শাস্ত্র অধ্যাপক, ত্রিপিটক বাগীন্দ্র এবং ‘দক্ষিণাংশ ভ্রমণ’, ‘বামানুজ চরিত’ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শচন্দ্র শাস্ত্রী চাকুলতার জ্যেষ্ঠ-তাত ছিলেন । চাকুলতার পিতা বতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য বঙ্গ সরকারের অধীনে চাকুরি করতেন । অধ্যাপক জীবনোপেক্ষ শাস্ত্রী এম, এ, বি-এল, পি, আর, এস, অধ্যাপক হেমচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি আই-এ, এস কৃতবিদ্য মহোদয়গণ চাকুলতার ভ্রাতা ।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে চাকুলতার বিভাগের সহিত সম্পর্ক ছিল হয় । এ সম্বন্ধে চাকুলতার ছোট বোন শান্তিলতা দেবী লিখেছেন,(২) “কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সুযোগ্য ইন্টার প্রিটার জীবন্ত গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম-এ-র সহিত চাকুলতা দেবীর

দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় । ইতিপূর্বে ঘোষাল মহাশয়ের প্রথম জ্যৈষ্ঠ সংসার ভাগাটেরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন । দশ বৎসর বয়সে বালিকা চাকুলতা সেই সংসারে সেতু বাঁধিলেন ।”

কিন্তু বিভাগের সহিত সম্পর্ক ছিল হলেও চাকুলতার পড়াশুনার ছেদ পড়ে নি । তাঁর পাঠ্যপুস্তক ছিল খুব প্রবল, মেধা ছিল অসাধারণ আর বুদ্ধিও ছিল খুব তীক্ষ্ণ । স্বামীগৃহে গিরেও নিয়মিত পাঠ্যভাষ্যের অমুল্যলব্ধ কলে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ওড়িয়া ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতার অল্প কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হতে ‘ভারতী’ উপাধি লাভ করেন ।

বিবাহের পূর্ব চাকুলতা অনূন ছয় বৎসর কাল সুস্থ ছিলেন । মাত্র বোল বৎসর বয়সে তিনি প্রবল হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন । কবির জীবনে এ থেকেই বিবাদের সূত্রপাত । তখন হতে ১৩৩৭ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় পর্বাঙ্ক অনবরত এই রোগে তিনি ভুগছেন । শুধু দৈনিক কষ্টই নয়, চাকুলতার জীবনী মানসিক তুঃখকষ্টেরও এক সক্রিয় কাহিনী । সে কথা আমরা পরে লিখছি । কিন্তু উচ্চ শিক্ষালাভ না করেও আজীবন অতিশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ভগ্ন মন নিয়ে এই মহিলা তাঁদ স্বল্পপরিমিত জীবনে যেরূপ অক্লান্ত ভাবে কাব্যচর্চা করে গেছেন, তা বাস্তবিকই বিশ্বের উদ্ভেদ করে । কিন্তু দৈনিক ও মানসিক কষ্ট-বহুলা চাকুলতার কবি-প্রতিভার বিনাশ সাধন করতে পারে নি, তাঁর কাব্যে এর ফলে যেরূপ উঠেছে বিবাদের এক সক্রিয় স্রব । আজীবন একজন নিরবচ্ছিন্ন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে অক্লান্ত কাব্যচর্চায় দৃষ্টান্ত শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যেই বিরল । বোধ হয় শুধু এলিজাবেথ ব্যায়েট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গেই এ ব্যাপারে চাকুলতার তুলনা চলতে পারে । দীর্ঘকাল যোগশয্যায় শায়িত থাকার পর চাকুলতা দেবী বুকেছিলেন তিনি স্বামীর সংসারবাহ্যায় সগাররূপে কোন কার্যের ভার গ্রহণে অসমর্থ । অথচ স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসায় অস্ত ছিল না । বস্তুতঃ চাকুলতার বহু কবিতা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালবাসায় প্রোজ্জ্বল । একটি নারীজন্মের জীবন, মাতা রূপে স্বামীসোহাগিনী রূপে রূপ-বস-গন্ধ-স্পর্শের এই পৃথিবীকে উপভোগের অল্প ব্যাকুল—কিন্তু এ জীবনে আর বুঝি তা হ’ল না । স্বপ্নসংসার রূপদেহে জীবনভয়ের মত থেকে থেকে জীবনের শত আশা, শত সাধ, শত কল্পনা যোগশয্যায় পার্শ্বে আহুড়ে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল । জীবন-দেবতার নিকট তাই কত প্রার্থনা—ভক্তি অল্পত অল্প কোমল হৃদয়ের কত কান্না । ‘বাধিতা গান’ একটি

(১) বাধিতা গান : চাকুলতা দেবী, সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪।১ বাহুড় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত । প্রকাশ এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫নং কলেজ স্টোরায়, কলিকাতা, আধুন, ১৩৪০ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০+৮+১১৯ মূল্য—১০ কবির মৃত্যুর পর তাঁর বচনা সংগ্রহ করে উক্ত কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ।

(২) ‘বাধিতা গান’ কবিজীবনী ; পৃষ্ঠা ৮ ।

বেদনামণ্ডিত হৃদয়ের স্বতঃউৎসাহিত অশ্রুমাঝি। কাব্যগ্রন্থটির নামেই এর সুস্পষ্ট প্রকাশ।

কিন্তু 'বাণিতার গান' শুধু আত্মবিলাপের নিঃস্বচ্ছিন্ন ক্রন্দনেই ভরপুর নহে। কবির প্রকৃতি-প্ৰীতি, স্বাদেশিকতাবোধ, স্বামীভক্তি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হয়েছে অপরিণীত ভগবৎ নির্ভরশীলতা—বা যোগতাপনক কবির জীবনে সান্ত্বনা ও শক্তির উৎস। এই বিধাসেই তিনি লিখেছিলেন :

“জীবন-দেবতা, পেয়েছি তোমারে জীবনের প্রতি কাজে,  
প্রতি নিমেষের অন্তহালে নাথ, তোমারি প্রতিমা বাজে।”

—জীবন দেবতা

কাননে কুসুমের অপরূপ বর্ণস্বয়মায়, জোনাকীর দীপ্ত অঙ্গে, নবকিশলয়দলে, প্রকৃতির চাকুতায়, নদীর স্বচ্ছন্দ-প্রবহমান সাবলীল গতিতে, অরুণ উষার অপরূপ বর্ণচ্ছটার ও নৈশনীলবতার কবি তাঁর জীবন-দেবতার প্রকাশ দেখে বিশ্ব-বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। কবির প্রকৃতি-প্ৰীতিমূলক কবিতাগুলি ভগবৎ-ভক্তিতে অমুগ্ধ। বিবিধ রুপে যেমন ভগবানের মানচিত্র, অগুণরমাগুণতেও তেমনই তাঁর ভূলা প্রকাশ। ক্ষুদ্র কবি হৃদয় কি ভগবানের চরণরেণুতে পুত হবে না? মাঝে মাঝে কিন্তু “জীবন-দেবতার” আভাসে, কবি হৃদয়ের বিধা-সংশয়ের সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায় :

“অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার  
অন্ধকারে ডুবির কেমনে?  
আধি দুটি মূল্যিা সভয়ে  
মহিলাম গুপ্ত গৃহকোণে।  
মূল্যিাম নয়ন বধন  
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে,  
কোথা ভয়, তমসা কোথায়  
কান্তরূপে বিশ্ব গেছে ছেয়ে।”—আভাস

কিন্তু স্বদেশপ্রেম ('আবার জাগো হে বঙ্গবীর'—উদ্বোধন)—স্বামীভক্তি, ভগবদভক্তি প্রভৃতির সুর কবির কাব্যে বসতই ধ্বনিত হোক না কেন, চির স্বাধীনতাজনিত বার্মজীবনের উদগত অশ্রু তাতে লুক্কায়িত থাকে নি। (৩) ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মুহুর্তেও কবির মনে জেগে উঠে দারুণ অভিমান বোধ। হানি-অশ্রুজল বধন হৃদয়ের কোণে আঘাত করে তখন ধারণাশক্তি ভগবানেরই চরণতলে লুটিয়ে পড়ে সত্য (৪), কিন্তু জীবন-দেবতাকে একথাও গুনতে হয় :

- (৩) তুমি কি বুঝিবে সখি  
কি বাতনা মরমে আমার?—নিশির প্রতি  
(৪) “হানি-অশ্রুজল হৃদয়ের কোণে  
বধন আঘাত করে,  
ধারণা শক্তি তোমার চরণে  
তখন লুটিয়ে পড়ে।”—আত্মহারা

(ক) হে দেবতা, “নিরৈচ্ছা অটুট স্বাস্থ্য তাতে কাঁদি নাই,  
নয়নের দৃষ্টি আমি চিরন্তনে চাই।”—আবেদন

(খ) “জীবন যতপি তব স্নেহ আশীর্বাদ,  
আনন্দ লাগে না কেন চারিদিকে তার?”—কেন?

মাঝে মাঝে এক অজানা চিন্তার দেশের কবিচিন্তিত ব্যাকুল হয়ে উঠে। ভব জলধির ধারে, নীলিমার পয়পারে যে দেশ আছে (৫) সে দেশ কি এই পৃথিবীরই মত চাদের কিরণে, উষার পেলবতার, ফুলের হাসিতে ভরপুর? জীবনের বসন্ত ভুলজ্ঞান, দেহের বসন্ত যক্ষণাক্রম, পার্থিব ভালবাসা, স্নেহ, অংশা, হাসি, প্ৰীতি, সুখ, শ্রুতি—সব কিছুই কি দেহের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? কবির মনে এরূপ কত কি বিধা ভরসংশয় জেগে উঠে। কিন্তু কে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে? কে তাঁর সংশয়ের নিরসন করবে? অজানা দেশের ডাক কবিচিন্তকে আলোড়িত করে তুলেছে সত্য, কিন্তু কৈ? মন ত বারণ মানে না! তবে এই ত জীবনের প্রভাত! দেহ-নিকুঞ্জে যৌবন-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে মাত্র। এখনই কি, এত শীঘ্র, এত সকালে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হবে? এই পৃথিবী কি খেলাঘর মাত্র? এখানে কি শুধু দু'দিনের কান্না-হাসি? কবি হৃৎকণ্ঠ বলে উঠেন :

“তরুণ হৃদয়ে একে বাসনার ছবি  
কি দেবির আর?  
জীবন-বেলায় গড়া বালুকার ঘর  
ভেঙেছে আবার।”—চিহ্ন

হাজারো কামনা, অমৃত বাসনা-আশাভরা নারী-হৃদয়ের দেহের নিকট এই যে পবাক্ষর—রূপরসগন্ধস্পর্শের পৃথিবীকে উপভোগ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার এই যে বার্থ পরিণতি, তা কবির কাব্যকে এক করুণ রসে নিক্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু কবির কাব্যের এই যে হৃৎকণ্ঠের সুর, চাকুতাব স্বাস্থ্য-হীনতাই তার একমাত্র উৎস নহে। ‘স্বাধীনতা শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী গৃহস্থের সংসারে ভাগ্যবিড়ম্বনার গৃহিণীর অক্ষমতা অনেক

- (৫) “ভব জলধির ধারে  
নীলিমার পয়পারে  
কোথায় সে দেশ?  
যায় কি তথায় দেখা  
অরুণের জ্যোতিরেখা,  
আলোকের লেখা?  
সেখা কি চাঁদিয়া তারা  
বসবে অমির-ধারা  
কিরণ ঢালিয়া?  
উষার তরুণ রবি  
ফুলের ললিত ছবি  
উঠে কি হাসিয়া?”—অজানা দেশ



সময় যে শোকাবহ ঘটনাবলীর চিত্রলোক নয়নের অন্তরালে অব্যবহৃত মধ্য নারীর মানসপটে প্রতিকলিত করিয়া তোলে, চাকলতার লেখনীমুখে তাহার বর্ণনা কাব্যাকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। চাকলতার পঞ্চম অধ্যায়ের আত্মজীবনী “শোভাময়ীর জীবনকাব্যে কবি-জগৎকে সেই ট্রাজেডি পরিষ্কৃত।” (৬)

কবি যখন বৃদ্ধিতে পাবলেন, তাঁর বোগ আর সারবার নয়, তখন তিনি একদিন স্বামীর সহিত ভারী সপত্নীর গৃহে গিয়ে তাঁকে মনোনীত করে আসেন।

“চাকলতা ইহার পর গৃহে কিরিয়া আসিয়া বাখাভরা জগৎকে অব্যক্ত হাহাকার কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত বন্ধ ও বন্ধ-পত্নীর বিবাহ-স্মৃতির সঙ্গিত মিশাইয়া ‘শোভাময়ীর জীবনকাব্যে’ যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি মুখ বাহাই প্রকাশ করুন, কাজে বাহাই প্রতিপন্ন করায় চোঁটা করুন সে সময়ে, তাঁহার অন্তরে যে অন্তরতম স্থানে জালায়ী অগ্নিস্রাব তাহার কোমল নারী-হৃদয়কে—তাঁহার সমুদয় অন্তরকে দগ্ধ করিতেছিল। সপত্নী নির্বাচনে যেটুকু রোমাঞ্চ বিবাদময়ীর জীবনকাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য ট্রাজেডির ঘনাকারে ভুবিয়া গেল। নারী-হৃদয়ের বঙ্গভূমিতে অসপত্নী স্বামীপ্রেমের ব্যাঘাত-জনিত ‘স্বর্গ’ বর্ণনাই কল্পনাতীত।” (৭)

কবিঃ “জীবন কাব্যে” যেভাবে চতুর্বিংশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কাব্যরচনার পর কিছুকাল চারি বৎসর কাল চাকলতা জীবিত ছিলেন। জীবনের এই শেষ কয় বৎসরে কবির জীবন-বর্ণনে অকৃত পরিবর্তন এদেখিল। স্তম্ভকাল মানসিক দুঃখ, শোক, অন্তর্দুঃখ সহিত যুদ্ধ করে কবি শেষজীবনে চিত্তের প্রশান্তি ও ভগবানে পরিপূর্ণ বিশ্বাস লাভ করেছিলেন। দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ যে মহত্তর জীবনের দিকে অগ্রসর হয়, কবিও শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সে বোধের স্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্যীয় :

- (ক) “না পুরার আঁখিনীর যদি এ জনমে প্রভু  
মানিয়া লইব আমি সেও দান তব বিভূ।”—বরণ
- (খ) আমি জানি সফলতা মনোবশ সাজে,  
জেগে থাকে জীবনের বার্থতার মাঝে।”—সাকলা
- (গ) “পীড়িত, দলিত আমি  
এ তো নয় হুঃখের কারণ,  
পাঁড়াই এখন দেব  
ফুটায়ছে আমার নয়ন।”—পূর্ণিমা

(৬) প্রিয়লাল দাস লিখিত ‘কবিজীবনী’ পৃষ্ঠা ন। ‘বাখিতার গানে’র সঙ্গে একত্র প্রণীত হয়ে ‘শোভাময়ীর জীবনকাব্য’ প্রকাশিত হয়েছিল। সমস্ত কাব্যটি ১৯১৬ চক্রে সমাপ্ত। ইহাতে কবির যোগ হতে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবির পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় এই কাব্য রচিত হয়।

(৭) ‘কবি-জীবনী’—প্রিয়লাল দাস, পৃষ্ঠা ৮

(ঘ) “কখনো নিফল নয় জীবনের কঠোর সাধনা”

—প্রলয়ে

(ঙ) “অনাগত দিনগুলি পরিপূর্ণ করি নিরন্তর  
তোমার বধুর নাম জগৎকে প্রতি স্তব্ধ করে  
চিরদিন উজ্জলিয়া থাকে যেন অমর অক্ষরে।”

—প্রার্থনা

বস্তুতঃ কবির জীবনের শেষ কয় বৎসরে রচিত অধিকাংশ কবিতা ভাবের গভীরতার, চিন্তার জোতনার, প্রকাশনৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যে সমসাময়িক সাহিত্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর রচিত কবিতাসমূহ বিচিত্রা, বামাবোধিনী, পঞ্চপুষ্প, জন্মভূমি, মাতৃমন্দির, অটল, বিকাশ, বিশ্বজনীন, পুষ্পপাণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চাকলতার কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে (১৯০৮ বঙ্গাব্দে) চাকলতার জন্ম। তাঁর জন্মের ঠিক সাত বৎসর আগে বিহারীলালের মৃত্যু হয়, আর দুই বৎসর পরে হেমচন্দ্রের ও আট বছর পরে নবীনচন্দ্রের। সে সময়ে অক্ষর বড়ালের কবি-প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত, আর রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভাও তখন মধ্যাহ্ন লগ্ন। অর্থাৎ যে সময়ে চাকলতার কবি-স্বপ্নের বিকাশ, তখন বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্যের ধারা অপস্থতপ্রায়, আর গীতি-কবিতার গতি বৃহৎ-প্রবাহমান। চাকলতার পাঠ্যপুস্তক ছিল অসাধারণ। স্তম্ভকাল তিনি স্বভাবতঃই পূর্বজ ও সমকালীন কবিদের কাব্যের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। অন্ততঃ অক্ষর বড়াল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন—এই প্রমাণ তাঁর কবিতায়ই আছে।

চাকলতার উপর বড়াল-কবির প্রভাব কতকটা বিষয়বস্তু ও ছন্দ নির্বাগম, কতকটা দৃষ্টিভঙ্গিতে।

চাকলতার

“কত যে আকুল আশা, কতপানি কাতরতা,

জগৎ জাগিয়া উঠে কত যে বিকল বাখা,

তদ্বিহা মহাবোম

উজ্জলিয়া সূর্যাসোম

তোমার চরণতলে ছুটে যায় কত কথা”

এই অংশের সহিত অক্ষর বড়ালের নিম্নোক্ত পঙ্ক্তি কর্তৃক ছন্দসাদৃশ্যের জন্ত তুলনীয় :

“অতি অসহায় খ্রীতি পাঁড়াইয়া পথ ধারে,

দিয়া হাসি দিয়া পান বরিয়া লহ পো তায়ে।

নগর প্রান্তর ঘুরি,

ত্যাগি, কত দাঙ্গপুতী,

কি পুণ্যের কলে আজি এসেছে তোমার ধামে।”

অক্ষয়কুমারের “পৃথিবীর শত হৃৎথে হৃদয় শতধা চুব”<sup>৮</sup> অথবা “কি দুর্দহ আমার জীবন।”<sup>৯</sup> এই দুটি কবিতার সহিত চাক্র-লতার নিম্নোক্ত দুটি কবিতাংশের ভাবসাদৃশ্যও লক্ষ্য করার মত :

(ক) “তুমি কি বুঝবে সখী কি বাতনা ময়মে আমার ?  
বুঝিবে কি দিবানিশি প্রাণে কেন জাগে হাতাকার ?”

—রজনীত প্রতি

(খ) “এ জীবন লয়ে আর কতদিন  
সময় কাটাতে হবে ধবণীর বুকে ?  
হৃৎসহ হৃৎথের ভায়ে হইয়া যলিন  
শূন্যে চেয়ে আর কত রব স্নান বুণে ?”

—নিরাশার

চাক্রলতার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর লেখা ‘জীব না দেবতা’ প্রচুতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-দেবতার’ চারামাত্র। তা ছাড়া রবীন্দ্রকব্যের উন্নততম শব্দসম্পদ চাক্রলতার বহু কবিতায় লক্ষ্যণীয়। অবশ্য চাক্রলতার কাব্যের শব্দসম্পদ শুধু রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের ফলেই গড়ে উঠে নি, এর মূলে রয়েছে তাঁর সংস্কৃত ভাষার ব্যাংগিতা ও বহু অধ্যয়নজনিত মার্জিত মন। চাক্রলতার

“ছাড়িতে শোভন বসুধারে  
কখনো তু হৃদয় না সয়ে।”

রবীন্দ্রনাথের “মরিতে চাহিনা আমি স্তম্ভর ভুবনে”<sup>১০</sup>র কথা মনে করিয়ে দেয় :

কাঁদ

“আজি পুষ্পকাননে গুঞ্জরে অলি  
মধুস্বকৃত বিহগ-কাকলী  
ঝরিছে শেকালী সৌরভ ঢালি  
তাসিয়া উঠিছে ধবণী”

অথবা

“মন্দিরে আজি বাজিছে শব্দ, অর্ঘ্য পূরিত থালা  
জলিছে প্রদীপ, কুসুম পাঞ্জে শোভিছে পুষ্পমালা  
মঙ্গল ঘট সিঁদুর মাথা  
চন্দনলিঙ্গ আশ্রমাথা

চাক্র আলিঙ্গনা গৃহ কুটিরে বহুত রয়েছে ঢালা,  
কপূর ধূপ চামৎ শব্দে পূর্ণ আরতি ভালা”

প্রচুতি কবিতাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্র-কাব্যসাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করে চাক্রলতার কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্যের ছায়াসম্পাত না হওয়াই অস্বাভাবিক। কিন্তু উপরে দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কবির কাব্যের সামগ্রিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের তথা অক্ষয়কুমারের প্রভাব নিতান্তই আপত্যিক।

বঙ্গদেশের মহিলা কবিদের কাব্য ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা ও হৃৎথের অশ্রুতে মেত্বর। “ব্যক্তিগত জীবনের বার্থতা এবং অপ্রাপ্তিব মধ্য থেকেই তাঁদের বিশেষ কাব্যদর্শন গড়ে ওঠে।” বঙ্গের অন্ততম আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কাব্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ব্যক্তিগত জীবনের হৃৎথের অশ্রুবিন্দুতে করুণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতির কবিতারও কবিমানসের ব্যক্তিগত হৃৎথ-বেদনার সুস্পষ্ট প্রকাশ। চাক্রলতা দেবীর কাব্যের মূলেও রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের হৃৎথ, বকনা ও বেদনার সক্রুণ ইতিহাস। একটি অমুতুতিপ্রবণ বেদনা-মখিত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ এই কবিতাগুলি।

• “বঙ্গের মহিলা কবি” পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সমস্ত মহিলা কবিদের কাব্য পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, “মহিলা কবিদের প্রত্যেকেই কবিতার একটা বিবাদের স্রব—একটা নিরাশার স্রব প্রবাহিত।” অজ্ঞাত মহিলা কবিদের সঙ্গে চাক্রলতার ‘সম্বন্ধসূত্র’ আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয় এদের সঙ্গে তাঁর চেতনার বিশেষতঃ মুন্ডের এক বিশেষ অর্থেই সম্পর্ক আছে... অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে অজ্ঞাত মহিলা কবিদের সংযোগ বেদনার সেতুবন্ধে। যদিও সে বেদনা একই সমতলের হৃদয়জাত নয়।” (১০)

এইবার চাক্রলতার কাব্য-বিচার শুরু করা যাক। তাঁর বিভিন্ন কবিতা হতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি বর্তমান প্রবন্ধে আগেই দেওয়া হয়েছে। তা থেকে আশা করি চাক্রলতার কবিদ, শিল্প-নৈপুণ্য ও কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে পাঠকের খানিকটা ধারণা হয়েছে। তাঁর অনাদৃত জীবনের বেদনাময় রূপটি তিনি কয়েকটি ইয়েভেব সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন :

(ক) নীরবে ফুটেছি, নীরবে ঝরিব,  
মিশিরা বাইব আঁখাবে,  
কাননের ফুল শুকাবে যখন,  
কোলে তোলে নিও আদরে।

—বনের ফুল

(খ) বাগানের এক প্রান্তে  
ফুটে আছে সুধামুখী ফুল...  
তবু সে চাহিয়া আছে  
নিশিদিন আকাশের পানে  
জীবন জুড়ায়ে তার

চির প্রিয় দেবতার খানে

—বাণিতার গান

(গ) ঝরিছে শেকালি অশ্রু ঢালিয়া

—বোধনে বিজয়া

৮ ‘নির্দেহ’—শব্দ

৯ ‘দুর্দহ জীবন’—প্রকৃতি

১০ এই প্রসঙ্গে শ্রীমদীর চক্রবর্তীর নীলনলিনী দেবীর কাব্য ও জীবন-কাহিনীমূলক প্রবন্ধ পঠিতব্য। নীলনলিনী দেবীর নীলনলিনী কাব্যসমগ্র নামক সংগ্রহিত কাব্য সংকলন বঙ্গভিত্তিক।

ভাবনা-চিন্তাহীন পবিত্র ওদের জীবনে প্রথম প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে। বিশ্বভূবন যেন মধুমাখা। জীবিকাকর্মের ক্রান্ত সংগ্রাম থেকে এখনও অনেক দূরে ওরা। হৃদয়ে এখনও তাপ আছে—চোখে আছে স্বপ্ন।

অল্প দূরে, জম্‌কালো সাইনবোর্ডের নীচে কাটা দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢোকে আনন্দ আর অপর্ণা।

লোক গিগগিস করছে দমবন্ধ ছোট ঘরটায়। চেয়ার-গুলো সব ভর্তি। ডিস হাতে ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত বেয়াড়া-গুলো। আট-সাঁট শাড়ীপরা কয়েকটি মেয়ে-পরিচারিকা খন্দেরেখের কাছে গিয়ে তাদের ভোজনস্পৃহা জেনে নিচ্ছে। এক কোণে ক্যাশ-বাক্স আর মসলা নিয়ে বসে আছে বিপুলকার সর্দারজী। কথাবার্তা, হৈ-হট্টগোলে ঘর সরগম।

ভাগ্য ভাল ওদের। দেয়ালের কাছে লেডিস লেখা ছোট খুপরিটা খালি পেল ওরা।

ভেতরে ঢুকে বসতে না বসতেই বাসনা এসে কাছে দাঁড়ায়, বলে, “আপনার কি হবে বড়দা?”

বড়দা! চোখ তুলে বাসনার দিকে তাকায় আনন্দ। বেঁটে মোটা-মোটা মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশ হবে। গোল শামলা রংয়ের মুখে হুঁচাবটি ব্রণের দাগ। সাদা শাড়ীর সবুজ পাড়টি সাপের মত পা থেকে উঠে গেছে পরিণত উদ্ধত বৃকের মাঝখান দিয়ে কঁধের ওপাশে।

অভ্যাসবশে বড়দা বলেই লজ্জায় পড়ে গেছে বাসনা। এদই মধ্যে অপর্ণাকে খুঁটিয়ে দেখা সারা হয়ে গেছে তার। বুকে নিয়েছে ওদের সঠিক সম্বন্ধ। বৃকের ভেতরটা কড়কড় করে ওঠে বাসনার।

ভাবলেশশূন্য স্বরে একবার বলে, “কি হবে আপনার ঘর বলুন?”

বাসনা ‘বলুন’ কথাটি শেষ করবার আগেই জোরের সঙ্গে আনন্দ বলে ওঠে, “শিককাবাব। শিককাবাব আর চা—হুঁজনের জন্ত—

অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে যায় বাসনা। যথাস্থানে বলে এসে এদিকে আসতে আসতে ভাবে—বেশ মিলেছে কিন্তু জোড়াটি—পকেটে পরগা কম—কিন্তু বেইয়েন্টে খাবার লখ আছে যোল আনা—

বৃকের ভেতর কেমন একটা বেধনা অস্বস্তি করে বাসনা। রোজ রোজ লেডিস লেখা পর্দা-ঘেরা ঘরগুলোতে জোড়া জোড়া তরুণ-তরুণীরা খাওয়া, হাসি, ঠাট্টা, মান-অভিমান দেখে দেখে তার নিশ্চাপ স্বাস্থ্যিক মনেও কেমন একটা শিরশির ভাব জেগে ওঠে। নিত্যদিনের টাকা-আনা-পাই-এর হিসাবের বাইরেও যে একটা অতি সুন্দর

কিন্তু এ জগতে তার প্রবেশাধিকার নেই। সে শুধু নীরব জট্টা। দেখে দেখে শুধু মনে ব্যথা পেতে পারে সে।

এখানে লোক আসে, বানাৎ করে পরগা ফেলে খেয়ে যায়। কিন্তু চুটি ভাত খাবার জন্ত পরগা জোগাড় করবার সংগ্রামটা যে কি কঠিন, কি ভয়ানক, তার পরিচয় লেখা আছে বাসনার দেহে আর মনে। একটা নিশ্বাস কেল বাসনা। বৃকের ভেতরটা সীসার মত ভারী হয়ে উঠে।

“তিন নম্বর কেবিনে ছুটো শিককাবাব আর ছুটো চা—” এক পাক ঘুরে সর্দারজীকে বলে আসে বাসনা।

শিককাবাব আর চা পৌঁছে যায় তিন নম্বর কেবিনে।

সোৎসাহে খেতে থাকে আনন্দ আর অপর্ণা। সামান্য সামান্য কথায় হুঁজনে হেসে ওঠে খিল খিল করে। সেই হাসির সুর বেইয়েন্টের সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে ওঠে—এমনি তার প্রাণশক্তি।

“শিককাবাব খেয়েই ত সময়টা কাবার হ’ল আজ—বেড়াবে আর কখন?” তৃপ্তির উদ্‌গার দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে আনন্দ বলে।

“কার হ’ল কাবার, তোমার না আমার?” তরল সুরে অপর্ণা বলে।

“আমার—আবার কার?”

“হতে পারে তোমার, আমার নয়—আমার হাতে আজ অটেল সময়—এমন কি সিনেমা দেখাও চলে—” চোখ নাচিয়ে অপর্ণা বলে।

“সত্যি?” হুঁচোখ খুলতে উজ্জল হয়ে ওঠে আনন্দে।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে হুঁখানা সিনেমার টিকিট বার করে আনন্দের নাকের ডগার কাছে ছলিয়ে অপর্ণা বলে, “তোমার এ কথা জেনে লাভ? তোমার ত আর সময় নেই—”

“সময় হচ্ছে ববারের মত, যত ইচ্ছে টানা যায়, আর যত টানা যায় ততই বাড়ে। এ টানাটানিতে আমার মত ওস্তাদ খুব কমই আছে”—হাত বাড়িয়ে টিকিট ছুটো অপর্ণার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে আনন্দ বলে।

হাত সরিয়ে নেয় অপর্ণা, কাড়াকাড়ি পড়ে যায় হুঁজনে। পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ওদের কথাগুলো যেন গিলতে থাকে বাসনা। ওয় বঞ্চিত বড়দা মনে অপর্ণা-আনন্দের খুনসুড়ি ছোট ছেলের রূপকথা শোনার তৃপ্তি নিয়ে আসে।

নাওয়া বস্তিতে একখানা মাত্র ঘর।

বাপ, গোকুল, কারখানায় মিলের চাকার দাঁতের কাছে গোটা ডান হাতখানা বেধে দিয়ে এসেছে আজ হুঁবছর। বাতের ব্যথা কম থাকলে পাড়ায় পাড়ায় বাসন মাজার কাজ

করে বেড়ায় মা সোণামিনী। ছোট ছোট তিনটি ভাই-বোন সব সময়ে খাবার জন্ত হাঁ করে আছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে, অনেক কিছু খুঁয়ে বেটুরেণ্টের এ চাকরিটা পেয়েছে বাসনা। এই পঁচিশ বছরের জীবনে মনের কোন সাধ-আজ্ঞাহই মেটাতে পারে নি সে।

তারও ইচ্ছে করে এই মেয়েটির মত বেনী হুলিয়ে, ছিমছাম লাড়ী পরে গোবিন্দের সঙ্গে গিয়ে বেটুরেণ্টের কোণে বসে খায়, হাসে, গল্প করে। তারপর সিনেমায় যায় একসঙ্গে।

কিন্তু ছুতার-মিস্ত্রী গোবিন্দর হাতে বোজ টাকা পয়সা থাকে না। যেদিন থাকে সেদিন মদে চুর হয়ে থাকে, তখন কোন কথা ভাল করে শোনার মত হুঁশ থাকে না তার। ভাল কথা বললেও গালাগালির বজ্রা ছুটিয়ে দেয়। মন্দ কথা বললে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। কিন্তু অল্প সময়ে গোবিন্দ একেবারে মাটির মাহুখ। বাসনার জন্ত আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে চায়, কিন্তু বাসনা চাঁদ চায় না, চায় চাঁদ, চায় সেই চাঁদ ভাঙিয়ে একটু ফুটি করতে।

আচ্ছা, গোবিন্দ যদি এই ছোকরাটির মত সুন্দর সুট পরে বের হয় তাকে সঙ্গে নিয়ে। করনা করতেও মম বন্ধ হয়ে আসে বাসনার। গোবিন্দর পেশীবহুল সূতাম পুরুষ-দেহটা চোখের স্তম্বে ভেসে ওঠে। এমন মেয়েলি চেহারা নয় তার গোবিন্দর। হ্যাঁ, সাদা পুরুষ একটি। নাই বা

বইল তার সুট, আধ-ময়লা ধুতিতে আর কাঠের ডুঁড়ো-লাপা তাঁতের সজ্জা ছিটের হাক-সাঁটেও চমৎকার মানায় গোবিন্দকে।

হঠাৎ একটা তীব্র ইচ্ছা বাসনার বুকটাকে যেন চিরে ফেলে। ধক ধক করতে থাকে তার হৃৎপিণ্ডটা।

কাছেই কার্ণিচারের দোকানটার কাজ করে গোবিন্দ। এখনও বোধহয় কাজ করছে। দু'প্রেট শিকাবাব আর দু'কাপ চা—কতই বা তার দাম? জীবনের কোন সাধটাই বা পূর্ণ করেছে বাসনা? প্রেমাম্পদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা-খাবার খাওয়াটা বেশী কি আর এমন! গোবিন্দের কাছে টাকা থাকলে সিনেমা দেখবে—না থাকলে না-ই দেখবে। পর্দা-ঘেরা একটা ছোট্ট থুপরীতে মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে সে আর গোবিন্দ। কথায় কথায় অমনি করে হেসে উঠবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কামনায় অধীর হয়ে ওঠে বাসনা।

বিল এনে আনন্দর হাত থেকে টাকা নিয়ে ভীড়ের ভেতর দিয়ে মালিকের ক্যান্স-বাক্সের দিকে হাঁটে না সে। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখতে দেখতে আনন্দ-অপর্ণার পেছনে পেছনে কাটা দরজা ঠেলে পথে গিয়ে নামে।

অল্প দূরেই গোবিন্দের কার্ণিচারের দোকানটার সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে।

## বর্তমান বাঙলা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

( সংস্কৃত লীলাখেল হচ্ছে )

অগ্নের বস্ত্রের বিস্তার চিন্তায় লোকজন দিনরাত অস্থির আজ !

বিপ্লবময় ঘোর দুর্গম পন্থায় হর্দম চায় দেশ ভাঙবার কাজ !

ইচ্ছা বন্ধার নির্ভীক চেষ্টায় ভাববার বোধ নাই ভুল-নিভুল ;

পুত্রের কস্তার ভার্য্যার স্নান মুখ সব

পাপকার্য্যের হয় আজ মূল !

ওই শোন্ দুর্কীর বিপ্লব-হৃদয় চিত্তের কর্ণের দূর-পর্দায় !

এক সাধ আজ সব অক্ষম দুর্কিল দুর্ভর হৃৎকের নিঃশেষ চায় !

উচ্চের সাধ আজ নিম্নের লোকজন এইবার শেষবার চায়

সংগ্রাম ;

নির্মম দুর্দম অর্ধের দুর্লভ প্রাণ বধ করবার পায় দুর্নাম !

সুংক্রাম এই দেশ অস্থির চঞ্চল, হুশিস্তায় আজ বোর উন্মাদ !

চাই আজ বিপ্লব ক্রমবার চেষ্টায় বস্ত্রের বস্ত্রায় অগ্নের বাধ !

চক্ষের তেজ নাই, বকের দুধ নাই, বোদের প্রেম প্রাণ হয়

পয়মাল !

বাঙলার স্থল জল আসমান দশদিক সোরগোলময় আজ

ঘোর গোলমাল !

শাস্তান নাই তাই সাম্যের গান গায়, দেশময় বিপ্লব হয় উত্তব ;

বাঁচবার জন্তই মৃত্যুর রাস্তায় যৌবন পায় বশ মান গোবব।

প্রাণ থাক্ নয় থাক্, ছাববার হয় হোক্ সুন্দর সংসার তার ;

বন্ধু-পিতল নিফল নিফল ততুলহীন খাব হয় ভাঙার !

# উড়িষ্যায় সংস্কৃত চর্চা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ভীৰ্ঘস্থান হিসাবে উড়িষ্যার পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী শাখা ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের নিকট সুপরিচিত, পৰম শ্রদ্ধার বস্তু। ভুবনেশ্বর, পুরী, কণারকের মন্দিরের মারফত ইহার শিল্পসম্পদ, সমগ্র জগতের শিল্প-বসিকের সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রদেশের সাহিত্যিক ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্যগৌরবের কথা পণ্ডিতসম্প্রদায়েও সুপরিজ্ঞাত নহে—পণ্ডিতসমাজের বাহিরে ইহার প্রচার নগণ্য। অথচ উড়িষ্যার বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যবিচার বিষয়ক গ্রন্থ ‘সাহিত্যধৰ্পণ’ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ—উড়িষ্যার রাজ্য প্রতাপরুদ্র গজপতির সভাপদ চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক বাংলার বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ—উৎকলীয় নব্য-স্মৃতি কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষা তালিকায় স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে এই স্মৃতিশাস্ত্রের অংশ-বিশেষ কলিকাতার এগিয়াটিক সোসাইটির প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আধুনিককালের মহামহোপাধ্যায় সামন্তচন্দ্রশেখর সিংহ বিরচিত ‘সিদ্ধান্তধৰ্পণ’ নামক জ্যোতিষগ্রন্থ সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত না হইলেও আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যোগেশচন্দ্র গ্রন্থকারের বনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ১৮৯২ সনে রচিত এই গ্রন্থ ১৮৯৭ সনে প্রকাশ ও পণ্ডিত-সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

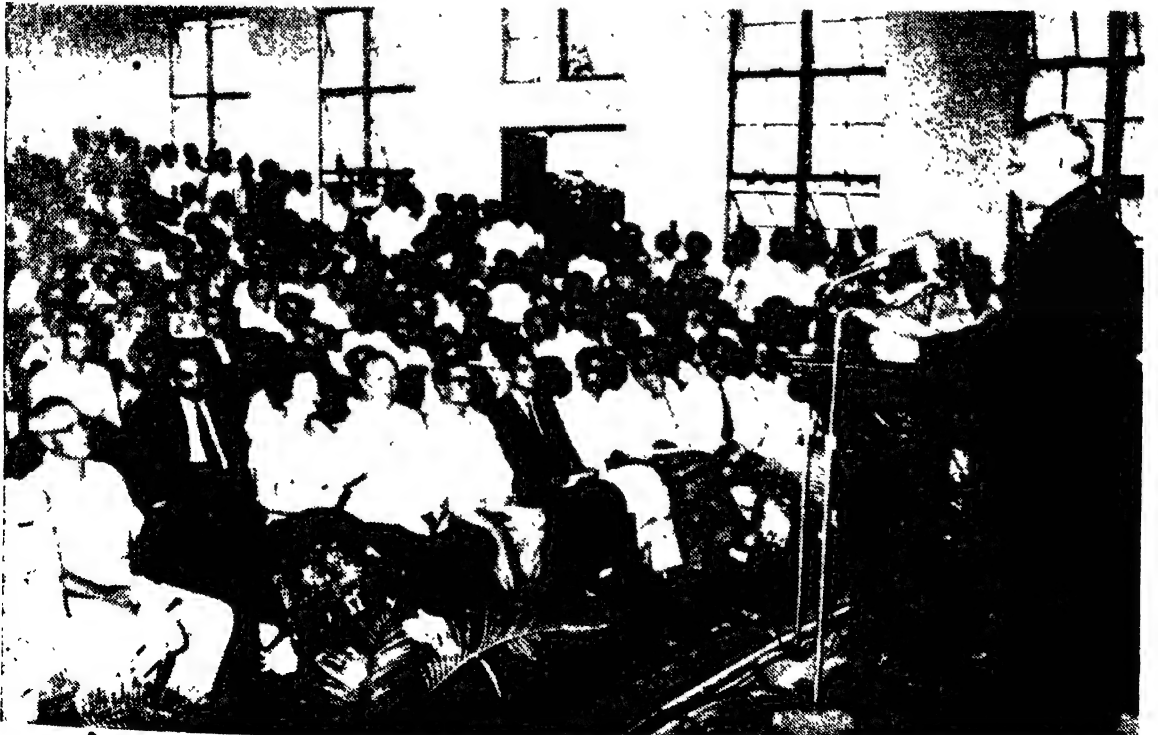
সম্প্রতি বিগত পূজাবর্ষের প্রারম্ভে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত ভারত প্রাচ্য বিজ্ঞানসম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দিতে যাইয়া উড়িষ্যার এই সমস্ত গৌরবের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িল। ভাবিয়াছিলাম এই সম্মেলনে উড়িষ্যার এই সমস্ত গৌরবের কথা বিস্তৃতভাবে শুনিতে, দেখিতে ও জানিতে পারিব। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, অধিবেশনের মধ্য দিয়া উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক গৌরবের চিত্র বর্ষাঘণ্ড ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে ইহার ক্ষীণ আভাসমাত্র আছে। উড়িষ্যার আধুনিক পণ্ডিতসমাজ এই অধিবেশনে এমন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই বাহা হইতে ইহার প্রাচীন বা বর্তমান গৌরবের পরিচয়

পাওয়া যাইতে পারে। অথচ উড়িষ্যাবাসীরা যে নিজেদের গৌরব সম্বন্ধে সচেতন নহেন এমন কথা বলা চলে না। উড়িষ্যার প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন সংগ্রহ ও প্রচারের কার্যে তাঁহারা উদ্যোগী নহেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, উড়িষ্যা স্টেট মিউজিয়ম, উড়িষ্যা সাহিত্য আকাদেমি, উড়িষ্যা কলা বিকাশক্ষেত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই কাৰ্যে বিশেষভাবে ত্রুটি হইয়াছেন। তবে হুংথের কথা, বাহিরের লোক ইহাদের কৃতকার্যের কথা বিশেষ কিছু জানেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের প্রচারের ব্যবস্থা সম্ভোষণক নয়। সংস্কৃত-কমিশনের মধ্য-প্রকাশিত রিপোর্টেও উড়িষ্যার এই দৈন্যের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বাহা হউক, সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে উড়িষ্যার সাহিত্য ও শিল্পের বহু মূল্যবান নিদর্শনের একত্র সমাবেশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি প্রধানতঃ প্রাচীন পুঁথির। পুঁথিগুলির অধিকাংশ উড়িয়া অক্ষরে তালপাতায় লেখা। ইহাদের অনেকগুলির মধ্যে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—কতকগুলির লিখন-ভঙ্গি বিচিত্র। আনুমানিক আধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসের গোল করিয়া কাটা মালার মত গাঁথা তালপাতায় লিখিত একখানি গাঁথার পুঁথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুঁথির আকারে কাটা একখানি তালপাতায় সমগ্র বিশ্বসহস্র নাম লেখা—চারখানি পাতায় গীতগোবিন্দ ও রামপঞ্চাধ্যায় লেখা লিপিকরের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লেখার উপকরণ হিসাবে বাঁশের পাতার ব্যবহার এই প্রদর্শনীতে দুই জায়গায় দেখা যায়। একখানি বাঁশের পাতায় গীতগোবিন্দের কিছু অংশ এবং আর একখানিতে ত্রীকুক্ষতাণ্ডব স্তোত্র। সমগ্র গ্রন্থ এইরূপ বাঁশ-পাতায় লেখা হইত কিনা বলিতে পারি না। কুন্তীপুস্ত বা তেরেট পাতায় (৭) লেখা দুইখানি বজ্রাক্ষরে লিখিত পুঁথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। একখানি দ্বিজরত্নের রচিত আচারবরুণ আর একখানিতে ভগবদ্গীতা।

অবশ্য এই সমস্ত বস্তু উড়িষ্যার পাণ্ডিত্যের শাক্য প্রদান করে বলা চলে না। তবে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-চর্চায় নিদর্শন-স্বরূপ কিছু কিছু গ্রন্থও প্রদর্শনীতে ছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণানন্দ মহাপাত্র রচিত সজদয়ানন্দ, মহেশ্বর মহাপাত্রের অভিনয়-চঞ্জিকা, রামচন্দ্র মহাপাত্রের শিল্পপ্রকাশ, কবি ডিঙিম বাহিনীপতি জীবাচার্যের তত্ত্ববৈভব নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের



দিল্লীতে অঙ্কিত আলুডাঃ ১৫ 'চক্ৰ-প্রদর্শনী'তে রাষ্ট্রপতি ব. ভবন



কলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমারহন উপলক্ষ্যে ডঃ বাধাকৃষ্ণ চাঃদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন





মঙ্গোলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ বুমজাগিন চেডেনবাল আগ্রাহর্গের দেওয়ান-উ-খাস  
পরিদর্শন করিতেছেন



পাঞ্জাবে পশু প্রদর্শনী

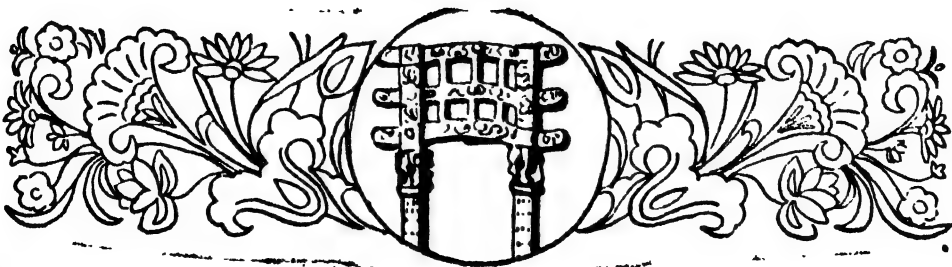


পৃথিবী নাম করা যাইতে পারে। এই সমস্ত পৃথিবী ট্রেট মিউজিয়াম, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরীর বসুন্ধর লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। মিউজিয়মে রক্ষিত পৃথিবী দুই খণ্ড বিবরণ ও প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। প্রথম খণ্ডে ধর্মশাস্ত্র ও দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের পৃথিবী বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বিশ্বনাথ কবিরাজের অপ্রকাশিতপূর্ব চম্পকলা নাটকের একটি সংস্করণ এবং উড়িষ্যা পিণিমালার একটি খণ্ড (প্রথম খণ্ড— দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য আকাদেমি এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ও উড়িষ্যার লেখকদের লেখা সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রকাশে অক্লান্ত যোগ্যতা দেখাছেন। আকাদেমি এ পর্যন্ত দুইখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি ১৬শ শতাব্দীর উড়িয়া কবি মারকণ্ডেয় মিশ্রের দশাগ্রীববধকাব্য আর একখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর বসুনাথ বরদাশিত নাট্যমনোরমা। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন— ইহার নাম সঙ্গীত মুক্তাবলী; গ্রন্থকার কণিকার বীরাদি-বীরবর নৃপসিঁচুদামণি শ্রী গাঙ্গীনাথ ভাঙ্গুর পুত্র হরিচন্দন। তুলিলাম—প্রাচী প্রকাশন প্রকাশিত নারায়ণ শতক ও পবিত্রামব্যায়োগও এখন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়াছে। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাবলী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় নাই। সঙ্গীতমুক্তাবলীর সম্পাদক অধ্যাপক গাঙ্গাধরচাঁদ-সাহিত্যচাঁদ সিদ্ধান্তধর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। প্রাচীন ধরনের পণ্ডিত হইলেও গ্রন্থপ্রচারে তাঁহার খেয়ল উৎসাহ ও আগ্রহ আছে। তিনি এখন আর একখানি গ্রন্থের সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি পূর্ব হইতেই সমালোচনার জগৎ হাতে আসিয়াছিল— কিন্তু জগৎ গ্রন্থের কোনও খবরই পূর্ব পাই নাই। মনে হয়, গীতা, নাট্য, শিল্পের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হইলে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। প্রাচীন নৃত্য ও মন্তাজ শিল্পের ধারা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া উড়িষ্যা

এখনও সজীব রহিয়াছে—এখনও প্রাচীন পরিভাষা সোণানে অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। এই ধারার পূর্ব পণ্ডিতরাভার পক্ষ এত সব গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। এদিকে শিল্পী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উভয়ের দৃষ্টি সমভাবে আকৃষ্ট হওয়া বঞ্জনীয়।

সম্প্রতি উড়িষ্যার শাস্ত্রচর্চা এক নূতন দিকের সম্মান পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্ট চর্চা পুরী জেলার বামুদেবপুর গ্রামে অর্ধবছর পৈপ্পলাদ শাখার ত্র্যক্ষণমাজের এবং পৈপ্পলাদ সংহতার একখানি পৃথিবী সম্মান পাইয়াছেন। সংস্করণের অধিবেশনে তিনি এই মূল্যবান সংগ্রহ সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের মধ্য দিয়া বোধগম্য করেন। এই পৃথিবীপ্রাপ্ত ফলে ইতিপূর্ব প্রকাশিত এই শাখার অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিত অংশুর সম্মোহনের ব্যবস্থা হইবে—এই শাখা সম্বন্ধে পণ্ডিতমাজের প্রচলিত ভাণ্ডারধারণ নিবন্ধন হইবে। অনুসন্ধান করিলে হয়ত কালক্রমে উড়িষ্যার গ্রাম হইতে পৈপ্পলাদ শাখা সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ উড়িষ্যায় এ পর্যন্ত প্রাচীন পৃথিবীর অনুসন্ধানের কার্য ব্যাপক ও নিয়মবদ্ধভাবে অনুশরণ করা হয় নাই।\* অবিলম্বে এই কার্য আরম্ভ করা দরকার। এখনও চেষ্টা করিলে অনেক অমূল্য বস্তু ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর হইতে পারে। সুখের কথা, পুরীতে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট এবং সংস্কৃত বিসর্চ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করি, সম্ভব ইহার কার্য আরম্ভ হইবে এবং উড়িষ্যায় সংস্কৃত-চর্চার গৌরবময় ইতিহাস অনুসন্ধিসু পণ্ডিতবর্গের গোচরীভূত হইবে।

\* অর্গত রাজেন্দ্রলাল মিশ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রায়ক উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অনুসন্ধান উড়িষ্যায় পুরী ধামের বাহিরে প্রসারিত হয় নাই।



# মানসিক রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

আপনার মানসিক স্বাস্থ্য যাচাই করুন

জানাবকরা দুই জন

আমেরিকার কান্সাস স্টেটের, টোপিকা শহরের মেনিঞ্জার ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ডক্টর উইলিয়াম সি মেনিঞ্জার কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করিয়াছেন, এই সকল প্রশ্নের উত্তর হইতে আপনি নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের ন্যূনতম স্তি বুঝিতে পারিবেন।

আপনার কি সকল সময় অস্থির বোধ হয়?

আপনার কি একপু হয় যে, কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না, অথচ কি কারণ জানেন না?

আপনার কি কেবলই অশান্তি বোধ হয় অথচ ইহাও কোন উপযুক্ত কারণও দেখা যায় না?

প্রায়ই কি আপনার মেজাজ সহজে বিগড়ায়?

আপনি কি প্রায়ই অনিদ্রার জগ্ন কষ্ট পান?

আপনার কি মেজাজ একপু হয়—কখনও খুব আনন্দ আবার খুব নিরাশ—এবং একজন্ম নিজের কারণকর্মে ব্যাঘাত?

আপনার কি যান্ত্রিক সঙ্গ হেল্যামেশ করিতে একেবারে অনিচ্ছা হয়?

আপনার চলিত কান্ডে ধাওয়া নড়চড়ে হইলে আপনার মন কি একেবারে তখনচ হয়?

আপনার মেজাজ কি একপু যে, ডেলিপিলের টুটামি কি একেবারে অসহ্য?

প্রায়ই কি আপনি রাগেন এবং মনের তিক্ততা অনুভব করেন?

অকারণে কি আপনি ভীত হন?

আপনার কি দায়িত্ব সব সময়ই কি আপনি ঠিক, আর সকলে অ-ঠিক?

আপনার ব্যথা-বেদনা কি লাগিয়াই আছে যাচাই করিয়া কোন ডাক্তার করিতে পারেন না?

ডক্টর মেনিঞ্জার বলেন যে, কোন একটি প্রশ্নের উত্তর পক্ষের “হ্যাঁ” হইলেই বুঝিতে হইবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বল তাহলে কিংবা পূর্ণাঙ্গাধার দেখা বাইতেছে।

## মানসিক রোগীর সংখ্যা

নির্ভরযোগ্য সংখ্যাতত্ত্বের অভাবে সঠিক বলা যায় না পৃথিবীতে মানসিক রোগী কত জন। অগতঃ নানা দেশ সামাজিক ও অর্থিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত—এই দিক হইতে বিচার করিয়া মানসিক রোগীর সংখ্যার একটা আনুমানিক করা সম্ভব।

ভারত—“হাজারে প্রায় ২ জন লোক মানসিক রোগগ্রস্ত—শিশু বা কিছুদিন পরে তাহান্নিকেকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। আমাদেব দেশে হাজারেকরা ৮ হইতে ১০ জন আছে যাহাদের মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই ইহান্নিকেকেও হিসাবে ধরিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ শতকরা ০.৫ জন বিকলাঙ্গ এবং বিকলমন বা হংসা। ইহা ছাড়া শারীরিক অন্তঃস্থতা, যথা উচ্চ রক্তের তাপ, নানারূপ চর্মের রোগ প্রভৃতি এবং মানসিক কারণে যে সকল রোগ প্রধানতঃ হয় তাহা ত আছেই। এত বড় তালিকার সঙ্গে আছে আবার সামাজিক সমস্যা-জড়িত নানা রোগ। ভারতে প্রতি বৎসর ১৭,৫০,০০০ লোক অপরাধ করে, বৎসরে অস্বস্ততার সংখ্যা ১৫ হইতে ১৭ হাজার এবং খুব কম করিয়া ৫ শতকরা ১৫ হইতে ২০ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধপ্রবণ।”

প্রতি বোল জনে একজন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র : একপু অনুমান করা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২০ লক্ষ লোক মানসিক রোগে ভুগিয়া থাকে—অর্থাৎ একপু রোগীর সংখ্যা প্রতি ১৬ জনে ১ জন। ইহা ছাড়া ১৫ লক্ষ লোকের মনের বিশ্বাস অসম্পূর্ণ অর্থাৎ একপু লোকের সংখ্যাও শতকরা ১ জন।

প্রতি বৎসর যে ১২ জন সম্ভ্রান আমেরিকার অন্তঃস্থত্ব করে জীবনে তাহাদের একজনকে মানসিক রোগেব জগ্ন হাসপাতালে বাইতে হয়। অবশ্য যে সকল মানসিক রোগী অল্প-অনুত্তর জগ্ন হাসপাতালে যায় না তাহাদের সংখ্যা আরও বেশী।

প্রতিদিন যত রোগী হাসপাতালে যায় তাহার প্রায় অর্ধেক মানসিক রোগী। হাসপাতালের মানসিক রোগী এবং বিকলমন ও শিহর রোগী যাহারা আয়োগ্যশালায় আছে তাহাদের সংখ্যা একজন্ম সকল রোগীর মোট সংখ্যার ৫৫ ভাগ।

ইহা ছাড়া মানসিক রোগেব জগ্ন যে সকল লোক ক্লিনিকে বা ডাক্তারের বাড়ীতে চিকিৎসিত হইতে যান তাহাদের সংখ্যাও এই সকল স্থানের মোট রোগীর শতকরা ৩০ ভাগ এবং সাধারণ হাসপাতালের রোগীর সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ। এই সকল রোগীর কাহারও পুরিষ্কার মানসিক রোগ বা উদ্ভ্রাণ অবস্থা, কাহারও সাময়িক উদ্ভ্রাণনা এবং কাহারও কাহারও একপু সকল শারীরিক রোগ আছে যাহার কারণ মানসিক।

দশ জনে একজন

করাসী শিশুদের—অনুমান করা হয় যে করাসী দেশে স্কুলের

যে সকল মানুষ আত্মহত্যা করে তাহারা অনেক সময় মানসিক বা শারীরিক রোগে ভুগিয়াই ইহা করে। জাপান, জেনবার্ক, জর্জিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডে আত্মহত্যার সংখ্যা সর্ব্ব দেশে যেহী ? সর্ব্বাংশে কম আত্মহত্যা হয় আয়ারল্যাণ্ড, নর্থ আয়ারল্যাণ্ড, ডিলি,

সুইজারল্যান্ড এবং স্পেনে। সব দেশেই পুরুষেরা মেয়েদের অপেক্ষা বেশী সংখ্যায় অস্ত্রাঘাত্য করে। অসুপাত ৩.১ কিন্তু নরওয়ে ৪.১ এবং জাপানে ২.১ হইতেও কম।

পুরুষের অস্ত্রাঘাত্য সংখ্যা সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফিনল্যান্ডে বেশী, জাপান, ডেনমার্ক এবং অস্ট্রিয়ায় স্ত্রীলোক অস্ত্রাঘাত্যকারীও কম নহে।

#### অপরাধীর মন জ্বাভাবিক

সমাজের অপরাধ সংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে নানাভাবে চেষ্টা করিতে হইবে—সমাজে ব্যক্তিদের দুর্বল মন তাহাদের প্রতিদৃষ্টি দেওয়াও এই চেষ্টার অন্যতম। গণবেশ্য দ্বারা দেয়া গিয়াছে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ হইতে ত্রুচতুর্থাংশ অপরাধী কোন না কোনরূপ মানসিক রোগগ্রস্ত।

#### অধৌক্তিক ভয় ও আশা

আজ জগতে সকলের মুণ্ডেই 'আগণিক' শক্তির ভাল-মন্দে কথা শুনা যায়। উগাহারা কি উপকার হইবে সে কথা বহু শুনা যায় তাহা অসম্ভব ক্ষতির কথাই বেশী আলোচিত হয়। অনেক মানুষকেই এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান নাই, বোঝে না, কখনও এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই, অথচ ভয়, যদি এই শক্তি বে-ধাঁস হয় তবে আর বাক্য নাই, মুহূর্ত্ত নিশ্চিত।

দৈনন্দিন জীবন-ব্যবহারের মধ্যে মানুষের এই ভয়ের আভাস পাওয়া যায়। যদি ক্ষত কোন পরিবর্তন হয়, শত্রুচানি হয়, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দেখা যায়, অমনি বলা হয় 'আগণিক' পরীক্ষার জল উঠা হইয়াছে। 'আগণিক' পরীক্ষার জল দুধ, জল, লব্ধা বিস্ফোরক হইয়াছে, এমনকি মানুষকে জননশক্তি হ্রাস পাউয়াছে—মানুষের মনে একরূপ ভ্রাসের সঞ্চার হইতেছে। আগণিক যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক স্বাভাবিক নূতন নূতন সমস্তা দেখা দিয়াছে।

#### চিকিৎসকের দৈনন্দিন কাহা

ফরাসী দেশে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, ১০০ বোগী মধ্য ৫০টি বোগী বোগ মানসিক অথচ প্রতিদিন চিকিৎসকগণ ক্ষয় বৌ-বাণি প্রভৃতি বোগ সম্বন্ধে বহুটা সচেতন, মানসিক বোগ সম্বন্ধে সে তুলনার কিছুই নহে। অথচ তাহাদের এই বিবরণ গুরুত্ব লাভিবে। হাসপাতালের বহির্বিভাগে, স্কুল, প্রযুক্তি-চিকিৎসাগ, শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের সময় চিকিৎসকগণ সমাজস্বাস্থ্য, শ্রমিক, নার্স এবং মালিকগণের সংস্পর্শ ও সহ-যোগতার তাহারা সমাজ ও মানুষের প্রভূত কল্যাণে লক্ষ্য।

#### আধুনিক মানুষের মনের স্বাস্থ্য

কেবল বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন! আধুনিক মানুষের বিশ্রাম কোথায়! ঘুমের গুণ বাড়ি, ঘুম না হওয়ার জল ঔষধ। স্বপ্ন দেখিবার জল ঔষধ কবিবার জল পাওয়াই। দুঃখ-বৈরাগ্য হইতে মুক্তি

পাটবার জলও ঔষধ আছে। একরূপ সকল ঔষধের খবর পাওয়া যায় বাহা সেবন করিলে মানুষ শিশুত্ব অর্জন করে—Alice-in-wonderland Drug.

হাসি-ঠাট্টার কথা নয়, আমাদের জীবন (অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে) একরূপ হইয়া পড়িয়াছে। (স্বাধীনতা লাভের পর আমরাও আধুনিকতা তথা পাশ্চাত্যের পথে পা দিয়াছি, একটু চিন্তা করিলেই যে-কেহ ইহা বুঝিতে পারিবেন)। খবরের কাগজের 'হেড লাইন', টেলিফোনের কল শব্দ, রেডিওর আওয়াজ, কি যুগ কি জগৎ অবস্থা সকল সমুদয় মনকে পীড়া দেয়। ইহার উপর আছে 'বক্তব্য চাপ, প্রস্তাবে লক্ষ্য, পেটের 'অন্ন', সকলে মিলিয়া যেন মানুষকে বেপারোয়া চালকের চাতের মোটর গাড়ীর মত অবিরাম গতিতে টানিয়া চলিয়াছে। গোটা পৃথিবীর ২৫০ কোটি লোকে প্রত্যেক মানুষের আপনায় জন—অথচ নিজের ঘরে সে প্রকৃতই এক—বেন সঙ্গীতীন।

আবার আর এক শ্রেণীর লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় তাহাদের মানসিক অবস্থা কি ভীষণ—কাগজানার কলের ট্রিকা-কাগজে তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, আবার কাগকে পরিষ্কার জামা-পোশাক সঙ্গেও অর্থিক দুর্ভাবনায় তাহাকে ছাড়িতেছে না। কাগজের শ্রমী সতিত 'থিটিমটি' চলিতেছে, অনেকের খাটুনির প্রচুর্য আছে কিন্তু খুশার নিঃশব্দ নাই, সমাজের সবই নিঃশব্দতায় হতভাগ্য বুকের দল, কোনরূপে খাইয়া বাঁচিয়া আছে।

#### আপনার দৃষ্টিভঙ্গি

কোন মানসিক রোগগ্রস্তের বা উদ্ভ্রান্তের বা ব্যাভাব উদ্ভ্রান্ত বোগ সাধিয়াছে তাহাও সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? আপনার জানা উচিত তাহারা উদ্ভ্রান্ত বোগ নিরাময় হওয়া বা তাহারা স্বাভাবিক জীবনে কিরূপে আসা আপনার ব্যবহার উপর নির্ভরশীল হাসপাতালে, হাসপাতালে বহির্বিভাগে, ঘরে রাখিয়া যে তাহেই আধুনিক মতে উদ্ভ্রান্তের চিকিৎসা গৌরব সমাজের লোকের মনোভাব যদি সহানুভূতিশীল এবং পরিবর্তিত না হয় কিছুতেই কিছু হইবে না।

যে সকল দেশে বড় বড় পাগল-গারম তৈরি করিয়া চিকিৎসা কথা আটক ব গিবার জল উদ্ভ্রান্ত বোগীকে বদ্ধ বাপা হইত সেট সকল দেশে সাধারণতঃ লোকের এই সকল বোগী প্রতি একটা ভীতি এবং শিকার ভাব দেয়া যায়। কিন্তু যে সকল দেশে সম্প্রতি মানসিক বোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে সেখানে সাধারণের একরূপতা দেখা যায় না।

#### ভুক্ত ধরা

আদিম জাতির মধ্যে কেহ উদ্ভ্রান্ত হইলে লোকে মান কহিত সে পালের শাস্তি পাউতেছে, অথবা ইহা ভুক্তের কাজ অথবা বোগী একেবারে ভুক্তগ্রস্ত। একরূপ ব্যবস্থা আফ্রিকার কোন কোন দেশে

এবং ভারতবর্ষে এখনও কিছু কিছু দেখা যায়—যথাযুগে এবং পরবর্তী কালেও এরূপ ধারণা খুবই বহুমূল ছিল।

মধ্য যুগে কোন কোন ধর্মমন্দিরে উদ্ভ্রান্তদিগকে অশ্রয় দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু উদ্ভ্রান্তদের বহু নেওয়ার চেষ্টা এবং একত্র উদ্ভ্রান্ত-ভবন নিৰ্মাণ প্রথমে মুসলমানেরাই করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতের চিকিৎসকগণের নিকট হইতেই ইতারা মানসিক রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আয়ত্ত করিয়াছিল। ইউরোপের লগুনের বেথলেম হাসপাতাল ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম উদ্ভ্রান্ত-ভবনরূপে ব্যবহৃত হয়। স্পেনদেশে ভেনেসিয়ায় ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভবন খোলা হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে ইউরোপের অগণ্য স্থানে আরও এরূপ ভবন বা এসাইলাম স্থাপিত হয়। ১৭৫৬ সনে উত্তর আমেরিকার পেনশা লভ্যানিয়া শহরের এক সাধারণ হাসপাতালে উদ্ভ্রান্ত রোগী-গণকে চিকিৎসার জন্য পৃথক পৃথক কুঠরীতে বদ্ধ রাখিয়া চিকিৎসা করা শুরু হয়। আমেরিকার প্রথম উদ্ভ্রান্ত ভবন ১৭৭৩ সনে ভার্জিনিয়ায় খোলা হয়।

#### উদ্ভ্রান্ত-ভবন বা বন্দীশালা

এই সকল উদ্ভ্রান্ত ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্য উদ্ভ্রান্তদের চিকিৎসা বা যত্ন নহে, তাহাদিগকে বদ্ধ রাখা বিশেষতঃ বাতারা ভয়ানক উদ্ভ্রান্ত তাহাদের দমিত রাখা। অনেক ভবনই ছিল প্রায় বন্দীশালা এবং উদ্ভ্রান্ত রোগীকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইত। অতি ধীরে ধীরে এই দৃষ্টিকোণ দূর হইয়া রোগীর প্রতি মানবীয় সহানুভূতির ভাব আসিতে থাকে। ১৭৯২ সনে প্যারীর বেস্জে হাসপাতালের ৫০ জন উদ্ভ্রান্ত রোগীর শৃঙ্খল মুক্ত করা হয়—এই শৃঙ্খলগুলি ৩০ বৎসরের ব্যবধানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেখা গেল এরূপ নূতন ব্যবস্থার পাগলের পাগলামী কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। ইতালিতেও প্রায় এই সময় Viacenzo chiarugi উদ্ভ্রান্তকে 'বেডি' মুক্ত করিয়া দিল।

কোয়েকারণ ইংলণ্ডে এই বিষয়ে সংস্কার আনে—১৮১৩ সনে York Retreat স্থাপন করে—তাহারা 'উদ্ভ্রান্ত-অশ্রয়' বা 'পাগলা-গারদ' কথাগুলি একেবারে বর্জন করে। লৌচ-শৃঙ্খলের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়—রোগীদের জন্য কাজ ব্যায়াম ও নীতি উপদেশের প্রবর্তন করা হয়। ইংরেজ কোয়েকারণের সুনাম আমেরিকার ডাউটরা পড়ে এবং সেখানে পেমদেলহেলী ব্যার—১৮১৭ সনে Friends Asylum খোলা হয়—এখানে মানসিক রোগগ্রস্ত ত আর পত্তর মত নহে। যাহুযেব মতই ব্যবহার পাইত।

#### চিকিৎসার সূচল

দশ বৎসর পূর্বে কলাম্বী দেশে ভীল-এডওয়ার্ড নামক স্থানে প্রত্যেক মানসিক রোগগ্রস্তকে অন্ততঃ এক বৎসর হাসপাতালে

ধাকিতে হইত, এখন চারিয়াস থাকিলেই মুক্তি পায়। এই হাসপাতালে ১৯৪৮ সনে ৫৫০টি বেড ছিল, বৎসরে ১০০টি রোগী নেওয়া হইত—এখন স্থায়ী বেডের সংখ্যা ২৭০, বৎসরে ৬০০ নূতন রোগীর চিকিৎসা হয়। যে সকল রোগীকে অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য রাখা হইত তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৫০ হইতে কমিয়া ৭৫ বেড়াইয়াছে।

নিউইয়র্ক ষ্টেটে মানসিক হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা গত তিন বৎসরে বাড়িয়াছে শতকরা ১০ কিন্তু নিদাময়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২৩। কলম্বিয়া মানসিক রোগীর যেটি সংখ্যা ত্রাস পাইয়াছে—১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ সনে ৪৫০ জন এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে ১২০০ জন।

#### বর্তমান সমাজ ও মানসিক রোগ

বর্তমান কালে সমাজের প্রত্যেকেই নিজের মান বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত। অর্থোপার্জনেই মান সহজে বাড়ে। তাই অর্থ, আরও অর্থ, অর্থের পিছনে ছুটছুটি। যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জন। বাহার যথেষ্ট অর্থ নাই সেও লোককে—সমাজকে দেখাইতে চায় যে, সে অর্থবান। এই ঠাঁট বজায় রাখিবার জন্যই শেষ পর্যন্ত স্থান হয় মানসিক হাসপাতালে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এই ভুল পথে বেশ অগ্রসর হইয়াছে—আমরা সেবে পা দিয়াছি। ভারতের বহু রাষ্ট্র-নেতাগণ দেশকে বাতারাতি জীবনধারণ-মান বাড়াইবার নামে—ইউরোপ, আমেরিকার মত করিতে চান এবং যে পথে এই উন্নতি(?) আনিতে চান তাহার বিপদ ঘটতে পারে এ কথা বিস্মৃত হন। প্রাচীন ভারতের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে এবং পাশ্চাত্যের ভুল-ত্রুটি এড়াইয়া চলিলে আমাদের দেশে ব্যাধির জন্মের সাহিত মানসিক ব্যাধি দেখা দেবে না ইহাই আশা করা যায়।

#### বিশ্বশান্তি ও মানসিক ব্যাধি

সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি আনিতে হইলে প্রত্যেক দেশেরই উন্নতি দরকার। আর্থিক উন্নতি চাই, ব্যাধির জন্ম চাই—শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন ব্যাধির। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, জাতির প্রতি জাতির ঈর্ষা দূর করা প্রয়োজন। ব্যক্তি এবং জাতি নিজের অপরাধী মনোভাব ত্যজ এবং চেহ অবস্থা স্বতঃই অপর ব্যক্তি ও জাতির উপর আবেশ করে। ইহা হইতেই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং বিবাদ বিসংঘের সৃষ্টি হয়। বিশ্বশান্তির জন্যই বিশ্বমানবের সূচ মন এবং উদার মনের প্রয়োজন। চেষ্টা এবং সাধনা ব্যতী মনেও স্ব স্ব অর্জন করিতে হয় প্রাচীন ভারত তাহা জানিত। এই জন্যই ছিল তাহাদের 'বৈগ' ব্যবস্থা। ঐহিক সম্পদ ও অর্থ লোভে উদ্ভ্রান্ত বিশ্ব আজ 'চিত্তবৃত্তি নিরোধের' বাণী শুনিবে কি? অথচ বিশ্বশান্তি এই পথে।

## শশাঙ্ক পণ্ডিতের পাঠশালা

শ্রীসজলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাস্তব ছাড়িয়ে আরও মুঠোখানেক পথ, তবে চিনতে দেবী হয় না। বাস্তব ধারাই বাঁশের খুঁটিতে পেরেক দিয়ে মাথা টিনের সাইনবোর্ড। কালে আর জলে ধুয়ে গেছে তার রং। তীর চিহ্নটাও তাই চোখে পড়ে না। উৎসাহীজন হয় ত কাছে গিয়ে পড়ে নিতে চেষ্টা করে—তাও না পারলে গোটা ছুই কুঁই হয় ত নারে। পড়তে অশ্রুবিধা হলেও অস্পষ্টভাবে বোঝ যায় “কেতুপুর মাইনর স্কুল।”

বছর বর্ষেক পরে এ বাস্তব ধার যেতে যেতে সাইনবোর্ডটা আমায়ও চোখে পড়ল। কাছেও যেতে হ’ল না—কুঁও দিতে হ’ল না। হৃদে রক্তের পরে কালো সে লেখা—গুলো আভাও যেন বন্ধ বন্ধ করে ওঠে। মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—যেদিন ওটা টাঙানো হ’ল এখানে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার জগদ্বারচন্দ্র চক্রতি ওই সাইনবোর্ডের পাশের অশথ গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন। অশথ গাছটাও কি তখন এত বড়ো বড়ো দেখাত! কি জানি! আর ঐ যে বাঁহাতি বোপাটা—বনগাঁদার লোপ—ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন শশাঙ্ক পণ্ডিত। পণ্ডিত শশাঙ্কমোহন ভট্টাচার্য, স্বাভিবল্লভ, কাব্য-ব্যাকরণভীষ।

আজ্ঞে আশু কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পূন ধরে গেছে সাইনবোর্ডের বাঁশ। কালের বিরুদ্ধে কিছুই কববার নেই—না হলে পণ্ডিত হয় ত এটাকে কালজীর্ণও হতে দিতেন না। এর গায়ে এতটুকু ঝাঁড় স্ফা করতে পারতেন না শশাঙ্ক পণ্ডিত। সেদিনের কথাটাও মনে আছে। যত্ন—ওই যে ধর্মবাস মুখুজ্যের ছেলে—বাঁশের গায়ে ছবি দিয়ে কেটে কেটে নাম লিখেছিল যেদিন। তা পড়নি ত পড় একেবারে পণ্ডিতেরই চোখে। আর তা না পড়ার দোষই বা কি! রোজ ষাওয়া-আসার সময় একবার দাঁড়িয়ে পড়তেন পণ্ডিত ওখানে। আপন মনে কি যেন বিড় বিড় করে বকতেন। অচেনা লোক দেখলে ভাবত পণ্ডিত হয় ত পাঠশালাই খুঁজছেন। আর চেনা লোকে প্রথম প্রথম হয় ত অবাক হ’ত। নিকুঞ্জ পরামর্গিক একবার জিজ্ঞাসাও করেছিল—কি দেখেন গো পণ্ডিতমশাই অমন করে?

পণ্ডিত যেন মুম্বুচ্ছিলেন, নিকুঞ্জর কথায় হাঁস এল, বলেছিলেন—এ গাঁয়ের লোকগুলো কেমন ধারা হে নিকুঞ্জ?

এজ্ঞে...অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল নিকুঞ্জ।

বোকার মত চেয়ে আছে যে, তাখো ত খুঁটির গায়ে কেন গরু বৈধেছে—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দাড়ির ঘষা ঘষা দাগ।...

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল নিকুঞ্জ সেদিন। বাঁশের খুঁটির গায়ে দাড়ি বাঁধার দাগ দেখতে পায়—কৈ এমন কথা ত তার জানা ছিল না। মালুমটা কি একমের।

আর সেই খুঁটির গায়ে কি-না ছুঁদের দাগ। পাঠশালা হতে না হতে চেঁচা বেত নিয়ে পণ্ডিত এসেছিলেন। চিংকার করে ডেকেছিলেন—যত্ন, শোন এদিকে।

যত্ন আমাদের সঙ্গেই পড়ত, পণ্ডিতের ডাকে ঠাপতে ঠাপতে এগিয়ে গেল।

বাঁশের গায়ে ছবি দিয়ে নাম লেখা হয়েছে কেন?

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল যত্ন। কান ধরে নাড়া দিয়ে পণ্ডিত আবাব হুকার দিয়ে উঠেছিলেন—কেন লেখা হয়েছিল?

পেছন থেকে এক যেন বলে উঠেছিল—অমর হবে মাটার মশাই।

অমর—রাগের মাথায় কথাগুলো বিকৃত হয়ে বেরিয়েছিল পণ্ডিতের দল দিয়ে। তার পর সুরু করেছিলেন মার। ওঃ সে কি মার! আজও যেন সেদিনের কথা মনে পড়ে।

তা কোথায় গেল সেই নিকুঞ্জ পরামর্গিক, কোথায় গেল ধর্মবাস মুখুজ্যের ছেলে যত্ন মুখুজ্য আর বাঁশের খুঁটির বন্ধুকানি চেঁহাব। পূন ধরেছে, রূপ পার্টেছে, কি ছিল কি হয়ে গেছে! আর কি হয়ে গেল শশাঙ্ক পণ্ডিত আর তার পাঠশালা।

বাস্তব ধারে দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি শশাঙ্ক পণ্ডিতের কথা। শশাঙ্ক পণ্ডিতের সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে আসছি। চলেছিলাম বাড়ীর দিকে, কিন্তু সাইনবোর্ডটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি হবে আর ওটা রেখে? পাঠশালাটা আর টিকল না বোধ হয়, শশাঙ্ক পণ্ডিত আর পণ্ডিত থাকবেন না। তবে ওটা আর থাকে কেন? কাছে গিয়ে একটানে ভেঙ্গে ফেললাম ওটাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জঙ্গলের মধ্যে। মনে আছে খুঁটিটা আমিই কেটে এনে বসিয়েছিলাম এখানে। আর আজ এতদিন পরে আমাকেই ভুলতে হ’ল।

কটিকারী আর কালকাস্তুরের ঝোপটা নড়েছে এখনও, নড়ুক। পা বাড়লাম বাড়ীর দিকে।

আজ এ গল্প লিখতে বসে বারবার মনে হয়েছে—এ গল্প হয়ত অনেককে খুশী করতে পারবে না। এত আর ছেলেমেয়ের মন-দেওয়া-নেওয়ার গল্প নয়। এক গম্ভীর রাসভারী পণ্ডিতের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে যাকে আমি চিনেছিলাম তারই কথা। বারবার সন্দেহ জেগেছে, তুমি লিখেছি আর ছিঁড়েছি, কৈ পাইনি ত তাকে খুঁজে। হারিয়ে গেছে বারবার, তবু আবার লিখেছি। ভুল হয়নি ত ?

তা শশাঙ্ক পণ্ডিতকে আর ভুলব কেমন করে। ছেলেবেলার সব কুড়িয়ে নেওয়া মনে পণ্ডিতের বৃত্তি যেন চিরস্থায়ী ভাবে জাঁকায় হয়ে গেছে। শশাঙ্ক পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে কত গুল, কলেজ ঘুরে এলাম কিন্তু আজও শিক্ষকের কথা উঠলে শশাঙ্ক পণ্ডিতের কথাই যেন সবচেয়ে আগে মনে আসে।

মনে আছে শশাঙ্ক পণ্ডিতের ও পাঠশালা যখন প্রথম বসে, শশাঙ্ক পাণ্ডিতের বাপ মৃগাক পণ্ডিত শিষ্য যজ্ঞমান নিয়েই বাস্তব থাকতেন। শশাঙ্ক পণ্ডিতকেও সঙ্গে নিতেন মাঝে মাঝে। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতেও সত্যনাথায়ণ পূজা, লক্ষ্মী পূজা, মাকাল পূজাতে অনেকদিন শশাঙ্ক পণ্ডিতকে দেখেছি। চাপা কুলের মত রঙ, গায়ে নামাবলী দ্বিগ্নে মটকান কাপড় পরে পূজা করতে আসতেন পণ্ডিত। সুব করে ব্রতকথা শোনাতেন। গাঁয়ের লোকেরে, বিশেষ করে বৌ-বিয়েরের ত শশাঙ্ক পণ্ডিতের কাছে ব্রতকথা না শুনে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় তাকে না পেলে ব্রতে একটা খুঁতই থেকে যেত। ঠাকুরঘরের দরজার কাছে ছোট্ট একটা জল-চৌকীর উপর তালপাতার পুঁথি বেধে পড়তেন পণ্ডিতমশাই। ছেলেবেলায় শোনা সে সুব, সব কথা হয়ত মনে নেই। তবু দু'এক লাইন যা মনে আছে তা যেন ভোলাব নয়। সত্যনাথায়ণের পাচালী পড়তেন পণ্ডিত ত্রিগদীর ছন্দে—

“আমার কিকর, দুই সন্ধ্যার বন্দী রাখ কি কারণে।

প্রাণ রক্ষা চাও, হয়ে ছাড়ি দাঁও, সপ্ততরী পুদি’ ধনে ॥

হয় চমৎকার, সুবধ রাজার, পাত্রমনে বিচারিয়া।

সন্ধ্যায়ের আনি কহে স্ততি বানী, বসন-ভূষণ দিয়া ॥

ত্রিগদী ছেড়ে শেষে দীর্ঘ ত্রিগদী ধরতেন পণ্ডিত—

না জানি কি কৈহু পাপ, কেবা দিল ব্রহ্মশাপ ; বিবাদ সাধিল

কোন দ্বেবে।

পতিব্রতা ধনাপতি, অস্ত্র নাহি তার গতি মোরে নাথ

সংহতি করিবে ॥

আচম্বিতে বজ্রাঘাত, হারাইলু প্রাণনাথ, বিধবার জীবন

বিবল।

কহে পিতা-মাতা আগে, অভাগী বিদায় মাগে, কুণ্ড কাটি

জালহ অনল ॥

মেয়েরা চোখ মুছত বারবার, বুড়ীরা শুনতে শুনতে ক্রিমিয়ে পড়ত, রাত গড়িয়ে যেত, পণ্ডিত তখন নিবিকার চিন্তে পড়ে যেতেন...

যখন গেল প্রাণনাথ সেইখানে যাব সাথ, কোন লাঞ্জে

রহিব ভবনে।

নিশ্চয় সাধুর স্তুতি হইবেন অঙ্গমুতা, হেনকালে

দেববাণী শুনে ॥

পতির আনন্দ ভুলি, প্রসাদ ভূমিতে কেলি, এখন হইছ

অঙ্গমুতা।

পতির জীবন চাও, প্রসাদ ভুলিছ; ষাও, সত্য বটে—

বলে সাধুমুতা ॥

তা সে পুরুতগিরি ছেড়ে দিলেন পণ্ডিত। বাপ-ছেলের মধ্যে মন কষাকষি চলল কতদিন। গাঁয়ে বেরুনই মুন্সিল হয়ে পড়ল পণ্ডিতের। মৃগাক পণ্ডিত গাঁ এক করে ফেলেছেন একেবারে ছেলের কথা প্রচার করে। কি, না শশাঙ্ক পণ্ডিত আর পুরুতগিরি করবেন না, পাঠশালা খুলবেন। এক গাঁ শিষ্য-যজ্ঞমান থাকতে এ খেয়াল কেন বাপু ?

পাড়ার বৌ-বিবাস ত বর পয়স্তু ধাওয়া করল। হরি চাটুজ্যের বোঁত কেঁদেই ফেলেছিল—কি হবে বাবা, একলা পণ্ডিতমশাই বুড়োবয়সে ক'বর সামলাবেন। শেষটায় কি আমাদের কুল-পুরোহিত ছাড়তে হবে।

সত্যি সে সব কথা ভাবলে এখন কেমন যেন লাগে, বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না। একটা পুরোহিতের বৃত্তি ত্যাগে কত লোকই না ভেবে মরেছিল। কুল-পুরোহিত ত্যাগ সে ত তখনকার দিনে দুটো চাড়ি কথা নয়। আর এখন সম্ভা সুবিধে পলে কুলগুরু ত্যাগেও.....যাক্গে সে কথা।

শেষ পয়স্তু পাঠশালাই বসালেন পণ্ডিত। আগে ঠাকুরদালানে বসত পাঠশালা। তার পরে ভগবতায়ণ চক্কি যেবার ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হলেন সেবার একটা চালা ভুলে দিলেন বাড়ী-লাগোয়া। একটা মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিলেন। শিষ্য ছিলেন ত মৃগাক পণ্ডিতের তাই বোধ হয়, যা হোক আরও অনেক ব্যবস্থাও করলেন তিনি। নাম দিলেন একটা পাঠশালা—‘কেতুপুর মাইনর স্কুল’। সেই নামের সাইনবোর্ড লিখিয়ে আনা হ’ল জংশন বাজার থেকে। ঝাঁপ কেটে এনেছিলাম আমি আর ভূতো। তা ঝাঁপ কি



আর দেয় পাঁচ সত্কার। কি কুপণই না ছিল লোকটা। ষষ্ঠী দিন দাঁড়িয়ে থাকত বাশতলায় পাছে কেউ পাতা ছেঁড়, কণ্ঠি ভাঙে বলে। তা কোথায় গেল পাঁচ সত্কার আর তার পাকা খাড়ে ভতি বাশবাগান। যুদ্ধের সময় গোরা-পন্টনের ছাউনি তৈরি করতে, ব্যারাক ঘিরতে সব বাশ জোর করে নিয়ে গেল... ..

হ্যাঁ বা বলছিলাম। ঐ একটা ঘোষ আমার, এক কথা লিখতে বসে আর এক কথা লিখি। তা সেই যুদ্ধের বাজারেও পাঠশালা বন্ধ করেন নি পণ্ডিত। ছেলে বরং বেড়েই গিয়েছিল পাঠশালায়। যুদ্ধের ভয়ে শহর ছেড়ে গায়ে এসে জড়ো হতে লাগল লোক। দু'চাব মাপ থাকতে হবে কি তার বেশীও। ছেলেগুলো আর বাঁধব হয়ে ঘুর বেড়ায় কেন? পাঠশালায় আটকও ত থাকবে, যতক্ষণ থাকে নিশ্চিন্তি। সব সময় "গেল গেল" করতে হবে না। তা ছাড়া পণ্ডিতের বিজ্ঞও ত কম নয়, ইংরেজী লিখতে-পড়তে জানে। সংস্কৃত ছাড়া পাশ, স্বাতন্ত্র্য আবার কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ। ভাল না হলেও ধারাপ ত হবে না।

আমরা তখন পাঠশালা ছেড়ে তিন মাইল দূরের হাই-স্কুলে পড়ি। সকালে বাঙলার সময় দেখতাম কোনদিন অঙ্ক কষাচ্ছেন, গুণকরীর আর্থা পড়াচ্ছেন, কোন কোন দিন আবার শ্লোকও লেখাতেন—

চন্দ্রনি ধাপিনং হস্তি, বস্ত্রোবর্হতি কুঞ্জরীম

কেশব চমৌরং হস্তি...

ধমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম এক একদিন। কি সুন্দর লাগত শলাক পণ্ডিতের আবৃত্তি। এতটুকু জড়তা নেই, অশ্লীলতা নেই। পণ্ডিত বংশেই জন্ম বটে, আর পড়ানোর নিয়মই বা কি? আবৃত্তি, প্রতিলিখা আর ব্যাকরণ এক সঙ্গেই শেখাতেন উনি। ভাবতাম, এ মাধুর্য আর বিচার বোধ ত আগে পাই নি। তখন "দীপিনং" আর "চমৌরং" বানান অশুদ্ধ হওয়ার ভয়ে সুর বেশুরে লাগত। কাঁপতে কাঁপতে প্লেট এগিয়ে দিতাম।

মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখাও হয়ে যেত। হয় ত ডাকতেন এক আধ দিন—ওহে, কি নাম যেন তোমার?

নামটা বলতাম, বলতে হ'ত প্রায়ই, নাম মনে থাকত না পণ্ডিতের। নাম শুনে পণ্ডিত লজ্জিতই হতেন—এই ছাড়া, তুমি ওই চাটুজ্যেদের বাড়ীর...তা কোন ক্লাস হ'ল?

একই ক্লাসে উঠে অনেকবার হয় ত বলেছি, তবু আবার বলতে হ'ত—এবার—

ক্লাস টেনে উঠেও পণ্ডিতের মুখেও দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারিনি কোনদিন।

তার পর কত বছর গেছে, স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়তে

এসেছি কলকাতায়। মাঝে মধ্যে বাড়ী গেছি। "কেতুপুর মাইনের স্কুল"-এর সাইনবোর্ডটা ব্যবহার চোখে পড়েছে যাওয়ার আগার পথের ধারে। দেখেছি যুগোথানেক পথ পেরিয়ে গাছপালার কাঁক দিয়ে ছিকে বেরিয়ে আসা পাঠশালার টুকরো টুকরো ছবি, নুতনও কিছুই পাইনি তার মধ্যে। কেতুপুর গ্রামে পাঠশালা একটা চিরকাল আছে। চিরকাল সেখানে শলাক পণ্ডিত বলে একজন মাষ্টার আছেন। এ দুয়ের সঙ্গে অচেনা লোকের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্ত আছে এক সাইনবোর্ড। এ যেন আবহমান কাল থেকে আছে। নিজের অস্তিত্বের কথা ব্যবহার জানায় না অথচ সে না থাকলে কি যেন থাকবে না একটা, একটা নেই নেই তাব হবে।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। ছাত্রজীবন শেষ করে সংসার-জীবনে পাড়ি দিয়েছি। স্থিতিহীন এক চাকরির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এই বর্ষ বছর ছন্দছাড়া হয়ে ঘুর বেড়িয়েছি। হঠাৎ কাল বর্ষ বছর পরে আবার পা দিয়েছি এখানে। হঠাৎ আর বলি কি করে। এমন করেই ত চিরকাল যুগলাম। আজ রাতে ঠিক নেই কাল কোথায় যাব। বজ্রবাক্য আত্মীয় স্বজনদের কাছে একসঙ্গে গিৎকার ছাড়া পুরস্কার আর পাইনে কোনদিন, তবু এ আকস্মিকতার মোহ আমার গেল না।

হাটের দিকে গিয়েছিলাম সকালে। দেখা হয়ে গেল পণ্ডিতের সঙ্গে। পায়ের ধূলা নিলাম। পরিচয়ও দিতে হ'ল নিজের। চিরকালের মত আলও পণ্ডিত ভুলে গেছেন আমার পরিচয়। ঠিক তেমনই আছেন পণ্ডিত, শুধু একটু বুড়ো হয়েছেন এই যা। সেই বড় বলিষ্ঠ, ঋজু চেহারা। নতুনের মধ্যে কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি পণ্ডিতের। তাও হয় ত এমনটা লাগল অনেকদিন পরে দেখা বলে। চলে আসছিলাম, পণ্ডিতই ডাকলেন, একথা-দেকথা বলতে বলতে শেষে বললেন—পাঠশালাটা তুলে দিচ্ছি বাবা।

তুলে দিচ্ছেন পাঠশালা?—বিস্মিত হয়ে তাকালাম পণ্ডিতের দিকে। সব বললেন তার পরে, তাকিয়েছিলাম পণ্ডিতের দিকে। ধরু ধরু করে কাঁপছিলেন রাগে না ক্রোধে জানি না। শেষে চোখ মুছলেন কাঁচার খুঁটে। এতদিন পণ্ডিতকে কাঁদাতেই দেখেছি আর আজ দেখলাম কাঁদতে। কেন কি ঘোষ ছিল পণ্ডিতের।

সত্যিই ত ঘোষ দেওয়া যায় না পণ্ডিতকে। রাস্তা দিয়ে সেই কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরছিলাম। ঘোষ যদি হয়ে থাকে ত সেকালের যুগের। আবার কালেরই বা ঘোষ বলি কেন। সব কপালের ফের।

তা ঘোষ পণ্ডিতের কপালেরই বটে। যুগ পাঠাচ্ছে,

সব পুরনো জিনিস গেল, নতুন যুগের সঙ্গে ভাল ফেলে চলতে পারেন নি পণ্ডিত, তিনি ত বাবেনই।

কথাটা হাটবারেই কানে উঠেছিল প্রথম। ছোট্ট কথা, তাও আবার মহেন্দ্র মিত্তিরের। বারো রাজ্যের খবর ঐ একটা লোকের কাছে। পণ্ডিত গিয়েছিলেন হাটে, মহেন্দ্র মিত্তিরই বলেছিলেন—বলি ওহে পণ্ডিত, তোমার সংস্কৃত ত গেল এবার। ওটা ডেড ল্যাংগুয়েজ হয়ে গেছে বুকে। মৃতভাষা, হিন্দী পড়াতে হবে এবার থেকে।

শশাঙ্ক পণ্ডিত হেসেছিলেন সেদিন। মৃতভাষা! সংস্কৃত মৃত ভাষাই বটে। অশিক্ষিতদের কাছে দেবভাষা, রাজ-ভাষার কদর এই বটে। বুঝবে কি ওরা! মনে মনে আকৃতি করেছিলেন—

দূর্বাদয়শ্চক্রনিভস্তথা তমাল তালী বনরাজিনীলা  
আভাতি বেলা লবণাঘুগ্ধে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখাঃ।

কি বুঝবে ওরা এর মর্ম। আশ্রয়প্রসাদের হাসি হাসলেন তিনি। হাসবেনই ত, তখন কি জানতেন তার ভাগ্যের কথা। না হ'লে মিত্তির মশায়ের ছোট্ট কথা আজ এত বড় গ্রহ হয়ে দেখা দেবে কেন তার জীবনে?

সত্যিই ছেলে-কমা শুরু হ'ল পাঠশালায়। তিন মাইল দূরের হাটস্থলে ইংরেজী, হিন্দি, বাংলার ক্লাসে ছেলে আর জায়গা পায় না। তবু পাঠশালাটা টিকে ত ছিল। কুড়কায় হলেও অস্তিত্বটা ত ছিল।

বছরখানেক বাদে আবার এক হাটবারে মহেন্দ্র মিত্তিরের সঙ্গে দেখা, হাঁক পাড়েন মিত্তির—বলি ও পণ্ডিত, তোমার শুভঙ্করীও গেল।

কি রকম?—পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তা কি জানি, শুনছি নতুন রকমের টাকা হবে। একশ' পয়সায় টাকা।

হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, এরপর একদিন বলবে : পণ্ডিত ছ'য়ে আর ছ'য়ে তিন হবে, আঠার মাসে বছর হবে, চোত্তির মাসে বছরের শেষ নয়, শুরু হবে—হাসতে হাসতেই বলেছিলেন কথাগুলো। তা হাসিরই ত কথা, শুভঙ্করী থাকবে না অঙ্কশাস্ত্র থাকবে, এও কি হয়। শুভঙ্করী কি আজকের, সেই কবে পড়েছিলেন তিনি। শুধু তিনি কেন তাঁর পিতামহ প্রপিতামহ, সকলেই। ও ত শিক্ষার অঙ্গই হয়ে গেছে।

সেই প্রতি বত ভজা হইবেক দর,  
তজা প্রতি এক আনা ছটাকতে ধর।

তারপর,

কুড়বো কুড়বো কুড়বো লিভো  
কাঠায় কাঠায় কাঠায় লিভো

এ সব থাকবে না অথচ শিক্ষা থাকবে, অঙ্কশাস্ত্র থাকবে, তা কেমন করে হয়! শাস্ত্রের বিধান ত আর পরিবর্তনশীল নয়। মিত্তিরের কথাই ওরকম। বার রাজ্যের কথা শুনে একটার ঝড়ে আরেকটা চাপিয়েছেন হয়ত।

কিন্তু না, মিত্তিরের কথাই ঠিক হ'ল। একশ' নতুন পরমাতেই টাকা হবে এবার থেকে। মিত্তিরই খবরটা দিয়ে গেলেন এসে। বললেন, দেখলে ত পণ্ডিত, আমার কথায় তোমার পেত্রয় হ'ল না তখন। তা বিশ্বাসই কি আমায়ও হয়েছিল পণ্ডিত যে, চোত্তির মাসে বছর শুরু হবে!

তাও হচ্ছে নাকি?—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন পণ্ডিত।

হচ্ছে নাকি মানে। সামনের বছর থেকে চোত্তির মাসে বছর শুরু হবে—গড়গড় করে বলে গিয়েছিলেন মিত্তির।

গেল, গেল, গেল। সব গেল, ভাষা গেল, অঙ্কশাস্ত্র গেল সময়ের হিসাবে গেল। বইল কি আর বাকি। তবু ত পাঠশালাটা ছিল এত দিন। ছ'চারটে ছেলে নিয়ে চলে ত যেত, কিন্তু আর পারলেন না পণ্ডিত, নতুন হাটে নতুন কথা আবার শুনলেন পণ্ডিত—ওজন পান্টাচ্ছে। দশমিক প্রথায় এবার থেকে ওজন হবে। এবার আর মিত্তির নয় খবরের কাগজ থেকে নিজেই পড়লেন। একবার নয়, ছ'বার নয় বার বার। এতদিনের পাঠশালাটা তাহলে গেলই এবার সত্যি সত্যি। জোড়া দিয়ে দিয়ে আর কতদিন চালাবেন তিনি। তুলেই দেবেন এবার পণ্ডিত; যুগাঙ্ক পণ্ডিত কত নিষেধ করেছিলেন পাঠশালা করার জন্তে। কত নিষেধ করেছিল হরি চাটুজ্যের বউ, আর পাড়ার অজ্ঞ বউ-কিয়েরা। সেদিন শোনে নি কারো নিষেধ। আর আজ কারো নিষেধ নেই অথচ তুলে দিতে হ'ল, তার আর দোষ কি?

যুগাঙ্ক ভট্টাচার্যের ছেলে শশাঙ্ক পণ্ডিত আবার পুরুতগিরি করবেন। লক্ষ্মীপুজায় আর ব্রতকথার ব্রাহ্মণ ভোজনে আবার তার ডাক পড়বে। আবার সত্যনারায়ণের পাঁচালী পড়বেন পণ্ডিত ত্রিগদীর্ঘ ছন্দে—

আমার কিঙ্কর, দুই সধাগর, বন্দী রাধ কি কারণে।

প্রাণ বক্ষা চাও, দুয়ে ছাড়ি দাও, সপ্ততরী পুরি ধনে।

হয় চমৎকার, সুরধ-রাজার, পাত্রসনে বিচারিয়া।

সধাগরে আসি, কহে স্ততি বাণী, বসন-ভূষণ দিয়া।

ত্রিগদী ছেড়ে আবার দীর্ঘ ত্রিগদী ধরবেন—

না জানি কি কৈলু পাপ,  
বিবাহ সাধিল কোন দোষে ।  
পতিব্রতা বিনাপতি,  
মোরে নাথ সংহতি করিবে ॥  
আচরিতে সজাযাত,  
বিধবার জীবন বিফল ।

কহে পিতামাতা আগে,  
কুণ্ড কাটি আলহ অনল ॥

মেয়েরা চোখ মুছবে বার বার । বুড়ীরা শুনতে শুনতে  
ঝিমিয়ে পড়বে । রাত গড়িয়ে যাবে প্রথম প্রহর থেকে  
দ্বিতীয় প্রহরের দিকে । পণ্ডিত তখনও নিবিকার চিত্তে  
পড়ে চলবেন—দীর্ঘ ত্রিপিদীর মধুময় ছন্দে ..

## শঙ্কর-মতে “সাধন” : কর্ম

ডাক্তার শ্রীমা চৌধুরী

২

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্কর-মতে, জ্ঞান যে কর্মজ্ঞ নয়, কর্ম যে  
মোক্ষের সাধন নয়, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে ।  
এই সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে ।

শঙ্কর বলেছেন যে :

বস্তুতঃ, স্বয়ং জ্ঞানকেই ‘বিদিক্রিয়াক্রম’ কর্ম, ‘জ্ঞান’ এই  
কর্ম বলে গ্রহণ করা চলে না । এবং বলা চলে না যে, এই  
ভাবে ব্রহ্ম কর্মলভ্য । কারণ, ব্রহ্ম অবিষয় বলে, ‘বিদিক্রিয়া’ বা ‘জ্ঞান’ বিষয়ও তিনি নন । বস্তুতঃ, জীব ব্রহ্মকে  
জানেন না, কারণ জীবই ত স্বয়ং ব্রহ্ম । শেষ্ঠা মুক্তির  
সাধক ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের জ্ঞান নয়, ব্রহ্মের জ্ঞানের  
আবশ্যক অজ্ঞানের অপসারণকেই মাত্র অর্থাৎ, এরূপ জ্ঞান  
সম্বন্ধক ব্রহ্মজ্ঞান নয়, নঞর্থক মিথ্যাজ্ঞান স্বেপ-কারক ।  
সাধারণতঃ, অংশ ব্রহ্মজ্ঞানকে সম্বন্ধক ব্রহ্মবিষয়ক বলে  
গ্রহণ করা হলেও, বাস্তবপক্ষে, তা নঞর্থক দেহাত্ম  
ভ্রমাদিনিবাস-বিষয়ক । শেষ্ঠা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃতরূপ এই  
নয় : ‘ব্রহ্মই আত্মা’ ; এর প্রকৃত রূপ এই : ‘আত্মা দেহ  
নয় ।’ আত্মা যে দেহ নয় এই নঞর্থক জ্ঞান হলেই, আত্মা  
ব্রহ্ম হন, অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মরূপকে উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মকে  
জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বতন্ত্রভাবে জানবার তাঁর আর সুযোগ বা  
অবকাশই থাকে না । বস্তুতঃ, ‘জ্ঞান’ অর্থই হ’ল যে,  
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুটি স্বতন্ত্র বস্তু । মানস প্রত্যক্ষের (Intros-  
pection-র) ক্ষেত্রে অবশ্য বলা হয় যে, চিত্ত নিজেই নিজেকে  
জানে ; অর্থাৎ চিত্ত তার একটি চিত্তবৃত্তিকে জানে । কিন্তু  
চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে প্রভেদ, ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে  
সেই প্রভেদটুকুও নেই । অতএব আত্মা ব্রহ্মকে জানবে

কি করে ? এমন কি “তত্ত্বমসি” (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬-৮-৭)  
প্রমুখ সম্বন্ধক বাক্যও ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হয়ে পড়েন না ।  
এ হলেও, ‘তৎ’ ও ‘ইমং’, ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব উপলব্ধির  
পরের ব্যাপসাদর্শই হ’ল এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ ।  
এরূপে, এমন কি জ্ঞানও মোক্ষের কারণ নয়, অজ্ঞান-  
বিনাশেরই কারণমাত্র, এবং মোক্ষ অজ্ঞানবিনাশ ব্যতীত  
অপর কিছুই নয়, যেহেতু, শঙ্কর যা বারংবার বলেছেন,  
অজ্ঞানবিনাশ হলেই হয় নিত্যাদি ব্রহ্ম বা মোক্ষের  
প্রকাশ ।

একটি তুলনার উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে, যোগ-  
সূত্রেও এই একই ভাবের কথা আছে :

“নাশ দর্শনং মোক্ষকারণং, অদর্শনাতাব্যব বন্ধাভাবঃ,  
স মোক্ষঃ ইতি । দর্শনশ্চ ভাবে বন্ধকারণস্তাদর্শনশ্চ নাশ  
ইত্যন্তো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্ ।” (যোগসূত্র ১-২৩) ।

অর্থাৎ, দর্শন বা জ্ঞান মোক্ষকারণ নয় ; বরং অদর্শন বা  
অজ্ঞানের অভাব থেকেই বন্ধের অভাব হয়, এবং এরূপ  
বন্ধাভাবই মোক্ষ । দর্শন বা জ্ঞান হলে, বন্ধের কারণ অদর্শন  
বা অজ্ঞানের বিনাশ হয়—এই অর্থেই কেবল দর্শন বা  
জ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলা হয়েছে ।

এরূপে, বেদান্ত ও সাংখ্য-যোগ মতানুসারে মুক্তি-প্রণালী  
এইরূপ :

জ্ঞান থেকে অজ্ঞান বিনাশ, তা থেকে বন্ধ-বিনাশ, তা  
থেকে মোক্ষ ।

অর্থাৎ, মোক্ষ যে কেবল কর্মরূপ কারণেরই কার্য নয়,  
তাই নয় ; মোক্ষ জ্ঞানরূপ কারণেরও কার্য নয় ; কোন  
কারণেরই কার্য নয় ; কিন্তু নিত্য ।

অতএব, সিদ্ধান্ত করা চলে যে, জ্ঞান বিষয়, জ্ঞানেরও বিষয় নন, জ্ঞানরূপ ক্রিয়াও বিষয় নন, কর্ম দ্বারা লভ্য নন, কর্ম মোক্ষের সাধন নয়।

সমুদয়ঃ উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কারপ্রযুক্ত চতুর্বিধ কর্মের কোনটিই মোক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, মোক্ষ উৎপাদ, বিকার্য, পাপুণ্য ও সংস্কার্য কোনটিই নয়। এ বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে।

একপদে সিদ্ধান্ত কবোচনঃ

"অতঃপর মোক্ষ প্রতি ক্রিয়াশূন্যত্বাদঃ" ন শকাৎ কেনচিদংশিতুং তস্মৈ জ্ঞানমকং মুক্তা ক্রিয়ায়া গন্ধ মাস্মাতুং" (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ১১৪)।

অর্থাৎ মোক্ষ যদি উপর উক্ত চতুর্বিধ কর্মের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে অত্র কান প্রকারেই মোক্ষে ক্রিয়াশূন্যত্বের পূর্ণ দৃষ্টান্ত পাবা যাবেন, অর্থাৎ, অত্র কোন প্রকারেই মোক্ষ কর্ম দ্বারা লভ্য বলে প্রমাণিত করা যাবে না। সজ্ঞা, মোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়া গন্ধমাত্র প্রাপ্য অযুক্তিক

যাহকঃ পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানের অবিসংসার ও, জ্ঞানশূন্যত্বজ্ঞানবিনাশ এবং অজ্ঞানবিনাশই মোক্ষ বলে জ্ঞানশূন্যত্বের অর্থ মোক্ষের সাধনরূপ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানশূন্যত্ব "মানসী ক্রিয়া", এবং সেই দিক থেকে মোক্ষ ক্রিয়ায় জ্ঞান আছে—এ বুদ্ধির গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত প্রসঙ্গপক্ষে মানসী ক্রিয়া নয়, —জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্পর্কে পদার্থবিদ্যে ও সমস্ত পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে।

"ননু জ্ঞান নাম মানসী ক্রিয়া ন, বৈলক্ষণ্যং" "ক্রিয়া হি নাসা যত্র বস্তুস্বরূপনিবপেক্ষেব চোত্তরে, পুরুষ চিত্ত ব্যাপারগামী চ" (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১১৫)।

প্রথমতঃ, ক্রিয়া বস্তুস্বরূপ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ ক্রিয়ার লক্ষ্য একটি পূর্বসিদ্ধি বা লক্ষ্যমান বস্তু নয়, একটি ভাবী, প্রাপ্তব্য লক্ষ্য। কেবল তাই নয়, ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, বিহিত বস্তুটিই সেই কর্মের লক্ষ্য বস্তু বা বিষয় অপেক্ষে বহুস্তর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমনঃ "গ্রামে গমন কর" — এই ক্রিয়ার স্থলে 'গমন' প্রধান কথা, গ্রাম বা গ্রামস্বরূপ নয়। দেবতাকে ধ্যান করিঃ অর্পণই প্রধান কথা, দেবতার স্বরূপ নয়। "ভামতী" টীকাতেও বাচস্পতি মিশ্র ব লছেন :

"দেবতা সম্প্রদানক হবিগ্রহণে দেবতা-বস্তুস্বরূপানপেক্ষা দেবতা-ধ্যান ক্রিয়া" (ভামতী ১-১৪)।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রিয়া চোদনা-তত্ত্ব। অর্থাৎ, 'এই কর' এরূপ চোদনা, আজ্ঞা বা নির্দেশের অধীন।

তৃতীয়তঃ ক্রিয়া পুরুষ তত্ত্ব বা পুরুষ-চিত্ত-ব্যাপারগামী। অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপেই কর্তার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। কর্তা ক্রিয়াটি করতেও পারেন, না করতেও পারেন, নানাভাবে করতেও পারেন।

কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথমতঃ জ্ঞান বস্তু-তত্ত্ব। অর্থাৎ, একটি পূর্বসিদ্ধি, বস্তুগত বস্তুর অজ্ঞানাবরণ বিনাশ করে, বস্তুস্বরূপেই দৃষ্টান্ত করে, সজ্ঞা এই জ্ঞান ক্রিয়ার সাহায্য কানও কিছু সৃষ্টি করেন। (১ঃ ২৪৮)।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান চোদনাতত্ত্ব নয় অর্থাৎ, বস্তুর অধীন বলে চোদন আজ্ঞা, বৈ নির্দেশের অধীন নয়, যেহেতু যা পূর্বে বস্তু আছে তাই বস্তু ক্রিয়া করে না, বা করান যায় না।

তৃতীয়তঃ জ্ঞান পুরুষ তত্ত্ব নয়

সংস্কৃত শব্দ সিদ্ধান্ত করেছেন যে :

"তস্মান্ন নসত্ত্বোপ জ্ঞানন্ত মহৎ বৈলক্ষণ্যম্।"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১১-৪)।

অর্থাৎ জ্ঞান পুরুষ তত্ত্ব হ'লেও, কিন্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন

"তত্ত্বোপ সত্ত্বি, যদভূতব্রহ্মাব্যবয়মপি জ্ঞানং ন চোদনাতত্ত্বম্" (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১১৫)।

এইভাবে যথ্য ভূত বা পূর্বসিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান-বস্তুর অধীন নির্দেশের অধীন নয়

উপম দ্বিঃ সজ্ঞা বলাছেন য, যখন সূতীক জুবেও প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ হ'লে, সাপ লিঙ্ক রূপ বিধি-বৈধি থাকলে ব্রহ্ম-বাক্যের ক্ষেত্রে তা শাক্তহীন বা নির্বাক

দৃষ্টান্তস্বরূপ, "আত্ম না অরে দ্রষ্টব্যঃ"। ব্রহ্মবাদ্যকোপ নিষদ্ব ২৪৫ এই সূত্রখ্যাত বৈশিষ্ট্যলব্ধ উপনিষদ্ব মন্ত্রটি শব্দে গ্রহণ করেছেন। এটি বৈশিষ্ট্যগামি বচনানি বা আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যলব্ধ বাক্য বহুস্তরীয় অজ্ঞ জীবকে অন্তর্মুখীন হ'লে কেবল নির্দেশ দেয়। বাহিরের ইঞ্জিয় ভোগা জীবিক বস্তু কানদিনই মানবকে প্রকৃত মুক্তি ও আনন্দ দান করে না। সজ্ঞা, সেই সকল বস্তু ভোগ করিয়ে, আত্ম দর্শনে উৎসাহ করাই এই সকল তথা কথিত বৈশিষ্ট্যলব্ধ বাক্যের উদ্দেশ্য—এই হ'লে ব্রহ্ম বা মোক্ষ কমাড় ও ক্রিয়ালভ্য হয়ে পড়েন।

নবমতঃ, কেবল বস্তুতত্ত্ব, বিধিবিহীন বাক্যও যে নির্বাক, এ কথাও বলা যায় না। কমক'ওই দাশমোয় প্রভৃতি শব্দে যে সকল ব্রহ্মাদি বিষয়ক ও বিধিবিহীন বাক্যাদি আছে, তা কি নির্বাক? বেদান্তেও একপদ বস্তু-তত্ত্ব ও

ব্রহ্মাত্মরূপ-বোধক যে সকল বাক্যাদি আছে, সেই সকল বাক্যাদি জীবের অজ্ঞান-নিবারণ করে। তার সাংসারিত্ব বিনাশ ও মুক্তি সাধন করে। (পৃঃ ২০২)।

দশমতঃ, একমাত্র ক্রিয়াই যদি ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র উভয়েই মূল কথা হয়, তা হ'লে এই সকল শাস্ত্রে 'নিষেধের' স্থান কই? 'বিধির' অর্থ ক্রিয়া বা প্রযুক্তি, 'নিষেধের' অর্থ ক্রিয়ার অভাব বা নিবৃত্তি। যেমন, 'ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ।' এ স্থলে, ক্রিয়া বা কর্মের নিষেধ নেই, তার বিপরীত বা কর্মভাবেরই নিষেধ আছে।

এরূপে নানা দৃষ্টি থেকে, যুক্তি সহকারে অংলোচনা করে 'কর' উপদের দশটি প্রধান প্রমাণ দিয়ে তাঁর ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাধারণ সাকামকর্ম এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট বা বেদের কর্ম-কাণ্ড-বিহিত, যাগ-যজ্ঞ দানাদিরূপ সাকামকর্ম মোক্ষের সাধন নয়, এবং বন্ধ বা জন্ম-প্রযুক্তবেরই কারণ। ব্রহ্মই মোক্ষ। সেজন্য শাস্ত্র, নিত্য-সত্য, নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্ম বা মোক্ষ কর্ম, বা জ্ঞান, বা ভক্তি, বা অন্ত কোন কারণের কার্য নন; অথচ তাঁর অস্তিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য।

"ন হি অহং প্রত্যয় বিবদ-কৃত্ব্যভিরেকেন তৎসাক্ষী সর্বভূতহঃ সন্ একঃ কুটস্থনিত্যঃ পুরুষো বিধি-কাণ্ডে তর্ক-

সম্বারে বা কেনচিৎপ্রসিদ্ধঃ সর্বভূতহঃ। অতঃ সঃ ন কেনচিৎ প্রত্যয়ভাষ্যতঃ শক্যো বিধিশেষত্বং বা নেতুন্। আত্মস্বাদেব চ সর্বেষাং ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

অর্থাৎ কেহই বিধিকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং তর্ককাণ্ড বা যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই এক কুটস্থনিত্য পুরুষকে জানতে পারেন না—যিনি 'অহং' প্রত্যয়ভাগী কর্তা বা বন্ধ-জীবের উদ্ধ শাস্ত্রস্বরূপ, যিনি সবাশ্রা ও সর্বভূতহঃ, অর্থাৎ যিনিই স্বয়ং জীব জগৎ। সেজন্য তাঁকে অস্বীকারও করা যায় না, কর্মজ্ঞ বলেও স্বীকার করা যায় না। সকলেরই আত্মা বলে তিনি হেয়ও নন, উপাদেয়ও নন, অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত।

"অতো বহুপদো বেদভাণ্ডো নাস্তীতি বচনং সাহস-মাত্রম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

অতএব, সমগ্র বেদই কর্মজ্ঞ, বিধিমূলক ও ক্রিয়াপূর্ণ, কেবলমাত্র বহু স্বরূপ-দ্যাতক বেদাংশ নেই—একপ উক্তি হুঃসাহসই মাত্র।

এরূপে, 'হঃ' তাঁর স্বভাবমুখি সরল সহজ, অথচ সুনিপুণ সুনির্গূঢ় ভাবে, কর্মের স্বরূপ ও ফল সম্বন্ধে যে সুন্দর আলোচনা করেছেন, তা যুগ্মজ্ঞানকে সত্য পথের সন্ধান দেবে, নিঃসন্দেহ।

## বন্যা

### শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার এক পুত্র বাংলার বাহির হইতে তাহার কনিষ্ঠ সহোদরকে লিখিয়াছে, "বাঙ্গালীঃ মেরুদণ্ড ভাঙবে না, ইতিহাসের প্রমাণ থেকে সঙ্কট আর সশস্ত্রের মধ্যে বাঙ্গালী চলেছে পতন এবং অত্যাচারের মধ্যে। প্রকৃতিক আর সরকারী অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বাংলার দুর্ব্বার প্রাণশক্তিকে বার বার চেষ্টা করেছে পরাভূত করতে, কিন্তু অস্ত্রের এ-প্রচুরের অধিকারী বাঙ্গালী প্রত্যেক বার তীব্রতর ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠেছে। ১৯৪০ সন থেকে নানা দঃপেষ মধ্যে বাঙ্গালী এগেচ্ছে। আমার মনে হয় কোন এক মহত্তর ভূমিকার জন্ত ঈশ্বর বাঙ্গালীকে গড়ে তুলছেন এটা সব কদিন পরীক্ষার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক হবে—'দঃপেষ সত্য তপস্রাতেই হোক বাঙ্গালীর জয়।' যুবক পুত্রের যুবাচিত বিশ্বাস শুচি থাকুক—এই প্রার্থনা করি।

পশ্চিম বাংলার বৃক্কের উপর দিয়া বজা ও বৃষ্টির যে তাণ্ডবলীলা চলিয়া গেল—ইহার জ্ঞাত কে বা কাহার দায়ী এই যুদ্ধ বিচার আরম্ভ হইয়াছে, বিভিন্ন দল (সরকারী ও বেসরকারী) বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন, তবে সকল দলেরই সব অভিযন্ত্রের মূলে যে বাঙ্গালীতির ল্পর্শ আছে সে কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন দলের যুদ্ধ বিচার চলুক, ইচ্ছাতে জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং ইহার ফলে ভবিষ্যতে বলার আক্রমণ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় জনসাধারণ অধিকতর উপবৃত্ত হইবে এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যতে এমনতর বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

কিন্তু সব চেয়ে বড় আশঙ্কা হইতেছে যে এই চরম দুর্গতির সময়ে বঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লী অঞ্চলবাসী কতটা সাহায্য কি ভাবে পাইবে। তাহারা ত একেবারে সর্বহারা।

অবশ্য, পল্লী অঞ্চলের দুর্গতি দূর করিবার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী মহল কোষের বাঁধিয়া কাঁড়াইয়াছেন এবং প্রায় প্রত্যেক জুয়ের নেতৃবৃন্দ সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সংখ্যা ঐতিমধ্যেই কম নয়, আরও বাড়িতে পারে। অর্থ সংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে, সব উপায় যে সমীচীন ও শোভন তাহা বলা কঠিন। দুর্গত এবং সরকারাদেশের সাহায্যের জন্য আমার ক্ষমতা অল্পবাহী আমি সোশাল্টিজি অর্থদান করিতে পারি না, কিন্তু তাহাদের সাহায্যের জন্য শানিকটা আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে অর্থদান করিতে পারি। ইহাতে আমার আত্মপ্রসাদ ত হইবেই, পুণ্য সঞ্চয়ও কম হইবে না। পণ্ডে ট্রাং মোচনের এবং নৈতিক দ্রুতি ও অগ্রগতির জন্য একদা যে বাড়ী দীর্ঘ, পুষ্করিণী, গাঙ্গা, ঘাট, হাসপাতাল, দেবালয়, বিজ্ঞানীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র প্রকল্প হইয়া অকৃতরে অর্থদান করিয়াছে সেই বাড়ী দীর্ঘ কি বর্তমানে আস্তের প্রাতি একেবারে উদাসীন ও দেহাঙ্গী হইয়া গিয়াছে, অর্থ সংগ্রহের দীর্ঘ প্রকল্প প্রাতিষ্ঠান বা সংস্থার উদ্দেশ্য যে একেবারে রাজনীতি বিবক্ষিত তাহা বলাও কঠিন। বিভিন্ন দলের মধ্যে পদস্থায় বৈষম্যের এবং অবিষম্যের ছোঁয়ায় যে নাই এ কথাও বলা যায় না। শুনিতে পাঠ, চন্দ্র সংগ্রহকারী কোন কোন দল দুর্গত ও দীনান্তরে যাহা দুর্গতের সহায়তা করিলেন, তাহারা অল্প কোন ভাবনাতে তাহাদের সংগৃহীত দিবেন না। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন দলের উপরেই তাহাদের বিশ্বাস নাই। আজ পাঠ্য প্রকল্পের 'সংস্কৃত জ্ঞান সমিতি'র কথা মনে হয়, কোথায় সেই নেতা, সেই নেতৃত্ব সেই বিশ্বাস? 'সংস্কৃত জ্ঞান সমিতি'র উদ্দেশ্যের মূলে এখনও ছিল, কোন রাজনীতি ছিল না, কাহারও কোন প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ভোট বুঝে নামিবার উদ্দেশ্য ছিল না। সংগৃহীত অর্থ বহু বিধে পল্লী অঞ্চলের সর্ব-হারাণের নিকট ঠিক কতটা পৌঁছাবে, সে সম্বন্ধেও সাধারণের মধ্যে গবেষণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন হিসাব। কেহ কেহ বলিতেছেন—সাময়িক মিশন এবং ভারত সেবার্থের উপর আশ্রয় ভার আশ্রিত হইলে জনসাধারণ এবং দুর্গতগণ এই বিষয়ে আশাবিহীন হইত।

বে পরিমাণ বসন্তের ক্ষতি হইয়াছে যথা সম্ভব তাহা পূরণের জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্তমান অল্প উপযোগী নানাবিধ ফসল অধিকার পরিমাণে প্রচলনের ব্যবস্থা করিতেছেন উদ্দেশ্য যে সাধু, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অনীতির মুখোস্ত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কাপাজ কলমে হস্ত অধিকতর উৎপাদন দেখা যাইবে, কিন্তু বাস্তবে তাহা টিকিবে না। স্বাভাবিক সময়েও কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বীজ, সার ইত্যাদি উপযুক্ত সময়ে সরবরাহ করা হয় না, আবার কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বীজ সকল স্থানে সমান ভাবে অক্ষয়িত হয় না—এ সম্বন্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের কৃষি বিভাগের উপর কণনও আস্থা ছিল না, এখনও নাই। এবারে

আবার বেনী পরিমাণ বীজই বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী করা হইবে; বিভিন্ন স্থানের সকল প্রকার বীজ পশ্চিম বাংলার সকল স্থানের মাটি, জলবায়ু প্রভৃতির উপযোগী হইবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঠিক সময়ে কৃষকেরা বীজ, সার পাইবেন কিনা তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক কর্তৃক ইচ্ছার কথা হইবে।

দীর্ঘ, সার প্রভৃতি সময় মত পৌঁছাইলেও কাহারো তাহা যারা ফসল ফলাইবে—এ হাও এই প্রশ্নে বিবেচনা করা দরকার—সর্ব-হারাণই ফসল ফলাইবে। সম্প্রতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে আমাদের জাতীয় অর্থ সম্পদ এবং কৃষি-জাত এবং শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। একমাত্র কঠিন পরিশ্রমের ও কৃষকের দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে। জাপান, আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা নিজেদের দেশ গঠনের গুরুত্ব বুঝে এবং দেশ গঠনের জন্য পরিশ্রম ও কাজ করে। আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যেও এই গুরুত্ব জাগরুক করা দরকার—তাহা হইতেই আমাদের জনসাধারণ কঠিন পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত হইবে।<sup>১</sup> আমাদের মধ্যে অনেকেরই সাধারণ তাহাবল সম্বন্ধে কোন বিবেচনা নাই, আমরা যদি আমাদের মধ্যে একান্তবোধ এবং একেবারে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি, এবং তাহা বহিত করিতে পারি এবং আমরা যদি দেশ হইতে দুর্নীতি বিচাড়িত করিতে পারি এবং নৈতিক অবনতি দমন করিতে পারি তবেই জনসাধারণ অধিকতর পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত হইবে, তাহা-দের এই শক্তি আছে। কিন্তু জনসাধারণ অধিকতর পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত হইবে না, যদি তাহাদের এই বিশ্বাস না থাকে যে, রাষ্ট্র দুর্নীতিশূন্য এবং রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নিষ্কল। তিনি আরও বলিয়াছেন আমাদের দেশে ভীষণভাবে দারিদ্র্যপ্রাপ্ত হইত এমন ভীষণ ও ব্যাপক দারিদ্র্য আর কোন দেশে নাই। দারিদ্র্য মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ও অধঃপতিত করে, মানুষকে অসংখ্য অসহনীয় এবং নিগ্রহের মধ্যে নিক্ষেপ করে। অবশ্য অনাড়ম্বর এবং বিলাসশূন্য জীবনই অভিপ্রেত, কিন্তু দরিদ্র জনগণের মধ্যে অনাড়ম্বর ও বিলাস-শূন্য জীবনের প্রচার-মহিমা করা নৈতিকের কাজ। উপরি-স্তরের লোকদের মধ্যেই হহার আরম্ভ হওয়া উচিত। দারিদ্র্য কুসংস্কার ও ঘৃণিত, কিন্তু আড়ম্বর ও বিলাসপূর্ণ জীবন অধিকতর কুসংস্কার ও ঘৃণিত। প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যমা রক্ষার জন্য তাহাকে ন্যূনতম স্বচ্ছন্দ দিতেই হইবে। যে সরকারী কৃষক সম্প্রদায়ের উপর অধিকতর ফসল ফলানোর ভার আর্পিত আছে, তাহারা কি ন্যূনতম স্বচ্ছন্দের মধ্যেও আছে? তাহারা কোন ভরসা অধিকতর ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত হইতে এবং সেই উদ্দেশ্যে অধিকতর পরিশ্রমের সম্মুখীন হইবে, বর্তমানে তাহাদের দৈন্য ও মন কি কঠিন পরিশ্রমের পক্ষে উপযোগী ও পটু? তাই বলি, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। আপন তাহাদের গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হউক, পরে তাহারা দেশকে গড়িয়া তুলিবে।

## অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১৮

পরদিন সন্ধ্যায় গুলবা চুপি চুপি কুকিয়ায় আঙিনায় আসিয়া ঢোকে, দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। দরজার পাশে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু কেহ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে না। অনেকক্ষণ এমিয়া থাকিয়া গুলবা চলিয়া যায়, খানিক পরে আবার সে ফিরিয়া আসে, বন্ধ দরজার পাশে শিকারী জানোয়ারের মত ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। রাত ক্রমে বাড়িয়া যায়, আকাশে তার ঢাকিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসে। গুলবা উঠিয়া দরজা আস্তে ঠেলিয়া দেখে, কিন্তু দরজা সত্যি বন্ধ। গুলবা অশেষ হইয়া ওঠে, দরজায় হু'বার টোকা দিয়া উদ্ভ্রাব হইয়া শোনে, কিন্তু ভিতর হইতে কোনই সাড়া আসে না। টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি শুরু হয়, গুলবা ক্রমে হতাশ হইয়া পড়ে। অবশেষে দরজায় শেষবার জোরে একটা থাক্সা দিয়া চলিয়া যায়।

বর্ষা আসিয়া পড়ায় কাজ বন্ধ, তাই গুলবা দিনেও ঘোরাফেরা করে। কিন্তু কুকিয়ার ঘরের দরজা প্রায় সময়ই বন্ধ দেখে, দেখা পাইলেও তাহাকে একা পায় না, কেহ না কেহ সঙ্গে থাকে। কুকিয়া যে তাহাকে ধরা দিতে চাহে না গুলবা তাহা বুঝিতে পারে কিন্তু তাহার দস্তে শিকারের উদ্বেজনা জাগিয়াছে, হিংস্র জানোয়ারের মতই নিঃশব্দে আড়ালে আবডালে অনুসরণ করিয়া বেড়ায়।

সন্ধ্যা শেষ না হইতে গুলবার দেওয়া পাঁচ টাকা শেষ হইয়া যায়, কুকিয়ার উত্তনে আবার আশ্রয় জন্মে না। রোগে ও অনাহারে তিলকা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা লোপ পাইতে বসিয়াছে। টাকা না দিলে কেহ খান-চাল দেয় না, এই সোজা কথাটা সে বুঝিতে চায় না, ক্ষুধা পাইলেই খাইতে চায়, এবং খাদ্য না পাইলে কুকিয়াকে গালাগালি করে।

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে, দরজা বন্ধ করিয়া ছেলে কোলে লইয়া কুকিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। তিলকা কিমাইতেছিল, জাগিয়া উঠিয়া ডাকে, “কোথায় গো, কি করছিছ ?”

কুকিয়া জবাব দেয়, “এই ত এইখানে আছি।”

তিলকা ক্রোধকণ্ঠে বলে, “হ্যাঁ গো, তুমি হয়ে গেল, আমাকে খেতে দিবি নে ?”

অবাক হইয়া কুকিয়া বলে, “দুপুর কিণো, এই ত সকাল হ'ল।”

“কিহেয় আমার পেট জলে যাচ্ছে আর তুই বলিস্ বেলা হয় নি ? খেতে দে, খেতে দে শীগগির।” বলে তিলকা।

কুকিয়া উঠিয়া পড়ে, তিলকার কাছে আসিয়া বলে, “বেলা হয় নি, সত্যিই বলছি বেলা হয় নি। বাইরে বিষ্টি পড়ছে, চেয়ে-চিন্তে যে ছোটো চাল নিয়ে আসব তারও উপায় নেই। আর একটু সবুজ কর, এমন অবস্থার মত করিস্ নে।”

গুলবা বাগিয়া ওঠে তিলকা, চেঁচাইয়া বলে, “তুই আমাকে অবুঝ বলিস্ ? আমি সব বুঝি, তুই খেয়ে বসে আছিস্ আমাকে দিবি কি ? তোরা বজ্জাত আমি সব বুঝি।”

কুকিয়া জবাব দেয় না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তিলকা ক্রোধকণ্ঠে তাহাকে গালাগালি করে, “হারামজাদী, বজ্জাত।”

কুকিয়ার বস্ত্র গরম হইয়া ওঠে, কোনমতে বাগ চাপিয়া সে বলে, “গালাগালি করিস্ নে, বোজগার নাই, হাতে পয়সা নাই, অত খাই-খাই করলে চলবে কেন ? খাবি কি ?”

তিলকা সে কথা কান দেয় না, তাহার অনুস্থ দেহমন যুক্তির ধার ধারে না, বলে, “তুই চুরি করে নিজে খাস্, আমাকে দিস্ নে।”

কুকিয়ার মুখ দিয়া কড়া জবাব বাহির হইতে যায়, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে নিজেকে সংযত করে। তিলকা থামে না, সে গালাগালি করিয়া চলে। কুকিয়া এইবার তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কঠিন কণ্ঠে বলে, “খাম, খাম বলছি।”

খমক খাইয়া তিলকা থামিয়া যায়, তাহার জ্যোতিহীন চোখ ছুটি বিস্তারিত করিয়া কুকিয়ার দিকে তাকায়। কুকিয়া বলে, “কেব যদি বলবি আমি চুরি করে খাই তা হলে তোরা মুখ ভেঙে দেব। তুই চোখের মাথা খেয়েছিল, তা না হলে দেখতিন না খেয়ে না খেয়ে আমার কি হাল হয়েছে। আমার পেটে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই।



আমি কাঁধা পরে' থাকি, আমি যে লজ্জার লোকের সামনে  
বেকুতে পারি নে।"

অপরিশীম ভূষণে ক্রকিয়র গলা বন্ধ হইয়া আসে, সে  
খামিয়া যায়। তিলকা ধীরে ধীরে চোখ বোজে, একটু পরে  
ঝিমাইতে থাকে।

বাহিরে রুষ্টির বিরাম নাই। দরজার ঠুক ঠুক করিয়া  
টোকা পড়ে। ক্রকিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়,  
সে বুঝিতে পারে গুলবা আসিয়াছে। একটা নিশ্চিত  
জীবনের ছবি তাহার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মাঝে, পেটে  
ভাত, পরনে শাড়ী, গায়ে গহনা। ইচ্ছা হয় দরজা খুলিয়া  
দেয়, দরজা খুলিয়া হাত পাতিলে এখনই টাকা পাইবে।  
ক্রকিয়া দরজার ছড়কোর উপর হাত রাখে কিন্তু বুঝিতে  
পারে না, হাত পাথরের মত ভারী হইয়া ওঠে। দরজার  
আবার টোকা পড়ে, ক্রকিয়া আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে  
না, ছেলেকে টানিয়া আবার ঘরের কোণটিতে গিয়া বসে।

অনেকক্ষণ পরে ক্রকিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হয়, রুষ্টি  
তখন খামিয়াছে। একটা বাটি আঁচলের আড়ালে করিয়া  
সে মন্তুয়ার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ভিতরে  
তাঁহার আর ঢোকা হয় না, মন্তুয়া ও মন্তুয়ার স্ত্রী কোন্সল  
সুরু করিয়াছে। গরীবের সংসারের সব কলহেরই ভাষা ও  
স্বর এক—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। ক্রকিয়া যেমন নিঃশব্দে  
আসিয়াছিল তেমনই নিঃশব্দে ফিরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়ায়।  
বেলা দুপুর, ছিন্ন মেয়ের কাঁক দিয়া স্বর্গ উঁকি মাঝে। ক্রকিয়া  
গলি ধরিয়া আগাইয়া চলে, সামনে হরি গোপের বাড়ী।  
ক্রকিয়ার অবস্থা যখন ভাল ছিল তখন হরির স্ত্রী অনেক  
সময় তাহার নিকট সাহায্য চাহিতে গিয়াছে, সেও সাধ্যমত  
সাহায্য করিয়াছে। আজ তাহার অভাব, আজ হরির স্ত্রী  
তাহাকে সাহায্য করিবে এই ভরসায়ে সে হরির বাড়ীর দিকে  
চলে। পথে হরির ছোট মেয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া  
যায়, ক্রকিয়া তাহাকে আদর করিয়া দ্বিধা বলিয়া ডাকে,  
জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় যাচ্ছিস্ গো দিদি?"

হরির মেয়ে বলে, "বাবাকে ক্ষেত থেকে ডেকে আনতে  
যাচ্ছি, সে আসে নি বলে এখনও আমাদের খাওয়া হয় নি।"

"যা দিদি যা" বলিয়া ক্রকিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া  
দিয়া হরির বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়। গ্রাম-সম্পর্কে হরির  
বউ তাহার শাশুড়ী, তাই সে দরজার সামনে আসিয়া ডাকে,  
"ঘরে আছ গো মা?"

"কে গো" বলিয়া হরির বউ ঘরের বাহিরে আসে,  
ক্রকিয়াকে দেখিয়া বলে, "বউ, কি বলছ?"

ক্রকিয়া তাহার খুব কাছে গিয়া চাপা গলায় বলে,  
"আজ আমার ঘরে ঢাল বাড়ছে মা।"

পরসাদের জন্তে চাটি ভাত নিতে এলুম, এই এতচাটি  
ভাত।"

শুনিয়া হরির বউ গালে হাত দিয়া বলে, "এই বাঃ,  
কি লজ্জার কথা হ'ল, আমাদের যে খাওয়া হয়ে গেছে বউ,  
হাঁড়িতে যে একটিও ভাত নেই। আর একটু আগে যাও  
আসতে।"

ক্রকিয়া অবাক হইয়া হরির বউয়ের মুখে চাহকে  
তাকাইয়া বলে, "খাওয়া হয়ে গেছে তোমাদের?"

"অনেকক্ষণ গো" বলে হরির বউ। ক্রকিয়া আর কোন  
কথা না বলিয়া চলিয়া আসে, রাগে ভূষণে তাহার ভিতরটা  
জলিয়া যাইতে থাকে, সে যে কোন্ পথ ধরিয়া কোন্ দিকে  
চলিতেছে তাহাও তাহার খয়াল থাকে না। ইঠাৎ বৈজ্যু  
মেয়ে টুকনী যখন তাহাকে ডাকিয়া প্রেরণ করে, "কোথায়  
চলেছিস্ ভোজী?"

তখন তাহার সম্মিত কিরিয়া আসে। টুকনী বলে,  
"অমন গৌজ গৌজ করে কোথায় যাচ্ছিস্ গো, ঘরে ঝগড়া  
করেছিস্ বুঝি?"

ক্রকিয়া দাঁড়ায়, বিব্রত ভাবে জবাব দেয়, "ঝগড়া করব  
কার সঙ্গে লা, মরা মানুষের সঙ্গে? তা নয় গো, এসেছিলুম  
হরি মহতোর বাড়ী।"

"কেন গো, ওর কাছে কেন?" প্রেরণ করে টুকনী।

ক্রকিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে, "আজ আমার ঘরে  
হাঁড়ি চড়ে নি বোন, তাই পরসাদের জন্তে চাটি ভাত চাইতে  
এসেছিলাম।"

টোট উলটাইয়া টুকনী বলে, "দেয় নি নিশ্চয়ই, ও  
কাককে দেয় না ভোজী, ও সবাব কাছ থেকে নেয়।"

ক্রকিয়া বলে, "বলতে নেই, আমি গরীব, আমিই কি  
ওকে কম দিয়েছি!"

ক্রকিয়ার মনটা তিত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কাকুর  
সঙ্গে কথা বলিতেও ইচ্ছা করে না, সে ঘরের দিকে চলে।  
টুকনী ছুটিয়া আসিয়া থপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলে,  
"ছেলেটা না খেয়ে আছে, আর তুই ভোজী খালি হাতে ঘরে  
ফিরে বাবি? চল না আমার ঘরে, পরসাদের জন্তে চাটিভাত  
আমিই দিতে পারব।"

ক্রকিয়া অবাক হইয়া টুকনীর মুখের দিকে তাকায়, এই  
কচি মেয়েটার দরজা এতখান। টুকনীর বাপও গরীব, রোজ  
আনে রোজ খায়, মাঝে মাঝে উপোশও করে, অশচ সেই  
লোক যখন ডাকিয়া ঘরের অন্ন পরকে দেয় তখন সেও  
সাধারণ নয়। টুকনীর থুতনী ধরিয়া চুমা খাইয়া ক্রকিয়া  
বলে, "আহা, সোনার টুকরো মেয়ে, ভগবান তোব মঙ্গল

টুকনো কুকিয়াব হাত হইতে বাটিটি লইয়া বলে, “একটু দাঁড়া ভোঁলো আমি ঘর থেকে ভাত নিয়ে আসিচি।”

তার পরে ছুটিয়া ঘরে যায়, একটু পরে বাটি ভরিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া আসে। বাটিটি হাতে লইয়া কুকিয়া মাথা নাড়িয়া বলে “ও তোব বখর আমাকে এনে দিলি, এখন তুই উপোস করবি।”

চাপিয়া টুকনো বলে, “না গো, উপোস করব না, এক আঁজলা বহর শেখ খেয়ে পট তরে লাব, তা হলেই এ এল পেটে যাবে।”

আবার রুটি পাঁতে শুরু করে কুকিয়া ভাতসমেত বাটি পাঁচলের আড়াল করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলে।

১৯

সারারাত রুটি হইয়া সকালের দিকে একটু খরিয়াছে। কুকিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে, ছেঁড়া মেঘের কাঁক দিয়া রোহটুকু আঁড়নার যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে সেইখানে গিয়া দাঁড়ায়। ভোর না হইতে চাষারা ক্ষেতে নামিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে আজ ব্যস্ততার অন্ত নাই। কুকিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কর্মতৎপর প্রান্তবেশীদের হাঁকডাক শোনে, অনেকক্ষণ হইতে তিলকা যে তাহাকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছে তাহা সে খেয়াল করে না। তিলকার ডাকে সাড়া দিয়াও ত কোন লাভ নাই, সে থাইতে চাহিবে, অথচ খাদ্য বলিয় কোন পদার্থ ঘরে নাই। তিলকা ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া ধামিয়া যায়।

আকাশে মেঘ আবার ঘনাইয়া আসে, আবার টুপটাপ রুটি শুরু হয়। কুকিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। সাড়া পাইয়া তিলকা আবার ডাকে, কিন্তু কুকিয়া নিঃশব্দে ঘরের কোণটিতে গিয়া বসে। তিলকা এইবার কেশিয়া যায়, ক্ষীণ কণ্ঠ যতখানি উঠিতে পারে ততখানি উঠাইয়া সে গালাগাল শুরু করে। কুকিয়া তাহা ক্রক্ষেপণ করে না, সে দেওয়াল চেষ্ট দিয়া চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকে। বাহিরে অবিরাম রুটি পড়িতে থাকে, বেলা ক্রমে বাড়িয়া যায়, তিলকার গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হয় না। আপনাব মনে সে বিড়বড় করিয়া বাকিয়া চলে।

ছেলেটা এতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, এইবার সে উঠিয়া মায়ের কোলের কাছে আসিয়া বসে। তাহার শীর্ণ মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কুকিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়ে, ঘরের একপাশে ছড়ানো মাটির হাঁড়িকুড়িগুলি একটি একটি করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া উলটাইয়া দেখে। কিন্তু কোন হাঁড়িতেই কিছু নাই, কুকিয়া হাঁড়িগুলি ঠেলিয়া দিয়া ছেলের কাছে আসিয়া বলে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে

পারে না আবার উঠিয়া আসিয়া হাঁড়িগুলি নাড়-চাড়া করে। এক-একটা হাঁড়ি দুই হাতে তুলিয়া খরিয়া তাহার শূন্যগর্ভের দিকে তাকাইয়া থাকে।

বেলা বাড়িয়া যায়, দুপুর আসে। কুকিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দেখে আকাশ মেঘে ঢাকা, রুটি অবিরাম পড়িতেছে। দরজা খরিয়া সে শূন্য পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া থাকে।

তিলকা ডাকে, “ওগো, কোথায় গেলি?”

সাড়া দেয় না কুকিয়া। তিলকা আবার ডাকে, শুনিয়াও শোনে না কুকিয়া।

তিলকা ডাকে, “কোথায় গো, ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।”

কুকিয়া দরজা তেজাইয়া দিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তিলকা তাহার জ্যোতিহীন চোখ দুটি তুলিয়া কুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, “খেতে দে গো।”

এইবার কুকিয়া বলে, “খাবি কি? ঘরে খাবার নাই।” সেকথা শুনিতে পায় না তিলকা। সে বলে, “দে, খেতে দে।”

কুকিয়ার মুখখানা হঠাৎ কঠিন হইয়া ওঠে, বলে, “শুনতে পাসু না, বলছি ঘরে খাবার নাই। কলসী ভরা জল আছে, খাবি?”

কথাটার অর্থ যেন বুঝিতে পারে না তিলকা, বলে, “দে।”

কুকিয়া একবাটি জল লইয়া আসিয়া তিলকার সামনে ধরে। শীর্ণ দুর্বল হাত বাড়াইয়া তিলকা বাটিটা নেয়, মুখের কাছে তুলিয়া যখন দেখিতে পায় তাহাতে কেবল জল তখন সে একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়া বাটি ছুঁড়িয়া ফেলে। বাটিটা কুকিয়ার গায়ে আসিয়া পড়ে। চোট বিশেষ না লাগিলেও কুকিয়া হঠাৎ রাগে দিশাহারা হইয়া যায়, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিলকার গলাটা দুই হাতে চাপিয়া খরিবার অন্ত আগাইয়া আসে। কুকিয়ার হিংস্র চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া তিলকা বিহ্বলের মত শীর্ণ দুটি হাত তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। খাটিয়ার পাশে আসিয়া কুকিয়া দাঁড়ায়। তাহার দুর্বল হাত দুটি দিয়া তিলকা কুকিয়াকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। যেমন ভাবে হঠাৎ কুকিয়া রাগিয়া উঠিয়াছিল তেমন ভাবে হঠাৎ আবার স্থির হইয়া যায়। উত্তেজিত মাথাটা ঝিমঝিম করিতে থাকে—খাটিয়ার একটি পাশ খরিয়া সে চোখ বুঁজিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে। কুকিয়া তাহাকে কাছে লইয়া আবার ঘরের কোণটিতে গিয়া বসে। তাহার মনে এখন আর রাগ নাই—তাহার মনে এখন যেন কিছুই নাই, কোলের কাছে বসে ছেলেটার কথা সে ভাবে না, তিলকার

কথা সে ভাবে না। সমস্ত দেহ যেন ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসে। বুকের ধুকধুকও যেন ক্রমে ক্রমে থামিয়া যাইবে। বাহিরের কর্মব্যস্ত জীবনের আওয়াজ সে শুনিতে পায় না, সে যেন পৃথিবীর বাহিরে। বহুবার ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে, খাইতে চায়, বহুবার ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। ক্লান্ত তিলকা মাঝে মাঝে কাতরাইয়া ওঠে, সেও আর ডাকে না, খাইতে চায় না। বৃষ্টি থামে, আবার বৃষ্টি নামে, এই ভাবে ধীরে ধীরে দিন শেষ হইয়া আসে।

ধরের ভিতর অন্ধকার জমিয়া ওঠে, হঠাৎ কুকিয়ার তল্লা ভাঙিয়া যায়। সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, কোথায়, কেন সে একা অন্ধকারে বসিয়া আছে বুঝিতে পারে না। ক্রমে তাহার চোখের ধোর কাটায়া যায়, অতীত বর্তমান আবার ফিরিয়া আসে। আবার রাত, আবার দিন, অল্প নাই, সহায় নাই, স্বজন নাই—কুকিয়ার বুকের ভিতরটা কে যেন নির্মম ভাবে সবলে চাপিয়া ধরে। সে আর পারে না, সে আর সহ্য করিতে পারে না, অদৃষ্ট তাহার চারিদিকে একটা কঠিন প্রাচীর গাঁথিয়া তাহার মুক্তির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এইখানে না খাইয়া তাহাকে তিলে তিলে মরিতে হইবে।

দরজায় টোকার আওয়াজ শুনিয়া কুকিয়ার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া ওঠে, তাহাকে মুক্ত করিতে, প্রাণ দিতে দূত আশিয়াছে! ত্রুপদে সে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। বাহিরে বাতুর অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, দরজার পাশে নিঃশব্দে যে দাঁড়াইয়াছে কুকিয়া তাহাকে চেনে। গুলবার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, “ওগো, নিয়ে চল আমাকে।”

অবাক হইয়া যায় গুলবা, কুকিয়া যে এমন সহজ ভাবে ধরা দিবে তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারে না, সন্দেহের সঙ্গে বলে, “আমি গুলবা গো, চিনতে পেরেছ আমাকে?”

আরও কাছে আসিয়া কুকিয়া উদ্গ্রীব ভাবে বলে, “ইয়া গো ইয়া, তুমি যে বলেছিলে আমাকে নিয়ে যাবে, আমি যাব তোমার সঙ্গে, আমাকে নিয়ে চল।”

এখন আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই, উত্তেজনায় গুলবার চোখ দুটি জলজল করিয়া ওঠে, কুকিয়ার কানের কাছে মুখ লইয়া বলে, “তুমি ত একদিন আমাকে কঁাকি দিচ্ছিলে গো। তোমার জন্তে আমি সব করতে পারি, তুমি বললে তোমাকে আমি মাথায় করে নিয়ে যাব।”

ধরের বাহিরে আসিয়া কুকিয়া বলে, “নিয়ে চল।”

আবার অবাক হইয়া গুলবা বলে, “কি বলছ গো, এখনই যাবে?”

কুকিয়া অবাক দেয়, “এখনই যাব, সেই বে কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলে, সেইখানে নিয়ে চল।”

উত্তেজিত গুলবা বলে, “তাই নিয়ে যাব গো। তুমি একটু এইখানে দাঁড়াও, আমি বাড়ী থেকে ছুটে টাকাকড়ি নিয়ে আসি।”

হঠাৎ কুকিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কানে কানে গুলবা বলে, “আবার কঁাকি দিও না কিন্তু।”

মাথা নাড়িয়া কুকিয়া বলে, “না।”

২০

কিছুক্ষণ পরে গুলবা যখন একটা পুঁটলি ও ছাতা বগলে করিয়া ফিরিয়া আসে তখন দেখে কুকিয়া দরজার পাশে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। গুলবা কাছে আসিয়া বলে, “চল তা হলে গো, আমি তৈরি হয়ে এসেছি।”

দরজাটা নিঃশব্দে ভেঙাইয়া দিয়া কুকিয়া বলে, “চল।”

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শাষণানে গ্রাম ছাড়াইয়া তারা মহুয়াটাড় স্টেশনের পথ ধরে। কিছুক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টি বন্ধ আছে। কখনও মাঠ, কখনও বনের ভিতর দিয়া পয়ে-চলার পথ, মাঝে মাঝে আবার দু'একটা ছোট নদী। এক কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীগুলি জলে ভরিয়া গিয়াছে, অতিকষ্টে পার হইয়া তাহারা চলে। মাইলতিনেক আসিবার পরে চাপিয়া বৃষ্টি নামে, আকাশ মেঘে ঢাকিয়া যায়, অন্ধকারে পথ প্রায় দেখা যায় না। পথের ধারে একটা বড় মহুয়াগাছ দেখিয়া গুলবা কুকিয়াকে টানিয়া তাহার নীচে আনিয়া বলে, “এত বিষ্টিতে পথ চলা যাবে না গো, এস, এইখানে একটু বসি।”

কুকিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার পথে নামিয়া বলে, “না না, বসে কাজ নাই, চল তাড়াতাড়ি এদেশ থেকে পালাই।”

অগত্যা গুলবাও পথে নামিয়া পড়ে।

বহুকষ্টে পাঁচ মাইল দাঁড়া চলিয়া তাহারা মহুয়াটাড় স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ছোট্ট স্টেশন, মেল দাঁড়ায় না, সকাল-সন্ধ্যায় দু'থানা আপ-ডাউন প্যাসেঞ্জার দু'এক মিনিটের জন্য দাঁড়াইয়া যাত্রী তুলিয়া নেয়। গুলবার স্টেশন চেনা, এই স্টেশনে গাড়ী চাপিয়া বহুবার সে কয়লার ধাদে কাজ করিতে কাতরাস গিয়াছে। কুকিয়াকে সঙ্গে লইয়া গুলবা স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার টিনের চালার নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। বহু যাত্রীর সেখানে সমাবেশ, বিজলীর আলোয় স্থানটা ঝলমল করিতেছে। বিজলীর আলো কুকিয়া কখনও দেখে নাই, রাত্রের কেবোসিনের ছোট্ট একটা ডিবা জালিয়া তাহারই ধোঁয়াটে আলোর সংসারের

কাজ করিয়াছে, আজ রাতকে দ্বিন করা আলোর জৌলুপ দেখিয়া তাহার চোখ ঝলসিয়া যায়। গুলবা আগে চলে, ক্রকিয়া বস্ত্রের মত তাহাকে অনুসরণ করে। মালপত্র ও বাড়ীর ভিত্তির মধ্য দিয়া কোনমতে আগাইয়া তাহারা একটা কোণে আসিয়া অবশ্রম নেয়।

ছোট বোচকাটি নামাইয়া রাখিয়া গুলবা বলে, “তুমি এখানে বসো গো, আমি গাড়ীর ধরতী নিয়ে আসি।”

ক্রকিয়া বসে, গুলবা চলিয়া যায়, একা বসিয়া ক্রকিয়া ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, কত বকমের কত লোক, কেহ খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছে, কেহ লটবহর লইয়া আসিতেছে, কেহ চলিয়া যাউতেছে। ক্রকিয়ার চোখে এ একটা নূতন জগত, ইহার সহিত তাহার পরিচয় নাই, সে যেন এখানে অনধিগত প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ভিতরটা স্ফুটিত হইয়া ওঠে।

গুলবা কিরিয়া আসে, হাতে তাহার শালপাতার একটা ঠোঙা। বসিয়া পড়িয়া ঠোঙাটা ক্রকিয়ার সামনে রাখিয়া গুলবা বলে, “পূর্বের গাড়ী আসবে ভোরবেলা, গোটা রাতটা বেশ কাটাতে হবে গো। পূর্ব-তরকারি নিয়ে এসেছি, খেয়ে নাও।”

ক্রকিয়া বলে, “তুমি খাও।”

গুলবা হাসিয়া বলে, “তোমার জন্তে আনলাম গো, তুমি না খেলে আমি খাব না।”

ক্রকিয়া মাথা নাড়িয়া বলে, “না গো, আমি এখন খাব না, তুমি খাও।”

গুলবা জিহ্বা করিয়া বলে, “তা হবে না, তুমি খেলে আমি খাব।”

গুলবার মনে একটা নেশা লাগিয়াছে, তাহার মুখে-চোখে তাহার চলায় বলায় খুশী যেন উছলিয়া পড়িতেছে। ক্রকিয়ার গা খেঁসিয়া বসিয়া সে হাসিয়া বলে, “তোমার জন্তে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বুঝলে গো, বিশ্বাস করবে না বললে, আমি রাতভোর তোমার দরজায় বসে থাকতুম।”

ক্রকিয়া শুনিয়া যায়, কোন জবাব দেয় না। নিজের মনে গুলবা বলিয়া চলে, “কয়লায় খাধে কাজের অভাব নেই গো, গেলেই কাজ পাব। ছোট একখানা ঘর ভাড়া করে লসার পাতব, কি বল?”

খুশীর আবেগে গুলবা ক্রকিয়ার হাতখানা টিপিয়া দেয়। চারিদিকে তাকাইয়া গলা খাটো করিয়া গুলবা বলে, “যখন জ্বলবে একবার গাঁ থেকে পেরিয়েছি তখন আর দেখানে কি হবে না।”

ঠোঙাটির প্রতি আবার নজর পড়ায় গুলবা অহুসোণের কণ্ঠে বলে, “কি গো, খাবে না তুমি? দিনভোর কিছু খাও

নি, খাও গো, কিধে পেয়েছে তোমার। আমি ততদণ হু’ পয়সার পান আর এক গাঁ টা বড়ি কিনে আনি।”

গুলবা চিঠি বাস্তবাবে চলিয়া যায়, তাহার উৎসাহের যেন অন্ত নাই।

ক্রকিয়া আবার একা বসিয়া থাকে। আলোর জৌলুপ সে যেন সহ্য করিতে পারে না, গায়ের আঁচলখানা ভাল করিয়া সযত্নে জড়াইয়া সে যেন নিজেকে আড়াল করিতে চায়। হুড়ুহুড়ু করিয়া একখানা মালগাড়ী আসিয়া পড়ে, ক্রকিয়া ভয় পাইয়া যায়; মুসাকিবখ নাম এক প্রান্তে একটি শিশু কাঁদে, ক্রকিয়া ভীষণ ভাবে চমকাইয়া ওঠে, বুকের মধ্যে কে যেন কঠিনভাবে একটা চাবুক মাঝে, সে ধরধর করিয়া কঁপিতে থাকে। ব্যাকুল হইয়া সে একবার চারিদিকে তাকায়, খাবারের ঠোঙাটি কোনমতে আঁচলে রাখিয়া উঠিয়া পড়ে, এক প দুই প করিয়া মুসাকিবখানার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায়, তার পর হঠাৎ ছুটয় সে আলোর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে গিয়া ঢোকে।

বৃষ্টি ঝমিয়া গেলেও আকাশ মেঘে ঢাকা, তারাহীন আকাশের নীচে, গাঢ় অন্ধকারে ক্রকিয়া গাঁয়ের দিকে ছুটয়া চলে। শূন্য মাঠের উপর দিয়া, গভীর বনের মধ্যে দিয়া পায়েচলার সঙ্গ পথ, কিন্তু সে পথে চলিতে ক্রকিয়ার মনে বিন্দুমাত্র ভয় নাই। আলোয় বসিয়া তাহার ভয় করিত-ছিল, অন্ধকারে আসিয়া সে নির্ভর হইয়াছে। উঁচুনিচু পিচ্ছিলপথে সে কতবার পড়িয়া যায়, অন্ধকারে গাছের ডালে চোট খাইয়া কপাল কাটে, কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, খাবারের ঠোঙাটি বুকে চাপিয়া তবু সে পাগলের মত ছুটিয়া চলে।

এতকণে গ্রামের সীমানায় আসিয়া পড়ে ক্রকিয়া। মাঠের মাঝখানে পরিচিত মছয়াগাছটা দেখিয়া সে কোপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে, যেন এক পরমাশ্রয়কে পাইয়াছে। মাঠ পার হইয়া, ক্ষেত পার হইয়া, ধানের উপর দিয়া ছুটিয়া সে গ্রামে আসিয়া ঢোকে। এইবার পা টিপিয়া চাপিয়া নিঃশব্দে চলে, গলি ঘুরিয়া নিজের বাড়িনায় আসিয়া দাঁড়ায়। বুক তাহার ছব ছব করিতে থাকে, পা যেন আর চলিতে চায় না। শাবধানে ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁক মারিয়া দেখে, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, কোন আওয়াজ শুনিতে পায় না। ধীরে ধীরে সে ঘরের ভিতরে ঢোকে, ধীরে ধীরে সে তিলকার খাটির পাশে আশ্রয় দাঁড়ায়, ঘুমন্ত তিলকার টানা টানা নিশ্বাসের আওয়াজ শুনিতে পায়। আবার সে ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া যায়, নিঃশব্দে হাত ডাইয়া এদিক-ওদিক ঘোঁজে, পরসাদের গায়ে হাত লাগিতে তাহাকে কোল টানিয়া নেয়, প্রচণ্ড আবেগে বুকে চাপিয়া ধরে। আগিয়া উঠিয়া পরসাদ ডাকে, “মা।”

ক্রমশঃ

# বাংলার আধুনিক তরুণ তরুণী

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আজকাল যে কথাতায় বহুল প্রচার হইয়াছে সেটা এই যে, বাংলায় তরুণ-তরুণী স্ত্রী ও কল্যাণের পথ বর্জন করিয়া প্রত্যাশীনতা ও নৈরাশ্রের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কথাটা কহদূর সত্য সেটা বিচার করা আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার, কারণ বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ এই তরুণগোষ্ঠীর উপরই নির্ভর করিতেছে।

প্রথমেই এই তরুণগোষ্ঠীর একটা সংজ্ঞা দরকার। বয়সের দিক দিয়া বাহ্যিক আঠারো হইতে পঁচিশ-ছাত্তার মধ্যে যের তরুণ-দিগকেই আমরা এই পর্বেতে কেলিতে চাহি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নানা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র, কিছু শিক্ষিত, কিছু অশিক্ষিত বেকার আর কিছু অধিবেকার অর্থাৎ আশ্রয়হীন জীবিকা অর্জন ব্যতীয়া করিতে পারে নাই। এই যুগোষ্ঠীকে নিয়াই আমাদের কথা।

ইহাদের প্রত্যেকেরই বালা অথবা নৈশব কাটিয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। সে সময়কার বাংলা দেশের কথা একবার মনে করা যাউক।

ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র তখন বিপর্যস্ত। ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলা তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শাসকবর্গ আত্মবিক্ষয় বাস্তব। প্রত্যেক শাসকমণ্ডলী কেবল দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চলে, সকল সমস্যার বিচার হয় যুদ্ধোদ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শৃঙ্খলা শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে থাকে। আত্মা, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রাদি বণ্টনের ভার গভীরঘোর হাতে। বণ্টনের মধ্যে প্রবেশ করে অবিচাষ, অনাচার—বণ্টনীদের অর্থলিপ্সার দারপথে। মানুষে মানুষে সহনশীলতা বন্ধ টুটিয়া যায়। আত্মপরাধের অধঃপাতি উড়িতে থাকে। দেশ বণন এই অস্বাভাবিক স্বার্থপরতার বিবে চর্জিত তখন ভয় হয় এই শিশুর।

ক্রমে সে বড় হইতে থাকে। যে স্বার্থপরতা ও অর্থলিপ্সা তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত তাহাকে সে স্বাভাবিকরূপেই গ্রহণ করে। তখন সৈকতদের হাটনির গুস্ত বিভ্রামলিও বন্ধ। শিক্ষকদের আত্ম-বিক্ষয় অত্র শিক্ষকতার কাজে ইচ্ছা দিয়া নানা প্রকারে অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত। পিতা কালোবাজারে মহাক্রমীয় পুত্রের আত্মবিক্ষয়, মাতা স্বর্গদ্বার আত্মহারা। সমস্ত দেশের নৈতিকবোধ অর্থলিপ্সার যুদ্ধে পরাজিত। আর লোভ জীবনদেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই আবহাওয়ার মধ্যে তার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

তার পর আসে বাংলা দেশের মহত্ত্ব ১৯৪৩ সনে। বাড়ী বাড়ী ভাঙের ঘেন ভিক্ষা করিয়া ককালের দল সর্বত্র হানা দেয়।

শিশু দেখে, মা, বাবা হয় দরজা বন্ধ করিয়া চূপচাপ বসিয়া থাকে নর কাতাকেও দু'মুঠা ভাত দিয়া কর্তব্য সমাপন করে। বেহা কহে হয়ত ইহার চাইতেও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। শিশু সেই শিক্ষাই গ্রহণ করে। অপরের দুঃখ, বেদনা, অসহায়তা ও যত্ন তাহার প্রাণে আর গভীর বেদনার সঞ্চার করিতে পারে না।

পরবর্তী অধায়ে দেখা দেয় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। সারা বাংলা বর্জিততার বস্ত্রজীবনের আত্মদ লাভ করে। পল্লীতে পল্লীতে বণনামায়া বাজিয়া উঠে। বালক ও যুগের দল যুগসত্য দীক্ষালাভ করে।

দাঙ্গা শেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিভাগ আর তার পিছনে পিছনে আসে বাঙালিদের দল। আর আসে অর্থভাব, চাঞ্চল্য, আত্মবিস্ময়। অর্থ বাংলা মূলচ্যুত হইয়া বাবার বৃত্তি অবলম্বন করে। কলে অপরাধকে এক বৃহৎ পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। এই বন্দ, এই সংঘাত, এই বিস্তোহের মধ্যে বালক-বালিকা ক্রমশঃ তরুণ-তরুণী হইয়া উঠে।

এক কথায় বলিতে গেলে, বাংলার আধুনিক তরুণ-তরুণী যে পরিবেশে মানুষ হইয়াছে তাহা যেমন অস্বাভাবিক তেমন অস্বা-বোধহীন। জন্ম হইতেই সে শুনিয়াছে অর্থের বন্দনা, স্বার্থপরতার স্তবপাঠ। অজ্ঞানের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে তাহা তাহার চরিত্রে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সম্ভবত্ববোধের ক্ষয় মনের যে গভীরতা থাকা দরকার তাহা তাহার চিত্তে জন্মিতে পারে নাই, সহনশীলতার চর্চায় সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অতি কম।

এই বিসদৃশ পরিবেশে মানুষ হইলে অর্থকে কল্যাণ বলিয়া আর জলুপকে স্ত্রী বলিয়া ভ্রম হইবারই কথা। ইহাই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি; কোথাও আশ্রয় হইবার কিছু নাই। এই পরিণতির পরিলক্ষ্য গর্ভ ভবিষ্যৎ হইতে পারিত একমাত্র স্বাধীনতার অনাবিল জলস্রোতে। কিন্তু সে স্রোত বহিল নিত্যন্ত ক্ষয়প্রায় আর জলও তাহার অনাবিল ছিল না।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা কোনও কল্যাণের অর্থ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না—না রাষ্ট্র, না সমাজ। বৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে নিদারুণ অর্থভাব ও আত্মপরাধতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল উহা রাষ্ট্রস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিল। তাহার সঙ্গে জুটিল শক্তি অক্ষয়। স্বার্থপরতা জাতীয় কল্যাণবোধের গলা টিপিয়া ধরিয়া ফেলিল।

বাংলার যুবশক্তি সে হত্যাকাণ্ড ঠাঁড়াইয়া ঠাঁড়াইয়া দেখিল কিন্তু দেখিয়া নিঃশব্দে উঠিল না। অর্ধেক কল্যাণ বলিয়া বাহারা গ্রহণ করে তাহাদের নিকট এই হত্যাকাণ্ড অপূর্ণবয়সে বিবরণ নহে, বয়ঃস্ফাভাবিকই মনে হইবার কথা। শুধু বাংলার দুঃখ হইল যে, এ লুণ্ঠন ভাগ তাহার ভাগ্যে বেশী জুটিল না। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া বাউক।

রাষ্ট্রস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসিল না। ইংরেজের পুণ্যতন শাসন-কাঠামোটাই বজায় রহিল। কংগ্রেসের প্রধান প্রধান পাণ্ডারা ইংরেজের গদীতে গদীয়ান হইলেন। কিন্তু কথায়, বিচারে, আচারে আর সর্বপ্রধান ঐশ্বর্য-সেবার তাহারা ইংরেজেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। বিশ্বজগতের সঙ্গে অস্বাভাবিক দিব্য অজুহাতে তাহাদের ভোগ ও অর্থলিপ্সা সার্থক হইতে লাগিল। এই মুষ্টিমেয় রাজা-উজীহের দলে বাঙালীর সখ্যা ভ্রম। ইহার জন্ত বাঙালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের দপ্তরে, চাকুরি বা ঠিকার, কোনরূপেই প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে পারিল না। কাজেই দেশমুহনে যে দ্রুতভাণ্ড উঠিল তাহা হইতে ছিটাকোঁটা মাত্র বাঙালীর ভাগে পড়িল। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের দিক হইতে কিরিয়া আপন দেশের দিকে চাহিয়াও বাংলার তরুণ-তরুণী শক্তি পাইল না। সেখানেও মুষ্টিমেয় বাঙালীর রাজগি। সে রাজগিতে বাংলার যুবশক্তির কোন আপত্তি ছিল না। নৈরাশ্র আসিল শুধু বার বার নিজের ভাগের কথা ভাবিয়া। আচ্ছা, যদি এই রাজকীয় পরিবারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকিত! রাজদরবারে সুপারিশের যদি কোন সুযোগ থাকিত! থাকিলে আর নৈরাশ্রের কারণ ঘটিল না। ইহা ত আদর্শবাদের কথা নয়, নিছক আত্মপরায়ণতার কথা। কলে বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও শ্রমের মূল্যবোধ কমিয়া গেল। রহিল শুধু ভাগ্যের দোহাই আর 'সম্ভার কিস্তি যারিবার' চেষ্টা।

এই পরিণতিই স্বাভাবিক। একমাত্র জড়বাদকে সফল করিয়া বাহারা জীবনের পথে চলে, তাহারা কোথাও থাকা থাইলেই নৈরাশ্রের করতলগত হইয়া পড়ে। ভাল খাওয়া-পরা এখন জীবনের চরম লক্ষ্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কি থাকিতে পারে? যে জীবনটা ভাগ্যক্রমে পাওয়া গিয়াছে তাহা পিতারও নয় মাতারও নয়—সেটা আমার নিজস্ব। যতদিন এবং যতভাবে পারা যায় সেটাকে ভোগ করাই একমাত্র কাম্য। কিন্তু সে ভোগের যথাযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করা ত সহজসাধ্য নয়। তাহার জন্ত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহার জন্ত যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে প্রতিযোগিতার শক্তি কোথায়? সে শক্তি সঞ্চয়ের জন্ত যে সাধনা করিতে হয় তাহা বাংলার আধুনিক তরুণ-তরুণী ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভোগেচ্ছা তাহাদের উপকরণ সংগ্রহের শক্তিকে

অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে নৈরাশ্রবাদ।

মোটকথা, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের যুব-সমাজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে তাহাদের মনে আদর্শবাদের একটা স্বচ্ছধারা প্রবাহিত ছিল। সে অনাবিল ধারার সঞ্জীবন রসে তাহারা শক্তি লাভ করিত। সে ধারা প্রধানতঃ বহিয়া চলিত দেশপ্রেমের ঋণে আর তার সৃষ্টি হইয়াছিল বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে। সে সময়ে বাংলার ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিতে যে অভূতপূর্ব জাগরণ আসিয়াছিল তাহার কোলাহল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্তও শোনা যাইত। সেই দেশপ্রেমের আদর্শবাদের ধারার বাংলা তাহার আত্মার স্বরূপ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

যতদিন সেই আদর্শবাদের ধারা সে বক্ষা করিয়া চলিয়াছিল ততদিন সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালীর গৌরব ছিল অসামান্য। তখন সে ছিল শহীদ, তখন সে ছিল সাধক! দেশমাতৃকার পূজার সে আপনার জীবনের মধ্যে সতের সন্ধান পাইয়াছিল আর সেই সত্যাত্মকৃতি সে ছড়াইয়া দিয়াছিল নানা প্রদেশে। বাংলার আদর্শবাদকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে পা বাড়াইয়াছে; বাংলার সাধনাই তাহার সিকির পথ স্তম্ভ করিয়া দিয়াছে।

বাংলার যুবক তখন পদের জন্ত অকাতরে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সেবার, স্নেহে আত্মপরিভেদ রাখে নাই এমনকি আদর্শের সাধনার নির্জীবনে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত তাহার সাধনার পথে বিঘ্ন আনিয়াছে সত্য কিন্তু এখনও তাহার মনে পূর্ব আদর্শের ধারা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইলেও একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। ইহাই আমাদের আশার কথা।

যে কোন কারণেই হউক, বাংলার তরুণ-তরুণীর নিকট সাধনার মূল্যবোধ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের জন্ত, আনন্দের জন্ত, বিজ্ঞার সাধনা করিতে তাহারা চাচে না। কারণ তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে, অর্থমূল্যে জীবনের সকল সম্পদ ক্রয় করা যায়; অর্থমূল্যে জীব ও কল্যাণকে ক্রয়ও করা চলে। এই সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতাই তার জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মূল কারণ। দরিদ্র অধ্যাপক বা শিল্পী অপেক্ষা ধনী কোলাবাজারীর উপর শ্রদ্ধা তাহার অনেক বেশী। ইহা চিন্তাহীনতারই নামান্তর মাত্র। এই চিন্তাহীন জগতে বাংলার তরুণ-তরুণী আজ সাধারণের সঙ্গে ভাল রাখিয়া শুধু সাধারণ খেলাই খেলিয়া বাইতেছে। এ খেলার চিন্তা বা খ্যানের স্থান নাই, আছে শুধু কোলাহলের। সে কোলাহলের রূঢ়তা যে আজ বাংলার কানেও বাজিয়াছে, ইহাই আশার কথা।

# দিব্য আঁথির রশ্মি কুসুম

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

যাক্ এ রক্তনী—যাক্ সে এখন  
কণ্ঠে পবিত্র অগণিত মণি মণ্ডিত মালা চলে যাক্—  
(দূর) গগনের পারে উড়ে যাক্—

লিঙ্গ মনের ব্রহ্মপানের বহুত্ব জাল পুড়ে যাক্  
উর্ধ্বনার অর্গ তরু ছিঁড়ে যাক্ ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্ ।

শুধু তমসার পারে তারুকা নিকরে  
অশ্রু কিনার খরে খরে খরে  
দিব্য আঁথির রশ্মি কুসুম ফুল নয়নে ফুটে পাক্ ।

বরাহে আবার আসে বরংগা  
অশ্রু উলসী অগ্নি বরণা  
বৈধ নিয়ে তার দ্বিগুণ বোণার স্বর্ণরত্নী গুটি সাত  
সেই সপ্তরত্নী করি বন্ধার  
অতি উদ্ভাস তুলি ওকার  
বজ্রত মৌলী ধূল গোরা-শঙ্করে করি প্রণিপাত ।

কিলমিল করে সোনালী আলোক  
মিতালির মোহে মিসিরাজে লোক  
ফাল্গুনী মোহে নরনারী দৌহে গাঁথিয়া পরেছে মালতী,  
রাঙা হয়ে উঠে পলাশের ফুল  
ফুটিয়া উঠিল বসন্ত মুকুল  
মাধবী কুঞ্জে ওজনে ভুঞ্জে দৌহাবে যুবক যুবতী ।

আঁধিতে আঁধিতে চায় অনিমেষ  
দিক্ নির্দিকের শুধু একদিক  
কিছু খন পরে ভরা অন্তরে গৃহপিজুর ফিরি তার  
শাখে লয়ে যায় সুরগ-সুরভি সপ্তপর্ণ বোধিকার ।  
আঁধি ছলছল হৃদয় উতল  
দখিনা পবন চালে পরিমল  
এক পা বাড়াতে, পিছু ফিরে চায়, কিছু ফিরে পেতে চায় বা,  
শেফালির মত ঝরে পড়ে পাছে তায় বা ।

আলোকের গনি যে পরশমনি বয় প্রত্নাশে-প্রত্নাশে  
(হায়) মেঘছায় ঘন বাক্স পবনে কোথায় লুকাই বল সে ?  
চুপিয়া যাব কিরণ কণিক নীলজল উঠে ছলকি  
চারপের বোঁতে ভাবনের গান গুঞ্জরি উঠে পুলকি  
প্রলয়ে সজনে সে ইন্দ্রজাল  
সুরকাল হতে চলে সারকাল  
কুড়ি হতে কুল ফুটিয়া ফোঁস কত বলবল গায় গান  
কত না ভুল, কত প্রজাপতি, তবু তার নাহি যায় মান ।

(সেই মানিনীর এত অভিমান !)  
ফাঙনে ভুবনে লাগে কম্পন  
ক্রন্দন বৃদ্ধি করে ক্রন্দন  
অবনী নব অবগুণ্ঠন মহাকাল খুলে দেয় তাই,  
রাঙানো বহন অশোক পলাশে  
চকিত নয়নে চেয়ে চারিপাশে

মন খুল বল কুসুমের দলে প্রাণ চায় যাবে তায়ে চাই ।  
(তারি) অন্তঃপুর আসে বসন্ত অন্তর মধু ভিখারী  
পাচায়ে মৌন মহা পাচাবার অভিসার পথে দিশারি ।  
ববিরশ্মির বমণীয় রূপ  
হর্ষে শিহরে প্রতি রোমকূপ  
তুণে ও পর্ণে বিনায় বর্ণে অবর্ণনীয় মালিকা—  
(তারি) পর্বে পর্বে বন্দনা বাণী জপে বিবহিনী বালিকা ।  
(সেই) অমুরাগে রাঙা বৈরাগিনীর অক্ষমালিকা গলে  
(তারি) ধুকধুকিখানি মধ্যমণির ঝিকিঝিকি যেন জলে !  
আলোকে পুলকে বন্দনায়, চেতন্য সিদ্ধ ছন্দ পায়,  
কল্পিত মীড় মুচ্ছনায় বেজে ওঠে কার বাণী ?  
(যাব) সুবে মাড়' দিয়ে বলে উঠে প্রাণ এই আসি, এই আসি  
আমি ইহা-বৈ ই ভালবাসি ।

আশ্রু সে আলো কালো চলে যাক্ পাচায়ে তেপান্তরা  
কালভৈরব নিয়ে চলে যাক্ জলদ কাছঘরী  
তার—ডবল ডবরী ।



এই আলোকের অধাক যে বাণী  
 দেয় সে ইসারা দেয় হাতছানি  
 সে রাগিনী রাগে কাণ্ডহার কাণে বাঁজায় বজ্রভূমি  
 (তাই) নবদুর্বার আভিম বিছায়ে শ্রামার চরণ চুমি।  
 অব্যবহিত আলো উজল নবীন  
 আরো বেশী ভালবাসি প্রতিদিন  
 নির্জনে বসি বজনে বিহীন চাহি না রাতের কালো  
 বত করি পান, অপূর্ণমান, আরো চাই তত আলো।  
 ছি ছি ছি! মাগে মা! কালো মিশমিশ!  
 কালীর সাপের কান্ধকুণ্ডলি।  
 কালো দেখিলই করে 'নপিত' অন্তর বিষে নিষায়ে,  
 আলো দাঁও মোরে বুক ভরে ভরে  
 আলো দাঁও মোরে ছ'নয়ন ভর  
 বর্ণমালার সাতনরী হার ক'ণ্ট সলব মিশায়ে  
 আলোরেই ভালবাসি চিরকাল বাসিয়া মেটে না তৃষা এ।  
 রূপকথা পুরে যে মায়াব পুরী  
 সেথায় বিহরে আরবের ছুরী  
 অপাঙ্গে হানি আঁধার বিজুরী বৈধা ভাঙিয়া করে চুর  
 আর আলো দাঁও, আরো দাঁও সুর,  
 হৃদয়ে বাণীর বজ্র মধুর  
 রক্তাকিনীর আনন্দ নীর নটন ভঞ্জে পরিপূর  
 তবু, তবু অন্তর সুবিধুর।  
 আকাশে উজল আলোর বজ্র শ্রামল সোহাগে ঢালা  
 ধরণী ধস্তা, প্রোতাস্বীর বজ্র উধার আলা,—  
 আলোর রাগিনী, আলোকের সুর,  
 পানীর কুঞ্জে বাজায় নৃপূর,  
 নারিকেল ভাল করে করতাল বাজায় সে ধ্বজনি,—  
 কাহাবে কাকুতি কাহাবে মিনাত করে মান ভঞ্জন।  
 (তার) লোভন নয়নে নয়নের জল  
 হয় সুশোভন করে ঢলঢল  
 সরসীর পরে প্রভাত কমল শিশিরেও অমলিন,  
 দেবী বীণাপাণি বাজায় বাণী বাজান দিব্য বাণ  
 রিগি বিনি বিনি বিনি।  
 উলসিয়া উঠে অলসিত হিয়া গাহিয়া বাণীর জয়  
 রূপ স্নেহ প্রাবন ধস্ত মুখবিত্ত বিষয়।

বাক্ চলে বাক্ বাতি, প্রোতাস্বীর বাতি  
 তর সঙ্কল মত্ত বিপুল দৈত্যের মত্ত বাতি।  
 অগণিত কণী ডাকিনী যোগিনী প্রোতিনীর সখী  
 ঐরাবতের মত্ত অতিকায় গন্তীর বেদী হাতী।  
 বিত্ত বিকা শিখা বিদ্যা লিখা আগ্নেয়গিরি বুক  
 উক্ আলোয়া গরজে দেয়া বজ্র উগারে মুখ।  
 ক্রকুটি-কুটিল চোখের চাহনি চমকে চতুর্দিশ  
 (বুঝি) মুখভরা মধু অভিনয় শুধু বুকভরা তার বিষ।  
 আঁধারের ধারা করে আবদল  
 নির্বিড় নিকষ কালো কুন্তল  
 বিষ নিষিল ভয়-বৈজয় গাভবময়ী বাতি  
 কণিক আলোকে ঘনীভূত তম তমশায় উঠে মাতি।  
 বাক্ দিনমণি মহামহীমান্  
 তমসার পাবে চিব অন্নান  
 ওঠে না ডোবে না নাবে না নেভে না দীপ্তি অনির্বাণ।  
 অমৃতোৎসার রশ্মি তাহার শাস্ত ভাবান  
 এক সে বিবস্বান।  
 উদয় নাই, অস্ত নাই, অবগুষ্ঠন কুণ্ডা নাই,—  
 ছায়া যবনিকা মাত্রাবর্ণিকা জালা বহ্নিকা পুড়িয়া ছাই  
 নাই শোক মোহ, নাই অনৈর্ঘ্য,—  
 শুধু আলো, শুধু অরুণ আলোক, শুভ্র স্বপ্ন প্রকাশ,  
 শুধু প্রেম, শুধু নিকষিত হেম,  
 চক্ষে হেরিয়া বকে পেলেম  
 বক্ শোণিতে লিখিয়া গেলেম যুগ যুগান্তে সে-ইতিহাস।  
 শুধু আলো আর শুধু প্রেম, আর  
 শুধু আনন্দ অমৃত স্নান  
 পূর্ণ ধস্ত মোন মগ্ন, মগ্ন তবু নিমজ্জমান।  
 তাই বলি চলে বাক্ এ বজ্রনী  
 আঁধার বজ্রনী চলে বাক্—  
 রশ্মি কুসুম ধরে ধরে ধরে  
 দেখিয়া দেখিয়া গুটী আঁধার ভরে  
 মিটে যদি আশা মিটে বাক্—  
 জীবনের যুগে মরণের চুম  
 স্বপ্ন জড়িয়া চোখে ঘুম ঘুম কেটে বাক্—  
 (শুধু) দিব্য আঁধার রশ্মি কুসুম  
 ফুল নয়নে ফুটে বাক্।

# খাদ্যশস্য বৃদ্ধি ও গ্রামে কুটীর-শিল্প

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্তী

বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারসমস্যার দিনে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি ও গ্রামে কুটীর-শিল্প প্রচলন বিষয়ে সকলেই চেষ্টা করা প্রয়োজন।

১। পশ্চিম বাংলায় আশু খানেন্দ গুপ্ত এবং ইহার চাষে অসুবিধা—

বৎসরের যে সময়ে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে, ধান, চালের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ গরীব চাষীরা প্রয়োজনীয় প্রমাণ তালিকা বিনে প্রেরিত পাবে না সে সময় আশুখান পাঠবার অংশ টি তালিকাগকে কোন মতে বাঁচাইয়া যান। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়, সেচবিভাগ বিত্ত উচ্চ ভূমির ইচ্ছাট বর্ষ ব প্রধান ফসল। ইহার চাষ মোটেই লাভজনক নহে। তবুও এই ফসল উঠিতে আরম্ভ করিলে ধান-চালের চড়া দর অনেক নাশিয়া যায়। আশুখানের পর সাধারণতঃ কোন বিনিয়োগ—

প্রতি বিঘাতে

আশুখান, বৈশাখ-ভাদ্র ৩ মণ ১১ হিসাবে	৩৩
কলাই, ভাদ্র-পৌষ ২ মণ ..	২২
মোট	৫৫

কোন মতে পাওয়া যায়। অল্প উপায় নাই বলিয়াই ইচ্ছায়া এ প্রকার চাষ করিয়া থাকে। একটি পরিবারে সাধারণতঃ যে ৫৬ বিঘা জমি থাকে, তাহা এ ভাবে চাষ করিয়া ৬ মাসের খোয়াকও করতে পারে না। বৎসরের অধিকাংশ সময় কাজ না থাকিলে, বেকার অবস্থার অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। এ বৎসর ত, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে।

২। প্রতিকার। আশুখান, পরে কলাই-এর সহিত ইঞ্জিপশিয়ান কার্পাস চাষ।

পূর্বে আমেরিকান ও অষ্ট্রা কার্পাস চাষ করিয়া, পরে দীর্ঘ ২৫ ৩০ বৎসর যাবৎ সকলতার সহিত ইঞ্জিপশিয়ান কার্পাস চাষ করিয়া, ইহা এদেশে সচলকীল (acclimatize) করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার চাষ প্রযোজনীয় ও লাভজনক হইলেও সরকারী কৃষিবিভাগ, ব্রিটিশ আমল হইতে এখন পর্যন্ত, কেন যে ইহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন বুঝা যায় না। যোগাদি প্রতিকারে সামান্য সাহায্য করিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যে, ইহার চাষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এ প্রকার কার্পাস আশুখানের সহিত ৪ ফুট অন্তর বুনিয়া বেশ ভাল ফল পাইতেছি। বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট কার্যে অল্প ভিত্তিতে এ প্রকার মিশ্রিত চাষ হইলেও, ইহা চাষীদের মধ্যে প্রচলনের কোন চেষ্টা হয় নাই, কিংবা ইহার ফলাফলও সাধারণের

অবগতির বস্তু প্রকাশিত হয় নাই। আমি নিজে এভাবে কার্পাসে সহিত আশুখান পরে কলাই চাষ করিয়া, চাষীদের বর্তমান আর ৫৫ ফলে প্রতি বিঘায় ২০০ টাকার উপর বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি।

আশুখান বৈশাখ-ভাদ্র ৭ মণ ১১ হিসাবে	৭৭
কলাই ভাদ্র-পৌষ ৩ মণ ..	৩৩
ইঞ্জিপশিয়ান কার্পাস বৈশাখ-মাঘ ৩ মণ ৫০ হিসাবে ১০০	
মোট	২১০

কার্পাস চাষে ফল পাটতে হইলে অতিবিক্ত সার-এবং জমি আবশ্যিক মত খুড়িয়া, বিদে, মট দিয়া ও নিড়াইয়া দিতে হয়। এজন্য খানের ও কলাই-এর ফলন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধান চাষে এবং ধান কাটিয়া কলাই-এর জন্য চাষে যে মট, বিদে ব্যবহৃত হইবে, তাহা দুই চ'তের অধিক লম্বা হইবে না। ইহাতে ৪ ফুট অন্তর বোনা কার্পাস চাড়া বাচাইয়া, মট চল'চল করিতে পারিবে। কার্পাস বীজ বপন করা হইতে ফসল না হওয়া পর্যন্ত, মাঝে মাঝে গাছেয় গোড়া কোপাটয়া নিড়াইয়া দেওয়া হয় বলিয়া, কার্পাস গাছেয় শিকড় মাটির বহু নীচে প্রবেশ করিয়া রস সংগ্রহ কয়তে সীত ও গ্রীষ্মে অনাবৃষ্টির সময়েও গাছ বেশ সতেজন ও ফল, ফুল, কার্পাসে পূর্ণ থাকে। কার্পাসের প্রয়োজনে অতিবিক্ত সার ও পরিষ্কর ব'বদ ৪০ বাদ দিলেও প্রচলিত আরের ও গুণ মূল্য পাওয়া যায়।

৩। গবর্ণমেন্টের চেষ্টা ভিন্ন এ প্রকার চাষ চাষীদের মধ্যে প্রচলন করা কঠিন—

চাষীদের মধ্যে এ প্রকার চাষ প্রচলন করিতে হইলে প্রথম কয়েক বৎসর (ক) সরকারী জগতস্বায়তন (খ) টেম্পল কার্পাস বীজ ছাড়াইয়া বিক্রীত ব্যবস্থা (গ) সমস্ত মত ধান ও কার্পাস বুনিয়া কোপান, নিড়ানের জগতস্বায়তন অর্থ ব্যবস্থা (ঘ) বিনামূল্যে সার বিতরণ (ঙ) এবং পুরস্কার ঘোষণা দ্বারা প্রণীত মত বস্ত্র লম্বা চাষ করানো ও অষ্ট্রা ভাবে সাহায্য না করিলে ফল পাওয়া কঠিন। এ প্রকার কাজের সফলতার জগতস্বায়তন দমনী, অভিজ্ঞ, ওষ্ঠা কর্মীর আবশ্যিক তাহা পাওয়া কঠিন। এজন্য বোম্বের কৃষি বিভাগ এ প্রকার কাজে হাত দেন না। ব'বসী প্রাণ্টনের অধিকরণে যোগ্য কর্মীকে পুরস্কার দেওয়া ব্যবস্থা থাকিলে এ কাজ সহজ হয়। আমি নিজে এই উদ্দেশ্যে ৫টি চাষী দ্বারা, এ ভাবে চাষ কবাইতে বাইয়া উপরোক্ত সকল বস্তু ব্যবস্থা করিতে অশক্ত হওয়ার, আশাফল ফল পাই নাই। পুরস্কার লোভে যে ২৩

জন চাষী ভাল ভাবে চাষ করিতেছিল তাহারাও যখন জানিতে পাবে যে, এই পুষ্কর বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সমর্থন নাই, তখন হইতে তাহারা কার্পাসের আর কোন যত্ন লয় নাই। কার্পাসের যত একটি নতুন কসলে চাষীদের কোন আকর্ষণ নাই। যান ও কলাই ডুলিয়া কার্পাসের জন্ম কোন বড়ই লয় নাই।

৪। ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস চাষের আবশ্যকতা—

ভারতবর্ষে এক ইঞ্চির উপর লম্বা। শেষের কার্পাস জন্মে না বলিয়া কাপড়ের কলগুলি প্রয়োজনে বহু কোটি টাকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ইহা নিবারণ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশে কোন পরিকল্পনামুখারী কিংবা তাহার উপর আশের কার্পাস চাষ করিলে কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল কমিটি মারক ১৯৫৪ সন হইতে ১৫ বৎসরের জন্ম তাহার ব্যবহারী খরচ বহন করিয়া থাকেন। Letter No. F1/14/55 II dated 15-16 Dec. 1954 to I. C. C. C. from the Under Secretary to Govt. of Indian, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.

ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রদেশ এই সত্য্য লইয়া উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষ করিলেও পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ বাহ্যতে এ প্রকার চাষ করেন সে জন্ম আই সি. সি. সি.-র ডেপুটি সেক্রেটারী পশ্চিম বাংলার কার্পাস বিশেষজ্ঞকে লইয়া ১৯৫৫ ডিসেম্বর মাসে আমার ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস চাষ দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। এটী ডুলার আশ সোয়া এক ইঞ্চি। এ প্রকার চাষের লাভালাভ পরীক্ষার জন্ম তিনি অন্ততঃ পাঁচ একর জমিতে ইহার চাষ করিবার পরামর্শ দেন। ইহার ব্যবহারী খরচ তাঁহারা বহন করিবার প্ররীতি দেন এবং পূর্বের দিন বাংলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে বলিয়া যান। এ সময়ে ও তাহার পর ১৯৫৭ সন পর্যন্ত লোকসভার পশ্চিম বাংলার এ প্রকার ডুলা চাষের প্রচলন বিষয়ে আলোচনা হয়। কৃষি বিভাগ হইতে এই উদাসীনতার কারণ স্বরূপ জানান হয় যে, (ক) জমিদারচরণ চক্রবর্তীই ইহার একমাত্র উৎপাদক এবং ১৯৫২ সন পর্যন্ত তাঁহার চাষ ভাল হয় নাই। (খ) কার্পাস বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারলেন্ডের মতে ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস ভারতবর্ষের যত্নযোগ্য। ১৯৫২ সন পর্যন্ত আমার চাষ ভাল হয় নাই যানিয়া স্ট্রীলও বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে এই ধারণা বর্তমান ১৯৫৯ সনের শেষভাগেও কৃষি বিভাগের মত উন্নত প্রতিষ্ঠানের পোষণ করিবেন আশা করি নাই। বিশেষ ১৯৫২ হইতে আমার উৎপন্ন ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস পরীক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর বিভিন্ন কন মিল, বিশেষজ্ঞরা এবং ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল কন কমিটি যে প্রশংসাত্মক মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন সময়ে আমার ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস চাষ বিষয়ে মডার্ন রিভিউ, অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রবাসী, যুগান্তর প্রভৃতি কাগজে আলোচনা হইয়াছে। ১৯৫২ সন হইতে কৃষি বিভাগকে আমার

চাষ দেখিবার জন্ম প্রতিবৎসর বার বার অনুরোধ করিলেও কেবল ১৯৫৪ ডিসেম্বর আই. সি. সি. সি.-র ডেপুটি সেক্রেটারীর সহিত ভিন্ন, আশ পর্যন্ত আমার চাষ দেখেন নাই। আশ্বান পরে কলাই-এর সহিত মিশ্রিত কসল হিসাবে আমি যে ১৯৫৮-৫৯ সনে ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস উৎপন্ন করিয়াছি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম কৃষিবিভাগে ডাইরেক্টর আর্ট. সি. সি. সি.-কে পাঠাইলে পর তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, এই কার্পাস খুবই ভাল। ইহার আশ সোয়া ইঞ্চি লম্বা এবং ৮০নং সূতা প্রস্তুতযোগ্য। “The cotton is very good. Its staple length is 1½, fit to spin 80 standard yarns”.

৫। ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস চাষ পরিকল্পনা—

ভারত কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির উপদেশমত ১৯৫৬-৫৭ সন হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ একর করিয়া ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস চাষ উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের জন্ম একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করি। কৃষি বিভাগ ইহা বিবেচনা করিয়া মত দিবার জন্ম কয়েকজন বিজ্ঞানীকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের নিকটেও কৃষিবিভাগের পূর্ণোক্ত আশিঙুলি উপস্থাপিত হইলেও তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে পরিকল্পনামুখারী কাষ্য করিবার জন্ম সুপারিশ করেন। শেষ পর্যন্ত কার্পাস বীজ পুঁতবার দুই মাস উত্তীর্ণ হইলে, কৃষি বিভাগ এটী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরবর্তী বৎসরেও এ প্রকার চাষের কোন সম্ভাবনা নাই জানাইয়া দেন। আমি যে ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাসের সহিত মিশ্রিত কসল হিসাবে আশ্বান ও কলাই চাষ করিতেছি, বহু বিশিষ্ট লোক তাহা দেখিতে আসেন। গত এপ্রিল মাসে পদ্মকৃষ্ণ ডক্টর বাধাকুম্ভ মুগোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগরের এ. ডি. এম্. এখানে আসিয়া এ প্রকার একটি চাষের পরিকল্পনা দিতে বলেন। ১৯৫৯-৬০ সনের জন্ম চাষীদের মধ্যে প্রচলনের জন্ম এ প্রকার মিশ্রিত কসলের একটি পরিকল্পনা এ. ডি. এম্. কৃষি বিভাগকে পাঠাইলে পর চাষের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় বর্তমান মাসে, “১৯৫২ সন পর্যন্ত আমার চাষ ভাল হয় নাই এবং ডক্টর হবমান ইহা ভারতবর্ষের অমুপযোগী বলিয়াছেন”, অজুহাতের পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। কৃষি বিভাগের সত্য্য ও সতর্যোগ্যতার, এ ভাবে বর্জিত হইয়াও এই মূল্যবান ইন্ডিপেন্ড্যান্ট কার্পাস বীজ রক্ষার্থ প্রতিবৎসরই নানারকম অভাব-অভিযোগ ও বাধা-বিরোধ মধ্যে কৃষিবিভাগ কোনদিন ইহা গ্রহণ করিবে আশায়, এটী বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কোনও মতে এটী চাষ চালাইয়া যাউক। সুপের বিষয় যে, সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অল্পর আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এ প্রকার চাষ গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। গ্রামে কুটীর্ণ-শিল্প—

কৃষকদের মধ্যে অল্প পরিমাণে হইলেও এই ডুলার চাষ প্রবর্তিত হইলে বেকার সময় তাহারা এই ডুলার অর্থ চরকার সূতা কাটিয়া

দৈনিক দেড় হইতে দুই টাকা উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। বাংলার তুলা জন্মান হয় না বলিয়া ১৯০৫ সন হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যন্ত চরকার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অথচ যে সকল প্রদেশে তুলা জন্মে সেখানে শিত্তোর ক্রীড়ামলেও চরকা কাটরা থাকে। (এখানে শিত্তোরের চরকা কাটা বিষয়ে একটি চিত্র দিলে আকর্ষণীয় হয়। Modern Review, Dec. 1953, এবং প্রবাসী, ১০৫৮ সনে এই প্রকার ছবি আছে)।

ইহা সকলেই জানেন যে, কলে কিংবা চরকার প্রস্তুত হুতার অর্ধেক মূল্যই তুলায় মূল্য শোধ করিতে ব্যয়িত হয়। বর্তমানে ব্যাপকভাবে যে অর্থ চরকা প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে,

তাহাতে তুলায় মূল্য শোধ করিয়া দৈনিক বায় আনার মত উপার্জন হয়। নিজের উৎপন্ন তুলায় অর্থ চরকার হুতা কাটিলে যে বায় আনার হলে দেড় টাকা হইতে দুই টাকা আর হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষ টাটকা বীজ ছাড়ান, তুলায় পাজ করাও সুবিধা হয় এবং তাহা ছাড়া দ্রুত মিহি ও শক্ত হুতা প্রস্তুত হয়।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি A. I. C. C. এবং দেশের কর্ণ-বাহগণ যে খাতপত্র বৃদ্ধি ও গ্রামে কুটীর-শিল্প প্রচলন বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, উপযুক্ত পরিকল্পনামুখারী কার্য্য করিলে তাহার অনেকাংশে নিশ্চিত সমাধান হইবে সন্দেহ নাই।

## চিত্তোর নগরের প্রাচীন ইতিহাস

ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্তোর রাজধানীর উন্নয়ন যাত্রা অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম চিত্রকূট। এই চিত্রকূট নগরী রামায়ণে উল্লিখিত চিত্রকূট হইতে বিভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত চিত্রকূট বৃন্দলগ্নের অন্তর্গত বাল্মীকির অবস্থিত এবং ঐতিহাসিক বৃগে ইহা কখনও রাজ-নৈতিক গুরুত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। শুণ্ডবৃগ পর্যন্ত কোন ভ্রম বা শিলালেখতে অথবা কোন সমসাময়িক গ্রন্থে রাজ-ধানীর চিত্রকূটের উল্লেখ নাই।

চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সঙের বিবরণীতে আছে যে ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলতি হইতে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে কুচেলেতে গমন করেন। কুচেলে হইতে প্রায় ৪৬৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে উসে এনন এবং উসে এনন হইতে প্রায় ১৬৬ মাইল উত্তর-পূর্বে চিকিট বা চিটি অবস্থিত। পণ্ডিতেরা মনে করেন কুচেলে দেশ বলিতে গুজর দেশ বুঝায়। ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ নৌশরি লিপিতে আছে যে তাজিক (আরব) সৈন্য সৈন্য, কচের, সৌরাষ্ট্র চাবোটক, মৌর্য ও গুজর প্রভৃতি দেশ ধ্বংস করে। মনে হয় হিউ-এন-সঙ বর্ণিত কুচেলে এবং নৌশরিলিপিতে উল্লিখিত কচের অভিন্ন। গুজর ইহা হইতে একটি পৃথক দেশ ছিল। আলেকজেন্ডার কানিংহাম চিকিট নাম জৈনাকতুক্তি নামের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন এবং তাহার এই মত অনেকে সমর্থন করেন। বৃন্দলগ্নের প্রাচীন নাম জৈনাকতুক্তি। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে চন্দ্র বংশের নৃপতি জৈনাক তাহার নামানুসারে এই দেশের নাম জৈনাকতুক্তি রাখিয়াছিলেন। স্তরায় কানিংহামের এই বিষয়ে মত সমর্থনযোগ্য নয়। চিকিট রাজধানীর চিত্রকূট ছিল বলিয়া গ্রহণ করা খেরঃ যদিও হিউ-এন-সঙ উসে এনন হইতে ইহার অবস্থিতির দিক নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন।

চিত্রকূট সম্বন্ধে হিউ-এন-সঙ লিখিয়াছেন যে, ইহা পরিধিতে

প্রায় ৬৬৬ মাইল এবং ইহার রাজধানীর পরিধি ২১০ মাইল। ইহার জমি উর্বর ও এখানে প্রচুর শস্য জন্মে। এই স্থানের প্রধান উৎপন্ন স্রবা ডাল ও গম। এখানের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিল মা ও এখানে দশটি দেবমন্দির ছিল। দেশের রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের উৎসাহ দিতেন। নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ এখানে সমবেত হইয়াছিলেন।

হিউ-এন-সঙ বর্ণিত চিত্রকূটে ব্রাহ্মণ রাজা কে ছিলেন এ পর্যন্ত তাহা নির্ণিত হয় নাই। কিন্তু স্পষ্টভাবে বিচার করিলে তাহা অনুমান করা সম্ভবপর। রাজধানীর জরপুর বাজার অন্তর্গত চতুস্তে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখতে গুহিল বংশের একটি শাখার দ্বাদশ জন রাজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন গুজর বা গুজর দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজধানীর জরপুর ও আলোরায় রাজ্য গুজরও দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলবিকনি এই দেশকেই গুজরাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্তমান গুজরাতকে নহরওয়ারা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গুহিল বংশের পঞ্চম নৃপতি বনিকের শিলালিপি উন্নয়নের রাজ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও এই বংশের নবম নৃপতি হর্ষকে একটি তাম্রলেখতে "চিত্রকূট ভূপাল" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুইটি লিপি ও চতুর্থ লিপি আলোচনা করিলে প্রমাণ হইবে যে, এই গুহিল বংশের রাজা জরপুর হইতে উন্নয়নের রাজ্যের পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও চিত্রকূট ইহার রাজধানী ছিল। নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি রাষ্ট্রকূট লিপিতে আছে যে, ঐ সময়ে গুজরাত চিত্রকূট দুর্গে বাস করিত। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইবে যে, চিত্রকূট গুজর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশের রাজারা গুজর দেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া ইহা

সমসাময়িক শিলা ও তাম্রলিপিতে গুর্জর এবং গুর্জরেশ্বর নামে একাধ কবা হইয়াছে। চতুর্থ লিপিতে হর্ষরাজকে বিজ বলা হইয়াছে। সুতরাং হর্ষ ও তাঁহার পূর্ববর্তী রাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চম নৃপতি বনিক ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বংশের প্রথম নৃপতি ভদ্রপট্টের রাজত্বকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ছিল বলিয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে। এই সব প্রমাণাদি হইতে মনে হয় হিউ-এন-সঙ্গ বর্ণিত চিত্রকুটের ব্রাহ্মণ রাজা গুহিল বংশের তৃতীয় নৃপতি উপেন্দ্রভট্ট ছিলেন।

উপেন্দ্রভট্ট গুহিল বংশের শাখা বিশেষের ইতিহাস চিত্রকুটের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চতুর্থ লিপিতে আছে যে, ভদ্রপট্ট গুহিল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি বামের (পরশুবামের) দ্বায় ব্রাহ্মণ ও ক্রিষ্ণের গুণাবলী-সম্পন্ন ছিলেন।

প্রায় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুহিল বা গুহনসন্ত নামে এক ব্যক্তি নাগরত্নে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রাদি ক্রমোদয় শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত নাগরত্ন হইতে যেনপাট, বর্তমান মেবার বা উদয়পুর রাজ্য শাসন করেন। উদয়পুরের নিকটে অবস্থিত বর্তমান নাগদার প্রাচীন নাম নাগরত্ন বা নাগতদ ছিল। মনে হয় ভদ্রপট্ট এই গুহিল বা গুহনসন্তের পুত্র বা পৌত্র ছিলেন, এবং গুহিল বংশের মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুর্জর দেশে নতুন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, সে স্বাধীনব্রহ্মের রাজ্য প্রত্যক্ষবর্ধন গুর্জরদের পরাজিত করিয়াছিলেন। এই গুর্জর রাজ সম্ভবতঃ ভদ্রপট্ট ছিলেন। ভদ্রপট্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঈশানভট্ট রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ঈশানভট্টের রাজত্বকাল ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। এই সময়ে বাদামির চ্যাপ্কা বংশের দ্বিতীয় পুলিকেশী লাট, মালব ও গুর্জর দেশে সৈন্যতাহান করিয়াছিলেন। পুলিকেশীর প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জররাজ ঈশান ভট্ট ছিলেন। ঈশান ভট্টের পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্র ভট্ট রাজত্ব প্রাপ্ত হন। উপেন্দ্রভট্টের রাজত্বকাল ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিউ এন সঙ্গ চিত্রকুট পরিদর্শন করেন। উপেন্দ্র ভট্টের পর তাঁহার পুত্র গুহিল গুর্জর দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুহিলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বনিক ছিলেন। বনিকের রাজত্বকালের দুইটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটি চতুর্থ হইতে ৫০ খ্রীষ্টাব্দে নগর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার উৎকীর্ণের তারিখ ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয়টি উদয়পুর রাজ্যের দেবোৎ নামক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার উৎকীর্ণের তারিখ ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে আছে যে, বনিক মহারাজাধিরাজ ধবলগ-দেবের অধীন রাজা ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন এই ধবলগদেব কোটাভাজ্যের কানহুগানে প্রাপ্ত লেখতে উল্লিখিত

মৌর্য্য বংশের নৃপতি ধবল অভিন্ন ছিলেন। গুহিলেরা কতকাল এই ধবলগদেবের অধীন ছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ চিত্রকুটে প্রাপ্ত একটি লেখ হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে যান নামক এক সম্রাট ব্যক্তি চিত্রকুটে বাস করিতেন। তাহার পিতা ভোজ, পিতারহ ভৌম, ও পুত্রিতারহ মহেশ্বর ছিলেন। বনিকের পর তাঁহার পুত্র আউক সিংহাসনে আরোহণ করেন। আউকের রাজত্বকালে ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আরব সৈন্যগণ গুর্জর দেশ বিধ্বস্ত করে। আউকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুন্ডরাজের রাজত্বকাল ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এলোহার দশাবতার মন্দিরগাত্রে খোদিত লেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দক্ষিণে দিগ্বী কাকী প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া উজ্জয়িনীতে হিরণ্যগর্ভের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সৈন্যগণ শীর্ণকৃতি জয় করিয়া গুর্জররাজ কদুক প্রতিষ্ঠিত সৌধে এক কার্য সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে উৎকীর্ণ সম্রাট তাম্র-শাসনে অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা হইয়াছে যে, দক্ষিণে উজ্জয়িনীতে হিরণ্যগর্ভের অনুষ্ঠানের সময় গুর্জর প্রভৃতি রাজবংশকে প্রতিহার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণের প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জররাজ গুহিন কুন্ডরাজ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কুন্ডরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্করগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। শঙ্করগণের রাজত্ব-কালে মালবের প্রতিহার বংশের নৃপতি বংশরাজ গুর্জর দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময় হইতে শঙ্করগণ ও তাহার বংশধরেরা প্রতিহারদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া গুর্জর দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে।

রাষ্ট্রকূট বংশের এক শাখা, লাট বা দক্ষিণ গুজরাতে রাজত্ব করে। এই বংশের নৃপতি ইন্দ্ররাজ শঙ্করগণের সমসাময়িক ছিলেন। ৮১২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কর্ণারাজের বরোদা লেখতে আছে যে, তাঁহার পিতা ইন্দ্ররাজ গুর্জরেশ্বরশক্তিকে পরাজিত করিয়া-ছিল। এই লেখের সঙ্গ পটঙ্কিতে গুর্জরেশ্বরের উল্লেখ আছে। এই লেখের গুর্জরেশ্বরশক্তি বলিতে প্রতিহার বংশরাজকে বুঝায় ও গুর্জরেশ্বর শঙ্করগণকে নির্দেশ করে।

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় গোবিন্দ (খ্রীঃ ৭২৫-৮১৫) প্রতিহার বংশরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করিয়া মালব দেশ জয় করেন ও সেই দেশের শাসনভার পদমার বংশের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পর সিংহাসনচ্যুত হইয়া নাগভট্ট শঙ্করগণের সাহায্যে গোড়রাজ ও তাঁহার আশ্রিত চক্রবর্তীকে পরাজিত করিয়া কানকুজ অধিকার করেন ও জম্বীর তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। (খ্রীঃ ৮০৮-৮১২)। এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম চত্বার্দশ পর্যন্ত নাগভট্ট ও তাহার বংশধরেরা কানকুজ শাসন করেন। চতুর্থ লেখতে আছে যে, শঙ্করগণ গোড়রাজের সাম্রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার প্রভুকে



দীর্ঘ, কৃষ্ণ ও

উজ্জ্বল

কেশরাশির জন্য...

**এরাসমিক**

পারফিউমড

**কোকেনাট হেয়ার অয়েল**

এখন এই নতুন আকর্ষণীয় বোতলে।

ছাই রকম সুন্দর সুগন্ধে

গোলাপ ও যুঁই



ECHO. 4A-50 80

এরাসমিক কোঃ বিঃ লওনের পক্ষে হিন্দুস্তান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

(দ্বিতীয় নাগভটকে) উপহার প্রদান করেন। ইহার পর শব্দ-পণ মালবদেশে জর করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে বৃদ্ধ পরাজিত করেন ও লাট দেশের অধিপতি কর্তব্যভূক্তকে গুর্জরদেশের আক্রমণ হইতে মালবদেশে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। নীলগুপ্ত লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ চিত্রকূট গিরিভূমিতে অবস্থিত গুর্জরদেশে পরাজিত করিয়াছিলেন। বরোদা তাম্রলিপিতে আছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ মালবরাজকে গুর্জর দেশে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকূট কর্তব্যভূক্তকে গুর্জর ও মালবদেশের মধ্যে দরবার অর্গলক্ষ্যরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে চিত্রকূটে গুজররাজ শব্দরপণ ছিলেন। শব্দরপণের রাজত্বকাল ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। শব্দরপণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হর্ষ রাজপদে প্রাপ্ত হন।

হর্ষ প্রতিহার বংশের নৃপতি ভোজদেবের (খ্রীঃ ৮৩৫-৮২২) সমসাময়িক ছিলেন। হর্ষের রাজত্বকালে গোড়রাজ ধর্ম্মপালের পুত্র নৃপতি দেবপাল গুজর দেশে সৈন্যভাষিান করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কলচুরি বংশের কোকিলদেব ডাহলদেব (জন্মপূর্ব) অধিপত্য স্থাপন করেন। এই বংশের কর্ণদেবের বংশী তাম্রলিপিতে আছে যে, কোকিলদেব—ভোজ, বল্লভরাজ, চিত্রকূট-ভূপাল হর্ষ ও শব্দরপণকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিলহর্ষ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চিত্রকূট-ভূপাল হর্ষ ও জেয়াক ভূক্তির চন্দ্রবংশের নৃপতি হর্ষ অভিন্ন ছিলেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধের লেখক অন্তর প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছেন যে, চিত্রকূট-ভূপাল হর্ষ এবং চিত্রকূটের গুহিল হর্ষ একই ব্যক্তি ছিলেন। দক্ষিণ কোশলের কলচুরি বংশের পৃথী-দেশের আমোদা তাম্রলিপিতে আছে যে, কোকিলদেব—কর্ণাট, বজ্র, গুর্জর, কোকিল, শাক্তব্রহ্মরাজ ও বসুবংশের রাজার কোবাগার লুঠন করেন। কোকিলের প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জররাজ হর্ষ ও বসুবংশের নৃপতি ভোজ ছিলেন। কোকিল উভয়দেব পরাজিত করিয়া অভয় দিয়াছিলেন যে, ইষ্টাদর সিংহাসনচ্যুত করিবেন না। হর্ষ চিত্রকূট ভূপাল ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হওয়ার তাঁহার রাজধানী চিত্রকূট ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ও এই গুহিল বংশের রাজা উদয়পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ার এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার সময় হইতেই চিত্রকূট ইচ্ছা রাজধানী ছিল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

চতুর্থলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হর্ষ উদ্যোচন জর করিয়া ভোজদেবকে অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হর্ষ টক, বর্তমান পঞ্জাব জর করিয়া গুর্জর রাজ্যভুক্ত করেন ও সেখানে অধিরাজ ভোজদেবের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেন। হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গুহিল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় গুহিলের রাজত্বকালে কানৌজরাজ শব্দবর্ষণ (খ্রীঃ ৮৮০-৯০২)

টক দেশ গুর্জর অলবনের নিকট হইতে জর করেন ও তথায় ভোজদেব যে সার্বভৌমত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ধ্বংস করেন। অলবন দ্বিতীয় গুহিলের অপর নাম ছিল অধবা ইহা তাঁহার অধীন পঞ্জাবের ঐ সময়ের শাসনকর্তার নাম ছিল। দ্বিতীয় গুহিল প্রতিহার ভোজের পুত্র নৃপতি মহেন্দ্রপালের সমসাময়িক ছিলেন। মহেন্দ্রপাল দ্বিতীয় গুহিলের সাহায্যে পালবংশের নারায়ণপালকে পরাজিত করিয়া গোড়দেশে প্রতিষ্ঠা দাখ্যভুক্ত করেন। চতুর্থলিপিতে আছে যে, দ্বিতীয় গুহিল পৌড়রাজ্য জর করিয়া পূর্বদেশের রাজবৃন্দ হইতে কব আদায় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গুহিলের মৃত্যুর পর ভট রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ভট প্রতিহার বংশের রাজা মহীপালের (খ্রীঃ ৯১৪-৯৪২) সমসাময়িক ছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় ইন্দ্র কালবুজ দখল করেন ও তথা হইতে মহীপাল পলায়ন করেন। গুহিল ভট ও মেজাক-ভুক্তির চন্দ্রবংশের হর্ষ রাষ্ট্রকূটদের বৃদ্ধ পরাজিত করিয়া মহীপালকে রাজা উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন। চতুর্থলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভট তাঁহার প্রভুকে আদেশে দক্ষিণাত্যে যাইতে পরাজিত করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলচুরি বংশের প্রথম যুবরাজ ও চন্দ্রবংশের বশোবর্ষণ গুর্জর দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। উভয়ের মৃত্যুর পর বালানিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। বালানিত্যের রাজত্বকালে চন্দ্রবংশের উৎকর্ণ করা হইয়াছিল, বালানিত্য দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভগবান মুরারির জন্য একটি মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চিত্রকূটের গুহিলবংশের পতন আরম্ভ হয় ও কলচুরিদের প্রতিহার রাজগণ হীনবল হন। গুহিলেরা প্রতিহার রাজগণের দক্ষিণসমুদ্র উপ ছিলেন ও তাহাদের রাজ্যবিস্তারে ৭ বর্জাবক্ষ্য সর্গদাষ্ট নাভায়া করিয়াছিলেন। ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাহারা রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় বৃককে চিত্রকূট ও কালবুজ জয়ে বাধ্যপ্রদানে অকৃতকর্তব্য হইয়াছিলেন। মহীশূরের রাজা পঞ্জবংশের সত্যাবাক্য কোকিলবর্ষণ দাবী করেন যে, তিনি তৃতীয় বৃককে উত্তর দেশ জর করিতে সাহায্য করিয়া গুর্জরাধিরাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বালানিত্যের ভিন পুত্র ছিল—বল্লভরাজ, বিগ্রহরাজ ও দেবরাজ। বালানিত্যের মৃত্যুর পর এই রাজপুত্রেরা সিংহাসনে আরোহণ করিবার স্বেচছা পাইয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না।

মালবের পরমার বংশের নৃপতি বাকপতি-মুজ দশম শতাব্দীর শেষ চতুর্দশকে গুহিলদেব পরাজিত করিয়া চিত্রকূট মালব রাজভুক্ত করেন। পরমার বংশের ভোজদেব (খ্রীঃ ১০০০-১০৫৫) চিত্রকূটে জিভূবন নারায়ণের মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন। তিনি সেখানে “ভোজদেবী জগতি” নামে একটি টমারত তৈয়ার করেন। ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান গুজরাটের রাজা চৌলুক বংশের ভীমদেব আবুপূর্বক আক্রমণ করেন। আবুগাজ পরমার বংশের ধর্ম্মক আত্মরক্ষার্থে ভোজদেবের রাজ্যে চিত্রকূটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ভীমদেবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া চিত্রকূট পরিভ্রমণ



[illegible]

হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা' !  
এর হলদে টিনের ওপোর  
খেজুর গাছের ছবি দেখলে  
সবাই চিনতে পারে ।

মনব 'বন' 'ডালডা' বেবন এটি বনস্পতি নাম।  
 আশ্রয় এবং পরিবাসের সহজ জায়গা। সুক্ষিত  
 পথে সব সময়ই ডালডা বনস্পতি কিনা বনস্পতি  
 বনস্পতি। বন না বন বনস্পতি বন না বন  
 হবার বিবাদ এতে থাকে না আবহাওয়া কিছু এছাড়া  
 বাসবন (সেই সব বাসবন  
 প্রকৃত বনস্পতি থাকবে।



**ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর  
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।**

করিয়া আব্বাছো প্রত্যাবর্তন করেন। ভোজদেবের মৃত্যুর পর চৌলুক্য বংশের অবনতি হয়।

চৌলুক্য বংশের কুমার পাল (খ্রিঃ ১১৪৫-১১৭২) শাক্তধর্মী বিজয়ের পর গুজরাটে করিবার পথে চিত্রকূটে শিবির স্থাপন করেন। এই সময়ে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেই স্থানে ভগবান সমিদ্ধেশ্বরের পূজা করেন ও তাঁহার মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত একটি গ্রাম দান করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিত্রকূট নাগভ্রহর গুহিল বংশের রাজ্যভুক্ত হয়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গুহিল বংশের মূল শাখা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মেনপাট বা মেবার শাসন করে। এই রাজ্যের রাজধানী নাগভ্রহর ছিল। এই বংশের নৃপতি জৈত্র সিংহের পুত্র তেজসিংহ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নাগভ্রহরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকর্ণ এক শিলালেখ চিত্তোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখতে চিত্রকূট মহাদুর্গের উল্লেখ আছে। ইহা নাগভ্রহরের গুহিল বংশের চিত্তোরে প্রাপ্ত লেখগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন। তেজসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সমরসিংহ নাগভ্রহর রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে উৎকর্ণ পাটধানা শিলালেখ চিত্তোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখগুলি ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দণ্ডভূপুত্রের চাহমান বংশের নৃপতি হুম্মীয় চিত্রকূট আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে সমরসিংহের পুত্র বহুসিংহ নাগভ্রহরের সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনেক পূর্বে গুহিল বংশের শিশোদীয়া শাখার কল্মশসিংহের সঙ্গে তাঁহার কন্যা পদ্মিনীর বিবাহ দেন।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান অলাউদ্দিন খালজি চিত্রকূট দূর্গ আক্রমণ করেন। বহুসিংহকে এই বিপদে সাহায্য করিবার জন্ত তাঁহার জামাতা কল্মশসিংহ পুত্রাদিসহ চিত্রকূট দূর্গে আগমন

করেন। বহুসিংহ দুই মাস সুলতান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার পর দূর্গরক্ষার হতাশ হইয়া সকলের অগোচরে গোপনে দূর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুলতানের শিবিরে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন। সুলতান তাঁহাকে বন্দী করেন ও বিপুল উদ্যমে চিত্রকূট দূর্গ আক্রমণ করেন ও তাহা জয় করেন। কল্মশসিংহ ও তাঁহার পুত্রগণ বৃদ্ধে নিহত হন। সুলতান তাঁহার পুত্র শিবির থাকে দূর্গরক্ষক নিযুক্ত করিয়া বন্দী বহুসিংহসহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। শিবিরে আর চিত্রকূট দূর্গে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয় মনে করিয়া তিনি চাহমান বংশের মালদেবের হস্তে দূর্গের ভার অর্পণ করেন। মালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জেসো দূর্গভার গ্রহণ করেন। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যন্তরকাল পরে গুহিল বংশের শিশোদীয়া শাখার হুম্মীয় দেব জেসোকে পরাজিত করিয়া চিত্রকূট দূর্গ দখল করেন। হুম্মীয় এবং তাঁহার বংশধরগণ চিত্রকূটে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন ও মহারাণা উপাধি গ্রহণ করেন।\*

\* প্রবন্ধের কলেবর সঙ্কোচিত করিবার জন্ত ইহার বচনায় মূল উপাদানগুলির প্রকাশপত্রের পরিচয় দেওয়া হইল না। পাঠকেরা ইহাদের প্রকাশপত্রের পরিচয় প্রবন্ধ লেখকের রচিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিতে প্রাপ্ত হইবেন :—

(1) Origin of the Pratihara Dynasty, Indian Historical quarterly, vol X, p 337.

(2) History of the Gurjara Country, Ibid', p 613.

(3) Early History of the Kalachuri Dynasty, Ibid, vol. XIII, p 482.

(4) The Pratiharas and the Gujjaras, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XXIV, part IV.

**ডায়া-পেরসিন**

হজমশক্তি  
বজায় রেখে  
স্বাস্থ্যের  
উন্নতি করে

ইউনিয়ন ড্রাগ - কলিকাতা

## আর্ন্ত-জাণে নৌকার অভাব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বহু জেলায়, বহু স্থানে এই বৎসর দারুণ বজ্র হইয়াছে। ঘর, বাড়ী, মাঠ, ঘাট ও পথ জলে ডুবিয়া গিয়াছে—জলে তলাইয়া গিয়াছে বলিলে প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে কতকটা খাপ খায়। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তু সব ভাসিয়া গিয়াছে। অস্ত্রান্তবীরের দ্বার এইভাবে বজ্রের জল সহজে কমিতেছে না—কারণ বা কারণসমূহ বাহাই হউক না কেন। কলে জনসাধারণের হুংপ, দুর্দশা, কষ্ট বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্ন্তজাণের জন্ত সরকার কষ্টক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রেরিত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধাদি ও মাথা গুঁজিবার জন্ত তাঁবু, ত্রিপল, হোগলা প্রভৃতি নৌকার অভাবে বজ্রাপীড়িত গ্রামাঞ্চলে সহজে বা নীচ নীচ পৌঁছিতেছে না, কোন কোন জায়গায় আদৌ পৌঁছিতেছে না। সাময়িক বিভাগ হইতে লওয়া ববাবে নৌকার সংখ্যা প্রয়োজন্যের তুলনায় খুবই কম। তবুও তাহাদের সাহায্যে কিছুটা খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধাদি বজ্রাপীড়িত জনগণের নিকট পৌঁছাইতেছে।

হাওয়াই জাহাজে করিয়া খাদ্যাদি যে সব উঁচু জায়গা জলের উপর আগিয়া আছে ও যেখানে বজ্রাপীড়িত জনগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার উপর ফেলা হইতেছে। সামান্য কিছু লোক এই খাদ্যাদি কেলিবার কালে বজ্রাচাণা পড়িয়া আহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মারা গিয়াছে।

আর্ন্তজাণে সাধারণ নৌকার অভাব, বিশেষ করিয়া ডিক্রী ব অভাব দারুণ অমুভূত হইতেছে। উপযুক্ত সংখ্যক নৌকা বা ডিক্রী নাই কেন?

প্রথমেই দেখা বাউক আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কতগুলি নৌকা, ডিক্রী, সালতী আছে। ইংরেজী ১৯৩১ সনের আদম-শুমারীর সময় অঞ্চলবস্ত্রের নৌকাদির সংখ্যা গণনা করা হয়। এই সংখ্যা যে সঠিক তাহার দাবী কর্তৃপক্ষ করেন নাই। ঐ সনের সেলস অ্যাপারিনটেনডেন্ট লিখিয়াছেন যে :

“Subsidiry Table VII slows the results of an attempt to obtain an estimate of the numbers boats and steamers in Bengal. Bengal is unique in India for the extent of its navigable water-ways and for the number and variety of boats which ply upon them, but no estimate for the whole province exists from which their numbers can be calculated.

The figures given in Subsidiary table makes no pretence to completeness or accuracy but they are interesting as the first attempted estimate of this kind.”

অর্থাৎ নৌকা ও স্টীমারের সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টায় কঙ্গ ৭ নং ‘পরিপূরক কোষ্ঠার দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের মধ্যে নৌকার প্রকার ও সংখ্যার এবং নাব্য জলপথের পরিমাপে বাংলা অদ্বিতীয়। কিন্তু এ বাবৎ সমগ্র প্রদেশের নৌকার সংখ্যা আন্দাজ করিবার মত কোন তথ্য ছিল না। পরিপূরক কোষ্ঠার যে তথ্য দেওয়া হইল তাহা সঠিক বা সম্পূর্ণ এ সম্বন্ধে কোন দাবী নাই, কিন্তু প্রথম চেষ্টা হিসাবে ইহার মূল্য আছে।

নিম্নে আমরা ১৯৩১ সনের বাংলার সেলস রিপোর্টের ৭০ পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তথ্যাদি দেওয়া আছে তাহা হইতে পশ্চিমবঙ্গের জন্ত আবশ্যক তথ্যাদির চূষক সংকলন করিয়া দিলাম। আগ্রহীল পাঠক সম্পূর্ণ তথ্যাদির জন্ত ঐ রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিতে পাবেন।

চাণীদের ছোট ছোট		মাল ও আরোহী বহিবার		
নৌকা প্রভৃতি	বড় বড় নৌকা			
ডিক্রী, ৫০ মণের	২০ মণ হইতে	বাগানের বহন		
সালতী কম বহন	৫,০০০ মণের	ক্ষমতা জানিতে		
প্রভৃতি ক্ষমতার	উপর বহন	পারা যায় নাই		
নৌকা	ক্ষমতা	বড়	ছোট	
বন্ধমান	২১	৫	১০	৬০
বীরভূম	১	১	১	১
বাকুড়া	১১	১	১	১
মেদিনীপুর	৫,১২৮	১১৫	২২৯	৬
হুগলী	৪১	২৯৫	২৫	১৭
হাওড়া	১২০	১২	৬০	২১
বঙ্গমত বিভাগ	৫,২২৫	১২৭	১৭৬	৭১
২৪ পরগণা	১,১২১	২৮৫	১,১০০	২৫৯
কলিকাতা	১	১	১	১,১৮১
নন্দীয়া	১,০২২	২২০	১১০	১১০
মুর্শিদাবাদ	১,৫১০	৭৭	২১১	৩৫
দিনাজপুর	১	১	১	১
জলপাইগুড়ি	১	১	১	১০
দার্জিলিং	১	১	১	১
মালদহ	২,০৩৫	২২৮	২১১	৭৩
কুচবিহার	১৭	১১১	৩	৫
পশ্চিমবঙ্গ	১৬,০৪১	১,৮০২	২,৬৬৫	৬৮৫
অঞ্চল বঙ্গ	৮,৮০,৯২৮	৪৮,৬০২	২১,৫৯৫	১৬,৪০২

পশ্চিমবঙ্গের (তাহার চিত্রিত জেলায় সব নৌকাদি ধরিয়া) নৌকাদির মোট সংখ্যা :— ২৬,১৫৪টি। অথও বঙ্গের নৌকাদির মোট সংখ্যা :— ১০,৪৬,৪২১টি। পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র বঙ্গের নৌকাদির শতকরা ২৫ ভাগ নৌকাদি ছিল।

উপরোক্ত তথ্য হইতে আর্জট্রাণের কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ নৌকাদির সংখ্যার মোটামুটি একটা হমিশ পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কিছুসংখ্যক নৌকাদি পূর্বোক্ত গণনার সময় বাদ পড়িয়াছে, তেমনি নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি জেলায় গণিত নৌকাদি (বাহার একটা মোটা অংশ পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে) সবটাই পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ধরিয়াছি।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট নৌকা, ডিকী, সালতী প্রভৃতির সংখ্যা ১৬,০৪১ + ১,৮০২ = ১৭,৮৪৩টি। আশ্রয় যদি ধরিয়া লই যে, নৌকাদি গণনার সময় সিকি বাদ পড়িয়াছে, তাহা হইলে পশ্চিম-বঙ্গে ছোট ছোট নৌকাদির সংখ্যা হইবে  $১৭,৮৪০ \times ৪৩ = ২০,৭৮৭$ টি। আর নদীয়া ও মালদহ জেলায় ছোট ছোট নৌকাদির সংখ্যা হইবে ৮,৭১০টি। ইহার অর্ধেক পাকিস্থানভুক্ত এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া যদি ধরি ত খুব অজ্ঞার হইবে না। কারণ নদীবহুল অংশই পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। এমতে এই হই জেলায় ৪,৩৫৭টি নৌকা পূর্বোক্ত ২০,৭৮৭ হইতে বাদ যাইবে। মোট ছোট ছোট নৌকাদির সংখ্যা, বাহা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে, ঠাঁড়ায় ১৯,৪৩০টি। মোটামুটি ২০,০০০ হাজার।

গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে হুতিনখানি করিয়া নৌকা পড়ে। আর বর্তমান বিভাগে প্রতি বর্গমাইলে অর্ধেকেরও কম।

এখন কথা হইতে পারে যে, ইহা ত ৩০ বৎসর আগেকার অবস্থা; এখন লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৌকাদির সংখ্যা বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে গত ৩০ বৎসর বাড়িয়াছে :

	শতকরা
১৯৩১-৪১	২০.৬
১৯৪১-৫১	১৩.৬
১৯৫১-৬১	২০*

মোট  
৬৮.৫ জন

তর্কের খাতিরে নৌকাদির সংখ্যা লোকবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়িয়াছে ধরিয়া লইলেও, প্রতি বর্গমাইলে একখানি করিয়া নৌকাও হয় না।

আমাদের বস্তুত্ব মনে হয়, গত ত্রিশ বৎসরে নৌকাদির সংখ্যা বাড়েনি, বরং কমিয়াছে। যে সকল কারণে নৌকাদির সংখ্যা কমিয়াছে তাহা দেখাইতেছি। আপানী আক্রমণের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার অনেক নৌকা জলে ডুবাইয়া দেন ও পোড়াইয়া ফেলেন। অবশ্য এইটি পূর্ববঙ্গেই ব্যাপক ভাবে হইয়াছিল; কিন্তু পশ্চিম-

বঙ্গে যেহা ই পার নাই। তাহার পর বৃহৎ শেব হইলে নদীযাত্রক পূর্ববঙ্গে স্বাভাবিক দরকায়ে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু নৌকাদি ধরিয়া পূর্ববঙ্গে চালান দেওয়া হয়। সরকারের নৌকা তৈয়ারীও পরিকল্পনা, অজ্ঞাত পরিকল্পনায় ভায়, অকর্মণ্যতা ও চুরির জন্ত বান-চাল হয়।

নৌকার যান্ত্রিকায়না বৈশ্ব ভাগই মুসলমান। বাহারা নৌকার মাল ও যাত্রী বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের মধ্যে মুসলমানের অনুপাতই বেশী। ১৯২১ সনে, হিন্দু, মুসলমান হিসাবে বাহারা এইরূপে জীবিকা অর্জন করিত (Transport water) তাহাদের সংখ্যা পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত হইতেছে ২৫ : ১৩২। দেশ বিভাগের পর অনেক মুসলমান, বাহারা পশ্চিমবঙ্গের নদীতে এইরূপে জীবিকা অর্জন করিত, নৌকা লইয়া পাকিস্থানে পলাইয়া যায়। যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়াছে পাকিস্থান সরকারের কড়াড়িতে নৌকা ফেরত আনিতে পারে নাই। এইরূপে নৌকার সংখ্যা কিছুটা কমিয়াছে।

আজকাল নদীনালায়, খালবিলে তেমন মাহ পাওয়া যায় না। এ বৎসর ভাগীরথীতে তেপসে মাহ বা উল্লি মাহ আসে নাই। শুধু এ বৎসর নচে গত মশ-বাং বৎসর বাবং মাহের অভাব ঘন ঘন অনুভূত হইতেছে। জেলেদের নৌকার সংখ্যা ক্রম কমিয়া যাইতেছে। জেলেরা অল্প ব্যবসা ধরিতেছে। শুধু ভাগীরথীতে নচে, অজ্ঞাত বহু স্থানে অবস্থা রুহুরূপ, এজন্য জেলেদের হুং-হুর্দিশ, অভাব-অভিযোগের কথা প্রায়ই সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বে নৌকার মালবহন করা সহজ ও সস্তা ছিল। অনেক গৃহস্থ মাসকাবারে বাজার গল্প হইতে ধরিয়া করিয়া নৌকার করিয়া গুলে আনিতে। বোলায় ক্ষেত্রবিশ্ববুর পিতা পানি-হাটীতে বাজার করিয়া জেলে ডিকী করিয়া খড়দহের খাল দিয়া মালামাল আনিতে। এক্ষণে খড়দহের খাল মজিয়া বাওয়ার ও বেলের পুল নীচ হওয়ার নৌকার মাল লইয়া বাওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ বহু স্থানের খাল, বিল মজিয়া বাওয়ার ও রাস্তা পাকা হওয়ার গল্প গাড়ী বা বেশী মাল হইলে মোটর-লরীতে আনিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এজন্য নৌকার সংখ্যা কমিতেছে বৈ বাড়িতেছে না।

পূর্বে জমিদারগণ খাল, বিল পাহাপাহারের জন্য খেরা নৌকা রাখিতেন—ইহাতে তাহাদের সামান্য কিছু আয় হইত। এখন জমিদারগণের জমিদারী গিয়াছে; আইনতঃ হয়ত খেরা পাহাপাহারের অধিকার সরকারের না বর্তাইলেও তাহারা এই সব খেরা বহু করিয়া দিয়াছেন ও নৌকা বেচিয়া দিয়াছেন। আশ্রয় একটি খেরার কথা জানি, জমিদারের বার্ষিক আয় খেরা হইতে হইত ৬.৭৭ টাকা। মাল লইয়া পাহাপাহার হইলে এক পরসা করিয়া নিকটস্থ জমিদারের কাছারীতে দিতে হইত। এখন কাছারী

\* জন্ম ও মৃত্যুকার হইতে এবং Sample census-এর যে সব তথ্যাদি জানা গিয়াছে তাহা হইতে।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

## রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকে  
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—  
আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও মোলায়েম দেখাবে।  
তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ  
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
লাবণ্যকে সুন্দর করে তোলে এবং আপনার ত্বকে  
সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সর্বত্র মত ফেণী মানুষ দেখবেন  
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেক্সোনা



রেক্সোনা, গ্লো, লি, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার, লি, কলকাতা ভারতে সঞ্চালিত

RP. 159-X52 BG

উঠিয়া গিয়াছে; বার্ষিক ৬.৭ টাকা আদায়ের জন্য লোক বাধা স্ববিধার নহে। এজন্য তাঁহারা নৌকা বেচিয়া দিয়াছেন।

এইরূপ বহু কারণে আমাদের মনে হয় নৌকাদির সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা খুবই কমিয়া গিয়াছে। আমরা আশ্বাস করি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নৌকাদির সংখ্যা ১৫,০০০ হাজারের বেশী হইবে না। আমাদের অহুমান ভুল হইতে পারে। এ বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি যদি সরকার আগামী ১৯৮১ সনের আদমশুমারীর সময় সংগ্রহ করেন ত ভাল হয়।

নৌকা বা ডিক্রীর প্রভুত সংখ্যা ও মালবহন ক্ষমতা নির্ধারিত হইলেই হইল না। বাহাতে বন্যার সময় আর্ন্তজাতিকের জন্য বর্ষেই সংখ্যক ছোট ছোট নৌকা, ডিক্রী, সালতী প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহাও ব্যবহা আগে থেকে করিতে হইবে। ছোট ছোট নৌকা, ডিক্রী, সালতী প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ে তাহাও ব্যবহা আগে থেকে করিতে হইবে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হই যে, প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডরিক দি গ্রেট বাহাতে বৃহৎ সময় তাঁহার নিজ রাজ্য মধ্যে কামান টানিবার ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ব্যবহারের বলশালী ভাল ঘোড়া বর্ষেই সংখ্যায় সহজে পাওয়া যায় তাহার জন্য বড় বড় কৃষকদের বলশালী ভাল ঘোড়া কিনিবার জন্য টাকা দান দিতেন। কৃষকেরা লাগল টানিবার জন্য ছোট ঘোড়ায় পরিবর্তে বড় ঘোড়া কিনিতে পারে ও রাখে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবহা করিয়া ছিলেন। আমাদের দেশে মূল্য বাবদ্যাহা কোন বিদেশী ব্যবসায়ী ঘোড়া বেচিতে আসিলে আগে পছন্দমত ভাল ভাল ঘোড়া কিনিয়া বাকী ঘোড়া বাজারে বেচিবার হুকুম দিতেন।

বাহাতে লোকে ছোট ছোট নৌকা, ডিক্রী, সালতী বাধে তাহার জন্য অল্পমূল্যে সরকার যদি কাঠ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন ত ভাল হয়। পাকা তাল গাছ—সরকার ত এখন দেশের জমিদার ও প্রাইভেট ফরেস্টের মালিক—আধা কড়িতে দেন বহু লোকে সালতী রাগিতে পারে। এজন্মের মত নদ, যেখানে গ্রীষ্মকালে লোকে পারে হাঁটিয়া পার হয় ও বর্ষায় নৌকার বা ডিক্রীতে পার হয়, নৌকা, ডিক্রী প্রভৃতি বাধিবার জন্য বা ডাকায় তুলিয়া রাখিবার জন্য ঘাট বা জমির যদি ব্যবহা সরকার করেন, তাহা হইলে লোকের নৌকা, ডিক্রী প্রভৃতি রাখিবার আগ্রহ বাড়িতে পারে। নৌকা, ডিক্রী প্রভৃতি বাহাতে চুরি না যায় তাহার জন্য নৌকা, ডিক্রী প্রভৃতিতে নম্বর করিয়া ধানার রেজিষ্টারী করিবার ব্যবহা করিলে

লোকে নৌকা ডিক্রী প্রভৃতি রাখিতে উৎসাহ বোধ করিবে এবং চুরিও বন্ধ হইবে।

এই বিষয়ে কি কি কথা উচিত আমাদের বাহা মনে হইল নিবেদন করিলাম, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। সরকার যদি বিভিন্ন স্থানীয় মাফলার প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করেন ত ভাল হয়। নাবজাদা ব্যক্তিদের লইয়া বা পাকা সরকারী কন্সটারীদেব লইয়া কমিটি গঠন করিলে বিশেষ কল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমি আমাদের দেশের নৌকা, ডিক্রী, সালতী সহজেই, বিশেষ করিয়া শ্রোতে, উন্টাইয়া যায়। নৌকার ভারকেন্দ্র সেণ্টার অব গ্রাভিটি) ও সেটা সেণ্টারের ব্যবধান বেশী হয়, বাহাতে নৌকা, ডিক্রী, সালতী সহজে উন্টাইয়া না যায় তজ্জন ইহাদের আকার-আকৃতি সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের মতায়ত ছবিসহ বাংলায় প্রকাশ করিলে, ভাল হয়। বাহাতে নৌকাদিতে বেশী বোঝাই না হয় তাহার জন্য তাহাজে যেমন গ্লিমসোল লাইন আঁকা থাকে তেমনিদ্বিগ প্রত্যেক নৌকাদিতে দিবার ব্যবহা থাকা উচিত বলিয়া মনে হয়।

কি করিলে যক্ষণে নৌকা, ডিক্রী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কি করিলে আবোহীদের নিরাপত্তা বাড়ে এ সম্বন্ধে যদি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মন দেন ত ভাল হয়

## দি ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া নিমিটেড

কোল : ২২—৩২৭২

গ্রাঃ : কৃষিসংখ্যা

সেক্টর অফিস : ৩৬নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সকল প্রকার ব্যাঙ্ক কার্য করা হয়

কি: ডিপজিটে পতকরা ৪.৩ সেভিংসে ২.৫ হুদ নেওয়া হয়

আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল ছয় লক্ষ টাকার উপর

চোরামান :

জঃ ম্যানেজার :

শ্রীমদ্রাধ কোলে এম,পি, শ্রীমদ্রাধ কোলে

অফিস : (১) কলেজ রোডের কলি: (২) বাঁকুড়া

# পুস্তক গরিচম

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণ —  
ডক্টর সুনীলকুমার গুপ্ত এম-এসসি, এম-এ, ডি-ফিল। এ, মুখার্জী  
এণ্ড কোং ( প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা  
—১২। মূল্য সাত টাকা।

গবেষণামূলক এই আলোচ্য গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের বাংলা  
দেশে যে জাগরণ আসিয়াছিল তাহারই একটি ধারাবাহিক ইতিহাস  
পাওয়া যায়। এ জাগরণ ইতিহাসের স্রবণীয় অধ্যায়। জীবনের  
সর্বক্ষেত্রে এই পরিবর্তন, পদবর্তী যুগের ক্ষেত্র-রচনার বিশেষ  
সাহায্য করিয়াছে। এক হিসাবে ইহাই বর্তমান যুগের বনিয়াদ।

যে পাঁচটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানিকে ভাগ করা হইয়াছে তাহার  
একটা বৌদ্ধিকতা আছেই, বরং তাহার ধারাবাহিকতাও লক্ষ্য  
করা যায়। এই পাঁচটি অধ্যায় হইতেছে—ধর্ম্মান্দোলন, সাহিত্য,  
শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি। এই ধর্ম্মান্দোলন হইতেই জাগরণের

সূত্রপাত। কারণ ধর্ম্মান্দোলনকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জাতীয়  
সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ—এমন কি রাজনীতিও গড়িয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ আমাদের দেশে খুব বেশী নাই।  
পূর্বে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।  
তিনি ঐরূপ অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে  
স্বয়ংক্রিয় যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় অবশ্য অনেক কাজ করিতেছেন।  
স্বপ্নের বিষয়, এ বিষয়ে আজ অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই  
নব জাগরণের কথা যোগেশবাবুও পূর্বে লিখিয়াছেন। তবে এই  
গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র দিক লইয়া বর্তমান গ্রন্থকার এই  
গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যে  
তাহার ক্ষতি হয় না। বরং একই বিষয়ের একাধিক গ্রন্থরচনার  
বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ আছে। এইরূপ  
অবকাশের ফলেই সুনীলকুমার তাহার এই গ্রন্থখানিতে নতুন

আনন্দ উৎসবে

## ক. হোডের

প্রসারন সামগ্রী



The advertisement features a black and white portrait of a smiling woman on the left. To her right, there is a decorative floral border. Below the text, several products are displayed: a box of 'Kenak Snow' soap, a cylindrical container of 'Kenak Talcum', a small glass bottle of perfume, and a box of 'K. Hoder's Extra Scented Oil'. The text is in Bengali, promoting these products as gifts for the Anand Utsav.



আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মাশোলনের সূত্র ধর্ম্মিহাই আগাইয়া গিয়াছেন ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার এই স্বতন্ত্র্য দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রন্থবানির বৈশিষ্ট্য। এই ধর্ম্মাশোলনের জন্যই যে একদা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার পারিপার্শ্বিকতা বিচার করিলেই সেটি বুঝা যায়। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, “ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রেরণা প্রথমে গভীর ষাণক ব্যবহারের মূলে কাজ করিয়াছে।” সমাজসচেতনতাও এই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। সমাজের কুসংস্কারগুলি দূর করিবার জন্যই একদা আইনের অংশর লইতে হইয়াছিল। এই কার্যে প্রধান উত্তোগী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই রামমোহনই প্রথম জাতির সহিত রাজনীতির পরিচয় করাইয়া দেন। সে দিক দিয়া “রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে রামমোহনই পথিকৃৎ।”

এইরূপ জাগরণ সর্বদেশে সর্বকালে হইয়াছে। যাহারা বাংলায় নবজাগরণের সহিত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনা করেন, তাঁহারা একটা বিষয়ে ভুল করিয়া থাকেন, বাংলার জাগরণের স্বরূপের সহিত ইউরোপের নব অভ্যুত্থানের কোথাও মিল নাই। সত্য বটে, এই জাগরণের মূলে ইউরোপীয় প্রভাব আছে এবং তাহারই মিলনের ফলে এইরূপ জাগরণের সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পতি-প্রকৃতি, ইহার সমাজ-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়াই জাতি হিসাবে ইহার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান।

এই বিষয়টিকে গ্রন্থকার মত্ন করেকটি কথায় অতি স্পন্দভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“বাংলার নব জাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিকাশ থাকিলেও ভাব-দর্শনের প্রাবল্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। এই কারণেই নবযুগের বহু মানবমুখী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এক ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া নবযুগের আন্দর্ষ স্পন্দর আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি সুফলও ফলিয়াছিল। এই ভাবাদর্শের প্রাবল্যের জন্মই হিউ-ম্যানিজম এই দেশে রূপে এসে জাতীয় চৈতন্য-মানসে একটি বিশেষ প্রেরণা হইয়া জাতিকে নবযুগের প্রাণরূপসমূহ শিল্প-সাহিত্যের পদ্ম ফুটাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরোপের ভ্রাতৃ ভোগবাদ বাস্তবিকতা ও প্রয়োজন-বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যে হিউম্যানিজম এদেশে এক প্রাণ-হীন ধর্ম্মের পরিণত হয় নাই।”

গ্রন্থকার এ সব বিষয়ে সচেতন থাকিয়াই বাঙালীর নবজাগরণের পৌরষময় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাহার এ প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। যাহারা তথ্যসম্বন্ধানী গবেষক তাঁহাদের কাছে এ গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ রূপে গৃহীত হইবে।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ—জীরামেশ্বর সেন। গ্রন্থত্বন, ১৩ মহাস্থা পাকী রোড, কলিকাতা—৭। মূল আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থানিকে উপভাস না বলিয়া বড় গল্প বলিলেই

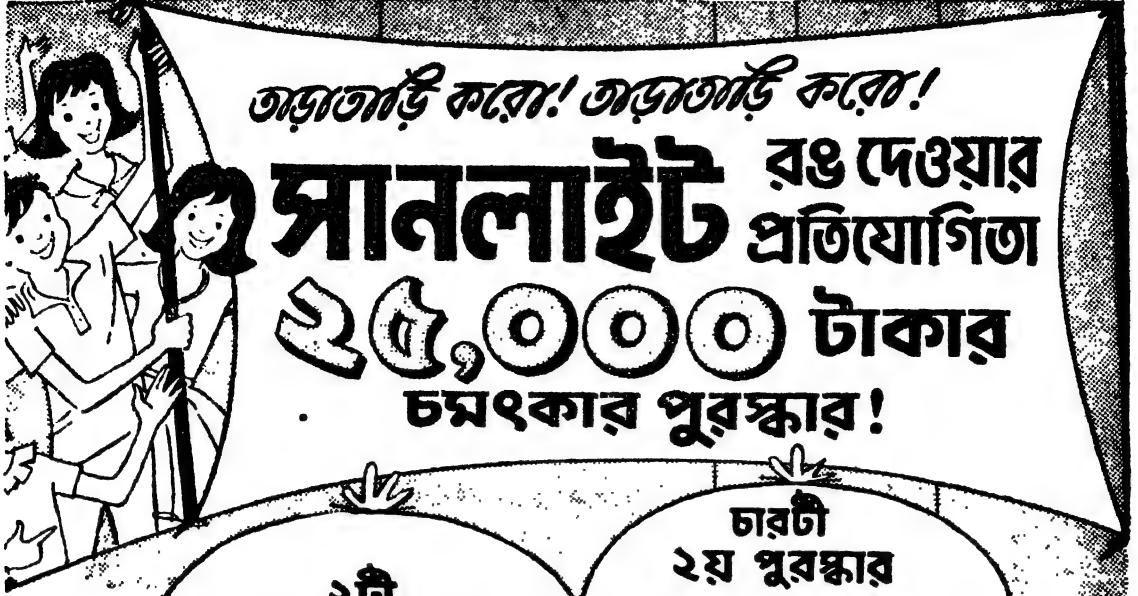
ভাল হয়। গল্প হিসাবে ইহা একটি সার্থক রচনা। প্রশান্ত এবং ইহা—পরম্পর ভালবাসিয়াও বিবাহ করিতে পারিল না। বাধা আসিল পিতার দিক হইতে। পিতা বহুপতি ধনগর্ভী, প্রশান্ত জানে গুণে সমৃদ্ধ হইলেও, দয়িত। সূতবাং ধনী ইম্পাত-ব্যবসারী বহুপতির একমাত্র কন্যা ইহা হইল প্রশান্তর পক্ষে নিষিদ্ধ ফল। ইহার বিবাহ হইল এক বিখ্যাত ব্যবসারী অংশীদার বিজ্ঞানস নস্তের সঙ্গে। ব্যবহারিক জীবনে ইরাকে দেখিলে অসুখী মনে হইবে না। স্বামীকে সে ভালও বাসিয়াছিল। তথাপি মনের কোণে কোথায় যেন ক্ষত ছিল। এই ক্ষতই তাকে দ্বিধামিকে চালাইয়া লইয়া কিরিয়াছে। সে নিজেকে গাড়ী চালাইত। ঐ গাড়ীর স্পীডের মতই সে নিজেকে বে-পরোয়া করিয়া তুলিল। রূপ ছিল তাহার অসংখ্য। এই রূপকে তাহার স্বামী ব্যবসা-ক্ষেত্রে কাজে লাগাইল। বিজ্ঞানসের ‘কুইন’ ধনে-মহলে ‘মকোরানী’ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই কেনা-বেচায় তাতে ইহাও একদিন হাপাইয়া ওঠে। সে চার-এক সব কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া যাইতে। সে চার নিঃসঙ্গ একক জীবন।

স্বামীকে সুরখী করিতে সে অনেক চেষ্টাই করিয়াছে। ভালও বাসিয়াছে, তবু যেন সম্পূর্ণ করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারে নাই। সে নিজেকে একস্থানে বলিয়াছে—“এমন স্বামী তার, বিভাগ, বুদ্ধিতে, কখনোপুণ্যে কোন দিকেই একটুও খুঁত নেই তার। কত ভালবাসে তাকে, বিশ্বাস করে প্রজ্ঞা করে। কিন্তু সে কি এগুলি অপাত্রে দান করে নি? ইহা ভাবে সে ত এর যোগ্য নয় সে ত তাকে ভালবাসে না, চেষ্টা করে ভালবাসতে, আদর করতে, যত্ন করতে। করেও। কিন্তু সেই আদর যত্নের মধ্যে কোথাও যেন দাব খেকে যায়। ভালবাসার মধ্যে যে ভীত ব্যাকুলতা থাকে, নিজেকে সেই ব্যাকুলতা দিয়ে কখনও পেতে চায় নি। নিজেকে বেরূপভাবে বলিয়ে দেওয়ার ঈর্ষা আছে, পরিপূর্ণ আনন্দ আছে, স্বামীকে কাছে সে ভাবে নিজেকে বলিয়ে দেয় নি, চেষ্টা করেও দিতে পারে নি। এই তার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এইরূপ আত্মগোপন বোধ করে। এক এক সময় কেমন যেন অস্থির হয়ে যায়। বড় বইতে থাকে বকের মধ্যে। সে তখন শান্তি খুঁজে বেড়ায় গতির মধ্যে।”

এই গতি দিয়াই সে তাহার জীবনের ভ্রম টানিয়াছে। ফুল-স্পীডে গাড়ী চালাইয়া দিয়া সে যেন নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

প্রবীণ লেখকের হাতে পড়িয়া পুরাতন বস্ত্রও নতুন হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার বিবরণে যে সমাজ-জীবন আশা-দেয় কলুষিত, লেখক সুরকোশলে সে দিকে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বইখানি পড়িতে কোথাও বাধে না। সহজ প্রকাশভঙ্গি, স্তম্ভর বাক্যবিজ্ঞাস। বইখানির নামকরণ খুব ভাল হইয়াছে। তবে ভাপায় ভুল বড় বেশী চোখে পড়িল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে ইহা সংশোধিত হইবে।

শ্রীসৌভাগ্য সেন



তড়াতাড়ি করো! তড়াতাড়ি করো!

# সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

## ২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

২ টি

প্রথম পুরস্কার

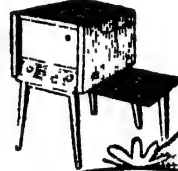
৪,০০০ টাকার  
ভেতর সারা জীবন  
এমন বা নগদ  
৪,০০০ টাকা



চারটি

২য় পুরস্কার

এইচ.এম. ডি.  
রেডিওগ্রাম



৬ টি

৩য় পুরস্কার

মার্কী অল  
ওয়েভ রেডিও  
এবং একটি  
করে হিন্দু প্রাথমিক  
সাইকেল



২,০০০

অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার



রঙের বাস  
বা  
তল গুল



অভিভাবকরা: আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও  
যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সান-  
লাইটের প্রতিটি মোড়ক পাঠিয়ে তারা সান-  
লাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে  
পারবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে  
(১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫  
বছর পর্যন্ত। এই দুটি বিভাগের ছবিগুলি  
আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক  
বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্যান্য পুরস্কার দ্বারা  
পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

তড়াতাড়ি করো

শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

দিনাভুলে আপনার সানলাইট পিসের  
কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে আসুন।  
প্রতিটি প্রবেশপত্রে একটি সন্মতি ছবি আছে  
যাতে আপনার ছেলেমেয়ের রঙ লাগতে  
হবে! যে রকম রঙ তাদের ইচ্ছা যতবার  
করতে পারবে।



অন্য একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

হিন্দুস্থান লিটারি লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

S/O-X62 BG •

নন্দনভণ্ড—ডক্টর সুবীরকুমার নন্দী। প্রকাশনদ্বির, ৩নং কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তেরটি নন্দনভণ্ডবিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় কৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের ভূমিকাই পুস্তকের মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থকার বছরদিন হইতে নানান দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নন্দনভণ্ড সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থ এই সব প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর একটি সূত্র সম্বলন। কয়েকটি প্রবন্ধে গ্রন্থকার নন্দনভণ্ডের মৌল ধারণাগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই দিক হইতে বক্রোক্তি, আটের মর্শ্বকথা, আটো বাস্তবতা, আটো সার্কিকতা, শিল্পে অবিকার-ভেদ, শিল্পীর বৈবাগ্য এবং শিল্পে প্রয়োজনবাদ সবিশেষ প্রাধান্য-যোগ্য। গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার রচনাশৈলীকে সান্ত্বিত্য সাধুবাদ দিতে হয়। একদিকে দার্শনিকের চিন্তা-দার্ঢ্য এবং অল্পদিকে সাহিত্যিকের সরস বাচনভঙ্গী, এতদ্ব্যতীতই যে গ্রন্থকারের সমান অধিকার, ইহা গ্রন্থকারের রচনার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। লেখিত সমালোচনা গ্রন্থের সহজ ভাবালুতা আলোচ্য গ্রন্থের কোথাও চোখে পড়িল না। যে বিশ্লেষণী পদ্ধতির সহায়তায় গ্রন্থকার উপরোক্ত মৌল নন্দনভণ্ডের ধারণাগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন নাট্যশাস্ত্রকার তদন্ত, দার্শনিক হেগেল, যোমা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের নন্দনভাষিক ধারণার সার্থক আলোচনায়। গ্রন্থখানি আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বিভাগের আবার নতুন করিয়া ঘায়েদ্বাটন করিল, এ কথা বলিলে সত্যের অপমান করা হইবে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপজ্ঞাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, রম্য রচনা, কবিতা ও গানের যে অভাব নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নন্দনভাষিক আলোচনার ক্ষুদ্রপাত হইলেও বাংলা সাহিত্যে ইহা বিশেষ উৎসাহ লাভ করে নাই। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দার্শনিক ক্রোচে একদিন নন্দনভণ্ডকে দর্শনের উপর নির্ভরশীল পরজ্ঞার অসম্মান হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে স্বচ্ছ এবং আত্মনির্ভর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে নন্দনভণ্ডের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল। এ দেশেও নন্দনভাষিক আলোচনার স্বাভাব্য এবং বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইবার সময় আসিয়াছে। যাহায্য এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাঁহাদের বিরাট দায়িত্ব পালনের সময় আসিয়াছে। গভীর নিষ্ঠা এবং হুনিবিড় একাগ্রতা লইয়া নন্দনভণ্ডকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে ব্রতী হইতে হইবে। ডক্টর নন্দী এই পুরোগামীদের একজন। তাই আমরা তাঁহার গ্রন্থকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

শ্রীগোতম সেন

যান্ত্রিক—অজুনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৮০-এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা-২। মূল্য দু' টাকা।

ভূমিকার লেখক বলেছেন : যাকে জেনেছিলাম ছেলেবেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহানগরী বলে—ঠিক যেমন ভাবে তাকে দেখেছি—দেখেছি বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন পরিবেষ্টিতে আর চিনেছি ও বুঝেছি অজুঁব দিয়ে—ঠিক তেমনি ভাবে তার আলোচ্য রচনার চেষ্টা করেছি এই লেখাগুলোর মাধ্যমে। শল্যাক্ত সাংবাদিক আমি। খেইহারা কাজেই ফাকে ফাকে মাঝে মাঝে বখন একটু সময়ের মুখ দেখি, তখন বা হটক কিছু লিখি।

সুতরাং 'শহরের জুলাই', 'পনোবোই আগষ্ট', 'কাকি হাউস', 'রাত্রির লোক', 'ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস' 'বুক ষ্টল', ও 'শহরের সিনেমা' এই কয়টি লেখার মাধ্যমে শহর কলকাতাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন লেখক। এগুলি গল্প নয়, প্রবন্ধ বা তথাকথিত রম্যরচনাও নয়—এলোমেলো চিন্তার সমষ্টি মাত্র। বিষয়বস্তু নির্কাচনে লেখকের কৃতিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু বাণী সাধনার আসনে তিনি স্থির হয়ে বসতে পারেন নি। ফলে—শহরের চৈতন্য তাঁহার মনে স্পষ্ট হলেও পাঠক-চিত্তকে কোঁতুলী করতে পারবে কি না সন্দেহ!

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

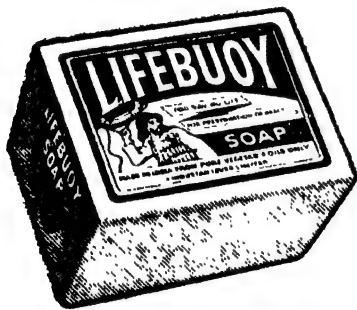
শিক্ষণ সন্ধিতা—(প্রথম খণ্ড) অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪২। মূল্য চার টাকা।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ ভারতীয় শিক্ষা-বাবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অদূরভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই শিক্ষা ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া হইবে, ইহাও স্থির হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান প্রাথমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই বিরাট পরিবর্তনের জন্ত বহু শিক্ষকের প্রয়োজন। এই সকল শিক্ষককে আবার শিক্ষণ বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইবে। একজন শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন দেশের সর্বত্রই অনুভূত হইতেছে। বর্তমান গ্রন্থখানি শিক্ষণ-শিক্ষাব্রতী-গণের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ গণ-ভুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয় আরও বিশদ ও ব্যাপকভাবে আলোচিত হইবে গ্রন্থকার এরূপ আভাস দিয়াছেন। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা : (১) বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস, (২) বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, (৩) বুনিয়াদী শিক্ষা-সংগঠন। প্রথম অধ্যায়ে—ভাব সংগঠন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ (১৯০৪-৩৭) দক্ষিণ আফ্রিকার ও ভারতে পরীক্ষামূলক কাজের বিবরণ ও প্রয়োগপূর্ণ (১৯৩৭ হইতে) ও বুনিয়াদী শিক্ষার

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই  
বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে  
নিরাপদ নয় । আর ময়লা বহন  
করে রোগের বীজানু যা সবসময়  
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-  
কর । লাইফবয় সাবান এই  
বীজানুগুলি ধুয়ে সাক্ষ করে  
দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য  
সুরক্ষিত রাখে ।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান  
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—  
এটি আপনাকে এত করবারে করে তোলে ।



বিশ্বাস লিমিটেড, কর্ণক এজেন্ট ।

L/P. 2-X52 UG

কম্পনশক্তি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে পুণার প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা-সংমেলন অমুষ্ঠিত হয় ও তিন্দুখানী তালিমী সন্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ করেকটি প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পথ কংগ্রেসী যন্ত্রণা পদত্যাগ করিলে এবং যুদ্ধকালীন নানা বিপর্দারের জন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতির বাহ্যত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ, শিশু-মনোবিজ্ঞান, বয়স্রূপে বুনিয়াদী শিক্ষা আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়টি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। তৃতীয় অধ্যায়টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্ত লিখিত। এই সুলিখিত অধ্যায়টি শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থীগণের বিশেষ কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্ত লিখিত হইলেও ইহার প্রথম দুইটি অধ্যায় যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ও অভিভাবকের পাঠ করা উচিত। বুনিয়াদী শিক্ষা মহাস্বাভাবিক জীবনের অম্ব-কীৰ্ত্তি। ভবিষ্যৎ ভারত এই শিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিলে দেশের প্রভূত বদল হইবে—স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থী এবং শিশুর মনের ও বুদ্ধির বিকাশ হইবে।

একটি সঙ্ক্ষেপের বিপুল প্রচাৰ কামনা করি।

চন্দ্র গ্রাহ—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। লেখক কর্তৃক ১০, জিকর লেন, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১৭। মূল্য চার টাকা।

গ্রন্থকার বলেন, “ভারতে যে বস্তু বিজ্ঞানের উপাসনা হইয়াছিল তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।” লেখক নিজে আধুনিক শিক্ষিত হইলেও ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদিতেই একমাত্র বিশ্বাসী। ভারতের প্রাচীন বিচার ও জ্ঞানের আলোকে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বাচাই করিয়া তবেই উহার সত্য-সত্য নির্ধারণ ও গ্রহণ করেন। পুস্তকের অধ্যায়গুলি একরূপ—পদার্থ বিজ্ঞান, পদার্থ গুণ ও কর্ম একাধায়ে, চন্দ্রগ্রহ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, তেজঃবায়ু, সবিতা, সুর্য্যে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন, সপ্ত, রজঃ, তমোগুণ, চন্দ্রের বোড়শ কলা, সুর্য্যে হইতে ধর্মের উৎপত্তি, আকাশ এবং ভারতবর্ষ।

লেখক একস্থানে বলেন, “বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে মূল আদিভ্যাক দেখিতেছেন, গ্রহ সকল দেখিতেছেন, কেহ বা মঙ্গল-গ্রহে জীব আছে—উহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া দেখিতেছেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ উহাদের যন্ত্রের গুণ আমাদের বিজ্ঞান-বিস্কন্ধ। গ্রহ সম্বন্ধে বাহ্যদের কোন জ্ঞান নাই তাহাদের মুখেই এই সকল উক্তি সম্ভব।” আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকারের, সকল না হইলেও বহু মত একরূপ। অবশ্য পুস্তকখানা পুর্বেকার লেখা। সোভিয়েটের ১৯, ২৭ ও ৩৭ লুনিফের চন্দ্রাবর্তনের পথে তিনি কি বলিবেন জানি না।

বর্তমানকালে একরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচাৰ হইবে ইহা অবশ্য আশা করা যায় না তবে লেখকের মতে বিশ্বাসী লোক বা পাঠক একেবারে নাই তাহাও বলা চলে না। কারণ ভারতবর্ষ সকল বকম মতের দেশ এবং সকল বকম বিশ্বাসীর মিলন এবং সংগ্রাম-ক্ষেত্র।

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমণি বাগচি প্রণীত। প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১০। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য দুই টাকা।

বর্তমান গ্রন্থ শ্রীমতী. মেরী লুথিবাক লিখিত Swami Vivekananda in America: New Discoveries হইতে গৃহীত উপকরণে রচিত। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম দুই বৎসরের কার্যাবলী তাঁহার কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এতদিন এই দুই বৎসরের ইতিহাস প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীমতী বাকের পুস্তক বিশ্ববাসীর নিকট যে সকল তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় স্বামীজী কি না অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, কত বিরুদ্ধতায় সহিত সংগ্রাম করিয়া ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় আমেরিকায় নবন্যায়ের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

স্বীকার করিতেই হইবে যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে স্বামীজী সেই দুই দেশে নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ব্যক্তি হইয়াও চরিত্রবলে ও মাধুর্য্যে বহু নবন্যায়ের স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই দুই দেশেও সর্বদাই তাঁহার মনে জাগ্রত থাকিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণী, ভারতের ও ভারতবাসীর চরম দুর্দশা ও দারিদ্র্যের কথা। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এদিন বয়ঃকনিষ্ঠ পরিচরহীন ভিক্ষু সন্ন্যাসী নৈরিক আলখাল্লা, নৈরিক পাগড়ী-পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগোর বিশ্ববর্ষ মহাসভার ভারতের মহান সনাতন বাণীর সহিত বিশ্ববর্ষ প্রতিনিধিমণ্ডলীকে পরিচিত করাইলেন। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে আমেরিকায় নানা শহরে বেদান্ত প্রচায়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৯৫ সনের আগষ্ট মাসে তিনি একবার ইংলণ্ডে গেলেন কিন্তু আবার ডিসেম্বর মাসেই মার্কিনে ফিরিলেন। দ্বিতীয় বার ভ্রমণের প্রেরণ ঘটনা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বামীজীর নিয়ন্ত্রণ। ১৮৯৬-এর ১৫ই এপ্রিল ইউরোপ হইয়া ভারতে ফিরিবার পথে তিনি আবার মার্কিন ত্যাগ করিলেন। এইভাবে দুই বার স্বামীজী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘোটে দুই বৎসর সাড়ে চারি মাস কাল থাকিয়া বেদান্ত প্রচাৰ করিয়াছিলেন। বেদান্ত প্রচাৰের বিনিময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় পাইয়াছিলেন সেবাধর্মের নূতন আদর্শ।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। বাঙালী যাত্রের বিশেষতঃ তরুণেরা এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত ও অমুপ্রাণিত হইবেন।

ইহার বহুল প্রচাৰ কামনা করি।

চিত্রতারকাদের মত

নিখুঁত লাবনড

আপনারও হতে পারে

সাক্ষি চ্যাটার্জীর মত লাষণাময়ী চিত্রতারকা  
জানেন যে নারীর সৌন্দর্য নির্ভর করে নিখুঁত ত্বকে ওপর।  
সাক্ষি চ্যাটার্জী বলেন—“লাজ টয়লেট স্যাবনের সবেশ  
মত কেণা আর শিঙ শগক আমি পছন্দ করি। আমার  
ত্বকে এটি মোলায়েম আর মসৃণ রাখে।” আপনার  
লাবণের কোনো শগক লাজ ব্যবহার করুন না কেন?  
মনে রাখবেন, স্নানের সময় লাজ সতিং আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান



সিইউএন লিভার লিমিটেড এর টেলি

LTS/LUX/96



উত্তরস্রোতঃ দিশি—বারী ত্যাকীখানন প্রণীত। প্রকাশক: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ১২। মূল্য তিন টাকা।

কেনার-বক্সী জয়ধামিনী। লেখক ১৩ই বৈশাখ ইং ২৬শে এপ্রিল ১৯৪০ বাসযোগে অস্ত্র সঙ্গীত সহিত হরিবার হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। তখন বহুবু পঞ্চাঙ্গ বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ বাসের যাত্রা আরও অগ্রসর হইয়াছে। বারীজীর বক্সীনাথ পৌঁছিতে দশ দিন ইটিতে হইয়াছিল, সেখান হইতে কেনার পথে আবার দশ দিনের ইটি-পথে কেনারনাথ বর্ণন হয়। সহজ, সঘল এবং অনাড়ম্বর ভাষায় বইখানি লেখা। শেষ না করিয়া ওঠা যায় না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় সাধুসঙ্গে চরণ ভীর্ণের মহা আকর্ষণে পথ চলিয়াছি। বইখানি পড়িলে পাঠের আনন্দ ব্যতীত সাধুসঙ্গ ও ভীর্ণ বর্ণনায় কল পাওয়া যায় এবং ভাষাতীত পথ সব্বদে নানা তথ্য জানা যায়। নিতুল লাইনোতে ছাপা। বাঁধাই চমৎকার। ইহার বহুল প্রচার কাষনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভাঙন দিনের কথামালা (প্রথম পর্ব)

সৈনিকের প্রাণবণা (দ্বিতীয় পর্ব)—শ্রীচুনীলাল

মুখোপাধ্যায়। শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পাল্লী এম্বাগাব, ৬ বেনিয়াপুকের লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য প্রত্যেকখানি ৫০ নয়াপয়সা।

প্রথমখানিতে আছে চিত্তাশীল কয়েকজন অধ্যাত বা প্রান্ত-অধ্যাত হিন্দু মুসলমানের মনে ১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—বেগনা ও বিক্ষোভের প্রকাশ। দ্বিতীয়খানিতে যানতু-র গণ-আন্দোলন, ঢাকার বাংলা ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি উপলক্ষে রচিত কয়েকটি কবিতা। লেখকের বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাব প্রশংসনীয়।

শিশিরবিন্দু—শ্রীসমীতকুমার গুপ্ত। পরিবেশক সাধারণ পাবলিশার্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটো স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১।

মৌসুমি শিশিরবিন্দু রত স্তম্ভ কবিতার মালা। ভাবের গভীরতা এবং ঘটনার সংবৎ পারিপাট্য মনোহর।

“কথা দাও কবিতা।

অন্তরের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে

আমার সঙ্গে নিবিড় ভাবে কথা কও।”

ভীর কবিতা ‘নিবিড় ভাবেই’ কথা বলতে চেষ্টা করে।

ঝরা পাতা—শ্রীগৌরোদাস। প্রান্তিকান—হাউস অব বুকস, ৭২ ফ্রান্স রোড, কলিকাতা। মূল্য ১টা, ৫০ ন. প।

প্রকৃতির আলোছায়া আর জীবনের হাসি-অঙ্গ—ইই-ই রূপ

নিবেছে কবিতাগুলিতে। ঘোড়ের উপর উপভোগ্য। কিন্তু কবির কচির প্রশংসা করতে পারি না—আঠে-পৃষ্ঠে-ললাটে প্রশংসা ও প্রচারণা ছাটবার প্রবল আগ্রহ দেখে। আরও মনে কুঠাবোধ করি—বধন ভিতরে পড়ি: “বীরে চুন্নাত, বোন বেগো সাজা পাবে”, আর ললাটে নামের সঙ্গে পরিচয়-লেখা দেখি—প্রধান শিক্ষক, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রক্তরেণু—শ্রীরমেশ মজুমদার। অকণিমা প্রকাশনী। ২ জগবন্ধু বোদক রোড, কলিকাতা—৫। মূল্য ২।

প্রচ্ছদে পড়লাম, “কাব্য-জগতে লেখক আজ নতুন নয়। কবিতা বংশের ধরে তিনি কঠিন ভাবে পদচারণা শুরু করেছেন বা বিদগ্ধ পাঠকবর্গের কাছে অবিস্মৃত নয়।” ভাবলাম, পরিচয়পত্রের ভাষা যতই অসুস্থ হউক কবিতার ভাষা ক্রটিহীন হবে। কিন্তু হতাশ হতে হ’ল।

প্রথম কবিতা ‘আকাশের চাঁদ’:

“মনে পড়ে তোমা আজিকে হঠাৎ মিলে  
তাসে মনে সেট নিবিড় রজনীর মাঝে  
হলহল হুকুল (৭) প্রারিত পদ্মাব বুকে  
ভেসেছি মৌর্য তরনীতে”

—জানি না, কেন ছন্দে লেখা।

তার পর ‘চকলা’

“মনে হয় তুমি আজো চলিছ চকল চরণে  
বিন বিন বিন ই চক-চলন-ধরণে”

—ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য, ‘বিদগ্ধ পাঠক’মাত্রই অস্বস্তি করবেন।

‘উজ্জ্বল’র তাঁর চিন্তা:

“আমি হাঁচুজলে ঝাড়িয়েই জাবি  
কি মোখলাম ওয়ে,  
সেই কথাটি কেমন হবে বুকাইব গো তোবে”  
—বোঝাতে পারেন নি, নিঃসন্দেহ।

তবে, আমরা বুঝি বা না বুঝি কবি অজীকার করেছেন:

“পাড়ি দিতে যদি পড়ে হাট চ’লি’  
তোমার কক্ষণা ভিনিতে কখনও গলিব না।”

—আহা। ‘পাড়ি দিতে চল পড়ে যাবেন?’ এ দুর্ভাগ্য ভীর পত্রের ঘটক।

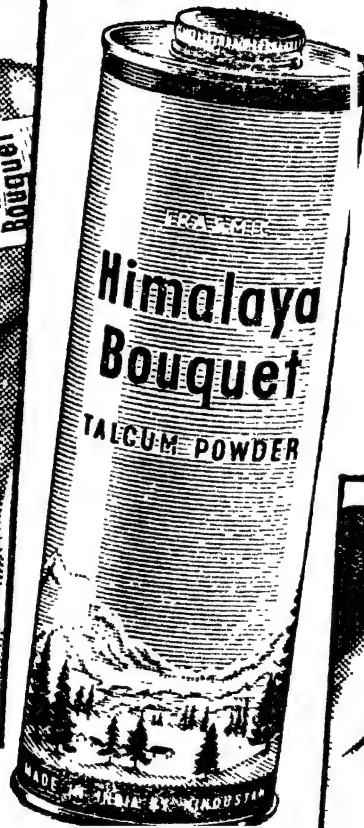
উৎপল—সংসার জীবনে শ্রীমৎ বারী বিজ্ঞানানন্দ-বিরচিত। প্রকাশক শ্রী অরুণপ্রকাশ সাহা। ৪৭ এ বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। মূল্য ২। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। সম্ভাব্যপূর্ণ সুখপাঠ্য করেকটি চতুর্দশপদী কবিতা। হৃৎস্পন্দ বিবরণ হাপার অনেক জ্বল হয়ে গেছে।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়





ব্যবহার করুন  
**হিমালয় বোকে**  
**ট্যালকাম পাউডার**



স্বাস্থ্য  
 সতেজ  
 থাকার জন্য



- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- সারা পরিবারের  
 পক্ষেই আদর্শ

আপনি লভেন পকে হিমালয় লিভার লিমিটেড কর্তৃক তৈরি

১৯৫২

# দেশ-বিদেশের কথা

## সংস্কৃত ও দক্ষিণ ভারত

রাজ্য প্রদেশ সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান চিরপ্রসিদ্ধ। সেজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য দণ্ডপ্রবণ ডাঃ চৌধুরী সম্প্রদায় রাজ্য গমন অতি স্বাভাবিক। তবু শুনেছিলেন যে, রাজ্যের কেউ কেউ বাঙালীদের সংস্কৃত উচ্চারণ বিষয়ে সন্দেহচিত্ত ছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য-বাণী মন্দিরের সংস্কৃত অভিনেতৃগণ ১৪ই অক্টোবর তারিখে রাজ্যের অপ্রসিদ্ধ ও সুবিশাল রসিক-বল্লনী তলে রাজ্যের গোড়ার মঠের তত্ত্বাবধানে উক্ত চৌধুরী রচিত “মহাপ্রভু-চরিতাম্” নামক সংস্কৃত অভিনয় করে বাঙালীর উচ্চারণ যে কত সুশ্লিষ্ট হতে পারে, তা সহস্র শব্দ বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে প্রমাণিত করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের রাজ্যপাল পরম প্রুদেয় শ্রীবিষ্ণু-রায় দেবী মহাশয়; রাজ্যের শতাব্দির বহুমান্য শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী প্রমুখ রাজ্যের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে রাজ্যের রাজ্যপাল, শ্রীমুখ পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং রামকৃষ্ণ মিশ্রের স্বামী আদিদেবানন্দ প্রমুখ অনেকেই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন।

রাজ্যের দ্বিতীয় সংস্কৃত অভিনয় হয় রামকৃষ্ণ মিশ্রের সংরক্ষণ-বিভাগীষ্ট এবং তৃতীয় অভিনয় হয় রাজ্যের স্বায় পোতাঙ্ক ওয়াই-এম-আই-এ হল রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রাঘবনের “রাজ্য সংস্কৃত রত্ন” নামক সংস্থানের তত্ত্বাবধানে। উভয় স্থানেই উক্ত বতীক্স বিমল চৌধুরী কর্তৃক শ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত অপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক “শক্তি সারদাম্” অভিনীত হয়। এই নাটকটি পূর্বে কলিকাতায় ও ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু শ্রীসারদামণি বিবেকানন্দের ভাবধারা পরিপ্লাবিত রাজ্যের রাজ্যে পূর্বে এক্ষণ সংস্কৃত নাটকাতিনয় আর হয় নি। এটি উভয় স্থানেই সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করে। “রাজ্য সংস্কৃত রত্ন”র পক্ষ থেকে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সপ্ত-সদস্যগণকে অভিনয়ন জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় রাজ্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অন্যান্য সংস্কৃতবিদগণ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রান্তে ডাঃ বতীক্সবিমল চৌধুরী সংস্কৃত এবং শেষে ডাঃ বহা চৌধুরী ইংরেজীতে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উচ্ছল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভান্তে ডাঃ রাঘবন, বেকটহরণ আরায় প্রভৃতি সুবীৰ্ণ অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে একই ভাবে প্রাচ্য-বাণীর দল সকলের চিত্ত জয় করেছেন। এখানেও পূর্বে কোনও দিন সংস্কৃত অভিনয় হয় নি। কিন্তু “শক্তি-সারদাম্”, “ভাবত-জয়সারবিন্দম্” এবং “মহাপ্রভু-চরিতাম্”—এই তিনটি নাটকের পর পর তিন দিন অমুঠানেও সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহে ও বাইরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে



অধ্যক্ষ শ্রীবতীক্সবিমল চৌধুরী ও অভিনেতৃবর্গ

প্রায় দ্বিসপ্তদশ দর্শক আকুল আগ্রহে নাট্যরস উপভোগ করেছেন নিম্নক বিশ্ময়ে। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-ধারার বিশেষ অনুরাগী। সেজন্য শ্রীসারদামণি ও শ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবনালেখ্য আশ্রয়বাণীগণ প্রকাশনতচিতে দর্শন করে বিমুগ্ধ হন। দ্বিতীয় দিনের শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত নাটকটি সম্বন্ধে স্বভাবতঃ তাঁদের আগ্রহ ছিল সমধিক। কারণ অতি নিগূঢ় তাঁর পুণ্য জীবন। তাঁর পূর্ণ জীবনীও নেই। পূর্বে কোনও দিন তাঁর সম্বন্ধে কোনও নাটক রচিত বা অভিনীত হয় নি। সেজন্য সেদিনের অভিনয় সকলের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকটি অতি সুশ্লিষ্ট ভাষায় বিরচিত হয়েছে। যেমন, বারীক্সকে অরবিন্দের অগ্নিরস্ত্রে নীক দান, সুরাট কংগ্রেস সেশন, দেশবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক বানিকডালা বোমা-বড়বল্ল সামলার সওয়াল, নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ এবং পরিশেষে স্বাধীনতা দিবসে শ্রীসারদার ভাবতীয়-ধর্ম-পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি দৃষ্ট সকলকে বিশেষ আকৃষ্ট করে।

# দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে  
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? মাড়ির ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার  
আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙুলটা ঢুকিয়ে  
নিন তারপর আঙুলে আঙুলে পিঁড়র মাড়ীতে মালিশ করে দিন  
এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও সুবাস  
শিশুর প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং গৃহকর্মে, ওষুধ হিসাবে, প্রসাধনে  
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের  
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

P.M.C

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটা ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান :  
হিন্দুস্থান লিটার লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার  
প্রাপ্ত পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

PYG. 13-X30 BG

প্রস্তুতকারক : এম. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস

শেষ দিনে অভিনয়ান্তে প্রদেয় শ্রীমুক নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীমহারের আশীর্বাদপূত আশ্রমে প্রস্তুত সাড়ী, বস্ত্র ও অন্যান্য বহু দ্রব্য অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের প্রত্যেককে উপহার দেন এবং অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। তৃতীয় দিনে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সর্বজনসম্মুখ ভক্তিরসধন সংস্কৃত সঙ্গীতমুখর নাটক 'মহাপ্রভু-হরিনাম' বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গ অভিনীত হয়। অভিনয়ের শেষে বিদূষী শ্রেষ্ঠা অধ্যাপক ডঃ রমা চৌধুরী তাঁর স্বভাবমূলত স্তম্ভিত ইংরাজী ভাষায় মৃদুসীলা বর্ণনা করে সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করেন।

অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নায় ভূমিকার অধ্যাপক শ্রীমশোক চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী দাশ। তা ছাড়া অন্যান্য সকলেও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন—যেমন অধ্যাপক অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবীজনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য, শ্রীথ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীশক্তি

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী উষা গুহ, শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র, শ্রীশীপক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশীপক ঘোষ। সঙ্গীতমালা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন—শ্রীবিমলকৃষ্ণ, শ্রীবিদ্যকৃষ্ণ, শ্রীপ্রভাতকৃষ্ণ, অক্ষচাঁদী শ্রীমনোহর চৈতন্য ও শ্রীমুখী চট্টোপাধ্যায়। উষ্টর চৌধুরী বিরচিত জাতীয় সঙ্গীত "জগদুগ্রহ ভাবত জননী। গঙ্গা গোলাবরী নন্দন-কাবেবী পুণ্যধারা পীতৃবর্গ" যখন প্রত্যাহ পীত হ'ত, তখন সকলেই স্বতঃই উগ্র হ'য়ে প্রজ্বলিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠতেন।

সর্বজন প্রদেয় উষ্টর চৌধুরী সম্প্রতি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল ধরে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত গবেষণ পাব প্রাচ্যবাণী মন্দিরের মাধ্যমে সংস্কৃত জননীর সেবা করে আসছেন নানা ভাবে। বহু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ, চতুশ্চি পরিচালনা, সঙ্গীত ভাষণ পরিষদ, সংস্কৃত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁদের অগ্রব কীর্তি। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রদেশে প্রদেশে সংস্কৃতের মাধ্যমে নিগূঢ় সৌহার্দ্য স্থাপনই তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।



লিলি বিস্কুট

রকমাস্বিতাক্ষ

স্বাদে ও

গুণে

অতুলনীয়।

লিলির লজ্জা  
ছেলেমেয়েদের প্রিয়।

## হাওড়া বন্দা হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গ ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষে বন্দা-বোগের ক্রম বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা সকলেই ওষাকিবহাল আছি, শতকরা দুই-তিন সংখ্যা এবং নতুন বোগের সংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক সংখ্যাতত্ত্ব পড়িয়া এই বোগের ভীষণতা সম্পর্কে আমরা আতঙ্কিত হইয়া থাকি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ এই বোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করিয়াছেন। সরকারী উদ্যোগ বাতীত আরও বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বন্দা বোগের প্রশমন কর্ত্তে হাসপাতাল স্বাস্থ্য নিবাস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইরূপ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতেছে হাওড়া বন্দা হাসপাতাল। কয়েকজন উদ্যোগী এবং সমাজসেবায়ী ভ্রমহোমসের সমবেত প্রচেষ্টায় এই হাসপাতাল হাওড়ার বোতানিক্যাল গার্ডেনের নিকট স্থাপিত হইয়াছে। এই হাসপাতালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিনামূল্যে সেবা এবং সহায়তা প্রদান করা। জনসাধারণ এবং অন্যান্য জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে দান সংগ্রহ করিয়া এই হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহ হয়, আশঙ্ক্যের বিবরণ, কোন রকম সরকারী সাহায্য হইতে এই প্রতিষ্ঠান এখনও বঞ্চিত। সরকারী সাহায্য বাতীতে কেবলমাত্র জানের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় প্রতিষ্ঠান চালান যে কতখানি গভীর নিষ্ঠা এবং সেবা আদর্শের উপর নির্ভরশীল তাহা সহজেই অনুমেয়। উক্ত হাসপাতালের ১৯৫৮ সনের বাৎসরিক হিসাবে দেখিতে পাইতেছি যে বৎসর মোট পাঁচ সহস্র আট শত বাহার জন বন্দা বোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছেন। এক সহস্র চারি শত আটানব্বই জনের রোগেরোগাকী করা হইয়াছিল। এখানে, ধূম-পান ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ মূল্য আদায় করা হয় না। উক্ত বোগেতে কষ্টপূর্ণ অর্থাভাবে বিনামূল্যে বোগীদিগকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতে না পারিবার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ একটি সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠান কোনরূপ সরকারী

সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে পাইতেছে না দেখিয়া বিম্বিত হইতে হয়। বন্দা বোগের বিস্তৃতি দমনের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা থাকা একান্ত আবশ্যিক। প্রত্যেকেই হাওড়া বন্দা হাসপাতালের প্রশংসনীয় সেবাবর্ণে চমৎকৃত হইবেন।

## শ্রীমান গোরা চট্টোপাধ্যায়

কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোরা চট্টোপাধ্যায় উক্ত কারিগরী বিভাগিকা লাভার্থে গত ২৫শে অক্টোবর মন্ত্রণালয় হেল বোগে পশ্চিম জার্মানী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। শ্রীমান গোরা আই, এম, সি পাশ করিয়া ট্রুটের ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে তিন বৎসর শিক্ষাবিদ্যী সমাপ্ত করেন। বর্তমানে শ্রীমানের বয়স মাত্র ২২ বৎসর। আমরা তাহার সর্বজনীন উন্নতি সফল্য কামনা করি।

## শ্রীমুখাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অমৃতসর খালসা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীমুখাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ইন্দোনেশীয় সরকার কর্ত্তক যোগদানকর্ত্তা গজা মা টা বিদ্যাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীমুখাংশুবিমল কখনও হলে যাত্রা করিবেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিমান শিক্ষক এবং শক্তিমান লেখক। চীন, যাপিয়া এবং দক্ষিণ অফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার লেখা বই শ্রবণী সমাজে সমুদ্র হইয়াছে। ইহা বাতীত তিনি বহু ইংরেজী ও বাংলা পত্র-পত্রিকাতে নিয়মিত লেখক। প্রবাসী এবং মডার্ন বিদ্যুৎ লেখক এবং পুস্তক-সমালোচক রূপে তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহু দিনের। তাঁহার বিনয় নম্র, মধুর ব্যবহারে আমরা সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ যুগ এবং উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। তিনি বিদেশে বাতালী তথা ভারতবাসীর মুখোপাধ্যায় কখন।

## ভ্রম-সংশোধন

গত কার্ত্তিক সংখ্যার 'ঐতিহাসিক আচার্য্য বহুনাথ সরকার' প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল ছাপা হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	কলাম	হইবে না	হইবে	পৃষ্ঠা	কলাম	হইবে না	হইবে
১৮	২	Muntakhabut		২২	১	বদ যুগ্মীক থা	বদাযুগ্মী ও থাকি থা
		Tuarikh	Twarikh	২২	২	তাঁহার	×
১৯	২	বনভট্টের	ঐহবের	২৩	২	শাহ উলীয়া	( ইহা ২য় পংক্তিতে ইংরেজ )
২০	১	শক্তি	শাক্ত				আমলের পরে বসিবে )
২০	১	কীর্তিবাহ	কীর্তিবাহ				
২১	১	Tuarikh	Twarikh	২৩	২	কংগ্রেস-অবাসকের	কংগ্রেস অবাসকের
২১	১	Lubabikh	Lubab	২৪	১	'পায়েন না' এই শব্দের পরে	বাড়ি চিহ্ন হইবে

ঐতিহাসিকবাহী বহুনাথ 'দীপাবিতা' প্রবন্ধে ১১৪ পৃষ্ঠার মহাশয়জীর বদিয়ের হলে মহাশয়জীর বদিয়ে হইবে 'তাউ' হলে 'তাট' হইবে।

## সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৮ই কার্তিক 'প্রবাসী' ও 'মহার্ণ' বিভিন্ন ভূতপূর্ব ম্যানেজার সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল যোগতোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২২২ সালের চৈত্র মাসে বাঁকুড়া জেলায় অন্তর্গত কুমারভাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।



সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যকিঙ্কর কৈশোরে বাঁকুড়ায় অধ্যয়ন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া তিনি মধ্যম ভগিনীকে নিকট এলাহাবাদে গমন করেন ১৩১২ সাল নাগাদ। এই মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয় সুবিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি তখন এলাহাবাদের কার্ঘ্য পাঠশালার অধ্যক্ষপদে বৃত্ত ছিলেন। তিনি ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামানন্দবাবু বন্ধুত্ব চিন্তামণি ঘোষকে বলিয়া সত্যকিঙ্করকে ইতিমধ্যে প্রেসে একটি শিক্ষানবিশী কর্তৃক যোগাড় করিয়া দেন। সত্যকিঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীপতির 'প্রবাসী'র কার্যও কিছু কিছু করিতেন। ইংরেজি ১৯০৭ সনের

আম্রবাণী হইতে রামানন্দবাবু করিতে থাকেন।

পত্রিকাও প্রকাশ

সরকারী হুকুমে চল্লিশ ঘণ্টার নোটিশে ১৯০৮ সনে রামানন্দবাবুকে সপরিবারে এলাহাবাদ হইতে চলিয়া আসিতে হয়। তিনি কলিকাতায় স্থিত হইলেন এবং এখান হইতে পত্রিকা হইখানি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সত্যকিঙ্কর ছায়াবস্ত্র রামানন্দবাবুর অনুসরণ করিতেন। তিনি এই সময় হইতে পত্রিকাখবরের কার্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। রামানন্দবাবুর সম্পাদনা ও পরিচালনার এবং সত্যকিঙ্করের কণ্ঠতৎপরতার এই পত্রিকাখবরের দ্রুত উন্নতি হয়। কোন বিপদ-আপদই প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকটি পত্রিকা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যকিঙ্কর ১৯০৮ সন হইতে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত এই আটচল্লিশ বৎসর এই পত্রিকাখবরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ যে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহার মূলে সম্পাদক ও তাঁহার সহকর্মীগণ ব্যতীত কিস্থিগ্রন্থান সত্যকিঙ্করের দানও বহিরাছে বোধে। তাঁহার পরিশ্রম, অধ্যবসার, প্রভুত্বপন্নমতি, প্রভৃতি গুণগুলি আমাদের নিকট মুগ্ধ করিয়াছে। সত্যকিঙ্করের দয়নীয় সচকর্মীরে হৃৎকণ্ঠে, অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে আকুল হইত। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার অশ্রমশক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারিতাম না। 'প্রবাসী প্রেস' সংগঠনেও রামানন্দবাবুকে তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সত্যকিঙ্কর সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গীতের চর্চা করিতেন। শুনিয়াছি, প্রসিদ্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সঙ্গীত-অমুনীলনে প্রথম দিকে তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। 'প্রবাসী' কার্যালয়ের মধ্যে একান্তভাবে ব্যাপৃত হইয়া না পড়িলে, সত্যকিঙ্করও হস্ত বাঁকুড়া-বিক্রপের ক্লাসিক সঙ্গীতের ধারাকে নিরন্তর চর্চায় ধারা পুষ্ট ও উন্নত করিয়া তুলিতে পারিতেন।

বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কাল হইয়াছে, এ বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া কিছু নাই। তথাপি আমরা—বাহায্য দীর্ঘকাল তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়াছি—তাঁহার মুহুর্তে আত্মীয়-বিরোগের বাধা অনুভব না করিয়া পারিতেছি না। তিনি সহকর্মীদের দ্বারা কতখানি গভীর শ্রদ্ধা ও ঐতিহ্য আসন লাভ করিয়াছিলেন, 'প্রবাসী' আপিসে অল্পমিত তাঁহার শোক-সভায় বিভিন্ন বক্তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবন হইতে বুঝা গিয়াছে। সত্যকিঙ্করের বিনোদী আত্মা শান্তিলাভ করুক এই প্রার্থনা।

সম্পাদক—শ্রীক্ষেতানন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়

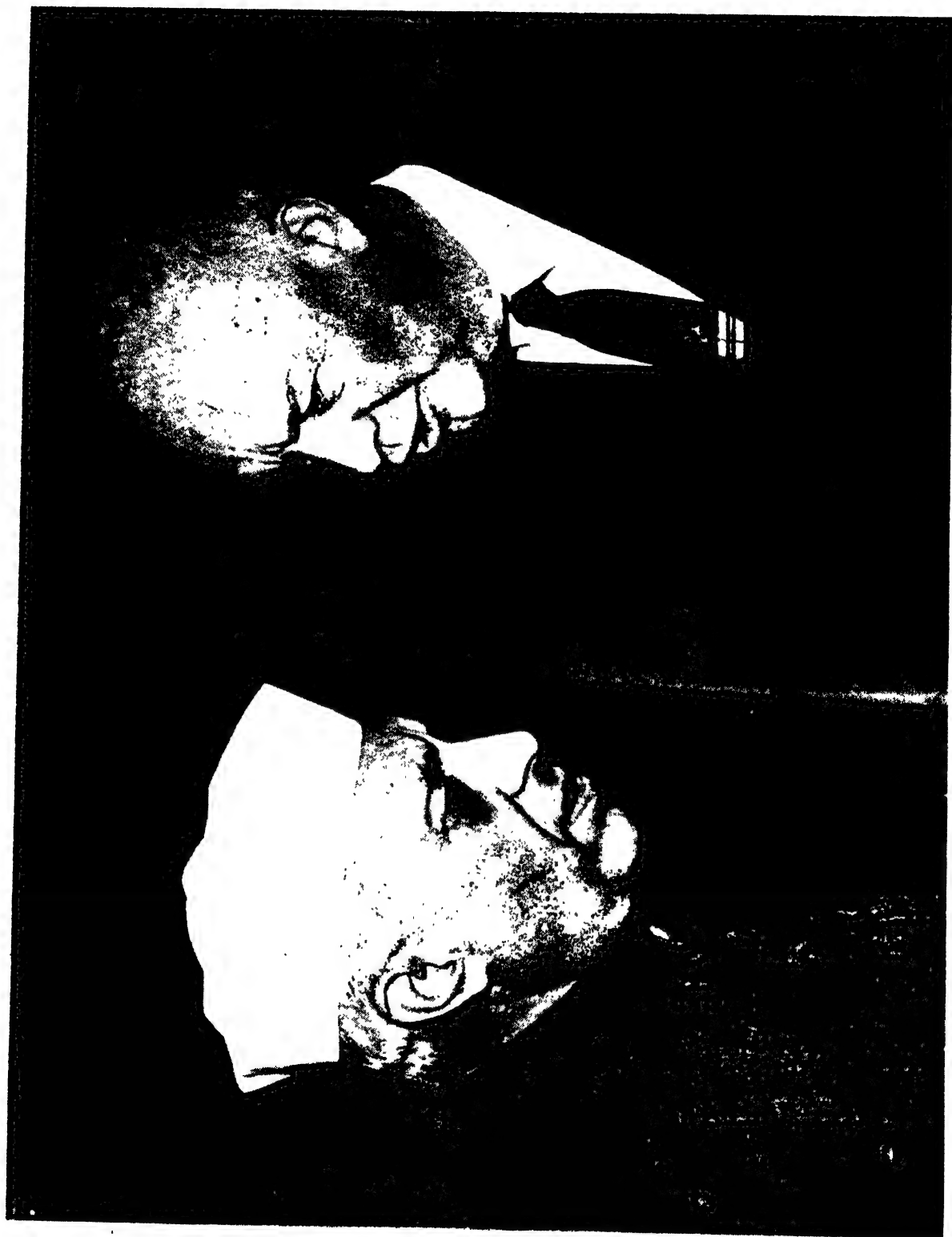
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লি., ১২০৭/৮ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯



ধবালী খেস, কলিকাতা।

জলসত্র  
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী





# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নারায়ণা বল্লীনে নভাঃ”

১৯৩৬ সাল  
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৬৬

৩য় সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### প্রতিরক্ষার অর্থ কি?

বিগত মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি চীন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার বিতর্ক এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারতে আগমন ও বিদায়যাত্রা।

প্রথমটিতে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় আছে। আমরা এই সম্পাদকের প্রসঙ্গাবলীর মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর রাজ্যসভার প্রাথমিক ভাষণের ও বিতর্কের পরের ভাষণের সাধারণ অঙ্কন দিচ্ছি। এখন সেই ভাষণ দুইটির কিছু বিবেচনা আমরা এখানে করিব।

পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতার শাস্ত্রবাদের উপর গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে এখন দেখা যাচ্ছে যে তাঁহার বার্ষিক্যের উপলব্ধি হই-  
রাছে, তবে তাহাতেও অনেক “কিন্তু” ভাব জড়াইয়া আছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন “চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করিবে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি নাই।” সেই সঙ্গেই পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, “যদি কোন সম্ভব মনে করেন যে, পক্ষীদের দ্বারা সরকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি উদ্বাসিত হইলেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন।”

তিনি এবার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, “যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা স্বাভাবিক নয়। এই সত্য সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার।” আবার এ কথাও বলিয়াছেন, “স্বাভাবিক অবস্থা হইতেই দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা আসে। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বোধোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।”

প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কারিগরি ও শিল্পোন্নতির চরম গুরুত্ব বিষয়ে সমস্তদিককে জানাইয়া তিনি বলেন যে, কারিগরি উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইবে।

শেষের দিকে তাঁহার নূতন উপলব্ধির পরিচয় তিনি দিয়াছেন এই বলিয়া “বন্ধুত্বের মনোভাবই ঠিক মনোভাব। কিন্তু তাহা

সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে, এবং দেশরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে হইবে। সতর্ক না থাকিয়া বন্ধুত্বের হাত বাড়াইলেই বিপদে পড়িতে হইবে। সে বিপদ মহাবিপদ কারণ, তাহাতে যে কোন-কিছু ঘটতে পারে।”

তিনি আরও বলিয়াছেন, “বৃহৎ অস্তি নিকাশ, কিন্তু যদি দেশের মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হয়, তবে প্রয়োজন হইলে বৃহৎ করিয়াই দেশ রক্ষা করিতে হইবে।”

রাজ্যসভার বিতর্কের শেষে তিনি নানা কথাই মধ্যে বলেন, “সরকার দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন এবং দেশের শিশু-কাঠামোকে শক্তিশালী করারও চেষ্টা করিতেছেন। আর ভবিষ্যতের জন্য শিল্প প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকেও গড়িয়া তোলা হইতেছে।”

বুঝা গেল যে এতদিনে পণ্ডিত নেহরু বুঝিয়াছেন যে ক্ষীণবল হইয়া শাস্ত্রের প্রয়াস বুঝা। অল্প দিকে তিনি প্রতিরক্ষা বলিতে কি বোঝেন তাহা আগেরই মত আবছায়া রহিয়া গিয়াছে। সামরিক ক্ষেত্রে, কি নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে সে বিষয়ে তিনি বস্তুতঃই বলিয়াছেন যে, তাহা প্রকৃতভাবে বলা উচিত নহে। কেন না তাহাতে শত্রুপক্ষ সে বিষয়ে সাবধান হইয়া তাহার পান্টা ব্যবস্থা করিবে এবং তাহা ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু আমরা ত দেখিতেছি বিপক্ষের পক্ষমহাবাহিনী এখনই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বানবাহন-ব্যবস্থা বিপদোৎপাদক কারণ অল্প রেললাইন ও ট্রেনে বিক্ষোভের ব্যবহার ত চলিতেছেই। উপরন্তু ইহাও বুঝা যায়, যে সামরিক দপ্তরে উদ্দেশ্যের গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করিয়াছে, নহিলে সামরিক চলাচলের এত সঠিক খবর উহারায় পার কোথায়? পণ্ডিত নেহরু যদি এ বিষয়ে কিছু না করেন তবে দেশের লোকেরই চোখে ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হইবে। বিপক্ষ সবই জানিবে।

দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার ত কোনও ব্যবস্থা আপাত-

দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কালিঙ্গা হইতে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেখানের পঞ্চমবাহিনীর নেতা স্থানীয় অল্প পাহাড়ী-দিগকে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছে, “বিখ্যা শুভর বাহারা বটায় তাহাদের শাস্তি জনসাধারণে দিবে।” অর্থাৎ চীনাগের অনুপ্রবেশ বা চীনা গুপ্তচর ও চীনাগের দালাল দলের ধ্বংসাত্মক কাজের ধরন নেওরা-দেওরা বা বাধা দেওরা বিপজ্জনক করিয়া তোলা হইবে।

কারিগরি বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান জলেব মত টাকা চালিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু বিপদকালে সে সকলকে অকেজো করিয়া দেওরা বা যানবাহন চলাচলেব ব্যবস্থা বানচাল করা, ইহার পূর্ণ ক্ষমতা যদি শত্রুর পঞ্চমবাহিনীর হাতে অক্ষুণ্ণভাবে থাকে তবে তাহার মূল্য কি?

দেশের অবস্থা অল্পদিকে ত চোখাবজারি, ঘৃষ এবং সরকারী মহলে হুর্নোতি ও সাধারণের প্রতি অবহেলার ফলে অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু কি মনে করেন যে, এই অবস্থার দেশ সমুদ্র বিপদ উপস্থিত হইলে দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষার সমর্থ হইবে? সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচগ্রহণ লালসাত অতি উচ্চস্তরেও পৌঁছাইয়াছে। অল্পদিকে ইহাদের হাতে উৎপীড়নের ব্যবস্থা ক্রমেই বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা আশ্চর্য হই যে, যাহারা আমাদের মুখপাত্র সাজিয়া নয়া দিল্লীতে বিলাসবাসনে নিগত তাহাদের মধ্যে কি কেহই এ বিষয়ে মুখ খুলিতে সাহস করেন নাই?

পণ্ডিত নেহরু ত লোকসভা রাজ্যসভা দুই ক্ষেত্রে কপট বিনয়ের সঙ্গে আজ্ঞাবহ ভূতা সাজিয়া বলিয়াছেন, “তোমরা বল আমি কর্ণধার থাকিব কিনা?” অবশ্য তিনি উহার কি উত্তর হইবে তাহা জানিতেন। কিন্তু তিনি নিজে কি মনে করেন যে, দেশকে বিপদগ্রস্ত অবস্থার কেজিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেই তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান এবং বিশ্বস্ততার পরীক্ষা হইত? দেশকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি তিনি ও তাঁহার চাটুকারবৃন্দ করিয়াছেন তাহার দায়িত্ব কি ঐটুকু মাত্র?

চীন যে এখন ক্রমিক বিবর্তি দিরাছে তাহার কারণ তাহার গোষ্ঠীর সকলে বোধ হয় পূর্ণ সমর্থন এখন দিতে প্রস্তুত নহে এবং বিপক্ষগোষ্ঠী ইতিপূর্বেই প্রমাণ দিরাছে যে, তাহারা সমস্ত প্রতিরোধ ও আক্রমণে সমর্থ ও প্রস্তুত। কোরিয়া, ক্রিময় দ্বীপপুঞ্জ ও লেবাননে তাহার প্রমাণ চটয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই ক্রমিক বিবর্তি শুধু ভূয়া বাক্যজাল বিস্তারে ও শাস্তিবাদের বক্তৃতার কাটাঠিলে বিপদ পরে ঘনাইয়া আসিবেই। সাময়িক সম্ভা আমাদের কি আছে সে বিষয়ে আমরাই—অর্থাৎ সাধারণ জন, লোকসভা ও রাজ্যসভার বিদগ্ধ চূড়ান্তবৃন্দ—অজ্ঞ, চীন নিশ্চয়ই জানে নহিলে এভাবে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না।

দেশের দুর্দশা ও অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের ও ধ্বংসাত্মক কার্যের সুরোগ ও গুপ্ত ব্যবহার একটা আবহাওয়া আমাদেব আছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিবৃন্দ এবং লোকসভা বিধান-

সভার সাধারণ খেলোয়াড়বৃন্দ সে বিষয়ে একেবারে অন্ধ। অবশ্য পঞ্চমবাহিনীর মুখপাত্রেরা তাঁহাদের নিজের দলের ব্যবস্থা কিছুটা জানেন। আমাদের হিসাবে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অতি জঘন্য ও অকেজো। লুটনবীশের চালনার ও বাক্যবাণী-দিগের তত্ত্বাবধানে দেশ কোন অধঃপাতে চলিয়াছে তাহা বিচক্ষণ ও ভূক্তভোগী জনমাত্রেই জানেন।

এইমত অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশে এক বহুজনের আগমন হইয়াছে, যাহার নাম আইজেনহাওয়ার। তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর কি কথাবাতা হইয়াছে তাহার অতি সামান্য অভাস আমরা সংবাদপত্রে পাই। তবে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার কি মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট চিত্র আমরা পাই তাঁহার যুক্তি পালায়মেন্টের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণে। উহার সারাংশ আমরা অল্প দিয়াছি।

ইহাও বিশ্বশাস্তিকামী সজ্জনের বিবৃতি এবং তাহাতে আছে সক্রিয় দেশ পরিচালকের ও বিগত দ্বিতীয় মহামুহুরে অল্পতম যুগনারকের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিবরণ। কেননা মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট সে দেশের শাসনতন্ত্রের প্রধান পরিচালক, শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপতি নহেন। সেই সঙ্গে এই শাস্তিবাদের পিছনে রহিয়াছে দুর্দ্বৈ ও আধুনিক সময়সজ্জার সম্ভিত পৃথিবীর ধনিকশ্রেষ্ঠ জাতি : স্তব্ধ এই ভাষণের তাৎপর্য অনেক গভীর, গুরুত্বপূর্ণ অত্যাগত এক বিদেশী রাষ্ট্রনাযকের শিষ্টাচারপূর্ণ অভিভাষণ ও সত্যাণন হে।

ইহাতে রহিয়াছে পাণ্ডিত নেহরুর শাস্তিবাদের সমর্থন এবং এই ভাষতীয় জাতিপুঞ্জের পূর্বসূরীগণের জীবনযত্নের স্বীকৃতি। এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে এই দেশের ও এই জাতিপুঞ্জের ইষ্ট কামনা জ্ঞাপন।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের আগমনের ফ্লাফল বৃদ্ধিবার ও বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই। সে কথা বুঝা বাইবে পরে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাচা লক্ষ্য করা যায় তাহাতে মনে হয় যে, তিনি যে নিজের ও মার্কিন দেশবাসীগণের পক্ষ হইতে আমাদের জন্ত যে বহুদুঃখ ও শ্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় মৌনিক শিষ্টতা মাত্র নহে। আমাদের কল্যাণ ও আমেরিকার কল্যাণ অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত এবং আমাদের কাছে বাহা কামা সে সবই মার্কিন জাতিরও কামা, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের লক্ষ্যও এক, এই সকল কথা, ঐরূপ পরিবেশে এবং এতেন অধিকারীর মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না।

বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচন সম্যকভাবে হইয়াছে এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু কতটা কি বলিয়াছেন এবং তাহার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার কি মতামত প্রকাশ বা পরামর্শ দান করিয়াছেন জানি না। তবে একথা নিশ্চয় যে, যদি পণ্ডিত নেহরু সবকিছু প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন তবে অবস্থার বিচার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই স্পষ্ট ভাষার করিয়াছেন।

## কলিকাতায় চীনা গুপ্তচর এবং গোপন বাঁটি

বিভিন্ন সংবাদ হইতে জানা যায়, কলিকাতা শহর এখন চীনা গুপ্তচর ও এজেন্টদের গোপন-কার্যকলাপের প্রধান বাঁটি হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদকে যিখা বলিতেও ইচ্ছা হয় না। কারণ, অল্প-কছুদিনের মধ্যেই দেখা যাইতেছে, কলিকাতায় ও হাওড়ায় চীনা-দের আকস্মিক সংখ্যাবৃদ্ধি। কিন্তু লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জিনেহুং বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি ইহা বিশ্বাসই করেন না। চীনারা যে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে এবং কলিকাতায় লগুী ও অস্বাস্থ্যকর দোকান খুলিয়া সুকৌশলে চোর-কাথা চালাইতেছে, সরকার তাহা জানেন কিনা—লোক-সভায় জিনেহুং বাহা তাগী এই প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরেও জিনেহুং বলেন, কলিকাতায় মত মতানুগতীতে প্রচুর সংখ্যক চীনা-দিগ্নি যাবৎ জুতা-প্রস্তুতকারী ও লগুী-ব্যবসায়ী হিসাবে বসবাস দিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এইগুলিই হইতেছে তাহা-দের বিশেষ উপজীবিকা।

জিনেহুং এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? দেখিতেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে লগুীর ব্যবসায়টাকেও তিনি এখানে চীনা-দের একটা দীর্ঘদিনের ব্যবসায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সত্য বটে, তার ব্যবসা তাহাদের বহুদিনের। শুধু জুতা কেন, চীনা-জোতাও অথবা চীনা ডেটিংয়ের ক্রিনিকও অতি পুরাতন। কিন্তু না লগুী সাম্প্রতিক উপদ্রবের মত যত্নতর গজাইয়া উঠিয়াছে। ই-আকস্মিক আবিভাবে সন্দেহ করিবার কিছু আছে বই কি।

মনে হইতেছে, জিনেহুং এত বড় একটা সংবাদকে কোন-কথায় দেন নাই। তাহা না দেন, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, লগুী ব্যবসায়টা যে এখানে চীনা-দের একটা দীর্ঘদিনের কারবার, এমন কথা তাহার হয় কেন? সংবাদ যিনিই দিয়া থাকুন, সত্য সংবাদ নাই। সত্য সংবাদ এই কথাই বলিবে যে, কলিকাতার পথে ও চীনা-লগুীর এই আকস্মিক আবিভাব একটা সম্পূর্ণই নূতন-বস্তু। শুধু নূতন নহে, বহুপ্রয়োগ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া ত বড় একটা সংবাদ তিনি রাখেন না ইহাও বিস্ময়কর। বাহাই-উক, এ সবকিছু সত্যক ভদ্রজ্ঞের প্রয়োজন আছে।

গ-স

## এই চীনা লোকটি কে?

খবরের কাগজে একটি বিচিত্র সংবাদ বাহির হইয়াছে। ভারতের উত্তর-সীমান্ত অঞ্চল হইতে একজন চীনা নাকি কলিকাতায় আসিতে আসিতে বহুমানের কাছাকাছি গুলিগ্রা ট্রেনের রট চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। হার নিকট কতকগুলি গুলি কাগজ ছিল এবং সেজন্য পুলিশ-দার উপর নজর রাখিয়া নিশ্চয়ই ঐ ট্রেন আসিতেছিল। কটা তাহা টের পাইয়া চম্পট দেয়। ট্রেনের চালক লোকটাকে কাইয়া পড়িতে দেখিয়া বহুমানের ট্রেন-মাষ্টারকে জানান এবং

তাহার পর ব্যাপারটাকে লইয়া পুলিশ-মহলে নাকি চাকলোর সৃষ্টি হয়। পুলিশ সেই লোকটার উপর যে কি ভীষণ ভাবে নজর রাখিতেছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়, যখন দেখি, লোকটার পলায়নের খবর দিয়াছেন ট্রেনের চালক—প্রহরারত পুলিশ নহে। পুলিশের সত্যক দৃষ্টি ইহাকেই বলে! পুলিশের এইরূপ দক্ষতা আমরা প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই। দেশের সড়ক যখন আসন্ন, ঘর-বাড়ির শত্রু যখন হুঁ-পাতিয়া আছে, তখন পুলিশের এই অসাধারণতা অস্বাভাবিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, লোকটাকে নাকি আর পাওয়া যাইতেছে না। লোকটা নিশ্চয়ই শুল্লো মিলাইয়া যায় নাই এবং একজন বিদেশীয় পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে গেল কোথায়? শহরে লুকাইবার স্থান অল্পই থাকিতে পারে, কিন্তু গারে সেরূপ স্থান কোথায়? এবং তাহাকে খুঁজিয়াই বা বাড়ির কথা বাইবে না কেন? অথচ এই একই পুলিশ ব্রিটিশ আমলে ভেৎকি দেখাইয়াছে! দেশ পুলিশের নয়, দেশ, তাহাদের বাহারা চালনা করেন সেই উপরওয়ালাদের। দাষ্ট্রেয় এই সড়ক মুঠে পুলিশ যদি একরূপ নিষ্ক্রিয় হয় তবে তাহার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত।

যাচা চটক, পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ঐ চীনা লোকটি নাকি কলিকাতায় ধরা পড়িয়াছে। তাহার কথা এলোমেলো এবং কোন প্রশ্নেরই সে সঠিক ভাব দিতে পারে নাই। তবে জানিতে পারা যায় নাই তাহার সবকিছু কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ সবকিছু সত্যই বিশেষ তদন্ত হওয়া উচিত।

গ-স

## সরকারী অর্থের অপচয়

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সরকারী অর্থের অপচয় কিংবা বে-আইনী খরচ দেশশাসনের স্বাভাবিক ব্যবস্থার পথ্যারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি অপচয় খরচা ঘটিয়াছে কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীতে কিংবা নিবৃত্তিতার ফলে। প্রতি বৎসরই অডিটার জেনারেল তাঁহার রিপোর্টে এই সকল বাজে খরচের বিষয়ে মন্তব্য করেন এবং তাহা আইন-পরিষদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করেন। ইহা কাগজে ছাপানো হয়, দুই-একদিন আইন-পরিষদে আলোচনা হয়, তার পর সব চূপচাপ হইয়া যায়। ইহার জগৎ কাহাও কোন সাজা হইয়াছে বলিয়া আজ পুণ্যন্ত শোনা যায় নাই। সরকারী অর্থ হইতেছে জনসাধারণের অর্থ এবং সে অর্থ আসে জনসাধারণের উপর কর আরোপ করিয়া। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রে খেয়ালখুসী মত এই অর্থের অপচয় করেন, অধিকাংশ সময়েই খরচা হয় আইনের আওতায়, কিন্তু তাহার ফল ও বিধি-ব্যবস্থা সমস্তটাই হইয়া উঠে বে-আইনী। অতীতের জীপগাড়ী ক্রয় করা বিষয়ে কেলেকারী, দামোদর ভাট্টা, সিজি সারের কারখানার ব্যাপায় প্রভৃতি জনসাধারণ বহুমানে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালের জগৎ অর্থের অপচয়ের নিদর্শন দেখা যায় কল্যাণী পরিকল্পনা কিংবা গভীর জলে মাছ ধরবার পরিকল্পনায়।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার আইন-পরিষদের নিকট পাবলিক একাউন্টস কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক অসঙ্গত কিংবা বে-আইনী ধরনের উদাহরণ দেখানো হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপরিবহন সংস্থার কর্তৃপক্ষ ভেটিংস স্ট্রীটে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি মোটর গ্যারেজ নির্মাণ করেন। কিন্তু পরে ঠিক হয় যে, আরও বড় গ্যারেজের প্রয়োজন আছে, তখন এই গ্যারেজকে ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে ভাঙিয়া ফেলা হয় এবং জিনিসপত্র ১৩ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়। এই গ্যারেজের জন্য ১.৬৪ লক্ষ সরকারী অর্থের অপচয় ঘটে। যে গ্যারেজ নির্মাণ করিতে ১.৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার জিনিসপত্রের মূল্য যে মাত্র ১৩ হাজার টাকা হইতে পারে না তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বলা পড়ে। সুতরাং এই বিষয়ে যে চুরির ভাগ-বাটোয়ারা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়ার ছিল যে, এত ভুল দামে এই গ্যারেজের জিনিসপত্র কেন বিক্রয় করা হইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, সরকারী ব্যবস্থার অসঙ্গততা বিবাজ করিতেছে এবং আইনের মাধ্যমেই চুরি-বাটোয়ারি প্রভৃতি হইয়া বাইতেছে।

রাষ্ট্রপরিবহন-সংস্থা আর একটি চুরির ব্যবস্থা হইতেছে যে, এক কয়েক বৎসরের পুরানো বাসকে জলের দমে বিক্রয় করিয়া দেন এবং সেই বাস বেসরকারী মালিকরা বিভিন্ন দ্রুত চালু করে। পরিবহন-সংস্থা এইরূপ চুরি চুরি খেলা প্রথম হইতেই খেলিয়া আসিতেছেন, সুতরাং ইহা নূতন কিছু নয়। এবারে পাবলিক একাউন্টস কমিটি দেখাইয়াছেন যে, ১৭টি ষ্টিভেরকার বাস ৪৭,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, তাহার মধ্যে কেবল মাত্র ৩৬,০০০ টাকা দিয়াছে বাকী টাকা দেয় নাই। রাষ্ট্রপরিবহন-সংস্থা ৩১,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া এই বাসগুলিকে সারাইয়া দেন। এই ১৭টি বাস বিক্রয় করিয়া সরকার মাত্র মোট ২০,০০০ হাজার টাকা পাইয়াছেন। এক-একটি নূতন বাসের মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। যাহারা ক্রয় করিতেছে তাহারা এই বাসগুলিকে পুনরায় চালু করিবার মানসেই ক্রয় করিতেছে, ফেলিয়া রাখিবার জন্য ক্রয় করে নাই। রাষ্ট্রপরিবহন-সংস্থা এই বাসগুলিকে সারাইয়া চালু রাখিতে পারিতেন। এক-একটি বাস প্রায় হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে অর্থাৎ উহাদের লোহালকড় বেন সেব দরে বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রশ্নে প্রশ্ন স্বাভাবিকই আসে যে, মন্ত্রীমহাশয়েরা কি করেন? আইনতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-মহাশয় এই সকল অনাচারের জন্য দায়ী। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের কার্য্য তাঁহার্য্য একেবারেই দেখেন না। তাঁহাদের লজ্জা বলিয়া বস্তু থাকিলে এই সকল অনাচার বিষয়ে রিপোর্টের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়ের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক বিভাগের গাফিলতির জন্য কিংবা অন্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়

পরোক্ষভাবে অবশ্যই দায়ী এবং এই জন্য তাঁহার পদত্যাগ করা প্রয়োজন। যেমন মুজ্জার শেয়ার ক্রয় করা ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী টি, টি, কুমারচাট্টোকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অডিটর জেনারেল এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটি এইরূপ আবণ্ড কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, যেমন ৮৮,০০০ হাজার টাকায় ২৬,০০০ টন জমার দুধ ক্রয় করা হয় কিন্তু বিলি করার ব্যবস্থা না থাকায় এই দুধ নষ্ট হইয়া যায়। ধরনের অনাচারের ফিরিঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমস্তই অপরিকল্পিত ব্যবস্থা, শুধু তাহাই নহে—সরকারী অর্থের এইরূপ অপচয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন। সরকারী অর্থের অপচয় বহু প্রকারে হয়, কতকগুলি চিরকালই গোপন থাকিয়া যায়। কতকগুলি অপচয় হয় চাক বাজাইয়া এবং আইন-পরিষদের তথ্য-কথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে।

কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর জন্যও সরকারী অর্থের অপচয় হয়; কলিকাতার ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে জাতীয়করণ করিবার জন্য যে বিল আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাতে সরকারী অর্থের অপচয় হইত। এই কোম্পানীর শেয়ারের বর্তমান বাজার দর মাত্র ৩২ লক্ষ টাকা, সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, এই কোম্পানীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এত পুরানো এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যে তাহা প্রায় পুরানো লোহা হিসাবে সেব দরে বিক্রীত হইবার বোগাতা অঙ্গন করিয়াছে। কাগজে-কলমে যন্ত্রপাতির মূল্য অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষীণ করিয়া দেখান হইয়াছে, এটি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে শুরুর মূল্য নাগরয়ল, অর্থাৎ জীর্ণালানদের সম্পত্তি। এই কোম্পানীকে ভাল করিয়া চালু করিতে গেলে প্রায় এক কোটি টাকায় নূতন যন্ত্রপাতি লাগিবে। সুতরাং এই রকম একটি অকেজো এবং ক্ষয়প্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কি করিয়া ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। প্রকারান্তরে এই অর্থ কোম্পানীকে দান করার সামিল হইত। পশ্চিমবঙ্গ আইন-পরিষদে জাতীয়করণ প্রস্তাবের ত্রিভু সমালোচনা হওয়ার বিলটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জাতীয়করণ করিবার পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩১ক ধারা অনুসারে আগামী দুই বৎসরের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহাতে সমস্তর প্রকৃত কোনও সমাধান হইবে না। দুই বৎসর পরিচালনা করিবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় কেহও দিতে পারিবেন না এবং তখন জাতীয়করণ করিতে গেলে আবার এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসিবে; সুতরাং বর্তমান আপত্তি তখনও দেখা দিবে।

প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে বর্তমান বাজার মূল্যে ইহাকে ক্রয় করিয়া লওয়া।

ন-৪

### পুলিসের নিজিয়তায় সমাজ-জীবন বিপন্ন

২৫শে নবেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি নৃশংস হত্যার কাণ্ডিনী প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি এইরূপ : "গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ডাঃ বোমকেশ মণ্ডল এক তরুণীকে সঙ্গে লইয়া আসানসোল রেল-স্টেশন হইতে যাত্রাযোগে আসিতেছিলেন। উহারা জি, টি, রোডের নিকটবর্তী হইলে একখানা ট্যাক্সি পিছন হইতে আগাইয়া আসিয়া রিক্সাচালককে ধামিতে বাধা করে। রিক্সা ধামিলে তিনজন যুবক ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া নামে এবং তরুণীটিকে জোর করিয়া রিক্সা হইতে নামাইয়া ট্যাক্সিতে তোলে। ডাঃ বোমকেশ মণ্ডল দুর্ভাগ্যবশত বাধা দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়া তাঁহাকেও ট্যাক্সিতে তুলিয়া লয়। অতঃপর আততায়ীগণ ট্যাক্সি চালাইয়া নিসার নিকটবর্তী কোন স্থানে যায়, তথায় ডাঃ মণ্ডলকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া একটি বস্তায় পুরিয়া দুর্গাপোলে লইয়া যাইয়া রাস্তার ধারে ড্রেনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পরদিন প্রাতে পুলিশ মৃতদেহটির খোঁজ পায়।"

বংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সংবিধানসম্মত উপায়ে গঠিত একটি সভ্য গণতন্ত্রের শাসনবৌদে ধাকিয়া রাজ্যবাসীর ধন-প্রাণ, মান-সম্মানের নিরাপত্তা গুণাদের অমুগ্রহণিভব হইবে, এ অবস্থা নিতান্তই দুঃসহ। পুলিশ-বাবুস্বার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারী তৎপরতাই বা কোথায়? এই সেদিনও দুর্গাপুর হইতে দেড় মাইল দূরে লছিপুর কলেজীতে পকাশ-বাট জন দ্রুত এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের অবিবাহিতা কন্যাকে অপহরণ করার চেষ্টা করিয়াছিল। তার পর খাস দুর্গাপুর হইতেই কয়েকজন অবাঙালী কোক-ওভেন কলোনী হইতে একটি তরুণীকে হরণ করিয়া মোটরযোগে উধাও হইয়া গিয়াছে। তরুণীটি ধস্তাধস্তি করিয়া মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িলেও তাহারা পুনরায় তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে এবং কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে বা মোটরের গতিবোধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এখানে বিষয়ের বিষয় এই যে, অপরাধের তাণ্ডবভূমি পকাশ হাজার লোক-অধুষিত দুর্গাপুরে নাকি ব্যোজেন কনষ্টেবল ও একজন সাব-ইন্সপেক্টরসহ একটিনাত্র পুলিশ-ফাঁড়ি! এবং তাহাতেও টেলিফোন সংযোগের কোন ব্যবস্থা নাই। শুনিয়াছি, পুলিশী-খাতে বহু টাকা ব্যয়বাদ আছে। চারিদিকে বেকর অবস্থা চলিতেছে তাহাতে যদি পশ্চিমবঙ্গে সহসা অষ্টম শতাব্দীর মত মাংসভার মাথা চাড়া দিয়া উঠে তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না।

গ-স

### জমিদারী বিলোপ সংশোধনী আইন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারী বিলোপ আইনকে সংশোধন করিবার জন্য আইন-পরিষদে একটি বিল উপস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিলের কতগুলি ধারা আইনসম্মত কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ উদ্ভূত হওয়ার, বিলটিকে বর্তমানে স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিলে বে-আইনী ভাবে জমি হস্তান্তরিত করিবার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাহা বর্ধার্থ আইনসম্মত কি না সে বিষয়ে মতবিবোধ হওয়ার বিলটির পুনর্বিবেচনা হইতেছে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে চলিল তথাপি জমিদারী বিলোপ এবং জমির পুনর্কন্টন ব্যবস্থার কোনও সমাধান হইল না। জমির মালিকরা এখনও ক্ষতিপূরণ পায় নাই, এবং জমিগুলির শেষ নিষ্পত্তিসূচক জমীপও সম্পন্ন হয় নাই। ভূমি সংস্কারের প্রথম ধাপেই (অর্থাৎ জমিদারী প্রথা বিলোপে) কষ্টপূর্ণ নাজেহাল হইয়া উঠিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্ষায়, অর্থাৎ জমির পুনর্কন্টন ব্যবস্থা এখনও শুরুই হয় নাই, যলে ভূমিনীতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাতে বাংলা দেশে কৃষির প্রগতি বাধিত হইতেছে।

দার্জিলিঙে যে সিন্ধু কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে জমির পুনর্কন্টন ব্যবস্থা এবং ভূমিনীতির নিদ্ধারিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই হয় নাই। কুচবিহারে জমিদারী বিলোপ আইনের এক ধারা কাষাকরী না করার সেখানে যথেষ্ট ভাবে এবং বে-আইনী ভাবে জমি হস্তান্তরিত করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের সহিত পাকিস্থানে গত মুসলমানদের সহিত জমি অদল-বদল করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার হস্তান্তরের দলিল বেজেন্সি করা হয় নাই। বর্তমানে মুসলমানরা পাকিস্থান হইতে কিরিয়া আসিয়া এই সকল জমি আবার দলল করিয়া লইতেছে, কারণ হস্তান্তর দলিল বেজেন্সি না করার সেটলমেন্ট অফিসাররা হিন্দুদের নামে জমি বেকড করিতে আপত্তি করিতেছেন, এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক। কলে হিন্দুদের পাকিস্থানের জমিও গিয়াছে এবং এখানকার জমিও যাইতেছে। পাকিস্থান সরকার অবশ্য এই অবস্থার সুরাহা করিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল হিন্দু পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ কোনও আইন না করার পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দুবা বিশেষ অসুবিধার পড়িয়াছে। যে সকল মুসলমানরা ভারতবর্ষে জমি পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা কিরিয়া আসিয়া আবার তাহাদের পুরানো জমি দলল লইতেছে এবং তাহা সম্ভবপর হইতেছে ভারতবর্ষের আইনে ফাঁক ধাকার। এই ফাঁক কষ্টপূর্ণ ইচ্ছা করিলে বহুপুর্কেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কুচবিহারের যেকেলিগঞ্জ এলাকায় এই অব্যবহার জন্য উদ্বাস্ত হিন্দুবা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভূমি সংস্কার আইনকে এখনও কাগ্যকরী করা হয় নাই, যদিও ইহা ১৯৫৬ সনে আইনবদ্ধ হইয়াছে। ভূমি সংস্কার আইনকে কাগ্যকরী করিতে না পারার অর্থ যে, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনও কোন সঠিক নীতি নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। ভূমি সংস্কার আইনকে কাগ্যকরী করিতে গেলেই দুইটি সমস্যা অংশ সমাধান প্রয়োজন; প্রথমতঃ ব্যক্তিগত মাথাপিছু সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষিপ্রথা কি ভাবে চলিবে তাহাও স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ সমবায় প্রথার কি অবস্থা হইবে তাহাও স্থির করিতে হইবে। ভূমি সংস্কার আইনে সমবায় প্রথার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে কবে এবং কি ভাবে কাগ্যকরী করা হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। উত্তর প্রদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে যত উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় প্রথার চাষ আবাদ শুরু করা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার সরকার কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি পাইয়াছেন এবং তাহার পুনরুদ্ধারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে জন-সাধারণ এখনও স্নায়বিকভাবে নড়ে। তবে বহু কৃষি জমিকে ধোয়া জমির আখ্যায় ফেলিয়া মালিকরা নিজের অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকরা কৃষি এবং বাস্তব জমি মিলাইয়া মাথাপিছু ৫০ একর (প্রায় ১২০ বিঘা) করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং বাদবাকী জমি বেনামীতে হস্তান্তর করিয়া প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে সরকার উদ্বৃত্ত জমি বিশেষ কিছু পাইতেছেন না এবং সেই কারণে সঠিক ভাবে কোনও ভূমিনীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না।

ন-২

### রেল-যাত্রীদের দুর্ভোগ

ডেপুটি প্যাসেঞ্জারী যাহারা করেন, তাহারা জানেন কি দুর্ভোগের কথা দিয়া প্রত্যহ তাঁহাদের যাতায়াত করিতে হয়। যুদ্ধ-পূর্বকালে যে ব্যবস্থা ছিল আজ নানা কারণে দেশের অবস্থা বদলাইয়া যাওয়ার সের-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চলিতে পারে না। আজ বহু উদ্বাস্ত-কলোনী বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। লোকসংখ্যাও অসম্ভব বৃদ্ধি বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে জানেন না এমন নয় এবং তাঁহাদের অবগতির জ্ঞান এ সম্বন্ধে বহুবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচিতও হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আজ পর্যন্ত প্রয়োজনানুসারে না বাড়াইলেন গাড়ী, না করিলেন স্থল-সুবিধার ব্যবস্থা।

কলিকাতা শহরে যেসকল তবিত্তকারী আসে, তাহার অধিকাংশই আসে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চল হইতে। কিন্তু উহার জ্ঞান প্রয়োজনীয় ভেণ্ডার-গাড়ী না দেওয়ার অধিকাংশ যাত্রী-গাড়ীতেই মাল বোঝাই করার যাত্রীদের দাঁড়াইবার স্থানটুকুও থাকে না। এইসব নানা কারণেই তাহাদের গাড়ীর বাহিরে

হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া আসিতে হয়। ভেণ্ডারগণের পক্ষ হইতে নাকি বহুবার তাহাদের অসুবিধার কথা রেল-কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। অবিলম্বে যাত্রী-গাড়ী ও ভেণ্ডার-গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। আপিসের সময় যাত্রীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া মহিলা-যাত্রীদের দুর্ভোগ ভূগিতে হয় অত্যন্ত বেশী। তাহারা না পারেন তরকারীর বোঝা ঝুলিয়া তিতবে বাইতে, না পারেন গাড়ী হটতে নামিতে।

ইহা ছাড়া অনেক অসুবিধাই যাত্রীদের ভোগ করিতে হয়। গাড়ীগুলি প্রায় অবাধাধা হইয়া আসিয়াছে, অলোপ্তার ব্যবস্থাও তদনুরূপ। মধ্যপথে হয়ত আলো নিভিয়াই গেল। চোর, বাটপাড়, পকেটমারের ইহাতে সুবিধাই হইয়াছে। ইহার উপর আছে অনিয়মিত ট্রেন-যাতায়াত। এসবের প্রতিকার কি একেবারেই অসম্ভব? রেলওয়ে যদি সাধারণের সম্পত্তি হয়, তবে সাধারণের স্থল-সুবিধার প্রতি এতটা অবেহেলা কেন? যাহাদের অর্থ-সাধ্যতার উপর এতবড় এক প্রতিষ্ঠানের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের টপেকা না করিয়া আড়ম্বল্য করিবেন কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা ইহাই আশা করি।

গ-স

### বিহারে হিন্দী প্রবর্তনে নূতন জুলুম

বিহারে বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিয়া, উহার পরিবর্তে বঙ্গভাষা ভাষীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দিবার যে অপচেষ্টা চলিতেছে, ইহার প্রতিকারের জ্ঞান কেন্দ্রীয় সরকারেরও দৃষ্টি বহুবার আকর্ষণ করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহা আরও জটিল আকার ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষীরা এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা এতদিন বিদ্যালয়ে ও আদালতের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুবিধা পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখন হইতে বিহার গবর্ণমেন্টের আদেশে বাংলার বদলে হিন্দী ভাষা প্রচলনের ব্যবস্থা হওয়ার, তাহারা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন। একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি বাড়ীঘর ও সাধারণ ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলগুলি—বাহা পূর্বে বাংলাতেই লিখিত হইত, আজ তাহা হিন্দীতে লিখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যম হারাইয়া ঐ সকল অঞ্চলের বাঙালী বালকবালিকাদের শিক্ষা যেমন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বাড়ী ও জমি-সংক্রান্ত দলিলগুলি হিন্দীতে লিখিত হওয়ার, বাঙালী কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থের দুর্কোথ্য হইয়া আর্থিক ক্ষতিরও কারণ হইতেছে। বিশেষ করিয়া একশ্রেণীর দালাল হিন্দী অনভিজ্ঞ কৃষকদের ঠকাইয়া পরমা বোজগার করিবার ঈদ পাতায়, তাহারা আরও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের ভাষার দিক দিয়া সংখ্যালঘুদের



স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে বতাই মুখের হউন না কেন, কাৰ্ণাতে কিন্তু বহুস্থানে— বিশেষ করিয়া, বিহার রাজ্যে হিন্দী ভাষার দাপাদাপিতে অহিন্দী-ভাষীরা জাহি জাহি করিতেছে। অথচ তাঁহারা জানিয়া-গুনিয়া চূপ করিয়া রহিয়াছেন। এ বিষয়ে নবতম যে উদ্যমের কথা শুনা যাইতেছে তাহা আরও ভয়াবহ। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় নাকি প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা আইনের একটি ধারার উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৬০ সন হইতে সকল পরীক্ষার্থীকেই মাতৃভাষার পরীক্ষা ছাড়া, অল্প সব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর হিন্দী ভাষায় লিখিতে হইবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিশেষ অমুমতি লইলে ইংরেজী ভাষাতেও উত্তর-পত্র লেখা যাইবে।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অহিন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য নয়। তাহাদের কাছে এই সিদ্ধান্ত বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই হইয়াছে। কারণ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে তাহাদিগকে হিন্দীর মাধ্যমে ইতিপূর্বে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় বিপুল-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এ নিয়ম কাৰ্য্যে পরিণত করিতে বিরত থাকিবেন, ইহাই আমরা আশা করিব। অত্যাশ্রয় তাঁহারা যে শুধু অহিন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করিবেন তাহাই নহে, হিন্দী ভাষার প্রতিও তাহাদের মনকে বিঘিষ্ট করিয়া তুলিবেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় অসত্য বলা হইবে না যে, হিন্দী প্রচারের অত্যাশ্রয় ইতিমধ্যেই ভারতের বিপুলসংখ্যক অহিন্দীভাষীকে হিন্দীর প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে। এট নূতন জন্মে দেই নিদেব আরও তীব্র করিয়া তুলিবে মাত্র।

গ-স

### শিশু-রক্ষায় আইন প্রবর্তন

ভিক্ষাকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত শিশুচরণ এবং শিশু অঙ্গ-হানি ঘটাইবার জন্ত সারা দেশে একশ্রেণীর সজবদ্ধ অপরাধীর দল সর্বদা তৎপর রহিয়াছে, আদালতের অনেক মামলার ইহার সত্যতা দৃশ্য পড়িয়াছিল। এতবড় একটি চক্রাঘাৎ আমাদের দেশে অব্যাহত এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে ইহাষ্ট আশ্চর্য্য! চলতি কথার বাতাকে বলে 'ছেলেধরা' ইহা পূর্বেও ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহা এমন ব্যাপক এবং ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করিয়াছে, বাতাকে লম্বা-জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

শুনা যাইতেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু-সংস্থার পক্ষ হইতে সম্প্রতি শিশু যৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি থমড়া রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু-সংস্থা এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কোড বিহিত করিবার জন্তও উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিশু-রক্ষার একরূপ ব্যবস্থা ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই আছে, নাই কেবল অভাগা ভারতবর্ষের। লোকসভার শিশু স্বরক্ষা সম্বন্ধে যে বিল উপস্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই সাধারণভাবে শিশু যৌলিক অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতি বহন করে না। ইহা মূলতঃ একটি ভয়ানক সমাজ-বিবোধী অনাচার দমনের

জন্ত আইন প্রণয়নের প্রয়াস। মন্দেব ভাল। অন্ততঃ শিশু-রক্ষার একটা দায়িত্ব সরকারের আওতার আসিবে। ভিক্ষাকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত শিশুচরণ এবং শিশু অঙ্গহানি ঘটাইবার জন্ত প্রথা দমন করিবার জন্ত এই বিলে বিভিন্ন মেয়াদেব দণ্ড প্রস্তাবিত হইয়াছে। শিশুচরণের জন্ত দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং শিশু অঙ্গহানি ঘটাইবার জন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চূড়ান্ত শাস্তি হিসাবে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, এই কারাবার বাতারা চালায়, তাহার পিছনে একটি বিঘাট প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহারা ধনী এবং পুঙ্খ। এ ব্যবসা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে—পরাধীন ভারতেও ছিল, স্বাধীন ভারতে ইহা আরও ব্যাপক এবং বেপারোয়া হইয়াছে। স্বাধীনপুঙ্খের সহকারী মন্ত্রী শ্রীমতী আলভা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিল আরও আগে উপস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, একটু দেরি হইয়া গিয়াছে। অথচ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন মহিলা সমিতি, শিশুকল্যাণ-সংস্থা এবং নাগরিক সমিতির সম্মেলনে শিশু-জীবনের এই নিখুঁত বিপদ সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হইবার অমুবোধ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বিল উপস্থাপনে সরকারের আলস্য ঘৃণিতে কয়েকটি বৎসর সময় লাগিয়াছে। অথচ ইহা এমন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিল নহে, বাতার জন্ত বিপুল পরিমাণের অর্থব্যয়ের কোন প্রশ্ন দেখা নিতে পারে—তাহা হইলেও না হয় দৃষ্টিস্তর কাষণ থাকিত। অথচ, আজ বলিতে বাধ্য হইতেছি, ব্রিটিশ আমলে পঙ্কজ-নিবাহী সমিতি পশুর উপর নিখুঁতভাবে অচরণ দমন করিবার জন্ত সরকারকে নিরাপে-ধরনের বক্ষামূলক আইন সহজেই প্রবর্তন করাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের বাতারা বৎসরের জনমত শিশু-মাতৃবেব প্রাণের নিরাপত্তার জন্ত সে-ধরনেরও কোন বক্ষামূলক আইন প্রবর্তন করাইয়া লইতে পারে নাই। এই সেদিনও কলিকাতার এক শিশু অঙ্গহানি করিয়া তাহাকে ভিক্ষাকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিবার অপরাধে বহু ভিক্ষকের মাত্র চুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আরও লঘুও হইয়াছে, এমন ঘটনা বিরল নহে। বাতাইটুক, শেষ পর্যন্ত সরকার যে সমস্তার প্রতিকারে কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে জনসাধারণ অবশ্যই কিছুটা আশস্ত হইবে।

তবে একটা কথা আমাদের বলিবার আছে। ভিক্ষা-প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অপরাধের বিলোপসাধন হইবে কিরূপে? ভিক্ষা বতদিন অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে প্রচলিত থাকিবার সুযোগ পাইবে ততদিন পর্যন্ত শিশুকে দিয়া ভিক্ষা করাইবার প্রয়োচনাও থাকিবে। ভিক্ষা-বৃত্তি বে-আইনী করা বা না-করা নাকি রাজ্যসরকারের ইচ্ছাধীন কর্তব্য। ইহাতেই আশঙ্কা থাকিয়া যাইতেছে, আলোচ্য বিলের উদ্দেশ্য ততদিনই সকল হইবে না, বতদিন না সরকার এই ভিক্ষা-বৃত্তির নিবোধ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন আছে। অনেক পিতামাতা শিশুকে ভিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা এই আইনের আওতায় পড়িবেন কিনা? বাচা হটক, এই ভিক্ষা-বাবসারের মহাজন হইয়া ও আড়ালে থাকিয়া এবং অনেকক্ষেত্রে পুলিশেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এই খেলা খেলিতেছেন, তাহাদের উচ্ছেদ সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োজন—সেখানে না আর এক খেলা চলে এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকিতে বলি।

গ-স

### পণ-প্রথা নিবারণী বিল

লোক সভায় পণ-প্রথা নিবারণী বিলের একটি খসড়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছিল, নগদ টাকা এবং গহনার দাবি করা ত চলিবেই না, উপহাঙ্গ উপহারের নামে কোন কিছু দেওয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই বিলটি বিবেচনার জ্ঞাত এতদিন লোকসভায় রক্ষিত ছিল। সকলেই জানেন, এই পণ-প্রথার ভায়ে কত সমাজ-জীবন ধ্বংস হইয়া বাইতেছে। আইন করিয়া কত তুচ্ছ জিনিস বন্ধ করা হইতেছে, অথচ বে-বিষ সমাজ-জীবনকে কুন্দিয়া কুন্দিয়া খাইতেছে, তাহার প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্তমানে এই বিস উপস্থাপিত হওয়ায়, ধর্ম্ম কল্যাণ পিতারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। কিন্তু এখন ওনা বাইতেছে, ঐ বিলটির মধ্যেও তাঁহারা ফাঁক রাখিতেছেন। এই ফাঁকটি হইতেছে—বিবাহে যে ধনেরই উপহার দেওয়া হটক না কেন, তাহার মূল্য বা খরচ সম্পর্কে কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না। এই “যে ধনেরই উপহার হটক না কেন” কথাটিম তাৎপর্য্য তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে যে, নগদ টাকার আকারে উপহার দিলেও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং পণ-প্রথা নিবারণী আইন পাস হইলেও শেব পর্য্যন্ত পণ, যৌতুক ও উপহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। কথায় ও কাজে এমন আসমান-অমিন ফারাকের দৃষ্টান্ত অসংখ্য উন্নত দেশে বিদ্যমান! বাচা হটক, সে আক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, বিবাহের সময় নগদ পণ কিবা উপহার ও যৌতুকের মাধ্যমে পাত্রী পক্ষের উপর দুর্ব্বহ চাপ হ্রাস করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, এই “পণপ্রথা নিবারণী আইন” পাস করারই বা কি সার্থকতা? একটা মন-ভুগান নাম দিয়া জনসাধারণের মনে উচ্চাশা সৃষ্টি করা হইতেছে—অথচ, সে আশা পূরণের উপযোগী ব্যবস্থা আইনে থাকিবে না, ইহা অপেক্ষা অশোভন ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? নগদ টাকার দাবী না করিয়া যৌতুক হিসাবে যদি কেহ একশতাবানি গিনি এবং মূল্যবান আসবাবপত্র চাহিয়া বলেন, অথবা পুত্র ডাক্তার হইয়া বাতির হইবে, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়োজনীয় বাবতীর সমস্ত প্রার্থনা করেন, তবে ত তাহা উত্থাপিত বিলের পণ-আইনে পড়িবে না। দাবী-দাওয়ার চরম সুযোগ এই নিয়মের দ্বারা হইতেছে। অথচ এই হস্তকর বিলই

সরকারের হাত দিয়া পাস হইয়া গেল। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ইহাই বোধহয় গণতন্ত্র!

গ-স

### ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামের অর্থোক্তিকতা

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সরকারের কাছে এই প্রশ্নাব করিয়াছেন যে, ‘পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ’ এই নামের পরিবর্তে কেবল ‘বঙ্গ’ কিংবা ‘বেঙ্গল পুলিশ’ এই নাম করা হটক। তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছেন, ‘পূর্ববঙ্গ’ এই নাম কোন দেশের জ্ঞাত সরকারী ভাষায় বণন ব্যবহৃত হইতেছে না, বরং উহার পরিবর্তে পূর্ব-পাকিস্তান শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে, তখন ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’ নামের কোন আবশ্যকতা অথবা যৌক্তিকতা নাই। পঞ্জাব বিখ্যাত হইবার পর উহার দুই অংশের জ্ঞাত ‘পশ্চিম পঞ্জাব’ ও পূর্ব পঞ্জাব’ নাম সরকারী ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে না। ‘পশ্চিম পঞ্জাব’ নাম উট্টিয়া বাওয়ায় পঞ্জাবের ভারতবর্ষ অংশকে কেবল ‘পঞ্জাব’ বলা হইতেছে। সেইরূপ ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামের বদলে কেবল ‘বেঙ্গল’ শব্দই বা ব্যবহার করা হইবে না কেন? আমাদের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। বাচা পূর্ব নাই, তাহার পশ্চিমও থাকার কোন হেতু নাই। তবে যদি কেহ মনে করেন যে, ভবিষ্যতে কোনদিন যদি ‘পূর্ব-পাকিস্তান’কে ‘পূর্ব-বঙ্গ’ করা হয়, তখন ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামেরও সার্থকতা উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেদিন কোনকালে আসিবে এমন ভরসা কেহ দিতে পারে না। তথাপি যদি সত্যিই সূর্য্য ভবিষ্যতে সেবক সমগ্র উপস্থিত হয় তবে এখানকার ‘বঙ্গ’কে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ করা অথবা উহাকে আরও বৃদ্ধিত আকারে প্রদর্শন করা অসম্ভব হইবে না। ‘পূর্ব-পঞ্জাব’কে শুধু ‘পঞ্জাব’ করিবার বিষয়ে যে যুক্তি, ‘পশ্চিমবঙ্গ’কে ‘বঙ্গ’ কিংবা ‘বেঙ্গল’ করিবার সম্পর্কেও সেই একই যুক্তি।

কিন্তু যুক্তি বাচাই থাক, সরকারের যুক্তি অজ পথ ধরিয়া চলে। তাহা না হইলে সরকারই ইহার অর্থোক্তিকতা বহুদিন আগেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

গ-স

### ডাকাতের দলে গ্রাজুয়েট শিক্ষক

১৪ই নবেম্বরের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র একটি চাকলাকর সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। সংবাদটি এইরূপ : “১১ই নবেম্বর বুধবার রাত্রে নদীয়ার রেলওয়ের বায়াণসী-এলাহাবাদ সেক্টরনে কুলপুর স্টেশনের নিকট দিল্লীগামী এক ট্রেনে যে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয় সেই সম্পর্কে খুঁত আসামীদের মধ্যে দুইজন গ্রাজুয়েট ও কানপুরের অধিবাসী বলিয়া জানা গেল।

তাহাদের মধ্যে একজন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অপরাধন পূর্নবিভাগের কর্মচারী। আসামীগণ ফাকামাউ স্টেশনে অবতরণের পূর্বে বাজীদের হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং জীবননাশ নামে এক ব্যক্তিকে পারধানার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিল। ট্রেন কা-

মট্টে শৈশবে খামিলে পাশের কামরার বাড়ীগণ আন্তরিক ও নিয়মিত  
উক্ত বাড়ীদের বাধন খুলিয়া দেন।

পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইলে গবর্ণমেন্ট বেঙ্গলের পুলিস সারা-  
বাড়ি এই অঞ্চলে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাশী চলায়। অল্পসন্ধানরত  
একদল পুলিস শেষ বাড়িতে ফাফামাট সেতুর নিকটে আদামোদিগকে  
গ্রেপ্তার করে।

এই সংবাদটি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার মধ্যেই কারণ আছে। চুবি,  
ডাক্তারি, খুন প্রভৃতি যতারা করে, তাহারা প্রায়ই অশিক্ষিত  
বেকার। তাহাদের এইরূপ আচরণের অর্থ হয়ত একটা কিছু করা  
বাটতে পায়, কিন্তু শিক্ষিত গ্রাজুয়েট—বিশেষ করিয়া স্কুলের  
শিক্ষকদের এই মনোবৃত্তি কি করিয়া আসে? অন্বেষণের তাড়নায়  
এইরূপ গম্ভীর কাব্য নিশ্চয়ই কারণ নয়। শুনা যায় একরূপ কার্য  
অনেকে স্বভাবে করে। ইহাদের সম্বন্ধে দেখাও বলা চলে না।  
কারণ তাহারা দীর্ঘদিন দরিদ্রা শিক্ষিতা করিয়া আসিতেছেন।

কারণ যাহাট্ট হটক গাঁতাদের দক্ষ কল্যাণ-দক্ষ, যাহাদের উপর  
চক্ষু চক্ষু সমস্তানের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-আচরণের গুরু দায়িত্ব  
হইয়াছে, যাহারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্র গড়িয়া তুলিবার কাজে  
নিযুক্ত—একবাক্য, যাহাদের হাতে আপন আপন সম্মাননের  
তুলিয়া দিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত আছেন, তাহাদের এতবড় পতন  
শুধু নিন্দনীয় নয়, অশ্রদ্ধাশীল অপরাধ বিচারে এই অপরাধীদের  
চরমদণ্ড দেওয়া উচিত।

গ-স

### দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নির্ঘাতন আজ নূতন নহে। মহাখ্যা  
গাঙ্গীও এই কারণে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন, গাঙ্গীজীর একপুত্র  
প্রাণও দিয়াছেন, কিন্তু এই বর্বর আচরণের কিছুমাত্র প্রশমিত  
হয় নাই। এই নির্ঘাতন-নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংজ্ঞার সমস্ত  
আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র মৌখিক প্রতিবাদ  
জানাইলেও, কোন ষেতাজ-রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ক্রিয়াত্মক  
বাবস্থা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু লি, টি  
আই কষ্টক লগুন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে দেখা বাটতেছে  
যে, ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার এই কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ-নীতির বিরুদ্ধে  
কেবল ব্যাপক আন্দোলনই আরম্ভ হয় নাই, দক্ষিণ আফ্রিকায়  
বাণিজ্য-জগৎ বয়কট করার ব্যবস্থাও এই সঙ্গে সূত্র হইয়া গিয়াছে।  
লগুন প্রবাসী দুইজন দক্ষিণ আফ্রিকার লোক এই বয়কট  
আন্দোলনে যোগ দিবার জগৎ ব্রিটিশ জাতির কাছে আবেদন  
জানাইয়াছেন। ইহাদের একজন হইতেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার  
জাশনাল কংগ্রেসের সভা। এই প্রতিষ্ঠানটি অশেতাজদের প্রতি-  
নিধি সভা। অপর লোকটি দক্ষিণ আফ্রিকার লিবারেল পার্টির  
সদস্য। ইহাও ষেতাজ প্রতিষ্ঠান। তাহাদের এই আবেদনে  
লাড়া পাওয়া গিয়াছে।

বয়কট আন্দোলন আপাততঃ যদিও কেবল কিছুসংখ্যক ছাত্র  
ও শ্রমিক, লিবারেল দল ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সমিতিসমূহের সমস্তদের  
মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি ক্রমেই ইহা বিস্তার লাভ  
করিতেছে এবং বৃহত্তর শ্রমিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্ডিনাল,  
সমবায় সমিতি এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও বয়কট আন্দোলনে  
যোগ দিবে ওরূপ আশা করা যাইতেছে। বয়কট আন্দোলনকে  
সাফল্যমণ্ডিত করার জগৎ জনসভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং প্রভৃতি  
আয়োজনও করা হইতেছে। মোরোর উপর লগুন ও নিকটবর্তী  
অঞ্চলসমূহে দক্ষিণ আফ্রিকার জিনিসপত্র বয়কট দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ-  
নীতির যে ক্রিয়াত্মক প্রতিবাদের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা  
সাফল্যমণ্ডিত হইলে, দক্ষিণ আফ্রিকার উপর ষেতাজ চাপ পড়িবে  
এবং ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত যদি অগ্রগত ষেতাজ-দেশেও অনুসৃত হয়,  
তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সহস্র বাধা হইয়া এই কাল-বিদ্বেষ নীতি  
ত্যাগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রসংজ্ঞা বঙ্গদেশের পর হাঙ্গেরি কেবল মু-  
মৌখিক প্রতিবাদ-দ্বারা প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার পরিবর্তে  
লগুনকে এই পদ্ধতি অধিক কার্যকরী হইবে ইহা বঙ্গ হই বক্তব্য।

গ-স

### বাস দুর্ঘটনার কারণ ও তাহার প্রতিকার

যানবাহনের সমস্তা আজ মানুষকে সকল দিক দিগাই বিস্তৃত  
করিয়াছে। লোক-সংখ্যা অধিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদনুসারে  
গাড়ীর সংখ্যা বাড়ান হয় না কেন? মানুষ যেন আজ মানুষ নয়!  
কোনরূপে ঠাসা-মালের মত তাহাদের গাড়ীতে বোকাই করিয়া  
দিলেই হইল। তাহাতেও যখন কল্যাণ না, তখন পানীতে মূল্য  
অবস্থায় নতুবা গাড়ীর ছাদে গিয়া মানুষ আশ্রয় লয়। ট্রামে-বাসে-  
রেলগাড়ীতে পর্যন্ত এই একই অবস্থা। অথচ এই অবস্থা যে  
চালু রাখা কোনক্রমেই উচিত নয়, ইহা গাড়ীর মালিকও বুঝিতে  
চাহেন না, আমাদের সরকারও এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন না। এই  
অবস্থা ভিড়ের চাপে প্রত্যহ কত যে প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে তাহারও  
সীমা-পরিসীমা নাই। শুধু কলিকাতাতেই নয়, এই অবস্থা  
মকরবলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জীবন-বাহ্যায় মানুষের সমস্ত  
চাপ নানা দিক হইতেই আসিয়াছে, ইহার মধ্যে যানবাহন-সমস্তা  
আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। একটি ভয়ভর্ত্ত বাস দুর্ঘটনা  
সম্প্রতি বামপুরহাটে ঘটিয়াছে। এই দুর্ঘটনার কারণ আর কিছুই  
নয়, যাত্রীদের সংখ্যাধিক্য। বাসের মধ্যে স্থান সঙ্কলন না হওয়ার  
ফলস্বরূপে ছাদে উঠিতে হইয়াছিল। তার পর বাসটি যখন এক  
বট গাছের তলা দিয়া যাইতেছিল, ছাদের উপরে অবস্থানকারী  
ব্যক্তিদের সঙ্গে তখন বৃক্ষাশ্রয় সংঘর্ষ ঘটে। সংবাদটি মধ্যাহ্নিক।  
কিন্তু এমন কথা বলিয়া কোনও লাভ নাই যে, জীবন বেধানে  
বিপন্ন হইতে পারে, বাসের উপরে না ওঠাই সেখানে উচিত ছিল।  
লাভ নাই এই কারণে যে, সব করিয়া কেহ ছাদে ওঠে না—বাসের  
মধ্যে জায়গা মেলে না বলিয়াই ছাদে উঠিতে বাধ্য হয়। বলা

বাহ্য, যাজ্ঞিকের উপদেশ দিয়া এই মধ্যস্থিত অবস্থার প্রতিকার করা বাইবে না। দেখতে হইবে, বাসের মালিকদের লোভ বেন সীমা না ছাড়াইয়া উঠে এবং যাজ্ঞিকের নিরাপত্তার দিকেও বেন তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হন। কিছুদিন আগে আন্দুলের একটি খবর বাহির হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া বোঝা যায়, বাসের মালিক বা কণ্ঠকর্তারা মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করেন না। বত্থন যাজ্ঞি উঠাইল স্বাভাবিক হয়, বেশী আয়ের লোভে তাহার তিন গুণ যাজ্ঞিকেও অনেক সময় বাসে উঠানো হইয়া থাকে।

এই অতিরিক্ত আয়ের লোভটাকেই প্রতিহত করা দরকার। ইহার জন্য এমন গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করা উচিত, বাসের কণ্ঠকর্তার বাহাতে কোনক্রমেই আর নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত যাজ্ঞিকে বাসে ভুলিতে সাহসী না হয়। সেই সঙ্গে, জনসাধারণের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, বাসের সংখ্যাও যে আরও বাড়াইতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

গ স

### দেব-দেবীর নামে খেলা

‘শিব গড়িতে বানর’ বলিয়া আমাদের দেশে একটি কথা আছে। ঠিক অমুরূপ বানর না হইলেও, দেব-দেবীর মূর্তি-গঠনকাণ্ডে যে বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া বাইতেছে তাহা আপত্তিকর। ধর্ম-বিশ্বাস সকলের সমান নহে, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম আঘাত করিতে হইবে এই বা কেমন কথা! ইহা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথাও নয়, অমুরাগের কথাও নয়—যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়, তাঁহার গায়ে নিষ্ঠাবন ভাগ করা কেহই সহ্য করিবে না। বত্থন দেখি, দেবী-মূর্তির মুখে কোনও অভিনেত্রীর মুখের আদল আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা দেবমূর্তির হাতে ঘড়ি আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে—তুখু ধর্মনিষ্ঠ মানুষ নহে, আপন দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই নির্বোধ তাচ্ছিল্য দেখিয়া সকলেই লজ্জায় অধোবদন হইবেন। তাচ্ছিল্য বাহারা দেখায়, কালাপাহাড়ের তুলনায় তাহাদের আচরণ কিছু কম নিন্দনীয় নহে। কালাপাহাড় ছিল মূর্তিনাশক। তাব একটা অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালের কালাপাহাড়রা মূর্তি ভাঙেন না, মূর্তি বিকৃত করেন। সে আরও ভয়ানক। ইহা কি পরিহাস? ‘কলির কার্তিক’-এর যে একটি নব্য মূর্তির আলোক-চিত্র সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই মূর্তির মধ্যেও ঠিক এই ধরনেরই একটা পরিহাস আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এ পরিহাস শুধু নিবুদ্ধিতা নহে, কু-রুচিরও পরিচায়ক। আমাদের বলিবার কথা এই যে, বিকৃত এই রুচির নেতৃত্ব কোথা হইতে আসে, তাহাও এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দুর্গাপূজার প্রাকালে এমন কিছু কিছু লেখা চোখে পড়ে, দেব-দেবীদের লইয়া কিছু ঠাট্টা করাই বাহার অল্পতম উদ্দেশ্য। ঠাট্টাটা নির্দোষ হইতে পারে, কিন্তু রচনায় পাত্র-পাত্রী যেখানে দেব-দেবী, আলোচনার ভাষা এবং ভজিতে কোনও তারল্য সেখানে শোভা পায় না।

গ-স

### জাল পাসপোর্ট-ভিসার কারখানা আবিষ্কার

গুনা বাইতেছে, পাসপোর্ট-ভিসাবিহীন অসংখ্য পাকিস্তানী মুসলমান এদেশে বসবাস করিতেছে। সংবাদ অথবা বত্থন নহে। সরকারও ইহা অবগত আছেন, কিন্তু ইহা প্রতিকার কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। এই পাকিস্তানীরা নানা ছুতার কেহ ব্যবসায়, কেহ চাকুরি লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের অনেকে স্বকাজের গৃহে বা নাম ভাড়াইয়া, পরিচয় গোপন করিয়া অল্পতম বাস করিতেছে। ইহাদের অনেক গোপন তথ্যও মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে। জানা গিয়াছে, ইহারা কোন কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে পুষ্ট। ইহাদের পাসপোর্ট-ভিসা সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয় না। বিনা পাসপোর্টেও তাহারা অবাধে চলিয়া আসিতেছে। এই পাসপোর্ট-ভিসা জালের কারখানাও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাণাঘাট, কুপাসা উদ্যত কাম্পে এই জাল-কারখানাটি অবস্থিত। সম্প্রতি চারজন নাকি মালপত্রসহ ধরা পড়িয়াছে। একটির সন্ধান মিলিয়াছে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে এরূপ জাল-কারখানা আমাদের দেশে আর কতগুলি আছে?

কিন্তু কারখানা আবিষ্কার হইতেও বেশী প্রয়োজন বে-আইনী-ভাবে এই রাজ্যে অবস্থিত পাকিস্তানীদের সন্ধান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও তাহাদের অপসারিত করা। এবং ভবিষ্যতে আর বাহাতে এরূপ ভাবে কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আজ পররাষ্ট্রের দ্বারা দেশ আক্রান্ত, এরূপ অবস্থায় কোন বিদেশীয়ই এখানে অবস্থান নিরাপদ নহে, ইহা সরকারকে অবগত রাখিতে বলি।

গ-স

### রাজ্যসভায় চীন বিতর্ক

প্রথম দিনে পণ্ডিত নেহরু বলেন :

ট্রেনেহরু বলেন, এখন দুই দিক দিয়া প্রশ্নটি বিবেচনা করা বাইতে পারে : প্রথমতঃ এই সভা বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করিয়া সরকারের নীতি সম্পর্কে ইহার মত প্রকাশ করিতে ও পরামর্শ নিতে পারেন ; দ্বিতীয়তঃ ঐ নীতি কাঙ্ক্ষণী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে প্রস্তাব করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার চিন্তা করা দরকার।

বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা অত্যন্ত জটিল এবং এই লইয়া জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবাবেগের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু এই কারণেই অসুস্থ নীতি ও তাহার রূপায়ণের ব্যাপারে শান্ত্যাব বজায় রাখা ও পরিষ্কার চিন্তা করা দরকার। এই রূপায়ণের অনেক দিক আছে, যেমন সামরিক। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হটল প্রতিরক্ষার জন্য দেশের শক্তি বৃদ্ধি করা।

অর্থানয়নী বলেন, ভাষ্য যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে,

তাহা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতি, অর্থাৎ দেশকে কোন সামরিক গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত না করার নীতি। “আমরা যখন আমাদের নিজেদের সীমান্তের গুরুত্ব বিপদের সম্মুখীন, তখন আমাদের এককালের অমুখ্য নীতিই পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাক্ষাৎ মণ্ডিত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ পৃথিবী আজ সাধারণভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ও সামরিক গোষ্ঠী বিলোপের দিকে চলিয়াছে।

“ইহা আপত্তিবিরোধী মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি বলিতেছি, অতীতে আমরা যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহা যথার্থ এবং আজও যথার্থই আছে। তবে পরিস্থিতি অমুখ্যাদী দেই নীতিকে গণ্য পাওয়াইয়া লইতে হইতে পারে।”

চীনে সংঘটিত আমাদের সম্পর্ক বর্তমান মুহুর্তে শান্তিপূর্ণ নহে, এবং রুদ্ভুতঃ এইটুকুর বিচারে এই নীতি ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু তাহার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। “আমরা মনে করি ইহাও জ্ঞান দায়ী চীন সরকারের কাণ্ড এবং সম্প্রসাধারণমূলক ও অক্রমবাস্তবক মনোভাব। কাগ্যতঃ তাহার আমাদের এলাকা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহার জবাব আমাদের দিতে হইবে, কিন্তু মূলনীতির সহিত তাহার সম্পর্ক টানা চলে না।”

ক্রীনেহর বলেন যে, তিনি এটি বিষয়ে পার্লামেন্টের সম্পূর্ণ নির্দেশ চাহেন। কারণ, শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তই বহাল থাকিবে। পার্লামেন্ট যাহা সিদ্ধান্ত করিবে, সরকারকে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। যদি সরকার তাহা অনুসরণ করিতে পারেন ভাল, তাহা না হইলে অল্প সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পার্লামেন্টের নীতি কাঙ্ক্ষাকরী করিবেন। তবে সামরিক ক্ষেত্রে কি নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে, পার্লামেন্টে তাহার সবিশেষ আলোচনা সম্ভব নহে।

ক্রীনেহর বলেন যে, নীতি কাঙ্ক্ষাকরী করার প্রশ্ন উঠিলে একমাত্র নীতির সামরিক দিক কাঙ্ক্ষাকরী করার প্রশ্ন উঠে। আজকাল দেশের কারিগরি ও শিল্পোন্নতির উপরই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নির্ভর করে। সমগ্র পৃথিবী তাহা জানে। সুতরাং কেবল সৈন্যদলে নতুন লোক ভর্তি করিলেই যুদ্ধের প্রস্তুতি হয় না। একজন কারিগরি ও শিল্পের প্রসার আবশ্যিক। তাহা না হইলে সামরিক দিক হইতে দেশ দুর্বল বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই সরকার এই বিষয়ে মনোযোগী আছেন। যদি কোন সমস্যা মনে করেন যে, পক্ষীদের মধ্যে সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাহা হইলে তিনি তুল করিবেন। সরকার অনেক তুল-ভাঙ্গি করিয়াছেন, কিন্তু দেশরক্ষা সম্পর্কে কখনও অনমনোযোগী থাকেন নাই।

ক্রীনেহর বলেন, “তবে আমি আপনাদের নিকট একটি স্বীকারোক্তি করিতেছি। চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করিবে, তাহা আমরা কখনও ভাবিতে পারি নাই।”

ক্রীনেহর বলেন যে, যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা স্বল্পস্থায়ী

নয়। এই সমস্যা সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। আমরা বাহাই ভাবি না কেন ভৌগোলিক সমস্যা উপেক্ষা করিতে পারি না। ভারত ও চীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র। উভয়ের সীমান্ত হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ। এই সীমান্ত বহাল থাকিবে। এই দুইটি রাষ্ট্র এখনও যেমন প্রতিবেশী, ভবিষ্যতেও তেমন প্রতিবেশী থাকিবে। কোন রাষ্ট্রই তাহার ভৌগোলিক সীমারেখা হইতে সরিয়া যাউবে না। সুতরাং ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিষয় ভাবিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, স্বল্পমেয়াদী অবস্থা হইতেই দীর্ঘমেয়াদী অস্থা আসে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্রীনেহর বলেন যে, কারিগরি উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইবে। দেশকে একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইতেছে বলিয়া প্রকৃত অবস্থাকে উপেক্ষা করা যাউবে না। শুধু অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে চলিবে না। ব্যবস্থার ফল ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবিতে হইবে। ভবিষ্যৎ বলিতে কেবল দেশের কারিগরি ও শিল্পোন্নতি বুঝাইতেছে না। সমগ্র দেশের সহিত সম্পর্কের বিষয়ও বুঝাইতেছে।

ক্রীনেহর আরও বলেন যে, অল্প দেশের সহিত মৈত্রী স্থাপনের বিষয়ে ভারতের নীতি ফলপ্রসূ হইয়াছে। তিনি বলেন, “সম্মা-লোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, আমরা চিনী-চীনি ভাই ভাই বলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছি। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়াছি। চিনী-চীনি ভাই ভাই বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কে বস তুলিয়াছিল, আমি জানি না। কিন্তু যিনিই করুন, তিনি ভুলই করিয়াছেন। কারণ, সকল দেশের প্রতিই আমাদের এইরূপ মনোভাব থাকা উচিত। যিনিই আসুন, তিনি ভাই-এর মতই আসেন। অবশ্য কিছু বাড়ি বাড়ি হয়, এবং তুলও হয়। ইহাই বেনামাদারক। তবে বন্ধুত্বের মনোভাবই ঠিক মনোভাব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সত্যক থাকিতে হইবে, এবং দেশরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে হইবে। কিন্তু সত্যক না থাকিয়া বন্ধুত্বের হাত বাড়াইলেই বিপদে পড়িতে হইবে। সে বিপদ মহাবিপদ। কারণ, সে বিপদে যে কোন কিছু ঘটিতে পারে।”

পাশ্চাত্যে অজ্ঞানতার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ক্রীনেহর বলেন যে, ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, যেখানে লড়াই অথবা ঠাণ্ডা লড়াই ঘূর্ণার বস্তু হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ এড়াইতে চায়।

ক্রীনেহর বলেন, “যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি ভাল। যুদ্ধ অত্যন্ত নিলাই। কিন্তু যদি দেশের মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হয়, তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াই দেশরক্ষা করিতে হইবে।”

ক্রীনেহর বলেন যে, চীন অথবা অল্প কোন দেশ কি করিবে,

তাহা তাঁহার বিচার্য্য নয়। তাঁহার বিচার্য্য বিষয়, তাঁহার নিজের দেশের অভিমত কি ?

তিনি বলেন যে, মানুষ এখন এক অসাধারণ অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন পবেষণা হইতেছে। পু জিবাদ অথবা কমুনিষ্ট মতবাদ পুৰাতন হইয়া পড়িয়াছে।

বিতর্কের শেষে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা :

তিনি বলেন, এই প্রথম এশিয়ার চুটটি বৃহৎ শক্তি—ভাংতে ও চীন—দীর্ঘ সীমান্ত বরাবর পরস্পরের সম্মুখীন ; এই প্রথম একটি বিশ্বশক্তি বা ভবিষ্যৎ বিশ্বশক্তি ভারতের সীমান্তে চাপিয়া বসিয়াছে। “ইচ্ছান্তে সমগ্র প্রসঙ্গটিরই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এই চিত্রটিই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।”

সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, “কেবল আজ বা আগামীকালেই ভগ্ন হইবে, শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা পদস্পর্ষের সম্মুখীন থাকিব। কারণ, ভারত বা চীন কেহই এশিয়া পরিচ্যাগ করিতে বাইতেছে না।”

সুতরাং প্রশ্ন হইল, এই দুই দেশ চিরস্থায়ী শত্রুতার মধ্যে বাস করিবে, না এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যাতে তাহারা “বন্ধুভাবে না হউক অন্ততঃ পরস্পরকে সহ্য করিয়া” বাস করিতে পারে।

সরকারের আন্তর্জাতিক ও চীননীতি সমর্থন করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বিশ্ব সংঘের কেন্দ্রস্থল এশিয়ায় সরিয়া আসিতেছে।”

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উক্ত সীমান্তে প্রতিরক্ষার জন্ত বহুপাতির তত প্রয়োজন নাই, বরং আছে “শিক্ষিত, সমর্থ, বলিষ্ঠ লোকের—যাহারা এই উচ্চতর বুদ্ধিদায়ক আবহাওয়া সহ্য করিতে পারিবে।” সরকার দেশের প্রতিরক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন এবং দেশের শান্তি কাঠামোকে শক্তিশালী করারও চেষ্টা করিতেছেন। আর ভবিষ্যতের জন্ত শিল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও গড়িয়া তোলা হইতেছে।

“এই সকল কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শান্তিপূর্ণ সীমান্তের দিকেও লক্ষ্য রাখিব, শান্তির জন্ত চেষ্টা করিব, দেশের ক্ষতি করিতে পাবে, এমন কোন অঙ্গী মনোভাব পোষণ করিব না।”

## পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার

“যুগান্তর” মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার নিম্নলিখিত সারাংশ দিয়াছেন :

“আপনাদের এই সভায় বক্তৃতা দানের জন্ত আমন্ত্রণ আমি বিশেষ মধ্যমারূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমি মনে করি যে, ইহা দ্বারা আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমাদের উভয় দেশের জনগণের অন্তর্নিহিত মৈত্রী উজ্জ্বল প্রতীক-রূপে আমি ইহাকে বিবেচনা করি।

“আমার দেশের জনগণের নিকট হইতে এই ৪০ কোটি লোকের নিকট আমি এই আশাস বহন করিয়া আনিয়াছি যে,

আমার দেশের লোকেরা আমেরিকার কল্যাণ ভারতের কল্যাণের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত বলিয়া মনে করে। স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা, শান্তি ও জায় বিচারের আবহাওয়ার জীবনযাপনের যে গভীর আকাজকা ভারত পোষণ করে, আমেরিকাও তাহার অঙ্গীকার।

“গত কিছু বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা যে সকল বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের পরিণতিতে এই ধরনের জীবনযাপনের নূতন এক বিরাট সুযোগ আমাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানকে আমরা কি উদ্দেশ্যদ্বারা নিয়োজিত করিব এই প্রশ্নই এখন মোহনশক্তি আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

“আমাদের সম্মুখে নবযুগের দীর্ঘ বসন্তকাল বিস্তৃত হইয়াছে। সেই যুগে মানুষ প্রতি বৎসর মৃত্যি হইতে ক্রমশঃ উন্নততর ফলসংগ্ৰহে সমর্থ হইবে, মৌলিক শক্তিশক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজন করি জগৎটার উপর অধিকতর প্রভুত্ব অর্জন করিবে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংশীলন হইতে এবং সকলে মিলিয়া শান্তিতে জীবনযাপন করিবে।”

কিন্তু উত্তিহাসে যে পৃথিবীর পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ ও অবিশ্বাস উত্থাপন করিতেছে—বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, বহুবার শাসনশক্তি ধ্বংসীতে বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক এবং মানবজাতি প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীতে ভীষণ দুর্য্যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। অপদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিজ্ঞানের বিপুলতা শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, এমনকি বাবসা-বাণিজ্যকে তাহারা শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করিয়াছে।

আমার মতে জগৎ যাহাদের উপর জনগণ দাঙিছু অর্পণ করিয়াছে তাহাদের এবং আপনাদের সকলকেই গোলাগুলিভাবে সহজ প্রহরিতা আনি করিতেছি :

যে কুসংস্কার আচার-আচরণ ও নীতি অমুসবের ফলে আমাদের পুত্র, পৌত্রাদি অতীতের মতই অসহায়ভাবে জীবনযাপন করিবে, হয়ত বা ভগ্ন যুগের ফলে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে আমরা এখনও কি সেই সকল সংস্কার, আচার-আচরণ, নীতি আকড়াইয়াই থাকিব ?

আমরা আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনাই জানাই উঠা যেন আমরা না করি। বিশ্বব্যাপী এই প্রার্থনা যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যোগদান করিতে না পাবেন তাহা হইলে তাঁহার রাজনীতি জ্ঞানের কোন পরিচয় দেওয়া হইবে না। প্রচার-ব্যঙ্গের স্থলে আলোচনা-বৈঠক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছদ্মকী ও পারস্পরিক দোষারোপ স্থলে জ্ঞান-বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে, অস্ত্রোপাধানের উন্নত প্রতি-বোধিতার সঙ্গে শাস্তিকালীন নানা সৃষ্টিমূলক কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে পৃথিবীর বৈশী ভাগ অঞ্চলের নরনারীরাই আজ সক্ষমবদ্ধ।

আমরা একটি উন্নততর যুগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি—এই আমাদের আশা। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের মত কাজ করিয়া আমি এই পৃথিবীর সকল নরনারী ও শিশু জন্ত



শান্তি, স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা-বল্লভে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিব।

এই উদ্দেশ্যসাধনে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিলে আমরা অমাদের ভাবী বংশধরদের স্বত্ববাদী হইব। আমরা কি এই কর্তব্য সম্পাদনে বিমূঢ় হইব, না দাস ও মানবকুলের আত্মসম্মতির উপায়স্বরূপ যুদ্ধের পথ অবলম্বন করিব—যাহার ফলে আমাদের পক্ষে মানবজাতির অপর কোনও অস্তিত্ব থাকিবে না।

আমি সেই দেশেরই প্রতিনিধি হিসাবে এখানে আসিয়াছি যে অল্প কালের মধ্যে এক বিপ্লবী জমি দখলের ব্যতীত কোনও আশঙ্কা নাই অল্প কোন জাতির শাসন-ব্যবস্থার উপর কোন বরফ নিঃসৃত্যধিকার স্থাপনের চেষ্টা করে না এবং ব্যতীত অপর জাতির স্বার্থ বলি দিয়া বাবদায়-বাণিজ্য, রাজনৈতিক কাগ্যকলাপ কিংবা অপর কোনরূপ ক্ষমতার সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা করে না। মানবজাতির শান্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তি গঠিত ও চিরস্থায়ী যে আকাঙ্ক্ষা বহিঃক্ষেপে সেই আকাঙ্ক্ষার রূপধারণ এই দেশটি ও অল্প কালের মধ্যে সহিত তাহাদের সম্পদ নিয়োজিত করিয়া সাধায়া করিতে প্রস্তুত।

ভবিষ্যতে বহু হিসাবে আমি এখানে আসিয়াছি এবং ভবিষ্যতের ১৮ কোটি মিলিয়ন বন্ধুর পক্ষ হইতে কথা বলিতেছি—আমি এখানে আসিতে পারিয়া আমার সুদীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ হইল। আমি আমার দেশবাসীদের পক্ষ হইতে ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যতবাসীর প্রতি ভারতে সংস্কৃতি, অগ্রগতি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তাহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি।

সংগ্রাম মানবজাতি আপনাদের এই দেশটি কাছে খণ্ডিত কিন্তু আশা-মাত্র চমক দিচ্চ হইতে আমাদেও, আমেরিকানদের সহিত আপনাদের বিশেষ ধরনের মিল বহিয়াছে।

রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম দিন হইতেই আপনাদের ও আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার কামনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের দেশেও আপনাদেরই মত নানা জাতি, গোষ্ঠী, নানা ভাষাভাষী ও ধর্মদর্শন-অধুষিত দেশ। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমাদের এই দুই দেশ রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জন করিয়াছে। আমরা কেহই এই অঙ্কুর করি নাট যে, আমাদের পক্ষে একমাত্র পথ। আমরা ভিতরেই আমাদের বার্তা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন। দেশবাসীদের এবং অল্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া রাষ্ট্র জনগণের সেবা করিব—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আমরা উভয়েই আমাদের সকল নাগরিকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। সর্বোপরি আমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই। দশ বৎসর পূর্বে আপনাদের প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যখন আমার অতিথি হইয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন :

রাজনৈতিক পরাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য এবং আর্থিক দুর্গতি—শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইলে আমাদের এই সকল দুই ব্যাধি দূর করিতে হইবে।

আমাদের প্রজাতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠার পর হইতেই রাজনৈতিক পরাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য এবং আর্থিক দুর্গতি এই তিনটি দুই ব্যাধির বিরুদ্ধে নিঃসৃত্যবে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে।

এই সকল দুই ব্যাধি অপনোদনের প্রয়াসে আমেরিকা অবশ্য সর্বদা আন্তর্জাতিক লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের উপর জয়লাভ করা হইয়াছে একথা কোনক্রমেই বলা চলে না। প্রকৃত পক্ষে মানব প্রকৃতির রূপান্তর না ঘটিলে ইহাদের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ কখনই সম্ভব হইবে না। এই সকল দুই ব্যাধি ও অজ্ঞায় দুর্যোগে আমাদের জীবন ও সম্পদ নিয়োগ করিবার জন্য আমাদের সম্মানিত নেতৃবর্গ প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া আমাদের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। আমাদের সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের এই চেষ্টায় আমরা কখনও ক্ষান্ত বা উদ্বিগ্ন হইতে নিবৃত্ত হইব না।

ক্রিয়াকর্ম এই কথা বলার পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। নৈরাশ্রবাদীরা বলিতে পারেন, এই তিনটি দুই ব্যাধির উপদ্রব পৃথিবীতে এখনও বর্তমান, শুধুমাত্র তাহাই নহে ইহা দৃঢ়ত্ব হইয়া আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ইহার তীব্রতা কখনও হ্রাস পাইবে না। তাহার এই সিদ্ধান্তও করিতে পারেন—ভবিষ্যৎ হইবে অতীতেই পুনরাবৃত্তি এবং পৃথিবীতে সঙ্কটের পর সঙ্কট দেখা দিবে, উত্তেজনা ও হুসিচ্ছা হইতে মানুষ কখনও অব্যাহতি পাইবে না—এজন্য মানুষ সর্বদাই এই চিন্তায় সশঙ্কিত হইয়া থাকিবে যে কোনরূপ আক্রমণাত্মক ঘটনা হইতে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে।

নৈরাশ্রবাদীরা এই বকম কথা বলিতে পারেন এবং আমরাও যদি একমাত্র নৈরাশ্র্য, বার্ষতা ও অকৃতকাব্যতার ইতিহাসই পথ্যালোচনা করি তাহা হইলে আমরাও তাহাই সমর্থন করিতে বাধ্য হইব।

হুসিচ্ছা, দুর্ভাগ্য ও চরম বার্ষতা যে কি তাহা আমরা, আমেরিকাবাসী, জানি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ইহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে, রাষ্ট্রসমূহের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জায়ের বিধান বজায় রাখার জন্য আমেরিকার হাজার হাজার পরিবার প্রভূত মূল্য দিয়াছে। আক্রমণ বাহাতে সাক্ষ্যমণ্ডিত না হয় তাহার জন্য আমাদের দেশের বহু পরিবারের বহু যুবক তাহাদের যৌবনের কয়েকটি বৎসর উৎসর্গ করিয়াছে। নিকট ও দূরবর্তী অঞ্চল হইতে এই দশ বৎসর আমেরিকায় যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহা আমাদের কেবল শঙ্কিতই করিয়াছে।

বিষাট সামরিক শক্তির সমর্থনযুক্ত একটি বিরুদ্ধবাদী দর্শন ও নীতির আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়ে যথেষ্ট এই সকল আতঙ্কের অবস্থার উৎস নিশ্চিতরূপে নিহিত রহিয়াছে। এই অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফলেই আমরা যথোপযুক্ত সমস্ত সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আমাদের সম্বন্ধের কথা স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। এই সমস্ত সৈন্যবাহিনী শুধু যে আমাদের কাছে লাগিয়াছে তাহা নহে, আমাদের বন্ধুবর্গ ও মিত্রশক্তিরা, যাহারা আমাদেরই মত এই বিপদ উপলব্ধি



করিয়াছে তাহাদেরও কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু এই সৈন্যবাহিনী কেবলমাত্র প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই কাজ করিয়াছে। এই শক্তি সংহত করিয়া আমরা বর্তমানের জঙ্গ ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জঙ্গও হারী শাস্তির পথে প্রয়োজনীয় সহায়তা করিচ্ছি বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ঐতিহাসিক দিবস হইতে এবং সহজাত প্রকৃতির দিক হইতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারা সামাজিক-নৈতিক ও বৈশ্ব-সমূহের মীমাংসা করিতে বরাবরই অস্বীকার করিয়াছে এবং এখনও তাহাই করে। আমরা যদিও স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তার অঙ্গ যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তথাপি ফলশ্রুতরূপে পারম্পরিক বাধ্যতায় প্রতিপাদনের ভিত্তিতে অঙ্গশক্তি হ্রাস করার উপর আমরা পূর্বের মতই জোর দিতে থাকিব।

গত দশকের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের নৈরাজ্য দেখা দিলেও এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের নৈতিক লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট আমেরিকানরা সাম্প্রতিক, কারিগরি ও জাগতিক বিষয়ে বিশ্বের সমৃদ্ধিমূলক কার্ণাও তৎপর গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল কার্ণার দ্বারা মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার নীতি সমর্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে এই প্রকার কার্য ও ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ কার্য সম্পাদিত হইবে বিন্দুমাত্র আমেরিকা মনে করে। উন্নততর জীবনযাত্রার জঙ্গ বিশ্বের অঙ্গান্ত রাষ্ট্রের বিশেষ করিয়া যাহারা নূতন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিম্নোক্ত প্রয়াস আমেরিকা বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া লক্ষ্য করিতেছে।

যাত্রা দশ বৎসর পূর্বে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভারতের সাহস রহিয়াছে, সজ্জা রহিয়াছে। কিন্তু এই দেশ এইরূপ বহুবিধ গভীর সমস্যার পর্বেপস্থিত হইয়া রহিয়াছে আধুনিক ইতিহাসে যাহার ভুলনা কদাচিৎ মেলে। আপনারা যে সাক্ষ্য অর্জন করিয়াছেন অত্যন্ত আশাবানী পর্যবেক্ষকের পক্ষেও সে সময়ে তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না।

ভারত আজ সুদূর আশ্চর্য সহিত বিশ্বের অঙ্গান্ত রাষ্ট্রের সহিত কথা বলিতেছে এবং সেই সকল রাষ্ট্রও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণে আছে। ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিটি নব ও প্রতিটি নারী কতখানি দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত অতীষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া থাকে, তাহা হইতেই সমস্ত বৃহত্তর পরিমাণ দৃঢ়তা যায়। বিগত দশকে বিশেষ যাত্রা কিছু বাধ্যতায় দেখা দিয়াছে ভারতের এই জয় তাহা মুছিয়া দিবে।

ভারত অঙ্গান্ত মহাদেশের জনসাধারণকে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়াছে এবং তাহাদের কাজে প্রবৃত্তি জোগাইয়াছে। যে কেহ একটি পৃথিবীর মানচিত্র লইয়া গত দশ বৎসরে যে সকল দেশে সাম্প্রতিক পরবর্তমান অবদান করিয়াছে, বর্ণগত বৈষম্য হ্রাস পাইয়াছে এবং যেখানে অর্থনৈতিক দুঃস্থ-দুর্দশার অন্ততঃ কিছুটা লাঘব হইয়াছে সেই সকল দেশগুলি একটি কলিঙ্গ পতাকা দ্বারা

চিহ্নিত করুন। তিনি সম্ভবতঃ দেখিতে পাইবেন যে, এই তিনটি দৃষ্ট ব্যাপি হইতে উদ্ধার লাভের জঙ্গ যুগ যুগ ধরিয়া যে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে বিগত দশটি বৎসরের মত সার্থকতা আর কোন সময়ে দেখা যায় নাই।

বিশ্বের সকল মানুষের জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিবার পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ সম্ভব হইয়াছে এই দশটি বৎসরের জঙ্গই।

আমরা যে মর্চেন্টে প্রার্থনা ও শাস্তির যুগ অগ্রসর হইয়া যাউতে পারিতেছি না তাহার অন্তরায় কোথায়?

ইহার উত্তর সম্পূর্ণ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভীতি ও আশঙ্কা রহিয়াছে আমরা এখনও দূর করিতে পারি নাই। ফল হইয়াছে এই যে, কোন দেশের সরকার শুধুমাত্র নিজের দেশের জনগণের কল্যাণের জঙ্গ স্বীয় দেশের সম্পদ কাজে লাগাইতে পারে না।

এমন সকল অর্থবায়ের বোঝা সরকারসমূহের উপর চাপিয়াছে যাহা ফলস্বরূপ নহে। প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থা যাতে পূর্ন হইতেই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ আজিকার দিনের অল্পবাহী যন্ত্রের কাছে তাহা নিরর্থক হইয়া যাউতেছে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই চট্টচক্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সামরিক দুর্বলতার ফলে পরোক্ষা কর্তৃক আক্রমণ, নাশকামূলক কার্য বা বাতির হইতে পড়িয়া তোলা বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কোন একটি রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি অপর রাষ্ট্রসমূহের মনে যে ভীতির সঞ্চার করে তাহার ফলে ইহার অঙ্গশক্তি ও সামরিক ব্যবস্থার জঙ্গ অধিকতর সম্পদ নিয়োজিত করিতে প্ররোচিত হয়। তখন বিশ্বব্যাপী অঙ্গ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সকল অঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংশয় বিরাজমান থাকায় উদ্বেগনা আরও বৃদ্ধি পায়। জাতিসমূহ নিজেদের শান্তিপূর্ণ উন্নতির সুযোগসম্পত্তিও বর্জিত হয়। ফলতঃ শুভেচ্ছা ও স্নেহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তির জঙ্গ মানুষের আকাঙ্ক্ষা আভাবিকভাবেই আরও তীব্র হয়।

আমাদের এযুগে বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণ অবশ্যই সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোকের দাবি এই-রূপ ব্যাপক ও তীব্র হইয়া উঠিবে যে কোন মানুষ বা কোন সরকার তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব করিয়া তুলিবার অঘোষণা আমাদের রাষ্ট্র অবিরাম চেষ্টা করিয়া বাইতে প্রতিশ্রুত। ছয় বৎসর পূর্বে ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে আমি বলিয়াছিলাম, “নিরস্ত্রীকরণের দ্বারা যে সকল হইবে তাহার একটা মোটা অংশ বিশ্বের সাহায্যে ও পুনর্গঠন তাহাবিলে দান করিবার কাজে অঙ্গান্ত রাষ্ট্রের সহিত যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাহার জনগণকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছে।” আমরা সরকার এখনও তাহার জনগণকে সেই আহ্বান জানাইতে প্রস্তুত।

কিন্তু অঙ্গশক্তি আপন হইতেই মুক্ত বাধার না—মুক্ত সৃষ্টি করে মানুষ।

অতীতের উপর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেই মূর্ত অতীতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, দাবিদের অপব্যবহার এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা যে কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে এটরূপ অসাব্য বিশ্বাস আত্মিকার মানুষকে প্রভাবিত করিতেছে।

মানবতার নামে আমরা কি অতীতের সংগে, অবিবাস ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধে একযোগে একটি পঞ্চাশিকী অথবা একটি পঞ্চাশ বাষিকী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে পারি না? বর্তমানে পৃথিবীতে যে উদ্ভেজনা বিজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার কারণ দৃঢ় করিবার বা হ্রাস করিবার কাজে আমরা কি নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারি না? এই সমস্ত পরিস্থিতি সরকারসমূহের নৃষ্ট এবং সরকার-গুলিই উদ্দেশ্যের পরিপোষক। বিধেয় জনগণ যদি ব্যাপক প্রচার ও চাপ হইতে মুক্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এই উদ্ভেজনা অনুভব করিত না।

গত দশ বৎসরকালে আমরা নিজেই যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিশ্বের এই আশঙ্কা, সন্দেহ ও সংস্কার অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। একজন বিশ্বের সর্বত্র জনগণকে অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া একযোগে ভবিষ্যতের দিকে আগাটিয়া যাইতে হইবে।

অতীতের যে অজ্ঞানের প্রতিবিধান এখনও হয় নাই, বর্তমানে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি এবং অপরের দুর্দশতার সুযোগ লইয়া যে ক্ষণস্থায়ী লাভ অন্ধান করা যাইতে পারে—এ সকলের কোন কিছুই আমাদের সংক্ষেপে পথ হইতে বিচূত করিতে পারিবে না।

আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে ও জ্ঞান আছে। বিশ্বের সর্বত্র জনগণের সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞাই এখন আমাদের সর্বোচ্চ প্রয়োজন। এইগুলি অন্ধানের সংগ্রামে ঈশ্বর যেন আমাদের অনুপ্রেরণা দেন।

আপনাদের জাতির ইতিহাস হইতে আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই মহান সংগ্রামে ভারত বরাবরই পুরোভাগে থাকিবে।

### দলীপ সিংজী

পৃথিবী-পাতি ক্রিকেট-খেলায় ডক্টর এস. দলীপ সিংজী গত ৬ই ডিসেম্বর নিম্নোক্ত অবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া বদ্ধ হইয়া, মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ক্রিকেট-ভগতে মহাবাজ দলীপ সিংজী সকলের নিকট 'দলীপ' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলায় ডক্টর সিংজী বড়োপুত্র ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সনের ১৩ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং টেলটোনহাম কলেজ ও কেবিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রুয়েতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেবিজ 'ব্যাটসম্যান' খেলায় 'ব্লু' লাভ করেন এবং ১৯৩১-৩২ সনে ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সাসেক্স দলের অধিনায়কত্ব করেন। ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পাইয়া 'সেকু'রী

লাভ করেন। যে তিনজন ভারতবাসীর ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলায় সুযোগ ঘটিয়াছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। কেবিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় হইতেই তাহার ক্রিকেট খেলার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, যদিও তৎকালীন ভারতীয় খেলা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই, এবং ১৯৩১-৩২ সনের পর তিনি আর টেস্ট খেলার অংশ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া তিনি অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মোট বারটি খেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার এই স্বল্পকালীন ক্রীড়া-জীবনে তিনি মোট ৪০ বার সেকু'রী, ৪ বার ডবল সেকু'রী করার কৃতিত্ব সহ মোট ১৫৩০৬ রান করিয়াছিলেন।

ক্রিকেটপ্রিয় ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন 'টিউলিপ'। তাহার খ্যাতি ও কৃতিত্ব শুধু ক্রীড়া-জগতেই আবদ্ধ ছিল না। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে তিনি ভারতের প্রধান বাস্তবিক পদে নিযুক্ত ছিলেন, নিম্নলিখিত ভারত ক্রীড়া-সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ক্রিকেট খেলার শিক্ষামাত্রা রূপে অনেককে খেলাইয়া শিখাইয়াছেন এবং মুম্বায় প্রবাসী পূর্ব পর্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে তাহার নাম ভারতবাসীর নিকট অবিচ্ছেদ্যীয়। গ-স

### সনৎকুমার রায়চৌধুরী

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রী আইনজীবী ও হিন্দু মহাসভা নেতা সনৎকুমার রায়চৌধুরী গত ৬ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। মুম্বায়ে তাহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

সনৎকুমার ১৮৮৪ সনে ঢাকার জমিদারবাংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্গত ভোলানাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ১৯০০ সনে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন হইতে এন্ট্রান্স পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এবং ১৯০৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম-এ পাস করেন এবং ১৯০৭ সনে বি. এল. পাস করিয়া আশুপুুর কোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ১৯২০ সনে বঙ্গীয় আইনসভায় স্বল্প সময় হিসাবে নির্বাচিত হন। আইন ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক কার্য হইতেও অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সনের দুর্ভিক্ষের সময় এবং ১৯৪৬ সনের দল-ভাঙ্গার সময় ডঃ জামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দৃঢ়তায় মিলিত হইয়া সেতাকাষা পরিচালনা করেন। তিনি হিন্দু-সংস্কার সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'হিন্দুধর্ম পরিচয়' নামে তিনি দুইখণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিজ গ্রাম ঢাকিতে তাহার প্রতিষ্ঠিত একটি কারিগরি শিক্ষালয়ও আছে। ১৯৩৭-৩৮ সনে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনবাবুর অনুগামী। ১৯৪১ সন হইতে তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। সর্বল, নিরহঙ্কার, মিষ্টভাবী, নির্ভাবান ও সজ্ঞান হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ-স

## গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছি। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৬৮-এর মধ্যে লেখকগণ-প্রেমিত গল্প লওয়া হইবে। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

- ১। নাম
- ২। ঠিকানা
- ৩। প্রেরণের তারিখ
- ৪। ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।
- ৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামের পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্ত।

গল্পের শুভাশুভায়ে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

- (ক) সর্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্ত পুরস্কার একশত টাকা,
- (খ) পরবর্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্ত পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,
- (গ) পরবর্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্ত পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমাগত প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্ত প্রদত্ত গল্প অথচ কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কস্মাধ্যক্ষ—“প্রবাসী”

## ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

পাদ্যপসাদিৎ ধর্ম্যং স তু বিদ্বান্ যুগে যুগে ।

আয়ুঃ শক্তিঃ চ মর্ত্যানাং যুগাবস্থামবেক্ষ্য ৷

ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথাশূদ্রহকাঙ্ক্ষয়া ।

বিবাস্য বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্যস্য ইতি শ্রুতঃ ॥

মহাভারত ( অংশাবতার পর্বাদ্যায় ) ।

বেদের অপর নাম শ্রুতি । ইহার কারণ এই যে, উহা কেবল শুনিয়াই অরণে মণা হইত । বিশাল বৈদিক সাহিত্য শুনিয়া কণ্ঠস্থ করা অনেকটাই অসম্ভব মনে করিবেন । কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে ! অক্ষর প্রবণশক্তি ও স্পর্শশক্তি অধিক যৌক্ত হয় । সেইরূপ যখন লেখন-কলা আবিষ্কৃত হয় নাই তখন মানুষকে অরণশক্তির উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইত যাহাতে উহা বেশী তৌত্র হইয়া থাকিত । মানুষের অরণশক্তি এমনই জিনিস যে, এক দাঁত কবিতা : বিশবার পড়িয়াও বোঝ হয় মুখস্থ হইবে না, কিন্তু যদি ক্রমাগত বিশদিন একবার করিয়াও উহার আবৃত্তি শুনা যায় ত মুখস্থ হইয়া যাইবে । এইরূপে কত গ্রাম-গীত অশিক্ষিতেরা শুধু শুনিয়াই শিখিয়াছে । সেইরূপ ব্রাহ্মণদের ধরে বৈদিক শুভ-সকল নিত্য-গীত হওয়ায় তাহাদের সন্তানদেরও মুখস্থ হইয়া যাইত । প্রত্যেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সমগ্র বৈদিক সাহিত্য কণ্ঠস্থ থাকিত—ইহাও আমার বলার অভিপ্রায় নয় । হাঁ, ইহাও তখন সম্ভব ছিল যখন বৈদিক সাহিত্য অধিক বিকশিত হয় নাই । কালক্রমে ইহা বহু শাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে । আর্ষদের বসতিও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া যায় । ইহার ফলে অবশ্যই বৈদিক সাহিত্যের কিছু অংশ লুপ্ত হইয়া যায় । বাকি শাখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনান্তে সীমাবদ্ধ থাকে । এখন এক ধর্ম্যপ্রাণ, সংস্কৃতি-প্রেমী মহান ঋষির কাণ্ড রহিল এগুলি সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করা । যেমন আজকালও দেখা যায়, কোন কোন উৎসাহী ব্যক্তি বিদ্যাপতির গান বা ডাকের বচন সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন ।

বৈদিক যুগে কখনই লেখন-কলা ছিল না, ইহা আমি বলি না । বেদেরই কোন কোন স্থানে বেদপাঠের (স্বাধার) উল্লেখ আছে । একস্থানে বাহু খুলিয়া বেদ পড়িবার কথাও আছে । সম্ভবতঃ উত্তর-বৈদিক যুগে লেখন-কলার প্রচার

হইয়া গিয়াছিল । ইহা কোথা হইতে আসিল ? উক্তের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, আর্ষ-পূর্ব দিক্‌বর্তী জাতি হইতেই আর্ষেরা লিখিবার কলা শিক্ষা করিয়াছেন । ইহা আজকাল সন্দেহাত্মক যে, আর্ষদের আগমনের পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক স্তম্ভ জাতি বাস করিত । হিন্দু জাতি উহাদের সন্তি অর্থাৎ সংস্কৃতির সঙ্গে আর্ষদের ধর্ম ও সংস্কৃতি মিশ্রিত হওয়াই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি উৎপন্ন হইয়াছে । ইতিহাসে ইহার পুনঃ পুনঃ উদাহরণ পাওয়া যায় যে, বিজৈতা জাতি বিজিত জাতি হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক সভ্যতা লাভ করিয়াছে । আর্ষেরা এক বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছেন । তাহার সমগ্র উত্তর-ভারতের অনায়া জাতিদের ভাষাগুলি ভুলাইয়া নিছক ভাষা ধরাইয়াছেন । বেঙ্গলিচন্দ্র ও দিল্লীদেশের সীমায় দুই-চারি খাজার ব্রাহ্মী জাতির লোক বস করে যাহারা এখনও ব্রাহ্মী ভাষা বলে যাহা মূলতঃ এক জাবিড়ী ভাষা । ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময় জাবিড়েরা উত্তর-ভারতে থাকিতেন । মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতা বোধ হয় ইহাদেরই কীর্তি । এই সকল স্থানের খননে যে সব মোহর (seal) পাওয়া গিয়াছে উহাতেই ভারতের সর্বপ্রথম লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । যখন এই জাতির মধ্যে লিপির ব্যবহার ছিল, কিন্তু আর্ষদের মধ্যে ছিল না, তখন অল্পমান করা স্বাভাবিক যে, আর্ষেরা ইহাদের নিকটই লেখন-কলা শিখিয়াছেন । ইহা পাদ্য অসংবাদিত সত্য যে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মীলিপি কোন বিদেশ হইতে আসে নাই । দক্ষিণ ও পূর্ব দিশের বাণীত সমগ্র জাতি বর্তমানে যে সকল লিপি প্রচলিত তাহা ফোনিশিয়ান লিপি হইত উৎপন্ন । ফোনিশিয়ান লিপি হইতে হিব্রু-লিপি এবং তাহা হইতে আরবীলিপির জন্ম হইয়াছে । ওদিকে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বের কাদমস নামক এক ফোনিশিয়ান গ্রীসে গিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় ফোনিশিয়ান লিপির প্রচার করেন । উহা হইতে গ্রীকলিপি এবং গ্রীক হইতে রোমানলিপির জন্ম হয় । এই সকল বর্ণমালায় নাম ও বিস্তার ভুলনা করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না যে, উহারা একই

মূল হইতে আশিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মীলিপি যাহা হইতে বাংলা ও দেবনাগরী প্রভৃতি লিপি আশিয়াছে তাহা উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কিন্তু এরূপ অনুমান করা হয় যে, মহেঞ্জোদাড়োতে এক-প্রকার সাক্ষেতিক লিপির প্রচার ছিল, ধ্বনিমূলক (phonetic) নহে। মিশরে প্রাচীন সাক্ষেতিক (hieroglyphic) লিপি হইতেই ধীরে ধীরে hieratic প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সম্ভবতঃ আর্ধ্য-পূর্ব সাক্ষেতিক লিপি হইতেই ধীরে ধীরে ধ্বনিমূলক ব্রাহ্মীলিপি উৎপন্ন হইয়াছে। এবং এই ক্রমবিবর্তন আর্থোরাই আনিয়াছেন, যেহেতু তাঁহাদের ভাষারই অধিক প্রচার হইতেছিল এবং লিপিও নিজ ভাষানুরূপ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন ছিল।

যে সাহিত্যের প্রাচীন সাহিত্য আছে, তাহাদের মধ্যেও সর্বপ্রথম লিপির ব্যবহার সাহিত্যের উদ্দেশ্যে হইত না। অন্ধকবি হোমার নিজের মহাকাব্য যুগেই রচনা করিয়া গাহিতেন। প্রথমে শিলালেখ ও খাতুপত্রেই ইহার ব্যবহার হইত। পুরোহিতেরা চাচ্ছিলেনই না যে, ধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং জনসাধারণ উহা পড়িতে পারে। কিন্তু তথাপি উহাদের নিজের স্বতঃস্ফূর্ত বোধের অংশবিশেষ পাতায় লিখিয়া রাখিতেন, ইহা খুবই সম্ভব।

বেদকে এক পুস্তক না বলিয়া এক লাইব্রেরী বলাই অধিক সঙ্গত। লাইব্রেরীতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনার সংগ্রহ দেখা যায়, বেদেও তদ্রূপ। প্রাচীনতম মন্ত্র হইতে উত্তরকালীন অংশের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। প্রথমে ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেন, পরবর্তী ঋষিরা উহাদের প্রয়োগ নির্দেশ করেন। যাহাদের পেশাই ছিল পুরোহিত্য, তাঁহাদের পক্ষে উভয়ই স্বরণ রাখা প্রয়োজনীয় ছিল। এদিকে নূতন মন্ত্রাদিরও রচনা হইতে থাকে যাহা ঋষিরা নিজ নিজ বংশ এবং শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন।

এই যুগে নূতন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের আবির্ভাব হয়। বেদ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার বিচার আরম্ভ হয়। বেদের উৎপত্তি কি? দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? আত্মা কি? ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি কিরূপে হয়? ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের উচ্চারণ ও পাঠের রীতি, ইহার ব্যাকরণ, ইহার ছন্দ, ইহার শব্দার্থ, ইহার অনুক্রমণী। অর্থাৎ নূচী ইত্যাদির রচনাও অনেকে ত্রী হন। নূতন যাহা কিছু লিখিত হইত সকলই উক্ত লাইব্রেরী অর্থাৎ বেদেতেই জুড়িয়া দিবার রীতি ছিল, কিন্তু উহা এখন অত্যন্ত বিশাল হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন রচনাগুলির বিষয়ও ভিন্ন ছিল, সুতরাং উহারা ‘বেদাঙ্গ’ নামে একত্রিত হইতে লাগিল।

বেদের, বিশেষতঃ উপনিষদের উক্তির উপর আধারিত দর্শন-গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে ত উহারাও ‘উপাঙ্গ’ নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ এই লেখকেরা কোন বিভাগেই বেদ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। এই গ্রন্থ-সকল হ্রস্বরূপে রচিত হওয়ায় মনে হয় যে, তখন পর্য্যন্তও লেখার স্মৃতি প্রচার হয় নাই। লেখা কঠিন কার্য ছিল, সুতরাং স্বরণের জন্য অত্যন্ত শব্দের স্মরণকল গ্রন্থিত হয়।

তখন সাহিত্যিক ভাষাও প্রাচীন মন্ত্রদলের ভাষা হইতে অনেক পরিবর্তিত হয়। পাণিনি এই সংস্কৃত (অর্থাৎ পরিমার্জিত) ভাষাকে নিয়মে বাঁধিয়া দেন। যদ্যপি পাণিনির পূর্বেও অত্রাণ বৈয়াকরণ ছিলেন, কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণই সর্বমাত্র। প্রাচীন মন্ত্রদলের বহু শব্দ তখন অপ্রাণিত হইয়া যায় এবং বহু শব্দের অর্থে পরিবর্তনও ঘটে। যাক্ষের ‘নিরুক্ত’ গ্রন্থে এই সকলের ব্যাখ্যা আছে। বাংলার বালক ও নবযুবকেরা সহসা ‘হরি’, ‘নাবিল’, ‘পামরিহু’ প্রভৃতি পদের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। সকল ভাষার পক্ষেই এরূপ অনেক প্রাচীন রূপ (archaic forms) পাওয়া যায়, যাহাদের অর্থ বর্তমানে কেহ বুঝিবে না, যদি না তাহার প্রাচীন কাব্যের সহিত পরিচয় থাকে। এই সকলের ব্যাখ্যা দ্বারা বেদব্যাঙ্গ নিঃসন্দেহ আর্ধ্য-সংস্কৃতি রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করিয়াছেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাঙ্গ যে কাজ করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তিনি লেখন-কলার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে, লোকের মনে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতিটি যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বেদজ্ঞদের সংখ্যা এত কমিয়া যাইতেছে যে, শীঘ্র ইহা লিখিয়া না ফেলিলে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যই লুপ্ত হইয়া যাইবে। বর্তমান যুগও আমরা অনুভব করি যে যে সব গ্রন্থ এখনও হস্তলিখিত পুঁথিরূপে আছে, শীঘ্র ছাপান না হইলে উহাদের লুপ্ত হইয়া যাওয়ার ভয় আছে। ঐরূপ বেদেরও লুপ্ত হইবার ভয় ছিল। ব্যাসদেব বেদের রচয়িতা ছিলেন না, লেখন-কলার আবিষ্কারকও ছিলেন না, কিন্তু বেদের সংগ্রাহক (compiler), লেখক (scribe) ও বিভাজক (arranger) ছিলেন এবং এই জন্যই হিন্দু-সংস্কৃতির সংরক্ষণে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁহারই প্রাপ্য। এছাড়া তাঁহাকে যে পরিচয় করিতে হইয়াছিল তাহার আশ্রয় করাও আমাদের পক্ষে কঠিন।

বেদের এক বৃহৎ অংশ অবশ্যই ব্যাসদেবের কর্তৃত্ব ছিল। বাকী অংশ সংগ্রহ করিবার জন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে দূর দূর ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। কারণ উহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গুরু-পরম্পরায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহাও

কালবশে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোন প্রাচীন কবির গান সংগ্রহ করিতে অনেক সজ্জন অনুভব করিয়া থাকিবেন যে, যদি একই গান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা অঞ্চলে পাওয়া যায় ত উহাতে কিছু না কিছু পাঠভেদ দেখা যায়। ঐরূপ একই সূক্ত যখন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পাওয়া যায় তখন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাই নিম্নের ধরানার জিনিস লোকে সহজে দিতে চাহিত না, সুতরাং এই জ্ঞাত সামান্যাদি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক সূক্ত দেবতা, ঋষি ও বিনিয়োগ অনুসারে সামান্য এক কঠিন কাজ ছিল। 'ঋষি' কথাটির অর্থ আশ্রয়। আজকাল 'রচয়িতা' বুঝি, কিন্তু তৎকালে এই বিশ্বাস প্রায় সর্বত্রই ছিল যে, বেদ অপৌরুষেয়, উহার কোন রচয়িতা নাই। 'ঋষি' অর্থ মন্ত্রজ্ঞতা বুঝা হইত। বহু প্রাচীন ঋষিদের নাম লোকে ভুলিয়া গিয়া থাকিবে, সুতরাং কেবল গুরু পরম্পরার নামেই উহাদের নাম রাখা হইত। যথা, মন্ত্রজ্ঞ ঋষির শিষ্য-প্রশিষ্যদের নিকট হইতে যে সকল মন্ত্র সিদ্ধ হইত তাহাদের ঋষিই মধুচ্ছন্দা মানিয়া লওয়া হইল। তৎপরে বাসুদেব এককে ঋক, সাম ও যজুঃ খণ্ডে বিভক্ত করিলেন এবং ইহা হইতেই তাহার উপাধি 'বেদব্যাস' হয়।

ভুল-পাঠা ইতিহাসের বইতেও আমরা এরূপ কথা পাই যে, ঋগ্বেদ সর্বাঙ্গোপেক্ষা প্রাচীন বেদ এবং অজ্ঞাত বেদের অধিকাংশ ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। আমাদের মতে এরূপ কথা ভ্রমাত্মক। যদি ব্যাসদেবকেই জিজ্ঞাসা করা যাইত যে, কোন বেদ অধিক প্রাচীন ত তিনি এরূপ প্রশ্ন নিবর্তক মনে করিতেন, যেহেতু তিনি সবকেই অনাদি মনে করিতেন। তাহার শ্রেণীবিভাগও প্রাচীন-নবীন বিচার হইতে করা হয় নাই। ইহা পুরোহিতদের সুবিধার জন্য করা হইয়াছে। ইহা আমরা অবগত বলিব যে, ঋগ্বেদে প্রাচীনতম মন্ত্রের অধিক সমাবেশ হইয়াছে এবং অনেক মন্ত্র তিন বেদেই সাধারণ ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রথমে সমগ্র ঋগ্বেদের রচনা হইয়া যাওয়ার পর উহা হইতে সামগ্রী লইয়া অজ্ঞাত বেদ প্রস্তুত হইয়াছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলেই প্রাচীনতম মন্ত্র অধিক সংখ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞাত বেদেও এরূপ মন্ত্র আছে, যাহা ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্র হইতে প্রাচীন। উদাহরণ স্বরূপ, যজুর্বেদে ছই অর্ধি কাঠকে (যাহার বর্ণণে অগ্নি উৎপন্ন হয়) ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে উর্কশী ও পুরুবদা নাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই অধিক প্রাচীন মনে হয়। পরে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উর্কশী-পুরুবদাকে নায়ক-নায়িকা

মানা হইয়াছে। ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন যে, চারি বেদের মধ্যে শুধু অথর্ব বেদে মহাপ্রলয়ের উল্লেখ আছে এবং তাহা হইতেই তিনি নির্ণয় করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদাদি রচনার পরে জলপ্রাবন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখিব যে, এরূপ তর্ক নিবর্তক।

অনেকে মনে করেন যে, লেখাপড়া না শিখিয়া কেহ কবি হইতে পারে না। কিন্তু আজ যদি পৃথিবীতে সমস্ত লেখাপড়া বন্ধ হয় ও সমস্ত পুস্তক নষ্ট হয়, তথাপি মানুষের মধ্যে কবিপ্রতিভা নষ্ট হইবে না। খোঁজ করিলে নিবন্ধের জাতিদের মধ্যেও এমন অনেক লোক পাওয়া যাইবে যাহারা মুখে মুখে পদ্য রচনা করে। যে সকল জাতিতে কখনও লেখাপড়ার রীতি ছিল না তাহাতেও অনেক লোক-গীত পাওয়া যাবে। বেদমন্ত্রের রচয়িতারাও এইরূপ স্বভাবকবি ছিলেন। পুরাতন 'নাচারী' (মৈথিলী শিবগীত) গুলির প্রয়োগ আজকাল লোকে বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে করে। সেইরূপ পরবর্তী ঋষিরা যজ্ঞাদিতে প্রাচীন মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে লাগিলেন এবং গড়ে অথবা গড়া পড়া যজ্ঞের বর্ধ-নিবেদ রচনা করিতে লাগিলেন। সব ভাষার সাহিত্যেই প্রথমে পদ্য ও পরে গদ্য আসে। সুতরাং প্রথমে মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ এবং পরে বিধিমূলক ব্রহ্মণভাগ রচিত হওয়া স্বাভাবিক। কেহ কেহ বার্কাক্য যজ্ঞাদি কথা ছাড়িয়া বানপ্রস্থ অবসথন করা উচিত মনে করিলেন ত তাহাদের ক্রিয় বা চিন্তার সামগ্রী অংগেক ভাগও রচিত হইল। ইহাই বৈদিক সাহিত্যের পৌৰ্ব্বাপর্য্য। ক্রমশঃ আদ্যাকের পরে সামবেদের সংহিতা রচিত হইয়াছে এরূপ মনে করা ভুল। পক্ষান্তরে বেদ ইতিহাস-গ্রন্থ নয়, যদিও খুঁজিলে ইতিহাসের মসলা ইহাতে যত্নতরূপে পাওয়া যায়। সুতরাং বেদে কোন ঘটনার উল্লেখ না থাকিলেই এরূপ বলা যায় না যে, উক্ত ঘটনা (যথা জলপ্রাবন) বেদ রচনার পরে হইয়াছে।

আর্য্যোরা ঐহিক ও পারলৌকিক ফল কামনায় অথবা শুধু ধর্ম্মবোধে পুরোহিতদ্বারা যজ্ঞ করাইতেন। এ সময় হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু নামক তিন শ্রেণীর পুরোহিতের উদয় হয়। তাহারা ক্রমশঃ ঋক, সাম ও যজুঃ (এ সকল নাম বেদবিভাগের পূর্বেই প্রচলিত ছিল) মন্ত্রের ব্যবহার করিতেন। 'হোতা' শব্দের অর্থ হরণকারী, কিন্তু মনে হয় হোতা শ্রেণীর গুরু পরম্পরা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহারা সর্বাঙ্গোপেক্ষা অধিক মন্ত্রের ব্যবহার করিতেন। পরে স্বর-লয়ের কিছু জ্ঞান হইলে (সঙ্গীতবিদ্যা বা গন্ধর্ব্ববেদ সাম বেদেরই অংশ মানা হয়) কোন কোন পুরোহিত গাহিয়া

গাছিয়া মন্ত্রগুলির উপযোগ করিতে থাকেন ও তাঁহারা উদ্গাতা নামে খ্যাত হন। অশ্বঘুরা বোধ হয় বিধিনিষেধ, বেদী নির্মাণ, যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান সময় ইত্যাদির বেশী খেয়াল করিতেন, সূতরাং ইহাদের জটিল সংবিধান প্রস্তুত করেন। এই শ্রেণীদের মধ্যে পরস্পর বহু বিরোধও দেখা যাইত। এই শ্রেণীদের ব্যবহারের জ্ঞান ব্যাসদেব বেদের পৃথক পৃথক খণ্ডের সঙ্কলন করেন এবং তাহাদের পারম্পরিক বিরোধও বহু পরিমাণে দূর করেন।

অথর্ববেদ কিং অল্প প্রকারের। ইহাতে যাগযজ্ঞের বিস্তার নাই, কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগেই অধিক আপোচনা আছে। এইরূপ বহুদিন পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যে ইহার স্বীকৃতিই হয় নাই। বৈদিক কর্মকাণ্ডের মার্গের নামই ছিল ত্রৈবীর্ষ্য অর্থাৎ তিন বেদের বিহিত কর্ম্মগুলির অমুষ্ঠান। কিন্তু অথর্ববেদও অপর তিন বেদ হইতে নূতন নয়। লোকমাত্র তিসিকের মতে ইহার সামগ্রী মুখ্যতঃ সূমের আদি অনার্য্য জাতি হইতে আসিয়াছে এবং বোধ হয় Non-canonical literature-রূপে বেদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শুধু বেদের সংগ্রহ ও বিভাগই ব্যাসদেবের একমাত্র মহত্ত্ব নয়। তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি আৰ্য্যদের কথা-কাহিনীর সংগ্রহ এবং উহাদের সম্বন্ধে মূল রচনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তখন পর্যন্ত আৰ্য্যদের সকল রচনাই বেদের অঙ্গ মনে করা হইত। এমন ব্যাসদেব ভারত সংহিতা নামক পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই রীতির প্রচলন করিলেন। এই যুগে যদি কেহ স্বল্প কাব্য রচিয়া থাকেন ত কেবল বাঙ্গালি। যদিও হিন্দুদের সাধারণ বিশ্বাস যে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন, তথাপি বহু আধুনিক পণ্ডিতের (যথা, ডক্টর হেমচন্দ্র বসুচৌধুরী) মতে মহাভারতই অধিক প্রাচীন।

রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, রাজা জনমেজয়ের পুরোহিত তুর কাব্যের শিষ্য-পরম্পরায় অশ্বপ্তন পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋষি যথাক্রমে উদ্ধালক, অকুর্ণ ও স্বাস্তবক্ষ্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই উভয় ঋষিই বেদের সত্রাট প্রথম জনকের সভা অঙ্কত করিতেন। অপর গণনায়া জনমেজয়ের বংশে তাঁহার অশ্বপ্তন পঞ্চম রাজা নিচক্ষু প্রথম জনকের সমসাময়িক ছিলেন। নিচক্ষুর পরেই প্রবল বক্রায় হস্তিনাপুর ধ্বংস হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী কৌরব রাজারা কোশল্যাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জনকবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম জনক বিদেহরাজ্যের স্থাপয়িতা নিমির পৌত্র ছিলেন ও সত্রাট উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে বেদ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভাল-

বাসিতেন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে এবং উহাতে শীতার পিতা শিরশ্বজ জনককে এই আদিকনকের বংশধর বলা হইয়াছে। জনকবংশের শেষ রাজা করাল জনক নাকি নিজ দোষেই জনকবংশের পতন ঘটান। ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাসেই বিদেহরাজ্যকে “বৃজ্জি সমবায়ের” অন্তর্ভুক্ত দেখি। ইহা বৃজ্জি, বৈশালী ও শাক্য গণরাজ্যগুলিরই সমবায়। বোধ হয় বংশগত রাজাদের কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া নগরযুদ্ধেরা নিজ নিজ নেতা নির্বাচিত করিয়া শাসন চালাইতে আরম্ভ করেন যে পর্য্যন্ত না তাহারা অধাতক্র কর্ত্তিক মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বেদ বিদেহের রাজধানী মিথিলার ও কোশলের রাজধানী অগোধ্যার উল্লেখ নাই। নৌকয়ুগে কোশলের রাজধানী ছিল আবিস্ত। বৌদ্ধসাহিত্যে দশরথ ও তৎপুত্র রামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে বারানসীর রাজা বলা হইয়াছে। রামায়ণের ঐতিহাসিক আধার অত্যন্ত দুর্বল। ইহার পাত্রদের উল্লেখ বেদে নাই। কিন্তু বেদে কুরু-পাণ্ডব রাজ্যের মন্ত্রতা এবং ভারত যুদ্ধের উল্লেখ আছে। দ্রুতরাষ্ট্র, অর্জুন, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় এবং দেবকীন্দন কৃষ্ণের নাম আছে। পানিনি ও গৃহসূত্রেও উগ্ৰাদর নাম আছে। সূতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক ঘটনা—অবিবর্ত্তন্য মাত্র নয়। মহাভারত ও পুরাণে এক বৈদিক পরম্পরা পাই। বহু বৈদিক উদাহরণ হাতে ক্রমশঃ রাখা গিয়াছে ইহা আসিয়াছে। মহাভারতের এক শৈলী, যথা পরবাক্যগুলি “অমুক উবাচ” বলিয়া, আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই শৈলীই পরবর্ত্তী পুরাণগুলিতেও অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু রামায়ণে এরূপ নাই।

অগ্নীয় লোকমাত্র তিসিক বলেন যে, পূর্বে মহাভারত “জয়” নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছিল (“ততো জয় মুদারয়েৎ”, “জয়ো নামেতিহাসোহয়ম্”)। পরে বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমান মহাভারত হইয়াছে, যাহাতে লক্ষের উপর শ্লোক। আদিপর্বে উল্লিখিত আছে যে, মহর্ষি ব্যাস ২৪ হাজার শ্লোকে “ভারত-সংহিতা” রচনা করিয়া নিজ শিষ্য সূমন্ত, জৈমিনি, নৈল এবং বৈশম্পায়নকে দেন, যাহারা উহা হইতে পৃথক পৃথক সংহিতা প্রণয়ন করেন। “জৈমিনি ভারতে”র কিয়দংশ এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা যে “মহাভারত” আমাদের সভ্য তাহা উগ্রপ্রবা-কথিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমে বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞান্তে অজ্ঞানের প্রপোত্র রাজা জনমেজয়কে কহেন এবং পুনরায় সৌতি (সূতপুত্র) উগ্রপ্রবা

● বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং বাঙ্গালিকর পিতা চাবনের নাম আছে। নিষদে রাম নামক এক ঋষির নাম আছে। রামোপনিষৎ প্রভৃতি আধুনিক রচনা।



নৈমিষ্যারণ্যে সমবেত শৌনকাদি মুনিগণকে কহেন। যদি ঠিক সত্য হয় ত উগ্রশ্রবা বোণ হয় ইহা বৈশম্পায়ন হইতে অথবা স্বীয় পিতা লোমহর্ষণ হইতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার আরও কলেবর-বৃদ্ধি পৰবর্তী কবি ও লিপিকারদের দ্বারা হইয়াছিল। বোণ হয় গুপ্তবংশের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এইরূপ প্রসিদ্ধ-রচনা জারী ছিল। মহাভারতে রামায়ণের যেটুকু প্রসঙ্গ মিলে তাহা নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বর্তমান সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা যেমন ব্যাসদেব নন সেইরূপ আঠার পুরাণ ও অতিশুদ্ধ উপপুরাণগুলির রচয়িতাও ব্যাসদেব হইতে পারেন না। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ব্যাসদেব একই “পুরাণসংহিতা” রচনা করিয়াছিলেন। বেদে বিভাগ করিয়া তিনি স্বীয় ব্রাহ্মণ-শিষ্য স্মৃন্ত, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে এক এক বেদের প্রাবক করেন। কিন্তু সূত (সারথি) জাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে (যেহেতু শূত্রের বেদে অধিকার ছিল না) পুরাণ ও ইতিহাস (মহাভারত) দিয়াছিলেন। উক্ত চারি ব্রাহ্মণ-শিষ্য সকলেই বিদ্বান্ ছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ রচনাও আছে। কিন্তু শূত্র লোমহর্ষণ বোধ হয় লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু উত্তম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি পুরাণেতিহাসের কাহিনীকল্পি এরূপ বৈশিষ্ট্যক ভাবে বলিতেন যে, শ্রোতাদের লোমহর্ষণ হইতে, ইহা হইতেই তাঁহার নাম লোমহর্ষণ হইয়াছে। লোমহর্ষণের শিষ্য কাল্প, সারথি ও শাংসপায়ন এক পুরাণ-সংহিতা হইতে তিন পৃথক পৃথক পুরাণ প্রস্তুত করেন। যদি ইহা সত্য হয় ত তাঁহার প্রশিষ্যদের ৩২০ পুরাণ প্রস্তুত করাত অসম্ভব নয়। পুরাণের সংখ্যা ও প্রত্যেক পুরাণের কলেবরও বাড়িতে বাড়িতে গুপ্ত রাজাদের সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া থাকিবে। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পুরাণগুলি অধ্যয়ন করিয়া এরূপ তিনটি বাহির করিয়াছেন যাহা পুরাণের পঞ্চলক্ষণযুক্ত, যাহাতে ভীষ্মমহাত্মা, ব্রতমহাত্মাদি কম এবং অস্ত্রাস্ত্র লক্ষণ হইতে সৰ্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ। তিন পুরাণেই কিছু অংশ প্রায় এক বক্য। সুতরাং এই সাধারণ অংশকে আদি পুরাণ-সংহিতা এবং তিনটি পুরাণকে উক্ত শিষ্যত্রয় প্রণীত মনে কবিবার হেতু আছে। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে

যে, জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিশায়কৃষ্ণের রাজত্বকালে কুরু-ক্ষেত্রে বহু ঋষি মিলিত হইয়া দ্বিবর্ষব্যাপী এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞান্তে ঋষির লোমহর্ষণের নিকট পুরাণ কথা শুনিয়াছিলেন। এখন ইনি কদাপি ব্যাস শিষ্য লোমহর্ষণ হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ তাঁহাবই বংশে অপর কোন সূত লোমহর্ষণ নাম ধারণ করিয়া থাকিবেন। ‘লোমহর্ষণ’ ও ‘উগ্রশ্রবা’ নাম নহে, উপাধিমাাত্র।

ভারত-সংহিতাতে ত ব্যাসদেব নিজ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা লিখিয়াছেন। কিন্তু পুরাণগুলির সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়। ইহাদের কিছু অংশ ত বেদের মতই প্রাচীন। বেদ সংহিতারূপে এবং পুরাণ কাহিনীরূপে সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছে। বেদের ‘পুরাণ’ নামের উল্লেখ আছে এবং বোধ হয় যজ্ঞান্তে পুরাণ-কথা শুনিবার রীতিও অতি প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জ্ঞাত হয় যে, ইহার কিছু অংশ অতি প্রাচীন এবং তাহা ব্যাস পিতা পরাশর স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠ হইতে পাইয়াছিলেন এবং স্বীয় শিষ্য মৈত্রেয়কে দিয়াছিলেন। পুনরায় তাহাই রাজা পরীক্ষিৎকে (অভিমন্ত্যর পুত্র) শোনান হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশের অপর নাম বিষ্ণুস্মৃত্তর। ইহাতে কৃষ্ণের জীবনী আছে এবং নিশ্চয়ই ইহার পরে (কিছু হরিবংশ পুরাণের পূর্বে) সংযোজিত হয়। ভাগবতপুরাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ইহা ব্যাসপুরাণ গুরুদেব পরীক্ষিৎ ও শুনিয়াছিলেন। ইহাতে কুরুসৈন্যের বিস্তার হইয়াছে সুতরাং ইহার রচনা হরিবংশের পরে মনে হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যাহাতে সৰ্ব্বপ্রথম রাধার নাম আসিয়াছে তাহা আরও পরে রচিত। এগুলিই প্রধান বৈষ্ণব পুরাণ। আর সকল মূল বিষ্ণুপুরাণ হইতেই সংশ্লিষ্ট হয়।

এই সকলের তুলনা করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি অনুমিত হয়। (১) পুরাণের কিছু অংশ অতি প্রাচীন। সৃষ্টিতত্ত্ব মহাগ্রন্থ, মৎস্তাবতার, দেবানুর সংগ্রাম প্রভৃতি কাহিনী আর্থ্যের ভারতের বাহির হইতে আনিয়া থাকিবেন। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যজ্ঞবংশের আদি রাজাদের কাহিনীও বহু প্রাচীন। (২) পরাশরের পিতামহের সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বানঃ ব্যাপ্তিতে থাকে। উক্ত বৈদিকযুগের দেবতা বিষ্ণুকেই ঈশ্বর মানা হইতেছিল এবং মৎস্ত-দেবতা (সুমেরীয় পুরাণেও মৎস্ত-দেবতার উল্লেখ আছে) প্রভৃতি বিষ্ণুই অবতার বলিয়া মানা হইল। কৃষ্ণ হইতে ভাগবতধর্ম্ম আরও জোর পাইল এবং বোধ হয় ব্যাসদেবই সৰ্ব্বপ্রথম কৃষ্ণের অতিমানবতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং (ব্যাস নিজে নয় ত) তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকেই বিষ্ণুর প্রধান অবতার মানিয়া কুরুপাশনার বিস্তার সাধন

\* গুপ্তযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বা Age of Renaissance ছিল। বৌদ্ধ-প্রাবৃত্ত ভারতে পুনরায় হিন্দু রাজাদের আশ্রয়প্রাপ্তিযে কেবল নূতন পুস্তকই লিখিত হয় নাই, প্রাচীন গ্রন্থ-সকলেরও পুনর্লিখিত enlarged editions প্রস্তুত হইয়াছিল।

করিয়াছেন।\* (৩) অমুক পুরাণ অমুকে “দিয়াছেন”, “পাইয়াছেন”, “বলিয়াছেন”, “শুনিয়াছেন” (কথাপি “লিখিয়াছেন” বা “পড়িয়াছেন” নয়) ইত্যাদি শব্দ হইতে মনে হয় যে, তখনও লিখিবার পূর্ণ প্রচার হয় নাই। কেহ মূল বস্তু কোন অগ্রজের নিকট শুনিয়া এবং তাহা কিছু বাড়িয়া পবে অল্পাংশে বলিয়াছেন। উত্তরকালে কোন বিশেষ বিশেষ রাজার সন্তোষার্থ ভবিষ্য নৃপতি বলিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, ত্রতমাহাত্ম্যাদি দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান সময়ে প্রাণ্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা আদি গ্রন্থ বোধ হয় একটিও ঐ মহাত্মাদের “লিখিত” নয়, যাহাদের নামে উহার চলে। এগুলি সব সংগ্রহ (compilations) মাত্র এবং শেষ সংগ্রহ বোধ হয় শুদ্ধরাজাদের সময়ে হইয়াছে। (৪) বশিষ্ঠ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র আদি প্রত্যেক নামের ঋষিও বোধ হয় একাধিক হইয়া গিয়াছেন, যাহারা বিভিন্ন সময়ে আবিভূত হন। (৫) কোন শাস্ত্রের মূল বস্তুকে পরবর্তী লেখকেরা পরবর্তী যুগে টানিয়া আনিয়াছেন।

ব্যাসদেবের অপর কীর্তি সমগ্র সাধন। তাঁহার ধর্মমত উদার ছিল। তিনি কোন ধর্মমতকেই ঘৃণ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জৈমিনি যদি মৌমাংস-সূত্রকার প্রসিদ্ধ জৈমিনি হন ত তাঁহার দ্বারাষ্ট ত্রৈলোক্যের বিস্তার হইয়াছে এবং বেদের বিভিন্ন ভাগের বিরোধ মিটান হইয়াছে। যেখানে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ঋক-মন্ত্র শোনাও পাপ মনে করিতেন এবং যেখানে প্রায় সকলেই বেদকে লিপিবদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন সেখানে পবে সকলেই বেদবিভাগ হইতে লাভ অনুভব করিলেন। এখন বড় বড় যজ্ঞে সকল শ্রেণীর পুরোহিতই নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। যদিও ইজ্ঞের প্রাধান্য লুপ্ত হইতে যাইতেছিল, তথাপি অনাধ্য দেবতা শিব ও শক্তিকে লওয়া হইয়াছিল। বায়ুপুরাণের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা এক শৈবপুরাণ এবং ইহাতে শিব-সম্বন্ধীয় কাহিনী আছে। পরে অস্ত্রান্ত শৈবপুরাণ উহা হইতেই উৎপন্ন হয়। পূর্বে ‘কর্ম’ শব্দে কেবল যজ্ঞ বুঝাইত কিন্তু এখন ইহাতে যজ্ঞ (হবির্কর্ম) ও পূজা (পুষ্পকর্ম) উভয়েরই বোধ হইতে লাগিল। উক্তের ত্রীমুণীতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মূল (পত্রং পুষ্পং) দিয়া পূজার পদ্ধতি অনাধ্যদের নিকট হইতেই লওয়া হইয়াছে। ত্র্যম্বো, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণবমতের সমন্বয় করা হইল। শুধু তাহাই

নয়, বৈদিক ত্রয়ীধর্ম যাহা প্রাণহীন ক্রিয়াকর্মেই সীমিত ছিল তাহাতে ভক্তির ধারা সেচন করিয়া সরস করিয়া দিলেন। ভাগবতপুরাণ ত ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বেদের চেয়েও শ্রদ্ধার জিনিস। জ্ঞানকাণ্ডেও ব্যাসদেবের দান অসীম। বেদান্তসূত্রকার বামদেব ব্যাস যদি এই ব্যাসদেবই হন ত হিন্দুধর্মে তাঁহার চেয়ে কেহই বেশী প্রভাব বিস্তার করেন নাই। উপনিষদশব্দকল হইতে এই বস্তু আহরণ করিয়া তিনি সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহার উপর যত ভাষ্য, উপভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী এবং পৃথক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতেই একটি বড় লাইব্রেরী হইতে পারে। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মচার্য্যই বেদান্তসূত্রের উপরই স্ব স্ব মত আধারিত করিয়াছেন।

এরূপ বলা হয় যে, যদি কোন নদী মরুভূমির মধ্য দিয়া বহে ত প্রায়ই ক্রমশঃ শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে হইতে বালুর মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার বিপরীত যদি কোন নদী সুজলা ভূমির মধ্য দিয়া বহে ত বৃষ্টি ও উপনদীসকলের সাহায্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এইরূপ কোন সাহিত্য বা বিচারধারা আগ্রহহীন যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। একটি উদাহরণ দিতেছি। সাংখ্যমত অতি প্রাচীন মত। ইহার উল্লেখ পুরাণেতিহাস, ঐতিহ্য-স্মৃতি ও সূত্র-সাহিত্যে আছে। কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ “সাংখ্যকারিকা” নামক ক্ষুদ্র পুস্তক অনেক পরবর্তী। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, “মূল সাংখ্যশাস্ত্র মহর্ষি কপিলের প্রবর্তিত ইহা তিনি নিজ শিষ্য আশুরিকে দিয়াছিলেন এবং আশুরি পঞ্চশিখকে দিয়া ছিলেন। পঞ্চশিখ উক্ত শাস্ত্রকে অনেক বর্দ্ধিত করেন। শিষ্য-পরম্পরায় উক্ত শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতব্রহ্ম সংক্ষেপে এই কারিকা রচনা করেন। ইহাতে আখ্যায়িকা ভাগ ও পরমত খণ্ডন ভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে।” “সাংখ্য-প্রবচন সূত্র” নামক যে গ্রন্থ আজকাল পাওয়া যায় এবং কপিল-প্রণীত বলা হয়, তাহা সাংখ্যকারিকার অনেক পরে রচিত। তবে ইহা হইতে পারে যে, উহাতে সংগ্রাহক মূল কপিলের সূত্রকে reconstruct করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে, বিস্তৃত সাংখ্যশাস্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।\*

\* “অবজ্ঞিকা” নামক হিন্দী মাসিকপত্রের জুলাই, ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার “জাতি, দেবতা ও ধর্ম” শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এই সকল কথা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

\* সাংখ্যের পরম্পরা ঠিক বৈদিক পরম্পরা নয়। বরং ইহা সন্ন্যাস-মার্গী বৌদ্ধ ও জৈন পরম্পরার সঙ্গে অধিক সন্মত। উপনিষদে ও গীতায় যে “সাংখ্য” শব্দ পাওয়া যায়, তাহাও কপিল-সাংখ্য নয়, কর্ম-সন্ন্যাস-যোগ।

এইরূপ জনসাধারণের অবহেলনা দ্বারা আমাদের কত বস্তু নষ্ট হইয়াছে তদ্ব্যতীত কতিপয়ের কেবল নামই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাসদেবের প্রবর্তিত ভারত-কথা, পুরাণ ও বেদান্ত মূল্য ভূমি বিহারিণী নদীর মত উত্তবোত্তর বিকশিত হইয়া আসিয়াছে।

আমাদের দেশে বরাবর অধিকাংশ লোক নিরক্ষরই ছিল। কিন্তু নিরক্ষরের মধ্যেও বীরগাথা (রামায়ণ-মহাভারত) ও পুরাণের কথাগুলি কখনও বিস্মৃত হয় নাই। রামলীলা, যাত্রা, কথকতা এবং নিজ নিজ পিতা-পিতামহের নিকটই লোকে এগুলি শিখিয়া লইত। পৌরাণিক কাহিনী শুধু মুখে মুখে কত হাজার বৎসর চলিয়া আসিতে পারে তাহা আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও নিরক্ষর লোকেরা ঘায়ের কোল হইতেই এই সকল কাহিনী শুনিয়া আসিত। ইহা আমরা গত দেড় শতাব্দীর ‘সভ্যতা’ সংঘাতে যেন ভুলিতে বসিয়াছি। এখন পিপিবদ্ধ হইলেও কোন সাহিত্যের সংরক্ষণ হয় না, ছাপিতে হয়। মুদ্রিত হইলেও এই বৈজ্ঞানিক যুগে এগুলি কে পড়ে? সংস্কৃত ভাষাই ত ভারত হইতে বিস্মৃত হইতে যাইতেছে। যদি এক শতের মধ্যে কেহ কেহ স্থলে পাস করিবার জন্য একটু সংস্কৃত পড়িয়াও থাকে, সে বিদ্যায় কি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের সাহস কদা যায়? সুতরাং এখন একমাত্র উপায় হপকিন্স, বাপসন, প্যাকিটার, টমাস, ম্যাকডোনাল, উইনটারনিংস, বারনেট, ডসন প্রভৃতি ইউরোপীয়দের ইংরেজী পুস্তক হইতে আমাদের হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা। নতুবা কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে সিনেমার সাহায্য লন। এক পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, “হিন্দু সমাজের পক্ষে পৌরাণিক কাহিনী কিছু জানা আবশ্যিক এবং সেই জন্য আমার ছেলে-মেয়েদের পৌরাণিক সিনেমা দেখাই।”

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি বেদব্যাস জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা রক্ষার জন্য যে কাজ করিয়াছেন, কোন দেশে কোন মনুষ্যই তাহা করিতে পারেন নাই। হোমারের কাব্য একই ঘটনা ট্রয়ের যুদ্ধের উপর ভিত্তি এবং বোধ হয় পরবর্তী লেখকদের হাতে কিছু

বাড়িয়াও থাকিবে। অধিকতর প্রাচীন কিছু কাহিনীর সমাবেশ ইহাতে অবশ্য আছে, কিন্তু তিনি পূর্বতন সাহিত্যের কিছুই রক্ষা করিতে পারেন নাই। আর্ঘ্যদের মানসক্ষেত্র কখনও মরুভূমি ছিল না এবং তাঁহাদের গ্রীক ভাষাতেও নিশ্চয় কিছু স্তব-স্ততি ও বীরগাথা ছিল যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইরানের (পারস্য) প্রাচীন স্তবস্ততির সংগ্রহ অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার সংগ্রহকার্য্য এক ব্যক্তিরও নাম শুনা যায় না। উহাদের উপর আধারিত করিয়া জবখুস্ত্র এক ধর্মমত অবশ্যই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পুরাণেতিহাস প্রস্তুত করেন নাই, যেমন বহু পরে ফিরদৌসী করিয়াছেন। মুসা (moses) ইস্রাইলদের প্রাচীন কাহিনী ও বিধিনিষেধের পুস্তক অবশ্যই প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা তোরাত বা Pentateuch নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা অত ক্ষুদ্র পুস্তক। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ সুতরাং ইহার রক্ষার দ্বারা ব্যাসদেব সমগ্র মানবজাতিরই সংস্কৃতি বাঁচাইয়াছেন, যাহা হইতে ধর্ম্মেতিহাসের (History of Religion) যে কোন ছাত্র লাভবান হইতে পারে। হইতে পারে যে, ব্যাসদেব অনার্য্য মাতার সম্ভান ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার মহত্ত্ব কিছুই কম হয় নাই। বরং যেকোন দারাবিশিকোহ মুসলমান পিতার ও হিন্দু মাতার সম্ভান হওয়ায় তাঁহা দ্বারা উভয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস সম্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যাসদেব দ্বারা আর্ঘ্য-অনার্য্য সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সম্ভব হইয়াছে।

যে সকল পুস্তক ও গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি :

- ১। তিলক—গীতারহস্য। Vedic Chronology.
- ২। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণচরিত্র।
- ৩। ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী—Krishna Dwaipayana and Krishna Vasudeva (Asiatic Society's Journal)
- ৪। যোগেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানবিধি—পুরাণে কাল (প্রবাসী)
- ৫। মহাভারত—আদিপর্ক
- ৬। বিষ্ণুপুরাণ।
- ৭। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—Political History of Ancient India.

## সুরের নেশা

শ্রীআশুতোষ সাহা

বসার কথা অনেক আছে,—

তবু বলা হয় না,

আজ উঠেছে মুখর হয়ে

নীরব মনের ময়না ।

মর্ম-কোথের দেদার গধু

উপচে এখন পড়ছে বধু,

আখের গুড়ের মরশুমে কেউ

সৌধুর শোয়াদ নয় না ।

কাকের মেলায় কোকিলকে কেউ

ডাকে না গান গাইতে,

হাঁড়িচাঁচার কদর এখন

দোয়েল-গ্রামার চাইতে ।

জানি,—তবু সুরের নেশায়

নিলাজ এ প্রাণ আজ ভেসে যায় ;—

গুঞ্জরিয়া অলির পুলক—

গুঞ্জরে সে তাইতে ।

পথ চলি আর পাঁচালি গাই

ভেয়ি আমি হারি গো,

হাটের ভিড়ে বিভোল উদাস

ক্ষাপা বাউল প্রায় গো ।

কেউ শোনে আর কেউ না শোনে

হিসাব নাহি—কেই বা গোণে ?

বনের টিগা রাজার সভার

শিরোপা কি চায় গো ?

ভাবের ভাঙের ঘোরে আমার

মনের আঁখি লালচে,

যতই দাগা পাচ্ছে সে যে—

সুরের সূধা ঢালছে ।

দুঃখ আমার অস্থির্পাঁজর

করছে ক্রমে যতই কাঁকর,—

কোন্ সে মহা সরস্বতীর

বলংকলি-চাঁপা জলজলে ॥

## মরণ

শ্রীপুষ্প দেবী

আসিবে মরণ কামনার ধন দুটি বাছ প্রণারিয়া

জননীর মত মমতা কোমল স্নেহে ভরা তার হিয়া

প্রতীক্ষা মোর কতদিন ধরে

ছিল পথ চেয়ে লভিতে ইহাবে

আজিকে সফল কামনা আমার পূর্ণ যা কিছু সাধ

মরণ এ নয় মানব জীবনে দেবের আশীর্বাদ ।

পরাণ আজিকে নির্ভয় হ'ল তোমার দরশ পেয়ে

বুঝেছি কি তুমি কত দিন ধরে আছি এই পথ চেয়ে

শিশুরে লইয়া কোঁতুকসম

লুকাইয়া ছিলে কোথা মনোরম

এতদিন পরে হয়েছে কি দয়া আসিয়াছ গধু তেঁদ

জননীর মত মমতা কোমল করুণাময়ীর বেশে ।

দুটি হাতে তব সাধুনা দানি জানাইলে বরাভয়

কত যে সৎস তোমার পরশ বলে বাখানবর নয়

ও দুটি আঁখিতে বরষি অমৃত

বলিলে যে কথা ছিল অকথিত

দক্ষিণ পাণি ললাটে রাখিয়া মুছে নিলে সব দুখ

নিমেষে মিলাল বাঁচিবার ভয় আনন্দে ভরে বুক ।

দীর্ঘ জীবনে প্রতি পরতেতে কত সুদুঃখ মাখা

কত নিঃসঙ্গ প্রয়াস আমার বুকের শোণিতে আঁকা

গুণ শেষ আশা মরণ আসিবে

নিমেষে সকল দুঃখ নাশিবে

মোর মুখপানে চেয়ে সে হাসিবে শুকাবে সকল ক্লত

সুগভীর স্নেহে কোলে নেবে মোরে আপন জননীমত ।

জননীয়ে পেয়ে ভরেনি কি হিয়া তুমি কি জননী মোর ?

ক্রন্দন মোর পশেছে শ্রবণে ভাঙিয়াছে ঘুম ঘোর ?

ছুটিয়া আসিতে খুঁজেছে কি কেশ ?

এলে দ্রুত পায়ে সঘরি বেশ ।

হেথা অভিনানে কাঁদে যে তনয়া তাই কি ব্যাকুল মন ?

নয়নের দিগ্ধি হারাল সীমানা পেয়ে তব দরশন ।

আঁখার ঘনাল আঁখি দুটি ভরে তোমার মায়াব বেশ ।

নহে আবরণ নহে স্ববনিকা আভূষিত তব কেশ ।

আসিয়াছ তুমি সব দুখ নাশি ।

তাপিত বক্ষে অমৃত বরষি ।

হাত ধরে তুমি লয়ে যাবে মোরে দুখ সীমানার পার ।

জরা শোক ব্যথা বিরহ বেদনা রহিবে না সেখা আর ।

## গেয়িং গ্যেট

শ্রীমতী দেবী

সুবিমল যেদিন সুখবরটা নিয়ে বাড়ী কিরল সেদিন বাড়ীর সকলের উপর প্রতিক্রিয়াটা সমান হ'ল না।

ভবানীপুরের অপেক্ষাকৃত নিরাশা একটা রাস্তার উপরে বাড়ী। খুব নতুন বাড়ী নয়, আবার পুরনো ব্যবহারেও নয়। বর্ষাকালে জোরে বৃষ্টি হলেও এখনও ঘরের ভিতর জল পড়ে না। হরিশাধনবাবু বছকাল এই একই বাড়ীতে বাস করছেন, কাল্লেই বাড়ীর ভাড়া আগেকার কালের দেরেই আছে। দোতলায় চারখানি থাকার ঘর, আবার তিন তলার উপরেও মাঝারি আকৃতির একটি ঘর ও সংলগ্ন বাথরুম আছে। এই ঘরটিতেই সুবিমল থাকে। দোতলার দু'খানি শোবার ঘরের অধিবাসী তিন জন। গৃহকর্তা হরিশাধনবাবু তাঁর মেয়ে শুক্লা ও হরিশাধনবাবুর অবিবাহিতা ছোট বোন মাধবী।

শুক্লা এই পরিবারের সকলের বড় আত্মদে। তার জন্মের পরই মা মারা যাওয়ায় অনাধর অল্প ত তার হয়ই নি, বরং অতিরিক্ত আদর-বন্ধে সে একটু "আত্মদে"ই হয়ে গেছে। পারতপক্ষে, তার কোনও আবদার বড় একটা অবহেলিত হয় না। বাবা ত "শুকু" বলতে অজ্ঞান, পিসিমা মাধবীও নিতান্ত অজ্ঞান আবদার না হলে সেগুলি রক্ষা করতেই চেষ্টা করে থাকে। নামে পিসিমা হলেও মাধবী বয়সে ঠিক শুক্লার মাতৃহানীয়া নয়। শুক্লার চেয়ে বছর চৌদ্দ পনের বড় হবে। হরিশাধন মাধবীকে সন্তান স্নেহেই পালন করেছিলেন, মাধবীও তাঁর মাতৃহানী কতটুকু লালন পালন করে সে ঋণ শোধ করছে।

সুবিমল ফিরে এসেই অফিসের ধড়াচুড়া ছাড়তে উপরের ঘরে চলে গেল। কাপড় বদলে, হাতমুখ ধুয়ে নীচে খাবার ঘরে ঢুকে ডাক দিল, "শুকু, পিসিমা।"

মাধবী চাকরকে চায়ের জলের জন্ত বলে ঘরে এসে ঢুকল। পেয়াল-পিরীচ সব শুদ্ধছে, এমন সময় শুক্লা চুল ঝাঁচড়াতে ঝাঁচড়াতে ছুটে এসে বলল, "আমার জন্তে চা কর না পিসিমা, আমার বড়ুদের বাড়ী চায়ের নেমস্তয় আছে।"

মাধবী বলল, "নিতিয় নেমস্তয় মেয়ের। কি আজকে আবার বড়ুদের বাড়ী?"

শুক্লা বলল, "ঐ যে ওর বোনটা, বুঝ না কি বলে তাকে, তারই জন্মদিন আজ। যত সব বাচ্চা বাচ্চার ব্যাপার তার মধ্যে আমাকে ডেকেছে কেন কে জানে?"

মাধবী বলল, "তা হলে ত আবার প্রেজেন্ট দেওয়ার পক্ষ আছে। কিছু জোগাড় করেচিসু?"

শুক্লা বলল, "না, এখনও ত কিছু জোগাড় হয় নি। যাবার পথে কিছু একটা কিনে নেব। এ বয়সের মেয়ে-গুলোকে কি যে দেওয়া যায় সেই এক সমস্যা। খেলনা-পুতুলের পক্ষে বড় হয়ে গেছে। বই পড়তে চায় না, আবার এমন ভাল-হিড়িঙে লগা যে, ফক পিসু দিতে গেলেও আড়াই গজ কাপড় না হলে চলে না। কি দিই বলত?"

মাধবী বলল, "বই-ই দিসু, কমে হবে। খুলে পড়ছে বাংলা বই কি আর পড়বে না?"

শুক্লার বয়স বড়িও আঠার উনিশ বছর হয়েছে, তবু ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলল, "বাক্সাঃ, তোমার খালি খরচ কমানোর ভাবনা। দিও এখন আনি চার পরশা, একটা প্রথম ভাগ কিনে দেব।"

মাধবী বলল, "তোমার মত খরচ বাড়াবার ভাবনা ভাবলে আর আমার চলছে কই? অন্ন টাকায় সংসার চালানোর ভারটা ত আর তুমি নেবে না?"

সুবিমল একটু বিরক্তভাবে বলল, "আরে, আগে চাটা কিছু একটু দাও। সাতা দিন বকু বকু করে এলাম, এখন শুধু তোমাদের বকুতা শুনে ত আর পেট ভরবে না?"

মাধবী তাড়াতাড়ি চা ঢালতে ঢালতে বলল, "এই দিচ্ছি। বালীগঞ্জের মাসিমা জ্বননগরের মোড়রা পাঠিয়ে দিয়েছেন, দেব ছুটো?"

সুবিমল উদ্বাসভাবে বলল, "দেও, খেয়ে নি একটু, দিশী জিনিস, এর পর বছরদিন আর জুটবে না।"

শুক্লা চেয়ে বসতে বাচ্ছিল, এক ঠেঙ্গার সেটাকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, "ওমা কেন?"

সুবিমল বলল, "কলাবিশিষ্টা জুটে গেছে। এবার তল্লিতলা ধাধতে হবে।"

শুক্লা মুখটা লগা করে বলল, "এই সেবেছে রে।"

মাধবী সবাইকে চা দিয়ে হরিশাধনবাবুকে ডাকতে

যাচ্ছিল। গুরুার আর্দ্রনাদে একটু অবাক হয়ে বলল, “কেন, সারল আবার কিসে? কতদিন ধরে আমরা অপেক্ষা করে আছি ধবরটার জন্তে, আজকে জানা গেল পাকাপাকি কথা, এতে ত খুশীই হওয়া উচিত।”

হরিশাধনবাবু না ডাকতেই এসে ঘরে ঢুকলেন। এরই মধ্যে তিনি গায়ে শাল চড়িয়েছেন। বয়স বেশী, স্বাস্থ্য দুর্বল, সর্বদাই তিনি খুব সাবধান হয়ে চলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “কিসের কথা হচ্ছে? সবাই এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে?”

মাধবী বলল, “দাদা, খোকা স্কলারশিপটা পেয়ে গেছে।”

ছেলের দিকে তাকিয়ে মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। হরিশাধনবাবু বললেন, “বেশ বেশ, কখন যেতে হবে?”

সুবিমল বলল, “বেশী ছেরি আর কই? মাস দেড়েক বড় জোর হাতে আছে। এর মধ্যে সব জোগাড়-জাগাড় হয়ে উঠলে হয়।”

আন্তে আন্তে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হরিশাধন বললেন, “অবশ্য তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আনন্দিতই ত হওয়া উচিত, কিন্তু এত দিনের জন্তে তুমি বিশেষ চলে যাবে তেবে যেন কেমন একটু আশঙ্কার ভাব আসছে। নিজে ত বড়ো হয়ে পড়েছি, স্বাস্থ্যও ভাল নয়। প্রায় কাজের বার হয়ে গেছে।”

মাধবী বলল, “সে ভাবলে কি আর চলে দাদা? কত বড় চাল এটা। একবার ফস্কে গেলে আর কোনদিন ছুটেবে না। ছুটো বছর কোনমতে কেটে যাবে। যেমন করে হোক, আমরা চালিয়ে নেব।”

গুরুা গাল ফুলিয়ে বলল, “হ্যাঁ, এখনই ত আধপেটা খাই, তখন সিকি-পেটা খাব আর মনের আনন্দে ঠেঁটি পরে চটি কটকট করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।”

মাধবী বলল, “তোমার শ্রী অঙ্গে ত আধপেটা খাওয়ার কোন লক্ষণ আমি দেখছি না। যা কাপড়-চোপড় জমা করেছ তাতে ছ’বছরের অনেক বেশী তোমার চলবে। আর রাস্তায় ঘুরতে ত তোমার কোনদিন কোন আপত্তি আমি ইতিপূর্বে দেখি নি, ঘরে থাকতেই আপত্তি।”

গুরুা বলল, “কথায় কথায় কি যে ঘোঁটা দাও। না হয় আছিই একটু মোটা। তোমার মত শিড়িঙে সবাই হবে নাকি?”

হরিশাধনবাবু বললেন, “শিড়িঙেও কেউ নেই, মোটাও কেউ নেই। যার যেমন দৈর্ঘ্য তার তেমন গ্রন্থ। তা গুরুা খান্ধ না যে?”

গুরুা বলল, “আমাকে যে আবার বুড়ুদের বাড়ী যেতে হবে। তার বোনের জন্মদিন। বাই তৈরী হয়ে নিই গিয়ে। তোমার বটুরার থেকে টাকা নেব নাকি পিসীমা?”

মাধবী চা খেতে খেতে বলল, “নাও গিয়ে গোটা চার, তার বেশী নিও না।”

“না গো না, আমি তোমার পকেট মারতে যাচ্ছি না।” বলে গুরুা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিশাধনবাবু বললেন, “গুরুা ছেলেমানুষের মত কথাটা বলল বটে, কিন্তু বিষয়টা ভেবে দেখবার মত। খোকা চলে গেলে আমাদের আর ত শ’দেড়েক টাকা কমে যাবে, সেটা ত পুষিয়ে নেওয়া দরকার। কি করা যায়, তোমরা কিছু ভেবেছ?”

সুবিমল বলল, “আমার খাওয়া ধরচটাও ত অন্ততঃ কমবে?”

মাধবী বলল, “তা গোটা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা কমতে পারে। দিনরাতের চাকরটা ছাড়িয়ে দিয়ে একটা ঠিকি ঝি রাখা যেতে পারে। তাতেও গোটা ত্রিশেক টাকা কমবে।”

সুবিমল বলল, “ওসব গাঁজাখুরি প্ল্যান ছাড় দিখি। এমনি ত কত সুখে আছি, তার উপর চাকর-বাকর ছাড়িয়ে দিয়ে দিনরাত করলা আর ঘুঁটের মধ্যে বসে থাক, তা হলেই সপ্তম স্বর্গ লাভ হবে।”

হরিশাধনবাবু বললেন, “না মাধু, তা হয় না। এমনিতেই তোমাকে যা খাটতে হয়, তাতে আমি নিজেকে বড় অপরাধী মনে করি। কিছুই ত তোমার জন্তে করতে পারলাম না।”

মাধবী বলল, “তোমার ঐ এক কথা। কি আমার জন্তে করাটা হয় নি? খেয়েছি, পরেছি, পড়াশুনা করেছি, বাকি আছে কি? এক নড়া ধরে পরের ঘরে বিদায় করে দাওনি, এই ত।”

হরিশাধন এই ক্ষেত্রে সত্যই নিজেকে অপরাধী ভাবতেন, তাঁর মা-বাবা মাধবীকে সাত-আট বছরের বেধে মারা যান। তিনি নিজেও তখন অল্পবয়স্ক যুবক, সবে বিয়ে করেছেন এবং সবে চাকরীতে ঢুকেছেন। মাধবীকে তিনি যথাসাধ্য যত্নে মানুষ করেছিলেন, কিন্তু টাকার অভাবে তার বিয়ে দিতে পারেন নি। মাধবী শ্রীমতী মেয়ে, কিন্তু রং তার কালো। বিনা টাকার কোথায় তার ভাল বব পাওয়া যাবে? নিজের মেয়ের বিয়ের কথাও এজন্তে তিনি ভাবতে পারেন না। যদিও গুরুার রং খুব কসাঁ এবং সমবয়সী বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে তার খুব খ্যাতিরও আছে।

সুবিমল বলল, “খাক্, ওসব ভাবনা ভাবার সময় এখন

নয়। আমার মনে হয় ভুল কাকার প্রস্তাবটা ভেবে দেখা ভাল। আমার বরখানা বেশ ভালই, সঙ্গে বাধক্রমও আছে। একজন মহিলা কি পুরুষ স্বচ্ছন্দে ওখানে থাকতে পারে। তোমাদের বিশেষ ঝড়েও পড়বে না। খানিকটা তফাতেই থাকবে। পিসীমা যেমন ভাল ম্যানেজার, তাঁর আওতায় ভালই থাকবে এবং খুশি হয়েই বেড়শ'-ছশো যা চাও দিতে রাজী হবে।"

হরিশাধন বললেন, "মহিলা 'পেয়িং গ্যেট' পাওয়া যায় নাকি।"

সুবিমল বলল, "বিশ শতাব্দীতে কলকাতার শহরে কি না পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন দিলে সবই জোটে। বল ত কালই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিই।"

মাধবী বলল, "বোস বাপু, অত ভড়বড় করো না, একটু ভেবে দেখি আগে। মেয়েমানুষ হলে একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত অবিগ্রি, কিন্তু অল্প একটা দিকও দেখবার আছে। খুব বেশী গায়ে পড়া না হয়। সারাক্ষণ বসে আড্ডা দিতে আমি পারব না এবং আমার সংসারের সব ব্যাপারে নাক ঢোকানও আমি পছন্দ করব না। মেয়েমানুষদের এ চুটি ঘোষ একটু বেশী।"

সুবিমল বলল, "বিজ্ঞাপন দিলে পুরুষ অতিথি ত তখনই দশ গুণা জুটে যাবে, কিন্তু তারও কি কিছু অশুবিধা নেই? তাঁরাও যে সমগ্রবিশেষে গায়েপড়া না হতে পারেন এমন ত নয়। গুরুা রয়েছে বাড়ীতে, তার বয়স খুবই কম, এবং ধরনধারণে, যা বয়স তার চেয়েও ঢের ছেলেমানুষ। বুকে চলতে জানে না। পিসীমাকে আবার এদিক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হতে হয়।"

হরিশাধনবাবু বললেন, "একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল লোক ত নেওয়া হতেই পারে না। জানাশোনা ভ্রমলোক হয়, একটু মধ্যবয়স্ক হয় তা হলেই। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের চেনা হলে আরও ভাল।"

সুবিমল বলল, "এত সব কথা ত বিজ্ঞাপনে শুছিয়ে বলা শক্ত। তা হলে আগেই খবরের কাগজের শরণ না নিয়ে চেনাশোনার মধ্যে খোঁজখবর নেওয়া ভাল। ভুলকাক কথটা ভুলেছিলেন, তাঁরই কাছে প্রথম সন্ধান নিই। তিনি হয়ত কোন বিশেষ লোকের কথা মনে করেই প্রস্তাবটা করেছিলেন।"

গুরুা সেজেগুজে এসে বলল, "বাজি পিসীমা। গোল-মালে একটু ধেরি হয়ে যেতে পারে, অমনি যেন খানায় খবর দিতে যেও না।"

মাধবী বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, পাকামি করতে হবে না,

যাও ত এখন। আটটার বেশী রাত হলে বুড়র মাকে বলে একটা বি বা চাকর সঙ্গে নিয়ে এস।"

গুরুা হড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। পিসীমার জালায় তার যে পুরোপুরি আধুনিক হওয়া হয় না, একজ্ঞ তার একটা ক্ষোভ মনের মধ্যে সারাক্ষণ জেগে থাকে। ঐ ত বেলা, রেবা ওরা কত রাত করে একলা একলা বাড়ী করে, কই ছেলেধরায় ধরে নেয় না ত? তাদের মা-বাবা কিছু বলে না ত? বরং যারা একটু কুনো ভীতু মেয়ে, এঁরা তাদের নিশ্চই করেন 'স্নাকা', 'বোকা' মেয়ে বলে। কিন্তু বাবা আর দাদার কাছে পিসীমার এতই খাতির যে তার সঙ্গে মন খুলে ঝগড়াও করা যায় না।

হরিশাধনবাবু বললেন, "আমি বড় সেকেন্দ্রে থেকে গেছি মাধু, তোমাকে নিয়ে আমার কোন হাঙ্গামা হয় নি, কিন্তু এই যে শুকু একলা একলা সন্ধ্যার পরে ঘুরে বেড়ায়, এটা আমার একেবারেই ভাল লাগে না। যতক্ষণ না বাড়ীতে ফেরে আমি মনে স্বস্তি পাই না।"

সুবিমল বলল, "পিসীমার মত আধুনিকী আর ক'টা পাচ্ছ এ যুগে? ওসব নিয়ে অস্বস্তি ভোগ করে লাভ নেই। যে কালের যা ক্যাসান তা ছেলেমেয়েরা অনুসরণ করবেই, বাপমা তাতে যাই ভাবুন।"

সুবিমল খাওয়া শেষ করে উপরে নিজের ঘরে চলে গেল। হরিশাধন বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে দর্শনশাস্ত্রের বই পড়তে আরম্ভ করলেন। মাধবী চায়ের পাট উঠিয়ে কেলে নৈশ আহ্বারের ব্যবস্থায় মন ছিল। শীতকাল প্রায় এসে পড়েছে, দিনের আলো বেশীক্ষণ থাকে না। বাইরের আব-হাওয়াও ক্রমে ধোঁয়ায় ঘোলাটে হয়ে উঠছে।

নিজের ঘর শোবার ঘরে গিয়ে মাধবী দেখল গুরুা তার বটুয়াটা হাঁ করে খুলে রেখে গিয়েছে। একটু বিরক্ত হয়ে বন্ধ করবার জন্যে সেটা ভুলে ধরে দেখল যে তার ভিতর একটাও টাকা নেই। গোটা ছয় টাকা সে রেখে গিয়েছিল, চার টাকা নেবে বলে গুরুা সব ক'টাই নিয়ে গিয়েছে। তার এ অভ্যাসটা মাধবীর একেবারেই ভাল লাগে না, কিন্তু হাজার ব্যুলও সে গুরুার এ অভ্যাসটি ছাড়াতে পারে নি। বাড়ীর টাকা নিচ্ছে তাতে আবার ঘোষ কি? তাও আবার বলেই নিচ্ছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, রাস্তার আলো জলে উঠল। রাস্তা-বাগ্না হয়ে গেল, হরিশাধন সন্ধ্যার সময়েই দিনের শেষ খাওয়ার পাট চুকিয়ে কেলেন, মাধবী তাঁকে ডেকে এনে খেতে বসিয়ে দিল। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "শুকু কেয়েনি?"

মাধবী বলল, "এই ত সব সাতটা, এখনই আসবে না।



বুড়ুর মা সঙ্গে লোক দিয়ে দেবেন, তিনি জানেন আমরা বাস্তবের মেয়েদের একলা ফেরা পছন্দ করি না। তুমি খেয়ে নাও।”

এমন সময় সুবিমল বেড়িয়ে-চেড়িয়ে কিবে এল। মাধবী দিকে তাকিয়ে বলল, “ভুলুকাকার সঙ্গে দেখা করে এলাম। শ্যুই তাঁর এক চেনা ভজলোক আছেন, তিনি “পেয়িং প্যেট” হয়ে থাকতে চান। এখন একটা মেস মত স্থানে আছেন, তাঁর খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তিনি খুব আগ্রহ করেই আসতে রাজী হবেন, ভুলুকাকা বললেন। একেবারে ছোকরা মানুষ নয়, চল্লিশের উপর বয়স। চুপচাপ ‘প্যাট-মোসফিয়ার’ ভালবাসেন, আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া তাঁর অপছন্দ হবে না।”

হরিশাধন জিজ্ঞাসা করলেন, “কি নাম ভজলোকের ? করেন কি ?”

“নাম নিখিলরঞ্জন মিত্র : ব্যাঙ্কে বড় কাজ করেন।”

মাধবী বলল, “বড়লোক দেখছি। সংসারে কেউ নেই নাকি।”

সুবিমল বলল, “বোন আছেন একজন, বিবাহিতা, অল্প প্রদেশে থাকেন। ভাই একটি আছেন, তা তিনি একেবারে আমেরিকায় ‘সেটল’ করে গেছেন, বিয়ে করেন নি।”

হরিশাধনবাবু বললেন, “একবার আলাপ করে দেখলে হয়।”

সুবিমল বলল, “কাল ভুলুকাকা তাঁকে নিয়ে আসবেন, বেশ পাঁচটা আন্ডাল। আমি সকাল সকাল ফিরব। পিসীমা চায়ের ব্যবস্থাটা কাল ভাল করে করো।”

মাধবী বলল, “তা হলে তিনি রোজই ঐ রকম চা চাইবেন।”

সুবিমল বলল, “আহা, আমি কি আর তোমাকে রাজ-স্বয়ংস্বরের আয়োজন করতে বলছি ? এই আলুর সিঙারার বহলে মাছের সিঙারা আর কি।”

মাধবী বলল, “তোমার ত এখনও যেতে মাস দেড়েক দেবি আছে, ততদিন ভজলোক অপেক্ষা করবেন ?”

সুবিমল বলল, “তা করবেন বই কি ? ভাল জায়গা পাওয়ার জন্যে লোকে দরকার হলে এর চেয়েও বেশীদিন অপেক্ষা করে।”

গুরু এই সময় কিবে এল। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। একজন হিন্দুস্থানী আয়া এসে তাঁকে-পৌছে দিয়ে গেল।

সুবিমল বলল, “এত সকাল সকাল যে ?”

গুরু বলল, “কি কতকগুলো চুনোপুটির কিচির-মিচির

বেশীকণ ভাল লাগল না। রেবা ছাড়া আমাদের দলের কেউ আসেই নি।”

অতঃপর যে যার নিজের কাজে চলে গেল, প্রত্যাশিত অতিথির বিষয়ে আর কোন কথাবার্তা হ’ল না।

সকালবেলা গুরু যখন শুনল যে, তাদের বাড়ীতে বাইরের এক ভজলোক থাকতে আসবেন, তখন মনে মনে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। তবে বাইরে বেশী-কিছু প্রকাশ করল না, কারণ পিসীমা হয়ত বহুনি লাগাবেন এবং দাদা ত নিশ্চয়ই ঠাট্টা করবে। খেয়ে-দেয়ে নিয়মিত কলেজে চলে গেল। কলেজ-ব্যাপারটা খুব যে তার ভাল লাগে তা নয়, তবে যা বাড়ীর লোকগুলি, একথা ত কাউকে খুশীকরেও বলা যায় না। পড়তে তাকে হবেই এবং পড়ার শেষে হয় মাষ্টারগীর্গরি নয়, কেরানীগীর্গরি করতে হবে। বাবা কি আর তার বিয়ে দেবেন ? পিসীমার এত বয়স হয়ে গেল, আজ অবধি তারই বিয়ে দিয়ে উঠতে পারলেন না।

কলেজ থেকে অল্পদিন সে যথাশাস্য দেবি করেই ফেরে, সেখানে তবু বহুবাহুবের দল আছে। ক্লাস না থাকলে, কাউকে কিছু না বলে সিনেমায়ও চলে যাওয়া যায়। কোন বন্ধু হয়ত পরশা দেয়, মাঝে মাঝে গুরু নিজেও দেয়। পিসীমার হাণ্ডব্যাগ ও বটুয়া হাতড়ে পরশা সে সর্বদাই কিছু জোগাড় করে রাখে। তাকে তাঁরা যখন হাতখরচ বলে কিছুই দেন না, তখন নেবে নাই বা কেন ? সে কি বড় হয় নি ? অল্প সব মেয়েরা কত খরচ করে। ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে কফিহাউসে যায়, সিনেমায় যায়। সে ত তবু তা করে না। করতে যে কিছু তার আপত্তি আছে তা নয়, বহুনি ধাবার ভয়েই করে না। বাড়ীতে কেউ যে তার পক্ষ সমর্থন একেবারেই করবে না, সেটা তার জানাই আছে।

আজ কিন্তু সে বেশ তাড়াতাড়িই কিবে এল। দাদা তখনও কেবনি, বাবা নিজের ঘরে। পিসীমা রান্নাঘরে বসে রসিকের সঙ্গে কি একটা তৈরি করছেন। ধাবারের শৃঙ্খল জায়গাটা ভরে উঠেছে।

“আমি এসে গেছি পিসীমা,” বলে ডাক দিয়ে গুরু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

“এত সকাল সকাল যে ?” পিসীমা জিজ্ঞাসা করল। “আচ্ছা মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আয়, আমি চা দিচ্ছি।”

গুরু তাড়াতাড়ি কলেজের কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুতে বাধকমে চলে গেল। একটু সাজতে হবে, কিন্তু খুব সাবধানে, যাতে পিসীমা বা দাদার চোখে না পড়ে। বাবা ত এসব বিষয়ে কিছুই বোঝেন না, তাঁর চোখেও কিছু পড়ে না। মুখ ধুয়ে এসে অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা

সাদা মাল্লাজী শাড়ী পরল, তবে পাড়টা তার খুব বাহায়েব। জামাটা পরল পাড় হলদে রঙের।

মাধবী হাত খোবার জন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাথরুমে যাবার পথে ভাইঝির দিকে চোপ পড়ায় জিজ্ঞাসা করল, “কি ব্যাপার? আবার বেরচ্ছিস নাকি।”

ধরা পড়ে গিয়ে একটু আমতা আমতা করে শুক্লা বলল, “এই চা খেয়ে একটু বেবাব শুখানে যাব, একটা বই আনতে হবে। টেবুটা ত এসে পড়ল।”

সুবিমল এই সময় এসে পড়তে আর কথাবার্তা এগোল না। মাধবী বলল, “কি যে ঘরটাকে কবে রাধ খোকা। আজ হুপুরে আমার ছু’ঘণ্টা সময় গেল তোমার ঘর সাফ করতে। ভজলোক ঐ অবস্থার ঘরখানিকে দেখলে প্রথমেই অপছন্দ করে ফিরে যেতেন।”

সুবিমল বলল, “আমাদের জাত অত খুঁটিনাটি দেখে না বাপু তোমাদের মত। ছাদের উপর অত বড় ঘর দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর এখনকার ঘরখানি যা অবস্থায় থাকে তা ত দেখ নি, তাই বলছি।”

মাধবী বলল, “তা বেশ, নোংরামিতে যদি তাঁর আপত্তি না থাকে ত আমার কিছু এসে যায় না। বরং ঘর গোছানোর পরিশ্রমটা বেঁচে যাবে। তা চা কি তোমাদের এখন দেব, না সে ভজলোক এলে খাবে।”

সুবিমল বলল, “তাঁরাও এসে পড়লেন বলে, একসঙ্গেই খাব, তবে শুকু অ্যাংগে খেতে চায় যদি ত ওকে দাও।”

শুকু বলল, “আমারও তাড়া নেই কিছু।”

বলতে বলতেই মি’ড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। সুবিমল বলল, “ওবাই আসছে বোধহয়। তা পিসীমা এখন যোগিনী বেশ পরে রইলে কেন। একটু ‘পাঞ্জিওজি’ করলে ত পারতে। দেখ ত শুকুকে।”

প্রায় এক-বয়সের গভীর মধ্যে পড়ে বলে সুবিমলের সঙ্গে মাধবীর ঠাট্টা-তামাশাও চলত। সে বলল, “কেন তোমার ‘পেয়িং গ্যেষ্ট’ কি আমাকেই দেখতে আসছেন। তা ভাবনা নেই জট্টাব্যার অভাব হবে না, শুকু ত আছে।”

চটবার ভান করে শুক্লা বলল, “আহা, পয়েছি ত একটা শাধা শাড়ী। বাইবে যাচ্ছি বললাম না।”

“কই সব কোথায়।” বলে হাঁক দিয়ে এক প্রোট ভজলোক উগরে উঠে এলেন। ইনি সুবিমলের দূরদৃষ্টের কাকা। তাঁর পিছন পিছন আর এক ভজলোক উঠে এলেন। বয়স তাঁর ভুলুকাকার চেয়ে খানিকটা কম, তবে কতটা কম তা ঠিক বোঝা যায় না। বেশ লম্বা মোহারা চেহারা, বং শ্রামবর্ণ, বগের কাছে ছ’এক গাছা চুল পাকতে আরম্ভ করেছে।

সুবিমল আর মাধবী এগিয়ে গেল, তাঁদের অভ্যর্থনা করতে। শুক্লা একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ভাল করে ভজলোকের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মনে মনে বলল, “এ রাম, একেবারে বুড়ো।” তারপর হরিশাধনের ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিল, বাবা, ওঁরা এসে গেছেন।”

হরিশাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন অভ্যাগতরা সকলে বসবার ঘরে গিয়ে বসেছেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই সুবিমল বলল, “নিখিলবাবু ইনি আমার বাবা। আর এই আমার ছোট বোন শুক্লা।”

নিখিল উঠে দাঁড়িয়ে হরিশাধন আর শুক্লাকে নমস্কার করলেন। হরিশাধন বললেন, “বসুন বসুন, ভুলুর কাছে ত আপনার কথা আগেই অনেক শুনেছি। আপনারা সব পশ্চিমে মানুষ হয়েছেন না? আদিবাস কোথায় ছিল আপনারদের।”

নিখিলবঙ্গন বললেন, “আদি বাসভূমি মেদিনীপুরের কোন গ্রামে ছিল। ঠাকুরদাদা কমিসরিয়েটে কাজ নিয়ে পশ্চিমে চলে যান। সেখানে পয়সাকড়ি অনেক উপার্জন করেছিলেন, সেইখানেই থেকে গেলেন। বাবাও চিরকাল ঐখানেই কাটিয়েছেন। দ্বিধিরও বিয়ে হয়েছে ঐ দেশেই। এক আমিই বাংলা দেশে ফিরে এসেছি।”

হরিশাধন বললেন, “আপনার ছোট ভাই বুঝি ইউ-এস-এতে আছেন?”

নিখিল বললেন, “হ্যাঁ, সে বিচ্ছে-টিয়ে করে ঐখানেই বসে গেছে।”

মাধবী বলল, “আপনারদের একটু চা দিতে বলি? আপিস থেকে ফিরে নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয় নি?”

ভুলুকাকা বললেন, “নিশ্চয়, নিশ্চয়। চা একবার খেয়ে এলেও আর একবার খেতে আপত্তি নেই। মাধবীর চা আমাদের পরিবারে বিখ্যাত।

মাধবী এবং শুক্লা মিলে চা এবং জলখাবার পরিবেশন আরম্ভ করল। ভুলুকাকা বললেন, “ঘর ত দেখেই, খাওয়াটাও দেখে নাও। তোমার মেসের খাওয়ার চেয়ে ঢের তফাৎ নিশ্চয়ই দেখবে।”

নিখিল বললেন, “আমার মেসের যা খাওয়া তা ত আপনি খান নি, কাজেই কতটা যে তফাৎ তা আপনি বুঝবেন না।”

ভুলুকাকা বললেন, “আবে মশাই মেসে আমিও খেয়েছি। সব মেসই সমান, যেমন খাওয়া, তেমনি আব-হাওয়া।”

মাধবী বলল, “ঘরখানাও একবার দেখে যান।”

হরিশাধন বললেন, “ছাদের উপর নিবিবিলি থর। তবে বাড়ীটা বহুদিনের পুরনো।”

নিখিল বললেন, “কিছু ত এমন পুরনো মনে হচ্ছে না।”

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে উপরের ঘর দেখে আগা হ’ল। ঘরটি ভালই, অপচন্দ্র হবার কিছু ছিল না।

সুবিমল বলল, “মাসদেড়েক অস্থবিধায় থাকতে হবে আপনাকে, তার আগে ত ঘরটা খালি করতে পারছি না।”

নিখিল বললেন, “তাতে আর কি? বারো মাস যেখানে কেটেছে তেরো-চৌদ্দটা মাসও সেখানে কেটে যাবে। এত ভাল জায়গা পাবার কোন আশা ত ছিল না।”

তারা বিদায় নেবার আগে হরিশাধনবাবু ভাইকে নিয়-কণ্ঠে বললেন, “দরদামটা তুমিই কোরো। বেশী আদায় করার ইচ্ছা আমার নেই, তবে খোকা চলে যাওয়ার আগে যে ফাঁকটা হবে সেটা যেন পুরে যায় এই আর কি?”

ভুলুবার বললেন, “সে ত নিশ্চয়।”

ভক্তলোক ছ’জন নেমে যেতেই হরিশাধন মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমার ত ভালই মনে হচ্ছে, তুমি কি বল?”

মাধবী বলল, “একবার দেখে যতটুকু বোকা যায়, তাতে ত খুঁৎ কিছু দেখলাম না।”

ছ’এক দিনের মধ্যেই জানা গেল যে, নিখিলবাবু আসবেন বলে পাকা কথা দিয়েছেন, ছ’শ টাকা দিতে তিনি রাজী। গুরুা তাড়াতাড়ি খবরটা রটিয়ে দিল তার বন্ধ-বান্ধবদের মধ্যে। রেবা বলল, “আমরা বুঝি জানি না ভেবেছিলাম? তলে তলে সব খবর নিয়ে রেখেছি।”

গুরুা বলল, “বাবাঃ, ঝড়ের আগে কুটিনাচ সব। এত খবর নেবার কি হ’ল?”

বেলা বলল, “তা নেব না কেন শুনি? বাড়ীতে ছ’জন ‘বে’র যুগি’ মেয়ে রয়েছে, আর একজন অবিবাহিত ‘পেরি’ গ্যেট’ আসছেন, এতে কোতুহল হয় না?”

গুরুা চোখ বড় বড় করে বলল, “ছ’জন? কি পিসীমাও এখনও ‘বে’র যুগি’র দলে আছেন নাকি?”

রেবা বলল, “ইস্, মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচি না। না হয় তোমার মত নবযুবতী নাই হলেন, তাই বলে তাঁর বিয়ের বয়সও একদম উৎরে গেছে নাকি?”

গুরুা বলল, “আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কি খবর নিলে?”

রেবা বলল, “এই না তোমার কোন কোতুহল নেই! বলছি, বলছি, ব্যস্ত হয়ে না। ভক্তলোক বেশ ভাল কাজ করেন। অবশ্য ইনকাম ট্যাক্স বাধ দিয়ে কত হাতে পান,

তা জানি না। তবে এটা জানি যে, বাপের কাছ থেকে বহু টাকা পেয়েছেন এবং সব ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছেন। বন্ধুগণ কিছু নেই।”

বেলা বলল, “চেহারাও ভাল, সে ত তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ।”

গুরুা বলল, “বাঁচালে। কোন ক্রটি আর রাখ নি। এখন ক্লাশের ঘণ্টা পড়ছে, সেদিকে একটু মন দিতে হয়।”

সেদিন বাড়ী ফিরে গুরুা দেখল দাদার বিদেশযাত্রার আয়োজন এরই মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মাধবী সুবিমল ছ’জনেই ব্যস্ত। হরিশাধনবাবু আগের চেয়েও আরো বেশী গভীর হয়ে গেছেন। ‘ছেলের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না।

দিনগুলো ছু ছু করে কেটে যেতে লাগল। সুবিমল যে ছ’ বছরের জন্তে চলে যাচ্ছে, এতে সবাই কাতর, অথচ ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবাই প্রকৃত্ত থাকার চেষ্টা করছে। ভুলুকা মাঝে মাঝে আসেন, নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। নিখিলবাবুও ছ’তিনবার বেড়িয়ে গেলেন এর মধ্যে। দুঃখের বিষয়, গুরুার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর একদিনই হ’ল। আগে থেকে ত জানা ছিল না, কাজেই বাকি ছ’বার সে যথারীতি দেবী করে কলেজ থেকে ফিরে শুনল যে, ভক্তলোক এসেছিলেন এবং ঘণ্টাখানেক বাবার সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করে ফিরে গেছেন।

সুবিমলের বাবার দিন অবশেষে এসেই পড়ল। গুরুা খুব খানিক কঁঁড়ে নিল, মাধবীর কান্না পাচ্ছিল ঢের বেশী, কিন্তু যাত্রাকালে অশ্রুজলে অমজল হয় ভেবে চুপ করেই রইল। সুবিমল বার দুই চোখ মুছল ক্রমাল দিয়ে এবং তার বাবা গভীরমুখে ছেলেকে উপদেশ দিতে লাগলেন।

পরদিন উপরের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নতুন আগন্তকের জন্তে সাজিয়ে রাখা হ’ল। তার পর দ্বিতীয় ছিল রবিবার, সেইদিনই ন’টা-দশটার সময় নিখিলবাবু তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। জিনিসপত্রের মধ্যে বেশী ভাগই হ’ল বই। খাওয়া-দাওয়া করে তিনি উপরে গিয়ে একবার স্ত্রীপাকার বইগুলির দিকে বিস্তৃতভাবে তাকালেন, তার পর স্থির করলেন একটুখানি বিশ্রাম করে নিয়ে তার পর সেগুলি শুছিয়ে রাখবেন। বেলা চারটের সময় ঘুমিয়ে উঠে দেখলেন যে, শীতকালের ছোটবেলা শেষ হয়ে আসছে এবং চা খাবার জন্ত রসিক তাঁকে ডাকতে এসেছে।

চা-খাবার সময় মাধবী জিজ্ঞাসা করল, “কিছু অস্থবিধা হচ্ছে না ত?”

নিখিল বললেন, “বিলুমাাত্র না। অশ্লুবিধা হবার কোন ফাঁক কি আর আপনাবা রেখেছেন?”

শুক্লা অভ্যন্তর বিজ্ঞের মত বলল, “এর পর কত ফাঁক বেরবে দেখবেন এখন।”

নিখিল বললেন, “কি কারণে?”

শুক্লা বলল, “মানুষ, মানুষ বলেই। কাছে এলে তারা একজন আর একজনকে খানিকটা বিরক্ত না করেই পারে না।”

নিখিল হাসতে হাসতে বললেন, “বয়সের পক্ষে সাংসারিক জ্ঞান আপনাবা বড় বেশী হয়ে গেছে দেখছি।”

শুক্লা বলল, “আহা, আমার বয়স কিছু কম নাকি? আমি ত ভীষণ বুড়ো।”

মাধবী বলল, “চের হয়েছে। বুড়ো যদি এতটু ত বুড়োর মত ভারিকি হয়ে থাক। নিখিলবাবু, আপনাকে আর এক পেয়ালা চা দিই?”

নিখিল বললেন, “না থাক, আমাকে এখনি একটু বেরতে হচ্ছে। এক ভক্তলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, ভুলেই গিয়াছিলাম,” বলে তিনি উঠে পড়লেন।

শুক্লা বলল, “শিশীমা, উনি যদি খুব রাত করে কেয়েন, তা হলে তুমি কি করবে?”

মাধবী বলল, “কি আবার করব? জানিয়ে দেব কোন-মতে যে আমরা খুব সকাল সকাল খাই।”

নিখিল অবশ্য খুব রাত করলেন না, আটটার মধ্যেই ফিরে এলেন। ভুলবাবু এসেছেন দেখে বসবার ঘরেই বসে গেলেন গল্প করতে। কথাবার্তা হতে হতে খাওয়ার সময়ও হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অবশেষে নিখিল তাঁর উপরের ঘরে চলে গেলেন।

ঘরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ইতস্ততঃ জুপাকার করা জিনিসপত্রের চিহ্নমাত্র নেই। বইগুলি সব দেওয়ালের তাকে এবং বুককেসে সাজানো হয়ে গেছে। অল্প জিনিসগুলিও বধ্যাযোগ্য স্থানে স্তুবিত্ত। বিছানা পরিপাটি করে পাতা। রাত্রে খাবার জল ঠিক করা রয়েছে। একটি টেবল-ল্যাম্পেরও আবির্ভাব হয়েছে বধ্যস্থানে।

বাড়ীতে যারা বাস করে পরিবারের মধ্যে, এ সব জিনিস তাদের চোখেই পড়ে না, চিরকালই তারা এগুলিতে অভ্যস্ত, কিন্তু নিখিল ঘুরেছেন বাইরে বাইরে, যত্ন করবার লোক কেউ বড় হয়ে বাবার পর তাঁর সঙ্গে থাকে নি, কাজেই এসব ব্যাপারে তিনি অভ্যস্ত নন। তাঁর মনটা পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। কাকে যে এর জন্য ধন্যবাদ দেবেন ভেবেই পেলেন না। মাধবী বাড়ীর গৃহিণী, তিনিই কি এসব ব্যবস্থা করেছেন? চাকরের কাজ বলে ত মনে হচ্ছে না। না কি

শুক্লাই করেছে! মেয়েটি বেশ সূক্ষ্মবী ও সূভাবিনী। কাজ-কর্মেও কি খুব পটু? বা হোক, তিনি সবমাত্র একদিন হ’ল এসেছেন, এখনই ত এসব নিয়ে আর কারও সঙ্গে গবেষণা করা চলে না। ক্রমে বোঝা যাবে।

দিন একটা একটা করে কাটতে লাগল। কাছে এলেই মানুষ মানুষকে বিরক্ত করে, শুক্লাও এই ভবিষ্যৎবাণীটা শব্দ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। শুক্লাও হৈ-ছল্লোড় ঘেন আরোই বেড়ে গেল। কলেজের বন্ধুরা বলল, “ইস, ‘প্রাণে গুণির জোয়ার এসেছে।’ হ’ল কি তোর?”

শুক্লা বলল, “হবে আবার কি? কৌনদিনই বা আমি ঘরের কোণে বসে তপস্বী করতাম?”

মাধবী শুক্লাকে একটু সাবধান করে দেবার চেষ্টা করল। “অত বেশী হৈ হৈ কর না বাপু, তোমার বাবা এতে অসন্তুষ্ট হন। নিখিলবাবুও একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তিনিও যাতে বেশী অবাধ না হয়ে যান, সেটাও দেখতে হয়।”

শুক্লা গাল ফুলিয়ে বলল, “বাবাঃ, যেন রামগুরুড়ের বাসায় এসে পড়েছি।”

নিখিল অবশ্য অবাধ হবার বা বিরক্ত হবার কোন লক্ষণ দেখালেন না। তিনি বাড়ীতেও খুব বেশীক্ষণ থাকতেন না। শুক্লাও দিকে তাকিয়ে তাঁর ভালই লাগত, পুরাকালের আত্মীয়রা এই বয়সে কি দারুণ গিন্নী হয়ে গিয়েছিলেন ভেবে তাঁর হাসি পেত। “সময়টা খুবই বদলেছে,” তিনি ভাবতেন।

মাধবী কিন্তু সেই আগের কালের মেয়েদেরই মত কিন্তু কত মাজ্জিত কত সপ্রতিভ। নীরবে সমস্ত বাড়ীটাকে কি নিপুণ ভাবেই চালাচ্ছেন। কিন্তু হাসির প্রভাৱ আলো করে রেখেছে সমস্ত বাড়ীটা ঐ শুক্লাই। এই ঘরনের মেয়ে, এত কাছ থেকে আগে তিনি কখনও দেখেন নি।

শুক্লাও সারাক্ষণ হা-ছত্যাশ। বন্ধুরা কত জায়গায় যায়। রাত্রি ন’টার ‘শো’তে সিনেমায় যায়, গড়ের মাঠে প্যারেড দেখতে যায়, অপেরায় যায়, আরও কত কি! তাকে কে নিয়ে যাবে? দাড়া ত দিব্যি চলে গেল, সেখানে কত মজা করবে। আর বাবা ত ঘর থেকে বহুবে একদিনও বেরোন না। বেরোতেনও যদি তাঁর সঙ্গে ওসব জায়গায় যাবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবত না।

বাশিমান নাচ এসেছে। শুক্লা কথাটা তুলল চায়ের টেবিলে। বলল, “আমি নিশ্চয়ই যেতে পাব না?”

মাধবী বলল, “ঐ ছপুঁরবাত অবধি তোমাকে কার সঙ্গে ছেড়ে দেব বল?”

শুক্লাও মুখটা অন্ধকার হয়ে এল। নিখিল ছ’পেয়ালা চা শেষ করে বললেন, “দেখুন একটা কথা বলি, আমি ভাব-

হিলাম ঐ নাচটা দেখতে যাব। আপনারা ছ'জন যেতে পাবেন না আমার সঙ্গে ? হরিশাধনবাবু কি আপত্তি হবে ? আমি ত ঘরের লোকই এখন ।”

গুন্না হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, “হ্যাঁ পিসীমা চল, লম্বীটি চল। তুমি গেলে বাবা কিছু আপত্তি করবেন না। বলি বাবাকে ?”

মাধবী এ সব জায়গায় বিশেষ যায় না। রাতবিবোতে বেকরতে তার ভালও লাগে না। কিন্তু অস্বীকার করলে নিখিল ভাববেন কি ? হয়ত তাঁর সঙ্গে বেকরতে অমত—এইটাই ভাববেন। আর গুন্না ত কেঁদেই ফেলবে। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, “আচ্ছা, দাদাকে বলে দেখি। কবে যেতে চান ?”

নিখিল বললেন, “কাল যেতে পারি, আজ টিকিট করে যাব।”

হরিশাধন কথাটা শুনে বললেন, “সাবে মাধু ? আবার এই নিয়ে কোন কথা উঠবে না ত ?”

মাধবী বলল, “আজকাল সবাই এ রকম বেরোয়, কে বা তা নিয়ে মাথা ঘামায় ?”

হরিশাধন বললেন, “আচ্ছা যাও। নিখিলত খুবই ভাল ছেলে। তবে অনাস্বাদ্য কিনা, তাই ভাবছিলাম।”

গুন্নার আর আনন্দ ধরে না। নিতান্ত বকুনি খাবার ভয় না থাকলে সে ছ'পাক নেচেই নিত। বেরোবার আগে বথন সাজ-পোশাক করবার সময় এল, তখন দেখা গেল যে, গুন্না আলমারি উজাড় করে সবচেয়ে ভাল শাড়ী আর জামা বার করেছে। মাধবী বলল, “বাগরে, কি ব্যাপার ?”

গুন্না অসহিষ্ণুভাবে মাথা কঁকিয়ে বলল, “তুমি কিছু জান না পিসীমা, ‘অপেরা’তে আর ‘ব্যালের’তে সবাই ভীষণ সাজে। আমরা ঠিকমত না সাজলে লোকে আমাদের গঁয়ে ভাববে। তুমি তোমার ঐ কিতে-পাড়ের গরমটা পরে যেও না যেন। দাদা ত তোমাকে খুব ভাল একটা শাড়ী দিয়েছিল, সেই বথন প্রথম তার চাকরি হ’ল, সেইটা পর না।”

মাধবী কি একটু ভেবে নিয়ে হাল্কা ধূসর রংয়ের সেই বেনারসীটিই বার করল। ভাইপো-ভাইঝি অনেক জেদা-জিহি করেও এটা তাকে একবারের বেশী পরাতে পারে নি। সাজসজ্জা শেষ করে বথন তারা বেকরল, তখন মনে হচ্ছিল যেন একসঙ্গে উষা ও সন্ধ্যা মুক্তি ধরে চলেছে। পরস্পরকে ছ’জন খুবই তারিক করল, সন্দের তৃতীয় ব্যক্তি তাদের মধ্যে কি ভাবলেন তা বোঝাবার অবশ্য কোন সুবিধা হ’ল না।

নাচটা তিন জনেরই খুব ভাল লাগল। গুন্না বলল,

“দেখলে পিসীমা, ভাগ্যে আমি অত চেষ্টামেচি করলাম, তাই ত দেখতে পেলে এমন জিনিস।

মাধবী ক্ষীণ একটু হেসে বলল, “জিনিসটা খুবই ভাল, সত্যি, তবে ধস্তাবাধটা কাকে দেব বুঝতে পারছি না।”

নিখিল বললেন, “আমাকে নিশ্চয়ই না, আমারই বরং উন্টে আপনারা ধস্তাবাধ দেওয়া উচিত।”

পরদিন মাধবী হরিশাধনবাবুকে বলল, “দাদা, কাল ত নিখিলবাবু একরাশ টাকা খরচ করলেন আমাদের নাচ দেখিয়ে আমাদেরও একটু কিছু করা উচিত তাঁকে আনন্দ দেবার জন্ত। কিন্তু এমন কিছু প্ল্যান কর যাতে তুমি বাধ না পড়। সুদিন তোমায় একলা ফেলে গিয়ে আমার বড় হুশিষ্টা হচ্ছিল।”

হরিশাধন ত সন্ধ্যার পবে-বেরোতে একেবারেই নারাজ। কাজেই সবাই মিলে ভেবে-চিন্তে স্থির কর যে, সামনের রবিবারে শিবপুরের বাগানে গিয়ে পিকনিক করা হবে।

রাগ্না রাগ্না সব ভোরে উঠে বাড়ীতেই করিয়ে নিল মাধবী ওখানে গিয়ে রাঁধতে বললে ত বেড়ান-টেড়ান কিছুই হবে না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে চেয়ে-চিন্তে একটা বাড়ীর গাড়ী জোগাড় হ’ল এবং ট্যাক্সিও একটা ভাড়া করা হ’ল। জিনিসপত্র আগলার র জন্ত রসিক চলল সঙ্গে।

বাগানে পৌঁছে গুন্না ত বনের হরিণের মত উদ্দাম হয়ে উঠল। খালি হুল ছেড়ে এগিয়ে যায়, আর হরিশাধনের হুশিষ্টা ধরে যায়। নিখিল ছ’তিন বার গিয়ে গুন্নাকে খুঁজে নিয়ে এলেন।

মাধবী বলল, “পারি না এ মেয়ের জালায়। খালি ছাড় গরুর মত দৌড়ে বেড়াচ্ছে।”

নিখিল বললেন, “ওয়েছেন উনি বাঙালীর ধরে, মনট কিছু একেবারে পশ্চিম জগতের মেয়েদের মত। প্রাণ-চাকল্যাটা ওদের বেশী।”

মাধবী হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ভাল করে ফুটল না।

খাওয়া দাওয়া হবার পর হরিশাধনবাবু একটু ছায়াঘর জায়গা বেছে নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। অন্তরা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

হঠাৎ রসিক বললে, “আরে, পাঁড়েজী এত হনুহনিয়ে আসছে কেন ? কি হ’ল আবার।” এই লোকটি হরিশাধনের আগেকার কলেজের দরোয়ান। বাড়ী আগলার জন্ত একে-বেথে আসা হয়েছিল। সবাই উদ্গীৰ্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

পাঁড়েজী প্রায় দৌড়ে এসে নিখিলের হাতে একটা

টেলিগ্রামের খাম ছিল। বলল, “ভয়ানক জরুরী, নীচের তলার বাবু বললেন, তাই নিয়ে এলাম।”

নিখিল বাস্তব হয়ে খামখানা খুলে বললেন, “সর্বনাশ।”

হরিশাধন উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, “কি হ’ল, খারাপ খবর?”

নিখিল বললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ।—ব্যাকটা ফেল হ’ল।”

মাধবী অশ্রুটন্তরে জিজ্ঞাসা করল, “আপনার টাকা ছিল ওখানে?”

নিখিল সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। হরিশাধন মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দবোয়ানকে বললেন, “তুমি বাড়ী ফিরে যাও। আমরাও আসছি, অল্প পরে। মাধু, জিনিসগুলো শুছিয়ে নাও, আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।”

নিখিল গাছতলায় যেমন চূপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই বইলেন। শুক্রা খবর শুনে একটা অশ্রুট আর্জুনাক করে বসে পড়েছিল, হঠাৎ উঠে দৌড়ে সামনের দিকে চলে গেল।

হরিশাধন বললেন, “বড় দুঃখের ব্যাপার হ’ল। তবে আপনি অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্যা মানুষ, এক কতি কালে পূরণ হয়ে যাবে।”

নিখিল সংক্ষেপে বললেন, “তা হতে পারে।”

মাধবী বলল, “শুকুটা আবার গেল কোথায়? এই ত এখানেই ছিল?”

নিখিল বললেন, “ঐ যে ঐ মোড়টার কাছে দাঁড়িয়ে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন।”

মাধবী উচ্চকণ্ঠে ডাকল, “শুকু শুনে যা।” শুক্রা নীর-মহুর্গতিতে এসে দাঁড়াল, “কি বলছ?”

মাধবী বলল, “চল আমরা যাচ্ছি।”

শুক্রা মাথা নেড়ে বলল, “আমি এখন যাব না। বেলার এগেছে দেখছ না ওদের সঙ্গে ফিরে।” নিখিলের দিকে তাকাল না।

হরিশাধন বললেন, “আচ্ছা যাও, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে।” মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ছেলেমানুষ, ওর কুত্তিগা কেন মাটি হয়?”

মাধবী কঠিনমুখে জিনিস গোছাতে লাগল, কোন উত্তর দিল না। নিখিল তার কাছে এসে বললেন, “সত্যি, বড় অসময়ে দুঃসংবাদ এস। এত আনন্দের আয়োজন আপনার দেব সব মাটি হয়ে গেল।”

মাধবী বলল, “আপনার ক্ষতির তুলনায় আমার আর কতটুকু ক্ষতি? কি যে আপনাকে বলব আমি তা ভেবেই পাচ্ছি না।”

নিখিল বললেন, “ক্ষতি অবশ্য হ’ল খানিকটা। কিন্তু শুধু ক্ষতিই কি হ’ল মাধবীদেবী?”

মাধবী নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিখিল বললেন, “কীচ আর হীরার তফাৎ বোঝবার যে জ্ঞান, সেটাকে আমি এক ক্ষতির অনেক উপরে স্থান দিচ্ছি।”

## বিরহিনী

শ্রীকালিদাস রায়

সখীরা চলে গেছে                      গা ধুয়ে নিজ ঘরে

গাগরী ভরি কালো জলে,

এখনো দীর্ঘিনীয়ে

ডুবায় তন্তুটিবে

কে করে ঘেরি কোন্‌ ছলে?

দন্তে কাটিতেছে

পাপড়ি কমলের

কে অই করে জলখেলা,

গাগরী ভরে আর

চালিয়া কেলে জল

শুধুই ভরা আর কেলা।

সারাটি দিন ধরে

বহেছে ধবতাপ

নীতল জলে অবগাহ

আরামদায়ী বটে

কিন্তু ওব কেন

কিছুতে হুঁচিল না হাহ?

সন্ধ্যাতারকাটি

কখন উদ্বিগ্নাছে

চাহিয়া আছে তার পানে,

ভীরের বেণুবনে

জোনাকি চমকায়,

বি'বি'রা ডাকে একতানে।

পাখীর কলরব

ঝামিয়া গেছে, তারা

নীড়ের বাহিরে না বয়।

আঁধার ঘনাইছে

কিরিতে বনপথে

ওব কি করিবে না ভয়?

বড়ই সাধ যায়

শুধাই গিয়ে ভায়

কে তুমি ঘাটে একাকিনী,

কিরিয়া যেতে ধরে

কেন না টান পড়ে

তুমি কি তবে বিরহিনী?



# দীপালীর পরে

শ্রীমুখময় সরকার

কার্তিকী অমাবস্তার ভারতের প্রায় সর্বত্র মহাসমারোহে দীপালী-উৎসব। প্রবাসীতে (১৩৬২—মার্চ) ‘দীপালী’ বর্ণনা করিয়া তাহার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছি। এক্ষণে তাহার পরবর্তী দুই-তিন দিনের উৎসব বর্ণনা করিতেছি। আমাদের বর্ণনীয় উৎসবের দেশ বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ।

দীপালী-অমাবস্তার পরদিন যে প্রতিপদ তিথি, তাহার বিশেষ নাম দ্বাত-প্রতিপদ। আর এক নাম বীর-প্রতিপদ। দ্বাত-প্রতিপদে দ্বাত-ক্রীড়া শাস্ত্রীয় বিধান। সে বিধান অদ্যপি আমরা মানিয়া চলি। পূর্বপ্রাতে চণ্ডীমণ্ডপে শ্রাদ্ধ পূজা হইয়া গিয়াছে, প্রতিমা এখনও বিসর্জন হয় নাই। মণ্ডপটি এখনও সুসজ্জিত, অস্ত্রশাখার বনমালা এখনও শুকাইয়া যায় নাই; অলিম্পন-রেখা এখনও মুছিয়া যায় নাই। দেওয়ালের বন্ধু, বন্ধু এখনও বেন ধূপের গন্ধ লাগিয়া আছে। সেদিন বৈকাল হইতে চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারপিণ্ডে শ্রৌচ ও প্রবীণদের সমাগমে মুখর হইয়া উঠে। এখানে-ওখানে পাঁচ-সাতটা শতবজী পাতিয়া পাশাখেলা আরম্ভ হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরের অধীশ তাহাদের গন্ধে আর ‘কচে বায়ো’ ছকায়ে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। বালক-যুবকেরা পাশা খেলিয়া আমোদ পায় না, কিন্তু তাহার বিকল্প কেবল-বোর্ড আছে। চণ্ডীমণ্ডপের দেহলীতে অভিব্যক্তদের সাক্ষাতে কেবল-বোর্ড খেলা সম্ভবপর হয় না; তাই এ পাড়ার-সে পাড়ার দুই একটা নিভৃত বৈঠকখানার তাহাদের কেবল-খেলার আসর জমিয়া উঠে।

দ্বাত-ক্রীড়ার বিকৃত রূপ জুয়াখেলা। কেবল শকাব্দসারে নয়, অর্থস্বারেও। দ্বাত-প্রতিপদের সমস্ত রাত্রি জুয়াখেলা চলিতে থাকে। বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম, পাশের গ্রামের অমর বাড়ীজ্ঞে ছিল একমাত্র জুয়াড়ী। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বিজ্ঞপী-শাখ এক অখণ্ডের মূলে সে জুয়ার ছক পাতিয়া বসিত, আর দুই-চারি জন অতি সঙ্কোচে পরস্পর খেলিতে আসিত। ইদানীং দেখি, জুয়াড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। আমতলা, নিমতলা, বিষ্ণুমন্দিরের চম্বর, পুরাতন ভাঙ্গা ভোগের-দালান, সমস্ত জুয়াড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। জুয়াখেলা বে-আইনী। কখনও কখনও দেখা যায় দুই-একটা লাল পাগড়ী ঘোরাঘুরি করিতেছে। কিন্তু তাহারা কিছু দেখিতে পায় না। মধ্যাহ্নে কাগজের নোটের বাবধান। দ্বাতক্রীড়া ভারতে কতকাল ধরিয়া চলিতেছে। বৈনিক আর্ধগণ দ্বাতক্রীড়া করিতেন। মহাত্মার কুরু-পাণ্ডবের দ্বাত-ক্রীড়ার কুরু-বরূপ লোকদুই, বীরদুই, ধর্মদুই ভারত-যুদ্ধে যাত্রা আঠার দিনে ভারতের

সর্বনাশ হইয়াছিল। এখনও কত লোক জুয়া খেলিয়া বাতাসাতি সর্ব্ব্বান্ত হয়। তথাপি শাস্ত্রে ইহার বিধান কেন? পরে সে কথা বলিতেছি।

দ্বাত-প্রতিপদের ঋপর নাম বীর-প্রতিপদ। কেন এই নাম? সেদিন কেহ বীত্ব প্রকাশ করে কি? অজ্ঞ কোথাও করে কি না, জানি না; কিন্তু বাঁকুড়ার করে। এখানে সে বীত্ব-গাথা গাহিব। অবশ্য এই বীরত্ব-প্রকাশ বাটুরী, হাড়ী, ভূমি, সঁওতাল কোড়া (কোলাঃ?) প্রভৃতি অস্ত্রাঙ্গ ও উপহাতিয় লোক-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাঁকুড়ার এই উৎসবের নাম গোরু-খোঁটানো, কাড়া-খোঁটানো। গ্রামে সাধারণের বাতাসাতের অপ্রশস্ত পথ; বর্ষাকালে তাহার উপর দিয়া স্রল বহিয়া যায়; সে পথের নাম কুলি। কুলির মাথায় এবং অঙ্গ উন্মুক্ত স্থানে মাঝে মাঝে মোটা মোটা শক্ত খোঁটা পুতিয়া দেওয়া হয়। একটা কবিয়া দীর্ঘশূল সবল বলীবর্ধ অথবা পুং-মহিষ (স্থানীয় নাম কাড়া) খোঁটার খোঁটার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মোড়িটা এমন আলগাভাবে বাঁধা হয় যে বলদ বা মহিষ স্বচ্ছন্দে খোঁটাকে কেন্দ্র করিয়া বাদংবার ঘুরিলেও মোড়ি খোঁটার সড়াইয়া যায় না। সাধারণতঃ বৈকাল বেলায় গোরু-খোঁটানো আরম্ভ হয়। খোঁটার বাঁধা গোরু বা মহিষের সহিত বাতাসা বিক্রম প্রকাশ করে, তাহারা মতপান করে। দুই-একদিন পূর্ব হইতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাউল সংগ্রহ করে, সেই চাউলের পচাই বা হাড়িয়া মদ তাহারা নিজেবাই চোলাইয়া লয়। জুয়াখেলার মত মদ চোলাইও বে-আইনী। কিন্তু আইনকে বৃদ্ধগুষ্ঠ দেখাইয়া নিবিবাদে ইহার উৎসবের প্রয়োজনমত মদ প্রস্তুত করিয়া লয়। বলদ-মহিষের সহিত বিক্রম-প্রকাশকারীরাই সম্ভবতঃ ‘বীর’ অর্থাৎ তাহাদের বেশভূষা। মুখে কালি, সর্ব্বাঙ্গে খড়ির বড় বড় দোঁটা। যেন এক একটা প্রেত। তাহাদের পরিধানে বীর-খটি (মাল-কোঁচা-করা ছোট কাপড়); গলার শালুক কুলের মালা; হাতে একটা পুতিগদ্বী, অর্ধগুচ্ছ গো-চর্ম বা মহিষ-চর্ম। এক পার্শ্বে একদল ‘গায়ের’ গীত গাহিতে থাকে—কৃষ্ণ-লীলার গীত। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার কত কবি এমন গীত রচিয়া গিয়াছেন, কে তাহার হিসাব রাখে? সে গীতের সুর সরল, ভাষা আরও সরল, কিন্তু বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ঠিক কেমন গীত, না শুনিলে কেবল ভাবায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আর একদিকে কাড়া-নাকাড়া বাজে। নাকাড়ার শব্দ শুনিয়া খোঁটার বাঁধা বলদ ও মহিষ মাতিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে বীরগণও মত্ত হইয়া তাহাদের সমীপবর্তী হয়। মুখে এক প্রকার বিকট শব্দ



করিয়া তর্জক চর্মণে লইয়া যেখন কোন বীর আসিয়া বলদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, অমনট সে বলদ শূঙ্গ আন্দোলন করিয়া বীরের নিকট ধাবিত হয়, শূঙ্গধারা তাতাকে আঘাত করে, কখনও বা বীরকে শূঙ্গ উত্তোলন করিয়া দশ-বিশ হাত দূরে নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া বীর হামাগুড়ি দিয়া আবার একটা মতিবেগ সজ্জিত বিকৃত স্বর-সংযোগ করিয়া মুগ্ধজি বিকটতর করিয়া একটা বলদে সম্মুখীন হয়; আদ্য অমনট বক্ত-চক্ষু বলদটা ঘাড় বাঁকাইয়া নাসারন্ধ্রে দৌস দৌস শব্দ করিতে করিতে বীরকে আক্রমণ করে। শূঙ্গ দ্বারা আঘাত হইয়া বীর ডিগবাজী খাটতে খাটতে খানিকটা দূরে চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। এইরূপে বোঁটার হারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বগু ও বীর, উভয়ের বীরত্ব প্রকাশ চলিতে থাকে। কখনও কখনও মহিষ বা বলিবর্দের শাণিতাশ্রয় বীরের দেহে বিদ্ধ হইয়া যায়, কখনও কোন মহিষ বন্ধন-বন্ধ ছিন্ন করিয়া জনতা ভেদ করিয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়টতে থাকে। ইহাতে অনেকটাই আশঙ্ক হয়, কাহারও বা প্রাণহানি সম্ভব হয়; তথাপি এই উৎসব দেখিতে গ্রামের সকল লোকই সমবেত হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে বন্ধনযুক্ত বলীবর্দ বা মহিষের সজ্জিত বীরেরা লড়াই করিত; এখনকার বন্ধনযুক্ত বলীবর্দ বা মহিষের সজ্জিত লড়াই সেট প্রাচীন রীতির অনুবর্তন। খ্রীস্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর চতুর্থ শতাব্দীর আরোহণ করিয়াছিল, তখনও সেখানে Bull-fight ছিল; কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্পেন দেশেও ছিল

•

গোপ-বোঁটানো সূর্যাস্তের পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। ইহার পর গো-পূজা। গো-পূজাও শাস্ত্রীয় বিধান। গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রচলিত নাম 'গোপ-বান্দনা' অর্থাৎ গো-বন্দনা। হেমন্তের স্তিমিত-বিক্রম সূর্য বধন পশ্চিম গগনে অস্তরಾಗ ছড়াইতে ছড়াইতে বিনায় গ্রহণ করেন, পশ্চিমবঙ্গ বধন কলরব করিতে করিতে কুলার প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে, উল্লসিত গাভীর দল তখন গ্রাম-পথে গোপূজ-বেণু উড়াইয়া গোপূজার মায়ালোক রচনা করিতে করিতে গোধী হইতে গৃহে ফিরিয়া আসে। গাভীগণ গৃহাগত হইবামাত্র গৃহিণী হরিজ্ঞা-চূর্ণ-মিশ্রিত জলে তাহাদের পা ধোয়াইয়া দেন। কোন কোন গৃহিণী স্বীয় কেশগুচ্ছ দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীর ঘোঁত পদ মুছাইয়া দেন। তার পর সকল গোপূজ গাভ্রে কলিকা কিংবা বাটি দিয়া রঙের ছাপ দেওয়া হয়। শ্রামলীর গাভ্রে খড়িব সাদা ছাপ, ধবলীর গাভ্রে গিদি-মাটির লাল ছাপ। গোপূজার অঙ্গরূপ সমাপ্ত হইলে তাহাদের লেজের কেশগুচ্ছ কাঁচি দিয়া ছাটিয়া সূদৃশ করা হয়। তার পর আরম্ভ হয় প্রত্যেক গাভীর প্রসাধন। প্রত্যেকের শূঙ্গ ধাক্ক-শীর্ষে সীধি-মৌর এবং গলায় শ্রামলতাব মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। সীধি-মৌরগুলি সাধারণতঃ রাখালেয়াই প্রস্তুত করে, কদাচিৎ গৃহিণীয়া। সীধি-মৌরের কাককার্ব রসিকজনের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। শ্রামলতা পাওয়া না গেলে প্রিঙ্গলতা অথবা শালুক ফুলের মালা গাভীদের কঠিনে শোভিত করে। সন্ধ্যার পর গুরোহিত আসেন। বরণডালা রীতিমত সজ্জিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও ভল্লধ্বনি সহকারে গাভীদের বরণ করা হয়। সেদিন যথাসম্ভব স্তব্ধ দিয়া গাভীগণকে আপ্যায়িত করা হয়। গৃহপালিত পশুকে এমন করিয়া আদর করিতে কোন ভাতি জানে কি? উহারা যে ইচ্ছা প্রাণী, সেদিন সে কথা ভুলিয়া যাটতে হয়; মনে হয় যেন উহারা আমাদের পরিবারভুক্ত আত্মীয়-স্বজন। পশু ও মানুষের সম্পর্ক যে কতদূর নির্বদ্দ হইতে পারে, তাহা বুঝিবার স্তম্ভ পুরাতন পুথির জীর্ণ পাতা উন্টাইবার পূর্বে এই সকল গ্রন্থকে আসিয়া প্রতিপদের 'গোপ-বান্দনা' দেখিলে অধিকতর কসলাই হইবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দ্বাত-প্রতিপদে রাত্রি-জাগরণে বিধেয়। কোন রাত্রি-জাগরণ করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু এতদ্ব্যতীত রাত্রি-জাগরণের যে বিচিত্র উপায় অবলম্বিত হয়, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করিতেছি। দ্বাত-ক্রীড়া, রাত্রি-জাগরণের একটি উপায়, কিন্তু ইহা সকলের জ্ঞান নহে। নারীগণ দ্বাত-ক্রীড়া করেন না, অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকারাও দ্বাতক্রীড়ার জটিলতা স্বপ্নময় করিতে পারে না। রাত্রি-জাগরণের অগ্রগত উপায় আছে—রামায়ণ-গান, ব্যাক্তা-গান, কীর্তন-গান। কিন্তু সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া গান শুনিবার ধৈর্যও সকলের থাকে না। রাত্রি-জাগরণের সর্বাপেক্ষা কৌতুকর ও সর্বজনিক অবলম্বন 'টাই ঘোড়ার নাচ'।

গভীর রাত্রে 'টাই ঘোড়ার নাচ' অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাড়ীরা এই নাচ নাচিয়া থাকে। হাড়ীরা ঢাক বাজাইতেও নিপুণ। টাই ঘোড়ার নাচে ঢাকের বাজনা উপভোগ করিবার মত। নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন ঢাকের বক্ত-নির্ঘোষ গ্রাম-প্রান্ত হইতে শ্রুত হয়, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তন্ময়া টুটিয়া যায়। টাই ঘোড়ার নাচ এক বিচিত্র ব্যাপার। 'টাই ঘোড়া' কোন জীবন্ত প্রাণী নয়। খড়, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা একটা ঘোড়ার মুখ নির্মাণ করে, তাহার উপর কাপড় জড়াইয়া কালি দিয়া মুখ-চোখ আঁকিয়া দেয়। মুখের পশ্চাতে ঘোড়ার দেহের সমান আয়তনের একটা বাঁশের ফ্রেম, সমস্তটা কাপড় দিয়া ঢাকা। ঘোড়ার পশ্চাতে শণের লেজটি কিন্তু চমৎকার তুলিতে থাকে। একটা মানুষ ফ্রেমের মধ্যে ঢুকিয়া দুই হাতে দুই দিকের বাজু ধরিয়া নাচ আরম্ভ করে। রাত্রিকালে আলো-অন্ধকারের রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে মনে হয়, সত্যি একটা লোক ঘোড়ার চড়িয়া আছে এবং ঘোড়াটা বাজনার তালে তালে নাচিতেছে। একটা নয়, দুইটা নয়, সাত-আটটা টাই ঘোড়া সারি সারি দাঁড়ায় এবং ঢাকের বাজনার তালে তালে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচে। ঘোড়-সওয়ার মাঝে মাঝে এমন 'চিহি-হি-হি' শব্দ করিয়া উঠে, মনে হয় সত্যি অশ্বের হেঁদাধ্বনি। ঘোড়-সওয়ার ব্যতীত নাচের দলে অনেক লোক থাকে। তাহাদের

মধ্যে কেহ গান গায়, কেহ বাজনা বাজায়। ঋণিকক্ষণ পরে নাচ-গান-বাজনা থামিয়া যায় এবং হুই জন লোক সম্মুখে অগাধিরা আসে। ইহারা যে দলের অধিকারী, বেশভূষা এবং চালচলন হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাথায় পাংগড়ী, হাতে লাঠি মুখে প্রকাণ্ড টাঙ্গির মত একজোড়া গৌক। গায়ে বেনিয়ানের মত জামা, খুঁটি পরায় ধরণ পশ্চিমাদের মত। একজন অপর জনকে বলে, "আরে নাগরিয়া, তোর ঘোড়া কোথায় কিনেছিলি বা! এ যে একদম নাচেতে নায়ে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দেয়, "নাচেতে নায়ে, কি বা? এ ঘোড়া আমি যে হবিহারের কুন্তমেলার কিনেছি বা।"

প্রথম। আরে ছিঃ ছিঃ! ছ্যাঃ ছ্যাঃ!! ছোঃ ছোঃ!!! কুন্তমেলার তাহার ভাল ঘোড়া কবে পাওয়া যায় বা? হাসিস না ভাই, তা তোর ঘোড়ার দাম কত শুনি।

দ্বিতীয়। আমার ঘোড়ার দাম তিন লাখ পাঁচ হাজার। তোর ঘোড়ার দাম কত? কিনেছিস কোথায়?

প্রথম। আমার ঘোড়ার দাম পাঁচ লাখ তিন হাজার। কিনেছি হরিহরছত্রের মেলার। বুঝেছ ভায়া? একবার নাচ দেখতে চাস? তবে চলুক ভাই!!

বলিষামাত্র ঢাকের বাদ্য বাজিয়া উঠে, আবার ঘোড়া-নাচ আরম্ভ হয়। এইরূপে উৎসাহ লাভ পাইয়া নাচ চলিতে থাকে। আবার-বৃদ্ধ-বয়সী সকলেই নাচ দেখিয়া আমোদ পায়, তাহার। "কেশে সাদারাজি আগিয়া থাকিতে পারে। নাচ শেষ হইলে দক্ষিণে আসিয়া 'শিরোপা' প্রার্থনা করে। তখন কেহ পরস, কেহ পুগাতন কাপড় ইত্যাদি আনিয়া দেয়। শিরোপা পাটয়া ঘোড়া-নাচের দল যখন প্রকৃত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন পাহাড়ের চূড়ায় পূর্বগগনে অরুণ-রাগ প্রকাশিত হয়।

দুর্ভাগ্য-প্রতিপদের দিন বাঁকুড়ার বিশেষ অস্থান 'জামাই-বান্দনা' (অর্থাৎ জামাত-বন্দনা); কেহ কেহ বলে 'জামাই-কোটা'। আবার কেহ কেহ 'বান্দনা' শব্দ 'বন্দন' শব্দজাত মনে করিয়া জামাতকে বোধিতা কৌতুক করে। এটি স্বচক্ষে দেখি নাই, অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। স্মৃতিতে ইহার বিধান নাই, পঞ্জিকার ইহার উল্লেখ নাই, অথচ বাঁকুড়ার ইহা অবস্থমান কাল প্রচলিত আছে। শ্রদ্ধা সেদিন প্রাতঃকালে চতুঃপাতা হইয়া নিমন্ত্রিত জামাতার ললাটে চন্দনের তিলক আঁকিয়া দেন এবং শিরে ধাতুর্বা দিয়া আশীর্বাদ করেন; তাহার দীর্ঘায়ু: কামনা করেন, তাহাকে উত্তম ভোজ্য, পানীয় ও বস্ত্রাদি দিয়া আপ্যায়িত করেন। জামতাও স্বশ্রুতে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, কেত্র বিশেষে স্বশ্রুতে স্বভাব সজিত বস্ত্রাদি উপহার দেয়। ত্রৈলোক্য মাসের শুক্লপক্ষে অরণ্যমস্তীর দিন অগ্ন্যজ্ঞ 'জামাই-বধী' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেদিন বাঁকুড়ার জামাত-বন্দনা হয় না। উদ্যোগী কদাচিত্ কেহ কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গের অধিকরণে 'জামাই-বধী' পালন করিতেছে, দেখিতে পাই। পঞ্জিকার জামাই-বধী উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা 'আচার্য'।

পরদিন জাতৃ-বিলীয়া। প্রাতঃকালে ভগিনীরা স্নান করিয়া তৃচি বসন পরিধানপূর্বক জাতৃপূজনের জন্ত প্রস্তুত হয়। প্রচলিত নাম 'ভাই-কোটা'। এই অনুষ্ঠানের তাৎপৰ্য অতি মধুর। ভগিনী জাত্যার ললাটে চুয়া-চন্দনের তিলক আঁকিয়া দিয়া ভালবাসার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া বলিতেছে, "ভাইয়ের কপালে দিলাম কোটা। যমের দ্বারে দিলাম কাটা।" "ভবনম দ্রবন্ত যম" যে যম, বাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, ভগিনী ভালবাসার শক্তিতে সেই যমকে ধাক্কা দিতে চায়। মৃত্যুকে অস্বীকার করিবার স্পষ্ট রাখে। সেদিন কেবল যে সন্তোদহা ভগিনীই সন্তোদহ জাত্যার ললাটে তিলক দিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করে তাহা নহে, পারিবারিক সম্পর্কে, গ্রাম-সম্পর্কে, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে জাত্য-ভগিনী সম্পর্ক হটলেই ভাই-কোটা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। পতিগৃহবাসিনী বিবাহিতা ভগিনী সেদিন পিতৃভ্রাতৃ আশ্রয় করে, যদি কোন কারণে তাহা না পাবে, জাতৃগণকে সে পতিগৃহেই নিমন্ত্রণ করে। সেদিন ভগিনীর হস্তে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণতঃ জোষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠ জাত্যকে এবং জোষ্ঠ জাত্য কনিষ্ঠা ভগিনীকে সেদিন বস্ত্রাদি উপহার দেয়। বাহার ভগিনী নাই, অন্ততঃ সেই দিনটির জন্ত তাহার মনে হয়, সে বড়ই দুঃখাগ। গৃহে গৃহে সেদিন আনন্দের কলরোল, মঙ্গলিক ছন্দধ্বনি ও শব্দধ্বনি, আর 'দীর্ঘতাং জুজাতাম্।'

জাতৃ-বিলীয়ার দিনে আনন্দ পরিবেশন করে 'কাঠি নাচের দল।' বাড়ী-হাড়ী এবং কোড়া-সংকালেরাই সাধারণতঃ কাঠিনাবে দল বানাষ্টয়া এই শুভদিনটিকে উপভোগ্য করিয়া তোলে। একদল বালককে নারীর বেশে সজ্জিত করা হয়। মাথায় হীরাফের কালি-মাথানো শূণ্যের পরচুলা, নাকে নখ, কানে হল, কপালে মাংতার টিপ, বুক কাঁচুলি, হাতে চুড়ি, কোমরে বাগরা, পায়ে যুগ্ম। ইহায়াই নর্তকী। প্রত্যেক নর্তকীর হাতে একজোড়া 'কাঠি' আর কোমরে গোজা একটি করিয়া কুমাল। সঙ্গে একদল 'পায়ের' আর অন্ততঃ একজোড়া মাদল। নাচের দল যে গ্রাম হইতেই আশ্রয় না কেন, প্রথমে চণ্ডীমণ্ডপের সমুদয় প্রাঙ্গণে নাচ দেখায়, তার পর বাড়ীতে বাড়ীতে। প্রথমটা চিমে তালে মাদল বাজে, গায়নেরা শ্রব ভাজে আর নর্তকীর দল সারি সারি ঝাঁড়িয়া এক হাত কোমরে দিয়া আর এক হাতে কুমাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘোঁষে ঘোঁষে নাচ শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে এক হাতে কাঠি লইয়া নৃত্য। তখন মাদল দ্রুতলয়ে বাজে, পায়নের গান চলে পুরানদে। সেই গ্রাম্য কবির কুন্ডলীয়ার গান। নাচ-গান-বাজনা যখন শেষ আসিয়া ঠেকে, তখন নর্তকীর দল দর্শকদলকে চকিত করিয়া সম্মুখে কলকণ্ঠে বলিয়া উঠে, "বিজাহুল ঘরে নাই—বিও—বিও।" নৃত্যের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হইলে হুই হাতে কাঠি লইয়া নৃত্য আরম্ভ হয়। কখনও সম্মুখে নত হইয়া, কখনও বসিয়া বসিয়া, কখনও শুইয়া শুইয়া নানা ভঙ্গিতে নর্তকীরা নাচে। মাদল তখন দ্রুততম লয়ে

রাজিতে থাকে আর গায়েনদের গানের স্বর তখন পঞ্চমে পৌঁছিয়া যায়। অপূর্ণ এই লোকনৃত্য। না দেখিলে ইহার মহিমা উপলব্ধি করা হইবে না। গরীব-স্বামী চাষী-মজুরের ছেলে মাত্র দুই-চারিদিনের মহড়ার এই নৃত্য অভ্যাস করিয়া লয়। ইহাদের শিল্প-প্রতিভা অনস্বীকার্য। অথচ ইহাদিগকে উৎসাহ দিবার কেহ নাই। এই নৃত্যকলা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শিক্ষিত ভদ্রসমাজে কেহ মাথা ঘামাটতে চাহে না। শুকসদয় দত্ত 'ব্রহ্মচারী' আন্দোলনের মাধ্যমে ভদ্রসমাজে এই নৃত্য প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু 'ব্রহ্মচারী' এখন লুপ্তপ্রায়। দৌলিন বঙ্গমঞ্চে এট মতের অভিনয় নিত্য প্রহসনে পূর্ণবসিত হয়।

কাটিনাচের পাটয়ে-বাঁজিয়ে-নাচিষের দল গ্রামবাসীকে আনন্দ দান করিয়াই তুষ্ট হয়; তাহাদের দাবি নিতান্তই তুচ্ছ। কেহ হুটটা পরমা দেয়, কেহ দুইমুঠা চাউল, কেহ চারিটি মুড়ি-মুড়কি। এক-আধটা পুরাতন ছেড়া কাপড়-জামা পাইলে তাহাদের আশ্রয়ের সীমা থাকে না। এই স্বল্প-তুষ্ট শিল্পীর দল দেশের যে কি মূল্যবান সম্পদ, গ্রামবাসী তাহা জানে না। তাহারা বৎসে বৎসে ভাঙতিয়ায় দিন বেলা আড়াইপ্রহর হইতে রাজি দেড়প্রহর পর্যন্ত গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থানে যে আনন্দ সুখ পরিবেশন করিয়া যায়, তাহার মূল্য অতি অল্পলোকেই বোঝে। তাহাদের স্বপ্ন কেহ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।

ভাত-বিতীয়ার পরদিন তৃতীয়া তিথি; কিন্তু লোকে বলে 'ষম-বিতীয়া'। ষম-বিতীয়া বলিয়া কোন পর্ব নাই; যদি থাকে, সে ঐ ভাত-বিতীয়ার দিন। সেদিনই ষম-ষমুনা ও চিত্রগুপ্তের পূজা বিহিত। কিন্তু প্রাকৃতজ্ঞানে তাহা জানে না। তৃতীয়ার দিনে 'ষম-বিতীয়া' হয়, ষমুনা তাহার ভাতা ষমকে ফোঁটা দেন,— এই বিশ্বাস ব্যাপক ও দৃঢ়মূল। এই বিশ্বাসের বশে সেদিন কেহ কোন শুভকর্ম করে না, কেহ বিদেশ-যাত্রা করে না। তবে উৎসবের বেশ সেদিন পর্যন্ত প্রায় সমভাবেই বিজ্ঞান থাকে। সেদিনও নিবাতাগে কোন কোন বংসব কাটিনাচ হয় এবং প্রায় প্রতিবংসর রাজিতে যাত্রাগান অথবা রামায়ণ-গান হয়।

এক্ষণে এই সকল উৎসবানুষ্ঠানের মূল অন্বেষণ করি। দ্বাত-প্রতিপদের রাজিতে কেন দ্বাত-ক্রীড়া করিতে হয়, ইহাই প্রথম প্রশ্ন। সেদিন রাজি-জাগরণ ও শাস্ত্রীয় বিধান, পূর্বে বলিয়াছি। দ্বাত-ক্রীড়া রাজি-জাগরণের একটি অবলম্বন। কিন্তু ইহার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। রাজি-জাগরণের বিধানই বা কেন? দীপালী-প্রবন্ধে দেখিয়াছি, অতি প্রাচীন কালে কাস্তিকী অমাবস্তায় দিব্য দক্ষিণায়ন হইত এবং পরদিন দ্বাত-প্রতিপদে নূতন বংসব আরম্ভ হইত। ইহা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কথা। সমস্ত রাজি বিনিষ্ট থাকিয়া তখন নববর্ষ দিবসটিকে চিহ্নিত করা হইত। রাজিতে লোকে প্রতিদিনই নিদ্রা যায়; কিন্তু বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে লোকে রাজি-জাগরণ করে। বিশেষতঃ সেই সুদূর অতীত কালে যখন পঞ্জিকা বলিয়া কিছু ছিল না, তখন নববর্ষ-

দিবসটিকে বৈশিষ্ট্য দান করিবার জন্য রাজি-জাগরণ একটি বিশেষ উপায় ছিল। নববর্ষ দিবসে দ্বাত-ক্রীড়ার তাৎপর্য আছে। দ্বাত-ক্রীড়ার স্বরূপের ভিত্তিতে লোকে অনুমান করিয়া লয়, সমস্ত বংসরটা কেমন কাটিবে। ভবিষ্যৎ বৎসর অশ্রুতিকর হউক, বৎসই ভয়ঙ্কর হউক, তাহাকে জানিবার, তাহার আভাস পাইবার জন্য মানব-মনেই একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আছে। এক কালে কোজাগরী পূর্ণিমাতেও নববর্ষ আরম্ভ হইত বলিয়া সেদিনও দ্বাত-ক্রীড়া ও রাজি-জাগরণের বিধান হইয়াছে (১৫৬৫ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে কোজাগরী পূর্ণিমা পড়)।

গো-পূজন, জামাতা-বন্দনা, ভাতপূজা—এ সমস্তই নব-বর্ষোৎসবের সহিত জড়িত। ভাবতীয় অধিগণ পঞ্চমের তীয়ে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কৃষিকর্ম ব্যতীত কোন জাহি সভ্য হয় না, আর গোপ ব্যতীত কৃষিকর্ম সম্ভবপর নহে। মানব-সভ্যতার উন্নয়ে গোকে যে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বংসবের প্রথম দিনে তাই গোজর বিশেষ আদর-বড় করা তাহার স্বাভাবিকতার নিদর্শনমাত্র। এবং ইহা সভ্যতার পরিচয়ই বহন করে। জামাতা, ভাতা প্রভৃতি প্রিয়জনকে আনন্দ-আপ্যাদন এবং তাহাদের মঙ্গলকামনা নববর্ষের পূর্ব স্বাভাবিক অঙ্গ। নৃত্য-গীতানি আনন্দ-আনন্দের বংসবের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। বংসবের প্রথম দিনে আনন্দে কাটিলে সমগ্র বংসব স্বখে কাটিবে, প্রাচীনকালে এটি বিশ্বাস ছিল, এখনও আছে।

কতকাল ধরিয়া এই সকল উৎসব চলিতেছে, দীপালী-প্রবন্ধেই তাহা জানা গিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধ পূর্ব-দিবসের পোষকতা করিয়া প্রাচীনতর কালের ইঙ্গিত করিবে।

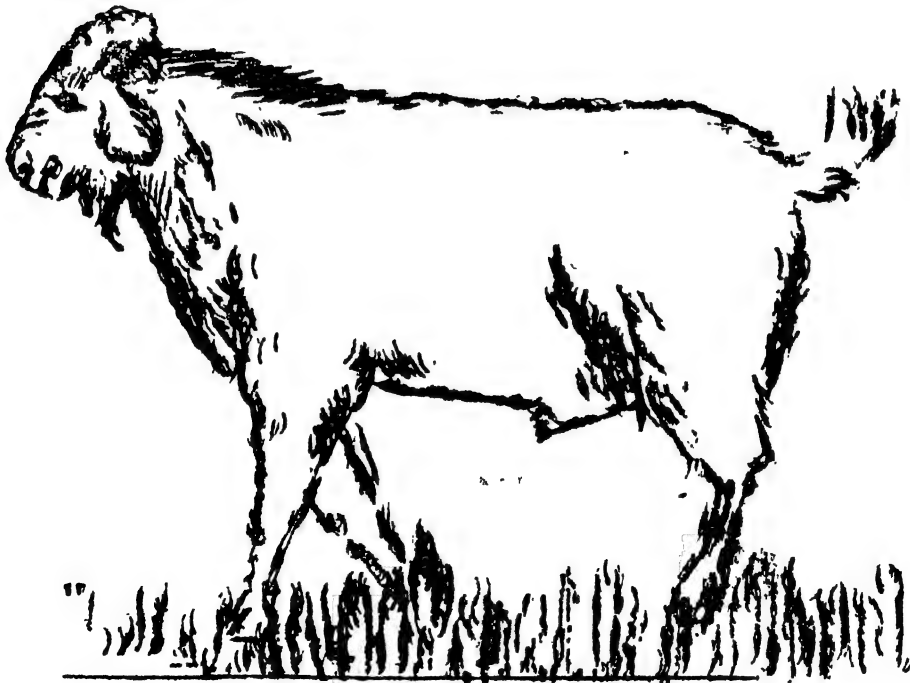
ঐতিহাসিকভিত্তিক বিজ্ঞান দ্বাত-প্রতিপদের দিন বসন্তোৎসব-পূজার বিধান দিয়াছেন। ঐতিহাসিকভিত্তিক অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ না হইলেও নিশ্চয় ভ্রাতৃত্বে প্রাচীন স্মৃতি অনুসৃত হইয়াছে। হেতু ব্যতীতে কেহ কোন কর্ম করে না, সে হেতু জাত হইতে পারে, অজাতও হইতে পারে। দ্বাত-প্রতিপদে দৈত্যরাজ বলি পূজিত হইতেন কেন? নিশ্চয় সেদিন দৈত্যরাজের কোন বিশেষ মহিমা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে মহিমার কথা সকলেই জানেন, বহু পূর্বে তাহার উল্লেখ আছে। দৈত্যরাজ বলি একদা মহা-পরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া বিরাট দান-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু বামন-মূর্তি ধারণপূর্বক যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি বাচনা করিলেন। দৈত্যরাজ দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু প্রথম পদে স্বর্গ, দ্বিতীয় পদে মর্ত্য আকীর্ণ করিলেন। বলি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বিষ্ণুর দেহ হইতে তৃতীয় পদ উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণু তৃতীয় পদ কোথায় রাখিবেন? বলির প্রার্থনামুসারে ভগবান তাহার তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করিলেন। তৃতীয় পদ সহ বলি পাতালে নিবদ্ধ হইলেন। হৃদয়বিশিষ্ট পাজালের অধিপতি

হট্টয়া হইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু তৃতীয় পদ মন্তকে ধারণ করায় সৌভাগ্য বোধন দৈত্যবাজের হট্টয়াছিল, নিশ্চয় তিনি সেদিনই পুন্না পাট্টবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন।

আমরা একাধিক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, বিষ্ণু সূর্য্য। দৈত্যবাজ বলি কে, “ভদ্রবিক্ষেপঃ প্ৰথমঃ পদম্” প্রবন্ধে (প্রবাসী—১৩৬৫। আখনি) তাহারও ইঙ্গিত পাট্টয়াছি। মূলা নক্ষত্রের অধিপতি বাক্স বা দৈত্য। অর্থাৎ মূলা-নক্ষত্রই দৈত্যবাজ বলি। মূলায় তাহাগুলি যোগ করিলে এক দানবের আকৃতি পাওয়া যায়। অংকাশের দক্ষিণ অংশ পাতাল গণ্য হইত। মূলা-নক্ষত্রও আকাশের দক্ষিণ অংশে থাকে। মূলা-নক্ষত্রের বৈদিক মান নিগূহিত। নিগূহিত শব্দের অর্থ মৃত্যু। পরবর্তী কালে নিগূহিত এক বাক্সী কল্পিত হইয়াছিল। তাহার নামানুসারে নৈখাত কোণ। বিষ্ণু তৃতীয় পদ বলির মন্তকে স্থাপন করেন—এই রূপক-কাহিনীর কলিতার্থ এই যে, সূর্য্য মূলা-নক্ষত্রে গমন করিলে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। সে কতকালের কথা? বর্তমানে অর্দ্রা-নক্ষত্রে বরির দক্ষিণায়ন হয়। অশ্বিনাদি নক্ষত্র-গণনার অর্দ্রায়

স্থান বর্ষ, মূলায় স্থান উনবিংশ। উক্তয়ের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র-ভাগের ব্যবধান। অরুন-দিন এক নক্ষত্র-ভাগ পশ্চাদগত হইতে প্রায় ২৫০ বৎসর লাগে। অতএব আনুমানিক ১৫০×১৩ ১২,৩৫০ বৎসর পূর্বে মূলা-নক্ষত্রে বরির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, দ্বাত-প্রতিপদে সেই স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল উৎসব যে, দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। জ্যৈষ্ঠ-দ্বিতীয় দিন বসুধা দান শাস্ত্রীর বিধান। কে বসু? তিনি বৈবস্বত, বিবস্বানের পুত্র। বিবস্বান দক্ষিণায়ন দিনের সূর্য্য। বসুও দক্ষিণ দিকের অধিপতি। এই সকল যোগাযোগ দক্ষিণায়ন দিনেরই ইঙ্গিত করে। বিশেষতঃ বসুধাদান পিতৃ-তর্পণের তত্ত্ব। দক্ষিণায়নই পিতৃ-তর্পণের প্রশস্ত কাল। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, দীপালী পূর্ণিমা সকল উৎসব অঙ্গুষ্ঠিত হয়, সে সকলের মধ্যে লুপ্তায়িত আছে অতি প্রাচীনকালের দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি এবং সে স্মৃতি প্রায় ১২০০০ বৎসরের। ভারতে আখ্য-কৃষ্টির বয়স মাত্র ৪০০০ বৎসর বলিতে পারি কি?



বামছাগল

শিল্পী—শ্রীঅনিলকুমার ঘো

(টাইপ-রাইটিং যেখানে কয়েকটি Key-র সাহায্যে ইহা অঙ্কিত)

# লালমহা

স্মৃতিভিত্তিক

বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, ছুইকির বোতলটা, এমনকি বাকি নিয়ে কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও অতনু এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সেই শ্রীমতীও এক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। অতনু তার শয্যার উপর পড়ে আছে। অকাতরে ঘুমাচ্ছে। শ্রীমতীরও সাড়া নেই। কেউ বার কয়েক এসে ফিরে গেছে। সাহস করে ডাকে নি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কেউব দেখা পাওয়া গেল। তার চোখে মুখে খানিকটা শঙ্কা আর খানিকটা সংশয়। গত-রাত্রে বাদামুহাদের সেও একজন অদৃষ্ট শ্রোতা! শেষ পর্যন্ত কেউ ডাক্তারবাবুকে খবর দিল।

ডাক্তার বাবু কেউব কাছে গতরাত্রে সংবাদ শুনে অস্বাভাবিক গভীর হয়ে উঠলেন। তিনি কেউকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বৌদরাসী ঘরে আছেন কি না সে খবর নিয়েছ?

কেউ বাড়ি নেড়ে জানায়, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ বলেই ত মনে হ'ল।

কতকটা আশঙ্ক হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি এখন চলে যাও কেউ, দরকার হলে আমি পরে যাবার চেষ্টা করব।

কেউ বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল।

কেউ চলে যেতে ডাক্তারবাবু বহুক্ষণ ধরে অঙ্গমনকভাবে পায়েচাষি করে এক সময় ধায়লেন। নিজের সঙ্গেই তিনি কথা করে উঠলেন। ডাক্তার তুমি আর কি করবে? কতটুকু এগোলে তোমার সম্মান থাকবে? বার দুই কিছু করতে পারল না—উপটো অপমানিত হ'ল সেখানে তোমার আর কতগণি সাধা? অতনু খেরালী, সে বেপরোয়া আর উদ্ধত কিন্তু, এতবড় নির্বোধ এ তিনি কেমন করে জানবেন? কেউ না এলেও ডাক্তারবাবুকে একবার যেতেই হ'ত। অতনুর জন্তও বটে আর শ্রীমতীর জন্তও বটে। গতরাত্রে শ্রীমতীকে বড় বেশী উত্তেজিত মনে হয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত অতনুর কারণনা সম্বন্ধে আলোচনা করেই চলে গেল।

টেলিফোন বেজে উঠেছে। ডাক্তারবাবু বিনিত্যারটি তুলে নিলেন, হ্যালো...হ্যাঁ আমি ডাক্তারবাবু বলছি, কিন্তু তুমি কে যা? ও তুমি মিজা...কি বলছ? অতনুর জী তাঁর ঘরে নেই? খোঁজ করে দেখ, নিশ্চয়ই কোথাও আছেন...আর এ খবর আমাকে দিয়ে

লাভ কি? তুমি বরং অতনুবাবুকেই জানিয়ে দাও। বাবুহা যদি কিছু করার প্রয়োজন থাকে তিনিই করবেন।

শেষের দিকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্ব ভারী হয়ে উঠল। তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করে বিনিত্যারটি নামিয়ে রাখলেন। গত-রাত্রে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে এমন কি ঘটনা ঘটল যার ফলে শ্রীমতী এভাবে কাউকে কিছু না বলে চলে যেতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তবে কোথাও যে অসম্মানজনক কিছু ঘটেছে এ বিষয় তাঁর সন্দেহ নেই। নইলে যে ঘরে রাত বারটা পর্যন্ত অতনুকে ভরাডুবি হাত থেকে কেমন করে কোন পথে বাঁচান য'র তাই নিয়ে আলোচনা এবং কণ্ঠস্বা স্থির করে গেল, সেই ঘরে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পরেই অতনু তাকে কণ্ঠচ্যুতির নির্দেশ দিল কেন? শ্রীমতীর এই চলে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কথটা বার বার তাঁর মনে হচ্ছে। অতনু তাঁকে ছাড়তে চাইলেও তিনি তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজন আজও শেষ হয় নি। শ্রীমতীর চলে যাওয়া কিংবা অতনুর ব্যবহার তাঁকে বত না বিস্ত্রিত করেছে মিজাও ব্যবহার তাব কাছে তাব চেয়েও বিষয়কর। অতনুর চতুর্দিকে যে বিপদ ঘনিষ্ঠে এসেছে তার শিঙ্কনে ডানকান-আগরওয়ালার যেমন হাত আছে মিজাও যে নিষ্ক্রিয় নেই এ কথাও তাঁর জানা। অতনুও এ খবর রাখে। তবুও অতনু কেন যে এই বিপজ্জনক খেলার যেতে উঠেছে আর মিজা যে কেন এমন নাটকীয়ভাবে তাঁর স্বরণাপন্ন হতে চাইছে এ রহস্যের সন্ধান ডাক্তারবাবুকে কে দেবে। অতনুর প্রতিষ্ঠানের মতো তাব শত্রুও যেমন আছে মিজাও তেমনই আছে কিন্তু অতনু...

চিন্তার বাধা পড়ল। টেলিফোন বেজে উঠল। এবারে মিজা না—অতনু। অত্যন্ত উত্তেজিত তার কণ্ঠস্ব। সে বলছিল, সবকথা টেলিফোনে বলা যার না। আপনি এখন একবার আসুন। বড় দরকার।

ডাক্তারবাবু চুপ করে থাকেন। কোঁতুল ক্রমশঃই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতী এদের ভাবিয়ে তুলেছে।

পুনরায় অতনুর কথা শোনা গেল, আমার বাড়ী এখনই আপনাকে আনতে বাবে। অতনু বিনিত্যার রেখে দিল।

ডাক্তারবাবু তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। অতঃপর তাঁকে বড় দরকার। শ্রীমতী রাগ করে চলে গেছে। তাঁর কাছে না এসে অস্ত্র চলে গেছে। কোথায় সে যেতে পারে তা ডাক্তারবাবুর জানা। নিশ্চয় সে তার বাপের কাছে গেছে। এর বেশী সাহস তার নেই। ডাক্তারবাবু তাকে ভাল করেই চেনেন।...

অতঃপর ডাক্তারবাবু এসে সেলাম করে সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর একদিনের এত আয়োজন কিছুতেই ব্যর্থ হতে তিনি দেখেন না। অতঃপর চলল এই মারাত্মক গহিকে সংবত করতেই হবে। নইলে তাঁর স্বপ্ন আর সপনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। ডাক্তারবাবুর মাথার মধ্যে গতবাত থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত ঘটে-যাওয়া ঘটনাবলি বিহীন গতিতে পাক খেতে লাগল।

গাড়ী এসে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে উপস্থিত হতেই সর্বপ্রথমে ছুটে এল মিত্র। অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে বলল, আপনি এসেছেন, তার পরেই কণ্ঠস্বর স্বঃসম্ভব মুহূর্তে পুনরায় বলল, অতঃপরবাবু সঙ্গে কাজ শেষ করেই আপনি চলে যাবেন না যেন ডাক্তারবাবু—আমারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনাবলি ঘটে চলেছে তার আকস্মিকতার তিনি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবু একটু অস্বস্তিকভাবে জবাব দিলেন, আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে ঠিক বুঝতে পারলাম না ত মিত্র?

মিত্র ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে দৃষ্টি হলেও প্রকৃত শাস্ত কণ্ঠে বলল, সব কথা শুনেই আপনি বুঝবেন। সহসা আলোচনার দ্বারা প্যাণ্টে সে পুনরায় বলল, অতঃপরবাবু এসে পড়েছেন। আপনি যান, আমি আপনার চাহের ব্যবস্থা করিগে।

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে অতঃপর সোজা তার শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হল। মুহূর্তের জন্ত একটু সন্দেহবোধ করে অল্পেই সে তার কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বলল, সব ব্যবস্থা বোধ হয় শুনেছেন—

ডাক্তারবাবু বললেন, সব খবর বলতে কি শ্রীমতীর চলে যাওয়ার খবরের কথা বলা হচ্ছে?

অতঃপর মুহূর্তে জবাব দিল, আপাতত তাই।

ডাক্তারবাবু মুহূর্তে জবাব দিলেন, ওটা খবর নয়। খবর হচ্ছে শ্রীমতীর চলে যাওয়ার কারণগুলি। এই বাড়ীর এবং পরিবারের অমঙ্গল আশঙ্কায় যে মেয়ে গতরাতে আমার কাছে গিয়েছিল, আমি তা ভাবতেই পারি না সে এখানে কি করে আসবার পর এমনকি ঘটতে পারে তার জন্ত সেই রাতেই এ বাড়ী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হ'ল অতঃপরবাবু? তাছাড়া এখন মনে হচ্ছে অপরের পারিবারিক ব্যাপারে আমি একটু বেশী মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলাম—তার পুরস্কারও আমি পেয়েছি। আর নতুন

কবে নিজেকে জড়তে চাই না। তাছাড়া আমাদের মধ্যে সন্দেহ ত চুকেই গেছে।

অতঃপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, সন্দেহ যদি চুকে গিয়েই থাকে তা হলে আবার এলেন কেন?

ডাক্তারবাবু গভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার কথা সকলে বুঝবেন না অতঃপরবাবু। আমার কথা থাক, কিন্তু শ্রীমতী যে এ বাড়ী থেকে অস্ত্র চলে গেছেন তা কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে?

অতঃপর জবাব দিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডাক্তারবাবু খানিক চুপ থেকে বললেন, কিন্তু আমাকে কেন ডেকে পাঠান হয়েছে সে কথা এখনও জানতে পারি নি আমি।

অতঃপর ঝিমিয়ে-পড়া ভাবটা মুহূর্তের জন্ত কেটে গেল। তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। বলল, আপনি কোন খবর রাখেন কি না সেটাকে জানবার জন্ত।

তার মুখের ভাব এবং কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেই ডাক্তারবাবু বললেন, এ প্রশ্নের জবাব টেলিফোনও আমি জানতে পারি না।

তা হয় ত পারতেন—অতঃপর কণ্ঠস্বরে পুনরায় সংঘম কিয়ে এল। মুহূর্তে কণ্ঠে সে বলতে লাগল, কিন্তু আমার কি জানি কেন বিশ্বাস ছিল যে, এ বাড়ীর মানসম্মান আর শুভাশুভ্য দিকে আপনায়ও দৃষ্টি আছে। এ বাড়ীর সুখ-দুঃখের আপনিও একজন অংশীদার।

ডাক্তারবাবু প্রাণহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, খুবই আশ্চর্যের কথা। কথটা কি আজ সকাল থেকেই ভাবতে শুরু করা হয়েছে?

অতঃপর এতবড় আঘাতেও কিন্তু রাগ করল না। বরং একটুখানি হাসবার চেষ্টা করেই জবাব দিল, আপনিও মিথ্যে বলেন নি, আমিও মিথ্যে বলিনি। আমাদের মধ্যে সন্দেহটা প্রকৃত ভূতের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে কোনদিন একটি কথাও বলা হয় নি। আমি নির্বিবাদে সন্দেহের চেয়ে আপনার বয়সকে সম্মান দিয়ে এগেছি। কেন দিয়েছি তা আমি জানি না—তবে দিয়েছি এ কথা সত্য। আর তার জন্ত কোন দিন নিজেকে আমার ছোট মনে হয়নি।

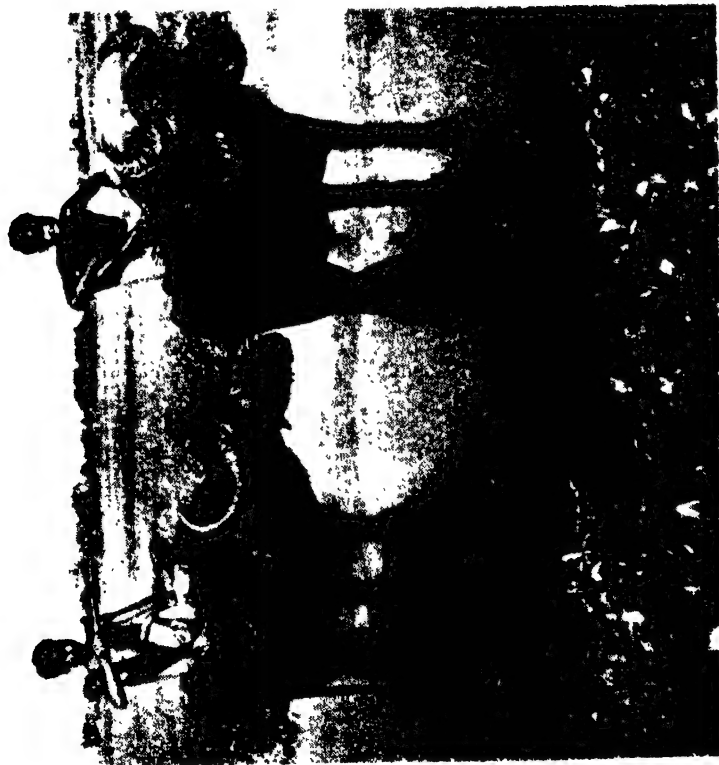
ডাক্তারবাবু একটুখানি হাসলেন—কথা বললেন না।

অতঃপর ধামতে পারল না। বলে চলল, আমার এই অকারণ হুর্দলতার আমি নিজেকে বড় কম আশ্চর্য্য হইনি। কাল রাত্রেই কথা ভাবুন আর আজ সকালের দিকে তাকান। শ্রীমতী চলে গেছে শুনে চমকে উঠলাম। মাথার মধ্যে আগুন জলে উঠল। ভাবতে বসে কিন্তু সর্বপ্রথমে আপনার কথাই মনে হ'ল। আপনাকে মিথ্যে বলব না। গতরাতে আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তার উপর শ্রীমতী আমাকে অজ্ঞাতভাবে কুৎসিত আক্রমণ করে বলল। আমিও তাকে ওজন করে কিরিয়ে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু তথাপি নীরব। কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করলেন না।



দুই বোন  
কটে  
অ চট্টোপ



রাখালিয়  
কটে : ছি.  
কটক নাহ





ক্রুশেভর বিষায় সম্বন্ধীয় আইশেনহাওয়ার



গঙ্গাতীরে

অতঃপূর্বে নেশার ঘোরে কথা বলে চলেছে এমনি ভাবে বলতে থাকে, কিন্তু আমার চাকর-বাকর আর কর্তব্যবোধের কাছে এই যে আমাকে ছোট করা হ'ল এ আমি ভুলতে পারব না। আপনার সঙ্গে তার দেখা হলে বলে দেবেন যে, এ ভাবে এ বাড়ীর চৌকাত ডিকোরে আর কোন দিন প্রবেশ অধিকার পাওয়া যাবে না। আমি জানি, যেখানেই থাক আপনার কাছে একদিন সে আসবেই।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু কথা বললেন, সে না এলেও আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। এ বাড়ীর দোর তার কাছে চিরদিনের জন্ত বন্ধ হয়ে গেলেও আমার দৃষ্টি চিরদিনই স্রীমতী মায়ের জন্ত খোঁজা থাকবে অতঃপূর্ব। আমার মন বলছে, স্রীমতী খুব সামান্য কারণে চলে যাবেন। কিন্তু এ'নিরে মিথ্যা বাদামুবাদ করে আর কি হবে।

ডাক্তারবাবু সহসা উঠে পাড়ালেন। তিনি প্রস্থানোক্ত হতেই অতঃপূর্ব পুনরায় বলল, কারণ বত বড়ই হোক তার জন্ত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, কার্য্য আর কারণের বড় নিকট সম্বন্ধ অতঃপূর্ব। যে কারণে তাকে চলে যেতে হয়েছে সেই একই কারণে তার কিংবদন্তি পথ সব সময় খোঁজা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।...বলেই ডাক্তারবাবু ক্রান্ত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। রাত্তার এসে প্রথমেই সম্মুখে যে ট্যাক্সি পেলেন তাতে উঠে বসলেন। মিತ್ರার সঙ্গে তিনি ইচ্ছা করেই দেখা করলেন না।

কিন্তু তিনি না করলেও মিত্রা চূপ করে থাকতে পারল না। ঝোঁকের স্বাধার যে "সময় বোমা" এদের ধ্বংস করবার জন্ত সে লুকিয়ে স্থাপন করেছে, বিস্ফোরণের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসতে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে এখন শিহিরে আসতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ভর পেয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নিজেই বড় অসহায় মনে হচ্ছে। অতঃপূর্বে সব কথা খোঁজাখুঁজি বলে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া সে যে কিছু জানে না এ কথা ভাববারও কোন যুক্তি নেই। অতঃপূর্ব বুদ্ধির চেয়ে অতঃপূর্ব বৈদ্য, ঠৈব্যা কম—যা তাকে বাঁচাতে পারবে না বরং ধ্বংসের আরও ত্বরান্বিত করবে। তাই সে ছুটে এসেছে ডাক্তারবাবুর কাছে।

ডাক্তারবাবুকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে মিত্রা ক্লান্ত গলার বলল, আমাকে মাপ করবেন এ ভাবে না বলে-করে বিরক্ত করতে আসার জন্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার আর অল্প কোন উপায় নেই। দয়া করে আমার ভুল শোধরানোর সুযোগ দিন।

ডাক্তারবাবু ক্লান্ত হেসে বললেন, আমি তোমার ভুল শুধরানোর সুযোগ দেবার কে...কতটুকু আমার শক্তি...তার কঠোর এমন একটা আর্জ সুর ধনিত হয়ে উঠল যে, মিত্রা নিরতিশ্রয় বিষয়-বিহীন হয়ে পড়ল। সে খানিক তাঁর চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে থেকে পুনরায় বৃহৎ কঠোর বলতে লাগল আপনি কে তা আমি জানি না, কিন্তু কারণানার লবিকদের উপর আপনার প্রভাব কতখানি সে খবর

আমার অজানা নেই। আর অতঃপূর্ব যে আপনি কতবড় শুভামুখ্যায়ী সে খবরও আমি জানি।

ডাক্তারবাবু সহসা সোজা হয়ে বসে মিত্রার মুখের পানে তাকালেন। বললেন, তাই যদি তোমার বিশ্বাস তা হলে সময় থাকতে এলে না কেন যা? তুমি কিংবদন্তি বাও মিত্রা। সব কথা অতঃপূর্বে গিয়ে বল। সে তোমাকেও জামুক নিজেই চিনুক। হয়ত কোন নতুন পথের সন্ধান পাবে। তোমার শুভ বুদ্ধি জয়-যুক্ত হোক। মনে হচ্ছে এখনও সময় বয়ে যায় নি।

খানিক চূপ করে থেকে মিত্রা বলল, এ পথে বিস্ফোরণ ঠেকানো সম্ভব হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তারবাবুর মুখে বড় সন্দেহ একটুখানি হাসি দেখা দিল। তিনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন তোমার বাঁচার পথ ত তুমি নিজেই দেখতে পেরেছ মিত্রা। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলে তুমি নিজেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

কিছুক্ষণ চূপ করে চোখ বুজে থেকে তিনি নিজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন। তার পর এক সময় চোখ খুলে বললেন, তা ছাড়া কাকে বাঁচাবার জন্ত তুমি এমন উতলা হয়েছ মিত্রা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

মিত্রা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনাকে মিথ্যা বলব না। অতঃপূর্বের জন্ত আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি কারণানার লবিকদের জন্ত। শেষ পর্যন্ত মরবে যে ওরাই ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধ গলার বললেন, তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে আমি জানি। বা হারিয়েছে তা আর কিংবদন্তি পাওয়া যাবে না, সম্ভবও নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় বস্তু তুমি আরও করতে পেরেছ মিত্রা। অতঃপূর্ব সর্বনাশ যে শুধু তাই একলাই সর্বনাশ নয় এ কথা দেরীতে হলেও যে তুমি বুঝতে পেরেছ এতে সত্যিই আমি খুশী হয়েছি।

মিত্রা নীরব।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, তুমি মাথা নীচু করে আছ কেন যা? তোমার ত লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। লজ্জা তাদের বাহ্য মাহুযকে সংপথে চলার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমি এখানে থাকতে পারব না। স্রীমতীকে কিংবদন্তি আনতে হুঁয়াক দিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে। এদিকের দারিদ্র্য তোমাকেই বহন করতে হবে।

মিত্রা হতাশ হয়ে বলল, এত বড় দারিদ্র্য কি একলা আমি বহন করতে পারব?

ডাক্তারবাবু ভয়সা দিয়ে বললেন, যে বুদ্ধি দিয়ে তুমি এতবড় একটা স্বদেশে সৃষ্টি করতে পেরেছ সেই বুদ্ধিই তোমাকে তা প্রতি-রোধ কন্যায় উপায় বাতলে দেবে। তা ছাড়া তোমার কাজ আমি অনেকটা এগিয়ে রেখেছি মিত্রা। তুমি শুধু প্রকৃত পথটা দেখিয়ে দিতে পারলে বাকী কাজটুকু ওরা নিজেই করতে পারবে।

মিজা মুহু কণ্ঠে বলল, আমার আর কিছু বলবার নেই।  
আপনার কথা মত চলবার চেষ্টাই আমি করব।

মিজা ধীরে ধীরে চলে গেল।

ডাক্তারবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ফিরে এসে মিজা সোজা তার নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বহু দিন পথে আবার সে তার অতীত জীবনের পানে দৃষ্টি ফেরাল—যে অতীত এই সামান্য কয়েক মাসের তাগুবে তার জীবন পথ থেকে প্রায় মুছে যেতে বসেছিল। বাবার আদর্শ শিক্ষা...জীবনের স্বপ্ন রাজনৈতিক দাবা খেলার যেদিন ভেঙে চূরমার হয়ে গেল সেই দিন থেকেই তার মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। কিন্তু এই পরিবর্তিত আদর্শহীন চলার গতি তাকে কতটুকু শান্তি দিতে পেরেছে—এই কথাটা কিছুদিন ধরে তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। যে দুর্জয় গতিতে সে ভেঙেছে এগিয়ে এসেছে তা আজ ধেমে গেছে। ক্ষয়-ক্ষতের পানে চোখ পড়তে নিজেই সে চমকে উঠেছে।...চলতে আর পারছে না। পারবেও না। আবার তাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

২২

শ্রীমতীর আকস্মিক উপস্থিতিতে আনন্দের পরিবর্তে একটা বিষ্ময় আর সন্দেহের ঝড় বয়ে গেল প্রণবের সংসারে। প্রণব কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘেয়েকে দেখতে লাগলেন। বহুকালের মধ্যে কেউই একটা সাধারণ কুশল প্রশ্ন পথ্যস্ত করতে পারল না।

শ্রীমতী নত হয়ে মা ও বাবার পায়ের ধূলা নিল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, অনেক দিন তোমাদের দেখি নি তাই চলে এলাম বাবা।

প্রণবের মুখোভাব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু রাণীর চোখে-মুখে সন্দেহের একটা বৃকন লেগে রইল। সন্দেহ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, এসেছিস তা ভাল কথা, কিন্তু আগে থেকে একটা খবর দিয়ে এলি নে কেন?

চিঠি দেবার আর সময় পেলাম কোথায়—শ্রীমতী বলল, কাল রাত্রে ঠিক হ'ল আসব। আর আজ সকালে গাড়ী চড়েছি।

রাণী বলল, কিন্তু জামাই এল না কেন?

শ্রীমতী একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বলল, তার আমি কি জানি?

অরুণ এসে পানিক তৈরি করে বলল, কথা নেই বার্তা নেই তুই যে হঠাৎ? বড়লোকটি বুঝি আসে নি? একলাই এসেছিস, না চাকর বাকর কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস?

বাবা, বাবা...শ্রীমতী ককিরে উঠল, তোমরা যেন কি! এসে দাঁড়াতেই খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন! ধূলো-পায় তোমাদের এত প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আর পারছি নে দাদা।

প্রণব বললেন, ঠিক কথা। সায়াদিন গাড়ীতে কেটেছে। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দে তোরা। এসে অবধি...কথাটা শেষ না করেই তিনি অজ্ঞ কথ্য বললেন, আমি আমার ঘরেই আছি

সুবিধে মত একবার বেও মা।

প্রণব চলে গেলেন।

এমনি বহু অব্যাহত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে একথা শ্রীমতীর জানা ছিল। সে সব প্রশ্নের জবাবগুলোও সে ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু যে লোকটিকে কাকী দেওয়া সবচেয়ে সোজা তাঁকে কি করে সত্য ঘটনাটা জানাবে এই ভয়েই শ্রীমতী দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার নির্ঝিবোখী সরল প্রকৃতি বাবাকে নিয়েই বত ভয়।

শ্রীমতী ঠিক বুঝতে পারছে না কতখানি তার বাবার কাছে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাবাকে কিছুই বলতে হ'ল না। তার মা চোঁচোমচি করে এমন এক কাণ্ড বাধালেন যে, শ্রীমতী মুখ লুকাতে পথ পায় না। অরুণ মাকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে আরও ক্ষেপিয়ে তুলে শেষ পর্যন্ত নিজেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। শুধু প্রণব একটা কথাও বললেন না। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় কঠোর হাত ধরে আকর্ষণ করে নিজেও ধরে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। কাকী মুখে কোন কথা যোগাল না। শ্রীমতী ভাবছিল তার বাবাকে সে কি বলবে—আর প্রণব ভাবছিলেন যে, কতবড় অপমানের জালা জুড়াতে ঘেয়েটা একলা একলাই তার বাবার কাছে ছুটে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় শ্রীমতী উঠে এসে তার বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত হেসে বলল, তুমি যে কোন কথা জিজ্ঞেস করছ না বাবা?

প্রণব ধীরে ধীরে জবাব দেন, কি আর জিজ্ঞেস করব ম—

শ্রীমতী স্তম্ভিত গলায় বলল, কেন এভাবে চলে এলাম? এই সব আর কি...

স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রণব বললেন, এই কি তার সময়? তা ছাড়া জিজ্ঞেস করে কি হবে মা? আমি কি বুঝি না যে, কতবেশী উত্কণ্ঠ হলে আমার ঘেঁষে এভাবে চলে আসতে পারে?

শ্রীমতী বলল, মা কিন্তু খুব রাগ করেছে।

প্রণব একটা নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওটা রাগ নয় শ্রী—দুঃখ, আশা ভঙ্গের বেদনা।

শ্রীমতী প্রশ্ন করে, তুমি কি একটুও দুঃখ পাও নি বাবা?

প্রণব চমকে উঠলেন। ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের অজ্ঞ তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, দুঃখ পাই নি এমন কথা বলি কি করে মা। কিন্তু তা এভাবে চলে আসার অজ্ঞ নয়। তোমার পরাজয় স্বীকার করবার অজ্ঞ।

শ্রীমতী একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বলল, একে তুমি পরাজয় ভাবছ কেন বাবা? আমি অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। জয়-পরাজয়ের কথা এখনই উঠতে পারে না বাবা।

প্রণব একটুখানি করুণ হেসে বললেন, তুমি যথাক্রমে ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছ একখাটা ত মিথ্যা নয় শ্রী।

শ্রীমতী মুচু কণ্ঠে বলল, অপর পক্ষকে দুর্বল কয়বার উদ্দেশ্য

নিরে যে একাকী করা হয় নি তা কেমন করে তুমি বুঝলে  
তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ—অকারণে দৃষ্টিভ্রান্তি করছ বাবা।

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, সংসারের রণনীতি  
কোনদিনই আমি ভাল বুঝি না মা, তাই ঘবে-বাইরে কোথাও  
আমোল পাই না। তবুও আমার মন বলে যে, মতবাদের  
লড়াইয়ের নীতি আরও ঢের বেশী জটিল। যাব জীবনে এ যুদ্ধ  
দেখা দেয় সে-ই শুধু জানে এর ভয়াবহতা। তাই আমি ভয়  
পেয়েছিলাম। 'ও' পা এগুতে গিয়ে দশ পা পিছিয়ে গিয়েছিলাম।  
কিন্তু পিছন থেকে ধাক্কা পেয়ে পড়ে গেলাম। দাঁড়াতে গিয়ে টেন  
পেলাম আমার একখানা পা ভেঙে গেছে।

শ্রীমতী চকুল হয়ে উঠল, তার স্বল্পভাষী বাবার মুখে এ ধরনের  
সংসারভয়ের আলোচনা সে ইতিপূর্বে আর শোনে নি। তিনি যে  
কোন প্রশংসার অবতারণা করতে উচ্চত হয়েছেন একথা বুঝেই  
শ্রীমতী স্নিগ্ধ হেসে বলল, ভাড়া পা ত চিরদিন ভাড়া থাকে না  
বাবা।

প্রণব মাথা নেড়ে বলেন, তা হয় ত থাকে না শ্রীমতী, কিন্তু  
এই হাড়মাংসের আড়ালে যে বস্তুটি আত্মগোপন করে আছে তাকে  
তুমি কোন দাওয়াই দিয়ে জোড়া লাগাবে মা? ওখানে ত তোমার  
ডাক্তার-বাড়ি পৌঁছুতে পারবে না।

বাবার কথায় শ্রীমতী শুধু বিস্ময়ই হ'ল না কতকটা বিব্রত  
বোধ করল। তথ্যটি সে চূপ করে থাকতে পারে না। বলে  
এত কথা তুমি কবে থেকে ভাবতে শুরু করেছ বাবা?

প্রণব ভেলেম-মুখের মত বলেন, তোমার সব দেখে-শুনে মা।  
কিন্তু এই পথে চিন্তা করতে আমার ভাল লাগে না।

শ্রীমতী গভীর কণ্ঠে বলে, তা হলে আর ভেব না বাবা। এসব  
তোমার জ্ঞান নয়—তোমাকে মোটেই মানায় না। বড় গোলমালে  
মনে হয়।

প্রণব সহসা জোরে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি ঠিক  
বলেছিস শ্রী। আমার নিজের কানেও বড় বিস্মী লাগছিল।  
ভাব করে মাহুকের স্বভাব পাটানো যায় না একথা তোরা মা  
বোঝেন না।

একটা জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতীকে ধামতে হ'ল। মা খেতে  
ডাকছেন। ভাত দেওয়া হয়েছে।

মাঝ কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভিজ ভিজ মনে হ'ল শ্রীমতীর।  
সে সাড়া দিয়ে জানাল যে, এখুনি যাচ্ছে।

সবদিক দিয়ে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে শ্রীমতী  
বদ্বপরিব্যব। কিন্তু এমনি ভাবে সকলে মিলে তাকে যদি একটা  
বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে তা হলে...

অরুণ এসে পুনরায় আহ্বান জানাল, কই যে আর। তোরা  
জতে বসে আছি যে।

শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল।

প্রণব বললেন, খেয়ে-দেয়ে আবার আমার কাছে একবার  
আসিস মা।

শ্রীমতী বলল, আসব বাবা।

বাবার ঘর থেকে বার হয়ে আসতেই ক্ষীরায় সঙ্গে চোখাচোখি  
হ'ল। ও কথা বলল না, মুচকি হাসল। ইন্দিপূর্বেও বার কয়েক  
ঠিক এমনি করেই চেনেছে, কথা বলে নি। ও হয়ত একলা  
পাবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে শ্রীমতী মুহূর্তের জ্ঞান ধমকে  
দাঁড়িয়েছিল। অরুণ পুনরায় তাগিদ দিল।

খেতে বসে অরুণ বলল, একসঙ্গে বসে খাওয়া প্রায় ভুলে  
গিয়েছিলাম মতি।

শ্রীমতী একটু হাসল।

অরুণ পুনরায় বলল, শুধু নাড়া-চাড়া করছিস—খাচ্ছিসনে  
কেন?

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে শ্রীমতী কোলমাথা ভাতে অস্থল  
ঢেলে নিল।

অরুণ বিস্ময় কণ্ঠে বলল, ও কিরে খোলের সঙ্গে অস্থল...

শ্রীমতী এবারও একটু হাসল। কোন জবাব দিল না। তার  
হাসিটা অজ্ঞান ধরনের। বাণীর মুগ্ধতার সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।  
অরুণ লক্ষ্য না করলেও শ্রীমতী মাথের এট ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য  
করেছে। তার সাহা যুগে খানিক বস্তু ছুঁতে এল। মা বাঁয়ে  
বাঁয়ে উঠে গেলেন। তোরা মা আমি এখুনি আসছি, বলে,  
তিনি সোজা প্রণবের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রণব শূন্য দৃষ্টি মেলে গভীর চিন্তায় মগ্ন। স্ত্রীর উপস্থিতি  
ডের পেলেন না।

বাণী ডাকলেন, শুনছ—

প্রণব আত্মস্থ হলেন, আমাকে কিছু বলছ?

বাণী হাসিমুখে বলেন, কথার ছিঁচ দেব! তোমাকে নব্বত  
এখানে আর কে আছে? একটু খেয়ে কণ্ঠস্বর আরও অনেকটা  
খাদে নামিয়ে তিনি পুনরায় বলেন, বুঝলে, এ সময় যেহেঁরা মাথের  
কাছেই থাকে। এসেছে ভালই করেছে, কিন্তু গোলমাল করে  
না এলেই পারত!

প্রণব খুব মনোযোগ দিয়ে স্ত্রীর কথাগুলি শুনে মুহূর্তে  
বললেন, তুমি অল্পেই বড় উতলা হয়ে ওঠো বাণী। এতটা  
ভাল নয়।

বাণী চলে যাচ্ছিলেন, প্রণব তাঁকে পিছু ডেকে বললেন, আমার  
একটা অমুরোধ বাণী, শ্রীমতীকে দিন কয়েক তোমরা উত্সাহ  
কর না।

বাণী বলেন, আমি বুঝি শুধু উত্সাহ করতেই জানি।

প্রণবের একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। বাণীও তা দৃষ্টি এড়াল  
না। তিনি সহসা অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, সংসারে এত বড়  
বন্ধন আর যেহেঁদের নেই।

প্রণব বার বার মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, সেই জন্মেই

আমি আরও ভয় পেয়েছি, এতখানি এগিয়ে গিয়েও শ্রীমতী আবার শিছু হটে এল কেন? তুমি বাও রাণী...আমাকে আরও ভাবতে দাও...ভাল করে বুঝতে দাও।

রাণীর চোখে-মুখে কিন্তু কোন প্রকার চিন্তা প্রকাশ ঘটল না। তিনি পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর দুর্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুনরায় রান্না ঘরে গিয়ে এলেন।

ভাই-বোনে তখনও খাওয়া নিয়ে বচসা চলছিল। অকারণেই অরুণ বিশ্বর হৈ হৈ করছে। কিছু পূর্বের গুমোট আবহাওয়াটাকে সে হয়ত হাফা করে নিতে চায়।

মা কিরে আসতে অরুণ আর এক দকা চীৎকার করে নিয়ে বলল, দাও ত মা আর এক বাটি অংশল হাতিকে।

শ্রীমতী পুনরায় সিন্দুর রান্না হয়ে উঠল। সেইদিকে চেয়ে মা মনে মনে খানিক হাসলেন। এবং সত্যি সত্যিই তিনি আর এক বাটি অংশল শ্রীমতীর পাতের গোড়ায় ধবে দিলেন।

অরুণ হেসে উঠল।

মা ধমক দিলেন, গাধার মত হাসিস নে অরুণ।

শ্রীমতী বলল, তুমিও মা দাদার কথা শুনে—

বাধা দিয়ে রাণী বলেন, পেটে কিছু দিতে হবে ত। যদি অংশল দিয়ে ছোটো খেতে পামিস তাই খা, নইলে এ অবস্থায় শরীর টিকবে কেমন করে।

শ্রীমতী চুপ করে থাকে। আর অরুণ হয়ত মনে মনে ভাবে, তার সশব্দে মা একেবারে মিথো বলেন নি।

পরদিন শ্রীমতীকে একলা পেয়ে কীথিয়া একপাল হেসে চোখ টিপে বলে, মা বলছিল তোমার ছেলে হবে দিদি—মনের মিল হ'ল না, আর ছেলে হবে, এটা আবার কেমন কথা গো...

শ্রীমতী ধমক দেয়, তোম কি তাতে হতভাগী—

কীথিয়া হেসে চলে যায়।

২৩

অতম্বর জীবনে এত বড় পরাজয় বুঝি ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নি। কিছু দিন ধরেই চলছিল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। ভেঙেছে বিশ্বর—ধূলা উড়েছে প্রচুর। এমন কি তার আত্মাভিমানকে পর্যাপ্ত ধূলিশা নিতে হয়েছে। তার মাধার উপরকার আচ্ছাদন-টুকুও আর অবশিষ্ট নেই। অতম্বর তাই আবার নতুন করে ভারতে বসেছে। তার জীবন পথের ভিত্তি প্রস্তুত করতে যে মাল-মশলা সে ব্যবহার করেছিল তার বতটুকু ছিল খাটি আর কতটুকু ভেজাল। অতম্বর পর্যটন করে দেখছে তার অতীত জীবনের প্রত্যেকটি স্তর। কেন এই বিপর্যয়? তার বিবাহিত স্ত্রী পর্যাপ্ত তাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। শ্রীমতীকে সে যেচ্ছার বিবাহ করে এনেছিল। কিন্তু স্ত্রীকে যে একটা আলাদা সম্মান দিতে হয় এ কথাটা একদিনের জ্ঞানও তার মনে হয় নি। দ্বিভ্রান্ত পিতার কড়া শ্রীমতীকে বিবাহ করে সে তাদের কৃতার্থ করেছে এই

কথাটাই তার ব্যবহারে মাঝে মাঝে উদ্ভ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই মামুষ শ্রীমতীকে সে জয় করতে পারে নি। সে চলে গিয়েছে।

মিত্রা বলে, বায় বতটুকু প্রাণ্য তাকে সেটুকু না দিলে নিজের পাওনা আশা করা যায় না। ভয় দেখিয়ে দেহটা হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু মন চলে যায় বহুদূরে। আমাকেই দেখুন না কেন অতম্বর বাবু। কিছুদিন আগেও আপনার অনিষ্ট কববার জ্ঞান কত আয়োজন না করেছি আবার আজ সেই আমিই আপনাকে অষ্টগ্রহর পাহারা দিচ্ছি বাতে কোন ক্ষতি আপনাকে না স্পর্শ করতে পারে।

অতম্বর বলে, আমি কিন্তু তোমার এ পরিবর্তনের কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাই না মিত্রা।

মিত্রা জবাব দেয়, আপনার সে চোখ নেই বলেই দেখতে পান নি। সঙ্গত কারণেই পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্লান্ত হেসে অতম্বর বলে, আমার চোখ নেই বলেই হয়ত দেখতে পাচ্ছি না—অন্ধের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি। তবুও তোমার ব্যক্তিগত কোন কিছুই আমি জোর করে জানতে চাইব না। তবে ডাক্তার-বাবু সশব্দে যদি তোমাকে কোন প্রস্তাব দিচ্ছি? ও লোকটিকে আজ্ঞা আমি বুঝায় না।

মিত্রা হেসে বলে, এত বছরে আপনি যাকে বুঝলেন না তাঁর সশব্দে আমি আবার কি বলব! তবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি যথার্থই আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অতম্বর জিজ্ঞেস করে, এতবড় বিশ্বাসের কারণও নিশ্চয় আছে।

মিত্রা বিশ্বাসী কণ্ঠে বলল, এতবড় প্রবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে আমি ছোট-বড় কাউকেই উপেক্ষা করি নি। ঠাণ্ডা মাধার হিসেব করেই নেমেছিলাম অতম্বর বাবু।

অতম্বর প্রশ্ন করে, তাহলে ধামলে কেন মিত্রা?

মিত্রা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে বলল, আপনি কিন্তু সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েই আবার প্রশ্ন করছেন।

তুল হয়ে গেছে মিত্রা, অতম্বর বলে।

মিত্রা বলে, আপনি ত অনায়াসে ধবে নিতে পারেন যে, হেবে বাবার ভয়ে মিত্রা পিছিয়ে গেছে।

অতম্বর একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, আগে হলে তাই ভাবতাম, কিন্তু শ্রীমতী আমাকে বদলে দিয়েছে। নিজের সশব্দে বতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে এতদিন শুধু চোখ বুজে আত্মবঞ্চনা করেছি। যাকে জয় ভেবে গর্ববোধ করেছি তা আমার জয় নয় পরাজয়।

মিত্রা হেসে বলে, আপনার এ আশান-বৈরাগ্য কতদিন স্থায়ী হবে অতম্বর বাবু?

অতম্বর মুখেও হাসি দেখা দিল। সে শান্ত হেসে বলল, কথাটা আবারও মনে হয়েছে মিত্রা। কিন্তু এই আশান-বৈরাগ্যও আমার মধ্যে কোনদিন এর আগে দেখা দেয় নি। আবার মধ্যের বড়দিপুণ গুটিকরক সব সময় মাধার চড়ে থাকত। তাছাড়া কোন কাজ

করে পিছন ফিরে তাকানোকে আমি দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে জানতাম না।

মিত্রা তিরস্কারের সুরে বলল, আপনার এই শক্তির দড়িট আপনার প্রধান শত্রু। আপনার শক্তিকে আপনি সব সময়ই চুষ করে দেখেন। নইলে মিত্রার পক্ষে এতখানি অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব হ'ত না অতঃপূর্ব।

অতঃপূর্ব বলল, মিত্রার কথা থাক। তার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ পরে হবে—

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, এখনও আপনার অহঙ্কার?

অতঃপূর্ব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিল, একে আমি অহঙ্কার বলি না। বাবসায় “স্পেকুলেশান” বলে একটা কথা আছে জান ত?

মিত্রা বলে, যাকে বোকা লোকগুলো ‘সুয়াখেল’ বলে?

অতঃপূর্ব জবাব দেয়, হতেও পারে—

মিত্রা গভীর হয়ে বলল, ঠিক তাই, আর এট খেসাই আপনি ঘবে-বাইরে এক সঙ্গে স্ক্রু করেছিলেন। যার ফলে ঘর এবং বার দুই ভাঙনের মুখে এসেছে।

অতঃপূর্ব কোন জবাব না দিয়ে ছিব্ব দুটিতে মিত্রার মুখের পানে চেয়ে রইল।

মিত্রা বলতে থাকে, অথচ যাকে আপনার দ্বিধাহীন চিন্তে বন্ধুর মত বিশ্বাস করা উচিত ছিল, তাকেই কয়েক মাসের উপেক্ষা আর যে মিত্রাকে গলা ধাক্কা দিয়ে হাঙ্গামার বাব করে দেওয়া আপনার উচিত ছিল তার সঙ্গে বসলেন পরামর্শ করতে— দিলেন বন্ধুত্বের হাত, বাড়িয়ে।

অতঃপূর্ব কেমন একপ্রকার হেসে বলল, ঐ জগতেই ত “স্পেকুলেশান” কথাটা ব্যবহার করেছি মিত্রা। তুমিই বল দেখি এতে কি আমি ঠেকেছি?

মিত্রা বলল, এ প্রশ্নের উত্তর আপনার ভবিষ্যৎ দেবে অতঃপূর্ব। তবে এমন মারাত্মক বেলা আর কোনদিন খেলবেন না। মানুষের জীবন নিয়ে এ ধরনের কাটকা বেলা বিপজ্জনক। এর পরিণাম কোনদিন ভাল হয় না জানবেন।

তুমি কি সুযোগ পেয়ে আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করলে মিত্রা?

মিত্রা খানিক চুপ করে থেকে কোমল কণ্ঠে বলল, না অতঃপূর্ব, এত বড় গুণীতা আমার নেই। আমি শুধু তৃতীয় পক্ষের মনের উপর প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলতে চেয়েছি। তার বেশী নয়। যে ব্যবহার শত্রুর মত গতি বললে দিতে পারে সেই ব্যবহার দিয়ে নিজের স্ত্রীকে আরও বড় বেশী কাছে টেনে নিতে পারতেন এ কথাটা কেন আপনি বুঝতে চাইছেন না। আপনার স্ত্রীর মনের দিকে চোখ বেলে চাইলেন না। লোক করে খুল-মাঠেরের মেয়ে বলে খোঁটা দিলেন। বিয়ে করে কৃতার্থ করেছেন এই কথাটাই—

কথার মাঝে মাঝিরে দিয়ে অতঃপূর্ব বলল, স্ত্রীমতী তোমাকে এই সব কথা বলেছে বুঝি?

অতঃপূর্ব মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে দুঃখিতভাবে মিত্রা জবাব দিল, খুব দুর্ভাগ্যের কথা। এতদিন কাছে কাছে থেকেও তার সম্বন্ধে আপনি এ কথা ভাবতে পারলেন কি করে বুঝি না। মানুষ গরীব চলেই ছোট হয় না। এত বড় অসম্মানের কথা মনে গেলেও তিনি কাউকে বলবেন না আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর স্বার্থ সঙ্কট! এ বাড়ীর চাকর-বাকরও জানে! আর আপনিই তা জানতে দিয়েছেন।

অতঃপূর্ব একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে স্তম্ভিত গলায় বলল, অথচ আমি জানতে পারি নি!

মিত্রা মুদ্র কণ্ঠে জবাব দিল, নিজে চোখ বুজ কাজ করে যারা মনে করে তার কাজের ব্যক্তি কেউ সাক্ষী হইল না! এমন করেই তাদের ক্ষতি পূরণ করতে হয় অতঃপূর্ব।

অতঃপূর্ব স্নানকণ্ঠে জবাব দেয়, কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি না মিত্রা। অস্ত্র যদি আমি কয়েই থাকি তার প্রতিবিধান ত আর পাচটা অস্ত্র দিয়ে করা হবে না।

মিত্রা বলল, যারা ভাল কথাই বোঝে না তাদের এমন করেই সোঝাতে হয় অতঃপূর্ব। গাছাভীর হত্যাকাণ্ডকেও তাই দাঁসী-কাণ্ডে ঝুলতে হয়েছে।

অতঃপূর্ব অল্প প্রশঙ্গে উপস্থিত হ'ল, স্ত্রীমতী কোথায় গেছে তুমি জান মিত্রা?

মিত্রা বলল, না জানলেও আশ্চর্যে বলতে পারি। চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারবেন।

অতঃপূর্ব স্নান হেসে বলল, তা হয় ত পারি।

মিত্রা বলল, আজ এত দিন পরে স্ত্রীমতীর খোঁজ করছেন কেন জানতে পারি কি? এ বাড়ীর দরজা ত তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেছে বলে শুনেছি।

অতঃপূর্ব একটু যেন অগ্রহণযোগ্যভাবে বলল, মিথ্যে কথা শোননি মিত্রা।

মিত্রা প্রশ্ন করে, তা হলে খোঁজ করে লাভ?

নিছক কৌতূহল, অতঃপূর্ব জবাবে বলল।

মিত্রা বলল, ডাক্তারবাবু বললেন, তিনি তাঁর বাবার কাছে চলে গেছেন।

অতঃপূর্ব সহসা স্ত্রীমতীর কথা বাদ দিয়ে ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, স্ত্রীমতী চলে বাবার পর তিনি বোধ হয় আর আসেন নি?

মিত্রা বলল, আপনি ডেকে পাঠাতে সেই যে একবার এসেছিলেন তার পরে আর আসেন নি।

অতঃপূর্ব সুধার, তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায়?

মিত্রা সংক্ষেপে জবাব দিল, তাঁর বাড়ীতে।

অতঃপূর্ব বলল, তোমরা সকলেই ইচ্ছামত চলা-করা করছ, কিন্তু আমার উপর এত বিধিনিষেধ কেন বলবে কি মিত্রা? •

মিত্রা বলল, বতদিন আপনার কাবানার ঘুণধরা খুঁটিগুলো পালটে ফেলতে না পারি ততদিনই আমার প্রত্যেকটি কথা আপনাকে মেনে চলতে হবে।

অতঃপর বলল, আর আমি যদি তোমাদের কথা অগ্রাহ্য করি মিত্রা?

মিত্রা একটু চমকে উঠলেও মুহূর্তে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হেসে জবাব দিল, আপনি তা পারেন না অতঃপর। কারণ আপনি কথা দিয়েছেন।

অতঃপর ক্রান্ত হেসে জবাব দিল, আমি ভিতরে ভিতরে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি মিত্রা। নইলে এভাবে আমাকে নিয়ে তোমরা মজা করতে পারতেন না। কিন্তু আমার একটা কথাই স্পষ্ট জবাব দেবে।

মিত্রা বলে দেবে।

অতঃপর মুহূর্ত শান্ত করে বলল, আমার অন্তঃকরণ স্বয়ংগ নিয়ে এই যে কাণ্ড করে যাচ্ছে এতে সত্যি সত্যি বাঁচবে কে? শুধুই কি আমি?

মিত্রা বিগতমন করে বলল, শুধু আপনি তত্তে যাবেন কেন।

অতঃপর হেসে বলল, তা হলে বেছে বেছে আমার মাঝার ঘুণধরা খুঁটি ভেঙে পড়বে কেন বলতে পার মিত্রা?

মিত্রা বলল, বড় গাছকেই বড় ঝাপটা সইতে হয়।

অতঃপর জবাব দিল, তাতে সব সময় গাছ ভেঙে পড়ে না।

মিত্রা বলল, কিন্তু যে গাছের শেকড় মাটি থেকে আলগা হয়ে গেছে তার গেলার ও মুক্তি তাকে না অতঃপর।

মিত্রার এ যুক্তি অতঃপর মানতে চায় না। সে মাথা নেড়ে বলে, হোমার এ যুক্তি আমার জন্ত নয় এ কথা আমি হালপ করে বলতে পারি। তোমার এই কথা কবিতা খুঁটিতে যারা ঘুণ ধরার তারা কি একবারও ভেবে দেখে না যে কারা এই ঘুণধরা খুঁটি চাপা পড়ে মারা যায়? এই মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি অস্তুত আমার জীবীর যারা তারা কোন দিন করে না। যারা আজীবন খেতে খায় স্বস্তিতে তাহাই শেষ পর্যন্ত মরে।

মিত্রা মুহূর্ত মুহূর্ত হাসতে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

অতঃপর বলে, খুব কি হাসি হ'ল এটা মিত্রা?

অন্ত কারণে হাসছিলাম, মিত্রা বলল, আচ্ছা অতঃপর, যে দুর্ভাগাদের কথা একটু আগে বললেন, অতিটা যদি শুধু তাদেরই এক তরকা হয় তা হলে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে বেড়ে চাইছেন কেন? ডানকান-আগবৎমালাকেই বা কিসের জন্ত তাড়ালেন?

অতঃপর উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, আর তাদের কথা ইচ্ছে তুমি বলতে পার আমি বাধা দেব না, কিন্তু ওদের নাম আমার কাছে তুলো না।

মিত্রা বলল, আপনি যদি না চান তবে আর বলব না। কিন্তু আপনার জন্ত ক'রকারীদের বিষয় যদি কিছু বলি? তাদের মত যে ভিষোগ জানাবার একটি মাত্র স্থান ছাড়া ত আর নেই অতঃপর।

অতঃপর বলল, আমার দেবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী যদি তারা দাবী করে সেক্ষেত্রে আমার কবীর কি বলতে পার মিত্রা?

মিত্রা জবাব দেয়, সেক্ষেত্রে দার এবং দারিৎ তাদের হাতে ছেড়ে দিন। সত্য অবস্থাটা জানতে পারলে ওরা আপনাই খেয়ে যাবে।

শান্ত করে অতঃপর বলল, কাজ করা আর কাজ করানো কি এক কথা মিত্রা?

মিত্রা চূপ করে থাকে।

অতঃপর বলতে থাকে, তোমার যুক্তি ভ্রান্ত এমন কথা আমি বলতে চাই না, কিন্তু আমাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে বলি।

মিত্রা বলে, করতে আমি কিছুই বলছি না। আমি শুধু যাচাই করে দেখার কথা বলছিলাম। ব্যবসার এটাও একধরনের “স্পেকুলেশন” নয় কি? একবার পর্যন্ত করে দেখুন না কেন।

অতঃপর সহসা গভীর করে বলল, আর কেউ পারবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি এ কাজ মরে গেলেও পারব না। তার চেয়ে বরং নিজের হাতে সব খসে করে ফেলব।

তবুও এই পথে চলতে পারবেন না... মিত্রা বলে, অতঃপর পুরানো দিনের সবই এখন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে তখন পুরাতন আর নতুন মধ্য একটা সামঞ্জস্য রেখে না চলতে পারলে যে অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

অতঃপর বলল, কার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে? পুরাতন-পন্থীদের না আধুনিক-পন্থীদের। মিত্রা তুমি আমাকে পুরাতন ভিতের উপর নতুন ইমারৎ তুলবার বুদ্ধি দিচ্ছ—তার পরমায়ু ক'খাটা একবারও ভেবে দেখছ না। বাইরে থেকে বং পালিশ করে বতাই দুটি-শেভন করে তোলা হোক না কেন ভিতটা কিন্তু নোনাধরাই থেকে যাবে। তুমি যা বলছ তাকে আমার দালদা-মেশান ঘি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অর্থাৎ ওটা ঘি-ও নয় দালদাও নয়। এই মধ্য-পন্থাকে আমার ভাল লাগে না মিত্রা।

মিত্রা হাসতে থাকে।

অতঃপর হুঃগিত হয়ে বলে, এটাও বুদ্ধি একটা হাসির কথা বলেছি?

মিত্রা বলল, আপনি বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন।

শুনে শুনে এই সবই আলকাল ভাবেন বুদ্ধি? আপনার জন্ত সত্যিই এতদিন পরে আমার ভাবনা হচ্ছে। কোথায় চাবুক আর কোথায় স্নেহপদার্থ ঘি। সত্যি সত্যিই আপনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এবারে বাড়ীর দরজা, জানালা আর চৌকাঠগুলি একে একে তুলে ফেলুন দেখবেন জীবনটা কত সহজ আর সুন্দর হয়ে উঠেছে অতঃপর।

অতঃপর গভীর হয়ে উঠল।

মিত্রা তার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে নরম গলায় বলল, আপনাকে হুঃখ দিলাম কি অতঃপর বাবু? বিশ্বাস করুন আমার উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ নয়।



অতঃমু একধারও কোন জবাব দিল না।

মিত্রা খামতে পারে না। বলতে থাকে, আর একটু সহজ হয়ে উঠুন... আর একটু নেমে এসে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান— ডাক্তারবাবু শুধিয়ে দেবেন আপনাব কাবখানা। আমি শুধিয়ে দেব আপনাব ঘর—

সহসা অতঃমু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, হঠাৎ সকলে মিলে আমার ভাল কববার জ্ঞান এমন উঠে পড়ে লেগেছে কেন বলতে পার মিত্রা দেবী? আমি ত কোন দিন তোমাদের এতটুকু উপকার কবেছি বলে মনে পড়ে না!

মিত্রার মুখেব চেহারা বদলে গেল। সে করুণ হেসে বলল, অপরের কথা জানি না। আমি কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে চাইছি।

অতঃমু একঝোড়া সড়ানী দুই মেলে মিত্রার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় তা হা করে হেসে উঠে বলল, তোমার এ কথাটাও কি আমি আমার কাছে বিশ্বাস করতে বল মিত্রা?

মুহুর্তে মিত্রা জানাল, হ্যাঁ।

অতঃমু মিত্রার দুই এড়িয়ে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে বলল, বিশ্বাস করলাম। জান মিত্রা মানুষের মন বড় বিচিত্র

বস্তু। একদিন বা ছিল নিছক অভিনয় আর তাই হ'ল সত্য। তোমাকে কোনদিন কোন কারণে আমি বিশ্বাস করতে পারব একথা যদি দৈববাণীও হ'ত আমি সে দেবতাকে কৃপার চেয়ে দেখতাম।

মিত্রার কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধা বুজে এসে, সে কিস কিস কবে বলল, আশ্চর্য! এই একই কথা আমিও যে সবসময় ভাবি; ভয় হয়...হাসিও পায়। এ কেমন কবে সম্ভব হ'ল বলতে পারেন। এর কি সত্যিই কিছু দরকার ছিল ...অবশ্য...

কেউ দেখা দিয়েছে।

মিত্রা একটু নড়ে-চড়ে অকারণে কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে স্থির হয়ে বসল।

কেউ ঘরে প্রবেশ করে বলল, দাদাবাবু বাবারটা কি এখন তৈরি করবেন? বলেন ত আমিও ব্যবস্থা করতে পারি। পাঁচটা অনেকজন বেঞ্জে গেছে।

অতঃমু বলল, তুমিই যা করা কর কেউ।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, বাবারটা আমিই করব। চল কেউ। ওরা একসঙ্গেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অমল:

## বন্যা ১৯৫৯

### শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক

বিপন্ন মোরা—জীবসন্ন ও বিষন্ন দেহমন—

এই কি বন্যা নিঃস্রব না বন্যা বিবর্ধন?

বন্যা হয়েছে, হতেছে এবং প্রতিকার নাই যবে—

ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে, বন্যা ব্রিগেড গড়িতে হবে।

গেছে ঘরবাড়ী, ভাঙা দেহমন, ধুয়ে মুছে গেছে ধান—

পল্লী হতেছে অ-বাসযোগ্য বন্ধ হে ভগবান।

কারাকা বাধ বাধ চাই আগে—তার তোড়জোড় কর—

কিছু সকলে নিরুপায় হয়ে 'নোয়া'র আকই গড়।

মর্যাদা যাতনা পেয়েছি—যা-অবিস্মরণীয়—

শহর বাঁচুক, সঙ্গে তাঁহার পল্লীকে বাঁচাইয়ো।

২

শাপের সঙ্গে এক সাথে থাকি স্রোতের সঙ্গে লড়ি,

বছর বছর কেমন করিয়া এমন জীবন ধরি?

কেহ গাছে ঝুলে, কেহ চালে চেপে, রক্ষা করেছি প্রাণ,

ভেসে গেলে বেশী ক্রোধ ত হ'ত না—সব জালা অবসান।

খড়কুটা দিয়া হ'বছর ধরে যে বাসা হইল গড়া—

নিমেষে কোথায় সব ভেসে গেল—অধিক যাবে কি করা?

এমন অগোয়বের জীবনধারণ করাও পাপ—

সত্য স্বাধীন পুণ্য দেশেতে বিধাতার অভিধাপ

সময় থাকিতে উপায় না করা—সে কি নয় অপরাধ?

স্বচ্ছায় এ যে কাছে ডেকে আনা জাতির আন্তর্নাদ।

৩

গোহাল পড়িছে—ঘরে হাঁটু জল, উপায় খুঁজে না পাই,

যোজন খুঁজিয়া 'অজর' 'কুপুর্ন' সবল নৌকা নাই।

মিলিটারী বাট আসিল ক'খান বন্যা সহিয়া গেলে,

কত যে শক্তি সামান্য দিত দুই দিন আগে এসে।

আঁধারে কাটিল 'আন' 'আন' কবি বিভীষিকাভরা রাত—

প্রভাতে পাঁচটা পেটোমাকে জানা'সা সুপ্রভাত।

বিলিক আসিছে ভিক্ষা আসিছে কথল পিছু পিছু,

বস্ত্রার প্রাণরক্ষার শুধু উপায় ছিল না কিছু।

দোষ দিব কারে? কষ্টে কাটাশু সব সাধনার ব্যাতি—

শবাসনা ভালে দেখিলাম কই, খণ্ড চন্দ্র ভাতি?

# বিদেশী নামের বাংলা প্রতিরূপ

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ জাতি

গোটা পৃথিবীটা ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্ব ও বিচরণ ক্ষেত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র ভূভাগের এক পঞ্চমাংশের উপর তারা প্রভুত্ব করত। গত পাঁচশ' বৎসরের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহে তারা প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইংরেজীতে অনুবাদ নাই এমন কোনও মূল্যবান গ্রন্থ অল্প ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ। এ সবার ফলে ভূগোল ইতিহাস সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে বাদের উল্লেখ আছে এমন সকল দেশের সকল নামই পাওয়া যায় ইংরেজীতে।

বাঙালী

বহির্জগতের সহিত বাঙালীর পরিচয় নূতন না হলেও তার পরিসর সঙ্গীর্ণ। আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ইংলণ্ডের সঙ্গে। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সকে পরিচিত করে দেয় যাদের সঙ্গে তাঁদের সংখ্যা ছিল মূটীমের। ক্রমে রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের অত্রাঙ্ক দেশও শিক্ষিত বাঙালীর চেনা হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাঙালী বিজ্ঞানী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। রাশিয়ার লৌহকপাট খুলে দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পর সকল দেশের ঘাবই এখন আমাদের জন্ত উন্মুক্ত। তা সত্ত্বেও নানা কারণে বিদেশগামী বাঙালীর সংখ্যা বেশী নয়। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এলাকা প্রধানতঃ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সীমাবদ্ধ। বিদেশ-প্রত্যাগত বাঙালীর অতি অল্প কয়েকজন মাত্র। তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে বহু বই ছাপেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাঁরা লেখেন তাদের বিষয়বস্তু সাধারণত থাকে বর্তমানকে ঘিরে। বাংলা দৈনিকের উপজীব্যও বর্তমান। ভ্রমণকারীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আকলিক। নানা দেশের ও নানা কালের বিবরণের জন্ত আমাদের এখনও নির্ভর করতে হয় ইংরেজী বইয়ের উপর। বাংলা বইতে বিদেশী নাম যে কম তার কারণ এই। স্থল-পাঠ্য ভূগোলের বাইরে স্থানের নাম, বিদেশী ইতিহাসের স্থান ও ব্যক্তির নাম এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত নামের বাংলা প্রতিরূপের প্রয়োজন ছিল কম। সম্প্রতি অকস্মাৎ স্থলের বর্ধমান থেকে বি-এ ক্লাস অবধি ইউরোপ ও পৃথিবীর ইতিহাস বাংলার পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। এবার বিদেশী নামের চল নেমে এসেছে গল্প-উপক্ৰাস-প্রধান বাংলা ভাষার উপর। ছাত্রদের জন্ত নূতন নূতন ইতিহাস বাংলার রচিত হইতেছে। এ সব পুস্তকের লেখকগণ প্রায় সকলেই কৃতবিদ্ব অগাধ্যাক। ইংরেজী ইতিহাস এদের রচনার অবলম্বন। ইংরেজী নামের বাংলা প্রতিরূপ লেখকরা সৃষ্টি করে নিচ্ছেন।

বহু নামের বাংলা পূর্বে কোন দিন ছিল না, যা ছিল তাও তাঁরা নূতন করে লিখছেন।

ইংরেজী নাম

লিপি ধ্বনির প্রতীক। বিদেশীর মুখের ধ্বনি লিপিতে প্রকাশে শোনা এবং লেখা দুয়কমেই ভুলের সম্ভাবনা বিজ্ঞান। এ ভুলের প্রমাণ মিলে এ দেশের নামের ইংরেজী রূপে। বিদেশী নামের প্রথম প্রতিবর্ণকারী ছিল ইংরেজ নাবিক সৈনিক পর্যটক অথবা বণিকের গোমস্তা। এরা কেহ ধ্বনিতত্ত্ব-বিশারদ না থাকায়ই সম্ভাবনা।

কলকাতার ইংরেজী রূপটি সম্ভবতঃ জব চার্ণকের সৃষ্টি। যে বিপোর্ট ক্লাইভের বিজয় বার্তা বহন করে প্রথম লণ্ডনে পৌঁছেছিল তাতেই আগেকার অখ্যাত প্রাক্তর পলাশী রূপান্তরিত হয়ে থাকবে প্রাসিঙে। কুমীর ইংরেজ গোমস্তাদের খাতার চুঁচুড়া ঠাই লাভ করেছিল তার নূতন রূপ চিনসুয়ার। ইংরেজের হাতে পড়ে জীবামপুর হারিয়েছে তার জী। 'ম' লোপের পর তার 'মান' খুইয়ে বর্ধমান হয়ে গেছে ব্যাডোয়ান। চন্দননগরে আর 'চন্দন' মিলে না, এবার পেগানে 'চন্দর' বা চন্দ্র। ককচন্দ্রের নগরের 'ন' কাটা গেছে, এখন তা ককগর।

কজিবরমের আড়ালে যে কাকীপুরম লুকিয়েছিল তা আমা-দেয় জানা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর জব্বলপুর ফিরে পেরেছে তার আসল নাম জাবালপুর। বিজয়বাড়া যে ইংরেজের আমলে বেজোরাড়া নাম নিয়েছিল তা বোঝা কঠিন। বিলিতি স্বাটে গর্জিত মথুরা হরে পড়েছিল 'মুজা'। বন্দর ও জাহাজ নির্মাণের কর্মশালা বিশাখাপত্তমকে ইংরেজী বই পড়ে আরহা এতকাল বলে এসেছি ভিজাগাপত্তম।

কোন এক ভক্তিমান হিন্দু যুগে নদীর নাম 'গঙ্গাজী' শুনে কোন অজ্ঞাত বিদেশী তার প্রতিলিপি করেছিল 'গঙ্গজী'। তাদের স্বরবর্ণের উচ্চারণে অনিশ্চয়তার জন্ত অপর ইংরেজেরা লিপির 'জ' কে পড়েছে 'গ্যাং' আর অঙ্কে জুড়ে দিয়েছে এক 'স'। একরূপে গঙ্গাজী হয়েছিল গ্যাংজীস। লিপি পড়বার দোবে 'কলকতা'ও সেইরূপ হয়ে ঠাঁড়িয়েছে 'ক্যালকট্টা' কার্ত্তবীর্ষার্জুনের নরসহচরী নরদ্বাকে তার ইংরেজী বেশে চেনা সহজ নয়। বমুনা ভাবান্তরিত হবার পথে হারিয়েছে তার 'উ'। সিদ্ধু আর তার পাঁচটি কদমা নদী ত বদলে গেছে বিলকুল। একরূপে শত শত ভারতীয় নাম ইংরেজেরা করে দিয়েছে অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ।

## নামের বাংলা প্রতিরূপ

ইংরেজীতে এদেশের নামে যে বিকৃতি ঘটেছে অল্প দেশের নামেও সেরূপ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাংলা বিদেশী নাম সাধারণতঃ ইংরেজী নামেরই প্রতিলিপি। সুতরাং এতে স্থানীয় উচ্চারণের ইংরেজীতে ভুল ছাড়া ইংরেজী লিপির বাংলা রূপান্তরেও ভুল ঘটা অনস্ব্য নহয়। বাঙালী পণ্ডিতদের কেহ কেহ আবার ফরাসী জাখান প্রভৃতি ভাষার ধ্বনি অনুলিখনের চেষ্টা করে থাকেন। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্ববঙ্গের লোক যেমন বাঙাল ভাষায় মাঝে মাঝে ‘চ’ চারটে ‘খাচ্ছি’ ‘খাচ্ছি’ আর ‘মাইরি’ বলে গর্ববোধ করে, ইংরেজী উচ্চারণেও মধো ফরাসী ও জাখান উচ্চারণ তেমনি শোনায়।

আমাদের চিন্তায় ইউরোপ অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। ইউরোপ নামটি বাংলা ভাষায় প্রাক্কণে প্রবেশলাভ করেছিল প্রায় দুইশ বৎসর আগে। এত দীর্ঘকাল ভাষায় থেকে নিজের বানানে তার মৌবসীধত্ব জায়গা না। অধ্যাপক দেবজ্যোতি বসুণ তাঁর বইয়ের নাম বেছেছেন ‘আধুনিক ইউরোপ’। ববীন্দ্রনাথের, ‘যুরোপ প্রবাসী’ পত্রের অধুনাগে অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘ইতিবৃত্তিকা’র লিখেছেন ‘যুরোপ’। অধ্যাপক কিরণচন্দ্র চৌধুরী তাঁর ইতিহাসের নামকরণ করেছেন ‘ইউরোপের ইতিহাস’। সাংগিতিক মনোজ বসু বই বেচিয়েছেন ‘নতুন ইউরোপ’ নাম নিয়ে।

আমরা আনাজীয়া বিখ্যাত হয়ে ভাবি ‘ইউরোপের’ আদিম্বর দুটি নিয়ে এত গোল কেন। নামটির আদি বানান ‘ইউরোপ’ লিখলে মহাভারত অন্তত হয় কিনা জানি না। এ বেন ‘হাতী ঘোড়া হস্ত্রম করে ডাঁপ দেখে নাকু সিটকানো’র মত লাগে। সেকালের মূনিব শব্দের বানানে ভেদ সৃষ্টি করে নিজের মূনিব প্রমাণের চেষ্টা করতেন না। বিত্ত উচ্চারণের দোহাই দিলে আফ্রিকা ও আমেরিকা’ত বাদ পড়ে না। আমরা বলি আফ্রিকা ও আমেরিকা কিন্তু লিখি আফ্রিকা আর আমেরিকা। এশিয়ার অন্তঃস্বরও আ নয় আ। বিত্তমতাবাদীরা এদের কি ব্যবস্থা করবেন জানতে উচ্ছিন্ন হয়।

মহাদেশ ছেড়ে এবার দেশ ও শহরের বাংলা নাম দেখা যাক। নামগুলো ববীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক বসুণ, চৌধুরী, মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হ’ল। একই দেশের নাম জরমানি, জাখানি, জারমেনী, জাখেনী। সে দেশের ভাষা জাখান, জাখান ও জাখান। প্রধান শহরের নাম বার্লিন বা বার্লিন। বইতে প্রাশিয়া ও ফ্রিশিয়া দুই-ই রয়েছে। রাশিয়াকে রুশদেশ লেখার পরামর্শ দিয়েছেন সুনীতিবাবু। পোল্যান্ড বা পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস অথবা ওয়ারসো। সুইটজারল্যান্ড না সুইজারল্যান্ড? বাভেরিয়া, বেভেরিয়া, এই-লা-স্মাপল, এ-লা-চাপেল, ইতালি, ইটালি, পটুগাল, পোর্ডুগাল, লাইপজিগ, লাইপৎসীগ, প্যারিস, প্যারী, পিডমন্ট, পাইডমন্ট, জাপলাস, নেপলস, ট্রিপো, ট্রোপ, ভেনিস, ভিনিস, জেনিভা, জেনেভা, বেথলিহেম, বেথলেহেম, ক্যানাডা, কানাডা, সাংহাই, সাংঘাই। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশীয়

নৌবহর যে প্রণালীতে বিধ্বস্ত হয়েছিল তাই নাম এক অধ্যাপক লিখেছেন ‘সিমি’, অল্প একজন, শুনিম। (Tshusima)।

বাস্কির নাম—ট্যালিসাস, তালেরা, বাস্কল, বাসকেইল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, বুর্কন, বুথবোচ এরূপ বিভিন্ন বানানে ব্যক্তি ও স্থানের নাম বই ক’খানায় ছড়িয়ে আছে। আমাদের আলোচনার জন্য উপরেই দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্ট।

## বাংলার বিদেশী নামের একাধিক রূপের দৃশ্য

আমাদের ছাত্র জীবনে আলোচনা হ’ত নামের বানান ভুলে নব্বয় কাটা যায় কি না। শিক্ষক মশায় বসতেন, ‘পরিচিত শব্দের বানান ভুল লিখলে নব্বয় কাটা যাবে বই কি। তাঁর কথা এখন আর থাকে না। সর্বাধিক পরিচিত নামগুলোর মধ্যে ইউরোপ অজ্ঞতম। তা বাংলায় এ পর্যন্ত চার বানানে দেখা দিয়েছে। যারা লিখেছেন, তাঁরা প্যাতনামা বিধান ব্যক্তি। কাজেই ছাত্রদের মধ্যে শোনা যায়, ‘বাংলার যে কোন বানান লিখলেই চলে।’ ইংরেজীর বেলা কিন্তু সবাই সতর্ক। বাংলা বানানে এই শিথিলতার প্রতিক্রিয়া শুধু ইংরেজী নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাংলা নাম ও শব্দের মধ্যেও প্রসারিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা কোন ভাষায় পক্ষেই গৌরবজনক নয়।

চেনা নাম অপরিচিত বানানে দেখা দিয়ে মনকে পীড়িত করে তোলে নিত্য চলার পথে আকর্ষণ বাক্যের হেঁচটে খাওয়ার মত।

ঘটনাস্থল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা ইতিহাস পাঠে সহায়তা করে। মানচিত্র সম্পূর্ণ বেধে ইতিহাস পড়ার ঘটনা ও ঘটনাস্থল মনে ঝাঁক হয়ে যায়। বাংলার নির্ভেদেগা মাপের অভাব। বাংলা বইয়ে বা মানচিত্রে বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকে না। বই পড়তে পড়তে যখন ‘সিমি’ বা ‘সর্বকোর’ সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তখন হৃদয়ের অবস্থান খুন্সে বের করেবার কোন উপায় থাকে না। নতুন বানান বোধের বাধা জন্মায় পাঠকের সত্যজ্ঞানের জন্য চেষ্টা অচেনা বাংলা নামের পাশে ইংরেজী নাম দেবার অবশ্যকতাও বোধ করেন না।

## বিদেশী বাংলা নামে বানান বিভ্রান্তির কারণ

ইংরেজীতে একই বর্ণ বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়। লেখকের ইংরেজী ধ্বনি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে প্রতিবর্ণীকরণ ভুল দেখা দেয়। বিভিন্ন লেখকের ধ্বনি জ্ঞান অনুসারে প্রতিলিপি করার বানানে বিভ্রান্ততা ঘটে। এখানে ইংরেজী বর্ণের উচ্চারণ বৈচিত্র্যের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে

a—Hall, Haliam, Hals, Hare, Hading, Hale, Hannibal, Haberlin,—এই আটটি পারিবারিক উপাধির চিহ্নিত a কয়টির উচ্চারণ আট বকম। কোন কোনোটের স্পষ্ট প্রভেদ বাংলার ধরা পড়ে না। অপর নামগুলো অনবধানতা বশতঃ বিভিন্ন লেখকের বিভিন্নরূপে লিখিবার আশঙ্কা থাকে।

শুধু স্বয়ং নয়, বাঞ্ছনবর্ণেও একবর্ণের পৃথক পৃথক ধ্বনি আছে। Darjeeling, Dibrugarh ও Dacca-তে একই 'd' দ ড ও ঢ এর প্রতীক। Gauhati, Geonkhali ও Genoa, Canada, Ceylon ও Cyprus-এর g ও c-র উচ্চারণ একাধিক। Briton, Brighton, Birmingham, Hertfordshire—এই চারটি 'i' এর উচ্চারণ চার রকম। এরূপ দৃষ্টান্ত আর বাড়ানো নিম্নপ্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “ইংরেজী বর্ণের ঠিক বাংলা প্রতিবর্ণ সম্ভব নহে।” তথাপি আমাদের লেখকগণ অসাধ সাধনের চেষ্টা করে বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকেন।

‘একটা নতুন কিছু কর’ ডি. লে. রায়েব এই উপদেশ গ্রহণ করে কেহ কেহ শুধু নতুনত্ব জুটই নতুন বানানে নাম লিখে থাকেন।

লেখকদের সমুখ বাংলায় বিদেশী নামের কোন অভিধান থাকে না বলে তাদের ভাড়াভাড়ি একটা প্রতিলিপি নিজেদেরই করে নিতে হয়। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রূপে প্রতিবর্ণ করেন, তাই বানানে অনেকটা ঘটে। রোমান বর্ণের উপর নির্ভর করে ক্রুরূপ ঠিকতে হয় তা দেখা গেছে একখানা প্রসিদ্ধ বাংলা দৈনিকের ক্ষেত্রে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের নাম যখন প্রথম সংবাদে দেখা দেয় তখন কংগডখানি লিখেছিল ‘সোয়েকর্ণ’। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবর্ণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। লেখকের জানা ছিল না যে Shoe লেখার oe মিলে যেমন ‘উ’ হয়, রাষ্ট্রপতির নামও তা হয়েছে। কিছুদিন পর থেকে অবশ্য সোয়েকর্ণ শুকর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

নামের বানানে ভিন্ন ভিন্ন রূপের আর এক কারণ ইংরেজী ও অন্তর দেশের স্থানীয় উচ্চারণ—এ দুয়েরই ব্যবহার। প্যারিস ও মারসেলস ইংরেজী আর ফরাসী, প্যারী ও মার্সাই, বাংলার উভয়ই প্রবেশ করেছে। একই কারণেই বাংলার বর্লিন ও বার্লিন, জরমানি ও জার্মানি দেখা যায়। রাশিয়ার বেলা কিন্তু আমরা ইংরেজী রাজ্য, ছেড়ে রাশিয়ান উচ্চারণ ‘রাশিয়া’ ধরেছি। প্রাশিয়াব ইংরেজী ‘প্রাশ্যা’কে আমরা করেছি ‘প্রাশিয়া’ আর জার্মান উচ্চারণ ‘জার্মিয়া’ও ছাড়িনি।

দেশী ও বিদেশী নামের বন্দ্ব এখনও চলছে। ভারত এদেশের রাখা নাম, ইণ্ডিয়া তার ডাক নাম হয়ে পড়েছে। ট্রিগ্গিট না মিশর, নাইল না নীল, সকাভা না সুরভা, সিলোন না সিংহল, কেপ কেমোরিন না কুমারিকা, বাখ্মা না বাকদেশ, জাভা না যবদীপ, এদের কোনটা টিকে থাকবে?

প্রতিকারের পথ

“বিদেশী নামের মধ্যে রূপদেশ স্থলে রাজ্য, চীন স্থলে চায়না,

পারস্য স্থলে পার্শিয়া, প্রভৃতি কখনও লিখন”কে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ‘বর্করতা’ বলে অভিহিত করেছেন। এসব ‘ভাষাগত বর্করতা বা অশিষ্টতা’ পরিহারের উদ্দেশ্যে আমরা ইংরেজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উপকৃত হতে পারি। বিভাজ্য বাহন ইংরেজী পবিত্রাগ কবে বাংলা ধারায় আমাদের সামনে যে সমস্তা দেখা দিয়েছে বিশ শতকের মাঝামাঝি, ইংরেজী ভাষায় তার উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে। ভারত ইংরেজ শাসনাধীনে আসিলে ভারতীয় নামের ইংরেজী প্রতিক্রমে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। তখন শ্রব উইলিয়ম জোন্স প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম রচনা করেন। সকল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কোলকাতা উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ শ্রব উইলিয়মের নিয়ম অনুসরণ করে চলতে থাকেন। এর ফলে প্রাচ্য নামের ইংরেজী প্রতিলিপি-নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। উচ্চারণ ও লিপি বিকৃত হয়েছে জেনেও যে-সব নাম ইংরেজী ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল তাদের কোন পরিবর্তন তারা করেন নি। ‘গ্যাঞ্জেন’ বললেও ব্রিটিশ পাঠকরা গঙ্গাই বুঝবে। বিস্ময়কর নামে তাঁরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তাঁরা মিস্রকে ইগুস, গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেন, দিল্লীকে ডেহলি, সুব্বাইকে বম্বে, মহীশূরকে মাইসোর, বৌদ্ধদের বুদ্ধিষ্ট নাম স্থানীয় উচ্চারণ অনুযায়ী পরিবর্তন না করে ইংরেজ পাঠকদের প্রতি সজ্ঞা দেখিয়েছিলেন। এখানে কিন্তু দু’শ বছর ধরে বাংলায় প্রচলিত ইউরোপের বানান নিয়ে খেলা চলছে। হবীজনাথ বলেছিলেন যে, বাড়াসীরা পদ্মবনে মত্তকরীসম বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াস্থলে পদদলিত করিতে পারেন।

কোন কোন ব্যাকরণে ইংরেজী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ দেওয়া হয়েছে। তা পড়ে কবি পোপের কথা মনে পড়ে। একবার তিনি বলেছিলেন যে, অভিধানকারগণ শুধু একক শব্দের অর্থ জানেন। একত্রিত পদসমূহের অর্থ তাঁদের গম্যের বহির্ভূত। ব্যাকরণের বর্ণের প্রতিবর্ণ ও কোন নামের প্রতিলিপি লিখতে খুব বেশী সাহায্য করে না।

বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ইংরেজী ভৌগোলিক নামের গেজেটিয়ার থেকে ভূগোলের নাম এবং ইতিহাস থেকে সঙ্কলন করে ঐতিহাসিক নামের একটি বাংলা গেজেটিয়ার প্রস্তুত করে স্থানের নামের বানানে বিশৃঙ্খলা দূর করতে পারে। ব্যক্তির নামের বাংলা অভিধান রচনা করে ব্যক্তির নামের বানানের একটি প্রামাণ্য অভিধান করা যায়। গুয়েবষ্টারের অভিধানে এ ধরনের সংক্ষিপ্ত নাম-পরিচয় দেওয়া আছে। এরূপ দু’খানি পুস্তক সঙ্কলন করে নামের বানান সমস্তা সমাধান করা সম্ভব।

## প্রয়োজনের সীমা

শ্রীকান্ত রায়

চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে পরিতোষ। এলো-  
এলো অনেক কথা একসঙ্গে ভিড় করে আসে। কিন্তু ভাল  
লাগে না—কিছুই যেন ভাল লাগে না। বাইরের ধমধমে  
মেঘলা আকাশের মত তার মনও বড় বেশী ক্লান্ত আর  
বিষন্ন হয়ে গিয়েছে। মেঘ করেছে সেই কখন থেকে, কিন্তু  
এখনও এক কোঁটা বৃষ্টি পড়বার নাম নেই। চতুর্দশ  
জানুয়ারি ফাঁক দিয়ে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে ছিল সে,  
কখন আকাশের বঃ পালটায়, কখনও বৃষ্টি নামে! অসহ—  
অসহ এই প্রতীক্ষা! আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে  
বিস্ত্রিত আর বিস্মাদে অস্থির হয়ে উঠেছিল পরিতোষ  
চৌধুরী। ছটফট করেছিল নিজের মনে মনে। অন্ততঃ যদি  
বাড়ি উঠত সেও অনেক ভাল ছিল।

তখন—টিঃ তখনই চিঠিটা এল। এনভেলোপটার  
দিকে এক নজর তাকিয়েই সব টের পেলে সে। আপিসের  
ছাপানো এনভেলোপ, পরিতোষ জানত—নিশ্চিত জানত  
চিঠিটা আসে। তাতে কি লেখা থাকবে তাও তার  
অজানা নয়। কি হবে খুলে, কি হবে পড়ে! তার কোন  
কৌতূহল নেই, উৎসাহও নেই। আপিসে কাজ করতে  
করতে আর কাসতে কাসতে যখন আশ্চর্য এক তরলের  
নোনা স্বাদে তার মুখটা ভরে গিয়েছিল তখনই পরিতোষ  
টের পেয়েছিল চাকরির পালাটাও এবার শেষ হতে চলল।  
বেতনসহ এক মাস ছুটি পাওয়া গেল—পুরো একটি মাস।  
নিয়মিত মাহ-মাংসের ব্যবস্থা হ'ল, আধ সের করে দুধ, প্রায়ই  
দামী ফলের রস; সপ্তাহান্তে ডাক্তার ইনজেক্শন দিয়ে  
গেলেন। সমুদ্রের ধারে যেতে পারলে সুবিধা হ'ত। একটু  
চেঞ্জ—শরীরের, ইয়া মনেরও পরিবর্তন দরকার বৈকি।

—চেঞ্জ! হাসতে হাসতে পরিতোষ নমিতাকে  
বলেছিল, কেন? এই মীজাপুত্রের স্বাস্থ্য এমনকি ধারাপ?

—তা হয় না। তোমাকে যেতেই হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে  
নমিতা বলেছে, আমি সব ব্যবস্থা করব।

—বুঝলাম। যেমন করে মাছ মাংস আর ছুথের ব্যবস্থা  
করছে?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

পরিতোষ আঙুলে আঙুলে বলেছে, কিন্তু এটাই একমাত্র  
নির্ভরযোগ্য পথ নয় নমিতা। চুড়ি-আংটি ত আগেই গেছে,  
এবার বোধ হয় গলায় হারটাকেও বেচবে?

—হার!

কৈশে কৈলেছে নমিতা, গরন আমি আর পরব না।

কিন্তু হার বেচেও সমুদ্রের ধারে যাওয়া হ'ল না।  
ডাক্তার ইতিমধ্যে আরও দামী দামী ঔষধের নাম বললেন,  
ভিজিটের টাকাও শুনে নিলেন নিয়মিত। আপিসের ছুটি শেষ  
হয়ে এল। এবার কিছুদিন অর্ধবেতন তার পর বিনা বেতনে  
এক মাসের ছুটি পাওয়া গেল। আপিস থেকে এর চেয়ে  
বেশী কি আর সাহায্যের কথা আশা করতে পারত?  
আন্তরিক চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার, নমিতার সেবাস্বত্বও  
এতটুকু এটি ছিল না; আর এই মীজাপুত্র ট্রাট থেকে সমুদ্রের  
দূরত্বটাই এমনকি বেশী। তপনের ভূগোল বইতেই লেখা  
আছে মাত্র আশী মাইল! সেই আশী মাইল দূর থেকে  
ওজোন মেশানো সামুদ্রিক বায়ুর এতটুকুও কি এসে ঢোকে  
না শওদাগরী আপিসের নগণ্য কেবানী পরিতোষ চৌধুরীর  
ধরে?

এই ছোট্ট বরটাতে শুয়ে শুয়ে সেই আশ্চর্য তরলের  
নোনা স্বাদ অগ্রভব করেছে সে, আর দেওয়ালের গায়ে  
টাঙানো কালেক্টরের লাল আর কালো কালিতে ছাপা  
সংখ্যাগুলি এক এক করে লক্ষ করেছে। এই প্রায়শ্চকার  
একটা ঘর, প্রতাহের নোনা স্বাদ। ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত এক  
একটা দিন! জীবন নয়, মৃত্যুও নয়—প্রতিনিয়ত মৃত্যুর  
বিভীষিকা! আরও বেশী অসহ এই আতঙ্কের ছায়া।  
অবশেষে আপিসের ছাপানো খামের আড়ালে মৃত্যুর  
সুনিশ্চিত আশ্রয়।

নমিতা চা নিয়ে বসে চুকছিল। পরিতোষকে ঐভাবে  
নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল  
সে। ভয়ের একটা মুহূর্ত কিন্তু অনিবার্য অমুভূতি তার  
শরীর বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

বড় দেওয়াল ঘড়িটার সাড়ে ছ'টা বাজল!

—কি হয়েছে! অমন করে বসে আছ কেন?—চা  
রাখতে রাখতে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল নমিতা।

হাসতে চেষ্ঠা করে পরিতোষ, না, কিছু নয়।

—ওটা কিসের চিঠি? ভয়ে ভয়ে ভিজ্জেন করে  
নমিতা।

—নাও, পড়ে দেখ।

পরিতোষ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিল। কাঁপা

কাঁপা হাতে খোলে নমিতা। চিঠিটা পড়ে—একবার, দু'বার, তিনবার। না, মুখে তার কান্না নেই, আঁতলাহ নেই, যন্ত্রণার ছাপও নেই। এখন নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরিতোষের মনে হ'ল অমৃতবের কোন ছবিই বোধ হয় এই মেয়ের মুখে ফুটে ওঠে না। নমিতা কাঁদে না কেন? কাঁদতে কি তার ভাল লাগে না? গয়না বেচার কথায় একবার যে কঁদেছিল তার পর থেকে কি কাঁদতেই ভুলে গেছে নাকি?

—পড়লে?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে?

—তুমি চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওকি, তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

—নমিতা।

—ও কিছু নয়, তুমি ব্যস্ত হয়ে না।

পরিতোষ কোন রকমে নিঃশব্দে সামলে নিল। তার পর যেন নিজের কাছেই বসেছে এমনি ভাবে বিড় বিড় করে বলে, আজ যেন আমার কি হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছ না।

—ওষুধটা খাবে এখন?

—না ওটা এখন থাক। ওষুধ খেতে আমার আর ভাল লাগে না। কি হবে ওষুধ খেয়ে—বলতে বলতে যেন একটু বিরক্তই হয়ে যায় পরিতোষ, আচ্ছা, রান্না করা, আমাকে ওষুধ খাওয়ানো আর সেবা করা ছাড়া তোমার কি আর কোন কাজ নেই নমিতা? বল, জবাব দাও আমার কথার।

উত্তেজনার তার দেহ ধরধর করে কাঁপতে থাকে।

নমিতা তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলে, একি স্থির হও তুমি।

না, না, ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমার প্রাণের জবাব দাও।

—কি হবে?

—কেন, কেন শুধু এই—

হঠাৎ সে কাশতে থাকে। নমিতা আস্তে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। চাটখটা ভাল করে ঝড়িয়ে দেয় সারা শরীরে। শিশুর মত ক্যালক্যাল করে তাকালো পরিতোষ। কাশি থামলে আস্তে আস্তে ঘুমাবার চেষ্টা করে সে।

ঠিক এই সময় বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে এতক্ষণে। নমিতা ভেবে পেল না এখন কে আসতে পারে। কপালের উপরে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে জড়িতপদে বাইরের দরজা এসে দরজাটা খুলে দিল সে।

বাব-ভেদ বছরের একটি ছেলে।

—শঙ্কর তুমি? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলে।

—ও কিছু নয়।—শঙ্কর বা হাত দিয়ে কপালের ওপর থেকে ভিজে চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে বলে, মাষ্টারমশাই কেমন আছেন?

—এস, দেখবে চল।

নমিতা তাকে পাশের ঘরের নিয়ে যায়। বিছানায় শুতে থাকতে থাকতেই পরিতোষ জিজ্ঞেস করে, কে এসেছে নমিতা?

—আমি মাষ্টারমশাই।—জবাব দেয় শঙ্কর।

—শঙ্কর!

পরিতোষ উঠে বসে।

—ও কি, তুমি আবার উঠছ কেন? নমিতা বিমোহিত ভাবে বলে।

—কোন ভয় নেই। তুমি অন্তরেই বেশী উত্তলা হয়ে পড়।—শঙ্করের দিকে তাকিয়ে সে বলে, তার পর, তোমার কি খবর?

—আপনার খবর নিতেই এলাম মাষ্টারমশাই।

স্নান হাসল সে আমার খবর?

নমিতা একটা শুকনো গামছা নিয়ে আসে, এই না শঙ্কর, ভাল করে ভিজে মাথাটা মুছে ফেল।

—থাক, আমাকে আবার এখনি বাড়ী যেতে হবে।

—শঙ্কর! পরিতোষ ডাকে।

—বলুন মাষ্টারমশাই।

—তুমি পড়ায় অনেক পিছিয়ে আছ, তাই না এন্ট্রান্সের অঙ্কগুলি ভাল করে বুঝতে পার?

শঙ্কর মাথা নীচু করে বসে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

—বুঝি, আমার জ্ঞান তোমার খুব কষ্ট হয়?

—আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন।

—ভাল। এ যোগ থেকে আমাদের মত মানুষরা সহজে ভাল হয় না শঙ্কর। আমি জানি তোমার অনেক অন্তরীক হচ্ছে, কিন্তু কি যে করি।

একর মাথা খুঁজে অপরাধীর মত বলে, বাবা আমার জন্য নতুন মাষ্টার ঠিক করেছেন।

—নতুন মাষ্টার?

—হ্যাঁ। বাবা বলেছেন—

—তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন শঙ্কর? এছাড়া ত আর কে উপায় ছিল না। নতুন মাষ্টার এসেছেন, ভালই হয়েছে, ম দিয়ে পড়াশুনো করো, পরীক্ষায় তোমাকে ভাল রেজা করতেই হবে।

—মাষ্টারমশাই, আপনি ছাড়া আর কারো কাছে পড়তে আমার ভাল লাগে না।

—পাগল ছেলে! তা কি হয় কখনও? তোমার মাষ্টারমশাই আর কত দিন পড়াবেন। বিষাক্ত জীবাণু আমার বুকের পাজর কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। জীবনের পরমায়ু এবার বোধ হয় সত্যি সত্যি শেষ হয়ে এল—নমিতা, তুমি কাঁদছ? আচ্ছা থাক ওকথা।

শঙ্কর পকেট থেকে কটা দশ টাকার নোট বার করে, এই নিম্ন মাষ্টারমশাই।

—টাকা?

—হ্যাঁ, বাবা আপনাকে দিতে বলেছেন।

—আমাকে দিতে বলেছেন—কিস্ত কেন? না না শঙ্কর, ও টাকা আমি নিতে পারব না। যতদিন তোমাকে পড়িয়েছি তত দিন টাকা নিয়েছি, আজ কিসের দাবিতে নেব?

—আপনার যে অনেক প্রয়োজন।

—নমিতা প্রয়োজন আমার অনেক। তবু এ টাকা আমি কিছুতেই নেত পারব না। শঙ্কর, তুমি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

—মাষ্টারমশাই!

—একটা কথা নয় শঙ্কর। এ অশ্রুযোথ আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না।

ব্যথাকৃত শঙ্কর নীরবে বসে রইল। তার পর পরি-তোষকে একটা প্রণাম করে সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার মধ্যেই বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হুঁজনে চুপচাপ! কিছুক্ষণ নয়, অনেকক্ষণ। এবার পরিতোষ আশ্বে আশ্বে ডাকল, নমিতা।

—কি?

—শঙ্করের কথা শুনে ত? টাকা দিতে এসেছে। আমার আর প্রয়োজন কি বল ত? তা ছাড়া নেব কেন? আমার প্রয়োজন যখন ওষেব কাছে ফুরিয়ে গেছে। ফুরিয়ে আমি সকলের কাছেই গেলাম নমিতা। ফুরিয়ে গেলাম অপিস থেকেও। এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা।

নমিতার চোখ বেয়ে ছ' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

—আঃ, মেয়েদের এই চোখের জল আমার সহ্য হয় না। কিন্তু জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর কেবল চোখের জল দিয়ে দেওয়া যায় না নমিতা। আশ্চর্য! তুমি চুপ করে আছ কেন? শুনেছে পাছ না নাকি! নমিতা আমার কথার জবাব দাও নমিতা।

উঃজনায় খবর করে কাপতে থাকে তার সারা দেহ। ফাংফাং মুতের মত হঠাৎ দুটি চোখ।

আর নমিতা।

এতটুকু কাকও হ'ল না তার মুখের পেশী, কান্না বামিয়ে চোখের জল মুছল। আশ্বে আশ্বে পরিতোষকে হুঁহাতে ধরে ডাককার মত বিছানায় শুইয়ে দিল। তার পর ধীরে অশ্রুটরুরে প্রায় ফিনফিন করে বলল, তুমি ঘুমোও এবার লক্ষ্মীটি, আর কথা বলো না। আমি তোমার চুলে আঙুল গুলিয়ে দেব। বসে থাকব তোমার পাশে সারাদাত।

—টাকা দিতে এসেছে শঙ্কর।—হাসবার চেষ্টা করে পরিতোষ, নেব কেন টাকা। আমার আর প্রয়োজন কি?

নমিতা হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদছে।





## সিনেমা ও বাংলাদেশ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

শিল্প হিসাবে না ইউক, স্বপ্ন হিসাবে আজ সিনেমা বাংলা দেশে জাঁকিয়া বসিয়াছে। এ তথ্য প্রমাণ করিবার জন্য কাহাকেও দূরে বাইতে হইবে না; ইহার জন্য অল্পমান বা আপত্তিকার দরকার নাই। বার বার পরিবারপোষ্ঠীর মধ্যেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে।

বাংলার তরুণ-তরুণী এখন সিনেমা-স্বপ্নে বিভোর। চিত্র-তারকারা এখন তাহাদের নমস্ত, আদ্যা দেবতা। শুধু বসন-ভূষণে নয়, আচার-ব্যবহারেও তাহারা আজ অমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দর্শনের জন্য এখন আর শুধু ক্ষীণ-মেধের দলট ভিড় করিয়া আসে না, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও তাহাদিগের সান্নিধ্যের জন্য লালসিত।

অর্ধ-শিক্ষিত বা অ-শিক্ষিত শ্রমিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম, ছাত্রদের মধ্যে বাহারা নিয়মিত সিনেমা দেখে না তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বাঙালী গৃহিনীরা সিনেমার অগ্রতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দুপুরের আসর তাহারা ইমাইয়া রাখেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কাজেই অশন-বশন সঙ্কোচ না করিয়া আসরে নিয়মিত দর্শনী সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু সিনেমার জের প্রেক্ষাগৃহেই শেষ হইয়া যায় না। ইহার চমক ঘরে ঘরে আসিয়া হান। দেয়। স্বপ্ন হিসাবেই আজ সিনেমার সমাদর, শুধু আমাদের খোঁচাক হিসাবে নহে। কাজেই সে স্বপ্ন মনকে চকস করিয়া রাখে, তাহাকে উত্তরোত্তর ব্যাকুল করিয়া বাস্তব-বিমূষ করিয়া তোলে।

অপরিণত বা রূপ মনের উপর এই স্বপ্নের প্রভাব অভাবনীয়-রূপে দেখা দেয়। সিনেমার কথা ও কাহিনী, সিনেমার গান, অভিনেতাদের হাব-ভাব—এ সমস্তই সে মনের মধ্যে বিবর্তিত হইয়া উঠি করে। ফলে সে জীবনকে রূপায়িত করিতে চায় এই স্বপ্নের মধ্যে আর সেই সূত্রেই তাহার জীবনে অসীম দুঃখ ও সংঘাতের সূচনা হয়।

বাঙালীর মন চিরদিনই কোমল ও কল্পনাপ্রবণ কিন্তু তাই বলিয়া অপরিণত নয়। বিচার-বুদ্ধি তাহার বশেষ ছিল আর এখনও আছে। তবে তার চরিত্রে এ অশোভন শিশুত্ব কেন দেখা দিয়াছে?

এ সমস্তার সমাধান করিতে খুব বেশী দূর বাইতে হইবে না।

গত মহানুভব ও তৎপরবর্তী কালে জাতিহিসাবে বাঙালীকে বত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে এমন আর কোন জাতিকেই করিতে

হয় নাই। দেশ বিভাগ হইয়াছে ১৯৪৭ সনে, আর্থ ১৯৫২ সনে অর্থাৎ বারো বৎসর পরেও বাস্তব্যাগীদের সমস্তার সমাধান হয় নাই। কেন হয় নাই সে অগাধ কথা, কিন্তু আজও শিয়ালদহ ষ্টেশনে বাঙালীর যে প্রেতমূর্তি দেখা যায় তাহা দেখিলে পৃথিবীর যে-কোন জীবিত জাতি শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা এ জাতির দুঃখ-দুর্দশার একদিকের চিত্র মাত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সকল চিত্র আছে তাহা বাহির করিলে সারা জগতের মনুষ্যত্ব যে লজ্জা পাইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই অমানুষিক দুঃখ ও লাঞ্ছনাৎ ফল, মনের মৃত্যু। সে মৃত্যু অস্বস্তি একদিনে আসে নাই, আসিয়াছে তিলে তিলে। সে মৃত্যু বতই ঘনাইয়া আসিয়াছে, মনের বাস্তব-বিমূষতা ততই বাড়িয়া গিয়াছে। পরিণত মন ক্রমশঃ শিশুমনে রূপান্তরিত হইয়াছে। দুঃখকে অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিবার যে শক্তি, অর্থাৎ তিতিক্ষা, তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ক্রমে এমন হইয়াছে যে, শিশু যেমন কোন ভয়ে বা দুঃখে লেশমাত্র কারণ দেখিলে চক্ষু বুজিয়া মায়েব কোলে উঠিতে চেষ্টা করে, বাঙালীও তেমনি ক্ষণিক দুঃখ-বিমূষতার জন্য পুনঃ পুনঃ এই সিনেমা-স্বপ্নের শরণাপন্ন হইতেছে। বিচার করিলে একথা তাহার নিশ্চয়ই মনে হইত যে, উহাতে দুঃখবোধ তাহার কমে নাই, বরং মনের চাকলা বাড়িয়াই গিয়াছে। কিন্তু বিচার করিবে কে? শিশুমন কি বিচার করিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ সিনেমা-জগৎ বাঙালীর এই মানসিক অবস্থাকে মূল-ধন করিয়া ব্যবসা করিতে সুরু করিয়াছে। বাংলার ভীত ও ভ্রান্ত মনের চাকলা প্রশমনের জন্য এক মহানুভবের সৃষ্টি হইয়াছে। সে হিতকর বস্তু আর কিছুই নহে—অপরিণত যৌন-আবেদন। এই যৌন-আবেদনই আজ সিনেমার অগ্রতম প্রধান উপজীব্য; এমনকি একমাত্র উপজীব্য বলিলেও অসত্য হয় না। পক্ষ মনকে পক্ষতর করিবার জন্য এমন মাদক-দ্রব্য আর কি আছে? জাতির মনের এক বৃহদাংশ অবশ্যই ইহা পড়িলে সিনেমা-জগতের এই ব্যবসা-তত্ত্ব অচিরেই ধরা পড়িয়া যাইত। এ কদর্য ব্যবসা বেগী দিন চলিত না।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। দুর্দশের প্রতিই চিরদিন অত্যাচার বোঝী হয়। আজ বাংলার চরম দুর্দশ; কাজেই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খাঙে-ভেজাল চলে বাংলা দেশেই। পক্ষ বাংলা সে অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণবীৰ্য্য হইয়া বাইতেছে। তেমনি করিয়া চলিতেছে এই মানসিক জগতে সিনেমার অত্যাচার। শিল্প, প্রগতি, রূপসৃষ্টি প্রভৃতি মনোহর

ঝোড়কে আবৃত হইয়া! যৌন-আবেদন প্রতিদিন মহামূল্যে বিক্রীত হইতেছে। ইহা যে রস নয় খসভাস তাহা কে প্রচার করিবে? সকল বাঙালীই জানে যে, তাহার খাড়ে ভেজাল দিয়া এক চরমতম নির্ভর ব্যবসা চলিতেছে কিন্তু যে সুস্থ মন সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে তাহা কোথায়? হয়ত এখন বাঙালীর মনে সিনেমা-জগতের এই অপচেষ্টা সন্দেহ কিছু কিছু সন্দেহ জাগিয়াছে, কিন্তু সে কদর্যা ব্যবসার সফল প্রতিবাদ করিবার মত শক্তি সে এখনও সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

অথচ, এই সিনেমাই পক্ষ বাঙালীর অশেষ উপকার করিতে পারিত। তাহার দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত, অবসাদগ্রস্ত প্রাণে শক্তিমান, মহত্তর জীবনের প্ৰেরণা আনিতে পারিত আর সাহায্য করিতে পারিত তার জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে। কিন্তু রুগ্ন মনকে সবুজ-সুপ্রায় সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য যে দরদেব দরকার তাহা না আছে বাঙালীর নিঃস্বপ্ন, না তাহার প্রবিশ্বদেব। তার উপর, রাষ্ট্র সিনেমাকে কল্যাণের পথে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে নাই। যে পথে সে চলিয়াছে সে পথ তাহার পক্ষে বিপথ। রাষ্ট্র ব্যবসাবুদ্ধিতে নির্বিচারে প্রাণজ দিয়াছে: সে ব্যবসারে সমগ্র জাতির আত্ম-লোকসানের হিসাব নে খতাইয়া দেখে নাই। আজও সে তা দেখিতেছে না। হয়ত সমগ্র দেশে সিনেমার প্রসার ও প্রচারণাকেই প্রগতির পরিমাপ বলিয়া রাষ্ট্রনেতারা আত্মপ্রশাদ লাভ করিতেছেন। ব্যাঙের ছাতার মত যে সিনেমা-হল গজাইয়া উঠিতেছে তাহাও সংখ্যা কথিয়া, সেগুলিতে সপ্তাহ ভরিয়া কতজন যে এই যৌন আবেদনের মহামূল্য পান করিতেছে তাহার হিসাব লইয়া দর-বন্দরের কতগুলি ‘ফিল্ম’ তৈরী হইল তাহার অঙ্ক কথিয়া তাহার বৈধব্যগুণে আপনাদের ঐশ্বর্য আহ্বি করিতেছেন। সিনেমা বেশি দেখে ক্ষীণ-মেধা বালগিল্যের দল; বাহাদুর মন অপরিণত অথবা রুগ্ন। সেট অপরিণত অথবা রুগ্ন মনের উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা যে একান্ত বিবেচনার বিষয় সে কথা তাহাদের মাথায় ঢোকে নাই।

কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা ইহা অপেক্ষাও গভীর কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন সিনেমার নট-নটীদের সামাজিক সম্মান দিবার চেষ্টা করিয়া। কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া রাষ্ট্র খেতাব দিয়াছেন, স্ফটিকজ্ঞান নেতারা তাহাদের সঙ্গে একত্রে ফটো তুলিয়া আত্মপ্রশাদ লাভ করিয়াছেন, কেত তাহানিকে খেলায় মাঠে ডাকিয়া আনিয়া

আব তাহাদের দিয়া ‘হকি’, ‘ফুটবল’ খেলা দেখাইয়া রাষ্ট্র-হিতার্থে অর্থোপার্জন করিয়াছেন। ইহা সামাজিক নিয়মভঙ্গের ইতিহাস। ইহা সমাজকে দুর্বল করিবার চেষ্টা; সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করিবার অপপ্রয়াস।

কিন্তু এ প্রয়াস ফলপ্রসূ হইতে পারে না। কারণ সমাজের কল্যাণ না করিলে কাহারও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ হইতে পারে না। প্রকৃত কল্যাণকর না হইলে সমাজ কাহাকেও মাজ করে না—রাষ্ট্র তাহাকে বহুবিধ সম্মান করিলেও তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। সিনেমার নট-নটীরা এখন সমাজের পক্ষে কতখানি কল্যাণকর সে কথা না বলিলেও চলে। তবে যদি কোনদিন তাহারা সমাজের কল্যাণসাধন করেন তবে সামাজিক শ্রদ্ধা ও প্রতিষ্ঠা তাহারা অবশ্যই পাইবেন। তাহার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়াসের দরকার হইবে না। রাষ্ট্রনেতারা হয়ত ভাবিয়াছেন যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত জাতিটা টিকিয়া আছে। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রম। সমগ্র জাতির নির্ভর রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উপর অনেক গুণ বেশী।

উপনিষৎ বলিয়াছেন, “আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।” জীব আনন্দের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকে। অন্ন নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়, শুধু আনন্দের আচ্ছাদেই লোক বাঁচিয়া থাকে। যতদিন তার দেহে বল ও মনে স্বাস্থ্য থাকে ততদিন সে আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে চায় সক্রিয়ভাবে। কিন্তু যেই দেহ অথবা মন অথবা উভয়ই রুগ্ন হইয়া যায় তখন আর সে আনন্দের অংশ সক্রিয়-ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। সুস্থ তরুণ-তরুণী খেলাধুলা, লেগ-ড্রম, চতুর্ভুজ প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দ পায়। আর তাহাদের মন ও শরীর যত রুগ্ন হইতে থাকে ততই তাহারা আনন্দ পায় বেলা বা সিনেমা দেখিয়া অথবা পল্লগুজবে। সিনেমা দেখাই যে রুগ্ন অবস্থার লক্ষণ তাহা নহে। তবে অপরিমিত সিনেমা দেখা যে মনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে একথা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা দেশে সিনেমা আজ মাদক-দ্রব্যরূপে দেখা দিয়াছে। ইহাও যথো বিচার-বুদ্ধির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্র এ মাদক-দ্রব্যের প্রচার ও প্রসারে বাস্তব। বাঙালীর রুগ্ন মনের কাছে এ নেশার প্রলোভন অপরিণীয়। তার মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া না আসিলে এ নেশার ঝোঁক তার কমিবে না।



## বকুল গাছে

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছানিপড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিটা মেলে দিয়ে দাওয়ায় ওপর চূপচাপ বসে আছেন সুকুমারী। শরীরটা তাঁর ক'দিনই ভাল নেই। অর অর ভাবটা যেন আজই বেশী মনে হচ্ছে। ফোপরা বকুল গাছটার গায়ে যেন কুড়ুল পড়ছে না—আঘাতটা যেন সরাসরি সুকুমারীর বুকে এসে লাগছে। তবু যখন তটে এসে মাথা খুঁড়ে মরে অনেকটা তেমনি ভাবে। মজুরদের পেনীগুলো সাপের মত পাকিয়ে উঠছে। কুড়ুলটা মাথার ওপরে উঠে আবার এসে পড়ছে বকুল গাছের বুকে। অসহ্য! তবু সুকুমারীকে এ আঘাত সহ্য করতেই হবে। অথচ বকুল গাছটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। সে-সব পুথানো দিনের কথা ক'জনই বা মনে রাখে? বারী জানত তারা আজ এ ভগ্নতে কেউ বুঝি বেঁচে নেই।

যৌয়ারা জেদ ধরল। আর ধরবে না-ই-বা কেন? হাজারে দাঁড়কাক এসে বাসা বাঁধল বকুল গাছটার ওপর। দিন নেই, স্নগ নেই কেবল শোনো কা-কা রব। নাতি পলটনের অর হতেই সুকুমারী আঁতর্ষ হয়ে উঠলেন। বড় ছেলেকে ডাকিয়ে নিজেই ফোপরা বকুল গাছটা কাটাবার কথা পাড়লেন—মাত্র পরগুদিন কথাটা পাকাপাকি হ'ল আর আজ মজুররা এসে পড়েছে। দাঁড় কাকগুলো সকাল থেকেই মিস্ত্রিদের ছাদে আস্তানা নিয়েছে আর সন্ধ্যবে সুকুমারীর দিকে চেয়ে যেন বিজ্ঞপ্তি করে পরিজ্ঞাহি ডেকে চলেছে। সুকুমারী অসহ্য শরীরে পলটনের কথা ভেবে দাঁড়কাক-গুলোর সঙ্গে সমানে চেঁচিয়ে উঠছেন, বাম—বাম—বাম। ঐ কাকের ডাক শুনে সুকুমারীর বুকেটা এখনও গুর গুর করে ওঠে। স্বামীর রোগশয্যার কথা মানসপটে ভেসে ওঠে। কতদিনকার কথা, এখনও সুকুমারীর সব কথা মনে আছে। সেদিন হলো বেড়ালটা কি ডাকই না ডেকেছিল! সেই অলুক্ষে ডাক শুনে রোগশয্যাতে স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। এখনও বেড়াল ডাক শুনেই অজানা ভয়ে সুকুমারীর শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দাঁড়কাকের ডাক শোনবার পর থেকেই সুকুমারীকে অজানিত আশঙ্কায় পেয়ে বসেছিল। সংসারের মললকামনা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস। কতগুলো কাককে শান্তি দেবার জন্য সুকুমারীর সাধের বকুল গাছটা চলে বাচ্ছে; আর তার সঙ্গে চলে বাচ্ছে এবাড়ীর বৃদ্ধার বেশ-কিছুটা সত্তা। কে বিশ্বাস করবে ঐ বকুল গাছটার সঙ্গে একটা বস্ত্র-মাসের মানুষ আজ তিন দিন ধরে গোপনে অশ্রুশ্রবণ কেলছেন? কেউ বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না। বাইরের সবকিছু এখন সুকুমারীর দৃষ্টিপথ থেকে সরে বাচ্ছে, চলে বাচ্ছে দৃষ্টিব অন্তরালে—আর ঠিক সেই সঙ্গেই আজ তিন দিন সুকুমারীর আর একটি দৃষ্টি প্রথমে হয়ে উঠেছে। মানস দৃষ্টি।

কিন্তু অন্তর্দর্শকে ত চাপা দেবার কোন উপায় নেই। স্বপ্নের বাড়ীর চারিদিক ছিল ভঙ্গলে থেবা। দিনের বেলা ভঙ্গলের দিকে তাকালে গাটা কেমন যেন ছয় ছয় করত। সুকুমারীর বয়স তখন কত হবে? বড়জোর দশ বছর। এখনও সুকুমারীর সব কথা মনে আছে। পায়ের মল পরে লাগলে খাট-শাড়ীটা পরে বকুল ফুল তুলছিলেন—থাব জমিদার বাড়ীতে চিকের আড়াল থেকে দেখা 'কৃষ্ণপালা'র একটা গানের কলি তুলছিলেন গুন গুন করে। হঠাৎ সুকুমারীকে পিসীমা তাঁকে ধরে এনেছিলেন অন্যরে। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে যেতে হয়েছিল বৈঠকখানার। শ্রামলালবাবুর মেয়ে দেখেই পছন্দ হ'ল। আড়ন্তদার মাহুদ, বাত থাকতেই গাঙ্গে বেরিয়েছিলেন—গিল্লীর গল্পনার কথা সাঝাটা রাস্তা তাঁর বুকে বিধেছিল। তাই অনেক দিনের কথা—দেওয়া মেয়েটিকে সরাসরি ভাবেই দেখতে এসেছিলেন। সেই স্মৃতির ভোরবেলায় কথা সুকুমারীর এখনও স্পষ্ট মনে আছে। প্রজাপতিগুলো ক'দিন থেকেই তাঁর মাথায় বেশী বসেছিল, সখিদের তাই নিয়ে কি রসিকতা! শ্রামলালবাবু পছন্দ করে চলে গেলেন, তার পর সখিরা ঘিরে থেবেছিল। সখিদের আনন্দ-ভরা মুখগুলো এখনও সুকুমারীর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চোখ বুজলেই এখনও সে-সব হাটের-বাওয়ার মুখ একে একে এসে ভিড় করে। সেই দিনগুলোই শুধু তাঁর কাছে থরা আছে। মাহুদগুলোর কোং হাদিস নেই।

দাঁড়কাকগুলো একটু আগে এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। উড়তে পারছে না। কেবল ডানা-ঝট-পটানি শোনা যাচ্ছে মিস্ত্রিদের বাড়ীর ছাদ থেকে। মজুররা বকুল গাছটাকে আঠে-পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। এইবার গাছটা দক্ষিণমুখে ফাঁকা জায়গাটোতে ছড়মুড় করে পড়বে। গাছটাকে আর একবার শেষ বারের মত দেখবার ইচ্ছা হ'ল সুকুমারীর। ঐ গাছের একটা ডালে দোলা খাটান থাকত। দড়ির ঘষটানি লেগে ডালে দুটো দাগ পড়েছিল। একটু তফাতে তফাতে দুটি দাগ। ডালটাকে মনে হ'ত নথর স্পৃষ্ট হাত। মাঝে মাঝে দড়ির দাগগুলোকে সুকুমারীর মনে হ'ত অনেক কিছু। বকুল গাছ যেন স্পৃষ্ট হাতে হ'গাতি বালা পরেছে। মনে পড়ে সুকুমারীর। একবার স্বামী কাপড়-চোপড় টাঙ্গাবার জন্য একটা দড়ি খাটিয়ে দিয়েছিলেন। ছকের মাথাটা বকুলগাছের বুকে বণন গিয়ে বিধেছিল তখন থেকে একটা বস সাহাধিন চুইয়ে চুইয়ে পড়েছিল। সুকুমারীর মনে হয়েছিল গাছ যেন কঁদছে। গাছেরই চোখের জল যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।

আশীর্বাদ হ'ল। গায়ে-হলুদের পর্কও চুকে গেল। বাজিতে ইংরেজী বাজনা বাজিয়ে বড় বড় মশাল জালিয়ে ওরা মানে বর-

বাকীরা বজরা থেকে নামলেন। দশ বছরের স্কুমারীর চোখে তখন বাজার ঘুম নেমে এসেছে। বকু কাপড়টা পরে বেন বেনী জুখবু হয়ে গিয়েছিলেন। সাবাটা মুখ চন্দনের ঠোঁটের একাকার হয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাদিও কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তার পর মশালের তীব্র আলো, শাখের আগুনের আঁচের জ্বালায় হুংরুজী বাজনার মধ্যে ঘুমঘুম গোঁধে স্কুমারী জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে আলোতে প্রথমেই বাড়ীর বকুল গাছটাকে দেখতে পেরেছিলেন। গাছের নীচে কে বেন সাধা চাঁদের একটা বিছিরে বসেছিল। বরষাজীর পারে প'রে দলিত হয়ে ফুলের গন্ধ, মশালের তেলপোড়া গন্ধ, আতসবাজীর গন্ধ সব মিলিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। পাড়ী-বেহাওয়ারা একসুয়ে গান গেয়ে চলেছিল। বৃন্দাদি বলেছিলেন, ঐ পাড়ীতেই নাকি স্কুমারীর বর আছে। তার পর সবাই একে একে চলে গিয়েছিল বাগানবাড়ীতে। অন্ধকারের জালটা আবার ঘিরেছিল জায়গাটাকে। আবার জোনাকীর দল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছিল। টিপ টিপ করে অলেছিল। বরষাজীরা বাবার সময় গ্রামের কুহবগুলো পিছনে পিছনে খানিকটা এগিয়ে এনেছিল, শেষে তারাও এদিক-ওদিকে মিলিয়ে গিয়েছিল। বরষাজীদের ছায়াগুলো দীঘির শান্ত-জলে ভেসে উঠেছিল, কিছু পরে সব যখন চূপচাপ, ঠিক তখন দীঘির কাল জলটাকে বেন কাল মন্থণ বিরাট একটা সলীল বল মনে হয়েছিল।

বকুল গাছটা সন্দেহ পড়ল। স্কুমারী চঠাৎ চমকে উঠলেন। আগুনের গুনে দাঁড়াকগুলো আর একবার তীব্রভাবে ডেকে উঠল। কা—কা—কা—।\*

শেষে কুশণ্ডিকার পাঠ চুকল।

পাড়ী করে স্কুমারী এলেন খণ্ডবাড়ী। স্বামী সাবাটা যাত্রার মাত্র দুটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তার পর চূপচাপ। আর স্কুমারীর মন কেবলই কেঁদে উঠেছিল—বৃন্দাদির কথা ভেবে, সেই কলার কথা ভেবে, ছোট ভাই বাখালের কথা ভেবে, বাড়ীর বৃদ্ধি গাছটার কথাও মনে পড়েছিল। আর মনে পড়েছিল দীঘির কথা, বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে যে চাঁদটা উঠতো তার কথা। খুকীর মাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন স্কুমারীর মা। পাড়ীটা যখন যাঠের মধ্যে অস্থির তলার বাধা ছিল—বেহাওয়াগুলো দা-কাটা তামাকে মৌল করে সুখে টান দিচ্ছিল—ঠিক তখন খুকীর মা এসেছিল স্কুমারীর কাছে। কান্নার ভেঙে পড়েছিলেন স্কুমারী। এতদিন পরেও খুকীর মায় মুখটা হব্ব মনে পড়ল স্কুমারীর। শেষে পাড়ী এলে দাঁড়াল খণ্ডবাড়ীর দরজার। খাণ্ডিত বউ দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, তাই দেখে স্কুমারী কঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাহুবটাকে চিনতে একটুও দেহী হয় নি স্কুমারীর। পাড়ী থেকে নামিয়ে স্কুমারীকে চুপু খেয়েছিলেন, আর স্কুমারীর মনে হয়েছিল বেন নিজের মায় বুকেই কিরে এসেছেন। তার পর ঠিক বকুল গাছটার নীচে এসেছিলেন। কি অকৃত ছিল।

বাপের বাড়ীর গাছটার সঙ্গে এখানকার গাছটার কি সাদৃশ্য! স্কুমারীর সেদিন মনে হয়েছিল বাপের বাড়ীর গাটাকে কে বেন খণ্ডবাড়ীতে এনে বসিয়ে দিয়েছে। দুধে-আলতার খালার দাঁড়িয়ে ছিলেন স্কুমারী, আর টুপটাপ দু'একটা ফুল মাথার ঝরে পড়েছিল। সেদিন থেকেই বকুল গাছ স্কুমারীর সত্য সঙ্গ এক হয়ে আছে। সে কি আজকের কথা!

দু'দিন পরে কিন্তু সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্বামী পড়বার জন্ত শহরে চলে গেলেন। নন্দ কুসুমকুমারীকে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল স্কুমারীর। কোথায় কুসুমকুমারী চলে গেলেন? কুসুমকুমারীর কথা ভাবতে ভাবতে যুগপৎ হাসি আর অশ্রু একসঙ্গে দেখা দিল স্কুমারীর মুখে আর চোখে। বাঁদা-বাঁদা খেলা, দশ-পঁচিশ খেলা, অষ্টা-কষ্ট খেলা, কড়ি-কড়ি খেলা হ'ত। ঐ নৌপরা বকুল গাছটার নীচে সান বাঁধানো চাতালে বসে দুই নন্দ-ভাজে কত সুখ-দুঃখের কথাই না হয়েছে। কে তার হিসাব রাখে? এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় স্কুমারী নিশ্চয় মনেই হেসে উঠলেন। কুসুমকুমারীর অতীত দিনের কথা ভেবে তাঁর মুখে আজ হাসি আসছে। খুব দস্তি মেয়ে ছিলেন কুসুম। ঘুমন্ত খাণ্ডীর আঁচল থেকে চাবি নিয়ে ভাঁড়ারঘর খুলত কুসুমকুমারী। বরষা মেয়ে ঘরে আচার সাজানো থাকত। সেই আচার এক খাবলা তুলে এনে চাবিটা বখাছানে রেখে দিয়ে আসতেন কুসুমকুমারী। কিন্তু এত হাসি, এত আনন্দের মধ্যেও স্কুমারীর মনটা কেমন বেন উদাস হয়ে যেত। বাপের বাড়ীর জন্তে প্রাণটা আনচান করে উঠত। এখনকার ঘেরঘের যত স্বাধীনতা ছিল না। কাপড় শুকতে দেবার হল করে ছাদে এসে দাঁড়াতে স্কুমারী। বাপের বাড়ীর দিকের আকাশটার মাঝে কি খুন্সে পেতেন তিনিই জানেন, অনিমেয় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। মাকে মাঝে পথ-চলতি মাহুব-গুলোকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতেন। যদি বাপের বাড়ীর কোন পরিচিত মাহুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। রাতে কুসুমের গলা জড়িয়ে এক বিছানার গুতেন, কুসুমের খুনসুড়ির মাত্রা মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে যেত। তবু কুসুমকে মনে হ'ত আপন মায়ের পেটের বোন।

পিঠের শিরদাঁড়িতে অসহ্য বহুলা হচ্ছে স্কুমারীর। চোখ দুটো অলে বাচ্ছে। গলায় বেন মকড়মি বড়কা। পাখের বোটি থেকে চক চক করে জল খেলেন স্কুমারী। তার পর? একদিন বাবা নিতে এলেন স্কুমারীকে। বাপের বাড়ী বাবার আগের দিন স্কুমারীর ঘুম আসে নি। মনটা চকল হয়ে উঠেছিল, সে কি উত্তেজনা! এ উত্তেজনা সব মেয়েরা বোঝে। একান্ত স্বাভাবিক। কুসুমের বিয়ে হয়ে গেল সেই কোন দূর দেশে। তার পর একদিন স্কুমারী নিজের চেহারাটা ভাল করে খুটিয়ে দেখলেন। নিজের শরীরটাকেই গুণু দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন বিশ্বের অনেক কিছু অবিশ্বাস্য জিনিস। শুধু কি শরীরটাই পরিবর্তন হয়েছিল? আর মন? মনের গহনে কবে

ভয়ে ভেসে উঠেছিল নতুন সুরের হৃদয়। কোকিলের স্বরকে মনে হত কত মিষ্ট। নিজের গলার স্বরটা নিজের বলেই মনে হ'ত না নিজের কাছে। গা-হাত-পাগুলো কত ভারি ভারি হয়ে গেল। চলনে হারিয়ে গেল পূর্বের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। একটু রসিকতার কথা শুনে মনে হ'ত রাজ্যের রক্ত তার মুখে এসে জমা হয়েছে। মাতামাতি শুরু করেছে। ভাঙা তোবড়ানো গালে, মাথার ছোট ছোট চুল হাত বুলিয়ে দেখলেন সুকুমারী। হ্যাঁ, চুল ছিল বটে সুকুমারীর। পাড়ার ঘেরেরা চুলের কথা হলে সুকুমারীর চুলের কথা এনে কলতেন। নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখার আর শেষ ছিল না। কোন অঙ্গকে বাদ দেবেন? কোন অঙ্গের গানব অংগান উপেক্ষা করবেন? মাথার চিরুণী, নাকে নলক, গলার হেলে হার, কোমরে গোটি, হাতে চুং-চুড়ি, বাউটি, তাগা, বাজু, কানে গোকরি মাকড়ি নয়ত ইছদী মাকড়ি। এ সব পয়ে কি সন্দর দেখাত সুকুমারীকে। বৌমাদের সেই বৌবন-কালের মধ্যে এনে বিচার করেন সুকুমারী। হোগা লেগেই আছে। আজ এ-হাসপাতাল কাল সে-হাসপাতাল। অথচ পাস করা বৌমাদের গর্বে সুকুমারীর বুক ফুলে ওঠে। বৌমারা গড় গড় করে মনিওড়ার পড়তে পারে, মোটা মোটা বই পড়িয়ে শোনায়। কিন্তু বৌমাদের স্বাস্থ্য না থাকার জন্য সুকুমারী বিষম হয়ে পড়েন। পৃথিবীর সব কিছু একটু একটু করে ভাল লাগতে লাগল সুকুমারীর কাছে। সেই মানুষটার সঙ্গে মনটা আনচান করে উঠত। বিকালে চুল বাঁধার পর মা বখন মিথিতে, হাতের চুড়িতে সিন্দূর পরিয়ে দিতেন, মাকে প্রণাম সেবে সুকুমারী কেমন যেন উদাস হয়ে পড়তেন। এবার কলকাতার দিকের যে আকাশ সেই আকাশটার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। কোথায় কোন ঘরে স্বামী আছেন তাঁর কথা মনে পড়ত। সুকুমারীর মনটা ঘুরে-ফিরে বেড়াত নাম-না-জানা শহরের আঁকা-বাঁকা রাস্তায়। কল্লনার অঙ্গন চোখে পরে স্বামীর ধ্যান করতেন। বিয়ের পর মানুষটাকে ক'দিনই বা দেখেছিলেন, কেবল পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। স্বামীর মুখের প্রতিটি রেখা তবু সুকুমারীর অচেনা লাগত না। মেরেরা একবার যে মুখ মন-প্রাণ দিয়ে দেখে নের সে মুখ তারা কোন দিন ভোলে না।

তার পর কোন এক বকুল-বরা চান্দনী রাতে স্বামী কিংবে এলেন। দুটো পাস করা স্বামী। মনটা একটু ফুলে উঠল সুকুমারীর। কুসুম তখন ছিলেন। একটা বকুল ফুলের মালা গাঁথেছিলেন নিজের মনের অজান্তে। তাই নিয়ে কুসুমের সে কি রসিকতা “ওলো ভেতবে ভেতবে এত।” মালাটা কেড়ে কুসুম চোঁচাতে বাবেন ঠিক তখনই কুসুমের মুখটা চেপে ধরেছিলেন সুকুমারী। খুব প্রাণখোলা ঘেরে ছিলেন কুসুম। প্রথম প্রথম কুসুমের স্বামী নাকি কুসুমকে নিয়ে ঘর করতেন না। এ খবর সবাই জানত, কিন্তু কুসুম জেনেও জানতে দিত না। ভারি হুংব হ'ত কুসুমের জ্ঞ। বেচারীকে বহুরের বেশী সময় বাশের বাড়ীতেই থাকতে

হ'ত। কিন্তু শেষে একদিন সব ঠিক হয়ে গেল। কুসুমের জীবনে আবার শান্তি কিংবে এসেছিল।

ডালপালাগুলো কাটা হচ্ছে। এবার শু ডিঙুলো বোকাই হবে গাড়ীতে। তার পর চলে বাবে আড়তে। ওখানে টুকরো টুকরো করে গাছটাকে কাটা হবে। শেষে আম, জাম, কাঁঠালের ছপের মধ্যে বকুল গাছটা তার আপন অভয় হারিয়ে মিশে যাবে। খন্দের এসে চাইবে। দোকানী ওজন করে দেবে। সেই কাঠ কোন গৃহস্থ বাড়ীতে এসে পড়বে। উম্মনের মধ্যে সেই বকুল কাঠ এগিয়ে দেবে বাড়ীর কোন বধু। রাজ্যঘরটা হয়ত কিছুক্ষণের জন্য খোয়ার ভরে উঠবে। তখন কুসুম হস্ত চোখ মুচবেন। এদিকে সুকুমারী সম্পূর্ণ অদৃষ্ট খোয়াকে কেন্দ্র করে চোখের জল কলবেন। হাঁপিয়ে উঠবেন। প্রাণটা ছটকট করে বেঘিরে আসতে চাইবে তাঁর। একবার সুকুমারী ভাবলেন ওদের ব্যবস করে দেবেন। হাতও তুললেন কিন্তু অবশ হাত দুটো পাশে পড়ে গেল। বিড় বিড় করে মজুবদের ডাকলেন কিন্তু কেউ শুনতে পেল না। বাতাসের সন সন ছাড়া আর কিছু স্বর ভেসে এল না।

মজুবরা চলে গেছে। তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। দাঁড়-কাকগুলো একভাবে থিমিয়ে চলেছে, নিশ্চয় হয়ে বসে আছে। এবার কোথা থেকে শোনা বাচ্ছে হু' একটা ঘুঘুর ডাক। ছাদের মাথা দিয়ে একটা কুটুম পাখী ডেকে গেল। ঐ ডাকটা শুনে সুকুমারী আর একবার সচকিত হয়ে উঠলেন। ঐ ডাকটা সুকুমারীর বড় প্রিয় ছিল। ঐ ডাকটা যেন সুকুমারীকে স্বামীর আগমন বার্তা শুনিতে যেত। তাড়াতাড়ি আলতা পরতেন সুকুমারী। গামছা দিয়ে ঘবে ঘবে মুখটা পরিষ্কার করতেন। কখন উনি আসেন। মহালেই উনি থাকতেন কিন্তু সুকুমারীর মনটা ছায়ার মত স্বামীর সঙ্গী হয়ে থাকত। আর ও পাশের আম চারাটার ডালে যে পাখীটা ডাকছে, ঐ পাখীটাকে সুকুমারী এখনও দুই পাখী বলেই জানেন। দুই নয়ত কি! পাখীটা এখনও বলে থোকা হউক। তখনও ঐ এক সুরে বলত থোকা হউক। কতদিনকার কথা সুকুমারীর, সে সব কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। আজও তাঁর তোবড়ান ভাঙা গালে লজ্জার একটা ঝিলিক খেল গেল। স্বামী তখন মহাল থেকে ফিরতেন—তখন ঐ আজকের পাখির মত সেদিনের পাখীটাও ডাকত—থোকা হউক। আর তাই শুনে উনি বলতেন, “তনু পাখীটা কি বলছে।” কথা শুনতে খুবই ভাল লাগত সুকুমারীর, তবু লজ্জার মুখটা রাঙা হয়ে উঠত। ক্রত পা কেলে চলে যেতেন আড়ালে কিন্তু মনটা বার বার স্বামীর ঐ কথাগুলো শুনতে চাইত। কোথায় গেল সে সব দিন। আর এখন?

পাশের ঘরে বৌমারা অমরোত্তর আগর শুনছে। কে একজন গান গাইছে, তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ড। হ্যাঁ, গান শুনেছিলেন বটে একবার, অনেক দিন আগে, ঘুঘু-ডাকা প্রাণ হাসের ছপুয়ে এক ককির গান গেয়েছিল। সে গান সুকুমারীর

হৃদয়ে গাঁথা আছে। যেমন গলা তেমন সুর। ওথবে সেলাই-কল চলছে। বক বক করে শব্দ হচ্ছে। সেজ বোঁরা পান গাইতে গাইতে সেলাই করছে। সুচটা না হাতে পড়ে, বাব বাব এট আশকার স্কুমারী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সব ভাল লাগে স্কুমারীর। তাঁদের সময় ঘেরেদের কাছে এই বকম স্বাধীনতা স্বপ্ন বলে মনে হ'ত। আহা! বোঁমাদের সুর কেউ যেন না কেড়ে নেয় ঈশ্বরের কাছে বাব বাব প্রার্থনা জানান স্কুমারী। তবু স্কুমারীকে ভাবিয়ে তোলে, ভাবতে হয় বৈকি। বোঁমাদের সব যন্ত্রের গাঙালে একটা ফাঁক আছে বলে বুঝতে পারেন। তাই স্কুমারীর মনে একটা চাপা ক্ষোভ আছে। মনস্তাপটাকে চাপা দিয়ে রাখেন। সংসারে পাঁচ জনকে নিয়ে মানিয়ে চলতে গেলে সব কথা জানানো যায় না। নিঃস্বের মনেই পুবে রাখেন। এত বড়, এত আদর, তবু স্কুমারীর চোখে ফাকি ধরা পড়ে। সব থেকেও যেন পর হয়ে আছেন। সব থেকেও যেন কিছু নেই। ফোঁপরা বকুল গাছটাকে চারিদিকের সতেজ গাছগুলি ঘিরে বেধে-ছিল। কিন্তু ই ঘিরে রাগাই সার। ফোঁপরা গাছটার সঙ্গে বেশ একটা সদ্‌শু ঋদ্ধে পান স্কুমারী। অত তেজী গাছটার হঠাৎ কি হ'ল? একে একে পাতাগুলি ঝরে গেল। অমন শুড়ি, ডাল-পালা সব যেন শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেল। স্কুমারীর নিজের লোল চামড়াগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সারাটা গায়ে নিজের হাতটা বুলিয়ে দেখলেন। কত চিকণ ছিল চামড়ায় গুপবটা। মাছি পিছলে পড়ত যেন। বলি রেখামুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেখে বেশ বুঝলেন এবার তাঁর বাবার সময় হয়ে এসেছে। কোথায় গেল চামড়ায় সে তেল-তেল ভাব—বকুল গাছটাও সে মশখ চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছিল। হ'জনের সঙ্গে কত মিল!

সন্ধ্যা থেকেই জ্বর বাড়ল স্কুমারীর, প্রবল জ্বর। বোঁমারা মাথার শিররে বাতাস করছে—কেউ পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ছেলেরা মুণ্ডার করে ঘোরাফেরা করছে। ওদিকে স্কুমারী জ্বরের ঘোরে বকে চলেছেন। দাঁড়কাকগুলোকে প্রলাপের ঘোরে তাড়াচ্ছেন। রাম-রাম-রাম বলে চেষ্টায়ে উঠছেন। আর দাঁড়-কাকগুলোও যেন মজা পেয়েছে। সবাই মিলে মিস্ত্রীদের ছাদে যেন সভা বসিয়েছে। সন্ধ্যা বেলা যখন নীড়ের পাখীরা সব নীড়ে কিংবে এসেছে শুধু গৃহহারা উদ্বাস্ত দাঁড়কাকগুলোর মুখে কা-কা ধ্বনির বিবাহ নেই।

—কে কুসুম এলি ভাই, বস তোয় ছেলেটাকে ঐ দোলনার বসিয়ে দে, কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে বইলি যে? বুঝতে পারলি না—বকুল গাছেয় দোলনার কথা বলছি যে—

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—কে নিশিকান্ত, দেখত বাবা, হলো বেড়ালটা কেন অলুক্ষে ডাক ডাকছে, তাড়িয়ে দিয়ে আর না বাবা, তোয় বাবায় জ্ঞত কবয়েজের কাছ থেকে অনুষ্ঠাও অমন নিয়ে আর বাবা—

স্কুমারীর চিন্তার টেট আজ অনেক বহন পরে স্থতির সৈকতে এসে আছড়ে পড়তে চাইছে, বেশ ছিলেন। কোন কথা বলতেন না। জুল জুল করে তাকিয়ে থাকতেন। নির্দিকায় হয়ে পৃথিবীর শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। আসন্ন মৃত্যুকে বধু রূপে ধ্যান করছিলেন। বাড়ীর লোকেরা স্কুমারীকে শুধু দেখে-ছেন, বুঝতে পারেন নি তাঁর মর্মবাথাকে। কি বাথা তিনি মনে পুবে রেখেছেন। সবাই দেখতেন স্কুমারী ঘুম থেকে উঠলেন—লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে দাঁড়ালেন, ক'পড়টা ছাড়লেন, তার পর মুখে চোখে জল দিয়ে, মাথায় গজাডল ছিটিয়ে ইষ্ট দেবতার ভূপে বসলেন। তখন তাঁর চোপ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। হুস থাকে না যদি না নাতির দল তাঁকে ডাকে। উপায়া কবে তাঁদের চুপ করতে বলে খেই হারিয়ে-বাওয়া মজ্জটা আবার হরত জপ করা শুরু করেন—কতক্ষণ ছোট নাতিরা বসে থাকবে? আবার তারা ডাকে—“ঠাকুমা, দিবি না?”

চোখ খুলতেই হয় স্কুমারীকে। নাতি ত নয়—একসঙ্গে অনেকগুলি শিশু-দেবতাকে সামনে বসে থাকতে দেখেন স্কুমারী। এক একটা মিস্ত্রি ভুলে দিতে হয় হাতে। নাতিদের মধ্যে পলটনটাই স্কুমারীর ‘নেওটা’ বেশী। সে আখবানা সন্দেশ স্কুমারীর মুখে ভুলে দিয়ে বাহাতে তাঁর মাথাটা ধরে থাকে। ঠাকুমা ত নয়—যেন এক বছরের কচি শিশু। খেতেই হয় স্কুমারীকে। পলটন ত পলটন। কুকক্ষেত্র বাধায়। কৈলেকটে সব ভেজো দেয়। স্কুমারীর অবিরত চর্চনরত মুখটা দেখে পলটন হাসে। স্কুমারী নাকি দিনহাতি পাক্লে পাক্লে সন্দেশ খান। না হলে মুখ নড়বে কেন? স্কুমারী পলটনের সঙ্গে প্রাণের ঝগড়া করেন—‘তোয় কচি বোনটা দিনরাত কি খায় শুনি দাছ?’ তখন মিটমিট হয়ে যায়। বোজকার ঘটনা। সবাই জানে। তার পর অজ্ঞাত নাতিরা হৈ-হজা করে চলে যায়। শুধু থাকে পলটন। তার কাঁধে হাত রেখে স্কুমারী লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ফোঁপরা বকুল গাছটার নীচে এসে হরত বসে বইলেন। ঝাপসা চোখে চারিদিকটা ভাল করে দেখলেন। একটা পুই মাচার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কুসুমের সাথের পুইগাছ ছিল। স্কুমারীর মনে হয় যেন থোকা থোকা পুই কল মাচাটাকে ভরিয়ে ফেলেছে। ঐ কল নিয়ে খেলা হ'ত। হাতের তালুটা পুই কলের রসে ছোপ ধরত। তবু ভাল লাগত। গাছটার নীচে এসে বসলেন। ফোঁপরা বকুল গাছটা তখন যেন বুড়ীর সান্নিধ্য পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল। যবা ডালগুলো যেন নড়ে-চড়ে উঠল। শুড়ির গায়ে বিঘাট বিঘাট কোকর। শূত্র কোকরে হাওয়া এসে লাগল—ঠিক তখনই স্কুমারীর মনে হয় যেন গাছ কথা কইতে চাইছে। গাছের ভাবায় কথা বলে বকুল গাছটা; সে ভাষাটা বুগিয়ে দেয় আশে-পাশের সবুজ গাছের দল। তাঁর নাতিরা যেমন তাকে ঘিরে থাকে, ভাষা বোপায়। ঠিক তেমনি বকুল গাছটাও ভাষা পায় কচি কচি গাছদের কাছে। পলটন তখন খেলা করে, কড়িং ধরে, আঘচায়াটাং পায়, তার কচি কচি



পাতার হু দেয়। হু দিয়ে ছলিয়ে দেয়। স্কুমারী নাতির কাণ্ড দেখেন আর মনে মনে হাসেন, আমচাটা বড় হবে, পলটন ওকে চিনবে, বুঝবে। ওর সঙ্গে আমচাটার সত্তার বধন পূর্ণ মিল হবে তখন ও গাছ থাকবে না। গাছ আর মানুষ অভিন্ন হয়ে বেঁচে থাকবে।

বৃষ্টি বদি পড়ল—চূপচাপ ঘরে বসে রইলেন স্কুমারী। পলটন তখন শুধু ঠাকুমার পাকা চুল তুলতে তুলতে গল্প করে।

—ঠাকুমা বকুল গাছও যেমন জাড়া তুমিও তেমনি—না ঠাকুমা ?

—হ্যাঁবে দাদু, এই মাথার কত চুল ছিল জানিস ? গাছটারও পাতা ছিল বুঝিস।

এমনি কত গল্প হয় নাতিতে-ঠাকুমাতে। ঠাকুমা নাতিকে গোপন করে মানসাক মেলাবার চেষ্টা করেন। বকুল গাছটার সঙ্গে তাঁর কতটা মিল হয়েছে। অঙ্কের হিসাব মিললে তাঁর মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে।

জান্নারবার মুখ ভার করে চলে গেলেন। আর স্কুমারীর বাঁচবার আশা নেই। কুলপুত্রোহিত খোবে স্নোবে গীতাপাঠ করছেন। একটা তুলসী চারা বাধা হয়েছে মাথার শিরে। সব নাতিরা ভিক্তে-ভিক্তে চোখে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। শুধু জানলার ধারে পলটন একা চূপচাপ ঝাঁড়িয়ে আছে। রোজকার সন্ধ্যা নয়—আজ আর ঠাকুমা নাতিদের ঘিরে গল্প বলবেন না। দ্বাধ ঠাকুমা অস্ত্র জগতের চিন্তার মগ্ন। নাতিরা কেউ বুঝতে চাইছে না। তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, কখন রাজপুত্রদের গল্প শুরু হবে। আবার ভোর হবে—আবার সব হবে। আর ওদিকে ? চারাগাছগুলো কি ভাবছে ? ফোঁপরা বকুল গাছটা হয়ত সকালবেলা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। তাদের মাঝখানে এগে আবার ঝাঁড়িয়ে থাকবে। বকুল গাছটার ফোঁকবে হাওয়া চুক সন সন করে আওরাজ হবে। বকুল গাছ যেন নাতি, গাছেদের আবার গল্প বলবে।

শীত ঐত করছিল ক'দিন ধরে। রাতটাকে কত দীর্ঘই না মনে হ'ত। শূণ্যের ডাক, চৌকিদারের হাঁক, সন্ন্যাসের বুক-হেঁটে চল', ঘাটে বৌ-ঝিনের বাসন মাজার আওরাজ—আর বুঝতে পারছিলেন না স্কুমারী। জবটা রাজিতে বাড়ত। গভীর রাতে সবাই বধন ঘুমিয়ে পড়ত তখন লাঠি ঠুক ঠুক করে বকুল গাছের নীচে এসে বসতেন স্কুমারী। গাছটাকে কাঁটার আদে

তিনিই দিয়েছিলেন, গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন সেই অপরাধই স্বীকার করতে আসতেন। রাতজাগা অভ্যাচার, অন্তর্দাহ সব সহ করেছে স্কুমারী টিকে ছিলেন। আজ বকুল গাছটার শেষ চিকুটুক বধন মিলিয়ে গেল তখন যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন।

স্কুমারী জ্বেরে ঘোরে বকে চললেন—

—মাঃ! কোথা থেকে এত সুন্দর গন্ধ আসছে গা, বকুল গন্ধ না কুসুম, দে দে আমাকে...

হ' হাত নিয়ে ফুল নেয়ার জগ হাত তুলতে গেলেন স্কুমারী। অদৃশ্য কুসুমের হাত থেকে। হাত দুটো সজোরে বিছানার পড়ে গেল। বিড় বিড় করে শুধু বললেন—

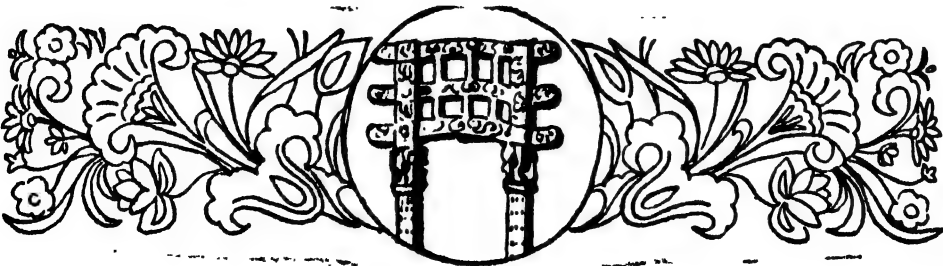
—একটা বেকাবীতে কিছু ফুল ভেঁব ঘরে রেখে দিয়ে আর না ভাই—মানুষটা ফুল ভালবাসে—

হ' বার বাম, বাম কললেন, তার পর—

বকুল গাছের যেন জ্ঞান মিলেন বুক ভরে। মুখটা স্কুমারীর স্বর্গীয় হাসিতে ভরে গেল। বৌমাঝ সবাই একসঙ্গে মাণ্ডির দিকে বুক পড়ে পায়ের ধূল' মাঝার নিল। ঠিক সেই সময় একটা বন্দুক ছোড়ার শব্দ হল। ভোর হয়ে গেছে। দ্বিত্বিরদের ছেলে বন্দুক দিয়ে একটা দাঁড়কাক মেরেছেন। আর বাকী কাক-গুলো কিছুক্ষণ শূণ্য বকুল গাছটার মাথার চকাকাবে ঘুরলো। তার পর চলে গেল একে একে। আর হয়ত ফিরবে না।

নাতিরা ঘুম-ঘুম চোখে দেখল—খাট তৈরী, অনেক লোকে বাড়ী ভরে গেছে। ফিস ফিস কথা হচ্ছে। মেয়েরা কানছে, পুরুষেরাও কানছে, সব দেখাদেখি নাতিরাও কানছে। কেন কানছে তারা বোধ হয় এখনও বুঝতে পারে নি। কানতে হয় তাই কানছে।

শুধু পলটন একা চুলু চুলু চোখে নেমে এল উঠানে। চারা আমগাছটার কাছে এসে হাঁটুভেঙে বসল। ফিস ফিস করে আর-চায়াটার সঙ্গে বুড় পলটন কি কথা বলল সেই জানে। আম-চায়াটার গায়ে হু দিল। ছলতে লাগল আমচাটা। একবার হাতটা বাড়িয়ে পলটন যেন কাকে খুজলো। হয়ত ঠাকুমাকে নয়ত বকুল গাছটাকে। তার পর আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। দেখল বকুল গাছটা নেই—সেই শূণ্যস্থান দিয়ে আকাশটার অনেকটা দেখা গেল—সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইল পলটন।





## জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১৬

আগের দিন বৈকালেই দেখেছিলাম যে, অনেক বাজীর বেশ বড় একটি দল কেন্দ্রবিন্দ্রে এসে উপস্থিত হ'ল। পরদিন পথে বের হয়ে দেখি যে, দলে দলে আরও বাজী আসছেন।

মন্দির বন্ধ হবার তারিখ এগিয়ে আসছে বলেই বাজীর ভিড় বাড়ছে। প্রতি বৎসরই এমনই হয়ে থাকে। গোড়ার দিকে বাজী আসে বগাব বেগে, ম'ঝে ঝাঁপিয়ে বায়, শেষের দিকে আবার জোয়ার। সেই জোয়ারেই আভাস পেলাম আমরা আমাদের ফিরতি পথে।

কেবল ইঞ্জিত নয়, দীপ্তিও। অনেকগুলি অচেনা মুখ পিছনে ফেলে আসবার পর চঠাৎ দেখি দুটি চেনা মুখ। সেই মুন্সরী ও তাঁর স্বামী দেখা পেলাম রামোয়ার্ডার কাছাকাছি আসবার পর।

মুন্সরী ঐষং পাণ্ডুর মুখখানিও দেখলাম উৎকল। দল ভাঙা-ভাঙি, দৈহিক অসামর্থ্য এবং পরে লক্ষ্য জবের মত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত ত্রিকেন্দ্রনারায়ণের চরণতলে গিয়ে পৌঁছাতে পারছেন সেইজন্যই অত উল্লাস মুন্সরীর।

খানিকটা তার উজ্জ্বল পড়ল আমাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হতেই। মুন্সরী প্রায় আবদারের সুরেই আমাকে বললেন, একটু দীর্ঘে দীর্ঘে চলবেন রায় মশায়—যাতে আমরাও আপনাদের সাথী হতে পারি। কেন্দ্র থেকে আজই আমরা রওনা হয়ে আসব।

কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দীর্ঘে দীর্ঘে চলতে পারি কৈ! এখন উপর থেকে নীচের দিকে গতি আমাদের। এ যেন ভাটার টানে তব তব করে এগিয়ে চলা। সেই রামোয়ার্ডা ও সেই গৌরীকুণ্ড পার হয়ে গেলাম। চেনা জায়গা বলেই আমরাও সেখানে বাত কাটাতে মন চায় না। নতুন পরিবেশ, অচেনা মানুষের সাহচর্য্য আশ্বাসন করতে চায় নতনের পিয়াসী মন।

তিন দিন লেগেছিল উজান ঠেলে যে পথটুকু অতিক্রম করতে তাব চেয়েও বেশী পথ একদিনেই পার হয়ে এলাম। পাঁচ ঘণ্টার প্রায় ১৩ মাইল পথ এসে খামলাম বনজপুর চটিতে।

পরদিনও ঐ রকম। পাঁচ ঘণ্টার ১১ মাইল পার হয়ে পৌঁছলাম নালাচটিতে। বেলা তখন প্রায় দুটো। দিনের আলো ও পায়ের জোর, কোনটারই অভাব নেই। তবু ওখানেই থামতে হ'ল। কেন্দ্র-বন্দরী পথের এক জংশন ঐ নালাচটি—উজান পথে যেমন শুকুকাশী। গায়ে জোর থাকলেও মন স্থির করবার এবং পথ ঠিক করবার জন্য সব বাজীকেই থামতে হয় ওখানে।

মোটানা নয়, একেবারে তেটানা।

বন্দরী-কেন্দ্রারের অতি প্রাচীন পাহাড়স মার্গ ঐ নালাচটি থেকেই চার্মোলি পর্যন্ত গিয়েছে উত্তীর্ণ ও তুঙ্গনাথ হয়ে। হাওড়া-দিল্লী রেলপথের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের সামিল ঐ পায়-চলা পথ কিন্তু তা কেবল দৃষ্টির হিসাবে। একালে তারও প্রায় ২৩ মাইল দূরত্বকে কাঁকি দেওয়া যায় মাত্র ১৪ মাইল পথ সামনে পশ্চিমদিকে হেঁটে ফিরে অগস্ত্যমুনি চটিতে গিয়ে বাস হলে। তৃতীয় টান আরও নীচে বায় বায় ঘরবাড়ীর। অগস্ত্যমুনি চটিতে পৌঁছবার পর বাসে চড়লে বজ্রীনাথ না গিয়ে সোজা ফিরে হাওড়া চলে হরিষারে।

“বর্গ হইতে বিনায়” নিয়ে এসেছি। মস্তের টান এখন অমুভব করছি নাড়ীতে নাড়ীতে। তাই বললাম জিতেনকে : কিবে গেলেও হয়—বন্দরীনাথ গেলে নতুন আর কি দেখতে পার ?

জিতেন হেসে উত্তর দিল : আমি নিজে সেখানে না গেলে আপনায় প্রশ্নের উত্তর কেমন হবে দেব ? আর আপনিও নিজে সেখানে না গেলে কোন উত্তরেরই সত্যাসত্য বাচাই করবেন কেমন করে ?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। দাব্বপথ থেকে কিবে যাবার স্বপক্ষে যুক্তি নিতাজুই তর্কাল। আর হাওড়াই যদি ঠিক হয় তবে হাটা পথই যে প্রশস্ত সে সন্দেহ জিতেনের সঙ্গে আমি একমত।

শেষ অনিশ্চয়তাটুকুরও নিবসন হ'ল যাত্রা জিতেন ভৈরবকল্প ঈশাদিবি তাৎপর্য্য ভেনেবাব পর।

স্থানীয় প্রাচীনদের সকলেরই অলঙ্কার বিশ্বাস ও গভীর নির্দেশ, কেন্দ্রনাথ দর্শন করবার পর বন্দরীনারায়ণকে দর্শন না করলে অমঙ্গল হয়।

একই মন্ডাকিনী এপার আর ওপার। এপারে নালাচটি, ওপারে উত্তীর্ণ। তথানি দূরত্ব আড়াই মাইল। উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় পর্বতশ্রেণীকে কেটে ছুঁভাগ করেই তৃপ্তি হয় নি মন্ডাকিনীর। শিবের তৃপ্তিয়ার বোক কেবলই হিমালয়ের চরণের দিকে। সেই চরণ ছুঁয়েই মন্ডাকিনীর গতি এখানে। স্তব্ধাং নদী পার হবার জন্যই বাজীকে নালাচটি থেকে নীচের দিকে নামতে হবে মাইল-খানেক। আবার ওপারের পাহাড়ে উঠতে হবে অতিরিক্ত আরও আধ মাইল উত্তীর্ণ গিয়ে পৌঁছবার জন্য।

ত্রিকেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় রাজধানী ঐ উত্তীর্ণ। সাবাটা শীতকাল ওখানেই কেন্দ্রনাথের পূজা-আরতি হয়ে থাকে। সে ময়মন পড়ে নি এখনও। স্তব্ধাং ছাড়া বাজীর মতই জীহীন এখন উত্তীর্ণের

মন্দির-এলাকা। যেটুকু ওখানে জনপদ তা তৃতীয় শ্রেণীর শহর। চারিদিকের উচ্চায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কেমন যেন বেমানান চূর্ণ-স্মরকী আর বনের জলুস।

ঐ জলুস আছে কেদারনাথের প্রধান মোহন্য রাওরল সাহেবের প্রাসাদেও। মহাভারতে যুগের বাণ রাজা ও তাঁর কস্তা উবার (বা থেকে উবী বা উবী নাম হয়েছে) রাজপ্রাসাদের ভগ্নভূপের উপর প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর-শিবাদের মঠ বৃদ্ধি ক্ষুধিত পাষাণের অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষার প্রভাবেই নিকটে কালক্রমে প্রাসাদ হয়ে উঠেছে।

তা খুঁটিয়ে দেখবার বৈধা নেই আমাদের, স্মৃত্যং সময়ও নেই। দিনের রাজা গুরু করবার পূর্বেই গাইড বই দেখে লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি আমরা—বেণিয়াকুণ্ডে গিয়ে রাজিবাস করব। উখীমঠ থেকে তার দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। স্মৃত্যং কেদারনাথের শূণ্য মন্দির এবং পাশাপাশি করেকটি ভবনে এক একবার উকি দিয়েই আবার পা চালিয়ে দিলাম আমরা।

বেণিয়াকুণ্ডের নিজস্ব কোন আকর্ষণ নেই। ওখানে না আছে বেণিয়া, না কুণ্ড, তবু অত যে নামডাক ঐ চটির তার কারণ তুঙ্গনাথ পাহাড়ের পাদমূলে ওর অবস্থিতি। কেদারক্ষেত্রের পথে যেমন ত্রিমুখীনায়ণ, গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে তেমনি তুঙ্গনাথ পাহাড়। এখানেও অতিক্রি ৩ মাইল দুর্গম চড়াই। তাই ভাঙবার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তই রাজীবীরা আগের দিন বেণিয়াকুণ্ডে উপস্থিত হয়ে অন্ততঃ একটি রাজি বিশ্রাম করে সেখানে।

অতিরিক্ত আর একটি কারণে এক দিনে প্রায় ১৫ মাইল পথ হাঁটতে রাজী হয়েছিলাম আমি, নিজেই গরজ আমাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই পার্কৃত্য অভিযান শেষ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে আমার মনে। দৈনিক মাইল তিনেকও যদি বেশী হাঁটতে পারি তবে চার দিনের পথ তিন দিনে পার হয়ে বাব এবং ঐ জলুপাতেই কমে বাবে আমাদের বনবাসের কাল। উচ্চায় প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে অতি-ভৃগু মনের কাছে সে প্রলোভন কিছু কম নয়। আর আমার মনের তলে আশা ছিল যে, তুঙ্গনাথের নাম করা চড়াইকে বাদ দিলে এদিকের পথ হয় ত তেমন কঠিন হবে না।

অঙ্কুর হিসাবে আমার কোন ভুল হয় নি, কিন্তু আশা মরীচিকা।

চড়াই হলেও বেশ ছিল উখীমঠ পর্যন্ত। কিন্তু জনপদটুকু ছাড়িয়ে বাবার পরেই দেখি যে, পথের চেহারা একেবারে বদলে গেল। তেমন প্রশস্ত আর নয়, সেটা অবশ্য পদযাত্রীর চোখে পড়বার মত কিছু নয়। বাকো উপেক্ষা করা যায় না সেটি সভ্যই বারাস্তক লোব, সে দোষ আমার চরণ দুটিকে ক্রমাপত্তই খোঁচা দিচ্ছে, চোখ দুটিকেও তা রেহাই দেয় না। অব্যবহৃত, অবহেলিত সংস্কার অভাবে জীর্ণ এ দিকের পথ, কোথাও গর্ত, কোথাও দেবি যে, পথের উপরেই শু প হয়ে জমে আছে মাটি, পাথর ও গাছের

ডাল। একাধিক জায়গায় দেখলাম যে, রাজীবীসড়ক একেবারেই অব্যবহার্য বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, আর লোকজন, জন্তু-জানোয়ারের পার্শ্বের তাগিদে পাশের পাহাড়ের উপর দিয়ে এমন খাঁটি পায়ে চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে যাতে চলতে গিয়ে হাতে অত বড় একটি লাঠি থাকতেও আমার মত রাজীবীকে সার্কাসের কসরত করতে হয়। বেচারা বাহাদুরের অবস্থা স্বভাবতঃই আরও কাহিল। একটু উচু অঞ্চল মন্থন জায়গা না পেলে পিঠের বোঝা সে না মাতেই পারে না। তেমন জায়গা ঐ উখীমঠ পর্যন্ত অনেক পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এ পথে রাজীবী বা কুলির পরিশ্রম লাঘব করবার জন্ত মন্থন যেন কিছুই করে নি; আর প্রকৃতি এদিকে মনে হচ্ছে অকরণ ও কুপণ।

পাণ্ডার প্রচার-পুস্তিকার পৃষ্ঠার চটির তালিকার নাম আছে অনেক, কিন্তু আমার চোখ যেগুলি পড়েছে সেগুলি ঐ পথের মতই পরিত্যক্ত মনে হয়, কেবল ভিটাই চোখে পড়ে অনেক। কোন কোন ঘরের চালাখানি মাত্র কোন রকমে ঝাড়া আছে। কুটিরের আকার মোটামুটি বজার আছে এমন অনেক চটিতেও চটিওয়ারা উপস্থিত নেই, চাঁচর জন বাদের দেখা মিলল তাদের চটিতেও আতিথ্যের তেমন আরোজন নেই, তাদের আছানে সজ্জদরতার অভাব না থাকলেও উৎসাহের অভাব আছে মনে হয়।

একাধিক্রমে তাদেরই কয়েক জনের মুখে শুনে কারণটা বুঝতে পারলাম। রাজীবীর মরণম শেষ হয়ে আসছে বলে নয়, এ পথে রাজীবী আজকাল আসেই খুব কম। যে কালে সবটাই হাঁটাপথ ছিল সেকালে কেদার থেকে তুঙ্গনাথ হয়ে বদরীনাথ যেতেই হাঁটতে হ'ত কম। এখন অগস্ত্যমুনি পর্যন্ত মোটর চলবার কলে প্রায় বিপরীত অবস্থা। এখন অধিকাংশ রাজীবী পরশ' থরচ করে মোটরে যায় হাঁটবার পরিশ্রম লাঘব করবার জন্ত, কাজেই তুঙ্গনাথের পথে লোক চলাচল আজকাল অনেক কম।

শুনতে শুনতে একবার জিতেন বলে উঠল : তা হলে গঙ্গোত্রীয়াও বোধকরি এ পথে না এসে অগস্ত্যমুনি হয়ে মোটরেই গিয়েছেন।

তাঁদের স্মৃতি আমারও মনের কোণে উকিমুকি মারছিল, আশা আমারও ছিল যে, এই পথে চলতে চলতে কোন একটি চটিতে আবার দেখা হবে তাঁদের সঙ্গে। জিতেনের মন্তব্য শুনে এখন মনে হ'ল যে সে আশা আমার নাও মিটেতে পারে, তবু বথাসম্ভব গঙ্গোত্রীদের বর্ণনা দিয়ে সেই চটিওয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু মাথা থেকে উত্তর দিল লোকটি : না, বাবুজী, পুরুষেরাই এ পথে চলে না আজ কাল, তা মেয়েরা আসবে এই বনজঙ্গলের হাঁটা পথে।

বেশ তিক্ত কঠিন্য তার, তবে রাজীবীর চেয়ে তুঙ্গনাথের বিরুদ্ধেই যেন বেশী অভিযোগ ও অভিমান তার। একই রকম কথা শুনলাম আরও অনেকের মুখে—যেহ কলিযুগে তুঙ্গনাথের হাছাছাই কমে গিয়েছে, নইলে কি আর তাঁর রাজীবী ভাঙিয়ে নেবাদ জন্ত এই উত্তরাঞ্চলে মোটরবাস প্রবেশ করতে পারে।

গুনতে গুনতে মনে দোলা লাগে আমার। এও একরকম নিষ্ঠুর নিরতি। কতদূরে অগস্তা যুনি—এখান থেকে মাইল দু' ত হবেই। আর উচ্চতার হিসাবেও অনেক নীচে তার অবস্থান। অথচ ঋষিকেশ থেকে সেই পর্যন্ত যে মোটর বাস আসা-যাওয়া করছে তারই থাকার এত দূরের বাড়ী সড়ক ও তার হ'পাশের চটিগুলিই কেবল নয়, ভুঙ্গনাথের মত মহাদেবতার বেদীতেও কটিল দেখা দিয়েছে।

তবু কাটা হটক, সফ্র হটক, বজ্র হটক—উখীমঠ ছাড়বার কিছু দূর পর্যন্ত মোটামুটি চলনসই পথ পেরেছিলাম। আর ঠিক সমতল না হলেও কঠিন চড়াই বা খাড়া উত্তরাই পাওয়া বাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে গ্রাম এবং শস্তক্ষেত্রও চোখে পড়ছিল। একটি বেশ বড় বসতি বা গ্রাম পেলাম—আপাতদৃষ্টিতে সমতল ভূমির গ্রামেরই যেন প্রতীচ্ছবি। একটি ঘরের চাল দেখি নবরকান্তি কুমড়োর ডগা ও বড় বড় সতেজ, সবুজ পাতার প্রায় ঢেকে কেলেছে। আর একটু কাছে এসে দেখি যে, ছোট-বড় অনেক কুমড়োও ফলে রয়েছে চালের উপর ঐ পাতাগুলির কাক কাকে। এমন দৃশ্য হিমালয়ে প্রবেশ করবার পর আর চোখে পড়ে নি। এখন দেখেই আমার মনে ত 'লোভে কম্পমান।' হাঁক-ডাক করে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল। সে মাঝারি আকারের একটি কুমড়োর দাম বললে চার আনা। চার টাকা দামও যদি সে হাঁকত তবু এ রকম জারগার তা আমি বেশী মনে করতাম না। স্তত্রং তৎক্ষণাৎ চার আনা দিয়ে জিনিসটি কিনে ঝোলাজাত করলাম আমি।

কারণ ত লোভ ! আর শাস্ত্রে আছে যে, লোভই পাপ। সেই পাপেরই ফল হবে হয়ত। সেব চারেক ওজনের সেই কুমড়োটি আমি খেচ্ছ'র নিজের পিঠে তুলে নেবার পরেই দোঁধি পারের নীচের পথ ও তার হ'পাশের দৃশ্য একেবারে ভিন্ন আকার ও প্রকৃতি ধারণ করেছে।

দোরেড়া না হুর্গা চটি থেকেই শুরু। আকাশগঙ্গা নামের একটি শ্রোতস্থানী পার হয়েছিলাম পাতালের দিকে অনেকটা নেমে গিয়ে, তার পর কাঠের পুলের উপর দিয়ে, তার পরেই চড়াই। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, ওপারে বতটা নীচের দিকে নাগতে হয়েছিল এ পারে মোটামুটি ততটাই উঠতে হবে। কিন্তু একটু পরেই তুল ভেঙে গেল। এবার আবোহণের দেখি আর শেষ নেই। উঠতে পথের চটি পেলাম একটি। জন দুই মাত্র দোকানদার। টিম টিম করে জলছে একটি যেন মাটির প্রাণী। সেই চটির সঙ্গে সঙ্গে আলোও অদৃশ্য হ'ল।

“পৌষায়াস” সার্থক নাম চটিটির। ঘনবাড়ী কথানা পিছনে কেলে যেখানে প্রবেশ করলাম, কেবল ডানাওয়ালা পাখিরাই সহজে যেতে পারে সেখানে। যেমন উঁচু, তেমনই দুর্গম।

নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে চড়াই পথ। কদাচের পথে

আগাগোড়াই যেমন পেরেছি তেমন খাড়া চড়াই অবশ্য নয়। পারের চলা সফ্র পথ খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে গিয়েছে। তেমন হাঁক ধরে নি বলেই বলতে পারি নি এতক্ষণ। হঠাৎ পাথরের কলকে ৬০০০ ফুট লেখা দেখে বেশ বেন একটা থাকা খেয়ে মন আমার সচেতন হয়ে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পর দেখি ৭০০০ ফুট—ও পথ গোদীকুণ্ডের চেয়েও বেশী উঁচু। উখীমঠের উচ্চতা ছিল ৪০০০ ফুট। মোট ৩০০০ ফুট একনমে উঠে আসবার পরেও সহজভাবেই যে হাঁটতে পারছি তার কারণ উচ্চতা এ পাবে অনেক-খানি জারগা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভিন্ন প্রকৃতি এ দিকের পাহাড়ের। ওপারে অধিকাংশ পথেই একদিকে দেখেছি গভীর খাদ ও অপরদিকে আকাশ সমান উঁচু পাহাড়। এপারে পাথর ধারেই খাদ চোখে পড়ে না; অপরদিকে পাহাড়ের বুক বা পিঠও নয়। আসল কথা, পাহাড়ের গা বেয়ে আর চলছি নে আমরা, পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি তার মাথার উপর দিয়ে। তবে চূড়ার আকার নয় এই মাথার। কাছিমের মত আকারের বিশাল একটি মালভূমি এটি। ‘ভূমি’ কথাটি সার্থক এই পাহাড়টির বর্ণনায়। পাথর নিশ্চয়ই অনেক আছে এখানে—আমাদের পারের নীচের পথটাই ত পাথর দিয়ে বাঁধানো। তবে পাথুরে পাহাড় এটি নয়। নিবিড় বন ছড়িয়ে রয়েছে সবটা মালভূমি জুড়েই। সেই বনের ধারে ধারে নয়, মাঝখান দিয়ে আমাদের পথ।

কেবল নিবিড় নয়, অদৃষ্টপূর্ব এই বন। ওপারের বন দেখে ভয় পেরেছিলাম। এখন সেই কথা স্বপ্ন করে নিজের কাছেই লজ্জা পাই। আমার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মন আজকের এই বন দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল। ওপারে যাকে মনে করেছিলাম মহীকুহ, এপারে এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ঠাড়িয়ে তাইই রূপ কল্পনা করে বুঝি যে, তুলনার তা ছিল সাধারণ একটি গাছই।

বেনিরাকুণ্ড পর্যন্ত চার মাইল পথের প্রায় সবটাই ঐ মহীকুহ-সকল নিবিড় বন। বুঝি হিমালয়েরই সমবরসী ও-বনের প্রত্যেকটি মহীকুহই। বন অত নিবিড় বলেই বৎসরের বার মাসই বৃষ্টি হয় এদিকে—তখনও বৃষ্টি মাথায় করেই চলছিলাম আমরা। যুগ-যুগান্তর ধরে এমনি অবিবাহ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে লোহার মত কালো হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ বৃক্ষেরই গায়ের রং। শেওলা বা জমেছে তা এদের কাণ্ড ও শাখার পুরু প্রলেপ লাগিয়েই নিঃশেষ হয় নি। সমতল-ভূমিতে বটগাছের যেমন খুঁচি নামে তেমনি এ' সব বৃক্ষের নানা শাখা-প্রশাখা থেকে ধরে ধরে ঘনীভূত শেওলার খুঁচি নেমে এসেছে প্রায় মাটি পর্যন্ত। থেকে থেকেই ভ্রম হয়, বুঝি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীরা সারি সারি ধানে বসেছেন, অথবা অধোবাহু হয়ে খুলে খুলে কুছ সাধনা করছেন।

জিতেন এগিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্বে বেনিরাকুণ্ডের কাছাকাছি এসে দেখি যে, পাথর ধারে একখানা পাথরের উপর চূপ করে বসে আছে সে।

তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু আকাশে নিবিড় মেঘ নেই। আর বনের ওখানে শেষ বলেই ডাটনে, বায়ে সামনের দৃশ্যগুলি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। এখন বেশ বুঝা যায় যে বায়ে একটু দূরেই খদ ও তার ওপারে নাকি-উচ্চ পাথুরে পাহাড়ের সারি। সামনে বেনিয়াকুও চটির ঘর-বাড়িও কয়েকখানা দেখা যাচ্ছে।

আমি তার কাছে আসবার পরেও জিতেন উঠে দাঁড়াল না। দেখে তীক্ষ্ণ বাক্যের সুরেই আমি বললাম, হাটবার সখ মিটেছে তোমার? বুঝেছ যে, তোমার পা-দু'খানিও লোহা দিয়ে তৈরী নয়?

কিন্তু বিজ্ঞপ্তি গারে মাপল না জিতেন। বহু মিষ্টি রকমের একটু হেসেই সে আমাকে বললে, আমার প্রশ্নের জবাব আগে দিন আপনি। সব রকমই দেখা হয়ে গিয়েছে বলে ওপার থেকেই ত আপনি কিরে বেতে চেয়েছিলেন। এখন বুকে হাত দিয়ে বলুন ত, এ দিকে না এলে মস্ত একটা লোকসান হত, কি না?

কোন মুখে অস্বীকার করব! চড়াই পথে একটানা পনের মাইল হেঁটে দেখ আমার বতই ক্লান্ত হউক না কেন, মন যে আমার নব নব প্রাপ্তির আনন্দে সজীবিত হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। সুতরাং প্রশ্ন শুনে লজ্জিত হাসি মুখে চুপ করে থাকতে হ'ল।

কিন্তু বিজ্ঞপ্তিগর্ভে উৎফুল্ল জিতেনের মুখ। সে সঙ্গতকণ্ঠে আবার বললে : ঐ দেখুন, আরও একটি নতুন দৃশ্য—বলতে বলতে সে তার ডান হাতখানা ভুলে অঙ্গুলী সঙ্কেতে খদেয় ওপারের একটি পাহাড় দেখাল আমাকে।

গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে দূরের দৃশ্য দেখবার জন্য বিশেষ একটু চেষ্টা করতে হয়েছিল বই কি! কিন্তু দেখবার পর চোখ আর কিরতে চার না। নরনাভিহীন দৃশ্য। গঠনের বৈচিত্র্য পাহাড়ে পাহাড়ে কতই ত দেখেছি ওপারে। সে সবই মনে হয়েছে খাম-খেরালী বিধাতার আকস্মিক সৃষ্টি। কিন্তু এখন সামনের ঐ পাথুরে পাহাড়গুলির একটির পারে দেখলার অনবদ্য কারুকার্য—যেন সেই বিধাতাই পাথরের বুকে মন ভেলে নিজের হাতে রূপ সৃষ্টি করেছেন।

খদেয় ওপারে পার্চিকলে রং-এর একটি পাথুরে পাহাড়। কি কারণে কে জানে—তার শিখর থেকে যেখা পর্বাঙ্গ অনেকটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। অবশিষ্ট পাহাড়টুকু এপার থেকে মনে হচ্ছে যেন প্রাচীর-চিহ্ন-শিল্পের সমৃদ্ধ একটি প্রদর্শনী। উড়িয়া থেকে সুর করে সারা দক্ষিণ-ভারত জুড়ে দেবমন্দিরের ছায়া ও দেয়ালে যে অতুলনীর হুম্ম কারুকার্য দেখা যায় তাদের যে-কোনটির সঙ্গেই তুলনা হতে পারে ওর এক একটি চিহ্ন। নৃত্য-বিহ্বল যে নট-রাজের বায়পদের আঘাতে ঐ পাহাড়ের একটি অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে, তারই দক্ষিণ চরণের নৃত্যস্থলে অবশিষ্ট অংশের খাঁজে খাঁজে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে ঘর-বাড়ি, কুল-পাতা, জন্তু-জানোয়ার, এমন কি মানুষের ভাববিহ্বল মুখচ্ছবিও।

নতুন দৃশ্য আরও কিছু কিছু দেখা হ'ল বই কি! পঞ্চকোনারেয় অন্ততম ভূঙ্গনাথ। ভূঙ্গনাথের অধিষ্ঠান বলেই বুঝি ভূঙ্গনাথ তাঁর নাম। ফুট-এর মাপে কেশারকঙ্কের চেয়েও উচুতে তাঁর দেউল। বহু আয়াসসাধ্য তাঁর দর্শন। বৃষ্টি ও কুরাশার জন্য তা অস্পষ্ট হলেও ভূঙ্গনাথ পাহাড়ের সাঙ্গদেশে তার অটল ক্ষতিপূরণ পেয়ে-ছিলাম। উপরে দর্শন দিতে পারবেন না বলেই বুঝি ভূঙ্গনাথ নীচেই তাঁর বিরাট রূপ ও বিপুল বিভূতি ক্ষণেকের জন্য প্রকাশ করে দেখিয়েছিলেন।

সারা রাতই অঝোরে বৃষ্টি হলেও বেশ নির্মল বোধ উঠেছিল সকালে। সেই পরিচ্ছন্ন প্রভাতে বেনিয়াকুও থেকে বাড়ী কংবার জন্য কিছুকণ পরেই একটিবার দোঁদেছিলাম আমাদের বায়ে ও সামনে তরঙ্গায়িত চিংড়িবারের সমুদ্র। সম্পূর্ণ হিমালয় নিশ্চয়ই নয়! কিন্তু কেশারের ভূঙ্গনার অনেক বেশী প্রণয় দেখা যায় এখান থেকে, স্তর ও শৃঙ্খল সংখ্যাও গণনার অনেক বেশী।

তবে ঐ থাকে বলে স্বাপি-দর্শন! না জানি কোন পাণ্ডায় অদৃশ্য হস্ত সামনের আবরণখানি সরিয়েই তৎক্ষণাৎ আবার টেনে দিল তা।

তার পরেই আবার বনবস।

ভুলোকনা চটি পর্বাঙ্গ চলনসই অবস্থাই ছিল। কিন্তু চলতে চলতে এক সময়ে নিজের চারিদিকে অস্বাভাবিক অন্ধকারের অভিঘ্ন সঙ্কে সচেতন হয়ে মেঘের সন্ধানে উপর দিকে তাকিয়ে আকাশের একটি কালিতে দেখতে পেলাম না। চোখে বা পড়ল তা কেবল গাঢ়ের ডাল আর পাতা। উভয়েরই কালো বং।

আবার দেখি যে, সেই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন সুর হয়েছিল। আমাদের দু'দিকেই দৈত্যের মত মহীকুহ সব। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, যে পথে চলেছি তাকে পথ বলে চেনাই যায় না। পটা পাতার হুগুন্ধমর কাদার মধ্যে পায়ের গোড়ালি পর্বাঙ্গ যেখানে ডুবে যাচ্ছে না, সেখানে বগ্নমের-কলার মত উচু হয়ে আছে অবত্ববিগ্ন সব পাথর।

উত্তরাই পথ এটি। এতক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে, গতকাল চড়াই ভেঙে যে পাহাড়ে উঠেছিলাম আজ উত্তরাই পথে সেই পর্বতশ্রেণী থেকে অবতরণ করছি। কিন্তু ভূঙ্গনার অনেক বেশী বাড়ী মনে হয় আজকের এই উত্তরাই পথ। চলতে আজ কষ্ট হচ্ছে বেশী। কারণ আছে বই কি। বেশ ঢালু পথে নীচের দিকে গতি আহার; সে পথ আবার পিছল। পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে বলেই পায়ের পেশীগুলির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উপরেও খুব চাপ পড়ছে।

অনেকক্ষণ পর পথের বায়ে বড় একখানি পাথর চোখে পড়ল। শেওলা কিছু জমে আছে তার উপর, তবে বসবার অমুশবুজ নয়। দেখে বাহাঘরকে আমি বললাম ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নিতে।

কিন্তু অমন সঙ্গত প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করল বাহাঘর। আর দীতিমত উত্তেজিত প্রত্যাখ্যান তা। অত ভারী বোঝা তার

পিঠে থাকতেও আমার প্রস্তাব তার কানে বাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে তার মাথা ও হাত নেড়ে এত উচ্চৈঃস্বরে তার অস্বীকৃতি আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমি ত বিন্মরে হতবাক। অথচ তার পরেই বাহাদুর আরও জোরে তার পা চালিয়ে দিল।

অগত্যা আমিও তার অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু আরও খানিকটা এগিয়ে বাবার পর মাথা পড়ল।

একটু দূরে সামনের একটি গাছে দীর্ঘ একপাল হুম্যান। ঠিক পবনশব্দকে মনে করিয়ে দেবার মত না হলেও দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ ওদেব অধিকাংশেরই। কালো মূষ। কিন্তু ঘাড়, গলায় প্রায় সাদা লম্বা লম্বা লোম। একেবারে চূপ করে বসে নেই ওদেব কেউ। কি যেন ওরা খাচ্ছে, আর বোধ করি সেই খাদ্যবস্তুর সন্ধানেই মাঝে মাঝে লাফিয়ে বাচ্ছে এক ডাল থেকে আর এক ডালে।

রাজী-সড়ক থেকে বেশ একটু দূরে আর অনেকটা নীচে হু-তিনটি মাত্র গাছে চলেছে ঐ হুম্যানদের লীলা। তবু সত্বরে ধমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কেন্দ্রের পথে হু-একটি কুকুর আর মোড় ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ারই ত চোখে পড়ে নি। স্তব্ধ এই নিবিড়, নির্জন বনের মধ্যে হঠাৎ অতগুলি হুম্যান দেখে একটু ভয় পাব বই কি!

কিন্তু বাহাদুর দেখি ভ্রক্ষেপও না করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি গলা চড়িয়ে বার দুই তাকে ডাকবাম পর সে পিছন ফিরে হাসিমুখে হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে।

আমি এক চোখ ঐ হুম্যানবৃন্দ ও অপর চোখ পথের উপর রেখে পায়ে পায়ে ঐ আরগাটা পার হয়ে গেলাম।

নিরাপদ দূরত্বে চলে বাবার পর বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : এই হুম্যানের ভয়েই বৃষ্টি তুমি ওদিকে বসে বিশ্রাম করতে চাও নি?

অস্বীকার করল বাহাদুর : না, বাবুজী!

তবে?

মং পুছিরে,—বলেই আমার দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিল বাহাদুর।

প্রায় তিন মাইল দূরে পাক্রবাসা চটি। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আট-দশখানা মাত্র চালাঘর। তারও আবার হু-তিনটি মনে হ'ল পরিত্যক্ত। লোভনীর বিশ্রামস্থান মোটেই নয়। তথাপি ঘড়িতে প্রায় দুটো বেজেছে দেখে ওখানেই সেদিনের মত বাসা বাঁধবার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু ওনেই সবেগে মাথা নেড়ে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল বাহাদুর।

সুস্থ তত নয়, বত বিম্বিত হলো আমি। অত বাধ্য বাহাদুর এত অবাধ্য কেন আজ। তার প্রত্যাখ্যানের ধ্বনটাও বিস্ময়কর। কেমন যেন সম্ভ্রান্ত তার। তখন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : এখানে রাত কাটাতে তোমার ভয় করে নাকি বাহাদুর?



গৌরীকুণ্ড

বিস্ত্রতভাবে স্বীকার করল সে : হ্যা, বাবুজী।

কেন? বাঘ-ভালুক আছে এখানে?

না, বাবুজী।

তবে কি চোর-ডাকাত?

না, বাবুজী?

তবে কিসের ভয় তোমার?

মং পুছিরে।—বলেই বাহাদুর তার বোঝার দিকে এগিয়ে গেল সেটি বখানিয়মে তার পিঠে তুলে নেবার জন্য।

নিবিড় বন নিবিড়তর হয়েছে সামনের পথে। অপরাহ্নবেলায় গভীর অরণ্যের অন্ধকারে স্বতঃই পা ছম ছম করে। জিতেনও আমার কাছাকাছি নেই বলে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে, ঐ বনের মধ্যে আমি একেবারে একা। পরিবেশ অন্ধকূল বলেই বৃষ্টি বাঘাটা আমার মাথার এসে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল যে, বাহাদুরের ভয়ের কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি।

কেন্দ্র-ভূঙ্গনাথের দেশ—মর্ত্যে আর স্বর্গের সীমান্ত। ওদেশে হাঁটা-পথে চলতে শুরু করলেই যেন মনের অতল থেকে অবেশ শৈশবে রত্নিন প্রত্যাশাগুলি উপর তলার ভেসে উঠতে থাকে। দেব-দেবী, কিন্নর-কিন্নরী, বন্ধ-বন্ধিনী দেখবার আশার কতবার আমার চোখ হুটিও ত চঞ্চল হয়েছে। স্ত্রীম গঠন ও ললিত-লাবণ্য দেখবার প্রত্যাশা তা। কিন্তু এখন বোধ করি চারিদিকে ঐ ভয়ঙ্কর পরিবেশের প্রভাবেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, পার্বত্যের সখী ও পরিচায়িকা শাস্ত্রমতে বত স্মরণীই হোক না কেন, ভোলানাথের পার্বত্যেবা অধিকাংশই ভূত ও প্রেত। এই ভূঙ্গনাথের রাজ্যে তাদের কোন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে বাবার আশঙ্কাতাই বাহাদুর অত সচল ও সতর্ক হয়েছে নাকি?

ঐ বনের পথে তখন আর জিজ্ঞাসা করি নি তাকে। কিন্তু রাত্রিবেলায় ভিন্ন পরিবেশ। বেশ খোলাঘোলা আরগার মণ্ডলটি। পাকা ঘিটল বাড়ী সেখানে কালী কলীওরালার ধর্মশালার। সৌভাগ্যক্রমে চটিওরালার ভাণ্ডারও সেখানে পেয়েছিলাম সমৃদ্ধ।

পরিপাটি ভোজনের পর দুর্গের মত নিরাপদ ঘরের মধ্যে ভুতের গল্প তেমন ভয়ের কারণ হবে না মনে করে সোজাহুজিই জিজ্ঞাসা করলাম বাহাদুরকে।

তুনেই ভয়ে শিউরে উঠেছিল সে, কিন্তু জিতেনও নানাভাবে তাকে আশ্বাস দেবার পর কেবল মুখই নয়, মন খুলেই উত্তর দিল বাহাদুর।

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে সে যে, এই কেন্দার-বদরীর দেশে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অশরীরী প্রেতেরা। কেউ সদাশয়, কেউ ভয়ঙ্কর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কাউকে দেখেছ তুমি ?

নহী, বাবুজী,—কেন্দারনাথজীকী কুপাসে—

বলতে বলতে সারা দেহ বেন কঁপে উঠল বাহাদুরের। আতঙ্কের স্পন্দিত চিহ্ন! কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টিতে তার কৃতজ্ঞতাও আছে—কেন্দারনাথজী যে অমন দুর্ভাগ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন সেই অল্প কৃতজ্ঞতা। দুই হাত জোয় করে কপালে ঠেকিয়ে কেন্দারনাথজীর উদ্দেশ্যে প্রণামও করল সে।

কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে, সর্কোভুক কণ্ঠে আমি বললাম, অত ভয় কেন রে ? তুই-ই ত বললি যে, ভাল ভুতও আছে।

আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের সব্বদেও তেমন ভয়সা নেই বাহাদুরের মনে। যে মানুষকে দয়া করে তাঁরা দর্শন দেন, বুঝতে হবে যে, সংসারে তাঁর দিন কুড়িয়ে এসেছে।

আর যাঁরা ধায়াপ ভুত ?

তাঁরা তখনই মেরে ফেলে, বাবুজী,—আমি খুব কষ্ট দিয়ে মায়ে।

এমন সুরে কথাটা বললে বাহাদুর যে, আমার মনে হ'ল বুকি সেই মুহূর্তে সে নিজেই সেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে।

তথাপি কৌতূহলী জিতেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সামনে ত কোন ভুতই কোন দিন আসে নি। তবে তুমি কেমন করে জানলে ?

আমি জানি, বাবুজী,—বিষয় কণ্ঠে উত্তর দিল বাহাদুর : আমায়ই এক সন্ধ্যাকে এক বদমাশ ভুত সেবার ঘেয়ে ফেলল—এ অঙ্গলচটির কিছুটা আগে।

পাক্ষরাসাকেই অঙ্গলচটি বলে বাহাদুর। তুনেই বুঝলাম আমি যে, আমার প্রকল্প প্রমাণ হয়ে গেল—ভুতের ভয়েই এ চটিতে যাত্রিবাস করতে রাজী হয় নি সে, পথে কোথাও বসে হ'লও বিশ্বাস করতেও নয়।

বাহাদুরকে জেদী করে করে শোনা গেল গল্পটা। ব্যাপারটা ঘটছিল এ অরণ্যের পথেই। চনচনে যোগ ছিল সেদিন বার জন্ম ঐ নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতেও গলদবর্গ সকলেই। দারুণ শিপাসার কাতর হয়ে পথভ্রান্ত একটি কুলি তার পিঠের বাঁকা নায়িরে বেধে নীচেব এক বর্ণার জল খেতে গিয়েছিল। লোকটি দুই অঙ্গল জল পান করতে না করতেই সেই যে

অজ্ঞান হয়ে পড়ল তার পর হাসপাতালে নিয়ে অনেক চিকিৎসা করিয়েও তাকে আর বাঁচানো গেল না—ধমুকের মত বঁকে গিয়ে মৃত্যু হ'ল তার।

বড় বদমাশ একটি ভুত আছে ঐ বনের মধ্যে। বিশেষ ঐ বর্ণাটির ধাবে বাসা নিয়ে ঐ বর্ণাটির উপর তার নিজস্ব সম্বন্ধ কার্যে করে যেতেছে সে। বাহাদুরের বন্ধু কুলিটি অনধিকার প্রবেশ করে সেই বর্ণার জল খেয়েছিল বলে বেগে গিয়ে ভুতটি চপেটাঘাত করেছিল কুলিটির ঘাড়ে।

কিছুক্ষণ চূপ করে থাকবার পর আরও একটু বুঝিয়ে বললে বাহাদুর। এ দেশের লোক বা বাজীদের ভুত বারাই এই পথের ধারে ধারে থাকে তারা কারও তেমন অনিষ্ট করে না। ভয়ঙ্কর আর বদমাশ ভুত হয় মরবার পর ঐ বাবার পতপালকের। ঠাকুরদেবতা মানে না ওরা, তর্পণ, শিগুদান ইত্যাদি অমুষ্ঠানের ধার দিয়েও বার না ঐ বিশ্বাসীদের বংশধরেরা। স্মৃত্যোগ ঘেয়ে হউক, পুরুষ হউক—ওদের কেউ যদি এই উত্তরাংশেও মাঝা বার তবে নির্ধাৎ সেই জায়গাতেই ভুত হয়ে থাকবে সে এবং অজুহাত ও সুযোগ পেলেই পথচারীর সর্বনাশ করবে।

১৭

গল্পের ভুতের ধর্ম্মই ঐ—মনে গিয়ে বাসা বাঁধবে সে। বাহাদুরের গল্পের বিশেষ ভূতটিকে পর দিন সকালেও মন থেকে তাড়াতে পারি নি। আমি নিজে ত সে সেখানে দ্বৈকে বসে আছেই, তার উপর আবার কিছু স্মৃতি ও চিন্তাও জাগিয়ে তুলেছে সে।

গত রাতে গল্পটি শুনেও শুনেই প্রচলিত বিশ্বাসের তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বেচারী বাবার পতপালক। বাজীর নেই, দেশ নেই। ছাপল-ভেড়া-মোষের পাল নিয়ে অনবরত ঘুরে ঘুরে প্রায় পত্তর জীবনই বাপন করে সে। তথাপি মরবার পর ভুত সে হবেই। আর তাও ভয়ঙ্কর, খুনে ভুত। এ হেন মনোবৃত্তির উৎস নিশ্চয়ই বিজ্ঞাতি ও বিশ্বাসীবিষয়।

কখন যে আমার চিন্তা সমষ্টি ছেড়ে বাস্তবিক, সম্প্রদায় ছেড়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে তা রাতে বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করবার পর বুঝতে পারলাম যে, মৈথগা থেকে রায়পুরের পথে আমার ক্ষণেকের পরিচয় যে ভৈশাল পরিবারের সঙ্গে সেই স্বামী-স্ত্রী সমগ্র বাবার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে বেন আমার কাছে এসে স্মৃতিচারণ প্রার্থনা করছে। স্মৃতির পটে আমি বেন স্পষ্ট দেখলাম সেই হাসি-হাসি-মুখ ময়ওয়ালা বুঝকটি ও তার সুললিত বুঝকী স্ত্রীকে। রায় দিতে একটুও দেরি হ'ল না আমার। বসবাই গোলাপ আর শাণিত খড়ের সম্মিলিত রূপ দেখেছি যে হস্তমুখ তরুণীর মুখে সে যে মৃত্যুর পর শাকচুরী হয়ে পাছের ডালে ঔৎ পেতে বসে থাকবে নিরীহ বাজী বা তার কুলির বাড়ি মটকাবার জন্য তা আমি কোন মতেই মানতে রাজী নই।



মন আমার বতই ঐ বায় দেয় ততই বেন আরও স্পষ্ট দেখি সেই বাবাবরীর মুখ। বুঝি সেই অজই চলার পথে আর একখানি সুন্দর মুখ অত বেশী চোখে পড়ল আমার।

সেই বয়সেরই মেয়ে এটিও। তবে অত তীক্ষ্ণ নয়, বয়ঃ চল-চলে এ মেয়েটির মুখখানি, আর ঈষৎ ক্লিষ্ট। মাঝারি আকারের একটি ঘাসের বোঝা তার পিঠে। সেই বোঝার ভারে সামনের দিকে একটু ঝুকে ঘীরে ঘীরে, একটু বেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে মেয়েটি।

ধমকে দাঁড়ালাম আমি—লোভ হচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে দুটি কথা বলতে। সে আমার কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা নাম হায়, বেটি?

সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে, মেয়েটির গৌরবর্ণ মুখখানি বেন টকটকে লাল হয়ে উঠল, লজ্জায় ঘুরে পড়ল তার চোখের পাতা দুটি, ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে আমার পাশ কাটিয়ে পিছনে চলে গেল সে।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার কাণে এল মিষ্টি, মিহি সুরের একটি মাত্র কথা—সীতা।

এ ত নাম। তা হলে আমাকে এড়িয়ে গিয়েও আমাকে উপেক্ষা করে নি মেয়েটি—একটু দেরিতে হলেও আমারই প্রেমের উত্তর দিয়েছে সে।

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, মেয়েটিও ধমকে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে চেয়ে আছে—প্রসন্ন চোখদুটিতে তার কোঁড়লী দৃষ্টি।

হুনি'বার আকর্ষণ সেই চোখ মুখের। সেই টানেই আমিও হানিমুখে তার কাছে গিয়ে বললাম, বাঃ বেশ নামটি ত! বাড়ী কোথায় তোমার?

আর তখনই ঘটল এক অঘটন। চোখদুটি তার আরও বিফারিত করে হঠাৎ অসুট আর্দ্রনাদ করে উঠল সীতা। পড়ে গেল মাটিতে। তার পর কেবল গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঁজলা উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থির আক্ষেপ।

চীৎকার করে উঠলাম আমিও! মেয়েটির অজ্ঞ বত, নিজের অজ্ঞ তার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন আমি। অপরিচিত, বিদেশী লোক আমি। কে যে কি হুহুভিসন্ধি বা অসদাচরণ আরোপ করবে আমার উপর কে জানে।

তবে ভাগ্য ভাল আমার। বাহাগ্রন্থ আর জিতেন সেদিন চটি থেকেই একটু দেরিতে বের হয়েছিল বলে আমার পিছনে পিছনে আসছিল তারা। এখন তারা হু'জনেই এক সঙ্গে ঐ জায়গায় এসে উপস্থিত হ'ল। আর সোবগোল শুনে ছুটে এল স্থানীয় কয়েকজন নর-নারীও। সীতার পরিচর্যা করতে করতে তারাই অস্তর ও আশ্বাস দিল আমাকে—কোন সন্দেহই করে নি তারা, বিস্মিতও হয় নি। মেয়েটি তাদের চেনা। অমন মূর্খা প্রায়ই হয় তার—বখনই ভুতে পায় তাকে।

ভুত!—

আমি চমকে জিতেনের মুখের দিকে তাকালাম, তার পর হু'জনেই এক সঙ্গে বাহাগ্রন্থের মুখের দিকে। সে দেখি তার দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েছে, বোধ করি ভূতনাথ কেন্দ্র-নাথজীর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু নির্ঝিকার সেই স্থানীয় লোকটি। সে আরও একটু ব্যাখ্যা করে শোনালো আমাকে। সীতার উপর ভর করেছে বার প্রেতাত্মা, সেই ভ্রষ্ট সাধু গড়ুর মহারাজকে সীতার পিতা শত্ৰু পাণ্ডা ব্রহ্মশাপে ভষ্ম করেছিল।

ঘাবড়াও মং বাবুজী—লোকটি অল্প একটু হেসে আমার আমাকে আশ্বাস দিল : শত্ৰুজী খোদহী আ গয়ে। অস্লী সকেতে একজনকে দেখিয়েও দিল সে।

নাম শুনেই আমার মনের অন্তরে একটি আলোড়ন গুরু হয়ে-ছিল। লোকটিকে ঘুর থেকে দেখবার পর একটি বিস্মৃত প্রায় অভিজ্ঞতা হঠাৎ বেন স্মৃতির পটে আকার ধরে কুটে উঠল। তিনি কাছে আসবার পর সব সন্দেহের নিরসন।

ইনিই সেই শত্ৰু পাণ্ডা—দেবপ্রয়াগের ঘাটে বিনি তাঁর জুজুটির একটি কথাঘাতেই তাঁর নিজের অস্বাভাব্য সন্ধকে আমাকে সচেতন করে তুলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও জাগাতে পেরেছিলেন আমার মনে।

আভাসও ত দিয়েছিলেন তিনি যে, গোপেশ্বরের পথে তাঁর সঙ্গে আমারই দেখাও হয়ে যেতে পারে।

ঘটনার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে তাঁর গণনায় সঙ্গে। কিন্তু কি শোচনীয় দুর্ঘটনা তার উপলক্ষ! লজ্জায়, সঙ্কোচে ভাল করে তাকাতেই পারি নে শত্ৰুজীর মুখের দিকে।

ব্যাখ্যাটা মানেন শত্ৰুজী। কিন্তু যে কৃত্তিম তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে তাকে তিনি মনে করেন অভিযোগ। ব্যাভিহী হয়েছে তাঁর জীবনের এক বিড়ম্বনা। বিশ্বাস কর, বাবু—শত্ৰুজী আমাকে বললেন : অভিলাপ তাকে আমি দিই নি। শুধু বলে-ছিলাম এই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে।

থেষে থেষে সম্পূর্ণ কাহিনীই আমাকে শোনালেন শত্ৰুজী। দেবপ্রয়াগে তাঁর যে কথাগুলি আমার মনে হয়েছিল হকৌথা, সেগুলির অর্থ বুঝলাম এতদিন পর।

চেলা গড়ুরকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসী-মণ্ডল চটির একখানা কুঁড়ে ঘরে কেলে বেধে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গায়ের লোকেরা ফেলতে পারে নি তাকে। বছর কুড়ি বয়সের স্ত্রীয়া, সুদর্শন যুবক সেই গড়ুর, পাড়োয়াল জেলারই লোক। সন্ন্যাসের পথে নতুন বাড়ী। মাথায় জটা হবে কি, চুলই মোটে বড় হয় নি। বৈরাগ্যের বা কিছু নিদর্শন তা কেবল তার কটিতে কোঁপীন ও অঙ্গের ভঙ্গরাগে। এ হেন লোকটিকে প্রবল অয়ে-সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকেরাই তাঁর চিকিৎসা



ও শুষ্কতার ভাব নিয়েছিল। খবর পেয়ে পাশের গ্রাম থেকে এসে-  
ছিলেন শম্ভুজীও।

একদিকে দেবপ্রসাদ ও আর একদিকে বজ্রীনাথ। প্রায় দুই  
সীমান্তের দুই তীর্থে জাত-বাবসারের তাল সামলিয়েও নিজের  
সংসার ও পৈত্রিক সম্পত্তির বক্ষণাবেক্ষণের জন্ত মাঝে মাঝে গ্রামের  
বাড়ীতে আসতে হয় শম্ভুজীকে। সেবারও তিনি বাড়ীতে এসে-  
ছিলেন তাঁর নিজের গরজেই। কিন্তু জড়িয়ে পড়লেন গড়ুরের  
ব্যাপারটির সঙ্গে। পরিত্যক্ত রূপ সাধুর সেবা-পরিচর্যা আরম্ভ  
করবার পর তাঁর উৎসাহই বেন সবচেয়ে বেশী।

শুধু যোগীসেবাই নয়, ওটি সাধু সেবাও—গৃহীর পক্ষে মহা  
পুণ্যের কাজ। খবর পেয়ে অনেক কুলবধুও ছুটে এসেছিল—  
শম্ভুজীর স্ত্রী বশোদা এবং কস্তা সীতাও।

দায়সারা কাজ নয়, আন্তরিক সেবা। হুঁ এক দিন নয়, প্রায়  
এক মাস, রোগ সারবার পথেও যোগী নিশ্চিন্ত আরাধ্যে করেকদিন  
ওখানে বিশ্রাম করেছে, ততদিনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কত কথা-  
বার্তা হয়েছে তার, কত ছোয়াছুয়ি, কিছু বক্তাকৌতুকও। তা  
আবার একদিন হয়েছিল সীতাকে উপলক্ষ্য করেই।

অল্প বয়সেই একবার মারাত্মক জ্বর পড়েছিল সীতা, তার পর  
থেকে একটি পা তার খোঁড়া হয়ে আছে, খোঁড়া পাখানির জন্ত  
অনেকের কাছে অনুকম্পা পেত সীতা, সন্ন্যাসীদের কাছে মাঝে মাঝে  
একটু ব্যঙ্গবিদ্রোহও।

একদিন গড়ুরের কুটিরে সীতার ঐ খোঁড়া পায়ের প্রসঙ্গ শুঁতাবার  
পর অনুকম্পা ও বিদ্রোহ মিশে এক হয়ে গেল।

বেশী বয়সের একটি নারী বলেছিল গড়ুরকে : সীতার খোঁড়া  
পাখানি তুমি সারিয়ে দিতে পার না, সাধুজী ?

তুনেই হুঁ তিনটি ছোট মেয়ে সম্বন্ধে বলে উঠেছিল : সারিয়ে  
দাও সাধুবাবা—সীতাদিকে ভাল করে দাও তুমি।

তুনে গড়ুর সীতার পায়ের অস্বাভাবিকত্বের সঙ্গ জায়গাটাতে  
হাত বুঁদিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই কিশোরী সীতা অনেকখানি  
দূরে সরে গিয়ে ভ্রষ্ট্র করে বলেছিল : নিজের জব বে সাধাতে  
পারে না সে আবার—

তুনে ঝিল ঝিল করে হেসে উঠেছিল ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বেশী  
বয়সের নারীটিও। গড়ুর হয়েছিল অপ্রতিভ।

অল্প ধরনের কথাও হয়েছে। বশোদা তাঁর কঠোরপ্রকৃতি,  
শাস্ত্রজ্ঞ স্বামীস্বরূপকে উপেক্ষা করেও জেরা করে বেঁধে করতে চেষ্টা  
করেছেন নবীন সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের খবর।

এমনি ভাবে বীয়ে বীয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গেই বেশ একটু  
অন্তরঙ্গ সম্বন্ধই গড়ে উঠেছিল গড়ুরের। স্ত্রীর সংসারের উঠাবার  
পর কেদার পঞ্চাঙ্গ গিয়েও তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসীকে খুঁজে না পেয়ে  
গড়ুর বধন বিমর্ষমুখে আবার ঐ বগল চটিতেই কিরে এল তখন  
সীতার লোকে আবারও সমাদর করেই গ্রহণ করেছিল তাকে।  
স্থানীয় মন্দিরে তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারা।

আর এক দফার বাড়ীতে এসে তাই দেখে শম্ভুজীও খুশী।

মন্দিরের সামনে সদর বাস্তার ধারে দিনের বেলায় আসন পেতে  
বসত গড়ুর মহারাজ। তবে বাড়ীর চলাচল বেদীন কম থাকত,  
প্রণামী বেদীন পরিমাণে বেশী পড়ত না তার সামনে, সেদিন সে  
উপরে বা নীচে কোন গাঁয়ে চলে যেত গৃহস্থদের বাড়ীতে বাড়ীতে  
ভিক্ষা করতে। যেত শম্ভুজীর বাড়ীতেও।

সেই গড়ুরজীকে—

বলতে বলতে থেমে গেলেন শম্ভুজী। উদ্ভেলনার বেন লাল  
হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। দূরের পাহাড়টির দিকে কিছুক্ষণ  
জরাজীর্ণ করে চেয়ে থাকবার পর ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে  
তিনি বললেন : সেই গড়ুর একদিন বেশ বড় একটি ঘাসের বোঝা  
পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে পিছনে আমাদের এই উঠানে এসে  
উপস্থিত হ'ল।

কেন ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তরে শম্ভুজী বললেন, সেটা প্রশ্ন ত তখন আমারও মনে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম গড়ুরকে। সে হেসে উত্তর দিল যে,  
অত ভারী বোঝা নিয়ে চড়াই ভেঙে উঠতে সীতার কষ্ট হচ্ছিল বুঝে  
সেদিনের বোঝাটা সীতার পিঠ থেকে নিজেই টেনে নিয়েছে সে।

দৃষ্টটি মনে মনে বজ্রনা করে স্মিতমুখে আমি বললাম : বাঃ !  
বেশ ত।—

বোধ কবি এমন একটি উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না শম্ভুজীর  
মনে। তিনি বিব্রতের মত কয়েক সেকেন্ডকাল আমার মুখের  
দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ মুণ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন,  
কিন্তু, বাবু, সবাই তোমার মত ভাববে কেন ? বাস্তবের চটি-  
ওয়ারা, আমার প্রতিবেশীরা যারা ও দৃশ্য দেখেছিল তাদের  
সকলের চোখে ভাল লাগে নি ব্যাপারটা। হাসাহাসিও কিছু  
হয়েছিল ঐ কথা নিয়ে।

একটু থেমে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে তিনি আবার  
বললেন, পরকে কি দোষ দেব, বাবু ! আমার নিজের স্ত্রীও ত তাই  
ভেবেছিলেন।

হিঃ।—সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গর্জন করে উঠলেন বশোদা।  
যেহেতু শব্দা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীকে ধমক দিলেন তিনি : কি  
যা-তা তুমি বলছ পরদেশী বাড়ীর কাছে।

তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমি,  
বাবুজী, শুধু বলেছিলাম যে, যারা বধন একটু পড়েছে দেখা যাচ্ছে  
তখন বেশ হ'ত ঐ গড়ুরের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিতে পারলে।

আমার কল্পনা ত উদ্দীপ্ত হয়েই ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সাং  
দিয়ে বললাম : ঠিকই ত। আমিও ত তাই ভাবছিলাম।

সহানুভূতির স্পর্শে বশোদার মনে অবরুদ্ধ আবেগ উদ্বেলিত  
হয়ে উঠল বেন। ঝাঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে পাচবয়ে তিনি  
বললেন : কত সহজে, বাবুজী, তুমি বুঝলে কথাটা। আর উনি ?  
তুনে কি বলেছিলেন, জান ?

আমার উত্তরেয় জন্ত অপেক্ষা করলেন না তিনি। দ্বিতীয় দিকে একটি জলজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার পর আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, উনি বললেন যে, যে যেরের নাম সীতা, সে কেন উরুশী হবে!—

চমকে উঠলাম আমি—একটি মধুর স্বপ্নের সাক্ষরানে হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু ভ্রমের তে উঠেছি পরিচিত জগতেই! তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল আমার—দেবপ্রয়াগে এই শত্ৰুজীব যে কঠোর রূপ দেখবার পর কঠিন পরিচয় পেয়েছিলেন। সচকিতে শত্ৰুজীব মুখের দিকে চেয়ে দেখি, পাথরের মত কঠিন তাঁর মুখ—সেই সেদিন দেবপ্রয়াগের ঘাটে যেমন দেখেছিলেন তাঁকে—আমার দেওরা দক্ষিণা প্রত্যাখ্যান করবার পর।

আমি তাঁর দিকে চেয়েছি দেখেই তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে জীব অভিযোগ স্বীকার করলেন শত্ৰুজীব। মুখেও তিনি বললেন, হাঁ, বাবু, নিশ্চয়ই বলেছিলেন ও কথা। এখনও তাই বলি আমি।

মুহূর্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর তাঁর। হুই চোখে কেমন যেন স্বপ্নের আবেশ—তাঁর দৃষ্টি বৃষ্টি বর্তমান ছেড়ে সুদূর অতীতে চলে গিয়েছে।

কিন্তু পরক্ষণেই সেই চোখ দুটাই ধক ধক করে জলে উঠল যেন। দৃষ্টান্তসিদ্ধে মাথা ডুলে জুড়কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, আমি জানি, বাবু, আমার সীতার কোন দোষ ছিল না। মূল দোষ আমার পুত্রের—কুলাঙ্গার, চণ্ডাল সে।

সে পঞ্চাৎ-পটও উদঘাটিত হ'ল। খেমে খেমে, কখনও উত্তেজিত, কখনও কৰুণ সুরে সে কাহিনীও আমাকে শুনালেন শত্ৰুজীব।

তাঁর সব আশায় ছাই দিয়েছে পুত্র অবোধানাথ। কি কুক্ষণেই যে তাকে তিনি চার্মোলির ইংরেজী স্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন—কত সীতার একেবারে বিপরীত হয়েছে সে। কি বিভা যে সে অর্জন করেছে, তা জানেন না শত্ৰুজীব। তবে তার অবিভাব সম্ভার নিজের চোখেই দেখেছেন তিনি। ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ একেবারে নেই অবোধানাথের। দেবদ্বিজে ভক্তি লোপ পেয়েছে তার, ত্রিসন্ধ্যা আফ্রিক পর্য্যন্ত করে না সে। পিতাকে সে সাক বলে দিয়েছে যে, রাজ্যের কাজ সে কিছুতেই করবে না। সংসারের আর কোন কাজেও লাগে না সে। চাষ-আবাদের কাজ করবে কি, ক্ষেত বা গোয়ালের দার দিয়েও যায় না অবোধানাথ। বোর্ডিং থেকে বাড়ীতে যখন সে আসে তখন বিজাতীয় সম্ভার সঙ্গে চোখে চশমা লাগিয়ে কজিতে হাত-বাড়ি বেঁধে কেবল পারে হু দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় সে।

সেই অবোধানাথ একদিন গভুরকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁদেরই বাড়ীর উঠানে স্বয়ং শত্ৰুজীব চোখের সাহসে ঠাঁড়িয়েই গভুরকে বলেছিল, শরীরটা ত, সাধুবাবু, দেখছি খুব শক্তই আছে তোমার। তবে ভিক্ষা কর কেন তুমি? খেতে খেতে পায় না?

শত্ৰুজীব মত সীতার কানেও গিয়েছিল সে কথা। তোতা-পাখীর মত সীতা আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। দিন কয়েক পর নিজেরের ক্ষেতে কাজ করতে বাবার পথে মন্দিরের সামনে গভুরের ঠিক মুখোমুখি ঠাঁড়িয়ে।

চরম দুর্ঘটনাটি ঘটে বাবার পরে সীতাকে জেরা করতে করতে তার মুখেই শত্ৰুজীব শুনেছিলেন তার স্বীকারোক্তি, শুনেছিলেন তখন গভুর যে উত্তর দিয়েছিল তাও।

—ভাইয়া ত তোমাকে ঠিক কথাই বলেছে, সাধুজীব। তুমি ভিক্ষা না করে কাজকর্ম কর না কেন?

—কাজ আমাকে দেবে কে?

—কেন, আমিই দিতে পারি। চল না আমাদের ক্ষেতে ঘাস কাটতে।

—মজুরি কি দেবে?

—মজুরি আবার কি! খেতে দেব পেট ভরে।

এমনি আরও সব কথা হয়েছে দু'জনের মধ্যে, কথামত কাজও হয়েছে কিছু কিছু। দোষের কিছু যে নয়, তা শত্ৰুজীব নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন সীতার মুখের ভাব দেখে—পিতার প্রস্নের উত্তর দিতে দু'একবার লাল হয়ে উঠেছে সীতার মুখখানি, কিন্তু কালো হয় নি একবারও।

সেদিন ত সীতা হেসে কুটি কুটি—সাক্ষরানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানবার পূর্বেই শত্ৰুজীব সেদিন গভুরকে দেখেছিলেন ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে পিছনে তাঁদেরই বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে উঠতে।

নির্মল হাসিই শত্ৰুজীব দেখেছিলেন গভুরের মুখেও, কিন্তু পরে প্রতিবেশীদের মুখে যে হাসি তিনি দেখলেন তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র—গায়ে জালা ধাঁয়ে দেয় তা! আগুনে ঘুতাহুতি পড়ল মনের বিরক্তি জীব কাছে প্রকাশ করবার পর উত্তরে যশোদার মুখের কথা।

কঠোর প্রকৃতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পয়দিনই গভুরকে একান্তে ডেকে নিয়ে কর্তৃত্বের কঠিন কণ্ঠে তাকে আদেশ করেছিলেন অবিলম্বে মণ্ডল চটিয় এলাকা ছেড়ে যেতে।

বিশ্বাস কর বাবুজীব—শত্ৰুজীব সনির্বন্ধকণ্ঠে আমাকে বললেন : সেদিন উপবীত আমি স্পর্শও করি নি, শুধু মুখে বলেছিলাম তাকে যে, ত্রিষাঙ্গি পূর্ণ হবার পূর্বেই সে যদি এ গ্রাম ছেড়ে না যায় তবে ব্রহ্মশাপ লাগবে তার উপর।

তার পর বৃষ্টি তৃতীয় রাত্রেই ঘটল সেই মন্বাত্তিক ঘটনাটি।

স্বপ্নের মত মনে পড়ে শত্ৰুজীব। আর তখনও স্বপ্নই মনে হয়েছিল তাঁর। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানার ওরেই শুনেছিলেন তিনি সংক্ষিপ্ত কথাবার্তাটুকু।

—তোমার বাবা আমাকে এ এলাকা একেবারে ছেড়ে যেতে বলেছেন—যেন গভুরের কণ্ঠস্বর।

উত্তরে যেন সীতা বললে, তবে চলেই যাও তুমি। আমার বাবা যে দক্ষ রাঙ্গী মানুষ, হয় ত সম্ভাই শাপ দিয়ে বসবসন।

তবে তুমিও চল আমার সঙ্গে ।

না, ছিঃ ! বিয়ে না হলে কি সঙ্গে যাওয়া যায় ?

তবে চল আমি—ভোর হয়ে এল ।

তার পর ভিজা ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে-চলার ছপ ছপ শব্দ  
যেন, কিন্তু একটু পরেই ছোট, তীক্ষ্ণ আর্দ্রনাদ—ওঃ !

কি হ'ল ?—সীতার গলা ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর গড়ুড়ের ক্লিষ্ট কণ্ঠে : সাপে কাটল বুঝি ।

নিজা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা তখন শত্ৰুজীর । গা-যোড়া  
দিয়েছিলেন তিনি । আর সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে গেল  
তার ।

সাপ, সাপ—

এবার আর অক্ষুট নয়, স্পষ্ট সীতার কণ্ঠস্বর । কথা নয়,  
আর্দ্রনাদ ! শব্দা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন শত্ৰুজী । ছুটে গিয়ে  
উদার অস্পষ্ট আলোকে দেখেন যে, ঘরের পিছন দিকে সজী  
বাগানের আলের উপর পড়ে ছটকট করছে সীতা, গোঁ গোঁ  
আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঞ্জলা উঠছে, প্রতি অঙ্গে আক্ষেপ—সেই  
দিনই আমরা যেমন দেখেছি প্রায় তেমনি ।

সাপে কেটেছে, সাপে কেটেছে সীতাকে,—চীৎকার করে  
বলেছিলেন শত্ৰুজী । শুনে বাড়ীর বশোদা ও প্রতিবেশী বারা ছুটে  
এল তাদেরও সেই সন্দেহ । সোরগোল, হৈ হৈ, কান্নাকাটি ।

কিন্তু না । ঘটনাখানেক পরে জ্ঞান কিরে এল সীতার ।  
তখনও খুব হুঁসল সে । কিন্তু বিস্ময়ের কোন লক্ষণই নেই  
তার দেহে ।

সে সব স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল সেই দিনই তাঁদের বাড়ী থেকে  
খানিকটা দূরে নীচে বাজী-সড়কের উপর নবীন সন্ন্যাসী গড়ুর  
মহারাজের মৃতদেহে ।

ঠিক ঐ জায়গাটাতাই,—শত্ৰুজী আমার মুখের দিকে চেয়ে তার

কাহিনী শেষ করলেন : আজ যেখানে সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল  
সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল গড়ুর লাশ । ঐ ঘটনার পর থেকেই  
বাবু, প্রায়ই এমন মূর্ছা হয় সীতার,—আর বেশী করে ঠিক ঐ  
জায়গাটাতাই ।

একটু ধেমে খপ্পাবিষ্টের মত মৃদুস্বরে শত্ৰুজী আবার বললেন,  
কারণ আছে বই কি ! আসক্তি ত ছিলই গড়ুর মহারাজের, তার  
উপর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার । আত্মায় ত সঙ্গতি হয় নি ।  
অতৃপ্ত কামনা নিয়ে সেই প্রেতাত্মা এখনও এদিকে বিচরণ করে—  
সুযোগ পেলেই ভর করে এসে সীতার উপর ।

বস্ত্রচালিতের মতই সবেগে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলাম আমি  
—যুক্তিবাদী মন আমার এমন ব্যাখ্যা মানতে চায় না । বস্ত্র-  
চালিতের মতই আমার চোখ দুটি গিয়ে পড়ল সীতার মুখের উপর ।  
মূর্ছা ভাঙবার পর ঘুমিয়ে পড়েছে সে । হাত-পা সবই কঁকল দিয়ে  
ঢাকা । কিন্তু সম্পূর্ণ মুখখানিই দেখা যায় । এখন অবসাদে  
ঈর্ষ্য বিবর্ণ তা । তবু অপূর্ণ সুন্দর । একটি যেন প্রফুল্লিত স্থল-  
পদ্ম—সারাদিন বোদে পুড়ে এলিয়ে পড়েছে ।

আমি ফিরে শত্ৰুজীর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ওর বিয়ে দেন  
না কেন ঠাকুরমশায় ?

বিয়ে !—

এমনভাবে কথাটা বললেন শত্ৰুজী যেন, প্রচণ্ড একটি ধাক্কা  
থেকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভেগে উঠেছেন তিনি । কিন্তু পরক্ষণেই  
তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন ।

উদভ্রান্তের মত হাসতে হাসতে তিনি বললেন, কে ওকে বিয়ে  
করবে, বাবু ? এই পাহাড়ের দেশে শত্রু যেমন করতে না  
পারলে মেয়ের আদব হয় না । সীতা আমার খোঁড়া বলেই ত  
সময়মত ওর বিয়ে হয় নি । তার উপর এল এই কলঙ্ক । আর  
কি বিয়ে হয় ও যেয়ে !—

ক্রমশঃ



## ভারতে জনসংসার রূপ

### শ্রীকালীচরণ ঘোষ

স্বাধীন ভারতের যে কয়েকটি বড় সমস্যা আছে তাহার মধ্যে অসম্ভব জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। দেশে অন্নাতাব যথেষ্ট আছে, যতটা আছে তাহার অনেকটা হয়ত স্বার্থহীন অতিলোভী মানুষের হষ্ট, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহের একটা বড় অসামঞ্জস্য না থাকিলে বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই ভোজ্যবস্তুর মূল্য উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকিতে পারিত না। এখন খাদ্যতত্ত্বের উৎপাদন প্রতি বৎসর যে হারে বাড়িতেছে; তাহা অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রততর গতি লইয়া চলিতেছে। ব্যবধান ক্রমেই দীর্ঘতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির শব্দ সৃষ্টি করিবার যে শক্তি আছে, মানুষের ভোজ্য উৎপাদন-ব্যাপারে তাহা নাই। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা এক বৎসরের সুরষ্টিব অভাবে কঙ্কালরূপে নরসমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

এতৎসত্ত্বেও লোকবৃদ্ধির সমস্যা যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত রূপ স্বেচ্ছা অনেকেরই ধারণা নাই। আর এই বৃদ্ধির হার চলিতেছে তাহার নানা-রূপ প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করিয়া, বলা বাহুল্য তাহাতেই ইহার গুরুত্ব বেশী।

আইন দ্বারা বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন অবশ্য বাল্য (৭) বিবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু বহুলাংশে যে প্রযুক্ত হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বে দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বৎসরের যে সংখ্যক সম্ভানবতী নারী দ্বৈষা স্বাইত, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সে সংখ্যা অতিমাত্রায় কমিয়াছে। অপ্রাপ্তবয়স্কের বিবাহে আইনগত বাধা যতটা না করিয়াছে অর্থনৈতিক অবস্থার চাপ তাহা অপেক্ষা বহুক্ষেপে বিবাহের বয়সের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মানুষের নিজ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের প্রতি লোভ বাড়িয়াছে, সুতরাং জীপজরুর বা অপরিপক্ক স্বামী, পুত্র ও খণ্ডবাল্যের প্রভাব (অভ্যাস) হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহের কাল ক্রমেই পিছাইতেছে। তাহা ছাড়া স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষালাভের একটা তীব্র স্পৃহা আগিয়াছে; ধনীরা ত কথাই নাই, মধ্য-বিত্ত দরিদ্র ধরেও এই লক্ষণ আশ্চর্যপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই এক কারণেই বালিকা-বিবাহ ভীষণ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

তাহা ছাড়া সমস্তর গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টায় “পরি-কল্পনা”র প্রথম হইতেই আর্থিক ও মাতার কার্যিক শক্তি-সামর্থ্যের অধিক সম্ভান লাভের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রচারণা চলিতেছে; পরিবার নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান বিস্তারিত ক্রটি নাই। কিন্তু উপরিউক্ত সকল বাধাই বিফল হইতে বসিয়াছে।

গত আশ্বিনমাস (১৯৫১) কালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫,৬৭,৪১,৬৬৯; আর ইউ-এন-ও’র ১৯৫৭ সনের মধ্যবার্ষিকী হিসাবে ইহা ধরা হইয়াছে ৩৯,২৪,৪০,০০০ জন। পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৯৫০ সনের ২৮৯.৩০ কোটি লোকের স্থলে (১৯৫৭) ২৭৯.৫ কোটি লোক লোকে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৪ এবং মৃত্যুহার ১৮ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের কাল হইতে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে প্রায় অর্ধ কোটি; অর্থাৎ চাই বৎসর কোনও বকমে পার হইয়া গেলে মোটামুটি এক কোটি লোক বাড়ি-তেছে। অল্প উৎপাদন এই ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই, পাওয়া সম্ভবও নয়। প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হিসাব সংখ্যাভালিকায় নিম্ন-লিখিত রূপ দাঁড়ায় :

সাল	বৃদ্ধি (হাজার)	পূর্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি (হাজার)
১৯৪৭	৩৪,৫০,৮৫	...
১৯৪৮	৩৪,৯৪,৩০	৪৩,৪৫
১৯৪৯	৩৫,৮৮,৩২	৪৪,০২
১৯৫০	৩৫,৮২,৯৩	৪৪,৬১
১৯৫১	৩৬,২৭,৯০	৪৪,৯৭
১৯৫২	৩৬,৭৫,৩০	৪৭,৪০
১৯৫৩	৩৭,২৩,০০	৪৭,৭০
১৯৫৪	৩৭,৭১,৩০	৪৮,৩০
১৯৫৫	৩৮,২৩,৯০	৫২,৬০
১৯৫৬	৩৮,৭৩,৫০	৪৭,৬০
১৯৫৭	৩৯,২৪,৪০	৪০,৯০
১৯৫৮	৩৯,৭৫,৪০	৫১,০০

অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যায়, ১৯৫৮ সনের ভারতবর্ষে আনুমানিক লোকসংখ্যা ৩৯,৭৫,৪০,০০০ বা ৪০ কোটি এবং ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮ এক বৎসরে জন্ম হইতে মৃত্যুসংখ্যা বার দিয়া মোট ৫১ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থূল কথা,

হই বৎসরে কিঞ্চিৎধিক এক কোটি লোক বাড়িয়া চলিতেছে। আর এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই বিন্দুত হইবে, কারণ প্রতি বৎসরই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা বিবাহিতা ও সন্তানধারণে সমর্থ হইবে এবং প্রতি বৎসর যত লোক মারা যায় তাহার অধিক এই বয়সের যুবতী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

আলোচনা-প্রসঙ্গে যাহারাই সহিত জনসংখ্যার কথা প্রথম উঠিয়া পড়ে, তাহার অধিকাংশই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন যে, বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। শতকরা নব্বাই জনের ধারণা যে, ভারতে মোট নবজাতকের সংখ্যাই ৫০ লক্ষ অপেক্ষা কম। বাহা বলা হইয়াছে উক্ত ধারণা যে ভুল, তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা উচিত। বাহা হউক, অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ প্রমাণ দেওয়া বাইতে পারে।

ভারতে প্রতি বৎসর মোট (জীবন্ত) শিশু জন্মসংখ্যা ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৫ পর্য্যন্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া প্রসবকালীন বা তৎপূর্বে জন্ম অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহাদের হিসাব ইহাতে নাই। আর যে সকল স্বাভাবিক সজীবন জন্ম সরকারী হিসাবের খাতায় জমা পড়ে নাই, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সংখ্যাও প্রদর্শিত হইল। যে সংখ্যক জন্ম-সংবাদ রেজিস্ট্রী হয় না, মৃত্যু সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নহে, কারণ অধিকসংখ্যক মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রম সরকারী কর্মচারী গোচরীভূত না করিয়া সম্পন্ন করার সম্ভাবনা কম।

	রেজিস্ট্রীকৃত জন্মসংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
১৯৪৮	৬১,৯৬,০০৮	৪১,৬৭,৮৭৭
১৯৪৯	৬৭,৬২,১৩১	৪০,৪৪,৪২৫
১৯৫০	৬৭,২৮,৪২৩	৪৩,৩২,৬৮৪
১৯৫১	৬৮,৪৬,৫১৭	৩৯,৪৯,৫০৬
১৯৫২	৭০,৫২,৭৩৬	৩৮,৪৩,৮২১
১৯৫৩	৬৯,৬৯,৩৫৮	৪০,৫৭,২০০
১৯৫৪	৬৯,৫২,৪১০	৩৫,৬৬,৩০৫
১৯৫৫	৫৮,৫৫,৮৫৪	২৫,২৩,৫২০

জন্ম ও মৃত্যুর উদ্ভূত সংখ্যা পূর্বে বর্ণিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কিছু ভাবভঙ্গ্য দেখা যাইবে। তাহার প্রধান কারণ প্রথম হিসাবে যেখানে রেজিস্ট্রী বাধ্যতামূলক নয় সেদিকে এলাকার এবং বাহা মোটেই গণ্যভূত হয় নাই, অথচ বৃদ্ধির হার দেখিয়া হিসাব করা যাইতে পারে, এরূপ সংখ্যাও ধরা হইয়াছে।

এখন জন্মহার যদি প্রায় সমানই থাকে এবং মৃত্যুহার ক্রম হ্রাস পায়, তাহা হইলে সমস্তর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি

পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বস্তু। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যুহার দেওয়া হইতেছে :

	জন্মহার লোকসংখ্যার প্রতি হাজারে	মৃত্যুহার লোকসংখ্যার প্রতি হাজারে
১৯৪৮	২৫.২	১৭.০
১৯৪৯	২৬.৪	১৫.৮
১৯৫০	২৪.৯	১৬.১
১৯৫১	২৪.৯	১৪.৪
১৯৫২	২৫.৪	১৩.৮
১৯৫৩	২৪.৮	১৪.৫
১৯৫৪	২৪.৪	১২.৫
১৯৫৫	২৭.০	১১.৭
১৯৫৬	২৭.৪	১১.৬
১৯৫৭	২৪.২	১১.৮

এখন জন্মের হার যদি প্রতি হাজারে ২৪-এর নীচে নামিতে না চায় এবং কোনও কোনও বৎসর ২৭ বা ২৭.৪ হয় এবং মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৭ হইতে নিম্নমিত হারে কমিয়া ১১.৮ হয় তাহা হইলে বিনা বিচারেই বলা যায়, দেশ জনসংখ্যার বৃদ্ধির ভাগিরা যাইতে বসিয়াছে।

আমার মনে হয়, পরিবার নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে এবং যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইতেছে তাহার তুলনায় কল আশারূপ কেন কোনও উল্লেখযোগ্য ফল হইতেছে না। আর মৃত্যুহারের সম্পর্কে বলা যায় যে, গত যুদ্ধকালীন ভারতে অবস্থিত আমেরিকার সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই ম্যালেরিয়া প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোপ পায়; এই ম্যালেরিয়াকে “রাক্সসী” নামে অভিহিত করা হইত, কারণ কেবল ম্যালেরিয়া হইতে বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যা অবিতর্কিত ভারতে ৪০ লক্ষ বা ততোধিক ছিল। তাহার পর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বর্তমানে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে মৃত্যুর হারের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। ফলে এই হার হ্রাস পাইতে পাইতে প্রায় ইংলণ্ডের লোকের মৃত্যুহারের কাছে পৌঁছিয়াছে। আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে অল্প এই হার আরও নিম্নতবে পৌঁছিয়াছে।

অধিকসংখ্যায় লোক হত্যা করিবার যুক্তি কেহ দিবে না, কিন্তু পরিমিত ভাবে বাহাতে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহার আরও সূত্র এবং ফলদায়ক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আত্মনিমগ্না  
ঐপ্রভাত নিয়োগী

[ প্রবাসী, ১৩৪০ কার্তিক ৫ইতে পুনর্মুদ্রিত ]





## খাজুরাহো

শ্রীভূপেশচন্দ্র দাস

উত্তর ও মধ্যভারত ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা। আমাদের দলে রয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতায় জন চল্লিশেক—বাংলা দেশের অতি ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ বললেই চলে। একটি পুরো বগী আমাদের দখলে। এই বগীতেই আমাদের আহার, বিহার, স্নান ও শয়ন।

জরুলপুৰ পরিক্রমা সেবে আমরা বওনা হলাম খাজুরাহোর উদ্দেশ্যে। মানিকপুর জংশনে ট্রেন বদলীতে হ'ল। মানিকপুর ও ঝাঁসি মধ্যপথে, অনেকটা ঝাঁসি দিকেই পড়ে হরপালপুর ষ্টেশন। হরপালপুর থেকেই যেতে হয় বাসে করে খাজুরাহোতে। খাজুরাহো এখান থেকে ৬২ মাইল।

৮ই অক্টোবর ১৯৫৯। খুব ভোরে উঠেই খাজুরাহো বাজার ভোড়োড়োড় শুরু হয়ে গেল। উবেগে আনন্দে আমরা রাত তিনটে-সাত্বে তিনটেতেই উঠে পড়েছি। হাতমুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেবে জামাকাপড় পরে সবাই আমরা প্রস্তুত সাড়ে চারটের মধ্যেই। কিন্তু দেরী করে ফেললেন মহিয়ারা। তাঁরা পছন্দসই শাড়ীই খুঁজে পান না। এ জন্তেই বোধ হয় শাস্ত্রকারবা লিখেছেন—পরি নারী বিবর্জিতা। তাঁরাও বোধ কবি আমাদের মতই ভুগেছেন।

বা হোক, আমাদের বাস ছাড়ল ভোর পাঁচটা পনেরোয়। হরপালপুর থেকে খাজুরাহো রাস্তাটি অতি চমৎকার। দু'পাশে নিম ও আমগাছের সারি। পথের দৃশ্যাবলী নয়নাভিরাম। বেশ সুন্দর সিঁধে রাস্তাটি। খাজুরাহো গ্রামে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ল সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলো মন্দির। সমগ্র অঞ্চলটি সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

খাজুরাহোর প্রাচীন নাম হচ্ছে ধর্জুরবাটক বা ধর্জুরবাহ। ধর্জুরবাটক এক সময়ে ছিল মধ্যযুগের চন্দেলগণের রাজধানী। মনে হয় এই অঞ্চলে এককালে প্রচুর খেজুরগাছ ছিল বলেই এই নাম। আমরা কিন্তু একটাও খেজুরগাছ দেখতে পেলাম না। চন্দেলগণের রাজ্য ছিল জৈম্বন্তভূমিতে, অথুনা বুলন্দশহর। কয়েক শতাব্দী ধরে খাজুরাহো তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরসমূহের অন্যতম বলে বিবেচিত হ'ত। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর উল্লেখ করেছেন।

নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চন্দেলগণ মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। এঁরা ছিলেন রাজপুত বংশীয় হিন্দু রাজা। প্রথমে চন্দেল-রাজারা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। পরবর্তী যুগে শিবই তাঁদের প্রধান উপাস্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই খাজুরাহোতে বিষ্ণু ও শিব

উভয়েরই মন্দির রয়েছে। তবে শিবমন্দিরের সংখ্যাই বেশী। আর রয়েছে জৈন মন্দির। খাজুরাহোর মন্দিরগুলো ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। যতদূর জানা যায়, এখানে সবচেয়ে পঁচাল্লীট মন্দির তৈরী হয়েছিল। এখন মাত্র কুড়িটি টিকে আছে মহাকালকে ফাকি দিয়ে।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মন্দিরশিল্পের স্তম্ভবন্ধ নমুনা হিসাবে এরা অদ্বিতীয়। প্রতিটি মন্দির শুটক ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রতি মন্দিরেই চারটি করে ক্রমোন্নত স্তম্বক বা অংশ। সকলের পেছনে রয়েছে সর্বোচ্চ শিখরটি। দেবে মনে হয় এভাবেষ্টের পালদেশ জুড়ে অবস্থান করছে কয়েকটি ক্রমোচ্চ শিখর। সর্বোচ্চ শিখরের তলায়ই রয়েছে বিগ্ৰহমূর্তি বা লিঙ্গ। এদিক থেকে উড়িয়ার মন্দিরের সঙ্গে এদের কিছুটা মিল রয়েছে। উড়িয়ার মন্দিরগুলোতেও রয়েছে চারটি অংশ—মূলমন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। কিন্তু এই চারটি অংশ যেন পৃথক পৃথক, খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর মত ঘননিবদ্ধ নয়। উড়িয়ার মন্দিরের মত এদেরও শিখরে রয়েছে আমলক। তবে উড়িয়ার মন্দিরে আমলক যে প্রাধাত্য পেয়েছে এখানে সে প্রাধাত্য অনুপস্থিত। শিখরের গায়ে ছোট-বড় বহু শিখর সংযোজনায় ব্যাপারে খাজুরাহোর মন্দিরের সঙ্গে গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের কিছুটা মিল খুঁজে পেলাম। যদিও অলংকরণ বৈচিত্র্যের ব্যাপারে শেখোক্ত মন্দিরটি অনেকটা শিহিরে আছে।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলো আরেকটা বিষয়ে উড়িয়ার মন্দির-গুলোর সমপোন্ধীয়। সেটা হচ্ছে মন্দিরগায়ে বহু বিচিত্র অলংকরণের সঙ্গে নবমিথুন বা বহুকাম মূর্তির অবস্থিতি। তবে ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দিরে এরা যে বিপুল পরিমাণে রয়েছে এখানে সেরূপ সংখ্যাধিকা নেই। তবে বা আছে তাও নেহাৎ কম নয়। শিল্পশ্রুতি হিসাবে এগুলো অতুলনীয়। মৈথুনের বিভিন্ন ভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে ভাস্কর্যের অলঙ্কৃতিতে। বাস্তবায়নের কামশাস্ত্রের বিশেষ কয়েকটি অধ্যায় উৎকর্ষ রয়েছে বিচিত্র ছন্দ, বিচিত্র সৌন্দর্য্যে। কেন যে এই ধরনের কল্পিত (?) মূর্তি দেবমন্দিরগাত্র অঙ্কিত করছে তার সঠিক তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কেউ বলেন, নয়নারীরা এই মৈথুনমূর্তি হচ্ছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদের প্রতীক। কেউ মনে করেন, বজ্রভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে এদের সৃষ্টি। কারও মতে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী জীবনের অস্তিত্ব বিকের চিত্রের মত এগুলোকেও নিষাবণ্ড সত্যের স্বীকৃতিতে

পাষণপাত্রে রূপায়িত করেছেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন, দেবদর্শনে আগত দর্শকের চিত্তে যদি এই আপাত-অঙ্গীল মূর্তিগুলো কোন বেথাপাত করতে না পারে তবেই তিনি বাইরের এই কাম-ক্রোধাদি বড়িপুর আক্রমণপাশ কাটিয়ে ভেতরে বিগ্রহমূর্তি দেখার সার্থক অধিকারী। নানা জনে বলে নানা কথা। কিন্তু আমি বলি এরা শিল্পেরই অঙ্গ, জীবনের সহজ সত্যের সঘল প্রকাশ। বিন্দুমাত্র অঙ্গীলতা নেই এতে। অঙ্গীল ভাবলেই অঙ্গীল। উল্লস শিশুর নগ্নতা কি অঙ্গীল? তা কি সহজ সৌন্দর্যের পরিণামক নয়?

মন্দির পরিক্রমার পথে প্রথমেই পড়ল বরাহমন্দির। এখানে রয়েছে সুন্দর স্তম্ভস্থ একটি বরাহমূর্তি। ইনি সামান্য বরাহ নন, বরাহ-অবতার ভগবান যিষ্ণু। স্থবিরাট এই বরাহমূর্তির সর্বশরীর জুড়ে বহু দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি উৎকীর্ণ। কদম্বা একটি শূর্য্যোবের মূর্তি যে এত সুন্দর ও মহিমময় হতে পারে তা এ মূর্তিটি না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বরাহের দশনশিখরে রয়েছে কে একজনর ভগ্ন মূর্তি। শুধু পা ছুটি রয়েছে অভয়। মনে হ'ল এ হচ্ছে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যাক্ষিপুত্র বড় ভাই। বরাহরূপী ভগবান হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। কিংবা এও হতে পারে ভগ্ন মূর্তিটি হচ্ছে পৃথিবীর। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের সেই স্লোকটি মনে পড়ল—

বসন্তি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।

শশিনি কলকললে নিমগ্না।

কেশব গুহ্য শূকররূপ ভয় ভগদীশ তব ॥

বরাহমন্দিরের সামনেই লক্ষ্মণ ও মতঙ্গেশ্বরের মন্দির। খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণ মন্দিরের চার কোণে চারটি নাতিবৃহৎ শিখর মন্দির রয়েছে। এগুলো মন্দিরের সুউচ্চ ভিত্তির উপরেই চারটি কোণে স্থাপিত হয়ে মন্দিরের শোভা বর্ধন করেছে। খাজুরাহোর সব মন্দিরই সুন্দর। তবে তাদের মধ্যে যেগুলো সৌন্দর্য্যের নিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ মন্দির তাদের অন্ততম। অথরূপ বা ততদিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট মন্দির হচ্ছে কদম্বা-মহাদেবের মন্দির, বিশ্বনাথের মন্দির, পার্শ্বনাথের মন্দির ইত্যাদি।

চন্দ্রেন্নবাজ বশোবর্ষণ (১৩০ খ্রীষ্টাব্দ) এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। তাঁর অপরা নাম লক্ষ্মণ বর্ষণ থেকেই এই মন্দিরের নাম হয় লক্ষ্মণ মন্দির। নাম যাই হোক আসলে এটি একটি বিষ্ণু মন্দির। বিভিন্ন অলঙ্কারসৌন্দর্য্যে ও স্তম্ভ সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মণমন্দির অভুলনীয়। সমগ্র মন্দিরের ভেতরে-বাইরে কঠিন পাথরের গায়ে কত যে কারুকার্য, প্রাণহীন পাষণকে জীবন্ত করে তোলায় কি কঠিন প্রয়াস! শিল্পীরা কি অলোকসামান্য নৈপুণ্যই না প্রকাশিত হয়েছে শুধু শুধু বিস্তৃত এই সু-উৎকীর্ণ পাষণনিচয়ে। এখানে দেখতে পেলাম যুবুধারিণী সেই বিখ্যাত নারিকার মূর্তিটি। মন্দিরেক্ষণায় সমগ্র মুখমণ্ডল এক সুশ্রুতি অথচ সুগঠিত ভাবের বাজনা। আয়নার নিজের মুগ্ধকৃতি দেখে কি অপূর্ণ ভাবাবেশ। তায় সমগ্র শরীরে স্বাচ্ছন্দ্য লাবণ্যের পেলবতার কি অপরূপ সমাবেশ। মনে মনে

বললাম, ওগো অজ্ঞাতনামা নারিকার, তোমার দেহবল্লভীর হিল্লোল তোমার সৃষ্টির বহুশত বৎসর পরে আজও আমার শ্রবণে তুলছে কলকল্লোল উচ্চাসে আবেগে আনন্দে। মরি মরি! কি অনবচ্ছিন্ন তুমি ছন্দায়িত। তুমি কে, আর কে সেই শিল্পী কঠিন পাষণকে মৃদু করে যে তোমার অমৃতরূপ দিয়েছে, শাশ্বত করে বেগে দিয়েছে তোমার চিরসজীবতার পাষণবন্ধনে? তুমি কি তায় মানসী প্রিয়া? তুমি কি তার পাবণী কারা?

মন্দিরের বেদিকে তাকাই সেদিকেই দোখ পাবণীভূত সৌন্দর্য্যের নীরব আব্বান। কত বিচিত্র সুন্দর দেবদেবীমূর্তি, কত নয়নরমা পদ্মপলাশের সূচিক্রিত অলঙ্কৃতি। কত নরমিথুন, সর্প-মিথুন, সিংহশার্ঙ্গ ও শালভজিকার ছড়াছড়ি।

সৌন্দর্য্যামৃতভূতজনিত, ভাবাবেগের স্বাধিকালটা বোধ হয় একটু বেশীকণ ধরেই ছিল। তাই কিছুকণ পরে চেয়ে দেখি আমার অজ্ঞাত সঙ্গীরা অল্প মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, এ মন্দিরে শুধু আমিই পড়ে রয়েছি।

লক্ষ্মণ মন্দিরের দক্ষিণ পাশেই মতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। এ মন্দিরের বিশেষত্ব এর বিগ্রহলিঙ্গটি। ৮ ফুটেরও বেশী উঁচু এবং প্রায় ৪ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এই সুবিশাল লিঙ্গটি। এত বড় শিবলিঙ্গ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিবলিঙ্গই আমার এর আগে দেখা শিবলিঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল। মতঙ্গেশ্বর সে রেকর্ড ভঙ্গ করলেন। জয় মতঙ্গেশ্বরের!

মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে এখানকার মিউজিয়াম। মিউজিয়মটি দেখবার মত। অস্ত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রাণ, অভয় সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও প্যানেলে মিউজিয়মটি সমৃদ্ধ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারার শিল্পকর্মের মহৎ দৃষ্টান্ত রয়েছে এখানে। একটি গণেশমূর্তি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নৃত্যরত গণেশের সর্পাক্ষে নৃত্য হিল্লোল। ভূঁড়িটি এত স্বাভাবিক এবং সুন্দর যে, আমরা কেউই লঙ্ঘনবের সে স্রষ্টার স্মৃতি হাত বুলানোর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। গণেশের কাছে আমরা বেন তখনকার মত ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলাম।

মিউজিয়ামের কাছেই বিরাট এক দীঘি। এতে লোকে স্নানাদি করে ও পুণ্যফল অর্জন করে। আমরা এমনই পাবণি যে, পুণ্যফল নাগালের মধ্যে পেয়েও স্নান করি নি।

লক্ষ্মণ মন্দিরের কিছু পেছনে উত্তর দিকে খাজুরাহোর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—সুউচ্চ, সুবিস্তৃত, সু-অলঙ্কৃত কদম্বা-মহাদেবের মন্দির। এর উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশী। (উচ্চতা ১০১'২", দৈর্ঘ্য ১০২'৩" এবং প্রস্থ ৬৬'১০")। এর আকার ও আয়তনের সৌরম্য একে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেছে। মন্দিরের প্রবেশপথের দু'পাশে সৈনিকের সঙ্গে ক্রীড়ারত সিংহের মূর্তি। সিংহ অবলীলাক্রমে অনেকটা বেন হস্তচ্ছলে, সৈনিক-পুরুষের সঙ্গে ক্রীড়া করছে। মূর্তি দুটি কোঁড়হলোদীপক।

রেডোয়া থেকে বেরিয়ে আমরা বগুনা হলাম পূর্বপেশ্বরী  
 মন্দিরস্থলা দেখতে। সবাই গেলেন না, বৃদ্ধবৃদ্ধারা রয়ে গেলেন,  
 তরুণতরুণীয়াই আমরা গেলাম। প্রায়েষ পথ, হাঁটতেও হবে কম নয়,  
 তাই আমরা ঘেরেদের এগিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সম্ভবযাত্রক  
 দুদম্ব বজার বেধে পথপ্রম লাঘবেষ জন্ত যে বার ঠিক খালি করে  
 চটকী পল্ল বলতে বলতে পথ চলতে লাগলাম। উবাগ্রসররই ঠিক

বেশী, তবে তার গল্পগুলি আমেরিকান। অজ্ঞাতদের মধ্যে সুকুমার ও জানকী বেশ সহস্র গল্প পরিবেশন করছিল। এদের শুভো হচ্ছে দেখী। আমিও একটি বিলিতি চুটকী ছাড়লাম। আমাদের উৎকট হাসির হো হো শব্দে মেয়েরা বার বার পেছন ফিরে তাকাত্তিল। বোধ হয় ভাবছিল, এদের হ'ল কি? এদের হাসির লক্ষ্য কি আমরা?

পূর্বপেটী মন্দিরের মধ্যে আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দিরই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অনেক পরবর্তী কালে নিশ্চিত একটি সুন্দর জৈনমন্দির রয়েছে এখানে। এখানকার অধিকাংশ মন্দিরই হচ্ছে জৈনদের। এদের মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরই সর্বোত্তম। এখানে একটি সুবিরাট মূর্তি রয়েছে পার্শ্বনাথের। পার্শ্বনাথ মন্দিরের গয়ে যে বিচিত্র কারুকার্য রয়েছে তা অতুলনীয়। কত বিভিন্ন শৃংখলন ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা রমণীমূর্তি রয়েছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। পত্রলিখনরতা, অলঙ্করকাগ অঙ্কনকারিণী, পদতলবিদ্ধ কণ্টক-উগ্রোচননিরতা, প্রসাধন বিলাসিনী, বৃক্ষশাখা-ধারিণী, (শালভঙ্গিকা)—কত নীলাদিত ভঙ্গিতে এরা উৎকীর্ণ। এতৎসহ রয়েছে তত্ত্ববিধ অলঙ্করণ।

পার্শ্বনাথ মন্দিরের কাছেই আদিনাথের মন্দির। এটি ছোট কিন্তু অলঙ্করণের সূক্ষ্মতার অনবদ্য। এর আশে-পাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। মন্দির প্রাচীরে যে খাজুরাঠো এক সময়ে স্তম্ভমুদ্র ছিল তা বর্তমানের মন্দিরগুলো এবং বিধ্বস্ত মন্দিরের ভিত্তিসমূহের অবস্থান থেকেই নির্ণয় করা যায়।

মন্দিরগুলো বেশ নির্জন, সংস্কারের অভাবে মন্দির-প্রাঙ্গণের কোণায় কোণায় এখানে-সেখানে ছোট ছোট গাছপালা গভিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ফুলের গাছও রয়েছে বেশ কিছু। সব ফুলের নাম জানি না। কে যেন আমার হাতে এনে দিল কিছু সাদা ফুল। শুঁকে দেখলাম বেশ সুগন্ধ। চামেলী। এত বড় চামেলী এদিকে জগায়, চামেলীর প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি হিন্দী কহাবত বা প্রবাদ—‘ছুচুন্দরকা শিবপদ চামেলীকা তেল।’ অর্থাৎ বাদরের গলায় মুক্তা হার।

দুপুরের উত্তম্ন হোদ মাথায় নিয়ে বণন ফিরে এলাম স্থানীয়

ডাকবাংলোয় তখন ফিদের পেট চোঁ-চোঁ করছে, নাড়ীভূড়ীগুলো হুহু হয়ে বাবার জোগাড়। পশ্চিমের জলহাওয়াই এমন গুণ যে, খুব ফিদে পায়, বিশেষতঃ বাঙালীদের। তাড়াহুড়ে করে কোন বকমে স্নান সেরে নিয়ে ডাকবাংলোর বাগানে বসে গেলাম আমরা গোল হয়ে ডান হাতের কসবতে। এই ডাকবাংলোতেই আমাদের রান্নার জোগাড় করা হয়েছিল। মুখে দিয়ে দোঁধ, ওরে বাবা, থিচুড়ীতে কি ঝাল! চাটনী দাও, চাটনী দাও। পেটে কিছু ভোজ্য পদার্থ যা হোক করে ঢুকিয়ে ভিজে গামছা-টামছাগুলোকে জড়ো করে আমরা উপস্থিত হলাম আমাদের বিজর্ভ বাসখানি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। হরপালপুর স্টেশন থেকে আজ বিকেলেই আমরা রওনা হব গোয়ালিয়রের দিকে।

বাসে বসে বসে পথচিন্তা করা ছিলাম ‘কি দেখিলাম।’ ন’ শো থেকে এগারো শ’ বছরের প্রাচীন সব মন্দির আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাগর্ভী মানুষের কাছে এ এক পদম বিস্ময়। মধ্য যুগটুকু কুসংস্কারের যুগ বলা হয়ে থাকে প্রায়শঃ। কিন্তু এটুকু কি কুসংস্কারের মানুষের চিন্তাধারার নমুনা? জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পরচি ও অর্থ-সামর্থ্যে কতখানি সমৃদ্ধ হলে এই ধরনের রূপকল্পনা সম্ভব? একটা জাতি সভ্যতার কত-খানি সমৃদ্ধ ঋণে উঠলে তার মধ্যে এট ধরনের উচ্চ মননশীলতা ও মানসিকতা গড়ে ওঠে? জানি, এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না এবং চেষ্টাও করব না দিতে। শুধু প্রাণ ভরে দেখে গেলাম বহুগাত বহুব্রহ্মতঃ বহুব্রাহ্মণের মন্দির-শিল্পের আবহাওয়ায় নিদর্শন, মনের অনিচ্ছাঃ বেথে দিলাম এর উদ্ভূত সুন্দর চিত্রাবলী আর জ্ঞানিয়ে গেলাম আমার ‘স্বপ্নমণ্ডিত’ একটি প্রণাম—মেই সব অধ্যাত-অজ্ঞাত স্থপতি ও ভাস্করদের উদ্দেশ্যে, বাদের শিল্পীমানসের চরমোৎকর্ষতার প্রতীক হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে আছে খাজুরাঠোর এই অনবদ্য মন্দিরগুলো তাদের নয়নাভিরাম মহীরান মূর্তি নিয়ে।

[ এই নিবন্ধ রচনার ভারত সরকার বর্তুক প্রকাশিত একগানা গাইড বকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ]



## পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র মাসে পাড়াগাঁ সপ্তকে আমার মনে একটা আনন্দ ও ভবিষ্যৎ আশার ভাব জেগে উঠেছিল। উপরি উপরি হুবহু আমার প্রায় অকলে চাষ-আবাদে পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ বারিপাত একেবারেই হয় নাই। পুকুর-ডোবা সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; জ্ঞান-পান দুইই কষ্ট, বাসন মাজার জলও প্রায় কোনও জলাশয়ে ছিল না। হুবহু চাষের জমি প্রায় সব পুতিত পড়েছিল; মাঠে তৃণগাছটিও ছিল না। আমার অকলে দুই-চারিটি গুরুত্ব জলাশয় ছাড়া আর জলাশয় নাই। পুকুরের গভীর অংশে জল শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। ততী অনসংখ্যক যে কয়টি নলকূপ পাড়াগাঁয়ে চালু আছে, সেগুলি মাত্র ভরসা ছিল। কিন্তু এবার মনে খুব অশান্ত ভরসা হয়েছিল। আকাশের বৃষ্টি উপর দর সম্পূর্ণ নির্ভরতার আবশ্যক নাই। বৃষ্টি হটুকু হয়েছে, হয়েছে। দামোদর পরি-কল্পনার সেচ-খালের জল (যমুনাঙ্গী পরিকল্পনারও বটে) আমাদের মাঠের বেশী ভাগ চাষের জমিতে “উঠেছে” আমন ধানের আবাদ অতি চমৎকারভাবে হয়েছে। অনেক বছর এমন ভালভাবে ধানের চাষ, দামোদর অঞ্চলের চাষীরা করতে পারে নাই। এবার নিশ্চয় গরীবেরাও হুমুঠো ভাত খেতে পারে। ছয় মাস কাল যাবৎ কৃষি-শ্রমিকেরা বেঁচে আছে “টেই মিলফের” কাজ করে, দৈনিক মজুরী হিসাবে আড়াই সের গম তাদের দেয়গার। তাও কিন্তু সারা সপ্তাহকাল নয়, অসংখ্য কষ্টপাখী; তাই সন্তোষে গড়ে তিন-চার দিনের বেশী কাউকেও খাজ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এবার কৃষি-শ্রমিকেরা ধান রেয়ার কাজ পেয়েছে। এর পর নিড়ানো, কাটা, তোলা ও ঝাড়ার কাজ মিলবে। ভূমির মালিকেরা কম জমিরই হটক, আর বড় গোতদারই হটক সবাইই সুবিধা হবে। সেচের জল পাওয়া যাবে, খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি হইতে আলু, কপি প্রভৃতি আয়কর ফসলের চাষের জগা। এককথায় এই খাজানাবন্ধি পশ্চিম বাংলার অনেকখানি অঞ্চল; এবার সংকটের “পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা” রূপায়ণের কিছুটা মুফল ভোগ করবে।

কিন্তু সব আশা-ভরসা-আনন্দ নিখাল হয়ে গেল। হতভাগ্য পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী! মহাভারতে, দুর্যোধনের “হবিষে বিষাদের” কথা আছে। এখন আমাদেরও তাই হ’ল যে। প্রকৃতির এক কল্পমুষ্টি। একি প্রচণ্ড বষণ! দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার একি সর্বনাশা রূপ! ‘উপরে ঝরছে বারি বরষা, গুরুগুরু দেয়া ডাকে’, “বেগে খেয়ে আসে ছেড়ে দেওয়া জল, কাটাখাল বুকে বুকে।” জানি না আমাদের শহরবাসীরা এ প্রচণ্ড প্লাবনের ধ্বংসলীলা অস্বপ্নমান করতে পেয়েছেন কি না। খবরের

কাগজে বজার ও ক্ষয়ক্ষতির অনেক বিবরণ এবং আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ইহা হতে অনেকে কিছুটা অস্বপ্নমান করতে পারবেন। কিন্তু সে অস্বপ্নমানের পরিধি কতটুকুই বা!

আমার নিজ প্রায় আটপুত্র এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কথাই একটু বলি। এই প্রায়ের অধিবাসীদের আমন ধান চাষের জমি প্রধানতঃ যে মাঠে রয়েছে, সেই কয়েকবর্গ মাইলব্যাপী “কংকড়ির মাঠে” আজ ধানের চিহ্নমাত্রও নাই। এইরকম শুধু একটি মাঠই নহে, এই অঞ্চলের বহু মাঠের ধানগাছ প্লাবনে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। গরীব লোকের অনেক মাটির ঘর ভূমিসাৎ হয়েছে, পুকুর-ডোবা “ভেঙে” গেছে, বাস্ত্যঘাট নষ্ট হয়েছে। সবক’র এই অকলে যে নতুন পাকারাজ্য নিৰ্মাণ করেছিলেন, সেগুলিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক বিভাগগুলির অধিকাংশ ঘরেরই দেওয়াল মাটির, ঐ সকল বিভাগসমূহের বেশীর ভাগই অসংখ্য অর্থ হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলটিতে যেন একটা “ওলট-পালট” হয়ে গেছে।

সরকার সাধামত যতটুকু করতে পারেন করছেন। নানা স্থানে “ত্রাণ-সমিতি” গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক দল “কোমর বেঁধে” লাগলেও বে-সরকারী সাহায্যের তেমন কোনও ব্যস্থা এ অঞ্চলে এখনও দেখা যাচ্ছে না। সরকার যে সাহায্য পাঠাচ্ছেন তাহাও সুস্থভাবে বন্টিত হয় না, এইরূপ অভিযোগও দুগুণ নহে।

এখন ধানকাটার কাজ চলছে। কৃষি-শ্রমিকেরা এখন কাজ মিলছে, তারা সপরিবারে উপবাসের ক্লেশ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু শীতের গীড়নও বড় কম নহে। ঘরের চাল শতক্ৰিয়, পরিণয় বস্ত্রই নাই; শীতবস্ত্রের কথা কল্পনা মাত্র। শীতে “জামুতামু কুশামুই” ভরসা। তারা এতে কতকটা অভ্যস্ত।

পাড়াগাঁয়ে আগেকার মত ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপ আর নাই। কিন্তু অল্প রোগ প্রধানতঃ, পেটের অস্বস্তির প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। ভেজালদ্রব্য ইহার একমাত্র কারণ না হলেও অল্পতম প্রধান কারণ বটে। পাড়াগাঁয়ে এখন অনেক জায়গায় সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক “পাশ করা ডাক্তার” চিকিৎসা ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন। শিকার বিভাগ হওয়ায়, সাধারণভাবে মানুষও স্বাস্থ্যরক্ষায় নিরমন্তলি জানছে, এবং ঐগুলি পালনে সচেষ্ট আছে, তবে অর্থের অভাব। বাহা হটক, এই সকল কারণে জনস্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল মনে হলেও উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টির খাওয়ার অভাবের প্রতিক্রিয়াও জনস্বাস্থ্যেরই মধ্যে বেশ প্রতিফলিত হচ্ছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে ইহা স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারে সরকার আশ্রয়ী, তবে সম্ভবগতিতে। তবে যে-সব শিক্ষা-পরিকল্পনা চালু করার চেষ্টা ও ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলির উপযুক্ততা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এজন্য আরও ধৈর্য, সময় ও পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। পল্লীঅঞ্চলবাসীদের বালক-বালিকা-দের জন্য ‘বিশেষ’ ধরনের শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত হওয়া সরকার। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করার সমস্যা এখনও ঠিক আগেকার মতই অসমীয়াসিদ্ধ হয়েছে। এ সম্বন্ধে সরকার নির্বিকার আছেন। শুধু আমাদের গ্রামাঞ্চলের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি নহে, বরদূর জাতি পশ্চিম বাংলার কোনও অঞ্চলেই এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নাই। অথচ, সরকার প্রায়জিক বেতনহাতির সংশোধন করে টা বৃদ্ধি করার বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। দেশের শিক্ষার মানের উন্নতি কি এই পথেই চলবে? গৃহ-নিষ্কাশ ও সার্ব-সংগ্রামাদির জন্য সরকার অর্থবরাদ করছেন, পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন, বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের উন্নতিবিধানের বন্দোবস্ত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীও অভাব নাই। অভাব মাত্র একটি—সমগ্র একটি মাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকার। অর্থাৎ “মুন-লেবু” সবই আছে—নাই কেবল ময়। এই শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করতে অক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফল নিম্নরূপ। এম-এ, এম, এস-সি, অথবা অনার্স প্রাপ্ত এজুয়েট ছাড়া আর কোনও শিক্ষকের নিযুক্তি সরকার অসম্মোদন করেন না, এবং ঐরূপ নির্দিষ্ট যোগ্যতাহীন শিক্ষক নিযুক্ত করা হলে (যেমন, পাশ কোর্সে উত্তীর্ণ এজুয়েট) তাঁদের বেতন বাবদ ‘এন্ট-ইন-এইড’ মঞ্জুর কয়েক না। সুতরাং নতুন শিক্ষক নিযুক্ত না করলে, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কাঁচা, পূর্বে যখন ঐ সকল বিদ্যালয় দশশ্রেণীর সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল, তখন যত জন শিক্ষকের নিযুক্তি সরকার মঞ্জুর করেছিলেন, কেবল সেই সংখ্যক শিক্ষক ঘাটাই, চালিয়ে যেতে হচ্ছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে, ক্ষেত্র বিশেষে এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যক “কোর্সের” অধ্যাপনার অসম্মতি দেওয়া হয়েছে। তাহার ফলে, নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী, “ইন্সটিটিউট অর্থার্স এন্ডিক” বিষয়গুলি অধ্যাপনার জন্য বিভিন্ন “এপে”, অর্থাৎ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মনে করুন, কোনও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে তিনটি ‘কোর্স’ পড়বার অসম্মতি দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ঐ তিনটি শ্রেণীকে নবমি এপে পড়াতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়টির, দশশ্রেণী বিদ্যালয় থাকাকালীন, ঐ দুইটি শ্রেণীর জন্য কোনক্রমেই তিনজনের বেশী শিক্ষক নিয়োগের অসম্মোদন নাই। এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন, তিনজন লোকে কি করিয়া একসঙ্গে নবমি শ্রেণীতে অধ্যাপনা কয়েক? কিন্তু জেনে বিস্মিত হবেন, খুব বেশী সংখ্যক বিদ্যালয়েই এই অবস্থা। আমি একটি তিন কোর্স শিক্ষাদানের অসম্মতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পরিচালনা, এবং বহুদূরী উচ্চতর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিবিধ আপিস-সংস্কার ও অভ্যর্থন বহুপ্রকারের কর্তব্যসম্পাদনের পরে সপ্তাহে “ত্রিশ শিরিষাড” ক্লাস লইতে হয়, ইহা দেখেছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এইরূপ অবস্থা চলছে।

সরকার, যতদিন না উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণকে আকর্ষণীয় বেতনহার দেন, ততদিন এই অবস্থার কোনও উন্নতি সম্ভাবনা আছে কি? শহরগুলিতে, গৃহশিক্ষকতা এবং কোচিং ক্লাস পরিচালনা দ্বারা অতিরিক্ত অর্থোপার্জন পথ রয়েছে। সেজন্য, ঐ সব অঞ্চল নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে—যেখানে শহরবাসের সুখসুবিধাও নাই, বেতনছাড়া, অতিরিক্ত বোজগারের কোন পথও নাই, সেখানে, কি হতে পারে?

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ১৯৬০সনের মার্চ মাসে প্রথম গৃহীত হবে। এই পরীক্ষায় পল্লী অঞ্চলের এমন কি শহর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা কিরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, তাহা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, এবং অভিভাবকগণ, কেউ অনুমান করতে পারছেন না। ছাত্র ছাত্রীদেরও আগামী পরীক্ষায় নিজেদের কৃতিত্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাই। আমাদের কথা কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে পাড়াগাঁয়ের লোকদের ব্যাপক বেকারত্ব ও তাহার ফলস্বরূপ ভয়াবহ দারিদ্র্য। এখানকার যত সামান্য পণ্যাদ্রুত, তাদের অধিকাংশকেই বৎসরের অন্ততঃ অর্ধেককাল বেকার থাকতে হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য, দেশ-হিঁতবী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, ইংরেজ-শাসকের আমল থেকেই, পাড়াগাঁগুলি অবহেলিত, বর্জ্যমান, ইহার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়েছে—এরূপ বলা যায় না। তাহা না হইলে, পাড়াগাঁয়ের অর্থনৈতিক দুর্দশার এতদিন কিছুটা প্রতিকার নিশ্চয়ই হ'ত।

কথা যাঁতে পাবে, কি ভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব? ইহার উত্তর অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ ও দেশহিতৈষী বিজ্ঞব্যক্তিগণ অনেক বারই দিয়েছেন। দেহের সমস্ত বস্তকে শুধু মস্তিষ্কে স্থান না দিয়ে সারা দেহে সঞ্চারিত করাই যেমন কর্তব্য দেশেও শিল্পোৎপাদন সংস্থাগুলির মধ্যে যেগুলি ক্ষুদ্রতর এবং আধুনিক কুটিরশিল্প হিসাবে পল্লী অঞ্চলে গড়ে তোলার যোগ্য, সেগুলিকে পাড়াগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেও এই বেকারত্বের ও অর্থনৈতিক দুর্দশার অবসান বা লাঘব ঘটতে পারে। অবশ্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি এখনও প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। যন্ত্রশিল্পের যুগে হস্তশিল্প প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে, এইরূপ হতে বাধ্য। ফলে গ্রামের হস্তশিল্পী সম্প্রদায় (artisan class) বেকার হচ্ছে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে সমগ্র সমাজ-সমষ্টির উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থার আশ্রয় প্রয়োজন।

তবে একথাও স্বীকার্য যে, শুধু সরকার সবকিছু করতে পারেন

না। পশ্চিমবঙ্গে অল্প রাজ্য থেকে বহু অশ্বশীল লোক এসে শুধু যে জীবিকা অর্জন করছে, তাহা নহে, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একটা আমার দেথা উদাহরণ দিই। ৫৬ বৎসর আগে, এক বিহারী দম্পতি উপাধ্বজনের তালিদে আটপুৰ হাইকুলের এক শিক্ষকের বাটিতে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে আসে। কিছুদিন পরে আটপুৰ রেল ষ্টেশনের তদানীন্তন ষ্টেশন মাস্টারকে অহুৰোধ করে, 'যে সব বড় বড় মুদীখানার মালিক রেলপথে আপনার ষ্টেশন দিয়ে মাল আমদানি করে, আপনি দয়া করে বলে দিন, তাঁহারা আমাকে অল্প পরিমাণে "মালপত্র" যেন ধারে দেন। আমি আপনার ষ্টেশনের পাশেই একটি মুদীখানা খুলব। বিক্রয়ের

টাকা থেকে একবারের ধার শোধ করে আবার 'ধারে' মাল লইব।"

ষ্টেশন মাস্টার খুব দয়াশীল ছিলেন, রাজী হলেন। সেই দম্পতি এখন এখানে বাড়ী কিনেছে, চাষের জমি কিনেছে, আরও তিন, কারবারটির দাম এখন কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু কই? আমার গ্রামের কেহ ত এ রকম উদাহরণ দেখাতে পারে নি।

শেষ কথা, পাড়াগাঁয়ের দিকে রাষ্ট্র ও সমাজের সবিশেষ দৃষ্টি-পাতের অত্যাশ্রয় প্রয়োজন হয়েছে। নতুবা, পল্লী অঞ্চলগুলি, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৭৫ জন লোক বাস করে, অবহেলিতই থেকে যাবে। ফলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হবেই হবে।

## তবু দেখ সে তোমার আছে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রভাত আকাশ 'পবে ওঠে শুকতারা,  
পথিকেরে এনে হয় দিনের কিনারা।  
ফুল ফোটে নিকুঞ্জ ছায়ায়,  
ভ্রমর গুঞ্জরি কিংব পাভায় পাভায়।  
এল ব্যর্থ তার যথু দিন,  
এ ফুল, ও ফুল তাই তার স্পর্শে হয় সে নবীন।  
উপরেতে চেয়ে থাকে "তারা" শিশিরে ভেজান আঁধি,  
মনে হয় এর চেয়ে অগতে সত্য আছে নাকি?  
পথিকের কণ্ঠ বেড়ি "তারা" যদি হেসে কথা বলে,  
কেড়ে নেয় মন তার আপনার মন-শতমলে,  
সে মুহূর্ত মিথ্যা কভু নয়?  
শোন তবে কহিব নিশ্চয়,—  
উজ্জ্বল কুসুম সনে, বরে যাওয়া পাণ্ডুর নাহি পরিচয়।  
যীরে যীরে ফুল পড়ে রাখে,  
বিস্মৃতি বেদীর 'পবে,  
আকাশের রং যায় টুটে,  
মিথ্যা হয় শুকতারা—যুছে যায়,—  
ক্রমে যায়,  
স্বর্গ তবে উঠে।

সেও মিথ্যা হয়।  
থর বৌড়ে পথিক হাঁকিয়া যায়,  
বর্মকান্ত প্রথর প্রকাশে,  
কেহ হাসে...কেহ ভালবাসে।  
দ্বিবদের হরিত্র সে আলো  
অজস্র আঘাতে রচে আঁধারের কালো।  
বেলা বয়ে যায়,  
অস্তিম গগনে শেষ রংয়ের ছটায়।  
থর থর বিষচরাচর,  
ডুবে গেল প্রদীপ্ত ভাস্কর।  
এখনি য' সত্য ছিল মিথ্যা হয়ে গেল সে এখনি,  
পথিকের পরিক্রমা সমুদ্রের আঁধার বজনী।

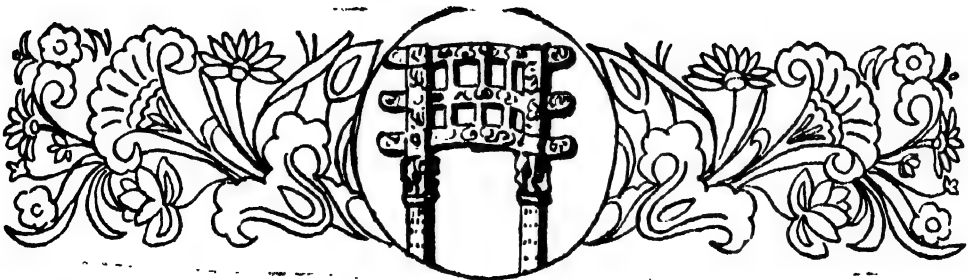
সন্ধ্যাতারা উঠিল আকাশে,  
ধীরে বহে দখিনা পবন সুহৃদ মলয় সুবাসে।  
"তারা" বলে হে পথিক তুমি মোর কবি,  
আমার মালকে আঁকা তোমারই সে ছবি।  
তোমার স্বাক্ষর পথ সন্ধ্যাতারা জানে,



যতটুকু আছে আলো,—ধস্ত হব সেইটুকু দানে ।  
মনে হয় এমন আশ্বাস যাব,  
তারে হায় অবিখ্যাস করিব কেমনে,  
মনে হয় অনন্তের রূপহার,  
আছে এর সত্য সমর্পণে ।

এও সত্য নহে,  
পথিক ফুকারি কহে,  
কোথা তুমি ওগো “তারা”  
উপরে জমেছে মেঘ,—অন্ধকারে করে দিশেহারা ।  
হঠাৎ চীৎকার,  
বাস্তু বহে ছনিবার,  
মেঘে মেঘে চুল হেঁড়াছিঁড়ি,  
এ উহার কণ্ঠ যেন ধরেছে আঁকড়ি,  
“তারার” ভরা আকাশেবে ছিন্নভিন্ন করে দেয় বুকি,  
দস্ত কড়মড়ি এ উহাবে বজ্রমুষ্টি মারে সমতালে যুকি ।  
বর্দমে ঢেকেছে পথ,  
ভেঙ্গে গেছে যাত্রাবধ,  
তবু যেতে হবে রাত্রির আহবে,  
ছিন্নবস্ত্র সিন্তবেহ, সাঁপটিয়া ছুই হাতে,  
পাদক্ষেপে, নিমজ্জিত প্রতি পদধানি,  
টানি টানে,  
চলিয়াছে সে প্রলয় রাতে ।

চারিদিকে গোপন নাগিনীদল করে কিলবিল,  
ডানা ভাঙ্গা শঙ্খচিল,  
দুব বনে ঝরুণ কাঁদুনী গায়,  
হায়,—  
এ কি আর্তনাদ...এ কি সারা সৃষ্টির ক্রন্দন ?  
কোথা সত্য.. কোথা আলো ..জন্মের শাস্ত স্পন্দন ।  
হায় রে দুরাশা,  
কেন এই পথচক্রে নিত্য যাওয়া আসা ।  
মিথ্যার বেসাতি নিয়ে নিত্য বেচ'কেনা,  
লাভক্ষতি মানদণ্ড যতটুকু চেনা ।  
সাংখ্যাতিক মিথ্যার বিচার,  
আত্মবাতী আশ্রয় অনাচার ।  
অজস্র বেদন লাগি নিত্য আয়োজন,  
তাই এ ক্রন্দন,  
পলে পলে তাই জমে অশ্রুর ভাণ্ডার,  
অসহায় রিক্তপাত্র পথের সন্ডার ।  
কে যেন সহসা, মেঘেবে আড়াল করি,  
অগুর আকাশে, হস্ত ধরি—  
প্রাণের প্রদীপধানি,—কহে পথহারা,  
স্বপনের সত্য নিয়ে,  
কারে তুমি চিনিবে কি দিগে ।  
কত “তারার” জলে নতে,—তারও মাঝে আছে প্রবতারা ।  
কালের বাক্যর বেগ তুচ্ছ তার কাছে,  
আজি কেহ নাই,—তবু দেখ সে তোমার আছে ।



## শঙ্করমতে “সাধন” : কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৩

পূর্ব চই সংখ্যায় শঙ্করমতে যে, সকাম-কর্ম মোক্ষের সাধন নয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পুণ্যকর্ম ও শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম মোক্ষসাধন হতে পারে কি না সে বিষয়ে মতভেদ হতে পারে।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, সম্পূর্ণ নিকাম ভাবে এবং জ্ঞান-সহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম বিষ, দ্বিধি প্রভৃতি বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন ফল বা মোক্ষও উৎপাদন করে। অর্থাৎ বিষের নিজস্ব ফল হ'ল সুহৃদসাধন করা। কিন্তু এই বিষই পুনরায় বিশেষ বিশেষ জীবের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে মন্ত্র-সহযোগে বিদ্যা প্রভাবে মৃত-সঞ্জীবনী সুখায় পরিণত হয়। একই ভাবে, অল্প দ্বিধিও সাধারণ কর্ম হ'ল শ্লেষ্মাদি বৃদ্ধি করে শরীরের অনিষ্ট সাধন করা। কিন্তু এক্ষেত্রেও শরীর প্রভৃতি জীবের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে সেই একই দ্বিধি শরীরের বিশেষ পুষ্টি-সাধকও হয়। একই ভাবে, পুণ্যকর্মও সংসারের কারণ হলেও নিকামতা ও জ্ঞানের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে মোক্ষেরও কারণ হয়।

শঙ্কর এই মতবাদ সজোরে খণ্ডন করে বলছেন যে, পুণ্যকর্ম সকাম ভাবেই হোক বা নিকাম ভাবেই হোক, জ্ঞান-বিহীন ভাবেই হোক বা জ্ঞানসহযোগেই হোক—যে কোন প্রকারেই হোক—কোন প্রকারেই কোনদিনই মোক্ষসাধক হতে পারে না। তার কারণ ত এক কথাতেই বলা যায়—মোক্ষ কোন কর্মেরই ফল নয়।

“অনারভাভাৎ মোক্ষস্ত।” (৩-৩ ভূমিকা)

বন্ধন-নাশই হ'ল মোক্ষ। বন্ধন হ'ল অবিজ্ঞা। সেজন্য অবিজ্ঞা-নাশই হ'ল মোক্ষ। কিন্তু—

“অবিজ্ঞানাস্ত ন কর্মণা নাশ উপপদ্যতে।”

(৩-৪—ভূমিকা)

কর্মদ্বারা অবিজ্ঞার বিনাশ হতে পারে না। একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই অবিজ্ঞার, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের ধ্বংস সম্ভবপর। বস্তুতঃ, পূর্বেই যা বারংবার বলা হয়েছে, উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি, সংপ্রতি—ফলভেদে চার প্রকারের। মোক্ষ এর একটরও অন্তর্ভুক্ত নয়।

এক্ষেত্রে, পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, উপরে যা বলা হ'ল, তা ত কেবল জ্ঞানবহিত কর্মেরই

স্বভাব। কিন্তু বিদ্যা-সংযুক্ত নিকাম কর্মের সম্পূর্ণ অজ্ঞ স্বভাব। কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, বিষ, দ্বিধি প্রভৃতি বস্তুর সাধারণতঃ যা সামর্থ্য আছে বিদ্যা, মন্ত্র, শরীর প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তা অজ্ঞ প্রকার হয়ে গিয়ে বিপরীত প্রকারের ফলপ্রসূ হয়। নিকাম কর্মের ক্ষেত্রেও তা অনায়াসে তাই হতে পারে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন :

“ন প্রমাণাভাবাৎ” (৩-৩—ভূমিকা)

এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নেই। অর্থাৎ, সাধারণ কর্মের যে ফল, বা সংসার, তার অতিরিক্ত বিভিন্ন কোন ফল বা মোক্ষ, যে কর্মসৃষ্টি করতে পারে, সে বিষয়ে কোন প্রমাণই নেই।

পুনরায় আপত্তি উঠতে পারে যে, নিকাম কর্ম যদি সকাম কর্মেরই জ্ঞায় একই স্বভাবের এবং একই ফলোৎপাদক হয়, তা হলে শাস্ত্রে নিকাম কর্ম সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধিবিধান দেওয়া আছে কেন? শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মেরই এক-একটি বিশেষ বিশেষ ফল আছে। নতুবা সেই কর্মে লোকের প্ররুতি হবে কেন? সেজন্য “বিষজিৎ জ্ঞান্নাস্মাদে” যে কর্মের কোন বিশেষ ফলের উল্লেখ নেই, সেই কর্মের ফলরূপে গ্রহণ করা হয় স্বর্গকে। এক্ষেত্রে অবশ্য নিকাম, নিত্যকর্মের স্বতন্ত্র কোন ফলের উল্লেখ না থাকলেও স্বর্গকে তার ফলরূপে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু স্বর্গ সকাম কর্মেরই ফল। সেজন্য, আর অজ্ঞ কোন ফলের সম্ভাবনা না থাকায়, “পারিতোষ্য জ্ঞান্নাস্মাদে” পরিমেয়ে, মোক্ষকেই নিকাম, নিত্যকর্মের ফলরূপে গ্রহণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, ফল না থাকলে নিত্যকর্মে লোকের প্ররুতি হবে না আশঙ্ক্য যদি “বিষজিৎ জ্ঞান্নাস্মাদে” আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত ত সেই বিষজিৎ জ্ঞানেরই মতে চলতে হবে; অর্থাৎ, সেই জ্ঞান্নাস্মাদে স্বর্গকেই নিত্যকর্মের ফলস্বরূপ বলে গ্রহণ করতে হবে—ইহাৎ মোক্ষকেই বা কেন এরূপ ফলরূপে গ্রহণ করা হবে?

পুনরায় পূর্বপক্ষবাদী বলতে পারেন যে, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নয়, সেজন্যই “বিষজিৎ জ্ঞান্নাস্মাদে” এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এবং সেজন্যই মোক্ষের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছেঃ।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী একথা

বলতেই পাবেন না ; যেহেতু পূর্বেই তিনিই স্বয়ং বলেছেন যে, বিষ, দধি প্রভৃতির দ্বারা নিকাম, নিত্যকর্ম অস্ত্র ফলরূপ মোক্ষ উৎপাদন কবে। সেক্ষেত্রে মোক্ষকে নিত্যকর্মের বিশেষ ফলরূপে ত স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ, মোক্ষ নিত্যকর্মের “ফল”, অথচ কর্মের “কার্য” বা ক্রিয়া জ্ঞান নয়—এরূপ উক্তি স্ববিবোধ-দোষদুষ্ট। “ফল” ও “কার্য”,—এই দুটি শব্দ ত সমার্থক। সেক্ষেত্রে :

“অফলঞ্চ মোক্ষঃ, নিত্যাশ্চ কর্মভিঃ ক্রিয়তে ; নিত্যানাং কর্মণাং ফলং ন কার্যমিতি চ—এষোহর্থো বিপ্রতিবিদ্ধোহি ভিধীয়তে, যথান্নিঃ শীতঃ ইতি।”

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩ ৩)

মোক্ষ কোন কর্মের ফল নয়, অথচ নিত্যকর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ; মোক্ষ নিত্যকর্মের “ফল”, কিন্তু নিত্যকর্মের “কার্য” নয় বা নিত্যকর্ম থেকে উৎপন্ন হয়—এরূপ উক্তি, “অগ্নিশীতল”—এরূপ উক্তির দ্বায়ই স্ববিবোধ-দোষদুষ্ট।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, জ্ঞানদ্বারা মোক্ষের উৎপত্তি না হলেও, সর্বদাই বল হয়ে থাকে যে, মোক্ষ জ্ঞানেই “ফল”। একই ভাবে, নিত্য-কর্ম দ্বারা মোক্ষের উৎপত্তি না হলেও, অন্যদ্বারা মোক্ষকে নিত্যকর্মের “ফল” বলা যেতে পারে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলেছেন যে, “জ্ঞান” ও “নিত্যকর্মের” মধ্যে প্রভেদ অনেক। জ্ঞান মোক্ষাবরক অজ্ঞানের বিনাশ করে মোক্ষ বা আত্মার নিত্যমুক্তস্বরূপটি প্রকাশিত করে, এবং সেই বিশেষ অর্থেই মোক্ষকে জ্ঞানের “ফল” বলা হয় (পৃঃ ২৩০, ২৩১), যদিও প্রকৃতপক্ষে নিত্যসিদ্ধ মোক্ষ কোন কিছুই “ফল” বা “কার্য” নয়। কিন্তু নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে তাও ত সম্ভবপর নয়, যেহেতু এমনকি, নিত্যকর্মও অবিদ্যা বিনাশ করতে পারে না, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, কোন অর্থেই ত মোক্ষকে নিত্য-কর্মের “ফল”রূপে গ্রহণ করা যায় না।

“অজ্ঞান-নিবর্তকত্বাৎ জ্ঞানস্ত।...ন তু কর্মণা নিবর্তসি-তুব্যমজ্ঞানম্।”

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

জ্ঞানের দ্বারা কর্ম যে কেবল অজ্ঞানেরই ধ্বংস করে, মোক্ষকে “ফল”রূপে সৃষ্টি করে না—একথাও বলা যায় না। কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে :

“কর্ম তু নাজ্ঞানেন বিরুদ্ধ্যতে। তেন জ্ঞানবিলক্ষণং কর্ম।”

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

জ্ঞান যা এক্ষেত্রে বা অজ্ঞানের ক্ষেত্রে করতে পারে, কর্ম তা কখনই পারে না, তার কারণ হ’ল এই যে, জ্ঞান ও কর্ম

পরস্পরবিরুদ্ধ। অর্থাৎ, জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বভাবতঃই পরস্পর-বিরুদ্ধ, কর্ম ও অজ্ঞান তা নয়। জ্ঞান আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি, অজ্ঞান আত্মস্বরূপের অনভিব্যক্তি—সেক্ষেত্রেই জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী, সেক্ষেত্রেই জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। এমনকি, অজ্ঞানকে জ্ঞানাতাব, সংশয়-জ্ঞান বা বিপরীত-জ্ঞান প্রভৃতি অর্থেও গ্রহণ করলে একমাত্র জ্ঞানই সেই সর্বের বিনাশ সাধন করতে পারে—কর্ম কোন-দিনও নয়।

পুনরায়, যদি বলা হয় যে, অন্ত্যস্ত কর্মের অজ্ঞান-নিবৃত্তি করবার শক্তি থাকলেও, নিত্যকর্মের তা আছে—তার উত্তর হ’ল এই যে :

“জ্ঞানেনাজ্ঞান-নিবৃত্তৌ গম্যমানামদৃষ্টে নিবৃত্তি-কল্পনামু-পত্তেঃ।”

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩ ৩)

জ্ঞান দ্বারা যে অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, তা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। সেক্ষেত্রে, নিত্যকর্ম দ্বারাও যে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, তা যখন কোনদিনও দৃষ্ট হয় নি, তখন অকারণে কল্পনা করা যায় কি কবে? বস্তুতঃ, দৃষ্ট ফল বর্জন করে অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা চলে না। যেমন : “ত্রীহীন অবদৃষ্টি” এই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মুখল প্রহাবের দৃষ্ট ফল তুষ-নিবৃত্তি বলে তার আর কোন অদৃষ্ট ফল কল্পনার প্রয়োজনই ত নেই। একই ভাবে এক্ষেত্রেও জ্ঞানের দৃষ্ট ফল বর্জন করে, কর্মের অদৃষ্ট ফলের কল্পনা অনুচিত। প্রকৃতকল্পে যা বারংবার বলা হচ্ছে, কর্ম অজ্ঞানের বিরোধী নয় বলে, অজ্ঞানের বিনাশকও হতে পারে না। এক্ষেত্রে এই মাত্র বলা চলে যে, সাধারণ সাকাম কর্ম-মাত্রেরই জ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু যে সকল নিকাম কর্ম জ্ঞান-বিরোধী নয়, তা যেবা দি লোকপ্রাপ্তি বা ক্রমমুক্তির হেতু হয়।

পুনরায়, নিত্যকর্মের যদি ফল-কল্পনা করতেই হয়, তবে :

“যচ্চ কর্মণাং ফলমবিরুদ্ধম্ তৎকল্পাতামিতি।”

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

যে ফল কর্মের সঙ্গে অবিরুদ্ধ, কেবলমাত্র সেই ফলই ত কল্পনা করা উচিত ; যে ফল বিরুদ্ধ, তা কল্পনা করা চলে কি করে? বস্তুতঃ, কর্ম-ফলের বিধানদান বা কল্পনা করা হয় লোকের কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্তই, যেহেতু ফলের বিষয় না জানলে স্বভাবতঃই তাদের সেই সেই বিশেষ কর্মে মতি ও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এরূপ ফল যদি বলা হয় বা কর্মেরই বিরোধী, তা হলে ত বরং ফল বলার চেয়ে না বলাই ভাল। এক্ষেত্রে অজ্ঞান-নিবৃত্তি বা মোক্ষরূপ ফলটি সম্পূর্ণ-

রূপেই কর্ম-বিবোধী, যেহেতু মোক্ষের পথ, যা পূর্বেই বারংবার বলা হয়েছে, সকল কর্ম ত্যাগ করা হয়।

পুনরায়, পূর্বে “পারিশেষ্য-ত্য়ায়েঃ” উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, নিত্য-কর্মের ফল “বিশ্বক্বেদে ত্য়ায়ানুসারে” স্বর্গ বলে গ্রহণ করা যায় না, এবং অত্ৰ কোন ফলেরও বিধান এক্ষেত্রে নেই,—সেজন্তু পরিশেষ ফল একমাত্র মোক্ষই নিত্যকর্মের ফল। এই মতবাদও যুক্তিযুক্ত নয়, যেহেতু “পারিশেষ্য-ত্য়ায়” এক্ষেত্রে প্রযোজ্যই নয়। কারণ, যেখানে একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক ফল জানা আছে, সেক্ষেত্রেই কেবল স্থির বলা চলে যে, অত্ৰ সবগুলি ফল এক্ষেত্রে হতে পারে না বলে, পরিশেষে অবশিষ্ট ফলটিকেই সেই কর্মের ফলরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত আর অত্ৰ কোন উপায়ই নেই। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে সেকথা কোনক্রমেই বলা চলে না। তার কারণ হ’ল :

“কর্ম-ফল-ব্যক্তিনামানন্ত্যাং পারিশেষ্য-ত্য়ায়ানুপপত্তেঃ।”

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

কর্মকারী ব্যক্তির সংখ্যা অনন্ত, তাঁদের ইচ্ছা, শক্তি প্রভৃতিও অনন্ত, তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশকালাদিও অনন্ত, —সেজন্তু স্বভাবতঃই কর্মের ফলও অনন্ত। সেজন্তু সর্বত্র

ব্যতীত এরূপ অনন্ত ফল জ্ঞাত হওয়া অত্বে পক্ষেও অসম্ভব নিশ্চয়।

পুনরায় বলা হতে পারে যে, ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম ও কর্মফল অনন্ত হলেও, জাতিগত ভাবে তা নয়, এবং সেই দিক থেকে এই “পারিশেষ্য-ত্য়ায়টি” এক্ষেত্রেও অনায়াসে প্রযোজ্য হতে পারে; অর্থাৎ, “কর্মফলত্ব”রূপ জাতিসকল অসংখ্য কর্মের ক্ষেত্রেই সমান, যেমন “মানবত্ব”রূপ জাতিটি সকল অসংখ্য মানবের ক্ষেত্রেই সমান। সেজন্তু যখন এই কর্মফলত্ব নিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই হচ্ছে না, তখন অবশিষ্ট মোক্ষই এর ফল হতে বাধ্য। এই আপত্তির উত্তর হ’ল এই যে, নিত্যকর্ম যখন কর্মই, তখন কর্মফলত্বই ত তার ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, অকস্মাৎ কর্মবিরুদ্ধ মোক্ষ তার ফল হবে কেন? সেজন্তু কর্মের যে চতুর্বিধ ফল—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার তার মধ্যেই একটি ফল তার ক্ষেত্রেও হ’ল, তা অবশ্যস্বীকার্য।

যদি বলা হয় যে, মোক্ষই এই চতুর্বিধ ফলের অন্যতম—তার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা পরে কর হবে।

## দ্বিধা

শ্রী প্রফুল্লকুমার দত্ত

অনেক দিনের চেনা-জানা; আত্মকে দুটি সত্তা হ’ল এক—

তবু আমার ভয় করা কি সাজে?

যে বিশ্বাসে সব ছেড়েও বেঁধেছ গাঁটছড়া,

হারালে তা বাসরঘরে, লাজে।

চোখের কোণে মনের কালো জল

রুদ্ধাবেগে হয়েছে উজ্জল—

অভিকিত দ্বিধায় কেঁপে নিটোল দুটি হাতে

যন্ত্রে-পরা সোনার বাজা বাজে!

তবু আমার ভয় করা কি সাজে?

ও হেঁয়ালি স্পর্শ করার দাবী

পূর্ণ হ’ত, যখন ছিলে ভাবী;

আজকে সে-সব অধিকারের তুচ্ছ হিসেব ফেলে

খেঁচাতেই এলে বুকের কাছে।

তবু আমার ভয় করা কি সাজে?

## মা

শ্রী সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্তুর কার কুসুম-কোমল, বয়ানে কাহার স্নিগ্ধ-হাসি?

নয়নে কাহার দরশন মধুর মাধবী-রাতের জ্যোৎস্নারশি?

পরানে কাহার বহিছে নিত্য গোপন স্নেহের ফলধারা?

দ্বিবস রজনী আপনার কাজে আপনি রয়েছে আশ্রহারী?

প্রতিদিন কার আহ্বান আসে ক্ষুধায় ষাচ্চ চা’বার আগে?

সুশীতল বারি কাহার হস্তে নেহারি সহসা তৃষ্ণা জাগে?

বিপদে কাহার আকুল হৃদয় ষাচে দেবতার প্রসাদটুক?

অমঙ্গলের বিষম ভাবনা শেলসম বি’ধে কাহার বুক?

জীবনপথের বিষয় বাধায় পশ্চাতে ঠেলে কাহার হাত?

সংসার-মরু ছায়াময় রঙ্গ সে শুধু কাহার আলীকবাহ?

সন্তান-সুখ-গৌরবে কার ভরে আছে বুক সবার চেয়ে?

শুভদিনে কার হৃদয়-কামনা ঝরে পড়ে দুটি নয়ন বেয়ে?

স্বপ্ন হতেও প্রিয় আপনার করিয়াছে কেবা ধরার মাটি?

সে তুমি জননী দেবী স্বরূপিণী চির-স্নেহময়ী-আমার মা-টি।

# বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীউমা দেবী

রবীন্দ্রনাথের বহুগামী প্রতিভার একটি দিক মাত্র আজ আলোচ্য—  
বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ। এই বাংলা দেশেরই এক আদি কবি  
একদিন গেয়েছিলেন বর্ষার অমিত গান্ধীর্থের কথা—“মৌবে-  
দেহুমম্বরং বনভূষঃ শ্যামান্তমালক্রমেঃ।” রবীন্দ্রনাথও বর্ষার এই  
গান্ধীর্থকে ধনিসৌন্দর্যে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে, পাণ্ডায়,  
গানে। কিন্তু বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টি এইখানেই  
নিম্নলিখিত হয় নি, তা আরও অতলে গিয়ে পৌঁছেছে জীবনের সঙ্গে  
একাত্ম হব এক সামগ্রিক সুষমার পূর্ণ চেতনায়। এ বিষয়ে  
তিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন বাঙ্গালিক-কালিদাসের কাছে—এ কথা  
বলসে অতুষ্টি হবে না, যদিও পাকা জহুরী মতন তিনি সেই  
মণিটিকে সংস্কৃত ও মার্জিত করে আরও উজ্জ্বল ও মনোহর করে  
তুলেছেন। সাহিত্যের স্বরূপ আলোচনার সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা  
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—“আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্র-  
নাথ একা—কোন ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাধে নি।”  
কথাটি রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অনন্তসাধারণতার দিক  
দিয়ে সত্য কিন্তু এর তাৎপর্য উত্তরাধিকারিণীর ঐতিহ্যের  
অস্বীকৃতিতে নয়। কথাটা আর একটু বিস্তার করে বলা  
দরকার।

কোন প্রতিভাই—তা সে যতই অলসসাধারণ বা অলোক-  
সাম্যম্ ভোক না কেন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সার্থক হতে পারে  
না। শংখাংকীর্ণ মণির মতই প্রতিভাও সজ্জারপেক্ষ। প্রাচীন  
আত্মকারিক মন্দির কাব্যাহেতু নির্গমসঙ্গে এক অস্বাভাবিক বলেছেন যে,  
কাব্যোক্তে মাত্র একটি এবং সেই হেতুতে তিনটি বিষয় অপেক্ষিত  
আছে—প্রতিভা, বাৎপত্য ও অমূল্যলন—

“শক্তির্নিপুণতালোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যপেক্ষণাৎ।

কাব্যাস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাস ইতি ত্রেতু তদ্ব্যবহাঃ।”

—অপূর্ববস্তুরিশ্রুতম্ প্রজ্ঞা প্রতিভা বা শক্তি বা কবিত্ববীজরূপ  
সংস্কারবিশেষ। এ শক্তি যার নেই তার পক্ষে কাব্যরচনা করা  
অসম্ভব। যদি বা কবে তাও হৃৎকর হয়ে ওঠে। অভ্যাস বা  
অমূল্যলন দক্ষতার অধিকারী করতে পারে কিন্তু সত্যতার কাব্য-  
সৃষ্টির ক্ষমতা এনে দিতে পারে না। প্রতিভা হচ্ছে সেই প্রাণ  
যার অভাবে কাব্যোক্ত শব্দসমূহের মতনই অস্পৃশ্য ও পবিত্রজনীয়।  
এই প্রতিভার অগ্নি যার মধ্যে আছে অমূল্যলনের ঘরণে সেই  
দীপ্ত, গুণ্ড থেকেই দীপা প্রজ্জ্বলিত হতে পারে। এক ডেলা মাটিকে  
যেই ঘষা যাক না কেন তার থেকে অগ্নি উদগারিত হতে পারে  
না। প্রতিভা হচ্ছে সেই মূল সম্পদ যা খাটিয়ে অমিত ঐশ্বর্যের

অধিকারী হওয়া যায় এবং যা না থাকলে ঐশ্বর্য অর্জনের প্রয়াস  
ভিক্ষাক্ষণের প্রয়াসে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু প্রতিভা কাব্যনিশ্চিতির প্রথম কথা হলেও শেষ কথা  
নয়। প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র নির্ভর করে অভিজ্ঞতার প্রসারের  
উপর। মানুষ তার সর্কীর্ণ সীমার আবদ্ধ থেকে সন্তুষ্ট নয়—সে  
চাইছে নিজেকে বিস্তার করতে, প্রসারিত করতে, চাইছে সীমার  
শৃঙ্খল থেকে অসীমে মুক্ত হতে—চাইছে জানতে নিজেকে এবং  
নিজেকে জানার পিছনে আছে সকলের সঙ্গে মিলে নিজেকে ভেদে  
নেওয়া, চেনে নেওয়া। তাই আপন অভিজ্ঞতার সর্কীর্ণ সীমার  
মধ্যেই সে সন্তুষ্ট নয়, সে জানতে চায় পংখ্য অভিজ্ঞতাকে। সে  
অভিজ্ঞতার রূপও দুটি—একটি ভাবগত, অপরটি বুদ্ধিগত। এই  
বিষয়ে মানুষ বা কিছুই অমূল্যব করেছে প্রাণের মধ্যে তাকে রূপ  
দিয়েছে ভাবের, প্রকাশ করেছে কাব্যে, দর্শনে। আর যাকে  
ভেদেছে, বিশ্লষণ করেছে, ধরেছে বুদ্ধির জালে তাকে রূপ দিয়েছে  
বিজ্ঞানে, শাস্ত্রে। তাই বুদ্ধিগত ও ভাবগত নিরঞ্জন ও পদম্ব  
অভিজ্ঞতার সোপান বেয়ে মানুষ উত্তীর্ণ হয়েছে আনন্দলোকে,  
প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে কবেছে উদ্ভূত, উদার।

কিন্তু কাব্যনিশ্চিতির সর্বক্ষেত্রে এও শেষ কথা নয়। আরও একটি  
বস্তুর অপেক্ষা আছে সে বস্তু অমূল্যলন। প্রদীপ আছে, শলাকা  
আছে কিন্তু তাকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, অরণ্য-ঘরণে শিখাটিকে  
জ্বালিয়ে নিতে হবে, সেই জ্বালিয়ে নেবার ব্যাপারটিই কাব্যনিশ্চিতি  
ব্যাপারের অমূল্যলন। ভাবের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে চিত্ত বধন টলমল  
তখন তার স্ব-উচ্ছ্বাসিত প্রকাশকে কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলতে  
গেলে বাস্তব প্রকাশকে বলি কাব্য। কিন্তু কাব্য-রচয়িতার মধ্যে  
আর একটি সত্তা লুকিয়ে থাকে তাকে বলি সমালোচক সত্তা। সে  
সত্তা প্রতিভাবান কবির মধ্যে সদা জাগ্রত। যা খুলী লেখা সে  
সইতে পারে না—কলম আটকে সে বলে এখানে কাটো, এখানে  
ঝাঁড়ো, এটা বদলাও, ওটা আবার নূতন করে সৃষ্টি কর। নিজের  
মনের ভাবের আরশিতে যাকে অমূল্যব করেছে, দেখ তার একটি  
যেথাও যেন ডুলি থেকে হারিয়ে যায় না, যে বাগিনী প্রাণের মধ্যে  
আলাপে আলাপে মুখবিত হয়ে উঠেছে দেশ বেল তার একটি  
তানও হারিয়ে না যায়।

তাই “বুদ্ধহীন পুঙ্গবম আপনাতে আপনি বিকশি” উঠতে  
পারে না কোন কবিই। তার শিকড় চারিগে যায় মাটির অতলে,  
ঐতিহ্যের গোপন ঘসে কপারিত হয়ে ওঠে তার প্রাণসত্তা, তার পুঙ্গব  
অনন্ত নীলাকাশের তলে মধুর বীজকোষটিকে রেখে যায় ভবিষ্যৎ

হাতে আর শাখায় পল্লবে-পুষ্পে-ফলে, আলোকে-বাতাসে ত্রিযোজিত হয়ে দফল, সুন্দর ও বিকাশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার বর্তমান সত্তা।

সর্বকবিসংধারণ এই সত্য রবীন্দ্রনাথ সৰ্বক্ষেণে সমভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিমাধুর্য্য ও উপনিষদের ভাব-গাঞ্জীয়া রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার এক অপূর্ব সুবদ্য পূর্বাধিত হইছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আদিমুগ্ধর সাত্ত্বিকের দর্শনের অপব্যোজতার অর্থ্য প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট-হৃদুতির নিরপেক্ষ আত্ম-অসংস্বে প্রবাসের ঋণুতার সঙ্গে পংবর্ত্তীয়গণেঃ লক্ষ্যনিঃস্রতি-কৌশল ও বাক্যরচনাশৈলীর কাকল্যামণ্ডিত মৌর্য রবীন্দ্রকব্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং এই সঙ্গেও লক্ষণীয় সেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধ্বনি ও সঙ্গের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ অংগ কতগুলি বন্ধিত করতেন, তিনি আকরণ করেছেন যেন দগ্ধশ্রুণ বৈশী বিতরণ করার জন্ত—“সংস্রুণমুঃশ্রুতঃ আদতে হি বসঃ এবঃ।”

রবীন্দ্র-রচনায় বর্ষার ধ্যে রূপ ও শব্দধারার পরিচয় আমরা পাই তার জন্ম কালিদাসের নিকট স্বাম্য। বহুল পরিদর্শনে কহজ্ঞ। বর্ষাকব্য কালিদাস যা রচনা করেছেন তার মধ্যে মেঘদূত দক্ষ শ্রুতি, বদিত ঋতুসংবোধে একটি তরঙ্গ আমরা পাই বর্ষাবর্ণনার এবং ধ্বং-বংশ ও কুমারসংবোধের মধ্যে সামান্য কয়েকটি সংজ্ঞিত এ পাওয়া যায়। নাটকের মধ্যে প্রিয়ংবদীশ্রুতিতে তুর্বা অঙ্কে বর্ষার সামান্য কিছু রূপ বিদ্যোতমকের মতন দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অতঃপর সিজ্ঞ। চন্দনরসে অম্ললিপ্ত—চন্দ্র-বরণে উদযুট কালিদাসের কাব্য, বলেছেন জরজরতট তার জাহ্নমঞ্জরীতে—

“অমৃতেনৈব সংসিক্তাঃ চন্দনেনৈব চচিতা।

চন্দ্র ওভিগুণৈঃ দৃষ্টাঃ কালিদাসো সুকৃতঃ।”

সুকাবির কাবানিষ্মিত সৰ্বক্ষেণে বর্ষাধার তার একাবলীতে বলেছেন— কাব্য হচ্ছে :

“কিকিংপোড়িতচন্দ্রমণ্ডলগঙ্গাং যুগ্মি ধ্বং বসঃ।

তৎকিকিংকবিকল্পমম্ম ন পুনর্বাগভিগুণাভুৎসঃ।”

চন্দ্রবিষকে ঈষৎ পীড়ন যদি করা যেত তবে যে দীপ্তধারা নির্গলিত হ’ত তারই তুলনা সুকাবির কাব্য। শব্দভিগুণ বা বাগ্যভুৎসে কবিকল্পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

ক্রমব যখন পুষ্পিত ফুলবনে স্বচ্ছন্দবিহারে স্বর্ণভ রৌদ্রে বিচরণ করে তেমন সুকাবির অমৃতজাত সঙ্গ অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য কাব্যকে উদ্ভাসিত করে রসস্রষ্টার পথে এগিয়ে চলে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথও এগিয়ে গেছেন সেই পথে এবং আগুয়ে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ যেমন কালিদাসের প্রতিভার রৌদ্রালোক পক্ষ মেসে গিয়েছেন কালিদাসও তেমনি বাস্তবিকের প্রতিভার রৌদ্রালোক পান করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। বর্ষার সৌন্দর্য্যকল্পনা ও রসজুড়তির তীব্রত্ব কি ভাবে এক থেকে অস্ত্রে ক্রমশঃ গাঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে তার আশ্রয় কাব্যপাঠিক যাহেবই আশ্রয়। যেঘনুত কালিদাসের এক অনবত্ত স্রষ্টা। অতঃপ্রকৃতিকে চেতনার আলোর সুপথ করে তুলে মানব তার চিহ্নিত হই অস্ত্রের সমস্ত বেদনা তাকে সমাপিত

করে প্রিয়বন্ধুর মতন আশ্রয় করে নিয়েছে, কালিদাসের কল্পনার এই অভিনবত্ব পরবর্ত্তীকালের বহু কবিকে দূতকাব্য রচনার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কালিদাসও তার এই কল্পনার অভিনবত্বের ভজ বক্ষীকর কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী। বাসগিরির বিবর্ত্তী বক্ষ এবং শলকার বিরহিনী প্রিয়তমা রামচন্দ্র ও সীতার পরিচিত প্রতিনিবিস্তারীয়। সমগত বর্ষাকালে মেঘাঃশ্রুত সংস্রুণেশে কটজ পুষ্পেঃ কান্তিদর্শনে নিঃশিনী প্রেমসীর জন্ত ব’তয়ের ফলসেই গেমবাসনা তাক্ত হয়েছিল।

বাস্তবিক বলেছেন :

‘কিচৈব বাস্পাভিদকল্পনং বর্ষাঃ সমস্রুণমুঃশ্রুতঃ।

কুটজানু পক্ষ সৌমিহ্মে। পুষ্পিশানু গিহিসামুদ্রঃ।

মম শোকাঃ ভুৎসঃ কামদক্ষীণানু হিহানুঃ।”

কালিদাস বলেছেন :

‘সি প্রঃ টেগঃ বৃজবৃন্তঃ কলিতার্থ্য হইয়ে,

প্রীঃ প্রীতিপ্রদঃ সঙ্গঃ স্ব গুণঃ বাসবঃ।”

বীজকবোঃ অঘর্ষণে প্রিবিহেঃ ব’তের তক্তি পাঠ :

অ যতঃ কলিতার্থ্য হইয়ে সঙ্গঃ সৌমিহ্মে বসঃ—

বাসবঃ পুষ্পিশানু গিহিসামুদ্রঃ।

সংল হইয়া ব’ত বসে কি কথা ব’ত সঙ্গঃ ?

জাহ্নম জাহ্নম চিত্র দিহেতে বৃজবৃন্তঃ পাই কুল

সৌমিহ্মে প্রঃ কামিহ্মে টেগঃ প্রিঃ বসেঃ কুল।

বাস্তবিকঃ সিক্তি পাই বাসবঃ প্রঃ কামিহ্মে পক্ষে :

‘সম্প্রসিক্তাঃ কামদক্ষীণানু হিহানুঃ।

প্রিয়ংবদীঃ সম্প্রসিক্তা চত্যাংকাঃ।”

কালিদাসের টক্তি পাঠ দেবদূতের পূর্বসংঘ :

‘তাচ্ছ্রুৎ তে অরণ্যজংগঃ প্রীতঃ কামদোংকাঃ

গাঠিকস শব্দ বিসদিশসংস্রুণে সম্প্রকরমাঃ

সম্প্রসিক্তাঃ কতিগুণদিনহ্মিহ্মিহ্মা দর্শনাঃ।”

কিংবা বাস্তবিকঃ :

‘সমুদ্রস্রুৎঃ সিক্তিপ্রীতিভাং

বলকিনো পরিধরা নদন্তঃ।

মহৎসু গুণেঃ মহৈষমাগঃ

বিশ্রমা বিশ্রমা পুনঃ প্রসিক্তি।”

মেঘজ্ঞান জগৎকারে ক’হর পূরে আকলপথ আতকম কাহে — গজেন করে, গুপ্ত ঘেবে শৃঙ্গাভরে তরু হয়ে বিশ্রাম করত করত। ঠিক এই রচনাই কালিদাসের পাই :

“বিহ্মঃ বিহ্মঃ শিখরীষু পদং নস্য গজাসি যজ্ঞ।”

কিংবা “কালক্ষেপঃ ককুতঃ সুরভৌ পবতে পবতে তে।”

কিংবা “নীচৈবাবাঃ। দ্যাবমাবিবদন্তঃ বিশ্রান্ত হেতোঃ।

কালিদাস বলেছেন :

“গভাধানকর্ণগণিচয়ান্ন নমাবত্মমালাঃ।

মেবিযান্তে নচনহুৎগং খে ভবন্তঃ বলকাঃ।”

ঠিক এইই অল্পরূপ কথা আছে রামায়ণে :

মেঘাভিকামা পরিসম্পত্তী  
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ ।  
বাতাবধূতা বরণোণ্ডনী  
লম্বেব মালা কচিরাবধূতা ।”

রামায়ণের কিঙ্কাকাণ্ডে আছে :

“নীলমেঘাশ্রিতা বিহ্বাং ক্ষুদ্রস্তী প্রতিভাতি মে ।  
ক্ষুদ্রস্তী রাবণস্তাক্কে বৈদেহীৰ তপশ্বিনী ।”

অল্পরূপ বর্ণনা বিরূপোর্বশীয়ে আছে :

“নবজলধঃসমুদ্রোঃসং ন দৃশুনিশাচরঃ ।...  
কনকবিনিকম্পিতা বিহ্বাং প্রিয়ান ন মমোর্বশী ।”

এই প্রসঙ্গে স্নেহকাব বর্ণনার সঙ্গে রামায়ণের কিঙ্কাকাণ্ডে কৌতুহ্যজ্জের পংখারবতী উত্তরকুরু জনপদের বর্ণনা তুলনীয়। বাস্তবিকর রামায়ণ যে কালিদাসের মেঘদূতের প্রেরণা একথা অনস্বীকার্য।

মেঘদূতের প্রখ্যাত টীকাকার দক্ষিণাবর্তনধ ও পূর্ণসংস্কৃতি কালিদাসের মেঘদূতের উপহার সঙ্গে রামায়ণের উপহার সাদৃশ্য অনেক স্থানেই দেখিয়েছেন, কল্পনার সম্ভ্রান্ত্যও লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এপিক কাব্যের সঙ্গে সাধারণ কাব্যের পার্থক্যকে মনে রেখে তুলনার তারতম্য বিচার করতে হবে।

বাস্তবিক মহাকাব্যের রচয়িতা, কালিদাস প্রধানতঃ কাব্যকার এবং রবীন্দ্রনাথ গীতিকার। কাব্যপ্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞত বর্ণিত বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও স্বরূপের পার্থক্যও বসিকজনসংবেদ্য। তুলনা যদি করা যায় তা হলে বাস্তবিককে মহোদয় পুরুষের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। কালিদাসের কাব্য যেন তাজমহল এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা যেন মস্ত আলোক-সূচী বিহুগুণকারী অভ্যুজ্জল হীরকখণ্ড। বর্ষার হেরুপ বাস্তবিকতে সহজ ও সরস, কালিদাসে তা সরস ও সূক্ষ্ম, রবীন্দ্রনাথে সূক্ষ্ম ও বিচিত্র। বাস্তবিকের বর্ষাপ্রকৃতি অচেতন, কালিদাসের চেতনবর্ষা, রবীন্দ্রনাথের স্থানে স্থানে অতি-চেতনরূপেও উদ্ভাসিত।

প্রাচীন সাহিত্যে মেঘদূতের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক-স্থানে বলেছেন—“গামগায় হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারত-বর্ষে যে দীর্ঘ এক পুণ্ডর মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাকিনী-ছন্দে জীবনপ্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মত আমরাও নির্কাসিত হইয়াছি।...মনে পড়িতেছে, কোন ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন—মাহুঘেরা এক একটি বিচিত্র ধীপের মত, পদস্পর্শের মধ্যে অপরিমেয় অক্ষ-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পদস্পর্শের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয় এককালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপবাণি ফেলি হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিংহাসীয়ে যুবীনে যে পুষ্পালাহা রমণীরা ফুল তুলিত, অবজীৱ নগরচত্বরে যে

বৃক্ষগণ উদয়নেব গজ বলিত, এবং আবার প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিক প্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীৱ জ্ঞত বিরহ-বাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকি উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকা-পুরীতে পরিণত হইয়াছে, আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মণ্ডলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু কেবল অতীত—বর্তমান নহে, প্রত্যেক মাহুঘের মধ্যে অতলস্পর্শ বিহব। আমরা বাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠান যায়, সেখানে সম্মুখের উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিদ্যার মাহুঘটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে...হে নির্জ্ঞান স্মিংশগরের বিরহী, স্বপ্নে বাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে বাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যালোকে শব্দ-পূর্ণিয়ারাজে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে! তোমার ত চেতন-অচেতনে পার্থক্যজ্ঞান নাই, কি জ্ঞান, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক।”

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাপ্রকৃতির ধ্যান ধারণার এই চরম রূপ। বর্ষা এখানে চিরবিরহের প্রতীক—বর্ষার সৌন্দর্য্য সেই চিরবিরহীর সঙ্গে চিরস্মরণের মিলনের প্রেরণা। বর্ষাগমে যে বিরহকল্পনা বাস্তবিকর রামায়ণে সাধারণ ও নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণিত, হয়েছে, কালিদাসের কবিতেনাম বর্ষাপ্রকৃতির মধ্যে সেই বিরহকল্পনা এক নিগূঢ় প্রেমের সৌন্দর্য্য অমব হয়ে উঠেছে। এখানে সমস্ত প্রকৃতি কবির অন্তরে ভাবস্পন্দনের সঙ্গে এক তারের মূর্ছনার স্পন্দিত হচ্ছে কিন্তু তবু এই বিরহ কাত ও কাতার প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার বর্ষাপ্রকৃতির এই রূপ তার সূচ সৌন্দর্য্যকে বিচিত্র করে এবং উত্তীর্ণ হয়ে অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম আনন্দবেদনার তরঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলিত হয়ে গভীর চেতনার মধ্যমূলে এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শেষ সপ্তকের পঞ্চম কবিতাটি উদ্ধৃত্য।

যে বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে, ঘনিরেছে সার-বাধা তালের চূড়ায়,  
যোমাঝ জাগায় “বাঁধের কালো জলে বায় আনন্দ সজ্জায় মধ্যে  
বসসম্পদ, প্রতিবার যে রঙের প্রলেপ লাগায় জীবনের পটভূমিকায়  
নিবিড়তর করে, যে বিচিত্র কাককলার চিত্রিত সমগ্র সত্তাকে দিবা-  
দুষ্টির সম্মুখে অব্যাহিত করতে পারে, যে বধূ যতন প্রাণে জাগায়  
প্রেম—হৃৎকণ্ডে পাবে গলাব হার করাতে সেই বর্ষাপ্রকৃতিকে কবি  
আহ্বান জানিয়েছেন স্বপ্নের দিগন্তে।

তথু আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেই নয়, জীবন সংগ্রামের মধ্যেও কবি জীবনকে বর্ষার প্রতীকে গ্রহণ করেছেন—যখন বলেছেন :



এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো  
বেদনার যে বান ডেকেছে  
বোদনে যায় ভেসে গো  
রক্ত মেঘে ঝিলিক মাঝে  
বজ্র বাজে গহন পায়ে  
কোন পাপল ঐ বাবে বাবে  
উঠছে অটহেসে গো  
এবার যে এল সর্ব্বনেশে গো ।

সীমাই যে শুধু অসীমের দিকে এগিয়ে যায় না—অসীমও আসে  
সীমার দিকে এগিয়ে এই স্মৃতির সত্যটিকেও কবি বর্ষাপ্রকৃতির  
প্রতীকে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধির গান্ধীর্ষ্য পরিপূর্ণ-  
ভাবে প্রকাশ করেছেন অসংখ্য গানের মধ্যে—যেমন—

“ধ্বজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার  
পরামর্শবা বন্ধু হে আমার  
আকাশ কাঁদে হতাশ সম  
নাই যে ঘুম নয়নে মম  
ছায়ার খুলি হে প্রিয়তম  
চাই যে বাবে বার  
বাড়িরে কিছু দেখিতে নাই পাই  
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই

সুদূর কোন নদীর পায়ে  
গহন কোন বনের ধারে  
গভীর কোন অন্ধকারে  
হতেছ তুমি পার

শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে যার আগমন, আশাচলচ্ছা ঘনিষে  
এলে বার জন্য আকুলতা, বজ্রবে বার অ’হ্বান, বার জগ্ন অস্তরে  
কলবোল, যে না এলে অপূর্ণতার বেদন তারই জগ্ন কবি প্রাণের  
মুগ্ধে অসংখ্য সুর তুলেছেন :

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ঝড় এল যে আজ  
যেবে ডাকে ডাক মিলিয়ে বাজরে মৃগ বাজ,  
আজকে তোরা কি পাবি গান  
কোন বাগিচীর সুরে  
কালো আকাশ নীল ছায়াতে  
দিল যে বুক পুষে—

বর্ষাপ্রকৃতির রূপায়ণে, ভাবায়নে ও উপলব্ধিতে ববীন্দ্রনাথের  
কাব্যে আমরা তিনটি স্তরই দেখতে পাই—প্রাচীন মহাকাব্যের  
সবল ও সাবলীল প্রত্যক্ষ বর্ণনা, সৌন্দর্য্য ও রসে টলরস কালিদাস-  
প্রমুখের সংস্কৃত-কাব্যের বৈচিত্র্য ও বিরহ এবং সর্ব্বশেষে উপনিষদের  
উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ এক আধ্যাত্মিক ধ্যানসম্পদ ।

## একটি স্মৃতি

শ্রীকরণাময় বসু

উড়ন্ত মেঘের ছায়া, এক ফাঁটা বৃষ্টি, চাপা বোধ  
অরণের খেলাধুরে মায়ায় বসন্ত শব্দ  
এনেছে হৃদ ভাষা । পীত বোঁজ সজ্জার কিছুকে  
নিটোল যুক্তোর দিন চোখ মেলে উজ্জল কোঁকুকে ।  
ঝাউবন মাথা নাড়ে, গাছে গাছে ফুল থোকা থোকা,  
ভিজে ঘাসে উড়ে আসে সবুজ বড়ের কাঁচ পোকা ।  
দীর্ঘজল টলোমল, পল্লকুড়ি কাঁপে ছলোছল,  
আকাশে বজ্রের মতো এক ঝাঁক কপোত চঞ্চল  
মেঘ ছাড়ে উড়ে যায় ; মনে হ’ল কবে একদিন  
সোনালি বোঁজের স্বপ্নে এসেছিল সোনার হরিণ

আমার মনের বনে : যুধি-গন্ধে ভরা দিনগুলি  
বিস্তৃত বেদনারসে অতীতের পট ঝাঁকে তুলি ।  
তারপর বেলাশেষে চাঁদ আনে রূপকথা-রাত,  
আমার কপালে ছোঁয় অধেষা কোমল কারো হাত ?  
মোমাছির খেলা শেষ, তবু দেখি মনের মোঁচাকে  
নাগকেশরের স্বপ্নে এক বিন্দু মধু জমে থাকে ।  
পার হয়ে সময়ের অতি দীর্ঘ ধূসর পাহারা  
আজো অপরাহ্ন বেলা কণে কণে পাই তার সাড়া ;  
পার হয়ে বৃষ্টি ভেজা শ্রাবণের চামেলির বন  
নৃপূরের শব্দ আসে, সেই শব্দ শোনে আজো মন ।

## অলৌকিক

শ্রীজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গুরুতর-রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনীষী নীলরতন সরকার মহাশয় ছুটে এলেন তাঁর চিকিৎসার জন্ত। তাঁর সঙ্গে এলেন বাংলা দেশের সেবা সেবা ডাক্তার। তাঁদের অক্লান্ত অধ্যয়নসায়ে এবং স্টিমুলেট চিকিৎসায় গুরুদেবের প্রাণরক্ষা হ'ল।

কবি আবোগালাভ করেছেন। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সরকার মহাশয় তাঁর সাজোপাজ নিয়ে আশ্রম দর্শনে বাহির হলেন।

চীন ভবন তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দোতলা সম্পূর্ণ হয় নি। পূর্ব-পশ্চিমে অব্যাহিত ছাদ। মাঝখানে মাত্র দু'খানি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। তার একটিতে চীনা প্রত্নাগার। অল্পটিতে তিব্বতী পুস্তকাদি এবং গবেষণাগৃহ। দোতলায় প্রবেশমুণ্ডই এই গবেষণাগৃহ। সরকার মহাশয় বীর পদক্ষেপে সেখান উপস্থিত হলেন। শুভ্রকেশ, প্রশান্ত প্রসন্নমুর্তি। আমরা সমস্তই তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম।

সম্মুখেই তিব্বতীগ্রন্থ। পুথি-আকারে ছাপা। বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐ তিব্বতী অনুবাদরাশি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা তার পরিচয় দিলাম :

“সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে সজে ভারতের ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক সন্ধক স্থাপিত হয়। তার পর থেকে বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যান এবং তিব্বতীগণ ভারতে আসতে থাকেন। সমস্ত বৌদ্ধ ত্রিপিটক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, এমন বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থেবও তিব্বতী অনুবাদ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও পার্শ্বিনি ব্যাকরণের (প্রক্রিয়া-কৌমুদীর) তিব্বতী অনুবাদ করা হয়েছে—হদানীজুন দলাইলামার নির্দেশে। অনুবাদক ভারতে এসে, পঞ্জাবে বসে এই অনুবাদ করে গেছেন। তার পর থেকে তিব্বতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বোগসুত্র ছিন্ন হয়ে যায়।”

মনীষী নীলরতন তাঁর স্বাভাবিক শাস্ত্রের বলে বললেন, “কিন্তু ধার্মিক বোগসুত্র আজও ছিন্ন হয় নাই। তিব্বতী ও ভারতীয় বোগীদের সন্ধক আজও অটুট রয়েছে।

“আপনারা হস্ত বিজ্ঞাননের নাম শুনে যাবেন, কাশীতে যিনি “গান্ধীবাণী” বলে পরিচিত। তাঁর গুরু তিব্বতী। গুরু ও শিষ্য উভয়েই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

“আমি তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষদর্শী। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে একটি ফুল দিই। তিনি আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে—ঐ ফুলটিকে হীরাতে পরিণত করেন। বাতুলিয়ার হীরা নয়—বর্ষার্থ হীরা। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষমহাশয় ও আমি উভয়েই সে হীরা পরীক্ষা করলাম। হীরা—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এর পূর্বেও তিনি এই ভাবে হীরা তৈরি করেছেন এবং আমি জানি তাঁর প্রদত্ত সেই হীরা বাজারে ত্রিশ হাজার টাকার বিক্রি হয়েছে।

“আমি করজোড়ে প্রণাম করে তাঁকে সেই হীরা ফেরত দিলাম। বিনীতভাবে বললাম—‘আমার আর প্রেলোভন দেগাবেন না। আশীর্বাদ করুন, আমার যেন অর্থাসক্তি দূর হয়।’”

আমরা মস্তমুগ্ধের দ্বারা ঐ অপূর্ব অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করলাম। অল্প কোন ব্যক্তির মুখ হতে এ কথা শুনলে আমরা তা ‘গান্ধীবাণী’ বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বাংলার সর্বজনস্বাক্ষর সত্যনিষ্ঠ নীলরতন সরকার মহাশয়ের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার অবিচ্ছিন্ন কবি বিরূপে?\*

\* দীর্ঘকাল পূর্বের (বাইশ বৎসরের) ঘটনা। এ পর্যন্ত অনেককেই এ কথা বলেছি। কিন্তু (সম্ভবতঃ আলপ্রে এবং সঙ্কোচে) লিপিবদ্ধ করতে পারি নাই। এখন এ কথা প্রকাশ করাই কর্তব্য মনে হ'ল।



## অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

২১

আজ সকালবেলাটা ভারি সুন্দর। কয়েকদিনের বাদলা কাটিয়া গিয়াছে, ভিজে মাঠেঘাটে বোধ পড়িয়া বলমল করিতেছে। হৈ হৈ করিয়া চাতিদিকে বোনার কাজ শুরু হইয়াছে। কেহ চাবাধান তুলিয়া আঁটি বাধিয়া রাখিতেছে, কেহ ক্ষেতচাষ দিতেছে, গালাগালি, লেজুমলা ও লাঠির বাড়ি খাইয়া ক্লাস্ত বলদ একহাঁটু কাধার মধ্যে মাথা হেঁট করিয়া লাজল টানিয়া চলিয়াছে। আলের উপর বসিয়া কেহ জলপান খাইতেছে। গ্রামের পথে ছুটাছুটি, হাঁকডাকের শব্দ নাই।

আড়িনায় বোনে বসিয়া কুকিয়া পরসাদকে পুরি-তরকারি খাওয়াইতেছিল, এমন সময় মনুয়ার বউ ব্যস্তভাবে আসিয়া ডাকে, “কি করছিল গো পরসাদের মা?”

ঠোকাটা আঁচলের আড়াল করিয়া কুকিয়া বলে, “কিছু করছি নে দিদি।”

মনুয়ার বউ বলে, “তুলসী মহতোর রোপা হচ্ছে আজ, আমাকে রোপণী খুঁজতে বলেছে, যাবি ত চল।”

মনুয়ার বউয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কুকিয়া বলে, “হ্যাঁ গো দিদি, আমার অবস্থা কি তুমি জান না? কাজ কাল করে মাথা খুঁড়েও ত কাজ পেলাম না, না খেয়ে মরতে বসেছি। তুমি সেধে কাজের কথা বলতে এলে, তুমি আমার মন ব জন্মের সত্যিকার দিদি ছিলে।”

কৃতজ্ঞতায় কুকিয়ার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিয়া পড়ে। ধান রূপিতে গেলে ছপুর বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে, কাদের শেষে শঙ্ক্যাবেলা তিন দেয় ধান পাইবে—এ যেন তাহার পক্ষে হাতে স্বর্গ পাওয়া। কুকিয়া চোখ মুছিয়া বলে, “চল গো দিদি।”

মনুয়ার বউ বলে, “তুই তুলসী মহতোর ক্ষেতে চলে যা, আমি ঘর হয়ে থাকি।”

মনুয়ার বউ ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়। কুকিয়া পরসাদকে খাওয়াইয়া ঠোকাটি লইয়া ঘরে ঢোকে, তিলকার পাশে আসিয়া ডাকে, “ধর গো।”

ডাক শুনিয়া তিলকা চোখ মেলিয়া তাকায়। কুকিয়া একটুকরা পুরি লইয়া তাহার মুখের কাছে ধরিয়া বলে, “খা।”

কুকিয়াকে দেখিয়া তিলকা আর বাগিয়া ওঠে না, গালা-

গালি করে না, একটা অসহায় করুণ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। কুকিয়া খাইতে বলায় সে খায়, কি খাইতেছে, কুকিয়া এ খাবার কোথায় পাইল, এমন কোন প্রশ্নই তাহার মনে ওঠে না। খানটুকু পুরি খাওয়াইয়া কুকিয়া বলে, “আমি তুলসী মহতোর ধান রূপিতে থাকি, ছপুরবেলা ভাত নিয়ে আসব।”

তিলকা কিছুই বলে না, আবার চোখ বোজে।

ছেলেকে কোলে লইয়া কুকিয়া তুলসীমহতোর ক্ষেতের দিকে চলে। গ্রাম প্রায় শূন্য করিয়া মেয়েপুরুষ ক্ষেতে আসিয়া নামিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠের ধারে কোন একটা গাছের নীচে জমা হইয়াছে, এক-আধজন বুড়ী তাহাদের তদারকের ভার লইয়াছে। পরসাদকে সেইখানে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া কুকিয়া মিনতি করিয়া বলে, “পরসাদকে একটু দেখ আই, ওকে বেধে গেলুম এখানে।”

তদারককারিণী বৃদ্ধাটি গ্রামের সাধারণ ঠাকুরমা, দস্তহীন মুখে একগাল হাসিয়া সে বলে, “বেধে যা বউ, আমি দেখব এখন। আর পরসাদ, আর।”

কুকিয়া পরসাদের পিঠে একটা ঠেলা দিয়া তাহাকে আগাইয়া দেয়, তার পরে আলপথ ধরিয়া তাড়াতাড়ি তুলসী মহতোর ক্ষেতের দিকে চলে। তুলসী মহতো মাঝারি গৃহস্থ পাচ-ছ’ বিবা তাহার ধানক্ষেত, সেখানে দশ-বার জন রোপণী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৈরী ক্ষেতে চাবাধানের আঁটি ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন রোপা শুরু করিলেই হয়। সর্ব্বদে কাদামাথা তুলসী মহতো লাজল খামাইয়া হাঁক দিয়া বলে, “তোমরা আলের উপর কাঁপতলির মত দাঁড়িয়ে বইলে কেন গো, মাথার উপর স্বর্ষ উঠল, নেমে পড়, নেমে পড়।”

শাড়ী হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া আঁট করিয়া পরিয়া মেয়েরা ক্ষেতে নামিয়া পড়ে। শারিবন্দী তাহারা ক্ষেতের এক সীমা হইতে রোপা শুরু করে। প্রত্যেকের বাঁ হাতে এক আঁটি করিয়া চাবাধান, সেই আঁটি হইতে ডান হাত দিয়া আঁটি দুই চাবা পদম ক্ষিপ্তভাবে সঙ্গে টানিয়া লইয়া কাধার পুঁতিয়া চলে এবং ক্রমে ক্রমে পিছনে হটিয়া যায়। শ্রেণীবদ্ধ রোপণীর অদভুত মধ্য একটা ছন্দ ও তাল আছে।

বেলা ক্রমে বাড়িতে থাকে, কুকিয়ার পা ভারী হইয়া

আসে, হাত আর চলে না। রোপার কাজে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন, দুর্বল কৃকিয়া তাই সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কৃকিয়া থাকিতে থাকিতে মাজাটা টনটন করিয়া ওঠে, কৃকিয়া মাঝে মাঝে সোজা হইয়া দাঁড়ায়। পাশের রোপণী বিরক্তির সঙ্গে বলে, “হাঁ গা, ষড়ি ষড়ি খাড়া হয়ে দেখছ কি?”

কৃকিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ে, শরীরের নিঃশেষিত শক্তিরূপে প্রয়োগ করিয়া সে রূপিয়া চলে। সে জানে, এ কাজে কঁাকি ধরা পড়িলে ভবিষ্যতে আর তাহার রোপার কাজ মিলিবে না। এক মাস রোপার কাজ চলিবে, এই এক মাসের বোজকার সে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না। কৃকিয়ার দেহের ও মনের মধ্যে বোঝাপড়া চলিতে থাকে, দেহ খামিয়া বাইতে চায়, মন তাহাকে চাবুক মারিয়া ক্লান্ত পশুর মত চালাইয়া লয়।

স্বর্ঘ্য ঠিক মাথার উপর আসিতেই রোপণীদের খাইবার ছুটি হয়। এতক্ষণে শিশুর পাল কঁাদাকাটি শুরু করিয়াছে, ছুটি মিলিতেই মায়েরা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেমেয়েদের কোলে তুলিয়া নেয়। কৃকিয়া শব্দে দীর্বে আসে, পরসারকে কাছে টানিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়ে, মাথাটা তাহার বিম্বিম করিতে থাকে। তুলসী মহতো হাঁক পাড়ে, “ওগো রোপণীরা, খেতে এস।”

প্রথা এই যে, রোপণীরা দুপুরে খাওয়া পাইবে ও বিনাশ্বে তিন সের ধান পাইবে। মহতোর বাড়ীর মেয়েরা বুড়ির ভিতর হাঁড়ি-কুড়ি বসাইয়া ভাতডাল ইত্যাদি ক্ষেতের ধারে লইয়া আসিয়াছে, রোপণীদের খাবার ব্যবস্থা সেইখানেই হইয়াছে। ডাক শুনিয়া তুলসীর রোপণীরা উঠিয়া পড়ে। কৃকিয়ার যেন উষ্ণিষবৎ ক্ষমতা নাই, কোনমতে সেও উঠিয়া পড়ে। অনেকেই নিজের নিজের খাইবার থালাবাসন লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে ডালভাত তুলিয়া দেওয়া হয়, যাহারা আনে নাই, তাহাদের গৃহস্থের থালাবাসনেই দেওয়া হয়। হাসিগল্পে সকলেই খাইতে বসে, কৃকিয়া মহতো-গৃহিণীকে বলে, “আমি এখানে বসে খাব না গা, ভাত বাড়ী নিয়ে যাব।”

“তা যাও গো।” বলে মহতো গৃহিণী, “তবে চটপট চলে এস, দেবী করো না যেন, বড় ক্ষেতটাই পড়ে আছে।”

ভাতের থালা তুলিয়া লইয়া কৃকিয়া বলে, “যাব আর চলে আসব মা।”

ঘরে আসিয়া কৃকিয়া অর্ধেক ভাত তিলকাকে খাওয়াইয়া দেয়—রোগা মানুষ, বেশী খাইতে পারে না। বাকি অর্ধেক ছেলেকে সঙ্গে লইয়া সে খাইতে বসে। পেট না ভরিলেও

পেটে ভাত পড়ায় দেহে স্বস্তি অনেকখানি ফিরিয়া আসে। ঢক ঢক করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া তাড়াভাড়ি থালাখানা মাকিয়া নেয়, তার পরে ছেলের হাত ধরিয়া আবার সে ক্ষেতে ফিরিয়া আসে।

রোপার কাজ চলিতে থাকে। এ বেলা কৃকিয়ার তেমন কষ্ট হয় না, মাথাটাও বিম্বিম করে না। সকলের সঙ্গে প্রায় তাল রাখিয়াই সে রূপিয়া চলে।

বহু গৃহস্থেরই রোপা হইতেছে, আশেপাশে বহু ক্ষেতেই মেয়েদের ভিড়। রূপিতে রূপিতে রোপণীরা গান ধরে, একটানা একটা মিষ্টি সুরে মাঠ মুখবিত হইয়া ওঠে। মহতো-গিন্নী বলে, “ওগো রোপণীরা গান ধর, গানের সঙ্গে হাতের কাজ বড় এগোয় গো।”

এ উহাকে ঠেলিয়া বলে, “তুই ধর গো।”

কিন্তু কেহই প্রথমে ধরিতে চায় না। ইহাদের মধ্যে যে প্রবীণা সে ঠেস দিয়া বলে, “হ্যাঁ গো, এত ঠেলাঠেলি কেন, গান ধরবে তার আবার এত বাহানা কিসের?”

একজন বলে, “তুমিই ধর না গো ভৌজা?”

প্রবীণা গান ধরে, আগে সে এক পদ গায়, আর সকলে পরে একসঙ্গে সেইটা আবার গায়। সেই গানের তালে তাল রাখিয়া রোপণীরা রূপিয়া চলে। কৃকিয়া নিঃশব্দে হাত চালায়, হৃদয়ের যে সরসতা হইতে মুখে গান বাহির হয় তাহার হৃদয়ে সে সরসতা বিন্দুমাত্রও নাই।

বেলা পড়িয়া আসে, রোপণীরা কাজে ঢিল দেয়, হাতের চেয়ে মুখ চলে বেশী। স্বর্ঘ্য দিগন্তে হেলিয়া পড়িতেই তাহারা ক্ষেত হইতে উঠিয়া পড়ে। সারাদিন তাহার ধর ছাড়িয়া বাহিরে আছে, এখন বাড়ী খাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া ওঠে। কলরবের অন্ত নাই, দিনের মজুরি তিন সের ধানের জন্য তুলসী মহতাকে তাগিদ দিতে থাকে।

মহতো বলে, “চল না গো আমার বাড়ী হয়ে, ঐ পথেই ত যাবে সব, ঘর থেকে ধান দিয়ে দেব।”

কেহ আপত্তি করে না মহতোর পিছনে পিছনে ঘরের পথ ধরে।

ধান লইয়া কৃকিয়া যখন বাড়ী আসে তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। উঁকি মারিয়া সে তিলকাকে একবার দেখিয়া নেয়, তার পরে পরসারকে বরজার সামনে বসাইয়া কুসার করিয়া এক সের আশ্বাজ ধান লইয়া তাড়াভাড়ি ময়ূরার বাড়ী যায়। ধান কুটিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। ঘরে তেল নাই, ডিবা জালিতে পারে না, অন্ধকারে হাতড়াইয়া ছ'খানা ষড়ি টানিয়া উত্তুনে আগুন জালিল। এইবার সেই আগুনের ক্ষীণ আলোয় তড়িৎভিত্তি ভাত চড়াইয়া দেয়, কৃকিয়া

খায়ে খায়ে উঠুনে জ্বাল ঠেলে, পরসাদ উৎসুক নয়নে ভাতের  
হাঁড়ির দিকে তাকাইয়া থাকে।

২২

চারদিন তুলসী মহতের খান কুপিয়াছে, তিন দিন  
কুপিয়াছে মাণিক মুদীর, আজ কুকিয়া হরি সিংএর খান  
কুপিতে যাইবে। তিলকাকে ছ'মুঠো বাসিতাত খাওয়াইয়া,  
ছেলে ও নিজে ছ'গ্রাস খাইয়া কুকিয়া মাঠে যাইবার জন্ত  
প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তাহার আজ অনেকটা গোছগাছ,  
খালি হাঁড়িগুলি আর এলোমেলো বরময় ছড়াইয়া নাই, এক  
পাশে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; সব হাঁড়ি শূন্যও নয়, দুই-  
একটার মধ্যে কিছু খানও সঞ্চিত আছে।

হেলেকে কোলে লইয়া কুকিয়া তিলকাকে বলে, “আমি  
চললাম গো।” তার পরে তড়িৎপড়ি ঘরের বাহির হইয়া পড়ে।  
তিলক শূন্যঘরে খাটির উপর শুইয়া পড়িয়া থাকে।  
কয়েকদিন উপরি উপরি ছ'বেলা পেটে অন্ন পড়ায় তিলকার  
দেহের ও মনের দুর্বলতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, চোখে  
আর অবসাদের ঘোর নাই। গরীবের সবচেয়ে মারাত্মক  
ব্যাধি হইতেছে খালি পেট, অত্যাচার ব্যাধি তাহার তুলনায়  
কিছুই নয়। খাইতে না পাইয়া তিলকা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া  
পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের খাও বাড়িয়া যাইতে  
ছিল, আবার খাইতে পাইয়া জীবনোন্মুক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে  
সঙ্গে বা কমিয়া আসিতেছে।

তিলকা মাথাটা তুলিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতরটা তাকাইয়া  
তাকাইয়া দেখে। অতিপরিচিত পুরনো পরিবেশ, অঞ্চ  
কেমন যেন নতুন বলিয়া মনে হয়। ঘরের কোণে সেই  
উঠুন, তার পাশে মেটে কলসী দুটি, ওপাশে সারিবন্দী  
কয়েকটা মেটে হাঁড়ি, কাঠের ভাঙা বাস, একখানা ভাঙা  
কুলা। কুলুঙ্গিতে কালিমাখা ডিবাটা। এসব যেন সে  
বহুদিন পরে আবার দেখিতেছে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া  
আসিলে মানুষ যেমন করিয়া নিজের খবর-দুয়ার আঙিনার  
দিকে নতুন করিয়া তাকায়, তিলকা আজ নিজের বরখানির  
দিকে সেইভাবে তাকাইয়া দেখে। গত বছর খাপরার চাল  
মেরামত করা হয় নাই, তাহাতে অসংখ্য ছিদ্র, বাহিরের  
প্রথম আলো সেই অসংখ্য ছিদ্রে বলমল করে, তিলকা মুগ্ধ  
হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া থাকে।

এতদিন তিলকা যেন একটা হুঃখপ্র দেখিতেছিল,  
তাহার মধ্যে ছিল না কোন শৃঙ্খলা, কোন স্পষ্টতা, আজ  
তাহার এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আসিয়াছে,  
সেই হুঃখপ্রের অনেক অংশ সে তুলিয়াও গিয়াছে। আজ সে

শুইয়া শুইয়া অত্যন্ত দিনগুলির ছিন্নশ্রদ্ধ জোড়া দিবার চেষ্টা  
করে।

দুপুর বেলা কুকিয়া ভাতের থালা লইয়া ঘবে আসে।  
কলসীতে জল নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি জল আনে,  
তিলকাকে খাওয়ায়, তার পরে ছেলেকে সঙ্গে লইয়া নিজে  
খাইতে বসে। তিলকা তাকাইয়া তাকাইয়া কুকিয়াকে  
দেখে, তাহার ব্যস্ত চুটাছুটি, তাহার ওঠাবসা তিলকার  
চোখে অদ্ভুত লাগে। হঠাৎ সে বলে, “এদিকে আস গো।”

কুকিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়, তিলকার কণ্ঠস্বরে এমন সুর  
সে অনেকদিন শোনে নাই, সে উঠিয়া তিলকার কাছে  
আসিয়া দাঁড়ায়।

কুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া তিলকা বলে, “তোকে  
বড় রোগা দেখাচ্ছে।”

কুকিয়ার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া যায়, কত  
দিন পরে তিলকা আবার তাহার দিকে ভাল করিয়া  
তাকাইয়া দেখিয়াছে! কিছুক্ষণ কুকিয়া কোন জবাবই  
দিতে পারে না, উদ্বেলিত হৃদয়টাকে সংযত করিতে চেষ্টা  
করে, তার পরে বলে, “বেশ ত আছি গো।”

তিলকা কুকিয়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে,  
সেখানে কি যেন সে দেখিতে পায়, কিসের যেন সে অর্থ  
বুঝিতে পারে না। কুকিয়া অস্বস্তি বোধ করে, একটু পরে  
সরিয়া যায়, বলে, “আমি যাই গো, হ'রসিংহের খানক্ষেত  
মাঠের ওপারে, বড় দুব, যেতে অনেকটা সময় লাগবে।”

তিলকা বলে, “যা তা হলে, পরসাদকে রেখে যা আমার  
কাছে।”

পথ চলিতে চলিতে কুকিয়া আজ গাঁয়ের লোকের সঙ্গে  
ডাকিয়া কথা কয়। ‘আজ মনটা তাহার ভারি হালকা।  
এতদিন সে যেন নিজের মধ্যে একাকী বন্দী হইয়াছিল,  
বাহিরের আলো-বাতাস সেখানে প্রবেশ করিবার পথ ছিল,  
না, আজ হঠাৎ বন্দীশালার দরজা যেন খুলিয়া গিয়াছে,  
সেখানে বাহিরের আলো-বাতাস ঢুকিয়া পড়িয়াছে, জগতের  
সঙ্গে আবার তাহার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। পথে  
টুকনীকে দেখিয়া কুকিয়া ডাকে, “কাথায় চলেছিস বোন,  
কার খান কুপছিস গো?”

টুকনী জবাব দেয় না, কুকিয়ার ডাক সে শুনিয়াও শোনে  
না। তাড়াতাড়ি কুকিয়া তাহার কাছে গিয়া হাত চাপিয়া  
ধরে, হাসিয়া বলে, “ডাকছি যে, শুনতে পাসনে?”

টুকনী গভীরভাবে বলে, “কি ভাগ্যি, আজ তোমার  
নজরে পড়লুম ভোঁজী, সেদিন কত ডাকলুম, সাড়াও দিলে  
না।”

হুই হাতে টুকনীকে জড়াইয়া ধরিয়া কুকিয়া বলে, “রাগ

করিশনে লক্ষী বোন, আমি কি মানুষ ছিলুম গো, আমি যে পুত্রও অধম হয়েছিলুম।”

টুকনী কুকিয়াব যুথের দিকে তাকাইয়া দেখে, আশ্চর্য হইয়া বলে, “কি চেহারা হয়েছে তোব ভোজী, অসুখ করেছে নাকি গো?”

হাসিয়া কুকিয়া বলে, “এ পোড়া শরীরে অসুখও হয় না ভাই, অসুখ হয়ে কত লোক মরে, আমার মরণ নাই।”

কুকিয়াকে একটা থাকা দিয়া টুকনী বলে, “মরবি কেন গো, তোব কি মরবার বল হয়েছে?”

হাত ধরাধরি করিয়া দুই জনে গল্প করিতে করিতে মাঠে আসিয়া উপস্থিত হয়।

“হাঁ গো, চমন তেলির ক্ষেতখানা পড়তি আছে কেন গো?” খান রূপিতে রূপিতে পাশের রোপণীকে প্রশ্ন করে কুকিয়া।

“চমনায়া হু’ভাই পৃথক হয়ে গেছে যে।” জবাব দেয় পাশের বউটি।

“তা ত জানিনে।” বলে কুকিয়া।

“হ্যাঁ গো, ওরা হু’ভাই পৃথক হয়েছে, চমনের এক জোড়া বলদ আছে, তার ভাগের ক্ষেত চাষ হয়ে গেছে, ছোট ভাইটার হাল-লালল নাই, এব-ওর কাছে চেয়েচিন্তে কোন মতে চাষ করছে, ভাই চাষ পিছিয়ে পড়েছে।” বলে পাশের বউটি।

এতদিন কুকিয়া খান রূপিতে আসিয়াছে, খান রূপিয়া চলিয়া গিয়াছে, আশেপাশে কাহারও ক্ষেতের দিকে তাকায় নাই, আজ সে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, এত বড় মাঠ সবটাই প্রায় বোণা হইয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে হু’একটি ক্ষেত মাত্র পড়তি আছে। এই সবুজের সমারোহ দেখিয়া তাহার মন আজ খুশী হইয়া ওঠে, বলে, “কই গো, আজ তোমরা গান ধরবে না?”

একজন জবাব দেয়, “খরলৈ বা কি, তুমি ত গাও না।”

কুকিয়া বলে, “আমি ভাল পাইতে পারি নে বলে গাই নে। তা ধর না গো তোমরা।”

মেয়েরা গান ধরে—

উঁচি কুড়িষয়া, পুরবে দুহাবিয়া

হল হল চুকহে বাতাস।

পিয়োয়া এই শান নিরমোহিয়া

চাটিও না দেলকেই ভিড়কা।

পিয়োয়া গেলেই পরবেশীয়া

সঁচলো যৌবনোয়া গেলেই বহয়,

আপনেও না আইলা পিয়োয়া,

না চিঠি ভেজলা।

অর্থাৎ—বরখান আমার উঁচু, তাতে আবার পূর্বদিকে দরজা, হু হু করে বাতাস চুকছে। প্রিয় এমনই নিরম যে, দরজাটা বন্ধ করবেও দিবে গেল না। প্রিয় চলে গেল পরবেশে, ভরা যৌবন আমার বয়ে গেল। নিজেও এল না প্রিয়, চিঠিও দিল না।

আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসে, দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি নামিয়া পড়ে। রোপণীঘের অনেকেরই ছাতা আছে, অথবা পাতায়-বোনা ছোপি আছে, কুকিয়াব কিছুই নাই—সে ভেজে, ভিজিতে আজ তাহার ভালই লাগে, সে ভিজিতে ভিজিতে গান গায় :

সঁচলো যৌবনোয়া গেলেই বহয়।

২৩

কয়েকদিন পরে আজ কুকিয়াব ছুটি, আজ কেহ তাহাকে খান কাটিতে ডাকে নাই। ছুটি বলিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া নাই, আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া সকাল হইতে তাহার অতি মলিন দুই-একখানা শাড়ী উল্লুনের ছাই দিয়া সেদ্ধ করিয়াছে। একটু বেলা হইতেই শাড়ীসমেত হাঁড়িটি লইয়া কাচাকুচি করিতে বাঁধে বাইবে এমন সময় তিলকা ডাকিয়া বলে, “একবাংটি এদিকে আয় ত।”

কুকিয়া বলে, “কেন গো, কি বলছিস, বাঁধে যাচ্ছি কাপড় কাচতে।”

তিলকা ব্যগ্রভাবে বলে, “আয় না একটু, কাজ আছে।”

হাঁড়িটি রাখিয়া কুকিয়া তিলকায় কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তিলকা তাহার শীর্ণ হাতখানা কুকিয়াব দিকে বাড়াইয়া দিয়া হাসিয়া বলে, “একটু ধর আমি উঠব।”

আশ্চর্য হইয়া কুকিয়া বলে, “উঠবি কেন?”

তিলকা বলে, “আমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াব, ধর দিকিন আমাকে।”

অবাক হইয়া যায় কুকিয়া, বলে, “পারবি যেতে বাইরে?”

“হ্যাঁ গো পারব, আমি তোব কাঁধে তব দিবে আস্তে আস্তে যেতে পারব, পাটা আমার অনেক হালকা হয়েছে।”

কুকিয়া তাহার হাত ধরে, তিলকা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসে, তার পরে সন্তর্পণে ভাল পাখানা নামাইয়া দিয়া তাহার উপর ভর দিয়া ঝাড়া হয়। কুকিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে শক্ত করিয়া ধরে, তিলকা যে আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে চায় না। তিলকা কুকিয়াব কাঁধে ভর দিয়া বলে, “এইবার চল।”

কুকিয়া সাবধানে আস্তে আস্তে চলে, তিলকা আহত পা

খানি আলগোছে কেলিয়া এক পা এক পা কবিতা অগ্রসর হয়। ধীরে ধীরে তাহার বনের বাহিরে আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়।

“আমাকে ছেড়ে দে গো, আর চট করে খাটিয়াখানা বাইরে নিয়ে আর।” বলে তিলকা।

রুকিয়া তাহাকে ছাড়িতে সাহস পায় না, বলে, “হ্যাঁ গো, পারবি দাঁড়াতে, পড়ে যাসু যদি?”

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, “না পড়ব না, তুই ছেড়ে দে।”

তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া রুকিয়া পাশেই দাঁড়াইয়া থাকে, তিলকা পড়িয়া যায় না, সে দাঁড়াইয়া শিশুর মত হাসিতে থাকে। রুকিয়া ছুটিয়া গিয়া হালকা খাটিয়াখানা তাড়াতাড়ি বাহিরে আনিয়া পাতিয়া দেয়, তিলকা তাহার উপর বসিয়া পড়ে।

বৃষ্টিধোয়া পৃথিবীর উপর বোম পড়িয়া বলমূল করে। সেদ্ধ কাপড়ের তাঁড়িটি মাথায় লইয়া রুকিয়া বাসের দিকে চলে। পথের বাঁ-পাশে মত্ত বড় মাঠেই ঘান বোপা হইয়া গিয়াছে, সে ঘন অসংখ্য খোপকাটা একটি নরম গালিচা, কোন খোপকাটা গাঢ় সবুজ, কোনটা হালকা সবুজ, কোনটা কিকে সবুজ, কোনটা আবাব সবুজের সঙ্গে হলুদ মেশান। যে ক্ষেত আগে বোপা হইয়াছে তাহার ঘানগাছগুলি মাটিতে শিকড় পুঁতিয়া গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, যে ক্ষেত হালে বোপা হইয়াছে তাহার ঘানগাছ এখনও দুর্বল, এখনও ক্ষেত হইতে বস টানিতে পারে নাই; তাই তাহা কিকে সবুজ। পথের ডান পাশে মাঠ, কখনও উঁচু, কখনও নীচু হইয়া দুবে শালবনে গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে আম ও মহুয়া গাছ। মাঠের লাল-কঁকর ঢাকিয়া ঘাস গজাইয়াছে, আম-মহুয়ার স্ত্রী ফিরিয়াছে। সন্ধ্যা পথ ধরিয়া বাসের দিকে চলিতে চলিতে রুকিয়া দুই চোখ ভরিয়া সবুজের এই সমারোহ দেখে। একটু পরে সে বাসের ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। কৈশোরের শুকপ্রায় বাধ শ্রাবণে কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, বোধ পড়িয়া কালো জল ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। মাথার হাঁড়িটি ঘাটে নামাইয়া রুকিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখে। বাসের ওপারে ঢালু মাঠ, তার পরে জঙ্গল, জঙ্গলের পিছনে দুবে নীল পাহাড়। ঐ নীল পাহাড়ের ওপাশে রুকিয়ার নাইহার (বাপের বাড়ী), বনে-বেরা ছোট্ট গ্রাম। শিশুকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কৈশোরে খুব বাড়ী আসিয়া সে ঐ দুবের গ্রামখানির জন্তু কাঁদিয়া চোখ ফুলাইত। আজ সেখানে রুকিয়ার আপনার বলিতে কেহ নাই, মা-বাপ মরিয়া গিয়াছে, একটি ভাই ছিল, সে বহু দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে,

তাহার কোন ঠিকানা নাই। তবু দুবের পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রুকিয়ার মন কেমন করিয়া ওঠে।

কাপড় কাচিয়া বাড়ী ফিরিয়া রুকিয়া দেখে তিলকা খাটিয়ার উপর কাত হইয়া শুইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে। ভিজে কাপড় বোম দিয়া সে ববে চুকিয়া বাসার আয়োজন করে। এক ফাঁকে বাহিরে আসিয়া বলে, “হ্যাঁ গো, সারাধিন কি বাইরে বসে থাকবি? তিতরে যাবি নে?”

তিলকা বলে, “কতদিন পরে আজ আলো-বাতাসে এসে বসেছি গো, ভেতরে বেতে আর মন হচ্ছে না।”

রুকিয়া আর কিছু না বলিয়া বনের কাছে চলিয়া যায়।

তিলকার চোখে পৃথিবীটা আজ বড় নতুন, বড় সুন্দর লাগে। সামনের আনগাছটার দিকে সে তাকাইয়া থাকে, আজন্মপরিচিত এই গাছটার দিকে ভাল করিয়া কোন দিন সে তাকায় নাই, আজ তাকাইয়া তাকাইয়া সে দেখে। অনেক দিন পরে কোন প্রিয় আত্মীয়কে দেখিলে লোক যেমন খুশী হইয়া ওঠে, আনগাছটার দিকে তাকাইয়া তিলকা তেমনি খুশী হইয়া ওঠে। মাথার উপরের আকাশটাও আজ যেন নীচে আসিয়া তাহার মন স্পর্শ করিয়াছে। এতদিন ধরিয়া দেহ ও মনের যে দুর্ব্বহ কষ্ট সে ভোগ করিয়াছে আজ বাহিরের আলো-বাতাসে আসিয়া তাহা একেবারেই ভুলিয়া যায়।

পরসার আসিয়া খাটিয়ার পাশে দাঁড়ায়। তিলকা তাহার কচি হাতখানা ধরিয়া টানে, পরসার আরও কাছে সরিয়া আসে। তিলকা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া ওঠে, কি শীর্ণ, কি শুকনো তাহার ছেলের কচি মুখখানা। বনের মধ্যে আবছা অন্ধকারে সে পরসারকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, আজ বাহিরে আসিয়া আলোর মধ্যে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখে। চুলগুলি তাহার প্রায় জট পাকাইয়া গিয়াছে, চোখ দুটি কোটরাগত, শুকনো মুখে লাগণ্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে আছে একটা কাতরতার ছাপ। হাত-পাগুলি শীর্ণ, সন্ধ্যা বকের পাঞ্জর একটি একটি করিয়া গণিতে পারা যায়। তিলকার বুকটা হঠাৎ ব্যথায় ভরিয়া ওঠে, মনের চিন্তা এলোমেলো হইয়া যায়। যে দুই-আড়াই মাস সে খাটিয়ায় পড়িয়াছিল সেই দীর্ঘ সময়ের একটি স্পষ্ট ধারণা সে করিতে চায় কিন্তু পাবে না, মাঝে মাঝে এক-একটি ফাঁক ছুটিয়া যায়। যে ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেই ঝড়ের ঝাপটায় যে ইহারাও ধসে হইতে চলিয়াছিল সেটুকু তিলকা বুঝিতে পারে। তিলকা তাহার শীর্ণ পাঞ্জরার উপর শিশুর শীর্ণ মুখখানা চাপিয়া ধরে। দীর্ঘ-কাল খাটিয়ায় পড়িয়া থাকার জন্তু সে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ



করে, রোগটা যে তাহার ইচ্ছাকৃত নয় একথা মন যেন সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে চায় না।

রুক্মিণী বাহিরে আসিয়া বলে, “ভাত হয়েছে, খাবি চল।”

তিলকা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, “আর হস্তাধানেক পরেই আমি চলতে-ফিরতে পারব গো, তার পরে একটা কাজটাজ জোগাড় করে নেব।”

রুক্মিণী হাসিয়া ফেলে, বলে, “আজ ত হবে বর থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেকুলি, এখনই কাজের ভাবনা!”

তিলকা বলে, “হ্যাঁ গো, আমার মন বলচে এইবার আমি ভাল হয়ে উঠব।”

রুক্মিণী তিলকার হাত ধরে, তিলকা রুক্মিণীর কাঁধে ভর দিয়া ভিতরে বাইতে বাইতে বলে, “আমি যদি এমনি করে হুঁশীক খেতে পাই তা হলে হস্তাধানেক পরেই ঠিক চলতে পারব, তুই দেখে নিস।”

২৪

এক শগুহ কাটিয়া গিয়াছে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা; ধান রুপিয়া বরে ক্রিান্তে রুক্মিণী দেখে তিলকা পথে দাঁড়াইয়া আছে। রুক্মিণীকে দেখিয়া তিলকা আরও একটু আগাইয়া আসে, উৎসাহের সঙ্গে বলে, “এই দেখ গো, এতটা পথ আমি চলে এসেছি।”

ততক্ষণে রুক্মিণী তিলকার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, ভয়ে ভয়ে বলে, “তুই পাগল, একা একা কেন এলি! আমি ধরে ধরে যাচ্ছি, ফিরে চল।”

রুক্মিণী তাহাকে ধরিতে যায়, তিলকা বাধা দিয়া বলে, “ধরবি কেন গো, এই দেখ আমি কেমন চলে যাব।”

তিলকা ধীরে ধীরে খোঁড়াইয়া চলে, কখনও টাল খায় আবার সামলাইয়া নেয়, যেন একটি শিশু প্রথম চলিতে শিখিয়াছে। রুক্মিণী পিছনে পিছনে আসে, তিলকার অদ্ভুত চলা দেখিয়া তাহার হাসি পায়, পথযাত্রাতে আবার স্বস্তিতে বুকটা ভরিয়া ওঠে।

বাত্রে রান্না-খাওয়া শেষ করিয়া রুক্মিণী আজ তিলকার খাটিয়ার একপাশে আসিয়া বসে। দরজা খোলা, আকাশে গুরুগুরু আধখানা চাঁদ উঠিয়াছে; ঘরের ভিতরেও ধানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। তিলকা রুক্মিণীকে প্রশ্ন করে, “তোমার বুঝি ঘুম পাগনি?”

“না” বলে রুক্মিণী।

তিলকা বলে, “আজ আমারও ঘুম পাচ্ছে না, কত কথা যে ভাবছি।”

উদ্ভ্রান্ত হইয়া রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করে; “কি ভাবছিল?”

রুক্মিণী কাছে সরিয়া আসিয়া তিলকা বলে, “গায়ে আর একটু জোর পেলেই আমি কাজ করতে পারব, তাই ভাবছি, গায়ে ত কাজ পাব না। কাতরাস গেলে কয়লার খাড়ে কাজ মিলবে, কিন্তু তাকে একলা রেখে যেতে আমার মন হবে না।”

কাতরাসের নামে রুক্মিণীর বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে, বলে, “না গো না, কাতরাসে তাকে যেতে দেব না, এই শরীর নিয়ে বিদেশে গেলে তুই মরে যাবি।”

“কিন্তু এ সময়ে গায়ে যে কোন কাজ মেলে না গো।” বলে তিলকা।

রুক্মিণী তা জানে, অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিবার সময়, দু’চারদিন কাজ মিলিলেও মিলিতে পারে, তা বাধে গাঁয়ের ভূমিহীন বাসিন্দারা দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকে। রুক্মিণী তিলকার কথার কোন জবাব দেয় না, নিঃশব্দে বসিয়া ভাবে।

হঠাৎ তিলকা সজাগ হইয়া ওঠে, বলে, “হ্যাঁ গো, শুনেতে পাচ্ছি গান গাইছে? কাদের বাড়ী গো?”

রুক্মিণীও শুনিতে পায়, দূর হইতে মিলিত নারীকণ্ঠের গান ভাসিয়া আসে। রুক্মিণী চমকাইয়া ওঠে, এ গানের সুর ও ভাষা যাহতে তাহার অন্তরকে আলোড়িত করিয়া দেয়, বিস্মিত কণ্ঠে বলে, “করমার গান গাইছে গো, করমা যে এসে পড়েছে সেকথা দেখ ভুলেই গেছি।”

শুনিয়া তিলকা উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বলে, “তাই ত গো, ধান রোপা হয়ে গেল, করমা ত এসে পড়বেই।”

করমা হইতেছে এ দেশের জনসাধারণের একটা প্রধান পূর্ব। ধান রোপা যখন শেষ হইয়া যায়, ভাদ্র মাস আসিয়া পড়ে, নদী নাল, বাধ-পুকুর কানায় কানায় ভরিয়া থাকে, অথচ বর্ষার বর্ষণ কমিয়া যায়, তখন স্বত্তরবাড়ী হইতে মেয়েরা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাইয়ের কল্যাণে তাহারা করমের পূজা করে। নাচ ও গান এ পূর্বের প্রধান অঙ্গ, তাই করমপূজার কয়েকদিন নবমী ও দশমীর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মেয়েরা সারারাত মাধলের তালে নাচে আর গান গায়।

রুক্মিণী কান পাতিয়া গান শোনে, অতীতের কত কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বত্তরবাড়ী আসিলে বাপের বাড়ীর লজ্জা প্রাণ কাঁদিত। ধান রোপা হইয়া গেলেই সে রোজ বাপের বাড়ীর লোকের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া থাকিত। যেদিন কেহ তাহাকে লইতে আসিত সেদিন তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। মনে পড়ে, একবার তাহাকে লইতে কোন লোক আসিল না,

গামের মেয়েরা শব্দবাবড়ী হইতে একে একে কিরিয়া খাসিতে লাগিল, সে কাঁদিয়া দুই চোখ লাল করিয়া ফেলিল। পূর্ব হইতে যে পথটি মহাশয়লা দিয়া গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছে দিনের মধ্যে একশ'বার সেই পথের দিকে সে আকুল হইয়া তাকাইয়া থাকিত। পরব আসিয়া পড়িল অথচ শেষ পর্যন্ত কেহ যখন তাহাকে লইতে আসিল না তখন বার বছরের মেয়ে বিকালের দিকে শান্তডৌর চোখ এড়াইয়া বাপের বাড়ীর পথ ধরিয়া ছুটিল। সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিল তখন বাপের বাড়ী অনেক দূর; পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া শালবনের মধ্য দিয়া দ্রুতগতি, সেই পথ ধরিয়া সে ছুটিতে লাগিল, ভয় পাইল না। এক প্রহর রাত্রি তাহাদের বাড়ীর আঙিনায় তখন নাচ চলিতেছে এমন সময় সে ছুটিয়া সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল।

“ওমা, একে গো, আমার পাগলী বেটি যে!” এই বলিয়া মা আসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। আজ তাহার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নিক্রুদেশ, আজ তাহার বাপের ভিত্তি পর্যন্ত সোপ পাইয়াছে, কুকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

তিলকা কুকিয়াকে একটা ঠেস দিয়া বলে, “কি ভাবছি গো?”

কুকিয়া বলে, “না, কিছু না, আমার খুম পাচ্ছে।”

“তবে যা, শোণে যা” বলে তিলকা।

কুকিয়া উঠিয়া গিয়া খয়ের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তার পরে এক কোণে বিছান কাঁধটির উপর গিয়া ছেলেকে কোলে টানিয়া শোয়। কিন্তু শুইয়া সে খুমায় না, ছেলেকে বেলার চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে, সে চোখ বুন্ধিয়া সেই শব্দ কথা ভাবে। তাহাদের সংসারে গুটিতিনেক ছাগল ছিল, একটু সেয়ানা হইলেই সে ছাগল চরাইত। সকাল বেলা নিজের ছাগল তিনটি লইয়া অন্ত্রাত্ত বাথাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গ্রামের পাশে জঙ্গলে চলিয়া যাইত, সেইখানে ছপুর্ব পর্যন্ত ছুটাছুটি, হৈ চৈ ও ছাগল সামলাইয়া কাটিত। ক্ষুধা পাইলে গ্ৰীষ্মকালে পিয়ালের টুক ফল ও শীতকালে জংলী ফল সংগ্রহ করিয়া খাইত, তার পরে নদীতে নামিয়া পোট ভরিয়া লল খাইত। ছপুর্বে বাড়ী ফিরিয়া বরাদ্দমত ভাত বা গুপসি খাইয়া আবার ছাগল চরাইতে বাহির হইত, তার পরে স্বয়ং পাহাড়ের আড়ালে হেলিয়া পড়িতেই ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। জুটিলে কোনদিন লাইত কোনদিন খাইত না খাটিয়া এক প্রান্তে শুইয়া গড়িতেই শারাদিনের ক্লান্তিতে সে অথোবে ঘুমাইয়া পড়িত।

কুকিয়া যেন অতীতের দিনগুলি ছবির মত পরিষ্কার

দেখিতে পার। আহা, কি আনন্দেই না সে সময়টা কাটিয়াছে! মাঝে মাঝে বিপদ-আপদ ঘুঞ্জে যে আসে নাই এমন নয়। একবার তাহার বসন্ত হইয়াছিল, বাঁচবার আশা ছিল না, সর্বাঙ্গে বা লইয়া শারাদিন আঙিনায় শুইয়া থাকিত, আর তাহার মা নিমগাছের পাতাসমেত একটা ডাল লইয়া মাঝে মাঝে হাওয়া করিত। সে যাত্রা কোন রকমে সে বাঁচিয়া ওঠে। আর একবার তাহার দুইটি ছাগলকে নেকড়ে বাঘ মারিয়া ফেলে। রোজকার মত সেদিনও দল বাঁধিয়া তাহারা শালজঙ্গলে ছাগল চরাইতেছিল। সেটা শীতকাল, হু হু করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাস বহিতেছিল, নেংটি বা পুতলি (ছোট মেয়েদের কোমরে জড়াইবার ঠেটি কাপড়) ছাড়া তাহাদের দেহের কোথাও আর আবরণ ছিল না, তাই একটা উঁচু পাথরের আড়ালে সকলে জমা হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ গোটা পাঁচেক নেকড়ে বাঘ আসিয়া এক মুহূর্তে তাহার দুইটি ছাগলকে মারিয়া ফেলে। চাঁৎকার-চৈতামেচি করাতে গ্রাম হইতে লোক আসিয়া পড়ে কিন্তু ততক্ষণ মরা ছাগল দুইটিকে লইয়া নেকড়ের পাল উধাও হইয়া যায়।

সেদিন তাহার বড় ঘুঞ্জে হইয়াছিল, শারাদাত কাঁদিয়াছিল।

রাত অনেক হইয়া যায়, অদূরে করমার গান বাজিয়া যায়, কুকিয়াও ঘুমাইয়া পড়ে।

২৫

সকাল বেলা কুকিয়া বুড়িতে কয়েক সের ধান লইয়া পাড়ার দিকে যাইতেছে দেখিয়া তিলকা প্রশ্ন করে, “কোথায় চললি, আজ বোধ হয় ধান রুপতে যাব নে?”

কুকিয়া বলে, “পাঁয়ের ধান রোপা শেষ হয়ে গেছে, কে আর ভাকবে বল। পাঁচ সের ধান নিয়ে বেনোয়ারীর মার বাড়ী যাচ্ছি, কুটে নিয়ে আসি। বরং ত চাল নেই, ধানই আছে কয়েক সের।”

সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত আসিয়া তিলকা বলে, “তা যা, কুটে নিয়ে আয়, আপত চালের ভাত বেশ লাগে যেতে।”

কুকিয়া ধানের টুকরি মাথায় তুলিয়া চলিয়া যায়, তিলকা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পথের পাশে অংগাছটার নীচে গিয়া বসে। আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘের লেশ নাই, সকালের সূর্য্য সবুজ পৃথিবী আলমস করিতেছে। তিলকার মনটা ধীরে ধীরে খুশী হইয়া ওঠে। মাথায় বেগাতির বুড়ি লইয়া বুড়ো শিউচরণ ঘুরীকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া তিলকা হাঁক দেয়, “শিউচরণা গো, ও শিউচরণা!”

বুড়ো শিউচরণ মুদী থমকিয়া দাঁড়ায়, সে কানে কম শোনে তাই হাঁকটা কোনদিক হইতে আসিতেছে তাহা ঠাহর করিবার জ্ঞান চারিদিকে তাকায়। তিলকা এইবার হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকে। তিলকাকে দেখিয়া মুদী আগাইয়া আসে, হাসিয়া বলে, “এই যে ভাই, কেমন আছি গো?”

তিলকা তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলে, “ভাল আছি দাধা, বড্ড ভুগে উঠলুম।”

বেশাতির ঝুড়িটা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া শিউচরণ বলে, “জানি ভাই সব, তা ভগবানের কৃপায় বেঁচে উঠেছ।”

তিলকা মাথা নাড়িয়া সায় দেয়, তার পরে ঝুড়ির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করে, “কি বেচতে বেরিয়েছ শিউচরণদা?”

শিউচরণ বলে, “আছে ভাই সবই কিছু কিছু, ছাত্ত, ছোলা ভাঙ্গা, মুন, তামাকপাতা এই সব। ঘুরে বেড়ানই সার হয়, বিক্রি কিছুই হয় না।”

“তামাকও আছে নাকি দাধা?” উৎসুক ভাবে বলে তিলকা।

ঝুড়ির শালপাতার ঢাকা সরাইয়া শিউচরণ বলে, “এই যে রয়েছে ভাই।”

“তামাকের একটা পাতা তুলিয়া নাকের কাছে লইয়া তিলকা গন্ধ শুঁকে, তার পরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে, “একটা পাতার কত দাম হবে গো?”

ভুরু দুটি কুঞ্চিত করিয়া শিউচরণ বলে, “সের হিসেবে বিক্রি করি গো। ও পাতাটার ওজন হবে প্রায় আধ ছটাক, তা হলে এই ধরো দাম পড়বে চার আনা।”

পাতাটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া তিলকা বলে, “বাবা গো, একটা পাতার এত দাম।”

শিউচরণ মাথা নাড়িয়া বলে, “জিনিসটা যে ভাল গো, তা মস্তা চাও ত তেমন জিনিসও আছে।” শিউচরণ আর একটা পাতা তুলিয়া ধরে।

তিলকা সেটা হাতে লইয়া প্রশ্ন করে, “এটার দাম কত?”

শিউচরণ একটু ভাবিয়া বলে, “অল্প কেউ হলে তাকে দশ পয়সা বলতুম, তোমার কাছ থেকে কি আর লাভ নেব, খরিদ দাম হুঁআনাই—তাই দাও।”

পাতাটাকে বার দুই সযত্নে আন্দোলিত করিয়া তিলকা করুণভাবে হাসিয়া বলে, “হুঁআনাই হবে দাধা, কিন্তু দামটা

এখন দিতে পারব না, হাতে পয়সা নাই। যত শিগগির পারি দিয়ে দেব।”

মাথা নাড়িয়া শিউচরণ বলে, “না ভাই, বাকি দিতে পারব না। নগদ বিক্রি বলেই হুঁপয়সা কমিয়ে বলেছি।”

তিলকা বিনয় করিয়া বলে, “তোমার পয়সা আমি রাখব না শিউচরণদা, সে ভয় তুমি করো না। গরীব বটে কিন্তু আমি বেইমান নই।”

পাতাটির জ্ঞান হাত বাড়াইয়া শিউচরণ বলে, “না ভাই, বাকির কথা বলো না। হুঁচার টাক শূঁজি গো, ধারে বিক্রি করলে আমার ব্যবসা চলে না।”

তিলকা তামাকের পাতাটা শিউচরণকে ফিরাইয়া দেয় না। শিউচরণ অধৈর্য হইয়া বলে, “দাও গো দাও, উঠতে হবে।”

তিলকা এইবার বলে, “তামাক যখন হাতে পেয়েছি তখন আর তা ফেরত দিচ্ছি শিউচরণদা; পয়সার বদলে আমি এক পাইলা ধান দিচ্ছি—নেবে?”

শিউচরণ ব্যবসাদার, ধান, চাল মছরা-মকাই পাইলে সে আপত্তি কবে না, তাহার বদলে জিনিস দেয়; বলে; “তা কেন নেব না গো, এক পাইলা ধানের দাম হুঁআনাই হবে, তুমি নিয়ে এস।”

তিলকা উঠিয়া যায়, ধরে গিয়া কুকিয়ায় সঞ্চিত ধান হইতে এক পাইলা ধান কোঁচরে করিয়া আনিয়া শিউচরণকে দিয়া দেয়।

দরজার ধারে বসিয়া তিলকা বৈশি টিপিতেছিল, এমন সময় কুকিয়া ধান কুটিয়া ফিরিয়া আসে। ধরে কুকিয়া হাড়িতে চাল রাখিতে গিয়া কুকিয়া দেখে কুলুঞ্জিতে গোটা একটা তামাকপাতা যত্ন রাখা আছে। জলের কলসীটা হাতে লইয়া আড়িনায় আসিয়া সে প্রশ্ন করে, “তামাকপাতা কোথায় পেলি গো?”

তিলকা বলে, “শিউচরণ মুদীর কাছ থেকে কিনলুম।”

উত্তর শুনিয়া কুকিয়া অবাচ হইয়া যায়, ধরে পয়সা কোথায় যে গোটা একপাতা তামাক সে কিনিতে পারে। মুখের দিকে তাকাইয়া তিলকা কুকিয়ার মনেব ভাবটা আঁচ করিয়া নেয়; বলে, “ধারে কিনেছি গো, হাতে পয়সা এলে দিয়ে দেব।”

কুকিয়া হাসিয়া বলে, “তাই বল।”

# ঐচ্ছাগারের সামাজিক দায়িত্ব ও আমাদের পরিকল্পনা

শ্রীশিবদাস চৌধুরী

( ১ )

কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ একদা দুঃখ কবিতা বলিয়াছিলেন—“দুর্গম, দুঃস্থ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই বিজ্ঞান আলোক পড়ে দেশের অতি সফল অংশেই। এমন বিরাট মৃত্যুর ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রগতি হইতে পারে না।”

আমাদের সমিচ্ছার বিজ্ঞাপনের অভাব নাই ও অর্থব্যয়ের (অপব্যয় ?) কার্পণ্য নাই। আমরা “সোসালালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি”র দেশে পৌঁছাইতে দুই পরিকল্পনার তরী ছাড়িয়া তৃতীয়টিতে আশ্রয়ণ করিতে চলিচ্ছাছি। এতৎসঙ্গেও “মৃত্যুর ভার” স্বক হইতে নামিতেছে না। ববীন্দ্রনাথের মনোবেদনা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বার বৎসর পরেও মোচন করিতে পারি নাই।

শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় জীবনব্যবহার সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ কিনা, ব্যক্তি-কল্যাণমূলক না গণ-কল্যাণমূলক, মানবীয় সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উদ্বেষিত কবিতা গণ-কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারে কি না, জাতীয় জীবনে সত্য, স্মরণ ও শিবের অভিযুক্তি প্রকটিত হয় কি না, এবিধ প্রশ্নের উত্তরের উপরেই শিক্ষার মানদণ্ড স্থির করিতে হয়। এই বিষয়ে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছে, পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তাই আলোচনা বাহুসা, অপ্রাসঙ্গিক ও। তবু বলিব যে, বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়ে বাস্তব-বাদীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া চিন্তা করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে।

আমরা এখানে শুধু শিক্ষার কাঠামোতে ঐচ্ছাগারের স্থান ও ইহার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। বিতর্ক-মূলক আলোচনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া কলিকাতার ঐচ্ছাগারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য পেশ করিব।

সমাজের ভিত্তি শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় বা নড়বড়ে করিতে পারে। এই জাতির চরিত্রকে সুরূপ দিতে হইলে ও বলিষ্ঠ করিতে হইলে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এই শিক্ষার রূপ সম্বন্ধে জোসেফ ট্যালিন যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে স্মরণ ভাষার সুস্বভাব প্রকাশ করা যায় না। তাহার রাজনৈতিক মতবাদে আমরা বিশ্বাসী না হইতে পারি—কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য।

“Will voluntarily and willingly throw open every door of learning to the young forces of the country, and afford them the

opportunity of scaling the peaks of learning, and will recognise that the future belongs to the young generations; this (education) will have the courage and determination to smash the old traditions, standards and views when it will become antiquated and begin to act as a fetter on progress and will be able to create new traditions and new views. The role of . . . . education is to make every possible member of a state an effective and efficient citizen and thus to give reality to the ideal of democracy. Literacy is a means and not an end in itself. The end is that whole education of the individual's personality which will develop to the highest degree his physical, intellectual and moral faculties, raise him to the full stature of a man and transform him into a conscious and useful member of a society.”

এই শিক্ষার আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে, ইহার উপযুক্ত বাহন দরকার। ঐচ্ছাগারই ইহার বাহন হইবার যোগ্য। ইহা ‘আদর্শ নাগদিকের’ friend, philosopher and guide; স্কুল-কলেজের শিক্ষা অনেকের নিকট দুর্গম, দূরত্ব। বর্তমান পরিকল্পনা ইহাকে আরও সজ্জিত করিতে উদ্যত। ইহা শিক্ষাকে পূর্ণরূপে দিতে পারে না। ইহা একমাত্র পথের নিশানা দিতে পারে—তাহাও যদি সংস্কৃত সংস্পর্শে আসা যায়। আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে আসল লেখাপড়া আরম্ভ হইবে বিভাগের চৌকাঠ ডিজাইনার পরে। এই বিষয়ে প্লেটো ও এডামসনের কথাও বিশেষ মূল্যবান।

প্লেটো বলেন :

“The question is whether the larger and more advanced part of the study tends at all to facilitate our contemplation of the essential form of good. Now, according to us, this is the tendency of every thing that compels the soul to transfer itself to that region in which is contained the most blissful part of that real existence, which it is of the highest importance for, it to behold.”

এয়াস'ন বলেন—

“Consider what you have in the smallest chosen library. A company of the wisest and wittiest men that could be picked out of all civil countries, in a thousand years, have set in best order the results of their learning and wisdom. The men themselves were hid and inaccessible, solitary, impatient of interruption, fenced by etiquette; but the thought which they did not uncover to their bosom friend is here written out in transparent words to us, the strangers of another age. We owe to books those general benefits which come from high intellectual action. Thus, I think, we often owe to them the perception of immortality. They impart sympathetic activity to the moral power. Go with mean people, and you think life is mean. Then read Plutarch, and the world is a proud place, peopled with man of positive quality . . . who will not let us sleep. Then they address imagination . . . They become the organic culture of the time.”

(২)

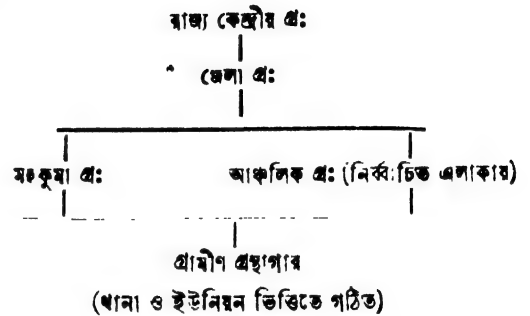
গ্রন্থাগারকে এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে হইলে ইহাকে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে। ইহার জন্য সুস্থির মিতব্যয়ী পরিকল্পনা চাই। দেখিতে হইবে যেন লাভের গুড়ি পিপড়াকে না খাইয়া ফেলে। বর্তমান পরিকল্পনা ও পরিচালনা-পদ্ধতি আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে আমরা কোথায় চলিয়াছি? কতটুকু সামাজিক দায়িত্ব গ্রন্থাগার পালন করিতে পারিতেছে?

এখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখ করিব। গরীব দেশের পক্ষে আরোজনের ক্রটি নাই—আড়ম্বরেরও অভাব নাই। কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের অভাব। যজ্ঞের কল অল্পমের।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে ৯টি রাজ্য কেন্দ্রীয়, ৯৬টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন ও ৫২টি জেলাগ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা ৮৮,৯১,৪৯৯ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মোট ব্যয় হইবে ১৪ কোটি টাকা এবং আরও ৩২০টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইবে। এই সমস্ত রাজ্যসরকারের দায়িত্বেই করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চ-গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে (Social Education) সমাজ শিক্ষাধ্যক্ষ জিনিথিলংজন দাস ‘সাহিত্যের খবর’র বৈশাখ (১৩৬৬) সংখ্যাতে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাকে সংকরা ভাষা মনে করিয়া ইহার সাধারণ উদ্ধৃত করিলাম।

“১৯৫০-৫১ সনে সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়ন-পরিকল্পনার হাত দেন ও বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক ও প্রয়োজনীয় আসবাব ক্রয়ের জন্য এককালীন সাহায্যরূপে ১,০৬,১০০ টাকা মঞ্জুর করেন। সেই সঙ্গে কেবলমাত্র স্বাক্ষর ব্যক্তিরের জন্য সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত বা নিকটবর্তী পাঠকেন্দ্র এবং গ্রন্থাগার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। ১৯৫০-৫১ সন থেকে ১৯৫৭-৫৮ সন এই আট বৎসরে এই ব্যবধানে ৯,৪৩,১০০ টাকা সাহায্য করিতে হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রাঞ্চলে নবপ্রতিষ্ঠিত পাঠকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার-গুলি উপকৃত হয়। গ্রন্থাগার উন্নয়ন-পরিকল্পনাটির কাঠামো এই-রূপ—



১৯৫৬-৬০ সনের বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থা ৪৮,৭২,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ব্যয়বরাদ	( পরিচালনা পঞ্চ বার্ষিকী )			
	গ্রন্থকর	আসবাব	গৃহসংস্কার	মোটভোজন
			ইত্যাদি বা গ্রন্থাগার গঠন	
কেন্দ্রীয়	১,৫০,৫০০	১,০০,০০০	১,৫০,০০০	২৫,০০০
১ম কিস্তি	১ম কিস্তি			
জেলা	১২,০০০	১৫,০০০	৭৮,০০০	২৫,০০০
১ম কিস্তি	১ম কিস্তি			
আঞ্চলিক	৮০০০ ( ,, )	৮০০০ ( ,, )	২৫,০০০	
গ্রামীণ	৬০০০		৫০০০	
			(স্থানীয় ২০০০ সহ)	

এই পর্যন্ত ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার, ১২০টি শাখাসহ ২৪টি আঞ্চলিক ও ২৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছোট ছোট শাখা-গ্রন্থাগারগুলি গ্রামের বোঝা-কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সরকার বহন করেন কিন্তু সংগঠন ও পরিচালনা স্থানীয় কর্মী সমিতির উপর তত্ত্ব রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বায়বোহন লাইব্রেরী; উত্তর-পাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও বঙ্গবন্ধুর সাধারণ পাঠাগার, ও পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতিতে এককালীন নিয়মিত সাহায্য করা হয়।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-কোর্সের ক্ষুদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১২ হাজার টাকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতিতে ২ হাজার টাকা ও হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সমিতিতে দেড় হাজার টাকা সাহায্য করা হয়।”

এই চাইল পরিবর্তনাব্যয় রূপ। এই ব্যবসে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিবর্তনান্তে মোট ব্যয় হইবে ৬০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। সরকারী বিভাগ ও পুস্তক-কলেজের ক্ষুদ্র এ বছরে বাজেটে লক্ষাধিক টাকার উপর বরাদ্দ করিয়াছেন, ইহা বাতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার সংস্কার ও প্রসারণ এবং শিক্ষা ব্যয় খাতের ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ বৎসরের নমুনা :

	১৯৫৯-৬০	১৯৫৮-৫৯
বেতন	২৪,০০০	১০,০০০
ভাতা ইত্যাদি	১২,০০০	৬,০০০
পরিচালনা	১২,০০০	৮,০০০
কটিংজেন্সি	৩,০০,০০০	২,৩৪,০০০
সাহায্য	১২ ০০,০০০	২,৭৮,০০০
মোট	১৫,৪৮,০০০	১২,৩৬,০০০

এই ব্যয়ে ৪,৮০,০০০ জন বঙ্গবাসী গ্রন্থাগারের সুযোগ পাউতেছে। পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ২,৬৩,০২,৩৮৬। টাকা নিম্নপ্রায়শন।

এতদ্ব্যতীত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও উহার পাঠকদের উন্নতির ক্ষুদ্র দ্বিতীয় পরিবর্তনাব্যয় ব্যয় হইবে ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। বিদ্যালয়গুলি ঘুরিয়া আসিলেই বুঝা যাইবে অর্থের সম্ভাব্যতা হইতেছে কি না? ইহা বাতীত (১) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় (১,৮০,০০০ টাকা), (২) জাতীয় গ্রন্থাগার (২,৫০,০০০), (৩) কেন্দ্রীয় বেঙ্গাল গ্রন্থাগার (১,৬৫,০০০), (৪) বাদবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠান, যথা—কিওলজিকেল সার্ভে, (৬) ইণ্ডিয়ান এনোসিয়েশন অব কান্টিনেনশন অব সায়েন্স, (৭) ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিষ্টিকেল ইনস্টিটিউট, ও (৮) এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনও কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরীগুলিকে বাৎসরিক সাহায্য করেন।

এই সমস্ত তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, যে পরিমাণ অর্থ আমরা ব্যয় করি তাহার তুলনায় আমরা অতি সামান্যই যিটোঁ পাউতেছি।

### (৩)

এখন আমরা গ্রন্থাগার পরিবর্তনাব্যয় ব্যাপারে দুই-একটি কথা লিখিব। গ্রন্থাগার (১) গ্রন্থ (২) পাঠক (৩) গৃহ ও (৪) কর্মী এই চার উপাদানের ক্রমায়ুসারে গঠিত। এই ক্রমায়ুসারে চলিলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে সহজে পৌঁছাইতে পারি। কিন্তু সরকারী নিয়মে ক্রম হইল (৩), (৪), (১), (২)। কলে অজ্ঞাত উন্নত দেশের

তুলনায় আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের দুই পরিবর্তনাব্যয় ব্যয়ে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বেশীর ভাগ অর্থই গৃহ নির্মাণে খরচ হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের মূল উপাদান গ্রন্থ ক্রয় সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বাতীত সুবন্দা গ্রন্থাগারের মূল্য খুবই কম। কারণ পাঠক চায় তাঁহার বই ও বসিবার একটু স্থান—আরামপ্রদ না হইলেও চলে—হইলে আপত্তি নাই। আর সময় মত বই না কিনিলে উচ্চ ডিম্পা হইয়া পড়ে। পরে কিনিতে হইলে বহুগুণ মূল্য দিতে হয়—যদি পাওয়া যায়। পরিবর্তনান্তে গ্রন্থাগারের স্থান হইবে তৃতীয়। প্রথমে পুস্তক রাখিবার স্থান হইলেই চলে। পরে, প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইলে, উচ্চতর চাত দিতে হইবে। পশ্চিম নৈরুত্তর একবার চুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বহু ব্যয়সাধ্য অট্টালিকা নির্মাণ না করিয়া সেই অর্থ শিক্ষা প্রসারের ক্ষুদ্র ব্যয় করা উচিত।

এই বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কথা প্রণয়নযোগ্য। তিনি বলেন, “যে সার্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চ শিক্ষার শিকড়ে রস যোগাইবে কোথাও তার সড়ি পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে! এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অল্প দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সর্পিণ উচ্চ শিক্ষার আরতনকে আরও সর্পিণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সংস্কারের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

মানুষের পক্ষে অল্পেও সংস্কার থালাব ও সংস্কার। এ কথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অল্প বেশানে বধেই মিলিতেছে না সেখানে থালা সন্ধ্যা একটু কবাকবি করাই সংস্কার। যখন দেখিব ভারত জড়িত বিজ্ঞান অল্পছত্র খোলা হইয়াছে তখন অল্পপূর্ণ কাছ সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অর্থাৎ আমাদের শিক্ষার বাহ্যিকত্বটাই যদি ধনীরা চালে হয় তবে টাকা ফুকিয়া দিয়া টাকার খলি তৈরী করার মত হইবে। অভিনায় মানব বিচ্ছাইয়া আমরা আসর ভাঙাইতে পারি, কলাপাতার আমাদের ধনীরা যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্ত যারা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো হয়ে মানুষ; এদেশে লক্ষ্যীয় কাছ হইতে ধার না লইলে সম্বন্ধীয় আসনের দাম কমিবে, একথা আমাদের কাছে চলিবে না।”

### (৪)

গ্রন্থাগার গৃহনির্মাণ ব্যাপারেও আমাদের গতানুগতিকতা পরিভাগ করা প্রয়োজন। ইহা গ্রন্থের সংরক্ষণ ও পাঠকদের ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। যেন রাখিতে হইবে (১) ভারতীয় জলবায়ু গ্রন্থে প্রথমশ্রেণীর শত্রু—(২) গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল।

### (৫)

স্থান-নির্বাচন—ইহা সহজগত লোকবসতিপূর্ণ বা যেখানে লোকের আবাসিক সমাগম হয় অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রহিয়াছে



এইরূপ স্থানে হইতে হইবে। পাঠক যেন অনায়াসে প্রয়োজনমত সেখানে পৌছাইতে পারে। নতুবা ইহা দর্শনীয় বস্তুই হইয়া থাকিবে। কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্থান-নির্বাচন উপরন্তু হইয়াছে কি না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

( ৬ )

পাঠ-কক্ষ—ইহা পুস্তক-ভাণ্ডারের নিকটবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে পাঠক প্রয়োজনমত নিজের বই নিজেই বাছিয়া লইতে পারেন। বর্তমান নিয়মানুযায়ী অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই “ভাণ্ডার-গৃহ” সাধারণ পাঠকের প্রবেশ নিষেধ। কলে গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের সাঙ্গিধের অভাবহেতু বহু গ্রন্থেরই সদ্যবহার হয় না। অনেক পাঠকই গ্রন্থাগারের নিয়মের বেড়ালাল অতিক্রম করিয়া ইহা ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ বা বিব্রত বোধ করেন। তাই দেশের অতি নগণ্য অংশই এই অমূল্যসম্পদ ব্যবহার করিতে পারে। এই চলতি-গ্রন্থা পরীক্ষামূলকভাবে তুলিয়া দিলে গ্রন্থাগারের পরিচালনা-ব্যয়ও কিছুটা কমিয়া যাইবে। পাঠকেরও সময়ের অপচয় ঘটিবে না।

বর্তমানে পাঠকের গ্রন্থসূচী আলোচনা করা সম্ভব প্রায় প্রতি পদে তাঁহাকে গ্রন্থাগারকর্মীদের উপর নির্ভর করিতে হয়। গ্রন্থ-সূচীও পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া রচিত না-ও হইতে পারে। এবং বহু গ্রন্থাগারেই গ্রন্থসূচী সুপরিকল্পিত ও সর্বজনবোধগম্য নহে। তার পরে এই গ্রন্থসূচী দেখিয়া পাঠক তাঁহার ম্লিণ জয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ যে বই পাইবেন তার কোন নিশ্চয়তা নাই। হয়ত বা অর্ধঘণ্টা পরে ম্লিণ (১) “নাই”, (২) “বাহির হইয়া গিয়াছে”, (৩) “বাধিতে গিয়াছে”, (৪) “স্থানচ্যুত” (৫) “দুপ্তাপা” ইত্যাদি মন্তব্য সহ ক্ষেপ্ত আসিল। কলে পাঠকের মনে যে পড়িবার ইচ্ছা জন্মে তাহা ক্ষমিত হইয়া আসিতে থাকে। ইহার জন্য গ্রন্থাগারকর্মীই যোল আনা দায়ী তাহা নহে। ইহা বর্তমান ব্যবস্থা বা পরিচালনা নীতির বিষময় কল। পাঠক যদি ভাণ্ডার গৃহে স্বয়ং পুস্তক নির্বাচনের সুযোগ পান তবে অতি অল্প সময়েই ও সহজেই তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থাগারও ইহার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে পারে। ইহার বিকল্পে একটি আপত্তি হইতে পারে। বই হারানোর সম্ভাবনা, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া—অবাধ চলাকোরার সুযোগ-সুবিধা দিয়া—তাহাদের প্রয়োজন অনায়াসে মিটাইয়া দিতে পারিলে এই ভর ও সন্দেহ-ভয়মূলক বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। পাঠকদিগকে পাইকারী হায়ে সন্দেহ না করিয়া তাঁহাদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যেন তাঁহারা নিজেদিগকে গ্রন্থাগারের অঙ্গীদাররূপে মনে করেন। আর বস্তুই সাবধানতা অবলম্বন করা হউক না কেন বই চুরি একেবারে বন্ধ করা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

( ৭ )

গ্রন্থ—সকল বিষয়ে, সকল ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে অল্পতঃক্ষেপে ছয়টি গ্রন্থাগারের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে ব্যবহৃত হইবে না এই অজুহাতে বিভিন্ন ভাষার বই সংগ্রহ বন্ধ করা উচিত হইবে না। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর অভিশাপ কুড়াইতে হইবে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনেরও এই অভিমত। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি সম্প্রদায়ণ ব্যাপারে অমুগ্ধিত প্রেস-কনফারেন্সে আরও বলেন যে, কোন কিছুই নগণ্য বলিয়া কেলিয়া দেওয়া বা সংগ্রহ না-করিবার নীতি ঠিক নহে। কারণ আজ বাহা ব্যক্তি-বিশেষের আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হইতে পারে—এমন সময় বা প্রয়োজন, আসিতে পারে যখন এই “তুচ্ছ” নথি-পত্রই গবেষকদের তাহাদের সিদ্ধান্তে পৌছাইতে বিশেষ আলোক-সম্পাদ্য করিতে পারে। অথচ আমাদের দেশের—বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, এমনকি জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ-নীতি কালোচিত নহে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অজ্ঞাত ভাষাতে লিখিত পুস্তক অতি কমই ক্রয় করা হয়। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ভাষার (বিশেষতঃ, কবাসী, জাখানী, কুশ ও জাপানী) অবদান বেশী ছাড়া কম নহে। কিন্তু উহার বহুটুকু আত্মদ পাই (ছোট্টোটা বলিলেও দোষ হয় না) তাহা ইংরেজী চামচের সাহায্যে। দুখের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের সাইক্লোপাইল-করা লিষ্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই, সেখানে ১২৫৮ সনে ৪,২২৩ খানি ইংরেজী, ১০৫ খানি কবাসী, ২৮ খানি জাপানী, ৬০ খানি কুশ ও ২২ খানি অজ্ঞাত ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রাচ্য ভাষাগুলির ভিতর (ভারতের বাহিরে প্রকাশিত) একমাত্র “কারসী” ভাষায় প্রকাশিত কিছু বই সংগ্রহ করা হইয়াছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের যখন এই নীতি তখন অজ্ঞাত-দের কথা না বলাই ভাল।

ইহা ছাড়া সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহও অতি নগণ্য। সাময়িক পত্রিকা সমকালীন গবেষণার সংবাদ বহন করে। অতএব ইহার সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ওনা বায়, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩,০০০ হাজার সাময়িক পত্রিকা বৎসরে সংগ্রহ করে। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তবে রাতারাতি সমস্ত সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জিওলজিকেল এন্ড্‌ন্যাশনালজিকেল জুলজিকেল, বোটানিকেল, সার্ভেস অব ইণ্ডিয়ান সেক্সে মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ সংগ্রহ-পন্থা স্থির করা উচিত। কারণ ইহাণের সকলেই নিজস্ব পত্রিকা রহিয়াছে ও “পরিবর্ত” (exchange) নীতিতে বহু ইহায়া সাময়িক পত্র পায় ও পাইতে পারে। তাই এমন ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে বাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষাতে প্রকাশিত



সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রিক পত্র কলিকাতাতে সংগ্রহ করা যায়। এই নীতি বীয়ে বীয়ে অজ্ঞাত চারটি জাতীয় গ্রন্থাগারের বেলারও প্রযোজ্য। এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—এই সমস্ত সত্ত্ব-সংগৃহীত সামগ্রিক পত্রপাঠকদের দৃষ্টিতে যথাসম্ভব শীঘ্র আনিতে হইবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে display পদ্ধতি ঠিক হইয়াছে কি না চিন্তার বিষয়। কারণ ৭,০০০ পত্রিকার ভিতর যাত্র করে কখনও লোকচক্ষুর সামনে আসে—বাকী অজ্ঞাতবালে।

Display'র ও শিশু লাইব্রেরী বা পুস্তকের দোকানের মত। ফলে স্থানান্তর একটি হইয়া দেখা দিয়াছে।

৮

গ্রন্থসূচী: গ্রন্থসূচী গ্রন্থাগারের প্রাণ। ইহাই গ্রন্থাগারকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে মুখ্যতঃ সাঙ্গীত করে। ইহাকে দপন বলা যাইতে পারে—গ্রন্থাগারের সম্পদসমূহ ইহাতে প্রতিকলিত হয়। পুস্তকসংখ্যায় গ্রন্থাগারের মর্যাদার মাপকাঠি নহে। অথবা দেশে বহু গ্রন্থাগার থাকিলেই দেশের কৃষ্টি ও সার্বজনীন উন্নতি পরিপোষক না-ও হইতে পারে। এই সমস্ত গণ্যের করে কখনোই খবর পাঠকসম্প্রদায় শ্রেণী নির্কীর্ণেই জানেন বা ব্যবহার করিয়াছেন? মানুষের সুকোমল বুদ্ধিগুলির উন্মেষে, জাতীয় প্রতিভার বিকাশ ও চরিত্রগঠনে কতটুকু এই গ্রন্থাগারের দান? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরে নির্ভর করে—গ্রন্থাগার কি পরিমাণে সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইয়াছে। ইহার প্রশ্ন প্রয়োজন গ্রন্থাগারে বসিত সমস্ত পুস্তকের লগ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত গ্রন্থসূচী। এই সূচীর প্রণয়ন গতানুগতিক হইলে চলিলে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচনা করিতে হইবে। নতুবা ইহা স্পুর্জনিকের মূগে শকট-বানের কাজ করিবে। এই সূচী এমন হইবে যে, ইহাতে পাঠকদের মনে নতুন নতুন প্রশ্নের উদয় হইবে। তাঁহাদের চিন্তাধারার প্রোতের মূগে বাধা সৃষ্টি না করিয়া প্রশ্নের সমাধান-স্বরূপ বাহির করিতে সাহায্য করিবে। সব সময়ই এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের সর্ব কণ্ঠ চোঁটার মূলে রহিয়াছে “মানবকল্যাণ”। সেই “মানব কল্যাণে” গবেষকের গবেষণায় যদি গ্রন্থাগার সাহায্য করিতে না পারে তবে এই গ্রন্থাগার রাখিরা কি লাভ? কলিকাতায় যে সমস্ত গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের অনেকেরই এখন পর্যন্ত পূর্ণসূচী প্রস্তুত হয় নাই। বর্তমান পরিচালনা নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত না হইলে, তবে যে ইহা সম্পূর্ণ হইবে তাহা বলা কঠিন। যে প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয় তাহাও কতটুকু কাজে আসে তাহাও ভাবিরা লেখবার সময় হইয়াছে। প্রচলিত নিয়মামুসারী তাহাদের দোষ-ত্রুটি নাও থাকিতে পারে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রকে বাদ দিলে চলিবে কেন? জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী এদেশে আদর্শ-স্থানীয় হওয়া চাই। ইহার ইউরোপীয় ভাষার গ্রন্থসূচী “J” পর্যন্ত (১৯৪১ সনে প্রথম বৎসর ছাপা হয়), সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থসূচী “Q” পর্যন্ত (১৯৫৬) ও বাঙ্গলার গ্রন্থসূচী “L”

পর্যন্ত এবাবং ছাপা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছাপা হইয়াছে সামগ্রিক পত্রসূচী ও আওতাধর সংগ্রহের সূচী। অজ্ঞাত প্রাচ্য ভাষার (আরবী, পারসী, চীন ইত্যাদি), আধুনিক ভারতীয় ভাষার (হিন্দী উর্দু, মারাঠী ইত্যাদি) ও সবকারী পুস্তকের গ্রন্থ-সূচী এখনও বাহির হয় নাই।

ইহার টেকনিকেল দিক, ছাপার গতি ও ব্যয়ের তার বাদ দিয়াও একটি বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাচ্য ভাষার পুস্তক-সূচী বর্তমানে রোমান হরকে ছাপাইবার সার্থকতা আছে কি? পূর্বে বোধ হয় উংরোপীয়-নবীণ ও ইউরোপীয় পাঠকদের মনে বাগিয়াই এই সমস্ত সূচী প্রস্তুত হইত, এখনত সে পরিবেশ নাই। এখনকার মুখ্য পাঠক সাধারণ ভারতবাসী। তাঁহাদের সকলের রোমান হরকের সঙ্গে পরিচয় নাও থাকিতে পারে। তাহা হইলে কি তাঁহাদের এই জ্ঞানবাক্যে অপারোক্তের কহিয়া রাখিতে হইবে? ফলে, দেখিতেছি গ্রন্থাগারের বিরাট গ্রন্থবানী মূষ্টিময় কয়েক জনের কাজে লাগিতেছে। অগণিত সাধারণের কোনও কাজে আসিতেছে না। তাই বহু স্থলনীলক্ষি আমাদের অজ্ঞাত-সাংঘেই অল্পেই বিনষ্ট হয়। ইহাকে গ্রন্থাগারের কলঙ্ক-চিহ্ন বলা যায় না কি? একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থে ব্যবহৃত লিপির ও ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সাধারণতঃ সেই গ্রন্থ ব্যবহার করা যায় না। তাই অ-রোমান অক্ষরে লিখিত গ্রন্থের নাম রোমান অক্ষরে গ্রন্থতালিকাতে নিবন্ধ করা মানে জ্ঞানবাক্যে জাতিভেদ সৃষ্টি করা। তাই যে লিপিতে যে গ্রন্থ লেখা সেই লিপিতেই সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে জানেন আলোর পরিধি বাড়িবে। লোকের মনে জ্ঞানভূমি লাগিবে—তাঁহাদের চিন্তাশক্তিকে সজীবিত করিবে। রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রগতিশীল রাষ্ট্রের নিজস্ব লিপি ও ভাষা প্রীতি ত তাঁহাদের প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে না। তাহা হইলে আমাদের আপত্তি কেন? ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা মার্কিন লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ও গ্রীক ও রাশিয়ান পুস্তকের নাম তদেবীয় লিপিতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে বলিতে পারেন যে, বর্তমান পদ্ধতিতে বিশ্বজোড়া পাঠকের সুবিধা হয়। কিন্তু গ্রন্থ-সূচী (catalogue) গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) নহে। ইহার উদ্দেশ্য স্থানীয় খন্দের ও দেশীয় পাঠক। একমাত্র গ্রন্থপঞ্জী ক্ষেত্রেই (National Bibliography বাদে) আমাদের দৃষ্টি সূচীর প্রসারিত করিতে হইবে। তবে ভিন্দোপী পাঠকদের সুবিধার লগ্ন রোমান হরকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্ট আকারে সংযোজনা করিলে সোনার সোহাগ। এই বাবস্থা হইবে সহজসাধ্য ও আদর্শ।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থের স্থান-নির্কীচক সংখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রথা চালু না করিয়া একটি সর্বজন স্বীকৃত সহজবোধ্য বিশ্বজনীন প্রথা চালু করিলে পাঠক-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। তাহা বহু সময়ও বাঁচিয়া যাইবে। কারণ তাহা বা এই সংখ্যার জটিলতা বা কারুকাণ্ড লইয়া মাথা ঘামাইতে চান না।

তাঁহারা চান সহজে প্রয়োজনীয় পুস্তকের সান্নিধ্যে আসিতে। ইহাতে পরিচালনার ব্যয়ও অনেক কমিয়া বাইবে। এখন পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত কোন প্রথাই আমাদের সমস্ত সমস্ত সমাধান করিতে পারে নাই। তাই ইহার ভিতর যেট সফল, সহজবোধ্য ও বহুল-প্রচলিত তাহারই কিছু অঙ্গ-বঙ্গ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণ বিষয়গী ও বৈজ্ঞানিক প্রকার সূচী প্রণয়ন সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। ইহা ধীরে-সুস্থে করা যাইতে পারে। তাই একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসূচী অবিলম্বে প্রকাশ করা দরকার (যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি করিতেছে)। এই তাড়াতাড়িতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে।

চতুর্থতঃ, আর একটি বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। গ্রন্থসূচী প্রণয়ন ব্যয়সাধ্য। তাই প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পক্ষে ইহার প্রণয়ন সম্ভবসাধ্য নহে। যেমতাবস্থায় কয়েকটি লাইব্রেরী মিলিয়া আঞ্চলিক সংযুক্ত-সূচী প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থাগার ও ভারতীয় গ্রন্থাগার জগতে নিরুদ্ভূত, কল্পনাক্রমে তাঁতাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করেন তবে পাঠক-সমাজ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বহু সময় ব্যয়িত হইবে। অর্থেরও অভাব হইবে না।

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক মাসের সংগৃহীত পুস্তকের একটি যুক্ত "আঞ্চলিক" গ্রন্থসূচী প্রকাশ করা উচিত। এখন জাতীয় গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক এট ধরনের সূচী বাহির করিতেছে, কিন্তু সমবায়-ভিত্তিতে করিলে আরও ব্যয় কম পড়িবে, বেশী সংখ্যক পাঠকের প্রয়োজনে আসিবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের বৈমাসিক সূচী সংক্ষেপে প্যাটিক উইলসনের বরোদার জার্নাল অব ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে (৭, ৪, ১৯৫৯ জুন, পৃঃ ৪১৮) মন্তব্য পরিচালনাযোগ্য :

"This is less useful than might be expected, . . . and not being cumulated or indexed, is ferociously difficult to use for ordinary purposes. . . ."

এমার্সন বলেন :

" . . . the colleges, whilst they provide us with libraries, furnish no professor of books; and I think no chair is so much wanted. In a library we are surrounded by many hundreds of dear friends, but they are imprisoned by an enchanter in these papers and leathern boxes; and though they know us, and have been waiting two, ten or twenty centuries for us—some of them—and are eager to give us a sign, and unbosom themselves, it is the law of their limbo that they must not speak until spoken to; and as the enchanter has dressed them, like battelians of

infantry, in coat and jacket of one cut, by the thousand and ten thousand, your chance of hitting on the right one is to be computed by the arithmetical rule of permutation and combination—not a choice out of three caskets, but out of half a million caskets all alike."

এই "Professor of books"দের বিদ্যা দারিদ্র্য। গ্রন্থাগারের কর্মী হইল সমাজসেবক। তাঁহাকে কিন্তু অস্বস্তি অকিসের কর্মীদের পথ্যারে ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাকে দরদীন নিয়া পাঠকের ও পুস্তকের সেবা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে পাঠকের মনের গতি অতীব বিচিত্র। সেই জন্য তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থা তদনুসৃত হইতে হইবে। গতানুগতিক হইলে চলিবে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বা পদ্ধতি আদর্শ কর্মসূচী করিতে পারেনা। ইহা তাঁহার দারিদ্র্য পালনে খুব কমই সাহায্য করে। ইহা গতানুগতিকতা ও ফাইল-ব্রহ্ম কেল্লাবাপ্রিয় কর্মসূচী সৃষ্টি করে। শিক্ষাকালও এক বছর। এত অল্প সময়ে এই শিক্ষা নিয়া গ্রন্থাগারের সূচী পরিচালনা কষ্টসাধ্য। ফলে গ্রন্থাগার জনপ্রিয় হয় না। তাই গ্রন্থাগার পূর্ণ-ভাবে সামাজিক দারিদ্র্য পালন করিতে পারে না। তাই প্রয়োজন, তিন কি চার বৎসরের একটি কোর্স প্রণীত করা। সার্টিফিকেট বা সটকোর্সও কম পক্ষে এক বৎসর হওয়া উচিত। ছাত্র গ্রন্থকথিবার পূর্বে তাঁহার psychological test লওয়া উচিত। যাহাতে এই কার্যের উপযুক্ত প্রকৃতির লোক পাওয়া যায়।

শিক্ষা ব্যবস্থাতে (১) মনস্তত্ত্ব, (২) গ্রন্থ সংরক্ষণ ও (৩) ২০টি ভাষা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। ভাষার ভিতরে একটি ইউরোপীয়, একটি ভারতীয় ভাষা (মাতৃভাষা ব্যতীত), ও সম্ভব হইলে একটি প্রাচ্য ভাষা (ভারতীয় ব্যতীত)। বর্তমানে যে ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, তাহা নাম মাত্র। ইহার সঙ্গে অবশ্য পাঠ্য থাকিবে (৪) ক্যাটালগিং ও ক্লাসিফিকেশন, (৫) এডমিনিষ্ট্রেশন, (৬) গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন পদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞান, (৭) বিজ্ঞান ও চাকরলা বা সাহিত্যের অর্থাৎ humanistic sciences যে কোন একটি বিষয়ের ইতিহাস, (৮) ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম ও দর্শনের চূড়ক ইতিহাস, (৯) তুলনামূলক ভাষা, (১০) উপরে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে পত্র। (৪), (৫) ও (৬) নং বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে এবং ছাত্রদিগকে স্থানীয় গ্রন্থাগার-সমূহে কম পক্ষে ৬ মাস যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা করিলেই উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া উঠিবে। সটকোর্সও (১), (২) (৩ একটি ভাষা), (৪), (৫), (৬) ও (৭ অথবা ৮) বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

এখানে আমরা যে সমস্ত সমস্ত উল্লেখ করিলাম ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহের কার্যাবলীর

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার সামাজিক দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে পারিতেছে না। কলে আমরা দ্রুত অগ্রসরমান জ্ঞানের জগতে ভাল বাণিয়া চলিতে পারিতেছি না। পুস্তকপাঠ কেবলমাত্র অবসর বিনোদন বা চিন্তার উৎকর্ষকার রূপ নহে। ইহার আরও মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাই জ্ঞান যাহা যে সমস্ত গবেষণা চলিতেছে তাহার সঙ্গে সমতালে চলিতে হইলে ছানিয়ার বেখানে বাহা হইতেছে তাহার খবর রাখিতে হইবে। ইহার নূতন হটস পুস্তক ও সাময়িক পত্র। নতুন অমূল্যসুদের বহু সময় ও অর্থ নষ্ট হয়। বর্তমান অব্যবস্থার দায়িত্ব জাতীয় কর্তব্যবোধ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সামাজিক চেতনার উদ্বোধনে বর্তমান ঐশ্ব্যগারগুলির অবদান নিকরূপ করা বর্তমানে সহজসাধ্য নহে। এই বিষয়ে কাজ কবিবার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ইহার উপরেই ঐশ্ব্যগার পরিকল্পনার স্বামী বনিয়াদ করিতে হইবে। এই তথ্যমূলক অনুসন্ধানের ভিত্তি হইবে সঠিক পরিসংখ্যান ও নানা বিষয়ের বিশেষ বিশেষ। বর্তমানে ইহার একান্ত অভাব রহিয়াছে। এই জন্তও ঐশ্ব্যগারিকদের পারম্পরিক প্রীতির সন্ধে হৃদয় স্থানীয় ঐশ্ব্যগারের সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম। সাধারণভাবে বক্তব্যের সক্ষা হিসাবে মাঝে মাঝে তাগাদের কাব্যাবলীম কিকি ইঙ্গিত দিয়াছি। নানা কারণে দেশ ত্রুটির কারণও বিশদ সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

কলিকাতার জাতীয় ঐশ্ব্যগার ইহার সুযোগ্য অক্সাভক্স্মী জিকেশ্বনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহকর্মীদের সাহায্যে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। এতৎ সম্বন্ধে ইহা সময়ের সঙ্গে ভাল বাণিয়া চলিতে পারিতেছে না। এমন কি সরকার বিধোষিত Socialistic pattern of society গঠনেও ইহা পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে কি না ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্ব্যগারের কথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। দৈনিক কাগজেও এ বিষয়ে বহু সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিকল্পনার অভাবে—অর্থের অনটনের অজুহাতে ইহার দুর্দশার অন্ত নাই। অথচ এই কম্বল ঐশ্ব্য-ভাণ্ডারটিকে অজ্ঞান অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ করিলেই যে অর্থের প্রায় হইবে তাহাতেই নতুন গৃহ হওয়া সাপেক্ষ পুনরায়ন করা যাইতে পারে। অজ্ঞানদের কথা না ধরিয়া ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র কলিকাতার (জনসংখ্যা ৪৬ লক্ষ) ঐশ্ব্যগারের সাধারণ চিত্রটি দেখা যাউক। এখানে বৎসরে ঐশ্ব্যগারের অল্প কম পক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইহাদের সম্মিলিত পুস্তক সংখ্যাও ২৫ লক্ষের কম নহে। যদিও ইহার বৈশী ভাগই আলমারির শোভাবর্ধন করিতেছে বা কীটের খোৎক হইয়া মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সুপরিকল্পিত সংগ্রহ-নীতির অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই প্রয়োজনীয় পুস্তক পাইবেন না। এমনকি কোন কোন

বিষয়ে প্রয়োজনীয় standard বই কলিকাতার কোন একটি ঐশ্ব্যগারেও পাইবেন না। ইংরেজীতে লেখা হইলেও না। অত ভাষা ত বাদই। আবার এমনও আছে যে, বই আছে কিন্তু হাদিস করা যাউতেছে না।

যাহা হউক এখন আমরা দেখি কি কর্তব্য তাহা বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব।

১১

ঐশ্ব্যগারের সামাজিক দায়িত্ব সন্ধে আমরা ধীরে ধীরে সচেতন হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহাকে যদি ইহার সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া চলিতে হয় তবে আমাদের সকলকেই (পাঠক, কর্মী ও বৃত্তিনায়ক) ঐশ্ব্যগারও সমকালীন জীবনের অদ্বীত অস্বীকার্য সন্ধে বিধাতীন মনে স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্ব সন্ধে অধ্যাপক জে. ডি. বার্ণল যাহা বলিয়াছেন সামান্য রদবদল করিয়া ঐশ্ব্যগার সন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন—

"If Library had any function at all—it is universal beneficence. It was the noblest flower of the human mind and the most promising source of material benefactions. There could be no doubt that its activities were the main basis of progress."

এই উদ্দেশ্যে পৌছাইতে হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে সমগ্র ভারতে প্রতিটি সাক্ষর লোককে তাঁহার প্রয়োজনীয় পুস্তক ও একটু পড়িবার আয়গা করিয়া দিবার দক্ষ সম্ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম শুভই হইবে। ইহাতে অল্প পরিকল্পনা রপায়ণ ও ত্বরান্বিত হইবে। পুষ্টিগত বিচ্যুতে অসুস্থতাপক্ষে পৃথিবীর অজ্ঞাত জাতির প্রায় সমস্তক হইয়া উঠিতে পারিবে। ইহার জন্ত পরিকল্পনা তালিয়া সাজাইতে হইবে। প্রত্যেক বিভাগতন বা অজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে সঠিত সাবুজ ঐশ্ব্যগারের উন্নয়নের চেষ্টা না করিয়া প্রতি এলাকায় লোকসংখ্যা ও প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীর ও মানের ঐশ্ব্যগার স্থাপন করিতে হইবে, যেমন—(১) শিশু, (২) জনসাধারণ, (৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) জুনিয়র কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৫) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৬) আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, (৭) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উচ্চতর কারিগরী বিদ্যা, (৮) সাহিত্য, কলা, ইতিহাস, ইত্যাদি humanistic sciences বিষয়ে (৯) হাসপাতাল, (১০) শ্রমিক ও কৃষক, (১১) সাক্ষর।

ইহার সহিত স্থানীয় ঐশ্ব্যগারের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করেক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঠ্যপুস্তক-ভাণ্ডার সৃষ্টি করিবেন। ইহাতে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রদের ডে-হোমের কার্যের সঠিক নিয়ন্ত্রণক বিচার করিলে দেখিবেন—অর্থব্যয়ের তুলনার অতি অল্পই ছাত্র-

সমাজ উপকৃত হইয়াছে। কলেন পরিচরিত। পরীক্ষার কল দেখুন। টাকা নিম্নপ্রয়োজন।

ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি। ইহার লোকসংখ্যা অনুপাতে গ্রাম্য ও শহরের সংখ্যা :

জনসংখ্যা	শহর ও গ্রামের সংখ্যা
৫০০ পর্যন্ত	৩,৮০,০১২
৫০০—১০০০	১,০৪,২৬৮
১০০০—২০০০	৫১,৭৬২
২০০০—৫০০০	২০,৫০৮
৫০০০—১০,০০০	৩,১০১
১০,০০০—২০,০০০	৮৫৬
২০,০০০—৫০,০০০	৪০১
৫০,০০০—১,০০,০০০	১১১
তদুর্দ্ধে	৭১
	৫,৬১,০০৪
১,০০,০০০ ট.ক	৭২ শহর
৪৬,০০,০০০	কলিকাতা
২৮,০০,০০০	বোম্বাই
১৩,০০,০০০	দিল্লী
১৪,০০,০০০	হায়দ্রাবাদ

এই বিরাট দেশের বিরাট জনসংখ্যার জন্য চারিটি জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজে স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সে বাস্তব হইক, এই চারিটি গ্রন্থাগারকে প্রতিটি ভাষার প্রতি বিষয়ের পুস্তকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে। যেন ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর পুস্তকের অভাবে কালের অন্তবিধা না হয়।

১৯৫৭ সনে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার, পাবলিক লাইব্রেরীর সার্ভিস সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে এক কমিটি নিয়োগ করেন। বিলাতের Nature পত্রিকায় ( ৪০৭ সংখ্যা, ৯ই মে, ১৯৫৯ ) সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য কথিত আছে তাহা সম্বোধিত ও প্রশিধানযোগ্য। ইহা আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই উহার খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল।

"This is in keeping with the educational functions of the public library service, but is not enough. The real problems

in establishing an adequate national library service which will meet scientific and technical needs, among others, have not been faced; and the extent to which it is a factor in industrial and scientific efficiency and not merely in education, is not understood. The contribution which the commercial or technical library of a large local authority could make in developing an economic service is ignored, as are the financial implications which arise when such a body is asked to meet national needs from local resources. If the nation's growing needs for scientific and technical information, educationally or in research, in industry and in commerce, are to be met at any reasonable and practicable cost, full and efficient account must be taken of all existing resources and the means provided for efficient co-operation without making demands liable to impair the efficient discharge of any institution's primary responsibilities. Further, we must proceed boldly and imaginatively to fill lacunae in the existing structure from rational resources, making full use of all appropriate advances in the handling and processing of scientific and technical or other informations."

প্রবন্ধের আরম্ভের আর ক্ষীণতা না করিয়া আমরা বলিব যে জাতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। পরিচালনা নীতিরও আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠককে এই পরিকল্পনা এবং পরিচালনাতে অংশীদার করা আবশ্যিক প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত ধরিত্রী সঙ্কলনের জন্য প্রতিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি কথিতা কেন্দ্রীয় গ্রন্থ ক্রয়, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, পুস্তক সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষণ-বিভাগের থাকা দরকার। ইহারা অজ্ঞাত লাইব্রেরীকে এই সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করিবে। ইহাতে ধরিত্রী পড়িবে ও uniformity থাকিবে। গ্রন্থ-জ্ঞী ( Bibliography ) প্রস্তুতও এভাবে হওয়া দরকার। বাস্তবতায় আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিব।

## গঙ্গালাভ

### শ্রীম্ভবোধ বসু

চিরবিহার ! আর কোনও দিনই সে কিরিয়া আসিবে না ! নবনীতবাবুর মনটা খারাপ হইয়া গেল। মর্মে মর্মে তিনি আত্মীয় বিরোধ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাই কালের ধর্ম। ইহাকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কঠোর সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

নবনীতবাবুর মনে অতীতের স্মৃতিগুলি ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল। দীর্ঘকালের সাহচর্য। আট-দশ বছর বয়সে যার সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, যার সেবা অখণ্ডভাবে নিরলস নির্ভার সঙ্গে তাঁর পক্ষান্ন বছর পর্যন্ত চলিয়াছে, সহসা তাকে হারাইতে হইলে একটা অপূরণীয় ক্ষতিবোধ মনকে আচ্ছন্ন করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি !

এই বিচ্ছেদ আসিতেছে, তাহা কিছুকাল হইতেই টের পাওয়া যাইতেছিল। আজ এই অনুখ, আজ এই ব্যথা, আজ এখানটা ফুলিয়াছে। দুর্বলতা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল। বন্ধনযুক্তির সময় আসিয়াছে—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তবু হঠাৎ যখন একদিন বিচ্ছেদপূর্ণ হয়, তখন শোক না করিয়া উপায় থাকে না।

লোকে বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না। কথাটা যে কত বড় খাঁটি তাহা নবনীতবাবু সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিলেন। উপর-পাটির মাংস-খাওয়া দাঁত এটি। আর পড়িবি ত পড় প্রথম সেই দাঁতটিই পড়িল !

ছিন্নমূল দাঁতটি ছুই আঙুলে ধরিয়া নবনীতবাবু স্মৃতিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতীতে ইহার সাহায্যে কত কাবলী-মটর ও মাংসের হাড় চিবাইয়াছেন, কত আখের খোশা ছাড়াইয়াছেন, শিশির শক্ত হইয়া আঁটিয়া যাওয়া খাপ ঢিলা করিয়াছেন, কত উদ্-পেঙ্গিল কামড়াইয়া তাহাতে লাগ বসাইয়া দিয়াছেন তাহার স্মৃতি এক পলকে হুসহুস করিয়া বোঝাই মেলের মত তাঁর মগজের মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল।

এইবার ? কোথায় কেলিবেন এটিকে ? ঘোড়ার ব্যালকনিয় তলায়ই রাস্তার ডাস্টবিনটা। টুকু করিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেই হয়। কিন্তু কেলিতে গিয়া সহসা তিনি হাত গুটাইয়া লইলেন।

নোংরা ডাস্টবিন ! • যত বাড়ীর যত আবর্জনা, ছাই-

পাশ, ময়লা স্রাকড়া, ভাঙা শিশি-বোতল, এঁটো-কাঁটার দুর্গন্ধ স্তূপ। তাঁর এত যত্নের, এত টুখপেস্ট ও ব্রাশের পরিচর্যা-উজ্জল দাঁতটি এই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়াছে ইহা কল্পনা করিতেই তাঁর অবশিষ্ট একত্রিশটি দাঁত এবং সারা শরীরে তীব্র শিহরণ খেলিয়া গেল। আর যেখানেই হোক, ডাস্টবিনে এটি ফেলা চলিবে না।

‘বেলুন কিনতে পয়সা দেবেন বলেছিলেন, এখন দেবেন ?’

নবনীতবাবু দাঁতের অস্ত্র সমাধিস্থলের অশ্রুস্রব্ধানে মাত্র চিত্ত নিয়োজিত করিয়াছেন, এমন সময় নীচের ফুটপাথ হইতে সজোর হাঁক শুনিলেন। চিনিতে বিলম্ব হইল না। অদূর-বর্তী বস্তির বাঁধর ছোকরাটা। বছর দশেকের এক মানবকের মধ্যে এতটা বজ্জাতি থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এখন দেখিলে, বড় একটা রবাবের বল আনিয়া তোমার বাড়ীর দেওয়ালে বেপরোয়া তাহা ছুঁড়িয়া মারিতেছে ও লুফিতেছে। আপত্তি করিলে মস্তব্য করিবে, ‘তাতে কি হয়েছে মশায়। দেওয়াল ক্ষয়ে যাবে নাকি ? ভেজা বল, কাঁধার ছাপ লাগছে দেওয়ালে ? হি হি, ভালই ত। বিনি পয়সায় জলছবি উঠে গেল !’ কিছুক্ষণ পরে হয় ত দেখা যাইবে বল পরিত্যাগ করিয়া সে ঢিল ধরিয়াছে। তোমার বাড়ীর নানা জায়গায় ভূতের ঢিলের মত বেপরোয়া প্রস্তরবর্ষণ শুরু হইয়াছে। প্রতিবাদ জানাইলে সে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে জানাইবে সে চতুই মারিতেছে, অন্য কোনও ছুই উদ্দেশ্য নাই। তাড়া দিয়াও লাভ নাই ! এক ছুটে বস্তির ভিতর গিয়া ঢুকিবে। সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য কর্ম।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবনীতবাবু বুঝিয়াছেন, ইহাকে চটাইয়া লাভ নাই, হাতে রাখিলেই সুবিধা। এজ্ঞ মাঝে মাঝে এটা-ওটা ঘুষ কবলাইতে হয়।

এখন একেই নবনীতের মন খারাপ। তার উপর দাঁতের কি যে সদগতি করা যায় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিব্রত। এমন সময় কিচেন ছোকরার আঁকার তাঁহার মেজাজ বিগড়াইয়া দিল।

‘পালা !’ ক্রষ্টকণ্ঠে তিনি কহিলেন, ‘সারাক্ষণ এটা দাঁও, ওটা দাঁও। বাঁধরামির আর নীমা নেই ! কিছু পারিবে। ভাগ !’

ছোকরা তাকিলের সঙ্গে একবার উপর দিকে তাকাইল। ভাবখানা এই—‘নিজের মুখেই ত বলেছিলেন মশায়। না দেখেন বয়ে গেল, কিন্তু মেজাজ দেখাবেন না।’ কিন্তু ভাষায় সে ভাব ব্যক্ত করিল না। বলিল, ‘আচ্ছা, কাল আসব।’ বলিয়া ফুটপাথ ধরিয়া এক ছুট লাগাইল।

কিছুক্ষণ ধরিয়াই অদূরে ডুগডুগির আওয়াজ শুনা বাইতেছিল। নবনীত এবার সেদিকে লক্ষ্য করিলেন। এত সহজে রেহাই পাইবার কারণ বুঝিলেন। হুমানের খেলা দেখানে হইতেছে। কিছু লোক দাঁড়াইয়া গেছে। হুমানমাত্রই যে সেদিকে আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি!

একটু বাত করিয়াই নবনীতবাবু পাড়ার পার্কে পাখচারি করিতে পিছুছিলেন বাড়ী কিরিবার মুখে বাগিচার কটকের কাছাকাছি একটা গাছ হইতে সতাই হুমান সামনে লাফাইয়া পড়িল। নবনীতবাবু কিছুটা চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন ‘মন মন একটু পরিচিত ভট্ট হিহি শব্দ শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন।

‘এত ব' স্তরে গাছে কি করছিলি?’

‘লক্ষ্যপূজার ভক্ত অংগের পল্লব নিতে এসেছি। আজ বেশ্পতিবার কিনা।’

বৃহস্পতিবার সন্দেশ নাই। কিন্তু এত রাত্রে? ন'টা বাজিতে বড় দেরি নাই। আত্মপল্লব ভাঙিবার ইহা কি যোগ্য সময়! তা ছাড়া কতক্ষণ ধরিয়া আসিয়াছে বাদর ছোকরা? হতিপূর্ক নবনীতবাবুকে লক্ষ্য করে নাই ত? অবশ্য পাকের বিপরীত দিকে কুকচুড়া গাছের গুঁড়ির কাছে পেন্-নাইকে মাটি খুঁড়িয়াই তিনি দাঁতটিকে কবর দিয়াছেন। এত দূরের গাছ হইতে তাহা লক্ষ্য করা অসম্ভব। কিন্তু কে বলিতে পারে আগে হইতেই ছোকরা বাগানে বেড়াইতে ছিল না? তবে কথা এই, আগেই যদি সে নবনীতবাবুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, তবে কি সে সঙ্গে সঙ্গেই কাছে হাজির হইয়া কোতুল মিটাইত না? বলিত না, গাছের গুঁড়ির কাছে বসিয়া কি করিতেন? ইহার কোতুলের আধিক্য অল্প ময়ালের ঘটনাকেও সম্মান করে না। প্রায় প্রত্যেকের হাঁড়ির ভেতর সে নিজের নাকটা গলাইয়া দেয়।

‘সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে পার্কে বসে আছি? পড়াগুলো করিস না?’

‘বাবো, এইমাত্র ত এলাম।’

‘আমি ব'টা আগে ত পার্কের ওদিকটার ঘুরছিলাম দেখলাম।’

‘ঘোং, বাজারে তবে চোঙাগুলি পৌছে দিতে গিয়েছিল কে?’

‘তবে ত কাজের ছেলে গল্প। আচ্ছা আসিস, বেগুন কেনার পয়সা দেব।’

নিশ্চিন্ত হইয়া নবনীতবাবু বাড়ী কিরিলেন।

দাঁত একটামাত্রই হারাইয়াছেন। চরমণে বিশেষ কোনও অনুবিধা হইতেছে না। মুখের গঠন বা হাসির উজ্জলতা ইহাতে সামান্যমাত্র ক্ষণ হয় নাই। তবু জিজ্ঞাস্য সর্বদা হারানো দাঁতটির কঁকের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিয়া মরে, নবনীতবাবুকে টিহার কথা ভুলিতে দেয় না।

ডেনটিস্টের কাছ হইতে কৃত্রিম দাঁত গ্রহণের কথা তিনি ইতিমধ্যেই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন যেন গহিত বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রথম জ্ঞী ময়িতে না ময়িতেই দ্বিতীয় জ্ঞী গ্রহণের মতই এই ভরা নিশ্চিন্দ। সুতরাং এই কতি মানিয়া লইয়া ইহাকে ভুলিয়া বাওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইহাতে বাধা আসিল ঠিক দুই দিন পরে। সকালের খবরের কাগজ হাতে লইয়া নবনীতবাবু দোতলার ব্যালকনিতে আসিয়া বসিয়াছেন। নীচে একটা সর্ষ শিশের শব্দে দুটি ফুটপাথের দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, চিরপরিচিত গল্প বামহস্তের মাঝের আঙুলে একটা মার্কেল স্থাপন করিয়া সেটা ধরকের জ্বার মত আকর্ষণ করিতেছে এবং লক্ষ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ অথচ করিবার উদ্দেশে ঠোট ছুঁচলো করিয়া শিপ দিতেছে।

অদূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবনীতবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—বস্তুটি একটি দাঁত।

দাঁত নবনীতবাবুর একাধ হয় না, সবারই দাঁত হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই তাঁর ‘ইনুইশান’ বলিল, হহা তাঁহার নিজস্ব দাঁতটি ছাড়া আর কিছু নয়। আরও মনোযোগ দিয়া নীচে তাকাইয়া এই ধারণা তাঁহার দৃঢ়তর হইল। তাঁহার সমাধিস্থ দাঁতটিকে তিনি প্রায় সনাক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। বন্ধাত ছোকরা সেদিন স্পষ্টই তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছে! নিঃসন্দেহে সে সেইদিন নবনীতবাবুর কার্য-কলাপের উপর নজর রাখিয়াছিল এবং সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছে। আহুত হইয়াও সে বেলুনের পয়সা নিতে আসে নাই, ইহাও অপরাধী বিবেকেই পরিচয় দিতেছে।

নবনীতবাবু কি করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিবার আগেই ‘ঠকাং’ করিয়া একটা শব্দ হইল। মার্কেল লক্ষ্যস্থল তেজ করিয়াছে।



এই আবার তাঁর সমস্ত অটুট দাঁতগুলির মধ্যে আগিয়া লাগিল।

‘ওটা কি রে?’ নিজেকে বখালায় সংবত করিয়া নবনীত कहিলেন।

পুরা ছই সেকেন্ড পরে মাথাটা বাঁ দিকে ঈষৎ কাত করিয়া গম্বু সংক্ষেপ জবাব দিল, ‘দাঁত।’

‘দাঁত? কার দাঁত? কোথায় পেলি?’

ইহার কোনও জবাব না দিয়া গম্বু ‘ঠুং’ করিয়া আবার দাঁতে মার্কেল মারিল।

‘ওটা আমাকে দিবি? কবরের মশায় বলছিলেন, ওষুধ ভৈরির জন্তে একটা দাঁত চাই—ও’ড়ো করবেন। অথচ কোথাও একটা দাঁত পাচ্ছি নে। খুব ভাল ছেলে গম্বু। ওটা আমাকে দিয়ে দে।...কই, বেলুন কেনার পরশা ত নিলি নে। আর না হয়, ঘুড়ি-লাটাইয়ের পরশাও দিচ্ছি। আজকাল আর ঘুড়ি ওড়াস নে?...’

গম্বু একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল।

‘এই নে, পরশা ফেলছি, ধর।’ নবনীতবাবু একটা আধুলি আঙুলে ধরিয়া कहিলেন।

‘চাইনে পরশা।’ গম্বু ভাচ্ছিলোব সঙ্গে कहিল, ‘পরশা চাইলেই যে খেঁকিয়ে ওঠে, তার পরশা কে চায়? তার চেয়ে বরঞ্চ আমি দাঁতের সঙ্গে মার্কেল খেলব। এই দাঁতের দাম দু’টাকা।’

ইজিতটা স্পষ্ট। নিশ্চয়ই নবনীতবাবুর গরজটা টের পাইয়াছে এবং দাম হাঁকিয়াছে। দু’আনা পাইলেই যে সন্তুষ্ট হইয়া একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ কথার ব্যাধি থাকিত, নহিলে সে কখনও দু’টাকা চাহিতে সাহস করে। একবস্তি ছেলের এই ডে’পোমীতে নবনীতবাবু রুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

‘বেশি চালাক হয়েছিল, না?’ তিক্তকণ্ঠেই তিনি कहিলেন। ‘দু’টাকার ক’পরশা হয়? ওর অর্ধেক ব্যয় করলে এক ডজন দাঁত আমি কিনে আনতে পারি। কোথা থেকে চুরি করেছিল ওটা? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি।’

মজা দেখিবার জন্ত গম্বু আর ধেরি করিল না। মার্কেল ও দাঁত ওটাইয়া ‘ষ্ট্যাটেজিক রিটিট’ করিল।

অবশ্য নবনীতবাবুর ইহা কাঁকা হুমকি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি জানেন, জোর করিয়া কিছু করিবার উপায় নাই। সামান্য ব্যাপার লইয়াও বস্তির বাসিন্দারা হৈ-হৈ ব্যাপার করিতে পারে। আর তা ছাড়া এটা যে তাঁরই দাঁত তাই বা ঠিক কি। আর যদি তাঁরই দাঁতটি হয়, তাতেই বা কি? একটা বখাটে ছোকরা তাঁর ভাবাবেগের

স্বযোগ লইয়া তাঁহাকে ‘গ্ল্যাকমেইল’ করিবে, ইহা কি সমর্থন করা উচিত? একটা পড়িয়া-বাওয়া দাঁত এমন কিছু মূল্যবান নয়।

তবু আগিস বাইবার সময় তিনি একবার গার্কটা বুঝিয়া গেলেন। যে কুকচুড়া গাছেব ছায়ার দাঁতটি শাঙ্কিতে চির-বিশ্রাম করিতে পারিবে ভাবিয়াছিলেন তার ও’ড়ির কাছে হাজির হইয়া দেখিলেন, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য। প্রায় হাতখানেক জায়গা ইকি দুয়েক গভীর করিয়া খোঁড়া। প্রায়ভাঙিত্ব খননকার্যের পর অহসঙ্কের বস্ত উদ্ধার করা হইয়াছে।

ইহার পর দু’দিন নবনীতবাবু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াছেন। বাঁহর ছোকরা তাঁকে দেখাইয়া দেখাইয়া দাঁতটি কুটপাথে সজোরে বর্ষণ করিয়াছে, উহাকে লাধি মারিয়া পেতুয়া খেলিয়াছে, উহাতে পেরেক বসাইয়া রাস্তায় সংগৃহীত ইটের সহায়তায় কুম্ভম হাড়ড়ি মারিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার ব্যাধি নবনীতবাবুর সমস্ত শিরা-উপশিরার উপর পড়িয়াছে। এই নিগ্রহের অপমানে তাঁর ব্রহ্মবন্ধু পর্যাণ্ড জলিয়া উঠিয়াছে। তবু তিনি নীরব রহিয়াছেন।

কিন্তু শত হোক নাড়ীর টান। দাঁতটি পড়িয়া গেলে কি হয়, উহার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভুলা যায় না। আপনজনের মৃতদেহের উপর অত্যাচারের মতই ইহার উপর যে অত্যাচার হইতেছে তাহা নবনীতবাবুকে মর্মে মর্মে পীড়া দিতেছিল। সুতরাং পরদিন যখন তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই বাড়ী হইতে মাত্র হাত কুড়ি দূরে তাঁর এই দাঁতটির উপর বেপরোয়া অপমান বহিত হইতে লাগিল তখন ইহাকে নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বার বার চোখ কিরাইয়া আনিলেন। বার বার তাহা ক্রীমান্ গম্বুর কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কুটপাথের এক পাশে একদলা থুতু ও কফ পড়িয়াছিল। গম্বু প্রথমে উহাতে দাঁতটি ডুবাইল। পরে উহা হইতে আকর্ষণ করিয়া—হয় ত পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যেই পাশের গোবরের গাছার মধ্যে পুঁতিল। হাতের কাছেই একটা কাঠি রাখা ছিল। এইবার সেটি তুলিয়া লইয়া সহসা গোবর খোঁটা শুদ্ধ হইল।

ইহা হইতে যে দুর্গন্ধ উৎখত হইল তাহা নবনীতবাবু যেন নিজের নাকের মধ্যে টের পাইলেন।

তাঁহার বয়স যদি অন্ততঃ কিছুটা কমও হইত তবে তিনি ছুটিয়া গিয়া অনায়াসে বাঁহর ছোকরার কানটা টানিয়া ধরিতেন। কিন্তু তাঁর মত সন্ধ্যাত ব্যক্তি যদি ছুটিয়া গিয়া একটা নিতান্ত ছেলেমানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাধান, তবে তাহা,



কেলেকারীর সৃষ্টি করিবে। তাঁহার দাঁতটির নিঃস্রব কথ্য লোকদের বলা চলিবে না। ছোঁকাব্য বাঁধারামিকে কেহই শুদ্ধ দিবে না। তাঁর নিজেকেই হাত্তকর হইতে হইবে।

সম্ভ্রান্ত হওয়া যে কতটা দুর্বলতা তাহা এমন স্পষ্টভাবে ইহার আগে তিনি আর কখনও টের পান নাই।

ছোঁকাব্য একবার আড়চোখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। নবনীতবাবুর ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হইল না। অর্থাৎ, এতেই হইয়াছে কি? না, আরও কিছু কারণে হইবে? তাঁর এই ব্যাখ্যা যে নিভুল তাহার প্রমাণ পাইতেও ঘেরি হইল না।

রাস্তা ও ফুটপাথের সংযোগস্থলটা বস্তির লোকদের কল্যাণে সর্ব্বদাই একটা আন্তার্কুড় ও নর্দমার সমাবেশ হইয়া থাকে। যিনি বারংবার কপৌরেশনের ষাণ্ডেরবা তাহা লাক করিয়া যায়, কিন্তু পরের মুহূর্ত্তে তাহা আবার যথাপূর্ব্বং। বর্ত্তমানে উহার একস্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার আকৃড়া ও রক্তাক্ত তুলা গড়াগড়ি বাইতেছে এবং উহাদের সংস্পর্শে কাছাকাছির জল পুঁজ-মিশ্রিত রক্তের মত বৌতংস হইয়া আছে। কাণ্ডির সহায়তার ছোঁকাব্য এইবার নবনীতবাবুর দাঁতটিকে সেই দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

‘গম্বু, শুনচিস্। গম্বু!’

গম্বু কিরিয়া তাকাইল।

‘শুন বা!’ নবনীতবাবু হাতছানি দিয়া ডাকিলেন।

গম্বু সেকেন্দুয়রকে দিখা করিল, তার পর দাঁতটি লাটি

দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে নবনীতবাবুর ব্যালকনিয়-ডলার আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘কি?’

‘দাঁতটা চেয়েছিলাম যে ওষুধ তৈরীর জন্য। আরেক জনের উপকার করা কি উচিত নয়? আচ্ছা নে, ছুঁটাকাই নে।’

গম্বু সত্যই মর্মান্বহত হইয়া ছিল। বেশি লোভ করিতে গিয়াই সেদিন সে দুই-দুইটা গোটা টাকা হারাইয়াছে। জীবনে সে নিজস্ব দুইটা শিকিও কোনদিন পায় নাই। এমন বোকামিও কেউ করে! আবার সুযোগ আসিলে হাত-ছাড়া করিবে না তাহা ঠিকই ছিল এবং এই সুযোগ-সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছিল গত দু’দিন ধরিয়া। তবু সে আর একবার চেষ্টা করিল।

‘আজ আর অন্ত সন্তায় হবে না, মশায়। আজ এর দাম বেড়েছে। পাঁচ টাকার এক আধলা কম নয়।’

নবনীতবাবু কোনও হামাহামি করিলেন না। মনিব্যাগ হইতে পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া আনিলেন।

কাউ স্বরূপ ত্রীমান্ গম্বু দাঁতটিকে রাস্তার কলের জলে ভাল করিয়া ধুইয়া দিয়াছিল। নবনীতবাবু আর বুঁকি লইলেন না। দাঁতটি কাগজে মুড়িয়া মনিব্যাগে ভরিয়া পরাসরি বাইয়া হাইকোটের ট্রামে উঠিলেন এবং আউটরাম ঘাটের জেটি হইতে উহা সজোরে ছুঁড়িয়া গলার বধাসম্ভব ভিতরে ফেলিলেন।

## শান্তি, সান্ত্বনা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

এ রাতও সুদীর্ঘ নয় : একথা তুমিও জানো,—আর  
আমিও জেনেছি ব’লে কিছু নেই এমন লজ্জার  
যাতে স্নেহে আসে ছুঁচোখের পাতার ঝালর,—  
বিবর যেষ্টের নীচে ঢাকা পড়ে দৃষ্টির আলোর  
ছোঁয়া; সে ছোঁওয়ার রং বুঝি ধরধরে নীল—  
সমুজের-স্বাদ-তার :—সে আমার অনন্ত-নিবিল।

একে একে চলে যাক এ রাতের অসংখ্য গ্রহর,  
আকাশের স্বপ্ন-ভরা তবু এই পৃথিবীর ঘর  
ছুঁহাতে আঙুলে রব’ গুলব না—দোর গুলব না—  
তুমি যদি ভুলে যাক, মনে জেন,—আমি ভুলব না  
আজ এই মুহূর্ত্তের-অন্ধকার—রাতের শপথ—  
দিন যদি কাছে আনে—আরও এক নয়া ভবিষ্যৎ ॥

তামসী সাকীর হাতে যৌবনের সুরাপাত্রখানি  
ভেঙ্গে বাবে অকস্মৎ—এ গত্য নিষ্ঠুর : তবু জানি  
ক্যাকাশে আলোয় ঢাকা লালসার লাল মাধামুখ  
চকিত চাহনি’ দ্বিগে চেখে নিতে তৃষ্ণায় উন্মুখ  
আমি নই। আমার এ নিশ্চিন্ত-শান্তি। আর কারও নয়,  
নিরুদ্বেগ মন তাই। যেনেছি সকল পরাক্রম ॥

## মরক্কো

### শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্তী

মধ্যপ্রাচ্য ও আরব জগত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫) বলা হইয়াছে মূল আরব ভূখণ্ডের 'আরব' ও 'মোজাবাব' ভিন্ন উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্য সাগর তীরবর্তী আরব-গণকে 'মজাবব' নামে অভিহিত করা হয়। মরক্কোর অধিবাসী-গণকে আরব ভাষায় 'মজাবব আল-আক্সা' বা 'মজিব আল-আক্সা' (অর্থাৎ পশ্চিম আরবের সীমান্তবাসী) বলা হয়। এই নামের ইংরেজী অপভ্রংশ 'মারাক্স' হইতেই মরক্কো নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই রাজ্যটির পশ্চিমতীরে অতলান্তিক মহাসাগর বিধৌত ও ইহার উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে আটলাস পর্বতমালা ও উচ্চ মালভূমি এবং পূর্বে প্রান্তে আলজিরিয়া রাজ্যের সীমানা।

পূর্বকালে এই স্থানে বারবারি জাতির বাসভূমি ছিল। ইহার ককেশীয় হেমাটাইট জাতির একটি শাখা। ইহার কতকাল এই স্থানে বসবাস করিতেছে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। ইহাদের ভাষা ইহুদীগণের হিব্রু ভাষার অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে আরবগণ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করিয়া স্পেন পর্যন্ত অগ্রসর হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর উম্ময়াদ বংশের রাজত্বকালে এই দেশে ইসলাম ধর্ম দ্বারা-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরবর্তীকালে উত্তর আফ্রিকার রাজ্য-গুলি আরব সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আরবগণ এই রাজ্যে আসিবার পূর্বেই খ্রীষ্ট ধর্ম এই দেশে সার্বভৌম প্রসার লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় বোড়শ শতকে ইউরোপে ক্রেস্টাইট নিপীড়নের কালে বহু ইহুদী এই দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই অবধি ইহার এই রাজ্যেই হারীভাবে বসবাস করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ হইতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের প্রাধিকার লইয়া ধর্ম আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন চুক্তি অনুসারে আলজিরিয়া ও মরক্কো সহ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড ফরাসী-গণের 'প্রভাবাধিত এলাকা'র অধীনে আসে। ১৯১১ সনের একটি নতুন চুক্তিতে ফরাসীগণ মরক্কো রাজ্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করে। এই সময় ফরাসী এলাকা পরিবেষ্টিত কয়েকটি স্থান লইয়া স্পেনের সহিত ফরাসীগণের বিবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯১২ সনে স্পেনের সহিত একটি চুক্তিতে ফরাসী ও স্পেনীয় এলাকা সম্পর্কে একটি সীমানা হয় এবং টাজিয়ার আন্তর্জাতীয় নিয়মেকমুক্ত বন্দররূপে ঘোষিত হয়। এই ব্যবস্থা ১৯৫৬ সন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন

তীব্র হইয়া উঠে। কিছুকাল প্রবল আন্দোলন ও সংঘর্ষের পর ফরাসীগণ মরক্কো রাজ্যের স্বাধীনতা মানিয়া লয় (১৯৫৬)।

মরক্কোর আয়তন এক লক্ষ বাহান্তর হাজার বর্গ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক, এবং জনসংখ্যা প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ। এই দেশের ভূমধ্য সাগর তীরবর্তী সমতল ভূমি ক্রমশঃ মধ্য মরক্কো হইতে উচ্চ হইয়া অ্যাটলাস পার্বত্য অঞ্চলে মালভূমির সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মরক্কো রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ তিন সহস্র ফুটের অধিক উচ্চে অবস্থিত। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমধ্য সাগরীয় উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া ও উচ্চ মালভূমি অঞ্চল শীতল। সাহায্য সন্নিহিত দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল মরুভূমি উত্তপ্ত, শুষ্ক ও অমুর্ষ্য।

মরক্কোর অধিবাসীবৃন্দকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) অতলান্তিক সমতল উপকূলের কৃষক শ্রেণী—বারবারি ও আরবীয়, (২) পার্বত্য দেশের উর্বর উপত্যকার বারবারি প্রধান কৃষক, (৩) অর্ধ-বাবারি পার্বত্য পর্বতারক বারবারি, ইহার বংশের অধিকাংশ সময়ই পশুপাল লইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, (৪) মরুভূমি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলবাসী বাবাবর ও অর্ধ-বাবাবর বারবারি (তুরায়োগ প্রধান) জাতি,—ইহার হৃদ্বাঙ্গ প্রকৃতির, (৫) নগরবাসী, ইউরোপীয় সহ বিবিধ জাতি।

মরক্কোর প্রধান অধিবাসী বারবারি ও আরব বংশোদ্ভূত। আরবী ভাষাই এই দেশের প্রধান ভাষা। অষ্টম শতাব্দীতে মরক্কোর বারবারি জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও পার্বত্য অঞ্চলে অজ্ঞানি তাহাদের প্রাচীন স্বাভাব্য প্রচলন আছে। রাষ্ট্র ভাবাবেগে সকলেই আরবী বৃত্তিতে ও বলিতে পারে। এই দেশে ইহুদী ও হিব্রু ভাষীয় সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নহে। বারবারি জাতির একটি শাখা হৃদ্বাঙ্গ তুরায়োগ জাতি, প্রধানতঃ মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্বাংশে বসবাস করে। সাহারা মরুভূমির পথে পথিকগণ এই তুরায়োগ দম্ভার ভয়ে সর্বদা দ্বিষ্ট থাকে। ইহাদের পুরুষগণ অবগুষ্ঠনের অনুরূপ মুখাবয়ব ব্যবহার করে ও অপর পক্ষে রমণীগণ অনাবৃত বদনে ভ্রমণ করে। আরবগণের সহিত এই পার্থক্য মরক্কোর সর্ব-স্থানেই দৃষ্টগোচর হয়। ইহা ভিন্ন প্রায় চার লক্ষ বিদেশীয় (ইউরোপীয়সহ) এই দেশে বসবাস করে। তাহাদের মধ্যে শত-করা সত্তর জন ফরাসী ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি ; শতকরা দশ জনের অধিক অজ্ঞাত আফ্রিকীয় জাতি, অবশিষ্ট অজ্ঞাত ইউরোপীয় ও বিবিধ জাতি। হুই-চারি জন ভায়তীয় ব্যবসায়ীও



## সহর থেকে গায়েঁ

গত বছর যখন আমি নিখুঁতলাকে বিয়ে করেছিলাম আমার বাবা  
মাকে না জানিয়ে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুদিনের  
ভেতরেই অবশ্য তারা এ ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে মেনে নিয়ে-  
ছিলেন। বিয়ের প্রায় একবছর বাদে আমি আর নিখুঁতলা আমাদের  
গায়েঁর বাড়ীতে গেলাম।



আমার মা নির্মলার সুন্দর চেহারা ও খিটু খাব্বারে খুব খুশী হলেন। সময়ে শিক্ষিতা বৌ সসারের কাজ কর



করবে না ভেবে যেটুকু হুশিয়ার ছিল সেটাও কেটে গেলো যখন নির্মলা সসারের সবকাজেই নিজেকে এগিয়ে গেলো।

মা সবথেকে খুশী হতেন যখন সুব মেয়ে বোয়েরা

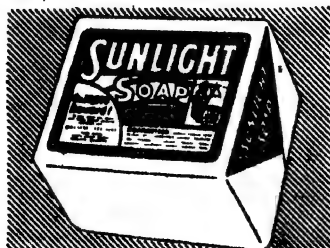
নির্মলাকে দেখতে আসতো আর নির্মলা তাদের নিয়ে বসে দেশবিদেশের পাঁচ রকম গল্প শোনাতো। মা তাঁর শিক্ষিতা বৌ সম্বন্ধে খুবই গর্বিত হলেন।

লগ্নে গত কালই ও পাড়ার লক্ষী মাকে বলছিলো “আমরা ভাবতাম লেখাপড়া শেখা মেয়েরা ঘর গের-স্থালীর কাজকর্ম পারেনা কিন্তু তোমার বোমা সেধরনের মেয়েই না।”

“কাজের কথাই যখন তুললে তখন শোন বোমা সকাল থেকে কি করেছে—রাগাবাগা সেয়েছে, খরদোর ঝাঁট দিয়েছে, জিনিস পত্তর গোছগাছ করেছে, সেলাই নিয়ে বসেছে, ছুটো চিঠি লিখেছে—এ সব সেয়েও চান করতে বাওয়ার আগে একগাদা কাপড় কেটেছে” বলে মা নড়ীর ওপর টাঙ্গানো একরাশ কাপড় দেখালেন। লক্ষী কাপড়গুলো দেখে অবাক” ওঃ মা এসব তোমার বোমার কাচা—এমন কি বিছানার চানর পর্যন্ত।

কি রকম খব্বাবে সাধা হয়েছে।

আর আমি যখন কাপড় কাচি কাপড় থেকে ময়লা বার করতে আমার প্রানান্ত হয়। তবে হাজার হোক আমাদের নির্মলা হলো গিয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ে।”



নির্মলা তখন চান সেয়ে কেঁদেছিলো— লক্ষীর কথা শুনি কানে গেলো—“মাসীমা, এর সাথে লেখাপড়া শেখার কি বোগ আছে। ঠিক যতন সাবান ব্যবহার করলেই কাপড় পরিষ্কার হবে।”

“কি সাবান বাছা আমার বলতো?” “কেন, সানলাইট সাবান, আপনি জানেন না?” লক্ষী তো অবাক “সত্যিই সানলাইট কাপড়কে সাধা ও উজ্জল করে কারণ অল্প একটু যতলেই প্রচুর কেনা হয় যাতে হাতের তেতর থেকে ময়লার প্রতিটি কথা বার করে দেয়।”

নির্মলার কথাগুলো যেন সকলকে একটু দক্ষ নতুন ধরন জানালো। মা বললেন “এতে আরও সুবিধা যে এ সাবানে কাপড় আছড়াতে হয়না একদম—অল্প একটু যতলেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু খাটুনীই বাচেনা কাপড়গুলোও বেশীদিন টেকে।”

“কিন্তু এ সাবানটার দাম বড় বেশী না কি?” এ প্রশ্নে মা হুপ করে গেলো নির্মলা বল্লো “সত্যি কথা বলতে এটা মোটেই বেশী খরচা পড়েনা কারণ এতে এত কেনা হয় যে এক গাদা কাপড় কাচা যায়।



দেখুন টাঙ্গানো কাপড়গুলো—ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ২০টা কাপড় এগুলো সব কাচতে একটা সানলাইটের আধখানা লেগেছে। তবুও কি আপনি বলবেন বেশী খরচা পড়ে।”

লক্ষীর মুখ হাসিতে ভরে গেলো, ও বললো, “বৈতে থাকো মা, তোমার অন্তরশেষ নেই। যোজ তোমার কাছ থেকে আমরা কত কিনা শিখছি।”

এই দেশে বাস করে। ১৯৫৬ সনে স্বাধীনতা ঘোষণার পর বহু কবাসী অধিবাসী এই দেশ ত্যাগ করে, তাহাদের অনেকে সরকারী ও অজ্ঞাত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীত্বক। ১৯৫৬ সন হইতে বহুভাষা সরকার সকল প্রতিষ্ঠানে, বিশেষতঃ ব্যাভীত, সমস্ত পদেই সরকারী নিয়োগের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

মরক্কো রাজ্য সুলতানের শাসনাধীন। এককাল পর্যন্ত সুলতান একমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। ছিরাভর জন সমস্ত বিশিষ্ট জাতীয় পরামর্শ পরিষদের সমস্তগণ সুলতান কর্তৃক মনোনীত হয়। সুলতান নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সমস্ত মনোনয়ন করেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করা ভিন্ন পরিষদের অস্ত্র কোনও ক্ষমতা নাই। মন্ত্রীসভা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে শাসন-কার্য পরিচালনা করে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনা হইতে নির্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধি পরিষদ গঠনের জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলনের একজন প্রাক্তন নেতা বর্তমান সুলতান পঞ্চম মহম্মদ এই বৎসরের (১৯৫৯) অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম নির্বাচনের দ্বারা জাতীয় পরিষদ গঠনের সকল ঘোষণা করিয়াছেন।

মরক্কো রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও অজ্ঞাত ধর্ম-মুষ্ঠানের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে অজ্ঞাত ধর্মামুষ্ঠানে বিধিকারী দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই রাজ্যে বহু সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বাস।

মরক্কো রাজ্য কৃষিপ্রধান হইলেও শিল্প-বাণিজ্যেও অনেক উন্নত। মরক্কোর 'কেজ' টুপীর শিল্প বিখ্যাত। এই টুপী নির্মাণের কেন্দ্রস্থল কেজ নগরীর নামানুসারেই এই টুপীর নাম হইয়াছে। মরক্কোর চামড়া (Morocco Leather) ও কার্পেট বিশ্ববিখ্যাত। এই রাজ্যের কর্ক-লিভার বৃক্ষের ছাল হইতে উৎকৃষ্ট কর্ক প্রচুর পরিমাণে নির্মাণ হয়। এই সকল পণ্য বিদেশে প্রচুর রপ্তানী হয়। কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ভূষা সাগরীয় জলবায়ুতে উৎপন্ন গম, বর প্রভৃতি শস্ত ও জলপাই, জাফা, কমলালেবু, ডুম্ব প্রভৃতি ফল। দক্ষিণে সাহায্য সন্নিকটে প্রচুর খজুর উৎপন্ন হয়। সাগর উপকূলের মৎস্য ব্যবসার হইতেও মরক্কোর বখেট উপার্জন হয়। এই স্থান হইতে টিনে রক্ষিত মৎস্য প্রচুর পরিমাণে কবাসী দেশে ও অজ্ঞাত ইউরোপীয় রাজ্যে বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়। এই রাজ্যে সাহায্য পরিমাণে খনিজ সম্পদও আছে। বর্তমানে সরকার খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের জন্য নতুনভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

মরক্কোর পরিষদ-গৃহ ও সুলতানের প্রাসাদ রাজধানী রাবাতে অবস্থিত। রাবাত নগরীতে প্রাচীন ইসলামীয় শিল্প ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প উভয়েরই নিদর্শন দেখা যায়। অত্যাধুনিক উপকূলে ক্যাসাব্লাঙ্কা অপর একটি প্রাচীন বন্দর-নগরী। তুরায়োগ দক্ষিণ-পশ্চিম সূত্রের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পর্বত গীর্জগণ ১৪৬৮ খ্রিঃ অব্দে এই বন্দর একবার ধ্বংস করে। কবাসী অধিকারকালে ইহা

পুনর্নির্মিত হয়। জিরাটীয় প্রাচীর সন্নিকটে প্রাক্তন আন্তর্জাতিক বন্দর তাজিরার অবস্থিত। এই নগরীতে ইউরোপীয় ও অজ্ঞাত বহু জাতির বাস। ইহা কবাসী আদর্শে নির্মিত একটি আধুনিক নগরী। মরক্কোর বৃহত্তম নগরী 'কেজ' দেশের অভ্যন্তরভাগে একটি নদীতীরে অবস্থিত। এই শিল্প-নগরীটির জনসংখ্যা সর্বাধিক। নগরীটির অধিকাংশ অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। অল্প-সংখ্যক আধুনিক অট্টালিকা ও পথ-বাটও আছে। অপরাপর পথ সঙ্কীর্ণ ও দিবাভাগে জনাকীর্ণ। কেজের সন্নিকটে একটি অতি প্রাচীন নগরী আবেল-সাসের অবস্থিত। এই নগরীর উপকণ্ঠে বহু প্রাচীন কোনসীয়, রোমক প্রভৃতির নির্মিত অট্টালিকা ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ অব্যাবধি দৃষ্টিগোচর হয়।

এই রাজ্যে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জন অধিবাসী অশিক্ষিত। স্থানে স্থানে অশিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় শতকরা ছিয়ানকই হইতে আটানকই জন পর্যন্ত। নগরাকলে শিক্ষার বখেট প্রসার আছে। তাজিরার প্রভৃতি নগরীতে শিক্ষিতের সংখ্যা ত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত। শিক্ষা-ব্যবস্থা কবাসী ব্যবহার অনুকরণে পরিচালিত হয়। বালক-বালিকাগণ বহু হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারী। তৎপর তাহারা নিদর্শনপত্র (Certificat d' Etudes primaires Musalmanes) লাভ করে। এই নিদর্শনপত্র লাভ করিলে ছাত্র-ছাত্রীগণ উচ্চ বিদ্যালয়ে (French Lycee) প্রবেশের অধিকারী হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্ত বৎসর পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে শিক্ষা-ব্যবহার উন্নতি ও প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। পল্লী-অঞ্চলেও দুই-এক স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাও চলিতেছে।

বর্তমান সুলতান পঞ্চম মহম্মদ একটি ঘোষণায় বলিয়াছেন— মরক্কো রাজ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যখন তাজিরার রাজপথে দ্রুতগামী যোটর সাইকেলে বোরখা-পরিহিতা কোনও সজ্জা রমণীকে চকিতে পাশ দিয়া চলিয়া যাঁতে দেখা যায়। তত্পরি চশেটাঘাতের ভয়ে ভীত ট্রাক্টিক পুলিশকে যখন সশঙ্কিতভাবে কোনও ধনী সজ্জা বোরখা পরিহিতা মহিলাকে ট্রাক্টিক বিধি মানিয়া চলিবার অনুরোধ জানায় তাহাও উল্লেখযোগ্য। যোটর চালনা ভিন্ন বর্তমানে কেহ কেহ পুরুষের সহিত টেনিস খেলায় অংশও গ্রহণ করিয়া থাকে। নগরী ও আশ্রমীয় প্রধান পল্লী-অঞ্চলে বোরখায় প্রচলন বেশী দেখা যায়। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সাহায্যিক অনুষ্ঠানের সময় ব্যাভীত বোরখায় ব্যবহার কম। তুরায়োগ রমণীগণ আদৌ বোরখা বা কোনও প্রকার অবাঞ্ছনীয় ব্যবহার করে না। ইহায়া খুব তেজস্বী ও স্পষ্ট-বাদী। মরক্কোর নারী-আন্দোলনে শিক্ষিতা তুরায়োগ রমণীর অবদান নগণ্য নহে। পার্কিতা অঞ্চলেও বিবাহাদি অনুষ্ঠানের সময় ভিন্ন অন্য সময় বোরখা পরিধানের বেশী বাধ্যবাধকতা দেখা যায় না। বোরখা পরিহিতা অনাবৃত্তা বদনে কর্তব্যতা অবস্থায়ই বেশী দেখা



# আপনারও চিত্রতারকার স্নাত ঝুঁসুয়া ফোমলে লাবণ্য

সুন্দরী সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন—“সবচেয়ে ভালভাবে লাবণের যত্ন নেওয়ার জন্য লাক্স টরলেট সাবানই আমার মতে সবচেয়ে ভাল। এটা এত সুগন্ধি ও বিশুদ্ধ।” আপনার লাবণ্যও ওই রকমই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে যদি আপনি বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টরলেট সাবান ব্যবহার করেন। মনে রাখবেন লাক্স স্নানের সময় সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টরলেট সাবান**  
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান



•LTS. 608-XS2 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।



যায়। এই সকল স্থানে পোয়াবরণ হিসাবেই বোরখার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। তাজিয়ার প্রভৃতি বৃহৎ নগরীতে অবস্থাপন্ন গৃহের ঘরদ্বীপগণকেও সাময়িক রীতি অহুসায়ে বোরখা পরিহিতা ঘেঁষিলেও দোকান-পাটে জব্বাদি ক্রয় করিবার কালে অনাবৃত্তা ববনে বিক্রেতার সহিত বচসায় প্রবৃত্ত অবস্থায় দেখা যায়। বর্তমানে নগরাক্ষয়ের বহু স্থানে ঘরদ্বীপ-পরিচালিতা অনেক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

নগরাক্ষয়ে মরকোবাসী অবস্থাপন্ন পুরুষদের মধ্যে অনেককেই ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করিতে দেখা যায়। কন্নাসী খাঁচে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করিলেও অধিকাংশই দেশীয় 'কেজ' টুঙ্গী ব্যবহার করে। নগরাক্ষয়ে ইউরোপীয় পোশাক ও কন্নাসী ভাষা স্বাধীনভাষাভেদে পয়েও ভারতের ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় পোশাকের ন্যায় অব্যাহত রহিয়াছে।

মরকো দেশে পল্লী ও নগর অঞ্চলে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। কন্নাসী-প্রভাবাধিত নগরাক্ষয়ে কিছুটা বিলাসিতা দেখা যায়, অপ-পক্ষে পল্লী-অঞ্চলের দাখিল্য ও দীনতা বিসমৃশ। শিক্ষা-বীক্ষার অধিক অগ্রসর না হইলেও আরব জগতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় মরকোবাসীর চরিত্র বাহ্যতঃ কিছু উন্নত।

আটলাস পর্বতের পক্ষ সহস্র হুট উঠে অবস্থিত কুন্ন ইক্কের নগরী পাশ্চাত্য যেশেব একটি আকর্ষণীয় স্থান। শীতকালে এই স্থানে তিন হুট পর্যন্ত ছুয়ারপাত হয়। পর্বত ও বনানী বেষ্টিত এই স্থানটি গ্রীষ্মকালে পজ্জ-পুঞ্চে সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। ইহাকে মরকোর কান্দীর বলা চলে। পর্বতের উপবিভাগের সমতলভূমি বহু হ্রদ ও কুন্ন কুন্ন পার্কভা নদীতে পূর্ণ। ইহা শিকারীদেরও একটি আকর্ষণীয় স্থান। বর্তমানকালে ইহা মরকো-বাসী ধনীদিগের গ্রীষ্মাবকাশের ও প্রমোদ-জয়নের স্থান বলিয়া বিবেচিত। প্রতি গ্রীষ্মকালে নগরীটির জনসংখ্যা অন্ততঃ দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। এই স্থানে ঘরদ্বীপের বোরখার আবরণ কিছুদিনের জন্য অপসারিত দেখা যায়।

১৯৫৬ সনে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বিদেশীয়, বিশেষ-ভাবে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। নাসেবের সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে যোগ না দিলেও মরকোরগণ তাহাদের প্রতি সহনাত্মিনীল। অন্যদিকে তাহারা কন্নাসী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির সহিত তিক্ততা বৃদ্ধিরও পক্ষপাতী নহে। বর্তমান বৎসরের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের পয়ে দেশোন্নয়নের একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করা ধার্য্য হইয়াছে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্র হইতে পৃথক হইলেও মরকো পশ্চাতে পড়িয়া নাই।



রকমাস্বিতাস্ব

স্বাদে ও

গুণে

অতুলনীয়।

লিলির লজেন্স

ছেলেমেয়েদের প্রিয়।



যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবুয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

যে পরিবারে হেলেযুঁতো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু বাহা ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি বাহ্যের পরম শত্রু। আগনি যতই সাবানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবুয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাক করে দেয় এবং আপনার বাহা সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা করবারে করে তোলে।



L/P. 3-X52 89

হিন্দুস্তান নিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

## প্রভাময়ী মিত্র

### শ্রীউষা মিত্র

বাংলা ১২৯৮ সালের ৬ই আষাঢ় তৎকালীন সুবিখ্যাত হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বিতীয়া কন্যাক্রমে প্রভাময়ীর জন্ম। সহজাত প্রতিভা লইয়াই প্রভাময়ী জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং শৈশব হইতেই নানাতাবে তাহার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা পরিণতি লাভ করিতে লাগিল তাঁহার পারিবারিক প্রেরণায়।



প্রভাময়ী মিত্র

১৩ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার আটপুয় গ্রামের মিত্র পরিবারের ৮ম সন্তানরূপে মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র ৮ম সন্তানরূপে মিত্রের (পরবর্তী জীবনে জেলা ও দায়রা জজ) সহিত প্রভাময়ীর বিবাহ হয়। প্রভাময়ী পিতৃগৃহ হইতে কাব্য, সাহিত্য, শাস্ত্র, দেশাত্মবোধ প্রভৃতিতে যে অমূল্য প্রেরণা ও আগ্রহ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন বাল্যবিবাহ তাহার প্রতিবোধ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলিত অধ্যয়নে তাহা দিনে দিনে পরিপুষ্ট লাভ করিতে লাগিল।

প্রভাময়ীর কাব্যসাধনা ছিল একলবোধ স্বত। অন্তরে কবি-গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিহুতে চলিত তাঁহার কাব্যসাধনা। এই

প্রসঙ্গে গুরুদেবের উদ্দেশে তাঁহার নিজের লেখায় তাঁহার মনের ভাবটি স্পষ্ট :

“তোমার আলোর যে কূল মেলিল আমি  
বনের অন্তরালে  
হোক রূপহীনা নাই থাক নাম খ্যাতি  
না যদি গন্ধ চালে  
ওগো সঙ্কল্প ! তব গতিপথে দিও  
শরন বিছাতে তার  
চরণ অরুণ পদম, আনত শিরে  
ছোঁয়ায়ে একটি বায়।”

অন্তঃপুরবর্তিনী প্রভাময়ীর জীবনে গুরুদেবের সাক্ষাৎ মিলিয়া-ছিল গোপুলিবেলার। যত হইয়াছিল উদ্ভব ফল। তাই তিনি লিখিলেন :

“গেছে দিবা বিভাবরী যার প্রতীক্ষায়  
প্রতিক্ষণে সৌরবান অপমাহু হার  
তধু কণ্ঠকের তরে  
একান্ত আপন করে,  
এ নিরঞ্জন অবসরে মিলিল তাঁহার—  
পদম নির্ভরতরে লুটাইছু পার।”

কৈশোর হইতে মৃত্যুর অনতিপূর্বে পর্যন্ত তাঁহার কাব্য-সৃষ্টি চলিয়াছিল অব্যাহত গতিতে—অন্যরাসে, অবলীলায়। তাহারই অতি সূষ্টিমের মাত্র প্রকাশ লাভ করিয়াছে “সাম্যাক্ষিকা” কাব্যগ্রন্থ-রূপে। তিনি বিভিন্ন সময়ে ‘ধুমকেতু’, ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। “দেউল” নাটক তাঁহার গভীরচিন্তা ও শিল্পানুভূতির নিদর্শন। শৈশব হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাঠ্যগ্রন্থাগ তাঁহার ছিল অনন্তসাধারণ। বৈষ্ণব সাহিত্য, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ববীন্দ্র-সাহিত্য এবং ববীন্দ্রোক্তর সাহিত্যে তাঁহার ছিল সমান দখল। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের সহিতও তিনি সাগ্রহে পরিচয় করিলেন। তাঁহার এই আগ্রহ মুকুটব্যাতেও অক্ষুর ছিল। ইতিহাস এবং বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান ছিল।

বাস্তবী হিসাবেও প্রভাময়ীর বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন পরিবারের অবয়োধবর্তিনী বধু বেদিন স্বামীর আগ্রহে ও উৎসাহে একান্ত যত্নে বক্তারূপে উপস্থিত হইলেন সেদিন তিনি নিজেও ভাবিতে পারেন নাই এতটা সাক্ষালাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার প্রথম দিনের ভাষণেই ষোড়শা বৃদ্ধ হইলেন

বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য এবং তেজস্বিতার। এর পর নানা জায়গা হইতে আহ্বান আসিতে লাগিল। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রীশ্রীসারস্বতী আশ্রমের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সমাজে নারী-কল্যাণে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতার তিনি বহু নরনারীকে পরিতৃপ্তি ও প্রেরণা দিয়াছেন। মৃত্যুর ১ বৎসর পূর্বেও তিনি শ্রীমদ্ভক্ত শিখা শ্রীশ্রীগৌরীমাতাজীর শততম বার্ষিকী উপলক্ষে নানা জায়গায় ভাষণ দিয়াছেন।

প্রভাসরী ১৩৩৮ সালে পুণা জম্মাষ্টমী তিথিতে দায়কুললীলা-সফর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকীর্ত্তিপালাভ করেন। ঠাকুরের “বত মত তত পথ” এবং বিশেষ কবিতা “জীব শিবের” আদর্শ তাঁহার জীবনের প্রতিটি পরিচ্ছেদে প্রতিকলিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কথায় :

“খুঁজিলা দেবতা তীর্থে দেউলে  
পুঁজিলা প্রতিমা পটে  
মোর মনমোর মনমিয়া সে যে  
বিহরিছে ঘটে ঘটে।”

জীবের সেবা এবং জীবকল্যাণকেই তিনি ঈশ্বরের সেবা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহা সক্রিয়-ভাবে মানিয়া চলিয়াছিলেন।

তৎকালীন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর পত্নী হইলেও তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রেম কোনদিন স্তম্ভ হয় নাই। অগ্নিসুগের বিভিন্ন স্বাদেশিক কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার পরোক্ষ সংযোগ ছিল এবং অন্তরালে থাকিয়াও তিনি তাঁহাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীর সঙ্গে কার্যসূত্রে জীবনে বহুদিন তাঁহার প্রবাসে

কাটিয়াছিল। প্রবাসের নিঃসঙ্গ কণ্ঠগুলি কাটাইবার জন্য তিনি চিত্রশিল্পকে অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়েও তিনি সাক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্র বহু প্রদর্শনীতে প্রদর্শনা-লাভ করিয়াছে। ১৩৪১ সালের ভাদ্রসংখ্যা ‘প্রবাসী’র মহিলা-সংবাদে তাঁহার প্রতিলিপি ও চিত্রসমালোচনা প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী প্রভাসরী ‘প্রবাসী’র প্রথম বৎসর হইতে নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা ছিলেন।

পরলোকান্তর সন্ধিক্ষে শ্রীমতী যন্ত্রের গভীর জ্ঞান ছিল। বিশেষ করিয়া কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী এই বিষয়ে বহু অল্পকাল ও গবেষণা করিয়াছেন। বহু শোকসন্তপ্ত নরনারী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া এবং তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

১৩৬৬ সালের ১০ই শ্রাবণ তাঁহার জীবনদীপ নির্কাপিত হয়।

মৃত্যু সন্ধিক্ষে প্রভাসরীর মতে একটি নিঃসংশয় অমুভূতি ছিল। শেষ-শব্দ্যায়ও তাঁহার মনে কোনদিন কোন বিধা আসে নাই। মৃত্যু সন্ধিক্ষে তাঁহার অমুভূতি ও ধারণা তাঁহার নানা কবিতার নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সাহসে যোগ-শব্দ্যায় তাঁহাকে নিজেই লেখা কবিতার অংশ কণিকণে আবৃত্তি করিতে শুনা বাইত :

“মৃত্যু তোমারে বরিয়াছি আমি, ভাবিনি ভয়ঙ্কর  
তিমির গহীন কঠিন মরণে ডুবি যে দীপঙ্কর।  
বিশাল লগাটে বিভূতিয় ঢাকা, আননে গভীর ক্ষান্তি  
প্রসন্ন দিঠি বিতবে প্রসাদ, আয়ত নরনে শান্তি।

প্রিয় প্রিয়তম বহু জনমের তব সাথে পরিচয়  
বাক্য ওঙ্কা, না মানি শঙ্কা—হে বিজয়ী হোক জয়।”

**ডায়াপেরসিন**  
হৃদয়শক্তি  
বজায় রেখে  
স্বাস্থ্যের  
উন্নতি করে

**ইউনিয়ন ড্রাগ - কলিকাতা**

# দি রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ও শিল্প-সাহায্য প্রতিষ্ঠান

শ্রীআদিভাণ্ডার সেনগুপ্ত

সম্প্রতি ভারত সরকার যে রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন গঠন করেছেন সে কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্থানের উদ্বাস্তদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কর্পোরেশনের কাজ হচ্ছে প্রধানতঃ দুটো। এর প্রথম কাজ হচ্ছে শিল্প স্থাপন করা। বলা হয়েছে, যদি কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায় শিল্প স্থাপন করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভবপর না হয় তা হলে কর্পোরেশন ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সহযোগিতায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে কুঠিত হবে না। কর্পোরেশনের দ্বিতীয় কাজ হ'ল ব্যক্তিগত মালিকানাকে সাহায্য করা। অবশিষ্ট কেবলমাত্র ঋণ দিয়ে সাহায্য করার কথা বলা হয় নি। ঋণ ছাড়াও পরামর্শ, কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপন্ন মাল বিক্রির সুবিধা ইত্যাদি দ্বারা কর্পোরেশন সাহায্য করবেন।

শ্রী জি. ডি. বিড়লা হলেন রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন শ্রী জে. সি. দে। এ ছাড়া আর যারা কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোডে আছেন তাঁদের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন শ্রী বি.পি. সিংহ রায়, সর্কীশ্রী কে. কে. রায়, ডি. এন. সেন, ডি. পি. গোয়েকা, এস. সি. রায়, পুনর্কাসন দত্তের সেক্রেটারী শ্রী অরুণ, অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী এন. এন. ওয়ানচু, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারী এল. কে. বা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সিনিয়র শিল্প উপদেষ্টা ডাঃ বি ডি কালেকর, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী আর গুপ্তা।

রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ১৯৫০ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখে কলকাতায় বেতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, শ্রী জে. সি. দে হলেন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ৮ নং থিরেটায় বোডে ভারত সরকারের পুনর্কাসন দপ্তরে কর্পোরেশনের আপিস স্থাপিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বলা হয়েছে, কর্পোরেশনটি একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হবে। সাধারণভাবে শিল্প মালিকদের উদ্বাস্ত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সাহায্যের সত্ত্ব হ'ল এই যে, পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তদের চাকুরি দিতে হবে কিংবা অন্ততঃ তাঁদের পুনর্কাসনে সাহায্য করতে হবে। শ্রী জে. সি. দে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

"It is necessary to dispel the prevalent misconception that industrialists eligible for assistance, must be displaced persons. for them there already exists a financing agency, the Rehabilitation Finance Administration."

আশা করা যাচ্ছে, যে সব শিল্প রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য পাবে সে সব শিল্পে যাতে

উদ্বাস্তদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় সেজন্য কর্পোরেশন সর্বদা চেষ্টা করবেন, কারণ উদ্বাস্তদের চাকুরি দিবার সর্বোত্তম শিল্পগুলোকে সাহায্য দেওয়া হবে। বর্তমানে পাঁচ কোটি টাকা অল্পবোদিত মূলধন নিয়ে রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন কাজ শুরু করেছে। এই টাকা দিয়েছেন ভারত সরকার। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আরও বেশী টাকা কর্পোরেশনকে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। সাহায্যপ্রার্থী শিল্পকে কতটা পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হবে সেটার কোন নির্দিষ্ট সীমা ঠিক করে দেওয়া হয় নি। তবে সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় প্রধানতঃ দুটো জিনিসের উপর জোর দেওয়া হবে বলে শ্রী জে. সি. দে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রথম জিনিস হ'ল সাহায্যের আবশ্যিকতা। দ্বিতীয়তঃ সাহায্যপ্রার্থী শিল্প প্রাপ্ত সাহায্যের সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে পারবে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। শ্রী দে বলেছেন, সাহায্যপ্রার্থী শিল্পগুলো যাতে খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য পেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। যারা সাহায্য চাইছেন তাঁদের কতখানি যোগ্যতা আছে সেটা কর্পোরেশনের ইকনমিক অফিসার পরীক্ষা করে দেখবেন। এ ছাড়া যে স্থানে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হবে সেটাও পরীক্ষা করার দায়িত্ব কর্পোরেশনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারদের উপর তুল্য হয়েছে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী জি. ডি. বিড়লা বলেছেন :

In trying to create employment, if we concentrate only on displaced persons we might lose the opportunity of creating employment for Bengalis. I would, therefore, like to widen the scope to include every Bengali in the employment picture. If we take a general view, you will agree that once you create employment among certain Bengalis, then it will have its impact also on the displaced persons."

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন ক্ষুদ্র, মাঝারি, এবং বৃহৎ সমস্ত প্রকারের শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঋণ এবং অগ্রিম দিবেন। এ ছাড়া যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সে সব শিল্পের সম্প্রসারণের জন্যও এবং অগ্রিম দিবার ব্যবস্থা হয়েছে। জানা গেছে, কর্পোরেশন কতকগুলো উপযুক্ত এলাকার শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা করবেন। আশা করা যাচ্ছে, এই সব শিল্প-পল্লীতে কারখানার স্থান, জল, বিদ্যুৎ, যানবাহন এবং কাঁচা মাল ক্রয় সম্বন্ধীয় সুবিধা থাকবে। যে সব শিল্প-মালিক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে চাইবেন সে সব মালিককে শিল্প-পল্লীতে কারখানার স্থান ভাড়া দেওয়া হবে। এমনকি এঁদের কাছে কিছুকিছু মূল্যে কিংবা সরাসরি কারখানার স্থান বিক্রি করা হবে

বলেও জানা গেছে। এই স্বর্ণে একটা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, কলকাতার নিকটে অত্যন্ত একটা অথবা দুটো শিল্প-পল্লী স্থাপন করা হবে। যে সব শিল্প-মালিক কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁদের খিরেটার রোড হ'ল দপ্তর থেকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেশনের তরফ থেকে স্থাপ্যতা বাবে বলা হয়েছে, কর্পোরেশন পশ্চিম বাংলার যে কোন স্থানে শিল্পের জন্ম সাহায্য দিতে রাজী আছেন। তবে যে ক্ষেত্রে সাহায্য দরকার সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়া চাই। এখানে আমরা আবেদনটা জিনিস বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি। পশ্চিম বাংলার পল্লী-অঞ্চলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্পোরেশন সাহায্য দিতে খুব উৎসাহী। প্রচারিত থববে প্রকাশ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং দণ্ডকারণো উদ্যোগ কলোনি ও উপনগরীগুলোতে কিবা এগুলোর কাছাকাছি শিল্প স্থাপন এবং সম্প্রসারিত করার প্রস্তাবও রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রী কর্পোরেশন বিবেচনা করবেন। প্রধানতঃ দুটো উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম কর্পোরেশন ট্রেনিং দিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মিটান। দ্বিতীয়তঃ যাতে উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং উন্নত ধরনের বস্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভবপর হতে পারে সেজন্য কর্পোরেশন চেষ্টা করবেন। ট্রেনিং দিবার জন্ম বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা-সংস্থাগুলোর সঙ্গে কর্পোরেশন বন্দোবস্ত করবেন বলে জানা গেছে।

কোন কোন মহলেয় ধারণা, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে উদ্যোগের কর্তৃপক্ষস্থানের যে পরিকল্পনাটি চালু করা হয়েছে সে পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে বানচাল হয়ে গেছে। উদ্যোগের কর্তৃপক্ষস্থানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার চৌদ্দটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর হু' কোটি টাকা খণ দিয়েছিলেন। এই টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মায়ক্ষয় বৃত্তি হয়েছে। অথচ শতকরা মাত্র চল্লিশ জন উদ্যোগকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত খণের পরিমাণের অনুপাতে উদ্যোগের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ দেওয়া হয় নি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার আসল অবস্থা সম্পর্কে অসুস্থকান করার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অনুযোগ জানিয়েছেন।

কলকাতার বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে এই স্বর্ণে একটা থবব প্রকাশিত হয়েছে যে, কয়েকটা শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকার আরও বার লক্ষ টাকা কর্জ দিতে রাজী হয়েছেন। এই কর্জের শিঙ্কনেও একটা সর্ভ আছে। সর্ভটি হ'ল এই যে, উদ্যোগের চাকুরি দিতে হবে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার নাকি স্থির করেছেন, খণ যত্ন করা হবে। ভারত সরকারের উদ্যোগ পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বস্ত্রী নিজে ভদ্র করবেন। এসকলতঃ উল্লেখ করছি, কিছুদিন আগে ভারত সরকার চৌদ্দটি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে হু' কোটি টাকার খণ দিয়েছিলেন। সে খণেরও সর্ভ ছিল, উদ্যোগের চাকুরি দিতে হবে। এই স্বর্ণে অভিযোগ করা হয়েছে, চৌদ্দটি প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই এই সর্ভ পালন

করতে অসমর্থ হয়েছেন। হয়ত এঁরা ইচ্ছা করেই সর্ভ পালন করতে চান নি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে একটা তদন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ পুনর্বাসন বস্ত্রী জী বান্না পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগ পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী জী এস. বান্নাক্সির সঙ্গে এমন কতকগুলো শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন যেগুলো খণের জন্ম আবেদন করেছেন। প্রচারিত থববে প্রকাশ, বিগত ২০শে জুলাই তারিখে চার-পাঁচটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানকে আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খণ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তের কলে জানা গেছে, একটা কাপড় কলে নাকি চায়শত উদ্যোগকে কাজ দিবার কথা ছিল। অথচ মাত্র হু'শত বিদ্যায়ী জন উদ্যোগকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নাকি মিল খুলবাব জন্ম খণ দেওয়া হয়েছিল। অথচ এখনও পর্যন্ত এই মিল স্থাপিত হয় নি। এই প্রস্তাবিত মিলে নাকি হু'শত উদ্যোগকে কাজ দেওয়া হবে বলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ এখনও পর্যন্ত একজন উদ্যোগকেও কাজ দেওয়া হয় নি। জানা গেছে, যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে খণ নিয়ে খণের সর্ভ ভদ্র করেছেন সর্ভভদ্র করার কারণ প্রদর্শন করার জন্ম সে সব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার নোটিশ জারী করেছেন। প্রচারিত থববে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার সময় কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নাকি বলেছেন, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুণ বাইরে থেকে ঠিক সময়ে বস্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভবপর হয় নি। এজন্য তাঁদের অনুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার বিগত ১৫ই আগস্ট তারিখে এই স্বর্ণে একটা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যে :

"If setting up industries for employment of refugees in West Bengal has been slow, it is because of time-consuming procedure followed by the Government and Lack of co-ordination between its different departments and between the Union and State Governments..

দি রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জী জি. ডি. বিড়লাও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের চিঠির উত্তরদান এসকলে বলেছেন :

I get a general impression that many of the projects have been held up because of too much red-tapism. That we shall have to eliminate."

আমাদের মনে হচ্ছে, উদ্যোগের কাজ দিবার সর্ভে শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে খণ দিবার পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্পর্কে অসুস্থকান করার সময় উল্লিখিত গলদগুলোর উপর নজর রাখা একান্ত দরকার। আমরা এখনও আশা করছি, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে পরিকল্পনাটি সফল হবে।

## ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার

ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার ১৮৯০ সনের ১৪ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডেভিড জে. আইসেনহাওয়ার ও মাতা আইডা এলিজাবেথের ইনি তৃতীয় পুত্র। ইহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্মানী। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ডুইট ও তাঁহার পাঁচ ভ্রাতা জীবনে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহার পিছনে রহিয়াছে পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অমুপ্রেরণা।

সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শেষ করিয়া ডুইট ওয়েষ্ট পয়েন্টে সময়শিক্ষা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় হইতেই তাঁহার পুঙ্ক হইল দীর্ঘ সময়-জীবন। ১৯১৫ সনে ডুইট স্নাতক হন। ইহার পর স্তান অ্যান্টোনিওতে (টেক্সাস) উনবিংশ ইনক্যান্ডি, রেজিমেন্টে সেকেন্ড লেকটেন্যান্ট হিসাবে নিযুক্ত হইলেন। এইখানেই ডেনভারের ব্যবসায়ী-কন্যা অষ্টাবিশী মারি জেনীভা ডাউডের সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহারই প্রথম পুত্র ডিন বৎসর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় পুত্র জন বর্তমানে হোয়াইট হাউসে সহকারী ঠাক শেক্রেটারি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ডুইট পানামা খাল অঞ্চলে সৈন্য-বাহিনীর অফিসার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৫ সনে তিনি জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের সহকারী হিসাবে ফিলিপাইনে যান। ডুইট এই সময়ে ফিলিপাইন বিমান-বাহিনী গড়িয়া তোলার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন এবং নিজেও বিমান চালাইতে শেখেন।

১৯৪১ সনে আমেরিকা যখন মহাযুদ্ধে যোগদান করে, তখন তিনি আমেরিকার ষাৰ্ড আৰ্মির সৰ্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪২ সনের নবেম্বর মাসে ডুইট আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে উত্তর-আফ্রিকায় অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। সেই সময়

তাঁহার সময়-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুঙ্ক্যাব হিসাবে ইউরোপে মিত্র-শক্তির সৰ্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সনে ক্রাঙ্গ-যুদ্ধও তিনিই পরিচালনা করেন এবং পশ্চিম জার্মানী জয় করেন। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধ শেষ হইলে, ডুইট মার্কিন সেনাবাহিনীর সৰ্ব্বাধিনায়ক হিসাবে জেনারেল মার্শালের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৪৮ সনের কেক্সগারি পৰ্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর আসিল তাঁহার স্মরণীয় ১৯৫২ সন। যে সনে তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসাবে সর্বোচ্চ ভোট পাইয়া প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সনে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইয়া ডিন কোটি ৫৫ লক্ষের বেশী ভোটে নির্বাচিত হইয়াছেন। এত অধিকসংখ্যক ভোট আজ পর্য্যন্ত কেহই পান নাই।

তিনি গলক খেলার বিশেষ ভক্ত। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার অমুগাৎ দেখা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধীয় তাঁহার উল্লেখযোগ্য বই 'ক্লুসেড ইন ইউরোপ' ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয়।

মিঃ ডায়েল যখন অল্পস্থ হন, তখন হইতে পরবর্ত্ত দশকের পূর্ণ কর্তৃত্ব ডুইট ডি. আইসেনহাওয়ারের হাতে আসে। তখন হইতেই তাঁহার মনে আগে, তাঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে জগত হইতে এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের অবসান করিয়া বাইবেন। ক্লুসেডের সহিত ব্যক্তিগত আলোচনার সাফল্য তাঁহাকে এই প্রচেষ্টায় আবণ্ড উৎসাহিত করিয়াছে। মাত্র একটি বৎসর তাঁহার কার্যকাল শেষ হইতে বাকী— এইজন্যই তাঁহাকে এত তাকাতাড়ি করিতে হইতেছে।

এই কারণেই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভাবত-সকর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ব-শান্তির সন্ধিচ্ছা লইয়াই, শুধু ভাবতবর্ষেই নহে, পারস্ত, গ্রীস, টিউনেসিয়া, মরক্কো, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জার্মানী দেশগুলিও পরিদর্শন করিতেছেন। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।





দিনে দিনে

দিনে দিনে দি



## রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকের লাবণ্য বাড়িয়ে জেলে



রেক্সোনা সাবানে  
'কাডল' বলে একটি বিশেষ  
ধরনের ত্বকের শ্রীহৃদিকারক  
তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে যার  
ফলে আপনার ত্বক আরও  
কোমল, আরও মন্থণ দেখায়...  
লাবণ্য এনে ধরে।

সৌন্দর্য্য সাধনার  
রেক্সোনা ব্যবহার  
করুন !



# পুস্তক পরিচয়

রম্যাপি বীক্ষা—(সৌরাষ্ট্র পর্ব)। ঐশ্বর্যবোধকরায় চক্ৰবর্তী। এ, মুখার্জী এণ্ড কোং (প্রাঃ), লিঃ। ২, বন্ধিষ চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬ টাকা।

রম্যাপি বীক্ষা একখানি উপভাস, অন্ততঃ বইয়ের শিরোনামের এই সৌন্দর্য রয়েছে। কিন্তু বইখানি পড়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে—এটি যোমালের স্মৃতির গাঁথা জয়ন-কাহিনী অথবা জয়নের পটভূমিকার যোমাতিক গল্প? যে কোন একটি নামে আলোচ্য বইখানিকে অভিহিত করার বাধা আছে বলেই এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। এতে সৌরাষ্ট্র-মণ্ডলীর কয়েকটি দেশ—স্বয়ং, বেষ্ট, স্বয়ং, প্রভাস হওল, সোমনাথ প্রভৃতির কথা রয়েছে। বিবৃত ভাবেই রয়েছে এই সব অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থভূমির পরিচয়। আরও রয়েছে যশ্বর ও পর্বত সজ্জিত পুরাণ কথা, ইতিহাসের কথা, প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনা, বা নাকি জয়ন-কাহিনী রচনার মূল্যবান উপকরণ, অথচ যোমালের স্মৃতি-বিবৃত হওয়ার প্রকৃত জয়ন-কাহিনীর গোন্ধে মেলে না। যোমালের জাল মনে জয়ন-কাহিনীকে উপায়ে করা যে যায় না—তা নয়, এই দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুলভ নয়। বরং এই জাতের কাহিনীই পাঠক-সমাজে সবার লাত করে থাকে। তবু মনে হয় জয়নের আসল পরিচয় কোথায় বেন একটু খান বিশেষ থাকে। দেশ, পথ, প্রকৃতি ও যাত্রাবের বর্ণনা পরিচয়ে যে কটি জয়ন-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে

স্বয়ং হইতে আছে—যোমালের আলো না আলিয়েও এদের জ্যোতি হু কালে প্রসারিত। দৃষ্টান্তরূপ জয়ন সেনের 'হিমালয় জয়ন', প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের 'হিমালয় পাবে কৈলাস ও মানস সরোবর', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'পদ্মাবতরণ' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এদের বর্ণনার নগাধিগত হিমালয়—খান-পতীর প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে কাহিনীর নায়ক হয়ে উঠেছে। তাঁর চারি পাশে রয়েছে অসংখ্য কুশীলব-ভাঙ্গা উপত্যকা অথবা তুষারপুঞ্জ জলবায়ু সঙ্গী বৌদ্ধ গৃহী পথিক বনিক শ্রমিক পাণ্ডা ও পুরোহিত প্রভৃতি। কল্পিত যোমালকে না পেয়েও—এদের সঙ্গ যাত্রাবের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনাকে উদ্দেশ্য করে তোলে না কি?

এক কথা বলার উদ্দেশ্য রম্যাপি বীক্ষার মধ্যেও এই গুণটি লক্ষ্য করা যায়। সৌরাষ্ট্রের যে ক'টি তীর্থভূমির পরিচয় এতে রয়েছে—সেগুলি অসম্পূর্ণ নয়—কৌতুহলোদ্দীপক এবং বর্ণনার গুণে মনোহারীও। কিন্তু গল্পের খানটুকু ওর সঙ্গে মেলে নি। আবার গল্পের কেন্দ্রেও—যোমালের বড় ধরার চোঁটা সন্ধ্যেও—সেটা পুরোপুরি গল্প হয়ে ওঠেনি। জয়নকে উপলক্ষ্য করে আরও কয়েকটি পার্কে গল্পের জের টানা হয়েছে বলেই হৃদয় এমনটি বটেছে।

প্রশ্ন হতে পারে এই রচনা না হউক উপভাস, নাই বা হ'ল জয়ন-কাহিনী—আগলে ওটা মনকে টানে কি না? সাহিত্যে এর মূল্যটুকু স্বীকৃত হলেই ত লেখার সার্থকতা। কথা ঠিক। তবে প্রত্যেক পাঠকই একটি প্রত্যাশা নিয়ে বই পড়েন। গল্প উপভাস জয়ন প্রবন্ধ কিংবা রম্য রচনা বাই হউক—পাঠকালে পাঠকের মেজাজও সেই মত তৈরী হয়ে যায়—আম সঙ্গে সঙ্গে একটি ছবিও মনেতে হুটে ওঠে। সেই ছবির রঙটা যদি কিছুবাক্য কিকে হয় পাঠকের মন খুঁত খুঁত করে। খালি মনে হয় কেন এমনটা হ'ল।

রম্যাপি বীক্ষা যদি হুর্কল রচনা হ'ত—এমন প্রশ্ন কেউ করতে না। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা, পুরাণ ও ইতিহাসের গভীর জ্ঞান, ভাবার সাবলীল সব দিক থেকেই এটি উল্লেখযোগ্য রচনা। পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করার—ওর চেয়ে প্রকৃষ্টতর পদ্য আর কি থাকতে পারে।

বইয়ের ছাপা ও বাধাই উৎকৃষ্ট। কয়েকখানি ছবিও এর মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

ঐরামপদ মুখোপাধ্যায়

## দি ব্যাক অব বাঁকুড়া নিমিটেড

কোম : ২২—৩২১০

গ্রাম : কায়সথা

সেক্টর অফিস : ৩৬নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়  
ফি ডিপজিটে শতকরা ৫, ও সেভিংসে ২, ছয় মেরা হয়.

আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল ছয় লক্ষ টাকার উপর

সোমবার :

জে. মাসেবার :

ঐক্যবান্ধ কোলে এম.পি, ঐক্যবান্ধ কোলে

অভ্যন্তরীণ অফিস : (১) কলেজ কোয়ার্টার কলি: (২) বাঁকুড়া



দীর্ঘ, কৃষ্ণ ও

উজ্জ্বল

কেশরাশির জন্য...

**মিক**

পারফিউমড

**কোকোনাট হেয়ার অয়েল**

এখন এই শতাব্দীর আকর্ষণীয় বোতলে।

ছাই রকম সুন্দর সুগন্ধে  
গোলাপ ও যুই



ECHO. 4A-50 BG এনাসমিক কো: লি: লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্তান লিটারি লি: কর্তৃক ভারত প্রস্তুত।

চিত্র-দর্শন—কানাই সামন্ত, ২১২ পৃষ্ঠা, ৫৮ বাহি মাক-  
টোন চিত্র, ১৫৮খানি রঙীন চিত্র,—বিভোবর লাইব্রেরী, ৭২  
ফারিস রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৫/-।

বাংলা ভাষার রূপবিজ্ঞা সম্বন্ধে বেশী বই লেখা ও প্রকাশিত  
হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের ‘বাগেশ্বরী প্রবচনাবলী’ (কলিকাতা  
বিদ্যাবিদ্যালয়), বামিনীকান্ত সেনের ‘আর্ট ও আর্হিটাক্চার’ (সুভদ্রাস  
চট্টোপাধ্যায়), সুধা বসু ‘ছবিবাণী সেবা ছবি’ (প্রকাশক শিবলাল  
বসু), অশোক মিত্রের ‘ভারত শিল্পের ইতিহাস’ সুরেন্দ্রনাথ দাশ-  
গুপ্তের ‘সৌন্দর্যতত্ত্ব’ (মিত্রালয়) এবং ‘ইউরোপে আধুনিক  
চিত্রাবলীর প্রগতি’ (দেবকুমার বসু)—যাত্র এই কয়খানি পুস্তকই  
বাংলা ভাষার রূপশিল্পের পরিচয় দিরাছে। বাংলার উচ্চ শিক্ষিত  
সমাজ রূপবিজ্ঞা সম্বন্ধে বর্ষেই বিমূর্খীভাব গোষণ করিয়া থাকেন।  
ছবির প্রদর্শনীতে উদ্বাসিত সাহিত্যিক মহাশয়েরা বড় পদার্পণ করেন  
না। সুতরাং কৃত্রিম জগতে সাহিত্য ও সঙ্গীত-বিজ্ঞা ব্যতীত—  
জ্ঞানের আর কোনও শাখা তাঁহাদের আলোচনার বহির্ভূত।  
সুতরাং বিভোবর লাইব্রেরী লীকানাই সামন্ত রচিত বহুচিত্র-  
শোভিত এই বইখানি প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি  
অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, এবং নিশ্চয়ই চিত্রপ্রেমীদের অভিনন্দন লাভ  
করবেন। গ্রন্থকার ভারতের প্রাচীন চিত্রশিল্পের পটভূমিকার  
আচাৰ্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নূতন চিত্রকলাপদ্ধতির ব্যাখ্যা  
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা বিশেষ সফল না হইলেও  
তাঁহার রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই নিবন্ধে গ্রন্থকার আচাৰ্য্য  
অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর চিত্র ব্যতীত আচার্য্যের আর কোনও  
শিষ্যের নাম উল্লেখমাত্র করেন নাই। ভারতের নবীন চিত্রকলার  
আলোচনার—কিত্তিরূপাথ মজুমদার, অসিতকুমার হালদার,  
সুরেন্দ্রনাথ ভট্ট, দেবীপ্রসাদ বার চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন, নরেন্দ্রনাথ  
ঠাকুরের চিত্র বার দিয়া—গ্রন্থকার পক্ষপাত ও সঙ্গীতভাব পরিচয়  
দিরাছেন। কেবলমাত্র নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী অবলম্বন করিয়া  
বাংলার নবীন চিত্রকলার সূত্র পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তথাপি,  
যায় পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার (১৩৩-১৫৪) নন্দলালের শ্রেষ্ঠকীর্তি  
ও শ্রেষ্ঠস্থিতি—শিবলীলার চিত্রাবলীর উল্লেখমাত্র না করিয়া কেবল  
যে নন্দলালের চিত্র-স্থিতি ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় অসম্পূর্ণ  
ও বিকৃত হইয়াছে তাহা নহে, ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক  
চিত্রাবলীর ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র  
“শিব-সীতাবিনীত” একখানি অক্ষয় ও দুর্দল বর্ণ প্রতিলিপির  
সুরোজনে—নন্দলালের মৌলিক রূপস্থিতির পরিচয়—সম্পূর্ণ করা  
যায় না। প্রকাশক পুস্তকে ১৫৮খানি দ্বিবর্ণের প্রতিলিপি প্রকাশ  
করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হুই-তিনখানি ব্যতীত প্রায় সব-  
গুলিতে আসলের তুল ও সৌরভের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ  
বেশে সঠিক ও নির্ভুল রঙীন প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় না। সুতরাং  
এই কটির জন্ম প্রকাশককে দারী করা যায় না। নানা দোষ ও  
ত্রুটি থাকিলেও—আমরা পুস্তকখানি প্রশংসা করি। চেষ্টা সফল

না হইলেও চিত্রবিজ্ঞায় আলোচনার ক্ষেত্রে চেষ্টাবাহী প্রবন্ধসমূহ।  
পুস্তকখানি প্রত্যেক লাইব্রেরীতে স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গীতিমুখর ভিয়েনা—ঈশেফানি নন্দী। পঞ্চদশ  
লাইব্রেরী, ১২৫১১-বি, তর্পণলালি ফ্রীট, কলিকাতা-৩।  
মূল্য দুই টাকা।

বংশিনী লেখিকার এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকাহিনীর স্বাভাবিক  
আবেদন ছাড়াও চমৎকার প্রচ্ছদপট, খানকরেক মনোরম আলোক-  
চিত্র ও ছাপার পারিপাট্যের আকর্ষণ আছে। ভাবা প্রাণতল ও  
বর্ণনার বৈঠকী আরেক থাকতে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।  
ভিয়েনা নগরীয় স্বাভাবিক, সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন গোঁরব লেখিকার  
অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল; বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত-  
সুধাকরদের জন্ম বা সাধনক্ষেত্রে সম্মুখী উপস্থিত থাকিয়া বর্তমানের  
কুশলী স্বরকারদের বন্ধু ও কণ্ঠে সেই সব মহামহীনের রচিত সঙ্গীত  
শ্রবণ করিয়া সঙ্গীতাত্মবোধগম্য সংবেদনশীল জন্মরথীণার তন্ত্রীতে  
তন্ত্রীতে কঁকার উঠিয়াছিল। এই গ্রন্থের পাতার পাতার “ভিয়েনা-  
সুন্দরী”কেও আড়াল করিয়া লেখিকার সেই বিহ্বল জন্মের  
প্রতিচ্ছবিই বেশী ফুটিয়াছে। রচনা খুবই সংক্ষিপ্ত না হইলে বাংলা  
জন্ম-সাহিত্যে গ্রন্থখানি একটি স্বর্গদ্বার আসন অধিকার করিতে  
পারিত।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

রাষ্ট্র-জ্ঞানের মধুভাণ্ড—‘মোহাম্মদ’, সরস্বতী লাইব্রেরী,  
৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-২। মূল্য তিন টাকা।

‘রাষ্ট্র-জ্ঞানের মধুভাণ্ড’ বইখানি আকারে ছোট হইলেও ইহা  
গ্রন্থের স্বর্গদ্বার পাইবার যোগ্য। স্বাধীন হইয়াও আমরা স্বাধীন  
ভারত-রাষ্ট্রের ধর প্রায় কেহই জানি না। গ্রন্থকার তাঁহার এই  
বইখানিতে আমাদের সেই কথাই শুনাইয়াছেন। বইখানিতে  
আটটি অধ্যায় আছে : ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা, ভারতের রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়,  
ভারতের রাষ্ট্র-চেতনা, ভারতের রাষ্ট্র-বিপ্লব, ভারতের রাষ্ট্র-সংগ্রাম,  
ভারতের রাষ্ট্র-সংস্কার, ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং নব-ভারতের  
ভিত্তি। অধ্যায়গুলি দেখিলেই পুস্তক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি  
ধারণা জন্মে। এক কথার ইহা একখানি ইতিহাস—ভারত-  
ইতিহাস। আমাদের দেশে ইতিহাস বলিতে বাহা আছে তাহা  
বিধায় ইতিহাস। যে-ইতিহাসে আমাদেরকে পাই না, বাহার  
সহিত ভারত-আত্মার কোন যুগসুত্র নাই, তাহাকে আর বাহাই  
বলি না কেন, ইতিহাস বলিতে পারি না।

সত্য কথা বলিতে কি রাষ্ট্র-জ্ঞান বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রায়  
সকলেরই সীমাবদ্ধ। এবং এই জ্ঞানের অভাবেই সামাজিক  
বিশৃঙ্খলতা, দলাদলি, মাঝামাঝি। এই তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনার  
গ্রন্থকারের প্রব্রু ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। এরূপ ইতিহাসেরই  
আমাদের দেশে এককাল প্রয়োজন ছিল। ইহা হাজিরের জন্ম

# দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে  
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



- দাঁত ওঠার সমস্যা? হাড়ের ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার  
আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙুলটা ডুবিয়ে  
দিন তারপর আঙুলে আঙুলে শিশুর হাড়িতে মালিশ করে দিন  
এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর ঝিট ও হুশাফ  
শিশুর প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং গৃহকর্মে, গুরুত্ব হিসাবে, প্রসাধনে  
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের  
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

P.M.C

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটা ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান :  
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং ৪০২, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার  
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার গৃহস্থের দোকানের নাম ও ঠিকানা

FIG. 13-3X30 BG

ডিস্ট্রিবিউটর : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লি. কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস

নিষ্পত্ত হইলেও প্রত্যেকের ইহা 'অবশ্য সংরক্ষণ' হিসাবে ধরে রাখা উচিত।

শিশু-সাহিত্য রচনার সিদ্ধান্ত মৌমাছি যে একরূপ জটিল জিনিসের অট্টোয়াইতেও অভ্যস্ত ইহা আশ্চর্যের জানা ছিল না। তাঁহার অর্থ সার্থক হইয়াছে। বইখানির নামকরণও হইয়াছে চমৎকার। নামেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ।

মনীষীদের ছোটবেলা—জীবন যৌব (মৌমাছি)।  
স্বপ্নভী লাইব্রেরী, ৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-২।  
মূল্য ২.২৫ নং পঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বিমল যৌব 'মৌমাছি' নামেই পরিচিত। বিশেষ করিয়া ছেলেদেরেরা তাঁতাকে ভাল করিয়াই জানে। শুধু ছেলে-দেরেরাই বা বলি কেন, তিনিও তাদের প্রাণের কথা বোঝেন। এই প্রাণের কথাটি ধরা বড় সহজ কথা নয়। আমরা বড় হইলে তাদের ঐ প্রাণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি, তাই ঠিক ছোটটি হইয়া ছোটদের কথা বলিতেও পারি না, বলিতে গেলেও ঠিকমত বলা হয় না। 'মৌমাছি' সেই তথ্যটি জানেন। অল্পদের যত

ছেলেদের সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ দ্বিগুণ হয় নাই। তাই তিনি ছেলেদের কথা এমন ভাল করিয়া বলিতে পারেন।

আলোচ্য বইখানিতে প্রথম দৃষ্টান্ত, পান্ডীতী, পরমহংস-দেব, এডিসন, হেনরী কোর্ড, ফ্রান্স এণ্ডারসন, রাজেন্দ্রনাথ, স্বামীজী ও নেতাজী ছোটবেলার কথা বলিয়াছেন। ছোটবেলার কথা অনেকই বলেন, তাহা শুধু জীবন-কথা মাত্রই। ওঃ কালিদাস নাগ তাঁহার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "জীবন শুধু তখন নয়, জীবন-বিস্মৃতির মূল রয়েছে শৈশবে এবং সেই শৈশব-জীবনের বিশিষ্ট রূপ আছে, হৃদয় আছে; সেটি যত্নে না রাখিলে জীবনীয় মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা যায় না।" ছেলেদের কথা বলিতে হইলে এই মূল তথ্যটি ধরা চাই।। সেদিক দিয়া 'মৌমাছি'র এই বইখানি অনবদ্য হইয়াছে। ছেলেদের অল্প একরূপ একখানি বই-এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন সার্থক হইয়াছে তাহা বইখানির ছয়টি সংস্করণ হইতেই বুঝা যায়।

শ্রীগোতম চন্দ্র



আনন্দ উৎসবে  
**ক.হোডের**  
প্রসারিত সামগ্রী

ক.হোড ২৩ কাক • কলিকাতা-২৩



# দেশ-বিদেশের কথা



## আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

ভারতের পৌরব আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ সংগঠন ও অনুষ্ঠানের দুর্গম পথে। এবার পরিষদ আটশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। আগামী পৌরব মাসে (আহুয়ারী, ১৯৬০) উহার সপ্তাহব্যাপী অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন গতিপথে মানুষ হ্রাস মত বসিয়া থাকিতে পারে না। সত্যের সন্ধানে সে চিব-জাগ্রত। জনগণের সাহায্য ও সহায়ত্বই আয়ুর্বেদকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং চলিবার পথে তাহার চিরজ্ঞান পাথর। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আয়ুর্বেদের শাস্ত্রনীতি, অবার্ষ্য ঔষধাবলি, স্বহস্ত, অষ্টাঙ্গের পদ্ধতি, প্রত্যাক্ষদর্শন, সূত্র প্রয়োগ ও বিশেষকর চিকিৎসা পীড়িত জনের নিরাময়তা, বিবাদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে আয়ুর্বেদের গতি মন্থ হইলেও কোটি কোটি ভারতীয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য আয়ুর্বেদের চিকিৎসার অটুট আছে। ইহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ঢকে ফেলিয়া উন্নতিশীল করা ত দুয়ের কথা, ভিন্নমূল বৃক্ষের মত উহা প্রাণহীন হইবে—উহার অভিজ্ঞ লোপ পাইবে। 'আধুনিক বিজ্ঞানের মহাসমাবোধের মধ্যেও নির্যাতন আয়ুর্বেদ বাচিয়া থাকিবে সত্যায়নকারী আয়ুর্বেদসেবীর নিষ্ঠা ও কর্তব্যের বিপুলতার। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পরিষদ তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া নানাভাবে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধনে প্রতী আছে। বিভিন্ন কবিষাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও চাক্ষু্য জ্ঞান, আধুনিক ও পুরাতন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তুলনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি বিজ্ঞান-বিভাগের অধিবেশনে আলোচিত হয় ও নূতন সত্য অনুসন্ধানের ইজিত করে। সাবস্বত সভার অষ্টাঙ্গের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দ্বারা উপসমিতি বা শাখা সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধানে সমন্বয় লিপ্ত আছেন। চলতি বৎসরে সংস্কৃতি, মনোবিজ্ঞান, শালাকা, ত্রাবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, শিশুযোগ ও কারচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও প্রত্যাক্ষদর্শনের কলাকল উপস্থাপিত করেন।

পরিষদের আর একটি কর্তব্যভূতি আয়ুর্বেদের আয়োগাশালা সম্মেলন। হাসপাতালগুলিতে একভাবে নিজ নিজ চিকিৎসা ও ঔষধকার্য সম্পন্ন করা হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য—আয়োগাশালা সম্মেলন বিভিন্ন চিকিৎসাপ্রণালী, ঔষধনির্মাণ, ঔষধপ্রয়োগের কলা-কৌশল, নিয়মাদি বহু প্রকার বিষয়ের পারস্পরিক আলোচনার সাক্ষাৎ

অধিকতর উন্নতিশীল চিকিৎসার প্রবর্তন করা, বাহাতে করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা পরিচালনা ও ঔষধ ব্যবহাৰ উন্নত হইতে পারে।

সম্প্রতি পরিষদ লোকস্বাস্থ্যের পবীকাকার্যে হাত নিয়াছে। পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে এবার শিশুস্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই নিরীক্ষা অত্যন্ত অঞ্চলেও পরিচালিত হইবে—শিশু শিশুস্বাস্থ্যের নব, বন্যদেহও।

'ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন' পরিষদের আর একটি কর্তব্যভূত ও বার্ষিক অধিবেশনের বিশেষ অঙ্গ। 'ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিত্রকলা, অর্থনীতি, আয়ুর্বেদ, দর্শন প্রভৃতি একই সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ। আয়ুর্বেদ অধর্কবেদের উপাসক যদিও পরবর্তীকালে ইহার অপমিসীর উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে ক্রমোন্নতির পথে। ভারতীয় কৃষ্টির প্রগতি ও বিভিন্ন দ্বারায় সাগরসন্মুখে বিশেষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঢেউ আসিয়া নব নব উদ্বেগের সহিত নবতর বিধভারতী জগৎলাভ কল্পক—ইহাই অভিপ্রায়।

একটি আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীও ইহার সহিত খোলা হইবে। উহাতে থাকিবে জনস্বাস্থ্য ও মুষ্টিযোগের চাট, আয়ুর্বেদগ্রন্থাবলি, পুরাতন পুষ্টি, কাঁচা ও শুক পাচগাছড়া, বস্ত্রশ্রাদিয চিত্রাবলি, বাতুতন্ত্র, ধনিজ পদার্থ, বিভিন্ন তৈল প্রভৃতি। জনসাধারণকে স্বাস্থ্য ও সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জনপ্রিয় বক্তৃতাদ্বারা ব্যবস্থা হইবে। বিশেষজ্ঞগণ ইহাতে যোগদান করিবেন।

অত্যন্ত বৎসরের মত এবারও সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক অধিবেশনে শলা, শালাকা, কারচিকিৎসা, হাসান—বাজীকরণ, মনোবিজ্ঞান, ত্রাবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি, প্রমেহ, জনস্বাস্থ্য—শিশুযোগ, কূট-যোগ, দ্বীপা-বক্তৃতাযোগ সম্বন্ধে এগারটি বিভাগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইবে।

## দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

৩৭ বছর আগে 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার' বহন সেবায়িত মুক করে, সেদিনের প্রথম পুজি ছিল শুধু দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা। অল্প উৎসাহ ও বুদ্ধতয়া আশা নিয়ে প্রেম, ঐতি ও বহুতাপ প্রাণচকল একমল কিশোর ও তরুণ একান্ত হয়ে সর্পণ করেছিল নিজেদের বিপুল কর্তব্যভূতি। সেই নিঃস্বার্থ সেবা কোষল অনাড়ম্বর কর্তব্যদ্বার মিলিত হয়েছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত পতীর সহায়ত্ব ও অনুগণ দান।

আজ নানা অভিকুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে, যখন নিয়মে এক একটি কল্যাণবর্ধী প্রতিষ্ঠান, উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে কর্মসূচী।

স্বাস্থ্যবানী, হৃদয়িক, বক্তা, কৃষিকল্প, সাম্প্রদায়িক দাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে আর্জুজ্ঞাপন সেবাদি, স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী বক্তৃতা, পাঠাগার মাধ্যমে জনশিক্ষা ও বিবিধ জনহিতকর কার্যাদি জিন, বর্তমানে ভাণ্ডারের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে :—

ক। হুইট এ্যালোপ্যাথিক ও হুইট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র 'চিকিৎসক হাতব্য চিকিৎসালয়।'

খ। একটি বন্দা হাসপাতাল, 'ঐজিবালানন্দ বন্দাচারী

গ। বন্দারোগীদের গৃহে চিকিৎসক দ্বারা 'গৃহচিকিৎসা' ব্যবস্থা ও বন্দারোগী-কেন্দ্র 'দরিদ্র বাছব ভাণ্ডার চেষ্টা ক্লিনিক'

ঘ। বন্দারোগমুক্ত মহিলাদের 'শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র'

ঙ। প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা কেন্দ্র 'ঐজিবোহনানন্দ বন্দাচারী সেবারতন'

চ। প্রহাণার ও অবৈতনিক পাঠাগার 'সচিবালয় প্রহাণার'

ছ। হুইট হুড বিতরণ-কেন্দ্র।

#### চিকিৎসক হাতব্য চিকিৎসালয়

এই চিকিৎসালয়ের মূলকেন্দ্র ৬৫২২বি, বিডন স্ট্রীট ও শাখা কেন্দ্র ১০৫১, রাজা দীনেজ স্ট্রীটে অবস্থিত। মূল ও শাখাকেন্দ্রে এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় বিভাগই আছে।

আলোচ্য বৎসরে হুইট শাখা মিলাইয়া ১,১০,৮২০ জন রোগীকে পরীক্ষা করা ও ঔষধ দেওয়া হয়।

#### দরিদ্র বাছব ভাণ্ডার চেষ্টা ক্লিনিক

১৯৪১ সনে, ৫ই এপ্রিল, পরলোকগত শ্রী এন, এন, সয়কার প্রমুখের বন্ধুপাতি সমন্বিত একটি বন্দা চিকিৎসা-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এই চিকিৎসা-কেন্দ্রে 'দরিদ্র বাছব ভাণ্ডার চেষ্টা ক্লিনিক' নামে পরিচালিত। এই ক্লিনিকটি অধিকতর স্থানের সুবিধায় জন্ম রাজা দীনেজ স্ট্রীটে স্থিত 'ঐজিবালানন্দ বন্দাচারী সেবারতন'ের নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বর্ধিতকেন্দ্রে গত বৎসর ১৩,০০৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সনে বন্দারোগীদের গৃহে গৃহে পাঠিয়েও ঔষধপণ্যাদি দিয়া চিকিৎসা করা

হয়। 'গৃহ চিকিৎসা' খুব সফলজনক বল পাওয়া গেছে। প্রায়ের ব্যবস্থা নারায়ণ ৫, ঢাকা দেওয়া হয়। খুঁ, বক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্ম বহুটা লাগে না।

#### ঐজিবালানন্দ বন্দাচারী সেবারতন

গত ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫২, ভদ্রানীতম রাজাপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'ঐজিবালানন্দ বন্দাচারী সেবারতন' হাসপাতাল উদ্বোধন হয়। বর্তমানে এই হাসপাতালটি ৫২টি শয্যাসম্বিত। এই হাসপাতালে প্রাথমিক অবস্থায় বন্দারোগী চিকিৎসা করা হয়। সেবারতনে চিকিৎসার জন্ম রোগীদিগকে ঔষধপত্র ইন্সপেকশন, এখানে খুঁ ইত্যাদি পরীক্ষা ও হুই বোলা টিকনি ব্যবস্থা কোন বহুটা দিতে হয় না।

আলোচ্য বৎসরে ১৪০টি রোগী সেবারতনে চিকিৎসিত হয়।

#### বন্দারোগমুক্ত মহিলাদের শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র

আলোচ্য বর্ষে ৪২ জন ভাঙ্গী শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র সেলাই শিক্ষাধীন আছে।

#### ঐজিবোহনানন্দ বন্দাচারী সেবারতন

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫১, কলিকাতার পৌরপ্রধান ডাঃ ব্রিডেন সেন কর্তৃক ২২এ, শিবকুঠি বা সেন, কাকুড়পাড়িতে প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা-কেন্দ্র 'ঐজিবোহনানন্দ বন্দাচারী সেবারতনের' উদ্বোধন হয়। সেবারতনটি ৩২টি শয্যাসম্বিত। সেবারতনে প্রত্যহ্ন প্রাতে ১৫০টি শিশুকে হুড বিতরণ করা হয়।

#### সচিবালয় প্রহাণার

১৯২৩ সনের মার্চ মাসে প্রহাণারটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা ৪,৭৮৮ তন্মধ্যে ইংরেজী পুস্তক ২৭৮। আলোচ্য বর্ষে 'আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়' ১১২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে ও প্রতিযোগীর পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

বর্তমান বিভাগগুলির ব্যয়ভারের সঙ্গে সম্প্রদায়িক কার্যাদি ও নতুন নতুন পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে পরিণত করার জন্ম চাই প্রচুর অর্থ সাহায্য সেই জন্ম ভাণ্ডারের পরিচালকগণ ধনী-দরিদ্র-নির্ভীকসে দেশবাসীরা ব্যবস্থা হইয়াছেন। ইহা জনসাধারণেরই কাজ। বাহার পক্ষে যেটুকু সম্ভব অর্থ অথবা মিনিসপজ দিয়া ভাণ্ডারকে সাহায্য করুন।





প্রবাসী গেম, কলিকতা

মেঘসংকার  
শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



মাছধরা



খররোড়ে

[ কটো : শ্রীম্মেন বাগচী ]

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নারায়ণা বলহীনেন লভাঃ”

১৯শ ভাগ  
২য় খণ্ড

মাস, ১৩৬৬

৪র্থ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### রোগ ও তাহার প্রতিকার

বর্তমানে দেশে অসহিষ্ণুতা ও অসংযম এত বেশী বাড়িয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খলতার কুশী রূপটা প্রকট হইয়া উঠিতেছে বেগানে দেখানে। বিশেষ করিয়া বিদ্যায়তনে ইহার অমুপ্রবেশ দেশবাসীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় সংসদেও ইহার আলোচনা হইয়াছে এবং সংসদের সমস্তদ্বারা তরুণ সমাজের মতি-গতিতে একাধিকবার উৎকর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে উৎকর্ষা প্রকাশের কি মুগ্ধা আছে যদি তাঁহাদের কথার ও কাজে না থাকে সামঞ্জস্য? কারণ, তাঁহারা নিজেদেরই—কি আচার-আচরণে, কি চরিত্র-গঠনে একটি আদর্শ খাড়া করিতে পারেন নাই। সেই অসংযম নানা আকারে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের উপদেশ আর কোন কাজেই আসিতেছে না। তাই মনে হয়, যে সংযমহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের সর্বস্তরে দেখা যাইতেছে, তাহার জন্ত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অশোভন আচরণ কতখানি দারী তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

রাজনীতির নামে বাহারা সর্বপ্রকার অশিষ্ট আচরণ, অস্থিরতা, অদৈর্ঘ্য ও অসংযমের প্রদর্শন দিতেছেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া লোকে কি শিখিবে? অন্ততঃ দৈর্ঘ্য ও সংযম যে নয়, তাহা অনস্বীকার্য। ভারতীয় সংসদেও মাঝে মাঝে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদূর সহিত না মিলিলেই উম্মা প্রকাশ করিতে হইবে, এই বা কিরূপ কথা? তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত ইহাতে শুধু ভারতীয় সংসদের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত নাই—ইহাও সহিত জড়িত রহিয়াছে জাতির নির্দোষিত প্রতিনিধিদের কর্তব্য-নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের প্রশ্ন। সমগ্র জাতির কল্যাণবিধানের গুরু দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের উপর।

যতবাদ পৃথক হইতে পারে, কিন্তু দেশ অপেক্ষা কি যতবাদ বড়? তাঁহাদের আচরণে বাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেশ-

জ্যোতিষায়ই নামাজব। মানুষ যখন ক্ষেপিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির অভাব ঘটিয়াছে। লোকসভার কমিউনিষ্ট সদস্যদের আচরণে সেই উগ্রতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যাপার কিছুটা লঘুভাবে দেখা যাইতে পারিত, যদি কি কেন্দ্রে, কি অঙ্গবাজ্যগুলিতে এই অবস্থিতি ঘটনা আর কখনও না ঘটিত। যদি আইনসভার সদস্যদের আচরণে কদাচিৎ শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিত। কিন্তু ভারতীয় সংসদে এবং একাধিক রাজ্য আইন-সভার বে-ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টতা বার বার প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। লোক-সভার যে-কোনও বিষয়ে, যে-কোনও প্রশ্ন তুলিবার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক সদস্যেরই আছে—তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদ বাহাই হউক না কেন। বৈধতার প্রশ্ন তুলিবার অধিকারও তাঁহাদের আছে, একথাও কেহ অস্বীকার করে না। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে তাঁহারা সব সময় ভুট নাও হইতে পারেন। কিন্তু উপলক্ষটা বাহাই হউক না কেন, সংযম তাঁহারা হারাইবেন কেন? কেন এমন আচরণ করিবেন বাহাতে সংসদের মর্যাদা নষ্ট হয়?

দুনীতি ও অসংযম আজ সর্বত্র দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহাকে প্রতিরোধ করিবে কে? আইন করিয়া বা থমকাইয়া ইহাকে আরন্তে আনা যায় না। চাই এমন একটি আদর্শ যে আদর্শে মানুষ অমুপ্রাণিত হইবে। অভাব সেই আদর্শের। সেই আদর্শ খাড়া করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, তাঁহাদেরই আজ সকল রকমে সংযত হইতে হইবে।

অমুকরণপ্রিয়তা একটি ব্যাধি। এ ব্যাধি সংক্রামক। যার জন্ত সামান্য ভাবত আজ নীতিবোধ হারাইতে বলিয়াছে। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজ-জীবনে সর্বত্র এই ভুট ব্যাধি অমুপ্রবেশ করিয়াছে। আমবা ওষধ প্রয়োগে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি। ‘কারণ’ দূর করিবার চেষ্টা করি নাই। প-স আজ আমাদের সেই পথ ধরিয়াই আগাইয়া যাইতে হইবে। প-স

## মানবাত্মিক আদর্শবাদ সম্বন্ধে আইসেনহাওয়ার

সকলেরই বোধ হয় স্মরণ আছে গত ১১ই ডিসেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবেশে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে সম্মানার্থে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি দিয়াছেন। এই সমাবেশে আইসেনহাওয়ার যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে জ্ঞানের পথে মিলনের আদর্শটিই বাহ্যতে শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য হয়, পৃথিবী বাহ্যতে বিদ্বেষ-বিমুক্ত সমৃদ্ধ এবং সুন্দর হয়, সেইদিকে সকল দেশের নায়ক, শাসক ও শিক্ষাত্রীদেব অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষ তাহার কয়েক হাজার বৎসরব্যাপী সভ্যতার অগ্রগতির অনেক ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, অনেক অজ্ঞাত লোকের দরজা খুলিয়াছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও পৃথিবী সুখের স্থান হয় নাই। তাহার কারণ, মানুষ অল্প দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে উপর আপন দেশের জয়ের ইমারত গড়াকেই তাহার মুখ্য কামনার বস্তু মনে করিয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্দেশে সমস্ত মানুষকে ভালবাসা, দুঃখী, দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলিকে বঞ্চিত মত শ্রীতি এবং প্রত্যয়ের সহিত হাত ধরিয়া আগাইয়া জানা, কোনদিন পৃথিবী পাতা ছাড়িয়া মানুষের অভ্যাসের মধ্যে দানা বাঁধে নাই। প্রভূত শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির মধ্যেও মানুষ তাই যুদ্ধের মত কদর্য্য বস্তুকে সবচেয়ে ভালবাসে। আজ দিন আসিয়াছে, যখন সভ্যতার এই প্রাচীন শত্রুকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। যুদ্ধ আজিও থাকিবে, কিন্তু সে যুদ্ধ করিতে হইবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে। জ্ঞানের বিস্তার ও বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতেই মানুষকে সংহত হইতে হইবে এই যুদ্ধের জন্ত এবং সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই হইবে তাহার প্রধান পীঠস্থল। তরুণ-তরুণীরা সেখানে মিলিত হইবেন এবং পুরাতন জ্ঞানের তাহার অমূল্যলন করিবেন, নতুন জ্ঞানের করিবেন উদ্বোধন এবং দুইয়ের স্রষ্ট সমন্বয়ে এমন এক সার্বভৌম চিন্তা ও মননশীলতার কাঠামো গড়িয়া তুলিবেন, যাহা ধর্ম্মসংস্কার ও ভূগোলের বেড়া অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সমস্ত মানুষকে অঙ্গপ্রাণিত করিবে।"

এই উক্তিগুলি সকলেরই চিত্ত স্পর্শ করিবে। মানবজাতি আজ যে প্রধান দুটি সমস্যার সম্মুখীন, তাহা সমাধানের পথে বিশ্ববিদ্যালয় কি ভূমিকা লইতে পারে, এই কথা তাহাট স্পষ্ট করা হইয়াছে। আজিকার পৃথিবীর একদিকে দারিদ্র্য, অগ্রদিকে যুদ্ধজাগ এবং এই দুই বিপদের বোঝা পিঠে লইয়াই মানুষকে চলিতে হইতেছে। বিজ্ঞান অনীম ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিতেছে ঠিকই, কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য আজও অল্পসংখ্যক দেশের কবচলগত হইয়া রহিয়াছে এবং তিন-চতুর্থাংশ পৃথিবী শুধু তাহার দিকে সড়ক হতাশার তাকাইয়া আছে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলি এই সব 'অমূল্য' দেশের বাড়ি বাড়ি বর্ষাশক্তি লাভের কড়ি কাষাইতেছে। আর এই কড়ি-কাষানোর প্রতিযোগিতা হইতেও বেচন, ইহার

পথ বোধ করার ভারসঙ্গত তানিদ হইতেও তেমন, যুদ্ধের সম্ভাবনাও মানুষের সম্মুখে একটা অনতিক্রম্য দুর্ভীষপাকের মত কণা উড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজনীতির নামে, দেশপ্রেমের নামে মানুষ তাহাকে উদ্ধাইতেছে। বিজ্ঞান তাহার হাতে তুলিয়া দিতেছে অমোঘ বিশ্ব-বিনাশের হাতিয়ার। এই বিপত্তি হইতে পৃথিবী ও মনুষ্য জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে, চাই প্রচলিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল রূপান্তর। মানুষ কোনদিন কোন কারণেই আর যুদ্ধ করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা যদি সার্বভৌম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে, বিজ্ঞানের শক্তিকে যদি শুধু গঠন ও সমৃদ্ধতির পথেই প্রবাহিত করিতে মনস্থ করে, এক দেশের দারিদ্র্য ও নিরুপায়তার উপর বাণিজ্য করিয়া অল্প দেশ লাভবান হওয়াকে যদি নিন্দনীয় অমানুষিকতা বলিয়া বোঝে এবং বিশ্বের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ যদি পানাম্পরিক শুভবুদ্ধির প্রেরণায় সমভাবে সবাই ভোগ করিতে পায়, তাহা হইলে আজিকার পৃথিবী সত্যসত্যই অভাব, অনটন ও বঞ্চনা-বিমুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ-মানসিকতার মধ্যে আমরা রহিয়াছি, তাহা এই বিশ্ববোধ সৃষ্টির অল্পই সহায়তা করিতেছে। আমরা ৭০ বৎসর মানব-গোষ্ঠী হইয়া অথচ মানবতাকেই বিনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছি। এমন দিনে বাস্তবিকই চাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপকরণগুলি আগাগোড়া নতুন ভাবে বাচাইয়া দেখা এবং এমনভাবে চালিয়া সাজা, যাগাতে মানুষের মনের আকাশটা বৃহৎ হইয়া উঠে।

এই জন্তই আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "পুরা-পৃথিবীর নীতিধর্ম্ম ও মানবাত্মিক আদর্শবাদও আমাদের কিরাইয়া আনিতে হইবে, আবার নতুন যুগের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সহায়তাও আমাদের পূর্ণভাবে লইতে হইবে। দ্বিতীয়টি দিবে আমাদের বিস্তারিত ও বস্ত-সম্পন্ন, আর প্রথমটি দিবে তাহাকে মানুষের মত ব্যবহার করার উপযোগী বিবেক ও নৈতিক জ্ঞান। যুগধর্ম্মে শুধু দ্বিতীয় দিকটাই সারা পৃথিবীতে আজ প্রধান হইয়া উঠিতেছে, আর প্রথমটায় আসন হইতেছে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত।"

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের মধ্যেও মানুষ এই কারণেই আজ ভয়, অশান্তি ও বঞ্চনা-যুক্ত হইতে পারিতেছে না।

গ-স

## দর্শন ও বিজ্ঞান

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস এবং দর্শন-কংগ্রেস—নামে পৃথক হইলেও ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়েই সর্বজনীন সত্যের আবিষ্কারক, ধারক ও প্রচারক। সত্যের উভয়ের সমস্তা যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিশ্বজনীন সমস্তা—শুধু ভারতের নহে।

বিজ্ঞান আজ অনেক কিছু করিয়াছে। আণবিক শক্তির অমূল্যলনীতে ভারত পিছাইয়া আছে সত্য, কিন্তু দুই অতীত-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সেই পুরাতন

পৃথিবীতে বিজ্ঞানের শক্তিতে ও অধিকারে একমাত্র ভারতই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইম্পাত-শিল্প তাহার দৃষ্টান্ত। ধাতু-রসায়নেও প্রাচীন ভারতীয় কৃতিত্বকে কোন দেশ অতিক্রম করিয়া বাইতে পারে নাই। ভারতের দার্শনিকী প্রজ্ঞার ইতিহাসও তাই। জীবন কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি, সৃষ্টির কারণ ও তাহার রহস্য—এই সব মূল সত্যের অন্বেষণে ভারতের তাত্ত্বিক প্রতিভা বেকালে বড়দর্শন সংস্থাপিত করিয়াছিল, সেকালে পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষে এরূপ চিন্তাশক্তির পরিচয় দেওয়া সাধ্য ছিল না। তার পর আসে অন্ধকারের যুগ— ভারত তাহার পূর্ব গৌরব হারাইল।

ঘীবে ঘীবে ভারত বিজ্ঞান-অমূল্যত্বের পথ হইতে সরিয়া আসিল। ঋষিরা দেখিয়াছিলেন, এ পথে মানুষের কল্যাণ নাই। শক্তির শেষ ধাপে আসিয়া ঋষিরাই একদা প্রস্থ করিয়াছিলেন, ততঃ কিম? এই প্রশ্নই তাঁহাদের আত্মমস্কানে প্রবৃত্ত করায়। তাঁহারা বাস্তব-জগত হইতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিলেন। এই অধ্যাত্ম-অমূল্যত্বের প্রত্যক্ষভাৱ কল বড়দর্শন।

মতভেদ আছে এবং থাকিবেও। যেমন বৈজ্ঞানিক প্লাক বলিয়াছেন, চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি। আবার অল্প বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, জড় হইতেই চৈতন্যের জন্ম হইয়াছে। বাতা হটক, জড় আগে, না চৈতন্য আগে, এই দুইরূপ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়া বৈজ্ঞানিক আটনষ্টারনের উক্তিই ধরা যাক। তিনি বলিয়াছেন, “আত্মিক দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির জয়দাতা।”

যদি তাড়াই সত্য হয়, তবে দর্শনকেই প্রাধান্য দেওয়ার আপত্তি কোথায়? আসল কথা, উভয়ই মূলতঃ একই প্রজ্ঞার দুই প্রকাশ। উভয়ের সার্থকতা পরস্পর-নির্ভর। দর্শনের পুনর্গঠন ছাড়া বৈজ্ঞানিকী ভাবনার পুনর্গঠন সার্থক হইতে পারে না। এইজন্যই, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে, কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া নয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের রহস্য ভেদ করিতে হইলে, মানুষের দার্শনিক প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হইতেই হইবে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিগদর্শনও বদলাইয়া বাইতেছে। সেইজন্য কোন উন্নতিরই সমাপ্তি-রেখা বলিয়া কিছু নাই—বিজ্ঞানেরও নাই, দর্শনেরও নাই। আজ বিজ্ঞান মানবতাব্য অভিলাষ হইতে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না, আবার দর্শন সঙ্কে সেই একই অভিযোগ করা যায়, সে মানুষকে সেই-মন-গঠনের উপযোগী প্রত্যয়ই বা দিতে পারিতেছে কই?

এই পরিবর্তন যিনি আনিতে পারিবেন—কি বিজ্ঞানের দিক দিয়া, কি দর্শনের দিক দিয়া তিনিই হইবেন জগতের বন্ধু।

গ-স

## সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইহার সাক্ষ্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

এই পরিকল্পনাকে বটবুকের সহিত তুলনা করা হয়, বাহার আশু কোন উপকারিতা হয়ত নাই, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে বাহার সুশীতল কার্যর লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য সঙ্কে কর্তৃপক্ষ এখনও তেমন সুনিশ্চিত হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাবিগরী সাহায্য-সংস্থাকে অমুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সঙ্কে তাঁহাদের অভিমত দেওয়ার জ্ঞা। সেই অনুসারে এই সংস্থার পক্ষ হইতে ভারতে একটি কমিটি আসে এবং এই কমিটি রিপোর্ট সভা প্রকাশিত হইয়াছে।

কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা বিংশ শতাব্দীর একটি বৈশিষ্ট্যমূলক পরীক্ষা এবং ইহার ফলাফলের উপর বিশ্বব্যাপী কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে, কারণ ভারতবর্ষে যে বৃহদাকারে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, পৃথিবীর অল্প কোনও দেশে তাহা হয় নাই। এই আন্তর্জাতিক কমিশনকে অমুরোধ করা হইয়াছিল যে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি ইহার প্রভাব, গ্রাম্য মনোবৃত্তির পরিবর্তন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার অবদান, এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহার সাক্ষ্য প্রভৃতি নিদ্রাণ করিবার জ্ঞা।

গ্রাম্যজীবনের পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য নয় কারণ অতীতের ঐতিহ্য এখনও দৃঢ়ভাবে বলবৎ আছে এবং ইহার প্রভাব অতীব বিস্তৃত। দুইটি পুরানো প্রথা, বধা, ভূমিপ্রথা এবং জাতিপ্রথা, অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং ইহার পরিবর্তনের পরিপন্থী। বাধ্যতামূলক ব্যবহার দ্বারা পরিবর্তন সাধন করা বাইতে পারে, কিন্তু তাহা উচিত হইবে না বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

এই বিষয়ে ভারতবর্ষে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার সমর্থন এই আন্তর্জাতিক কমিশন করেন। ভারতবর্ষের নীতি হইতেছে যে, স্থানীয় উদ্যোগে ও ইচ্ছাজাত সহযোগিতার দ্বারা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কাঙ্ক্ষণীয় করা। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যে পরিপূরক অর্থসাহায্য দিতেছেন সে সঙ্কে কমিশন সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে পরিকল্পনাটির সমূহ রূপই বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় এবং অর্থব্যয়ের মাপকাঠিতে উন্নয়নের মাপকাঠি বিচার করা হয়, যদিও বাস্তবিক অগ্রগতি সেই পরিমাণে হয় না।

কমিশন কৃষি-উন্নয়নের প্রতি জোর দিয়াছেন এবং মনে করেন যে, সমাজ উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কৃষির উন্নয়ন ও বিস্তৃতি। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত দেখা যায় যে, যান্ত্রীকীকরণ, কৃষি খনন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির দিকেই অধিকতর নজর দেওয়া হইয়াছে এবং এই কাঙ্ক্ষণীয় সাধারণতঃ জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি সম্পন্ন করে। সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংস্থা ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রায় একই কাজে লিপ্ত আছে, ফলে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সত্যিকার কৃতিত্ব পরিষ্কৃত হইতেছে না। সেই কারণে এই আন্তর্জাতিক কমিশন বস্তুতঃই বলিয়াছেন

যে, গ্রাম্য কৃষি-উন্নয়নই সমাজ-উন্নয়ন পরিবর্তনের প্রধান কার্য হওয়া উচিত, সেই উদ্দেশ্যে সেচ-ব্যবস্থার বিস্তৃতির জন্য অর্থ এবং লোক নিয়োগের প্রয়োজন এবং বর্তমানে পতিত জমিকে কৃষির আওতার আনিতে হইবে। কমিশন মনে করেন যে, একটি "জরুরী কার্যকরী সজ্জা" স্থাপিত করা প্রয়োজন। গ্রাম্য কন্সলিউশন লইয়া এই দল গঠিত হইবে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রয়োজন অনুসারে এই দল ভ্রমণ করিবে, এইরূপ প্রমিত দল গঠন করিলে পতিত জমিতে দ্রুত চাষ-আবাদ সম্ভব হইবে এবং সেচ-কার্যও বিস্তৃতি লাভ করিবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কৃষির উপর অবশ্যই জোর দেওয়া হইবে, কারণ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে রূপ পরিগ্রহণ করিতেছে তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কৃষি-উৎপাদনে সমাজ-উন্নয়ন পরিবর্তনের সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন কারণ কেবলমাত্র এই পরিবর্তনের দ্বারা ইই গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর। সমবায়-ব্যবস্থা একক ভাবে এতদিন কোনও সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই, এবং পঞ্চাশের দশক যে কাঠামো প্রচলিত হইতে বাইতেছে তাহারও তেমন কার্যকারিতা থাকিবে না যদি না সমগ্র গ্রাম্য জন-সাধারণকে তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সর্বক্ষেত্র সম্মুখ এবং আশাবিত্ত করা হয়।

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা বহু বিশেষজ্ঞ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্রই মূল আছে মানুষ। চীন-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে দ্রুত প্রগতির পথে চলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ যে, সেখানে সমগ্র মানুষকে নতুন আদর্শে উদ্বীপিত করা হইয়াছে, এবং যতদূর পর্যন্ত ভারতবর্ষে জনসাধারণকে নতুন আদর্শে উদ্বীপিত করা না হইতেছে ততদূর পর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তন কেবলমাত্র আয়তনাত্মক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। ভারতবর্ষে সমবায়প্রথা কিংবা পঞ্চায়েতপ্রথা আশাহুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই কারণ জনগণের সহজ সাবলীল উদ্বীপনার ও সহযোগিতার অভাব আছে বলিয়া। ভারতবর্ষে আজ প্রয়োজন গণচেতনার জাগরণ এবং সেই কারণে সমাজ-উন্নয়ন পরিবর্তনকে নতুন ভাবে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ, সমবায়প্রথা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সমাজ-উন্নয়ন পরিবর্তন সাংস্থার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে সমবায় ব্যবস্থা ব্যতীত সমাজ-উন্নয়ন পরিবর্তন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিবে না। সেই কারণে প্রয়োজন যে, সমবায় ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সমবায় ক্রম-বিক্রয় এবং সমবায়ের ভিত্তিতে বস্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজন।

ন-য়

### ভারত-চীন সীমানা বিরোধ

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তরের সীমানা লইয়া যে বিরোধ শুরু হইয়াছে তাহার জন্য ভারতবর্ষই প্রধানতঃ দায়ী, দায়ী তাহার

তথাকথিত পঞ্চশীল, দায়ী তাহার উদারতা (অথবা দুর্বলতা) এবং নিজের স্বার্থ সর্বক্ষেত্র উদারীনতা। যে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তির উপর ১৯৫৪ সনে ভারত-চীন চুক্তি হয়, চীন কর্তৃক ভারতীয় উত্তর সীমান্তের কিছু অংশ দখলের ফলে আজ সে নীতি বার্ষিক্যের পর্যাবসিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চালে ভারতবর্ষ এখনও অনভিজ্ঞ এবং অপটু। প্রথমতঃ, চীন কর্তৃক তিব্বত দখল ব্যাপারকে স্বীকার করিয়া লওয়া ভারতের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বৃত্তিতার পরিচায়ক হইয়াছে। ভারত ও চীনের মধ্যে স্বাধীন তিব্বতের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন, এবং চীন কর্তৃক ১৯৫১ সনে পদাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ, ১৯১২ সন হইতে তিব্বত নিজস্ব স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিল।

বর্তমান চীন অতীতের চেমিস্থানী স'ম্রাজ্যবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে সে আজ বদ্ধপরিকর। এই দুর্বৃত্তি ভারতের স্বাধীনতা উচিত ছিল এবং যদি থাকিত তাহা হইলে বর্তমান পরিস্থিতি যাহা উঠিয়াছে তাহা ভারতবর্ষ সময় থাকিতে প্রতিরোধ করিতে পারিত। চীনকে সমস্ত বাণ্যের জন্য ভারতবর্ষ চীনের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার নিকট তিব্বতকে প্রায় বন্দিদান দিয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। অবশ্য তিব্বতের ব্যাপার লইয়া চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আসে না, কিন্তু ভারতবর্ষ যদি নৈতিক সমর্থক না দিত এবং তিব্বত দখলকে যদি কূটনৈতিক পন্থায় অস্বীকার করিত তাহা হইলে বিশ্বের বহু দেশের সমর্থন ভারতবর্ষ লাভ করিত এবং তিব্বতের স্বাধীন অবস্থা ভবিষ্যতে কিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তিব্বতের স্বাধীনতা অপহরণের ব্যাপারে ভারতবর্ষ চীনকে শুধু নৈতিক সমর্থন দেয় নাই, সেই সঙ্গে নিজের সমুদয় বিপদের চিন্তন গোড়াপত্তনও করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সমস্ত পদাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তিব্বতের ব্যাপারে যে ভুল করিয়াছেন তাহা অমার্জনীয়। আজ একদিকে পাকিস্তান, অন্যদিকে চীন, এই দুইটি দেশের সহিত সীমান্ত রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকেও যুদ্ধের পর্যায়ের রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের শাস্তিকামী মনোবৃত্তি দুর্বলতার সাক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের এই দুর্বলতার সাহায্য গত আট নয় বৎসর ধরিয়া চীন লইয়াছে এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে আঘাত হানিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, নিজেকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যেখান হইতে আজ তাহাকে হটানো মুশ্বিল, কারণ চীন যুদ্ধে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত হটিতে রাজী হইবে না এবং চীনের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা, এই অবস্থার আমেরিকার যুক্তযাত্রী কিংবা রাশিয়া কেহই প্রত্যক্ষভাবে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিতে রাজী হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে ভারতের চিঠি লেখালেখির উপর নির্ভর করা ছাড়া পত্যন্তর নেই।

পশ্চিম নেত্র বলিয়াছেন যে, ভারতের যে সকল অংশ চীন



দখল করিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষ বৃদ্ধ করিবে না, আলোচনা করিয়া বাইবে এবং প্রয়োজন হইলে অনিশ্চিতকালের জন্য সে আলোচনা চালাইয়া বাইবে, অবশ্য তাহার কলংকল অনিশ্চিত। যেমন কাম্বোজের ব্যাপার লইয়া ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সহিত গত ১৪ বৎসর ধরিয়া বুঝাপড়া করিতেছে। কাম্বোজের ব্যাপারে যদিও বুঝাপড়ার আর বাকী কিছু নাই, অর্থাৎ কাম্বোজের ভাগা সুরক্ষিত হইয়া আছে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে অংশ আছে তাহা ভারতবর্ষের এবং পাকিস্তান যে অংশ জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছে তাহা পাকিস্তানের অধীনেই থাকিবে। যাক্রাদলের রাজার মত ভারতবর্ষ যতকাল ইচ্ছা গলাবাজী করিয়া বাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাম্বোজের বাকী অংশটুকু ফিঁদা আসিবে না। যদি ভারতবর্ষ প্রথমেই পাকিস্তানকে সামরিক শক্তির দ্বারা চটাইয়া দিতে পারিত তাহা হইলে অবশ্য সমস্ত কাম্বোজই আজ ভারতবর্ষের থাকিত।

সেইরূপ লাদাকের যে অংশ বর্তমানে চীন জোর-জবরদস্তি করিয়া দখল করিয়া লইয়াছে তাহা চীনেরই থাকিবে, সে সবক্ষে ভারতবর্ষ যতই চীংকার করুক তাহাতে চীনের কিছু হইবে না। ১৯৫২ সন হইতেই চীন তিব্বতের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা, পঞ্চাট তৈয়ারী করা শুরু করিয়া দিয়াছিল এবং সেই সকল দাঙ্গা বর্তমানে চীন ভারতের সীমান্ত পঞ্চাঙ্গ এবং কোন কোনও স্থানে ভারতের অভ্যন্তর পঞ্চাঙ্গ টানিয়া আনিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, চীন আজ ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্তব্যাপী সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে হুটান, সিকিম ও নেফা এলাকায় সৈন্য চালনা করিয়া দিতে পারে। আজ লাদাকের অংশ দখলের ফলে চীনের সিংকিয়াং প্রদেশ ও দক্ষিণ তিব্বতের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সুবিধা চীন সহজে ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ চীন যেহেতু এখন ম্যাকমোহন লাইনকে অস্বীকার করিতেছে। আশঙ্কা এই যে, যদিও সরকারী ইতিবৃত্তে দেখানো হইয়াছে যে, গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া লাদাক ভারতের অংশ হিসাবে আছে, কিন্তু তাহাকে বন্ধার জন্য একটি ভারতীয় সৈন্যও সেখানে ছিল না।

ন-ব

### বিশ্বভারতীয় সমাবর্তনে শ্রীনেহরু

বিশ্বভারতীয় আচার্য্য শ্রীনেহরু তাহার সমাবর্তন উপলক্ষে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, “বিশ্বভারতী ভারতের অজ্ঞাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নয়। বিশ্বভারতীতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে যেখানে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রী গঠিত হয়। শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কই শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষকের বক্তৃতা অপেক্ষাও এই পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সম্পর্কই জীবন-গঠনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশে গাজেটের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু শান্তিনিকেতনে এমন শিক্ষা

দেওয়া হয়, যাতে ব্যক্তিসত্তা যেন জনতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া না ফেলে। বিশ্বভারতীয় ইংরাজী প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকিয়া শিক্ষালভ—টাইই গুরুদেবের আদর্শ ছিল! পাশ্চাত্য জগতে ইংরাজী নাই। এই বার্ষিকতার জন্য ব্যক্তিবিশেষ ও দেশের ক্ষতি অবশ্যস্তারী। শান্তিনিকেতনে দুইটি ধারা বর্তমান। একটি বিশ্বভারতীয় মৌলিক আদর্শ, অল্পটি যুগের ধারা। যুগের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন প্রতিষ্ঠান বাঁচিতে পারে না। বিচ্ছিন্ন থাকিবার চেষ্টা করিলে উচ্চ শ্রেণীবিশেষের প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িবে। এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রত্যেককে নতুন কিছু যোগ করিতে হইবে; কিন্তু মূল আদর্শকে তুলিলে চলিবে না।”

শ্রীনেহরু আর একটি কথা বলিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব বর্তমান যুগে সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মোন্ট্রিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমের মর্যাদা আছে। কোন পরিশ্রমের কাজই যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা আমরা ভুলিয়া বাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষপতির পুত্রকেও পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সময়ের পরিবর্তন সত্ত্বেও মনে করা হয় যে, শ্রম মর্যাদার মর্যাদা লাভ করবে।” বাগানের কাজ, কৃষিজাত যে কোন শ্রম টংপাণনের কাজ, গৃহের বা কিছু তৈয়ার করার যে কোন কাজ—যাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এবং শরীর ও মন সুস্থ, সবল থাকে, সেপাড়া ছাড়াও তাহা করিবার জগ তিন ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলেন। ধনী হউক, নিধন হউক প্রত্যেকেরই যে শ্রমের কিছু কাজে ছেলেবেলা হইতেই অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন আছে এবং প্রত্যেকের পক্ষেই যে উচ্চ বাধ্যতা-মূলক বা আবশ্যিক হওয়া উচিত, তাহা যেন কেহই না ভুলেন।

শ্রীনেহরু যে বিশ্বভারতীকে এতখানি স্বাভাবিক দান করিয়াছেন তাহাতে কবিত্বের প্রতি তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য, বিশ্বভারতী আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। গুরুদেবের আশা ও আদর্শের সার্থকতা এখানেই। কিন্তু এই আদর্শ কি সর্বত্র রক্ষা করা যায় না?

গ-স

### নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে

#### শ্রীকণ্ঠভূষণ চক্রবর্তী

সম্প্রতি বাকালোরে নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে মূল সভাপতি শ্রীকণ্ঠভূষণ চক্রবর্তী একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহার ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, “বিশ্ববস্তুর সম্পর্কে অধুনাতন বাংলা-সাহিত্যে দুটো বিষয়ের অভাব চোখে পড়ে। আমি তথ্য-সাহিত্যের কোন অভাবের কথা বলছি। আমি বলছি সৃষ্টিশীল সাহিত্যের কথা। প্রথম বাংলায় দেশের স্বাধীনতা লাভ নিয়ে অথবা স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী জাতিমানস নিয়ে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। অথচ ভারতের স্বাধীনতা লাভ



একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। আশ্চর্য্য যে, এই দাসত্বমোচনের উল্লাস সাহিত্যে প্রকাশ পেল না।

“এর কারণ এই হওয়া অসম্ভব নয় যে, দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা লাভের মধ্যে মুক্তির আশ্বাস পায় নি—তার কাছে স্বাধীনতা লাভটা শুধু বিদেশীদের কাছ থেকে কয়েকজন স্বদেশীয়ের নিকট সরকারী নগ্নবখানাটা হস্তান্তরের ব্যাপার—সে নিজে এমন কিছু পায়নি বা তার অন্তর স্পর্শ করতে পারে, বহু তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা রাষ্ট্রের শাসনে দিন দিন খর্ব হতে খর্ব হতে হচ্ছে। কিন্তু দেশবিভাগ এবং অগণিত মানুষের জন্মভূমি থেকে চিরনিরাসনের বেলায় ত সে কথা খাটে না। বঙালী স্বাধীনতার আনন্দ অমূল্য না করুক, দেশবিভাগের নিদারুণ দুঃখটা পেয়েছে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরদিনের বাসভূমি অনিচ্ছায় ত্যাগের করুণতা, তাদের আশ্রয়লাভের অনিশ্চিত আশায় দেশান্তরে দুঃখবাত্তা অপরিচিত বিদেশে পণ্ডরও অথম অবস্থার অসহনীয় কষ্টের নিরুপায় জীবন এবং জীবনে যা কিছু প্রিয় ছিল সবকিছুর নিঃশেষ ধ্বংস—এই মহা সর্বনাশের কাহিনী বাংলা-সাহিত্যে রচিত হ’ল না কেন? হ’ একজন দেশচ্যুত মানুষের পরবর্তী জীবনের দুঃখকষ্ট নিয়ে সামান্য কিছু লেখা হয়েছে দেখছি, কিন্তু দেশবিভাগের সমগ্র দুঃখটার রূপ দিতে কেউ চেষ্টা করেন নি। আমি এখনও আশা করি যে, কোন শক্তিশালী সাহিত্যিক এই সর্বনাশ মহাবিপ্লব নিয়ে সাহিত্য রচনা করবার প্রেরণা পাবেন।

“বিষয়বস্তুর পরে রূপ এবং রূপের কথায় প্রথম কথা ভাবার। আমার বেন মনে হয় যে, বর্তমান সাহিত্যিকেরা ভাষার লাবণ্য সর্বদা নিরাসক্ত। ইচ্ছা করলে যে, এই লেখকেরা তাঁদের ভাষাকে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করতে পারেন না এমন নয়, তবে তা তাঁরা করেন না। নিজের বিশিষ্ট রূপটি রক্ষা করে ঐসব স্বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রগত হয়ে অবশেষে বাংলা এমন একটা অপক্লম ভাষা হয়ে উঠেছিল যে, পৃথিবীর কোন ভাষাই বোধহয় সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে, প্রকাশক্ষমতার, বাঞ্ছনীয় এবং তীক্ষ্ণতার তাকে অতিক্রম করে যেতে পারত না। কিন্তু আজ আমরা ঐ অপূর্ণ সম্পর্নটাকে যেচ্ছার বিনষ্ট করতে বসেছি কেন? কর্তৃপদ, কর্মপদ এবং সঞ্চকপদকে সবলে বাক্যের শেষপ্রান্তে ঠেলে দিচ্ছি, অজ্ঞাত পদগুলিও যদুচ্ছা ওলট-পালট করছি এবং বাক্যের সূঠাম ঋজু মূর্তিটাকে অষ্টবক্র মূর্তিতে পরিণত করে ও তার গতিব তালটাকে বেতাল চুকিয়ে লগুভগু করে দিয়ে পরম আনন্দ অমূল্য করছি। তবে একধার উল্লেখ না করলে অস্তর হবে যে, আজ যদি সাহিত্য সংবাদধর্মী এবং চিত্রসর্ব্ব্ব হয়ে উঠে থাকে তার একটা কারণ বোধ হয়, একটা নূতন শ্রেণীর পাঠকসমাজের অভ্যাস। শিক্ষার প্রসারের কালে পাঠক্য লোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এমন একটা পাঠকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা প্রকৃতপক্ষে অর্ধ-শিক্ষিত। কোন দেশের সাহিত্যপাঠকদের অধিকাংশ যদি

কঠিন হয়ে পড়ে। তবে যেখানে পাঠকসমাজের কঠি সার্জিত নয় এবং বসবোধশক্তির নীনতা গভীর, সেখানে সকলের পক্ষে আদর্শ রক্ষা করা কঠিন। সাহিত্যিককেও ত বাঁচতে হবে। কিন্তু তবু এই কামনা করব যে, সাহিত্যিকেরা শুধু গল্পই বলবেন না বা শুধু চিত্রই আঁকবেন না, বাস্তবকে অন্তরের বস দিয়ে নিবিক্ত করে জীবনের মহিমাও প্রকাশ করবেন।

“এ কথাটা যে এত বিশেষ করে বলছি তার কারণ যে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব অপরিমিত। মানুষকে নিত্যসত্যের সন্ধান দিতে, তাকে জীবনের গৌরবে বিশ্বাস দিতে, তার মানসলোকে জ্যোতির্গর আদর্শের আলো জালিয়ে রাখতে এবং তার হৃদয়কে কল্যাণের অভিমুখী করতে একমাত্র সাহিত্যই পারে। আবার সে মানুষকে বিভ্রান্তও করতে পারে। তাঁর দায়িত্ব সমসাময়িক মানুষের মন চালিত করবার গুরুভার গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মাধ্যমে সেই মনকে সত্যের পথে, শান্তির পথে, কল্যাণের পথে চালিত করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহিত্যের সেই মহৎ দায়িত্ব মহত্তর হয়ে উঠেছে। আজ এই মুহূর্ত্তের পৃথিবীতে মানুষের মনের অবস্থা আর সহজ নেই। পৃথাতন সব আদর্শ আজ তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে, মনের তার কোন আশ্রয় নেই, অন্তরে আজ সে হতসর্ব্ব্ব, নিতান্ত কাঙাল। পৃথিবী আজ সেই অস্থির দিশাহারা মানুষের পৃথিবী। সে মানুষকেও দুই মন্দিরের পূজারী-পাগুরা দুই দিক থেকে টানাটানি করছে—একদল চায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অণ্ডল চায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। এই দুই দলের বিরোধে সমগ্র মানবসমাজ বিধা হয়ে গেছে।”

“আজ পৃথিবী জুড়ে বেন সমুদ্রস্থল চলেছে—সেই বিমণ্ডিত জলধির ঘূর্ণিত অতল থেকে বাংলার সাহিত্যিকেরা অমৃতভাগুস্তা কল্মকে আবাহন করে তুলুন—সেই অমৃতের পূণ্যপ্রভাবে বাসুকীর বিব-স্বাসের গরল দূর হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বায়ু নিখল হোক—মানুষের অতৃপ্তি থাক, অলা জুড়াক—আবির্ভূত হোক নিত্যকালের শান্ত শিব স্মরণ।”

গ-স

### যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে। সেদিনও দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহার ক্রটি ছিল অনেক। সেই ক্রটি-বাহুল্যের মধ্যে যেটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পুরোবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা আধুনিক বিজ্ঞান ও বহুবিজ্ঞান-শিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব। বিজ্ঞান-সাধনার সেদিন বাঙালী তথা ভারতবাসী ছিল অপাণ্ডের। এই কলক-মোচনই ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য। নবজাগ্রত ভারতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাদবপুর স্বদেশীয়গণের সেই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রলক্ষ্যকে বঙ্গদেশ পশ্চিম ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ

করিয়াছে বাদবপূর যাত্র চার বৎসর আগে। কিন্তু ঠিক মামুলি ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বাদবপূর গড়িয়া উঠে নাই। তাহার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এখানে। এবং এ উদ্দেশ্যও ইহার ছিল, কেবল স্নাতক উৎপাদনের যন্ত্র হইয়াই সে থাকিবে না। তাই দেখি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বাদবপূর একটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে এই স্বল্পকালের মধ্যে। দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে বিবট প্রয়াস চলিয়াছে, তাহার অল্প প্রয়োজন বাস্তবায়ন ও যন্ত্রবিদ্যেব দল—বাহারা কলকারখানা গড়িয়া ও চালাইয়া দেশের সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিবে। কি শিল্প, কি কৃষি কোনও কিছুই উন্নতি অংশঃস্বরূপ হইতে পারে না যদি নাকি কৃষসী কক্ষীয় অভাব না দূর হয়। কারিগরী শিক্ষার দিকে তাই দৃষ্টি না দিয়া আর উপায় নাই। কারিগরী বিদ্যালয়িকার ক্ষেত্রে বাদবপূর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু যে আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা কি সার্থকতার উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছে বাদবপূরে ও তাহার সগোত্র অগ্রাঙ্গ বিদ্যায়তনে? এই প্রশ্নের দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছে অনেককেই। কারিগরী বিদ্যায় যাহারা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বেকারির প্রকাশ দেখিয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন ও সে উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন বাদবপূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে।

দেশ বধন এক বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে ত্রুটি হইয়াছে—যাহার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করিবে কারিগরী বিদ্যায় অভিজ্ঞ কর্মীদের উপর তখন তাহাদের মধ্যে কর্মের অভাব হয় কি কারণে আমরা বুঝিতে অক্ষম। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে, এই বিভিন্ন ব্যাপারের নিগূঢ় রহস্তটা কি? আমাদের দেশে সত্যি কি কারিগরী বিদ্যার সমাদর নাই? আর তাহা যদি না থাকে তাহা হইলে এত অর্থ ব্যয় করিয়া, এত কষ্ট করিয়া নূতন নূতন সেই সব বিদ্যা-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য না হয় মনের প্রসার—সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেকারি দেখা দিলেও, শিক্ষা-সঙ্কোচের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু কারিগরী শিক্ষার সার্থকতা ব্যবহারিক প্রয়োগে। যে সে-শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার যদি কণ্ঠ সংস্থান না হয় তাহা হইলে সে-শিক্ষার বাস্তব মূল্য কতটুকু?

এই সব দেখিয়া মনে হয়, কারিগরী বিদ্যায় পদ্ধতি বা বীতিব মধ্যেই গলদ আছে। কারিগরী বিদ্যায় প্রসার নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু তাহা হাতে-কলমে কাজ করিয়া কলকারখানা চালাইবার জন্য চেয়ারে বসিয়া হুকুম দিবার জন্য নয়। এই বোধ তাহাদের আগাইতে হইবে। গলদ হইয়াছে এ দিক দিয়াই।

গ-স

গণতন্ত্র আজ কোন্ পথে?

গণতান্ত্রিক শব্দের অর্থ প্রত্যেক দেশেই সমান। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে হয়, তবে সর্ব-

প্রথম উহাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখিরা, জনমনের আস্থা অর্জনে যত্নবান হইতে হইবে। যদি কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা কারণেও জনসাধারণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তবে তাহা ক্ষমতার উচ্ছতো উপেক্ষা করিয়া নহে, বখোচিত ধীরতার সঙ্গে যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াই তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। কিন্তু শাসন-ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন যথেষ্ট ধীরতার পরিচয় দেওয়া হয়, ইহা এ দেশের জনসাধারণ প্রায়ই উপলব্ধি করিতে পারে না। বরং তাহারা দেখে, জনমতের চাপে উচ্চপদাধিকারী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সৎক্ষে তদন্ত করিবার জন্য সরকার কমিশন গঠন করিলেও, কমিশনের সিদ্ধান্ত মনোমত না হইলে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন। কিছুদিন পূর্বেও প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ম ও মধ্যপন্থ কক্ষচারীদের দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা সৎক্ষে বেরূপ মুখর হইয়াছিলেন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সৎক্ষে বা প্রয়োজনমত মন্ত্রীদের সৎক্ষে বেরূপ হইতে পারেন নাই। অথচ উপর-মহল সততা ও নিষ্ঠাসম্পন্ন হইলে যে নিয়মহলগুলিতে স্বভাবতই সততার পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাহা সম্ভবত কেহ অস্বীকার করিবেন না।

অবশ্য দুর্নীতি, অপব্যয় ইত্যাদির প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যথেষ্টই আছে। যেমন দেখা যায়, অপব্যয় ও অপচয় নিবারণের জন্য অডিট কন্ট্রোল ব্যবস্থা আছে, দুর্নীতি, অনাচার সৎক্ষে তদন্ত করিবার জন্য পুলিশ আছে, জারিবিচারের জন্য বিচার বিভাগও আছে। কিন্তু এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, অডিটের কলে সরকারী অপব্যয়, অপচয়—এমনকি দুর্নীতির যে সব দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে, তাহার প্রতিকার বা তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন সাধারণত করা হয় না বলিয়াই, জনমন বিরুদ্ধ ধারণা করিয়া বসে। অগ্রাঙ্গ ব্যবস্থাতেও প্রশাসনিক অবস্থার কোন উন্নতি হইতেছে না বলিয়াই জনগণের বিশ্বাস।

কিন্তু উচ্চ সরকারী মহল সাধারণ মানুষের এই অভিযোগ বা বিরোধ সৎক্ষে কোন গুরুত্বই দেন না ইহাও বহুবার দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি ত্রীনেত্রকর উক্তিতে সেইরূপ তাজিলোর ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু এবারে সাধারণ মানুষের মুখ হইতে নহে, ভারতের ভূত-পূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীসি. ডি. দেশমুখ অভিযোগ করিয়াছেন একেবারে সরাসরি উচ্চপন্থ কর্মচারী ও মন্ত্রী পর্যায়ের কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই। একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ আছে, তাহা উপস্থাপিত করিবেন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক দুর্নীতি সৎক্ষে তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রধান-মন্ত্রীকে দীর্ঘ পত্রও লিখিয়াছেন। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেত্রকর প্যট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন, সেরূপ উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠনে তিনি রাজী নন। ট্রাইব্যুনাল গঠন না করার

পক্ষে শ্রীনেহরু যে সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যথোপযথ্য প্রধান কথা হইল, তিনি মনে করেন, এরূপ টাইবুনালাল গঠিত হইলে উহার ত্রুটি-বিচুতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্ত আর একটি টাইবুনালাল গঠনের দাবি উত্থাপিত হইবে। ইহা নিতান্তই কাঁচা যুক্তি। জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তির নিতান্তই অভাব হইয়াছে আমাদের দেশে, সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে যদি তিনি মনে করেন, এইরূপ টাইবুনালালের দ্বারা তদন্ত হইলে, উপর-মহলের অনেক কীর্ষি-কাহিনী সর্বসাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে জনমনের সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস যে আরও ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীনেহরুগণের উক্তির পরে দেশে যে চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, টাইবুনালাল গঠনই তাহা প্রশমনের উপায় বলিয়া মনে করি। শ্রীনেহরু দেশের ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এরূপ টাইবুনালাল গঠনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে।

গ-স

### পুলিসের কর্তব্য-শৈথিল্য সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কঠোর মন্তব্য

হাবিশন বোডের অধিবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার দ্বারা গুরুতরভাবে আতঙ্কিত হইবার সংবাদ জোড়াসাঁকো থানার পৌছিলে, পুলিস তদন্ত কার্যে গাফিলতি দেখায়। তখন আতঙ্কিত ব্যক্তির পত্নী ডেপুটি কমিশনারের নিকট এই মর্মে লিখিত অভিযোগ করেন যে, একদিকে তাঁহার স্বামী হাসপাতালে অটোমট অবস্থায় রহিয়াছেন, অত্ৰিকি বাড়ীতে অভিব্যক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে শাসাইতেছে। ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, এই অভিযোগের পর ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশ পাইয়া জোড়াসাঁকো পুলিস তদন্ত-কার্যে প্রকৃত আগ্রহী হইয়াছিলেন। তাহার পূর্বে পুলিসের দারুণ শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম. বার এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, “উচ্চতর পর্যায়ে অভিযোগ না পৌছান পর্যন্ত বিনি কর্তৃত্বপূর্ণ হন না, তাঁহার মত কর্তৃচাৰী হাতে মানুষের খন-প্রাণ কিতাবে নিয়ামক থাকিতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।”

এইরূপ আর একটি বিচারে বার দিতে গিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট জীবজরেশ মুখার্জী বলিয়াছেন, “পুলিস কর্তৃক পীড়নের অভিযোগ আজকাল কেন এত বাড়িতেছে ভাবিয়া আমি অবাক ছই।...সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে, এইরূপ অভিযোগ যদি চলিতে থাকে এবং তাহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে পুলিসের হেফাজত নামক ব্যাপারটার আমি সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইব এবং কার্যবিধি ও এরূপ অজ্ঞাত বিধান অনুসারে আমার সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া পুলিসের অবাধ্য কর্তৃচাৰীদের বিরুদ্ধে আইনের বিতীর্ণিকা প্রয়োগ করিব—সে ব্যক্তির বেই হউন, আর যে পদেরই অধিকারী হউন না কেন।”

দুইটি মন্তব্যই অত্যন্ত কঠোর এবং স্পষ্ট। কোনও কোনও ব্যাপারে পুলিসের অসাধারণ গাফিলতি, আবার ক্ষেত্রবিশেষে যাত্রাতিথি উৎসাহ ত্রিটিশ-আমলেরও দেখা গিয়াছে। আমলের এই পুলিসের কর্তব্য-শৈথিল্যের প্রকৃত কারণ সেই ত্রিটিশ-আমলের ঐতিহ্যগত দুর্নীতি। এ ব্যাধি পুরাতন ও জটিল। কোন এক বা একাধিক কর্তৃচাৰীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে ইহা প্রতিকার হইবে না, ইহার জন্ত পুলিস-বিভাগকে চালিয়া সাজা দরকার। বস্তুতঃ পুলিস বাহাতে ত্রিটিশ আমলের সেই আচরণ ত্যাগ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত চালাইতে সমর্থ হয়, সেজন্য তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্তি করিয়া তোলা আবশ্যিক। পরাধীন ভাৱে মানুষের প্রাণ ও মানের মূল্য ছিল না। তখন সন্দেহক্রমে বাহাকে-তাহাকে ধরিয়া পুলিস তাহাদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, আজ তাহাকে সে ব্যবহার করিতে দেওয়া অসম্ভব। এই স্বীকারোক্তির নামে অভিব্যক্ত ব্যক্তিই প্রতি যে কদম্ব ব্যবহার পূর্বে করা হইত, আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও সেই ব্যবস্থাই চালু আছে। ইহাও পরিবর্তন আবশ্যিক। পরাধীন আমলের শাসন-ব্যবস্থা আজ যে অচল এবং তাহার যে পরিবর্তন আবশ্যিক, সে চেষ্টাও কোন পক্ষ হইতে দেখা যায় না।

গ-স

### দামোদরের চতুর্থ বাঁধ উদ্বোধন

দামোদরের আর একটি বাঁধ—পাক্কেত বাঁধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য এবারে সম্পূর্ণ হইল। দামোদর উপত্যকা পরি-কল্পনায় ইহা চতুর্থ বাঁধ। বক্তা নিঃসঙ্গের জন্ত যে আরও অন্ততঃ দুইটি বাঁধ নির্মাণ করা দরকার, সে কথা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, এই ব্যাপারে যেটুকু কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার গুরুত্বও বড় সামান্য নহে। বাঁধের উদ্বোধন কাজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই যদিও সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু দেশের সেবার এই বাঁধকে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্ত বাঁহার ডাক পড়িয়াছে—তিনিই আশ্রয় লাগে, তিনি কোনও বিখ্যাত নেতা বা নেত্রী নহেন, সামান্য একজন নারী-শ্রমিক মাত্র।

গাফীজী একবার বলিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের বাস্তবপন্থিতর পক্ষে তিনি একজন ভাতীকে দেখিতে চান, তাঁহার কথার সহকারী হইল ভোভোভেদের সকল প্রশ্নই জুলিয়া দিতে চান। আজ পাক্কেত বাঁধের জলধারায় যেন ভোভোভেদের সেই অভিশাপটিই আজ বিসর্জন ঘটিল। সামান্য একজন নারী-কর্মীকে এক অসামান্য সম্মান দিয়া যেন এই সত্যটাকেই আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, এ দেশ গণতান্ত্রিক, জাতিবর্ণ অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নহে। শ্রমের মর্যাদা এবং মনুষ্যত্বকেই এ দেশে বড় করিয়া দেখা হইবে।

প্রসঙ্গতঃ তবু একটি কথা বলিতে হইতেছে, বাঁধ সম্পূর্ণ করিবার পূর্বে নদী-পথকে যুক্ত আমাদের করিতেই হইবে। তুল বাহা হইবার হইয়াছে, দ্বিতীয়বার আরম্ভা যেন তুল না করি।

গ-স

## পাকিস্তানের সহিত নূতন বাণিজ্য-চুক্তি

যেব পাওয়া গেল, পাকিস্তানের সহিত ভারতের আর একটি নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ভারত পাকিস্তান হইতে তুলা, কল, হাঁস, মুগী প্রভৃতি ক্রয় করিবে এবং পাকিস্তান ভারত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্বা, কল ও চামড়া ক্রয় করিবে। এইভাবে উভয় দেশের মধ্যে মোট দুই কোটি টাকা মূল্যের পণ্যক্রয়ের আদান-প্রদান হইবে। ইহাতে আরও স্থির হইয়াছে, বস্তানিকৃত পণ্যের মূল্য উভয় দেশের টাকার হিসাবে গ্রহণ করা চলিবে। অর্থাৎ উভয়কেই সমপরিমাণ টাকার পণ্যক্রয় ক্রয় করিতে হইবে। যদিও ইহার গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই, কারণ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা কতটুকু? তবে এতদিন যে কারণেই হউক এই পরস্পর আদান-প্রদানের পথ বাধা বন্ধ ছিল, এই চুক্তিতে তাহার পরিবর্তন ঘটিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে খালের জল লইয়া যে বিরোধ তাহারও একটা মীমাংসা প্রায় হইয়াছে। দেনা-পাওনার আলোচনাও চলিতেছে। আশা করা যায়, কস্মীর এবং উভয় দেশের পরিত্যক্ত সম্পত্তিরও এবারে একটা কিনারা হইবে। ঐ সঙ্গে পাসপোর্ট ও ভিসার কড়াকড়ি বাহাতে তুলিয়া লওয়া হয় তাহার চেষ্টা অবিলম্বে করা উচিত। উভয় দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ছাড়া কেহই যে বাচিতে পারে না, হয়ত এতকাল পরে তাহার বৃদ্ধি থাকিবে। তাই এদিক দিয়া—সামান্য হইলেও এই নূতন বাণিজ্য-চুক্তির গুরুত্ব অনেকখানি।

গ-স

## পুরাকীর্তি সংরক্ষণে সরকারের অবহেলা

প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় ফলে আমাদের অনেক কিছুই জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু বাহা আবিষ্কার নয়, এমননি হেলা-কেলার প্রত্নতত্ত্বের বিষয়বস্তুগুলি তিব্বত পড়িয়া গঠিবে, তাহার সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা হইবে না, ইহা শুনিতেও কেমন লাগে! মূর্খদারাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্যের কথা কাহারও অবদিত নয়। এই জেলায় প্রায় সর্বত্রই নানাবিধ পুরাকীর্তিগুলি ছড়াইয়া আছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের এক সুবৃহৎ অংশই আজ খোয়া গিয়াছে। কিছু অংশে নষ্ট হইয়াছে, কিছু বা অসামান্য ব্যবসায়ীদের কবলে পড়িয়াছে। এখনও বাহা আছে তাহার সংখ্যাও কম হইবে না। পরাবীন দেশে যেগুলির সংরক্ষণ সম্ভব হয় নাই, আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সেগুলিকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না, ইহাই লজ্জার কথা। অথচ এই সম্পদগুলিকে লইয়া একটি সংগ্রহশালা অনায়াসেই স্থাপন করা বাইত। এইরূপ একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হইলে দেশবাসীরা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিতেন।

কিন্তু কেন জানি না, সরকারী তৎপর হইতে আজও তেমন

কোন উদ্যম দেখা যাইতেছে না। তবে সুখের কথা, একটি বেসরকারী উদ্যোগ সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। ইহার সঙ্গীত মূল্যবান পুরাকীর্তি কিছু কিছু লইয়া জিয়ারগঞ্জে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা বায়সাধ্য। সরকারী সহায়তা না পাইলে কাহারও একার চেষ্টায় এক কাজ সম্ভব হওয়া সম্ভব নয়। সে সহায়তা যে পাওয়া যাইবে এমন লক্ষণ অবশ্য এখনও দেখা যায় নাই। ইহা পরিতাপেরই বিষয়। কল্যাণমূলক একটি কাজের জন্য বেসরকারী উদ্যম যেখানে প্রস্তুত হইয়াই আছে সরকার যদি সেখানে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন বা তাহার পরি-কল্পনা যদি মন্থরেই আবদ্ধ থাকে তবে ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর নাই। অতঃপর আমরা সরকারকে এ বিষয়ে তৎপর হইতে দেখিব।

গ-স

## কলিকাতা শহরে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ

ভারতের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎপাদন ও বণ্টন-কেন্দ্র। এই অঞ্চলে কস্মীর সংখ্যাও অত্যন্ত প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। পূর্বে বাহা ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর কি শিল্পের দিক দিয়া, কি উৎপাদক-সংস্থার দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়াছে। সেই অনুপাতে কস্মীর সংখ্যাও পূর্বাঙ্গেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে পরিবহনের সংস্থান সেই অনুপাতে বাড়িল না। ইহা আমরা নিতাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কস্মীগণ কি ভাবে উৎপাদন-কেন্দ্র এবং অফিসাদিতে বাতায়ত করে। বর্তমানে রেলপথে শহরতলী হইতে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ কস্মীকে কলিকাতার আসিতে কি অবর্ণনীয় হৃৎক ভোগ করিতে হয় তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতা শহরের অবস্থাও তদনুরূপ। শহরতলী ও শহরঞ্চলে পরিবহনের এই অভাবের ফলে এখানকার উৎপাদন ও বণ্টনের যে প্রভূত ক্ষতি হইতেছে ইহা বলাই বাহুল্য। অতীত হৃৎকের কথা, এই দশ-বার বৎসরের মধ্যে শহরে ট্রাম লাইনের কিছুই সম্প্রসারণ হয় নাই। বাস সার্ভিস সরকার হাতে লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার যে কবে পর্যন্ত শহরের সকল অঞ্চলে প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যায় বাস প্রবর্তন করিতে পারিবেন তাহা বুঝ যাইতেছে না। কিন্তু আরও একটি প্রস্তাব বহু দিন ধরিয়া প্রায় বামা-চাপা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

১৯৪৭ সনেরও আগে অর্থাৎ তখনও দেশ বিভাগ হয় নাই, তখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, পরিকল্পনাটি কাগজেপত্রেরই রহিয়া যায়। পরিকল্পনা ছিল, কলিকাতা শহরের চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকার রেল স্থাপন। তখনই বাহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, আজ প্রয়োজনের দিক দিয়া তাহা শত গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, পরিকল্পনা পরিকল্পনাতেই রহিয়া গেল। যাকে যাকে কর্তাদের টনক নড়ে। এইরূপ টনক একবার নড়িয়াছিল ১৯৫২ সনে। সে সময় একটি বিশেষ কমিটি গঠিত

হয়। কিন্তু উঠাই শেষ। তার পর এই আট বৎসরের মধ্যে কোন কথাই শুনা যায় নাই। কেন যে ইহার কাজ অগ্রসর হয় না ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পরিকল্পনাটি এরূপ বৃহদাকারও নয়, বাস্তবহীনও নয় যে বর্জ্যপক্ষ ভীত হইবেন। এই রেলপথটি দমদম, চিৎপুর, ফেরারলি ট্রেস, হেট্রিংস, খিদিমপুর ডক, মাঝে-মাঝের মধ্য দিয়া যাইয়া আবার দমদমে ফিরিয়া যাইবে। ইহাতে মালপত্রের আদান-প্রদান এবং কন্সীদেব বাতায়ান্তের পক্ষে অনেকখানি সুবিধা হইবে এবং ট্রাম-বাসের ভীড়ের চাপও কমিবে।

আর একটি ট্রেন—যাত্রা সোজা ডায়মণ্ডহারবার হইতে রাণাঘাট এবং অপর দিক আসানসোল হইতে বাংলা ব্রীজ হইয়া দমদম পর্যন্ত বাতায়ান্ত করিলে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের যাত্রী এবং মালপত্রের আদান-প্রদানের পক্ষে খুবই সুবিধার হয়। এই ব্যবস্থায় ট্রাম-বাসে ভীড়ের চাপও আশাহীনরূপে কমিয়া যাইবে। বস্তাকার রেলের সহিত এই লাইনটিকেও সমান মূল্য দিতে হইবে তবেই এই পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিবে।

কলিকাতা শহরের ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর স্বার্থের দিকে চাহিয়া এবং সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া রেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে কলিকাতার এই নূতন রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করিবেন ইহাষ্ট আমরা আশা করি। রেলের অর্থসঞ্চতি বেকাপ তাহাতে এই ধরনের একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা রেলকর্তৃপক্ষ যদি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের তিন কোটি অধিবাসীরই সমষ্টিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিবেন।

গ-স

### উড়িষ্যাকে লইয়া পশ্চিমবঙ্গের খাতাঞ্চল গঠন

অবশেষে উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট যে পশ্চিমবঙ্গের সহিত উড়িষ্যার একটি খাতাঞ্চল গঠনের প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন ইহা আশার কথা। এই একজোটে হওয়া বিষয়ে উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের যে সব আশঙ্কা ছিল তাহার নিরসন কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, উড়িষ্যার কোন অঞ্চলে বাহাতে খাদ্যাভাব না ঘটতে পারে, তজ্জন্ত উড়িষ্যার উৎপন্ন চাউল দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার তথায় ৭৫ হাজার টন চাউলের একটি ভাণ্ডার গঠন করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কোন অঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর চাউলের মূল্য যদি প্রতি মণে ১৮ টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যাবাসী বাহাতে অনধিক ১৮ টাকা মণ দরে চাউল পাইতে পারে সেজন্ত একটা সাবসিডি বা অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, এই দুইটি ব্যবস্থার ফলে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে উড়িষ্যার আশঙ্কা আর থাকিবে না।

তবে এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের কতটা সুবিধা হইবে জানি না। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর মতে চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ

টন, কিংবা কিছু বেশী পরিমাণে চাউলের ঘাটতি দাঁড়াইবে। এই ঘাটতি উড়িষ্যার উৎপন্ন চাউল দ্বারা পূরণ হইবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, সরকার খাদ্যশস্ত্রের বাণ্যপথে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি পূরণ করিবেন। এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে কলিকাতার প্রমোজনীর খাদ্যশস্ত্রের জোগান দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে স্বার্থের দিক হইতে এই ব্যবস্থাটি সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয়। তবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা হইতে মোট কি পরিমাণ চাউল পাইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। কারণ, বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মতই উড়িষ্যাতেও বস্তার দরুন ফুসলের সৃষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাহার উপর উড়িষ্যার টংপুর চাউল হইতে উড়িষ্যাবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৭৫ হাজার টন চাউল উড়িষ্যাতেই মজুত রাখা হইবে। এবং উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট এরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উক্ত বাস্তব বাস্তব প্রত্যাহ ৫০ মণের বেশী চাউল কেনাবেচা করিবে, তাহাদের প্রত্যেককেই উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসা চালাইতে হইবে। তাব পর প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের নির্দেশমত সময়ে সময়ে উহাদের হস্তস্থিত চাউলের শতকরা ২০ ভাগ গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় গাটনের এই সব বেড়াঞ্চাল ডিভাইয়া উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে খুব বেশী পরিমাণে চাউল পাইবে এমন মনে হয় না। তবে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের চাউলের অভাব পূরণ করিবেন। বর্তমানে ইহাই আশার কথা।

গ-স

### ‘জাল-ভেজাল’ নাটকের পুনরভিনয়

জাল এবং ভেজাল জীবের অপসারণ বিষয়ে কর্তাদের জমকি আজ নূতন নয়। কিছু কাল না থাকিলে, এই লোক-ঠকান তথ্যে তাঁহারা আসব গরম করিয়া তোলেন। আজকাল মানুষের ইহা গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে, যতদিন খাতবন্দ থাকিবে ততদিন ভেজাল থাকিবেই।

কিন্তু এই লোক-ঠকান চাঁৎকার তাঁহারা করেন কেন? এ আশ্চর্যজনক যে নিতান্তই অভিনয় এ বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণের আছে। কর্তারা এতটা তাহাদের নির্বোধ ভাবেন কেন?

গত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় আবার জাল ও ভেজালের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। জনৈক সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্রিয়তার অভাবেই ভেজাল বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব এই অপরাধ দমনের জন্য কাঠার বিধান আবশ্যিক।

ভেজাল-দমনের এই কথাতালি-দুণ্ডু অভিনয় কত রজনী অতিক্রম করিল জানি না। কিন্তু যত রাজিই অতিক্রম হউক, এই নির্লজ্জ

অভিনয় আর ভাল লাগে না। সকলেই জানেন, খাড়ে বাহারা ভেজাল দেয় বা যোগীর ঔষধে বাহারা বিষ মিশ্রিত করে, তাহারা দেশের শত্রু। ইহাদের জ্ঞাত কঠোর শাস্তির আবশ্যকতাও সর্ব-সম্মত। তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে কঠোর আইন প্রণীত বা প্রবর্তিত হইতেছে না কেন? অথচ ইহাদের মুখেই দেশপ্রেমের, সমাজ-রক্ষার কত বড় বড় কথাই না শোনা যায়। চায়, দুর্ভাগা দেশ! কারাগারের কয়েদীদের সুখ-সুবিধার জ্ঞাত ইহাদের প্রাণ কান্দে, দেশের পতিতাদের উদ্ধারের জ্ঞাত যাহারা অংগ বাড়াইয়া বাইতেছেন তাহারা জল ও ভেজাল দমনে কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিতে এত কুণীত বা উদ্যমী কেন? শৃঙ্গার আফালন ও দাপাদাপি এ পর্যন্ত অনেক হইয়াছে। এখন উহা কমাইয়া কাজের কাজ যদি কিছু থাকে, তাহাই করিতে অগ্রসর হইউন। আইন সংশোধন করিতে হস্ত করুন, কিন্তু অসার অভিনয়ে আর লোক হাসাইবেন না। খাড়ে ভেজাল দিয়া বাতারা প্রাণহানি ঘটাইতেছে, আর বাতারা অতীনের অজ্ঞাত দেখাটয়া প্রাণ লইয়া একুশ ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাহারা সম্মান অপরাধী। এ কথা বেন তাহারা না ভেলেন।

গ-স

### পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট বিষয়ে রাষ্ট্রপতি

বর্তমানে পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং ঋচিকর প্রচ্ছদপটের দিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা আশার বশ্য সন্দেহ নাই। কারণ সৃষ্টির সাধনা, সৃষ্টিবোধই সাধনা। এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি ডঃ বাজেন্দ্রপ্রসাদ মুদ্রণ-পারিপাট্য ও পুস্তকের ডিজাইনের জ্ঞাত রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, “সাধারণ ভাবে ভারতে মুদ্রণ-ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক-গুলি মুদ্রণের কোন উন্নতিই হইতেছে না। অথচ ঐ সব অপরিণতশিষ্ট ও বালক-বালিকাদের পাঠ্যপুস্তকগুলিই সংস্কার বিশেষ করিয়া আবশ্যক। তাহাদের প্রত্যেকটি বই স্মরণ প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত করিয়া এবং ততোধিক স্মরণ করিয়া ছাপিয়া বাহির করা উচিত। কারণ তাহাদের চিত্ত আকর্ষণই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। স্মরণ বই হাতে পাইলে তাহাদেরই আনন্দ হয় বেশী। এই আনন্দের উপরই তাহাদের অধ্যয়নের স্পৃহা নির্ভর করে।”

রাষ্ট্রপতির এই কথাগুলি আমাদের দেশের প্রকাশকদের স্মরণ করিতে বলি। বর্তমানে শিক্ষা-পদ্ধতিও হইয়াছে বৈচিত্র্য অবলম্বিত পাঠ্যপুস্তকগুলিও তদনুসারে কম অবহেলা পাইতেছে না। কোনরূপে ভোড়াভাড়া দিয়া বইগুলি বাহির করিয়াই তাহারা থালাস। শিশু-মন জয় করিতে হইবে, এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই—না প্রকাশকের, না লেখকের। অথচ দাম তাহারা কম করেন না—যে বায়বাহুল্যের জ্ঞাত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া দরিদ্র গৃহস্থের বর্তমানে চিন্তার কারণ হইয়াছে। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক সুলভ ও স্মরণ হইবে ইহাই আমরা প্রকাশকদের নিকট হইতে

আশা করিব। দেশের অপণিত ছাত্রছাত্রীর কল্যাণ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে ইহাও ঐ সঙ্গে তাঁহাদের স্মরণ করিতে বলি।

গ-স

### বাংলা-বিহারের সংযোগরক্ষাকারী বরাকর-সেতু

শুনা বাইতেছে, বরাকর সেতুতে ফাটল ধরিয়াছে। ঐরাও ট্রাক রোডের উপরে এই বরাকর সেতুটির গুরুত্ব যে কতখানি তাহা কাহারও অবদিত নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে যোগরক্ষাকারী এই সেতুর উপর দিয়া প্রত্যহই হাজার হাজার যাত্রী এবং যানবাহন চলাচল করে। শিল্পদ্রব্য এই অঞ্চলটিতে বস্তুমানে মালপত্র পরিবহনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সেতুটি সংযোগ রক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এতরূপ একটি সেতুর সংস্কার করিতে যদি দীর্ঘ সময় লাগে, তবে বড়ই লক্ষ্যের কথা। ব্যবসায়ী মালবাহী ট্রাক ও ভারবাহী অগ্ন্যস্ত্র গাড়ীগুলিকে দীর্ঘদিন ধরিয়া মাইথন বাঁধের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইতেছে। সম্প্রতি যাত্রীদেরও নাকি চলাচল করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সকলকেই যদি মাইথন বাঁধের উপর দিয়া ঘুরিয়া বাইতে হয়, তাহা মাইল দূরে পৌঁছবার জ্ঞাত তাহাদের দশ নষ্ট। পথ অস্বস্তি করিতে হইবে। অথচ এই অব্যবস্থাকেই তাহারা চালাই করিলেন!

অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বরাকর সেতুর সংস্কারের কাজ যতদিন না শেষ হয়, ততদিনের জ্ঞাত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে উহার পাথের একটি অস্থায়ী সেতু বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। অস্থায়ী শুধু স্থানীয় লোকদেরই নয়, ঐরাও ট্রাক রোডের প্রতিটি যাত্রীকেই—বিশেষ করিয়া মাল বাতারাভের পক্ষে যে এক চরম অসুবিধার পড়িতে হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

গ-স

### চলন্ত ট্রেনে আবার ডাকাতি

চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি যাহাজানি এমন একটা নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটার প্রতি মনোনিবেশ করিতে না করিতে আর একটা ঘটিয়া বাইতেছে। এই ঘটনাগুলি পরস্পর লক্ষ্য করিলে দেখা বাইবে, উহাদের অধিকাংশই ঘটতেছে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের মধ্যেই। রোহান বাঁধের একপ্রান্ত সহকারী ইঞ্জিনীয়ার গত ৩১শে ডিসেম্বর তাহার পত্নীসহ একখানি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদ যাঁতে-ছিলেন। মানিকপুরের কাছাকাছি কোন স্থানে দুই ব্যক্তি—কামরায় আর কোন যাত্রী না থাকায়, ছোবা হাতে উঠিয়া আসে এবং তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠ করিয়া লয়। নগদ টাকা ও গহনায় অন্ততঃ পক্ষে হাজার টাকা ছিনাইয়া লইয়া তাহারা পলাইয়া যায়। নিরুপায় দম্পতি যে দুর্ভাগাদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়া-ছেন, ইহা নিতান্তই ভাগ্যের কথা। কারণ, বহুক্ষেত্রে তাও সম্ভব হয় না।



সমাজ-জীবন কতখানি বিশৃঙ্খল ও অনির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিলে তবেই এই স্বকম ঘটনা হইতে পারে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। চলতি ট্রেনের এই ডাকাতি ও খুনখারাপি স্বাভাবিক বন্ধের জন্য সর্বসাধারণের ভিত্তিতে একটি কর্ণ-পত্রিকারূপে তৈরী হইয়া এবং অচিরেই তাহা কার্যে পরিণত করা দরকার। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত তাহা হয় নাই বলিয়াই এই আপদ একটা প্রতিকারহীন কলঙ্করূপে হইয়া উঠিতেছে।

গ-স

### পরাদীনতা-মুক্ত আর একটি দেশ

আবার আর একটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। ক্যামেরুনস—পশ্চিম আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ উপকূলবর্তী এই রাজ্যের কয়েক লক্ষ অধিবাসী চল্লিশ বৎসরের ক্রাসী অভ্যন্তরীণ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু এ মুক্তিতে তাহারা উল্লসিত হইতে পারে নাই। কারণ মোট একশটি জেলার মধ্যে এগারটি জেলার অধিবাসীরা এই অধিকার লাভ করিয়াছে। আগামী মার্চ মাসে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী অহমাদু আহিনজো বিশেষ আইনের দ্বারা রাজ্য-শাসন করিবেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ক্যামেরুনস রাজ্যটি ছিল জার্মানীর প্রোটেক্টোরেট। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হইবার পর বিজয়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্যামেরুনসকে নিজের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। চার-পঞ্চমাংশ ক্রাসী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এক-পঞ্চমাংশ পায় ব্রিটেন। ভাসাই নদীতে এই ভাগাভাগি এবং ইঙ্গ-ক্রাসী কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়।

মাতৃভূমির এই বিভাগের বিরুদ্ধে প্রথম হইতেই ক্যামেরুনসের দুই অংশে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর এই বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। গত ১৯৪৮ সনে রাজ্যের দুই অংশের জাতীয়তাবাদীদের উত্তোকে ইউ-পি-সি বা ইউনিয়ন অব দি পিপলস অব ক্যামেরুনস দল গঠিত হয়। ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম ক্যামেরুনস গঠন এই দলের উদ্দেশ্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে ঐক্যবাদের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন-নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে নিঃশব্দভাবে। ১৯৫৫ সনে ক্রাসী কর্তৃত্বক্ষেত্র হিংস্র আক্রমণে পাঁচ হাজার ক্যামেরুনবাসী নিহত হইয়াছিল। ১৯৫৭ সন হইতে ব্রিটিশ ক্যামেরুনসেও দমননীতি প্রয়োগ করা হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্যামেরুনসের বিভাগ চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল। ক্রাসী ক্যামেরুনস স্বাধীনতা লাভ করিল। এখন এই স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতঃই এই রাজ্যের একতাবদ্ধ হইবার প্রবল প্রত্যঙ্গ প্রবল হইবে। ক্রাসী ক্যামেরুনস স্বাধীনতা লাভ করিল বটে, কিন্তু ক্যামেরুনসের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দল—ইউ-পি-সি এখনও নিষিদ্ধ। ক্রাসী ক্যামেরুনসের স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আজ অভিনন্দিত না হইলেও, এই দুর্ভাগ্য রাজ্যের স্বচ্ছ হইতে ঔপনিবেশিক শাসনের জোড়াল

নামিয়া বাওয়ার বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিমাত্রই সম্ভাব্য প্রকাশ করিবে। এই স্বাধীনতাকে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার পরিণত করিতে সহায়তা করিবার দায়িত্ব অনেকখানি রাষ্ট্রসংঘের। আজ শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়াতেই এই রাজ্য সম্ভবে রাষ্ট্রসংঘের কর্তব্য শেষ হয় নাই। এই ক্ষমতা বাহাতে জাতীয় প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দিক হইতে আগামী মার্চ মাসের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের পূর্বে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া এবং জাতীয় নেতাদের নির্বাচনে অংশ লইবার সম্পূর্ণ সুযোগ সৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র প্রাচ্যে যে জাতীয়তাবাদী মহাপ্রাবন আসিয়াছে, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী বীরে বীরে অবনমিত হইতে বাধ্য হইতেছে। তারতবর্ষ ও চীনসহ এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রায় দেড় শত কোটি মানুষ গত দশ-পনের বৎসরে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আফ্রিকা দশটি রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হইল। সাহায্যের দক্ষিণে এখনও বিশাল অঞ্চলগুলি পরাদীনতার বন্ধনে আবদ্ধ। স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী তাহাদের সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করিতেছে। ভেদনীতির সুকৌশলী প্রয়োগের দ্বারা মুক্তিকামী জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাহাদের মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করা, স্বাধীনতার নামে তাঁবেদার গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা, সংবিধানের জটিলতার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কোনও আয়োজনই তাহারা ক্রটি করিতেছে না। কিন্তু সমগ্র আফ্রিকায় আজ যে উত্তাল জাতীয়-তরঙ্গ আসিয়াছে, তাহাকে বোধ করা সম্ভব হইবে না। আমরা বিশ্বাস করি, ক্যামেরুনসের পর আফ্রিকার অস্তিত্ব অঞ্চলের স্বাধীনতাও অশুভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ এ যুগে টিকিতেই পারে না।

গ-স

### হগ মার্কেটে গুণ্ডা কর্তৃক ভদ্রমহিলা লাঞ্ছিত

১০ই জানুয়ারীর ‘বুগাস্তের’ প্রকাশিত একটি সংবাদের উপর সম্পাদকের মন্তব্য দেখিয়া চকল হইয়া উঠিয়াছি। চকল হইয়াছি এই কারণে যে, অতঃপর আমরা কোথাও নিষাপদ নহি—বয়েও নহি, বাহিরেও নহি। মন্তব্যটি এই :

“গত বড়দিনের সন্ধ্যায় কলিকাতা হগ মার্কেটে এক দল দুর্বৃত্ত একটা ভদ্র তরুণীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া যে ভাবে নির্দোষে পলাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কলিকাতার সমাজ-জীবনের এক আতঙ্কজনক চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাবীন কলিকাতার সর্কপ্রধান বাজারে ভদ্রনারী চলাফেরা নিরাপন্ন নয়, ইহা যেমন প্রগাঢ় সন্দেহের কথা, এক-বাজার লোকের মধ্যে কয়েকটি গুণ্ডা একজন নারীর সন্মুখ ও শালীনতার উপর আক্রমণ চালাইল, অথচ কেহই আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে বিপদ-মুক্ত করিতে সাহস পাইল না, ইহা তেমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডের মতো নির্দোষ। কলিকাতা বর্পোয়েশনের সভ্য বিবরণি লইয়া সম্মতি



যে আলোচনা হয়, তাহাতে জানা যায় যে, যাকেট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐ সময় বাজারে উপস্থিত ছিলেন না। একজন সার্জেন্ট ছিলেন, তিনিও বিশেষ কিছুই করেন নাই। চারজন দায়োয়ান ও শতাধিক য়েথর ছিল, তাঁহাদেরও কাহারও কোন ভূমিকায় পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বাজারের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা-রক্ষার দায়িত্ব তাহা হইলে কাহার? সমাজের সকল স্তরেই আজ গুণ্ডামি ও মারামারির একাধিপত্য চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে আমরা যেন এক সর্বপ্রাণী গুণ্ডাবাজের আওতার গিয়া পড়িতেছি। এই ঘটনার সঙ্গে বাহারা জড়িত, তাহাদের প্রেক্ষার ও দণ্ডের জন্য গোয়েন্দা পুলিশ তৎপর হইবেন কি?”

গ-স

### বিভাগাগর কলেজের শতবার্ষিকী

সম্প্রতি বিভাগাগর কলেজের শতবার্ষিক-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। বিভাগাগর কলেজটি ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ নাম পূর্বে ছিল না। বিভাগাগরবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজটির নাম ‘বিভাগাগর কলেজ’ রাখা হয়। ‘কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল’ ছিল ইহার পূর্ব নাম। ‘কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল’ হইতে ‘মেন্টোপলিটান ইনষ্টিটিউশন’ এবং পরে উহা কলেজে পরিণত হয়। ইহা শুনিতে বেশ, কিন্তু তখনকার দিনে এ দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের এই বেসরকারী প্রয়াসের ইতিহাসটি নেহাত সহজ উদ্ভাষে ইতিহাস নয়। বস্তুতঃ বিভাগাগর কলেজের শতবার্ষিক-উৎসব এক মহামনসী পুরুষের স্মৃতিস্মরণ সফল ও তপস্চর্য্যের ইতিহাসকেই আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শত বৎসর পূর্বে ‘কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল’ নামক যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়তনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, প্রাতঃস্মরণীয় বিভাগাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠ সাধনায় তাহার পূর্ণতর বিকাশ ঘটিতে বিশেষ দেরি হয় নাই। মাত্র তের বৎসরের মধ্যেই সেই বিদ্যালয়তনকে তিনি বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার এক গীঠস্থানে—মেন্টোপলিটান কলেজে পরিণত করিয়াছিলেন। কথ্যটা সকলেই জানেন, তবু নুতন করিয়া আবার বলা প্রয়োজন যে, ১৮৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত মেন্টোপলিটান কলেজই এখানকার প্রথম বেসরকারী কলেজ। তখন কলেজ বলিতে সংস্কৃত কলেজ আর হিন্দু কলেজ। পর পর অবশ্য আরও অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ‘কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল’ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্কুল বলিতে ‘ডক সাহেবের স্কুল’ আর গৌরমোহন আচ্যের ‘ওরিয়েন্টাল সেমিনারী’ ছাড়া আর কোন স্কুল ছিল না। অষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাই ‘কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল’ হইতে ‘মেন্টোপলিটান স্কুল’ এবং ক্রমে আজিকার ‘বিভাগাগর কলেজ’র বিপুল পরিণতি এক দীর্ঘ ইতিহাস।

মেন্টোপলিটান কলেজ অর্থাৎ বিভাগাগর কলেজ কর্তৃক উদ্ভাষিত আজিকার এই শতবার্ষিক-উৎসব, বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথম বেসরকারী উদ্ভাষের স্মরণীয় হইবেই স্মরণীয়। সামান্য

সেই স্মরণকে, আপন নিষ্ঠা এবং সাধনায়, যিনি এক অসামান্য সিদ্ধির সাফল্য দান করিয়াছিলেন, স্মরণোৎসবের এই লগ্নিতে আজ আবার সেই বিভাগাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যেই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আশা করিতেছি, শিক্ষার যে প্রদীপটি তিনি জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার অজ্ঞান শিষ্য হইতেই আবার জ্ঞানের আরও অসংখ্য প্রদীপ এ দেশে জ্বালাইয়া তোলা হইবে।

গ-স

### হাসপাতাল হইতে নবজাত শিশু লইয়া কুকুর উধাও

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের দেশের হাসপাতালগুলি সবক্ষেপে বেসরকারি অভিযোগ নিত্যই শুনা বাইতেছে তাহা যে-কোন সভ্য দেশের পক্ষে কল্পকের কথা। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা-হাসপাতাল হইতে একটি চাকলাকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ হাসপাতালের প্রসূতি-বিভাগ হইতে এক নবজাত শিশুও গলদেশে কামড়াইয়া ধরিয়া একটি কুকুর হাসপাতালের গেট অতিক্রম করিয়া সদর রাস্তায় উপর দিয়া ছুটিয়া বাহিয়া নিকটবর্তী ধরধারা নদীর সেতু নীচে লইয়া গিয়া মাংস ভক্ষণে উত্তম হইলে পাড়ার প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জনতার কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া হাসপাতালের এক নারী কামচারী ছুটিয়া আসে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে লইয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা একবারেই এই অভিযোগ করেন যে, কুকুরের গ্রাস হইতে যখন শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তখন তাহার গলদেশের গভীর ক্ষত হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল।

যদিও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ পরে জানাইয়াছেন, শিশুটি মৃত ছিল। তাহারও জানাইয়াছেন, গভবতী মহিলাটি কঠিন এক্সপ-সিয়া বোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হন, এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ হইলে শিশুটি অল্পকাল পরেই মারা যায়। ঘটনাটি ঘটিয়াছে বরা জাহ্নুয়ারী। এই বরা জাহ্নুয়ারী হইতে ঠাঠা জাহ্নুয়ারী পর্যন্ত শিশুটির মৃতদেহ নাকি হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। সেখান হইতে কোন উপায়ে কুকুরটি মৃত শিশুকে মুখে করিয়া অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে।

শিশুটির মৃত্যুর সহিত সংবাদিকগণ সাক্ষাৎ করিতে চাছিল জলপাইগুড়ির চীফ মেডিক্যাল অফিসার অব তেলথ রোগিনি তখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছেন বলিয়া জানান এবং সাক্ষাতের অসম্মতি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই নবজাত কণা সম্ভাব্যতঃ যে বরা জাহ্নুয়ারী মারা গিয়াছে সেই সংবাদ অভিভাবকদের দেওয়া হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা স্বাস্থ্যবিভাগের মুখপাত্র জানান যে, শিশুটির পিতামহী হাসপাতালে রোগিনীকে দেখিতে আসিলে তাঁহাকে এই সংবাদ জানান হয় এবং তিনি শিশু মৃতদেহটি সংস্কার করিবার জন্য লিখিতভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নাকি অনুরোধ জানান। তবে

তিনি এই অসুস্থের জ্ঞানান, তাহার উত্তরে উক্ত যুগপাত্ত বলেন যে, তারিখের উপর কালি পড়িয়া যাওয়ার তারিখটিই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এই ঘটনার পর যেসব যোগিনী হাসপাতালে ছিলেন তাঁহারা একে একে আপন সন্তানের নিরাপত্তার জন্ত হাসপাতাল ছাড়িয়া চলিয়া যান।

আমাদের বলিবার কথা এই, হাসপাতালগুলি যদি মানুষের কল্যাণই না করিতে পারিল তবে তাহা বাধিবার প্রয়োজনই বা কি? বর্ধুপক্ষের কাছে প্রতিকারের আশা নিরর্থক। কারণ, এত অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁহাদের চৈতন্য হয় নাই। শুধু বলিব, “হে মোর দুর্ভাগা বেশ!”

গ-স

### চিনির দর বৃদ্ধির কারণ কি

চিনির দর অস্বাভাবিক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ সংস্কারের দুর্বোধ্য। সত্য বটে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে চিনির যে মনস্তর শেষ হইয়াছে তাহাতে দেশে চিনির কলগুলিতে পূর্ন ম:স্বের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ টন কম মাল উৎপন্ন হইলেও দেশ হইতে কতক পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। এরিকে দেশে চিনির চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে এবং চলতি ব সেরেই ইক্ষু ফলনের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নহে, তাই চিনির চলতি মনস্তরে দেশে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু উহা চিনির মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। কেননা ভারত সরকার বর্তমানে ভারতের চিনির কলসমূহে উৎপন্ন সাবুজা চিনি নিষ্কিষ্ট দ্বয়ে ক্রয় করিয়া তাহা নিষ্কিষ্ট দ্বয়ে চিনি-ব্যবসায়ীদের নিকট বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রদান করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় দেশে চাহিদার তুলনায় চিনির যোগান কম হইলেও উহার মূল্যবৃদ্ধির কোনও কারণ ঘটিতে পারে না।

সুতরাং এখানেও দেখা বাইতেছে, অতিরিক্ত মুনাফালোভী মহাজনদের খেলা চলিতেছে। সরকারী শাসন এখানে ব্যর্থ। সরকার বাহা করিয়াছেন তাহা মার্মূল ব্যবস্থা। সেই ‘কেয়ার প্রাইস শপ’র মাধ্যমে নিষ্কিষ্ট দ্বয়ে চিনি বিক্রয়ের উদ্যোগ। কিন্তু যেখানে এই ‘কেয়ার প্রাইস শপ’ নাই, সেখানকার অধিবাসীদের কি দশা হইবে? বাহা করা উচিত ছিল তাহা না করার সরকারের অক্ষমতাই বার বার প্রকাশ পাইতেছে। এইসব ধনী মহাজনরা—বাহারা ইচ্ছামত বাজার-দর চড়াইতেছে ও নামাইতেছে তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সরকার সেইদিকেই সর্বাপেক্ষা উদাসীন।

### আবার জলদস্যু

যোগল আমলে পূর্বাঙ্গী জলদস্যুর কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সে এক যুগ আগের কথা। বর্তমান যুগে যে এরূপ অবাধ-দস্যুতা নড়ব, ইহা চিন্তা করিতেও কেমন লাগে। অথচ ইহাই হইতেছে। কাঁধের রসুলপুর নদীর মোহনা হইতে হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত যথাবতী

জলপথে জলদস্যুর আক্রমণে মাল বোঝাই নৌকাগুলি লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ও ভ্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী জলপথে মাল আনা বন্ধ করিয়াছেন।

বর্তমানে কলিকাতা হইতে কাঁধে সরাসরি লবী-যোগে মালপত্র আনা ও নেওয়া চলিতেছে। ইহার ফলে মাল আমদানির খরচ বাড়িয়াছে, ফলে দর বাড়িতেছে। প্রত্যেক জলপথে আমদানি হইলে খরচ পড়ে কম। কিন্তু জলদস্যুর উপদ্রবে ব্যবসায়িকগণ নৌ-পথে মাল আনা বন্ধ করার কয়েক সত্তর নৌকা, মাঝি ও মাল্লা আজ বেহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এখন কোনক্রমে কার্যক্লেপে দিনযাপন করিতেছে। বঙ্গোপসাগর বন্ধে সমুদ্রের প্রাকৃতিক বহু পরিবর্তন হইতেছে, রসুলপুর নদীর মোহনা হইতে হলদিয়া পর্যন্ত সমুদ্রগর্ভে যজ্ঞতরু বিশাল চড়া পড়িয়াছে। তাহাতে নৌকা চালানোও ভয়ের কারণ, খুব অভিজ্ঞ মাঝি না হইলে, উক্ত চড়ায় নৌকা আটকাইয়া যায় এবং কখন কখনও ছুটি-তিন দিন পর নৌকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বহুক্ষেত্রে নৌকা নষ্ট হইয়াও যায়। জলদস্যুদের সুযোগ এটখানেই। সমুদ্রের বন্ধে কোন মালবাহী নৌকা আঁকা পড়িতেই, জলদস্যুরা দল বাঁধিয়া ছোট ছোট নৌকা লইয়া উক্ত নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং কোন প্রকার বাধার পূর্বেই তাহারা মূল্যবান জাহাজি নৌবায় বোঝাই করিয়া সরিয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া হিজলী হইতে তালপাটি ও হলদিয়া, মোহনা হইতে রূপনারায়ণের মোহনার মধ্যে এই প্রকার লুণ্ঠন চলিতেছে।

এখন কথা হইতেছে, এরূপ লুণ্ঠন মাত্র একদিন হয় নাই। অনেকদিন হইতেই দল বাঁধিয়া তাহারা লুণ্ঠনকার্য্যে চালাইতেছে। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, আমরা এক সুসভা, শুশ্রূষাল সুশাসিত রাজ্যে বাস করিতেছি। রাজ্যে কি পুলিশ নাই? সরকারও কি এ সংবাদ অবগত নহেন? হলদিয়ায় নতুন বন্দরও সরকার নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু বন্দর রক্ষার ব্যবস্থা নাই ইহা ততোধিক বিষয়।

গ-স

### মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনে সরকার

দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি শিক্ষা কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। ইতি-পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা ছাত্রদের যোগ্যতা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি শিক্ষা কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের উপরিবিধিত অভিমত বিচার করিয়া দেখিয়া এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দেশের সাধারণ শিক্ষাবিদগণও মনে করেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যিক। শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদের বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে ব্যর্থ হইতেছে। চাক্ষুরা যত্ন কাব্যে দক্ষতা এবং কয়েকটি নিয়ম যত্নের যত অসুস্থদণ

করিলেই প্রচলিত পরীক্ষা কেবল পাস করিতে নহে, খুব উচ্চমান অধিকার করিয়া কৃতিত্বও দেখাতে পারে। কিন্তু অধীত বিষয়ে তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইল কিনা, অথবা তাহারে ব্যক্তিগত বিকাশ হইল কিনা, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। দেখা যাউতেছে যে, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির বার্থতা এবং উহার পরিবর্তনের আবশ্যিকতা সৰ্ব্বক্ষেপে দেশের সংস্কারী এবং বেসংস্কারী প্রায় সকল শিক্ষাবিদই একমত। কিন্তু কিরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবে কে? এগুন শিক্ষা কল্পপক্ষ এবং বেসংস্কারী শিক্ষাবিদগণের কর্তব্য হইতেছে, নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ণয় করার দিকে মনোযোগ দেওয়া। গ-স

### ডাঃ বি. পট্টভী সীতারামায়া

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ বি. পট্টভী সীতারামায়া গত ১৭ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজপাল ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

পট্টভী সীতারামায়া কৃষ্ণা জেলায় মদলীপট্টম জন্মগ্রহণ করেন। গত নব্বইয়ের তাঁহার ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। মদলীপট্টম এবং মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ২৬ বৎসর বয়সে তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং গান্ধীজীর একান্ত ভক্ত শিষ্য হন। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্যে অধিবেশনে তিনি অন্ধ্র-প্রদেশ প্রবেশ করিবার প্রস্তাব পেশ করেন। বালগঙ্গাধর তিলক এত প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৩৭-৪০ সন পর্যন্ত তিনি অন্ধ্র-প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গান্ধীজী প্রবর্তিত সকল আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি কারাবরণ করেন। জেলে বসিয়া তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাস লিপিতে আবিস্ত করেন।

১৯৩৮ সনে ত্রিপুরা-কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়া তিনি অত্যধ বস্ত্রের নিকট পরাজিত হন। এই সময় গান্ধীজী বলিয়া-ছিলেন, সীতারামায়াই পরাজয় তাঁহার নিজেরই পরাজয়।

স্বাধীনতার পর তিনি পুন্ড্রোত্তরপ্রদেশ ট্যাক্সেস কমিশনার হইয়া ১৯৪৯ সনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহার পর তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি হায়দ্রাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাঃ পট্টভী পণ্ডিত এবং অলেখক ছিলেন। কংগ্রেসের ইতিহাস ব্যতীত তিনি “গান্ধীবাদ ও সমাজবাদ” এবং “হিন্দুসমাজে নারী” গ্রন্থগুলিও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম জীবনে ডাক্তারী পাস করিয়া তিনি ১৯০৬ সনে মদলী-পট্টম চিকিৎসা বাবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার সম্পাদনার “জয়ভূমি” নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। পরে তিনি গান্ধী আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তী ভাবে বাহায়া স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা চূড়ান্তে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ডাঃ সীতারামায়া ছিলেন তাঁহারে অন্ততম। ভারতের প্রথম ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য স্বতন্ত্র অন্ধ্র গঠনের আন্দোলনে তাঁহার ভূমিকা

চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। তাঁহার কংগ্রেসের ইতিহাসে কংগ্রেসের গঠন ও উন্নতিতে বাংলার দানকে যোগা স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই—একথা সাহসের সঙ্গে তিনিই বলিয়াছিলেন। একথা আজ অস্বীকার করা চলে না, অন্ধ্রের সীমানা ছাড়াইয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ও মননশীলতা সাধা ভারতকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার নাম জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিত থাকিবে। গ-স

### মহারাজী সূচাক দেবী

অক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয় কন্যা ময়ূভদ্রের মহারাজী সূচাক দেবী গত ১৪ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর সূচাক দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূভদ্রের মহারাজা রামচন্দ্র ভদ্রদেবের সহিত সূচাক দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনের মাত্র আট বৎসর পরেই ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার স্বামী মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র ক্রঃব্রজনারায়ণ বিগত মহাযুদ্ধে বিমান দুর্ঘটনার নিহত হন।

সূচাক দেবী বিদ্বা। কাব্যে, সম্রাটে, চিত্রবিলাস এবং সমাজের বিবিধ কল্যাণার্থে তিনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও চিত্র-শিল্পী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্রে সংরক্ষিত আছে। ‘ভক্তি অর্ঘ্য’ ও ‘প্রণতি’ নামক কাব্য তাঁহার রচিত। গ-স

### প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বেলগুয়ে বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও চিত্তঞ্জন বেল-ইঞ্জিন কারখানার প্রাক্তন জেনারেল-ম্যানেজার প্রশান্তচন্দ্র মুখার্জি গত ৪ঠা জানুয়ারী মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও বহু কণ্ঠকীর্তি পিছনে রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে দেশবাসী মাত্রেই মর্মান্বিত হইবেন।

১৯০৪ সনে প্রশান্তচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পি. সি মুখার্জি নামেই তিনি পরিচিত। তিনি কেবলি বস্ত্র-বিজ্ঞানে ‘ট্রাইপস’ লাভ করিয়া ১৯২৭ সনে পুরাতন ‘ব্রিষ্ট ইণ্ডিয়া রেল’ কাঙ্গে যোগদান করেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে থাকেন। ৩৪ বৎসর কাল তিনি ভারতের রেলপথ পরিচালনার ও এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে ১৯৫৬ সনে তিনি বেলগুয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ১৯৫৮ সনে রেলমন্ত্রী দপ্তরের সর্বপ্রধান সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পরিচয় দেন। অসাধারণ ধীশক্তি, কণ্ঠকুশলতা ও জনপ্রিয়তা ছাড়া কণ্ঠ-কীর্তি এই শীর্ষে আরোহণ সম্ভব হয় না। প্রশান্তচন্দ্র কঠোর শ্রমের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে স্বল্প উৎসাহ ও প্রবৃত্ততার সহিত সম্পাদন করিতেন, তাহা যেমন অমূল্যবীর্য তেমনি আদর্শহীনীয়। প্রতিভাশীল, কণ্ঠকেন্দ্র, হাস্যোজ্জ্বল মুখার্জির সাগ্নিধালাভের সুযোগ বাহারই হইয়াছে তাঁহার অমায়িক আচরণে তাঁহাকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি কণ্ঠজীবনে যে কৃতিত্ব রাখিয়া গেলেন, তাহা বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গ-স

## গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছি। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৬৭-এর মধ্যে লেখকগণ-প্রেমিত গল্প লওয়া হইবে। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

- ১। নাম
- ২। ঠিকানা
- ৩। প্রেরণের তারিখ
- ৪। ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।
- ৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামের পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্ত।

গল্পের শুণাঙ্গসমূহ নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

- (ক) সর্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্ত পুরস্কার একশত টাকা,
- (খ) পরবর্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্ত পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,
- (গ) পরবর্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্ত পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্ত প্রদত্ত গল্প অথবা কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কর্মধ্যাক—“প্রবাসী”

# জীবনচর্চা বনাম সাহিত্যচর্চা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আমরা বাঙালীরা আমাদের সাহিত্যের গৌরব করে থাকি। সাহিত্য আমাদের একটা বড় আত্মাভিমানের স্থল। আমরা এই বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করি যে, সাহিত্য ও কাব্য আমাদের মাথার মণিস্বরূপ; বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ মহিমাচ্ছটা ওই মণি থেকেই বিকিরিত হয়েছে। ভারত-বর্ষীয় সমাজে সাহিত্যের কারণেই আমাদের যা কিছু প্রতিষ্ঠা।

বাঙালী যে সংজ্ঞাত ভাবে সাহিত্যপ্রিয় ও সাহিত্যকুশল জাতি তদ্বিশ্বের কোন সম্মুহ নেই। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থল হওয়া উচিত কিনা, কিংবা তাতেই আমাদের সমস্ত অভিমান নিঃশেষিত হওয়া ভাল কি না সে কথা আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। বিশেষতঃ, আজকের দিনে সাহিত্যের যে ঐতিহ্য অর্থ ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে প্রচলিত হয়েছে তাতে করে সাহিত্যের স্বত্রে পূর্বের গৌরববোধ আর জাঁকড়ে ধরার অবকাশ আছে কিনা সে কথা আমাদের ধীরচিন্তে ভেবে দেখা দরকার। কেন আমাদের এই দ্বিধা ও সংশয়পন্ন মনোভাব তা একটু বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রকৃতি নানাদিক দিয়ে জাতীয়তার ঐতিহ্য থেকে অলিত হয়ে পড়েছে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই স্বপ্ননের আরম্ভ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ওই প্রক্রিয়া আরও প্রবলতাপ্রাপ্ত ও ত্বরান্বিত হয়েছে। আজ প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলা সাহিত্য তার মূল প্রেরণা একান্ত ভাবে ইউরোপীয় ভাবাদর্শ থেকে সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। 'সবুজ-পত্রের' কালে এই পাশ্চাত্যীকরণের শুরু, তার পর 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি অতি-আধুনিক পত্রিকার দ্বারা বেয়ে এখন পর্যন্ত ওই পাশ্চাত্য-ভাবনাই আমাদের সাহিত্যে সমধিক বলবৎ রয়েছে বলা যেতে পারে। আত্মস্তিক পাশ্চাত্য প্রবণতার পাশে পাশে তদ্বিপরীতে জাতীয় আদর্শের প্রভাবযুক্ত সাহিত্য যে রচিত হচ্ছে না এমন নয়, আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের কতিপয় শ্রেষ্ঠ লেখক প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ভাবেরই বিশেষ-রূপে উদগত। কিন্তু সব জড়িফে মিচংল নয়তম পেরায়

যুদ্ধোত্তর-পর্বের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য মনোভাবেরই জর-যোষণা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্যের উপর আত্মস্তিক পাশ্চাত্য প্রভাবের একটা কৃফল হয়েছে এই যে, বাঙালী সংস্কৃতি-ভাবনা ও সংস্কৃতি-চর্চার যে একটা নিজস্ব আদর্শ রয়েছে তার বন্ধনসীমা থেকে সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। সৃষ্টির জীবনচর্চার আদর্শ এখন আর লেখকদের কল্পনাকে তেমনভাবে উদ্দীপিত করে না; নীতি ও ধর্মবুদ্ধি-যুক্ত চিন্তা এখনকার নন্দনবাগী সাহিত্যিক ধারণায় প্রায়শঃ উপহসিত হয়—আজকের দিনে সাহিত্য নিছক লিখন-চাতুর্ধ্য আর আঙ্গিক-নৈপুণ্যে এসে ঠেকেছে। জীবনসম্পর্ক বিংহিত এই একান্তভাবে সাহিত্য-আশ্রিত চিন্তা ও কল্পনা সাহিত্যকে যে কি রিক্ততার দশায় এনে ফেলতে পারে তা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ধারা-ধরনের দিকে একনজর তাকালেই আমরা বুঝতে পারব।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এ রকমটি ছিল না। সত্য বটে, তখনকার সাহিত্যের পরিধি আজকের মত এত বিস্তৃত ছিল না, লেখকদের সংখ্যা এবং কর্মতৎপরতাও ছিল আজকের তুলনায় অনেক সীমিত; কিন্তু যত জনাই বা যা-ই তাঁরা লিখে থাকুন না কেন, তার ভিতর তাঁদের প্রত্যয়ের জোর ছিল। সাহিত্যকে তাঁরা জীবনচর্চাবিশৃঙ্খল বলে মনে করতে পারেন নি। জীবনে তাঁরা যা-কিছু গভীর ভাবে ভেবেছেন, অনুভব করেছেন, মনন ও ধ্যান-ধারণা করেছেন তারই ছাপ গিয়ে পড়েছে তাঁদের সাহিত্যের উপর। তাঁদের চোখে সাহিত্য জীবন-নিরপেক্ষ একটা নির্বস্তক কল্পনামাত্র ছিল না, জীবনের সঙ্গে যোগেই তাঁদের সাহিত্য সার্থকতা লাভ করত। দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ভাবনা-ধারণা ও কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির বনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আদর্শবাদ তৎকালীন লেখকদের নিখাস-বায়ু-স্বরূপ ছিল বললেও চলে।

এমন নয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী গল্প ও কাব্য-লেখকগণ সমসাময়িক পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। মোটেই তা নয়, বরং সব জড়িফে বিচার করলে

সাহিত্যের সঙ্গে যোগ অনেক বেশী গভীর ছিল। তবু জাতীয়তার ভূমির উপর তাঁরা সকলেই দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সম্মোহনজনিত প্রতিক্রিয়ায় গোড়ার দিকে কিছু অমিতাচার ও আতিশয্য ঘটেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ওই বিভ্রম কাটিয়ে উঠে জাতীয় ধ্যান-ধারণার কক্ষপথে ফিরে আসতে ও তথায় আশ্রয় হতে তাঁদের বেশী বিলম্ব হয় নি। রেনেসাঁসের একটা প্রধান ধর্মই এই যে, তা নতুন নতুন সূত্র থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই প্রেরণাকে কাজে লাগায় জাতীয়তার গভীরে আরও নিবিড় ভাবে প্রবেশ করবার জন্য। ভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিচয় নব-ভাবে উদ্ভূত লেখকদের স্বদেশের বৈশিষ্ট্যকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে জানবারই শুধু প্রণোদনা দান করে। এটা কি পশ্চিম ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল কথা, কি উনিশ শতকীয় বাংলা রেনেসাঁসের মূল কথা। বাংলার নব-জাগৃতি আন্দোলন ইউরোপীয় ভাবধারার অক্লান্তলজাত সমৃদ্ধতার অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় ঐতিহ্যকে যে আরও সার্থকভাবে চিনতে পেরেছিল সে ইতিহাস সুবিশিষ্ট।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যের ত্রীরক্তি কখনও জাতীয়-জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রস্ফুটন ভিন্ন কল্পনায় নয় - একথা প্রতিপন্ন করতে চাওয়া। উনিশ শতকের বাংলা দেশে ধর্ম, সমাজ-সংস্কার চেষ্টায়, শিক্ষায়, জাতীয়তার ভাবধারার প্রভাবে ও অন্ত্যস্ত বিবিধ কর্ম-তৎপরতায় জাতীয় উত্ত্রের যে সর্বাত্মক পরিপুষ্টি ঘটেছিল তার থেকে তখনকার সাহিত্য বিযুক্ত ছিল না। সমাজের আর দশটা কর্মের মত সাহিত্যও তখন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-পরিচলনার একটা দৃক মাত্র ছিল এবং ওই পরিচলনার পরিধির ভিতর তার যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। জীবনের পরিধি অনেক বড়, সাহিত্যের পরিধি সেই তুলনায় অনেক সঙ্কুচিত বলা যায়। সাহিত্যকে সামগ্রিক জীবন-চর্চার অংশ ও অনীনরূপে দেখলে তবেই তাকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখা হয়। উনিশ শতকের লেখকদের মনে জীবন সম্বন্ধে এই অধঃপ্রবেশ ছিল বলেই সাহিত্যকেও তাঁরা প্রকৃত সার্থকতার ভূষিত করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্যকে অখণ্ড জীবন-সাধনার প্রভাব-পরিধি থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে নিছক সাহিত্য-ভাবনার সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে সংকুচিত করে দেখবার চেষ্টা করব তখনই সাহিত্যের বিকার অনিবার্য। আজকের সাহিত্যে এমনতর বিকার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। সাহিত্যচর্চা জীবনচর্চা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে সাহিত্যে যেসব কুফল দেখা দেওয়া

সম্ভব তার সবই একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সামগ্রিক জীবনচর্চার আদর্শ থেকে সাহিত্য ক্রমশঃ অপস্রম্যমান হওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে সাহিত্য বুঝি শুধুই ভাষা-চাতুর্যের বিকাশ সাধন ও আঙ্গিক নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ক্ষেত্র, সাহিত্যের সঙ্গে আদর্শবাদের, নীতির, ধর্মবুদ্ধির যেন কোন সম্পর্ক থাকতে নেই। ইদানীন্তন কালের অধিকাংশ উপজ্ঞান-লেখক উপজ্ঞানকে একান্তভাবে কাহিনী পরিবেশনের ক্ষেত্রে বলে মনে করেন, উপজ্ঞানের পশ্চাতে যে স্নেহভীর জীবন-বোধের একটা দৃঢ় পট বিস্তারিত থাকা দরকার সে কথা তাঁরা বিস্মৃত হন। অবশ্য এ কথাটা বার্তাক্রম যে নেই তা নয়, তবে সব জড়িয়ে দেখলে, পর্যবেক্ষণ-নির্ভর, কাহিনী-পরিবেশন প্রবণতাটাই এ কালের উপজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ বলে মনে হয়।

এইখানেই বিপত্তির শেষ নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প-সম্ভার যেন তেন প্রসারণ কাটাবার বৈশ্ব মনোবৃত্তি। শিল্পসৃষ্টি আজ আর তার অন্তর্নিহিত শিল্পোৎসর্গের জন্য পুরা মর্যাদা পায় না; যে শিল্পকর্মের সঙ্গে বাণিজ্যিক সাক্ষ্য-সম্ভাবনা জড়িত নয়, অশেষ গুণগণনা থাকা সত্ত্বেও তার যে শুধু বাজার-দরই নেই তা নয়, তার কোমীক ও স্বাক্তও নয়। এ বড় ভয়াবহ অবস্থা। আমরা সাহিত্যিকর্মের ব্যবসায়িক দিক উপেক্ষা করি না, তা বলে ব্যবসায়িক মূল্যমানই যদি সাহিত্যের মর্যাদা নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, সে অতিশয় অপকৃষ্ট পরিস্থিতির সূচনা করে। অন্ত্যস্ত দশটা বিক্রয় পণ্যের মত সাহিত্যও আজ জনতার হাতে নিছক কেনা-বেচার সামগ্রীর সামিল হয়ে পড়েছে।

এ সবই হতে পেরেছে সাহিত্য থেকে জীবন বিস্মৃতি হয়ে যাবার ফলে। জীবন অর্থে এখানে জীবনের আধ্যাত্মিক, আঙ্গিক, নৈতিক দিকটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আদর্শবাদ উন্নত জীবনচর্চায় ধারণা সমাজবোধ, পরহিত-ব্রত, স্নানকৃত ক্রটি ইত্যাদি মিলে জীবনের যে সার্থকরূপের ছবি আমাদের মনে জাগরুক রয়েছে, তার সঙ্গে এখনকার সাহিত্যের ধারা ধরনের বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যুগের সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য বেড়েছে, ভৌগোলিক পরিধির প্রসার আর কর্মতৎপরতার গভীর বিস্তার হয়েছে—সবই স্বীকার করা গেল, কিন্তু একটি বড় মূল্যের বিনিময়ে আমরা এই সুবিধাগুলি লাভ করেছি। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান মানসজগতের ভিতর চিস্তা দাবিত্যাগ অতি প্রকট। চিন্তার এই দিক্ততা এসেছে, যে-কথা এই মাত্র বলা হয়েছে, জীবনচর্চা আর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার ফলে। বর্তমান লেখকদের মধ্যে নাকি



সমাজ-চেতনা প্রবল—এই বকম বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ কোন কোন সমালোচক সমাজ-চেতনাকে এ যুগের সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ রূপে নির্দেশ করে থাকেন। কিন্তু এঁদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য, সমাজ চেতন কি নীতিকে বাহ্য দিয়ে, ধর্মবুদ্ধিকে বাহ্য দিয়ে? ব্যক্তিগত জীবনচরণে ফাঁক এবং ফাঁকি বেখে কি সাহিত্যকে কলেশুলে সুশোভিত করে তোলা যায়? জীবনের সাধনায় নানাবিধ বিচ্যুতি দিয়ে গেল সেদিকে দৃকপাতমাত্র করলাম না অথচ সাহিত্যের সাধনায় উত্তম কৃতিত্বের সৌধ গড়ে তোলার আশা করলাম—এ বকম বিপরীত প্রবৃত্তির স'র্ষক সহ-অবস্থান কি সম্ভব? এই যে আজকাল, কথায় কথায় দুর্গত-নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের জন্ম সাহিত্যের পাতায় দরদর আর সমবেদনার স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়, তা কবিগুরু ভাষায় 'সৌখিন মজহুরী'র এক কাঠিও উপরে কেন উঠতে পারছে না তা কি প্রমিত দরদী লেখকগণ কখনও খীরচিন্তে ভেবে দেখেছেন? আত্মগ্লান্নের সাধনা-ব্যতিরিক্ত যে সমষ্টি-কল্যাণের সাধনা তার মূলেই গলল। ব্যক্তি-জীবনের চিন্তায় কর্মে ও আচরণে পরিশুদ্ধ হবার চেষ্টা না করে যাঁরা সমষ্টির কল্যাণ-বিধানের চেষ্টা করেন, তাঁরা সমাজ-হিতব্রতের গোড়ায় কোপ মারেন। ইংরেজী বাক্যরীতি অনুসরণ করে তাঁদের এ চেষ্টাকে খোড়ার আগে গাড়ীজোতা-রূপ বিচ্যুতির দোষে ছুট বলা যেতে পারে। এ যুগের সাহিত্যের প্রবহমান সমাজ-চেতনার অঙ্গদর্শের একটা মস্ত ভ্রান্তি এই যে, তা সমষ্টিকে একটা আকারহীন যৌগপত্তা বলে মনে করে, রাষ্ট্রের (state) হেগেলীয় ধারণার মতই তা এক বিমূর্ত (abstract) কল্পনা বই আর কিছু নয়। কিন্তু সমষ্টি কি ব্যক্তিকে বাহ্য দিয়ে কল্পনীয়? বহু বহু ব্যক্তির সমবায়েই তা সমষ্টির কলেবর গঠিত। আর এ কথা যদি আমরা একবার স্বীকার করে নিই তা হলেই দেখা যাবে, সমষ্টি-কল্যাণেরও আগে আমাদের ব্যক্তিক উন্নয়নের কথা ভাবা দরকার। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, আত্মিক, নৈতিক দ্বতাবের শোধন না হলে আমরা সমষ্টির কল্যাণবিধান করব কোন্ হাতিয়ারের সাহায্যে?

এ সব কথা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আপাত-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ সম্পর্কবিহীন জল্পনা মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। আমরা সাহিত্যের পটভূমিকা সচেতন ভাবে মনে রেখেই এই ব্যক্তি-সমষ্টির প্রশ্নের অবতারণা করেছি। আমরা সাম্প্রতিককালে জীবন আর সাহিত্যের বিরোধের কথা বলছিলাম। জীবন হ'ল ব্যক্তির প্রতীক, আর সাহিত্য হ'ল সহিত্ত্বের অর্বাণ সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক। একে আত্মোন্নয়ন চেষ্টা; অপরে আত্মোন্নয়নের পরিশুদ্ধ কল

বহু মানুষের মধ্যে বিতরণের প্রয়াস। নিজে শুদ্ধ হলে তবে ত অল্প অনেক মানুষকে উচ্চ ভাবনায় দীক্ষিত, মহৎ কল্পনায় অনুপ্রাণিত করে তোলা সম্ভব। আমরা জীবন-সাধনায় জয়যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনের কথা বলি না, এদিকে সাহিত্য-সাধনায় বৃন্দ হয়ে যেতে চাই। সাহিত্য কি জীবন-পরিকল্পনার বাইরে? সে কি নিছকই লীলাবাধ? মহৎ মূল্য-বোধ আর আদর্শবাধ ধ্যান-ধারণা বিরহিত যে সাহিত্য, সে সাহিত্য দৌন্দ্ব্যস্থিতির নামে আমাদের প্রাণ-মন কতটুকু ভরাতে পারে?

এই প্রশ্নেই যত গেরো। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে অগুনতি গল্প-উপন্যাস-আধুনিক কবিতা ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে জীবন-সাধনার কতটুকু যোগ আছে, সে জিজ্ঞাস্য কি সংশ্লিষ্ট লেখকদের মনে কখনও কোন উপলক্ষে উঁকি দিয়েছে? তাঁরা কি কখনও আত্মানুসন্ধান করে দেখেছেন তাঁদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে মহৎ ও উচ্চ জীবনধারণের কতদূর প্রণোদনা রয়েছে? নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল পথদেক্ষণ-নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টি করলেই তা হ'ল না; তার পিছনে জীবনানুভূতি থাকা চাই, নয় তা সে সাহিত্যের প্রকৃত মর্যাদা লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। উপন্যাসে যাঁরা শুধু কাহিনী-পরিবেশনে তাঁদের সকল মনোযোগ ও উত্তম ব্যয় করেন, তাঁরা উপন্যাস সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত নন বলেই মনে হয়। কাব্যকে যেমন জীবনের সমালোচনা (criticism of life) বলা হয়, তেমনি উপন্যাসও হ'ল জীবনের একপ্রকার গঠনাত্মক সমালোচনা। জীবনচর্চার সশ্রদ্ধ অন্তর্দীপন ব্যতিরেকে এ সমালোচনার বোণ লেখকের মনে উদ্ভিক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এবিষয়ে পাশ্চাত্য একজন সমালোচকের অভিমত বাস্তবিকই প্রবিধানযোগ্য—

"The money rewards of the successful novelist allure to the profession not a few men destitute of any sense of responsibility for the use of their gifts; and the fact that these rewards are often to be won by pandering to the unrefined or actually base tastes of the multitude throws a temptation in their way which some otherwise well-endowed writers have not been able to resist. But in the right hands the novel, by the very fact of its being so closely in touch with actual life, has a magnificent opportunity to take a large share in moulding the thought of the new age. It will do well if it listens to the suggestion of Matthew Arnold's often-quoted definition of poetry, and takes as



its mission: the offering of a constructive criticism of life."

(A. I. Du Pont Coleman of Fiction, Encyclopedia of Religion and Ethics, Second Impression, 1930)

এর অর্থ, সকল উপন্যাসিকের আর্থিক প্রতিষ্ঠা এমন অনেককে লেখক-বৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করে, যাঁদের মধ্যে তাঁদের ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। জনতার অমার্জিত কিংবা স্থূল রুচির চাহিদা মেটাতে পারলে প্রায়ই বেশ ছ'পয়সা গুছিয়ে নেওয়া চলে, এই দৃষ্টিতে তাঁরা প্রলুব্ধ হন। কেউ কেউ সুলেখক হয়েও এই প্রলোভন দমন করতে পারেন না। কিন্তু যোগ্য লেখকের হাতে পড়লে এই উপন্যাসই বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাক্ষ্য হেতু নূতন যুগের ভাবনা কল্পনার নিঃস্বপ্নে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণের চমৎকার সুযোগ লাভ করতে পারে। ম্যাথু-আর্নল্ড বর্ণিত কাব্যের সংজ্ঞা থেকে সংকেত গ্রহণ করে উপন্যাস যদি জীবনের রচনাত্মক সমালোচনা প্রচারকে তার ব্রত হিসাবে নেয় তবে কাজ হয়।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের এই রচনাত্মক সমালোচনার সঙ্গে জীবনচর্যার যোগ অতি নিগূঢ়। ব্যক্তিগত জীবনে অসু-ক্ষণ ভাবনা, চিন্তা, মনন, বিশ্লেষণ, আত্ম-সমালোচনা, আত্ম-তত্ত্বের চেষ্টা—এসব থেকেই ক্রমে জীবনের সামগ্রিক ধারণার

নাগাল পাওয়া যায়, আর সেই সামগ্রিক ধারণা সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই সাহিত্য বার্থ্য সার্থকতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্বে নয়। আমাদের সর্বদা স্বরণ রাখা দরকার, জীবন সাহিত্যের চেয়ে অনেক বড়। সাহিত্য জীবনের একটা দিক মাত্র; পরন্তু সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-সাধনা, ধর্ম, সমাজসেবা, রাজনীতি, কর্ম, জীবিকা ইত্যাদি বিচিত্র অভিব্যক্তি মিলিয়ে জীবনের বৃত্ত পূর্ণ। শিল্পের দাবির চেয়ে জীবনের দাবি বহু বহু গুণে ব্যাপক ও গভীর। সুতরাং স্বভাবতঃই শিল্প-সাহিত্য জীবন-পরিকল্পনার অংশ ও অধীন একটি খণ্ডিত সাধনার এলাকা মাত্র, শিল্প সাহিত্যের আওতার বাইরে জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।

সাহিত্য-সাধনাকে বার্থ্য ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে জীবনের এই সামগ্রিক পরিবর্তনের বোধ লেখক-মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। নয় ত সাহিত্যের এলাকা শুধু অসার বস্তুতেই ভরে ওঠা সার হবে। পরিতোপ এই যে, বর্তমান যুগটাই এমন যে, এ যুগে জীবনবান না হয়েও লেখক হওয়া যায়, সংস্কৃতিকে জীবন থেকে সর্বদেহ ছাঁটাই করেও সংস্কৃতিবান বলে নিজের পরিচয় দেওয়া যায়। জীবনানু-শীলন ব্যতিরেকে সংস্কৃতি অর্থহীন। বহু বিষয়ে মন সুকমিত, সুমার্জিত না হলে সংস্কৃতিবস্তুর গৌরব করা চলে না। জীবনের সাধনা আর সংস্কৃতির সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান শিল্প সাহিত্যের এলাকায় এই একান্ত আবশ্যক-বোধটির অভ্যুত্থানই অভাব দেখা দিয়েছে।-

## দীপশিখা

শ্রীকালিদাস রায়

বিজলীর বাতি জলে বড় বড় শহরে  
ছোট ছোট শহরেতে কেরোসিন।  
হীনের কুটীরে গ্রামে, বসুতির ভিতরে  
দীপশিখা জলিতেছে চিরদিন।

তিন শ' বছর আগে যতগুলি জলিতে,  
তারো বেশী জলে আজ, কমে নাই।  
কুটার বেড়েছে ঢের তাই চাই বলিতে,  
তোমার প্রতাপ আজো দমে নাই।

'বিজলীর যুগ এটা'—বিলাসীরা বলিছে  
সারা দেশে নজর যে পড়ে না।  
দেখে না যে লাখ লাখ দীপ আজো জলিছে  
কাঙালে মানুষ বলি' ধরে না।

বিজলীতে শহরের রাতগুলি হোক দিন,  
দীপশিখা তুমি অমরতা পাও।  
কুটারের চক্ষুমা রঙ তুমি অমলিন,  
নয়ন না বালসিয়া আলো দাও।

প্রাঙ্গণে তুলসীর ডালে ডালে বাঁধি তার,  
বিজলীর বাতি গাঁজে জলিবে ?  
মন্দিরে পূজারীর বালু হাতে প্রতিমার  
নিত্য আরতি কি গো চলিবে ?

দীপশিখা তব আলো পোড়া আঁধি জুড়াবে  
সুখাল তোমার দিন কে বলে ?  
আকাশে তারার দিন কখনো কি ফুরাবে  
বিজলী জলিছে বলি ভূতলে ?

## ফাংশন

### শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নটবর বোষ লেনের তিরিশ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল জনচাংক ডেলে !

বাড়ীটা প্রকাণ্ড নয়, ছয়োরে শাল্লা-পাহারাও নাট, তবু ছেলেগুলির মধ্যে উদ্বেগ-উৎকর্ষের ঈশ্বর ভ্রমণ। ছয়োরের কড়া নাড়তে সাহস হচ্ছে না কারও।

বাড়ীটা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রমণীমোহন রিত্রের। সাহিত্যের নানা বিভাগে নয়—একটি মাত্র বিভাগে আর সেইটাই আধুনিক পাঠকগোষ্ঠীর সবচেয়ে প্রিয় বিভাগ—অর্থক্য কথা-সাহিত্যে রমণীমোহনের খ্যাতি বাংলাজোড়া—(বিজ্ঞাপনের ভাষায় পৃথিবীজোড়া, যদিও এযাবৎ তাঁর কোন বই পৃথিবীর অপর কোন ভাষায় অনূদিত হয় নি!) তা খ্যাতি শুঁকে যত উজ্জ্বল তুলুক সাহিত্য-অনুষ্ঠানগী ছেলেদের সঙ্কোচ হবে কেন শুঁকে সাহিত্য-অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ জানাতে এসে? অবশ্য বিনা উপলক্ষে আলাপ-আলোচনা করতে এসে সঙ্কোচ হয়। তখন জ্ঞান বা বিজ্ঞাবস্তার কথা ভবে কিংবা ক্ষুরগার আলোচনার আনন্দে পড়বার ভয়ে অথবা অসামান্য ব্যক্তিত্বের ভাবে বক্তব্যকে ঠিকমত শুদ্ধিয়ে উপস্থাপিত করতে পারবে কি না এই সন্দেহ দ্বিধায় বিচলিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। ছেলেদের সঙ্কোচের মূলে ছিল অস্ত্র কারণ,—একটি বহুশ্রুত কাহিনী। ওরা শুনেছে রমণীমোহন অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কোন সভা-সমিতিতে, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা পছন্দ করেন না। চিরকালই যে উনি সভা-বিষেয়ী ছিলেন—তা নয়। অল্প কিছুদিন থেকে—প্রায় মাসতিনেক হবে উনি সর্বপ্রকার সভা-সমিতি উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন করেই চলেছেন। ইদানীং বহু সভা-আহ্বায়ক, বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শুঁকে সভাপতিত্বে বরণ করতে এসে বিফলমনোরথ হয়েছেন। শুধু বিফলমনোরথ নয় রীতিমত কড়া কড়া কথাও শুনেছেন। পারতপক্ষে আজকাল তাঁর কাছে কেউ আসছেন না।

তবে উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি যে একেবারে পরিহার করেছেন তাও নয়। এই কিছুদিন আগে কোন বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠান বন্ধ করেছেন—আবার একজন অপরিচিতকেও আশ্বাস দিয়ে দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। মোটের উপর মানুষটি খাম-খেরালিতে ভরা।

ওরা কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে করে হোক তাঁর সম্মতি আদায় করবেই। ওরা চায় না এমন কোন যশস্বী সাহিত্যিককে যাঁরা যে কোন অনুষ্ঠানের পক্ষে সুলভ। তাঁরা ত হামেশাই সভাস্থ হচ্ছেন—একটু দিনে তিন-চারটি সভা ছুঁয়ে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধস্তাধরছেন। আর সেই সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলের কৌতূহলকে বেশ খানিকটা স্তিমিত করে দিচ্ছেন। ওরা চায় সভাস্থক্ষেত্রে দুর্লভ-দর্শন পুরুষ—যাঁকে সভাপতি বা প্রধান-অতিথি করে নিয়ে যাওয়া মানোই সভার গৌরব বর্ধন আর সমিতির পরমায়ু অজ্ঞন। এ ছাড়া নতুন কিছু করার সোহও ত রয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতিকালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা নাকি লোকের মুখে মুখে ফিরছে এবং এরও তা শুনেছে। শুনে যদিও ওদের মনে হয়েছে এটা ঐশ্বর্যসিক প্রচেষ্টা, তবু হতোধ্যম হয় নি ওরা। সব রকম কঠিন কথা শোনবার এবং নির্দিষ্ট ব্যবহার পাবার আশা করেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে ওরা।

ওরা বাজী ফেলে এসেছে! জাঁক করে বলেছে, এমন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিককে এ্যার আনব যাঁকে সাধারণ সভা-সমিতিতে বড় একটা দেখা যায় না। যিনি যে কোন ধরনের সভার নাম শুনেলেই উজ্জল হয়ে ওঠেন না, অমুনয়-বিনয়, স্তুতি-তোষামোদে যিনি অবিচলিত চিত্ত, যিনি ঈশ্বরের চেয়েও খেরাল আর লোঁহের মত অনমনীয় তাঁকেই আনব আমরা।

প্রতিজ্ঞার বোরে, উত্তেজনার আবেগে এতটা পথ ছুটে এসে তিরিশ নম্বর নটবর বোষ লেনের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে কেমন করে খবরটা পৌঁছে দেবে ভিতরে? নাম ধরে সন্ধান করবে, না ছয়োরের কড়া নাড়বে? কোন্টা অধিকতর শোভন বা যুক্তিযুক্ত?

তার আগে মাসতিনেক পূর্বে যে ঘটনাটি ঘটেছে—যা ওরা শুনেছে, বাংলা দেশের অনেকেই বিশেষ করে যাঁরা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে উঁকি মারেন কিংবা যাঁরা দৈনিক সংবাদপত্র ও সিনেমা পত্রিকা পড়ে সাহিত্য-চর্চা করছি ভেবে আশ্চর্যপ্রাপ্ত লাভ করেন, এঁরা সকলেই জানেন ঘটনাটা। এখানে আসবার আগে ওদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছিল সেই ঘটনা নিয়ে। অবশ্য তার খুঁটিনাটি তথ্য ওরা

জানত না, কেউই তা জানেন না। আমরাই কি জানতাম? ভাগ্যিস ট্রেনের সেই পরোপকারী ব্যক্তিটি এবং বিখ্যাত সমালোচক অবনী সমাদ্রারের যুগে সবটা শুনেছিলাম। তার সঙ্গে নিজেকে উর্বর কল্পনাশক্তিকে মিশিয়ে নিয়েছি অবশ্য। তর্ক উঠবে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কল্পনার ভেজাল দেবার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এই কারণে—খাঁটি সোনার যেমন নয়নলোভন অলঙ্কার হয় না, তেমনি নিছক বাস্তব বর্ণনার দ্বারা মনোবোচক কাহিনী তৈরি করা যায় না। অতএব ছেলেবা ছরোরের কড়া নাড়বার আগে মাসতিনেক আগেকার সেই ঘটনাটা তুলে দিচ্ছি :

মাসতিনেক আগে চৈত্রেব প্রথমে সাহিত্য-সমালোচক অবনী বলল, দাড়া, কলকাতার বাইরে এক জায়গায় যাবেন? বেশী কাছেও নয়, আবার খুব দূরেও নয়। চলুন দু'জনে মিলে ঘুরে আসি।

রমণীমোহন বললেন, শহরের বাইরে যেতে ত খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না।

কেন দাড়া, নিজেকে ত কোন ব'জাট পোয়াতে হবে না, ওরা নিয়ে যাবে গাড়ী করে—রাখবে রাজসমাহরে। এতে ভাবনার কি আছে?

একটু ধেমে বলল অবনী, কালও ওরা এসেছিল আমার কাছে। ফাংশনটা শুনলাম অঁকিয়েই হবে। গাড়ীভাড়া বলে কিছু আগাম টাক দিতে এসেছিল, নিইনি। আপনার সম্মতি না পেলে—

রমণীমোহন বললেন, না এতে আর অসম্মতির কি আছে? তবে সবটা না জেনে—

অবনী বলল, আমি কি না জেনেন্তেনে একটা বাজেমার্ক জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব? যাবেন মফঃস্বলের চমৎকার একটি গ্রামে, থাকবেন ওখানকার এক জমিদার বাড়ীতে রাজার হালে। যাওয়া-আসায় বাস্পযান, পেট্রলযান, জল-যান চাই কি গোয়ান পর্যন্ত চড়ার সব মিটেবে। যে খোলা-মেলা মাঠ আর নীল আকাশ আর সবুজ শস্তক্ষেত নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন—তা দেখবেন দু'চোখ ভরে। হয় ত এমন রিয়ালিস্টিক ঘটনাও চোখে পড়বে যার ছবি পাকাপাকি ভাবে তুলে দিতে পারবেন সাহিত্যে।

তবু বললে না আসল ব্যাপারটা কি? খালি থাক-বাওয়া-বেড়ানোর কথাই বলছ ফলাও করে।

অবনী হেসে বলল, দাড়া, থাক-বাওয়া-বেড়ানটাই ত আসল—সাহিত্য সভা হ'ল কাউ। তা হলে শুনুন আসল বৃত্তান্ত। নরসিংপুরে একটা মেলা বলে তিন দিন ধরে—ওখানকার বিখ্যাত কবি ত্রিলোচন রক্ষিতের নামে। বিশ বছর আগেকার কয়েকটি পত্রপত্রিকা খুললে কবি ত্রিলোচন

রক্ষিতের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হবে। যদিও বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, ওখানকার লোকেরা ওকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ওর নামে সভা হয়, একটি মেলাও বসে। একজন রাজপুত্রের মেলায় উদ্বোধন করেন। একজন সাহিত্যিক থাকেন সভাপতি আর একজন সাহিত্যিক প্রধান অতিথি। আপনাকে ওঁরা সভাপতি করতে চান, আমাকে প্রধান অতিথি। কি দাদা রাজী ত?

তা তুমি খখন যাচ্ছ, না বলি কি করে।

তবে একটা কথা বলে রাখি—আমাদের হয় ত দু'দিন আটকাবে ওরা।

দু'দিন কেন?

একদিন স্থাপত্যসভা আর একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অর্থাৎ—

থাক আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি কিন্তু দু'দিন থাকতে পারব না—আমরা অসংস্কৃতের দল—

অবনী হাসল, দাড়া মিছেই রাগ করছেন। কালের হাওয়া কি হাত দিয়ে ফেরাতে পারেন। দেশেবিদেশে পৃথিবীর সব জায়গাতেই সংস্কৃতির মনোলোভা চেহারাটার জয়জয়কার। ও না থাকলে আমরাও শূন্য। থাক—তা হলে আজই জানিয়ে দিই ওদের।

কল্পনায় বড়ো চিত্র আঁকতে আঁকতে অবনী আর রমণীমোহন ট্রেণে এসে বসলেন। ওঁদের নিয়ে যাবার জন্তু যারা এসেছিল তারা উঠল অস্ত্র কামরাগ।

ট্রেণ ছাড়বার আগে ওদেরই একজন বলল, এই পাশের থার্ড ক্লাসেই বইলাম স্তার। মাইক, ফুল, ফাগুবিলা, প্রোগ্রাম আরও নানান জিনিস ম্যানেক করে নিয়ে যেতে হচ্ছে স্তার—আমরা মাত্র তিনজন—বুঝতেই ত পারছেন। কিছু মনে করবেন না—

অবনী বলল, না না, এতে আর মনে করা-কবির কি আছে—তা আপনার নামটি কি ভায়া?

আমার নাম মধন। আমাকে আর আপনি কেন স্তার—আমি আপনাদের ছোট ভায়ের মত। বিনয়ে অবনত হয়ে ছেলেটি দু'জনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

একজন সবে ইঙ্কল-ভাড়া কিংবা নতুন চাকরি-পাওয়া তরুণ ওপাশের বেঞ্চিতে বসে ফুটবল খেলার আলোচনা করতে করতে প্রায় হাতাহাতির প্রাক্ মুহুর্তে পৌঁচেছিল। মধনের যুগে মাইক, ফুলের মালা প্রভৃতি শব্দগুলি শুনে ওরা উৎকর্ষ হয়ে উঠল। মধন প্রণাম সেয়ে গাড়ী থেকে নামবার উপক্রম করতেই ওদের মধ্যে জনদুই একসঙ্গে বলে উঠল, বড়দা, শুনুন, আপনারা ফাংশনটা কোথায় হচ্ছে?

মধন মুখ কিরিয়ে জবাব দিল, নরসিংপুরে।

ওহো—ওই যে কি একটা মেলা বলে ওইখানে।

হাঁ, কবি ত্রিলোচন রক্ষিতের স্মৃতিমেলা।

মস্তবড় নাম বড়দা—মনে থাকবে না। তা আপনাদের প্রোগ্রাম কি? ভাল ভাল আর্টিস্ট আনাচ্ছেন ত কলকাতা থেকে? ওই যে প্লে-ব্যাকে যঁার গান শুনি সব ছবিতেই—রাত্রি দে—তাকে আনাচ্ছেন ত?

সবাই আসবেন। এ ছাড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আসছেন। আরও ছ'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক আপনাদের সামনেই রয়েছেন—এঁরাও যাচ্ছেন অমুঠানে।

ছোকরার দল একবার অপাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল রমণী-মোহন ও অবনীর দিকে। ওদের চোখেযুখে একটুও আগ্রহের চিহ্ন কুটে উঠল না।

মদন তখন প্ল্যাটফরমে নেমেছে—ওরা তিন-চার জন একসঙ্গে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল, কাশ্মলটা কবে হচ্ছে বড়দা? মানে আর্টিস্টরা কবে আসছেন?

দূর থেকে কি যেন বলল মদন। তিন-চার জন একসঙ্গে বেশি চাপড়ে কলরব করে উঠল, তবে মাইরি যেতেই হবে।

অতঃপর সিনেমা-প্রদর্শন নিয়ে তুলল তর্ক সূত্র হ'ল।

রমণীমোহন গলা নামিয়ে বললেন, ভালা এক সেকেন্ড ক্লাসে তুলে দিয়ে গেল! ছোঁড়াগুলো সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটেছে ত?

অবনী কিস্কিন্দ করে বলল, ক্ষেপেছেন দাদা! ওরা অল ক্লাসের পুষ্টিপুস্তক।

ওদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। এই সময়ে প্ল্যাটফরমের দূর প্রান্তে কালো আলপাকার কোট গায়ে চেকারের আবির্ভাব। জানালায় গলা বাড়ানো একটি ছেলে বলে উঠল, ওরে মামা আসছে রে।

যেমন বলা দলটি চটপট উঠে পড়ল—আর চকুর পলক পড়তে না-পড়তে কামরাটা খালি হয়ে গেল।

অবনী বলল, যাক—বাঁচা গেল।

রমণীমোহন বললেন, ওদের একজন কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হ'ত। ধর, চা-টা খেতে হবে ত।

অবনীমোহন বলল, বাবড়াবেন না দাদা—সঙ্গে যখন যাচ্ছে—ঠিক সময়ে এসে ব্যবস্থা করবেই। আপনি বসুন ত স্থির হয়ে।

স্থির হয়ে বসবার উপায় কি। ছ'একটা স্টেশন পাব হতে না হতে রমণীমোহনের চায়ের পিপাসা প্রবল হয়ে উঠল। গাড়ীতে চাপলেই অধিকাংশ চা-খোর যাত্রীর এটা হয়ই। বড় জংশন স্টেশন এলে চাওয়ালারা যখন কাঁকে কাঁকে গাড়ীর কামরাগুলি আক্রমণ করে তখন কে এমন চা-লোভী হিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আছেন—

আধঘণ্টা পরে মাঝারি মত একটা জংশন স্টেশনে গাড়ী থামতেই রমণীমোহন আকুল হয়ে উঠলেন।

অবনীভায়া, এইবার চা আর কিছু নোনতা খাবার পেলে ভাল হ'ত। ট্রেন জানিতে খিঁচুনি বেশ বাড়ি দেখছি।

হা বলেছেন। তা ওদেরও কোন ছাঁস নেই দেখছি। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অবনী।

নামব কি নামব না করতেই পাঁচ মিনিট কেটে গেল—গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। তখন ভেগাবরা একজোটে কামরার সামনে এসে একতানে গলা সাধে।

রমণীমোহন অধৈর্য্য কণ্ঠে বললেন, গাড়ী ছেড়ে দিল যে, ছোঁড়াটা গেল কোথায়? ছ'খানা টিকিট কেটে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে কৃতার্থ করে দিয়েছে দেখি!

অবনীর মেজাজও ভাল ছিল না; কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করবে কার উপর? অনেক কষ্টে মনোভাব সংযত করে বলল, যা বলেছেন দাদা—আজকালকার ছেলেরা ভারি ইয়েস্পনসিবল। সুস্বাদু মাইক নিয়েই মেতে রইল। যাদের বাণী ছড়িয়ে মাইক জাঁকিয়ে তুলবি—তাদের কথাই একদম ভুলে গেলি। নামবার সময় দেখে নেব—

তা ত নেবে, এখন চায়ের তৃষ্ণা মেটে কিসে? তুমি ত বাড়ী থেকে দিবা সন্টে এগেছ—

আপনি ক্ষেপেছেন—আপনার বোমাটি সেই পাত্রীই বটে। ভারি হিশাবী। চায়ের কথা ভুলতেই জবাব দিলেন, এখন সাত-তাড়াতাড়ি চায়ের হালান্না করে কে? যাচ্ছ ত রাজবাড়ীতে—থাকবে রাজার হালে, তাঁরা কি এক কাপ চা আর এক প্লেট নোনতা মিষ্টি খাওয়াবেন না! যেন এক লাফে রাজবাড়ীতেই পৌঁছব আমরা—পথটা ফাট।

রমণীমোহন হেসে ফেললেন। বললেন, ভায়া কি জাতিস্থর হলে? ত্রেতার স্মৃতিটা উপমার ক্ষেত্রে টেনে আনা ঠিক হচ্ছে না।

অবনী লজ্জিত হাশ্মে বলল, দেখুন ত ওদের আক্কেল! পরের স্টপেজে নেমে ওই ছোকরার কান ধরে যদি না নিয়ে আসি—

নামতে হ'ল না—পরের স্টপেজে মদনই গাড়ীর দরজায় এসে বলল, নাগুন স্ত্রাব, আমরা পৌঁছে গেছি।

এখনও তিনটে স্টেশন আছে না?

আজ্ঞে, আমরা এইখানে নেমে সটকাট করব।

তা বাপু সটকাট কি সব দিক থেকেই করতে চাও? রমণীমোহন উচ্চকণ্ঠে বললেন।

সে কি স্ত্রাব—

বলি অভিধিহের ত ট্রেণে তুলে দিয়ে খালাস—তার পর তারা রইল কি গেল...চাটা—

ইসু—ভাবি অস্তায় হয়ে গেছে স্থাব। মদন ব্যস্ত হয়ে উঠল। রঞ্জিৎ—রঞ্জিৎ—

ওর ডাকে বাড়িটা লম্বা চুল—সম্মা গল! একটি ছেলে অদূর থেকে জবাব দিল, ইয়েশ মদনদা—

মদন চৈচিয়ে বলল, বলি তোদের আঙ্কেলটা কি? আমি মাইক টাইক সামলাচ্ছিলাম—তুই কোথায় এদিক সামলাবি, তা না—

রঞ্জিৎ কাছে এসে বলল, আমার কি দোষ মদনদা, ট্রেণে উঠবার আগে এঁদের চিনিয়ে দিতে যদি—

মদন সকাতেবে এঁদের পানে চেয়ে দ্রিত কাটল, এ-হে হে—সত্যি আমাবই অস্তায়। মাপ করবেন স্থাব, আসুন স্টেশনের স্টেলে বস চাটা...ইংরেজ রঞ্জিৎ, শুধিয়ে আর ত মালবাবুকে—এদিকে অসুখ-টসুখগুলো একটু কমেছে কি?

কোথায় কমেছে? রঞ্জিৎ মাথা কাঁকিয়ে লম্বা চুলগুলিকে পিছনে ঠেলে দিতে দিতে জবাব দিল, এই ত আসবার সময় দেখলাম—চারটে ট্রেনের রয়েছে প্র্যাট-করমে।

রমণীমোহন উৎসুক হয়ে বললেন, কি অসুখ?

আজ্ঞে সে আর শুনে কাজ নেই। চায়ের জল ত গরমই খাবারগুলো না হয় জিজ্ঞেস করে—

না না, আর চা-টা দরকার নেই। সস্ত্রাসে বলে উঠলেন রমণীমোহন।

ওর কথাটা লুকে নিয়ে মদন বলল, সেই ভাল, মনের ধুকপুকুনি বেখে না খাওয়াই ভাল। আর বণ্টাহুয়েকের জানি বইত না—একেবারে সেখানে গিয়েই—

রঞ্জিৎ মাথা কাঁকিয়ে চুলগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে হাত জোড় করল, অপরাধ নেবেন না স্থাব—দেখতেই ত পাচ্ছেন—আমরা মাত্র তিনজন—এনি হাউ ম্যানেজ করে নিয়ে যেতে হচ্ছে—

টিকানায় পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। একে চৈত্রেয় গুমোট গম—তার উপর চায়ের মোতাত মেটে নি, এদিকে অসমতল পথে বাসের কাঁকুনিটাও প্রাণান্তকর। কয়লার গুঁড়ো—ধুলো আর ধামে শরীরটার গানি জমেছে প্রচুর। তবু যা হোক কালিমত একটি নদী পার হবার সময় নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে কিছুটা স্নেহবোধ করছিলেন, কিন্তু গো-বানে চেপে উঁচুচু পথে যে ধাক্কাটা সর্ব্ব অজ্ঞের উপর দিয়ে গেল—তাতে মনে পুলক সঞ্চার হবার কথা নয়।

অবনী বলল, দাদা হেঁথেকেছেন—কি চমৎকার দিনারি?

মনে মনে জলছিলেন রমণীমোহন—খিঁচিয়ে উঠলেন, তুমি দেখ হুঁচোখ ভরে! আদেখলা কোথাকার! এই তোমার সোজা পথ—আরামের যাত্রা? এখন বাপমার পুণ্যে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।

ঘরে ফিরবেনই দাদা—খাবড়াবেন না। অবনী কানের কাছে মুখ এনে ফিগফিগ করে বলল, ছোটো চ্যাংরা ছোড়াকে পাঠিয়েছে—ওদের ঘটে আর কত বুদ্ধি। একটু খৈর্য ধরুন দাদা—এই গরুর গাড়ীর ক্ষেপটা শেষ হলেই ডারায় পৌঁছব—তখন চব্বাচে-ব্য—

রমণীমোহন গুম হয়ে রইলেন।

ধুম দেখে যারা বহ্নিকে অনুমান করেন—তারা সব সময়ে অভ্রান্ত নন। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে সেট প্রমাণিত হ'ল। জমিদারবাড়ীতে খাতিরযত্নের বাছল্য দেখে নতুন করে অবস্থিবোধ করলেন রমণীমোহন। অতিথি হলে মাতৃহ না হয় দেবতাতুল্য হয়, কিন্তু তাকে পুতুল বানাবার বিধিটা কোথা থেকে জন্মাল? আশ্চর্য—গাড়ী থেকে নামতে-নামতে একজন চাকর এসে গাড়ুর জলে পা ধুইয়ে নতুন কেনা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলে, আর একজন প্রকাণ্ড একখানা ভালপাতার পাখ নেড়ে বাতাসের ভঙ্গী করতে লাগল। রমণীমোহনের চোখের সামনে রামরাজার পুরাতন ছবিখানা ফুটে উঠল। রামসীতা বসে আছেন সিংহাসনে, লক্ষ্মণ স্বর্ণছত্র ধরেছেন ওঁদের মাথায়—ভরত আর শত্রুঘ্ন মিলে ব্যজন করছেন—পাত্রেমিত্র—হনুমান-জামুণার দল জোড়হস্ত, মুনিরা উচ্চারণ করছেন স্বস্তিবচন।

এখানেও পাত্রেমিত্র পুরোহিতের অভাব নাই। ওঁরা বাৎসল্যে, বিনয়ে এমনই নরম হয়ে উঠেছেন—যা নাকি যৌন গভীর স্তুতিরই নামান্তর।

প্রথমে চা—তারপরে ডাব—সর্ব্বশেষে জলখাবার। সে কি প্রচুর উপকরণ! রহৎ খালাতের যেন ঠাকুরের বৈশাখী শীতল নিবেদন। ঢালা ফরাসের উপর ধপধপে চাকর পাতা আর তার সঙ্গে সজতি রেখে পাশ বালিশ, তোয়ালে প্রভৃতি। জলযোগান্তে তাকিয়ান আড় হয়ে পড়বামাত্র স্নুহৎ বেকাবীতে এল পান ও মশলা, হুঁপ্যাকেট সিগারেট—একটা কুখ্যাকৃতি ছাইদান। সিগারেট ধরতে-না ধরতে পায়ে চাপ পড়ল। চমকে উঠলেন রমণীমোহন, কে—কে?

এজ্ঞে, বাবু আমি নিতাই। একটু পরসেবা—। রোগা কালোমত একটি প্রোট অপরাধ কালনের ভঙ্গীতে হুঁহাত জুড়ে বকের উপর রাখল।

রমণীমোহন সোজা হয়ে বসে বললেন, আরে বাপরে—  
পড়সেবা! না না, যাও তুমি।

লোকটি কাঁধ কাঁধ মুখে বলল, এজ্ঞে, হাক্সান্ত হয়ে  
এয়েছেন—শরীলটা বেজুত হয়ে আছেন—

না বাপু, বেশ আছি, তুমি যাও।

অবনী বলল, দাদা, টিপুক না একটু। ও বেচায়ী ত  
চাকরি—উপরওয়ালা নারাজ হতে পারেন।

আরে বাধ ভোমার উপরওয়ালা! গলা নামিয়ে বললেন,  
যাই বল ভাই—এদের ধরনধারণ ভাল ঠেকছে না। হয় স্বর্গ  
নয় পাতাল—মাক্‌খানে যে পৃথিবীটা রয়েছে সে ভোলে কি  
করে, আশ্চর্য্য!

লোকটি ততক্ষণে একপাশে সরে গেছে। জোড়হাত—  
বিবর্ণ মুখ।

রমণীমোহন ওর পানে চেয়ে বললেন, তুমি আবার গরুড়  
মূর্ত্তি হলে কেন? যাও না।

এজ্ঞে, আপনাদের সেবার জন্তেই ত বাবুয়া রেখেছেন—

অবনী বলল, শুনলেন দাদা, সেবার অধিকার না পেলে  
আহারের অধিকারও থাকবে না। অতএব—। শঠান শুয়ে  
পড়ল অবনী। বলল, এস হে—এদিকে এস। বেশ ভাল  
করে সারা অঙ্গ মর্দন করে দাও—যাতে গোধানের  
গোবেড়েন থেকে দেহটা সুস্থ হয়ে ওঠে।

অপরাত্ন বসবে সভা।

গ্রাম দেষে রমণীমোহনের মনটা মুখড়ে পড়েছিল। এই  
অজ পল্লীর সভায় বিশেষ করে বলবার কিই-বা আছে।  
তেমন গুণীজনের সমাগম হবে কি সভায়? কলকাতার  
বাবুয়া আসছেন—রং-তামাসার ব্যবস্থা রয়েছে—এসব দেখতে  
লোকসমাগম যথেষ্ট হবে, কিন্তু সে সভায় বিদ্যাবত্তা জাহির  
করার অবকাশ কোথায়? সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে  
আলোচনাও নিরর্থক।

মধ্যাহ্নে গুরুভোজনের পর দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ল।  
শয্যায়ে বহু চলে দিয়ে ভাবলেন—অতিথিসেবার জন্ত যাঁরা  
চাকরি পেয়েছে—তাঁদের চাকরি বজায় থাক, তার সঙ্গে  
যদি নিজ্ঞা আসে ত মন্দ কি! আলস্যভাবে দিন যদি সন্ধ্যায়  
মিলিয়ে যায় থাক না, সভা না বললে খুসিই হবেন রমণী-  
মোহন।

ভাবতে ভাবতে পায়ের উপর হাতের চাপ—মাথার চুলে  
কুঁকুরে বাতাস—হুঁচোখে তল্লার শিখিল স্পর্শ—তার পর  
কোথায় যেন তলিয়ে গেলেন।

অতল থেকে একসময়ে ভেসে উঠলেন। মনে হচ্ছে  
যন্ত্রের জগৎ। এক বর লোক, ফিসফিস শুজন, শিরবে

ফাহুদের আলো, ধূপচন্দনের সঙ্গে টাটকা বেগুনের সুবাস,  
তার সঙ্গে চায়ের মোতাত্তীধবানো মিষ্টি গন্ধ—

অবনী বলল, কি দাদা, শরীর ভাল ত?

অঙ্গস্পর্শ করে দেখলেন দেহবোধ আছে, স্বপ্ন দেখছেন  
না। গ্রামের গণ্যমান্য মানুষগুলি এসেছেন পরিচয় কর্তে  
—পাছে ওঁদের বিশ্রামের ব্যাবাত ঘটে তাই সতর্কিত চলা-  
কোরা—চুপিসারে আলাপন।

ওঁকে উঠতে দেখে একজন প্রৌঢ় সর্সীকে সতিনয় ভঙ্গী  
মাথিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে আরও কয়েকজন।

এঁরা সমিতির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, ইনি মেম্বারের  
দল। তারও পিছনে গ্রামস্থ সঙ্জনরুদ্ধ। আলাপ করে খুসি  
হলেন রমণীমোহন। সভাটা জমবে ভাল—এমন বিশিষ্ট  
শ্রোতাও যখন রয়েছে!

সত্য—চমৎকার জমল সভা। উপস্থিত স্মারীক জমিয়ে  
তুললেন। শ্রোতা এবং বক্তা দু'পক্ষের সহিষ্ণুতা দেখে  
চমৎকৃত হলেন রমণীমোহন। এবং এঁদের ধৈর্য্য পরীক্ষা  
করার আগ্রহে নিজের বক্তব্যকেও এতখানি টেনে বাড়ালেন  
—যা তাঁর করণার অতীত।

অবনী সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষে বসে পড়েছিল। চুপি  
চুপি সতর্ক করে দিয়েছিল ওঁকে—সংক্ষেপে সারবেন দাদা,  
ফিরতে হবে কাল ভোরবেলায় মনে রাখবেন।

বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বাড়ী ফেরার কথা যে ভাবে সে ত  
পেশাদারী বক্তা। তার উপর শ্রদ্ধা নাই রমণীমোহনের।  
এমন জনসমাবেশ—এমন আগ্রহ ইতিপূর্বে কোন সভাতেই  
লক্ষ্য করেন নি। ওরা বক্তৃতা শুনেছে না, সর্সী দিয়ে পান  
করছে।

অবনীর পানে না চেয়েই নানা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন।  
বেগতিক দেখে অবনী একটা স্লিপে লিখল, সংক্ষেপ  
করুন—কাল ভোরবেলায় ফিরতে হবে।

কাগজখানায় অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করে দল পাঁকিয়ে ফেলে  
দিলেন—দ্বিগুণ উৎসাহে বক্তৃতা দিতে লাগলেন রমণী-  
মোহন।

হঠাৎ উঃ বলে চমকে উঠলেন। বোঝকটাকে অবনীর  
পানে চেয়ে চাপা ধমক দিলেন, কি হচ্ছে ছেলেমানুষি!

ওর জামা ধরে বসাতে গিয়ে অবনী একটি মোক্‌ম চিমটি  
কেটেছে গিঠে।

একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ালেন রমণীমোহন এবং  
বক্তৃতার উৎস উৎসারিত করে দিলেন।

সে স্রোতে অবনী ভাসল—শ্রোতৃবৃন্দ ভাসল।

সভা ভাঙল রাত এগারোটায়।



সভাতল্লের পরমুহূর্তে ওঁরা পড়লেন ঘূর্ণীপাকের মধ্যে।  
ধস্তবাদ দান, হাতছোড়, কুতর্ষ হওয়া, পাছল্লশ, অটো-  
গ্রাফের খাতা নিয়ে কচি ও কাঁচা ছেলেমেয়েদের চৈলাঠেলি।  
অটোগ্রাফ শিকারীরা বিরে ধরল ছুজনকে। বায়না ধরল,  
শুধু সেই দিলে চলবে না, যা হোক কিছু লিখে দিতে হবে।

রমণীমোহন হোমটাক্ষ দেবার মত এক-একখানি খাতা  
তুলে নিচ্ছিলেন। একটুখানি ভেবে নিয়ে বাণী লিখছিলেন  
কখনও ছ'ছত্রে পড়ে, কখনও-বা এক লাইন গড়ে। অবনী  
কলম চালাচ্ছিল ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লেখার মত করে।  
শুধু স্বাক্ষর আর তারিখ।

রমণীমোহনের ধীর গতি দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল  
অবনী। বলল, দাদা, ও বাণী-টানি থাকুক, ঝপাঝপ সেই  
মেয়ে কাজ শাকুন, না হলে কাল ভোরে আর উঠতে হবে  
না।

তবু ভোরবেলাতেই উঠলেন। বাড়ীপুত্র তখন জেগে।  
আবার আদর-আপ্যায়নের বড় বইতে লাগল। চা, জল-  
খাবার প্রভৃতির পালাশেষে মেলানি। প্রণাম, আশীর্বাদ,  
স্নেহ-সম্ভাষণ। একপক্ষের ক্রটি স্বীকার, অস্ত্রপক্ষের আনন্দ-  
লাভের স্বীকৃতি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে পদযান, গোযান,  
জলযান। জলযানের পর পেট্রলযান। সবশেষে বাস্প-যান।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল পেট্রলযান অর্থাৎ বাসে উঠবার  
কালে।

বাসে উঠে রমণীমোহন শুছিয়ে বসলেন। তৃপ্তির একটা  
উদগ'র তুলে বললেন, ভারি আনন্দ পেলাম ভাই, না এলে  
আপসোস হ'ত।

অবনী হেসে বলল, কেমন, আসবার আগে আপনাকে  
বলেছিলাম কিনা।

এই সময়ে অলক্ষ্যে বিধাতা একবার মুখ টিপে হাসলেন।

কণ্ডাক্টর কাছে এসে বলল, বাবু টিকিট ?

টিকিট। রমণীমোহন চাইলেন অবনীর পানে, অবনী  
চাইল রমণীমোহনের দিকে।

পুরো ঙ'মিনিট কাটল পদল্লের দৃষ্টিবিনিময়ে।

অবশেষে অবনী বলল, দাদা—ভাড়াটা কি ওঁরা দেন  
নি ?

সেকি আমার কাছেই দেবার কথা ছিল ? কটমট চক্ষে  
চাইলেন রমণীমোহন।

তুমি চেয়ে নিতে পারনি ?

অবনী বলল, আমার কথা ছেড়ে দিন দাদা, কোনকিছুই  
শৌর্য্যাপলি নিতে পারলাম না। চিরদিনকার ভবঘুরে—  
বাউণ্ডলে। ওসব মনেই ছিল না।

কচি খোকা কিনা। দাঁতে দাঁত বেধে চাপা ধমক দিলেন  
রমণীমোহন। তার পর গন্তীর গলায় বললেন, তা হলে ট্রেন  
ভাড়াটাও আগাম চেয়ে নাও নি ?

অবনী অপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, কি জানেন দাদা, কথা  
ছিল ওঁরাই টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাবেন। তা—তা  
—সভা ভাঙতে বানিকটা রাত হয়েছিল ত। যাঁদের পৌঁছে  
দেবার কথা—তাঁরা—

তা বেশ হয়েছে। এখন পকেটে যদি কিছু থাকে  
বার কর। বাশওয়ালা ত সাহিত্যসভা ডাকেনি, সাহিত্যিকও  
নয় ওরা।

অবনী লজ্জিতহাস্তে বলল, জানেনই ত দাদা, আপনাব  
বৌমাটি ভারি হিসেবী মানুষ। আসবার সময় চেয়েছিলাম  
কিছু—তা বললেন ওরা নিয়ে যাচ্ছেন রাজসমাদবে—পরশা  
কি হবে শুনি ?

হুম্। অবনীর পানে একটি অগ্নিগর্ভ কটাক্ষ হেনে  
পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলেন। ব্যাগ খুলে রমণী-  
মোহনেরবও চক্ষুঃস্থির। ব্যাগটা বলতে গেলে শূন্যগর্ভ। ওতে  
যা ছ'একটি আনি-চুয়ানি পড়ে আছে তাতে একজনেরও  
বাসতাড়া কুলাবে না।

এতক্ষণ একবাস লোক কোতুহলী দৃষ্টি মেলে ওঁদের  
বাহানুবাদ শুনছিল। এর পরেব অবস্থাটা কল্পনা করে মন্ত-  
মুখ রমণীমোহন দামতে লাগলেন।

বিপরীত বেঞ্চে-বসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এই বিপদ  
থেকে ওঁদের উদ্ধার করলেন। শুধু বাসের ভাড়াই  
মিটোলেন না তিনি—ট্রেনেরও টিকিট কাটলেন তিনখানা।  
রমণীমোহন দারুণ লজ্জায় সেই থেকে মাথা হেঁট করে রইলেন  
—ট্রেনে উঠেও মাথা তুললেন না।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি কিন্তু করছেন কেন দাদা ?  
আমারই যদি এমন বিপদ হ'ত আপনি কি এগিয়ে আসতেন  
না ? ভাল হয়ে বসুন। পান খাবেন ?  
না।

অবনী বলল, দিন—আমায় দিন।—সিগ্রেট ? আলবৎ  
চলে।—চা ? অমুতে কাব অরুচি বসুন ?

শবগুলিই প্রত্যাখ্যান করলেন রমণীমোহন। অবনীর  
নির্লজ্জতায় বেশী করে লজ্জিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হলেন  
ততোধিক।

দাদা—উঠুন, আমরা এসে গেছি। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে  
চমকে উঠলেন রমণীমোহন। উঃ—একভাবে জানালায় দিকে  
মুখ করে তিনটি বণ্টা কেটে গেছে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনাব  
নাম আর ঠিকানা যদি দয়া করে দেন। আপনাব কাছে—



বিলক্ষণ! হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। আপনাদের কাছে সারা বাংলাদেশ খুঁজি—আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি একদিন আপনার বাড়ীতে গিয়ে—

রমণীমোহন বললেন, কিন্তু আপনি ত আমাকে চেনেন না, আমার ঠিকানা—

ভেমনি হাসতে হাসতে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আপনি ভারত বিখ্যাত লোক—আপনার ঠিকানা জানা কি এমন কঠিন!

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন রমণীমোহন, যাই হোক—আপনার ঠিকানাটা দিন। আমারও কর্তব্য আছে।

অবনী বলল, দাড়া—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

তুমি ধাম। প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়ে রমণীমোহন নোট-বইটা বার করলেন। তার পর ঠিকানা নিয়ে ভদ্রলোককে ধস্তাধরি জানিয়ে ও নমস্কার করে সোজা বেরিয়ে গেলেন গेट দিয়ে—অবনীর দিকে ফিরেও চাইলেন না।

নটবর ঘোষ লেনের তিরিশ নম্বর বাড়ীর সামনে প্রতীক্ষমান ছেলের দল ততক্ষণে কড়া-নাড়া-পর্ক শেষ করে রমণীমোহনের আস্থানে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছে।

রমণীমোহনকে প্রণাম করার পর মুখপাত্র ছেলেটি বলল, আপনার কাছে এলাম স্যার। আমাদের একটা ফাংশন আছে তেরোই আষাঢ়, আপনি যদি দয়া করে—

ফাংশন। ক্রু'কু'কে রমণীমোহন এক মিনিটকাল কি চিন্তা করলেন। বললেন, তা উপলক্ষ্যটা কি?

মুখপাত্রটি সবিনয়ে বলল, আজ্ঞে রবীন্দ্র-জয়ন্তী।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী? তেরোই আষাঢ়? উঃ—সাংঘাতিক ছেলে ত তোমরা!

ওঁর প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কার দলটি একেবারে নিভে গেল। পরস্পরের পানে চেয়ে ওরা মাথা চুলকোতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে মুখপাত্রটি সাহস সঞ্চয় করে নিভস্ত গলায় বলল, আজ্ঞে স্যার, আপনারা ত নানান জায়গায় ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত—আমরা কাউকেই জোগাড় করতে পারি নি। তা ছাড়া শহরের হিড়িক না মিটলে—

কোথা থেকে আসচ তোমরা?

আজ্ঞে সবসে থেকে।

সবসে? পাড়াগাঁও? ট্রেন, বাস, নৌকা—

আজ্ঞে না, ট্রেন থেকে নেমেই সাইকেল বিক্রী, মাত্র এক ঘণ্টার জিনি।

না বাপু, পাড়াগাঁয়ে যেতে-টেতে পারব না। মানে যাবই না ঠিক করেছি। গম্ভীর মুখে বললেন রমণীমোহন।

মুখপাত্রটি এবার হাতজোড় করে সন্মত কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে কিছু কষ্ট হবে না। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি। তা ছাড়া প্রধান অতিথি মশায় যাবেন। হু'লেনে একদম—

প্রধান অতিথি! ক্রু'কু'কে রমণীমোহন প্রশ্ন করলেন, প্রধান অতিথি কে?

মুখপাত্রটি বিনীতকণ্ঠে বলল, আজ্ঞে বিখ্যাত সমালোচক অবনীনাথ সমাদ্দার।

হু! গম্ভীর একটা হুঙ্কার ছেড়ে রমণীমোহন হুফাভাবে অবলম্বন করলেন।

মুখপাত্রের পিছনের তিনটি ছেলে সে আওয়াজে চমকে উঠল। আড়চোখে রমণীমোহনের গম্ভীর ক্রকুটি কুটিল মুখের পানে চেয়ে একটু একটু করে পিছুতে লাগল হুয়োয়ের দিকে।

মুখপাত্রটি সাহস সঞ্চয় করে বলল, তা হলে স্যার আমাদের ফাংশন—

ফাংশন! হঠাৎ ধমকে উঠলেন রমণীমোহন, ফাংশন? ইয়াকর আর জায়গা পাওনি? তেরোই আষাঢ় রবীন্দ্র-জয়ন্তী! বলি ষটা করে ফাংশন ত করছ—মনে পড়ে তেরোই আষাঢ় দিনা কি? বল ত হেঁথি—ওই দিনটিতে বাংলা-সাহিত্যের কোন্ দিকপাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন? বল—?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ধমক।

মুখপাত্রটির মুখ চুপ হয়ে গেল। কি সাংঘাতিক প্রশ্ন! ইস্কুল ছাড়ার পর এমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—সেকথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে কোনদিন?

ছেলেটি কিন্তু চালাক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনে মনে দমে গেলেও অপ্রতিভ ভাবটুকু কাটাবার জন্য সঙ্গীদের সন্ধান করে বলল, কিবে অন্তা—বিজয়—কুহু—তোরা কি বলিস? বল না যে?

মুখ ফিরিয়ে দেখে পিছনটা একদম ফাঁকা।

## শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

### শ্রীবিনায়ক সাংঘাল

ভাব-প্রকাশের জগতই হয়েছে ভাষার সৃষ্টি। কোন সুদূর অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীগুলির উৎপত্তি হয়েছিল আজ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবুও কোন ভাষার বিবর্তন-ধারাটি উজ্জানে অনুসরণ করলে তার অন্তরহস্ত্র আদি উৎসে পৌঁছাতে না পারলেও তার অবশিষ্ট অলক্ষ্য স্তরগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। শব্দ-গ্রন্থিত বাক্যই ভাষার একক (unit), সুতরাং শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ-ধারাটি পর্যালোচনা করলে এমন বহু তথ্যই আবিষ্কার করা যায় বা অতীত কোঁতুলপ্রদ। কোন জীবন্ত ভাষাই স্থির নয়, নদীর মত সে নিরন্তর বয়ে চলে; প্রবাহ-পথে কত নূতনকে সে গ্রহণ করে, কত পুণ্যতনকে বর্জন করে এবং এই গ্রহণ-পূরণের মধ্যে দিয়েই অর্জন করে প্রকাশের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য। শব্দ-রূপের কত রূপান্তর ঘটে, কত শব্দার্থ পরিবর্তিত হতে হতে হয়ত এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে মৌলিক অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই আর থু জে পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষাবিদ্যের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট দল; এক দলের মত, যেহেতু বাংলা, সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন না হলেও, তার প্রভাবশ্রুতি সেই হেতু তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রশৃঙ্খলে আট-পুঁঠ বেঁধে রাখতে হবে, নতুবা ভাষার গুচিটা নষ্ট হবে। দ্বিতীয় দল ভাষাকে দেখেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, তাঁরা জানেন যে, এই ভাষার মূল কাঠামোটা মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হলেও ইন্দো-ইউরোপীয়, উদারীয়, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাবর্গের অস্ত্র শব্দের সমুচ্চয়ে গঠিত এবং দেহ; সুতরাং একে সংস্কৃতের ধবদধারীতে আগলে রাখা নিছক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়, বিশেষ করে এ যুগে যখন সংস্কৃত তার জীবন্ত সত্তা হারিয়ে প্রায় প্রেতলোকের কাছাকাছি পৌঁছেছে। দ্বিতীয় দলের লোকের মধ্যে গুচিবায়ুতা না থাকলেও আছে হুজুগপ্রিয়তা, স্বাধীনতার নামে বৈদ্যাচারের স্পৃহা। তাই ভাষার ব্যাপারে একটা মধ্যপথ বেছে নেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়, যাতে শব্দের গুচিতাও বধাসম্ভব বজায় থাকে, অথচ প্রকাশের স্বচ্ছন্দ্যতাও ব্যাহত না হয়। ধরা যাক 'স্বজন' শব্দটি; সংস্কৃত ব্যাকরণমতে এটি অশুদ্ধ, হওয়া উচিত 'সর্জন'; কিন্তু 'স্বজন' রূপটি ভাষায় এমন কার্যে হয়ে গিয়েছে যে, একে উচ্ছেদ করা এখন এক রকম অসম্ভব। 'ভগবান' এই জগৎ সর্জন করেছেন' বললে অতিবড় গুচিবাদীও কি তর্জন করে উঠবেন না? অতীতকে, 'বিসর্জনে'র স্থানে 'বিস্বজন' লিখলেও কল সমানত হবে। অশুদ্ধ হলেও 'বিতরিত'র বদলে 'বিতীর্ণ' লেখা কেউ সমর্থন কবেন কি?

অর্থনৈতিকের বদলে অর্থনীতিক? এমনি কবে রূপের দিক থেকে অর্থের দিকে দৃষ্টি ফেড়ালে সেখানেও আমরা দেখতে পাব বিস্ময়কর পরিবর্তন। কিন্তু কেমন কবে এবং কত দিনে কোন শব্দ তার মুখ্য অর্থ ত্যাগ করে গৌণ অর্থ গ্রহণ করে তা নিশ্চয় কবে বলা শক্ত, তবে হাল-আমলের দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। লোক-ব্যবহারের কথা আলোচনার বাইরে যেথো আমরা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা থেকে শব্দার্থের অপব্যবহারের দু'একটা নমুনা দিই। 'প্রদোষ' শব্দটির আসল অর্থ সায়ংসন্ধ্যা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন লেখায় শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন প্রাতঃসন্ধ্যা অর্থে, মধুসূদন রবীন্দ্রক রচিত অর্থে, নিকবকে কোব বা পিধান অর্থে প্রয়োগ করেছেন, দাশরথি 'কোদণ্ড' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কোদাল অর্থে। কিন্তু এই সব সাহিত্যরথী শব্দ-গুলিকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করেছেন বলতে যে এঁ এঁ অর্থ ভাষার প্রচলিত হয়েছে তা নয়। 'বলাকা' শব্দটির বেলায় কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এর ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'যুধ' বা 'শ্রেণী' অর্থে, অথচ শব্দটির বস্তুার্থ অর্থ 'বক'; 'রাভংসদল আকাশে বলাকা বাধি' সত্য চক্ৰ' ইত্যাদি পংক্তি থেকেই এর প্রমাণ মিলবে। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী কোন কোন সাহিত্যিকও শব্দটিকে ঐ অর্থের অর্থেই নেবার পক্ষপাতী। এমনি কবে পর পর বহু সাহিত্যিকই যদি ঐ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করতে থাকেন, তা হলে কালক্রমে হয়ত মুখ্য অর্থকে পাশ কাটিয়ে এর কল্পিত অর্থটিই ভাষায় থু টি গাড়বে। 'সতীর্থ' শব্দটিকে সহকর্মী বা সহযোগী অর্থে কে বা কঁায়া কবে প্রথম প্রয়োগ করেছেন তা নির্ণয় করা সহজ নয়, কিন্তু ধবদেব কাগজের পাতা ওপটালেই এর ভূরি ভূরি নিদর্শন চোখে পড়বে। আসল কথা এই যে ভাষা চার ভাবেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে, সংস্কারের শব্দ বাঁধে তার তোড়ের মুখে ভেসে যায়, কিন্তু তাই বলে অজ্ঞতাজনিত অপপ্রয়োগ ক্ষমা' নয়। আজকাল ভাষা না শিখেই কলম খরার যেওয়াজ হয়েছে, বহু-গণের জ্ঞান এখন অনাবশ্যক, ই-ট, উ-উ নিয়ে এখন ছিনমিনি খেলা চলছে। এই বৈদ্যাচার ভাষাকে কবে তুলেছে বিশৃঙ্খল, কাজেই যনগড়া হবেকরকম বানান আজ বাজারে চলছে। একটা ছেপ টানা আও আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অবশ্য, ভাষা পুরোপুরি গড়ে উঠবার আগে পর্যন্ত এই রকম একটা অব্যবস্থিত অবস্থা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এখন থেকেই প্রয়োগের বোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত না হলে একটা সার্বজনীন বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রধান ভাবে অর্থের বিবর্তন এবং গোঁপ ভাবে বানান-বিপ্লবের সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

তত্ত্বাবাদীরা দাবী করেন ‘আবশ্যকীয়’, ‘সিদ্ধান্ত’, ‘মনাস্তব’, ‘নিশি’, প্রভৃতি ব্যাকরণমতে ভুল, স্মৃতবাং সাধু ভাষায় শুভলিখ প্রয়োগ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি শব্দ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে দেখা যাক তাঁদের এই দাবী কতদূর সমর্থনযোগ্য। ‘আবশ্যক’ শব্দটি বিশেষণ হলেও বিশেষ্যরূপেও ব্যাকরণমতে এবং প্রাচীন সংস্কৃত বিশেষ্যরূপে ওর প্রয়োগ আছে, অর্থবিত্তি কণ্ঠ, প্রয়োজন, দ্রষ্টব্য—‘উৎসাহাবশ্যকং কৃত্য’ ইত্যাদি (মহু ৪, ২৩, )। কাজেই বিশেষ্য ‘আবশ্যক’ থেকে নিশ্চয় ‘আবশ্যকীয়’ শব্দটিকে বাতিল করার পক্ষে যুক্তি কি থাকতে পারে, বিশেষ করে যখন ‘প্রয়োজনীয়’, শব্দের সাদৃশ্যে ঐক্যপতি ভাষায় কার্যে হয়ে গিয়েছে? ‘সিদ্ধান্ত’ সম্পর্কে বলা যায়, যদিও ব্যাকরণমতে ওটি ভুল তবুও শিষ্ট প্রয়োগসম্মত বলে অবশ্যই গ্রহণীয়। তা ছাড়া, পিঙ্গলী অর্থে সংস্কৃত সিদ্ধান্ত শব্দ পাওয়া যায়, এ থেকে অনুমান হয় পবে অপ্রচলিত হয়ে পড়লেও ‘সিদ্ধ’ ধাতু প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল। সংস্কৃতে নিশি শব্দ যেমন আছে তেমনি আছে নিশ শব্দ, এই নিশ শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ নিশি। প্রথমায় স্থলে সপ্তমীর প্রয়োগ কখনই সমর্থনীয় নয়; কিন্তু নিশিগাল (ছন্দোবিশেষ), নিশিপুন্না (শৈবাসিক) সংস্কৃতে পাওয়া যায়। বাংলার পড়ে এর প্রয়োগ শিষ্টসম্মত। কবিকঙ্কণে অধিকরণ কারকেও পদটির প্রয়োগ পাওয়া যায়, ‘আজি দেখিলাম নিশি (রাজিতে) ভীষণ স্বপন’ পশ্চিম শব্দের সপ্তমীর একবচনের পদ পশি, হ্রস্ব শব্দের হ্রস্ব, কিন্তু বাংলার কণ্ঠ-কারকের স্থলে এ ছটির প্রয়োগ প্রচুর পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত:— ‘কে বলিবে বিধাতার সেই পশি’ (হেমচন্দ্র), ‘কখন কৃপণে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হ্রস্ব’ (ববীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি। ‘মনাস্তব’ সংস্কৃত-মতে অবশ্যই অন্তর্ক, মনঃ+অস্তব=মনোহস্তব হওয়া উচিত, কিন্তু শব্দটি সাহিত্যে এবং সাধারণ কথাব্যবহারে এতই প্রচলিত যে ওকে শুদ্ধ বলে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর ‘যদি হয় প্রাণান্তর মনাস্তব তায় হবে না’—পংক্তিটি আশা করি অনেকেই মনে পড়বে। এই ধরনের ব্যাকরণ-বিগর্হিত, প্রয়োগ সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। মনঃ+ঈবা=মনীবা হওয়া উচিত কি? সাধারণভাবে প্রয়োগসিদ্ধ বাতিক্রমগুলি ব্যাকরণে নিপাতন নামে পরিচিত। শিক্ষিত কোন লোক লজ্জাস্তব বললে আমরা লজ্জা পাই, কিন্তু সংস্কৃতে ‘বনপতি’ না বলে ‘বনম্পতি’, ‘গোপন না বলে ‘গোম্পন’ বলাই বিধি (ভুলনীয়—বানব < বানব, স্মব < স্মব)। লোক-ব্যবহারের ফলেই এই সব অতিরিক্ত আগন্তুকধ্বনি (শ্রুতি ধ্বনি বা glide) শব্দের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু এর কারণ নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে উচ্চারণ সৌকর্য্য যে অন্ততম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজীতে ‘message’, অর্থাৎ ‘সংবাদ’ বহন করে যে সে ‘messenger’, ‘messenger’ নয়। ভাষায় চরিত্র-বিচিত্র, ফলকথা, ব্যাকরণ ও প্রয়োগ-বীতি

(idiom) মধ্যে যেখানে ছন্দ সেখানে প্রথমটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, সব ভাষাতেই এই একই নিয়ম।

এইবার কতগুলি সংস্কৃতভাষ্য অর্থ্যৎ ছন্দ-সংস্কৃত শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিব্রত, বিদায়, সাবাস্ত, সাশ্রয়, ছত্র (পংক্তি), গল্প, গঠন, গাভী, শিচরণ, অনটন, হিজাট ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। আবার ছবি, ছুঁচি, শুড়, গোল, পাগল, ছাগল প্রভৃতি শব্দগুলিকে অপভ্রংশ বা দেশজ বলে মনে হলেও আসলে এগুলি সংস্কৃত; পটোল শব্দও পাওয়া যায় বৈজ্ঞকে। অবশ্য, এদের মধ্যে কোনটি কত পুরানো এবং আদিম অবস্থায় অজ্ঞ কোন ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ কিনা তা বলা শক্ত। সংস্কৃত ছবি (অর্থ শোভা) ছাড়াও আর একটি ছবি-শব্দ ভাষ্যভাষ্যে আছে যার অর্থ চিত্র বা প্রতিকৃতি। সেটি এসেছে আরবী শব্দ হ থেকে। গোলযোগ বা বিপ্লব-বোধক শব্দের অভাব নেই ইংরেজীতে, তবুও এদেশের ‘বাপরে!’ প্রয়োগটি ঐ ভাষায় প্রবেশ করে ‘bohbery’-রূপে কার্যে হয়ে গিয়েছে। কোন ভাষাকে ঐ অর্থ বহী বলা যায় তখনই যখন তার শব্দ-ভাণ্ডার হয় এত সম্পন্ন যে, প্রতিরূপের অভাবে ভাবের প্রকাশ শুদ্ধ হয় না কিছুতেই। সংস্কৃত শব্দগুলি ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ এবং এদের অর্থ বাস্তবের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। খুলী-মত এদের অর্থ বা রূপের পরিবর্তন-সাধন কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। সে বা হটক, এখন শব্দগুলিকে এক এক করে বিচার করা যাক।

বিব্রত-শব্দ সংস্কৃত অভিধানে নেই; যে অর্থে শব্দটি বাঙলার ব্যবহৃত হয় সে অর্থ নিম্নলিখিত কথায় খুবই শক্ত। ব্যাকরণমতে এর অর্থ হওয়া উচিত ব্রতভ্রষ্ট, কিন্তু বাঙলার অর্থ কি তাই? ‘নানা-ব্যাপারে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি’ বললে বোঝার ‘দাঁপরে পড়েছি’, ‘বিপন্ন বোধ করছি’। ‘Farewell’-অর্থে বিদায় আরবী ‘বিদায়’ শব্দ থেকে এসেছে, দা-ধাতু থেকে নিশ্চয় বিদায়-শব্দের সঙ্গে এর শোণিত-সম্পর্ক নেই। সম্ভবত, ‘সবাবস্থের’ সংক্ষিপ্ত রূপ ‘সাবাস্ত’। সাশ্রয়-শব্দও অভিধানসম্মত নয়, সংস্কৃতে এর ব্যবহার নেই। বাঙলার অর্থ দাঁড়িয়েছে বায়-লাঘব, অর্থ-সংস্থান। কেমন করে এই অর্থ এসে বলা শক্ত। সম্ভবত আশ্রয় প্রার্থ্য পেরে ক্রমে সাশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন অবকাশ হয়েছে সাবকাশ। ‘আব বস কেন, মরবার সাবকাশ নেই’ ইত্যাদি প্রয়োগ সেকালের শিক্ষিত লোকের মুখেও হামেশাই শোনা যেত, আশ্রয় মানে ‘অবলম্বন’, তার থেকে সম্বল বা সঞ্চয় অর্থ আসা অসম্ভব নয়। আরবী ‘সত্য’ (পংক্তি) প্রথমে হয়েছে ছত্র বা ছত্ব, পরে ছত্রের অপভ্রংশ এই ধারণায় ছত্রাকারেই একে জাতে তোলা হয়েছে। ‘গঠন’-শব্দ সংস্কৃতে নেই; ধ্বনি-বিকৃতির ফলে মহাপ্রাণ স্থান পরিবর্তন করার ‘ঘটন’ ‘গঠন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্পের সংস্কৃতরূপ গল্প, ধ্বনি-বিকারে রূপে রূপান্তর ঘটেছে। মূল-সংস্কৃত শব্দ ‘গবী’ ধ্বনি-বিকৃতির ফলে বাঙলার গাভীতে পরিণত হয়েছে, গবী প্রথমে প্রাকৃতিক গাবী-রূপ ধারণ করেছে। প্রাচীন বাঙলার ঐ রূপটির ব্যবহার বিরল হলেও একেবারে অচল নয়; দৃষ্টান্ত: ‘নন্দিনী গাবীর তয়ে মুন কৈল

ডাকি' ( কানী-মহাভারত )। অর্ধাচীন সংস্কৃতে গাভী শব্দেরও প্রয়োগ পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্যে 'শিহরণ' শব্দটির ছড়াছড়ি, সম্ভবতঃ এটি অমুকৃতি শব্দ। সংস্কৃত বলে গণ্য হলেও আসলে এটি অসংস্কৃত, তাই বলে বাঙলায় এর দাবি নগণ্য নয়। অনটন শব্দ অভিধানে নেই। অনটন শব্দের অর্থ চলা; কাজেই মনে হয় অচল অবস্থা বা অভাব অর্থ বোঝাতে শব্দটি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় অর্থে বিভ্রাট কেমন করে এল বলা শব্দ, সংস্কৃতে যে বিভ্রাজ শব্দটি আছে—যার প্রথমার একবচনের রূপ বিভ্রাট—তার অর্থ নীপ্তিমান। রটনা অর্থে রাষ্ট্র শব্দটির বাঙলায় অল্পপ্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা, হেতু-নির্ণয় হুঃসাধ্য। কিন্তু যেমন করেই আসুক এর প্রয়োগ ঠেকানো যাবে না। 'থবণ্টা শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল' ইত্যাদি প্রয়োগ অহরহই শোনা যায় এবং যাবে। 'তালিকা' শব্দটিকে 'মালিকার' সগোত্র বলে মনে হলেও আসলে ওটি বর্ণচোরা আরবী শব্দ। বিজ্ঞান শব্দটিও সংস্কৃত নয়, কোন অনাধা ভাষা-গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত কিনা বলা যায় না। সংস্কৃত 'বিজয়' ( অর্থ-জয়, পরাজয় ) থেকে এর উৎপত্তি সম্ভব কি ?

এইবারে কয়েকটি খাটি সংস্কৃত শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক বেঙুলি রূপ না বদলালেও অর্থের বদল হয়েছে বধেষ্ঠ। প্রথমেই নেওয়া যাক 'বিচ্ছুরিত' শব্দটি; আধুনিক বাংলায় এর অর্থ বিকীর্ণ, মূল অর্থ অস্থূলিপ্ত, শোষণাত্মক অর্থে কুমারসম্বৎ থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, 'মনঃশিলা বিচ্ছুরিতা নিবেহঃ শৈলেননদেয়ু শিলাতলেনু'। প্রথমে ধাতুর অর্থ খ্যাত হওয়া, স্তব্ধতা; 'প্রথা' শব্দটির মৌল অর্থ খ্যাতি; বাংলায় অর্থ বদলে দাঁড়িয়েছে রীতি, মূল অর্থ বাংলায় এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। 'বাপদেশ' শব্দের আদি অর্থ বিজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা, ছল, বধা : 'এবং বাপদেশভাষঃ' ( উ ৬ ) 'অথ কোহন্ত বাপদেশঃ' ( ওষ নাম কি ? ) কার্য-বাপদেশে বললে বোঝান উচিত 'কাজের নামে বা ছলে', 'কাজের জন্তে' নয়, অথচ একমাত্র শেষের অর্থটিই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত। 'বিড়ম্বন' ( ১ ) মানে ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, বাংলায় অর্থ বকনা, অনর্থক কষ্টভোগ, অবশ্য শেষের অর্থটি প্রাচীনেও না ছিল তা নয়। মহা ধাতু থেকে নিম্পন্ন 'মহিলা' আধুনিক প্রয়োগে সম্মানসূচক, শব্দটির অর্থ এখন 'সম্রাজ্ঞী', প্রাকৃতিক কিন্তু মহীলা বা মহিলা শব্দের অর্থ ছিল 'মদমতা বা কামুকী স্ত্রীসংস্কৃতেও এই অর্থ প্রচলিত নয়। ব্যবসায় শব্দটির অর্থ সংস্কৃতে উত্তম, অধ্যবসায় এবং সবশেষে বাণিজ্য, বাংলায় কিন্তু একমাত্র অর্থ বাণিজ্য, 'রূঢ়' সংস্কৃতে জাত, প্রসিদ্ধ, বাংলায় কঠোর, কর্কশ 'ভক্ত' সংস্কৃতে জনিত, উৎপাদ, বাংলায় কারণে, ফলে, উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে, 'ঘৃণা' ( ঘৃণা ধাতুর অর্থ আর্দ্র করা, সেচন করা ) সংস্কৃতে করুণা—'কারুণ্যঃ করুণা ঘৃণা' ( অমর ), বাংলায় জুগুপ্সা, বিতৃষ্ণা, করুণা অর্থে এর প্রয়োগ নেই। 'এবং' সংস্কৃতে 'এইরূপ' বাংলায় 'আরও', 'সুতরাং' সংস্কৃতে 'অতীত', বাংলায় 'অতএব', 'ভাস্কর' সংস্কৃতে সূর্য্য, অগ্নি, স্বর্ণ, বাংলায় মূর্তিনির্মাতা ( Sculptor ), 'সম্ভরণ' সংস্কৃতে সম্যক তৃপ্তিদান, ত্রাণাদিমুক্ত খাদ্য বিশেষ, বাংলায়

সতর্ক, 'সম্ভরণে আসা-যাওয়া করা' বললে বোঝায় 'সাবধানে'। সমূহ শব্দটি আসলে বিশেষ্য, অর্থ—গণ, সমুদয়, সেনাদল; বাংলায় কিন্তু বিশেষণরূপেও এর ব্যবহার আছে, অর্থ বহু, খুব। 'বিপৎসমূহ' এখানে 'সমূহ বিপদে' পরিণত হয়েছে। 'বাজ' শব্দের বৌগিক অর্থ ছল, বিদ্র; বাংলায় রূঢ় অর্থ বিলম্ব। 'বান্ধিত'—সংস্কৃতে বাধা-প্রাপ্ত, নিষিদ্ধ, নিবারণিত, বাংলায় প্রধানত 'অনুগৃহীত' অর্থে ই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। 'ত্রয়মাণ' অর্থ সংস্কৃতে মমূর্ষু, বাংলায় বিষম। সংস্কৃতে 'স্তোত্র' শব্দের অর্থ বিশেষ্যে জলবিন্দু, চাতক, বিশেষণে জল। বাংলায় অর্থ দাঁড়িয়েছে মিথ্যা প্রবোধ বা স্তুতি। সম্ভবত, স্তোত্র শব্দের সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্যে ঘটেছে এই অর্থ-বিভ্রাট। স্তোত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ—গানাদিমুগ্ধপূরণের জন্ত অর্থশূন্য শব্দ, তার থেকে মিথ্যা প্রবোধ অর্থ আসা অসম্ভব নয়। সঙ্গতি শব্দের অনেক অর্থ, যেমন—মিলন, সজা, সামঞ্জস্য, যোগ্যতা ইত্যাদি; বাংলায় একটি অতিরিক্ত অর্থ দাঁড়িয়েছে অর্থ-সংস্থান, বোধ হয় আত্ম-ব্যয়ের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থেকেই এই অর্থের উৎপত্তি। 'সঙ্গতি নেই' মানে আত্ম-ব্যয়ের সমতা নেই অর্থাৎ ইংরেজীতে 'বাক' বলে 'Cannot make both ends meet'। 'স্তিমিত'—শব্দটি বাংলায় প্রায়ই 'ক্লীণ' অর্থে প্রযুক্ত হয়, অথচ এর আসল অর্থ—মার্জিত, স্থির, নিমীলিত; স্তিম্ ধাতুর অর্থ আর্দ্র হওয়া, স্থির হওয়া। মূলত্ববী অর্থে 'স্থগিতে'র ব্যবহারও সংস্কৃতসম্মত নয়, শব্দটির বার্থ অর্থ আবৃত, তিরোচিত; স্থগ্ ধাতুর অর্থ আবৃত করা, গোপন করা। 'সচরাচর' সংস্কৃতে 'চরাচরের সহিত', বাংলায় সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। উপজ্ঞাস শব্দের অর্থ সংস্কৃতে উপস্থাপন, প্রস্তাব বা প্রস্তাবনা। বাংলায় গল্প, আখ্যায়িকা, প্রধানত novel-এর প্রতিশব্দরূপেই এর ব্যবহার। 'সম্ভব' শব্দের মুখ্য অর্থ ভ্রম, ভ্রমণ, উৎসাহ, ভর এবং সবশেষে ভক্তিজনিত বেগ বাস্তবতা বা শুধু সম্মান ভক্তি। মুখ্যার্থগুলি লুপ্ত হয়ে শেষের গোঁণ অর্থটিই বাংলায় কার্যময় হয়েছে। 'সমীহা' ( সমীহ ) শব্দের আদি অর্থ সম্যক্ ইচ্ছা ( তুলনীয় অনীহা অনিচ্ছা ) অথচ বাংলায় প্রচলিত অর্থ ক্ষমা, সম্মান। 'নিমীহ' শব্দের বৌগিক অর্থ নিশ্চেষ্ট, নিস্পৃহ, বাংলায় রূঢ় শাস্ত, নির্বিষোধ, গো-বেচারা। 'প্রশস্ত' সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, বাংলায় চণ্ডা, বিদূত। 'ভাসমান' সংস্কৃতে নীপ্তিমান, শোভমান, বাংলায় 'বা ভাসছে।' এই রকম আরও বহু শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে, বাহুল্য ভয়ে নিবৃত্ত হলাম।

ভাষার সব শব্দই যে চিরকাল একই অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকবে এ ধারণা শব্দার্থ-বিজ্ঞানসম্মত নয়। শব্দের এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। ইংরেজী 'knave' শব্দের মূল অর্থ বালক, প্রচলিত অর্থ ছবৃত্ত; 'villain' শব্দের মূল অর্থ গ্রাম-বাসী, প্রচলিত অর্থ ছবৃত্ত, swain শব্দের মূল অর্থ বালক, প্রচলিত অর্থ কুবক, uncouth শব্দের মূল অর্থ অপরিচিত প্রচলিত অর্থ অমার্জিত, কুশর্মন। অনেক সময় দেখা যায় বৈদিকে যে শব্দ যে অর্থে প্রচলিত ছিল লোকিকে সেই শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ

করেছে। গুণ (গোপায়তি) খাত্তর অর্থ রক্ষা করা, গোপন করা, বধা—ক্ষতং মে গোপায় (তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা কর) —তৈত্তিরীয় ঋষি অথবাৎ। উক্ত খাত্ত নিম্ন গোপ শব্দের প্রাচীন অর্থও রক্ষা। গোপালক হিসাবে গোপের (গো—পা+অ কর্তৃ) প্রয়োগ ভাগবতাদি পবনবর্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। আধুনিক কাব্যে বৈদিক ‘ক্রন্দসী’ শব্দটির ছড়াছড়ি, অর্থ (যদি থাকে) ‘ক্রন্দনরতা নারী’, অথচ আসল অর্থ ‘বর্ণ ও মর্ত্য’। উষা অর্থে ‘উষসী’র প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ করেছেন এবং উত্তরসাধক আধুনিক কবিরাও করে থাকেন অদ্বৈতচন্দ্র, ‘স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী’—উর্দ্বারী কবিতার এই পঙ্ক্তিটি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শব্দটির প্রকৃত অর্থ কিন্তু প্রদোষ বা সায়াসক্ষ্যা। কৃষ্টি শব্দের বৈদিক ও সংস্কৃত অর্থ—বিধান (বাস্তি), করণ (cultivation) বা আকর্ষণ, বাংলায় ‘culture’ বা সংস্কৃতি অর্থে চালফিল খুব চলছে। ‘সন্দেহ’ ও ‘তবে’র অর্থান্তর-তদ্ব্য এই পরিচিত যে, তার বিশদ বিস্তারে নিবস্ত হলাম।

এর পরে কয়েকটি সর্বদা ব্যবহৃত শব্দের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। বলা প্রয়োজন, শিষ্ট প্রয়োগকেই আমি শুদ্ধ মান বলে মানি, যদিও অকারণ ব্যাকরণ-বিধি লঙ্ঘন করাও আমি সমর্থন করি না। অপপ্রযুক্ত শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলির রূপ বদলান হয় নিছক নতনত্বের খাতিরে, কতকগুলি আবার প্রযুক্ত হয় কপোল-কল্পিত অর্থে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলগুলি ঘটে বাল্যশিক্ষার ক্রটির জন্তে, কোন কোন স্থানে ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের ফলে। এইভাবে যথেষ্ট শব্দপ্রয়োগের ফলে ভাষার বাঁধন যায় আলগা হয়ে এবং একের তুলে অপরে সংক্রান্ত হয়ে ভাষাকে করে তোলে বিপর্যস্ত। ভাষার মাধ্যমেই হয় ভাষার বিকিকিনি, তাই ভাষার বাজারে এই ‘অবাধ নীতি’ চলতে দিলে এমন একটা অবস্থা অচিরেই আসবে যখন, শুধু ভিন্নভাষী বিনোদী পক্ষে নয়, সেট ভাষা-ভাষী শিক্ষার্থী পক্ষেও, প্রয়োগ-সিদ্ধ, শুদ্ধ রচনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাল দিয়ে যেমন বাঁধতে হয় সুরকে, তেমনি ভাষাকেও বাঁধতে হয় শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে, নইলে তার সুরমা নষ্ট হয়। এখন একে একে শব্দগুলি পরীক্ষা করা যাক :—

ভ্রাম্যমান, অগ্রসরমান, প্রবহমান, চলমান প্রভৃতি শানচ প্রত্যয় যোগে গঠিত কতকগুলি শব্দ সাহিত্যে, সংবাদপত্রে সম্প্রতি খুবই চলছে। আত্মনেপদ খাত্তর উত্তরই কেবল শানচ হয়; কিন্তু ভ্রম, হ্র, প্র-বহ, চল কোনটিই আত্মনেপদ নয়। বহ খাত্ত উত্তরপদ; কাজেই বহমান শুদ্ধ; কিন্তু ‘প্রাধঃ’ সূত্র-অনুসারে প্র-পূর্ব-বহ খাত্তর আত্মনেপদস্থ বাধিত হয়েছে। অবশ্য ভ্রাম্যমাণ শব্দ হতে পারে ‘বাকে ভ্রমণ করান হচ্ছে’ এই অর্থে। কতিবান্, সংস্কৃতিবান্, সম্মানীয় প্রভৃতি শব্দও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখাতেও আজকাল অবাধে চলছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কতিমান্, সংস্কৃতিমান্, সম্মানীয় প্রভৃতি শুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ‘মতুপ’ সম্বন্ধে নিম্নটি সংক্ষেপে এই :—অ-(অ, আ) বর্ণান্ত

প্রতিপদিকের উত্তর মতুপের ‘ম’ স্থানে ‘ব’ হয়, অত্র ‘ম’। প্রতিপদিকের উপধা স্থানে ‘ম’ থাকলেও ম স্থানে ব হয়, যেমন লক্ষ্মীবান্। ‘বিকশিত’ বানানটি বাংলায় খুব চলতি; রবীন্দ্রনাথই বিশেষ করে বানানটিকে চালু করে গিয়েছেন; অথচ প্রকৃত বানান হওয়া উচিত বিকশিত; বি-পূর্বক কাশ খাত্ত ক্ষ কয়লে হয় বিকশিত (তুলনীয় প্রকাশিত), বিকশিত নয়। ‘মোচন’ অর্থে ‘খালন’ বাংলায় আর একটি বিশিষ্ট অপপ্রয়োগ, এই মজাগত দোষ ‘ফালন’ করতে সময় লাগবে। ‘ইতিহাসপূর্ব’ অর্থে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ শব্দের ব্যবহারও সমর্থনীয় নয়।

অরণ্যানী শব্দের সাদৃশ্যে বনানী, অকল্পন শব্দের সাদৃশ্যে মর্যম্বদ, পুরাতন শব্দের সাদৃশ্যে নবতম বাংলায় খুব চল গিয়েছে। অপর-পক্ষে, প্রভ শব্দটি খুব প্রচলিত হলেও শুদ্ধ শব্দ নৃত্যের প্রয়োগ বাংলায় নেই।

‘কামান’ শব্দটি কারসী (কমান্) অর্থ ধনু। প্রাচীন বাংলায় ঐ অর্থে প্রয়োগও আছে প্রচুর; বধা—‘ভুকৃষ্ণ কামের কামান’, ‘কামের কামান জিনি ভুকৃষ্ণ ভজিয়া থানি’ (চণ্ডী); ক্রমাগত ভুকৃষ্ণ সঙ্গে তুলনার ফলে শুধু ভ্র অর্থেও এর প্রয়োগ পাওয়া যায় প্রাচীন কাব্যে—বধা, ‘দশনে অধর চাপে খেঁচিয়া কামান’। আধুনিক বাংলায় কিন্তু ঐ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ নেই। ইংরেজী ‘cannon’ শব্দের সঙ্গে ধ্বনি সামোর ফলে এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ‘তোপ’। ইংরেজ আমলের আগে ‘cannon’ অর্থে ‘তোপ’ শব্দই বাংলা তথা হিন্দীতে প্রচলিত ছিল। হিন্দীতে আজও কমান্ এর অর্থ ধনুক (বধা তীর-কমান্); cannon অর্থে তোপ শব্দই ঐ ভাষায় প্রধানত প্রচলিত। বাংলায় ‘আয়াস’ এবং ‘আরাম’ দুটো শব্দ চলতি আছে। অনেক সময় দেখা যায় বিশিষ্ট লেখকরাও এ দুটির প্রয়োগে তুল করেন। শব্দ দুটি আকার এবং ধ্বনির দিক থেকে কতকটা অনুরূপ হলেও আসলে ওরা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণের শব্দ। প্রথমটি সংস্কৃত, অর্থ—ক্লেশ, প্রমত্ত; দ্বিতীয়টি আরবী অর্থ—আরাম। ‘আরাম’ অর্থে আরামের প্রয়োগ সাহিত্যরচয়ীদের রচনাতেও বিরল নয়। দৃষ্টান্ত :—‘সিপাইবাহাজীরা যখন বিপ্রাহরিক (?) আরাম উপভোগ করেন...ইত্যাদি। আরাম থেকে আসে আরাম এবং তার থেকে নিদ্রা।’ (লৌহ-কপাট, দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ৩১)। ‘আভাস’ ও ‘আভাষ’ শব্দ দুটিরও অপব্যবহার প্রায়ই চোখে পড়ে। আভাস—[আ+ভাস (দীপ্তি পাওয়া) অচ] শব্দের অর্থ দীপ্তি, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, ইঙ্গিত (তুলনীয় বসভাস, হেতভাস)। ভাষ খাত্ত (অর্থ বলা)-নিম্ন গোপাল শব্দের অর্থ আলাপ, সম্ভাষণ, ভূমিকা, যুগবদ্ধ শব্দ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। দুঃখের বিষয়, প্রথমটি অর্থে দ্বিতীয়টির প্রয়োগ সাম্প্রতিক সাহিত্যে এক রকম নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তুলনা-নির্দেশক ‘তর’ প্রত্যয়ের স্থলে ‘তবো’ লেখা অসঙ্গত। অথচ আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনার এটা একটা ক্যানন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘কেমনতরো’, ‘নানানতরো’

ইত্যাদির 'তরো' আবহী তবহ শব্দ থেকে এসেছে; অর্থ রকম, প্রকার।

একত্র শব্দটি অব্যয়, অর্থ এক সঙ্গে (সুত্র সপ্তম্যাঙ্কল), সুতরাং 'একত্রিত' লেখা অনাবশ্যক ও অপ্রায়, অথচ মূখ্যের ও লেখার ভাবায় শব্দটির 'হরিয় লুট'। 'শ্রদ্ধাম্পাদ' শব্দটিরও খুব চল, 'শ্রদ্ধাই' কোন মহিলা সম্বন্ধে আমরা শব্দটি খুবই ব্যবহার করি; কিন্তু 'আম্পাদ', ভাজন, প্রমাণ প্রভৃতি শব্দগুলি অজহলিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গভেদে এদের রূপভেদ হয় না। পুত্রে কোন মহিলাকে সম্বোধন করবার সময়ও 'শ্রদ্ধাম্পাদ' না লিখে 'শ্রদ্ধাম্পাদেবু' লেখাই বিহিত। 'বয়স হয়েছে বার' এই অর্থে বয়স্ক লেখা ভুল; সমাসের উত্তর পদ হলেই কেবল 'বয়স' প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'কপ' প্রত্যয় হত, যেমন সমান-বয়স্ক, অল্প-বয়স্ক। অসমস্ত অবস্থায় বয়স্ক বা বয়ঃস্থ দিয়ে কাজ চালান যেতে পারে। সহকর্মী বা সহযোগী অর্থে 'সতীর্থ' শব্দটিও দিবি চলছে আজকাল; অথচ ওয় অর্থ 'সমান তীর্থ বা গুরু বাদে' অর্থাৎ সহপাঠী। পারিনিমিতে শব্দটির বানান হওয়া উচিত সতীর্থ; (এই প্রসঙ্গে 'সমান-তীর্থ বানো', 'তীর্থ যে' প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)। ক্রীড়া-সাংবাদিকদের কুপায় 'পেশল' শব্দটি (মাংসল শব্দের সাদৃশ্যে?) 'পেশীবহুল' অর্থে এতই প্রসার লাভ করেছে যে শব্দটির প্রকৃত অর্থ যে সুকুমার, মনোহর একথা অনেকেই অজানা হয়ে গিয়েছে। উপাদান অর্থে অবদানের, দক্ষিণীয়ে স্থলে বক্ষরিত্রীয়ে (শিক্ষরিত্রীয়ে সাদৃশ্যে) ব্যবহারও বিদ্যমান। তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এই শৈল্পাচার কখনই উপেক্ষণীয় নয় এবং পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হবার আগেই বাশ টেনে খবার প্রয়োজন আছে।

সন্ধির নিয়ম অনুসারে অন্তস্থ 'ব' এর আগের 'ম' 'ং' হয়ে যায়। অনেক সময় অনবধানতাবশত এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়, অর্থাৎ কিবা, সম্বাদ, সম্বং, বাব্বাব, বশ্বদ, প্রিয়বনা প্রভৃতি লেখা হয়। বাংলার অন্তস্থ 'ব' এর বিশিষ্ট উচ্চারণ না থাকায় এই জাতীয় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে বিবর্ত-বিধি থাকলে ভাল হয়; অথবা বগীয় 'ব' এর বেলায় সংস্কৃতে বিবর্ত-বিধি থাকায় 'ব' এর পূর্বে সর্কাজ 'ং' লিখলে ভুলের হাত সহজেই এড়ান যায়।

সর্কান-ব্যবহৃত কয়েকটি তৎসম শব্দের বর্ণান্তরিত্য নমুনা नीচে দেওয়া হ'ল। তদুত্তর ও দেশজ শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাবে।

শব্দ	অন্তস্থ	বাক্যবিশিষ্ট
দুর্কিবহ	দুর্কিবহ	বাক্যবিশিষ্ট
আমুসজিক	আমুসজিক	"
পদ্বিহুট	পদ্বিহুট	"
সর্কাজী	সর্কাজী	বাক্যবিশিষ্ট
রুগুণ	রুগুণ	"
পূর্কাকু, অপরাহু	পূর্কাকু, অপরাহু	"
রুগু	রুগু	শব্দ শব্দের সাদৃশ্যে
বিকিরণ, উৎকিরণ	বিকীরণ, উৎকীরণ	বিকীরণ, উৎকীরণ শব্দের সাদৃশ্যে

ওতপ্রোত	"	ওতঃপ্রোত	উচ্চারণ বিকৃতি হইতে
আপাতদৃষ্টি	"	আপাতঃদৃষ্টি	"
মন্ত্রপুত	"	মন্ত্রঃপুত	"
প্রাতঃরাশ	"	প্রাতঃরাশ	"
পাশ্চাত্য	"	পাশ্চাত্য	'দক্ষিণা-পশ্চাৎ-পুর্বোভ্যন্তায়' সূত্র দ্রষ্টব্য
তাজা, পরিতাজা	"	তাজা, পরিতাজা	ল্যপ নিম্ন
(তাজ-পাং)	"		পরিতাজা শব্দের সাদৃশ্যে
ভৌগোলিক, পৌরোহিত্য	"	ভৌগলিক, পৌরোহিত্য	"
প্রনষ্ট	"	প্রগষ্ট	'নশে: বাস্তস্ত' সূত্র দ্রষ্টব্য
নির্নিমেষ	"	নির্নিমেষ	"
বিকসিত	"	বিকশিত	"
ভাণ	"	ভাণ	(ভুল, কপটতা প্রভৃতি অর্থে)
কুংসিত	"	কুংসিত	"
উচিত	"	উচিৎ	"
অদুত (অং-ভা-+দুতচ)	"	অদুত	ভূ-ধাতু-নিম্ন 'ভূত' শব্দের সাদৃশ্যে
পৈতৃক	"	পৈত্রিক	তদ্বিত্ত বিধির বিরুদ্ধতা
সম্ভাবনা	"	সম্ভবনা	"
বক্তব্য	"	বাক্তব্য	"
লক্ষণীয়	"	লক্ষণীয়	"
অপশ্রিয়মাণ	"	অপশ্রয়মান	"
অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষমাণ	"	অপেক্ষমান, প্রতীক্ষমান	"
			• গড়বিধির বিরুদ্ধতা
চুয়া	"	চোয়া	"
দুষণীয়	"	দোষণীয়	"
কার্তিক, বার্তিক	"	কার্তিক, বার্তিক	(বার্তাবাহক অর্থে শুদ্ধ)
ইয়তা, আরত	"	ইয়তা, আরত	"
সত্তা, সত্ব	"	সত্তা বা সত্ব, সত্ব	"
সত্ব (স্বামিত্ব অর্থে)	"	সত্ব বা সত্ব	"
পক (পচ-স্ত)	"	পক	"
ঐশ্ব	"	ঐশ্ব	"
প্রজ্বলিত	"	প্রজ্বলিত	উচ্চারণের সাদৃশ্যে
কজ্জল	"	কজ্জল	"
আকাঙ্ক্ষা	"	আকাঙ্ক্ষা	"
কোদিত	"	খোদিত	"
উহ	"	উহ	"
স্বত-উৎসারিত	"	স্বতোৎসারিত	সন্ধিবিধির বিরুদ্ধতা
সজোজাত, সজ-উখিত	"	সজোজাত, সজোখিত	"
মনঃকষ্ট	"	মনোঃকষ্ট	"
সমীচীন	"	সমীচীন বা সমীচীন	"

মহীয়সী	„	মহীয়সী
কুল (ভট, তীর)	কুল	বংশার্ণক কুল শব্দের সঙ্গে গোলযোগের কলে
আকৃতি	„	আকৃতি
দূর্বা, স্থপ	„	দূর্বা স্থপ
তুলি, তুলিকা	„	তুলি, তুলিকা
কৌতুহল	„	কৌতুহল

কৌতুক শব্দের সাদৃশ্যে

র-ড় এর গোলযোগ এবং অমুনাসিকের (চন্দ্রবিন্দুর) যথেষ্ট প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তা ছাড়া অমুনাসিকের ব্যাপারে ঐকমত্যেরও অভাব আছে, যেমন, নিক্ষেপ অর্থে ছোড়া, ঢোঁড়া, অলস অর্থে কুড়ে কুঁড়ে, বিন্দু অর্থে কোঁটা কোঁটা ছেরেই ব্যবহার আছে; আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুসারে খোপা খোপা, বোজা বোজা তটরপট সাহিত্যে চলছে।

যে ভূসংলি সংবাদপত্রে ৬ সাহিত্যে সর্বদা চোখে পড়ে উপরে তারই একটি তালিকা দাখিল করা গেল, বলা বাহুল্য এটি সম্পূর্ণ নয়। এই জাতীয় কোন তালিকাটি সম্পূর্ণ হতে পারে না; আর আমার উদ্দেশ্যও নয় তুলে কিংবদন্তি সামনে ধরে পাঠকদের বৈধাঙ্গ্যতা ঘটান। পদ-প্রয়োগের শিথিলতা আধুনিক সাহিত্যে এত ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যে, সময়োচিত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা ভাষা-শিক্ষক হিসাবে আমার পবিত্র কণ্ঠব্য বলে আমি মনে করি। নতুবা কেবল উপদেশকের উচ্চ মঞ্চে চড়ে বিক্রম-বাণ বধণ করা আমার অভিপ্রায় নয়। ইংরেজির অনুকরণে অনেক

নতুন প্রয়োগ-রীতি আজ ভাষায় প্রবেশ করেছে। দৃশ্যে বহু বয়ে যে ভাষা আমাদের উপর আধিপত্য করে আসছে তার প্রভাব আশা-দেব ভাষায় কিছুই পড়বে না এ কথাই সম্ভব নয়; কিন্তু তাই বলে অন্ধ অনুকরণও বাঞ্ছনীয় নয়। বেহিসাবী গ্রন্থে ধনের পরিমাণই বেড়ে যায়, ভাষার সমৃদ্ধি বাড়ে না। এই প্রসঙ্গে একজন বিদ্বত সাহিত্যিকের লেখা থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই:—‘এক সেকেণ্ড পূর্বে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যে’—‘স্বপ্নের জাগরণ’, বৃন্দাবন বসু, শারদীয় ‘ধূপছায়া’ ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ৫০)। এরূপ প্রয়োগে ইংরেজী-রীতির গন্ধ একটু উগ্রভাবেই ফুটে উঠে; পরক্ষণেই ‘আমি ঘরে ঢুকলাম’ বললেই খাঁটি বাংলা-রীতিসম্মত হ’ত না কি? ‘এই লেখকের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে।’ এই ধরনের উক্তি প্রায়ই চোখে পড়ে। স্পষ্টতই এখানে প্রতিশ্রুতি শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ইংরেজী ‘promise’-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, কিন্তু ‘promise’ শব্দটির অধ্বন্যগত অর্থ কি এখানে ‘অঙ্গীকার’? এ সব স্থলে লেখা উচিত ‘সম্ভাবনা’। কিন্তু কে অতশত চিন্তা করে, কেই বা কার কড়ি ধারে? কাজেই ভাষার দাঙোও ‘স্ব-বাক্য’ চলতে থাকুক। যেরূপের নাম বাধবার মত জীলজ শব্দের কি অভাব আছে আমাদের ভাষায়? তবুও খাঁটি পুংলিঙ্গ-শব্দ ‘সবিতা’, ‘নীলিমা’ প্রভৃতির প্রতি কেন এই অকারণ পক্ষপাত? মোট কথা, শিক্ষানবিশীর শ্রম স্বীকার না করেই সাহিত্যের আসরে নামার মান্ডল আমাদের দিতেই হবে। এ আমাদের বিধিলিপি।

## ধূসর গোধূলি

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

তবে তাই হোক।

এ’দিকে রাত্রি ছায়া অজহীন আঁধারে মিলোক।

দেখছি অজস্র দিন রৌদ্রময় উজ্জল মণ্ডর

তবু কি শ্রান্তির ভাবে গন্ধ তার ব্যাঘ্র বিধুর।

কি নিজন বেদনায় আকাশের সায়াহু ছায়ায়

মিলায় গোধূলিহেম। রাত্রি নামে; দিন খেমে যায়

বিবর্ণ বিষম স্নান জীবনের ভাবে;

অহনিশি সংগ্রামের ব্যর্থতার ক্ষুদ্র বায়ে বায়ে।

তবে তাই হোক।

তোমারে বিদায় দিই। জীবনের গোধূলি আলোক

নিঃশব্দে নিভিয়া যাক প্রসারিত সন্ধ্যার অন্ধনে।

তারপর পুঞ্জীভূত তমিস্রার একাকার রাতে

আমার সমাধি আমি গড়ে নিই আপনাব হাতে।

একান্ত নিবিড় রাত্রি;

আমি যাত্রী

একাকার ছায়া অন্ধকায়ে।

আকাশের শূন্যতার পানে

আমি শুধু মুছে যাই জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থতারে ॥



# লালমহা

শ্রীকৃষ্ণভট্ট

২৪

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিত্রা ফিরে এল। সঙ্গে কেউ এসেছে ট্রে নিয়ে।

মিত্রা বলল, খান কয়েক পেট্রি শুধু এনেছি। চা অ'র এখন দেব না। কোকো খান। কথার কথার আজ আপনাব বড় দেখি হয়ে গেল।

কেউ টিপসের উপর ট্রে বেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

অতঃ বলল, সেজন্য তুমি দায়ী মিত্রা।

মিত্রা একটু হেসে কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, আমার দোষ হয়ে গেছে মেনে নিলাম। এবারে দয়া করে আপনি আরও করুন।

অতঃ খেতে খেতে বলল, আজ, কেউ হঠাৎ তোমার এমন ভক্ত হয়ে উঠল কেনন করে বলতে পার মিত্রা?

জবাব না দিয়ে পাণ্টা প্রসন্ন করে মিত্রা, হয়েছে নাকি?

অতঃ বলল, কেন, বুঝতে পার না তুমি?

পারি। মিত্রার কঠোর সহসা গাঢ় হয়ে উঠল। বলল, সত্যিকারের প্রভুভক্ত বলেই শত্রুমিত্র চিনতে ভুল করে না।

অতঃ সত্যি বলল, এক সময় কিন্তু তোমাকে চোখে চোখে রাখত আর সুযোগ পেলেই চীৎকার করত।

নিতান্ত সহজ কণ্ঠে মিত্রা জবাব দিল, আজ আর বলতে বাধা নেই অতঃবাবু। চীৎকার করে কিছু অজায় করত না। আপনার আশে-পাশে জনকয়েক লোক সব সময় জেগে ছিল, আর আঁকে বলেই আজও আপনার মাথা উচু করে চলবার পথ আছে। আর আমিও নিজেই কতকটা সুযোগ পেয়েছি।

অতঃ পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, সুযোগ কে কাকে দিয়েছে ওটা তর্কের বিষয়। কিন্তু মাথা উচু করে চলার অর্থটা ঠিক বোঝা গেল না মিত্রা। তুমি কি আমাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছ?

মিত্রা উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল, আমার হৃৎস্পন্দে, আঘাত করার কথাটা আপনি ভাবতে পারলেন। অবস্থার গুরুত্বটা বোধ হয়, আপনি বুঝতে পাবেন নি, তাই এ কথা বলতে পারলেন।

অতঃ বলল, অবস্থার গুরুত্ব বুঝেও আমি সত্যো হেড়েছি

মিত্রা। এত খেলো তাই মুখ থেকে তুমি বঁড়িশি খুলতে পারছ না।

একটুপানি চূপ করে থেকে মিত্রা জবাব দিল, তা হয়ত পারি নি, কিন্তু শিকারীকে জলেও নামিয়েছি আর লাজের ঝাপটাও ঘেয়েছি। এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

তবে প্রাণে মারতে পার নি। অতঃ পরিস্থিতি করে বলল।

মিত্রাও রহস্য করে বলল, হতমান করতে পেরেছি ত?

তা পেয়েছে। অতঃ জবাব দিল, আর এইটাই ত আমারও ঐশ্বর্য, কিন্তু তোমার আঁত কি হয়েছে বল দেখি মিত্রা? একবার বলছ মাথা উচু করে চলতে পারছি অ'বার বলছ হতমান হয়েছি, তোমার কোন কথাটা সত্যি?

মিত্রা সহজ গলায় বলল, দু'টোই সত্যি অতঃবাবু। যে আপনাকে জলে নামিয়েছে আপনি তাকে ডাঙর তুলেছেন। আপনারই সেবার সে দিয়ে বলল তার প্রাণ। যে জানে আপনার জলে নাহার ইতিহাস তার মুখ ত চিরদিনের জল বন্ধ হয়ে গেছে।

অতঃ মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, মেয়েদের চরিত্র হচ্ছে, এটা স্বীকার। ও জনবীর আমার আগ্রহ নেই তাই বলে কথাগুলো এমন দুর্বোধ্য হবে কেন? আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

মিত্রা গম্ভীর অবগতপূর্ণ কণ্ঠে বলল, সেই ভয়েই মূল্যে ভরতি পেয়েও তা গ্রহণ করতে জানেন না। মূল্য দিতে পাবেন না।

অতঃ বলল, মূল্যে ভরতি ছাড়াই পেলেও তাকে মূল্য দিতে হবে মিত্রা?

মিত্রা গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, আন্তর্কৃৎ কেলে দেবার আগে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে দেখ কি? ছাইয়ের তলার মশি-মুন্ডাও পাওয়া যেতে পারে।

অতঃ বলল, এত ঘুরিয়ে কথা বল কেন মিত্রা? আর একটু সহজ-সরল ভাষায় বলতে পার না?

মিত্রা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, পারি। তবে সকলে যে সহজ-সরল কথা সহ্য করতে পারে না অতঃবাবু। আপনিও পারবেন না।

খানিক মিত্রার মুখের পানে অমুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অতনু বলল, আর একটু সহজ করে বল।

মিত্রা বলল, রাততপ্তে একজন যুবতী সুন্দরী জীলোকের ঘর থেকে স্বামীকে বার হয়ে আসতে দেখলে কোন জীই চূপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু তারই অভিযোগের পাণ্টা জবাব দিতে গিয়ে সেই জীব চরিত্রের উপর অকারণে যদি দোষাবোপ করে বাক্য করা হয় তা হলে—

ধাম মিত্রা—অতনু ধর্মকের সুরে চীৎকার করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সে তার অতীতে ফিরে গেল।

মিত্রা জবাব দিল, সশকথা সহজভাবে বললে আপনার ভাল লাগবে না বলায় অমুযোগ দিয়েছিলেন না অতনু বাবু?

অতনু ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে।

মিত্রা কিন্তু ধামতে পারল না। বলে চলল, আপনি অনেক বোঝেন, কিন্তু এই অকিঁ সখ্যবণ কথাটা কেন বুঝতে চান না আমি জানি না। মন্তব্য সব সময়ই মাহুয। গ্রহের ক্ষেত্রে আপনি ওখানে আমি এখানে। তারই জোরে আপনি আমাকে গরু-ছাগল মনে করতে পারেন না। মনে করা উচিত নয়।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, শ্রীমতী কি তোমাকে-  
কিঁল নিবৃত্ত করে গেছে মিত্রা দেবী?

মিত্রা শান্তভাবে জবাব দিল, এ আপনার অশ্রদ্ধার কথা অতনু বাবু। মনটাকে আর একটু উদার করবার চেষ্টা করুন। দেখবেন অনেক সমস্যাই কত সহজ হয়ে যাবে।

একটু ইতঃস্তম্ভ করে অতনু বলল, শ্রীমতী পুরোপুরি মেয়ে নয়—

মিত্রার বিষয় সীমা হাড়িয়ে গেল। বলল, এমন উদ্ভট কথা কখনও শুনি নি আমি। একজন মেয়ের সম্বন্ধে অপর একটি মেয়ের কাছে এই ধরনের কথা আর কোনদিন আপনি বলবেন না। আপনার আসল বক্তব্যটা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি শুধু খেলাতেই ভালবাসেন না—খেলেও আনন্দ পান। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে যে ঐ একটি বিশেষ বিন্দুতে সীমাবদ্ধ নয় অতনু বাবু।

অতনু চূপ করে আছে।

মিত্রা বলে চলেছে, আপনার জী অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে এই ধরনের খেলোয়ারী মনোবৃত্তিকে সম্ভবতঃ কোন দিন আমোল দিতে পারেন নি, তাই পুরোপুরি পেয়েও আপনার মন ভরে নি।

অতনু তথাপি নীরব।

মিত্রা বলতে থাকে, আগের দিনে ঘেরেরা স্বামীর কাছ থেকে সন্তান পেলেই ভালবাসার চরম পুরুষের পেয়েছে মনে করতে বিধা হয় না, কিন্তু আজ আর এইখানে এসেই তারা ধামতে পারে না। দেহ এবং মন দুটোই তাদের সজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে। এর কোনটাকেই আর উপেক্ষা করা চলে না।

এতক্ষণে বিধাতার অতনু খেমে খেমে জবাব দিল, তোমার কথাগুলো কি নিতান্তই এক তরকা হয়ে যাচ্ছে না মিত্রা?

মিত্রা বিধাহীন কণ্ঠে জানাল, না অতনু বাবু। এটা হ'ল নিছক পরস্পর পরস্পরকে বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ। এই প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে দরদ দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে দেহ আর মন কোনটাই উপবাসী থাকে না।

অতনু ধীরে ধীরে বলে, তোমার কথাগুলি কিছু কিছু বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে। আরও একটু সহজ করে বলবে কি?

মিত্রা একটু হেসে বলল, মিথ্যা বাদপ্রতিবাদ করে সব কিছুকে লম্বু করে দেখবার চেষ্টা করেন বলেই সহজটাও আপনার কাছে সহজ মনে হয় না। কথাটা আপনিও জানেন আর আপনার জীকেও জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদের মধ্যের প্রকৃত ব্যবধানটা। তাই তিনি চাইলেও আপনি সম্পূর্ণ এগিয়ে যেতে পারেন নি। আপনার অশ্রদ্ধার আপনাকে এগোতে দেয় নি। উপরন্তু খোঁচা দিয়ে তাঁর উপবাসী মনটাকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছেন—

অতনু যেন স্তম্ভিত হয়ে উঠল, মিত্রা—

মিত্রা ধামতে পারে না। কতকটা যেন নেশার খোঁকে সে বলে চলেছে, অস্বীকার করতে পারেন এ সব কথা? অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে, একদিন আপনিই তাঁকে উপবাসী করে দিয়ে রেখেছেন।

অতনু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি কি চাও মিত্রা—

অতনুকে সম্পূর্ণ অগ্রহ করে মিত্রা বলতে থাকে, আপনার চোখে না পড়লেও আমার দৃষ্টিকে তিনি লাকী দিতে পারেন নি। আপনার এই ধরনের ব্যবহারকে তিনি শুরুতে উপেক্ষা করে চলবার চেষ্টাই করেছেন। মিথ্যা বলব না—প্রথম প্রথম আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এ তিনি কবছেন কি? কেন তিনি বিজ্ঞোহ ঘোষণা করছেন না এত বড় অসম্মানজনক অজ্ঞার বিরুদ্ধে?

অতনু ক্রান্ত গলায় বলল, তোমার মতে আমি আগাগোড়া শুধু ভুল আর অজ্ঞায়ই কবছি?

মিত্রা জবাব দিল, গোড়ার কথা আমি জানি না অতনু বাবু। আমার বতটুকু চোখে পড়েছে সেইটুকুই আপনাকে বললাম। আপনিই ভাবুন দেখি, কতবড় অজ্ঞার আর নোড়রা কথা স্বামী হয়ে জীকে বলেছেন? এর পরে কোন জী মুখ বুজে থাকতে পারে?

অতনু ধীরে ধীরে বলে, তুমি ত স্বামীর জী নও মিত্রা!

মিত্রা খানিকটা ধর্মকের সুরে বলল, ধামুন অতনু বাবু। মা হয়েই ঘেরেরা মায়ের পেট থেকে জন্মায় না। তাই বলে তাদের পুতুল খেলার মায়ের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয়কে নিছক অভিনয় মনে করার পিছনেও কোন যুক্তি নেই।

কাতর কণ্ঠে অতনু বলল, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মিত্রা।

মিত্রা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু জ্ঞানপাপী নই অতনু বাবু।

অতনু মুহূর্তে বলল, বত কথা আজ তুমি আমাকে শোনালে তা আমার মনে থাকবে মিত্রা। কিন্তু শ্রীমতীকে নিয়ে এতটা

বাড়াবাড়ি করবার যে তোমার কি উদ্দেশ্য তা আমি এখনও বুঝলাম না।

মিত্রা বলল, একটুও বাড়িয়ে বলিনি। বা আমার মনে হয়েছে আমি একপটে তা প্রকাশ করেছি। তা ছাড়া এতে আমার লাভ কি?

অতঃপূর্বে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সেটা তুমিই ভাল জান। কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশ্যটা সত্যিই বুঝতে পারি নি।

মিত্রা বলল, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে—আমার বা মনে এসেছে বলে গেছি। যদি মনে করেন এ সব ভিত্তিহীন কথা, তা হলে তুলে বাবেন। আমরা ইতর জন, চাকরিটি বজায় থাকলেই সুখী হব।

মিত্রা দুইতর জগৎ থেকে পুনরায় অল্প প্রসঙ্গে এল, বলল, আচ্ছা অতঃপূর্বে, আপনাব জী যদি এখন কিবে আসেন তা হলে কি করেন?

অতঃপূর্বে ধীরে ধীরে বলে, শ্রীমতী খুব সহজে আসবে বলে আমার মনে হয় না।

মিত্রা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তাঁর সম্বন্ধে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত কোন যুক্তিতে করে বসেছেন আমি বুঝি না অতঃপূর্বে?

অতঃপূর্বে বলে, ওটা আমার বিশ্বাস।

মিত্রা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আপনাব তুল—আপনাব জীকে আসতেই হবে। তাঁর নিজের জন্ত না হলেও অন্ততঃ সম্ভাবনের মঙ্গলের জন্ত—অতঃপূর্বে বসে ছিল। সহসা সোজা উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কি পাগলের মত বকছ মিত্রা—

মিত্রার বিষয় সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে বোকার মত খানিক অতঃপূর্বে মুখের পানে চেয়ে থেকে হতাশ কণ্ঠে বলল, আপনাকে আমার আর বলবার কিছু নেই। আপনি আমার চেয়েও দুর্ভাগা অতঃপূর্বে।

অতঃপূর্বে জবাব দিতে পারেন না। তার কথা হারিয়ে গেছে।

২৫

অকস্মাৎ ঠাকুরদার উপর অতঃপূর্বে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। মিত্রার কথাগুলি যুক্তি-বিচার দিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বারে বারেই তার মন বলেছে যে, সে হয় ত মিথ্যা বলে নি। তার জীবনের এতগুলি বছর যে পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছে তার হৃদয়ে অতঃপূর্বে অনেক ফুল কোটাতে পারত। কিন্তু তা সে করে নি। করবার কথা একবারও মনে হয় নি। আত্মচিন্তার নিয়ম ছিল। যে চিন্তা শুধু দেহকে কেন্দ্র করেই বাস্তব রূপ নিয়েছে। ভেঙেছে অনেক, ছিঁড়েছে প্রচুর। এ পথে যে আনন্দ সে পেয়েছে তা শুধু তাকে উদ্বাস করে তুলেছে। ঠাকুরদা তাকে হৃদয় ভরে নিতে শিখিয়েছিলেন, দিতে নয়। চিরদিন পেয়ে পেয়ে অতঃপূর্বে মনের একটা দিক প্রায় মরে যেতে বসেছিল। শ্রীমতীই তার জীবনে প্রথম মেয়ে বার হাতের সোনার কাঠির ছোরা লেগে সে ঘুম ভেঙে জেগে

উঠে হৃদয় বাড়িয়ে বলেছিল, আমাকে গ্রহণ কর। শ্রীমতী নিলে—নিজেকেও উজাড় করে দিলে। এত দিনের ঘুম-জড়ান চোখে সে চিনতে কল তুল। শ্রীমতী কল্পনার রাজকন্যা নয়। একজন নারী। তার রূপ আছে, শক্তি আছে। অতঃপূর্বে সময়ের জগৎ নিজেকে আদর্শ পুরুষরূপে ফিরে পেল। যে পুরুষ নারীর কাছে থবা দেয় নিজেকে নবরূপে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায়। ছয় ছাড়া অতঃপূর্বে শ্রীমতীকে ঘরে নিয়ে এল গৃহস্থান্তরীকরণে।

কিন্তু লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পরিচল্ল মন আবার নতুন করে অন্ধকারে বিপথগামী হ'ল। আবির্ভাব ঘটল মিত্রার। আবির্ভাব বললে ভুল বলা হবে। একলা বিপদাপন্ন অবস্থার পেয়ে আশ্রয় দেবার নাম করে অতঃপূর্বে দুদো পোষা নেকড়ে তাকে নিয়ে এল তার বিশ্রামকুঞ্জে। অতঃপূর্বে চোখে তপন টানাদ নেশা। ঘরের মধ্যে মিত্রা একলা দাঁড়িয়ে। আর দোরগোড়ায় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ডানকান আর আগারওয়ালা। অতঃপূর্বে চোখ তুলে তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কঁকড়ে গেছে, কিন্তু চোখে দুদো জলছে। অতঃপূর্বে চমকে উঠল। তার মনের অসংবত মত্ততা কেটে গেছে। আশ্চর্য! ঐ দুটো অদ্ভুত জলন্ত চোখের মধ্যে শ্রীমতী এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। তাতে তার সেদিনের সেই সোনার কাঠি, মুখে বিচিত্র একটুকরো হাসি। অতঃপূর্বে আর একবার চমকে উঠল। ওর দুটির সম্মুখ থেকে অন্ধকারের কাল বরনিকা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে আলোয় আলো হয়ে গেছে। সে আবার নতুন চোখে দেখল মিত্রাকে, দেখল নিজেই। অতঃপূর্বে সমস্ত সত্তা কঁপে উঠেছিল সেদিন। আর এক পা সে এগোতে পারেনি। একটা মিষ্টি সঙ্কোচ আর দ্বিধা তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়েছিল। অতঃপূর্বে ইঙ্গিতে মেয়েটিকে মুক্তি দেবার আদেশ জানাল। ডানকান আগারওয়ালা দূরে দাঁড়িয়ে মিত্রার বিব্রত আর বিপদ স্বপ্ন অবস্থা উপভোগ করছিল। হঠাৎ তাই জাগরুকের ভূমিকায় এগিয়ে এল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অতঃপূর্বে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাতল। কি সন্দেহ আর স্নিগ্ধ মনে হয়েছিল সেই আলোটুকু যে আলোতে সে দেখতে পেয়েছিল নান্দ্য অতঃপূর্বে। কিন্তু কোথায় শ্রীমতী! তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অতঃপূর্বে জীবনযাত্রার এই অন্ধকার পথের সন্ধান কেমন করে সে পেল? কেমন করে ঘটল তার আবির্ভাব? কে দিল এখানকার সন্ধান?

অতঃপূর্বে দ্বিধা বিভক্ত মনের আর এক দিক বিজোড় হয়ে উঠল তার জীবনের এই গোপন মহলে শ্রীমতীর প্রবেশ করবার দুঃসাহস দেখে, কিন্তু অপর দিক খুশি হ'ল আনন্দের আর একটি সহজ-সুন্দর পথের সন্ধান পেয়ে।

অতঃপূর্বে চলার পথে এই ধ্বননের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে আর হয় নি। অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করে অতঃপূর্বে। একটা অনাস্বাদিত পরিভূক্তির স্বাদ পেয়ে সে যেন জেগে উঠেছে। নিজের অন্তর্যাকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছাটা আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এখানে মিত্রা নয়, চিত্রা নয়, হেনা কিংবা সুচিত্রাও নয়—কাঁটা বনে চলতে-কিরতে তার দেহ থেকে অনেক বস্তুক্ষরণ হয়েছে, বিন্দু বিন্দু ভাঙা বস্তু। কিরে সে কিছুই পায় নি। শুধু মনের কোণে জড়িয়ে আছে খানিকটা স্মৃতি। অতৃপ্ত আনন্দের চঞ্চল অল্পভূতি মাগান শ্রুতি, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে দেহ। জর্জরিত হয়েছে মন। তবুও অতনু ধামতে পারে নি। ধামার কথা সে মনেও স্থান দেয় নি।

নতুন সস্তাবনার চিন্তায় অতনু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অনুবণিত হয়ে উঠেছে এক অপূর্ণ শব্দ! যে সুরে তাল আছে, মান আছে, লয় আর হৃন্দ আছে।

অতনু কিবে এল যবে, খুলে দিল স্বামী-স্ত্রীর দুই শব্দন কক্ষের মাঝে দমজাটা। তাজা ফুলের মধুর মদির মৌরভে ভবে গেছে তার মন। কোথাও এতটুকু অক্ষকারের মালিঙ্গ নেই। অতনু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আশে-পাশের সবকিছু। কাঁটা নেই—মৌরভ আছে। নরম একদাশ তাজা ফুল। তুলে নিল বৃকে। প্রাণ ভরে বেলা করল। ডুবে গেল গভীর থেকে আরও গভীরে।

কিন্তু তার মনের আর একটা দিক মেনে নিতে পারল না। এই নতুন ব্যবস্থাকে। স্তব্ধ মত আবার ঐ খেলা দমজা বন্ধ করে দিয়ে কানে তার বিপণিত বুদ্ধির বিষ ঢেলে দিল। অতনু চমকে উঠে। যে ফুল বৃকে তুলে নিয়েছিল তাকেই সে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। পা তুলে মাড়িয়ে দিতে উদ্ধত হ'ল। ফুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সাপ। দংশন করে না। শুধু হুঁচোপের বিষাক্ত দৃষ্টি দিয়ে একবার অতনুর সর্বাঙ্গ লেহন করে নিঃশব্দে দুপ ফিরিয়ে চলে গেল। সেই থেকেই অতনু ছটকট করছে অস্থিরে। দৃষ্টিতে যে এত বিষ থাকতে পারে ইতিপূর্বে ঠিক এ ভাবে সে কোনদিন অনুভব করে নি। এদে চেয়ে দংশন টের ভাল ছিল।

অতনু আবার অস্থির হয়ে পড়েছে। এ অস্থিরতা তার মনের। মিত্রা অনুযোগ দিয়ে বলে, আপনি দেখছি খুব ভেঙে পড়েছেন।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে অতনু জান কণ্ঠে বলল, মিথো বল নি মিত্রা। কথাটা আমিও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি। একের পর এক আমার সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে।

মিত্রা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, ঠাচ্ছে করলেই সে ভাঙন আপনি বোধ করতে পারেন।

বাধা দিয়ে অতনু বলল, না মিত্রা, ঠাচ্ছে করলেই মানুষ তা পারে না। অন্ততঃ আমি যে পারছি না তা ত দেখতেই পাচ্ছি। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মচকীতে পারছি না।

মিত্রা কোমল কণ্ঠে বলে, দয়া করে কয়েকটা দিন অন্ততঃ আপনার এই চিন্তাগুলো ছাড়ুন। শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিন।

অতনু বলল, বিশ্রাম কি কিছু কম নিচ্ছি মিত্রা? কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে সে বিশ্রাম উপভোগ করা আমার ভাগ্যে নেই,

তোমরা সকলে মিলে এ আহার কোথার নিয়ে এলে বল দেখি। বেশ ছিলাম আমি।

মিত্রা নরম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কোন জবাব দিতে পারে না।

অতনু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, অতনু কোনদিন তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করে নি। করতে সে জানত না।

মিত্রা ভিজ়ে গলার জবাব দেয়, আপনি আমাকে কমা করুন অতনু বাবু।

একটুখানি হেসে অতনু বলে, কমা কে কাকে করবে আমি বুঝি না মিত্রা। নিতে হলে কিছু দিতে হয়, এই চিরদিনের সত্যটা তুমি আমাকে শিখিয়েছ। শ্রীমতীও চোঁটা করেছিল, কিন্তু তার হাতের মুঠি দৃঢ় ছিল না। আমার গতিবেগ তাই আয়ত্তাবাহীনে বাধা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

মাথা নেড়ে মিত্রা বলল, ভুল বললেন। আসলে শ্রীমতীই আপনার বেপথু মনটাকে তৈরি করে দিয়েছেন, নইলে মিত্রার দ্বারা কিছুই হ'ত না। কিন্তু এসব কথা আপনার কাছে কে শুনতে চাইছে? আপনি এবারের চূপ করুন।

অতনুর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনা। সে বলতে থাকে, আমাকে বাধা দিও না। কথা বলতে দাও। জান মিত্রা, আজ ক'দিন ধরেই আমি তোমার মতো শ্রীমতীকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমার জীবনপথে তুমিই একমাত্র মেয়ে যে অজ্ঞান আঘাতে ভেঙে পড়ে নি বরং নিঃশব্দে বৃক বেঁধেছে সেই আঘাতকে কিরিয়ে দেবার ভঙ্গ। যে দেহটাকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে এত জঞ্জাল জড়ো হয়েছিল সেই দেহকে কেন্দ্র করেই জঞ্জাল সাক করতে লেগে গেল। মনে মনে বললাম, সাবাস। অথচ এমনি যজ্ঞ যে, তোমাকেই জড় করবার জ্ঞান সেই জঞ্জালের মধ্যে সন্ধানপনে ছড়িয়ে দিলাম প্রচুর ভাঙা কাচ। তখন কি একবারও ভাবতে পেরেছি যে, সেই ভাঙা কাচগুলি একদিন আমার বৃকেই এ ভাবে বিধবে!

মিত্রা কাপা গলার বলল, আমিও রেহাই পাই নি অতনু বাবু। আমারও সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। খেলাটা সব সময় খেলা থাকে না বলেই সংসারে এত হুং অতনু বাবু। কিন্তু এই হুংখের মধ্যে শুধু বেদনা নেই বলেই এ খেলা খেয়ে যায় না।

অতনু বলে, তোমার এ কথার মানে?

মিত্রা হঠাৎ অনেকখানি সাবধান হয়ে উঠল। বলল, কেন আবার—মানুষের হুংখের কখন মানুষকে উল্লাস করতে কি আপনি দেখেন নি? সেও ত এক ধরনের আনন্দ।

অতনু চূপ করে থাকে।

মিত্রা বলতে থাকে, এই দেখুন না—নিছক খেলা করবার জগতই মিত্রাকে আপনি এ বাড়ীতে দিলেন আশ্রয়। শ্রীমতী কিন্তু

এসেছিলেন সহৃদয়ী পদমধ্যাদা নিয়ে—তিনি থাকতে পারলেন না। কিন্তু থাকে খেলার পুতুল হিসেবে—

কথাটা শেষ না করেই মিত্রা থামল।

অতঃপূর্ব গভীরভাবে বলল, থামলে কেন, বল।

মিত্রা মুহূর্তে বলল, তার পথের কথা আপনার অজানা নেই অতঃপূর্ব।

অতঃপূর্ব বলল, অর্থাৎ তোমাকে খেলিয়ে পেতে চেয়েছিলাম আনন্দ। কিন্তু শ্রীমতীকে দুঃখ দিয়ে কি পেতে চেয়েছিলাম বলবে কি?

মিত্রা সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই ছিল। হয়ত ধরনটা ছিল আলাদা।

অতঃপূর্ব বলে, হয়ত তোমার কথাই ঠিক। খেলা সব সময় খেলা থাকে না বলেই এত দুঃখ, এত আনন্দ। শ্রীমতীকে দুঃখ দিতে আমি চাই নি। কিন্তু সে পেল দুঃখ। তোমাকে নিয়ে এলাম দুঃখের আঘাতে ভেঙে গুড়ো করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। হয়ত এমনি করেই মানুষকে শিখতে হয়। নইলে শ্রীমতীর জন্ত আমার মনের এ আকুলতা কেন, আবার তোমার কথা ভেবেই বা এমন ব্যাকুল হয়ে উঠছি কিসের জন্ত?

অতঃপূর্ব কথা বলার ধরনটা আজ এলোমেলো। মিত্রা সাবধানে এগোতে চাইছে। সে মুহূর্তে বলল, আমার কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনার জীবন আর একটু তলিয়ে দেখা উচিত ছিল। আর শানিক ঐখ্যে ধরলে ভাল করতেন।

অতঃপূর্ব সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, না মিত্রা, তাতে অতঃপূর্ব কোন স্নেহ চৈতন্য হ'ত না। তার অহঙ্কার আরও বেড়ে যেত। বড় আঘাতেই বড় পরিবর্তন ঘটে।

মিত্রা বলল, এত ভালবেসেও তাকে ধরে রাখতে পারলেন না।

অতঃপূর্ব মুখে শূন্যর শানিকটা হাসি দেখা দিল। বলল, খানেও সন্দেহ ছিল মিত্রা। শ্রীমতীরও ছিল, আমারও ছিল। শ্রীমতীর জন্ত আজ আমি আর ভাবছি না, আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে। এই ভাবনাগুলি সত্যিই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে—

সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল মিত্রা। হাসির শব্দে অতঃপূর্বকে গুঁে। তার মনের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়। বিব্রত-ভাব করে।

মিত্রা বলে, হঠাৎ আপনার দুঃখের সাগর এমন করে উথলে উঠল কেন অতঃপূর্ব। আপনি এমন ত কোনদিন ছিলেন না?

অতঃপূর্ব জান হেসে জবাব দেয়, নিজে দুঃখ না পেলে অপরের ঐ অমুভব কথা যে সম্ভব নয় মিত্রা—

মিত্রা কতকটা বহুস্তর ছিল বলল, আজকাল তা হলে অমুভব তে পারছেন? কিন্তু সত্যিই কি এটা আপনার মনের কথা অমুভব?

অতঃপূর্ব জান হেসে বলে, তোমার কি সন্দেহ হয়?

মিত্রা স্পষ্টভাবে বলল, হয়।

অতঃপূর্ব বলল, আমার হৃদ্যাগা। কিন্তু এই সন্দেহের কারণটা বলবে মিত্রা?

মিত্রা সহসা যেন একেবারে বদলে গেল। সে ক্ষুদ্র কণ্ঠে জবাব দিল, কারণটা ত সামনেই পড়ে আছে। আপনি চোখ বুজে থাকলে কেমন করে আর দেখতে পাবেন।

একটু থেমে সে পুনরায় বলতে থাকে, আপনার সান্নিধ্যে এসে কতটুকু পেলাম আর কতখানি খোয়ালাম তার হিসেব আজ আর করবেন না। তাতে কোন পক্ষেই দুঃখ ঘুচে না। তার চেয়ে আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, মাথা টুচু করে চলতে সাহায্য করুন অতঃপূর্ব। তার ভগবান! নিজের জীবনকে অকারণে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে উনি এসেছেন আমার মত একটা অপবিত্র মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে। এ ধরনের চিন্তা আপনি কেমন করে করেন আমি বুঝি না।

অতঃপূর্ব বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মুখে তার কথা যোগায় না।

মিত্রার হৃদ্যে সজল হয়ে উঠেছে। তাই লুকাতে সে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

২৬

বেশীকণ না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মিত্রা পুনরায় ফিরে এল। অতঃপূর্ব তখনও হৃদ্যেতর মধ্যে মাথাটা চেপে ধরে চুপ করে বসে আছে। মিত্রা ঘরে ঢুকে শানিক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার আনত অস্তমন্য মুখের পানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, অতঃপূর্ব—

অতঃপূর্ব মুগ্ধ তুলে তাকাল। কথা বলল না।

মিত্রা পুনরায় বলল, এত কি ভাবছিলেন?

অতঃপূর্ব বলল, আত্মসমর্পণের মধ্যে যে এতবড় আনন্দ আছে তা আমি জানতাম না—

মিত্রা আরও একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে অস্তবঙ্গ কণ্ঠে বলল, আপনাকে একেবারেই মানাচ্ছে না অতঃপূর্ব। এসব কথা আপনার মুখে সত্যিই বড় যেমানান লাগছে। আপনি বরং আগের মত ধমক দিন। অকারণে দুঃখের কারণ হোন, তবুও কারণে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যাবেন না।

অতঃপূর্ব যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাবে সে বলল, ডুবি যদি গ্রহণ কর আমি তোমাকে আমার কারণানাটা দিয়ে দিতে পারি।

মিত্রা হেসে ফেলে বলল, কি বললেন? আমাকে দেবেন আপনার কারণানা? কিন্তু আপনি দিতে চাইলেও আমি কি নিতে পারি? সেইজন্যই বুঝি দুঃখ দূর করবার কথা বলছিলেন? সত্যি করে বলুন দেখি অতঃপূর্ব, এতে আমার দুঃখ দূর করা হবে না শত্রুতা করে আরও চেয়ে বেশী বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে?

তায় চেয়ে বরাং ডানকান আর আগায়ওয়ালাকে ডেকে দান করুন।

মিত্রা পুনরায় হেসে উঠল।

অতঃ পক্ষীয় হয়ে বলল, তুমি কি আমাকে পাগল ঠাউরেছ মিত্রা ?

মিত্রা হালকা সুরে জবাব দিল, তার বড় বাকীও নেই। নইলে মিত্রাকে নিয়ে এই ধরনের পরিহাস করতে অতঃপাবুর আটকাত।

অতঃ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, তোমাকে বেশী প্রশ্ন দিচ্ছে বলেই কি আমাকে এভাবে আঘাত করছ মিত্রা ?

মিত্রা বিন্দু হেসে জবাব দেয়, শুধু প্রশ্ন পেলে এতখানি এগোতে ভয়না পেতাম না অতঃপাবু। এ সাধারণ কথাটা আপনার বোঝা উচিত ছিল।

অতঃ গাঢ় কণ্ঠে বলল, এই কথাই এতক্ষণ ধরে তোমার কাছ থেকে আমি শুনে চাইছিলাম। বলতে পার মিত্রা, এতবড় অসম্ভব কি করে সম্ভব হ'ল ?

মিত্রা ভিতরে ভিতরে সঙ্গীত হলেও প্রকাশে সে ঝিল ঝিল করে হেসে উঠল।

অতঃ বিন্দু মিত্রা অপ্রতিভ হ'ল না।

মিত্রা শান্ত কণ্ঠে বলল, এই সব আজ্ঞে-বাজ্ঞে চিন্তাই বুঝি আজকাল আপনি করেন ?

অতঃ কথাটা একপ্রকার স্বীকার করে নিল।

মিত্রা গভীর হয়ে উঠে বলল, তার পর বোধ হয় মিত্রাকে নিয়ে মনে মনে এক নাটক সৃষ্টি করেন ? তাই না ? হাতের কাছে এমন উপযুক্ত নায়িকা পেয়ে ছাড়বেন কেন ?

অতঃ বলল, তুমি হঠাৎ এমন গভীর হয়ে গেলে কেন মিত্রা ?

মিত্রা বলল, গভীর না হয়ে কি কবি বলুন ত ? মিত্রা সত্যি-সত্যিই আপনার কেউ নয়। ভাগ্যানোষে সে সঙ্গম হারিয়েছে বলেই না তাকে নিয়ে এই ধরনের ঠাট্টা—

বাধা দিয়ে অতঃ বলল, না মিত্রা, ঠাট্টা তোমাকে আমি করি নি। ভাগ্য তোমার সঙ্গম নষ্ট করতে পারলেও তোমার মনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

মিত্রা জবাব দিল, দেহটাই যদি না বাঁচল মন বাঁচবে কাকে আশ্রয় করে অতঃপাবু ? দেহের বিবে মনটা যে নীল হয়ে গেছে।

অতঃ বলল, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি থাকলেও অসুভূতি নেই। বলতে পার মিত্রা—যাকে কেন্দ্র করে তোমার জীবনে এতবড় বিপর্যয় তারই মঙ্গল-চিন্তায় সেই তুমি এতখানি উতলা হয়ে উঠেছ কিসের প্রেরণায় ?

মিত্রা এতক্ষণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সে সঙ্গ কণ্ঠে বলল, এক কথা আপনাকে আমি কতবার বলব ? ভুল আপনিও যেমন করেছেন আমি নিজেও তেমনি করেছি। ভুল করে সে ভুল শুধরে নেওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া আপনি ভুল করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কবেন নি। কিন্তু আমি ভুল করে আপনার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি।

অতঃ চুপ করে থাকে।

মিত্রা বলে চলে, প্রশস্ত করে দিয়েছি একথাই বা বলি কেন ? আপনার অনেক ক্ষতিই করেছি। আপনার এত অশুভের আমি উপযুক্ত নই অতঃপাবু। আপনি অনেক দিয়েছেন, অনেক দিতেও চেয়েছেন। অনেক আমি নিয়েছি আরও হয়ত নিতে হবে, কিন্তু তার আগে আমাকেও কিছু দেবার সুযোগ দিন। আমার সর্বনাশা কাজের ফলে যত আপনার ভেঙেছে তার কিছুও যদি আমি গড়ে দিতে না পারি তা হলে নিজেকেও যে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

এতক্ষণে অতঃ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি আর আমার কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছ ?

করেছি—করেছি অতঃ পাবু—মিত্রা বৈধা হারিয়ে বলল, যেখানে যতকিছু অঘটন ঘটেছে তার মূলে রয়েছে আমার প্রতিহিংসা নেবার দুঃস্বপ্ন।

অতঃ অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আর আমার আত্মবিশ্বাসের মিথ্যা দস্ত। মিত্রা যে দোষ করে তার চেয়ে যে দোষ করবার সুযোগ করে দেয় সে কম অপরাধী নয়। কিন্তু তোমার এতবড় সর্বনাশা বুদ্ধি হঠাৎ এমন মঙ্গলময় হয়ে উঠল কিসের ছোঁয়া লেগে ?

মিত্রার কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরে আবেগ বাইরে প্রকাশ পেল না। বধাসম্ভব সত্ত্ব কণ্ঠেই সে বলল, সব কথা বলতে নেই অতঃপাবু। তবে পাঁচেন যদি ডাক্তারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। আপনি অজ্ঞানভাবে তাঁকে মধ্যাস্তিক অপমান করেছেন। অথচ এমন লোক হয় না।

শ্রমতীও কথাটা বহুবার আমাকে শুনিয়েছে। অতঃ বলল, তুমিও বলছ। কিন্তু আমি তোমাদের কারুর কথাই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

মিত্রা বলল, আপনার দুঃভাগ্য। আপনার সে চোখ নেই বলেই দেখতে পান না। ভুললোকের একটি চোখ আর একখানি কান সব সময় আপনাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। আপনাকে বেশী বলে লাভ নেই, কিন্তু একটা অমুরোধ—বিশ্বাস করতে না পারলেও তাঁকে অবিশ্বাস করবার দুঃস্বপ্ন যেন আপনার কোনদিন না হয়।

অতঃ বলে, তোমার কথা ভবিষ্যতে মনে রাখবার চেষ্টা করব।

মিত্রা বলল, আপনাদের মধ্যে এসে পড়ে কি পেলাম আর কি হাওয়ালাম তার হিসেব করতে আজ আর ভাল লাগে না অতঃপাবু। কিন্তু একটা কথা খুব ভাল করে বুঝেছি যে, মানুষের ভাল কথা শক্ত অথচ মন্দ কথাটা কত সহজ। কত অল্প চেষ্টায় আপনার কতবড় ক্ষতি করে বসলাম।

অতঃ বলল, সেই থেকেই শুধু মন্দ আর ক্ষতি ক্ষতি করে তুমি চাঁৎকার করছ মিত্রা। কিন্তু আমার মনে হয় অতঃপাবু ক্ষতি করতে গিয়ে তার যথেষ্ট উপকারই করেছে।

মিত্রা বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দেয়, না অতঃপাবু, মিত্রা বেজার\* আপনার কোন উপকার করে নি। ডাক্তারবাবু ইচ্ছাকৃত

ক্যাকের চের কাছ থেকে। আমি নিমিত্ত যাত্র। আজ্ঞা, লোকটিকে আপনি জোড়ালেন কোথা থেকে ?

অতঃ বলল, জোড়ালেন হই নি। আপনি এসে জুটেছেন। ঠাকুরদার আটটার পরিচয়-পত্র নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সেই থেকেই আসছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে নিয়ে বতাই বড় বড় কথা বল না কেন ওর প্রত্যেক ব্যাপারে অনাবশ্যক মাথা গলান আমার ভাল লাগে না। যদিও সোজাপ্রজি কোনদিনই তাঁকে অবজ্ঞা করি নি।

মিজা বলে, প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হ'ত। আজ কিন্তু কথাটা ভুলেও মনে আসে না। বরং অভিভাবক বলে মনে করতে ভালই লাগে। শ্রীমতী রাগ করে চলে গেলেন। আপনি বোতল নিয়ে বসলেন। ভর পেয়ে ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। বললাম সব কথা অকপটে। বুদ্ধি চাইলাম।

বললেন, জল অনেকদূর গড়িয়েছে দেখছি, কিন্তু তোমাকে যদি কেউ সাহায্য করতে পারে সে তুমি নিজেই। কল্যাণের পথটা বর্ষন তোমার চোখে পড়েছে তখন নিজেই তুমি বাকী পথটুকু এগিয়ে যেতে পারবে। একের জন্ত বহু দুঃখের কারণ আর হতে পারবে না।

অতঃ নিঃশব্দে গুনতে থাকে।

মিজা বলতে থাকে, কাকর দুঃখ দূর করার ক্ষমতা নেই আর এতগুলি লোকের দুঃখের কারণ হয়ে বসলাম। আশ্চর্য! এই সহজ সত্যটা এতদিন আমার চোখে পড়েনি। একবারও ভেবে দেখিনি যে, বাক চূর্ণ করার জন্ত আমার এমন নিষ্ঠুর আয়োজন তার কতটুকু বাবে কিন্তু যারা মাসের শেষ দিনটির পানে চোখ রেখে দিন গোনে তাদের এমন করে সর্বনাশ করতে চলেছি আমি কোন বুদ্ধিতে? আমাকে ধামতে হ'ল, আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলাম। ডাক্তারবাবু আমার বিধাঙ্ক মনকে শক্তি যোগালেন।

মিজা ধামতেই অতঃ বলল, তার পর—

মিজা একটুখানি হেসে বলল, কিন্তু পিছু হঠতে গিয়ে দেখি যাদের সঙ্গে নিয়ে এতদিন ধরে কাজ করেছি তারা আমাকে মানতে চায় না। আবার ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি ঐর্ষ্য ধরে আমার সব কথা শুনে সম্মুখে বললেন, আমি জানি মা, কিন্তু তাই ভেবে পিছিয়ে পড়লে ত চলবে না। ওদের এগোবার পথটা আরও সহজ করে দাও। বাধা দিয়ে বুদ্ধিহীন করে তুল না।

বললাম, তাতে কি ওদের প্রতিরোধ হবে ডাক্তারবাবু ?

তিনি বললেন, সামনে থেকে বাধা না পেল তবুই না ওরা ডাইনে, বাঁয়ে আর পিছন কিংবা তাকাবার কথা ভাববে যা। বাধা সব সময়ই যোগায় বুদ্ধি আর উদ্দীপনা। যা সব সময় কল্যাণকর হয় না।

অতঃ বলল, শ্রীমতীও ঠিক এই কথাই বলেছিল। তার মতে ওরা যা দাবী করে তা দেবার যদি বর্ষা শক্তি নাও থাকে তবুও দেব না একথা বলে না।

আমি জবাবে বলি, আমার বক্তব্যটাও তাই। কিন্তু কথার মধ্যে আমি কোথাও কাকী রাখতে চাই না, স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, শুধু বর্তমান নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না—বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কথাটাও ভাবতে হবে। কিন্তু এই কথাটাই কেউ বুঝতে চায় না।

মিজা বলল, কেমন করে বুঝবে বলুন অতঃবাবু। আপনাদের আর ওদের জীবনধারণের মান এর জন্ত দায়ী। কিন্তু আমার কথা থাক, আপনায় জ্ঞী আর কি বলেন শুনি—

শ্রীমতী বলে, ওদের প্রয়োজন আছে একথা যদি স্বীকার কর তা হলে এতদিন ধরে যা তুলে নিয়েছ তার থেকে কিছু নিয়ে দাও। ওয়াও বাঁচুক, ডুমিও বাঁচ।

আমি বলেছিলাম, এর নাম কি বাঁচা? তার চেয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলু পটলের ব্যবসা করব।

শ্রীমতী জবাব দিয়েছিল, ওটাও নাকি আমার ছেলেমানুষের মত কথা হ'ল। দরজা বন্ধ করার মুক্তি নেই—ওতে সন্দেহকেই বাড়িয়ে তোলা হবে, তার চেয়ে ওদের ডেকে বলা হোক এ ভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বড় হতে পারে না। ওদের এত দিনের পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা। একে রাখতেও ওরাই পারে, ভাঙতে হলেও ওরাই ভাঙ ক...

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার পর? কিন্তু শ্রীমতী এর পরে আর কোন জবাব দিতে পারে নি। শুধু এড়িয়ে যাবার ছলে বলেছিল, এর আর তার পর নেই...

মিজা বলল, সব আরম্ভেরই শেষ আছে অতঃবাবু। আসলে সর্বত্র আমাদের ঘটেছে নৈতিক অংশপতন। কেউ কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তারবাবু বলেন, পাকীজীর নাম করে যাঁরা বত চীৎকার করছেন তাঁরাই ওর শব্দ থেকে বেঁধে নিয়ে গেছেন। তাই কেউ কাকর কথা গুনতে চাইছে না। আপনি আচরি ধর্ম পরের শিখাও, নইলে অপরে শিখবে কেন? কিন্তু এ সব আলোচনা থাক।

অতঃ বলে, থাকবে কেন মিজা? অপরের কথা আমি জানি না, কিন্তু নিজে আমি সজ্ঞ করছি আবর্জনা পরিষ্কার করবার। আমার সীমানার মধ্যে বত জন্মেছে তা নিজে হাতে সাফ করে আবার নতুন করে আরম্ভ করব।

মিজা বলল, এটাও কি আপনার সেই পুরাতন বাড়ীতে নতুন করে বালী পললজারা দেওয়া হবে না?

অতঃ বলে, শ্রীমতী কিন্তু আশার কথা গুনিয়েছিল। তার মতে মাঝুরের মনটা শুধু মাত্র কয়েক বিধা জন্ম নয়। বিশাল তার পরিধি। পুরাণ থাক না এক পাশে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। নতুন করে নতুনের জন্ম হ'ক সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে। তাতে হয়ত পুরাতনও বাঁচবে, নতুনও এগোবার পথ পাবে। পুরাতন ছিল বলেই না নতুনের আবির্ভাব।

মিজা নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।





পকত ছহিতা



পহেল গা'ণ্ডের একটি মনোরম দৃশ্য—শ্রীনগর

ফটো : ঐসচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়



‘নউ দিলীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নিমন্ত্রিত অভাগতাদের সহিত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে  
পবিত্র বরাইয়া দিতেছেন



ভারতীয় পার্লামেন্ট-অভিমুখে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার

অতঃ একটু হেসে বলে, শ্রীমতীকে কোন দিনই আমল দিইনি, পরিহাস করে সব সময় হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া জীব কাছ থেকে এই ধরনের উপদেশ শোনবার মত আমার মন তৈরী ছিল না। উপেক্ষা করে তাই উপহাস করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার এত দিনের চলার পথে কোথাও ফাটল ছিল, আজ সেই ফাটল হাঁ করে আমাকে গ্রাস করতে বসেছে। জান মিত্রা, জীবনে আমি অনেক জুয়া খেলেছি। খেলার হার-জিত দুইই আছে। আর একবার না হয় নতুন পথে খেলা শুরু করে দেনি, নইলে, যে পরস্পর-বিবোধী চিন্তা আমাকে শত পাকে জড়িয়ে শাস-রোধ করে মারবার চেষ্টা করছে তার হাত থেকে আমি বাঁচতে পারব না।

মিত্রা ধীরে ধীরে জবাব দিল, আপনার কাছে ত ধারাল অস্ত্রের অভাব নেই অতঃবাব।

অতঃ প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, এতদিন সেই কথাই ভেবে এসেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি তা পারি না। সে শক্তি আজ আর আমার নেই। হাত কঁপে উঠবে। যে অস্ত্রে বন্ধন ভিন্ন করতে বাব তা আমাকেই শেষপর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করবে। বলতে পার মিত্রা কেন এমন হ'ল ?

মিত্রা কোন জবাব দেয় না। তার চোখেমুখে খালি স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। অতঃর তা দৃষ্টী এড়ায় না। সে বলে, তুমি হাসছ—ভাবছ বেধ হয় এ আমার পরাজয় ? কিন্তু তবুও আজ আমাকে তুমি বাধা দিতে পারবে না। দুঃখের চেয়ে আজ আমার আনন্দই হচ্ছে বেশী, ভারী হাস্য লাগছে নিজেকে। কোথাও আজ আর গ্লানি নেই।

মিত্রা খোঁচা দেবার লোভ সঞ্চার করতে পারল না। সে বলল, বড় চমৎকার আপনার মন ত ?

অতঃর বাগ করে না, কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলে, সত্যিই তাই—বিচিত্র এর গতি আর প্রকৃতি। শ্রীমতী এখন থেকে চলে গেছে বলেই একটা দিক এমন করে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। নইলে হয় ত আরও সময় নিত।

মিত্রা খানিক চুপ করে কিছু ভেবে নিয়ে বলল, তা হলে কত দূর আর আবার নিজের হাতেই খুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবেন বলুন ?

অতঃর প্রশান্ত দৃষ্টিতে খানিক মিত্রার মুখের পানে চেয়ে থেকে হাসিমুখে জবাব দিল, বন্ধ করতে গিয়েই না সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম অজ্ঞাতসারে আমার হাত দু'খানা কত দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই জন্তেই এত গলাবাজী আর বিতর্কের ঝড় তুলেছিলাম।

মিত্রা বলে, মনের দুর্বলতা ঢাকবার জন্ত বুঝি ?

অতঃর বলল, আজ আর অস্বীকার করতে চাই না মিত্রা। কিন্তু শ্রীমতী সন্ধে আর আমি ভাবতে চাই না। আমি তোমার কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছি না।

মিত্রা সাধেই অতঃর মুখের পানে তাকাল। বলল, আমাকে

নিরে আবার কিসের চিন্তা অতঃবাব। আমি ত নতুন করে আর কোন জট পাকাই নি।

অতঃর মুহূ কণ্ঠে বলে, ডাক্তারবাবু কোথায় গেছেন তুমি জান মিত্রা ?

মিত্রা জবাব দেয়, জানি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?

অতঃর বলল, কেন গেছেন তাও জান নিশ্চয় ?

মিত্রা বলল, না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। তিনি আপনার জীকে নিয়ে আসবেন বলেই গেছেন।

অতঃর বলল, সেই জন্তই আমাকে ভাবতে হচ্ছে।

মিত্রা অবাক হয়ে বলল, তাঁর বাড়ীতে তিনি আসবেন, এতে ভাববার কি আছে ?

অতঃর মুহূ গলায় বলল, আছে মিত্রা। আর ভাবনাটা আজ তোমার জন্তেই।

একটু হাসবার চেষ্টা করে মিত্রা বলল, আমার জন্ত একটু কম করে ভাবলেই আমি বেশী খুশী হব অতঃবাব। অনেক বড় লজ্জায় হাত থেকে আমি বাঁচতে পারব।

অতঃর চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, আমি সবই বুঝি মিত্রা—

মিত্রা সহসা থিল থিল করে চেসে উঠে বলল, ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এই কথা বলতে চান বুঝি ?

অতঃর ধীরে ধীরে জবাব দেয়, তাই মিত্রা—

মিত্রা পুনরায় গভীর হয়ে উঠে বলল, এ ভাবনাটাও আমার উপর ছেড়ে দিন অতঃবাব। দেপবেন, কত সহজে আপনার সব সমস্তার স্বীকৃতি করে দেব।

অতঃর প্রশ্ন করে, কোন পথে মিত্রা ?

মিত্রা সহজভাবে জবাব দিল, যে পথে শ্রীমতী আসবেন সেই পথেই—

একটু হাসবার চেষ্টা করে অতঃর বলল, শ্রীমতী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাঁর রয়েছে আইন-সম্মত অধিকার, কিন্তু তোমার ত কোন অধিকার নেই মিত্রা ! তার পথে তোমার—

মিত্রা কিছুটা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এমনি ভাবে বলল, থামুন অতঃবাব—তার পরেই আকস্মিক ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে দৃষ্টী মেলে চেয়ে চেয়ে দেখিল অনন্ত উনঃর নীল আকাশ। নাকে এসে বাগানের সমস্ত কোটা রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ। চোখের কোণে হয়ত অকারণেই খানিকটা জল এসে পড়েছে ... অপরিসীম যুগা আর প্রাণভরা প্রীতি। একদিনের সত্য আর একদিন কি ভাবে মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

মিত্রা নিজেকে নিজে শাপন করল।

ইতিমধ্যে কখন যে অতঃর উঠে এসে মিত্রার পাশে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পার নি। সহসা তার অহ্বানে সে ঘুরে দাঁড়াল।

মিত্রার মুখের পানে চোখ পড়তেই অতঃর বিম্বিত ব্যাকুল কণ্ঠে

বলল, তোমার কি হ'ল মিত্রা? কোন অসম্মান করেছি  
কি তোমায়?

মিত্রা হাসতে লাগল—চোখে বসিও জল ছিল তখনও।  
নিজেকে গোপন করবার বিন্দুমাত্র বাস্তবতা প্রকাশ পেল না।  
শাস্ত্যভাবে সে বলল, নিজের অবস্থার কথা ভেবে চোখে জল এসে  
পড়েছিল অতঃপূর্ব। নইলে থাকে বাড়ীতে স্থান দিতে ভয় পান

তাকেই অজ্ঞ ভাবে সাহায্য করবার কথা মুখেও আনতে পারতেন  
না। আমার জন্ত আপনাব এত বৈশিষ্ট্য ক'রও যেমন অশোভন  
আপনার কাছ থেকে কিছু হাত পেতে নেওয়াও তেমন অপমানকর—  
বলেই মিত্রা চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।  
অহম্ব্য নীরাক বিশ্বয়ে শুধু চেয়ে রইল। সাধারণ ভাবে  
একটা প্রতিবাদ করবার মতও ভাষা তার মুখে যোগাল না। ক্রমশঃ

## বালিকা বধু

শ্রীউর্মিলা দেবী

বহুদিন আগে এই শুভ দিনটিতে  
তুমি এসেছিলে আমারে লইয়া যেতে,  
মহা সমারোহে পুষ্প শোভিত রথে  
এসেছিলে তুমি দীপমালা জালি পথে।

ছোট্ট হৃদয় উঠেছিল মোর তুলি  
বাজনার সুরে লজ্জা সরম তুলি,  
ছুটেছিলুম ছাড়ে বর বৈধবীর আশে  
সেই কথা স্মরি আজ মোর হাসি আসে।

প্রেম ভালোবাসা পুলকের শিহরণ  
কিছুই তখন বোঝেনিক মোর মন,  
বিয়ে? সেটা ভারি মজার একটা খেলা  
গয়না কাপড় বাজনা ফুলের মেলা।

বুঝি নি তখন বিচ্ছেদ ব্যথা কিছু  
গুরু ঝগড়ের ভার আছে এর পিছু,  
তব পিছে পিছে প্রবেশিত বধুবংশে  
নারীর শ্রেষ্ঠ পুণ্য তীর্থে এসে।

হেথায় তখন উৎসব বাঁশী বাজে  
ছেলেমেয়ে সব ক'ত বিচিত্র সাজে,  
হাসিভরা মুখে ধরি মোর হাতখানি  
তাঁহাদের মাঝে লয়ে গেল মোরে টানি

নয়ন মেলিয়া সকলি দেখেছি ভালো  
বলেছি পরাণ প্রেমের প্রদীপ জালো,  
ভালোবেসে জয় করিব সবার মন  
এবি সাধনায় করেছি পরাণ পণ।

সারাদিন ধরে সবাকারে খুশী করে  
ক্লান্ত নয়ন ঘুমে যেত মোর ভরে,  
শ্রান্ত চরণে আসিলে শয্যা পাশে  
কাছে নিতে প্রিয় স্তম্ভুর হাসি হেসে।

উজাড় করিয়া দিতে যে প্রেমের ডালি  
প্রতিদানে দেখি আমার সকলি খালি,  
সবাকারে তুমি নিঃস্ব পরাণ মম  
তোমাতে দেবার কিছু নাই প্রিয়তম।

আজিকে বুঝেছি আমার জীবন মাঝে  
তোমার স্মৃতি ঐক্যভাৱা সম রাজে,  
তুমি ছাড়া আর কেহ নাই মোর প্রিয়  
অস্তর তরা আমার প্রণাম নিও।

# কালিদাস সাহিত্যে ‘জয়ান্তর’ ও ‘পূর্বাত্য’

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

জন্মালে মরতে হয়, আর মরণের পর সকল প্রাণীকে যে আবার সমরমত ‘জননী-জঠরে’ শয়ন করতে হয়’ হিন্দুধর্মে এই মূল তত্ত্বটি মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্য ও নাটকগুলির গল্পের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে সন্নিবেশ করেছেন যে, পড়লে পাঠকের মনে হবে ইহা যেন ছিল তাঁর মস্তাগত বিশ্বাস, এ তত্ত্বকে তিনি স্বয়ংসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত অনায়াসে যেন নিয়েছেন, প্রমাণের আবশ্যকতা অনুভব করেন নি।

পূর্বজন্ম ও পরজন্মে উল্লেখ তিনি তাঁর ঘটনার বহুস্থানে বহুবার করেছেন, এমনকি পূর্বজন্মের সংস্কার যে পরজন্মের মন ও কণ্ঠের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে একথাও তিনি স্পষ্টভাবে একাধিক-ভাবে বলে গেছেন।

“রঘুবংশের” ষষ্ঠম সর্গে তিনি বলেছেন : ‘পরলোকজুযাং স্বকর্মীভগ্নতরো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্” ( রঘু—৮.৮৫ )।

দেহীণা পরলোকে গিরে নিম্ন নিম্ন বর্ষাকল অমুসায়ে ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।

এখানে মহাকবি বলতে চেয়েছেন যে, যাহুয সংসারে থাকার সময় যে ধর্মের কাজ করতে থাকে, মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে সেই সব কণ্ঠের ফল অনুভবী তাকে সেই স্বকর্মের দেহ, মন, অহুভূতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি পেতে হয়।

তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোনও নর বা নারী মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা করে যে, সে তার শ্রিয়া বা শ্রিয়ের সঙ্গে মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে একসঙ্গে বাস করবে, তার সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ তার কণ্ঠের ফল আর তার শ্রিয়ের বা শ্রিয়ার কণ্ঠের ফল সমান নাও হতে পারে। সে তার নিজ কণ্ঠের ফলে যে লোকে গিয়ে বাস করতে পেল তার বাস্তবিতের কণ্ঠ-ফল ভিন্নপ্রকারের হওয়ায় তাকে যেতে হ’ল বিভিন্ন লোকে। সুতরাং মহাকবির মতে, মৃত স্বামী বা মৃত পত্নীর চিতায় ঝাপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেও স্বামী-স্ত্রী যে পরলোকে গিয়ে এক জায়গায় একসঙ্গে দুটিতে বাস করতে পারে এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে যাহুয কি সেখানে অনন্তকাল বাস করতে পার? মহাকবি বলেন, ‘না’। ‘পূর্ব-যেবের’ এক স্লোকে তিনি বলেছেন, “স্বদীভূতে স্ফুরিত ফলে স্বর্গিনাং গাং পতানাম্” ( পূর্ব-যেব—৩১ )।

যে পুণ্যের ফলে যাহুয স্বর্গে গিয়ে বাস করতে পার, সে পুণ্যের যেসব বথন স্মরণে আসে আবার তখন তাকে মর্ত্যালোকে ফিরে

এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। একথা তিনি আরও কয়েক জায়গায় বলেছেন।

“জয়ান্তর” প্রসঙ্গে কালিদাসের আরও একটি বিশ্বাসের কথা জানিতে পারা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন্মের ভাল-বাসার স্মৃতি পরজন্মেও কিছুটা রয়ে যায়, একেবারে লোপ পায় না। ‘রঘুবংশ’ের সপ্তম সর্গে তিনি লিখেছেন : ‘মনো হি জয়ান্তর—সঙ্গতিজয়’ ( রঘু—৭.১৫ )। অর্থাৎ পূর্বজন্মের ভালবাসা মন বেশ বুঝতে পারে।

যাদের মুখ দিয়ে মহাকবি একথাগুলি বলিয়েছেন, তারা যেন বুঝতে চায় যে, পূর্বজন্মে যাদের মধ্যে প্রণয় ছিল, মৃত্যুর পর আবার যদি তারা নর ও নারী হয়ে জন্মায় ও হ’ল্লনার মধ্যে কখন আকস্মিক ভাবেও সাক্ষাৎকার ঘটে, পরস্পরের প্রতি তারা একটা অহেতুক আকর্ষণ অনুভব করে। মন যেন জানাতে চায় কতদিনের এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

পূর্বজন্মে ও পরজন্মে যে একটা যোগাযোগ আছে, পূর্বজন্মের কোনও কোনও স্মৃতি মনের চেতনাংশে না এলেও অবচেতনাংশে রয়ে যায়, মহাকবির এই বিশ্বাস তাঁহার ‘রঘুবংশ’ কাব্যের রামের ‘বামনাশ্রম’ দর্শনের কাহিনী হতে বুঝা যায়।

মহাবি বিশ্বামিত্র যখন বাল্মকির অত্যাচার থেকে তপোবন রক্ষা করার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বনের পথ দিয়ে যেতে যেতে ‘বামনাশ্রমের’ কাছে এসে পড়লেন আর তাঁদেরকে বলিরাজা ও বামন অবতারের গল্প বলতে লাগলেন, রামের মন সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মহাকবি যেন বলতে চাইলেন যে রামের যদিও বামন অবতারের কোনও কথা মনে পড়ল না, তবু পূর্বজন্মের ব্যাপারগুলি তাঁর মনের অবচেতনাংশে সংস্কাররূপে রয়ে যাওয়ার তাঁর মনে হ’ল এ আশ্রম যেন তাঁর পরিচিত, বলিরাজ ও বামনের কথা যেন তাঁর জানা। কিন্তু কি করে যে এ আশ্রম তাঁর পরিচিত হ’ল, বলি-বামনের কি কথা যে তিনি জানতেন তার কিছুই তিনি মনে করতে পারলেন না। পূর্বজন্মের কোনও কথা তাঁর মনে পড়ল না। তিনি উদ্বিগ্ন মনে পথ চলতে লাগলেন।

পূর্বে বলা হয়েছে, কালিদাসের বিশ্বাস ছিল পূর্বজন্মের সাধনা পরজন্মে জন্মগত সংস্কারের মত থেকে যাহুযের মন ও কণ্ঠকে প্রভাবিত করে। একথার সমর্থন পাওয়া যায় ‘কুমার-সম্ভব’ কাব্যে। পার্বতীর বাল্যাবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি তাঁর ‘প্রাক্তন’ বা পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা বলেছেন। পার্বতী এমন অনায়াসে ও এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন যে,

মহাকবিকে লিখতে হ'ল, 'হিরোপদেশাশ্রয়দেশকালে। প্রপেদিয়-প্রাক্তনজয়বিজ্ঞা' (কু—১.৩০)।

তার পূর্বজন্মে অজিত বিজ্ঞা সংস্কাররূপে এজন্মে তাঁকে আশ্রয় করে হইল, তাই উপদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিজ্ঞা অনায়াসে তাঁর আয়ত্ত হয়ে যেতে লাগল। এখানে মহাকবি স্পষ্টভাবে জানাতে চেয়েছেন যে, কেবল অসাধারণ মেধার জ্ঞান নয়, পূর্বজন্মে অজিত বিজ্ঞা তাঁর মনের মধ্যে সংস্কাররূপে থাকতে ও এজন্মে বিজ্ঞাশিক্ষা করার সময় সেগুলি মনে পড়াতে পার্শ্বী অমন অনায়াসে সমস্ত বিজ্ঞা শিখে ফেলতে লাগলেন।

'রঘুবংশে'ও তিনি একটি অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন বালকের উল্লেখ করেছেন। সূর্য্যবংশের একটি সুসন্তান, সুদর্শন যিনি পরে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করে সমগ্র দেশ অশাসনে রেখেছিলেন কেন যে বাল্যকালে অনায়াসে সকল বিজ্ঞা শিখে ফেলতে লাগলেন তার কারণ দেখাতে গিয়ে মহাকবি বলছেন : 'স পূর্ব-জন্মান্তর পূর্ণপদ।' (রঘুবংশ—১৮ ৫০)।

পূর্বজন্মে তিনি নানা বিজ্ঞার পার দর্শন করেছিলেন বলে, আর সেগুলি তাঁর এজন্মে অংশপথে আসতে লাগল বলে তাঁর গুরুকে শিক্ষা দেওয়ার ক্লেশ অনুভব করতে হ'ত না।

এখানে মহাকবি পূর্বজন্মের সঙ্গে পরজন্মের একটা সূক্ষ্ম যোগ-সুজের সন্ধান দিলেন।

অভিশাপশ্রুতদের জীবনযুদ্ধান্ত বর্ণনায় মহাকবি যেন খোলাখুলি ভাবে পূর্বজন্ম-পরজন্মের ব্যাপার দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'রঘুবংশে' দেখা যায়, মহারানী ইন্দুমতীর কেন যে অতি সুকোমল গুণসমালার স্পর্শে মুহূর্ত ঘটল, এ জটিল সমস্যার সমাধান করে মহামুনি বশিষ্ঠ বলে পাঠালেন যে, পূর্বজন্মে ইন্দুমতী ছিলেন স্বর্গের এক অপ্সরা—তাঁর নাম ছিল হরিণী। কোনও মূনির শাপে তাঁকে এজন্মে মাহুবেষ ঘরে জন্মাতে হয়, তার পর মূনির কথামত স্বর্গের পুষ্প চোখে পড়াতে শাপের অবসান হ'ল। তিনি পূর্বজন্ম কিয়ে পেয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন।

কতকটা এইরকমের আর একটি ঘটনায় উল্লেখ 'রঘুবংশের' পঞ্চম সর্গে পাওয়া যায়। অজের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি সেখানে এক গল্পের অবতারণা করেছেন। রাজকুমার অজ বখন সঠিক্তে বিনভর্তনগয়ে আগছিলেন, পথে এক বিরাটকার হাতী তাঁর সৈন্যদের তড়া করে। হাতী বধ শাজ্জেব নিষেধ বলে তিনি তাকে ভয় পাইয়ে নিরস্ত করবার জ্ঞান তাঁর কানে এক বাণ মারলেন। বাণ মারবার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা অস্থিত হয়ে গেল আর তার স্থানে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে এক অতি সুশুক্ল গর্জরূপীয়া। গর্জরূপী বলালেন, পূর্বজন্মে তিনি রূপের অভ্যস্ত গর্জরূপী বলালেন মাতঙ্গ-মূনির শাপে কদাকার হস্তী হয়ে জন্মেছিলেন। এখন অজের বাণের স্পর্শ পেয়ে তিনি শাপমুক্ত হয়ে পূর্বজন্মের গর্জরূপ কিয়ে গেলেন।

'পূর্বাভাব' (ইংরেজীতে বাকে বলে "Premonition") সম্বন্ধেও কালিদাসের প্রশংসার যোগ্য জ্ঞান ও বিশ্বাসের বশেষ প্রমাণ

তাঁহার সাহিত্যে পাওয়া যায়। অদৃষ্টবিষায়ে জীবনে যে কোনও একটা বিশিষ্ট ঘটনা ঘটেবে সে সম্বন্ধে মাহুবেষ মনে অনেক সময় পূর্ব হতে একটা আভাসের উদয় হয়—একে বলে 'পূর্বাভাব'। মানব মন সম্বন্ধে মহাকবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসা না করে থাকে যায় না।

'পূর্বাভাবের' কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখান গেল :

'বিক্রমোর্বশী' নাটকের দ্বিতীয় তরুণ রাজা পুরুষবা একদিন তাঁর উজ্ঞানের এক নিজন স্থানে বসে প্রিয়বন্ধু বিশ্বককে মনের দুঃখ শোনাচ্ছিলেন। দুঃখ—স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী, যাকে তিনি দেবতাদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনার সময় ভালবেসে ফেলে-ছিলেন, তিনি তাঁকে একটি বারের জ্ঞান দেখা দিতে আসছেন না। উর্বশীকে একবার দেখবার জ্ঞান তাঁর মন যে কত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে তার বর্ণনা করার শক্তি যে তাঁর নাই, এই কথাই তিনি বন্ধুকে বলছিলেন। দুঃখের কথা বলতে বলতে সহসা তাঁর মনে একটা স্বপ্নের ভাব এল। তিনি বন্ধুকে বললেন, 'অভিমুখীদিব বাহিনীসিন্ধুনুরজতি নিবৃত্তিযেকপদে মনঃ' (বিক্রম—২২ অঙ্ক)।

মনের কোনও অভিশাপ পূরণ হওয়া নিশ্চিত হয়ে এলে মাহুবেষ মনে যেমন একটা স্বপ্নের ভাব আসে আমার মনে তেমনি একটা আন্দেব ভাব আসছে।

যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, হঠাৎ তাকে দেখতে পাওয়ার আশা মনের মধ্যে কেন একটা পুলকের সঞ্চার করল। পরের ঘটনায় মহাকবি যেন তারই উত্তর দিতেছেন। ঘটনাটি এই—যে সময় পুরুষবা তাঁর বন্ধুকে এই কথা বলছিলেন, ঠিক সে সময় উর্বশী এক আকাশ-বানে বসে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠানপূর্বের রাজ-উজ্ঞানের অপর প্রাপ্তে নেমে এলেন। পুরুষবা জানতেন না যে, উর্বশী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জ্ঞান তাঁর উজ্ঞানে এসেছেন। তিনি হতাশ-প্রেরিকের মত বন্ধুর কাছে মনের দুঃখ জানাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর মনে একটা স্বপ্নের ভাব এল, যে ভাবটি মাহুবেষ মনে তখনই আসে যখন তার কোনও একটা দুঃখবোধী অভিশাপ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে পড়ে। রাজার এ 'পূর্বাভাব' যে যথার্থই পূর্বাভাব তাহা প্রমাণিত হতে বিলম্ব হ'ল না। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে উর্বশী তাঁর এক সখীকে সঙ্গে নিয়ে রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে মহাকবি যেন এই ভাবটি হুটাতে চেয়েছেন। রাজকুমারী নিকাদিষ্টা, তিনি ইহলোকে না পয়লোকে নিশ্চিত করে জানবার উপায় ছিল না। রাজকুমারী কিছু মারা পড়েন নি, তিনি ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অপর এক দেশের রাজার প্রাসাদে তাঁর এক বাণীর অমৃতরূপে বাস করছিলেন। এই সময় এদেশের রাজার এক সাদাস্ত সর্দার অপর এক দেশের রাজাকে যুদ্ধে পয়াজিত করে তাঁর অনেক লুণ্ঠিত ধনবোয় মধ্যে হইজন নৃত্যগীতকুশলী তরুণীকেও মহারাজের প্রাসাদে উপহার পাঠিয়ে দিল। এই তরুণী হুটি ছিলেন সেই নিকাদিষ্টা রাজ-

স্বামীয় অত্যন্ত পরিচিতা, এক সময় এক প্রাসাদে সকলে বাস করতেন। তাঁদেরকে যখন রাজপ্রাসাদে আনা হ'ল, একজন অপরকে বললেন, "অন্তি লোকপ্রবাদ আগামী সুখ দুঃখ বা জগদ্ব্যবস্থা স্বস্থিতি।" 'লোকে বলে সুখ আসছে না দুঃখ আসছে মনের অবস্থা থেকে তা' বুঝা যায়'—যেন অদূরভবিষ্যতে মানুষের জীবনে কিছু সুখ প্রাপ্তি ঘটবে না দুঃখের বোঝা এসে চাপবে তার একটা দায়। যেন মনের পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে পূর্ন হতে সে কথা গানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

যিনি বললেন এ কথা তিনি জানতেন না যে, তাঁদের নিকৃষ্টিতাজকলা এখানে এই রাজপ্রাসাদে বাস করেন। তার পদ যখন রাজ্য। রাণীর সম্মুখে তাঁদের হ'জনকে নিয়ে আসা হ'ল, রাণীর কাছে তার অমুচরীকপে দণ্ডায়মানা পরিচিতা রাজকুমারীকে অপ্রত্যাশিত পে দেখতে পেয়ে তাঁদের আনন্দের সীমা বইল না। তাঁদের ক্রোধের যে মিথ্যা নয় এখানে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র পঞ্চমাস্তকেও পূর্বাভাবের একটা আভাস পাওয়া যায়। মহাবি কথের শিবোরা শকুন্তলাকে তাঁর স্বামী রাজা যাজ্ঞবল্ক্য নিকট রেখে আসবার জগ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার যেক মুহূর্ত পূর্বের ঘটনা—

রাজা দুঃখান্ত বসে আছেন রাজসভায়, রাজকাজে ব্যস্ত, এমন পর প্রাসাদের 'সকীতলা' থেকে তাঁর এক নবীনা রাণী হ'স-দিকার গান শোনা গেল। রাণী গাহিতেছেন, যেন 'এক মধুকর ত্রিমুকুলের মধু পান করে তাকে ছেড়ে চলে গেল কমলিনীর পান করতে, মুকুলকে কি সে ভুলে গেল?'

তরুণী রাণীর স্মৃতি কণ্ঠে মধুর সুরে গাওয়া গান শুনে রাজার মনে একটা বিষাদের ভাব এল, কেন যে এল তিনি ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হ'ল, এ পরিপূর্ণ সুখ ও ঐশ্বর্যের মাঝে দুঃখের যখন কোনও অবতারণা নাই, কোনও প্রণয়িনীর সঙ্গে বিচ্ছেদও হয় নাই, তখন কেন এমন স্মৃতি স্ববে গাওয়া গান তাঁহার হৃদয় এক অজানা বাধায় ভরিয়ে দিল। বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, 'নমু অবোধ-পূর্বক ভাবভিরাণি জননাস্তব দৌহরানি'—নিশ্চয় পূর্ব-জন্মেরই কোনও প্রণয়ের ব্যাপার মনের মাঝে সংস্কাররূপে রয়ে গেছে অথচ স্মৃতির পথে আসতে গায়ে না, তাই বুঝা যায় না।

তিনি ভাবলেন, অনেক সময় স্মৃতির বস্তু দেখে, মধুর শব্দ শুনে স্মৃতি মানুষের মনও টিবিগ্ন হয়ে উঠে, তার কারণ এই হতে পারে যে, পূর্বজন্মের কোনও প্রণয় বিচ্ছেদের কথা এ জন্মে মনের মধ্যে সংস্কার রূপে রয়ে যায় অথচ স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ে না। তিনি রাজকাজে ছেড়ে উৎকর্ষিত হয়ে বসে বসে রইলেন।

মহাকাব্য এখানে পূর্বাভাবের একটি সুন্দর উদাহরণ দিলেন। রাজা দুঃখান্তকে যে, ম'এ কয়েক মুহূর্ত পরে দৈবের বিড়ম্বনায় লুপ্ত-স্মৃতি হয়ে নিজের প্রণয়িনী শকুন্তলাকে—কেবল প্রণয়িনী নয়, বিবাহিতা ও সন্তান-সন্তাবিতা ধর্মপত্নীকে চিনতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, ও য'র জগৎ পরে তাঁকে অমৃত্যুপের অনলে দগ্ধ হতে হবে, জীবনের সেই কলঙ্কময় অধ্যায় যে এসে পড়ে রাণী হংসপদিকার গান তাঁর হৃদয়ে একটা অহেতুক বিষাদের অমুভূতির সৃষ্টি করে পূর্ব হতে যেন তারই একটা আভাস দিয়ে গেল।

## ছায়ার তীর্থ

শ্রীকৃতাশ্রুনাথ বাগচী

প্রথমে তাপের নথরে যখন মাটির চেতনা লুপ্ত,  
শোষণ তীর্থ পাষণে পাষণে কি বড়বস্ত্র শুণ্ড !  
দুঃখ যখন হৈতোর মত মত্ত বড়ের প্রলাপে,  
হতাশ তিমিরে সপ্ত ঋষির দীপ্ত নয়ন সুপ্ত ;

তখন তোমার সূর্য নিয়তির ক্রুর হরধনু ভঙ্গ,  
নির্বাণহীন প্রাণ বহিরে আনো বহি নিঃসঙ্গ।  
রুকপূরের বক্ষ দুয়ারে হানি অলক্ষ্য আঘাতে  
মুক্তি লভিল চির দুলভ শ্রামল সবস অঙ্গ।

ভবে অধর গুরু গভীর মেঘ ডব্বরু ছন্দে,  
শিহরিত ধরা প্রগাঢ় শ্রেমের নিবিড় মন্দির গন্ধে।  
নৃত্য নেশায় সব হারায় উপল-মেখলা ধারী,  
ক্রান্ত বিদ্যুৎ পতাকা উড়িয়ে দশদিকন্ত বন্দে।

হে চিবকুমার ! ললাটে তোমার অরুণ তিলককাস্ত,  
অমিত বীর্ঘ্য বিশাল বক্ষে ললিতঐশ্বর্যে শাস্ত।  
ইন্দ্রধনুর মাল্য তোমার, চন্দ্রের সুধাপাত্র,  
ছায়ার তীর্থে ক্রান্তি জড়াক মরুগরীর পাশ।



## মেকি

### শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ভূদেব রায় মারা গেলেন। বহুকালকার লোক—এই নবদ্বীপ শহরকে একদিন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র দেখিয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপের রাস্তার পাশে পাশে পচা ডোবা, বাকসের ঝোপ আর বাশবন ছিল। সারা শহরে মাত্র দুই-তিনখানি মনোহারী দোকান, একটি ঔষধের দোকান ছিল। চারের দোকান ছিলই না—আর মাত্র দু'খানি খাবারের দোকান ছিল। ক্রমশঃ তাঁহার চোখের সম্মুখেই শহর বড় হইতে লাগিল। দোকানপত্র বাড়িল, গাঁচের বাস্ত, বিদ্যাতের আসো-পাখা-বেড়িও, তিন-চারখানি দিনেম-হাউস দেখা দিল। এখন এখানে কলক্স হইয়াছে—ছেলে ও মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং নিত্য-নতুন স্কুল, গানের স্কুল, নাচের স্কুল, পাঠাগার প্রভৃতি ব্যাঙ্কের ছাত্তার মত গজাইয়া উঠিতেছে। বেশ ভাগের পর হইতে এখানে পূর্ব-বাংলা হইতে অল্প লোক আসিয়াছে। গৌর ও গঙ্গা এই দুই বস্তুর জ্ঞান নাকি বহুলোকই নবদ্বীপকে পছন্দ করে। তীর্থস্থান ক্রমশঃ ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই আত্মিকালের বহু পুরাতন ভূদেব রায় মারা গেলেন। কিন্তু সবচেয়ে মর্যাস্তিক ব্যাপার এই, পুত্র হরিপদ রায়ের জ্ঞান রাখিয়া গেলেন নড়বড়ে একখানি জীর্ণ-কীর্ণ একতলা বাড়ী আর কিছু দেনা। হরিপদের বিবাহ হইয়াছে—একটি কন্যা ও একটি পুত্রও হইয়াছে। হরিপদ পিতার মৃত্যুর পর চক্ষে অন্ধকার দেখিল। বাহা হউক, যতদিন বাবা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার পেনসনের বাধা টাকা করটি একটা মস্ত সহায় ছিল। এখন সেই মস্ত সহায়টি পর্যন্ত চলিয়া গেল। বলিতে গেলে হরিপদ অগাধ জলের মধ্যে পড়িল। হরিপদ লেপাপড়া বৎসামাত্র শিখিয়াছে—তবে বাংলা ভাষার লেখা ভাল, এবং হিসাব-পত্র ভাল জানে। তাই শহরের বিখ্যাত একটি মুদ্রাখানার দোকানে হিসাবের খাতাপত্র লেখে। কিন্তু মাহিনা বড়ই অল্প—মাত্র ত্রিশটি টাকা।

মালিক বহুবোষ মাসাচ্ছে এই বৎসামাত্র টাকা করটি দিতেই বহু কথা শুনাইয়া থাকেন। এখন নতুন করিয়া এই বাজারে চাকরি খুজিবার সংসারও তাহার নাই। কাহার উপর ভরসা করিয়া ঘর-সংসার ছাড়িয়া বিদেশে ঘুরিবে? ইহা ছাড়া সংসারের অবস্থা ত দিন-আনি দিন-খাই করিয়া চলিতেছে। ভাতের উপর ভাল জোটে না। ছেলেমেয়েরা মাছ মাছ করিয়া পাগল করিয়া ফেলে। কিন্তু চার টাকা সেয়ে মাছ কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা ত তাহার নাই। আর ঘি, দুধ, ভাল-মন্দ মিষ্টি, ডিম, মাংস—এই

সব স্বপ্নেও ভাবা যায় না। চাউলের দাম ত্রিশ টাকার উঠিয়াছে না জানি আরও যদি বাড়িয়া যায় তবে উপস্থিত এখন বাহা এক-বেলা জুটতেছে, ভবিষ্যতে তাহাও জুটবে না। হরিপদ চক্ষের সম্মুখে নিরানন্দময়, আশাহীন ভবিষ্যৎ ফুটিয়া ওঠে। নিজেরা না খাইয়া একদিন একবেলা কাটাইতে পারে, কিন্তু ছেলেমেয়েটি, তাহা ত ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে পারিবে না, বা তাহার পিতার অবস্থা বুঝিবে না। উহারা খাইতে চায়—খাবার না পাইলে কান্না জুড়িয়া দেয়। ছোট মেয়েটি একটুখানি গুড়, দুটি মুড়ি, বা একটু-খনি দুধের জল খর করিয়া এক নাগাড়ে কানিতে থাকে, চুপ করিতে বলিলে চুপ করে না—ঘমকাইলে বা মারিলেও চুপ করিবে না, কান্না ধ'মাইবে না। শুনিলে কষ্ট হয়, দেখিলেও ম'চা হয়, দুঃখ হয়। উপযুক্ত আহারের অভাবে এটুকু ছেলেমেয়ের বাড়-বাড়ন্ত নাই। তাত-পাশুলি সরা সরা, মুখ ছোট, পেটটি ফাঁত হইয়াছে, মাথার চুলগুলি শুঁঠান রকম।

হরিপদ অপসক দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের দিকে তাকাইয়া থাকে। জীব শূণ্য হাত দুইটি স্মরণ করিয়া দেয় যে, সরা সরা সোনার দুই-গাছি চুড়ি পোদ্দারের বহনাকার ঠাণ্ডা সিন্দূরের মাঝে পড়িয়া আছে। উগা যে আর কোনদিন ছাড়'ইয়া লইয়া সন্ধ্যার হাতে উঠিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সুখমা বলিল, যা চাল আছে তাতে টেনেবুনে ওবেলা হতে পারে। কিন্তু এ বেলায় তেল, খুন, আলু, হলুদ এ-সব আনতে হবে। তার পর চাল—সুখমা স্বামীর মুখে দিকে তাকাইয়া ধামিয়া যায়।

হরিপদ বলে, ত্রিশ টাকা করে চাল—এদিকে লক্ষ্যবাবু টাকার তাগাদা দিচ্ছেন। মিউনিসিপ্যালটিব ট্যাক্সও অনেক বাকি পড়েছে, তাহাও হুবেলা তাগাদা দিচ্ছে—আর এর পর খাতির করবে না। পুজো এসে গেল, ছেলেমেয়েদের বা হোক জামা-প্যাণ্ট দিতেই হবে। আর তোমারও ঐ একখানি মাত্র শাড়ী—

—আমার? আমি ত ঘরেই থাকি। তোমার বাইরে বেরতে হয়, তোমারই দরকার। জুতোব অবস্থা যা, ওতে আর তালি চলবে না। ঐ জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তা-ঘাটে হাঁটছে? খুঁটি-জুতো তোমারই দরকার। কিন্তু—। এই কিন্তু পর আর কোন সমাধান নাই। সমস্ত কিন্তু সমাধান হয় যদি টাকা থাকে। কিন্তু কোথায় সে টাকা।

ধীরে ধীরে গলির ভিতর অন্ধকার নামিয়া আসে। আশে-পাশের বাড়ীর উল্লন হইতে বাশিকৃত ধোয়া আসিয়া দিবসের

প্রথমে আলোকে ডুবাইয়া অন্ধকার করিয়া দেয়। হরিপদর ঘনে হয়, তাহার জীবনের আলো এমনি অকালে নিভিয়া অন্ধকার হইয়া বাইতেছে।

এখন একমাত্র আশা, শোনা বাইতেছে, মালিক নাকি এক মাসের বোনাস দিবেন। তবুও বিশ্বাস হয় না। অমন হাড়-কুপন বহুবোধ যে, তাহাদের এক মাসের মাহিনা বোনাস দিবেন, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু দোকানের অজ্ঞাত কর্মচারীরা চুপি চুপি জানাইয়াছে যে, না দিলে মজা দেখাব না!—পূজোর মরশুমে শ্রমঘট করে বাছাখনকে চোখে সব্বের ফুল দেখিয়ে দেব। ইহার মধ্যে বলাই ছোকাটাই ভাবী সাহসী আর চটপটে। সে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সকলের সহি লইয়া মালিকের কাছে দিরাছে। উদাত্তে দাবি আছে—প্রত্যেককে এক মাসের মাহিনা বোনাস দিতে হইবে, এবং প্রত্যেককে একখানি করিয়া নতুন কাপড় দিতে হইবে। হরিপদ প্রথমে সহি করিতে চাহে নাই। ভয়ে ভয়ে বলিয়াছে, ভাই ঘোষ মহাশয়ের বা মেজাজ তাতে ভয় লাগে। তোমাদের তাড়ান শক্ত। তাড়াতাড়ি তোমাদের মতন লোক জোটান কঠিন। কিন্তু আমার মতন হিসেব লিখিয়ে নব্বীপ শহরে অনেক আছে। আমার ত দুবেলা চোখ বাঙাচ্ছেন—এই ছুতো পেলে আর কি চাকরিতে রাখবেন? কিন্তু সেই বলাই ছেলেটি ভাবি সাহসী। হরিপদর নিচে হাত রাখিয়া অভয় দিয়া বলিল, কুছ পরোয়া নেই। তাড়াক না দেখি একবার! তার পর আশ্বা বাছাখনকে বিদ্যাবন দেখিয়ে দেব না! এই একটি মাত্র ভরসাতে হরিপদ মনকে ঢুট করিয়াছে। মনে মনে হিসাব করিয়াছে—এক মাসের মাহিনা বোনাস পাইলে, উহা হইতে চাল-ডাল ও ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় কিনিয়া দিবে। সজ্জা দেখিয়া, নিজের জন্ত একজোড়া জুতা, একখানি ধুতি ও শ্রম্যার জন্ত একখানা সাড়ী কিনিয়া দিবে। আজ কতদিন বে শ্রম্যা পূজার সময় কাপড় পায় নাই—এ দুঃখ খুব বড় হইয়া, হরিপদর বুক বাজিয়াছে। পূজার সময় পাড়ার ছেলেমেয়েরা, বো-ধিয়া নতুন জামা-কাপড় পরিয়া, কেমন সাজিয়া-গুজিয়া ঠাকুর দোখরা দেখিয়া বেড়াইতেছে আর তাহার জী-পুত্র ছেড়া, তালিমারা জামা-কাপড় পরিয়া হতঃশ, স্রিয়মান দৃষ্টিতে, অপরের নতুন জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া আছে। হরিপদ একটা বড় বকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে। না, এইবার আর তাহা হইতে দিবে না। পূজার আগেই মাহিনা আর বোনাস তাহার চাই-ই। হরিপদ ঠিক করে—কালই বলাইকে আবার শ্রবণ করিয়া দিবে।

শ্রম্যা বলে, ওগো! পূজা ত এসে গেল। মাঝে মাঝে পাঁচ দিন বাকী। এবারও বোধ হয় ছেলেমেয়েটার জামা-টামা কিছু হচ্ছে না। আমার জন্ত কিছু বলি নে। ওরা ছেলেমাছ—পাঁচটা ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় দেখছে আর আমার কাছে এসে বায়না খরছে, মা আমাদের জামা-প্যাট কবে হবে—

হরিপদ জীৱ দিকে তাকাইয়া বলে, চেষ্টা ত করছি। ঘোষ

মশাই ত বলেছেন, পূজার আগে মাইনে আর একমাসের বোনাস দেবেন। দেখি কি হয়।

পূজা আসিয়া পড়িল। পাড়ার পাড়ার সার্বজনীন পূজা-মণ্ডপে বাজনা, বাঁশী বাজিয়া উঠিল। দোকানে দোকানে নতুন নতুন জামা-কাপড় আর আলোর আলোর জানাইয়া দিতেছে, বৎসরের পর আবার মা দুর্গা আসিতেছেন। চতুর্দিকে ছুটির বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদেশ হইতে কাহারও বাবা, কাহারও দাদা, জেঠা, কাকা, নতুন নতুন জামা-কাপড়, খাবার-দাবার, নতুন কপি লইয়া বাড়ী আসিতেছে। কেহ বা নতুন বাজের মথো, ছেলেদের জুতা, জামা, কাপড়—জীর জন্ত এসেস, সাবান, নানা গন্ধের বই লইয়া আসিয়াছেন। মেঘস্কৃত আকাশে শরতের সুরধিকরণ, ঠিক উৎসবের মধুর হান্তের মত, চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতিবেশীদের গৃহের অন্ধনে, শিউলী ফুল ফুটিয়াছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ভোরে শিশিরসিক্ত ফুলগুলি লইয়া কলরব করিয়া ছুটিতেছে। ফুল-কলক বন্ধ হইয়াছে কেবলীরা ছুটি পাইয়াছে। ছাত্র, চাকুরিয়ারা নতুন জুতা মচমচ শব্দ তুলিয়া অকারণ হান্তে রাজপথ সচকিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার মোড়ে ঘোড়ে নতুন নতুন বস্ত্রভে শারদীয়া পত্রিকাগুলি হকাররা বিক্রয় করিতেছে—মাইকে নতুন নতুন রেকর্ডের গান ধ্বনিত হইতেছে। দেওয়ালে দেওয়াল-জোড়া নতুন নতুন সিনেমার বিজ্ঞাপন—জামা-কাপড়ের বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে, শারদীয়ার উপস্থিতি ভালরূপে জানাইয়া দিতেছে।

না, আর পূজার দেৱী নাই, মা আসিতেছেন। হরিপদ অঙ্গ-মনস্বভাবে এই সব দেখে—তাহার হৃদয় হইতে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস উচ্ছসিত হইয়া ওঠে, এবং বোধ করি, হুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রুগুলি চোখের কোণে দেখা দেয়। নিজের নিবানন্দ গৃহ—অন্ধকার ঘর, প্রেমসীমিত অশ্রু—ছেলেমেয়েদের উলাস, স্রিয়মান দৃষ্টি, সমস্তই একে একে তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া ওঠে। এক সময় অসুট কণ্ঠে বলে, ভগবান—ভগবান!

ষষ্ঠী দিন একটু সকাল সকাল দোকানে বাইতেই, বহু ঘোষ ফাটিয়া পড়িল, বলি ওহে হরিপদ, এই দরখাস্তের নীচে এই সইটা তোমার ত! হরিপদ অষ্টমীর পাঠার মত কঁপিতে কঁপিতে দেখিল সেই দরখাস্তখানি। তাহাদের নানাবিধ দাবীর দরখাস্তখানি ঘোষ মশায়ের হাতে।

মুহু কণ্ঠে বলিল, হঁ।

বহু ঘোষ বলিল, এক মাসের বোনাস। বলি বোনাসটা কি? আমি ত ঐ ইংরেজী ভাষা জানিনে বাপু। আর একখানা করে নতুন কাপড় আমার দিতে হবে। তোমাদের দাবী জোড়দার হয় নি। মাত্র একখানা কাপড় চেয়েছ। কেন, গুণ্ডিগুন্ড সকলের জন্ত শান্তিপুণে করাশডাডার ধুতি, সাড়ী চাইলেই পারতে। বৌয়ের জন্ত একখানা করে বেণাবসী, ফুলেল তেল, পাউডার, পয়েন্ড—

হুগো দরখাস্তে বাদ দিলে কেন? সে নবাবপুত্রের কোথায়? সই বলাইটা।

বলাই তখনও আসে নাই। এইবার বহু ঘোষ ফাটিয়া ঝিল। তাঁর মুখ দিয়া একসঙ্গে যেন শ্রোত বহিতে লাগিল। আনন্দ সঙ্ঘোষন করিয়া, দোকানের সমস্ত কর্মচারীদের ঠিকে তাকাইয়া সে তিনখানি দশ টাকার নোট হরিপদর ঠিকে ফেলিয়া দিয়া বলল, এই নাও, তোমার এই মাসের ইনে। খাতার ষ্ট্যাম্পের উপর সই করে বিদেয় হও। আর আসতে হবে না—তোমার মত ঢেব ঢেব খাতা লিখিয়ে পাব। আর তোমাদের ব্যবস্থা পূজার পর হচ্ছে। বোনাস, বাণের জয়ে ওনি নি মূলীখানার দোকানে বোনাস দেয়। বলি, আমি কি টাটা-বিড়লা—বে বোনাস দেব। বলাইটা আশ্রুক—তার বড় তেল হয়েছে। দাবী করতে শিখেছে—বা এবার, রাস্তার রাস্তার ঘুরে নিশেন ঘাড়ে করে বলগে—আমাদের দাবী মানতে হবে।

হরিপদ কান্নাভরা স্বরে কিছু বলিতে গেল। কিন্তু বহু ঘোষ হাত নাড়িয়া ধমক দিয়া বলিল, খুব হয়েছে—আর মারাকান্না কান্ডতে হবে না। দোকান করতে করতে চুল পেকে গেল, বহু লোক দেখেছি—মাস্ত্রকে চিনতে আর বহু ঘোষের বাকী নেই। নাও—এখন খসে পড়।

নোট তিনখানি পকেটে করিয়া হরিপদ দোকান হইতে বাহির হইল, তখন সারা শহরে উৎসবের বজ্রা বহিয়াছে। পাঁচটি প্রাণীর মাত্র এই তিনখানি নোট সম্বল। সমস্ত বাড়ী খুঁজিলে, আর একটি আধলাও পাওয়া যাইবে না। সম্বল মাত্র ঐ ভাড়া একতলা বাড়ী, তাহারও ট্যান্স বাকী পড়িয়াছে অনেক কোয়ার্টারের। ঘরে চাল নাই—তেল নাই—কাহারও একখানি আঙ্গ কাপড় পর্য্যন্ত নাই। বিষয়-সম্পত্তি বলিতে গেলে কিছুই নাই। কিন্তু পৃথিবী হাসিতেছে—গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে—ফল ফুল ফলিতেছে। দোকানে দোকানে কত খাবার—কত চাল—ডাল—তেল। খাবারের দোকানে অমুস্তে খাতের আয়োজন, দোকানগুলি আলোর আলোয় হাসিতেছে। শহরের আরও কত লোক, তাহারা হাসিতেছে—পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া, কত প্রয়োজনীয় অ-প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনিয়া স্তু পাকার করিতেছে। ওধু সেই—এই ফল-ফুল শোভিত শত-শ্রামল বসুন্ধরার মাঝে, ভিক্ষকের মত, ঘন অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছে। জীবনের এক পরিহাস!

আর মণ চাল, মুন, তেল কিনিতেই কুড়িটা টাকা খরচ হইয়া গেল। একখানি মাত্র নোট—মাত্র দশ টাকা। এই মাত্র তার সম্বল। সে নিজে, তাহার স্ত্রী, দুটি শিশুপুত্র, এই কয়জনের জন্য এই একখানি নোটই কি বখেট? বায় বায় প্রদ্ব করে, হরিপদ নিজেকেই। ছেলেমেয়ে দুটি, নূতন জামা প্যাণ্টের জন্য পথ চাহিয়া আছে। বাড়ী কিরিলেই, তাহারা কত আশাভরা স্বরে,

বলিবে—বাবা আমাদের জামা—সেই আনন্দভরা, খুশী-বলয়ল মুখকে কি করিয়া সে একটি ফুংকায়ে নিভাইয়া অন্ধকার করিয়া দিবে? জগৎ জোড়া এই আনন্দের দিনে, পিতা হইয়া, কি করিয়া বলিবে, নায়ে—এবারও হ'ল না তোদের জামা-প্যাণ্ট। না—হরিপদ আর ওকথা বলিতে পারিবে না। নোটখানি আর একবার স্পর্শ করিয়া, হরিপদ একটি ছোট্ট-খাট্ট দোকানে ঢুকিল।

রাত অনেক হইয়াছে। ছেলেমেয়েটি, তাহাদের নূতন জামা-প্যাণ্ট হাতে করিয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়াছে। উহারা ঘুমাইবার আগে বলিয়াছে, বাবা নোটুন জুতো দিও কিন্তু। ওবাড়ীর অপর্ণা যেমন পরছে—শিবুর যেমন জুতো সেই রকম দিও কিন্তু। বাড় নাড়িয়া, হরিপদ বলিয়াছে—হাঁ, ঐ রকমই দেব।

স্বয়ং ঘরে আসিয়া দেখিল, লঠন টিপ টিপ করিয়া জলিতেছে, আর হরিপদ ছিন্ন বিছানায় বসিয়া, আপন মনে বিড়ি টানিতেছে।

—একি এখনও ঘুমোও নি?

—ঘুম! ঘুম কি চোখে আছে? ঘুম চোখ থেকে উড়ে গিয়েছে।

—কিন্তু ভেবে কি করবে? ভগবান কি এমনি নিষ্ঠুর হবেন! না—না—একটা উপায় করবেনই। ঠাকুরের ওপর মতি রাখ, দেখবে, নিশ্চয়ই একটা হিলে করে দেবেন। হরিপদ কোন কথা বলিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, পাড়ার কোলাহল বন্ধ হইল, যাত্রী গভীর হইতে গভীরতর হইল, তবুও হরিপদের চোখে ঘুম আসিল না। কি যেন ভাবিতে ভাবিতে, বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভাবনার শেষ নাই। লোকের কাছে অনেক দেনা, ঘরে একটি পরমাণু নাই। এত বড় বিশাল পৃথিবীতে, তাহার আত্মীয়স্বজন বলিতেও কেহ নাই। বে দুই-একজন আত্মীয় আছে, তাহারা খোজ লয় না। সে একাকী আত্মীয়স্বজন বিহীন হইয়া, এই বিরাট পৃথিবীর সমস্ত আনন্দরস হইতে বঞ্চিত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে লাঞ্চিত জীবন বহন করিতেছে। কিন্তু তবুও তাহাকে বাঁচিতে হইবে। নিঃশ্রিত স্ত্রী-পুত্রকন্ডার দিকে চাহিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হরিপদ গৃহমধ্যস্থ অসীম অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গেল।

আজ মহা অষ্টমী। সন্ধ্যার পর সন্ধিপূজা সুরু হইবে। ছেলে-মেয়ে দুটি পাড়ার বারোমারী তলা হইতে ঠাকুর দেখিয়া দুটি বাতাসা, চাল, ছোলা, কলা খাইতে খাইতে আসিয়া বলিল, বাবা আমাদের জুতো কই? বলেছিল যে কিনে দেবে? সবাই কত ভাল ভাল জুতো পরছে। চল না দোকানে—দেখবে কত ভাল সব জুতো। হরিপদ অস্ত্রমনক ভাবে বলিল, হঁ কিনে দেব। কালই কিনে দেব—

সন্ধ্যার পর রাস্তার আর পা বাড়াইবার উপায় নাই। লোক

লোকারণ্য—এখন ভীড় যে, ঠেলিয়া সাজা পায় হওয়া যায় না। উৎসব-প্রসন্ন নরনারী, বালক-বালিকা, নৃতন জামা-কাপড় পরিয়া, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়াছে। অল্প সকলের মত হরিপদও বাহির হইয়াছে। তাহার দুই চোখ যেন জলিতেছে—ভীড়ের মধ্যে সে যেন কিছু সন্ধান করিতেছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক এক জায়গায় ভীড় করিয়া ঠাকুর দেখিতে ছিল। মনে হইল, তাহারা শহরের নয়—পার্বত্য প্রায় হইতে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে। উদ্দেশ্যে মধ্যে একটি বার তের বৎসরের মেয়ের গলায় বেশ মোটা একটা সোনার হার ঝক্ ঝক্ করিতেছে। হরিপদ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভীড় ঠেলিয়া ঠিক সেই মেয়েটির পিছনে আসিয়া ঝাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু ঠিক কুণ্ঠিত ব্যাভ্রের মত জলিতেছে। সে ভীড় দোৰেতেছে না—প্রতিমা দেখিতেছে না—এত আলোকসজ্জা—এত ভীড়—এত জনকোলাহল—সব যেন তাহার নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু একাধি দৃষ্টিতে, অত্যন্ত লুক্ক দৃষ্টিতে মেয়েটির গলায় হারটির দিকে তাকাইয়া থাকে।

এক সময় জোরে ঘড়ি ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। লোকজন উঠে-যবে ‘হুগা মাজিকী জয়’ বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। ঠিক সেই সময় হরিপদ, মেয়েটির গলায় হার সজোরে টান দিতেই হারগাছটি ছিড়িয়া তাহার হাতে আসিল। মেয়েটি চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার চীৎকার পূজার বাজনা ও জয়ধ্বনির মাঝে ডুবিয়া যায়।

একটা চায়ের দোকানের এক কোণে বসিয়া এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়া হরিপদ মুখে ঘাস মুছিয়া কেলিল। পকেটে হাত ঢুকাইয়া হারগাছটি অঙ্গুষ্ঠে করিয়া মনে মনে ভাবিল, অজ্ঞাতঃ চান-পাঁচ ভরির কম নয়। পাঁচশো টাকা ত বটেই—

পরের দিন একটা চেনা সেকরার দোকানে আসিয়া বলিল, কি হচ্ছে দাদা—

সেকরা তাহার কাজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, কি হরিবাবু যে, আজ ছুটি নাকি—

—নাঃ, আমার আবার ছুটি। দেখ ত দাদা, হারগাছ বিক্রী করতে হবে। আমার শালীর হার, এটা বিক্রী করে দেবে। ক’দিন আনি আনি করে আর আনা হয় না।

কপালের ঘাস মুছিয়া, কম্পিত-হাতে পকেট হইতে সেই হারগাছটি সেকরার হাতে তুলিয়া দিয়া হরিপদ বিপুল আশায় তাকাইয়া থাকে।

হারগাছটি হাতে লইয়া সেকরা বলিল, একি বাবু এ যে গিলটীর হার—এ ত সোনা নয়—

—সোনা নয়? বল কি হে? হরিপদ আর্জুনাদ করিয়া উঠিল—না-না ভাল করে দেখ। আমার শালীর বিয়ের হার—এ কি করে গিলটির হবে।

মুহ হাসিয়া সেকরা কষ্টি-পাথরে হার ঘুরিয়া বলিল, এই দেখুন বাবু, এ সোনা নয়—।

কপালের ঘাস মুছিয়া বিবর্ণ মুখে হারগাছটি হাতে লইয়া হরিপদ উঠিয়া ঝাঁড়াইল। দিবসের সমস্ত আলো তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে নিভিয়া গেল। কোনমতে পকেটে হারগাছটি ঢুকাইয়া বিড় বিড় করিয়া হরিপদ বলিল, এ সোনা নয়—যেকি।

‘যেকি! যেকি!’ বলিতে বলিতে হরিপদ দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

## ত্রয়ী

### শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

১

উপল-বন্ধুর পথ—

পরিবার ব্যয়ণা কুলছে;

সাঁকোর ওপর চলে অশরীরী আরণ্যক

ছায়ার নিখিল।

আশে-পাশে দুর্ধর্ষ পাহাড় প্রাচীর।

প্রভাতের সূর্যকরে কুরালা হুলছে।

তখন না বহি ভুমি ঝালাে ক্রবির

পৃথিবী কি কয়ে হবে এক অনাবিল?

২

মোমাছি এ কূলে ও কূলে

ছুটে ছুটে যায়।

চল কোথায়?

অগ্রান অকূলে।

৩

কাল কবি বলে বলে না আমি কী করে

মাল কেলি গুরু হয় বিদেশী বন্দরে।

## শঙ্করমতে “সাধন” : কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৪

পূর্বসংখ্যায় পুণ্যকর্ম ও শাস্ত্রোপহিষ্ট নিত্যকর্মও যে মোক্ষের সাধন নয়, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। শঙ্কর এ সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা করেছেন।

পুনরায় যদি বলা হয় যে, নিত্যকর্ম অস্তান্ত কর্মের অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির, সেজন্য তার ফলও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন—তার উত্তরে শঙ্কর বলেছেন যে, যখন নিত্য-কর্মও “কর্ম”, তখন তার ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন হবে কেন? বস্তুতঃ “কাম্য” কর্ম বাদ দিলে, “নৈমিত্তিক” ও নিত্য “কর্ম” উভয়ই তুল্যরূপ, উভয়েই যাবজ্জীবন বিহিত হয়েছে। কিন্তু নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রে ত মোক্ষ ফল কল্পনা করা হয় না কোনোদিনও, নিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই বা হবে কেন?

“নৈমিত্তিকেষু ফলেষু ন মোক্ষঃ ফলং কল্যাতে, তৈশ্চাভিষেবাৎ নৈমিত্তিকেষ্বন, জীবনাহি-নিমিত্তে চ শ্রবণাৎ, তথা নিত্যানামপি ন মোক্ষঃ ফলম্।”

(বৃহা-ভাষ্য-ভূমিকা, ৩-৩)

এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণও শঙ্কর দিয়েছেন। পেচকাহির চক্ষু অস্তান্ত প্রাণীদের চক্ষু থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, যেহেতু অস্তান্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে চক্ষু দ্বারা রূপ বা নীল-পীতাদি বর্ণ অবলোকনের জন্য আলোকের প্রয়োজন হয়, পেচকাহির ক্ষেত্রে তা হয় না। কিন্তু তা’ সত্ত্বেও এ কথা কল্পনা করা নিতান্তই হাস্যকর হবে যে, পেচকের চক্ষু অস্তান্ত প্রাণীদের চক্ষু অপেক্ষা ভিন্ন এবং অস্তান্ত প্রাণীদের চক্ষু রূপ-গ্রহণ করে বলে, পেচকাহির চক্ষু রূপ-গ্রহণ না করে বস-গ্রহণ করে। সেজন্য, কোনো বিষয়ে যদি কল্পনা করতেই হয়, তা হলে সেই বস্তুর যা’ শক্তি-সামর্থ্য আছে, সেই বিষয়েই কেবল কল্পনা করা চলে, তার বাইরে কিছু নয়। একই ভাবে, কর্মের ক্ষেত্রে যদি ফলের কল্পনা করতেই হয়, তাহলে কর্ম যে রূপ ফল উৎপাদন করতে পারবে, সে রূপ ফলই কেবল কল্পনা করা উচিত মোক্ষ-প্রার্থী অথ কোনো রূপ ফল কল্পনা নয়।

“হি” ও “বিষের” যে উদাহরণ উপরে দেওয়া হয়েছিল, তা’ ত কেবল এই মাত্রই প্রমাণ করে যে, নিকামভাবে এবং জ্ঞান-সহযোগে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্ম সাকাম ও জ্ঞানহীনভাবে অস্তান্ত কর্মের অপেক্ষা স্বতন্ত্র ফল উৎপাদন করে। কিন্তু সেই ফল যে মোক্ষ, তা’র প্রমাণ কি? একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুতঃ নিত্যকর্মের স্বতন্ত্র ফল হলেও আপত্তি

হতে পারে না, যদি সেই ফল, কর্মেরই উপযোগী হয়। যেমন, দেবদ্বিলোক লাভ, ক্রমযুক্তি প্রভৃতি ফল নিত্যকর্মের হয় যখন তা’ উপাসনাদি সঙ্গ যথাযথ ভাবে সংযুক্ত হয়।

পুনরায় নিকামভাবে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্মের ফল যে চিন্ত-শুদ্ধি, তা’ ত পূর্বে বহুবারই বলা হয়েছে। এরূপ আত্ম-শুদ্ধির জন্য যারা নিত্যকর্মের অমুষ্ঠান করেন, এবং তার ফলে আত্মদর্শন এবং সর্বত্র সমদর্শন করতে সমর্থ হয়ে, মোক্ষ লাভ করেন, তাঁদের শাস্ত্রে “আত্মযাতী” বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দিক থেকে, যা’ পূর্বেই বহুবার বলা হয়েছে, জ্ঞানসহযোগে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্ম আত্মজ্ঞানের সাধন।

“আত্মযাতিশব্দস্ত তুতপূর্ব-গত্যা প্রযুক্ত্যাতে জ্ঞানযুক্তানাং নিত্যানাং কর্মণাং জ্ঞানোৎপত্তি-সাধনত্ব-প্রদর্শনার্থঃ।”

(বৃহা-ভাষ্য ভূমিকা, ৩-৩)

নিত্যকর্মের আর একটি ফল হ’ল পঞ্চভূতে বিলয়—“ভূতাপ্যায়ম্”।

এরূপে, নিত্যকর্মের নানারূপ ফল :

(১) সাকামভাবে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্মের ফল হ’ল ব্রহ্মাদি-দেবতাব বা দেবপদ প্রাপ্তি। এই হ’ল সাকাম কর্মের ফলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ফল (“ব্রহ্মাস্ত-কর্ম-বিপাকঃ”)। অবশ্য সাকাম কর্ম বলে, এর ফলে সংসারে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য, যা’ পূর্বেই বলা হয়েছে।

(২) নিকামভাবে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্মের ফল হ’ল চিন্ত-শুদ্ধি, জ্ঞানদীকার, জ্ঞানোৎপত্তি। এর ফলে মোক্ষ এবং সংসারে অনাবৃত্তি।

(৩) নিকামভাবে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্মের আর একটি ফল হ’ল ক্রমযুক্তি, যখন তা’ সন্তোষোপাসনার সঙ্গ যুক্ত হয়।

(৪) নিকামভাবে অমুষ্ঠিত নিত্যকর্মের আর একটি ফল হ’ল পঞ্চভূতে বিলয়।

সেজন্য, নিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনার অন্তে, শঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন :

“তস্যাং সান্তিসদ্ধীনাম্ নিত্যানাং সর্বমেধাশ্চমেধাহীনাম্ চ ব্রহ্মদ্বাহীনী ফলানি। যেথাং পুনর্নিত্যানি নিরতিসদ্ধীনী আত্মসংস্কারার্থানি, তেথাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানিত্যানি...তেথাং-মারাজ্জপকারকস্বাং মোক্ষসাধনাতপি কর্মণি ভবজীভি ন বিরহ্যন্তে।”...

“তস্মায় মোক্ষার্থানি কর্মণীভি সিদ্ধম্। অতঃ কর্ম-ফলানাং সংসারত্ব-প্রদর্শনার্থৈব ব্রাহ্মণমারভ্যতে।”

যাঁরা ফলাভিলাষী, তাঁদের নিত্যকর্ম এবং সর্ব-অর্থমেধাদি-  
রূপ কাম্য-কর্মের ফল হ'ল ব্রহ্মাদিপর লাভ। অপর পক্ষে,  
যাঁরা ফলাভিলাষী নন এবং কেবল আত্মগুহির জন্তই নিত্য-  
কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁদের সেই সকল নিত্য-কর্মজ্ঞানোৎ-  
পত্তির কারণ হয়। এইভাবে, নিত্যকর্ম পরম্পরাক্রমে  
জ্ঞানের পরোক্ষ সাধন বলে, সেই অর্থে মোক্ষ-সাধন।

কিন্তু কোনো কর্মই সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের কারণ নয়।  
যাঁরা জ্ঞানযোগে অধিকারী, তাঁদের পক্ষে নিত্যকর্মও অবশ্য  
প্রয়োজনীয় নয়। যাঁরা কর্মযোগে অধিকারী, তাঁদের পক্ষে  
তা' অত্যাৱশ্যক।

এরূপে, নিকাম কর্ম এইভাবে চিন্তাশক্তি দ্বারা জ্ঞানোৎ-  
পত্তির উপায়স্বরূপ হলেও, যে' সকলের পক্ষে অত্যাৱশ্যক  
নয়—এ বিষয়ে শঙ্কর তাঁর তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভাষ্যে (১-১১)  
পূর্বপক্ষ খণ্ডন ব্যপদেশে প্রপঞ্চিত করেছেন।

এক্ষেত্রে, নিকাম কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হলে, আশঙ্কা  
হতে পারে যে, যেহেতু কর্মমুর্ত্তান একমাত্র গার্হস্থ্যশ্রমেই  
সম্ভবপর, সেহেতু অস্ত্রান্ত আশ্রম নিশ্চয়োজন।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, এরূপ আশঙ্কার কোনো  
ভিত্তি নেই।

“কর্য্যানেকদ্বাং” ( তৈত্তি-ভাষ্য, ১-১১ )

কর্ম অনেক প্রকার। সেজন্ত গার্হস্থ্যশ্রমের অগ্নিহোত্র  
প্রভৃতিই কেবল কর্ম নয়। সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য, তপস্তা, সত্য-  
বচন, শম, দম, অহিংসা প্রভৃতি অস্ত্রান্ত আশ্রমের জন্ত  
বিহিত কর্মও কর্ম, এবং এই সকল কর্মও সমানভাবে  
জ্ঞানোৎপত্তির সাধক। একই ভাবে ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিও  
ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ বলে' বিহিত হয়েছে। সেজন্ত কেবল  
গার্হস্থ্যশ্রমের জন্ত বিহিত কর্মের মাধ্যমেই যে জ্ঞানোৎপত্তি  
হতে পারে, একথা মনে করা ভ্রমই মাত্র।

পুনরায়, জন্মান্তরীয় কর্মের ফলে, বর্তমান জন্মে কর্মমু-  
র্ত্তানের পূর্বেই, অর্থাৎ, গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশের পূর্বেই, জ্ঞানে  
অধিকার জন্মাতে এবং জ্ঞানোদয় হতে পারে। এরূপ পরম-  
দোষাগ্যবান্ সাধক নিত্য আত্মাকে দর্শন করে, প্রজ্ঞা বা  
পূজ, সাকাম কর্ম ও সাকাম উপাসনা দ্বারা লভ্য মনুষ্যলোক,  
পিতৃলোক ও দেবলোকে বীতস্পৃহ হন—সেজন্ত তাঁর আর  
পুনরায় গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ এবং কর্মে প্রবৃত্তি হবে কেন ?  
একই ভাবে, যিনি গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করেছেন, এবং  
বধাবিহিত কর্ম নিকামভাবে সাধনও করেছেন, তিনিও  
জানলাভের পথে কর্মের জ্ঞানের পরিপক্ব বা পূর্ণতম অবস্থায়  
নয় কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না, এবং স্বভাবতঃই  
কর্ম থেকে বিবর্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পুনরায়, বলা যেতে পারে যে, গার্হস্থ্যশ্রমের অগ্নি-  
হোত্রাদি কর্মের বিধানই শ্রুতিতে বিশেষভাবে দেওয়া  
আছে। অস্ত্রান্ত আশ্রমের তপস্তা, ব্রহ্মচর্যাদির বিধান সেরূপ  
অধিক ভাবে দেওয়া নেই। অগ্নিহোত্রাদি অধিক ক্লেশ-  
সাধ্যও নিশ্চয়, এবং অস্ত্রান্ত আশ্রমের জন্ত বিহিত-তপস্তা,  
ব্রহ্মচর্যাদি গার্হস্থ্যশ্রমেও সম্ভবপর। এই তিন কারণে,  
গার্হস্থ্যশ্রম এবং অস্ত্রান্ত আশ্রমকে তুল্য বলে গ্রহণ করা  
অস্বচিত।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, সাধারণ জনদের ক্ষেত্রে  
কর্মই সর্বাঙ্গেকা উপযোগী। তাঁরা স্বভাবতঃই বিভিন্ন কলের  
আশায় বিভিন্ন কর্মে রত হন, এবং এরূপ সাকাম কর্ম অসংখ্য  
বলে', সে সঙ্কে বিধিবিধানও সমভাবে প্রচুর। পুনরায়,  
কর্ম হচ্ছে উপায়, জ্ঞান হচ্ছে উপের বা উপায় দ্বারা লভ্য  
লক্ষ্য। স্বভাবতঃই উপায় সঙ্কেই অধিক আলোচনার  
প্রয়োজন হয় উপের অপেক্ষা। এই কারণেই, শ্রুতিতে কর্ম  
সঙ্কেই অধিক বিধিবিধান দেয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে,  
জন্মান্তরকৃত গার্হস্থ্যশ্রমের অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা অস্ত্রান্ত  
আশ্রমের ব্রহ্মচর্যাদিও জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হতে পারে,  
সেজন্ত কোনো কোনো ব্যক্তি জন্মাবধিই বৈরাগ্যসম্পন্ন হন।  
অন্ত কেহ কেহ পুনরায় প্রথম থেকেই বৈরাগ্যবিহীন ও  
বিজ্ঞাবিষেবীও হন। সেজন্ত যঁরা প্রথমাবধিই সন্ন্যাস  
প্রবৃত্তিশীল, তাঁরা গার্হস্থ্যশ্রম ভিন্ন অস্ত্র আশ্রমেই আশ্রয়  
গ্রহণ করেন।

যদি পুনরায় বলা হয় যে, নিকাম কর্ম দ্বারা চিন্তা-মল  
অপসারিত হলে জ্ঞানোৎপত্তির বাধা বিদূরিত হয়, এবং তার  
পরই স্বতঃই জ্ঞানের উদয় হয়; সেজন্ত পুনরায়, কর্ম-  
কাণ্ডের উপর জ্ঞানকাণ্ডেরই বা কি প্রয়োজন ? তার উত্তর  
হ'ল এই যে, কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি হলেই জ্ঞানের উদয়  
হয় না, তৎপরে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন, শ্রবণ, মনন ও  
নিদিধ্যাসনও অত্যাৱশ্যক।

এই আলোচনার দ্বারা শঙ্কর দুটি তত্ত্ব পরিষ্কৃত করতে  
চেষ্টাছেন। প্রথমতঃ, নিকাম কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির বিশেষ সহায়ক  
হলেও, সকলের পক্ষেই অত্যাৱশ্যক নয়। এ' সঙ্কে “সাংখ্য”  
ও “যোগের” মধ্যে প্রভেদ নির্ধারণ প্রসঙ্গেও বলা হবে।

দ্বিতীয়তঃ, নিকাম কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির বিশেষ সহায়ক  
হলেও, সাক্ষাৎ সাধন নয়, সাক্ষাৎ সাধন হ'ল জ্ঞানকাণ্ডের  
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। এরূপে নিকাম কর্ম নঞর্থক  
( Negative ) দিক্ থেকে চিন্তামলরূপ জ্ঞানোৎপত্তির বাধাই  
মাত্র দূর করে, সধর্থক ( Positive ) দিক্ থেকে জ্ঞানের  
সাক্ষাৎ উদয়ের কারণস্বরূপ হয় না। এই হ'ল শঙ্করের  
নিকাম কর্ম বিষয়ক মতবাদের মূল কথা।



# বঙ্গীয় মধ্যযুগের প্রতিভাবতার শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

কেবল শার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের গুরুরূপে নয়, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি অজ্ঞাত কারণেও বিদগ্ধ সমাজে চিহ্নস্বরণীয়।

প্রথমতঃ, তিনি বহু স্মৃতি-নিবন্ধের প্রণেতা, যে নিবন্ধসমূহ শার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের মনীষা ও প্রতিভাকে বিশেষ উদ্দীপ্ত করেছিল—যে নিবন্ধগুলি, কলতঃ, রঘুনন্দনের অভুলসৌধসমূহের ভিত্তিধরূপ ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য চূড়ামণির পিতা শ্রীকর এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্রও বিশেষ গুণী জ্ঞানী পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি বংশপরম্পরায়ও প্রখ্যাত।

তৃতীয়তঃ, আচার্য্য চূড়ামণির সমাজ-হিতৈষণা সমাজ-চেতনার বহু উর্দ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর সময়বর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় বিপদাশঙ্কে ও অজ্ঞাত কারণে নানা সামাজিক বিধান পরিগৃহীত হয়েছিল যা আচার্য্য চূড়ামণি স্বীকার করে নেন নি। তাঁর বলিষ্ঠ পৌরুষ ও হিতপ্রতিষ্ঠা পাণ্ডিত্য—সামাজিক হিত কখনও ব্যাহত হতে দিত না।

এখন উপরের তিনটি বিষয়কে আরও প্রপঞ্চিত করছি।

শ্রীনাথচার্য্য-চূড়ামণির গ্রন্থাবলী এখনও প্রায়ই অমুদ্রিত। হস্তলিখিত পুঁথি থেকে সংগৃহীত তথ্যই এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে।

১। শ্রীনাথের নিবন্ধাবলী।

(ক) টীকাবলী।

১। নারায়ণের ছন্দোগ—পরিশিষ্ট—প্রকাশের টীকা সার-মঞ্জরী। ১

২। শূলপাণি-কৃত তিথি-বিবেকের টীকা ত্যাপর্বা-দীপিকা। ২

৩। শূলপাণি-কৃত শ্রাদ্ধ-বিবেকের টীকা শ্রাদ্ধ-বিবেকব্যাখ্যা। ৩

৪। জীমুতবাহন-কৃত দায়ভাগের গীষণ।

(খ) অর্পণ-গ্রন্থ। ৪

১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ৬৪৩ নং পুঁথি।

২। প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে ডাঃ বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত Contributions of Bengal to Sanskrit Literature নামক সিরিজের ৩য় গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত।

৩। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথি, ২, ৪৩৩। এই গ্রন্থে লেখক স্বীয় সার-মঞ্জরী টীকাই নাম তিনবার উল্লেখ করেছেন। এখানে নিজের নাম “আচার্য্যচূড়ামণি”ও একবার উক্ত করেছেন।

৪। “দায়ভাগঃ...বক্তবিধ-টীকা সহিতঃ”—ভারত শিখোষণ

১। বিবেকার্ণব। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীনাথ স্ব-সচিত্র কৃত্য-তত্ত্বার্ণবে উল্লেখ করেছেন ( L. 1933 )।

২। কৃত্য-তত্ত্বার্ণব। ৫

গ্রন্থের প্রারম্ভ—

শ্রীগোবিন্দ-পদাভ্যাজ্ঞবল্লভস্বয়ং-সাধনম্।

বশে বৃন্দাবকধুনী—স্বকরম—মনোহরম্। ১

শ্রীকরাচার্য্য-পুত্রেন শ্রীমচ্ছ্রীনাথ-শর্ম্মণা।

প্রীতয়ে বিহ্বাং চক্রে কৃত্য-কাল-বিনির্ঘরঃ। ২

জ্যোতে বিধৌ কালকৃতৌ বিদ্যোঃ

প্রায়ঃ সর্দৈব প্রতিতো বৃথানাম্।

অতজ্জহুচ্ছেদকৃতে মুনীনাম্

বিচাধ্য বাচো বিদধ্যামি তথ্যম্। ৩

নানাবিশেষ-বিহ্বাং মতমাকলযা

কোনকোভং যদভিলিখ্য সমর্পয়ামি।

অঙ্কং বৃথা বিপথগড্ডান্নিকাশ্রবাহে

দূষাধিহায় কুরুতাদমমজ্ঞ পাণ্ডম্। ৪

ইহ খলু নিত্য-নৈমিত্তিকানি—বার্ষিক-কর্মাণি কাংলজ-বিশেষাকর্মাণি জ্ঞায়ন্তে তে চ বিশেষ বৎসরায়ণকর্তৃ-বাস-পক্ষ-তিথি-নক্ষত্র-রূপতয়া ভিন্নাঃ...প্রত্যেকং নানাপ্রকারঃ কুজ কর্ণাণি কীদৃশ-শ্রাদ্ধস্মৃতি নির্ণয়মন্ত্বেণ প্রবর্ত্তৌ কদাচিৎ কর্মণো বৈগুণ্যমপি শ্রাদ্ধিত তদ্বিপর্যায়স্তো যুক্ত ইতি।

গ্রন্থের শেষভাগেও আচার্য্য চূড়ামণি অতি সন্ময়ভাবে নিজের উদ্দেশ্য পুনরায় ব্যক্ত করেছেন—

অতএব পুরাণং শূদ্রাধিপাল্লয়সিহস্ত পূজনমিতি নবসিহপুর্বাণম্। আগমোক্তমন্ত্বে বিধবলাজ জপ্য এব ন পঠনীয়ঃ। শেষং বিবেকার্ণবে জেয়ম্।

বিচাধ্য নানামুনিবর্ধবাচো

নিবন্ধজাতক মহার্ণবাম্যম্।

ময়া কৃতঃ কালবিনির্ঘয়োঃ

মুদং বৃথানাম্ চিরমাতনোভু।

কৃত্য-তত্ত্বার্ণবো নাম নিবন্ধো যতিতো ময়া।

প্রীরন্তামজ্ঞ বিবুধা ব্যবহার্য্যত্বশ্রুতিঃ।

সংস্করণ। কলিকাতা বিচারদ্র প্রেস, ১৮৬৩। এই গ্রন্থে অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী ও রামভদ্রের টীকাও আছে।

৫। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের স্লোকস্বরের আচার্য্যচূড়ামণি নিজেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সন্ময়ভাবে বিবৃত করেছেন। হস্তলিখিত পুঁথি, এসিয়েটিক সোসাইটি—৩৬২০।



ইতি মহামহোপাধ্যায় জীমছীকম্বাঙ্গ-জীমছীনাথার্চ্য্য চূড়ামণি-কৃতঃ কৃত্য-তত্কার্ণবঃ সমাপ্তঃ ।

উপরে উদ্ধৃত প্রারম্ভিক ২ নং শ্লোক থেকে এটি স্পষ্ট যে, এ গ্রন্থ “কৃত্য-কাল-বিনির্ধার” নামেও তিনি অভিহিত করেছিলেন। কালক্রমে শ্রোত ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে যে সকল পদ্যম্পদ-বিবোধী যত পণ্ডিত হই, তা’ হই কবাই আচার্য্য চূড়ামণির উদ্দেশ্য। একজন তিনি কেবল স্বদেশের পণ্ডিতগণের যত পর্যালোচনা করেন নি, সম্রাটের বিশেষায়নের যতও তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। তাই তাঁর বিশেষ কামনা—যেন গজ্ঞানিক প্রবাহের দিকে ছুটে না গিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর এই বহু বিবেচনাগ্রন্থত গ্রন্থের প্রতি যথোচিত আদর প্রদর্শন করেন।

এই গ্রন্থের শেষাংশে তিনি স্বীয় গ্রন্থ “বিবেকার্ণবে”র নাম উল্লেখ করেছেন। কাজেই কৃত্যতত্কার্ণব গ্রন্থ “বিবেকার্ণব” গ্রন্থের পরবর্তী রচনা, সন্দেহ নাই।

আচার্য্য চূড়ামণির এই আকৃতি—নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি যে সকল বৈদিক ক্রিয়া এবং কালক্রমে উদ্ভূত সেই সকলের অন্তরূপ যে সকল ক্রিয়াকলাপ—সেই সকলের বৎসর, অরন, শুভ, মাস, পক্ষ, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির বিবেচনার নানারূপ বিচার অবশ্যজ্ঞাবী—সেই সব ক্ষেত্রে তিথি যে ব্যবস্থাসমূহ উপস্থাপিত করেছেন, তা’ যেন বিশ্বমণ্ডলীয় শ্রীতির কারণ হয়।

#### (৩) তত্কার্ণব-৬

এই গ্রন্থের শেষে জিনাথ বিনয় সহকারে বলেছেন,  
তত্কার্ণব-তত্কার্ণবেহ্মনি বা প্রবাদানন্তথা নিপিঃ ।

বিবৃতিঃ শোধানীয়া সা গুণলেশাসুসারতঃ ।

এই গ্রন্থে প্রাচীন সমুদ্র বাতীত নবীন নিবন্ধেরও উল্লেখ আছে, যেমন হস্তলিখিত পুঁথির ৪১৭ পৃষ্ঠার কামধেনু, কল্লতক, মহার্ষি, হোমজি, মিতাক্ষরা, হারলতা, পামিজাত প্রভৃতি।

#### (৪) বিবাহ-তত্কার্ণব ১৭

এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকেও স্মার্ত নানায়ুনির যতের প্রতি অঙ্গপ্রদর্শনপূর্বক বলেছেন,

প্রথম গোবিন্দ-পদারবিন্দ

বিচার্য্য নানায়ুনিবর্ষবাচঃ ।

আচার্য্য চূড়ামণির বক্তব্য

বিবাহ-তত্কার্ণবমাতনোতি ।

প্রথম তরঙ্গের শেষে এই তরঙ্গের নাম উল্লেখপূর্বক তিনি বলেছেন, ইতি মহামহোপাধ্যায় জীমছীনাথার্চ্য্যচূড়ামণি-বিমর্চিত্তে বিবাহ-তত্কার্ণবে সৰ্ব্ববিবেকঃ প্রথমতরঙ্গঃ ।

এই গ্রন্থের প্রথমেই গার্হস্থ্যকর্মকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে ঘোষণা করে জিনাথার্চ্য্য চূড়ামণি বলেছেন যে, “সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্গ্যা”

(৬) এগিয়েটিক সোসাইটির হস্তলিখিত পুঁথি ৩৬৮১ ।

(৭) কবীর সাহিত্য-পরিষদের ১৪৮৪ নং পুঁথি ।

—বজ্রাতের ভার্গ্যাই শ্রেয়ঃ। আশ্রমারনের নাম উল্লেখপূর্বক জিনাথ বহু আভ্যন্তরীণ লক্ষণ পরীক্ষার যে উপায় নির্ণয় করেছেন, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর কি না বিবেচ্য। তাঁর যত আটটি বিভিন্ন স্থানের মাটি নিয়ে তা গোলাকার করে এক জায়গায় রাখতে হইবে, এবং বহু তার থেকে স্রুতিকা বেছে নেবেন। কোন মাটির কি কল, আচার্য্য চূড়ামণি তা উল্লেখ করেছেন।

বহু গুণাবলীও জিনাথ সবিজ্ঞারে উল্লেখ করেছেন। তার পরে নিম্নিষ্ট গোত্র প্রভৃতির আলোচনা।

#### (৩) চন্দ্রিকা-গ্রন্থসমূহ

(ক) আচার্য-চন্দ্রিকা ১৭

(খ) আচার্য-চন্দ্রিকা ৮

(গ) দান-চন্দ্রিকা ১০

#### (৪) দীপিকা-গ্রন্থ

(ক) গৃহ-দীপিকা ১০

(খ) আচার্য-দীপিকা ১১

#### (৫) বিবেক-গ্রন্থ

(ক) ভূগোৎসব-বিবেক ১২

(৭) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, Cat. III, p. 524, Ms. No. 1648.

(৮) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, No. 1734 & Brojendra Mitra, Notices, VIII, p. 270, Ms. No. 3683 of the Asiatic Society : H. P. Shastri, vol. III, p. 406.

(৯) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুঁথি। (Vide 2nd vol. of Hrishikesh Shastri), 563, fols. 10-196, Incomplete.

ষোড়শনাদি বিবরণ এই নিবন্ধের প্রথমে আচার্য্য চূড়ামণি ঐক্যের বন্দনা করেছেন—

ঐগোবিন্দপদম্ব্যং বন্দ্যামিত্রাদিভিঃ সুরৈঃ ।

বন্দ্যে বৃন্দাবনেচরমিন্দ্রদানন্দকন্দুকম্ ।

ঐক্যচার্য্যপুত্রো জীমছীনাথশরণা ।

বিচার্য্য যন্ততন্ত্রাদি ক্রিয়তে দানচন্দ্রিকা ।

(১০) কৃত্য-তত্কার্ণবে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের পুঁথি এখনও আবিস্কৃত হয় নি। “ইতি বিজ্ঞানত অমরীংগুট-দীপিকায়্য সিদ্ধান্তানর্শে চাহুসঙ্কেতঃ ।”

(১১) তত্কার্ণব এবং রঘুনন্দনের বহু-আচার্য-তত্কার্ণবে উল্লিখিত।

(১২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Notices, তৃতীয় খণ্ড, ১২ পৃঃ, ১৪৩ নং পুঁথি। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থমালা, ১ম গ্রন্থ। কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ)

(খ) প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক ১১০

(গ) শুদ্ধি-বিবেক ১১৪

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকের প্রারম্ভে আচার্য্য চূড়ামণি জীৱামত্মকে স্তুতি জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কখন থেকে আবৃত্ত করে বাবতীয় প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে স্বকীয় মত জ্ঞাপন করেছেন। শুদ্ধি-বিবেকের প্রারম্ভেও জীৱামের স্তুতি।

জীৱামের গ্রন্থ-গৌরব ও ঠিক পূর্ববর্তী স্মার্তগণ।

উপস্থিতিপিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত গ্রন্থসমূহে স্মৃতি-শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক্ পর্য্যাপ্তভাবে পর্য্যালোচিত হয়েছে।

দায়ভাগ টিপ্পন গ্রন্থে জীৱাম “কুল্লুকমতমপাস্তম” কবে কুল্লুকের মত নিরাক্ত করেছেন। অত্র দিকে অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী স্বকীয় দায়ভাগ-সিদ্ধান্ত-কুন্ড-চন্দ্রিকা জীৱামের এই টিপ্পনের কটু সমালোচনা করেছেন। এই সকল বিভিন্ন মত গ্রন্থের গৃহস্থ প্রতিপাদনের দিক থেকে একান্ত উপাদেয়। অত্রদিকে কুল্লুকভট্টের সময় নির্দেশের দিক থেকেও এটা সত্য হয়ে দাঁড়াল কুল্লুক জীৱামের পূর্ববর্তী নন।

এই দায়ভাগ-টিপ্পনে জীৱাম ধর্ম্মধর্ম্মের মত চারবার, নারায়ণোপাখ্যায়ের মত পাঁচবার, মদনপাদিস্তোত্র তিনবার এবং বর্দ্ধমান উপাখ্যায়ের নাম তিনবার উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে স্বকীয় সাব মঞ্জরীর নামও তিনবার উল্লেখ করেছেন।

কৃত্য-তত্ত্বার্ণব গ্রন্থে জীৱাম ভবদেব, লক্ষ্মীধর ও শঙ্খধর্ম্মের নাম উল্লেখ করেছেন।

কৃত্য-তত্ত্বার্ণবের এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে দানসাগর বজালসেন কর্তৃক ১০২১ শকে রচিত হয়। ১৫

(১৩) Mitra, Notices, VIII 272, No. 2830.

প্রথম কামদং নাম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকোক্তং জীৱামেন বিতকতে।

ইতি মহামহোপাধ্যায় জীৱামচার্য্য-স্মৃ—

জীৱামচার্য্য-বিরচিত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক: সমাপ্ত:।

(১৪) Do, Do, 273, No. 2831.

এই গ্রন্থে অশৌচপদার্থ-বিবেচন থেকে আবৃত্ত করে আচার্য্য চূড়ামণি অশৌচ বিষয়ে বহু বিষয় আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভ:—

প্রথম সচ্চিদানন্দং বাগীশং জগতং প্রভূম।

জীৱামঃ কমলাকান্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম।

জীৱামচার্য্যপুত্রেন জীৱামেন সত্যং মুদে।

বিবেকঃ শুদ্ধিবিষয়ে ক্রিয়তে পরমাদর্য্যম।

(১৫) As. Soc. Ms. Fol. 45, তৎকালং নিখিলনৃপচক্র-তিলক-জীৱম বজালসেনদেবেন পূর্বে শশিনবদনমিতে শকবর্ষে ১০২১ দানসাগরে রচিতঃ।

(২) জীৱাম আচার্য্য চূড়ামণির বংশগৌরব

(ক) পিতা জীৱম আচার্য্য

জীৱাম স্বকীয় শ্রাদ্ধবিবেক-টীকার স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার উপদেশ অনুসারেই এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৬

(খ) জীৱামপুত্র রামভদ্র জায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।

(১) দায়ভাগ টীকা—দায়ভাগ-বিবৃতি বা দায়ভাগ-দীপিকা। ১৭  
গ্রন্থের প্রারম্ভে রামভদ্র বলেছেন যে, তাঁর পিতার গ্রন্থ আলোচনাপূর্ব্বক দায়ভাগের এই বিবৃতি তিনি লিখছেন—

আলোচ্য তাতনির্ম্মিতনিবন্ধমারাধ্য বিশেষধর্ম্মম।

অর্থাচার্য্যভ্রাতৃত্বতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগম্।

গ্রন্থের শেষ কবিতার লেখকের অহঙ্কার প্রকাশ পেলেও গ্রন্থকারের উক্তি সর্বাংশে সত্য—

জীৱামভদ্র-রচিতং পাপো সংস্থাপ্য দীপিকামেতমম।

জীমুতবাহনকৃতগৌরবার্থঃ বিদন্ত বিধাসঃ।

ইতি মহামহোপাধ্যায়-জীৱামচার্য্য-চূড়ামণিতত্ত্ব-জীৱামভদ্র-জায়ালঙ্কার-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতা দায়ভাগ-টীকা সমাপ্তা।

এ গ্রন্থ পাঠে এটি স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, পিতার দায়ভাগ-টীকার বিরুদ্ধে যারা মত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মত নিরাক্ত বা অপাস্ত করবার জন্যই রামভদ্র জায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। যেমন—দায়ভাগের ১৫৫ (পৃঃ ৮২)র অচ্যুত চূড়ামণির মতেই সমালোচনাপূর্ব্বক বলেছেন—“কিঞ্চিৎ চূড়ামণিতদস্যং।” তার পুনঃ সমালোচনাপূর্ব্বক রামভদ্র বলেছেন, “তন্মদাঙ্কায়ঃস্বভাবঃ বিবেচিতং নাম সামান্য জীমুতবাহনমতঃ ন হুঁবিতং তাতপাদেন।” এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই “গুরুবঃ” পদের দ্বারা তাঁর পিতৃদেবের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মত উদ্ধৃত করে—অজ্ঞানের মত উল্লেখপূর্ব্বক পিতার বিরুদ্ধমত খণ্ডন করেছেন।

(২) স্মৃতি-তত্ত্ব-বিনির্গম বা ব্যবস্থাসংগ্রহঃ। ১৮ তিথি, দান, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, শুদ্ধি, উদাহ, প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ মত-বিচার। এই গ্রন্থের শেষভাগে পুন্সিকায় তিনি নিজেকে “নবদীপবাসী” বলে ঘোষণা করেছেন।

রামভদ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তন্ত্র-প্রমোদ(১৯) এবং বর্ধ পুত্র রঘুশি আগম-সার(২০) নামক তন্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থের রচনা

(১৬) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুঁথি, vol. II, No. 433—  
ব্যবস্থাবৈধবসংগ্রাভি-সমুদ্রাঙ্কনদেহতেবে।

বিবৃথপ্রদীপন্যায় নমঃ জীশূলপাণয়ে।

জীৱামচার্য্যপুত্রেন জীৱামজীৱামশরণা।

ব্যাখ্যা শ্রাদ্ধবিবেকত জনকোক্তা নিবধ্যতে।

(১৭) ভবত শিবোদয়নির সংকরণ ঐষ্টব্য।

(১৮) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (৩,৪৮৫-৮৬), পুঁথি নং ১৫৬৭-১৫৬৯

করেন। এই আগর প্রথমের আরম্ভে পুজেরা স্থপতিত পিতার প্রতি অশেষ ভক্তিভাষা প্রদর্শনপূর্বক পিতার স্তুতি করেছেন।

পুণ্যপুণ্যরূপে আলোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীতি হবে যে, জীমূতবাহনের “দায়-ভাগ”কে অনগ্রসর করার জন্য এই পরিবার যে রকম প্রচেষ্টা করেছেন, বঙ্গদেশের আর কোনও পরিবার তা করেন নি। তত্পরি, এঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে পুনরায় রঘুনন্দনের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাবান পণ্ডিতাগ্রগণ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলে দায়ভাগের মর্যাদা বঙ্গদেশে চিরকাল অক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে।

রামভক্ত, খুব সম্ভবতঃ, রঘুনন্দনের থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। স্মার্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন রামভক্তের নামোল্লেখ কোনও স্থানে করেন নি। রঘুনন্দন খ্রীষ্টীয়প্রভুর সমসাময়িক—খ্রীষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি নবদ্বীপে পণ্ডিতকুলশিখোমণিরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। রামভক্ত খ্রীষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিচের স্বকীয় গ্রন্থাদি বিবরণ করেছিলেন।

(৩) আচার্য্য চূড়ামণির সমাজ-হিতৈষণা।

বাঁকড়া জেলার স্মার্তশিখোমণি গোবিন্দানন্দ কবিকল্প ভট্টাচার্য্য স্বীয় বর্ষকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে স্বীয় মতের স্বাতন্ত্র্য বলার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ছিলেন। আচার্য্য চূড়ামণি তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্গীয় স্মৃতি-গণের মত সংরক্ষণপূর্বকই নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমগ্র সমাজে। রঘুনন্দন বহুল স্থানে স্বীয় গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে কৃত্য-তত্ত্বার্ণব থেকে আটবার ২১ স্বীয়

গুরুর মত উদ্ধৃত করেছেন। এ ভাবে তত্ত্ব-তত্ত্বার্ণব এবং বিবাহ-তত্ত্বার্ণব থেকেও এক একবার স্বীয় গুরুর মত স্বীয় তত্ত্ব-তত্ত্ব ২২ এবং উদাহ-তত্ত্ব ২৩ উদ্ধৃত করেছেন। এ ভাবে ‘গুরুচরণাঃ’ বলে অষ্ট-বিংশতি-তত্ত্বের দ্বাদশ স্থানে ২৪ ‘ভট্টাচার্য্য চরণাঃ’ বলে একবার ২৫ এবং ‘আচার্য্য চূড়ামণি’ বলে দুবার ২৬ স্বীয় গুরুর মত সমুদ্রিত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কিন্তু স্বীয় সময়ের কাঠিন্যের জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক—তিনি তত্ত্ব-তত্ত্ব তৎসময় থেকে আর ব্রাহ্মণ ও শূত্র ব্যতিরিক্ত কোনও বর্ণ বঙ্গদেশে থাকবে না বলেছেন, নারীদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার তাঁদের প্রতি ভুলনামূলকভাবে অধিকতর উদাসীন প্রদর্শন করেছেন। কালের প্রভাব অবশ্য স্বীকার করে নিলেও রঘুনন্দন এ সবকিছু উৎকৃষ্ট উঠেছেন—দেখতে পেলে আমাদের চিত্ত স্তম্ভিত হ’ত।

আনন্দের বিষয়—রঘুনন্দনের গুরুদেব জিনাথ আচার্য্য চূড়ামণি সামাজিক ব্যবস্থাপনার কঠোর ভ্রাতা ও উচ্চতর আদর্শ সর্বদা অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে ব্যাপকতর বিশ্লেষণ আমরা বারাদেশে করব।

ইতি কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ। পৃঃ ৫০২, কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ ২২পি স্বল্পপূরণম্। মলমাস-তত্ত্ব, পৃঃ ৮১৩। উদাহ-তত্ত্ব, পৃঃ ১৩২। তত্ত্ব-তত্ত্ব, পৃঃ ২৩৬।

(২২) তত্ত্ব-তত্ত্ব, পৃঃ ২৫৭ (২৩) উদাহ-তত্ত্ব, পৃঃ ১১৭ ‘আসন্নমাস পিতৃমাতৃ’ ইতি নারদবচনে...বিবক্ষিতম্ এবং বিবাহ-তত্ত্বার্ণবঃ।

(২৪) তিথি-তত্ত্ব, পৃঃ ৩১, ৮৫, ১৫০; মলমাস-তত্ত্ব, পৃঃ ৭৬২-৭০, ৮১৫, সংস্কার-তত্ত্ব, ৮৭৩, একাদশী-তত্ত্ব, পৃঃ ৫, ১০৩, তত্ত্ব-তত্ত্ব, পৃঃ ৪০১, বজ্রকৌলি-প্রাচ-তত্ত্ব, পৃঃ ৪২৩, (এবং প্রাচ-চন্দ্রিকারায় গুরুচরণাঃ); পৃঃ ৫০০, ছন্দোগ-ব্রহ্মোৎসর্গ-তত্ত্ব পৃঃ ৫৪৭

(২৫) তত্ত্ব-তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩৬।

(২৬) বজ্রকৌলি-প্রাচ-তত্ত্ব, পৃঃ ৪৮৮ এবং বজ্রকৌলি ব্রহ্মোৎসর্গ-তত্ত্ব, পৃঃ ৬৪০।

(১১) (২০) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Notices, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০২ ও ১৪১ (নং ২৬০ ও ২৬৩)।

(২১) জীবনাল সংস্করণ, তিথি-তত্ত্ব, পৃঃ ৮৬, কৃত্যতত্ত্বার্ণবে রাজমার্ত্তণ্ডঃ, ইত্যাদি, ঐ পৃঃ ১৬১ ‘বেদমালা...প্রানপূর্বকম্’ ইতি কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ—গুত-বচনাৎ। আত্মিকতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৭, যেন বাসদা প্রানঃ কৃত্য জলহৃত্য হেনৈব তর্পণম্’ ইতি কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, পৃঃ ৪২৮, জ্যোতিষকর্মোবোগন্ত নীযজনাভর্থঃ, সর্গতত্ত্ব; পৃঃ ৬৪০।



# প্রতীকা

## শ্রীআশিস গুপ্ত

আমি সাড়া পাচ্ছি  
আমি অনুভব করতে পারছি  
তোমাকে ।  
হয়তো সেই তোমাকে  
যাকে জেনেছিলাম আমার শৈশবে,  
আনন্দিত অজ্ঞান বর্ণময় দিনগুলিতে ।  
হয়তো সেই তুমি  
এতদিন হারিয়েছিলে আমার সচেতন বয়স্কার ।

তবু আজ নিশ্চিত মনে হ'ল  
তুমি আছ,  
যদিও তোমার আজ আর আমার মনে নেই ।  
তুমি আছ,  
এই অসংখ্য জনতার মাঝখানে  
আমার বিশিষ্ট একজন ।  
সেই তোমাকে  
তোমার রয়ে যাবার সত্যকে  
সেই বিশিষ্ট তোমাকে  
আমি আবার জেনেছি ।

তোমাকে জেনেছি অন্তরের অন্তরলোকে  
কঠিনতম আবেগে ।  
যে আবেগ  
জীবনযুদ্ধে আমার অস্ত্র ।  
যে আবেগ পাশ্চাত্য অস্ত্রের মত  
আমার জীবনের সমস্ত দৈন্ত  
সব প্রাণি বৈধে দেবে  
মস্তকের বাঁধনে ।

তোমাকে ধৈর্যিনি  
তোমাকে পেয়েছি তবু ।  
তোমাকে পেয়েছি  
স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বিস্তৃত সূর্য্যের মত ।  
তোমার দহনে আমি দীর্ঘ শুষ্ক  
আমি উত্তর ।

হে আমার সূর্য্য ।  
উদয় শিখরে আর একবার তুমি  
অবস্থান কর,

বর্ণময়তার উজ্জ্বল ভাষ্যরত্ন  
তোমাকে একবার দেখবো,  
বিচিত্র অপকৃপ বর্ণময় তোমাকে  
নিরুপম অল্পম তোমাকে  
আর একবার দেখবো ।

হে সূর্য্য !  
বর্ণময় তুমি সূক্ষ্ম ।  
বর্ণহীন তুমি কঠোর ক্লক ।  
উদয়াচলে তুমি ছিলে বর্ণময় ।  
তোমার রঙ, আমার মনকে বাঙিয়েছিল  
কোনদিন ।  
আর আজ আমাকে ক্লক কঠোর  
সন্ন্যাসী করেছে  
স্বচ্ছ করেছে আমার মন ।  
আলো ছাড়া সামান্ত বস্তুকণাও  
অস্বচ্ছতার সৃষ্টি করে ।  
কিন্তু রঙ তোমার  
বাঙিয়ে দেবে আমার মনকে ।

হে মধ্যাহ্ন তপন  
জানি আমি  
আর ত কখনো কি হবে না তুমি  
পূর্ণ তীব্র ;  
যেমন আমি আর  
সেই ছোট অবস্থা আমি হয়ে  
নিতে পারবো না কখন ।

তাই,  
অপেক্ষায় আছি  
ধূসর তপ্ত বায়ুময়  
মক্কর ঝড় বুকে নিয়ে ।  
সুদৃঢ় অন্তঃকালের পানে  
যখন তুমি আবার হবে বর্ণময়  
নীতার্ঘ মক্করাত্রি আসবার আগে  
আর একবার আমার স্বচ্ছ মন  
লগ্নবর্ষে বামধ্বজ রাঙা হয়ে উঠবে ।



পূজার আনন্দ সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। মিনয়-  
বাতির রঙীন আলোয় ঝলসে উঠছে রঙবেরঙের শাড়ী ;  
আর মাইকের মুখে ঝরে পড়ছে অজস্র সুবাস্তোত। রঙ  
ধেখে চোখে ঝোর লাগছে হর্ষকন্ঠের ; আর হাসির উচ্ছলতায়  
স্পন্দিত হয়ে উঠছে মাটির কোল-বেঁধা ধূসর আকাশ।

কিন্তু আনন্দময়ীর আগমন সন্তোষ কোথাও যে বঞ্চনার  
করণ সুর শোনা যায় না, তা নয়। বরং বঞ্চনাকে তুলতে  
হলে অপরের শাকল্যের আনন্দে মেতে উঠতে হয়। আর  
সেই সবচেয়ে সহজ পন্থাটুকু অবলম্বন করতে হয়  
অধিকাংশকেই। অতএব নতুন শাড়ী পরণে না থাকলেও  
হলে হলে মেয়ের বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে, পকেট  
মজুতুমি হলেও পুঙ্খমুপে ভিড় করতে সক্ষম করে না  
কোনও পাড়ার ছেলেরা। তাই কলকাতার পথে জনতার  
কোলাহল এতদিনের রক্ত মনের আত্মপ্রকাশের বস্ত্রাশ্রোতে  
ভাসিয়ে নিয়ে চলল সবাইকে। মেতে উঠল আবালবৃদ্ধ-  
বনিতা। ঘুচে গেল প্রাণেশিকতার সঙ্গীর্ণতা। হিন্দুপুজার  
প্রতিমা দেখতে ভিড় করে এল কত বিধর্মী। অকালবোধন  
কালাতীত কলকাকলীতে তবপূব হয়ে ওঠে ; সকলের  
মধ্যে সঞ্চার করে দেয় শীতোত্তরের সজীবতা হেমস্তের  
আগেই। মধুমাসের মাধবতা শরতের হালকা মনে এনে  
দেয় অপার্থিব পুলক, অনির্বচনীয় আবেগ।

তবু আনন্দের প্রকাশ বিচিত্র বসুমতী ধারণ। তাই  
বিভিন্ন মনে আপন আপন ভঙ্গিতে যে আনন্দের পর্বকল্পনা  
রূপায়িত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহের  
সজ্জাতে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বিনটে হয় অছুরেই।

শক্তির বেলায় ঘটল ঠিক তাই।

সবে সে সেজেগুজে বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরুনার  
উদ্বেগ করছে। এমন সময়ে বকুনি খেতে হ'ল বাপের  
কাছে। আর তাও কিনা সেই বন্ধুর সামনেই।

দোষ তার খুবই সামান্য। কলাবো গঙ্গায় যখন ডুব  
দিয়ে এল, তখন পুরুতঠাকুরকে ঘিরে যে সব তরুণ-  
তরুণীরা নানাবকম মন্তব্য করছিল, সেও ছিল তাদের  
একজন।

প্রশ্নগুলো মোটেই জটিল নয়।

—কবার ডুব দিলে গঙ্গায় কলাবো, ঠাকুরমশায় ?

—ঝাঁড় তাড়ান করে নি ত গণেশদ্বার সতীলক্ষ্মী বোঁকে ?

—ডুবে যেত যদি। গণেশদ্বার অমন মানানসই বোঁকি !

শক্তি শুধু বলেছিল, কি ফাঁড়াটাই আজ গেল গণেশ-  
বোঁকির।

কোঁতুকদীপ্ত সজিনীদেব মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে  
আবার বলেছিল, বেচারী গণেশদ্বার অত বড় ভুঁড়ি নিয়ে কি  
আর জলেডুবন্ত বোঁকে বাঁচাতে পারত ? শুধু শুঁড় দিয়ে  
ভুঁড়ি ধাপড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদত। কি করণ  
পরিস্থিতি—ভাবতেও গা শিউবে ওঠে।

সারা দেহটা ছলিয়ে তাড়াতাড়ি আঁচলটা টেনে দিয়েছিল  
পিঠের উপর। আর হাসিতে মুখব হয়ে উঠল সারা  
আঙ্গিনা।

কিন্তু চটে উঠেছিলেন ঠাকুরমশাই।

—ঠাকুরদেবতা নিয়ে যত সব ইয়ার্কি। তোমাদের  
এখানে মোড়লি করতে কে বলেছে শুনি ? বাও, বাও

এখান থেকে, সরে যাও। এটা পুজামণ্ডপ, চলাচলির জায়গা নয়।

জগদ্ব চোখে শুক্তির দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। কারণ, ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল স্নেকোমল। ছেলেটি বাঁশী বাজায় ভাল। সন্ধ্যার মজলিশে সকলের মনোরঞ্জন করার গুরুদায়িত্ব নিতে হয়েছে তাকে। তিন্ন পাড়ার ছেলে হলেও ওকে ষোণাষোণ করে আনার ব্যাপারে আগ্রহটা অবশ্য শুক্তিরই। শুক্তির আগ্রহ যে বিষয়ে সেটা করা যে হবেই এত জানা কথা। কারণ ওর মত কথায় আর কাজে চটপটে, রূপে আর সাজে ফিটপাট এই শহর-তলীতে আর দ্বিতীয় কোন মেয়ে আছে কি?

ঠাকুরমশায়ের কটাক্ষ তাই নেত্রীর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না।

—চলে যাও মানে? আপনি কি যা-তা বলছেন ঠাকুরমশাই? আমরা এখানে কি করতে এসেছি জানেন? রাগে আর জিজ্ঞাসায় পুরুতঠাকুরের কপাল ক্রকুটি কুটিল হয়ে উঠল।

—আপনি ত কলার্বোকে নাইয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু এখন ওকে দাঁড় করাবেন কোথায়?

—কেন, গণেশঠাকুরের পাশে?

ঠোট উলটে জবাব দিলেন পুরুতঠাকুর।

—আহা, তাতো বটেই। কিন্তু কি ভদ্রিমায় দাঁড়াবেন সেটা ত ঠিক করতে হবে আমাদের। সব জিনিসটা যাতে দেখতে বেশ সুন্দর হয়—

শুক্তির মুখের কথা শেষ হ'ল না। খেকিয়ে উঠলেন পুরুতঠাকুর।

—খাম। কলার্বো তোমাদের আধুনিক নারিক। নয়। তাকে কি তোমাদের মত ঠোটো-পালে রঙ মেখে গণেশের মন তোলাতে হবে? যাও, যাও। এখানে জ্যেষ্ঠাযো করতে হবে না।

যমক ধেরে কিন্তু মোটেই ধাবড়ে গেল না শুক্তি। চোখ ছোটো ঝিকিয়ে টেনে টেনে বলল, ঠোটো-পালে কলার্বো বেচারী কিই বা আর যাবে? সে অবস্থা কি আর আপনারা বেখেছেন? তবে গভীর যে হাঁটুর ওপর একখানা গামছার মত শাড়ী পরিয়ে রেখেছিলেন, এটা কি ভাল করেছিলেন? যদি গণেশদাঁ ডাইভোস' করে দিত? হিন্দু-কোডবিল পাশ হয়েছে সে ত উনি জানেন।

লহর তুলে সবাই হাসল। রাগে, অপমানে ঠাকুর-মশাইয়ের মুখে আর কথা সরে নি। তাই বুকি শুক্তির বাপের সঙ্গে পথে দেখা হওয়াতে নিজের রুদ্ধমনের অগ্নি-উদ্বীর্ণণ আর সামলাতে পারেন নি।

আধিনাথবাবু আধুনিকতার সব কিছু পছন্দ করেন না। প্রতিবেশীর মুখে নিজের মেয়ের মিন্ধা বা বক্তোক্তি প্রসঙ্গ-মনে নিতে পারেন নি। তাই বাড়ীতে পা দিয়েই শুক্তির সাজসজ্জা দেখে আর দ্বিধা থাকতে পারলেন না।

—সল্লি কোথায়? গণেশবৌদিকে সিনেমার নারিক। সাজাতে?

মুখেরা শুক্তি বাপের কাছে একেবারে মুক। সবই জেনে ফেলেছেন আধিনাথ। পরিস্থিতি লঘু করবার চেষ্টা করল শুক্তি-সদিনী।

—পুরুতাকা! বড্ড শুচিবয়ে লোক, মেশোমশাই, ও ত সত্যি সত্যি ঠাকুরদেবতা নিয়ে কিছু বলে নি। শুধু ওঁকে চট্টয়ে দিয়ে মজা দেখছিল।

—কেন? মজা করবার আর কিছু ছিল না? এমন মজা করা কেন?

এবার শুক্তি প্রয়োগ করল তার অব্যর্থ অস্ত্র। কাঁধ কাঁধ গলায় জানায়, পূজার দিনে মনের বাশ আলগা হলে একটু-আধটু বেকাঁস কথা বেরুবেই। তা নিয়ে যদি আজও তোমাদের কাছে বকুনী খেতে হয়—

ইচ্ছে করেই বক্তব্য শেষ করল না শুক্তি। কিন্তু অস্ত্র ওর সফল হ'ল। মুহূর্তে ভিজ্জে গেলেন আধিনাথবাবু।

—পূজার দিনে ফুটি করবে নিশ্চয়ই। তবে গুরু-লঘু জ্ঞান বেধে। আমরা যে কত কাণ্ড করতাম।

অভীত-স্বতি রোমন্থন করতে লাগলেন আধিনাথবাবু। আর এই সুযোগে কেটে পড়বার ভাল করল শুক্তি।

আমরা একটু ঠাকুর দেখতে বাচ্ছি বাবা। শুনেছি কান্নারব্রিগেডের ঠাকুর খুব চমৎকার হয়েছে।

—সে কিবে? অন্তরুবে বাবি? সঙ্গে বাবে কে? কিবিবি কখন?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন আধিনাথ।

—আমরা এক সঙ্গে মস্ত একটা দল বাচ্ছি। মনে হচ্ছে আধখানা বাস আমরাই রিজার্ভ করব। ভূমি কিছু ভেবনা বাবা।

আধিনাথ কিন্তু শুক্তির আখাসের খার দিয়েও গেলেন না। অগ্রসর সুরে আগের প্রশ্নগুলোর জের টেনেই বললেন, তা ছাড়া নিজের পূজো ছেড়ে অস্ত্র জায়গাতে তোরা বাসই বা কেমন করে?

—পূজো ত হচ্ছেই। কিন্তু চাচ্ছি যে ঠিকমত ওঠে নি। তাই মনের মত ঠাকুর আনা যায় নি। সে জন্মেই ত পল্টুবারা যুবড়ে পড়েছে। অস্ত্র পাড়া থেকে এখানে কি আর কেউ ঠাকুর দেখতে আসবে? বরং আমাদেরই ছুটিতে হচ্ছে অস্ত্র পাড়ার ঠাকুর দেখতে।

—কি বললি ?

বারাল ধমক শোনা গেল আধিনাথের গলায়। বিকৃত স্বরে বিজ্ঞপ্তি হবে পড়ল, ‘মনের-মত-ঠাকুর’ ? পূজোটাকে কি তোরা কুটবল খেলা পেয়েছিলি ? এবারে ভাল টিম হয় নি। অতএব সামনের বার তার শোধ মেটাতে হবে—এই মনোভাব নিয়ে তোরা বন্দনা করবি মা ছুগ্গার ? ছি ছি ছি।

গুজি এও কোং-র অবস্থা করুণ। ন-যমো ন-তমো। আর আধিনাথ রাগে কথা হারিয়ে কেলেনে।

টিক এমনি সময়ে ভবানী ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পরনে লালপাড় গরমের শাড়ী। হাতে পূজার নৈবেদ্য। স্নিগ্ধগলায় বললেন, আরতির ভোগ নিয়ে যাচ্ছি। গুজি, তুই কি আমার সঙ্গে আসবি ?

মেয়ের মৌনতাকে অসম্মতির লক্ষণ বুঝে বললেন, তুমিনাথের সঙ্গে যাচ্ছিস বুঝি ? বেশী ঘেরী করিস নি কিন্তু।

—চমৎকার ! নিজেদের পূজা চেড়ে বে-পাড়ায় ড্যাং ড্যাং করে নেচে বেড়ানো। এর নাম পূজো ? আমাদের ছোটবেলার আমরা ঠাকুরমণ্ডপ থেকে এক পা নড়তাম না এ’কটা দিন। দশমীর দিনে স্তম্ভরীর খালে ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে মণ্ডপ থেকে শান্তিলাল নিয়ে তবে কিরতাম। কিবে এসে কোলাকুলির পালা সারতেই কাটত একটা পুরো সপ্তাহ। এই হ’ল পূজো।

আর একটু গলা চড়ালেন।

—আর তোরা ? পূজার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, শুধু ফকিরাভি। মার সঙ্গে আরতির ভোগ না নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখে বেড়ানো। কি দরকার ? কোমটা আগে ? পূজো ত নয়, ভক্তি ত নেই, শুধু ঠাকুরদের নিয়ে মিস ইভিগার কম্পিটিশন বানানো ?

মেয়েকে বহুনি খেতে দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন ভবানী। বকতেও পারে লোকটা। অনর্গল, একবার স্নুফ হলে আর থামতেই চায় না।

—আহা ভোগ নিয়ে যে আমি যাচ্ছি। ওর তাই বাঙার দরকার কি ? বত আজোকে বকতেও পার তুমি।

—আজোকে বকছি ? তার মানে তুমি ধরতে পার নি। তা পারবে কি কবে ? তুমি ত আবার কিছু খোজ রাখ না। আজকাল যে রূপসীনের রূপ ওজন করা হয়, —কারটা কত বেশী তা মাপা হয়, সেটা জান কি ?

—বত বলল বাড়ছে—

রাগে, লজ্জায় ভবানীর আর বাকশূর্তি হ’ল না। আড়-চোখে দেখলেন গুজি-তনিমার ঠোটে চাপা হাসি। আধিনাথ কিন্তু থামবার পাত্র নয়।

—জেনমি মা-ছুগ্গার বত প্রতিমা হয়েছে, তাহের

মধ্যেও একটা কম্পিটিশন লাগানো হবে, কোন্ প্রতিমা সবচেয়ে ভাল হয়েছে—অংগতনের আর বাকি কোথায় ?

এবার আর ভবানী সামলাতে পারলেন না। চাপা-গলায় আগুন ধরিয়ে বললেন, পূজোর দিনে মেয়েটাকে ত নাহক্ নাকাল করছ—ওদিকে যে গুণধর ভায়ে সমস্ত দিন বাড়ীতে পা ধের নি, সে বেলায় বুঝি কোন ঘোষ নেই ?

—কে, উদয়ন ? কি হয়েছে তার ?

—বড়শা ত জলসার গেটে বই বিক্রি করছে।

আন্তে আন্তে অঘট বেশ জোরগলায় বলল, গুজি।

—সেটাই বা এমন কি পূজোর অঙ্গ গুনি ? ওরা ত তবু ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে, ও যে প্রতিমার ছায়াও মাড়ায় না, সেটা বুঝি কিছু নয় ?

মুখে কথা সরলো না আধিনাথের। দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছেন ভবানী। শুধু আজ নয়। বছরদিন, বছবার। বার বার যা খেয়ে খেয়ে গা-সওয়া হয়ে গেছে প্রায়। বাপ-মরা ছেলেটাকে নিয়ে তাঁর বিধবা দিদি যেদিন এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তাঁর কাছে, সেদিন থেকেই কি অসীম স্নেহে বুকে তুলে নিয়েছিলেন উদয়নকে। তারই অগ্নে প্রতিপালিত হয়ে আজ সে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু মতবাদের দিক থেকে যেন কোথায় একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে ছ’জনের মধ্যে। মার্চেন্ট আপিসের বড়বাবু আধিনাথ তাঁর সংস্কার-জীর্ণ মন নিয়ে বুঝতে পারেন না, কিসের মোহে উদয়ন তাঁদের সেই অতীতের ভিত্তিকে গুঁড়িয়ে ফেলতে চায়। মাঝে মাঝে দুর্বল প্রতিবাদ যে করেন নি তা নয়। কিন্তু নীরব উদয়নের দুর্ভেদ্য বিশ্বাসে ফাটল ধরতে পারেন নি এক চুলও। তবু তাঁর স্নেহ এক কোঁটা কমে নি। ওর উপর ভরসাও যেন বেড়ে গিয়েছে দিনের পর দিন। আর সে কথা জানেন ভবানী ভাল করেই।

আধিনাথের শুক-বিষণ্ন মুর্তি দেখে গুজি ও তনিমা সুরোপ বুঝে দৌড় মারল। আর ভক্তিবিনয় হৃদয়ে ধীর পায়ে ওদের অহুসরণ করলেন ভবানী।

গলি থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ে পূজামণ্ডপ। কিন্তু সেদিকে নয়, গুজিদের লক্ষ্য তার উল্টো দিকে, রাস্তার উপরে। সেখানে কুটবল গ্রাউণ্ডে জলসার আয়োজন হচ্ছে। মাঠের সবুজ ঢেকে দিয়েছে শতরঞ্জ, আর খোলা আকাশকে সীমায়িত করেছে ত্রিপলের ঘেরাটোপ।

মাঝখানে গেট। তারই এক পাশে বুকটল। চৌকির ওপর সাকানো বইয়ের সারি। তারই একটার ওপর বুক পড়েছে উদয়ন। মাথার চুল উস্কেখুস্কে, একটা পেল্লয়া-খন্ডের পাঞ্জাবী গায়ে।



—আচ্ছা বড়ল, তুমি কি? পেটের মধ্যে কি উঠের মত একটা বলি বেখেছ?

চমকে শুক্তির দিকে চোখ তুলল উন্নয়ন। খোঁচা খোঁচা হাড়ির কঁাকে প্রসন্ন হাসি বাবে পড়ল। স্বপ্নাতুর চোখে কোঁতুক ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল।

—কি সর্বনাশ! হিঁহুয় খবরের ছেলে আমি, আজ যে আমার উপোস।

—তাই বুঝি খুবগীর ডিম আর চায়ের শ্রদ্ধা করা হচ্ছে? টেবিলের তলার আঙুল দিয়ে উচ্ছিষ্টগুলোকে দেখিয়ে দিল শুক্তি। আর মুখে আঁচলচাপা দিয়ে থিলু থিলু করে হেসে উঠল।

হাসল উন্নয়নও। ধরা পড়ে যাওয়ায় অপ্রতিভ, কিন্তু স্নেহ-কোমল হাসি। লম্বা ক্লক চুলগুলোকে কাঠির মত আঙুল দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দিল। তার পর আঁচলকা কি মনে পড়াতে জিজ্ঞেস করল, তোরা যাচ্ছিস কোথায় বলত?

—ঠাকুর দেখতে, কারারাত্রিগেডটা দেখা হয় নি।

—আরে সে ত সাতদিন রয়েছে। পরে গেলেও ক্ষতি নেই। তুই একবার পন্টর ওখানে যা দিকি। নতুন কতকগুলো ইন্টাগ্ৰাল ডেভেলপমেন্টের ওপর লিটারেচার এসেছে, সেগুলো একুশি পাঠিয়ে দিতে বলবি। লোকজন ত আর একটু পরে এসে হাজির হবে।

মুখ শুকিয়ে গেল শুক্তি। পন্টর বাড়ীতে যেতে হলে আবার ওদের বাড়ী ঘুরে যেতে হবে এবং এবার আর বাবাকে এড়ানো যাবে না। ওদিকে বাস ষ্টপেজে স্ন্যাকোমল এতক্ষণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। সব মাটি!

কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু আমতা আমতা কথা শোনা গেল, এখন কি পন্টর বাড়ীতে আছে? ও হয়ত কোথাও বেরিয়ে গেছে।

—তোব মুখ! ওর যে জিম্বাষ্টিকের মহড়া চলছে। রাস্তিবে তোদের সব ফিজিক্যাল ফিট্‌স্‌ দেখাতে হবে না? আচ্ছা এক প্ল্যান ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। কাল থেকে লাবাকণ ওই নিয়েই মেতে আছে।

হেসে উঠল উন্নয়ন। কিন্তু শুক্তি মোটেই উৎক্লবোধ করল না। শরীর-চর্চায় কৌশল দেখাবে সব ভালপাতার সেপাই! ভাবতেও গা বিন্‌ বিন্‌ করে। উন্নয়নের যত উত্তপ্ত পরিকল্পনা! কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলবার সাহস ওর নেই। উন্নয়নের ব্যক্তিগত এমনিই যে, ভবানী স্বয়ং ওকে সামনাসামনি কিছু বলতে ভরসা পান না। যদিও আদি-মাতের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে উন্নয়নের অল্পপস্থিতিতে যথেষ্ট যত্ন্য মাঝে মাঝে তিনি করেন। অতএব শুক্তির উপর

সে আবাল্য শাসন আর কড়'ষ করে এসেছে অপ্রতিহত-ভাবে।

—যাই বলিস শুক্তি, রূপ, ধন, বশ, এসবের বর চাওয়ায় আগে শরীরে একটু বলৎদেহি, এইটে বলাই আজ সবচেয়ে বেশী দরকার। চারদিকে বা সব নমুনা দেখি তার মধ্যে অধিকাংশই করকরে কড়িৎ; বাহবাকি প্রায় সবই পেটমোটা নাজীশাদা।

মনে মনে আতংকিত হ'ল শুক্তি। একবার বক্ষুতার বান ডাকলে কি আর রক্ষে আছে! ওদিকে তনিমা চিমটি কাটছে। কিন্তু শুক্তির বিপদ ও বুঝবে কি করে?

হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ সচকিত করে তুলল সবাইকে। আরতি আরম্ভ হবে, তারই পূর্বাভাস। ঢাকী পূর্ব-বাংলার উষ্মান্ত। এককালে ঢাকের বাজনার তার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু বেশ ছেড়ে আগার মধ্যে কি তার প্রতিভাও সে কলে এসেছে?

ঢাকের আওয়াজ মোটেই ভাল লাগছিল না শুক্তির। কি বিস্ত্রী চামড়া আর কাঠির বেন্দুরো আওয়াজ। অথচ ঢাকের বাজনা পূজার একটা প্রধান অঙ্গ। মানুষগুলোর কি ক্রুচি, মনে মনে ভারলে সে।

ঢাকীর দিকে অপলক চোখে দেখছিল উন্নয়ন। শুধু এবড়ো-খেবড়ো চামড়া দিয়ে কাঠির মত শরীরটাকে ঢেকে বেখেছে কোনমতে। অথচ বোধনের জাগরণ ওর আঙুলের চঞ্চলতাতেই। কিন্তু কটির অভাব যার সমস্ত চৈতন্ত জুড়ে রয়েছে, শিল্পীর প্রতিভা তার কাছে কি করে আশা করতে পারে মানুষ? বেহনার সমস্ত মনটা টনটন করে ওঠে তার।

—বুখলি উন্নয়ন, ছোটবেলাকার মত ঢাকের বাজনা আজকাল শুনতেই পাই না। সে ঢাক শুনলে মনে হ'ত সত্যিসত্যিই মাদুর্গা নেমে আসছেন কৈলাস থেকে—সমস্ত আকাশটা যেন গমগম করতে থাকত আর সারা মনটা তারই বেশে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত।

পাড়ার এক বৃদ্ধ হাতে লাঠি নিয়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশেপাশের বাড়ীর মহিলারাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। ভবানীকেও ওঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

উন্নয়নের দিকে মুখ ফেরাল শুক্তি। চোখের কোণে কালি অথচ চাপা এক অদ্ভুত আলো ধরধর করে কাঁপছে ওর বিশাল মণি ছুটোতে। সেই বৃদ্ধটিকে কি যেন বোঝাতে সে ব্যস্ত। হয়ত ঢাকীর বেহনার কথা।

এই ত স্বেযোগ! পায়ে পায়ে পিছু হটে গেল। আঙুল নেড়ে ইঙ্গিত করল তনিমাকে। তার পরেই ছুট।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাস ষ্টপেজে এসে পৌঁছে দেখে

সুকোমলের কোন চিহ্নও নেই দেখানে। বুক হয়ে গেল একেবারে।

কিস্কিস্ক করে জিজ্ঞেস করল তনিমাকে, তবে কি আমাদের দেবি দেখে সুকোমল চলে গেল ?

—দেবী হয়েছে কি এমন ? আর তাছাড়া, চলে যাবে মানে ? আজ ওর প্রোগ্রাম আছে না ?

—সে ত আটটার পর। তার আগে এই সময়টুকুর অন্তে যে বেটুরেটে নিয়ে যাবে বলেছিল।

—বাও এবার কোথায় যাবে। ওদিকে হয়ত তোর বড়দা আবার চটে আগুন হচ্ছে।

বিসম গলায় শুক্তি জবাব দিল, স্পেসব বালাই ওর নেই। আমাদের কথা এতক্ষণ বেমানাম তুলে গেছে। ও একটা ক্যাপা। দেখলি না কিরকম বগড়া বাধাবার তাল করছিল। ওই ক্ষেত্রেই ত যত দেবি। ছোটবেলা থেকেই আমাকে এমনি জালিয়ে মারছে ও।

প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে গেল শুক্তি। সামনের উড়ে পানওয়ারার দোকানে এক ডজন লোক একই সঙ্গে বিভিন্ন বকমের পান চাইছে; আর পাশে হিন্দুস্থানী ধাবাবের দোকানের গুহাটা মাঝুখে ঠাসাঠাসি। রাস্তার ধারে শাল-পাতার উচ্ছিন্ন খুঁটে ছেঁড়াঝামা পুরা একটা ভিখিরী।

হঠাৎ কাঁচ; একটা ট্যাক্সী প্রায় ওদের গায়ের ওপরেই এসে ছমড়ি খেয়ে পড়ল। ক্রকুটকে ওরা চোখ ফেরাল কাচের জানালার দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে নেচে উঠল শুক্তির মন।

ট্যাক্সী থেকে নামল সুকোমল। কিন্তু সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক আর একটা মহিলা। ভদ্রলোকদের দিকে এক-পলক তাকিয়েই মেয়েটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল শুক্তি। মেয়েটিও রুক্ষমাখা গালে সুগন্ধী ক্রমাল বুলোতে বুলোতে ওদের দিকেই দেখছিল। সূর্যটানা চোখদুটো আর নিপুণ-ভাবে আঁকা ক্রুগল কেন হঠাৎ আজ কঠিন হয়ে উঠল ?

ট্যাক্সীর বিল মিটিয়ে দিল সুকোমলের সঙ্গীদের একজন। পূজার দিনেও তার পোশাক বিজাতীয়। বসে-বাওয়া গাল দুটোকে ফুলিয়ে নিয়ে একটা শিশ দিল সে লোকটি। কিকে রঙের শোকার আড়াল থেকে চোখ দুটো দিয়ে যেন লেহন করছিল শুক্তি-তনিমার উদ্ভত রোমনকে।

হাসিমুখে এগিয়ে এল সুকোমল।

—তোমাদের বলগার জন্ত কলকাতা থেকে এঁদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলাম। ইনি হচ্ছেন শীলা সরকার। নামকরা নৃত্যশিল্পী। বড় বড় বহু কাংশনে ইনি নেচেছেন। আর ওঁরা হলেন আমার বন্ধু শোভন সরকার (এঁর ভাই) আর অমিত বসু।

মুখে হাসি ফুটিয়ে ভোলবার চেষ্টা করল শুক্তি। কির মনে তখন তার অভিমানের তুফান উঠেছে।

কি আক্কেল সুকোমলের! এদের এনে হাজির করায় কি দরকার ছিল ? এখন যে সমস্ত সন্ধ্যাটা নষ্ট হবে এদের আপ্যায়ন করতে। নিজের পায়ে কুড়ুল মারার দৃষ্টান্ত এর চেয়ে প্রকৃষ্ট আর কি হতে পারে ?

কিন্তু মনে যাই হোক, বাইরে তার প্রকাশ ঘটতে দিও না শুক্তি। হাত দুটো লীলায়িত ভঙ্গিতে বুকের উপত্যকায় সন্নিবদ্ধ করে স্বাগত সন্তান জনাল মাঝু অতিথিদের। বাড়ি কাত করে পথের দিগন্ত নির্দেশ করে নিল। তার পরে চলতে শুরু করল যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই।

পাশ থেকে কিস্কিস্ক করে সুকোমল নিবেদন করল, শীলাকে একটা নাচের প্রোগ্রাম প্রথমেরই দিয়ে দিতে হবে। সেটা দিয়ে শুরু করলে তাক্ লেগে যাবে সকলের। এর আরতি-নাচ বিখ্যাত।

সমস্তায় পড়লো শুক্তি। সর্বপ্রথমেরই শরীরচর্চার কৌশলগুলি দেখিয়ে দেবার কথা। উদয়ন বার বার বলেছে পন্টকে সে কথা। শক্তিমান হতে হবে দেশের তরুণদের—তবেই বলিষ্ঠ মনের অধিকারী তারা হবে, দুর্বল হয়ে যাবে যত সংস্কার আর হীনোতি। দীর্ঘ এক বক্তৃতা সে দিয়েছে এই বিষয়ে। কিন্তু সুকোমল বিপদ বাখাল যে।

দৃষ্টিস্তায় পথে হাঁচট খেতে খেতে চলল শুক্তি। শহরতলীর সামাজিক জীবনে নেত্রী শুক্তি।

গুপ্তনরত মৌমাছির মত তার পিছনে এল সুকোমল এগু কোং।

গেটের কাছে উদয়ন তখনও দাঁড়িয়ে। ভিতরে ইতি-মধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। মঞ্চের সামনে মাইকে সংখ্যা গণনা করছে রেডিও দোকানের ভদ্রলোকটি।

শুক্তির চোখ পলটুর খোঁজে ঘুরতে লাগল। আর শীলার মুখের ওপর সভাপন লোকের চোখ ঘুরে ঘুরে এসে পড়তে লাগল।

হঠাৎ একটা কলরব। গেটের মুখে ভিড়। সভাপনিকে নিয়ে ঢুকল পলটু। আর তক্ষুনি দৌড় দিল শুক্তি। পলটুর কাছে পৌঁছে বার বার জঁতো দিতে লাগল ডান-হাতের কজিটাতে।

—বিস্মিত বিরক্ত পলটু তার দিকে কিবে চাইল।

সংক্ষেপে শুক্তি বিবৃত করল তার বিপদের কথা।

সুকোমলকে ত পলটু জানে। যথারীতি সে এসেছে। কিন্তু সঙ্গে আছেন শীলা সরকার। দয়া করে এসেছেন সুকোমলের সনির্বন্ধ অনুরোধে। চমৎকার নাচতে পারেন। পলটু কি ওর নাচ দেখেনি। নাই দেখুক, আজ এই সুযোগ



হারানো ঠিক হবে না। তাই প্রথমেই ওকে একটা ছোট প্রোগ্রাম দেওয়া হোক। কতকগুলি বা লাগবে? কাঠখোঁটা আসন না দেখিয়ে যদি আরতিনৃত্য দিয়ে আরম্ভ করা যায়, তবে বেশী আকর্ষণীয় হবে নিশ্চয়ই।

ক্রীচকে ভীকৃদৃষ্টিতে শুক্তির দিকে চাইল পলটু। বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হয় তাকে। ঠোঁট নাড়া বেধে পেটের কথা বুঝতে হয় তাকে। কাজেই বলার ভঙ্গি আর ভাষা আকৃতির সুর আর ব্যক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা সবটাই বুঝল সে।

এগিয়ে গেল স্ন্যাকোমলের দিকে। সৌজন্য বিনিময় বধারীতি সম্পন্ন হ'ল।

উদয়ন বইয়ের স্তরের সামনে বসে তখনও কি একটা পড়ছে। হঠাৎ মাইকের ঘোষণা শুনে চমকে উঠল, আককের অমুঠান শ্রীমতী শীলা সরকারের আরতি নাচ দিয়ে শুরু করা হ'ল।

গভীর গলা সতাপতির। সুললিত সুর বাজবয়ের। স্নান শিঞ্জিনী নুপুরের। আর লীলারিত দেহবন্দরী শীলা সরকারের।

আগরের সমস্ত অমুভূতি একটি ইন্দ্রিয়ে এসে সংহত হয়েছে, চোখের পলক আর কারও পড়ছে না। আর উদয়নের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে একটি যিশু ভাণ্ডব তালে নেচে উঠছে—ক্রোধ।

মঞ্চের এক পাশে নিরীহ সতাপতি বলে আছেন। পাশে

আছেন জড়পদার্থ তাঁর সহধর্মিণী। আর তাঁরই কাশে কাশে কিসকিস করে কি যেন বলছে পলটু। চীৎকার করে তাকে গালাগাল দিতে ইচ্ছে করল উদয়নের। দাঁতে দাঁত ধবল সে। অপেক্ষা করতে লাগল অন্ধকার থেকে আলোর বাওয়ার মুহূর্তটির।

একটু পরেই এল সে লগ্ন। মঞ্চের দিকে সে এগিয়ে গেল আর জনমণ্ডলীর কবতালিকে বার বার মাথা হুইয়ে অভিনন্দন জানাল শীলা সরকার।

উদয়নকে দেখতে পেয়েই পলটু তাড়াতাড়ি সতাপতিকে কি যেন একটা বলল।

কিন্তু সতাপতি কিছু ঘোষণা করার আগেই কে একজন বলে উঠল, আমরা ঠাঁর পূজারিণী নাচ দেখতে চাই।

চমকে উঠে বক্তার দিকে তাকাল উদয়ন। নবাগত; তাই তার অপরিচিত। পলটুও চিনতে পারল না; কিন্তু শুক্তি এবার অসম্বল হ'ল; সে চিনতে পেরেছে। শোভন সরকার। অতিথি বলেই কি এই জুলুম সইতে হবে? তাই সে উইংয়ের পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে পলটুকে কি যেন বললে। এবং পলটুর মুখ থেকে বধারীতি সে বাণী সতাপতির মুখে বাহিত হয়ে মাইকের মধ্য দিয়ে জনমণ্ডলীর কাছে এসে পৌঁছল, শ্রীমতী সরকারের কাছে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ; কিন্তু ঠাঁকে আর পীড়ন করা ঠিক হবে না। তাছাড়া এর পর আপনাবা শ্রীমান ইন্দ্রজিৎের 'আগন' দেখবেন।

কে যেন চৈত্রে উঠল, না, না, আসন নয়; আর একখানা মাচ হোক। হু-চারজন তাকে স্বর্কন করল।

কিন্তু বাকী সবাই বিনা প্রতিবাদে নীরব ঝট্টা হয়ে শুধু বলে রইল।

নিজের মনে গজরাতে লাগল উন্নয়ন, সাংখ্যের পুরুষ সব। নির্বিকার, নিশ্চল, প্রকৃতির নাচে আত্মহারা।

আর বিব্রত বোধ করলেন সভাপতি। পলটুর দিকে তাকালেন। পলটু উইংয়ের পাশে ঝাড়ানো ছেলেটিকে বলল, তাড়াতাড়ি অডিটোরিয়ামের আলো নেভাও পরে ইলেক্সিতকে আসতে বল।

পলটু জানে, একবার ইলেক্সিত হাজির হলে কেউ কিছু বলবে না। অনেক সভা, অনেক কাগজনে সে পরিচালনা করেছে।

টপ্ করে আলো নিভে গেল। কিন্তু ইলেক্সিত মঞ্চের ওপর এগিয়ে আসবার আগেই লাক্সিয়ে পড়ল শীলা। পূজারিণীর ভক্তিমায়।

করতালিতে মুখব হয়ে উঠল আসব। অপমানে মুখ কালো হ'ল পলটুর। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল শুভির। কোঁতুকে হাসতে লাগল শোভনের চোখ দুটো। বাশীর সুরে আকুল হয়ে উঠল সুকোমলের ঠোঁট দুটো। আর রাগে সর্বাঙ্গ জলে গেল উন্নয়নের। চৈতন্য সে বলল, সভাপতির বোধগা অগ্রসারে আমরা ইলেক্সিতের আসন দেখেব আশা করছিলাম।

ধেমে গেল শীলা। একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠল সারা আসর থেকে। উন্নয়নকে চেনে অনেকেই। অনেকের সঙ্গেই এর আগে বহু ব্যাপারে মতের গরমিল হয়েছে তার। ওর খারালো কথাই খোঁচায় লজ্জা হয়েছে বহুলোক। আজ তারাই সুযোগ পেয়েছে প্রতিশোধের। ছেড়ে দেবে কেন?

অপমানের চাইতেও সেই অবহেলাই বেশী করে বাজল উন্নয়নের বুকে। শুদ্ধ হয়ে গেল সে। আবার নৃত্যের হিল্লোলে ছলে উঠল শীলার সারাদেহ। আর সীমাহীন বেধনায় অশাড় হয়ে গেল উন্নয়নের সমস্ত অহুভূতি। পাখরের মন নিয়ে সে বেরিয়ে এল অন্ধকার আসর থেকে। আকাশের নীচে এসে ঝাড়াল। বহু আলোর ভরে গেছে সমস্ত দিগন্ত; তবু কেন নীরজ অন্ধকার উন্নয়নের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে? পিছলে পড়ছে বৈজ্ঞানিক আলো। পিচেমোড়া কলকাতার বুকে; তবু কেন বজ্রের আলো শুধু তার অন্তরের মধ্যে?

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ছোট মেয়ে অঝোরধারায় কেঁদে চলেছে। তাড়াতাড়ি সে কাছে এগিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করে সে বুঝতে পারল যে, মেয়েটি তার বাপ-মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। থাকে কাছেই একটা গাঁয়ে। দল বেঁধে সবাই এসেছিল শহরতলীর পূজা দেখতে। ভিড়ের মধ্যে এই বিজ্ঞাতি।

উন্নয়নকে বেধে তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিল সবাই। প্রথম নিশ্চিন্তমনে। ঝড় থেকে একটা উটকো মেয়ের ভার নেবে গিয়েছে বলে। কারণ উন্নয়ন থাকতে কে আর এই সব ঝামেলা পোয়াতে যাবে? এ বিষয়ে সবাই ওর তুলনার অনেক ছোট। তাই তারাই উন্নয়নকে স্বাধাযোগ্য স্থানে উপস্থিত দেখেই চটপট কেটে পড়ল যে তার গন্তব্য পথে; পূজার স্মৃতি নষ্ট করবে কে একটা অজানা-অচেনা গাঁয়ের মেয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে? তার জন্ত রইল উন্নয়ন।

তাই কোলাহলমুখরিত শহরতলী ছেড়ে উন্নয়ন পাড়ি দিল এক গ্রামের ভৌরু শুদ্ধতার দিকে। কখন পৌঁছাবে, কিভাবে পৌঁছাবে, কার কাছে পৌঁছাবে এ-সব অবাস্তব প্রশ্ন তুলে অকারণ উৎকণ্ঠিত হওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ।

তারার নিশানা আর জ্যোৎস্নার আলো হ'ল তার দিশারী। বাপ-হারানো মেয়ে হ'ল তার সঙ্গিনী। বাসের চুলচেরা পায়েরাটা পথে তাদের পৌঁছে দিল এক মাঠ থেকে অস্ত্র মাঠে, এক গাঁ থেকে অস্ত্র গাঁয়ে, এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে।

কিন্তু সে ত আর পৃথিবী পরিক্রমার অভিযান করেনি। তাই এক সময়ে সে গন্তব্য গ্রামে গিয়ে পৌঁছল; খুঁজে পেল মেয়ে-হারানোর বাপ-মার ঘর। তার পরে আবার সে ফিরে এল নিজের বাসায়। ভোবের শুকতারায় তখনও কলকাতার প্রাণাধুড়ে নিভে যায় নি; ঠাণ্ডা হাওয়া আর শেখরাতের পাখীর ঝটপটানি সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু কি চেহারায় হয়েছে তার?

শিউরে উঠলেন বিমলা; মুখ বিকৃত করলেন ভবানী; আর বোবা হয়ে গেলেন আদিনাথ।

খুলার ভরে গেছে সমস্ত শরীর; কাঁদার হাঁটু পর্যন্ত নোংরা হয়ে উঠেছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পা দুটো। আর অনিচ্ছায় চোখ দুটো লাল টকটকে। ঠিক মাতালের মতই।

তবু তার ঠোঁটের কোণে প্রথম প্রশান্তি স্নিগ্ধ হাসির মধ্যে ফুটে উঠেছে কেন? অশীম মমতায় চোখ দুটোই বা কেন ভিলে কল্প হয়ে উঠেছে?

ভীষণ ক্লান্ত; ঘুমে ভেঙে আসছে চোখ দুটো। বিমলার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তর দেবার অবকাশ মিলল না। হারিয়ে ফেলল নিজেকে স্বপ্নজ্ঞানো তন্দ্রার মধ্যে।

আর স্বপ্ন ছুটে গেল শুভির চোখ থেকে। মাতালের মত টলতে টলতে সে চুকল নিজের ঘরে। পাখরের মতই নিথর হয়ে গিয়েছে তার সারা অন্তর।

সেও বেরিয়েছিল রাতের কোলকাতার দিকে। লুকে ছিল কতলোক, আর তাহের মধ্যে সুকোমল। মস্ত পিচে-

চাকা বাস্তব ধূলোটুকুও লাগেনি তার পায়ের। হাওয়াব গতিতে উড়ে চলেছিল তারের ট্যান্ডী। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া; এক পুজামণ্ডপ থেকে আর এক পুজামণ্ডপ; এক প্রতিমা থেকে আর এক প্রতিমা।

কিন্তু তার পর?

শিউরে উঠল শুক্তি। সমস্ত শরীরটাকে নোংরা মনে হচ্ছে; সারা অঙ্গিই যেন ধুলোয় মিশে গেছে; আর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে মনটা।

কেন এমন হ'ল? কেন যে সুকোমলের মিষ্টি হাসিতে ভুলে গিয়েছিল? কেন মধ্যমলের প্যাট-পরা শোভনের পাশে গিয়ে সে ট্যান্ডীতে বসেছিল? কোন্ সাহসে জন্তু-আঁকা জামা-পরা শোভন ফিসফিস করে বলেছিল সুকোমলকে—আজকের মত শুক্তিকে আমার ছেড়ে দে মুহু। তুই আমার প্রাণের বন্ধু; এটুকু চাইবার দাবী আমার আছে; তোরা জিনিস আবার তোকেই ফিরিয়ে দেব।

সে কি আকর্ষণ ভুবে গিয়েছিল নোংরা পাকে। তাই কি বিন্দ্বিন্ করছে সমস্ত শরীর আর শিরশির করছে সমস্ত অন্তর?

কিন্তু সুকোমল? কি জবাব দিল সে?

একটা পণ্য—বাজারের বেসাতীমাল। শুধু খন্দেরের চোখেই তার দাম, নিজস্ব কোন মর্যাদা নেই তার।

তাই পুরণো পুতুলের মত তাকে ছুঁড়ে কেলে দিতে বিন্দুমাত্র বিধা করল না সুকোমল। স্বচ্ছন্দে সম্মতি জানিয়ে গাড়ী থেকে শীলার হাত ধরে নেমে গেল। বংশীবাদক সুকোমল আর নৃত্যশিলী শীলা। সাপুড়ে আর সাপ।

সাপের চোখ নিয়েই এগিয়ে এসেছিল শোভন। সাপের

শরীরের মতই ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল শুক্তির মরালখন্ডু ঐবা।

কিন্তু ফণা তুলে ক্রোধে উঠল শুক্তি। ঝটকা মেঝে হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ট্যান্ডীর কোটর থেকে। তার পর কোলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। পায়ের হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছে নিজের ঘরের দোরগোড়ায়।

মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। মা, পিসিমা শুধু বোবার মত তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? কেন এই শুদ্ধতা? কি লক্ষ্য করছেন তাঁরা তার মুখের রেখায়? কেন জিজ্ঞেস করছেন না কিছু? কেন তাকে এই চরম লজ্জার কথা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কেটে মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে?

সমস্ত মন তার বিজোহী হয়ে উঠল। জোর করে তাই নির্ধারিত করে দিতে চাইল ক্রুদ্ধ বেদনাকে।

—ক্রট—সুকোমল জব্বত—

কিন্তু কথা আর শেষ হ'ল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সব চৈতন্য সমাহিত হ'ল মৃত্যুর মত মুচ্ছার মধ্যে। সব বন্ধনা ভুবে গেল বোধাভীত সৃষ্টির অন্তরে।

ঘুমিয়ে পড়ল শুক্তি আর স্বপ্ন দেখতে লাগল উন্নয়ন।

ইষ্ট-দেবতার স্মরণ করলেন আদিনাথ-ভবানী-বিমলা। ফিরে এসেছে শুক্তি, শান্ত হয়েছে উন্নয়ন।

ধৃবধৃ করে জলছে শুধু প্রতিমার তৃতীয় নয়ন। খাকমকু করে বালসে উঠছে হাতের ধর্পর। শেষমাতের হিমেল হাওয়ায় বারবার কঁপে উঠছে মাটির প্রদীপটা।



## রুশ পর্যটক নিকিটিন ও মধ্যযুগের ভারত

### শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসাবাদিজ্ঞা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব দূঃসাহসিক বণিক ভারতে এসেছিলেন রুশদেশীয় মিঃ অথানাসিয়াস নিকিটিন তাঁদের মধ্যে একজন। নিকিটিন তাঁর জন্মভূমি তিরেব থেকে ঠিক কোন সময়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তার সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব নয়, তবে তিনি তাঁর বিবরণীতে এ সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা থেকে দেখা যায় যে, তিনি ওয়েসিলি পাপিন নামক অপর একজন রাশিয়ানের সঙ্গে কাজান যুদ্ধের এক বৎসর পূর্বে রাশিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক তৃতীয় ইসগরান কর্তৃক শিবভান-এর শাহের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন উপহারাদি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। ইতিহাসের সালসামানিতে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দেই কাজান যুদ্ধ হয়েছিল বলে উল্লিখিত আছে এবং সেই হিসাব অনুযায়ী নিকিটিন ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিদেশ ছেড়ে নিকিটিন ভদ্রানন্দী বয়ে কাসপিয়ান সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাতারী দস্যুদের হাতে পড়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন ও বন্দী হন। অবশেষে তাতারদের রাষ্ট্রদূত হাসান-বেগের মধ্যস্থতায় নিকিটিন মুক্তি পান এবং তাঁরই সহযোগিতায় নিকিটিন নির্ঝরে বোখারোর এসে পৌঁছান। বোখারো থেকে নিকিটিন কীরগরান, বন্দর আকাস, হরমুস (অরমুস), মাসকট হয়ে পশ্চিম-ভারতের সামুদ্রিক বন্দর চাউল-এর মধ্য দিয়েই তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। চাউলে সাত দিন অবস্থানের পর নিকিটিন পদব্রজে আঠারো দিন পর গিয়ে পৌঁছালেন ওমহিতে (সুহাটের চল্লিশ মাইল দূরবর্তী বর্তমান ওমহিটা শহর) এবং সেখান থেকে জনাব হয়ে বিদবে গিয়ে পৌঁছান। নিকিটিন বিদবে প্রায় চার বৎসর ছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকালেই তিনি সেখান থেকে কালিকট, সিংহল দ্বীপ, পেগু প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। বিদবে চার বৎসর কাটাবার পর নিকিটিন চলে যান সামুদ্রিক বন্দর দাবোল বা দেওয়াল-এ এবং সেখান থেকেই সমুদ্রপথে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বদেশে পৌঁছবার পূর্বেই পথিমধ্যে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমুদ্রপথে পতিত হন। নিকিটিনের স্থলিখিত বিবরণীর পাণ্ডুলিপিটি কয়েকজন রাশিয়ান ব্যবসায়ী ঐ বৎসরেই স্ববস্ত্রে যত্রোতে বয়ে নিয়ে যান ও গ্র্যাণ্ড ডিউকের সেক্রেটারীর হস্তে সেটি সমর্পণ করেন।

নিকিটিন ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্কিষেবে ভারতীয়েরা খালিপারেই থাকে, তবে যেহেতু বাথার ধোঁপা বাঁধে ও ওড়না ঢাকা দেয়। পথেবাটে

বেহোলেও তাদের এই পোশাকের কোন অলসবদল করা হয় না। রাজপুরুষ ও সম্রাট ব্যক্তিগতগণ গায়ে সিঁকের একটা চাদর জড়িয়ে রাখে। তৃত্য শ্রেণীর বা ক্রীতদাসরা খালি গায়ে ও খালি গায়ে তাঁর-খন্ডক বা বর্শা, ছোঁরা বা তলোয়ার ও ঢাল নিয়েই রাজ্যের চলাকোরা করে থাকে। সাত বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকারা উল্লম্ব অবস্থাতেই রাজ্যের চলাকোরা করে এবং এম জন্ম কোনরূপ লজ্জাবোধ করে না। ভারতীয়দের গায়ের রং কালো, তাই তারা সাদা চামড়ার মাল্লবদের দেখলে বিস্মিত হয়ে যার ও হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিকিটিন চাউল থেকে যান জুনের এবং সেখানে প্রায় দু'মাস-কাল অবস্থান করেন [দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকিটিনের বিবরণীর অনুবাদকার Count Wielhorsky নিকিটিনের উল্লিখিত এই স্থানের অবস্থান বা তার বর্তমান নাম সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। ভারতবর্ষের পুরাতন মানচিত্রেও এই নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিকিটিন যখন বিদব (বর্তমান আমেদাবাদ) পরিভ্রমণ করেন তখন জৌনপুর নামে একটি বল্লহারী মুসলমান রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। খুব সম্ভবতঃ নিকিটিন এই জৌনপুরকেই জুনের বলে উল্লেখ করেছেন—লেখক] জুনের-এর শাসক আস-খান সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, ঐ শক্তিমান মুসলমান শাসক যখনই পথে বেহোতেন তখন হাতী বা ঘোড়ার না চেপে পাড়ীতে করেই বেহোতেন, যদিও হাতী বা ঘোড়া কোনটার তাঁর অস্তাব ছিল না।

নিকিটিন জুনের-এর আবহাওয়া সম্বন্ধে বলেছেন যে, শরৎ-কালেই এককালে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়, তাই এখানকার প্রধান চাষ-আবাদ বা কিছু এই সময়েই হয়। গম, ছোলা, কড়াইগুটি ও সজীব চাষটাই এখানে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে হয়। নিকিটিন বলেছেন এখানকার লোকেরা ঘোড়াকে ছোলা ছাড়াও খিচুড়ীও খেতে দেয়। এ দেশে যে সব ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায় প্রায় সবই চালানী ঘোড়া, কারণ এদেশে ঘোড়া ভ্রমণ না বললেই হয়। এখানকার অধিবাসীদের বানবাহনের প্রধান সম্বল হ'ল ঘোষ ও বাড়, যাদের পিঠে চেপে বা মালপত্র চাপিয়েই একস্থান থেকে অত্থানে ভ্রমণপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বা নিজেই বাতায়াক করে।

নিকিটিন বলেছেন যে, ভারতীয় প্রধানুযায়ী বিদেশী সওদা-গমনের পথিপার্শ্ব সরাইখানাতেই থাকতে হয়। এই সব সরাই-খানার অভ্যাগতদের সুখস্বচ্ছন্দ্য দেখার জন্য মহিলা পরিচারিকা রাখা হয়েছিল, যারা পথিকদের জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করে দেয় ও



শরনের সুবন্দোবস্ত করে দেয়, প্রয়োজন হলে তারা পথিকদের শয়ানস্থলীও হয়।

জুনের-এ অবস্থানকালে জুনের-এর শাসনকর্তা আসতখান নিকিটিনের ঘোড়াটি কেড়ে নেন এবং পরে যখন তিনি শোনেন যে, নিকিটিন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী তখন তিনি ঘোড়াটি কেবল দিতে রাজী হন, যদি নিকিটিন মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে রাজী হন। আসতখান নিকিটিনকে এই ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য ১,০০০ বর্ণমুদ্রা উপহার দিতেও স্বীকৃত হন। আসতখান নিকিটিনকে আরও জানিয়ে দেন যে, তাঁর প্রভাব যদি নিকিটিন প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে তাঁর ঘোড়াটি ত কেবল দেবেনই না, উটে নিকিটিনের শিরশ্ছেদ করার জন্য তিনি ১,০০০ বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করে দেবেন। আসতখান নিকিটিনকে তাঁর প্রভাব সবচেয়ে চিন্তা করার জন্য রাজ্য চার দিন সময় দিয়েছিলেন। বাহা ইউক, শেখপর্বাণ্ড খোজা ইওচা মহম্মদ নামক একজন খোরশানী সন্তান উল্লেখ্যকর চেষ্টার আসতখান নিকিটিনকে এ রাজ্যে যেহাই দেন ও তার ঘোড়াটি কেবল দেন। নিকিটিন এই ব্যাপারে খুবই হুঃখিত হন ও তাঁর মনোবাসীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, যদি কোন খ্রীষ্টান বাশিয়ান হিন্দুস্থান পবিত্রমণের সন্ধান করেন, তাহলে তার ধর্মবিশ্বাস অস্বাভাবিক হয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তবে বেন তাঁরা হিন্দুস্থানের পথে পা বাড়ান। এদেশে বিভিন্নরকমের মশলাদি ও রত্নদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে হয় এবং নামেও খুব সম্ভব কিন্তু সেগুলি বাশিয়ানদের কোনই কাজে লাগবে না বলে নিকিটিন মন্তব্য করেছেন। সমুদ্রপথে যে সব পণ্যাদি এদেশ থেকে চালান যায় তার উপর কোনই কর ধার্য করা হয় না। অবশ্য অল্প বহরকমের কর দিতে হয়। এদেশে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সামুদ্রিক বোম্বোটেদের উৎপাত। এই সব জলদস্যুগণ প্রায় সবাই হিন্দু-ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুর্ষি উপাসক। বাবসারীরা অনেক সময় এদের হাতেই সবচেয়ে বেশী নিগ্রহীত বা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতের রাজ্যপথে যদিও দস্যুদের উৎপাত নেই কিন্তু বাদরের উৎপাত রয়েছে বলে নিকিটিন মন্তব্য করেছেন।

নিকিটিন জুনের থেকে রাজ্য করে কুলবর্গা ( কুলবর্গা ) হয়ে প্রায় এক হাস বাদে বিদ্যে এসে পৌঁছান। বিদ্যে সবচেয়ে বলতে গিয়ে নিকিটিন বলেছেন যে, বিদ্যে ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যিক ষাটি। বিভিন্ন দেশ থেকে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঘোড়া, বিভিন্ন খাদ্যশস্যাদি, মশলাদি, সিল্কের দ্রব্যাদি ও বিভিন্নরকমের বাণিজ্যিক পণ্যাদি এখানে বিক্রয়ার্থে আসে। এখানকার রাজ্যে ক্রীতদাস পর্যন্ত বিক্রয় হয়। নিকিটিন বলেছেন, এই অঞ্চলের নারীরা প্রায় অধিকাংশই চরিত্রহীন ও হিংস্র প্রকৃতির। প্রয়োজন হলে এরা নিজের ঘরবান্ধবকেও বিব্রতরোগে হত্যা করতে হিন্দু-রাজ্যে বিধাবোধ করে না। নিকিটিনের মতে হিন্দুস্থানের মুসলমান-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মধ্যে বিদ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র। পুত্রটি আকাশে ফেরন বিরাট তেজস্বী কন লোকবসতি। বিদ্যের

বর্তমান স্থলতানের বয়স রাজ্য ২০ বৎসর। তিনি নামেবাজীই স্থলতান, আসলে রাজ্য পরিচালনা করছেন খোরশান দেশীয় তাঁর আত্মীয়বর্গেরা। আত্মীয়দের মধ্যে মালিক তুচায়, মালিকখান ও খারাতখান-এর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মালিক তুচায়ের অধীনে প্রায় দু'লক্ষ সৈন্য, মালিকখানের অধীনে ১ লক্ষ ও খারাতখানের অধীনে প্রায় ১০ হাজার সৈন্য এবং অপরাপর আত্মীয়দের অধীনে প্রায় ১০ হাজার সৈন্য আছে। স্থলতানের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। স্থলতান যেখানেই যান তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনীও যায়।

নিকিটিন বলেছেন, অসংখ্য লোকবসতিপূর্ণ এই রাজ্যের একদিকে যেমন দেখা যায় সম্রাজ্য ব্যক্তির ও আত্মীয়গণ ঐশ্বর্যের চূড়ার বলে চরম বিলাসিতায় মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন অপর দিকে তেমন সাধারণ অধিবাসীদের হুঃখ-দুঃখণা অবর্ণনীয়। আত্মীয়গণ যখন পথে বেড়ান তখন রূপের পালকে চেপেই যান, কুড়ি জন ভৃত্য কাঁধে করে এই পাখী বরে নিয়ে যায়। এ ছাড়া ৩০০ অশ্বারোহী, ৫০০ পদাতিক সৈন্য, দশ জন মশলাধারী ও দশ জন সজীতকলাকারকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। স্থলতান যখন বাইরে যান তখন তিনি মনিমুক্তাচিহ্নিত পোশাকাদি পরে, মাথার পাগড়ী বেঁধে ঘোড়ার চেপেই বাইরে যান। স্থলতানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অগণিত সৈন্যও দেহরক্ষীরূপে যায়।

স্থলতানের শিকার অভিযান সবচেয়ে নিকিটিন বলেছেন, স্থলতান যখনই শিকারে যান, স্থলতানের হাতা ও বেগমরা, শতাধিক বিদেশীয় উপপত্নী ও তিনজন উজীর্ঘীসঙ্গে যান। এ ছাড়া ১০ হাজার অশ্বারোহী, ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্য, ২০টি বুঝলে সজ্জিত হস্তী, ১০০ জন তেঁপুবাদক, ১০০ নর্তকী, ৩০০ অশ্ব, শতাধিক বাদক ও তার সঙ্গে থাকে। স্থলতান সাধারণতঃ সম্রাজের মধ্যে দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধশক্তির শিকারে যান।

বিদ্যের রাজপ্রাসাদের বিবরণ দিতে গিয়ে নিকিটিন বলেছেন, প্রাসাদের সাতটি ভোরণদ্বারের প্রতিটিতেই শতাধিক প্রহরী ও শতাধিক মুসলমান কেহাঙ্গী মোতায়েন আছে—বাদের কাজ হচ্ছে প্রাসাদে প্রবেশেচ্ছু ও নির্গমেচ্ছু প্রতিটি লোককে পরীক্ষা করা ও তাদের নাম-ধাম লিখে রাখা। সাধারণতঃ কোন বিদেশীকে পুহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। প্রাসাদের স্থাপত্য-শিল্প ও নির্মাণ-কৌশল দেখে নিকিটিন মুগ্ধ হয়ে যান এবং প্রাসাদের সুসজ্জিতকাঠের ভূমণ্ডল প্রশংসা করেন। প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি বিচারালয় রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন অভিযোগের বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। রাজ্যকালে পুহরের রাজপথে প্রায় ১০০০ কোতোয়ালী অর্থাৎ অশ্বারোহী শাস্ত্রীরা মশাল নিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

বিদ্যের হিন্দু অধিবাসীদের সবচেয়ে নিকিটিন বলেছেন যে, এখানকার হিন্দুদের সঙ্গে তিনি খুব ভালভাবে বিশেষ দেখেছেন যে, তারা আদরের প্রতি বিধাসী ও বন্দেবই (৭) হস্তোত্তর জামোয়া সৈন্য



আদর। সর্বসাকুল্যে এদেশে প্রায় ৮৪টি বিভিন্ন ধর্মব্রত রয়েছে, যদিও এরা সবাই বুদ্ধের প্রতিই আস্থাশীল। এক ধর্মবিধানে বিশ্বাসী হয়েও এদের প্রত্যেক মতাবলম্বীদের মধ্যে আচার-বিচার-গত প্রভেদ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান, বা দেখে নিকিটিন মন্তব্য করেছেন যে, একের মধ্যে প্রভেদটা এতই বেশী যে, একে অপরের অম্লরূপ খাভ বা পানীর পর্যায় গ্রহণ করেন না। প্রত্যেকেরই খাভ তালিকা ভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে অনেকেই শ্রবণ, পঙ্ক, ভিন্ন, মুবগী সবই খায়, আবার অনেকে সম্পূর্ণরূপে নিরানিবাশী। কতিপয় প্রভেদ প্রত্যেক ধর্মব্রতাবলম্বীদের মধ্যে বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়।

নিকিটিন শেকওমের হিন্দুদের পবিত্র বুদ্ধখানাটি (বৌদ্ধ চৈত্যা?) পরিদর্শন করেন এবং এই মন্দিরটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—মন্দিরটি খুবই বিরাট আকারের এবং সবটাই পাথরের তৈরী। মন্দিরের দেওয়াল এবং ধামগুলি কুঁদে কুঁদে বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে, স্থাপত্য ভাষ্কর্যের দিক থেকে বার মূলা অপরিষের এবং চমৎকারিছে সেগুলি অভুলনীর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতি বৎসর অসংখ্য হিন্দু এই মন্দির দেখতে আসে। এখানে ৫ দিন ব্যাপী একটি মেলাও হয় এবং প্রতি বৎসর সেই মেলায় প্রায় এক কোটি লোকের সমাগম হয়। দর্শনার্থীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী, বারা এখানে এসে মন্তক-মুগুন করে বুদ্ধের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানায়। মন্দিরে বুদ্ধের প্রস্তর-নির্মিত একটি বিরাট মূর্তি রয়েছে এবং মূর্তিটির সাহসে কাল পাথরের তৈরী একটি বীড়ের মূর্তিও রয়েছে। এ ছাড়া মন্দিরগায়ে বহু বকমের মূর্তিবিশিষ্ট চিত্রাদিও অঙ্কিত করা হয়েছে। উপাসকরা প্রথমে বসন্তমূর্তির পা চুম্বন করে কুল দিয়ে পূজা করে। পরে বুদ্ধ-দেবকে পূজা করে। বুদ্ধদেবের মূর্তিটি যে ঘরে আছে সেই ঘরের একটি বাহ্য দরজা ছাড়া ঘরের আর কোন দরজা-জানলা নেই।

বিদ্যের কাছেই সালিয়ারিনাং নামক একটি স্থানে শিকহালা-উকীন বাজারে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয় এবং মেলায় বিভিন্ন বকমের জন্তুজানোয়ার বিক্রয়ার্থে আসে। এই মেলা থেকে বিদ্যে কেবল বোড়াই চালান যায়—প্রায় বিশ হাজার। নিকিটিনের মতে এত বড় কেনাবেচার হাট আর কোথাও বসে কি না সন্দেহ, অন্ততঃ তাঁর জানা নেই।

নিকিটিন বিদ্যের হিন্দুদের আচার-বিচার লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে, এরা পঙ্ক-মোষকে দেব-দেবীজ্ঞানে পূজা করে এবং গৃহপালিত পশুরূপে প্রতিপালন করে। হিন্দুরা দিনে দু'বার খায় কিন্তু রাজ্যকালে কিছুই খায় না। প্রতি রবিবার ও সোমবার এরা বাজ একবারই খায়। কোনরূপ মদ এরা খায় না। হিন্দুরা স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাদ্যাদি গ্রহণ করে না, এমনকি, মুসলমানেরা বাতে তাদের খাদ্যাদি দেখে না কেনে সেই জন্ত খাদ্যাদি চাপা দিয়ে ঢেকে রাখে। উচ্ছিষ্ট খাভ খাওয়া হিন্দুদের

করে, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসে খাওয়া এদের সামাজিক রীতি-বিক্রম। হিন্দুরা মাথার ওপর দু'হাত একত্রে তুলে পূর্বমুখী হয়ে ঈশ্বর ভজননা করে এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে এবং এদের আরাধ্য দেব-দেবীকে প্রণাম জানায়। হিন্দুরা পথেঘাটে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে নীরবে মাথা নীচু করে ভূমিস্পর্শ করে দু'জনেই দু'জনকে ওভেছা জানায়। নিকিটিন বলেছেন, হিন্দু নারীর সন্তান প্রসব-কালে তাদের স্বামীরাই ধাত্রীর কাজ করে। পুত্রের নামকরণ করে পিতা ও কস্তার নামকরণ করে মাতা। প্রথা অনুযায়ী হিন্দুরা শরৎকালে মাটিতে কবর না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেই সংকার্য করে এবং পোড়া ছাই নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। হিন্দুরা বধন বুদ্ধ করতে বার তখন তারা হাতীর সাহায্য নেয়। এদের সৈন্তবাহি ঘটনার প্রথমে থাকে পরাস্তিক ও পরে অশ্বারোহী সৈন্তেরা যুদ্ধবাজা করে। হস্তীবাতিনী নিয়ে বাওরার সময় এরা লোহার চাদর দিয়ে হস্তীদের পা ঢেকে দেয়।

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ধর্মীয় আচারাদি সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, এ দেশের মুসলমানরা মার্চ মাস ভোর উপবাস করে। ভারতে পদার্পণের পর নিকিটিন খ্রীষ্টানধর্মের কোন অনুষ্ঠানই পালন করতে পাবেন নি, কারণ তিনি যে সব ধর্মগুরুক স্বদেশ থেকে নিয়ে বেহিরেছিলেন সেগুলি পশ্চিমবঙ্গে দম্প্রভুতে নিগৃহীত হওয়ার সময় খোঁরা যায়। নিকিটিন সারা মার্চ মাস ভোর মুসলমানদের আচারাদি পালন করেছিলেন—বোধ হয় বাধ্য হয়েই করেছিলেন। নিকিটিন বিদ্য থেকে দেওয়ালে বান। দেওয়াল বা দাবোল মুসলমান-অধিকৃত হিন্দুস্থানের সর্বশেষ সামুদ্রিক বন্দর। বহির্দেশ থেকে দাবোলে বিক্রয়ার্থে বিভিন্ন জাতের অস্ত্র চালান আসে। দাবোল থেকে কালিকটের দূরত্ব প্রায় ২৫ দিনের পথ এবং কালিকট থেকে সিংহল দ্বীপ প্রায় ১৫ দিনের পথ। নিকিটিনের মতে ক্যাথে সারা ভারতের বন্দরগুলির মধ্যে অত্যন্ত। ক্যাথেতে কবল, সিঙ্কের কাপড়ের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্র জরাদি প্রস্তুত হয়। কালিকটও ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। কালিকট অঞ্চলে বিভিন্ন বকমের মশলাদি, আদা, প্রচুর জম্মায় ও বিভিন্ন বন্ধনজরাদিও প্রস্তুত হয়। এখানে প্রত্যেকটি জিনিসই খুব সস্তার পাওয়া যায়। এখানকার দাসদাসীদের আচার-ব্যবহার প্রশংসনীয়। বাদিজাক কেন্দ্র হিসেবে শ্রীহট্ট ও পেগুর নারও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি স্থানেই প্রচুর চন্দন গাছ জম্মায়। সিঙ্ ও বিভিন্ন ধরনের মণিমুক্তা প্রচুর পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপ পরিভ্রমণান্ত নিকিটিন বলেছেন, এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মণিমুক্তা, দামী দামী পাথর, ফটিক ও হস্তী পাওয়া যায় এবং এখান থেকে ভারতে চালান যায়।

ভারতীয়দের কালগণনা সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, ভারত-বাসীরা সাধারণতঃ একটি বৎসরকে চারিটি প্রধান ঋতুতে ভাগ

হচ্ছে তিন মাসকাল। গ্রীষ্মকালে এ দেশে বেশী গরম বোধ করা যায় না (?) বলেই নিকিটিন মন্তব্য করেছেন।

• নিকিটিন কালিকট থেকে পুনরায় দাবোলে কিংবে আসেন এবং সেখানে পৌঁছানোর পরই তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের সিদ্ধান্ত করেন। দাবোল থেকে জলপথে অগ্রসর হয়ে পারস্তের মধ্যে গিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও লাহিনা সহ করে তিনি ৪ঠা নভেম্বর ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাকিয়াতে ( বর্তমান সিরোডোসিয়া ) গিয়ে পৌঁছান।

নিকিটিন তাঁর বহুবিধ বিবরণীয় এইখানেই অভ্যর্থিতভাবে সমাপ্তি টানেন, খুব সম্ভবতঃ এর পরই তিনি মারা যান।\*

\* [এই বিবরণীটি Count Wielhorsky কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত নিকিটিনের ভ্রমণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই লিখিত। উপরোক্ত ইংরেজী অঙ্কনটি Mr. R. H. Major কর্তৃক সম্পাদিত। “India in the Fifteenth Century”তে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংযোজিত হয়েছিল—লেখক]

## ভুবুঝি

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

ভুবে ভুব-সাঁতার কেটে

পাখার বেঁটে অগাধ জলে

আমি চাই মুক্তা মণি, সারাক্ষণই

হাতড়ে মরি কোঁতুহলে,—

রক্তাকরের সেই অতলে।

অতলের তলাস্তিকে, শুক্তি বৃকের মুক্তাটিকে

নগ্ননের প্রদীপ জেলে, বেধায় মেলে

আনবো পেলে সেই মার্গকে।

মুক্ততার রশ্মিমালা,—সাগরের সেই গহ্বরে

তুলে তার গাঁধবো মালা, বৃকে তাই থাকবো প'রে

প'রে সেই সাতনরী হার রঙীন আশার রেশ্মি ডোরে।

রূপে তার জালবো বাতি

সে-রূপের আলোর মাতি

সে মণির এমনি অগীম দীপ্তি বলে—

ভিমিরে রক্ত চিরে লক্ষহীরে উঠবে জলে।

আমার এই জীর্ণ তরী

বাইতে ডরি

অর্ধে অচিন সূর্ণি জলে

তুখু এই মুক্তা ঘাটে

জীবন কাটে

পেয়েছি অনেক মণি

বর্ণ লালিম ডালিম-তাজা

এবে চাই চোখের মণি, বৃকের মণি

রক্ত কমল রক্ত বাঁটা,

আমার বৃকের স্নেহের হৃথের

জোয়ার ভাঁটার তাজন-তাজ

আমি চাই একটি যেটি

পল্লবাপের শ্রেষ্ঠতম,—

হোলাবো কর্তহারের মধ্যমণি বন্ধে মম।

আজো তাই সন্ধ্যা বেলায়

এই অবেলায়

ভুবছি খালি, তুলছি বালি,

তবু হায়! ভুবছি যত উঠছি তত

অঞ্জলি মোর শূন্য খালি।

যবে তাই কিরছি এখন

মিতি যেমন রিক্ত হাতে

নিরে বাই সেই তাজা মন

—তখন যেমন, এখন তেমন,

# চরক-সংহিতার কথা

শ্রীমদ্রাজেন গুপ্ত

১

চরক ও সূত্রক সংহিতায় চাইতে আয়ুর্কেন্দ্রশাস্ত্রের প্রাচীনতম পুস্তক দেখা যায় না। চরক বলেন যে, যে-ইন্দ্রের হাতে আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রের ভাণ্ডার তা হতে তাঁর গুরু ভরদ্বাজ সে-শাস্ত্র শিখা করেন। সূত্রক বলেন যে, ঐ ইন্দ্র হতেই তাঁর গুরু ব্রহ্মস্মি আয়ুর্কেন্দ্র শিখে-ছিলেন। সুতরাং এদের দু'জনের গুরু—ভরদ্বাজ ও ব্রহ্মস্মি—দুজনেই একই যুগের। এবং সেই যুগ ধরে আশা হয় যে, চরক ও সূত্রক—দু'জনের কালের বেশী তফাৎ ছিল না। কিন্তু কিছু তফাৎ যে ছিল তার প্রমাণ আছে দু'জনের সংহিতায়। সূত্রক যেন কিছু পদবর্তী কালের। কারণ, বসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনার জানা যায় যে, সভ্যতার অনেকখানি উন্নতি চলে তবে যাহুয বোগ-চিকিৎসার পান্ডেব ব্যবহার করতে শিখেছিল। সূত্রকে পান্ডেব ব্যবহারবিধি বর্ণিত হয়েছে। চরকে তা নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা স্থির করেছেন যে, চরকের কাল হ'ল এখন হতে প্রায় দুই হাজার বছর আগে।

চরকের কাল সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে এর বেশী জানাও প্রয়োজন নেই। কারণ চরক-সংহিতা বইখানিতে কি আছে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই পুস্তকের আরতন বৃহৎ, ভাষা সংস্কৃত এবং বিষয়টি জটিল। সুতরাং এই সংহিতা জনসাধারণের সহজ আয়ত্তের বাইরে। মূলের বাংলা অনুবাদও সহজপ্রাপ্য নয়। তার সূচীপত্র পড়লে বিষয়বস্তুর অল্পটুকু ধারণা জন্মে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বোগ-চিকিৎসার অংশ বাদ দেব। অন্য অংশের একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করব।

২

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র-পাঠকারীদের কাছে প্রাচীন আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রে যা সব চাইতে বিচিত্র মনে হবে তা হ'ল শরীর ভাল রাখার জন্য কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে তার জন্য উপদেশ। চরক-সংহিতায় অনেকখানিই এই জন্য নিয়োজিত হয়েছে। শরীর ভাল রাখাকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শরীর ভাল রাখার জন্য সংচিহ্নাপহারণ, হৃদাখানাতোড়ী, সন্ধিহীন-সংবী ও মেহমেনে নির্মূল থাকার জন্য বিদ্যুত ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ আছে। কালিদাসের ঋতুর্গণনে ঋতুভেদে বসবাসের বিভিন্ন রকম উপদেশ আছে। কিন্তু তা কাব্যগভী ও বিলাসী চিত্রশাস্ত্রিক। চরকের

আম্রার মজলার্ব' কীর্ষিত। বাহ্য ভাল রাখার উপদেশ-সম্বলিত আধুনিক বিজ্ঞানের চিত্তিতে লেখা বই আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তা সবই বস্তুতাত্ত্বিক। মন, আত্মা ও ভগবৎভক্তির সে প্রয়োজনীয়তা সেখানে স্বীকৃত হয় নি বা চরকের সংহিতায় মন মন ও বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

৩

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা—এই মিলে হ'ল আত্মা। এই আত্মার পক্ষে কি হিতকর, কি অহিতকর, কতখানি আত্ম, ও আত্মর রকমটা কতখানি ভাল—এই সব যে শাস্ত্রে আছে তার নাম আয়ুর্কেন্দ্র।

এই শাস্ত্র বোগ-চিকিৎসার জন্য বোগের কারণের সন্ধান করে অতি সহজ যুক্তিতে, তাই বোগ চিকিৎসার পদ্ধতিও সহজ। বোগ হলে বুঝতে হবে, রোগীর বেহে কোন কার্য বা ক্রমের অভাব বা বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং জর্য ও বা কর্মে যা কম তা বেশী কর অথবা যতটা বেশী তা বাদ দাও।

কিন্তু আয়ুর্কেন্দ্রের ক্রমের অর্থ খুব ব্যাপক—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্রিতি এবং আত্মা, মন, কাল ও দিক—সবই ক্রম। সংযোগ ও বিরোধ হ'ল কর্ম। এই সব কথা বিদ্যুত করে বলার পর চরক-সংহিতা ক্রমভেদের বিবরণ দিয়েছেন। মধু, দুগ্ধ-মৃতাদি, জীবদেহের নানা অংশ, অনেকরূপ ধাতু। লতা-গুহাদি, নানা প্রকার কল, পাছেব নানা অংশ বা নির্ধাস, পাঁচ প্রকার লবণ, আট প্রকার মূত্র, আট প্রকার হৃৎ, তৈলাদি স্বেদনপদার্থ—সবই চিকিৎসার লাগে—তাদের নামের বিদ্যুত তালিকা, পরিচর ও গুণবর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কোন কোন জিনিস যাচ্যেয় পক্ষে কোন দিক হতে কতখানি হিতকর। এবং শরীরে যার অভাব হয়েছে তা কোন পথে পূরণ হবে এবং বা বেশী হয়েছে তা সহজে কি ভাবে বর্জন করা যায়। কিন্তু চরক যার-তার হাতে চিকিৎসাশাস্ত্র দিতে অনিচ্ছুক। তাঁর শ্রুতিবান, হেতু ও যুক্তি, জিতেন্দ্রিয় ও প্রভুত্বপন্নমতি হওয়া চাই।

৪

চরক শরীরের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার রাখার জন্য নানারূপ উদ্ভিদ ও খাতক লবণ ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং সভ্যতাই

পরিষ্কারের উপায় বহি এবং মলত্যাগ করানো। কখনও তা বন্ধ করাও দরকার হয়। সবই আলোচিত হয়েচে খুব বিতৃষ্ণভাবে।

শরীর স্নান বাথার জন্ত যে আহ্বান করতে হবে তা বেশ পরিচিত হয়। তবে বাঁধ বেঁধে ধুয়া, তাঁর তেমন আহ্বান চাই। রক্তশালী ও বেটে ধান, মুগ, লাভ ও পৌষভিত্তিরি পাখী, কুকুমার, ধবগোস, যক্ষ সিংওয়ালা হরিণ, শাশ্ব নামক হরিণবিশেষের মাংস প্রভৃতি সহজে হজম হয়। শিঠা, গুড়, দধি, ছানা, মাছকলাই, শূকর ও কাছিরের মাংস গুরুপাক। বিনি বাবেন তাঁর বহি হজম-শক্তি ভাল থাকে তবে সহজেই হজম হবে। ব্যায়াম দ্বারা বাঁধ অগ্নিবল প্রবল তাঁর পক্ষে গুরুপাক দ্রব্যও কিছু বেশী খেলে অপকার আনে না। স্নাতবাং লঘু ও গুরুদ্রব্য—সবই উপযুক্ত রাজ্যের খেতে হবে।

পেটভরা থাকলে গুরুপাক চালেব পিঠে ও চিড়ে কিছুতেই খাবে না। বিদে পেলে এসব জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া যায়। শুকনো মাংস ও শাক, শালুক ও পদ্মের ডাটা, যোগা-পাতর মাংস, রাজা করা দৈ, শুকনো নষ্ট দুধ, শূকর, গো-হরিণের মাংস, মাছ, দৈ, মাছকলাই ও স্বকনামক ধান সর্বদা খাবে না। বেটে ধান, শালি ধান, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, বব, বৃষ্টির জল (পরিষ্কৃত জলের সহজুলা) দুধ, ঘি, জলাপাতর মাংস ও মধু যোজ খাওয়া যায়। এমন কিছু খাবে না বা যোগ নিয়ে আসতে পারে।

রাজে দৈ খাবে না। দিনেও ঘি, চিনি, মধু, মুগের খুব বা আমলকীর রস না মিশিয়ে খাবে না। কেন এসব যেখানে বলা হ'ল চবক তা বিস্তারিত বলেছেন।

৫

চক্ষের বৃষ্টির উপকারের জন্ত চোখ হতে জলস্রাব করান ভাল। তার জন্ত রাজে চোখে কাজল দেওয়া উচিত। কোন কোন মানুষের জিতবট্টা রক্ত। নানা বস্তুর সংযোগে একটা শলা তৈরী করে তা হতে ধূমপান করলে রক্ত ব্যক্তি শ্রিত হয়। মাথা পরিষ্কারের জন্ত অল্পশ শলা তৈরী করতে হয়। জ্ঞান, আহ্বান, বহি, হাঁচি, মুখ-ধোয়া, নস্ত নেওয়া, চোখে কাজল দেওয়া ও ঘুবেয় পর ধূমপান কর্তব্য। কারণ তখন বাতজ্জেরা বেরিয়ে আসতে চায়। নানারূপ গন্ধ দ্রব্যাদি সহ তৈল পাক করে তা দিয়ে নস্ত নিলে জ্বিগোব কমে, ইজিরের বল বাড়ে, মাথার অনেক রকম রোগ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কটু, তিক্ত বা কষার রসবিশিষ্ট কোন গাছের ডাল দিয়ে দাঁত দিয়ে তার অর্ধভাগ চিবিয়ে নেবে—তা দিয়ে এরূপে দন্ত ঘর্ষণ করবে যেন দন্তের মাড়ীতে আঘাত না লাগে। একবার সকালে, একবার সন্ধ্যায়—দিনে দু'বার দাঁত মাজবে। এ কাজে করঞ্জ, করবী, আকল, হালতী, অর্জুন, ও অসন গাছের ডাল ভাল। সোনা, রূপা, তামা, সীসা ? বা পীতল দিয়ে জিবছোলা পড়াবে। জায়কল, লতাকছবীর কল, সুপারী, লবঙ্গ, পান, কপূর, ছোট

মাথার তেল দিলে মাথাধরা, টাক, অকালপকতা, চুলগঠা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। চুল কাল হয়—ভাল ঘুঘু হয়। গায়ে তেল মাখলে শরীর শ্রিত ও তাজা থাকে।

জ্ঞানে শরীর পরিষ্কার করে, আবু বাড়ায়। বাল্য ও পুরনা পড়লে মনোব আনন্দ ও আবু বাড়বে। জল ও মাটি দিয়ে দুই পা ও মলবার খুলে মেখা বাড়ে, দেহ-মন পরিষ্কার হয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। চুল, দাড়ি ও নখ কাটলে এবং তাদের পরিষ্কার মাখলে গুটি, আবু ও মনোব পরিষ্কার বৃদ্ধি পায়। জুতা ও ছাতা ব্যবহার করলে পথ চলতে স্রুণ হয় এবং বল বাড়ে।

৬

অন্তঃপর চরক-সংহিতা শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত—এই ছয় ঋতুতে—কখন কি ভাবে থাকতে হবে যুক্তিসহ তার নির্দেশ দিয়েছেন। অতি সংক্ষেপে তার বিবরণ দিচ্ছি—

(ক) শীতকালে শরীরের পাচকায়িত্ব ভিতরই থেকে যায়। তাই তখন গুরুপাক দ্রব্য হজম হয়। তখন কাছিম, গো-পর্দভাদির মাংস শিককার্য করে থাকে। খাবার পর মধু ও মদ খাবে। যে ব্যক্তি শীতকালে ঘি, দুধ, গুড়, বসা, তৈল ও নুতন চাউলের ভাত ও পুরা জল খায় তাহ আবু ক্ষয় হয় না। কাছিম ও মহিষাদি মাংস ককর্য হলেও মহা অনিষ্টকর বাতবিকার নিবারণার্থ শীতকালে সেবা। শীতকালে রাজে অগুরু-চন্দন-চর্চিতাকী জ্বীকে যথেষ্ট উপভোগ করবে, দিনে নিজ্ঞা খাবে।

(খ) হেমন্তকালে গায়ে তেল ও হরিজ্ঞা মেখে, মাথার তেল দিয়ে স্নান করবে, গায়ে একটু ঘোদ লাগাবে, চারদিকে বায় ঘর আছে এমন ঠাণ্ডা ঘরে মোটা কবাসে থাকবে, গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র পরিবে। এই ঋতুতে অজ্ঞাহারে থাকবে না, বায়ুজনক এবং জল বা হুখে ভিজিয়ে ছাড়ু খাবে না।

(গ) হেমন্তকালের সঞ্চিত জৈয়াদি বসন্তকালে নানা পীড়া নিয়ে আসে। স্নাতবাং তখন জৈয়াদি নানা রকম কাজ করবে। হুশ্যাচা কিছু খাবে না, দিনে দু'খাবে না। ব্যায়াম করবে, গায়ে আমলকী ও হরিজ্ঞা বেটে মাখবে, চোখে কাজল দেবে এবং স্রুথোক জলে স্নান করবে। যবেয় ছাতু, শরত মুগ, ধবগোস, হরিণ, লাভ ও চাতকপক্ষীর মাংস হিতকর। বসন্তকালে নবকিশলয়-সুহৃদ-সুহৃদভিত্ত-কানন ও সুবতী কামিনী উপভোগ করবে।

(ঘ) গ্রীষ্মকালে বিনি ঠাণ্ডা জলে মেখে ছাতু, অজলমুগ ও পক্ষীর মাংস, ঘি, দুধ ও শালিধানের ভাত খান তিনি অবসন্ন হন না। এই সময় মদ খাওয়া ভাল নয়—নিভাত ছাড়তে না পারলে জল মিশিয়ে খাবে। জ্বী-সঙ্গর করবে না।

(ঙ) বর্ষাকালে জলে-গোলা ছাতু, দিবা-নিজ্ঞা, শিশির, নদীর জল, ব্যায়াম, যৌত্র বর্জন করবে। পানীয় ও তোজা, ঘি, মশলা ও মধু মিশিয়ে খাবে। পাত্ত হার্জনা ও জ্ঞান করে যৌত্র পাত্তলা কাপড় পরে শুক স্থানে বাস করবে।

প্রথম পূর্ব্যতাপে সেই ভগ্ন হওয়ার পিত প্রকৃতি হয়। তাই তার উপশব্দেব লভ লবু শীতল তিক্ত ও মধুর অরপান উপবৃত্ত যাত্রার বেঁকে হয়। তখন বলা, তেল, কাছির ও মহিষাদির বাস থাকে না। তখন জান খুব উপকারী। শরৎকালে ফুলের মালা ও নির্মল কাপড় পরে সন্ধ্যাকালে চাঁদের আলো ভোগ করলে আয়ুস হিত হয়।

৭

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মল, মূত্র, শুক্র, বায়ু, বহি, হাঁচি, উল্লাস, জ্ঞান, ক্ষুধা, পিপাসা, অজ্ঞ, নিদ্রা ও অযত্ননিত নিবাসের বেগ ধারণ করবে না। কোনটিতে কি দোষ হয় চমক তার বিবৃত্ত বিবরণ দিয়েছেন।

কিন্তু বেগ ধারণ করা কর্তব্য—লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, ঘেব, মান, পরিশ্রম, নিরাজ্ঞতা, অভ্যাসক্তি ও পদধন-বিষয়ক স্পৃহা। অতিরিক্তও কিছু করবে না, যেমন—ব্যায়াম, হান্ত, বক্তৃতা, কথাবার্তা, বেড়ান, স্ত্রী-সঙ্গম ও যাত্রা-জাগরণ।

হেমন্তের সঞ্চিত জন্মা চৈত্র মাসে, গ্রীষ্ম-সঞ্চিত বায়ু জ্যৈষ্ঠ মাসে ও বর্ষ-সঞ্চিত পিত অগ্রহারণ মাসে—বসন্ত-বিরেচনা দ্বারা ঘূর করবে। কি কি ঔষধাদি দ্বারা এ সব হবে তার বিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন।

৮

বাদের আচরণ, বচন ও মন পাণাধিত ও বাবা বল ও কলহ-প্রিয়, বাবা উপহাস দ্বারা মর্মে বাধা দেয়, লুভ, পরজীকাতর, শঠ, পরের অপবাদ ঘটায়, চঞ্চলমতি, রিপুসেবী, নির্দয়, ধর্মহীন সেই নরাধমের সহবাস ছেড়ে দেবে। যাঁরা বুদ্ধি-বিজ্ঞানবর, সংস্কার, বৈরাগ্য, শ্রুতি ও সমাধি দ্বারা উন্নত, যাঁরা বুদ্ধদের সেবা করেন, বস্ত্রভক্ষ্য, শোকে অবসন্ন নন, যাঁরা সকলের প্রতি প্রসন্নবদন, যাঁরা প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মচারী, সংশয়ের উপদেষ্টা, পুণ্যকথা শুনে ভালবাসেন, পুণ্য মর্শনে অভিলাষী, সর্বদা তাঁদের সহবাস করবে।

এ সব পড়লে মনে হবে, এটি কি চিকিৎসাশাস্ত্রের বই নয়? এ কি ধর্মশিক্ষার বই? চমিক্ত ভাল লাগলে দ্বাদশ ভাল থাকবে, যোগীর সংখ্যা বেশী হবে না, খাবিরা ভাবতেন। এখনকার চিকিৎসা-শাস্ত্র এ দিক দিয়ে বড় যায় না। তাই দিন দিন রোগ ও রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এত বেড়েছে ও আরও বাড়ছে যে, এত চমকপ্রদ আধুনিক ঔষধাদি ব্যবহার করেও রোগীর সংখ্যা কমান যাচ্ছে না। তাই দিন দিন আরও বেশী সংখ্যক মানুষের হৃৎক বেড়েছে।

৯

চমক সংহিতা আরও অনুসরণ করছি—

প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে জ্ঞান, আচমন ও উপাসনা করলে, পরিচ্ছন্ন থাকবে; এক পক্ষের মধ্যে তিনবার চুল দাড়ি কাষাবে ও নখ কাটবে। ছেড়া কাপড় পরবে না, নিত দালা গলার ঘেবে, স্নান

বেশত্বা করবে। নীন-দরিদ্রদের দান করবে, পরম অপহরণ করবে না।

বালিস ছাড়া শোবে না। পাপাচরণশীল স্ত্রী, মিত্র ও ভৃত্যকে পরিত্যাগ করবে। নীচ লোকের উপাসনা করবে না, উত্তম ব্যক্তির বিবোদী হবে না। জ্ঞান না করে, কাপড় না ছেড়ে, খুব না খুয়ে, উত্তম মুখে বসে থাকবে না।

স্ত্রীকে অবজ্ঞা করবে না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করবে না এবং কোন গুহ কথাও শোনাবে না। তাঁকে সর্কেদর্শী করবে না। অধীর হবে না, উদ্ভতমনাও হবে না। পেশাপরিপালক হবে।

শোকের বশীভূত হবে না। অভিষ্টকারীর সিদ্ধিতে অতি হর্ষ এবং অসিদ্ধিতে অতি বিষাদ প্রদর্শন করবে না। শুচি হয়ে হোর করবে। তৎপর নিয়মিত বাক্যে নিজেকে আশীর্বাদ করবে—অগ্নি যেন আমার শরীর হতে না যান। বায়ু প্রাণ, বিজ্ঞ বল, ইন্দ্র বীরা ও জল কলাপ আমার দেহে প্রতিষ্ঠিত করুন।

১০

ভিষক, দ্রব্য, পরিচারক ও যোগী—এই চারের সহযোগ কার্যকরী হলে তবে রোগ সাধে। যাক্ষদিপের বৈষম্য হ'ল রোগ, আর সমতা হলে আরোগ্য—তারই অপর নাম প্রকৃতি।

বৈভের চাই শাস্ত্রে নির্মল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চিকিৎসার দক্ষতা ও আত্মপরিভ্রতা।

দ্রব্য চাই প্রচুর ও শুণ্যবিশিষ্ট। পরিচারকেরও শুণ্য চাই—যেন নানা পথ্যাদি তৈরি করতে জানেন, রোগীকে আহার দিতে পারেন এবং তার প্রতি অত্যাচারী হন। যোগী যেন পূর্বে কথা শ্রবণ করতে পারেন, বৈভের কথা শোনে, যোগে ভীত না হন এবং নিজের রোগ বৈভকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, রোগ-চিকিৎসার বৈভই প্রধান। বৈভ যদি সূচিকিৎসক না হন তবে দ্রব্য, পরিচারক ও যোগী কেউই কোন কাজে লাগবে না।

যোগের হেতু, লক্ষণ, প্রশমনের উপায় এবং যাতে পুনরাক্রমণ না হয়—এই সব বিষয় যার জ্ঞান আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈভ। কিন্তু সেই বৈভের প্রকৃতি যদি দুট হয় তবে সব শাস্ত্রই বুঝা। সুতরাং সৎগুরু উপাসনা দ্বারা আত্মকর্ষনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বুদ্ধিকে যাক্ষিত করতে হবে।

বিজ্ঞা, বিতর্ক, বিজ্ঞান, শ্রুতি, তৎপরতা, ক্রিয়া, এই ছয়টি শুণ্য যার আছে, তাঁর চিকিৎসার সাধাব্যাদি কখনও অসাধ্য হয় না। বিজ্ঞা, যতি, কর্মকৃষ্টি, অভ্যাস, সিদ্ধি ও সদগুরু আশীর্বাদ যিনি পেয়েছেন তিনিই বথার্থ বৈভপদবাচ্য হয়ে থাকেন। আর্ন্ত ব্যক্তি-দিপের প্রতি মিত্রভাব ও কাক্ষা, সাধারোগের চিকিৎসার আরম্ভ এবং আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিদিপের চিকিৎসার তার বহন না করা—এ সকল হ'ল বৈভবৃত্তি।

১১

প্রতি স্নহ পুরুষের তিনটি বাসনা থাকে চাই। প্রাণ, ধন ও পরলোকের সুখশান্তি। প্রাণ ভাগে সব যায়, সুতরাং স্নহ জীবন চাই-ই। ধনহীন ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন গুরুতর পাপ। সুতরাং ধনোপার্জননের বিশেষ চেষ্টা করবে। পরলোক আছে কি না, অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রত্যেক প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও এই সন্দেহ পরিহার যে কর্তব্য, তা বিতুষ্টভাবে চরক আলোচনা করেছেন এবং পরলোক ও পুনর্জন্মের কালে স্নহী হবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন—গুরুজনের সেবা, পড়াশুনা, ব্রতচর্চা, বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, কৃত্যপালন, অতিথিসেবা, দান ও তপস্বীত্ব করবে।

১২

ভিতরক ভিতর রকম। চরিত্র, সিদ্ধসাহিত্য ও বৈদগ্ধবৃত্ত। বৈদগ্ধ নর অথচ বৈদগ্ধ ভেক ধরে বেড়ায়, তারা ছদ্মচর; সিদ্ধসাহিত্য ভিতরকরা স্বর্গ, তারা স্ত্রী, যশ, জ্ঞান ও কার্যসিদ্ধি প্রকৃতিতে গুণ-পূর্ণ। তাঁরাই বৈদগ্ধবৃত্ত বারা ঐবধ প্ররোপে, শাস্ত্রজ্ঞানে ও লোকব্যবহারে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আরোপ্যপ্রাণ।

১৩

এর পর চরক ক্রমশঃ শরীরের নানা অবাহিত অবস্থার আলোচনা করে তার উপশমের উপায় বর্ণনা করেছেন। এই ভাবে আলোচনা করে করে অনেক পরে ঐবধ দ্বারা চিকিৎসায় অব্যাহত উপনীত হয়ে-

ছেন। এ সব এই প্রবন্ধের উপজীব্য নয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হ'ল, পাঠকের সঙ্গে চরক সংহিতায় কিছু পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

'ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ'—এই আদর্শে যাতে মানুষ মঙ্গলজনক জীবন-বাশন করে, চরকের তাই অভিপ্রায়। তাই যোগ চিকিৎসায় চাইতে এই আনুর্কেন্দ শাস্ত্র যন ও শরীরকে স্নহ ও নির্মল দ্বাধার জন্য বৃত্তিপূর্ণ উপদেশই বেশী।

কিন্তু আজ-কালকার মানুষে নিয়ত কর্মবাস্ত—তাই এখন চরকের অনেক উপদেশ পালন করা সহজ হবে না—তবু চরকের উদ্দেশ্য যদি জানা থাকে এবং তা ভাল লাগে তবে প্রয়োজনানুসারে মানুষ তার সারতত্ত্ব অনুসরণ করতে পারবেন।

১৪

আনুর্কেন্দশাস্ত্র প্রাচীনকালে যেখানে ছিল, আজ আর সেখানে নেই। দিন দিন কবিবাক্যেরা (তাঁদের মধ্যে অনেকে আধুনিক ডাক্তারী পাশ) আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ঐবধ নিজেদের শাস্ত্র ও চিকিৎসায় কুক্ষিপত করে বর্তমান আনুর্কেন্দশাস্ত্রকে অধিকতর উপযোগী করে তুলেছেন।

তবু কেমন করে মানুষ স্নহর জীবন-বাশন করবে তাই তাঁদের চিরদিনের ধ্যান ছিল, এখনও তাই আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এদিকে আগে তত মনোযোগী ছিল না। এখন সেদিকে তারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

## মুহূর্ত

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

সেহিন ভখনো সন্ধ্যা নামেনি পেরুয়া নদীর কূলে,  
তোমার তরণী তেড়েনি আমার বালুকা-ছড়ানো তীরে,  
আমি বসে শুধু চেউ শুণে শুণে বারবার গেছি তূলে,  
বারবার শুধু আনমনা হই, শুধু চাই কিরে কিরে।  
হয়ত তেবেছি অনেক কথাই, গেয়েছি অনেক গান,  
সেহিন ভখনো আমার সে বেলা হয়নিক' অবসান।

হিনের ক্লাস্ত পাখীরা চলেছে ডানা ছুইটিয়ে টানি'  
ওপায়ের মেয়ে জল নিয়ে যায় এপারের কথা জানি।  
কারা ঘরে কেবে, কারা কেবে নাকো—দাঁড়ার পথের ধাঁকে,  
বাঁধাবর কোন পথিকের হিয়া কি জানি সে কাবে ডাকে।  
সে ডাক আমারে করে উন্মনা তোমায়েও ডেকে আনে,  
সেহিনের সেই সন্ধ্যার নদী সেই কাহিনীটি জানে।

আকাশ বেধেছে গোবুলি-ধূসর সেহিনের কণটিরে  
বে-কণে তোমার তরণী ভিড়িল আমার এ-বেলা তীরে।

## শিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী

শ্রীগৌতম সেন

আজ এই প্রচােরের যুগে গুণাগুণের বিচার করা কঠিন। তাই এমনও দেখা গিয়াছে, অনেক গুণিজন অপরিচয়ের অন্ধকারেই রহিয়া গেলেন—প্রকাশের সুযোগই পাইলেন না। শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরীর নাম তেমনি প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। যতটা খ্যাতি তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল তাহা পাইলেন কোথায়? চিত্রনিভা জাত-শিল্পী। সূক্ষ্মের পূজারি, সূক্ষ্মের সাধনাই তিনি সারা জীবন করিয়া গেলেন। তাঁহাকে জানিলাম আটল্টি-হাউসে, তাঁহার একক চিত্র-প্রদর্শনীতে। দেখিলাম এ জগতে তিনি সত্যিই একা। জীবনকে প্রত্যক্ষ না করিলে এমন 'স্বপ্ন' শিল্পীর হাতে ধরা দেয় না। তেমনি দেখিলাম, প্রকৃতির কোলে একটি উচ্ছল হুলসী মেয়ে। প্রকৃতির সহিত এতটা অন্তঃসঙ্গতা না থাকিলে প্রকৃতিকে আঁকা যায় না। শ্রীমতী চিত্রনিভার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। জীবন ও প্রকৃতির অন্তঃসঙ্গ দিকটাই তাঁহার চিত্রপটে প্রভাপিত। এই একক প্রদর্শনীতে তাঁহার যে ছবিগুলি দেখিলাম, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের পরিচয়। তাঁহার প্রতিটি কাজ নিখুঁত। জীবনের বিচিত্র ধারা বিচিত্র চরিত্র তাঁহার ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার আলপনা-আঁকা হাত এত সহজে বেলানিয়াত হইতে পারে ইহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। আঁকিবার এই সবল ভঙ্গীটিই মানুষের মনকে এত কাছে টানিয়াছে।

তবে চিত্রনিভা এক হিসাবে ভাগ্যবতী, তিনি শান্তি-নিকেতনে থাকিবার সুযোগ পাইয়া কবিশুদ্ধ স্নেহ ও আশীর্বাদ পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল তাঁহার মাতামহের কাছে জিয়াগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ) কাটিয়াছে। তখন হইতেই দেখা বাইত, অল্প বালক-বালিকার সহিত তাঁহার প্রকৃতি যত্ন। অন্তরে খেলা ভালবাসিত, খেলা লইয়াই থাকিত—চিত্রনিভার মন পড়িয়া থাকিত গঙ্গাতীরে। এই গঙ্গার ধারটি তাঁহার এত মনোরম মনে হইত যে যখন-তখনই তিনি আশিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। যেন সাধক আশিয়া বসিয়াছেন সাধনার পীঠক্ষেত্রে।

এই বালককালেই তাঁহার বিভিন্ন বেশ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। পিতা ছিলেন গোমোর (মানজুর) চিকিৎসক।

এই গোমোর আশিয়া তিনি প্রকৃতির নূতন রূপ দেখিলেন। পাহাড় দেখিয়া তিনি বিষয়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। সারাদিন মছরা বনে কাটাইতে কি অপূর্বই না লাগিত। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে গোমোর পরিত্যাগ করিতে



হেমলতা ঠাকুর

হইল। ইহার পর তাঁহাকে কিছুদিন কাটাইতে হইয়াছে পৈতৃকভূমি চাঁদপুরে (ত্রিপুরা)। এ বাড়ীটিও ছিল মেঘনা নদীর তীরে। মেঘনা দেখিয়া তাঁহার নূতন করিয়া গঙ্গার কথা মনে পড়িল। গঙ্গাই যেন ফিরিয়া আশিয়াছে মেঘনার রূপ ধরিয়া। মেঘনা ছিল পাগলা নদী। কিন্তু প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যে শিল্পী-মন উতলা হইয়া উঠিল। এই নানা রংকে শিল্পী তুলির আধারে ধরিয়া রাখিলেন। বিবাহের পর তিনি গেলেন লামচর নোয়াখালিতে। স্বামীর উৎসাহে তিনি আবার নূতন করিয়া অম্লপ্রেরণা লাভ করিলেন। এই সময় তাঁহার শান্তিনিকেতনে আসিবার সৌভাগ্য হয়।



এই পরিবেশই তিনি চাহিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের স্বল্প তাঁহার আবাস্য ছিল। শান্তিনিকেতনে গঙ্গা-মেঘনা ছিল না বটে, কিন্তু তেল মনোরম পরিবেশ, সঙ্গীতের স্বতোৎসবিত আনন্দ-নিবারণ।



জ্যোৎস্না প্রাণিত মাঠ

প্রথম জীবনে গঙ্গা ও মেঘনার আত্মীয়তার পবে এই অসুখদগ্ধ তাঁহার জীবনকে নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিল। প্রকৃতি যেন শান্তিনিকেতনে বিশেষ করিয়া ধরা দিয়াছে। এই বিশেষ রূপটিই তিনি তুলির টানে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ছবির পব ছবি—যেন ছবির মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন। এ যেন আবিষ্কার। শান্তিনিকেতনকে এমন করিয়া আর কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কলাভবনে পাঁচ বৎসর শিক্ষা করিয়া চিত্রনিভা নোয়া-

খালিতে স্বামীর কাছে কিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কিরিয়া আসিলেও শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহার বাব বাব ভাক আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নুতন পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার নির্দেশে প্রায়োগিকতার বিবিধ দিক তিনি চিত্রে রূপায়িত করিয়াছেন। ছবি আঁকা ছাড়াও শান্তিনিকেতনের চাকু-শিল্পেও তাঁহার হান কম নয়। তাঁহার জীবনে সর্ব-পেক্ষা স্বর্গীয় দিন হইল যেদিন তিনি রাজবাটে গান্ধী-মণ্ডপে ‘আলপনা’ আঁকিবার জন্ত আমন্ত্রিত হন। এই ‘আলপনা’ আঁকিতে তিনি প্রাণ-মন যেন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চিত্র-জীবন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, ধন্ত হইয়াছে।

চিত্রনিভার ‘পেনসিল স্কেচ’ও ‘লুও অপুর’। বহু মনীষীর ছবি এই পেনসিলের রেখায় তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। এদিক দিয়া এই ছবিগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এরূপ দুইখানি স্কেচ আমার ‘প্রবাসী’তে প্রকাশ করিয়াছি। আমার এবারেও তাঁহার চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একখানি উৎকৃষ্ট পেনসিল-স্কেচ এবং একখানি বড়ান চিত্রের প্রতিলপি প্রকাশ করিলাম।

‘শান্তিনিকেতন আশ্রমিক পত্র’—এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া সত্যই শিল্পীকে সম্মানিত করিলেন এবং দেশবাসীও তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিল। শিল্পীর নিকট আমরা বহু কিছু আশা করি। কারণ তাঁহার দেবার এখনও অনেক আছে।

## একদিন

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখনো চাইনি ঐ চোখে।

চলতে-কিরতে দেখা,

তবুও নিচু ষাড়

ছিল যেমন—তেমনি

বেখেছি চোখ।

ভুলেও আকাশ দেখিনি

—ঐ চোখে।

কোটে ফুল—গোলাপ, টগর, হালছুরানা

—বহুবাহার

দেখিনি—ফুল দেখি না—

মীল আকাশ।

দেখি—বড়

ভানভান্ডা পাবি,

নদী—মাতাল, উথালপাথাল,

স্তম্ভ—কান্না

একটানা দীর্ঘশ্বাস

আর হাপবেদ শব্দ।

তবু

হঠাৎ একদিন—

(প্রায়ই দাঁড়ায়—অ’লও দাঁড়িয়েছিল পাশে

সে দাঁড়িয়েছিল আলুগালু কেশ)

আচমকা চেয়েছিলুম চোখে—ঐ চোখে

যে-চোখে তখন

ক’কোটা অক্ষ

মুক্তার মত কাঁপতে।

আকাশও দেখেছিলুম—

সেদিন ঘোমটা-খোল টাফ।

# পাতাগায়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

“প্রবাসী”র পাঠক-পাঠিকারা জানেন যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দ) বাটীর প্রাক্ষেপে সঙ্ঘার সময়, প্রস্তুত হুগলীর সমুদ্র নবেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) অন্তর্গত আটজন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসধর্মগ্রহণের চেষ্টা করতেন। এই পবিত্র দিনটো অগোচরে গত করেক বৎসর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর, আঁটপুরে উক্ত স্থানে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। বাবুরাম ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাস্ত্রীরাম ঘোষ কর্তৃক সঙ্ঘগ্রহণের স্থানটিতে একটি প্রস্তরকলক স্থাপিত হইয়াছে। বেলুড়মঠের একজন মহারাজ এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন; এবং এই উৎসবে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এই বৎসরও ২৪শে ডিসেম্বর ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এবং “উৎসব” সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দজী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। এই বৎসরের উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল এবং বহুজনের সমাগম হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে আঁটপুরে আশিয়াছি। কিন্তু এখানে আশিয়া কি দেখিলাম?

এ অঞ্চলে ধানের কল মাঝামাঝি রকমের হইয়াছে। গত দুই বৎসরের তুলনায় ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু এই ভালোর কোনও অর্থ নাই। যাহাদের জমি একটু বেশী আছে তাঁহারা উপকৃত হইতে পাবেন, যাহাদের জমি অল্প তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে না। যাহারা ভূমি-হীন শ্রমিক তাঁহাদের হৃৎকণ্ঠে ঘুচিবে না। নতুন ধানের দাম ১৩।১৪ টাকা মণ, নতুন চাউলের দাম ২২।২৩ টাকা মণ। শ্রমিকের দৈনিক মজুরী এক টাকা চারি আনার মধ্যে; অর্থাৎ মোটামুটি দুই শের চাউলের মূল্য। ইহা হইতেই অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতির ব্যবসায় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। সুতরাং পল্লী-অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। একটি পরিবারের হিসাব দিতেছি:

একটি কৃষক-পরিবারের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দিলাম:

(১) কৃষকের নাম: নরুড়চন্দ্র সঁাতরা, গ্রাম ও পোঃ আঃ আঁটপুর, জেলা হুগলী।

(২) পরিবারের সংখ্যা: পূর্ণবয়স্ক সাত জন, অল্প-বয়স্ক একজন। মোট আট জন।

(৩) ভাগ্যচেষ্টার জমির পরিমাণ: ১৩।১৪ বিঘা। বেশীর ভাগ জমিতে কেবল ধান চাষ হয়। ২।৩ বিঘা জমি পাট ও আলু চাষের যোগ্য। মোটামুটি দেড় বিঘা মণ ধান, অর্থাৎ কুড়ি মণ চাউল পাইতে পারে। তাহার দৈনিক খরচ ভাত ও মুড়িতে প্রায় পাঁচ শের চাউল। সুতরাং মাসিক প্রয়োজন প্রায় চারি মণ চাউল। কুড়ি মণ চাউলে তাহার বৎসরে পাঁচ মাসের মাত্র খোরাকী হয়। অবশিষ্ট সাত মাসের খোরাকের চাউল এবং জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জব্যের সংস্থান অল্পপরিমাণ জমি হইতে উৎপন্ন পাট, আলু ও তরিতরকারী বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে করিতে হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা সাত মাসের খোরাক, অর্থাৎ আট মণ চাউল, মোটামুটি  $২৮ \times ২০ = ৫৬০$  টাকা পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জব্য (ডাউল, তৈল, মসলা প্রভৃতি), লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি আছে। সুতরাং, এইরূপ পরিবার কি ভাবে দিনাতিপাত করিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পরিসংখ্যানের কোনও প্রয়োজন হয় না। পল্লী-অঞ্চলে নরুড়ের সংখ্যাই অধিক।

গত দুই বৎসর অকল্যাণে অল্প প্রায় প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া আছে। ধানের কল বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে।

সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জব্যের মূল্য এইরূপ:

নতুন চাউল	৪।০ আনা শের
ময়ূর ডাউল	৫।০
মুগ ডাউল	১।৫০
ছোলা	৪।০
সঃ তৈল	২।০
নাঃ তৈল	৩।০
সুত (সাধারণ)	৬।০
বনস্পতি	২।০
চিনি	১।০
শুড় (বেশী)	৪।০
শুড় (ভেলী)	৪।০

আলু	১০	”
বেগুন	১০/০	”
মাছ	২১০	”
মুলা	৭/০	”
পালং শাক	৭/০	”
সীম	১০	”
পেঁয়াজ	১০/০	”
কুল ককি ১ট	১০-১০/০	”
সুপারি	৬	”
চিঁড়া	১	”
নুতন ধান	১৪	মণ
কয়লা	২	”

শ্রীতকালীন সব পশুই এখন মাঠে; আলু, ককি, বিলাতী বেগুন, অস্ত্রাক্ত শাকসব্জী প্রভৃতি ধুবই “নাবী” হইবে। স্থানীয় ফসল এখনও বাজারে আসে নাই। শেষ পর্যন্ত এই সকল ফসলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সঠিকভাবে এখনও বলা যাইবে না। তবে সেচের অভাব হইবে না। এ অঞ্চলে রবিশস্ত্রের চাষ সাধারণতঃই কম।

খেজুর গুড় স্থানীয় অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিত। কিন্তু বর্তমানে দেখিতেছি, খেজুর গুড়ের উৎপাদন নাই বলিলেই চলে। আমার অঞ্চলে কেহই গাছ “কাটে” নাই। এইরূপ অনেক পুরাতন শিল্পের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশে বাঁশ নাই বলিলেই চলে। এমনকি ইহার ফলে সুতদেহ সংকাবেব অতিশয় অনুবিধ ঘটিয়াছে। ছাড়া গোব্বা বাছুরের আক্রমণ নিবারণের জন্য, শাকসব্জীর বাগানে বেড়া দিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশও পাওয়া যাইতেছে না।

চারিদিকেই দারিদ্র্য পরিদৃষ্ট। হাক্কণ শীত, বলিতে গেলে কাহারও গাছাবরণ নাই। একদা সমৃদ্ধ পরিবারের লোকেরা যেরূপ শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতেছে দেখিলে বিশ্বাস হয় না। পরিধানের বস্ত্র নাই; গাছবস্ত্র কোথা হইতে জুটিবে। এইরূপ অনেক অভাবের উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে ভরসার কথা এই যে, ম্যালেরিয়া এবং অস্ত্রাক্ত ব্যাধির প্রকোপ নাই। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, সকলেই স্বাস্থ্য জীর্ণীর্ণ।

শিক্ষাসঙ্কট এখনও চলিতেছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত-

ভাবে লিখিয়াছি। স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আগের মতই আছে। সুতরাং স্কুলের সম্পাদক হইয়াও বলিতেছি, ইহার ফলে ছেলেদের লেখাপড়া সঠিকভাবে হইতেছে না। কংগ্রেস বা অন্য কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক কার্যের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। খগড়া, বিবাহ, হলদলি প্রভৃতিতে গ্রামাঞ্চল ক্ষতবিক্ষত; নেতৃত্বের চরম অভাব। সকলেই নেতা।

এই পর্যন্ত লিখিবার পর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এলাহাবাদের খাগা নামক গ্রামে, লক্ষাধিক কিশোরদের এক সমাগমে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পড়িলাম। তিনি বলিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, যখন তিনি দেখেন গ্রামের বালক-বালিকারা খাত্ত, বস্ত্র ও শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, আজিকার শিশুদাই আগামীকালের নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিবে। সুতরাং তাহাদের সুস্থ-ভাবে গড়িয়া তোলাই দেশের প্রধান সমস্যা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই কথার সহিত কাহারও মতবৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভাবে কোনও পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। রাষ্ট্র এবং সমাজ এ সম্বন্ধে যেন মোটামুটি উদাসীন। অবশ্য বিকল্পভাবে “ছিটেকোটা” কাজ হইতেছে। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত নিবেদন, তিনি তাঁহার কথা কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি সূচী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন।

শ্রীজহরলাল নেহরু আরও একটি খাটি সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “কৃষকেরা আত্মনির্ভর হইয়াছে। কিন্তু সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য যে সকল পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহাদের কার্যে শৈথিল্য ও নির্ভর্য অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি অত্যন্ত মনোবেহনা অনুভব করেন। তাহারা আপিসের কাইলাহি কাগজপত্র “হুহু” রাখিতে অত্যন্ত ব্যস্ত; এবং তাহারা মনে করেন, কৃষকদিগের উপর প্রভুত্ব করাই যেন তাহাদের প্রধান কার্য।” নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, প্রধানমন্ত্রীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রধানমন্ত্রী এ কথা পূর্বে বহুবার বলাগিয়াছেন; কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান কি?

## ধলভূম

### শ্রীপ্রবন্ধনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিহারে সিংভূম জিলার ধলভূম একটি মহকুমা। ধলভূমের আয়তন ১,১৬০ বর্গমাইল। সিংভূমে আরও দুইটি মহকুমা আছে—একটি হইল সিংভূম সদর, অপরাটির নাম সেরাইকেলা। বিহারের অপরাপর অংশের সহিত ধলভূমের সংযোগ হইল উত্তরে মানভূম দিয়া, পশ্চিমে সেরাইকেলা দিয়া আর ঈশ্বর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সিংভূম সদর দিয়া।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এখনকার ভায় পূর্বেও সিংভূম এককভাবে বিহারের একটি সম্পূর্ণ জিলা হইলেও, তাহার দুইটি অঞ্চল সদর এবং ধলভূমের পরস্পরের সহিত বিহারের মধ্য দিয়া সরাসরি কোন সংযোগ পূর্বে ছিল না; মাঝখানে পড়িত সেরাইকেলা এবং তৎসংলগ্ন খংসোয়ান, এই দুইটি দেশীয় রাজ্য। দুইটি অঞ্চল ভৌগোলিক হিসাবে একেবারে অসংলগ্ন হইলেও কেবল তাহাদের দুইটিকে লইয়া উত্তররূপে একটি জিলা গঠন করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সেরাইকেলা আর খংসোয়ানকে মিলাইয়া সেরাইকেলা মহকুমা করিয়া বিহারে ঢুকান হইলে তবেই সদর সেরাইকেলা আর ধলভূম পাশাপাশি এই তিন মহকুমা দিয়া সিংভূমের বিধাবিভক্ত আকার বর্তমানে একীভূত করিতে পারা গিয়াছে।

সিংভূম জেলা বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। বর্তমানে বিহারের বিভাগ হইলেও ছোটনাগপুর বরাবরই তাহা ছিল না। ১৯১২ সনে বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া এক পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়,—তৎপূর্বে বর্তমান বিহার রাজ্যের সমগ্র আয়তন বাংলাদেশের সহিত একত্র ছিল। ইংরেজ আমলের সেই বিরাট একত্রিত মিশ্রিত প্রদেশে বিহারের এমন কোন স্বতন্ত্র সংজ্ঞা বা অস্তিত্ব ছিল না বাহার দ্বারা বলা বাইতে পারে যে, তৎকালে ছোটনাগপুর বিহার নামক কোন স্থানের অন্তর্গত ছিল। বরঞ্চ সমগ্র বৃহৎ প্রদেশকে বাংলাদেশ বলিয়াই ধরা হইত—প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হইত লেফটেন্যান্ট গবর্নর অব বেঙ্গল (Lieutenant Governor of Bengal)—বিহার কথাটির উল্লেখ তাহাতে ছিল না। এই হিসাবে ছোটনাগপুরকে তখন বিহারের বিভাগ না বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিভাগ বলা বাইতে পারিত।

১৯১২ সনে পৃথক প্রদেশ গঠিত হইবার পরেও, ইংরেজ আমলে বরাবর—বর্তমানে বাহা বিহার রাজ্য, তাহাকে বিহার ও ছোটনাগপুর নামে অভিহিত করিয়া ছোটনাগপুরের একটি পৃথক সংজ্ঞা ও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ছোটনাগপুর আর বিহারে প্রকৃতপক্ষে এক অথবা অস্তিত্বই

নাই—অনিবার্য ভাবে ছোটনাগপুর বিহারের অংশ নহে—তাহা আসল বিহার নহে।

বর্তমান ছোটনাগপুর বিভাগের পূর্বাঞ্চল মানভূম ও ধলভূমের সহিত বিহারের ঐতিহাসিক সন্ধক আরও ক্ষীণ—১৯১০ সন পর্যন্ত মানভূম ও ধলভূমের আইন-মাদালত বাঁকড়া জেলার এলাকাত্ত ছিল।

সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকাত্তি ধলভূম। উত্তরে তাহার পূর্ব-ভাগ, দক্ষিণে তাহার কক্ষ টিলা বা ক্ষুদ্র গিরিকন্দর খচিত উচ্চভূমি—মাঝখানে দিয়া বাংলা দেশেরই সমতল ভূমি প্রসারিত হইয়া ধলভূমের সমভূমি গঠন করিয়াছে। এই সমভূমি পশ্চিমে অতি দীর্ঘ উন্নত হইয়া ক্রমে ছোটনাগপুর মালভূমি বা Plateauতে মিশিয়া গিয়াছে। ধলভূমে বাহিরে চাইবাসা হইতে এই উচ্চতা বৃদ্ধি উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিয়াছে—দেশভূমিকে তখন আর বাংলাদেশের সমতল বলিয়া আখ্যাত করিবার উপায় নাই।

অক্সফোর্ড প্রাকৃতিক মানচিত্রেও তাই সুবর্ণরেখার দুইকূলে ধলভূম সমভূমিকে, এমনকি আমসেনপুর ছাড়াইয়া সেরাইকেলার এক বৃহৎ অংশকে পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুরের সহিত এক বস্তু চিত্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

অতএব মানভূম ধলভূম লইয়া বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগ আর কেবল হাজারিবাগ, হাটী, পালামৌ লইয়া প্রকৃতি গঠিত ছোটনাগপুর অবিত্যক এক নহে—কুটনীতির স্বার্থে ধলভূম এক্ষণে বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের ভিতর পড়িলেও স্বাভাবিক নিয়মে তাহা ছোটনাগপুর মালভূমির কিংবা অধিত্যকার অন্তর্গত নহে।

ধলভূম প্রকৃতরূপে খনিজ এবং বনসম্পদের অধিকারী। কর্ণা-বোপা জরিও সেখানে সুপ্রচুর—লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি সেখানে অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে—আবাদ করিলেই হয়। স্থানীয় আরহাওরা এবং জলবায়ুও ধলভূমে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

ধলভূমে ঐশ্বর্য্যবিকা প্রধানতঃ চাষ আবাদের উপরেই নির্ভর করে। তাহার পরীক্ষণীয় সম্ভাবনা পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর এবং মানভূম জেলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিহারের পূর্ব সীমান্তবর্তী স্থানগুলির আর্থিক উন্নতির জন্য বিহার গভর্নমেন্ট বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করে নাই—বিশেষতঃ মানভূম ও ধলভূমের ঐশ্বর্য্য অঞ্চল অল্পমত অবস্থান পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ আছে—এই সব জায়গা প্রধানতঃ নদী উপত্যকার দেশ—দেশের শিল্প গঠনের জন্য চাই নদী-নিয়ন্ত্রণ, নদনদীর উপর বিরাট বাধের পরিকল্পনা। ইহা ছাড়া এখানে আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে; এখন স্থানীয় নদী-নিয়ন্ত্রণ ব্যয়সাধ্যও বটে, বৃহৎ স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ না

হইলে এ পরিবর্তন কল্যাণ নহে—আবার ইহাতে বিহারের সমগ্র ভাবে তেমন উপকার নাই—উপকৃত হইবে বিহারের পূর্ব সীমানার অবস্থিত কয়েকটি অঞ্চল মাত্র। আর মুখ্যতঃ উপকৃত হইবে কে ? পশ্চিমবঙ্গ, কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীরই উৎসস্থান বিহারের ভিতরে, কাজেই উৎসস্থলে নদী নিয়ন্ত্রিত হইলে বঙ্গপ্রান্তর, আবার অপর পক্ষে সাময়িক ভালাভাব, এই দুই প্রকার বিপর্যয় হইতেই পশ্চিমবঙ্গ বহুলাংশে বাঁচিয়া যায়। আসল লাভ হইবে পশ্চিমবঙ্গের, এই সম্ভাবনার বিহার গভর্ণমেন্টকে ব্যয়সাধ্য কোন পরিবর্তনায় নাযায় কাহার সাধ্য। কলে উক্ত গভর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়তার হইয়াছে এই যে, সুবর্ণবেলা উপহ্যকার ধলভূম, গ্রাম্য ধলভূম অমূল্যত অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ধলভূমের আদিবাসীরা যে উপভার্য্য কথা বলে, সেই উপভাষাতেই কথা বলে উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের সাধারণ মানুষ।

ধলভূমে বাংলা সাপ ও পঞ্জিকা প্রচলিত এবং পাল-পার্কণ উৎসবাদিও মেদিনীপুর এবং মানভূমে যে বকম হয় অবিকল সেই বকম। ছট, কাণ্ডয়া, রামনবনী, মহাবীর ঝাণ্ডা প্রভৃতি উৎসবের নামগন্ধও এখানে নাই; পরিবর্তে ভূর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, চুতপূজা, হরিনাম-সংকীর্তন, পৌষপার্কণ প্রভৃতি বাংলাদেশের ও বাঙালী সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। পল্লীগীতি, লোকনৃত্য, বাজা, পাঁচালী, কথকতা, বাধাকৃষ্ণের বিবহ ও মিলন লীলা-বিবহক সংকীর্তন সকলই হুবহু বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। লোকাচার এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়া, সামাজিক ব্যবহার এবং সাধারণ জীবনযাত্রার প্রণালীর দিক দিয়া—যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন, ধলভূমে বাঙালী ভাবেই অবিঃবাকী আধিপত্য। বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাদেশের—সেই শব্দধ্বনি আর উল্ধ্বনি মুগ্ধরিত বিবাহ-প্রাঙ্গণ, জ্ঞী-আচার, কুণ্ডিকা—যেমন বাংলাদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহে সচরাচর দেখা যায়—হিন্দুস্থানীদের ভায় ঢোল বাকানব আধিক্য এখানে নাই।

বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের বাড়গ্রাম মহকুমা এবং সারা মানভূমের সহিত ধলভূমবাসিগণের আত্মীয়তা।

আহারে-পরিচ্ছদে, গুচি-মণ্ডি বিচারে সমগ্র ধলভূমবাসীদের মধ্যে বাঙালীরাই অত্যন্ত স্পষ্ট। সে দেশের বন্ধনের বিশেষত্ব—সেখানে পুরুষদের ভিতর ধৃতী পড়ার বকম, সেখানে নারীদের কেশ-বিভাস, শাড়ী পরার প্রণালী, তথায় পরম্পরের মধ্যে অভিমানের কারণ—সবোতেই একটি বিশিষ্ট বাঙালীমানব ছাপ রহিয়াছে। দিবস শেষে গৃহস্থ বধু তুলসীতলায় ধুনা সহকারে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিতেছে এ চিত্র বাংলাদেশের ভায় ধলভূমেরও বৈশিষ্ট্য। তুলসীদাসের রামায়ণের পরিবর্তে সেখানে কৃত্তবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত সমাদৃত। জাতিতে ও বংশে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায়-সংস্কৃতিতে, অশনে-বাসনে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে প্রকৃত বিহারের সহিত ধলভূমের

কোন মিল নাই ত বটেই—সিংড়র সময় হইতেও ধলভূমের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ইহা পূর্বে সহকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। (Notes on languages by Census Superintendent, Census of India, Volume VII on Bihar and Orissa, Page 240 দ্রষ্টব্য) এ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে যে ধলভূম ও সদর লইয়া জেলা গঠন প্রথম হইতেই অস্বাভাবিক হইয়াছিল।

ধলভূমের আদিবাসীরা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা বাঙালীদের সহিত ঢের বেশী ঘনিষ্ঠ; হিন্দী অপেক্ষা বাংলা ভাষাই তাহাদের মৈত্র এবং সহজে আরম্ভ হয়। ননোদী নির্বিশেষে তাহার অজ্ঞাত দিগের সহিত বাংলা ভাষায় কথা বলিতেই অভ্যস্ত। বাংলা ভাষাই তাহাদের অজ্ঞাতম স্বতীয় ভাষা। রাজা পুনর্গঠন কমিশনের নিকট বহন ধলভূমের প্রতিনিধিবর্গ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তখন তাহাদের মধ্যে সাওতালী সমস্তগণ এট কথাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তাহার সাওতালী ভাষার লিখিত পুস্তকাদি বাহির করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে, সকল পুস্তকই বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং সে সমস্ততে টীকা-টীপনী, ব্যাখ্যাও সব বাংলা ভাষায়।

রাজাপুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূম প্রতিনিধিদের দ্বারক-লিপিতে বলা হইয়াছিল যে ধলভূমের আদিবাসীরা বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং পূজা-পার্কণ উৎসবাদির বেশী ভাগ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার সম্পত্তিও উত্তরাধিকার বিষয়ে বাংলা দেশের দায়তাপ আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আদিবাসীগণের ভিতর সাওতাল ও ভূমিজগণ বাংলা ভাষা ও বাঙালীদের চালচলন বহু পরিমাণে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েক বৎসর এই প্রকার চলিলে সাধারণ বাঙালী আর ইহাদের ভিতর বিশেষ কিছু প্রভেদ থাকিবে না।

ধলভূমের আর এক শ্রেণীর আদিবাসী কুম্মী অথবা কুম্মীকজির-দের সম্বন্ধে বহু অস্বাভাবিক এক সংস্কার আছে—তারা তাহাদের মাহাতো পদবী হইতে উদ্ধৃত। ইহারা মনে করেন, যেহেতু তাহারা মাহাতো—তাহারা মূলতঃ হিন্দুস্থানী হইবেই, বাঙালী হইতেই পারে না। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কুম্মী সম্প্রদায় কেবল ধলভূম মানভূম নহে, সারা ভারতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের সংখ্যা অনুান ৫ কোটি। যেমন ব্রাহ্মণ ও কাহ্ন সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করে, সেটরূপ কুম্মীরাও বাঙালী, বিহারী, মারাঠী হইয়াও জাতিতে কুম্মী। বীরভূম, মেদিনীপুর এমনকি বাংলাদেশের একেবারে ভিতরের জেলাগুলিতেও কুম্মীকজির কম নাই। ধলভূমের কুম্মীরা বিহারী কুম্মী নহে। পাটনা, পরা ইত্যাদি স্থানেও কুম্মী মাহাতো আছে—তাহারাই প্রকৃত বিহারী কুম্মী। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাটী, হাজাবাগ প্রভৃতি স্থানের কুম্মী হইতেও ধলভূমের কুম্মীরা স্পষ্টতঃ বহল পরিমাণে ভিন্ন যেমন বাঙালী কার্ব্ব, পাজাবী

কার্য ও বিহারের কার্য লাল কার্য—ইহারা পরস্পরে এক নহে।

বিহারে কিছু গত ১৯৫১ সনের লোক গণনার ফলভূমের কুশী-গণকে কুশী ভাষার কথা কহে, এই কথা অজ্ঞাতে হিন্দীভাষীর পর্যায়ে দেখান হইয়াছে। কুশী ভাষা নাকি অনেকটা হিন্দী ভাষার অনুরূপ এবং কুশী ভাষাভাষীগণ নাকি হিন্দীভাষী বলিয়া পরিগণিত হইতে আগ্রহী নহে। ফলভূমের কুশীগণের সঙ্কে ইত্যাকার ধারণা যে কতদূর অসত্য—অধিক কথা প্রয়োজন নাই—তাহা কুশীসম্প্রদায়ভুক্ত লোকসেবকদের ঐকমত্যে মহাত্মার দিল্লীতে লোকসভার নির্বাচন হইতে বুঝা যায়। ঐকমত্যে মহাত্মা দক্ষিণ মানভূম ও ফলভূম লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাবিধো নির্বাচিত হন, ১৯৫২ সনে, অর্থাৎ ১৯৫১ সনের সেলস গ্রহণের পরে। ইনি বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলা ভাষার জ্ঞান বিহার গভর্ণমেণ্টের অধীনে মানভূম ফলভূমে বাঙালীদের ভাষা অধিকার সাবাস্তব জ্ঞান, বাংলা ট্রান্স গানে মানভূমে বাঙালীর লোকচারণ বজার বাথিয়া তাহার আশ্রিতেনা উদ্ধৃত্ত করিবার জ্ঞান ইহা নির্ণায়ক বরণ ও ত্যাগ স্বীকার সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশের অজ্ঞান হানের জ্ঞান ফলভূমেও ভূমি-বাবহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। ফলভূমে ভূমি-বাবহার বন্দোবস্ত বৈশিষ্ট্য একমাত্র ইহাই নহে। ১৯৩৪ সন হইতে ১৯৩৭ সন অবধি বিহার সরকার ফলভূমে ভূমির পরিমাণ, ভূমি, রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় পাঞ্জনা ইত্যাদি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে এক ব্যাপক ভূমি জরীপ এবং স্বত্ব নিশ্চয় কার্য করা হইয়াছিল। তাহাতে জমির স্বত্বের যে তালিকা ও লিখিত পরিমাণ বিভিন্ন মানচিত্র সরকারে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সমস্তই বাংলা ভাষার বাংলা অক্ষরে লিখিত। ভূমি স্বত্বের আনুপূর্বিক বিবরণ অথবা পরচা ফলভূমে বাংলা ভাষাতেই লিখিত হয়। যে সমস্ত দলিলপত্র সরকারী মগাক্ষেত্রখানার রক্ষিত আছে তাহা সমস্তই বাংলার। ফলভূমে দলিলপত্র সাধারণতঃ বাংলা ভাষাতেই লিখিত হয়; সনদ, পতনী আদি সমস্তই বাংলা ভাষাতে। বন সংরক্ষণের জ্ঞান বিহারে যে আইন আছে, তদনুসারে নোটশ কিংবা বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৮ সন অবধি বাংলা ভাষাতেই হইয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি বিহার সরকার এ বিষয়ে অনেকটা অবহিত এবং তৎপর হইয়াছে এবং বাংলা ভাষার চলন নানাভাবে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলভূমে আদালতে বাংলা ভাষাই ছিল আদালতের ভাষা। ১৯৩৪ সন অবধি বাংলা ভাষার আধিপত্য ছিল সেখানে অবিসংবাদিত—অন্ত ভাষার স্থান সেখানে ছিল না। ১৯৩৪ সনে বিবজ্ঞ হিসাবে হিন্দী ভাষা সেখানে স্থান পাইল, কিন্তু সে বিজ্ঞের ব্যবহার অল্প ক্ষেত্রেই হইত। ১৯৪৮ সন হইতে ঠাণ্ডা জোর করিয়া বিহার সরকার ফলভূমে আদালতের ভাষা হইতে বাংলাকে স্থানচ্যুত করিল—আদালতের কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিষেধ হইয়া গেল। বহু ক্ষেত্রেও কিছু বাংলা ভাষাকে সরকারী কার্যকলাপ হইতে

একেবারে বাদ দিতে পারা যায় নাই—১৯৫১-৫২ সনে একমাত্র জায়সেনপুর বাদে ফলভূম নির্বাচন মণ্ডলীর তালিকা ( Voters list ) সংকার কর্তৃক বাংলা ভাষার প্রকাশিত করিতে হইয়াছে।

বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য ফলভূমে কিছু বেশী দিন থাকিবে কিনা সন্দেহ। বাঙালী-বিষয়ে প্রচারে বিহার সরকারে উৎসাহ দানের অন্ত নাই। রাশি রাশি সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিহারী-দের যথো বঙ্গ ও উড়িষ্যা-বিষয়ে বহুদল করিয়া দিবার জ্ঞান নিয়োজিত হইয়াছে। শত শত দুর্ভাগ্য আছে যে বিহারের কংগ্রেসী সরকার বাঙালীদের প্রতি ভীতিমূলক আদেশ ও নির্দেশ বাহির করিয়াছে, এমন কি গুপ্তাচারী প্রেরণ দিয়াছে। আশঙ্কা হয় যে, বিহার-বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বাকি যে সকল বাঙালী অঞ্চল বিহারে থাকিবে, তাহাদের আর দক্ষা নাই। বিহারীরাই স্বার্থের প্ররোচনায় এবং বিহারের কংগ্রেসী সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের ফলে অসহায় হইয়া বাঙালীদের প্রতি মূর্খ-দেহাতীরা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া সময় সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপ অবধি হস্ত বাদ দিবে না; গুপ্তাচারী অত্যাচারে হতশ হইয়া ক্রমে ক্রমে বাঙালীরা ফলভূমের বাস উঠাইতে বাধ্য হইবে।

একেই ১৯৫১ সনের লোক গণনার অজ্ঞান করিয়া, প্রত্যাবণা করিয়া বিহারের দক্ষিণে ও পূর্বে সীমান্ত অঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহাতে বিহারের সীমান্ত অঞ্চল-গুলি অধিবাসী অধুষিত হইয়াও বিহারে বজার থাকে; তাহার পর অত্যাচার ও অবিচারে ফলভূম হইতে বহু বহু বাঙালী বিহার লয়, তখন সত্যি বিহার সরকারেরও সতীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন বিহারী নেতৃবর্গের মনঃকামনা পূর্ণ হইবে। অন্যরাসে তাহারা পরবর্তী আদমশুমারীতে প্রচার করিয়া দিবে যে ফলভূমে বঙ্গভাষীর সংখ্যা নিতান্তই তুচ্ছ ও অকণিক এবং ইহা ফলে ফলভূম কার্যমী-ভাবে বিহারে বহিরা হইবে। বিহার অঞ্চল প্রদেশান্তর বিল আলোচনার শেষে পণ্ডিত পদ যে স্পষ্টর লোকসভার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিহার হইতে দেশাংশ কর্তন ভাবীকালে আর কখনই করা হইবে না—তাহা ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনার কথা স্বপ্ন করিয়া দিবে কিনা কে জানে।

ইহা প্রায় সর্বজন বিদিত যে বিগত সেলাসে বিহার সরকারের তদ্ব্যবধানে প্রস্তুত বিহার সীমান্তের পরিসংখ্যা গ্রহণযোগ্য বা স্বীকার-যোগ্য নহে। সেলাসের বহু সংখ্যক মিলিত পাটনা সরকারী দপ্তরে হারাইয়াই গেল; তাহাদের পরিবর্তে বিহার সরকার বাহার উপর নির্ভর করিয়াছে তাহা বিহারীদের সুবিধাভ্যাসী কল্পনা, প্রকৃত তথ্য নহে।

অতএব সঠিক বিবরণ অবগত হইবার পক্ষে কেবল ১৯৫১ সনের সেলাস যথেষ্ট নহে; তাহাকে আগেকার সেলাস হইতে আনুত মালমপলা দ্বারা বাচাই করিয়া লওয়া দরকার। পূর্বেকার সেলাস সকলের ভিতর আবার ১৯৪১ সনের সেলাসে ভাষা অনুযায়ী লোক সংখ্যা বিবরণ নাই।



১৯৩১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী ধলভূমে মোট লোক সংখ্যা ছিল ৩,৯৪,৫০৫; মাতৃভাষা বাহাদের বাংলা তাহাদের সংখ্যা ১,৪১,১০৫ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.৭), হিন্দীভাষীর সংখ্যা ৪৯,৬২৪ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৭) এবং আদিবাসীদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৪১,০১০ (অর্থাৎ বাঙালীদের চাইতে ৯৫ জন কম)। আদিবাসীদিগের মধ্যে আবার ৬৪,০১০ ব্যক্তির অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জনের নিজ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা ছিল বাংলা,— ধলভূমের ওড়িয়াদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের অর্থাৎ ১৭,৪৭৭ জনের দ্বিতীয় ভাষা ছিল বাংলা এবং হিন্দীভাষীদের মধ্যেও ধলভূমে ২,৬৯৪ জন তাহাদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা বলিয়া স্বীকার করিয়া ছিল। ধলভূমের বাঙালীদের সংখ্যার সহিত বাংলা বাহাদের দ্বিতীয় ভাষা ছিল তাহাদের সংখ্যা যোগ করিলে বাংলা ভাষা ব্যবহারক্ষম কলকাতা বাঙালীদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইত ২,২৫,৬৯০ অর্থাৎ ধলভূমবাসীগণের মোট সংখ্যার শতকরা অনুপাত ৫৭ জন। আদিবাসীরা খুব কম লোকেই হিন্দী জানিত—সাঁওতাল ও ভূমিজদিগের মধ্যে সব ধরিয়া ১০০ জনও হিন্দী জানিত কি না সন্দেহ; বর্ম সাঁওতাল ও ভূমিজগণের মধ্যে কিছু কম ৭০০০ জনের দ্বিতীয় ভাষা ওড়িয়া ভাষা বলা বাইতে পারিত।

১৯৫১ সনে বিস্তর কোশলে হিসাবে কারচুপি সংঘেও ধলভূমে বাঙালীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,৮৭,৯৮৯ অর্থাৎ মোট লোক সংখ্যার (৬,১০,৫০৪) শতকরা ৩১.৪ জন। হিন্দীভাষীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া দেখান হইয়াছে ১,১৯,৯৭৮; তাহা হইলেও তাহা বড় জোর শতকরা ২০.১ জন। ওড়িয়াদের সংখ্যা হইয়াছে ৬৩,৬৯২—শতকরা ১০.৭। সাঁওতালীরা প্রায় সকলেই বাংলা বলে—তাহাদের সংখ্যা করা হইয়াছে ১,১৯,২৩৫ অর্থাৎ শতকরা ১৯.৯। সাঁওতাল সমেত সকল আদিবাসীদের মোট সংখ্যা ১,৭৬,৯৮২—শতকরা ২৮.৮। (বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "Census of India, 1951, Language Handbook, Singbhum District" ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা অতি স্পষ্ট যে, ধলভূমে বাঙালীর ভাষাভাষীর সংখ্যা বহু অল্প কোন সংখ্যা তত নহে।

ধলভূমের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রসিদ্ধ জামশেদপুর শহর অবস্থিত। জামশেদপুরের বিষয়ে বিহার সরকার সঙ্কলিত পরিসংখ্যান এতই পরম্পর-বিরোধী যে, উহা নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। ১৯৫১ সনের সেলস কার্ডের অঙ্ক হিসাবে বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত দুইটি পরিসংখ্যান পুস্তকে জামশেদপুরের লোকসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি "Census of India, 1951, Language Handbook, Singbhum District" জামশেদপুরে হিন্দীভাষী লোকসংখ্যা দেখান হইয়াছে ৮১,৯১৮, কিন্তু আর একটিতে "Census of India, 1951, District Handbook, Singbhum"—এ গোলামুন্ডী, বৃন্দলাই ও পটকা

এই তিন থানা বাদ দিয়াও জামশেদপুরে সেই হিন্দীভাষী লোকসংখ্যাকেই অনায়াসে দেখান হইয়াছে ৯১,৭৮২ বলিয়া। শেষ-পর্যন্ত কোন সংখ্যা যে বিহার সরকারের মতে অভ্রান্ত, তাহা কেহ জানে না।

এমতাবস্থায় আমরা জামশেদপুর শহরের খাস নাগরিক সমিতির বিবরণই নির্ভরযোগ্য মনে করি। তাহাও ১৯৫১ সেলসের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

Jamshedpur Town Committee Report অনুযায়ী জামশেদপুরের মোট জনসংখ্যা ১,৯৪,৯৯০, তাহার মধ্যে খাটা বাঙালীর সংখ্যা ৫৪,৭৬২।

বাহারা হিন্দীভাষী তাহাদের মধ্যে বিস্তর লোক জামশেদপুরে অস্থায়ী বাসিন্দামাত্র; ইহা ছাড়া তাহারা সকলে যে বিহারী তাহাও নহে, অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি হইতে আসিয়াছে। এই সব কথা না ধরিয়াও সমগ্র হিসাবে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা জামশেদপুরে ৪২,৪২০ তাহার বেশী নহে। হিন্দীভাষীদের ভিতর হইতে খাটা বিহারী হিন্দুস্তানীদের খুলিয়া বাতির করিলে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,২৪০ অর্থাৎ তাহারা জামশেদপুরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮ জন মাত্র (১৯৫১ সেলস অনুযায়ী Jamshedpur Town Committee Report দ্রষ্টব্য)।

জামশেদপুর বাদ দিলে ধলভূমের অবস্থা দেখায় এইরূপ—

মোট জনসংখ্যা	হিন্দীভাষী	বাঙালী	সাঁওতালী	ওড়িয়া
১৯৩১	১২,৯০২	১,৩৩,৩৩৭	৯৬,৫৫৫	৩৫,৮৪৯
সেলস ৩,১০,৮৫৭ (৪.২%)	(৩৯.৭%)	(৩১.৬%)	(১১.৫%)	(১১.৫%)
১৯৫১	৩,৯২,৩৪২	৩৮,০৬০	১,৩৬,৩৯৩	১,১৭,৬৭৪
সেলস ৩,৯২,৩৪২	(৩৪.৮%)	(৩০.৭%)	(১১.৩%)	(১১.৩%)

বিহারের বিগত সেলসে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের যে সংখ্যা নির্ণয় হইয়াছে তাহা অবিহারীগণের দাবি ক্ষুণ্ণ করিবার অল্প একটি অপকোশল মাত্র। সেলসের বাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আমরা যদি কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে সেলসে কারচুপির বহর যে কতখানি সে বিষয়ে কিছু ধারণা হইবে। রাজা পুনর্গঠন সমিতির নিকট পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির স্মারকলিপিতে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

১৯৩১ চইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে

সিংভূমের হিন্দীভাষীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯২৭ হইতে ২,১৫,৭৮৮ অর্থাৎ...	১,২৪,৫১৫
১৯৫১ সনে সিংভূমে সমগ্র জনসংখ্যা ...	১৪,৮০,৮১৬
ইহাদের মধ্যে সিংভূমে বাহাদের অঙ্ক ...	১২,৮৮,৪০৩
বাকি সিংভূমে আগতক ...	১,৯২,৪১৩





প্রবাসী পোদ, কলিকাতা

সদ্য প্রকাশিত

কলিকাতা

(প্রবাসী আঁখন, ১৩৪১ হইতে পুনর্মুদ্রিত)



## বাংলা

বাস, আগন্তুকদের মধ্যে—

বাহার্য বিদেশী, ভারতের

বাহির হইতে আগত ২৬,১৫২

বাহাদেব মাতৃভাষা বাংলা ৩৭,০২৪

বাহাদেব মাতৃভাষা ওড়িয়া ৩১,০৮৩

বাহার্য দাক্ষিণাত্যের লোক ১৩,৭২৮

১,০৮,০৬৪

বাকি

৮৪,৩৪২

এই ৮৪,৩৪২ আগন্তুককে হিন্দীভাষী বলিয়া ধরিলে যে সব হিন্দীভাষী বহাদেব সিংভূমেই ছিল—সিংভূমে অনাগন্তুক হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি এইরূপ দাঁড়ায়—

সিংভূমে হিন্দীভাষীগণ

উপরোক্ত মোট সংখ্যা বৃদ্ধি ১,২৪,৫১৫

বাস আগন্তুক ৮৪,৩৪২

বাকি অনাগন্তুকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ৩৭,০৪৭

অর্থাৎ ১৯৩১ সনে যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা ২১,২৭৩ ছিল, কেবল বংশবৃদ্ধির দ্বারা ২০ বৎসরে শতকরা ৪০'৯ হারে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে এই সমগ্র বিহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২০-এর বেশী নহে। ১৯৫১ সেন্সাসে অনাগন্তুক মানে অবশ্যই যে স্থায়ী বাসিন্দা তাহা নহে; অনাগন্তুক মানে সেন্সাস হিসাবে অনাগন্তুক। ১৯৫১ সনের আগেই আদম-শুমারী ১৯৪১ সনে হইয়াছিল; বাহার্য ১৯৪১ সনের পূর্বে সিংভূমে আসিয়া থাকিয়াছে—১৯৫১ সনে সিংভূমে বাসকালে তাহারাই অনাগন্তুকের পর্যায়ে গণ্য হইয়াছে। বহুসংখ্যক হিন্দী-ভাষী যদিও তাহার্য 'অনাগন্তুক', কেবল উপার্জনের আশায় পরিবারবিস্তার হইয়া অস্থায়ীভাবে সিংভূমে বাস করিতেছে; বৎসর বৎসর তাহার্য নিজ নিজ জন্মস্থানে গমন করে। এতদব্যতীত, বিশেষতঃ বংগ সিংভূমে হিন্দীভাষীদের মধ্যে জ্রীলোকের সংখ্যা তুলনার অতি অল্প, ২০ বৎসরে শতকরা ৪০'৯-এর জায় এত উচ্চ হারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? কাগজে-কলমে কায়দাজী ছাড়া ইহা সম্ভবে না। সিংভূমে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা অসম্ভবরূপে কঁপাইয়া তোলা হইয়াছে—হয়ত মিথ্যা কথিয়া বহু আদিবাসী হিন্দীভাষীরূপে গণিত হইয়াছে, কারণ সিংভূমে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে আবার আদিবাসীর সংখ্যা অস্বাভাবিক নাথিয়া গিয়াছে।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিবার যত—সিংভূম সময়ে বাঙ্গালীর সংখ্যাবৃদ্ধি। বাংলাদেশ কখনও সিংভূমের সমরূপে বাংলাভাষী বলিয়া দাবি করে নাই, অতএব সে স্থানে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা ৬,৪১২ হইতে পাঁচগুণ বাড়িয়া ৩০,২৭০ করিলেও বিহাদের অসুবিধা নাই, কিন্তু ধলভূমকে বাংলাদেশ নিজস্ব বলিয়া দাবি করে কি না—ধলভূমের ঐতিহ্য বাংলাদেশেরই ঐতিহ্য কি না, কাজেই

লোকগণনার ধলভূমে বাঙ্গালীর সংখ্যা বাহাতে বেশী না দেখান হয় এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে, অপর দিকে সিংভূম সমর ও সেরাইকেলার প্রতি উড়িয়ার দাবি গণ্ডনেরও চমৎকার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গিয়াছে; সেই সব স্থানে ওড়িয়া-ভাষী জনসংখ্যা ক্রমশঃই নাকি কমিয়া বাইতেছে!! অসম্ভবতঃ বিহাদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সেন্সাসে সেরাইকেলা আর সময়ে ওড়িয়াভাষীর সংখ্যা যে ভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্যণীয় যাত্রা—তদেগীর কতকগুলি অভিসন্ধিপূর্ণায়ণ সর্কারীচেষ্টা নেতার রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ভাল করিয়াই বাহাতে পূরণ হয়, এমন ভাবে ইহা রচিত হইয়াছে।

বিহাদের ১৯৫১ সনের সেন্সাস ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এমনই অপ-কৌশলজনিত প্রমাণে পরিপূর্ণ যে, সেই আদমশুমারীর বৎসর হইতে ছয় বৎসর পর্যন্ত—রাঙ্গা পুনর্গঠনবিধি এবং বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশাঙ্গরবিধি বলবৎ হইবার পর অসম্ভবতঃ এক বৎসর না অতীত হইলে—বিহার সরকার তাহাদের সেন্সাসের বিবরণীর অংশ বা ধানবাদ বাতিয়েকে পূর্ন সীমান্তবর্তী জেলাগুলির আত্মপূরিক তথ্যার্থ প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই অথবা বিহাদের বাহিরে সাধারণের প্রচারাধর্মে পাঠায় নাই। অথচ ইতিপূর্বে এই সকল ভ্রান্ত অপ্রকাশিত তথ্য রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির সম্মতিক্রমে তাহাদের নিকট উপস্থাপিত এবং তৎপরে তাহাদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু যত অভিসন্ধিমূলকভাবেই বিহার এবং তৎসহিত ধলভূমের পদিসংস্থান রচিত হউক না কেন, বাহা হইয়াছে তাহাদের যথা হইতেও দেখা যায় যে, ধলভূমে একটি প্রধান অংশে বাঙ্গালী-দের সংখ্যাধিকা কেবলমাত্র আশেপাশে নহে, পশ্চিম অনঙ্গ-সাপেক্ষ এবং নিবৃত্ত; সে অংশ আবার বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় ঠিক পাশাপাশিও বটে।

অর্থাৎ ঘাটশীলার ঠিক পূর্বে ধলভূমের যে অংশটি পড়ে—কেবল তাহা নহে, তৎসংলগ্ন এবং ঘাটশীলার পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর দুই ধারে চার-পাঁচ মাইল জুড়িয়া সমস্ত জায়গায় সহিত জায়সেদপুরের দিকে সুবর্ণরেখার দক্ষিণে লুয়াবাসা, গীতিলতা, হুগু-পুকুর, পটকা, কালিকাপুর, ঘোঁ-ভাণ্ডার, আসানবানি প্রভৃতি গ্রাম ও নগরে বেষ্টিত স্থানটিও অবিসংবাদীরূপে বঙ্গভাষী প্রধান। বিহার সরকারেরই তদ্ব্যবধানে ১৯৫১ সনের ভারতীয় সেন্সাসের অন্তর্গত করিয়া প্রস্তুত "Languages Handbook, Singhbhum District" পুস্তকের ৯৬-১২৩ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন গ্রামের ভাষাভাষীদের অঙ্ক সকল হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ঘাটশীলার পূর্বে ও পশ্চিমে উপরি নির্ণীত সুবহু অবিভক্ত ভূমিখণ্ডে বাংলা ব্যতীত অস্ত্রান্ত্র প্রতিটি ভাষাভাষীদের সকলকে জড়াইয়া তাহাদের মোট সংখ্যা বাহা হয়, বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা তাহার ষিগুণেরও অধিক।

মাত্রাজ এবং কোমলার বংগ জিলা ভাঙ্গিয়া তাহার কুত্রাণ

এক প্রদেশ হইতে বিযুক্ত হইয়া অপর প্রদেশে সংযুক্ত হইতে পারে, কর্তাদের মধ্যে সদিচ্ছার লেশমাত্র থাকিলে সেই ভাবে ধলভূমের বেলাতেও তাহার যে অংশে বঙ্গভাষাভাষীর অনাপেক্ষিক আধিক্য ঘটিয়াছে, অন্ততঃ তাহা বাংলায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারিত।

ইহা ছাড়া অপর কথা কর্তব্য যে, ধলভূমের অত্র বাংলাদেশের দাবি শুধুই ভাষাগত সংখ্যাগুরুত্ব উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বাধীনতার প্রাকাল হইতে দেশবিভাগের ফলে বাংলাদেশের উপর দিয়া বড় চলিয়াছে। তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি পাকিস্তানের কবলে গিয়াছে; পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসিবার কলে বাকি পশ্চিমাংশের আর্থিক সংস্থান বিপর্যস্ত ও প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির বন্য পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ উপ-মানের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার ইহাই ত স্বাভাবিক যে, ধলভূমের দ্বার প্রচুর অনাবাদী ভূমি-সংবলিত বিহারের সীমান্তবর্তী বাঙ্গালী অধ্যুষিত জনবিলস অঞ্চলসমূহ বিহার স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাহার ভারতের প্রতি, ভারতীয়দের প্রতি অহু-রাগের খাতিরেই, ভারতের একটি বিভূষিত বিপর্যস্ত অংশের প্রয়োজনার্থ ছাড়িয়া দিবে। পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের অংশ নহে? বাঙ্গালীরা কি ভারতীয় নহে? তাহাদের সাহায্য করিতে বিহার সরকারের তথা ভারত সরকারের এ বিমুখতা কেন, এত অনিচ্ছা, এত কুপণতা কেন? ধলভূমদি বিহারের সীমান্ত অঞ্চল বাংলা-দেশে আসিলে বিহারের কি এমন ক্ষতি? বিহারের সমগ্র আয়তনের তুলনায় বাংলাভাষী সীমান্ত আয়তন বেশী হইলে নয় ভাগের এক ভাগ হইবে।

ধলভূমের অত্র বাংলার দাবি শুধু ভাষার অহুরোধে নহে, কৃষ্টি ও সভ্যতার অহুরোধে, অশনবসন, বীতিনীতির সমতার অহুরোধে, উৎসব, শিল্প ও জনগণের স্বভাবের ঐক্যের অহুরোধে। নামকরণ, সাল গণনা, সাধারণ মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি সকলই ধলভূমবাসী-গণের বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দেয়। ধলভূমের আদিবাসীদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষা বাংলা—বাঙ্গালীদের সঙ্গে সহজেই এবং স্বভাবতঃই আদিবাসীদের যে সহানুভূতি পড়িয়া উঠিয়াছে সেদূর আর কোন আতি, কোন সম্প্রদায়ের সহিত আদিবাসীদের হয় নাই। আদিবাসীদের ঘরীয়া গণনা করিলে সমগ্র ধলভূমে বাংলাভাষীদের নিশ্চিত সংখ্যাধিক্য হয়, ইহাও প্রাধান্যবোধ্য। অপরাপর সকলে মিশিয়া ধলভূমে যে সংখ্যা হয়, বাংলাভাষীরা এখানে তাহাকেও অনায়াসে ছাড়াইয়া যায়। ভৌগোলিক দিক দিয়াও ধলভূম বাংলাদেশের—ইহা বাংলাদেশের সবভূমি—পশ্চিমে বিস্তৃত মাত্র।

বিহারে বাসিন্দা বাঙালীদের প্রতি যে ভাল ব্যবহার করা হয়, তাহা নহে। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূমের বাঙালীদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে, বিহারে নাগরিক হইয়াও তৎকালকার বাসিন্দা বাঙালীরা বিহারীদের তুলনায় বিহার সরকার হইতে ভেদাঙ্গক অত্যাচার আচরণ

পাইয়া থাকে। ধলভূম মুক্তি পরিষদের কর্মসচিব গত ৪ঠা মে, ১৯৫৬-তে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাথ্যতঃ এখনও ধলভূমের স্থায়ী বাসিন্দাদের সরকারী কর্তৃপক্ষকে ডোমিসিল সাটিকিফিকেট দেখাইতে হয়, বাহাতে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় করিতে পারে যে, তাহারা বিহারেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। বিহারের হিন্দীপ্রধান অংশে হিন্দীভাষীদের এই দায় নাই, ধলভূমের হিন্দীভাষীদেরও নাই, কিন্তু ধলভূমের বাঙালীর নিকট ডোমিসিল সাটিকিফিকেট না থাকিলে কাগজ-কলমে বাহাই নিয়ম থাকুক, কাথ্যতঃ বিহারে সরকারী চাকুরি ত মিলিবেই না, সরকার হইতে অত্র কোন সুবিধা, যথা, পারমিট বা কোন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অমুমতি আদায় কিংবা সরকারী কন্টাক্ট বা সরকারের কোন কাজ করিয়া দিবার জন্য আর্থিক চুক্তি—এ সকলও একজন বিহারীর সহিত সমতুল্য ভাবে পাইবার জো নাই। যে সব বাঙালী ধলভূমে পুরুষাভুত্বের বাস করিতেছেন ধলভূমে যাহাদের বাস্তুভিটা, তাহাদেরই এই দুর্দশা; তাহাদের অপবাদ যে, তাহারা বাঙালী।

তার পরে শিক্ষার ব্যাপারে অহিন্দী স্কুল-পাঠশালা হইতে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমকি ত বিহার গবর্নমেন্ট তরফ হইতে সন্ম-সকল আছেন। বহু ভাষাগার সরকার জোর করিয়া বহুত্বের অত্র নৈশ বিভাগসমূহকে হিন্দী মাধ্যমে শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। হিন্দী মাধ্যম স্কুল আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে কি বকম তারতম্য করা হয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জামসেদপুরে রামকৃষ্ণ মিশন চালিত দুই স্কুলের ব্যাপার হইতে পাওয়া যায়। স্কুল দুইটির একটিতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় আর একটির শিক্ষার বাহন বাংলা। প্রথমটি অনায়াসে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ন-মেন্ট হইতে স্বীকৃতি পাইল, দ্বিতীয়টি তিন বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পরেও তাহা পায় নাই। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূম-বাসীর স্মারকলিপি হইতে আরও জানা যায় যে, বাঙালী হইলে স্থানীয় ছাত্রদের পক্ষে স্কুলসমূহে প্রবেশাভ্যুত পিওরা দুক্ক হইয়া উঠিতেছে।

অতঃপর ধলভূমে জনসাধারণের মতামত বাস্তব করিবার স্বাধীনতা ও সুবিধার কথা। ১৯৪৭ সন আগষ্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার তিন-চার দিন পরে ১৮ এবং ১৯ আগষ্ট তারিখে জামসেদপুরে বিহার-বাংলা সম্মিলনের নবম বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে বিহারের বাঙালী-অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চল বাংলাদেশের সহিত যুক্ত করা হউক, এই মত গৃহীত হওয়ায় পর সভায় যে তুলুল উপদ্রব আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। বাহির হইতে আসিয়া বিহারী শুণ্ডারা অস্ত্রহস্তে সভায় প্রোতাবস্তা-আগন্তুক নির্কিণেবে সকলকে আক্রমণ করিয়া সভা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। দুইজন বাঙালী সাংঘাতিকভাবে অধম হইলেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয় রহিল। ইহায কিছু পরে সভাসমিতি করিবার যে সব নিয়ম কর্তৃপক্ষ বাধিয়া দিলেন তাহা অপেক্ষা অসম্ভব সর্ব আদ্য কিছু হইতে পারে না। নিয়মগুলি করায় অর্থ, কর্তৃপক্ষের

অনুমতি বাতীত সভাসমিতি বাহাতে না হইতে পারে তাহাই সুনিশ্চিত করা।

সভাসমিতি করার সর্বশুলি হইল এই—

১। পূর্বেই সভার আস্থায়ক ও বক্তাগণের নাম কর্তৃপক্ষকে জানানো হইবে,

২। কোন রাজনৈতিক আলোচনা চলিতে পারিবে না,

৩। সভার বাহা প্রস্তাব করা হইতে পারে মাত্র যে সকল বক্তৃতা করা হইতে পারে, তাহার অথবা তাহাদের নকল কর্তৃপক্ষকে সভার পূর্বেই পাঠাইতে হইবে,

৪। সভার প্রতিদিনের কার্যক্রম অন্ততঃ একদিন আগে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

সময় বিশেষে উপযুক্ত নিয়মগুলির প্রয়োগের ব্যতিক্রম ছিল, বিশেষতঃ বলা বাহুল্য, এই নিয়মগুলি কখনও সরকার-সমর্থিত হিন্দীভাষীদের সভার কিংবা হিন্দীভাষীর অধিকুলে সভাসমিতি, বক্তৃতায় প্রযোজ্য হয় নাই।

রাজা পুনর্গঠন সমিতির জামসেদপুর সফটকালে, বিহার সরকারের তত্ব হইতে বাংলার দাবি ব্যর্থ করিবার আয়োজনের সীমাবদ্ধিসীমা ছিল না। প্রচারের জন্য মোটরগাড়ী ও লম্বা জবর-দখলের ছকুম হইয়াছিল—গাড়ীগুলির মালিকদিগের প্রতিজ্ঞার কাছে পূর্বরাত্রে পুলিশ কনটেইনল পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল যে, গাড়ীগুলি যেন যথাসময়ে হাজির হয়, শুধু তাহাই নহে, হাজির হইবার ছকুম তামিলের আমিন হিসাবে গাড়ীগুলির চালকদিগের লাইসেন্সগুলি ছাড়িয়া লইয়া পুলিশ তাহাদের নিজেদের হেফাজতে রাখিয়াছিল।

১৯৫৫ সনের ২ই ফেব্রুয়ারিতে রাজা পুনর্গঠনে সমিতির নিকট সাক্ষাৎকারের পর ও আগে ধলভূমের প্রতিনিধিগণের লাল্লাবাব অবধি ছিল না। সাক্ষাৎকারের পর রাস্তার বাহির হইলে কয়েকটি গুপ্তা আসিয়া তাঁহাদের প্রহার করে—পুলিস অবশ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে তামাসা দেখিয়াছে। তাঁহাদের নেতা ধলভূম হিঠেবিগী সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রহার আর লাল্লাবাব চোটটা বেশ বড়ভাবে পড়িয়াছিল। আবার এক বৎসর বাদে ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৬-তে যখন জামসেদপুরে বিহারীরা পুর্নলিয়ার ও কিষাণগঞ্জের কিছু অংশ বাংলার চলিয়া বাইবার প্রতিবাদে হস্ততাল ঘোষণা করিয়াছিল—তখন সেই হস্ততাল ভঙ্গের অভিযোগে গুপ্তাংশ দ্বারা এই ভয়লোক আর একবার ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন। তিনি জামসেদপুরে একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক—হস্ততাল হইলেও সর্বজনস্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী কয়েকটি ক্ষতী কর্তৃক সুরণ, বিশেষতঃ চিকিৎসার কার্য কখনও বন্ধ থাকে না। ডাক্তার শ্রবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধ, তিনি হস্ততালের দিনে তাঁহার চিকিৎসাগার বন্ধ রাখিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

রাজা পুনর্গঠন সমিতির নিকট কিছু বিহারীদের এই প্রকার গুপ্তাংশ দায় ছিল। বিহার সরকারের অপকৌশল তাঁহারা বুঝিয়াও

বুঝিলেন না। বলপূর্বক স্থানীয় জনগণের কঠোরোধ করা হইয়াছে, বাহির হইতে প্রচুর অর্থ দিয়া লোক আনিয়া বহু আফালনে ধলভূম বিহারের বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, ধলভূমের নেতৃস্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে স্ব স্ব গৃহের বাহির হওয়া অবধি বিপজ্জনক; রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট এই সমস্তই তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য হইয়া গেল—গোয়ালপাড়ার তদেন্দীয় কয়েকজনের স্বার্থবুদ্ধিতে সুকৌশলে উদ্ভাবিত বাঙালী নির্ধাতন দেবিয়া যেমন তাঁহাদের বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল যে, গোয়ালপাড়া আসামীদেরই দেশ, বাঙালীর নহে,—সেমনই ধলভূমে বিহারীদের জাকজমক, বাহবাফোট কলববে অভিভূত হইয়া মস্তব্য করিলেন—ধলভূমকে বাংলার অন্তর্গত করিতে যথেষ্ট আন্দোলন হয় নাই। গুপ্তামী এবং ধূর্ত রাজনৈতিক প্রচাবে এই সমিতি বরাবর বিভ্রান্ত হইয়াছেন—শুধু বিহারে নহে, অন্য কয়েকটি স্থানেও সরকারী বা বেসরকারী অর্থে পুষ্ট কয়েকজনের প্ররোচনায় গুপ্তামী, ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও স্থানীয় লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শনের ফলে অপপ্রচেষ্টার দ্বারা তাঁহারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বলিয়া দেখা গিয়াছে।

সিংভূমের সদরে ওড়িয়া ভাষীর প্রাধান্য হইলেও ওড়িয়াভাষীরা জানে যে, সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় তাহাদের কোন দাবি নাই। ধলভূম বাংলাদেশের প্রাণা বলিয়া ওড়িয়ারা স্বীকার করে ও তাহার বঙ্গভূক্তির আন্দোলন সমর্থন করে। উড়িষ্যার বহু নেতা, তাঁহাদের মধ্যে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি, পরে উড়িষ্যা হইতে নির্বাচিত লোক সভার সদস্য শ্রী বি. কে. দাস একজন—পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে, প্রকাশ্যে এ বিষয়ে বাঙালীর দাবিকে যুক্তিসহ ও অত্যাশঙ্কক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের অঙ্গাঙ্গ স্থানে বহু নিরপেক্ষ ব্যক্তি ধলভূমকে বঙ্গভূক্ত সমীচীন বোধ করিয়াছেন। লোক সভার সদস্য ডাক্তার লক্ষ্যনন্দ্রয়ের ইহাই মত এবং তাঁহার সভাপতিত্বে ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে অকংগ্রেসী দলগুলি কর্তৃক আহৃত যে সম্মেলনীয় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সম্মেলনের অধিবেশন বসিয়াছিল, তাহাতে ধলভূমের প্রতি বাংলার দাবি জোরের সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল।

পুর্নলিয়ায় ও কিষাণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সে সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিবার চেষ্টার বিরাম ছিল না—প্রায়ই তিনি পশ্চিমবঙ্গে দাবির বিরুদ্ধে বিহারে বহুস্থানে ধর্মঘট, হস্ততাল ও বিক্ষোভের কথা উল্লেখ্যে ঘোষণা করিয়াছেন; যখন তখন বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে, বিহার হইতে কিয়দংশ ভূমি পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্তে বিহারবাসীদের ভিতর যে পন্থীর সম্ভাব্য এবং কোথায় স্ফীত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং সে মতবোধ তিনি নিজ প্রাণে অনুভব করেন। অতীতকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গের বাহিরে নিকট-সীমান্তে বাঙালীদিগকে বঙ্গের কিরাইরা আনিবার ব্যাপারে নিতান্তই উদাসীন। পরসম্পদে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ চালিত বিহার সরকারের বত আগ্রহ, নিজ অধিকারে শ্রীযুক্ত বিধান দায়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের তত নহে, কারণ এখানে অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইলে শক্তির সহিত বিবাদ করিতে হইবে। বাংলার সমস্ত সমাধানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার অভাব রহিয়াছে, একথা কে অস্বীকার করিবে?

তাই রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি ধলভূমের বঙ্গভূমির পক্ষে ভাষা কিংবা অস্ত্র কোন দফার আপাতদৃষ্টিতে একটি কারণও খুঁজিয়া পান নাই (রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির বিবরণী—৬৬৭ অনুচ্ছেদ)। এই রকম ত হইবেই! প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার, জাতির সম্মান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাহ্যিক দায়িত্ব ও আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশী হওয়া স্বাভাবিক—সেই সরকারই যদি স্বীয় জাতির জন্য সুপারিশ করিতে উদ্যোগী থাকে বা ভয়ে পিছুইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের বর্তমানাবস্থার বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির দরবারে সে জাতি তাহার ভাষা প্রাপ্য কিরূপে পাইবে?

ধলভূমকে বিহাদের জন্য বজায় রাখিতে রাজ্য পুনর্গঠন সমিতিতে কম বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই। পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যা দুই প্রদেশের দাবি ডিঙাইয়া তবেই না বিহার রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির সুপারিশে ধলভূম নিজ সীমানার ভিতর রাখিয়াছে। পুন্ড্রিয়া উপজিলার বিষয় নিয়তাজি হইয়া শেষকালটা রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি যখন উত্তর পশ্চিমবঙ্গকে দিয়াই দিলেন, তখন সমস্তা হইল যে, তাহা হইলে বিহারবাসী ধলভূমে বিহারের পথে বাইবে কি করিয়া? একমাত্র উপায় সিংভূম সদর আর সেবাইকেলা মহকুমায় ভিতর দিয়া যাওয়া, কিন্তু সে সব স্থানের প্রতিও যে উড়িষ্যাবাসীরা দাবি অকাটা! তখন ধলভূম বিহারে রাখিবার জন্য রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি উড়িষ্যার ভাষা প্রাপ্য অগ্রাহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সিংভূম সদর ও সেবাইকেলা খারসোয়ান সমেত বিহারে থাকিয়া গেল। একটি অস্ত্র বজায় রাখিতে আরও বহু অস্ত্রের প্রবৃত্তি হওয়ার দৃষ্টান্ত সচরাচর বহুস্থানে পাওয়া যায় না।

সেবাইকেলা ও খারসোয়ানে ওড়িয়ারাই সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর জাতির গোষ্ঠি এবং সিংভূম সদরে হো শ্রেণীর আদিবাসীর পূর্বেই সংখ্যার ওড়িয়ারদের স্থান। হো'রা শতকরা ২৫ জনে উড়িষ্যা প্রদেশ এবং সিংভূম সদর ও সেবাইকেলা মহকুমায় থাকে। সেবাইকেলাও সদর মহকুমায় উড়িষ্যার সহিত একেবারে লাগাও, পাশাপাশি। স্তত্রায় এখন যেমন হো'রা দুই রাজ্যের শাসনে বিভক্ত হইয়া আছে—একটি অংশ পড়িয়াছে উড়িষ্যার আর একটি বর্তমান বিহারস্থ সেবাইকেলা ও সিংভূম সদর এই দুইটি মহকুমায়, সেবাইকেলা ও সদর উড়িষ্যার শাসনাধীন হইলে তেমনি হো জাতির প্রায় সকলেই এক রাজ্যের এলাকার থাকিতে পারিত—তাহাদের আর বিধাবিভক্ত হইতে হইত না। হো জাতির সহিত ওড়িয়ারদের বিশেষ সম্প্রীতি, ওড়িয়া ছাড়া আর কাহারও সহিত হোদের বনিবনাও হয় না। ভাষার সাদৃশ্যে, রাজনৈতিক চিন্ত-বৃত্তিতে এবং সাংসারিক সত্যে হো এবং ওড়িয়ারদের ভিতর-সম্বন্ধ

নিকট হইতে নিকটতম। হো'রা তাই স্বভাবতই তাহাদের সমগ্র বাসভূমি উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিতে চাহে—তাহাদের মধ্য হইতে সিংভূম এলাকার নির্ধারিত পাঁচজন বিহারের বিধান সভায় সমস্তর অন্তর্গত চারিজন বাব বাব সিংভূম সদর ও সেবাইকেলাকে উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিবার দাবি উত্থাপন করিয়াছেন। উড়িষ্যার সহিত সংযোগকারী রাজ্যখাট ও ব্যবস্থা সবই সিংভূম সদরে এবং সেবাইকেলা খারসোয়ানে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তারিত। বরং একটি পূর্বতল্লেশীয়া দ্বারা বিহার হইতেই এই সব অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। তাহা ছাড়া ওড়িয়া ও হোদের উপর বিহারীরা ভাষার অত্যাচার চালাইতেছে—চাইবাসা এবং সেবাইকেলা মহকুমায় ও সদরে ওড়িয়া ভাষা ও কৃষ্টি দমনের চেষ্টা চলিতেছে অবিরাম এবং পদ্ধতিবদ্ধভাবে।

কিছুতেই কিছু হইল না, রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট কোন বৃত্তিই খাটিল না। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির ভয় হইল যে, যদি বিহার পুন্ড্রিয়ার অংশের সহিত সেবাইকেলা বা সদর মহকুমাও হারায় তাহা হইলে ধলভূম মহকুমার সহিত বিহারের ভৌগোলিক সংযোগ থাকিবে না। বিহারকে সমস্ত রাখিতেই হইবে, অগত্যা, বিহারের সহিত ধলভূমকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য উড়িষ্যার দাবি তুচ্ছ হলে পরিত্যক্ত হইল। ধলভূমকে বিহারে রাখা উচিত কি না সে প্রশ্নের পাশ কাটাইয়া গিয়া ধরিয়া লওয়া হইল ধলভূম বিহারে থাকিবে এবং সুষ্ঠুভাবে তাহার ব্যবস্থা রাখিবার নিমিত্ত সিংভূমের সদর ও সেবাইকেলাকেও বিহারে রাখিতে হইবে। যে বিষয় প্রমাণ করিবার কথা তাহা প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, বুঝা বাইতেছে।

বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইন পাশ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধলভূমের উল্লেখ মাত্র নাই। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীমতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাংলার জায়সমস্ত দাবির বেশী ভাগ উপেক্ষা করিয়া আইনটি বেন বাহারা ক্ষমতার শিথিলে বসিয়া জনসাধারণের জায়সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সহজ ও শোভনভাবে মানিয়া না লইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে বসেই করে, তাহাদেরই জিদ ও উদ্ভোতার প্রতিচ্ছবি। “আমরা ধলভূমাদি বিহারে পরিত্যক্ত বাঙালী অঞ্চলের বাঙালীদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করি।” বাঙালীরা বিহার চাহিয়াছিল, কর্তারা দৃষ্টান্তে ও জঘন্তভাবে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন—স্ববিচারের চেষ্টাও অবজ্ঞাত করে নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, কেন বিহারীরা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট অংশের অর্থাৎ বাঙালীদের নিরীহ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রতিবন্ধকতা করিল। আমাদের সহিত তাহাদের কিসের শত্রুতা? তুচ্ছ সীমানার অংশ প্রদেশান্তরিত হইলে বিরাট বিহারের এমন কি আসে যায়?

বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর বিধি দ্বিতীতে কেন্দ্রীয়

আইন সভার আলোচনা হইবার কালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পঠিত পত্র এবং তাঁহার সহকারী স্রীমাতায়েব খটতাপূর্ণ উক্তি বাঙালীরা ভনিয়াছে—‘বাহা হইবার তাহা হইল—বিহারে যেখানে হাড়িয়া না দিলে বিহার সীমান্তের অত্র কোন ভূমির প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দাবি বাহাই হউক, ভবিষ্যতে আর কোনক্রমেই পশ্চিমবঙ্গ তাহা পাইবে না।’ বাঙালীর উপকার পাছে হইয়া যায়, সেইজন্য বৃত্তি ও সদবুদ্ধিকেও কর্তৃপক্ষ হান দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু আমরা স্রীমন্তুলুচন্দ্র ঘোষের বাণীর প্রতিধ্বনি

করিয়া বলিতে চাই যে, বাংলা প্রদেশগঠনে এই বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইনটি যে শেষ কথা—ইহাই যে বাংলার দাবি মিটাইবার প্রথম এবং শেষ কিস্তি—এই সব উক্তির প্রত্যয় তুলিয়াও আমরা দিতে পারিব না। নিজতাবী অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দ্বারা যে সব বিষয় একটি জাতির জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সঠিত জড়িত, যতদিন পর্যন্ত সেই অধিকারের অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণপ্রাপ্তি না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের ব্যাপারে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই।

## সীতার ভয়

(রাধকে সোনার হরিণ শিকারে পাঠিয়ে)

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

আশার কুটার বৈধিছি পঞ্চবটের তীরে  
ময়ূর-পাখায় গাঢ় নীল-সোনা-সবুজ নাচে ;  
হাস্যবাস্তবে কাশের দেশম কাপছে ধীরে ;  
মনকে পাঠিয়ে যুগয়ায় চোখ স্বপ্ন ধোঁজে।

মনকে পাঠিয়ে যুগয়ায় কোনো নতুন ধোঁজে  
আঁচলেতে একা কুড়ুই আকাশ-ঝরানো সোনা,  
এমন দুপুরে বিপদের ভয়,—মন কি বোঝে ?  
এক-ছই-তিন-নিমেঘে নিমেঘে আদর গোনা।

হরিণশিশুর চোখের চাওয়ায় গভীর কালো,  
বিখ্যাসে ভ'বে তুলেছে আমার আগামী কাল ;  
ভরাট বনের মনের ধবরে আলিয়ে আলো  
দীপাঘিতার খুশী ভ'বে তুলি রাত-সকাল।

এমন সময়ে মনকে পাঠিয়ে ব্যাধের মতো  
স্বপ্ন শিকারে, গভীর বনের মনের স্রোতে,  
হঠাৎ বনায়, পাখার ঝাপটায়, চিন্তা যতো,—  
কেন পাঠালাম রামকে আমার কঠিন ব্রতে !

বিপদ চেষ্টায় ; মন কি আমার কুড়িয়ে গেলো ?  
স্বপ্ন-আশার হঠাৎ যুগয়া কুণ্ডলো বৈকে ?  
রামের হাতের শব্দ সন্ধান ব্যর্থ হোলো ?  
কোন কৈকেয়ী নতুন বিপদ আনলো ডেকে ?

অনার্থ ক্রটি বিধবার ভালোবাসায় খুশী  
হই নি। আমার বৃকে চেয়ে আছে সাপের মণি,  
শূর্ণনখার চোখের জ্বলন আজও পুষি,  
ভয়ের মতন। ছোবলালো নাকি নাগিন কণী ?

বিপদ চেষ্টায়। অসম্ভবের যুগয়া লোভে  
কেন পাঠালাম, যা ছিলো আমার স্বর্গপুঞ্জী ?  
কিরবে কি আর এমন সকাল কখনও কবে ?  
যেথায় কি আর হারানো রামকে যতই খুঁজি ?



## জটীর জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

( ১৮ )

সেদিন আর এগিয়ে যেতে পারি নি, শিহিয়ে গিয়ে বাত্মিবাস করেছিলাম আবার ঐ মণ্ডলচটিতেই। সারা দিনটা কেটেছে শত্ৰু পাণ্ডার বাড়ীতে।

চরণ দুটি আমার বিশ্রাম পেয়েছে নিশ্চয়ই। সেদিন এক বেলাও রাখতে হয় নি বলে হাত দুটিও। কিন্তু মন? সে যেন সারাটা দিন ক্রমাগতই দোল খেয়েছে সুখ-দুঃখের নাগরদোলায়। ফুলের মত নিশাপ কুমারী মেয়ে সীতার দৈহিক হর্ভোগ প্রত্যক্ষ করবার পর তাব বাপ-মায়ের মুখে তাব ব্যর্থ-জীবনের কাহিনী মোটামুটি শুনবার অবশ্যস্বার্থী প্রতিক্রিয়া ওটি। এব চেয়ে চড়াই-উতরাই ভাঙাও বুঝি ভাল—তাতে দেহই ক্লান্ত হয়, মন অস্থির হয় না।

বোকার উপর বোঝা। ভাবামুহুর্তে সে কাহিনীও মনে পড়ে যায়—পুরাতন দুঃখও আবার নূতন হয়ে মনে জেগে উঠে।

সেদিনও দুঃখ পেয়েছিলাম। একদিন কেন, পর পর দুদিন। প্রথমে বরষা ও পরে রামপুর চটিতে গঙ্গোত্রী নষ্টনীড় আর দীর্ঘ-নিশ্বাসের কাহিনী শুনবার পর।

গঙ্গোত্রী আর সীতা, সীতা আর গঙ্গোত্রী। রাজ্যে গুরেও পর্যায়ক্রমে দুটি মেরেকেই ঠিক যেন চোখের সামনে দেখি। দুটি জীবনের একই জাতের ব্যর্থতা এক অদৃশ্য তুলানগুরে দুদিকে চাপিয়ে তুলনা করতে থাকি। ভারী দেখি সীতার দুঃখের দিকটা; আর অমুকম্পার সেই দিকেই বেশী যুকে পড়ে আমার মন।

দুঃখিনী গঙ্গোত্রীও। তবু সীতার দুঃখের সঙ্গে তুলনা হয় না তাঁর দুঃখের। নিষ্কিন্ত মনের অসাধারণ শক্তিবলে গঙ্গোত্রী নিজেই তাঁর দুঃখকে জয় করে ইদানীং প্রায় নিরাসক্তভাবে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু সীতা গঙ্গোত্রী নয়; সীতার দুঃখের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। ভালবাসার কুঁড়ি তার হৃদয়ে কুল হয়ে কুটবার পূর্বেই সাপ হয়ে দংশন করেছে তাকে। নিরক্ষর, সবলা পল্লী-বালা এখন বোবা পণ্ডর মত ছটকট করছে সেই বিবেক জ্বালায়। কেউ নেই তাকে একটু সাহায্য করবার।

খোঁড়া মেয়ের বিয়ে যদি নাও হয়, চিকিৎসা হতে ত কোন বাধা নেই। কিন্তু তাও হয় নি, হবেও না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম এক ফাকে সীতার জননী যশোদাকে। কিন্তু শুনেই হাট হাট করে কঁদে উঠলেন প্রোঢ়। কানতে কানতেই বললেন, তা কি কবাবেন উনি। জন্মদাতা পিতা হলে কি হবে—মাহুঘটির বুকখানা যে ভগবান পাখর দিয়ে গড়ে দিয়েছেন।

দিল্লী-লঞ্চে না হয় বহুবুবেয় দেশ। রাজ মাইল দশেক দুয়েই চার্মোলিতে যে সরকারী হাসপাতাল আছে, চিকিৎসার জন্ত সীতাকে সেখানেও একবার নিয়ে বান নি শত্ৰুজী।

মিথ্যা বলেন নি যশোদা—হৃদয়খানি শত্ৰুজীর বোধ করি পাষণ দিয়েই গড়া। কিন্তু এ কেমন পাষণ!

বৈকালে চটিতে কিংবা বাবার পূর্বে আমিও একবার শত্ৰুজীকে অমুরোধ করেছিলাম। কিন্তু উত্তরে বিষয়কণ্ঠে তিনি বললেন, ডাক্তার কি করবে বাবু? স্বকৃতকর্মের হর্ভোগ থেকে ডাক্তার-বৈদ্য কি কাউকে রক্ষা করতে পারে!

উত্তরে ডাক্তার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলে। কিন্তু সে সব যুক্তি মুখে ধূবে থাক, মনেও এল না আমার। বিদ্রুত হয়েই আমি বললাম, ঐ কচি মেয়ে আপনায় কি এমন দোষ করেছে ঠাকুর মশায় বাব জন্ত এমন হর্ভোগ তাকে ভুগতে হবে!

শুনে কিন্তু হাসলেন শত্ৰুজী; আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমরা এ সব কথা মানবে না, কিন্তু আমরা মানি। কোন জন্মের কোন কৃতকর্মের ফল মাহুঘ এ জন্মে ভোগ করে তা কি সঠিক জানা যায়? তবে সীতার বেলায় এ জন্মের দোষও একটু আছে বৈকি! যে আশা কিছুতেই মেটারায় নয়, তেমন আশা কদাও একটা দোষ, বাবু। সে দোষ করলেও মাহুঘকে সাজা পেতে হয়।

এমন যুক্তি মানতে পারি নে আমি। সুতরাং আরও বেশী বিদ্রুত হয়ে তিক্তকণ্ঠে আমি বললাম, অভিলাপ দেবার একটা যে অভিযোগ আছে আপনায় বিফলত্ব তা হলে একেবারে মিথ্যা নয়—মনে মনে ওদের হৃদয়েরই শাস্তি আপনি কামনা করেছিলেন।

আশ্চর্য! এবার ঘাড় কাৎ করে স্বীকার করলেন শত্ৰুজী। কিন্তু তার পর সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন: আমার সে কৃতকর্মের ফল আমিও কি ভোগ করছি নে? সে দিন গড়বকে কেটেছিল যে সাপ সে, বাবু, আমাকেও যেহাই দেয় নি। কোন মাহুঘের চোপ বেখানে যেতে পারে না, সেই আমার বুকের মধ্যেও তখনই ছোবল মেরেছিল সে। তাব পর থেকেই বিবেক জ্বালায় আমিও নিরঙ্কর জলে মরছি।

তুলতে পারি নি ঐ কথাগুলি, তুলতে পারি নি শত্ৰুজীকে।

পরদিন বদরীনাথের পথে আমার সহবাজী হতে পারেন নি তিনি—শুধু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একদিন পর রাজা করবে

আমাদের আগেই বদরীধামে উপস্থিত হয়ে সেখানে বধাসময়ে তিনিই আমাদের তীর্থকৃত্য করাবেন। তথাপি একাকী পথ চলতে চলতে সেদিন সীতার পাশে পাশে শত্ৰুজীকেও আমি যেন থেকে থেকেই প্রত্যক্ষ দেখছিলাম।

বিশাল এক মহীকূহ যেন বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েও খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সীতার অর্ধে নিঃশ্বাস ও নিবহকার ত্রাস্তব। তথাপি দ্বিতপ্রভাত হতে পারেন নি তিনি। বিচারক হয়ে মেরেকে সাজা দেবার পূর্ব যেরের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জলে মরছেন।

অন্তমন্ডল হয়ে পথ চলছিলাম। ইঁটা পথে এই প্রথম আমার পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন আমি। এমনকি, আগের দিন যে জায়গায় সীতাকে নিয়ে অমন অবতন ঘটেছিল সে জায়গাটাও কখন যে পার হয়ে গিয়েছি তা আমার খেয়ালই হয় নি। বৃষ্টি ঝট্টা-খানেক পর প্রথম থমকে দাঁড়ালার উত্তেজিত ছোট একটি জনতার সম্মুখীন হয়ে।

অন্ধবৃত্তের আকারে চলার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় কয়েকজন লোক। জনতাবৃত্তের অভ্যন্তরে প্রায় কেন্দ্রস্থলে মূর্তিমান বীররসের মত দণ্ডায়মান যে নারক, সে দেখি আমাদের জিতেন।

হাতের লাঠির সাহায্যে এইমাত্র একটি সাপকে বধ করেছে সে।

তখন দীর্ঘ নয় সন্ন্যাসপটী—বড় কোর গজখানেক। তবু নাকি কথা তুলে ফাঁস করে উঠেছিল সেটি, আর চলার পথে জিতেনের প্রায় পারের কাছেই। স্থানীয় যে বৃকটি জিতেনের সঙ্গে সঙ্কেই আসছিল সে সাপটির মারমূর্তি দেখেই সভরে ও সববে জিতেনকে পিছন দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে জিতেনের পারের রক্তও তার মাথার চড়ে গিয়েছে। সেই বৃকটির মুখেই এখন শুনলাম আমি যে তার শক্ত মুঠায় ভিতর থেকে নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে জিতেন তৎক্ষণাৎ লড়াই শুরু করে দিয়েছিল সাপটির সঙ্গে।

কিন্তু লড়াই শব্দটাকে ঘোষতব আপত্তি জিতেনের—অতটুকু এক সাপের সঙ্গে তার মত লোক লড়াই করবে কি?

ঐ একবারই বা ফাঁস করে উঠেছিল সাপটা—জিতেন আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে : তার পূর্বেই, আমি ওকে কিছু করবার আগেই, কথা নাযিয়ে পালাবার চেষ্টা বেটার। তখন হাতের লাঠি দিয়ে দিলাম হুঁপা বসিয়ে। তৃতীয় বার আঘাত করবার আর দরকারই হ'ল না।

অসম্ভব নয়—বা সুরু আর ছোট দেহ সাপটার। সেই ভয়ই তাকে আর একবার দেখে নিয়ে আমি সুরকণ্ঠে বললাম, তা হলে মায়লে কেন ওকে—ভীষণের পথে—

মুখের কথাটা শেষ করতেও পারলাম না আমি; জিতেন তার হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুক প্রায় গর্জন করে বলে উঠল : মারব না? কে জানে এই সাপটাই ছোবল ঘেঁষেছিল কি না সেই



অলকনন্দা

গড়র না কি মহারাজকে। তা না হলেও ওটা অমনি আরও কাউকে কেটে আর কোন সীতার সর্কনাশ ত করতে পারত।

চমকে উঠলাম আমি—কাল ত এমন উত্তেজিত দেখি নি জিতেনকে। ভারতেই পারি নি আমি যে, কিশোরী সীতার জীবনের নিদারুণ বিড়ম্বনার কাহিনী আমার অগোচরে জিতেনের পৌরুষকে এত বেশী উত্তেজিত করে রেখেছে। এখন নিঃশেষ হবার পূর্ব বুশীও হলাম আমি। হুঁপা এগিয়ে গিয়ে জিতেনের পিঠ চাপড়ে বললাম, ঠিকই করেছে তুমি—বেশ করেছে।

হাঁ, বাবুজী—ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন সাহ দিয়ে বললে : আচ্ছা কিম্বা বাবুজী নে। সাপ জরুর বিবেচনা ধ।

ওটুকু উত্তেজনার উপকারই হ'ল আমার—নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম।

দেখি যে খুব খাড়া না হলেও চড়াই ভেঙে উপরে উঠছি।

এও পাহাড় চড়া। তবে অল্প একটি পাহাড় এবং তা একেবারে ভিন্ন জাতের। আর একটি অতিকায় কাছিমের পিঠ যেন। কিন্তু ভুঙ্গনাথের পথে যে বন পার হয়ে এসেছি তার চিহ্নও নেই এই পাহাড়টির উপর। গাছ বা আছে তা চোখে পড়বার মত নয়। চোখে পড়ে না পাখরও। বরং আমাদের যে দিকে খান সেই ডান দিকে দেখি অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু জমির উপর আমাদের দেশের মতই ক্ষেতখামার। পাকা ধান কেটে কেটে গোছা বেঁধে রাখছে মেরে-পুকব চাষীরা। ধান ক্ষেতের ঝাঁকে কাকে লাউ-কুমড়োর ক্ষেত, আর বৃষ্টি কোন কোন রবিশস্তের। পা হুঁটিতে চড়াই ভাঙবার ক্রান্তি না থাকলে বোধ করি মনেই হ'ত না যে বাস হিমালয়ের এলাকাতেই আর একটি পাহাড় অতিক্রম করছি আমি।

তবে তা বেশ বুকা বার বখন চোখের দৃষ্টি ডান দিকের ক্ষেত-খামার এবং তার পূর্ব বাসখিলা গঙ্গার অদৃশ্য ধারা পার হয়ে ওপারে

চলে যায়। সেখানে নদীর ধারে ধারে এক সারি পাহাড়, কিন্তু সব ক'টিই ভাঙা।

নেড়া পাহাড়, লালচে রং, ভেত্রে গিয়েছে বলেই দেখতে আরও রুক্ষ। বেনিয়াকুণ্ড চটিতে প্রবেশ করবার পূর্বে এমনি একটি পাহাড়ের পায়ে যে স্বাভাবিক দেয়াল চিত্র দেখেছিলাম তাই আভাসও নেই এদের কোনটির কোন একখানি প্রস্তরফলকেও। সংহার ও স্থষ্টির বিচিত্র সমন্বয় এখানে নেই। ভূতনাথ নন, কেবল ভূতেরাই বৃষ্টি নিছক ভাঙবার লগ্নই ভেঙেছে এই পাহাড়গুলিকে।

বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম বাহাদুরকে। সে নির্নিরাকার ভাবে উত্তর দিল : প্রবল বৃষ্টিতে থসে গিয়েছে পাহাড়।

ঐ 'থস' কথাটা শুনেই আমার স্মৃতির অতলে প্রবল এক আলোড়ন শুরু হ'ল। আমার গঙ্গোত্রীকে মনে পড়ে গেল আমার—মনে পড়ল তাঁর মুখে পাহাড়ের থস নামার যে বর্ণনা আমি শুনে-ছিলাম তাঁর পিতার অপবাত মুন্ডার বিবরণের সঙ্গে। এমনি ভয়ঙ্কর তাহলে সেই ভাঙন!

ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটি জিজ্ঞাসাও মনে জেগে উঠল আমার—এমনি থস নামা যদি তেমন অস্বাভাবিক না হয় এই পাহাড় অকলে তবে সব জেনেওনেও গঙ্গোত্রী পাহাড়ে পাহাড়েই অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? নির্মম নিরন্তর অলৌকিক কোন আকর্ষণ কাজ করছে নাকি তাঁর পিতার মত তাঁর নিজের উপরেও? না তাঁর নিজেরই অবচেতন মনের কোন ইচ্ছার অসহায় ক্রীড়নক সে।

গঙ্গোত্রী বাই হোক না কেন, আমার নিজের তখন প্রায় সম্মোহিত অবস্থা। ঐ ভাঙা পাহাড়টির উপর থেকে আমার দৃষ্টি যেন আর সবতে চায় না। চোখের মতই চরণ দুটিও আমার অচল হয়ে গিয়েছে যেন।

সখিৎ কিরে এল বাহাদুরের অসহিষ্ণু কঠোর নির্দেশ শুনে : চলিবে বাবুজী—খুঁপ কড়ী হো রহী।

সচেতন হবার পর ভাল করে তাকিয়ে জিতেনকে আর দেখতে পেলাম না—নিশ্চয়ই তার অভ্যাসমত এগিয়ে গিয়েছে সে। তবে এখন তাতে ক্ষোভের চেয়ে স্বস্তিই আমার বেশী, কারণ বাহাদুরের তাড়া খেয়েই লজ্জিত হয়েছি আমি—যেন চুপি করতে গিয়ে ধরা পড়ার অবস্থা।

ভাল জালা হয়েছে আমার। গঙ্গোত্রী, তাঁর জননী, সীতা, সেই নাক-না-নানা বাবারব্বী এবং তেমনি আরও অনেকের কোন না কোন একজন চোখের সামনে উপস্থিত না থাকলেও মনের পথে আনাগোনা করছেই।

আমারও সেই লক্ষণের অবস্থা আর কি।

বনের পথে তিন জন একত্র চলেছেন। সকলের আগে রামক্সে, মাঝখানে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। মাঝখানে থেকে সীতা আড়াল করে রেখেছেন বলে লক্ষ্মণ পূর্ণব্রহ্ম রামকে দর্শন করতে পারছেন না।

ঠাকুরের কথা। রূপক দিয়ে তখন বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য মিল আমার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে।

কেন্দারনাথের পথে বাজা আমার গুরু হতে না হতেই পার্শ্বতীরা এলেন আমার সামনে। একজন অদৃষ্ট হতে না হতেই আর একজন আসেন, অথবা চোখের আড়াল হলেও বিচরণ করতে থাকেন আমার মনের আনাচে-কানাচে। কেন্দারনাথ-বদরীনাথকে স্মরণ করবার সময় বা স্মরণে পাক্টি কই!

একটু ঘুরিয়ে এবং বাগ করবার ভাণ করে বাহাদুরকে বললাম, ভূই বা-তা সব ভূতের পল্ল শুনিরেই আমার মনটাকে হুঁকল করে দিয়েছিল। নইলে এমন ভয়-ভয় ভাব হবে কেন!

সবল বাহাদুর মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দিল : আমার কোন দোষ নেই, বাবুজী; আর মিছে কথাও আমি বলি নি। কেন্দারনাথজী বাজো সর্কজীই ওনারা হাজারে হাজারে বিচরণ করেন। ওপারে বৈকুণ্ঠে একবার পৌঁছেলেই দেখবেন যে, একটুও ডর লাগবে না।

বদরীনাথ বিস্ময়ই নাম। অলকনন্দা পার হলেই তার নিজস্ব এলাকা শুরু হবে। বৈকুণ্ঠেরা তাকে বলে বৈকুণ্ঠ। শোনা কথা বাহাদুর আবৃত্তি করল প্রতিধ্বনির মত।

কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠ যে আনন্দলোক তা যানেন না আর একজন। বাহাদুর বাকে মনে করে ভূতপ্রেতের গৌরান্দ্রা তাকেই তিনি বলেন ভেলকি—সেই বিষ্ণু বা বদরীনারায়ণেরই ইচ্ছালা বা দিয়ে বাস্তুকে তিনি সংসারে বেঁধে রেখেছেন।

সামনের চটিতে গোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল।

নাথের মধ্যে বৃন্দাবনের আভাস থাকলে কি হবে—গোপেশ্বর এখানে শিব। তাঁর নাথের চটি ও বসন্তির নামও গোপেশ্বর। এখান থেকেই বেঘ হয়ে গিয়েছে একেবারে আদি ও অকৃত্রিম পাকদণ্ড পথ লগ না বার মাইল দূরে পঞ্চকোণের পঞ্চম কক্ষেব্বের মন্দির পর্যন্ত।

পূর্বেও খুব কম বাজীই যেত দুর্গম পথে আরও অতিরিক্ত কুড়ি মাইল হেঁটে কক্ষেব্বকে দর্শন করতে। আজকাল বোধ করি একেবারেই কেউ যায় না। গোঁড়া শৈব চন্দ্রচূড় হরত সেই কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে আরও গোঁড়া হয়েছেন।

সন্ন্যাসী তিনি নন। কক্ষেব্বের পাণ্ডাই হরত হবেন এই চন্দ্রচূড়। তবে কেবলই পেশাদার লোক বলে মনে হয় না তাঁকে। গোঁড়া হলেও তিনি প্রধানতঃ ভক্ত, বা শঙ্করী নন। বিশ্বাস তাঁর শিলাময় পাহাড়ের মতই অনড় হলেও তাঁর সেই বিশ্বাসের প্রকাশ বড় মধুর।

আমরা তখনই চামৌলির দিকে বাজা করব শুনে চন্দ্রচূড় মুচকি হেসে বললেন, জাল কাটতে পারলে না তা হলে।

যানই বুঝতে পারি নি তখন, বিহ্বল হয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি? কিসের জাল?

উত্তর হ'ল: ইজ্জতজাল।

আমি নির্বাক। দেখে তিনি মুহূর্ত হাসি তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, কি কবে পারবে। এই কেন্দ্র-নাথজীর রাজ্যেও ত ভেলকির জাল পেতে রেখেছে সে যাতে বেঁধে মুসক্ক বাজীকেও আবার সে তাঁর মায়ার সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি অর্পবোধ হয় না। আবারও বিহ্বল হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন আপনি? আমরা ত বদরীনারায়ণকে দর্শন করতে চলেছি।

আর আমিও ত তাঁর কথাই বললাম, উত্তর দিলেন চন্দ্রচূড়: ভেলকি ত সেই বদরীনাথেরই। কেবল মায়ারী নয়, মায়ারীর রাজা সে।

এতক্ষণ পর যোটাযুটি বুঝতে পারলাম তাঁর বক্তব্য। এবার আমিও হেসেই বললাম, বদরীনাথ যেতে আমাদের নিষেধ করছেন আপনি?

দৃঢ়ভাবে উত্তর হ'ল: হ্যাঁ। ডান দিকে না গিয়ে বা দিকের পাকদণ্ডি পথ ধর তোমরা। সেই পথের শেষে পকম কেন্দ্র-রুদ্রেশ্বরের মন্দির। শান্তি যদি চাও তবে তাঁরই চরণতলে তা পাবে। কেন্দ্রনাথজী-ভুঙ্গনাথজীকে দর্শন করবার পর আবার কেন সেই মায়ারীর কান্দে গিয়ে পড়বে?

বিশ্বয় লাগে চন্দ্রচূড়ের চোখের দিকে চেরে। অসম্ভব বিশ্বাসের উত্তাপ তাঁর কণ্ঠস্বরে থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে তাঁর বিষ্ময়ের লেশ-মাত্রও নেই। এ আলোচনার পরিহাস অচল বিবেচনা করেই ঐবৎ কুণ্ঠিতভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বদরীনাথকে বার বার মায়ারী কেন বলছেন আপনি?

উত্তরে চন্দ্রচূড় বললেন, মায়ারী না বললে তাঁকে ত বলতে হয় শঠ।

শঠ?

তা বই কি। বৃন্দাবনের গোপীয়া কি বলেছিল তাকে—‘নিচুঁব নট, কপট শঠ’,—নয়?

কিছু পাণ্ডিত্যও যে আছে এই চন্দ্রচূড়ের তা বুঝতে পেরে আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম আমি। সত্যই পাণ্ডিত্যের তরু যদি শুক হয় তবে আমি নির্বাং হেয়ে বাব। তা ছাড়া তরু করবার সময়ই বা আমাদের কোথায়।

কিন্তু আমি চুপ করে থাকলেও চন্দ্রচূড়ই আবার বললেন, ঐ ত নারায়ণের স্বভাব—সবাইকে জুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের স্বার্থের কাজ হাসিল করে সে। স্বয়ং শিবকেও রেহাই দেয় নি সেই চোড়ী নারায়ণ।

‘শঠ’ কথাটারই প্রতিশব্দ হলো এ বিশেষণটি বড় বৈদ্য কানে লাগে। জিতেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, কি বলছেন আপনি?

চন্দ্রচূড় কিন্তু একটু যেন বিব্রিত হয়েই বললেন: তোমরা জান না তা? শোন নি, কি করে নারায়ণ বদরীনাথ দখল করেছেন?

আমরা দুজনেই ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম। চন্দ্রচূড় তখন মুচকি হেসে বললেন, শিবকেই নারায়ণের বেশী ভয় কি না, তাই সকলের আগে তাঁকেই তাড়িয়েছে বদরীনাথ।

সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কাহিনীই শোনালেন তিনি।

স্বয়ং কেন্দ্রনাথেরই অদি বাড়ী নাকি ছিল ঐ এখন যেখানে বদরীনাথের মন্দির আছে সেই উপত্যকার। দেবাদিদেব মহাদেব তিনি। ভারতবর্ষের সকলের তিনি আরাধ্য দেবতা। বিস্মকে কেউ পুরোয়াই করে না। শিবের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে স্তম্ভিত হয়ে তখন বিষ্ণু একদিন তিলতে তার নিজস্ব মন্দির পরিত্যাগ করে এসে কেন্দ্রনাথের বাড়ীর কাছাকাছি এক উপত্যকার ছোট একটি শিবুর রূপ ধরে কান্দতে আরম্ভ করলেন।

ওদিকে বাড়ীতে কেন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্শ্বতীর কথাবার্তা হচ্ছিল তখন। অল্পপূর্ণা রোজই যেমন করেন সেদিনও তেমনি জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীকে: তোমার রাজ্যে কেউ এখন অভ্যুত্থান বা নির্যাতন নেই ত?

কেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, না।

কিন্তু ঠিক তখনই শিবরূপী বদরীনাথের কান্নার শব্দ শুনে পেলে পার্শ্বতী। তাড়াতাড়ি তিনি বাইরে আসতেই তাঁর চোখে পড়ল শিবটি। স্নেহ ও করুণায় গলে গিয়ে তখনই পার্শ্বতী কোলে তুলে নিলেন তাকে। ঘরে এসে স্বামীকে ভৎসনা করে বললেন, কি করে অমন কথা বললে তুমি? এই দুধের বাচ্চা এত শীতে খোলা মাঠে পড়ে পেটের খিদেয় ঝুঁকছে। একে আমাদের ঘরে আহার কাছেই রাখব আমি।

কেন্দ্রনাথজী কিন্তু শিবটির দিকে একবার তাকিয়েই সন্ত্রস্ত-কণ্ঠে বললেন, অমন কথাও করো না, দেবী। এটি শিব নয়, কপট-কুল চূড়ামণি। কোন অভাবই ওর নেই। ওকে তুমি হুণী ভেবে ঘরে যদি ঠাই দাও তাহলে আসলে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা হবে।

হ'লও তাই। স্বামীস্বতী-বাণীতে কান দেন নি পার্শ্বতী। স্নেহ ও করুণায় অন্ধ হয়ে নিজের ঘরেই তিনি রেখেছিলেন শিবটিকে। কল পেলে পরদিনই।

শিবটিকে খালি ঘরে রেখে হুঁজনে অলকন্দার স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিরে এসে দেখেন যে, সমস্ত ঘরানাই জুড়ে বসে আছে আগের দিনের সেই অতটুকু শিব বিরাট এক চতুর্ভুজ পুরুষ হয়ে। হুঁজনেই চিনলেন বিষ্ণুকে, কিন্তু প্রতিবাদ করবার সময়ই পেলেন না তাঁরা। ঘরের ভিতর থেকে বিষ্ণুর পতীর কণ্ঠের আদেশ কানে এল তাঁদের—তোমরা আর কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধ। গে; এখানে এখন থেকে আমিই বাস করব।

নিরুপায় হয়ে বিতাবিত কেশরনাথ তাঁর বর্তমান ধারে আশ্রয় নিয়েছেন।

বদরীনাথ ও তাঁর মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব বলেই কল্পনা নানা কাহিনী সৃষ্টি করেছে। তাদেরই একটি এই উদ্ভট কাহিনী। অসংস্কৃত কল্পনার সৃষ্টি নিশ্চয়ই এবং বৌদ্ধ-বিশেষের গন্ধও একটু ওতে আছে। তবে হিন্দুধর্মের মূলধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় ঐ কল্পনা। প্রলয়পর্যায়জল অপসারিত করে অনন্তদল স্রষ্টকর্মলের আবির্ভাবের তত্ত্বই বুদ্ধি রূপ নিয়েছে এই কষ্ট-কল্পিত স্থল আখ্যায়িকার মধ্যে।

তবে তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই চন্দ্রচূড়ের। যসগ্রাহী তিনি এবং যস নিয়েই বিতোর। গল্প শেষ করবার পূর্ব আশ্রয় মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এমন চালবাজ যে বদরীনাথ, ক্রতঃস্বরকে ছেড়ে তাকে দর্শন করতে বাবে তোমরা?

গোড়া ভক্তের এ হেন প্রশ্নের কি উত্তর দেব আমি! লজ্জিত হাসিমুখে চুপ করেই থাকলাম দেখে তিনিও যেন হাল ছেড়ে গিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিষয়-কঠে তিনি বললেন, তবে যাও। নুতন কিছু ত নয়। বিষ্ণু ত চিরদিনই তার ভেলকি দেখিয়ে জীবকে মোক্ষের পথ থেকে ভুলিয়ে সংসারে নিয়ে বাঁধছেন। তোমরাও যে ভুলবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

আমি আড়চোখে ক্রিান্তনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, আবার কেমন যেন উদ্মনা হয়েছে সে। সেটা আমার পক্ষে ভয়ের কারণ। আর এদিকে চন্দ্রচূড়ের কথাগুলিও আশীর্ব্বাদ বলে মনে হয় নি। আমরা পঞ্চম কেনাবেক দর্শন করব না শুনে সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। তাঁর সেই স্কোভকে অন্ততঃ আংশিকভাবে দূর করবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, এখানকার গোপেশ্বরও ত শিব। আর তাঁকে দর্শন করবার জগ্জই ত, দেখুন, এই মন্দির পর্য্যন্ত এসেছি আমরা। এখানে পূজা করবার জন্ত দয়া করে আমাদের পুরোহিত হবেন আপনি?

রাজী হলেন না তিনি; কিন্তু হেসে বললেন, গোপেশ্বরজীব পুরোহিত মন্দিরেই আছেন। যাও—দর্শন-পূজা কর পে তোমরা। বলেই একটি সরু গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

তত্ত্ব থেকে বস্তুর স্তরে নেমে একটু আশঙ্ক হ'ল আমার মন। মন্দির দেখতে দেখতে ভর-ভর ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

মণ্ডলটি থেকে গোপেশ্বর মাইল দূরেক ঘোটে দূর। শেষের দিকে খানিকটা চড়াই থাকলেও পথও বেশ ভালই। স্তম্ভমাং বেলা ন'টা বাজবার পূর্বেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা।

বিষাট এক কাছিমের পিঠের মত পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় গোপেশ্বর চটি। কিন্তু পাহাড় বলে ঘোটে মনেই হয় না জায়গাটিকে। পরিবেশ চোখে বতটা পড়ে তার সর্ব্বত্রই কেত। 'মাঝখানের বসতি বড়িফু হলেও গ্রামই মনে হয়। মোড়লা বাড়ীর সংখ্যা আড়লে গোনা যায়। মন্দিরের তেমন ঠাট ত এদেশে

কোথাও চোখে পড়ে নি। গোপেশ্বরের মন্দির ভুলনার আরও ছোট, আরও সামান্য। তবে বহু প্রাচীন মন্দির এটি। এর উপর নির্ম্ময়কালের ধ্বংসলীলা মানুষের উপেক্ষার প্রস্তর পেয়েছে। মন্দির এখন জীর্ণ, বিগ্রহ উপেক্ষিত। ভিতরে টিম টিম করে একটি প্রাণীপ জলছে দেখলাম। ভিতরটা স্নাতস্নেত। দেয়ালে কেবল যে শেওলা জমেছে তাই নয়, বেখানে কাটল সেখানে ঘাসও গজিয়েছে বৃষ্টি। আশ্রয় ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই ক'টি চামচিকে ঝটপট পাখার আগুয়াজ করে উড়ে গেল।

মন্দিরের পাশেই বাইরে বিষাট একটি ত্রিশূল দেখলাম। তার গায়ে মস্ত বড় একটি কুঠার ঝুলছে। ত্রিশূল মহাদেবের; কুঠারটি নাকি পবিত্রাশ্রমের।

মন্দির বাড়ী-সড়ক থেকে বেশ একটু দূরে। সড়কের দু'ধারে একদিকে ঘন বসতি, মন্দিরে যাবার পথ গিয়েছে বাজারের ভিতর দিয়ে। এ গ্রামের লোকসংখ্যা যে নিতান্ত কম নয় তা অসম্ভবমান করলাম জলের কলের কাছে গাড়োয়ালী গৃহিণীদের ভিড় দেখে। বাড়ী-সড়কের ধারে পাঠশালাও একটি আছে।

খালি পড়ে আছে যে চালাঘরগুলি সেগুলি বৃষ্টি চটি। উ কি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—ধমকে দাঁড়ালাম হঠাৎ একজননের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে। বেনী-বরসের একজন স্ত্রীলোক, তার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে আরও বেনী-বরসের পুরুষ একজন। যেটে ঘেঁষতে ছেঁড়া কবল একখানা বুদ্ধি এইমাত্র পাতা হয়েছে, তার উপর ময়লা কাপড়ের দু'টি পুটুলি। পুরুষটির শীর্ণ ও জীর্ণ দেহে জরা এবং রোগ উভয়েরই যুগপৎ আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝা যায়।

চেয়ে দেখবার মত মুখ একখানাও নয়। কিন্তু চেনা চেনা ঠেকছে যে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সেই বেশিয়ারকুণ্ড চটিতে সন্ধ্যাবেলার দোকানে সওদা করতে বসে পিছনে অবিরাম খুক খুক কাশির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেছিলাম একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে জন-চাবেক লোকের ছোট একটি দল। সেই দলেই একজন পুরুষ তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে এক গ্রাস চায়ের দাম ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল। পরদিন আবারও সেই দলটিকে দেখেছিলাম ভুলোকনা ও পান্ডববাসা চটির মাঝামাঝি পথে।

ঘোটাঘুটি শব্দ দেহ লক্ষ্য করেছিলাম তাদের মধ্যে একা এই স্ত্রীলোকটির। পুরুষ তিনজনই বৃদ্ধ। তা ছাড়া তখনই মনে হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন হুমায়োগ্য রোগে কুগ্গছে—হর খাস, নয় ত রাজ রোগই। স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথাও বলতে পারে না কেউ—বিড় বিড় করে বা বলে তার অর্থ বুঝতে হয় প্রসারিত হাতের তেলোর দিকে চেয়ে।

মনে পড়ল যে দেখেছিলাম তারা খুকতে খুকতে চলছে—কখনও আগে-পিছে, কখনও একসঙ্গে দল বেঁধে। বাহাদুর তখন বুকিয়ে বলেছিল আমাকে—বাস ভাড়া দেবার সাধ্য ওদের নেই

বলেই হাটা-পথে ওরা চলেছে বদরীনাথ দর্শন করতে। নির্ভর সম্পূর্ণ ভিকার উপর।

ভাল করে তাকাতেই সন্দেহ-ভঞ্জন হ'ল। ততক্ষণে আমাদের দেখে জীলোকটিও এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে—আর সেই পরিচিত ভঙ্গিতে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছে কিছু ভিকার জ্ঞ।

বিনা আদ্যাসে পকেট থেকে বা উঠল তাই তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : দলে চায়জন ছিলে না তোমরা ?

হ্যাঁ বাবু—ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল জীলোকটি : দলের আর হ'জন এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইনি অশক্ত।

তাতে সন্দেহ নেই। বুকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে বসে বসেও ধুকছে সে। পিছনের চড়াই কেমন করে যে পার হয়ে এল এই রূপ বৃদ্ধ তা বুঝতে পারি নি আমি। ঐ যে শুনেছি 'পদুঃ লজ্জবতে গিরিঃ'—এ কি তারই উদাহরণ দেখছি আমার চোখের সামনে!

সম্ভ্রম বিষয়ে ভাবছিলাম আমি, কিন্তু তখনই তাল কেটে গেল। করুণ স্বর আবার কানে এল আমার : মোটে এক আনা দিলে বাবু—এক গ্রাস চা-ও ত হবে না এতে।

হাত আবার পকেটে ঢুক গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গেই জীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি বুঝি তোমার স্বামী ?

হ্যাঁ বাবু—বেশন কপাল করেছিলাম—

কানে গিয়ে লাগল জীলোকটির তিক্ত কণ্ঠস্বর। কিন্তু ততক্ষণে পুরা একটি টাকাই হাতে উঠেছে আমার। আর ইতস্তত : না করে তাই কেলে দিলাম জীলোকটির হাতের তেলোতে।

পুরুষে ছোট একটি টিল ফেললেও জল নড়ে জানি। কিন্তু এ যে দেখছি উত্তাল তব্রভঙ্গ। দান পেয়েই বড় বেগী বেন চকল হয়ে উঠল জীলোকটি।

তৎক্ষণাৎ এমন ভাবে যুবে দাঁড়াল সে যাতে ভিতরের পুরুষটি আমার দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ক্ষিপ্ত হস্তে টাকাটি সে বেঁধে ফেলল তার আঁচলের খুঁটে : তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রায় গদগদ স্বরে সে বললে, তুম, বাবু, বহুত আচ্ছা আদমী হো।

তোষাষোদে শুনি স্বয়ং ভগবানও ভুট হন। আমি ত কোন ছার! ক্ষণেকের বিষয়কে হটিয়ে আত্মপ্রসাদ আমার সম্পূর্ণ মন জুড়ে বসল। এবার হেসেই তাকলাম জীলোকটির মুখের দিকে। বললাম, থানা বনারো—যজ্ঞেসে থা লো। বন্দোবস্ত সব ঠিক হয় তো ?

ভূবন্ত হো আরোগা—উল্লসিত কণ্ঠে উত্তর দিল জীলোকটি। সঙ্গে সঙ্গেই তার মেহেব বিভিন্ন তটে আরও কয়েকটি তব্রজ ভেঙে পড়ল বেন। সেও আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, তোমরা এখানে থাকবে বাবু ?

থাকবার পরিকল্পনা নেই আমাদের—একটানে পিশূলকুঠি পর্যন্ত বাবার ইচ্ছা নিয়েই মণ্ডলটি থেকে বাত্মা করেছি আমরা। তথাপি জীলোকটির প্রশ্ন শুনে জিজ্ঞাসু চোখে জিতেনের মুখের দিকে তাকলাম আমি।

কিন্তু জিতেন নির্বিকার। সে দৃঢ়স্বরে বললে, না, মণিলা, চলুন এগিয়ে বাই।

সুতরাং কিংব জীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম, নহী ঠহয়েঙ্গে। হমলোগোঁকা অভী চলনা ছায়।

করেক পা এগিয়েও গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আবার চেনা সুরের ডাক কানে এল—বাবুজী!

কিংব তাকিয়ে দেখি যে, সেই জীলোকটি ঘর থেকে পথে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমি ধমকে দাঁড়লাম দেখেই সে দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে আবার বললে, আজ দিনটা এখানে থেকেই বাও না বাবু। কাল সকালে একসঙ্গেই বাওয়া বাবে।

আমি আবারও অস্বীকার করলাম, নহী হো সক্তা।

পরক্ষণেই চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। বিদ্যবেশে ছুটে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অকৃত উদ্ধত ভঙ্গিতে তার মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ তুলে জীলোটি বললে, হস্ত ক্যা ? বলেই ফিক্ করে হেসেও ফেলল সে।

একটা সাপ বেন হঠাৎ ধোঁস করে কণা তুলে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—তার বিযাক্ত নিখাস আমার গায়ে এসে পড়ল—না, নঃনই করল সে ? পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার সির সির করে উঠল। না, মন ? চমকে হ'পা পিছনে হটে গেলাম আমি।

বৃদ্ধা না হলেও প্রোচা জীলোকটি। অমার্জিত ময়লা রং তার বোদে পুড়ে ও জলে ভিজ়ে মুতের চামড়ার মত বিবর্ণ। হাতের আঙুলগুলি দেখতে পাকানো দড়ির মত। লাবণ্যের সম্পর্কহীন পাকা মুখখানিতে গঠনের পারিপাট্য একেবারেই নেই। চাপা হাসির আকস্মিক প্রলেপে আরও কুংনিং হয়েছিল সেই মুখ।

নিমাক্রণ বিষক্তি ও বিড়ফার মুখ কিরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু কমছে না ত সেই সির সির ভাবটা!

বন্ধা করল বাহাহুর। পিঠের বোকা তুলে নিতে ছতঃই একটু তার দেরি হয়েছিল বলেই আমার পিছনে আসছিল সে। কাছে এসে এখন সে ধমকে দাঁড়াল। চোখ দুটি তার বধ্যাসত্ত্ব উপর দিকে তুলে প্রথমে আমাকে ও পরে জীলোকটিকে বেধে নিল সে। তার পর তাকে সে ধমক দিয়ে বললে, ভাগ রহাঁসে। পুরা এক রূপরহী তো তুয়ে মিল গয়া। কিংব দুখ কাঁও দেবী হো ?

সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে এগিয়ে বাবার নির্দেশ দিল তার হাতের ইসারায়।

মিনিট পনয় পর আমার কাছাকাছি এসে বাহাহুর আমাকে বললে, আচ্ছা কিরা বাবুজী কি উস চটিমে আপ ঠহয়ে নহী মুকে মালুর হোতা ছায় কি বহ আওরত অচ্ছী নহী থী।



আমি বিব্রত ভাবে বললাম, কি বললিস তুই? কি করে জানলি?

বাহাদুর উত্তরে বললে, মনে এল তাই আপনাকে বললাম বাবুজী। এই তীর্থে পথে কত লোকই ত আসে। তাদের সবাই কি আর সাধুসন্ত হতে পারে!

তখনও সেই অহুভুতিটা মনে রয়েছে আমার—অজ্ঞানতে কোন অন্তি বস্তু মাড়ালে দেহ ও মনের যে অবস্থা হয় কতকটা সেই রকম। বাহাদুরের কথা শুনেই মনে হ'ল বুঝি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা একটি পেয়ে গিয়েছি আমার ঐ অবস্থায়—দেবমন্দিরের শুচিতা যেমন মনকে শুচি করে অন্তি পরিবেশেরও ত শুনি যে তেমনি বিপরীত প্রভাব আছে মানুষের মনের উপর।

কিন্তু ব্যাখ্যাটা আমার মনের মত হলেও তৎক্ষণাৎ চোখ রাঙিয়ে নিজের মনকে শাসন করলাম আমি। ও ব্যাখ্যা যে হুমুখে তবো'রালের মত। হৃৎক নিরে যেখানে কারবার সেখানে নিশ্চর করে কে বলতে পারে কার অন্তিচিন্তা কার মধ্যে সংক্রান্ত হয়েছে!

মনে মনে প্রহু বীণুর্জের আদেশ শ্রবণ করলাম—যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন কোন পাপ করে নি সেই প্রথম চিল ছুড়ক এ পালিষ্টায় গারে।

১০

কলুবনালিনী গঙ্গা। হরিদ্বার থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতবার গঙ্গার স্নান করেছি ততবারই মনে পড়েছে ঐ বর্ণনা। দেহ ও মনের অতি দ্রুত অহুভুতির মধ্যে কিছু কিছু প্রমাণও পেয়েছি তার। কিন্তু সে ত স্নান করার পর। গঙ্গা দর্শন করলেও কিছু কলুব নাশ হয় নাকি!

বাহাদুর এক সময়ে আমাকে বললে, ঐ যে বাবুজী, অলকনন্দা।

অনেক টুচু থেকে দেখা। তবু বেশ ভালই দেখা গেল। বিপুল অলখার্য পরস্রোতে বয়ে চলেছে। কিন্তু গঙ্গার অঙ্গ বেশ এখানে। বাহাদুর না বলে দিলেও আমি বুঝতে পারতাম যে ইনি হন্যাকিনী নন। ফটিক শুভ্র নয় এর জল। আর হুকুলের পাছাড়েই স্পষ্ট লালের আভা থাকলেও রাঙাও নয় তা। কাঁদা-গোলা রংএর ঘোলা জল অলকনন্দা—বর্ধাকালে কলকাতার ঘাটে হেটে রংএর যে গঙ্গা জল দেখি আমরা তার চেয়েও বেন কালো। অলকনন্দা এখানে ঠিক কুলুনাঙ্গিনী না হলেও হন্যাকিনীর মত গর্জন নেই তার।

অত দূর থেকে দেখেও চোখ জুড়িয়ে গেল বেন। চোখের পথে মনে গিয়েও ছড়িয়ে পড়ল সেই দ্রুততা। তার পর পায়ের গতি আমার দিগুণ বেড়ে গেল।

তার একটি কারণ যে, উত্তরাই পথ তা সঠিক বুঝলাম অলকনন্দার উপরকার পুলের কাছাকাছি উপস্থিত হবার পর। বীরে উপর দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হ'ল যে আমার হাড় বুঝি

মট করে ভেঙে যাবে—এতই উচু সেদিকের পাছাড়। বিশ্বাসই হয় না যে ঐ পাছাড় থেকেই এইমাত্র নদীর ঘাটে নেবে এলাম আমি।

ওপারে চার্মোলি। মনোরম পার্কভা শহর একটি।

পূর্বে নাম ছিল লালসান্না। অলকনন্দার উপরে যে পুলটি পার হয়ে ওপারে শহরে গিয়ে উঠতে হবে সেটির রং তখন আগা-গোড়া লাল ছিল বলেই শহরের নামও ছিল লাল “সান্না”, মানে পুল। পুলের লাল রং এখন আর নেই, লাল নামও এখন নেই শহরের। ভালই হয়েছে। আমাদের দেশের “লাল”দলের শাখা এখানেও যদি থেকে থাকে তবে তা অন্ততঃ টকটকে লাল রং বা লাল নামের অতিরিক্ত সম্মর্দন ও সহযোগিতা পাবে না।

দেবপ্রসাদের চেয়ে অনেক বড় শহর চার্মোলি—দোকান-পশার, আপিস, আদালত, ধর্মশালা, হাসপাতাল নিয়ে বেশ জমজমাট। মাকের থাকে কাঁচকা অকলে পণ্যের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে ধরা পড়ে।

জিতেনের তর মর না—তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে বাস ঘরবার ইচ্ছা তার। কিন্তু আমার অঙ্গ প্রবৃত্তি—গৃহস্থালীর শৃঙ্গ ভাণ্ডায় আবার পূর্ণ করতে চাই আমি। স্তত্রাং সবিনয়ে জিতেনকে নিবৃত্ত করার পর বাজারে খুঁজে খুঁজে লঙ্ঘল, মিছরি, বিস্কুট ত বটেই, হুন, তেল, হলুদ, মশলাও কিনলাম ধরে ধরে। কলে বোঝা যে বাড়ছে সেদিকে খেয়ালই নেই আমার।

অত সব জিনিস যে খেলেটির মধ্যে রাখা হবে সেটির খোজ করতে গিয়েই ধরা পড়ল যে বাহাদুর আমাদের সঙ্গে নেই।

আমি ঘণ্টাখানেক পর উপরে বাস-সড়কের ধারে গিয়ে দেখা পেলাম তার। টিকেট ঘরের পাশে আমাদের মোটরঘাট শুকিয়ে বেখে কাছাই ছায়ায় বসে আর একটি কুলির সঙ্গে গল্প করছিল সে। একটু ধমক দিলাম তাকে আমাদের না জানিয়ে সোজাসুজি সে উপরে উঠে এসেছে বলে; তার পর ষা'বাদের ঠোঙাটি তার হাতে দিয়ে বললাম চটপট খাওয়া সেবে নিতে।

সে কিন্তু অমন লোভনীর ঠোঙাটিও এক পাশে সরিয়ে বেখে কুণ্ঠিত হয়ে আমাকে বললে, একটা ঠিকানা লিখে দেবেন, বাবুজী? চিঠি আমি আর একজকে দিয়ে লিখিয়েছি। বলতে বলতে তার ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে সে একখানা পোষ্টকার্ড দেখাল আমাকে। ভিজিবিজি কি বেন লেখা আছে তাতে—কেবল ঠিকানায় ঘরটাই খালি।

কাঁদখানা আমি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে : কাকে চিঠি লিখলিস?

উত্তরে দেখি কথাই কোটে না তার, শুধু চোখ হুটই নয়, মুখ-খানাও নীচু করে অশ্রুতরয়ে বা সে বললে তার মধ্যে কেবল ‘জীনগর’ নামটাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারলাম আমি।

তবে ঐটুকুই শুনেই মনে পড়ে গেল আমার—আসবার পথে



ঐ জীনগরেই বাহাদুরকে আমরা দেখেছিলাম তার বাক্যস্তা বধু কল্পিত এবং তারই মাতাপিতার সঙ্গে স্থানীয় এক বড়ী বাড়ীর প্রাক্ষে। বাহাদুরের হাতকা মুণে নারীমূলত লজ্জার লালিমার অর্থও সঙ্গে সঙ্গেই বোধগম্য হ'ল আমার। স্ততরাং মুচকি হেসে বললাম : কল্পিতকে চিঠি লিখছিল নাকি ?

প্রশ্ন শুনে স্পষ্টই সে আরও বেশী বিব্রত হয়ে থাকলেও এবার সম্পূর্ণ উত্তরই দিল সে : না, বাবুজী। তার বাপ দলবাহাদুর শুদ্ধকে।

ও একই হ'ল। স্ততরাং মনে মনে খুশী হয়েই তার কর্মমাজ তামিল করলাম। তবে বেশ সময় লাগল ঐটুকু ঠিকানা লিপিতে। বাহাদুরের কোন উচ্চারণই তেমন স্পষ্ট নয়। হ' তিনবার শুনেলে তবে এক-একটি শব্দ বোধগম্য হয় আমার। স্ততরাং ঠিকানার ভুলে এমন মূঢ়্যবান চিঠিখানাও ডাকঘরেই বাতে পঞ্চ না পার সে-জন্ত সম্পূর্ণ ঠিকানাটি হাতেব কাছে টুকরা কাগজের অভাবে আমার নোট বইতে প্রথমে টুকে নিয়ে পরে তাই নকল করে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম পোষ্টকার্ডের পিঠে। তার পর কার্ডখানি ব্যঞ্জে ফেলে দেবার জন্ত বাহাদুরের হাতে দিয়ে আবার তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : কল্পিতের জন্ত তোম মন খুব উত্তলা হয়েছিল নাকি ?

উত্তর না দিয়েই পালিয়ে গেল বাহাদুর—মানে, ছুটে গেল অদূরে পোষ্ট আপিসের দিকে।

নিচে দুদীর আর মনোহারী দোকানে সন্ধ্যা শেষ করার পর বাহাদুরকে কাছে না দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তখনই তাকে খুজি বের করার তাগিদেই চেয়েও আরও কড়া একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম আমি আমার নিজের মধ্যেই। একটানা প্রায় নয় মাইল পথ হেঁটে আসবার পর পেটের মধ্যে তখন মাউ মাউ করে আগুন জ্বলছে। দুপুরে কোথায় গিয়ে কখন যে বাজা করতে পারব তার ঠিক নেই। স্ততরাং ঐ চামোলির বাজারেই তখনই পেটের আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হ'ল।

মিষ্টির দোকানের অভাব নেই ওখানে। পেড়া ও লাড়ু জাতের মিঠাই খেয়ে খরে সাজান রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। মালাই-সহ গরম ছধ সব দোকানেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুধের চেয়ে দুইয়ের উপর বেশী আসক্তি আমার। খুজতে খুজতে তাও পাওয়া গেল। সেই দোকানে বসেই দুজনে পরিপাটি ভোজন সযাধা করলাম। এখন সিঁড়ির মত পথ বেয়ে উপরে বেতে হবে বাস-সড়ক পর্যন্ত।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই খচ করে উঠল আমার ডান পায়ের গুলফ-সজ্জ্ব কোন একটা জায়গায়। বতবার পা ফেলি ততবারই তাই। চলতে চলতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানাম একটু। বুঝলাম যে স্থির হয়ে দাঁড়ালে কোন কষ্ট বোধ হয় না, কেবল চলতে গেলেই কন

কন করে জায়গাটা। আমার পক্ষে যত জোরে চলা স্বাভাবিক তত জোরে চলা এখন দেখছি একেবারে অসম্ভব।

শেষে অবস্থাটা জানালাম জিতেনকে। সে জিজ্ঞাসা করল, পা মচকার নি ত আপনায় ?

মনে করতে পারলাম না। চলতে চলতে নিশ্চয়ই পাখরের কাকে অনেকবার পা আটকে গিয়েছে, গোড়ালীর সন্ধিস্থলটা বঁকেও গিয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে, কোথাও আঘাত লাগল তাতে। আর বাধা অনুভব করলাম ত এই প্রথম—দোকানঘরের দিবা সমতল বারান্দায় বেকির উপর আরামে পা ঝুলিয়ে বসে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন সযাধা করার পর।

জুতা মোজা খুলে ডান পায়ের পাতা ও গুলফ দু'জনেই অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলাম। দেখা গেল যে একটু কোলা আছে গোড়ালীর ডান দিকে। তবে জিতেনের চোখে তা অস্বাভাবিক ঠেকলেও আমি নিরুদ্ভিগ্ন। অনেক বৎসর পূর্বে এক দুর্ঘটনার আহত হয়ে হ'সপাতালে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল আমাকে তুটি পাহেরই নানা জায়গায় ছেঁড়া চামড়া জোড়া লাগাবার জন্ত। কেটে গিয়েছিল ডান পায়ের গুলফ অঞ্চলের মোটা চামড়াও। যা শুকাবার পরেও বিশেষ ঐ জায়গাটা একটু ফুলেই রয়ে গিয়েছে। বাধা বা অগ্র কোন উপসর্গ গত পনের বৎসরের মধ্যে ওখানে একবারও প্রকাশ পায় নি বলে ঐ জায়গায় সাহসজ্ঞ ক্ষীতিক্রমে মোটেই অস্বাভাবিক মনে করিনি আমি।

তবে এখন যে হাঁটতে গেলেই লাগছে ঐ জায়গাটাতে তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্ততরাং ওদুধের ছোট বস্ত্রটি খুলতে হ'ল। টিচার আইডিনের শিশি দেখি শূন্য—ছিপির ফাঁক দিয়ে ইতিমধ্যে তরল পদার্থটুকু অদৃশ্য হয়েছে। তবে আরোডেক্স মলর পাওয়া গেল একটা অক্ষত ডিবাতে। তখনই বাধার জায়গায় তাই একটু মালিশ করে গোড়ালীর চারিদিকে হাল্কা একটা বাণ্ডেজ বেঁধে দিল জিতেন। তার পর সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, উপরে গেলেই বাস পাওয়া যাবে, মনিদা। আর সামনের বাস-স্টেশন পিপুলকুঠি পর্যন্তই আজকেই প্রোগ্রাম আমাদের। অষ্টকটা দিন আর পুরা এক রাতের বিশ্রামে আপনায় পায়ের বাধা সেবে যাবে আশা করি।

সেটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। আপাততঃ উপকার পেলাম অগ্র একটা উৎস থেকে। ডান পায়ের কাজটা বধাসকর হাতের লাঠিকে দিয়ে করিয়ে উপরে গিয়ে পৌছবার পথেই তখনকার যত ভুলেই গেলাম বাধাটাকে—নূতন থোরাক পেয়েছে আমার মন।

উপরে আরও জয়জয়মাট। পথের ধারেই পাশাপাশি কয়েক-খানা দোতলা বাড়ী। নূতন সরকারী বিশ্রামভবন যেটি নির্মিত হয়েছে সেখানে ত রাজপ্রাসাদ। সারি সারি বাড়ী ও বাস-সড়কের মাঝখানে ফুটপাথের মত বে দীর্ঘ ও প্রশস্ত জায়গা আছে সেখানে। বাস-কোম্পানীর টিকেট ঘর ও প্রতীক্ষালয় ছাড়াও পান-সিগারেটের

টল, মিষ্টির দোকান ও একটি বীতিযুক্ত হোটেল আছে দেখলাম। সড়কের উপর লম্বা এক সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে; বাস আসছে ও ছাড়ছেও পাঁচ-দশ মিনিট পরে পাবেই। ঠিক গিজগিজ না করলেও লোকজন এখানে অনেক। ব্যস্তসমস্ত ভাব সকলেরই। সব মিলিয়ে হৈ হৈ, বৈ বৈ কাণ্ড।

চান্দনী-চক থেকে চৌরঙ্গির মোড়ে এসে পড়লাম যেন—অন্তমনস্ত ত হবই।

কেবল বিশ্বাস্তি নয়—নূতন এবং বেশ মূল্যবান এক প্রাপ্তির উপলব্ধি যেন আমার মনে।

যেন জলের মাছ ডাঙার পড়ে অনেকক্ষণ ছটকট করবার পর আবার জলে এসে পড়েছে।

বাস-এ উঠে ডাইভারের পাশের ছটি আসন দুজনে দখল করে বসেই জিতেনকে আমি বললাম, একটা সিগারেট দাও ত।

জিতেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বিড়ি ছেড়ে তঠাং সিগারেট বে?

হাসিমুখে উত্তর দিলাম: বর্করতা থেকে সভাতায় কিংবে এসেছি—উৎসব করতে হবে না!

কিন্তু উৎসব বলতে কেবল ত এই জঙ্গল সিগারেটটি ফুঁকে ফুঁকে ধোয়াতে পরিণত করা। গাড়ী ছাড়তে দেবি থাকলে কি হবে—পায়ের বাধা নিয়ে অকারণে হেটে চলে বেড়াবার সংস্কার হয় না। সুতরাং বাধাতামূলক এই অবসরের ঠাকটুকুকে তার কোনবকম সক্রিয় উৎসব দিয়ে ভরতে না পেলে গাড়ীতে বসেই অলস-দৃষ্টিতে লোকজনের চলাফেরা দেখে উৎসব করবার দুধের স্বাদ খোলেই যেটা ছিলাম আমি।

সেই কৃষ্টিও আমার জনতার মধ্যে বিশেষ একজনের মুখের উপর গিয়ে পড়বার পর একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

গেকুয়া হাডের আলখাল্লা-পর্য্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। শীর্ণ-দেহে জরায় চেরেও যোগের নৌরাত্নের চিহ্ন বেশী দেখা যায়। মাথার চুল ও মুখমণ্ডলের দাড়ি-গোফ গাত ত-এক দিনের মধ্যেই নির্মূল করা হয়েছে বলে চোরালের উদ্ভূত ছাড় ও মুখের অশ্রুত পাণ্ডুর বর্ণ এত দূর থেকেও বেশ চোখে পড়ে। কিন্তু তা ছাড়াও অস্পষ্টভাবে আরও কি যেন দেখছি আমি। চেনা-চেনা ঠেকছে সন্ন্যাসীর মুখখানি।

বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস। একটু পরেই মনে হ'ল যে, তিনিও আমাকে দেখছেন। তার পরেই চোখাচোখি দুজনের।

বিস্তৃতভাবে চোপ কিরিরে নিলাম আমি। কিন্তু মন আমার ক্রমাগতই বলছে যে, এই সন্ন্যাসীকে কোথায় যেন দেখেছি আমি। চুপি চুপি জিতেনকে বললাম আমার সন্দেহের কথা। তার পর দুজনেই একসঙ্গে তাকালুম তাঁর দিকে। তখনও দেখি যে, তিনি চেয়েই আছেন আমাদের দিকে।

বিশুদ্ধ অভিনিবেশ সহকারে তাঁকে লক্ষ্য করবার পর জিতেনও

স্বীকার করল যে, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তারও; কিন্তু কোথায় যে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তা ঠিক ঠিক মরণ হচ্ছে না তার।

তবে মরণ করবার জন্ত আর বেশী চেষ্টা করতে হ'ল না। আমাদের দুজনে একসঙ্গে দেখেই সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আমাদের বাস-এর কাছে এসে নিজেই হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মুঝকো নহী পহচানতে হো?

গলার স্বরও চেনা-চেনা। তথাপি ঠিক মনে পড়ছে না ত? সুতরাং কুঠিত হয়ে বললাম, ঠিক কোথায় যে দেখেছি আপনাকে—

অবিকশমে—আমার মুখের কথা শেষ হবার পূর্বেই বললেন সন্ন্যাসী: উসসে ভী আগে হরদোয়ারবে।

স্মৃতির দ্বার অম্বাদের সন্ধে খুলে গেল। জিতেন উল্লসিত হয়ে বললে, ঠিক—ঠিক মনে পড়েছে এখন। অবিকশে গলার ঘাটে দেখা হয়েছিল আমাদের। আপনার নাম স্বামী সত্যানন্দ আশ্রম না?

স্মিতমুখে ঘাড় কাঁচ করলেন সন্ন্যাসী। অ'র তখন সব কথাই আমারও মনে পড়ে গেল। এই সন্ন্যাসীর নিজের মুখ থেকেই শুনেছিলাম এর বার্থগাধনার করুণ ইতিহাস। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে এক আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইনি সাধন-ভজন করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে তিনি না পেরেছেন ঈশ্বর, না মাতৃষ। ভগ্নস্তন্যে সে আশ্রম থেকে বেগ হয়ে এসে পরিভ্রাজক হয়েছেন। বলেছিলেন যে, তাঁর চেষ্টাও আছে নিজস্ব একটি আশ্রম করবার।

সন্ন্যাসীর এই ইচ্ছার কথা শুনে জিতেন সেদিন আমার কাছে তাঁকে বিক্রম করেছিল। পাছে এখনও সন্ন্যাসীর মুখের উপরেই আবার তেমনি কোন বোঁস কথা বলে ফেলে সে, সেই আশঙ্কায় আমি অলক্ষ্যে জিতেনের গা-টেপে সতর্ক করে দিলাম তাকে। তার পর সন্ন্যাসীকে বললাম, আপনি না গোরালিরে আপনার এক শিষ্যের কাছে যাবেন বলেছিলেন।

শুনে সন্ন্যাসী শ্রীত হয়েছেন মনে হ'ল আমার। একটু ফেসেই তিনি বললেন, সে কথাও মনে আছে তোমার? কিন্তু, বাবা, মনে মনে মধুবা-বৃন্দাবনই বাওয়া চলে। গোরালিরে যেতে অর্ধের প্রয়োজন হয়। একে কপর্দকহীন পরিভ্রাজক সন্ন্যাসী আমি, তার আবার অস্ত্রধে পড়েছিলাম। বদরীনাথ থেকে নেবে বোশীষ পর্ব্বান্ত আসবার পর একেবারে চলৎশক্তিহীন অবস্থা আমার। সেখানেই পড়েছিলাম কয়েক দিন।

শেষের দিকে স্বতঃই বিষম কঠোর। মুখখানাও দেখি যে লান হয়ে গিয়েছে।

আমার ভাব সেইজন্তই কুঠিত; কিন্তু একটা বলবার জন্তই বললাম, তার পর? এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ত?

না বাবা।

তবে

আমার ঐ প্রশ্ন শুনেই তৎক্ষণাৎ একেবারে বেন বদলে গেলেন সন্ন্যাসী। চোখমুখ তাঁর দেখতে দেখতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎক্লেশকে তিনি বললেন, সুস্থ না হলেও এখন আর কোন হুঁচকানো নেই আমার। ভগবান আমাকে আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছেন—একেবারে অন্নপূর্ণার কোল।

আমি বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে।

তিনি উত্তরে বললেন, ঐ হা। বললাম ঠিক তাই। না, না বাবা—তার চেয়েও বেশী। একসঙ্গেই অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মী দুজনেই কোল দিয়েছেন আমাকে। এখনও ত মাথের কোলেই রয়েছি আমি।

বলে কি সন্ন্যাসী—ইনি প্রকৃতিস্থ আছেন ত!

নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাবেও মনের স্নেহ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং সন্ন্যাসীর চোখ এড়ায় নি তা। হাসতে হাসতে তিনি আবার বললেন, না বাবা—আমি রুগ্ন হলেও পাগল হই নি। তোমরা ত তাদের দেখ নি। দেখলে তোমরাও মানবে যে, কৈলাসের অন্নপূর্ণা ও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী রূপ ধরে এসেছেন আমার কাছে। আমি একসঙ্গেই পেয়েছি মা ও ঘরে। তাঁরাও সম্পর্কে তাই—জননী আর কণ্ঠা।

চমকে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি জিতেনের মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম যে, সেও আমার মতই চমকে উঠেছে। পুনরায় স্বামীজীর মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমি বললাম, আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন ত।

বুঝিয়েই বললেন তিনি, তবে হাসিমুখে আর নয়। গভীর হয়ে গভীর হয়ে তিনি বললেন, সব কথা কি বুঝিয়ে বলা যায়, বাবা? না, নিজেই বুঝতে পারে কেউ? বোম্বাইয়ের এক চটির বায়ান্দার চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন আমি। কত ব্যাক্তি ওখান দিয়ে এল গেল—আমার দিকে চেয়েও দেখল না কেউ। কিন্তু পরন্তু দুপুরের দিকে বদনীনাথ দর্শন করে বোম্বাইয়ের নেমে এলেন সেই মা আর তাঁর ঘরে। আমার হুঁচকানো কথা শুনবার পরেই একেবারে কোল পেতে দিয়েছেন তাঁরা। আমাকে কাণ্ডিতে বসিয়ে এনেছিলেন পিপুলকুঠি পর্যন্ত। তার পর ত মোটরের পথ। সহায়ক করে তাঁদের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। বলতে বলতে সন্ন্যাসীর চোখের কোলে বেন জল দেখা দিল।

কিন্তু গুনতে গুনতে আমার বুকের মধ্যে মনে হ'ল বেন ঝড় উঠেছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার আমি তাকালুম জিতেনের মুখের দিকে। কিন্তু তার পূর্বেই জিতেনের চকল চোখ দুটি গিয়ে পড়েছিল বাইরের জনতার উপর। আমি তার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অহুসরণ করবার পূর্বেই উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠল সে : আর স্নেহ নেই, মনিদা—ঐ ত মাসীমা।

আর একটু চোঁটা করতেই আমিও স্পষ্ট দেখলাম—টিকেট-ঘরের পাশে ঠাঁড়িয়ে পড়াবীর জননী তাঁর দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে কি বেন পাতি পাতি করে খুজছেন।

জিতেন আমাকে একটি চোঁটা দিয়ে আবার বললে, মনিদা, অন্ততঃ এ গাড়ীতে আমাদের বাওয়া হবে না।

বুঝা যে চোখে ভাল দেখতে পান না তা অবশ্য আমার অজানা নয়। কিন্তু তাই কি একমাত্র, এমন কি প্রধান কারণও হতে পারে তাঁর ঐ আচরণের?

একসঙ্গেই তিনজন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু আমাদের হৃদয়কে বেন দেখতেই পেলেন না তিনি। আর যে সত্যনিদ্রা আশ্রমের সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয় তাঁর, সেজ্ঞা তাঁরই দিকে তু-পা এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, আমাকে বলে আস নি কেন, বাবা? তোমাকে খুজি খুজি আমি যে এদিকে হরষাণ।

সত্যনিদ্রা কুণ্ঠিত হাসিমুখে উত্তর দিলেন : দূরে কোথাও বাই নি ত আমি। মিছামিছি মাতাজী, কেন আমাকে খুজতে বেব হয়েছ?

উত্তর হ'ল : খুজব না! তোমাকে কি বাবা বিশ্বাস আছে! একবার নিজের ঘর থেকে পালিয়েছ তুমি, দ্বিতীয়বার আশ্রম থেকে। আমার কাছ থেকেও আবার যে তুমি পালিয়ে যাবে না তা আমি মানি কেমন করে!

আশ্চর্য! সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলাম আমি। কেনারের পথে কতবার কত কাছে থেকেই ত এই মতিলাকে দেখেছি আমি। তাঁর মুখে মিস্তি কথাও নিশ্চয়ই শুনেছি। তবু তখন অধিকাংশ সময়েই একে আমি দেখতাম বেন বিমর্ষ, না হয় উদাসীন। কিন্তু আজ দেখছি একেবারে ভিন্ন মূর্তি তাঁর। সত্যনিদ্রার সঙ্গে তিনি কথা বললেন ভাস্কর্য্য ভাষায়, কিন্তু কণ্ঠ থেকে তাঁর মধু বেন ঝরে পড়ছে। বৃদ্ধার সালাটে নিশ্চল চোখ দুটি এখন মনে হয় বেন চক্-চক্ করছে।

সেই মুখের দিকে চেয়ে সত্যনিদ্রা উত্তরে হাসিমুখে বললেন, মাক কব, মাতাজী। দূরে বাবার ইচ্ছাই ছিল না আমার—ঘর থেকে বাইরে এসে চটির সামনেই ঠাঁড়িয়েছিলাম আমি। হঠাৎ এই হৃদয় চেনা লোককে দেখে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম কথা বলতে। গিয়ে শুনি যে এরাও তোমাকে চেনেন।

বহুবচন ব্যবহার করলেও স্বামীজী আঙল দিয়ে জিতেনকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আর জিতেনও পূর্ণাঙ্গই বৃদ্ধার দিকে তু-পা এগিয়ে গিয়ে সহাস্রকণ্ঠে বললে, কেমন আছেন, মাসীমা? চিনতে পারছেন ত?

বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঐ সত্যনিদ্রার।

তুল করেছিলাম আমি, মনে মনে একটু অবিস্ময়ই করেছিলাম বৃদ্ধার প্রতি। আমাদের তিনি মোটেই উপেক্ষা করেন নি—আসলে দুজনের কারও উপর এতক্ষণ চোখই পড়ে নি তাঁর। এখন প্রথমে জিতেনকে এবং পরে আমাকে চিনতে পেয়েই উৎক্লেশ হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, এই যে তোমরাও এসে গিয়েছ দেখছি!

কি ভাগ্য আমার যে, আবারও তোমাদের দেখা পেলাম। তা কোন দিক থেকে এলে তোমরা? বদরীনাথ দর্শন করে ফিরে এলে নাকি? না তবে চলছে সে দিকে?

জিতেন তাঁকে বুঝিয়ে বললে আমাদের অবস্থা, এক সপ্তাহ বনবাসের মোটামুটি কাহিনীও। শুনে বৃদ্ধা বললেন, তাই বল। সেইজন্যই ত পথে আর আমাদের দেখা হ'ল না।

মাথাটাকে হুলিয়ে হুলিয়ে, টেনে টেনে কথাটা বললেন বৃদ্ধা। তার পর একবার আমার ও একবার জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলেন পরম আত্মীয়ের মত।

অগত্যা আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গোত্রী কোথায়?

শুনে বেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন বৃদ্ধা। যেন মস্ত একটা অপরাধ করে ফেলে তার মস্ত মার্জনা চাচ্চেন এমন ভঙ্গিতে তিনি বললেন, এই দেখ কি ভোলা মন আমার। আসল কাজটাই কেলে রেখে আগড়-বাগড় বকে বাছি। গঙ্গোত্রী যাবে আবার কোথায়—চটির ঘরে বসে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করছে। চল, চল তার কাছে। পথে কতবার যে সে তোমাদের কথা বলেছে।—

চুপচাপ থেকে এক ধাপ নিচেই ছোট একটি দোতলা বাড়ীর কাছে গিয়ে গলা চড়িয়ে তিনি ডাকলেন : গঙ্গোত্রী, ও গঙ্গোত্রী—আও বেটি। দেখো কির কিসকা দর্শন মিল গয়া।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল দোতলার বারান্দায় গঙ্গোত্রীর পরিচিত মুখখানি। পরক্ষণেই আমার কানে এল তাঁরও উল্লসিত কণ্ঠস্বর : আঃ হাঃ—চাচাজী আ গয়ে! কিতনা ভাগ্য হায় মেয়া। বদরীনাথজীকী কুপা। নহী ত কির ভেট কার্যসে হোতা। হম ত অভী চলবহী খী।

বলতে বলতে তার তার করে নিচে নেমে এলেন তিনি।

জিতেনের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই আবারও উচ্ছসিত সম্ভাষণ গঙ্গোত্রীর : রহ দেখিয়ে—লভন ভাইয়া ভী আজ মাধহীয়ে হায়, তব হনুমানজী কঁহা জায়েগা। বহুত ভাগ্য হায় মেয়া—কির সবকা দর্শন মিল গয়া।

নির্মূল কোড়ুক আর আন্তরিক আনন্দ বেন উৎসলে পড়ছে গঙ্গোত্রীর চোখ দুটি থেকে; হাসি তাঁর সারা মুখেই। জিতেনও উৎফুল্ল; হাসছে আমাদের বাহ্যহৃদয়।

দোতলার ঘরে গিয়ে দেখি যে তাঁদের জিনিসপত্র পরিপাটি করে ভুজিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাজার আয়োজন সম্পূর্ণ। তবু কোটখারের বাস ছাড়তে ঘণ্টাভরেক দেহী আছে শুনে মেঝের উপর গোল হয়ে বসলাম আমরা। প্রথমেই গঙ্গোত্রীর মুখে তনুলাম তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনী। আমরা বা অজ্ঞান করেছিলাম তাই ঘটছে—মোটেরে পথে চলেছেন বলেই এরই মধ্যে বদরী-বিশাল দর্শন করে আবার এই পর্য্যন্ত কিরে আসতে পেরেছেন তাঁরা।

গঙ্গোত্রীর জননী মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : বদরীনাথজীকে কেমন দেখলেন?

শুনেই হুই হাত জোড় করে উদ্বেগে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। আমার প্রশ্নের ঐ তাঁর উত্তর। কিন্তু গঙ্গোত্রী হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার, চাচা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দর্শন করলেও হ'লন যাজী এক বকম দেখে না বদরী-বিশালকে। মা বলেন যে তিনি বিষ্ণুজী দর্শন করেছেন, স্বামীজী মহারাজ দর্শন করেছেন শিবমূর্তি।

মনে কোঁড়হলেয় চেয়ে কোঁড়কই বেশী জাগে এককম কথা শুনলে। স্মরণ্য আমি গঙ্গোত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললাম, আর তুমি কি দর্শন করলে?

শুনে শব্দ করেই হেসে উঠলেন গঙ্গোত্রী, আর সেই হাসির ফাকে ফাকে বললেন, আমার, চাচা, পাশ-চোখ। আমি দেখলাম কেবল কিয়ট-কবচ-কুণ্ডল—সোনাদানা মণিমুক্তার বাহার।

হাসি হাসি মুখে আমাদের আলাপ শুনছিলেন স্বামী সত্যানন্দ, এবার তিনি মন্তব্য করলেন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে : 'বাদৃশী ভাবনার্ত্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল জিতেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, তা হলে মণিদা সেখানে গেলে দেখবেন যে প্রকাণ্ড একটি কড়াতে আলু-কাঁচকলার ডালনা রাখা হচ্ছে।

গঙ্গোত্রী দ্বিধা বিম্বিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছেন দেখে জিতেন হাসি একটু কমিয়ে তার সব সম ভবিষ্যদ্বাণীর আরও সব ব্যাখ্যা শুনিতে দিল সকলকে : একটুও বাড়িয়ে বলিনি আমি। তীর্থে এলে কি হবে। মণিদা ত দিনরাত কেবল রান্না আর খাওয়ার কথাই ভাবছেন। এই চামোলিতে ঢুকেই উনি এক ঘণ্টা ধরে প্রায় এক বিয়ের বাজার করলেন—নূতন এক গন্ধমাদন চাপিয়েছেন বেচারা বাহ্যহৃদয়ের পিঠে। তা ছাড়া মণিদার নিজের কোলা খুঁজে দেখুন—দেখবেন যে সেস খানেক কোটা তবকারী আছে তার মধ্যে।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। স্মরণ্য হাসিমুখেই সেটি হজম করে আমি বললাম, ভালনা হউক, ভাল হউক, ভাগ্যে থাকলে তা ত দেখব বদরীনাথের মন্দিরে উপস্থিত হবার পর। আপাততঃ আমার হুঁচকানা অস্ত্র কার্যে। পায়ে এখন যে বকম ব্যাধি বোধ করছি তাতে সামনের জিশ মাইল পাড়ি দিতে পারব কি না, সেই সবকিছুই মনে সন্দেহ আমার।

গঙ্গোত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়ে বললাম ব্যাপারটা। শুনে অভিজ্ঞ জনের মতই আমাকে পরামর্শ দিলেন তিনি : সুকি না নিয়ে পিপুলকুঠিতেই একটি ডাণ্ডি বা কাণ্ডি ভাড়া করবেন, চাচা। আমার যা ত অব গারেও ঐ কাণ্ডির দৌলতেই প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিয়ে এলেন। আর এই স্বামীজী—বোম্বাইর থেকে পিপুলকুঠি পর্য্যন্ত তাঁকে ত কাণ্ডিতেই এনেছি আমরা।

আবার স্বামীজীকে তাকিয়ে দেখলাম আমি; পরক্ষণেই তাকালার সোজা গঙ্গোত্রীর চোখের দিকে।

গল্প করতে করতেও কয়েকবার এমনি নীরবে স্বামীজীর সবচেয়ে

প্রশ্ন করেছি গঙ্গোত্রীকে। এবার বুঝি বুঝতে পারলেন তিনি যে, শুধু এটুকু শুনেই কোঁড়হল আমার তৃপ্ত হয় নি। না হলে ঐ কোঁশলটুকু তিনি করতে গেলেন কেন?

নিজের হাত-বড়িটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই চঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শেষবার আপনার উপর একটু জুলুম করব, চাচা। চলুন আমার সঙ্গে একটি চারের দোকানে। দেখি, একটু স্পেশাল চা আপনারকে খাওয়ারতে পারি কি না।

খাওয়ারটা নেহাতই উপলব্ধ। আমার জানবার ইচ্ছাটা মিটল বাকি দুজনের চোখের আড়ালে বাবার পর।

প্রথমে আমাকেই প্রশ্ন করেছিলেন গঙ্গোত্রী : স্বামীজী মহারাজকে, চাচা, আপনারাও চেনেন নাকি?

বাড় নেড়ে স্বীকার করলাম দেবে গঙ্গোত্রী আবার জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় দেখা হয়েছিল আপনারদের?

উত্তর দিলাম, হরিদ্বারে। একটি আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানেই এই স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

কথাবাস্তাও হয়েছে নাকি?—আবারও জিজ্ঞাসা করলেন গঙ্গোত্রী?

সত্য উত্তরটা তৎক্ষণাৎ মুখে এল না আমার। এঁরা যাকে সমাদর করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন বলে বুঝতে পেয়েছি তাঁর সম্বন্ধে গঙ্গোত্রীর মনে কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে চাই নে আমি। সত্যতা এবারও গোপনে জিতেনের গা টিপে তাকে সতর্ক করে দিয়ে গঙ্গোত্রীকে আমি বললাম, অতি সামান্য—সাদু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে।

তার পর অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তোমরা শুকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ যে?

উত্তরে গঙ্গোত্রী যেন লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি কেন? ও পেরাল ত আমার মাতের।

চমকে উঠলাম আমি। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ঐ গঙ্গোত্রীর মুখ থেকেই তাঁর জননীর যে অসুস্থ অবস্থার বর্ণনা আমি শুনেছিলাম যে, স্বামী তাঁর মৃত, তাঁকেই সন্ন্যাসীর সাজে জীবন্ত কিংবা পায়ের অদম্য ও অসংশোধনীর আকাঙ্ক্ষার কথা। সন্দেহ জাগল আমার মনে—বুড়ার সেই আকাঙ্ক্ষাই তৃপ্ত হয়েছে নাকি এই সত্যানন্দ আশ্রমকে দেখে?

কিন্তু গঙ্গোত্রী দৃঢ়ভাবে স্বীকার করলেন তা : না চাচাজী। অতটুকু জানবুড়ি আমার মাতের এখনও আছে। তবে তাঁর মনের আর একটি দুর্বল দ্বার খালা দিয়ে ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছেন স্বামীজী।

আমার মনের মধ্যে উল্লস কোঁড়হল সঙ্গেও নির্বাক আমি।

কোন উত্তর না পেয়ে গঙ্গোত্রীই আবার জিজ্ঞাসা করলেন :

স্বামীজী মহারাজ তাঁর নিজের কথা আপনারকে কিছু বলেছেন নাকি?

গঙ্গোত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলাম আমি : একবার বুঝি শুনেছিলাম যে, নিজস্ব একটি আশ্রম করার ইচ্ছা আছে স্বামীজীর।

আর কোন কথা? ওর পূর্বজন্মে কোন সংবাদ?

গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে আগ্রহের সুর। কিন্তু আমি নিজে ঐ কথাটাই বলতে চাইনে তাঁকে। মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করতে না পেয়ে বাড় নেড়ে স্বীকার করলাম।

বোধ করি সেই ভুলটাই আরও মন খুলে বললেন গঙ্গোত্রী : আমরা শুনেছি ভারি অদ্ভুত মাহাত্ম্য উনি। আপন জন সকলকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে ঢুকছিলেন গিয়ে এক আশ্রমে। কিন্তু সেখানে অ'র ভাল লাগছে না স্বামীজীর। অথচ নিজের বাড়ীতেও কিংবা বাবার মুখ নেই তাঁর।

গঙ্গোত্রীর মনের মধ্যেই বলবার তাগিদ হচ্ছে বুঝে আমি চুপ করেই অপেক্ষা করেছিলাম। ঐধর্মের পুণ্যের হাতে হাতেই পেয়ে গেলাম। কতক সেকেন্ড চুপ করে থাকবার পর ফিক্ করে হেসে ফেললেন গঙ্গোত্রী : হাসতে হাসতেই বললেন : উনি কি বললেন, জানেন চাচাজী? বললেন যে, যে জী-সজ্জানকে বঞ্চিত করে নিজের প্রতিভেট ক'ণ্ডের সব টাকাও উনি আশ্রমে দান করেছেন এখন আশ্রম থেকে বিজ্ঞহস্তে পালিয়ে এসে আবার সেই জী-পুজের কাছেই উনি কোন মুখে ভবগোষণ দাবি করবেন?

বোগাস (bogus) —

হঠাৎ জিতেনের তিক্ত কণ্ঠস্বর কানে এল আমার। অবিকশেণে সমালোচনার ঠিক এই কথাই ব্যবহার করেছিল জিতেন। আর তেমনি তিক্ত এখনও তাব কণ্ঠস্বর। বুকলাম যে, বার্থ হয়েছে আমার সতর্কবাণী—জিতেনের মনের কথা সংযমে অর্গল ভেঙে তার মুখে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য! ঐ সমালোচনারই প্রতিক্রিয়া গঙ্গোত্রীর আচরণ ও কথায় বা প্রকাশ পেল তা সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখি যে, নিজের প্রগলভতার জগৎ নিজেই বুঝি লজ্জিত গঙ্গোত্রী—অসুতাপের সঙ্গে করুণারও উদয় হয়েছে তাঁর মনে। আত্মতের মত জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিবাদের ভাষা করুণ সুরে প্রকাশ করলেন তিনি : না ভাইয়া, তা নয়। আমি বলি যে, ট্রাজিক (tragic)—বড়ই করুণ স্বামীজী মহারাজের বার্থ জীবন।

ওতো আমারই মনের কথা—অবিকশে গঙ্গার বাটে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী শুনবার পর ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল আমার। গঙ্গোত্রীর মুখে আমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে আমি স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে বললাম, ভূমি ঠিকই বলেছ মা, আমারও তাই মনে হয়।

বিশ্বব্রহ্মের উপর বিশ্বাস—গঙ্গোত্রীর ঐ গভীর মানবতাবোধের

উৎসও পরক্ষণেই উদ্ঘাটিত হ'ল। সমবেদনার করণ মুখধানিতে বিধর একটু হাসি কুটরে গঙ্গোত্রী আমার মুখে দিকে চেয়ে বললেন, স্বামীজীকে দেখবার পূর্ব থেকেই গুরুদেবের আর একটি ঘটনা বার বার মনে পড়েছে আমার।

সেই বহানু চটির কাছে দাঁড়িয়ে বা কবেছিলেন গঙ্গোত্রী এবার আর তা কবলেন না তিনি—হিন্দী পড়ে ভাব প্রকাশ করে বাংলা পড়ের ভাষা ও হিন্দী খুঁজে বের করতে বললেন না আমাকে। নিজেই তিনি আবৃত্তি করলেন :

“যবেও নহে পারেও নহে যে জন আছে রাখখানে

সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তাবে।”

সেই আর একদিনের মতই ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, সে দিনের মতই কুঠিত মুখের ভাব গঙ্গোত্রীর। কিন্তু আমি দেখছি বেন যন্ত্রক্ষির প্রভাবে সেই কুঠিত মুখখানিও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বোধ করি আমার চোখের দৃষ্টিতে উজ্জ্বলিত প্রশংসা লক্ষ্য করেই গঙ্গোত্রী বিস্মৃতভাবে চোখ নামিয়ে নিলেন, লজ্জিত স্বরে তিনি বললেন, কি জানি, ঠিক আবৃত্তি হ'ল কি না। সেই কতকাল আগে পড়েছিলাম আমার এক বাঙালী সখীর কাছে। ইদানীং তা একেবারেই চর্চা নেই—ভুলেই গিয়েছি সব।

উত্তর দেবার সুযোগই পেলাম না আমি। ভিত্তন উজ্জ্বলিত কণ্ঠে বললে : চর্চা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ভাষা বা আপনি মনে রেখেছেন, আমি বাঙালী হয়েও তা পারি নি। লাইন দুটি আমার একেবারেই মনে ছিল না, যদিও আপনার মুখে শুনবার পরেই বুঝতে পেরেছি যে, কোন দিন সম্পূর্ণ কবিতাটিই নিশ্চয়ই পড়েছিলাম আমি।

ও মন্তব্যের উত্তর দিলেন না গঙ্গোত্রী। বৎ সলজ্জ আনন্দের যেটুকু রক্তিম। তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠেছিল সেটুকু চোঁটা করেই মুছে কেলে আগের কথাই স্মৃতি ধরে তিনি বললেন : সত্যি, চাচা,—স্বামীজীর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে। তাকালেই মনে হয়—ঐ যে গুরুদেব লিখেছেন : “দিনের আলো যায় ফুলো সাজের আলো জ্বল না”—ইনিই বুঝি সেই।

এও আমারই মনের কথা। একটি উপসং নির্ধিনিঃস্বাস চেপে রেখে আমি বললাম, বেঁচে থাক, মা। ঘাটের কিনারা থেকে এমন হতভাগ্যকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বড় ভাল কাজ করেছে তুমি।

কিন্তু ও কথার প্রতিবাদ করলেন গঙ্গোত্রী। তবে বড় মধুর সেই প্রতিবাদ। মুখের হাসি লুকাবার জন্তই বুঝি খুব জোরে মাথাটা ঠায় ঝোকে। তিনি বললেন : সে, চাচা, আমি নই,—আমার মা। তিনিই ভেদ করলেন স্বামীজীকে সঙ্গে নেবার জন্ত।

আমি দ্বিতমুখে বললাম : ও একই কথা হ'ল। তার পরের কথাও একটু ভেবেছি কি? একটি আশ্রয় করে দেবে নাকি স্বামীজীকে?

এবার পরিহাসে তবল আমার কণ্ঠস্থ; চোঁটা কবেও শেষের দিকে হাসি চাপতে পারি নি আমি। আমার মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গোত্রীও হাসি হাসি মুখে বললেন : সে কথা আমার মাকে জিগেস করেছিলাম আমি। কিন্তু শুনে যা কি বললেন আপনি অনুমান করতে পারেন তা?

ভাবেই প্রকাশ করলাম যে, পারি নে। তখন গঙ্গোত্রী আমার বললেন : মাকে তখন দেখলে আপনি, চাচা, তাকে চিনতেই পারতেন না। আমিও দেখে একেবারে তাজব বনে গিয়েছিলাম। আমি আশ্রমের কথা বলতেই প্রথমে ত তিনি চটে লাল। কিন্তু তার পরেই একেবারে বললে গেল মায়ের মুখের ভাব। চোঁব-চোঁব খেলতে গিয়ে খেলায় সাধীকে জ্বল করবার জন্ত কাঁচা বরসের মেরেতা চোঁবমুখের হাসি চেপে যেমন কিস কিস করে কথা বলে তেমনিভাবে মা আমাকে বললেন—আমাদের বাড়ীতে ওঁকে নিয়ে বাচ্ছি হুঁদিন আটকে রাখবার জন্ত। গোপনে ওঁর জীকে-হেলেকে খবর পাঠিয়ে দেব। তারা কি খবর পেলে না এসে থাকতে পারবে।

উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হ'ল আমার। কিন্তু স্মিতকণ্ঠে বললাম : উঠ গঙ্গোত্রী। তোমার মাকে প্রণাম করব আমি।

পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করেছিলাম গঙ্গোত্রীর জননীকে। গঙ্গোত্রীর মাথার হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলাম বহন স্বামী সত্যানন্দ আশ্রমকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ী ছাড়বার পূর্বে আমারও নিমন্ত্রণ করলেন গঙ্গোত্রী কোন এক সুযোগে আলমোড়ায় গিয়ে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে।

বিদায়ের বেননা জীবনে এত তীব্রভাবে কষই অনুভব করেছি আমি। শেষের দিকে চুপ করেই ছিলাম। অল্পমনস্ক ভাব আমার। চঠাৎ যে শব্দ শুনে চমকে উঠলাম তা ষ্ট-ট-পাওয়া মোটর ইঞ্জিনের ককশ গর্জন নয়, গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে বেন অলকনন্দ্যর উজ্জ্বল কলকল্লাল।

ভিত্তনের মুখের উপর সঙ্গত একটি কটাক্ষ নিষ্কণ করে গঙ্গোত্রী বললেন : সত্যি, কৈলাস যদি দেখতে যান তবে, ভাইয়া, অবশ্যই আলমোড়া হয়ে যাবেন। ঐ কঠিন পথের সব খবর আপনাকে লিখে দেব আমি। আর আপনাদের মত সাধী পেলে হয়ত আমারও ঝোক চাপবে আর একবার কৈলাস দর্শন করবার।

ক্রমশঃ



## অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

২৬

বিকাল হইতেই গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া যায়, যেরূপা নতুন শাড়ী পরিয়া ব্যস্তভাবে এ-বাড়ী ও-বাড়ী আনাগোনা করে, শিত্তরা কলবব করে, মাঝে মাঝে মাদল বাজিয়া ওঠে। আজ কয় পর্বের শেষ রজনী, সারারাত নাচ ও গান চলিবে। আঙিনায় খাটিয়া টানিয়া তিলকা বসিয়া বৈশি টেপে। বৈশির নেশাটা তাহার একরকম শিশুকাল হইতে, কয়েক মাস আগে পড়িয়া থাকায় সে উহাতে বঞ্চিত ছিল, আজ তাই বারে বারে বৈশি যুখে ফেলিতেছে।

একটুখানি তামাকের পাতা অতি যত্নসহকারে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া বাঁ হাতের তেলোতে রাখে, তার পরে ছোট একটা কোঁটা হইতে একটু চূণ ডান হাতের আঙুলে তুলিয়া লইয়া তামাকের সঙ্গে মিলাইয়া দুই হাতে বহুক্ষণ ধরিয়া উলিয়া মালয়া রসাল করিয়া তোলে। এমন সময় সরযু আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পা ভাঙিবার পরে সরযুকে তিলকা আর দেখে নাই, আজ তাহাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলে, “এ যে পূর্বের স্বর্ণ পশ্চিমে উঠল গো, এস এস, থবব কি বল ?”

সরযু আসিয়া তিলকার পাশে খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলে, “কি বলব ভাই, এতদিন আসতে পারিনি, হাজামার মধ্যে ছিলুম।”

“কি হাজাম! গো ?” আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে তিলকা।

সরযু বলে, “সে অমেক কথা, কি আর শুনবে।”

হাজামাটা যে কি তিলকা তাহা কিছু কিছু জানে। সরযুর বউ এ গাঁয়ের সেতা সুলতানী, ছুতানাতার রাগ করিয়া সে নাইহার চলিয়া যায় আর বউপাগলা সরযু কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করে। এই ব্যাপার হামেশাই ঘটে। হাত হইতে এক টিপ বৈশি তুলিয়া লইয়া সরযুর দিকে আগাইয়া দিয়া হাসিয়া তিলকা বলে, “বউ কোথা গো, এখানে না নাইহার ?”

বৈশিটুকু যুখে ফেলিয়া দিয়া লজ্জিতভাবে সরযু বলে, “পিয়েছিল চলে, কিছুতেই আসতে চায় না, বলে করমার পরে আসব। জান ত ভাই, ঘরে আমার অন্ধ লোক নাই, ও না

থাকলে অচল, তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরণ নিয়ে এসেছি। এনেও ত শান্তি নাই।”

সরযুকে একটা ঠেলা দিয়া তিলকা প্রস্থ করে, “কেন গো ?”

বিস্ত্রতভাবে সরযু বলে, “বাঘনা ধরেছে পর্বব করবে।”

“সে ত ভাল কথা গো।” তিলকা বলে।

একটু গম্ভীর হইয়া সরযু বলে, “ভাল ত বটেই, কিন্তু ব্যক্তি ত কম নয়। নতুন শাড়ী কিনতে হ’ল, বুলি কিনতে হ’ল, কিনলুম সব ধার করে।”

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, “পর্বব করতে হলে খরচ করতেই হবে ভাই।”

সরযু বলে, “আজ আবার বলছে রাঙে নাচবে গাইবে।”

শুনিয়া তিলকা উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বলে, “নাচগান না হলে করমা পর্বব হয় গো ? বেশ ত বলেছে তোমার বউ।”

যুঝ তার করিয়া সরযু বলে, “বেশ ত বলেছে, কিন্তু নাচগান একা হয় না, সঙ্গী চাই। তাই জোগাড় করতে পাড়া-ময় ঘুরে বেড়াছি। হ্যাঁ ভাই, যাবে তুমি মাদল বাজাতে ? এ গাঁয়ে তোমার মত মাদল বাজিয়ে আর বিতায়টি নেই।”

সত্যি তিলকা মাদল বাজাতে ওস্তাদ। খাটোয়ারের ছেলে, ছেলেবেলা হইতে সে মাদল বাজায়, তার হাতের চাটিতে মাদল কথা কয়। বাজনার নামে তিলকার শিল্পী-মন চঞ্চল হইয়া ওঠে, সরযুর পিঠে একটা চাপড় দিয়া বলে, “যাব ভাই, নিশ্চয় যাব, কিন্তু নাচতে-কুঁদতে পারব না, বসে বসে বা পারি বাজাব।”

খুশী হইয়া সরযু বলে, “বেশ বেশ, তাই হবে, আর ভৌজীকে সঙ্গে নিও, নাচবে-গাইবে। বউ খুব করে বলে দিয়েছে, কই গো ভৌজী।”

তিলকা বলে, “ও বাড়ী নেই—এলে বলব।” সরযু এইবার উঠিয়া পড়ে।

রুকিয়া জল আনিতে বাহিরে গিয়াছিল, খানিকপরে ফিরিয়া আসে। তিলকার তব নয়, রুকিয়া আসিতেই



ডাকাডাকি শুরু করে। জলের কলসীটা নামাইয়া কুকিয়া বলে, “কি হ’ল, এত ডাকাডাকি কেন?”

তিলকা উৎসাহের সঙ্গে বলে, “সরযু এসেছিল, বউপাগলা সরযু গো।”

“বেশ ত, তা কি হয়েছে?” বলে কুকিয়া।

তিলকা হাসিয়া বলে, “আজ রাতে ওর বাড়ী কুমর লাগবে, তাই তোকে আমাকে যেতে বলেছে—যাবি গো?”

কুকিয়া তিলকার মুখের দিকে আশ্চর্য হইয়া তাকায়, সে দুষ্টির সামনে তিলকার মুখের হাসি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। একটু পরে কোন জবাব না দিয়াই সে ঘরে গিয়া ঢোকে কিন্তু পরক্ষণেই কুকিয়া আসিয়া বলে, “তুই যা, আমি যাব না।”

এইবার কুকিয়ার দিকে তাকাইয়া তিলকা লজ্জার মরিয়া যায়, ছিঁ ছিঁ, কত বড় অজ্ঞার কথা সে বলিয়াছে। গায়ে শতছিন্ন একটি বুলা, পরণে আরও জীর্ণ শাড়ী, ইহা ছাড়া অস্ত্র বস্ত্র তাহার নাই, কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করিয়া সে ঘরের বাহির হয়, ইহাকে কেমন করিয়া তিলকা পরবের রাত্রে অস্ত্রের বাড়ী যাইতে বলিল! অতীতের কথা তাহার মনে পড়ে, নিতান্ত গরীব হইলেও পরবে পরবে স্ত্রীকে কখনও শাড়ী, কখনও বুলা দিয়াছে, কিন্তু এবার কিছুই দেয় নাই। অপরাধীর মত তিলকা নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, এ-বাড়ী ও বাড়ী গানের সুর ও মাদলের আওয়াজ শোনা যায়। কাজের ফাঁকে কুকিয়া এক-বার বাহিরে আসিয়া তিলকাকে বলে, “কি গো, তুই যাবি নে?”

তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, “না।”

কুকিয়া বলে, “অত করে বলে গেছে, তুই যা।”

তিলকা আবার মাথা নাড়িয়া বলে, “না গো, যাব না; তোকে আমি কি করে যেতে বললুম তাই ভাবছি। আরও দশজন আসবে, সেখানে তাদের সব নতুন কাপড়-চোপড়, আর তুই যাবি ছেঁড়া শাড়ী পরে! ছিঁ ছিঁ। আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে গো।”

কুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কাঁধের উপর হাত রাখিয়া আশ্বস্ত আশ্বস্ত বলে, “তুই যা, পরবে যেতে বলেছে, যেতে হয়। তোর দেহেও ত ছেঁড়া কাপড়, তা আর কি হবে, তুই পুরুষ মতলুষ, তোর দোষ নাই।”

কোন উত্তর না দিয়া তিলকা বসিয়া থাকে। কুকিয়া “তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে, “ওঠ, খেয়ে নে—ভাত হয়ে গেছে।”

সরযু বাড়ী কাছেই, তাই শুইয়া শুইয়া কুকিয়া তাহার বাড়ীর গান ও বাজনা পড়িকার শ্রুতিতে পায়। মাহল যে তিলকার হাতে বাজিতেছে তাহা সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে, এত মিঠে বাজনা আর কাহারও হাতে বাজে না। মেয়েরা গাহিতেছে:

“ভাইয়া হো, বিচ নগরা থাকে ত বসলা,

কিছু শাড়ীয়া ভেজিহ হামারা; খাতির সন্দেহ

পূজব করম গৌসাই।”

অর্থাৎ, ভাই তুমি গ্রাম ছেড়ে সহরের মাঝখানে গিয়ে বাস করছ, কিছু কাপড়-চোপড় আর তোমার ধবর পাঠিও, আমি করম গৌসাইয়ের পূজা করব। মেয়েরা আবার গাইছে, এবার ভাইয়ের জবাব:

“বহিন গে, সবকুছ সন্তা ভেল, শাড়ীয়া মাহাগা ভেল।”

অর্থাৎ—বোন, সবকিছুই সন্তা হয়েছে কেবল শাড়ীই বজ্র মহার্ঘ।

কুকিয়া কান পাতিয়া শোনে, গানের সুর, গানের ভাষার সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে, কত উৎসবে কতবার সেও এই গানই গাহিয়াছে। গানের সঙ্গে মাহল বাজে, আসব জমিয়া ওঠে। অন্ধকার ঘরে কুকিয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মনের চোখ মেলিয়া সে দেখিতে পায় সরযুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আভিনায় নতুন শাড়ীপরা মেয়ের দল হাত-ধরাধরি করিয়া গান গাহিয়া নাচিতেছে আর তাহাদের সামনে বসিয়া তিলকা মশগুল হইয়া মাহল বাজাইতেছে।

গান আবার বদল হইয়া যায়—মেয়েরা গায়:

“কাকরো যে হাথী সোনমুল্লী আংগুঠি রে আংগুঠি,

কাকরো খোপাকে ভরি ফুলরে

আখারা মাহাকি গেলা?

মান্দরিয়াকে হাথীমে সোনমুল্লী আংগুঠি রে আংগুঠি  
পেলমিকে খোপোয়া ভরি ফুল

আখারা মাহাকি গেলা।

কাঁহা পাইলে গে আতর গুলাব

আখারা মাহাকি গেলা—

গেল হেলু খুত্তরবাড়ী, হুয়াই পাইলু, আতর গুলাব,

আখারা মাহাকি গেলা।”

অর্থাৎ—কার হাতে সোনার আংটি গো, কার হাতে

সোনার আংটি?

কার খোঁপায় ফুল গো, গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে?

মান্দরির হাতে সোনার আংটি গো, সোনার আংটি।

পেলমির খোঁপায় ফুল গো, গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে।

কোথায় পেলো গো এত আতর আর গোলাপফুল,  
গন্ধ ছাড়িয়ে গেল চারিদিকে ?  
খণ্ডবাড়ী গিড়েছিলুম, সেখানে পেলুম আতর আর  
গোলাপফুল, গন্ধ ছাড়িয়ে গেল চারিদিকে ।

শুনিতে শুনিতে কুকিয়া এক সময় নিজেও শুনশুন  
করিয়া গাহিতে শুরু করে । বাটোয়াদের মেয়ে সে, চলিতে  
শিখিয়াই সে নাচিয়াছে, কথা বলিতে শিখিয়াই সে  
গাহিয়াছে । গানের সুর ও মাধবের আওয়াজ তাহাকে  
মস্তুর মত মুগ্ধ করিয়া দেয়, অন্ধকার ঘরে শুইয়া কুকিয়া  
সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গায় :

“কাকরো যে হাথী সোনমুন্ডী আংগুঠি বে আংগুঠি,  
কাকরো খোপাকে ভরি ফুলবে  
আখারি মাহাকি গেলা ।”

২৭

যেদর দরজা খুলিয়া কুকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে পূর্বের  
আকাশটা বাড়া করিয়া সূর্য উঠিতেছে । গত রাত্রে  
উৎসবান্তে গ্রাম এখনও ঘুমাইয়া । কুকিয়া নিঃশব্দে দরজার  
সামনে আসিয়া বসে । ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে, রোদ আসিয়া  
পড়ে তাহার ছোট্ট আঙিনায়, কুকিয়া ওঠে না, উঠিবার তাড়া  
নাই, বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবে । সঞ্চিত কয়েক সেব  
ধান প্রায় ফুরাইয়া আসিল, অথচ রোজগারের আর কোন  
পথ নাই । ইহার পরে কি খাইবে তাহারা ? সকালের  
অপূর্ব শান্তির মধ্যে বসিয়া সে কিছুমাত্র শান্তি পায় না ।  
পৃথিবী জুড়িয়া এত আলো, অথচ তাহার চারিদিকে কেবল  
অন্ধকার ।

তিলকার ঘুম ভাঙে না, শেষরাতে বাড়ী কিরিয়া সে  
শুইয়াছে । গ্রাম ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে, বাথালেয়া হল্পা  
করিয়া গরুর পাল মাঠের দিকে লইয়া যায়, পিছনে পিছনে  
গোবর কুড়োনীরা গোবর লইয়া বাগড়া করে । চাষীরা ঘে-  
ষাহার ক্ষেতের দিকে চলে, তাহাদের অনেক কাজ, সস্ত-  
রোপা ধানক্ষেতে জল রাখিতে হইবে, তাহার জন্য সর্বদা  
তদারক দরকার, হয় ত কোথাও আল ভাঙিয়া গিয়াছে,  
হয়ত কোথাও পাশের ক্ষেতের মালিক রাতারাতি আল ফুটা  
করিয়া জল চুরি করিয়াছে । বেল: ক্রমে বাড়িয়া যায় ।

তিলকা একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া উঠিয়া বসে, তার  
পরে খাটিয়া ছাড়িয়া সে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় । ঘুম-  
ভরা ছুই চোখে আলো লাগিতেই সে ছুই হাতে চোখ  
চাকিয়া কুকিয়ার পাশে বসিয়া পড়ে, বলে, “অনেক বেল  
হয়ে গেছে যে ।”

কুকিয়া বলে, “না গো, বেলা হয় নি, আর একটু ঘুমিয়ে  
নিলিনে কেন ? সারারাত জেগে মাফল বাজিয়েছিল ।”

চোখ দুটি বগড়াইয়া তিলকা বলে, “শরীরে তাগদ নেই,  
হাতছুটো ধরে গেছে গো ।”

কুকিয়া তাহার হাতখানা কোলের মধ্যে টানিয়া নিয়া  
বলে, “একটু টিপে দি ।”

ভাবি আরাম পায় তিলকা, সে কুকিয়ার গা ঝেঁপিয়া  
বলে, বলে, “নেশার কোঁকে বাজিয়ে গেছি গো, তখন ত  
কিছু টের পাই নি ।”

কুকিয়া প্রশ্ন করে, “মহ খেতে দিইয়েছিল ?”

মাথা কঁকিয়া তিলকা বলে, “শরঘুট দিল আছে, পুরো  
এক বোতল সামনে এনে বসিয়ে দিল, সাববে ছিলুম সবখানি,  
এক ছটাক মহ পেটে পড়লে সবখুঁশ বেশামাল হয়ে যায়—  
মাতলামি শুরু করে দিল, আমি কিন্তু মাথা ঠিক রেখে  
বাজিয়ে গেছি ।”

বাহির হইতে দরজায় যা দিগা কে যেন ডাকে, “পরসাদের  
মা, ঘুম ভেঙেছে গো ?”

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া কুকিয়া দরজা খুলিয়া দেয়,  
মহুয়ার বউকে দেখিয়া হাসিয়া বলে, “এস দিদি, এস উঠেছি  
অনেকক্ষণ ।”

মহুয়ার বউ আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার পরশে  
হলুদ বং করা নতুন শাড়ী, গায়ে ছিটের নতুন বুলা, কপালের  
আধখানা তেলসিঁত্রে লেপা ।

“রাতে তোমাকে দেখলুম না পরসাদের মা, তাই এলুম  
খবর নিতে ।” বলে মহুয়ার বউ ।

কেন যে মহুয়ার বউ আজ সকালবেলা আসিয়াছে  
কুকিয়ার তাহা বুঝিতে দেবী হয় না । গরীবের ঘরে নতুন  
কাপড়, নতুন বুলা হামেশা আমদানী হয় না, বৎসরে একবার  
হইলেই সে একটা মস্তবড় ঘটনা বলিয়া গণ্য হয় । সেদিন  
সেই ভাগ্যবতী নতুন শাড়ী পরিয়া আত্মীয়-বান্ধব-পরিচিতের  
বাড়ী কিছু একটা ছুতা করিয়া ঘুরিয়া আসে । মহুয়ার বউ  
যে নতুন শাড়ী ও বুলা দেখাইতে আসিয়াছে তাহা কুকিয়া  
বোঝে, তাই প্রশংসা তুলিবার ভক্ত বলে, “বেশ শাড়ী আর  
বুলা কিনেছ দিদি, কত দাম হ’ল ?”

“শাড়ীর কথা বলছ পরসাদের মা”, হাসিয়া বলে মহুয়ার  
বউ, “ত দাম পড়েছে অনেক—সাড়ে সাত টাকা, বার হাত  
গো ।”

কাছে আসিয়া শাড়ীর একটা প্রান্ত হাতে তুলিয়া  
কুকিয়া বলে, “তা ত পড়বেই, বেশ গপসো আর মজবুত  
শাড়ী, বেনোয়াবীর বাপ সওদা করতে জানে ।”

মহুয়ার জীব কাক হইয়া গিয়াছে, সে এইবার আর এক বাড়ী বাইবার জন্ত ব্যস্ত, শাড়ীর বাহারটা দেখাইবার জন্ত একটা ঘুরপাক দিয়া বলে, “চলি গো পরসাদের মা।”

“এই ত এলে, এখনই যাবে কি গো। একটু বস না দিদি।” বলে কুকিয়া।

ইচ্ছা না থাকিলেও মহুয়ার বউ বসে, বলে, “বান্ধা চেপেছে তোয় ?”

মলিনভাবে একটু হাসিয়া কুকিয়া বলে, “না দিদি, বেলা ত বেশী হয় নি, কাজকর্ম নাই, হবে এখন ধীরে-সুস্থে।”

“তা যা বলেছিল পরসাদের মা, রোপার কাজ শেষ হয়ে গেল, এবার হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে হবে।” বলে মহুয়ার বউ।

কুকিয়া কাছে আসিয়া বসে, প্রশ্ন করে, “হ্যাঁ দিদি, তুমিও বেকার হয়ে বসেছ নাকি ?”

জুড়টি কুঁচকাইয়া আহতকণ্ঠে মহুয়ার বউ বলে, “দেখ না বউ, ভেবেছিলাম, খানক্কেত নিড়োতে কেউ না কেউ ড্রাকবে, তা কেউ ডাকলে না গো। গত বছর খান রোপার পরেও ছ’হপ্তা নিড়োনোর কাজ করেছিলুম।”

এই খবরটা পাইবার জন্ত কুকিয়া উদ্গ্রীব হইয়াছিল, তাহার মনে ক্রীণ একটু আশা ছিল যে, ছ’চার দিন হয়ত নিড়োনোর কাজ ছুটিবে। মহুয়ার জীব কথা শুনিয়া বুকটা হিম্মা যায়। সে কোন কথা বলে না।

মহুয়ার বউ বলে, “না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হ’ত গো যদি না ঠিকাদারের বন কাটাই হ’ত। তখন ছ’পরশা যা বোজগার করেছে তাই দিয়ে আধপেটা কার্টিকমাস খেয়ে পর্বন্ত দিনগুলোর হয়ে যাবে, তার পরে শীত পড়লে একটা না একটা কাজ জুটবেই।”

এই হিসাব কুকিয়াও করিয়াছিল কিন্তু তাহার কপালে বিড়ম্বনা আছে, তাই সুস্থ-সবল মানুষটা প্যা ভাঙিয়া বিছানায় পড়িল। মহুয়ার বউ যাহা বলিল ঠিক তাহাই হইবে, না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে। কুকিয়ার জবাব না পাইয়া মহুয়ার বউ বলে, “কি ভাবছিল গো এত, কথা কইছিল না ?”

কুকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেয়, “তোমার কথা শুনিছি গো দিদি।”

কুকিয়ার মনের ভাব কিছুটা আঁচ করিয়া মহুয়ার বউ বলে, “পরসাদের বাপ ত চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, এইবার ওর হেপাজত কর, পেট ভরে খেতে দে, ভাল হয়ে উঠবে।”

ক্রীণকণ্ঠে কুকিয়া বলে, “হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছ।”

একটু পরে মহুয়ার বউ উঠিয়া যায়, কিন্তু কুকিয়া ওঠে

না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তিলকা ঐনি টিপিতে টিপিতে খোঁড়াইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া বেড়ায়। গত রাত্রেই গান-বাজনার আনন্দে সে এখনও মশগুল আছে, বলে, “লোক হয়েছিল গো, পাড়ার অনেক মেয়ে এসেছিল, কিন্তু এলে কি হবে, আজকালকার মেয়েরা নাচতেও জানে না, পাইতেও জানে না, হৈ-হল্লা।”

তিলকার একটা কথাও কুকিয়ার কানে ঢোকে না মহুয়ার জীব কথাগুলি তাহার কানে বাজিতে থাকে, “এইবার ওর হেপাজত কর, পেট ভরে খেতে দে, ভাল হয়ে উঠবে।” কিন্তু কেমন করিয়া সে হেপাজত করিবে, পেট ভরিয়া খাওয়াইবার অন্ন কেমন করিয়া যোগাড় হইবে এই প্রশ্নের উত্তর মহুয়ার বউ ত দিয়া গেল না।

তিলকা হাতের ঐনি মুখে ফেলিয়া বলে, “গায়ে আমার ভাগদ নাই তবু সারাদাত বাজিয়ে গেলুম ত। এসেছিল মতি ছোঁড়া বাজাতে, বণ্টাখানেক নাচনীদের সামনে লাকখাপ করেই বেদম হয়ে বসে পড়ল, আর ওঠে না। গত বছর সারাদাত নাচনীদের সঙ্গে মাঠল নিয়ে সমানে নেচেছিলুম, বেদম হয়ে বসে পড়ি নি। তুই ত ছিলি গো ?”

কুকিয়া মাথা নাড়ে।

তিলকা বলে, “এবার আমার ভাগদ নাই তা নাচব কি ? তবে এও বলে দিচ্ছি, একবার যখন উঠে দাঁড়িয়েছি আর আমাকে খাটিয়ায় পাড়তে পারবে না।”

এমন জোরালো কথা শুনিয়াও কুকিয়া আশঙ্ক হইতে পারে না যাহার বলে তিলকা বলীয়ান হইবে তাহা যে যবে নাই, উৎসাহের আতিশয্যে তিলকা সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ কুকিয়া ভাল করিয়াই জানে, খোরাক না পাইলে তিলকা আবার খাটিয়ায় পড়িবে।

ধীরে ধীরে কুকিয়ার মনের মধ্যে আবার একটা ভয় বনাইয়া ওঠে। কিন্তু না ভয়কে আর সে প্রশ্রয় দিবে না, ঐ মানুষটিকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতেই হইবে, যেমন করিয়াই হোক খাদ্য তাহাকে জোগাড় করিতেই হইবে— তাহা না হইলে—কুকিয়া আর ভাবিতে পারে না, হঠাৎ খড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তিলকা বলে, “কি হ’ল গো ?”

কুকিয়া বলে, “না, কিছু না।”

২৮

আজ আবার কুকিয়ার ঘরে হাঁড়ি চাপে না। আর না হইয়া কেবল খবচ হইলে কুবেরের তাকারও শেষ হইয়া যায়; কুকিয়ার ত ছ’কলনী ধান। ছ’দিন সে আধপেটা খাইয়া তিলকাকে পুরো খোরাক দিয়াছে, আজ তাহার দুটি কলনীই শূন্য।

ঘরের কোণে কুকিয়া বসিয়া থাকে, খাটিয়ার উপর বসিয়া তিলকা পা ছুটি হোলায়। বাহিরে সকালের সূর্য ধীরে ধীরে মাথার উপর উঠিয়া আসে।

তিলকা হঠাৎ বলে, “জল ভেট্টা পেয়েছে গো, জল দিবি?”

কুকিয়া উঠিয়া গিয়া কলসী হইতে এক ঘটি জল গড়াইয়া তিলকাকে আনিয়া দেয়। ঢক ঢক করিয়া এক ঘটি জল নিঃশেষ করিয়া তিলকা হাসিয়া বলে, “জলটা ত পেট ভরে খেতে পাচ্ছি।” কিন্তু জল খাইলে পেট ভরে না। একটু পরে তিলকা বলে, “হাঁড়িগুলো ভাল করে ধেবেছিল, কোথাও কিছু নেই?”

ঘরের কোণ হইতে কুকিয়া মাথা নাড়িয়া বলে, “না।”

তিলকা বারছই হাই তুলিয়া খুপ করিয়া শুইয়া পড়ে, বলে, “বড় খুম পাচ্ছে গো, একটু ঘুমিয়ে নি।”

কুকিয়া ঘরের কোণ হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে তিলকার খাটিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আবছায়া অন্ধকারে তিলকার শীর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। কুকিয়ার মনে পড়ে, এই মানুষটি দুই দিন আগে বড়াই করিয়া বলিয়াছিল আর খাটিয়ায় পড়িবে না। সে আজ একবেলা না খাইয়াই খাটিয়ায় পড়িয়াছে। কুকিয়ার মন ভরে যেন অসাড় হইয়া আসে, এই যে শুইল—বুঝি তিলকা আর উঠিবে না।

দরজা গোলার আওয়াজ পাইয়া তিলকা চোখ মেলিয়া বলে, “কোথা চললি গো?”

কুকিয়া বলে, “তুই বুঝো, আমি এখনই আসছি।”

তিলকা উঠিয়া বসিয়া বলে, “কেউ আর আমাদের একটা কাণাকড়ি, এক ছটাক চালও খার ধেবে না, কেন মিছে বুঝে মরবি, তার চেয়ে বলে বলে কিমো।”

কপালে একটা চাপড় মারিয়া সে আবার বলে, “বরাত, বরাত! ভেবেছিলাম এ বছর ভাল কাটবে, উণ্টে যা হ’ল তাতে প্রাণে বাঁচব কি না সন্দেহ। শরীরে যদি আর একটু তাগদ পেড়ুম তা হলে তোকে নিয়ে কয়লার খাড়ে চলে যেতুম।”

কুকিয়া বলে, “তুই শুয়ে পড়, আমি পরশাটকে নিয়ে বেনোয়াবীর মার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি।”

তিলকা আবার শুইয়া পড়ে, বলে, “তবে যা।”

ঘরের বাহির হইয়া কুকিয়া মানুষ্যর বাড়ীর দিকে যায় না, গ্রামের গলিপথ ধরিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে। গ্রামের চেহারা এখন অস্তরকম, প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর বাদে আর সব জমি কাঁটাগাছ দিয়া বেরা, তাহাতে কেহ ভুট্টার, কেহ মাক্কয়ার চাষ করিয়াছে। গ্রামপথ এখন খুবই সজীর্ণ, সেই পথ ধরিয়া কুকিয়া আগাইয়া চলে। চলিতে গেলে অনেক

স্থানে ভুট্টার বড় বড় পাতাগুলি গায়ে আসিয়া লাগে। কুকিয়া হঠাৎ দাঁড়ায়, হাত বাড়াইয়া সবুজ পাতাগুলি স্পর্শ করে, আর একটু হাত বাড়াইলেই কচি ভুট্টাটি ছুইতে পারে। একবার সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, না, কেহ কোথাও নাই, একটা প্রচণ্ড লোভ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, হাত ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দেয়। হঠাৎ একটা হমকা বাতাস আসিয়া ভুট্টা গাছগুলোকে হেলাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, কুকিয়া চমকাইয়া ওঠে, হাত টানিয়া লইয়া একদকম ছুটিয়া চলে, বকের মতোটা তাহার টিপ টিপ করিতে থাকে। অনেকক্ষণ কুকিয়া কোনদিকে তাকায় না, তাকাইতে যেন ভয় পায়।

গলিপথে মাঠে আসিয়া পড়ে, ক্ষেতের পাশ দিয়া কুকিয়া চলে। ধান যোপার পরে সে এদিকে আর আসে নাই, এক্ষেতক দিনে ধানগাছ বেশ বাড়িয়াছে, বাতাসে সবুজ ডগা-গুলি হেলিয়া পাড়িতেছে। এপারে অনেকগুলি ক্ষেত তাহারই হাতে দোপা। প্রত্যেকটি ধানগাছে তাহার স্পর্শ লাগিয়া আছে, এরা যেন তাহারই সন্তান, প্রত্যেকে তাহাকে চেনে। কুকিয়া অবাক হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া থাকে। বহুবুয় পর্বন্ত বিস্তৃত এত যে ধানক্ষেত ইহার মধ্যে একটুও তাহার নাই। আর দুই মাস পরেই পাকা ফসলের ভায়ে ধানগাছ হেলিয়া পড়িবে, অথচ তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আসিয়া খাইবে না, তাহার মাটির কলসী ছুট খালি থাকিয়া খাইবে।

হঠাৎ কুকিয়ার অন্তস্ত ক্রান্তি বোধ হয়, সে ফিরিয়া আবার গ্রামে ঢোকে। মতি গোপের বাড়ীটা পার হইয়া খাইতেই বাঁ-পাশে অনেকখানি জমি ভাল করিয়া কাঁটাগাছ দিয়া বেরা, তাহাতে মাক্কয়া দোপা হইয়াছে। সেইদিকে চোখ পড়িতে কুকিয়া ধমকিয়া দাঁড়ায়, আহ! ফসলের কি প্রাচুর্য! মাক্কয়ার বড় বড় কোয়াগুলি প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে, আর ছ’চার দিনেই কাটিবার মত হইবে। বাহার অভাব নাই, ভগবান যেন তাহাকেই বেশী করিয়া দেন। কুকিয়া জানে, এটা গোবিন্দ মহতোর ক্ষেত, এ মাক্কয়া তাহারই ঘরে খাইবে। গোবিন্দ মহতো বড়লাক, মাক্কয়া সে খাইবে না, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া তিতলির হাটে বেচিতে লইয়া খাইবে আর তাহারই মত গরীবের পাল কিনিয়া খাইবে।

কুকিয়া নিশ্চয় একটা কাঁটাগাছ টানিয়া খানিকটা কাঁক করে, তার পরে হাত বাড়াইয়া মাক্কয়ার কয়েকটা কোয়া ছিঁড়িয়া নেয়, আঙুলে রগড়াইয়া দানাগুলি ছাড়াইয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। স্বাহীন দানাগুলি তাহার ভাবি মিটি লাগে। হাত বাড়াইয়া একটি-দুটি করিয়া সে অনেকগুলি কোয়া

ছিঁড়িয়া কৌচড়ে রাখে। এমন সময় গিছনে লোকের লাড়া পাইয়া সে ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করে। গুটি দুই ছেলে হুলা কবিত্তে কবিত্তে চলিয়া যায়, কুকিয়া দাঁড়ায়, তার পরে আবার সেইখানে কিরিয়া আসে। চারিদিকে তাকাইয়া সে আরও কিছু মাক্কাযর কোয়া ছিঁড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে।

২৯

তিলকার টানা টানা নিখাসের শব্দ শোনা যায়, সে ঘুমাইতেছে। কোলের কাছে ছেলেটাও ঘুমাইতেছে, কুকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারে আকাশে একফালি চাঁদ গাছের আড়ালে হেলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু অস্ত যায় নাই। কুকিয়া দরজা ভেজাইয়া সেইখানে চুপ করিয়া বসে। তিলকা একবার একটা অম্পট আওয়াজ করিয়া পাশ কিরিয়া শোয়, খানিকক্ষণ কাটিয়া যায়, কুকিয়া উঠিয়া আবার দরজা ফাঁক করিয়া বাহিরে তাকায়, চাঁদ অস্ত গিয়াছে। সাবধানে হুতড়াইয়া কুকিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা বোরা ও একখানা কান্ডে হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। কোথাও কোন শব্দ নাই, আকাশে তারা বলমল করে, রাত প্রায় দুপুর। দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে পথে নামিয়া কুকিয়া মাঠের দিকে চলে। গ্রামের সুরু গলি দিয়া চলিতে তাহার নিখাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসে, সত্তর্পণে পা ফেলিতে গিয়াও পায়ে পাথর ঠেকিয়া আওয়াজ হয়, কুকিয়া ভয়ে চমকিয়া ওঠে, ছুটিয়া গলিটা পার হইয়া মাঠে আসিয়া পড়ে। একপাশে একটা মস্ত বড় আমগাছ, তাহার নীচেটা গভীর অন্ধকার, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া কুকিয়া হাঁপায়। একা এমনভাবে সে অন্ধকারের রূপ কখনও দেখে নাই, অতি চেনা পথ, চেনা গাছ, চেনা মাটির দেয়াল, চেনা ঘর সবই যেন অচেনা, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা যেন নড়িতেছে, কোনটা যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। কুকিয়ার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে, একছুটে বাড়ী কিরিয়া বাইতে ইচ্ছা করে।

চোখ বুঁজিয়া কুকিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়ায়। ন', সে কিছুতেই কিরিয়া বাইবে না, যে কাজ করিতে সে দুপুর রাতে ঘরের বাহির হইয়াছে তাহা সে করিবেই। না খাইয়া মরার মহাভয় যাহাকে রাজহীন বিরিয়া আছে, রাতেও অন্ধকার দেখিয়া তাহাকে ভয় পাইলে চলিবে কেন? যেমন করিয়াই হোক তিলকাকে সে খাওয়াইবে, তাহা না হইলে তিলকা মরিবে, সে মরিবে, পরপাদ মরিবে। কুকিয়ার ভিতরটা ক্রমে স্থির হইয়া আসে, সে আবার চোখ মেলিয়া তাকায়, অন্ধকার তাহার কাছে আর তেমন ভয়ঙ্কর বলিয়া

মনে হয় না। কুকিয়া আঁচলটা কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া নেয়, তার পরে বোরা আর কান্ডে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে পা ফেলিয়া মতিগোপের বাড়ীর দিকে চলে। অন্ধকারে তাহাকে একটা নিশাচর পশুর মতই দেখা যায়, কুণ্ডিত পশুর মতই অতি চুপি চুপি খাদ্যের সন্ধানে চলিয়াছে।

মতিগোপের বাড়ীর পাশ দিয়া কুকিয়া আবার গ্রামের পথ ধরে, একটু পরে সে কাঁটাগাছ দিয়া ঘেরা মাক্কাযর ক্ষেতের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, পথের দুই পাশে কাঁটাগাছের বেড়াগুলি অন্ধকারে অদ্ভুত দেখায়, কোনদিকে কোন শব্দ নাই। অন্ধকারেও কুকিয়া মাক্কাযর পরিপুষ্ট কোয়াগুলি দেখিতে পায়, কি এক মস্ত্রে তাহার মন হইতে সমস্ত ভয় চলিয়া যায়। বেড়ার যে কাঁটাগাছটা সে দুপুরে টানিয়া খানিকটা সরাইয়াছিল সেটাকে এখন তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেতের ভিতর ঢুকিয়া যায়, তার পরে মাক্কাযর কোয়াগুলি কাটিয়া কৌচড়ে রাখে। কৌচড় ভরিতে বেশীক্ষণ লাগে না। কৌচড়ের কোয়াগুলি বোরার ঢালিয়া দিয়া কুকিয়া আবার কাটিতে সুরু করে। কোনদিকে এখন তাহার খেয়াল নাই, তাড়াতাড়ি বাহাতে বোরাটি ভরিয়া ফেলিতে পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। হঠাৎ পথের উপর কাহার পায়ের আওয়াজ পাইয়া ভয়ে কাঁঠ হইয়া দাঁড়ায়। কাছেই কোথায় শুকুনো পাতা খড়মড় করিয়া ওঠে, কুকিয়া বুপ করিয়া ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া পড়ে, তাহার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করিতে থাকে। পায়ের আওয়াজ আগাইয়া আসে, খুব কাছেই শুকুনো পাতা আবার খড়মড় করিয়া ওঠে, কুকিয়ার নিখাস বন্ধ হইয়া আসে। আওয়াজ আরও কাছে আসে, তার পরে একটা বোঁং বোঁং শব্দ করিয়া কাহার যেন ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কুকিয়ার ভিতরটা এতক্ষণে হাসিতে ভরিয়া যায়, বুনা শূণ্যের দ্বারা তাহাকে কি জড়টাই না করিল। সাবধানের মার নাই, কুকিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তার পরে হাত চালাইয়া বোরার অর্ধেকটা তর্তি করিয়া ফেলে। আর লোভ করা উচিত নয়, বিপদ হইতে কতক্ষণ, কুকিয়া বোরা লইয়া ক্ষেতের বাহিরে আসে, তুলিয়া ফেলা কাঁটাগাছটা আবার যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া বোরাটা কাঁথালে লইয়া তাড়াতাড়ি কিরিয়া চলে।

এবার তাহার তেমন ভয় করে না। মাঠের বাঁধাটা সে একরকম ছুটিয়াই পার হয়। গ্রামের গলিতে ঢুকিয়া সে আবার সাবধানে চলে। ঘরের দরজায় বোরাটা নামাইয়া কুকিয়া হাঁপাইতে থাকে, এতক্ষণ উত্তেজনার বশে সে ক্লান্তি বোধ করে নাই, এখন তাহার দেহের সব শক্তি যেন লোপ

পায়। কুকিয়া সেইখানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পরে সে ওঠে, নিশ্চক্ষে শিকল খুলিয়া বোরা লইয়া সাবখানে ঘরে ঢোকে। তিলকা তখনও অঝোরে ঘুমাইতেছে, কুকিয়া বোরাটা ঘরের কোণে লইয়া গিয়া খালি কলশীতে মারুয়ার কোয়াগুলি ঠাসিয়া ভরিয়া রাখে।

৩.

“হ্যাঁ গো, মারুয়ার লপসি বাঁধছিস বুঝি, কোথায় পেলি মারুয়া?” উম্মুনের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করে তিলকা।

জাল ঠেলিতে ঠেলিতে কুকিয়া বলে, “ও পাড়ার গোয়ালারা মারুয়া কাটিতে লেগেছে, এক দেব চেয়েচিস্তে নিয়ে এলুম।”

তিলকা সেইখানে বসে, গতকাল তাহারা উপোস করিয়া আছে, উম্মুনে চাপান হাঁড়িটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া বলে, “আহা, নতুন মারুয়ার কি মিঠে সুবাস বেরিয়েছে গো।”

কাঠের খুস্তি দিয়া মারুয়া বাঁটিতে বাঁটিতে কুকিয়া বাড় নাড়িয়া বলে, “হুঁ।”

হুই হাঁটুর উপর হাত দুইখানা রাখিয়া উবু হইয়া বসিয়া তিলকা বলে, “ভাতের চেয়ে মারুয়ার লপসি খেতে আমার ভাল লাগে। ভারী জিনিস গো, পেটে থাকে অনেকক্ষণ।”

কুকিয়া কোন জবাব দেয় না, কাজ করিয়া চলে।

তিলকা নিজের মনেই বলে, “ওপাড়ার গোয়ালাদের ধানক্ষেত নেই বটে, টাঁড় জমিতে ওরা যা মারুয়া-মকাই পয়দা করে তাতে ওদের ছ’মাস চলে যায়। হ্যাঁ, কিষাণ বটে ওরা।”

কুকিয়া নিশ্চক্ষে মাথা নাড়ে। তিলকা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, “আমার যদি ছ’চার কাঠা টাঁড় জমিও থাকত তা হলে আল এমন হাল হয় গো। গাছটা পড়লেই যদি আমার পায়ের উপর না পড়ে আমার মাথায় পড়লেই হ’ত, সব ল্যাঠা চুকে যেত।”

কুকিয়া মুখ তুলিয়া তিলকার মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মুখ নীচু করে।

সারাদিন কুকিয়া ঘরের বাহির হয় না, সজ্জা লাগিতে বোরা আর কান্তেখানা তিলকার চোখ এড়াইয়া দরজার পাশে লুকাইয়া রাখে। রাত হইলে সকলের সঙ্গে সেও শেষ কিন্তু তিলকা ঘুমাইয়া পড়িলে পরসাদের পায়ে একটা চাবক চাপা দিয়া কুকিয়া আসিয়া দরজা খোলে। আজ আকাশে মেঘ বনাইয়াছে, একটা তারাপু দেখা যায় না, জমাট অন্ধকার যেন কটীপাথরের মত কালো। বোরা ও কান্তে

লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার গা চমছম করিয়া ওঠে, পা চলিতে চায় না। নিশ্চক্ষে আবার সে ঘরে ঢোকে, পরসাদের পাশে গিয়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার ঘুম আসে না, কত কথা সে ভাবে। যেমন করিয়াই হোক একটা দিন ত মারুয়ার লপসি খাইয়া কাটিল, তিলকাকে উপোস করিতে হইল না। কিছুটা মারুয়া আছে কালও চলিবে, কিন্তু পরশু? কুকিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। হয় ত কালই গোবিন্দ মহতো! ক্ষেতের মারুয়া কাটিয়া লইয়া যাইবে, আর এমন সুযোগ সে পাইবে না। কুকিয়া উঠিয়া বসে, পাশে পরসাদ ঘুমাইয়া আছে, ঘুমন্ত তিলকার টানা টানা নিশ্বাস শুনিতে পাশ্বে যায়, রাত নিয়ুম। কুকিয়া বোরা কান্তে লইয়া বাহিরে আসে, দরজার শিকল তুলিয়া দেয়, তার পরে তাড়াতাড়ি পথে গিয়া নামে।

আজ সে কোথাও দাঁড়ায় না, আজ তাহার ভয় নাই, মনে হয় সেও যেন বাঘ-ভালুকের মত অন্ধকারের একটা জীব। মারুয়া ক্ষেতের পাশে আসিয়া কুকিয়া দাঁড়ায়, ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, তার পরে বেড়ার কাঁটা-গাছটা তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেতে ঢোকে। আজ গভীর অন্ধকার, হাতের কাছেই জিনিসও প্রায় দেখা যায় না, কুকিয়া এক রকম হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মারুয়ার কোয়া কাটির কোঁচড়ে রাখে।

হঠাৎ ক্ষেতের অপর প্রান্ত হইতে “ধর ধর, চোর” বলিয়া একটা চীৎকার ওঠে, ছড়মুড় করিয়া কাহারা মারুয়া ক্ষেতের ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসে, কুকিয়া যেন বেহুঁস হইয়া যায়, হাত হইতে কান্তেখানা খসিয়া পড়ে। চীৎকার করিতে করিতে লোকগুলো প্রায় কাছে আসিয়া পড়ে। কুকিয়ার হুঁস ফিরিয়া আসে, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মুহূর্তে তাহাকে তৎপর করিয়া তোলে, অক্লান্ত ব্রতপন্থর মতই সে ছুটিয়া ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাস্তায় পৌছিবাব সঙ্গে সঙ্গে একখানা লাঠি আসিয়া কুকিয়ার বাঁ হাতে পড়ে, তৎক্ষণাৎ হাতখানা অবশ হইয়া যায়। যন্ত্রণায় সে আহত পণ্ডর মতই আতঁনাদ করিয়া ওঠে, পাগলের মত ছুটিতে থাকে।

একটা হল্লা খানিকক্ষণ তাহার কানে আসে তার পরে সে আর কিছু শুনিতে পায় না। ছুটিতে ছুটিতে যখন সে ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার সর্বাঙ্গ ধর ধর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ঘরে ঢুকিয়া কুকিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তার পরে ছেলের পাশটিতে গিয়া শুইয়া পড়ে। বুকের মধ্যে তাহার হাতুড়ি পিটিতে থাকে, মুহূর্তের মত সে পড়িয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পরে হাতের অসহ ব্যথা ধীরে ধীরে তাহার



চেতনা ফিরাইয়া আনে। বাঁ হাতে কজিটার কি ভীষণ  
যন্ত্রণা, সমস্ত হাতটা যেন অসম্ভব ভারী, নাড়াইতে পারে না।  
হাঁটুর কাছটাতেও জলিয়া বাইতেছে, সেখানে হাত দিয়া  
ককিয়া ভয় পাইয়া যায়, হাঁটু হইতে অনেকখানি নীচের

দিক পর্যন্ত মাংস বাঁধের নখের মত ধারাল শেরাকুলের কাঁটা  
হুক্কাক করিয়া চিরিয়া দিয়াছে, তখনও সেখান দিয়া বক্ত  
পড়িতেছে।

হঠাৎ ককিয়া হুকুপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

ক্রমশঃ

## বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

মানুষ পৃথিবীতে আসে, আবার চলে যায়। মানুষকে ধরে  
রাখবার সাধ্য কারও নাই। মানুষকে মনে রাখতে পারে,  
যদি সে বেখে যায়—কাজ, যে কাজ দেশের ও দেশের কল্যাণ  
সাধনে সহায় হয়। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ খুব ধনী হতে  
পারে, বড় শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু, যদি সেই ধন, সেই  
শিক্ষা দেশের উপকারে না আসে, তার সার্থকতা থাকে না।  
সুকুমারবাবু ইউনিভার্সিটির ভাল ছেলে ছিলেন, কৃতী ছাত্র  
ছিলেন, বড় স্কলার ছিলেন, বগৌজনের খেঁচের কবিতা অনর্গল  
মুখস্থ বলে যেতে পারতেন, বড় চাকুরী করতেন, ভাল পাকা  
বাড়ী ছিল, মটর গাড়ী ছিল, তিনি দেশেতে খুব সুন্দর ছিলেন,  
দীর্ঘজীব বলিষ্ঠ দেহ ছিল—এসব তাঁর বড় পরিচয়ের মাপ-  
কাঠি নয়। তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি মিশতেন গরীবের  
সঙ্গে, তিনি মিশতেন—ঐ যে মাঠে বোদে পুড়ে, বৃষ্টি ভিলে  
লাঙল চষছে সেই গরীব চাষীর সঙ্গে। তাঁদের চুখে, কষ্ট কি,  
তাঁদের অভাব, অভিযোগ কি, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তেন  
প্রগাঢ় ভাবে, যশোরে সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে আমার সঙ্গে  
হয় তাঁর পরিচয়। দেখেছি যে সময় তাঁর সহকর্মী ডেপুটি  
ম্যাজিস্ট্রেটের হল খেলাধুলা, গল্প-গুজবে কাটাচ্ছেন তাঁদের  
অবসর, সুকুমারবাবু তখন কারও কলা বাগানে, আম  
বাগানে, কচু বাগানে, ধানের ক্ষেতে—গুরু চরাচ্ছে এক  
রাখাল, সেই রাখালের পাশে। এদের সঙ্গে সোজা-সুজি  
মেশবার কলই তাঁর অনুরূতি, বয়স্ক শিক্ষা। এদের অজ্ঞতা  
খুব করলে এরা কতখানি লাভবান হতে পারে, এই ছিল তাঁর  
বড় চিন্তা:—নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে যা

ছিল, তা যাচ্ছে উঠে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ আর নাই—  
কথক ঠাকুর আজ নির্ধাক, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র,  
ভীষ্ম কর্ণ, বুদ্ধ, হর্দিশচন্দ্র অভিনয় বিনে-পরসায় বড় আসবে  
বসে সেই যাত্রাগান শোনবার সুযোগ আজ লুপ্ত। অথচ  
এদের শিক্ষার দরকার। এই কনুভূতি কার্য্যকরী করবার  
সুযোগ পেলেন—যখন তিনি ইনস্পেক্টর-জেনারেল অফ  
রেজিষ্ট্রেশন হয়ে যুক্ত বাংলায় হাজার খানেক সব-রেজিষ্ট্রারের  
হস্তাকর্ত্ত হয়ে বসলেন। সকলের অবসর যাতে কার্য্যকরী  
প্রয়াসে যায় হয়, তার জন্তে নির্দেশ দিলেন সমস্ত অফিসারকে  
এই বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন প্রচারে। নির্দেশ দিয়েই তিনি  
ক্ষান্ত ছিলেন না। মাসিক বুলেটিনে ব্যবস্থা হ'ল তাতে  
ছাপা হ'ত—কোথায় কে কি কাজ করলেন এবং  
কতখানি। সম্পাদক ভাবে আমাকে এই বুলেটিনের কাজ  
করতে হ'ত। সে আঙ্গ বিশ বৎসর আগেকার কথা—সে  
সময় এত ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হয় নাই—তিনি এ  
কাজ করেছেন শুধু মানবতার প্রেরণায়। চুঃখের বিষয়  
বেশীদিন তাঁর আর আই, জি, আর থাকা হ'ল না—যুক্ত  
বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ফজলুল হক সাহেব, তাঁর  
সঙ্গে তাঁর মানসিক প্রবণতা নিয়ে কাজ করা বেশী দিন  
সম্ভব হ'ল না—বেড় হাজার টাকার সরকারী চাকুরী মুহূর্ত্তে  
ছেড়ে দিয়ে গুরুদেবের ডাকে একশত টাকা বেতনে তিনি  
চলে গেলেন শ্রীনিকেতনে গুরুদেবের হাল লাঙলের পাশে—  
তাঁর পরিচয় আমার এইখানেই শেষ।



## সোনার তরীর ‘দুই পাখী’ আর মহুয়ার ‘বন্দিনী’

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

দ্বীপকাব্যে মানব অন্তরে বিচিত্র সত্তার সবল ঐশ্বর্যময় প্রকাশ দেখা দিয়েছে বারংবার। মানুষের অন্তরে আছে দুটি সত্তা—একটি গৃহী অপদটি পথিক। গৃহীটি টানে জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের অলস ভোগের মধ্যে, আর পথিকটি নিয়ে বেতে চায় ত্যাগময় বৈরাগ্যের মহিমায়। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের বেড়াধারা চেতনায় এই পথিক সত্তাটি থাকে স্তম্ভিত গহনে। গৃহীটিকে সঙ্গীভাষিত করিয়া রাখে মানুষ—যে তাহাকে কবিতা রাখে সুখ-নিশ্চলতায় তৃপ্ত। এ পথিক যখন জানাইয়া দেয় মুক্তির আশীর্বাদ, তখন সে-মস্ত্রের দীক্ষার ধ্বংসের আশিষ্টিও বলে ওঠে, “ন অগ্নে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।”

চিত্র উপমার দ্বিক দ্বিগা “সোনার তরী”র “দুই পাখী” আর “মহুয়ার” “বন্দিনী” অভিন্ন। এ দুয়েই এই গৃহী আমিটির বলা কথার রূপকল্প দেখি, ভাবের দ্বিক দ্বিগাও আশ্চর্য জাগরণই দুই কবিতার ধ্বনি। খাঁচার পাখীটি ছিল খাঁচার শাস্ত নির্ভরতার প্রাত্যহিকতার আবাসে, বন্দিনী নারীটিও সাম্প্রতিকতায় ছিল সুখে। ছিল না দুঃখবোধ। বনের পাখী আসিয়া শোনাইল খোলা আকাশের সুর—পথিক আসিয়া জানাইল মুক্তির বাণী। সে গান প্রবেশিল বন্দি জীবনের শ্রবণে, মুক্তির আশীর্বাদে প্রত্যাশায় হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আগিল অন্তরে শান্তিহীন হাহ। “দুই পাখী”র মর্মস্বাণীর সমাপ্তি এইখানে। তাহাতে অন্তরের সে জাগরণ তাহার মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে মুক্তির পথ খোঁজার ক্রন্দন থাকিলেও পাওয়ার পূর্ণতা নাই। এখানে জীবনের প্রাত্যহিকতার বাধাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেখানে মন বলে, জানি মুক্ত গগনে আছে আশীর্বাদ, আছে সুখের বাণী কিন্তু “মোর

শক্তি নাই উড়িবার”। বহু জাগ্রত হৃদয়ের এখানেই ঘটে পদিসমাপ্তি। চির ক্রন্দন তাহাদের সঞ্চল। সেই দ্বিক দ্বিগা “দুই পাখী” অধিকতর বাস্তবধর্মী কিন্তু “মহুয়ার” “বন্দিনী” নারী, সেখানে প্রেমের সহিত বীর্যের গ্রহি অবস্থিতি। সে শক্তিহীনতার দীনতা সহ্য করিবে না, পথিকের সুরে যখন মিলিয়াছে অন্তরের সুর। প্রেমের সেই আস্তরমিলনেই ত মুক্তি। থাকুক না তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার পিছুটান, কিছু ক্ষতি নাই তাহাতে। সে খাঁচার পাখীর মত ভুল করিয়া বনের পাখীটিকে খাঁচার টানিতে চায় নাই। কিন্তু এও কি সম্ভব প্রেমের গানে যখন অন্তর জাগিয়াছে তখন কেমনে বাহিরে বলিয়া বলিয়া থাকিবে? সে আপন গৃহকাণে বলিয়াই পরাইবে মিলন-বাধী। বৈষ্ণব কাব্যে বাহাকে কবিগণ বলিয়াছেন ভাবসম্মেলন। সে মিলনে গৃহ হয় পথের ধর্ম দীক্ষিত। গৃহেই তার অবস্থিতি কিন্তু আছে পথের জন্ত বিবহ। তার প্রেম পাওয়ার স্বীকৃতি বিরাটকে অন্তরত্ব করার প্রতিভা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এ অন্তরুত্তি আনিয়া দেয় সেই পথিকের যোগ্য হইবার সাধনা। সাধনার ফলে জীবনে পথের মহিমার সঞ্চার হয়। সেই অধ্যাত্ম-সম্পদই জীবনের প্রকৃত প্রেমের মিলন। এ মিলন আশ্চর্য মিলন। পাথির জগতের নৈকট্যের প্রশ্ন নাই এখানে, তাহার অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। প্রেমের এই অসাধারণ সমুদ্রতির যে জীবনবাদ তাহার মহিমা হইতে “সোনার তরী”র “দুই পাখী” বঞ্চিত। দুই পাখীর সমাপ্তি হৃদয়ের বেদনায়, আর বন্দিণীর শেষ মিলনের সার্থকতায়। প্রেমোপলব্ধির দ্বিক দ্বিগা “দুই পাখী”কে যদি বলি উৎসের জাগরণ তবে “বন্দিনী”তে পাই মোহনার অভলম্পশীতা।

# বারোয়ারি সংস্কৃতি-চর্চা ও বাংলাদেশ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু একদা গুণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমাদের দেশে কলা-বধূকে লক্ষ্যও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাহার স্থান হয় নাই” (সংগীত—পথের সঙ্গ)। এ আকস্মিকের কারণ তাঁহার সময়ে আংশিক ভাবে থাকিলেও, এখন যে আর বিন্দুমাত্রও নাই একথা শপথ করিয়া বলা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া সংগীতের ক্ষেত্রে।

সংগীত-বধূ লক্ষ্যছাড়া হইয়া গণেশের ঘরে জাঁকিয়া বসিয়াছেন। গণেশও কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি যথার্থই মেরাপ বাঁধিয়া, আলোকসজ্জার বাহার বচনা করিয়া মহোৎসাহে বারোয়ারি সংগীত পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন আর সংগীত-বধূ ‘লাউড স্পীকার’ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া ধস্ত হইতেছেন। গণেশ আজ কলাকে ছল করিয়া ব্যবসয়ে নামাইয়াছেন; এ ব্যবসায়ের ঢেউ তাহাকে কোন সমুদ্রে নিয়া যাইবে কে জানে?

বারোয়ারি পূজা ও বারোয়ারি সংগীতের আসরে আজ বাংলাদেশ ছাইয়া গিয়াছে। পূজা-ভক্তির, আর সংগীতের আসর, কৃষ্টির নিদর্শন। বাঙালী তরুণের দল ঘরে ঘরে টাঙ্গা আলার করিয়া বারোমাসে তেরোটা পূজা চালাইয়া যাইতেছে আর সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই কালে ও অকালে এক একটা সংগীতের আসর বসাইতেছে। বাংলাদেশে এমন ভক্তি ও কৃষ্টিই জোয়ার আর কোনদিন আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কথটা যদি সত্য হইত তবে বাংলার নবজাগরণ আসিয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারিত। যেমন আসিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোত্তাবের পরে। তখন যে ভাবের বজ্র বহিরাছিল সে প্রাচীন অর্দ্ধমৃত বাংলার প্রাণ পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু সংগীতকলায় নয়, কর্মে, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে সর্বত্রই নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে সাড়া আসিয়াছিল ভাবের রাজ্যে। ভাষার মধ্যে নিহিত ছিল আত্মচেতনার বাণী। তাহার উৎস ছিল সাম্য, প্রেমে। আজ বাংলাদেশে বারোয়ারি ধর্মের ও বারোয়ারি কৃষ্টির যে সাড়া জাগিয়াছে তাহার মূল অভাববোধ, তাহার মূল আত্মবিশ্বাস। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার জন্ম, চিন্তাহীনতার মাঝে তাহার কৃতি। কাজেই সে সাড়ায় না আছে কোন মহৎ প্রেরণা, না আছে কোন আন্তরিক আবেদন।

বাংলার তরুণ তরুণীর নিকট তাহাদের ভবিষ্যৎ এখনও পরিষ্কার হইয়া দেখা দেয় নাই। যেটুকু দেখা গিয়াছে সেটুকু খুব উজ্জল বলিয়া তাহাদের মনে হয় নাই। নুতন পরিবেশে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার পরে, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে প্রচুর কিন্তু তদনুরূপ কর্মশক্তি তাহাদের দেহে বা মনে সঞ্চারিত হয় নাই।

ইহার কারণ আমাদের আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। প্রতিষ্ঠা যে একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই লাভ করা যায়, বিদ্যা ও সংস্কৃতি যে নিরন্তর সাধনা ছাড়া আয়ত্ত করা যায় না, এ পদম সত্যের সন্ধান তাহারা পায় নাই। পাইবার কথাও নয়। কারণ তাহাদিগের চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠার যে ছবি তাহারা দেখিয়াছে তাহার ভিত্তি সাধারণতঃ সাধনা বা পরিশ্রমের উপর স্থাপিত হয় নাই। সে সকল প্রতিষ্ঠার পৌষ প্রায়শঃই ময়দানবের তৈরী—বাতারাত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যা ও সংস্কৃতির যে রূপ তাহারা দেখিয়াছে তাহার গঠন যে মাত্র প্রচারের মাল-মশলায় রচিত এ সম্বন্ধে তাহাদের কোনক্রমেই হয় নাই। সাধকের রূপ তাহারা দেখে নাই—দেখিয়াছে পল্লবগ্রাহীর রূপ।

প্রচার-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লবগ্রাহীর সংখ্যা অপরিমিতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু বস্তুজগতেই নয়, আজ ভাবজগতেও প্রচার প্রতিষ্ঠার বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু প্রচারের দ্বারা মূর্খকে বিদ্বান বলিয়া চালাইয়া দেওয়া এখন আর অসম্ভব নয়। সংস্কৃতির ত কথাই নাই, প্রচারই তার একমাত্র বাহন। সাধনার কথা বাহারা উল্লেখ করে তাহারা মূর্খ। তারপর সংস্কৃতিরও নুতন সংজ্ঞা হইয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, তাহার কিছুটা ঢং, কিছুটা বকুনি আর বাকিটা সমস্তই প্রচার। এই প্রচার-কৌশল অবশ্য প্রকৃত গুণীকে বিভ্রান্ত করা যায় না; কিন্তু সরুপ জ্ঞানীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। আর, আসিবেই বা না কেন? যদি কেবল প্রচারের দ্বারাই কাম্যকল লাভ হয়, তবে নৈতিক সাধনার মূল্য রহিল কি? কলে সাধকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে আর পল্লবগ্রাহী প্রচার-কুশলী লোকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে।

ইহাতে দেশের অকল্যাণ হইতেছে হুই প্রকায়ে।

প্রথমতঃ, জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে, আর দ্বিতীয়তঃ, সহজ-সিদ্ধির দৌলতে প্রকৃত সাধনার মান নামিয়া বাইতেছে।

সাধনার সঙ্গে প্রচারের প্রায় আহ-নকুল সম্পর্ক। সাধনা ধ্যানের বস্তু ; কোলাহলের মধ্যে তার স্থান হয় না। আর প্রচার কোলাহলের অন্তরঙ্গ বস্তু ; উহার মধ্যেই তার জন্ম ও প্রসার। কোলাহল মনকে বিভ্রান্ত করে, ধ্যান মনকে শান্ত করে, তার শক্তি বৃদ্ধি করে।

কোলাহলের প্রতি তরুণ-তরুণীর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তার উপর যদি তা প্রচারের কোলাহল হয় তবে ত আর কথাই নাই। তাই বারোয়ারি পূজা ও জলসার কোলাহল আজ বাংলাদেশে উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে। পল্লবগ্রাহী প্রচার-কুশলী লোকের দল নিজেদের অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্ত এই কোলাহলের স্থায়িত্ব কামনা করিতেছেন। এটিকে নানাপ্রকারে বিভ্রান্ত হইয়া বাংলা-দেশের জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, তাহারা তাই জলসাধরে প্রবেশের টিকেটকে সংস্কৃতির মানপত্র বলিয়া মনে করিতেছে।

না করিবার কারণ নাই। ইহাই স্বাভাবিক। একটা সাধারণ কথাই ধরা যাক। আজ বাংলাদেশে ঘরে ঘরে পঁচিশে বৈশাখ 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মীপূজার মত ব্যাপকভাবে। রবীন্দ্রনাথের একখানা ফটো ফুল ও মালায় সাজাইয়া ধূপধূনা দিয়া উহা অর্চনা করা হয়। এই পূজা করিয়া বাংলার তরুণ-তরুণী আত্মপ্রশাদ লাভ করে। ভাবে, একটা কাজের মত কাজ করা হইল ; এ অনুষ্ঠানটি শুধু সারা ভারতবর্ষে কেন, সারা বিশ্বের দরবারে তাহার সংস্কৃতির সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু যে সাক্ষ্য ইহা দেয় তাহা তাহার সংস্কৃতির নহে—তাহার চিন্তাহীনতার। রবীন্দ্রনাথের পূজা যে তাহার ফটোপূজা নহে, তাহার কাব্য-সাহিত্যের পূজা সে কথা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে। সে পূজা কোলাহলের মধ্যে হয় না ; সে পূজার প্রধান উপচার ধ্যান ও সাধনা।

তাই বলিয়া, পূজার বহিরঙ্গের যে কোন মূল্যই নাই একথা কেহ বলিবেন না। কিন্তু সে মূল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভাবের অভাবকে রূপের রেখা দিয়া ঢাকা যায় না ; নির্ভার কণিক শুধু আচারের প্রলেপে দূব হয় না।

তেমনি করিয়া আজ বাংলার বারোয়ারি পূজা ও জলসা সারা দেশের চিন্তাহীনতারই পরিচয় দিতেছে—সংস্কৃতির নহে। সংস্কৃতির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহা দেশের সমগ্র সভ্যতার প্রতীক। শুধু শিল্প, কলার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নহে,

কৃতি ও নীতির সঙ্গেও ইহার অঙ্গাদীভাব। কোন বিষয়ে পারদর্শী হইলেই যে সংস্কৃতি লাভ ঘটে তাহা নহে। অমার্জিত কৃতি ও নীতি সে পারদর্শিতাকে সংস্কৃতির পথে বাইতে বাধা দেয়। সংস্কৃতির পরিচয় জলসাধরে পাওয়া যায় না। ইহার পরিচয় পথে, বাটে, সামাজিক আচারে, ব্যবহারে মূর্ত হইয়া উঠে। সংস্কৃতি দরবারী পোশাক নহে যে, দরবার মত ইহা পরিধান করিয়া সজ্জনের দরবারে হাজির হওয়া যায় ; ইহা নিতান্তই আটপোরে কাপড়।

বাংলার যুবশক্তিকে যাহারা ধ্যানের পথ হইতে কোলাহলের পথে টানিয়া আনিতেছে, তাহারা বাংলার শত্রু। নানাপ্রকার ষাত প্রতিঘাতে বাংলাদেশ আ : হীনবীর্য, তাহার উপর যদি এই সাংস্কৃতিক ভূতের বোকা তাহার ঝড়ে চাপে তবে ভূতের বেগার খাটিতে খাটিতে তাকে মৃতপ্রায় হইতে হইবে। আর তাহাই হইতে বসিয়াছে।

এই বারোয়ারি সংস্কৃতি-চর্চার পথে বাংলার কর্মশক্তি বসাতলে বাইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই জীবনের লক্ষণ। বাংলার যুবশক্তির মধ্যে সে লক্ষণ কোথায় ? নানাপ্রকার প্রচার মোহে আজ সে শক্তি বিমূর্ত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবনাদর্শ প্রভৃতির শাস্ত্র রূপ দেখিবার চেষ্টা আজ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রচারের মারকত ইহাদের যে রূপ দেখা যায় তাহাকেই মতা বলিয়া মানিয়া লওয়া যুবশক্তির পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, ক্রমাগত দেশের চিন্তাহীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে আর ইহাই বাংলার যুবশক্তির অবসন্নতার প্রধান কারণ।

সত্যি যদি এই ব্যাপক বারোয়ারি সংস্কৃতি-চর্চায় বাংলার কোনও উপকার হইত, তবে পথে, বাটে, হাটে, বাজারে আমাদের এত অভদ্রতা, এত অসৌজন্য প্রকাশ পায় কেন ? তবে শ্রদ্ধের লোকের উপর শ্রদ্ধা, স্নেহভাজনের উপর স্নেহ, বিভ্রার প্রতি ভক্তি এত কমিয়া আসিয়াছে কেন ? তবে দেশের কৃতি হীন হইতে হীনতর আর নীতি গহিত হইতে গহিততর হইতেছে কেন ?

যুবশক্তির পক্ষে একঘাটার বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। আধুনিক তরুণ-তরুণীর একঘাটা মনে রাখিতে হইবে যে, যে জগৎ তাহারা আজ সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে তাহার মধ্যে তাহাদেরই বাস করিতে হইবে ; তাহাদের কৃতকর্মের ফল পরিশেষে তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। কর্মের পথে আত্মশক্তি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব ; বাংলা সকল দেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে।

## সূত্রপাত

শ্রীপুষ্প দেবী

কত সামান্য জিনিস থেকে কি কাণ্ডই না হয়ে গেল।

সত্যিই স্মৃতি ভেবে পায় না কি দরকার ছিল নিখিলের বিয়ে করার? সামান্য একটা স্মৃতির রীল কেনার ক্ষমতা বার নেই সে কি ভরসার বিয়ে করার দায়িত্ব নেয়? কি জানি বাপু এরা কি শুধু ফুলের গন্ধ আর রূপেই মাতোয়ারা? কাঁটার সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন? আজ প্রায় দু'মাস ধরে চলছে এই স্মৃতি আনার বিজাট। না আনবে নিজে, না আনতে দেবে অন্য লোককে। এই জালাতেই ত কোনও জিনিস আনার কথা বলতে ভয় করে স্মৃতিভার। আর কত বিজাট বে মনে পড়ে বারম্বারের ছবি মত অতীত দিনের—তা বলার নয়। কখনও বিরক্তিতে ভরে যায় সারা শরীর মন, আবার কখনও এই অসহায় দুর্বল মানুষটির কথা ভেবে মমতা জাগে।

কিন্তু শুধু মমতা করলেই ত চলবে না—সংসারও বে চালাতে হবে। সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা মেয়ে—পুজোর দিনে তার একটা জামা নিজের হাতে সেলাই করে দেবে—এইটুকু মাত্র সখ তার, সেও কি একটা অপরাধ? কেন, ঐ নিখিলের বন্ধু সমবেশের বউ ত কত বকম সেজে আসে। তাবও ত আর এমনকিছু অদ্ভুত নয়—কিন্তু যখন বা ক্যাসান সর্ব্বাঙ্গে দেখে সমবেশের বউ পরে আছে। এই ত এখনকার দিনের ‘অজন্ডা শাড়ী’—প্রায় একশ’ টাকা দাম, আগাগোড়া জবির ঢাকাই-কাজ করা। মুখ ফুটে চায় না বলে স্মৃতিভার প্রাণে কি কোনও শখ নেই? এমনকি কথাটা ভুলেও দেখেছে নিখিল বুঝতে পারে না। সেবার যখন প্রথম ‘হারজাদারী শাড়ী’ উঠেছে মীরা পরে আসার স্মৃতি জিজ্ঞেস করল, “ওমা, কত দাম নিল শাড়ীটার? কি চমৎকার দেখতে!” তখনও নিখিল সমবেশের সঙ্গে তন্দ্রা হয়ে রইল রাজনীতির আলোচনায়। আবার তারা চলে গেলেও স্মৃতি সে এসব ভুলে দেখেছে, নিখিল হারজাদারী নামটুকু শুনেই হারজাদারের কি কি বৈশিষ্ট্য তার আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। স্মৃতি মাঝে মাঝে ভাবে, হায় যে, জী না হয়ে যদি ছাত্র হতাম। খুঁবি আচার্য্য বড় বড় অনেক আখ্যা দিয়ে মনকে স্তোক দিতে চেয়েছে স্মৃতি স্বামীর সম্বন্ধে। কিন্তু এখন যেন নিজের মনের কাছেও হায় মানতে হয়েছে।

এবার স্পষ্ট বিজ্ঞোহ জানাল স্মৃতি—বেশ ত ওর না হয় সখ নেই সাধ নেই আমাকে সাজানর। যেরেক আমি সাজাব আমার মনের মত করে। ও কেন আমার মত বা হোক করে লজ্জা-

নিবারণ করবে? যখন স্মৃতিভার বরস ১৬ কি ১৭ তখন একবার একটু গরম কাপড় আনতে বলেছিল স্মৃতি। এসেছিল একটা খেসকুটে ছাই রংয়ের গরম কোটের মত শক্ত কাপড়। রাগে, দুঃখে স্মৃতিভার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এমন শাখের মত স্মরণ রং স্মৃতিভার—যে কোনও রঙেই ত মানাবে তাকে। তাই কোনও রং বলে নি স্মৃতি। তা ছাড়া বললেই বা কি হ'ত? স্মৃতিভার কথা কিই-বা দাম আছে নিখিলের কাছে? যদি দোকানদার বলে যে এই টিকিন বা খেরোর রং জলে যোদে ভীষণ টেকসই তখন সেই টিকিন বা খেরোই পরতে হবে স্মৃতিভার। কিংবা যদি কোনও অধ্যাপক তার বুড়ো জ্যাঠামশায়ের জন্তে বা বিধবা মায়ের জন্তে কোনও রং পছন্দ করে নেয় তা হলে ত আর বন্ধে নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞী সে হং থাকতে পারে তা স্মৃতিভার ধারণাও ছিল না। তবে টেকসই বটে ছিল জিনিসটা—উঃ! আজ দশ বছরে একটুও ছিঁড়ল না। এর পরে যখন এটা ছিঁড়বে তখন কি স্মৃতি ভেঁচে থাকবে? না, বড়ী জামা পরার বরস থাকবে তখন? তা ছাড়া এই বিদঘুটে খেসকুটে রংয়ের জামা কাপড় পরার সকলের চোখ যেন তার দিকেই চেয়ে থাকে। সামান্য কুর্সী জামা কাপড় পরলেও বাড়ীর লোকেরাই অবাক হয়—আর সবচেয়ে অবাক হয় নিখিল। সে বলে, “কোথাও বেরুচ্ছ নাকি? স্মৃতিভার যেন কপাল চাপড়ে কান্ডাতে ইচ্ছে হয়।”

খাক গে ওসব কথা। বলতে গেলে বা শেব হবার নয় তা বলার চেষ্টা করার মত বোকামী আর নেই। তবুও মনে সে সব একবার এলে আর বন্ধা নেই।

একে ত সেলাইয়ের কল নিয়েই বিজাটের অভ্যাস নেই। তবু ভাগ্যে বাপের বাড়ী থেকে ন'দি এই দরকারী জিনিসটি বৌতুক দিয়েছিলেন, নইলে কেনোনা সে ত জীবনেও হয়ে উঠত না। কত হাদ্যামা করে পাশের বাড়ীর অমিরাদিকে দিয়ে দু'গজ সিঁদু আনিরে ছিল স্মৃতি—মনে আশা ছিল স্মৃতিভারকে সাজাবে মনের মত মুঞ্চিল হ'ল স্মৃতি নিয়ে—একটা জর্দা রং আর একটা ভারোলেট রং—অতই যদি করল অমিরাদি স্মৃতিভারকে। ছুটোও যদি ঐ সময় মিলিয়ে এনে দিত? বাকু বোজাই নিখিলকে একবার করে তাগাদা দেয় আর খোপার বাড়ী দেবার সময় পাঞ্জাবীর পকেট থেকে নমুনায় সিঁদুর টুকরোটুকু পাটভাঙা নতুন পাঞ্জাবীর পকেটে পুবে দেয়। তিন সপ্তাহ কেটে গেল—স্মৃতি আর আসে না। শেবে জোয় মন্ডব্য করে স্মৃতি, “আশ্চর্য্য মানুষ ছুঁবি। ছুটো দিল কিমতে

মনে থাকে না? সত্যি, আজ যদি তুমি না আনো আমি নিজেই বাব স্ত্রীতো কিনতে।”

তাকে বিশেষ আশ্বাস দিয়ে নিখিল বেরিয়েছিল—ফিবল হাতে—হাতে দুটো প্রকাণ্ড প্যাকেট। বলল, “এই দেখ চাবুক ঘোড়া শুদ্ধ এনেছি।” প্যাকেট খুলে দেখল খুব মোটা মোটা দুটো ডালা। বলল, “ভাবলাম এলাম বখন তালাপটিতে তালা দুটো নিয়ে বাই, বা চোখের উপজীব—তাছাড়া স্ত্রীমুখ থেকে বখন বেরিয়েছে যে, এবার নিজেই বাব বাজারে তখন আর অন্তঃপুরিকা করে রাখা কেন? উঃ, এই তালাব জন্তে কম ঘুঘতে হ’ল—সেখানে আবার রামুও সঙ্গে দেখা। রামু যাচ্ছে নৈনিতাল—বাজারে বাজার সঙ্গে। সারা চান্দনী এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কত যে ঘুরেছি! হ্যাঁ, এই দেখ ভুলে যাচ্ছি, খুব ভাল লেসও পেলাম, তের আনা করে গজ বাজারে। ওখানে এগাব আনা কয়ে দিল। আমবা দুজনে পুরো একটা প্যাকেট কিনলাম। দাও তোমার ফ্রকের তলায় কত দেবে।”

লেশের নমুনা দেখে স্মৃতির ত চক্ষুঃস্থির—সাদা-কালোর মেশানো সূতির লেশ, যা সূতর দিকের ফ্রকে মানাবে সে আর বোঝাতে উচ্ছ্বাস নাই। বলল, “হ্যাঁ, ভালই হ’ল। কই, স্ত্রীতো দুটো দেখে?”

তখন নিখিলের মনে পড়ল। বলল, “আবে সত্যি তাই ত। স্ত্রীতোটাই ত কেনা হয় নি—অনেক ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত লাগল কি না। আসার সময় রামুর সঙ্গে টাঙ্গিয়েই ফিবলাম তাই স্ত্রীতোটা আর নেওয়া হয় নি—পছন্দ করে বেছে এসেছি।

এবার স্মৃতির পক্ষে ধৈর্য্য রাখা কঠিন হয়ে উঠল, বলল, “চমৎকার হবে। জরদা বড়ের সিঁকে কালো আর সাদা মেশানো লেশ বসিয়ে বা বাহার হবে তাতে আর বড় মিলিয়ে স্ত্রীতোরই বা কি দরকার—সবুজ স্ত্রীতোতেই সেলাই করব এখন।”

নিখিলের কিন্তু তাতে একটুও প্রশান্তি বাহত হ’ল না। বলল, “কি আশ্চর্য্য, এত সহজে চটে বাও কেন? ঘুরে কথা বসালেই হলুতুল। বলছি ত কাল এনে দেবই। এই জন্তে তোমার খুশী কথা যায় না—মামুদের কি ভুল হয় না? তাছাড়া বড়-টং সব পছন্দ করা আছে—শুধু গিয়ে নিয়ে আসা, এ আর কতক্ষণের কাজ?”

তবুও স্মৃতির রাগ যায় না। বলে, “তোমার পছন্দ করা ত? যেমন লেস পছন্দ বাহার? অমন লেস মামুও পাবে নাকি? বিয়েটা সাধারণ তলায় দেয়।”

অবাক চোখে নিখিল স্মৃতির দিকে চায়। বলে, “কি আশ্চর্য্য! দোকানদার ত বললে, ফ্রকের গলার আর তলায় কুঁচিয়ে দিলে খুব বাহার হবে—আর রামুও ত নিলে।”

স্মৃতি বলল, “বলবে না কেন, তার বিক্রী হচ্ছে না যে, নেড়ে বৃষ্টি ত। তা তুমিও নিজের জন্তে একটা কেন কিনলে পারতে—যেদের ফ্রকের সঙ্গে মানিয়ে।

রাতটা একটু অসন্তোষের মধ্যেই কাটল। তার পরদিন সকালে নিখিল বার বার স্বপ্নতোক্তি করতে। “আজ আর কোন ভুল নয়—প্রথমেই স্ত্রীতো কেনা।” তাছাড়া লেসটা কেনা যে বুদ্ধির কাজ হয় নি তাও বুঝতে পেয়েছে। মনের অপোচনে পাও নেই—নিখিল ত জানে লেসটা কিছুতেই কিনতে রাজী ছিল না রামু। নিখিলই তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে—“মিসেস খুশী হবে, নাও না কিনে।”

কারণ সব বাণ্ডিলটা কিনলে গজে এক পরমা কম পাওয়া যায়, অথচ পুরো বাণ্ডিল কিনলে তার টাকার কুলোয় না। আগেই তালা কিনতে গিয়ে পকেট অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। স্মৃতির মুখে দিকে চেয়ে রামু বেচাতীর্থ গৃহ-অশান্তি ও কলহা করে নিচ্ছে, বুঝছে, মিসেসদের পক্ষে জিনিসটা আনন্দদায়ক নয়। বেকার সময় বাবে বাবে বলল, “আজ সকাল সকাল আসব—দিনের আলোতেই ফ্রক সেলাই করতে পারবে। দাও ত নমুনা দুটো ভাল করে নিয়ে বাই।”

স্মৃতি কড়ার খুঁটি নাড়তে নাড়তে বলে, “পকেটেই আছে আজ এক বচ্ছব।”

নিখিল আর কথা বাড়ানো নিরাপদ নয় বলে বেরিয়ে পড়ে। অকস্মেৎ প্রথমেই যায় স্ত্রীতোর দোকানে, দুটো নয় বীতিমত চাবটে চাব বড়ের স্ত্রীতোই কিনে নেয়। একবার যেন কি সবুজ রঙে সেলাই করব বলেছিল স্মৃতি—‘অধিকতর ন দোবার’। নিশ্চয়ই খুশী হবে—মনের আনন্দে কিংবা নিখিল। বাজার ডাঃ সোমের সঙ্গে দেখা। হর্ষ বাজিরে গাড়ী থামালেন সোম।

হেসে বললেন, “কি ব্যাপার বলুন ত? আজ তিনদিন আপনার দেখা-সাক্ষাৎ নেই—বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ নাকি? মামুটার আবার পরীক্ষা কাল থেকে। রোজই আপনার দিদি বলেন আপনার খোঁজ নিতে।”

নিখিল মামুর গৃহ-শিক্ষক, সত্যিই পব পব তিনদিন যাওয়া হয় নি। আগের দিন মাঝটা ধরার সকাল সকাল অকস্মেৎ বাড়ীই গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন রামুও পাঞ্জার পড়ে বাওয়া হয়ে ওঠে নি। আজও বাড়ীই কিংবা দোকান থেকে—অপ্রত্যাশিত একশেষ।

ডাঃ সোম সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত তার হাতে মামুকে দিয়ে। তাছাড়া মামুর মত ছেলে হাফ-ইয়ার্লিতে মাত্র একটা সাংবলোতে দু’নম্বর কম পেয়ে সেকেন্ড হয়েছে। এখন পব পব তিনদিন তার অসুখ-বিসুখ কম অপরাধ নয়। বিশেষতঃ এল. মল্লিকের দোকান থেকে বেকনো স্বপ্নে দেখেছেন ডাঃ সোম। কি ভাবলেন কে জানে? ভাল হ’ত যদি দেখতেন শুধুই দোকান থেকে বেকতে। মিথ্যা বলা অভ্যাস না থাকলেও চক্ষুলাল কাটাতে বলা যেত—কোনও আত্মীয় বা সহকর্মীর অসুখ-বিসুখ বাধা পড়েছে। গুরুচোরের মত মুখ করে নিখিল বেচারা গাড়ীতে উঠল। মনে ভরসা পকেটে স্ত্রীতো দুটো আছে কেনা। সোমের গাড়ী বাড়ীতে থামতে না থামতেই

নানা গুজন। দিদি স্মিতহাস্তে বললেন, “বিয়ে করে অবধি বেচারী কুসংস্কারই পান না।”

ডাঃ সোম তাতে ঘৃণাহৃতি নিয়ে বললেন, “আজও কি আসবেন—আমি একেবারে প্রেমপ্তার করে নিয়ে এসেছি।”

মাসু ছলছল চোখে এসে দাঁড়ায়, বলে, “জানেন মাষ্টারমশাই, কালও আমি স্বপ্ন দেখেছি দেবালীর কাঠ হয়ে গেল। কাল বিকেলে দাদা দিদি সুন্দর জাহাজ দেখতে গেল, আমি বাই নি আপনি আসবেন বলে।”

এ না বাওয়া যে মাসুর কাছে কতটা আশ্চর্য্যাগ তা বুঝতে নিখিলের দেবী হ’ল না। সোম আবার বললেন, “পরীক্ষার আগের দিন যে আপনি আসবেন না, এ অভাবনীয় ব্যাপার—নইলে আমিই বা হয় একটু দেখিয়ে দিতাম। কি ব্যাপার? মিসেসের আদেশে শক্তিরালয়ে গিচ্ছলেন নাকি—না সিনেমায়?”

উত্তর দিতে পারে না—মনে মনে চটে ওঠে স্মৃতিস্বপ্ন ওপর। আশ্চর্য্য! মাসুর পরীক্ষার আগেই ঠর স্মৃতি না হলে চলবে না। শুধু শুধু লোকের কাছে অপদস্থ একশেষ। কেনা চাকর পেয়েছে একেবারে—মনে পড়ে ক্ষুদ্রে বোনের কথা, বোন বলেছিল, “বৌদির এম. এ. পাস চাকর।”

মনে বিবের ক্রিয়া চলে পড়াতে পড়াতে। রাত প্রায় ন’টা বাজে। উঃ, অসম্ভব মাথাটা ধরছে। আজকাল কি যে বিস্ত্রী মাথা ধরাটা হচ্ছে—চশমাটা হরত বদলাতে হবে—একেই ত যথেষ্ট পাওয়ার আছে—আরও বাড়লে ত অন্ধের পর্যায়ে পড়তে হবে। চশমা কখন মনে পড়তেই কমাল খোঁজে চশমা মোছার গুজ, পকেটে হাত দিতেই প্রথমে বেরুল স্মৃতির চোঁক্কাটা—সেটা টেবিলে রেখে চশমা মোছে। মনটা আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্মৃতির চোঁক্কা দেখে—উঃ, বা মেজাজ হয়েছে স্মৃতিস্বপ্ন, সঙ্কেত অতিরিক্ত। ঐ বকম মেজাজ সহ্যে গলে ব্লাডপ্রেসার ছাড়া উপায় কি? কে জানে, ব্লাডপ্রেসারই হয়েছে কি না? মাসুর দিদি কুমুর কাছ থেকে একটা অ্যাসপ্রো নিয়ে চক চক করে এক গ্রাস জল খায় নিখিল। ক্রিমের পেট চোঁ চোঁ করছে—দুপুরে টিকনিও আজ খায় নি সকাল সকাল বাড়ী কিরবে বলে। মনে আশা ছিল, স্মৃতিস্বপ্ন আজ হরত কালকে বকাবকি করার অমূল্যেচনার কিছু ভালমূল্য খাবার করে রাখবে, হরত চায়ের সঙ্গে আসবে গরম গরম কড়াইসুটির কচুরি বা মাংসের সিদ্ধাড়া। এভাবে রাত প্রায় ন’টা বাজে, রাতের খাবার খাওয়ারও সময় হয়ে গেল। বাধা হয়ে গোপাল চাকরকে এক কাপ চা দিতে বলল—অন্ত সময় এর সঙ্গে হ’খানা বিস্কুট অন্ততঃ জুটত কিন্তু আজ মেজাজ খারাপ দিদির। কাজেই মিসেস সোমের দিক থেকে কোন কথা না পেয়ে চাকর এক কাপ অখণ্ড ‘চা’ই শুধু দিল। একবার মনে হ’ল নিখিলের যে, দরকার নেই খালি পেটে এই চা খেয়ে। কিন্তু ভয়ত বড় বালাই—কাজেই পো গুলেও গোপালের সেই গামছা নিংড়ানো জল গিলতে হ’ল অগ্নানবদনে।

মাসুরকে পড়া তৈরি করে দিতে দিতে প্রায় পৌনে দশটা বাজে মনকে ততক্ষণে সম্পূর্ণ তৈরি করে নিয়েছে নিখিল। সত্যিই স্মৃতিস্বপ্নকে বতই ভালবাসে—তা বলে তার এসব খেলালে কর্তব্যে গাফিলত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে তার মেজাজ দিনকে-দিন বেড়েই যাচ্ছে। বিয়ের আগেই বন্ধু বলেছিল, “স্মৃতিস্বপ্ন মার কিন্তু বেজার রাগী বলে সুনাম আছে, সামলাতে পারবি ত?”

মেজাজ প্রায় সপ্তমে নিয়েই বাড়ী কিবল নিখিল। এসে দেখে, স্মৃতিস্বপ্ন জানালার ধারে বসে সুপুবি কুচোচ্ছে—মুখ ভাব-লেপশুজ। ছোট স্নেনেজায় মনে ভাবাচ্চর নেই। ছুটে এসে জড়িয়ে ধল বাবাকে—নিখিল পকেট থেকে স্মৃতির চোঁক্কাটা তার হাতে দিতেই খুশীতে বলললিয়ে উঠল তার মুখ—বলল, “ওমা, চকোলেট এনেছ বুঝি?” টপ করে একটা চকোলেট মুখে পুরতেই নিখিলের মনে পড়ল মাসু যখন পড়তে বসেছিল তখন তার হাতে ছিল এই ব্রাউন রঙের চোঁক্কা। অজ্ঞমনসকে সেইটেই এনেছে পকেটে পুবে। পকেট হাতড়ে দেখলো স্মৃতির চোঁক্কাটা রয়ে গেছে ডঃ সোমের টেবিলের উপরে। এখানে স্নেনেজা বলে চলছে, “জান বাবা, মা বলে—‘তোমার বাবার কিছু মনে থাকে না—কি করে তোমার জামা করব বল?’ এই ত বাবার সব মনে থাকে। পরন্তু চকোলেট আনতে বলেছিলাম না বাবা?”

মনে মনে স্মৃতিস্বপ্নকে আর প্রশ্নর দেবে না ঠিক করেই এসেছিল নিখিল। তার উপর ক্লান্তি ও বিবাক্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছিল, কাজেই রাগের মুখে নিজের ভুলটা না মেনেই বলে, “মনে কেন থাকবে না, কিন্তু সব কাজেই কি মেজাজ চলে?”

বাস এবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটল—স্মৃতিস্বপ্ন বলল, “কি দরকার আমার মেজাজ সহ্যের? একটা কথা না বলেও উপায় নেই, বললে সে কথাও থাকবে না, শুধু শুধু অশান্তি। রাত দশটার বাড়ী কিরে এখন মেজাজ কে দেখাচ্ছে সবাই দেখছে। বলে দে স্নেনেজা, আমরা কাল বাথরগঞ্জ যাচ্ছি।”

নিখিল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, “কাককে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি চলে এ মুখ আর দেখতে হবে না।” গারে কামিঙটা গলাতে গলাতে নিখিল বেগিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

নিজের অসংযমে কান্নার ভেঙে পড়ে স্মৃতিস্বপ্ন।

রাতটা পার্কের বেঞ্চে কাটিয়ে সকালে মাথা খানিক ঠাণ্ডা হলে নিখিল ভাবে, কাজেই ত মাসুর মূল, দেখে আসি কেমন পরীক্ষা দিল। গিয়ে দেখে মাসু বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুলের কটকে। হাতে সেই বিজ্ঞাটের মূল স্মৃতির চোঁক্কা। বলল, “দেখুন মাষ্টার মশাই, বাবাকে চকোলেট আনতে বলেছিলাম, বাবা ভুলে কতক-গুলো স্মৃতির গুলি এনে দিয়েছে। সেই সেদিন ত আমি সুন্দর জাহাজ দেখতে যেতে চেয়েছিলাম—বাবা বললেন পড়ার কতি হবে, মাষ্টারমশাই কিরে যাবেন। তার বললে তোমার চকোলেট এনে দেব। এমন ভুলো মন বাবার।”



বাড়ী কিরে দেখে সুমিতা, সুনেত্রা কেউ নেই—পাশের বাড়ী টুহু এসে একটা চিরকুট হাতে নেয়। তাতে লেখা—‘চললাম, সুমিতা।’ টুহু বলল, ‘বাবা! কি কারা কাদছিল সুনেত্রা ‘না’ বাব না, না বাব না’ বলে। ওহা কেন গেল কাকাবাবু?’

নিখিল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—ঘরের সামনেই কলের উপর সেই সিঁড়ের টুকরো দুটো তেমানি পড়ে আছে। মনে ভাবে, সামান্য সুতোয় পুত্র ধবে কি বিভ্রাটের সূত্রপাতই হ’ল। যজ্ঞের দিনে সুনেত্রাকে সাজানোর সাথ মিটল না সুমিতার।

## মধ্যবিত্ত

শ্রীরথিন মিত্র

ভারতবর্ষের অরণ্যচাষী পণ্ড-সমাজের দ্রুত লুপ্তপ্রায় কয়েকটি সম্প্রদায়কে বক্ষা করবার জন্তে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সংকারগুলি নানা পরিকল্পনা করছেন। তাদের পুনর্নবীতি, বংশবৃদ্ধি এবং নিঃশঙ্ক বিশেষের জন্তে বহু বন্যাকুল সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব পরিকল্পনার জন্তে যে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে তা শুনলে অনটন-পীড়িত দেশবাসী সময় সময় চমকে ওঠেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং যে উদ্দেশ্যে সরকার এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাতে সমালোচনা করার কিছু নেই, আধুনিক সব দেশেই অরণ্য-সম্পদকে বক্ষা করবার জন্যে বিভিন্ন চেষ্টা চলছে। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে অন্য এক সম্প্রদায়ের যে স্বরিত বিনষ্ট ঘটছে সে দিকে সরকারী ও নাসীনা সমালোচনার পূর্ণ অপেক্ষা রাখে। অবশ্য এ সম্প্রদায় মহুযোতর কোন প্রাণীর নয়, মানুষের। এ সম্প্রদায় জাতির রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যবিত্ত নামে আখ্যাত হয়ে আছেন। যে হিসেবের উপর ভিত্তি করে একদিন এই সম্প্রদায়ভুক্তদের বিস্ত-বৈধত্বের পরিমাণ মধ্যম বলে চিহ্নিত হয়েছিল সে হিসেব আজকের অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বাতিল হয়েছে, পূরণদিনের মধ্যবিত্তেরা আজ মূলত বিস্তহীন সম্প্রদায় ভুক্ত।

শুধু আমাদের দেশ নয়, পৃথিবীর সব দেশের সার্বিক জাগৃতির মূলে বয়েছেন এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়; একটা সমগ্র দেশকে অন্ধকার হতে আলোকে উত্তীর্ণ করতে যে মানসিক সংগ্রামের প্রয়োজন হয় সে সংগ্রামের নায়ক এই মধ্যবিত্তেরা, যে কটা বিপ্লব আর বিদ্রোহ পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে তা এই মধ্যবিত্ত সমাজের যত্নবশত। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে সেই রক্তক্ষয় ও সংশয়মিত প্রথম মুহূর্তে ধনী এগিয়ে আসেনি আর সাধারণ মানুষ নিশ্চেষ্ট ছিল তাদের জীবনের নিষ্ঠুর বৃত্তে। একমাত্র বলতে গেলে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত, সংগ্রামের রক্তমণ্ডলে সমগ্র জাতির চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা লাভের স্পৃহাকে অদম্য করে তোলেন।

মধ্যবিত্তেরা স্বাধীনতাপূর্ব পর্যন্ত সমাজের কেন্দ্রভূমি ছিলেন, তাঁদের জ্ঞানে, শিক্ষার, আদর্শ ও মর্যাদাবোধে বাঙালীর আত্মিক-তেজ অন্য জাতির আর্থিক গরিমাকে মান করে দিয়েছিল। সমগ্র দেশের গতির নিয়ন্তা ছিল এই সম্প্রদায়ের কর্মব্যাপ্তি। কিন্তু স্বাধীন হবার পর থেকে পালা বদল ঘটেছে। সম্প্রদায় হিসেবে মধ্যবিত্তেরা আজ নিশ্চিহ্নের পথে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেশের সামাজিক গঠনে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে আপাত-দৃষ্টিতে তা সাধারণের লক্ষ্যে অ’সে না কিন্তু সমাজের গভীরে হাঁদের আনাগোনা করতে হয় তাঁরা যত্নেই উপলব্ধি করতে পারেন এত দিন সমাজ-বাবুস্বার মেরুদণ্ড স্বরূপ যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল তার ক্ষয় কত গভীর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষয়ের কথা, এ দুর্দশার কথা অঘোষিত থেকে ব্যর্থ, কারণ এ সম্প্রদায়ের আভিজাত্য ও শিক্ষাদর্শ নিজেদের দৈন্যকে সর্বসময়কে তুলে ধরতে বাধ্য দেয়; তাই নোন-ধবা ঘরের অন্ধকারে বা হাসপাতালের হিম-শীতল পরিবেশে বহু লাহিত জীবন নিরানুগত করে।

যে সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় একদিন বাঙালী জাতির চিন্তা-চেতনার বিপ্লব এনেছিল সে সম্পদ আর্থিক নয় আত্মিক। মধ্যবিত্তের এই আত্মিক সম্পদ তাকে বিশিষ্ট করে ছিল অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। আজকে আত্মিক সমৃদ্ধির মূল্যবোধ কমে গেছে। শিক্ষার উচ্ছ্রা নয়, অর্থের দ্রুতি আজ সামাজিক সন্ত্রাসের মাপকাঠি। বাঙালী মধ্যবিত্ত এতদিন মাহুবেব মনোর হাতে সংস্কৃতির পসরা সাজিয়ে বসেছিল, সংসারের বাজারে স্থূল পণ্যের কাষব্যয় করেনি, ফলে তার আত্মিক বিস্ত সঞ্চিত হয়েছে কিন্তু আর্থিক মূল্য কিছু পায় নি। তাই আজকের পরিবর্তিত সমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নীচে, অনেক নীচে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংগ্রামী, সংগ্রাম ত্যাগ করতে জানে একটা আদর্শের জন্যে একটা মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে। কিন্তু আজ সে সংগ্রাম করবে কোন উৎসাহে? শঠতা আর বকনা যেখানে সব নীতি ধর্মের উপরে স্থান পাচ্ছে সেখানে কিসের প্রেরণার সে কাঁপাবে সংগ্রামের মধ্যে?



“সত্য যদি নাহি মেলে হৃৎ সাথে যুগে” কোন আশ্বাসে মানুষ অন্ধকারে পাড়ি জমাবে ?

একটা কথা আছে, তা হচ্ছে সক্ষমতম ব্যক্তি বেঁচে থাকার অধিকারী। কিন্তু আজকের দিনে সক্ষমতম কে ? আধুনিক বিচারে সেই জন অথবা সমষ্টিই নির্দোষ বা অক্ষম যিনি বা যাঁরা শঠে শাঠাং নীতি পালন করেন না। আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী শুধু শিক্ষিত নন তাঁরা এক ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতির বক্ষক এবং বাহক। তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় জীবনের সুকুমার বৃত্তি আর মর্যাদাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে তথাকথিত জীবন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে। একথা স্বীকার করতেই হবে আহত বাঙালী মধ্যবিত্ত যে শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার ফলে বাঙালীর জাতি হিসেবে আত্মিক ধ্বংস ঘোলকলার পূর্ণ হতে পারেনি।

হাহাকার আর হতাশার মুহূর্তমান হয়ে রয়েছে বলতে গেলে সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এ বাধা হয় ত রাজপথে লাল নিশানের তলার ঘোদিত হয় না, হয়ত তা ময়দানের লক্ষ মাস্তকের জমায়েতে উচ্চারিত হয় না ; কিন্তু তাকে অস্বীকার করা সূঁচের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করার সামিল। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের জন্যে নূতন যুগের পরিশ্রেক্ষিতে পুনর্বাঁসনের ব্যবস্থা কি করা হচ্ছে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য আমরা আজি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, এই নূতন যুগের সঙ্গে একতালে পা না ফেলতে পারলে

বাঙালী কেন, যে কোন জাতেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে একটা জাতের সবাই ইট ভাঙবে, লোহা গলাবে আর মাটি খুঁড়বে ? প্রত্যেক দেশেরই একটা জাতীয় মানসিকতা আছে ; আর এই মানসিকতা গড়ে উঠে ভৌগোলিক ইত্যাদি নানান পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবের ফলে ; বাঙালীর শ্রম-বিমুখতা চারিত্রিক দোষ নয়, চারিত্রিক গঠনের ফল। এ গঠন পারিপার্শ্বিকের চাপে এক দিন নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে, আর বাঙালীর শ্রম সহিষ্ণুতার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একদিনের মধ্যে ভিন্ন মানসিকতার একটা সম্প্রদায়কে ত বলা যায় না তোমরা হাতিয়ার নিয়ে নেমে যাও খনির ভেতরে, নয় ত ভেঙ্গে যাও সমুদ্রে। সে জন্যে সময় চাই। তা ছাড়া জনহিতজন্যী সরকার একটা জাতীয় আত্মিক এবং আর্থিক পুনর্বাঁসনের সময় সে সম্প্রদায়ের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ মর্যাদা দেবেন বৈকি।

বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রয়োজন জীবন-ধারণের নিশ্চিত পরিবেশ, আলোক-উজ্জ্বল জীবনের উচ্ছ্বসিত বিলাস-বাসন নয়, সাধারণ জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তাই বাঙালীর কাম্য। এত অভাবেও বাঙালীর চরিত্রের সহজ ধর্ম্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে তাই বস্তু বৈতর্ক্যের বিতৃষ্ণিত অপেক্ষা এখনও মানসিক বিস্তারের পক্ষপাতী বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, আর সে জন্যে প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তি উপর রচিত সরকারী পরিকল্পনা।

## মণিমালার জন্যে

### শ্রীকৃষ্ণী সোম

শ্রাবণী নদীর দোলা রক্তজবা রূপের জোয়ার  
রিমিকিমি নেশা মজ্জার  
অজানা পথের মত নতুন ইসারা  
কুচির কুঁড়ির বৃকে জাগে যেই সাড়া  
এনে দিলে শিহরণ—স্বপ্ন, গান—মধুকর্য্য দিন  
মোহের আবেশ দিলে বঙুন-বঙুন।

তুমি ত রহস্যময় অপকল্প সৌন্দর্যের দেশ !  
তোমাতেই খুঁজে পাই স্বর্নলীল কামনার শেষ।  
আমার নিঃসঙ্গ প্রাণে জেলে যাও হরন্ত অজার,  
নিশ্চল নিপুণ শিল্প মনে হয় দূর অজ্ঞার।

যন্ত্রণার ভীবে বিঁথে অসহ আঁচড়ে  
আমাকে জালাও তুমি, তুমি জল নাকি ?  
করুণ বেহাগবাগ কেন টান হৃদয়ের ছড়ে  
কি সূঁচ তোমার বল ? কেন শুধু মিথ্যা এই কী ?

প্রতারণা আর কেন, মণিমাল, উন্মীল গ্রহবে  
সাহসী ডুববি হও মুক্তোভরা মনের সাগরে।

# সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসংজ্ঞা দেবী

যাঁর সঙ্গে বারো বৎসর বয়সে বিবাহসূত্রে জীবনের বোগ হয়েছিল এবং প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স পর্যন্ত সহধর্মিণী ও সহকারী রূপে যাঁর সঙ্গে বাস করে'ছি, তাঁর দেহত্যা জীবনের কথা বর্ণনাক্রমে কিছু প্রকাশ করে বলা আমার কর্তব্য বলেই মনে হচ্ছে। সম্পূর্ণ রূপে সৌষ্টবের সঙ্গে তাঁর চরিত্র অঙ্কন করা আমার মত বিচাচীনার কষ্টই নয়। তবে নাকি যাঁর ইচ্ছিতে আমার এ জীবনতরী এ-বাৎকাল ভেসে চলেছে, তাঁরই ইচ্ছিতে আংশিক ভাবে স্বামীর চরিত্রের মাধুর্য—খাতার পাতার অন্ন-ব্রহ্ম হুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।

আমার স্বামীর ত্রিবিধ বৎসর বয়সে বিবাহান্তে আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। তাঁর তরুণ বয়সে বিলেত বাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একমাত্র ছেলের বিবাহ সইতে পারবেন না বলে তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁকে বিলেত যেতে বাধ্য দেন। সেই দুঃখে ও অভিমানে ইনি বিয়ে করব না বলে কোট ধরে প্রায় ত্রিবিধ বছর কাটিয়ে দেন। পরে মায়ের ছেলের বহু কান্নাকাটি ও মান-অভিমানের পর ছেলে বিয়েতে মত দেন। বার বৎসর বয়সে কিশোরী আমি প্রথমটা তাঁকে ভয়ই করেছিলাম। কিন্তু তিনি এমন সুনিপুণ কৌশলে দু'ব থেকেই স্নেহ ছড়িয়ে আশে আশে মাস ছয়কের মধ্যে আমার ভয় এতটাই ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন যে, বছরখানেকের ভিতরই আমি তাঁর উপর আধিপত্য করতে কিছুমাত্র বিধা করি নি এবং তিনিও আমার কর্তৃত্বের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

গীতার বাক্যে কর্তব্যবোধী বলে তিনি তাই ছিলেন। বোগজন্ত পুরুষই এসে কর্তব্য করে সাধনোচিত ধামে কিরে গেলেন। “কর্তব্যে বাধিকারকে মা ফলেয়ু কদাচন”—এই ভগবৎবাণী তাঁর মুখে কোন দিন শুনি নি কিন্তু এই মহৎ বাণীর নির্ধাঙ্গ দিয়েই তাঁর জীবনটি গঠিত ছিল। সুবৃহৎ পরিবারের তিনি একজন ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে কর্তব্যজীবনে দেশবিদেশে বহু ভিন্ন-দেশীয় লোকের সঙ্গে মেশবার আমার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু তাঁর মত “আপন মোছা” লোক আমি দ্বিতীয় একটি দেখিনি। সংসারে থেকে সংসার করে যে মানুষ নিজের নাম বশ সুখ সুবিধা অর্থ ইত্যাদির দিকে দৃকপাতমাত্র না করে পরের জন্ত নিজেকে এমন ভাবে বলিয়ে দিতে পারে এ দুঃখ একান্তই বিরল বলে আমার মনে হয়।

শ্রীমান দিলীপ দাস তাঁর একটি গানের আসরে একবার বলেছিলেন—“তাঁর ঘর নেই তাঁর পদ নেই, যাঁর ঘর নেই তাঁর পদ নেই।” কিন্তু স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়েও পুণ্যোন্মাদ্যর ঘর থেকেও যাঁর

পর থাকে না এর দুঃখ যেমন তিনি ছিলেন এমন আর কেউ হতে পারেন কিনা আমার জানা নেই। এ আমার অভ্যক্তি নয়। বোধ করি বোগজন্ত ছিলেন বলেই এই অসাধারণ ভাব এত অধিক পরিমাণে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এদিকে সংসারে স্বামী হয়ে জীব প্রতি স্বামীর কর্তব্য পুরোমাত্রায় করেও অপর পক্ষে স্বামীর দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বাইরের সকল কষ্টের মধ্যেও রুগ্না জীব প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সেবার কষ্ট বেশীর ভাগ নিজের হাতেই করে গেছেন। শেষ মৃত্যুশয্যা ছাড়া দীর্ঘ জীবনে একটি দিনের জন্তেও এতটুকু সেবা জীব কাছে নেন নি। এই বকম পিতা হয়েও সন্তান সন্ততিদের প্রতি প্রচুর স্নেহ টেলেছেন অথচ পিতার দাবী সম্বন্ধে মনের কোণেও কখনও কোন অঙ্কুর উঠতে দেখি নি। এই বকম ঘরে বাইরে সর্বত্রই তাঁর একই ব্যবহার, একই ভাব দেখেছি।

কর্মজগতে তাঁর প্রধান কীর্তি হিন্দুস্থান ইঞ্জিওয়েল সোসাইটি। এর আইডিয়াটি অবশ্য ধীশক্তির আধার অধিকাচরণ উকিল মহাশয়েরই। তিনি আমাদের বাড়ী ঘন ঘন এসে আমার স্বামীকে কনভিনস করিয়ে এই মহান কর্মক্ষেত্রে নামিয়েছিলেন। এটি যে জগতের বৃক্রে ক্রমশঃ হিন্দুস্থান ইঞ্জিওয়েল রূপ মহীকহ আকার ধারণ করে ভারতবর্ষব্যাপী হুটে উঠেছিল, তা একমাত্র এই নীরব কর্মীর প্রাণঢালা সাধনা, স্থিরবুদ্ধি, বিচারপূর্ণ গবেষণা এবং শরীর-পাত করা পরিশ্রম দ্বারা।

জন্মদায়ের ঘরেও প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র যারের চক্ষের মণি হয়ে তিনি যেভাবে এই কর্মসাধনার নিজেকে ছুঁিয়ে দিয়েছিলেন তা দেখবার ও শেখবার বস্তু। দীর্ঘদিন এই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যে বহুদিন ভুগেছিলেন। এক দিকে ঔষধপথ্য এবং অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা তেল মালিশ ইত্যাদি চলতে থাকলেও অল্প দিকে কর্মসাধনা বিবাহবিহীন ভাবে এগিয়ে চলেছিল।

তিনি কাজ করতেন সম্পূর্ণ একাধ্র এবং অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে। যখন লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন বাইরের কোন কথাই তাঁর কাণে যেত না। একদিনের একটি ঘটনা বলি—একদিন তাঁর হিন্দুস্থানের লেখাপড়ার কাজ দস্তবস্ত চলছে এমন সময়ে একটি অপরিচিতা মহিলা আমার কাছে বেড়াতে আসেন। তখন যে ঘরে তিনি তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে কাজ করছিলেন তার ঠিক সামনেই আমি সেই সুরসজ্জিতা মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ঘণ্টাখানেক মহিলাটি ছিলেন এবং সমস্ত সময়ই আমার স্বামীকে নিবিষ্ট-

চিত্তে লেখাপড়ার কাজ করে যেতে দেখে সেই সুসজ্জিতা মহিলা বাবার সময় বেশ ক্ষুধমনে এক সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন—“এত সময় বে বসে রইলাম, ইনি কণিকের তরও কোনও দিকে চান নি, কি নির্বিষ্ট ভাব, বেন একটি পোকা।” বহুদিন আমরা নিজেনের মধ্যে তাঁর পোকা খ্যাতি নিয়ে হাসাহাসি করেছি। বাই হোক এই হিন্দুস্থান ইন্সটিটিউট বখন তাঁরই মন প্রাণ শরীর ঢালা সাধনার ফুলফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল তখনই আন্তে আন্তে তাঁকে আপিসের শীর্ষস্থান থেকে সরাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সদা-প্রসন্ন কৰ্ম্মযোগী তিনি তাতে তিলার্দ্ধ বাধা দেওয়া দূরে থাক, জানতে পেয়ে সে কাজ সম্পূর্ণ সাহায্য করেছিলেন।

তাঁর জীবনব্যাপ্তি কি আইন, কি ইঞ্জিনিয়ারিং যে বিষয়ের বখন জ্ঞানের অপেক্ষা হয়েছে, নিজেই পড়াশুনা করে নিয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত নিপুণতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করে নিয়েছেন। এক ভাষা থেকে অল্প ভাষার তর্জমায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পূজাপাদ রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’, ‘জীবনস্মৃতি’ ইত্যাদির ইংরেজী তর্জমা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সকলেই সে কথা স্বীকার করেন। অবসর সময়ে টলষ্টয়, তর্জক এলিয়ট প্রমুখদের বিখ্যাত নভেলগুলি হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এমন সহজ বাংলায় উপাখ্যানটি বলে যেতেন যে, কোথাও একটু বাধত না বা মুহূর্তের জ্ঞাত ইতস্ততঃ করতে হ’ত না। সে সময়ে কেউ ঘরে এলে বুঝতেই পারত না যে তাঁর হাতে ইংরেজী বই। এ জিনিস যাঁরা দেখেছেন সবাই জানেন। কত বক্তার বক্তৃতা যে তিনি স্মরণ করে বিশদ করে লিখে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সে সব বক্তৃতা অবশ্য চিরদিন বক্তাদের নামেই প্রকাশিত হয়েছে।

একবার এক জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা তাঁর তেমন আয়ত্ত না থাকায় তার মনের স্থগ্ন ভাবগুলি ইচ্ছামত ফুটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। এমন অবস্থায় একটি পাঠিতে আমার স্বামী সঙ্গে এই পণ্ডিতটির আলাপ হয়। উক্ত পণ্ডিত কথাবার্তার কি করে জানি না বুঝে নেন যে, ইনিই তাঁর মুখিলের আসান করতে পারবেন। তখন তিনি একে তাঁর অনুবিধার কথা মোটামুটি বলেন। তার পর আমার স্বামী ইংরেজীতে সেই ভাবটি স্মরণ পদিস্ট করে তাঁকে লিখে দেন। জার্মান পণ্ডিত সেই লেখাটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বার বার বলতে থাকেন, “আমি ঠিক এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারি নি, তুমি কি স্মরণ সজ্ঞে প্রকাশ করেছ!” সেই জার্মান ভ্রমলোক তার পর থেকে এতই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েন যে, দেশে কিংবাবার পর থেকে প্রায়ই উচ্চসিত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখতে থাকেন। আমার স্বামী প্রথম দু’তিনটি পত্রের উত্তর দিয়ে আর পত্র দেন নি। ভ্রমলোক উত্তর না পেয়ে শেষে চিঠি লেখা বন্ধ করলেন।

আমার স্বামী নিজে মাত্র খানতিনেক বই প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রথমটি হ’ল মহাভারতের বহুসাগর ছেঁচে সরল বাংলার তার

মূল আখ্যানের প্রকাশ। এটি আমার বিবাহের পূর্বে লেখা। শুনেছিলাম এক সময় রেখিটেটে জয়ে প্রায় দু’আড়াই মাস তাঁকে বিছানায় আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল, সেই সময় এই মহাভারতের সারাংশ লিখে যোগশয্যাটিকে জীবনে বুধা যেতে দেন নি। অনেক পরে “বসন্ত প্রান্তের প্রফুল্লিত সফ্রা পুষ্প” নামে একটি ঐতিহাসিক জাপানী গল্প তর্জমা করেন। শেষ মুতায় আগে লেখা বইখানির নাম “বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ” এইটিই তাঁর রচিত একমাত্র মৌলিক গুচ্ছক।

নিজেই তিনি বলতেন আমার জীবন-অভিধানে পারব না কথাটি নেই। বাস্তবিক তিনি পারতেন না এমন কাজই ছিল না। ট্রেনে যেতে যেতে এক ভ্রমলোক তাঁর হস্তদেখা বিচার করে বলেছিলেন—“বহুবিধ প্রতিভা একত্র সমাবেশ হওয়াতে কোনও বিশেষ একটি প্রতিভা আপনার মধ্যে ফোটার স্বযোগ পায় নি।” ভ্রমলোকের বেথাবিচার যে কত সত্য তা যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

তাঁর দেহটি বিধাতা সৌন্দর্য্য দিয়ে নিখুঁত করে গড়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধ ছিল তাঁর আজসন্দিগ্ধ। হেলার কেলার তাঁর হাত থেকে যা কিছু বেরত তাও ফুলের মত ফুটে উঠত। ঘর-সংসারের কোন কিছু কাজ করতে হলে সেটি তাঁর মনোর অমুপাতে স্মরণ না হলে সইতে পারতেন না। তিনি সুরজ্ঞ ছিলেন। দেশ ও বিলিতি সব বস্তু স্মরণেই তাঁর যেন সহজাত তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল। এসবাজে ছড় দিয়ে মুহূর্তানি বখন দিতেন তখন সেই বস্তুটি শুণী লোকের হাতে পড়েছে বুঝেই যেন মুহূর্তেই সুরে বেজে উঠত। অল্পবয়সী আকর্ষণে তাঁকে দেখেছি। স্বভাবে ছিলেন সুরসিক উদার এবং পরোপকারপ্রবণ। তাঁর প্রশান্তচিত্ত পূর্বের জ্ঞাত সর্গদা প্রমুখ থাকত। কোন কটু ভাষণ বা অপবাদ এই প্রশান্তিকে বিচলিত করতে পারত না। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানের বিরাট সাফল্যে জগতের দর্শাপরতন্ত্র লোক প্রকাশ্যে কাগজে লিখেও কত নিন্দাবাদ করেছে। আবার তাদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ নিলজ্জের মত এসে বলেছে, “অমুক জায়গায় অমুককে আপনি বললে আমার একটি চাকরি হতে পারে।” তিনি তৎক্ষণাৎ সহ্যাতবদনে টুপি এবং লাঠিটি নিয়ে সেই নিন্দুক ব্যক্তিরই সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হতেন। কেউ অমুযোগ করলে বলেছেন, “অমুক আমার নিন্দা করেছে বলে আমি কি তার শত্রুতা করব? তা ছাড়া কেউ পালাপাল মিলে আমি কাবু হইনে, আমার গণ্ডারের চামড়া।”

একটি ঘটনা বলি—কোন ব্যাপারে এক ভ্রমলোক নিজের স্বার্থরক্ষার বা নিজেকে বাঁচাবার জ্ঞাত তাঁর নামে প্রকাশ্যে বহু নিন্দাবাদ করেছিলেন। এতে গুরু ছেলেমেয়েরা সেই অত্যন্ত পরিচিত ভ্রমলোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টার পর সেই ব্যাপারটি মিটিরেও ছেলেমেয়েদের মনের কোভ বাচ্ছে না দেখে, তিনি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন উক্ত ভ্রমলোক কিছুই

অভার বলেন নি। তার পর আগের সেই সহজ ভাব দেখাবার জন্য বিশেষ করমাস দিয়ে একটি মন্ত কেক আনিবে ছেলেদের সামনে দিয়ে যেটবে করে নিয়ে সেই কেক হাতে করে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলেন। তাঁর অহুরোধে আমাকেও তাঁর সঙ্গে কেক পৌঁছতে যেতে হয়েছিল। এমনি কত ঘটনাই আছে।

তিনি যে দানশীল ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তাঁর ক্যাসিয়ার অনেকবার বলেছেন, “বাবু মশাই বাকের বা দিতেন তা প্রয়োজনের অতিরিক্তই দিতেন। আমি যদি বলেছি ‘এতটা দেবার আবশ্যক কি?’ তখন বাবুশাই বলতেন তুমি বোঝ না অনন্ত, মানুষকে দিতে হলে তার প্রয়োজন পূর্বে করেই দিতে হয়।” আমাদের পাড়ার গরীব মুসলমানেরা চিরদিন বলেছে, ‘ঠাকুর সাহেব পীও’।

তাঁর মৃত্যুর পরে বৈবাহিক কন্যাত্রে বহু লোকের সঙ্গে আমার দেখা করতে হয়েছিল। তাদের সকলের মুখে এই একটি কথাই শুনেছি যে, তিনি ছিলেন দেবতা। সেনসাস এনকোয়ারী উপলক্ষে এক পদস্থ ব্যক্তি আমাদের বাড়ী এসে বলেছিলেন—“মিঃ টেগোর বস করার জন্য এ বাড়ী তীর্থ হয়েছে। আমি কখন উপলক্ষে এখানে এসে আজ ধন্য হলাম।”

এই নীরব ত্যাগী পুরুষটি জগতে কাকর কাছ থেকে কিছু না নিয়ে, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা না করে, বাকের বা দেবার তার অতিরিক্ত দিয়েই পৃথিবীর বুক থেকে নীরবে স্বর্গে গিয়েছেন। মৃত্যু বর্ষন কঠিন বাহুপাশে তাঁকে বিয়ে ধরেছিল, তখন প্রায় তিন মাস সেই বেষ্টনীর মধ্যে তিনি শব্দশাস্ত্রী ছিলেন। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি এবং ততোধিক যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসার মধ্যে শরীরটিকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে সব সময় তিনি চোখ বুজে প্রশান্তবদনে নীরবে শুয়ে থাকতেন। কেউ কোন দিন উঃ কি আঃ করতে শোনে নি এবং তাঁর মুখের প্রশান্তভাবের কদাপি কোন বিকৃতি ঘটে নি এই তিন মাসের মধ্যে। আমি বর্ষনই জিজ্ঞাসা করেছি, ‘এখন কেমন আছ?’ বলেছেন ‘ভাল’। একদিন বলেছিলেন—‘আমি সবসময় ভালই থাকি’। তার পর নিজের অজপ্রত্যাশ দেখিয়ে বললেন, ‘এরা কে কেমন আছে, তুমি দেখে নাও’। আরও একদিন নিজের বুক হাত দিয়ে বলেছিলেন ‘সুস্থ হেসে, এ বড় বোকা, পৃথিবীতে এত বাতাস আর এ টানতেই পায়ছে না’। পেট থেকে জল তখন তাঁর ফুসফুস আক্রমণ করেছে, ঘাসকষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু ঐ কথাটি ছাড়া আর কিছুই বলেন নি।

তাঁর মৃত্যুর পরে তখনকার হিন্দুস্থানের চীক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বতীলাল সেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেছিলেন, “আমি আমাদের আপিসের প্রধান প্রধান সকলকে বলেছি—আমাদের সঙ্গে মিঃ টেগোরের মেলামেশার এবং ব্যবহারে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের বা বলবার আছে তা আমরা সবাই একটু একটু করে লিখব।”

তখন যদি বাস্তবিক এটি লেখা হ’ত তা হলে সাধারণত তাঁর জন্মের ব্যবহারের এবং উদার চরিত্রের পরিচয় কিছু কিছু পেতেন।

কিন্তু বিধাতার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল ইনি গোপনে থেকে গোপনেই কয়েক বাবেন। ডাঃ সেনের এ সদিচ্ছা তাই কার্যে পল্লিত হয় নি। আজ দীর্ঘকাল বাদে ভগবৎবিধানে সাধ্যমত সংক্ষেপে আমাকেই কিছু বলতে হ’ল।

এই প্রসঙ্গে আমার সংসারের কথাও কিছু বলি। সংসার-জীবনে শেষের দিকটা কি প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা উঠেছিল এবং সেই ঝড়ের ভিতর থেকেই পদ্মপ্রভু কি ভাবে তাঁর এই দীনা সেবিকাকে রক্ষা করেছেন সেইটুকু বলে প্রভুর মহিমা ঘোষণা করে ধন্য হয়ে লেখনী ধারণের অযোগ্য আমি এ লেখনী ধামিয়ে দেব।

জগতে কোন বিষয়ই অতি ভাল নয়, তা পুরাকাল থেকেই প্রমাণিত হয়েছে—অতি-দানে বলি রাজারও বন্ধন হয়েছিল তাই শাস্ত্র বলেছেন, ‘সর্বমত্যজঃ পরিত্যজ’ টিক এই কারণই আমার স্বামীর স্বভাবগত উদারতা, দানশীলতা বিশেষ করে কাউকে না বলবার অক্ষমতা ধীরে ধীরে আমাদের সংসারটিকে স্বর্ণের বেড়াভালে ঘিরে ফেলে এবং তাঁর মৃত্যুর অল্পপূর্বে টাকে সর্বস্বান্ত করে দেয়।

আজীবন প্রচুর ধনসম্পত্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত বিলাসে থাকি এবং জীবনের শেষে সর্বস্বান্ত হওয়া এ দুটি যে কি ভীষণ ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অল্প কেউ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না। সংসারে যদি স্বর্ণ একবার প্রবেশ করে তা হলে স্বভাবতঃ সে স্বর্ণ বেড়েই চলে। এই দীতিতে স্বর্ণ আমাদের সংসারে বেড়েই চলেছিল। সুদ এবং সুদের সুদ ক্রমে ভরম উঠতে লাগল। উত্তমর্ঘেরা আদালতের সাহায্যে তাগাদা শুরু করলেন।

সেই সময় থেকে থেকে এক একটি উত্তাল তরঙ্গ যেন মুখবানান করে তেড়ে আসত। মানুষ আমরা—আমাদের সাধ্য ছিল না তা নিরাকরণ করা। সেই তরঙ্গের সামনে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অসহায়। বিধির বিধানে মানুষের বুদ্ধির অগম্য উপায়ে এই তরঙ্গগুলি যেভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে—তা দেখে সর্বশক্তিমান বিধাতার কৃপাহীন নিরীক্ষণ করে আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি নি। এই উত্তাল তরঙ্গগুলি যেভাবে ক্রমান্বয়ে উঠত এবং মিলিয়ে যেত তা ভাবায় বলা আমার অসম্ভব। সেই ভরস্বর দিনগুলির সম্যক বর্ণনা করার আজ অবশ্য আমার ইচ্ছাও নেই।

জীবের জীবনে যত বড়ই জটিলতা, যত বড়ই হৃদশা অশ্রুত না কেন সে যদি প্রভুর স্বরণ মননরূপ অভয়দণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতার সঙ্গে দৃঢ়হৃদে ধরে থাকতে পারে, তা হলে সকল বিক্ষেপ, সকল হৃদশাই একদিন মিটে যায়। এ আমার ক্ষুদ্র জীবনের চরম অভিজ্ঞতা—বহুকষ্টে উপার্জিত সত্যজ্ঞান।

মহাত্মা দয়ালদাস স্বামী কোনও অবস্থায় তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন :

“ভজন করা তেরা ক’ম হার

ভোজন দেনা মালিককা।”

তাঁর এ কথার সত্যতা তাঁর শিষ্যরা অচিরেই জেনেছিলেন। আমার নিজেরও এ কথা সর্বদা মনে হয়। আমাদের কাজ আত্মানী

করা, আশরা যদি তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ভজন চালিয়ে যেতে পারিত, ভোজন পাবই। যে ভীষণ দুঃস্বপ্ন সংসারে এসেছিল, তাতে আশরা সর্কস্বাদ হয়েছি কিন্তু তবু ভোজন আমাদের ঠিকই চলেছে।

আমাদের সম্মাননা বৃহৎ জমিদারের ঘরে জয়গ্রহণ করে বতটা

আমাদের কাটাতে পারত তা পেল না বটে, কিন্তু সেই ভীষণ স্বপ্ন কবল হতে মুক্ত হয়ে অন্তরকম ভালভাবে তাদের জীবন চলে যাচ্ছে। জীবগবানের কাছে প্রার্থনা করি—দুনিয়ার সকলের সঙ্গে ওদেরও জীবুদ্ভি হোক, সকলের কল্যাণ হোক আর আমি যেন আমার পবন-অভূত অরপান করে সংসারের ক্ষেত্র থেকে চিরবিদায় নিই।

## জারী গান

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

জারী গান বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয়। কারাবালায়-নিহত হাসান-হোসেনের উদ্দেশে মুসলমান সম্প্রদায় মহরম মাসে যে শোক প্রকাশ করে, সেই করুণ কাহিনী অবলম্বনে বাংলার পল্লীকবিরা যে সমস্ত গান রচনা করেছেন—বাংলাদেশে তা জারী গান নামে পরিচিত।

প্রকাশ্যে কোন বিষয় প্রচার বা জাহির করার নাম জাহিরী বা জারী। আবার, পারসী শব্দে জারী অর্থ—ক্রন্দন করা। মীর মশারুফ হোসেন এই হাসান-হোসেনের কাহিনী সাহিত্যরসে পুষ্ট করে বাংলার জনসমাজে প্রচার করেন।<sup>১</sup> তাঁরই চেষ্টায় এমন একটি মর্যাদাসিক কাহিনীর রসাস্বাদন সবার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। জারী গানের বিষয়বস্তু নিয়ে আবার ইমাম-বাঈর সৃষ্টি হয়েছে।<sup>২</sup>

সমাজে নৈতিকতত্ত্ব প্রচারে জারী গানের বিশেষ স্থান রয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত ও শাস্ত্র-পুরাণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বালাদার<sup>৩</sup> এবং কবিগুণালারা যেমন হিন্দু সমাজে ধর্মভাব জাগ্রত রাখতে সাহায্য করেছেন, তেমনি কোরাণের সূক্ত এবং আরাবিক কাহিনী অবলম্বনে মুসলমান পল্লীকবিরা মুসলমান সমাজে নৈতিকতত্ত্ব প্রচার করেছেন এবং জন-সাধারণের আত্মিক ক্ষুধার খোরাক জুগিয়েছেন। আবার, সামাজিক অত্যাচার-অত্যাচার এবং নির্ভরতার বিরুদ্ধেও এই সমস্ত পল্লীকবিরা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন—জারী গানের মাধ্যমে।<sup>৪</sup>

১ বিখ্যাত-সিদ্ধ—মীর মশারুফ হোসেন। ১৮৮৫

২ হারামণি—মু, মনসুরউদ্দীন : পৃ: ৩। ১৯৪২, ক-বি

৩ বালাদার। চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে বশোহর-খুলনার পল্লীকবিরা এক বকম গান রচনা করেন, নাম—বালা-গান; গায়ক—বালাদার।

৪, ৫, ৬ বশোহর-খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র। ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট।

বাংলায় দলবদ্ধভাবে গীতগানের মধ্যে জারী গান অন্যতম। মূল গায়ন, ছ'চারজন বাদক ও হোহার-সমবায়ের একটি জারী গানের দল গঠিত। জারী গানে ধূয়া, আরেব, কেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন ইত্যাদি ছয়টি অংশ থাকে। আসরে, প্রথমে বন্দন<sup>৫</sup> ও পরে ধূয়া গাওয়া হয়। 'বয়েৎ' অর্থাৎ গীত, এবং গীত-বচয়িতাকে 'বয়াতি' বলে। মূল গাইয়ে বা গায়নকেও অনেক সময় 'বয়াতি' বলা হয়। কেননা, মূল গায়নবাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীত-বচয়িতা। এই 'বয়াতি' বা গীত-বচয়িতাদের মধ্যে ছ'চারজন হিন্দু—সনাতন, রামচাঁদ প্রভৃতির নাম শোনা গেলেও প্রধানতঃ, মুসলমানগণই এই জারী গানের গায়ক, বাদক, পালক, প্রচারক—সব কিছু ৥

২

জারী গানের প্রাচীনতা এবং জনপ্রিয়তা সম্পর্কে 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের ভূমিকায় জানা যায় :

"কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপুজার কালে কত জারী গীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদেতে পূজার দিনে রামধাত্রী, চণ্ডীগীত, পাঁচালি, মনসাব ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, কুস্তিখেলা, নৌকা বাইচ, বোড়ার দৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান থাকিত।"<sup>৬</sup>

জারীগান বাংলার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। তবুও, এই জারী গানের উৎপত্তিস্থান, কাল এবং প্রধান প্রবর্তক-দের সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন :

"প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া বশোহর জেলায় জারীগান চলিতেছে—এই গানের উৎপত্তিস্থান বলিয়া বশোহর মশখী।...জারী গীতের প্রধান প্রবর্তকদিগের মধ্যে পাগলা

৬ সঙ্গীত-রত্নাকর—নবীনচন্দ্র দত্ত। [ বইখানি অভ্যুদয় হস্তাণ্ডা, কেবলমাত্র সমালোচনা পাওয়া যায়; বঙ্গবর্নন, ১২৭৯ পৌষ সংখ্যায়।

কানাই প্রথম এবং ইহু বিশ্বাস ৮ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ।  
যশোহরের উত্তরাংশ অর্থাৎ কিনাইদহ-ও মাগুরা মহকুমা  
জারী গানের পীঠস্থান ।”২

একটি ছড়ায় ১০ এই পাগলা কানাই এবং তার সম-  
সাময়িক আরো কয়েকজন জারী গায়ক এবং হিন্দু-মুসলমান  
পল্লী-কবির পরিচয় পাওয়া যায় । ছড়াটির প্রথমংশ ১১  
এখানে যশোহর-খুলনার জারী গায়কদের পরিচায়ক হিসাবে  
উদ্ধৃত করলাম :

“নামটি আমার মেহেবচাঁদ,  
কালীশঙ্করপুর ঝড়ী ।  
আমি দেশ-বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী ।  
শুনি আকাশে এক মেলা হয়েছে ভারী,  
তাতে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই,  
গাইতে গিয়াছে জারী ।  
আসানউল্লা, সোনা, সেহু, তরিকুল্যা,  
কোবান মোল্লা,  
গেছে রোশন খাঁ, নৈমদী মুন্সী,  
আব মুলতান মোল্লা—  
এরা কয়জনতে পাগলা কানাইর সাথে  
দ্বিয়াছে পালা ;  
এরা সব চালাক চতুর, কানাই বড় কল্লা ॥”

—এই সমস্ত বিচার করে দেখলে সহজেই বোঝা যায়,  
পূর্ববঙ্গেই এই জারী গানের প্রচলন বেশী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও  
একদা জারী গান যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, তার  
প্রমাণ—জারী গানের একখানি প্রাচীন পুঁথি পশ্চিমবঙ্গেই  
পাওয়া গেছে ॥১২

৭ পাগলা কানাই । জন্ম : ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগ ;  
যশোহরের কিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত বেড়বাড়ী গ্রাম । পিতা :  
কুড়ন শেখ ।

৮ ইহু বিশ্বাস । পাগলা কানাই-এর সমসাময়িক । জন্মস্থান :  
যশোহরের কিনাইদহ মহকুমার ঘোড়ামারা গ্রাম ।—ঐষ্টব্য :  
যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট ।

১০ মৎ-সংগৃহীত একটি ছড়া, অপ্রকাশিত । এই ছড়াটির  
ইংরাজি পরিবর্তিত রূপ ১৩১২ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ  
পত্রিকা’র যোদ্ধাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ।

১১—ঐ [১০] ছড়াটির কেবলমাত্র প্রথমংশ যশোহর-খুলনার  
ইতিহাস, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে সংগৃহীত ।

১২ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—পুঁথি পরিচয় । পুঁথি নং  
১২ । বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ ।

৩

গান সংগ্রহ ॥ এখানে, যশোহর-খুলনার কয়েকজন  
প্রাচীন পল্লী-কবির গান প্রকাশ করা গেল । গানগুলি  
জারী গানের বন্দনা বা ধূয়া হিসাবে গীত হয় । [ খুলনা  
জেলায় জনৈক বলাইলাল বিশ্বাস ও তোমার আলী গাজীর  
সহযোগিতায় গানগুলি সংগৃহীত । ] গানগুলিতে দেহতত্ত্বের  
ভাবই সুস্পষ্ট ॥

( ১ )

ওগো মনেরি কষ্ট বলবো পষ্ট  
এখন এই সভায়—  
অনেকদিনের মনের কষ্ট, বলবার  
সময় নাইকো হয় ।  
ভাগ্যপুণে পেয়েছি তোমায়,  
কোন মাটিতে কথা বলো কর—  
সে মাটি আছে কোন ভায়গায় ॥

মগরবের নামাজ বাড়ে,  
আসব কোন্ দিন হয়—  
আর একদিন শুনি সূর্য্য উদয়,  
আর নাইকো দেখি সেখায় ।  
এমন কাণ্ড ঘটেছে কোথায়,  
আমি শুনবো বলে করেছি আশায়,  
বয়্যতি দাঁও না পরিচয় ॥

বৃক্ষডাল সর্প রূপ ধরে, বলো কোন্ সময়—  
এর কোন্ বৃক্ষেতে এরূপ হলো,  
সে বৃক্ষ আছে কোথায়,  
শুনব বলে করেছি আশায় ।  
আমি তাহের গাইন অতি দুঃশয়,  
বয়্যতি বলো সব বিষয় ॥

( ২ )

তরাও নিজপুণে নিজেরও অধীনে  
বরকত-জননী মা আমার—  
পড়ে ভবঘোরে, ডাকি বাবে বাবে,  
মা তোমায়—

ওগো রম্মলের মেয়ে,  
ইমাম হোছেনের মা হয়ে, হলে জগৎ-মা ।

তোমার ইমাম হোছেন কাঁদে,  
জামা দিলে পিঁদে, পুত্র ব'লে তার,  
ওমা খুশী হয়ে মনে, যেয়ে সেই ময়দানে,  
ইদেব নামাজ করিলেন আদায় ॥

তরাও নিরবধি, ওগো সৈয়দজাদী,  
দয়া করো যদি আপনি—  
হাসবেরও মাঠে, বিষম সঙ্কটে,  
পড়িব মোরা যেদিনে। অম্মতেরি তলাসে,  
পৌছাবেন নবী এসে, কিতাবে শুনি।  
সেদিন নবীর তলাসে,  
পাগলিনীর বেশে আসিবেন আপনি।  
সেদিন আমাদেরি ভয়, না জানি কি হয়,—  
মাগো মা এই ভাগ্যে না জানি ॥

মা ব'লে কোলেতে বাবে, মনেতে আশা—  
ওমা সেইদিন যেন হয় না মা,  
সেই কুলছুমির দশা।

তোমার পুণ্ড্রিবেটা শুনি,  
হোমের মাদার মণি,  
হোজকে যেদিন পড়িলো—  
আজরাইল ধরে ছোড়া,  
মারে অগ্নির কোড়া,

ধমকে আশুন উড়িলো।  
ধমকেরি চোটোতে, মা মা মা ব'লে  
ডাকে রক্ষা পাইলো।  
যেদিন ঘোর বিপদ, ভারি বিপদভয় হলো,—  
তাই, তাহের আলি বলে, থেকে চরণগুলো,  
মাগো মা দাঁও চরণগুলো ॥

(৩)

নিশি প্রভাত কালে,  
কোকিল বলে, ওরে দখিনা—  
এ বেশে আর ঘুমিয়ে থেকে না।  
মাব-দরিয়ায় ডুবলো তোমার, লাল ডিঙ্গাখানা।  
তুমি জাগিয়ে দেখে বিছানা 'পর  
খসে প'লো নাকের সোনা,  
বুঝি গলার হার খসিয়ে প'লো—  
বিধির কারখানা।  
তখন শিবে কঠাখাত মেরে বলে,  
বিধিবে, তোর কি এই বিবেচনা ॥

বলে, আর ডাকিস্নে কালো কোকিল,  
প্রভাতেরও কালে—  
শুয়ে ছিলাম, ছিলাম নিরালে,  
ও তুই ডাক দিয়ে কেন,  
শোকের অনল দিলিয়ে জেলে।  
একশুণ আশুন ত্রিশুণ জলে,  
নির্বাণ হয় না জলে গেলে।  
প্রাণপতি মোর ছেড়ে গেছে,  
বসন্তেরও কালে ;—  
আমি কোন্ দেশে যাই, কোথা বা পাই  
কোকিলের, ও তুই, দে আমার বলে ॥১৩

করি এই নিবেদন, হে নিরঞ্জন,  
তোমার দরবারে,—  
তুমি ভালবেসে দোস্ত কও কারে।  
কি মহালীলা প্রকাশিলে  
সেই বংশের 'পরে।  
তুমি, কারও হাসাও কারও কাঁদাও,  
কাহারে ভালাও সায়রে।  
আমার বিয়ের রাতি ম'লো পতি,  
কোন্ বা বিচারে —  
মোস্লেম কয়, তার অসীম লীলা,  
সদৌ, কে তা বুঝতে পারে ॥

(৪)

এ ধন যৌবন, কত নয় আপন,  
নিশিকা স্বপন ঘোছা দেখতে পাই।  
কাহে ধন কাহে জন, কাহে পুত্র পরিজন,  
কাহেকে বলবে আপন আপন তাই ॥১৪

১৩ এই অংশটুকু বায়ানি (বায়ানি) গান হিসাবেও পাওয়া  
হয়।

১৪ গানটির এই অংশে, কবি হেনরী ওয়ার্ডগওয়ার্থ লং-  
ফেলো ( ১৮০৭-৮২ )-র 'A Islam of Life' কবিতাটির প্রথম  
ছ'লাইন বিশেষ ভাবে মনে পড়ে :

'Tell me not in mournful number,  
Life is but an empty dream।



সেজ্জা লেগেট ভাল, চোর কপ্‌নি শাক,  
মউত্‌ কালে সব নিদ্রবদে খুলে লেগা।  
চুই হস্ত পদকা ধরি, বন্ধন লাগাবে ডুরি,  
ধাক্‌সে তেবে দাখিলে ক'রে বেগা।

হায় গো, ভাবো সে বাবিতালা, ১৫  
খুচিবে সকল জালা—  
আধেরে পাবে ভাল কাম।

মা খাতুন জিন্নাত ইয়াদ কবো,  
মুখেতে বলো নবীজীকো নাম ॥

১৫। খোদাতালা।

লালচাঁদ ভণে, নবীজীকো একমনে,  
আবজ করি বায়ে বায়ে।  
করিম রহীম হাদী, ভাবো সে গুণনিবি,  
আখেরে কে করিবে পার ॥

আমার নবা যেমন, আর কি অমন,  
ভবের মাঝে হবে—  
এই নবীর নামে, কতো বান্ধা, পার হয়ে যাবে ॥ ১৬

১৬। গানটিতে বাংলার সঙ্গে গ্রামা হিন্দীর মিশ্রণ লক্ষ্যণীয়।  
এই প্রসঙ্গে বীর গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'চৈতন্যচন্দ্র' বাংলা-হিন্দী  
মিশ্রিত ভাষার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

## ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

শ্রীঅণমা রায়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে লোকসংখ্যা-সমস্যা  
বিভিন্ন ন্ত্রীতে দেখা দেয়। অতীতে জাপানী, ফ্রান্স, ইটালী,  
বেলজিয়াম ও জাপানকে স্ব স্ব লোকসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ  
চেষ্টা করতে হয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু চেষ্টা করা হচ্ছে। এই-  
জন এই সব দেশকে বিবাহে উৎসাহদান, গর্ভস্রাব বন্ধ করা, গর্ভ-  
নিরোধ করার ঔষধাদির ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া এবং বৃহৎ পরিবার  
পৃষ্ঠনে অধিবাসীদের প্ররোচিত করার জন্য তাদের অধিক সম্মান  
তাদের অর্থসাহায্য ও অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা  
করতে হয়। এর কারণ যে, এই সব দেশে, বিশেষ করে প্রথম ও  
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম যার এবং জন্মের  
হার সেই থেকে নীচের দিকে নামতে থাকে। এমনকি আমেরিকার  
যুক্তরাষ্ট্রেও স্বাস্থ্যবান, সবল ও উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোকসংখ্যা বজায়  
রাখবার চেষ্টা চলছে এবং ইংলণ্ডে যাতে লোকসংখ্যা কিছু বাড়ি  
সে চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি লোকসংখ্যা বিষয়ে ব্রিটেনে গঠিত  
একটি রাজকীয় কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে প্রতি  
দশশতাব্দির সাম্প্রতিক ২২ জন সম্ভাব্যতার স্থানে ২৪ জন সম্ভাব্যতা  
জন্মের তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই সব দেশ উন্নত এবং  
এখানে বহু আগে শিল্পবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে ও জনশিক্ষা  
বিস্তারিত ভালভাবে হয়েছে। সুতরাং দেশবাসীকে প্রাসাদাদান  
যোগ্যতার ও কর্মে নিযুক্ত করার ক্ষমতা এই সব দেশের কাছে।

কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ অংশটি জুড়ে যে সব অল্পশিক্ষিত ও কৃষি-  
প্রধান দেশ আছে সেখানে লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

অথচ বিজ্ঞানচর্চা না থাকতে ও যন্ত্রশিল্পের অভাবে এই সব দেশে  
অল্পসংখ্যা ও বেকারসংখ্যা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে পড়াচ্ছে। এই  
সব দেশকে বঁচাতে হলে জননিয়ন্ত্রণ করা লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি  
বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি দেশে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ  
নীতির উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা সমান রাখা, কতকগুলি দেশে জনসংখ্যা  
বাড়ানোর চেষ্টা করা এবং অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির  
লক্ষ্য হওয়া উচিত জনসংখ্যা কমান।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির আর একটি দিক আছে—তা শুধু  
সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ নয়। দুর্ভাগ্যবশত শারীরিক বা মানসিক  
রোগাক্রান্ত নরনারী যাতে নির্দোষ, অপটু ও অকর্মণ্য কতকগুলি  
সম্প্রদায়ের জন্ম না দেয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-নীতির সে বিষয়ে বিশেষ  
লক্ষ্য রাখা উচিত।

চীন দেশে মাও-সে-তু সভাপতি হবার পর মন্তব্য করেন, চীন  
দেশে লোকসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন। চীনের অতীত দিক লোক-  
সংখ্যা সর্জনজনবিদিত। তা সত্ত্বেও মাও-সে-তু-জর এরূপ মনোভাবের  
পিছনে যে অল্প ভবিষ্যতে যুদ্ধভীতি রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ  
নেই। এই যুদ্ধভীতিই বহু উন্নত দেশে লোকসংখ্যা বাড়ানোর  
চেষ্টার একটি প্রধান কারণ।

সর জুলিয়ান হাঙ্গলী প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ  
পণ্ডিতেরা জোর গলায় বলেছেন যে, পৃথিবীতে জননিয়ন্ত্রণ বায়া,  
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ না করলে সাম্রাজ্যের দুর্গতির সীমা থাকবে

না। সব উইলিয়ম হাঙ্গলী জয়নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজনীয়তায় সৰ্ব্বদে নিয়মিত নথি কাগজ দিতেছেন :—

(১) এই বিজ্ঞানের যুগে নানাবিধ ঔষধ ও রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হওয়ার সুত্ব হার সর্বত্র বেশ ভালভাবে কয়ে বাচ্ছে এবং মানুষের আয় বেড়ে বাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জন্মের হারও সঙ্গে সঙ্গে না কমলে বিশ্বোদ্যনের ভাৱ জনসংখ্যা হঠাৎ এমন বেড়ে বাবে যে, পৃথিবীতে এত লোকের খাদ ও কর্ম জোগান সম্ভব হবে না।

(২) পৃথিবীর বনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের হানিগুলি বাড়তি মানুষের অত্যাচাৰে নষ্ট হয়ে বাচ্ছে—ফলে পৃথিবী মরুময় হয়ে যেতে পারে।

(৩) উন্নত ও পরাক্রান্ত দেশের বাড়তি মানুষগুলিকে এসোচ্ছাদনের জন্য অল্পমত দেশগুলিতে পাঠিয়ে সেখানকার লোকদের শোষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

(৪) অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য মানুষকে দেশান্তরে বাস করতে হচ্ছে—ফলে, সেখানে সামাজিক অসামঞ্জস্য ও নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তার জন্য তৃতীয় মহাযুদ্ধ হতে পারে।

(৫) এত বেশী লোককে চাকরী দেবার মত কাজ পৃথিবীতে থাকবে না।

(৬) যন্ত্রশিল্পে অগ্রবী দেশগুলিতে এত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পথেঘাটে সর্বত্র দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে উঠছে এবং বাসস্থানের দারুণ অভাব ঘটছে।

(৭) বঙ্গদেশে জনসংখ্যা একপা ভাবে বেড়ে উঠেছে যে, সে সব জায়গায় জলকষ্টের অন্ত নেই।

(৮) বাড়তি মানুষকে কাজের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে হচ্ছে। এত লোকের ভীড়ে শহরগুলি যেমন বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে তেমনি গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল হয়ে যাওয়াতে কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে রাজনৈতিক অশান্তির আগুন জলে উঠছে।

(৯) পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক অল্প নিরক্ষর, জনসংখ্যা আরও বাড়লে এরা কোন দিন টি শিক্ষার আলোক পাবে না এবং জীবনযত্নের মত কাল কাটাবে।

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশই ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য।

প্রায় দু'শতাব্দীব্যাপী ইংরেজের দ্বারা একটি প্রথম শ্রেণীর রাজশক্তির অধীনে থেকেও ভারত একটি অল্পমত কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে পড়েছিল। ভারতে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, এমন কি কৃষি সম্বন্ধেও কোন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। অষ্টচ বৎসরের পর বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে বাচ্ছে। ফলে, ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছে। দশ বছর আগে, স্বাধীনতা লাভের পর, ভারতের নেতারা দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবার চেষ্টা আরম্ভ করেন এবং সেইজন্য একটি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করে ১৯৫১-৫২

সনে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। তখনকার লোকসংখ্যা ও পরবর্তী পাঁচ বছরে লোকসংখ্যা কত বাড়তে পারে সে সম্বন্ধে একটি আনুমানিক প্রাক্কলন তৈরি করে মোট লোকসংখ্যার জন্য পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হয়। কিন্তু পাঁচ বছরে দেখা গেল যে, ভারতের লোকসংখ্যা ইতিমধ্যে পরিকল্পিত লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতবাসীর ভাত-কাপড় ও চাকরীর ব্যবস্থা করা প্রায় বিফল হয়ে যায় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই দেশের নেতারা বুঝতে পেয়েছিলেন যে, জন-কল্যাণের জন্য দেশের জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা দরকার। ১৯৩১ সনে ভারতের সেল্যাস কমিশনার মন্তব্য করেন যে, ভারতে এই অপরিমিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শঙ্ক্য কারণ, সম্ভাব্যের কারণ নয়। মহাত্মা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, ডাঃ বাণিকৃষ্ণ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র সকলেই অমূল্য করেন যে, জয়নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারতের এই অপরিমিত লোকবৃদ্ধি বন্ধ করা দরকার। ১৯৩৬ সনে হরিপুরা কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ দেবার সময় নেতাজী বলেন যে, শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে জয়নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বেশী। এ কথা খুবই সত্য—কেননা ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে ও তাদের উৎপন্ন ফসল সারা বছর একবেলা পাবার মতও পর্যাপ্ত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর মতে ভারতে জয়নিয়ন্ত্রণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন, তবে তা করতে হবে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা, কোন বকম কৃত্রিম উপায়ে নয়।

ভারতে লোকসংখ্যা বছরে শতকরা প্রায় দু'জন করে বেড়ে বাচ্ছে, কিন্তু শুধু বেশি সংখ্যার শিশু জন্ম এর জন্য দায়ী নয়। গত দশ বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত অগ্রগতি হয়েছেন যে, মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে গিয়েছে এবং ভারতবাসীর আয়ুর পরিমাণ গড়ে প্রায় বায় বছর বেড়ে গিয়েছে। জন্মের হার কিন্তু বিশেষ করে নি এবং কোথাও কোথাও বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞেরা ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাম্প্রতিক চায়ে যদি ভারতের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে, তা হলে আগামী পরভাগ্নিশ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা মহাপদের (billion) তিন-চতুর্থাংশে দাঁড়াবে (৭৫০,০০০,০০০,০০০)। এই বিশাল জনসংখ্যা ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বনাশ এনে ফেলবে ও ভারত আরও অল্পমত দেশ হয়ে পড়বে—অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কখনও উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারবে না। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বায় বায় বলেছেন যে, ভারতের জনসংখ্যা যদি সাম্প্রতিক জনসংখ্যার অর্ধেক হ'ত, তা হলে অতি শীঘ্র ভারত একটি উন্নত দেশ হয়ে যেত। এই জন্য দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার ভারত সরকার ও প্ল্যানিং কমিশন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বোঁক দিয়েছেন এবং তৃতীয় ও

চতুর্থ পাঠশালা পরিচালনাধীন এখনকার চেয়ে বেশী বোকা সেবেন বলে সন্দেহ করেছেন।

ভারতে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্তও জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন :

(১) দুই-এক বছরের ব্যবধানে সন্তান জন্মালে মাতার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। অথচ এখানে দেড় বছর থেকে দু'বছর অন্তর সন্তানচর নারীকে গর্ভধারণ করতে হয়। ডাঃ মারী টোপস-এর মতে দুটি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ দুই থেকে তিন বছরের ব্যবধান থাকা উচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ব্যবধান থাকলে ভাল হয়।

(২) দুর্বল পিতামাতার পুনঃপুনঃ সন্তান হওয়ার জন্ত বহু রুগ সন্তান জন্মকালে আঘাত পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভাবস্থায় ও ভ্রূষিষ্ট হবার পর বহু শিশু মারা যায় এবং শৈশবে ও যৌবনে বহু সন্তান মারা পড়ে। বহু নারী এই কারণে চিরকালের জন্ত রুগ হয়ে পড়েন এবং জনশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে।

(৩) ভারতে লক্ষ লক্ষ রুগ, বিকলাঙ্গ এবং স্বভাবহ্রাস্ত নরনারী সন্তান প্রজনন করছে এবং সমাজের উপর অনর্থক বোঝা চাপাচ্ছে। আইন দ্বারা তাদের প্রজনন বন্ধ করা দরকার ও এই সব ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন।

(৪) জাতীয় প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও সাধারণ লোকদের নিজেদের কল্যাণের জন্ত পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ভারত দেশের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বাড়ায়। দরিদ্রের সংসারে দুখা বেশি—এমন কি স্ট্রীর দুখও।

স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছামত সন্তান প্রজননকে পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বলে। এ কি করে সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মহাস্ত্রীর কথামত ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ যে সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই দুই বা তিনটি সন্তানের পিতামাতা যদি অন্তঃপর ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারেন তা হলে পরিবার নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইহা সম্ভব নয়। স্ত্রী ঋতুমতী হবার পরবর্তী তৃতীয় হপ্তাকে নিষাপদ সময় বলে—কেন না এই সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে গর্ভসংস্কার সম্ভাবনা খুবই কম। এই প্রকার মিলনকে যিদ্মিক বলে এবং এর দ্বারাও পরিবার নিয়ন্ত্রণ কতকটা সম্ভব। কিন্তু এটিও ব্রহ্মচর্য সাপেক্ষ এবং সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হলে ভারতের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্ত এটি আদর্শ পন্থা হ'ত। বহু বকর সাময়িক জব্বা ও বাজিক কোশল উদ্ভাবিত হয়েছে, যার ব্যবহারে গর্ভ-নিরোধ হতে পারে। কিন্তু সেগুলি ব্যয়সাপেক্ষ এবং দরিদ্র ভাষ্যবাসীর ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া ভারতে বাস-গৃহের অভাবে এক ঘরে বহু দরিদ্র দম্পতিকে বাস্তবাস করতে হয়, সেখানে এইরূপ ভাবে গর্ভ-নিরোধ ব্যবস্থা করা অসম্ভব। পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের প্রবৃত্তি ও শক্তি অক্ষুর যেরূপ তাদের দেহে সাতাট একটু অস্ত্রোপচার করে সাময়িক ভাবে বন্ধাও আনা যায়।

যেহায্য যে সব পুরুষ ও নারী এই বকর অস্ত্রোপচারে রাজী হবেন সরকারকে যথাসম্ভব বিনামূল্যে তাদের উপর অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার আইন সভায় বলেছেন যে, অতি নগণ্য মূল্যে যদি গর্ভ-নিরোধের কোন পাবার ঔষধ দেওয়া সম্ভব হয় তা হলে তার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সকল হতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সব ঔষধ নগণ্য মূল্যে দিলেও চলবে না—বিনামূল্যে দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি-গ্রস্ত ও স্বভাব-হ্রাস্ত নরনারী ছাড়া অস্বাভাবিক ভাষ্যবাসীর উপর জুলুম করে পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। জনসাধারণকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ভাল করে বুঝিয়ে তবে এ কাজ করতে হবে। পরিবার নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের যে যথেষ্ট উৎসাহ আছে তা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি নমুনা-জরিপ থেকে বেশ বোঝা যায়। ১৯৫১-৫২ সনে ভারত সরকারের অম্ব্যবোধে আমেরিকার ডাঃ টোন দ্বিতীয় নিকটে লোদিকলোনী নামক একটি মধ্যবিত্ত পৌরসভায় ও মহীশূরে রায়না গ্রামে পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দুটি নমুনা-জরিপ করেন। লোদিকলোনীতে শতকরা ৭৫ জন ও রায়না গ্রামে শতকরা ৭৮ জন অধিবাসী পরিবার নিয়ন্ত্রণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁরা জানান যে, দারিদ্র্যমোচন ও স্বাস্থ্য-বক্ষার জন্ত পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁরা প্রস্তুত।

ডাঃ চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে ভারত সরকারের আর একটি জরিপে দেখা যায় যে, বাংলার শহরে ৩০০ দম্পতির মধ্যে শতকরা ৭২টি এবং গ্রাম্যকলে ৩০০ দম্পতির মধ্যে শতকরা ৫৪টি দম্পতি সাগ্রহে পরিবার নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, তাঁরা চার থেকে ছ'টির বেশি সন্তান চান না। নিম্নলিখিত ভারত হাইজিন ও পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট কলিকাতার বেনেটোলার মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে ও বালিগঞ্জের উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে জরিপ করে দেখেন যে, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন তিনটির বেশি এবং ৮৪ জন পাঁচটির বেশি সন্তান চান না।

মুক্তপ্রদেশের লক্ষ্মী জেলায় গ্রাম্যকলে জরিপ করে দেখা গিয়াছে যে, সন্তানবতী নারীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন চারটির বেশি সন্তান চান না এবং সাড়ে তিন বছর অন্তর গর্ভধারণের পক্ষপাতী, পিতাদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জন আরও কমসংখ্যক সন্তান কামনা করেন। মেয়েরদের মধ্যে শতকরা ৬৮ জন এবং পিতাদের মধ্যে শতকরা ৪৭ জন গর্ভ-নিরোধ কৌশল দেখবার জন্ত উৎসুক। গোবেল ইনস্টিটিউট জরিপ করে দেখেছেন যে, শহরে ও গ্রাম্যকলে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন, নারীদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন পরিবার নিয়ন্ত্রণ নীতি সাগ্রহে শিখতে চান।

এই সব জরিপ দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি চেষ্টা করলে জনসাধারণের দ্বারা সহজেই পরিবার-নিয়ন্ত্রণ কথিয়ে ভারতের জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে পারেন।

সম্প্রতিদের উপর প্রয়োজনীয়ত জন্মনিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে সরকারকে শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার ও গর্ভ-নিরোধের ঔষধাদি সহজলভ্য করতে হবে এবং সেগুলিকে জনসাধারণ বাতে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে ভারত সরকারই সর্ব-প্রথম পরিবার নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সরকারী দপ্তর মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছেন। প্রথম পাঁচসালী পরিকল্পনার মেয়াদ কালে পরিবার নিয়ন্ত্রণ কাজ বাবদ ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং ১৪৭টি ক্লিনিক খোলা হয়েছিল। (শহরাকলে ২১টি এবং গ্রামাকলে ১২৬টি)। দ্বিতীয় পাঁচসালী পরিকল্পনার মেয়াদকালে পরিবার নিয়ন্ত্রণ বাবদ ৫০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করা হয়েছে। পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জন-সাধারণকে পরামর্শ দেবার জন্য ও সেই সম্পর্কে যত্ন কাজ করবার জন্য ভারতে ২ হাজার ৫ শত ক্লিনিক (শহরাকলে ৫০০ ও গ্রামাকলে ২,০০০) খোলা হচ্ছে—শহরাকলের প্রত্যেকটি ক্লিনিক ৫০ হাজার লোকের এবং গ্রামাকলের প্রত্যেকটি ক্লিনিক ৬৬ হাজার লোকের সেবা করবে।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করবার একটি ধাপ বটে, কিন্তু তার সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার, যোগনিরোধ, খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, বেকার-সহায়

সমাধান, শ্রমিক-কল্যাণ, জনসাধারণের জ্ঞান অসংখ্য গৃহনির্মাণ, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি জনকল্যাণকর কাজ না করলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে না। এই সব সমাজ-কল্যাণ কাজ দ্বারা ভারতবাসীর মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবে ও ভারত-নারীদের মধ্যে একটি অভিনব মর্যাদাবোধ অঙ্কুরিত হবে—যার ফলে ভারত সত্যসত্যই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে নিজেব আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

অতি পুরাকালেও পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করা হ'ত। প্রাচীনকালে গ্রীক, রোমান, ইহুদি, কিনিসিয়ান, চীনা, আরব ও হিন্দুগণ গর্ভ-নিরোধের যত্ন নানা রকম ঔষধ ব্যবহার করত। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে মানুষ লোকসংখ্যা-সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করে আসছে। অবশ্য বেশি বয়সে বিবাহ, চিরকুমার ব্রত, মন্বন্তর, কবচ-মাহুলী দ্বারা গর্ভনিরোধ ও লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করা হ'ত। “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্ঘ্যা” ও “পুণ্যার্থে বনং ব্রজেৎ” এই দুটি অমুশাসন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতের সমাজে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হ'ত।

ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ সুকল্লিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে—পরিবার নিয়ন্ত্রণ য'ব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজ যদি আমরা এ কথা বুঝতে না চাই বা উপেক্ষা করি তা হলে আমাদের চিরকাল দায়িত্বের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে।

আনন্দ ডিঙ্গেসবে  
**ক.হোড়ের**  
প্রসার্কন সামগ্রী

ক.হোড় ২৩ কোং • কলিকাতা-১০

# পুস্তক পরিচয়

বরণীয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, আইভিট লিমিটেড, ২নং বক্সিং চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫ টাকা।

“আমার জীবনতত্ত্ব গঠনে বিবিধ বিষয়ভিত্তিক খাত-অখাত নানা লোকের নিকট হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছি” লেখকের এই সত্যবোধ তাঁর গ্রন্থগানিকে ‘বরণীয়’ করেছে।

যোগেশবাবু ‘নিশিকান্তের মা’ বা তাঁর ‘গুরুমহাশয়’ সেক্ষত্ৰ তাঁর রেখা-চিত্রে জীবন্ত হয়ে আছেন। তাঁর ‘স্মৃতিঃ মনিকোঠায়’ জলধর সেন ও তাঁর ‘পিতৃদেব’ পড়ে সবাই মুগ্ধ হবেন। তা ছাড়া বাঙালী তথা ভারতীয়ের কাছে চিরস্মরণীয় প্রায় কুড়িজন মহাপুরুষ জীবনের রেখাপাতও তিনি করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও গভীর অনুভূতির আলোছায়ায়। তাঁদের মধ্যে শতাব্দী পার করে উজ্জল হয়ে আছেন : হেমচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। আবার রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শত-

বার্ষিকীও আগন্তপ্রায়। আবার এই ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীও আসবে। এই সময়ে দেশের ছেলেমেয়েদের জীবনী পাঠে ঈদৃশ করবে ‘বরণীয়’ গ্রন্থখানি, এবং তারা বিশেষভাবেই উপকৃত হবে। একদিকে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বহুনাথ সরকার যেমন আছেন তাঁদের পাশে আছেন নেতাজী সুভাষ এবং মেঘনাদ সাঁড়া। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও প্রেরণা পাবে যখন তারা দেখবে লেডী অবলা বসু (বিভাসাগর বাণীভবন প্রতিষ্ঠাত্রী) ও জ্যোতিষ্ময়ী গাঙ্গুলীর জীবনালেখ্য। আবার যোগেশবাবুর যুগব্যাপী জীবনী-সাধনার কল ও ‘বরণীয়’কে বহুদিন স্মরণীয় করে রাখবে।

যোগেশবাবুকে এই সমালোচনা প্রসঙ্গে অহুযোধ্য করি যে, এক্ষেত্রে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত গবেষণা ও স্বদেশ-প্রেরণা দিয়ে তিনি বাঙালীদের চরম উপহার দিন গত ২০০ বৎসরের “জীবনী-কোষ”। (Dictionary of National Biography-র সংক্ষিপ্ত

— বাংলা চিন্তাসম্মত সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন —

## রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং তাঁতার জীবনকথায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ছয়খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একত্রে গ্রন্থিত। বদ্বিজ্ঞেতা, মাধবীকল্লণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত্র জীবন-সন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য সাধনার কথা তৎকল্পক আলোচিত। লাইনো হরফে বারবারে ছাপা, স্বর্ণাক্ষিত রেজিন বান্ধাই, মনোরম প্রচ্ছদপট। [মূল্য : ২ টাকা মাত্র]

## বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

১৪ খণ্ড উপন্যাস একত্রে [১০৮]

দ্বিতীয় খণ্ড

উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র রচনা একত্রে [১৫৮]

## রামায়ণ—কৃতিবাস বিরচিত

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত এবং সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৮টি বহুবর্ণ ও ১৫টি একবর্ণ চিত্র সুসজ্জিত। [২৮]

## জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরাণীর আত্ম-জীবনী ও নবজাগরণযুগের আলোচনা। [৪৮]

## মহানগরীর উপাখ্যান

শ্রীকল্পাকাণ্ডা গুপ্তা রচিত কৈবর্ত্য বিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি প্রেমসিদ্ধ স্বপ্নপাঠ্য উপাখ্যান। [২৪০]

## রবীন্দ্র দর্শন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবন-বেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৮]

## সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-২

। অতীত পুস্তকালয়েও পাইবেন।

সংস্করণ) বঙালীর নব-জাগরণে সে গ্রন্থ প্রভূত সাহায্য করবে, এবং এক্ষেত্রে যোগেশবাবুর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ রকম গ্রন্থের উপযুক্ত প্রকাশকও আছে সেটা আশা করি; যিনি যোগেশবাবুর লিখিত জীবনী-কোষ বিবর্তমান গ্রন্থাগারগুলিতে ও ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন। “বিশ্বকোষ” ও সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা থেকে সুরু করে, ‘প্রবাসী’ ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতির মধ্যে কত মূল্যবান জীবনীর উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে সেটি “বঙ্গবীর” পাঠে অমূল্যব করছি—তাই সেকথা স্মরণ করলাম।

### শ্রীকালিদাস নাগ

কাশ্মীর পরিভ্রমণ—জীনলিনীকিশোর গুহ। এ. মুখাশ্রী

এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২০০।

জয়কাহিনী নামে পাঠক-সমাজে সাধারণতঃ ব্যাধা পরিবেশিত হয় তাহা হয় নীচস দিনপঞ্জী, নয় প্রচুর অবাস্তব কথা ও কিছু মিথ্যার সমস্ত ভেজাল মিশ্রিত মোহরচনা নামক সাহিত্যিক পিছুম্বী। কিন্তু সুপরিচিত দেশসেবক ও সাংবাদিক লেখকের এই গ্রন্থখানি নিয়মের ব্যতিক্রম। লেখক সাংবাদিক হিসাবে ভাংত-সরকারের আমন্ত্রণে কাশ্মীর গিয়াছিলেন এবং সরকার নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারেই সারা কাশ্মীর ‘টুর’ করিয়াছেন। সেই ভ্রমণের কাহিনী অঙ্গতম এক-খানি সরকারী প্রচারপত্র হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কুশলী লেখক সে চোরাবালিও সুরকৌশলে অতিক্রম করিয়া সত্যনিষ্ঠ অথচ প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। সরকারী পরিচালনার অধীনেও তিনি যে নিজের চোখ দুইটিকে খোলা এবং বিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তিকে সক্রিয় রাখিয়াই সারা কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থে প্রতি পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় এই গ্রন্থ রচনা করিবার জন্ত তাঁহার প্রশমসাধ্য বিশেষ অধ্যয়নের প্রমাণ।

“ভূষণ” কাশ্মীরের প্রকৃতি বর্ণনা এ গ্রন্থে একেবারে যে নাই তাহা নহে। কিন্তু কাশ্মীরের প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষকেই লেখক অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া পরে ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠ ও শিল্পীর সহানুভূতি দিয়া কাশ্মীরের সাধারণ ও অসাধারণ সব রকম মানুষকেই পাঠকের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কাশ্মীরের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, অঙ্গজাতীয় সমস্যা হিসাবে বর্তমান কাশ্মীরের বিশিষ্ট রূপ এবং ঐ রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি লেখক স্বয়ং বিশেষভাবে আয়ত্ত করিবার পর খুব অল্প কথার ও বীতিমত মুল্লারানার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে কাশ্মীর তথা ভারত-সীমান্ত রক্ষার জন্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর “জোয়ানেরা” যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিতেছেন তাহার সপ্রশংস অথচ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা এ গ্রন্থের অঙ্গতম বৈশিষ্ট্য। অনেকগুলি মনোদয় ছবি গ্রন্থের আকর্ষণ ও মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। কাশ্মীর স্বর্ষকে, অমূল্যস্বপ্ন পাঠক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র—শ্রীমুখর সরকার। কলি, বর্তমান। মূল্য ১২৫ নয়া পয়সা।

গ্রন্থখানি আকারে ছোট কিন্তু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাম স্মরণীয় হইলে সুপরিচিত। আলোচ্য বইখানি তাঁহার জীবন-কাহিনী নয়, কিন্তু তাঁহাকে জানিবার এবং তাঁহার কর্মবহুল জীবনের অনেক কথাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া যেভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাহারই কিছু কিছু আভাস এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই সকলে জানেন, কিন্তু সে যে কত গভীর এবং কত দূর প্রসারিত তাহাই গ্রন্থকার আমাদের জানাইয়া দিলেন। সবচেয়ে বড় কথা আচার্য্যের চরিত্র। এরূপ চরিত্র বর্তমান যুগে বিরল। এককথায় বলিতে হইলে ইহাকেই ‘গীতার পুরুষ’ বলে।

গ্রন্থে যেসব অধ্যায়গুলি ভাগ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার গবেষণার দিকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা কি একদিকে, প্রায় সর্ববিষয়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অসাধারণ বীণশক্তি ও কর্মে নিষ্ঠা না থাকিলে এরূপ কার্য তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। সকলেই দেখিত, এক আশ্চর্য্যভালা পুরুষ তাহাদের মধ্যে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। অত বড় পণ্ডিত হইয়াও, সব ছাড়িয়া তিনি শ্রেষ্ঠায় শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। “শিক্ষকতা তাঁহার জীবিকা মাত্র ছিল না, শিক্ষকতাই ছিল তাঁহার জীবন।” কারণ তিনি বলিতেন, “শিক্ষকতা সহজ কথ্য নয়, এ কথ্য বার-বার নয়। অনেক গুণ থাকলে তবে শিক্ষক হওয়া যায়। হাজার হাজার ছেলে শিক্ষকের আচরণ অনুকরণ করবে, শিক্ষকে সাবধান হয়ে চলতে হয়।”

সত্যি, ভগবান তাঁহাকে যেন ‘শিক্ষক’ করিয়াই এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ সে আদর্শও নাই, শিক্ষকও নাই।

যোগেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনী আজও লেখা হয় নাই। কিন্তু লিখিবার যোগ্য উপকরণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে রাখিয়া গেলেন। সেদিক দিয়া এই গ্রন্থের মূল্য অসামান্য।

হরিপদ মাষ্টার—শ্রীমুনীল বসু। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২। মূল্য দুই টাকা।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অনভিনীত নাটকের কোন মূল্য নাই—কারণ ইহার পাঠক নাই। এই জন্ত সাহিত্য হিসাবে নাটকের স্থান আজও আমাদের দেশে হইল না। প্রকাশকও ছাপিতে চাছেন না, কারণ বিক্রি হয় না। কিন্তু দেখা বাইতেছে এই নাটক তাহার ব্যতিক্রম। নহিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার আর একটি সংস্করণ হইত না।

হরিপদ মাষ্টার লাহিত শিক্ষক-জীবনের স্বর্ণকথা। বাস্তব-ধর্মী নাটক। প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া এরূপ নিখুঁত চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব নয়। জীবনের প্রতিকলনই ত নাটক। এই নাটকে কোথাও বক্তৃতা নাই। সেইজন্যই হরিপদ মাষ্টার এতখানি জীবন্ত হইতে পারিয়াছে। লেখকের জীবন-বোধ এবং শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা প্রশংসনীয়।

শ্রীগোতম সেন



# দেশ-বিদেশের কথা

## দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত প্রচার

দক্ষিণাভ্যেব সহিত বাংলাদেশের আত্মিক যোগ সাধনকালের। বিশেষ করে—সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি ভারতের এই দুই অঞ্চল বিশেষভাবে অগ্রগামী। সেজন্য বিগত ডিসেম্বর মাসে বাক্সালোবে সম্মিলিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৫তম অধিবেশনে ষ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা অতি সুবিবেচনা-বস্তুত। এর জন্য আহুত হন কলিকাতার ডঃ বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডঃ রমা চৌধুরী স্থাপিত প্রাচ্যবাণীর সুবিখ্যাত অভিনেতৃন্দ। এঁরা কয়েক মাস পূর্বেই মাদ্রাজ ও পশ্চিমচৌতে সর্বপ্রথম বাংলা সংস্কৃত অভিনেতৃন্দরূপে প্রভুত বশ অর্জন করেছেন। এবারও তাঁরা পূর্বেই মত ডঃ বতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক জীশীসারদামণির স্মৃতিভবনীর পূর্বোদ্ব ও উত্তরোদ্ব অবলম্বনে বিবচিত সঙ্গীতমুখর বাঙ্গাল সংস্কৃত নাটক “শক্তি-সারদম্” ও “মুক্তি-সারদম্” বাক্সালোবে পূর্ব পর দু’দিন অভিনয় করে বাঙালী ও অবাঙালী সকলেরই চিত্ত

জয় করেছেন। এই দুটি সংস্কৃত নাটক বথাক্রমে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এবং বাক্সালোরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বাবধানে সুবিশাল দেশ-বিদেশের প্রাক্কমণ্ডলীর সম্মুখে অতি সন্দরভাবে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের পূর্ণ সাফল্য যে চারটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা : নাটকের ভাষা ও ভাব, অভিনয়, সঙ্গীত ও রূপসজ্জা—সে সবকিছুই পরাকর্ষ্য এই ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রথমতঃ ডঃ চৌধুরী বিবচিত নাটকগুলির ভাব ও ভাষা অতি সহজ, সরল ও সুন্দর। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বহুদিন ব্যাপ্ত প্রাচ্যবাণীর সঙ্গে সংস্কৃত অভিনয় করে ভারত-বিখ্যাত হয়েছেন। তৃতীয়তঃ এবারের নাটকের মধ্যে সঙ্গীতাংশে বিশেষ চমৎকারিত্ব দেখান সুবিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী জীমতী ছবি বন্দোপাধ্যায়। জীমতীকেদার ভট্টাচার্য্য, জীমতী বড়া বর ও তরুণ-শিল্পী জীপূর্ণেন্দু রায়েব কৃতিত্বও এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থতঃ, রূপসজ্জার পূর্ণ ভাব গ্রহণ করেন



## লিলি বিস্কুট

রকমারিতাক

স্বাদে ও

গুণে

অতুলনীয়।

লিলির লজেন্স

ছেলেমেয়েদের প্রিয়।

LILY BISCUIT CO. PRIVATE LTD. CALCUTTA-4



ভারতবিখ্যাত রূপসজ্জাকার—ঐযুক্ত হরিদ্র চন্দ্র। এভাবে সর্বদিক থেকেই প্রাচ্যবাসী মন্দিরের সংস্কৃত নাট্যাভিনয় দক্ষিণাত্য-বাসিগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হয়।

আর এক দিকেও ডঃ বতীজ্রবিমল চৌধুরী কর্ণাটকবাসিগণের চিত্তজয়ে করেন। সেটি হচ্ছে নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্ণাটক সাহিত্য অধিবেশনে গোড়ীয় সাহিত্য ও কর্ণাটক-সাহিত্যের যোগসূত্র এবং কর্ণাটকের মহীরসী নারীগণের বিষয়ে অপূর্ণ তথ্যপূর্ণ ভাষণের দ্বারা। একই ভাবে “সমাজ ও সংস্কৃতি” শাখার অধিবেশনে প্রধান বক্তারূপে ডঃ রমা চৌধুরী “বাংলার দর্শন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব” বিষয়ে যে মনোজ্ঞ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন, তা সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে।

প্রাচ্যবাসী মন্দির তাঁদের এবারের তৃতীয় সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅবিনন্দ আশ্রমে। এ স্থানে তাঁরা ডঃ বতীজ্রবিমল চৌধুরীর বহুবাব অভিনীত সুপ্রসিদ্ধ নাটক “ভক্তি-বিকুপ্রিয়ম্” বিসংক্রান্তিক দেশ-বিশেষ থেকে সমাগত ভক্ত ও পণ্ডিত-গণের সম্মুখে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীজীমা ডক্টর চৌধুরী দম্পত্য ও শ্রীমতী ছবি বন্ধ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ দর্শন করে আত্মীকৃত জ্ঞাপন করেন।

এই সমস্ত নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন অধ্যাপক শ্রীঅলোক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বপ্না দাস, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমহিষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশক্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র। সংস্কৃত অভিনয়ের ক্ষেত্রে এরা সত্যিই নবরত্ন।

সংস্কৃত শিক্ষা সম্প্রসারণের দিক থেকে বঙ্গদেশ থেকে এই যে অপূর্ণ প্রচেষ্টা চলেছে, ভগবদ রূপ'য় তা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক। ১৯৪৩ সনে প্রাচ্যবাসী সংস্থাপিত হয়—সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণের নিমিত্ত। বিগত ১৬ বৎসরে এই গবেষণাগার থেকে ১৬০ খানা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে—সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদের দান, সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানদের দান, দূতকাব্য-

সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, বেদ-বেদান্ত-স্বকী দর্শন বিষয়ে বহু গ্রন্থ, এ প্রকারের কত গ্রন্থ—কিন্তু প্রত্যেকটিই প্রাচীন পুণ্ড্র উপরে নির্ভর করে লিখিত বিষয়ে এবং পর্য্যালোচনার অভিনব। তার পর সর্বসাধারণে সংস্কৃতকে প্রিয় করে তোলার জন্য ডক্টর চৌধুরী দম্পত্য স্থাপন করেছেন প্রাচ্যবাসীর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এবং সংস্কৃত ভাষণ পরিষৎ। এই উভয় পরিষদের তত্ত্বাবধানে নিখিল ভারতব্যাপী একটি গণ-সংস্কৃতান্মোলন ব্যাপকভাবে গড়ে তোলবার প্রচুর সহায়তা ঘটেছে। প্রাচ্যবাসীর পত্রিচালিত তিনটি চতুষ্পাঠী, বিশেষতঃ মহিলা চতুষ্পাঠী, শিক্ষানানে ও আদর্শসংস্থাপনে বঙ্গদেশে গঠিত। বঙ্গদেশের সর্বত্র রয়েছে প্রাচ্যবাসীর শাখা। প্রাচ্যবাসী থেকে দৈনিক ভারতীয় সাধনার সিদ্ধি বিষয়ে কিছু না কিছু নূতন পরিচিতি প্রকাশিত হচ্ছেই।

নিখিল ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যবাসীর এই উদ্যতম আদর্শ দেশব্যপী চিত্ত অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করুন—ভগবৎ-সকাশে এই প্রার্থনা।

### নিকুঞ্জকামিনী দেবী

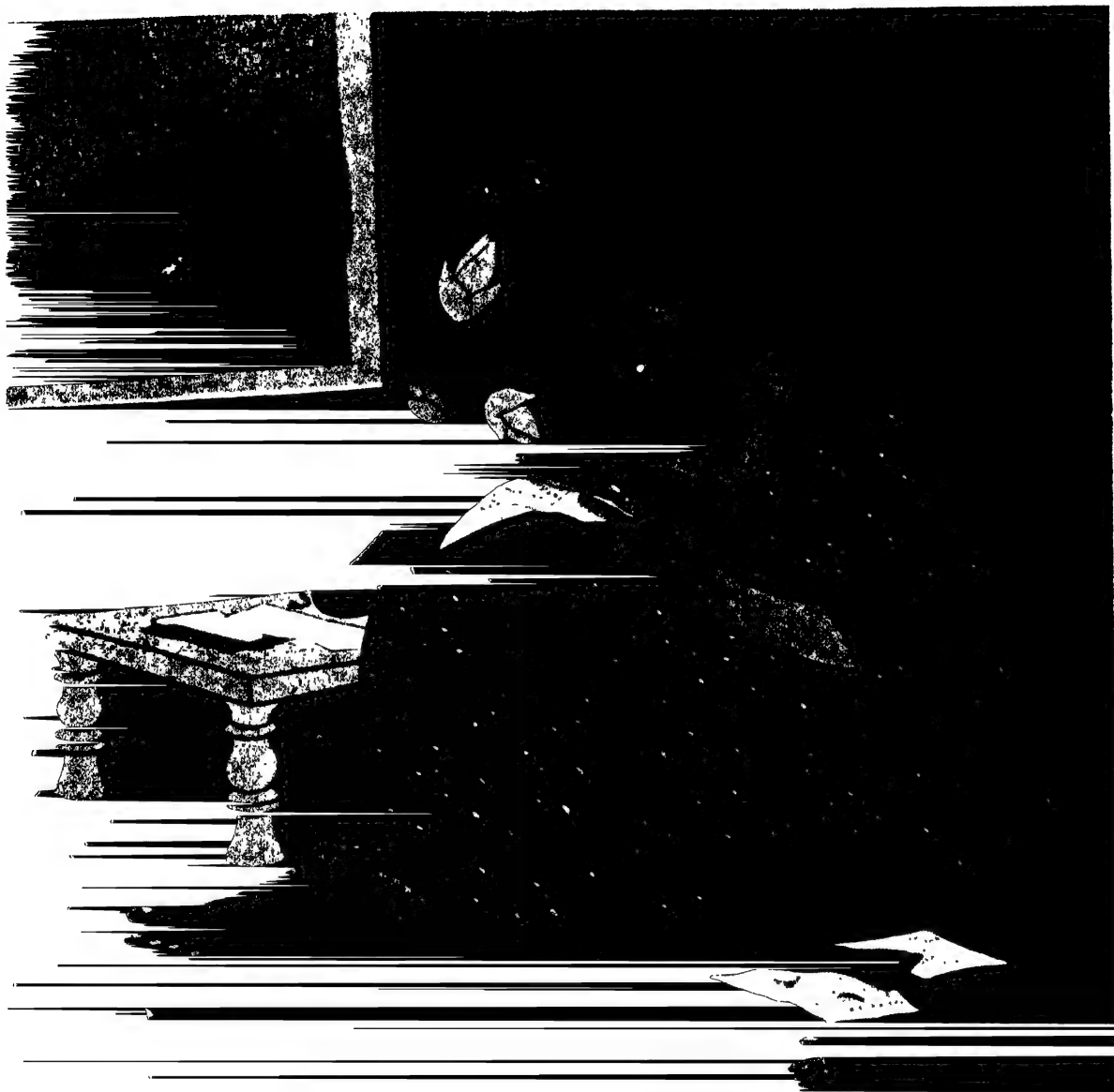
‘প্রবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত রামসদন চট্টোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব আলিপুরের এ্যাড্‌মিনাল ম্যাজিস্ট্রেট) মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী নিকুঞ্জকামিনী দেবী গত ২৩শে ডিসেম্বর ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার ভবানীপুষ্কে বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনি কবিশঙ্কর অস্থানে শ্রীনিকেতন-সচিব হইয়া ছিলেন। মহাশয় পুত্র বিজয়কুমার এডভোকেট ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমার ভূতপূর্ব একাউন্টেন্ট জেনারেল। একমাত্র কন্যা শৈলবালা, ভ্রাতৃত্বা শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ও বহু পৌত্র পৌত্রাদি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বপ্নের মহাশয়ের নামে বাঁকুড়ায় গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী ও শঙ্করদেবীর নামে চিকিৎসালয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রী শ্রীপুষ্প দেবী উপনিষদের অধ্যাপিকা হিসাবে সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত।

**ডায়া-পেপার্সিন**  
হজমশক্তি  
বজায় রেখে  
স্বাস্থ্যের  
উন্নতি করে

**ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা**

সম্পাদক—শ্রীকৈলাশনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লি., ১২০, ২ আচাৰ্য্য প্রহরাজে রোড, কলিকাতা-৯



প্রবাসী পেন্স, কলিকাতা।

১ প্রবাসী পেন্স  
প্রবাসী পেন্স ও পুস্তক



ସମ୍ପତ୍ତି ବି



ସମ୍ପତ୍ତି ବି

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ

# প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্  
নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ"

১৯শ ভাগ  
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৬৬

১ম সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### অথ চক্র ও চক্রী সমাচার

কেবলে নিকার্নো যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বলিতে কি, এই যুদ্ধ ঐপদ্মনাভনের সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের কমানিষ্ট বিমোচন-অভি-  
যানের পরিসমাপ্তি। এখন চলিতেছে সংযুক্তদের মন্ত্রীসভা গঠন-  
পর্ব—এবং নির্বাচনের "ময়না তদন্ত"।

কেবলের এই নির্বাচনে অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় উপকরণ  
ছিল। নানাপ্রকার বিপরীত শক্তির প্রতিক্রিয়ায় এই নির্বাচনে  
সারা কেবল প্রদেশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভোট দিবার অধিকারী  
জনতার শতকরা ৯০ ভাগের অধিক নির্বাচনে যোগদান করে।  
প্রত্যেকটি দলেরই কন্ঠ্যব্দ প্রাণপণ করিয়া লড়িতে থাকে, কিন্তু  
বিমোচন-সংগ্রাম পরিষেবে প্রেসিডেন্টের শাসন স্বাক্ষর যারপিত  
দাক্ষার সুযোগ ছিল না।

ফলে কমানিষ্ট দল :১৫৭ সনের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের  
অপেক্ষা প্রায় ১২ লক্ষ বেশী ভোট পাটয়াছে কিন্তু বিধান পরিষদে  
আসন পাটয়াছে ২৬টি মাত্র, যেখানে ১৯৫৭ সনে পাটয়াছিল  
৬০টি। এই ভুতৃত ব্যাপারে লোকের মনে কেমন একটা ধাধা  
লাগিয়া গিয়াছে। কমানিষ্ট দল প্রথমে নিজেদের ও নিজের অনুচর-  
বর্গকে সাত্বনা দিবার জন্ত বলেন, তাঁহাদের লোকসমর্থন পূর্বাপেক্ষা  
অনেক অধিক হইয়াছে—তাহার অর্থ যে, কেবলের জনসাধারণে  
তাঁহাদের সমর্থক দল ক্রমেই বাড়িতেছে। পরে অবশ্য তাঁহারা হার  
মানিয়াছেন। কমানিষ্ট-বিরোধী সংযুক্তদের পক্ষেও জয়-পরাজয়  
লইয়া কিছু মতভেদ বহিয়াছে মনে হয়।

আসলে এই নির্বাচনে দেখা গিয়াছে যে, লোকে বুঝিতেছে  
অন্ত দার্শনিক দলের মত কংগ্রেসও একটি দল মাত্র এবং উহাও  
অন্তরের মত সুবিধাবাদী দলগত-স্বার্থপর, আদর্শবিহীন ও ক্ষমতা-  
লোলুপ। সুতরাং দল হিসাবে বা আদর্শবাদের গুণে তাহার কোনও  
বিশেষ গুণাগুণ নাই। শুধুমাত্র আছে তুলনামূলক ভাবে পরিমাণ  
ও পরিমাপের কথা। এবং সেখানেও কোন স্থিতি নাই যে,  
"এই বিভ্রাল বনে বাইলে বনবিভ্রাল" হইবে না।

কমানিষ্ট পার্টি কেবলের শাসনতন্ত্র হস্তগত করিয়া নিছক পার্টির  
স্বার্থে দেশকে পোষণ, শোষণ ও দমনের গণ্ডে কেলিয়াছিলেন।  
অর্থাৎ নিম্ন দলকে পোষণ, অস্ত্রদলীয় ও নিরীহ দলতীনজনকে পোষণ  
এবং তাঁহাদের প্রতিক্রিয়াকে কঠোর হস্তে দমন এই চালাইয়াছিলেন।  
বোধ হয়, তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, নয়া দিল্লীর "অন্ধের নগরী  
বেবু বাক্সার দল" "গণতন্ত্র" "জনমত" ইত্যাদি মেকীর বাট্টা ঠিক  
কহিতেই আরও তিন বৎসর কাটাইবেন। ততদিন কেবলে কমা-  
নিষ্ট একছত্র হইয়া বাটবে।

চুইতও ঠিক সেইমতই, যদি না এই সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদ  
পদ্মনাভনের নেতৃত্বে বিমোচন আন্দোলন চালাইতে থাকেন। যাহার  
ফলে নয়া দিল্লীর স্বার্থকেন্দ্রীক মন্ত্রী-বৈঠকেরও টনক নড়ে এবং  
কেবলে প্রেসিডেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন।

দলীয় শাসন শেষ হইল, প্রেসিডেন্টের শাসন চলিল, দেশের  
লোক সখিৎ করিয়া পাইল এবং স্থির ভাবে চিন্তার অবকাশও  
পাইল। তখন আসিল নির্বাচনের সমস্যা ও তাহার ভাবনা—  
"রাহুর দল ত বিদেয় হ'ল, কেতুর দলই বা কোন কম?" এই  
'দোটা' চিন্তার ফলই আমরা নির্বাচনে দেখিতে পাই।

যদি বলেন যে এই কথা বাড়াবাড়ি, তবে বলিব যে, ঐতিহাসিক  
দেশমুখের শাসনতন্ত্রে দুর্নীতির পরিমাণ ও কারণ নিদ্বন্দ্বিতা সম্প্রতি  
প্রস্তাবের পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখুন। এ দেশের অধিকারী বর্গ  
যে দুর্নীতির প্লাবন বহাইয়াছেন তাহার ফলভোগী কে নহে?  
শতকরা ৯৯ জন এই দুর্নীতির ভাবে ঝুঁটি এবং বাকিয়া—প্রত্যক্ষ  
ভাবে বা পরোক্ষভাবে—উহারই কল্যাণে পুষ্ট। অথচ আভিকার  
সংবাদে দেখি যে, প্রকাশনাধ সংগ্রহ মত লোকও দেশমুখের এই  
প্রস্তাবকে কটুবাক্যে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। তবেই না নেহরুর  
কংগ্রেস।

যেহে কথাই দেখুন। কোথায় কেবলের যুদ্ধজয়ে জনসাধারণের  
সম্মুখে উল্লাস, আর কোথায় দলগত স্বার্থে মেঘের বধের চেষ্টা।  
যজ বালায় কংগ্রেস।

## কেরলার ভোটযুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রন্ট

কেরলার নির্বাচনী ঘন্থে এবারে অবসান হইল। এই ভোটযুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রন্ট ২৪টি আসন দখল করিয়াছেন। স্তব্ধ কংগ্রেস পার্টি যে মাইনরিটিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এমন হইল ইহাই অনেকের প্রশ্ন। ভোটের সংখ্যা তাঁহাদের গণতান্ত্রিক ভুলনার কম নয়, বরং বেশী। তথাপি তাঁহারা যেরূপ সংখ্যায় ভোট পাইয়াছেন, এবারেও হয়ত বাজিয়া করিতে পারিতেন। কিন্তু এবারে কংগ্রেস-পি-এস-পি-লীগ একত্র হইয়া এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সংযুক্ত ফ্রন্টের কৌশলে ভোটগুলি বিভক্ত হওয়ার কংগ্রেস হারিয়া গিয়াছেন ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু হারিবার মূলেও বিতর্ক গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির বদলে সাম্প্রদায়িক জোটবদ্ধতাই বেশী কার্যকরী হইয়াছে—এই ব্যাখ্যাও অনেক করিতেছেন। অর্থাৎ মুসলিম লীগ ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং সেই সঙ্গে নায়ার সম্প্রদায়ও কংগ্রেসের সহিত জোট বাঁধিয়াছেন।

গণতান্ত্রিক আদর্শ ও লৌকিক আচরণ, অর্থাৎ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উচ্চ সর্বসমানবিক আদর্শের উপরেই কংগ্রেস এতকাল জোর দিয়া আসিয়াছেন। কোন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের হাইকমান্ড অপর কোন পার্টির সঙ্গে আপোষ-রফার প্রস্তাব দেন নাই। ভারতীয় গণতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে এই মনোভাব ও নীতি নিঃসন্দেহে পরিচয় দিয়াছিল। কেরলার নির্বাচনে-ক্ষেত্রে কংগ্রেস শুধু পি-এস-পির সঙ্গে একত্র হন নাই, তাঁহারা মুসলিম লীগের সহিতও জোট বাঁধিয়াছেন। ভারতবর্ষের নির্বাচনী ইতিহাসে ইহা শুধু অভিনবই নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। যে মুসলিম লীগকে লইয়া ভারতে এত অশান্তি, এত ভাগাভাগি—যে প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক-নাম চিহ্নিত এবং যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রায় প্রতিদিন বক্তৃতা দেন, সেই প্রতিষ্ঠানকে ডাকিয়া কোল দেওয়া এবং স্বৈচ্ছায় রঞ্জিত ক্ষমতার আসনে বসাইবার আয়োজন কতখানি দুর্দর্শিতার কাজ হইতেছে, তাহা যেন কংগ্রেস হাইকমান্ড চিন্তা করিয়া দেখেন। আজ কংগ্রেসিদিগকে হারাইতে গিয়া যদি কংগ্রেসইজ্জদের অংশ গ্রহণ করিতে হয়, তবে চোর তাড়াইতে ডাকাত ডাকিবার মত অশ্রু একদিন দেখা দিতে পারে, ইহাও এই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে বলি।

গ-স

## বর্তমান কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সভাপতি

এইবার কংগ্রেসের নূতন সভাপতি হইলেন শ্রীমঞ্জী বেন্ডী। নূতন সভাপতিকে লইয়া কংগ্রেসের অধিবেশনও হইয়া গেল। পরদিন ভারতে একদা কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তখন সভাপতির ভাষণ সমগ্র দেশে যে উৎসুক্য ও উদ্দীপনা জাগাইত, আজ যদি তাহার অভাব দেখা যায় তাহাতে বিস্মিত বা হুঃখিত হইবার কিছুই নাই। সেদিন কংগ্রেস ছিল স্বাভাবিকভাবে ভারতীয়-

দের মিলিত শিবির এবং কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত জাতির মহানায়ক। প্রতি বৎসর তাই কংগ্রেসের নির্দেশ ও কংগ্রেস সভাপতির সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ লোকে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রুতি এবং সমগ্র জাতি তাহা হইতে নূতন প্রেরণা ও নবীন উৎসাহ লাভ করিত। সে অবস্থার আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে—স্তব্ধ ইহার প্রয়োজনও ফুটাইয়াছে। এই জটিল পাকিস্তানি চাহিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে তুলিয়া দিয়া একটি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের নূতন আত্মপ্রকাশ। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারই বলিতে পারেন। কিন্তু আমবা দেখিতেছি, ইহা অজ্ঞাত পার্টির মত একটি পার্টি মাত্র। যে মাপ-কাঠি দিয়া অজ্ঞাত রাজনৈতিক দলের বিচার হইয়া থাকে আজকাল তাহাই কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নূতন সভাপতি শ্রী বেন্ডী প্রকারান্তরে সেকথা স্বীকারও করিয়াছেন। বর্তমানে দেখা যাউতেছে, কংগ্রেস ও সরকার পৃথক বস্তু নয়। সরকার বাহা বলিবেন, কংগ্রেস তাহার প্রতিশ্রুতি করিবে। এ নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। সভাপতির ভাষণেও সরকারের কথাই পুনরুক্তি দেখা গেল। অর্থাৎ ভারত সরকারের আর্থিক, বৈদেশিক ও বৈদেশিক সমস্ত নীতিরই তাত্ত্বিক সমর্থন তিনি যোগাইয়াছেন। এমনকি বেথানে যুক্তির হাণ্ডে তিনি পানি পান নাই, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর দোহাই দিয়াই কাজ সাধিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়া এই কথাই মনে উদয় হয়, বক্তা সরকারের মুশপাত্রী কিনা! পরিকল্পিত অর্থনীতি, সোশ্যালিজম, সরকারী ভাষা, চীনের আক্রমণ, পঞ্চাঙ্গ ও পরদাষ্ট্র-নীতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ভারত সরকারের নীতি অনুসরণ করিয়া প্রশস্তি গাহিয়াছেন। এমনকি হিন্দীপ্রসার প্রসঙ্গেও সেই স্তুতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার এই সরকার-সমর্থন চরমে উঠিয়াছে, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরদাষ্ট্রনীতির সমালোচকের উপর বিজ্ঞপণ হানিয়া পঞ্চাঙ্গের গুণকীর্ণ করিয়াছেন। চীনের ভারত আক্রমণ আর বাহাই করুক পঞ্চাঙ্গের সার্থকতা নিশ্চয়ই স্মৃতিতে করিতেছে না। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি যদি সকল হইত, তাহা হইলে এই দেশকে কি এতখানি বিব্রত, এতটা বিভ্রান্ত হইতে হইত, যেমন হইয়াছে পাকিস্তান-এর আত্মপ্রদায়ের চেষ্টার কলে? ভারত সরকার যদি সন্মত থাকিতেন, যদি পঞ্চাঙ্গের প্রকোপে তাঁহাদের বাস্তববুদ্ধি বিমূঢ় না হইত তাহা হইলে কি চীনা সৈন্য ভারত-সীমান্ত হত্যা করিয়া ভারতীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত?

কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি সে আলোচনার যথো না গিয়া জাবকেই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। যে দেশে বিরোধীদের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে, সে দেশেও যদি পার্টি সরকারের শুধু অনুগামী নয়, অন্ধ জাবকে পরিণত হয় তাহা হইলে সরকারের দোষ-ত্রুটি চোখে আজল দিয়া কে দেখাইয়া দিবে?

প্রশ্ন উঠিতে পারে, রাজনৈতিক দল-পরিচালিত সরকার ত পাটির প্রতিষ্ঠাতা মাত্র। সরকার যন্ত্র, দল যন্ত্রী। সরকার ছাড়া, দল কায়। ইহাই হওয়া উচিত। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কই? এখানে ত দেখা যাইতেছে যন্ত্রই যন্ত্রীকে চালাইতেছে—যন্ত্রী যন্ত্রকে নয়। সরকারের ভ্রান্ত নীতি সংশোধিত হইলে দেশের কল্যাণ হয়। ইহাতে সরকারেরও চৈতন্যোদয় হইত এবং প্রত্যেকটি কর্তৃপক্ষের নব মূল্যায়ন হইত। সমালোচনা ছাড়া সংশোধন হয় না। বর্তমান কংগ্রেসের সেই ভূমিকাই গ্রহণ করা উচিত ছিল।

গ-স

### ভারতবর্ষে মার্শাল ভরশিল্প

পৃথিবীর মধ্যে দুইটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। এই দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অতি অল্পকালের ব্যবধানে ভারত পরিদর্শন করিয়া গেলেন। ইহা ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেন না আমাদের জাতীয় জীবনের এক বটিন সঙ্কট সময়ে তাঁহারা এ দেশে আসিলেন। উত্তর-সীমান্তে অত্যন্ত চৈনিক আক্রমণের ফলে ভারতের জনহিত আজ ক্ষুদ্র। বহুদলী সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কও অশা কমা যায়, ভারতে আসিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া গেলেন।

ভারতবর্ষ কোনদিনই বিবোধ চাহে নাই, বরং বন্ধুত্বই কামনা করিয়াছে। এরূপে কায়নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তির জন্ত অধ্যর্থিতও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এমনকি সে রাজনৈতিক মতবাদগত পার্থক্যের প্রসঙ্গও দূরে রাখিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার অগ্রসর হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও পদস্পর্শিক সহযোগিতা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে, তাহাও বর্তমান জগতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। উভয় দেশের আন্তরিক কামনা, আলাপ-আলোচনার অতিথি-সমাগমে ও বিনিময়ে, পরস্পর পরামর্শ, সহযোগিতা ও সাহায্যের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া এই দুই দেশের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মত এবং আদর্শে পার্থক্য থাকিলেও, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকিতে ইহাদের কোথাও বাধে নাই। সেইজন্যই সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতবর্ষকে বিনামূল্যে সাহায্য করিতে দ্বিধা করে নাই। এই সাহায্যের ফলে ভারত যেমন একদিকে উপকৃত হইয়াছে, তেমনি উভয়ের সহযোগিতার বন্ধুত্বও প্রগাঢ় হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মার্শাল ভরশিল্পের ভারতবর্ষে আগমন তাহারই স্বীকৃতি।

সোভিয়েট দেশের রাষ্ট্রিক গঠন ও পরিচালন ব্যবস্থার সুহিত ভারতের কোথাও মিল নাই সত্য, কিন্তু জাতীয় উন্নতির সঙ্কল্প ও প্রয়াসের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সাদৃশ্য অনেকখানি। দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা দূর করিবার জন্ত সোভিয়েট জনসাধারণ দীর্ঘকাল

যে দুঃখ সহিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছে, তাহার সাফল্য কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই বিস্তারিত সৃষ্টি করিয়াছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আজ সোভিয়েট দেশ পৃথিবীকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। এক কথায় বড় হইবার সকল গুণই তাহাদের মধ্যে বর্তমান। গঠন মনোবৃত্তি তাহাদের রক্তের মধ্যে। নহিলে একটা দেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া, এত শীঘ্র তাহারা আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিত না। দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা দূরীকরণে ভারতবর্ষ সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিলেও, সোভিয়েটের অগ্রগতি আমাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে নানা-ভাবে প্রেরণা দিয়াছে। আমাদের শিল্পোন্নয়ন কাণ্ডেও তাহারা যন্ত্রপাতি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক দিয়া, নীতির দিক দিয়া এবং আদর্শের দিক দিয়া, উভয় দেশের মধ্যে একটা আত্মিক বোণ আছে। যে নিরন্তরীকরণের মাধ্যমে তাঁহারা আজ শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা ভারতেরই শাস্তবাহিনী। এই কারণেই উভয়দেশের সৌহার্দ্য কোনদিনই ছিন্ন হইবার নহে।

গ-স

### অব্যবস্থার ষাঁতাকলে ভারতীয় বিজ্ঞানকন্ময়ী

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানকন্ময়ী ডঃ জোসেফের আত্মজ্ঞাতার কথা সকলেই জানেন। এষ্ট আত্মজ্ঞাতার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? মুহূর্ত্ত দিয়া তিনি দেখাইয়া গেলেন, কত বড় প্রতিভার অপমান আমরা করিয়াছি। বিজ্ঞানকন্ময়ী হিসাবে ডঃ জোসেফ যে গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাও যথোচিত সদ্যবহারের সুযোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়। কেবল ডঃ জোসেফ নয়, এদেশে বহু তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানকন্ময়ী ভবিষ্যৎ এই দিক দিয়া হত্যাশায়ী। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলিয়াছেন, বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে কাজ করিতে আগ্রহী, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। স্ট্রিনেহেরু ইহার কারণ অনুসন্ধান মনোযোগ দিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ এবং নানা রকম আমলাতান্ত্রিক বন্ধনে আবদ্ধ যে, গবেষণা অপেক্ষা ফাইল, রিপোর্ট ইত্যাদি ঠিক করিতে ও টাকা-খানা-পরসার হিসাব মিলাইতেই উদ্যোগ এবং উদ্যমের অধিকাংশ নষ্ট হয়। বিজ্ঞানকন্ময়ী কেবলই এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় চাকুরির সন্ধান করিবেন, ইহা অবশ্য গবেষণা-কাণ্ডে চালাইবার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। আর এই চাকুরীর সন্ধানই বা তাহাদের করিতে হয় কেন? এই ‘কেন’র উত্তরই এখানে জটিল। যোগ্যতা অনুযায়ী গবেষণা করিবার সুযোগ এবং উপযুক্ত বেতন অথবা বৃত্তি পাইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা অল্প ভাগ্যাধেষণে বাহির হন না। সমগ্রা সেইখানে।

আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এদেশের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রয়োগক্ষেত্রের উপর আটখা বসিয়াছে। আমলাবা গবেষণা সম্পর্কে প্রায় নিস্পৃহ বলিলেও অতুক্তি হয় না। তাঁহারা কাইল এবং হিসাবে খবরদারি করিতে বাস্তব। আমলাতন্ত্রের হিসাবে খেঁড় অমুযায়ী বেতন ও পদমর্যাদা—সেখানে বিজ্ঞানকর্মীর যোগ্যতা ও গবেষণা-কৃতিত্ব নিতান্ত গোঁণ ব্যাপার। গ্রেড অমুযায়ী বেতন অথবা বৃত্তির খোঁপে খোঁপে বিজ্ঞানকর্মীদের বসাইয়া দিবার পর চাকা ঘুরিতে থাকিল আমলাতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মে। ডঃ জোসেফের চাকুরির চাকা পনের বৎসর ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যে এক শত বাট টাকায় ঠেকিয়াছিল, উহা সেই আমলা-তান্ত্রিক ভাগ্যচক্রের অপরিবর্তনীয় বিধান অমুযায়ী। তাঁহার যোগ্যতা অথবা গবেষণা-কৃতিত্ব কিছুই এ আমলাতান্ত্রিক গ্রেড ও গড় হিসাবের দৃষ্টচক্রে হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

জানি না, সরকার এ সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখেন কিনা। খোঁজ লটিলে দেখিতে পাইবেন, গলদ কোথায়? সরকারের অজ্ঞান মস্তুরে নিয়ম বাহাই হইক, বিজ্ঞানকর্মীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বেতন-বৃদ্ধি কেবল কক্ষকালের দৈর্ঘ্য অনুসারে হওয়া উচিত নয়। বৃত্তার ফলে, বহু প্রতিভার অপচয় ঘটিতেছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেতন ইত্যাদির যে হার, বিজ্ঞানকর্মীদের বেতন ও বৃত্তি ইত্যাদি সে ভুলনার অত্যন্ত সামান্য। এই অসুস্থ বৈষম্য কেবল এ দেশের আমলা-সরঞ্জাম ব্যবস্থাতেই বোধ হয় সম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিভাবান বিজ্ঞানকর্মী বিদেশে কর্ম সংস্থানের চেষ্টা করিলে তাঁহাকে লোভ দেওয়া যায় কি? আকর্ষণ শুধু অর্থেরই নয়—আরও একটা দিক আছে, যাঁহা প্রতিভার মাত্রই উপেক্ষা করিতে পারেন না। এ দেশে বৈজ্ঞানিক কর্ম ও গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক কলে ছাঁটাই বলিয়া প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানকর্মীরা সর্বত্র স্বচ্ছন্দে কাজ করিবার সুযোগও পান না। এ অভিযোগ নূতন নয়, অতিরঞ্জিতও নয়—দৃষ্টান্তও বহু দিরায়েছে। ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত বহু ভাবাবিদ বিজ্ঞানকর্মী—তিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে বিষয়ে উপযুক্ত কাজের সুযোগ না পাইয়া বিদেশে চলিয়া যাঁতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, ২০শে জানুয়ারীর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ লিখিয়াছেন—“ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত বহু ভাবাবিদ বিজ্ঞানকর্মী, তিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ সে বিষয়ে উপযুক্ত কাজের সুযোগ না পাইয়া বিদেশে চলিয়া যাঁতে বাধ্য হইয়াছেন। এম-বি, বি-এস ও রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস-সি উপাধি প্রাপ্ত গবেষকের প্রবন্ধ এ দেশের বৈজ্ঞানিক আমলাদের খামখেয়ালী বিচারে অনাদৃত হইয়াছে, পরে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়া আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগীয় অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মী আমেরিকায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাজ করিতে আহবানিত হন। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ যে, উপরোক্তালায়া

অপ্রসন্ন হওয়ায় একজন ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীর গবেষণার ফলাফল চাপা দিয়া রাখা হয়, অথচ কিছুকাল পরে অল্প দেশের দুইজন বিজ্ঞানী অল্পরূপ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করিয়া নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। বিদেশে কয়লা-সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার কৃতিত্ব অর্জন করিয়া এদেশে ফিরিয়াছিলেন একজন তরুণ বিজ্ঞানকর্মী, একটি প্রসিদ্ধ সরকারী কলেজে চাকুরিও তিনি পান, কিন্তু গবেষণা চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াও তিনি পান নাই এবং অবশেষে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে বিদেশে কাজ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন গবেষণার সুযোগ পাইবেন বলিয়া।”

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। এই সনাতন প্রথা পরিবর্তন করার দায়িত্ব সরকারের, নহিলে এই অব্যবস্থার অবসান কোন দিনই হইবে না।

গ-স

বাজার হইতে চিনি উধাও হইল কাহার দোষে?

চিনির দর দেখিতে দেখিতে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গেল। এই সম্ভাবনা-পথ সরকারই প্রস্তুত করিয়া দিয়া-ছেন। সরকার বাতাত্তেই কন্ট্রোল দর বাঁধিয়া দিতে গিয়াছেন, তাহা লইয়াই একপ চিনিমিনি খেলা পূর্ণের হইয়াছে, এমনও হইতেছে। বাজারে চিনি ছিল—কিন্তু যে মুহূর্তে সরকার তত্ত্বক্ষেপ করিলেন, অমনি বাজার হইতে চিনি উধাও হইয়া গেল! আজ কোথাও চিনি নাই। কিন্তু সরকার এই ‘নাই’ কথাটি বিশ্বাস করিতে চাছেন না। তাঁহারা পরিসংখ্যানের পাতা খুলিয়া দেখাইয়া দিবেন প্রভু চিনি আছে। আর ‘নাই’ বলিলেই হইল? চিনি যে আছে তাহার প্রথম প্রমাণ মিষ্টারের দোকানগুলি অন্ধ ও বন্ধ চর নাই, চাষের দোকানের খাঁপ পড়ে নাই। চিনি আছে বটে, তবে সাধারণ বাজার আজ কালো হইয়াছে।

সরকার নিশ্চেষ্ট নাই—তাঁহাট প্রমাণ করিতে বেশন-কাউর ব্যবস্থা করিলেন। এই কাউ দেখাইলেই সপ্তাহে এক পোয়া (আজকাল দেড় পোয়া হইয়াছে) হিসাবে চিনি মিলিবে। প্রথম কথা হইতেছে এই কাউ অনেকই সংগ্রহ করিতে পারেন না, দ্বিতীয় কথা হইল, কাজ-কর্ম বন্ধ করিয়া লাইন দিবারই বা তাহাদের অবকাশ কোথায়? তাহার উপর চিনির ববদ হইতেছে, সপ্তাহান্তে দেড় পোয়া। চমৎকার ব্যবস্থা!

চাহিদা অমুযায়ী উৎপন্ন হ্রবোর অভাব, দেশে চিনির কলেরও সংখ্যাখণ্ড নাই—তাঁহার উপর ইঞ্জু-চাব সেরূপ হয় নাই, এরূপ মামূল কথা দিয়া সাধারণকে আর ভুলানো যাইবে না। তাহারা ক্রমশঃই সাবালক হইতেছে। তাহারা আজ ঘুরিতে পারিয়াছে, দেশে চিনির মূল্যবৃদ্ধির সমস্তা একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্তা। ব্যবসায়ীদের হুনিবার লোভ-পরবশতাব জগৎ এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। হুংখের বিষয়, এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে গবর্নমেন্টের হস্তে স্তম্ভ থাকিলেও তাঁহারা আজ পর্যন্ত এই



### সরকার ও ফাটকাবাজী

ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বহিয়াছেন। ভারত সরকার চিনির কলগুলি হইতে যে চিনি গ্রহণ করিতেছেন, তাহা হইতে পশ্চিম-বঙ্গে প্রয়োজনীয় চিনি সরবরাহ করা হইতেছে না। কেন করা হইতেছে না, তাহা জানেন। যে কারণেই হউক, আমরা দেখিতেছি, চিনির মূল্যবৃদ্ধির জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারই দায়ী। কারণ, কাঁচারা লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ চিনি ব্যবসায়ীদের সংঘত করিবার জন্ত আজ পর্যন্ত কার্যকরীভাবে কোনও চেষ্টা করেন নাই। সরকারের এই নিলিপ্ততাৎ ফলে ব্যবসায়ীগণের সাহস বাড়িতেছে এবং দিন দিন উৎসাহ চিনির মূল্য অধিকতর পরিমাণে চড়াইয়া দিতেছে। এমনকি সরকারের সকল নিষেধকেই উপেক্ষা করিয়া, চিনি বাজার হইতে উদাও করিয়াও লইতেছে।

সরকারের তরফ হইতে গত ১৬ট জম্মুয়ারী তারিখে একপ ঘোষণা করা হয় যে, ২০শে জম্মুয়ারী হইতে গবর্ণমেন্টের কলিকাতা ও হাওড়াস্থিত 'কেয়ার-প্রাইস-পলি'গুলির মাধ্যমে প্রতি সের চিনি এক টাকা দশ নয়া পয়সা দরে বিক্রয় করা হইবে। এই অধ্যুপদেশে দানব কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। পরে সরবরাহ-মন্ত্রী ঐপ্রজ্ঞাপ্ত সেন ঘোষণা করেন, চিনির সমস্ত অগামী ফেরয়ারী মাসের পক্ষে সম্মান হইবে না। তাহাও কেন তারিখ হইতে, সে বিষয়ে সরবরাহ-মন্ত্রী ভেঙ্গা দিতে পারেন নাই। যদি চিনির সমস্ত সম্মান হইতে যেপ্রকারের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থা যে কিরূপ দাঁবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

জনসাধারণ আজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছে, একপ একটি গুরুতর সমস্যার সম্মান করিতে কর্তৃপক্ষের এই ভাববিশ্বাসের কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গে প্রতি মাসে কুড়ি হাজার জন চিনি খসে হয়। এই চিনির উপর ব্যবসায়ীরা বর্তমানে প্রতি সেরে দশ আনার মত লাভ করিতেছে। কাজেই মুনাফাশিকারীগণের প্রত্যেক মাসে লাভ হইতেছে দেড় কেটি টাকার কাছাকাছি। গত সাত আট মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অনাচারের প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। আজ চিনির অবস্থা চরমে উঠিয়াছে, কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। শুধু চিনি কেন, সকল পণ্যের ব্যাপারেও কোটি কোটি টাকা আজ ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হইতেছে। জনসাধারণের মনে আজ এই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত সরকারের সহিত ব্যবসায়ীদের কোন অ-লিপিত চুক্তি বহিয়াছে, যাহার ফলে সরকার এমন উদাসীন! সরকার কি বুঝিতেছেন না, দেশবাসী আজ চতুর্দিক হইতে ভুজ্জরিত? এই অসহায় দেশবাসীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সরকারের। তাহাদের ইহাও অংশ রাখা উচিত, সকল বকম দুর্নীতির প্রতিকারের জন্ত দেশবাসী না খাইয়া ও না পরিয়া একটা বায়বহুল গবর্ণমেন্টকে তাহাঁরাই পোষণ করিতেছে।

গ-স

ফাটকাবাজী যেন ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার স্তরে স্তরে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার প্রভাব হইতে অর্থনৈতিক কার্যমোকে মুক্ত করিতে কর্তৃপক্ষ আজও সমর্থ হইলেন না; ফাটকাবাজীদের ক্ষমতায় বিরুদ্ধে সরকারী ক্ষমতা শুধু যে অক্ষমতার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহাদের প্রতি যেন সরকারের দুর্বলতা আছে, এবং মাঝে মাঝে প্রজ্ঞাপ্ত সমর্থন আছে বলিয়াও মনে হয়। সম্প্রতি চাউল ও চিনির দুপ্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধির পিছনে শুধু যে সরকারী ব্যবস্থার বার্থতা আছে তাহা নহে, কাঁচারদের উদাসীনতাও এই বিপর্য্যের জন্ত দায়ী।

শ্রদ্ধাশ্রু উৎপাদনে পশ্চিম বাংলা একটি চিত্তবিনোদিত-প্রদেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই ব্যাপ্তির জন্ত সরকারী নিশ্চেষ্টতা অনেকখানি দায়ী। ব্যাপ্তি পূরণের জন্ত সম্প্রতি পশ্চিম-বাংলা ও উড়িষ্যাকে লইয়া একটি যুক্ত অঞ্চল গঠিত হইয়াছে এবং উভয় ফলে উড়িষ্যার উৎপাদিত চাউল পশ্চিম বাংলায় প্রামাণ্যী করা হইবে। উভয়ই আশা হইয়াছিল যে, এই প্রদেশে চাউলের ব্যাপ্তি দূরীভূত হইবে এবং চাউলের মূল্যও কমিয়া আসিবে। কিন্তু এই দুইটি আশার কোনটাই আজ পর্যন্ত সফল হয় নাই। উড়িষ্যার খাদ্যসচিব কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং উহার অভিমতে উড়িষ্যা প্রতিমাসে পশ্চিম বাংলার প্রায় ৩০,০০,০০০ চাউল বস্তুর নিঃসরণে, এবং উড়িষ্যা চায় যে, পশ্চিম বাংলার চাউলের মূল্য ২১.২২ টাকার অধিক হইবে না, কারণ এখানে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উড়িষ্যার চৌরীরা স্বভাবতই অধিক মূল্য দাবি করিবে এবং তাহার ফলে উড়িষ্যাত্তর চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ উড়িষ্যার চাউলের নিকট হইতে যে দরদান করা হইতেছে তাহার অনেক অধিক মূল্যে পশ্চিম বাংলার চাউল বিক্রয় হইতেছে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীরা এই মাধ্যমিক লাভ লুটিয়া লইতেছে। সুতরাং পশ্চিম বাংলার চাউলের বাজার দর অত্যধিক হওয়ার কারণ পাইকারী ব্যবসায়ীদের অত্যধিক লাভ করিবার প্ররুতি এবং তাহা যেন সরকারের পেচা-পুত্র, এবং ইহাদের কাছাকাছি সন্তোষ এবং মাধ্যমিক লাভ করিবার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার্য্য আছে।

উড়িষ্যার খাদ্যসচিব বলেন যে, কেবলমাত্র জম্মুয়ারী মাসেই কলিকাতায় চাউলের মূল্য ২০ টাকা মণ হইতে ২৩ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের মতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বেশী, কারণ, খোলা বাজারে অত্যন্ত সাধারণ চাউলই প্রায় ২৬ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। উড়িষ্যার অভিযোগ এই যে, বাংলা দেশের পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণে চাউল আমদানি করিতেছে তাহা গোপন রাখিয়া নিম্ন পরিমাণের হিসাব দিতেছে। অর্থাৎ, যেমন চিনি ও মিলবস্ত্র ব্যাপারে ঘটিতেছে, সেইরূপ উড়িষ্যার চাউলের ব্যাপারেও বাংলা দেশের পাইকারী ব্যবসায়ীরা জোট করিয়া চাউলের সরবরাহকে গোপন করিয়া রাখিতেছে এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের খরচায় বিঘাট মুনাফা লাভ করিতেছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার প্রতিবোধে যথোচিত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

উড়িষ্যাৰ তিনাব অৱসাবে গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠাৰী পৰ্যন্ত পশ্চিম-বাংলাৰ উড়িষ্যা হইতে ৪০ হাজাৰ টন চাউল বণ্ঠানি কৰা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলাৰ বাবাসায়ীৰা বলিষাছেন যে, তাহাৰা মাত্ৰ ১৪হাজাৰ টন চাউল আমদানি কৰিযাছেন। কিন্তু তাহা হইলে বাকি চাউল কোথায় গেল? সবচেয়ে আশ্চৰ্য্য বিষয় হইতেছে, পশ্চিম বাংলাৰ খাজমতীৰ বাবাসায়ীদেৱ সমৰ্থনে সাক্ষী পাওয়া। তিনি বলিষাছেন যে, উড়িষ্যাৰ খাজমতীৰ আবেল-তাবেল বকিষাছেন; কিন্তু পশ্চিম বাংলাৰ খাজমতীৰ বা কি সহতব দিতেছেন যে, পশ্চিমবাংলাৰ চাউলেৰ বাবসায়ে কেন ক্ৰমবৰ্ধে কালোবাডাৰী ও মুনাফাখোৰী বাবসা চলিতেছে। গত কয়েক বৎসৰ ধৰিয়া এই প্ৰদেশে চাউলেৰ বাবসায়ে যে প্ৰহসন চলিতেছে তাহাতে যত্ৰ কোনও আত্মদখানজানী ব্যক্তি হইলে এতদিনে খাজমতীৰ পদ তত্ৰতে ইন্তুফা দিতেন।

প্ৰশ্ন হইতেছে যে, উড়িষ্যাৰ চাউল সংগ্ৰহ কৰা এবং আমদানি কৰিবার ব্যাপাৰ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন বেসরকারী পাইকারী বাবাসায়ীদেৱ উপৰ ছাড়িয়া দিয়াছেন? তাহাদেৱ উচিত ছিল নিজেদেৱ বেতনভোগী কৰ্মচাৰীদেৱ দ্বাৰা উড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানি কৰা। এই সকল বেসরকারী পাইকারী বাবাসায়ীদেৱ নাম পৰেৱে কংগ্ৰেজ প্ৰকাশিত তত্ত্বাৱ প্ৰয়োজন বাহাতে জনসাধারণ এটরূপ সমাজবিৰোধী ব্যক্তিদেৱ চিনিয়া বাসিতে পাৰে। ইহাদেৱ সম্বন্ধে কতৃপক্ষৰ বৰ্ণেট তবলসতা আছে এবং তাহাদেৱ নিষ্কপ্ততা দেখিয়া মনে হয় যে, সমৰ্থনও আছে।

চাউলেৰ মূল্যবৃদ্ধি বোধ কৰিবার জগ্ৰ গত চই ফেব্ৰুৱাৰী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও উড়িষ্যা সরকারেৰ প্ৰতিনিধিদেৱ মধ্যে একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে কতকগুলি উপায় অবলম্বনেৰ প্ৰস্তাব কৰা হয়। এট প্ৰস্তাবেৰ মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিজনক ব্যবস্থা হইতেছে যে, উড়িষ্যা হইতে 'আমদানীকৃত ধান' সরাসরিভাবে কলিকাতা অঞ্চলস্থিত চাউলকলেৰ মালিকদেৱ দেওয়া হইবে, ইহাতে নাকি মাধ্যমিক বাবাসায়ীদেৱ মুনাফালভ বন্ধ হইবে এবং তাহাৰ ফলে চাউলেৰ মূল্য হ্ৰাস পাইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাৰ মধ্যে অনেক গুণ্ডামিল আছে। প্ৰথমতঃ, উড়িষ্যাৰ চাউল সংগ্ৰহ কৰা এবং সেইখান হইতে চাউল আমদানি কৰিবার জগ্ৰ বৰ্ত্তমান যে বেসরকারী ঠিকাদাৰ নিযুক্ত কৰা হইয়াছে, যদি তাহাৰাই চাউল আমদানি কৰিতে থাকে তাহা হইলে চাউলেৰ মূল্য বিশেষ কমিবে না। দ্বিতীয়তঃ, চাউলকলগুলি পাইকাৰদেৱ কি দৰে চাউল বিক্ৰয় কৰিবে এবং প্ৰতি মণ ধানে কত দেৱ চাউল নিবে সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কৰা হয় নাই। চোৱাকারবাৰীৰ স্তবিধায় জগ্ৰ এই ব্যাপাৰগুলি অন্ধকাৰেৰ মধ্যেই রাখা হইয়াছে। চাউল-কলগুলিৰ লাভেৰ অংশ কি পরিমাণ থাকিবে? তাহাৰা কি শুধু ধান ভাঙিবার খণ্ডটুকু লইবে, না তাহাৰ অধিক লাভ থাকিবে?

যেখানে পাইকারী পরিমাণে ধান ভাঙান হইবে, সেখানে এক মণ ধান ভাঙিতে সাধারণতঃ মণপ্ৰতি চাৰি আনাই যথেষ্ট। এই বিষয়ে চাউলকলেৰ মালিকদেৱ অব্যাহত স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। তাহাৰা যে নিজেৰাই চোৱাকারবাৰী কৰিবে না, কিংবা চাউলকে গোপন কৰিয়া থাকিবে না, সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। এবং কতৃপক্ষও এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ উদাসীন। সরকারী প্ৰস্তাব হইতেছে, ধান ভাঙিবার পৰ চাউলকলগুলি "অন্ততঃ কিছু পরিমাণ" চাউল সরকারকে বিক্ৰয় কৰিবে বাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "জায়া-মূল্য" লোকানেৰ মাৰফৎ বিক্ৰয় কৰিতে পাৰেন। স্তব্ধতা বেসরকারী পাইকারী বাবাসায়ীৰা বাহাতে অধিক লাভ কৰিতে পাৰে তাহাৰ জগ্ৰ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাবস্থা কৰিয়া দিয়াছেন যে, তাহাৰা সরাসরি-ভাবে চাউল কলগুলি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবলমাত্ৰ "কিছু পরিমাণ" চাউল লইবেন কেন? বাকি চাউল তাহাৰা লইবে এবং তাহাৰা কি ভাবে বিক্ৰয় কৰিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন এট সমস্ত চাউল নিজেদেৱ অধীনে রাখিতেছেন না এবং তাহাৰা নিজেৰাই কেন এট সমস্ত চাউল সরকারী লোকানেৰ মাধ্যমে বিক্ৰয় কৰিতেছেন না তাহা জনসাধারণ বুদ্ধিতে অপব্যৰ্ণ। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, খাজমতীৰ যেকুণ কাটকাবাৰী চলিতেছে তাহাকে প্ৰতিবোধ কৰিবার জগ্ৰ সাৰা দেশব্যাপী স্থায়ী সরকারী লোকান থাকা প্ৰয়োজন এবং এই লোকানগুলি হইতে অল্পমূল্যে চাউল, চিনি প্ৰভৃতি যদি বিক্ৰয় কৰা হয়, তাহা হইলে খাজমতীৰ বাবসায়ে অথবা মুনাফা লাভেৰ প্ৰচেষ্টা বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাংলা দেশে চালেৰ উৎপাদন প্ৰয়োজনেৰ তুলনাৰ ঘটতি পড়ে। তাই সরকারত বৃদ্ধিৰ জগ্ৰ শুধু কেন্দ্ৰীয় সরকার কিংবা অজ প্ৰদেশেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিয়া থাকিলেই চলিবে না; বাংলা দেশে চাউলেৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিতে হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কংগ্ৰেজ নেতাৰা নিশ্চেষ্ট ও নিৰ্কিৰায়। তাই সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় খাজমতী জী পাতিল হ্ৰংপ কৰিয়া বলিয়াছেন যে চাৰংগা পতিত জমিগুলিকে আবাদী কৰিবার প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰাদেশিক সরকারেৰ উৎসাহেৰ অভাব পরিস্ফুট হয়। কেন্দ্ৰীয় সরকার যখন প্ৰাদেশিক সরকারেৰ নিকট হইতে এই বিষয়ে প্ৰগতি সম্বন্ধে খবৰ চাৰিয়া পাঠান, তখন চাৰি মাসেৰ মধ্যেও প্ৰাদেশিক সরকারেৰ উত্তৰ দেওয়াৰ অবসৰ থাকে না। কিন্তু তাহাদেৱ দত্তৰ দেওয়াৰ কিছুই নেই কাৰণ এই বিষয়ে তাহাৰা কিছুই করেন নাই। ভারতবর্ষে প্ৰায় ৫০ একৰ আবাদযোগ্য কৃষিজমি পতিত পড়িয়া আছে; এই জমিগুলিকে যদি চাৰ আবাদী কৰা হয় তাহা হইলে এদেশে খাজমতীৰ উৎপাদন ১০ কোটি টন বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্ৰীয় খাজমতী বীকাৰ কৰিয়াছেন যে, জমিৰ সৰ্কোজ মাথাপিছু গড়নিৰ্দ্ধাৰণেৰ ফলেও ভূমিহীন চাৰীৰ সমস্যা সমাধান হয় নি।

## মিল-বস্ত্রের চুরবস্থা

ভারতের মিল-বস্ত্র-শিল্প দেশের বৃহত্তম শিল্প। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার অগ্রগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯৫০ সনে মোট ৭১৫০০ কোটি গজ স্থ্রীবস্ত্র এদেশে উৎপাদিত হইত, তাহার মধ্যে মিল-বস্ত্রের পরিমাণ হইতেছে ৪৯২৫ কোটি গজ এবং ইহা-বস্ত্রের পরিমাণ ২২২৮ কোটি গজ। ১৯৫৩ সনে ভারতে মিল-বস্ত্রের পরিমাণ ৫০০ কোটি গজ হয়; ১৯৫৮ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৯৮ কোটি গজ এবং গত বৎসর ইহা হ্রাস পাইয়া ৪৯২৫ কোটি গজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মিল-বস্ত্রের উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৫০০ কোটি গজ। ভারতে বেগানে বৎসরে ৫০ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশগণে মিল-বস্ত্রের অত্যন্ত দ্রুতহারে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্তে উৎপাদন পরিমাণ কয়েক বৎসর স্থিরবদ্ধ থাকার পর ১৯৫৮ সন হইতেই ক্রমান্বয়ে পক্ষে চলিয়াছে। ভারতের শ্রমিক-শিল্পী বস্ত্র-বস্ত্রাণী ইত্যাদি স্থান অধিকার করিয়া আছে, সুতরাং সেদিক দিয়াও মিল-বস্ত্র-শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু মিল-বস্ত্রের বস্ত্রাণী ১৯৫৮ সন হইতেই ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, এবং ইহার আভ্যন্তরিক চাতিদার যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। এটি চাতিদার কমতির প্রধান কারণ হইতেছে, ব্যবসায়ীদের অসাড়তা, অর্থায়, অত্যধিক লাভ করিবার পরুতি এবং ইহার ফলে বস্ত্রমূল্য অধিক হওয়ায় চাতিদা হ্রাস পাইতেছে। ভারতীয় স্থ্রীবস্ত্র মুক্তসংস্থা সম্প্রতি স্বীকার করিতেছে যে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা হোত বস্ত্র-শিল্পের বহির্ভূত ব্যবস্থার তত্ত্ব দায়ী। ১৯৫৯ সনে স্থ্রীবস্ত্রের বস্ত্রাণী বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ফাটিকা-বাজী ব্যবসায় লিপ্ত আছে, কারণ তাহারা মনে করে যে, অগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের স্থ্রীবস্ত্র অভাব পরিস্থিতি হইবে। এই কারণে স্থ্রীবস্ত্রের মূল্য অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিল-মালিকরা একজোট হইয়া উৎপাদনকে কমতির দিকে রাখিয়াছে এবং তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

ন-ব

## ছাত্রদের নৈতিক পতন ও তাহার মূল উৎস কোথায় ?

প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। ছাত্রেরা বিগড়াইয়াছে, অভিভাবকেরা অসহায় অথবা উদাসীন, শিক্ষকদের প্রভাবও আজ লুপ্তপ্রায়—ইহা ত পুরাতন কথা। এ বিষয়ে আলোচনাও হইয়াছে অনেক। কিন্তু প্রতিকার সম্বন্ধে কেহ কোন পথ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরিষদের অধিবেশনে ছাত্র-সমাজের উচ্ছ্বাসগত সম্প্রদায় বিগড়ত আলোচনা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ জ্রীমানী সাম্প্রতিক ছাত্র-বিশৃঙ্খলার দীর্ঘ বিবরণ দিয়া দেখান যে, ছাত্র-ছাত্রীরা কথায় কথায় ঝগড়া করে, কলেজের বেতনের হার সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়া

আন্দোলন, অযোগ্য ছাত্র-ভর্তির দাবি, শিক্ষককে বরখাস্ত করিবার জ্ঞপ্তি প্রদান ও জলুম, পতীকার অসাড় উপায় অবলম্বনের জ্ঞপ্তি শাস্তি-ভোগীরা পক্ষ হইয়া অনশন-সত্যাগ্রহ, সিনেমা, আমের-প্রমোদ অনুষ্ঠানে জোর করিয়া চুক্তিবাদ চেষ্টা—এই রকম নিত্য-নূতন অনায়াস দাবি এবং ছাত্রদের স্বার্থ ধরিয়া খুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা পণ্ড করিবার অভিযানে ইহার যুব তৎপর। উদ্ভব-ভারতেই নাকি এইরূপ ছাত্র-গোলযোগের উৎপাত সবচেয়ে বেশী। ডঃ দেশমুখ ও বলিয়াছেন, বহুদলে নৃসিং ভারতে এবং পণ্ডাবে ছাত্রবিক্ষোভ-ঘটিত উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম।

কোথায় কম, কোথায় বেশী এ জটিল আলোচনা করিয়াও আজ লাভ নাই। প্রয়োজন, অবিলম্বে শুদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্যোগ। এইরূপ উচ্ছ্বাসতা বৃদ্ধির মূল কারণ সম্বন্ধে কোথায় তাহারও মত-ভেদ নাই। তবে কোন কোন মতলের দাবী, ছাত্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৃদ্ধির অনেক সমস্ত কারণ আছে। এটি ধারণার স্বপক্ষে সামাজিক এবং অর্থিক দৃষ্টান্ত, শিক্ষা-ব্যবস্থার যথেষ্ট সুরোগের অভাব ইত্যাদি কারণ দেখান হইতেছে বটে। কিন্তু সমস্ত অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার থাকিলেও ছাত্র-ছাত্রীরা নিরহংস লাগিলে ভাঙিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা হস্তান্তর করিয়া 'দেবে, ইহা কোনরূপেই বরদাস্ত করা যায় না। ডঃ দেশমুখ এই প্রশ্নের হাতা বলিয়াছেন, মুক্তির দিক দিয়া তাহা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষারতনের পরিবেশের অনেক উন্নতি প্রয়োজন, দেশমুখ তাহা স্বীকার করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রটি-বিচারের জ্ঞপ্তি হইলেও মতো নিরাপত্তার থাকারও স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়া উচ্ছ্বাসতা শোভা পায় না।

এ বিষয়ে শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই চলিবে না। এ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সঠিক কথা বলিয়াছেন, উচ্ছ্বাস ছাত্র-নেতাদের শাস্তিবিধান ব্যাপারে কোনরূপ বিধা করা উচিত নয়। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকার তাহারা স্থ্রীবস্ত্রী ছাত্র-কম্পনবিদ ইত্যাদির আলোচনা-আলোচনা করেন, ইহারা চুল করেন। ইহার ফলে, পরোক্ষে আইন-অমূল্যকারীদের প্রভাব পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ সন্তোষজনক সঠিক বিবেচনা করা হইত, কিন্তু বিশ্বাস্য যাহারা স্থ্রীবস্ত্রী করে, তাহাদের কঠোর শাস্তিবিধানে কোনরূপ ছললতা প্রদর্শন উচিত নয়। ডঃ দেশমুখের এই পরামর্শ প্রতিটি ছাত্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণের অবিলম্বে গ্রহণ করা কত্তব্য। ডঃ দেশমুখ আরও বলিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা স্থ্রীবস্ত্রী কাজে বাহ্যিক পণ্ড এবং নিরন্তর তৎপর সেই সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতি-ব্যবসায়ীগণের বিরুদ্ধে অবশ্য সোজামুজি ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাই। কিন্তু না থাকিলেও একথা জোর করিয়া বলিতেই হইবে, দেশে এমন কোনও রাজনৈতিক দল নাই যাহারা ছাত্রদের উদ্ভাবনী দেয় না। কেবলে নবী পাবাপারের মাতুল লইয়া যে

ছাত্র-আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার উদ্যোক্তা অথবা পৃষ্ঠপোষক ছিল কংগ্রেস।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-পর্ষদের অধিবেশনে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ঐকমত্যপতি ত্রিপাঠী বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র-অসন্তোষ উত্থানী না দিবার জন্য ‘ভঙ্গলোকের চুক্তিতে’ আবদ্ধ হইলে ভাল হয়।” ভাল অবস্থা হইল। কিন্তু দলীয় রাজনীতি এমনই সুবিধা-সন্ধানী যে, উক্তার সচিৎ ‘ভঙ্গলোকের চুক্তি’র সামঞ্জস্যবিধান অত্যন্ত দ্রুত ব্যাপার। উত্তর প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-বিক্ষোভের পশ্চাতে কংগ্রেসেরই একটি প্রভাবশালী উপদলের উদ্যোগ সম্পূর্ণ প্রবল জনপ্রতি সন্মতঃ একেবারে অমূলক নয়। পশ্চিম বাংলার ছাত্র-বিক্ষোভের পশ্চাতে রাষ্ট্র-বিরোধী দল-উপদলের ক্ষমতাবুদ্ধির চক্রান্ত বর্তমান—অধ্যাপক সিদ্ধান্তেরও এই অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ সত্য। দেশে রাজনৈতিক দলগুলির শুভবুদ্ধির উদয় হইবে এমন ভরসা ক’রয়া লাভ নাই। রাজনৈতিক দলগুলি যত্নে ছাত্র-ছাত্রদের বিপক্ষে পরিচালিত কবিবার সুযোগ না পায়, প্রধানতঃ, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ভগ্নাই অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

বর্তমানে আর একটি সর্ম্মনাশা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে ছাত্র-ইউনিয়ন। গোলযোগ ও জটিলতা এটান হইতেই সূত্র হয়। এই ছাত্র-ইউনিয়নের পাণ্ডুরা অনেকই দলীয় রাজনীতির নির্দেশে পরিচালিত অথবা রাজনীতি-ব্যবসায়িগণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই ছাত্র-সমাজকে সম্পূর্ণ আনিত হইলে প্রথম কর্তব্য হইল ছাত্র-ইউনিয়নগুলির বিলোপসাধন। ডঃ দেশমুখ বলিয়াছেন, অন্ততঃপক্ষে ছাত্র-ইউনিয়নগুলিকে সম্পূর্ণ রাজনীতি-মুক্ত করিয়া সাংস্কৃতিক এবং সমাজ-সেবামূলক কাজকর্মে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করা উচিত।

ছাত্রদের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের কারণ, অনেক অনুমান করেন শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি মত। অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়—ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ভ্রম সেই কারণে শিক্ষাব্রতীরা তাঁহাদের কষ্টব্য-পালনে নিরাস্রাভ কিংবা উদাসীন হইবেন—এই মুক্তি দ্রষ্টব্য। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা কোন দেশেই অজ্ঞাত অর্থকরী বৃত্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অথচ অল্প কোন দেশে এইরূপ কর্তব্যে অবলম্বনা দেখা যায় না। শিক্ষাব্রতী যদি তাঁহাদের কর্তব্য করিতে উৎসাহ-বোধ না করেন, তবে অল্প কোন অধিক অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিতে তাঁহাদের বাধা কোথায়? অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করিতে উৎসাহ নাই, অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে কোনরূপে জীবিকা-অর্জনের সুযোগটিও ছাড়িবে না, এই মনোভাব নীতিগতভাবে চরম লজ্জার এবং নিন্দার। অধ্যাপকরা ছাত্রসমাজের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যে হারাইতেছেন তাহার একটি প্রধান কারণ, তাঁহারা নিজেরাই শিক্ষাব্রতীর আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পতনই ছাত্রদের সেই পথে টানিয়া আনিয়াছে। জট বহুদিক

হইতে বাধিয়াছে। এই জট খুলিতে হইলে শিক্ষক ছাত্র সকলেরই মতিগতি, মনোভাব সংশোধনের জন্য একটা বিরাট পরিবর্তন আবশ্যিক।

গ-স

### শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ কোথায়?

শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, এভাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে আমেরিকার মিশোর্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডঃ এলিস এলিস কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষা ও ভাবধারার আদান-প্রদানে উগ্র স্বাদেশিক গোড়ামি স্থান নাই। একদেশের শিক্ষাপদ্ধতি, প্রকরণ, গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান ও ভাবনাম্পন অজ্ঞদেশে ব্যবহৃত হইতেছে, আধুনিক-কালে প্রতিনিয়ত তাহার দৃষ্টান্ত মিলিতেছে। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, শিক্ষা ও ভাবধারার ক্ষেত্রে সকল দেশকেই প্রয়োজনমত শৃণু গ্রহণ করিতে হয়। আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রধানতঃ ব্রিটিশ, জার্মান এবং ফরাসী শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শে গঠিত। ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাও সে দিক দিয়া মূলতঃ ইউরোপীয়, অথবা আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, ব্রিটিশ ছাচে ঢালাই। শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ভাব ও ধর্ম্মধারার অনুশীলনে বিদেশ হইতে শৃণু গ্রহণ করিতে ভারতবর্ষ দীর্ঘা করে নাই। তবে এট শৃণু কতখানি আমাদের উপকারে লাগিয়াছে তাহাই ভাবিবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ এলিস এ কথাও বলিয়াছেন, বিদেশ হইতে শৃণু লইতে হইবে বটে, কিন্তু কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া অজ্ঞ দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ও ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ করিলে লাভ না হইয়া ক্ষতিই বেশী হইবে।

আর হইয়াছেও তাহাই। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সফট দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে তাহার একটি কারণ, আমাদের শিক্ষার ছাচের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের জোড় মিলে নাই। অজ্ঞদেশের অনুকরণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়িলেই, শিক্ষা-ব্যবস্থা চাৰি-দেওয়া গাড়ীর মত গড় গড় করিয়া চলিতে থাকিবে, এই অন্ধ-সংস্কারের মূলে আর যাহাই থাকুক, বাস্তব-জ্ঞানের অভাব ইহা বলিতেই হইবে।

ডঃ এলিস বলিয়াছেন, এককালে আমেরিকাও তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্রিটিশ-জার্মান-ফরাসী ছাচে গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, তাহাতে কুলাইতেছে না। শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেকখানি ভুলিয়া থাকিতেছে বিলুপ্ত কেতাবী-পাণ্ডিত্য। অথচ আমেরিকার দ্রুত-গতিশীল শিল্প-প্রধান বৈয়দিক উদ্যোগের জন্য দরকার, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান, বুদ্ধিগত দক্ষতা। সনাতন কলা-শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার আদর্শ এবং পদ্ধতিকে আমেরিকা একেবারে বাতিল করিল না বটে, কিন্তু মার্কিন সমাজের বৈয়দিক উন্নতির বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি, শিল্প ও কারিগরী বিভাগে উদ্দেশ্যে অসংখ্য নতুন নতুন শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিল।

এ কথায় যেন আমরা আবার ভুল না করিয়া বসি, আমেরিকা যাহা করিয়াছে তাহা তাহার নিজের প্রয়োজনে : আমরা শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিব, আমাদের সামাজিক প্রয়োজনমত। পরিবর্তন আমাদের অবশ্যই আনিতে হইবে, কিন্তু তাহা তাড়াহুড়া করিয়া আনিতে চলিবে না। আমেরিকা এইরূপ তাড়াহুড়া করিতে গিয়াছিল তাহাতে ফল ভাল হয় নাই। আমেরিকা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। আমরা ঠেকিতেছি, কিন্তু শিখিতেছি না। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই, যতদিন না তাহার শিক্ষা-পদ্ধতি বদলাইতেছে। আমাদের উচ্চশিক্ষায় যে সঙ্কট, তাহার মূল কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন অথবা সংখ্যাভ্রান্তা নয়। আয়তন খাটো করিলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইলেই শিক্ষা আধুনিক যুগের প্রয়োজনোপযোগী হইবে, উন্নত হইবে এমন আশ্বাস শিক্ষা-কর্তারাও দিতে পারিতেছেন না। মস্কাতার আমলের 'লেকচার পাসে-টেক্স' মস্কাতার শিক্ষাদান-পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় বিষয়-বস্তুর ভার-বোঝাই পঠনক্রম এবং পাটকারী-ভর্তি ও পরীক্ষা-বাবস্থা—এই ত্রিদেশব্যস্ত শিক্ষা-কল যতদিন চলি থাকিবে, ততদিন উচ্চশিক্ষার আধুনিকীকরণ কোন মতেই সম্ভব হইবে না।

গ-স

## ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অসৎ আচরণ

ইতিহাস সাধা দিবে, দু'র অতীতে কোন বিদেশী পর্যটক ভারত ভ্রমণে আসিয়া ভারতীয় জনসমাজের আচরণে উচ্চমানের সততার আনন্দ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এমনটি আর দেখি নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, বিনা-মলিলে ধূপপ্রদান ও গ্রন্থ এবং ক্রেতা দোকান হইতে নিজেই ওজন করিয়া পণ্যদ্রব্য তুলিয়া লইতেছে এবং দোকানের মালিককে মূল্য দিয়া চলিয়া যাউতেছে। বিশ্বাসভঙ্গের অথবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয় ছিল না।

কিন্তু আজ সেই ব্যক্তি বাচিয়া থাকিলে কি দেখিতেন? স্বর্ণ আজ নরকে পণ্ডিত হইয়াছে। সেই মানুষ আজ কত নীচে নামিয়া গিয়াছে! আজ মানুষের আচরণে অসততাই যেন একটা আদর্শে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সহকারী রেলমন্ত্রী ঐযুক্ত রামস্বামী কোয়েল্যট্টে ঐতবন্ধ-ব্যবসায়ী সমিতির দ্বারা আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিদারুণ অসততার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। উক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী দামাঙ্গদের জনৈক ব্যবসায়ীকে ভাল চায়ের নমুনা দেখাইয়া চায়ের মত রং-করা কবাত-গুড়া সহবাহ্য করিয়াছিলেন। দামাঙ্গদের ব্যবসায়ী এগার লক্ষ টাকার চা সহবাহ্যের অর্ডার দিয়াছিলেন। ঐযুক্ত রামস্বামী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীর সততার নমুনা যদি ইহা হয়, তবে বৈদেশিক ব্যবসায়ী ভারত হইতে পণ্য ক্রয় করিতে উৎসাহিত হইবে কেন? একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর এই প্রকারের অসততার সমগ্র ভারতীয় জাতির চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিকের মনে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের এক

জন অসৎ ভারতীয় ব্যবসায়ী বহুতঃ সর্বভারতের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। আরও পরিতাপের বিষয়, এই ধরনের অপকর্মে একজন নহে, বহুজনকেই লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এবং ভায়েত সরকার সেসব অসততার অনেক খবরও রাখেন। অনেক ঘটনায় ভারত সরকারকে বৈদেশিক সরকারের কাছে বিব্রতভাবে কৈফিয়তও দিতে হইয়াছে।

বৈদেশিক ক্রেতার কাছে বিক্রয় দ্রব্যের ভাল নমুনা দেখাইয়া অপকৃষ্ট দ্রব্য চালান দেওয়া হইয়া থাকে, ভারতীয় রপ্তানী ব্যবসায়ীর সম্পর্কে বৈদেশিকের এই অভিযোগ বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। ভারত-সরকার এ ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন জানি না। শুষ্ঠ ব্যবস্থা করিলে, এরূপ দৃষ্টান্ত আর নিশ্চয়ই দেখা যাইত না। সরকার এ সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। শুধু তাহার ব্যবসায় করিবার অধিকার ও সুযোগ বাতিল করিয়া দেওয়া নহে, যথার্থীত তদন্তের পর তাহার সম্পত্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বৈদেশিকের ক্ষতিপূরণ করিবার রীতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত। সমাজ নিন্দাবাদে বা লঘুগণে এই অসততা স্তব্ধ হইবার নহে।

গ-স

## প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় নূতন প্রচেষ্টা

প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থার কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। যে অব্যবস্থার মধ্য দিয়া বর্তমানে শিক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে, তাহাতে এ দেশে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইবার কারণ আছে। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থা চলিতেছে বলার অর্থ ইহা নহে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সুব্যবস্থিত। তথাপি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিনিয়োগ যদি সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া তোলায় ব্যবস্থা করা না যায়, তাহা হইলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গোড়াতেই বিব্রিত হইয়া থাকে। অথচ একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না যে, প্রাথমিক শিক্ষা-দান ব্যাপারে যেন আগাগোড়া একটা অবহেলায় ভাব চলিয়া আসিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটি জাতীয় অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্রেটি কোথায় এবং তাহার কারণ বিজ্ঞেয়ও বহুবার কথা হইয়াছে, কিন্তু ধারাবাহিক কার্য-পদ্ধতি আজও বাঁধা গেল না। অর্থাৎ কোথা হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন ইহা কল্পক্ষেত্র কাহারও মাথায় আসিতেছে না। ফলে, বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অজুসরণ করিয়া ছাত্রদের সর্জনশীল ডাকিয়া আনিতেছেন। এবারে সুপের বিষয়, এ সম্বন্ধে দেশের শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শৈল্পী সর্বভারতীয় শিক্ষা-পরিষদে এ বিষয়ট আলোচিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আরও শুনিয়াছি, এ বিষয়ট শিক্ষা-পরিষদে যাইবার পূর্বে, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগীয় ডিবেন্টরগণও এ সম্পর্কে আলোচনার জন্ত ঘুরিয়া বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। প্রাথমিক স্তরে অসংখ্য ছাত্র পরীক্ষার অকৃত-

কার্য হইলে তাহারা চিবতবে পড়াওনা ত্যাগ করিয়া শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, এই গুরুতর বিষয়টির প্রতিকার বিশেষভাবে চিন্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রতিকারের জ্ঞান ও অক্ষম শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপটু করিয়া তুলিবার জ্ঞান শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের কথাও উঠিয়াছে। শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নহে, মনোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতে নৈতিক পটুতা জন্মে, তৎজ্ঞান খেলাধুলার যথাযথ ব্যবস্থা করার প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে এই সচেতনতার ফলে যদি প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সু-সংস্কার সাধিত হয়, তবে তাহা খুবই আনন্দের কথা হইবে।

কিন্তু তাঁহাদের এই চিন্তার ক্ষম সেই গতাহুগতিক। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ছেলেদের তৈরি করা যায়, আজ সেই দিক দিয়াই চিন্তা করিতে হইবে। আমরা যা কিছু করি বা ভাবি তাহার মধ্যেও মৌলিকত্ব নাই। ইউরোপীয় প্রভাব আজও আমাদের মধ্যে সমানে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আজকের শিক্ষা-পদ্ধতিকে মোড় ঘুরাইবার ক্ষমতাও তাই ইহাদের মধ্যে দেখা যায় উঠেছে না। এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যাহারা শিক্ষা দিবেন, তাহাদের স্বচ্ছল জীবিকার ব্যবস্থা করা। নিত্য অভাব-পীড়িত শিক্ষকের কাছে প্রশিক্ষাদানের প্রত্যাশা করা অবাস্তব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের আগে বাঁচাইতে হইবে। প্রাথমিক স্তরে সু-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন-মানের উন্নয়নের ব্যবস্থা অপরিহার্য।

গ-স

### তীত-শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ

শিল্পপ্রধান স্থান বলিতে একদিন বাংলা দেশকেই বুঝাইত। বৃহৎ-শিল্পের দিক দিয়া নয়, কুটির-শিল্প এবং কারু-শিল্পের একটা বড় রকম ঐতিহ্য রহিয়াছে এই বাংলা দেশের। বাংলা দেশের তীত-শিল্পজাত 'মসলিন' এক সময়ে সমগ্র জগতের বিখ্যাত উৎপাদন করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের বেশম-শিল্পে এখনও যে শ্রেণীর বেশম-জাত বস্ত্র উৎপন্ন হয়, জগতের আর কোথাও তাহা হয় না। পিতল-কাঁসার স্রব্যাদিতেও পশ্চিমবঙ্গের সুনাম আজও সর্বত্র। এই সম্পর্কে খেলনা-শিল্প, মাড়-শিল্প, হাতীর দাঁতে প্রস্তুত বিবিধ উপকরণাদিরও নাম করা যাইতে পারে। এই সব শিল্পের উন্নতির জ্ঞান যথোপযুক্ত চেষ্টা হইলে এবং এই সব শিল্পজাত পণ্য দেশে ও বিদেশে ক্রেতাদের দৃষ্টিপথে আনিতে পারিলে প্রচুর অর্থ পশ্চিমবঙ্গে আসিতে পারে এবং বহু ব্যক্তি জীবিকা-সংস্থানের সুযোগ লাভ করিতে পারে। কিন্তু গ্রন্থের বিষয়, যেভাবে এই সব শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিলে সেই শিল্পগুলি সমধিক উন্নত হইতে পারে এবং যে ভাবে প্রচারকাণ্ডা করিলে এই শিল্পজাত স্রব্যগুলি দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে সেইভাবে কাজ হইতেছে না। তীত-শিল্পের কথাই ধরা যাক। জগতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই তীত-শিল্পের আদি জন্মস্থান। এক

সময়ে এই পশ্চিমবঙ্গ হইতেই ছাপা-তীতবস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত, এবং এই বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল বলিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ হইতে ইংলণ্ডে তীতবস্ত্র আমদানী বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ধনেশালি, বালুচর ইত্যাদি জাতীয় তীতবস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় এবং মাত্রাজ ও অন্ধ্রাজ অঞ্চল হইতে আগত রং-বেবড়ের শাড়ির প্রতিযোগিতায় এই সব শাড়ির জনপ্রিয়তা কমে নাই। মূলধন, সূতা, বস্ত্রের বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং তীতিগণকে নানাপ্রকার ডিজাইন দিয়া এই সব শাড়ির জনপ্রিয়তা আরও বাড়ান যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্ধ্রাজ কুটির-শিল্প, কারু-শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনুগ্রহ করা বলা যাইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-জাত এই সব উৎপন্ন পণ্যগুলি বিক্রয়ের জ্ঞান যদি মাত্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে এই সব শিল্পের বেগী উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কারণ এই দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাতির হইতে ধনাগম হইবার সম্ভাবনাই বা কোথায়? সূতরাং ভারতের অন্ধ্রাজ রাজ্যে এবং বিদেশেও বাহ্যতে বিক্রয় হইতে পারে সেই চেষ্টা সর্বতোভাবে করা কর্তব্য।

গ্রন্থের বিষয়, বর্তমানে কলিকাতা, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, মাত্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলে উৎপন্ন তীত-বস্ত্র ও কারু-শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জ্ঞান ঠেল থাকিলেও, পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন এই জাতীয় পণ্য বিক্রয়ের জ্ঞান অন্ধ্রাজ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের কোন ঠেল আছে কি না আমাদের জানা নাই। তবে ইহা জানি, দেশের নানাস্থানে যেসব শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয় তাহাতে প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের কোন ঠেল দেখা যায় না। বাতির কথা দূরে থাক, পাস কলিকাতাতেও এমন কোন ঠেল নাই যেখানে দেশবাসী ও বিদেশীগণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। কলিকাতার কোন কেন্দ্রীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গের কুটির ও কারুশিল্পজাত সমস্ত পণ্য প্রদর্শনের জ্ঞান যদি একটি স্থায়ী শিল্প-মিউজিয়াম স্থাপিত হয় তাহা হইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

সংস্কার ইহার পিছনে অর্থব্যয়ও করিতেছেন শুনিতেছি। কিন্তু কাজ কতটা হইতেছে তাহাই ভাবিবার বিষয়। শিল্পের উন্নতি এবং প্রচার বিষয়ে কিছু সূত্রে ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র তীত-শিল্প-সম্প্রদায় পালনের দ্বারাই কর্তব্য করা হইবে না।

দেখিতে হইবে কি কি কারণে এই তীত-শিল্প পশ্চাতে পড়িয়া আছে। প্রথমতঃ, তীত-শিল্পের যান্ত্রিক উন্নতি আবশ্যক। বাহ্যতে হস্তচালিত তীতেও পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত তীত প্রবর্তন হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ইহাতে উৎপাদন-শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে। কারণ উৎপাদন বাড়াইতে না পারিলে, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বহু পশ্চাতে পড়িয়া যাইবে।

গ-স



## দুর্নীতি দমনে অক্ষমতা

বর্তমান হইতে 'আর্থা' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"বর্তমান জেলায় এ্যাডিক্‌র্যাপসন নামে একটি বিভাগ আছে।

এই বিভাগের শৈথিল্য শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, পরন্তু দুর্নীতির তদন্তগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে এই সংস্থাটি কুণীত। এখানকার কোন সংস্থা রিলিফ ওয়ার্কের জন্য জরুরীক সৌভাগ্যশালী কনট্রাক্টের দ্বারা মাল-সংবরণের কাৰ্য্য করান। এই কনট্রাক্টকে দিয়া কি কিছুকাল পূর্বে কাটোয়া-গোড়াউন হইতে মাল আনা হইয়া, আবার উহার কয়েকদিন পরেই কাটোয়ার মাল না থাকার জন্য বর্তমান হইতে পুনরায় তথায় মাল প্রেরিত হয়? এই সময়ে কি কাটোয়া অপেক্ষা নিকটবর্তী গলসীতে মাল-মজুত ছিল? সংকারী গো-ডাউনগুলি খালি থাকে সত্ত্বেও এন্ডেন্ট মারফৎ বেসরকারী স্থানে অধিক ব্যয়ে মাল মজুত রাখার উদ্দেশ্যই বা কি? সংকারী গুদামগুলি কি শুধু ঘুঘু বাসা হইয়া থাকিবে?

স্থানীয় এনফোর্সমেন্ট উপদেষ্টা জাতীয় দুর্নীতিদমনে নিশ্চেষ্ট। শুধু তাহাই নহে, কিছুকাল পূর্বে 'আবৃত্তাব ভবন'ের মধুচক্রের তদন্তও যেন স্তব্ধরূপে বিরাজ করিতেছে। সহরে ভেজাল তেল, মশলা, খাদ্যাদি অবাধে বিক্রয়ের প্রতিরোধ করিতেও এই বিভাগ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে।"

এইরূপ দুর্নীতি সর্বত্র ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। প্রতিকার করিবেন যাহারা তাহারাই যদি 'রক্ষক হইয়া ভক্ষক' হন তবে কি উপায় হইবে? এই অবাধ দুর্নীতির প্রশয় সংস্কারের অক্ষমতাই পরিচায়ক।

গ-স

## দেশ কি অরাজক?

"কিছুদিন হইতে গোয়ালানদের অত্যাচারে নিরীহ চাষীগণ সর্বস্বান্ত হইতে বলিয়াছে। গোয়ালানরা দল বাঁধিয়া চার-পাঁচ শত গো-মতিবাদিসহ এমনকি বিশ-পঁচিশ মাইল দূরবর্তী শস্যক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবে চড়াও হইয়া শস্য খাওয়াইয়া দিতেছে। বাধা দিতে গেলে লাঠিবাঁজী করিয়া খুনজম করিতেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ করিতে গেলে খুন করিয়া কোলবে বলিয়া শাসাইতেছে।

এবার একে বজা ও অতিবর্ণনের কলে গ্রামবাসীর দুর্দশার সীমা নাট। তাহার উপর চাষীর রক্ত-জল-করা ফসল যদি এই-ভাবে নষ্ট হইয়া যায় তবে ইহার পরিণতি অত্যন্ত সর্বনাশ হইবে।

দলবদ্ধ গোয়ালানদের প্রতিরোধ করার শক্তি নিরীহ চাষীর নাই। আর সেভাবে ছোট বাঁধিয়া প্রতিরোধ করিতে গেলে ব্যাপক খুনজম হইয়া সকলকেই বিপদে জড়াইয়া পড়িতে হইবে।

নাগরিকদের ধনসম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সংস্কারের কি না বুঝা যাইতেছে না। অপরাধ করার পরই কি পুলিশের কর্তব্য থাকিবে, অপরাধ বাহাতে না ঘটে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কি পুলিশের নাই?"

বসুনাথগঞ্জ হইতে 'ভারতী' পত্রিকা উপরে যে সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সত্যই বলিতে ইচ্ছা করে, 'দেশ কি অরাজক?'

গ-স

## ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রশঙ্গে শ্রীনেহরু

ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তের নেকা, নাগাপাহাড়, মণিপুর ও ত্রিপুরা আসামের মধ্যে বাটবে, কি স্বতন্ত্র থাকিবে এই লইয়া বহু আলোচনা পূর্বেও হইয়াছে, বর্তমানেও হইতেছে। গোষ্ঠাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, এই সকল অঞ্চলকে আসামের সহিত একই শাসনাধীনে যুক্ত করার কোন প্রস্তাব উঠিতে পারে না। তিনি ইহার এই অভিমতের সপক্ষে কারণও দেখাইয়াছেন। ইহার মতে এই সকল অঞ্চলের প্রত্যেকটিই নিজস্ব সমস্যা আছে এবং আসামেরও কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। সমস্যাভারাক্রান্ত আসামের স্বত্ব আরও বহু সমস্যার বোঝা চাপাইয়া দিলে কেবল যে আসামের অগ্রগতি বাহতই হইবে তাহা নহে, বহু জটিল সমস্যার ভার আসামকে নীচের দিকে টানিয়া নামাইবে। সেই জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এই অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যবস্থা ভারত গবর্নমেন্টের হাতেই থাকা উচিত। এই সকল স্থানের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান করিতে যে প্রচুর সঞ্চল এবং সামর্থ্য থাকা দরকার তাহা ভারত গবর্নমেন্টেরই আছে। যাহারা এখন নেকা, নাগা প্রভৃতি অঞ্চলকে আসামের সহিত যুক্ত করিতে চাছেন, ইহার উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, এইরূপ করিতে গেলে নেকা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা আসাম হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইবে। আসামের সহিত এই সকল অঞ্চলের মিলনের কথা এখানকার অধিবাসীদের দ্বারা উত্থাপিত হওয়াই উচিত।

এই কথাগুলি পাঠ্য করিলেই বুঝা যায় শ্রীনেহরু খুব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা খুবই সত্য, সীমান্তস্থিত সকল অঞ্চলগুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের হাতেই থাকা উচিত। কারণ, এই শ্রেণীর সমস্যা স্থানীয় দেশস্বত্বের প্রশ্নের সহিত জড়িত। তা ছাড়া, নাগাদের লইয়া বর্তমানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার সমাধানও একান্ত আবশ্যক।

গ-স

## দুর্ঘটনার স্বরূপ

দুর্ঘটনা কেন হয়—এ লইয়া কেবল বিচার-বিশ্লেষণ করিলেই তা দুর্ঘটনার হাত এড়ানো যাইবে না। প্রথম দেখিতে হইবে, এই দুর্ঘটনাগুলিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন স্রষ্টা প্রচেষ্টা করা হইয়াছে কিনা। কোন চেষ্টাই হয় নাই। চেষ্টা হইলে, কমবুদ্ধি হায়ে ইহা এতটা ব্যাপক হইত না। কিছুদিন আগেও এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, বাহাতে অবহেলার একটা দিক স্পষ্টভাবে



উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দুর্ঘটনাটি ঘটে চৌরজীব যোড়ে। একটি যুবক মোটর-স্কুটার করিয়া আসিতেছিলেন, লাল আলো দেখিয়া যথারীতি গাড়ীও থামাইয়াছিলেন এবং সবুজ আলো জলিয়া উঠিলে গাড়ী চালাইতে শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ পিছন হইতে একখানি বেসরকারী মোটরবাসেব থাকা খাইয়া তিনি ছিটকাইয়া পড়েন। এবং পংমুহুর্তেই একখানি মোতলা সরকারী বাস আসিয়া তাঁহাকে চাপা দেয়।

আরও কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। কল্যাণনি অঞ্চলে পানাগড় হটতে বয়স্কবয়স মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় ৩৭টি দুর্ঘটনা এই একটি দিনে ঘটে। তন্মধ্যে ২৯টিই গ্রাণ্ড ট্রাক হোড়ে। হতাহতের সংখ্যা না বলাই ভাল। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদির ভগ্ন স্থানীয় পুলিশের নিকট অবদান জানাইয়াছিল। থানার কন্ট্রোল নাকি জানাইয়াছেন যে, গ্রাণ্ড ট্রাক রোডের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের বর্ণনায় কিছু নাই। এত গুরুতর তথ্য মধ্যস্থতিক বাপায়ে এ ধরনের সাক্ষ্যবাব যে নিরাস্ত্র হৃদহীনতার পরিচায়ক, সেকথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ কন্ট্রোল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দুর্ঘটনা এড়াইবার ভগ্ন বানবাহন চলাচল সম্পর্কে সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কলিকাতা বা কল্যাণনি অঞ্চল—যেখানেই হটক না কেন, রাস্তায় গাড়ীর ও লোকের ভিড় অস্বাস্থ্য বাড়িয়াছে। অথচ এত ভিড় থাইবার ভগ্ন রাস্তাগুলি চওড়া করা হইতেছে না, রাস্তাবাহি এত চওড়া করা সম্ভবও নয়। এ বকম অবস্থায় ভিড় কমান অসম্ভব, স্তম্ভাঃ গাড়ীগুলি বেশী বেগে চলিলে দুর্ঘটনা অবশ্যকারী। স্তম্ভাঃ অপাততঃ দুর্ঘটনা এড়াইবার একমাত্র উপায় বাজার, স্কুল, রাস্তার মোড়, সঙ্কীর্ণ রাস্তা প্রভৃতি যে সব স্থানে দুর্ঘটনের মধ্যে গাড়ী থামাইবার দরকার হইতে পারে, যে সব জায়গায় গাড়ীগুলি দীর্ঘকালিত চলিতে বাধ্য করা। ইহা ছাড়া দুর্ঘটনা এড়াইবার অন্য কোন উপায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন যে, খুব অল্পে গাড়ী চালাইতে হইলে গাড়ী বাধিবাব বা চড়িবাব সার্থকতা কি? উত্তরে বলা বাইতে পারে যে, সময় বত মূল্যবানই হটক না কেন, মানুষের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। নিত্য দুর্ঘটনার দ্বারা অমূল্য জীবন-নাশের আশঙ্কা এড়াইবার ভগ্ন হাজার হাজার ঘণ্টা সময় নষ্ট হইলেও অশক্তি নাই। গাড়ী চালাইবার উপযোগী রাস্তা তৈয়ারী করার সামর্থ্য যেখানে নাই, সেখানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া দ্রুত চলিবার নেশা ত্যাগ করাই সমীচীন।

গ-স

### লরী-চালনার ফলে গোবিন্দপুরে দুর্ঘটনা

খবরের কাগজ খুলিলেই দুর্ঘটনাগুলি নজরে পড়ে। ইহা নিয়মিত এবং একাধিক। আসানসোল হইতে ত্রিশ মাইল দূরে গোবিন্দপুরের নিকট একটি মোটরের সহিত লরীর সংঘর্ষ যেমন শোচনীয় তেমনি মধ্যস্থতিক। ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা

যায়, লরী-চালকের বে-পরোয়া হওয়ার ফলেই প্রায় এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটিতেছে। নিহত ও আহতের সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে তাগা ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে। এই যাত্রীদল বন-ভোজনের উদ্দেশ্যে পরেশনাথ বাইতেছিলেন। এই শোকাবহ পরিণতি শুধু তাঁহাদের স্বজনবর্গের নহে, মানুষ মাত্রেই মনে পবন বেগনার সৃষ্টি করিবে।

এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা আমাদের বলিবার আছে। দুর্ঘটনাসমূহের প্রকৃতি বাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অধিকাংশ দুর্ঘটনার সঙ্গে লরী বা ট্রাক জড়িত থাকে। লরী বা ট্রাক চালকেরা যেরূপ বেপরোয়াভাবে এবং যেরূপ ভীত গতিতে-বানগুলি চালনা করে, তাহাতে দুর্ঘটনা যে আরও বেশী ঘটে না তাহাই আশ্চর্যের কথা। বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, এই বান-চালকদের অধিকাংশই অ-বাঙালী। এই চালকদের অনেকের মাল-বহনের লাইসেন্স থাকে না বলিয়া ও অনেক সময় তাহারা অপরিভ্রমণক মাল-বহন করে বলিয়াও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ সরকার হটতে বান-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে, তবে কেন এরূপ ঘটিতেছে ইহাষ্ট ভাবিবার বিষয়। হয়, সরকার-নিযুক্ত কন্ট্রোলরীণ এ বিষয়ে উদাসীন অথবা টাকা খাইয়া তাহারা বোবা হইয়া বসিয়া আছে। এট দাঃস্বজ্ঞানহীন লোকদের অবিস্ময়াকারিতার বহু লোকের জীবন ষাটতেছে। ইহা একদিনের ঘটনা নহে, নিত্য নিয়মিতভাবে হইয়া চলিয়াছে। সরকার কি এট সব চালকের বেপরোয়াপনা নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম? অক্ষম না হইলে, বার বার এরূপ ঘটনা ঘটিতেছেই বা কেন? সরকার যদি ইহাদের সতর্কতার সহিত বান-চালনা করাইতে অপারগ হন, তাগা হটলে লরী বা ট্রাক চালনার ভগ্ন পৃথক রাস্তার ব্যবস্থা করুন। ভদ্র, নিরীহ পথচারী বা বান-যাত্রীদের জীবন এইভাবে বিপন্ন কারবেন না।

গ-স

### চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নূতন বিস্ময়

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি আজ ভগ্নতক ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। মধ্য মানুষকেও এই বিজ্ঞানই কিছুক্ষণের ভগ্ন বাঁচাইয়া রাখিতেছে। বিশেষ করিয়া শল্য-চিকিৎসায় এই বিজ্ঞান 'হয়'কে 'নয়' করিতেছে, আবার 'নয়'কে 'হয়' করিতেছে। সদায়মুত মানুষের দেহ হটতে উৎপাটিত চক্ষু সংযোজনের দ্বারা দৃষ্টিহীন মানুষকে চক্ষুস্থান করা সম্ভব, ইহা কি পূর্বে কেহ ভাবিতেও পারিয়াছিল? তাহাও আজ সম্ভব হইল। নিউইয়র্ক রোচেস্টারের ডাঃ উইলিয়াম কোকোমিজ নামক একজন চক্ষু-চিকিৎসক পাটনা হাসপাতালে সম্প্রতি দানাপুয়ের ১৬ বৎসর বয়স্ক রাগাল বালক জীভ্রামবিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের কাসিয়া হটতে আগত ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবতী জীমতী খুটাইনের নয়নতারা সাকল্যজনক ভাবে পরিবর্তন করিয়া তাহাদের অক্ষয় দূর করিয়াছেন।

রোচেস্টারের আর একজন বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ লিওনার্ড

জ্যোত পরলোকগমনের পূর্বে এই চক্ষু দুইটি দান করিয়া যান। নিউইয়র্ক হটতে প্রায় নয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চক্ষু দুইটি পাটনার আনা হয়। লণ্ডন ও কলিকাতা হইয়া গুলাঘরাপায়ে রেক্সিয়ারেটবে করিয়া চক্ষু দুইটি পাটনা বিমানঘাটিতে আনিয়া পৌঁছিলে, পাটনার কুৰজী হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল হটতে উহার ডেলিভারী লওয়া হয়।

ডাঃ কোকোমিজ ইতিমধ্যে চক্ষুতে অস্ত্রোপচার দ্বারা এখানকার কয়েকশত দরিদ্র অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

যদিও ইউরোপ-আমেরিকায় এই নয়নতারা পবিত্র নব বর্ষমানে খুব সম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবে আমাদের দেশে ইহা প্রথম। সে দেশে অনেক দয়ালব মানুষ—জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কোন কিছুই প্রয়োজন নাই বুঝিয়া চক্ষু দুইটি করিয়া যাঁতেছেন। কারণ চক্ষু দান না করিয়া গেলে, এরূপ চিকিৎসা হইতেই পারিবে না। অতঃপর ভারতবর্ষে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে, উভা আশা করা যায়। উহার ফলে বহু দৃষ্টদীপ্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া পাইবে, এক কিম্বদন্তির কথা। আজ ডাঃ টাইলস্‌ম কোকোমিজ শুধু একজন বালক ও যুবতীর দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন উভাই শেষ বর্ষা নয়। তাঁর মারফৎ একটি নূতন যুগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটিয়াছে এবং এই যুগে বহু অন্ধ ব্যক্তি আলোর মুখ দেখিতে পাইবেন, এই আশা করা যাঁতে পারে। তা ছাড়া, দাঁতাদের চোখ আছে, উভারাও এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি সহ্য স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইবেন—বিজ্ঞান এই বহু সহস্র মাইল দূরত্ব পরিত্রাণে কি দূরত্ব আকর্ষণে এক ক্ষুদ্র পরিবারের আত্মীয়তার মধ্যে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, মানুষ মানুষে হানাহানি ও যুদ্ধ যতই চলুক, যতই তার আদিম প্রবৃত্তি, বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করুক, বিজ্ঞান বিশ্বমানবের হৃদয়কে অলঙ্কা বন্ধনে এবং নিবিড় আত্মীয়তার টানিয়া আনিতেছে। এই বিশ্বয়, এই আত্মীয়তা, এই বিশ্ব-বন্ধন আধুনিক বিজ্ঞানের দান এবং বিশেষ শতাব্দীর দান।

গ-স

### রোগ-চিকিৎসায় মধু

মধুর ভেষজগুণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের জানা। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে যখন মিশরে চিত্রলিপি বা 'হিরোগ্লিফিক'-এর সাহায্যে লেখার কাজ চলিত, সেই সময়ের প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে মধুর স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ভেষজগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র খুব উন্নত হইয়া উঠে বৌদ্ধ যুগে। কিন্তু তাহারও বহু পূর্বে হইতেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই মধুর গুণ সম্বন্ধে অসংখ্য উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুরাণকাহিনীতে মধুকে 'দেবতার খাদ্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতে যেমন সূর্য্যতাকে বলা হয় 'আদি-আয়ুর্বেদজ্ঞ', তেমনি গ্রীসের হিপোক্রেটিসকে বলা হয়, 'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক।' এই

হিপোক্রেটিস ১০৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘায়ু-লাভের রহস্যও নাকি এই মধু। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যহ সকালে আহারের সঙ্গে এক চামচ করিয়া মধু খাটতেন।

বাসায়নিক পদার্থ হিসাবে, মধু হটল এক অতি জটিল জৈব বাসায়নিক তরঙ্গ পদার্থ। হাজার হাজার ফুল, গছগাছড়া আর লেব-উদ্ভিদ হটতে সার চরম করিয়া মৌমাছি যে ভাবে তাহাদের চাকে এই মধু তৈরী করিয়া রাখে, তাহা কোন মানুষের তৈরী ল্যাবরেটরীতে করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এক আউন্স মধু তৈরী করার জন্য একটি মৌমাছিকে দশ হাজার হটতে বার হাজার ফুলের পুষ্পদার আহরণ করিতে হয়। এই ভাবেই একটি মৌমাছি পরিবার একটি ঋতুতে প্রায় ১৫০ সের পর্যন্ত মধু তৈরী করে।

প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে মধু যত পুরাতন হয় ততই নাকি তাহার গুণ বাড়ে। অস্তিত্ব পূজ্য হিসাবে তাহার গুণ যে কিছুমাত্র নষ্ট হয় না তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৩ সনে মিশরের একটি পিরামিড হটতে যখন প্রত্নতত্ত্ববিদরা 'ফাও ও তুতানখামেন'-এর ৩৩০০ বছরের প্রাচীন মমি বা সংরক্ষিত শব উদ্ধার করেন তখন সেই সঙ্গে একটি পাখরের পাত্রে বাখা কয়েক সের মধুও তাঁহারা পান। বাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ৩৩০০ বছরের পুরাতন মধু তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্যারোপ্যেগী রহিয়াছে।

ইহার কারণ, মধুর ভিতর রহিয়াছে অতি মূল্যবান কয়েকটি বীজাণুনাশক গুণ। এইজন্যই অসংখ্য জগার ফলে বা দগ্ধ স্থানে যে সব পুরাতন ঘা 'কছুতেই সাঁতান যাঁতেই' না এবং অনারত তাহা হটতে পুজু নির্গত হটতে ছ। সে সব ক্ষেত্রে মধু প্রয়োগ করিয়া স্ফুল প'ওয়া যায়। কোঁড়ার উপরে, পেশীর বেদনার আর ক্ষীত গ্রন্থি উপর চূর্ণ আর মধুর প্রলেপ জগাইবার ব্যবস্থা ভারতে বহু প্রাচীন কাল হটতে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া, ভারতীয় আয়ুর্বেদে প্রায় প্রত্যেকটি ঔষধই মধুর সহিত মিশাইয়া খাইবার রীতিও চলিয়া আনিতেছে।

সোলিয়েট চিকিৎসকেরা বর্তমানে মধুকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রোগনিরাময়ের কাজে প্রয়োগ করিতেছেন। যেমন, মধুর একটি হাসপাতালে ডাক্তার উ'লনস্‌ কয়েকটি যোগীর ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ সারিয়া তোলায় কাজে পরীক্ষামূলক সাফল্য অর্জন করেছেন। এই রোগীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ১০০ হটতে ২৫০ গ্রাম করিয়া মধু খাটতে দেওয়া হয়। ফলে ইহাদের ক্রমেই কাসি কমিতে থাকে, ওজন বাড়িয়া যায় এবং রক্তের সংযুতি স্বস্থতর হটতে থাকে। পাকস্থলীর ক্ষত বা গ্যাস্ট্রিক আলসার নিরাময়েও মধু বিশেষ উপকারী বলিয়া দেখা গিয়াছে। মধুর নিউট্রিশন ইনস্টিটিউটের গবেষণা এই ধরনের একদল রোগীকে দৈনিক ৬০০ গ্রাম করিয়া মধু খাটতে দিয়া দেখেন যে, প্রত্যেকেই পেটের যন্ত্রণা, বমির ভাব, বুক জালা প্রভৃতি একেবারে সাহিয়া গিয়াছে। আয়ুর্বেদোক্ত মধু এককাল আমাদের দেশে

উপেক্ষিতই হইয়া আসিতেছে, এইভাবে সোভিয়েট বিজ্ঞানীর কথা শুনিয়া যদি আমাদের চৈতন্য হয়।

গ-স

## নয়া দিল্লীতে বিশ্ব-কৃষিমেলা

কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে বিশ্ব-কৃষি সম্মেলন হইয়া গেল, এ সংবাদ সকলেই জানেন। ইহাতে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম, বিশ্বের কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি আপন আপন ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়া গেল। ইহার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। আমাদের দেশেও—মেলা-অমুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হইল এই, পরস্পরের সহিত মেলা-মেশা এবং বোগবস্ত্র স্থাপন। ইহার মাধ্যমে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা এবং আপন আপন উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়াস সাধিত হইবার প্রচুর অবকাশ আছে। সুতরাং দিল্লীর কৃষি-সম্মেলন এদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কিন্তু আমরা আলোচনা করিতে চাই অল্পদিক দিয়া। এটি অমুষ্ঠানে বাস্তবপন্থি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার এক ভাষণে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য কৃষিনীতি গ্রহণেই আমাদের মুক্তি।

অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করা চলে না, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রিক সেই কৃষিপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। তাহার কারণও আছে। এক দিকে যাহারা বহুবিরোধী তাঁহারা যেমন কৃষি-উন্নয়নের কোনও পথ দেখাটতে পারেন নাই, তেমনি অপর দিকে দেখা যায়, পূর্ব পদ্ধতিতে ও অজ্ঞাত অনেক নূতন আবাদি অঞ্চলে যথেষ্ট সাফল্যে (ট্রাঙ্কিং) কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন করিতেছে। তবু এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, এ দেশের কৃষি-ব্যাপারে আমেরিকা বা সোভিয়েটের মত অতি নির্মম ভাবে যত্ন চালনা কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাহার কারণও আছে। আমাদের দেশের অবস্থা আর উচ্চাদের দেশের অবস্থা এক নয়। যদিও ভুল-বাগু-মাটি প্রায় সকল দেশেই মূলতঃ এক। বাহ্য কিছু রূপান্তর ঘটে তাহা আবহাওয়ার গুণে। অবশ্য মানুষের বুদ্ধিও ইহার জন্ত অনেকখানি দায়ী। কিন্তু সে প্রভেদ সকল সময়ে বা সকল প্রদেশে দৃষ্টব্য বাধা নয়। সারের পার্থক্যও কোথাও কিছু নাই। যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা জমির গুণাগুণ এবং ফসলের প্রভেদ অনুসারে। আমাদের দেশে খণ্ড জমির জন্ত যে অনুবিধা, তাহাও দূর করা যায় কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার বা অন্য কোন সুব্যবস্থার সাহায্যে। তবে এ কথা নিশ্চিত, এই বিজ্ঞানের সূত্রকে প্রয়োগ করিতে হইবে স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত সমতা রাখিয়া। শুধু নির্কিচাবে পথের অনুকরণ করিলে স্তব্ধের মূখ আমরা কোনও দিনই দেখিব না।

\* এই বিশ্ব-মেলাও অমুষ্ঠিত হইয়াছে সেই অনুকরণের মনোভাব

লইয়া। মেলা জিনিসটা এ দেশে নূতন নয়। ইহারই মাধ্যমে রকমারি পণ্যবস্তুর একত্র সমাবেশ ও দেশ-দেশান্তরে না হউক—দূরদূরান্তরের মানুষের ক্ষণিক মিলন এদেশে প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এদেশের বহু মেলাই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আধুনিকতার সজ্জাতে তাহার বিলুপ্তি না ঘটিলেও, তাহার প্রকার অনেকটা বদলাইয়াছে। কিন্তু নয়া দিল্লীতে অমুষ্ঠিত বিশ্ব-কৃষিমেলা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। এখানে বিশ্বের কৃষিসম্পদ আপন আপন নিদর্শন দেখাটতে বাস্তু। এইরূপ মেলা ইউরোপে প্রায় ঘটিয়া থাকে। নিয়মিত ভাবে এই ধরনের বিশ্ব-মেলার উদ্যোগ হয় মিলানে, লাইপজিগে, ইটরোপের আরও অনেক শহরে এবং আমেরিকাতেও। এই ধরনের মেলাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় শিল্পজাত পণ্যের উপরই। তাহাদের উৎপাদনের বৈচিত্র্য ও সমস্তার উপর গিয়া পড়ে সমস্ত জোর। ভারত চিরদিনই কি এই অবস্থায় থাকিবে? যদি না থাকে, তবে সংস্কারের দেখা উচিত, আমরা অল্প দেশের তুলনায় কোথায় আছি। তবে অল্প দিক দিয়া বিচার করিলে, ইহার মঙ্গলের দিকও একটা আছে। সে দেশ-বিদেশের কৃষির প্রসার ও প্রগতি দেখিয়া শিখিবে, কেমন করিয়া ভারত তাহার গৌরবের আসন আবার ফিরাইয়া পাইবে।

যে সমস্ত দেশে কৃষিক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে ইদানীং কালে, তাহাদের অনেকগুলিই বিশ্ব-কৃষিমেলার যোগ দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আছে, সোভিয়েট ইউনিয়নও আছে। এ যুগে শিল্প ও কৃষি দুই ব্যাপারেই এটি দেশ দুইটির প্রগতি পৃথিবীর প্রায় অল্প সব দেশকেই ছাড়িয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া তাহাদের বিস্ময়কর অগ্রগতি সহ্য হইল তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাউবে এই বিশ্ব-মেলায়। কিন্তু বাস্তবায়িত তাহাদের নাগাল আমরা ধরিয়া ফেলিতে পারিব, এ আশা দুর্দাশ। তবে তাহাদের ধারা অনুসরণ করিয়া আমাদের ক্রটি আমরা অনেকটা সাফিয়া লইতে পারিব, এমন আশা করাটা অজ্ঞার হইবে না। এই সব দিক দিয়া বাংলা দেশ এখনও অমুন্নত। সুতরাং কৃষি-মেলা আমরা যে চোখে দেখি, প্রগতিশীল প্রদেশগুলি সে চোখে দেখে না।

কৃষি-মেলার যে বিবরণ আমরা অল্প প্রদেশের বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের 'ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট' হইতে পাই, তাহাতে দেখা যায়, দর্শকদের মধ্যে কৃষকের দলই সর্বপ্রধান এবং তাহারাই বাহ্য কিছু খোজখবর লয়। আমাদের উপর বাস্তবতার তীক্ষ্ণ অভিশাপ রহিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া আমাদের সবকিছুই প্রহসন একথা বলা চলে না। এ ধরনের আন্তর্জাতিক মেলার উদ্দেশ্য পণ্য-বিনিময় ততটা নয়, বরং ভাব-বিনিময়। নয়া দিল্লীর এই মেলা সার্থক হইবে যদি দেশ-বিদেশের প্রগতি ও প্রাচুর্য দেখিয়া আমাদের চৈতন্যের উদয় হয়।

গ-স

## হাসপাতাল ও জনগণের স্বাস্থ্য

‘বর্ধমান বাণী’ জানাইতেছেন :

“রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মহামারী প্রতিরোধ একমাত্র চিকিৎসক ও ঔষধের উপর নির্ভর করে না। সরকার, চিকিৎসক এবং জনগণের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। হাসপাতাল আছে জেলা সময়ে, মহকুমায় এমন কি পল্লীতেও কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা এত স্বল্প যে আয়ুপাতিক হিসাব উল্লেখ না করাই ভাল। বর্ধমান শহরে বিস্তারিত হাসপাতালে—১০ বছর আগে যে ব্যবস্থা ছিল, আজ জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সেই অবস্থাতেই আছে। কলিকাতায় রোগী প্রতি যেখানে দু’টাকা আচাৰ্য্য বাবদ বরাদ্দ আছে এখানে এক টাকা পার্শ্ব্য হইয়াছে। এই তারতম্য ঘোচান উচিত।

বর্ধমান শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তরিত হতে চলেছে। বানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে দুর্ঘটনা। এমার্জেন্সী রকম নাই। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রায় রাস্তার উপরই দিতে হয়। এমার্জেন্সী বিভাগে যে রোগী আসে তার পঁচিশ ভাগ দুর্ঘটনাজনিত। অবিলম্বে শব্দায়ুক্ত এমার্জেন্সী ওয়ার্ড না খুললে রোগীর পরিচর্যা হবে না।

হাসপাতালে সাধারণ মহিলা ওয়ার্ড সম্বন্ধে কিছু না বলাই উচিত। ওখানে স্ত্রী রোগী অন্তত্ব হয়ে বাবে একদিন থাকলেই। চর্য ঐ বিভাগে উঠিয়ে দিতে হবে নয়ত ভেঙে নতুন ঘর তৈরি করতে হবে।”

এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কত্তব্য।

## গোয়ালার অত্যাচার

“বঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গদাইপুর, সোনাটিকুরী, মঙ্গলজুন, ঘোড়শালা, বাঘা, তজক ও লাখালীপাড়া মৌজার সমুদ্র বিস্তীর্ণ বড়লের বিলের পূর্বে কিনারায় অবস্থিত বলিয়া ইহাদের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ উদ্ভূমি আমন ধান চাষের উপযোগী এবং অবশিষ্ট জমিতে রবিশস্ত্র এবং বোবো বাজ উৎপন্ন হয়। এ বৎসর প্রথম বর্ষায় বৃষ্টির অভাবে আমন ধান রোপনে বিলম্ব হয় এবং শেষ বর্ষায় অতিবৃষ্টির ফলে নামলা ধানের ক্ষতি হইলেও প্রত্যেক ক্ষেতেই কিছু কিছু ফসল আছে। সে সকল ফসল এখনও সম্পূর্ণরূপে পাকে নাই। কেবলমাত্র আউস ধান কাটা হইয়াছে বলিয়া কৃষকগণ দু’বেলা দু’মুঠো খাইয়া বাচিতেছে। রবি ফসল সূচ্যরূপে বোনা হইয়াছে। আশা করা যায়, রবি ফসল এ বৎসর ভাল উৎপন্ন হইবে। বোবো ধানের বীজবপন সেবমাত্র বিলের ধারে ধারে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এই অবস্থায় এই অঞ্চলে এক ভীষণ উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রায় শতাধিক গোয়ালী তাহাদের হাজার হাজার গরু-মহিষ লইয়া এই অঞ্চলে হানা দিয়াছে। ইহারা কেহই উপযুক্ত মৌজায় বাসিন্দা নহে। কয়েকদিন যাত্র

আসিয়াই গোয়ালারা বহু জমির কাঁচা-পাকা ধান তাহাদের গরু-মহিষ দ্বারা খাওয়াইয়া তহরূপ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিলে তাহারা প্রোহু করে না। ইহাদের সম্ভবতঃ শক্তির বা লাঠির সম্মুখে খুন জন্ম বাতীত গরু মহিষ বেঘরিয়া খোঁয়াবে দেওয়ার উপায় নাই।”

বঘুনাথগঞ্জের ‘ভারতী’ পত্রিকা প্রদত্ত এই সংবাদটির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

গ-স

## বাস ও নামাল শ্রমিক

বাঁকুড়ার ‘হিন্দুবাণী’ পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি জানাইতেছেন :

“চিরচরিত প্রথা হিসাবে বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে সাওতাল ও ভূমিচীন শ্রমিকদের বর্ধমান ও পূর্বে বাঁকুড়ার গমন শুরু হইয়াছে। ইহাতে বাস মালিকদের মনও মন শুরু হইয়াছে। মালপত্রের বস্তার মত ম’মুখ বোঝাই করিয়া দক্ষিণ বাঁকুড়া হইতে আনা হইতেছে এবং তাহাদিগকে আবার দুর্গাপুর বা পাতঙ্গারের দিকে পাঠান হইতেছে। বাসগুলিতে যে এ ভাবে ওভারলোড আসিতেছে তাহা বাস্তব কোন পুলিশ ধানাই লক্ষ্য করা দরকার মনে করে নাই। সাধারণ বাজী বিশেষতঃ মাঝ হইতে বাহাদা বাসে ওঠার অপেক্ষা করে তাহাদের দুর্দশার শেষ নাই। এমন ঘটনাও বহু শোনা গিয়াছে যে দশ বার ঘণ্টা বাস্তব ধারে বসিয়া থাকার পরও লোক বাস প’য় নাই। এই অবস্থা বাহাতে না ঘটে সেজন্য আর-টি-এ কষ্টপক্ষ করেকটি স্পেশাল বাসের কট পারমিট দিয়াছিলেন কিন্তু বাস মালিকগণ তাহা ব্যবহার না করিয়া সাধারণ রুটের বাসগুলি হইতেই অতি লাভের চেষ্টার আঁজেন এবং এই অতি লাভের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে সাধারণ বাজীরা। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার সম্ভবতঃ পুলিশ বা আর-টি-এ কাহারও সময় নাই।”

## ভাগীরথীর ভাঙন

‘বর্ধমান’ জানাইতেছেন :

“পুণাতোয়া ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সাধক কমলাকান্ত, প্রভু চৈতন্য, যুগাবতার রামকৃষ্ণের পুণ্য পদধোয়ন্ত কালনা সহর আজ ভাগীরথীর সর্বগ্রাসী ভাঙনের কবলে। বিগত বস্তার পর হইতে প্রতি বছর এই শহর ভাঙনের কবলে পড়িয়াছে। বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও অজাবি তাহা কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অচিরে ইহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ের অন্ততম কেন্দ্রস্থল চিরদিনের জন্য অবলুপ্তির পথে চলিয়া যাইবে। এবং বহু পরিবার াস্তগারা হইয়া পড়িবে। আমরা উক্ত এলাকার অধিবাসীদের এই আসন্ন বিপদের বিষয় চিন্তা করিয়া আতঙ্কিত হইয়াছি। আশাকরি মাননীয় সরকার বাহাদুর ইহাকে রক্ষা করিবার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া উক্ত এলাকার অধিবাসীদের রক্ষা করিবেন।”

## হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী

আমাদের দেশে বহু প্রাচীন গ্রন্থাগার শুধু অবহেলায় জন্মই নষ্ট হইয়া যাউতেছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল, 'হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী'টি অতীত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে বিগত ১৮৫৪ সনে হুগলীর কয়েকজন আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ কর্তৃক এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। তারপর ১৯০৮ সনে হুগলী কোর্ট চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত হইলে লাইব্রেরীটিও সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, উহাতে নটিক-নভেলের বাছল্য নাই। এখানে এরূপ অনেক অমূল্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রহিয়াছে যাহা অল্প কোন গ্রন্থাগারে দৃশ্যপা। উহার মধ্যে ১৮৪৩ সনে ভারতীয় বাণ্যীয়-বান সম্প্রদায় প্রমাণিত একখানি পুস্তক, স্বর্গত সৌদ্রীকমোহন ঠাকুরের ভারতীয় সঙ্গীত-কলা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ, ডিক্লিই গেজেটিয়ার্স, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অফিসিয়াল কলেকশন ইত্যাদি বহু দৃশ্যপা গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই সব পুস্তক হইতে বহু কৃতী ছাত্র ও শিক্ষাবিদ তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া হুগলীতে হইলাম, উপযুক্তরূপে পূর্ণপোষকতার অভাবে এই গ্রন্থাগারটি বর্তমানে এক আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে এবং উহার ফলে গত আগষ্ট মাস হইতে গ্রন্থাগারটি এক প্রকার বন্ধ হইয়াই আছে। যদি এরূপ অবস্থা চলে তাহা হইলে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রায় সাড়ে আট হাজার পুস্তক উপযুক্তরূপে তত্ত্বাবধানের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উহার সহিত বহু মূল্যবান ও দৃশ্যপা গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা অবগত হইলাম, গ্রন্থাগারের বর্তমানে যে পরিচালক সমিতি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক বিধান ও খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা নিজেরা গ্রন্থাগারটি সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। গবর্ণমেন্টও বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতেছেন এবং উহাদের এই গ্রন্থাগারের সাহায্যে আগ্রহ হওয়া কর্তব্য। মেটের উপর এই গ্রন্থাগারটি একটি জাতীয় সম্পদ। উহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হইবে না।

গ-স

## সুরেন্দ্রনাথের বাসভবন

মনোবিরের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা সরকার করিবেন ইহা সকলেই আশা করে। পরাধীনতার ফলে যাহা এতদিন সম্ভব হয় নাই, আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন তাহা সম্ভব হইতেছে না, ইহাই আমাদের প্রশ্ন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীনবন্ধু মিত্র—বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে দুইটি চিরস্মরণীয় নাম। পরাধীন ভারতে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে সুরেন্দ্রনাথের বাণিতা, মনীষা ও অসামান্য রাজনীতিজ্ঞতা যে প্রেমাগ্নির সঞ্চায় করিয়াছে, ভারতবাসী নিত্যন্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। আর নীনবন্ধুর সাহিত্য-

কীর্তি—বিশেষতঃ নীলকরদের নৃশংস ও বীভৎস অত্যাচারের স্বাক্ষর-রূপে লিখিত বাস্তব চিত্র 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জাতীয় জীবনে যাহাদের দান ভুলিবার নয়, তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনগুলি জাতির তীর্থক্ষেত্ররূপে যাহা পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল এবং জাতীয় সম্পদরূপে যাহা সংরক্ষিত হওয়া অবশ্যকরীয় ছিল, ওনা যাইতেছে, সেগুলি পরহস্তে বিক্রীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এইরূপে আমরা পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীও হারাইয়াছি।

ইহাতে দেশের কৃতী সম্ভ্রানগণের স্মৃতি-সংরক্ষণে-উদাসীন দেশের সরকারের তথা দেশবাসীর চিন্তের দৈর্ঘ্য সূচিত করে। এ দেশে মাইকেল মধুসূদনের অমর সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে বিজড়িত ভবন জাতীয়করণে সংকাষের উদাসীন দেশবাসীর মনোবৈদল্য কারণ হইয়া রহিয়াছে। এই দুই স্মরণীয় পুরুষের বাসভবনও যদি সরকার ও দেশবাসীর উদ্যমভাবে নষ্ট বা হস্তান্তরিত হয়, তবে সমস্ত দেশের পক্ষেই তাহা লজ্জার কারণ হইবে। সরকার এটগুলি সংরক্ষণ করিতে তৎপর হন, ইহাই অনুরোধ।

গ-স

## উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৩০শে জানুয়ারী প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। বয়স হইলেও, তাঁহার এমন আকর্ষক মৃত্যু হইবে কেহ ভাবিতে পারেন নাই।

১৮৮১ সনে উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ভাগলপুরের গঙ্গুলীয়া ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান পরিবার। উপেন্দ্রনাথ সেই পরিবারের সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি ভাগলপুরেই ওকালতি করিতে শুরু করেন। পরে তাঁহার ঐ কাজ মনঃপূত না হওয়ায়, সাহিত্য-সেবাকেই তিনি বাছিয়া লইলেন।

সাহিত্যিক হিসাবে যে তাঁহার স্থান কোথায়, সে কথা আজ আর নুতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারায় লালিত হইয়াও, বিংশ শতাব্দীর জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুরাতন কালের মানুষ হইয়াও, নুতন কালের মানুষকে তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। এ ক্ষমতা সকলের থাকে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ যাহারা খ্যাতিমান, প্রথম দর্শনেই তাঁহাদের শক্তিকে স্বীকৃতি জানাইতে তাঁহার কখনও দ্বিধা হয় নাই। উপেন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্য-নারক। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই নেত্র-দ্বয় দাবি তিনি অপরিমিত নিষ্ঠার সঙ্গেই বহন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শশিনাথ', 'অমূলতরু', 'অভিজ্ঞান', 'রাজপথ' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

কিছুদিন পূর্বে তাঁহার ৭০তম জন্মদিবস অমুষ্টিত হইয়াছে। কে জানিত, দেশবাসীরা নিকট হইতে ইহাই তাঁহার শেষ স্মরণ। গ-স

# ভারতের সংস্কৃতি

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

“সংস্কৃত” অর্থে,—মাজিত, নির্মলীকৃত, শোধিত,—সুবর্ণের অগ্নি সংস্কারে তাহার মলিনতা নষ্ট হওয়ায় সুবর্ণ যেমন বিশুদ্ধ উজ্জল এবং ভাংস্বর হয়, সংস্কৃতি বা সংস্কারের ফলে ব্যক্তি বস্তু মানব-সভ্যতা ও সমাজও তেমনি নির্মল উজ্জল এবং উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সংস্কৃত ভাষা—প্রাচীন ভারতের বৈদিক দার্শনিক, পৌরাণিক তথা সাহিত্যিক ভাষা মাজিত অলংকৃত সুসংবদ্ধ ও পারিপাট্যসম্পন্ন—এবং সে ভাষাই উহাকে ‘সংস্কৃত’ বলা হয়।

বস্তু সংস্কার, গৃহসংস্কার, পথবাট সংস্কার বা ইষ্টাপূর্ত্তাদি এই প্রকারের বিষয় নহে। লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমার বক্তব্য।

সংস্কৃতির তাৎপর্য—মানুষ সংস্কৃত না হইলে তাকে ব্রাত্য বলা হয়। অর্থাৎ ব্রত অত্যন্ত ভিত্তি। সংস্কৃত হইবার ভাষা যথেষ্ট ক্রিয়া কর্মপদ্ধতি বা ব্রতাদি তাহাই সংস্কার। সে ভাষাই বলা হয়—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ

বেদান্ত্যাস্তবেদিকপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

এই জ্ঞান-ভাবভূমির ভাষা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজ এবং এবিধ জ্ঞান বা সংস্কৃতির অভাবে শূদ্র এইরূপ শ্রেণী বিভাগ প্রাচীন ভারতে করা হয়।

সংস্কার অনুযায়ী দ্বিজ বা শূদ্র আখ্যা দেওয়া হইত। প্রথম জন্ম মাতৃ গর্ভ হইতে— দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন সংস্কার হইতে গণ্য করা হইত। “প্রথম মাতৃগর্ভাৎ স্ত্র্যং দ্বিতীয়ং মৌলিবন্ধনং।”

অতঃপর “অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যং দয়াজবং”—এবং আহার শুদ্ধি প্রভৃতি সংস্কারভাসের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত। “আহারশুদ্ধৌ সর্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্বতঃ”—এইরূপ শুদ্ধি ও সংস্কারের ফলে—“ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তনুঃ”—আত্মা দেহ মন বুদ্ধি ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধাাসনের উপযোগী হয়।

দশবিধ সংস্কার—জাতকর্মের পূর্ব হইতেই এই সংস্কারের বিধান ছিল। যথা “গর্ভাধান, পুংসবন, সৌমস্তোত্রয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ।”

পুংসকালে আর্ষকুমারীগণেরও উপনয়ন সংস্কার হইত।

যথা বোধায়ন সূত্রে—“পুংসকালে কুমারীগণ মৌলিবন্ধন-মিষাতে অশ্বায়নঞ্চ বেদানাং শাবিত্রী বচনং তথ।” তাঁহারাও কুমারগণের জ্ঞান শব্দব্রহ্ম ও পত্রব্রহ্ম পবিনিষ্কৃতি হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীও হইতে পারিতেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বে নিষ্ঠাত হইতেন।

উপনয়ন সংস্কার হইতেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের আচরণ আরম্ভ হইত—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ—পূজোপাসনা, ঋষিযজ্ঞ শাস্ত্রপাঠ, পিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, নৃযজ্ঞ অতিথিসেবা, ভূতযজ্ঞ জীবকে অন্নদান।

আহার ও আচার—আহারে এবং আচারে সত্য সাবধান হওয়ার অনুশাসন ছিল। কারণ “আচারঃ প্রভবো-ধর্মঃ।” আহার সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষুধাকে নৈশ্বানর অগ্নি বলা হয় (গীতা: ১:১৪) নিজের ক্ষুদ্রিত্তি প্রাণায়-হোত্র। পরের ক্ষুদ্রিত্তি ভূতযজ্ঞ বলিয়া ধ্যাত। তাই আহাের প্রথম পঞ্চগ্রাস পঞ্চপ্রাণকে আছতি দেওয়া হয়। প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া।

ভোগ ও ত্যাগ—এই আহুতি বা উৎসর্গ প্রসঙ্গে ‘স্বাহা’ মন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহার ব্যুৎপত্তি স্ব+আ+হ+ড+আ অর্থাৎ স্ব বা আত্মানম্ আচ্ছাহামি। অর্থাৎ নিজেকেই আছতি দিলাম। নিজের অহমহমিকা অহং মমত্ব প্রভৃতি অভিমান সহঃ তাহার মন্ত্র ছিল—“মাং মমীয়ং সকলং সমাক্ সমর্পয়ামি স্বাহা।”

ঐহিক জীবনে সংস্কৃতির সাধনায় এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ভোগ সংকীর্ণ স্বার্থের অধেষণ বা পরস্বাপহরণ করিবে না, বৃহত্তর জীবনদর্শে ভোগের মুখে ভোগ করিবে। তাই বিধি ছিল—যজ্ঞ সম্পূর্ত্তির পর যজ্ঞাবশেষ হোতা গ্রহণ করিতেন। অধ্যায় শক্তির ক্ষুদ্রণ ভোগের মুখে হয় না, কারণ ভোগের দ্বারা বৃত্ত্যাহে বৃদ্ধি হয় ভোগাকাজ্ঞার নিবৃত্তি হয় না। তাই শ্রুতি বলেন, “তেন ত্যক্তেন ভূজ্যাথাঃ” (ঈশোপনিষৎ)।

প্রকৃতি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি—‘সংস্কৃতি’ শব্দের অর্থ এবং বিনিয়োগ ব্যক্তিতে হইলে ‘প্রকৃতি’ ও ‘বিকৃতি’ শব্দ দুইটির অর্থও প্রণিধানযোগ্য। প্রাণী মাঝেই ক্ষুধা পাইলে খায়, মানুষও ক্ষুধা পাইলেই খায় সুতরাং ক্ষুধা পাইলে খাওয়া প্রাণী মাঝেই প্রকৃতি, মানুষেরও। কিন্তু মানুষ অখাদ্য



খায়—বিকৃত রুচিবশতঃ গর্ভবতী নারী মাটি খায় এবং শিশুরাও খায় ( Geophagy ) কৃষ্ণ না পাইলেও খায় এবং ক্ষুধার অতিরিক্তও খায়—ইহা তাহার ‘বিকৃতি’।

তাই আচার্য্য বিনোবাজী বলেন যে, যখন মানুষ-ক্ষুণ্ণার্ভক খাওয়াইবার জন্য নিজে উপবাস করে, নিজের মুখেই গ্রাস নিঃসম্পর্ক অনাস্থ্যীয় অতিথিকে তুলিয়া দেয় তখন তাহা হয় তাহার ‘সংস্কৃতি’। ‘সংস্কৃতি’ কখনও মন্দ অর্থে ব্যংহত হয় না : ( ভূদানযজ্ঞ ২২শে মার্চ ১৯৫৮ পৃঃ ৫১ )

ভারতের ভেদ ও ঐক্য—ভারতে জাতিভেদ প্রথার প্রতি পাশ্চাত্যদেশীয়েরা অনেক কটাক্ষ করেন। কিন্তু এক বিষয়ে ভারত অগ্রসর, ইয়ুরোপ অনগ্রসর। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু শতাব্দী বঙ্গপরের প্রাচীন। এখানে ঐতিহ্যপূর্ণ ও শক্তি সম্পন্ন দশ-বারটি ভাষা প্রচলিত আছে। তাহা পি বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মের মাধ্যমে এক ভারতীয় রাষ্ট্র-বোধের স্বাকৃতি আছে। কেহই এ কথা বলেন না যে রাজ্য-গুলি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হউক। অথচ এই প্রদেশগুলি ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, গ্রীস, হল্যান্ড, বেলজিয়ম-এর তুলনায় ক্ষুদ্র নহে। ‘বাল্কান’-ষ্টেটগুলি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় ইংরাজীতে একটি নতুন শব্দই উদ্ভূত হইয়াছে Balkanisation ; সূত্রান্তে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত এই ভারতীয়তার বোধ, সাক্ষ্য ও সাধারণ বোধ, ইহা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে এবং ইহা তাহার প্রাচীন সংস্কৃতি প্রসূত।

সত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি—মনাতন সত্যের সর্ব-ব্যাপী রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন, “One must be able to love the meanest creation as oneself” অর্থাৎ “আত্মোপমোদভূতেষু দৃষ্টং কুবন্তি সাধবঃ” তিনি আরও বলেন,

“A man, who aspires after that, cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into the field of politics, and I can say, without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with politics—do not know what religion means.”

ভারতের ‘ধর্ম’ ও ইংরেজী ‘religion’ এক বস্তু নহে—মহাত্মাজী ভারতীয় ব্যাপক অর্থেই ‘religion’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বাহা! মনুষ্য সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই ‘ধর্ম’।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফলে সমগ্র

মানব-জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সৌমাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক দেশেরই আপন আপন বিশিষ্ট সভ্যতা আছে। এই বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে সেই সেই দেশের আপন আপন বিশেষ পরিবেশে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, ভৌগোলিক পরি-স্থিতির সঙ্গে, ইতিহাসের ধারা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে চলিতে প্রত্যেক মানবগোষ্ঠী এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, আপন সহজাত স্বভাব, শিক্ষা এবং সাধনায়, তাহার সমষ্টিগত সিদ্ধির উত্তরাধিকার সূত্রে।

সংস্কৃতির ঐতিহ্য—আবহমান অতীতের ঐতিহ্যের প্রভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সকল জাতির পক্ষে, অশুভ এবং অশোভন তাই ভাগবত বলেন, “জ্ঞানী ব্যাকতরং ভাং যন্তুত্মপজীবতি ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্লেমং জারং নার্ষসভী যথাঃ” যদিও মানুষের সঙ্গে দ্বারা মানুষ যেমন প্রভাবিত হয়, সেইরূপ এক জাতির সম্পর্ক—অপর জাতি,—এক সভ্যতার সংস্পর্শে অপর এক সভ্যতাও অবশ্যই প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষও এইরূপ অসংখ্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে যথা :

“কিরাতেহুনাঙ্ক পুলিন্দ পুন্ড্রা।

জাতিয় শুভা যবনাঃ খসারয়ঃ ॥”

ইহাদের সংস্পর্শ এবং ইহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিরও পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন ঘটয়াছে।

খাদ্যের পরিপাকের ফলে যেমন মানুষের শরীর পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ আবহাওয়া, আহাৰ্য ও পানীয়ের ফলে জাতির দেহ গঠিত হয় এবং শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অমূল্যলভের ফলে জাতির চিন্তা ও ভাবধারাও এক বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। ‘বিজ্ঞান’—বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের অমূল্যলভপরায়ণ এবং ‘দর্শন’ বিভিন্ন জ্ঞানের সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে, তাহাদের শাখত মূল্য নির্ধারণ করিতে এবং তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে যত্নবান।

ভাবী ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ—নির্মাণ করিতে হইলে তাহার ‘প্ল্যান’ বা পরিকল্পনা একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণের প্রণালীতেই করিতে হইবে। বৃহৎ অট্টালিকা গঠন করিতে হইলে তাহার ভিত্তি যেমন সুগভীর হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই ভিত্তি দৃঢ়ভূমি বা প্রস্তর-কঠিন মাল-ভূমির উপর স্থাপিত হইলে তাহার স্থায়িত্ব যেরূপ অবিনশ্বর হয়, সেইরূপ জাতির ভিত্তিস্থানীয় জাতীয় চরিত্র যদি নৈতিক বল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সেই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং উৎকর্ষ অবিক্ষণ্য হইয়া থাকে। প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকাও যদি বালি বা নমনীয়



ভূমির উপর নির্মিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার ধ্বংস হইবে, ভিত্তি বসিয়া যায় এবং কালক্রমে অট্টালিকাও ধ্বংসিয়া যায় এবং তাহার প্রস্তরাদি ধ্বংসিয়া পড়িয়া গৃহবাসীর প্রাণহানির কারণ হয়।

জাতীয় চরিত্র—দেশের এবং জাতির সাধনায় কোন উচ্চতর বা বৃহত্তর পরিকল্পনা থাকিলে জাতির মেরুদণ্ডরূপ নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং উৎকর্ষ বিধান না করিলে সমস্ত আশা ও কল্পনা—মরীচিকায় পর্যবসিত হয়।

সংস্কার বা সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইল শুদ্ধি-জনক কার্য। এই সংস্কৃতি নির্ভর করে মানুষের সভ্যতা-জনিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপর। পূর্বেই বলিয়াছি যে সংস্কারের অর্থ নির্মলোৎসব—জীর্ণোদ্ধার সাধন, মার্জন-শোধন প্রোক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি বুঝায়। সংস্কৃতির এই অংশটি negative অর্থাৎ বর্জন বা ব্যবকলনের দিক। অন্য অংশটি positive বা সনাতন, তাহা অর্জন, সংযোজন বা সংকলনের দিক।

বর্জনের দিকে পড়িলে, দোষ দূর করা—অর্থাৎ যথা সম্ভব এবং যথাসাধ্য দোষ পরিহারপূর্বক জীবনকে নির্দোষ নিষ্কলক এবং নির্মল করা।

অর্জনের দিকে পড়িলে,—সত্য, ক্ষমা, ত্যাগ, আত্মসম্বয়, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শুচিতা, পৌরুষ এবং উদারতা প্রভৃতি গুণকে নিষ্ঠার সহিত—আশ্রয় করা।

গীতার ষোড়শাধ্যায়ে—বর্জনীয় দোষগুলিকে আত্মরী সম্পদ এবং অর্জনীয় গুণগুলিকে দৈবী সম্পদ বলা হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে—“দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধ্যামুদী মতা”। অর্থাৎ আত্মা দৈব এবং মনকে সংস্কৃত পরিশুদ্ধ নির্মল এবং নিমুক্ত করিতে হইলে চাই দৈবীসম্পদ এবং আপন সম্বন্ধে পৃথিবীর আবিলতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতার দ্বারা আঁটে পুটে আবদ্ধ করিতে হইলে চাই আত্মরী সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত তথাকথিত সম্পদগুলি মানুষের সর্ববিধ অগ্রগতির অন্তরায় এবং সকল বিপদের কারণ।

ব্যক্তি বা ব্যক্তির পক্ষে যে কথা সত্য, সমষ্টিগতভাবে জাতির পক্ষেও সে কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

সভ্যতা ও শিক্ষা—ইংরেজীতে—Civilization বলিতে বুঝায় culture, refinement of feelings taste & manners, freedom from crudeness, coarseness and vulgarity, এবং তাহার সহিত development of arts & science, embellishment of mind & intellect. চিন্তাশীল ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করিবেন যে এই সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা অর্জন করিতে হইলে দৈবীসম্পদ অর্জন এবং চরিত্র গঠন ব্যতীত হইতে পারে না। বর্তমান সভ্যতার ফলে

বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা যে দৃষ্ট দେখিতে পাই তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সভ্যতার বেশমী পোষাক পরা যুথোস ঢাকা বর্ষদত। এতদেবীর পণ্ডিতেরা বলেন,

“দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যালঙ্কতোহপি নন

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ?”

তাহার ছবি আমরা আলোকচিত্রে দেখি, ডিটেকটিভ গল্পে পড়ি এবং প্রত্যেক দিনের ফৌজদারী আদালতের বিরুদ্ধে তাহার নগ্নরূপ দর্শন করি।

সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক—ইহা নীং যে কয়জন মহা-পুরুষ ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ, ভিলক, অববিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও বিনোবাজীর নাম অবশ্য স্বরণীয়। ইহারা সকলেই ভারতের এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সঙ্কীর্ণতা—সর্ববিধ সংস্কৃতি এবং অগ্রগতির পথে মহান অন্তরায়। সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে নিজের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলিয়া, কুপ মণ্ডুকের মত তাহাকেই জগৎ মনে করিলে শুধু আত্মপ্রবন্ধনা করা হইবে। বিশ্বকে উপলব্ধি করিয়া, ‘এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে’—বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিয়া—“যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্” এইরূপ ‘বিশ্বভারত’ নির্মাণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বার্থ বিশ্বকবি হইয়াছেন।

জাতীয়তার প্রয়োজন ও সীমাবদ্ধতা—যতদিন কোনও দেশ বা জাতি পরপন্থনত থাকে ততদিন তাহার সঙ্কীর্ণ অর্থে ‘জাতীয়তা বা patriotism বা nationalism’এর মুখ্যতঃ প্রয়োজন আছে, নচেৎ জাতীয়তার নামে ইতিহাস যে অভ্যাচার, অন্যায় এবং শোণিতপ্রাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “Nationalism is a cruel epidemic that is sweeping over the world and eating its moral vitality” গত মহাযুদ্ধ অ্যাটম বোমা দ্বারা (৬ আগষ্ট ১৯৪৫) হিরোসিমা-নাগাসাকিতে অন্যান্য ২ লক্ষ নিরীহ নর-নারীর হত্যা, ইতিহাসে চিরদিন রক্তাক্তের (১) লেখা থাকিবে।

স্বাধীনতার অর্জন, পালন এবং রক্ষার জন্যই জাতির এই গভী দিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন এখনও বহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে যতদিন না—United Nations তাঁহাদের সমষ্টির প্রতিভা সংযোগে—এক সম্মিলিত অখণ্ড জগৎ বা One world-এর পরিকল্পনাকে শাসনিক শান্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বিশ্বমানবতা বোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে পত্রের এবং প্রবন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতা

বোধের মূর্ত প্রতীক। তিনি দেশের মাটিকে প্রণাম করিয়াছেন—

‘হে আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা—

তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।’  
তাঁহার ‘বাধি ও প্রতীকার’, ‘মানুষের ধর্ম’ প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতি ও উদারতা—সাহিত্য সৃষ্টির পথেও সঙ্গীর্ণ দৃষ্টি মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ সঙ্গীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করে, তাঁহার সৃজনী প্রতিভাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। চিত্র, সঙ্গীত, ললিত-কলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি উদারতা, সার্বজনীনতা এবং বিশ্বমৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আমরা শিখিয়াছি—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্—

উদারচরিতানাং বস্তুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

তাই এখানে “সর্বত্রাত্যাগতো গুরুঃ”, অতিথি সর্বত্র গুরু এবং বরগীষ। “সমঃ সর্বেষু ভূতেশু মন্তুজিং লভতে পরাম্”—সর্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ হইলেই দৈবের পরাভক্তি লাভ হয়। “সুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমবশিনঃ।”

সংস্কৃতি ও ধর্ম—ধর্মের প্রসঙ্গও এই উদারতা অবশ্য প্রযোজ্য। বৈদিক ঔপনিষদিক ধর্ম, গীতায় প্রচারিত ধর্ম, যে ধর্মের উপর রমোহন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকেরা জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মানুষের ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিকে সম্মান এবং স্বীকৃতি দান করিয়া তাঁহার উপর সংজ্ঞিক—অর্থাৎ সমাজকে—তথা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ব্যক্তি মানুষ যে ‘নর’, সে নারায়ণেরই প্রতীক। শ্রুতি বলেন, “এষ দেবো বিশ্বকর্ম; মহাত্মা সর্বা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবষ্টঃ।”

তুলসীদাস বলেন, “সব ঘটে বিবাজে রাম।” বিবেকানন্দ বলেন, “ভীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন পুঁজিছে দৈবর।” ভাগবত বলেন,

যো মাং সর্বেষু ভূতেশু তিষ্ঠন্তু পরমেশ্বরম্।

হিত্বাহর্চাং ভজতে মোচ্যাদ্ ভগ্নশ্চৈব জুহোতি সঃ ॥

সর্বভূতস্ত পরমেশ্বরকে ভাগ্য বা অবহেলা পূর্বক যে মূর্তি-পূজা সে কবল ভগ্নে বিচালিয়া হোম করার মত পণ্ড্রম। মহাভারত বলেন, “ন মানুষ্যং শ্রেষ্ঠতং হি কিঞ্চিৎ”।

ইহাকেই চণ্ডিদাস তাঁহার অনবদ্য কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, “সবার উপরে মানুষ সত্য তাঁহার উপরে নাই।”

নারায়ণ নমস্কৃত্য নবৈকব নরোত্তমম্

দেবীং সংস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে ‘জয়’ শব্দটির অর্থে সাধারণ জয় বা বিজয় মাত্র নহে ‘জয়’ শব্দের অর্থ রামায়ণ মহাভারত

পুরাণাদি ধর্ম শাস্ত্রকে বুঝায় বাহা পাঠ বা অমুশীলন করিলে আমরা সংসার ‘জয়’ করিতে এবং সংসারের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হই।

ধর্মাক্ততা—ধর্ম এবং সমাজের গোঁড়ামি ও সঙ্গীর্ণতার প্রতি অকুলি নির্দেশ করিয়াই স্বাধীনতাধীনতা তাঁহার ‘অচলায়তন’কে রূপ দিয়াছেন। এই মূর্ততাকে ভৎসনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

“আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটাইয়াছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেছি। জ্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তুষায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে লজ্জন করে এমন সকল নিবর্ধকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে।” (ত্রিগোপালকৃষ্ণ রায় উদ্ধৃত পত্র—২০শে আষাঢ় ১৩১৭। সংহতি পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ ঐষ্টব্য)

মহাকবি দেশের ভড় বুদ্ধিকে কষাঘাত করিয়া মানবতার প্রতি মমত্ববোধ জাগাইতে চাহিয়াছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি যখন বহু সহস্র বৎসরের অসংস্কার এবং পরাধীনতা নিবন্ধন অবসাদের ফলে, আপন সংস্কৃতির শস্ত্র ত্যাগ করিয়া তুম্যমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল, যখন ভারত সম্মান আপন শোণিত স্রাব করিয়া বিদেশীয় জলোকার পুষ্টি সাধন করিতেছিল, ধর্ম যখন ‘বারো রাজপুতের তেবো হাঁড়ী’র প্রথায় পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নিজের ‘পাক’ (১) বা পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল, তখন সংস্কৃতির ঘোর দুবিপাক উপস্থিত হইয়াছিল তাই এই যুগন্ধর পুরুষেরা মিষ্ট কষ্ট নানাবিধ মিঠে-কড়া বচনে জাতির আরোগ্যার্থে আঘাত-চিকিৎসায় (shock treatment) ত্রুতী হইয়া তাঁহার অপ্রকৃতিস্থতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রকৃত ধর্ম—মৌলিক অর্থে ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক এবং উদার। “ধারণার্ছ ইত্যাহ্বার্ছো ধারয়তে প্রভাঃ। যঃ স্রাং ধারণস্যস্বতঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।” অর্থাৎ ধর্মই সমাজ এবং জাতিকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের একতা ও সমগ্রতা (integrity) রক্ষা করে। ইহাই ভারতের প্রকৃত ধর্ম।

ধর্ম এবং সঙ্গ—ত্রিগোপালকৃষ্ণ ‘চাচাগাছে’র উপমা দিয়াছেন। তাঁহাকে যেমন বেড়া দিয়া বাঁচাইতে হয় চতুষ্পদের বৃত্তক্ষু আক্রমণ হইতে—তেমনি করিয়া কোমল এবং নমনীয় শৈশবের অপরিণত অবস্থায় মানুষের তথা জাতির চরিত্রকে রক্ষা করিতে হয় কতকগুলি অবশ্য পালনীয় সংযম নিয়মের

অনুভূতিভায়। ‘দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাগ্যঃ’— কারণ মানুষের মনের সহজাত বড়বিপুল দুঃসঙ্গ পাইলে অগ্নির ত্রায় বটিকার সংযোগে অদম্যশক্তি লাভ করে, তাই দৈবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, “তবদায়িতা অপি ইমে সঙ্গাং সমুদ্রায়ন্তে।” কিন্তু এ সমস্ত কথা দুঃসঙ্গের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা কোনও জাতি বা ধর্ম বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এখন শৈশবে বোড়া অতিক্রম করিয়া নভোযোয়ান স্বাধীন ভারত, বিখ-জগতের সহিত কর্মর্দন করিয়া, লাভবান হইতেছে এবং হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

জাতি এবং বর্ণ—আমাদের সমাজের স্মার্ত ব্যবস্থায় ‘জাতি’ এবং ‘বর্ণ’-কে এক পর্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয়ের জাতি এবং বর্ণ পাইলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিভাগের সুবিধা হয় বলিয়া। কিন্তু জাতি ও বর্ণ এক বস্তু নহে। ‘বর্ণ’— গুণ কর্ম বিভাগের উপর নির্ভর করে। অভিধানে এখনও দেখা যাইবে ‘জাতি ব্রাহ্মণ’ অর্থে নিকট ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, যাহার জন্মক জাতিই একমাত্র পরিচয় ‘সংস্কৃত’ লাভ করিয়া সে দ্বিজও হয় নাই, বৈদ পাঠ বা জ্ঞানলাভ করিয়া সে ব্রাহ্মণও হয় নাই। ভগবান বুদ্ধ, তাহাৎ ধর্মপাদ, ‘ব্রাহ্মণ-বর্ণে’—ব্রাহ্মণকে যে সকল গুণের পরিচয়ে নম্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত পরিচয়। পত্নিকায় বলে অযুক সময় জন্ম হইলে অযুক ‘বর্ণ’ হইবে এবং সেই হিসাবে কে গাভে উল্লেখ করা হয় এবং জাতি নির্বিশেষ ব্রাহ্মণাদিকেও ক্ষত্রিয় শূদ্রাদি বর্ণ পরিচায়িত করা হয়।

ফলিত জ্যোতিষ—যদিও ‘বর্ণ’ এবং ‘জাতি’র পার্থক্যের প্রামাণ্য হিসাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই প্রথা উল্লেখ করিতেছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে বলা অগ্রজ প্রয়োজন যে, ফলিত-জ্যোতিষ, জ্যোতিষীর অর্থগম এবং অন্ন সংস্থানের জগুই রচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকারপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জানিবার জগু মানুষের বৌতুলও সেই পরিমাণে উগ্র। সেই কারণে, সেই দ্বলতার ফলেই, ফলিত জ্যোতিষ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, নচেৎ জন্মলগ্নের উপর নির্ভর করিয়া কোষ্ঠী-বিচার এবং বিবাহের যোচক বিচার এক অন্ধ-কুশঙ্কাদের পরিণাম এবং প্রতিফল মাত্র। এই কুশঙ্কার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবলম্ব্য দূর করা কর্তব্য নচেৎ উঠিতে হাঁচি, বসিতে টিকটিক এবং যাইতে অপ্রেম-মহার ভয়ে ভীত জাতি—যে ভিমিরে সেই ভিমিরেই চিরদিন থাকিবে। দৈনিক পত্রিকায়—“এ সপ্তাহ কেমন যাইবে” অথবা এই কুশঙ্কাদের পরিচয় এবং প্রশ্রয় দিতেছে।

গীতার ‘চাতুর্ভূগ্য’—বর্ণ এবং জাতি যে একাধিব্যঞ্জক নহে, এবং গীতার গুণকর্ম বিভাগ অনুসারেই যে একধিন

জাতির নির্ণয় হইত, তাহা ভাগবত হইতে এবং মহাভারতের যুধিষ্ঠির নহুষেব কথোপকথন হইতে সুস্পষ্ট বৃত্তিতে পাবা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেনঃ

যশ্ব যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসাং বর্ণাভিব্যঞ্জকং  
যদন্তত্রাপি দৃষ্টেত তন্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের গুণ যদি অন্তরিত দেখা যায় তাহা হইলে সেই গুণের দ্বারা এই সময়ে বর্ণের নির্দেশ করিতে হইবে।

সত্যকামের উপাখ্যান এবং পুরাণের বিভিন্ন উপাখ্যানও তাহাই প্রমাণ করে। অনুসঙ্গ বিলোম বিবাহেও বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে শোণিত সংমিশ্রণের প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সমগ্র বৌদ্ধ-ধর্মকে ভারতবর্ষ স্প্রাঞ্জর মত স্বরূপে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। তাই আব, অন্য, জাবিড়, চান, ‘শকছন দল পাঠান মোগল’ এখানে এক দোহে লীন হইতে পারিয়াছে।

জাতি ও সংস্কৃতি—বামমোহন এই জন্মগত জাতিবাদকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ‘কুশঙ্কর’ কঠিনপ্রাণ, একবার তাহার শিকড় বা মূল বাড়িলে তাহাকে উন্মূলন করা সুকঠিন। তবে সময়ের গতি, বিজ্ঞানের প্রগতি এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলে লোকে এখন পূর্বাঙ্ক মনস্বীত্বের উপদেশ অধিকতর প্রচাৰ্য্য হইতেছে ইহা মঙ্গলের কথা।

বিজ্ঞানের প্রভাব—নৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব দ্রুতবেগে দূর হইয়া যাইতেছে। বৎসরের পথ দিনে অতিক্রান্ত হইতেছে। পৃথিবীর উভয় গোলাধ্ব, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক তথা ব্যবসায়িক আদান-প্রদানে ক্রমশঃই বসিষ্ঠতা লাভ করিতেছে।

বিশ্বমৈত্রী ও ববীন্দ্রনাথ—একুপ অবস্থায় যেমন অনেক প্রকার বৈষম্য দূর হইতেছে, তেমনি আবার নানাবিধ রাজ-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অশান্তি, জিলা ও হিংসা উপস্থিত হইতেছে। তাই ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ

“The human world is made one, all the countries are losing their distance everyday, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a world-wide commerce of heart and mind, sympathy and understanding and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of indivi-

dual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness." ( Paris May 3, 1930 ).

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই কামনা করিয়াছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মৈত্রী এবং মিলন, মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ এবং আন্তরিক সহানুভূতির মাধ্যমে। অর্থাৎ “দ্বিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিবে,—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।” ভারতের সংস্কৃতিও এই মিলনের প্রস্তুতির জন্য সাধনা করিয়াছে—মৈত্রী, করুণা, যুঁহিতা এবং উপেক্ষা প্রভৃতি উদার মঙ্গলগণবলী।

পশ্চিমের কবি Rudyard Kipling বলিয়াছেন, “The west is west, the east is east, And the twain shall never meet”. অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। ভারতীয় সংস্কৃতির রাজদূত রবীন্দ্রনাথ এই অসম্ভবকে অবশ্যই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—ভারতীয় সাহিত্যের মূলকথা রস-সৃষ্টি। এই রসকে বলা হইয়াছে ‘ব্রহ্মস্বাদ সহোদরঃ’। ব্রহ্ম রসস্বরূপ ‘রসোবৈ মঃ’। সেই রস-স্বরূপের আন্বাদন হয় সাহিত্যের মাধ্যমেও। অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে রস-ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি যলেন, “একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সমাগজ্ঞাতঃ স্বর্গলোকে কামধুগ্ভবতি।” হয়-পার্বতীর মত এই শব্দের সহিত ও বাক্যের সহিত অর্থ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কালিদাস বলিয়াছেন, “বাগর্বাণিব সম্পত্তৌ”, শক্তির সহিত শক্তিমানের মত, অগ্নির সহিত তাহার দাহিকা শক্তির মত—অজ্ঞাতাশ্রয়ী এই সম্পদ। সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের সাধনাই ভারতীয় সাহিত্যের ত্রিধর্মগামী ভাগীঐশ্বর্যধারা যাহা ভাবসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।

সাহিত্যে—বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যে বাক্য এবং অর্থ, রস এবং ভাব, ধ্বনি এবং ছন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবিষ্ট থাকার প্রয়োজন এবং তাহাই ভারতীয় কাব্যের সম্পদ এবং আদর্শ।

মস্তোজেকাধখণ্ডন্ত স্বরূপানন্দচিন্ময়ঃ

বেতাস্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মস্বাদ সহোদরঃ ॥

এবং,—ন ভাবহীনো’হস্তি রসো ন রসো ভাববজ্জিতঃ

পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥

সাহিত্য এবং দর্শন—উভয়েই লক্ষ্য প্রকারান্তরে একই। দৃঃধ দূর করা এবং আনন্দ লাভ করা। এই সুখবাদ (hedonism) পবিত্রতর, উন্নততর এবং সাধারণ সুখবাদ হইতে মহত্তর এবং উজ্জলতর। হিতবাদ এবং সুখবাদ পাখীর দুটি ডানার মত। উভয় পক্ষে ভর করিয়া কাব্য কল্পলোকে উড়ডীন হয়, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ের মিলিত শক্তির যোগে।

সাহিত্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যায় এই অর্থের সমর্থন। ‘সাহিত্য’ শব্দে এক সংসর্গ, এক ক্রিয়াধর্ম বা বৈদিক ভাষায় সমানায়ত্ব সৃষ্টি হয়। ‘সহিত’ অর্থে সংযুক্ত, সমভিব্যাহৃত। তাই বৈদিক প্রার্থনায় পাই ‘সহনাববতু’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সকলে এক সঙ্গে পালিত, শিক্ষিত, বর্ধমান, তেজস্বী এবং ঐর্ষ্যহীন হইবার সম্মিলিত প্রার্থনা।

‘হিত’ শব্দের অর্থ—যোগ্য, পথা, উপকারক, প্রিয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব ব্রহ্মস্বাদের উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অর্থ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন :

“ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে

আলোকের অতীত আলোকে।”

তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ বা প্রতিনিধিস্বরূপ ক্রান্তদর্শী, মহাকবি। তাঁহার স্বর্ষ্যচেতনা কবিত্বটির দ্বারা উদ্ভাসিত। সাহিত্যের সুখবাদও সেই অনন্ত ভূমানন্দের আন্বাদকামী। ‘নাগ্নে সুখমন্তি ভূমৈব সুখম্’। ‘আন্তনের পরশমণির’ দ্বারা তিনি baptism of fire লাভ করেন। তিনি ‘সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেল’-অন্তর দেবতার আরতি করেন। সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে তাঁহার বাঁশি ধ্বনি-বেদনারসে উচ্ছল এবং মাধুর্য রতনে উন্নত হইয়া মন্ত্রিত হয়। দুটি নয়ন মেলে অপক্লপকে দেখে যাতুয়ার যে অলৌকিক আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার অন্তর হয় পরিপ্লুত এবং ‘ভাব হতে রূপে অবিরাম’ চলে তাঁহার ‘যাতুয়া আসা’।

সাহিত্যিকের দর্শন Dialectic materialism নহে, antihumanic religion নহে, antireligious humanism নহে, egoistic hedonismও নহে কারণ ইহা ব্যক্তিগত সুখবাদ নহে। কবি বলেন, “অপক্লপ আনন্দের ভাব, বিধাতা যাহারে দেন তার বন্ধে বেদনা অপার।” ইহা ব্যক্তিগত নহে যেহেতু কবির প্রসাদ যে গ্রহণ করে সে-ই এই অপক্লপ আনন্দ বেদনা আন্বাদ করে। ইহাকে আইনষ্টাইনের কথায় cosmic religious consciousness অথবা অক্সফোর্ডের ভাষায় an L. C. M. of science, philosophy and religion বলা যায়।

সাহিত্যে মানবধর্ম—religion শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয় ‘ligo’ to bind হইতে। যাহা প্রত্যেক নর-নারীকে জাতিগত বন্ধন ছাড়াও অভিনব আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করিয়া বিখ্যমানবকে একপরিবারভুক্ত করে, তাহাকে Religion of Humanity, devotion to human interests বা Humanism বলা হয়। ইহার দেবতাও নরাকৃতি পরব্রহ্ম। ইনি এই নূতন বন্ধনে আবদ্ধ এবং অমুপ্রাণিত নিজের ভক্তগণের দ্বারা ভাবে ভাষায়, রূপে ও অরূপে পূজা গ্রহণ করেন। ইনি তিন পুরুষে মানুষ। আদ্বিতে ইনি ‘নরোত্তম’ ( বা

গীতার পুরুষোত্তম) মধ্যে ইনি 'নর' এবং ততঃপর ইনি নরের পুত্র (নর+অপত্যার্থে ঋয়ণ) 'নারায়ণ'। এই Humanism-এর প্রণাম গীত হইয়াছে মহাভারতে—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চ নরোত্তমম"। অর্থাৎ নরোত্তম বা apotheosised man, নর=average man এবং নারায়ণ বা progeny of man-কে প্রণাম জ্ঞাপন। এই নরোত্তমই গীতার পুরুষোত্তম এবং ভাগবতের ভগবান।

দর্শনে ও সাহিত্যে বসন্ত—ভারতীয় দর্শন, জগতের যিনি 'কারণং কারণানাং', তাহার পরিচয়-সূত্র করিলেন 'জ্ঞানাত্মা যতঃ' অর্থাৎ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি ভীবন্তি, যং প্রযন্ত্যতিসংবিশন্তি তদ্ব্যক্ত তদ্বিক্রিয়াদয়ঃ'। তাহার পর এই অনির্দেশ্বরূপ বস্তুটি শব্দে আর একটু আভাস দিলেন, বলিলেন তিনি আনন্দ স্বরূপ। "অনন্দোক্তো যঃ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি ভীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যতিসংবিশন্তি।" এবং পরে বলিলেন, "রসো বৈ সঃ রসং হেবাংগং লব্ধা স্তৌ ভবতি, নন্দীভবতি অমৃতী ভবতি।" বলিলেন, "স এব রসোনাং রসতমঃ"। এই রসই সাহিত্যের ভূমি, অথবা আনন্দ চিন্ময়স্বরূপ ইনি "কখনো বা ভাবময় কখনো মূর্তি।"

"তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে।" কবি আশং করেন : "উত্তরিত্ব একদিন শাস্ত্রিত্ব শাস্ত্রের উদ্দেশে চঃখহীন নিকেতনে।" সেনিকেতন হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না 'ন স পুনরাবৃত্ততে' বা 'বদগত্যা ন নিবর্তন্তে'। সে-লাভ অপেক্ষা অধিকতর লাভ নাই সে-সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখও নাই। তাহা "বুদ্ধি-গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্"। ভারতীয় সংস্কৃতির 'ধর্ম' ধারণাত্মক, গ্রহণাত্মক, সমগ্রাত্মক। সমুদ্র যেমন "নদীনাং বহবোশু বেগাঃ" অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া শান্তভাবে গ্রহণ করে এবং আশ্রয় করে—ভারতীয় সংস্কৃতিও তদ্রূপ। 'যত মত তত পথ' বলেন জীৱামকৃষ্ণ। মহিষ স্তোত্রও তাহাই বলেন—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃচ্ছ কুটিল নানাপথজুযাং

নৃণামেকো গম্যন্তমপি পয়সামর্ষ ইব ॥

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, কিন্তু এক গম্যস্থান। যে যেমন পারে টেনে ইষ্টিমারে হোক সেথা আশ্রয়ান ॥"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য—পশ্চিম বলেন—চাহিদা বাড়িও—বত পাও তত নাও এবং আরও চাও। ভোগের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। ভোগ কর। ভারতবর্ষ বলেন, চাওয়া কমাও, তাহা চাহিয়া কি হইবে বাহা দ্বারা জীবনে অমৃতত্ব লাভ হইবে না। "বেনাহং নানুভাব্যঃ কিমহং তেন কুর্য়াম্?" যেহেতু "হরতি নিমেঘাং কালঃ সর্কম্।" কারণ চাহিয়া এবং পাইয়া জীবের অনন্ত তৃষ্ণা মিটিবার

নহে। অগ্নিতে দূত দিলে আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে ভোগ দিলে—"ভূয় এবাভিবর্ধতে।" ববীল্লনাথ বলেন—

এ কেবল দিনে রাতে

জল ঢেলে ফুটা পাতে

বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটিবাবে।

দর্শন ও কাব্য—দর্শন প্রথমে নিম্ন খণ্ডিয়া গিয়া পরে চিনি দেয়। কাব্য প্রথম হইতেই মধুরাশ্ব দেয়। তাই "কাব্যং হি দর্শনং হস্তি", যদিও উভয়েই দেয় চরমে পরম আনন্দ। তাই সূত্রকার বলেন, "প্রয়োজনমানন্দঃ কাব্যাত্ম" "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" "মনোহাংগিণ্যো শব্দার্থো কাব্যম্।" তাহার মনোহারিত্বের কারণ, রস-মাদুর্য্য, ভাব-বৈচিত্র্য ছন্দঃ সৌন্দর্য্য এবং অলঙ্কার-সৌকুম্য, যাহার দ্বারা কাব্য রাসক-জনকে আত্মস্থিত করে। তাই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া পরে বেদব্যাস ভাগবত রচনা করিয়া চরিতার্থ হন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—ভারতবর্ষ উপলব্ধি করিয়াছে যে, প্রকৃত স্বার্থ লাভ হয় পরার্থপরতায়, তাই এখানে শ্রুতি বলেন, 'তেন ত্যক্তেন ভূজীযাঃ' তাপের মুখে ভোগ করিবে অর্থাৎ ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে হইবে ইহাই প্রকৃত আশ্রয়প্রসাদ। নচেৎ স্বার্থ সেবায় লোভই বাড়িয়া উঠে তৃষ্ণা লাভ হয় না। তাই মহাকবি বলেন :

"স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুদ্রমানল

তত তার বেড়ে উঠে বিশ্বধাতল

আপনার খাচ্ছ বলি না করি বিচার

জঠরে পুঁতে চায়।"

কারণ এই লোভ, এই কাম, 'মহাশনঃ' 'মহাপাপাঃ' মানুষের মহাটের। চাহিয়া না পাইলে ইহা হইতেই ক্রোধ হয়, হিংসা হয়। যাহার ফলে আত্ম আত্মসকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দেখিতেছি "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিরূর দ্বন্দ্ব।" ভারতবর্ষ শান্তিকামী, প্রতাহ প্রতী অমৃষ্ঠানে শান্তিমন্ত্র তাহার অবস্থা পাঠা "যদিহ যোঃ যদিহ ক্রুরং যদিহ পাপং তচ্ছা তচ্ছিবৎ সর্কমিব শমস্ত নঃ।"

সমস্ত পৃথিবীর তপণ কামনা করিয়া সে নিত্য তপণ করে "ও আত্মকন্তুষপঞ্চং জগৎ তৃপ্যতু" ইহাই ভারতীয় দর্শনের, ভারতীয় সাহিত্যের, তথা সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

যোগীকে নিরাময় করিয়া, অভুক্তকে অন্নদান করিয়া, দুঃখিতকে আনন্দ এবং ভীতকে অভয়দান করিয়াই তাহার আনন্দ। 'আত্মোপায়োন' সর্বত্র সমদর্শনই তাহার দর্শনের শিক্ষা। আমরা এই শিক্ষা ও আদর্শ হইতে কত দূরে, পড়িয়া রহিয়াছি তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষ বলেন, বাহা দেওয়া হয় তাহাই সার্থক হয়,

যাহা না দেওয়া হয়, শুধু নিজের অসখা ভোগে বা বিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহা ব্যর্থ হয়। “ভগ্নং যন্ন দীয়তে।”

ভারতবর্ষ ও কমিউনিজম—আজকাল ক্রিশিয়ার Commu-nism-এর উদারতায় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্ত বলা প্রয়োজন যে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর মতবাদ বহু পূর্বে ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে তাহারই বীজ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ক্রিশিয়াকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন : “যাবন্তি য়েত জঠরং তাবৎ স্বয়ং হি চেহিনাম। অধিকং যোভিমন্তেত স জ্ঞেনো দণ্ডমর্হতি ॥” নিজের ঠিক যতটুকু অবশ্য প্রয়োজন তাহার অতিরিক্তে যে লোভ করে সে তৎস্বের মত দণ্ডনীয়। নিজের আবশ্যিক প্রয়োজনটুকুই তাহার প্রকৃত স্বয়ং। এই বুনিয়াদের উপরেই মহাজ্ঞানীর trusteeship বা ত্রাসবন্ধার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। যাহার নিকট উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা তাহার নিকট শুল্ক আছে মাত্র। দেশের সঙ্কটমুহুর্তে তাহা অন্নান মুখে দান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের চিকিৎসার আদর্শ—মহান্ এবং লোকোত্তর। “নাস্বার্থং নাপি চার্থার্থম্ অথ ভূতদ্বয়ং প্রতি”—চিকিৎসক চিকিৎসা করিবেন তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা কাম্য কামনা বা স্বশোলিঙ্গা চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে, শুধু যোগীর প্রতি, আত্মবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাহারই দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্ত।

“কুর্কতে যে তু বৃত্তার্থং চিকিৎসা পণ্যবিক্রয়ং, তে হিহ কাঞ্চনং রাশিং পাণ্ডুরাশিমুপাসতে” যাহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পণ্যস্ববের মত বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করে তাহারা কাঞ্চনরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশির সমাদর করে।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান—ভারতীয় আদর্শে নারী দেবীর মত পূজা পাইবার যোগ্য। “যত্র নারীন্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।” চণ্ডীতে দেবী সমগ্র নারীশক্তির

মধ্যে ওতপ্রোতরূপে প্রকাশিত—“স্মিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।” তাই বিবাহের মন্ত্রেও দেবি “সত্রাজ্ঞীস্বপ্তরে ভব।”

ভারতের কর্মযোগ—ভারতীয় আদর্শে জড়তা বা আলস্যের স্থান নাই। গীতা প্রত্যেক নরনারীকে নিয়ত কর্ম করিবার এবং স্বশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হইবার প্রেরণা দিয়াছেন। “নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং” “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন।” জ্ঞানের দেবতা শরস্বতী এখানে “নিঃশেষ জাড্যাপহা”।

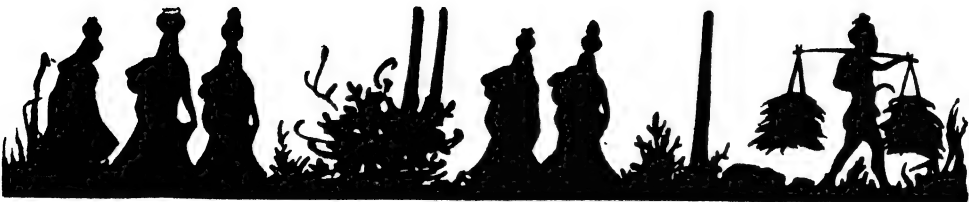
ভারতের ভক্ত সাধক স্বর্ধলিপ্সাহীন—ভারতবর্ষের ভক্ত সাধকগণ নিজের স্বর্গ, নিজের সুখ, বা নিজের দুক্তির জন্ত প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের আদর্শ মহাশয়, তাঁহারা বলেন :

“ন কাময়েহং গতিমাম্বয়ং পরাম্--আতিং প্রপদে,হখিল দুঃখভাজাম্” তিনি ঈশ্বরের নিকট পরমা গতি প্রার্থনা করেন না। দুঃখশোকাকর্ষ জনেব বেদনার অংশভাগী হইতে চাহেন, যাহাতে তাহাদের দুঃখের কণমাত্রও লাঘব হয়।

উপসংহার : আজ কোথায় এই আদর্শ ভারত, আর কোথায় আমরা পতিত ভারতবাসী। তথাপি মহাকবির ভাষায় বলিব, ‘তা বলে ভাবনা করা চলবে না’ স্মৃতরাং “আগে চল, আগে চল তাই।” গীতার ভাষায় বলিব, “উদ্ধবেদাস্তনাস্তানং নাস্তানমবসাদয়েৎ”—কারণ “নহি স্পৃশ্যন্ত সিংহন্ত প্রবিশন্তি মুখে যুগাঃ”। স্মৃতরাং “কুরু পৌরুষমাস্ত্যক্ত্যা”—সকলে আপন শক্তির সমস্তটুকু প্রয়োগ করিয়া ‘আদর্শ’-সিদ্ধির জন্ত যত্নবান হউন। স্বাধীন ভারত আদর্শনিষ্ঠ হইয়া যশস্বী হউক। ভারতবর্ষ নিখিলের মঙ্গল প্রার্থনা করে এবং সেই প্রার্থনার স্বারাই এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করি :

“সর্বৈ ভদ্রাণি পশুন্ত সর্বৈ সন্ত নিরাময়াঃ।

সর্বৈ ভবন্ত সুখিনো মা কামদঃখভাগ্ ভবেৎ ॥”







# চোরকাটা

মরিচকাটা  
মজুমদার

ত্রেক-কথা নয়ত, যেন জদপিণ্ডের ওপর পা দিয়ে শাপন।  
আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝি ছড়মুড় করে যাত্রীসমেত  
বাসটা একেবারে নদীগর্ভে গিয়েই পড়বে। পারঘাটামুখো ঐ  
চালু গড়ানে বাস্তব অমন ছরস্তু গতিতে গাড়ীটা নামানোই  
বা কেন আর অমনভাবে ত্রেকুই বা কেন কথা।

—ব্যস, এইবার নাহুন স্তার। থেল খতম।

কথাগুলো বলল ভূষণ জ্বাইভার। ওরই পাশটিতে বসে  
নানা বিষয়ে আলাপ করতে করতে আসছিলাম এই দীর্ঘ  
আড়াই-ঘণ্টার পথ। সরকারী অফিসার, বাচ্ছি সুলতান-  
পুরের জমিদার বাড়ীতে, এই সব শুনে বেশ ঝাতিবই করল  
ভূষণ।

—আপনাকে ত দেখছি কেউ নিতেও আসে নি বাবুদেব  
বাড়ী থেকে। এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে নিয়ে শেষে ভূষণ  
ওপর-পড়া হয়ে বললে—কিস্থ ভাবতে হবে না স্তার, আমি  
সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

কুলি কয়েকজন মুখিয়েই ছিল, তাদের মধ্যে চতুর খেটা  
সে ইতিমধ্যেই আমার হাতের থলেটা টাম মেয়ে কেড়ে নিয়ে  
বলল—আমুন বাবু, আমি পৌছে দেব।

ভূষণ বললে—জাঁড়া ব্যাটা। শুধু কি থলেটাই? সাথে  
কি তোকে গির্দোড় বলি। নে, বাকি মাল নে।

কণ্ঠাষ্টার গুণে গুণে আমার মাল তিনটে নামিয়ে দিল  
গির্দোড় অর্থাৎ গদাধরের মাথার।

—বুঝলি? সাহেবকে নিয়ে যা বাবুদেব বাসায়।  
কলকাতা থেকে এয়েছেন।

পরশে ধবধবে আমি প্যান্ট, সরকারী অফিসার, লতএব  
ভূষণ 'সাহেব' বলেই সম্মানিত করল। মুখে-চোখে  
অর্ধমুট ধস্তাবাদ একে আমি গদাধরের পিছু নিলাম। পারা-  
পারের কড়ি মিটিয়ে চালু পথ বেয়ে নামতে লাগলাম। ইতি-

মধ্যেই মনে গ্রাম্য পরিবেশের মাধুর্যের ছোঁয়া লেগেছে। চালু  
বালি-বালি পথ মাড়িয়ে নামছি আর তাকিয়ে তাকিয়ে  
দেখছি চারিদিক। ছলু ছলু কল কল, চেউগুলো না জানি  
কি-কথা কইছে তটভূমির সঙ্গে। দূরে বলাকার সারি।  
ও-পারে একটা বড় নৌকার পাটাতনে পাট বোঝাই করছে  
কুলিরা। হুঁহা এখন পাটে বসেছেন। গদাধর পারের  
নৌকার মাল নামাল। আমিও উঠলাম।

উপুড় হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে গদাধর শুধাল—  
আপনি কি বাবুদেব আত্মীয়-কুটুম্বী?

পরিচয়টা কি জানি কেন গোপনই করে ফেললাম।  
বললাম—হ্যাঁ। গদাধর জানল না, আমি জমিদারদেব কত  
বড় শত্রু, আজ এসেছি ওদেবই অতিথি হতে। সরকার  
পক্ষ থেকে আমার পাঠিয়েছে। জমিদারী-প্রথা বিনশ্তি-  
সাধনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, আমি তারই প্রতিমুষ্টি  
হয়ে চলেছি শেষ যবনিকা টেনে দিতে। অনুষ্টের সবচেয়ে  
বড় পরিহাস এই যে, ঐ বাবুদেবই বারমহলে সরকারের  
আগিস খোলা হচ্ছে আর আমি সেই আগিসের অফিসার  
হয়ে চলেছি ঐ বাবুদেবই অধিকারের ওপর যুগদাবির স্বাক্ষর  
দিতে।

—নাহুন বাবু।

নৌকাটা তবু তবু করে বয়ে ইতিমধ্যেই বাটে ভিড়েছে।

—বাবুদেব কি চিঠি নেকেন নি? কেউ ত নিতে এয়ে  
নি আপনাকে?

আমি চুপ করে রইলাম। রংগোলাম গদাধর পিছু  
পিছু।

ইট সাজিয়েছে সিঁড়ির মত। কুলিদেব পাশ কাটিয়ে  
ওপরে উঠছি। পরশের প্যান্টে কাছামাটির ছোপ বাঁচাতে-  
মাঝে মাঝে অশ্বখগাছের বিস্তৃত শিকড় ধরে টাল



সামলাজিলাম। কলসী কাকালে দুটো যুবতী বউ নেমে  
বাচ্ছিল বাটে, আমার আড়ষ্টতা দেখে তারা মুচকি হাসল।

বাটের ওপরটা বেশ জমজমাট। গোটা পাঁচেক দোকান।  
পাশ দিয়ে কংক্রিটের রাস্তা এঁকেবঁকে কোথায় কোন ভিন-  
দেশে চলে গেছে, আম-কাঁঠালের বন পেরিয়ে খাল-বিল  
ডাইনে-বায়ে ফেলে।

—অনেক দূর নাকি বে বাবুদের বাসা ?

—না বাবু, এই ত কাছেই।

বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে যেঠো পথে নামতে হ'ল। আঁকা-  
বাঁকা পথ। একটা অড়হর ক্ষেত পড়ল। সেটা শেষ  
হতেই একটা মাঠ।

—এই মাঠ পেরোলেই উই আমবনের মধ্যে বাবুদের  
বাসা।

—তাই নাকি ! বাঁচলাম। চল।

বিস্তৃত মাঠটা ষিক্ ষিক্ করছে চোরকাঁটার। বেশ বড়  
বড় বাড়। ডগাঙুলে কটা-কটা রং, তাতে কালচে-লালের  
ছোপ। একটু চিত্তিত হলাম। প্যাণ্টের আর কিছু  
ধাকবে না।

—ইস, এ কি কাণ্ড রে গদাধর। এতো চোরকাঁটা।  
এটা কাঁদের মাঠ ?

—বাবুদের।

—সাক করে না কেন ? অসম্ভব চোরকাঁটা যে।

সাক কি আর বাবুবা করবে বাবু। কেউ জমা নিত  
ত হ'ত।

—মের না কেন ? ফসল তুললেই পারে। ঐ ত  
পাশেই কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অড়র ক্ষেত।

—এ জমি কেউ নেবে না বাবু। এ-মাঠে মেয়েছেলে  
খুন হয়েছিল।

—খুন হয়েছিল ? সে কি রে ? কারা করেছিল ?

—বাবুবা। জমিদার চন্দ্রমৌলী চৌধুরী। এ জমিতে  
ফসল করবে কি বাবু, চাষীর বলে—ফসল বিধে লাল হয়ে  
যাবে, মেয়েছেলের রক্ত খেয়েছে এ-জমি।

আশ্চর্য লাগল। কিন্তু আশ্চর্য হবারই বা আছে কি !  
কবেকার সেই সামন্তযুগ থেকে পৃথিবীর অনেক মাটি রক্তে  
লাল হয়েছে এমন। কখনও জমি দখল নিয়ে, কখনও বা  
মেয়েমানুষ। জমিদারেরা দেশের অনেক উপকার করেছে,  
কিন্তু কৃতজ্ঞতার স্বরে অসংখ্য জুতি জমা রেখেও মানুষ  
হাঁফিয়ে উঠেছিল ওদের শোষণে আর অত্যাচারে। সেই  
পুঞ্জীভূত পাপের ফলেই যুগের দাবিতে আজ জমিদারী-প্রথা  
বিলুপ্তি খটছে। আর আমি চলেছি সরকারের প্রতিনিধি  
হয়ে সেই জমিদারী-প্রথার চিত্তা সাজাতে। পথ দেখিয়ে  
নিয়ে চলেছে জমিদারের দরিদ্র-নিপীড়িত প্রজাদেরই এক

বংশধর। চোরকাঁটার তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রভাগ আমার পরণের  
প্যাণ্ট ভেদ করে হাঁটু পর্যন্ত বিঁধে দিচ্ছে।

মাল তিনটে নামিয়ে গদাধর বলল—এটা কাছারি-বাড়ী।  
বাবু! বোধ হয় ভিতর-বাড়ীতে। ডাকব ?

—হ্যাঁ, ডাক।

—কি বলব বাবুদের ?

আমি কার্ড বার করে দিলাম, বললাম—এইটে দেখাবি,  
বুঝবেন। গদাধর চলে গেল। পূর্বদিক বেড়ে যে রাস্তা  
গেছে, সেইটে ধরে। আমি বাঁধানো চত্বরের ওপর ক্রমাল  
পেতে বসলাম। এদিক-ওদিক চাইলাম। জনপ্রাণী নেই  
যেন, কেমন থাঁ থাঁ ভাব। একটা দারোয়ান নেই ? বা  
অস্ত্র কোন কক্ষচারী ? ওদের কাউকে এখনও পর্যন্ত না  
দেখে অবাক হলাম। হঠাৎ বিনা নোটাশে আসা নয়। চিঠি  
দেওয়া হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে। আমার নাম, কোন  
তারিখে কোন গাড়ীতে যাচ্ছি, সব কিছু। বিষয়টা বিশ্লেষণ  
করে দেখতে লাগলাম। না, ওদের দোষ দেওয়া যায় না।  
রক্ত মাংসেরই মাহুত। আমার ওপর একটা বিদ্রোহ  
ধাকারই কথা। অন্ততঃ সংবর্ধনা জানানোর কারণ নেই।  
দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ফটকে। কি বিরাট, কি কারুকাঠ্য !  
মানুষানে মস্ত বড় রাজমুহুর, তার নীচে অর্ধবৃত্তাকারে লেখা  
God Save the King ! বর্ষাব জলে মরচে ধরেছে, কেউ  
আর নতুন করে রং দেয় না। বাগানটা ত্রিঙ্কুন। অভিজাত  
গোলাপ গাছের বংশধরদের অসংসদ থেকে বাঁচাবার জন্য  
আগাছাদের চুলের মুঠি ধরে উপড়ে ফটকের বাইরে কেলে  
দেবার মত অভিতাবক মালোও কি নেই একটা ? পিছন  
ফিরে দেখি, স্থলিতবাস এক বিদেশিনী, অপর্যব থেকে-  
প্রশ্রমমুষ্টি কেমন তামাটে বিগত-যৌবনা হয়ে পড়ে আছে  
পিছনে। বাগানেরই এক কোয়ারার জলে একটা হয়ত  
জ্ঞান করত রূপসী, স্থানচ্যুত হয়ে এক পাশে পড়ে আছে  
আজ।

—কিছু মনে করবেন না দিব্যানুবাবু ! আপনাকে  
বসিয়ে রাখলাম। পিছন ফিরে চাইলাম। দেখি, এক  
সুদর্শন তরুণ, চাবি হাতে আসছেন, কাছে এসে নমস্কার  
করলেন। প্রতি-নমস্কারের সময় লক্ষ্য করলাম তরুণের  
দীর্ঘ দেহ-সোষ্ঠ-বের মধ্যে শুধু আভিজাত্যের সমস্ত ঘোষণাই  
নয়, বিনীত শালীনতাও আছে।

—কামরা বড় লজ্জিত। কাকাবাবুর হঠাৎ ব্লাডপ্রেশার  
বেড়েছিল, তাই আপনাকে 'বিসিত' করার জন্য লোক  
পাঠাতেও পারি নি।

—না, না, তাতে কি হয়েছে। মনটা হাক্ করে

বললাম—নির্দিষ্ট যতখানা খুলে দিয়ে উনি চাবিটা আমার হাতে দিলেন।

—আপনিই কি শ্রীবিক্রমকান্তি...

—না, বিক্রমকান্তি আমার কাকার নাম। আমি তরুণকান্তি। ফিরে এসে আবার আলাপ করব। এখন চলি, আপনার চা, জলখাবার ও হাত-মুখ ধোয়ার বন্দোবস্ত করি।

সন্ধ্যা নামো-নামো। চৌকির ওপর চিৎ হয়ে ভাবছিলাম, আগামীকাল আমার সহকারীরা কাগজপত্র নিয়ে এলে পর আপিসটা সাজাতে হবে। গৌছানো সংবাদ দিয়ে চিঠি দিতে হবে মাকে আর স্ত্রীকে। ভাবছিলাম, ঐ যে বাড়লগঠনটা ঝুলছে সিলিং থেকে, কত দাম হবে ওর? দু'তিন হাজার?

—দ্বিব্যন্দুবাবু কি গুয়েছেন? তরুণকান্তি ডাকলেন ঘোরগোড়া থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

—না, এমনি একটু গড়িয়ে নিছি। আসুন না ভেতরে।

—কাকাবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন। ডাকছেন। আসবেন না কি?

—কাকাবাবু! ওনারই না রাডপ্রেসার? অসুস্থ বলছিলেন, তবে কেন... তরুণকান্তির মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম।

—দীর্ঘদিনের অভ্যাস, কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। এই সময় অন্ন একটু পায়চারি করে কাছারী-ঘরে বসবেনই, তা সে যত খারাপই হউক না কেন শরীর। তাছাড়া আপনি একজন অতিথি এসেছেন বাড়ীতে, আপনার সঙ্গে দেখা না করে হাঁফিয়ে উঠছেন উনি।

তাড়াতাড়ি জামা পরে এগোলাম। কাছারি ঘরে প্রবেশমাত্র বৃথতে পারলাম, কে মধ্যমণি। তরুণকান্তির কাকা কোন্ জন। 'আসুন দ্বিব্যন্দুবাবু' বলে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন বলেই যে তাঁকে চিনলাম তা নয়। হাজার লোকের মধ্যে নির্বাক বসে থাকলেও এ-লোককে চেনা যায়। টকটকে রং, মানানসই কালো বন সযত্নালব্ধ পোঁফজোড়া। স্ত্রীমণি দেহখানা যেন মুর্ত্ত সামন্ততন্ত্র। নিখুঁত সুন্দর সেগুন কাঠের মস্ত চেয়ারে বসে আছেন ঠিক মাঝখানে, ডাইনে-বামে কয়েকজন। মাথার ওপর ঝাড়-লগঠনটা নিপ্রাণীপ হলেও মানাচ্ছে।

—নমস্কার! বলে, বিক্রমকান্তির ঠিক সামনে টেবিলের ওপারে লম্বা বেঞ্চে বসলাম।

বসার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমকান্তির পার্শ্বচরিত্রা সমন্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে ক্যাল-ক্যাল

করে চাইলাম। মেঘউষকর মত গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বিক্রমকান্তি জানালেন—ওটা প্রজাদের আসন। আপনি উঠে এসে এখানে বসুন।

লজ্জায় কান দুটো লাল হয়ে গেল। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'ল। ওটা প্রজাদের আসন! যুযুঁ'জমিহারা-প্রথার ঝুটা বনেদীয়া না আমার মত চাকুরিয়াকে যেন তীব্র ব্যক্তের কমাঘাতে জর্জরিত করে দিল। নিঃশব্দে উঠে অল্প আসনে বসলাম।

—আমি খুব লজ্জিত দ্বিব্যন্দুবাবু, আপনার সম্বন্ধনা হয় নি তেমন! আপনার কোন অনুবিধা হয় নি ত?

—হয় নি, হলে জানাব। রাগত: বলে ফেললাম কথাটা।

এর পর আলাপ সুরু হ'ল। ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন। আমিও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে গেলাম। আর, কথার ফাঁকে ফাঁকে চোখ ফিরিয়ে দেখে যেতে লাগলাম ঘরের আসবাব-পত্র, জানালা-দরজা, মেঝের গালচে, দেওয়াল-টাড়ানো বাইসন, বনশূয়ের আর হরিণের মুণ্ড, আর চওড়া সোনালী-ফ্রেম-বাঁধানো বড় বড় ওয়েলপেটিংগুলো। আমার চোখে-মুখে কৌতূহল লক্ষ্য করেছিলেন বোধ হয় বিক্রমকান্তি।

—ওগুলো আমার দ্বাদার শিকার। তরুণের বাবার। অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল তাঁর। ঐ যে—

ওর সামনের দেওয়ালে প্রলম্বিত বিরাট অয়েলপেটিংটার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বিক্রমকান্তি বললেন—ঐ হ'ল আমার দ্বাদার ছবি! আমি নিজেও এতক্ষণ ঐ ছবিটারই পরিচয় জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। এমন আশ্চর্য পৌরুষ-দীপ্ত দেহখানা কার? গুলীবিদ্ধ সিংহটার ওপর পা রেখে হাতে রাইফেল নিয়ে ঐ যে ছঃসাহসী পুরুষসিংহ, তার সঙ্গে তরুণকান্তির মিল খুঁজে পাই কি না দেখলাম একবার।

—বাবের থাবাতেই মৃত্যু হয়েছিল দ্বাদার!

আত্মীয়বিশ্লোগের বেদনামখিত দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল বিক্রমকান্তির বুক থেকে।

ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন এক মুসলমান বৃদ্ধ। জীর্ণ দেহখানা যতখানি সম্ভব ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন—আস-সালাম-আলাইকুম!

—এস হুফল মিঞা। বিক্রমকান্তির কণ্ঠস্বর থেকে অগ্রজবিশ্লোগ ব্যথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।—তারপর, কি খবর?

—আর খবর ছোটখাট। বলতেও লজ্জা হয়। আপনার এখানে আসতেছিলাম ছেলেটা মেট্রিক পাশ করল খবর দিতে, তা কুদ্দুস মিঞার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। শুধোলে, কোথায় যায় গো? বললাম, ছোটখাটকে শুভ খবরটা দিলে

আসি। তা, কুদ্দুস কি কইল জানেন? আল্লা জানেন, কি জখম পেলাম বুকের মধ্যে। কুদ্দুস কইল—আবে ওদের আর খোঁসামুদি করে লাভ।

হুজুরের মুখের দিকে তাকালাম আমি। সবল অহুগত প্রকার অকপট বেদনাবোধ তার চোখে-মুখে। বুড়ো পাক্কায়া জখম পেয়েছে বলেই কথাগুলো সবলভাবে বলেছে। বরখানা ধমধমে হয়ে গেল। খাঁচার বাঘ যেমন বাগে গরগর করে লোহার গরাদে খাণা মেয়ে বিফল আক্রোশে ফিরে যায় ঠিক তেমন এক চাপা ক্রোধ ফুটে উঠল বিক্রমকান্তির মুখমণ্ডলে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। হাতের ছিটিটা চেপে ধরলেন বার কয়েক। ক্যাকাশে আনন্দ প্রকাশ করলেন একবার—তোমার ছেলে পাস করেছে শুনে খুশী হলাম হুজুর।

আমার বুকখানা কিন্তু কি এক বুনা-উল্লাসে সাত হাত হয়ে গেল। ওটা প্রজাদের আসন। চমৎকার হয়েছে, ঐ প্রজাদের আসন থেকেই শেষ প্রজা হুজুরমিঞার সবল কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল চরম অপমান। খোলা পিঠের ওপর 'সপাং' শব্দে চাবুক যেন।

—ব্লাডপ্রেসারটা আবার যেন বাড়ল তরুণ। বলে, ভীত-দুষ্টি মেলে অসহায় বিক্রমকান্তি চারপাশে তাকালেন একবার। ওরা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করে ওকে ভিতর-বাড়ীতে নিয়ে গেল।

রাত্রি ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেবে বিছানায় এলিয়ে রবি ঠাকুরের 'জুখিত পাখান' পড়ছিলাম। সার্থক গল্প বটে, খানিকক্ষণ পড়ার পর মনে হ'ল কে যেন আমার ঘরে ঢুকে 'সব বুট হায়', 'সব বুট হায়' বলে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। বই বন্ধ করে বসলাম চোরকাঁটা ছাড়াতে। একটা, দুটো তিনটে,...ছেলেমানুষের মত শুনে শুনে একটা একটা করে খবর কাগজের ওপর রাখতে লাগলাম। তামাটে, ছুঁচলো, ভীক্ষাগ্র চোরকাঁটা। এমন যে শক্ত জিনের কাপড় তারও বুদন ভেদ করে কি আশ্চর্য্য চাতুর্য্য চোরের মত চুপি চুপি প্রবেশ করেছে। অবাক হচ্ছিলাম দেখে দেখে। চোরকাঁটা। উপযুক্ত নাম।...একশ', একশ' এক, একশ' দুই...এবার ঐর্ষ্য হারালাম। অসম্ভব, আর গোনা হ'ল না। তবু ছাড়িয়ে যেতে লাগলাম—শক্তির শেষ রাখব না। সামনের হারিকেনটা যেন আলোর নয় অন্ধকারেরই বস্ত রচনা করে চলেছে বেশী। যেন চোরকাঁটার শব্দে তার মিডালি। ও জানে না এ বিষয়ে চাণক্যের মত জিজ্ঞাসা আমার। প্যাণ্টের ক্রীজ নষ্ট হলে শান্তির ভাঁজ নষ্ট হয় মনের, চোরকাঁটার উপদ্রব অসহ্য আমার কাছে। টেনে টেনে বার করে বাব শেষ চোরকাঁটা পর্য্যন্ত। মাঠের ছবিটা

মনে পড়ল বার বার। সেই চোরকাঁটার মাঠ, বিকৃষ্ট করছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। মনে পড়ল গদাধরের কথা—এ মাঠ কেউ জমা নেবে না। ফসলে দোষ হবে, মেয়ে-মানুষের খুন খেয়েছে এ জমি। খবরের কাগজের ওপর জুপীকৃত চোরকাঁটাগুলো দেখে তাই মনে হয়। যেন এক রাশ মশা, রক্ত চুষে খেয়েছিল আকর্ষ, তারই কালচে রং নিয়ে মরে পড়ে আছে।

আহা-হা—হো-ও-ও-ও।

যেবর গা-লাগা কাছাকাছি কোনখান থেকে হঠাৎ হাঁক পড়ল একজন। বুঝলাম চৌকিদার। তার কাঁপা কাঁপা হাঁক তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। লাঠি ঠুকে এগিয়ে এসে গলা খাঁকারি দিল। আমার আলোটা জ্বলছে দেখে আলাপ করতে এল।

—কে?

—হাম চৌকিদার বাবুজি।

—ও। বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম। আমার চোরকাঁটা-ছাড়ান ও না দেখে, এই হচ্ছে।

মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকে চৌকিদার বললে—আপ ত সবকারী অফসর হ্যায় বাবুজি।

—হ্যাঁ, আমি সবকারী কাজেই এসেছি। তোমার নাম?

—অযোধ্যা সিং।

—কদিন কাজ করছ?

—হাম? চালিশ সাল হো গিয়া বাবুজী। হামারা নানা কিয়া দশ সাল, পিতাজী তিশ আওর হাম চালিশ।

অবাক হয়ে গেলাম। চল্লিশ আর ত্রিশ সম্ভব, সম্ভব আর দশ আশী।—আশী বয়স?

—হ্যাঁ হুজুর, আশী বয়স সেবা কিয়া হুজুর লোগোঁকো।

ওদের এই বংশপরম্পরায় সেবা করার গর্ব্বটা যেন কসু-করাসের মত অলজ্বল করে উঠল।

নারকেল দড়ির চারপাইয়া টেনে মাথার যুরেটা আর হাতের লাঠিটা রাখতে রাখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অযোধ্যা সিং।

—আপ লোগ সমত্যানাশ করু দিয়া বাবুজী।

—সত্যনাশ। মানে?

—জমিদারী ছিন্ লেনেকো আয়া আপ। হ্যায় না?

—আমি ছিনিয়ে নিতে আসি নি অযোধ্যা। সবকার ছিন্ লিয়া।

—একহই বাত হুজুর, আপহই সবকার।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়ো অযোধ্যা সিং প্রশ্ন করল—আব হামারা ক্যা হোণা? হামারা লড়কা ক্য ক্যা হোণা?

অযোধ্যা সিংয়ের সহায়হীনতা বরে বরে পড়ল কথা-  
ভুলোয়—মূলকমে কুছ নেহি। না জমিন, না জোখনেকা  
পাই, ইয়া বলহ। হামারা লড়কা তুখা মবে গা।

আমি চুপ করে গেলাম, কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।  
অযোধ্যাই অবশ্র অস্বস্তি কাটাল আমার। বললে—চোরকাটা  
বাইরে এনে দি', খানিকক্ষণ গল্প করি।

তাই হ'ল, বসলাম বাইরে। অযোধ্যা বীয়ে বীয়ে তার  
জীবনের ঘটনা বছরের পুরনো পাতা উলটে উলটে অনেক  
কথাই বলার টেঙা করল। এত বড় একটা জবরদস্ত জমিদার  
বাড়ীর স্বাভাবিক সম্পত্তি চৌকী দেওয়ার দায়িত্ব যে কি বার  
বার বোঝাবার চেষ্টা করল অযোধ্যা।

—তরুণবাবুকা পিতাজী হামুশে পাঁচ দিনকা ছোটা  
খা।

—তা হলে তোমরা সমবয়সী ছিলে ?

—জী। এক সাথ খেলা হামু দোনো।

—কি নাম ছিল তাঁর ?

—চন্দ্রমৌলি চৌধুরী।

—কি, কি ? চন্দ্রমৌলি ?

—হাঁ ছজুর, বড় দিলদার জমিদার থে'।

জমিদার চন্দ্রমৌলির জুয়র যে কত দরাজ ছিল সে দুষ্টান্ত  
দিচ্ছিল অযোধ্যা।

—কিন্তু মুটে গদাধর যে বলছিল, চন্দ্রমৌলি ঐ মাঠে  
এক মেয়ে খুন করেছিলেন। সেই খুনে-জমিদারই তরুণ-  
কান্তির বাবা। সেই হ'ল দিলদার জমিদার ? আমার  
কৌতূহল যেন দাপাদাপি শুরু করে দিল বুকের ভেতর।  
জিজ্ঞেস করব নাকি অযোধ্যাকে ?

—অযোধ্যা সিং। খুব চাপা গলায় ডাকলাম। ছায়া-  
ছায়া পরিবেশের মধ্যে আমার সেই সন্তর্পণ সোধোন যে অর্ধ-  
পূর্ণ বুকেছিল অযোধ্যা।

—বোলিয়ে ছজুর।

কাছে এগিয়ে এসে তার চারপাইয়ায় বসলাম। চারি-  
দিকে চেয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—এক  
বাং পুছেগা ?

—হাঁ হাঁ, পুছিয়ে।

—চন্দ্রমৌলি জমিদার ত খুনে লোক শুনেছি।

অযোধ্যা সিং তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। তার লোল-  
চর্খ মুখমণ্ডলের মধ্যে জলন্ত অগ্নিপিশুর মত জলজল করে  
উঠল চোখ দুটো। তার প্রশ্ন—কে বলেছে ? কোন বেকুফ  
বলেছে ?

আমিও রুখে উঠলাম—কে আবার বলবে ? আমার  
কাছে আবার গোপন করছ কি ? এ গাঁয়ের সকলেই জানে  
চোরকাটার মাঠের কথা।

—ও চোরকাটার মাঠের কথা শুনেছেন আপনি ?

—নিশ্চয়।

—ও এমন ছ'একটা ঘটনা জমিদার মাজেরই জীবনে  
ধাকে বাবুজি। তা ছাড়া ওকে খুন করা বলে না। চন্দ্র-  
মৌলি খুন করতে চায়নি মনসুরবাবুকে।

—মনসুরবাবু ? কে এই মনসুরবাবু ?

—লক্ষ্মী শহরকা এক বাড়ীজী, এক নোটজী।

একরাশ কৌতূহল অসংখ্য প্রশ্নের রূপ ধরে আখালি-  
পিখালি শুরু করে দিল আমার কণ্ঠে। মনে হ'ল অযোধ্যা  
সিংকে ফুলিয়ে ডেকে নিয়ে যাই আমার বরে, তার পুর  
পাশে বসিয়ে চুপি চুপি বলি—তোমার ছেলেকে একটা খুব  
ভাল চাকরি করে দেব অযোধ্যা, তুমি শুধু বল দেখি মনসুর-  
বাবুজীর পরিচয়। কিন্তু এমন অধৈর্য্যতা অশোভন। বললাম  
—তা বটে অযোধ্যা সিং—এমন ছ'একটা ঘটনা জমিদারের  
জীবনে থাকে বৈকি। বাই, শুয়ে পড়ি। একটু গরম লাগছে  
যেন, দরজাটা খুলে রাখব ? বা চোটোর বৈনৌ ডলাই-মলাই  
করতে করতে অভয় দিল অযোধ্যা—কুছ ফিকির মাং  
কিডিয়ে, মোজ সে শো যাইয়ে বাবুজি।

বালিশে খুঁৎনি ভর দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর ভাবতে  
লাগলাম, কে সেই নোটজী মনসুরবাবু। সুদূর লক্ষ্মী থেকে  
এই নিষ্কল গ্রামে সে এসেই বা কেন ? এল যদি বা খুন হ'ল  
কেন চন্দ্রমৌলির হাতে ?

বম্ বম্ বম্। কেবলই মনে হতে লাগল, খোলা  
দরজাটার ফ্রেমের ওধারে ঐ যে অনন্ত আকাশের ছায়া-ছায়া  
পটভূমি, ঐ আকাশের জ্যোৎস্নার কালর তুলে একটি পরমা  
সুন্দরী নর্তকী তালে তালে পা ফেলে নেমে আসছে মর্ত্য-  
লোকে। কুণিশের ভক্তিতে দোলায়িত তার দক্ষিণ পাশি,  
কিন্তু চটুল চাহনিতে তীক্ষ্ণ পঙ্কশর। যেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে  
নেমে এসে মুক্ত হ'ল নর্তকী। বালিশের ওপর মাথা বেধে  
চোখ বুজে আমি শুনেতে লাগলাম তার নুপুর-নিকণ। বম্  
বম্ বম্।

চৌধুরী বাড়ীর অন্দর মহলে কি এমন রূপ নেই, না  
ছিল না। এমন টলমল যৌবন, এমন দুখে-আলতা রং,  
এমন টানা টানা কাজল-কালো চোখ ! ছিল নিশ্চয়।  
অন্তঃপুরের পদধীষিতে সজ্জাস্ত্রন সেরে সজল এলোচুলে  
চন্দ্রমৌলির শয়নকক্ষের দিকে যেতেন বৈকি বড়রানী এমনি  
বম্ বম্ শব্দে। সে শব্দ নোটজীর নুপুরের নয়, গৃহিনীর  
পায়ের মলের। নিতম্বের ছলচাতুরীর ছন্দে বাজত না সে  
মল, বাজত শান্ত সংযত গৃহিনীর পদক্ষেপে। হয়ত মন  
ভরতো না চন্দ্রমৌলি চৌধুরীর। তিনি শিকারী লোক যে।  
আজ আগ্রা, কাল কান্দী। সেখান থেকে দিল্লী, দিল্লীতে  
দিল তরল না, চল লক্ষ্মী।...

ঝন্ ঝন্ ঝন্। বাড়ীজী নাচছে ঘোঁষনছন্দে। যুঁই আর বেলকুলের সঙ্গে আতয়ের খসু, তারও সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে উগ্র সুরার গন্ধ। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে বসে আছে কেউ নবাবজাধা, কেউ শেঠ, কেউ জমিদার। মহালস চোখে লোলুপদৃষ্টিতে সর্কাক লেহন করছে বাড়ীজীর আর মাঝে মাঝে তারিফ জানাচ্ছে— সাবাস! সাবাস!

বটন লাগি পিয়াকে মিলন কি  
পিয়াকে দরশ বিনা জিয়া তড়পত হোই  
তুমহাবে কারণ নিশা লাগি...  
পিয়াকে মিলন কি...

গাইছে মনসুরবাদী। ভাষাসুন্দ মনোরম ভক্তি তার, চোখযুগ ও সর্ক অবয়বের মাধ্যমে পিয়া-মিলন-পিয়াদীর বিবহ-বেদনার কি অপূর্ণ রূপপ্রকাশ।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন একজন শ্রোতা। গলার পাকানো চাদরটা খুলে রেখে সজ্জিত্যার হাত থেকে কেড়ে নিলেন সারেঙ্গী। মনসুরবাদী ফিরে চাইল একবার, সমর্থনের মিষ্ট হাসি হেসে নতুন উদ্যমে গাইল তার চুঁতরী। ‘পিয়াকে দরশ বিনা জিয়া তড়পত হয়!’ কিন্তু কে ঐ সারেঙ্গী-বাদক? চন্দ্রমৌলী না? বাংলা দেশের সেই জমিদার চন্দ্রমৌলী চৌধুরী? হ্যাঁ, সেই নাক চোখ যুগ বং, সেই সযত্ন-লালিত গুন্দ। কিন্তু হাতের সেই বন্দুক কই? অব্যর্থ শিকারী সেই চন্দ্রমৌলী চৌধুরীর বন্দুক?

গানের শেষে আদ্যব জানিয়ে মুহূহাশ্রে বলল মনসুরবাদী—প্রথম পরিচয় যে পেয়েছিলাম, তা দেখছি বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সারেঙ্গী নামিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন চন্দ্রমৌলী—মানে?

—মানে, সত্যি আপনি শিকারী। বন্দুক কাঁধে করে জুরুর বাংলা দেশ থেকে এসেছেন শিকার করতে, কিন্তু সারেঙ্গীর ছড় টেনেও শিকার করতে আপনি পাবেন দেখছি।

বাইজীর বিষয় চোখের দিকে আর যেন চাইতে পারলেন না পুরুষসিংহ চন্দ্রমৌলী চৌধুরী।

—বাঃ খুব, বাঃ খুব! বলে সুরাপাত্রটা মনসুরবাদীয়ে অধরের দিকে এগিয়ে দিলেন মহম্মদ নবাবজাধা। কলরব করে উঠল চাটুকার সাদপাড়। চন্দ্রমৌলী কিন্তু আর বেশীক্ষণ বসলেন না। বাড়ীজীর কোলে আলতো ভাবে ছুঁড়ে দিলেন তাঁর গলার চেনহার, তার পর বার হয়ে চলে গেলেন। মনসুরবাদীয়ে জহর-সারেঙ্গীতে ছড়খানা নির্মম মাধুর্য্যে চালিয়ে চালিয়ে কি এক অপূর্ণ কান্না তুলেছিলেন চন্দ্রমৌলী চৌধুরী। বাড়ীজীর কণ্ঠ থেকে ভাল মান লয়

মীড় সবকিছুই হরণ করে চলে গেলেন আসব থেকে। নবাবজাধা নিয়ামুৎউল্লা আর শেঠ সুখনলালের কাছ থেকে বায়না নিয়েছিল সারেঙ্গীবাদক বাচ্চু মিঞা; পাঁচ শত মুদ্রার পরিবর্তে ও, মনসুরবাদী আর তার সজিনী রতনবাদী নাচগানের মদিরায় ডুবিয়ে রাখবে ওদের আজ সারাবাত। উপলক্ষ্য চন্দ্রমৌলী চৌধুরী। কিন্তু ভাল কেটে গেল।

...আমি আর সেদিন নাচতে-গাইতে পারলাম না। আরে গাও মেয়ে জান, গাও মনসুরবাদী। বলে বার বার চলে পড়ল আমার গায়ে আর কাকুতি মিনতি করল কিন্তু তবু আমি পারলাম না। বললাম—গুস্তাগি মাক কিজিয়ে নবাবজাধা, তবিয়ে ঠিক নহি। ওরা হাসল, গা টেপাটেপি করে বিজ্ঞপ করল—ওঃ হো, মহকুৎ! ‘পিয়া দরশন বিনা জিয়া তড়পত!’ বাড়ীজীর আবার ভালবাসা! পেশাদার নর্তকীর আবার প্রেম! বিক্সী ইজিত করে হাসল ওরা সকলে। রাগে গরগর করতে লাগল বাচ্চু মিঞা। রতন-বাই কিন্তু বুকল আমার মনের কথা। হাজার হোক মেয়ে-মানুষ ত!

—তুমি ভালবাসলে চন্দ্রমৌলীকে?

—হাঁ বাবুজি! ভালবাসলাম।

—কি করলে তার পর?

—কি আর করব! খোঁজ নিয়ে জানলাম চন্দ্রমৌলী ঐ রাজ্বেই কাশী রওনা হয়েছেন। বাচ্চু মিঞাকে বললাম—তুমি ত কাশী থেকেই একটা বায়না পাচ্ছিলে, চল না সেখানে যাই।

বাচ্চু রেগে উঠল। বলল—তুমি প্রেম করবে বলে আমার! এই দল গড়িনি মনসুরবাদী। আশ্রয় একরাত্রেব জন্ত আমার পেতে পারি হাজার টাকা, কাশীর শেঠ দিতে চেয়েছে মাত্র ছ’শো। কেন বাব সেখানে?

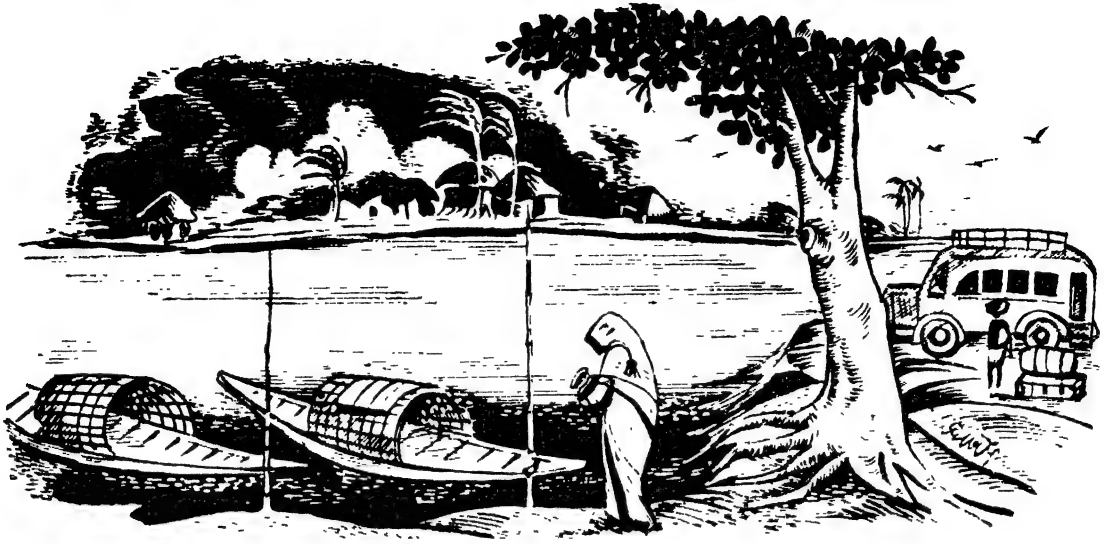
—কি হ’ল শেখ পর্যন্ত? গেলে কাশী?

মনসুরবাদী মুহূ হাসল, জয়ের হাসি। বললে—আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারত না বাচ্চু। লক্ষ্য করলাম, কেমন যেন রাজ্জা হয়ে গেল বেচারি।

—বাচ্চু বুঝি তোমার প্রণয়প্রার্থী ছিল?

মাথাটি ঝঁকনত করে মনসুরবাদী চলে গেল চন্দ্রমৌলী প্রসঙ্গে।

—খুঁজে পেলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে। স্নান সেবে শুদ্ধবস্ত্রে যাচ্ছেন কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে। আমি মুসলমান, বিবেক আমার বাধা দিল, সে অবস্থায় তাঁকে আর ডাকলাম না। কোন কথা হ’ল না সেবার। রাজ্বে সেই শেঠের বাড়ীতে নাচগান সেবে পবের দিনই আমাদের রওনা হতে হ’ল আশ্রী।



অবাক বিশ্বয়ে আমি চেয়ে রইলাম মনস্বরবান্দিয়ের দিকে।  
—তুমি মুসলমান, উনি হিন্দু, তবে কেন এমন ভালবাসার  
ভুল করলে মনস্বরবান্দি ?

—এর উত্তর নেই বাবুজী। তবে কি জান তোমাদের  
বিশ্বনাথজী আমার প্রতি দয়া করলেন।

—কি বকম ?

—পনের দিন পর আমাদের লক্ষ্মীয়েব সফদরগঞ্জের  
বাগায় হঠাৎ এসে পায়ের ধুলো দিলেন জমিন্দার চৌধুরীজী।  
বললেন—মনস্বরবান্দি। চোরকাঁটা কাকে বলে জান ?

আমি বাড় নাড়লাম—না, জানি না।

উনি বুঝিয়ে দিলেন আর বললেন—ঐ চোরকাঁটারই মত  
তুমি চুপিসারে কখন যেন আমার এই বকের মধ্যে বিঁধে  
আশ্রয় নিয়েছ। আমি তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে।

মনস্বরবান্দিয়ের টানা টানা দুই চোখের পাতা অশ্রুশিক্ত  
হ'ল। আমি দেখলাম, তার আঁর্জ আঁধিপলবে শুধু একটি  
মাত্র ভাষা। সে ভাষা ভালবাসার।

—জান বাবুজী, চন্দ্রমৌলী চৌধুরী একজন অতি  
উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতরসিক ছিলেন।

—না জানি না। বাইসন বুনো মোষ শিকার করতেন  
তারই নিদর্শন দেখেছি আজ সন্ধ্যায়, গুঁড়ের কাছারী ঘরে।

—শুধু ঐটুকু ? তা হলে কিছুই জানেন নি গুঁড় সন্ধ্যায়।  
কি ঐগধ, কি খেয়াল, কি ভজন, কি ঠুংরী সব গানই  
গাইতেন স্তম্ভর, জ্ঞানও ছিল গভীর। তাঁর ঐ পুরুষসিংহের  
মত রূপ আর মহৎ শিল্পীর প্রাণের কাছে আমি সর্বস্ব উৎসর্গ  
করে বসলাম।

ভারাবনত বল্লরীর মত মনস্বরবান্দি মাথা নীচু করে বসে

রইল। আমি দেখলাম টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের  
জল মাটিতে পড়ল।

বাচ্চ মিঞার দল গেল ভেঙে। রতনবান্দি জুনাগড়ের  
নবাব বংশের কোন এক বংশধরের বেগম হয়ে চলে গেল  
আর আমি বাংলা দেশের চোরকাঁটা হয়ে পড়ে রইলাম  
সফদরগঞ্জের এক কোণে।

—আর বাচ্চ মিঞা ?

—বাচ্চ মিঞা আমাকে সে অবস্থায় ফেলে কোথাও  
যেতে চাইল না। আমি অবাক হয়ে আবার চাইলাম মনস্বর  
বান্দিয়ের দিকে। দেখি, সেই কব্বাক নৃপুং-বাজানো মর্ত্য-  
লোকে নেমে-আসা চটুলা নর্তকী নয়, সন্ধ্যায়ে মাতৃষের  
মাধুরী নিয়ে মনস্বরবান্দি চেয়ে আছে মাটির দিকে।

সহসা কানে এল কর্কশ চিৎকার।

বাচ্চ মিঞা টেঁচাচ্ছে—শালা বেইমানকো হাম ছোড়্গা  
নেহি—ছাড়ব না বেইমান জমিদারকে। মাসে মাসে টাকা  
পাঠালেই তার কর্তব্য শেষ ? চল মনস্বরবান্দি, সুলতানপুরে  
যাই, সেখানে গিয়ে শায়েস্তা করে আসি চন্দ্রমৌলীকে।  
তোমার গর্ভে যে সন্তান...

—না না না, আমি যাব না মিঞাজী। আমার মাক  
কর।

—আমি কোন কথা শুনব না তোমার, তোমার  
ষেতেই হবে। ভালবাসার নামে যে সন্তান আসছে ছুনিয়ায়,  
তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে চন্দ্রমৌলীর অন্তঃপুরে যাবার।

সন্তান। চন্দ্রমৌলীর সন্তান। আমি আর প্রত্যাখ্যান  
করতে পারলাম না বাচ্চ মিঞার প্রস্তাব, রওনা হলাম।  
দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে পৌছলাম সুলতানপুর



গ্রামে। নদী পেরিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে এসেছি এই মাঠে, এই মাঠ অভিক্রম করলেই জমিদার চন্দ্রমৌলীর প্রাসাদ।

—একি! চোরকাঁটা, তুমি?

বাচ্চ মিঞা আর মনসুরবাবুদের পথ আগলে হঠাৎ ক্রোধে ঝাঁপাতে দেখলাম চন্দ্রমৌলীকে। হাতে সারেকদী নয়, রাইফেল। কাছাকাছি কোথাও বেরিয়েছিলেন বোধ হয়, ক্ষেত্র শিকারে।

মনসুরবাবু একবার মাত্র চোখ তুলে চাইল চন্দ্রমৌলীর দিকে। বড় করুণ। মনস্তিভরা সে চাহনি।

জবাব দিল বাচ্চ মিঞা—হ্যাঁ, তোমার চোরকাঁটা এসেছে তোমার বেইমানীর জবাব দিতে।

—বেইমানী! গর্জন করে উঠল চন্দ্রমৌলী।

—হাঁ জী, বেইমানী! শুকে তোমার অশ্রমমহলে ঠাই দিতে হবে, দেবে কি না বল?

—দেখ বাচ্চ মিঞা! সাবধানে কথা বল। চন্দ্রমৌলী চৌধুরী কখনও পরিণামের কথা ভেবে কাজ করে না।

—আবে যাও যাও, বেইমান কাঁহাকার...

দ্বিতীয়বার ‘বেইমান’ পছোখন উচ্চারিত হবামাত্র ক্রোধোন্মত্ত চন্দ্রমৌলী হাতের রাইফেল তুলে চন্দ্রের নিম্নে গুলি চালিয়ে দিলেন। মনসুরবাবু আর্ত চিৎকারে চন্দ্রমৌলীকে বিবত করার চেষ্টায় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু চন্দ্রমৌলীর রাইফেলের গুলী সেদিনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ’ল না। বক্তাক্ত দেহে দু’জনেই লুটিয়ে পড়ল মাঠে।

আমি সে দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল শরীর। দেখলাম, সন্ধ্যাবেলায় যে চোরকাঁটাগুলো জড়ো করেছিলাম, সুপীকৃত সেই চোরকাঁটা ঠেলে বক্তাক্ত কলেবরে উঠে দাঁড়াল মনসুরবাবু। স্মন্দর ক্ষমান্বিত চোখ দুটি তার। কাতর কণ্ঠে আমার বলল—এবার বুঝছ বাবুজী, তোমার অজবাসকে ভয় করে কেন আমি উঠে এসেছি এই জমিদার বাড়ীতে? এ আমার তীর্থস্থান, তাই। চন্দ্রমৌলী আদর করে আমার চোরকাঁটা বলে ডাকত। তাই আমি বক্তভঙ্গা চোরকাঁটা হয়ে জন্য়ালাম এই মাঠ ভরে। ওরই সারেকদীর ছুড়ে আমার বাবুজী-জীবনের

যুত্থা ঘটছিল, ওর বন্দুকের গুলীতে আমার সার্থক নবজন্ম হ’ল চোরকাঁটার দেহে।

—বাবুজী!

—বল মনসুরবাবু!

—আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা?

—তুমি নাকি ওদের জমিদারী কেড়ে নিতে এসেছ?

কাতর দুটি চোখ মেলে উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে চেয়ে রইল মনসুরবাবু। চন্দ্রমৌলীর বংশকে জমিদারী থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করে মনসুরবাবুদের হয়ে প্রতিশোধ নেবার উল্লাস আমার পেয়ে বলল।

বললাম—হ্যাঁ তাই।

—তুমি কিবে যাও বাবুজী! আমার হাত দুটো চেপে ধরে করুণ মিনতি জানাল মনসুরবাবু।

—কিবে যাব কেন?

—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কিবে যাও। চন্দ্রমৌলীর সন্তান তরুণকান্তি, সে আমারও সন্তান। ওর যুথ চেয়ে আমি অহুবোধ করছি।

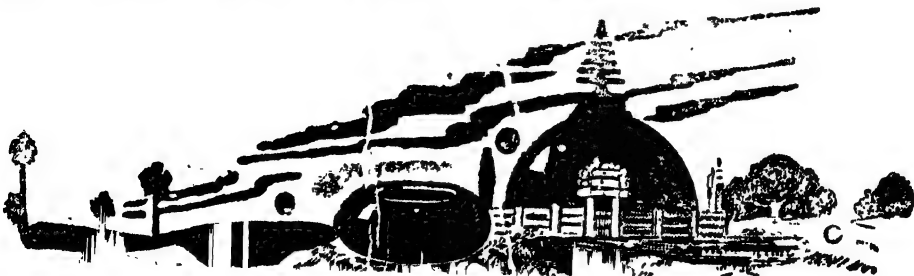
টপ টপ করে দু’কাঁটা নিটোল অশ্রুবিন্দুর রূপ ধরে ঝরে পড়ল মাতৃদেব মহিমা। কিন্তু এতখানি উদারতা অসহ্য মনে হ’ল আমার কাছে। চিৎকার করে উঠলাম—না-না-না, কিছুতেই হবে না তা।

বাবুজী! বাবু জী-জী-জী!

গায়ে হাত বেখে সজোরে ঝাঁকানি দিলে কে যেন ঘুম ভাঙাল আমার। ঝানিক পর ঘোর কাটল আমার। চেয়ে দেখি, অযোধ্যা সিং।

বলছে—বাবুজী কি ভয় পেয়েছেন? অমন করে কি সব বকছেন সারাবাত?

শুধু অযোধ্যা নয়, হেথি তরুণকান্তিও। আমার কপালে হাত দিয়ে বলছে—ইস্! দিব্যদুর্বার! জয়ে গা বে পুড়ে যাচ্ছে আপনাব।





# ঊনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী মহিলা গণিতা রমাবাই সরস্বতী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

## পূর্ব পরিচয়

ভারতীয় বিদ্বদী গণিতা রমাবাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে মহীশূর রাজ্যের সীমান্তে পশ্চিমঘাট গিরিমালার শৃঙ্গদেশে অবস্থিত 'গঙ্গামল' নামক স্থানের এক নিবিড় অরণ্যে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম অনন্ত শাস্ত্রী। তিনি "চিৎপাবন ব্রাহ্মণ" বংশসম্ভূত ছিলেন। অনন্ত শাস্ত্রী অসাধারণ পণ্ডিত এবং উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু জীলোককে শিক্ষার আলোকদান সমাজবিগর্হিত কাণ্ড ছিল। কিন্তু শাস্ত্রী ইহা গ্রহণ না করিয়া স্বীয় জ্ঞানী সন্তানকে সংস্কৃত ভাষার সুশিক্ষিতা করেন। তৎকাল গোড়া হিন্দুসমাজ কর্তৃক শাস্ত্রী এবং তাঁহার স্ত্রীকে বহু সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। রমাবাই এতেন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তেজস্বী পিতামাতার সন্তান। পিতামাতার শিক্ষাদান-প্রণালীর গুণে রমাবাই অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার মাতা ব্রহ্মহর্ষিগোত্রীয়া গাঙ্গেয়ান করিয়া সাত বৎসরের বালিকা রমাবাইকে ঘুম হইতে জাগাইতেন এবং মুখে মুখে গীতা, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের জ্ঞানের অর্থ মারাঠি ভাষায় বুঝাইয়া মুখস্থ করাইতেন। ফলে রমাবাইর বয়স বয়সে বয়সে তখন তিনি ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক স্মারক হ্রস্বকর্ম ও কঠিন করিয়া স্বীয় আলোকসাম্রাজ্য প্রতিভার পরিচয় দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনন্ত শাস্ত্রীর মত উদার মনোভাবাপন্ন পিতাও রমাবাইকে বেদ এবং উপনিষদ পাঠের অনুমতি দেন নাই, কারণ তখন জীলোকের পক্ষে বেদ ও উপনিষদ পাঠ নিতান্ত রীতিবিগর্হিত ছিল। সামাজিক উৎপীড়ন হইতে ঘূরে অবস্থান এবং ধর্মচ্যেদন নিষ্কল-বাসে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অনন্ত শাস্ত্রী গভীর অংগো বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্তসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিভাবস্তার কাহিনী চতুর্দিকে প্রচারিত হওয়ার দলে দলে লোক প্রত্যহ শৈলশিখরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল, গঙ্গামলের অরণ্য-বাটিকা ক্রমে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। যাত্রাক্ষেত্র ও নারিকেলের চাষ খাল শাস্ত্রীর প্রাসাদ্যদনের ব্যয়নির্বাহ হইত। আতিথেয়তা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, কেহই বৃত্তান্ত উল্লেখে শাস্ত্রীর কুটীর হইতে ফিরিতে পারিত না। ফলে, তেজ বৎসরের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় ঋণজালে জড়িত হইয়া তিনি শৈলশিখর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

## গৃহহারা

অনন্ত শাস্ত্রী গৃহহারা হইয়া পর্যটকের জীবন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীক শাস্ত্রী মহোদয় তিনটি শিশু-সন্তান সহ সংসার-সমুদ্রে

ঝাপাইয়া পড়িলেন। তিনি তীর্থে তীর্থে তাহাদিগকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুরাণ, ভাগবতাদি পাঠ দ্বারা প্রাসাদ্যদনের ব্যয় নির্বাহ হইত। এইরূপ দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে শাস্ত্রী-পরিবার অবশেষে ১৮৭৬ সনে মাদ্রাজে উপস্থিত হন।

## অদৃষ্টের পরিহাস

মাদ্রাজে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ। লোক তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির। চারিদিকে হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে। পুরাণ পাঠ শুনে কে? অনশন ও অর্দ্ধশনক্ৰিষ্ট ৭৮ বৎসরের অক্ষ বৃদ্ধ অনন্ত শাস্ত্রী ১৮৭৪ সনে এমনি এক দুর্দিনে অনন্তরূপে চলিয়া গেলেন। শৈলশিখরে যাত্রার কুটীর হইতে একদিন সহস্র সহস্র নমনারী বৃত্তান্ত উল্লেখে ফিরিতে পারিত না, আতিথেয়তার অলস্তু বৃষ্টান্ত প্রশংসা করিতে গিয়া যিনি একদিন সর্বস্বত্যাগী হইয়া রিক্ত হস্তে পথে ধাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ অল্পভাবে তাহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল! ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

## অনাধিনী রমাবাই

পিতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে রমাবাইর মাতা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মুহুমুখে পতিত হন। রমাবাই এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অকুল সাগরে ভাসিলেন। চিন্তাকুল হৃদয় ও অনশনক্ৰিষ্ট শীর্ণদেহ লইয়া তাঁহারা দুই জন অতিকষ্টে মাদ্রাজ ত্যাগ করিলেন। তখন অনাহার ও মানসিক দুঃস্থির ভ্রাতা-ভগ্নীর শরীরের অবস্থা যে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। রমাবাই তখন বোড়শবয়সী যুবকী। ভ্রাতা ও ভগ্নী উত্তর-ভারত অভিমুখে রওরানা হইলেন। তাঁহারা ততোধিক কাল করিতে অক্ষম, ভিক্ষা করিতেও পারেন না, প্রাসাদ্যদনের উপায় হয় কিরূপে? উভয়ে বিষয় বিপদে পড়িলেন। পিতামাতা তাহাদিগকে ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে বিধান আছে, বিশেষ ভাবে ভগবানের পূজা করিলে, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দান করিলে, ভগবানের নাম সক্রীড়ন করিলে, উপায়াস প্রায়শ্চিত্তাদি এবং ধ্যান-ধারণা করিলে, ভগবান সশরীরে উপস্থিত হইয়া ভক্তের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন ও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভ্রাতা-ভগ্নী সাময়িক অর্থক্লান্ত হাত হইতে বক্ষা পাইবার জন্য পিতামাতার উপদেশ মত চলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দীর্ঘ তিন বৎসরকাল তাঁহারা তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করতঃ ধর্ম-কর্ম, দেব-বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডে পিতামাতার পরিত্যক্ত যে সংস্কার

অর্থ ছিল, তাহা ব্যয় করিয়া কেলিলেন, কিন্তু ভগবান যুধ তুলিয়া চাহিলেন না। আবার তাঁহারা বিষম অর্থাভাবে পতিত হইলেন। রমাবাইর পরিধানের মাত্র একখানা ধুতি ছিল, স্নান করিয়া অর্জ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার অর্ধেক শুধাইতে দিতেন এবং বাকী অর্ধেকের দ্বারা বহুকাঁচের গাজাচ্ছাদন করিতেন। এমনই ভাবে কোনও দিন অনাহারে, কোনও দিন বা অর্ধাহারে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। উত্তর ভারতে তাঁহারা কাস্মীর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পূর্ব ভারতের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ১৮৭৮ সনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের আবের্ষে পড়িয়া রমাবাই প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি কতকটা সন্দেহ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্মে অনাহার বীজ এই সময়েই ভিতরে ভিতরে তাঁহার অন্তরে বোপিত হইল।

#### কলিকাতায় ভ্রাতাভগ্নী

রমাবাই কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশদোরভ চার দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ‘চিংপাবন-ব্রাহ্মণ’ বংশদ্ভূতা অলোকসামাগ্র প্রতিভাশালিনী বিংশবয়ীরা অববাহিতা এই ব্রাহ্মণ-কণার বিবরণ কলিকাতার—তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কলিকাতা মহানগরীর পশ্চিমমণ্ডলী তাঁহার অনন্তসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া প্রকাশ্য-সভায় তাঁহাকে ‘সংস্কৃতি’ উপাধিতে ভূষিত করেন। পণ্ডিতা রমাবাই পূর্বে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত না হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। স্বকটিন সমস্ত-পূরণে তিনি অধিতীয়া ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার মহারাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত পশ্চিমমণ্ডলী রমাবাইকে দুই প্রস্তাবে জর্জরিত করেন, কিন্তু তিনি স্বীয় অনন্তসাধারণ প্রতাপমন্ডিতবলে প্রত্যেক প্রস্তাব সহস্র প্রলান করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধাঘূষিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার নারীমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুও নেতৃত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় পণ্ডিতাকে এক মানপত্র প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমিতির সভাপণ ভ্রাতা-ভগ্নীকে এক সামাজিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ ভাবে সন্মতি করেন। দেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমিতির সভ্যবৃন্দ এই সম্মেলনা-সভায় উল্লেখ্য ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বেজিষ্টার টনি সাহেব (Mr. Tawney) সংস্কৃত বড় পণ্ডিত ছিলেন। রমাবাইর কলিকাতায় আগমন সময়ে টনি সাহেব তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় এক অভিনন্দন দেন, তাহার প্রথম ছত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন “মার্ঘ্যে, তব ঐশ্বর্যকীর্তি মর্যাপি স্নেহজ্ঞাতিনা।” বিশ্ব-বরণ্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন পণ্ডিতা ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে তাঁহার বাটতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বধোচিতভাবে আপ্যায়িত করেন। কথ-

প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র পণ্ডিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বেদপাঠ করিয়াছেন কি? পণ্ডিতা উত্তর দেন, হিন্দু-মহিলার বেদপাঠে অধিকার নাই। কেশবচন্দ্র যুগ্মহাস্ত করিয়া এক সেট বেদ তাঁহাকে উপহার দিয়া বেদ ও উপনিষদ পাঠের স্তম্ভ উপদেশ দেন। কেশবের কথায় তিনি বেদপাঠে মনোনিবেশ করেন এবং ক্রমে একেখববাদিনী হইয়া পড়েন। হিন্দুধর্মে অনাহার বীজ ইতিপূর্বেই বোপিত হইয়াছিল। বেদপাঠের পর আর তিনি মৃষ্টি পূজার অগ্রসর হন নাই, ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও পৌত্তলিকতার ঘোর বিবোধী হইয়া পড়েন। তাঁহার উভয়েই এই সময়ে “ছুঁংমাগ” পরিহার করেন। দেশভ্রমণ বাপদেশে ভ্রাতাভগ্নী বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারের সংস্পর্শে আসিতেন, তথায় বালবিধবার নিদারুণ লাহনা দর্শনে রমার কোমল প্রাণ কান্দিয়া উঠিত। মাতাজে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের জাতির ব্যবহার-বিষয় তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সজ-স্বামীহারা বালিকা-বধূর কঠোর নির্ধাতন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তীর্থে তীর্থে পণ্ডিতা ও গুণীদের দৌরাত্ম্য ভ্রাতাভগ্নী কতবার সঙ্গ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অশ্রুতিপন্ন বৃদ্ধের ঘোড়শী তরুণীর সহিত বিবাহ, তীর্থস্থানে বক্তৃতাশ্রমের বিনিময়ে স্তম্ভ স্বর্ণে বাওর ব্যবস্থা—তথা ‘স্কল’ লাভ, দেব-মন্দিরে মোহান্ত-মহারাজের অপার লীলা, সেবাদাসীর বীভৎসকাণ্ড ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত ভ্রাতাভগ্নী ভারত-পরিভ্রমণের সময় অবলোকন করিয়াছেন। রমাবাইর মন সন্দেহের দোলায় দোলাহিত হইতে লাগিল, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হরাইলেন।

#### আগাম

কলিকাতা হইতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও রমাবাই আগাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথাকার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষে গোহাটা আসিয়া উপস্থিত হন। রমাবাইর ভাবী স্বামী বিপিন-বিহারি মেধাবী তখন গোহাটা নখ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকায় তথাকার বিদ্যজ্ঞানমণ্ডলীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিপিনবিহারীর বিজ্ঞাবত্তা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং অমায়িক ব্যবহারের স্তম্ভ গোহাটীর শিক্ষিত সমাজ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। ভ্রাতা-ভগ্নী গোহাটা গিয়া জনপ্রিয় বিপিন-বিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমেই গোহাটীর তৎকালীন জননায়ক শ্রদ্ধাভাজন গুণাভিরাম বড়ুয়ার সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বড়ুয়া মহোদয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে একখানা “আগাম বৃক্ষজি পুঁথি” উপহার প্রদান করেন। রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা গোহাটীতে বিদ্যজ্ঞান সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। বিপিনবিহারীর বিজ্ঞাবত্তা, সংগঠন-ক্ষমতা ও অস্বাভাবিক গুণাবলী দৃষ্টে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহা পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

#### গ্রীহষ্ট

১৮৭৯ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্ডিতা রমাবাই ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গ্রীহষ্টে পদার্পণ করেন। তাঁহাদিগকে সাদর

अपन बाबाछी टाकुव

ଏହି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହେ ମହାତ୍ମା ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ । ବ. ୧୫୫୩ ୩

শুভ্রে বিবাহ শ্রীহট্টের ইতিহাসে এই প্রথম। বিবাহের পর স্থানীয় সংবাদপত্র নিন্দাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করে। শ্রদ্ধের ডাক্তার সুলকীমোহন দাস পণ্ডিতের বিবাহ সমর্থন করিয়া এই মন্তব্যের উত্তর দেন। শ্রীহট্টের মূলক নৃতাপোপাল চট্টোপাধ্যায় সুলকী-বাবুর লেখার প্রতিবাদ করেন। এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ কিছুদিন চলিতে থাকে। বিপিনবাবু সমাজবিক্ষিত হন। শুধু একবার তাঁহার মাসভূতো ভগ্নী শ্রীহট্টের প্রথম গৃহ-রচয়িত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী তাঁহাদিগকে সমাজে স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

#### বিবাহিত জীবন

বিবাহের পর পণ্ডিতকে লইয়া বিপিনবাবু শিলচর যান। সেখানে তিনি ওকালতি করিতেন এবং ক্রমে একজন প্রথম শ্রেণীর উকীলরূপে পরিগণিত হন। শিলচরে যেখানে Dr P. K. Das-এর Philanthropic Dispensary ছিল, ঐ ভাণ্ডারগৃহই তাঁহার বাস করিতেন। বিবাহের উনিশ মাস পর ১৮৮২ সনের ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিপিনবাবু হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র কোলের শিশু মনোহরমাবাইকে নিয়া পণ্ডিতা অকুল পাথারে ভাসিলেন। বিপিন বাবুর মৃত্যু সময়ে শ্রীহট্ট লাভু নিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র দাস অষ্টপতি মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, বিপিনবাবুর মৃত্যুর পর রমাবাই “বি-বি” “বি বি” বলিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁহার কাতর আর্তনাদে উপস্থিত বান্ধিবর্গ অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রমাবাই বিপিনবিহারীকে “বি-বি” বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

#### শিলচর পরিত্যাগ

বিপিনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়েরা সমাজবিক্ষিতা বিধবাকে স্থান দিলেন না বা স্থান দেওয়ার উক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিলেন, বলিষ্ঠ তত্ত্ব বিপিনবিহারী এট “চিৎপাবন ব্রাহ্মণ” তনয়াকে বিবাহ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর রমাবাইকে একমাত্র শিশুকন্যাটিকে নিয়া শিলচর পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি শিলচর হইতে পূণা চলিয়া যান, তথায় এক বৎসর বাস করেন। চাইকোটের চিফ জাষ্টিস মহাশয়ের গোবিন্দ বাগড়ে, ডক্টর ভাণ্ডারকর, মিঃ টিলাং, মিঃ চন্দ্রভাবকর প্রভৃতির সহায়তায় তিনি সেখানে “আর্য মহিলা সমাজ” সংস্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত জীবিত আছে।

#### বিলাত যাত্রা ও খ্রীষ্টীয়ধর্মে দীক্ষা

১৮৮৩ সনের প্রথম ভাগে দুই বৎসরের শিশুকন্যা মনোহরমাকে কোলে লইয়া রমাবাই বিলাতযাত্রা করেন। শিলচরে থাকিতে Mr. Allen নামক একজন মিশনারি সাহেব তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতেন। পুনাত্তে মিস হারকোর্ড এবং বেভারগেও ফাদার গোবে তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন এবং বাইবেল শিক্ষা

দিতেন। গোবে নিজে একজন “চিৎপাবন ব্রাহ্মণ” ছিলেন, শেষে খ্রীষ্টধর্ম পরিগ্রহ করেন। বিলাতে Wantage-এর Little Sister গণ মাতাপুত্রীকে সাদরে গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের উপর হমার বিবেচনাব্যক্রমশ: বদ্বিত হইতেছিল, ফলে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি কন্যা মনোহরমাবাইসহ Wantage-এ খ্রীষ্টীয়ধর্মে দীক্ষিতা হন।

রমাবাই বিলাতযাত্রার পাথের কল্পে সংগ্রহ করিলেন, জানিবার লজ্জা অনেকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। “খ্রীষ্টীয়নীতি” নামক একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখেন এবং উহার বিক্রয়কল্প অর্থ দ্বারা “ডেক”-যাত্রীরূপে বিলাতগমন করেন। ত্রিপুরা কালীকঙ্ক নিবাসী ঙ্গলনীনাথ নন্দী মহাশয় হাটলাম কলেজের অধ্যক্ষ থাকা সময়ে ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমি বাংলা অনুবাদ পড়িয়াছি। সমগ্র পুস্তকে রমাবাইর খ্রীষ্টীয়ধর্ম আঙ্গুস্তির লেশমাত্রও পরিচিতি থা জিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মনুষ্যস্বর্ণী ভাষায় খ্রীষ্টান্যটিকে নীতা-চরিত্র অনুশীলন করিতে এবং সীতার দ্বায় সতীসাক্ষী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই ১৪৫ পৃষ্ঠার পুস্তকখানি ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

#### আমেরিকার রমাবাই

Wantage হইতে পণ্ডিতা বিলাতের Chltenham Ladies College-এ সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপিকার কাজ করিতে চলিয়া যান। উক্ত কলেজে তিনি ছাত্রী ও অধ্যাপিকা দুই-ই ছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিস ডোরথি বিলের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেন, এদিকে ছাত্রীদিগকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিতেন। ১৮৮৬ সনে বন্ধু পরলোকগতা আনন্দীবাই বোশী আমেরিকার Womens Medical College হইতে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় M. D. উপাধি লাভ করেন।

এই উপাধিলাভের “কনভোকেশন” সভায় পণ্ডিতার নিমন্ত্রণ হয় এবং নিমন্ত্রণ বক্ষার্থে তিনি শিশুকন্যাসহ আমেরিকায় গমন করেন। Women's Medical College-এর অধ্যক্ষ বড্‌নি সাহেব তাঁহাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার লজ্জা অনুবোধ করায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতাও দেন। আমেরিকা বাসকালে পণ্ডিতা (সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা) নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমেরিকায় “কিওবগার্টেন” প্রণালী শিক্ষা করিয়া তিনি এই সম্পর্কে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ভারতীয় শিশুদিগের উপযোগী কয়েকখানা সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত করেন। “সুজয়াজ্ঞো প্রবাস বৃত্তান্ত” নামক একখানি বই ১৮৮৯ সনে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখেন, বহুকাল ইহা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল, আজকাল আছে কি না জানি না।



মাতা-পিতার সঙ্গে সপ্তম বর্ষিয়া রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা

#### সারদা-সদন

রমাবাই সমগ্র আমেরিকার ভারতীয় বিধবা সঙ্কে বৃত্তা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ফলে, তথায় একটি রমাবাই-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইল। হিন্দু-বিধবার শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খুলিতে সমিতি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়া জানাইলেন যে, দশ বৎসর পঞ্চাশ তাঁহারা স্কুলের সাকুল্য ব্যয়ভার বহন করিবেন। ১৮৮২ সনের প্রথম ভাগে রমাবাই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'সারদা' নাম্নী মাত্র একটি বালিকা লইয়া 'সারদা-সদনের' প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ১৮৯০ সনে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা পুনঃ নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। তথায় দশ বৎসরেরও অধিককাল ইহা বর্তমান ছিল। ১৮৯৪ সনে সারদা-সদনের জনৈক ছাত্রী খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়। ভীমরলের চাকে ঢিল পড়িল। শহরময় গুজব উঠিল, রমাবাই জোর করিয়া ছাত্রী-দিগকে খ্রীষ্টান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অভিভাবকগণ ছাত্রী-দিগকে দলে দলে স্কুল ছাড়াইয়া লইয়া বাইতে লাগিলেন। রমাবাই ছাত্রীদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাদিতে কাদিতে অনিচ্ছাসঙ্গেও তাহারা অভিভাবকের আদেশানুযায়ী স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। 'সারদা-সদন' কমিটির ভারতীয় সমস্তগণ এই গোলমালে কমিটির কার্যে ইচ্ছুক ছিলেন। রমাবাই ইহাতে ভয় না পাইয়া ধীর ভাবে কাজ করিয়া বাইতে লাগিলেন। অবশিষ্ট কয়েকটি পিতৃমাতৃহীনা ছাত্রী লইয়া স্কুল চালাইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বাহারা হিন্দু ছিল, তাহাদের থাকা ও খাওয়ার ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

#### মুক্তি-মিশন

পণ্ডিতা ১৮৯৫ সনে পুনায় কেডগাঁও নামক পল্লীগ্রামে একশত একর ভূমি ক্রয় করেন। দশ বৎসর পর আমেরিকা হইতে

বখন সারদা-সদনের সাহায্য বন্ধ হইয়া বাইবে, তখন এই ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহার আয় দ্বারা সারদা-সদনের ব্যয়ভার বহন করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। Mukti Prayer Bell নামক একখানা ক্ষুদ্র সাময়িক পত্র তিনি সম্পাদন করিতেন, ইহা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া তাঁহার কাছাকাছিতার ভারতীয় সংবাদ বহন করিতেছে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কিরূপে মহা-মহীকর্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, পত্রিকাখানা পড়িলেই তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই পত্রিকা ভারতের নানা স্থানে এবং বিলাত, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় এবং নানা স্থান হইতে মিশনের জন্য অর্থাচিত সাহায্য আসিয়া থাকে। ইহার দ্বারা কেডগাঁওয়ে তিনি সর্বহং অট্টালিকা নির্মাণ, কুপ খনন, ফলকর বৃক্ষ রোপণ, গোশালা স্থাপন, কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাৰ্য্য সুষ্ঠুরূপে সমাধা করেন। ১৮৯৬ সনে মধ্য-ভারতে ভীষণ দ্রুতিক উপস্থিত হয়। তিনি তখন তথায় গিয়া দ্রুতিক-ক্রিষ্ট, ককাল-সার, তিন শত বৃক্ষ সুত্রীলোক, বালিকা ও শিশুকে উদ্ধারক্ৰমে মুক্তি-আশ্রমে প্রেরণ করেন। ইহারা পরে খ্রীষ্টীয়-ধর্মে দীক্ষিত হয়।

#### বিউবনিক প্লেগ

১৮৯৭ সনে বোম্বাই নগরীতে 'বিউবনিক প্লেগ' দেখা দেয়। লড অগুহার্ট তখন বোম্বাইয়ের গবর্নর। ভারতবর্ষে প্লেগ তখন নূতন দেখা দিয়াছে। দলে দলে লোক বোম্বাই ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। বাস্তব মৃত ইন্দ্র জ্ঞপীকৃত অবস্থায় পাওয়া বাইত। গবর্নমেন্টও ভয় পাইলেন এবং বাহাতে এই মারাত্মক ব্যাধি আর বিস্তারলাভ না করিতে পারে, তজ্জন তাঁহারা এক অভূত উপায় আবিষ্কার করিলেন। বাহার প্লেগ হইত তাহাদের তখন ধরিয়া তাঁহারা প্লেগ-হাসপাতালে পাঠাইতে লাগিলেন।

দেশবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না, পিতামাতা বা আত্মীয়বর্গ ছাড়া কেহই একা হাসপাতালে বাইতে রাকী হইত না। আত্মীয়েরাও রোগীকে তথায় পাঠাইতে চাহিতেন না। গবর্ণমেন্ট তখন ঘরে ঘরে খুঁজিয়া রোগী বাহির করার জন্য গোরা সৈন্য নিযুক্ত করেন। ইহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগীদিগকে এবং বাহাদের রোগের সম্ভাবনা বলিয়া সন্দেহ করিত, তাহাদিগকে জোর করিয়া হাসপাতালে লইয়া বাইত। পণ্ডিতা যে সকল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে ‘মুক্তি’তে স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই বাদ গেল না। রোগীদিগকে পুরুষ ডাক্তারেরা সাধারণের দৃষ্টি-সমক্ষে, ঝুঁকিতে বাঘি (Bubo) হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতেন। রোগীদিগের আপত্তি গ্রহণ হইত না। এই বিসদৃশ ব্যবহার পণ্ডিতার সহ্য হইল না। যিনি জীজ্ঞাসিত উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি কখনও এমনতরো চূর্ণ করিয়া থাকিতে পারেন না।

দুগ্ধা সিংহিনী

১৮৯৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের ‘Bombay Guardian’ পত্রিকায় তিনি লিখিলেন :

“My dear ‘Guardian’.

..... The shameful way in which women were to submit to treatment by male doctors goes to prove that the English authorities in general do not believe that the Indian women are modest and need special consideration. I know it would have been impossible to provide women doctors, in all the places where the Plague appeared. It was therefore out of necessity that male doctors had to treat the women. But I do not see why women patients could not at least have been screened and protected from the public gaze, while being treated by the Government physicians.

How would an English women, poor though she may be, like to be exposed to the public gaze and roughly handled by male doctors? Is not the Indian woman quite as modest as the English woman? Does she not as a woman deserve better treatment at the hands of the Governor and the Plague Committee of Poona?

Believe me, yours for the sake of truth and righteousness.

Ramabai.”

রমাবাই সীতা নাম্নী তাঁহার মুক্তি-আশ্রয়ের একটি বালিকার প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ঈদৃশ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করার লর্ড স্যান্ডহার্স্ট পণ্ডিতার উক্তি grossly inaccurate and misleading বলিয়া উত্তর দেন। পণ্ডিতা ইহার উত্তরে যে দীর্ঘ প্রতিবাদ ‘Bombay Guardian’ পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম না। শুধু সামান্য কয়েক ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

“My dear ‘Guardian’,

..... So the Governor of Bombay has declared my statement about the shameful treatment of one of my girls and the bad management of the Poona Plague Hospital as ‘grossly inaccurate and misleading’. Some assume that only Orientals make certain assertions, without giving any proof of their truth. But I see that the Occident also can boast of some people including our worthy Governor who make certain assertions without giving any proof of their truth. How else could he say that he made enquiries about things stated in my letter when he never condescended to ask me a word about it. The manager of the Plague Hospital can never be expected to acknowledge the truth of the facts stated by me, for they were not the suffering parties. In the name of truth and justice, I ask the conscientious Christian public to say if Lord Sandhurst did right to declare my statements as ‘grossly inaccurate’ when he has never so much as asked me to prove them.

পণ্ডিতার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া ১৮৯৭ সনের ১২ই সেপ্টেম্বরের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ মন্তব্য করেন :

No “Maharatta paper, we believe, has delineated the arrangements in the plague hospital in such horrid colours as the learned Pundita has done. Lord Sandhurst is bound to contradict the statements as specifically as they have been made by her; for the Pundita has sought to turn the table upon him.”

শেখ জীবন

১৮৯৬ সন হইতে ১৯২২ সন পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর-কাল তিনি ‘মুক্তি-মিশন’ের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। মিশনের উন্নতিব জন্য শেখ বরসেও তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার কণা মনোরমাবাই এই কার্যে তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপা ছিলেন। মনোরমা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস্ট ছিলেন। তিনি মুন্সীর দুই বৎসর পূর্বে শুধু হিন্দু মহিলাদের জন্য এক স্কুল স্থাপন করেন এবং নিজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন।



দ্বী-শিক্ষাবিন্দার ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মাতার জায় তাঁহারও একান্ত আগ্রহ ছিল। ১৯২১ সনের ২৪শে জুলাই মনোরমাবাই ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বুধা মাতা এই দারুণ শোক অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৯২২ সনের ৫ই এপ্রিল তারিখে তিনি আহারাঙ্কে নিজা গেলেন। এই নিজাই মহানিস্রায় পরিত্যক্ত হইল। প্রভূষে মুক্তির আশ্রমবাসীগণ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, তাঁহার প্রাণহীন দেহ বিছানার পড়িয়া আছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি “A Testimony” নামক একখানা পুস্তিকা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সমগ্র বাইবেলের অমুবাদ প্রকাশিত করিয়া যান। ‘মুক্তি-মিশনে’ বয়ন-বিভাগ, স্থিতি-শিল্প বিভাগ, মুদ্রণ-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, গোশালা-বিভাগ, মৃৎ-শিল্প বিভাগ, পণ্ড-পক্ষী-পালন বিভাগ ইত্যাদি তাঁহারই হাতে-গড়া জিনিস। মিশন-সংলগ্ন হাসপাতাল ও ‘কৃপাসদন’ নামক একটি উদ্ধারশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁহার অক্লান্ত কীর্তি।

ইংরেজীতে বাচাকে বলে, ‘True Christian’ তিনি তাহাই ছিলেন। পণ্ডিতা ভারতের নানা স্থানে Prayer Circle প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রার্থনার উপকারিতায় তিনি চিরকাল বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন এবং আশ্রমী কল ও লাভ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, ‘মুক্তি-মিশন’ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বের এক দিনের কথা। আশ্রমের এতটি নয়নারীর গ্রাসাচ্ছাদন তিনি কিরূপে দিবেন? আমেরিকার সাহায্য আসিতে এখনও তিন চার দিন বাকী আছে। তিনি কাতাকেও কিছু না বলিয়া প্রার্থনার ডুবিয়া বহিলেন। সাহায্য যেদিন আসার কথা তার আগের দিন তিনি একা ত্যক্ত হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে বোম্বাইগামী ট্রেনে গিয়া আরোহণ করিতে মনস্থ করিলেন। উদ্বেগ, বোম্বাইয়ের কোনও বন্ধু হইতে হাওলাত আনিয়া আশ্রম যক্ষা করিবেন। কোনও দিন ট্রেনের আসিতে এত দেবী হয় না। তিনি প্র্যাটকর্ষের এক বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। বেঞ্চে বসিয়া একপ্রতিতে প্রার্থনা করিয়া হাইতেছেন। প্র্যাটকর্ষে গাড়ী আসিয়া ঢুকিল, শীজই ছাড়িয়া দিবে, কারণ গাড়ী আজ দেবীতে আসিয়াছে। ঠিক এমনি সময় তাঁহার বেঞ্চার সামনে ট্রেনের বে কামরা ছিল, তাহা হইতে এক অপরিচিত ভক্তলোক দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং তাঁহাকে আসিয়া বলিলেন, “আমি আপনাকে মনে মনে ধুজিতোছিলাম। যাক, অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনাকে এখানেই পাইয়া গেলাম, তা না হইলে আজ যাকেই আপনার ‘আশ্রমে’ আনার বাইতে হইত। ‘মুক্তি-মিশন’ের জন্ত আমার

এই সামান্য দানটুকু গ্রহণ করুন।” দৌড়িয়া ভক্তলোকটি কামরায় উঠিতে না উঠিতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। যমার নোটগুলি গণনা করার আগেই ট্রেন প্র্যাটকর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পূণ্যব ট্রেন আসিতে এখনও কিছু দেবী আছে, তাই যমার ঐ বেঞ্চে বসিয়াই টাকাকুলি গণনা করিয়া দেখেন, ঠিক বত টাকা তিনি বোম্বাইয়ের সেই বন্ধু হইতে হাওলাত আনিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, অপরিচিত ভক্তলোকটির দানের পরিমাণও ঠিক তাহাই। এক পরমা বেশীও নহে, কমও নহে। যমার চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তাঁহার বাইবেলের কথা মনে হইল, “I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me.” যমার জীবনে এরূপ ঘটনা আরও বহুবার ঘটিয়াছে, তাই বসিতেছিলাম, তিনি ছিলেন প্রকৃত বীণভক্ত খ্রীষ্টান। প্রার্থনার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল বলিয়া এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়া বাইতে পারিয়াছেন। প্রার্থনা ও উপবাস ছিল তাঁহার নিত্যধর্ম। তিনি কখনও মাংস খাইতেন না এবং বস্ত্রাহায়ে সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার স্বামী বিনিবাহারী আইন-বহি ক্রয়ের জন্ত খ্রীষ্টে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতে ২৫০/- স্বর্ণ গ্রহণ করেন। দমা বোম্বাই গিয়া স্বামীর এই স্বর্ণ পরিশোধ করেন। ইহা তাঁহার মহামুত্তবতার পরিচায়ক। তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবর্ণমেন্ট ১৯১৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে ‘কৈশর-ই-হিল’ স্বর্ণপদক দিয়া পুণ্ডিত করবেন। আজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মিশনে প্রায় দুই হাজার সহায়-সম্বলহীন অনাথ প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর পর পরিচালকবর্গ আশ্রমের নাম ‘রমাবাই-মুক্তি-মিশন’ রাখিয়াছেন। শ্রী ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের নেতৃত্বে বয়ন শিক্ষা-কমিশন পুণ্ডিতে যাত্র, তখন পণ্ডিতা উক্ত কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার সাক্ষ্যে হান্টার সাহেব এতই প্রীত হন যে, তিনি উহা দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ১৮৮৯ সনের ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির বোম্বাই অধিবেশনে তিনি মহিলা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, তামিল, মারহাট্টা এবং হিব্রু এই ছয়টি ভাষা জানিতেন। পণ্ডিতা রমাবাই সর্বপ্রথম ভারতীয় নারীদিগকে তাহাদের উচ্চতর কর্তব্যের কথা শ্রবণ করাইয়া উন্নত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার মত এবং কর্মপন্থা আমাদের মধ্যে হ্রত অনেক অনুমোদন নাও করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চ-ছন্দয়া এবং কর্তব্য-পরায়ণা মহীয়সী মহিলা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও মতবৈধে নাই।



## কৃতি কি

শ্রীআশুতোষ সাংঘাল

কৃতি কিবা বলো ভুলে যদি যাই

তোমাকে !

চিরদিন মনে রাখিবারে পাবে

কোথা কে ?

প্রাণ-বিনিময় !—বাতুলের কথা !

প্রেমের নেশার বোরে আকুলতা !

ব্যক্তের হাসি হাসে মহাকাল

হোথা সে !

২

শাস্ত্রত প্রেম !—আকাশ-কুসুম !—

জানো কি ?

নহি আমি রাম,—তুমি নহ মোর

জানকী !

যে হেতু জীবন নহেক কাব্য,—

অভিলাষ তব অসম্ভাব্য !

দুয়ে আর দুয়ে চার হয় শব্দ,

মানো কি ?

৩

এ জগতে কেহ ভোলে না কি কত

কাহারে ?

ঝরাফুল,—কত বাখে মনে তরু

তাহারে ?

কতো বিচিত্র উচ্ছ্বাস তুলি'

একে একে চলে যায় চেউগুলি ;—

নদীতটে কি গো থাকে স্মৃতি তার

আহা রে !

৪

ভেবেছ জীবন শুধু প্রেম আর

কবিতা ?

জানো না কি হয়, তোমারি মনের

ছবি তা ?

অনন্তকাল চিরদিবায়ামো

না রহিবে তুমি, না রহিব আমি !—

তাই ওগো আমি লই হাতে হাতে

লভি যা' !

৫

যাবে কহ প্রেম সে যে স্নমধুর

ছলনা !

একটি আকাশে ক'টা চাঁদ ওঠে

বল না !

হৃদয়-গগনে শত শত চাঁদ

নিত্য সে পাতে নব মায়াফাঁদ ;

একটি কমল ফোটে কি সলিলে

ললনা !

৬

কোনো কৃতি নাই—যদি যাই তোমা

তুলিয়া !

স্মৃতিটিরে কেন রাখো বেড়ে পুঁছে

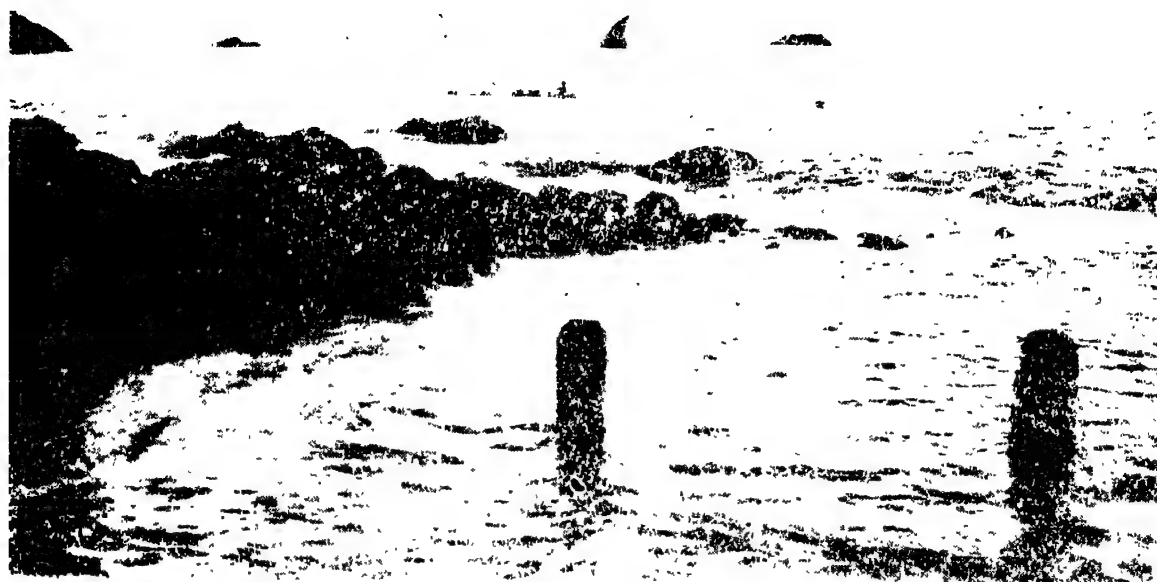
তুলিয়া ?

ভেবেছ কি প্রেম তব পোষা পাখী,—

রাখিবে রাখিয়া মরিবারে ডাকি' ?—

চিরদ্বন্দ্ব,—যায় সে শিকল

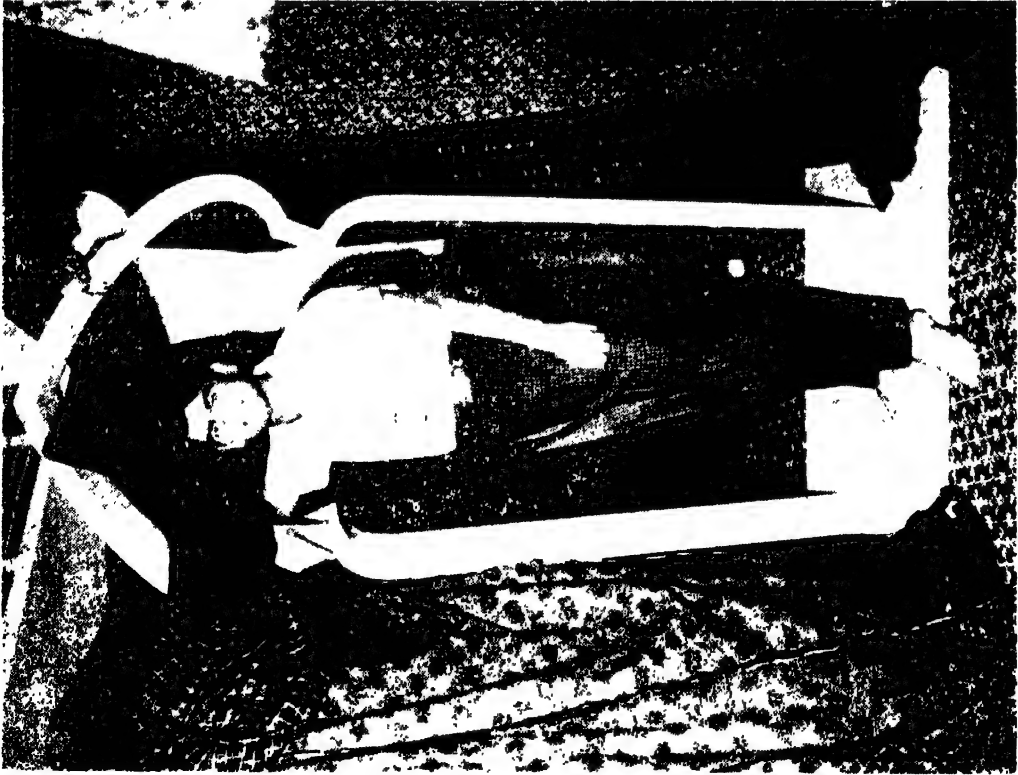
খুলিয়া !



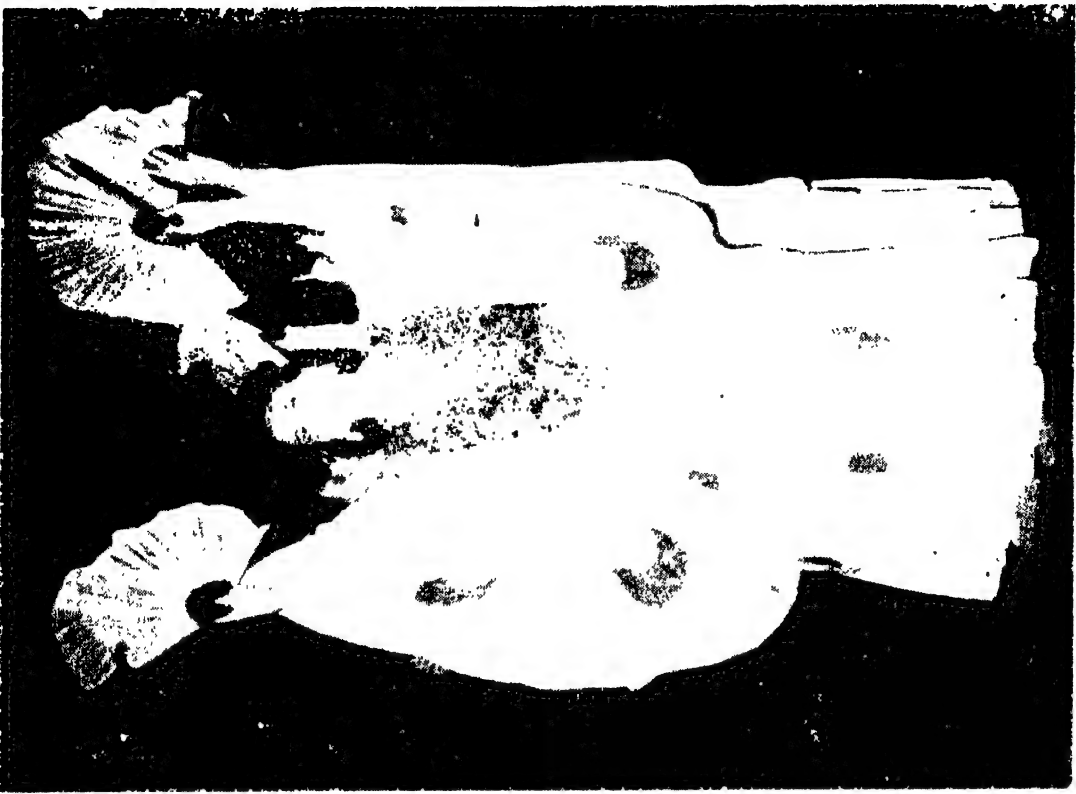
କଥା କୁମାରୀ ୧୯୫୨ ମସିହା ୧୧, ୨୭, ୨୮



ଦିଶୁ ନେଇ ନା ପ୍ରାଣ



উইয়াকের প্রদর্শনীর একজন যুগ্ম ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী  
নন্দনা দেবাই, তেছেন



পাটী লোক-নৃত্য  
ভিয়েতনামবাসী ছাত্র: নন্দনা এই নৃত্য দেখাইতেছেন

# লালস্বামী

২৭

পিড়ালয়ে ঐমতী অনেকদিন হ'ল এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে নিজেও যেমন কাকর কোন গবঃ-খবর নেয় নি ও-তরকও তেমনি নীরব। কীরিয়া বারকয়েক চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতে এসে ধমক খেয়েছে। রাগী একেবারে বিশ্বয়করভাবে থেমে গেছেন। শুধু বাবার সঙ্গেই যাতোক টুটো মন খুলে কথা হয়— আর দাদার সঙ্গে পুথানো দিনের মত খগড়াকাটি। কিন্তু এ অবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

ঐমতী নিজেই ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে এনেছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা ঘরের বাইরে যেতে চায় না। দশ জনার দশ দকমেব প্রসঙ্গে সে সবড়ে এড়িয়ে চলতে চায়।

প্রণব অসুযোগ দিয়ে বলেন, এ ভাবে চললে শেষ পর্যন্ত যে একটা শক অসুখে পড়বি মা।

ঐমতী বলে, ভয় নেই বাবা—আমার অসুখ-বিসুখ হবে না।

প্রণব বলেন, না তলেই ভাল, কিন্তু কীরিয়াকে নিয়ে বোজ বিকলে একটু ঘুরে আসতে নোব কি? ওতে শরীফটাও ভাল থাকবে, মনটাও প্রফুল্ল হবে মা।

ঐমতী জবাবে বলে, এবারথেকে যাঁব বাবা।

প্রণব খুশী হয়ে বলেন, তাই যেও—

বাবার কথা ঐমতী স্নেহে পায়ে নি। বোজই কীরিয়াকে নিয়ে সে নদীর পায়ে বেড়াতে যায়। দুবে ঘন বনানীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অতীত নতুন করে তার চোখে থরা দেয়। একদিন ওরা তাকে হুনি'বাব বেগে আকর্ষণ করত। বাসর হয়ে উঠত গাছপালা, লতাপাতা। আজ কিন্তু ঐমতীর কাছে ওরা সব বোবা। শুধুই একরাশ মৃত স্মৃতি—মাধুর্ষ নেই। গাছকে শুধু গাছই মনে হয় আর পাতাকে নিছক পাতা।

কীরিয়া বলে, বাবে দিদি ঐ বনে? নিয়ে আসব তীর আর ধরু ক?

ঐমতী অসম্মত ভাবে জবাব দেয়, নিয়ে আর—

কীরিয়া চলে যায়। কাছেই তার ঘর।

ঐমতী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পায় পায় এগিয়ে চলে। কোন কিছুতেই সে আর তেমন উৎসাহ পায় না। যন এবং বেহের উপর একটা অপরিণীত ক্রান্তি নেমে এসেছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে হতাশ হয়। তার বিবাহিত জীবনের মধ্যে অতমুর কাছ থেকে এমন কিছুই সে পায় নি যার জগে পিছন কিয়ে তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস কেগতে হবে। তবু সে অতমুরকে তার চিন্তার বাইরে সরিয়ে রাখতে পারে না। তার গর্ভের সন্তান বাবে বাবে এ দিকে অক্লিস্কৃত করে। ঐমতী অবাক হয়ে যায়। মুখে কেমন এক প্রকারের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠে। তার জীবনে এটা একটা চরম পরিহাস—একটা প্রকাশ দুর্ধরনা।

কীরিয়া কিয়ে এসেছে। ঐমতী তাকে আসতে দেখে দাঁড়াল। কাছে আসতে বলল, বেশী দূরে কিন্তু যাব না কীরিয়া।

কীরিয়া মুহু মুহু হাসতে থাকে। কথা বলে না। এমন অদ্ভুত কথাই কি জবাব সে দেবে।

হু'জনাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। কাকর মুখে কথা নেই। এক সময় কীরিয়াই এই নীরবতা ভঙ্গ করে কথা করে উঠল, তোমার মন ভাল নেই দিদি। চল, ঘরে ফিরে যাই। কিয়ে বাবার প্রস্তাবেও ঐমতীর কোন আপত্তি নেই। সে মুহু কঠে বলল, তাই বরং চল কীরিয়া।

কীরিয়ার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। জানাইবাবুয় জগে মন কেমন করছে বুঝি?

ঐমতী অজ্ঞ কথায় বলে, আমি চলে বাবার পর আর একদিনও বোধ হয় তীর-ধরু ব্যবহার করিস নি কীরিয়া?

কীরিয়া জবাব দিল, না। তোমার অজ্ঞ ভুলে রেখেছিলাম। আজ নদীর জলে কেল দিয়ে যাব।

ঐমতী আশ্চর্য হয়ে যায়। নরম গলায় বলে, হঠাৎ কেল দিতে যাঁবি কেন?

কীরিয়া শূন্য হয়ে জবাব দেয়, যেথেকে দেব আর কাব জগে?

ওর বাগ দেখে ঐমতী একটুখানি হাসল। বলল, তুই শুধু শুধু বাগ কথাছিস কীরি। আমি কেমন করে এ অবস্থার বাই বল দেবি—

কীরিয়া বিস্মিতভাবে খানিক চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কি সরম দিদি—আমার মনেই ছিল না তুমি যে পোরাতি।

শ্রীমতী একটু হাসল।

সন্ধ্যার পূর্বেই ওরা কিবে এসেছে। বাড়ীতে এসে প্রথমেই শ্রীমতী তার কণ্ঠস্বর কাছে উপস্থিত হ'ল। তিনি যেন অপেক্ষা করে আছেন এমন ভাবে আহ্বান জানালেন, আর যা। আজ বুঝি নদীর পারে গিয়েছিলি?

সম্ভ্রান্তকণ্ঠে ঘাড় নেড়ে শ্রীমতী জবাব দিল, হ্যাঁ বাবা।

প্রণব খুশী হয়ে বললেন, বেশ করেছে যা। সাধামত কাজের মধ্যে থেক। মনও ভাল থাকবে শরীরও ভাল থাকবে।

শ্রীমতী খানিক চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, কথাটা আমিও ভেবেছি বাবা। তুমি যদি রাগ না কর তবে বলতে পারি।

প্রণব স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

শ্রীমতী বলল, তোমার অমুমতি পেলে আমি একটা কাজে হাত দিতাম। প্রফেসার কাকার সঙ্গেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এখন তুমি বললেই এততে ভরসা পাই বাবা।

প্রণব হেসে বললেন, কিন্তু আসল কথাটাই যে এখনও জানতে পারলাম না যা?

শ্রীমতী বাবার গা বেবে ঠাঁড়িয়ে বৃহৎ হেসে বলল, তোমাদের মেরে-ফুলে একটা চাকরি নেব ভাবছিলাম বাবা।

প্রণব সহসা সোজা হয়ে বসে খানিক কক্ষর মুখে পানে চেয়ে থেকে একটু হেসে বললেন, তোমার প্রফেসার কাকা বুঝি তোমাকে এই বৃত্তি দিয়েছেন যা?

না বাবা, শ্রীমতী জবাব দেয়, তিনি বলবেন কেন—আমারই সময় কাটতে চাইছে না। তা ছাড়া আমি কি কিছুই বুঝি না?

প্রণব বললেন, হঠাৎ বোঝা-বুঝির কথা বলছ কেন যা?

একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীমতী বলল, আমি এখানে চলে আসবার ফলে তোমাকে আর একটা নতুন টুটসানি নিতে হয়েছে বাবা। অথচ আমার ওবাড়ী থেকে নিয়ে আসা টাকা তুমি ধোঁবে না।

প্রণব একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, সে টাকা যদি না ছুঁতে পেরে থাকি তা হলে তোমার দোতগায়ের টাকা বে নিতে পারব তা তোমার কে বললে শ্রীমতী? টুটসানি তুমি না এলেও নিতে হ'ত। তা ছাড়া আজ তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বলেই ত এ কথা ভাবতে পারছ যা।

শ্রীমতী কথাটা স্বীকার করে নিরেই বলল, তোমার অমুমান সত্যি বাবা।

প্রণব বললেন, তোমার যদি বিয়ে না হ'ত?

শ্রীমতী জবাব দিল, তা হলে হয়ত এ চিন্তা মনেই আসত না।

প্রণব সহসা সন্দ্বিধ কণ্ঠে বললেন, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে কি শ্রী?

শ্রীমতী সবপেঁ বাধা নেড়ে বলল, তুমি অকারণে সন্দেহ

করছ। এ সব আমার নিজের কথা। তা ছাড়া আজকের দিনে মেরেদেরও এই পথে চিন্তা করবার সময় এসেছে বাবা।

প্রণব বললেন, তোমার এ কথা আমিও স্বীকার করি। আমার কাছে অরুণ আর শ্রীমতীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু এ বৃত্তি তোমার বিয়ের আগে চললেও বিয়ের পরে চলতে পারে না। চলা উচিত না। সেই জন্তেই তোমার বাধা না দিয়ে আমার উপায় নেই।

একটা জবাব দেবার জন্তেই শ্রীমতী মুখ তুলেছিল—সহসা দানার চোঁচোমেটিতে তাকে ধামতে হ'ল। বলল, অত চীৎকার করছ কেন—আমি বাবার কাছে আছি।

অরুণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। রাগীও ছেলের পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করেছেন। শ্রীমতীর হাতে একখানি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে সে সরে পড়ল। ছেলের সঙ্গে সঙ্গেই মাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রণবের সম্মুখেই শ্রীমতী চিঠিখানি খুলে পড়তে শুরু করল। লিখেছেন ডাক্তারবাবু।

শ্রীমা—

তুমি কোথায় যেতে পার তা আমাকে জানিয়ে না গেলেও আমি জানি। আর জানি বলেই একটুও বাস্তব হই নি। তুমি ঠিকই করেছে। আমি হলেও এই কাজট করতাম। প্রতিবাদ না করে বারা অজ্ঞারকে যেনে নেয়, ঐশ্বর্যের পরীক্ষার তারা উত্তীর্ণ হলেও অজ্ঞারকে যে প্রজ্ঞার দেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক আপত্তি তোমাকে চিঠি দিতাম। দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাওয়ার গতি কোন দিকে ঘুরে যায় সেট দিকেই একাগ্রভাবে চেয়ে ছিলাম। তোমার চলে যাওয়া সকল নিক দিয়ে সার্থক হয়েছে, এ কথাটা বুঝতে পুণ্যে আর একটি মুহূর্ত্ত দেব করি নি। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। সন্ধ্যা হলেই মনটা কেমন উতলা হয়ে ওঠে। অতঃপরবাবু কারখানা আমাকে ধরে রেখেছে। ওর জন্তে নয় যা। ঐ কারখানাকে উপলক্ষ্য করে বারা হুমুয়া যেতে পার তাৎপর্যট জন্ত। বড় গোলমাল। একদিকে আড়াল থেকে ডানকান আর আগরওয়ারা চাকা ঘুরাচ্ছে আর কোথাকার কে এক শিলাদিত্য বিশ্বাস ভিতরে বসে ইচ্ছন জোগাচ্ছেন—বুঝি দিচ্ছেন। বন্ধুর ছদ্মবেশে ওদের যে বত বড় সর্বনাশ তিনি করে চলেছেন এ কথা বুঝিয়ে বলবার একটা লোকও নেই। এ অবস্থার কেমন করে আমি দুয়ে সয়ে বাই বল দেখি?

তুমি এখান থেকে চলে বাবার দিনকয়েক পর থেকেই অতঃপরবাবু কারখানায় ব'গুয়া বন্ধ করেছে। বন্ধ করে ভালই করেছে। নইলে সহজটা জটিল হয়ে পড়ত। আশুন আলিয়ে রাখতে শিলাদিত্য এক সঙ্গে প্রচুর কাঠ গুজে দিয়েছেন। প্রথমে ধোয়ার ধোয়ার চতুর্দিক ঢেকে কেলেছিল। এখন ধোয়া নেই—আশুন জলছে। কাঠগুলি সব পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের জন্ত কিছুই শিলাদিত্য যত্ন রাখেন নি। আমি এই সুযোগের

অপেক্ষাই ছিল। হাতের কাছে আর কাঠ না পেয়ে নিজেকেই সে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। হুঃ হুঃ, কিন্তু উপায় নেই :—

এইমাত্র থবর পেলাম, ভেলেটির আসল নাম শিলাদিত্য নয়—সুধা বিশ্বাস। আর, একদিন নাকি সে তোমাদের পরিবারের একজন ছিল! তোমার বাবার প্রিয় ছাত্র আর দাদার বন্ধু। তাই আমাকে খামতে হয়েছে। নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কি করা যায়। শিলাদিত্যকে বেলাবে সন্ধ্যাতে চেয়েছিলাম সুধাকে ত সেভাবে সন্ধানো সম্ভব হবে না!

মনে হচ্ছে, এ সব কথা তোমাকে না জানালেই বোধ হয় ভাল কতাম। দূরে বসে তুমি ত আমার কোন উপকার করতে পারবে না মা! তার চেয়ে বল দেখি কেমন অঙ্ক তুমি? আচ্ছা, এই বুড়োই না হয় নানা বন্ধুগোষ্ঠে তোমার খোঁজ করতে পারে নি, কিন্তু তুমিও ত একবার এ বুড়োকে স্মরণ করলে না মা।

এ দিকের কথা নিয়ে তুমি ভেবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের শরীরের উপর দৃষ্টি বোধো। বহুদিন তোমাকে দেখি নি। মন আমার ব্যাকুল হয়ে আছে। অনেক আগেই ছুটে যেতাম, কিন্তু তে মনের সকলের মঙ্গল চিন্তাই আমাকে ধামিয়ে রেখেছে।

এখন একবার উঠতে হচ্ছে। যিত্রা এইমাত্র কোন করে একবার দেখা করবার অনুবোধ জানিয়েছে। মেয়েটিকে বতাই দেখা'ত বিশ্বাস আমার উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবকথা একদিন তোমাকে মুখে বলব।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আর মা বাবাকে নমস্কার জানিও।

ইতি গুভাকাজী  
কাকাবাবু

চিঠিখানি পড়া শেষ করেও শ্রীমতী একই ভাবে বহুক্ষণ বসে রইল। ভাবছিল সে সুধাদার কথা। আর ভাবছিল যিত্রার কথা। সুধাদা আজ শত্রুর ভূমিকায় আর যিত্রা যিত্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুধাদাকে সে বুঝতে পারে, কিন্তু যিত্রার এই রূপান্তর অবিহ্বাত।

বে মেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে ছোবল দেবার জন্ত—ব'ব চোখে সে সাপের মত হিংস্র আর কুটিল চাহনি ছাড়া অস্ত কিছু একদিনের জন্ত দেখে নি, সেই মেয়ে রাতারাতি তার স্বভাব-বর্ষা ভাগ করে বদলে বেতে পারে এ সে—

শ্রীমতী আশ্রয় অজ্ঞাতে কথা করে উঠল, না এ হতেই পারে না।...

প্রথম অনেকক্ষণ ধরেই শ্রীমতীকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন, কি হতে পারে না শ্রী? চিঠিতে কোন ধারণা থবর নেই ত মা?

শ্রীমতী ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে সে জবাব দিল, কাকাবাবু এখানে আসবেন লিখেছেন। তাই...

প্রথম বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তাঁর এখানে আসা কেন হতে পারে না শ্রীমতী?

বাবার প্রপ্নে শ্রীমতী লজ্জা পেল। বলল, সুধাদা সবকিছু কতগুলো কথা লিখেছেন কি না—

প্রথম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কে—সুধা দিয়ে আমার ওখানেও উৎপাত শুরু করেছে?

হ্যাঁ বাবা। শ্রীমতী জানাল, তাঁদের কারখানার নাকি কি সব গুণগোল পাকিয়ে তুলছে।

তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রথম পুনরায় বললেন, আমি নিজে সেখানে যাব। শরতানকে জেলে পাঠিয়ে তবে আমার অস্ত্র কাজ।

তিনি চের'ব ছেড়ে সহসা উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে পাশের ঘর থেকে অক্ষণ এবং তার মা ছুটে এলেন।

শ্রীমতী তার বাবার একান্তে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে বাবা! যেতে যদি হয় অবশ্যই যাবে, কিন্তু তার আগে সব কথা ভালভাবে জেনে নেবে ত? আমি ব'ব কাকাবাবুকে এখানে আসবার জন্ত লিখে দিচ্ছি। তাঁর মুখে সব শুনে তার পরে যেতে হয় বেও। আগে থেকেই—

তাকে বাধা দিয়ে প্রথম বললেন, সব কথা তুমি আজও জানিস নে বলেই—নইলে হতভাগা একটা কালসাপ। আমি আমার করে হুধ-কলা দিয়ে পুড়েছিলাম। তারই প্রতিদান দিচ্ছে।

শ্রীমতী সহসা কটিন কণ্ঠে বলল, জানব না কেন বাবা? সাপের বা স্বভাব সেই ভাবেই সে চলবে—আর আমরা মানুষের মতই বাধা দেব। তুমি বাস্তব হয়ে না। বাবছা কাকাবাবুই করবেন। আমি ব'ব তাঁকে এখানে আসবার কথাই লিখে দিই।

খানিক চুপ করে থেকে প্রথম বললেন, তাই দাও শ্রীমতী—চিঠি পেয়েই বেন তিনি চলে আসেন।

২৮

ঘরে যিত্রা আর বাইরে সুধা। চিঠি লিখতে বসে নতুন করে কথাটা শ্রীমতীর মনে হ'ল। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে মেয়েটা যে কেমন করে হাত করল এ বহু তার কাছে অজ্ঞাত। তিনি অতঃ নন। তাঁর বয়স হয়েছে। চতুর্দিকে প্রথম দৃষ্টি তাঁর। এ ছাড়া কেউ সর্বনাশ মেয়েটাকে পাহারা দিচ্ছে। এসব তার নিজের চোখে দেখা।

শ্রীমতী আশ্চর্য হ'ল তার চিন্তাধারাকে এই পথে পাক খেতে দেখে। যে ঘরকে সে ছেড়ে এসেছে তারই প্রতি এই অকাণ্ড মমতা কেন! কেন সে আজ এতখানি চকল হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী জোর করে এই চিন্তার আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখতে শুরু করল।

কাকাবাবু—

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। এই চিঠি অনেক আগেই পারার আশা নিয়ে আমি রোজ পথের পানে চেয়ে থাকতাম। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে কিছুতেই ভুল বুঝবেন না। আমার চলে আসার কৈফিয়ৎ হিসেবে এ কথা সিংহি না। আজ বড় আনন্দ হ'ল যে, আমার সে ধারণা মিথ্যা হয় নি। আপনি আমাকে ভুল বুঝেন নি।

তখন দুঃখিত হলাম যে, চতুর্দিকের গোলমালের সব ক'কি একলা আপনাকেই পোহাতে হচ্ছে। কিন্তু এত লোক থাকতে কেন যে আপনি এত মিথ্যা কামেলা পোহাচ্ছেন এর কোন সত্য কারণ খুঁজে পেলাম না। কিসের ভক্ত আপনি নিজেকে এ ভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। এর কি বার্থ কোন প্রয়োজন আছে কাকাবাবু? তা ছাড়া যাঁর ভক্ত আপনি এত ভাবছেন তিনি ত আপনাকে চান না। তবুও কেন এই মিথ্যা বোঝা আপনাকে বইতে হবে?

সুখ্যাৎ সত্যকে এই প্রসঙ্গে আমি গোটাকরেক কথা বলা একান্ত আবশ্যক মনে করছি। তাঁর সত্যকে আপনি কতটুকু জানতে পেরেছেন লেখেন নি, কিন্তু আমি যতটুকু জানি শুধুন। এক সময় তিনি বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। দাদার অকৃত্রিম বন্ধু বলেও জানতাম। আমি নিজেও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমার বিয়ের পরে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করা ত দূরের কথা তাঁর সঙ্গে এক সময় আমাদের পরিচয় ছিল এ কথা স্বীকার করতেও লজ্জার আমাদের মাথা কাটা যায়।

তখন দেশ বিভক্ত হয় নি। আমাদের প্রজা হরি বিশ্বাসের ছেলে সুখ্যাৎ বিশ্বাসকে বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্য। লেখাপড়ার ঠর আগ্রহ দেখে, আর হরি বিশ্বাসের একান্ত অমুরোধ এড়াতে না পেয়ে বাবা তাকে নিয়ে এসেছিলেন। লেখাপড়া শিখলেও তিনি মানুষ হলেন না। আমার বিয়ের পরেই তাঁর শিক্ষার মুখোশ খসে পড়ল। তার পরে যে পাথে তিনি চলতে শুরু করলেন তাকে প্রত্যেক শিক্ষিত আর সভ্য মানুষই বিপথ বলে থাকেন।

সংক্ষেপে এই হ'ল সুখ্যাৎ বিশ্বাসের কাহিনী। এর পরেও যদি তাকে এই পরিবারের একজন বলতে চান তা হলে আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে আমি বাবার হয়ে আপনাকে অমুরোধ জানাচ্ছি যে, শিলাদিভাষ্য ভক্ত যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সুখ্যাৎ বিশ্বাসের বেলারও তার কিছুমাত্র তারতম্য করা হলে আমরা দুঃখিত হব। আর সেই সঙ্গে আপনার কথাটাই আর একবার বলব—অভ্যাসকে যারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় তাঁরা অভ্যাস-কারীকেই প্রশংসা দিয়ে থাকেন। আমার একান্ত অমুরোধ আপনার নিজের কথার অন্তর্গত যে আপনি নিজেই করবেন না।

আপনি চলে আসুন কাকাবাবু। আমার নিজের ইচ্ছেমত দু'দিন আপনাকে সেবা করবার সুযোগ আমাকে দিন।

কথা বিশ্বাসের কথা আমি বাবাকে বলেছি। তিনি খুবই

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি নিজেই ওখানে বাবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমি বাধা দিয়েছি। এতে কোন লাভ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বরং দুটকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দেওয়া হবে।

ওপানকার কথা মনে হলোই সবার আগে আপনার কথা মনে হয় কাকাবাবু। ঐ আকর্ষণহীন প্রাসাদে আপনাকে না পেলে আমি হয়ত দম বন্ধ হয়ে মাথা বেঁতাম।

আমার জন্ত ভাববেন না। আপনার আলীকাদে ভালই আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ঊর্জিত স্নেহমগ্না শ্রীমতী।

চিঠিখানি সেই রাজেই শ্রীমতী পাঠে আপিসে পাঠিয়ে দিল।

২০

চিঠি পেয়ে আর দেরি করেন নি ডাক্তারবাবু। তুফান এক্সপ্রেস তাঁকে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে দিয়ে গেল। খবর নিয়ে আসেন নি তিনি। কিন্তু প্রণব মাষ্টারের বাড়ী খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয় নি।

শ্রীমতী সেইমাত্র ক্ষীণহার সঙ্গে ফিরে এসেছে। উদ্যানিঃ রোজই সে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভ্রমণে যায়। বাড়ীর প্রাঙ্গণে দূর্বপ্রথম শ্রীমতীর সঙ্গেই ডাক্তারবাবুর দেখা হ'ল। হেসে পায়েব ধূলা নিতেই তিনি মাথার হাত বেগে আলীকাদ করলেন। বললেন, চোখাটা ত তোমার ভাল দেখাচ্ছে না মা?

শ্রীমতী একটুখানি হাসল, কোন জবাব দিল না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, হাসির কথা নয় মা। ডাক্তারের চোখকে তুমি অত সহজে ক'কি দিতে পারবে না। নিশ্চয় শরীরের উপর তুমি যত্ন নিচ্ছ না। এটা ভাল কথা নয়—

শ্রীমতী শ্রিত হেসে বলল, আপনি যখন এনে পড়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে বাবে কাকাবাবু। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও আপনার শোনা হবে না। সাংগিন আপনার গাড়ীতে কেটেছে। ঘরে চলুন। খানিক বিশ্রাম করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে যতখুন্সী কথা কইবেন, আমি না করব না।

ডাক্তারবাবু সন্তোষে হাসলেন।

ইতিমধ্যে বাবা এবং তাঁর পিছু পিছু মা এসে উপস্থিত হয়েছেন। মা মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রণব কতকটা যেন হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখে একটা সাধারণ ভক্তাত্মক কথাও যোগাল না। বাবার এই বিভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য করে শ্রীমতী দীর্ঘমত বিস্মিত হলেন সে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে একটু হেসে বলল, ইনিই ডাক্তারবাবু—আমার কাকাবাবু, বাবা।

প্রণব এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। ডাক্তারবাবুর মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে প্রণবের একখানি হাত ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, এতদিনের দীর্ঘ অনর্শন আর একমুখ দাড়ি একমাত্র তোমাকেই দেখছি ঠিকাতো পারি নি নব।

প্রণব হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, কি মুন্সি—তুমি নালু মুন্সীই হলে আমার শ্রীম কাকাবাবু! তুমি তা হলে আশ্রয়—



কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তিনি বললেন, বেঁচে আছি হে নব—আজও বেঁচে আছি। কিন্তু আমাদের এখন খামতে হচ্ছে। দেখছ না, তোমার মেয়েটা কেমন করে তাকাচ্ছে! ওকে আমি চটাতে চাই না ভাই।

প্রণব কক্তার মুখের পানে সন্তোষে চেয়ে দেখে বললেন, তোমার কাকাবাবুকে নিয়ে আমার ঘরে যাও মা। আমি এলাম বলে। তিনি আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে দ্রুত উদ্দেশে চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু একটি বেতের আরাম কেদারার হাত-পা ছড়িয়ে তরে পড়েছেন। শ্রীমতী পাখা হাতে তাঁকে বাতাস করছে।

শ্রীমতীই প্রথমে কথা কইল, খবর দিয়ে এলেন না কেন কাকাবাবু? আপনার মনের মত হুঁচকারটে খাবার তৈরি কবে যাকতাম।

ডাক্তারবাবু চোখ বুজেই জবাব দিলেন, সেইজন্মেই খবর দিয়ে আসি নি, আগে মা-ব্যাটার মধ্যে বোকাপড়া তার পর খাওয়া।

শ্রীমতী শ্রদ্ধা হেসে বলল, খগড়া কোথায় যে বোকাপড়ার কথা বলছেন, কাকাবাবু?

প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে ডাক্তারবাবু বললেন, কথাটা মনে থাকে যেন।

শ্রীমতীও হেসে জবাব দিল, ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেবেন, কাকাবাবু। ঐ যে, বাবা আসছেন। আবার যেন গল্পে সেতে উঠবেন না। আমি এখুনি আপনার মুখ হাত-পা ধোবার জলের ব্যবস্থা করে আসছি।

শ্রীমতী দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শ্রীমতী চলে যেতে ডাক্তারবাবু প্রণবকে উদ্দেশ করে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও নব। তোমার মেয়েটা কিরে আসবার আগেই হুটো গোপন কথা সেয়ে নি।

প্রণব দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, নালু মুন্সী যে: যবে নি তা আজ জানলে তুমি আর জানেন তার আটপাী। কথাটা আপাতত: আর কাউকে জানতে দিও না।

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তুমি যে বহুস্ত-উপকাসকেও তার মানিয়ে দিলে হে নালু মুন্সী! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই!

ডাক্তারবাবু একটু হেসে জবাব দিলেন, এতদিন যখন না বুঝেও তোমাদের চলে গেছে তখন আর ক'টা দিন না বুঝেও কোন ক্ষতি হবে না নব, কিন্তু দোহাই ভাই, তোমার ঐ উকিল মেয়েটাকে যেন কিছু বল না। তাকে বা বলবায় অশ্রুই বলতে চাই। যাও, এবারে দরজাটা খুলে দাও।

তা দিচ্ছি। আর বলছ যখন তখন গিন্নীকেও সাবধান করে দিয়ে আসছি।

প্রণব দ্রুত চলে গেলেন। এবং অল্পকণের মধ্যেই ফিরে এসে পুনরায় বললেন, তোমার আদেশ মানিয়ে এলাম।

হুঁজনেই একসঙ্গে হাসতে থাকেন।

হাসি থামিয়ে প্রণব সতৃপ্ত অঙ্গ প্রসঙ্গে এলেন, স্বর্ধা নাকি তোমাদের খুব বেগ দিচ্ছে?

ডাক্তারবাবু কথাটা তেমন গায়ে না মেখে উত্তর দিলেন, তা একটু দিচ্ছে কিন্তু, ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা মা-ব্যাটাতে সহজেই তাকে সাহেজা করতে পারব।

ডাক্তারবাবু ভুলেও শ্রীমতীর চলে আসা নিয়ে কোন কথা বললেন না। প্রণবও তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

শ্রীমতী পুনরায় ফিরে এসেছে। ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়লেন। হেসে বললেন, আমি প্রস্তুত মা।

এ কথাই জবাব শ্রীমতী কথায় দিল না—দিল মধুর হেসে।

( ৩০ )

হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ সমাপ্ত করে ফিরে আসতে ডাক্তারবাবু আধ ঘণ্টাও লাগে নি। তাঁর বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্রীমতী বলল, এবারে একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন, আমি আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে যাব।

ডাক্তারবাবু সহাস্তে বললেন, এটা ত তোমার বাড়ী নয় মা। যাদের বাড়ী এসেছি ব্যবস্থাটা তাদের করতে দিয়ে তুমি বরং আমার কাছে বসে গল্প কর। তা ছাড়া তোমার কাছে খাওয়া ত আমার একটি রাজত্বই ফুরিয়ে যাবে না, মা।

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত জবাব দিল, ফুরিয়ে যেতে আমি দিলে ত।

ডাক্তারবাবু সন্তোষে বসলেন, কথাটা সময়মত ভুলে যেও না কিন্তু।

হুব নাকি কাকাবাবু। শ্রীমতী জবাব দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, শুনে খুশী হলাম। ভাল কথা, তোমার বাবা গেলেন কোথায়?

শ্রীমতী বলল, বোধ হয় বাজারেই দিকে গেছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভালই হয়েছে। এই সুযোগে আমার বক্তৃতাটা শেষ করে কেলি। সময় আমার হাতে অত্যন্ত কম মা। মাত্র একটি দিন। এমই মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ-কর্তব্য স্থির করে নিতে হবে।

শ্রীমতীর মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। ডাক্তারবাবুরও তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি পুনরায় বললেন, সুখা বিশ্বাসকে নিয়ে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছি—কোথা দিয়ে আবার নতুন করে কি জট পার্কিয়ে বসবে তার ঠিক নেই—নইলে হুঁচকারদিন থেকে যেতে আমার আপত্তি ছিল না।

শ্রীমতী গভীর কণ্ঠে বলল, একটা অতি সাধারণ লোককে আপনারা বড় বেশী মূল্য দিচ্ছেন কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তোমার কথাটা ঠিক হ'ল না

মা। শত্রুকে ছোট করে ভাবতে নেই তাতে শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয়।

শ্রীমতী কতকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু এই ঠকা-জ্ঞেতার আপনায় ত কোন লাভ-লোকসান নেই কাকাবাবু!

ডাক্তারবাবু স্থিত হেসে বললেন, কি যে আছে আর কি যে নেই সে প্রশ্ন থাক। তা ছাড়া জান ত মা, ভাগ্যবানের বোকা সবসময় দুর্ভাগ্যবাহী হয়ে থাকে। কি কখনোই যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

শ্রীমতী অভ্যমানভরা কণ্ঠে বলল, আপনার কথা শুনে হৃৎপেলোয়। কিন্তু ভাগ্যবান আপনি ক'কে বলছেন?

ডাক্তারবাবু মুহূর্তে হেসে বললেন, যদি বলি তোমাকে, আর তোমার জন্মই আমার সব দুর্ভাবনা?

শ্রীমতী বলল, তা হলে আমার জন্ম দুর্ভাবনা করতে নিষেধ করব।

ডাক্তারবাবু তাঁর বড়বহুল হাসিমুখে বললেন, অবশ্য সবটাই যে ঠিক তোমার জন্ম এক কথাও বলা চলে না। আংশিক সত্য বললেই ঠিক হবে।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলতে থাকে, ওদের ভাল-মন্দর বাইরে চলে এসেও কি আমার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারি নি কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দেন, এক বিন্দুও না, শ্রীমতী। বৎ আমার দুর্ভাবনা বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া মুক্তি যে আমি নিজেই চাই না মা। কিন্তু তোমার রাগ দেখছি আজও যোল-আনাই আছে।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে অস্বীকার করে বলল, না কাকাবাবু এটা রাগ-অভিমানের কথা নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা হলে একে আমি কি বলব মা?

আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। শ্রীমতীর কণ্ঠের কঠিন হয়ে উঠল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, সে-সব কথা আপনার না শোনাট ভাল।

ডাক্তারবাবুর মধ্যে কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি তেমনি হাসিমুখেই বললেন, কথাটা কিন্তু আমাকে শুনতেই হবে। অবশ্য তুমি যদি অধিকারের প্রশ্ন না তোল।

শ্রীমতী অনেকখানি দমে গেল। সে আর্দ্রকণ্ঠে বলল, আপনি এভাবে আমাকে বলতে বাধ্য করবেন না কাকাবাবু—

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠের স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, তোমার অনিচ্ছা থাকলে আমি আর জোর করব না মা। তবে তোমার কাকাবাবুকে যদি সত্যিসত্যিই তোমার মল্লকাকাকী মনে কর তা হলে সবকথা তাঁকে অকপটে বলতে পার।

শ্রীমতীর হৃৎচোখ চলছিলিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবুর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি একটু বেন অপ্রস্তুত হয়েছেন মনে হ'ল। কথা না বলে অন্তমনস্কভাবে কি চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্রীমতী বলল, সব কথা জানেন না বলেই—

তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, জানলে পরে তোমাকে প্রশ্ন করব কেন মা? ভুল কিছু জেনেছি কি না সেই জন্মেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম। তোমাকে হৃৎ দেবার জন্ম নয়।

সহসা খানিকটা উত্তেজিত হয়ে শ্রীমতী বলতে শুরু করল, রাত বায়োটায় মিত্রায় ঘর থেকে বার হয়ে আসতে দেখেও আমি তেমন গুরুত্ব দিতাম না যদি... শ্রীমতী কথাটা শেষ না করেই থামল।

ডাক্তারবাবু মুহূর্তেই বললেন, ভাল বুঝলাম না মা।

শ্রীমতী পুনরায় বলতে লাগল, একটি মেয়ের ঘর থেকে বেশী রাত্রে বার হয়ে আসার কারণ শুধু একটা ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে। এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তখনই সন্দেহজনক বলে মানুষ মনে করে যখন সেটিকেই উপলক্ষ্য করে আর পাঁচটা ভয়ঙ্কর মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। কাকাবাবু, এত-বড় অপমানকেও হয়ত আমি মুখ বুজে সহ্য করে যেতাম, যদি তা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আমাকে মাপ করুন এর বেশী আর একটা কথাও আমি বলতে পারব না। আমি মুক্তি চাই।

ডাক্তারবাবু সন্তোষে শ্রীমতীকে কাছে আকর্ষণ করে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দেখছি, মিত্রা আমাকে একবর্ণ মিথ্যা বলে নি, তোমার সম্বন্ধেও বলে নি—তার নিজের সম্বন্ধেও বলে নি।

শ্রীমতী কেমন বেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, এর পরে কোন প্রশ্ন এসে পড়তে পারে এই ভয়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজের কথা মোটেই তুললেন না। শ্রীমতী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, আমাদের চারিদিকে একটা বিষাক্ত হাওয়া বইছে, তা আমি জানি মা। কিন্তু বিষের ভরে পাগিয়ে না দিয়ে মুখোস এঁটে এগিয়ে গিয়ে সেই বিষের উৎসকে ধ্বংস করে দেবো কি আমাদের উচিত নয় শ্রীমতী?

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলল, মিত্রা বিষাক্ত সাপ—

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, সাপ কিন্তু মানুষ নয় মা, এ দুইয়ে অনেক প্রভেদ।

শ্রীমতী দ্রুতকণ্ঠে বলল, আমি তর্ক করতে চাই না কাকাবাবু। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু তাতে হৃৎটাই আরও বেড়েছে।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, তুমি কিন্তু হৃৎটাকেই প্রকারান্তরে লালন করতে চাইছ। শোন মা, যে অবস্থায় মধ্যে পড়ে তুমি চলে এসেছ তা আমার অজানা নয় এবং এই চলে আসার সেদিনে যেমন প্রয়োজন ছিল আজ আমার তোমার ফিরে বাবারও তেমনি প্রয়োজন দেখা নিয়েছে মা।

একটু ধেমে খানিক কি চিন্তা করে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, মাত্র কয়েক মাস বয়েসের সময় অতন্মু তার মাকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছে সে পুরুষের কাছে এক ভিন্ন পরিবেশে। ওর প্রকৃতির মধ্যে হয়ত সেই জন্মেই কোমলতার এত বেশী অভাব। তার উপর ওর বাপ এবং ঠাকুরার মতবিরোধকে উপলক্ষ্য করে বাপের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হ'ল।

শ্রীমতী নিরস কণ্ঠে বলল, পুরুষ মানুষের কাছে এমন বহু ছেলেই মানুষ হয়ে থাকে কাকাবাবু। তাই বলে তাকে।

কথাটা তাকে সমাপ্ত করতে না দিয়ে ডাক্তারবাবু পুনশ্চ বলতে থাকেন, তুমি বা বলবে তা আমি জানি না, কিন্তু অতঃপর ঠাকুরা তাকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা ওকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা না করে বরং একজন আত্মসম্মত মানুষ করেই গড়ে তুলেছিল। তাই দ্বী হয়েও তুমি স্বামীঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছ। ডানকান-আগারওলার মত লোকও তার বিষয় বহু হতে পেয়েছিল একদিন, আর মিত্রা তার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করবার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্রীমতী এতক্ষণে একটুখানি হেসে জবাব দিল, অথচ সেই মিত্রাই এই অল্প সময়ের মধ্যে বললে গেছে, এই কথাটা আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলছেন?

ডাক্তারবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তাই বলছি মা। মিত্রার যে চোখে আমি একদিন আগুন জ্বলতে দেখে ভর পেয়েছিলাম সে দৃষ্টি আজ আর তার নেই। এখন তা স্নেহ আর মমতার টলমল করছে।

শ্রীমতীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে নিরস কণ্ঠে বলল, এই স্তম্ভক দেখে আপনি খুশী হতে পারলেও আমি পারছি না কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন, অবস্থাটা আমি হয়ত তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারি নি মা। কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্য তুমি আর একজনাব উপর অবিস্তার কর না।

ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে শ্রীমতী না হেসে থাকতে পারল না। সে বলল, আমাকে একটা সত্য কথা বলবেন কাকাবাবু—

তোমার কাকাবাবু এতক্ষণ ধরে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, এইটাই কি শেষ পর্যন্ত তুমি বলতে চাও শ্রীমতী? ডাক্তারবাবু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন।

শ্রীমতী লজ্জিত হয়ে বলল, ছিঃ কাকাবাবু! আপনি আমাকে কি মনে করেন? আমি শুধু বলতে চাই যে, কিসের জন্য এই পরিবারের সুখ-স্বাগ, ভাল-মন্দ সবই আপনি নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন? যাক না সে উচ্ছ্বসে—ভূবে যাক তার কার-খানা। আপনার কিসের দায়—কিসের দায়িত্ব।

ডাক্তারবাবু সহসা হা হা করে হেসে উঠলেন।

শ্রীমতী বলল, হয়ত হাসির কথাই বলেছি, তাই হাসছেন। আমারও মাঝে মাঝে কেমন একটা সন্দেহ হয়। সত্যতঃ, আপনার কিছুই না জেনে আমরা নানা কথা বলে থাকি। কোথায় যেন একটা গভীর রহস্য রয়ে গেছে যেখানে আজও পৌঁছাতে পারি নি।

ডাক্তারবাবু আর একবার হেসে উঠে বললেন, রহস্য মনে করলেই রহস্য, নইলে জলের মত সোজা। হুই আর হুই চারের মত।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু আমি বোঝ করতে বসলেই বোঝকলটা অনেক বড় হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু রহস্য করে জবাব দিলেন, ওটা অন্ধ না জানার কল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথার মধ্যেও আমার আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি মা। মুখ্যতঃ তোমাকে নিয়ে বাবার জন্তই আমি এসেছি। আর আগামী পরণ্ডই আমি যেতে চাই।

শ্রীমতী অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আমার কিন্তু বাওয়া হবে না কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু একটু যেন উত্তেজিত হয়েই জবাব দিলেন, হবে না মানে? একশ' বার হবে। তোমার কোন গুণ-আপত্তি আমি গুনব না।

শ্রীমতী হেসে কেসে বলল, আপনি কুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি শ্রীমতীর কাকাবাবু হলেও ও বাড়ীর কেউ নন। তাছাড়া আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমাকে ও বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে না।

ডাক্তারবাবু হতাশ হয়ে বললেন, তুমি বড় তর্ক করতে ভালবাস শ্রীমতী। এই কথাই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলবে, তুমি তোমার স্বামীকে তাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ?...

শ্রীমতী চুপ করে থাকে।

ডাক্তারবাবু বলেন, কিন্তু আজ বাদে কাল যখন তোমার কোলে সন্তান আসবে তাকে তুমি কিসের জোরে ধরে রাখবে—

শ্রীমতী একটুখানি ইতঃভূত করে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, নবকান্দ হলে কিরিয়ে দিতে হবে কাকাবাবু। জোর করে ধরে রাখতে পার না।

ডাক্তারবাবু বার বার মাথা নেড়ে স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, তখন কি পারবে মা?

শ্রীমতী ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, পারবার চেষ্টা করব কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, মনে মনে তুমি যখন স্থির করে ফেলেছ, তখন আর জোর করে কি কব মা, কিন্তু তোমার কাকাবাবু যদি ঠিক নিজেব বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় তা হলেও কি তুমি আপত্তি করবে?

শ্রীমতী হাসি মুখে জবাব দিল, না—

খুশী হলাম। ডাক্তারবাবু স্থিত হেসে বললেন, তা হলে আমার ভাড়া ঘরে চল। মা সন্ধ্যার পায়ের ছোঁয়া লেগে আমার ভাড়া ঘরই হয়ত একদিন রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠবে। তবে একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মা। একজন সাধারণ স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে যে কোন মেয়েই পারে। ওতে কোন কৃতিত্ব নেই। অতঃপর সাধারণ নয় স্বীকার করি, কিন্তু বার আনা এগিয়ে গিয়েও তুমি যে কেন না বুকে পিছু হঠতে শুরু করলে এইটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।

শ্রীমতী মুহ কণ্ঠে বলল, পিছু যখন একবার হটেছি তখন নতুন করে আবার শুরু করবার আমার ইচ্ছেও নেই, উৎসাহও নেই কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বার আনা ত তোমার নামে জমা হয়ে আছে যা—বাকী শুধু চার আনা। আমার কথা বে কত সত্য! তা আজ অতঃপরকে দেখলে তুমিও স্বীকার করবে!

একটা জবাব দেবার জগুই শ্রীমতী মুখ তুলেছিল। অকস্মৎ প্রণব এসে উপস্থিত হতে তাকে ধামতে হ'ল।

ডাক্তারবাবু প্রণবের কাছে নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে বললেন, একটি ঘণ্টা এই ঝগড়াটে ঘেরটার কাছে কেলে বেধে কোন রাজ্য জর করে এলে নব?

প্রণব তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললেন, কি তুমি রাজ্য জয়ের কথা বলছ নালু মূলী? আমার আজকের আবিষ্কার কি তার চেয়ে কিছু কম। প্রথমতঃ, আমার বালাবন্ধু, দ্বিতীয়তঃ কতবড় এক জমিদার, তৃতীয়তঃ সম্মানিত কুটুম—কত যুগ অজ্ঞাতবাসের

পর আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ যে আমার কি আনন্দ সে তুমি বুঝে না কল্যাণ মূলী—

প্রণব হঠাৎ খেয়ে থামলেন।

শ্রীমতী অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল। তার চোখ দুটি বিষ্ময়ে, আনন্দে যেন ঝিকিয়ে বার হয়ে আসতে চাইছে। মনে মনে সে বার করেক আবৃত্তি করল, কল্যাণ মূলী...কল্যাণ মূলী...

সহসা শ্রীমতী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ডাক্তারবাবু উঠে

এসে সম্বোধন তাকে কাছে টেনে নিলেন।

শ্রীমতী তখনও কুলে কুলে কাঁদছে।

আর প্রণবের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে এক ঝলক স্বর্গীয় হাসি।

[ আগামী বারে সমাপ্য ]

## মুরলীধর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শোন শোন সখী, শোন না উছাস লো :

সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে !

শোন যমুনায় তানের বিলাস লো :

আসে ভেসে ঐ কত অমুরাগে !

ক্রমুক ঝুমুক তাল নুপুরে বণি' গোপাল ঝুমুক ঝুমুক তালে আসে।

উছলে সপ্তসুরে মুরলী এ-মধু সুরে প্রেমের রাগিনী উছাসে।

চস্ তুঘিত এ-ঔষধি পিয়ার লো

হরি হরশনে মিটাবে সোহাগে।

শোন শোন সখী শোন না উছাস লো :

সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে !

শিখিচূড়া শিরে দোলে, বনমালা দোলে গলে কে ঐ পীতাম্বরধারী !

কমল নয়ন মরি, কটাক্ষ বাঁকা হরি নাচে নাচে কৃষ্ণ মুরারী !

সখী, যমুনায় চল চল—বাস লো

যেথা রবে নাথ—দেখি চল তাকে।

শোন শোন সখী শোন না উছাস লো :

সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে !

নন্দেব নন্দন, মাধব, মনোমোহন, গিরিগোবর্দ্ধনধারী !

মীরার হে সুলভ পরম মনোহর, জন্মিবৃন্দাবনচারী !

চল চল বাই কেটে মায়াপাশ লো

যেথা ডাকে বঁধু ডাকে অমুরাগে।

শোন শোন সখী শোন না উছাস লো :

সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে !

[ ইন্দ্রিয়া দেবীর সমাধিঙ্গত মীরাজ্ঞানের অমুরাগ ]

# রাষ্ট্রের দণ্ডনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য

## ত্রয়োগনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষ সমাজবাসী। সমাজ ছাড়া তার জীবন অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত ও অর্থহীন। সমাজতান্ত্রী সন্থাসীকেও তাই নির্জন তপস্রা ভঙ্গ করে বার বাহ কিরে আসতে হয় লোকালয়ের কোলাহলের মাঝখানে, সমাজচ্যুতকে পূর্বজীবন কিংবা পাওয়ার আগ্রহে নতি স্বীকার করতে হয় সমাজ-শাসনের কাছে।

জীবনের অবিচ্ছেদ্য পরিবেশ এটি সমাজকে মানুষ তাই স্রবণাতীত কাল থেকে সব রকম সম্ভাব্য ক্রটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে এসেছে। সহজাত বুদ্ধি আর সমাজবদ্ধ জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে যে, সমগ্র জীবনের সুখ ও শান্তির প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থ সকলকেই ত্যাগ করতে হয়। সকলেই যদি সবকিছু পাওয়ার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সকলকেই বঞ্চিত হতে হয়। বিদ্যাবিহীন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে অসহনীয় হয়ে উঠে সকলের জীবন। তাই মানুষ সকল যুগে কতকগুলি বিধিনিষেধ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে, এবং যে তা ভঙ্গ করেছে তাকেই দণ্ড পেতে হয়েছে। অপরাধীর অপরাধ যে ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে—এ কথাটা কয়েক হাজার বছর আগেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল।

সমাজ-বিরোধী অপরাধী যদি তার অপরাধ অহুসায়ে শাস্তি না পায়, বিশেষ কোন প্রভাবের জোরে অপরাধ করবেও অবাধ বিহারের সুযোগ পায় তবে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমগ্র সমাজ-দেহকেই বিচলিত করে তোলে। অপরাধী যদি মুক্তি পায় তবে বার সে ক্ষতি করেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নয়, সমাজের আর সকল শাস্তিকামী নাগরিকও রাষ্ট্রের জার বিচারে আস্থা হারায়। সকলেই নিজেদের জীবন ও সম্পদ অনিশ্চিত বলে ভাবতে আরম্ভ করে, আর যে সকল দ্রবুও শুধু শাস্তির ভয়ে সংযত হয়ে থাকে তারাও পাপের পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং একজনমাত্র অপরাধীর অজার নিকৃতির অর্থ সমগ্র সমাজের শাস্ত জীবনকে বিচলিত করা। একটিমাত্র দ্রবুওকে প্রলুব্ধ দেওয়ার অর্থ শত দ্রবুওকে উচ্ছ্বলতার উৎসাহ দেওয়া। স্নেহাঙ্ক দৃঢ়বাস্তবের অজার প্রলুব্ধ যদি দ্রবুওজনকে অবাধা, উচ্ছ্বত ও নিষ্ঠুর হওয়ার সুযোগ না দিত তবে হুঃশাসনের পক্ষে অমন নির্ভর, দ্বিধাহীন চিন্তে, প্রকাশ্যে শ্রোণীকে লালিত করা কখনই সম্ভব হ'ত না। তাই রাষ্ট্রের সকল মানুষের ওত কল্যাণের দায়িত্ব বাদের তাঁরা কোন যুক্তিতেই একজন অপরাধীকে তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে অবাধহি তিতে পানেন না, এমনকি 'গণদারি'র প্রতি স্বীকৃতি জানাতেও নয়। অনেক সময় দেখা যায় অনেক অভিব্যক্ত ব্যক্তির সমর্থনে

আদালতে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়। তাদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে কোন বিচারপতি যদি কখনও কোন অপরাধীকে অজার ভাবে মুক্তি দেন তবে সেই অপরাধীর মতই তিনি অপরাধ করবেন। সমাজের সাধারণ মানুষের মনে একবারও যদি এ ধারণা দৃঢ়মূল হওয়ার সুযোগ পায় যে, আইনের ব্যবতীর বিধিনিষেধ শুধু তাদেরই ভাঙে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভাঙে নয়, তবে রাষ্ট্রের সমগ্র বিচার ব্যবস্থাটি তার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলবে। বিচার হয়ে দাঁড়াবে প্রবলের অত্যাচার। "Laws grind the poor and rich men rule the laws" এ কোড সাধারণ মানুষের মনের সব সময়ই থাকে। এ কারণে রাষ্ট্রের শাস্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক যারা তাদের কলনও এমন কাজ করা উচিত হবে না বাতে ঐ বিশ্বাসই তাদের আরও বেশী দৃঢ়মূল হতে পারে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'ল তার অভ্যন্তরস্থ সকল মানুষকে সব রকমের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি থেকে রক্ষা করা। এ কারণে তার সার্বভৌম শক্তি বা নিরপেক্ষ জারবিচারে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ জাগতে পারে এমন কোন কাজ তার কলনও করা উচিত হবে না। অপরাধীকে কোন অজুহাতেই রাষ্ট্র প্রাপ্য দণ্ড থেকে নিকৃতি দিতে পারে না।

কিন্তু এত গেল সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে অপরাধীর প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্যবোধ কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অপরাধীরও কি রাষ্ট্রের কাছে কিছুই আশা করার নেই? সেও ত রাষ্ট্রের নাগরিক, সুতরাং তার ভালমন্দ দেখার দায়িত্বও ত রাষ্ট্রের আছে? নিশ্চই আছে, এবং এই কারণেই কবি বলেছেন :

"দণ্ডিতের সাধে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

অর্থাৎ সমগ্রের স্বার্থে ব্যক্তি বিশেষকে যে দণ্ড রাষ্ট্র দিয়ে থাকে তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুঃখকষ্ট দিয়ে অপরাধীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া নয়। দণ্ডের সঙ্গে দুঃখকষ্টের সম্পর্ক অতি নিকট হলেও ঐটিই তার শেষ কথা নয়, এমনকি উদ্দেশ্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে তা হ'ল আর এক মহৎ উদ্দেশ্যের অনিবার্য মাধ্যমমাত্র। সে মহৎ উদ্দেশ্য হ'ল অপরাধীর সংশোধন। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টি আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। যা যে শাস্তি দেন সমাজকে বা শিক্ক দণ্ডিত করেন ছাত্রকে তার মধ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা থাকলেও প্রতিশোধের মনোভাব নিশ্চই কোথাও নেই। সংশোধনই হ'ল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। অবাধ সম্ভান বা অবাধ ছাত্র হরত সেই যুক্তিতেই তা বুঝতে পারে না,

আর সে কারণে দারুণ কোডে অনেক কিছুই করে তখন। কিন্তু ভবুও তাদের প্রকৃত গুণাবলী কখনও সেই নিবুদ্ভি উদ্ভবের কাছে নতি স্বীকার করেন না। কারণ সে পয়সার স্বীকারের অর্থ সেই বিপথগামী হতভাগ্যেরই সর্বনাশ করা।

যোগীর দেহে যখন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় তখন তার কতখানি লাগবে তা নিয়ে মুহূর্তের জন্তেও চিন্তা করেন না কোন শলা-চিকিৎসক। ভর্যার্ত যোগী হরত আকুল হয়ে সে অস্ত্রপ্রয়োগে আপত্তি জানায় বা তার প্রিয়জন কেউ মুর্ছিত হয়ে আছড়ে পড়ে চিকিৎসকের পায়ের কাছে। কিন্তু ভবুও তাঁকে নিজ সিঁদায়ে অবিলম্বে থাকতে হয়, আর সকলের সব কাতর অমুরোধ উপেক্ষা করে হাতে তুলে নিতে হয় শাপিত অস্ত্র। যোগীর কল্যাণকারীদের মধ্যে দ্বিববুদ্ভি বাবা তামাও সেই সঙ্গে এগিয়ে আসে চিকিৎসকের সহযোগিতায়। অস্ত্রপ্রয়োগকালে যোগীর কাতর বজ্রণার হরত হুঁচোখ তাদের জলে ভরে যায়, যোগীর বাধা শত বাধা হয়ে লাগে তাদের বুকে। ভবুও তাদের শক্ত হাতে ধরে রাখতে হয় যোগীকে, আর তার ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করে বেলে ধরতে হয় চিকিৎসকের শাপিত অস্ত্রের সম্মুখে।

টিক এমনি ভাবেই সঙ্গদোষ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবে যে হতভাগ্যের মনুষ্যত্ব সাময়িক ভাবে তার পত্তনের কাছে পরাস্ত হয়েছিল তাকে তার লাহিত জীবন থেকে রক্ষা করতে তার গুণাবলীর দৃঢ় মনোভাব নিতে হয়। মনের পত্তন বনের পত্তন মতই অব্যাহত, উদ্ভত; নিছক শোকবাক্যে তাকে সংযত করা যায় না। শুধুমাত্র পাশব শক্তির কাছেই পত্তন হার মানে। কিন্তু এই পাশব শক্তি প্রয়োগকালে তার উদ্দেশ্যের কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। এক মুহূর্তের জন্তেও দণ্ডদাতার এ কথা ভোলার উপায় নেই যে, প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, অপরাধীর সুপ্ত বা পরাস্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই একটি বিশেষ ব্যবস্থা তার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক কথায় অপরাধ-প্রবণতা থেকে তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং রাষ্ট্রের দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের জবাবে এক কথায় বলা যেতে পারে সংশোধন, প্রতিশোধ গ্রহণ নয়। প্রতিশোধ মানুষকে আরও বেশি উদ্দাম ও উচ্ছল করে তুলতে পারে, তাকে ভাল করতে পারে না। প্রতিশোধের শুধু রসনা অপরাধীর ক্ষমতার সবটুকু আর্জতা নিঃশেষে লেহন করে নিয়ে তাকে আরও বেশি নিষ্ঠুর করে তোলে। তাতে শুধু সেই ব্যক্তিরই ক্ষতি হয় না, সারা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশের সভ্য সমাজই পরীক্ষা করে দেখেছে, চোখের বগলে চোখ বা দাঁতের বগলে দাঁত নিয়ে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা যায় নি। বরং অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেছে তাতে।

দণ্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাকে দ্বিতীয় লাহিত জীবনবাণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে

শান্তি দেওয়া হয় নি। তার কাজের কলে সমাজের শান্তি জীবন আহত হলেও সমাজ তাকে ভাগ করে নি। যে দণ্ড সে ভোগ করেছে সমাজ ও তার উভয়ের কল্যাণেই তা অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। শিশুকে যখন তার মা-বাবা বা ছাত্রকে যখন তার শিক্ষক শান্তি দেন তখন সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তারা তাকে বুঝিয়ে দেন যে, সে শান্তি তার অপরাধের জন্তে, নইলে তার প্রতি কারও স্নেহ-ভালবাসা এতটুকুও করে নি। যে মুহূর্তে সে ভাল হবে সেই মুহূর্তেই তার শান্তিদাতা তাকে কাছে টেনে আনবে। অমুশোচনার যখন তার হুঁচোখ দিয়ে জল ঝরবে তখন তার দণ্ডদাতাই তা সবচেয়ে মুছে দেবেন। এ কারণে দণ্ডদাতা ও দণ্ডিতের মধ্যে আত্মিক যোগ ও স্নেহের বন্ধন যত বেশি দৃঢ় হয় দণ্ডদানের ঐঙ্গিত্য কলও তত বেশি ঘরাবিত হয়।

নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে মানুষের মন সারা সমাজের গুণের বিবিধে উঠেছে তাকে এ কথা বোঝানো নিশ্চরই সহজ কাজ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এত কঠিন যে, তা প্রায় অসম্ভবের সমতুল। তাই এই সুকঠিন কর্তব্যপালনের দায়িত্ব যদি উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত না হয় তবে অপরাধীর দণ্ডভোগের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিশুর চরিত্র গড়ে ওঠে বাপ-মায়ের শিক্ষার, ছাত্রের চরিত্র গড়ে ওঠে শিক্ষকের দক্ষ পরিচালনার, সমাজবাসীর জীবন সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ হয় সমাজনেতার আদর্শে। দণ্ডিত অপরাধীর বন্দীজীবনের চঃখভোগও এই ভাবে শুক্লপ্রসূ হতে পারে তার রক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠায়। তাঁদের সহানুভূতিশীল আচরণ ও বোয়া পরিচালনাই শুধু বন্দীদের এ কথা বোঝাতে পারে যে, তাদের বন্দীশা অভিশাপ নয়, ছদ্মবেশী আশীর্বাদ। দণ্ডভোগের সঙ্গে লজ্জা ও গ্লানির সম্পর্ক অতি নিবিড় হলেও তার প্রভাব কখনও এত বেশি হওয়ার সুযোগ দিতে নেই যার ফলে বন্দীর ব্যক্তিত্ব গুরুতর ভাবে আহত হতে পারে। কারণ তা যদি হয় তবে সেই হতভাগ্য চিরদিনের জন্তে তার ভাল হওয়ার সকল আশা হারিয়ে ফেলবে। যার ফলে দণ্ড শুধু নিতা-নুতন অপরাধীরই সৃষ্টি করবে, কোন অপরাধীকে তার অভিশপ্ত জীবন থেকে উদ্ধার করে সবল সুস্থ মানুষে পরিবর্তিত করতে পারবে না।

সুতরাং দণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি দায়িত্ব তাদের অবদারকদের। দণ্ডদাতার পয় যে কর্তৃপক্ষের জিম্মায় তারা থাকবে তাঁদের যদি দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকে এবং সে জ্ঞানকে কার্যকর করার জন্তে থাকে আত্মনিক ইচ্ছা ও কর্মদক্ষতা, তবেই অপরাধীর দণ্ডভোগের বেদনা তার ভবিষ্যৎ জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে। এত বড় গুরুদায়িত্ব যে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ওয়ার্ডার এবং আত্মজিহ্বার বিভোর কারাবর্জিতদের দ্বারা কোন মতেই পালন করা সম্ভব নয় তা। জেলখানা সম্বন্ধে যার এতটুকুও অভিজ্ঞতা আছে তাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। সব জেলখানাতেই কর্তব্যবীর-ওয়ার্ডার-কন্ট্রাক্টার-বোট-কয়েদী মিলে এমন এক অভ্যহীন জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে

বে, তার মধ্যে একবার কেউ পড়লে তার আর উদ্ধারের আশা নেই। আজকের কারাগার বেন এক স্বতন্ত্র রাজ্য, বার সঙ্গে বাইরের জগতের ভাষা-নীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও জীবনানুশঙ্গ কোনই সম্পর্ক নেই। সেটা বেন আজমহারী, সাংসারহীন, বিপথগামী ব্যক্তিত্বের এক সাময়িক আশ্রয়। ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে তার কোন শিক্ষা, কোন অনুপ্রেরণাই আজকের কারা-ব্যবস্থা তাদের দেয় না।

তা হলে কেমন করে এই আকাজক্ষিত ফলাফল সম্ভব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে, কারাগারকে রূপান্তরিত করতে হবে মানুষ-গড়ার কারখানায়। আর সে কাজের দায়িত্ব হুদয়হীন আমলাতন্ত্রের হাত থেকে নিয়ে দিতে হবে আদর্শবাদী সমাজসেবী শিক্ষাক্রমীদের। যাদের প্রথম কাজ হবে হতভাগ্য অপরাধীদের পরিত্রাণে মানুষকে নতুন করে জাগিয়ে তুলে নিজের ও সমাজের উপর তাদের হারান বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে আনা। যে ব্যক্তি নিজেকে সমাজ থেকে বত বেশি দূর বলে মনে করবে তার অপরাধ-প্রবণতা তত বেশি হবে, ঠিক যেমন বৃহৎ পরিবারে যে ছেলে বত বেশি উপেক্ষিত তার সমগ্র পরিবারের উপর আক্রোশ ও কুচিন্তা তত বেশি। সুতরাং বতকণ পর্যন্ত না একজন অপরাধীকে উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যাচ্ছে ততকণ পর্যন্ত সমাজের সুস্থ শান্ত জীবনের উপর তার আক্রোশ কিছুতেই দূর হবে না। বার অর্থ হ'ল, কিছুতেই তাকে অপরাধমুক্ত করা যাবে না। এ সকল কারণে কারাবিভাগের সঙ্গে সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের চেয়েও শিক্ষা-বিভাগের সম্পর্ক নিকট হওয়া উচিত। প্রত্যেক কারাগারে অপরাধ-বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত যারা নিয়মিত ভাবে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে দণ্ডিত ব্যক্তিদের কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শিক্ষাও দেবেন।

অপরাধীরাষ্ট্রেরই ধারণা যে, তারা শহীদ, হুদয়হীন সমাজ, ব্যবস্থার বলি। তাদের মন থেকে এ মিথ্যা ধারণা দূর করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, তাদের চেয়েও অনেক দুঃস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাজে বাস করছে, যারা জীবিকার জন্তে অহোরাত্র পরিশ্রম করলেও কখনও সত্যতার পথ ত্যাগ করে নি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ করতে হবে যে, সম্মানই হ'ল মানুষ-জীবনের সব চেয়ে বড় আকাজক্ষার বস্তু। প্রতিদিনের সংবাদপত্র পড়িয়ে তাদের শোনাতে হবে কোথায় কোন ব্যক্তি নিজ জীবন তুচ্ছ করে প্রবল শ্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে বা জলন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে অপর এক বিপন্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেছে, কোথায় রাজ্য থেকে নোটের তাড়া কুড়িয়ে পেয়ে কোন ব্যক্তি সংবাদপত্রে প্রকৃত মালিকের সন্ধানে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, কোথায় কোন রিক্সাওয়ালী বা ঘোড়ার পাড়ীর কোচম্যান আয়েতীনের তুলে কেলে বাওয়া মনিয়াগ বা গহনার বাজ পাওয়ারাজই বোঝার ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে। এ

ব্যাপারে সংবাদপত্র বা সরকারের কর্তব্যও কিছু কম নয়। সংবাদ-পত্রে 'বিবিধ সংবাদ' বা 'ঘটনা ও দুর্ঘটনা'র মধ্যে এই ঘটনা সত্যতার সংবাদগুলি সংক্ষেপে না ছাপিয়ে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে ছাপাতে হবে। ঐ সকল সং ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ছবি বড় করে ছাপিয়ে বার বার করে বলতে হবে যে, তাদের কৃতিত্ব গির্জা-লজ্জন বা সাগর অতিক্রমণের চেয়ে এতটুকুও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যেখানে ভুললোকেয় শিক্ষিত ছেলেরাও ট্রাম বাসের প্রাণ্য কয়েকটি মাত্র পরমা কঁাকি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারে না সেখানে এই অতি সাধারণ অথচ সত্যনিষ্ঠার অবিলম্বে মানুষগুলি দায়িত্বের গিরি ও প্রলোভনের সাগর অতিক্রম করে সত্যের জয়-পতাকা প্রদর্শন করেছে। আর তা করেছে কোন বকম পুণ্ডর বা সম্মানের প্রত্যাশা না রেখেই।

রাষ্ট্র-পরিচালকদেরও কর্তব্য হবে, শুধু শুধু নিজেরই স্বত্ব বা মণিমাণিকা বলে ঘোষণা না করে ঐ সকল সরল আদর্শনিষ্ঠ মানুষ-গুলিকে প্রকাশ্য সত্যের আয়ত্ত্বিত করে সম্মান জানান, আর যোগ্যতা অনুসারে তাদের সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত করা। সং ও সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলির এই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দণ্ডিত ব্যক্তিদের বুঝিয়ে দেবে যে, অস্ত্রের স্বার্থে নয়, নিজের প্রয়োজনেই মানুষের সং হওয়ার দরকার। কোন সৌভাগ্য নিয়ে না জন্মিয়েও মানুষ শুধু তার সত্যতার গুণেই বড় হতে পারে। মুক্তির পথ বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সরকারী পদে বহাল করে রাষ্ট্রের কর্তৃ-পক্ষকে অজান্তে বন্দীদের একথা বোঝাতে হবে যে, সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার পথ আজও তাদের সম্মুখে খোলা রয়েছে। মুক্তির সাত দিন পরেই 'এ' ক্লাস বন্দীকে যে 'বি' ক্লাস হয়ে জেলে ফিরে আসতে হয় তার একমাত্র কারণ ঐ সাত দিনের উপবাস, অপমান ও নিরাশ্রয়তা তাকে বুঝিয়ে দেয়, পাপের পথ ছাড়া আর কোন পথই তার সম্মুখে খোলা নেই। এই অসহনীর অবস্থা থেকে ঐ হতভাগ্য মানুষগুলিকে একমাত্র সহানুভূতিশীল সরকারই রক্ষা করতে পারেন। আশ্চর্য্যাত উদ্বাস্তকে পুনর্বাসনের দায়িত্ব যেমন সরকারের, সমাজচ্যুত অপরাধীর পুনর্বাসনের দায়িত্বও ঠিক তেমনি তার।

লম্বা দাগটানা কুর্জা কয়েকদিনের গা থেকে খুলে ফেলে তাদের বার বার করে বলতে হবে তারা মানুষ, শিক্ষার্থী—'এ' ক্লাস বা 'বি' ক্লাস কয়েক নয়। সাধারণ পোশাক পরেই তারা আসবে তাদের শিক্ষাগারে আর সেখানে কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে লাভ করবে মানুষ হওয়ার শিক্ষা। সে শিক্ষা যেমন তাদের বিগত জীবনের বাবতীর ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করবে, ঠিক তেমনি দেখাবে তাদের আগামী দিনের চলার পথ। আর এ পরিকল্পনাকে কল করে তুলতে হলে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে কারাগারের বর্তমান পরিচালনা-ব্যবস্থায়।

সম্প্রতি কারাসংস্কারের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে পথ ধরেছেন তাতে বন্দীর দণ্ডভোগের ইঙ্গিত ফলাফলের



সভাবনা ধুবই কর। পান-বাজনা ও নিত্য-নূতন প্রয়োদ্ধাট্টানের ব্যবস্থা করে এবং পরিভ্রমের বিনিময়ে নগদ-প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে জেলখানাকে যে ভাবে একটি আরাধ্যায়ক ও নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বন্দীর ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ হওয়ার শিক্ষা ও অল্পপ্রেরণা লাভের কোনই অবকাশ নেই। এমন কি সে যে অজ্ঞায় করার অপরাধে কারাগারে আনীত হয়েছে এ কথাও তার মনে থাকে না। কলে মুক্তির পর আবার যখন তার উপবাস ও লাহিনা শুরু হয় তখন জেলখানার নিশ্চিত নিরাপদ দিনগুলির সুখ স্মৃতি তাকে নূতন করে অপরাধের পথে পা বাড়াতো হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর সেই দুর্বলচিত্ত মানুষটি অতি

সহজেই সে প্রলোভনের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। অপরাধীর মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলায় গুরুদায়িত্ব অধীকার করে ও ভবিষ্যতে তার সম্মানজনক জীবনযাত্রার কোন সুযোগ না করে দিয়ে শুধু বদি কারাগারের দৈনন্দিন জীবনের সুখবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাতে শুধু অপরাধীর অপরাধ-এষণতাকেই প্রেরণ দেওয়া হবে। একারণে পবিত্র ও কঠোর কৃষ্ণ হতে হবে কারাগারের দৈনন্দিন জীবনরীতি, সং, সংযত ও কঠোরিত মানুষ গড়ে তোলা হবে তার একমাত্র কাজ। সাময়িক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করতে হবে কারাগারের প্রত্যেকটি কাজে। তবেই দণ্ডভোগ এক বিপদ-গামী মানুষের অভিশপ্ত জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে।

## যকের প্রতি

শ্রীহরিপদ গুহ

তোমার বিরহ-ব্যথা জাগিয়া মনে,  
চঞ্চল করি তোলে বিজন ক্ষণে।  
কেমনে রহিলে তুমি প্রিয়ারে ছাড়ি ?  
বুকে লয়ে এত ব্যথা বুঝিতে নারি।

কোথায় অলকা আর সে রামগিরি,  
ব্যবধান রচে কত তোমায়ে বিরি।  
তোমার মনের যত না বলা বাণী,  
মেঘে মেঘে কিস্ কিস্ করে কানাকানি।

কাটাইতে বিভাবরী কেমনে একা ?  
প্রিয়া পাশে বহুদিন ছিল না দেখা।  
ফেলিতে কি আশির্জল একেলা থাকি ?  
শিহরিতে ক্ষণে ক্ষণে বধন ঢাকি।

তোমারি বেদনা মোরা বুকেতে বাধি,  
বরষে বরষে তাই বিরহে কাঁদি।  
আজিও বরষা দিনে তোমায়ে স্মরি,  
বিরহের নব নব মূর্তি গড়ি।

শাস্ত্রনা দিতে কেহ ছিল না পাশে,  
কাটিত দিবস কি গো শুধু ছত্যাশে ?  
যখন ঝরিত বারি, ডাকিত দেয়া,  
নাচিত ভবন-শিখি, ফুটিত কেয়া।

ডাছক ডাছকী মনে হরষে মাতি,  
লুকোচুরি খেলাখেলি সারাটি রাত্তি।  
নিশি ভোর চখাচখী কাঁদিয়া সারা,  
ডাকিত হাছুরীগণ পাগল পাবা।

তখন তোমার হিয়া ব্যথিত ছুখে,  
কেহ নাহি নিত তোমা টানিয়া বুকে।  
তাই কি জলদে তুমি ডাকিয়া আনি,  
পাঠাইলে বিরহের বায়তাবানি ?

## মহাজন

### শ্রীধর্যদাস মুখোপাধ্যায়

ছোট সহর। আর এই ছোট সহরটায়ই আশেপাশের দশ-বিশ মাইলের মধ্যে প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরে বিশ মাইলের মধ্যে কোন সহর নেই। দক্ষিণে পনের মাইল। পূর্ব-পশ্চিমে শুধু গ্রাম আর গ্রাম।

এ সহর আজকের নয়। কবে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার বার আক্রমণে বিব্রত লক্ষ্মণসেন বুঝি এই সহরের বুক থেকে পালিয়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় সে ভীরা-কাহিনী এই সহরের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে মুগ্ধ করতে থাকে আজও। লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর কোন চিহ্ন এ সহর বা তার আশেপাশে খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু পাওয়া যায় এর তিন-চার মাইল দূরে বজালসেনের টিবি বা দেখবার অস্ত্র দুই দুবাত্তর থেকে মাহুঘ ছুটে আসে এখানে।

ইতিহাসের পাতায় যে সহরের নাম জড়িয়ে আছে তা যেমন ছোট তেমনি বিচ্ছিন্ন। উত্তর-দক্ষিণে আড়াই মাইল লম্বা আর পূর্ব-পশ্চিমে এক মাইল চওড়া এই সহরটার লোক বাস করে এক লক্ষের উপর। ঘেঁষাঘেঁষি আর গালাগাধি করে মাহুঘ থাকে এখানে। অন্যরাসে এক বাড়ীর ছাদ থেকে আরও দশ বাড়ীর ছাদে বেড়িয়ে আসা যায়। আর বাস্তার কথা না বলাই ভাল। সৰু গলির মত এব বড় রাস্তা। একথানা! ছাড়া দুখানা গাড়ী পাশাপাশি বাবার উপায় নেই।

ইতিহাস-গ্রন্থে এই সহরের না আছে জীহাদ, না আছে গঠন-পরিকল্পনা। বাজারের মধ্যে দোকানগুলো যেখানে বার খুসী সে দাঁড়িয়ে আছে। ময়রার দোকানের পাশেই কাঁচা চামড়ার কাজ চালাচ্ছে মুচি আর তার পাশেই মুদির দোকান।

কেবল সোনাকরপার দোকানগুলি এখানে গলি বাস্তাটায় হ'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। এই সোনাপট্টিতে অল্প দোকান নেই বললেই চলে। সোনাপট্টির সব চেয়ে পুরাণ দোকান মল্লিক মশায়ের। আদিনাথ মল্লিক এই দোকান বখন খোলে তখন এখানে কোন দোকান ছিল না। বাজারের ওদিকটার নলীদেব চালের আড়ত। আর বিবেশ্বর দালের মুদিখানার দোকান। দুইদুটীসম্পন্ন আদিনাথ বুঝেছিলেন এ সহর বাড়বে। গড়ে উঠবে এক বিরাট ব্যবসা-কেন্দ্র। সত্যিই আদিনাথের অমুখান সত্যে পরিণত হয়েছে। তার দোকানের পাশে আগু-লিছনে এদিকে-ওদিকে আরও ছোট বড় দশ-বিশখানা দোকান বসল। রাস্তার ওপারেও বসল শ্রাকরার দোকান। এই সব দোকান নিয়ে পড়ে উঠল সোনাপট্টি।

তখনও সহর এভাবে গড়ে ওঠেনি। সহরে একমাত্র সোনা-

রুপার দোকান মল্লিকদের; গহনা গড়াতে বা সোনাকরপা বেচাকেনা করতে লোক ওখানেই আসত। শুধু সাধারণ মাহুঘ নয় চোরাই সোনার কারবার করেই নাকি মল্লিকরা কে পে উঠেছে এ গল্প এখনও আশেপাশের শ্রাকরার দোকানীরা কিসকিস করে থন্দেরকে শোনার।

অনেকে বলে ওদের গায়ের জালা। মল্লিকদের পুরাণ দোকান বহু দিনের বাঁধা থন্দের। আন্তে আন্তে সুনাম বেড়ে উঠেছে। গ্রাম ও সহরের মাহুঘ আসে এখানেই। তাই ওদের হিংসা।

সত্যিই হিংসা করার মত। গলির মধ্যেই এ দোকানটার সহর ও তার আশেপাশের দশ-বিশ মাইলের মাহুঘকে আসতেই হয়। প্রাণের টানে না হোক দায়ে পড়েই আসে বিপন্ন মাহুঘ এখানে। এ দোকান বেন সহর ও গায়ের মাহুঘের প্রাণকেন্দ্র। হৃদ্যনে সকলকেই আসতে হয় ছুটে। সুনামেও আসে হ'টার জন গহনা গড়াতে। তার সংখ্যা আজকাল কমই।

সহর আর গ্রামের মিলনসেতু এই মল্লিকমশায়ের দোকান। সারা দিনরাত তিনজন লোক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে থন্দের সামসাতে। জিনিস আসছে আর কষ্টিপাথবে যাচাই হচ্ছে। হ'টারটে হচ্ছেও না। ওজন দেখছে তার পর তারিখ, নাম ঠিকানা বাঁধান খাতার লিপে তার পাশে ওজন, কি জিনিস এবং কত টাকা দেওয়া হ'ল তা লিপে যাচ্ছে।

—লিখুন। মকরমুখো কানপাশা একথানা সাড়ে তিন আনা—  
—থরচ বার টাকা। মেট্রো হার একগাছা হুঁভরি পাঁচ আনা—  
—থরচ এক শো কুড়ি টাকা। রুপার গোট এক ছড়া ওজন—

—হুঁভরি পাঁচ আনার মাত্র এক শো কুড়ি টাকা দিচ্ছেন?  
বেশী টাকার জন্ত আবেদন করে থন্দেরটি।

—আজ্ঞে! থন্দেরের দিকে চেয়ে দেখলেন মল্লিক। ওর বেশী ত দেওয়া যায় না? তা আপনার দরকার কত?

—অন্ততঃ আরও কুড়ি টাকা।

—তা, হয় না? আচ্ছা লিখুন! এক শো ত্রিশ টাকা।  
সোনার দরটা হঠাৎ পড়ে গেল কিনা!

—আমারটা। আর একজন প্রস্ত কবল।

—কিছু বলতে হবে না। যে পর্যন্ত আয়ত্তা পারি দিই।  
লিখুন। মিনে করা আংটি একটি চার আনা আধ পাই—থরচ  
—একটু খামল মল্লিক। আপনার দরকার?

—গোটা বাইশ টাকা। চোক গিলে কথা বলল থন্দেরটি।

—তা ত হয় না? লিখুন আঠার টাকা।

সকাল আটটার দোকান খুলে বেলা দেড়টা পর্যন্ত এক ভাবে মল্লিককে গহনা ওজন করা, জাবনা খাতার লেখা আর টাকা দেওয়া চালাতে হয় যোজাই। ঐশ্বর্য, বর্ষা নেই। সকল সময়, সকল দিন এ দোকান খোলা রাখতে চায় মল্লিক। সবকার বাধ সাথে। সপ্তাহে দেড় দিন বন্ধ রাখতেই হবে। এ দেড় দিন আর দুপুরে খাবার সময় ছাড়া যাত্রি এগার-বারটা পর্যন্ত মল্লিক দোকান খোলা রাখে। বলে—লোকের যেন কোন অসুবিধা না হয়।

সকালে এসে এক কাপ চা খেয়েই একজন খাতা নিয়ে বসে কেবল লিখে বাবে। মল্লিক নিজে কষ্টপাখরে কবে, ওজন দেখে টাকা দেবে। তার পর স্নুফ হবে—লিখুন পাঁচ আনা আধ পাই—

অদ্ভুত বৈধব্য মল্লিকের। বাড়ী থেকে হু'খানা লুচি, পরোটা আর একটু চা খেয়ে এসে বসবে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দিয়ে, পুরাণ পাওয়ারওয়ারা চশমাটা চোখে লাগিয়ে ভিড় সাইলাতে। তার দোকানে ভিড় নেই এমন দিন মল্লিকের যেনই পড়ে না। যেন করার সময়ও নেই। আরবণ-চেষ্টের ডালাটা খোলা। তার মধ্যে থোকা থোকা নোটের গোছা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে নিত্যন্ত অবহেলায়। তুলে নাও আর নাও। পাঁচ টাকার সঙ্গে, দশ টাকার নোট বুরি মিশে যাচ্ছে। এক টাকার নোটগুলি বাতাসে উড়ে বাবে ঘোষ হয়। এক শো নোটগুলি সব চেয়ে একপাশে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। সকাল বেলায় বেশ গোছান ছিল। খন্দেরের ভিড়ে কেবল হাত চুকিয়ে গোছাভরে নোট বার করতে হয়েছে। গুণে দিয়ে বাকীগুলি রেখে ডালাটা ঠেলে দেয় মল্লিক। দুহড়ে, গুটিয়ে, ভাঁজ ভেঙে পড়ে থাকে নোটগুলি গালা-গাদি করে, যেন মায়া নেই টাকার ওপর।

খন্দের আসছে। মল্লিকের এ-পাশ ও-পাশ সামনের দোকানীরা জুলজুলে চোখে তাকিয়ে দেখছে। ঈর্ষার পা জলে যাচ্ছে। যত খন্দের সব ওখানে, যেন বিনা স্নুদে টাকা পায়। হু'পরসা করে টাকা প্রতি মাসে মাসে যেন স্নুদ দিতে হয় না। কোন কোন সময় তারও বেশীও বে দিতে হয়। অস্ত্রের এক পরসা স্নুদ নিলেও সেখানে বাবে না খন্দের। কি বাহু জানে অঘোর মল্লিক।

ঠিক মল্লিকের ডান পাশের দোকানটা নরেশ পোদ্দারের। সেখানে তিন-চার দোকানের ছোকরা মালিক এসে বসে যখন কোন কাজ থাকে না। কাজ প্রায়ই থাকে না, কে কাজ করাবে। তেব আনা সেবেয় চাল খেয়ে গহনা গড়াতে বড় কেউ আসে না। বাবা আসে তা মল্লিকের দোকানে। কানাই নন্দী বলে—শালা মল্লিক যেন চুষক দিয়ে খন্দের টানে।

—বা বলেছিস। কি যধু আছে ওয় দোকানে।

—আমি ভাবছি এক ছুড়ি এনে বসাব দোকানে। দেখি শালা খন্দের কোথায় থাকে?

—সত্যি তুই ভেবে দেখ কানাই। আমাদের দোকানে কি আবার চিমটি কাটি খন্দেরকে?

নানা রকম যত্ন করে বিকৃত ছোকরা দোকানীরা। সময় সময় চীংকার করে ওঠে হঠাৎ। বলে—খন্দের জন্ম কর নিতাই! খন্দের জন্ম কর!

অঘোর মল্লিকের ওসব শোনার সময় নেই। আরও রেগে যায় ওরা। নরেশ পোদ্দার চীংকার করে উঠে কানাইকে বলে, কি বরাতই করে এসেছিলি কানাই। কাণা খোঁড়া সবই এক জায়গায়।

কানাই মনে মনে খুসী হয়। নরেশ বেশ বুদ্ধি করে কথা শোনার মল্লিককে। সামনের দোকানে বাবা একটু-আধটু কাজ পেয়েছে তারা ছেনি দিয়ে চুড়ি ঘর কাটতে কাটতে মুখ তুলে বলে, বরাত দাদা! সবই বরাত করে।

বরাতই বটে! গহনা গড়ান ছাড়া অল্প দোকানগুলোর কাজ নেই। মল্লিকের যেমন সূদী কারবার তেমন গহনা গড়ান আছে। গহনা গড়ার অল্প বে কোন দোকানীরা থেকে সে বেশী। পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দোকানটার মাঝখানে আলমারি একটা আর আরবণ-চেষ্ট দিয়ে পাটিসান করা। ভিতরের দিকে দিনরাত ঠুকাঠক শব্দে কাজ হচ্ছে। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতায়, সব রকম কাজেই অলঙ্কার গড়ার মল্লিক! রেডিয়েটও গড়িয়ে রাখে। গহনা বাধা বিক্রীর মতই শুভকাজেও প্রায় একচেটে ব্যবসা তার। ভাল নজর কাজে অঘোর মল্লিকেরই নাম বেশী। অনেক টাকা মাইনে দিয়ে ভাল কারিকর সে রাখে।

তাই ত সব ব্যাপারেই ধনী থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত আসে তার দোকানে।

বুন্দাবন সাহার নামডাক কম নয়। শহরের বহু লোক বুন্দাবন সাহাকে ধনী বলেই জানে। কেমন করে তার লাখপানের টাকা সিনেমার বই করতে গিয়ে উড়ে গেল সে খবর হু'চার জন ছাড়া কেউ জানে না। কলকাতা থেকে ফিরে এল বুন্দাবন। কসাঁ গোলগাল মুখটার কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

—কি হ'ল? নীপাধিতা শুধাল।

—সব চলে গেল নীপা!

—বাবে না? আমাকে সং সাজিয়ে রেখে সবগুলো গরনা নিয়ে গেলে বই করতে! তখনই বাধণ করেছিলাম। বাবসাটাকে তুলে ধর। কিছু পুঁজি গিয়েছে থাক। আবার কিছু পুঁজি কেল। তা হলে ত সব গরনা বেত না!

—সত্যি তোমার কথা না শুনে কি ভুলই বে করেছি।

—কি কবে এখন এই গিলটিকরা গরনা পরে সং সেজে আমি গিয়ে দাঁড়াব লতার বিয়েতে? লজ্জার মাথা কাটা বাবে না?

—বাবে না? গভীর ভাবে জবাব দিল বুন্দাবন, বাব বাব এককথা! ভুল সে করেছে তাই বলে স্ত্রী সহায়ত্বিত দেখাবে না। বুঝবে না লোকটা ভাল করতে গিয়ে পথে বসেছে। এ অবস্থাইছা করে ডেকে আনে নি। অতগুলো টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার

তার যে হুঃখ সেটা বুঝবে না নিজের জ্ঞান। কেবল খোঁচাবে তার গহনা নিয়ে নষ্ট করে এসেছি সেই কথা বলে। তাকে গিলটি করা গহনা পরিয়ে রেখেছি বলে।

রেগে গেল দীপাধিতা আরও। বললে, তোমার কথায়? আমি বাবই লতার বিয়েতে আমাকে টাকা লাগে।

—টাকা নেই!

—কেন নেই? কেন আমার টাকা সব এমন করে নষ্ট করে এলে?

—বাজে বকো না?

—বেশ! আমি এখনও এমন অসহায় নই যে তুমি টাকা না মিলে আমার বাগরা হবে না। আমি আংটি বাঁধা বেধে বাব বাপের বাড়ী।

—বাও। বা খুসী করগে।

পরেশ অনেকক্ষণ পরে কিয়ে এল আংটি নিয়ে। বললে দোকান আজ বন্ধ যা! বাবু পেরায়েব চাকর।

দীপাধিতা বুঝেছে বাবুর শেখান কথা। বলেছে ওভাবে বাধা নিয়ে তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আমি নিজেই চললাম। দোকান থেকে সোজা টেম্পনে চলে বাব।

গা-ভর্তি অলঙ্কার, হাতে রিটওয়াচ, সুরেশা এবং সুন্দরী দীপাধিতা পোদ্দারের দোকানেই জিজ্ঞাসা করে—মল্লিকের দোকানটা কোথায়?

অভিজ্ঞাত ঘরের সুন্দরী বোয়ের আবির্ভাবে নরেন পোদ্দার চমকে ওঠে। ভাড়াভাড়া উঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকের দোকান দেখিয়ে দেয়।

—কি ব্যাপার রে নরেন? কানাই দোকান ছেড়ে উঠে আসে। সঙ্গে সঙ্গে অল্প দোকানদারও সবাই। মল্লিকের দোকানের স্রুখে গিয়েই ভিড় করে।

বেলা দশটা। মল্লিকের দোকানে বেশ ভিড়। চাবী, ব্যবসাদার, মণ্ডার সব বকর লোকে দোকান গিসগিস করছে।

মল্লিক দীপাধিতাকে চশমার কাক দিয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—আমুন।

ছোট এক ফালি দোকান। তার মধ্যে একটি বেঞ্চি পাতা। তিন জন ছাড়া বেঞ্চিতে বসার উপায় নেই। বাকী লোককে হয় দোকানে নয় রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

অল্প খদ্দেরদের নিকট চাইতেই তারা সরে গেল। বাবা বেঞ্চে বসেছিল তারা উঠে জায়গা দিল।

—দেখুন ত কত টাকা পাওয়া যাবে এ আংটিতে?

—আজ্ঞে! অর্ধেক হয়ে চেয়ে বইল মল্লিক একটুখানি। তার পর নিজেকে চাপিয়ে ঠ্যাংগুর সঙ্গে লাগান হাতটায় নীচের দিকে ঠেলাতেই কাঠের ওপর থেকে নিজের পাল্লাটা উচু হয়ে উঠল।

—কতটা ওজন হ'ল?

—আজ্ঞে আট আনা তিন পাই!

—কত টাকা পার?

ভরুণীর মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকের মত পোড়-বাওয়া প্রোঁচ আর ঝামু ব্যবসাদার বুঝি হিসেবে ভুল করে বসল। বললে, পঞ্চাশ টাকা।

—তাই দিন?

—কি নামে লিখব?

—দীপাধিতা দেবী!

—ঠিকানাটা!

এবারে ঘাবড়ে গেল দীপাধিতা। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ঠিকানার দরকার নেই। শুধু নামটাই লিখে রাখুন।

—আজ্ঞে আশ্বিনে লিখে রাখতে হয়!

—দরকার নেই! শুধু নামেই হবে!

—আজ্ঞা থাক! কেমন যেন নম্র হয়ে গেল পাখরের মত কঠিন মনের মালিক অঘোর মল্লিক।

পাঁচবানা দশ টাকার নোট নিয়ে উঠে পড়ল দীপাধিতা দেবী।

—রসিদটা নিয়ে যান! একটুকরো সাধা কাগজে নাম তারিখ ওজন ও টাকার অঙ্কটা লিখে একটা চিবুকুট হাতে গুঁজে দিল মল্লিক।

দীপাধিতা দেবী চলে বাওয়ার পরও নরেন, কানাইয়ের দল হাঁ করে তার বাওয়া পথে দিকে চেয়েছিল। এই শহরেই বাস করে, শুধু তারা দেখে নি ত কোনদিন। দেখবে কেমন করে? ঘরের বউ কি বায় হয় নাকি রাস্তার? তবে আজকে বার হ'ল যে।

—কি যে বোবা হয়ে গেলি নাকি? কানাই থাক! দেয় নরেনকে।

—হাইরি! বোবা হয়ে বাওয়ার মতই রূপ! যেন দুর্গা প্রতিমা!

—কিন্তু আংটি বাঁধা দিতে এল কেন? ও ত বাবা অভাবে নয়?

—কপড়-কাটি করে এসেছে দেখছিল নে?

—হ'লই বা নিজে আসবে কেন?

গবেষণা শুরু হ'ল সোনাপটিতে। কেবল আলোচনা নেই মল্লিকের দোকানে। দীপাধিতা সাহা চলে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প খদ্দেরের দিকে মন দিলে মল্লিক।

—মাস্টারমশাই! আপনার চুড়িটা তা হলে বিক্রী করাই সাবাস্ত্য করলেন!

পর্যাপ মাস্টারের মুখটা লাল হয়ে উঠল অপমানে। পান্দেই এসে দাঁড়াল তাঁর প্রাণের এক চাবী ঠিক এই সময়েই। লোকটি মাস্টারমশাইকে দেখলেই নম্র হয়ে পড়ল তাঁর জানার। তার কাছেই তাঁর অবস্থাটা এমন করে উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ করে দিল মল্লিক। লোকটা জেনে গেল মাস্টারমশাই গহনা বিক্রী করছে।

বাঁধা রেখে তা তুলে নিতে পারছে না। মনে হ'ল তার বান-সস্ত্র সব গেল। আর কোনদিন তাঁকে নমস্কার করবে না লোকটি।

—কি হ'ল মাঠার মশাই? মল্লিকের কথার সময় নষ্ট হওয়ার বিরক্তি।

—হাঁ। বিক্রীই করব।

—আচ্ছা! আপনার তা হলে নেওয়া আছে কুড়ি টাকা। এগারো মাসে স্ত্রী হ'ল ছ' টাকা চৌদ্দ আনা। চুড়ির দাম হ'ল বত্রিশ টাকা, কেহও পাঁচ টাকা হু'আনা।

বিক্রী করার কথা বলতে চার নি মাঠার। বিক্রী কেন, বাঁধা রাখার সময়ই মনটা খারাপ হয়েছিল। সোনার হাতে সোনার কঁকন কেবল অলঙ্কারই। তাকে টাকার ভাঙিয়ে সংসারের ভুল প্রয়োজন যেটাতে ভারী কষ্ট হয়। মনে পড়ে রমাকে বিয়ের সময়ে বকনের সাজে। গায়ে গহনা, পুরনো বেনারসী, মাথায় মুকুট, কপালে চন্দনের কোটা, খোঁপায় বজ্রনীলময়ী মালা। কস্তা সস্ত্রদানের সময় কে ভেবেছে এ মেয়ের গায়ের গহনা বেচে যেতে হবে। কারও দুঃখপ্রেমও ত ছিল না তা। সেই আনন্দ জ্বলন্ত হৃদয়ে যাকে কেউ এ ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করতে পারত! কত আদর্শ, কত আশা, এ গহনা বাবা মা তার দিয়েছিল শুধু মেরে কেসে সাজাবার জন্তেই।

সত্যিই সাজিয়ে দিয়েছিল তারা। রমার হু'পাছ চুড়ি, তার নিজের ও রমার আংটি রমার একজোড়া হুল, আর অমন সুন্দর হার ছড়া সবই গিয়েছে। এই দোকানই গ্রাস করেছে সব। প্রথমে বাঁধা তার পর বিক্রী। রমার কাছে গিয়ে ঝাঁড়াতেই লজ্জার মাথা হেঁট হয়ে এসেছে। ছিঃ ছিঃ গহনা বন্ধক রেখে সংসার চালাতে হবে। বে গহনা দিয়ে রমাকে বিয়ের সময় সাজিয়ে দিয়েছিল। সুন্দর কোমল অঙ্গের অলঙ্কার রমা বুঝতে পারে ঠিকই। বলে, চুড়িগাছা না হয় নিয়ে যাও শহরে। বিক্রী করে টাকা আন।

—না, না বাঁধা রাখব! বিক্রী করব কেন? তোমাকে দিতে পারিনি কিছু আর তা খোঁষাব এমন করে।

রমা বুঝি জানে। বাব বাব তার হাসির কথা মনে পড়ে মাঠারের। ঐ জান হাসি তার অন্তঃস্থলে গিয়ে হাতুড়ির মত বা দেয়। রমা বেন হাসির মধ্যে দিয়েই বলে, তুমি ত নেবার সময় প্রতিবাহী বল, বাঁধা রাখলে ছাড়িয়ে আনতে পারব। বিক্রী করলে যে একেবারেই বাবে। না, না তা পারব না। কিন্তু...

কিরিবে আনতে পারে নি একবারও। মিছামিছি হাস-করকের স্ত্রী শুনে দিয়েছে শেষে বিক্রী করার সময়। প্রথমে বিক্রী করলে ঐ স্ত্রীর টাকাটা মল্লিকের ঘরে উঠত না। পারে নি।—কোন বাবই মাঠার প্রথমে বিক্রী করতে পারে নি। হাতে নিয়েই মনে হয়েছে আহা এমন সুন্দর জিনিসটা বিক্রী করব। কত সুন্দর মানার রমাকে এটা পরলে। এখনও বেন রমার দেহের স্পর্শ লেগে আছে এতে। একি একেবারে হুঁচিয়ে

—এই নিন টাকাটা হাতে দিতেই চমকে উঠে মাঠারমশাই। বুঝি মনে হয় কি পেলাম। রমার সাধ-মাহাজাদ আর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিক্রী করে পাঁচ টাকা হু'আনা পেলাম। তার কাছে রমার জিনিসের এই মূল্য?

—কত টাকা দর খরলেন সোনার? কে একজন প্রশ্ন করলে পাশ থেকে।

—আমি টাকা। হু'আনা খাদ। মল্লিকের জবাব বেন মুখস্থ করা।

কমর বিল্লী লাগে মাঠারের। কি গরম এই ছোট ঘরটার। পকেট থেকে কামালটা বার করে মুখটা মুছে নেয়। এবারে উঠতে হবে। কি হবে আর বসে থেকে। সবই ত গেল। আরও বাবে। বাবা বসে আছে পাশে তাদেরও বাবে। চাবী অনাজুদি সেখানে দেখলেন আড়চোখে। চেয়ে আছে মল্লিকের দিকে। একবার তার কথা শুনেছে আর একবার দেখেছে রমার চুড়িটাকে।

—আহা পা লাগে গায়ে।

—না, না, আপনি বান মাঠারমশাই। সেলাম করল অনাজুদি সেখ।

—তোমার কি আছে গো সেখের পো? পর পর ডাক হচ্ছে গহনা বিক্রীর আদালতে, মল্লিকের তীক্ষ্ণ নজর। জ্বর সে। সবাই দিকে তার সমান চুটি।

—আজ্ঞে! একজোড়া উপোর মল আছে?

—দেখি।

গামছা জড়ান মল জোড়া খুলে ফেলল অনাজুদি। তার পর মল্লিকের হাতে দিতে হাত কেঁপে উঠল বুঝি। বুড়া হয়েছে খানিকটা। তাই হাত কাঁপছে, না ঘুমন্ত মেয়ের পা থেকে মল খুলে এনে বিক্রী করছে তাই কাঁপছে, সে কথা চাবী অনাজুদি ছাড়া কে জানে।

—মরলা বাদ বাবে যে অনেক?

—আজ্ঞে।

মরলা! মরলাই ত। তার মেয়ের পা থেকে খুলে আনা যে। কালও কতিয়া পারে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওই মলে শুধু মরলাই দেখল স্ত্রীকরা, বাপের স্নেহ কোমল অমৃতভূতিও যে ঐ সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে বুঝি মল্লিক দেখে না। মল্লিক বুঝি বাপ নয়।

বাপ হয়েই বা কি করল অনাজুদি। সে মাগতে পারে নি এ মল জোড়া। সালেমা রেখে দিয়েছিল। স্বত্ত্বের স্মৃতির নাম করে। স্বত্ত্ব রেখে দিয়েছিল পুত্রবধূ পরবে। সালেমা বড় হবার পর উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব কতিয়া পারে। ছেলে নেই ত মেয়েই সব।

আট-দশ বিঘে জমির হু'বিবেই ঘুরিয়েছে অনাজুদি। বান বজা, অনাবৃষ্টি আর আকাল। এ দেশে শুধু হাহাকার আর নেই

দেয়। অজন্মা আর বান এ দুটাই লেগে আছে। চাব করতে পারে না, যদি করে বানে সব ডুবিয়ে দেবে। কোন প্রতিকার নেই। আছে কেবল শুকিয়ে মরা, অনাহার। জমি বেচ, ঘড়া ষটি বদনা বেচ। গুরু-লাজল বেচ, চাবীর চাব বিক্রী কর! পেটে ত খেতে হবে। চাব হয় নি পেট গুনবে না। তার চাই-ই।

—আবার করবা কি দিয়ে! জো হয়েছে ত! সালেমা কঠিন এক প্রশ্ন নিয়ে এল অনাজুদিয় সামনে।

—তাই ত ভাবছি!

—ভেবে কি হবে! মল জোড়া দিয়ে এস শহরে।

—না, ও কথা বলিস নে সালেমা! ও আমার বাপজানের দেওয়া জিনিস।

—আহা! বাপজানের ওপর কত ছেদা! আমি না থাকলে ও মল থাকত!

সবই শুচিয়েছে অনাজুদি। জমি, ঘড়া ষটি বদনা সানকি কি বিক্রী না করেছে।

ঘুমিয়ে আছে কতিমা। সব ভোয়ের আলো দেখা দিচ্ছে। পাখীরা গান গাইছে। কিরকির করে হাওয়া বইছে। কোন স্পন্দন দেখে বুঝি কতিমা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মুখে মুহ হাসি।

—আমি পারব না সালেমা? তুই খোল।

—কি পার তুমি?

—বাপ হয়ে ঘুমন্ত মেয়ের পা থেকে মল খুলতে পারব না—বুকজোড়া কীরখাস ছাড়ে।

—আহা-হা! জন্ম গেল ছেলে খেতে, এখন বলে ডান।

হ' একবার পা ছুড়ল কতিমা। ঘুমের মধ্যেও বুঝি বুঝে নিরেছে তার আদরের মল জোড়া জন্মের মত চলে যাচ্ছে। তাই প্রতিবাদ জানিয়েছে।

—এই নাও।

—নাঃ, থাক রে সালেমা!

—তাড়াভাড়ি যাও! পাড়ী পাবে না।

বোয়ান ময়দ অনাজুদিয় চোখে বুঝি জল আসে। কি পড়ল চোখে। বাপের স্মৃতি না মেয়ের স্বপ্ন বন্ধ করে মল পায়ে দিয়ে চোখের স্রুখে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য।

—পনের ভরি ন' আনা! রূপের মল একজোড়া—ছুট বাদ হ' ভরি—ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে আছে অনাজুদি মল্লিকের দিকে।

—তোমার দাম হ'ল গিয়ে এক টাকা বারো আনা ভরি—তেইশ টাকা দশ আনা।

খোলা ডরার থেকে নোটের তাড়া টেনে নিল মল্লিক। তেইশ টাকা আর খুচরোর কোটো থেকে দশ আনা ভুলে নিয়ে দিয়ে দিল অনাজুদিকে। চাবীদের সঙ্গে কারবারের কৌশল মল্লিকের বহুদিন থেকে বগু। তাড়াভাড়ি টাকাটা হাতে গুজে দিলেই হয়ে গেল। দরদস্তর ওরা করতে পারে না বেশী। করলেও ওদের বোঝাতে সময়

লাগে না মল্লিকের। টাকা হাতে নিলে আর জিনিস কেনত চায় না। নয় ত বলে বড্ড কম হচ্ছে দামটা, অন্ত দোকানে দেখব।

—কে? শোভেন নয়?

শোভেন যেন দেখতে পারনি পরাণ মাষ্টারকে এমনি করে পাশ কাটাল। পরাণ মাষ্টারের ক্রাসফ্রেণ্ড শোভেন। পাশের গ্রামেই বাড়ী—মধ্যস্থ ছিল, গিয়েছে। থাকতে আর ছিল এখন নেই। ক্ষতিপূরণ এক পরমা পার নি ক'বড়বের মধ্যে। রিটার্ন দিয়ে নানা রকম কর্ত্তব্য পূরণ করে সদয়ে হ'টাটাটি করাই সাহ হয়েছে।

শোভেন হ'বার ঘুরেছে এই পথে। মল্লিকের দোকানে উঠেছে দেখে পরাণ মাষ্টার। মাষ্টারের সঙ্গে এক সঙ্গে মল্লিকের দোকানে উঠতে বুঝি প্রেসিডে বেধেছে, আবার ঘুরে এসেছে এক পাক। আবারও চেনা লোক, গৌব দাস, গ্রামের মুন্সী দোকানদার। সেও মল্লিকের শিকার।

বিকেলের ট্রেন আলোর আলোর কিরতে হবে, বর্ষা কাল, রাস্তার অসফর কাদা। টেট মিলিকের মাটি দিয়ে রাস্তা উচু করা হয়েছে, নরম স্রুঃস্রুঃ মাটি। জল পেয়ে আর গরু, বাছুর ম'হুয়ের পায়ে পায়ে ধানের জমির মত কাদা হয়েছে। কাদার সাগর পার হতে হলে দিনে দিনেই স্রুবিধে।

মরিয়া হয়ে দোকানে উঠেছে শোভেন। যে থাকে থাক। যে দেখে দেখুক। সব ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। অভিজাতের খোলস খুলে পড়ছে। উলঙ্গ করে দিয়ে যাচ্ছে সকলকে। দিক। টাকা কিছু চাই। জিনিস ক'টা কিনতেই হবে, থাক পরাণ মাষ্টার।

হ'জনেই সামান্যামনি, লজ্জায় মুখ নাশিয়ে নের উত্তরেই। যেন কেউ কাউকে চেনে না এমন ভাবে কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বিড়ম্বনা সর্বস্বই। দোকানে উঠে একটু বসবার জায়গা নেই। গৌর উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল বাবুকে।

—আস্থন বাবু, আস্থন? মল্লিকের অমায়িক আপায়ন।

গৌরের কাজ সাদা। টাকা ক'টা কাপড়ের খুটে বেঁধে নিল। ব্যবসাদার মানুষ, ব্যবসা করতে করতে বুঝি ভূয়ো প্রেসিড উবে গিয়েছে। মুকীখানার দোকানের তেল হুনের দাগ ধরা ময়লা জামাটা পরেই চলে এসেছে গৌর। দরকার টাকার, পুজি বাড়াতে হবে, পুজি চাই।

চায় ধারে চেয়ে দেখল শোভেন, চাবীর দলই বেশী। জমি চাব করবে, বা আছে সবল তাই নিয়ে এসেছে, গ্রামের মহাজনের টাকার এক আনা স্রুদ, এখানে হ'পরমা।

গৌরের সঙ্গেও মুখোমুখি, লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে শোভেনের, উপায় নেই, মানসস্তম্ব থাকছে না। সকলকেই এক ঘাটে জল খেতে হচ্ছে, ছোট-বড়র প্রভেদ নেই। চাবী, মধ্যবিত্ত, মজুর বলে কোন কথা নেই, সবাই সমান, মহাজনের কাছে সব খন্দেব। সমাজ-ব্যবস্থা সবাইকে এক সঙ্গে টেনে এনে ধুলায় নারাজে। বাদ কেবল মল্লিকের মত হ'টারটে লোক, তারা জাল

পেতে বেখেছে, ছোট-বড় সব মাছকে শুটিয়ে টেনে এনে ভুলবে আররণ-চেষ্টার অঙ্ককার গুহার।

—আমুন? কি আছে আপনায়? হাসি দেখা দিয়েছে মল্লিকের মুখে, ভারী আনন্দ। ভক্তলোক খন্ডের সোনার জিনিস, লাভ বেশী।

পাশে-বসা চাষী নিয়ে এসেছে রূপার পোট এক ছড়া, ওজন করতে করতেই মুখ তুলে এক মুখ হাসি নিয়ে আপ্যায়িত করতে তুল হয় না মল্লিকের।

—এই আঁটিটা—?

—বসুন? দেখি।

কষ্টপাথরে ঘসেছে একদিকে অস্ত্র দিকে কথা বলছে খন্ডের সন্নে, আবার নতুন কেউ এলে আপ্যায়িত করছে। জিনিস মল্লিকের, মাথাও বুঝি অনেক। সব দিকে ভাল সামলাচ্ছে, তুল হয় না।

শোভেন মল্লিকের পিছনে ক্যালেন্ডারটা এক মনে দেখে। জন্মের গোপাল হাত বাড়িয়ে মা বশোদার কাছে বুঝি নাড়ু চাইছে। মাথার কোঁকড়া চুলগুলি চূড়া করা কপালের উপর বাঁধা, সেই চূড়া থেকে ঝুলছে একটি টিকলি।

নিজের গোপালের কথাও বুঝি মনে পড়ল শোভনের। মা বলছে গোকন তোমার চুল কোথায়?

গোকন চুল দেখায়।

তোমার টিকলি?

টিকলি দেখায়।

আনন্দে এ বশোদাও হাততালি দেয়। বলে দেখেছ—

তোমার গোকনের কেমন বুদ্ধি। টিকলি দেখাচ্ছে।

ছবিতে সত্যিই কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে গোপালকে। এ যুগের গোপাল হলে?

টিকলিটা মল্লিকের দোকানে তুলে দেওয়ার পরও টিকলির কথা গোকন ভোলে নি। মা যেই বলেছে গোকন তোমার চুল কোথায়? গোকন কপালে হাত দিয়ে টিকলি দেখাতে চেয়েছে। তার পরেই আধো আধো স্ববে বলেছে নেই।

শোভেন কল্যাণীর দিকে চাইতেই দেখেছে অক্ষতে টলমল এক জোড়া পদ্ম আঁখি নীরব ভংসনার কাতর। মনে হয়েছে এবারে বুঝি ঐ অক্ষ বজা হয়ে নাহবে। ভাসিয়ে দেবে তাকে মা বশোদার ক্ষোভের পাখারে।

টাকা আর বসিদের চিরকুট হাতে নিয়ে দেখল হিসের করে। খুটিয়ে খুটিয়ে হিসাব করল শোভেন। চিরকুটে দোকানের নাম নেই, নেই ট্যাম্প। বত ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বাঁধা-পড়ার শিকলের লাগ বুঝি চিড়ি চিড়ি করে আলা ধরিয়ে দিল। বলল—আপনাদের বসিদের দোকানের নাম নেই কেন? ট্যাম্প কই।

মল্লিক একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ইনি ত অনেকবার দোকানে এসেছেন, হঠাৎ বিপড়ে পেলেন কেন?

—আজ্ঞে, আমরা নাম দিইনে। আর ট্যাম্পও না।

—কেন?

—নিয়ম নেই।

—এ চিরকুটে আপনায় নাম নেই? এটা দেখালে আপনি যদি আমার জিনিস কেনে না দেন?

হাসল মল্লিক। ভুবনমোহিনী হাসি। আর বাবা বসেছিল তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগল অঘোর মল্লিক। কি বলে বাবু। দেখুন আপনায়। মল্লিকের সম্বন্ধে কি বলে? স্বপ্ন শব্দ গড়ে ওঠে নি সেই সময়ের মল্লিকের দোকান। হাসি দিয়ে সেই কথা বলতে লাগল মল্লিক সকলকে। সকলকে যেন সালিশ মানল।

লজ্জাই পেল শোভেন। সত্যি সে নিজেও ত এ দোকানে বহুবার এসেছে। কই এ প্রশ্ন ত মনে জাগে নি?

পথ চলতে চলতে আবার মনে হ'ল, তবে কেন দোকানের নাম দেয় না? কারণ কি? নাম দিলেই বিপদ। যে খাতার বাজোব সোনা রূপো বাঁধা পড়ছে সে খাতা লুকান থাকবে। ছুল্লিকেট খাতার কয়েকটি জিনিসের মাত্র হিসাব দেখাবে। তা না হলে আরকর কাকি দেওয়া যাবে না। প্রতিদিন বত জিনিস বাঁধা বিক্রী হচ্ছে তার হিসাব জানবে না কেউ কোনদিনও। জানবে না সরকারও। সামনেই থানা, সরকারী প্রতিষ্ঠান। সেই-জন্মই সুবিধা সরকারকে কাকি দেওয়া, আরকর থেকে যেহাই পাওয়া।

শোভেন দেখেছে একদিন ব্রাহ্ম দলটার এসে সাহাদিন্দের বাঁধা-বাঁধা আর বিক্রী-করা জিনিসের স্তপ। বড় একটা কোটা থেকে চলেছে সানের উপরে। ইলেকট্রিকের তীব্র আলো পড়ে কিস্কিক করছে বন্ধকে বন্দী অলঙ্কারগুলি। আংটি, চূড়ি, হার, পাশা, মল, টিকলি, বাজুবন্ধ, কঙ্কণ। এককালের জমিদারের পুত্রবধূর কঙ্কণের সঙ্গে চাষী বোয়ের রূপার হাঁসুলীর অদ্ভুত মিতালি। কোথাকার চাষী বোয়ের সঙ্গে কোথাকার জমিদার পুত্রবধূর সাক্ষাৎ নেই। কোন দিন কেউ কাউকে দেখবেও না, কিন্তু তাদের দেহসৌহর্তে গর্জিত কঙ্কণ আর হাঁসুলীতে বড় মিতালি, পাশাপাশি একই বাজ্রে, সিন্দুকে তারা বন্দী হয়ে থাকছে। কত সোহাগ আর জেহে আত্মীয়স্বজনের দেওয়া জিনিস আররণ-চেষ্টার অঙ্ককারের কালো গহবরে, অনাদরে জড়া-জড়ি করে পড়ে থাকবে। যে সোনা শোভা পায় সোনার বংগী কঙ্কণ চলচল অঙ্গে, সে সোনা বোবা হয়ে মুখ লুকিয়ে থাকবে অঘোর মল্লিকের কারাগারে।

দোকান থেকে বেরিয়ে পয়শা মাটির মাঝার মাঝার ঘুরেছে। মাথাটা কিম কিম করছে। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। যেহ যেন চলতে চাইছে না। মল্লিকের দোকান নয়, গুদামখানা। দেহের সঙ্গে মনটাও হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু আনন্দ নেই, হাসি নেই, হৃৎকণ্ডে হৃৎকণ্ড তুলে থাকার উপায় নেই।

সামনেই বড় বাজার উপর সিনেমা হল। গাড়িয়ে পড়ল



মাঠায়। কত লোক লাইন দিয়েছে সিনেমা দেখবে বলে। একটা নয় এইটুকু শহরে তিন তিনটে সিনেমা হল। সাধনে বিয়াট ছবি টাডান। নারক নারিকা হাসছে। আদর করছে নারিকাকে। ওখানে বোধ হয় দুঃখ নেই। ওদের বুঝি মল্লিকের দোকানে বেতে হয় না বৌয়ের শেষ গহনা নিয়ে।

—কি হে সিনেমার বাবে নাকি মাঠায়? ভাল বই হচ্ছে।

মাঠায় চমকে উঠে দেখে শোভেন। মল্লিকের দোকানের সামনে সে চিনতে চার নি। এখন হাসিমুখ।

—চল, খুব ভাল বই হচ্ছে!

ভাল বই। কি দেখাবে। ওখানেও কি দুঃখের কাহিনী দেখাবে নাকি? তা হলে সে বাবে না, আনন্দ চাই। দুঃখকে তুলে থাকতে চায় মাঠায়। চারিদিকে দারিদ্র্যের বিভীষিকা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের আলো দেখতে চায়।

—চল, মাঠায় চল। কষ্ট ত সারা জীবন ধরেই আছে। একটু আনন্দ, একটু রিক্রেশন দরকার।

দরকার ত বটেই! জীবনকে ক্ষয় করে করে বাঁধা রাখা মহাজনের ঘবে। জীবনের কোমল প্রবৃত্তিগুলো কঠোর বাস্তবের আঘাতে আঘাতে পিষে মেরে ফেলাই ত জীবন নয়।

মাঠায়ের পাশেই এক সুখী দম্পতি। বোটি ছবি দেখতে দেখতে কথা বলছে, প্রসন্ন করছে, কোন সময় বা হেসে পড়িয়ে পড়ছে, দমার কথা মনে পড়ছে মাঠায়ের। বহুদিন ধরে রমায় সিনেমা দেখার সখ। পায়ে নি, মাঠায় তাকে দেখাতে পারে নি। তাই বুঝি ভাল লাগে না। বাব বাব রমায় কথাই মনে হয়, “একদিন সিনেমায় নিয়ে চল না, দশ বছর বিয়ে হয়ে এসেছি, এম যথো একদিনও সিনেমা দেখালে না।”

রমায় কথা কোন সময় তুলে গিয়েছে মাঠায়। হল থেকে বেরিয়ে এল সে আর শোভেন। আরও কত লোক। এ যে অনেক লোক। এত লোক সিনেমা দেখেছে?

—চল মাঠায় তাড়াতাড়ি চল, নইলে ট্রেন পাওয়া বাবে না। এটাই লাঠ ট্রেন।

পা চালাল হুঁজনে। সঙ্গে গৌর মুনীও এল। সেও দেখেছে সিনেমা। বড় বাস্তা থেকে গলি দিয়ে চুকছে তারা তাড়াতাড়ি বাবায় জঙ্গ। আবছা অন্ধকার গলিটার মোড়ে দেখা বাচ্ছে মল্লিকের বিয়াট দো-এলা বাড়ী। দরজার কে কড়া নাড়ছে।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। কথা-বার্তা নেই। হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে পেল। কয়েক মিনিট পরেই এনে দিল গহনাটা। গহনার সঙ্গে ভাঁজ-করা গুরিয়ার মত ছোট্ট মোড়ানো কাগজে লেখা নাম। বাঁধা-রাখা জিনিস কেহও নিল লোকটি।

—কে? তাদের পিছু পিছু আসছে লোকটি।

—ওঃ, পরাণ, কোথায় এসেছিল? সিনেমা দেখতে?

—না, আপনি?

—আমি এসেছিলাম মল্লিকের দোকানে।

ইনিও মল্লিকের দোকানে। গ্রামের মহাজন দেবেশ রায়। গ্রামের চাবীর জমি বাব কাছে বাঁধা। সোনা রূপো থেকে বদনা, ঘড়া, খটি যাঁর বাড়ীতে শু পাকাবে চিরদিনের জঙ্গ জমা রাখে দুঃখী বাহুবোরা।

মনে পড়েছে দেবেশ রায়ের কথাই। এই দুদিনে মামুষ কেবল নিয়েই বাচ্ছে। কেবল দিচ্ছে না কেউ। তাই সময় সময় দেবেশবাবু হাতে টাকা থাকে না। তখন তাঁকেও আসতে হয় শহরে মল্লিকের দোকানে। হু’ পরসা স্ত্রী টাকা নিয়ে গ্রামে চার পরসা স্ত্রী ধার দেবেন। হু’ পরসা লাভ সেখানেও।

নীরবে হাঁটছে চার জন। পাশাপাছি গ্রামে বাড়ী। একই ট্রেনের বাড়ী। আবছা অন্ধকারে দেবেশ রায়ের মুণ্ডটা দেখা বাচ্ছে না ভাল করে। কিন্তু মল্লিকের হাসিমুখ মনে পড়ছে। তার আপ্যায়নের ভাষা ভেসে আসছে কানে।

মনে পড়ছে এই সঙ্গে ভূগোলের সেই ভামপায়ার বাহুড়ের কথা। শ্রান্ত পথিক বিজ্ঞানমের জঙ্গ গাছতলার এসে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে। ছুটে আসবে ভামপায়ার। শ্রান্ত আর ঘুমন্ত পথিককে তার পক্ষ বাজন করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখবে আর সেই সুযোগে তার স্ত্রীকৃত চক্ষু পথিকের দেহের মধ্যে সত্তর্পণে আঙুলে আঙুলে প্রবেশ করিয়ে তার দেহের সমস্ত রক্ত শুবে নেবে। ঘুমন্ত পথিকের আরামের নিদ্রা আর কোন কালে ভাঙবে না।

যাত্রি দশটা। মল্লিকের দোকানে এতক্ষণে ভিড় কমেছে। হু’ একজন আসছে, কেউ গহনার খন্ডের, কেউ বাঁধা রাখার। দেবেশ রায়ের মত কেউ এক-আবজন বাঁধা-রাখা জিনিস ছাড়িয়ে নিতে আসবে মল্লিকের বাড়ীতে। আবার ভোর হবে, আবার মল্লিক দোকান খুলবে আর আসবে পরাণ মাঠায়, শোভেন, অনাজদি, গৌর মুনীও দল। সবাই ভাঙবে, গড়ে উঠবে গুণু আঘোর মল্লিক?



## সমবায় ও অনুমান

শ্রীকীর্ত্তিদাস মাইতি

প্রাচীন কালে সমবায় সংজ্ঞার প্রকৃত রূপ গোঁতম প্রকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সূত্র ১-১-৪ হইতে পাওয়া না গেলেও নব্য নৈয়ায়িকেরা বৈশেষিকের উক্ত পদার্থ সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া তাহা নিজস্ব ধারায় গ্রহণ করিয়াছেন। কনাদ সূত্র ৭।২।২৬ হইতে পাওয়া যায় যে—  
“ইহেমমিতি বতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ—এই সূত্রের “ইহেমমিতি” অংশ হইতে ইহা ধরা যায় যে, সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। [অতএবেহেতি প্রত্যয়োপপত্তৌ সমবায়ানুমান প্রসঙ্গাচ্—ভার্য লীলাবতী, পৃ: ৭০৬।] কিন্তু প্রশস্তপাদ তাঁহার “পদার্থ ধর্ম্ম-সংগ্রহ” ব্যাখ্যায় ইহা অস্বীকার করিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন যে—  
“অমৃতসিদ্ধানামাধার্য্যার্থ্যার্থ্য ভূতানাং বঃ সঞ্চ ইহ প্রত্যয় হেতু স সমবায়ঃ” কলে পদবর্ত্তী ব্যাখ্যাকাদেয়া শুধু যে এই সমবায়কে অহুমানসিদ্ধ ধরিয়াছেন তাহা নহে মূলসূত্র-ধৃত কার্য্য-কারণ সঞ্চকেও অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য শব্দ মিশ্র প্রকৃতি উক্ত অস্বীকৃতি সত্ত্বেও শুধু যে “অমৃতসিদ্ধি” লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে—  
“অসম্বন্ধস্যোব বিভ্রামানমমৃত সিদ্ধিঃ” উক্তি করিয়াছেন তাহা নহে এই সমবায়কে জ্ঞানবর্ত্তিক তৎপর্য্য টীকাকার সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতি বিশ্বে নির্দিষ্ট ধারায় নিয়ম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জ্ঞানশাস্ত্রে প্রশস্তপাদ ব্যাখ্যা বা শব্দ মিশ্রের কার্য্য-কারণ বিধি অস্বীকারের স্থান না থাকিলেও সমবায়ের অস্তিত্ব দুই তথ্যের দ্বারা আছে এবং বৈশেষিকের জ্ঞান সমবায় অহুমানসিদ্ধ না হইয়া প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ মাত্র। ইহা ছাড়া সমবায় লক্ষণ স্বীকারে জ্ঞানশাস্ত্রে অস্তিত্ব বিশেষ লক্ষণ অস্বীকার করিয়াছে তাহা এই যে—“পরমাণু-বহনশক্তিঃ সমবায় ইতি (জ্ঞানবর্ত্তিক; পৃ: ৫৩)। এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি সত্ত্বেও সমবায়ের সহিত অহুমানের সঞ্চ বিচারের আবশ্যকতা বহুভাষ্য উত্তোতকম রীতিতেই অনস্বীকার্য্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নব্য কালে যাহা ব্যাপ্তি প্রাচীন কালে তাহা অবিভাজ্য। অবিভাজ্যের অর্থবিচারে নৈয়ায়িকেরা ‘বিনা-ভাবের অভাব’ এই নিষ্পত্তি অবধার্য্য করিয়াছেন। ‘বিনাভাবের অভাব’ সূত্রার্থ বিচারে আবার ‘অভাব’ লক্ষণ জানা আবশ্যক। “অভাব” বিষয়ে জ্ঞানপ্রকরণে যে পাঁচটি সূত্র পাওয়া যায় (২।১ ৩৮-৪০; ৩।১।৫ ও ৪।১।১৪) তাহা ধারা ইহার লক্ষণ অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। মীমাংসক ভাট্ট মতে ইহা অস্তম প্রথম পদার্থ। কিন্তু গুরু মতে ইহা কেবল অধিকরণ স্বরূপ এবং সেজন্য সমানাদিকরণ্য ও ব্যাদিকরণ এই উভয় প্রকার ভিত্তিতে ইহার স্বরূপ নির্ণীত হয়। “ভূতলে ঘট নাই” বলিলে ঘটভাব ভূতল ও ঘটের সমানাদিকরণ্য ও ব্যাদিকরণ সঞ্চ বিচারে ধরা যায় এবং উভয় সঞ্চই সমবায়

লক্ষণ বিচারে বোধ্য; কেন না—“অমৃতসিদ্ধানামাধার্য্যার্থ্যার্থ্য ভূতানাং বঃ সঞ্চ স সমবায়ঃ।” সমবায় মূলীভূত অমৃতসিদ্ধির ব্যাখ্যায় পরমাণুবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলিয়াছেন—  
“বয়োদ্যয়োদ্যে একমবিনাশদপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাববৃত-সিদ্ধৌ।” দুইটি বিষয়ের একরূপ সঞ্চ হইতে পারে কিনা তাহা এখন বিবেচ্য।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী থমসন ইলেক্ট্রন সঞ্চ প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য লইয়া গবেষণা করিতে গিয়া একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন যে কোনও বস্তুর গায়ে বিদ্যুতের সঞ্চ হইলে বস্তুর ওজন বাড়িয়া যায়, যেন বিদ্যুতের একটি আলাদা ওজন আছে এবং বস্তুর ওজনের সঙ্গে বিদ্যুতের এই ওজনটি যোগ হইয়া একুনে বিদ্যুৎবাহী বস্তুর ওজন বাড়ে। এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানী প্রমাণ করিলেন—একটি ইলেক্ট্রনের ওজনের কতটুকু বস্তুর ও বা ভরের উপর নির্ভর করে আর কতটুকু অংশ বৈদ্যুতিক চার্জ বা জোলের উপর? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া ইলেক্ট্রনের ভর ও বৈদ্যুতিক চার্জ আলাদা ভাবে মাপা হইলে এক অভাবনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল, ইলেক্ট্রনের বস্তুর ও বা ভর এবং চার্জ ওজনের দিক হইতেও আলাদা আলাদা কোনও স্বতন্ত্র জিনিস নয়। ইলেক্ট্রনের সবটুকু কণা বা ভরই বৈদ্যুতিক চার্জের অঙ্গ। এই সুপাত্তিকাবী আবিষ্কারের ফলে চূড়ান্ত ভাবে স্থির হয় যে, ইলেক্ট্রন বিদ্যুৎবাহী বা বিদ্যুৎ-গুণসম্পন্ন পদার্থ কণা নয়। ইলেক্ট্রন নিজেই আগাগোড়া বিদ্যুৎ-ময় একটি তড়িৎ রেণু মাত্র। এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থের মৌলিক উপাদান সঞ্চ একদিনের লব্ধ জ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। জানা গেল, ইলেক্ট্রন পদার্থমাত্রেরই একটি মৌলিক উপাদান বা পরমাণু [ পরঃ বা ক্রুটে; জা, সূ-৪:২।১৫ ] এবং পার্থক্য বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি অবিভাজ্য ও সক্রিয় অবস্থায় পরমাণুশ্রেণী বিভ্রামান থাকে অর্থাৎ বাবতীর বস্তুর মধ্যে সমবায় শক্তি স্বীকার্য্য। ক্যাথোড রশ্মি উৎপাদনের সময় দেখা যায় যে, যে ধাতব চাকতি হইতে ক্যাথোড রশ্মি উৎপন্ন হয়, সেই চাকতি হইতেই পজিটিভ রশ্মি সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা হইতে তখন পর্য্যন্ত একটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বস্তু কণা হইয়াছে যে শুধু ইলেক্ট্রন নয়, পজিটিভ রশ্মিকণা বা প্রোটনও পদার্থমাত্রেরই মূল উপাদান। ভর ও বিদ্যুৎশক্তির সমানাদিকরণ্য ফলেই বস্তুর উৎপত্তি এবং যে সকল বস্তুতে বিদ্যুৎ অক্রিয় থাকে সেখানে এই শক্তি অমৃতসিদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে।

আধুনিক আবিষ্কারে বাহ্য প্রমাণিত প্রাচীন সমস্যার চিন্তায় আমরা তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। প্রস্তুত উঠিতে পারে যে, সমস্যার সহিত জাগতিক বস্তু ও শক্তির সম্বন্ধ ভিত্তি অস্বতঃসিদ্ধ সার্বজনীন সম্পর্ক বিষয়ে প্রাচীনেরা কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন কি না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বৈশেষিক সমস্যার সূত্র (৭২২৬) ব্যাখ্যায় উপকরণ-কার শব্দ মিশ্র বলিয়াছেন—“স্বভাব-শক্তিরেব সর্বত্র নিয়ামিকা।” কাজেই কোন কোনও নৈয়ায়িক ‘সমস্যারেন শব্দগ্রহ’ বলিয়া এই সমস্যাকে শব্দশাস্ত্রে মাত্র প্রযোজ্য বলিলেও প্রাকৃতিক অস্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে প্রয়োজ্য গণ্য করিবার বহু কারণ আছে, বিশেষতঃ ক্রিয়াবলী-প্রকাশকার বর্ধমানের—“পদ-পদার্থদ্বয়ে ন সংযোগো নবা সমস্যায় সম্বন্ধার্থঃ”—উক্তি আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তে সহায়ক।

জ্ঞান বৈশেষিক সম্প্রদায় বহু বিচার করিয়া সমস্যার নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ (প্রমাণ) স্বীকার করিলেও ইহাকে আশ্রিত বলেন নাই, স্বতন্ত্র বলিয়াছেন [নাগার্জুনতত্ত্বমত সমস্যাদ্বিধঃ; জ্ঞান—লীলাবতী, পৃঃ-৭৮৩]। প্রত্যক্ষ, মূলীভূত সন্নিকর্ষের এই অংশের বিভাগ বিষয়ে নৈয়ায়িকেরা উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেও অগ্রবর্তী হইয়া সমস্যার বেধানে থাকে তাহা স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে; সংযোগ বা সমস্যার জ্ঞান অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধে নহে [স্বতন্ত্রঃ সমস্যায়িনাঃ সমস্যায় ইতি—জ্ঞানবাস্তবিক, ১১৫] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপকরণক বর্ধমানোপাধায় তাৎপর্য পরিণতির প্রকাশ-টীকার উক্তরূপেই উদ্ধৃতকরণে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সমস্যারের একরূপ অভিযান্ত্রিক কলে ইহা স্বতন্ত্র (প্রমাণ) প্রকরণ (Inductive System) রূপে আলোচনা পাইবার উপযুক্ত। সমস্যার সম্বন্ধান্ত নিরপেক্ষ সম্বন্ধ বলিয়া বৈশেষিক সূত্র—“ইহেমমিতি যতঃ কার্যাকারণয়োঃ স সমস্যায়ঃ (৭২২৬)” ব্যাখ্যায় নবা নৈয়ায়িক। শব্দ মিশ্র কার্য-কারণ সম্বন্ধকে উপলক্ষণ বিবেচনার বাদ দিয়া কেবল “স্বভাবশক্তিরেব সর্বত্র নিয়ামিকা” সূত্র লক্ষণ করিলেও আধুনিক আলোচনার উত্তর লক্ষণই পাই।

আলোচনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, ব্যাপ্তি বেরূপ অনুমানের ভিত্তি তেমনই উক্ত ব্যাপ্তির প্রতিযোগী অবিনাশাবণ সমস্যারের ভিত্তি অর্থাৎ অস্বীকারী শাস্ত্রে অনুমান ও সমস্যার উভয় প্রকরণই আমাদের জ্ঞানের পথপ্রদর্শক।

এই প্রশ্নে সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া? বৈজ্ঞানিকতার দিক হইতে দেখিতে গেলে (logically) সমস্যার অনুমানের পূর্বগামী না অনুমান সমস্যারের পূর্বগামী।

জ্ঞানবাস্তবিক তাৎপর্য টীকার বাচস্পতি মিশ্রের “অনুমানশ্চ প্রত্যক্ষ বৈলক্ষণ্যম্” প্রসঙ্গে উক্তি এই যে—“সম্পাদকি কাম্যাস্তব সত্যেব সর্বত্রোপলভ্যতা ব্যাপকত্বম্ (চৌধুরা সংস্করণ; পৃ-১৮৫)” অর্থাৎ প্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি বলেই ব্যাপকতা-জ্ঞান জন্মে, আর সেই ব্যাপকতা জ্ঞান আদৌ সমস্যার

সত্ত্ব বলেই সমস্যারই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং অনুমানের পূর্বগামী। এমতে বস্তুতঃ অনুমান পদ্ধতিমাত্রই মূলতঃ সমস্যার পদ্ধতি। কিন্তু অনুমান সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহাতে সিদ্ধান্তটি আমাদিগকে কোনও নূতন সত্যের সন্ধান দেয় না, স্বীকৃত হেতু বাক্যগুলিতে যে সত্য নিহিত আছে তাহাই প্রকটিত করে মাত্র, অনুমান (ক) স্বার্থানুমান ও (খ) পরার্থানুমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদ্ভাবন (জ্ঞান পরিশিষ্ট প্রকাশ বা প্রবোধ সিদ্ধি, পৃঃ-১১৩, ১১৬-১১৮, ১২১ দ্রষ্টব্য), টুথ-পন, উপস্থাপন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রক্রিয়াগুলিকে প্রত্যক্ষরূপে অনুমান বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহাদের কোনওটিতে আমরা একটি সত্য হইতে পৃথক অপর সত্যে উপনীত হই না, যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই তাহা হেতু বাক্যেরই ভিন্ন আকারে পুনরাবৃত্তি মাত্র। পরার্থানুমান অথবা ন্যায়ানুমান সম্বন্ধেও এই অভিমতই প্রযোজ্য। পরার্থানুমান বা জ্ঞানে প্রধান হেতু বাক্যের ব্যাপক কথা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রধান হেতু বাক্য হইতেই সিদ্ধান্তটি নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তটি সত্য পূর্বেই ইহা জানা না থাকিলে প্রধান হেতু বাক্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ জ্ঞানানুমানের সাহায্যে কোনও নূতন সত্য প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। যে চিন্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করি তাহার সাধারণতঃ দুইটি অংশ—একটি অংশ অনুমানমূলক এবং অপরটি ব্যবস্থামূলক। যে প্রক্রিয়া-দ্বারা কোনও সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাই সমস্যার পদ্ধতি এবং বাহ্য দ্বারা সেই সাধারণ সম্বন্ধটির ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই অনুমান পদ্ধতি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বস্তুবাচ্য পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে। যে সকল মনুষ্যকে আমরা জানি তাহাদের অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং মানুষের জীবন ও মরণশীলতা এই দুইয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ (সমস্যার) বহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া আমরা একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হইলাম যে, “সকল মনুষ্যই মরণশীল” অর্থাৎ যে সকল মনুষ্যকে আমরা বাস্তবিক দেখিয়াছি মরণশীলতা কেবল তাহাদেরই বিশেষণ নয়, বাহাদিগকে আমরা কখনও দেখি নাই অথবা বাহাদিগকে আমাদের কখনও দেখিবার সম্ভাবনা নাই তাহাদেরও বিশেষণ। এখানে যে সিদ্ধান্তটি করা হইল তাহা নূতন সত্যের সন্ধান দিতেছে এবং আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক করিতেছে; সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে বস্তুতঃই (দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ) অনুমান বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা আবার যুক্তি প্রয়োগ করি “সকল মনুষ্যই মরণশীল, রাম মনুষ্য, অতএব রাম মরণশীল” তখন আমাদের সিদ্ধান্তে নূতন কোনও সত্য থাকে না। এখানে প্রধান হেতু—বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইতেছে মাত্র এবং কোনও বিশেষ স্থলে ইহার প্রয়োগ কি ভাবে হইতেছে তাহাই নির্দেশ করা হইতেছে। কোনও সাধারণ সত্যকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখাইলে ইহার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে

কিন্তু কোনও নুতন সত্য প্রতিপাদন করা হয় না। কতকগুলি বিশেষ বস্তু পর্যবেক্ষণ করিয়া বখন একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তখনই দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যাধুমান [ অমুমিত্যোপায়িক সমস্তরূপোৎপত্তি বস্তুবাচকং বাক্যং পর্যায়ম্—ভারতীয়াবতী ; পৃ:- ৭৭৪ ] প্রক্রিয়া শেষ হইয়া গেল ; সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে নামিয়া আসায় যে প্রক্রিয়া তাহাতে ঐ শ্রেণীর পর্যাধুমানের কোনও স্থান নাই ; সুতরাং যুক্তি প্রয়োগ ব্যাপারে অমুমান পদ্ধতির স্থান অতি গৌণ।

এই মতামুসায়ে সমবায়ই অমুমিতি প্রক্রিয়ার মৌলিক রূপ, কেবলমাত্র তাহাই নয়, যুক্তির ক্রম হিসাবে সমবায় অমুমানের পূর্বগামী, অর্থাৎ সমবায়ের প্রয়োগ পূর্বে না হইলে অমুমানের প্রয়োগ হইতে পারে না। সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া একটি সাধারণ সত্য প্রতিপন্ন করা হইলে তবেই অমুমান পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে। ভ্রাতৃকে অমুমানের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিলে দেখা যায় ইহার একটি হেতু বাক্য সাধারণ সত্য হইতে বাধ্য এবং স্বতঃসিদ্ধ সত্য বাতীত অস্ত্র শ্রেণীর সাধারণ সত্য প্রমাণ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত সমবায় পদ্ধতির সাভাষ্য না লইয়া উপায় নাই। আমরা প্রথমে সমবায় পদ্ধতির দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হই এবং পরে তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। এ স্থলে যদি কেহ আপত্তি করেন যে সমবায়মুমানগুলিও স্বতঃসিদ্ধ নয় তাহায়া প্রকৃতির নিয়মামুগতিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রকৃতির একরূপতা বা সর্বত্র নিয়ামিকা স্বভাবশক্তি (Law of the Uniformity of Nature)-কে প্রধান হেতু বাক্যরূপে লইয়া প্রত্যেক সমবায়কেই অমুমানের আকারে পরিণত করা বাইতে পারে তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মামুগতিতার সাধারণ বিধি ও কতকগুলি প্রাক্তন সমবায় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত [ কেন পুনঃ প্রমাণের স্বাভাবিকঃ সন্দেহো গৃহ্যতে। প্রত্যক্ষ সন্দেহাদিনু প্রত্যক্ষেণ—তাৎপর্য্য টীকা ; পৃ:-১৬৬ ] সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সমবায় পদ্ধতিতেই অমুমান পদ্ধতির পূর্বগামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং এই ভাবেই ভ্রাতৃবাস্তবিকতার উদ্ভোদকর এবং তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র আলোচনা করিয়াছেন।

যুক্তি বা বিচারের ক্ষেত্রে ভ্রাতৃমুমানের স্থান কোথায় এবং কোনও সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে ইহার মূল্য কতটুকু সে সন্দেহ গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত হইলে সত্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টার অমুমান যে কেবলমাত্র গৌণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে এই অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না। এখানে আরও বলা বাইতে পারে যে, সহচার অর্থাৎ কতকগুলি পদার্থের একত্বাবস্থান দর্শনই সমবায়ের ভিত্তি। আমরা প্রথমে বার বার কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনার ব্যতিক্রমহীন সহচার [উভয়ো সামান্যধিকরণং সহচরঃ—সমুপপাদ্যিঃ এমতভাবিণী ; পৃ:-৭] দর্শন করিয়া প্রকৃতির সর্বত্র নিয়ামিকা সাধারণ বিধি প্রতিপন্ন করি এবং তৎপরে সেই বিধিটিকেই অস্ত্রাত্মক সত্যের প্রক্রিয়াতে মূলস্থান হিসাবে ব্যবহার

করি। কিন্তু অগ্নিও দাহিকা শক্তি আছে ইহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়া বখন অমুমান করিতে বাই যে, অগ্নি একটি ক্ষেত্রে অগ্নি বস্তুকে দগ্ধ করিবে তখন আমরা ইতঃপূর্বেই নির্দিষ্টারে প্রকৃতির সর্বত্র নিয়ামিকা সাধারণ বিধিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই বিধির প্রতি বিশ্বাস যদি পূর্বে হইতেই কোনও না কোনও রূপে আমাদের মধ্যে বর্তমান না থাকিত তাহা হইলে আমরা কোনও ক্ষেত্রেই জ্ঞাতপূর্ব সত্য হইতে অজ্ঞাতপূর্ব সত্যে উপনীত হইতে পারিতাম না। কার্য-কারণ বিধি সন্দেহেও একই কথা প্রযোজ্য। কার্যমাত্রেরই কারণ আছে এই বিশ্বাস সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলভিত্তিস্বরূপ। কার্য-কারণ বিধির অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার না করিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না, অথচ কেবলমাত্র দুইটি বস্তু বা ঘটনার ব্যতিক্রমমহিত পৌরোপরি দেখিয়া কার্য-কারণ বিধিকে নির্দিষ্টারে স্বীকার করিয়া না লইলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রেই সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না। এই দুই মূল নিয়মকে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং ইহাদিগকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি সাধারণ সত্য (সর্বলোক-সিদ্ধ নিয়ম) উপনীত হওয়াই সমবায় পদ্ধতি। কিন্তু যেহেতু ইহাতে কতকগুলি সাধারণ সত্য হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যাপক সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি সেই হেতু আমরা ইহাকে সমবায় পদ্ধতি বলিয়াও বর্ণনা করিতে পারি। সুতরাং সমবায়ের যে লক্ষণ আমরা দিয়াছি সেই লক্ষণ গ্রহণ করিলে সমবায়ই যে একমাত্র অমুমুতি পদ্ধতি তাহা স্বীকার করা যায় না এবং যেহেতু প্রকৃতির সর্বত্র নিয়ামিকা এবং কার্য-কারণ বিধিকে সমবায় পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় না। [ তচ্ছ্বেং প্রত্যয় কারণ-মাস্তানিচ সমবায় চাবিলক্ষণমিতি—তাৎপর্য্য টীকা ; পৃ:-১৮৫ ৬ ] সেই হেতু সমবায় যে মূলতঃ অমুমানের পূর্বগামী এই মতও যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাৎপর্য্য টীকার “অমুমানস্ত প্রত্যক্ষ বৈলক্ষণ্যম্” প্রসঙ্গে বাচস্পতি ইহাই আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস সার্কভোমের “ভাষ্য পরিচ্ছেদ” মতে—অমুমানের সংযোগাদি বাধ্য সমবায় সিদ্ধি: (পৃ:-১১), অর্থাৎ অমুমানই মূল পদ্ধতি। সমবায় পদ্ধতির কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ইহাও মূলতঃ অমুমান পদ্ধতি অথবা ইহা অমুমান পদ্ধতির রূপান্তর মাত্র। বাবতীয় যুক্তি ও বিচার মূলতঃ একমাত্র অমুমান পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অমুমান সমবায়ের পূর্বগামী। কোনও সমবায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা বাইবে। কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিলে তাহাদিগকে একটি সন্দেহ সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে এমন একটি সাধারণ নিয়ম অমুপসংহারী (Hypothesis; ‘বস্তুমাত্র পক্ষকোঃমুপসংহারী’—তর্ককৌমুদী; পৃ:-১২) রূপে আমাদের মনে উদ্ভিত হয়। এই অমুপসংহারীকে আশ্রয় করিয়া আমরা সেই বস্তু বা ঘটনাবলী সন্দেহ কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। যদি সেই সিদ্ধান্তগুলি অধিকতর বিতর্কিত ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা

সমর্থিত [ তাদৃশ কতিপয় বিষয় ভ্রমোদর্শন বা সংস্কার সচিব বাহ্যিক্রিয় বেদন্যা—ভায়লীলাবতী, পৃঃ-৪২৩ ] হয় তাহা হইলে তাহা আর সংযোগ না হইয়া [ সংযোগে প্রাপ্তিভূত ন বৃত্তা স্বাভাবিকঃ সৰ্ব্বতঃ তাৎপর্য টীকা ; পৃঃ-১৮৬ ], সেই অনুপসংহারী নিয়মের বন্ধগত সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুপসংহারীটি প্রথমে বৈকল্যে আমাদের মনে আসিয়াছিল অনুমান ও বিচারের কালে তাহা হয়ত সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত হইতে পারে কিন্তু কল্পনার সাহায্যে প্রথমেই ঐরূপ একটি সাধারণ নিয়মের ধারণা করা সম্ভব পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ, অপর পক্ষে বাস্তব তথ্যের সাহায্যে অনুপসংহারী নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করাই অনুমান পদ্ধতি [ তৎপ্রতিষ্ঠাননিয়ম অনুমান খণ্ডে—অনুপসংহারী প্রকরণ উষ্টব্য ]। সুতরাং এই উপায়েও যখন কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন আমরা অনুমান পদ্ধতির সাহায্যেই তাহা করিয়া থাকি ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। একটি অনুপসংহারীকে অনুমান পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে একটি সাধারণ সত্য প্রমাণিত হয়, সুতরাং কোনও ক্ষেত্রে সমস্যারের প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্বে অনুমান প্রয়োগ করিতে হইবে।

তদুত্ত “ভায়লীলাবতী” গ্রন্থে বহুভাষা “অতএবেহেতি প্রত্যয়প্রপত্তৌ সমস্যায়ানুমান প্রসঙ্গাৎ” ( পৃঃ-১০৬ ) উক্তি দ্বারা সমস্যা ও অনুমানকে পারস্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত ছাড়া আরও কিছু বলিতে চাহিয়াছেন। এ মতে অনুমানই সাক্ষাৎ অর্থাৎ সম্মুখগামী প্রক্রিয়া ( Direct process ) ; সমস্যার অনুমানের প্রকার ভেদমাত্র এবং এই দুইয়ের মধ্যে মূলতঃ বা প্রকৃতিগত কোনও ভেদ নাই। মীমাংসক পার্শ্বদাত্ত্বী মিশ্র তাঁহার “শাস্ত্রলীপিকা” গ্রন্থে ভিন্ন কথা বলিয়াছেন যে—“বস্তু বাদৃশস্ত যেন বাদৃশেন সহ সাক্ষাৎ প্রণাল্যা বা বাদৃশঃ সৰ্ব্বতঃ সংযোগ সমস্যার একার্থ সমস্যারঃ কার্যকারণতামহত্ত্বো বা দৃষ্টান্ত বর্ণিত নিয়ত জ্ঞাতভ্যং তাদৃশং সাধারণ্যং দৃষ্টবস্ত্ত্বম্ভিঃ তাদৃশে তাদৃশ সৰ্ব্বকিনি প্রবলেন প্রমাণেন তৎপ্রত্যাপ্তিপর্যায়ভ্যাম্ পরিচ্ছিন্নে বা বুদ্ধিঃ সাহঅনুমানম্ [ অনুমান নিম্নপনয় ]।” অনুমানে কতকগুলি ছেঁড় বাঁকা হইতে সোজা-সুজি তাহাদের মধ্যে নিহিত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ; সেজন্য ইহা সাক্ষাৎ পদ্ধতি কিন্তু সমস্যায় কতকগুলি বিশেষ তথ্যের জ্ঞান হইলে আমরা সেইগুলি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে পারি না ; একটি জটিল ( Indirect ) পথ ধরিতে হয় ; এই জটিল সমস্যার জটিল পদ্ধতি। যে বিশেষ বস্তু বা ঘটনাবলী আমরা কোনও এক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছি সেগুলিকে হয়ত কতকগুলি কাল্পনিক নিয়মের যে কোনটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইতে পারে। সুতরাং আমরা সেই-রূপ একটি নিয়মকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তগুলি অনুমান প্রণালীর সাহায্যে পাইয়া থাকি সেগুলিকে বাস্তব তথ্যের সাহায্যে পরীক্ষা [ লক্ষিততত্ত্বকল্পনপদ্ধতেনবেতি বিচারঃ পরীক্ষা—ভায়লীলাবতী, পৃঃ-১১ ] করিয়া থাকি। যদি

তাহারা বাস্তব তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় তাহা হইলে যে কাল্পনিক নিয়ম হইতে তাহারা নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নতুবা সেই নিয়মটিকে পরিহার করিয়া অপর একটি নিয়ম কল্পনা করিয়া তাহাকেও সেই পূর্বোক্ত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সুতরাং সমস্যার পদ্ধতি যে বিচার প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রকৃতপক্ষে অনুমান পদ্ধতি। অনুমানের বিপরীতমুখী প্রয়োগই সমস্যা। কোনও ভ্রমের ছেঁড় বাঁকাগুলি এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার সহিত একটি অনুমিতাভূমান বা প্রসঙ্গিতমূলক কথাই অন্তর্গত পূর্বগ ও অনুগের সাদৃশ্য আছে। পূর্বগ দেওয়া থাকিলে তাহা হইতে অনুগ কি হইবে তাহা নির্ণয় করা যায় কিন্তু অনুগ দেওয়া থাকিলে তাহা হইতে সাক্ষাৎ ভাবে পূর্বগ কি হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। প্রথমে একটি পূর্বগ কল্পনা করিয়া লইয়া তাহা হইতে সেই অনুগ নিঃসৃত হইতেছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে হয়। ঠিক ঐরূপে কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান হইবার পর আমাদের চিন্তা বিপরীত দিকে গমন করে এবং সাময়িকভাবে একটি নিয়মকে স্বীকার করিয়া লয়। এই কাল্পনিক নিয়ম হইতে সমস্যার প্রণালীতে ঐ বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলে আমরা পুনরায় সেই কাল্পনিক নিয়মে কিংবা স্বীকৃত এবং তাহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। [ কার্যাত্মকপূর্বমুৎপন্নঃ সমস্যারঃ পশ্চাত্ত্বপদ্ধতানং কার্যমুপাদানাদধরকঃ করিষ্যতি ; কার্যাহেতুবল্যং—তাৎপর্য টীকা ; পৃঃ-১৮৭ ]। ইহাই সমস্যা এবং ইহার পতি অনুমানের বিপরীতগামী।

উপরে যে মতটির কথা বলা হইল তাহা যে কতকংশে সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কেন না “ভায়লীলাবতী”-কার বহুভাষা অনুমান আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, “নচতত্ত্বোদয়মিতম্। অনবগত নিয়মত্বাৎ ( পৃঃ-৪২৩ )”। আমরা কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা দেখিয়া একটি সাধারণ নিয়ম উপস্থিত হই এবং সেইজন্য মনে করি যে, সাধারণ নিয়মের স্থান বিশেষ বস্তু বা ঘটনাসমূহের পরে কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলির স্থান পরে। কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা কোনও এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায় কিন্তু যে সাধারণ নিয়মগুলি তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে তাহারা তাহার আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বর্তমান ছিল এবং পরেও থাকিবে [ নাপানাগতম্। অনবগতত্বাৎ—ভায়লীলাবতী, পৃঃ-৪২৩ ]। এই সাধারণ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই সত্ত্ব বা ঘটনাগুলি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তুগুলির যে পৌরসাপেক্ষ সম্পর্ক আছে [ অনাগত প্রাকালিকয়েবেতর্থাঃ—উপরোক্ত লীলাবতী সূত্রের কঠাভরণ ; পৃঃ-৫ ] সমস্যায় আমরা তাহার বিপরীত দিকে গমন করি বলিয়া সমস্যাকে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা সঙ্গত।

অনুমানে আমরা বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই এবং সমবায়ের সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হই। ঠিক এই কারণেই অনুমান ও সমবায়কে পরস্পর সম্পর্কে উদ্ভাবন প্রক্রিয়া (converse processes) বলা যায় কি না বিবেচ্য। কয়েকটি নিয়মামুসারে একটি কথার উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করিয়া যে নূতন কথা পাওয়া যায় তাহাকে পূর্বগামী কথার উদ্ভাবিত কথা বলে; যথা: “কোনও কোনও দ্বিপদ জীব মনুষ্য”, এই কথাটি “সকল মনুষ্যই দ্বিপদজীব”—এই কথাটির উদ্ভাবিত কথা। অনুরূপ অর্থেই কখনও কখনও বলা হইয়া থাকে যে, সমবায় অনুমানের উদ্ভাবন; কিন্তু এই দুই পদ্ধতির মধ্যে বহু বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে একটিকে অপরেরটির উদ্ভাবন বলিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না। সেজন্যই জার্মানজীবী-কার জয়ন্তভট্ট ১৯১৭ খ্রীঃাব্দে—“অনুমান ও তু বাক্যার্থ বিষয়মা” পৃঃ-১৪০। উক্তি করিয়াও “আবার পোষণধারের শব্দার্থ” সর্বেক নিশ্চয়মানে উপস্থিত” খ্রীঃ (পৃঃ-১৪২) বিচার করিয়াছেন।

উদয়নব পদবর্তী জার্মানজীবী গঙ্গেশের সুবিখ্যাত গ্রন্থ “অনুমান চিন্তামণি”-তে ‘সমানাধিকরণ’ ও ‘ব্যাধিকরণ’ খ্রীঃকে অনুমান প্রসঙ্গে আলোচিত দেখা গেলেও পরমাচার্য্য বাচস্পতি তাঁহার “তাত্পর্য্য টীকা” গ্রন্থে উল্লিখিত উভয় বিষয়কে প্রত্যক্ষমূলীভূত ‘সমবায়’ প্রসঙ্গে গোঁঠম প্রকরণের ১১.৪ খ্রীঃক্রমে আলোচনা করিয়াছেন। কলে, সমবায় অনুমানের পূর্বগামী অথবা অনুমান সমবায়ের পূর্বগামী এ সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু ইহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহার সর্বাংশেই পরস্পরের পরিপূরক এবং অনুমান চিন্তামণির সিংহ-ব্যাঙ্গ প্রকরণ ও ব্যাধিকরণ অধ্যায়দ্বয়ের সমবায়ের উল্লেখ করিলেও বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোনটি পূর্বগামী সে প্রশ্নের কোনও সার্থকতা নাই। ইহাদিগকে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। সত্যের সন্ধানে ইহার উভয়েই অপরিহার্য্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুমান ও সমবায় উভয়েই অনুমানের প্রকারভেদ, যে মানস প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা এক বা একাধিক জ্ঞান পূর্ব বা স্বীকৃত সত্য হইতে একটি অজ্ঞাত পূর্বে উপনীত হই তাহাই অনুমিতি। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের যে বিষয়ের সাক্ষাৎ-জ্ঞান আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া যে বিষয়ের সাক্ষাৎ-জ্ঞান নাই তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা কি উপায়ে সম্ভব। জগতের বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নানা বিষয়ে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। আমরা বিশ্বাস করি যে দুই বা, ততোধিক বস্তু মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে যে সাদৃশ্য আছে সেই সাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে পদোক্ত-জ্ঞান লাভ করিতে পায়া যায়। সাদৃশ্য বস্তুগুলির মধ্যে একটিতে যদি কোনও বিশেষ গুণ বর্তমান থাকে অথবা কোনও বিশেষ অবস্থার তাহাতে কোনও বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে অজ্ঞাত বস্তুগুলিতেও সেই বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যাইবে

অথবা অনুরূপ অবস্থার অনুরূপ ক্রিয়াও দেখা যাইবে [অসতি বাধকে সামান্য নিষ্ঠম সদৃশ কার্য্যান্ত্রৈবোপলব্ধে; অজ্ঞাত কার্য্য-সাদৃশ্যসাক্ষ্যকথ্য প্রসঙ্গাৎ—জার্মানজীবী; পৃঃ-৮০২]। কোন-রূপ বিচার বা আলোচনার পূর্বেই এই যে সাধারণ বিধিকে আমরা স্বীকার করিয়া লই তাহাকে সাধারণবিধি (Principle of Similarity) বলা হইয়াছে এবং যে কোনও প্রকারের অনুমান হউক না কেন একলেই এই সাধারণবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল বস্তুই যদি সর্বপ্রকারে বিসদৃশ হইত তাহা হইলে অনুমিতি অসম্ভব হইত। এই সাধারণবিধিকে ভিত্তি করিয়া কিভাবে আমরা অনুমান করিয়া থাকি তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইলেই বুঝা যাইবে।

সকল মনুষ্যেরই মতিভ্রম হইয়া থাকে

মুগিৎ ও মনুষ্য

মুগিদেরও মতিভ্রম হইয়া থাকে (মুগিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ)

ইহা একটি অনুমান। আমরা জানি যে, দুর্বলতা বহু মনুষ্যের স্বভাবের একটি অঙ্গ। দুর্বলতা আছে বলিয়াই তাহাদের মতিভ্রম হইয়া থাকে। আবার আমরা ইহাও জানি যে, যাহারা মুগি বলিয়া পরিচিত মননবিষয়ে অজ্ঞানের সহিত পার্থক্য সম্বন্ধে তাহাদের সহিত অজ্ঞাত মনুষ্যের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে; সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম যে, দুর্বলতা বিষয়েও অজ্ঞাত মনুষ্যের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। আবার—

একটি প্রস্তরখণ্ড আকাশে ছাড়িয়া দিলে আকাশে পড়িয়া যায়।

একটি ফল আকাশে ছাড়িয়া দিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

একই আপেল আকাশে ছাড়িয়া দিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

এই সকলই জড়বস্তু এবং ভূপৃষ্ঠে ও বায়ুমাণ্ডলের মধ্যে সক্রিয়; সুতরাং যে সকল বস্তুও মধ্যে এই সাধারণ থাকিবে তাহাদের সকলকেই আকাশে ছাড়িয়া দিলে তাহারা ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। ইহা একটি সমবায় খ্রীঃ; কারণ এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটিমাত্র বস্তু দেখিয়া একটি সাধারণ সত্য নিরূপণ করিতেছি।

সুতরাং অনুমানই হউক অথবা সমবায়ই হউক বিভিন্ন বস্তু মধ্যে সাধারণের জ্ঞানই উভয়ের ভিত্তি। এই দিক দিয়া দেখিলে উপমানকেই (Analogical inference) উভয়ের মৌলিক আকার বলিতে হয়। অবশ্য দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে কোনও সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করিলে তাহা যে নিশ্চয়ই সত্য হইবে এরূপ নয়, বস্তুগুলির সাধারণ্য যদি তাহাদের সাধারণ্য (Essential attributes) সম্বন্ধে হয় এবং যে বিষয়ে বস্তুগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং যে বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করিতে যাইতেছি তাহাদের মধ্যে যদি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বা অজ্ঞাত কোনও অযাতিচাৰী (যেমন—সমানাধিকরণ) সম্বন্ধ থাকে কেবলমাত্র তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত সত্য হইবে। “সকল মনুষ্যই মরণশীল; রাম মরণশীল, রাম মনুষ্য অতএব মরণশীল” এ স্থলে সিদ্ধান্ত সত্য হইল; কারণ “মনুষ্যত্ব” এবং “মরণশীলতা” এই দুইয়ের মধ্যে অজ্ঞাতচাৰী সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং রাম ও অজ্ঞাত



মহুঘোর মধ্যে সায়ধ্বংস সঙ্কে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু “কোনও কোনও ফল মিষ্ট; তেঁতুল এক প্রকার ফল, অতএব তেঁতুলও মিষ্ট,” এ স্থলে ফলস্ব এবং মিষ্টত্ব এই দুইয়ের মধ্যে অব্যভিচারী সম্বন্ধ না থাকায় সিদ্ধান্ত সত্য হইবে না। “কয়েকজন ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত যোগী কুইনাইন সেবনে সুস্থ হইয়াছে, অতএব যে কোনও ম্যালেরিয়া যোগী কুইনাইন সেবনে সুস্থ হইবে” এই সমস্যার সূত্র সত্য হইতে হইলে কুইনাইন ও ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তি, এই দুইয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে দেখাইতে হইবে। উপমান [সাধাসাধনমিতি কবণাল্লট। কংগ লক্ষণমবেদমূণমানম্—জ্বর সূত্রবৃত্তি; বিষনাথ] কার্য-কারণ সম্বন্ধ অথবা অন্ত কোনও অব্যভিচারী সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া উহার সিদ্ধান্ত সকল সময়েই অনিশ্চিত হইয়া থাকে।

উপরে যাহাকে সাধন্য বিধি বলি হইয়াছে তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের মৌলিক একা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে উহা তাহাদের প্রকারভেদ। আমরা যে জগতে বাস করিতেছি এবং বাহার সহিত আমাদের মিত্য পরিচয় ঘটতেছে তাহা যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ পদার্থ-রাশির সমষ্টিমাত্র নয় পরন্তু ইহা একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংগত বস্তু এবং ইহার প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এই বিশ্বাস আমাদের অন্তর্নিহিত। কার্য-কারণ সম্বন্ধ এবং সর্বত্র নিয়মিতকা স্বভাব শক্তিতে বিশ্বাস এই মূল বিশ্বাসের ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত। দুইটি গুণ বা ক্রিয়ার মধ্যে যদি কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে যে কোনও পদার্থে প্রথম গুণ অথবা ক্রিয়া থাকিলে তাহার গুণ ও ক্রিয়াও অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং কতকগুলি পদার্থের মধ্যে কোনও গুণ বা ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মৌলিক সাধন্য থাকিলে সেই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত অন্ত গুণ বা ক্রিয়াও সকলের মধ্যে থাকিবে। জগতের মৌলিক একো এই বিশ্বাসই সর্বপ্রকার প্রমাণের মূল ভিত্তি।

অনুমান ও সমস্যার যদি একই (সামান্যিকরণ) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাই যে, তাহাদের পার্থক্য প্রধান ভেদে (difference in the starting point)। কোনও এক জাতীয় বস্তুসমূহের সারণ্যের সহিত একটি বিশেষ গুণ বা ক্রিয়ার অব্যভিচারী সম্বন্ধ আছে, অনুমানে এরূপ জ্ঞান হইতেই চিন্তন বা মনন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যখন আমরা জানিতে পারি যে, কোনও বস্তু সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত তখন সেই বিশেষ গুণ বা ক্রিয়া তাহাতেও থাকিবে ইহাই সিদ্ধান্ত করি। সমস্যায় আমরা যে কতকগুলি বিশেষ বস্তু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই তাহাদের সকলের মধ্যে একটি গুণ বা ক্রিয়া বর্তমান এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে, অপর যে সকল বস্তুর সহিত এই বস্তুগুলির মৌলিক সাধন্য আছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই গুণ বা ক্রিয়া

থাকিবে। অনুমানে আমরা একটি সাধারণ সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনাতে তাহাকে প্রয়োগ দ্বারা তাহার অর্থ বৃদ্ধিবার চেষ্টা করি [নব্যবর্তকত্ব স্বভাবত তথ্যচ সাধুণ্যং কার্য্যং সদৃশকারণানুমানবিলম্বাপত্তে:—জায়লীলাবতী; পৃঃ-৮০৯] এবং সমস্যায় কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে সংযোগসূত্র রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া একটি সাধারণসূত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা করি। [সম্বন্ধস্বং বিশিষ্ট প্রতীতি নিয়ামকতাম্—তর্কসংগ্রহ জায়বোধিনীটীকা, পৃঃ ৬২]। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জগতের একটা অংশ আমাদের সম্মুখে ঐক্যবদ্ধ সুসংগত পদার্থসমষ্টি রূপে দেখা দেয় [যদবচ্ছিন্নঃ তদভ্রান্ত-তদ্ব্যমুত শিষ্ণুত্বমিত্যর্থঃ—তর্কসংগ্রহ জায়বোধিনীটীকা, পৃঃ ৬২]। সেই একা বা সংগতি রূপকে বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া তোলাই অনুমানের কার্য্য। অনুমান এবং সমস্যার এই কার্য্যটি দুই প্রণালীতে নিষ্পন্ন করিতে পারে কিন্তু তাহাদের মূলগত উদ্দেশ্য একই। কোনও বস্তুর কেন্দ্রে অবস্থান এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য জানা থাকিলে আমরা সম্পূর্ণ বৃত্তটি অঙ্কিত করিতে পারি, অর্থাৎ তাহার পরিধিই প্রত্যেক বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করিতে পারি, আবার পরিধিই কয়েকটি বিন্দুর অবস্থান জানা থাকিলে আমরা তাহাদের সাহায্যেই বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ নিরূপণ করিয়া সমগ্র বৃত্তটি অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি নির্ণয় করিতে পারি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৃত্তের সংগতিবদ্ধ রূপের ধারণা আমাদের মনে আছে বলিয়াই আমাদের জ্ঞান অগ্রসর হইতে পারে। অনুমান প্রথম প্রক্রিয়ার অমূর্ত এবং সমস্যার দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার অমূর্ত। সমস্যার ও অনুমান দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নহে, আবার তাহাদের মধ্যে একটি মূল প্রক্রিয়া এবং অপরটি তাহার প্রকার ভেদ মাত্র ইহাও সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সর্বদাই এই দুই প্রকার অনুমানের ব্যবহার হইয়া থাকে [অকৃতকঃ সমস্যায় ইতি চ কার্য্য সাধার বক্তোনানুমায়তে:—জায়বোধিক, পৃঃ-৫৩] তবে এইরূপ সমস্যার ব্যবহার হইবার পর্ব সমস্যারের অংশ বিশেষ অবশিষ্ট থাকে।\*

উল্লিখিত সমূহ আলোচনা: জায়সূত্র ১১৫ এর ‘তৎপূর্বকম’ অংশ ব্যাখ্যারূপে স্বীকার্য্য [এবং তাবৎ বাবস্থিতমন্তঃ তৎ পূর্বকমহুমানমিতি—জায়বোধিক, পৃঃ-৫০] এবং সূত্রোজ্জিহিত অনুমানের জীবিত বিভাগ পূর্ববৎ, শেষবৎ প্রভৃতি সমস্যায় প্রযুক্ত অনুমান বিভাগই মাত্র।

\* Whilst the inductions of all advanced sciences make great use of deduction they can never be reduced without residue to that process—Our Knowledge of the external World, Dr. Broad, page-36.



## জটীর জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(২০)

নয় মাইল দূরে পিপুলকুঠি। ভারত-ভিত্তিক সীমান্তে অল্পতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। হিম্মতের ভোটকল, চামর, বাঘ-হরিণের চামড়া, শিলাভূত ইত্যাদি পণ্য নিয়ে ঠাসা এক একটি দোকান। বিনিময়ে তিন্মত বেতে পারে যে-সব ভারতীয় পণ্য অনেক দোকানেই তাৎপেরও প্রাচুর্য্য চোখে পড়বার মত। বাজীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং সাজসজ্জা ত আছেই : চার্মোলির চেয়েও অনেক বেশী জমজমাট শহর এই পিপুলকুঠি।

কিন্তু সেই শহরেই একি অভ্যর্থনা আমাদের! যেমন প্রকৃতির, যাত্রাবেরও তেমনি অপ্রসন্ন মুখ। অতিথির অভ্যর্থনা দূরে থাক, আশ্রয়ই পাইনে কোথাও।

কালি কমলিওয়ারাল প্রকাণ্ড ধর্মশালায় দীনহীন সাজ দেখে এবং ভিতরে স্থানাভাব আছে শুনে বাস থেকে নেমে আমার ভাতা পা নিয়েই জিতেনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিন-চারটি চটি পরাবেক্ষণ করলাম। কিন্তু সর্বত্রই শুনি স্থানাভাব। একজন প্রথমে আখাস দিয়ে কিছুকণ তার বারান্দার বসিবে রাখবার পর শেষ পর্যন্ত বিদায় করে দিল আমাদের দলটিকে। অগত্য ধর্মশালাই আশ্রয়।

সেই ত বাবারই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একি দুর্বস্থা তার! শহর ও পল্লীজীবনের বা বা অবস্থানের কেবল সেইগুলিরই বেন বিশৃঙ্খল একটি স্তম্ভ। দোতলার সিঁড়ির মুখেই শৌচাগার। সিঁড়ির দুই ধারে সুন্দরী ঢালা বারান্দা থাকলেও তা অতিক্রম করে পারবার খোপের মত যে-সব প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তাদের প্রত্যেকটিরই দ্বার বলতে কেবলই ঐ প্রবেশপথ। তাতে চৌকাঠই নেই, তা কবাত থাকবে কোথায়? মাটির মেঝে, যেন হয় বেন এই উত্তরাংশেরই বিলিক মাপ এক একখানি—এমনি অসমান পাথর ও মাটির বিস্তার। বাতায়ন দূরে থাক গবাক্ষও নেই বিপরীত দিকের দেয়ালে। অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরগুলি যেন হয় বেন এক একটি অন্ধকূপ।

অথচ এতেন ধর্মশালাতেও গিজগিজ করছে লোক। পাতি পাতি করে খুন্ডেও কোন ঘরেই আরসা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বেখানে আশ্রয় নিলাম আমরা, তাকে চিলে-ঘব বলা বেতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বার দিকের ঢালা বারান্দার বাবার পথ বই নয়। তবু আরতন একটু বেশী আছে দেখে ওখানেই দেয়ালের পাশে ডাড়াডাড়ি আমাদের বিদ্যনা ছুটি পেতে অর্ধেকটা পথ অধিকার

করলাম আমরা। তার পর ছুটে নেমে গেলাম একটু আলো এবং খোলা হাওয়ার মকানে।



পিপুলকুঠির পথ

কিন্তু হাওয়ার অভাব না থাকলেও বাটরে গোলা আকাশের নীচেও আলো কোথায়! আকাশ যে ইতিমধ্যে আরও কালো হয়ে গিয়েছে। কোঁটা কোঁটা বুটী পেয়েছিলাম পথেই, এখন দেখি যে, বেশ বুটী হচ্ছে। প্রকৃতির বড়বজ্রে যোগ দিয়েছে আমার নিজের দেহটিও। চা খাবার উদ্দেশ্যে পালেশের একটি দোকানে বেতে বেতেই বেশ বৃষ্টিতে পাবলাম যে, আমার ডান পার্শ্বের সেই খচ খচ বাখাটা একটুও কমে নি।

চার্মোলিতে পল্লোজীদের বিদায় দেবার পর থেকেই মনটা ত ব্যারাপ হয়েই ছিল। তার উপর এত সব প্রতিকূল অবস্থার চাপে আরও মূষড়ে পড়ল তা।

অমূল নয় কোন অবস্থাই। উপরের ঐ মেঘে-ঢাকা আকাশের মতই গোমড়াগুণ দেখি চারের সোকানদারদেরও। অভ্যাস-মত স্বতন্ত্র একটু পরিচ্ছন্ন গরম জল চেয়েছিলাম তার কাছে। কারণটা সে মন দিয়ে শুনেলেও পরে কিন্তু সে বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল : অত ব্যামেলা করতে পারব না বাবু। আমার তৈরি চা অল্প পাঁচমুনে বা আছে তাই খাও ত খাও, নইলে অল্প দোকান দেখ।

হোটেলের অভ্যর্থনা ও সরবরাহ গুর চেয়ে উন্নত নয়।

ধর্মশালায় নীচের তলার রান্নাঘরে ঢুকতেও প্রবৃত্তি হয় না। স্তম্ভাং জিতেন স্থানীয় একটি হোটেলেরই বাজের আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু বধাসময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েও গুনি যে, ভাত তখনও উনানের উপরে চাপানোই হয় নি। আধঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করবার পর অপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর আহাৰ্য্য-ত্রিসাবে বা প'ওয়া গেল তা ভোজ্য হলেও খাদ্য নয়। কেদারক্ষেত্রে অপরিপক্ক খিচুরিও যে সমাদর ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণে দেবভোগ্য পরম'ন্ত্র হয়ে উঠেছিল তার বিন্দুমাত্রও নেই এই মহাব্যস্ত পেশাদার ব্যবসায়ীর বাক্য বা আচরণে। নিজক পেটেই তাগিদেই কিছু গলাধঃকরণ করতে হ'ল। এমন যে বাহাদুর, তারও অকুচি না থাকলেও অতৃপ্তি প্রায় আমাদেরই মত।

হোটেলের বাইরে অবস্থা আরও প্রতিকূল। ইতিমধ্যে ধারা-বর্ষণ শুরু হয়েছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কয়েকটি দোকানে মিনিট করে আলো জ্বলছে বলেই অল্প অন্ধকার মনে হয় আরও গভীর। টেক জ্বল পথ ঠিক করলাম। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই ভাঙ প'য়ে সেই খচখচ বাধাটা লাগছেই।

ইতিমধ্যে ধর্মশালায় আমাদের দখল-করা জায়গাটুকুতে বা ঘটেছে তা আমি কেবল যে করনা করতে পারি নি তা নয়, এখন চোখে যেনেও বিশ্বাস হয় না আমার। সন্ধ্যা ঐ চিলে-ঘরের মধ্যেই দেখি যে, 'অ'রও হ'জর লোক এসে অবশিষ্ট জায়গাটুকু দখল করে সটান গুয়ে পড়েছে। পরিপাটি কবে পাতা আমাদের শয্যা দুখানিও অল্প একরকম আক্রমণে বেরখল হয় হয় অবস্থা।

দর্শনের পূর্বেই স্পর্শ। বেশ মোটা এক ফোটা জল এসে পড়ল আমার প্রায় ব্রহ্মচালুর উপরে। ভয়ের নয়, শীতের শিহরণ অনুভব করলাম আমার সর্ব অঙ্গে; আর সেই জন্তই চোখের দৃষ্টিও আমার অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

ততক্ষণে বাহাদুর একটি মোমবাতি জ্বালিয়েছে। সেই অল্প আলোতে ঘেঁষে যে, টালির ছানের চার-পাঁচটি ফুটোয় ভিতর দিয়ে বড় বড় ফোটার বৃষ্টির জল পড়ছে আমাদের শয্যার উপরেও। ইতিমধ্যেই বেশ ভিজ্ঞেও গিয়েছে লেপতাবকের কোন কোন জায়গা।

ঘটনা শোকাবহ হলেও শোক করবার সময় নেই তখন। শাস্ত্রবাক্য—সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অন্ততঃ অর্ধেক রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। আমরাও তাই করলাম। জিতেন কিশোরকে ছুটি শয্যাই গুটিয়ে কেলে। ঠিক কোন কোন জায়গায় যে উপর থেকে বৃষ্টি-জলের ফোটা পড়ছে তা মিনিট দশেকের মধ্যেই বুঝে নিল সে। তার পর খালা-ঘটিবাটি বা আমাদের সঙ্গে ছিল তা থেকে এক একটি পাত্র নির্দিষ্ট এক এক স্থানে রেখে জলের নিয়ন্ত্রণ সাবলোব সঙ্গেই প্রতিবোধ করল সে। অবশিষ্ট যে নিরাপদ স্থানটুকু পাওয়া গেল সেইখানেই অতঃপর সংকিপ্ত শয্যা বসনা হ'ল আমাদের।

কিন্তু স্থপ্তি কোথায়? বৃষ্টির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে সার্থকভাবেই তা প্রয়োগ ক'য়েছি আমরা। কিন্তু ধর্মীয় আক্রমণ প্রতিবোধ করবার উপায় ত জানা নেই। খাটি ধর্মশালা এটি। খোল-কবতাল সহযোগে সাড়শর ও সযবেত কঠোর তুলসী কীর্তনধ্বনি ঠিক আমাদের পানের ঘর থেকেই বেন আকার পরিগ্রহ করে তারের মত ছুটে এসে পড়ছে আমাদের উপর। লেপ দিয়ে আগেই গা ঢেকেছিলাম, এখন কানও ঢাকলাম। তথাপি অস্বস্তি আক্রমণ থেকে নিস্তার নেই। আর ঘুম আসছে না বলেই দেহের বিভিন্ন স্থানে এত ক'য়ন নাকি?

মবার উপর খাড়ার ঘা হানল জিতেন। আমি ক্রমাগতই উলখুস করছি বুঝে এক সময়ে সে আমার গ'য়ে একটি স্টো দিয়ে বললে: বর্ষবতী থেকে সভ্যতার ফিরে এসেছেন বলে চার্মোলিতে আপনি উৎসব করতে চেয়েছিলেন। এখানে পানের ঘরে উৎসবই ত হচ্ছে। তাতে এত বিরক্তবোধ করছেন কেন?

কেবল কি বিরক্তি! দৈহিক বস্ত্রণও ততক্ষণে অসহ হয়ে উঠেছে। আমি উঠে বসে বললাম, একটা আলো জাল ত জিতেন। দেখি, কিসে এত কামড়ানো।

টেকের অল্প আলোতেই বা চোখে পড়ল তা অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টি।

প্রথমে ইঁদর-ছানা বলেই ভ্রম হয়েছিল—এতবড় আকৃতি এক একটির। চশমা পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখি যে, ওরা আসলে ছারপোকাই—হিমালয়ের প্রাণী বলেই বুঝি অনুপাতবক্ষ্য জন্ত প্রকৃতি অতবড় আকার দিয়েছেন ওদের। দুট শয্যারই সর্বত্র পিপীলিকার মত ছড়িয়ে পড়েছে তারা। ইতিমধ্যেই আমাদের রক্ত কিছু কিছু যে তাদের প্রত্যেকেরই পেটে গিয়েছে তারও প্রমাণ পেলাম বিছানার-চাদরের অঙ্গেই। আমার অস্ত্রানতে আমারই ক'য়নকীল অঙ্গুলিও নিম্নেণে যে ক'টি প্রাণী মারা পড়েছে তাদের পেটের ভিতর থেকে বের হয়ে আমার দেহের তত্তা রক্ত অ'মারই শয্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়িত চোখ আমাদের হ'জরনরই।

মোমবাতি জ্বালিয়ে তার উজ্জলতর আলোতে দেখা গেল যে, দেয়ালের গা বেয়ে অগণিত পিপীলিকা-বাহিনীর মত অসংখ্য ধারার অমনি অতিকার ছারপোকাসা সব নৈমে আসছে হয় উপরের ছাদ, নয় ত ঐ দেয়ালেরই কোন কোন ফুটা বা কটল থেকে। সব ক'টি বাহিনীরই লক্ষ্য বেন আমাদেরই হৃৎকেননিভ শয্যা দুটি, যদিও আরও তিনটি লোক এই ঘরের মেঝেতেই কালো কবলেয় উপর গুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

আত্মরক্ষার জন্ত বুদ্ধ ক'য়েছিলাম আমরা। কিন্তু বুধা চেষ্টা। রক্তবীজের মত ওদের প্রতি বিন্দু রক্ত থেকেই নূতন প্রাণীয় জন্ম হয় না বটে তবে আক্ষয়িক অর্থেই ওরা যে অসংখ্য। যেয়ে শেষ করা বাচ্ছে না ঐ ছারপোকা-বাহিনীকে। আর পারবে জোরে ওরা আমাদের সঙ্গে না পারলেও কোঁশলের প্রতিবোধিতায় ওদের

জুড়ি আমরা নই। আলো দেখলেই পালাতে জানে ওরা, আর টালির ছানওয়ালা এই ভাঙা বাড়ীতে ওদের লুকোবার ভাবগারও অভাব নেই। আমরা আলো নিভিয়ে শুলেই গোপন-গুহা থেকে বের হয়ে এসে আবার আক্রমণ শুরু করে ওরা।

পুনঃ পুনঃ শব্দবাহার বজ্রণা আর শুরু করতে না পেয়ে শেষে আমরাই বণে ভঙ্গ দিয়ে বাইরে বাহাদ্যার গিয়ে বসলাম।

পাশের ঘরে কীর্জন তখন খেমে গিয়েছে, তথাপি ঘুমোবার অমূল্য নয় পরিবেশ। অসহায়ের মত আমি বললাম, তিন সপ্তাহেরও বেশী হিমালয়ে ভ্রমণ করছি আমরা—এত দুর্ভোগে অল্প কোথাও ভ্রুগতে হয় নি। আজ এমন কেন হ'ল তা বলতে পার জিতেন?

উত্তর না দিয়ে আর একটি প্রশ্ন করল সে : আপনাব কথাই সত্য হ'ল নাকি, মণিমা? পথে সাপটাকে মেরেছি বলেই এখানে এই দুর্ভোগে নাকি আমাদের?

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না তার, কিন্তু স্পষ্টই আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। শুনে এত কঠোর মধ্যেও হাসি পেল আমার। বললাম, একটি সাপ মারবার প্রতিকূল যদি এই হয় তাহলে আজ রাতে শত শত ছারপোকা ম'রবার শাস্তি কি হতে পারে তা বজ্রনা করতে পার তুমি?

সে চোঁটা কবল না জিতেন। কিন্তু অপ্রসন্ন কণ্ঠেই সে বললে, নানা-চটি থেকে ফিরে গেলেই ভাল ছিল।

আমি এবার তার পিঠের উপর আলগোছে একটি হাত রেখে বললাম, তা বখন করা হয় নি, তখন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে এখন? বোগীর মত এস, বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেবার চোঁটা কথা থাক।

শেষ পর্যন্ত ঐ সফীর্ণ বাহাদ্যাকেই ভূমিশয্যার একটু ঘুমিয়ে নিরেছিলাম। কিন্তু তাতে কি আর বিশ্বাস হয়! সকালে দেহে বাজ্যের ক্লান্তি আর মনে অবসাদ।

তথাপি সকালে উঠেই বাহাদ্যকে বাজ্যের অজ্ঞ তৈরী হবার ছকুম দিল জিতেন।

তিন্ত্র কণ্ঠস্বর তার। বুঝলাম যে আজ সামনের টানের চেয়ে পিছনের ঠেলাই তার দেহ ও মনের উপর বেশী কাজ করছে। গত রাত্রির দুর্ভোগের স্মৃতিই কেবল নয়, বর্তমানের অস্বস্তিও প্রবল। দিনের আলোতে আবার স্পষ্ট হয়ে কুটে উঠেছে ঐ ধ্বংশালা ও তার পরিবেশের সমস্ত কদম্ব্যতা। সূর্য হরয়েছে ছাব-পোকায় বদলে মাঝঘের উৎপাত। কলরবে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে সমস্ত বাড়ীগানি। আমাদের অধিকৃত চিলে-ঘরখানির ভিতর দিয়ে পায়ে কাদা বা কাঁধে মোট নিয়ে অবিরাম শ্রোতে নদ-নারী বাবা বাতায়্যাত করছে তাদের চোখের দৃষ্টিতে একটুও নিমন্ত্রণ নেই আমাদের ওজ্ঞ। নিমন্ত্রণ নেই চায়ের কোন দোকানেও; কল-

তলাতেও ঠেসাঠেলি। সমগ্রভাবে এই পিপুলকুটি বেন প্রতি মুহূর্তেই ঠেলে বহিষ্কার করতে চায় আমাদের মত হ'জন অবাঞ্ছিত অতিথিকে।

কিন্তু সামনে বদনীনাথেরই বা আমন্ত্রণ কোথায়? সামনের পথ অবশ্য এখান থেকে চোখে পড়ে না। তবে প্রকৃতি যে বাধা দিচ্ছেন তাতে 'ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়' নেই। তেমন খাবাবর্ণ এখান না থাকলেও বৃষ্টি পড়ছেই। তার সঙ্গে আজ আবার একটু হাওয়াও আছে। কালো আকাশে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে মাঝে মাঝে বং দেখা যায় জুকুটির ছ শিয়ারী।

কঠিনতর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আমার নিজেই ডান পায়ের গুলফ-সন্ধিতে।

গত রাতে অনেকক্ষণ ধরে সেট বাধার জায়গাটাকে আয়ো-ডেক্স মালিশ করেছিলাম, কিন্তু কোন উপকারই হয় নি। চলতে গেলেই খচ খচ করছে সেই জায়গাটা।

তিন্ত্র কবিবাহী পাচনের মত চা খেতে খেতে মনটা আমার বখন আরও তিন্ত্র হয়ে গিয়েছে তখনই পথের ওপারে ধ্বংশালায় বাহাদ্য থেকে জিতেনের তসতিফু কঠোর ডাক কানে এসে আমার : শিগগির আসুন, মণিমা, বড় দেবি হয়ে যাচ্ছে যে!

তাকিয়ে দেখি যে, ইতিমধ্যে নিজেও সে বংশাজে মেজে বাজ্যের জগ প্রস্তুত হয়েছে।

সি ডি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়েই ডানদিকের বাহাদ্য চোখে পড়ল কয়েকটি পরিচিত মুখ। কেদারক্ষেত্রই দেখেছিলাম এই দলটিকে। অনেক কুসি সঙ্গে নিয়ে ডাণ্ডি ও কাণ্ডিতে চড়ে এসেছিলেন পাটনার জী-পুন্স চ'ব পাঁচ জন। প্রোচ বহুস সকলেই। তাদেরই একজন পুন্স হানি-মুখে সন্ত'বণ করলেন আমাকে।

আমরা তখনই বওনা হব শুনে তই চোপ বড় করে তিনি বললেন : অমন কদ্ব ও করবেন না বাতালীবাবু। কাল বিকেল থেকেই বাজ্য আমরা স্থগিত রেখেছি এই দুর্ভোগের জ্ঞত। বৃষ্টি থাকলে পাভাড়ের পথে চলতে নেই।

পিপুলকুটিতে প্রবেশ করার পর এই প্রথম বন্ধুভাবের সন্তাবণ শুনলাম; সুর ও আন্তরিক মঙ্গলকামনার। নিজেদের ঘরে এসে আমি জিতেনকে বললাম কথাটা।

কিন্তু সতর্কবাণী কানেও তুলল না সে : বললে, এখানে থাকার চেয়ে জাহাঙ্গমে যাওয়াও ভাল।

একটু যা তার উদ্বেগ তা কেবল আমার ভাঙা পা'খানির জ্ঞত। আমি যে খু ডিয়ে খু ডিয়ে চলছি তাই লক্ষ্য করে সে বললে, একটা কাণ্ডি নিলে হয় না?

মানমুতন একটু হেসে আমি উত্তর দিলাম : অতিবিক্ত টাকা কি সঙ্গে আছে? নিজেই পায়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া এখন অজ্ঞ উপায় নেই।

একটু খেমে আমি সসজ্ঞাচে আবার বললাম : তুমি, জিতেন,

আজ আমার একটু কাছে কাছেই থেকে। তাহলেই পায়ে জোয় পাব আমি।

হয়ত চেষ্টাও করেছিল জিতেন। কিন্তু ঐ যে একবার বলেছি, পায়ে বুঝি পাখা আছে তার। ক্রমশঃ আমাকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে যেতে আধ-বন্টানেক পর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বাহার অবস্থা আমার পিছনে আছে। তবু মনে আমার স্বস্তি নেই। রুটি ম'খায় করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছি। মনটা আমার উপরের আকাশের মতই ভার ভার আজ। প্রতি পদক্ষেপেই আমি যে বদরীনারায়ণের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাছি তাই ভক্ত একটুও উৎসাহ বোধ হচ্ছে না। বং মনে আমার বিবস্ত্রিত সঙ্গ কেমন যেন একটা উৎপে।

অল্পকাল অবস্থা কেবল একটি। পথ ভাল—খুবই ভাল।

পাহাড়মার্গ নয়, বাস-সড়ক। পিছনে পিপুলকুঠি পর্যন্ত যেমন এদিকেও তেমনি, যদিও যাত্রী নিয়ে মোটর-বাসগুলির নিয়মিত যাতায়াত এখনও শুরু হয় নি। অন্ততঃ বোম্বাই পর্যন্ত মোটর চালাবার পরিবর্তন আছে উত্তর-প্রদেশের সরকারের। তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন, ১৯৬০ সনে, বেশ বুঝতে পারছি যে ভারত-ভিত্তিক সীমান্তের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার জরুরি ঐ আয়োজন হয়েছে। কেবল যাত্রীবাহী বাস নয়, সামরিক বিভাগের ভারি ভারি ট্রাক চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এই নতুন মোটর-সড়ক। স্তম্ভাং যেমন দুটো তেমনি প্রস্তুত এই পথ। আর বিশ্বাসের বিস্তার। এমন ভাবে টেনে টেনে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পথ যে, চড়াই-উতরাই প্রায় বুঝাই যায় না।

পথ স্বগম বলেই ভাঙা পা ও ভাঙা মন নিয়েও চলতে পার-হিলাম আমি। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই ভেঁচি কাটল সেই আমার একমাত্র বন্ধুও। আর তাও অনেকক্ষণ পর একজন মানুষ দেখে মনটা যেই আমার একটু তাজা হয়েছে ঠিক তখনই।

বিপরীত দিক থেকে একা একা আসছিলেন একজন। গৃহস্থের বেশ, কিন্তু সাধু-সাধু রূপ। সৌম্যমূর্তি শ্রোত্র যাত্রী। কাঁচা-পাকা লম্বা চুল মাথায়, তেমনি লম্বা দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। আমার সামনে ধমকে ঠাড়িয়ে রিতমুখে সন্তোষ কলেন তিনি : জয় বদরীনাথালকী !

খুশী হয়ে আমিও প্রতি-সন্তোষ করলাম। কিন্তু তার পরেই একটি যেন বজ্র হানলেন তিনি—হুসংবাদেব বজ্র।

বললেন : একটু সাবধান হয়ে পথ চল বাবু—সামনে ধস নামছে।

ধস ! ভক্তলোকের মুখ থেকে শুনলাম কথাটা, না আমারই বুকও মধ্যে ধপ করে একটা শব্দ হ'ল ! বিহ্বলেয় মৃত্ত জিজ্ঞাসা করলাম আমি : কি নামছে ? কি বললেন আপনি ?

সামনে পাহাড় ভাঙছে, উত্তরে বললেন ভক্তলোক : পথ কঠিন, তাই সাবধানে চলতে বললাম।

তথাপি মৃৎগ মত আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু হেসে অশ্বাসের শ্বরেই তিনি আবার বললেন, অত ভাবনা কেন ? তেমন কিছু নয়—আমিও ত সেই পথেই এলাম। বদরীনাথালের নাম করতে করতে চলে যাও। তবে সাবধানে পা ফেল !

মুখ ফিঁড়ে দেপি যে ভাবনাচী বাহাদুর ঠিক আমার পিছনে ঠাড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। অসহিষ্ণু মুখের ভাব তার। শুভানুধ্যায়ী যাত্রীটিকে পথ ছেড়ে দেবার পর আমাকে উদ্দেশ্য করে সে বললে, চলিয়ে বাবুজী হুম নে পছলেচী সুনামা।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, হবে আগে বলিস নি কেন ? বাহাদুরও বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল : কাঁচা হোতা বললেন সে ? হেরেনকা মন নচী ধা ছোটাবাবুকা।

তরুর মত সহিষ্ণু যে বাহাদুর, তার আজ এত অসহিষ্ণুতা কেন ? বিস্মিত হলাম আমি। কিন্তু পিঠের উপর বোঝা রয়েছে তার—প্রায় গরু-মোষের মতই এখন তার আকার। মুখ দেখা যায় না। কি যে সে ভাবছে তা সঠিক বুঝা গেল না।

এদিকে রুজির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বললে যাচ্ছে পথের চেহারা এবং পরিবেশের রূপও। সড়ক এদিকে আর তত প্রশস্ত নয়, দেখতেও কাঁচা সড়কের মত। সেই মোটর সড়ক হলেও অনুমান করলাম যে, এদিকে নিশ্চয়গায়া তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। আজ উতরাই পথেই বরাবর চলে এসেছি। এখন যেখানে আছি সেটা মনে হ'ল যে পাহাড়ের কোল নয়, চরণের কাছাকাছি। আমরা আরও একটু গুপ্তসর হবার পর স্পষ্টই বুঝা গেল তা। সামনেই দেখা গেল ছোট একটি পুল যার মানে এই যে, অবিলম্বেই একটি পাহাড় অতিক্রম করে আর একটি পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছিব আমরা। আমাদের বাম দিকে অলকন্দার বদ। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এখন মাঝে মাঝে দেখা যায় তাকে।

এদিকে কেন্দ্রবের পথের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য আছে এ পথের। তবে বৈসাদৃশ্যও বেশ প্রকট। এদিকে দু'এক ফা'লং পরে পড়েই বীতিমত চটি না হটক, দু'একটি চায়েব দে'কান অবশ্যই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পিপুলকুঠি ছাড়বার পর এ পথে তেমন একটিও চোখে পড়ল না।

একমাত্র ভরসা নিয়েব মনেবই একটা কল্পনাব মথো। পাওয়ার দেওয়া গাইড বইতে দেখেছি যে পিপুলকুঠির পথেই গড়ুর গঙ্গা চটি। সেটি আবার বদরীপথের স্বানামধস্ত তীর্থ। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে যাত্রী-সড়ক কেটে ছ' ভাগ করে যে পাগলা ঝোঁরা খানিকটা নীচে অলকন্দার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে তাহাই নাম গড়ুর গঙ্গা। বিষ্ণু বাহন পক্ষীরাজ গড়ুর নাকি সেই নদীর তীরে দীর্ঘকাল তপস্বী করে সিঁহিলাভ করেছিলেন বলে গড়ুর গঙ্গা নাম হয়েছে তার। সে গঙ্গার জ্ঞান করলে অসীম পুণ্য লাভ হয় ; অতিবিস্তৃত মহামুলা একটি পার্থিব লাভও নাকি হয় গড়ুর গঙ্গার গর্ভ থেকে কোন একটি হুড়ি কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারলে।

গড়ুরে ববই নাকি সর্পবিষের অস্বাভাবিক প্রতিবেদক হয়ে আছে গড়ুর-গঙ্গা নদীর গর্ভস্থ প্রত্যেকটি হুড়িই।

কিন্তু সে হুড়ি সংগ্রহ করবার জন্য কোন আগ্রহ ছিল না আমার মনে, এমন হুঁধ্যোগের দিনে গড়ুর-গঙ্গার স্নান করবার ইচ্ছাও নয়। তীর্থ নয়, চটির ভক্ত আগ্রহ আমার। আশা ছিল যে, এমন একটি নামকরা তীর্থের এলাকার প্রবেশ করলেই দেখতে পাব যে, কোন একটি দোকানে গরম চা প্রস্তুত করে জ্বিতেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভয়সাও ছিল যে তখন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে পারব আজকের দিনটা সেখানেই থেকে যাবার জন্য।

কিন্তু সে আশাও নিশ্চল হল আমার।

সামনের পুলটি পার হয়ে লোকালয়ের আভাস যেখানে পেলাম সে জায়গাটার নাম গড়ুর চটি হলেও প্রসিদ্ধ গড়ুর-গঙ্গা তীর্থ তা নয়। এখানে না আছে মন্দির, না ধর্মশালা। চটিও নেই। একটিমাত্র দীনহীন কুটিরে সামান্য কয়েকটি বিবর্ণ আসবাব ও একটি জলস্ত্র উমান নিয়ে বৃড়োমতন যে গাড়োয়ালী দোকানদার ছবির গড়ুর ভক্তিতেই উপবেশন করে একা একা তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল, তার কাছে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, আমারই মত দীর্ঘদেহ একজন বাঙালী রাজী আবদুল্লাহকে পূর্বে এই পথ দিয়েই বোম্বাইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

সুতরাং থাকা চলে না এখানে। আর থাকবার উপযুক্তও নয় জায়গাটা। গড়ুর-গঙ্গা চটি এটি নয়। নতুন মোটর সড়কের ধারে একেবারে নতুন একটি চটির পত্তন হয়েছে মাত্র। এখানে জলের কল নেই, পৌচাগার নেই, দ্বিতীয় আর কোন দোকান নেই, একটিমাত্র দোকানঘরের চারিদিকেই স্তব্ধ বেড়াও নেই। কাজেই এগিয়ে বাতরা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই আমাদের।

এগিয়েই চললাম।

একটি নয়, এক টানে দুটি বাঁক—কতকটা ইংরেজী "S" অক্ষরের মত। সবটা দূরত্ব এক কালং হবে হয়ত। একটি যেন কিস্তিকিমাকার অতিক্রম জীবের অনাহারক্লিষ্ট উদর ও অতি-ক্ষীতি বুক। দোকান থেকেই সোজা গিয়ে নামতে হয়েছিল তার জঠর গহবরে! সেখানে আর একটি ছোট পুল। সেটি পার হয়ে উঠলাম গিয়ে সেই অতি-ক্ষীত বক্ষের উপরে। ইংরেজী "S" অক্ষরের দ্বিতীয় অর্ধবৃত্ত সেটি। অমনি বঁক সামনে আরও আছে কি না, তাই ভাবতে ভাবতে পারের সেই খচ খচ বাধাটা নিয়ে আজকের পথে এই প্রথম কষ্টসাধ্য একটি চড়াই ভাঙছিলাম। কিন্তু বাকের বক্রিমত্বটুকু অতিক্রম করতেই সামনে দেখলাম যেন তেপান্তরের মাঠ। পাহাড় ও পথের যে দৃশ্য এইমাত্র পিছনে কেলে এলাম, সামনে একেবারে তার বিপরীত।

মোটাই তেমন উচু নয় আমার ডান দিকের ভাড়া পাহাড়টি। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত একটানা দৈর্ঘ্য ও চ্যাপটা গঠন। দেখলে

মনে হয় যে, ওটি পাহাড় না হয়ে আধুনিক বস্তানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় একটি 'ডাম'ও হতে পারে। বামদিকে অলকনন্দার খদ কিঞ্চিৎ তুলনায় অনেক খেনী গভীর এবং ষাড়া। তার অপর তীরে ধূসর মেঘাব মত যে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে তা মনে হয় যেন খুবই নীচু। সামনে আমার প্রসারিত দৃষ্টিকে বাধা দেবার ভক্ত না আছে কোন পাহাড়, না গাছপালা। পারের নীচের সড়ক কাঁচা হলেও বেশ প্রশস্ত; আর এ জায়গাতে মোটেই তরকারিত গঠন নয় তার। হঠাৎ যেন সমতল ভূমিতে নেমে এসেছি বলে ভ্রম হয়। আর সেইজন্যই মনে হ'ল যেন মাঠ।

কিন্তু উল্লাসে নেচে উঠল না আমার মন। বরং সে যেন ভয়ে বিহ্বল। মনে হচ্ছে যেমন জনহীন প্রান্তরে পথহারা এক পশ্বিক অমি—সামনে ধু ধু করছে তেপান্তরের মাঠ। বৃষ্টির বেগ আগেই ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এখন এই খোলা জায়গায় আমার দুর্বল দেহের উপর চারিদিক থেকে মুসলধারার আক্রমণ অসহ্য হয়ে উঠল। পারের ক্যানভাসের জুতা ও পশমী মোজা আগেই ভিজে গিয়েছিল, এখন গায়ের বর্ষাতিও দেখি যে জল আর প্রতিরোধ করতে পারছে না। বেশ শীত লাগছে এখন। পারের সেই খচ খচ বাধাটার জন্ত ক্রতবেগে চলতে পারছি নে বলে আরও বেশী।

এমনি যখন দেহ ও মনের অবস্থা আমার তখন হঠাৎ একটা আশ্চর্য কানে এল—গুম গুম গুম—

ভয় পেয়ে ধমকে দাঁড়ালাম, পিছনে তাকিয়ে দেখি যে বাতাসেরও ধমকে দাঁড়িয়েছে। বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম তাকে : ও কি রে ?

সে বললে, ধস।

আর একবার চমকে উঠলাম। মাথার ছাতাটাকে চোখের সামনে থেকে পিছন দিকে একটু সরিয়ে দুই চোখ বড় করে তাকালাম একবার সামনে ও একবার আমার দক্ষিণের পাহাড়টির ভেঁতা চূড়ায় দিকে। দৃষ্টি অতদূর পর্যন্ত তুলতেও হ'ল না। ইতি-মধ্যেই প্রত্যক্ষ-দর্শন। হাছা কুয়াশার পাতলা চামরখানা ছাড়া মাঝে আর কোন আবরণ নেই। একেবারে সুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা—আমি আর ধস।

২১

তা হলে এই সেই ভয়ঙ্কর।

সামনে হাত দশেক দূরেই পথ দেখি যে আর পথ নেই। রাশি রাশি মাটি, কাদা, সমূল ও সপল্লব ছোট ছোট গাছ এবং ছোট, মাঝারি, বড়—নানা আকারের শিলা ভূপাক্ষে এসে পড়ছে পথের উপর। নিশ্চল স্থপন নয় তা, যেন প্রাণ আছে তার। আছে অঙ্গসকলন, আছে গতি। অথবা কোন এক অদৃশ্য চূড়ায় আঙনে প্রকাণ্ড একটি কটাচের মধ্যে টগবগ করে হুটছে কাদামাটি পাথরের ঘনীভূত কাথ—থেকে থেকে উপছে পড়ছে এবং সেই

গতির বেগেই বাম দিকে প্রস্তুত এই যোটের সড়কের সীমা অতিক্রম করে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছে গিরে অলকনন্দার পাতালমণ্ডলী গহবরে।

আবও ভয়ঙ্কর আমার ডানদিকের পাহাড়ের রূপ। হিমালয় হাণু নন এখানে, গতির বেগে ঢেঁল হয়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তবে বৈশাখের নিকরদেশ মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যাবার আবেগ তার নয়, ওদিকে মন্ডাকিনী এবং এদিকে অলক-নন্দার সঙ্গে মিলনের জন্ত যে আবেগ ইতিপূর্বে থেকে থেকেই লক্ষ্য করেছে অবতরণশীল প্রত্যেকটি নিখরিসীর অবিহাম গতিহীন, তেমনি উচ্ছল না হলেও ঠিক সেই আবেগই দেখছি আমার ডাইনে এই পাহাড়টির বিপুল বক্ষের অবিহাম কম্পনের ভয়ঙ্কর গজ-ছন্দে। বুঝি অলকনন্দার কোলের জন্তই তারও এই ক্রন্দন, তার গতিও নীচের দিকেই। বীরে বীরে স্তরে স্তরে ভেঙে লুটিয়ে পড়তে পাহাড় পথের উপর এবং সেখান থেকে গড়িয়ে বাম দিকে খাদের পথে অলকনন্দার কোলের দিকে।

খুব খুব করে ভাঙছে, ফট ফট করে শব্দ হচ্ছে পতনোন্মুখ শিলায় সঙ্গে অজ্ঞাত শিলায় সংঘর্ষের। গোড়া থেকে শিখর পর্যন্ত বতরুঁকু চোখে পড়ে তার সর্বত্রই ঐ একই জীলা। যেন একই স্তরে বাঁধা হয়েছে বিপুলায়তন একটি বস্ত্র, একই ছন্দে গতি এই পাহাড়টির অগণিত কম্পমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের। সম্মিলিত একতান গুম গুম গুম।

নটরাজের প্রলয় নাচন মনে করতে পারি নে। জটাজাল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় নি, ফুঁ পড়েনি প্রলয় বিবাহে, তাই যে তাই পদক্ষেপের অভ্যাসও নেই দৃশ্য বা শব্দের মধ্যে। চিরে তাল ও বিলম্বিত লয়ের মুহুর্তমান গুণ বুঝি তার বৃদ্ধাঙ্গুরটির, তথাপি তারই ছন্দে ছন্দে নিয়তির মত দুর্য্যাক, সপের মত ক্রুর ও মূঢ়ার মত নিশ্চিত ধ্বংস বীরে বীরে প্রাস করছে মিশ্রিত শিলা ও মাটির বিপুলায়তন এই অচল পাহাড়টিকে।

অদৃশ্য ক্ষয় ও অনিয়ন্ত্রিত ছন্দ, কিন্তু পতন অবিহাম, তাকালেই বেশ বুঝা যায় যে, চোখে দেখা যাচ্ছে যে কালো কালো পাথরগুলি তাদের প্রত্যেকটিই যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন এক অদৃশ্য সেনাপতির নির্দেশ পেলেই লাফিয়ে পড়বার জন্ত। পড়ছেও থেকে থেকেই। কিন্তু একটিও একা নয়। গড়িয়ে পড়তে পড়তে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে বাক বাক সে ছুঁয়ে যেতে পারছে তাদেরও সবাইকেই সঙ্গে নিয়ে পড়বে সে, সেই সঙ্গে পথের উপর টেনে নামাবে সে ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি মাটি-কাদা এবং অশুষ্টি পাথরকুচিও।

নামাচ্ছেও তাই। ধস ধস শব্দে পড়ছে বলেই ধস নাম হয়েছে পাহাড়ের এই ধ্বংসলীলার। কিন্তু যাকে যাকে অধিকতর তীক্ষ্ণ ধ্বনিও কানে আসে। গতির বেগে এবং অজ্ঞাত শিলাখণ্ডের সঙ্গে সজ্বাতের ফলে প্রকাশ্য এক একখানি পাথরও যাকপথেই বোম্বার মত সশব্দে কেটে চৌচির হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাহাড়ের ভাঙন শুরু হবার পর কখন যে কি আকারের ধস নামবে কে বলতে পারে তা? অন্ততঃ আমার মত অনভিজ্ঞেরা তা নিশ্চয়ই নয়।

বিস্ফারিত চোখদুটির সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবার পর আমি পিছনে বাহাদুরের দিকে চেয়ে অসহায়ের মত বললাম, এই জারগাটা কেমন করে পার হব বাহাদুর?

নীরসকণ্ঠে উত্তর দিল সে: পার না হয়ে আর উপায় কি? বনের নিকটা যে যে বীরে বীরে এগিয়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে কিবে গেলে হয় না?

সো ক্যায়সে হো সক্তা বাবুজী? ছোটো বাবুজী ত আগে বাড় গয়ে।

ঠিকই ত। এতক্ষণে স্মরণ হ'ল আমার যে জিতেন আমাদের সঙ্গে নেই এবং সে একা একাই এগিয়ে গিয়েছে। অসাধারণ মোটেই নয় তার এ হেন ব্যবহার। তবু—

এক নিমেষেই সবগুলি দৃষ্টান্তই মনে পড়ে গেল। প্রথমে প্ররোচনা এবং পরে অনেক অশ্রাস দিয়ে যে বাস্তব ঘর থেকে আমাকে হিমালয়ের এই দুর্গম পথে টেনে এনেছে তার কর্তব্যচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবে ওদের কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আজ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে সে। চরম অবিরোচনা ও দারিদ্র-জানহীনতার অকট্য প্রমাণ তার আজকের আচরণ। আমাদের মঙ্গলামঙ্গল সব্বক্ষে তার নিখরম উপেক্ষারও। এমন একটি ভয়ঙ্কর জারগাতেও সে যে তার পিছিয়ে-পড়া সাথীটির জন্ত অপেক্ষা করবে না তা ইতিপূর্বেই অত সব তিস্ত অভিজ্ঞতা সংগে আমি কল্পনা করতে পারি নি। আশা ও আস্থা ছিল বলেই মূঢ়ার ঐ ভয়ঙ্কর ফাঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে বাহাদুরের তিস্ত কণ্ঠের নিখরম সত্যকথন শুনবার পর বাগের চেয়ে কোভ ও দুঃখই বেশী আমার মনে। অকস্মাৎ আমার চোখ কেটে ভাল এল যেন। অসহায়ের মত আমি বাহাদুরকে বললাম, কি করা যাবে তা হলে?

বাহাদুর আড়চোখে আর একবার তাকিয়ে দেখল তার সামনে, ডান দিকে সেই অবিহাম ধস নামার দৃশ্য, তার পর আমাকে উৎসাহ দেবার জন্তই সে বললে, কি আর করা যাবে—এগিয়ে চলুন। ছোট বাবুও ত এই পথেই গিয়েছেন।

তাও ঠিক।

জিতেনের অবাঞ্ছিত আচরণের অপর দিক ওটা। অভিমানে অন্ধ হয়ে এতক্ষণ দেখতে পাই নি, এখন সে দিকটাও চোখে পড়ল আমার। দেখে সাহস এবং উৎসাহও একটু পেলাম। যে জারগাটা কিছুক্ষণ পূর্বেই জিতেন পার হয়ে গিয়েছে সেটা আমার পার হতে পারব না কেন? আমার চোখের সামনে যে পাহাড়টা ভাঙছে তার দৈর্ঘ্যও ত খুব বেশী নয়।

আবও একটু উৎসাহ পেলাম অঙ্গ একটা দৃশ্য থেকে। এতক্ষণ পর সেটিও এই প্রথম চোখে পড়ল আমার। গজ দশেক দুবেই অটুট রয়েছে যে পাহাড়গুলি তাদের গোড়ার কাছে এই সড়কের

উপরেই তিন জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। তাদের একজন দেখতে একটু বাবু মতন, অপর দুজনের হাতে কোদাল না শাবল কি সব বস্ত্র—যা থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা খেটে-খাওয়া মানুষ। তিন জনেই দেখি যে আমাদের দিকে চেয়ে আছে—যেন হ'ল যেন মুচকি মুচকি হাসছেও।

তাতেই নিজে আমি ভয় পেয়েছি বলে একটু লজ্জাও হ'ল আমার। আবার বাহাহুয়ের দিকে চেয়ে আমি বললাম, তাই হোক তা হলে। আমি এগই—তুমি এস আমার পিছনে পিছনে।

জয় বদরীবিশালকী—

বলে সামনের দিকে পাও বাড়িয়েছিলাম আমি। কিন্তু তখনই বাহাহুয় ধপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল; মুখে সে ব্যাকুল স্বরে বললে, ঠগেরা বাবুজী। ঐ সে মত চলনা।

তার পর একটা কাণ্ড করল সে।

খানিকটা পিছিয়ে গেল বাহাহুয়। কিছুক্ষণ বুঝি সে খুজল জুতসই একখানা উচ্চ পাখর; কিন্তু তা না পেয়ে অবশেষে কুণ্ঠী-বেলোয়ারের মত পথের উপরেই চিৎ হয়ে শুয়ে কপালের ফাস আলগা করে পিঠের বোঝা মাটিতে কেসে আবার উঠে দাঁড়াল সে। ফিরে এসে আমার হাত ধরল; তার পর বললে, অব চলো বাবুজী।

সেই অতিকার উদ্ভূত কটাহে ফুটন্ত ক'থের মত উভাল, কিন্তু বরকের মত নীতল ভগ্নস্তপের উপর দিগে অস্থির চরণে সতর্ক গতি আমার। পাহাড় তখনও ভাঙছেই; গড়গড় শব্দে ছোট মতন একটি পাখর অনেকখানি মাটি-কাদা সঙ্গে নিয়ে একবার এসে পড়ল প্রায় আমার পায়ের কাছেই। শীতের দোসর এখন ভয়; হাত-পা আমার কাঁপছে ঐ বাকি বলে বাতাসত বেতলীলতার মত, মুখ তাকিয়ে গিয়েছে; আর প্রতি পদক্ষেপে ষট ষট ব্যথা লাগছে ডান পায়ের গুলক-সন্ধির কাছে।

তবে জায়গাটা দু'জনে নিরাপদেই পার হয়ে এসাম। সেই তিনটি লোকের কাছাকাছি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাহাহুয় আবার ঐ ভগ্নস্তপ অতিক্রম করে ফিরে গেল তার মোট, মানে আমাদের মালপত্রের কাছে।

লোক তিন জনের এক জন কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ গিয়েছে বাহাহুয়ের দিকে। দেখলাম যে করকবার বার্থ চেষ্টা করবার পর সেই প্রায় দেড়-মি বোঝাটা পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; যথাসম্ভব চোপ উচু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডানদিকের সেই ভংগুর টলমলে পাহাড়টির দিকে। তার পর চোখ নামিয়ে নিজেও সে ঐ পাহাড়টির মতই টলতে টলতে আমার দিকে অগ্রসর হ'ল।

কুন্ডনিখাসে চেয়ে দেখছি আমি—অথবা কিছুই দেখছি নে। হঠাৎ কানে এল আমার—হুশিয়াব জগরান।

পর দুই-শুই কাতর একটি চিৎকারের সঙ্গে বিকট একটি নাদ—ঝপাং—ঠং।

মাটিতে পড়ে গিয়েছে বাহাহুয়। মোটটি তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু আরতনে সেই মোটের চেয়েও অনেক বড় মাটি-কাদা-পাখরের বিরাট একটি তাল হর হর করে নেমে এসে চেপে বসেছে বাহাহুয়ের পিঠ বা বুকের উপর। সম্পূর্ণ মানুষটিকে আর দেখা যায় না। কেবল একখানা তার হাতই বুঝি দেখলাম কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভগ্নস্তপের উপরে উঠে এসেছে। আর যেন কানে এল আমার তার আন্তর্কণ্ঠের কাতর আহ্বান—বাবুজী!

কিন্তু একি বৈসাদৃশ্য! আরও একটি শব্দ কানে এল যেন পৈশাচিক ঝটহাশ। ঐ সঙ্গে দুটি শব্দও—শালা নেপালী।

বিশ্বাসই হয় না যে কানে শুনেছি আমি। তবে চমকে উঠে পাশের দিকে তাকাবার পর আর অবিশ্বাসও করতে পারি নে। দেখলাম যে সেই তিন জন লোক প্রায় আমর গা যে যে দাঁড়িয়ে ভূপতিত বাহাহুয়ের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

নারকীর দৃশ্য। কিন্তু ওখানে ও অবস্থায় ঐ তিনটি লোকট যে আমার একমাত্র শাস্ত ও আশ্রয়। তাদেরই উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করে আমি বললাম, বদরীবিশালকী নামপর বচাও উস আদমীকো।

উত্তর হ'ল: আদমী আপ কিসকো বলতে হয়? ওহ ত এক বৃদ্ধ জানোয়ার। উসকো ত মরণ্য হী চাহিয়ে।

অবিশ্বাস আচরণ মানুষের প্রতি মানুষের। ঘৃণায়, বিরক্তিতে বি বি করছে আমার মন। তথাপি আমার দুই হাতে আমি হাত জড়িয়ে ধরলাম সবচেয়ে কাছের লোকটির; কাতর অতুনরের স্বরে বললাম, সব মানছি। তবে এখন নয় ভাইয়া—গালমন্দ যা ঈচ্ছা পরে নিও। এখন বাঁচাও ওকে—তুলে নিয়ে এস এই জায়গাটাতে। আমার ত সাধ্য নেই—গায়ে জোরই নেই আমার।

তবে গরজই বা কেন? মরুক না। ও ত কুলি।

তবু মানুষ।

ভাষে ঘি ঢালা। ও কথা শুনে ভাবান্তর যা হ'ল তা আমার প্রত্যাশার বিপরীত। আবার দেখি যে, দাঁত বের করে হাসছে ওরা তিন জনেই।

আর মাটি-কাদা-পাখর স্তপের নীচে পড়ে বাহাহুয় ওখানে কাদছে—কাহত একটি কুতূহের কোঁও কোঁও ক্রন্দনধ্বনি যেন।

মাঝাটা আমার কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তবু তাকে বেলে গেল বুদ্ধিটা। বললাম, অচ্ছা বকশিস মিলেগা—পহলে বচাও উস কুলিকো।

লোক তিন জন একথা শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল কিছুক্ষণ; তার পর তাদের একজন বললে, দু'টাকা লাগবে বাবু।

তৎক্ষণাৎ রাজী আমি। ফলও হ'ল তাতে। বাবু মতন দেখতে যে লোকটি সে মাথার ইগায়ায় সম্মতি ও হুকুম দিল, যে দুটিকে





পরাঙ্গী পেস, ক'জক, ক,

দেবী পুণিমা  
ক'জক পেস, ক'জক পুণিমা

পরাঙ্গী, মাঘ ১৩৫১ ক'জক পুণিমা (ক'জক)



মনে হয়েছিল যজ্ঞ তুমিই এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এল প্রথমে আমার মোটটি ও পরে বাহাদুরকে।

তবে তিন জনেই আবার গালিও দিচ্ছে তাকে। পাড়া-ভাড়া মাটি পাথরের চেয়ে কম ভারি ও কম তীক্ষ্ণ নয় বেচারি বাহাদুরের উপর বিরক্তি ও বিদ্বেষের এই অসাধারণ ও অতিরিক্ত বর্ষণ।

কিন্তু বাহাদুরের দিকেই তখনও প্রধান মনোযোগ আমার। নিজের ভাড়া পা নিয়ে বধাসম্ভব ক্রতবেগে তার কাছে গিয়ে একটি হাত ধরলাম তার। তাকে টেনে তুলবার মত নৈমিত্তিক শক্তি আমার নেই, শুধু যুগে বললাম, উঠ বাহাদুর—উঠে দাঁড়াও ত।

তার পর আবার কুন্ডলিনীঃশাস প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু আবার দেখলাম অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। এবার আর ভয়ঙ্কর নয়, শোচনীয়। মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার স্তম্ভ সে কি প্রাণপণ চেষ্টা বাহাদুরের—একবার এক পায়ের উপর নির্ভর করছে সে, আবার অপরাধের উপর। একবার উঠেও দাঁড়াল সে। কিন্তু ভঙ্গি যে দেখছি অষ্টাবক্রের। অদূরের ঐ পাহাড়টার মতই ধরধর কাঁপছে বাহাদুর—যন্ত্রণার বিকৃত তার মুখ। পরক্ষণেই এক চাপ ধসের মতই আবার সে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে এল তার আন্তরিকতার কাতর বিলাপ—বাবুজী হম ত বগয়া।

চোখে দেখে কিছুই বুঝা যায় না। বাহাদুরের দেহের দু-তিন আয়গায় কেটে গিয়েছে দেখলাম, যন্ত্রপাত কিছু হয়েছিল এবং হচ্ছেও। কিন্তু একটি ক্ষতও তেমন গভীর নয়, যন্ত্রপাতের পরিমাণও সামান্য। বাহাদুরের লোহা-পেটা শরীরটিকে কাবু করবার মত উপসর্গ একটিও নয়। তথাপি উঠে যে সে দাঁড়াতে পারছে না তা ত আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং অনুমান করছি যে, তার কোমড় বা পায়ের কোন অঙ্গি গুরুতরভাবে জখম হয়েছে।

কল বাহাদুরের পক্ষে বাই হোক না কেন, আপাততঃ আমার পক্ষে যাবাজুক। ভাববাহী কুলির সল দেহ আকস্মিক আঘাতে অচল আর একটি গুরুভার বোঝাতে পরিণত হয়েছে। সে ভাব এখন বইবে কে?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে আবার সেই তিনটি লোকের দিকে তাকলাম আমি, তাড়াতাড়ি দুটি টাকা বেব করে তাদের এক জনের হাতে দিয়ে বললাম, তোমরা অনেক উপকার করছে আমার। তবু আরও একটু করতে হবে ভাই। দয়া করে তোমরা তিন জনে ভাগাভাগি করে আমার এই কুলি আর মোটটাকে সামনের চটিতে পৌঁছিয়ে দাও।

উত্তরে সেই বাবু মতন লোকটি বললে, নহী হো সক্তা। সড়ক ঠিক নহী হার। উসতরক হম নহী জারেন্দে।

কোন দিকে বাবে তাহলে?

আজুল দিয়ে বিপরীত দিক নির্দেশ করল লোকটি—অর্থাৎ বৈদিক থেকে আরম্ভ এসেছি।

সর্বনাশ। এ যে উত্তরসড়ক আমার। সামনে আরও যে

ধস নামছে তা না জেনেই ত জ্বিতেন বোশীমঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। পথে সেও পাহাড়-চাপা পড়ল না ত? আমি না পাচ্ছি তার কোন সংবাদ, না তাকে জানাতে পারছি আমাদের দুববহার কথা। তার টাকা পরমা এবং বিজ্ঞানপত্রও ত রয়েছে আমাদেরই সঙ্গে। সে সব নিয়ে বিপরীত দিকে আমি বাই কেমন করে? আর না গিয়ে এই ঘোর দুর্ভোগের দিনে আহত কুলিটিকে নিয়ে এই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আমি থাকবই বা কোন হিসাবে? এ দিকের যে পাহাড়টা এখনও অক্ষত আছে দেখছি তাতেও যদি ভাঙন শুরু হয়!—

ভাবতেই ভয়ে আমার বুকের দস্ত ভল হয়ে গেল। নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই যে ভাব আমার মনে জেগে উঠল তা আশ্চর্য্যকর আদিম প্রবৃত্তি, জ্বিতেনের বিকৃত একটা অন্ধ আক্ৰোশ এবং আমার পায়ের কাছেই মোকদ্দমান অহত বাহাদুরের প্রতি কণার একত্র সংমিশ্রণে প্রায় এক বীভৎস দস। হুস্ম হুস্মানিতে মেনে ভাল-মন্দের বিচার করবার শক্তি তখন আর আমার নেই। সময়ও নেই। সুতরাং তৎক্ষণাতঃ মনেব ভিতর থেকে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝোড়ে ফেলে সেই লোকটির দিকে চেয়ে আমি বললাম, তাহলে উলটো দিকেই নিয়ে চল কুলিটিকে—অন্ততঃ গড়র চটি পর্যন্ত।

কিন্তু এবারও অস্বীকার করল লোকটি : সো ভী নহী হো সক্তা।

কৌণ?

হমলোগ সরকারকে মোকব, কুলী নহী হার।

পুরা বকশিব দেঙ্গে।

তব ভী ছোট। কাম নহী কর সক্তে।

লেকিন য়হ তো ধবমকা কাম হার।

নহী হো সক্তা বাবুজী—উপরসে ছকুম নহী হার।

বলেই তার সঙ্গী দু'জনকে সে ছকুম দিল যন্ত্রপাত সব গুছিয়ে নিয়ে বওনা হবার স্তম্ভ। আর সত্যি আমাদের দু'জনকে ওখানে ফেলে রেখে গড়র চটির দিকে বাত্নাও করল তারা।

বিশ্বাস হয় না আমার। কিন্তু বিশ্বাস না করবার যখন আর কোন উপায় থাকল না তখন আমি প্রায় আত্মনাশ করে বললাম : তব হমলোগোকে ক্যা উপায় হো গা?

দুব থেকে উত্তর এল : কুলি মিলনেসে ভেজ দেগা।

কিন্তু কোথায় কুলি? আশ্চর্য্যকরভাবে পয়ে গড়র চটির দিক থেকে বারা এল তারা তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলে। পরনে তাদের হাক-প্যান্ট ও গরম কোট, মাথায় কান-ঢাকা টুপি এবং পিঠে ছোট ছোট ব্যাগ। সামনে বোশীমঠে অবস্থিত এক আবাসিক বিভাগের ছাত্র তারা। কি একটা ছুটিতে বাড়ীতে এসেছিল, এখন বোডিং-এ ফিরে যাচ্ছে। পাহাড়ের ধস-নামা তারা জন্ম থেকেই দেখে আসছে বলেই বুঝি এ বকম অবস্থার সড়ক এড়িয়ে চলতে জানে তারা। এলও তাই। পার্শ্বত

মুখিকের মত ক্রমবেগে এবং নিরাপদেই তারা পার হয়ে এল ঐ ভাঙনের আরগাটা।

আমাদের দুর্বলতা দেখে তাদের সহানুভূতির অভাব নেই। কিন্তু কি করতে পারে ঐ বালকেরা? আমিই বা কি করতে বলব তাদের? সামনের পথ ধরাপ আছে জেনেও তারা সেদিকেই এগিয়ে গেল দেখে আমি শুধু তাদের বললাম, পথে আমার মত কোন বাতালী-বাজীর দেখা পেলে তাকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দিতে।

জিতেনকে কিংবে আসতে বলব, এখন সে প্রবৃত্তিও আমার হয় না।

তবু ঐ ছেলে ক'টি এগিয়ে গিয়ে একটি ঝাঁকের আড়ালে অস্থায়ী হবার পথ আমি আমার মনের কানে ক্রমাগতই আশার শুধন শুনিছি বেন—জিতেন খবর পাবে এবং খবর পেয়েই চলেও আসবে সে। সেই আশাই আমার উদ্বল হয়ে উঠল যখন মিনিট পনের পরেই অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতর দিয়ে ছায়ামূর্তির মত একজনকে দেখলাম বোম্বাইয়ের দিক থেকে আমাদের দিকে আসতে।

তবে মরীচিকা। মূর্তিটি আরও একটু কাছে আসতেই তুল ভেঙে গেল—সে জিতেন নয়। তথাপি আশ্বাস পেয়েছে আমার মন। যাহূব ত আসছে একজন—কিছু সাহায্য পেতে পারি তার কাছে।

কিন্তু আমার কাতর অনুরোধ মন দিয়ে শুনবার পথ লোকটি আমার চেয়েও কাতর হয়ে আমাদের বললে যে, আসতে আসতে নিজেই সে পাখরচাপা পড়ে মরতে বসেছিল; এখন সে আস্ত একটি যাহূব দূরে থাক, পাঁচ-সেরি একটি পুটুলিও বয়ে নিতে পারবে না।

আবার ঐ তেপান্তরের মাঠে আমি একা—যানে, অর্ধ-অচেতন অক্ষম বাতাহূবের পাশে নিজের অক্ষমতার তীব্র সচেতনতা নিয়ে লক্ষ্য কিন্তু অপদার্থ পুরুষ আমি, নৈরাশ্রের অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই বেন ডুবে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার গায়ে বর্ষাটি খুলে বাতাহূবের পা-মাথা ঢেকে দিয়েছিল। কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিপাত থেকে তাকে কতখানি রক্ষা করতে পারে ঐ পাতলা বর্ষাতি। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়াও বইছে। বাতাহূবের ভূমুষ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে ম্যালেরিয়ার রোগীর মত হি হি করে কাঁপছে—আর বিড় বিড় করে কি বেন বলছেও।

আমিও একটু আচ্ছাদন তাকে দেবার জন্য আমি ছাতা নিয়ে বললাম তার মাথার কাছে, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি বাতাহূব?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, এবং কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জড়িত হয়ে বললে, হয় নে পাপ কিয়া বাবুজী—অচ্ছা হায় কি মুখে সাজা মিলী। লেकिन আপকী বাজাতী তো হয় নে বরবাদ করনী। মুঝকো আপ মার ভালিয়ে বাবুজী,—লাখ মারকে খদকা অন্যথ পিজা নিজিয়ে।

বলে কি বাতাহূব। আর বা সে বলছে তার উত্তরই বা কি দেব আমি। তার মাথার আলগোড়ে হাত বুলাতে বুলাতে পূর্ব-প্রসঙ্গেই কিংবে গিয়ে আমি বললাম, তোমার ঠিক কোন আরগাটাতে লেগেছে তাই আমার বল ত বাতাহূব—দেখি একটু টিপে দিলে যদি তুমি উঠে ঝাঁড়াতে পার।

তুনে বেন আরও অধীর হয়ে উঠল বাতাহূব। সে তার নিজের হুই হাত তুলে তার মাথার উপরেই আমার হাতখানি চেপে ধরে আরও অধীর, আরও গাঢ় হয়ে বললে, আপ তো যেমা মাতানিতা হায় বাবুজী। লেकिन হয় নে কা কিয়া? হায় ভগবান, হয় নে কা কিয়া!—

বলতে বলতে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের মাথা নিজেই চপেড়াতে স্ক্রু করল সে।

তাতে আরও বিপন্ন অবস্থা আমার। অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম তাকে, তার সক্রিয় হাতখানি নিজে আমি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে চুকিয়ে দিলাম বর্ষাতির নীচে। কিন্তু তারপর আবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, পুরুষ মত ভাবভরে চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে সে। এবার চোখাচোখি হতেই একেবারে ভিন্ন হয়ে, প্রায় কিস কিস করে সে বললে, যেহে ওরাস্তে আপ কোঁও জান দেওগে বাবুজী? মুঝকো একেলাহী মরণে দো—মহাপর মুঝে ছোড়কর আপ গড়ব চি টিয়ে লোট জারো, বাবুজী।

কান্নার চেয়েও দুঃসহ বাতাহূবের এই কাতর আবেদন। তাড়া-তাড়ি উঠে ঝাঁড়লাম আমি। একটা ধমক দিলাম বাতাহূবকে : কি যে বলিস তুই! তোকে এখানে কেলে যেখে আমি যেতে পারি নাকি? মরতে হয় তুঁজনে একসঙ্গেই মরব।

একটু থেমে তারপর আশ্বাস দিলাম তাকে : অত ঘাবড়াজিঙ্গ কেন? উপায় একটা হবেই।

কিন্তু মুখে ঐ কথা বললেও নিজের মনে আমি আশ্বাস পাচ্ছি কই? হুঁট অসহায় প্রাণী পড়ে আছি ত সেই তেপান্তরের মাঠে। ঘড়ি বের করে দেখি যে বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু বৃষ্টি ও কুয়াশার জন্য তখনই মনে হয় বৃষ্টি সন্ধ্যা হয়ে এল। কুয়াশা এখন আগের চেয়েও নিবিড় হয়েছে। আকাশ আরও বেশী কালো।

হুঁচোখ কেটে জল এল আমার, তবে কি এই তেপান্তরের মাঠে জীবন্ত সমাধিই নিশ্চয় নিয়তি আমার।

অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি—সেই ছেলেদেরই দলটি না? ঠিক তাই। তবু মনে হয় যে এরা বৃষ্টি তারা নয়। বাবার সময় এদের মুখ কটি দেখেছিলাম কোটা ফুলের মত। কিন্তু এখন দেখছি বিবর্ণ। কেমন বেন সন্ত্রস্ত বৃষ্টি প্রতি লোড়া চোখেই।

আমি কোন প্রশ্ন করবার পূর্বেই ওদের একটি ছেলে কৈকিরতের সুরে বললে, বহুত পাখর পিড়তে। জা নহী সর্কে হয়লোগ। ইসলিয়ে ওয়াপশ আ পয়ে। অব বয পোট জারয়ে।

কিন্তু নিঃশ্বাসে শুনেছিলাম, ওরা গড়ব চিটিম দিকে চলতে স্ক্রু

করবার পর দীর্ঘনিশ্বাস কেলাম একটা—শেষ আশাও নিমূল হ'ল তাহলে। জিতেনকে সংবাদ দেওয়া গেল না।

কোন নিষ্ঠুর দেবতা কি খেলাই বে খেলছেন আমার সঙ্গে—আশা ও নৈরাশ্যের নাগরদোলায় দোল খাওয়ার আর বিরাম নেই। আমার দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমার একটি আশ্বাসও কানে এল আমার—কিশোরকণ্ঠে ব'লার মত মিহিসুয়েব আশ্বাস। ভাঙনের আরগাটা নিরাপদে পার হয়ে বাবার পর ঐ দলেরই একটি ছেলে ওপার থেকে ডেকে বললে আমাকে : পিছেসে ভৈসাল আ বহে, উসসে আপকো মদ মিল জায়েগা।

সত্যই ত। বিপরীত দিকে কিংবে চেয়ে দেখি যে ঐ আশ্বাসই রূপ ধরে এগিয়ে আসছে যেন। কেবল এক পাল যৌবন নয়, সঙ্গে ঘোড়া না খড়বও আছে কয়েকটি। পশুপালকদ্বাও সংখ্যায় তিন জন।

কেবল আশ্বাস নয়, আশার নেচে উঠেছে আমার মন—এতগুলি বাহন ব'ধন একসঙ্গে আসছে তখন কেবল বাহাদুর কেন, আমিও একটা ঘোড়ার চাপতে পারব।

কিন্তু হরি হরি। মরীচিকা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। ঐ দলের একটি পশু বা একটি মানুষও ধমকে দাঁড়াল না। আমার সত্যের অন্তর এবং প্রচুর পারিশ্রমিকের প্রলোভনকে সমভাবেই উপেক্ষা করে পশুপালকদের একজন চলতে চলতেই আমাকে বলে গেল যে, এই দুর্ব্যাগের দিনে তাদের ঘোড়া-খড়বের পিঠে কোন মোটাই তারা চাপাবে না।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম, তা হলে কি উপায় হবে আমাদের। উত্তরও দিল না লোকটি। পশু ও মানুষের অত বড় দলটিও বীরে বীরে কুরাশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে পড়লাম আমি। দাঁড়িয়ে থাকবার মত দৈহিক শক্তিও আর আমার নেই। অনেককণ্ড যাবতই ভিজে চোল হয়ে আছি। অসহ্য শীত লাগছে এখন, তার উপর নৈরাজ্য প্রকাণ্ড একটি বরফ-স্তম্ভের মত আমার বুকের উপর চেপে বসল যেন। হঠাৎ আমার মনে হ'ল যে আমি অভিশপ্ত, আমি পরিত্যক্ত, মানুষ ত বটেই, স্বয়ং ভগবানও আমার পরিত্যাগ করেছে।

আর তখনই অদ্ভুত করলাম আমি আমার দক্ষিণ বাহুতে বজ্র-মুষ্টির কঠিন নিষ্পেষণ, যেমন দৃঢ়, তেমন শীতল। এই নাকি তুহিন-শীতল মৃত্যুর ঔষ। কিন্তু বাহুতে কেন তা? ভীতি-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি যে মৃত্যু নয়, মৃত্যুপথযাত্রী বাহাদুর তার হাত বাড়িয়ে আমার বাহু চেপে ধরেছে। চোখোচোখি হ'ল তার সঙ্গে। বিস্ফারিত তারও চোখ দুটি, কিন্তু দৃষ্টি ভীতিবিহীন নয়—স্নেহময়ী জননীর চোখের দৃষ্টির মতই যেন মমতার কোমল, সমবেদনায় করুণ।

কিস কিস করে বাহাদুর বললে, অব তো মৈ জাতা হ'। যেহা সব কহুর থাক কখনা বাবুজী।

সত্যই হচ্ছে নাকি বাহাদুর? আর তা ঠার চেয়ে দেখছি

আমি? কথাটা মনে হতেই সমস্ত দেহে আবার একটি শিহরণ অদ্ভুত করলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বাহাদুরের সেই শীতল স্পর্শ থেকেই একটা যেন উত্তপ্ত বিদ্যুতপ্রবাহ আমার প্রত্যেকটি শিরা উপশিয়ার সঞ্চায়িত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সজীবিত হয়ে উঠল আমার অবসন্ন স্নায়ু ও পেশীগুলি। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়লাম।

এ কি ক্লেব্রা আমার। বাহাদুরই না হয় আহত ও চলৎশক্তি-হীন। কিন্তু আমি ত তা নয়। তথাপি নারীর মত, শিশুর মত বাহাদুরের পাশে বসে তার সঙ্গে একজু জীবন্ত সমাধি লাভ কদাচেকি কেন আমি আমার একমাত্র কর্তব্য মনে করছি? কেন নিজে আমি সক্রিয় হয়ে চেষ্টা করছি নে তাঁকে বাঁচাবার জন্ত? সামনের পথই না হয় আমার অজানা, কিন্তু পিছনের পথ ত চিনে এসেছি আমি—যে পথে মাইল চারেক মাত্র দূরেই পিপুলকুঠি শহরে একটি কেন, দশটি কুলি আমি পেতে পারি এখান থেকে বাহাদুরকে জীবন্ত তুলে নিয়ে বাবার জন্ত। সেই দিকে ছুটে না গিয়ে কেন এখানে আমি দৈবের মুখ চেয়ে বসে থাকব।

পাছে করুণার ছদ্মবেশে ক্লেব্রা আবার আমাকে নিষ্ঠুর কর্তব্য-সাধনের কঠিন পথ থেকে বিচ্যুত করে সেই আশঙ্কায় বাহাদুরের কাতর মুচ্ছবি দ্বিতীয়বার চেয়েও দেখলাম না আমি। একটু সরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তুমি ভাবনা কর না বাহাদুর—তোমাকে আমি মরতে দেব না। তোমার জন্ত কান্তি আনতে বাচ্ছি আমি—গড়ুর চটিতে যদি না পাই, পিপুলকুঠি থেকে নিয়ে আসব।

তৎক্ষণাৎ এক টানে আমাদের একটি বিছানা খুলে কেলে লেপ-তোষক দিয়ে ঢেকে দিলাম বাহাদুরকে। তার উপর বর্ষাতি চাদরখানি চাপিয়ে দিয়ে নিজে আমি নির্দ্বয় হয়ে যাত্রা করলাম পুনরায় পিছনে কেলে-আসা সেই গড়ুর চটির দিকেই।

আশ্চর্য। আমার নিজেরই একটা পা যে ভাঙা তা আর তখন মনেই পড়ছে না। খচ খচ ব্যাথাটাকেও যেন জর করেছে আমার জাগ্রত পৌরুষ।

পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাবার দরকার হ'ল না।

গড়ুর চটি পর্যন্ত গিয়েই দেখি যে, ঐ আরগাটায় ভেমন লক্ষীহাড়া রূপ আর তখন নেই। এখন সেই ছোট চারের দোকানটিতে বৃদ্ধ দোকানী হাড়াও আরও চার জন লোক উনানের ধারে বসে জটলা করছে দেখলাম। চেনা মুখ চারটিই। ওদের মধ্যে যে লোকটি প্রোঁট সে কিছুকণ পূর্বে বোলীমঠের দিক থেকে আমারই সমুখ দিয়ে এ দিকে এসেছে—আমি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেই তখন সে অজুহাত দেখিয়েছিল পাথর চাপা পড়ে তার নিজেরই আহত অবস্থার। এখনও দেখলাম যে, সে উনানের ধারে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন তাতে মালিশ করছে।

বাকি তিন জনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্ত-সমর্থ যুবক—সেই তিন

জন বাবা ছোট কাজ করবে না বলে আহত বাহাহুবকে শাশ করতে চায় নি।

ওখানে থাকতেই পয়চের পেয়েছিলাম তাদের।

সরকারী পূর্ত বিভাগের ওভারসিরয় ওদের মধ্যে সেই বাবুসতন লোকটি; বাকি দু'জন মজুর। রাজীসড়কে প্রয়োজনীয় যোষাতি কাজের জন্য নিযুক্ত বাহিনীর ছোট একটি গ্যাং।

অনুন্নয় করে এদের কাছে কোন সাহায্য যে পাওয়া যাবে না তা পূর্বেই বুঝেছিলাম আমি। স্ততরাং এবার একেবারে বিপরীত চাল চাললাম।

ওভারসিরয়টির মুখে দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললাম, আমার ঐ আহত কুলিটিকে অন্ততঃ এই পর্যন্ত এনে দিতে হবে। যদি তা না কর তবে এখনই পিপুলকুঠি গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করব আমি—শৌড়িতে তোমাদের বড় সাহেব আর লজ্জাতে মুখমস্ত্রীর কাছে তার করব। তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের তিনটিকে জেলে পাঠাব ঘানি টানবার জন্য। জান আমি কে?

মিথ্যা কথাই বললাম। কিন্তু তাতেই কাজ হ'ল একেবারে মস্তের মত। দোকানের সব কটি মাসুখই তৎক্ষণাৎ সসজ্জমে উঠে দাঁড়াল। ওভারসিরয়টি আমাকে লম্বা একটি সেলাম ঠুকে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, হজু তখন যদি বলতেন এ কথা—

চুপ রহো—

তখন পাকা অভিনেতাই হয়ে উঠেছি আমি। পুলিশী ভদ্রিতে হাতের লাঠিখানা মাটিতে ঠুকে আমি ধমক দিয়ে কথা বন্ধ করলাম তার; আগের চেয়েও গদম শূন্যে আবার বললাম, আমি কথা চাই নে, কাজ চাই। এক্ষুনি বগুনা হয়ে বাও তোমরা। আধ-ঘণ্টার মধ্যে ঐ কুলিটাকে এখানে নিয়ে আসা চাই।

ওনে দেখে যে, পাণ্ডবর্ণ হয়ে গিয়েছে সব ক'টি মুখ, অথচ গড়িমসি ভাবটা আছেই। স্ততরাং দ্বিতীয় একটি অস্ত্রও নিক্ষেপ করলাম আমি; আবার বললাম, আমার হুকুম তামিল না করলে

জেল খাটেই নির্ধাৎ। তবে কুলিটিকে যদি বরে এনে দাও তবে শুধু রেহাই নয়, বকশিসও পাবে।

চোখে চোখে কি যেন কথা হ'ল ওদের তিন জনের; তার পর ওভারসিরয়টি আবার হাত জোড় করে আমাকে বললে, ওরা হজুর গরীব দিন-মজুর—জানতে চাইছে বকশিসের পরিমাণটা। অমন হাতীর মত চেহারা কুলিটার। আর পঞ্চ ত হজুর কম নয়।

কত চাই।

দু'জন লোক বাবে—দশ টাকা হজুর।

রাজী হলাম আমি। কিন্তু চোখ মুখের সেই কটমটে ভাবটা বলার বেগেই বললাম, এক্ষুণি ছুটে বাও তোমরা। কুলিটিকে আগে আনবে—মালপত্র আশুক বা না আশুক।

তার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা আমার। এবার ঐ দোকানে আমার খাতিরের আর অন্ত নেই। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। এমনকি ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা তেপান্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজবার পর অতিবাহিত আশুনতাতও নয়। যেন আমার পড়ে আছে বাহাহুবের কাছে, চোখ দুটি পথের উপর—বাকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়টা সেটা স্বচ্ছ নয় বলেই যেন আরও অগহিকু তাদের দৃষ্টি।

ঠিক আধঘণ্টা পরে ফিরে এল তারা। কিন্তু এ কি দেখছি আমি! একটি মোটাই দু'ভাগ করে দু'জনে বরে এনেছে। বাহাহুবকে দেখছি নে ত। ওদের পিছনে অনশ্ল সড়ক খাঁ খাঁ করছে দেখলাম।

ওধকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাহাহুব কোথায়?

উত্তর হ'ল : উসকো হমনে ছোড় দিয়া।

কোঁও?

আপকা সাখী উহাঁপর আ গয়ে।

তার যানে আমাদের জিতেন।

[ আগামীবারে সমাপ্য ]

## বসন্তে

### শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফুলে ফুলে কি সুন্দর সেজেছে শাক্সলী!  
পাখীদের কণ্ঠে কণ্ঠে মধুর কাকলি!  
বাতাবি-ফুলের গন্ধে মগ্নির বাতাস!  
মধুপের গুন্ গুন্; বাগান বিলাস  
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে লোহিত বরণ;  
বনে বনে কঁদে যায় ক্যাপা সমীরণ;  
আমারও হৃদয় কাঁদে কিসের লাগিয়া।  
যাবে কভু দেখি নাই, দেখিব না, হিয়া

তারই তবে তৃষ্ণাভূয়! হেথা হতে যবে  
চলে যাবো, হে বসন্ত, পুষ্পের সৌরভে  
তখনও মাতাল হবে হৃদিনাসমীর  
'আজিকার মতো ঠিক! তখনও পাখীর  
কলরবে পূর্ণ হবে কাক্সনের বন।  
বাতাস কাঁদিয়া যাবে আজিকে যেমন।

## শঙ্করমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্করমতে, সকাম-কর্ম জ্ঞান-বিরোধী এবং সেজন্য মোক্ষ-বিরোধী হলেও, নিকাম-কর্ম জ্ঞান-সহায়ক ও সেজন্য মোক্ষ-সহায়ক। অর্থাৎ, নিকাম-কর্মের দ্বারা চিন্তাশক্তি হলে, তবেই সেই বিশুদ্ধ চিন্তেই জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভবপর। কিন্তু সকলের পক্ষেই এরূপ নিকাম-কর্ম সমান প্রয়োজন নয়। কারণ, পূর্বজন্মে অতি সুষ্ঠুভাবে নিত্যকর্মের দ্বারা যাদের চিন্তা এ জন্মে প্রথম থেকেই শুদ্ধ হয়েছে আছে, তাঁদের ত আর নিকাম-কর্মের প্রয়োজন হয় না নুতন করে। সেজন্য গীতা-ভাষ্যে, মূলানুযায়ী, শঙ্কর দ্বিবিধ বুদ্ধি এবং দ্বিবিধ সাধকের উল্লেখ করেছেন—সাংখ্য-বুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধি, সাংখ্য ও যোগী।

এরূপে জ্ঞান-নিষ্ঠ “সাংখ্য” এবং কর্ম-নিষ্ঠ “যোগীর” মধ্যে সাধন-প্রণালী এবং সাধন-ফলের মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ শঙ্কর গীতার শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে অতি সুন্দর ভাবে নির্দেশ করেছেন। শঙ্করের মতে, এই সর্বশেষ অধ্যায়ে সমগ্র “গীতা-শাস্ত্রস্বার্থঃ সর্বশ্চ বেদার্থঃ” গীতা-শাস্ত্রের ও সকল বেদের মূলীভূত অর্থ উপসংহার করে বলা হয়েছে।

“সর্বেষু হি অতীতেষু অধ্যায়েষু উক্তোহর্থঃ অন্বিন্নায়াহেব-গম্যতে।” ( গীতা-ভাষ্য, ১৮-১ )।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তারিত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করা হয়েছিল, সেই সকল তত্ত্বেরই এই শেষ অধ্যায়ে উপসংহার করে, সংক্ষেপে পুনরায় বলা হচ্ছে, যাতে অনায়াসে সেই সকল নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা যায় ( আনন্দগিরি-টীকা )।

এই গীতা সার-ভূত অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই “সংস্তান” এবং “ত্যাগের” মধ্যে প্রভেদ করেছেন শ্রীভগবান এই বলে :

“কাম্যানাং কর্ণাং স্তানং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

সর্ব-কর্ম-কল-ত্যাগং প্রোক্ত্যন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥”

( গীতা, ১৮-২ )।

ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, অর্থমেধাদি যজ্ঞ প্রমুখ “কাম্য-কর্ম” ত্যাগই হ’ল “সন্ন্যাস”; এবং সেই সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম ত্যাগই হ’ল “ত্যাগ”।

অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে, “সন্ন্যাস” ও “ত্যাগ” এই দুটি শব্দ সমার্থক—

“যদি কাম্য কর্ম-পরিত্যাগঃ কল-পরিত্যাগো বা অর্থে বক্তব্যঃ, সর্বথাপি-ত্যাগ-মাত্রং সন্ন্যাস-ত্যাগ-শব্দয়োরেকোহর্থো ন ষট-পট-শব্দাদিব জাত্যন্তর-ভূতার্থো।”

( গীতা-ভাষ্য, ১৮-২ )।

কাম্য-কর্ম-পরিত্যাগই হোক, বা সর্ব-কর্ম-পরিত্যাগই হোক, সবই ত সেই একই ত্যাগ ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়। সেজন্য “ষট” ও “পট” এই দুটি শব্দের অর্থ যেকোন বিভিন্ন, “সন্ন্যাস” ও “ত্যাগ” এই দুটি শব্দের অর্থ যেকোন বিভিন্ন নয়।

যা হোক, “সন্ন্যাসই” হোক, বা “ত্যাগই” হোক—“সাংখ্য” বা জ্ঞান-নিষ্ঠ সাধকের সাধন-প্রণালী হ’ল এই সন্ন্যাস বা ত্যাগ, এক কথায়, এই সর্ব-কর্ম-ত্যাগকেই বরণ করে নেওয়া। “কাম্য” কর্মের কথা ত দুই থাক, এমন কি, “নিত্য” ও “নৈমিত্তিক” কর্মও তিনি নিঃশেষে বর্জন করেন।

এস্থলে যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, নিত্য-কর্ম অবশ্য অন্তর্ভুক্ত, এবং সেজন্য জ্ঞানাদিকারী নিত্য-কর্মও পরিত্যাগ করলে, তিনি পাপের ভাগী হবেন—তাব উত্তর পরে দেওয়া হচ্ছে।

পুনরায় যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, নিত্য-কর্ম ত সকাম-কর্মের দ্বার কোনও ফলের সৃষ্টি করে না, তা ত্যজ্য হবে কেন—তাব উত্তর হ’ল এই যে, নিত্য-কর্মেরও নিশ্চয় ফল আছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে পরেও বলা হবে।

সেজন্য জ্ঞানযোগাদিকারী, জ্ঞান-নিষ্ঠ “সাংখ্য” “কাম্য-নিত্য-নৈমিত্তিক” সকল প্রকার কর্মই নিঃশেষে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

অপর পক্ষে, কর্ম-যোগাদিকারী, কর্ম-নিষ্ঠ “যোগী” “কাম্য-কর্ম” পরিত্যাগ করলেও “নিত্য নৈমিত্তিক-কর্ম” পরিত্যাগ করেন না।

এ স্থলে, মূলানুসারে কর্ম-ত্যাগ-বিষয়ে দুটি মতবাদের উল্লেখ শঙ্কর করেছেন :

“ত্যাগ্যং দোষবহিত্যেকৈ কর্ম প্রাহ্মণীষিণঃ।

যজ্ঞ-দান-তপঃ কর্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥”

( গীতা, ১৮-৩ )।

কোন কোন মনীষী বলে থাকেন যে, কর্মমাত্রেরই



সম্বোধ বলে সকল কর্মই পরিত্যাগ্য; পুনরায়, কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্কারূপ কর্ম পরিত্যাগ্য নয়।

তাত্ত্বিক শব্দ বলছেন যে, প্রথম মতবাদ যাঁরা প্রপঞ্চিত করেছেন, তাঁরা “সাংখ্য-দৃষ্টিকে”ই আশ্রয় করে তা করেছেন। সেজন্য তাঁরা বলছেন যে, সকল কর্মই দোষপঙ্কিল, যেহেতু তা সবই সংসারের হেতু এবং রাগ-দোষাদি-দুষ্ট। এই কারণে সংসার ও রাগ-দোষাদি-দোষ বৈরূপ পরিত্যাগ্য, সকল কর্মও সেরূপ একই ভাবে পরিত্যাগ্য। এক্ষেপে তাঁদের মতে, কর্মাদিকারিগণেরও সকল কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

কিন্তু দ্বিতীয় মতবাদ যাঁরা প্রপঞ্চিত করেছেন, তাঁরা বলছেন যে, অস্ত্র কর্ম পরিত্যাগ করলেও যজ্ঞ, দান ও তপস্কারূপ কর্ম পরিত্যাগ করবেন না কোনদিনও কর্মাদিকারিগণ। এক্ষেপে মতভেদ কিন্তু একমাত্র কর্মাদিকারিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,—একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠতে পারে সর্ব-কর্মই পরিত্যাগ করা, অথবা যজ্ঞ-দান-তপস্কা বাহু দিয়ে অস্ত্রান্ত্র সকল কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞানাদিকারিগণের ক্ষেত্রে এক্ষেপে বিভিন্ন মতবাদের কোনরূপ অবকাশই নেই, যেহেতু তাঁদের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কর্ম-ত্যাগই অত্যাবশ্যক, তার আর অস্ত্রাধা হতে পারে না কোনক্রমেই।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, অলসতা-বশতঃ; বা অস্ত্র কারণে কর্ম-ত্যাগ করলে তা “নৈকর্য্য-সিদ্ধিও” নয়, অন্তঃসৌন্দর্য্য-বোধ্যও নয়। কিন্তু জ্ঞানসহযোগে কর্ম-ত্যাগই মোক্ষসাধন কর্ম সন্ন্যাস। সেজন্য এস্থলেও শব্দ বলছেন যে, জ্ঞানমার্গাদিকারী “সাংখ্যগণ” জ্ঞানসহকারেই কর্ম পরিত্যাগ করেন, অস্ত্র কোন পাণ্ডিৎ কারণে নয় :

“তেষাং মোহ-হৃৎ-নিমিত্ত-ত্যাগানুপপত্তেঃ”।

( গীতা-ভাষ্য, ১৮-৩ )

সাধারণ কর্ম-ত্যাগের ছুটি প্রধান কারণ : মোহ ও হৃৎ।

প্রথমতঃ, তাঁদের ক্ষেত্রে “মোহ” বা অজ্ঞানের কোন সম্ভাবনাই নেই। তত্ত্বদর্শী বলে তাঁরা আত্মার সঙ্গে কর্মের কোন সম্বন্ধই দেখেন না, সেজন্য আত্মা থেকে কর্ম বর্জন বা ত্যাগের কোন প্রশ্নই এক্ষেত্রে নেই। দ্বিতীয়তঃ “হৃৎ” বা কায়ক্লেশ-ভয়েরও কোন প্রশ্ন এস্থলে নেই। কায়ক্লেশ-নিমিত্ত হৃৎ এবং ইচ্ছা-দোষাদিও যে আত্মার নয়, দেহের—এই উপলব্ধি তাঁদের আছে বলে তাঁরা কায়ক্লেশ-ভয়েও সর্ব-কর্ম পরিত্যাগ করেন না। সেজন্য তাঁরা সর্ব-কর্ম-পরিত্যাগ করেন এই জ্ঞান-সহকারে :

“গুণানাং কর্ম, নৈব কিঞ্চিদ কৰোমি ইতি।” ( গীতা-ভাষ্য, ১৮-৩ )।

“কর্মজও প্রকৃতির গুণসমূহ বা দেহেরই ধর্ম, সেজন্য আমি কিছুই করি না”—এই বুদ্ধিতেই তাঁরা কর্ম সন্ন্যাস করেন, অস্ত্র কোন কারণে নয়।

সেজন্য শব্দ বলছেন যে, গীতার ১৮-৩ শ্লোকে যে “সন্ন্যাস” ও “ত্যাগে”র কথা বলা হয়েছে, তা “সাংখ্য” বা জ্ঞানাদিকারিগণের জন্য নয়, “যোগী” বা কর্মাদিকারিগণের জন্যই কেবল। এই শেখোক্তদের ক্ষেত্রেই কেবল মোহ ও কায়ক্লেশ ভয়াদি বশে অকারণে কর্ম-ত্যাগ হতে পারে। যাঁরা কর্মাদিকারী, তাঁদের ক্ষেত্রেও এক্ষেপে অলসতা, মোহ, ক্লেশ-ভয় প্রভৃতি কারণে যদি কর্ম-ত্যাগ করা হয়, তা হলে তা অনিষ্টেরই কারণ হবে। সেজন্য কর্মাদিকারিদের সেরূপ “রাজস” ও “তামস” কর্ম-ত্যাগ অপেক্ষা “সাত্ত্বিক” কর্ম-ত্যাগ শতগুণে শ্রেয়ঃ বলে এক্ষেপে “সাত্ত্বিক” কর্ম-ত্যাগকেই এ স্থলে “সন্ন্যাস” বলা হয়েছে।

“তস্মাৎ জ্ঞান-নিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনো নৈব বিবক্ষিতাঃ; কর্ম-কল-ত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসস্বাত্ত্বপেক্ষয়া সন্ন্যাস উচ্যতে। ন মুখ্যঃ সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাসঃ।”

( গীতা-ভাষ্য, ১৮-৩ )

সেজন্য “সন্ন্যাস” শব্দের অর্থ এস্থলে জ্ঞান নিষ্ঠেরই সন্ন্যাস নয়—মুখ্য, প্রকৃত সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস নয়।

অবশ্য, জ্ঞান-নিষ্ঠের এক্ষেপে মুখ্য, প্রকৃত সন্ন্যাস স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সেজন্য এই ভাষ্য শেষে শব্দ সিদ্ধান্ত করেছেন :

“তস্মাৎ কর্মণি অধিকৃতান্ প্রতি এতৈব সন্ন্যাস-ত্যাগ-বিকল্পঃ। যে তু পরমার্থ-বিশিনঃ সাংখ্যাভ্যন্তরে জ্ঞান-নিষ্ঠান্যমেব সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাসলক্ষণায়াম্ অধিকারো নান্তজ্ঞেতি তে বিকল্পার্থাঃ।”

( গীতা ভাষ্য ১৮-৩ )

যাঁরা কর্মাদিকারী তাঁদের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস, ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যাঁরা পরম তত্ত্বদর্শী, জ্ঞান-নিষ্ঠ “সাংখ্য”, তাঁদের ত লক্ষণই হ’ল সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস বা ত্যাগ, সেজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে এক্ষেপে মতভেদের বিন্দুমাত্রও অবকাশ বা সম্ভাবনাই নেই।

জ্ঞানীদের প্রকৃত ও মুখ্য “সন্ন্যাস” এবং কর্মীদের তথ্য-কথিত “সন্ন্যাসের” মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ, তা শব্দ তাঁর গীতা-ভাষ্যে ব্যাখ্যার বলেছেন। যেমন, পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করেছেন যে, শ্রীভগবান কর্মমুঠান এবং কর্ম-সন্ন্যাস উভয়েরই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, তা হলে কোনটি শ্রেয়ঃ? উত্তরে শ্রীভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন যে, কর্মযোগ ও সন্ন্যাস—ছুটিই মোক্ষ-সাধন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কর্মযোগই শ্রেয়ঃ।

এই ছুটি শ্লোককে সাধারণ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতে গেলে কর্মই নৈকর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা শঙ্করের অবৈতবাদ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে শঙ্কর এস্থলেও “সন্ন্যাস” অর্থে জ্ঞানিদের সর্ব-কর্ম-ত্যাগ গ্রহণ না করে, কর্মিদের কর্মফল ত্যাগই গ্রহণ করেছেন। পূর্ববৎ, তিনি এস্থলেও বলছেন যে, জ্ঞানিদের ক্ষেত্রে কর্মানুষ্ঠান ও কর্ম-ত্যাগ—এই বিকল্পের অবকাশই নেই, যেহেতু কর্মানুষ্ঠান তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

“আত্মবিদন্ত সংশ্রাস-কর্মযোগয়োঃ অসম্ভবাং তয়োনিঃ-শ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্মসংশ্রাসাচ্চ কর্মযোগে বিশিষ্টভে ইতি চানুপপন্নম্।”

(গীতা ভাষা, ৫-১)

আত্মজ্ঞের ক্ষেত্রে কর্ম-ত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান—এই দুটি অসম্ভব। এই কারণে কর্ম-ত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান উভয়েই মোক্ষসাধন এবং কর্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ—এরূপ উক্তি জ্ঞানীর ক্ষেত্রে অর্থোক্তিক।

সেজন্ত এই কর্মানুষ্ঠান ও কর্ম-সন্ন্যাস কর্মিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এরূপ কর্মিগণের ক্ষেত্রে কর্মযোগকে কর্ম-সংশ্রাস অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করা হয়েছে এইজন্য যে, কতৃত্বাভিমানী কর্মীকে এস্থলে যম-নিয়মাদি-প্রমুখ সূকঠোর সাধন পরিপালন করতে হয়, অথচ নিকাম-কর্মের অনুষ্ঠান সহজতর।

“সত্যোব কতৃৎ-বিজ্ঞানে কর্মৈকদেশ-বিষয়াৎ যম-নিয়মাদি-গহিতত্বেন চ ছবনুষ্ঠেয়াৎ সূকঠরত্বেন চ কর্মযোগস্ত-বিশিষ্টত্বাভি-ধানম্।”

(গীতা-ভাষা, ৫-১)

এস্থলে কর্মাধিকারিগণের “সংশ্রাসের” অর্থ হ’ল : সকাম “কাম্য” কর্ম-পরিত্যাগ ( গীতা, ১৮-২ ) “কর্মযোগের” অর্থ হ’ল : নিকাম “নিত্য-নৈমিত্তিক” কর্মসাধন। কিন্তু জ্ঞানি-গণের প্রকৃত, মুখ্য ও পূর্ণ “সন্ন্যাস” সর্ব-কর্ম নিঃশেষে পরি-ত্যাগ। সেজন্তই বলা হচ্ছে :

“অনাত্মবিন্-কতৃক্লোবেব সংশ্রাস-কর্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়স-করত্ববচনং তদীয়ান্ কর্ম-সংশ্রাসাৎ পূর্বোক্তাত্মবিন্-কতৃক-সর্ব-কর্ম-সংশ্রাস-বিলক্ষণাৎ...

(গীতা-ভাষা, ৫-১)

অনাত্মজগণের সংশ্রাস আত্মজগণের সন্ন্যাস পরম্পর-বিভিন্ন।

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য, কর্মাধিকারিগণের “সন্ন্যাস” বা সকাম “কাম্য” কর্মত্যাগ এবং “কর্মানুষ্ঠান” বা নিকাম “নিত্য-নৈমিত্তিক” কর্মসাধন ফলতঃ একই সাধনের

অন্তর্গত : সকাম কর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিকাম কর্ম সম্পাদন করা যে মোক্ষের পরোক্ষ সাধন, তা’ পূর্বেই বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও পৃথকভাবে ধরতে গেলে নিকাম কর্মসাধন সকাম কর্মপরিত্যাগের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, যেহেতু নিকাম কর্মসাধনের মধ্যেই ত সকাম কর্ম-পরিত্যাগও নিহিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু সকাম কর্মপরিত্যাগের মধ্যে নিকাম কর্মসাধন সেক্ষেপে নিহিত নেই। কেবলমাত্র সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে, নিকাম কর্ম সেই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত সাধন না করেও থাকা যেতে পারে। কিন্তু সকাম কর্ম পরিত্যাগ না করলে নিকাম কর্ম সম্পাদন করা যায় না। সেজন্ত সমূলে সকাম কর্ম পরিত্যাগ করলে চিত্তশুদ্ধির হেতু কামনা-বাসনার বিনাশ হয় বলে চিত্তশুদ্ধির উদয় হতে পারে—সেজন্তই সেই দিক্ থেকে সকাম কর্ম পরিত্যাগ ও পরম্পরাগত ভাবে মোক্ষের সাধন হতে পারে। কিন্তু এরূপ সাধন অতি কঠিন—পূর্ণ আত্মজ্ঞ না হয়েও সম্পূর্ণ কর্মবর্জন অসম্ভব। সেজন্ত এক্ষেত্রেও যম-নিয়মাদিরূপ দুর্ব্বল যোগাঙ্কের মাধ্যমে চিত্তকে নিবস্তুর বশে রাখতে হয়। অতএব নিকাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসম্পাদনই শ্রেয়ঃ এবং চিত্তশুদ্ধির উৎকৃষ্টতর উপায়।

এরূপে শঙ্করের মতে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হ’ল এই যে, যারা কর্মাধিকারী, তাঁদের পক্ষে কর্মত্যাগ শ্রেয়ঃ নয়, নিকাম কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ। এরূপ নিকাম কর্মই বধাক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানাধিকার ও জ্ঞানোৎপত্তির মাধ্যমে মোক্ষের সাধক যারা অবশ্য জ্ঞানাধিকারী, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা জ্ঞানমার্গানুসারী বলে সকল কর্মত্যাগী। সেজন্ত :

“জ্ঞানবতো জ্ঞান-ফলভূতং সংশ্রাসং বিবক্ষন্ বিবিধিষোঃ সাধনরূপমপি সন্ন্যাসং ভগবান্ বিবক্ষিতবান্।”

(গীতা ৫-১, আনন্দগির্-টীকা)

এরূপে জ্ঞানিগণের জ্ঞানের ফলস্বরূপ সংশ্রাস বা সর্ব-কর্ম-ত্যাগ তা জ্ঞানলিপ্ত কর্মীদের জ্ঞানসাধনরূপ সংশ্রাস বা কাম্য-কর্ম ত্যাগ থেকে পৃথক্।

কর্মাধিকারিগণের উপরে উক্ত ত্রিবিধ কর্মত্যাগ হ’ল এইরূপ :

মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ নিত্য-কর্ম পরিত্যাগ করা হ’ল “তামস” ত্যাগ। কায়ক্লেশভয়ে নিত্যকর্ম পরিত্যাগ হ’ল “রাজস” ত্যাগ। আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য-বোধে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান হ’ল “সাত্ত্বিক” ত্যাগ।

(গীতা-ভাষা, ১৮.৭-৯)

কর্মাধিকারী কর্মনিষ্ঠ “যোগিগণ” এই সাত্ত্বিক ত্যাগকেই অবলম্বন করে সাধনপথে অগ্রগত হন। এরূপ আসক্তি ও

কলত্যাগ, অথবা নিকাম কর্ম্মসুষ্ঠান তাঁদের পক্ষে অত্যাশঙ্কক। কারণ, বা' পূর্বেই বলা হয়েছে, একরূপ নিকাম কর্ম্মসুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীকৃত চিন্তাশক্তি, জ্ঞানাধিকার, জ্ঞানোৎপত্তি হলে তাঁরা পরম্পরাগতভাবে মোক্ষলাভ করেন।

সেজন্যই ত্রীভঙ্গবান জীমূতগবদগীতায় বলছেন কর্ম্ম-নিষ্ঠ "যোগিদেব" উদ্দেশ্যে :

"বজ্রো হানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাগ্যং কার্ষমেব তৎ।

বজ্রো হানং তপশ্চৈব পাবনানি মনৌষিগাম্ ॥

এতানপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।"

(গীতা ১৮:৫-৬)

বজ্র, হান ও তপস্তা—এই তিনটি কর্ম্ম পরিভ্যাগ করবে না। বজ্র, হান ও তপস্তা মনৌষিগকে পবিত্র করে।

সেজন্য আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে এই সকল কর্ম্ম করা কর্তব্য। এই হ'ল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত।

এরূপে "সাংখ্য" ও "যোগী" মধ্যে সাধন-প্রণালীর দিক্ থেকে প্রভেদ হ'ল এই যে, "সাংখ্য" সর্ব-কর্ম্ম পরিভ্যাগ করে একমাত্র জ্ঞানযোগকেই আশ্রয় করেন; "যোগী" নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিকাম ভাবে সাধন করে ক্রমশঃ জ্ঞান-যোগের অধিকারী হন। সেজন্য জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে যে ভেদ, সাংখ্য ও যোগের মধ্যেও সেই ভেদ :

"লোকেহ্মনি ধিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানব।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।"

(গীতা, ৩-৩)

ভাষ্যে শব্দর পুনরায় বিশদতর ভাবে বলছেন :

"কা সা ধিবিধা নিষ্ঠা ? ইত্যাহ তত্র জ্ঞান-যোগেন জ্ঞান-মেব যোগঃ তেন সাংখ্যানাং আত্মানাত্ম-বিষয়-বিবেক-জ্ঞান-বত্যাং ব্রহ্মস্বরূপমাদেব-কৃত-সংজ্ঞাসানাং বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিষ্ঠিতার্থানাং পরমহংস পরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেব অবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্ম্মযোগেন কঠোর যোগঃ তেন কর্ম্মযোগেন যোগিনাং কমিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ৩-৩)

যাঁরা জ্ঞান-যোগকেই আশ্রয় করেছেন তাঁরাই হলেন "সাংখ্য"। তাঁরা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে মূলভূত প্রভেদ সঘর্ষে জানেন, ব্রহ্মস্বরূপমাদেব-কৃত-সংজ্ঞা প্রাপ্ত প্রহণ করেছেন পরমহংস পরিব্রাজকরূপে, বেদান্তজ্ঞানের দ্বারা পরমতত্ত্বের অর্থ উপলব্ধি করেছেন, এবং একমাত্র ব্রহ্মেই স্থিতি করেন। অপরপক্ষে, যাঁরা কর্ম্ম-যোগকেই আশ্রয় করেন, তাঁরাই হলেন "যোগী"।

এরূপে, সাধন-প্রণালীর দিক্ থেকে "সাংখ্য" ও "যোগী" মধ্যে প্রভেদ হ'ল এই যে, সাংখ্যগণ কর্ম্মনিষ্ঠা

অবলম্বন না করেই কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠার দ্বারাই মোক্ষলাভ করেন ; যোগিগণ প্রথমে কর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং তার পর জ্ঞান নিষ্ঠা অবলম্বন করে মোক্ষলাভ করেন।

পুনরায়, সাধন-কলের দিক্ থেকে "সাংখ্য" ও "যোগী" মধ্যে প্রভেদ হ'ল এই যে, সাংখ্য প্রথম থেকেই অকর্তা, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্যই ভিক্ষাচর্য। প্রমুখ কর্ম্মে রত হন (গীতা-ভাষ্য, ৪-২০) ; যোগী পরে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে অকর্তা হন এবং লোকশিক্ষা ও শিষ্টাচার রক্ষার জন্য কর্ম্মে রত হন।

(গীতা-ভাষ্য, ৪-২০, ৬-২৫—পূঃ—২২২)

পরিশেষে, সাধন-কলের দিক্ থেকে "সাংখ্য" ও "যোগী" মধ্যে প্রধানতম প্রভেদ হ'ল এই যে, সাংখ্য সাক্ষাৎভাবে সন্তোমুক্তির, কিন্তু যোগী কেবল ক্রমমুক্তির এবং পরম্পরাগত ভাবে মুক্তির অধিকারী।

এরূপে বা পূর্বেই বলা হয়েছে, "সাংখ্য" বা "জ্ঞান-মার্গাবলম্বিগণ" জ্ঞানোদয়ে তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভে যত্ন হন। অপরপক্ষে, "যোগী" বা "কর্ম্মমার্গাবলম্বিগণ" নিকাম কর্ম্ম ও সন্তোমুক্তির উপাসনার মাধ্যমে ক্রমমুক্তি, অথবা নিকাম কর্ম্মের মাধ্যমে ক্রমাগত চিন্তাশক্তি, চিন্তাশক্তির মাধ্যমে জ্ঞানাধিকার, জ্ঞানাধিকারের মাধ্যমে জ্ঞান এবং পরিশেষে জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করেন পরম্পরাগত ভাবে।

অবশ্য, এ'কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, সাক্ষাৎভাবেই হোক, পরম্পরাগত ভাবেই হোক "সাংখ্য" ও "যোগ"—উভয় মার্গই পরিশেষে সেই একই কলের সাধক ; মুক্তি বা মোক্ষ। সেজন্যই গীতা বলছেন :

"সাংখ্য-যোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবহন্তি ন পতিতাঃ।

একমপ্যাহিতঃ সম্যগুভয়োবিস্কতে কলম্ ॥"

(গীতা, ৫-৪)

"এক ব্যক্তিরাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলে থাকেন, পতিতরা নয়। এদের মধ্যে একটিমাত্রও সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত হলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়।

ভাষ্যে শব্দর বলছেন যে, "সাংখ্য" ও "যোগ", জ্ঞান ও কর্ম্ম, কর্ম্ম-ত্যাগ ও কর্ম্মসুষ্ঠান পরম্পরাবিবোধী, সেজন্য তাদের কলও পরম্পরাবিবোধী, সেজন্য উভয়েরই সেই একই মোক্ষের সাধন হতে পারে না—এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এর উত্তর হ'ল এই যে, "সাংখ্য" ও "যোগের" কল সেই একই :

"সাংখ্য-যোগো পৃথগ্ বিরুদ্ধ কলৌ বালাঃ প্রবহন্তি, ন পতিতাঃ। পতিতাস্ত জ্ঞানিন একং কলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি।"

(শব্দর-ভাষ্য, ৫-৪৪)

অজ ব্যক্তিরের মতেই সাংখ্য ও যোগের বিরুদ্ধ কল

হয়। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে, তাদের একই, অবিকল্প ফল হয়।

“যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোমৈগরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যক যোগক যঃ পশুতি সঃ পশুতি ॥”

(গীতা ভাষ্য ৫-৫)

সাংখ্য দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, যোগ দ্বারাও সেই একই স্থান লাভ হয়। যিনি সাংখ্য ও যোগকে একরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠবে যে, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে একটির অমুষ্ঠান করলেই উভয়েরই ফললাভ হবে কিরূপে? এর উত্তর হ'ল :

“যৎ সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তৎ ব্যোমৈগরপি। জ্ঞানপ্রাপ্ত্যপায়ত্বেন দৈবত্বমপ্যর্ক্য কৰ্ম্মণি আত্মনঃ ফলমনভিসঙ্কায় অমুতিষ্ঠন্তু যে তে যোগিণঃ, তৈরপি পরমার্থ জ্ঞান-সন্ন্যাস-প্রাপ্তি দ্বায়েণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ।”

(গীতা-ভাষ্য, ৫-৫)

জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাসী “সাংখ্যগণ” যে স্থান “মোক্ষ” প্রাপ্ত হন, “যোগীগণ”ও ঠিক সেই একই স্থান প্রাপ্ত হন। একরূপ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য দৈবত্বের সমস্ত বন্ধ অর্পণ করে নিকাম ভাবে যে যোগীগণ কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁরাও ক্রমশঃ পরমার্থ-জ্ঞান ও সন্ন্যাস লাভ করে মোক্ষলাভ করেন।

গীতার শেষ অধ্যায়েও, শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই বিষয়ে পুনরায় উপসংহার মুখে আলোচনা করেছেন। তিনি এস্থলে বলছেন যে, কর্ম-যোগের ফল হ'ল জ্ঞানযোগে অধিকার, এবং তার ফল হ'ল, কর্মত্যাগ, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষ।

“যা চ কর্মজা সিদ্ধিক্রতা জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতা-লক্ষণা, তস্মাৎ কৃতভূতা নৈকরম্য-সিদ্ধিঃ জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণা বক্তব্যোতি যোগ্যক আরভ্যতে।”

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৪৯)

এরূপে, কর্ম-যোগের যুক্তিক্রম হ'ল এরূপ :

কর্ম-যোগ → কর্ম-যোগসিদ্ধি অথবা জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতা → জ্ঞান-নিষ্ঠা অথবা মোক্ষ।

অর্থাৎ :

নিকাম কর্ম — চিত্তশুদ্ধি → জ্ঞানাদিকার → জ্ঞানলাভ — মোক্ষ।

পুনরায় বিশদতর ভাবে শঙ্কর গীতা-ভাষ্য শেষে বলছেন যে, কর্ম-যোগের মোক্ষ-ক্রম হ'ল এই : তাঁরা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে নিকাম ভাবে “স্বকর্ম” বা দৈবচর্চাদি কর্ম সম্পাদন করেন, তার ফলে দৈবত্বেরই অমুগ্রহে তাঁদের

দেহেপ্রিয়াদি জ্ঞান-নিষ্ঠা যোগ্যতারূপ সিদ্ধি লাভ করে; এবং এইভাবে জ্ঞান নিষ্ঠা প্রাপ্তিরূপ ক্রমের সাহায্যে তাঁরা পরিশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৫০)

সেজন্য শঙ্কর বলছেন যে, কর্ম-যোগের ফল হ'ল “সম্যাগ-দর্শন” :

“কর্মযোগ-নিষ্ঠায়াঃ পদম-বহুশ্রমীষৎপদগণস্বপদংক্রত্য অথেষ্টানীং কর্ম-যোগ-নিষ্ঠা-ফলং সম্যাগদর্শনং সর্ব-বদাস্ত-বিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ।”

(গীতা ভাষ্য, ১৮-৬৬)

কর্মযোগ নিষ্ঠার পদম বহুশ্র বা দুর্ভার হ'ল : দৈবত্বের লবণ গ্রহণ করা, এবং তার ফল হ'ল : সর্ববদাস্তবিহিত সম্যাগ-দর্শন বা ব্রহ্মাপেক্ষা।

এরূপে “সাংখ্য” ও “যোগের” পদম ও চরম ফল হ'ল ব্রহ্মাপেক্ষা বা মোক্ষ। এস্থলে সাংখ্যের অপেক্ষারূপ ক্রম ভেদ থাকলেও শেষ ফলের দিক থেকে কোনরূপ ভেদ নেই।

এই ভাবে সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও নিকাম কর্ম, কর্ম-ত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠানকে মোক্ষের দিক থেকে উপায়স্বরূপ বলে গ্রহণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যই যে যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই হ'ল শঙ্করের মত। স্বভাবতঃই, সাংখ্য ভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা, এবং প্রথমে কর্ম-নিষ্ঠা, তার মাধ্যমে জ্ঞাননিষ্ঠা—এই দুটির মধ্যে প্রথমটিই সহস্রগুণ উৎকৃষ্টতর, যেহেতু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান-নিষ্ঠাই মোক্ষের সাংক্ষাৎ সাধক। সেজন্য বিলম্ব না করে, অপর কোন সাধনের অপেক্ষা না করে যদি প্রথম থেকেই জ্ঞানমার্গে অধিকার থাকে ও জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করা যায়, তা হলে তা নিশ্চয়ই অধিকতর কাম্য। একথা শুদ্ধ জ্ঞান-বাদী শঙ্কর বাৎসবর নানা ভাবে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এ বিষয় পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

এই কারণে, শঙ্করের মতে “সাংখ্য” উচ্চাধিকারী, “যোগী” নিম্নাধিকারী। সেজন্য শঙ্কর বলছেন যে, অজ্ঞান ও নিম্নাধিকারী বলেই অভগবান তাঁর নিকট এই ভাবে ত্রীমদ্-ভগবৎগীতায় কর্ম-যোগের প্রপঞ্চনা করেছেন ও বিধান দিয়েছেন।

“রূক্ষ কঠমৈব তথ তুমিতি” চ জ্ঞাননিষ্ঠ হসন্তবমজ্ঞান স্বাবদারণেন দর্শয়িত্যাহ।”

(গীতা-ভাষ্য ৩—ভূমিক)

“ভূমি কর্মই কর”—এই উপদেশে ত্রীভগবান অজ্ঞানকে দিয়েছিলেন এই কারণে যে অজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব ছিল।

“বোধোক্তানেক পক্ষাহুতানাশক্তিযগন্তমজুর্নমজ্জং প্রতি  
বিধানাৎ ।”

(গীতা ভাষ্য, ১৮-৩)

অন্য কোন সাধন প্রণালী অবলম্বনে অক্ষম বলেই অজ্ঞ  
অজ্ঞানের জন্য এরূপ কর্মযোগের বিধান ।

এরূপে “সাংখ্য” ও “যোগের” মধ্যে মূলভূত প্রভেদ  
হ’ল, যা উপরেই বলা হয়েছে, শুদ্ধজ্ঞান এবং নিষ্কাম কর্ম  
মাধ্যমে শুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ । এস্থলে “সাংখ্য” নামটি  
দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে, এর দ্বারা মহামুনি কপিল-  
প্রপঞ্চিত প্রকৃতি পুরুষ ভেদমূলক সাংখ্যদর্শন ; এবং “যোগ”  
অর্থে মহামুনি পতঞ্জলি প্রপঞ্চিত “চিন্তা-বৃত্তি-নিবোধ” রূপ  
যোগ দর্শন । সেজন্যই এই দুটি শব্দের বিশদ ও পুনঃ পুনঃ  
ব্যাখ্যা গীতা ভাষ্যে পাওয়া যায় । যেমন শব্দর বলছেন :

“সাংখ্যঃ নাম—ইমে সত্ত্বরক্তমাসি গুণা ময়া দৃশ্তাঃ

অহং তেভ্যোহস্তঃ তদ্ ব্যাপারসাক্ষিত্বতঃ, নিত্যঃ, গুণ  
বিলক্ষণঃ আত্মেতি চিন্তনমেবসাংখ্যো যোগঃ ।”

(গীতা ভাষ্য, ৩ ২৪)

‘এই সত্ত্ব, রজস ও তমস গুণ আমি দেখছি, কিন্তু আমি  
এই গুণত্রয় থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, বরং আমি গুণত্রয়ের  
সমস্ত ব্যাপারের নিবিকার সাক্ষীই মাত্র, আমিই নিত্য, গুণ  
বিভিন্ন আত্মা’—এরূপ চিন্তার নামই হ’ল “সাংখ্যযোগ” ।

সেজন্যই, গীতার শেষ অধ্যায়ে শব্দর বলেছেন যে, এস্থলে  
“সাংখ্য” শব্দের অর্থ “বেদান্ত” ।

“সাংখ্যে জ্ঞাতব্যঃ পরার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিন শাস্ত্রে, তৎ  
সাংখ্যঃ বেদান্তঃ ।”

(গীতা ভাষ্য ১৮-১৩)

জ্ঞাতব্য বস্তু যে শাস্ত্রে সম্যক্ ভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়,  
সেই শাস্ত্রই হ’ল “সাংখ্য” অর্থাৎ “বেদান্ত” ।

## কবিকে

### ক্ৰীষ্ণুরেশ বিশ্বাস

আমি আনিয়াছি ঐতি-চন্দন,  
আমি আনিয়াছি গীতি-বন্দন,  
হে কবি, হে সখা, হে প্রেমময় মন—  
উদার দীপ্ত ললাটে তোমার পব,  
কর পল্লবে ছন্দ-অর্থ্য ধব ।

আমি আনিয়াছি মুক্ত হৃদয়  
সে-হৃদয় শুধু আমারই তো নয়,  
সে তোমার—তার কত পরিচয়  
পেয়েছি, পেতেছি আরো আমি পাব, পাব—  
তীর্থে চলেছ, আমি তব সাথে যাব ।

আমাদেরও ছিল ভাবতী-সাধনা,  
আমাদেরও ছিল অসীম কামনা,  
সীমানা ছাড়াতে ডানার প্রেরণা—  
সে-কথা বন্ধ ভুলো না, বন্ধ ভুলো না,  
কি পেয়েছি আর কি পেলাম না, ও-ভুলোনা

তোমার গুণ হৃদয়ে কলকে  
আজো শিশু মন দীপ্তি ঝলকে ;  
রাভায়ে, মাতায়ে পলকে পুলকে  
ভাবের ভুবনে রঙে রঙে কত খেলা—  
হে কবি বন্ধ আজো হেমন্ত-বেলা ।

এসো, বাছ ডোরে বৃকে বৃকে বাঁধি,

প্রথর স্বর্ঘ্য দ্বিগেছিল ধাঁধি’

ধূয়ার ছলনে এসো বসে কাঁধি—

নুপুদের শ্রমি যেটুকু শুনেছি, আহা

মধুর মধুর, তুমিও শুনেছ তাহ ।

## ঘটনা ও রটনা

### ত্রিকালীচরণ ঘোষ

সাধারণ মানুষের শব্দে বাহা ঘটে তাহার নির্জলা সত্য বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না, সামান্য কম বেশী, একটু এদিক ওদিক কখনও বা কিছু অবাস্তব কথাও ইহার মধ্যে বেঁধে আসিয়া পড়ে। ম'হুয়ের স্মৃতি, দুষ্টিভঙ্গি, ঘটনা বিস্তারিত কবিতার শক্তি, বলিবার বীতি-পদ্ধতি, নিজেব বা ঘটনা সম্পর্কীয় ব্যক্তির সহিত আত্মীয় বন্ধুরূপে পরিচয় বা বনিষ্ঠতা প্রভৃতি নানা কারণ এই ঘটনা বিবরণকালে সত্যের ব্যক্তিক্রম সাধন করিয়া থাকে।

বাহা প্রকৃত, তাহাও একই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বিবরণে নানা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। গল্প আছে, সার ওয়াশ্টাংর ফুট এক সময় টংলগুয়ে এক বিশদ ইতিহাস লেখার সঙ্কল্প করেন। একদিন পথে দেখলেন একটি ঘোড়ার গাড়ী (তখন মোটর গাড়ী ছিল না) অতি দ্রুতবেগে আসিয়া একটি পথচারীকে চাপা দিল, ঘটনাস্থলের চারিদিক ঘিরিয়া বহু লোকের ভিড় হইয়া গেল। বখানিয়মে বেশী ভাগ লোকই শফট-চালকের উপর দোষারোপ করিল। (বর্তমানে যেমন কেহ মোটর চাপা পড়িলে রাস্তার লোক আসিয়া বিনা বিচারে গাড়ীর চালককে বেদম প্রহার করে এবং গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে, সেইরূপ বিছু হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই।) কেহ বা গাড়ী-চাপা লোকটির দেহ মর্শাইল। তাকে সাহায্য করিবার জন্য মাত্র দু'একজন পাওয়া গেল, বাকি সবই নানা কোলাহলে স্থানটি মুখরিত করিয়া তুলিল। অনেকেই "বদি"র উপর অর্থাৎ বদি গাড়ীখানা আর একটু বীরে বীরে আসিত, বদি একটু দক্ষিণ বা বামদিক ঘেঁষিয়া যাইত, বদি লোকটি তাড়াতাড়ি পার হইতে চেষ্টা না করিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি, বদির উপর জোর অর্থাৎ stress বা emphasis দিতে বাস্তব হইয়া উঠিল।

ফুট সাহেবের কানে তাহার আশ-পাশের কতক আলোচনা আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ইতিহাস লিখিবেন, তাহার সম্মুখে বাহা ঘটিয়াছে, তাহারই একটা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য মাথায় "হুইবুডি" গজাইয়া উঠিল। ("হুইবুডি" কেন, তাহা পরেই বলা হইতেছে।) তিনি সামান্য একটু দূরে সরিয়া গিয়া ভিড় হইতে অপস্থতমান এক লোককে ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার সম্মানে প্রাপ্ত-জ্ঞান বিবৃত করিলেন। মধ্যে ফুট সাহেব একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নিজে দেখেছেন, না, আপনায় শোনা কথা?" ভক্তলোক নম্রমতায় বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বলেন, কি যথায়? নিজে চোখে না দেখলে আমি এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারতাম।"

তিনি আরও কয়েক ব্যক্তিকে ঐ একই কথা প্রশ্ন করিলেন,

মোটর উপর ঘটনাটির চাক্ষুশ দর্শন শুধুকে সকলেই নিশ্চিত, একের সঙ্গে অপরের বিবরণের সামান্য হইতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে এবং ফুট বাহা দেখিয়াছেন তাহা হইতে মোটামুটি সকলেই বিবরণের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তাহা উপেক্ষণীয়।

ইহাতে তাহার মনের মধ্যে এক গভীর সংশয় উপস্থিত হইল। বাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন সেই ঘটনার সহিত উপস্থিত লোকের বিবরণের মিল নাই, আর বাহা শত শত বর্ষ পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে। রাজ-রাজড়ার ব্যাপার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনার সময় কেহ উপস্থিত ছিলেন না; যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা লিপেন নাই। প্রবাদের মত মুখে মুখে যে গল্প চলিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচিত হইয়াছে এবং তাহাকেও সেই সব তথ্যের উপর নিজ ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। কথিত আছে, তাহার মাথায় অপর এক দ্রুতগতি জাগিল, দুই সপ্তাহী তাহার উপর ভর করিলেন তিনি তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপি, (যখন ফুটের লেখা এবং তাহার লিখিবার শক্তি অসাধারণ ছিল, স্মৃত্যং তাহার পরিমাণ অস্বাভাবিক: গল্পের খাতিরে ধরিয়া লওয়া গেল—(বহু শত পৃষ্ঠা ব্যাপী) ৪০ ৪০ করিয়া সাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেন। জগৎ ফুট লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে বঞ্চিত হইয়া নিশ্চয়ই এখনও হায়! হায়! করিতেছে, কেবল শব্দে তাহা শোনা যাইতেছে না।

এরূপ ঘটনা একেবারে অনিচ্ছাকৃত বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারিলেও ইহাতে কাহারও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এবং রায় বখন মনে করিতেছে শ্রাম ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তখন রায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে কিছু না বলিলে শ্রাম নিজেই নিতান্ত "বোকা" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে না, ইহা সাধারণ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

সত্য কথা বলার চেষ্টার মধ্যে আরও নানা প্রকারে বাহা অ-সত্য, সরাসরি বাহা মিথ্যা নয় এমন বিবরণও আসিয়া পড়িতে পারে। ইহাও একটা দুষ্টিভঙ্গ দেওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিত যোক্ষমূল্য (Max Muller) পদ্যমহাসদেবের দু'একটি অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া পদ্যমহাসদেবের এক পদ্য ভক্ত শিষ্যকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রচলিত কাহিনীমতে, এবং সবল বিশ্বাসে শিষ্য উহার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তাহার উত্তর হইতে এই বিষয়ে যে সন্দেহের কোনও অবকাশ আছে, তাহার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। পণ্ডিত প্রশ্ন-কর্তার ইহাতে সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। তখন তিনি বলেন, কথার কথার আসল ঘটনা তবল হইয়া আসে, ইহা "dialogue-ic process." লোক-পরম্পরায়

তিনিতে তিনিতে এবং তাহা বিবৃত করিতে খাটি সত্য কিছু কিছু মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যিনি যেমন শোনে তাহা ভাল লাগিলে এবং নিজ নজির থাকিলে মূল ঘটনা বা বিবরণে কিছু “বসান” (বসায়ন) যোগ করিবার একটা দুর্ব্বার প্রবৃত্তি মাথায় মগো গজাইয়া উঠে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষ প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আমাদের মহাভারত মহাকাব্য। এক দল পণ্ডিত আছেন, যাহাদের মতে আদি ও “অকৃত্রিম” মহাভারতে মাত্র ছাশিখ হাজার শ্লোক ছিল। ইহা ঘটনা করিতে এবং ত্রিগুণেশ্বরী তাহা লিখিয়া লইতে গলদবশত হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহাকেও আবার একটা কাহিনী বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে; কারণ তৎসাময়ী পণ্ডিতেরা বলেন, মহাভারতের যুগে কোনও লিখিত অক্ষর সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমানে মহাভারত গ্রন্থ লক্ষ লক্ষ লোক সম্পূর্ণ। গণেশ-লিখিত একখণ্ড আদি মহাভারত থাকিলে আর অতিরিক্ত চূড়ান্ত হাজার লোক সংযোজিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যাহাই হউক এইরূপ ঘটনাও খুব অস্বাভাবিক নহে। ইহাতে সাধারণ লোকের ক্ষতি ত হয় নাই, বরং জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগই হইয়াছে।

এ সকল যুগের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; মানুষ বতদিন মানুষ আছে ততদিন ইহা থাকিয়া যাইবে। আমাদের পুরাতন পুঁথিতে বর্ণিত দেবতার এই সত্য ঘটনার মোড়ক দিয়া তাঁহার যে নানা রূপ নিতে পারিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণও আছে। বর্তমানে ইহাকে যুগোপযোগী মূর্ত্তি দান করা হইয়াছে। প্রচার ইহার বহন এবং প্রেরণ আর দূতবাহু প্রকৃতি এক-আধ জন নয়, এখন সমস্ত দেশবাসী বা তাহারও বাহিরে, সমস্ত ভগবান।

অকায়ে নিজেদের গোঁব-কীর্তিকাহিনী প্রচারের জন্ত যে পথ গ্রহণ করা হইতেছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে গোঁব করিবার বিশেষ কিছু নাই; তাহা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। সত্যের বেখানে নামমাত্র স্পর্শ আছে, তাহা যথাসম্ভব সত্যের রূপ দিয়া লোকের কাছে প্রতিপন্ন করিবার একটা বিরাট অপপ্রচেষ্টা ভগবতের লোকের সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

এখানেও একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ ধরা বক্তব্যটি পবিত্র করিবার চেষ্টা করিব। ভাবতবর্ষ হইতে একদল “প্রতিনিধি” ১৯৫৯ সনের শেষভাগে সরকারী উৎসাহে “সাগর দর্শন যাত্রা”র এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি দেশভ্রমণে বাহির হন। এই দলের কার্যকলাপ এবং এই বিদেশ-ভ্রমণের মোট কলাকল সম্বন্ধে গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৯) তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী (‘সত্যমেব জয়তে’ প্রতীকের ধারক ও বাহক) রাজাসভায় কোনও এক “অ-সত্যের উত্তরে বলেন, “it was a remarkable success” ইহা আশ্চর্য বা অসাধারণরূপে সফল হইয়াছে। অর্থাৎ

যে উদ্দেশ্যে তাহারা সাগর দর্শন যাত্রার রেশ সচা করিয়াছেন, তাহাও উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সিদ্ধ হইয়াছে।

এখন এই “বিমার্কেবল সাক্সেস” যে কি তাহা বিবৃত করিলে সত্য ঘটনা এবং তাহার ঘটনা কি তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। যাহারা নিত্য সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ইহার কতকগুলি বিষয় অজ্ঞাত নয়, তথাপি এই সকল জরাজীর্ণ সাপ্তাহিকগুলি স্বতন্ত্ররূপে একবার দেখাইয়া দিলে পবে এই সাজ সম্বন্ধে একটা প্রকৃষ্ট ধারণা করিবার সুবিধা হইবে।

এই দলে মায় দুইজন পার্লামেন্টের সভ্য সমেত ৪৩৫ জন লোক সরকারী সহযোগিতায় নবতন জরাজীর্ণ বহির্গত হন। সমস্ত যাত্রার পথে ইহাদের শৃঙ্খলা পালনের বাংলাই লক্ষ্য করা যায় নাই। নূতন স্বাধীন দেশের মানুষ ইহারা, সত্যবাদী প্রত্যেকের আচরণে স্বাভাব্য প্রকাশ করাষ্ট যেন এক মহৎ উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে প্রকাশ না হইলেও কথিত: প্রমাণিত হয়। শ্রীবাবুগাও প্যাটেল এক বিখ্যাত সংবাদিক; তিনি যে সকল ঘণা সংধারণে প্রচার করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, জলতরী “সোনাবতী” কোচিনে পৌঁছিলে দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে তাঁহাদের অচরণের জন্ত জাহাজ হইতে নামিয়া বাইতে বলা হয় এবং তাঁহারাও বিনা আপত্তিতে সে অনুবোধ পালন করেন। নূতন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রভাবিত হইয়া একজন পুরুষ ও তাঁহার বান্ধবী সিংহল ত্যাগে আর কোনও উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। এই দল সিংহলে বন্দরনায়কের শব্দযাত্রার যোগদান করিয়া যে ক্রটি পরিচয় দেন, তাহাতে একজন সিংহলবাসী বিম্বিত হইয়া ভারতের মুতের প্রতি এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয় কিনা, প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন। আমরা ইহাও কি উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কষ্টপূর্ণ নিদ্রাণের বড় একটা নির্দেশ পাওয়া যাইত।

সাগর দর্শন এবং দেশের যাত্রা কিছু নয়, শ্রেয়: তাহাই বহন করিয়া লইয়া বাইবার যে প্রতিনিধিদের মুখা উদ্দেশ্য তাহারা মালয়ে পর্য্যক্রমে দল বলিয়া অবিলম্বে পরিচিতি লাভ করিয়া ভারতের সমৃদ্ধি প্রচারে সমর্থ হইলেন। বিদেশী মুদ্রা বিনিময় লাভের জন্ত প্রত্যেককে মোট পঁচাত্তর টাকা লইয়া বাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইহারা যে মাল ক্রয় করিলেন তাহা পঁচাত্তর টাকার বেশি হইতে ত্রিশগুণ দ্বয়ের অধিক। ভারতে যখন ইহারা ফিরিলেন তখন মোট ১,২২,০০০ টাকার আমদানী শুদ্ধ দিতে হইয়াছিল। ইহা প্রকাশ্য মালয়ে উপব ধাৰ্য্য করা টাকা। ব্যক্তিগত ব্যবহার, সরকারী প্রতিনিধি, প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রভৃতি কারণে কত মালয়ে উপব শুদ্ধ দিতে হইল না, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহার মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একাই ১,২৭৫ টাকা শুদ্ধ দিতে অনুবিধা বোধ করেন নাই।

এখন কৃষ্টিয় দিকটা একটু আলোচনা করা বাইতে পারে। এই প্রতিনিধি দলের সম্মানার্থে বেখানেই কোনও সভা ও ভোজের



আয়োজন করা হইয়াছে সেখানে ৪৩৫ (চার পাঁচ) জনের মধ্যে এককালে ত্রিশ জনের বেশী লোক উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মালয়ের গুজরাটী সমাজ অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে ৫০০ খানি ভোজ সাজাইয়া ছিলেন, আনন্দে বিস্ময় নিজেও ভাবতবাসীর মধ্যে একজনও উপস্থিত হন নাই। সিঙ্গাপুরে, জনশ্রুতি অনুসারে কাহাকেও কাহাকেও কুখ্যাত পল্লী-অঞ্চলে নিম্ননীয় বাবুদারের গুপ্ত পুলিশ হেপাজতে কালহরণ করিতে হইয়াছে। ভারতীয় ব'ষ্ট্রবুকের কম্বোয়ী গিরা কাহাকেও পনের ঘণ্টা বাদে পুলিশ হাজত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইহাট আমানের "novel type of adventure" নূতন ধরনের অভিযান এবং প্রধানমন্ত্রীর মতে ইহা অভাবনীয়রূপে উদ্দেশ্য সফল করিয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এই জাউন্টকার অবিলম্বে ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সৃষ্ট এবং পরিচালিত।

ভারতের সর্বমুখ্যে সত্য চাকার অভিসন্ধি লইয়া প্রচার-কার্য চলিতেছে। ইহা যে উদ্দেশ্যমূলক "অ-সত্য" তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সাধারণ ভাবে লোকে যাহাকে অসত্য বলে তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির খাচ, শিল্প-প্রয়াস ও তাহার ফলাফল, জবাব্দাতা, বৃত্ত পবিত্রতার বায় ও বায়ুগুণাতিক ফস, উচ্চতর অসম্মু অচ্যুত প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

সত্য গোপন করিয়া একটা ছদ্মরূপে তাহা বাড়িবে প্রকাশ করার রীতি মানুষের সমাজ সৃষ্টি বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। পরম্পরের মধ্যে জাগতিক বাবুদার সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া লষ্ট বেকনের একটা বিশ্বভাড়া খ্যাতি আছে। তিনি বলিলেন, তাহার শক্তিমান তাহাদের ঘনিষ্ঠ উল্লেখ বা মতামত প্রকাশে অ-সত্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সত্য ঘটনা গোপন করা বা যাহা ঘটে নাই তাহা চেনা করিয়া বলা (Dissimulation and simulation), অথবা বাহাই হটক কোনও বকমে তাহা প্রকাশ না করা (Reserve), মানুষ এটা তিনটি পথের একটি বা একাধিক অবলম্বন করিতে পারে।

ডিসসিমিলেশন বা সিমিলেশন দুর্বলের আশ্রয়। ইহার প্রয়োগবিধি বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে সক্ষম করিতে হয়, সুতরাং ইহা বড়তর প্রয়োগে সফল অপেক্ষা কুফল প্রসব করে বেশী। তাহার শক্তিমান, কর্মপটু তাহাদের উজ্জ্বল ও আচরণ সকলের সমক্ষে সূর্যালোকের জায় লম্ভি হইয়া উঠে। বাহাদের গভীর মত বেশী, তাহাদের খোলস ততই প্রয়োজন; দ্ব্যর্থবোধিত বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ তাহাদের গত্যন্তর নাই।

ছলনা বা পাতলা অথচ পর্দার আড়ালে সত্যকে গোপন করা যে একেবারে নিফল তাহা বলা যায় না। তাহার সবল বিশ্বাসী তাহার উচ্চপদস্থ, বিতর্কালী, বক্তৃতাবাগীশ লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহাতে বড় সুরিধা, জনসাধারণের একটা বড় অংশের নিকট হইতে কোনও প্রতিবাদ শোনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই দ্ব্যর্থবোধিত বাক্যের আশ্রয়ে প্রয়োজনকালে মৃণ্য হইতে গৌণ

অপ্রকাশিত অর্থের সাহায্য লওয়া বাইতে পারে। আর না হয় "খুড়ি" বলিয়া একেবারে ভিন্ন মত প্রকাশ করা অসম্ভব নয়।

প্রকৃত ঘটনা আর তাহার প্রচারে এত পার্থক্য পাড়াইতেছে যে, লোক বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সারা জগৎ জুড়িয়া এই এক খেলার অভিনয় ভিন্ন ভিন্ন খাতে চলিতেছে। তাহার শক্তিমান, তাহাদের ভাষণে, অধিদমাত্রায় অ-সত্যের অংশ লক্ষ্য করা যায়। সমাস্কর্ষণ অপ্রাকৃত বস্তু সত্য বলিয়া প্রচারে রাষ্ট্রের কর্তব্যবাদের আশ্রয়বাস লম্ব হইয়া পড়ে, বক্তৃতা নানাক্রমে অসুরিধার মধ্যে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে দুই-একটি বস্তু সম্পর্ক ছেদ করিয়া চলিয়া যায়। প্রধান ক্ষতি, অবিচার্য্য সেকট ক্রম অবিচার্য্য হইয়া উঠে। যিনি যত উচ্চ নৈতিকগুণে পদে আসীন থাকেন, তাহার সত্য-বিচার্য্য উচ্চ সমাজ ও রাষ্ট্রের এত অবিচার্য্য সত্যন করিয়া থাকে।

আজ ভারতের বহু বিপদের সূচনী হইয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রধানদিক্বে প্রতি সাধারণ লোকের অস্থির অভাব। যাহা শোনা যায়, কাহাকেও তাহার বাস্তবিক মাত্রা এত বেশী যে, তাহাতে লোক অনাস্থ্য হইতে বিরূপ মনোভাব অঙ্কন করিতে থাকে। অববর্ত উচ্চতর ঘটনা হইতে মিথ্যা ঘটনার বাহুল্য, সমস্ত ভারতের চরিত্র আজ মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িতেছে। অ-সত্য কথা বলিয়া, দুর্ভাষি, শঠতার আর কেহ চক্ষু মমূভব করে না। যখন মানুষের লজ্জা-সংকটের আবরণ ধরা যায়, "দুর্কান কাণ" লোকের মত তাহার প্রেমের মধ্য দিয়া বুক ফুলাইয়া চলিতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই শঠের প্রাপ্য বলিয়া দেশের ঘোর দুর্দিন বুঝিতে অসুরিধা হয় না।

অপর যা রাষ্ট্রীয় একটি পথ চরিত্র্য্যে, তাহা লষ্ট বেকনের মতে "রিজার্ভ", বহু মনে তাহাকে (বক্তৃতা) সংযম বলিয়া উল্লেখ করা বাইতে পারে। বহু কথা যাহাকে বলিতে হয়, পণ্ডিতরা বলেন, তাহার কথার মধ্যে সাধারণ নিয়মেই বহু মিথ্যা আসিয়া পড়িতে বাধ্য। আর কিছু না হটক লক্ষ্য-চোড়া কথা যে ভবিষ্যৎ বাস্তব ঘটনার সহিত না-মিলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে থাকে না। আবেগের ভরে, বিশেষতঃ ঘন ঘন কর্মজাগি পাঠিলে, মানুষ নিজ শক্তির কথা ভুলিয়া যায়। ইহার প্রতিকার আছে বাক্য সংযমে বা সম্পূর্ণ তুচ্ছভাব। অগ্রপশ্চাত্ত বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হইলে সদাসংকল্প বাস্তব করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আর যেখানে ঘটনা এক এবং অবস্থার গতিকে বলিতে হয় আর সেখানে কোনও কথা না বলিয়া বৎ মুক বা অস্বাভাবী দুর্গম লওয়া শ্রেয়ঃ; সকল কথার উত্তর দিয়া 'সবজান্তা' হওয়ার বাহুল্যই গ্রহণের চোড়া করা সমীচীন নয়। যে সকল শ্রোতা প্রকৃত ঘটনা জানে, বা লম্বই লোকের জ্ঞানজানি হইয়া পড়িবে, সে ক্ষেত্রে বাক্য-সংযম করাই একমাত্র পথ, অলম্ব্য সত্য কথা বলিয়া দোষ স্বীকার করার কোনও দোষ নাই।

সাধারণ লোক হইতে প্রধানতম রাজপুরুষ পর্যন্ত একটু বিচার-বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে না শিখিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিনিয়মে ভাঙন ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

## পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

এম (আটপুঘা) অবস্থানকালে পল্লী অঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের সর্ববিষয়ে দুর্ব্যবহার সম্পূর্ণ হইতে হইয়াছিল। স্থানীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে কত অভিভাবকের, কত ছাত্রের বিদ্যালয়ের বেতন মুকুব করিবার কাতর মিনতি শুনিতে হইয়াছিল এবং কত চিঠি পাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে, ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলাম, পল্লী অঞ্চলের সকলস্তরের মানুষদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থেও এই কথা বলা যায়। কত অসহায়, দীনদরিদ্র বিধবা পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছেন, তাহার নিদর্শন নিম্নের চিঠিখানিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ চিঠি অনেক পাইয়াছি। কিন্তু সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়া আর বিশেষ কিছুই সাহায্য করিতে সক্ষম হই নাই।

মাননীয় আটপুঘা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মহাশয় সমীপে—

মহাশয়, আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার পুত্র শ্রীমান নিমাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় আটপুঘা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ইহার ১৯৫৮-৫৯ এই দুই বৎসরের মাহিনা বাকী আছে। আমি অতি দরিদ্র বিধবা, কোনও বকমে ঋণিকশ্রমের দ্বারা এমের লোকের মুড়ি ভাজিয়া ও খান ভানিয়া দিনা দিনপাত করিয়া থাকি। সেই জন্য আমার পক্ষে এই বিদ্যালয়ের বেতনভার বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা ছাড়া আমার আর কোনও সক্তি নাই, বাহার দ্বারা আমি ইহার বিদ্যালয়ের বেতন দিতে সমর্থ হই। এজন্য আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, গম্যাকে সম্পূর্ণ ভাবে এই ঋণজাল হইতে মুক্তিদান করিতে ইবে। না করিলে, আমি কোনও প্রকারে ঐ বেতন দিতে সমর্থ হি। দয়া করিয়া, আপনি এই দরিদ্র বিধবার সুব্যবস্থা হিবেন। আশা করি, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা হিবেন। অপরাধ মার্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক কালীবালা দেবী

গ্রাম সোমনগর : জেলা হুগলী।

তাং ৩০ ১২ ৫৯

পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহেও বিশ্বখ্যা দেখা দিয়াছে। সহরের তীর্থ না হইলেও, পল্লী অঞ্চলের পক্ষে উঠাকে তীর্থ বলিতেই বে। স্থানীয় বিদ্যালয়েও কিছুদিন পূর্বে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা পিয়াছিল। কাহাদের প্রয়োচনার ছাত্রেরা এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল পন করিয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যালয়ের পদকরূপে, বিনা দিখায় বলিতে পারি, বিনা কারণে, কর্তব্য-

পরায়ণ, ছাত্রদের প্রতি দয়বান, প্রবীণ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেই বিকোতটা বোঁদী ছিল। সেই সময়, নিজের প্রধান শিক্ষকের বৈর্যের সীমা দেখিয়া বিমিত হইয়াছিলাম। কিন্তু, প্রধান শিক্ষকই জয়-লাভ করিয়াছেন। সেই উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের একজন প্রধান নেতার প্রধান শিক্ষককে লেখা, নিম্নোক্ত চিঠি পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে। মনে হয়, এইরূপ অশুভগু ছাত্রের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু, তাহাদের সংস্কারের অভাবে, তাহারা তাহাদের হুংর ও মনোবেদনা এইরূপ ভাবে প্রকাশিত করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে, ইহা মনে করাও ভুল হইবে না যে, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতঃই সং, কিন্তু বাহিরের প্রভাবে—তাহারা বিপক্ষে পরিচালিত হয়। কলিকাতার সহিত যুক্ত কোনও স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতেও এইরূপ চিঠি পাইয়াছি।

“অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণামান্তে,

মহাশয় মশাই, আশা করি আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বার্তা। আজ বহুদিন হ'ল, আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করে উঠতে পারলাম না। তাই আজ আমার বিড়ম্বিত জীবনটায় শান্তিলাভের জন্যে পত্রের মাধ্যমে আপনার শুভাশীষ কামনা করছি। যদিও জানি যে, আপনার কাছে না চাওয়াতেই আমরা অস্বাচ্ছিতেই শুভাশীষ পেয়ে থাকি, কিন্তু তবুও আমার মন আজ অশান্ত ভাবে ছুটে চলতে চায় ঐ জিনিসটি সর্বোচ্চে পাওয়ার আশায়। কারণ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি গত ১৯৫৯ সনের আই. কম. পরীক্ষার আমার অধ্যয়ন-জীবনে সর্বপ্রথম মসৌর ভুলি আচড় কেটেছি—তাও আবার Commercial Geography Paper-এ—যেটা আমার ছাত্রজীবনের প্রিয়পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এ রকম অভাবনীয় বিপর্যয়ের জন্যে সত্যিই এখন আমার নিজের-উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তবুও আবার আগামী ১৯৬০ সনের জন্যে তৈরী হচ্ছি। আজ আমাদের Test-এর Result বের হওয়ার পর University Examination Fees দিতে যাচ্ছি। তাই সর্বোচ্চে চাই, আপনাদের মত শুভর অশেষ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। কারণ, কোন শুভকাজে গুরু আশীষ না পেলে কিছু সিদ্ধ হয় না। আশা করি অতি সত্ত্বর আপনার স্নেহাশীষ লাভ করব।

আমার ছাত্র জীবনের শেষ ক দিনের জন্যে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতার চরম শিখরে উঠে আপনাদের অনেক বাধা দিয়েছি, তাই আজ তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছি বোধ হয়। জানি না, এম জন্যে

এখনও কত দিন অশান্তির জালা ভোগ করতে হবে? তখন আমার কি এতটুকুও বুঝি ছিল না, বা দিয়ে নিজের আত্মার উন্নতি করে একজন প্রকৃত ছাত্রের আদর্শ স্থাপন করি? সুতরাং তার এ বকম দুর্গতি হবে না ত—হবে কায়?? সত্যিই মাঠার মশাই, আজ আমার বিগত জীবনের ঘটনাবলীগুলো আলোচনা করে এক অসহ্য অমুশোচনাপূর্ণ জালায় স্থগি কয়েছি।

আমি দেশে গেলেও উপেনবাবুর স্মৃতি আমাকে আর এক প্রকার দুঃখের মাঝে কেলে দেয়। উপেনবাবু যে আমাদের মাঝ থেকে হঠাৎ সবে বাবেন, তাও এক আশ্চর্য্য বকয়ের কাণ্ড—নিষ্ঠুরা নিয়তি দেবীর নীতি। আজ আমি ভাবছি যে, উপেনবাবুর আত্মার কাছে—আমি ব্যক্তিগতভাবে কি কৈকিয়ৎ দেব? ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি ভালবাসি আটপুর স্কুলের ছাত্রদের আর শ্রদ্ধা করি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের। তাই ছুটে বেতে চাই আটপুরের দিকে, কিন্তু আজ গত ছ'মাস হ'ল আমার সে গতি সম্ভব করে দিয়েছে—গত পরীক্ষার ফল। আমার পরিকল্পিত নীতি নিয়ে দ্ব্যবহাটার প্রাক্তন ছাত্রসমাজ তাদের স্কুলে এক সভার আয়োজন করে আমাকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি আমার স্কুলেই সে বকম ঐতিহাসিক আয়োজন করতে পেলাম না—তার আগেই দ্ব্যবহাটার

ছাত্রেরা করে কেলল। আমি ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই উচ্চ পরিকল্পনা ওদের (দ্ব্যবহাটার ছাত্র) কাছে স্থাপন করে-ছিলাম। এটাও আমার ব্যক্তিগত জীবনে আর এক পরাজয়। বাক্, আপনাদের শুভাশীষ যদি পাই, তা হলে আমরাও (প্রাক্তন ছাত্রেরা) স্কুলের উন্নতির ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাণ ঢেলে স্কুলের সেবা করার সুযোগ পাব।

আমি এখন থেকে আগ'মীকাল দেশে বাছি। এখন, অর্থাৎ Final Examination পর্যন্ত বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করার আশা করছি। কারণ এখন ত আর আমাদের ক্লেশ হবে না। সুতরাং এখানে থেকে এখন শুধু (বরচ বাড়ানোর ক্ষেত্রে) কর্তব্যবদ্ধ-জীবনে পড়াশোনা ভাল লাগে না। তাই "টিউশনি" ছেড়ে দিয়েই চলে বাছি—আপনাদের আশীর্বাদের ভরসা নিয়ে।

তাই সর্ব্বাঙ্গে আশা করি, আমার এই ধোঁরা-মোছা আজকের শুভ দিনে আপনার আন্তরিক স্বেচ্ছাশীষ :

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন, আর অস্ত্রান্ত মাঠারমশাইদিককে আমার প্রণাম জানাবেন। স্কুলের সমস্ত ভাই-বোনকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে এবং বাড়ীর ঠিকানায় আপনার শুভাশীষপূর্ণ করুণার আশা নিয়ে পুনরায় প্রণামান্তে—ইতি

আপনার ছাত্র, ২৮-১২-১০৫০

## স্বীকৃতি

### ত্রীনচিকেতা সুরদাজ

একটি আকাশ থাক চেতনার চবিত্ত নির্মাণে।

তোমার স্মৃতির বং ঝঙ্ক ঝঙ্ক তবে মেয়ে

নির্জন আকাশে নীল বৃষ্টির মত সারাদিন,

(প্রেমের প্রতিভা সব মেঘ হয়ে ঝঙ্ক এখানে)।

যে সব কান্নার বীজ হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে

তুমি তাকে মুক্তি দাও—তারা সব সৃষ্টিতে প্রবীণ

হোক। এই ত এ পৃথিবীর আদিম স্বভাব :

আমাকে বাজাও তুমি যন্ত্রণার নিপুণ আঙুলে

আমাকে উত্তীর্ণ কর ; সময়ের সাক্ষাতিক ধূলে

সন্ধ্যার অন্তগৌ হোক,—তার পর তুমি তাকে পাবে।

হে পৃথিবী, হে আকাশ হে আমার ধূসর সময়—

তোমাদের সব সত্ত্ব মেনেছি প্রসন্ন পরাভবে।

কান্নার বৃষ্টিরা ছাড়া আঙুরেরা হয় না নিটোল,

নিভৃত নরম মোমে রূপ হয় রাত্রির আকাশ।

এখন তোমাকে আমি মেনে নেব ; আর আমি ভয়

করব না : যন্ত্রণার কাকুকাটে প্রত্যাহের শবে

রূপ দেব ; হ'হাতে ছড়াব বং-বাল।

এই কথা বলে গেল যৌবনের শালীন বাতাস,—

"যন্ত্রণা উজ্জল হাহ কখন যে হাঁবে হয় কাচ

আমরা জানি না। তবু খনির অতল অন্ধকারে,

গলে গলে রূপ নেয় সোনার উজ্জল অতিলাষ।"

সময়ের হাতে শেলে ফিরে পাব লাভ্যপ্রভাবে—

সে আমার শুদ্ধ মন—হিংস্র স্রষ্টার স্বভাব—

যন্ত্রণা নিষিল বিখে সৃষ্টির আদিম উত্তাপ।

# মানসিক স্বাস্থ্য

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

বর্তমানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যতগুলি সমস্যা আছে তাহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে মানসিক রোগের সমস্যা। ক্যানসার, হৃদরোগ এবং ক্ষয়রোগ এই তিন মিলাইয়া হাসপাতালে যতগুলি বেডের দরকার হয় উন্নাদ বোগীরা তদপেক্ষা বেশী বেড দখল করিয়া আছে। মানসিক রোগের ক্ষয় হাসপাতালে (চলতি ভাষায় পাগলা গারদে) যেখানে একটি বোগী স্থান পায় বাহিরে এরূপ বোগীর স্থলে অন্ততঃ দুই বোগী বসিয়াছে যাহাদের হাসপাতালেও পার্শ্ববাসী মত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই অথচ স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখের সংসার বাস করিতে পারে এরূপ অবস্থাও নয়।

বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মোটসংখ্যা পৃথিবীতে কত তাহা অবশ্য জানা যায় না, কিন্তু যে সকল দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের তৎপরতা উন্নত ধরনের (যথা ইউরোপ ও আমেরিকা) সেই সকল দেশে হাসপাতালের অর্ধেক বিছানা মানসিক-বোগীতে ভর্তি। আর বড় বড় সাধারণ হাসপাতালের বহিঃবিভাগে যাহারা চিকিৎসিত হয় সেই সকল বোগীর এক-তৃতীয়াংশ বা বয়ঃ উচারও বেশী মানসিক রোগের ক্ষয়ই সেখানে যায়।

ইউরোপের হাসপাতালে মানসিক বোগীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালের এরূপ বোগীর সংখ্যা ৬,০০,০০০ লক্ষ। প্রত্যেক বোল্ডন লোকের মধ্যে একজনের কোন না কোনরূপ মানসিক অস্থিরতা আছেই। হল্যান্ডে প্রতি এক-সহস্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মোটামুটি ৩৫ জনের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে জাপান, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং সুইটজারল্যান্ড আত্মহত্যার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, স্বাস্থ্যসেবা হারাণাতি ভাবে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সুইডেন অপেক্ষা দশগুণ, ইংলণ্ড হইতে পাঁচগুণ সুরা পান করে।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক আলোচনা সভায় ঘোষণা করা হইয়াছিল, “মানসিক ও ভাবপ্রবণতার ক্ষয় যে পরিমাণ সামাজিক ব্যাধি আছে (যথা অল্প বয়স্কের অপরাধ-প্রবণতা, পানদৌষ, অজ্ঞান নেশা, আত্মহত্যা প্রভৃতি), মামুলি উন্নাদ রোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার পরিমাণ এত বেশী যে, এরূপ অবস্থাকে মহামারীর অবস্থা বলিয়া ঘোষণা এবং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়।” ঘোষণার পর কয়েক বৎসর গত হইলেও পৃথিবীর অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।

মানসিক রোগ আজ ব্যাপকভাবে সমস্ত জনগণের মধ্যে ছড়াইয়াছে। আশার কথা ইহার চিকিৎসা বিষয়ে বহু উন্নতি হইয়াছে। জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতা ও উদ্বেগ সঙ্কেত (কাগজ ইহা হইতেই অনেক সময় মানসিক রোগ জন্মে) মানুষ সজাগ হইতেছে। আমাদের অনেকের জীবনেই এরূপ অনেক ছোটখাট ঘটনা হয় যাহাতে মানসিক শক্তি বাহত হয়। পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক সঙ্কেত বিক্ষুব্ধ হয় এবং কর্মক্ষমতাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের সকল সময়ই মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক জীবনের বহু সমস্যাই মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, স্নায়ু সম্পর্কীয় সমস্যা, যদিও অপাতদৃষ্টিতে ঐগুলিকে ভয়, সাহসের অভাব, অসংযম, ঘৃণা ও ভাবপ্রবণতার সমস্যা বলিয়া মনে হয়।

সকল লোকেরই বর্তমানের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ও উচার করা সঙ্কেত অবহিত হওয়া উচিত। বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এই দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান (UNESCO), জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়ে World Federation of Mental Health নামক একটা সংস্থা গঠন করিয়াছে এবং বৎসরটিকে World Mental Health, Year 1959-60, এই নামে অভিহিত করিতেছে।

গত এপ্রিল, ১৯৫৯ হইতে ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য বৎসর’ শুরু হইয়াছে এবং ইহা ১৮ মাস পর্যন্ত চলিবে—কর্মসূচীতে বহিঃক্ষেত্রে—গবেষণা, তথ্যায়ুসন্ধান, জনসাধারণকে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জাগ্রত করা এবং শিক্ষাদান।

শত শত বৎসর ধরিয়া মানসিক রোগজ্ঞকে ‘পাগল’ বা ‘উন্নাদ’ আখ্যা দিয়া গারদে আটক রাখা হইত, পায়ে বেড়ি দেওয়া হইত। মানসিক রোগ সম্পর্কে পুরাতন ভীতি সমাজ আজ ধীরে ধীরে বর্জন করিতে চলিয়াছে—অজ্ঞান বোগের মত মানসিক রোগও নিরাময় হয়, এই ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যদি রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসায় ব্যবস্থা করা যায় তবে শতকরা ৮০টি বোগীর নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক রোগমুক্ত এই সকল নদ-নারী আবার সমাজে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলে পৃথিবীর কল্যাণ হইবে।

## অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৩১

ঘুম হইতে উঠিয়া মস্তবড় একটা হাই তুলিয়া তিলকা প্রগ্র করে, “জ্যেগে আছি সু গো, উঠি নি যে এখনও, অশুখ কবেছে বুঝি?”

ছেঁড়া কাঁধাখানায় সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া কুকিয়া শুইয়াছিল, তিলকার ডাকে সাড়া দিয়া বলে, “হুঁ।”

ষাটিয়া হইতে নামিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাছে আসিয়া কুকিয়ার কপালে হাত দিয়া তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, “উঃ, কপালটা ত বড় তেতেছে গো, জ্বর এসেছে যে।”

কুকিয়া কোন জবাব দেয় না। তিলকা বলে, “তুই যেন উঠি নি, চুপ করে শুয়ে থাক, আমি যা হয় করব এখন।”

তিলকা কলশীতে হাত দিয়া দেখে তাহাতে জল নাই। জল না হইলে চলিবে না, কলশীটা তুলিয়া লইয়া তিলকা জল আনিতে বাহিরে চলিয়া যায়। কুকিয়া এইবার কোন মতে উঠিয়া দেখালে ঠেস দিয়া বলে। রাত্রে ঘটনাটা হৃৎপত্রের মত এখনও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। অসাড় আহত হাতখানা কালের উপর লইয়া সে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে সে চোখ মেলিয়া তাকায়, কোলের কাছে ছেলের তখনও ঘুমাইয়া আছে, কুকিয়া তাহার গায়ের উপর হাত রাখে। নিজেকে সে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। এই ছোট্ট বরখানা এতদিন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকে বিবিয়া নিরাপদে রাখিয়াছে, আজ যেন তাহার কোলে বসিয়াও সে শান্তি পায় না। ধীরে ধীরে নিজের প্রতি একটা অপরিণীত যুগা মনের মধ্যে বনাইয়া ওঠে, সে ভাবে, কেন তাহার জন্ম হইয়াছিল, কি প্রয়োজন ছিল এই দীন-দরিদ্র জীবনটার।

বেলা হইয়াছে, পথে মানুষ চলিতেছে, গাছে পাখী ডাকিতেছে, বাহিরে বজ্র আলো, অথচ কুকিয়ার মন সমুচিত হইয়া আসে, লোকজন, আলো হইতে সে নিজেকে আড়াল করিতে চায়, সে যেন আলোর মানুষ নহে, অন্ধকারের জীব। একদিন সে এই অন্ধকার হইতে, এই চরম দুঃখ-দারিদ্র্য হইতে গুলবার হাত ধরিয়া পলাইয়া বাচিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহার সে ইচ্ছা নাই, আজ সে বাচিতে চায় না, মরিতে চায়।

গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরে জল নাই। তিলকা এখনও আসে নাই। হঠাৎ একটা সম্ভ্রম তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারে, রাত্রে ব্যাপারটা যদি জানাজানি হইয়া গিয়া থাকে, হাতে হাতে ধরিতে না পারিলেও যদি কেউ তাহাকে চিনিতে পারিয়া থাকে? সম্ভ্রমটা ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত মনকে জুড়িয়া বসে।

তিলকা আসিয়া ঘরে ঢোকে, জলের কলশীটা নামাইয়া রাখিয়া বলে, “একটা কথা শুনে এলাম গো!” কুকিয়ার ভিতরটা কাঁপিয়া ওঠে, কি কথা শুনিয়া আসিয়াছে তিলকা?

তিলকা বলে, “গোবিন্দ মহতোর ক্ষেত থেকে রাতে মাক্কা চুরি হয়েছে। চোর ধরা পড়ে নি, সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে, একটা বোরা আর কান্ডে ফেলে গেছে। বোরা, কান্ডে গোবিন্দ মহতো চিনেছে।”

কুকিয়া কোন কথা বলে না, চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে, সে কিছু শুনিতে চায় না।

তিলকা কাছে আসিয়া বলে, “গোবিন্দ বলে বেড়াচ্ছে এ লালমনিয়ার কাজ। হাতে হাতে ধরতে না পারলেও সে তাকে ছাড়বে না, এমন শিক্ষা নাকি দিয়ে দেবে যা সে জীবনে ভুলবে না।”

কুকিয়া এইবার চোখ মেলে, বুকের উপর হইতে একটা ভারী বোঝা হঠাৎ নামিয়া যায়, ক্ষীণকণ্ঠে বলে, “বড় তেট্টা পেয়েছে, এক ষট জল দে গো।”

তিলকা জল আনিয়া কুকিয়ার হাতে দেয়, সে এক চুমুকে ষটিটা প্রায় খালি করিয়া ফেলে। তিলকা বলে, “তুই শুয়ে থাক, আমি সব করে নেব।”

গরীবের সংসারে পুরুষেরা ঘরের কাজে মেয়েদের মতই পটু। তিলকা ঘর কাঁট দেয়, বাসন মাজে, উত্তুন ধরাইয়া মাক্কার লপসা রাখিবার আয়োজন করে। মাটির হাঁড়িটা উত্তনের উপর চাপাইয়া সে গভীরাত্রে চুরির গল্পা আবার শুরু করে, বলে, “গোবিন্দ মহতোর লোকেরা ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে বসেছিল, চুপি চুপি কখন এসে লালমনিয়া মাক্কা কাটতে লেগেছে ওরা তা টের পায় নি, মেঘ করে নাকি বোর আঁধার হয়েছিল। হ্যাঁ গো, চোরেদের ভয়ডর নাই?”

কুকিয়া এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না, তিলকা বলিয়া চলে, “আওয়াজ শুনে ওরা তেড়ে যায় কিন্তু ধরতে পারে না,

হাতের বেলা মাঠের মাঝখানে চোর ধরা কি সহজ কথা গো, বললে লাঠি ছুঁড়ে ঘেরছিল, মাথায় লাগলে বাপধনকে আর উঠতে হ'ত না।”

কুকিয়া মাথাটা আবার ঝিম ঝিম করে, সে শুইয়া পড়ে। মনের মধ্যে কত রকম চিন্তা আসিয়া ভিড় করে, আহা! বেচারী লালমনিয়া, চুরির অপবাদটা তাহার ঝড়ে গিয়া পড়িয়াছে অথচ সে চোর নয়। লালমনিয়া ও তাহার জীব একটা বদনাম আছে, কোথাও চুরি হইলে গ্রামের লোক প্রথমে তাহেই সন্দেহ করে। এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইয়াছে কুকিয়া তাহা বুঝিতে পারে। লালমনিয়ার গরীব, তাহার উপর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, সর্বদাই তাহাদের ঘরে অভাব লাগিয়া থাকে, এক বেলা খাইলে অল্প বেলা উপোস করে। অনেকগুলি অনাহার-শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া যাহার বখেট আছে তাহার অধিকার হইতে লালমনিয়া ছ'এক দানা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া আনে, ইহারই নাম চুরি। কুকিয়াও ত কৃষ্ণবানী আর শিশুপুত্রের মুখ চাহিয়া গোবিন্দ মহতের ক্ষেত হইতে ছ'চার দানা মাক্কা আনিতে গিয়াছিল, সেও চোর। তাহার মনে পড়ে গত বৎসর লালমনিয়ার বউ লক্ষ্যাব অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া কাঁঠাল চুরি করিতে মতি গোপের কাঁঠালগাছে উঠিয়াছিল। মতি গোপ স্বংগ ছিল, চাঁৎকার করিয়া গাছতলার লোক জমা করিয়া ফেলে, বেচারী লালমনিয়ার বউ নামিয়া পলাইবার সুযোগ পায় না, গাছের উপর কাঁঠ হইয়া বসিয়া থাকে। শেষে অবশ্য নামিতেই হয়, জীলোক বসিয়া কেহ গায়ে হাত দেয় না, কিন্তু গালাগালি দিয়া খেদ মিটাইয়া নেয়। কুকিয়া সেদিন ভাবিয়াছিল, বউটা এমন অপমানের পরেও কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে, গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই কেন? আজ সে প্রশ্নের জবাব মিলিল। ছেলেকে কোলের কাছে টানিয়া কুকিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে।

৩২

সাবাদিন ও সাবাবাতের বিশ্রামের পর ভোরবেলা কুকিয়ার হাতের ব্যথা কমিয়া যায়, সে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। উঠিয়া দরজা খুলিতেই তিলকার ঘুম ভাঙিয়া যায়, সে চোঁচাইয়া বলে, “কেমন আছিস গো—উঠে পড়িল যে?” কুকিয়া বলে, “ভাল আছি।” তারপরে বাহিরে দৌড়-প্রাণিত আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়।

তিলকাও উঠিয়া আসে, চারিদিকে তাকাইয়া বলে, “আহা, কি সুন্দর দিন গো।”

দিনটা এত সুন্দর যে কুকিয়ার মনও খুশী হইয়া ওঠে, পৃথিবীর দিকে সেও মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া দেখে। পশুর মত

গরীবের প্রাণ বড় কঠিন, দারিদ্র্যের নির্দয় পেষণে সে সহজে মরে না, তাহাদের মনের স্বাস্থ্যও তেমনি মজবুত, সহজে ভাঙিয়া পড়ে না, অল্পেতেই খুশী হইয়া যায়।

খুশীমনে আঙিনায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিলকা বৈশির কোঁটাটি খুলিয়া দেখে কোঁটা শূন্য, তবু কোঁটা উলটাইয়া হাতের উপর বারকয়েক ঝাড়ে, কিন্তু কিছুই যখন পড়ে না, তখন আবার সেটাকে বন্ধ করিয়া ট্যাঁকে জুড়িয়া রাখে। কুকিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করে, তাহার চোখে চোখ পড়িতেই তিলকা স্নানভাবে একটু হাসিয়া বলে, “এক পাতা তামাক কতকাল চলবে বল, ফুরিয়ে গেছে।”

কুকিয়া কোন জবাব দেয় না, তাহারও মুখ স্নান হইয়া আসে, সে জানে তাহার সবকটা হাড়ি উলটাইয়া ঝাড়িলেও আজ এক দানা অন্ন পড়বে না। এত আলো তাহার ভাল লাগে না, সে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া ঢাকে, কিন্তু সেখানেও সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে ন, শূন্য কলশটা লইয়া আবার বাহিরে আসে।

তিলকা চোঁচাইয়া ওঠে, “এই দেখ, তুই কেন বাবি জল আনতে। একদিনের জরে তোকে বড্ড কাবু করেছে গো, দে কলশটা, আমি ঝাছি।” কুকিয়ার হাত হইতে কলশটা কাড়িয়া লইয়া তিলকা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া যায়।

কুকিয়া ছোরগোড়ায় বসিয়া থাকে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে তাহার কোন কাজ নাই। অতীতের কথা তাহার মনে পড়ে, সেও একদিন দশজনের মতই ছিল, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজের মধ্যে এক মুহূর্ত ফুরানু ছিল না। এখন তাহার ছুট, সাবাদিন গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে।

খানিক পরে জলের কলশী লইয়া তিলকা আঙিনায় ঢাকে, কেমন একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া কলশীটা কুকিয়ার সামনে রাখে। তিলকার ব্যস্ততার কারণ কুকিয়া বুঝিতে পারে না। তিলকা কাছে আসিয়া রূপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, “ওগো শোন, তোকে একটা খবর দিতে ছুটে এলাম।”

কুকিয়া অশ্রু হইয়া তিলকার মুখের দিকে তাকায়। তিলকা বলে, “শোন গো, ভগবান আমাদের ছুঁছুঁ দেখে দয়া করেছেন।”

তিলকার কথার সুরে কুকিয়া অবাক হইয়া যায়, যে সুরের সন্ধে এতদিন সে পবিত্রিত এত সে সুর নয়। তিলকা পরম উৎসাহের সঙ্গে বলে, “ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, তা না হলে ঘরে এসে কাজ দেয়, সেও আবার আমার মত খোঁড়া লোকের সাধ্যমত।”

কুকিয়া এইবার বলে, “কি হয়েছে ভাল করে বল। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।”

তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া তিলকা বলে, “শুনলে তুই বিশ্বাস করবি নে কিন্তু সত্যিই বোজগারের উপায় হয়েছে গো। কলসী নিয়ে জল আনতে চলেছি, দেখি আকলু মুদীর দোকানের সামনে ভীড় জমেছে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকলুর খাটিয়ার উপর এক এই মোটা কাচ্ছি ঠিকাদার বসে আছে, বলছে—সরকার ইন্টেনশন থেকে মহাঘড়ি পর্যন্ত পাকা সড়ক করবে, সে সড়ক যাবে আমাদের গাঁয়ের পূর্ব দ্বিগে। সড়কের জন্ত পান্থর ভাঙবার ঠিকা নিয়েছে কাচ্ছি ঠিকাদার। পান্থর ভাঙতে হবে গো, ঐ আমাদের গাঁয়ের পূর্ব দ্বিগের মাঠে বসে পান্থর ভাঙতে হবে, বসে বসে কাজ। আবার নগর কারবার, গাধামেপে হস্তা হস্তা পরমা দেবে। আহা, ভগবানের কি দয়া গো।”

খবরটা এত ভাল যে কুকিয়া তাহা মোটেই বিশ্বাস করিতে চায় না, সন্দেহের সঙ্গে বলে, “কি বলেছিল, ভাল করে শুনেছিস ত?”

ঘাড় নাড়িয়া তিলকা বলে, “হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শুনেছি বই কি, তাই ত এক্ষণ দেরী হ’ল। বেট ভাঙ সব শুনে এসেছি, যার খুশী সে আজ থেকেই কাজে লাগতে পারে, ঠিকাদারের এমনি তাড়া গো।”

একটা অনুতময় স্পর্শে কুকিয়ার জ্বরগ্রস্ত দেহমন যেন শীতল হইয়া যায়, অনেকদিন পরে সে আবার হাসে, বলে, “তুই আমি ছ’জনেই পান্থর ভাঙবে।”

তিলকা উঠিয়া দাঁড়ায়, খালি কলসীটার দিকে নজর পড়িতেই হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। কুকিয়া বলে, “হ্যাঁ গো, জল আনিব নি?”

তিলকা হাসিতে হাসিতে বলে, “ভুলে গেছি গো, একে বারেই ভুলে গেছি। খবরটা পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এলুম, জল আনিব কখন?”

মন খুলিয়া কুকিয়া হাসে। কলসীটা আবার তুলিয়া তিলকা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জল আনিতে চলিয়া যায়। কুকিয়া আহত হাতের যন্ত্রণা তুলিয়া বাহিরে আলোয় আসিয়া দাঁড়ায়।

৩৩

তোমার হইয়াছে, আশ্বিনের সোনালী বোর মাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঝুড়ি হাতে মন্থার বউ তিলকার বাড়ীর সামনে আসিয়া হাঁক দেয়, “কই গো পরসাদের মা?”

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসে না। মন্থার বউ আর একবার কণ্ঠস্বর আর একটু চড়াইয়া হাঁক দেয়, কিন্তু তবুও

কেহ সাড়া দেয় না। বৈজয় মেয়ে টুকনীকে আসিতে দেখিয়া মন্থার বউ বলে, “দেখ না বেটি ভিতরে গিয়ে, এত ডাকলুম, পরসাদের মা সাড়া দেয় না কেন?”

টুকনী আড়িনার গিয়া ঢোকে, সেখান হইতে টেচাইয়া বলে, “দরজায় তালা ঝুলছে গো বেনোয়ারীর মা, ঘরে লোক নেই।”

এতক্ষণে মন্থার বউও আড়িনার আসিয়া দাঁড়ায়, অবাক হইয়া বলে, “তাই ত গো।”

টুকনী মাথা নাড়িয়া বিজয়ের মত বলে, “ওরা এক পহর রাত থাকতে উঠে পান্থর ভাঙতে মাঠে চলে যায়, এত বেলায় তুমি ওদের ঘরে পাবে না বেনোয়ারীর মা।”

“তাই ত দেখছি গো।” বলে মন্থার বউ।

টুকনী বলে, “ভোজী কাল বলছিল ওরা হ’লপ্তাতে তিন হস্তার কাজ করেছে।”

দরদেব সঙ্গে মন্থার বউ বলে, “আহা, তা বেশ করেছে, বড়ই অত্যাচার পড়েছিল গো।”

ছইজনে আবার বাহিরে আসিয়া পথ ধরে। ইহারাও পান্থর ভাঙিতে চলিয়াছে, গ্রামের সমস্ত বেকার লোক ও তাহাদের ঘরের মেয়েরা, এমনকি শিশুরা পর্যন্ত পান্থর ভাঙার কাজে লাগিয়াছে।

মন্থার বউ আর টুকনী গাঁয়ের পূর্বদ্বিগের মস্ত বড় টাঁড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই টাঁড়ের এক প্রান্তে ব’ বয়সী সরকারী সড়ক তৈরী হইবে। টাঁড়ের প্রায় সবটাই পান্থর ভাঙা চলিতেছে। এক এক পরিবার এক এক স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে, ঘরের বো-বিতা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি নদীনাশার কোল হইতে পান্থর আনিয়া জমা করিতেছে, মরদেব সেহ পান্থর হাতুড়ি দিয়া ভাঙ্গিয়া জুপ করিতেছে। সারাদিন ঘরের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই, সকাল বেলা সপরিবারে ইহারা মাঠে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঝুড়িতে করিয়া পান্থর লইয়া আসে, গৃহপালিত ছাগলটি, মুরগীটি পর্যন্ত আনিয়া কাছাকাছি বাধিয়া রাখে। অনেকেই কাঠখুঁটি গাড়িয়া মাথার উপর একটা ছেঁড়া চাদর টাঙাইয়া লইয়াছে, কেহ আবার ছিন্ন ছাটাটি একটা খোঁটার সঙ্গে বাধিয়া একটু ছাগার সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, টাঁড়ের উপর মস্ত হাট বসিয়াছে।

টাঁড়ের মাঝামাঝি আসিতেই টুকনী দেখাইয়া দেয়, “ঐ হোখা গো, বেনোয়ারীর মা, ঐ যে ওপাশে পলাশের ডালটা পোতা, ঐটে তিলকাধার আড্ডা।”

একটু ঘুরিয়া সেইদিকে ঝাইতেই কুকিয়া তাহাদের



দেখিতে পার, ডাকিয়া বলে, “এস গো বেনোয়ারীর মা, এই যে, এখানে।”

মহুয়ার বউ সেইখানে গিয়া দাঁড়ায়। কুকিয়া হাতের হাতুড়ি বাধিয়া খাড়া হয়, আড়ষ্ট মাজাটা ছ’বার ঝাঁকায়। আড় ভাঙিয়া বলে, “কি ভাগ্যে তুমি এদিকে এলে দিদি, কাল তোমাকে দেখিনে। যাব যে একবার তোমার বাড়ী সে ফুরসুৎ নাই।”

মাথার ঝুড়িটা কাকালে করিয়া মহুয়ার বউ বলে, “গিয়ে ছিলুম তোব বাড়ী গো, ঘরে দেখলুম তোলা ঝুলছে।”

কুকিয়া হাসিয়া বলে, “খুব ভোরে উঠে চলে আসি দিদি, যে ছ’ঘণ্টা আশেষ করে বরে থাকব সে ছ’ঘণ্টা কাজ করলে ছ’পরমা রোজগার হবে, জান ত আনন্দের অবস্থা।”

পাশের সুপীকৃত টুকরো পাথরের দিকে চাহিয়া মহুয়ার বউ বলে, “পরমাদের বাপ খাটিয়ে আছে, খুব ত ভেঙেছে গো।”

হাতুড়িটা শব্দে ফেলিয়া দিয়া তিলকা হাসিয়া বলে, “আমি খাটিয়ে? তুমি কি ভেবেছ বেনোয়ারীর ম’, এত পাথর আমি ভেঙেছি? তা নয় গো, ভেঙেছে পরমাদের মা। রাতহুপুবে উঠে বলে চল গো চল, ভোর হয়ে গেছে। আমি কিছু করিনে, একটু আধটু খুঁটখাট করি আর ঠৈনি টিপি।”

“শোন কথা”, বলে কুকিয়া, “ও ভাঙে নি, আমি সব ভেঙেছি।”

মহুয়ার বউ ঝুড়িটা সামনে রাখিয়া বসিয়া বলে, “যে কথাটা বলতে এলুম গো, পরমাদের মা—”

উদ্গীৰ্ব হইয়া কুকিয়া বলে, “কি কথা দিদি?”

মহুয়ার বউ বলে, “আমার বেনোয়ারীর যে অন্তর্য কবে ছিল সেই গত বছরের আগের বছর গো, ধান রোপার সময়, বাচবার আর আশা ছিল না—”

মাথা নাড়িয়া কুকিয়া বলে, “মনে আছে বেনোয়ারীর মা।”

মহুয়ার বউ বলে, “আখিনে মাসে মা দুর্গার পূজার ঢাক বেজে উঠতেই মানত করেছিলাম, আমার বেনোয়ারী ভাল হয়ে উঠলে পাঁঠা দেব, ভালও হয়ে উঠল ছেলে।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে কুকিয়া। মহুয়ার বউ বলে, “সে বছর ত পাঁঠা দিতে পারি নি, গত বছরেও হয়ে ওঠে নি, কম ক’রেও এক কুড়ি টাকার দরকার। এ বছর দেবীর কুপায় ভ’পরমা রোজগার হয়েছে। আর দেবী করা নয়, এই পূজার পাঁঠা দেব ঠিক করেছি। আখিনের আজ বার দিন গেল, পূজার আর পাঁচদিন বাকি, নবমীর দিন তোমরা আমার গাঙ্গী খাবে গো।”

ব্যাপারটা কুকিয়া আঁচ করিয়া লইয়াছিল, বলল, “যাব দিদি।”

তিলকা উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, মাংসভাত সে অনেকদিন খায় নাই, মন খুলিয়া হাসিয়া বলে, “নবমীপূজার দিনটা আর পাথর ভাঙব না, সকাল সকাল পৌঁছে যাব।”

মহুয়ার বউ বলে, “হ্যাঁ, তাই করো, খেয়ে দেয়ে বড়কা গাঁয়ের মেলা দেখতে যাব।”

উৎসাহিত হইয়া তিলকা বলে, “বেশ, বেশ, মাংসের চরণে প্রণাম জানিয়ে আসব।”

কুকিয়া অবাক হইয়া বলে, “বরকা গাঁ দু’কোশ রাস্তা, তুই কেমন করে যাবি বল ত?”

সবেগে মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, “হেঁটে যাব, আর কেমন করে যাব। হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে সমানে পা চালিয়ে যেতে পারব না, ধীরে ধীরে চললে আমি এখন দু’কোশ কেন, দশ কোশ চলে যেতে পারি।”

মহুয়ার বউ উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, “তা হলে আমি চলি গো, বেলা অনেক হ’ল।”

আকাশের দিকে তাকাইয়া কুকিয়া বলে, “তাই ত গো, দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল।”

ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া মহুয়ার বউ তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়।

৩৪

সবে ভোর হইয়াছে, ইহারই মধ্যে এখানে-ওখানে ঢাকের বাজনা শোনা যাইতেছে। এ পূজার বাজনা নয়, এ গাঁয়ে পূজা হয় না, দেবীর ভক্তজনের উপর ভর হইয়াছে, এ তাহারই বাজনা। আজ নবমী পূজা, গাঁয়ে পূজা না হইলেও চারিদিকে উৎসাহ ও আনন্দের শাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মহলা ছেঁড়া কাপড় কয়খানা স্নানশুদ্ধ করিয়া হাঁড়িটি মাথায় লইয়া কাচাকুচির জন্তে কুকিয়া বাঁধে গিয়া উপস্থিত হয়। বাঁধে অনেক মেয়ে আসিয়া জুটিয়াছে, কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া উৎসবের জন্তে সকলে প্রস্তুত হইতেছে। বাঁধের উঁচু চিপির উপর দাঁড়াইয়া কুকিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, দু’বেল সবুজ মাঠ, সবুজতর শাল অরণ্য ও নীলাভ পাহাড় তাহার ভারি ভাল লাগে। আজ তাহার মন হালকা, আজ সে দশজনের মত কথা কহিতে পারে, হাসিতে পারে।

কাপড় কাচা শেষ করিয়া কুকিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখে আঙিনার মাঝখানে ছেলেকে সামনে বসাইয়া তিলকা মাঝল বাজাইতেছে। হাসিয়া তিলকা বলে, “বেটা মাঝলের

আগুয়াজে কেমন মশগুল হয়ে গেছে দেখ। ষাটোয়ারার বাচ্চা কিনা। এখন থেকে মাদলে চাঁটি মারলে তবে মাদল বাজাতে শিখবে।”

রুকিয়া ভিলে কাপড় বোদে দিতে দিতে জবাব দেয়, “মাদল বাজালে নিজের পেট ভরে না, বউ ছেলেরও পেট ভরে না। ও বিজ্ঞেয় আর দরকার নাই, ওকে আর মাদল বাজনা শেখাতে হবে না।”

তিলকা শিল্পী, তুচ্ছ ষাওয়াপারার কথায় সে কান দেয় না, মাথা নাড়িয়া বাজাইয়া চলে।

একটু বেলা বাড়িতেই তিলকা মাদল ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, বলে, “কই গো, চল, বেরিয়ে পড়ি, মনুয়ার বাড়ী খেয়ে মেলার পথ ধরব।”

রুকিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, “চল।”

তখন তিলকার সাজসজ্জার পালা শুরু হয়, সকালবেলার কাচা কাপড়খানা শতচ্ছিন্ন সেখানে কিভাবে পরিলে ফুটো-ফটাগুলি কিছু ঢাকা পড়ে সেই চেষ্টা চলিতে থাকে। যখন এই অসাধ্যসাধন সমাধা হয় তখন গাম্ভাখানা মাথায় জড়াইয়া হাঁক দেয়, “আমি তৈরী গো।”

রুকিয়াও ছেঁড়া শাড়ীখানা কোনমতে পরিয়া নেয়, তার পরে ছেলের হাত পরিয়া পথে নামিয়া পড়ে।

মনুয়ার বাড়ীতে লোনসমাগম না হইলেও হৈট হইতেছে যথেষ্ট। পরবে পাঠ্যকাটা গরীবের সংসার রহৎ ব্যাপার, মনুয়ার, মনুয়ার বউ, একপাল ছোটবড় ছেলেমেয়ে সবাই ব্যস্ত, সবাই মুগ্ধ। তিলকারা আসিয়া উপস্থিত হইলে বাড়ী সরগরম হইয়া ওঠে। শালপাতা জুড়িয়া বড় বড় খালার মত কথা হইয়াছে, তাহাই এক একখানা লইয়া উঠান জুড়িয়া সকলে খাইতে বসিয়া যায়। ভাত দেওয়া হইয়া গেলে মাংসের হাঁড়ি আসে, ছেলেবড়ো সকলের দৃষ্টিই তাহাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। মনুয়ার বউকে বলে, “তিলকাকে দেখেত্তনে দে গো।”

তিলকা পাতাশু ভাতের ত্বপের মাঝখানে সযত্নে একটা গর্ত করে, মনুয়ার বউ হাতা করিয়া তুলিয়া সেইখানে মাংস ঢালিয়া দেয়। হুঁহাতা দেওয়া হইলে মনুয়ার বউ ইতস্তত করে, মনুয়ার বলে, “দে, আর এক হাতা দে।”

তিলকা খুশী হইয়া ওঠে, মনুয়ার বউ আর এক হাতা মাংস তুলিয়া ঢালিয়া দেয়, কিন্তু সেটা আসলে ভক্ততারক্ষা, তাহাতে খোলই বেশী, মাংস মাত্র হুঁএক টুকরা। তিলকা মনে মনে ক্ষুধ হইলেও মুখে বলে, “আহা, কত দিচ্ছ গো বেনোয়ারীর মা।”

বেনোয়ারীর মা সেই সুরোগে নিজের ছেলেমেয়ের দিকে

আগাইয়া যায়। দিনে ইহারা একবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ইহাদের বরাতে মাংসভাত বৎসরে এক-আধদিন মাত্র জোটে। ষাওয়া যখন শেষ হইয়া যায় তখন পাতায় বা তাহার আশেপাশে একটি ভাতও পড়িয়া থাকে না।

এইবার সাজগোজ করিয়া মনুয়ার বউ, ছেলেমেয়েরা মেলায় বাইবার জন্ত প্রস্তুত হয়। বেলা প্রায় দুপুর, হুঁক্রোশ পথ খাইতে হইবে, তাই আর দেবী না করিয়া সকলে পথে বাহির হইয়া পড়ে।

বরকা গাঁয়ের পথে আজ বেশ ভীড়, আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে মেলার যাত্রীরা দল বাসিয়া হল্পা করিয়া করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তিলকা চলিতে পারে না। সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে। ছেলেকে কোলে লইয়া রুকিয়া এক একবার অনেকখানি আগাইয়া যায়, আবার পথের পাশে দাঁড়াইয়া তিলকার সঙ্গে নেয়।

পথ ক্রমে দুরাইয়া আসে, সামনের বড় টাঁড়খানার ওপরেই বড়কা গাঁ; এখান হইতে মেলার ভীড় দেখা যায়। সেই দিকে কত লোক যে চলিয়াছে তাহার অন্ত নাই, মেয়ে ও শিশুর সংখ্যাই বেশী। মেয়েদের পোশাকের বাহারই বা কত! লাল, সবুজ, হলদে কত রঙের শাড়ী পরিয়া, গহনার গা ঢাকিয়া পথ আলো করিয়া তাহারা চলিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে চলিতে রুকিয়ার মন মনুচিত হইয়া পড়ে, সে পাশে পরিয়া দাঁড়ায়।

গ্রামের বাহিরে মাঠের কোলে ইটের তৈরী ছোট এক খানা মণ্ডপ, ইহার ভিতরে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রামের পূজা হইলে কি হয়, অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া মেলা বসিয়াছে, অসংখ্য লোকসমাগম হইয়াছে। তিলকা আর রুকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখে। অনেকগুলি মিঠাইয়ের দোকান বসিয়াছে, স্তূপাকার লাডু ও গজা বিক্রয় হইতেছে, সেখানে ঠেলাঠেলি সবচেয়ে বেশী। খানকয়েক মনিহারীর দোকানের সামনেও ভীড় ধুব, কাচের চুড়ি ও টিনের ছোট আয়নার চাঁহিলা সেখানে যথেষ্ট। বাঁশের তৈরী বুড়ি, বাঁহু, ডালাকুশো ও মাটির হাড়ি-কলসী ইত্যাদি লইয়া গ্রামীণ শিল্পীরা একদিকে দোকান পাতিয়াছে। শিশুর স্বপ্ন সার্থক করিয়া মেলার একপ্রান্তে গোটাছুই নাগরদোলা শব্দে ঘুরিতেছে।

ভিড় ঠেলিয়া তিলকা আর রুকিয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়, তার পরে মিঠাইয়ের দোকান হইতে ছেলের জন্ত হুঁ আনার লাডু কেনে। তিলকা বলে, “এইবার চল গো, দেবী দর্শন করি।”

তাহারা মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হয়। মণ্ডপের সামনে ধুব ভিড়, যথেষ্ট ঠেলাঠেলি না করিলে ঠাকুর দেখা সম্ভব নয়।

কুকিয়া বলে, “আমি ছেলে নিয়ে কাঁকায় ঠাঁড়িয়ে থাকি, তুই বা, দর্শন করে আয়।”

ভিলকা আশ্চর্য হইয়া বলে, “তুই যাবি নে?”

বাড় নাড়িয়া কুকিয়া বলে, “না গো, আমি অত ভিড়ে চুকতে পারব না, আমি এখান থেকেই মায়ের চরণে প্রণাম জানাব।”

ভিলকা ভিড়ের মধ্যে চুকিয়া যায়, কুকিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া মনে মনে বলে, “মা, আমি মহাপাপী মা, তাই আমি দূর থেকে তোমার প্রণাম জানাচ্ছি। আমি অসতী, পরপুরুষ পাপমন নিয়ে আমার হাত ধরেছে, আমি চোর, পরের ক্ষেত থেকে মাকুয়া চুরি করেছি, আমার রাজা হিতে চাও দিও মা, আমার স্বামীপুত্রদের ভাল করো।”

বার বার এই আবেদন জানাইয়া কুকিয়া তাহার যুক্তকর কপালে ঠেকায়।

একটু পরে ভিলকা ঠাকুর দেখিয়া ফিরিয়া আসে, বলে, “কি ঠাকুর দেখলুম, চোখ জুড়িয়ে গেল।”

কুকিয়া বলে, “এবার বাড়ী চল, আর হেরি করিস নে।”

ভিলকা বলে, “চল।”

ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া কুকিয়া আগে আগে চলে, ভিলকা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া পিছনে আসে। বেলা পড়িয়া আসিলে মেলা জমাট বাঁধিয়া ওঠে, উৎসব-মস্ত নর-নারীর কাহারও ঘবে ফিরিবার তাগিদ নাই – পথ তাই জনশূন্য। সন্ধ্যা নামিয়া আসে, বনের আড়ালে সূর্য চলিয়া পড়ে, দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হয়। নিস্তক অরণ্যপথ ধরিয়া ভিলকা কুকিয়া আর পরসাদ মন্থবগতিতে চলিতে থাকে। ক্রমে আকাশ হইতে শেষ আলো মুছিয়া যায়, অন্ধকার দিগন্তে নিবিড় হইয়া ওঠে, সেইখানে ছিন্নবসন মলিনমুখ একটি পুরুষ একটি নারী ও একটি শিশু ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

## উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্প দেবী

হিরণ্যেন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতম্ মুখম  
তত্ত্বং পুষ্পপার্বণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ (১৫)

হিরণ্যের পাত্রের মাঝে ঢাকা সত্যের মুখ  
হে পুষ্প তুমি আবরণ খোল তার।  
সূর্য তোমার দীপ্তিতে ভরা উগ্রতা থাক সবে  
উজ্জলতর আলোর অন্ধকার।  
করজোড় করি মিনতি আমার হে অরূপ তব কাছে  
তোমার প্রভাব স্বনিকা যাক সবে  
সত্যের সেই অরূপ বিভায় বিকশিয়া যেন উঠি  
চির শিবময় সত্যে দরশ কোরে। (১৫) ঐশোপনিষদ

পুষ্পে কর্ণে যম সূর্য প্রাজাপত্য বাহু দশীন  
সমুহ তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্চামি  
সোহসাবশৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি। (১৬)

হে একা পথিক অনাদিকালের গুপ্তন তব খোল  
স্বরূপ তোমার বারেক হেরিতে চাই,  
কল্যাণময় যুগতি তোমার আমার নয়ন ভরি  
বিকশিত কর, দরশ যেন যে পাই।  
সংবর তব রূপ ও-রূপ তুমি মঙ্গলময়  
আমারে তোমার শিব রূপে দাঁও দেখা  
তোমার মাঝেতে আমারে হেরিয়া বিশ্বয়ে তবে প্রাণ  
করজোড়ে প্রভু থাকি ও আশীষ লেখা ॥

(১৬) ঐশোপনিষদ

# সাবর্ণ চৌধুরীবংশের আদিকথা

শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গোঁড়েশ্বর আদিশুর বঙ্গদেশকে জ্ঞান-গরিমায় ভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে কান্তকূজ হইতে পাঁচজন পঞ্চগৌড়ীয় বেদপাঠক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে প্রচার যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা আজও অনির্করণ শিখায় জ্বলিতেছে। তাঁদের জ্ঞান শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রালাপন পরবর্তী যুগে, এমনকি আজকের আধুনিক যুগসন্ধিক্ষণেও মাঝেও প্রাজ্ঞত্বের নিকট শ্রদ্ধার সহিত স্মরিত হইতেছে।

এই পঞ্চগৌড়ীয়ের মধ্যে সাবর্ণি ঋষির গোত্রজাত দেবগর্ভ নামে একজন ব্রাহ্মণ অস্তিত্ব। ইনি মহারাজ আদিশুর নিকট বটগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বটগ্রাম পূর্বে কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা এক্ষণে নির্ধারণ করা যায় না। কালক্রমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্নটি পুত্র জন্মে। এদিকে আদিশুর স্বর্গারোহণ করায় তাঁহার উত্তরাধিকারী ক্ষিত্তিশ্বর রাজা হইলেন। তিনি এই ছাপ্পান্নটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম দান করেন। তখন হইতেই বাটীর ব্রাহ্মণ সন্তানগণের নামানুসারে অমুক গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দেবগর্ভের বাটী পুত্রের মধ্যে হল নামক সন্তান গঙ্গাপাধ্যায় বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশের পূর্ব-পুরুষেরা বঙ্গালসেনের রাজত্বকালে কৌলীজ প্রাপ্ত হন নাই। সেই কৌলীজ মধ্যাদার সমাকর্ষণকালে এরা প্রোড়ীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (সুখাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “কালীক্ষেত্র নীলিকা”, প্রকাশকাল-১৮২১ অব্দে, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্বে) গঙ্গাবংশীয় সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিপুরুষ ‘পাঁচ শক্তি খান’ হাবেলী শহর (বর্তমান হালিশহর) পরগণার আধিপত্য লাভ করেন ও শ্রুতিমুখ “হালিশহর সমাজের” প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে বিক্রমপুর হইতে বৈজ্ঞানেশ্বরী, কোল্লগর হইতে সন্ন্যাস্ত কায়স্থ পরিবার আসিয়া ইহার উন্নয়ন বৃদ্ধি করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। (এ, কে, রায় লিখিত “লক্ষ্মীকান্ত”, প্রকাশকাল-১৯২৮, ১৫ হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা)।

পাঁচ শক্তি খান বিচিত্র উপাধি হইতেই (ইহার পূর্ব নাম, পকানন গঙ্গোপাধ্যায়) প্রমাণিত হয়, তিনি পাঠান রাজত্বকালে দরবারে বিনিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম জারগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নিয়বঙ্গের গুড়বংশীয়

শুভরাজ খান কর্তায় সহিত বিবাহ হওয়ার তিনি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সাতটি পুত্র ছিল, এবং কুলগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ আছে, তাঁহার সকলেই হালিশহরে বাস করিতেন। (“এতে পাঁচ শক্তি খান সন্তান হালিশহর নিবাসিনঃ”)। পরে এখান হইতেই সাবর্ণগৌড়ীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পবেন, এবং সর্বত্রই তাঁদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

পাঁচ শক্তি খানের প্রপৌত্র স্বনামধন্য “লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার” প্রায় ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া সুলতান হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ বা শের শাহের রাজত্বকালে বিপুল জমিদারী অর্জন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সহিত মানসিংহের কোন বন্ধন সম্বন্ধই ছিল না, এ বিষয়ে এতদিন যে সব কাহিনী ও প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় পুঁথিখানার স্বর্গগত অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক মীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় সম্পূর্ণ ভুল ও অলিকল্পনা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। (কুমারহট্ট-হালিশহর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে “কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ” প্রবন্ধের ২১৮ পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল-১৩৬১ বঙ্গাব্দ)।

এই লক্ষ্মীকান্তের পিতার নাম কামদেব ব্রহ্মচারী। আত্মমানিক হলের চৌদপুরুষ পরে কামদেব গঙ্গোব উত্তর দেখা যায়, সম্ভবতঃ ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পূর্বে। ইনি একজন সন্ন্যাসীভাবাপন্ন বৌদ্ধী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীব নাম ছিল পদ্মাবতী। এই পদ্মাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয় বলিয়া শ্রীযুক্ত বিভূদান রায়-চৌধুরী মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কামদেবের পিতার নাম ছিল, শঙ্কুপতি এবং কামদেবেরই পিতামহ পকানন গাঙ্গুলী ওরফে পাঁচ শক্তি খান।

শক্তি খানের পারিবারিক ইতিহাসের সমুদ্র উপকরণরাজি কুলগ্রন্থে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া অধ্যাপক মীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় লক্ষ্মীকান্তের উপরোক্তকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিলেন। (এ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে “কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ” প্রবন্ধের ২১৯ পৃষ্ঠা দেখা)।

প্রবাদ অনুসারে লক্ষ্মীকান্ত কালীঘাটে, হালিশহরে এবং সাবর্ণ চৌধুরীপরিবারের আদিস্থান গোঘাটে ও আমাটিয়া গ্রামে—(শ্রীযুক্ত বিভূদান রায়চৌধুরী মহাশয় আবার সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিস্থান বর্তমান জেলার পাহাড়পুংর গ্রাম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পকানন গঙ্গো অথবা তাঁহার পুত্র কর্তৃক এই

স্থানে সার্বগণ্যের বসবাস শুরু হয়।) দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া-  
ছিলেন। (“লক্ষীকান্ত”, ৪৪ পৃষ্ঠা)।

শোনা যায়, লক্ষীকান্তের সময় হালিশহর হইতে বড়িশা পর্যন্ত  
এক প্রাচীন রাজপথ ছিল, ‘আইন-ই-আকবরী’তে সরকারী সাতগাও  
অন্তর্গত পরগণা সমূহের মধ্যে হালিশহরের নাম পাওয়া যায়।  
 (“জাবেবেউল্লান সেলশন”, নতুন সংস্করণ, ১৫৪ পৃষ্ঠা)। এই  
সমস্ত পরগণা হইতে ১২,৫০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইত বলিয়া  
উল্লিখিত আছে। সে সময় অবশ্য লক্ষীকান্ত মজুমদার জীবিত  
ছিলেন না।

লক্ষীকান্তের ‘মজুমদার’ উপাধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে সব কাহিনী  
প্রচলিত বা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ভুল। এমন কি অনেকে  
লক্ষীকান্তকেই প্রথম জমিদার বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।  
ইহাও যে, অলৌকিকজ্ঞান মাত্র তাহা এদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,  
মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন।

এই লক্ষীকান্তের আটটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম রায়  
ওরফে রামেশ্বর রায় সম্ভবতঃ আকবরের সময় জীবিত ছিলেন।  
অতঃপর মানসিংহ বিঘরক সমস্ত কাহিনী যে ভুল তাহা আর একবার  
প্রমাণিত হইল। এই রামেশ্বর রায়ের পৌত্র বিদ্যাধর রায় বর্তমান  
সিদ্ধেশ্বরী মাতা, বুড়োশিব, এবং শ্যাম রায় বাধিকামাতাজীউর  
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত শ্রবোধকুমার  
রায়চৌধুরী মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বর্তমান  
প্রবন্ধের লেখককে বলেন, বিদ্যাধর রায়ের গঙ্গায় অবগাহনকালে  
পারে এক প্রস্তরখণ্ড লাগায়, তিনি উহা পায়ের দ্বারা দূরে  
নিক্ষেপপূর্বক স্থান সারিয়া উঠিয়া আসেন এবং ইনি রাত্রিই  
স্বপ্নাদেশ পান, উপরে উদ্ধৃত ঐ তিনটি মূর্তি গজাঙ্কিত পাথরের  
দ্বারা নির্মাণের জ্ঞাত। পরদিন প্রভাতে বিদ্যাধর রায় দেখিতে  
পান, ত্রিবেণীর জটনৈক অঙ্ক-ভাস্কর্য্য তাহার জায় স্বপ্নাদেশে দৃষ্ট  
হইয়া মূর্তিনির্মাণের জ্ঞানই আগত হইয়াছেন। কিছুকাল তাহার  
অন্ধতা লইয়া বাদ্যযন্ত্রাদির পর ঐ অঙ্ক-ভাস্করকেই মূর্তি নির্মাণের  
জ্ঞাত নির্দেশ দেওয়া হয়। পূর্বে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির  
কালীতলার উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল এবং ঐ মন্দির থাক-  
কালীন যে এই নামের স্থল হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বিদ্যাধর রায় এই কালীতলার (বর্তমানে যে স্থানে পুলিশ ষ্টাড  
অবস্থিত) নিকট একটি বাজার নির্মাণ করাইয়া ছিলেন ও এই  
তিনটি দেব-দেবীর উৎসব এবং বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া-  
ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টাভেদে আমি কোনরূপ  
প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আবার স্বর্গগত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয়ের  
মতে, বিদ্যাধর রায়ের সনের হালিশহর সার্বর্ণ চৌধুরীদের হাতছাড়া  
হইয়া যায় এবং কালক্রমে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার  
প্রধান অংশ নবদ্বীপের রাজা বাঘব রায়ের করতলগত হয়। ১১৩৫  
সালে কুমারজয়ী নদীর অন্তর্গত ৭৫ মহালের অন্ততম হালিশহর।  
রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্রে লিখিত আছে, ৮,০২০ টাকা কর

রায়ের সময় আদায় হইত। ইহা ছাড়াও তাহাদের প্রভুত্বের  
নিদর্শন আজও স্থানে স্থানে বর্তমান থাকিয়া অতীতের ঐতিহ্যের  
কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু সার্বর্ণ চৌধুরী বংশের উজ্জ্বল  
তাহাতে খানিকটা স্নান হইয়া আসিলেও একবারে বিলুপ্ত হইয়া  
যায় নাই। বরং নবদ্বীপাধিপতিদের প্রভুত্বের নিদর্শনের পাশে  
তালুকদাররূপে সার্বর্ণ চৌধুরীগণের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজ  
করিতেছে। একটু ভাল কথিয়া লক্ষ্য করিলেই এই দুই প্রভাপের  
সম্বন্ধ দৃষ্ট হইবে বলিয়াই মনে করি। যদিও আজকালের ধ্বংস-  
কৌল্য মুখে আসিয়া হালিশহরস্থিত সার্বর্ণ চৌধুরীগণ কোনরকমে  
টিকিয়া আছে। একদিন যাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা আর হইত আজ  
সেই শ্রাম রায়ের আয় মাত্র ৫০ টাকার গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাও  
আবার জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।  
শ্যাম রায় যে সুরমা মন্দির মাঝে বাস করিতেন, আজ তাহা  
ধ্বংসস্তপে পরিণত। এই ধ্বংসের মুখে দাঁড়াইয়া লোলচন্দ্রসার বৃদ্ধ  
সার্বর্ণ চৌধুরীদের ক্ষীণ প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। কিন্তু  
তাহাও নিভিতে বিশেষ দেরি নাই।

অতীতে যে এই সার্বর্ণ চৌধুরীরা শ্রেষ্ঠ জমিদার বলিয়া পরিগণিত  
হইয়াছিলেন তাহা আজ কাহারও অজানা নহে। নিদর্শনরূপ  
উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই বংশীয় জমিদার দণ্ডনাদার রায়, রাম  
রায় ও কালীচরণ রায় স্বগ্রামবাসী বিখ্যাত সাধক ও কবি রাম-  
প্রসাদ সেনকে সর্বপ্রথম ভূমি দান করিয়াছিলেন। সন্দেহ  
তাবিধ ১৭ই চৈত্র, ১১৬০ বঙ্গাব্দ। ভূমির পরিমাণ ৮/০ বিঘা।  
(ননীয়া কালেক্টরীর ১৮,০৪০নং তায়দান)। ইহাও কিছুকাল পরে  
অর্থাৎ ১১৬৫ সনে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদকে  
ভূমিদান করেন। (ঐ, ৩১,৩৪৭নং তায়দান)।

হালিশহরের অপব অংশ বাঁশবেড়িয়ার রাজাগণ “কৌসমতপঃ  
হালিশহর” নামে দখল করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। রাম  
রায়ের মৃত্যুর পর যে বাটোরারায় কর, তদ্বারা উক্ত অংশ আবার দুই  
ভাগে বিভক্ত হইয়া রাম রায়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রঘুদেব ও দ্বিতীয়  
পক্ষের পুত্ররঘু নৃসিংহদেব ও রামকৃষ্ণদেবের দখলে চলিয়া যায়।  
 (“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস”, উত্তর রাঢ়ীয়, কারস্বকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড—  
১১৫ পৃষ্ঠা)। এই সময়টা পাঁচ শক্তি খানের ১৪১৫ পূর্বক কাল  
বলিয়া বঙ্গীয় পুথিলালো স্বর্গগত অধ্যাপক ও অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র  
ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন। (“কুমারহট্ট-  
হালিশহর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শতবাধিকো আবকগ্রন্থ” লিখিত  
“কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ” প্রবন্ধের ২২০ পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল-১৩৬১  
বঙ্গাব্দ)।

আবার অধ্যাপক কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত “কালীক্ষেত্র নীলিকা”  
গ্রন্থে (প্রকাশ, ১৮৯১ অব্দে, ৭২ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠা)। দেখা  
যায়—সুবসিন কুলি খাঁর সময়, অর্থাৎ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের  
নতুন বন্দোবস্ত হয়। খাঁ শাহের সময় সমস্ত বঙ্গভূমি ১০ চাকলা ও  
১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক চাকলায় রাজস্ব আদায়ের  
জন্য এক এক জন জমিদারের উপর ভার দেওয়া হয়। তাহার

ঐ প্রজাতিগণের নিকট রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। সুবেদার আবার এই (কর্ণচৌধুরী) জমিদারদের নিকট বাৎসরিক টাকা লইতেন।

এই সময় সার্বর্ণ চৌধুরীবাংশের জনৈক জমিদার কেশবচন্দ্র মজুমদারও বাংলার দক্ষিণ চাকলার কর্ণচৌধুরী (জমিদার) ছিলেন, এবং ঐ সময়েই তিনি 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পিতামহের নাম গৌরহরি ও পিতার নাম শ্রীমন্ত মজুমদার। এদের সম্পূর্ণ অধীনে না হইলেও অধীনস্থ পাঁচটি পরগণা, যথা : মাগুরা, খামপুর, কলিকাতা, নৈকান ও আনোয়ারপুর; এবং ইহা ছাড়াও হেতেগড় পরগণার কিয়দংশের জায়গীর মোগল সম্রাটের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এদের পূর্ব বাসস্থান হুগলী জেলায় গোপালপুর বাগীচ স্থানে ছিল বলিয়া দেখিতে পাই। পরে গৌরহরি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত বর্তমান দমদমার নিকট নিমতা-বিরিটি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

কেশবচন্দ্রের 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্তির কিছু পূর্বে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান আজিম ওসমানের বাংলা শাসন কালে ইংরেজেরা সুরতানটি, কলিকাতা ও গবিন্দপুর, এই তিনখানি গ্রাম বাণিজ্যের জন্ত ১৬,০০০ টাকার ক্রয় করে, এবং উক্ত তিনখানি গ্রামের জন্ত নবাব-সরকারে বাৎসরিক খাজনা দিতে বাধ্য থাকে।

উপরোক্ত গ্রাম তিনখানি ইংরেজগণের হস্তগত হওয়ার কেশব রায়ের পক্ষে দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাঘাত জন্মে। তাহার উপর আবার ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে হামিলটন নামক জনৈক ইংরেজ ডাক্তার বাদশাহ ফেরু শাহের পীড়া আরোগ্য করিয়া দিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ৭ হামিলটনের চেষ্টায় আটত্রিশটি মোজা কিনিবার ইংরেজরা অধিকারী হয়। এ ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খাঁ কিন্তু বিবস্ত্র হইয়া উঠেন, এবং তিনি কলিকাতার নিকটস্থ জমিদারদিগকে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দেন।

কেশব রায়চৌধুরী দেখিলেন আপন জমিদারীর মধ্যস্থলে না থাকিলে সব বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব তিনি পূর্ব বাসস্থান তুলিয়া কালীঘাটের তিন মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে বড়িশা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সুরতাং দেখা বাইতেছে, কেশব রায় কর্তৃক ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর সার্বর্ণ চৌধুরীদের বড়িশায় আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এ সঙ্কেতও মতবিরোধ আছে। স্বর্ণগত অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য্যের মত অঙ্গসংবরণ করিয়া দেখা যায়, হালিশহর হইতে

\*কেশবচন্দ্র বা তাঁর পিতামহ গৌরহরির সহিত লক্ষ্মীকান্তর ঠিক কিয়কম সঙ্কট ছিল তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারেন না, সেই কারণে আমরা তাঁকে "জনৈক জমিদার" বলিয়া উল্লিখিত করিলাম।—লেখক।

সার্বর্ণ চৌধুরীবাংশীর জমিদারগণ যখন বিভিন্নস্থানে ছড়াইয়া পড়েন, তখনই তাঁদের বড়িশায় আবির্ভাব ঘটয়াছে, এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, লক্ষ্মীকান্তর সময়ে হালিশহর হইতে বড়িশা পর্যন্ত এক প্রাচীন রাজপথের কথা। ইহা হইতেও মনে হয়, ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বেই সার্বর্ণ চৌধুরীদের বড়িশায় বাস হইয়াছে। বাহা হউক, আমরা দুই মতই এ স্থানে উল্লেখ করিয়া এ প্রশ্নের এখানেই শেষ করিলাম।

এখন আমরা পূর্ব আলোচনার কিরিয়া যাই।

কেশব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার চতুর্থ পুত্র শিবদেব জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি শক্তিমান এবং দানবীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আরেক নাম ছিল সন্তোষ রায়। এই "সন্তোষ রায়" নাম সঙ্কেত অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, তিনি প্রাচীরকে একরূপ পরিমাণ দানে সন্তোষবিধান করিতেন যে, লোকে ঐ নামেই তাঁহাকে ডাকিত এবং চিনিত। এমনকি জমিদারী কাগজপত্রও ঐ নামের উল্লেখ দেখা যায়।

সন্তোষ রায়ের আমলে অর্থাৎ ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে বগীর উৎপাত শুরু হয়, এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, সম্রাট আলীবর্দী খাঁ বগীরদের 'চৌধ' ঘোষণার স্বার্থে বাৎসরিক টাকা দিতে যীকৃত হন, ও ঐ টাকা সংগ্রহের জন্ত সম্রাট জমিদারগণের উপর অত্যধিক কর চাপাইয়া দেন। ঐ টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ার অনেক জমিদারের ভাগ্যে কাহাবাসও জোটে। কলকাতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সন্তোষ রায় ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

সন্তোষ রায় ঐ ঘটনার অন্তর দিন পরেই অবশ্য মুক্তি পান, এবং সেই সঙ্গে উৎসাহও তারবারেই সন্ধিকটে 'আবজাখাসি' নামক একটি গ্রামও প্রাপ্ত করেন। তাঁহার মুক্তি ও গ্রামপ্রাপ্তি সঙ্কেত স্মৃধাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "কালীক্ষেত্র দীপিকা" গ্রন্থে (প্রকাশ, ১৮৯১ অব্দে, ৮২ পৃষ্ঠায়) যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। সেই কারণে এ স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

বাহা হউক, সন্তোষ রায় যে উপাধিতেই হউক মুক্তিসাভ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং কালীঘাটে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত কালীকায় দেবীর পূজা দেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার বলিয়া মনে করি, সার্বর্ণ চৌধুরীরা তাঁদের পূর্বপুরুষ পাঁচু শক্তিমানেয় আমল হইতেই শাক্ত ধর্মীয়।

সন্তোষ রায় এই সময় ঐ পূজাদি ছাড়াও তখনকার দেবাইত্ত-গণের অনেককে বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালে অর্থাৎ ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর ঘোষাল, গোপালচন্দ্র হালদার প্রভৃতি তদানীন্তন দেবাইত্তগণ এবং আরও অনেককে আপন জমিদারীর ভিতর বিস্তর জমি দান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় দানের পরিমাণ ছিল প্রায় লক্ষ বিঘা। জমিদারী-প্রথা বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বহু

লোক তাঁহার প্রদত্ত জমি লইয়া পুরুষানুক্রমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন ও তাঁহার বশোগোবর ঘোষণা করিয়া উক্ত নামের সার্বভূমি রক্ষা করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময় পৈতৃক জমিদারী লইয়া কেশব বায়েব পুত্রগণের মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার কমিটি বোর্ডের সেক্রেটারী কর্তৃক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচ ভাইকে প্রদান করা হয়। যেট জমিদারীর অঙ্গ লবণ শুষ্ক বাতীত ৭৭,২৭৭ ৮০/১০।০ টাকা ইংরেজ সরকারের খাজনা স্থির হয়।

১৭৮২ অব্দে জমিদারদিগের সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতস্থ গবর্ণমেন্টের যে “দশসালা” বন্দোবস্ত হয়, তাহার কাগজ-পত্রে সন্তোষ বায়েব নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরে ঐ বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইয়াছিল। (মুর্শাদুমার চট্টোপাধ্যায়ের “কালীক্ষেত্র দীপিকা”, প্রকাশ, ১৮৯১ অব্দে, ৮০ হইতে ৮৫ পৃষ্ঠা)।

ইহার কিছুকাল পরেই সন্তোষ বায়েব মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সার্বর্ণ চৌধুরীবংশের জ্যোতিপ্রভাও ক্রমশঃ স্তান হইতে থাকে। কিন্তু আজও তাহাকে তথা সার্বর্ণ চৌধুরী-জমিদার-গণকে লোকে ভোলে নাই। বোধ করি কোন দিন ভুলিতেও পারিবে না। ইহার্য্য হয়ত একদিন মহাকালের ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া বাইবেন, কিন্তু বাঙালী তথা বাংলার ইতিহাস অজ্ঞানদের সঙ্গে ইহাদেবও মরণ করিবে। বাংলার শিক্ষিতসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া ইহার অমূল্যলন করিয়া বাইবেন এবং ইহা শাস্তরূপেই বাংলার জমিদারবংশের মাঝে বিভাজ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।\*

\* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনার বহুতর বাস্তি ও পুস্তকের সাহায্য-ঐহাণে বর্তমান লেখক স্বীকৃত করিলেন।

## জয়দিনে

শ্রীউদ্ভাসিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখিতে দেখিতে বছর ঘুরিল পৌষ আসিল কিরে

এক বছরের হলি আজ তুই ওরে—

গত বছরের এই দিনটিতে জনম হ'ল যে তোরে।

সেদিনের সেই আনন্দ মোর—

আজিও রয়েছে প্রাণ মন বিবি রহিবেও চিরদিন

নির্মল অমলিন ॥

নব প্রভাতের অরুণ আলোর প্রথম রশ্মিকণা

পৃথিবীর বৃকে ছড়ায় যেমন সোনা—

ও রাজা অধরে তেমনি সে মধু হাসি

মোদের বৃকেতে ছড়ায় অমৃতরাশি।

মঙ্গলদিনে আজিকে ছেবের যাচি গো আশীর্বাদ

পূর্ণ হটক সাধ—

মানুষের মত মানুষ হইয়া উচ বাধিয়া শির

হইও বিজয়ী বীর।

ছুটের তরে বেথো মনে যুগা ছুঃখীবে দ্বিও স্নেহ

ভরিয়া হুঃয় গেহ ॥

আদর্শ তব উচ্চ হটক ইহাই কামনা করি

মোর প্রাণ মন ভরি—

জয়গান তোমা গাহিবে যেদিন সবে

সেদিন আমার হৃদয় পূর্ণ হবে ॥



# বন-হরিণী

শ্রীকল্যাণী কর

পশ্চিমের এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলাম, সেই সময়েই প্রশান্তবাবু সঙ্গে আমার পরিচয়। এ পৃথিবীর চলাব পথে কত লোক আসে কত লোক যায়, কত লোকের সঙ্গে হয় পরিচয় ; কিন্তু এক এক সময় ক্ষুদ্র একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কখন যে একজন আর একজনের একেবারে অভ্যন্তরের দ্বারে পৌঁছে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

প্রশান্তবাবু এসেছিলেন বায়ুপরিবর্তন করতে, শুভকণে আমাদের সাক্ষাৎ, তাই প্রথম পরিচয়ের ব্যবধানটুকু কাটিয়ে উঠতে বেশী দেরি লাগল না। প্রশান্তবাবু হয়ে উঠলেন আমাদের সাক্ষাৎভার নিয়মিত সভা। রাজনীতির সবস আলোচনার প্রতিদিন আমাদের অলস সন্ধা দুপুর হয়ে উঠত।

সেদিন কি কারণে সভার অঙ্গ সভারা সবাই অস্থপস্থিত, কেবল প্রশান্তবাবু প্রতিদিনকার মত ইঞ্জিচেরারে গা এলিয়ে 'ইভনিং নিউজ'র পাতা ওটাচ্ছেন। সামনে টেবিলের উপর ধুমায়িত চায়ের পেয়ালা, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রশান্তবাবু হাসিমুখে বললেন, এবার আপনাব সঙ্গে তর্কটা জমবে ভাল।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। তার পর শিবিচে চা টেলে নিয়ে ডাকলাম, ঝুমরী—ঝুমরী—

আমার প্রিয় হরিণিশি শুমরী ছুটে এল এবং পরম তৃপ্তিতে আমার হাতের চাটুকু নিঃশেষ করে ঘাসের উপর ছুটে বেড়াতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গলাব ঘুঙর বাজতে লাগল ঝুম ঝুম করে।

প্রশান্তবাবু হঠাৎ বেন কেমন আনমনা হয়ে গেলেন, মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বললাম, কি প্রশান্তবাবু, তর্কটা শুরু হোক।

জ্ঞান হাসি-হেসে প্রশান্তবাবু বললেন, নাঃ, আজকে আর তর্ক জমবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। হুঁএকটা নিশাচর পাখী এদিকে সেদিকে গাছেব উপর পাখা কাপে উঠল। গাছেব আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ সোনালী আলোব ইসারা পাঠাচ্ছে, রজনীগন্ধা পাপড়ী মেলে সুবাসটুকু ছড়িয়ে দিল চারিদিকে। ঝুমরী ছুটে ছুটে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, আমি গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম, ঝুমরী আরতচক্ষু তুলে প্রশান্তবাবু দিকে তাকিয়ে বইল। দুর্দাগন্ত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ঝুমরী দিকে দৃষ্টি তুলে বললেন প্রশান্তবাবু। তার পর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন, জানেন সুব্রতবাবু; মানুষেব জীবনে এমন কোনও কোনও ঘটনা ঘটে যায়, যার স্মৃতি মন থেকে কিছুতেই মুছে কেলা যায় না। এমন এক ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে।

প্রশান্তবাবু বলতে থাকেন, “সে প্রায় বিশ বছর আগের কথা। আমি তখন আসামেব এক চা বাগানে ছিলাম। উক্তারীতে বেশ নাম করেছিলাম, ওখানকার কুলিরা ত আমাকে দেবতার মত ভক্তি করত, আমার উপর ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস।

আমাদের সুব্রতবাবু চা বাগানের পরেই আসামেব গভীর অরণ্য। কত জানা-অজানা জন্তু—কত ভীষণ সাপ, বাঘ, হাতী যে সেই অরণ্যেব গহনে আশ্রয়গোপন করে আছে তার সীমা নেই। সুপ্রশান্ত ব্রহ্মপুত্রের কেনিল জলমাশি ছিল ছিল করে বয়ে চলে সেই বহুতম্বর অরণ্যেব গা ঘেঁষে। বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের প্রচণ্ড মূর্তি, সমস্ত নদী ঘৌরনেব উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠে চতুর্দিক ভাসিয়ে নেয়, ধীরমহুয় নৃত্যেব ছন্দ—যেন নটরাজেব প্রলয়নাচনে গিরে সমাপ্তিব রেখা টানে।

সেবার ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বক্ষায় এক গভবতী হরিণী ভেসে এল আমাদের চা বাগানে, একটা শিশু প্রসব করেই হরিণী শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আমার একজন অমুগত লোক হরিণ-শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে এল—আমার জীবজন্তু পোষবার সখ ওদের অজানা ছিল না। কুকুর, বিড়াল, খরগোস, অনেক পাখী গুয়েছি, অনেক দিন থেকেই একটি হরিণ পুষবার বড় সখ ছিল, এত দিনে সে ইচ্ছা পূর্ণ হ’ল। কিন্তু হরিণশিশুটিকে বাঁচিয়ে তোলা কঠিন—কি করে যে তাকে বাঁচাব তাই হয়ে উঠল আমার সারাদিনেব সব চেয়ে বড় চিন্তা। সারাদিন ঘড়ি ধরে ওকে দুধ খাওয়ান, গ্লুকোস খাওয়ান, সময়মত স্নান করান, লোম ত্রাণ করে দেওয়া—আমার ও মণিকার এই হ’ল এক কাজ। এব একটু ক্রটি হতে পারত না। ওর জল নতুন কাঠের বাস্র এল, নরম পালকের বিছানা হ’ল, ওর বাঁতে কোনও কষ্ট না হয় সে বিষয়ে আমাদের হুঁজনেবই সজাগ দৃষ্টি। আমাদের নিঃসঙ্কান জীবনেব স্নেহকাতর মন যেন হঠাৎ এক অবলম্বন পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরল।...”

প্রশান্তবাবু চোখে বেন এক অভূত দীপ্তি, কোম অতীতেব স্বপ্নে ভুবে গেছেন তিনি, বর্তমান লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিব সামনে থেকে! “কি অধীর উৎকণ্ঠা আমাদের এই হরিণশিশুটি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে ত? কাজ থেকে ফিরেই ওকে না দেখলে চলত না। যাত্রিতে কতবার জেগে জেগে দেখতাম ওকে, কি জানি, সে কেমন আছে? শেষ পর্যন্ত আমাদের এত কষ্টেব, এত আকুল আশ্রাহেব পুঙ্খানু পুঙ্খানু মিলল। হরিণশিশুটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আদর করে ওর নাম রাখলাম লায়লী।

লায়লী এখন বেশ নান্দসমুহস হয়ে উঠেছে। তৈলচিকণ মশণ চামড়ার পরিপূষ্টির লক্ষণ। লায়লী এখন গৃহ চিনেছে, এখন তাকে আর বেঁধে রাখতে হয় না, স্নেহের ডোবেই বাঁধা পড়েছে লায়লী। মাঝে মাঝে বাইরে ছেড়ে দিতাম, মুস্তির আনন্দে এদিকে সেদিকে মাঠের বুকে সামনের পা ছুটি তুলে সে নেচে বেড়াত, কচি সবুজ ঘাস কচকচ করে খেত, কখনও এ-গাছে কখনও ও-গাছে মুখ দিয়ে সে খেলায় মেতে উঠত। অদূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতাম, খুব দেহের উপর যেন অসংখ্য তারা ফুটে রয়েছে, যেন কোন শিল্পীর খেলালী তুলিতে থাকা। কখনও আকুল স্নেহে ডাকতাম—লায়লী! ডাক শুনেই লায়লী খেলা ভুলে ছুটে আসত, গা ঘেসে দাঁড়িয়ে গা চেটে দিত, কখনও বা ভীকু ছুটি আঁকচক্ষু মেলে চেয়ে থাকত মুগ্ধের দিকে, সেট মৌন চাহনিতে কত কথা, কত ভাষা। আমি তাকে কোলে নিয়ে আদর করতাম, সে পরম তৃপ্তিতে চূপ করে আদর উপভোগ করত।

আমি হাসপাতাল থেকে কিরে এলেই লায়লী এসে আমার কাছে দাঁড়াত; আমার ভাষা টেনে পা চেটে তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আদর করে তার গায়ে মাখায় হাত বুলিয়ে দিতাম, আমার সঙ্গে বিস্কুট কিংবা পানিটুকি খাওয়া ছিল তার যোজ্যকর বন্দ। কখনও আমার একটু অবহেলা টের পেলেই লায়লীকে অভিমান, ডাকলেও আসবে না, খেতে দিলেও খাবে না, ঠিক যেন ছোট্ট মেয়ের মত।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল। লায়লী আরও বড় হয়ে উঠেছে। ভর হ'ল, বনের হরিণী এবার বনে পালিয়ে যাবে। এক বন্ধুর পরামর্শে এবার তাকে একটু একটু আঁকি খাওয়াতে আরম্ভ করলাম। কয়েকদিন খেয়েই তার নেশা হয়ে গেল। সকালবেলা লায়লীকে ছেড়ে দিতাম, লায়লী মুস্তির আনন্দে বিভ্রাংগিত হয়ে ছুটে যেত ঘরের পাহাড়ে। সারাদিন বনের হরিণ-হরিণীর সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়াত, খরখার জল খেত, বন্ধনভীনে জীবনের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকত; কিন্তু সেই একটুখানি আঁকি-এর নেশা সন্ধ্যার আগেই তাকে টেনে আনত গৃহের বন্ধনে। আপনি এসে ধরা দিত বনের হরিণী!... আপনায় মগ্নই তাকে আমি নেশায় বাঁধতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়েছে।

কতকণ্ট পরিচর্য করে প্রলোভনাব্যু আবার বলতে আরম্ভ করলেন—“লায়লীর জীবনে তখন যৌবন এসেছে। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, লায়লী আর ঠিক সময়ে গৃহে কিরে আসে না, অন্ধকার বিরে আসে চারদিকে, কখনও বা গভীর রাত হয়, লায়লী এসে আঁকি খেয়ে চূপ করে পড়ে থাকে। আমাদের স্নেহের আফ্রানে আর যেন যেন করে সাড়া দেয় না লায়লী। লায়লীর গতিবিধি লক্ষ্য করে মন যেন অভিমান, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বুকের উপর যেন আশঙ্কায় এক জগদল পাখর চেপে বসত, কি জানি লায়লী যদি না আসে। বতকণ

পর্যন্ত লায়লী না আসত মনে এ অবস্থির অবসান ঘটত না।

তবুও তাকে ছেড়ে দিতে হ'ত, কারণ এই বনের হরিণীকে বাঁধতে গেলে তাকে একেবারেই হারাবো হব। গৃহের প্রতি তার আর কোনও আকর্ষণ নাই। আমার বিছানার কাছে কাছে, আমার টেবিলের চারপাশে নেচে বেড়াত যে লায়লী, একটু আদরের লোভে গা ঘেসে দাড়াত যে লায়লী, এত সে লায়লী নয়। বনের নিরহরিণীর কলোচ্ছ্বাসে, তরলতার শ্রামলিমায়, দুর্গম অরণ্যাবীর্য বুকে আলো-জ্বাধারের খেলায় যেন মারা-অজ্ঞান পরিঘেছে লায়লীর চোখে; এ যেন কোন অপরিচিত জগতের হরিণী, তার কানে বাজছে অরণ্যের মর্ম্মহর্দয়, তাকে টেনে নিচ্ছে ঘূরে—কত ঘূরে!

তিন-চার দিন হয় লায়লী চলে গেছে, আজও কিরে আসে নি। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় আমাদের দিন কাটছে, কত আশঙ্কা, কত ভয় মনে। আমার অমুগত লোকদের পাঠিয়েছি চারদিকে, কেউ কোনও খোঁজ দিতে পারছে না। একদিন একটা লোক ধরব দিল—লায়লীকে অজ্ঞ একটু হরিণের সঙ্গে বর্ণায় জল খেতে দেখেছে কিন্তু মানুষের সাড়া পেয়েই ওরা ছুটে পালায়। তবুও একটু আশঙ্ক্য হলো, লায়লী তবে জীবিতই আছে।

লায়লী কিরে এল না; শূন্য গৃহে যেন হঠাৎ শুনি লায়লীর পদধ্বনি, হাসপাতাল থেকে কিরেই মনে হয়, বুঝি লায়লী ছুটে এল। কিন্তু লায়লী ত এল না। অজ্ঞ এক কুলি ধরব দিল, নদীর ধারে লায়লীকে আরেকটা হরিণের সঙ্গে ছুটে যেতে দেখেছে। আমাদের উৎকণ্ঠা শুধু বেড়েই চলে।

সেদিন এমনি পূর্ণিমা রাত্রি! পশ্চিমগগনে ধামধোলালী চিত্রকরের বিচিত্র রংয়ের খেলা শেষ হয়েছে, সারা গগনে একে দিয়েছে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলিঙ্গন। মোহময়ী বন্ধনীর আলোয়-আধারে ঘুরে পূর্বের রক্তধন হয়ে উঠেছে, শাল-অর্জুন-সরল বৃক্ষের অভ্যন্তরে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্ধকার, তাবি কাকে কাকে চন্দ্রালোকের গোপন অভিলাস।

বাংলার বারান্দায় বসেছিলাম আমি ও মণিকা। হঠাৎ দোখ ঘুরে অমুগত পাহাড়ের উপর পাশাপাশি ছাঁট হরিণ—সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য তা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না সূত্রতাব্যু। জ্যোৎস্নালিঙ্গ আকাশের পটভূমিতে রহস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ অরণ্যাবীর্য, তারই পাশে শুভ্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পাহাড়ের গায়ে এই হরিণ-যুগলের মূর্তিতে যেন এতকণের অসমাপ্ত ছবিখানি সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। পূর্ণ সৌন্দর্যের ছবিখানিতে শেষ তুলির রেখাটি টেনে দিয়ে অদৃশ্য শিল্পী হয় ত তৃপ্তির হাসি হাসছিলেন। মুগ্ধবিশ্বের নির্বাক হয়ে আমরা চেয়ে রইলাম।

সকলেই আমাকে পরামর্শ দিল—হরিণটিকে বেঁধে রাখুন, নইলে আর রাখতে পারবেন না। তার পর দিন লায়লী কিরে আসতেই তাকে তার ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হ'ল। আদরবস্ত্র করে তাকে খুশী করতে চেষ্টা করলাম, তার প্রিয় নানা বস্তু জিনিস

এনে তাকে খেতে দিলাম, সন্ধ্যায় নিজে সঙ্গে কং বাগানে বেড়িয়ে নিয়ে এলাম।

পর দিন চুপি চুপি লায়লীর প্রেমিক এসে তার কাছে দাঁড়াল। অসহায় লায়লী করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে উঠল, বাঁশের বেড়ার ফাকে ফাকে মুখ ঘসে নীরবে হুঁজনে কি কথা হ'ল কে জানে। তার পর দিনও এল। কুলিরা বলল, বাবু, যদি কিছুম মেন, ঐ হরিণটাকে মেয়ে ফেলি, তা হলে হরিণী আর যাবে না।

তাদের এই নিষ্ঠুরতার ভীত আপত্তি জানালাম। কিন্তু অবচেতন মনে হয় ত ভেবেছিলাম—ওকে মারুক, আমার লায়লীকে ত তা হলে হারাব না এবং সেই পাপেরই এই শাস্তি।...

প্রশান্তবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমার বলতে আরম্ভ করেন—“হুঁমিন পর থেকে লায়লীর প্রেমিক আর আসে না। লায়লী যেন নিখুম হয়ে পড়ে আছে, খাবার পাশে পড়ে আছে, কোনও কিছু মুখে দেয় না, চুপ করে এক কোণে পড়ে থাকে, হঠাৎ কাণ খাড়া করে কি শোনে, বাঁশের বেড়ার ফাকে ফাকে মুখ গুজে কি যেন খোঁজে। হুঁমিন, তিন দিন গেল, লায়লীকে বহু চেষ্টা করেও কিছু খাওয়াতে পারি নি, ওকে দেখে বুকের ভিতর বেদনার টনটন করে উঠল।...মাতৃহীনা শিশু হরিণীকে কত যত্ন করে খাইয়ে

বাঁচিয়ে তুলেছিলাম, সেই হরিণী আজ চোখের সামনে অনাহারে মৃতপ্রায়, তাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারলাম না।

পর দিন ঘুম ভাঙতেই মনটা যেন বেদনার ভারাক্রান্ত মনে হ'ল, ছুটে গেলাম লায়লীর ঘরে, আমার লায়লী তখন আর নাই। এক কোণে পড়ে আছে লায়লীর হিমশীতল দেহ।”

প্রশান্তবাবু হঠাৎ উঠে দ্রুত পারচারী করতে লাগলেন। অলক্ষ্যে চেয়ে দেখলাম, তাঁর দুই গালে অশ্রুধারা চাদের আলোয় চিক্চিক করছে।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সংযত করে প্রশান্তবাবু এসে চেয়ারে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, “লায়লীকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না সুব্রতবাবু, তার সেই ভীত স্তম্ভর গুটি চোখ মনে পড়ে, সে চোখের চাচনীতে যেন আমার প্রতি নীরব প্রতিশোধ। লায়লীকে বেঁধে রেখে আমি যে নিষ্ঠুরতা করেছি, কি করে আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে বলতে পারেন?”

ভয়ঙ্কর করে কুমরীর ঘুঙুর বেজে উঠল। কুমরী এখনও পারের কাছে বসে আছে, চাঁদের আলোয় স্বপ্নালু দৃষ্টি তার চোখে, সেও কি দেখছে দূর বনানীর স্বপ্ন?

## কবিতার দিন

শ্রীকালিদাস রায়

বলছ ত কবিতার দিন গেছে ফুরিয়ে  
কেমন করে তা বল এড়াবে?  
আকাশের নব মেঘ ভুড়ি দিয়ে উড়িয়ে  
আন দিকে আঁধি ভব ফেরাবে?  
দেখিবে না শরতের ভরা নদী, কুলে তার  
কাশধনে নাচে গাঙশালিকে?  
ঠেলিবে হৃদয় তু আনিবে যে উপহার  
তাহারই কোটা ফুল ডালিকে?  
চাবে না হৃদয় তারাভরা নিশীথের গগনে?  
যাও নাকি সৈকতে বারিষির?

কানে তুলা দিয়ে রবে কুলায়েব কুঞ্জে  
শুনিবে না প্রেমালপ কপোতীর?  
কচিমুখে হাসি নিয়ে এলে ধূলা মাখিয়া  
শিশুর গালের চুমা হারাবে?  
প্রিয় স্ববে মানভরে বসে ববে বাকিয়া  
তাবে কি ধমক দিয়ে তাড়াবে?  
বলছ ত কবিতার লীলা হ'ল বন্ধ,  
তাহা যে ছড়ানো সারা ভুবনে।  
কালো যদি নাই হও নাই হও অন্ধ  
কবিতা এড়াবে বল কেমনে?

# বাংলার বাউল ও বাউল গান সহজে কয়েকটি বক্তব্য

শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্তা

সম্প্রতি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’ গ্রন্থখানি পাঠ করার সৌভাগ্য হ’ল। দু’গুণে বিভক্ত প্রায় হাজার পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে বাউল ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস, তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রথম খণ্ডের মধ্যে বাউল ধর্মের উপাদান, বাউলের সাধন-পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বাউল গানের সংগ্রহটির মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। তা ছাড়া লেখক বাউল ধর্মের আলোচনায় প্রসঙ্গে স্ত্রী, বৌদ্ধ, নাথ, বৈষ্ণব-সহজিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। কোঁচুতলী পাঠে সে সকল পড়ে লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলায় বাউল-ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস, তাদের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখকের মতবাদ সর্ব্বাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হ’ল না। এ ছাড়া গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাগার অধৈত্যাচার্য্যের সাধন সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখও ভ্রমাত্মক। যে সকল বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারি নি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্যই এ আলোচনার অবতারণা।

১। প্রথমে অধৈত্যাচার্য্যের সাধন প্রসঙ্গেই আলোচনা করা যাক। লেখক গ্রন্থমধ্যে অধৈত্যাচার্য্যকে বহুবার ‘অবদূত’রূপে উল্লেখ করেছেন (পৃ: ৪১-৪৭)। তাঁর অনুমান অধৈত প্রথমে যোগমার্গ-বল্লী শক্তির উপাসক ছিলেন, পরে যোগের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমের অবতারণা করেন। এ অনুমানের পরিপোষকরূপে তিনি চৈতন্য-ভাগবত থেকে একটি (২৮) এবং চৈতন্য-চরিতামৃত থেকে দুটি (৫১৯) দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন (পৃ: ৪১)। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁর সাধন সম্বন্ধে লেখকের অনুমান ও উল্লেখ সম্পূর্ণরূপেই ভ্রমাত্মক। অধৈত্যাচার্য্য কোন কালেই ‘শিবশক্তির সামরস্ত্রের’ সাধনা করেন নি, তিনি ‘অবদূত’ সাধক ছিলেন না, তিনি কখন ‘যোগের’ সাধনা করেন নি। চৈতন্য-ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের যে উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি তাঁকে অবদূত প্রমাণ করেছেন, সে উক্তিটি আরো অধৈত্যাচার্য্য সফল নয়, সেটি নিত্যানন্দ সফল। চৈতন্য-ভাগবতের ঐ অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, অবদূত নিত্যানন্দকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই শ্রীচৈতন্য কৃত্রিম কোণ প্রকাশ করে জীবনাসকে বলেছিলেন—“এই অবদূত কেন রাগ নিবন্তর। কোন জাতি কোন কুল কিছু নাহি যায়।” (লেখকের এ উক্তিটিতেও ভুল আছে।)

চৈতন্য-ভাগবত থেকে জানা যায় যে, অধৈত্যাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠা-মুখারী শিষ্যদের সঙ্গে জ্ঞানচর্চা করতেন (২১০; ২১১)।

যোগবাশিষ্ঠ অধ্যায়-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। বশিষ্ঠ, শিষ্য রামচন্দ্রকে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেছিলেন, তাই জ্ঞানযোগ। একজনই এ গ্রন্থের নাম যোগবাশিষ্ঠ। অধৈত্যাচার্য্য যে অধৈতবাদী জ্ঞানী ছিলেন, তাঁর নামেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কমলাক্ষ। অধৈত্যাচার্য্যের পূর্ব-শিষ্যদের মধ্যে মুহারী গুপ্ত ও মুকুন্দ বৈদ্য অঙ্গতম ছিলেন। জ্ঞান-চর্চার ভ্রাতৃ শ্রীচৈতন্য তাঁদের তত্ত্বার করেছিলেন, মুহারী গুপ্ত স্বয়ং সে কথা উল্লেখ করেছেন (কড়চা—২৪; ২৬)। অতএব অধৈত্যাচার্য্য প্রথমে অধৈতপন্থী জ্ঞান-সাধক ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরে তিনি মাধবেশ্বরপুরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত থেকে তিনি যে দু’টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন তার একটিতে জ্ঞানযোগের সাধকরূপেই তাঁকে ‘মহাযোগেশ্বর’ বলা হয়েছে এবং মাধবেশ্বরের নিকট দীক্ষিত হবার পরে বৈষ্ণব-আগম-মুখারী তাঁর পূজাটোনা লিপ্সু হ’ত বলেই দ্বিতীয়টিতে তাঁকে ‘আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল’ বলা হয়েছে।

অধৈত্যাচার্য্য প্রথমে অবদূত, যোগসাধক বা শিবশক্তির উপাসক ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণই কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নেই, লেখকের এরূপ উল্লেখ তথ্যের বিকৃতি হয়েছে।

২। এবারে বাউলদের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব যে তাদের প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে লেখকের মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

বাউলদের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—“ইহা স্পষ্ট বুদ্ধিতে চটবে যে, বাউলদের প্রেম প্রকৃতিপুরুষ মিলনাত্মক প্রকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ হইতে উদ্ভূত, দেহের উদ্ভগত এক আত্মবিশ্রুতিময় অনুভূতি। ইহা একান্তই মানবিক। দেহের বাহিরে বাউলদের কোন সাধনা নাই।” (পৃ: ৮২)

এই প্রেমকে ‘মানবিক প্রেম’ বলার কারণটি আর একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে—“প্রেম অর্থে নিত্যানন্দময় পরমতত্ত্বের মানবিক প্রতিনিধি—কৃষ্ণরূপ ও রাধাশ্বরূপী—পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অচ্ছেদ্য আকর্ষণ।” (পৃ: ৮২)

অগ্রজ শ্রীমুখ ক্রিতিমোহন সেনের বাউল পরিচয় থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেছেন—“শ্রীমুখ সেন মহাশয়ের মতে বাংলার বাউলদের সাধনা ভগবৎ-প্রেমের সাধনা, কিন্তু বাংলার বাউলরা প্রেম বলিতে বাহ্য বুদ্ধি, তাহা ভগবৎ-প্রেম নয় ইহা পূর্ব্বই বলা হইয়াছে।” [পৃ: ৮২]

এ সকল উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বাউলদের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের মতবাদ এই যে, বাউলগণ ভগবৎ-প্রেমিক নহে, তাদের প্রেম প্রাকৃতিক নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণজনিত এক আত্ম-বিশুদ্ধিময় অমুভূতি সূত্রবাং একান্তই মানবিক।

প্রেম বাউলদের প্রধান তত্ত্ব সে কথা লেখক স্বীকার করেছেন এবং বাউলদের তত্ত্ব যে তাদের গানেই সুস্পষ্ট একথাও তিনি অনেক স্থানে জানিয়েছেন। সুতরাং বাউলদের প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য প্রথমে লেখকের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে বাউলদের কয়েকটি গানের অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

ক। সমর গেলে সাধন হবে নায়ে

অবোধ মন। .

যতন আগ্রহ বিনে মিলবে কিরে

প্রেম রতন। [ ৩৭২ নং ]

খ। আছে কাম প্রেমেতে মাথাধারি, প্রেমের জন্ম বুঝা ভার

ও যে জন চিনেছে জগৎস্বামী

কাম থেকে হয় নিষ্কামী

তার আর কৰ্ম আছে কি,

ও সে প্রেমেতে খেলে সঁাতার। [ ৪০৮ নং ]

গ। প্রেম পাখারে যে সঁাতারে

তার মরণের ভয় কি আছে।

জাতিকুল ভয়-লজ্জা তার সব গিয়াছে।

পাগল নয় সে পাগল পাবা,

হ' নরনে বহে ধারা,

ও তার ধারার ধারা মিলে গেছে।

দীন গোপাল কয়, সে আপন ভোলা

প্রেম পাগলা

রসের স্রোতে ভাসতেছে।

ঘ। ভাবেয় ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক

হয় যে জন,

ও তার বিপরীত রীতি পছতি,

কে জানে কখন

সে থাকে কেমন। [ ৪১৩ নং ]

বাউলদের এই গান থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাউল-সাধক সাধন করার জন্য বার্ষিক, কারণ যতন-আগ্রহ বিনে প্রেম-রতন লাভ হয় না। কাম আর প্রেমে মাথাধারি, কিন্তু জগৎস্বামীকে যে চিনেছে সে কাম থেকে নিষ্কামী হয়ে প্রেমেই সঁাতার কাটে। যেজন ভাবেয় ভাবুক প্রেমের প্রেমিক হয় তার রীতি-পদ্ধতিও সাধারণের থেকে আলাদা। লাঞ্-লজ্জা ভাগ করে প্রেমপাখারে সঁাতার কেটেই তার পাগল্যে অবস্থা হয়েছে, স্রমধূনির ধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে তার নয়ন-ধারা। সেই প্রেম-পাগলা, আপন-ভোলাই রসের স্রোতে ভাসে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রেম-রতন লাভ করার সাধনার বাউল যত্ববান, আর সে রতন লাভ করেছেই তার পাগল্যের অবস্থা, জগতের থেকে সে আলাদা, সে আপন-ভোলা।

উষ্টরপুকে লাভ করার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। বাউল-সাধক এই প্রেমের সাধনা করে কোন ইষ্টলাভের জন্য? তাদের গান থেকেই তার উত্তর পাওয়া যাবে:

ক। এমন দিন কবে হবে, পাব মনেদি মানুষ রতন।

আকারে নয়ত মানুষ, প্রেম ধর্ম তাহার লক্ষণ। (৩২৪নং)

খ। আমার মনের মানুষ যে যে

আমি কোথায় পাব তায়ে।

এ সকল গানের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ‘মনের মানুষ’ই বাউলদের সাধ্যবস্তু। মনের মানুষকে তারা অবশ্য সহজ মানুষ, অটল মানুষ, জগৎস্বামী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। এই সাধ্যবস্তু লাভের জন্যই তাদের প্রেম-সাধনা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরও প্রেম প্রধান তত্ত্ব, পুরুষার্থের সাধন। ব্রজেনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জগতী ত্যাদেরও প্রেম-সাধনা। তাদের প্রেম কৃষ্ণপ্রেম, এবং প্রেম বাদের লাভ হয়েছে তারাই কৃষ্ণপ্রেমিক। বাউল-সাধকও তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রেমের সাধনা করে মনের মানুষরূপী ভগবানের জন্য, অতএব তাদের প্রেমকে ভগবৎ-প্রেম বলতে বাধা কি আছে?

বাউলদের এই প্রেমতত্ত্বকে লেখক—পরম তত্ত্বের মানবিক প্রতিনিধি, কৃষ্ণরূপ ও বাধ্যরূপিনী, পুরুষ ও প্রকৃতির আকর্ষণ-জনিত প্রেম, সুতরাং মানবিক প্রেম—কেন বলেছেন তার তাৎপর্য্য অমুপাবন করার চেষ্টা করা যাক। এট তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তত্ত্বশাস্ত্রের তত্ত্ব-গঠনে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তত্ত্বের-আলোকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, লেখকের মানবিক প্রেম কথাটি তাৎপর্য্যহীন।

তত্ত্বালোচনার পূর্বে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তত্ত্ব-সাধন সম্বন্ধে সাধ্যবস্তু মধ্য একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৌদ্ধ ও শাক্ত সম্প্রদায়ই কেবলমাত্র তত্ত্বের সাধক। ধারণাটি ভুল সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ বহুমানকাল-পচলিত সকল সম্প্রদায়ের সাধনাই তত্ত্ব-মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাই হউক, এবার আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

তত্ত্বমতে শক্তিমান ও শক্তির মিলিত রূপটি পরমেশ্বরের স্বরূপ। সুতরাং বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মিলিত রূপ, শৈবদের শিব বা হব—শিব ও পার্বতী (শক্তি) বা হব ও গৌরীর মিলিত রূপ, শাক্তদের শক্তি—শক্তি ও শিবের মিলিত রূপ জীবও পরমেশ্বরের শক্তি সুতরাং অভিন্ন তত্ত্ব। এবার তত্ত্বমতে জীবদেহ আশ্রয় করেই পরমেশ্বরের অবস্থিতি স্বীকৃত হয়েছে, অতএব তাঁর শক্তিমান ও শক্তি-তত্ত্বমত প্রকাশ রয়েছে প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে। এই তত্ত্বানুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় নর-নারীর দেহে কৃষ্ণ-রাধা, শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতির অদ্বিত্য স্বীকার করেছেন।

নর-নারীর অন্তর্নিহিত শক্তি-শক্তিমান সত্তার ভেদ-প্রতীতি সংসার-বন্ধনের এবং স্মৃতি-জ্ঞান যোজ্যে কারণ। বতরুণ এই ভেদ-প্রতীতি ততক্ষণ জীবের কামনা, বাসনা, ভোগাকাজ্ঞা বলবৎ থাকে। অভেদ-জ্ঞানেই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তা হলেই পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন সম্ভবপর হয়। এই মিলনেই তত্ত্ব-সাধকের চরম লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যপথে দুটি বেথেই শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সগুণ-বাহী সম্প্রদায়ের এবং অস্ত্রান্ত্র নিগূর্ণবাদীদের সাধন-পদ্ধতি নিহিত হইতেছে। সেই অনুসারেই কেউ ভক্তিপথের সাধক, কেউ জ্ঞান-পথের ও কেউ যোগপথের।

নর-নারীর প্রকৃতি বিকার ও ষড়বিপ্লব মূলে তাদের শক্তিমান ও শক্তি-সত্তার ভেদ-জ্ঞান। স্মৃত্যং এরূপ জ্ঞানের বিনাশসাধন তত্ত্ব-সাধকের প্রথম প্রয়োজন, সেই সাধনাতেই স্বরূপ-জ্ঞানও লাভ হয়। স্বরূপ-উপলব্ধি বস্তু যে সাধন, তত্ত্ব সাধনার সেই প্রাথমিক স্তরকেই বলা হয়—চিত্তভুক্তি, ভূতভুক্তি বা কায়সাধন। ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীভেদে এই সাধন-পদ্ধতিও বিভিন্ন।

প্রথম স্তরে এই সাধনে স্বরূপ-উপলব্ধি ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাকেই বলা হয় ক্রিয়ান্ত মরা বা সহজ অবস্থা। এই অবস্থাতেই পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত হয়। এই মিলনের স্তর ভিন্ন সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনাকেই ষট্চক্র-ভেদ, সহস্রসাধন, প্রেমের সাধন, উটাসাধন বলা হয়েছে। এর কলে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন বা একাত্মতা লাভ হলেই সামরন্তের অবস্থা হয়, সামরন্তের আত্মদানেই সাধক আনন্দাভিতুত হয়ে থাকে। একেই বলা হয় সমাদি, নির্বাপ, বা মহাভাবের অবস্থা।

তত্ত্বসামান্যবাদী সাধনের স্তর দুটিকে বাহ্য ও অন্তর ভেদে ভাগ করা চলে। বাহ্য সাধনে লক্ষ্যপথের স্তর প্রকৃতি, অন্তর সাধনে সিদ্ধিলাভ। এই হ'ল মোটামুটি তত্ত্ব-সাধনার তাৎপর্য।

এবার বাউলদের সাধন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বাউলদের সাধন বৌগিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম স্তরের সাধনটিকে তারা নাম দিয়েছে 'চারিচক্রের ভেদ'। এই সাধনের দুটি উদ্দেশ্য—প্রথম, ইন্দ্রিয়-দমন ও লজ্জা-বুগ্ধাদি প্রকৃতি বিকার দূর করা; দ্বিতীয়, শক্তি-শক্তিমান বা পুরুষ-প্রকৃতি ভাবের বিলোপ সাধন দ্বারা স্বরূপ-জ্ঞান লাভ। বাউলদের পানের দৃষ্টান্ত থেকেই এই সাধনের মর্ম উপলব্ধি হবে—

ক। ইন্দ্রিয়-দমন কর আগে যন

না হলে সাধন হবে না ( ৩৮১নং )

খ। প্রেম করা কি সহজ কথা, আগে স্বভাব রাখ দূরে।

তোমার আহার করব শিরিত এ জনমের তবে। (৪২৮নং)

এই গান দুটি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়-দমন ও ভেদ-জ্ঞানের বিলোপ অর্থাৎ স্বভাব-ত্যাগ তাদের সাধনার প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ সাধন সিদ্ধির প্রকৃতিমাত্র।

বিশেষ দুটি 'চক্র' অবলম্বনে সাধনের দ্বারাই স্বভাব-ত্যাগ বা

স্বরূপ-উপলব্ধি হয়, তখনই প্রাকৃত কাম প্রেমে পরিণত হয়। বাউল-সাধক তাই বলেছে :

ক। কাম বেধা প্রেম দেখা

দেখনা নজর করে।

দুখেতে হয় ঘি উৎপন্ন মখনেব জোয়ে। (৪২৮নং)

খ। ওরে প্রেম করা কি কথার কর্ম,

আছে কামের মতো প্রেমের জয়

সেই প্রেম করা জোন্তে মরা

কুমড়ো পোকার যেমন ধারা। (৪০৭নং)

সাধনের প্রভাবে কাম থেকে যে প্রেমের জয়, সে প্রেম ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়ক স্মৃত্যং সে শুদ্ধ প্রেম ভগবৎ-প্রেম। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতি-পুরুষ ভেদভাব বতরুণ থাকে ততক্ষণ কামকে প্রেম বলা চলে না, স্বরূপের উপলব্ধি বা স্বরূপ-জ্ঞান হলেই কাম প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অতএব সেথকের অতিমাত্রাব্যাপী প্রকৃতি-পুরুষের অজ্ঞেয় আকর্ষণজনিত কামকে যেমন প্রেম বলা চলে না, মানবিক প্রেম কথাটিরও একেত্রে কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে লেখক বাউলদের 'চারিচক্র ভেদ' প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে পারেন নি। যে ক্রিয়াতে কাম প্রেমে পরিণত হয় তাকে তিনি মহাবোগের সাধন বলেছেন। বাউলদের সাধন-বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—“এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি সাধন সঙ্গিনী প্রকৃতির শারীরিক ও মানসিক এক বিশেষ অবস্থার যোগ সাধনা এবং তাহাকে মহাবোগ বলিয়া গ্রহণ। অপরটি চারিচক্র ভেদ।” (পৃ: ২৮২)

যে ক্রিয়াকে তিনি মহাবোগের সাধন এবং চারিচক্র ভেদ থেকে আলাদা বলেছেন সেটি বস্তুতঃ ঐ সাধন নয়, চারিচক্র ভেদ অর্থাৎ বাহ্য সাধনের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এই ক্রিয়াটিকে তিনি বাউলদের চরম সাধন অর্থাৎ মহাবোগের সাধন মনে করে পরম ভুল করেছেন। বাউলদের প্রকৃত সাধন আরম্ভ হয় ঐ ক্রিয়ার পরে। স্মৃত্যং এটি মহাবোগের প্রথম সোপান মাত্র।

ইড়া ও পিজলা নাকীঘরের সমীকরণ দ্বারা সূক্ষ্ম-পথ উন্মুক্ত করাই এই চক্রভেদের বৌগিক প্রক্রিয়া। এর পরে সূক্ষ্ম-পথেই সাধকের উটাসাধনা বা মহাবোগের সাধনার আরম্ভ। এই পথেই সাধক দেহমথ্য হু'টি পদ্ম ভেদ করতে লক্ষ্য হয়। তাই বাউল-সাধক লিখেছে—‘সূক্ষ্মা ধরিয়ে মৃগাল বাহিরে উঠ সেই পদ্ম পয়ে।’ হু'টি পদ্ম ভেদ করে সহস্রদল পদ্মে সাধকের স্বরূপ-শক্তি পরমেশ্বরে সঙ্গে যুক্ত হয় বা একাত্মতা লাভ করে। বাউলদের চরম সাধনার এই হ'ল শেষ অবস্থা, সামরন্তের অবস্থা। এ অবস্থায় অপূর্ণ এক আনন্দসেব আত্মদান হয়।

এই সাধনের আরম্ভ থেকে সাধকের ভাবাকৃতি অবস্থা—প্রেমের শেষ সীমা মহাভাবে এর পরিণতি। একজনই এ সাধনাকে প্রেমের সাধন বলা হয়। এ ভাবেই বাউল-সাধক প্রেম-ভবের সঙ্গে

যোগ-তত্ত্বের মিলন সাধন করেছে। তাই তাদের খ্রিষ্টিক বা মহাম্মাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যায়।

এবার এ প্রসঙ্গের শেষ করি। বাউলদের যে সাধন-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হ'ল তা থেকে তাদের প্রেম যে মানবিক প্রেম নয়, ভগবৎ-প্রেম—এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করা বাবে আশা করি।

৩। লেখকের মতে বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলার বাউল ধর্মের উদ্ভব। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত হ'ল—“চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনই বাউল ধর্মের প্রাথমিক স্তর। তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্ম বা পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনই বাউল ধর্ম ও সাধনার ভিত্তি।” (পৃ: ৩৫৬)

বাউল ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখকের এ অভিমত সমর্থন-যোগ্য নয়। পরবর্তী আলোচনা থেকে লেখকের মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হবে।

বাউল-ধর্মের উৎসের সন্ধান পেতে হলে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমে ঐ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক বাহ্যিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা দেশে ব্রজেন্দ্র-মন্ডল ঐক্যকে উপাত্ত দেবতারূপে গ্রহণ করে ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। নব্বীপে এই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, চৈতন্য ছিলেন তার মহামণি। এই ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর কয়েক মাস পরে নিত্যানন্দ নামে এক অবদুত চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি বাংলা দেশে ঐক্য নাম ও প্রেমধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহাযোগেশ্বর, সর্বপ্রকার প্রকৃতি বিকার মুক্ত, জাতিভেদ বিচারহীন, বিধিনিয়মের অনবধীন এক আপন-ভোলা মহাপুরুষ। এরূপ একজন সাধক বাংলা দেশে ঐক্য-প্রেমধর্ম প্রচার করে বশবী হয়েছেন।

বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আর এক সাধক অবৈতাচার্য্য, তিনি ছিলেন মহাজানী। তাঁর সাধন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্বে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তিনিও ঐক্য-ভক্তিধর্ম প্রচার করেই বশবী হয়েছেন। অবৈত ও নিত্যানন্দ এই দু'জন তত্ত্বজ্ঞানী ও আত্মারাম সাধক গোড়ার বৈষ্ণব সমাজে প্রভুরূপে খ্যাত। সন্ন্যাসোক্ত্য জীবনে মহাপ্রভু চৈতন্য নীলাচলবাসী হয়েছিলেন, সুতরাং বাংলার বৈষ্ণব সমাজের ভার অর্পিত হয়েছিল প্রভুরূপের উপর। আত্মমায়িক ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চদশকের মধ্যে উভয়ের তিরোধান ঘটে। এই সময়ের নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায় বাংলা দেশে বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধার হয়েছিলেন। এর পরে এদের সঙ্গে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে তাঁরও প্রতিপত্তি ছিল। নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় ছিলেন

সম্ভাব্যের সাধক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতের বীরভদ্রের নাম নিত্যানন্দের শাখার উল্লেখ করতে মনে হয় বীরভদ্রও সম্ভাব্যের সাধক ছিলেন। প্রেম-বিন্যাস ও ভক্তি-বক্তারূপে উল্লেখ থেকে মনে হয় নিত্যানন্দ-পুত্রী জাহ্নবী বা জাহ্নবা দেবী মধুর ভাবে কৃষ্ণভজন সমর্থন করতেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে তাঁরও বিশেষ প্রভাব ছিল। এই জাহ্নবা দেবী পরবর্ত্ত বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের একটি যুগধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল।

এর পরের যুগধারার বাংলা দেশে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এই বৈষ্ণবাচার্য্যের বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠ্যমী উত্তর-সাধক। তাঁদের প্রচারিত ধর্ম-বৈশিষ্ট্য থেকেই আত্মমায়িক ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টদশক থেকে বাংলা দেশে শ্রীধার প্রাধাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিবপ্রধান শৈব এবং শক্তিপ্রধান শাক্তধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তার সঙ্গে বাংলার এই দুই যুগের কৃষ্ণপ্রধান ও বাধাপ্রধান ধর্ম-বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা যেতে পারে। বাহ্য হউক, অবৈত-নিত্যানন্দ প্রভাবিত যুগকে ঐক্যপ্রধান ধর্মের এবং নরোত্তম-শ্রীনিবাস প্রভাবিত যুগকে শ্রীধাপ্রধান যুগরূপে স্পষ্টতঃই অভিহিত করা চলে। প্রথম যুগের ঐক্যধর্মে দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুবিধ প্রেমভাবেরই স্থান ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় যুগে মধুর ভাবই প্রাধাত্য লাভ করে। প্রথম যুগের সাধন-বৈশিষ্ট্য—রাগমার্গে ব্রজের চতুর্বিধ ভাবে ঐক্যভজন (রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপই ঐক্যের স্বরূপ—তত্ত্বশাস্ত্রের এ তত্ত্বটি এ ক্ষেত্রেও মনে রাখা প্রয়োজন), দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য—রাগমার্গে মধুর ভাবে শ্রীধাকৃষ্ণের যুগল-ভজন।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার বৈষ্ণব ধর্মের এই হ'ল মোটামুটি ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে দুটি শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি শাখা নিত্যানন্দ, অবৈত ও তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রভাবান্বিত প্রথম যুগের ঐক্যভজনের বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত—এই শাখাটিই বাউল। বাউলদের গানে যে বৈরাগ্য, নিরাসক্তি, জাগতিক বিধিনিয়ম-বিমুখতা, আত্মভোলা, ও প্রেম-পাগল ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তার মূলে নিত্যানন্দের জায় আপন-ভোলা, প্রেম-পাগল, আত্মারাম সাধকের এবং অবৈতের জায় তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের সাধন-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সহজেই অনুভূত হবে। এই সম্প্রদায়ের ঐক্য-তত্ত্বই বাউলদের ‘মনের মাহু’ তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়েছে।

রাগমার্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজনের যে ধারা দ্বিতীয় যুগে প্রাধাত্য বিস্তার করেছিল, তার বৈশিষ্ট্য হ'ল মধুর ভাবে ভজন, কিন্তু ব্রজগোপীদের প্রেমবৈশিষ্ট্যমুসারে পরকীর্য্যভাবই হ'ল এর আদর্শ। গোড়ার বৈষ্ণবদের এই পরকীর্য্য প্রেমতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। গোড়ার যতের অমুসরণে বৈষ্ণব-সহজিয়াগণও বলে, যুগল ভজনে ব্রজভাব প্রয়োজন এবং



তার কলেই গিরিধারীকে লাভ করা যায়। চণ্ডীদাসের সহজিয়া-ভক্তদের পক্ষে এরূপ উল্লেখই দেখতে পাই, তিনি লিখেছেন :

“যুগল ভজন তাহার বাজন  
বেদবিধি অগোচর।  
ব্রজভাব লয়ে ভজন করিলে  
সেই পায় গিরিধর।”

কিন্তু গিরিধারী বা নন্দেন নন্দনকে ভক্তনের জ্ঞান চাই পরকীয়া ভাব, তাই তারা বলে—‘নন্দেন নন্দন কয়ে ভজন, উপপত্তি ভাব লয়া।’ কারণ ব্রজধামের সখীদের প্রেমও ছিল পরকীয়া—‘ব্রজব মাধুর্যস পরকীয়া হয়।’ (উদ্ধৃতিগুলি মনোজ্যোতসন বহুর সহজিয়া সাহিত্য থেকে গৃহীত)। বাউল সম্প্রদায় পরকীয়া প্রেমের কথা কখনই বলে না, এ প্রেম তাদের আদর্শ নয়। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সঙ্গে বাউলদের প্রেমতত্ত্বের এই হ’ল প্রধান পার্থক্য। এ আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের তুলনা-মূলক বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই—শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, প্রেমতত্ত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন পার্থক্য, উভয় সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধন তখন সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হতে কখনই পারে না। বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে বাউল ধর্মের মূলতঃই প্রভেদ, অতএব এ ধর্মকে বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মের আদিত্যের সিদ্ধান্ত করা একেবারেই অসঙ্গত।

৪। এই গ্রন্থারস্তের পূর্বে লেখক ‘নিবেদন’ করেছেন—“আমি এই গ্রন্থের মধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি যে, মুসলমান কবিরাই বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক বলিয়া মনে হয় এবং বাউল সাধনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভব কবিদের নিকট হইতে আসিয়াছে।” (পৃঃ ১০)

মুসলমান কবিদের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে বাউল ধর্মের উদ্ভব, তারাই এ ধর্মের আদি প্রবর্তক—এ অনুমানও সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়েই এবার আলোচনা করা যাচ্ছে।

কবিদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি বাউল ধর্মকে প্রভাবিত করেছে বলে লেখকের অভিমত, তার মধ্যে একটি হ’ল বাউলদের গানে প্রকাশিত ভগবানের প্রতি অস্টি, দৈজ ও তাঁহার কাঙ্ক্ষকতাবোধ। সহজিয়াদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য নেই, সুতরাং এটি সুফী প্রভাবিত কবিদের নিকট থেকে বাউলরা গ্রহণ করেছে বলে তাঁর অনুমান (পৃঃ ২০৪)।

বৈষ্ণব-পরাবাসী সংগ্ৰহে অঙ্গগত প্রার্থনাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই বুঝতে পারেন যে, বৈষ্ণব-সাধকদের বৈশিষ্ট্যই বাউল গানে পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। জৈঠক-পরবর্তী-যুগের বাউল-সাধকদের অঙ্গ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় নি। সুফী ধর্মে সঙ্গে বাংলাও বৈষ্ণব ধর্মের সাদৃশ্য স্বীকার, কিন্তু সুফী প্রভাবাধিত কবিদের থেকে বাউলরা পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে, এ অনুমান অসঙ্গত।

কবিদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বাউল সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে

বলে লেখকের অনুমান, সেটি হ’ল তাদের ‘কায়-সাধন’। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—“চারিচক্রভেদ নিঃসন্দেহে কায়-সাধন বা সহজ-সিদ্ধির সাধনার ধারা হইতে বাউল ধর্মে গৃহীত হইয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, মুসলমান কবিরাই বৌদ্ধ সহজ-সাধনার ধারাটি বহুদিন সন্ধানপনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল এবং আমার মনে হয় বাউল ধর্মে এই বৈশিষ্ট্য মুসলমান কবিদের নিকট হইতে গৃহীত।” (পৃঃ ২৮২)

বাউলদের চারিচক্র ভেদ বা কায়-সাধন অর্থাৎ যৌগিক প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধ-সহজিয়া প্রভাবিত কবিদের থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে একপ অনুমান করাও হুস হবে। নিম্ন আলোচনা থেকে বাউলদের এই বৈশিষ্ট্য যে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকেই গৃহীত তা অনুমান করা যাবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অবধূত নিত্যানন্দ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় প্রভাবিত প্রথম যুগের কৃষ্ণ-ভক্তনের ধারা থেকে বাউল ধর্মের উদ্ভব। কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শ ও যোগ-সাধনের পদ্ধতি অবলম্বন করেই বাউলদের প্রেমের সাধনা। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় যোগপথ অবলম্বন করেন নি একথা স্বীকৃত। কিন্তু অবধূত নিত্যানন্দের অন্তর্গত শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে যোগ শিক্ষা করেছিলেন—এরূপ প্রমাণ ভুলত নয়। নিত্যানন্দের অন্তর্গত শিষ্যদের অচ্যুত রামদাস অভিযাম চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা জয়নন্দের শিক্ষা-গুরু ছিলেন। জয়নন্দের গ্রন্থে যোগমতঃসুধারী দেহতত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে (বৈরাগ্য খণ্ড, পৃঃ ৭৭)। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রেরও কৃপালাভ করেছিলেন। অভিযাম ও বীরভদ্রের কৃপাপ্রাপ্ত জয়নন্দ, নিত্যানন্দের দারপরিগ্রহণের পর হৃদয়ে অবস্থিতি প্রসঙ্গে লিখেছেন—‘নিত্যানন্দ নিবাস করিলা বড়দহে। মগা-দুঃখ যোগেশ্বর বংশ যাতে দহে।’ বীরভদ্রকে উদ্দেশ্য করেই যে এই টুকু তা অনুমান করা যায়। জৈঠক-চরিতামৃত বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের ‘কৃষ্ণ মগাশাখা’রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি একসময়ে বাংলার বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধারও ছিলেন। অষ্টকোণ প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে তাঁর ধর্মমতের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাস থেকে বীরভদ্রের কিছু পরিচয় লাভ করা যায়, তাঁর যোগবিশুদ্ধি কিছু কিছু নিদর্শনও মেলে। এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, বীরভদ্র যোগসাধক ছিলেন। সুতরাং নিত্যানন্দের শিষ্য ও পুত্রের প্রভাবেই জয়নন্দের যোগ-জ্ঞান লাভ হয়েছিল এবং আরও অনুমান করা যায় যে, বাংলা দেশে নিত্যানন্দ-পবর্তী যুগে তাঁর নিকট দীক্ষিত ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বাউলরা এই সম্প্রদায়েরই উদ্ভেদ-সাধক, সেজন্যই তাদের প্রেম-কল্প ও যোগসাধনার আদর্শের সঙ্গে বাউল ধর্মের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য। বীরভদ্রকে বাউল সম্প্রদায় আদিগুরু স্বীকার করে সে কথা লেখক উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৪)।

কায়-সাধন বা সহজসাধন যোগ-সাধনেরই অন্তর্গত, অতএব বাউলদের সাধন-পদ্ধতিটি এই সম্প্রদায়ের যোগ-সাধনের উপর

প্রতিষ্ঠিত বলাই সঙ্গত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে কিছু-সংখ্যক মুসলমানও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে ফকির সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল, সেসকলই তাদের সঙ্গে বাউল ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমার অনুমান। এই সম্প্রদায় যে প্রথমে বৌদ্ধ বর্ণ্যাবলম্বী ছিল, এবং তাদের কিছু প্রভাব যে বাউল সম্প্রদায়ে পড়েছে সে কথা স্বীকার করা যায়।

আলোচনা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটের উপর বৈষ্ণব-সহজিয়া ও ফকির ধর্মের সমন্বয়ে বাউল ধর্মের উদ্ভব এবং বাউল ও বৈষ্ণব-সহজিয়াদের ধর্ম, তত্ত্ব ও দর্শন মূলতঃ অভিন্ন—লেখকের এ মতবাদ আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি না, কেন মনে করি না—এই আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শেষ বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাউল-পরিচয়' থেকে ভগবৎ-প্রেমিক, ভাবুক, দার্শনিক ও সহজ-সাধক (যৌগিক

প্রক্রিয়া ঘাটাও স্বপ্ন সহজাবস্থা লাভ হয় তখন সহজ-সাধক মাজেই প্রকৃতি সংসর্গে সাধন করে মনে করা হুগ) যে বাউল সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের অভিমতঃসুধারী কল্পনার বাউল নয়, উপরন্তু তা'রাই সপ্তদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত আদি বাউল সম্প্রদায়—একথা স্বীকারে বাধা আছে মনে করি না। বাউল ও বৈষ্ণব-সহজিয়া—এ দুটি প্রধান শাখা থেকে পরবর্তী সময়ে অনেক উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে এবং তিন শ' বছরে উভয়ের ভাবধারার ও আচরণের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু মূল্যের স্বাতন্ত্র্য তাতে নষ্ট হয়েছে সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। বৈষ্ণব-সহজিয়া ও বাউলদের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন বর্তমানে অভিন্ন—লেখকের এ অভিমত যদি স্বীকার করতেই হয়, তবে একথাও মনে হতে হবে যে, বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃত বাউল ধর্মের সম্পূর্ণ লোপ হয়েছে।

## শীত

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

পানপের পীত পর্ণে পাণ্ডুর ঘোঁষ শিহরণ  
খসায়ছে বর্ণাঢ্য খোলস,  
অবশীর্ণ অবয়ব ক্রন্দনে ঘাটিছে আকিঞ্চন,  
সম্মোহন সঞ্জীবন দম  
শিকড়ের তলে;  
পলে পলে  
বিলয়ের-ফেনপুঞ্জ আড়ষ্ট আনোল  
বিক্ষিপ্ত বিভঙ্গে কুঁশে উন্মত্ত আবিল।

জীবন দীর্ঘায় যেন পরিকীর্ণ পউষ-প্রান্তর,  
ছরছাড়া দিক্ততার রূপ,  
কবোটি-কঠিন মাটি—উষের পিয়াস-জর্জর  
গুঁড় তালু, নিত্রান্ত নিশ্চূপ—  
মুহুর্ত হাঁকে,  
ছার্কপাকে  
শুধু ভাগে ব্যর্থতার ব্যত্যয়-বৃষ্টি—  
লালসা-উৎকর্ষ তবু অভীষার-দূত।

উর্জলোকে বীরাচার; যোগাবিষ্ট উলঙ্গ আকাশ  
জাগায়-যে অন্ধ অমানিশি  
গূঢ় গুহ্য তন্ত্রবলে; হি-হি কম্প শৈত্যের-সজ্জাস  
পরিব্যাপ্ত, আর্দ্র দশ দিশি;

শুক হাহাকার  
বায়ুস্বর  
আকর্ষিছে বীর্ষ্যহীন ক্রুদ্ধ উর্জ্বাস  
কুহেলিকা-আন্তরণে নিস্তীর্ণ নৈরাশ।

প্রকৃতির তৃক্-চ্যুত নেমিহারী যেন এই শীত  
প্রলম্ব সে এ-পৃথিবী গায়ে—  
ভ্রংশ বুদ্ধি মত্ত মতি গতি তাই আঁকে যে ইঙ্গিত  
দিনান্তের পূরকের বায়ে—  
মৃত্যু গাঢ় হিম  
বিম্বিম্ব  
সারাবাত—জীবনে-যৌবনে প্রাত্যহিক  
দেশ-কাল-পাত্র ভরি' সম্পৃক্ত সাক্ষিক।

কবে হবে বেগ বাগ্র ?—বল কবে তোমার নৈশ্বাস্ত  
ছড়াবেন? চিহ্নজান-বিশ্ব-  
কাতর এ-প্রাণের পল্লবে; মুক্ত হব ওগো শীত,  
অনন্তের লভিয়া আশিস  
তোমার ভূহিনে—  
অন্তরীণে—  
আহরিষ গতি-রাগ-নিগূঢ় আগ্রহ  
মৃত্যুহীন চূষনের শেষ-অনির্দেশ।

## ফটো

শ্রীঅর্ণব সেন

ছটি পাতলা মশণ ঠোট শুকনো, বিবর্ণ। যেন এক মাগামস্ত্রে সব রক্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। মুখখানি ক্যাকাশে। কপালে কোঁটা কোঁটা; বাম জমেছে। ছটি চোখ স্থির। চোখ পরিষে নেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

শোভনার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ও হয়ত চীৎকার করে উঠত, কিংবা এ ঘর থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু ওর সমস্ত শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। ও অবাক হয়ে চেয়ে আছে ফটোর দিকে।

ছবিটা বুঝি কথা বলে উঠবে এখনি। ঠোট ছটি বোথ হয় এইবার নড়ে উঠবে। ভুরু দুটি কঁপে উঠবে। ছটি চোখ জীবন্ত হয়ে শোভনাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। বিঁধতে চাইছে শোভনার কোমল বুক, শরীর।

অথচ কেবল ছবি একটা। বাথানো ছবি। সুরঞ্জনদার মৃত জীব ফটো।

সুরঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

‘কি শোভনা, তুমি বস নি এখনও? অত লজ্জা কিসের? আর তোমায় কেই-বা বসতে বলবে বল?’

শোভনা তখনও দাঁড়িয়ে। ফটোর দিকে চেয়ে আছে।

সুরঞ্জন ডাকল, ‘ওকি, তোমার কি হয়েছে? তোমার চোখমুখ ওরকম কেন? শরীর খারাপ করছে? এদিকে চেয়ারটায় বস।’

শোভনা কোন কথা বলল না।

‘কি, কি হ’ল?’ সুরঞ্জন এক গ্রাস জল নিয়ে এল।

শোভনা জল খেয়ে চেয়ারটায় বসল।

‘না কিছু হয় নি। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।’

সুরঞ্জন হাত-পাখা দিয়ে ওকে বাতাস করছিল। শোভনা ওর হাত থেকে পাখাটা ইতেনে নিল।

সুরঞ্জন বলল, ‘তোমার কি শরীর খারাপ করছে এখনও?’

সুরঞ্জন আলতো করে শোভনার কপালে হাতটা হোঁয়াল। ‘না, কিছুই হয় নি। জ্বর ত নয়। তবে কি হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠেছিল? কিংবা কোন আকস্মিক শারীরিক যন্ত্রণা?’

শোভনা বাতাস খেতে খেতে বলল, ‘না, আমার কিছু হয় নি। ওই ছবিটা দেখছিলাম ঘরে ঢুকে। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।’

‘ওঃ, ছবিটা!’ সুরঞ্জন নিখাস ফেলল, ‘যাক, অস্ত্র কি ছুরি নয়, তবু ভাল। হ্যাঁ, অল্পমার ওই ছবিটা এনলার্জ করিয়ে বাধিয়ে এনেছি ক’দিন হ’ল।’

‘বড় জীবন্ত ছবি।’ শোভনা চূপ করল।

সুরঞ্জন স্নান হেসে বলল, ‘জীবন্ত! কি জানি, আমার ত মনে হয় নি কখনও। এমনি খুব সাধারণ একটা ফটো ওটা। অল্পমার আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার মাস দুই-তিনের মধ্যে তোলা।’

শোভনা বলল, ‘এখন বাড়িতে ত তুমি একলাই আছ?’

‘হ্যাঁ, একলাই একরকম। একটা বাচ্চা চাকর আছে। আর কেই-বা থাকবে?’

শোভনা হাসল।

‘সে ত বোঝাই যাচ্ছে একলাই আছ। ঘরদোর এমন-ভাবে আর রাখবে কে? একলা আছ বলে কি ঘরের ঝুল ঝাড়তে নেই, বিছানার চাদর বদলাতে নেই, টেবিলটা একটু গুছিয়ে রাখতে নেই?’

সুরঞ্জন বলল, ‘ওসব করবার সময় কোথায় আমার? যাক, তুমি চা খাবে ত? দাঁড়াও, আমি চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি চাকরটাকে।’

শোভনা বলল, ‘আমি চা করব। তুমি কেবল গরম জলটা তৈরি করে দিতে বল।’

সুরঞ্জন বলল, ‘আমার বাড়িতে এসে তুমি নিজ চা করে খাবে?’

শোভনা হেসে উঠল। ওর কানের দুলাটা হলে উঠল ওর হাসিতে।

‘তুমি চূপ করে বসে থাকবে। আমি তোমায় চা করে খাওয়াব।’

শোভনা উঠে দাঁড়াল। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি স্তব্ধ হয়ে আছে।

চা খেতে খেতে সুরঞ্জন বলল, ‘শোভনা, তোমার স্বামীর কিরতে আর কত ঘেরি? তিনি না ফেরা পর্যন্ত ত তুমি এখানেই থাকবে বাপ-মার কাছে?’

শোভনার মুখের দিকে চাইল সুরঞ্জন। আগের চেয়েও সুন্দর দেখতে হয়েছে শোভনা বিয়ের পর। ওর কপা গালে গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে। চোখ দুটি আগের

মত নীলিমা। আর গভীর কালো চোখের তারা দুটি ছরস্ক,  
চকল।

শোভনা হেসে বলল, ‘ওর কোপ’ ত আড়াই বছরের।  
ফিরতে এখনও ঢের দেরি। ও না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই  
থাকব।’

সুরঞ্জন বলল, ‘তা হলে তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা  
হতে পারে?’

শোভনা বলল, ‘হ্যাঁ, তোমাকে আমি জানি না।  
তোমার কথাই আছে, কাজ নেই। তুমি একদিনও  
আমাদের বাড়ি যাবে না এ আমি বাজি ফেলে বলতে পারি।  
তুমি কম স্বার্থপর! তোমাকে কি আমার চিনতে বাকি  
আছে?’

সুরঞ্জন শোভনার কথা শুনে শুনে হাসছিল।

‘তুমি একলাই আমার বাড়িতে চলে আসবে আমি  
ভাবি নি। অল্পপমা মারা গেছে তুমি মাসিমার কাছে  
শুনেছিলে বোধ হয়।’

‘তুমি ত কিছুই ভাব নি। অত দূর থেকে কলকাতায়  
এসেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি, অথচ তুমি বিয়ের  
পর একটা শব্দ পর্যন্ত নিলে না আমার। তোমার বউয়ের  
সঙ্গে আমার দেখা হ’ল ন’, এই হুঃখ দিয়ে গেল।’

দোতলা বাড়িটা ওপরতলা আর নিচেতলা, দুটি ভাগে  
ভাগ করা। ওপরতলায় থাকে শোভনারা আর নিচে-  
তলায় থাকে সুরঞ্জনরা। শোভনারাই বাড়ির মালিক,  
সুরঞ্জনরা ভাড়া থাকে। তবু চুটি পরিবারের মধ্যে গভীর  
অন্তরঙ্গতা।

‘সুরঞ্জনহা, আজ আমাদের ওখানে থাকে। মা বলে  
পাঠিয়েছে।’ শোভনা শাড়ির আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে  
জড়াতে বলে সুরঞ্জনের মাকে।

সুরঞ্জনের মা হাসতে হাসতে বলেন, ‘বেশ ভাল। কাল  
কিন্তু তুমি আমাদের এখানে থাকে। সুরঞ্জনের জন্মদিন  
কাল।’

শোভনা বলে, ‘তাই বুঝি, কই, আমাকে কিছু বলেনি  
সুরঞ্জনহা। আপনি ভাগ্যিস বললেন মাসিমা।’

‘তাই নাকি? সুরঞ্জন বুঝি লুকিয়ে রেখেছিল তোমার  
কাছে?’

‘হ্যাঁ, সেদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম জন্মদিনের কথা।  
তাও বলল যে, বুড়ো বয়সে আর জন্মদিন হয় না। দেখুন  
কি কথা!’

সুরঞ্জনের মা হাসতে থাকেন।

‘আজকাল বেশ কথা শিখেছে তোমার সুরঞ্জনহা।  
আমাকেও সেদিন কি একটা কথা শোনাল যেন।’

‘হুঁ, হবেই ত। স্বত বাজে কাজিল ছেলেদের সঙ্গে  
আড্ডা দেয় আজকাল। বাড়ি থাকতে দেখি না বড় একটা।  
কেবল আড্ডা আর আড্ডা। মা ওর জন্তে যে সোয়েটারটা  
বুনছিলেন তার উল একটু কম পড়েছে। আজ এক মাস  
ধরে ও আর সেই উলটুকু এনে দিতে পারছে না। অথচ  
ওই নিজের জিনিস ত।’

সুরঞ্জনও ছাড়ে না। শোভনার মার কাছে গিয়ে বলে,  
‘জানেন মাসিমা, শোভনা আজকাল বড্ড গল্পের বই পড়ছে।  
পড়াশুনা কিছুই করে না। এই দেখুন না, আমার লাইব্রেরীর  
বই গুঁর বন্ধুদের পড়তে দিয়েছেন আজ পনেরো দিন হয়ে  
গেল। এদিকে আমার দরকারী বই আনা বন্ধ হয়ে  
আছে।’

শোভনার মা হাসেন।

‘হ্যাঁ, তুমি ওকে ধমকে দিলেই পার।’

সুরঞ্জন বলে, ‘ও আমার কথা শোনে নাকি! আমাকে  
গ্রাহ্যই করে না। যদিও বা আগে একটু করত, আজকাল  
মোটাই করে না।’

শোভনার মা বলেন, ‘আমার ত মনে হয় একমাত্র  
তোমাকেই ও কিছুটা মানে। আমার কথা ত একদম  
শোনে না। তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে বাবা।  
ইডেন গার্ডেনে কি একটা একজিভিশান্ হচ্ছে, তোমাকে  
দেখিয়ে আনতে হবে। শোভনা আমাকে বলছে ক’দিন  
থেকে। তোমার সঙ্গে ওর একটু বগড়া না করলেও চলে  
না, আবার তুমি না হলেও ওর চলে না।’

সুরঞ্জন বলে, ‘হ্যাঁ, নিজের কাজের বেলা আমাকে দিয়ে,  
কাজ করিয়ে নেবে। অথচ আমি একটা কাজ করে দিতে  
বললে বলবে সময় নেই। একটা ক্রমাল সেলাই করে দিতে  
বলছি কবে থেকে।’

শোভনার মা বলেন, ‘বেশ ত, আমি করে দেব। ওকে  
সাধতে যাওয়ার দরকার কি?’

সন্ধ্যাবেলাতেও সুরঞ্জন ঘরের ভেতর বসেছিল। শোভনা  
এসে ঘরে ঢুকল।

‘আজ বেড়াতে বের হও নি সুরঞ্জনহা?’ শোভনা  
আরও কাছে এগিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, ‘পরশা  
সুরিয়েছে বুঝি, সিগারেট খাওয়ার পরশা নেই?’

সুরঞ্জন একবার শোভনার মুখের দিকে চেয়ে আবার  
মাথা নিচু করল। টেবিলের ওপর থেকে পেন্সিলটা নিয়ে  
হিজিবিজি কাটল একটা খোলা খাতার পাতায়।

‘আজ্ঞে না। বিকেলে আর বেরুব না ক’দিন। তুমিই ত মাকে বলেছ আমি সর্বদা আড্ডা দিই আত্মকাল। তাই ক’দিন একটু বেট নেব।’

দৈস, কি বাধ্য ছেলে।’ শোভনা ঠোট বঁকাল : ‘দেখব হ’দিন বাড়ী থাকতে পার।’

• সুব্রহ্মণ্য শোভনার দিকে চাইল আর একবার। ফিকে গুজু রঙের শাড়ী, মুখে পাউডারের হালকা প্রলেপ। নতুন রায়দায় তৈরী ছল ওর কানে।

‘বেরুচ্ছে বুঝি ? ভাল, যাও।’

শোভনা জানলার কাছে দাঁড়াল।

‘আমার সঙ্গে একটু যাবে ? হমদমে পিসিমার বাড়ী বি।’

সুব্রহ্মণ্য মাথা নাড়ল।

‘আমি বেরুবো না আজ। আর তোমার পিসিমার বাড়ী আমি যাবও না।’

শোভনা বলল, ‘পিসিমার বাড়ী তোমায় যেতে হবে না। দুই মাস পর্যন্ত বাসে যেতে বলছি। পিসিমার বাড়ীর কাছে পৌঁছে দিয়েই তুমি চলে এস। আমি মট্টরাকে নিয়ে যাব।’

সুব্রহ্মণ্য বলল, ‘আমি যেতে পারব না।’

শোভনা অভিমানের ভঙ্গিতে ষাড় ফিরিয়ে বলল, ‘একলা মি যেতে পারতাম, কিন্তু হ’জনে গল্প করতে করতে যাব, ই তোমাকে সঙ্গে নিতে চাইলাম। বেশ, তুমি যেও না। মি একলাই যাচ্ছি।’

শোভনা চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে।

সুব্রহ্মণ্য ডাকল, ‘এই শোন, শোন। যাচ্ছি চল।’

এমনি করেই একটির পর একটি মাস কেটে যাচ্ছিল। শোভনা আর সুব্রহ্মণ্য। আকাশের রঙ ঘন নীল আর গাছের তার রঙ গাঢ় সবুজ। জীবনে ক্লান্তি নেই, মনে ত্রাস্তি ই। বছরও ঘুরে গেল। কিন্তু শোভনা আর সুব্রহ্মণ্যের খে রামধনুর সাত রঙের খেলা বন্ধ হ’ল না।

কিন্তু পরিবর্তন ও বিবর্তন একদিন আসে।

শোভনা একদিন সুব্রহ্মণ্যের ঘরে এসে চুকল ওপূর্ববেলায় ক।

শোভনা বলল, ‘একটা দরকারী কথা বলতে এসে-  
।ম। আমার শীঘ্রি বিয়ে হবে জান ত ?’

সুব্রহ্মণ্য হাসল।

‘নিশ্চয় জানি মস্তবড় ইঞ্জিনিয়ার তুমি। বিলেত যাবেন  
দিন পরে। সব খবর আমি শুনেছি মাসিমার কাছে।  
আমাকে কি করতে হবে ?’

শোভনা সুব্রহ্মণ্যের চোখে চোখ রাখল। একবার ঠোট  
কামড়াল। ওর চোখের কোণে কান্নার আঁতাস।

‘আমার বিয়ের খবর শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে,  
না ? স্বার্থপর।’

শোভনা মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুব্রহ্মণ্য বলল, ‘আমি স্বার্থপর ? কিন্তু শোভনা তুমি  
আমাকে বুঝতে পারবে না কোনদিন।’

শোভনা বলল, ‘তুমি কেন আমাকে ঠকালে ?’

সুব্রহ্মণ্য একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘শোভনা, আমি  
অনেক ভেবে দেখেছি। তুমি যা চাইছ তা হয় না। হওয়ার  
কোন উপায় নেই। আমার কতটুকু সাধ্য, সামর্থ্য ?’

শোভনা বলল, ‘বুঝছি, আমি শুধু বোঝা হয়ে থাকব।  
আমারই ভুল হয়েছিল।’

সুব্রহ্মণ্য বলল, ‘তুমি তোমার বাবা মা, আত্মীয়স্বজন  
সবাইকে ছাড়তে পারবে, শোভনা। কিন্তু আমি তোমাকে  
আমার কাছে টেনে নেব কোন সাহসে ? তোমার বা আমার  
বয়েসই বা কত ? আমি চাকরি করি না, তোমায় খাওয়াব  
কি করে ? আর, এতকালের মিষ্টি সম্পর্কটা তেতো করে  
লাভ কি ?’

শোভনা বলল, ‘চমৎকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে ! থাক,  
আর দরকার নেই।’

সুব্রহ্মণ্য বলল, ‘তোমাকে কি দিতে পারব বলতে পার ?  
শুধু শুধু তোমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট হবে। আমার যোগ্যতা  
কতটুকু ?’

এর পর সুব্রহ্মণ্য অনেক ভেবে দেখেছে। না, সত্যিই  
অসম্ভব। শোভনাকে বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।  
কোন ভরসার ও বিয়ে করবে ? শোভনাকে সুব্রহ্মণ্য একথা  
বোঝাতে পারে নি। সুব্রহ্মণ্য মনে মনে ভেবে দেখেছে,  
শোভনা যেন সুব্রহ্মণ্যের কাছে ছায়ার মতো। সুব্রহ্মণ্য তাকে  
ভালবাসতে পারে, কাছে টেনে নিতে পারে না। ওকে  
দেখতে পারে, কিন্তু ধরতে পারে না। শোভনা যেন রূপ-  
কথার দেশের রাজকন্যা। দৈত্যরা সেই রাজকন্যাকে  
পাহারা দেয় সারাদিন, সারারাত। সুব্রহ্মণ্য তাকে উদ্ধার  
করবে কি করে ? রাজকন্যার কান্নায় বুঝাই মুক্তো ধরে  
পড়ে।

শোভনার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পরে শোভনা ওর  
স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে। মাঝে মাঝে ছ’একবার এসেছে,  
তখন সুব্রহ্মণ্যের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। তার পর সুব্রহ্মণ্য  
সেই বাড়ী ছেড়ে অল্প আয়গায় উঠে গেছে। তবু সুব্রহ্মণ্যের  
পরিবারের সঙ্গে শোভনাদের পরিবারের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ  
রয়ে গেছে।

আরও কয়েক বছর পর সুব্রজ চাকরিতে ঢুকেছে। ওর বাবা-মা কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছেন। সুব্রজের সঙ্গে অনুপমার বিয়ের খবরও শোভনা পেয়েছে। বিয়েতে উপহারও পাঠিয়েছে।

সুব্রজ যবে বসে বসে শোভনার কথাই ভাবছিল। আজ এতদিন হঠাৎ শোভনা যে একলাই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে একথা সুব্রজ ভাবে নি। শোভনা নিশ্চয় এখন সেইসব ঘটনা ভুল গেছে। হয়ত তার উল্লেখ করলেও ও লজ্জা পাবে। হ্যাঁ, শোভনা বিয়ে করে সুখী হয়েছে। তবু সুব্রজকে এতদিন ও মনে রেখেছে এটাই আশ্চর্য। শোভনা হঠাৎ ফটো দেখে অমন নার্ভাস হয়ে গেল কেন? সুব্রজ হাসল। অনুপমার সঙ্গে শোভনার দেখা হ'ল না।

সুব্রজ অনুপমার ফটোর দিকে চাইল। যে ঘুরে বেড়াই, যে হাসত, যার হাটার মধ্যে ছন্দ ছিল, ভোরবেলা যার চুলের গন্ধে ঘুম ভাঙত, সে আর নেই। অথচ এইখানেই সে একদিন ছিল।

শোভনা এই ফটোটা দেখে বসেছিল, বড় জীবন্ত। ও তাই হয়ত হঠাৎ চমকে উঠেছিল। কিন্তু কেন, ভয়ে? ছবি দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে? শোভনা কি সত্যিই ভয় পেয়েছিল? অনুপম, মারা গেছে ঠিক, কিন্তু তার ছবিটা ত ভয়ংকর কোনোজকু নয়। বরং অমন মিষ্টি চেহারা ছিল অনুপমার, দুটি চোখ কি স্নিগ্ধ ছিল। ছবিটাতে সেই ভাবটি বেশ ফুটে উঠেছে। দুটো লাজুক চোখ! ওই ফটোর মধ্যে দিয়ে অনুপমাকে যেন হৃদয়ে ফিরে পাওয়া যায়। দুটি নরম চোখ কি গভীর শান্তি দেয়।

শোভনাদের বাড়ী আর যাওয়া হয়ে উঠেছিল না। সুব্রজ প্রায়ই ভাবে একদিন শোভনার সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু যাওয়া হয় না। কাজ ত রয়েছে। কাজের ফাঁকে একবার যে শোভনাদের বাড়ী যাওয়া যায় না এমন নয়। তবু হয়ে ওঠে না। হয়ত কোন সংকোচ, জড়তা সুব্রজের যাওয়ার ইচ্ছেকে জড়িয়ে ধরে। এগোতে দেয় না। কিংবা হয়ত ভাও নয়। শুধু আলস্য, উদ্যোগনার অভাব। কি হবে গিয়ে, কি লাভ? কিন্তু একবার যাওয়া উচিত: অন্তত শোভনাকে ও কথা দিয়েছিল একদিন ও যাবে ওর বাড়ী। সেই কতদিন আগে শোভনা এসেছিল সুব্রজের কাছে। না, অন্তত: ওর তার খাতিরে একবার যাওয়া উচিত ছিল। সুব্রজ নিজের ব্যবহারেই লজ্জা পায়। কোন কিছুই ভাল লাগে না। আবার শোভনার কাছে যাবে?

সেদিনও বিকেলে কোন কাজ ছিল না। 'বোঝ কোন রকমে বিকেলটা কাটিয়ে দেয় এখানে ওখানে আড্ডা দিয়ে, বেড়িয়ে। না, আজ শোভনাদের বাড়ী একবার ও যাবে।

হিঃ! আরও অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। শোভনা নিশ্চয় কথা শোনাবে এলো। তবু ওর রাগ করবার ভঙ্গিট মনোবশ।

দরজাটা খোলাই ছিল। সুব্রজ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

‘এই যে, সুব্রজ। মাসিমার বাড়ী বুঝি ভুলেও আসতে নেই?’

শোভনার মা দাঁড়িয়েছিলেন।

‘না, নানা কাজে আর আসা হয়ে ওঠে না।’

সুব্রজ মাথা চুলকে প্রণাম করল।

‘ভাল আছ ত? তোমার কথা প্রায়ই ভাবি, বাবা। এস, বসবে চল।’

‘শোভনা আছে ত মাসিমা?’

‘হ্যাঁ তুমি বস। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

শোভনা হঠাৎ বেরিয়ে এল সামনের ঘর থেকে।

‘কে এসেছে, মা?’

সুব্রজ কথা বলতে গেল। কিন্তু ওর গলার স্বর শুকু হয়ে রইল। শোভনা কথা বলল না। মাথা নিচু করল।

সুব্রজ তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে শোভনার দিকে। নির্বোধের মতো, অচেতনের মতো ও চেয়েই আছে। শোভনার মা অঙ্গ জুড়ে শুধু বিজ্ঞ ওদ্ভ্রতা। মাথায় সিঁদুর নেই। সিঁথিতে অপরিণীত বিজ্ঞতা, শূন্যতা। দু’একটি ক্লক চুল উড়েছে। নিরাতরণ ৬টি বাছ চোখকে পীড়া দেয়, কিন্তু তবু চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই।

‘প্রশান্ত আজ দু’মাস হ’ল মারা গেছে বিলেতে, ওদের কারখানার একটা এক্সিডেন্টে।’

শোভনার মা চোখ মুছলেন।

শোভনা কথা বলল, ‘এস, বসবে এস ঘরে।’

সুব্রজ অন্ধর মত শোভনার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শোভনার ঘরে ঢুকল।

সুব্রজ ডাকল, ‘শোভনা।’

শোভনা বলল, তুমি একটু বস। আমি আসছি এখনি।’

সুব্রজ একলা বসে রইল। কি আশ্বাস নির্জন ঘর! আর তেমনি শূন্য। কিছু নেই ঘরে। জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেবল একটি খাট, আর একটি বেতের ছোট টেবিল।

একটিমাত্র ফটো দেওয়ালে। ফুলের মালা ঝুলছে। দু’একটি পোড়া ধূপকাঠি তার পাশে। শোভনার স্বামীর ফটো ওটা। বছকাল আগে দেখা মানুষকে সুব্রজ ফটোর মধ্যে চিনতে পারল।

বড় গভীর চেহারাটা সুব্রজ ফটোর দিকে চেয়েই

ইল সম্মোহিতের মতো। ফটোর ছটি চোখ যেন সুবর্ণের  
 দ্বয়ের গভীর প্রবেশে ডুবে যেতে চাইছে। ছবিটা বুঝি  
 ঠাণ্ডা বলে উঠবে এখুনি। ঠোট ছটি বোধ হয় এইবার নড়ে  
 উঠবে। ভুরু দুটি কেঁপে উঠবে। ছটি চোখ জীবন্ত হয়ে  
 রঞ্জনকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। বিধিতে চাইছে সুবর্ণের  
 বীর, বৃক। কে তুমি? তুমি কি চাও? কেন এসেছ?  
 শোভনা ধবে এসে ঢুকল। ওর হাতে চায়ের কাপ।  
 ‘ওকি, তোমার শরীর খারাপ করছে?’

শোভনা ভয়ার্ত চোখে সুবর্ণের মুখের দিকে চাইল।  
 কপালে কোঁটা কোঁটা ধাম। বিবর্ণ মুখ, ছটি ঠোট শুকনো।  
 ‘না, কিছু হয় নি।’  
 সুবর্ণ শোভনার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল। ওর  
 হাত কাঁপছিল।  
 শোভনা বলল, ‘হঠাৎ যেমে উঠলে কেন? এখন ত  
 গরম পড়েনি মোটেই।’  
 শোভনা ক্যানটা খুলে দিল।

## শ্রীনিকেতন গঠনে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। হিন্দু হোস্টেলে থাকি। হিন্দু  
 ষ্টেলে সব সময়েই অনেক ভাল ছেলে বাস করিয়া লেখাপড়া  
 ইয়াছে। আমাদের সময় বাহাদের নাম মনে আসিতেছে তাহা-  
 মখো বিশেষ করিয়া জীর্ষাজেহ্রুপ্রসাদের নাম উল্লেখযোগ্য।  
 গত একটি ভালো ছেলে বিশেষ ভাবে আমার আকৃষ্ট করিল।  
 সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার চরিত্রের যে দিকটা সকলকে  
 করিয়াছিল তাহা তাঁহার অন্যতম জীবনযাত্রা-প্রণালী ও  
 র প্রত্যেকের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার শক্তি।  
 সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মীর সন্তান। পিতৃদত্ত বৈভব  
 কে নষ্ট করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার  
 নহিত প্রতিভা ও চরিত্রবলকে উদ্দীপিত করিল। এই পাথের  
 তিনি রাজ্য করিলেন। নিজের প্রতিভার বলে তিনি  
 বী চাকুরি পাইলেন এবং কর্মশক্তি তাঁহাকে উহার সীমাহীন  
 করিল। ইহা নিশ্চয়ই বড় কথা।

কিন্তু সুকুমারের জীবন মহীয়ান হইয়া উঠিল তখনই যখন  
 ঐ কালপূর্ব্বে বহু পূর্বে তিনি ঐ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ  
 । শ্রীনিকেতনের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। সে আসন  
 নি-এস-দিয়েদও কাম্য ছিল, কিসের লোভে তাহা তিনি ত্যাগ  
 । আসিলেনই কথায় আজ আমরা চিন্তা করি। সরকারী  
 সুকুমারবাবু বাংলার বিভিন্ন জেলার সর্বশ্রেণীর সম্পর্কে  
 াছিলেন। শুধু আদালত গৃহের আবেষ্টনীতে নয়, বাহিরে  
 র জীবনযাত্রার ভিতরে। দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অশিক্ষা  
 ক দ্রষ্ট করিয়াছে। সরকারী কার্যের ভিতর থাকিয়া এই  
 দর্শন বহুদূর দূর করা সম্ভব তিনি তাহা করিয়াছিলেন।  
 তাঁহার মন তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শ্রীনিকেতনের কর্ম পরিচালনায় জ্ঞান  
 একজন ভালো লোক বড় সরকারী চাকুরি ছাড়িয়া আসিতে চায়।  
 এই লোক যে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা আমি অস্বীকার করিলাম।  
 আত্মীয়-বন্ধুদের নিবেদন অগ্রাহ করিয়া সুকুমার চলিয়া আসিলেন।  
 টাকার অভাব ক্ষতিটার হিসাব করিলেন না। অনেকে মনে  
 করিল লোকটার মাথায় ছিট আছে। নিশ্চয়ই ছিট থাকিবারই  
 কথা। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বুদ্ধিমান লোকেরা সংসারকে  
 চিরন্তন পথে লইয়া যায় যাত্রা কিন্তু উচুতে তোলে ঐ ছিটগ্রহ  
 লোকেরাই। সুকুমারবাবু শ্রীনিকেতনে যোগদান করিলেন। দীর্ঘ  
 কয়েকবৎসর পর নানা কারণে তিনি ঐ কার্যভার ত্যাগ করিয়া  
 আমাকে উহা গ্রহণ করিবার জ্ঞান অমুরোধ করিলেন। আমি উহা  
 গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু গিয়া দেখি সুকুমার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন  
 আমার মত লোকের পক্ষে তাহা বজায় রাখা দুঃসাধ্য। ধর্মীর  
 দ্রুত সুকুমার, অনেক টাকার মালিক সুকুমার দেশের কাজ করিতে  
 বাইয়া সম্পূর্ণ নিজেই উৎসর্গ করিয়াছেন। থাওয়া-দাওয়ায়, বেশ-  
 ভূষায় গ্রামবাসীর সবল জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ  
 করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত লইয়া কাজে নামিলেন যে,  
 গ্রামবাসীদের সমপরিমাণে না নাহিলে তাহাদের সঙ্গে একত্র কাজ  
 করা সম্ভব নয়। দেশসেবার এই উচ্চ আদর্শের নিকট আজ  
 আমার আমার মস্তক অবনত করিতেছি।

কবির কথা অমূল্য করিয়া বলি। আজ তোমার বাঁচিয়া  
 থাকা উচিত ছিল। তোমাকে দেশের প্রয়োজন আছে।



## হাল্কা পণ্টনের আক্রমণ

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সার্কি মাইল, সার্কি মাইল,  
সার্কি মাইল সম্মুখে,  
সবাই মৃত্যুর উপত্যকায়  
ছুটল ছয়শ' বোড়সোয়ার !  
“হাল্কা পণ্টন, সামনে খাও !”  
কয় সে, “কামান সব পাকড়াও !”  
মৃত্যুর উপত্যকার মধ্যে  
ছুটল ছয়শ' বোড়সোয়ার !  
“হাল্কা পণ্টন, সামনে খাও !”  
কেউ কি ভয়ে সেথা চমকাও ?  
যদিও কোন জানে না সৈন্ত ।

কোন একজন করল ভুল !  
উত্তর দেওয়া তাদের মানা,  
কাবণ কাকুর হয় না জানা,  
কেবল তাদের করুনা মর্জনা !  
মৃত্যুর উপত্যকার মধ্যে  
ছুটল ছয়শ' বোড়সোয়ার ।

তাদের ডাইনে কামানগুলো,  
তাদের বাঁয়ে কামানগুলো,  
তাদের সামনে কামানগুলো  
ছাড়ল গোলা বজ্রনাথে ;  
গোলা-গুলীর বইল ঝড়,  
নির্ম্ম তারা অশ্বের উপর,  
মৃত্যুর মুখের মধ্যভাগে,  
দোজগ মুখে অভঃপর  
ছুটল ছয়শ' বোড়সোয়ার ।

তাদের খোলা কুপাণ ঝলসায়,  
হাওয়ায় ঝলসায় যখন ঘুয়ায়,

গোলন্দাজদের কেটে তরায়  
সৈন্তদেরকে হামলায়, যখন  
বিশ্বসংসার স্তম্ভিত হয় !  
কামানশ্রেণীর ধোঁয়ায় মগ্ন,  
তারি ডান পাশ করল ভগ্ন,  
কসাক এবং রুশদেশীরা  
এলোমেলো কুপাণ-বাঘ,  
হ'ল চরমায় টুকুরো টুকুরা ।  
তারপর তারা ফিরল বোড়ায়,  
ফিরল ছয়শ' বোড়সোয়ার ।

তাদের ডাইনে কামানগুলো,  
তাদের বাঁয়ে কামানগুলো,  
তাদের পশ্চাৎ কামানগুলো  
ছাড়ল গোলা বজ্রনাথে ;  
গোলা-গুলীর বইল ঝড়,  
পড়ল বোড়া, বীর এর পর,  
লড়ল যারা এতই সুন্দর  
ফিরল মৃত্যুর মুখ থেকে,  
দোজগ মুখাৎ ফিরল তারপর,  
যা সব ছিল তাদের এর পরে,  
ছিল ছয়শ' বোড়সোয়ার ।

মুহুরে তাদের আর কি গৌরব ?  
ওঃ, কী ভীষণ লড়ল ঐসব !  
বিশ্বসংসার স্তম্ভিত হয় ।  
পা'ক মান তারা আক্রমণের ।  
হোক মান হাল্কা সেনাদের,  
শ্রেষ্ঠ ছয়শ' বোড়সোয়ার !

\* লর্ড টেনিসনের “The Charge of the Light  
Brigade” অবলম্বনে ।

## দুরাশার মৃত্যু

শ্রীআশিস গুপ্ত

আমি ত জানতাম নিশ্চয়ই

তুমি অপেক্ষা করবে।

অপেক্ষা করবে

দ্বিগুণে দ্বিগুণে সাদা

আর সুন্দর কাগজের মত

ঐতিহাসিক আমার

সুন্দর টেবিলের উপরে।

মনে করেছিলাম

আগামী হাজার বছরের ইতিহাস

আমি লিখব

সেই কলংকহীন শুভ্র পাতাগুলিতে।

সে ইতিহাস হবে

আগামী দিনের অনেক দৌল্ভাগ্যের

অনেক গানের

অনেক হৃদয়ের প্রাচুর্যের।

হায়!

এল এক ধমকা হাওয়া

আত্মনিয়ন্ত্রণ

আর ইকনমিস্টের খোলা জানালা দিয়ে।

গোছা গোছা সুন্দর

আইভরী-কিনিশ কাগজগুলো সব

ঐতিহাসিকের টেবিল ছেড়ে

ছড়িয়ে পড়ল

নোংরা রাস্তায়,

ডাষ্টবিনে

সার। শহরের পদচলিত অবহেলাতে।

তবু মনে ছিল অদীম উৎসাহ,

অসম্ভবকে সম্ভব করবার মত

মত্ত যুবক মন,

সংস্কারকের শৈথিল্য!

পচা ড্রেন হতে

ডাষ্টবিনের বিত্তীয়কাম্য পরিবেশ হতে,

কর্দমাক্ত

হোসপাইপের জল দেওয়া রাস্তা থেকে

কুড়িয়ে কুড়িয়ে

জড়ো করলাম কাগজগুলিকে!

কিন্তু সব মিথো হ'ল।

বুঝি নি ত,

আগে বুঝি নি ত।

মিথ্যে হ'ল তাই সব।

দেখলাম,

সেই সব সুন্দর সাদা কাগজ

বিচিত্র কুৎসিত দাগে বোঝাই

রাস্তার আর

ডাষ্টবিনের দাগ।

নতুন কিছু লেখবার

কিছু জায়গাও আর বাকী নেই।

আমার ইতিহাস লেখা আর হ'ল না।

আমার আর তোমার ইতিহাস

সে কি

অনন্তকালের জন্ত থমকে দাঁড়াল?

## কেন্দ্রীয় সরকার ও বেকার-সমস্যা

শ্রী আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ভারতীয় অর্থনীতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বেশীর ভাগ কাল পল্লী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, এগুলো প্রধানতঃ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। পল্লী-অঞ্চলে যাঁরা কুটিরশিল্প নিয়ে নিযুক্ত থাকতেন তাঁদের আবার আংশিকভাবে ক্ষেতের কাজ করতে দেখা গেছে এবং যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকত সেটুকু সময় হাতের কাজ করে এঁরা নিজেদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। এ ছাড়া যাঁরা প্রধানতঃ কৃষিকারী ছিলেন তাঁদের ভিতর থেকেও বহু লোক ঠিকি কাজ করে যতটা সম্ভব উপার্জন করতেন। অবশ্য, যখন ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকত তখনই এঁদের ঠিকি কাজ করতে দেখা যেত। তবে ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকার সময়টাও নেহাৎ কম নয়। বছরে প্রায় ছয় মাস হবে, কিন্তু আজ এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এর কারণ হ'ল দুটো। প্রথমতঃ গ্রামীণ শিল্পের অবনতি ঘটেছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল কৃষির উপর চাপবৃদ্ধি। তাই অসংখ্য লোক গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে এবং কলকারখানার চাকুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া কৃষি-সংস্থারের জন্ত যে সব প্রস্তাব করা হয়েছে সে সব প্রস্তাব যদি কার্যকরী করা হয় তাহলে ক্ষেতের কাজ আগের চাইতে আরও কমে যাবে। এজন্যই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কর্ম-সংস্থান কমিটি বলেছেন, মোট কাজের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশটির বেশী কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা যাবে না। কমিটির মতামতগারে অবশিষ্ট কাজগুলো শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ এগুলো হবে কৃষিবহির্ভূত। কিছুদিন ধরে সরকারের তরফ থেকে যে সব বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে সে সব বিবৃতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সরকার কৃষির উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। শোনা যাচ্ছে, আগামী ১৯৭৬ সনের মধ্যেই কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা সত্তর শতাংশ থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

আগেকার হিসাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ায় সত্তর লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। অবশ্য, দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রারম্ভে সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের চাকুরির হিসাব ধরা হয়েছিল।

সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে প্রতি বছর নাকি ত্রিশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারী যুগপাত্তরা বলছেন, যদি পরিবর্তিত হিসাব পঁয়ষট্টি লক্ষে পৌঁছতে হয় তাহলে বর্তমান এবং আগামী বছরে দেশবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যখন শুরু হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে, হিসাব অনুযায়ী ষত লোকের কর্ম-সংস্থান বাকী থাকবে তার উপরও ১৯৬১ সন থেকে ১৯৬৬ সনের মধ্যে বহু নতুন লোক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছে। অনুমান করা হয়েছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কমপক্ষে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের প্রয়োজন হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে সর্বশাকুল্যে দু' কোটি দশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান একরকম অসম্ভব। ত্রীনন্দ বলেছেন, যেসব ব্যক্তিকে কর্ম-সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পরিকল্পনাধীন কাজে ও চাকুরির সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব নয় সে সব ব্যক্তির জন্ত উৎপাদনমূলক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সম্প্রদায়িত করা কর্তব্য।

গত বছর অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় কর্ম-সংস্থান কমিটি গঠন করা হয়েছে। যখন এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিছা গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তখন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাটিত কয়েকটা বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। প্রথম থেকেই এই কমিটি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করে আসছেন যে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করার সময় যথাগম্য অধিক কর্ম-সংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত দরকার। যখন দেখা যাবে, নানারকম পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব তখন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্ত কমিটি সুপারিশ করেছেন যার ফলে অধিকতর সংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থান দরকার হবে। অবশ্য, যে কোন পদ্ধতিই অবলম্বিত হোক না কেন, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অবস্থার উপর সর্বদা নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যাতে কর্মের সুযোগ বর্ধিত হয় সেজন্য চেষ্টা করা দরকার।

যদি পল্লী-অঞ্চলগুলোতে শিল্পক্ষেত্রে স্থাপিত হয় তাহলে ঐ সব অঞ্চলের শিল্পায়ন দ্বারা সম্ভব হবে বলে আশা করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় কর্ম-সংস্থান কমিটি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা লোক সংগ্রহ করা না হয় তাহলে সরকারী চাকুরি এবং সরকার পরিচালিত শিল্প-সংস্থাগুলোতে কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে লোক সংগ্রহ করতে হবে। অবস্থা পর্যালোচনা করে কলকাতার 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন

As Minister for Employment, Mr. Nanda, is understandably worried; but he would be justified in telling his colleagues, in the cabinet and on the Planning Commission, that creation of employment is not his business at all. It is certainly beyond his means, for jobs can be created only by increased economic activity—the concern of other Ministries.

আমাদের দেশে এমন অনেক শিল্প আছে যেগুলো সম্পর্কে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন আদৌ সম্প্রসারিত হয় নি। কাজেই যাতে এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে এই আইন সম্প্রসারিত হয় সেজন্য কোম্পানী আইনের পরিবর্তন দরকার। তা ছাড়া কারবার গুটাবার মামলার যাতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার-গুলোর হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে সেজন্যও কোম্পানী আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়, কারণ তা না হলে উৎপাদন এবং কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে সমুচিত হয়ে যাবে। বর্তমানে যে রকম কারবার গুটাবার সময় কেবলমাত্র কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়ের বিষয় বিবেচনা করা হয়ে থাকে, সে রকম বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারবার গুটাবার সময় দেশের বৃহত্তর স্বার্থ এবং কর্ম-সংস্থান সম্পর্কীয় অবস্থার কথা সকলের আগে বিবেচনা করতে হবে। ১৯৫৯ সনের ২৫শে মে তারিখে ত্রিগুণজারীলাল নন্দ কেন্দ্রীয় কর্ম-সংস্থান কমিটির বৈঠকে ভাষণ দেবার সময় এই মর্মে সুপারিশ করেছেন যে, প্রত্যেক শিল্পে এমন একটা বিশেষ তহবিল গঠন করা দরকার যেটার সাহায্যে কোন শিল্প-সংস্থা বন্ধ করে দেবার দরুন যে সমস্তার উদ্ভব হয় সে সমস্তার প্রতিকার করা যেতে পারে এবং ছাঁটাই ও বেকারির ক্ষেত্রে দায়িত্ব বহন করা সহজ হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যদি কোন কারখানা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা বন্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়, তা হলে এর প্রতিকারের জন্য খুব শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত দরকার। তবে একটা পরিকল্পনা-বিত্তাস ছাড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়।

এমন অনেক সময় আসে যখন কোন শিল্প-সংস্থার দখল নিয়ে বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু আর্থিক সঙ্গতির অভাব রয়েছে অথবা আবশ্যকীয় লোকজন পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু পরিচালক নিয়োগ স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রথমেই যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সেজন্য শিল্প-সংস্থাগুলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। কয়েকটা গৃহীত মান অনুযায়ী একজন মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যখন কোন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় তখন কারখানার কর্মীরা অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হন। এঁদের প্রতিডেণ্ট ফাণ্ডে যে অর্থ জমে সে অর্থের পরিমাণ সামান্য বললেই চলে। অথচ কারখানা বন্ধ হবার পর জীবনধারণের জন্য এঁরা এই সামান্য সঞ্চয়-টুকুও নিঃশেষ করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোন কোন শিল্প-সংস্থা কর্মীদের কিছুটা সময়ের মাহিনা দিতেও সক্ষম হন নি। অথচ এর প্রতিবিধানের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন কাণ্ডকারখানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নি। তাই বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতে কর্মীদের আবার শিক্ষা দেওয়া এবং অন্য কাজে সরিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয় সেজন্য এই বিশেষ তহবিল কাজে লাগান যেতে পারে।

দিনের পর দিন যেভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে বেকার-সমস্যা খুব জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই ত্রীনন্দ শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন, কারণ তিনি মনে করেন, যদি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য অব্যাহত থাকে তা হলে বেকার-সমস্যার সমাধানের পথ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠবে। যদিও একথা ঠিক যে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার জটিল উপসর্গ ছাড়া আর কিছুই নয়, তথাপি শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার নীতি সমর্থনযোগ্য কি না ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার। ত্রীনন্দ বলেছেন, কেবলমাত্র সে সব ছাত্রকে বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাস করানো বাঞ্ছনীয় যাদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। ত্রীনন্দের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার আছে। তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু বলছি, বিগত কয়েক বছর ধরে সাধারণ মানুষের পক্ষে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রধান কারণ হ'ল দুটো। প্রথম কারণ হচ্ছে, শিক্ষার ব্যয় খুব বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার সুযোগ সমুচিত হয়ে এসেছে। সুতরাং সরকার যদি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে শিক্ষালাভের

# একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়! মিষ্টি তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিষ্টি তার দিদির জামা নেয়, ওর মায়ের শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি স্বপ্নে ফস! আর স্বপ্ন থেকে রঙীন।

জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনার অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়নার দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সর্বান্বই ব্যবহার করুন।

**সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে**

সুযোগ আরও সঙ্কুচিত করেন তা হলে বেশীর ভাগ গৃহস্থের পক্ষে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এটা সত্যি হুঃখের কথা যে, যখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা চলছে তখন আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করার জন্য সরকারী মুখপাত্রেরা সুপারিশ করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কর্ম-সংস্থান কমিটি পল্লী-অঞ্চলের শিল্পায়নের উপর জোর দিয়েছেন। কমিটির সভাপতি পল্লী-অঞ্চলের শিল্পায়নকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্ততম মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া কমিটি সর্বাধিক সংখ্যক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করার কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন, কারণ তা হলে অধিকতর সংখ্যায় লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। পল্লী-অঞ্চলের নেতৃত্ব শিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতে থাকা বাস্তবায়ন, এ সংক্ষে কোনও দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। তবে নেতৃত্ব হাতে রাখতে হলে পল্লী-অঞ্চলে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কর্ম সংস্থান কমিটি ও পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মে নিযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

‘দি স্টেটসম্যান’ পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেন—

“Preoccupation with the problem of unemployment as such, although it is really the result of the economy's failure to expand in proportion to the growth in population, may well have been an effective hindrance in finding an answer to it. With the economy given the impetus it needs to expand, and with something done about population, the problem may well

be brought down to manageable proportions quicker than by undefined unorthodox ways.”

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প-ব্যবসা প্রসারের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কাজ সম্পূর্ণ করার জোর আয়োজন চলছে। কাজে যতই সম্পূর্ণ হচ্ছে, লোকের কর্ম-সংস্থানের সুযোগও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরানো বেকার এবং নতুন কর্মপ্রার্থীর জন্য যতটা পরিমাণ কাজের সংস্থান প্রয়োজনীয় ততটা পরিমাণ কাজের সংস্থান করা অসম্ভব। আমরা আগেও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীনন্দ বলেছেন, কেবলমাত্র গতাহুগতিক ধারায় কর্ম-সংস্থান-সমস্যার সূঠ সমাধানের আশা নেই। তাঁর অভিমত হ’ল, যদি সমস্যার সমাধান করতে হয় তা হলে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। অবশ্য, নতুন পথ, এই কথাটির দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা সুস্পষ্ট নয়। তবে আমাদের মনে হচ্ছে, যদি কোন-রকমে স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শিল্পের মাধ্যমে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যেটা লোকের কর্ম-সংস্থানের উপযোগী, তা হলেও কিছুটা মঙ্গল সাধিত হবার আশা আছে। জনসাধারণ সাধারণতঃ মনে করেন, যদি কলকারখানায় কিম্বা দপ্তরে চাকুরির ব্যবস্থা করা হয় তা হলে বেকার-সমস্যার সমাধান হবে, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জনসাধারণ এইভাবে চিন্তা করে থাকেন, কারণ কেবল-মাত্র কলকারখানায় কিম্বা দপ্তরে চাকুরির ব্যবস্থা হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, এইভাবে কখনও বেকার-সমস্যার সমাধান হয় নি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মোট কর্মরত লোকবলের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং কারখানা চালাইয়া অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। আমাদের দেশেও কর্ম-সংস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্য এইভাবে চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। ফল ভালই হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



## ক্যাম্পে

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

( আটপুর সর্বাধ সাধক বিদ্যালয় )

রাত্রি সাড়ে তিনটায় লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বেলডাক্স ট্রেনে এসে, সঙ্গে সঙ্গেই শেষবারের মত পোটলা-পুটলি নিয়ে, যত্নাভি করে মাটির বুকে কিবে এলাম। যুহুভের হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। বহুদূরে গাড়ীর লাল আলোটা ক্রমশঃ আঁধারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটুকু কোনরকমে বসে-দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। পূর্বের আকাশ রান্ধা করে, দূরের বনানী দীর্ঘ করে খনকুখ কেশদামের মধ্যে শিথির লাল টকটকে সিঁহুরের মত আবির্ভাব হ'ল স্বর্ষ্যোদয়ের। দিকবালায়া মেতে উঠল রঙের হোলি খেলায়। “ওঁ জবাকুমুখশঙ্কশং...” মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করে যুক্তকর কপালে স্পর্শ করলাম।

বেলা সাড়ে ছ'ট', ২২শে ডিসেম্বর '৫৯। আপন আপন জিনিষপত্র কাঁধে, মাথায়, বগলে চেপে একত্রিশ জনের লাইন এগিয়ে চলল ওভারব্রিজ পেরিয়ে। নতুন দেশ, অচেনা রাস্তা, মাঝে মাঝে ধামতে হচ্ছে—অজগর যেন শিকারের পিছু নিয়েছে।

‘গোবিন্দ স্মৃতি বিদ্যালয়’। একহাঁটু ধুলো পেরিয়ে ইঁটের প্রাচীরঘেরা, কালশিবে-পর্য্য বিদ্যালয়-চত্বরে এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থরূপ আর একটা অজগরও এসে হাজির হ'ল। চট করে মাঠে একটা পাক দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। উত্তর ও দক্ষিণে দুটি ছোট ছোট সিঁড়ি এবং তিন দিকে ছোট ছোট সাধারণ ফুলের বাগান। উত্তরদিকে সারি সারি আমগাছ দিয়ে সাজান একটি স্মৃতির আমবাগান। সামনেই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বাসা। পূর্বদিকে একটি ছোট ও একটি বড় জলাশয় আগাছাপূর্ণ। তারই কোণ ঘেঁষে বোড়িং বাড়ী। দক্ষিণদিকের এক কোণে সর্বাধসাধক ব্লক তৈরী হচ্ছে—সবেমাত্র নেড়ামাথা। এখানকার বালি খুব সাধা—ময়দায় ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দোতলার এক কোণের দিকে ঘর পেলাম। শিক্ষকের পৃথক ঘর হলেও আমি ছেলেদের কাছেই রইলাম। প্রথম দিনটি সাধারণভাবে ঘুরে ফিরেই কাটল। রাত্রি পর্যন্ত অস্ত্রান্ত হল আসতে লাগল। আমবা সর্বসমেত প্রায় সতেরটা শিক্ষায়তন থেকে এখানে মিলিত হলাম। এই দারুণ শীতে কারও কারও বেশ কষ্ট হয়েছিল।

রাত্রিশেষে পুরাতন স্বর্ষ্য নব আবর্তনে নুতনরূপে দেখা দিল। সূর্য হ'ল আমাদের অভিযান। প্রায় এক মাইল দূরে “হরেক নগর রোড” তৈরী করার ভার পড়ল আমাদের উপর। চা পানাস্তে প্রায় সাতটায় আরম্ভ হ'ল বোড়া, কোদাল, হাতলের ছড়োছাড়। প্রায় বেশীর ভাগই ছোট ছোট ছেলে। সে কি উৎসাহ তাদের! কার রাস্তা ভাল হবে! মেজর চক্রবর্তী, ক্যাপ্টেন সিনহা, ক্যাম্পের কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডার মাঝে মাঝে এসে পিঠ চাপড়ে ছেলেদের উৎসাহ বৃদ্ধি করলেন। ক্ষণিকের বিশ্রাম, আবার কাজ। দশটায় টিকিন, সাড়ে বারটায় ছুটি, সারি দিয়ে ক্যাম্প ফিরে আসা, একতালে রাস্তা চলা—এ যেন এক নতুন ব্যাপার। পথের দু'ধারে লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত এই ক্ষুদ্র পল্টনদের দিকে, কারণ সকলের একই রকমের থাকি পোশাক। ক্যাম্পে ফিরে কাক-স্নান, তার পর লাইন দিয়ে খাবার নেওয়া, অনভ্যস্ত হাতে থালা ধোওয়া—সে এক উপ-ভোগ্য ব্যাপার। বৈকালে চা পানাস্তে খেলাধুলা—বল, ভলি, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি। সন্ধ্যায় ‘রোল-কল’, ‘জাতীয় সঙ্গীত’। পরে ছেলেদের খাবার ও আমাদের মিটিং মেজর চক্রবর্তীর সঙ্গে। কয়টা দিনের মোটামুটি ধারা ছিল এইরূপ।

একদিন স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে ‘টিপু সুলতান’ দেখিয়ে আমাদের সধর্দনা জানান হ'ল। পরদিন দুপুরে মেজরের অনুমতিক্রমে যুশিধাবাহে প্রাচীন নবাবী কীর্ত্ত অবলোকন করার একটা সুযোগ এল। প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্বের এই স্থান আজ প্রায় নির্জন। তোরণে তোরণে বাজে না নহবৎ সকাল সন্ধ্যা; মোজার পড়েন না কোরাণ মসজিদে মসজিদে; হাজার দুয়ারী, ইমামবারা, হাদেমখানা নির্বাক সাক্ষী নবাবী বিলাসের। অস্ত্রাগার জানায় তাঁদের শৌর্ষ; আসবাবের চাকচিক্য, বিরাট ঝাড়লগ্নন, পাঠাগারের উন্মুক্ত দ্বার আজিও জানায় কারে স্বাগত সন্ধ্যাণ! বন্দীরা গাহে না গান, পাখীরা মিলায় না তান। সবই যেন থাপছাড়া, যেমানান। নবাব সিরাজের অতৃপ্ত অত্মা যেন আজও ঘুরে বেড়ায় জব্যসস্তারের আনাচে-কানাচে; মতিঝিল, হীরা-ঝিলের তরঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়ায় শীর্ণকায়্য পুণ্য-গলিলা মন্ডাকিনীর কুলকুল তান—‘দাছ সাহেব, দাছ সাহেব...।’ আদর্শের ভগ্ন দুর্গপ্রাচীর করতে থাকে



ব্যক্ত। পথের লাল কাঁকর ও ধূলি নীরবে জানায়—“নাই নাই, নাই সে পথিক নাই।” কীর্তি অবিনশ্বর, Once for all, জানায় সে “ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।” চোখের দেখা শেষ, মনের মধ্যে কত কথার আনাগোনা, কত পাশপুণ্যের স্পর্শ পাওয়া বাংলার প্রাচীন রাজধানীর মাটি ছেড়ে সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

“দিন যায়, আসে নিশা; যায় নিশা, আসে দিন” গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে যায় দিনের পর দিন। হঠাৎ শুনি, কাল Camp fire, ঘরে ঘরে ছেলেদের মধ্যে উদ্দীপনার বড় উঠেছে। হারমনিয়াম, তবলা, মাউথ-অর্গান, নাচগান কত না আনন্দ, কত না প্রস্তুতি।

শেষের দিন—Camp fire day, আজ যেন ছুটির দিন; মনের কোণে স্বপ্ন মিলনের সুখানুভূতি আবার বিদায়েরও বিষণ্ণতা—একটা complex। প্রভাতে সামান্য বাক কাজ শেষ করে গ্রামবাসীদের স্নেহে সকলে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হলাম। এখানকার ‘মনোহর’ বিখ্যাত। বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিঃ দত্ত নবনির্মিত রাস্তাটির উদ্বোধন করে এই সামাজিক কাজের প্রয়োজনীয়তা সঘনাই সতর্ক করে দিলেন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ভোরবেলা মালার পথটি সুশোভিত করা হয়েছিল। মুসলমানপ্রধান এই গ্রামটি ঘুরে ‘হিন্দুস্থান-পাকিস্থান’ ভাবটা একান্ত অবাস্তব বলে মনে হ’ল। গ্রামের ডাক্তার সাহেব, প্রেসিডেন্ট, শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য ভক্তমহোদয় অশ্রুশ্রব্ধ হয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের স্বতিকে তাঁদের মধ্যে জাগরুক রাখার জন্য আমাদেরকে “ক্যামেরায়িত” করলেন। আর তারই কিছু কিছু তাঁদের স্বত্বরূপে আমাদের পরিবেশন করলেন। এ মিলন ও বিরহ-স্বত্ব বড়ই মধুর—অব্যক্ত, শুধু প্রণিধান-যোগ্য।

মাঠে বৈজ্ঞানিক আলোকে দুর্বাঙ্কলগ্রাম বন্ধে সূর্য হ’ল আমাদের বিদায়-বিধুর মিলন উৎসব। ‘ক্যাম্প ফায়ার’ জ্বলে উঠল। সহস্র মেজর চক্রবর্তীর আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ ছুটে গেল সকলের কানে কানে, মনে মনে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ‘চরিত্র’—একথা পরিষ্কার ভাষায় জানালেন তিনি। মনে পড়ল, সকল শিক্ষক ধূমপান না করলেও ১৪ বছরের ছেলেদের শাদাকাঠি ছাড়’ চলে না। এ বড় লজ্জার ব্যাপার—ছাত্রসমাজের কলঙ্কস্বরূপ। জানি না, এতে তাঁদের কি ক্রটিদের পরিচয় লুকায়িত আছে। বিদায় ব্যাঘ্র

মিলিটারী মানুষ মেজবেরও কঠোর ভারী হয়ে উঠল। সূর্য হ’ল ছেলেদের নাচ, গান, আবৃত্তি, কমিক। আমাদের ছাত্ররা ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা ‘ক্যাম্প লাইক’ গেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ করল। দুটি মাত্র পুরস্কার বিতরণ করা হ’ল—রাস্তার কাজে ও অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠতায়, আমাদের ছাত্রেরা দ্বিতীয় পুরস্কারটি লাভ করার গৌরব অর্জন করল। ‘বড় খান’র মাছ, মাংস, মিষ্টান্নের ঘটল প্রাচুর্য। প্রায় সারারাত্রি চলল, ‘লয়ে রসারসি করি কবাকষি পৌঁটাল-পুঁটাল বাঁধা।’

৩১শে ডিসেম্বর। বর্ষ বিদ্যায় আমাদেরও বিদায়ের পালা। শীতের বরাপাতার মত এক-একটা দল হতে লাগল বৃন্তচ্যুত। মেজর চক্রবর্তী শেষ বিদায় জানাতে এলেন আমাদের ঘরে। ছেলেদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর পূর্ব দিনের কথাগুলি; জানালেন শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। আমরা হলাম ধন্য, বিশ্বয়ে হতবাক। উচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যবহারই এত মধুর, এত অন্তলম্পনীয়। হু’একটি অশ্রুবিন্দু মনের অজ্ঞাতে টলমল করে উঠল চোখের কোণে। মেজর চক্রবর্তীর নির্দেশে গরম হালুয়া, পুরা, রসগোল্লা হ’ল আমাদের বাস্তব পাণ্ডের। গেট পর্যন্ত এলেন তিনি এগিয়ে দিতে। ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’—

আবার এক হাঁটু ধুলা, সেই অভয়-শিকার শেষে ফিরে যাওয়া, মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকান। নিস্ত্রাণ বিদায়তনটিকে ছেড়ে যেতে অন্তরের কতই না ব্যাকুলতা, কতই না মমতা। ‘adien adien’, বিদায়, বিদায়, অগ্নি! জননী মনোমুগ্ধকারিণী।’

পথের ঝাঁকে পিছনে ফেলে আসি তাকে...

## দি ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া লিমিটেড

কোন : ২২-৩২৭২

গ্রাম : কৃষ্ণসখা

সেন্ট্রাল অফিস : ৩৬নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ফি: ডিপজিটে শতকরা ৪, ও সেভিংসে ২, হর সেওয়া হয়

আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল ছয় লক্ষ টাকার উপর

চেয়ারম্যান :

ডে: মানেজার :

শ্রীজগন্নাথ কোলে এম,পি, শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে

অগ্রাঙ্গ অফিস : (১) কলেজ রোডের কলি: (২) বাঁকুড়া

## বিস্মৃতপ্রায় উপজাতি বোডো

শ্রীভারতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সে অনেককাল আগেকার কথা। আৰ্য্যাবা তখনও ভারতবর্ষে তাদের বিজয় অভিযান আরম্ভ করে নি। সেই সুপ্রাচীন কালেও এদেশে কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিকেরা ঐ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলিকেই মনে করেন ভারতের আদিম অধিবাসী। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই জাতিগুলিকেই আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন, অট্রিক্, নিগ্রোইড প্রভৃতি। অট্রিক্ এবং নিগ্রো-ইডগোষ্ঠীর পরে এদেশে বসবাসকারী যে জাতিটির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাদেরকে বলা হয় বোডোগোষ্ঠী। এদেশে অনুপ্রবেশ করবার আগে তারা যে অঞ্চলে বসবাস করত তাদের ভাষায় তার নাম হ'ল "বোডা"। নৃতাত্ত্বিকেরা তাই এই নবায়নজন্মের নামকরণ করেছেন বোডা উপজাতি।

ভারতে প্রবেশ করবার আগে বোডোদের আদি বাস-ভূমি সম্ভবতঃ এখনকার গোবি মরুভূমির কাছাকাছি কোনও জায়গায় ছিল। আমাদের একটি উপকথা প্রচলিত আছে কয়েকটি আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করত "ডিলাউত্রা" আর "চাংগীবা" বলে দুটি নদীর মধ্যবর্তী কোনও এক দেশে। কোন কারণবশতঃ নদীদুটি গেল একেবারে শুকিয়ে আর জলের অভাবে গাছপালা সব মরে দেশটি একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। বাধ্য হয়ে তারা তখন বাস্তবতা ত্যাগ করে আরও পূর্বদিকের পাহাড়িয়া দেশে এসে বসবাস আরম্ভ করে দিল। যাদের মধ্যে এই কাহিনী প্রচলিত সেই খাসি, জয়ন্তি প্রভৃতি উপজাতিগুলিকে অনেকে বোডোজাতির বংশধর বলে মনে করেন। তাই কোনও কোনও নৃতাত্ত্বিকের ধারণা, বোডো-দের ভারত আগমনের সঙ্গে এই কাহিনীর কোনও যোগ আছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কয়েকটি জায়গার নামের শেষে দেখা যায় "বোড" এই কথাটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন—হোব-বোড, কুব বোড ইত্যাদি। নামের শেষে "বোড" কথার ব্যবহার বোডোদের মধ্যেও দেখা যায়। তাই এই বিশেষ শব্দের বহুল ব্যবহার দেখে মনে হয়, ঐ অঞ্চলগুলিতেই বোডোরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বহুকাল পরে বোডোদের মধ্যে অনেকে তাদের আদিম ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। তখন এই নব-

বৌদ্ধদেরকে বোডোরা বলতে লাগল বিষ্টি বোড। বিষ্টি মানে হ'ল লামা। তাই পরে বিষ্টি বোড বলতে লামা বসবাসকারী দেশকে বুঝাতে লাগল।

সমসাময়িক অস্ত্রাস্ত্র আদিবাসীদের তুলনায় বোডোরা কিছু উন্নত ছিল। কারণ তাদের মধ্যে স্ত্রী ও বেশম বস্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় ভারতে আসবার আগেই সেই সময়কার অস্ত্রাস্ত্র সুসভ্য জাতির সম্পর্কে এসে তারা বয়নশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে। এছাড়া তাদের দু'একটি উপাস্ত্র দেবতার সঙ্গেও মিশর ব্যাবিলোনিয়ার দেবতাদের বেশ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বোডোদের মধ্যে সর্পপূজা প্রচলিত ছিল। তাদের ভাষায় সর্পদেবের নাম ছিল দুটি যেমন "সি-বু" আর "বতু-বুয়া"। এই "সি-বু" বা "বতু-বুয়া"-র সন্মান ছিল সবচাইতে বেশী। গ্রামের মধ্যে খুব উঁচু গাছের গোড়ায় বেদী করে তার উপর "বতু-বুয়া"-র মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে রাত্রিবেলায় পূজা হ'ত। বতু-বুয়ার এক মূর্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তিটির আকৃতির সঙ্গে মিশরদেশে প্রচলিত সর্পদেবতা "বী"-র অদ্বুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তাই মনে হয় বোডোরা মিশরীদের সংগ্রবে এসেছিল। অবশ্য অস্ত্রাস্ত্র উপজাতিদের মতন বোডোদের ধর্মও ছিল মূলতঃ কৃষিপ্রধান। দেখা যায়, তারাও শস্ত-উৎপাদনকারী অরণ্যদেশকে পূজা করছে অত্যন্ত ভক্তিতে। ছয়েন সাং-এর বিবরণীতেও তাদের বৃক্ষপূজার কথা লিখিত আছে। এ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন যে, এরা অর্থাৎ বোডোরা একথণ্ড উজ্জল বস্ত্রের দ্বারা বৃক্ষের কাণ্ড আবৃত করে।" এই বস্ত্রকে বলা হ'ত "হালালী"। এই হালালী দিয়ে তারা জামা-কাপড়ও তৈয়ারি করত। কিছুদিন আগে অবধি আমাদের কয়েকটি উপজাতি বেশমী কাপড়কে বলত "হা-স-সী"। তাই মনে হয় বোডোরা হালালী বলতে বেশমকেই বুঝত। তাদের ধর্ম আর কৃষ্টি সম্পর্কে এর বেশী আর কিছু জানা যায় না।

আমাদের পার্শ্বত্যাগগুলি পেরিয়ে তারা ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। কতকাল আগে তাদের বসবাস আরম্ভ হয়েছিল একধার জবাব কিন্তু এখনও মেলে নি। এদেশে প্রবেশের পর তাদেরকে যে

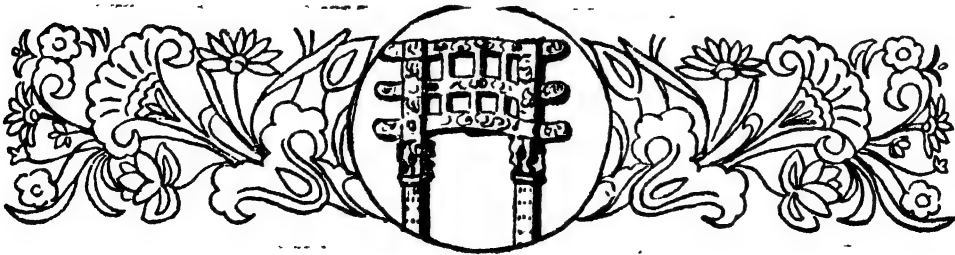
দেশীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধ করতে হলেও মনে হয় এ অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ দেখা যায়, খুব অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তারা বেশ সড়াবেই বসবাস করছে। এই মিলনের ফলে বোডোদের আচার-ব্যবহারেরও বেশ পরিবর্তন দেখা গিল। স্থানীয় অধিবাসীদের দেবতা কামাখ্যা দেবী তাদেরও অস্ত্রতম উপাস্ত দেবতা হয়ে পড়লেন। আর তাদের সর্গ-দেবতাও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে একই সঙ্গে পূজা পাচ্ছেন স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের কাছে থেকে। এই সময়ে কামাখ্যা দেবীর নামের কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। দেবীর নাম হয়েছে “উমানুড়া-উমানুড়া”। কথার যে কি মানে তা এখন আর কেউ জানে না। অনেকে বলেন “উমানুড়া” কথা থেকেই উমানন্দ পর্বতের নামকরণ হয়েছে। এ ছাড়া আরও এক নতুন দেবীর পরিচয় এই সময়ে পাওয়া যায়, তার নাম হ’ল “কা-মেই-ক্রিয়”। নামের সাদৃশ্য দেখে মনে হয় এখনকার কামরূপের কাছাকাছিই এই দেবীর কোনও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাক সে কথা; আসামে বোডোদের উপনিবেশ স্থাপন নানাকারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে এসে কয়েকটি নগরের তারা পত্তন করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নগরের চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে। কোনওটি তাদেরই দেওয়া নামে অথবা একটু-আধটু পরিবর্তিত হয়ে। শুধু তাই নয়, আসামের কয়েকটি অঞ্চল তাদের দেওয়া নামেই এখনও অবধি নিজেদের পরিচয় বহন করছে। হাকলং, জাপলং, রজারং প্রভৃতি জনপদগুলি সেই সুপ্রাচীন বোডো উপনিবেশের কথাই স্বরণ করিয়ে দেয়। অনেকের মতে এখনকার ত্রিপুরা রাজ্যও বোডোদের অস্ত্রতম কীর্তি।

আসামে উপনিবেশ স্থাপনের পর সম্ভবতঃ বোডোরা উত্তর বাংলার বসতি স্থাপন করে। রংপুর-দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতে যে সমস্ত আদিবাসী দেখা যায় তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি লক্ষ্য করলে মনে হয় এদের সঙ্গে বোডোদের কোনও-না-কোনও মিল ছিল। তাইতে

মনে হয় উত্তর বাংলার বোডোরা ঐ জেলাগুলিতেই তাদের বসতি স্থাপন করে, আর জেলার আদিবাসীরা সম্ভবতঃ বোডোদেরই বংশধর। এর বেশী অবশ্য বাংলা দেশে বোডোদের অবস্থানের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না।

উত্তর-পূর্ব ভারতে বোডোদের অস্তিত্বের চিহ্ন আজ যদিও কিছু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তাদের কোনও পরিচয়ই আজ আর অবশিষ্ট নেই। মহাকাব্যে উল্লিখিত হিড়িম্বার কাহিনীকে অনেকে বোডোদের সঙ্গে আর্ঘ্যদের সংঘর্ষের কাহিনী বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। পশ্চিম ভারতে একমাত্র পরিচয় যা মেলে তা হচ্ছে গ্রীঃ পুঃ প্রায় পনের শতকে বোডোদের এক শাখা উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। এদেরই কোন দলপতি-কন্তার সঙ্গে চন্দ্রবংশের এক রাজকুমারের বিয়ে হয়। মনোমালিন্তের জন্তে অল্পদিনেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। আর বোডোকন্তা মনোহুঃ পূর্ব ভারতের দিকে চলে যায়, কিন্তু চন্দ্রবংশের কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয় তা এখনও ঠিক হয় নি। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে বোডোদের অস্তিত্বের অস্ত্র কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

বোডোদের আধিপত্য কবে যে লোপ পায় তা অবশ্য বলবার কোনও উপায় নেই। মনে হয় অস্ত্রাত্ম আদিবাসী-গোষ্ঠীদের মতই তারাও আর্ঘ্যদের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় অথবা আত্মসমর্পণ করে। ধীরে ধীরে আর্ঘ্যদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে তারা এই সমাজে এমনভাবে মিশে যায় যে, তাদের ব্যক্তিগত সত্ত্বার চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকে না। জাতি হিসাবে তারা লোপ পেলেও তারা কিন্তু এখনও বেঁচে আছে—আমাদের মধ্যে, আমাদের পূজা-পার্বর্গের মধ্যে, আর কয়েকটি নগরে তাদের দেওয়া নামের মধ্যে। বলা বাহুল্য আমাদের একান্ত অজান্তেই।



# পুস্তক'গরিচয়

আধুনিক ভারতের গল্প সংকলন—মহুবাণক শ্রীবি.  
বিশ্বনাথম। প্রকাশক শ্রীনিবাসন বসু, ১৭, বেণিরাতোলা লেন,  
কলিকাতা—১। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১; মূল্য হ' টাকা।  
গ্রন্থখানি চৌদ্দটি ছোট গল্প নিয়ে রচিত। তেইটি গল্প ভারতের  
তেইটি রাজ্যের ভাষা ও একটি নেপালী ভাষা থেকে বাঙলার  
অনূদিত। নেপাল পৃথক স্বাধীন রাজ্য। এ কারণ গল্পটিকে  
ভারতের গল্প বলা যায় না। তবে নেপালের সংস্কৃতির সঙ্গে  
ভারতীয় সংস্কৃতির মিল বিস্তার।

গল্পগুলি পাঠে এ কথা বললে অত্যাঙ্কি হয় না যে, ভাষা ও  
সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও লেখকগণ একই দৃষ্টিকোণ থেকে  
জীবনকে দর্শন করেছেন, গল্পগুলির উপজীব্যের অন্তর্নিহিত সুরেও  
মিল আছে। আমাদের বাংলায় এক শ্রেণীর লেখকও গল্প রচনার  
এইরূপ বাস্তব পথাবলম্বী। কাজেই এ দিক দিয়ে বাংলাও বিচ্ছিন্ন  
নয়।

ছোট গল্পের পাঠকের সংখ্যা সকল দেশেই প্রচুর যদিও  
উপজাতিদের মত ছোট গল্পের সংকলন গ্রন্থের কাটতি বেশি হয় না।

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার গ্রন্থ-  
খানির জনপ্রিয়তা সন্দেহের অবকাশ নেই। এর প্রকাশ  
কারণ গল্পগুলির রসোত্তীর্ণতা 'এক বিষয় জমি আর একটি কুঁড়ে ঘর',  
'চোর', 'দৈনিক', 'আবার শকেট কাটা গেল'—নামক গল্প কয়টি  
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোন দেশের সাহিত্যের সম্পদ  
হবার মত গুণ এগুলিতে বিভূষিত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

জলপিপি — শ্রীঅতুলগঙ্গা মেইকাপ। প্রকাশক : শ্রীদেবেন্দ্র-  
নাথ সেন। ৩৭, মতিশীল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২.৫০ নংপঃ।

লেখকের কবি-অমুভূতি আছে। প্রকাশ-নৈপুণ্যও অনেক  
স্থলে প্রশংসনীয়, তবে সর্বত্র নয়। ছন্দে প্রচলিত নিয়ম তিনি  
কোথাও কোথাও স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করেছেন—'সাবলীলতা' বজায়  
রাখবার জন্য। দু'এক স্থানে—যেমন 'স্তর আততোষের' প্রথম  
দিকে—'সাবলীলতা' থাকলেও, মনে হ'ল, একটু অশোভন লঘুতা  
এসে গিয়েছে। পন্নীর কতকগুলি দৃষ্ট ও ভাব সুন্দর হয়ে কুটেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



রকমাস্বিতাস

স্বাদে ও

স্তপে

অতুলনীয়।

লিলির লজেন্স

ছেলেমেয়েদের প্রিয়।

সামগ্রিক—ক্রিয়মেশের সেন। ৯, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.৫০ নং পঃ।

পরাধীন ভারতের মুক্তি-কামনার একদা বাংলার তরুণ-তরুণীরা যে অগ্রমুখে দীক্ষিত হইয়া মরণ পণ করিয়াছিল, সেই বিপ্লব-যুগের একটি খণ্ড-চিত্র এই উপজ্ঞাসে বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনের যাতাকলে কি ভাবে বিপ্লবীরা নিষ্পেষিত হইয়াছিল, কি অমানুষিক অত্যাচার তাহারা চালাইয়াছিল, লেখকের বর্ণনা-কৌশলে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি চরিত্রের নিখুঁত-চিত্রণে মনে হইয়াছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। 'সামগ্রিক' ইতিহাস না হইয়াও, ইহা ইতিহাসের মর্যাদা বক্ষা করিয়াছে এই কারণে।

স্মৃতি ও শুভাশিস দুটি প্রধান চরিত্র। বিপ্লবের মধ্য দিয়াই ইহারা পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রেম ইহাদের নীচে নামায় নাই, বরং ত্যাগের মধ্য দিয়াই ইহারা সার্থক হইয়াছে। আর একটি মেয়ে শান্তা। সেও শুভাশিসকে ভালবাসিত। তাহার প্রেমে স্বেচ্ছা ছিল। কিন্তু সে স্বেচ্ছাও একদিন এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শান্তার সে-চরিত্রের পরিচয় পাইয়া স্মৃতিরও ভুল ভাঙিল।

একজন বিপ্লবীর মা হইতে হইলে, কিরূপ হইতে হয় তাহা শুভাশিসের মা 'দিনমণি' আমাদের দেখাইয়া দিলেন। মা বড় না হইলে সন্তান বড় হয় না। বিপ্লব-যুগে এরূপ 'মা'-ই ঘরে ঘরে জন্মিয়াছিলেন। উপজ্ঞাসে হিসাবে ইহার মূল্য বাহাই হোক না কেন, উপজ্ঞাসের মাধ্যমে একটা যুগকে প্রত্যক্ষ করিলাম, সামগ্রিকের সার্থকতা এইখানেই। লেখকের ভাষা বলিষ্ঠ, কোথাও জড়তা নাই—চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। পাকা হাতে পড়ার, ইহা কতকগুলি অবাস্তব ঘটনার জাল বিস্তার করিবার অবকাশ পায় নাই। সেইজন্যই ইহা উপজ্ঞাসের মর্যাদাও লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানি সধারণের সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—ক্রিয়মেশের স্তম্ভ, ৯নং শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

বিজ্ঞান-সাধক-চরিত-মালার ইহা তৃতীয় গ্রন্থ। জীবনী-গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যই হইল সেই মাসুলটিকে পরবর্তীকালের মানুষের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া। অর্থাৎ একটি কালকে অপর কাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা। এই সংরক্ষণের অভাবেই আমরা বহু মহা-পুরুষের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী 'বিজ্ঞান-সাধক-চরিত-মালা'র এই সিরিজগুলি বাহির করিয়া দেশের কল্যাণ করিতেছেন।

আলোচ্য জীবনীটি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। মহেন্দ্রলাল ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ডাক্তার। প্রভূত বশ ও অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভ্রাতী হইয়াছিলেন, এ কাহিনী কাহাবও অবিরত নয়। কিন্তু কেন তাঁহার এই মতের পরিবর্তন হইয়াছিল, কেনই বা ইহাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন এবং এই ব্রত গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কিভাবে লাহিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল ও কি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে কিছু সময় অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক এই গ্রন্থে দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে তখন নূতন চিকিৎসা হিসাবে হোমিওপ্যাথিক সবে-মাত্র প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং ইহাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে মহেন্দ্রলালকে সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সহস্র বাধাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কারণ তিনি বাহ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কোন কারণেই মিথ্যা হইতে পারে না। এমনি ছিল তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তার বলেই, তিনি যত্নের পূর্বে পুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, কোন কারণেই যেন তাঁহার জীবনের জ্ঞান এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়। এত বড় আত্মবিশ্বাস জগতে দুর্লভ। এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পাইয়া আজকালকার ছেলে-মেয়েরা উপকৃত হইবে। লেখকের ভাষা সরল এবং সংক্ষেপিত হইলেও ইহা তথ্যবহুল। এরূপ গ্রন্থের প্রচার বরং হয় ততই মঙ্গল।

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি—ক্রিয়মেশের চৌধুরী, শান্তি-লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩-২৫।

প্রবন্ধ-লিখিতে হিসাবে ক্রিয়মেশ নারায়ণ চৌধুরীর খ্যাতি আছে। তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্যই হইল, বস্তুব্য বিষয়কে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করা। এ সাহস সকলের থাকে না। অথচ প্রবন্ধ রচনার এ গুণ না থাকিলে চলে না। সেইজন্যই অধিকাংশ আলোচনা হয় পক্ষপাত-দুষ্ট অথবা আক্রমণাত্মক। সমালোচনা ঠিক এটো কারণেই খুব কঠিন কাণ্ড। বক্তার মতই এখানে নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই লোকে কথা গুলিবে। এরূপ সমালোচক আজকের দিনে বড় একটা নাই। পূর্বে ছিলেন, সুরেশ সমাজপতি এবং কাব্যবিশারদ মহাশয়। সাহিত্যে অনাচার এই জন্যই তপনকার দিনে সম্ভব ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই অনাচারের কথাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। যে অনাচার আজ সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে নিয়ত আঘাত করিতেছে। এগারটি প্রবন্ধে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সাহিত্য-বিষয়ক। সমালোচক হইয়াও তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—“সাহিত্য থেকে জীবনকে আমরা বর্জন করেছি। আমাদের পক্ষে সাহিত্য যদি জীবনের সাধনা হ'ত, শিল্প আর জীবনের ভঙ্গালী সর্বদেয় বোধ যদি আমাদের মনে স্পষ্ট হ'ত, তাহলে সাহিত্যকে কখনই পর্যবেক্ষণের কলাকল্যে মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা তৃপ্ত থাকতাম না, পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মননেন্দুও যুগপৎ চর্চা করতাম, কাহিনীর রসের উপর এবং কাহিনীর রসের থেকে কিছু বেশী—জীবন-রহস্যের অজুড়তি পরিবেশনেও সমান সচেষ্ট থাকতাম। দার্শনিক নৈতিক রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে তাহলে এমন সবদে পান কাটিয়ে চলবার প্রয়োজন হ'ত না।”

সাহিত্যে জীল-অজীলের সীমানা যেমন কেহ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না, আচার-অনাচারের বেধও তেমন টানা যায় না। "রচনা বাস্তব সংসারের কক্ষ-মলিন ঘটনা নিয়েই হউক আর অবাস্তব স্বপ্নবিশ্বের মায়াকুলেহলিটাকা অদেখা পরিবেশ নিয়েই হউক সৃষ্টিধর্মিতার সম্পর্কে অচিরেই সে রচনার গোত্র বদল হয়। সৃষ্টি-ধর্মী রচনা কিছুক্ষণের জন্তে হলেও মনকে প্রাত্যহিকতার মালিন্যম্পর্শ থেকে মুক্ত করবেই, তাকে অসীমের সুরে বাঁধবেই" গ্রন্থকারের এই উক্তি হইতেই সাহিত্যের আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সৃষ্টির প্রধান লক্ষণটাই হইল, মনকে তা'র আকর্ষণ করিবেই এবং হৃদয়কেও এক অপূর্ণ অমুড়ভিত্তে ভরিয়া তুলিবেই। জীবন যে সাহিত্যের সহিত গঙ্গাজীবে জড়িত। জীবন বড় হইলে তাহার সাহিত্য বড় হইতে বাধ্য। আমরা জীবনকেই ছোট করিয়া আনিতেছি, সাহিত্য বড় হইবে কি করিয়া? কিন্তু ইহার পরিবর্তন আবশ্যক। এই পরিবর্তন আনিতে হইলে, নান্যায়বাবু মত কঠোর সমালোচকের প্রয়োজন। এই জগৎ ইহার দায়িত্ব আজ অনেকশ'ন। বইখানি সমরোপযোগী হইয়াছে বলিয়াই ইহার মূল্য আছে। এরূপ গ্রন্থ যত প্রচার হয় ততই দেশের কল্যাণ। বইখানির প্রচ্ছদপট সুরচিসঙ্গত।

রমেশ রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য-সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য নয় টাকা।

রমেশ রচনাবলীর সহিত পরিচয় নাই, এরূপ লোক বাংলা দেশে বিরল। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁহার রচিত সমগ্র উপজাস-গুলি গ্রন্থিত হইয়াছে। বঙ্গবিদেশ, মাধবী-বঙ্গল, মহারত্ন জীবন-প্রভাত, বঙ্গপুত্র জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, সমাজ—এই ছয়খানি উপজাস ছাড়াও রমেশচন্দ্র বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ লিপিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপজাসগুলির মধ্যে প্রথম চারখানি ইতিহাস-ভিত্তিক, অপর দুইখানি সামাজিক সমস্যা লইয়া বিরচিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও উপজাসগুলির মধ্যে তাঁহার শিল্প-মানসের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই ঐতিহাসিক উপজাস লিখিবার দ্বারা আমরা প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখিতে পাই। ঘটনা বৈচিত্র্যে এবং তৎকালীন পারিপার্শ্বিক বর্ণনায়, আচার-আচরণ ও আদর্শের বিকাশে, বীরত্ব-মহিমার প্রকাশে ইহা মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা অল্প কোন রচনার প্রকাশ পায় না। যুগের প্রয়োজনে একদা এই ধারায় উপজাস লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। দ্বারা বাহাই হউক, বঙ্কিমের পর এরূপ সার্থক রচনা একমাত্র তাঁহার মধ্যেই দেখিতে পাই। সেইজন্ত আজও—একটা শতাব্দীর পরেও—রমেশ-সাহিত্য সমান মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূল উৎস স্বদেশ-প্রেম বা দেশ-ভক্তি। কারণ তিনি জানিতেন, একমাত্র সাহিত্যের দ্বারা দিয়াই দেশের অগণিত জনমানবকে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায়। রমেশচন্দ্রের যুগ ইংরেজিয়ার যুগ। কাজেই সে যুগে বাহ্যিক সাহিত্য করিতে

চাহিয়াছিলেন, তাহারাই ইংরেজী ভাষায় মাধ্যমেই প্রথমে করিতে গিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনাও সূর্য হর ইংরেজী ভাষাতেই। তাঁহার বহু ইংরেজী প্রবন্ধ এবং কবিতা তাহার সাক্ষ্য দিবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় লিখিবার প্রেরণা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ রমেশচন্দ্র নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "রচনী পদ্ধতি আবার কি, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা বাহা লিখিবে তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে।" এটী কথাই রমেশচন্দ্রকে বাংলা ভাষায় লিখিতে অনুপ্রাণিত করে। স্মরণ্য এদিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের গুরু। এ কথা নিঃসংশয়ে আজ বলা যায়, সাহিত্য-সাধনার রমেশচন্দ্র গুরুর মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপজাসগুলির মধ্যে 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' আজও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

রমেশচন্দ্র সিবিলিয়ান এবং ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত হইয়াও তিনি খাতি স্বদেশী ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই স্বদেশ-প্রেমই তাঁহাকে সাহিত্য-সাধনার উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূল উৎসই ছিল স্বদেশ-বাৎসল্য বা দেশ-ভক্তি। স্বাধীনতার বীজ সে যুগে বাহ্যিক হোপন করিয়া গিয়াছেন, রমেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্ততম। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের এই দানের কথা নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বসীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণ-শক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচারকর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনায় মগ্নাঙ্গা জ্বলন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিত্তে, সর্বত্রই তাঁহার উত্তম পূর্ণবেগে দাবিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন।"

আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। কিন্তু ইহা ত একদিনেই সম্ভব হয় নাই। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এইসব মনীষীদের বহুবিধ কষ্ট-সাধনা। ইহারা নমস্ত।

সম্পাদনাকার্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের যে নিষ্ঠা ও যত্ন দেখা গেল তাহা প্রশংসনীয়। গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এই সম্পাদনার গুণেই সার্থক হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা এবং রমেশচন্দ্রের কষ্ট-জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। রমেশচন্দ্রকে জানিতে হইলে এই অধ্যায়টি অপরিহার্য। এইজন্তই এ-ভূমিকাটি হইয়াছে গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন।

গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সৌন্দর্যের দিক দিয়া এবং পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়া নিখুঁত হইয়াছে। সাহিত্য-সংসদেব প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি জিনিস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা গেল, তাঁহাদের রুচি। এই মার্জিত রুচিই তাঁহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীগোতম সেন



কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে—জীনীহারংজন চক্রবর্তী।  
বেঙ্গল পাবলিসাস, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।  
মূল্য ২'২৫।

একথা অনস্বীকার্য যে, আজ বাংলা সাহিত্যের প্রসার নিগুণ-চায়ী হয়েছে অনেক কীর্তিমান মানুষের অনলস সাধনার অর্থা পেয়ে। উপজাঙ্গ, ছোট গল্প, রম্যরচনা, কবিতা এবং রসরচনার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বিশ্বরকম না হলেও তা যে সন্তোষজনক, একথা সকলেই স্বীকার করেন। গবেষণা-অবিষ্ট, নানান ধরনের লেখার অধুনা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ যুগের মননসাধনার প্রধানতম লক্ষণ হচ্ছে আমাদের অতীত মননসাধনার বিস্মৃত অধ্যায় পুনরাবিষ্কার করা এবং মানুষের সামগ্রিক জীবনের অতীত ইতিহাসকে উদ্ঘাটিত করা। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। পার্শ্বতাপ্রদেশের লেপচাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের জ্ঞানার্জনের প্রয়াসও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থ থেকে বহুদিনের গবেষণার ফলটুকু পরিবেশন করেছেন মনোজ্ঞ ভাষায়। আজ পর্যন্ত লেপচাদের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা লেখা হয়েছে বলে আমরা জানি না। সেদিক থেকে গ্রন্থটিকে পথিকৃৎ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বহু কথা বলবার আছে লেপচাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে; তাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজাপার্বণবিধি, লেকচার এবং লোকগীতির মাধ্যমে আমরা যে একদা-সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ জাতীয় এবং সমাজ-জীবনের

ছবির আভাসটুকু এই গ্রন্থে পাই তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বহু বর্ণবিচিত্রিত একখানি আলখোবর বখালা দিতে হলে এ যুগের অজ্ঞাত গবেষক-দেরও এ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পার্শ্বতাপ্রদেশের সবক্ষে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা নেই। আলোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের ঔৎসুক্যকে উদ্দীপিত করেছে।

লেপচা জাতি আজ ক্ষয়িষ্ণু। আধুনিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী বিস্তার থেকে আপনাদের সু-প্রাচীন ঐতিহ্যকে সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন লেপচার। আমাদের সর্বপ্রথমে এই ঐতিহ্যটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধু দর্শকের ভূমিকাই আমাদের ভূমিকা নয়। এদেশের মানুষের এবং রাষ্ট্রের এ সবক্ষে গুরু দায়িত্ব রয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর স্ননিপুণ বিশ্লেষণে এই ক্ষয়িষ্ণু জাতিটির সমাজ এবং সামগ্রিক জীবনের মূল সমস্যাগুলির কথা আমাদের বলেছেন। আমাদের হিমালয়-প্রান্তিক বিঘাট সীমান্তকে যদি সমাজপ্রতি গ্রহরীষ অতন্ত্র প্রহরার রাখতে হয় তবে পার্শ্বতাপ্রদেশ ছেলে-মেয়েগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সেখানে আমাদের মহৎ কর্তব্য রয়েছে। সে গুরুদায়িত্ব আমাদের অচিৎবেই বহন করতে হবে। গ্রন্থকার তার ইঙ্গিতও করেছেন।

আমরা এই কৃষকশ্রু গ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের ঐতিহাসিক পটভূমিতে গ্রন্থখানির আবির্ভাব একান্তই কালোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থ সমাদৃত হবে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

আনন্দ ডি'সর্বে  
**ক.হোডের**  
প্রসারিত সামগ্রী



ক.হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪



# দেশ-বিদেশের কথা

## আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী

১৮৫৯ সনের নভেম্বর মাসে এই আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আজ এই একশত বৎসরের ইতিহাস শ্রবণ করিলে প্রথমেই মনে পড়ে, স্বর্গীয় বহুনাথ শর্ম্মার কথা। আহিরীটোলা পল্লীতে এই বহুনাথ পণ্ডিত বাস করিতেন। সাধারণের নিকট তিনি বহু পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে নিম্ন গোষাধী লেনে নিজের বাসার পল্লীর কয়েকটি ছাত্র লইয়া একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। পল্লীস্থ বিজ্ঞানসাহী ভদ্র মহোদয়গণের সাহায্যে এবং উক্ত পণ্ডিতের প্রাণপণ যত্নে ঐ ক্ষুদ্র পাঠশালা অচিরে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাংলা গবর্ণমেন্টের নিকট অনুমোদিত হইয়া স্বাধীনতা পূর্ব্বমেন্ট সাহায্য পাইতে আরম্ভ করে।

ইহাই আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাস। আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ত্তি বাংলা দেশের শিক্ষা-জগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই। যে সময়ে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সে সময়ে সমগ্র বাংলা দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। কাজেই এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের অতীতের

কথা শ্রবণ করার সঙ্গে, জনসাধারণের সুহৃদ সাধনার কথাও শ্রবণ করি—তাহাদের ভাগ, সহায়তা ও শুভ প্রচেষ্টাই আজ ইহাকে এতটা গৌরবদানে সমর্থ হইয়াছে। ইহা স্থল জীবনের পক্ষেই শুধু গৌরবের নয়, সমগ্র বঙালী জাতির পক্ষে গর্বের বস্তু।

## শ্রীমতী স্নেহলতা দাস

স্বদেশনাথ কলেজের ছাত্রীবাসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অধ্যাপক শ্রীযুক্তমন্মথ দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্নেহলতা (পুণ্য) দাস পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন ধর্ম্মশীলা, পরহিতৈষিণী ও সমাজ-সেবাপরায়ণা নারী ছিলেন। এই নিঃসন্তান মহিলার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রীতি ও ভালবাসায় ঢেকে দেখিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। বাকুড়া জেলার ইন্দাসগ্রামে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত দাস হৃদিজন পল্লীতে একটি নলকূপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই গ্রামে একটি কালীমন্দির নির্মাণ করিতেছেন। সেখানে তাঁহাদের বসতবাটিতে স্নেহলতা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জীবনগঠন, জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করা।

**ডায়াপেপসিন**  
হজমশক্তি  
বজায় রেখে  
স্বাস্থ্যের  
উন্নতি করে

ইউনিয়ন ড্রাগ - কলিকাতা

## গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা যে গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছি, তাহার শেষ তারিখ ১৯৬৬ সালের ১লা চৈত্র ইহা স্বরণ রাখিতে বলি। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

- ১। নাম
- ২। ঠিকানা
- ৩। প্রেরণের তারিখ
- ৪। ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।
- ৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামের পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য।

গল্পের শুভাশুভায়ে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

- (ক) সর্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য পুরস্কার একশত টাকা,
- (খ) পরবর্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,
- (গ) পরবর্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত গল্প অথচ কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কম্পাদক—“প্রবাসী”

সম্পাদক—শ্রীকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—ঐনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস আইডেট লিঃ, ১২০.২ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

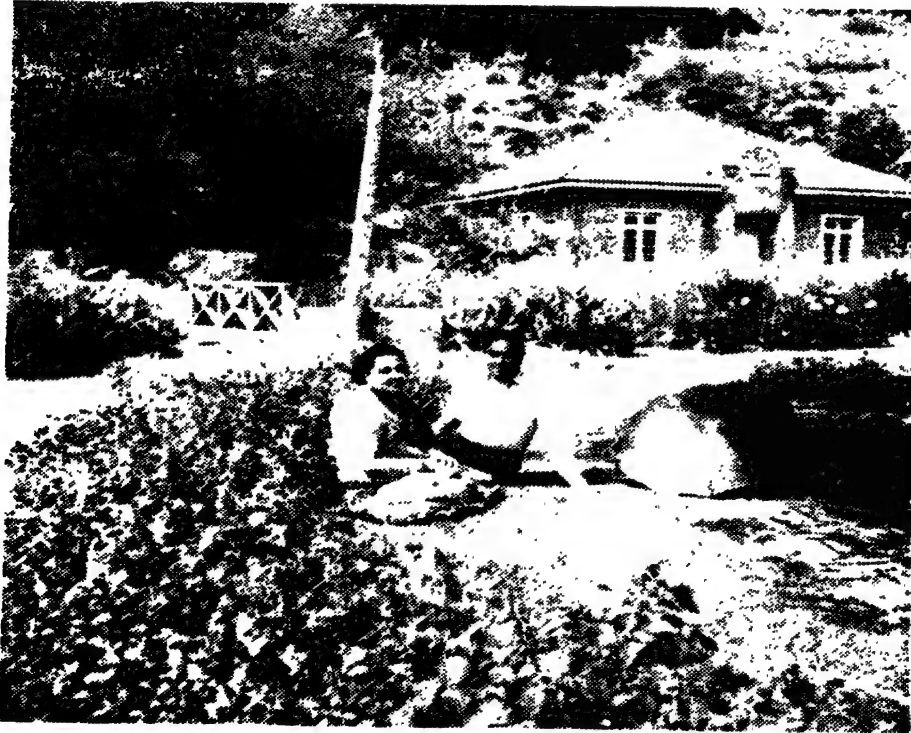


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রতিষ্ঠা  
শ্রীমতীজনাথ ল'ল



ডাল থেকে প্রভাত :- শ্রীনগর



প্রাসাদ-উদ্যান—কান্দ্রী

ফটো :- সচ্চিদ্রুয়ার চট্টোপাধ্যায়

# প্রবাসী

"সত্য শিবম সুন্দরম্"

নায়মাস্ত্য বলভীনেন লভ্যঃ"

১৫শ ভাগ  
২য় পত্র

চৈত্র, ১৩৬

৪ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### চীন ও বিশ্বশান্তি

এই প্রসঙ্গ জিপিংবার সময় চীনের পুঙ্খ মাংস পণ্ডিত গেল যে, ঐনেতক গাং চীং ম্যাং জি চৌ এন-লাইয়ের নিকট এক পর প্রবেশ করিয়াছেন, উক্ত প্রোগামী ২০শে এপ্রিল নাগাদ নয় দিল্লীতে উক্তার সঠিক বৈঠকের প্রস্তাব আছে। এই পত্র জি চৌ-এন-লাইয়ের ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে লিখিত পত্রের জবাব। উক্ত প্রোগামী দিল্লীতে আসিবার অমুদ্রণ প্রেরণ করায় উক্ত জি চৌ-এন-লাইয়ে বহুবাদ জানাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, এই সাক্ষাৎ আলোচনায় "আমরা এই সকল সমস্যার পূর্ণ বিবেচনা করিতে পারিব এবং এই সমস্ত জগৎ পুরণের পর যুক্তিতে পারিব, যতদূর শক্তির মধ্যে আমাদের একত্ব বৈবাদের মীমাংসা হইতে পারে" তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, এপ্রিলের শেষে উক্তাকে বিদেশে যাইতে হইবে, সুতরাং ২০শে এপ্রিল নাগাদ যদি জি চৌ-এন-লাই আগমন করেন তবে বড়ই ভাল হইবে।

বলা বাহুল্য, এই পত্রের সঙ্গে অত্র অনেক বার কথ্য মিশাইয়া একটি "স্বতন্ত্র কাগজ" প্রকাশ করায় এই সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। ঐনেতকর সকল ব্যাপারের জায় এই চিঠির উক্তার পূর্বের চিঠি দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।

আমরা জানি না এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হইবে, কেননা ঐনেতক এবং উক্তার বৈদেশিক দপ্তরের সহকারীরা কথাকথান সঙ্কে ভবিষ্যৎবাণী করা আমাদের ক্ষমতার বাহির। তবে এইটুকু বলা চলে যে, দেশের লোকের মন যদি দৃঢ় থাকে তবে আমাদের বৈদেশিক দপ্তর দেশকে আর বেশী ছাড়িতে পারিবেন না।

ঐনেতক বিদেশে যাইবার পূর্বে এই জটিল ব্যাপারের একটা মীমাংসা হইলে মঙ্গল। নচেৎ বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর নুতন ভাবে প্রেরণায় তিনি কি করিয়া বসিবেন বলা অসম্ভব। পররাষ্ট্র ব্যাপারে—বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে—যে সুচাঞ্চলিক জ্ঞানবুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োজন তাহার কতটা আমাদের রাষ্ট্রচালক-বৃন্দের কাছে সে ত সারা জগতই জানিয়া গিয়াছে। নতুবা আমাদের এই বর্তমান অবস্থা আসিতেই পারিত না।

বিদেশের অভিজ্ঞতা খাতার আঁচে তাহদের মনে কখনো ঐনেতক কানে ঢুকেন না। কিন্তু চীনের বৈদেশিক সম্পর্কে উক্তাকে সতর্ককরণের চেষ্টা একাধিক লোকে করিয়াছেন এবং উক্তাদের মধ্যে পররাষ্ট্র বিভাগের লোকও ছিল। তিনি চীনের তৎকালীন ভাষাতত্ত্ব দূতের কথায় এবং উক্তার নিজের মনে লোকের পরামর্শে সে সকলট অগ্রাহ্য করেন। তৎকালে চীনে হতে বিনা প্রতিবাদে তুলিয়া দেওয়ার পরও উক্তাদের হিমালয় প্রাকবেল্টের চমৎকৃত বিষয়ও উক্তাকে একাধিক লোকে বলা হইয়াছিল। তিনি তুচ্ছ করেন। লোকসভার মাকমেলন সীম স্তবধা চীনারা অগ্রিম করিয়াছে এই কথা কাগজেবই এক সমস্ত বলিলে তিনি কত দূরত্ব তাহার প্রতিবাদ করেন এবং মাকমেলন সীম স্তবধাকে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করেন। এই অর্থোজিক ও অবস্থার উক্তই এখ- জি চৌ-এন-লাই ঐনেতকর মুণ্ডের উপর নিক্ষেপ করেন। যতাই হউক পৃষ্ঠ ২২২র টি টা-পাট চালাইয়া এবং দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়া এখনও এই অস্ত্র। উক্তার পর দিল্লীতে গোপন বৈঠকে কি আলোচনা হইবে এবং তাহার ফলাফল কি হইবে তাহা কেবলমাত্র অজ্ঞাত, আমরা সে বিষয়ে কি বলিব।

দিল্লীর বৈঠকে একদিকে অত্র হুওং চৌনৌতিবিলাসের ন কুণীনীতিতে অভিজ্ঞ চীনা প্রতিদ্বন্দ্বি এবং অত্রদিকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে "আনন্ডি", অথচ নিজের বুদ্ধিবিবেচনা সঙ্কে অত্র উক্ত বহুদায়ক ভাষাতত্ত্বের দল—আলোচনা হইবে অপরূপ সন্দেহ নাই! তবে ভরসা এইমাত্র যে, আমাদের দিকে কায়দা এবং অত্রদিকে অগ্রায় শক্তিশালতা এবং বর্তমান কালের জগৎ এরূপ অগ্রায় লালসায় বিরোধী। নতুবা ঐনেতক এই যুক্তিতর্কবিশীল শান্তিবাদ ভারতকে ডুাইতে বাঁধিয়াছিল। এখনও বলা যায় না যে দেশ কোথায় আছে, তবে এই কথায় স্পষ্টতঃ সকাপেক্ষা শক্তিমান দুই রাষ্ট্রের উচ্চতম অধিকারী পর পর আসায় এবং তাহাদের বাণীতে ভারতের পক্ষসমর্থন থাকায় ভবিষ্যৎ আকাশে স্বর্গের লক্ষণ কতকটা কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐনেতক এখনও

বৈঠকের কথাবার্তার বেকাস কিছু প্রতিজ্ঞা দিয়া বসিতে পারেন।  
সুতরাং আশঙ্কা যায় নাই।

আজিকার দিনে সারা জগতে বিশ্বশান্তির কথা চলিতেছে।  
সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এই দুই প্রবল  
পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে যুদ্ধের অনল ধুমায়িত হইতে-  
ছিল, সম্প্রতি তাহার নির্বাণের চেষ্টা চলিতেছে। সোভিয়েটের  
মুখপাত্র ও কর্ণার নিকিতা খ্রুশ্চভ এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর ও  
চেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি এ দেশে ইতিপূর্বেও আসিয়াছিলেন  
এবং আমাদের রাষ্ট্রের সহিত নিজ দেশের সখা ও মৈত্রীর সম্পর্কের  
স্থাপনা সেইবারেই করিয়া গিয়াছিলেন। এইবার প্রথমে সোভিয়েট  
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও পরে ক্রিমস্কি খ্রুশ্চভ সেই সম্পর্ক দৃঢ়তর  
করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। খ্রুশ্চভ যুক্তরাষ্ট্রে বলিয়া গিয়াছেন  
যে, বিশ্বশান্তি অভিযানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সমর্থক আমাদের ভারত  
এবং এই বিশ্বশান্তি পরিবর্তনের উদ্ভব এই দেশে।

আমাদের সময়ে বিশ্বশান্তির ও পঞ্চাশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি  
প্রথমে হয় বালু সন্মেলনে, যেখানে এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্য, মৈত্রী  
ও স্বাধীনতার পথনির্দেশ এই পঞ্চাশের পথেই করা হইয়াছিল। এই  
সন্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ ও গণতন্ত্রবাদের ভয়বাজার অস্থান  
বাঁহারা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চৌ-এন-লাই বিশিষ্ট অংশ  
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া  
পূর্ণ সহযোগ দিয়া একমত প্রকাশ করে। এই সন্মেলনের ফলে  
বহু অ-কমুনিষ্ট রাষ্ট্র চীনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করে।

আজ সেই সখ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে  
এবং বিশ্বশান্তির প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে "গণতন্ত্রবাদী" চীনের  
সম্প্রদায়গণীতির দাপট। বলা বহুল, সম্প্রদায়গণীতি সাম্রাজ্য-  
বাদেই অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায়গণীতির মূল ও বীজস্বরূপ  
দেখা দেখ ভারতের সীমান্তে। ব্রহ্ম এবং ইন্দোনেশিয়ায়ও অশান্তি  
ও বিরোধের স্রষ্টা হয় চীনের অত্যাচার দাবিদায়। এই সকল  
অশান্তির মূল আছে "গণতান্ত্রিক" চীনের অ-গণতান্ত্রিক মুক্তশক্তি  
আত্মশাসন এবং সেই গণতন্ত্র উন্নয়নের পরের ভূমি ও পরের ধন-  
সম্পত্তি দখল করিবার প্রবৃত্তি।

এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে ভাবে ১৯৫৪  
সন হইতে গত বৎসর পর্যন্ত চীনের এই ভারত সীমান্ত অতিক্রম  
করিয়া ভারতের ভূমিতে নিজ অধিকার স্থাপনের চেষ্টাকে এদেশের  
লোকের চক্ষু-কর্ণগোচর না করিয়া লুকটাইয়া রাখা হয়, তাহারই  
ফলে বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হয়। এখন এই অবস্থার "শান্তিপূর্ণ"  
মীমাংসা কি ভাবে করা হয় তাহাই লক্ষ্যণীয়।

জগতে হিংসা, ঘেদ, পংসাপহরণ প্রবৃত্তি, এ সবই সমানে  
রহিয়াছে। মনুষ্যসমাজ এখনও স্বভাবতঃ পঞ্চাশমুণী হয় নাই।  
পূর্বেও বহুবার বিশ্বশান্তির বাণী প্রচার জগতে হইয়াছে কিন্তু  
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, যে শান্তিকামী প্রথমে অস্ত্র ত্যাগ  
করিয়াছে তাহারই সমুদ্র বিপদ ঘটিয়াছে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বশান্তির প্রচার বাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের  
মধ্যে শুধু ভারতই অস্ত্রসজ্জার আচ্ছাদিত নহে। সুতরাং আমা-

দের মুখে শান্তির বচন দুর্বলের শাস্তিভিক্ষা বলিয়া মনে করায়  
চীন কিছু নূতন প্রতিক্রিয়া দেখায় নাই। অল্পদিন পূর্বেও  
জগতে যে রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনও বিশ্বমানবের মধ্যে যে  
আদিম প্রবৃত্তি আছে, তাহার বশে আমাদের অবস্থার বিচার এই  
ভাবে করা ই স্বাভাবিক। আমাদের দোভাগ্য এইমাত্র যে, ইহা  
আণবিক বোমার যুগ এবং জগতের মধ্যে আণবিক বলে বদীমান  
জাতিদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়াছে যে আণবিক যুদ্ধের একমাত্র  
পরিণাম সমগ্র মানব জাতির চরম দুর্গতি এবং সেই দুর্গতির মধ্যে  
বিস্ত্রোতা ও বিজিতের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। এই  
চেতনার বশেই শক্তিশালী জাতির মধ্যে শান্তির প্রেরণা আসিয়াছে।  
আমাদের বাকগুরুশ্রী নেতৃবর্গ শুধুমাত্র তাহার আওয়ান করিয়াছেন।  
কিন্তু এই শান্তিপ্রচেষ্টা এখনও মায় ও ফলপ্রসূ হয় নাই এবং তাহা  
হইবেও না ষ-দিন জাতিপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ  
থাকিবে। সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্রবল শিল্প স্বাধীনতা,  
স্বাধীন ও স্বাধিকার বজায় রাখার অস্ত্র কেনও উপায় নাই। এবং  
চীন বাহা করিয়াছে তাহার পর সহজে তাহার উপর বিশ্বাস করা  
বুদ্ধিবিবেচনার অর্থাবহী দেখানো হইবে। ভারতের নিরাপত্তার  
জঙ্ঘা হিমালয়ের প্রাকার অটুট ও অচ্যুত করাই প্রয়োজন। পঞ্চাশ  
বা শান্তিবাদে পূর্বেও আমাদের বিশ্বাস করে নাই, এখনও করিবে  
না। জগতের সকল অঞ্চলেই চীনের এই হিংসাত্মক কার্যক্রমের সাড়া  
পৌঁছিয়াছে এবং পৃথিবীর প্রবলতম দুই শক্তিই এই কার্যক্রমের  
পরিণতিতে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখায়, তাহাদের উচ্চতম তাৎকালিক-  
বয় ভাষ্যতক পদক্ষেপে সহায়ত্বিত ও সমর্থন জানাইয়াছেন।  
সেই আগমনের প্রতিচ্ছায়াই চীনের এই স্রব  
বলনের প্রধান কারণ। অবশ্য পণ্ডিত নৈরাজ্য দৃঢ় ও অনমনীয় ভাবে  
প্রদর্শন না করিলে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া এরূপ সমর্থন  
জানাইতেন না সন্দেহ নাই। চীনও নেতৃবর্গ এই দৃষ্ট ও দৃঢ়  
মনোভাব এবং ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ক্রোধের বজ্রা  
দেখিয়া চকিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু তাহাতেই এরূপ  
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আইসেনহাওয়ার ও খ্রুশ্চভ দুই জনই ভারতকে পূর্ণরূপে  
সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। উপরন্তু চীনের শত্রুত্বের প্রায়  
শতকরা ৮০-৯০ ভাগ সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যের উপর নির্ভর  
করে। খ্রুশ্চভ শান্তির "অভিযান" চালাইতেছেন। এমত  
অবস্থায়, আমাদের পরবর্ত্তি দপ্তরে মাহুথ থাকিলে অনেক কিছুই  
করা সম্ভব হইত। কিন্তু কূটনীতির চাল দূরে থাকুক, আমাদের  
পণ্ডিতজী এবং তাঁহার উপদেষ্টাবর্গ রাষ্ট্রনীতির কোন কিছুই গবর  
রাখেন কিনা সন্দেহ। যদি তাহা রাখিতেন তবে চীনের কথা ও  
ব্যবহারের এই অসঙ্গতি এবং সেই ব্যবহারের মধ্যে উত্তরোত্তর রূঢ়  
ও হিংস্রত্বের বৃদ্ধি তাঁহাদের অনেক পূর্বেই চৈতন্য প্রদান করিত।  
এখন যেভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা কি চার  
বৎসর পূর্বে করা বাইত না?

### দুর্নীতি দমনে টাইবুনালাল

উপর মহলে দুর্নীতি দমনের জ্ঞাত পূর্বে যে টাইবুনালাল গঠনের প্রস্তাব হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু সাংবাদিকদের নিকট বলেন, আমি এই টাইবুনালাল গঠনের পক্ষপাতী নই। সর্বত্রই দুর্নীতির কথা চলিতেছে ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে। দুর্নীতি দমন যে অত্যাবশ্যক, ইহা শ্রী নেহরু স্বীকার করেন। তবে তাহার পদ্ধতি অগুরু। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে টাইবুনালাল গঠন করিবার প্রস্তাবও প্রিনি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা মতে দুর্নীতি দমনের স্থায়ী টাইবুনালাল গঠন যেমন দেশের পক্ষে তিকর তেমনি অগণতান্ত্রিক। ঘৃষ, দুর্নীতি প্রভৃতি এমনই দ্রুত যে, তাহার নিদিষ্ট প্রমাণ অভিযোগকারীর পক্ষে দেওয়া কঠিন। উহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কেহ যদি বলেন যে, নিদিষ্ট প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হও তাহা হইলে অভিযোগকারীর প্রতি সমস্ত সুবিচার করা হয় না। জনসাধারণের ব্যাপারে এনফোর্সমেন্ট পুলিশ বেনামী চিঠি বা অস্পষ্ট সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তদন্ত আরম্ভ করিয়া প্রকৃত তথ্য বাহির করেন। ইনকামট্যাক্স, সেলট্যাক্স ঘটত বিষয়গুলি ইহার দৃষ্টান্ত। অতএব সরকারী ঘৃষ, দুর্নীতির ব্যাপারেও সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া বঞ্জনীয়। অভিযোগের কারণ থাকিলে লোক অভিযোগ করিবেনই, কিন্তু ইহা সত্য বা মিথ্যা তাহা অনুসন্ধানের দায়িত্ব সরকারের হাতে। স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে হটক, দায়িত্বগল, মজদুরী ব্যক্তি হইতে নগণ্য লোকেরাও বিভিন্ন প্রয়োজনে তাহাদের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ঘটনা হইতে এইরূপই মনে করেন যে, উচ্চ-নিম্ন প্রায় সব মহলেই দুর্নীতির মহামারী লাগিয়াছে। শাসনের পুরোভাগে অবস্থিত ব্যক্তিগণও ইহা অস্বীকার না করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। গোয়েন্দা পুলিশের চেষ্টায় বহু সরকারী উচ্চ ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তির দুর্নীতি অহরহ ধরা পড়িতেছে। প্রকৃত অবস্থা যেখানে এই, সেখানে আরও কঠোর এবং ব্যাপকভাবে দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা না করিলে ইহার প্রতিকার কোন পথেই হইবে না।

টাইবুনালাল গঠন প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু বলিয়াছেন, ইহা অগণ-তান্ত্রিক। বর্তমানে এই ঘৃষ এবং দুর্নীতি যে ব্যাপক আকারে দেখানিয়াছে, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াই কি হইবে তবে গণতান্ত্রিক বীজি? গণতন্ত্র মানে কি শুধু দল ও গোষ্ঠী পোষণ ও তাহার বাহিরে শুধু শোষণ ও পোষণ?

গ-স

### জনগণের সহিত পুলিশের সম্বন্ধ

দীর্ঘদিনের পরাবীনতা শুধু পুলিশের কেন, সকল মানুষেরই প্রকৃতিকে বদল করিয়া দিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষের এই পরিবর্তন কালের প্রলেপে হস্ত সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু পুলিশের মনোভাব বৃদ্ধি পরিবর্তিত হইবার নয়। পুলিশকে আমরা দেখিতে চাই বিপ্লবের স্বাক্ষর, শিষ্টের বন্ধু, আত্মের জ্ঞাতা ও দুঃখের ভ্রাসক হিসাবে। বহু অগ্রসর দেশেই জনসাধারণের নিকট পুলিশের

এই রূপটিই পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এ রূপটি আমরা আর দেখিতে পাইলাম না।

পাইলাম না, তাহার কারণও আছে। দীর্ঘ পরাবীনতাকালে এদেশের পুলিশ বিদেশী শাসকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের যন্ত্র হিসাবে তাহাদের হুকুম তামিল করিয়া আসিয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে তাহারা নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে নাই, করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। কলে পুলিশ দেশের শিষ্ট, দুঃস্থ সকলের পক্ষেই ভ্রাসক ছিল। বন্ধুরূপে নহে, শত্রু ও সন্দেহকূটিল দৃষ্টিতে পুলিশকে দেখিতেই তাহারা অভ্যস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। পুলিশ সবকে যে ভয় তাহারা মস্তবের মনে ঢুকাইয়া দিয়াছিল, আরও তাহারা সেই ভয়ের চোখেই পুলিশকে দেখে।

তবু পুলিশ ও জনসাধারণ উভয়েরই মানসিক পরিবর্তন বাঞ্ছিত আদর্শের দিকে যে কিছুটা অগ্রসর হয় নাই, সে কথা বলিব না। হইয়াছে, আন্তরিকতা থাকিলে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যকার সম্বন্ধ প্রত্যাশিত লক্ষ্যের দিকে ক্রমশ অগ্রসর না হইয়া বাওঁয়াও কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। তবে এ কথা মনে করি, সম্বন্ধকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাইতে হইলে একক প্রয়াসে তাহা সম্ভব হইবে না। পুলিশ ও জনসাধারণ উভয়কেই সেজ্ঞা আন্তরিক ভাবে সচেতন হইতে হইবে।

সম্প্রতি কলিকাতার অসুস্থিত পুলিশ ও জনসাধারণের সহযোগিতা সম্বন্ধে এক আবেশচেনা-সহায় জাতীয় অধ্যাপক ড. রাধাবিনোদ পাল এবং উক্ত সভায় ও মহাদানে অসুস্থিত কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্যারামেড পশ্চিমবঙ্গের পুলিশসহজী জীকাজীপদ মুখোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে তাহারাও পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপরই বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। ডঃ পাল এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য পুলিশকে সেবার মনোবৃত্তি লইয়া জনসাধারণের মধ্যে কাজ করিতে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন, আর ত্রিগুণোপাধ্যায় জনচিত্ত জয় করিবার জন্য প্রয়াসী হইতে পুলিশকে উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য ডঃ পাল জনসাধারণকেও তাহাদের নাগরিক আচরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা স্বরণ করিয়া দিতেও বিমুদ হন নাই। জনসাধারণ যে নাগরিক সন্যাসের আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছে এবং পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন যে নাগরিক কর্তব্য-নিষ্ঠার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, সে অভিমতও তিনি দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। ডঃ পাল সত্যই বলিয়াছেন যে, সুগঠিত পুলিশবাহিনী না থাকিলে দেশে সম্ভবতঃ সামাজিক জীবনস্থাপন সম্ভবপর হয় না এবং কণ্ডবানির্ভর পুলিশবাহিনীর দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ডঃ পাল পুলিশকে আর একটি কর্তব্যের কথা বিশেষ ভাবে স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন। সেই মূল্যবান কথাগুলি পুলিশ যদি সত্য স্বরণে রাখে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সন্তোষের কণ্ডব্যাপালন অনেক সম্ভব হইবে। ডঃ পালের সেই মূল্যবান উক্তি হইল : পুলিশের রাজ-



নীতিমূল্য প্রভাব ও সম্পর্ক হইতে মুক্ত থাকি সম্পর্কে। পুলিশ যদি রাজনীতির সহিত নিজের জড়ায়িতা ফেলে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সরল ও সহজ ভাবে কর্তব্য সম্পাদন কখনই সম্ভব হয় না। প্রতিপক্ষে বিধা, সংশয়, ঐক্যমীমাংসা ও অবহেলা তাহাদের কণ্ঠের পথ বিঘ্নিত করিয়া তোলে। পুলিশের বাহা কর্তব্য তাহা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতে হইলে রাজনীতিক মতবাদের ঘূর্ণি হইতে তাহাদের নিজের সর্বস্ত্র দিয়ে সরাইয়া রাখিতে হইবে।

রাষ্ট্রের কল্যাণসাধনের জন্ত সতত জাগ্রত থাকাই যে পুলিশের কর্তব্য ইহা স্বরণ করাইয়া দিয়া অব্যাহতি একটি বিশেষ কর্তব্য সম্বন্ধে পুলিশমন্ত্রী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সে কর্তব্যটি হইল চীনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে ভারত সীমান্তের কোন কোন স্থানে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সে সব অঞ্চলে, সামরিকবাহিনী ছাড়াও পুলিশের কর্তব্য বহিষ্কার।

বাহা হটক, পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে বাহিত সম্বন্ধ সংস্থাপনের ফলে যদি জনমন পুলিশকে বহুভাবে ভাবিতে পারে তবেই দেশের সত্যকার মঙ্গল হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। গ-স

### উড়িষ্যার চাউল গেল কোথায় ?

সকলেই মনে করিয়াছিলেন, উড়িষ্যাকে লইয়া খাতাকুল গঠিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যা মিটিবে এবং উড়িষ্যার চাষীও বাড়তি ধান-চাউল কিছু বেশী হয়ে যেচিয়া সামান্য সম্বলতার মূল দেখিতে পাইবে। এইরূপই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। উড়িষ্যার বাড়তি চাউল পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাণ আমদানি হইতেছে তাহা একমাত্র সরকারই বলিতে পারেন। সত্য কথা বলিতে কি, সরকারও সম্ভবতঃ তাহা বলিতে পারেন না। অথচ চাউল তাঁহারা প্রচুর পাঠাইয়াছেন, ইহা সত্য। একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উড়িষ্যা হইতে এক লাখ টন ধান এবং চাউল পশ্চিমবঙ্গে নাকি আসিয়াছে। তাহা হইলে এত পরিমাণ ধান-চাউল কোথায় বাইতেছে ? রহস্য এইখানেই।

সরকারী বাসস্থান কুপায় উড়িষ্যার ধান চাউল যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গে আমদানি করা হইতেছে তাহাতে আমদানী চাউলের একটি বৃহৎ অংশ মজুতদার-মুনাকালিকারীদের গোপন-পন্থায়ে অদৃশ্য হইতেছে। ইহা সরকারেরই সৃষ্টি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ খাতাকুল গঠন করিয়া 'স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন না ঘটাইবার' নামে উড়িষ্যার উৎপাদিত চাউল লইয়া 'জিনিমিনি' পেলিবার অর্থ স্বযোগ ইত্যাদির হাতেই উলিয়া দিয়াছেন। খেলাটা চলিতেছে খোলাখুল ভাবেই, আর খেলায় সাহায্য করিতেছে আইনে ফাঁক অথবা দাঁকি। উড়িষ্যার বাড়তি চাউল পশ্চিমবঙ্গে আমদানী করার উদ্দেশ্যে গঠন একমাত্র উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না। চাউল কি পরিমাণ আসিতেছে, কোথায় বাইতেছে, এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্রেতা-গণ তাহা ক্রয়মূল্যে পাইতেছে কি না, এই সমস্ত প্রশ্নে সুনিশ্চিত সত্যের দিবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

উড়িষ্যা হইতে আমদানী চাউল বাহাতে ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীও চোরাকারবারীদের কান্দগত না হইতে পারে, সেজন্য উড়িষ্যা সরকারের সহিত একযোগে বিধিব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। সরকার এই সকল দায়িত্ব বহনসময়ে এবং যথোচিত দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

চাউলের পাটকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার সম্বন্ধ সরকার পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার অর্থ নিশ্চয়ই রূপ হইতে পারে না—স্বাধীন ব্যবসায়ের স্বযোগ লইয়া ফাটকাবাজ ও মুনাকাল-লোভীগণ যথেষ্ট কারবার চালাইবেন এবং জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য লইয়া চোরাকারবারে সরকার প্রবৃত্ত দিবেন। অথচ সেইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে।

কি করিয়া এই সব চাউল মুনাকালোভী মজুতদারের গুদামজাত হইতেছে, প্রশ্ন উঠিতে পারে। আইনের ফাঁক এমন যে, উড়িষ্যাতে পঞ্চাশ মণ ধান বা চাউল কিনিলে কোনও লাইসেন্স দরকার হয় না এবং সরকারকে শতকরা কুড়ি ভাগ লেভিও দিতে হয় না। কাজেই মজুতদাররা ত সুবিধা পাইবেই। আইন বাঁচাইয়া এক এক দফার চক্কির বস্তা অর্থাৎ আটচল্লিশ মণ ধান বা চাউল পশ্চিমবঙ্গে চালান দিবার অবাধ স্বযোগ। সে ধান-চাউল কোথায় পৌছাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার হিসাব রাখেন না। অপর পক্ষে বাঁচাইয়া লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী তাহাদের ফাঁকি বেশী। সরকারী লেভির দাবি মিটাইতে হইবেই। ইহার উপর মালগোষ্ঠীর অভাব। সব মিলিয়াই চাউল-রহস্যের পরিণামটা মারাত্মক, আইনের ফাঁকি দিয়া মজুতদারের ঘরে চাউল উঠিতেছে, পশ্চিমবঙ্গে উঠিতেছে হাহাকার! চমৎকার প্রশ্ন—কিন্তু এ প্রশ্নের আর কতকাল চলবে ? গ-স

### সরকারী টাকার অপচয়ে মেডিকেল ষ্টোর্স

কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সে অব্যবহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই হতভাগ্য আমলাতন্ত্র-সর্বস্ব দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও দায়িত্ব-বিভাগ এমনই ছক-কাটা যে, কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের গুরুতর গলদ বাহির করিতে বিস্তর সময় লাগে। গলদ বাহির হইলেও, তাহার জন্ত দায়িত্ব নিরূপণ করা আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ সরকারের হিসাব-নক্সা বিষয়ে ঘাটিত আছে, নিয়ম-কানুনও কেতাদুরস্ত। কিন্তু এখানে দেখা বাইতেছে, কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সের হিসাব-পত্রের গলদ বাহির করিতে দপ্তর-কর্তারা গলদবদ্ধ। কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সে লক্ষ লক্ষ টাকাও অপচয় ঘটিয়াছে নাকি কয়েক বৎসর ধরিয়া! অথচ অপচয়ের অভিযোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য-দপ্তর সচেতন হইলেন মাত্র কয়েক মাস পূর্বে। তারপর যথার্থীতি কয়েকজন ইনস্পেক্টর প্রেরিত হইলেন তদন্ত করিবার জন্ত। তাহারা কিংবা আসিয়া বলিলেন, খাতাপত্র সব ঠিক আছে।

ইহাই প্রহেলিকা! বাতাই হটক, সরকার নাকি সিদ্ধান্ত



তুলনায় এদেশে গবেষণার জ্ঞান দানের পরিমাণ অতি নগণ্য। অতঃপর এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ। নূতন মূলধন সৃষ্টি কিংবা শিল্পে, ব্যবসারে উৎসাহ দান করা। কিন্তু প্রত্যক্ষ-কর সম্পর্কে অর্থ-সচিবের নূতন প্রস্তাবগুলি স্বল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর অবিকল বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। প্রস্তাবিত অর্থপ্রত্যক্ষ-করের অধিকাংশই টেকসই জিনিসের কিংবা কলকারখানার ও অজ্ঞাত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বস্ত্রপাতি প্রভৃতির উপর। লৌহপিণ্ড, টিনের পাতলা ও মোটা চাদর এবং এলুমিনিয়ামের পিণ্ড এবং চাদর ইত্যাদির উপর উচ্চহারে আভ্যন্তরীণ শুদ্ধ প্রবর্তনের ফলে কেবল যে লোহা, এলুমিনিয়াম ও টিন দিয়া তৈয়ারী ঘরকন্নার আসবাবপত্র প্রভৃতির দর চড়িবে তাহা নহে, ঐ সকল ধাতুর পাতলা চাদরে তৈয়ারী টিনে বা কোঁটার ভর্তি নানা রকম জিনিসের দরও চড়িবে। বিজলী পাখা, বালব ও ব্যাটারী, সব রকম মোটর গাড়ী, লরী, ক্ষুটার, মোটর সাইকেল, বিদ্যুৎ-চালিত মোটর প্রভৃতির উপর সদা-প্রবর্তিত শুদ্ধের হার রীতিমত চড়া। সাইকেলের চাকা ও রিমের উপর যে হারে শুদ্ধ ধার্য হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকখানি সাইকেলের জ্ঞান দশ টাকা আদায় হইবে। ডিজেল তেলের উপর প্রথমে গ্যালিন প্রতি ২৫ ন. প. শুদ্ধ ধার্য হইয়াছিল। চড়িতে চড়িতে ইহা ৮০ ন. প. উঠিয়াছে। এখন আরও ২৫ ন. প. বাড়ানো হইতেছে। মোটর গাড়ী, সাইকেল ও ডিজেল-তেলের উপর উচ্চহারে শুদ্ধ ধার্য করার বাস্তব্রাতের খরচ যেমন চড়িয়া বাইবে, মূলধন অপচয়ের পথও তেমনই প্রশস্ত হইবে।

আজকাল পল্লী-অঞ্চলে এবং ছোট ছোট শহরে বাস্তব্রাতের জ্ঞান সাইকেলই প্রধান ভরসা, কেবল-মাত্র মধ্যবিত্ত নহে—অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও সাইকেলের উপর ভর করিয়া কাজ-কারবার চালাইয়া থাকেন। ডিজেল তেলের দর সম্ভা এবং ডিজেল তেলে চালিত মোটর লরী, বাস প্রভৃতি অনেক বেশী টেকসই হয়। ইহাই ডিজেল-চালিত গাড়ী জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ। ক্রমাগত শুদ্ধ বাড়াইয়া ডিজেলের দর চড়াইয়া দেওয়ার কেবল যে এ ধরনের গাড়ী চালাইবার খরচ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে। ডিজেলের পরিবর্তে পেট্রোল-চালিত গাড়ী চালাইবার জ্ঞানও পরোক্ষভাবে চাপ পড়িবে।

দরিদ্র দেশে বার হ্রাসের জ্ঞান যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে, সরকার বার বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করিতেছেন। ডিজেলের উপর শুদ্ধবৃদ্ধির মূল রহস্য কি? ভারতে তিনটি তৈল শোধনাগার খুলিবার সময় পেট্রোল, ভারি ডিজেল, হালকা ডিজেল প্রভৃতি বিভিন্ন তেলের আনুপাতিক চাহিদা সঠিক সন্ধান না করিয়া বেশী পরিমাণে পেট্রোল তৈয়ারীর ব্যবস্থা বোধ হয় হইয়াছিল। সেই অনুপাতে কিন্তু ডিজেল প্রাপ্তের ব্যবস্থা হয় নাই। কলে বেশী পেট্রোল উৎপন্ন হইলেও, ডিজেলের বাটতি পড়িয়াছে। এই বিভ্রাটের মূল দায়িত্ব পরিকল্পনা-রচয়িতাদের। আর সরকার ক্রমাগত

ডিজেলের উপর শুদ্ধ বাড়াইয়া সে তুলের জ্ঞান জনসাধারণের উপর চাপ দিতেছেন। এই সব অ-প্রত্যক্ষ-করের জ্ঞান সংসার খরচ যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজস্ব ও রাজস্ব-বহির্ভূত দুইটি খাত মিলাইয়া ঘাটতি বার সংকুলানের জ্ঞান অর্থ-সচিব আগামী বৎসর ১৫৩ কোটি টাকার কালতু নোট ছড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই টাকাটাও বাজার ফাঁপাইয়া তুলিয়া দর চড়াইবার অমূল্য অবস্থাই সৃষ্টি করিবে। সরকার কি এদিক দিয়া একবারও চিন্তা করেন নাই? ইহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি বাজার ফাঁপাইয়া তুলিয়া দর জায়া স্তরে রাগিবার জ্ঞান সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহা পারিতেছেন না বলিয়াই এই বিভ্রাট।

অতর্কিতক ভাষের খাতে অপব্যয় ও অপচয়—বাহ্যকে সহজ বাংলায় ‘পাচার’ বলে—নিবারণ করা ত দূরের কথা, সঙ্কোচনের চেষ্টাও দেখা বাইতেছে না। পরিণতি যে কি হইবে সে কথা কেহই ভাবে না।

গ-স

### উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে ভেষজ ও ভেষজের উপাদান উৎপাদনের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জ্ঞান আট কোটি ঋণ অর্থাৎ নয় কোটি টাকা সাহায্য করিবে—একথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই টাকার ভারতে পাঁচটি কারখানা স্থাপন করা হইবে, একখাও কান্দারও অজ্ঞাত নয়। এই কারখানাগুলির একটিতে পেনিসিলিন, ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ, একটিতে যৌগিক ঔষধ ও উহার উপাদান, একটিতে ভেষজ গাছ-পালা হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধ, একটিতে জীবজন্তুর শিরা রক্ত প্রভৃতি হইতে ইনজুলিন জাতীয় ঔষধ এবং আর একটিতে অস্ত্রোপচারের জ্ঞান প্রয়োজনীয় বার রকম বস্ত্রপাতি তৈয়ার হইবে স্থির হয়।

উক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এই সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী একটি সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ দল ভারতে আসিয়া তথ্যসন্ধানের পর ভারত সরকার কারখানার জ্ঞান কোন্ কোন্ স্থান উপযুক্ত, সে বিষয়ে সুপারিশ করিতে একটি কমিটি গঠন করেন।

বর্তমানে ভারত সরকার এই কমিটি-রিপোর্ট অনুযায়ী স্থান নির্বাচন করিয়াছেন—পেনিসিলিন ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানা উত্তর প্রদেশের হাবিকেশে, যৌগিক ঔষধ ও তাহার উপাদান উৎপাদনের কারখানা অন্ত্রের সনৎনগরে, ভেষজ গাছপালা হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধের কারখানা কেবলের কোনও একস্থানে, অস্ত্রোপচারের বস্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানা মাজাজ শহরের নিকট-বর্তী একস্থানে এবং শিরা-গ্রন্থি-রক্ত ইত্যাদি হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধের কারখানার একটি শাখা কলিকাতা ও একটি শাখা বোম্বাইয়ে স্থাপিত হইবে। এই পাঁচটি কারখানার প্রয়োজনীয়

বিবিধ ভেষজ সর্ষপ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আর একটি কারখানা স্থাপনের জগৎ ভারত সরকার পশ্চিম আফ্রানীর বোয়াস কোম্পানীর সহিতও একটি চুক্তি করিয়াছেন। এই কারখানাটি বোয়াসের খড়পদ নামক স্থানে স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিম্বিত না হইয়া পাবা যায় না। এই স্থান নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কথা একবারও মনে পড়িল না, উহাই আশ্চর্য। অথচ এই জাতীয় কারখানা তৈয়ারীর উপযুক্ত স্থান পশ্চিমবঙ্গ। কেননা, ভেষজ-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন এদেশে কয়েকটি কংগ্রেস কল ও দলবিশিষ্ট দুটো-চারিটি শিল্প ছাড়া অন্য শিল্প ছিল না, সেট সময়ের পশ্চিমবঙ্গে একটি ভেষজ কারখানা স্থাপিত হয় এবং সেদিন পর্যন্ত এই সব প্রতিষ্ঠান প্রায় একচেটিয়া ভাবে সমগ্র ভারতে স্থানীয়ের সহিত বহুসংখ্যক ভেষজ সরবরাহ করিয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর সম্ভ্রান্ত আসাম রাজ্যে ভেষজ প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা হইতে উদ্ভূত রাসায়নিক দ্রব্য এবং ইপিকাক, অগ্নি, ডিউকালিশ ইত্যাদি ভেষজ উৎপাদনের গাছ-গাছড়ার অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া উষ্ম, চা-জাত কেবিন ও গুস্তিহাত ঔষধ উৎপাদনেরও প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এত উন্নত যে, এখানে যন্ত্রপাতির যন্ত্রপাতি নির্যাতনের সুযোগেরও কোন অভাব নাই। মের্টের উপর পশ্চিমবঙ্গে ভেষজ ও অস্ত্রোপচারের জগৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের এত সুযোগ রহিয়াছে যে, মোতিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে পরিকল্পিত পাঁচটি এবং আফ্রানীর বোয়াসের সাহায্যে পরিকল্পিত একটি কারখানাও প্রত্যেকটি এই রাজ্যে সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ভেষজ প্রস্তুতের এই রাজস্ব-সঙ্কে পশ্চিমবঙ্গকে কোন স্থানই দেওয়া হয় নাই। একমাত্র শিরা, গ্রহি ও রক্ত হইতে ঔষধ উৎপাদনের কারখানার একটি ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় শাখা কলিকাতায় স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে। উহা উল্লেখযোগ্য কিছুই নহে। এই অবস্থার কারণ কি তাহা আমরা অনুমান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভারত সরকার ভেষজ শিল্পের স্থান নির্বাচনে যে কয়টি গঠন করিয়াছিলেন, তাহার পাঁচ জন সদস্যই অবশ্য ভারতবাসী কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ বাঙালী নাই। অথচ বাঙালীরা মধ্যে 'চকিমা-বিজা ও ভেষজ-শিল্পে প্যান্থানা বাক্সির অভাব ছিল না। উহাদের মধ্যে একজনকেও ভেষজ-শিল্পের স্থাননির্বাচন-কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় নাই। উহা কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার ছিল কি? নচেৎ পশ্চিমবঙ্গ এই শিল্প হইতে একেবারে বঞ্চিত হইল কেন? এখন পর্যন্ত কেবলে কোন উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই—উহা সশ্বে ও গাছগাছড়া হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধ প্রস্তুতের কারখানার স্থান কেবলে 'কোনও উপযুক্ত স্থানে' হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব কথাবকে জবাব দিবে?

এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি কোন দায়িত্বই ছিল না? বরং দেখা গিয়াছে তাহারা বরাবরই নিশ্চেষ্ট ছিলেন।

যেদিক দিয়াই হউক, ব্যাপারটি পশ্চিমবঙ্গের দিক হইতে অত্যন্ত দুঃপজনক। পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পে অবিদিত কারণে বাঙালীর বড় একটা কর্ণসংস্থান হয় না। সেক্ষেত্রে এই রাজ্যে কারখানাগুলি স্থাপিত হইলে বাঙালীর কর্ণসংস্থানের পথ অনেকটা সুগম হইতে পারিত। বরং দেখা যাইতেছে, যে সব শিল্প স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, সেই সব শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইতেছে না। একথা কেবল ভেষজ-শিল্প সম্বন্ধেই নয়, নয়, অস্ত্রাস্ত্র অনেক শিল্প সম্বন্ধেও একথা খাটে। ভারত সরকার বর্তমানে দেশে করণাভিত্তিক বং ও বজ্রনদ্রব্য উৎপাদনের জগৎ একটি বৃহৎসংখ্যক কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইম্পাত উৎপাদনের জগৎ কারখানা স্থাপিত হইতেছে। প্রতিক্রিয়াশীল দ্রব্য উৎপাদন নিমিত্ত দেশে আর একটি বড় কারখানা স্থাপনের তেড়োজড় চলিতেছে। এ সব কারখানা অনায়াসে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইতে পারে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে কয়লা ইম্পাত, প্রাকৃতিক কাঁচামাল ইত্যাদি কিছুই অভাব নাই। কিন্তু কোথাও পশ্চিমবঙ্গের নাম করা হইতেছে না। ইহা কি সজ্ঞতা—না ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা?

যে কারণেই হউক, বর্তমানে এই অবস্থার অবদান হওয়া বাইনীয়।

গ-স

### পশ্চিম বাংলার বাজেট-বিশ্লেষণে মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বাহির হইবার পূর্বে বেক্রপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল, বাহির হওয়ার পরে দেখা গেল ইহাতে ভর পাইবার কিছু নাই। গত বৎসর পর এই রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া একটা ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে এবং বঙ্গাবিসংকট অঞ্চলে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ শোচনীয় দুর্দৈব ভোগ করিতেছে। পান্য এবং অস্ত্রাস্ত্র নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় সাধারণ লোকের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। উপার্জননের ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছে না। ধান-চালের দর এখনই যে স্তরে উঠিয়াছে, তাহাতে পরে—স্বাভাবিক টানটানির সময় অবস্থা কি ঠাড়াইবে তাহা বলনা করাও যায় না। এত প্রতিভুল উপসর্গ সশ্বেও রাজকোষে আর্থিক অবস্থার যে অবনতি ঘটে নাই, ইহাই সামান্য। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র রায় অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। সেক্ষেত্রে সংশোধিত বাজেটে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্তের ভরসা দিয়াছেন। এবং আগামী বৎসরের মূল বাজেটে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমান করিয়াছেন। রাজস্ব খাতের বাহিরে আরও ব্যয় মিলাইয়া চলতি বৎসরের মূল বাজেটে মোট ৪৮ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্তের স্থানে এখন সংশোধিত হিসাবে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্ত থাকা হইয়াছে। ইহা

সম্পূর্ণই আগের বৎসরের উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাবদ বকেয়া ব্যয়দেয় জের। আগামী বৎসর এ ধরনের বিলম্বিত বরাদ্দ জুটবার কোন সম্ভাবনা এখনও নাই। সেজন্য রাজস্ব খাতের বাড়িবে বায় মিলাইয়া মোটের উপর ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বাড়তি পড়িবে বর্ষান্ত্রে মজুত তহবিল হইতে তাহা পূরণের পথেও ১৯৬১ সনের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা মজুত থাকিবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাল্যসংস্কারের ক্যাচবৌদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি পুনঃনিবেশনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। ইত্যাক্তে বায় কুঁচি পাইলে, বাজেটের বিবর্তন ঘটবে।

বাজ্য দরবারের অর্থকুচ্ছা সম্পর্কে। তাহার উপর অতিরিক্ত অর্থের চাপন নান্দিক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন স্বীকৃতপাঠ্যের সঙ্গে সমগ্র বা আর্থিক বায় বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সংকোচ সাহায্য করিলেও, সেগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বাজ্য সরকারকেই একমাত্র দায়িত্ব বহন করিতে হয়। এই কারণেই প্রথম পরি-কল্পনার সমাপ্তি স্বীকৃতি চাপ্ত বাখার জন্য বিদ্যমান পরিকল্পনার সমলে রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব। কেউ টাকা অতিরিক্ত বাজেট চাপ পড়িয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় প্রস্তুতি স্বীকৃতির জন্য উঠা ছাড়া মোট ১৮০ ১৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। এবং তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে এই বরাদ্দ মোট ৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বাজেট চাপ পড়িবে। এই বিপুল বায়ের বিনিময়ে এখন পর্যন্ত আর কতটা গুরু পাইয়াছে, কিংবা জীবনযাত্রার কতটুকু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার কোন হিসাব মুখ্যমন্ত্রী দেন নাই। বৎসরের পর বৎসর বাজেটে পরিকল্পনার জন্য মোট বরাদ্দ, তন্মধ্যে কত খরচ হইয়াছে এবং আর কত খরচ করিতে হইবে, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ আর্থিক অবস্থার কতটা উন্নতি ঘটিয়াছে কিংবা কতদিনে উন্নতি ঘটবে, সে সম্পর্কে কোন ধরন-জোড়া নাই। পরিকল্পনার সঙ্গে অর্থ বায় কতটা যেন মূল লক্ষ্য। প্রতিবন্ধক কতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব-নিরূপণ করিবার প্রয়োজনও নাই—বোধ হয় উহা অবাস্তবও। অবশ্য একদিন উহার সূত্রসূত্র দেখা বাটবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আশায় মানুষ আর কলকণ্ড প্রতীক্ষা করিবে?

তবে স্তব্ধ বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন, এত ব্যয়ভর চাপা সংকোচ, পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের আর সাধারণের উপর চাপের কোন কর্তি চাপান হইবে না। সংবাদটি শুভ। জনসাধারণ ইহাতেই খুসী হইবে।

গ-স

### দরিদ্র দেশে মন্ত্রীদের বিলাস

আমাদের দরিদ্র দেশ। কিন্তু মন্ত্রীদের আচরণের বিবিধ উপকরণ ও দেশভ্রমণের জাকজমক দেখিয়া কে বলিবে ভারতবর্ষ গরীবের দেশ। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইংরেজী আদর্শ-কাগজ আজও আমরা ত্যাগ করিতে পারি নাই। সেট সেলামি-মোহ, পদাঙ্কবাণী মধ্যমা বক্ষার প্রয়োগ, ট্রেনে 'সেলুন' ব্যবহার

এবং সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য বক্ষায় যত্নবান মন্ত্রীরা সন্মুখাধারণ হইতে নিজেদের পৃথক করিয়া লইয়াছেন। শুনা বাইতেছে, কেন্দ্রীয় সংকোচ মন্ত্রীদের এষ্ট জাঁকজমক কমাইবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

অবশ্য যেন-পথে যাতায়াতকালে মন্ত্রীগণ যাতাতে স্বাক্ষর বোধ করেন তাকর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রয়োজনীয় যুক্তিসঙ্গতপরিমাণ স্বাক্ষর, মন্তব্য-পদমালা; জাতিব-কদিবার অগ্ররূপ নয়। সংক্ষেপে না হইলেও, প্রায় অনেক ক্ষেত্রে সেকালের বাদশাহী বিলাস, উচ্চদের ভোগাভোগের তুলনায় খুব বেশী ভিন্ন ছিল না।

কেন্দ্রীয় সংকোচ সেটনিকেট করিয়া করিয়াছেন। এবং বেলুদেহে সেলুন বাক্ত, সমরিক কয়লায় সেলাম ও সঞ্চিনা দান ইত্যাদি ব্যাপারে আড়ম্বর কমাইবার কথাও এই সঙ্গে বলিয়া-ছেন। এই ব্যবস্থা অনেকগুলি মন্ত্রণেই করা বাইত। বহু তিক্ত এবং তিক্ত বিক্রম সমাজেও। শুনিবার পর কেন্দ্রীয় সংকোচ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিজ্ঞে হইলেও, দৃষ্টি যে পড়িল উঠাই স্তব্ধের কথা। বাক্ত পকন, মনে হয় বাজ্যবানী দ্বিতীয় সংকোচে মহলে জাকজমকে প্রচি সংকোচ অগ্রবাহ সতজে বাটবার নয়।

এই প্রসঙ্গে এট মনেও 'অনন্দবাজার' পত্রিক উচ্চায় সম্পাদকীয় কলাম একটি মন্তব্য কথা বলিয়াছেন। তাহারো বক্তব্যেছেন, "গ্লাউচিং ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী। তিনি বেলে যাতায়াত করিতেন সর্বনিম্ন শ্রেণীতে। শোনা যায় তিনি বলিতেন ট্রেনে আরও নিচু ক্লাস থাকিলে তাহাতেই যাতায়াত করিতাম। আমাদের দেশের মন্ত্রী মহোদয়র কাছে অতটা আশা করি না, ... গ্লাউচিং সম্পকে লোকে বিনীত, উপরে অক্সফোর্ড অর্থাৎ বিজ্ঞান পাশিণ, কিন্তু ভিতরে লিভিংস্টন অর্থাৎ পুণাপুরি ব্যবসায়ী মন।" আমাদের ক্ষমতার অগ্রবাহ নেতাও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর যাতায়াতের বস্ত্রে বৎসর লাগিতেছে আড়ম্বরপ্রসূতার সংক্ৰমক মোহ কতাইকে বাক্তের সম্প্রদ লোকে কি বলিবে? উপরে পাকবানী আশের পাশিণ ভিতরে ওষধাতী বিলাসবাসনা?"

গ-স

### উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নূতন সঙ্কট

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। উচ্চশিক্ষার আয়োজন বাড়াইতে হইবে। কিন্তু আয়োজন নান্দিক হইলে কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না। উচ্চশিক্ষার মান দ্রুত অবনতির দিকে বাটতেছে, ইহার প্রধান কারণ কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যধিক ভিড়। এষ্ট ভিড় কমাইতে হইলে কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং প্রত্যেক কলেজে ছাত্র-ভর্তি সংকোচে সংখ্যা বাড়িয়া দিতে হইবে। এবং কলেজের সংখ্যা শুধু বাড়াইলেই চলিবে না। উচ্চশিক্ষার আদর্শ

অনুযায়ী পুনর্বিজ্ঞাসে প্রথম প্রয়োজন কলেজগুলিকে ভিতরে বাহিরে চালিয়া সাজানো এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য নতুন কলেজ স্থাপন। সংখ্যাগত নয়, গুণগত উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী দরকার।

এইজন্যই মনে হয় কেবল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই ছাত্র-ভর্তির সমস্যা মিটিয়া যাইবে না। কারণ উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা বৎসরে বৎসরে যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে—তাহার সহিত সমান-তালে কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে পারা অসম্ভব। কেবল অসম্ভব নয়, ক্ষতিকরও। যেমন-তেমন কলেজ খুলিয়া গুণ ও বোগ্যতা বিচার না করিয়া হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার কলে জুড়িয়া দিলে সমাজ অথবা শিক্ষার্থী কাহারই লাভ হইতে পাবে না। উচ্চশিক্ষা যে বর্তমানে গভীর হতাশা ও অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার একটি কারণ উচ্চশিক্ষার নামে বাহা চলিতেছে, বলিতে গেলে তাহা একটি প্রহসন। সকলের পক্ষেই কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ প্রয়োজন নয়—সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য নয়, একথা আমাদের দেশে লোকে সহজে বুঝিতে চাহে না। অবশ্য তাহার কারণও আছে। ডিগ্রী না হইলে, আমাদের দেশে কোনো চাকুরিই মিলিবে না—মোহ সেইখানেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অব্যাহতি অযোগ্যের ভিড় কমাইতে হইলে, এই সব দিক বিবেচনা করা কর্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই ভিড় কমাইবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার নীতিগত যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। স্কুল হইতে পাস করিয়া সব ছাত্রছাত্রীকে নির্দিষ্টকালে কলেজে ভর্তি হইবার অবাধ সুযোগ দিবার যে বর্তমান রীতি, ইহার পরিবর্তন সাধন। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চায়—প্রথমে তাহাদের গুণগত বোগ্যতার একটি মান নির্দিষ্ট করা কর্তব্য। এই মান অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া কেবলমাত্র যোগ্য ছাত্রছাত্রীকেই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। এক কথায়, কমিশন উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকোচনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন অবশ্য ইহা সতর্কপ্রশ্নই করিয়াছেন। তবে ইহার সহিত দেশের অসংখ্য তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িত। গুণ ও বোগ্যতা বিচারে বাহারা কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সুযোগ হারাইবে—তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম হইবে না, তাহারা করিবে কি? যাইবেই বা কোথায়?

এই সব ছাত্রছাত্রীর জন্য কি কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে? কলেজী শিক্ষার উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে তাহা অব্যাহতি এবং তাহা নানা ভাবে ক্ষতিকর স্বীকার্য করি। চাপ কমাইবার এক উপায় উচ্চশিক্ষার প্রতি এই সার্বজনীন বোক কমান। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন, নানা বয়স বৃত্তিকরী, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। কমিশনও অবশ্য সেই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কথা হইল, উচ্চশিক্ষার

সুযোগে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কার্যকরী শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সমানতালে অগ্রসর হওয়া চাই। নহিলে বিড়ম্বনা ত বাড়িবেই বৎ কঠিন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হইবে।

ব্রিটেনে স্কুলের সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর শতকরা মাত্র তিন জন ছাত্রছাত্রী কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাই বলিয়া বাকি ছাত্রছাত্রীর জীবন বার্থ হয় না। তাহাদের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা সেখানে বর্তমান। আমাদের দেশেও বাহারা উচ্চশিক্ষা পাইবে না, তাহাদের ভবিষ্যৎ সবক্ষে শিক্ষানীতি বিধারকগণ ও রাষ্ট্রকর্তাদের সহায়ত্বের সঙ্গে ভাবিতে হইবে।

গ-স

## পুস্তকের ভারে শিক্ষা-মানের অবনতি

উচু ক্লাসের ছেলেদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা যে অবস্থা পুস্তকের ভারে শুধু বিব্রত নহে, নিপীড়িত হয় এ কথা দেশের শিক্ষা সঙ্কে যাহারা চিন্তা করেন, তাহারাও অনুভব করেন। পাঠ্যপুস্তকের এইরূপ বাহুলা থাকিলে প্রকাশকদের কল্লি-রোজগারের সুবিধা হয় বৃদ্ধিতে পাদি, কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তকভারে প্রতীড়িত করিয়া তাহার কি হিত বা স্বার্থসাধন করেন, সে দৃষ্টান্ত প্রতি অভিভাবককেই ভাবাইয়া তোলে। পূর্বে বড় ভাই যে বই পড়িত, ছোট ভাই সেই শ্রেণীতে উঠিলে সেই সব বই-ই পাঠ্য হিসাবে পাইত। তাহাতে অভিভাবকের বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। এখন সে সব ত অতীতের কাচিনীতে পরিণত হইয়াছে। কোন ছাত্র পরীক্ষার অকৃতকার্য হইয়া কোন শ্রেণীতে থাকিয়া গেলে, তাহাকেও আবার একগাদা নতুন বই কিনিতে হয়। অথচ সকলেই জানেন যে, পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট পুস্তকগুলির অতি সামান্য অংশই বিদ্যালয়ে পড়ান হইয়া থাকে। আর পারবস্তিত বইগুলি মানেই দিক দিয়া উন্নত ত নয়ই, বৎ নিকট শ্রেণীর। তথাপি পরিবর্তিত হইতেছে। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে, শিক্ষা বিভাগ চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন, অভিভাবকরা অসহায় ভাবে শ্রমার্জিত অর্থ, বলা চলে একরূপ জলেই ফেলিতেছেন। এ সব বিষয়ে অভিযোগেরও অন্ত নাই। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে। উহার বাহা করিবার তাহা করিবেনই।

শৈশবে অথবা পুস্তকের চাপে ক্লিষ্ট করিয়া শিক্ষা সঙ্কে শিক্ষার্থীদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয় বলিয়া, এ যানাবনতি ঘটতেছে কিনা কে বলিবে? আমরা সরকারী শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি, তাহাদের দ্বাৰ্শে দরিদ্র অভিভাবকদের অর্থের এইরূপ অপচয় ঘটান হইতেছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের আগ্রহ শৈশবেই অথবা পাঠ্যগ্রন্থের চাপে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহারা অনুসন্ধান করুন এবং বিভিন্ন দ্বাৰ্শের আতাতের কলে যদি পাঠ্যপুস্তক সঙ্কে এইরূপ যথেষ্টাচারের প্রবর্তন হইয়া থাকে তবে কঠোর হস্তে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করুন।

গ-স



## ট্রেন-ডাকাতি রোধকল্পে উত্তর-প্রদেশ সরকার

চলন্ত ট্রেনে ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই ডাকাতি দমনের জন্ত উত্তর-প্রদেশের সরকার নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, পুলিশের সংখ্যা না বাড়াইলে আর এই উৎপাত দমন করা সম্ভব হইবে না। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-প্রদেশ সরকারকে পুলিশের সংখ্যা বাড়াইবার জন্ত অর্থসাহায্য করুন। বর্তমান যুগ ধার কথিয়াও অর্থহীনে কদার যুগ। স্তব্ধতা কেন্দ্রীয় সরকার মুক্তহস্তে দানও হয়ত করিবেন। কিন্তু তাহাতে চলন্ত-ট্রেনে ডাকাতি বন্ধ হইবে কি?

উত্তর-প্রদেশে ট্রেন-ডাকাতি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। গত ২ই নবেম্বর একদল সশস্ত্র ডাকাত সম্ভবত ভাবে ট্রেনের কামরার প্রবেশ করে। সেই কামরার বারজন যাত্রী ছিল, তাহাদিগকে অস্ত্র দেখাইয়া তাহাদের টাকাকড়ি, জিনিসপত্র লইয়া ট্রেনের চেন টানিয়া পলায়ন করে। ইহা ছাড়া স্টকেস, টাকা ইত্যাদি অপহরণও অহরহই চলিতেছে। মধ্যপ্রদেশে এককাল ডাকাতিব জন্ত কুখ্যাত ছিল, এখন উত্তর-প্রদেশেও উহা সংক্রামিত হইল। এত উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমাজ-কল্যাণ, জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়ন চেষ্টার মধ্যে এই চুরি, ডাকাতি, ঘৃণা, দুর্নীতির প্রবাহ অদ্ভুত মনে হয় না কি? ডাকাতের দল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এমন সুসংবদ্ধ যে, তাহারা একটি কামরার সকল যাত্রীকে ঘায়েল করিয়া চলিয়া যায়। পুলিশের সংখ্যা কত বাড়াইলে তাহাদের দমন করা সম্ভব হইবে?

গ-স

## অপরাধমূলক চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ

তথ্য ও বেতার দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকর লোকসভায় প্রস্তোত্তরে জানাইয়াছেন যে, হত্যা, লুণ্ঠন ও রাহাত্তানি প্রভৃতি অপরাধমূলক ছায়াচিত্রের প্রদর্শন সরকার চলচ্চিত্র আইন অমুসারে এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই নিষিদ্ধিকরণ সরকারের বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল। কারণ এই সব বিদেশী চিত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এদেশবাসীরা এই সব দুর্য্যক্তির কলা-কৌশলে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে এবং নব নব উদ্ভাবনীর কলে তাহারা এই কাজে রীতিমত পাকা হইয়া উঠিয়াছে। আজ যে দেশে বিজ্ঞানপ্রসূত পদ্ধতিতে লুণ্ঠনরাজ হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন কৌশলে চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া ডাকাতি করিয়া চলন্ত ট্রেন হইতেই অনান্যাসে পলাইয়া বাইতে সমর্থ হইতেছে, ইহার গুরুত্ব সেই চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রগুলি আমাদের উপকারও যে রূপ করিতেছে, অপকার তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়াছে। নিষ্পাপ নিষ্কলুষ কতকগুলি যুবক যুবতীর সর্জনশ করিতেছে এই সব চিত্রগুলি। আজ ইহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষও অমুরূপ একটি অভিযোগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কি ভাবে অতি সহজেই

অজ্ঞায় করা যায় এবং কি কথিয়া নিরাপদে সরিয়া পড়া যায়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখিলে, অপরাধ-প্রবণ মানুষ উৎসাহ পায়। কিন্তু অপরাধের আদি প্রবণতাটি আসে কোথা হইতে? সমাজ-জীবনে যদি কর্তৃহীন, লক্ষ্যহীন, আশা ও আদর্শহীন মানুষের ভিড় জমে এবং সঙ্গত পথে জীবননির্মাণের রাস্তা যদি তাহারা খোলা না পায়, তবেই তাহারা অসঙ্গত পথকে খুঁজিয়া বাহির করে। অপরাধমূলক কাহিনী বা ছায়াচিত্র সেই অবস্থাতেই তাহাদের বিপথগামী করিতে পারে। অল্পলি সাহিত্যও ঠিক একই কারণে তাহাদের আকর্ষণ করে।

সুতরাং সমাজকে সুস্থ করাই প্রথম কর্তব্য। 'তাড়ি' বন্ধের জন্ত তালগাছ না কাটিয়া, যে কারণে তাড়ি চলে তাহাই অপসারিত করার প্রয়োজন সর্বপ্রথম। তথালি সরকারের এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা উচিত। আমরা আশা করিব, সরকারের মূল প্রচেষ্টা হইবে, অতঃপর সমাজ-জীবনকে সুস্থ করে তোলা।

গ-স

## দুর্নীতির কবলে মিলজাত বস্ত্র

কাপড়ের দাম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই দম বৃদ্ধি আজ এত দূরে পৌঁছিয়াছে যে, তাহা ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে। কারণ অবশ্যই আছে নহিলে কার্য্য হয় কি করিয়া। মিলের মালিক বলিতেছেন, সূতার দর বাড়িয়াছে। কাপড়ের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া সরকারও কিছুটা বিচলিত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে। তাহারা কাপড়ের কলগুলিকে অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছেন, ছুটি বন্ধ রাখিয়া সম্ভায়ে সাত দিনই কাজ চালাইয়া বাইতে এবং একাধিক শিফটে কাজ চালাইতে। মিলগুলি বাস্তবতে তুলার অভাবে না পড়ে, তাহার অল্প গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে ৬ লক্ষ বেলেয় পরিবর্তে ১২ লক্ষ বেলে তুলা আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু ব্যবস্থা করিলেই যে সফল ফলিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ, এদেশে প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে, পণ্য-জরায় উৎপাদন বাড়িলেও বাজারে তাহার মূল্য উর্দ্ধমুখী হয়। খাতিশ্রু, চিনি ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা এই অবস্থা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। মিলজাত বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এরূপ আশঙ্কার কারণ বুঝা যাইবে। ভারতে স্বাধীনতার পূর্বে ৩৮টি কাপড়ের কল ছিল এবং এই সব কলে ১ কোটি টাকু ছিল। বর্তমানে দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা ষাড়াইয়াছে ৪৮২ এবং উহাতে টাকু সংখ্যা ষাড়াইয়াছে ১ কোটি ৩২ লক্ষ। এই সময়ের মধ্যে কাপড়ের কলে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪৮ সনে দেশের কাপড়ের কলগুলিতে ১৪৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৪৩১ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭ সনে উহার পরিমাণ ষাড়ার বহুগুণে ১৭৮ কোটি পাউণ্ড ও ৫৩১ কোটি ৭০ লক্ষ গজ। এই নয় বৎসর কালের মধ্যে কাপড়ের কলসমূহ



কোনও দিন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে নাই যে, উহাতে উৎপন্ন বস্ত্র আশাহরূপ ভাবে বিক্রয় হইতেছে না এবং উহা কলে মজুত বস্ত্রের পরিমাণ বাড়িয়া বাইতেছে। ১৯৫৭ সনে ভারত হইতে ৮৪ কোটি গজ মিলবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক নানা কারণে ১৯৫৮ সনে উহা ত্রাস পাইয়া ৫৮ কোটি গজে পরিণত হয়। উহাও মিলসমূহের উপরোক্ত ধুয়া তুলিবার অল্পতম কারণ ছিল। এই সব দেখাইয়া ১৯৫৮ সনে মিলসমূহ ১৪৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী সূতা এবং ৪৩১ কোটি ২০ লক্ষ গজের বেশী বস্ত্র উৎপাদন করে নাই। কিন্তু ১৯৫৯ সনে ভারত হইতে বিদেশে মিলজাত বস্ত্রের অধিক চাহিদা দেখা দেয়। এ নিকে দেশে তুলার উৎপাদন কম হওয়ার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বাজারে এরূপ হটাইয়া দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশে মিলজাত বস্ত্রের একটা হ্রাস দেখা দিবে। এই সুযোগে মজুতদার শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক বস্ত্র মজুত করিয়া ফেলে। এই সব কারণেই দেশে মিলবস্ত্রের দর শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ রিপোর্ট আমরা ২৫শে ফেব্রুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে পাইতেছি।

এখন কথা হইতেছে, দেশে মিলজাত বস্ত্রের উপযুক্তরূপ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কলওয়ারালা বস্ত্রের ও সূতার উৎপাদন কমাইয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? প্রথমে তাহার আপত্তি তুলিয়াছিল অতিরিক্ত উৎপাদন শুধুই বিরুদ্ধে। গবর্ণমেন্ট শুধুই পরিমাণ কমাইয়া দিলেও, কলওয়ারালা সমুদ্র হয় নাই। তাহার সবকামকে জরুরিবার জন্য কলে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। উহাতে তাহার ক্ষতি হয় নাই। উৎপাদন কম হইলেও, মুলা বাড়াইয়া সে ক্ষতি তাহার পূরণ করিয়া লইতেছে।

সুতরাং খাতশস্ত্র, চিনি প্রভৃতির দ্বারা বাজারে বস্ত্রের যে অভাব ও দুর্ঘটনা দেখা দিয়াছে তাহা বস্ত্রের অভাবজনিত নয়—চাউল, চিনির মতই সে অভাব মনুষ্যসৃষ্ট। এই সমস্যার সমাধান না হইলে কলে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়িলেই বা কি কমিলেই বা কি। অল্প দিক দিয়া গবর্ণমেন্ট যত চেষ্টাই করুন, এই সব ফাটকাবাজী, দুনীতি প্রভৃতি কর্যের হস্তে দমন করিতে না পারিলে, আসল সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না।

গ-স

### অপচয় বিষয়ে অজ্ঞতা, না উদাসীনতা?

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক এম. এস. খ্যাকার ভারতীয় শিল্পে অপচয় সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, মাত্র চামড়া-শিল্পে যে পরিমাণ সহ উপাদানের অপচয় ঘটিয়া থাকে তাহার সম্ভাব্য হইলে বৎসরে ৩৫ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা চামড়া শিল্পে বার্ষিক উৎপাদনের দ্বারা অর্জিত মুদ্রার সমান। কেবলমাত্র

চামড়া' নহে, অস্ত্রাশ্র শিল্পেও এই একই অবস্থা চলিতেছে। আখের বস বাহির করিয়া লওয়ার পরে ছিবড়াগুলি চিনি-কলে পোড়ান হয়। ইহা হইতে 'নিউজ-প্রিন্ট' ও 'পিজবোর্ড' তৈয়ারি করা সম্ভব। ভারতে একটি কলে 'পিজবোর্ড' তৈয়ারী হইতেছে। 'নিউজ প্রিন্ট' তৈয়ারীর জন্য আর একটি কল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অস্ত্রাশ্র কলে এখনও এ ধরনের চেষ্টা শুরু করে নাই। আখের বস জাল দিয়া চিনি তৈয়ারীর পরে যে মাতগুড় পড়িয়া থাকে, তাহা দিয়া কৃত্রিম সুরা-সাব প্রস্তুত করিলে অতিরিক্ত আয় হয়। কয়েকটি কলে সেরকম ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অধিকাংশ কল এ বিষয়ে উদ্যোগীও হয় নাই। সাবান-কারখানায় অপচয় গাদ হইতে গ্লিমাশিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিলে, মূল উৎপাদন সাবানটি পড়তা খরচে বিক্রয় সম্বন্ধে গ্লিমাশিল হইতে প্রভূত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

বিদেশে বড় বড় সাবান-কোম্পানী এই ভাবেই পড়তা খরচ কমাইয়া থাকে। যানিতে তৈল পিষিয়া লওয়ার পরে খইলেদ মধ্যে যথেষ্ট তৈল পড়িয়া থাকে। বস্ত্রের সাহায্যে উহা পিষিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইলে তৈলের অভাব আংশিক পরিমাণে ত্রাস পাইত। নানা দিক দিয়া এদেশে কত অপচয়ই যে হইতেছে তাহার কোন হিসাব নাই। মাত্রাজের শিল্প ও শ্রমসচিব আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, যে দেশ যত বেশী দয়িত্ব, সে দেশে অপচয়ের পরিমাণও তত বেশী।

কিন্তু এ অপচয় হয় কেন? হয় তাহার কারণ এ সব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, কিংবা জানিয়া গুলিয়াও সর্ব বিষয়ে উদাসীন। দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, গরীব গৃহস্থের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া চড়া দরে বাজে মাল চালাইবার সুযোগ সুবিধা এদেশে যেমন আছে এমনটি সারা পৃথিবীতে নাই। যদি খোলাবাজারে মুনাফা যথেষ্ট না হয় তবে কালোবাজারের পথ ত খোলাই আছে। অল্প দিকে শ্রমিক ইত্যাদি দলবদ্ধ যাহারা আছেন তাহারও এই মুনাফার অংশ খাইয়া চূপ করিয়া থাকেন। যদি প্রতিযোগিতার বাজারে মাল বেচিতে হইত তবে সকল পক্ষেরই হুঁস হইত।

গ-স

### মরক্কোতে ভয়াবহ ভূমিকম্প ও জলোচ্ছাস

গত ১লা মার্চ মরক্কোতে প্রবল ভূকম্পন ও জলোচ্ছাসের কলে সমগ্র শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। শুনা বাইতেছে, এই দুর্ঘটনার প্রায় দশ লক্ষ লোক নিহত এবং বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের আগাদীর বিমানঘাটিতে লইয়া যাওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণের দিক দিয়া ইহা স্বর্ণ-কালের ইতিহাসের বৃহত্তম ভূমিকম্পে ঘটনাগুলির অল্পতম। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হিসাবে ভূমিকম্প শুধু তাহার আকস্মিকতার জন্য নহে, তাহার প্রচণ্ড ধ্বংসকারিতার জন্য ভয়াবহ। ইহা এমনই এক বিপর্যয় বাহা নিরোধ করিবার এবং বাহ্য সম্ভাবনা এড়াইবার

কোন বৈজ্ঞানিক উপায় মানুষের পক্ষে আয়ত্ত কৰা সম্ভব হয় নাই। কোথায় এবং কবে ভূমিকম্প কতখানি প্রচণ্ডতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা সঠিক করিয়া বলিবার ক্ষমতা বিজ্ঞানেরও হয় নাই। সুতরাং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং অসহায়ভাবে ভূমিকম্পের আঘাতের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এইরূপ ভূমিকম্প জাপানে বহুবার হইয়া গিয়াছে। উত্তর বিহার এবং কোরেটার ভূমিকম্পেও ভারতকে অল্প প্রাণহানি এবং ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ক্ষতি, ক্ষতিই। এবং বাহা হইবার তাহা হইয়াছে। তবে যতকাল এই ক্ষতি বেন তাহার জাতীয় দুর্গতিতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জেরও কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

গ-স

### আবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে দুর্ঘটনা

বর্তমানের নিকট শক্তিগড় অঞ্চলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনার বর্ধমান মিউনিসিপালিটির কমিশনার লীসম্ভোবকুমার খান সহ মোটর চার জন আরোহী মৃত্যু হইয়াছে। একখানি ধাবমান লরী ধাক্কা তাহাদের গ্রাইভেট গাড়ীখানি চূর্ণ হইয়া যায়। একটি বালক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অবশিষ্ট লোকেরা কেউ হাসপাতালের পথে, কেউ-বা সেখানে পৌঁছাইয়া মারা যান। ঘটনাটি যেমনই দুঃখের তেমনই আতঙ্কজনক। প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত রাস্তার উপর এই ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া সকলেই নিশ্চয় অবাক হইবেন। কিন্তু অবাক হইবার কিছুই নাই। এরূপ ঘটনা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে হামেশাই ঘটিতেছে, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে একমাত্র লরী হইতে। এই লরীগুলি খাস কলিকাতার পথেই প্রায় উন্নত বাড়ের মত দ্বিবিদিক জ্ঞান চাড়াইয়া নৌড়ায়—কলে বাহা হইবার তাহা হইতেছে। আর কলিকাতার এলাকা ছাড়াইলে ইহাদের বেপরোয়াভাবে যে কতগুণ বাড়ি তাহা বলিবার নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দেশে আজ এমন এক নৈরাজ্যজনক অবস্থা দেখা দিয়াছে যে, কোন অজ্ঞানেরই প্রতিকার হয় না। যে-কোন অনাচার উপদ্রব, গুপ্তমি ও অব্যবস্থার মুখে জনসাধারণ বেন অসহায় তৃণতণ্ডুর মত ভাসিয়া চলিয়াছেন। নতুবা দিনের পর দিন একই বিরোপাক্ষ নাটকের পুনরাবৃত্তি হয় কি করিয়া?

গ-স

### দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় চাকুরির জটিল অস্থিমোচন

দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার বাঙালীর প্রবেশাধিকার নাই—এই বহু আলোচিত অশ্রবাদের নিরসন হইতে চলিল। শুনা বাইতেছে, এখন হইতে দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরি খালি পদের জন্ত স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে

লোক নির্বাচন করা হইবে এবং একজু দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার জেনারেল-ম্যানেজার লী কে. কে. সেনকে ভারত সরকারের তরফ হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা একটি শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। কারণ স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে উপরোক্ত শ্রেণীর চাকুরিতে লোক নিয়োগ হইলে তথ্য বাঙালী উপযুক্তরূপে সুযোগ-সুবিধা পাইবে।

কিছুদিন পূর্বে এই বিষয়টি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট তাহাদের দাবি জানাইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষেই শ্রমমন্ত্রী আবদুল সাত্তার দুইবার দুর্গাপুর ও আসানসোল গিয়াছিলেন। মনে হয়, এই চেষ্টার ফলেই দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার বাঙালীর প্রবেশপথ সুগম হইল। বাঙালীর বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্ত দুর্গাপুরে বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গে কি প্রকার আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কাহারও অবগিত নাই। বর্তমানে দুর্গাপুরে কেবল ইম্পাত কারখানা নয়, আরও অনেক সরকারী ও বেসরকারী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাপুরের সরকারী ও বেসরকারী কোন কারখানাতেই চাকুরি ব্যাপারে আজ পর্যন্ত বাঙালী তাহার যথাযোগ্য স্থানপ্রাপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গের শ্রমমন্ত্রী এ বিষয়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুর্গাপুর অঞ্চলে শিল্পসংস্থাপিত চাকুরিতে বাঙালী কোন সুবিচার পাইতেছে না। তাহার একধার অর্থ এই যে, ইতিমধ্যে এসব কারখানার চাকুরিতে বহুসংখ্যক অবাঙালী জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাদিগকে চাকুরি হইতে অপসারণ সম্ভবপর নহে এবং এরূপ কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রথম হইতে এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে দুর্গাপুর অঞ্চলের কারখানাগুলিতে হাজার হাজার বাঙালীর কর্মসংস্থান হইতে পারিত এখন অবশ্য অন্ততঃ দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার চাকুরিতে বাঙালী সুবিচার পাইবে মনে হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী অজ্ঞাত কারখানার বাঙালীর চাকুরির সমস্যা এখনও অমীমাংসিতই রাইয়া গেল।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় 'টারার' নির্মাণের কারখানার পরিচালক স্থানীয় ডানলপ কোম্পানী কারখানার খালি পদে লোক নিয়োগকালে পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নির্দেশ মাত্র করিয়া চলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আরহা আশা করিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের ইউরোপীয় পরিচালিত অজ্ঞাত শিল্প ও বাণিজ্য-সংস্থাসমূহও ডানলপ কোম্পানীর এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

প্রাদেশিক মনোভাবের প্রশ্রয় আমরা দিতেছি না। পশ্চিম-বঙ্গে বেকারসমস্যা বর্তমানে অত্যন্ত জটিল। দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উহার নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। সেই জন্তই এত কথা বলিতে হইল।

গ-স

## যতুনাথ সরকারের অমূল্য গ্রন্থাগার

ঐতিহাসিক আচার্য যতুনাথ সরকারের গ্রন্থাগারটি অমূল্যবস্তুর ভাণ্ডার বিশেষ। নানা ভাষায় লিখিত দ্ব্যুপাং পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থ, মানচিত্র ইত্যাদির সমাবেশে এই গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ। আচার্য্য সরকারের ষাট বৎসরের চেষ্টায় সংগৃহীত এই গ্রন্থাগারে যোগল ও ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে অমূল্য আকর-গ্রন্থ ও অজ্ঞাত ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগৃহীত হইয়া আছে। মরাঠা জাতির এবং ভারতে করাসী ও পতুগীজ রাজত্বের ইতিহাসের যেসব উপকরণ এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে তাহা শুধু মূল্যবান নহে, দৃশ্য ও বস্তু। তাহা ছাড়া ভারতের সাময়িক ইতিহাস-সম্বন্ধীয় বহু দু'পা গ্রন্থাদিও তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহার অমুসন্ধিৎসা আছে তিনি আচার্য্য যতুনাথের সংগ্রহের মধ্যে জীবনব্যাপী গবেষণার উপকরণ লাভ করিতে পারিবেন। আচার্য্য-পত্নী এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করিয়া কেবল জাতীয় গ্রন্থাগারকেই সমৃদ্ধ করেন নাই, জাতির জ্ঞানৈশ্বর্য্য স্থপতিও সহায়ক হইয়াছেন, সমগ্র জাতিকে এক অসাধারণ মাহুঘের তপস্বীর ফলভাগী করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্ততা জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

পরিশেষে একটি আশঙ্ক্যের কথা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দুই-একটি অমূল্য গ্রন্থাগারের পরিণাম দোষগ্রহীত আমাদেব মনে এই আশঙ্ক্য স্থিতি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থস্থচী প্রণয়ন, অথবা গ্রন্থবিভাগে অবহেলা, বিলম্বে দরুণ বা অল্প কোন কারণে এই গ্রন্থাগারের প্রত্যেক উপকরণ যদি সুক্ষ্মিত ও গবেষকদের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় না থাকে তবে তাহা অপরিণীম পরিচালনের কারণ হইবে। জাতীয় গ্রন্থাগার সেরূপ অব্যবস্থা ঘটিলে না বলিয়াই আমরা আশা করিব।

গ-স

## কসবায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-মণ্ডপে অগ্রিকাণ্ড

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী এক বিধবাসী অগ্রিকাণ্ডে কসবায় একটি অতিকায় অনুষ্ঠান-মণ্ডপ সম্পূর্ণরূপে ভরীভূত হইয়া যায়। চিত্তরঞ্জন বিভাগের সম্মুখে খোলা মাঠে নবনির্মিত মণ্ডপে এই দিন সন্ধ্যার উদয়নক্ষর অমলাশঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান দিয়া উৎসবের সূচনা হওয়ায় কথা ছিল। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয়, কেহ প্রাণ হারান নাই। তবু বেদনাবোধ করিতেছি এই কারণে, কসবার এই ঘটনাটিই আমাদের অস্বাভাব মনে করাইয়া দিতেছে যে, বিপদের আশঙ্কা যেখানে পদে পদে, অসতর্ক মাহুঘের আত্মসম্মত মনোভাব যেন সেখানেও কিছুতে কাটিতে চাহে না। এবং এই অসতর্ক শিথিল মনোভাবই শেষ পর্যন্ত মস্ত একটা বিপদের কারণ হইয়া ঝাঁড়ায়। কলিকাতা শহরে আগুন এই প্রথম

লাগিল না—প্যাণ্ডেলও ইতিপূর্বে অনেক পুড়িয়াছে। হালসী-বাগানের মধ্যস্থিত দৃশ্য বোধ হয় আজও কেহ ভুলিতে পারেন নাই। তবু যে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারিল, তায় কাবণ আর কিছুই নয়, পূর্বের ঘটনাগুলি হইতে শিক্ষা-গ্রহণ করিবার এবং ভবিষ্যতে তাহাকে কাজে লাগাইবার মনোভাব আজও গড়িয়া উঠে নাই। কসবার ঘটনার উদয়নক্ষরের ক্ষতিই সর্বাধিক। অগ্রগণ্য এই নৃশাস্ত্রীর যে সাক্ষসবল্লভ সেদিন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় অদ্বৈতলক্ষ টাকা। কসবার ঘটনার বাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সকলকেই সেজন্য সতর্ক থাকিতে বলি। এবং সরকারকেও বলি, আইন করিয়া এই সব বিপজ্জনক মণ্ডপ নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করিয়া দিন কিংবা এইরূপ দুর্ঘটনার প্রতিকারের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে ইঞ্জিওরার্স ও পাহারার ব্যবস্থা করুন।

গ-স

## বিজ্ঞানশিক্ষায় নুতন ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পরিষদের যে অধিবেশন নয়া দিল্লীতে হইয়া গেল, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা আলোচনার বলিয়াছেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিভাগেই সর্বস্তরের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে থাকিবে।

বিভাগে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান কিছু নূতন বিষয় না হইলেও দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। কাজেই বিভাগগুলিতে বিজ্ঞান যে ভাবে পড়ান হইত, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাহার আমূল সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের কয়েকটি সাধারণ তত্ত্ব শিখাইলেই যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয় না, উহা যে হাতে-কলমে শিবিবার ও শিখাইবার বিষয়, একথা এখন বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসিয়াছে। শুধু পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট বিষয়টুকু শিখাইলেই যে বিজ্ঞানশিক্ষা দান সার্থক হয় না, উহা সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার্থীর মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতুহল ও অমুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে—একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশসমূহের বিজ্ঞানশিক্ষা প্রণালী হইতে আমাদের অনেক কিছুই শিখিবার ও গ্রহণ করিবার আছে। আর সেই উন্নত প্রণালীতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষক আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সেরূপ শিক্ষক আমাদের দেশে বিয়ল। সেইজন্যই পরিষদ বিজ্ঞান শিক্ষকদের শিখাইবার জন্য স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা

দেওয়ার জন্ত শুধু শিক্ষকের নহে, আঞ্চলিক ভাষাসমূহে উপযুক্ত বিজ্ঞানজ্ঞেয় অভাবও অন্তর্ভুক্ত বেনী। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে বিজ্ঞান-বিজ্ঞার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও বিজ্ঞান-পাঠ্য ও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করিয়া জাতির মনে বিজ্ঞান-প্রীতি উদ্দীপ্ত করিতে সহায়তা করেন। কৃতী ব্যক্তিগণ যদি আমাদের বিজ্ঞানজ্ঞেয় ছাত্রদের জন্ত সরস সবল বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এই অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে। এক সময়ে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জীবেনী, প্রফুল্লচন্দ্র বসু, জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানতত্ত্বকে মনোহারী করিয়া মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগদানন্দ বসু মহাশয়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিজ্ঞানীদের জাতির মঙ্গলের জন্ত তাঁহাদের আদর্শানুসরণ করিতে অমরোপ জ্ঞানাইতেছি।

গ-স

### মহাজনী ব্যবস্থা

‘দামোদর’ পত্রিকা পরিবেশিত সংবাদটি শুধু বিষয়ক নহে, অভিনবও বটে!

“সম্প্রতি গুদকর্য্য বাজারে মিহি চিনি প্রতি মণ ৪৫ টাকা ও মোটা চিনি ৪১ টাকা পাইকারী ভাবে বিক্রয় হইতেছে। সরকারী টেণ্ডার মূলে যাঁহারা চিনি পাইয়াছেন তাহাদের চিনি বিক্রয়ের সত্ত্ব অন্তান্ত চমৎকার, প্রতি বস্তা চিনিপিছু দুই বস্তা বিক্রয়ের অযোগ্য বাদ্যম খইল বাজার দরে না লইলে কোন খুচরা দোকানদারকে চিনি দেওয়া হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া বাইতেছে। গত অক্টোবর মাসেও প্রতি বস্তা চিনিপিছু কয়েক বস্তা ডাইল, কলাই বা দালদা ইত্যাদি অপর যে কোন জিনিস লইতে বাধ্য করিয়া তবে দোকানদারদের চিনি বিক্রয় করা হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ডিলারের কোন সেলসম্যান না থাকার জন-সাধারণকে দু’এক সেব চিনির জন্ত বায়ে বায়ে হয়মানি হইতে হইতেছে।”

গ-স

### ছাত্রদের কীৰ্ত্তি

মোদনীপুর তমলুক হইতে নিম্নের সংবাদটি বাহা বাহির হইয়াছে তাহাতে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র যে কতদূর নিম্নগামী হইয়াছে তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। শিক্ষা-পদ্ধতিকে আগা-গোড়া ঢালিয়া সাজিতে না পারিলে, ইহার আদর্শ-বিনিময় গড়িয়া উঠিবে না।

“এক সংবাদে প্রকাশ যে, হাঁড়িয়া হাইস্কুলের কতিপয় স্কুল ফাইন্সাল পরীক্ষার্থী স্কুল টেষ্ট পরীক্ষার অকৃতকার্য্য হওয়ার স্বাক্ষর অক্ষকাবে ছাত্রবাসে হেড মাষ্টারের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। মাষ্টার মহাশয় জাগিয়া দেখেন যে, গৃহটি চারিদিক হইতে দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। তাঁহার কক্ষটিও বাহির দিক হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি আকস্মিক বুদ্ধিবলে একটি কাটারী ঘরা জানালায় কাঠের পর্দাগুলি কাটিয়া কোনক্রমে বাহিরে আসিতে সক্ষম হন। মাষ্টার মহাশয়ের দেহে আগুনের বলক

লাগায় তিনি আহত হইয়াছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। কাহাকেও প্রেস্তার করা হয় নাই।

গ-স

### হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অথবা বিলম্ব

বহুনাথগঞ্জের ‘ভারতী’ পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি দিতেছেন :  
“জগদীশবর মহকুমা সদর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারী টালবাহানার বিষয় ইতিপূর্বে আমরা কয়েক বারই আমাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচনা করিয়াছি। অতীত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে সরকারী নীতি কি, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে এখানে এই হাসপাতালটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত বহু দিন পূর্বে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং দুই-তিন বৎসর পূর্বেই ইহা এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। চাহিদায়ত্ত অর্থও স্থানীয় জনসাধারণের তরফ হইতে সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় জমিজমাও সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এ অবস্থায় পরিকল্পনাটি রূপায়ণের পথে বাধা কোথায় তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। এখানে এইরূপ একটি হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিম্নয়োজন, বিশেষ করিয়া সরকারী পর্যায়েই বণন ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, ১৯৫৬ সনেই যে হাসপাতাল এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা তাহা ১৯৬০ সনেও প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মূলে কোন বুদ্ধি থাকিতে পারে তাহা আমাদের জানা দরকার। আমাদের মহকুমার এম-এল-এগণ এ বিষয়ে কি কতদূর করিয়াছেন জানি না, তবে বর্তমানে তথ্যের মুখে তাঁহাদের কিছুটা কহণীয় আছে তাহা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সরকারকে অবিলম্বে এ সম্পর্কে চাপ দিবার জন্ত আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান জানাইতেছি এবং সরকারও বাহাতে এই ‘সময়ক্ষেপ’ নীতি পরিহার করেন উজ্জ্বল অমরোপ জ্ঞানাইতেছি।”

গ-স

### দণ্ডকারণ্য বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ

দণ্ডকারণ্য লইয়া কলেজকারী উত্তমোত্তম বুদ্ধি পাইতেছে। জল অনেক ঘোলা হইয়াছে, আর ঘোলা করিয়া লাভ কি? শোনা বাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এতদিনে টনক নড়িয়াছে। এতদিনে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১০০ কোটি টাকার এই পরিকল্পনায় যে মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পবাসী ৩৫ হাজার উষ্ম পরিবারের কিংবা দেড় লক্ষাধিক উষ্মের পূর্ণ পুনর্বাসন, তাহা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইতেছে। গত ৯ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উষ্মাধাতে ব্যর্থ-ব্যবাদের দাবি-প্রসঙ্গে দণ্ডকারণ্য ও জীমেহেরচাঁদ খান্নার নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। কেবল নিন্দাবাদ নয়, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিবোবাদের নেতৃত্ব ত বটেই, খাস কংগ্রেসী দলের সদস্যগণও খান্নার পদত্যাগ দাবি করিয়াছেন। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা দলমত নির্কিশেবে একযোগে

খান্নাকে অপসারণের দাবি করিয়াছেন। বিশ্বব্দের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার এই যে, এতদিন পর্য্যন্ত খান্নাজী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং পুনর্কাসন-মন্ত্রী প্রীত্বেন্দ্র সেনের যে দোহাই দিতেছিলেন, অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার অজ্ঞাতে কিছু করা হয় নাই বলিয়া খান্না এতদিন যে সাফাই গাহিতেছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হইয়াছে। কারণ এক দিকে যখন প্রীত্বেন্দ্র সেন দণ্ডকারণ্যের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করিতেছেন, অন্য দিকে তখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ঘোষণা করিয়াছেন, দণ্ডকারণ্যে বাহা-কিছু করা হইতেছে তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পূর্বে না জানাইয়া এবং পূর্বে কোন সম্মতি না লইয়া করা হইয়াছে। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থা অসম্ভাবজনক। কারণ ডাঃ রায় মনে করেন যে, দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে তিনি কেন্দ্রের নিকট ইতিমধ্যেই লিখিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্কাসন মন্ত্রী এ বিষয়ে কি বলেন তাহার মন্তব্য আমরা অপেক্ষার দিলাম। তবে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তের বর্তমান দুর্দশার পিছনে এখানকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও অনেক। তাহাদের দেহ-মনের অবনতিব পিছনে অনেক দলীয় চক্রান্ত অর্থাৎ তাহাদের দুর্দশার সুযোগে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অনেক হীনস্বার্থ পূরণের চেষ্টা ব্যর্থ হইত যদি এখানকার কর্তৃপক্ষ সজাগ ও দৃঢ় ব্যবস্থা রাখিতেন।

গ-স

### অনুন্নত শ্রেণী কান্নার ?

অনুন্নত শ্রেণী কান্নাদের বলা হইবে, এ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার মহা মুস্থিলে পড়িয়াছেন। এই অক্ষমতার কথাটা খুবই স্পষ্টভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে অভিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিশনের মতে জাতিবৈত্তিতে অনুন্নত শ্রেণী বাড়াই করা উচিত, কিংবা সংসদীয় অভিমত ইহার বিপরীত। তাঁহার বলিয়াছেন, জনসমাজের কোন অংশকে অনুন্নত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইলে, জাতির নাম এবং অবস্থাকে বিচারের মাপদণ্ড যেন করা না হয়। রাজ্য সরকারে বা আবার পুরাতন গতানুগতিক রীতিকেই অনুসরণ করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার অনুন্নত শ্রেণীর পুরাতন তপশীল তালিকাটির কোন ব্যতিক্রম ঘটাইতে রাজী নহেন। এই বিভিন্ন মতই তাঁহাদের বিজ্ঞাপ্ত করিয়াছে।

অথচ তাঁহাদের কাজ করিয়া বাইতে হইতেছে, কিন্তু কাজের কোন নিয়মক নীতি নাই। সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী অনুন্নত শ্রেণীভালিকে বিশেষ সুবিধার অধিকার দিতে হইবে, অথচ কান্নাকে ঐ শ্রেণী বলা হইবে তাহাই নিরূপিত হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় সংবিধানোক্ত সঙ্গদেষ্টাটাই যে প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুধু জাতিবৈত্তির অনুন্নত অবস্থার পরিচায়ক হইবে, এইরূপ মাপদণ্ড নির্ভরযোগ্য

নহে, নীতিসঙ্গত অথবা গণতন্ত্রসম্মতও নহে। এমন ঘটনা বিয়ল নয়, বাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বিভবান ও শিক্ষিত পরিবারের ব্যক্তিগণ শুধু জাতির নামটি অনুন্নত তপশীলের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিশেষ-সুবিধা আদায় করিয়াছেন। ইহা জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক নহে। মনে হয়, জাতির অনুন্নত অবস্থাকে ভিত্তি কাঁচা নহে, পারিবারিক অনুন্নত অবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই অনুন্নত শ্রেণী নির্ণীত হওয়া উচিত। শিক্ষার এবং যোগ্যতার নিত্যন্ত অনগ্রসর পরিবারসমষ্টিই স্বার্থ অনুন্নত শ্রেণী।

গ-স

### সাব-রেজিষ্টার আপিস

ত্রিপুরার 'সেবক' পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি দিতেছেন। বিষয়টি সরকারকে জানানো কর্তব্য :

"মহকুমার অজ্ঞাত দূরের কথা সম্বন্ধেই কোন সাব-রেজিষ্টার নাই। প্রকাশ ১৯৫০ সনে সাত সহস্র এবং ১৯৫১ সনে নূনপক্ষে ছয় সহস্র দলিল রেজিষ্টারী হয়। সাব-রেজিষ্টারী আপিসটি একটি পায়রার খুঁপীর মতন। সংশ্লিষ্ট নর-নারীকে আপিসের সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া অনেক সময়ই বিফলমনোরণে ২০.৪০ মাইল পথ হাঁটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

যিনি সাব-রেজিষ্টারের কাজ করেন তাঁহার প্রকৃত পদ এস-টি-ও। এস-টি-ও হইলেও কথা ছিল না, তাঁহাকে বিচার, রেশন, সিভিল-সাপ্লাই আরও বহু বকমের কাজ সম্পাদন করিতে হয়। কোটে বসিলে ট্রেজারী চলে না। ট্রেজারীতে গেলে, রেশনের কাজ অচল, রেশনের কাজে গেলে দলিল রেজিষ্টারী হয় না। ফলে প্রায়ই দেখা যায় সন্ধ্যার পয়ঃ বাতি জ্বালাইয়া দলিলদাতাগণ টিপসহ দিতেছে। যাহারা বেলা ১১টার হাজিরা দিয়া অনাহারে, বোজে, বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উঠি-বসি করিয়া সন্ধ্যার পর দলিলে টিপসহ দেয় তাহাদাই বৃষ্টিতে পাবে ত্রিপুরা রাজ্যে দলিল রেজিষ্টারী কান্নাকে বলে ?"

গ-স

### পোষ্টমার্টারের জিদ

'দামোদর' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"শ্রামশুল্কের পোষ্ট আপিসের মাষ্টার মহাশয়ের জেদের ফলে শ্রামশুল্কের চটি বিশেষ নূতন গ্রামবাসীরা ( শ্রামশুল্কের গ্রামেরই একটি অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না ) আজ বংশাব্যতিকাল বহু হুর্ভাগ ভোগ করিতেছেন। পোষ্ট আপিসের অতি সন্নিকটে থাকিয়াও তাঁহাদের চিঠিপত্র পাইতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগে। তাঁহাদের অপরাধ তাঁহার ঐ স্থানে একটি লেটার-বক্স দিবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ মহল তাহা অনুমোদনও করিয়াছিলেন। এমন কি লেটার-বক্স আসিয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের অজ্ঞার জেদের দরুন তাহা আজ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামে স্থাপিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত বাজারে বলিয়াছেন, আমি যতদিন থাকিব কিছুতেই ইহা হইতে দিব না।"

এই অবিচারের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গ-স

## সরকার অবহেলিত গ্রাম

বর্ধমানের 'ডাক' নিম্নের খবরটি দিয়াছেন :

"স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী সাহায্যে অনেক অল্পমত স্থানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে ঘোড় ঘুরিলেও বর্ধমান জেলায় একটি সমৃদ্ধ গঞ্জ কিরূপে সরকারী অবহেলা ও উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মালডাঙ্গা বাজার অঞ্চল। মস্তেখর বাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মালডাঙ্গা গঞ্জের অবনতি ও মস্তেখরের নতুন গঞ্জের উত্থান লক্ষ্যণীয়। অথচ এই মস্তেখর বাস্তার সহিত মালডাঙ্গার সংযোগ সাধন করা হয় নাই। মালডাঙ্গা গঞ্জের অবনতি বোধের জন্য আও প্রয়োজন তিনটি—(১) মস্তেখর বাস্তার সম্প্রসারণ, (২) ভাতাড়নাসি গ্রাম বাস্তার সহিত মালডাঙ্গার সংযোগ-বাস্তার উন্নয়ন এবং (৩) খড়ি নদীর কেয়ি ঘাট নিয়ন্ত্রণ।

গ-স

## ক্ষিতিমোহন সেন

পঞ্চমশতাব্দীজন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ৮০ বৎসর বয়সে গত ২৮শে ফাল্গুন ( ইং ১২ই মার্চ ১৯৬০ ) ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরিণত বয়সেই মৃত্যুশয্যে পতিত হইলেন, এজন্য কোভের কোন কারণ নাই। কিন্তু দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী যে প্রবীণ জরী এতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে বংসবহানেকের ভিতর আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের অমরূপ আর কেহই বাঁচিয়া রহিলেন না।

ক্ষিতিমোহন ২৮ বৎসর বয়সে ১৯০৮ সনে "শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাত্রীকূপে যোগদান করেন। তাঁহারা তিন পুরুষ কালীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। কৈশোরেই তিনি সন্তপন্থীদের অমুগামী হন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি যে প্রেরণা পাইয়াছিলেন মুহূর্তকাল পর্যন্ত তাহাই তাঁহার জীবন ও কর্মে রস এবং রসদ যোগায়। তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শিক্ষায়তনটির প্রথম অবস্থার প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ পান। এই বীজ ক্রমে মহামহীক্রে পরিণত হইয়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দীর্ঘ ৫০ বৎসর এই বিদ্যায়তনের বিভিন্ন বিবর্তনের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন নিজেকে একান্ত ভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। প্রথমে সামান্য মাত্র শিক্ষাত্রী পদে অধ্যাক এবং সর্বশেষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই সেবাক্রমেই ক্ষিতিমোহনের জীবনের সম্যক পরিচয় নয়। আকৈশোর সাধু-সন্তবাবী সংগ্রহ ও আলোচনায় তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারত, মধ্যভারত ও বঙ্গদেশ পরিভ্রম করেন। ভারতবর্ষের যে মানবধর্ম জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইয়া আছে তাহা সাধারণ মানুষের ভিতর হইতে

তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিয়া বিদগ্ধ সমাজের গোচরে আনেন। বাংলার বাউল রবীন্দ্রনাথের এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ক্ষিতিমোহন সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে এই 'বাউল-দর্শন' যেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বহু পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রবন্ধাদির মাধ্যমে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাসীতে যাহারা বিগত যুগে অমূল্য রচনা পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন ছিলেন অন্যতম। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, ও গুজরাটিতে তিনি বহু মৌলিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির নাম : বাংলা-কবীর ৪ খণ্ড, দাহ, জাতিভেদ, প্রাচীন ভারতে নারী, ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার সাধনা, হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা, মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা, বলাকা কাব্য পরিক্রমা, যুগপুরু রামমোহন, চিত্রর বঙ্গ, হিন্দী : ভারতে জাতিভেদ, সংস্কৃতি সঙ্গম, গুজরাট : চীন-জাপানো প্রবাস, শিক্ষণো ব্যাখ্যানো মালা, তত্ত্বনো সাধনা ; ইংরেজী : Medieval Mysticism of India।

ক্ষিতিমোহন কথক বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁহার কথকতা যাহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের কর্ণে এবং হৃদয়ে যেন তাহা একেবারে প্রবেশিত হইয়া আছে। ক্ষিতিমোহন সেনের মৃত্যুতে আমরা একজন অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়-প্রবানের বিরোগ-বাখা অমুভব করিতেছি।

য

## গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

বাহার্য সন ১৩৬৬ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন, আশা করি, আগামী ১৩৬৭ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অগ্রগৃহপূর্বক আগামী বর্ষে বার্ষিক মূল্য ১২ (বার টাকা) মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নতুন না পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহকনম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্তর্ভুক্ত পূর্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি বাইতে পারে; তাহা ক্ষেয়ত দিবেন।

বাহার্য আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

বাহার্য অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনও কখনও বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি—

প্রবাসী-ম্যানেজার



## উপনিষদের কথা

শ্রীশুরেশচন্দ্র রায়, শাস্ত্রী

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মূলমন্ত্র—‘আত্মানং বিদ্ধি’—  
নিজেকে জান। নিজেকে কি আমরা জানি না? আর  
কি ভাবে জানিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন  
শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিয়াছেন—‘আত্মন’-শব্দের অর্থ কেবল দেহ  
বা জীব-ই (Individual body or soul) নয়, ব্রহ্ম-ও  
(Universal soul) বটে। ‘বৃহ্’-‘বাহু’+‘মন্’ করিয়া  
ব্রহ্ম। ‘বৃহ্’—বৃহৎ। ‘মন্’ নিবর্তিত। অবধি-বহিত  
বৃহৎ-ই ব্রহ্মের স্বরূপ। যাহা বৃহত্তম—বিশ্বব্যাপী বস্তু—  
তাহাই ব্রহ্ম। আত্মা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ,—আত্মাই ব্রহ্ম।  
নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপে জান—বৃহৎ করিয়া জান। সমুদ্রকে  
যে তরঙ্গটি উখিত হইয়া পরক্ষণেই বিলীন হইয়া যায়,  
তাহাই সমুদ্রের সামগ্রিক পরিচয় নয়। যে অস্তঃপ্রবাহ  
অনাধিকাল থেকে চলিয়াছে একটির পর একটি তরঙ্গের  
লীলা-চঞ্চল গতিকে সঞ্চারিত করিয়া, তাহাকে না জানিলে,  
সেই অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-প্রবাহের প্রাণ সত্তাকে না জানিলে,  
—সমুদ্রের সত্যকার পরিচয়ে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায়।  
মানুষের ব্যক্তি-জীবনেও তেমনি দু’টি পরিচয় আছে। ইহার  
বাসনা-বাপিত মানুষ যে ভাবে প্রতি মুহূর্তে অর্ধ-ব্যক্তি-  
ভোগের ভিতর দিয়া আপনাকে জানিতে অভ্যস্ত, তাহা  
তাহার চেতনের (Consciousness-এর) পরিচয় অতি স্থূল  
বহিরঙ্গের পরিচয়। এ পরিচয়ে প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি নাই;  
সুখ আছে, শান্তি নাই; ভক্তি আছে, যুক্তি নাই। এই  
চেতনের পরপারে আছে অতি-সূক্ষ্ম পরা-চেতন (Super-  
consciousness) সেই নিভৃত আভ্যন্তর চিৎ-লোকেই  
মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর স্বরূপের আবাস। সেই সূক্ষ্ম সূদূর  
চিন্ময় সত্তাকে না জানিতে পারিলে মানুষের সত্যকার  
পরিচয়ের অনেকখানি বাদ থাকিয়া যায়। তাই, ধর্ম-বুদ্ধির  
উত্তর-আধ্যাত্মিকার প্রথমই মানুষের সংবেদনশীল মনে প্রগ্ন  
(Metaphysical speculation) সঞ্চিত হইয়াছিল—  
‘আমি কে? আমার স্বরূপ কি? যে জগতে আমি বাস  
করি তাহার প্রকৃতি কি? কোথা হইতে জন্মিয়াছি?  
জন্মের পর কাহার সাহায্যে জীবিত আছি? বিনাশের পর  
কোথায় যাইয়া স্থিতিলাভ করিব? এ-স্থান হইতে সৈ-স্থানে  
যাইবার যথার্থ পথ কোন্টি?’ এক মন হইতে এই প্রশ্ন

অগ্ন মনে সঞ্চারিত হইয়া চলিল, —সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া  
চলিল এক দ্বিবা অভাববোধ। ‘কাসৌ পুরুষঃ?’ কোথায়  
সে? এই আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে আরম্ভ হইল আত্মাত্ম  
সন্ধানের—অন্তরঙ্গ পরিচয়ের—বিপুল প্রয়াস; কেবল সন্ধান  
বা আবিষ্কার নয়—বস্তুর পরপারে যিনি বিদ্যমান আছেন  
বস্তুর আশ্রয় হইয়া, দৃষ্টের অন্তরালে যিনি গুপ্ত রহিয়াছেন  
দৃশ্যভীতির ভূমিকায়, নব্বয় ওদূরকে অতিক্রম করিয়া  
(transcend) যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন শাস্ত্র-নিভাক্রমে,  
সেই পরমসত্যকে জীবনে অব্যবহিত ভাবে লাভ করাই  
হইল সে প্রয়াসের চরম লক্ষ্য। আত্মার অসীম তত্ত্বাণেষ্ণিতার  
ভিতর দিয়া সেই চিরবহনময় লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিল  
আমাদের এই ভারতবর্ষই সর্বপ্রাণে। স্বরূপাতীতকালের  
এক স্তম্ভ দ্বিনে, যখন জগতের অন্তঃস্থ দেশে জ্ঞান-সুখের  
ঈশ্বরাত্ম আলোক-সম্পাতও বহু শতাব্দী বিলম্বিত, যখন  
মানুষের চিন্তাধারা বাহ্য-জীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-ব্যারামের  
সমস্ত সমাধানেই ছিল সীমিত, সেই শতকর পূর্বের বস্তু-  
সত্যতার দ্বিনে, ভারতের সমাধি-মগ্ন ঋষির অন্তর্লোকে সেই  
দ্বিবা পুরুষের জ্যোতির্ময় প্রকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল আর  
অমনি ঋষির চিন্ত-উৎসে উচ্ছ্রিত হইল—

‘বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্মম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মনাম্।’

—‘আমি অন্ধকারের অতীত আদিত্য-প্রতিম স্বপ্রকাশ  
মহান পুরুষকে দর্শন করি।’

এ দর্শন চক্ষুর দর্শন নয়, সুগভীর চেতনিক অবলোকন  
(Soulsight), অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি নয়, প্রাপ্তবস্তুর পরম  
উপলব্ধি। এই জ্যোতির্ময় অন্তর্ধ্যামী অমৃত পুরুষই আত্মা  
(‘এষ তে আত্মা অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ’) তাহাই ব্রহ্ম। তাহাই  
বস্তু—আর সব প্রতীতিমাত্র, অবস্তু। ধ্যানে অতীন্দ্রিয়  
চিন্ময় সত্তার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হইয়া ঋষি দেখিলেন—জলে-  
স্থলে-ওষধীতে বনস্পতিতে একই দেবতার লীলা, দেখিলেন  
—‘স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্ঠাৎ স পশ্চাৎ স পূর্বস্তাৎ স  
দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ’—এই যে তিনি উজ্জ্বল, এই যে তিনি  
অধঃ, এই যে পশ্চাতে তিনি, এই যে সম্মুখে তিনি, এই যে  
তিনি দক্ষিণে, এই যে তিনি উত্তরে। দেখিলেন—যিনি



‘অগ্নি আত্মনি তেজোময় অমৃতময়ঃ পুরুষঃ’ (এই আত্মায় তেজোময় অমৃতময় পুরুষ), তিনিই ‘সর্বভূতাস্তরাণ্য রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্’ (সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অল্পপ্রবিষ্ট থাকিয়া নানারূপে প্রকাশিত) ইহাই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ দিব্যানুভূতির জ্যোতিঃ প্রপাতে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনাদি অখণ্ড অব্যাহিত পরম এককে জীবনে ও বিশ্বের সর্বত্র অনন্যত দর্শন। এই আত্মিক বোধই মানুষের সত্যকার পরিচয়। আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অল্প কোন লাভ ‘মুক্ততে নাশিকং ততঃ’, কারণ, ‘পুরুষাণ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা দা পরাগতিঃ’। পরমাশ্রয়, হইতে শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। তিনি পরাকাষ্ঠা, তিনি পরাগতি।

কিন্তু শাণিত ক্ষুরধারের জ্বায় সঙ্কট-বজ্রের সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া সেই হ্রবগ্রাহ্য চিন্ময় সত্তাকে উপলব্ধি করার অধিকার ত সকলের নাই। সে অধিকার লাভ করিতে হইলে ব্যবহারিক জগতের প্রলোভন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্য, সংযম, মিষ্টা ও বৈরাগ্যের পাণ্ডেয়সহ জ্ঞানস্বত্বের সাহায্যে সে পথে যাত্রা করিবার জ্ঞান প্রস্তুতির প্রয়োজন সর্ব্বাঙ্গে। এই জ্ঞানই ব্রহ্মস্বত্বের আরম্ভে আশ্রিত হইয়াছে—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥

‘অথ’—অনন্তর। কাহার অনন্তর? অধিকারী হইয়া। অধিকারী কে? সাধন-চতুষ্টয় (বৈবক, বৈরাগ্য, ষটসম্পত্তি মুমুকুতা) বাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, তিনিই অধিকারী। ‘অতঃ’—সেই হেতু। হেতু কক্ষের ফল—স্বর্গ। স্বর্গ নশ্বর। জ্ঞানের ফল—মোক্ষ। মোক্ষ অবিনশ্বর। সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষের জ্ঞান। ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’—ব্রহ্মণঃ (কর্মে ব্জী)—সর্বব্যাপী পরমপুরুষকে, আত্মাকে।

১ বিবেক—নিরানিত্যবস্তু-বিচার। আত্মা অবিনাশী, অচল, ব্যাপক, তদন্তিতিক্ত পদার্থবিনাশী, চল ও পরিচ্ছিন্ন—এবস্ত্রকার জ্ঞান।

বৈরাগ্য—সংসারের দুঃখময় পরিণাম-সমীক্ষণে বিষয়-ভোগে নিলিঙ্গ।

ষটসম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ছয়টিকে ষটসম্পত্তি বলে। শম—বিষয় হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। দম—বিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। উপরতি—শ্রবণ ও মননাদি ব্যতিরিক্ত কর্ম হইতে বিরতি। তিতিক্ষা—সুখ-দুঃখ, লীল-ক্রোধ, মান-অপমান ইত্যাদিতে উপেক্ষা। সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তেকাশ্রয়। শ্রদ্ধা—গুরু-বাচ্য ও বেদান্ত-শাস্ত্রে বিশ্বাস।

মুমুকুতা—অনিত্যবস্তুতে বিরক্ত হইয়া নিত্যবস্তুতে সম্পন্ন হইবার জ্ঞান উদগ্ধ বাসনা।

‘জিজ্ঞাসা’—জানিবার ইচ্ছা। পানের ইচ্ছাকে যেমন পিপাসা বলে, জানিবার ইচ্ছাকেও তেমনি বলে জিজ্ঞাসা। পানের ইচ্ছা বলবতী হইলে পান ব্যতীত অল্প কোন বিষয়ে যেমন প্রবৃত্তি জন্মে না, জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলেও যেমনি জ্ঞান ব্যতীত সংসারাদি বিষয়ে কোন প্রবৃত্তি থাকে না। এখন, ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’—স্বত্বের মিলিতার্থ হইতেছে—বিবেক-বৈরাগ্য-যুক্ত, সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, মুক্তিকামী<sup>১</sup> সাধকই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার (ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থ অবগত হইবার) অধিকারী, অন্তে নহে। বস্তুতঃ, অধ্যাত্মচেষ্টনার তীব্র সংবেগই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রথম ভূমিকা। সাধন-চতুষ্টয় অধিগত হইলে চিন্তা নির্মল হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়।

সেই ব্রহ্ম কিরূপ?

জন্মান্তর যতঃ ॥

‘যতঃ’—যে কারণ হইতে। ‘অণা’ (জগতঃ)—এই জগতের। ‘জন্মান্তরঃ’—জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ) হয়। যে কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, তাহাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের প্রমাণ কি?

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥

(ব্রহ্ম) ‘শাস্ত্র’ ‘যোনিঃ’—প্রমাণ। ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি, সেই হেতু। ব্রহ্মের অস্তিত্বের বা স্বরূপ-নির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র। ‘অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম’—যাহা কেহ জানে না, অল্প কোন উপায়ে জানা যায় না, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় শাস্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের শাস্ত্র হইতেছেন নানা বিস্তার আকর—উপনিষদ।

উপনিষদ শব্দটি উপ-নি-সদ-মাতৃব উত্তর ক্রিপ-প্রত্যয়-যোগে সাধিত হইয়াছে। এই শব্দটির স্বার্থ-সম্বন্ধে বিস্তার মতভেদ ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যপাদ ‘সদ’-মাতৃকে বিশিষণ (বিনাশ), গতি ও অবসাদন (শিথিল-করণ) এই তিন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন (‘সদ’বিশিষণ-গত্যবসাদনেষু)। উপ (উপাশ্রিত্য য়াং দিভ্যাং) নি (নিঃশেষণ) সদ (সৌহৃতি—অবসাদনশ্রুতি বিনাশশ্রুতি ব’ মায়াম তৎকার্য্যক) ইতি উপনিষদ। অথবা ‘পরমশ্রেয়সি নিষঙ্গং মুমুকুং পরব্রহ্ম গময়তীতি’ উপনিষদ। অর্থাৎ ব্রহ্মবস্ত্র সংসার (জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ) ও তৎকালীভূত অবিজ্ঞার উচ্ছেদ-সাধন (বিশিষণ বা অবসাদন) করে বলিয়া অথবা শ্রেয়োনিষ্ঠ মুমুকুকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করার বলিয়া উপনিষদ নামে অভিহিত। ‘ব্রাহ্মণ্য বাব ত উপনিষদঃ ক্রমেতি’ (কেন)—নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িনী উপনিষদ বলিলাম; ‘য এতামেব ব্রহ্মোপনিষদং বেদ’ (ঐ)—যে এতাব্দী

ব্রহ্মবিজ্ঞা জানে; ‘তত্ত্বোপনিষৎ পুরুষং পৃচ্ছামি’ (বৃহদারণ্যক) —আপনাকে সেই উপনিষদগম্য পুরুষের (ব্রহ্মের) বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি (কৌষীতকী) —তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ দিব; ‘মুগ্ধং হৌষোপনিষৎ মহাজ্ঞঃ শরং ছ্যাপানানি শিতং সঙ্কলিত’ (মুগ্ধক) —উপনিষদ (জ্ঞান)-মুগ্ধ গ্রহণপূর্বক তাহাতে উপাসনা-শাণিত মহাজ্ঞ শর সম্বান কর ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যও উপনিষদ্ যে ব্রহ্মবিজ্ঞা তাহা সমর্থন করে। কেহ কেহ উপনিষদের ব্যাপ্তিগত অর্থ একরূপও করিয়া থাকেন—উপ (উপগম্য গুরু) নিঃ (নিশ্চয়) সদ (সৌভাগ্য, গচ্ছতি প্রাপ্তি বা ব্রহ্মতত্ত্বং যয়া বিজ্ঞায়) সা উপনিষদ। (শিষ্য গুরুসমীপে বাইয়া যে বিজ্ঞাবলে নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে, তাহাই উপনিষদ। ‘তবিজ্ঞানার্থং স গুরুঃস্বাভিগচ্ছৎ সমিৎপাণিঃ শ্রেয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠন ॥ তথৈব স বিদ্যামুপসন্নায় সমাক্ প্রাসন্ত-চিভায় শম’মিতায়। (যেনাকরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তং তত্ত্বং ব্রহ্মবিজ্ঞান ॥’ (মুগ্ধক) —তাহা জানিবার জন্য তিনি শিষ্য) সমিৎপাণি হইয়া (হোমাগ্নি-কণ্ঠ হস্তে লইয়া) বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে বাইবেন। সেই বিদ্বান সমাকরূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণাবিত, সমীপাগত ব্যক্তিকে (শিষ্যক) যদ্বরা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা যথার্থ উপদেশ করিলেন। আবার কেহ বা বলেন —উপ=সমীপস্থ (অন্তরাঙ্গা), নি=নিশ্চয় (অন্তরাঙ্গাই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয়), সদ=নাশ (তল্যটিত অজ্ঞানের)। অর্থাৎ, যে বিদ্বান অন্তরীলনে জন্মমৃত্যু-প্রবাহের কারণীভূত অজ্ঞানের নাশ হয় এবং অন্তরাঙ্গার ব্রহ্মত্বে নিশ্চয় হয়, তাঁহারই নাম উপনিষদ। ব্যাপ্তি বিশ্লেষণে মতানৈক্য থাকিলেও, যাহার অন্তরীলনে অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অতি-নিকটস্থ অন্তরাঙ্গা স্বরূপ-ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হয়, তাদৃশ ব্রহ্মবিজ্ঞাই যে উপনিষদ, সে বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। উপনিষদ এই নামকরণ হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই পদমপুরুষার্থ মোক্ষের একমাত্র সাধন।

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস—বেদ। যাহা কিছু জ্ঞানের, ধ্যানের ও সাধনার বস্তু তাহার পরিচয় আমরা বেদে পাই। বেদ-সাহিত্যের চারিটি স্তম্ভ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। দেবতার মন্ত্র ও স্মৃতি-বাক্যের নাম সংহিতা। যে বাক্যে সংহিতার বিনিয়োগ, তাৎপর্য ও প্রশস্তি বর্ণিত আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ভাগ আরণ্যক নামে আখ্যাত। কর্ম-পরিপাকে যাহারা বাহ্য স্বজের প্রতীকে আস্তর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া অরণ্যপ্রশমে বাস করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে তত্ত্বমূলক স্মৃতিবলী চরন করিয়া ধ্যান করিতেন। আরণ্যক ঋষির এই ধ্যানলব্ধ তত্ত্বের নামই

—উপনিষদ। ঋতি, স্মৃতি ও ত্রায়—এই প্রস্থানত্রয়ই (ত্রিবিধ পন্থা) ব্রাহ্মণ-ঋষের প্রধান সূত্র তন্মধ্যে উপনিষদসমূহ ঋতি-প্রস্থানের অন্তর্গত, সনৎস্মৃজাতগীতা ও ভগবদগীতা স্মৃতি-প্রস্থানের অন্তর্গত, শারীরিক-সূত্র (বেদান্ত) ত্রায়-প্রস্থানের অন্তর্গত বলিয়া অভিহিত। লোকমাত্র তিলক ‘Orien’ পদ্ধতির সূত্র অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদের কালকে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০-৫০০০ বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে উপনিষদ শব্দ সন্নিবেশিত থাকায় উপনিষদের প্রাচীনত্ব স্বতঃই প্রমাণিত হয়। উপনিষদের রচনাকাল সাধারণ ভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অনূন তিন-চারি শত বৎসর পূর্বে ধরিয়া লইলেও শাস্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। উপনিষদের প্রাচীন নাম—শ্রুতিশির।

মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুগ্ধক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও খেতাশ্বতর—এই এগারখানি উপনিষদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণবৈপায়ন বেদান্তসূত্রের উদ্ভূত সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন এবং এই এগারখানি উপনিষদের উপরই শঙ্কর-ভাষ্য দৃষ্ট হয়। প্যারিসের গ্রন্থাগারস্থ গ্রন্থপঞ্জীতে ২৬০ খানি উপনিষদের নামোল্লেখ আছে। ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় শতকে রচিত বলিয়া নিতান্ত অর্কাচীন, অপ্ৰামাণ্য ও সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট। পণ্ডিতগণ উপনিষদসমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। বৈদিক—সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অন্তর্ভূত। ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকী উপনিষদ বৈদিক।

২। বৈদিকভাবানুসরণে ঋষি-প্রণীত উপনিষদ আর্ষ। প্রশ্ন, মুগ্ধক, মাণ্ডূক্য, খেতাশ্বতর ইত্যাদি আর্ষ উপনিষদ।

৩। সাম্প্রদায়িক—জাবাল, নৃসিংহতাপনী, রুদ্রাক্ষ, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বরাহ, মহোপনিষদ প্রভৃতি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রচিত উপনিষদ।

৪। কৃত্রিম—যাহাতে আর্ষ-ঋষি-বহির্ভূত মত সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাই কৃত্রিম উপনিষদ; যথা আল্লোপনিষদ।

উক্ত এগারখানি উপনিষদের মধ্যে ‘ঐতরেয়’ উপনিষদ ঋগ্বেদীয়। উহা ঐতরেয়-আরণ্যকের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। ‘কেন’ ও ‘ছান্দোগ্য’-উপনিষদ সামবেদীয়। কেন তলবকার-ব্রাহ্মণেও নবম অধ্যায় এবং ছান্দোগ্য তাণ্ড্য শাখার ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় হইতে একাদশ অধ্যায়। ‘কঠ’ ও ‘তৈত্তিরীয়’-উপনিষদ কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়। কঠ ‘তৈত্তিরীয়-সংহিতার পরিশিষ্টের প্রথম

অধ্যায়। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ তৈত্তিরীয়-আবণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়। ‘ঈশ’ ও ‘বৃহদারণ্যক’-উপনিষদ গুরুত্বজুর্বেদীয়। ঈশ গুরুত্বজুর্বেদ-সংহিতার চত্বারিংশ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক বাজসনেয়ী শতপথ-ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। ‘কৌষীতকি’-উপনিষদ্ ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ‘ঐশ্বক’, ‘মুণ্ডক’ ও ‘মাণ্ডুক্য’-উপনিষদ্বয়ের ঋগ্বেদীয়। প্রথম মহাবিশ্ব-পিতৃ-প্রোক্ত এবং মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য তন্মামক ঋগ্বেদ-দৃষ্ট। ‘শ্বেতাশ্বতর’-উপনিষদ্ কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর ঋগ্বেদ-দৃষ্ট-সংহিতার শেষ ছয় অধ্যায়। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের চরম ও পরম লক্ষ্য হইলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ক্রম সকল উপনিষদ্ একরূপ নয়। নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহ হইতে এই উক্তির স্বাধার্য্য প্রতিপাদিত হইবে।

‘কেন’-উপনিষদের ঋগ্বেদগণ প্রথম উপাখ্যান করিয়াছেন—

‘কেনেযিতং পততি প্রেযিতং মনঃ

কেন-প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি স্মৃতঃ।

কেনেযিতাং বাচমিমাং ববন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥’

‘কাহার ইচ্ছায় মন সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে? প্রাণ কাহার প্রবণায় বিষয়াসক্ত হয়? কাহার ইচ্ছায় মানুষের বাক্য-স্মৃতি হয়? কোন দেবতাই-বা আমাদের চক্ষু ও কর্ণকে স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন?’ ( ইহা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ) উত্তরে উক্ত হইয়াছে—

‘শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনঃ

যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্ত।

প্রাণশ্চক্ষুশ্চক্ষুরতিমুচ্যযীরঃ

প্রোত্যাখ্যল্লোকাদমুতা ভবন্তি ॥

নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগগচ্ছতি নো মনো

ন বিদৌ ন বিজানীমো যথৈতদমুশিষ্যামঃ।

যদ্বাচানভ্যদিতং যেন বাগভ্রান্ততে

তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্বিদমুপাসতে ॥’

‘যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই মন-আদির নিয়ামক। তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। এই জ্ঞান দ্বারা শ্রোত্রাদির আত্মত্ব-ধারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানীগণ ইহলোক হইতে অপস্থত হইয়া অমর হ’ন। যাহা চক্ষুর গোচরীভূত নয়, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না মন যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে আমরা জানিতে পারি না, তাহাও সম্বন্ধে কিরূপে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও আমরা জানি না।—

যিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না, অথচ যাহার দ্বারা

বাক্য প্রকাশিত হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়ো— লোকে এই যে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নয়।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগু পিতা বক্রণের সমীপে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—‘অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।’—‘ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন।’ উত্তরে বক্রণদেব বলিলেন—‘যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিগ্যাসাং। তৎ-ব্রহ্মেতি।’—‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া যদ্বারা জীবিত থাকে, এবং পরিণামে যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর। তিনিই ব্রহ্ম।’ ( ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ ) এখানে প্রস্তাব লক্ষ্যবস্ত্র ব্রহ্ম হইলেও, উক্তবটি সৃষ্টিতত্ত্বে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

বাক্যপ্রবণ ঋগ্বেদ বালক পুত্র নচিকেতা ও যমরাজের মধ্যে প্রস্তোত্তরের সমষ্টি হইতেছে সমগ্র কঠোপনিষদ্। সেখানে নচিকেতার প্রশ্ন এই—

‘যেয়েস্ত্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

হন্তীত্যোকে নায়মন্তীতি চৈকে।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টন্তয়াহং

বদাগমে বরন্তুতীঃ ॥’

—‘যুত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে একটা সংশয়,— কেহ বলেন ( পরলোকগত ) আত্মা ‘থাকে’, কেহ বলেন ‘থাকে না’— আপনাব উপদেশ হইতে আমি সে সম্বন্ধে ( আত্মার অস্তিত্ব-অনাস্তিত্ব সম্বন্ধে ) সত্যাবধারণ করিয়া লইব। বরের মধ্যে এইটি আমার তৃতীয় বর’। প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলিলেন :

‘ন জায়তে ত্রিযতে বা বিপশ্চি-

ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥’

সর্বজ্ঞ আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হ’ন না, ইঁহা হইতেও কোন বস্তু উদ্ভূত হয় না। ইনি অজাত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। দেহের বিনাশে ইঁহার ( দেহীর—আত্মার ) বিনাশ হয় না।’ এখানে আত্ম-জিজ্ঞাসাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক ঋষিরা অজিরাব নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।’—‘ভগবন্, কোন বস্তুটি জ্ঞাত হইলে এই সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়?’ উত্তরে অজিরা বলিলেন :

‘যস্মিন্ দ্যোঃ পৃথিবী চাণ্ডরীক্ষমোতং

মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ।

তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমগ্ভা

বাচো বিমুক্তাশ্চতৈশ্চ সেতুঃ ॥

—‘বাহাতে ছ্যলোক, ভুলোক, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত  
প্রাণের সহিত মনও বিমুক্ত বহিয়াছে, সেই আত্মাকে—কেবল  
সেই আত্মাকেই জ্ঞান। অত্যাশ্চ কথ্য পদিত্যাগ কর।  
ইনিই অমৃতের সেতু (মোকলাভের উপায়)’ এখানে প্রশ্নের  
লক্ষ্যবস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও উত্তরটি আত্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত  
হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেরও অনুরূপ ভাবই অভিব্যক্ত  
হইয়াছে। দেখানে মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য  
বলিলেন—‘ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মক্ষশ্চে পৃথিবৌ  
সর্বাণি ভূতানি মধু; যচ্চায়মগ্ন্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহ-  
মৃতময়ঃ পুরুষো যচ্চায়মগ্ন্যাং শরীরেষু তেজোময়োহমৃতময়ঃ  
পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মদমমৃতমিহং ব্রহ্মাহং সর্কম ॥’

—‘এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু (মধুবৎ প্রিয়), তেমনি  
সর্বভূতও আবার পৃথিবীর মধু। আর এই পৃথিবীতে  
অধিষ্ঠিত যে এই চৈতন্যময় পুরুষ (কূটস্থ) আর এই যে  
দেহাভিমানী শরীরাদিষ্ঠিত তেজোময় পুরুষ (জীবাত্মা),  
ইহারাও সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও আবার ইহাদের  
মধু; ইনিই সেই আত্মা, ইনিই সেই অমৃত, ইনিই সেই  
ব্রহ্ম, ইনিই সেই সর্ক। এ স্থানে আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান তথা  
সর্কজ্ঞান।’

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রধান উপদেশও এই সত্যই।  
সে স্থানে ‘পিতোবাচ ঋতকেতো সোমোদ্যৎ...তমাদেশম  
প্রাক্ষ্যঃ। সেনাক্ষতং শ্রুতং ভবতামৃতং মতমবিজ্ঞাতং  
বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥’

—পিতা (উদালক) (পুত্র) শ্রুতকেতুকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন—‘হে সৌম্য ঋতকেতু, তুমি কি আচাধ্যাকে সেই  
আদেশের (যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম উপদিষ্ট হ’ন, তাহার)  
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?—যাহার দ্বারা অক্ষতও শ্রুত  
হয়, অচিন্তিতও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, অবিজ্ঞাতও সুবিজ্ঞাত  
হয়, সেই আদেশের কথা?’

এই অদ্বুত প্রশ্নে ঋতকেতু বিষয় প্রকাশ করিলে পিতা  
বলিলেন—‘স যঃ এষোহগ্নিমৈতদ্ভাষ্যামিহং সর্কম্ তৎ সত্যং স  
আত্মা, তত্ত্বমসি ঋতকেতো ইতি ॥’

—‘সেই যে এই অগ্নিমা (সদৃশ) এ সমস্তই এতৎস্বরূপ;  
সেই সদৃশই সত্য, তাঁহাই আত্মা। হে ঋতকেতু, তুমিও  
তৎস্বরূপ।’

ঐতরেয়োপনিষদে মুমুক্শু ব্রাহ্মণগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা  
করিতেছেন—‘কোহয়মাত্মোতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স  
আত্মা।’

—‘যাঁহাকে আমরা ‘ইনি আত্মা’ এইরূপে উপাসনা  
করি, তিনি কে? (দেহমধ্যে করণরূপী ও কর্তৃরূপী এই  
দুই প্রকার আত্মার মধ্যে) কোন্টি সেই আত্মা?’ উত্তরে  
বলা হইতেছে—‘এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্কে  
দেবা ইমানিচ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশআপে।  
জ্যোতীঃসীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরানি  
চেতরানি চাণ্ডজানিচ জারুজানিচ শ্বেদজানি চোত্তিজানি  
চাখ্যাপাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিক্কৎ প্রাণি জন্মং চ  
পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্কং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে  
প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞান ব্রহ্ম ॥’

—‘ইনিই (উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই) ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র,  
ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চ-  
মহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ—এবং এই  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদেহ সমেত সমস্ত বীজ, সমস্ত অন্তজ, জরায়ুজ,  
শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, হস্তী, অধিক কি, মনুষ্য, পক্ষী  
প্রভৃতি যাহা কিছু জন্ম ও স্থাবর সেই সমস্তই প্রজ্ঞান (ব্রহ্ম-  
চৈতন্য) হইতে সমুৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে আহিত এবং  
প্রজ্ঞানই তাহাদের লয় স্থান—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।’ (ইহা  
ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ) এ স্থানে আত্মতত্ত্বের প্রশ্নটি ব্রহ্মতত্ত্বে  
মীমাংসিত হইয়াছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে—

‘নান্তঃপ্রজ্ঞঃ ন বহিঃপ্রজ্ঞঃ নোভয়তঃপ্রজ্ঞঃ ন প্রজ্ঞানখনঃ  
ন প্রজ্ঞঃ নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্য  
মব্যাপদেহাং মোক্ষপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিব-  
মদৈবতং তুর্গং মত্তন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥’

—‘যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ (স্বপ্নাবস্থার জ্ঞায়) নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ  
(জাগ্রতের জ্ঞায়) নহেন, উভয়প্রজ্ঞ (জাগরণ ও স্বপ্নের  
অন্তরালাবস্থায়ুক্ত) নহেন, প্রজ্ঞানখন (সুশুপ্তির জ্ঞায় তমো-  
তাবাপন্ন) নহেন, প্রজ্ঞ (দৈততাবাস্থ্যকজ্ঞানযুক্ত) নহেন,  
অপ্রজ্ঞ (অচেতন) নহেন, যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য  
(অবিষয়তত্ত্বনিবন্ধন ব্যবহারের অতীত), অগ্রাহ  
(কর্মেঞ্জিরের অবিষয়), অলক্ষণ (দৈতসম্বন্ধের অভাবহেতু  
অবর্ণনীয়), অচিন্ত্য (ধারণার অযোগ্য), অব্যাপদেহ (তিনি  
এত বিবর্ত যে যে দেশ ও কালের দ্বারা ব্যাপদেশ করার  
অর্থাৎ তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন ইত্যাদি  
আবোপিত করার অযোগ্য), যিনি একান্তপ্রত্যয়ের বিষয়ী-  
ভূত (জাগ্রদাদি অবস্থায় ‘এক আত্মাই আছেন’ এই  
প্রত্যয়গম্য), প্রপঞ্চোপশম (রূপবসাদিপঞ্চবিষয়ের অতীত),  
শাস্ত (অচকল), শিব (মঙ্গলস্বরূপ) ও অদৈত (শুদ্ধব্রহ্মণ)  
—তাঁহাকে জ্ঞানিগণ চতুর্গ (তুরীয়া-অবস্থাস্বাক—জাগরণ,  
স্বপ্ন ও সুশুপ্তির অতীত তত্ত্ব) বলিয়া মনে করেন। তিনিই

আত্মা—তিনিই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।” এখানে আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রোগ্রোপনিষদে কত্যা-পুত্র কবন্ধী সমিংহন্তে মহসি পিঙ্গলাদেব নিকট বাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্ কুতো হবা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥’—‘ভগবন্, এই প্রাণিবর্গ কোথা হইতে উদ্ভূত হয?’ উত্তরে ঋষি বলিলেন—‘প্রজা-কামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহতপাত স তপন্তস্তা স মিথুন-মুৎপাদয়তে। বয়িক প্রাণকৈতোতো মে বহুধা প্রজাঃ কদ্রিয়ত ইতি ॥’—‘প্রজাকাম প্রজাপতি তপস্তা (সিসৃক) করিলেন। তপস্তা করিয়া, ‘ইহারা আমার জন্ত বহুবিধ প্রাণী সৃষ্টি করিবে’ এই ভাবিয়া বয়ি (প্রকৃতি) ও প্রাণ (পুরুষ) এই মিথুন সৃষ্টি করিলেন।’ এখানে প্রসঙ্গটি ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে নয়,—সৃষ্টি সম্বন্ধে।

দৈশাপনিষদের ভাষায় তত্ত্ব জ্ঞানের মূল কথা হইতেছে—

‘দৈশাবাস্তুমিহং সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুক্তীধঃ মা গৃথঃ কস্তদ্বিদ্ধনম্ ॥’

—‘জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চকল (নশ্বর) বস্তু আছে, সেই সমুদয়ে ব্রহ্ম অগ্ন্যুত, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিবে। তাহাতে বিষয়-লালসা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর।’ কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ হইতে যে গভীর সত্য আমাদের সম্মুখে স্ফুট হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহা এই :

অশেষ-বিশেষের প্রত্যনৌকস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মকে আত্মার আলোকে দর্শনের নাম—জ্ঞান। তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই কৰ্ম্ম। ব্রহ্ম স্বয়ংকৃত। এই নিমিত্ত তিনি অ-করণ, কিন্তু সৰ্ব্বকারণ-কারণ। এ সব দুঃপ্রপঞ্চ সৃষ্টি (কৰ্ম্ম)। কৰ্ম্ম ও কর্তা সৰ্ব্বদাই পৃথক। জ্ঞান (ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ ‘জগত্যাং জগৎ’-রূপ (সৃষ্টিকরণ) কৰ্ম্ম। ব্রহ্ম নিত্য, কৰ্ম্ম অনিত্য। ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ, কৰ্ম্ম অজ্ঞানপ্রমত্ত। সুতরাং কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব। ‘জগত্যাং’ জগতে। জগৎ অসৎ, গতিশীল, অনিত্য। জগৎ হইতে ভিন্ন—সৎ, নিত্য, শাস্ত ও সৰ্ব্বাত্মক একজন আছেন, তিনি—ব্রহ্ম। (সুতরাং অসৎ অনিত্য সংসার-বিষয়ে মুক্ত হইয়া তাহার মূলভূত সৎ-নিত্য বস্তুতে বঞ্চিত হওয়া—কণার জন্ত ভূমা ত্যাগ করা—বুদ্ধিসত্তের কখনও বাঞ্ছনীয় নহে)। ব্রহ্ম নিঃসংশয়, নিরাকার, নিরাধার সৰ্ব্বগত, এজন্ত অচল। অচল বলিয়া অবস্থান্তর-হীন, অৰ্থাৎ অবিনাশী। সুতরাং-ই নিরাকার। নিরাকার বলিয়া সৰ্ব্বদাই একরূপ, সুতরাং নিত্য-সত্য। সচরাচর ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের প্রতিই লোকের অধিকতর অগ্রগতি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগৎকে অসৎ-অনিত্য বলিয়া জানিলে

ভোগ-লিপ্সা নিবর্তিত হয়। সুতরাং, তেন ত্যক্তেন ভুক্তীধঃ’—বাক্যের দ্বারা (সংসার-নিবৃত্তি ও কৰ্ম্মফলে বৈরাগ্য আনাইবার জন্ত) অনিত্য ধনজনাদির এষণা (—রূপ যে অন্তরাগ, তাহা) ত্যাগ করিয়া শাস্ত ব্রহ্মানন্দ-সন্তোষে উপদেশ করিয়াছেন।

এইভাবে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, আত্ম জিজ্ঞাসা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা মূলে একই ব্যাপার—একই প্রশ্ন বিভিন্ন-ভাবে জিজ্ঞাসিত। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল বিচারের আশ্রয় ভূমি বলিয়াই মহসি কৃষ্ণদেবপায়ন উপনিষদকে ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ আখ্যা দিয়াছেন। সাধন-সম্পন্ন শিষ্যের পক্ষে যাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মবিদ্বৎ আচার্য্যের পক্ষে হইতে তাহাই ব্রহ্মমোক্ষসাধন। এবং উভয়কে যুক্ত করিয়া সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে বিচার করিলে উপনিষদকে বলা যাইতে পারে—‘ব্রহ্মবিদ্যা’। ‘সংসার-ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ-ব্যাচ্য’।—‘ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের উপক্রমণিকা, ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের উপসংহার।’ স্তম্ভঃ, কেবল বিচারগাত্মক জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত অনিত্য বস্তু বর্জনপূর্বক একমাত্র ব্রহ্ম-পদার্থই উপনিষদের তাৎপৰ্য্য। ‘যেনাহং নাশুতা সাং কিমং তেন কু’ত্ম?’ ‘যাহা আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারে ন, তাহা লইয়া আমি কি করিব?’

উপনিষদ ভারত-জননীৰ খাতস্তরা প্রশ্নের এক অনিন্দ্য আনন্দ-সংগ্রহ। এখানে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার উপলব্ধ সত্য মহামহিমায় সমাহিত হইয়া আছে। উপনিষদ ভারতের এমন একটা স্বদ্বিবান্ ত্রিভু বহন করিয়া চলিয়াছেন যাহা সৰ্ব্বদেশে সৰ্ব্বযুগে সৰ্ব্বক্ষেত্রে অপরোকে প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। বেদে যে জ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুর উদগত হইয়াছিল, তাহাই উপনিষদে পুষ্প-ফল-সমবিত উদার-প্রসারী মহাবনস্পতিতে পরিণত হইয়া অধ্যাত্ম নভোবিহারী বিহঙ্গমদলের পবিত্র আশ্রয়-নাড় হইয়াছে। তন্ত্র, পুরাণ ও যজুর্দর্শনে যাহা কিছু সত্য ও প্রামাণ্য নিহিত আছে, সে-সকলের মূল নিকষ হইতেছে—উপনিষদ। বেদান্ত-গঙ্গা উপনিষদেরই মানসসরোবর হইতে উদ্ভূত হইয়া কত ধারায় কত দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া রাখিয়াছে। শুধু এদেশের নয়, যুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারায়ও উপনিষদের প্রভাব বিস্তার। উপনিষদে যে ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইয়াছে, জগতের আর কোন দেশের ধর্মমতে বা তত্ত্বচিন্তায় তাহা দৃষ্ট হয় না। উপনিষদের তত্ত্ব বোধি-দীপ্ত প্রত্যাদেশ—ব্রহ্মজ্ঞানের বাহ্য প্রকাশ। এক একটি উপনিষদ যেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের তপোলক অধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের অমৃত-নিঃসর্জনী কবিতা। যুগ-যুগান্তরের ‘হৃদ-সমীক্ষণ-লব্ধ অন্তরতম দার্শনিক প্রত্যয়ের শীর্ষ থেকে ব্যক্ত

এই স্বলক্ষ্য ও দৃঢ়-পিনদ্ধ কবিতাবলী ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাভীর্ষ্যে, আদর্শের ঔদার্যে ও ছন্দের মাধুর্যে ঋষিদের কণ্ঠে সুরময় হইয়া এক অপূর্ব বিদেশী শুচিতায় যেন ফুৎলোকে পৌঁছিতেছে। উপনিষদে ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমা সমাধি-ময় দেহ-লালসা মৃত, প্রাণ দেহাতীতের সন্ধানে অত্যাশ্রিতলোকে উদ্ধারিত। সমাধির সেই নিব্বিকল্প ভূমি হইতে উপলব্ধির আলোকে আপ্ত হইয়া ব্রহ্মসাদক ঋষিগণ উপনিষদে অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র ও অমৃতমন্ত্র পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন—যে-মন্ত্রের পরম আশ্বাসন মানবের পরিকল্পিত ক্ষুদ্রাশ্রিত আত্মাকে বিস্তারের অভিযুগে—অভয়-প্রতিষ্ঠার অভিযুগে—জ্ঞাতীশ্বর অক্ষয় অমৃতের অভিযুগে লইয়া যায়। গ্যালিলিও, নিউটন, মার্কনি, ফ্যারাডে, রুগার ফোর্ড, আইনস্টাইন প্রভৃতি বস্তু-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের আমরা বিশ্বের পর বিশ্ব প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু ভারতের আত্ম-বিজ্ঞানীরা আজীবন গবেষণার পর অশেষ আশ্বাস অতলে অবগাহন করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধানী আলোকে জীবনের যে সংকীর্ণতম সঙ্কট আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বের সেই বিরাট বিশ্বের কথা কি আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হয়? আমরা কি মনে করি যে, সেই ক্রান্তদশী ঋষিদের পদ্ধান্তিত পন্থাই যমুনাধীর সনাতন পন্থা, তাঁহাদের অমর বাণীই মানবাত্মার বোধন গায়ত্রী?

উপনিষদের একটি বিশিষ্ট বিভাব হইতেছে—অদ্বৈত ভাবনা। হীণ ও ব্রহ্মচৈতন্যের একত্বই অদ্বৈতভাবনার মূল কথা। উপনিষদ্ বলেন—এক অদ্বৈত অথগু অনন্ত আত্মাই সকলের মধ্যে স্তত্রঃপে অমুখ্যাত—‘একং সদিপ্রা বহুধা বদ’ন্ত’। ইহাই ভারতের অথগু সার্বভৌম আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র এবং বিশ্বের সকলেরই এ গণতন্ত্রের সাধারণ নাগরিক, কারণ সকলের মধ্যেই যে বিশ্বদেবের অমৃত প্রকাশ। উপনিষদ্ মানুষকে মানুষ বলিয়া প্রজ্ঞা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি সকলের মধ্যে এককে দেখেন এবং সকলকে একের মধ্যে দেখেন, তিনি আর কদাপি কোন জীবকে হিংসা বা ঘৃণা করিতে পাবেন না। ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, ‘অহং ব্রহ্মসি’, ‘ওমুনি’, প্রভৃতি ঔপনিষদিক মহাবাক্য মূলতঃ জীবাত্মার তত্ত্ব বিখ্যাত্যেই প্রশস্তি। অথগু ব্রহ্ম কত্বের বোধ হইতেই ভারত নিখিল বিশ্বাসীর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ অমৃত্যব করিতে শিখিয়াছে। ভারতীয় মনে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীভাবনা আত্মার ব্যাপ্তিময়তারই প্রসন্ন পরিণতি। উপনিষদে ‘আত্মানং বিদ্ধি’র যে উপদেশ, তাহা এই প্রেম ও ঐক্যের পথেই, ‘শব্দন্ত বিশ্ব অমৃতন্ত পুত্রা’র যে উদ্বাস্ত আশ্বাস, তাহাও এই প্রেম ও সাম্যেরই অভিবাঞ্ছনা। উপনিষদ্ ভারতীয় মনে এমন একটা অমোঘ শক্তি প্রদান

করিয়াছেন যাহাতে সে নূতনকে বর্জন না করিয়া করিয়াছে গ্রহণ,—বৈচিত্র্যকে প্রভেদ মনে না করিয়া আনিয়াছে তাহার মধ্যে সুষমজগৎ সমাহার ও সমন্বয়। এই শক্তিবলেই সে আক্রমণকারী বিজ্ঞাতাকে জয় করিয়াছে, বহিরাগত শত্রুকেও বরণ করিয়া লইয়াছে পরম মিত্ররূপে, যাহার ফলে ‘শক-হন বল, পাঠান-মোগল একদেহে হ’ল লৌন’। সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ জগতের ইতিহাসে বিরল। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এই সমন্বয়-সাধনার (Synthetical idiology) পুত প্রবাহে ভারতীয় মনের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে সরস-সজীব রাখিয়াছেন। বুদ্ধ-অশোকের মৈত্রী ও করুণা, শঙ্করের প্রজ্ঞা ও তপস্তা, নানক-মহাপ্রভুর প্রেম-সাধনা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহাজীবন ও গান্ধী-দণ্ডিন্দ্রের বাণী ঔপনিষদিক তত্ত্বেরই অন্তর্নিহিত বহিঃপ্রকাশ।

আজ সমস্ত জগৎ এক বিরাট বিপদাশ্রয়ের সমুদ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের নৈতিক জীবনে আসিয়াছে অবসাদ, তাহার বিবেক হইয়াছে বিভ্রান্ত, তাহার পৌরুষ হইয়াছে মিথ্যার জড়াল। দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে ক্রটিতে ক্রটিতে চলিয়াছে সংঘাত। পরস্পর সন্দেহ আর অবিশ্বাস মানুষের শাস্ত্রিক করিতেছে বিস্তৃত। দিকে-দিকে কত বিরোধ, কত সংঘর্ষ আজ উদ্ভাস হইয়া জীবনকে উত্তরোল করিয়া তুলিয়াছে। হিংসা-দ্বন্দ্ব-জিগীষার বর্ষাবায়ু অণবিক অমুরের প্রসন্ন-গর্জনে পাক খাইয়া ফিরিতেছে। ‘উদ-বুদ্ধির দন্দ-যুদ্ধে তত্ত্বের রাজ্য ধগু ধগু হইয়া যাইতেছে। আজ মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে—‘ঈশাবাস্তমিদং সকলং’। মানুষ মানুষকে আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। আহতের দল সাহসের সঙ্গে বলিতে পারিতেছে না—‘সর্বব্যাপী পরম-পিতার ক্র-অমর দান। একা ভোগ করিলে চলবে না। ‘ত্যাগেন ভূতীষঃ’। ত্যাগের মধ্যে সকলের সঙ্গে একত্র এ পরমানন্দকে ভোগ করিতে হইবে। আজ কল্পকণ্ঠে বলিতে হইবে—‘ম’ গৃহঃ কস্তদ্বন্দ্বনম্’—কাহারও ধনে লোভ করিও না। ধন-সম্পদ, জীবন-মোহন, রাজ্য-রাজমুকুট, বিজয়-গৌরব নিত্য নয়, নিত্য হইতেছে স্নেহ, মমতা, ত্যাগ, প্রেম, সন্তোষ আর ভগবান। ভোগে ভগবান নাই। কাড়া-কাড়ি হানাহানিতেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে ত্যাগের দ্বারা—‘ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব, মানসঃ—‘একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়’। কিন্তু কে এই তত্ত্বকথা বলিবে? কে এই যুগে যুগে প্রতীদন্দীদের মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের নবপ্রাণ সঞ্চার করিবে?—ভারত। পুরাণী প্রজ্ঞার ধাবক ও বাহক ভারত, মহাপুরুষগণের মহাসাধনার উত্তরাধিকারী ভারত সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্য এখনও বিস্মৃত হয় নাই। ইত্যুৎকৈই



সে শানন্দে এ-ভার গ্রহণ করিয়াছে। শান্তিই ভারতের প্রতীক। শান্তি ও মৈত্রীর বাণী লইয়াই ভারতের অশোক একদিন আন্তর্জাতিক পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। কালের পরিবেশে অহিংসামন্ত্রের ঐশ্বরিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোককান্ত জবহরলাল শান্তি ও মৈত্রীর বাণী অনাড়ম্বরভাবে দেশে-বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আত্মাবান শান্তিপ্রিয় ভারতের কণ্ঠে আজ পঞ্চশীল, সহাবস্থান, অহিংসা, সত্য ও মৈত্রীর মন্ত্র উদগাত হইতেছে। এই মন্ত্র-বলে :

‘হিংসা-ঘেয মন্ত্রশাস্ত্র ভূজ্ঞেয় মত—শঙ্কাতবে

হোক শাস্ত্র হোক ;

আধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আধার বিবরে,

নামুক আলোক !’

আমাদেরও কামনা—আলোক নামুক। সে আলোকে হিংসা-ঘেযের কলুষ-কালিমা ধৌত হইয়া সকল মালিন্য

বিগলিত হইয়া উপনিষদের উদার বিশ্ব-ভারতী ভাবদর্শনের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতায় এক বিশ্বজনীন সমাজ-ব্যবস্থা রচিত হউক—যে-সমাজে নিজ নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য লইয়া মধ্য-সাহচর্যে বসবাস করিতে পারিবে অন্তর্বর্তী দিনের মানবগোষ্ঠী। মিলনরতী ভারতের প্রযত্ন বিশ্বসংস্থায় স্বীকৃতি লাভ করিলে বিশ্বজগৎ শান্তিময় হইবে।

‘ঘোঃ শান্তি রন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ

শান্তি রোষধয়ঃ শান্তিঃ।

বনস্পত্যঃ শান্তি বিশ্বদেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তি সর্বং শান্তি

শান্তিরেব চ সা মা শান্তিরেধি ॥’

— দ্যলোক, ভুলোক, অন্তরিক্ষ শান্তিতে পূর্ণ হউক, আপ, ওষধী, বনস্পতি শান্তিময় হউক, সমগ্র বিশ্ব শান্তি বিরাজ করুক। যে-শান্তি পরমশান্তি, সেই শান্তি আমাতে আসুক।

নমঃ পরমশ্রীভ্যো নমঃ পরমশ্রীভ্যো নমঃ পরমশ্রীভ্যো

## দীর্ঘপথ

### শ্রীকরুণাময় বসু

এ জীবন কিছু নয়, শুধু জানি আকাজ্কিত সুরে  
অশ্রান্ত পথের বাধা পার হয়ে হৃদয়ের কেন্দ্রে পথ ঘুরে  
নিয়ে যাব অগ্নিকরা নৈবদ্য-বেদনা ;  
মানুষের অনির্বাক্য এই ত সাধনা।  
নিয়েছি পথের ধূলা মুচুতম মুকুট সঞ্চয়,  
কোথায় তরুর ছায়া, রৌদ্র-দিনে কোথায় আশ্রয় ?  
কোথায় বকুলবীধি, গন্ধমাখা অপরাহ্ন বেলা  
হঠাৎ ফুরাবে দিন ; সাজ করি এই তুচ্ছ পুতুলের খেলা  
অক্লান্ত আনন্দ স্নিগ্ধ নবতর পুণ্ডিত বিকালে  
নুতন নক্ষত্র-পথে আত্মা মোর আশা-দীপ জ্বলে।

এ জন্মে তীর্থধারে কত যাত্রী পদচিহ্ন রেখে,  
আশ্রয় জীবন-প্রশ্ন, অজানিত সুখ-দুঃখ এঁকে  
চলে গেছে দূর হতে দূরে ;

পথ হতে পথান্তরে, নদী হ’তে মহা সমুদ্রে।

দুঃখ আছে, ব্যথা আছে জানি

জীবনের মর্যকোষে যদি কোন থাকে সত্যবাণী,—

সেই বাণী কোন দিন অন্ধকারে হবে না নিঃশেষ :

খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষতি পার হয়ে হৃদয়ের পাবে সে উদ্দেশ।

অনির্বাক্য বেদনার জ্যোতি

তিলে তিলে গড়ি তোলে নামহারা দেবতার আশ্রয় মূর্তি

এ জীবন-পন্থ বনে কোন ক্ষণে নেমে আসে চাঁদ,

কখন জোয়ার জলে লেগে থাকে কার যেন অশ্রুর আশ্রয় ?

আকাশের ছায়াপথ, সপ্তর্ষি আলোয়

এ বিষয় বাসাতাঙা হৃদয়ের স্বপ্নটুকু হোয় :

তারপর মাঠ ঘাট, শালবন, বাঙা পথে অনন্ত স্বাক্ষর,

শিল্প-কীর্তি ফেলে রেখে চলে গেছে রূপধন কোন বাছুর।



## সাইরেন

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

—চললাম বোমা, চললাম প্রদীপ। একদিন তোমরা আমাদের ওখানে যেও সব।

—যাব মামীমা, নিশ্চয়ই যাব। বলতে বলতে যুথিকা হেঁট হয়ে তর্জনির প্রান্ত দ্বিগুণে রমণীর দু'পায়ের আঙুল স্পর্শ করে মাথায় ছোঁয়ায়। রমণী ডান হাত বাড়িয়ে তার চিবুক ছুঁয়ে ওঠে ঠেকায়। তার পর বলে, ভারী ভাল লাগল তোমাদের। বেশ আনন্দ কেটে গেল সময়টা। কিন্তু ওনাকে নিয়ে—অদূরে দণ্ডায়মান স্বামী কল্যাণকে হাত দিয়ে দেখিয়ে—কোথাও যে স্বস্তিতে কাটাতে পারব তার উপায় নেই। এমন গড়ফড় মানুষ দু'টি যদি কোথাও থাকে। যদি আপনাব ঝেঁঝেই ছিল না তোমার তবে এলে কেন? অনর্থক লোকজনকে বিরক্ত করে মাঝ। এখন থুণী হয়েছে ত? চল, লঙ্গী-ছেলের মত খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে চল। বাক্স, বাগ, অস্থির করে মারলে আমায়। বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে।

যুথিকা বলে, কি চমৎকার মানুষ। ছ'জনের মনে মিল যেমন, চেহারা মিলও তেমন।

জ্বর যুথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় প্রদীপ। তার পর বলে, মিল হবে না কেন? আমাদের মত দিনরাত খিটিমিটি ত ওদের লেগে নেই, গজ-বক্সের লড়াইও হয় না অষ্টগ্রহর। তাই সুখেই আছে ওরা। উঃ! কি বিয়েই হয়েছে আমার।

যুথিকা বলে, সত্যি। দিনরাত দাঁতের বাদ্যের কচ্-কচানিতে পাড়ার লোকেরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ। ওদের দেখে শেষ, কেমন করে সংসার করতে হয়।

—থুব শিখেছি। আর শেখার বাকি কিছু নেই। সংসার করছি বটে আমি। বাপ-ঠাকুরদার নামটা না হয় ছেড়ে দিলাম, নিজের নামটা পর্যন্ত তুলে যেতে বসেছি। পাগল হবার আর কিছু বাকি নেই আমার। সেই বেটি মোতির মা ঘটকী মাগীকে একবার যদি পাই—।

—কি কর তার?

—বিশেষ কিছু না। শুধু ঐ শুভি থেকে দাঁতগুলি তার উপড়ে ফেলি একটি একটি করে। কি ধরিবীজ মেয়ে-মানুষ বে বাবা! মরা-কাল জুড়ে দাঁত বাড়ীতে এসে।

বলত, এখানে বিয়ে না হলে মেয়ের ঠাকুরদা আত্মহত্যা করবে। রূপে লঙ্গী, গুণে সবস্বতী মেয়ে। হাজারে এমন একটা মেলে কিনা সন্দেহ। এ মেয়ে বিয়ে করবে না ত করবে কোন মেয়েকে। এমন হাড়েশে টের পাচ্ছি, কেমন লঙ্গী-সবস্বতীকে নিয়ে ঘর করছি আমি।

যুথিকাও বেগে উঠে। বলে, আমিও দেখে নি একবার মাগীকে পেল। বলেছিল, ছেলে রূপে গণপতি, গুণে মম্বু-ছাড়া কাতিক। গোরাই মত আর জন্ম অনেক তপস্বাই করেছিলে ম; যে, এমন ছেলে জুটেছে তোমার ভাগ্যে। এখন তাই ভাবি, কি পাইই না জুটেছে আমার ভাগ্যে। তপস্বাই যদি একটু বুঝে সুঝে করতাম, হয়ত এমনট জুটত না। শুধু রূপটাই মিলেছে গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে, আর কিছু নয়। এই দু'বছরেই হাড়ে দু'বো গজিয়ে উঠল আমার। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রূপ আর গুণ কানে বলে একবার তাকিয়ে দেখ মামাবাবুটিকে তোমার। তা হলেই বুঝতে পারবে সব।

প্রদীপ বলে, শুধু ম'মাবাবুটিকেই দেখলে হবে না। মামীটিকেও দেখ, লঙ্গী-সবস্বতী কাকে বলে। তখনকার দিনের বি-এ পাশ করা মেয়ে। কিন্তু ম'মাবাবুকে মান্ত করে কত। তার কথা এতটুকু অমান্য করে না। একটা দিনের তরেও ওদের মধ্যে অদিল দেখলাম না আমি।

—দেখবে কোথেকে। শুনেছি ওদের না কি ভাল-বাসার বিয়ে। ভালবেসেই ওরা নাকি বিয়ে করেছে পরস্পরকে।

—ভুল শুনেছ। ভালবেসে ত নই, বরং বলতে পার এ বিবাহে মত ছিল না মামাবাবুর। যা হয়েছে, বলতে পার সে শুধু মামীমারই ক্রটিতে। সেই অগ্রণী হয়ে বিবাহ করেছে মামাবাবুকে।

—বল কি?

—উপায় ছিল না। কলঙ্কের ভয় মেয়েদের বড় ভয়। আর সেই ভয়েই এক দিনের না-খমী মামীমাটি তার সব কিছু সংসার, মতবাদ বদলে বিবাহ করে বসল মামীটিকে, এক বকম জিহ্বা করেই।

—এমন অপূর্ব সময় হ'ল কি করে?

প্রদীপ বলে, সাইবেরনের কুপায়।

বিস্মিত যুধিকা প্রশ্ন করে, সাইবেরন ? সে আবার কি কথা ?

—ভারী মজার কথা। তোমার আমার বিয়েতে ঘটকালি করেছিল মোতির মা, তাই এমন বিপদ। আর ওদের বিয়েতে ঘটকালি করেছে সাইবেরন, তাই এমন সমস্যা। সে দিন ঠিক ঐ সময়টিতে সাইবেরন যদি না বাজত, তা হলে এমন অপরূপ সমস্যা সম্ভবপর হ'ত না কখনই।

—বাজে কথা। যুধিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মোতির মাকে তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না, তাই।

—উঁহ। এ পারাপাড়ির কথা নয় খুঁই। এ বাস্তব। ঘটনাটা শুনেলেই বুঝতে পারবে তুমি। আমি যেমনটি শুনেছি ঠিক তেমনটি তোমার বলি শোন। যুদ্ধের সময়, জাপানীদের ভয়ে ধরহরি সকলেই। সাইবেরন বেজে চলেছে প্রতি নিয়তই। এমনি একদিন অপরাক্তে ওরা চলেছে ত'জনেই চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে।

গাড়ীতে ভিড়ের অন্ত নাই। ঠাণ্ডাঠাণ্ডি লোক দাঁড়িয়ে আছে হাতল ধরে। শীতের অপরাহ্ন। সোনা-রোদে বালমল। ডান পাশে সুদূর প্রসারিত মাঠ। মাঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। মানুষের নিকৃষ্ণ জটলা। শান্ত পরিবেশ। বেশ একটা অলস মন্থর ভাব। ঐ দিকে রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় সন্ধ্যাগরী আপিস। মাঝে মাঝে ইউরোপীয়ান পল্লী। মামা অর্থাৎ কল্যাণ সেন বসেছিল ট্রামের সামনের সীটে। লেডিজ সীটে বসেছিল রমলা সোম অর্থাৎ বর্তমানে যিনি আমার মামী। হ'জনের পরিচয় দূরে থাক, চাক্ষুষ দেখাটি পর্যন্ত হয় নি এর আগে। সেই দিন দেখা হ'ল। মামা বলেন বেশ, জান হে প্রদীপ, ভিক্ষার ঝুলি কাঁখে তোমার মামী চলেছিলেন ভিক্ষা করতে।

মামীমা প্রতিবাদ করে বলে, কখন না। সমিতির চাঁদা আদায়ের জন্তে বেরিয়েছিলাম। চাঁদা আদায় করাকে ভিক্ষে করা বলে না।

—তা বলে না। কিন্তু ওটি ত ছিল। ওরই আবরণে যা-কিছু আসে। ব্যবস্যাটা কিন্তু মন্দ ছিল না ক্রমি।

মামীমা রেগে ওঠে। বলে, দেখ, রাগিও না বলছি। ভাল হবে না কিন্তু।

যুধিকা বাণা দেয়। বলে, ঝগড়ার কথা পরে শুনব'খন। আগে পরিচয়টা কি ভাবে সূত্র হ'ল তাই বল।

—পরিচয় সূত্র হ'ল সাইবেরনের সুরাধে। সেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে অকস্মাৎ অশান্তির ঢেউ তুলল সাইবেরন। শান্ত প্রকৃতির বুক চিরে উঁচু-নীচু করে সাইবেরন বেজে উঠল ভীষণ আর্তনাধে। মুহূর্ত মধ্যে একটা স্তম্ভিত ভয়-চকিত

ভাব। পরমুহূর্তে মাঠের সেই ছোট ছোট জটলা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল চক্ষের নিমিষে, বোঝা গেল না। সৈন্ত-ভর্তি লরীগুলির দ্রুত গমনাগমন আর মটর-বাইকের তর্জন-গর্জন পরিবেশটিকে ভয়াল করে তুলল আরও বেশী। ট্রামেরও গতি রুদ্ধ হ'ল সেই সঙ্গে। কণ্ঠস্বর গভীর কণ্ঠে আরোহীদের জানিয়ে দিল, আপনাবা দ্রুত করে গাড়ী থেকে নেমে প্লিট-ট্রেকে আশ্রয় নিন। এ সময়ে গাড়ীতে থাকবার হুম নেই কাহারও। ভীত-সম্মত আরোহীর দল যে যেভাবে পারল গাড়ী থেকে নেমে বাতাসে মিলিয়ে গেল। পূর্ণগর্ভগাড়ী মুহূর্তমধ্যেই শূণ্যগর্ভ হয়ে পড়ল। কিন্তু বিপদ হ'ল একজনের।

—কার ? মামীমার নিশ্চয়ই। যুধিকা প্রশ্ন করে মাঝখানে।

প্রদীপ ষাড় নেড়ে বলে, তারই। সে তখন সীটে ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনে যাকে পাচ্ছে বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করছে, কি ব্যাপার বলুন ত ?

কিন্তু উত্তর দেবে কে ? নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সকলেই। স্মৃত্যবৎ প্রত্যুত্তর এল না কারো কাছ থেকেই। কল্যাণ আসছিল সকলের পিছু পিছু। রমলার প্রাণে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, সাইবেরন বাজছে। ট্রাম থেকে নেমে চট করে কোথাও আশ্রয় নিন। এ সময়ে ট্রামে থাকা নিরাপদ নয়।

রমলা ভীত হয়ে ওঠে। ভীত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আশ্রয় নেব কোথায় ? এ অকালে আমার ত জানা-শুনা কেউ নেই।

কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার তড়িৎ দিগন্তে কবনের না। পাশেই প্লিট-ট্রেক আছে। উপস্থিত সেখানে সব আশ্রয় নিন। গাড়ী খালি করে দিন।

রমলা প্লিট-ট্রেকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে। ইতি মধ্যেই কালো কালো মাথায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে শেগুলি। অধিকাংশই নিরুশ্রাবী পথচারীর দল। এতক্ষণ মাঠের মধ্যে জটলা করছিল নিকৃষ্ণে, এখন ট্রেকগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে শোষিয়ে। দেখে শুনে মুগ্ধ শুকিয়ে উঠল রমলার। বলল, এই ট্রেকে আশ্রয় নিতে বলেন আমাকেও ?

—আমি বলি না। কিন্তু গাড়ীতে যখন থাকত দেবে না, তখন আশ্রয় ত নিতে হবে কোথাও ?

—তা হ'ক। ওখানে মরে গেলেও আমি চুকতে পাব না।

কল্যাণ বলে, মরামরিব কথা নয়। বেঁচে থাকতেই আশ্রয় নিতে হবে। এখানে আমারও পরিচিত কেউ নেই যে সেখানে আশ্রয় দেব আপনাকে।

গাড়ী খালি হয়ে যায়। কণ্ঠস্বর আবার তাগাদা দেয়।

রমলা তাকায় অসহায় ভাবে কল্যাণের মুখের দিকে। কল্যাণ একটু ইতস্ততঃ করে, তার পর বলে, আশ্বিন আমার সঙ্গে। একবার চেষ্টা করে দেখি কোথাও আশ্রয় পাই কি না।

সন্ধ্যাচ কববার সময় নয়। রমলা করেও না। পুরুষের অবলম্বন পেয়ে সে কতকটা সাহসী হয়ে উঠে। কল্যাণেরই সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে ক্ষিপ্ত-পদে। মাথার উপর খান দু'য়েক প্রেন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের গুরু-গম্ভীর বব পারিপার্শ্বিক অবস্থার গাম্ভীৰ্যকে বাড়িয়ে তুলেছিল চতুর্ভুজ। রাস্তা: ফাঁকা—জনহীন। একটা সর্বনাশের পূর্বভাঙ্গ ঘেন সর্বত্রই পরিস্ফুট। তারই মধ্য দিয়ে কল্যাণ এগিয়ে চলে পূর্বদিকের একটা রাস্তা লক্ষ্য করে। পিছনে রমলা। পরিত্যক্ত পথ, পরিচ্ছন্নতায় ভরা। কল্যাণ বোঝে সৌখীন ইউরোপীয়ান পল্লী। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময় নাই তার। নিজের জন্ত সে বিব্রত নয়। বিব্রত সজিনী মেয়েটির জন্ত। এ মেয়ে তার আত্মীয়া নয়, পরিচিতা নয়। সন্ধ্যাচ তার এইখানে। তবে বিপদে মানসিক বুদ্ধিগুলি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে বলেই সে মুখ ফিরিয়ে বলতে পারে, কি কাণ্ড দেখুন, এমন জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে আশ্রয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

রমলা কথ: বলে না। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তার পর আর একটু এগিয়ে এসে কল্যাণের পাশে পাশে চলতে থাকে।

কল্যাণ বলে, একটা আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই। যতক্ষণ না পাই, অসুবিধে ভোগ করতে হবে আপনাকে।

রমলা এবার উত্তর দেয়, তা হ'ক। স্লিট ট্রেকে থাকার চাইতে এ অনেকগুণে ভাল। এখানে একটা না একটা আশ্রয় কোথাও মিলবে নিশ্চয়ই।

—আশ: করি মিলবে। সেই আশা নিয়েই এসেছি এখানে। কিন্তু যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণই ভাবনা। আপনাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না মনে।

রমলা হয় ত মনে মনে একটু লজ্জিত হয়। নতকণ্ঠে বলে, আমার জন্তে আপনার কতখানি দুর্ভোগ দেখুন। তাই ভাবছি, আপনার দেখা না পেলে কি ছরবস্থাই না হ'ত আমার। শেষ পর্যন্ত স্লিট ট্রেকেই হয় ত আশ্রয় নিতে হ'ত আমাকে। কিন্তু সেখানে থাকলে এতকণ্ঠে নিশ্চয়ই হুমকি হয়ে মরে পড়ে থাকতাম আমি।

কল্যাণ বলে, স্লিট ট্রেকে যে আপনি আশ্রয় নিতেন না,

এ আমি জানি। কিন্তু আপনার দুর্ভোগের নিরসন না করা পর্যন্ত কোন কৃতিত্বই আমার নেই জানবেন। এখন তপ্ত কটাহ থেকে আঙুরের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার মত অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের।

প্রত্যুত্তরে রমলা কি একটা বলবার উপক্রম করছিল। কিন্তু মুখের কথা তার ওষ্ঠপ্রান্তে এসেই মিলিয়ে গেল। সহসা অনতিদূরে বিস্ফোরণের এক প্রচণ্ড শব্দ শব্দ-ব্যাকুল মহানগরীর সমস্ত নিশ্চরতাকে খান খান করে দ্বিগ্ন মনের মধ্যে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে তুলল আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে একটা চাপা ভয়ানক বাতাসে ভেসে এসে শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিল।

—মাগো! একটা অস্ফুট আর্দ্রনাদ রমলার মুখ দিয়েও বার হয়ে এল। ভীত বিবর্ণ মুখখানি দু'হাতে ঢেকে সামনের দিকে দৌঁবে বুকে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'ল না কল্যাণ। এতক্ষণকার সমস্ত সন্ধ্যাচ, সমস্ত ইতস্ততঃ ভাবকে সে মুহূর্তমধ্যে কাটিয়ে উঠে রমলার একখানি হাত দৃঢ়ভাবে ধরে সামনে যে বাড়ীখানা পেল সেইখানে তাকে টেনে এনে বলল, ভয় পাবেন না। আশ্রয় আমরা পেয়েছি একটা।

রমলা হাত ছাড়বার চেষ্টা করে না। শুধু ভীত-কম্পিত কণ্ঠে বলে, ভগবান রক্ষা করেছেন। কিন্তু বোমা পড়ল কোথায়?

—বোমা পড়ে নি। মিলিটারী লরীর টায়ার কেটে আওয়াজ হয়েছে। মনের অবস্থা স্বাভাবিক নয় বলেই ভয় পেয়েছিলেন অতখানি। নইলে বৃকতে পারতেন সব।

লজ্জায় রমলা এতটুকু হয়ে যায়। বলে, ছি! ছি! কি কেলেকারী! সত্যি সত্যি বোমা পড়েছে মনে করে কি কাণ্ডটাই না করে ফেলেছিলাম বলুন ত?

কল্যাণ বলে, আপনাকে ঘোষ দ্বিই না। ভয় জিনিসটা মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। আপনাকেও ফেলেছিল।

যে বাড়ীখানার সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছিল সেখানি বিরাট না হলেও সুদৃঢ় বাড়ী। দ্বিতল বাড়ীখানি বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চর পুরীর মত। ইউরোপীয়ান পল্লীর মধ্যে ইউরোপীয়ানেরই বাড়ী। রমলাও সেই কথাই বলে, এ যে খাস সাহেবের বাড়ী দেখছি।

কল্যাণ উত্তর দেয়, সাহেব পল্লীতে সাহেবেরই বাড়ী হওয়া উচিত। এখানে বাঙালীর বাড়ী পাব কোথায়? তবে আশ্রয়ের জাত নেই।

রমলা একটু আহত হয়। বলে, সেটুকু শিক্ষা আমার আছে। ও ভেবে কথাটা বলি নি আমি।

—না বলাই ভাল। তবু ত আশ্রয়। বিপদের সময়  
এব মূল্য অনেক। কিন্তু পরিবেশ দেখে মনে হয় সাহেব  
লোকটি সৌখীন। আপনার কি মনে হয়?

—কিছু না। রমলা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কল্যাণ কলিংবেল এ হাত দিতে যায়। কিন্তু তার  
আগেই দরজা খুলে যায়। সাহেবের আদালী এসে সমস্ত  
সেলাম বাজিয়ে দাঁড়ায়। কল্যাণ বলে, মাইজী বিপদে পড়ে  
সাহেবের কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছেন। ‘অল ক্লিয়ার’ হলোই  
চলে যানেন। সাহেবকে জানিয়ে এস তুমি।

কিন্তু জানাতে হয় না। সাহেব ছিলেন পাশের ঘরেই।  
বেরিয়ে এসে আহ্বান জানালেন তিনিই, কাম ইন প্রীজ।  
গ্ল্যাড টু মিট ইউ। যেন কত কালের পরিচয়।

সাহেবের নাম জন মরিসন। কলকাতার উপকণ্ঠে কোন  
এক নাম-করা ছুট মিলের মালিক। সুতরাং, ধনী ব্যক্তি।  
অতিক্রান্ত-সৌখীন ভক্তলোক। কিন্তু শরীরের বাঁধন এখনও  
তাকে যৌবনের মাদুপথে আগল দিয়ে রেখেছে। উন্নত-  
বলিষ্ঠ দেহ, কেশ-বিরল মস্তিষ্ক এবং সারল্য-মণ্ডিত মুখশ্রী,  
দেখলেই গ্রীক-দেবতা দর কথা স্বরণে জাগে।

কল্যাণ বাড়ি তুলিয়ে বলে, থ্যাঙ্কসু। সাইরেন আমাদের  
মিলিয়ে দিয়েছে। রাস্তার মাড়ে লরী ফাটার শব্দকে বোমার  
শব্দ মনে করে ইনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাই  
আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন এখানে। আপনারাও বিবস্ত  
করলাম অসুখ।

—বেশ করেছেন। অতিথি সর্ব অবস্থায় বরণীয়।  
বিবস্ত্রিত কোন কারণ নেই এতে। আপনারা কিন্তু হবেন  
না। আপনারাও আমন্ত্রণ জানাতে পেরে বরং গুণীই হয়েছি  
আমি। আশুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি  
আপনারাও।

পাশের ঘরেই ছিলেন মরিসনের স্ত্রী ডোরা। স্বামীরই  
উপযুক্ত স্ত্রী। তেমনি অমাগ্নিক, তেমনি ভক্তমনা।  
ছ’জনা কেই অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। রমলাকে পাশে  
বসিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই মিসেস  
সেন। এত আজ্ঞাপাল প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার বললেই হয়।  
তা ছাড়া এখানে আপনারা নিরাপদ, অন্ততঃ রাস্তার চাইতে  
ত বটেই।

মিসেস সেন? কথাটা ভীতির মত গিয়ে বেঁধে রমলার  
কানে। রমলা চমকে উঠে। বিবর্ণ মুখে কল্যাণের মুখের  
দিকে তাকায়। দেখে, সেও তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে  
তাকিয়ে দেখে তারই দিকে।

আশ্চর্য ঘটনা! এমন অসম্ভব কেমন করে হ’ল? এমন  
অভাবিত সম্বন্ধই বা এরা অসম্ভব করে নিল কি করে।

কোন পরিচয় ত এখনও দেখা হয় নি এদের কাছে  
রমলা বাবড়ে যায়। মিসেস মরিসনের ভুল সংশোধন করতে  
ভুল হয়ে যায় তার। সে শুধু তাকিয়ে থাকে।

ডোরা মরিসন বলে চলেন, এ দেশে এসেছি অনেক  
দিন। এ দেশের ছেলেমেয়েদের দেখেছি। মেয়েদের অনেক  
কথাই শুনেছি। তাদের শ্রদ্ধাও করে থাকি যেথেষ্ট। কিং  
তাদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি  
আজও পর্যন্ত। মনে হয়, আপনার সঙ্গে আলাপ করে  
কোভ আমার অনেকাংশে মিটেবে, মিসেস সেন।

রমলা কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তার মুখে ভা  
ভোগায় না। সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আরক্ত মুখে একটুখানি  
ঘাড় নাড়ে।

মিসেস মরিসন বলেন, মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় সম্পূর্ণ  
আর বিপদে। বিপদের পরিচয়টাই তাদের কাছে টাঙে  
বনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেয়। বিপদ আমাদেরও সুযোগ  
দিয়েছে। সুতরাং এর সদ্যবহার আমরাও করব। আল  
করি, এতে আপনার অমত হবে না কিছু। দৈনন্দিন জীবনে  
না হ’ক, মাঝে মাঝে যদি দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাতেও আ  
গুণী হব খুব।

রমলা এবার সচেষ্ট হয়ে উঠে। সে যে মিসেস সেন নই  
এই কথাটাই সে বোঝাতে যায় মরিসন সম্প্রতিক, কিং  
কেমন এক অনাস্বাদিত লজ্জায় কণ্ঠতালু তার জড়িয়ে আসে  
গলার স্বর গলার মধ্যেই আটক পড়ে যায়। সে মুখ নামিয়ে  
নেয়।

মিসেস মরিসন কৌতুক বোধ করেন। বলেন, আপন  
বড় বেশী সঙ্কুচিত হচ্ছেন, মিসেস সেন। কিন্তু এখানে সঙ্কো  
করণের মত কিছু নেই। বাড়ীতে নিজেকে যতখানি  
স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরুদ্ধিগ্ন মনে করে থাকেন, এখানে তা  
চাইতে কম মনে করবেন না।

রমলা এইবার কথা বলে। চকিতে একবার কল্যাণে  
দিকে তাকিয়ে দেখে মুতকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে, না, ন  
নিরাপত্তার অভাব আমি এক বিন্দুও অনুভব করছি  
মিসেস মরিসন। তবে—

—তবে কি বলুন?

কিন্তু বলবার সুযোগ রমলা পায় না। ততক্ষণে মরিস  
সম্প্রতির বছর ছ’য়েকের শিশুপুত্রটি শাড়ীপরিহিতা অপক  
এক অতিথিকে দেখে একেবারে তার কোল-ঘোঁসে এ  
দাঁড়ায় এবং ছ’হাতের ছ’টি পুতুলকে তুলে ধরে পরম বিজ্ঞে  
মত বলে, পাপা, মাম্মা। অর্থাৎ ছ’টি পুতুলের এক  
দিয়েছেন বাবা, অপরাট দিয়েছেন মা।

রমলা যেন অব্যাহতি পায়। তার হৃৎকিত মন এমনি

এক অস্বস্তিকর পরিবেশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্ত যেন অবলম্বন খুঁজে ফিরছিল, এবার সে অবলম্বন পায়। তাই সে দু'হাত বাড়িয়ে পদম স্নেহভরে শিশুটিকে কোলের উপর টেনে নেয়। তার পর আদর করে তার নরম গাল দু'টি টিপে দিয়ে বলে, আর একটা দেবে তোমার মামীমা, বেবী। খুব বড়, কেমন, নেবে ত ?

শিশু গন্তীর মুখে ঘাড় নাড়ে।

অপর দিকে কল্যাণ আর মরিসন নিজের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন হয়ে উঠে। সাইরেন থেকে শুরু করে, ক্রম জার্মান যুদ্ধ, জাপানীদের ভারতবর্ষ আক্রমণ, আমেরিকানদের যুদ্ধে যোগদান, কোন আলোচনাই বাকি থাকে না তাদের। একটির পর একটি প্রসঙ্গ তুলে তারা আলোচনা করে চলে অনর্গল।

কিন্তু আলোচন জমাট বাঁধতে পারে না রমলা আর মিসেস মরিসনের। আলাপ করবার উৎসাহ রমলার কম নয়, কিন্তু সঙ্কোচ পথ বোধ করে দাঁড়ায়। নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে না পেরে সে দৃষ্টিতে পড়ে। এমন সময় মিসেস মরিসন বলেন, বেশ মিলেছে, কিন্তু আমার স্বামী আর আপনার স্বামী দু'জনে : দু'জনেই সমান মিশুক। আপনি কিন্তু একটু বেশী লাজুক, মিসেস সেন। তাই স্বস্তি পাচ্ছেন না এখানে।

রমলা বিপন্ন বোধ করে। এ সব কথাই উত্তর দেওয়া যায় না। অথচ নিরন্তরে থাকাকিও ভক্ততা-বিক্রম। অনেক চেষ্টা করে চোখযুগ লাল করে একটা উত্তর সে দিতে যায় বটে, কিন্তু 'অল-ক্লিয়ারেব দীশী' বেজে উঠে সেই মুহূর্তে।

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতে সকলেই। মিঃ মরিসনই কথা বলেন প্রথমে, জাপানীরা বোধ হয় ভয় পেয়ে পিছু হটে গেল।

মিসেস মরিসন সায় ধেন, খুব সম্ভব তাই। তা না হলে এতক্ষণে মোরগোল পড়ে যেত। কিন্তু এই বন্ধু যবে বসে বসে হাঁপিয়ে ওঠার চাইতে মুক্ত বাতাসে যাওয়া অনেক ভাল। কি বলেন, মিঃ সেন ? শেষ কথাগুলি তিনি কল্যাণকে উদ্দেশ্য করেই বললেন।

কল্যাণ সায় দিল, নিশ্চয়ই। এক'শো বার ভাল, কিন্তু এবার আমবা উঠি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। বলে কল্যাণ তাকায় রমলার দিকে।

কিন্তু রমলা তাকায় না। সে তখন গল্পে মসৃণ শিশু-মরিসনের সঙ্গে। তারই হাত ধরে সে তখন এগিয়ে চলেছে বাগানের দিকে।

মিসেস মরিসন বলেন, নিশ্চয়ই যাবেন। তবে সম্মানিত অধিষ্ঠি আপনারা। সচরাচর জোটে না এমনটি। 'এ

লাভিং বেঙ্গলী পেয়ার।' আপনাদের ওপর লোভ আমার খুব বেশী, তাই ছাড়ছি না সহজে। চায়ের টেবিলে আরও কিছুক্ষণ থেকে তবে ছাড়া পাবেন। তার পর রমলার দিকে ফিরে মিলি হেসে বলেন, আমার ছেলের 'আন্টি' আপনি। অতএব আমার নিকট আত্মীয়। আপনার ত কোন ওজরই থাকবে না এ ক্ষেত্রে। তাড়াহুড়ো চলবে না। বসতে হবে আরও কিছুক্ষণ। আমি এলাম বলে, বলতে বলতে মরিসন হস্পতি একটু ব্যস্ত ভাবেই অক্ষরের দিকে প্রস্থান করলেন।

জ্যৈষ্ঠ অমৃতোষে মিঃ মরিসন অতিথিদের তত্ত্বাবধানে বইলেন বটে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্ত নয়। সহসা পাশের ঘরে টোলফোন যন্ত্র বেজে উঠল খন খন করে। বয় এসে খবর দিয়ে গেল, হার্মিটন সাহেব ফোন করছেন 'মিল' থেকে।

মিঃ মরিসন উঠে পড়ে বললেন, এক্সকিউজ মি, মাই ফ্রেণ্ডস। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এক মিনিটের জন্তে বিদায় নিচ্ছি আমি। আপনারা দু'জনে ততক্ষণ একটু গল্প করুন, আমি এলাম বলে। মিঃ মরিসন চলে যান।

কল্যাণ আর রমলা দু'জনে বসে থাকে মুখোমুখি। একটা অস্বস্তিকর পরিণতি চাড়া দিয়ে উঠে দু'জনার মধ্যে। প্রথমে কথা বলে রমলা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, অপমানের ত চূড়ান্ত হ'ল আমার। এবার এ প্রহসনের যবনিকা ফেলুন। সাহেবী-খানার প্রতি লোভ আমার নেই। আপনার যদি থাকে, আপনি থাকুন, আমি বিদায় নি।

কল্যাণ মনে মনে আহত হয়, কিন্তু শাস্তকণ্ঠে বলে, লোভ আমার কিছুতেই নেই। তবে ভক্ততা জ্ঞানটুকু আছে। রমলা আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনার ভক্ততা জ্ঞানের ভ্রমে বসে বসে এই সব আপত্তিকর কথাগুলো শুনতে হবে আমাকে ? বেশ লোক ত আপনি।

—শুনবেন কেন ? ওদের ভ্রান্তি সংশোধন করে দিন। সেইটাই ত উচিত ছিল আপনার।

—শুধু আমার। আপনার নয়, আপনিও ত নিরপন করতে পারতেন ওদের ভ্রান্তি।

কল্যাণ রাগ করে না। বলে, পারতাম, কিন্তু সুযোগ জুটেছিল আপনার, সে সুযোগের যখন সদ্ব্যবহার করলেন না, তখন মুস্তিস হ'ল আমার। বেশ ত, যাবার বেলায় এদের ভুল ভেঙে দিয়ে যাই, আসুন।

—না, রমলা মাথা নাড়ে, কেলেকারী বাড়িয়ে কাজ নেই আর। অপমান বা হবার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে শ্রদ্ধাটুকু হারিয়ে যাই কেন ? এতক্ষণ পর ভুল ভাঙতে গেলে লাভ হবে না কিছু, বরং সম্ভবই লাগিয়ে তোলা হবে ওদের মনে।

অপমান যদিও বা সয়ে গেছি কোন মতে, অশ্রুমান সইতে পারব না কিছুতেই।

কল্যাণ বলে, আপনি বুদ্ধিমতী। পরিবেশের চক্রান্ত বুঝতে পারছেন সবই। এতে আমি আশ্চর্য হই নি। তবে নিজেদের অসাবধানতার বা ঘটে গিয়েছে তার জন্তে সাবধান হওয়া ছাড়া কি-ই বা করবার আছে আমাদের।

রমলা রাগ করে বলে, কিছু না। শুধু জড়-ভরতের মত বসে থাকব এখানে আর নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করব অকথা-কুকথাগুলোকে। সাবধান হতে হয়, আপনি হন। আমি পারব না, এ অসহ্য আর এক হওও এখানে থাকতে চাই না আমি। আমি চললাম। রমলা সত্যসত্যই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

কল্যাণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, হোহাই আপনাকে। এতক্ষণ যখন সইতে পেরেছেন তখন আর একটু সহ্য হান। চায়ের টেবিলে এঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদের। এ ভাবে চলে যাওয়া শোভনীয় হবে না। অভিজ্ঞ না হয়ে অন্ততঃ আশ্রয় ঘাঁনের মর্যাদাটুকু এঁদের দিন।

রমলা বাঁবিয়ে উঠে, দিতে হয় আপনি দিন। আমি অপারগ, অপরের অমর্যাদা হ'ক, এ আমি চাই না। কিন্তু তাই বলে এক টেবিলে বসে মেমসাহেবী-খানা আমার মুখে কচবে না।

কল্যাণ হতাশ হয়ে বলে, এর পর আপনাকে দ্বিতীয় অনুরোধ করা শোভনীয় হবে না। তবে আমার মনে হয়, মিসেস মরিসন নোধ হয় আপনাকেই বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

—তার এ অনুরোধ রাখতে আমি অক্ষম। আপনি বলে দেবেন, চা আমার সহ্য হয় না। খেলে—

কিন্তু কথাটা শেষ হয় না, মিসেস মরিসন ফিরে আসেন। হাসিমুখে বলেন, আপনাদের হাম্পাত্য আলাপটা পার্শ্বের ঘর থেকেই শুনে পাচ্ছিলাম মিসেস সেন। বুঝি আর না বুঝি, বেশ লাগছিল কিন্তু, নতুন নতুন এমনই হয়। ও ব্যসে আমাদেরও হ'ত, কিন্তু খবরদার, রাশ আলগা করবেন না, তা হলেই ঠকবেন। স্বামীকে বেশে রাখতে গেলে রাশ শক্ত করবেন। কর্তাটি বুঝি বাড়ী ফেরবার জন্তে খুব বেশী তাড়া লাগাচ্ছিলেন আপনাকে? নীড় ছাড়া থাকতে পাবেন না বোধ হয়?

রমলা বিব্রত বোধ করে। মুগ্ধচোখ লাল হয়ে উঠে। শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

কল্যাণ রমলার অবস্থা বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি বলে, আপনার বুঝতে একটু ভুল হয়েছে মিসেস মরিসন। আমাদের আলাপটা হচ্ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। নীড় ছাড়ার প্রায়ই

ওঠে নি দেখানে। এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আজ ওনার কষ্টিং ডে। সেই কথাটাই স্বরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন আমাকে। আপনারা হয় ত জানতে পাবেন হিন্দু-ধর্মের মেয়েরা অনেক বকম বার-ব্রত, উপবাস পালন করে থাকেন অভ্যস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

মিসেস মরিসন বাড়ি নেড়ে সাই হেন, জানি। আপনাদের মেয়েদের অনেক বকম আচার-নিষ্ঠার কথাই শুনেছি আমি। তবে জানতাম বিশ্বারই আচার-নিষ্ঠা খুব বেশী।

—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। তবে সখ্যবাপও বাধ যায় না অনেক বার-ব্রত থেকে।

—পুণ্যাত্মা মেয়ে। মিসেস মরিসন স্মিত-মুখে তাকান রমলার দিকে।

পার্শ্বের ঘর থেকে মিঃ মরিসন ফিরে আসেন কান্দ সেবে। স্ত্রীর মুখ থেকে রমলার ধর্মনিষ্ঠতার কথা শুনে খুশীমুখে বলেন, বিলিঙ্গিয়স্ মাইণ্ডেড গার্ল! হাউ গ্রেসাস! হাউ ওয়াণ্ডারফুল! ডোরা এই ব্যসেই দেখে মেয়েটি কেমন ধার্মিক।

ডোরা বলেন, হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সকলেই তোমার কাছে গ্রেসাস, সকলেই ওয়াণ্ডারফুল। আমিই শুধু ফুল।

সাহেব হাসতে থাকেন। রমলাও মুখ টিপে টিপে হাসে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলে ফেলে, ফুল নয় মিসেস মরিসন, ফ্রাওয়ার। বাংলা ভাষায় বা ফুল হংবেঙোতে তারই নাম ফ্রাওয়ার।

এবার সমবেত কঠোর হাস্তধ্বনিতে ঘরখানা ভরে উঠে।

চা পরিবেশন করেন মিসেস মরিসন। রমলাকে লক্ষ্য করে বলেন, শুনেছি এ দেশের মেয়েরা পর পুরুষের সামনে, এমনকি নিজেদের স্বামীর সামনেও কিছু খায় না। আপনার আপত্তি যদি সেইখানেই হয়, বলুন, সে ব্যবস্থাও আমি করে দিচ্ছি।

রমলা আকর্ণ-বঞ্চিত হয়ে উঠে। চকিতে একবার কল্যাণের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

অমৃতভাষণে কল্যাণ অভ্যস্ত নয়। তবুও কোনমতে বলে ফেলে, ধন্যবাদ মিসেস মরিসন। তার কোন প্রয়োজন হবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা প্রকৃতিতেই একটু নিষ্ঠাবতী। এই সব বার-ব্রতকে তারা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই মেনে চলে। স্মৃতরাং বিশেষ ব্যবস্থা করলেও কোন ফল হবে না। উনি রাজি হবেন না। আপনি এ নিয়ে ক্লোভ করবেন না। আপনার সব ক্লোভ আমি একাই পুষিয়ে দিতে পারব। ওনারটাও না হয় আমাদেরই দেবেন।

মিসেস মরিসন হেসে বলেন, সেই ভাল। ওনারটাও আপনাকেই দেব। আপনারা শুধু কথাই নয়, কাজেও 'বেটার হাক'।

মিঃ মরিশন কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পেলেন জীবর কাছ থেকে, তুমি বাপু থাম। এখুনি হয় ত বলে বসবেন, হাউ ওয়াশাবফুল, হাউ গ্রেসাস। কিন্তু এ ওয়াশাবফুলও নয়, গ্রেসাসও নয়। এ হৃদয়বস্তা। জীবর প্রতি স্বামীর যে নিষ্ঠা, যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, এ তারই নিদর্শন। এ তুমি বুঝবে না। এ সব তোমার বুদ্ধির অগম্য।

মিঃ মরিশন বলেন, এ সত্যিই আমি বুঝব না ডোবা। কারণ হৃদয় বলে যে পদার্থটি আমার ছিল, সেটিকে অনেকদিন আগেই তোমায় দান করে বসে আছি।

আবার একটা হাতশ্রোত বরের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।

কথা বলে রমলা, এর পর আর কোন কথা শুনব না মিসেস মরিশন। মিঃ মরিশনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা যে আপনার প্রতি কতখানি, ঐ একটি কথায় প্রকাশ পেয়ে গেল। ডোবা স্মিতহাস্তে কটাক্ষ হানেন স্বামীর প্রতি।

লঘু হাস্ত-পরিহাসের মধ্য দিয়ে গল্প এগিয়ে চলে। মিসেস মরিশন রমলাকে এক সময় বলেন, সোমথ বয়স আপনার। কত বড়ীই স্বপ্নই না দেখবেন এ বয়সে। আমারেও একদিন ছিল।

রমলা পাণ্টা জবাব দেয়, ছিল না, বলুন এখনও আছে। এখনও যে চুল চুল বড়ীই স্বপ্ন দেখেন তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

—উহ। ভুল দেখেছেন আপনি। কোন স্বপ্নই আর চোখে ভেসে ওঠে না। তাই মনে হয়, কোন রকমে ভালয় ভালয় এখন দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি।

রমলা গম্ভীরমুখে বলে, শুনে ভারী দুঃখ পেলাম মনে। মিঃ মরিশনের জন্তে দুঃখটা আমার আবও বেশী। আহা বেচারী! হৃদয় দান করে আজ এ কি বিড়ম্বনা তাঁর ভাগ্যে।

মিঃ মরিশন প্রাণখোলা হাসি হাসেন। জ্বাক বলে, তুমি হেরে গেছ মেরী। মিসেস সেনের কাছে আজ তোমার পরাজয়।

—ফাজিল, একটা আস্ত ফাজিল মেয়েটা। মিঃ সেনকে বলে, তোমাকেও হৃদয়দানের বিড়ম্বনা ভোগাচ্ছি দাঁড়াও। মিসেস মরিশন হাসিমুখে কথাগুলি বলেন।

এই মধ্যে রমলার গল্পের ভাগীদার জুটল আরও এক জন। বালক মরিশনের সঙ্গে রমলার ভাব জমে উঠল বেজায়। একটি ভলি পুতুলকে বিরে তাড়ের আলোপের স্নেহপাত। বালকের কোতুল সৃষ্টি করবার জন্য রমলা আবিষ্কার করে এক আশ্চর্য ডলের গল্প। সেটা কুস্তকর্ণের তাই লক্ষকর্ণ। তার পর কুস্তকর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে গল্প বলে লক্ষকর্ণের। গল্প শেষ করে বলে, সেই বাচ্চুকে ডলটাকে সে উপহার দিতে

চায় বালককে। বালক সানন্দে রাজি হয়। বলে জন্মদিনে এ উপহার সে গ্রহণ করবে তার নতুন আন্টির হাত থেকে।

অল্পক্ষণের পরিচয়। অশচ এই মধ্যে বেশ একটা জীবির সম্পর্ক গড়ে উঠে ছোট এই পরিবারটির সঙ্গে। পরিচয় যখন সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বিধিনিষেধ ডিঙিয়ে আন্তরিকতার মধ্যে অল্পপ্রবেশ করছিল সেই সময় অকস্মাৎ চক্ষুস হয়ে উঠল রমলা। কল্যাণকে উদ্দেশ করে বাংলাতে বলল, বাড়ীতে আপনার ভাববার কেউ ন থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে। হয়ত এতক্ষণে তারা পুলিশে ধবর দিয়ে বসেছে। আপনার যদি আসাপ করবার সখ না মিটে থাকে আপনি বসুন, আমি উঠি।

অত্যন্ত রুচ কথ্য। আশাতের প্রচণ্ডতার কল্যাণ প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। তার পর এক মুহূর্ত রমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে, মানে?

রমলা এতটুকু ইতস্তত না করেই বলে, মানে সোজা। রাজিবাসের সংকল্প নিয়ে এখানে আসি নি। এবার আমার বিদেয় দিন, আমি উঠি।

এবার রুচ হয় কল্যাণ। বলে, স্বচ্ছন্দে। পায়ে বেড়ি দিয়ে আপনাকে ধরে রাখি নি আমি। পথ খোলা, সোজা চলে যেতে পারেন। রাজিবাস করবার জন্তে এখানে টেনে আনা হয় নি আপনাকে। আপনি কচি খুচিটি নন যে, ভালমন্দ বোঝেন না কিছু। অপাত্রে করুণা দেখাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছি আমি। স্মিট-ট্রেকই ছিল আপনার উপযুক্ত স্থান। ট্রামে ফেলে এলেই হ'ত আপনার উপযুক্ত শাস্তি।

রমলাও আহত হয়। মুহূর্তে বলে, তারই শোধ নিচ্ছেন এইভাবে?

—না। আমি হীন নই, বর্বর ইতরও নই যে, শরণাগত এক অসহায় মেয়েকে এই ভাবে শাস্তি দেব।

—কিন্তু প্রতিমুহূর্তই আমার যে অপমান বেড়ে উঠছে এ তো আপনার অজানা নয়। আমার কতি হ'ক, এই কি আপনার কাম্য?

কল্যাণ অসম্মতি জানায়। বলে, বিশ্বাস করুন। শুভ ছাড়া আমি অন্তত কামনা কারও করি নি কখনও। আপনারও করি না। চলুন, এদের কাছে বিদায় নিয়ে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি আমি।

দিনের আলো স্নান হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের পাল শেষ হয়। অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ বিদায়। এর মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। সবচেয়েই আন্তরিকতা।

প্রদীপ ধামে। এতক্ষণ একটানা বলে একটু রম নয় সে।



যুধিকা তাড়া দেয়, তার পর ? খামলে কেন, বল ?

প্রদীপ একটুখানি হেসে বলে, মধু পেয়েছ, না ? তার পর জানি না।

যুধিকা অমুনয় করে, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। লক্ষ্মীট বল, তার পর কি হ'ল ?

প্রদীপ বলে, তার পর ছ'জনে বেরিয়ে আসে পাশাপাশি ট্রামলাইনের উদ্দেশ্যে।

রমলা তার দুর্ভোগের কথা তুলতে যায়। কিন্তু কল্যাণ বাধা দেয়। বলে, থাক, ও-কথা নাই বা তুললেন। অপাত্রে করুণা বিতরণ করতে গিয়ে ও জিনিসটা আমারও বড় কম হয় নি। অসম্মানও ভোগ করেছি অনেক। এবার আপনার সব দুর্ভোগের ইতি হ'ক। আপনি দক্ষিণ দিকে পা বাড়ান আমি বাড়াই উত্তর দিকে।

—অর্থাৎ অনিষ্ট যা কিছু সব আমারই হ'ক। তাই দক্ষিণ দিকে মানে শমনসদনে ঠেলে দিচ্ছেন আমাকে।

কল্যাণ দাঁত দিয়ে জিত কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, ও-কথা বলবেন না। বলছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় আপনার বাড়ী। বাড়ীর কথাই বলছিলাম আপনাকে। আপনার অকল্যাণ হ'ক এ আমার কামনা নয়। তার পর একটু হেসে বলে, ক'দেবেই বা পরিচয়। এর পর আর আমাদের দেখা না হওয়াই স্বাভাবিক। বিগট কলকাতা নগরী। লক্ষ লক্ষ লোকের আবাসভূমি। তার মধ্যে আপনার আমার দেখা একেবারে অসম্ভব না হলেও, সম্ভাবনার খুব নীচু স্তরেই পড়ে। তবে কোনদিন যদি স্তরের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ নীচু স্তর উঁচু স্তরের পর্যায়ে আসে, আমাদের দেখা হয়, সেদিন সোজা মুখখানা ঘুরিয়ে নেবেন ডান দিকে। পরিচয়ের লেশমাত্র ইঙ্গিত প্রকাশ করবেন না চোখেমুখে।

রমলা মনে মনে আহত হয়। বলে, অভদ্র হবার শিক্ষা আমি পাই নি। তাই উপকারী ঋণ এ ভাবে পরিশোধ করবার রীতি আমার জানা নেই। যদি কোনদিন আবার আমাদের দেখা হয়, বুঝবেন আমি অকৃতজ্ঞ নই।

—তুনে সুখী হলাম। আপনার কল্যাণ হ'ক। আমার উত্তর-মুখো ট্রাম এসে গেছে। আপনারও দক্ষিণ মুখো ট্রাম ঐ আসছে। সুতরাং আর আপনার দুর্ভোগ বাড়ান উচিত হবে না। আচ্ছা নমস্কার। বলতে বলতে কল্যাণ এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

এইখানে প্রদীপ আর একবার ধামে। যুধিকা বিস্মিত হয়ে বলে উঠে, ওমা, তোমার গল্প শেষ হয়ে গেল নাকি ?

প্রদীপ হেসে বলে, শেষ আর হ'ল কই ? এমন চমৎকার গামীটিকে পেতাম কোথায়।

—তবে ? যুধিকা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে।

—বীবে। অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন। গল্পও ত একটুখানি জিকতে চায়। তাই কল্যাণকে ট্রামলাইন পার হতে দিয়ে সে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু জিকতে আর পেল কই ? কল্যাণ হয় ত লাইনটা পার হয়েছে গিয়েছিল, কিন্তু পিছন থেকে ডাক শুনে তাকে দাঁড়াতে হ'ল ফিরে। রমলা তার পাশে এসে জামার এক প্রান্তে টান দিয়ে বলছে, তুনেছন, কানেও কম শোনে নাকি আপনি ? তখন থেকে ডেকে ডেকে গলা মোটা হয়ে গেল আমার। লোকেরা যে কি ভাবছে জানি না। কল্যাণ তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার ? আবার সাইরেন নাকি ?

—না। এবার মিসেস মরিসনের গাড়ী। সোফার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে, মানে আমাদের পৌছে দেবার জন্তে। সোফার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে ঐখানে—বলে অদূরে দণ্ডায়মান বাকবাকে একখানা গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তার পর অসহায় কণ্ঠে আবার বলে, এখন কি করি বলুন ত ?

—কিছু না। শ্রেয় সাহেবের গাড়ী চড়ে বাড়ী চলে যাবেন।

—আর আপনি ?

—আমার ট্রাম এসে গেছে। তবে উত্তর মুখো আর হ'ব না। আপনার যখন হিল্পে একটা হয়ে গেছে তখন দক্ষিণ দিকেই যাব। কারণ আমারও পথ ঐ দিকে।

—তবে আমিও যাব না। আপনি সোফাকে বলে দিয়ে আসুন। একে সাইরেন বেজেছে, বাড়ীর লোকেরা এমনিতেই উদগ্রীব হয়ে আছে আমার জন্তে, এ অবস্থায় পরের মটরে করে যদি যাই তা হলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রশ্ন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে আমার।

—আমার প্রশ্ন কিন্তু আপনার চেয়েও ঢালাক। সে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা রাখে নি। বর্তমানেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।

কিন্তু করতে পারা গেল না কিছুই। সোফার রাজি হ'ল না। বলল, যেমসাহেবের আদেশ, এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে ঢাকরি খোয়াতে রাজি নয়। অতএব—।

কল্যাণ বলে, অতএব রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনবরক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। উঠুন গাড়ীতে।

গাড়ীতে উঠে রমলা বলে, আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না। এর পর অদৃষ্টে যে আর কি আছে, কে জানে।

কল্যাণ বলে, যে জানে সেই বলছে, অদৃষ্ট আপনার সুপ্রসন্ন। নইলে হঠাৎ কথাটা কেন মনে পড়বে আমার।

রমলা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ডাকায় কল্যাণের মুখের দিকে।

কল্যাণ বলে, ভবানীপুর চক্রবেড়ে থাকেন আমার দূরসম্পর্কে এক মাসীমা, মাসী চোখে দেখেনও কম, কানে শোনেনও কম। উপস্থিত সেইখানে নেমে বিদ্রোহ করব সোফার ব্যাটাকে। তার পর আপনি আপনার, আমি আমার।

এ ব্যবস্থা রমলা মেনে নেয়। সুতরাং সোফারকে সেই মতই গাড়ী চালাবার আদেশ দেয় কল্যাণ। চক্রবেড়ে বোডের উপর মাসীমার বাড়ী। গাড়ী থেকে নেমে কল্যাণ রমলাকেও নামায়। তার পর সোফারকে মোটা বকসিস দিয়ে বিদ্রোহ করে সে। রমলা মনে মনে খুশি হয় কল্যাণের সুবিবেচনায়।

ছোট বাড়ী আর কর্মবাস্ত মাসীমা। একেবারে মুখো-মুখি পড়ে যায় কল্যাণ—পিছনে রমলা। পাশ কাটাবার উপায় নাই। সুতরাং পায়ের ধুলো মাখায় নিয়ে বলে, দেখা করতে এলাম মাসীমা—আমি কল্যাণ।

রমলা এগিয়ে আসে। সে অকৃতজ্ঞ নয়, সুতরাং কল্যাণের মাসীমার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করতে রাজি নয়। তাই এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে মাসীমার পদধূলি মাখায় তুলে নেয়। কল্যাণ কিছু বলবার বা বোঝাবার আগেই কাণ্ডটি ঘটে যায়।

মাসীমা ক্ষণদৃষ্টি সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করে বলেন, কে কল্যাণ? এতদিন পর মাসীমাকে মনে পড়ল বাবা? সঙ্গে এটিকে? বোমা নাকি? দেখি দেখি, বলে তিনি রমলার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মুখখানি দেখবার চেষ্টা করেন। তার পর খুশি-ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন, আহা, বৈচে থাক মা, রাজরানী হও মা। ইয়ারে কল্যাণ, বিয়ে করলি, কিন্তু তোর গরীব মাসীমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলি না। কত আশা করেছিলাম যে দিদি নেই, তোর বিয়েতে বোঁ ঘরে তুলব আমি। সে আশা মিটল না আমার। যাক গে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোঁমাকে নিয়ে ওপরে চল। এস মা, এস, ঘরের লক্ষ্মী এস। কলি এসেছে। তাকেই ডাকি। সেই নিয়ে যাবে তোমার ওপরে। বলেই তিনি ডাক দিলেন, ওরে কলি, অ কলি। দেখে যা, কারা এসেছে, তোরা কল্যাণদাদা কেমন রাঙা বোঁ নিয়ে এসেছে।

কল্যাণ মহাশয় পড়ে। কিস্কিন্স করে কঠিন কণ্ঠে রমলাকে বলে, মাসীমাকে অতখানি ভক্তি কে দেখাতে বলেছিল আপনাকে? এখনি ত বলে বসবেন যে, অপমানের চূড়ান্ত হ'ল আপনার। কিন্তু এর জন্তে দায়ী কে? না, এখানে আর এক যুক্তও আপনার থাকা হবে না। কলি এসে পড়বার আগেই আপনাকে চলে যেতে হবে এখান

থেকে। ডান দিকে মোড় ফিরলেই ট্রামলাইন। পথ চিনে নিতে কষ্ট হবে না আপনার। আমিই না হয় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আসুন। বলেই সে মাসীমার অলঙ্কিতে সহসা রমলার হাত ধরে দরজার দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু রমলা ঝাবড়ে যায়। কেমন একটা বিহ্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একদিকে কল্যাণের মাসীমার কথাগুলি, অপর দিকে কল্যাণের এই অতি-ব্যস্ততা তার স্বাস্থ্যতন্ত্রী-গুলির উপর প্রতিক্রিয়া করে সেগুলিকে অবশ করে দেয়। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কল্যাণের মুখের দিকে। কিন্তু বৈশীকণের জন্ত নয়। সিঁড়ির মাথা থেকে কল্যাণীর কলকণ্ঠ ভেসে আসে, ওকি দাদা, বৌদিকে নিয়ে অমনভাবে টানাটানি করছ কেন? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি এলাম বলে। বলতে বলতে সে সিঁড়ি বেয়ে তবতব করে নেমে আসে একেবারে রমলার পাশটিতে।

রমলা চমকে উঠে। বিশ্বয়ান্তরিত তার মুখ দিয়ে শুধু একটা অশ্লুট ধ্বনি বার হয়ে আসে, কল্যাণী তুই।

—কুমি। কল্যাণী ধমকে পড়ে। তার পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠে, কি ব্যাপার বল ত? কল্যাণদার ঘর আলো করলি কে থেকে?

রমলা ঘেন বকে বল পায়। কল্যাণীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, উঃ, বাঁচলাম ভাই এতক্ষণে। চল, তোর ঘরে চল। সব কথা শুনবি এখন।

কল্যাণ ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আধঘণ্টা পর কল্যাণী ফিরে আসে। সারা মুখচোখ কোঁতুকহাস্তে ভরিয়ে তুলে কল্যাণকে বলে, অভিনয়টা বাইরের পর্দায় বেশ জমে উঠেছে দাদা। এখন মনের পর্দায় নামিয়ে আনতে পারলে শেষরক্ষা হয়।

কল্যাণ বলে, অভিনয় দিয়ে শেষরক্ষা হয় না কলি। অভিনয়ের স্থান চিরদিনই বাইরের পর্দায়, মনের পর্দায় নয়।

কল্যাণী দ্বিধা হেসে বলে, যাতে হয় সেইটাই আমি দেখতে চাই দাদা। কিন্তু তার আগে রমলার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমার জানা দরকার। রমলা আমার সহপাঠিনী। স্কুলের সঙ্গিনী, কলেজেরও এক বছরের সঙ্গিনী। কলেজের দ্বিতীয় বছরে আমার হ'ল বিয়ে। আমি কলেজ ছেড়ে গেলাম স্বস্তরবাড়ীতে। রমলা রয়ে গেল কলেজ বাড়ীতেই। বড় লোকের মেয়ে। খেলালী মেয়ে। পণ করল বিবাহ করব না বলে। পথ হ'ল মেয়েদের একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার। বাংলা দেশের মেয়েরা বড় অবলা। তাদের সবলা করবার জন্তই তার এ অভিযান। প্রতিষ্ঠান সচল যেখানে অর্থ সঙ্কল। সেই অর্থ সংগ্রহের ছরশায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘোরে ঘোরে।

আজও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিল। পথে এই দুর্ধোগ।

কল্যাণ শ্রিতমুখে বলে, সাইরেন তার এই মহান ত্রুটির অন্তরায় হ'ল।

কল্যাণী মুচকি হেসে বলে, তা হ'ল। তবে ভিক্টর কোলা শূণ্য রইল বটে, কিন্তু পূর্ণ হ'ল মনের কোলা।

রমলা বলে, সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এ ঋণ সে আর বাড়াতে চায় না। এখান থেকে কাছেই তার বাড়ী। চিনে যেতে কোন অসুবিধে হবে না। অতএব এখন থেকে তুমি মুক্ত।

কল্যাণ বলে, বাঁচলাম। এ মুক্তি আনন্দের মুক্তি। বোকা বহে বহে বাড়টাই আমার পড়েছে হয়ে। তোমার বন্ধুর অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের জয় হ'ক। আমি তার শুভ কামনা জানাচ্ছি এখান থেকেই। প্রদীপ থামে।

যুধিকা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। বলে, এ তারী অজ্ঞায় কথা। অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েই মামাবাবু সরে পড়লেন?

প্রদীপ বলে, রসো রসো। সরে পড়বার জো-টি কোথায়। মাসখানেক পরই চিঠি এসে হাজির। অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী লিখেছে কল্যাণকে নিজের বিপদের কথা।

—বিপদ? কিসের বিপদ? কোন এ্যাকসিডেন্ট নাকি?

প্রদীপ মুহূর্তে হেসে বলে, এ্যাকসিডেন্টই বটে, তবে শারীরিক নয় মানসিক। কর্তব্যবোধে রমলা মরিসন দম্পত্যিকে চিঠি লিখে জানাতে গিয়েছিল সেদিনের কৃতজ্ঞতার কথা। তাঁরা খুশি হয়ে পাঁচটা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাকে। শিশু মরিসনের জন্মদিন। আমন্ত্রণ সেই উপলক্ষেই। 'আপ্তি'র উপস্থিতির দ্বারা এ উৎসব সম্পন্ন না হলে তাঁরা খুশি হবেন না কেউ। সুতরাং এ উৎসবে ত্রী এবং ত্রীমতী সেনের উপস্থিতি অপরিহার্য। এ উৎসবে না এলে শুধু যে তাঁরা আন্তরিক হুঃখিত হবেন তা নয়, হয় ত মরিসন দম্পত্যিকেই ছুটে আসতে হবে তাদের কাছে। রমলার বত ভয় এইখানেই। এ অবতন যদি ঘটে কোনদিন তা হলে লজ্জার পরিসীমা থাকবে না তার। তাই সে অসুবোধ জানিয়েছে কল্যাণকে, সেদিনের মত এ বিপদেরও কাণ্ডারী হতে হবে তাকে। সেদিন সর্ব বিপদে সে যেমন আগলে রেখেছিল রমলাকে, আজকের এ বিপদেও সে যেন আগলে ধর্য তাকে। অবশ্য অশিবার্ষি কারণবশতঃ এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না রমলার পক্ষে। কিন্তু কল্যাণ যেন এ নিমন্ত্রণের মৰ্ধাটুকু রাখে। বালক মরিসনকে

একটা বান্ধুসে ডল দিতে প্রতিশ্রুত রমলা। একটা মনোমত ডল কল্যাণ যেন কিনে নেয় 'ডল-মার্কেট' থেকে। টাকা সে পাঠিয়ে দেবে লোক মারফত।

যুধিকা বলে, মন্দ কথা নয়। দায় আমার কিন্তু উদ্ধার কর তুমি। কিন্তু কি করলেন মামাবাবু?

—করবার আর কি থাকতে পারে নিজের গুণদোষে চপেটাঘাত করা ছাড়া। বড় লোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা মানে পুরো এক মাসের মাইনেটাই পকেট থেকে খসে। এইটাই কল্যাণকে অভিজ্ঞত করে ফেলল বড় বেশী। বার বার আক্ষেপ করে বলতে লগল, এ মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে এ বোকামি সে কেন করতে গিয়েছিল সেদিন।

যুধিকা জিভ আর তালুর দ্বারা মুখে চুক চুক ধ্বনি তুলে বলে, আহা, সাইরেন তোমারও যদি এমন একটা ঘটকালি করত তা হলে আজকের গুণদোষে তোমার কি বাহারই না খুলত। মোতির মা ভুল করেছে ভাতী।

—করেছেই ত। সেদিন গুণদোষের অমন বাহারের জন্তে মামা কি পেলে জান? এক রাজকন্তে আর অর্ধেক রাজত্ব। কারণ বর্তমানের মামা তার বাপ মায়ের একটি মাত্র মেয়ে। এমন ষড়ৈশ্বর্যমণ্ডার জন্তে আমি একটা কেন, বিশটা গালেও অমন বাহার খোলাতে রাজি আছি। মোতির মা এ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। উঃ! তাকে একবার পেলে—।

—বেশ করেছে। খুব বাহাদুর তুমি। এখন বল, কি হ'ল তার পর?

—তার পরের ঘটনাতেই বাস্তবতায়। দু'দিন ধরে মনের জালায় ছটফট করে বেড়াতে লাগল কল্যাণ। তৃতীয় দিনে সে চলল কল্যাণীর সঙ্গে পরামর্শ করতে আর রমলাকে তার মনের অনিচ্ছার কথা জানাতে। কিন্তু বেকরবার মুখেই বাধা পড়ল। কড়া নেড়ে একেবারে ধরে এগে ঢুকল রমলা। মুখ তার ফ্যাকাশে; উদ্বেজনায় শরীর কম্পমান।

দরজা খুলে দিয়ে কল্যাণ অবাক হয়ে যায়। বলে, আপনি? কি ব্যাপার?

রমলা একেবারে ভেঙে পড়ে, আমায় বাঁচান কল্যাণবাবু, বড় বিপদ আমার।

কল্যাণ বলে, জানি। আপনার চিঠি পেয়েছি। সেই জন্তেই বেরোচ্ছিলাম কল্যাণীর সঙ্গে একটা পরামর্শ করবার জন্তে।

রমলা বলে, না, আপনি জানেন না। চিঠি যখন পেয়েছেন তখন বিপদ ছিল না। ছিল তারই একটা ইজিত। এখন ইজিত মূর্ত হয়ে উঠেছে। লক্ষ্যবিন্দু আবির্ভূত হয়েছে।

কল্যাণ বুঝতে পারে না। অব্যবহার মত প্রেরণ করে, আবিভূত হয়েছে, মানে ?

—মাফন, মরিসন কোম্পানী সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাড়ী। মিষ্টার, মিসেস আর মাষ্টার সব মরিসনই এসেছেন সেখানে।

—বলেন কি ?

—তারা খুঁজছেন— ?

—খুঁজছেন ? কাকে ? বলুন, চূপ করে থাকবেন না ? কাকে খুঁজছেন তাঁরা ?

—আপনাকে আর আমাকে দু'জনকেই খুঁজছেন তাঁরা। আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করছেন বাবার সঙ্গে। ধবর পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি চুপি চুপি।

কল্যাণ তাকিয়ে থাকে নির্বাক বিষয়ে। কোন কথাই বার হয় না তার মুখ দিয়ে।

রমলা আকুল হয়ে বলে, এখন কি করি আমি বলে দিন। সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। কি করে মুখ দেখাব সেখানে। তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

কল্যাণ ধীরে ধীরে বলে, আমি কি করতে পারি বলুন ?

—আপনি পুরুষ। বুদ্ধি দেবেন আপনি। আর সেই বুদ্ধিমত কাজ করব আমি। বলুন, কি করা উচিত আমার ?

কল্যাণ বলে, ভুল যা হবার হয়ে গেছে গোড়াতেই। তখনই মরিসন দম্পতির ভুল ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু এখন হেরী হয়ে গেছে অনেক।

—তা হলে ? রমলা হতাশ হয়ে পড়ে।

কল্যাণ বলে, এখন অবার নতুন করে ভুল ভাঙতে হবে আমাকেই। সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমার বলতে হবে তাদের এর জন্তে দায়ী আমি আর আমার অসাবধানতা।

রমলা যেন অকুলে কুল পায়। সাগ্রহে অহুসন করে বলে, তা হলে আপনি চলুন।

কল্যাণ অবাক হয়ে যায়। বলে, যাব ? কোথায় ?

—কেন, আমাদের বাড়ী। বাবার কাছে সব কথা খুলে বলবেন চলুন। অবিস্বাসিনী মেয়ে হয়ে আমি বৈচে থাকতে পারব না।

—আমিও তা বধি না। কিন্তু—।

রমলা ব্যাকুল হয়ে বলে, না, কিন্তু না। কোন আপত্তিই আমি শুনব না। হোহাই আপনারকে, আপনি চলুন। তা না হলে আপনার দ্বিবি বলছি এখান থেকে সোজা গলায় গিয়ে ঝাঁপ দেব আমি।

কল্যাণ বিব্রত বোধ করে। হয়ত একটু বা ইতস্ততও করে।

রমলা ধৈর্য হারায়। কল্যাণের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এসে বলে, এখন ইতস্তত করবার সময় নয়। আমার মান, আমার সম্মান এখন সব কিছুই নির্ভর করেছে আপনার ওপর। হোহাই আপনার, আপনি আমার রক্ষা করুন কল্যাণবাবু। এই আপনার নামে শপথ করে বলছি, ভবিষ্যতে কোনদিনই অব্যবহার হ'ব না আপনার, অসম্মানও করব না। জানি না, এতক্ষেণে বাবা মা কি না ভাবছেন আমার সম্বন্ধে। ভাবছেন কুলটা মেয়ে—। উঃ, মাগো ! রমলা হ'হাতে মুখ ঢাকে।

কল্যাণ ব্যস্ত হয়ে বলে, বেশ আমি গেলে আপনার মান, আপনার সম্মান যদি রক্ষা পায়, আমি যাচ্ছি, চলুন। বলতে বলতে সে রমলার পাশে সরে আসে।

যুধিকা গালে হাত দিয়ে বলে, মাগো, কী কাণ্ড দেখ। অত বড় মেয়ে, লজ্জা করল না এতটুকু। আমরা হলে ত মরে যেতাম লজ্জায়।

—এ তোমরা নও তাই রক্ষে। এ অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী, চিরকুমারী ব্রতধারিনী শ্রীমতী রমলা সোম। কিন্তু তাকেই বা দোষ দেব কেন। এ কি লজ্জা করবার সময়। জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন লজ্জা-ভয়ের বালাই থাকে না। রমলার জীবনে এমন মুহূর্তই এসেছিল সেদিন।

—কিন্তু এর পরিণতি হ'ল কি ?

—সে ত বুঝতেই পাচ্ছ আজকের দু'জনার আনন্দধন জীবন দেখে। রমলার বাবা বিচক্ষণ ব্যক্তি। রাগও দিলেন বেশ বিচক্ষণ। এক ঢিলে দু'পাখী মারলেন। মেয়ে পণ করেছিল বিবাহ করব না বলে। তারই সদৃশি করে নিলেন এই সুযোগে। মেয়েকে বললেন, যে তোমার সম্মান সম্মম রক্ষা করেছে মা অসময়ে, যার কাছে তুমি প্রতিশ্রুত অব্যবহার হ'ব না বলে, তার অসম্মান হ'ক এ আমি চাই না। চাই না যে মরিসন-দম্পতি হাজার হ'ক তারা বিদেশী লোক—ক্ষুব্ধ হ'ক তোমাদের আচরণে। আর এ বিধিনির্দিষ্ট জিনিস। এর ওপর হাত নেই কারও। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তোমাদের। তিনিই যখন যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন, তখন একে মেনে নিতেই হবে তোমার। তুমি জমত কর না মা, কল্যাণ তোমার অমুপযুক্ত হবে না। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার মাও আশীর্বাদ করছেন, তোমরা সুখী হবে দু'জনে। বালক মরিসনের জন্মদিনে তোমরা উপস্থিত থাকতে পারবে সেদিনকারই পরিচয়ে।

যুধিকা বলে, সাইয়েনের বাহাছরী আছে বল ?

প্রদীপ উত্তর দেয়, আছে বলেই ত মোতির মায়ের ওপর আমার এত আক্রোশ। বিয়ের রাতে কনে-চন্দন পরাতে

পর্যন্ত এই কথাটাই চুপি চুপি জিজ্ঞাস্য করেছিল কল্যাণী, কোনটি বেশী মিষ্টি যে তাই ক্রমি? শঙ্করানি, না সাইবেরনের ধনি?

—কি উত্তর দিয়েছিলেন মাসীমা? যুথিকা প্রশ্ন করে সকৌতুকে।

রমলাও উত্তর দিয়েছিল তেমনি ভাবে, আজকের দিনে শঙ্করানি নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিনের সাইবেরনের ধনিটাও কম মিষ্টি ছিল না ভাই, কলি।

যুথিকা বলে, মাসীমাও ত ফাজিল মেয়ে বড় কম নয়!

প্রদীপ বলে, সেদিন ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই। বিবাহের পর বদলে গেছেন একেবারে। এখন একেবারে মাটির মানুষ। কে যেন ভেঙে গড়েছেন নতুন করে। সেদিন

বিপদের দিনে যে কথা দিয়েছিলেন মাসীবাবুকে, এখন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন সে-কথা। মাঝে মাঝে তাই ভাবি, মোতির মা না হয়ে সাইবেরন যদি এমনি ষটকালি আমারও করত, তা হলে এমনি অনাবিল, এমনি নিবিরোধী জীবন আমিও যাপন করতে পারতাম।

যুথিকা রাগ করে। চোখমুখ ঘুরিয়ে অপক্লপ ভঙ্গিমায় বলে, আ হ-হা, তুমি আর চণ্ড কব ন' বাপু। নিবিরোধী জীবন? কি এমন চিরবিবিরোধী জীবন তোমায় যাপন করতে হচ্ছে শুনি যে, সব সময় খোঁটা দাও মোতির মার?

রূপ-রঞ্জিনী নয়, রাগিনী মূর্তি। পরস্পর এই মাহকতা-মাখান রাগিনী মূর্তি ভাবী ভাল লাগে প্রদীপের। তাই মুখে আর কোন কথা বলে না। শুধু মনে মনে এই মাধুর্যটুকু উপভোগ করে আর মুহ মুহ হাসে।

## আসছে ভালো সময়

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আসছে ভালো সময়, বাছা,

আসছে ভালো সময়।

হয় তো মোরা ঝাঁচবো না কেউ দেখতে যে সেইদিন,

ধর! কিন্তু বাক্মকিবে সারা রাত্রিদিন

আগামী সেই সুসময়ের আলোয়।

কামান-গোলা লাগতে পারে সত্য প্রতিষ্ঠায়,

যুক্তি কিন্তু শক্তিশালী অনেক বেশী তার;

মোদের যুদ্ধ জিতবো মোরা এদের সাহায্যেতে —

অপেক্ষাটা একটু করো আর!

আসছে ভালো সময়, বাছা,

আসছে ভালো সময়।

করবে কলম তরবারির স্থানটি অধিকার,

শক্তি নহে—জায়ের দাবী কর্তা হবে তার

আগামী সেই সুসময়ের আলোয়।

'নেশন'গুলো করবে না আর ঝগড়া পরস্পরে,

কাহার চেয়ে কে বলীয়ান করতে প্রমাণ তার,

মানুষ কত করবে না বধ তুচ্ছ গৌরবেতে—

অপেক্ষাটা একটু করো আর।

আসছে ভালো সময়, বাছা,

আসছে ভালো সময়।

শিশুরা আর করবে না কেউ মোটেই পরিশ্রম

মাটির নীচে কিংবা উর্দ্ধে থাকতে তাদের দম,

আগামী সেই সুসময়ের আলোয়,

স্বাস্থ্যপূর্ণ মাঠে খেলা খেলবে ততক্ষণ

যাবৎ দেহ মনটা শক্ত না হয় সবাচার;

লেখাপড়া করবে তারা সকলে এক সাথে —

অপেক্ষাটা একটু করো আর!

আসছে ভালো সময়, বাছা,

আসছে ভালো সময়।

আমরা প্রতি পুরুষ-নারী আনতে সুদিন ভবে

বধাপাধ্য সহায়তা করবো সর্গোবধে,

আগামী সেই সুসময়ের আলোয়।

ক্ষুদ্রতম সাহায্যটা সঠিক ভাবে দিলে,

আবেগটাকে করবে প্রবল বড়ই চমৎকার;

একদিন তা হবেই হবে ভীষণ শক্তিশালী—

অপেক্ষাটা একটু করো আর।

চার্লস ম্যাকের—'The Good time coming' অবলম্বনে।

# জীবনে আকস্মিকতা

## শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

আমরা একাধিক ক্ষেত্রে শুনেছি পাই—অমূকের জীবনে মুহূর্তের মধ্যে একটা বিঘাট পরিবর্তন এসে গেল। সত্যিই কি তাই? কারুর জীবনে মুহূর্তের মধ্যেই একটা স্থায়ী পরিবর্তন আসা কি সম্ভব?

হেগেলের নৈসর্গিক দ্বন্দ্ববাদ করারবাকের মাধ্যমে দার্শনিক রূপ পরিগ্রহ করে। মাস্ত্র' সেই তথ্যকেই যাচাই করে দেখলেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁর বিজ্ঞানী মনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইতিহাসের উত্থান-পতনের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখে তিনি এই অভিজ্ঞতাকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক রূপ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। পরন্তু দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা থেকে সূত্র করে সমাজ—তথা জাতির জীবনে পঞ্চাঙ্গ তা' প্রয়োগ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন তিনি।

তাঁর মূল বক্তব্য এই—দু'টি পদস্পর্শ-বিরোধী ভাবধারার অবিরত সংঘর্ষে তৃতীয় একটি নবতর ভাব বা তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সর্বিশেষ বিশ্লেষণে তিনি বহুবিধ জাগতিক তথ্য পরিবেশন করেই এই প্রাতি-পাদিক তত্ত্বটিকে জনসাধারণের বোধগম্য করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মৌলিক সত্যটিকে একটা মনগড়া উদাহরণ দিয়ে এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। যেমন, একশ্রেণীর লোক বরাবর মনে পোষণ ও বাক্যে প্রচার করে আসছেন—ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ ও নিয়ামক। আবার অপর একশ্রেণী বলে আসছেন—ঈশ্বর বলে কোনও চরম স্বীকৃতি কিছুই নেই; জ্ঞানের বিকাশ আমাদের এখন পর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত হয় নি, তাই কলনাত্মক মন একটা মানসিক আশ্রয়-ভূমি নিষ্কাশন করে, মানস-পরিচরণের পরিধিকে বোধের আয়ত্তে রেখে, আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং এ ভাবেই সে বিশ্ব-রহস্যের সমাধান করতে চেষ্টা করে। এই দু'টি পদস্পর্শ-বিরোধী মত যে সমাজে বর্ধন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে সেখানেই এই অস্তি-নাস্তির চরম দ্বন্দ্ব জন্মলাভ করেছে প্রতিবাদ। সেই নবোত্তরণ-যুগের দার্শনিকগণ বলে বেড়ান, ঈশ্বর কে, তা' আমরা জানি না, জানবার দরকারও নেই। গতিই জীবনের একমাত্র উপলক্ষ সত্য ও পরীক্ষিত তত্ত্ব। জগৎ ও জাতির যাঁতে গতি অব্যাহত থাকে তা'ই সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যদর্শনের পূর্ণতা বিধানই মানব-জাতির একমাত্র কর্তব্য—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ব্যাখ্যারই প্রচলিত নাম (যথার্থ কিনা সন্দেহ) প্রগতিবাদ।

এটা গেল দর্শনের দ্বন্দ্বিক অধ্যায়ের তাত্ত্বিক দিক। তাছাড়া বাস্তব জীবনে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়েও একে বিচার করা হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব একই সত্যে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন, সাম্রাজ্য-তন্ত্র ও চাকরাণ-প্রথায দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিয়েছে

বৈজ্ঞানিকের আধিপত্য। আর সর্বস্বাধীন ও আত্মস্বাধীনতার পরস্পর-দৃঢ় সংঘাতের পরিণতিতে মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান—ইত্যাদি।

যাক, সে সব তত্ত্বকথা ছেড়ে এবার আমরা মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি। তবে কি আকস্মিকতা বলে কোনও সত্তা নেই? স্থান, কাল ও শূন্যের ত্রিবন্ধনে জীবন-প্রবাহের যে ঘূর্ণাবর্তের অল্পপ্রধারা জীবনকে ঘিরে বইছে প্রতিনিয়ত, সে সব কি কবিরচনায়? এর উত্তরে বলল, না মশাই, সে সব আবর্ত ও প্রতিক্রিয়াই বাস্তব সংঘটন। সে সবের কোনটাই কলন-বিলাস বা স্বপ্ন-সম্ভাব নয়। এ বিষয়ে আমরা সকলেই সুল ইজিয়াশ্বরী বৃহস্পতি ও চার্লসকেব অন্তর্গামী হতে বিধাবোধ করি না। তবে কথাটা হচ্ছে এই যে, মুহূর্তেই ঘটুক কি দীর্ঘদিনের ব্যবধানের ঘটুক, কোন ঘটনাই হঠাৎ ঘটে না। যন্ত্র বিকল হয়ে দুর্বিনী ঘট বা রাজপথে চলতে চলতে “পা পিছলে আলুর দম” হওয়া প্রভৃতির কথা এই আকস্মিকতার প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করতে চাই না। কারণ ও সব উচ্ছ্ব ঘটনার বিজ্ঞারিত আলোচনা করতে গেলে নিবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি করতে হয়। তাই এমন ধরনের আকস্মিকতার কথা আলোচনা করব যাতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অতি ক্ষুদ্র পরিসরে স্বল্প-কথায় পরিবেশন করা সম্ভব হয়।

অতি-প্রচলিত একটি জনশ্রুতি নিয়েই প্রসঙ্গটির অবতারণা করছি। সুপ্রসিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ অমুক লালাবাবুর নাকি পাণ্ডী চেপে মহলেদ জমিদারীর তদারককে যেতে যেতে একটি সাধারণ কথা থেকে যেন দারুণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। কথাটি নাকি আবার তাঁকে উদ্দেশ্য করেও বলা হয় নি। তাঁরই প্রজ্ঞা—এক রজক-গৃহস্থের আত্মনা দিয়ে তাঁর পাণ্ডী চলছিল দিনের পড়ন্ত-বেলায়। গৃহস্থাত্মকে উদ্দেশ্য করে ঘরের কেউ নাকি ঠিক তখনই বলছিল, “উঠলে না বাবা, বেলা যে গড়িয়ে গেল; আর ঘুমিয়ে কাটালে বাসনার আন্তন দিবে কখন?”

বাস। ঐ কথাগুলি কানে আসতেই লালাবাবুর চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠল। তিনি কথাটাকে হৃদয়ে দৈনন্দিন-জীবনের সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করে দার্শনিকের মধ্যে বিচার করলেন। পরবর্তী ইতিহাস এইরূপ—এতে রজকের কলার বাসনা পোড়ান হয়েছিল কিনা আমাদের কাহারাও জানা নেই, তবে এতে লালাবাবুর পার্থিব বাসনা নাকি চিত্ততরে ভস্মীভূত হয়েছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর উত্তর-জীবন ও কীর্তিকলাপ উপযোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে আসছে।

একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে লালাবাবুর জীবন-সারাহে



ভোগ-প্রার্থনার অবসিত লগ্নে বাসনায় (অবশ্য বজ্রকেব কথাই বাসনা) অগ্নি সংযোগ করার ইঙ্গিত তাঁকে অভিমাত্রায় ব্যাকুল করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ধারা কত শত কথাই ত হামেশা আমরা শুনে থাকি। কই, কাহারও ত তেমন মনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করে না।

প্রশ্ন এই—লালাবাবু জীবনে তবে এমনটি হ'ল কেন?

তার জবাবে বলব—লালাবাবু জীবনে ঐ পরিবর্তন কিন্তু কোনও আকস্মিকতার সৃষ্টি নয়। আর নেহাৎ তাঁকের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, আকস্মিক প্রভাবের এক মাহেস্ত্র মুহূর্তই চিত্তের ঐ পরিবর্তন এসেছে, তবে বলব—তা হলে সেই চিত্তবিক্ষোভ কখনও স্থায়ী রূপ গ্রহণ করতে না। হু'দিনের মকট বৈরাগ্যেই পর্যাবসিত হ'ত মাত্র। কিন্তু লালাবাবু এমনটি না হয়ে, সেই পরিবর্তন অমুহূর্তে কাঁধাকদী হয়েছিল।

এই আকস্মিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা আবার সেই বৃন্দিক সংঘর্ষের তত্ত্ব কিংবা আসছি। দু'ধের দ্বিধে অবস্থায় গতির (ঘূর্ণনের) সঞ্চায় হলে দু'ধের বিকার হয়। অর্থাৎ পূর্বেকার আকার থেকে দু'ধ বিশেষ একটি অঙ্গ আকার পায়। এই আকৃতির বিকৃতিই রূপান্তর। দু'ধ তখন আর দু'ধ থাকে না, নবনীরিত তত্রু অর্থাৎ উপরিভাগে মাখনসম্মত ঘোলে পরিণত হয়। আবার অপর একটি উদাহরণ ধরা যাক—যেমন, শীতল জল। শীতল জলে উত্তাপ সঞ্চারিত হলে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এ ভাবে প্রাকৃতিক সব বস্তু উপাদানেই বিজাতীয় অপর কোনও শক্তির সংঘর্ষ বা দিশ্রণে বিশেষ বস্তুটির বা উত্তর বস্তুরই রূপান্তর হয়। পদার্থের সম্বন্ধেই হলে একাকার হয়ে যায়, যেমন জল ও দু'ধ, আবার পদার্থের সংঘর্ষেই হলে উভয়ের রূপান্তর হয়ে তৃতীয় একটি নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়—যেমন, জল ও উত্তাপ।

এখন কথা হ'ল পদার্থের সংঘর্ষেই বস্তুত্বের এই দুঃস্থান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন সংঘর্ষের একটা নির্দিষ্ট সীমাত্তে আসলেই সম্ভব হয়, নতুবা নয়। জলের সঙ্গে উত্তাপের সংগ্রাম বাধিয়ে দিলেই ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্প হয় না। ঐ ধর্মের সঙ্গে জলের স্ফুটনাক পর্যাপ্ত অপেক্ষা করতে হয়। গোলা চোখে আবার সেই স্ফুটনাক পরীক্ষার উপায় নেই তাপমান যন্ত্র ভিন্ন। কিন্তু স্ফুটন জলে বাষ্পের সৃষ্টি হওয়া মাত্রই বিনা যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই খোলা চোখেই তা আমরা বুঝতে পারি। এ ভাবে প্রকৃতির রাজ্যেও নিত্যমুহূর্তে আনাড়ী দৃষ্টি দিয়েই সর্বত্রই আমরা বৃন্দ-প্রসূত সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে সব বিশ্লেষণ করে বার্থ্য তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছি না।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও আকস্মিক সম্মতন সম্বন্ধেও সেই একই কথা। অর্থাৎ যে কোনও ঘটনার উদ্ভব বখনই এবং যে ভাবেই হ'ক না কেন, তা কোনও না কোনও বৃন্দেই চরম পরিণতি। তবে আমরা অনেক সময়ই সে সব পরম্পর সংঘর্ষের গতি-প্রকৃতি সঠিক ঋঁচ করতে পারি না। আবার, ক্ষেত্র বিশেষে

বৃন্দমান তত্ত্ব দু'টি ঋঁচ করতে পারলেও সংঘর্ষের চরম পর্যায়ের মুহূর্তটির ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হই না। তাই আমরা প্রায়ই লোককে বলতে শুনি—“একবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে গোলবাজির মত ব্যাপারটি ঘটে গেল, মশাই।”

ভূয়োদর্শন, তীত্র অমুদক্ষিৎসা, বিজ্ঞানীমূলভ বিশ্লেষণী প্রতিভা, ঐতিহাসিকমূলভ বৈধা প্রভৃতি গুণাবলীর একত্র সমাবেশ হলেই সংঘর্ষের এই চরম মুহূর্তের ইঙ্গিত ধরতে পারা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারের যান্ত্রিক উপায়ে লব্ধ কোনও তথ্যের মত সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে দিন-রূপ জানিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কখনই সম্ভব নয়। বীক্ষণাগারের অতি সীমাবদ্ধ পরিবেশ সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্তে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নিঃসীম একটি বিশাল সমাজ-জীবনের পরিবেশ যান্ত্রিক সূইচের মত কোনও ব্যক্তিবিশেষের করায়ত্ত হতে কখনই পারে না। তাই সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণে কোনও একটি মনোমত পরিবেশ বিশেষ একটি সামাজিক প্রভুত্বের প্রভাবে স্থায়িত্ব দিয়ে কিছুদিন রাখতে প্রয়াস করলেও সেই দুর্য্য প্রতাপের বন্ধপথে শত শত বহিরাগত প্রভাবে তা ক্ষুদ্র হয়ে যায়। মানস-ভূমির লেবরেটারির দৌধ কোনও দিনই গড়ে উঠতে পারে না কোনও চলমান সামাজিক বা দৈনন্দিন তত্ত্ব বিচারে। তাই, অতীতের অমুরূপ ঘটনার বিশ্লেষণ থেকেই আমরা এই দ্বন্দ্বিক তত্ত্বের বাস্তবায়িত রূপ খুঁজে বের করতে বৈদ্য উৎসাহ বোধ কবি এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই।

ইতিহাসেব পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু ঘটনার কখনও পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই, পুরাতন অভিজ্ঞতা আমাদেরকে কেবল বৃন্দবাদের মূল সূত্রটিকেই ধরিয়ে দেয়—কতকটা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মত। শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, গণিতের বিশেষ বিশেষ রাশিগুলির পরিবর্তে আমাদেরকে বিভিন্ন তথ্য সেই সূত্রের ছকে বসাতে হয়। তার পর গাণিতিক নিয়মে অঙ্ক করে গেলেই হ'ল। ছকের তথ্যগুলি পরিবেশনের ক্রটি-বিচ্যুতির উপরই অন্তরকালের কসাকস নির্ভর করে। এবং খাটি কথা এই যে, সে সব ক্ষেত্রে তথ্য ক্রটিপূর্ণ অল্প বিস্তর থাকবেই থাকবে। তাই গণিতের ‘প্রেক্ষিণান’ বা নির্ভুলত্ব সমাজ-বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে কোনও কালেই সমতা বক্ষা করে চলে না।

আবার উক্ত লালাবাবু কথাই ফিরে আসছি। লালাবাবু জীবনী সম্বন্ধে হয়ত আগাগোড়া ইতিহাস বখাবধ কিছু লিপিবদ্ধ নেই। তবে বখন থেকে তিনি আধ্যাত্ম জগতে একজন ববেধ্য ব্যক্তি বলে পরিগণিত হলেন, তখন থেকে তাঁর অনেক ভক্তই হয় ত তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের অনেক কথাই লিখে থাকবেন। ঐতিহাসিক অমুদক্ষানে হয় ত আমরা এমন সংবাদও পেতে পারি যে, তাঁর গার্হস্থ্যপ্রায়ের দৈনন্দিন-জীবনে এমন কোনও দুঃস্থান ঘটনা ঘটেনি বা তাঁর পরবর্তী ভাগবত-জীবনের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত



দান করতে পারে। এমনকি প্রাক-সন্ন্যাস জীবনে ঘোর বৈপরীত্য লক্ষিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

উপরে আমরা দেখিয়েছি যে, স্বন্দেব পরম্পর বৈপরীত্যের চূড়ান্ত সংঘর্ষের পরিণতিতেই তৃতীয় একটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথা স্পষ্ট করেই বলব যে, বৈপরীত্যের পরম্পর সংঘর্ষ যদি তুলা-মুলা অর্থাৎ উভয়তঃ সমান না হয়, তবে সেই সংঘর্ষে লক্ষণীয় নবতর কোনও সৃষ্টি হয় না। সংগ্রামের দুটি ভাবেই মধ্যে যদি একটি অধিকতর বলীয়ান হয় তবে তৃতীয় নূতন একটি সজ্জটন না হয়ে উভয়ের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী ক্রিয়াটিই অপরাটকে নিশ্চিহ্ন করে সর্গোদয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। মনোবী ডার্বিনের অভিযুক্তিবাদের সমর্থনে—“অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং পরিণামে যোগ্যতাব্যব উদ্বর্তন”—প্রাণী জগতে এই অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। স্থূল জৈব জগতের পরিধি ছাড়িয়ে সূক্ষ্মমন-শীলতাপূর্ণ মানব-রাজ্যে এই উত্তরণ-নীতি কতখানি কাব্যিকবী সে সম্বন্ধে প্রচুর মতবৈধ অজ্ঞাপি বিদ্যমান। বর্তমান নিবন্ধে সে আলোচনা মুখ্য প্রতিপাদ্য নয় বলে শুধুমাত্র আমাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে কিছুটা প্রাসঙ্গিক বলে একটুখানি ইঙ্গিত করেই যাব।

হ্যাঁ, লালারাবুর লিপিত জীবনবৃত্তান্ত যেকোনই হোক না কেন, তাঁর নিভৃত জীবনের অলিখিত কার্যকলাপ সমীক্ষা করার সামর্থ্য যদি আমাদের থাকে তবে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব, তিনি আটপন্থর মূলতঃ দ্বৈতবাহুগামী ও আধ্যাত্মপরায়ণ নিশ্চয়ই ছিলেন। শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক আবরণ তাঁর মৌলবৃত্তিকে চেপে রাখার সাধারণের চোখে তার বৈষয়িক রূপটাই ফুটে উঠেছিল। অন্তরেব অনির্বাণ বৈরাগ্যপ্রবণতা ও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা স্বজনগণের চক্ষু-চক্ষুর অগোচরে থেকেই দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। স্বয়ংকন্দরের উদাসী একতারার অনাহত-ধ্বনি এতদিন তাঁকে বিষয়-রসের মত্ততার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করে তুলত মাত্র। ঐ সৌন্দর্যের স্থান-কাল-উপযোগী নিভৃত পরিবেশে তা' প্রাতিষ্ঠানিক পদমাণ্ডকে চকস করে তুলল। উদাসীর একতারা এবার তাঁকে সুযোগ বুঝে গুনিতে দিল—

মন এবার তুই চিনে বে বে আপনায়ে,

এবার ওয়ার ঘুঁস কেনে,—কিসের অধেষণে ?

কিসের বিত্ত, কিসের সংসার—সকলি যে যায়ার আগার  
বুঝেও তুই বুঝি না যে—হুংগ রইল মনে।

এসেছিলি আপন কাজে, দিন কাটালি সত্তের সঙ্গে,

—সায় করিলি তায়ে

হায়, চিনবি তবে সব আপনায়ে।

বাসনা-সাগরে রইলি ডুবে—মণি-মুক্তার অসীম লোভে

মনের সুরে মধুর স্বপ্নে, ডাকছি তোরে বারে বারে ;

ওনেও তুই ওনলি না যে, বিষয়-রসের বন্ধনে।

মাহুয মনশীল প্রাণী। মানবের পরিচয় ও প্রবৃত্তি মুখ্যতঃ

জৈব ধর্মের তাগিদেই পরিচালিত হয় না—এ কথা স্বীকার করতে

অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। প্রতিটি মাহুযের অদৃশ্য ও অলিখিত জীবনের গূঢ় পর্য্যালোচনা করলেই তার মানসিক ও অবচেতন রাজ্যের সংবাদ পাওয়া সম্ভব। শুধু মাত্র তখনই মাহুযের আধ্যাত্মিক এষণার প্রবৃত্তির সন্ধান মেলে। প্রকৃত জীবনের ঘটনাপঞ্জীর উপকরণ নিয়ে মানব-চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ কখনই সম্ভব নয়। ইতিহাসের চরিত্র বর্ণনার বা সাহিত্যের সমালোচনার ঐ সব বাহ্যিক উপকরণ ভিত্তি করেই ‘খিসিন’ লিখতে হয় সত্য, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের মূলগত তাত্ত্বিক তথ্য নির্ণয়ে ঐ সব উপকরণ বিশেষ মূল্যবান নয়।

দ্বন্দ্ববাদের উদার সমর্থক—এক কথায় বস্তুবাদী দার্শনিক বিশ্লেষণকর্তা ফরারবাক্ মানবের শরীর ও মনের এই দ্বৈত সত্তার কথা জোর করে বলতে গিয়েই মার্কসপন্থীদের বিরাগভাজন হয়ে-ছিলেন। স্বর্গতঃ মনোবী এম, এন, বারথ ও তাঁর এই সত্যবোধকে ব্যক্তি করেই টালিনপন্থীদের মনঃপুত হতে পাবেন নি।

প্রসঙ্গক্রমে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মনে একরূপ ভাব পোষণ করে কার্যতঃ কোনও ব্যক্তি অজ্ঞরূপ আচরণ করতে পারে কিনা। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, দার্শনিক পরিভাষায় মনের জটিল সংজ্ঞা নিয়ে আমরা এক্ষেত্রে সন্তোষের ব্যায়াম করতে চাই না। তাই উপযুক্ত প্রশ্নের স্বরূপে আমরা সকলেই একবাক্যে বলতে পারি—হ্যাঁ, মশাই, তা সম্ভব—শুধু সম্ভবই নয় সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। মনের সঙ্গে দেহের নৈকট্য সম্বন্ধ থাকলেও মনোবৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণয় দৈনিক চর্চার দ্বারা দেহাত্মবোধের উপর মানসবৃত্তি বহুলাংশে আবিপত্য করতে সমর্থ হয়। দেহ স্থূল আহাৰ্য গ্রহণ করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, পক্ষান্তরে মানসপুষ্টি শুধুমাত্র দেহের স্থূল যোগানের উপরই নির্ভর করে না, স্থূল দৃষ্টিও অগোচর সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির মাধ্যমে তার পুষ্টি অনেকাংশে নির্ভর করে। এই অর্থেই ঈশ্বরপুত্র বলেছিলেন—Man does not live by bread alone—মাহুয শুধুমাত্র স্থূল আহাৰ্য গ্রহণ করেই বাঁচতে পারে ন।

মানব-জীবনের আকস্মিকতা বিচার করতে গিয়ে কেবল আলোচ্য ব্যক্তির বাহ্যিক্রিয়ের দৃশ্যমান কাব্যকলাপ বিচার বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, অন্তরীক্ষিতরূপেও সম্যক পর্য্যালোচনা করা চাই। তা' না হলে প্রথম পদে পদে অনিবার্য। যত্নাকরের বাস্তবিক্তে রূপান্তর নারদের এক মুহূর্তের মজ্জণায়ই সম্ভব হয় নি। যত্নাকরের বাহ্যিক আচরণেও আবর্জনাশূন্যের নিম্নে মূল্যবান মানসরত্নের আকর লুক্কায়িত ছিল। অসহুপারে জীবিকার দায় তাকে মিটাতে হলেও নেহাৎ সর্কীর্ণ পরিবেশে সাংসারিক কর্তব্যবোধ তার অটুট ছিল। তার জীবিকার হীনবৃত্তিকেও সে তার নিজস্ব কর্তব্যরূপ ধর্মরক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ বলেই মনে মনে গ্রহণ করত। তাই ক্ষেত্র ভৈরী থাকায় এক মোহ-মূল্যের আঘাতেই তার অন্তরতম সত্তা তমসার আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল। এটাও

অন্তর্দৃষ্টিই এক বিশেষ পরিণতি—যোগ্যত্বের উদ্বর্তন। পূর্বেই প্রকাশ্যভাবে বলা হয়েছে যে, বৃন্দ ক্ষেত্রবিশেষে উভয়তঃ প্রবল সংবর্ধ-  
বর্ধা হয়ে নবতর সৃষ্টি ঘোষণা করে, আর কোথাও বা বৃন্দমান তৎ  
হুটি সমভাবে তীব্রতর না হওয়ার দুর্বল বৃত্তি সর্বলব পদানত হয়ে  
থাকে। অবশ্য জন্মগতে পদানত হওয়ার প্রসঙ্গ আসে না—  
সেখানে প্রবল দুর্বল প্রাণীকে একেবারে ধ্বংস করেই উদ্বর্তন  
করে। এই ক্রমঃবিকাশের দ্বারা নীতিগত ভাবে সর্বত্রই সমভাবে  
সক্রিয় বলে ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক সমালোচনা প্রসঙ্গে ত্রিঅবিন্দ  
তার অননুসরণীয় ভঙ্গিতে বলেছিলেন—The ultimate value  
of a man is not to be measured by what he says,

not even by what he does, but by what  
becomes. বলা বাহুল্য এই 'what he becomes'  
জীবদশার মাহুয়ের সবশেষ উত্তরণ।

কাজেই এক্ষণে বলতে হয়, আকস্মিকতা বলে কোনও সংঘ  
বা বিশেষ প্রভাব কিছু নেই মানব-জীবনে। মাহুয়ের চিত্ত  
সীমায় মধ্যে আবদ্ধ করে আত্মা যেমন অনন্ত প্রবহমান মহাকাল  
পর পর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর মাইল-পোষ্টের এক্সিয়া  
সীমায়িত করে রাখে, ঠিক তেমনি, নিরন্ত সংগ্রামশীল মনোবাজে  
এক একটি বিশেষ সত্যের উত্তরণের মুহূর্তকেই আমরা দৈনন্দি  
জীবনে আকস্মিকতা বলে চিহ্নিত করি।

## ‘মরুভূমি কি স্থখে বাঁচিয়া আছে’

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মরুভূমি কি স্থখে বাঁচিয়া আছে।  
কে বা তাবে দিল কতটুকু জল,  
কি বা চেয়ে কি পেয়েছে সে কাহার কাছে,  
ছলনা এ ছলনা কেবল।  
আকাশ অঙ্গনে কালো আঘাটের মেঘ,  
অনন্ত মরুর তীরে করিছে গর্জন,  
ছলনায় পরিহাসে বর্ষণ আবেগ,  
দ্বিচারিণী মাটি পায় সবুজ চূষন।  
হায়,  
কত যে ‘সাহাবা’ ‘গোবী’ পড়ে আছে আপন গৌরবে,  
অক্লান্ত বাজুর ভাঙার তার,  
তার নিমজ্জন নাই পৃথিবীর ভোজের উৎসবে,  
তাই সে যে মহাশিব হকের সভায়।  
হৃৎ-ছলনা ভরা শ্রাম সমারোহে,  
সে ভোলে না কোনদিন,  
থবে বাওয়া কুসুমের মোহে,

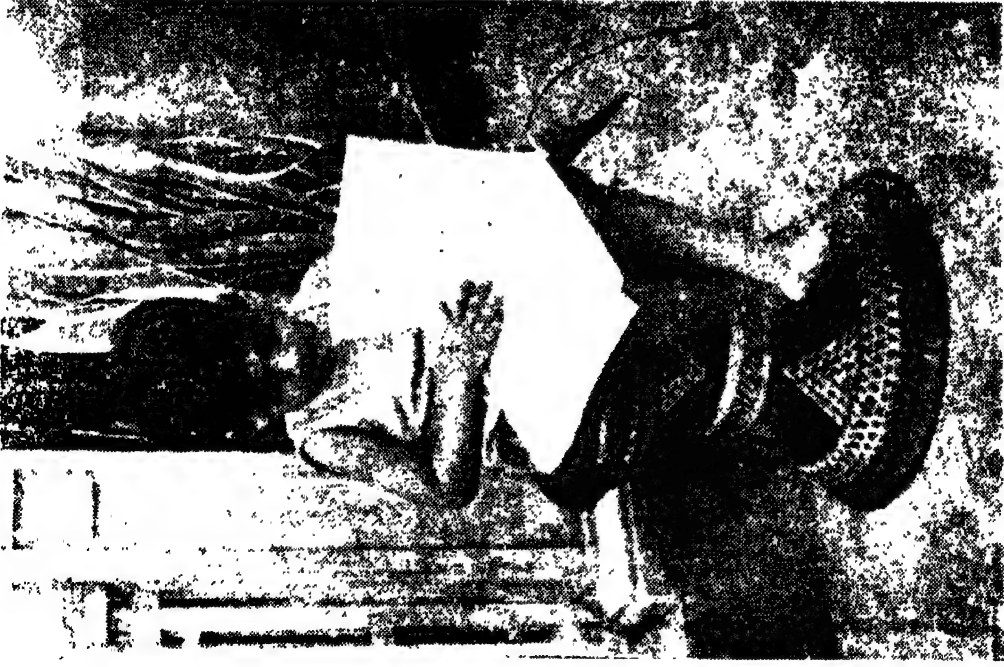
যজ্ঞ তাই হয় শিবহীন।  
এই নিয়ে কবি লিখে কাব্যের সম্ভাব তার,  
চিত্রকর চিত্র তার আঁকে।  
কত গান, কত ভান, কত মান অভিমান বিচিত্র কথার,  
ইতিহাস লিখে লিখে রাখে।  
ইতিহাস ইতিহাস,—  
মৃৎ ভ্রমর ফিরে কুসুমের ঘেঁহে কত সাজ।  
পরিহাস পরিহাস,  
‘শুল মর্মর প্রিয়া’ তবু কেন প্রেত হাসি হাসে মমতাজ।  
মরীচিকা, মরীচিকা,  
ছলনা এ ছলনা কেবল,  
মরীচিকা মরীচিকা,  
নিত্য চলে নিত্যকালে, উষর প্রান্তর পথে মরু-বাত্মীদল।  
তারা জানে তারা শুধু জানে,  
মরুভূমি আপনারে করেনি বঞ্চনা।  
তারা জানে তারা শুধু জানে,  
মরুভূমি মরীচিকা করেনি বচনা।”



রাস্তাহানে রাস্তা নির্মাণে পুরুষ ও স্ত্রী কর্মিদল



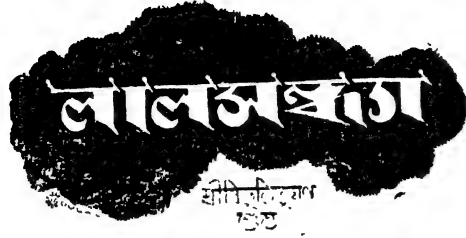
স্বাধীন-নির্ভর নিষ্কাশনে কেবলার বর্মণী



মনোযোগ



মনতা  
কঠো :—হৃষিকেশ ভট্টাচার্য



৩১

শ্রীমতীর মুখে হাসি চোখে জল। সে ভিজে গলায় বলল, একদিন আপনি পরিচয় দেন নি কেন ?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, সে অনেক কথা, মা কিন্তু একজন বাইরের লোককে যে সম্মান আর ভালবাসা তুমি দেখিয়েছ তাতেই তোমার খাস পরিচয় আমি পেরেছি। তুমি যে আমার বুকের কতখানি ভরিয়ে রেখেছ তা শুধু জানি আমি আর আমার অন্তর্যামী।

শ্রীমতী লজ্জিত হেসে বলল, একটু আগেও আপনাকে আমি কত শক্ত কথা বলেছি। আপনি অমাকে ক্ষমা করবেন।

ডাক্তারবাবু শাস্তকণ্ঠে বললেন, কঠিন হলও কথাগুলি সত্যি। সত্যকথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় না, পাগল মেয়ে।

ছেলেমানুষের মত চকস কণ্ঠে শ্রীমতী বলল, আপনার কুঁড়েঘর সত্যিসত্যিই তা হলে রাজপ্রাসাদ হয়ে গেল। আমার কাছে কিন্তু আপনার কুঁড়েঘরও স্বর্গ মনে হ'ত শুধু আপনাকে সব সময় কাছে পেলে।

ডাক্তারবাবু নীরব।

শ্রীমতী বলতে থাকে, আর আপনাকে নিয়ে আশা কোন ছড়াবনা নেই—কোন দিক দিয়ে কোন বাধাই আর পথ খাটকে দাঁড়াতে পারবে না।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বাবা পেলেই বা তা মানছে কে—

শ্রীমতী আঙুলে আঙুলে জিজ্ঞাস করল, অমর তা হলে পরশুই বাচ্ছ ত ?

ডাক্তারবাবু বললেন, যেতেই হবে মা। নইলে শেষ পর্যন্ত সবদিক সামলান যাবে না। সুখবাবু হয়ত নতুন করে জট পার্কিয়ে তুলবেন। তারচেয়ে আমরা কিরে গিয়ে দু'জন মিলে আর একবার বুঝিয়ে বলে দেবি : যদি মেনে নেয়, ভাল—নইলে বা ঘটবার তাই ঘটবে—

শ্রীমতী বলল, আমার মতে বার বতরুঁকু প্রাণ্য তা পাওয়াই উচিত।

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, অনেক সময় লম্বুপাশে গুরুদণ্ড পেতে হয় মা। আমি শুধু সেই পথটাই বন্ধ করে দিতে চাই। তা সে যে কেউই হোক।

শ্রীমতী বলল, আপনি বা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমি আর কতটুকু বুঝি—কথাটা শেষ না করেই সে খানিকটা কুণ্ঠিত ভক্তিতে অগ্নি কথায় এল, কিন্তু আমি যে বড় মুন্ডিলে পড়ে গেলাম—

ডাক্তারবাবু মুগ্ধ তুলে জিজ্ঞাস করলেন, কিম্বদন্তি, মা—

শ্রীমতী ইতঃস্তত করে বলল, আপনাকে ত আর কাকাবাবু বলে ডাকা উচিত হবে না—

আমার অপরাধ মা ? ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন।

ষতদিন জানতাম না সে এক কথা, শ্রীমতী বলল, কিন্তু মেনে-ওনে...কথাটা শেষ না করেই শ্রীমতী থামল।

ডাক্তারবাবু বললেন, লম্বু পাশে গুরু দণ্ড দিচ্ছ নাকি মা ? কোথায় পরিচয় দিলাম বলে পুরস্কৃত করবে না বা নিজের ইচ্ছায় দিয়েছিলে সেটুকুও কেড়ে নিতে চাও ?

শ্রীমতী লাজনম্র কণ্ঠে কিংকিন করে বলল, এ বাড়ীতে আপনি কাকাবাবুই থাকুন ও বাড়ীতে আপনাকে আমি বাবা বলেই ডাকব। শ্রীমতী মাথা নীচু করল।

ডাক্তারবাবুর চোখ দুটো সহসা বাষ্পাকুল হয়ে উঠল একটা অদ্ভুত সুখানুভূতিতে। তিনি শ্রীমতীর মাথায় হাত রেখে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, একেবারে কংক্রিটের দেওয়াল ভুগে দিতে চাও মা :...

প্রণব নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল। প্রণব বলল, না হে কল্যাণ মুন্সী, অন্তরমহল তোমার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হতে পারছেন না। আর অন্তরমহলেও দে.স নেই। আমার কাছে তুমি নালু মুন্সী হলও তিনি তাঁর এতবড় কুটুমকে এত সহজে ছাড়তে চাইবেন না, এ আমি জানতাম। মোটকথা পরশু তোমাদের যাওয়া নাকি হতেই পাবে না।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে টিপে টিপে হাসতে থাকলেও শ্রীমতী চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আমি মাকে বুঝিয়ে বললে তিনি আর বাধা দেবেন না। ঠিক পরশুদিন না গেলেই চলবে না বাবা।

ডাক্তারবাবু শ্রীমতীর কথায় সার দিয়ে বললেন, শ্রীমা ঠিক

কথাই বলেছে, নব। অজ্ঞাতবাসের যেসব বখন শেষ হয়েই গেল তখন মাঝে মাঝে আসব ভাই। এ রাজা তোমরা আমাকে রেহাই দাও।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে চলে গেল। দুই বালাবন্ধুর আলোচনার মধ্যে সে আর বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব মনে ক'ল না।

শ্রীমতী প্রস্থান করতই ডাক্তারবাবু অজ্ঞপ্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন, তোমার মেয়েটার খুব বুদ্ধি হে নব।

প্রণব কৃতার্থের হাসি হেসে চুপ করে রইলেন।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, এই মেয়েটার জন্তই আমার সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হ'ল। আমার উপোসী মনটাকে শ্রীমতী আবার জাগিয়ে তুলেছে। ফলে পড়ে আত্মপ্রকাশ করেছি, বুঝলে হে প্রণব, আত্মপ্রকাশ না করে আমার উপায় ছিল না।

তিনি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

প্রণব গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমাদের বড়লোক জাতটাকে এই ভুলেই আমি ছুঁতে দেখতে পারি না। বাপের সঙ্গে মতান্তর হতে তিনি ছেলেকে দিলেন দু'ব করে, ছেলে রাগে, হুঃখে, অভিমানে বাপকে ছেড়ে চলে গেল। এ পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তার পরেও ঘটনাগুলোর কোন সহজ অর্থ আমি বুঝে পাই না। ছেলের পাশে পাশে রয়েছ অথচ পরিচয় গোপন করে—

তাকে ধামিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু হাসি মুখে বললেন, এখানেও সেই একই প্রসঙ্গ বড় হয়ে দেখা দিল প্রণব। অর্থাৎ মতের অমিল। বাবা আমাকে সব দিক দিয়ে জড় করবার একেবারে পাকা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি শৈশব থেকেই এমন ভাবে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যাতে ভবিষ্যতেও আমি যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

প্রণবের কণ্ঠে বিস্ময়, ভারী আশ্চর্য্য কথা ত।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই প্রণব। এমন ঘটনার অভাব নেই, প্রতিদিনই ঘটছে। হয় ত ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে। তাই হতাশ না হয়ে সময় এবং সুযোগ মত অতঃপর পাশে এসে দাঁড়িলাম। ব্যবস্থাটা অবশ্য আমাদের আটনৌ নলিনী বাবুই করে দিলেন। অত্যন্ত সজ্জন লোক তিনি। তাঁর সাহায্য না পেলে আমাকে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'ত। বিশেষ করে, বাবার শেষ উইল নিয়ে, বাবা মৃত্যুর বহু পূর্বে আমাদের বাবতীর সম্পত্তি বিক্রী করে নগদে রেখে যান। আর এই বিব্রট টাকার অঙ্ক থেকে সামান্য কয়েক হাজার অতঃপর দিয়ে বাকীটা আমাকে দিয়ে যান।

প্রণব বললেন, কিন্তু তোমার সন্ধান ত তিনি জানতেন না নালু মুন্সী—

ডাক্তারবাবু বললেন, তার ব্যবস্থাও উইলে তিনি করে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর বার বছরের মধ্যে আমার সন্ধান না পাওয়া গেলে তবেই অতঃপর এই টাকার অধিকারী হবে।

একটু খেমে ডাক্তারবাবু পুনরায় শুরু করলেন, বাবার মৃত্যুর

পরেই আমি অতঃপর কাছে কাছে থেকে ওর চরিত্রের দুর্বল অংশের সন্ধান নিয়ে ঢাকা ঘোরাতে আরম্ভ করি। এমনি দিনে হঠাৎ খবর পেলাম, শ্রীমান বিবাহ করেছেন—এবং তা আবার আমারই বালা বন্ধু প্রণব মাষ্টারের মেয়েকে। বড় আনন্দ হ'ল খবরটা পেয়ে। আমার কাজ আরও সহজ হবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাবার শিক্ষার প্রভাব অতঃপর কাটিয়ে উঠতে পারল না। সে ভালবাসা চায়, কিন্তু স্বধা দিতে জানে না। শ্রীমতী চেষ্টা করেও ঠিক কার্যদা করতে না পেয়ে একদিন চরম আঘাত হেনে চলে এল। এমনি আঘাত পাবার তার প্রয়োজন ছিল প্রণব। অতঃপর অস্বস্তির চূর্ণ হয়ে গেল। তাই আমাকেই ছুটে আসতে হ'ল আমার মাকে কিরিয়ে নিয়ে বাবার জন্ত, আর আমিও এই দুর্বল মুহুর্তের সুযোগ নিয়ে কয়েম হয়ে বসব। তিনি পুনরায় হেসে উঠলেন।

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বললেন, বুঝলাম না কল্যাণ মুন্সী, প্রথম থেকে তোমার পরিচয় দিলে কি এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত।

ডাক্তারবাবু বললেন, কি হতে পারত আর কি পারত না তা বলা শক্ত, তবে একবার বার্থ হলে আমি বাপ হিসেবে আর এগোতে পারতাম না। আত্মদখ্যান বাঁচাবার জন্তই আমাকে মানে মানে সরে যেতে হ'ত।

প্রণব বলতে থাকেন, কথাটা ঠিক বলেছ নালু মুন্সী! থামা পন্থাটি বার করেছিলো তুমি। জলেও নেমেছ—মাছও ডাঙার তুলেছ অথচ কাপড় ভেজাও নি।

ডাক্তারবাবুর মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল।

৩২

আজ সকাল থেকেই মিত্রা ছটকট করে বেড়াচ্ছে, যে খবরটা সে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে তা অভাবিত না হলেও নিজেই সে কিছুটা অসহায় মনে করল, তার সব চেষ্টাই কি শেষ পর্যন্ত বার্থ হবে? ডাক্তারবাবু এখানে নেই, অতঃপরও সব কথা অকপটে বলা চলে না, হয় ত গিতে বিপরীত হবে।

সময় কাটতে চাইছে না। মিত্রা তার নিয়মিত কাজগুলি করতেও আজ বাধে বাধে ভুল করছে। তার এই অজমনিম্বতা অতঃপর দৃষ্টি এড়াল না। সে অসুযোগ দিয়ে বলল, আমার সকাল বেলায় ওষুধ দিতে তুমি তুলে গেছ মিত্রা, তোমার কি আজ শরীর ভাল নেই?

মিত্রা রূ'ন হেসে বলল, আমি যদি ভুলেই গিয়ে থাকি—আপনি ডেকে একবার মনে করিয়ে দিলেন না কেন?

মিত্রার উত্তর করবার ধনে অতঃপর রৌচিমত বিস্মিত হ'ল, কিন্তু এই নিয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। চুপ করে রইল। কিন্তু মিত্রার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হ'ল না। কতকটা অমৃতপ্ত হয়েই সে বলল, আপনি বৃষ্টি রাগ করলেন অতঃপর বাবু?

অতঃপর শান্ত গলায় বলল, রাগ করব কেন মিত্রা? তুল

হওরা খুবই স্বাভাবিক। তার জের টানতে গেলেই অশান্তি বাড়ে, আমি নিজেকে দিয়েই তার বধেই প্রমাণ পেয়েছি। তাই আর সহজে রাগ করি না।

মিত্রা এ কথাবার কোন জবাব দিল না।

অতঃপর অজ্ঞা কথার এল, বলল, ডাক্তারবাবুর আর কোন খবর পেয়েছ ?

মিত্রা একটু হতভম্ব করে বলল, আপনার বুঝি অজ্ঞা ডাক্তারের চিকিৎসা পছন্দ হচ্ছে না ?

অতঃপর জবাব দেয়, বিলম্ব—ভুললোকে বহুদিন দেখি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তিনি আসবেন কবে ?

মিত্রা বলল, এত খবর রাখেন আর এ সংবাদটা রাখেন না ?

অতঃপর বলল, জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না মিত্রা।

মিত্রা জবাব দিল, আমারও জানা নেই।

অতঃপর খানিক চুপ করে থেকে অজ্ঞা কথা তুলল, তোমাদের শিলাদিত্যবাবু নাকি খুব সোংগোল করছেন ? তিনি এগোলেন কতখানি ?

মিত্রা বিস্মিতকণ্ঠে বলল, খবরটা আপনাকে কে দিলে জানতে পাই কি ?

অতঃপর মুখে বিচিহ্ন একটুকু হাসি দেখা গেল, সে বলল আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে ওরা নাচবে আর আমি তা জানব না, এ তুমি স্বপ্ন করে আশা কর মিত্রা ? সব খবরই আমার কাছে আসে, কিন্তু তোমাদের মত দিশেহারা হয়ে পড়ি না। আমি নিজেও খেলতে ভালবাসি, অপরকেও খেলিয়ে আনন্দ পাই।

মিত্রা গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু খেলাটা সব সময় খেলা থাকে না অতঃপর—

খামলে কেন মিত্রা—অতঃপর সহজকণ্ঠে বলল, অনেক সময় মারাত্মক হয়ে উঠে, এই কথা তুমি বলবে ত ?

মিত্রা চুপ করে থাকে। অতঃপর বলতে থাকে, কথাটা ইদানীং আমি বুঝতে শিখেছি। কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারি না—তাই শিলাদিত্যকে জেনেগুনে আমি বাড়তে দিয়েছিলাম। আজ সে কথা তুলেছে মরণ-ছোবল মারবার জন্ত। ওর ঐ উদ্ভট কথা আমি মাটির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারতাম, যদি তোমরা সকলে মিলে আমাকে প্ররক্ত করে না ফেলতে। আমি বোধ হয় কোন দিন আর অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারব না। আবার হয় ত নতুন করে আমাকে আশ্রয় করতে হবে।

অতঃপর মুহু মুহু হাসতে থাকে।

মিত্রা স্নান দুটিতে খানিক চেয়ে থেকে বলে, এ সব আপনি কি বলছেন অতঃপর ?

অতঃপর বলে, ঠিক কথাই বলছি, তাই ঐ মরণ-ছোবল বুক পেতে নেবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছি মিত্রা। যবে আবার নতুন করে আমি জন্ম নেবই। ওকি, চমকে উঠলে কেন ? আরে, না না

ভয় পেয়ে চমকে উঠবার মত কোন কথা আমি বলি নি। কিন্তু এ সব কথা থাক।

মিত্রা মুহু কণ্ঠে বলে, থাকবে কেন অতঃপর। আপনি বলুন, আমি শুনব।

অতঃপর বলল, সেই জন্তেই ডাক্তারবাবুর খোঁজ করছিলাম। অনেক দুর্ভাবহার আমি তাঁর সঙ্গেও করেছি। কে বলতে পারে আগামীকাল হয় ত এ বাড়ী থেকেও আমাকে চলে যেতে হতে পারে। তাই হিসেব করতে বসেছি, আর মনে হয়েছে দেখা আর পাওনাটা বড় অসমান হয়ে পড়েছে, তাই—

মিত্রা স্তম্ভকণ্ঠে ডাকল, অতঃপর।...

অতঃপর হাসিমুখে বলল, অলঙ্কারে বলতে পার মিত্রা, দেখছ না, আমি আর সহজে কারুর উপর রাগ করি না !

মিত্রা উৎকণ্ঠায় সঙ্গে বলল, ওরা যদি সত্যি সত্যিই আপনার এতবড় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলে ?

অতঃপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, তা হলে আমি ঘরে বসে পরমানন্দে বীণা বাজাব মিত্রা, অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

এ হাসি মিত্রা সহ্য করতে পারে না, কেমন যেন অপরাধী মত মুখ করে চলে যাবার জন্ত উদ্ভট হ'ল।

অতঃপর পিছনে ডাকল, যেও না মিত্রা—

মিত্রা ফিরে দাঁড়াতেই অতঃপর পুনরায় বলল, তোমার সেই ধর্ম-বুদ্ধি আর প্রচণ্ড সাহস কোথায় গেল মিত্রা ? তুমি কেন নিজেকে দোষী মনে করছ ? দোষ যদি কোথাও তোমার থেকে থাকে তার চেয়ে ঢের বেশী দোষ আমি করছি।

মিত্রা জবাব দেয় না।

অতঃপর বলতে থাকে, জীবনের আরম্ভ থেকে এত বেশী খোসামোদ আর স্তুতি পেয়ে এসেছি যে, আসল নকল চিনতেও ভুলে গেলাম। সেই জন্তেই কেউ আমার কাছে তার প্রাণ্য পার নি, দু'হাত ভরে নিয়েছি—দেবার কথা একবারও মনেও আসেনি। নিতে গেলে দিতে হয়, এই কথাটা কেউ কোন দিন আমাকে বুঝিয়ে বলে নি।

মিত্রা এতক্ষণে কথা বলল, আপনি কি কোন দিন বোঝাব চেষ্টা করেছেন ?

অতঃপর বলল, করেছি বলেই ডাক্তারবাবুকে এতদিন ধরে সহ্য করতে পেয়েছি। তুমিও আমার কাছে—

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, আমার কথা থাক।

অতঃপর বলল, থাকবে কেন ? সত্যিই ত তোমাকেও আমি সহ্য করে আসছি।

মিত্রা বলল, শুধু নিজের জীকেই আপনি সহ্য করতে পারলেন না।

অতঃপর কথাটা এক প্রকারে স্বীকার করে নিয়েই বলল, অস্বীকার করতেও তাকে পারছি না মিত্রা, বরং তার কথা ভেবে আজ আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। একে তুমি কি বলবে ?



মিত্রা বীরে বীরে বলে, সম্ভবত এ আপনার সাময়িক দুর্বলতা।  
অতঃপর জীবন দিল, হয় ত তাই, কিন্তু এই দুর্বলতার মধ্যে যে  
এক অপূর্ণ সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তার সন্ধান আমি পেয়ে গেছি,  
বুঝতে পারছি যে, মানুষের মধ্যে এই দুর্বলতা না থাকলে সে স্তম্ভ  
হয়ে উঠতে পারে না—পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

মিত্রা চোখ ভুলে স্থির দৃষ্টিতে অতঃপর পানে তাকাল।

অতঃপর বলতে থাকে, কথাকটি নানা ভাবে শ্রীমতী আমাকে বহু  
বার তুলিয়েছে, আরও বলেছে, ভালবাসার সঙ্গে ঋণিকটা শ্রদ্ধার  
খাদ না মেশালে তার পরমায়ু স্বল্পায়ু হয়। আমার ভালবাসার  
নাকি বেগ আছে—প্রশান্তি নেই। তাই বলকে তা শুধু খোলা  
করতেই পেরেছে, নির্মূল করতে নয়।

অতঃপর একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগল, অহঙ্কারে কথাগুলি  
তুলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি নি, বরং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি  
মাষ্টারের মেয়ে মাষ্টারী করবার দুঃসাহস দেখে, তার পরে আঘাত  
করেছি বর্ষের মত। আঘাতকে মাখা পেতে নিলেও শ্রীমতীর  
চোখে মুখে ঝুপা-মেশান অমৃকম্পার যে ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলাম,  
সে দিনে তার বখার্ব অর্থ না বুঝলেও আজ আমাকে অনেক কথাই  
মনে করিয়ে দেয়।

অতঃপর মুখে শ্রীমতীর কথাগুলির পুনরুজ্জ্বলিত মিত্রা অকারণে  
ব্যথা পায়, কিন্তু প্রকাশে সে কোন কথা বলে না।

অতঃপর বলতে থাকে, আজ আমি তোমাকেও বুঝতে পারি—  
শ্রীমতীকেও বুঝি, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কাছে গভীর সমুদ্র।  
তাকে আমি কোন দিনই বুঝলাম না।

সহসা অতঃপর চুপ করল, চোখ বুজে সে যেন তার অন্তরের  
মধ্যেই ডুব গেল, একটা শাস্ত সমাহিত ভাব। যার মাথার উপর  
এত বড় বিপদের ঝড়াল খাড়া ঝুলছে, তাঁর এমন শাস্ত নির্লিপ্ত  
ভাব বড়কটা অসম্ভব এবং অবিদ্বাংস। মিত্রা কোমল দৃষ্টিতে তার  
মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কথা বলে বিরক্ত  
করল না।

খানিক পরে অতঃপর ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে তাকাল। হাসি  
মুখে বলল, এখনও তুমি ষাওনি মিত্রা?

মিত্রা আর দ্বিতীয় কথা না বলে অত্যন্ত দ্রুত ঘব ছেড়ে চলে  
গেল। তার যে আজ কি হয়েছে—কিছুতেই সে অতঃপর কাছে  
সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে না।

আশ্চর্য! এই কি সেই অতঃপর? একসঙ্গে অনেক দিনের  
অনেক কথাই তার মনে পড়ল। হাসিও পায় দুঃখও হয়।

আকস্মিক ভাবে মিত্রার দৃষ্টি স্থানান্তরিত হয়ে তার নিজের উপর  
পড়ল। মানুষের চরিত্র বড় অদ্ভুত। আশ্চর্য্য হবার কোথাও  
কিছুই নেই, নইলে অতঃপর সর্বনাশ করতে এসে সে তার নিজের  
এত বড় ক্ষতি করে বসল কিসের লোভে—কিসের লোভে সেই  
অতঃপর মললেও সস্ত সে পাগলের মত পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে?...  
মানুষ একটা গতিশীল চক্রবান। প্রয়োজনে তার গতির

পরিবর্তন ঘটে, শুধু ষ্ট্রায়ার কাটাবার অপেক্ষা। সোজা থেকে  
বাঁকা আর বাঁকা থেকে সোজা...

মিত্রা আর ভাবতে পারে না।...

৩৩

অতঃপর আজ প্রচুর ঘুমাচ্ছে, নির্বিকার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।  
ডাকতে এসে বারকরেক ফিরে গেছে মিত্রা। ওর নিরুপদ্রপ  
বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাল না, কিন্তু নিজেকে সে এক মুহূর্তের জন্য চুপ  
করে থাকতে পারছে না। চতুর্দিক থেকে একটা গাঢ় অন্ধকার  
তাকে যেন চেপে ধরে আছে। এই দুর্ভাবনা থেকে সে অব্যাহতি  
চায়, মুক্তি চায়। সে তার মনের দৈর্ঘ্য হারিয়ে কলেছে, শুধু  
শুধু কান্না ছাড়া তার আত্মা।

ইতিমধ্যে মিত্রা শিলাদিত্যের কাছে ছুটে গিয়েছিল তাকে  
নিবৃত্ত করার জন্য। তাকে উপেক্ষার হাসি দিয়ে প্রত্যাখ্যান  
করেছে শিলাদিত্য। তার নাকি করবার কিছুই নেই, সে চলতে  
জানেন—ধামতে জানেন না।

মিত্রা বলেছে, এতবড় প্রতিষ্ঠানের এতগুলি কর্মচারী যে না  
থেকে মরবে শিলাদিত্যবাবু।

শিলাদিত্য জবাবে জানিয়েছে যে, ওরা নাকি সব মরেই আছে,  
সে শুধু ওদের আশ্রয় বাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়ার  
সহায়তা করতে উদ্যত হয়েছে।

মিত্রার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলেও সে আর দ্বিতীয় কথা না  
বলে প্রস্থানে উদ্যত হতে শিলাদিত্য পুনশ্চ বলেছে, আর একটা শব্দ  
জেনে য'ন মিত্রা দেবী—

মিত্রা ঘুরে দাঁড়াল।

শিলাদিত্য বিজ্ঞি ভাবে হেসে বলেছে, আপনাদের ডাক্তারের  
ফিরে আসবার অপেক্ষায় আমরা বসে থাকব না। কিন্তু মিত্রা  
দেবীর পতন দেখে সত্যিই বড় দুঃখ পেরেছি।

মিত্রা বলেছিল, ভারী আশ্চর্য্যের কথা শুধাবাবু—ওকি চমকে  
উঠলেন কেন। আমি কিন্তু আপনার উত্থান দেখে খুশী হয়েছি।

একটু থেমে পুনরায় বলে এসেছিল, আমি যাচ্ছি, কিন্তু বাবার  
আগে আর একবার আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করে  
যাচ্ছি...

দ্রুত পায় মিত্রা সেখান থেকে চলে এসেছে। মনে মনে সে  
তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করেই স্থান ত্যাগ করেছে।

ডাক্তারবাবু আজই শ্রীমতীকে নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু  
তাঁর ফিরে আসবার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকলে তার চলবে  
না। নিজের বুদ্ধি এবং শক্তি আর কেউ সহায়তার সে সূচী  
বিশ্বাসের অগ্রসর হবার সবকিছু পথেই প্রচুর বিঘ্নের কাঁটা ছড়িয়ে  
দিল। একটু ভুল করলেই নিশ্চিত মৃত্যু...

সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই। মিত্রা তার দুই কবচলের মধ্যে যত্নে স্থাপন করে ওড়ী ছিঁড়ার মগ্ন...

...ইতিমধ্যে কেউ এসে খবর দিয়ে গেল যে, সেই দুই কবচ পঞ্চাঙ্গ তাড়ের হিসেব কাগাগোড়া মিলে বাচ্ছে...

কেউ চলে যেতেই মিত্রা পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল। অতঃপর কারখানার ভালমন্দ সব দাখিল ডাক্তারের বৃত্ত তার উপর দিয়ে গেছেন, আর সেও এই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তখন কিছু মনে না হলেও এখন মনে হচ্ছে, ডাক্তারের বৃত্ত এই ধরনের অনুযোগ করাটাও যেমন বাস্তবিক নয়, তা'র পক্ষেও কোন প্রকার কথা দেওয়া অর্থহীন। এখন অনুযোগটাও মিথ্যা না, আর সে নিজে যে প্রতিকূল অবস্থায় সজ্ঞা প্রাপ্ত লড়াই করে চলেছে এ কথাও সত্য।

পাশে ঘর থেকে অতঃপর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিত্রা :  
মিঃ...

মিত্রার চিন্তার ঘোর কেটে গেল, সে দ্রুতপদে অতঃপর ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল এবং অতঃপর 'ব্রাহ্ম মুখের পানে দৃষ্টি পড়তে মুহূর্তের মধ্যে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মুখে তার এক কোটা ক্রোড়ে নেই, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, সে বায়ে বায়ে শুধু একটি প্রশ্নই করতে থাকে, কি হয়েছে আপনাদের অতঃপর?

অতঃপর মিত্রার হাত ধরে যেন জানালার কাছে নিয়ে গেল :  
দূরে তার কারখানার পানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, শেষ পর্যন্ত ওর কারখানাটাকে ধ্বংস করাই ঠিক ক'লে মিত্রা ?...

ধ্বংস—মিঃ যেন আশ্বস্ত করে উঠল।

অতঃপর ভ্রমিত পল্লীর বলতে থাকে, হ্যাঁ, ধ্বংস—দেখ না ওখানকার আকাশটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতটা আমি ভাবতে পারিনি। অভিযোগ ক'বার ওদের কিছু নেই এমন কথা আমি বলি না। ব'রং হঠাৎ উভয় পক্ষেরই আছে মিত্রা, কিন্তু তবুও আমার জিজ্ঞাস্য ক'রতে ইচ্ছে হয় যে, এই-ই কি যথার্থ বিচার পথ ?

অতঃপর অপরক দৃষ্টিতে চোরে থাকতে থাকতে এক সময় অগ্রমনক হয়ে পড়ল, তার চোখের সম্মুখে তখন হয় ত আর এক দিনের আর একটি সন্ধ্যা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। জীমতীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সন্ধ্যাটি। লাল বনের কান্নাকাতি তখন কাগজের সমাধোহ... অতঃপর নিজেকে ভুলে গেল, মনে তার বং ধরল...তার পর...

মিত্রা মুহূর্তে ডাকল, অতঃপর—

অতঃপর বর্তমানে কিরে এল। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ কর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, এরই নাম বোধ হয় বিধিলিপি মিত্রা, চোটা করেও তাই অভিনেতা পৌঁছতে পারছি না, আমার অহঙ্কার আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আমি এক।

মিত্রা আবার ডাকল। অতঃপর তাকে ধামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ভাবছ, আমি বুঝে ভেঙে পড়েছি, মিত্রা ? না না, ভেঙে পড়ব কেন—আজ বং আমার আনন্দের দিন, নিজেকে আমি কিং

পেরেছি। আবার নতুন করে চলার পথ এ আশ্বাসের মধ্যে দেখতে পেরেছি। আমার অতীতের বা কিছু ভাল, বা কিছু গ্লানি সব পুড়ে ছাই হয়ে থাক, আবার নতুন করে চলার পথ সুরম্য হয়ে উঠুক।

অতঃপর উদভ্রান্তের মত হা হা করে হেসে উঠল।

মিত্রা ভয় পেয়ে গেল, এই হাসির ধ্বনি আলাদা—এব চেহারার আলাদা।

অতঃপর পুনরায় কথা করে উঠল, এ লাল রঙ একদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল মিত্রা, আমার মনে রঙ ধরেছিল। আমার মনের রঙ জীমতীর সিঁথিতে লেপে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনের রঙটা ছিল কাঁচা, তাই সংস্পর্শে জল লাগতেই তা ধুয়ে গেল...

অতঃপর পুনরায় হেসে উঠল, এ হাসি সর্বস্বার্থের উদ্ভাস হাসি। মিত্রা স্থান-কাল-পুত্র ভুলে তাকে বেঁটন করে ধরে বায়ে বায়ে শুধু বলতে থাকে, অতঃপর, চেয়ে দেখুন ত আমার নিকে। কি হ'ল আপনাদের ? আমি বলছি, কিছু যায় নি আপনাদের—আপনাদের সব আছে...দব...

নিষেধকে বেঁটন-মুক্ত করে বংকের মত ঠাণ্ডা গলায় অতঃপর বলতে থাকে, কি আমার আছে আর কি আমার খোঁয়া গেছে, সে কি আর আমি জানি না ? কিন্তু তুমি কেন অত ভয় পেরেছ মিত্রা, আমি ত পাই নি ? আমার কাছে আজকের সন্ধ্যাটি একটি অস্বপ্নীয় সন্ধ্যা। মনে বলছে, এখন থেকেই আমাকে সুর করে দবে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানারও—নিজের জীবনেরও। আমার অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠ গুণটো জলে উঠতে পথ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

অতঃপর আবার হেসে উঠল, হাসিটা যেন তার ধামতেই চায় না।

মিত্রা ঠিক বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে কি সে করবে। কি করা তার কণ্ঠে। অতঃপর বর্তমান অবস্থাকে সে ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থা বলে ভাবতে পারছে না। মুখে সে যত কথাই বলুক, এ আশ্বাসের শিখা যে তারও সর্বস্বার্থ বেড়ে ধরেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে মিত্রা নিজেকে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। সে বায়ে বায়ে শুধু ঘর-বার করছে...

সিঁড়িতে দ্রুত পারের শব্দ শোনা গেল। মিত্রা ছুটে এগিয়ে গেল। কেউ আবার ফিরে এসেছে। চোখে-মুখে তার বিজয়-উল্লাস। মিত্রাকে সম্মুখে পেয়ে অনেকক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না।

মিত্রা আকুল আবেগে জিজ্ঞাস করল, কি খবর কেউ—অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন ?

কেউ দম নিয়ে বলল, জান দিদিমণি, সে এক ভীষণ ব্যাপার হয়েছে। কারখানার মজুররা ক্ষেপে গিয়ে এ শিলাদিত্য মশাইকে আগুন ফেলে দিয়েছে—

মিত্রা আর্ন্ত টীংকার করে উঠল, কেউ—

কেউ নির্ভিকার ভাবে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যা—আপনাকে আমি মিথো বলছি না দিদিমণি। ওরা দুটো বেনী পরসা চেয়ে ছিল। কারখানাটা নষ্ট করতে চায় নি, কিন্তু শিলাদিভাব বোঝানলেন না, চুপি চুপি কারখানার আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মিত্রা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তার পর ?

কেউ বলে, ধরা পড়ে গেলেন। তার পরেই তাকে ঐ আগুনের মধ্যে... একটু খেঁমে সে পুনরায় বলতে থাকে, ডাক্তারবাবু বৌদি-রাণীকে নিয়ে আসছিলেন—কারখানার আগুন দেখে ওখানেই নেমেছেন। সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। আগুন প্রায় নিভে গেছে, এখনি তাঁরা এসে পড়বেন। আপনাকে তিনি ধরটা দিতে বললেন।

মিত্রা হঠাৎ যেন দুঃখের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে, সে চকস কণ্ঠে বলল, এতক্ষণ এ কথা আমাকে বলনি কেন কেউ ? তুমি ধরটা তোমার দাদাবাবুকে দাও গিয়ে—আমি ততক্ষণে তাঁদের এগিয়ে আনতে যাই।

মিত্রা কেউর বিন্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে যেতে একবার ধমকে দাঁড়াল—মনে হ'ল, অতন্ন তাকে যেন পিছন থেকে বায়ে বায়ে ডাকছে, মিত্রা... মিত্রা... কিন্তু এ বাড়ীতে তার স্থান কোথায়... অধিকার কতটুকু—মিত্রার পায়ের গতি আরও দ্রুত হয়ে উঠল, ফিরে যাবার সহজ রাস্তা যখন তার জন্ত নেই তখন দূরে সরে না গিয়ে উপায় কি... চলতে চলতে মিত্রা একবার অকলপ্রাপ্তে তার চোখ দুটো ঘষে নিল...

সমাপ্ত

## কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য

অকালমৃত্যু জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার গতিপথে ছেদ টানে। স্বাভাবিক আয়ু-পরিধির অমুকুল আবহাওয়ায় যে জীবন ফুল-ফলে মঞ্জুরিত হয়ে উঠার সম্ভাবনা রাখে, অকালমৃত্যু তার মূলে কুঠারাবাত হানে। ফুল না ফুটেই জীবন ধরণীতে লুটায়। কিন্তু যারা অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী, তাঁরা স্বল্পায়ু জীবনেও নিজ নিজ কর্ত্তি ছাপ রেখে যান। চোটারটন, শেলী, কীটস, বাইরন, সত্যেন্দ্রনাথ এরূপ প্রত্টিভার অধিকারী ছিলেন।

কালীপ্রসন্নর এদের মত কবি-প্রতিভা ছিল না। জনসাধারণের নিকট তাঁর যেটুকু পরিচয়, তা হুতোম প্যাচার নস্সার লেখক ও সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদের প্রকাশক হিসাবে। কিন্তু নিজের স্বল্পপরিষর জীবনে (মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান) তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংবাদপত্র, নাটক প্রভৃতির উন্নতির জন্ত যে চেষ্টা করে গেছেন, সে সম্বন্ধে আজকাল আমরা কতটুকু খবর রাখি ? অথচ এ কথা খুবই সত্য, যাদের অক্সান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অর্থায়ুকুল্যের ফলে সে যুগে বঙ্গ সাহিত্যের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল, কালীপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদের অন্ততম।

১৮৪০ সনে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারে কালীপ্রসন্নর জন্ম হয়। পিতা নন্দরাম সিংহর তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর হরচন্দ্র ঘোষ নামক এক ভ্রাতৃলোকের উপর কালীপ্রসন্নর দেখাশুনা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। কালীপ্রসন্ন ছেলেবেলার হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু ছাত্র হিসাবে সেখানে তাঁর কৃতিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শেষে বাড়ীতে উইলিয়ম কাক প্যাটরিক নামক এক সাহেবের নিকট ইংরেজী এবং দুজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যয়ন করেন এবং তিনটি

ভাষাতেই যথেষ্ট ব্যাপ্তি লাভ করেন। তবে তাঁর সমদিক টান ছিল বাংলা ভাষার প্রতি। নিজের বালাজীবন সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে হুতোম প্যাচার নস্সার তিনি লিখেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাংলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না।... সংস্কৃত শেখাবার জন্ত আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্তে বড় পরিশ্রম করতেন। ক্রমে আমরা চার বছরে দুগ্ধবোধ পার হলেম, মাথের দুই পাত ও মঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর স্ত্রী হ'ল। টিকি, দোটা ও বাঙা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তরু করতে বাট, ছোড়াগোছেব ঐ রকম বেরাড়া-বেশ দেখতে পেলেই তাকে তারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়সা লিখতে চেষ্টা করি ও অস্ত্রের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনায় বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কলেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কলেজের ছোকরা হয়ে পড়লেম। গৌরব লাভেছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উচু হয়ে উঠল।... ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজন চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হ'ল। তারই সার্থকতার জন্তই যেন আমরা বিজ্ঞোৎসাহী সাজলেম—প্রত্টিভার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছে হ'ল—সভা করলেম, ব্রাক্স হলেম, তত্ত্বাবোধিনী সভার যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত লোকদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জাহুক যে আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেউ বিষ্টর যথো! হার! অল্প বয়সে এক-একবার অবিরেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগলামো করেছি, এখন সেইগুলো স্বরণ হলে কান্না ও হাসি পার।"

কালীপ্রসন্নের স্বল্পবয়সকালীন অপরূপ কণ্ঠনিষ্ঠায় ইতিহাস। বসন্তঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও সাহিত্যিকদের উৎসাহবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশ্বব্রহ্মের উদ্দেশ্য করে। মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় প্রতিষ্ঠা করেন। পার্বীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনীষীগণ এই সভার সভ্য ছিলেন। সভার অগ্রতম উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা সাহিত্যের চর্চা। তা ছাড়া বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও কবিতা সে সভায় পাঠ করা হ'ত এবং সমসাময়িক বিখ্যাত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের সভায় আহ্বান করা হ'ত। সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্নের অর্থানুকূলে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ত।

কালীপ্রসন্ন গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। চরিত্রের এই সব সজ্জাত বৈশিষ্ট্যের ফলে তিনি সেকালের সমস্ত কল্যাণকর প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হয়ে সহস্রই সফলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দেশবাসীর তরফ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে এক জনসভায় আয়োজন করেন। সে সভায় স্বংচিত মানপত্রে তিনি বলেছিলেন, "আপনি বাংলা ভাষায় যে অসুস্তম অক্ষতপূর্ব্ব অমিতাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন তা'হা মহাবর সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমনকি আমরা পূর্ব্ব স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাট যে, ক'লে বাংলা ভাষায় এত দৃশ্য কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুণ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাংলা ভাষায় আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাংলা ভাষাকে অসুস্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনি হঠতে একটি নূতন সাহিত্য বাংলা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহী সভা সংস্থাপক প্রদত্ত যৌগিক পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে, অলোক-সাম্য কাব্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে বর্ত্তমান যেখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদেববাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাট কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কাব্য বিবেচনার সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আপনি উত্তরোত্তর বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আরও যত্নবান হউন। আপনা বদ্ধক যেন ভাবী বঙ্গসম্ভানগণ নিজ দুর্গম জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুধ্বল মার্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজী ভাষা সপত্নীয় পদাবনত হইয়া কালতিপাত করিতে না হয়..."

উক্ত মানপত্র হতে কালীপ্রসন্নের দৃষ্টি ও সাহিত্যরসিকতার পরিচয় মিলে। সমসাময়িক সাহিত্যিক-সমালোচক মহলে মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল—এই ইজিত উক্ত মানপত্রেই

আছে। বিচার-বিভ্রমে সেই আবিল মুহূর্ত্তে কালীপ্রসন্ন মেঘনাদ-বধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ ও বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তির তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ জনস্বয়ং করে মধুসূদনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এ তাঁর কম দৃবদশিতা, অন্তর্দৃষ্টি ও রসজ্ঞানের পরিচয় নয়। এই সহজাত সাহিত্যবোধ, বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অগাঢ় অনুরাগ, এর প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতর অর্থায়ন এবং বাংলা গদ্যবীতিতে কথাভাবের সাবলীল প্রয়োগ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের অমরত্বের দাবী রাখে।

বাংলা কবিতাকে পুষ্প ও ত্রিপদীর শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়ে মধুসূদন যে বাংলা কাব্যের গতিপথ মন্থণ ও তার ভবিষ্যৎ অপূর্ণ সম্ভাবনাময় করে তুললেন, কালীপ্রসন্ন তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "লোকে অপার ক্লেণ স্বীকার করিয়া জলধিজল হঠতে বহু উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমান অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। অমরা বিনাক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রার্থনাস্থিক বহুলাভে কৃতার্থ হইয়াছি।" মাইকেলের অনুসরণে হতোম প্যাচার নম্রায় তিনি অমিতাক্ষর ছন্দে দুটি কবিতা লিখেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। কবিতাটি হতে কালী-প্রসন্নের কবি ক্ষমতার পরিচয় মিলবে :

'হে সজ্জন ! স্বভাবের স্নানশ্রম পটে,

বহুভ্রমসের বঙ্গে

চিক্রিচ চিরিত্র-দেবী সংস্কৃতি বরে।

কৃপাচক্রে হের একবার, শেষে

বিবেচনা মতে

যার যা অধিক আছে, তিরস্কার

কিবা পুরস্কার

দিও তা'হা মোরে। বহু মান লব

শির পাতি।"

এই প্রসঙ্গে হতোম প্যাচার নম্রা স্বয়ং হুঁচরটি কথা বলা দরকার। কি সে যুগের সমাজচিত্র হিসাবে, কি জ্ঞেবাশ্রক রচনার নমুনা হিসাবে, কি বাংলা গদ্যবীতিতে নূতন ধারার সাক্ষ্য হিসাবে এই পুস্তকটি অমরদের বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। বাংলা গদ্যের সেই আদি যুগে সংস্কৃতপ্রধান গদ্যবীতিকে উপেক্ষা করে বহুপ আশ্চর্য্য সঙ্গত ও প্রাজ্ঞতার সহিত তিনি কথা ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন, তাতে শুধু তাঁর সাহসেরই পরিচয় মিলে না, এ তাঁর অপূর্ণ দৃবদশিতারও পরিচায়ক। টেকচাঁদ ঠাকুর ও হতোম বাংলা গদ্যবীতিতে যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করলেন, তার কলে বঙ্গ ভাষা অসামান্য গতিবো লভ করল। সংস্কৃতপ্রধান গদ্যবীতির নাগপাশ থেকে ভাষাজননীর মুক্তিবিধান কালীপ্রসন্নের এক মহৎ কীর্তি।

হতোম প্যাচার নম্রা ছাড়া কালীপ্রসন্ন কালিদাসের 'বিক্রমোর্কশী' ও 'মাগতীমার' ভবভূতির নাটকের অনুবাদ করেন

এবং 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি পুরাণসংগ্রহ নাম দিয়ে পুরাণসমূহের এবং ক্রীমদভাগবদগীতারও সটীক অমুবাদ করেছিলেন। 'বঙ্গেশ বিজয়' নামক অপব একটি পুস্তকও (অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত) মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে তিনি রচনা করেন।

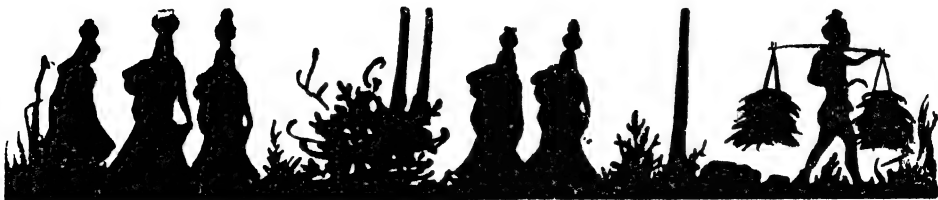
দেশের সমস্ত কল্যাণকর অমুষ্ঠানের সহিত কালীপ্রসন্ন ও তৎ-প্রতিষ্ঠিত বিভোৎসাহিনী সভায় যোগ ছিল—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকরদের নির্দয় অত্যাচারের কাহিনী লোকের চক্ষের সম্মুখে তুলে ধরল। পুস্তকটির ইংরেজী অমুবাদ প্রচার করার পাত্রি লজ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন আদালতে গিয়ে স্বয়ং জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন এবং লজের কারামুক্তির পর বিভোৎসাহিনী সভায় পক্ষ থেকে তাঁর স্বত্বস্বাধীন আয়োজন করেন। তা ছাড়া বহু অবৈতনিক বিভাগের স্থাপন, দুঃস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অর্থসাহায্য, সাহিত্যিকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচনার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পুস্তকখরচের ব্যবস্থা প্রকৃতি জনহিতকর কার্যের দ্বারা তিনি শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করে তুলেছিলেন। সে সময়ের কলকাতার বিত্তপানীর জলের অতিশয় অভাব ছিল। এ অভাবের প্রতিকারকল্পে তিনি বিলাত থেকে দুই হাজার টাকা ব্যয়ে চারটি ধারাবাহিক আনারার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬২ সনে এক দুর্ভিক্ষ তহবিলেও তিনি হাজার টাকা দান করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন 'হিন্দু পেট রটে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে সাহায্য ও পত্রিকাটি স্তম্ভভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে পত্রিকা ও প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করেন। কালীপ্রসন্ন হরিশ্চন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতার অতিশয় অগ্রদূত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাই তিনি এক পুস্তিকা রচনা করে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন এবং 'হরিশ স্মৃতি ভাণ্ডারে' স্বয়ং পাঁচ শত টাকা দান করেন। হরিশ স্মৃতি মন্দির স্থাপনার্থ তিনি বাতড়বাগানে দুই বিঘা জমি নিদার প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু 'স্মৃতি সন্মিতির' অনগ্রসরতার দরুন সে প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নি।

শ্রাব মর্ডান্ট ওয়েলস সুপ্রিম কোর্টের বিচারাসন থেকে প্রায়ই বলতেন—ভাঙালী জাতি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। নীলকর মকদ্দমায়ও তিনি অমুরূপ উক্তিই করেছিলেন। সংগ্রহ জাতিতে

অপমানিত করার বিরুদ্ধে ১৮৬১ সনের ২৬শে আগষ্ট রাজা রাধাকান্তদেবের বাড়ীতে দেশীয় নেতৃবর্গের যে সভা হয়, কালীপ্রসন্ন তাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনেরও তিনি বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন এবং যে সব ব্যক্তি বিধবা বিবাহে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিনি হাজার টাকা পুঙ্খবহু ব্যবস্থা করেছিলেন। বহুমুখী কর্মপ্রবণতা ও স্বভাবের ঔনার্যের জন্য বিভাগাগর কালীপ্রসন্নকে বধেই স্নেহ করতেন কালীপ্রসন্ন যখন পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে মহাভারতের অমুবাদ আরম্ভ করেন বিভাগাগর তাঁকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত মহাভারতের কথা রচনা ও প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এই সব নানাবিধ জনহিতকর কার্য ছাড়াও তিনি বাংলার নাট্য সাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের উন্নতিকল্পে বিভোৎসাহিনী বঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। সে বঙ্গমঞ্চে রামদত্ত-রায়ণ তর্কভট্টের 'বৌদ্বৈত' ও কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোৎকলী', 'সাবিত্রী সত্যবান' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। তিনি নিজেও একজন সু-অভিনেতা ছিলেন।

এর পর কালীপ্রসন্ন বিভোৎসাহিনী নামে একটি মাসিক পত্রিকা এবং সর্বভাষা প্রকাশিকা নামক ভূবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও শিল্পসাহিত্য-আলোচনা বিষয়ক অপব একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা দুটিই সেকালের সাহিত্যিক ও পাঠক-মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। রাজা রামেন্দ্রসুল মিত্রের বিরোধার্থ সংগ্রহ এবং পরিদর্শক নামক একটি দৈনিক পত্রিকাও কিছুকাল তিনি সম্পাদনা করেন। ইংরেজী ভাষায় আইন গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া নিজ ব্যয়ে বাংলা মুদ্রাবল্লী কিনে ছাপাখানা ও বাংলা পত্রপত্রিকার বিস্তারকল্পে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার তুলনা মিলে না। মাত্র ত্রিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য, প্রজাতির উন্নতির জন্য, সমাদ সাংস্কারের জন্য এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য তিনি যেসকল অক্লান্ত ভাবে অর্থ ও পরিশ্রম দিয়ে দেশের সেবা করে গেছেন, তা বাস্তবিকই বিশ্বের উজ্জেক করে। অক্লান্ত কর্মসাধনা, উদারপ্রাণতা, বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অপরিদীপ্য নিষ্ঠা, সমাজ-চিত্ততথ্য ও পরার্থপরতার জন্য তিনি সেকালে মহাত্মা উপাধি লাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, দেশ ও দেশের সেবার উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সাহিত্য-বদিক ও সাহিত্যিক এমন একজন লোকের কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি।



# বুড়ো শিবের গাজন আর টেপী

শ্রীসন্ধ্যা রায়

বুড়ো শিবের মেলা বসছে একেখেরে। মাহুঘের চাঁৎকার, গাড়ী-ঘোড়ার আনাগোনা আর ভক্তদের ঢাক-ঢোলের বাজ, আর 'একেশ্বরনাথ মণি মহাদেব' 'শিবশঙ্করাথ মণি মহাদেব' এসব মিলে একেখেরের আকাশ, বাতাস মুগ্ধিত হয়ে উঠেছে। মাহুঘের পায়ে ঘেঁঠো ধূলা আর ট্রাকবাসের লালধূলা দুটো মিলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে একেবারে। দু'থেকে দৈপল মনে হয় কালো একটা মেঘ জমেছে দক্ষিণ দিগন্তে।

যুগ যুগ ধরে মেলা বসছে একেখেরে। মাত্র একটি দিনের মেলা। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দুপুরের দিকে শেষ হয় মেলা আর শুরু হয় তার আগের দিন দুপুরের দিকে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মেলা, তবুও আশে-পাশের গ্রামবাসীরা এই দিনটির জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে। শেষ হয় একটি বছর, আবার তারা দিন গোণে পনের বছরের মেলার। এমনই ভাবে চলে তাদের প্রতীক্ষা, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। বুড়ো শিবের বয়স কেউ জানে না। কেউ বলতেও পারে না। টেপীও জানে না, তার বাবাও না, আবার তার বাবার বাবাও না। বুড়ো শিবের বয়সের কোন হিসেব-নিকশ নেই।

বাকুড়া শহর থেকে সোজা একটা লাল কাঁকরে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা চলে গেছে বিষ্ণুপুর হয়ে আরও পূবে। এই রাস্তাই ভাঙলেন পাড়ার এসে চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সোজা একটা চলে গেছে বাকুড়া-বিষ্ণুপুর, বাকিদেরটা ভাঙল গাঁয়ের মধ্যে আর ডান দিকেরটা একেখের।

হুস করে একটা বাস পেরিয়ে গেল একেখেরের দিকে, লোকে ঠাসা। শহর থেকে লোক বোঝাই করে আসছে—আবার ফাকা ফিরে যাচ্ছে—আবও লোক থানতে। জনসমুদ্র এখন একমুণী। সবাই চলেছে একেখেরের দিকে, সবাই লক্ষ্য বুড়ো শিব। মাহুঘ, বাস-ট্রাক আর রিক্সার মিছিল, চলেছে আপন আপন ছন্দে, গতিতে।

ভাল পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকে টেপী।

জাগ্রত শিব একেখেরের। ভক্তের ডাকে সাড়া দেয় বুড়ো শিব, মনস্কামনা পূর্ণ করে ভক্তের। হাজার বকমের ভক্ত বর্ণা দেয় শিবের মন্দিরে। তাদের কেউ চায় অর্থ বৈভব, কেউ চায় মান-বশ, কেউ চায় বোগমুক্তি আবার কেউ বা সত্যিকার শাস্তি। কেউ বা বিষণ্ণ আর চিনির বাতাস নিয়ে নৈবেদ্য সাজায়, আবার কেউ বা দেয় সোনার টিকলী আর এক মণ দ্রুঘের ভোগ, আবার কেউ বা অস্ত্রের লঙ্কাভাল, সবেরই বকম-ফের।

পাপ থগুন করতে আসে অনেকই, সারাটা বছরের জমান পুঞ্জীভূত পাপ তারা থগুন করতে চায় বৎসরের শেষান্তে...একটি দিনে। তারা জীবন্ত শিবের অল্প কাকব মিশিরে, জীবন্ত প্রাণময় শিবকে গৃহহীন ভিখারী সাজিয়ে পাখরের জড়-জ্বির শিবের ম'ধার বুনো নারকেল ভেঙে জল দেয়, খাঁটি হু ধরে স্নান করার শিব-লিঙ্গকে। শ্বেত-সারবেল পাখরে বেদী বাঁধিয়ে দেয়। নাম খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে। সোনাদানা চড়ায় শিবের সর্পাঙ্গে, জলসত্র খোলে মেলার মধ্যে। হারবে হুনিয়া! বাপ-মাকে নিরন্তর বেখে তাদের মৃত্যুর পর বুঝোৎসর্গ করা যেন।

এর আগের বছরও মেলা দেখেছে টেপী। এ বছর মা বৈকে বসেছেন, "সোমন্ত আইবুড়ো মেয়ে মেলার বাওয়া হবে না।" বোল পেরিয়ে সতেরোর পড়েছে টেপী মাঘে। বাড়বাড়ন্ত গড়ন তার, তা সে কি করবে? এই ত বিশ্বাসদের টুনি, বোসেদের বিন্দে তার চেয়ে দু'এক বছরের বড় বৈ কম না, তাদের গড়নই আলাদা। চিমসে আমচুয়ের মত সব। কেউ দেখলে বলবেই না তাদের এত বয়েস, আর তারাও বেখে-টেকে বয়েস বলে তাই। যেন দু'জনেই টেপীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তারা এখনও হু'চার বছর দেখবে মেলা, আর টেপী? কান্না পায় টেপীর। ভাবে সেও কেন ওদের মত শুটকী হয়ে জন্মায় নি, তা হলে ত আর বছরের সাধ এমন একটা মেলা দেখা থেকে বাদ পড়ত না সে। মা ত বলেই খালাস, "তোমার সব জিনিস এসে যাবে টেপী।" হেঁ, এসে যাবে বললেই এসে গেল আর কি? বাবার কোন পছন্দ আছে নাকি? কত বকমারী মাথা-বাঁধা ফিতা উঠেছে আজকাল, তা বাবা জানে, না দেখেছে? কিনে আনবে হয় ত সেই ঠাকুর-মার আমলের কালো কয়েক হাত বাজ মাথা-বাঁধা দড়ি। ধোং ও সব নিজের জিনিস নিজে কেনাই ভালো, পয়ের পছন্দ আর নিজের পছন্দ এক হয় নাকি কখনও?

মাঘের স্বভাবটাই এই বকম। ববাবর ভাল কাজে বাগড়া লাগানই মাঘের কাজ। কেন, একটা দিনের মেলা, তা কিছুক্ষণ যদি টেপী যেতই বাবা কিবা দাদার সঙ্গে, কি এমন ভাগবতটা অন্তত হ'ত শুনি? সোমন্ত মেয়ে? সোমন্ত মেয়েরা বুঝি দাস্তার বেবোবে ন? ঘরের কোণে বসে থাকবে চুপ করে? কেন, তারা কি বৈকুণ্ঠ ময়দার দোকানের বসগোজা নাকি, যে, রাস্তার লোকে তুলেই কুপ করে মুখে পুবে? তবে হেঁ, পুরুষ জাতটার চাউনিটাই যেন কেমন কেমন। কেমন যেন সব হেঁলা চাউনি। হাঁ করে যেন গিলবে মাহুঘটা স্বেছাই। এমন ভাবে বেহায়াগুলো

টেপীর দিকে চায় যে, লজ্জায় মরে যায় টেপী। কেন, আর কি কিছু দেখবার নেই নাকি দুনিয়ার? গাড়ী-ঘোড়া দেখে, গাছপালা দেখে, আকাশের রঙ দেখে, তা না, সব ছেড়ে তাকাবে টেপীর দিকে। আগে কিন্তু এমনটা ছিল না। এটা শুরু হয়েছে আজ বছর তিনেক হ'ল। লোকেরই বা মোব কি? টেপী নিজেই নিজেকে নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পুজোর কেনা ব্লাউজ, বডিজ আজও সব ছোট মনে হচ্ছে বৃকের দিকে। মাকে বলতে পারে না লজ্জায়, বৌদি ঠাট্টা করে মুখ টিপে টিপে হাসে। ঠাট্টা করবে নাই বা কেন বৌদি, নিজেও শুটকীদেব দলেই ত।

আগের বছরেও হয়ত বা মেলা দেখা হ'ত না টেপীর। মা ত এ বছরের মত বলেই দিয়েছিল, যাওয়া হবে না তার। এক্ষেত্রে বকুলফুলের মা নিয়ে গিয়েছিল টেপীকে নিয়ন্ত্রণ করে—মেলা দেখতে। বকুলফুলও খুশিবাড়ী থেকে এসেছিল। বছর দুয়েক হ'ল বিয়ে হয়েছে বকুলফুলের। সেবারেও কেনাকাটা অবশ্য অনেক কিছুই করেছিল টেপী—তবে মেলা বাকি দেখা বলে সে ভাবে সে দেখতে পারেনি। পরের সঙ্গে কি মেলা দেখা যায় কখনও, না তা সম্ভব? বকুলফুলের নামটা খোঁজাল হতেই টেপীর চোখের পাতা দু'টো ভিজে উঠে অশ্রুতে। তার বকুলফুল আজ আর নেই, মারা গেছে সে। মাস ছ'য়েক হ'ল বাপের বাড়ীতে সে এসেছিল ছেলে হতে। কিন্তু বাবা এক্ষেত্রে তাকে বাঁচাতে পারলেন না, তার ছেলেকেও না। এক্ষেত্রে শিবের আনন্ডল আর প্রসাদী ফুল-বেলপাতা কিছুই ধরে রাখতে পারলেন না তার বকুলফুলকে। শহর থেকে ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেল তার বকুলফুল। পাপ! পাপ আর পুণ্য মানে টেপী; বকুলফুল মারা গেল তার বাপ-মায়ের পাপে। এত বড় পাপ কি কখনও সহ্য করতে পারে বুড়ো শিব? টেপী নিজের চোখে দেখেছে, ঠাকুরের মাথায় চড়ে আবার সেই প্রসাদী ফিরে আসছে বকুলফুলদের দোকানে। সেখানে আবার বিক্রি হচ্ছে সব নতুন পুজার জুড়ে। বকুলফুলের বাবা পুজা করে মন্দিরে—আর বাড়ীতে দোকান চালায় তার মা। এ আর এক দুনিয়া।

মেলা দেখেছিল টেপী তার আগের বছরটার। মেলায় গিয়েছিল ভজাদার সঙ্গে। পনের বছরের মেয়ে টেপী—আর ভজাদা বিশ কি বাইশ। বিকালে বেরিয়ে বাড়ী ফিরেছিল সেই রাত বারটার। ছোটখাটো নানান জিনিসে ভরে গিয়েছিল তার হ'হাত, ভজাদার হাতও খালি ছিল না একটু।

মেলা! যেন বিরাট জনসমুদ্র একটা, তার কুলকিনারা নেই কোন, কেবল মাছুষ—মাছুষ আর মাছুষ। ছোট-বড়, বুড়ো-যোয়ান শিশু। দোকান, দোকান আর দোকান!

পাইগয়লার পাশ থেকেই দোকানের শুরু। সারি সারি দোকান বসেছে বাস্তার হ'থারে, বকমারি দোকান, খাবারের দোকান, মাছ, ভালপাখা, মনোহারী জিনিস, লোহার বঁটি, হাতা, আরও নানান টুকটাকী। খেলনার দোকান। একটা দম-দেওয়া ঘোড়া

পা উঠাচ্ছে-নামাচ্ছে। বেল-ইঞ্জিন চুটছে, কত বড় বড় ডল-পুতুল গাটাপাটায়, চমৎকার ভাবে সাজান। সাড়ে ছ'আনার দোকানই বসেছে হ'নশটা। মাথার ফিতার দোকানে এসে দাঁড়ায় টেপী। কিতা কেনে পছন্দমত, কপালের টিপ কেনে কয়েকটা, মাথার কাঁটা কেনে।

ভজাদা তাকে একটা মাথার-গোঁজা চিকণী কিনে দেয়। সোনার মত অক্ষরে লেখা 'ভালবাসা', চিকণীটা হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করে টেপী, ভারী সুন্দর চিকণীটা, খুবই পছন্দ হয়েছে তার। আর হবে নাই বা কেন—পুরো একটা টাকা দাম নেয় চিকণীটার। চানচুর বিক্রি হচ্ছে, খুব ঘন্টি নাড়াচ্ছে দোকানদার। 'চনা বানারা মজাদার।' খুব বিক্রি হচ্ছে তার।

চুড়ির দোকান বসেছে পুরো এক সারি। দশ-বারটা দোকান হবে, বকমারি সব চুড়ি, চোপ ঝলসে যায় ওদিকে তাকালে। ফাসাক আর ডেসাইট জ্বলতে শুরু হয়েছে, অনেকে জ্বলেছে কারবাইড বাতি। বকমারি দোকান আর বকমারি সব বাতি। সারাটা প্রান্তর যেন এক মুহুর্তে ইন্দ্রপুরীর মত হয়ে যায়। চুড়ির দোকানে এসে দাঁড়ায় টেপী। শাপের চুড়ির দর করে। তার পুরুট গোলগাল হাত দুটো তুলে ধরে দোকানদারের দিকে। দোকানদার একবার মুখ তুলে তাকায় হাতের মালিকানীকে দেখতে। তার চোখে চোখ পড়ে টেপীর, সারা মুখটা লাল হয়ে ওঠে তার, মুখটা নীচে নামিয়ে শাপ। পরে। দাম মিটিয়ে দেয় ভজহারি, পুণ্য পাঁচদিক। একপাশে শাখাখালু, পাট শাক, কঁচপাকা, কচিশসা, কুলকুটো বিক্রি হচ্ছে। একটা মনোহারী দোকানের দিকে এগিয়ে যায় টেপী। বড় দোকানগুলো সব গলাকাটা। চোপ বৃজে দাম বলে সব, নখ-পালিস আর একটা কুমকুম কেনে সে। নাগরদোলা আর চড়ক বসেছে নীচের দিকের মাঠে, খুব ঘুরছে চড়ক আর নাগরদোলা, ছেলে ছোকরাদের ভিড় জমেছে বেশ। হ'আনা পরয়া দিয়ে তারা হ'জনে চড়কে চাপে, হ'জনে একটা বাস্তের মধ্যেই। টেপী আর ভজহারি, বনবন করে ঘুরছে বাস্তগুলো—মাথা গুলিয়ে যায় টেপীর, ভয়ে জড়িয়ে ধরে ভজহারিকে। ভজহারি আনন্দ পাষ, হাসে, চড়ক থেকে নেমে তারা সোজা একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢোকে, পেটপুরে খায় হ'জনে, খিদে পেয়েছিল খুবই। পাশে একটা লোক কাঠের বাস্তে চানচুর আর গুণচূপ বিক্রি করছে। কেবোসিনের একটা ডিব্বী বাতি জ্বলেছে তার সামনে, খোঁওয়া উঠছে খুব, একটা ছেলে গুণচূপ খাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কুপকুপ করে মুখে চালাচ্ছে একটার পর একটা। একটা গোলগাল কুপের পাতা চাটছে আপন মনে।

আরও অনেক কেনাকাটা করে তারা হ'জনেই যেলার চার-দিকটা ঘোরে-করে। জরি-দেওয়া পাখা কেনে কয়েকটা দেখে-গুনে। তার পর পাখর বাটি কেনার জন্ত এগিয়ে যায় বড় শিমুল গাছটার দিকে, বাস্তার একটা পাশ জুড়ে সারি সারি গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে বিক্রী হচ্ছে পাখরের বাটা, খুরি, প্লেট, শিল



নোড়া। দমনস্তর করে কয়েকটা বাটা আর গ্রেট কেনে টেপী। আমের অংশ খেতে এগুলো বেশ, আমের অংশের কথা মনে হতেই জ্বিলে জল সবে তার, শুধু টেপীর কেন, কত লোকেরই ত এমন হয়। কেন এমন হয় কে জানে? আচ্ছা, বেটাছেলেদেরও কি হয় এমনই? লজ্জায় সে জিজ্ঞেস করতে পারে না ভজ্জহরিকে। একটা পকেটমার ধরা পড়েছে কার পকেট কাটতে গিয়ে, রাম-গোলাই হচ্ছে মেলায় লোকগুলোর কাছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে গলগল করে, এখনও হাত পাঠেনি বেচারীর।

কেনাকাটার কথা মনে মনে ভাবে টেপী। নিজের ত প্রায় সবই কেনা হয়ে গেছে, এবারে ছোট ভাইপোটার জন্তে একটা কাগজের নীল-লাল কিরকিরি, বেঙ বাজনা আর বুহু'মি—বাস, তা হলেই ত হয়ে গেল এককম। আচ্ছা বৌদির জন্তে একটা কিছু কিনলে কেমন হয়? একটা পাউডার কিবা স্নো? একটা স্নোই কিনে কেলে টেপী পুরো চোদ্দ আনা দিয়ে, সাড়ে চ'আনার দোকানের সামনে এগিয়ে যায় সে। বেজার ভিড় সেখানে, বত রাজোর প্রাসটিকেব জিনিসপত্র। আয়না, তরল আলতা, পেতলের ধূপদানি, বড় চামচ। একটা ধূপদানি কেনে মায়েব জন্তে। অনেকগুলি ধূপ দেওয়া যায় এক সঙ্গে। পুজা করার সপ আছে মায়েব যোল আনা অথচ একটা ধূপদানি কিনবে না, হাড়কিপেট সব, ধূপ দিতে হলেই মাটি আন, না হয় পোবর খোজ। বত সব।

পরিতৃপ্তি একটা নিখাস ফেলে টেপী, ভজ্জহরিকে বলে : চল, এবার ঠাকুর দেখব। মন্দিরের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় তারা। পুলিশ আর ভলেন্টারিরা রাস্তা পাড়ারা দিচ্ছে, মাঝে দড়ি বেঁধে রাস্তাটাকে হ'ভাগ করেছে। একটা ভিতরে বাবার আর একটা বাইরে আসবার। ভিতরে বাবার রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলে হ'জনে। কার যেন ছেলে হারিয়েছে, মাইকে বলছে তাই। “নাম থাকহরি, বয়েস দশ বছর, পরশে কালো হাক প্যান্ট, ডোরা কাটা হাক সাট। ওর বাবা সত্যকিরর যায় অপেক্ষা করছেন আমাদের ক্যাম্প। ভলেন্টারিরা ভাই-বোনেরা লক্ষ্য রাখ।” একটা চাকলা জাগে যেন ভলেন্টারিদের মধ্যে, বাচ্ছা ছেলে দেখলেই তারা তাকায় তার জামা আর প্যাণ্টের দিকে। মন্দিরের কাছাকাছি চলে আসে তারা। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডাবার উপায় নেই কারও, একটু ঠাণ্ডিয়েছে ত পিছনের চেউ এসে যারবে গিঠে ছপাং করে। আমার গোটাকরেক পরসা ছুড়ে ছুড়ে দেয় টেপী ভিখারীগুলোকে, সব ক'জনেই ব্যাধিগ্রস্ত, কুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছে তাদের, একটা বিল্লী গন্ধ বেবোচ্ছে তাদের গা থেকে।

বড় ফটকটা দিয়ে ভিতরে আসে তারা, ফটকের বাহিরে কত কারুকার্য। ভিতরে ঢুক একটু স্বস্তির নিখাস ফেলে টেপী। ভিতরে মাহুয়ের ভিড় কিছুটা কম। ছোট ছোট মন্দিরগুলোকে পাশে বেধে এগিয়ে যায় টেপী বড় মন্দিরটার দিকে। মন্দির-চত্বরে তখন পালাকীর্তন সুরু হয়েছে, মাথুব হচ্ছে। কীর্তনরীরা এসেছেন মানভূমের কি একটা গাঁ থেকে, বেশ গলা জ্বললোকেব,

যেমন গলা তেমনই তাঁর দেবকান্তি চেহারা। সামনের খালায় একটা হ'আনি বেধে দণ্ডবত করে টেপী। তার দেখাদেবি ভজ্জহরিও। মাথার চামরের স্পর্শ অমুভব করে টেপী। বেশ স্তম্ভিত লাগে তার। খালায় বেশ পরসা পড়েছে।

মন্দিরের সামনে ট'ডান পিতলের বড় বড় ঘণ্টাগুলো বাজাতে সাধ যায় টেপীও, সাধ হলেই কি সব জিনিস হয়? না লাকিয়ে নাগালই পাবে না সে। ভজ্জহরি সামনে লাকালাকি করতে তার কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ভজ্জহরি ঘণ্টা বাজায়, বেশ মিষ্টি আওয়াজ—টুং টাং।

ভজ্জহরি আর টেপী হ'জনেই মন্দিরের দেওয়ালে নাম লেখে কঠেকরলা দিয়ে। সারা দেওয়াল নামে নামে ছেয়ে গেছে একেবারে। তিলধারণের জায়গাও নেই কোথাও। পূজারীর নামাবলীর মত যেন দেখাচ্ছে মন্দিরের দেওয়াল। ভজ্জহরি নামের নীচেই নাম লেখে টেপী ভাল ভাবে, ধরে ধরে।

তামাসা করে ভজ্জহরি : ‘বিশ্বী নাম, আজকালকার দিনে টেপী, খেদী, পেঁচী, এসব নাম অচল। ঠাকুরমা-দিদিমাদের যুগে ওসব চলত, তোমার নাম হবে রাণী, কি, ঠিক ত?’

টেপীর নিজেরও এ নামটা পছন্দ নয়, কিন্তু সে করে কি? নিজের নাম ত নিজে বদলান যায় না। রাণী! কয়েকবার মনে মনে আঙড়ার নামটা, স্মরণ! খুসীতে ভরে উঠে টেপীর মন, সম্মতিসূচক মাথা হেলায়।

পূজারীকে কয়েক আনা খুচরা পরসা দেয় ভজ্জহরি পূজার জন্তে। তারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে শিবসিদ্ধ দর্শনের জন্তে। চমৎকার একটি পরিবেশ, ধূপ-ধূনা-চন্দন আর নান'ন ফুলের গন্ধে মন্দির মাতোয়ারা যেন, ঘিরেব প্রদীপ জ্বলছে এক পাশে টিমটিম করে। গেকরা বস্ত্রে সজ্জিত ভক্তেরা পূজার উপচার নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। ধনি উঠছে ‘হয় হব বোয়াম বোয়াম। ঠাকুরের মানসিক শোধ দিতে বারা এসেছে তারা ধর্মা দিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে, বাবার স্বপ্ন আর আশীর্বাদ পাবে, তবে তারা উঠবে, জাগ্রত শিব এজেন্সিদের।

পূজারী মস্ত পড়ছে। আজ তাদের ফুৎসং নেই কারুরই। শুদ্ধ আর পবিত্র পরিবেশে মাথা নিজেই মুয়ে আসে টেপীর। প্রণাম করে টেপী আর ভজ্জহরিও। শ্বেত চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে ভজ্জহরি কপালে দেয় টেপী, ভজ্জহরি দেয় টেপীর কপালে।

—কি চাইলে ঠাকুরের কাছে? কৌতুক করে টেপী।

—তোমাকে। সোজা জবাব দেয় ভজ্জহরি।

—হঠাৎ!

মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকায় টেপী, বাপবে, কত উঁচু। কিম্বদন্তী আছে, এত বড় মন্দির নাকি একই রাজে তৈরী হয়েছিল। ভোবের কোকিল ডাকায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের। অসমাপ্ত আছে তাই চূড়ার কাছে খানিকটা জায়গা আজও, আর

আছে নাকি একটা পাথরের কোকিল, সেট কোকিলটা, যেটা ডেকে ছিল সেদিন। এসব অবস্থা শোনা কথা টেপীর। নিজে কোকিল-টোকিল দেখবার সুযোগ পায় নি সে, আর বিশ্বাসও করে না তাই এসব।

মন্দিরের সর্বত্রই শিল্পকার্যের নিদর্শন, হাজার হাজার দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরের গায়ে খোদিত। ভক্তেরা ভক্তির প্রাবল্যে সিন্দুর আর তেল দিয়ে সেগুলি বোকাই করে তুলেছে। আজ দেখলে মনে হয় যেন সব সিন্দুরের তালগোল।

মন্দিরের একপাশে শিবদুর্গা সঙ্গে দু'জন ছেলে ভিক্ষা করছে, বেশ বোজগার তাদের। আজকে যেন ঠিক ভিক্ষা নয়। শিবদুর্গা ভক্তদের কাছে কিছু নিয়ে তাদের যেন খত করছে, এই বকম একটা ভাব তাদের চোখে মুখে। বাচ্ছা ছেলে, নিজস্ব একেবারে তাদের জড়িত নয়ন—কিন্তু তবু বিজ্ঞানের অবকাশ নেই হয়-পার্কটীর। এগিয়ে চলেছে তারা পায়ে পায়ে। পায়ে বপুব বাজছে কুমকুম কুমকুম।

খানারগীর মন্দিরে প্রণাম সেবে বাইরে বেরিয়ে আসে দু'জনে বড় কটকটা দিহেই, বড় কটকের বেঘন হলোই আবাব জনসমুদ্র। যেন সমুদ্র আরও উত্তাল আরও উত্তোল। পিছনের দিকে মৃত দারকেশ্বর পড়ে আছে সর্বস্বপ্নের মত।

আর কেনাকাটা নয়, হেলায় বাকী একটা দিক দেখে ফিরে যাবে তারা এবার। সার্কাস বসেছে এদিকটার। দুটা বানর একটা বাঁধা মাচার উপর ঘোরাকেরা করছে আর দাঁত খিচুচ্ছে দর্শকদের দেখে। একটা জোকের মুখ দিয়ে লাল, নীল, সাদা হবেক হকমের কাগজ বেব করছে। কাগজের শেষ নেই যেন। তার সাজ-পোশাক আর টুপীটা দেবেই হাসি আসে টেপীর। তাঁবুর ভিতর বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। খেলা শুরু হয় নি এখনও। টিকিট বিক্রী হচ্ছে তারই।

একটু দূরেই একটা পুলিশের ক্যাম্প। তার পাশে আনিটারী ডিপার্টমেন্ট আর ভলেন্টারিস ক্যাম্প। মাড়োরাড়ীদের দেওয়া একটা জলসত্র, টিনের লম্বা চোঙা দিয়ে জল দিচ্ছে একটা লোক। এত রাজেও জল খাচ্ছে অনেকে। পূণা সজয় করছে মাড়োরাড়ী বাবুরা। কাঠের লাঙল বিক্রি হচ্ছে একপাশে, চাবীর দল ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, দরদারি চলছে।

আনিটারী ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোকে হুচোখে দেখতে পায়ে না টেপী। ওরা কিছু দেখেনা হেলায়, দোকানে হোকানে খেয়ে বেড়ায় আর উপরি আদায় করে। দোকানদারেরাও চোখ বুজে ভেজাল চালায় তাই, তাই না রাজের অবিক্রীত আলুব দম আবার সকালে বিক্রি হয়। চপের মধ্যে সে আলু পাচার হয়। লোকে মুড়ি আর আলুব চপ খায় খালপাতার চোঙা করে পরিতৃপ্তি সহকারে। তারা কেট জানে না আলুব আসল রহস্য। টেপী নিজে এসব দেখেছে আর শুনেছেও।

দূরের ফাকা মাঠটার আর হাসাকেরা বোশনাই পৌছাতে পারে

নি, তাই অন্ধকার হয়ে আছে সেই স্থানটা, কতকগুলো নড়াচড়া করছে তারই আশে পাশে, তাদের কিসকিসানি কাণে আসছে। স্বাক্ষি এবার পড়ার হয়েচে, ভক্তলোকের আনাপোনা কমে আসবে এবার। হেলায় আওরাজ উঠছে গমগম।

হেলা এবার বিপরীতদুপী, ভক্তলোকেরা কেনাকাটা শেষ করে ফিরছে, প্রায় সবাই হাতে মাগুর আর পাখা। এবারে হেলায় আনাপোনা বাড়বে অসং, মাতাল, চরিত্রহীন আর লম্পটদের। অন্ধকার মাঠে তাদেরই পদধ্বনি আর কিসকিসানি। শহরের বাহাদুরি আর গ্রামের চরিত্রহীনাদের ভিড় সেখানে। সঙ্গসুখ দিতে এসেছে তারা লম্পট পুরুষদের, রাত কাটাতে তারা আর হৈ-হুল্লোড় করবে তাদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ইচ্ছিত বিকোতে এসেছে তারা স্ব ইচ্ছায়। পুলিশ বন্ধ তাদের, অর্থ বশ সবাই, সাবাস হোঁপাচকু।

রাত অনেকটা বেড়েছে, দোকানের হাসাকগুলো কেমন নিস্ত্রাভ লাগছে চোখে। সারাটা দিনের বেচাকেনায় দোকানদার ঝিমিয়ে পড়েছে, পরিশ্রান্ত সেও।

বাড়ীর পথ ধরে তারা দু'জনেই। টেপী আর ভক্তহরি।

ভক্তদা তখন দিক্সা চালাত না, গোপাল নন্দীর ধানকলে যেটের কাজ করত, লোকজন খাটাত আর খবরদারী করত তাদের উপর, হস্তা পেত দশ টাকা। ভক্তদাকে তাদের বাড়ীর সবাই ভালবাসত, মান খাতিব ছিল তার, মাঝে মধ্যে চা-টা পেত। তার সঙ্গে ভক্তদাকে জোড়া লাগাবার গোপন পরামর্শ চলত বাড়ীতে, টেপী সে সব আড়ি পেতে শুনত, শুনতে ভাল লাগত তার। কিন্তু ভক্তদা বাহাতক দিক্সা চালাতে আরম্ভ করলে বাড়ীর সবাই ছো ছো করে উঠল। ছিঃ ছিঃ করলে সবাই, এর চেয়ে ধানকলের যেটের কাজ নাকি অনেক ভালো, বেতন অল্প হলেও ইচ্ছিত ছিল তাতে। ভক্তদা তা মানতে রাজী নয়। বললে, কেন, আমি ত চুবিও কছি না, সিদও কাটছি না—খেটে খাব, তা সে যে কাজই হোক না কেন, এতে অজারটা কোথায়? যেটের চাকুরিতে মাসে চল্লিশ টাকা আর দিক্সা চালিয়ে পুরো দু'শ, তা ছাড়া ওটা পরাবীন আর এটা স্বাবীন।

এক দিন ত মা ভক্তদারই মুখে উপব বা তা বলে বসলেন : সে দিক্সা চালায়—ছোট কাজ করে। আরও কত কি।

সে দিন থেকেই ভক্তদা তাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দেয়, আচ্ছা, আমি স্বীকার করলাম দিক্সাই না হয় সে চালায়—তাই বলে কি তার আত্মমর্যাদাও থাকবে না নাকি? টেপী ত কোন অজায় দেখেনি ভক্তদার। না-করে সে নেশা-ভাঙ আর না আছে কোন বদ খেয়াল। কি দেখ ভক্তদার? দিক্সা চালালে কি তার জাত-গোত্র সব শেষ হয়ে যায় নাকি? তা যদি হয় তা হলে বাবা, দেল-গাড়ী চালায়, মোটর চালায়, হাওয়াই জাহাজ চালায়, তাবাত ত জাত-গোত্রহীন? তা যদি না হয় তা হলে তার ভক্তদাই বা হতে পারে কেন?

অনেককণ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে টেপী। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এবারে। শহরের দিক থেকে একটা বাস আসছে, আলো জ্বলছে তাতে। একটা বেন নেকড়ে ছুটে আসছে সহরের দিক থেকে। চোখ দুটো তার জ্বলছে—জল জল করে। গাড়ীটা বেকে যায় এক্ষেত্রেবের দিকে। পিছনে সাইকেল-বিক্রা চলছে দল বেঁধে, বেন শোভা-যাত্রা বেরিয়েছে তাদের, একটা মন্ত মিছিল। একটা সাইকেল-বিক্রা ফিরে আসছে মেলার দিক থেকে। খালি বিকরা। বেল লাইনের টলে জোরে নামছে। প্যাক প্যাক করে তার ভর্ণ বাজছে। সামনে একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। আলোটা কাঁপছে, বিকরা গতি মধুর হয়ে আসছে বেন। ধেমে পড়ে এক সময়।

—বাণী।

চমকে উঠে টেপী।

এসিয়ে আসে ভক্তহরি। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক, মোড়কটা টেপীর হাতের দিকে বাড়িয়ে দেয় ভক্তহরি। বলে : শাড়ী আছে তোমার, আর এটা প্রসাদী ফুল ঠাকুরের। একটা শালপাতের সৈত ভক্তহরির হাতে।

হাত বাড়ায় টেপী ভক্তহরির দিকে। দুঃখেই ত মাহুষ কান্দে কিন্তু তার চোখে জল আসে কেন হঠাৎ? এ টেপীর আনন্দ-জ্ঞ। আনন্দে টেপী যে কি করবে ভেবেই পায় না প্রথমে। পেশম তুলে ময়ূরীর মত নাচতে ইচ্ছা করে তার। আনন্দের আবেগে ভক্তহরির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সে।

মেলা ক্রমশঃ জমে আসছে বেন। গম গম আওয়াজ ভেসে আসছে এক্ষেত্রেবের দিক থেকে। হাসকের আলোর ঘোশনাই উঠেছে উপরে। দু'জনেই চেয়ে থাকে সেই দিকে অপলক নেত্র। বুড়ো শিবকে প্রণাম জানায় দু'জনেই অবনত মস্তকে।

## পাছ

### শ্রীআতিথি রাহা

জীবনের ব্যর্থতার প্লানি, মুছিয়া নিমেষে—

দিকহারা পাছ আমি দাঁড়াইছু শ্রান্ত বেশে,

বিক্রপাণে শূণ্য হাতে কিরি দীর্ঘপথ শেষে;

জাঁধার বনায়ে আসে—

এখনও যে দীর্ঘপথ বাকী;

আনমনে দীপ জালি

ভ্রান্ত আমি চলেছি একাকী।

কেহ নাই পথ হতে

সমাদরের গৃহে লবে তাকি,

দৈগ্ধ নাই, নাই ক্ষোভ

হাসি আছে বেদনারে ডাকি।

আশার মুকুলগুলি ছিন্ন হয়ে গেছে মোর—

নিঃসঙ্গ হয়েছে যাত্রা, তীব্র অমায়িক ধোর;

বন্ধুর পথে আমি চলেছি অক্লান্ত বিভোর।

## পূর্ণতম

### শ্রীতপতী চট্টোপ ধ্যায়

জগৎভরা এই যে আলো আকাশ ভরা গান।

ফুলের মাঝে এত যে রঙ ফলের মাঝে দান।

সবুজ পাতা বিবির বিবিনো গ্রাণ জুড়নো ছায়া।

মায়েব বুকে প্রিয়ব চোখে স্নেহভরা মায়।

বিস্মিত মোর হিয়া সে আজ পরাণ দিয়ে লোটে

মুগ্ধ হিয়া নুতন করে নবীন হয়ে ওঠে।

সেই হিয়া মোর জগৎভরা জ্যোৎস্না দেখে মেতে

ছুটে যে চায় সে জ্যোৎস্নারই উৎসলোকে যেতে।

যারই ছোট কণায় আমার হৃদয় উপছে পড়ে।

কেমন তুমি পূর্ণতম দাঁও গো দেখা মোরে।

তোমায় খোঁজার পথে আমার হাতছানি দেয় যারা

কেমন করে মিথ্যা বলি মূল্যহীন কি তারা।

দোষ ত তাতে নয়,

সেইখানেতেই খামলে যে মন পূর্ণ নাহি হয়।

# ঘাঁটু পূজা

শ্রীমুখময় সরকার

কাল্পনিক শেষ দিবসে উষাকালে ঘাঁটু পূজা একটি কৌতুক-জনক ধর্মকৃত্য। পূর্বদিন বৈকালবেলায় বালক-বালিকার ঘাঁটু পূজার জন্য ঘাঁটু ফুল সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। গ্রামে পুকুরীঘর পাড়ে অথবা ঘোপ জঙ্গলে ঘাঁটুগাছের অভাব নাই। প্রায় চক্রাকার অমৃগ পত্রযুক্ত গুল্মের শীর্ষ গুল্ম গুল্ম বক্তাভ-শুভ্র পুষ্পবাহি বসন্ত সমীরণে কেশর বিস্তার করিয়া মুহু সৌরভ বিকীর্ণ করিতে থাকে। পুষ্প-আহরণের সময় ভ্রমর ও মক্ষিকার গুল্মরণের সঙ্গে বালক-বালিকাধের কলগুঞ্জন মিশ্রিত হইয়া এক গিচি শব্দমাধুরী সৃজন করে। সন্ধ্যা-আহত ফুলে ঘাঁটুর পূজা হয় না। 'বাসি ফুলে' পূজা করিতে হয়। প্রাচীনারা ঘাঁটু ফুল না বলিয়া ঘাঁটুকন' ফুল বলেন। পঞ্জিকায় ঘাঁটুর নাম ঘণ্টাকর্ণ। বলা বাহুল্য, ঘণ্টাকর্ণ শব্দের বিকারে 'ঘাঁটুকন'। তাহা হইলে ঘাঁটু সংস্কৃতায়িত হইয়া ঘণ্টাকর্ণ হয় নাই; ঘণ্টাকর্ণ শব্দেরই রূপান্তরিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ ঘাঁটু'।

ঘণ্টাকর্ণ নামটিও কৌতুকবহু। ঝাঁহার কর্ণে ঘণ্টা আছে, তিনি ঘণ্টাকর্ণ; ঘাঁটুর কানে ঘণ্টা কেন? ইহার এক লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এ কাহিনীর মূল কোন পুরাণে আছে বলিয়া মনে হয় না। ঘাঁটু নাকি প্রথমে এক রূপবান দেবকুমার ছিলেন। কি একটা অপ-রাধের জন্য ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে অভিশাপ দেন, ফলে ঘাঁটুর জন্ম হয় পিশাচকূলে। লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছিল বলিয়া ঘাঁটু বিষ্ণুর উপর ভীষণ চট্টিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবেন না, বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করিবেন না। পাছে কেহ বিষ্ণুর নাম করিলে তাঁহার কর্ণে তাহা প্রবেশ করে, তাই কর্ণে ঘণ্টা বাধিয়া রাখিলেন। কানের কাছে সর্বদা ঘণ্টা বাজিতে থাকিলে বিষ্ণুর নাম তিনি আর শুনিতে পাইবেন না। একটা ছড়ায় ঘাঁটুর উৎপত্তি ও প্রকৃতি বর্ণিত আছে :

শুন শুন সর্বজন ঘাঁটুর জন্ম-বিবরণ।

পিশাচ-কূলে জন্মিলেন শাস্ত্রের লিখন ॥

আবার হরিনাম কর্ণেতে করবে না শ্রবণ।

তাঁই দুই কানেতে দুই ঘণ্টা করেছে বন্ধন ॥

অতি ২ ত্র্যয়ে ঘাঁটুর পূজা। স্মৃতরাং পূর্বদিন রাত্রিতেই পূজার আয়োজন করিয়া রাখিতে হয়। আয়োজন অতি

অনাড়ম্বর। মুড়ি, ভাজিবার এক টুকরা খোলাই ঘাঁটুর আসন; পুরাতন এক টুকরা কাপড়ে হলুদ মাথাইয়া হয় ঘাঁটুর বসন। শুষ্ক চাউলে শুষ্ক মাথাইয়া ঘাঁটুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়। প্রত্নাষে পাত্রোৎখান করিয়া গৃহিণীরা ঘাঁটুর প্রতিমা নির্মাণ করেন। গোয়াল হইতে তাল এক-তাল গোময় লইয়া পাকাইতে পাকাইতে ঠিক বর্তলাকার করিয়া ফেলেন, যেন একটি শালগ্রাম-শিলা। তাহাতে দুইটি বেঁচি-কড়ি এমন ভাবে বসাইয়া দেওয়া হয় যেন দুইটি চক্ষু। কোমল গোময়-পিণ্ডের প্রতিমায় একটি ঘাঁটুকুলের মঞ্জরী গুল্মিয়া দেওয়া হয়।

বাড়ীর অঙ্গনে একটি স্থান, সাধারণতঃ তুলসীতলা ঘাঁটু-পূজার জন্য নির্দিষ্ট হয়। স্থানটি ধোত করিয়া গোময় লেপিয়া পরিচ্ছন্ন করা হয়। তার পর ভাঙা মুড়ি-ভাজার খোলায় ঘাঁটুর প্রতিমা স্থাপন করা হয়। হরিজ্ঞানজিত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রতিমার কিয়দংশ আচ্ছাদিত করা হয়। ঘাঁটুর কপালে সিন্দূর এবং বেঁচি-কড়ির চোখ দুটিতে কাজল পরাইয়া দেওয়া হয়। পার্শ্বধূপ-দীপ জলিতে থাকে। শুষ্ক-মিশ্রিত শুষ্ক চাউলের নৈবেদ্য সজ্জিত করা হয়। পূজার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন নাই, গৃহিণীরাই ঘাঁটুর পূজা করেন। ঘাঁটু-পূজার একটি মন্ত্র আছে পঞ্জিকায় :

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাপি বিনাশন।

বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে বক্ষ বক্ষ মহাবল ॥

এই মন্ত্রট কেহ শুদ্ধ ভাবে, কেহ অশুদ্ধ ভাবে তিন বার উচ্চারণ করিয়া গৃহিণীরাই ভক্তিভাবে ঘণ্টাকর্ণের অর্চনা করেন। বালক-বালিকারা তখন অঙ্গনে আসিয়া সমবেত হয় এবং নানাবিধ ছড়া কাটিতে থাকে। কেহ বলে :

ঘাঁটু এল লড়ে

হাতীর উপর চড়ে ॥

আবার কেহবা বলে :

ঘাঁটু, ঘোর ঘোর ঘোর।

ঘাঁটু, বিয়া দিব তোব ॥

ইতিমধ্যে পূজা সাজ হয়, শব্দ বাজিয়া উঠে। পূজান্তে পূজাবিণী ঘাঁটু-প্রতিমাকে একটি প্রকাণ্ড খোলা দিয়া ঢাকিয়া দেন। তখন কোন বালক আসিয়া লাঠির আঘাতে খোলাটি ভাঙিয়া দেয় এবং ঘাঁটু আবার দৃষ্টিগোচর হ'ন।

অবশ্য এমনভাবে লাঠির আঘাত করিতে হয়, যেন উহা বাঁটু-প্রতিমাকে স্পর্শ না করে। বাঁটুর চারিপার্শ্বে দুই-চারিটি কড়ি ছড়াইয়া রাখা হয়। বালক সানন্দে ঐ কড়িগুলি কুড়াইয়া লয়। তার পর বাঁটু-পূজার প্রদীপের শিখায় কাজল পাড়িয়া গৃহিণীরা ছেলেমেয়েদের চোখে পরাইয়া দেন। কাজল-পরা শেষ হইলে প্রশাদ বিতরণ। শুক চাউলে গুড় মাখাইয়া বাঁটুর যে ভাগ হয়, তাহাই প্রশাদ পাইয়া বালক-বালিকার দল সানন্দে চিবাইতে থাকে। এইরূপে বাঁটু-পূজার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

বৈকালে বালক-বালিকারা দল বাঁধিয়া “আলোর মালোর” করিতে বাহির হয়। একটি ছোট বাঁশের চুপড়িতে এক কোণে বাঁটুকে বশাইয়া প্রত্যেক বাড়ী হইতে বালক-বালিকারা বাহির হয়। ভাষা যেমন হটক, বিষয়বস্তু যাহাই হটক, বালকগণে সমস্তের ছড়া শুনিতেই ত ভাল লাগে। সেদিন বৈকালে গ্রামের পথ শিশুদের কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠে। শানারণতঃ বালকদের হাতে থাকে বাঁশের চুপড়ি; তাহাতে পুষ্পাচ্ছাদিত বাঁটুর প্রতিমা। বাঁটু ফুলের মূহুর গন্ধে সুবাসিত হইয়া উঠে গ্রামের পথ। বালিকাদের হলুদ-ছোপানো কাপড়, পায়ে মল, চোখে বাঁটুর কাজল, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা। গ্রামের পথে পথে যখন তাহারা ছড়া বলিতে বলিতে আগাইয়া চলে, তখন মনে হয় যেন ধূলার ধরণীতে চাঁদের হাট নামিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে গিয়া তাহারা দল বাঁধিয়া দাঁড়ায় আর সমস্তের বলিতে থাকে :

“আলোর মালোর চাল শুদ্ধের দাঁও।

নইলে খোস-পাতাড়া লাও ॥”

গৃহিণী তখন বাহির হইয়া আসেন এবং প্রত্যেক বাঁটুর চুপড়িতে একমুঠা করিয়া চাউল-ছোলা-কুমুমবীচি\* ফেলিয়া দেন। বালক-বালিকার দল ইহাতেই তুষ্ট হইয়া হাসিমুখে সে স্থান ত্যাগ করে এবং অল্প বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হয়। একমুঠি চাউল-কলাই দিতে কাতর, এমন রূপণ গৃহিণীও থাকেন। খানিকক্ষণ ছড়া বলার পর যখন দেখা যায় কেহ বাহির হইয়া আসিল না, তখন বালক-বালিকারা বাঁগিয়া যায় এবং বাঁটুর প্রতিমা হইতে একটু গোবর লইয়া বাড়ীর দেওয়ালে লেপিয়া দিতে দিতে বলে :

“তবে এই খোস-পাতাড়া লাও ॥”

তাহাদের বিশ্বাস, বাঁটুর গোবর দেওয়ালে লেপিয়া দিলে ঐ বাড়ীর লোকেরের খোস-পাচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ হইবে।

\* কুমুমবীচি, কুমুদ নামক শস্তের বীজ। ইহা শুক ও অগ্নি। কুমুদের আরক্ত পীতবর্ণ পুষ্পদলে বস্তু বস্তু হইত।

সংগৃহীত চাউল-ছোলা-কুমুমবীচি লইয়া বালক-বালিকারা বাড়ী ফিরিলে গৃহিণীরা সেগুলি ভাজিয়া দেন, আর তাহারা চাল-কলাইভাজা চিবাইতে চিবাইতে আফ্লাদ প্রকাশ করিতে থাকে।

বাঁটু চর্মরোগের দেবতা। পূজায় সন্তুষ্ট হইলে তিনি চর্মরোগ নিবারণ করেন; তাহার পূজা না দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চর্মরোগের দ্বারা শাস্তি দেন। এইরূপ ভাবনাকে নিছক ‘অনার্য’ বা ‘লৌকিক’ বলিয়া উপহাস করিয়া লাভ নাই। বেদে ক্রুদ্ধদেবও যজ্ঞ দ্বারা পরিতোষিত না হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া মানব ও জীবজগৎকে ‘বোদন করান’, ব্যাধি দ্বারা প্রদীপিত করেন। পঞ্জিকায় লিখিত মাস মহাবল ঘণ্টাকর্ণ মাসকে বিস্ফোটকভয় হইতে ত্রাণ করেন। কিন্তু কাল্পনিক সংক্রান্তির উৎসাহে অমন বিচিত্র রীতিতে বাঁটু পূজা কেন? বাঁটু প্রতিমাকে একটা খোলা দিয়া ঢাকিয়া আবার লাঠি দিয়া খোলাটা ভাঙিয়া দেওয়া হয় কেন? বিশেষতঃ, ‘আলোর মালোর’ কথাটার অর্থই বা কি? বাল্যকাল হইতে মনে এই সকল প্রশ্ন লুকাইয়াছিল। সম্প্রতি বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে আসিয়া প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর মিলিয়াছে।

এ অঞ্চলে ফাল্গুন-সংক্রান্তি বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র চৈত্রমাস সন্ধ্যাকালে বালক-যুবকেরা ‘বাঁটু গাইতে’ বাহির হয়। উচ্চবর্ণসম্মতেরা নহে, বাউরী-গাড়ী-মুচি-ডোম ইত্যাদি তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণীর বালক-যুবকেরা দল বাঁধিয়া ‘বাঁটু গাইয়া’ থাকে। একটি ক্ষুদ্রাকার দোলা নানাবর্ণের কাগজের ফুল ও মালা এবং জামপাতা ও বাঁটু-ফুলের মালা দ্বারা সজ্জিত করা হয়। ঐ দোলার ভিতরে একটি প্রদীপ জলিতে থাকে। এখানে ঐ প্রদীপটিই বাঁটু। দুই জন বাহক বাঁটুর দোলাটি বহিয়া লইয়া যায়। প্রয়োজন-মত মাঝে মাঝে বাহক পরিবর্তন করা হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে বালক-বালিকারা কেন “আলোর মালোর” বলিয়া থাকে। প্রকৃত কথাটা নিশ্চয় “আলোর মালা”; প্রাকৃতজনের মুখে উহা “আলোর মালোর” হইয়া গড়াইয়াছে। যেমন করিয়া ইক্ষুপিজলী শব্দ রূপান্তরিত হইয়া “ইঁড়োল-পিঁড়োল” হইয়াছে। এক সময় হয়ত দীপই বাঁকুড়াতেও বাঁটুর প্রতীক-রূপে গৃহীত হইত; কালক্রমে সে রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ‘আলোর মালা’ কথাটা বিকৃতরূপে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, সেটা সহজে ভুলিয়া যায় নাই। ইহারই নাম ‘স্মৃতি’। প্রজলিত দীপই যদি বাঁটুর প্রতীক হয়, তবে তাহাকে ‘আলোর মালা’ বলা অসঙ্গত নহে। কথাটা অল্প কারণেও যুক্তিসঙ্গত; পরে আলোচনা করিতেছি।

ঘাঁটু-গাইয়ের দল ঘোঁসার মধ্যে ঠাকুর লইয়া কোন গৃহস্থের লাছ-দুয়ারে \* আসিয়া সমবেত হয়। তার পর ছড়া গাইতে আরম্ভ করে। দলের মধ্যে ঘাহার কণ্ঠস্থব ল্পষ্ট ও উচ্চ, সে এক পঙক্তি করিয়া গাহিয়া যায় এবং অপর সকলে সমন্বরে “বোল রাম” বলিয়া ধুয়া ধরে। যথা :

পরথম এলাম পরথম এলাম ঘর গেরস্থর বাড়ী।

—বোল রাম ॥

গেরস্থর বেঁধে বেঁধেছে সাগ্নের খাড়ি।

—বোল রাম ॥

সাগ্নে গেল আগ্নে দিয়ে।

—বোল রাম ॥

চোর পালাল ছুপ ছুপিয়ে।

—বোল রাম ॥ ইত্যাদি...

ছড়া সাধারণতঃ অর্থহীন শব্দ-সমষ্টিমাত্র মনে করা হয়। কিন্তু এই ছড়া অর্থহীন নহে। ফাল্গুন পত, চৈত্র আগত। ঘাঁটু গাইয়ের দল প্রথম গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়াছে। গৃহস্থ সজিনা ডাঁটা (সাগ্নের খাড়ি) রাঁধিয়া রাখিয়াছে। সজিনা-ডাঁটা প্রকৃতপক্ষে ‘ডাঁটা’ নহে, উহা সজিনা (সং শোভাজন) বৃক্ষের ফল। আকার দণ্ডের ত্রায় বলিয়া ডাঁটা, খাড়া বা খাড়ি নামে অভিহিত হয়। যেমন সোঁদালের যষ্ঠ্যাকার ফলকে অনেকে বলে ‘বীদর-লাঠি’। সজিনা-ডাঁটা চর্মরোগ-নিবারক, এমন কি বসন্তরোগের প্রতিষেধক। ছড়ার মধ্যে একটা রূপক আছে। সজিনা যখন আদিনা দিয়া আসিল, তখন চোর ছুপ-ছুপাইয়া পলাইয়া গেল। কে এই চোর? চর্মরোগই চোররূপে কল্পিত হইয়াছে; কারণ ইহা চোরের ত্রায় সকলের অলক্ষ্যে মানবদেহরূপে গৃহে প্রবেশ করে। ছড়ার মর্মার্থ এই যে, সজিনা ডাঁটা আহাৰ করিলে চর্মরোগ হেহ পবিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আর একটি ছড়া আছে :

নীল বনায় চুমচুমি।

বুড়ি আনল গুম্‌গুমি ॥

গুম্‌গুমিয়ে ভাজব দাঁত।

বুড়ি আনল চৈত্র মাস ॥

চৈত্র মাসের চতুর্দশী।

ঘাঁটুর কপালে চন্দন ঘষি ॥

ঘষতে ঘষতে পড়ল ফোঁটা।

একা ঘাঁটুর সাত বেটা ॥

এই ছড়াটিও যেমন অর্থহীন, তেমনই কবিত্বপূর্ণ। বসন্তকাল। নৈশ গগনের অনন্ত নীলিমায় অগণিত হীরার চুমকি বিকৃতিক করিতেছে। [নীলবন=আকাশের সীমাহীন নীলিমা। প্রাচুর্য ও বাহুল্য বুঝাইতে ‘বন’ শব্দের প্রয়োগ বাংলায় বহু প্রচলিত। বন+আ (স্বার্থে)।] এক বুড়ির কীভাবে মাঝে মাঝে মেঘের সঞ্চায় হয়, আকাশে মেঘের চাপা গুম্‌গুম শব্দ শোনা যায়। [এই বুড়ি এক অশুভ শক্তি। মকর-সংক্রান্তিতে এই বুড়ির ঘর পোড়ান হয়।] এই বুড়ি চৈত্রমাস আনিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে গুমট ও চর্মরোগ। তথাপি এই চৈত্রেরই শুভ চতুর্দশী তিথিতে ঘাঁটুর বিবাহ। সেদিন চন্দন ঘষিয়া ঘাঁটুর কপালে ফোঁটা দিয়া তাঁহাকে বরবেশে সজ্জিত করিতে হয়। বিবাহের পর ঘাঁটু সাত পুত্র লাভ করেন ॥

নিম্নের দুইটি পঙক্তি বলিয়া ঘাঁটু গাওয়া শেষ করে :

ধোপা ঘাটের জল খেয়ে।

মোষ পড়ল ধড়ানু দিয়ে ॥

অমনি এক বালক কিংবা যুবক ধড়ানু করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থ তাহার মাথায় জল ঢালিয়া দেয়। সে উঠিয় বসিলে তাহার হাতে তেল দেয়, তেলটা সে মাথায় অথবা সর্বাঙ্গে মাখিয়া লয়। তার পর গৃহস্থ কিছু চাউল পরমা ইত্যাদি দিয়া ঘাঁটু গাইয়ের দলকে বিদায় করে। প্রায় এক মাস ধরিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া এইরূপে ঘাঁটু গাইয়া তাহারা যে চাউল ও পরমা সংগ্রহ করে, মাশান্তে তাহা দিয়া একদিন সকলে মিলিয়া ভূরি-ভোজনের আয়োজন করে।

বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটু-পূজার বিচিত্র ধরনের বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সম্পর্ক নির্ণয় সহজ কর্ম নহে। তথাপি এই উৎসবের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া সহজ বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। ‘ঘণ্টাকর্ণ’ নাম সংক্ষেপে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা হইতে ঘাঁটুকে চিনিবার উপায় নাই। কত বিচিত্র কারণে লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব হইতে পারে, এখানে সে আলোচনার স্থান নাই। কিন্তু কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, ঘাঁটু পূজা আদৌ সূর্য পূজা ছিল। কথাটা সহসা শুনিলে বিশ্বাসের উদ্রেক করিবে; কিন্তু অনুধাবন করিলে ইহাতে বিশ্বাস হইবার কোন কারণ থাকিবে না। বজ্রধ্বনের ইচ্ছা পূজা এবং বিহারের ছটপটব প্রকৃতপক্ষে সূর্য পূজা, কিন্তু সাধারণ লোকে এ কথা জানে না। হঠাৎ সে কথা বলিতে গেলে লোকে বিশ্বাস প্রকাশ করে। বাকুড়ায় ঘাঁটুর প্রতিমা একটি গোলাকার গোমর-

\* লাছ < লছা প্রা < যথ্যা সং (যথ চালনযোগ্য প্রস্তুত পদ)। লাছ-দুয়ার=বড় দ্বারের সংলগ্ন দ্বার (‘নাচ-দুয়ার’ নহে)।



পিতৃ। পূর্বে বলিয়াছি, উহা দেখিতে প্রায় শালগ্রাম-শিলার মত। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক। বিষ্ণু সূর্য; সুতরাং উহা সূর্যেরই প্রতীক। বহুলাকার গোমর-পিণ্ডে যে বাঁটু-প্রতিমা নির্মিত হয়, তাহাও সূর্যের প্রতীক বলিয়াই মনে হয়। বাঁকুড়ায় “আলোর মালোর” এই অমুমানের পোষকতা করিতেছে। পূর্বে বলিয়াছি, কথাতা প্রকৃতপক্ষে “আলোর মালা”। কারণ বর্ধমানের পশ্চিমাংশে একটি জলন্ত প্রদীপই বাঁটুর প্রতীক। মনে হইতেছে, অমিত-জ্যোতিঃ মণ্ডিচামালী সূর্যই “আলোর মালা” নামে কীৰ্তিত হইয়া থাকেন।

বৈদিক সাহিত্যে সূর্যই মানুষের চর্মরোগ নিবারণ করেন। বাঁটুও চর্মরোগ নিবারণের দেবতা। সুতরাং বাঁটু-পূজা যে সূর্য পূজারই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ, এমন অমুমান অশক্য হইবে কি? প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ প্রত্যাহেই উদীয়মান রবিকে যজ্ঞস্থলে আত্মান করিতেন। উৎকালই সূর্য-পূজার প্রশস্ত সময়। বাঁটু-পূজাও প্রত্যাহে বিহিত হইয়াছে। এই সাদৃশ্য কি একান্তই আকস্মিক?

পূজাস্থে একটা খোলা ঘাটা বাঁটুকে আবৃত করা হয় এবং ঋতুর আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া এক বালক ইত্যন্ততঃ বিক্ৰিপ্ত কড়িগুলি সংগ্রহ করে। কেন এই অদ্ভুত অমুষ্ঠান? বেদে সূর্য হিরণ্য-পাণি অর্থাৎ স্বর্ণ-রশ্মি। পরবর্তীকালে ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল—সূর্যের পাণিতে (হস্তে) হিরণ্য (স্বর্ণ, ধন) আছে। যজমানকে তিনি স্বর্ণ দান করেন। সূর্য পূজা করিলে ধন লাভ হয়, এই বিশ্বাসও অতি প্রাচীন। খোলা ভাঙ্গিয়া আবৃত বাঁটুকে অপাবৃত করা হইল; যেন সূর্যদেব শর্বরীর তিমির ভেদ করিয়া পূর্বদিকস্তের তল দেশ হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কড়ি ধনের প্রতীক। এই হেতু লক্ষ্য পূজাতেও কড়ির প্রয়োজন হয়। শতবর্ষ পূর্বেও যজ্ঞাক্রমে কড়ির প্রচলন ছিল। বাঁটুর চতুর্দিকে বিক্ৰিপ্ত কড়িগুলি বালক কুড়াইয়া লইল; যেন হিরণ্য-পাণি সূর্যদেব আবিস্কৃত হইয়া তাহাকে ধন দান করিলেন।

একটি ছড়ায় আছে, চৈত্র মাসের চতুর্দশীতে বাঁটুর বিবাহ। ইহা নিশ্চয় চৈত্রের কৃষ্ণা চতুর্দশী; কারণ শুক্লা-চতুর্দশী কোন কোন বৎসর শৌর বৈশাখ মাসে পড়িয়া যায়। চৈত্রের কৃষ্ণা-চতুর্দশীর পূর্বদিন মধু কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে শাজীর বিধান অমুশাবে বাকুলী-স্নান বিহিত। ইহা এক বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ। “বাকুলী-স্নান” প্রবন্ধে (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৬৪) সে যোগের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছি। অতি প্রাচীনকালে সেদিন সূর্যের উত্তরায়ণ হইত। এ দিক হইতেও সূর্যের সহিত বাঁটুর যোগাযোগ দেখিতেছি। বিবাহের কলে বাঁটুর সাত পুত্র লাভের কথা ছড়ায় উল্লিখিত আছে। বেদে সূর্য ‘সপ্তাশ্ব’। বর্ণালীর সপ্তবর্ণই সপ্তাশ্ব। সূর্য-রশ্মির সপ্তবর্ণই কি বাঁটুর সাত পুত্র?

বাঁটু পূজা কতকাল ধরিয়া চলিতেছে, স্থূলভাবে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। কাল্পন-সংক্রান্তিতে বাঁটু পূজা। ছড়াতেও চৈত্র মাসের উল্লেখ আছে। ছড়ার বর্ণনা হইতে মনে হয়, কাল্পন-সংক্রান্তিতে যখন বসন্ত ঋতু আরম্ভ হইত, তখন এই পর্বোৎসবের উদ্ভব হইয়াছিল। বসন্ত ঋতু আরম্ভ হইলেই চর্মরোগের ভয় দেখা দেয় এবং রোগ হইতে পরি-ত্রাণের নিমিত্ত লোকে দেবতার অর্চনা করে। সে যুগে নিশ্চয় চৈত্র-বৈশাখ দুই মাস বসন্ত ঋতু ছিল। এই দুই মাসের প্রাচীন আর্তব নাম মধু-মাধব। কালিদাসেও মধু-মাধব বসন্ত ঋতু। বর্তমানকালে কাল্পন-চৈত্র দুই মাস বসন্ত ঋতু গণ্য হয়। অর্থাৎ ঋতু সে কাল হইতে এক মাস পশ্চাদ্গত হইয়াছে। অয়ন-চলন-হেতু ক্রিষ্ণবর্ষিক দুই সহস্র বৎসরে ঋতু এক মাস পশ্চাদ্গত হয়। বাঁটু পূজাও প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যগোপী ত্রাণেরা ভারতে শকাব্দ গণনার প্রবর্তন করেন। তাঁহারাই সূর্যোপাসক ছিলেন। সেই সময়েই ভারতের নানাহানে নানা আকারে সূর্য পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।





## জটীর জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

২২

নিজের পাখা থাকলে তখনই উড়ে গিয়ে দেগতায় জিতেন কি করছে ওখানে। কিন্তু পাখা ত নেই-ই, তার উপর হ'খানা চরণের একখানা ভাঙা। স্তম্ভাং আবার দুঃসহ প্রতীক্ষা। আধ ঘণ্টার বেশী নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যেন এক যুগ।

তার পর চোখে পড়ল।

লম্বা লম্বা পা কলে আগে আগে এল জিতেন। রাজ্যের বিরক্তি তার মুখের ভাবে। দূর থেকে আমাকে দেখেই সে গলা চড়িয়ে বললে, তা হলে, মশিলা, আমাদের বদরীষাজ্ঞা এবারকার মত এখানেই শেষ—কেমন?

কানেই পেল কথাটা, মন পর্যন্ত নয়। বদরীনাথ নন, অস্ত্র এক জনের কথা ভাবছিলাম আমি। শুক কঠে জিজ্ঞাসা করলাম, বাহাহু কোথায়?

ঐ ত—বলে তার পিছন দিকে হাতের ইশারা করল জিতেন।

অস্ত্র ভাবি বোকা পিঠে নিয়ে স্বভাববঃই পিছিয়ে পড়েছিল বাহকটি। এবার নীচে পূলের উপর দেখা গেল তাকে। পিঠে বোকা থাকলে যেমন বেকে বার বাহুঘের শরীরটা ঠিক তেমনি বেকে গিয়েছে। তথাপি বুঝা যায় যে, বেশ শক্ত-সমর্থ পুরুষটি। চারের বোকানোর মেহেতে বাহাহুকে নাঘিরে দিয়ে বধন সোজা হয়ে ঝাঁড়াল লোকটি তখন এক নজরেই বুঝতে পারলাম যে, বেশ দীর্ঘও তার দেহ। দশাসই চেহার।

কিন্তু আমার প্রধান মনোবোগ তখন বাহাহুঘের দিকে। ঘণ্টাখানেক পূর্বেই বাকে আশ্রয় পায়ে এসেছি, সে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে কি না, সেই সম্বন্ধেই উবেগ ও সন্দেহ আমার মনে। হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথায় জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলাম, এই বাহাহু, কেমন আছ তুমি?

না, আশঙ্কা আমার অমূলক। বেশ বেঁচে আছে সে। তার দেহের ধর্ম ধর্ম কল্পনের মধ্যে জীবনের এবং হাউ হাউ ক্রন্দনকান্নিয মধ্যে তীব্র সচেতনতার অমোঘ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমন হাতীর মত জোরাল লোকটি দুর্বল, অসহায় একটি শিশুর মতই চোখের জলে দুই গাল ভাসিয়ে জড়িত হয়ে বলে যাচ্ছে, আপলোগ তো মেয়ে মাতা-পিতা হায়—লেকিন হয় নে ক্যা কিয়া।

চূপ কর হারামজাদা, জিতেন কিন্তু বরক দিল তাকে; বা করবার তা ত করেইছিল। তার পর আবার এই কাহিনি কেন?

কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে কেল সে, বললে,

কেবল পিতা নয়, মাতা-পিতা দুইই হয়ে বসে আছেন দেখছি ত সেই ঋষিকেশ থেকেই। ঠাণ্ডা সামলান এখন।

বুঝা যায় না জিতেনকে। তার বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে মত অভিমান ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তা কেটে পড়বার মুখেই প্রবল বাধা পেয়েছে। এখনও বাধা পাচ্ছে তার মুখেই ঐ হাসিতে। জিতেনের কঠোর ভাষা ও গলায় আওয়ারাজের সঙ্গ যোটাই বাপ যায় না তা, যেমন তার এই ক্রিয়ার আসাটা বাপ যায় নি আমানিগকে পিছনে ফেলে তার ঐ ভয়ঙ্কর জারপাটাও পার হয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু দুইই ত সত্য। স্তম্ভাং তার মন্তব্য শুনবার পর আমি বিব্রত ভাবে বললাম, তাই ত? এখন কি করা বাবে এটাকে নিয়ে?

মুখের হাসিটুকু মোটামুটি বজায় রেখেই উত্তর দিল জিতেন: আপাতত: একটু সেক দিতে হবে। তারও আগে ভিত্তে জাম্বা-কাপড়গুলি ওর পা থেকে খুলে ফেলতে হবে।

কেবল মুখে বলাই নয়, তখনই কাজেও লেগে গেল সে। কতকটা টেনে ও কতকটা ঠেলে বাহাহুকে সে কেলল নিয়ে উনানের ধারে; আমারের উত্তরের ঝোলাঝুলি খুঁজে শুকনো জাম্বাকাপড় বা পাওয়া গেল, তারই কিছু কিছু দিয়ে নিজের হাতে সে সাজিয়েও দিল তাকে, কাজ করতে করতেই দোকানদারকে সে হুকুম দিল বাহাহুকে খুব কড়া করে এক গ্লাস চা দিতে।

বাহাহু তখনও হি হি করে কাঁপছে, চলছে তখনও তার সেই শিশুসুলভ কারাটাও। কিন্তু আমার অবস্থা তখন কতকটা স্বাভাবিক। মনে মনে আশ্বাস পেয়েছি আমি, অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে পেয়েছি যেন একটি সুদৃঢ় আশ্রয়। তা ঐ জিতেন। কেবল আশ্রয় নয়, হারামজন কিংবে পেয়েছি আমি—আমার লক্ষণ ভাইকে।

তবে আশ্বাসের পিছনে পিছনেই এল অমূল্যকিৎসা—আমি ত জিতেনকে খবর দিতে পারি নি, তথাপি কি সূত্রে ওখানে কিংবে এল সে? এবং—

মুখ হুটে জিজ্ঞাসাই করলাম তাকে।

উত্তরে জিতেন বললে, খবর আর কোথা থেকে পাব? আরও গোটা দুই ঘন্টা পার হয়ে গিয়ে ভাল একটি চটি পেয়ে সেখানেই রাস্তাবাড়ার আয়োজন শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাবনা জাপল আপনারা আসছেন না দেখে। ঘণ্টা দুয়েক পথ চেয়ে বসে থাকবার পর উঠে। দিকে কিংবে না এসে আবার কি করতে পারি আমি?

তার পর ?

ওখানে এসে দেখলাম বা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না— বাহাদুর ছাউ ছাউ করে কাঁদছে আর আপনি বাসের পাঠিয়েছিলেন সেই ছিট কুলি ওয় গারের উপর থেকে লেপ-বধাতি ইত্যাদি ছিনিয়ে নিতে নিতে-মুখে ওয় চোদপুরুষ উদ্ধার করছে।

সে কি কথা ! বাহাদুরকে আনবার জন্তই ত দশ টাকা কবুল করে ওদের হুঁজুকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন আমি।

তাই নাকি ! কিন্তু ওয়া বে বললে—নেপালী কুলিকে কিছুতেই ওরা পিঠে তুলবে না।

হুঁজুনেই আমরা একসঙ্গে কিংবা তাকালার ওভারসিরের সেই মজুর দুটির খোঁজে। চালার নিচেই আছে হুঁজুনে। কিন্তু দেখি যে, বোধ করি ভর পেয়েই দুটিতে গিয়ে বসেছে তাদের মূনিবের পিছনে। ওভারসিরের নিজে দুটি হাত জোড় করে কাতর দৃষ্টিকে তাকিয়েছে আমার দিকে যেন ওদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্তই। তার চোখের সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে মিলতেই মুখেও সে বললে, বুঝবার তুল হয়ে গিয়েছে বাবুজী। ওয়া তখন একটু রঙ্গ করছিল কুলিটার সঙ্গে। আর তাতেই আপনার সঙ্গী বেগে গিয়ে বললেন যে তিনিই ওটাকে বয়ে আনবেন। নইলে—

চুপ রহো।

আমি ধমক দিয়ে ধামিয়ে দিলাম লোকটাকে। প্রবৃত্তিই হয় না ওদের সঙ্গে আর কথা বলবার। আমার প্রত্যাশারই কেবল নয়, এই উত্তরাখণ্ডে আমার ইতিপূর্বের সমস্ত অভিজ্ঞতারও ওরা যেন মুর্ত্তিমান প্রতিবাদ। দেবলোকে বিচরণ করতে করতে অকস্মাৎ যেন তিনটি শিশাচের সম্মুখীন হয়েছি আমি।

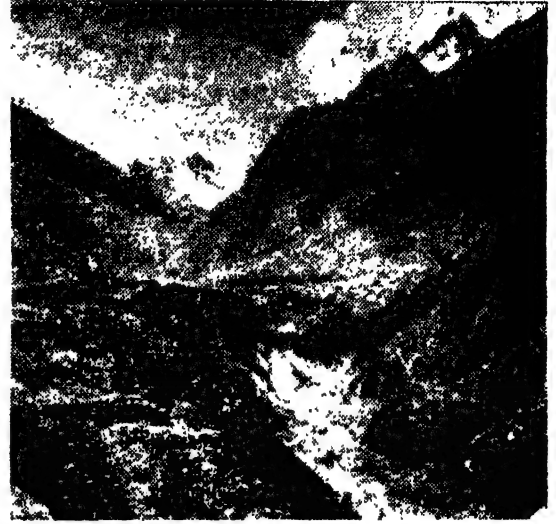
জিতেনের মুখের দিকে কিংবা তাকিয়ে তিনুকঠে আমি বললাম, কেনায়ে পথে এমন ত একজনও দেখি নি। সেখানে না ডাকলেও প্রত্যেকটি লোকই এগিয়ে এসেছে আমাদের সাহায্য করবার জন্ত। কিন্তু বদরীনাথের পক্ষ কাল থেকেই এ কি অভাবনীয় ব্যতিক্রম দেখছি।

উভয়ে জিতেন বললে, বর্জ্যতা থেকে সভ্যতার কিংবা এসেছেন বলে খুব ত উল্লাস হয়েছিল আপনার। এখন বুঝুন।

বিক্রমে ভীষণ কঠোর তার, ভীষণ তার ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকুও। এই দ্বিতীয়বার জিতেন আমার উপর প্রতিশোধ নিল মোটর ও মোটর সড়কের প্রতি আমার শকপাতিষের জন্ত। কিন্তু তার পরেই একেবারে বিপরীত গতি ও ভিন্ন স্রব তার। হাসি ধামিয়ে গভীর হয়ে সে বললে, তবে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম আছে। নেপালী কুলিকেও বয়ে আনবার জন্ত শেষ পর্যন্ত লোক যে পাওয়া গিয়েছে তা ত আর অস্বীকার করবার জো নেই।

সেই দশসাই চেহারা লোকটিকে দেখিয়ে ও কথাটা বলেছিল জিতেন। আমিও মিনিট পাঁচেক পর আবার দেখলাম তাকে। ততক্ষণে তিনিও উমানের ধারে জেকে বসেছেন। আলাপও

জমিয়ে তুলেছেন তিনি বুড়ো মোকাদ্দীর সঙ্গে। আব্বা হুঁজুনেই তাঁর দিকে তাকিয়েছি বুঝে আব্বাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন তিনি।



বদরীনাথ—মুখে থেকে

প্রথমেই যাকে অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল তাঁকে এতক্ষণ উপেক্ষা করেছি বলে অপ্রতিভ বোধ করছি। কিন্তু আলাপ সুরু করি কেমন করে ?

কুঠিত চোখ দুটি জিতেনের মুখের দিকে ফিরিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এক পেলে কোথায় ?

পাব আর কোথায় ? মাটি ফুড়ে উঠলেন উনি। বললই একটু বেন হাসল জিতেন।

কথাকটির মতই হুঁকোখা এ তার হাসিও। আমি বিহ্বল ভাবে বললাম, মাটি ফুড়ে উঠলেন মানে ?

মানে ঐ যা বললাম, তাই। মাটি ফুড়ে উনি যদি না উঠে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আসমান থেকে নেমেছেন।

আরও হুঁকোখা হৈয়ালি ওটি। না বুঝে আমি মুচের মত জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে আবার বললে, তা ছাড়া আর কি বলব আমি ? আমার মাথার কি কিছু ঠিক ছিল তখন, না খুটিয়ে খুটিয়ে সবকিছু দেখতে পাবছিলাম ? আপনার লোক দুটি ত মালপত্র তাদের পিঠে নিয়ে চলে এল ওখান থেকে। আর বাহাদুর এদিকে খালি গারে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে হাউমাউ করে কাঁদছে। তখন একবার অবস্থা আমার মনে হয়েছিল যে, দিই বেটাকে অলকনন্দার বদেব মধ্যে ঠেলে কেলে। কিন্তু তা পারলাম না। অথচ হারামলাদাকে আমারই পিঠের উপর তুলে নিলাম।

সম্পূর্ণ অবিস্মৃত। বিশ্বাসই হয় না আমার যে, জিতেন ঐ কথাটা বলেছে এবং আমি নিজেও কানে ওনেছি তা। হুই চোখ

বন্ধ করে বার দুই ঢোক গিলবার পর আমি বললাম, কি বললে তুমি? তুমি পিঠে তুলে নিলে বাহাদুরকে?

তা ছাড়া কবি কি আমি? জিতেন এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, প্রায় একশ দিন ত এই হারামজাদা আমাদের সোয়া-বশি বোঝাটা ওর নিজের পিঠে নিয়ে পিছনে পিছনে এসেছে আমাদের। আজও আমাদের সেই বোঝাটা ওর পিঠে ছিল বলেই ত এই দুর্দশা হ'ল ওর। তার পর ওকে ওখানে ফেলে আমি চলে আসি কেমন করে।

হাঁ করে শুনছিলাম আমি। কেবল যে আমার বসনাই তখন নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গিয়েছে তা নয়, মনও আমার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়কেই অতিক্রম করে যেন অমুভূতির উপরেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মুখে দূরে থাক, কোন কথা আমার মনেও আসে না আর।

কিন্তু জিতেন আমার বিহ্বল মুখে দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। এখন একটু যেন সন্তুষ্ট ভাব তার। ঈশ্বর কৃষ্টিত স্বরেই সে আবার বললে, কিন্তু, মণিলা, আমি পারব কেন। শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে ঐ ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে এসেছিলাম। তার পরেই মনে হ'ল যেন আমার নাভিখাস উঠছে। বুকেছিল বুঝি বাহাদুরও—‘হাঁ হাঁ—বাবুজী, বাবুজী’—বলতে বলতে ও নিজেই আমার গলা ছেড়ে দিয়ে স্থল করে পথের উপর পড়ে গেল। আর আমি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম মুস্তিমান আমাদের মত এই অতিকার পুরুষটিকে। চোখোচোখি হতেই হেসে বললেন উনি, রহ কাম আপসে হো নহী সক্তা বাবুজী, লেকিন আপ ঘাবড়াইয়ে মত—হম অপনা পিঠ পর ইসকো উঠা লেগে।

যেমন কথা তেমনি কাজ, পরক্ষণেই বাহাদুরকে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে ছিলেন তিনি, তার পর নিরেও এসেছেন তাকে এই গড়র চটি পর্যন্ত।

সমস্ত বিশ্বয়ে লোকটির দিকে আবার কিবে তাকলাম আমি। আর তখনই তাঁর হাতের আধ-পোড়া বিড়িটিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

আমাদের আলাপের সাধারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সেই জন্তই আমি তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই নিজের মাথাটাকে একটু থেকে মুচকি হেসে তিনি বললেন, নহি বাবুজী—আসমান ভূমিন কুছ নহী হায়। হম পিছেসে আ হা থা। ইন লোগোঁকে হাল দেখকর কুছ কুছ সমঝ লিয়া ওর অপনা পিঠপর উঠা ভী লিয়া জব্বী আদমীকো।

ততক্ষণে কৃতজ্ঞতা ছাড়াও আরও যেন কি কি দিয়ে বুকের ভিতরটা আমার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আমি পাচঘরে বললাম, লেকিন আপনে হম লোগোঁকে বহুত উপকার কিয়া। ক্যা হম দেগে আপকো?

কুছ নহী—উত্তর দিলেন লোকটি: আপকা কোই কাম হম

নে কিয়া ভী তো নহী। কাম কিয়া বদরীবিশালকে জিন হোনে মুকে খোয়াসে তাকত দেখরকে ইন সনসারয়ে ভেজ দিয়া।

হাসতে হাসতেই কথা কটি বললেন তিনি, বলেই, লোকান থেকে নেমে গেলেন পথের উপর, সেখান থেকে আমাদের দিকে আবার কিবে তাকিয়ে বললেন, অব হম চলতে বাবুজী—জয় বদরী-বিশালকী।

বেশ মিষ্টি তাঁর মুখেই হাসিটুকু, মিষ্টি কণ্ঠস্বরও, কিন্তু—

জিতেন তখন বলেছিল যে, লোকটি হয় মাটি ছুড়ে উঠেছে, নয় ত নেমেছে আকাশ থেকে। এখন আমার নিজের চোখের সামনেও তেমনি একটি ব্যাপার ঘটল যেন। তাঁর বস্ত্রবাটি ঠিক ঠিক বোঝবার পর আর দেখা পেলাম না তাঁর।

অন্ধকারে বিদ্রাবীপ্তি যেন! ক্ষণপ্রভা মিলিয়ে যাবার পর চারিদিকে আবার গভীর অন্ধকার। আমাদের সমস্তা যেমন ছিল প্রায় তেমনি রয়েছে।

চালের নীচে আগুনের ধারে এসেও বাহাদুরের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। এখনও যন্ত্রণার বিকৃত হার মুখ, থেকে থেকে চোখের জল তার দুই গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে। ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করাবার জন্ত আবার একটা চেষ্টা করা গেল। কিন্তু ফল একেবারে বিপরীত—চীংকার করে কান্না শুরু করল সে।

চীংকার বন্ধ হলই আবার সেই তার বিড় বিড় প্রলাপ শুরু হয়, হম নে ক্যা কিয়া—হার ভগবান।

সওয়া বার না অত বড় মানুষটার অমন শিশুর মত কান্না। আমি জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, কি করা বাবে এখন?

জিতেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তর দিল, আমরা আর কি করব—ডাক্তার যখন নই। ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

তা ত সেই পিপুল কুঠিতে। সেখানে ওকে পাঠাবার জন্ত বাচন চাই যে। মাথার উপর এখন একটু ছাদ আছে, এই বা তফাৎ, নইলে মৌলিক সমস্তা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গিয়েছে।

একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিতেনকে বললাম কথাটা—ওভার-সিররের ঐ মজুর দুটি ছাড়া এখন আর ত কোন লোক নেই এখানে। আরও কিছু টাকা কবুল করে ওদের দিয়েই বোঝা বওয়ানো ছাড়া আর কি উপায় হতে পারে?

কিন্তু প্রস্তাব শুনেই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল জিতেন: কথা মত দশ টাকা আপনি ওদের যদি দিতে চান ত দিন। কিন্তু অতিমিত্ত আর এক পরস্যও নয়।

ঐ লোকগুলির বিরুদ্ধে অমনি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণা আমারও মনে, কিন্তু ওদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি আছে? অসহায়ের মত আমি ঐ কথাটা জিতেনকে বলতেই সে দৃষ্টকণ্ঠে উত্তর দিল, ‘অজ্ঞার যে করে আর অজ্ঞার যে সহে তারা দুই-ই এক। এই লোকগুলিকে আর এক পরস্যও দেব না আমি। ভাষা

মজুদী দিয়ে পেশাদার কুলি আনব, আপনি বহন এখানে, আমি কুলি আনতে বাছি।

আমার মাথাটা আবার যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, বিহ্বল হয়ে আমি বললাম, তুমি আবার বাবে?

যাব বই কি। জিতেন উত্তরে বললে, ওর একটা গতি করতে না পারলে আমরাও ত নড়তে পারছি নে এখান থেকে।

কিন্তু গিয়ে সময় মত ক্রিতে পারবে ত? খুব কাছে ত নয় পিপুল কুঠি।

সেখানে যাব না আমি—যাব ভেলাকুচি।

তার মানে সামনের দিকে—আবার সেই ভয়ঙ্কর পথে একটি মাত্র নয়, একাধিক ধস অতিক্রম করে। ভয়ে বুক বেঁপে উঠল আমার।

কিন্তু আমার অপ্ৰতিভে কান দিল না জিতেন, আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিল, সে বললে যে, দু’হবার ধস অতিক্রম করবার ফলে ধস এড়িয়ে চলবার কার্যনাট্য শিখে নিয়ারছে সে। তা ছাড়া বৃষ্টি খেমে একটু রোদ বধন টপেছে তখন ভাঙনের সে তোড়ও হয় ত এখন নেই।

ত হয় ত ঠিক। তথাপি সশর যাব না আমার, সেই কথাই বলতে বাচ্ছিল্য, কিন্তু তার পূর্বেই জিতেন হেসে বললে, আপনার বুঝি ভয় হচ্ছে যে, আবার ওদিকে গেলে আমি আর ফিরে নাও আসতে পারি? কিন্তু ভাববেন না, আমি ফিরে আসবই, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বুলিও নিয়ে আসব।

জিতেন পথে ন মতে না নামতেই বাহাদুরের কথা কানে এল আমার, ব্যাকুল স্তরে সে বলছে, আপ ভী জাইয়ে বাবুজী, আপ ভী।

কাতর অশ্রু নয় কেবল তার মুখেই কথাতেই নয়, হাত বাড়িয়ে আমার একখানা পাও চেপে ধরল সে। আবার বললে, মেয়ে ওরাজে আপনী বাজা নষ্ট মত কর না—আপ ভী জাইয়ে ছোটা বাবুজীকা সাধ।

আমার বিহ্বল ভাব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, কিন্তু জিতেন ওকথা শুনে হাসল, আবার তখনই সে ধমকও দিল বাহাদুরকে, চুপ কর হারামজাদা। নিজে ত তুমি পা ভেঙে বসে আছিস, এখন অস্ত্র কুলি না পেলে আমরাই বা যাব কেমন করে?

জিতেন চলে যাবার পর বুড়া দোকানী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাববেন না বাবুজী, কুলি ওখানে পাওয়া যাবে। আর একটি মাত্র কুলিও যদি পাওয়া যায় তবে তাকে নিয়েই চলে যাবেন আপনারা। নেপালীটা পড়ে থাকে, থাকুক এখানে, ও আপনিই ভাল হয়ে যাবে।

সায় দিল সেই ওভারসিরয়, ঠিক বাবুজী, এ পথে কুলি-কামিন হরদয় জন্ম হয়। সে জন্ত বাজীরা কেউ বসে থাকে নাকি—না কিবে যায়?

তুনেই বাহাদুর আবার ভেট ভেট করে কাঁদতে শুরু করল

যেথো ওভারসিরয়টি তাকে একটি ধমক দিয়ে বললে, তুমি বেটা জন্ম হয়েছিল তোম নিজেই দোষে। তার জন্ত তোম বাজীকে তুমি হরদয় করছিস কেন? হেঁটে ফিরে যা তুমি, আর তা যদি না পারিস ত দু’দিন পড়ে থাক এখানে, নিজে তুমি কুলি হয়েও জন্ত এক কুলির পিঠে চাপবার সব কেন তোম?

শুনে নিজেই কপাল নিজে চাপড়ায় বাহাদুর, আর সেই বুলি তার মুখে, হার ভগবান—হম নে কা। কিয়া।

ওরা সকলেই কিন্তু দাঁত বেঁধে কয়ে হাসে, খেকে খেকে আবার ধমকও দেয় বাহাদুরকে।

বাহাদুরের হয়ে আমিই প্রত্নাদ করলাম, রাগ করে একবার ধমকও দিলাম ওভারসিরয়কে তার জনস্বতীন আচরণের জন্ত, কিন্তু সেদ্রষ্ট লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, উত্তরে লোকটি যা আমাকে বললে তা পয়েক্ষ হিড়প আর কি—নেপালীটার শয়তানি বুঝবার মত বুদ্ধিই নাকি আমার নেই।

হয় ত সত্যই ওরা বিশ্বাস করে না যে, বাহাদুর গুপ্তর ভাবে জন্ম হয়েছে। বুড়া দোকানীও একবার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতই গভীর স্বরে আমাকে বললে যে, বুলিটার ‘নিয়াস’ হয়েছে বা এই পাচাড় অধলে অনেকটাই হয়ে থাকে।

চিকিৎসার বিধানও দিল সে—আগুনে পুড়িয়ে টকটকে লাল লোহার শিক দিয়ে ওর দুই পায়ে কয়েকবার সে কা দিলেই এখনই নাকি ও চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ওভারসিরয়। আর শুধুই তাই নয়, এই আশ্রয়িক চিকিৎসা-পদ্ধতি তখনই তারা বাহাদুরের উপর প্রয়োগও করতে চায়।

ই ঠা করে বাধা দিলাম আমি—আহত, অসহায় লোকটিকে মেয়ে কেলবার মতলব নাকি ওদের?

এ রকম একটা আশঙ্কাই আমার মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন এই ওভারসিরয় বধোচিত ভাবে আমাকে উপদেশ দিল বাহাদুরের পাওনাগুণ চুকিয়ে দিয়ে এই গড়ুচটিতেই তাকে কেল যেখে যেতে।

জিতেনকেও আমার এই আশঙ্কার কথা খুলেই বলতে হ’ল।

ঘণ্টা দেড়েক পর দুটি কুলি সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে, তখন খুবই উৎকল ভব, পথ তাকে টানছে—এগিয়ে যাবার পরিকল্পনাই তারও মনে। বাহাদুরের মজুরি তাকে চুকিয়ে দিয়ে একটি কুলির পিঠে চাপিয়ে তাকে পিপুলকুঠির দিকে হওনা করিয়ে দেবে, তার পর দ্বিতীয় বুলিটিকে নিয়ে আমরা পাড়ি দেব ভেলাকুচির দিকে, সেখানে সে নাকি আমাদের রাজিবাসের ব্যবস্থাও করে এসেছে।

আমারও ইচ্ছা এগিয়ে যাবার, কিন্তু জিতেনের প্রস্তাবে মন সায় দেয় না আমার, একাজে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বললাম তাকে, মায় এই আশ্রয়িক চিকিৎসা-পদ্ধতির খুটিনাটিও। তার পর বললাম, এই হাত-পা, না কোমর ভাঙা অক্ষয় লোকটিকে নগদ কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে এ রকম জারগার একটা অচেনা কুলির হাতে

সঁপে দিলে সে ত হাসপাতালের পরিবর্তে সোজা বয়ালয়েও গিয়ে উঠতে পারে।

মন দিয়ে শুনবার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বইল জিতেন, তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সে বললে, ঠিকই বলেছেন আপনি—এ অবস্থার বাহ্যিককে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। পিপুলকুঠি পর্যন্ত আমাদেরও গর সঙ্গে যেতে হবে।

কিন্তু ঐ কথা বলতে বলতেই দেখি যে বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠেছে গর মুখ। একটু খেমেই হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুক দীতিমত তিক্তকণ্ঠে সে আবার বললে, সেই হাওড়া ষ্টেশনেই আপনাকে বলি নি আমি—ধর্মপথে সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল কর্তব্য-জ্ঞান। চুলোর বাক আমাদের বদনীনাথ দর্শন। ঘাড়ের বোঝা আগে নামাই।

ফিরে চললাম।

নিজেরই আমার বিশ্বাস হয় না, ঘর-বাড়ী ছেড়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে চলে এসেছি। প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল—কেবল চলছি আর চলছি, দিন পনের কেটেছে এই হিমালয়ের গির্জা-কন্দর আর আদিম অরণ্যে। শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা পার হয়ে এসেছি। দুর্গম পথে পায়ে হেঁটেই ত চলছি প্রায় পো'খানেক মাইল। লক্ষ্য বদনীনাথ, খুব কাছাকাছিই এসে ছিলাম সেই লক্ষ্যের—সামনে মাইল পঁচিশ মোটে পথ। তথাপি আর এগিয়ে না গিয়ে ফিরেই চলেছি।

অভাবনার পরিণতি। কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করি নি, গ্রাস করি নি কোন বাধাকেই—সে দিন সকালেও প্রাকৃতিক দুর্ভোগ এবং আমার ভাড়া পারের ব্যাধাকেও নয়। অচল হয় নি আমার সে ভাড়া পা-খানি, সে দুর্ভোগও কেটে গিয়েছে। তথাপি বাজা বার্থ হ'ল আমার।

দুঃসহ ঐ বার্ষিক্যের বেদনা, কোন দিক থেকেই সাধুনা পাইনে। আমার গড়ুরচটিতে উপস্থিত থাকতেই হুঁটি-একটি করে দেশী ও বিদেশী পথিক দু'দিক থেকেই এসে জুটছিল এঁ ছোট দোকানটিতে। যোজীমঠের দিক থেকে যারা এসেছেন, আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন তাঁরা—এখন তেমন আর ভাঙছে না ওদিকের পাহাড়গুলি। অতিরিক্ত মূর্ত্তমান আশ্বাস ত আমাদেরই জিতেন—একবার নয়, চার-চাব্বার ঐ জায়গাগুলি নিরাপদে অতিক্রম করেছে সে। এগিয়ে গেলে আমিও নিরাপদে পার হতে পারতাম, তথাপি এগিয়ে যাওয়া হ'ল না, যেন নির্মম নিয়তি ঠেলে কিরিয়ে দিল আমাকে।

রূঢ় বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ পৃথিকের আশ্বাস মনে হয় যেন উপহাস। উপহাস করছেন স্বরং প্রকৃতিও। আমরা বিপরীত দিকে বাজা করবার সঙ্গে সঙ্গেই বোদ উঠল।

আমার মনের কাটা-ঘারে মূনের ছিটেও পড়ে। মাঝ পথ

থেকে ফিরে বাড়ি গুন সহায়ত্ব প্রতি প্রকাশ করে কেউ কেউ। একবার একটু ভ্রংসনাও গুনতে হ'ল, সেই সঙ্গে একটি বক্রোক্তিও।

পথে দেখা হ'ল এক এক করে পাটনার সেই বাড়ীদলের সব ক'জনের সঙ্গেই। আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে দেখে পিপুলকুঠি থেকে বার বার বাহনের উপর আসীন হয়ে রওনা হয়েছেন তাঁরা। আজই সকালে বৃষ্টি মাখার করে বদনীনাথের দিকে বাজা করছি দেখে আমাদের দৈহিক মজল কামনার উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরাই আবার বিমর্ষ হলেন আমাদের পারত্রিক কল্যাণের চিন্তায়। চুক্তিমত পাওনাগুণা চুকিয়ে দিয়ে অমায়ালে যে কুলিকে বিদায় করে দেওয়া চলে—যেমন তাদের দীর্ঘ বাজাপথে একাধিক অন্তঃস্থ কুলিকে তাঁরাই বিদায় করেছেন—তেমনি একটি কুলির পিছনে বদনীনাথকে ছেড়ে ছোটো নাকি কোন ধর্মপ্রাণ বাড়ী।

জ্ঞানমুখে শুকনোমত একটু হেসে আমি উত্তরে বললাম, স্বরং বদনীনাথজীই ত ছাড়লেন আমাকে—তাঁর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দিলেন।

এসে মত বোলিয়ে বাঙালীবাবু।

প্রবীণ বিহারী উকিল গভীর মুখে ভ্রুঞ্জি করে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন আমাকে, ভগবান কভী কোইকো ছোড়তে নই হায়। আপ আপনা দিলয়ে দেগিয়ে। শায়েন আপনাকে মনয়ে দর্শন করনেকী ইচ্ছা নই খী।

মনে জোর পাই নে প্রতিবাদ করবার। শ্রদ্ধা ভক্তি ও ঐকান্তিক আগ্রহ যে আমার মনে নেই তা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে—পথ চলতে চলতে ক্রমাগতই রূপ দেখে বিহ্বল হয়েছি, যেহ রাস্তা হলে ঘরের আহাম বা শহরের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আমার মন, চড়াই ভাঙতে ভাঙতে মনের চোখে যেন হাতছানি দেখেছি পিছনে ফেলে-আসা সমতল ভূমির। তার পরেও যেটুকু নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল তাও অটুট আছে বলে এখন আর জোর গলায় দাবি করতে পারি নে। যে দশ বাহ্যিকের পর পা না কোমর ভেঙেছে সে আমার মনটাকেও ত রেহাই দেয় নি—ভেঙে দিয়েছে আমার নিজের সাহস ও উদ্যকেও। স্মৃত্তবাং মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবার পথে আহত বাহ্যিকের অন্ধর দেহটাই যে এখন একমাত্র বাধা তা আমি জোর গলায় ঘোষণা করি কেমন করে।

মনের অগোচরে পাপ নেই বলেই অপরাধীর মত জ্ঞানমুখে চূপ করেই ছিলাম। বোধ কবি তাই বুঝতে পেরেই ভ্রলোক আবার একটু আশ্বাস ও উপদেশ দিলেন আমাকে, জো কিয়া আছা হী কিয়া আপনে। লেখিন পিপুলকুঠিয়ে আকরকে ইস কুলিকো ছোড় দিজিয়ে। ঐর উইহাসে হুসরা এক মজবুত কুলি লেকর কিয় আ জাইয়ে। ইতনা নিকটতক আকরকে ভী দর্শন নই করকে ঘর লোট জানা কোই কারকী বাত নই হায়।

ঐ বা একটু আশা আমার ভাড়া মনের কোন এক কোণে টির টির করে জলছিল। নিবিড় অন্ধকারে অত্যন্ত কীণ একটি

দীপনিধা যেন। কিন্তু পিপুলকুঠিতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাও নিতে গেল।

পথের এলাকার প্রবেশ করতেই জিতেনের সঙ্গে দেখা। পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমাকে দেখেই বললে, কোন লাভ হ'ল না, বর্ণিণী। হুর্ভোগ আরও ভূগতে হবে।

পিপুলকুঠিতে যা আছে তা একটি ডিসপেনসারি মাত্র। তাতেও ডাক্তার নেই। রাজ্যীয় স্বত্ত্ব কুঠিরে আসছে বলে গুটিকয়েক শিশি-বোতল নিয়ে ঠাট্টুকু বিনি বজায় রেখেছেন তিনি কম্পাউণ্ডার। আবাসিক হাসপাতাল আছে সেই চারোদিকে।

সে ত আরও প্রায় দশ মাইল দূরে।

উত্তরে জিতেন তিক্তকণ্ঠে বললে, কেবল দশ মাইল নয়, কম কয়েক চৌদ্দ ঘণ্টার পথ। কাল সকাল আটটার আগে বাস পাওয়া যাবে না।

যোগী নিয়ে তা হলে এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে ?

তা ছাড়া আর উপায় কি।

তখন তখন নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে আমার। সারাটা পথ বাহাহুয়ের কাতবোস্তি তখন তখন এসেছি। একবার তার গায়ে হাত দিয়েছিলাম—তখন মনে হয়েছিল যে, জ্বর এসেছে তার। আর নিজের জ্বরও আমার হৃদিত্তা কি কম! এত আবার সেই পিপুলকুঠি যেখানে কাল ভাল এক বাটি চা পাই নি, অসংখ্য ছারপোকায় অবিরাম নিঃশ্বাস দংশনের জন্ত সারা রাত চোখের দুটি পাতা এক করতে পারি নি। সেই সব স্মৃতি এখন এক সঙ্গে মনে জেগে উঠল আমার। আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাকতে হবে—আবার সেই ধর্মশালায় ?

না—মাথা নেড়ে উত্তর দিল জিতেন, অজ্ঞ একখানা ঘর পেরেছি।

তখন একটু আশ্বস্ত বোধ করলেও তখনই আবার বাহাহুয়ের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তাকে নিয়ে কাণ্ডিওয়ালা ততক্ষণ কাছে এসে গিয়েছে। দেখি যে, পিঠের ঝুড়িতে চোখ বুজে নিচ্ছিলেন মত বসে আছে বাহাহুয়। যন্ত্রণার স্রিষ্ট তার মুখ, দুই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে মনে হ'ল।

আমি কিরে আবার জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, বহই না হয় পাওয়া গেল। কিন্তু এটাকে নিয়ে কি করব ?

জিতেন উত্তর দিল, কম্পাউণ্ডার লোক ভাল। বলেছেন যে, আমাদের ঘরে এখনই যোগী দেখে যাবেন তিনি। ঘরে যান আপনামা—আমি ডেকে আনিছি তাকে।

২৩

সেই পিপুলকুঠিই ত। আজ সকালেই জিতেন বলেছিল যে, এখানে থাকার চেয়ে জাহাঙ্গীরা বাওয়াও ভাল। অথচ ঘণ্টা বশেক পরেই এ কি বিশ্বয়কর পরিবর্তন তার! কি করে যে হ'ল জ্ঞ আশ্রয় জেবে পাই নে।

সত্যি ভাল ঘর। বেশ ভাল। আশাতীত বন্ধের ভাল। গৃহস্থ বাড়ীর ধবধবে, তকককে শোবার ঘর। এক রাজির ভাড়া এক টাকা, খুশী হয়েই কবুল করছে জিতেন।

ভাল কেবল ছাদ, দেয়াল, মেঝে নিয়ে ঐ ঘরখানাই নয়। বানের ঘর তারাও ভাল। ভাল চারিদিকের পরিবেশও।

দিন কেটেছে তেপান্তরের মাঠে—বল্লভের ফলার মত কখনও বৃষ্টির ফোঁটা, কখনও বা হু হু করা বাতাসের খোঁচা খেয়ে খেয়ে। তেমনি তীক্ষ্ণ খোঁচায় মত বকে এসে বিঁধেছে থেকে থেকে এক একজন মানুষের মুখের কথা বা নীরব উপেক্ষা। কিন্তু এখন একেবারে বিপরীত।

আশ্রয় পেরেছি যেন সুরক্ষিত একটি দুর্গের মধ্যে। না যদি এটি ? ঘরে চুকতেই ধূপের গন্ধ পেলাম।

বার বাড়ী তিনিই সপরিবারে বাস করেন পাশের ঘরখানাতে। ধূপকাঠি পুড়ছে সেখানে। কানে এল বুঝি গৃহলক্ষ্মীর কঙ্কণ ঝঙ্কার।

আমরা সদলবলে ঘরে গিয়ে চুকতে না চুকতেই দুটি ছেলে না ঘেরে নাচতে নাচতে ছুটে এল। একটির ত পা টলছে—এতই ছোট সে। তাদের একজন আধো আধো স্ববে বললে, জ্বর বদনী বিশালকী। দ্বিতীয়টি বললে, এক পাই দো শেঠ।

মুখে 'হঠা' 'হঠা' বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ঐ শিশুদেব মা—মাঝবয়সী মহিলা একজন। ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, বৈঠো বাবুজী, আবার কর। বহুত তখলি হয় হোগা সব কোইকে। কোন লখম হয় ? দেখে দেখে।

ততক্ষণে কাণ্ডিকুলি দ্বিতীয় কুলিটির সাহায্যে বাহাহুয়কে ঝুড়ি থেকে নামিয়ে মেঝের উপর বসিয়ে দিয়েছে। মহিলাটি আমার হাতের সঙ্কেত বুঝে বাহাহুয়ের কাছে গিয়ে বললেন, ক্যা হয় বে ? কথা পয় চোট লগা ? কায়সা বুঝবক তো জো সামালকে চল নহী সকে ?

তিব্বতের ভাষা হলেও কোমল কণ্ঠস্বর মহিলার। অনেক দূর থেকে একটি বিশ্বস্তপ্রায় সঙ্গীতের বেশ আমার কানে ভেসে এল যেন। বাহাহুয়ের চোখে আবার দেখি যে, ধারা নেমেছে।

ঘটনাক্রমে সত্যিই যে ঘটছে তা যেন বিশ্বাস হয় না আমার।

তথাপি ঘটল অমনিই আরও অনেক ঘটনা।

একটু পরেই জিতেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঐ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন স্থানীয় ডিসপেনসারির ভারপ্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার। তাঁর বিজ্ঞা কম, কিন্তু জ্ঞান আছে। আবাসিক হাসপাতাল এখানে নেই বলে একটু যেন লজ্জিতই তিনি। ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার। বক্তৃতা করে বাহাহুয়কে তিনি দেখলেন, দেশী বুলিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর জিতেনকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন কিছু বুঝা যাচ্ছে না। তবে জ্বর এখন



হয়েছে তখন তিনের কোন একটা যন্ত্র নিশ্চয়ই বিকল হয়েচে

থাকতে হবে। আমি তেমন কিছু করতে পারব না। কাল সকালেই আপনারা তাকে চার্মোলির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।

তবে জিনের অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, সেটাও এই রকম হাসপাতালই হবে না ত ?

না বাঙালীবাবু—লজ্জিত হাসিমুখে প্রতিবাদ করলেন ডক্টরলোক, লক্ষ্য-এর মত না হলেও বেশ ভাল হাসপাতাল সেটি। ভেষ্য, পথ্য, গুজ্জবা সব ব্যবস্থাই আছে সেখানে। ডাক্তারও শুণী লোক—এসিষ্ট্যান্ট সার্জেন।

বাহাদুরের নির্দেশ মত তার বাখার জায়গাটাতে কি একটা লোশন লাগিয়ে ব্যাগুজ বেঁধে দিলেন তিনি, দু'তিনটি বড়িও দিলেন খেতে, চলৎশক্তিহীন বোগীর জন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জাম অবিলম্বেই সংকারী যেষথের মারফতে আমাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের অক্ষমতার জন্ত আর একবার আমাদের কাছে মার্জনা চেয়ে তবে বিদায় নিলেন তিনি।

ঔষধের পর পথ্য। সাবাটা দিন না খেয়ে আছে বাহাদুর, অথচ গায়ে বেশ জ্বর। স্তব্ধাং জিন্তেনকে বললাম ওর জন্ত কোন দোকান থেকে একটু দুধ আনতে।

কিন্তু বারণ করলেন সেই মহিলা। এতক্ষণ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। বোগীর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে সম্পাউগুদের যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার সবই শুনে থাকবেন। আমি দুধের কথা ভুলতেই তিনি মাথা নেড়ে বললেন, নহী বাবুজী। বুগার বহনেলে ভৈসীকে দুধ নহী পিলানা চাহিয়ে। উসকে দেনে হোগা সাবুদানা।

বিজ্ঞের মত কথা, গিন্নীর মত ভারিচ্চি চাল! তবু বেশ ভাল লাগল তা। আমি হেসে বললাম, কিন্তু বহিন, সাবুদানা এখানে পাব কোথায় ?

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তিনি উত্তর দিলেন, দোকান থেকে এনে দাও, আমার ঘরেই জাল দিয়ে দিচ্ছি আমি। উনান ত আমার জগছেই। তোমরা আমার হাতে যদি খাও তবে তোমাদের জন্তও ভালকুটি দিতে পারি আমি।

আগের মতই কোমল, মধুর স্বর, হাসি হাসি মুখ মহিলার। মূর্ত্তিমতী সাজুনা যেন। গতকাল অপরাহ্ন থেকে আজ ঘণ্টাখানেক পূর্বে পঞ্চাঙ্গ পয় পয় অনেকগুলি দুর্ঘটনার ঝাত-প্রতিঘাতে আমার মনের মধ্যে বত কোড় ও গ্লানি জমেছিল সব যেন দূর হয়ে গেল এই সদা পরিচিতা পার্শ্বতা রমণীর সঙ্গর ব্যবহারে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে আমি বললাম, আমবা, বহিন, জাত মানি নে। তোমার হাতের ডালকুটি বদনীনাথের প্রসাদ মনে করেই খাব আমবা। কিন্তু বিনিময়ে আমি যদি কিছু তোমাকে দিই, তুমি নেবে ত ?

মহিলাকে একটু বিব্রত দেখে পরক্ষণেই খুলেই বললাম কথাটা। শুধু বলা নয়, খুলে দেখিযেও নিলাম আমায় প্রস্তাবের নিমাবরণ বহু রূপও।

কেবল সেই কোটা তরকারিগুলিই নয়, চার্মোলির বাতায়

থেকে আগের দিন তেল-মুন-মশলা ইত্যাদি বা বা কিনেছিলাম সব কোলা থেকে বের করে দিয়ে আমি আবার বললাম, তোমার ডাক্তার থেকে তোমাদের জন্তও আজ আর কিছুই খরচ করার দরকার নেই। এইগুলিই বাঁধ তুমি, অবশিষ্ট যা থাকে তাও তোমারই। ভবিষ্যতে আবার আমাদের প্রয়োজন হলে তখন কিনে নেব আমবা।

এত সব উপকরণ দেখে বত খুসী মহিলা, বিব্রত যেন তার চেয়ে অনেক বেশী। ভাল ভাল জিনিস তিনি বাঁধলে আমাদের মুখে রুচবে কিনা সেই জন্ত উৎসেগ তাঁর। আমি আশাস দিলেও আশাস পান না তিনি। মা, মাসী, ভগিনী, হুহিতার কথা মনে পড়ে যায় আমায়।

বিষয়ের ঘোরটা আর কাটতে চায় না। বাইরে আসবার পর বরং আরও বাড়ছে তা।

নৈশ ভোজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর চারের পিপাসা মেটাবার জন্ত দোকানে গিয়েছিলাম। গত কালের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। স্বস্তর একটু গরম জল সাহস করে চাইতে পারলাম না। অজ্ঞান জনের জন্ত তৈরী চা বত বিশ্বাসই হোক না কেন, তাই বানিকটা গলাধঃকরণ করে বধাসম্ভব মর্মোত জমাবার উদ্দেশ্যে পথের উপরে দাঁড়িয়েই এক গ্লাস চা চেয়েছিলাম। কিন্তু ভরা গ্লাসটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেও আমার মুখের দিকে চেয়ে দোকানী আবার টেনে নিল তা, তার পর একটু সন্দিগ্ধ সুরে সে বললে, আপহী বাবুজী কাল গরম পানী মাংগা খা না ?

আমার সন্দেহ অল্প রকম—কাল অমন একটি ক্রমশ করে ছিলাম বলে আজ ক্রমশ না করেও অপমানিত হতে হবে নাকি ? বিব্রত ভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

কিন্তু না। হাওরা ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছে। আমাকে সঠিক ভাবে চিনতে পারবার পর দোকানী স্মিতমুখে বললে, উঠকে বৈঠকে বাবুজী। হয় পাঁচ মিনিটকে অন্যর আপকো অছা গরম পানী দেজে।

ভাল খাণ্ডের প্রতিশ্রুতির চেয়েও অবিলম্বে সুরের চা পাবার সম্ভাবনা চের বেশী প্রীতিপ্রদ আমার কাছে, আমি পুলকিত হয়ে উঠে বসলাম।

কেবল ভাল চা নয়, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম উপাদেয় এবং উপযুক্ত নোনতা জলধাবারও পাওয়া গেল।

বাতায় দাঁড়িয়ে থাকতেই লক্ষ্য করেছিলাম দোকানের ঘেরেতে একটি অসঙ্গ ঠোত এবং তার কাছেই খুব চটকদার একখানা শাড়ী



পরা পুর কপা এক ভয় মহিলাকে। মাথার কাপড় নেই এবং নাকে নাকছাঁবি আছে দেখে বা অস্থান করেছিলাম তার সর্বন পেলাম ঐ ঘরের মধ্যেই শালা পাজারী এবং লুটির মত করে শালা খুঁটি পরা সুন্দরন একজন পুরুষকে দেখে। দক্ষিণ-ভারতীয় নন্দিত তাঁরা।

ভয়লোক দোকানীর ভাণ্ডার থেকে 'উপমা' প্রস্তুত কববার লজ্জা আশঙ্কীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। নামটা আমার কানে গিয়েছিল, তার পর বস্ত্রবও ভাগ পেলাম আমি।

বলা নেই, কওয়া নেই, ভয়লোক পাতার কবে খানিকটা সেই উপাদেয় খাত এনে দিলেন আমাকে। একেবারে টাটকা—তখনও ঘোঁরা উঠছে, আর খাটি ঘরের সুগন্ধ তাতে।

সংকল্প বা অপকল্প বা আমি করেছিলাম তা একখানা বিস্মৃত ঐ দোকান থেকে পরমা দিয়ে কিনেও দাঁতের অভাবে চিবুতে না পেরে পিঁচিয়ে উপর কলে রাখা, তার পর শুধু চা-ই ঢক ঢক করে গিলছিলাম আমি।

ভয়লোক খাতটুকু সসঙ্কেচে আমাকে পরিবেশন করবার পর ইংরেজীতে বললেন, আপনি অস্থগ্রহ করে এটুকু পেলো আমার স্ত্রী ও আমি উভয়েই খুশী হব। যার লজ্জা আমাদের দেশীয় এই খাত আমার স্ত্রী ঐ ধার-করা ঠোঙের উপর নিজের হাতে এই মাত্র প্রস্তুত করলেন সেই আমার মায়েরও দাঁত নেই—ঠিক আপনায়ই মত অসহায় অবস্থা তাঁর।

ইঙ্গিত শূন্য হলেও লজ্জা নয়, আনন্দেব বোম্বা অস্থভব করলাম আমি। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে ভয়লোকের মুখমণ্ডলে অস্থকম্পা নয়, সশ্রদ্ধ অস্থনয় ফুটে রয়েছে, অস্থরে মেঝের উপর তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন লোহার মত শক্ত বাসি বিস্মৃতখানাকে নিয়ে আমার দুরবস্থা, আমি তাঁর দিকে তাকাতোই তিনিও ইংরেজীতেই বললেন, আমাদের খুঁটনা মার্জনা করবেন, আর একটুও বিব্রত হবেন না আপনি—আমাদের মায়ের লজ্জা এই দেখুন অনেক আছে।

বে কোন অবস্থাতেই 'উপমা' প্রির খাণ্ডা আমার, সেদিন ঐ অবস্থার ও জিনিস ত মনে হ'ল যেন অস্থত।

দোকানে বসেই একটু আলাপ হ'ল ঐ নন্দিতের সঙ্গে, তামিল ব্রাহ্মণ—চক্রবর্তী রাজা গোপালাচাচারি সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে একটু নাকি সন্ধকও তাঁদের আছে। মাতুরায় কাছাকাছি একটি গ্রামে পৈতৃক বাসভূমি ভয়লোকের, তবে চাকরি উপলক্ষে নানা শহরে ঘুরে বেড়ান তিনি। কলকাতাতেও একাধিকবার এসেছেন বললেন, এবং সেই লজ্জা বাতালী দেখলেই খুশী হন তিনি—কলকাতার কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, ময়দান প্রভৃতির স্মৃতি নিয়ে কিছুকণ বোম্বয়ন করবার সুযোগ পাওয়া যায় বলে।

তবে সে রাজ্যে কেশারবন্দরীয় স্মৃতি নিয়েই বিস্তার হু'জনে। ভয়লোক তাই কিছু কিছু শোনালেন আমাকে। বৃদ্ধা জননীকে নিয়ে নির্নির্মে উত্তর তীর্থই দর্শন করে কিরতে পেরেছেন বলে

যেমন গভীর পরিভ্রমি তাঁর মনে তেমনই দুই দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও। আমাদের দুর্ঘটনার ধবর আমার মুখ থেকে শুনে উভয়েই সমবেদনা প্রকাশ করলেন।

আমার মনের কতক উপর আর এক পোঁচ প্রলেপ লাগল যেন। মাস্তাকী নন্দিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একা একাই ঘুরে বেড়লাম কিছুকণ। সেই সব পথ ঘাট, সেই ধর্মশালা, সেই সব ঘরবাড়ীই এখন যেন নতুন ঠেকছে চোখে। ধর্মশালার দোতলায় উঠে গিয়ে সব কথানা ঘরই এক একবার উকি দিয়ে দেখলাম, আজ আর তত ভিড় নেই ওখানে, বাজারেও ভিড় কম। কালকের মত হাড়িপানা মুখ আজ আর একটিও চোখে পড়ল না।

আমাদের নতুন বাসার পাতান বহিনের কাছ থেকে কেবল যে মুখযোচক খান্দাই পাওয়া গিয়েছে তা নয়, শুকনো কবলও পাওয়া গিয়েছে খান চায়েক। সে রাজ্যে নিত্যা সম্পূর্ণ নিকিয়—না বৃষ্টির কোটা, না হুর্গক, না একটি ছারপোকা।

অথচ সেই পিপুলকুটিই।

পরদিন সকালে উঠে মুখ ফুটে বলেই ফেললাম জিতেনকে কুল চর নি ত আমাদের? একি সত্যই পিপুলকুটি?

উত্তর না দিয়ে কেবল হাসল জিতেন—তার মনেও তত আর ক্ষোভ নেই।

দিনের আলোকে গৃহস্থ বাড়ীর ঝকঝকে তকতকে ঘরখানি আরও ভাল দেখাচ্ছে। বাইরে আজ আরহাওয়াও ভাল। বৃষ্টি ত নেই-ই। তার উপর তেমন উজ্জ্বল না হলেও বোদ উঠেছে। অল্প ঝেঁতে ভালই লাগে সে বোদটুকু। প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ মোতাবেক লজ্জা কিছুটা পথ হাঁটেতে হ'ল। তাও ভালই লাগল। শৌচাগার দেখলাম বেশ পরিচ্ছন্ন। জমানার মোতামেন আছে সেখানে। হাসিমুখে সেলাম করল সে। হুটি পরমা বকবিল পেরেই খুঁকিতে একেবারে ডগমগ।

মুখহাত ধোবার লজ্জা আরও একটু দূবে কলতলার যেতে হ'ল।

ভিড় দেখে একটু দূবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পাশের কোন একটা বাড়ী থেকে যেন পরিচিত একটা স্বর কানে এল আমার। সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করে কেউ বৃষ্টি কোন ধর্মীয় অস্থান পালন করছে—অথবা অমনি আবৃত্তি করছে হয় ত। আর একটু মনোযোগ দিতেই কয়েকটি কথাও বুঝতে পারলাম। তার পর সম্পূর্ণ স্লোকটিই মনে পড়ে গেল আমার :

"মধু বাতা শ্বতায়তে মধু ক্ষয়তি সিন্ধবঃ

মধু নস্ত্রতোবসো মধুযং পার্থিবং রজঃ।"

তুনেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মন—এ যে আমারই অন্তরেব প্রতিধ্বনি। কতকটা এই বকমই ত মনে হচ্ছিল যেন আমার—এধানকার আকাশ, বাতাস, যাটি সবই আজ মনে হচ্ছিল মধুময়। বাইরে থেকে মধু গিয়ে জমেছে আমার মনে, না আমারই

মনেব যুধু বাইবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই ভাবতে ভাবতে আমার আসল কাজটাই ভুলে গেলাম আমি।

তদ্বয় হয়ে ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা ছেদ পড়ল যেন।

চোখ, কান ইত্যাদি ইঞ্জিয়, এমন কি মন ছাড়াও আরও কিছু

বোধ হয় আমাদের মধ্যে আছে বার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের কোন বৈশিষ্ট্য সন্ধে আমরা অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠি। তাই হ'ল আমার। চোখে না দেখেও হঠাৎ এক সময়ে খুব তীব্র ভাবে আমি অনুভব করলাম যে, কে যেন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে সন্ত্রস্ত ভাবে চোখ দিয়ে খুঁজতে শুরু করেই পরক্ষণেই দেখতেও পেলাম তাকে।

তুধু যে তাঁর চোখ দুটি দিয়েই আমাকে দেখছেন তা নয়, হাসিমুখে দেখছেন তিনি। পুরুষ নয়, একজন মহিলা। বেশ সুন্দর মুখখানি।

বিস্তৃত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু সেই সহস্রাব্দী তথাপি আমাকে বিহ্বল করছে বুঝে আবারও তাকাতে হ'ল সেই মুখখানার দিকে। আমার চোখে চোরা চাহনি, কিন্তু সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই মহিলায়। তখনও তিনি আমারই দিকে চেয়ে হাসছেন।

প্রথমে কেবলই অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, এখন একটু বিরক্তিও জেগে উঠল মনে। কিন্তু তার তড়ানার তৃতীয় বার মহিলার দিকে তাকাতেই বিহ্বলপ্রায় মত মনে পড়ে গেল আমার। অচেনা ত উনি নন—কাল রাত্রে উনিই আমার উপহার দিয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতের তৈরি 'উপমা'। সেই মাস্তাজী ভক্তলোকের স্ত্রী উনি। কাল রাত্রেও ত দেখেছিলাম—ঠিক এমনি সহস্র চোখেই কালও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি।

চিনতে পারবার পর যা কিছু সন্ধান আমার তা প্রথমেই তাঁকে আমি চিনতে পারি নি বলে। মাক চাইলাম আমার সে ভুলের জগৎ। উনি উদার ভাবে ক্ষমাও করলেন। তার পর শুধানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল আমাদের। আমার অন্তরে সঞ্চিত যুধু পরিমাণ আরও একটু বৃদ্ধি পেল যেন।

নিজের বাদ্য কিরে আসতে আসতে সেই বৈদিক যুদ্ধই মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম আমি। কিন্তু ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই তাল কেটে গেল যেন।

জিতেনের অবস্থা দেখি একেবারে অস্তরকম।

আমাদের ঝোলাঝুলি থেকে সব জিনিস বের করে মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে নিয়ে মাঝখানে চটি একখানা বই হাতে নিয়ে বসে অন্তরমগ্ন হয়েছেন সে। মুগ্ধ ভাব তার গভীর; চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা আবেশ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি জিতেন?

উত্তর না দিয়ে হাতের বইখানা সে আমার হাতে ভুলে দিয়ে বললে, ঐ জারপাটা একবার পড়ে দেখুন ত।

কনকলের জীঘামকৃত্য সেবাস্থম থেকে যে ধানকরেক প্রচায়

পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া গিয়েছিল তারই একখানা বই। কেনে একটি কুলিতে এতদিন অজ্ঞাত জিনিসের নীচে অবশ্যে চাপা পড়ে ছিল। কুলি উপর কয়বার পর প্রথমে মেঝেতে এবং তার পর জিতেনের চোখে পড়েছে।

এখন আমার চোখেও পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের বহু প্রচলিত একটি রচনা থেকে কুহু একটি টুকুটি :

“বহুরূপে সমুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ দৈব ?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে দৈব।”...

জানা কথাই ত। তবে তা নিয়ে জিতেনের এত ভাবনা কেন ?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনে জিতেন যুধু-গভীর স্বরে বললে, বদরীনাথ শেষে এইরূপেই আমাদের দর্শন দিলেন নাকি ? হাতের ইঙ্গিতে বাহাদুরকে দেখিয়ে দিল সে।

চমকে উঠলাম আমি—দেহের শিবার শিবার আমার অকস্মাৎ যেন অত্যন্ত উচ্চ শক্তির তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। এত কথাও মনে আসে ছেলোটায় !

তার মস্তবোর উত্তর না দিয়ে অনুরে বাহাদুরের পাশে হাঁটুগেড়ে বসলাম আমি। চোখবুজে শুয়ে আছে সে ; জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। কপালে হাত দিতেই বেশ বুঝতে পারলাম আমি যে, গায়ে তার কাল রাত্রেও চেয়েও বেশী জ্বর আছে এখন। তবে আমার ছোঁয়া পেয়েই জ্বাফুলের মত লাল চোখ দুটি মেলে বাহাদুর কাতরকণ্ঠে বললে, বাবুজী !—

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। জিতেনকে বললাম, জিনিসপত্র শুছিয়ে ঝোলাঝুলি বেঁধে ফেল তুমি। আমি বাস-এর টিকেট কিনতে যাচ্ছি।

২৪

হস্তভাগাটাকে নিয়ে সমস্তার আমাদের অন্ত নেই।

পিপুলকুঠিতে থাকতেই বাহাদুরের প্রাপ্য টাকাটা হিসাব করে তাকে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নেবে না সে। ঐ জ্বর গায়েও হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে সে কি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান তার—হুম নে আপকী বাজা নষ্ট কর দী। তব রূপরা কৈসে লে সক্তা। নহী লেগে হুম—কভী নহী লেগে।

বেশী পাড়াপীড়ি করতে ভয়সা হয় না। ১০২° ডিগ্রী জ্বর দেখেছি তার গায়ে। বেশী উত্তেজিত হলে নতুন কোন উপসর্গ দেখা বদি দেয়—সেই আশঙ্কা।

সুতরাং টাকাগুলি আবার নিজের পকেটেই বধাস্থানে রেখে দিয়ে বিস্তৃতমুখে কুলির প্রতীক্ষা করছিলাম। তখন হঠাৎ পায়ে টান লাগল আমার।

টান নয়, বাহাদুরই আমার একখানা পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি তার দিকে তাকাতেই কাতরস্বরে সে বললে, আর একটা কুলি

এখন থেকে নিয়ে তোমরা বাবুজী বনরীবিলাল চলে বাও। আমার জন্ত আর হরবাণ হরোনা তোমরা। কেবল একটা গাড়ীতে আমাকে তুলে দাও—তা হলেই হবে।

সেই পক্ষর মত ডাবডেবে চোখ তার; মুখের ভাবে সকাচর, সনির্বন্ধ অচুনর। চেয়ে থাকি আর না তার সেই মুখের দিকে।

সেই জন্তই তার ঐ কথা শুনবার পর চূপ করেও থাকতে পারলাম না। বললাম, গাড়ীতে না হয় তুলে দিলাম—কিন্তু বাবি কোথায় তুই?

উত্তরে সে মুহূর্তেরে বললে, শ্রীনগর।

শুনে অমন অবস্থাতেও হাসি পেল আমার। বললাম, শ্রীনগরে কোথায় বাবি তুই? কল্লীগীর কাছে?

মাথাটা একটু ঝেঁকে স্বীকার করল বাহাজুর। আমি জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, সেও মুচকি মুচকি হাসছে। আমার চোখের দৃষ্টিতেই মনের প্রসন্ন বৃদ্ধিতে পেয়ে সে বললে, শ্রীনগরে ওর ভাবী স্বপ্নবাবুজীতে ওকে পাঠাতে পারলে সব দিক দিয়েই ভাল হ'ত। কিন্তু লোকটা যে একেবারে অচল। তার উপর এত জ্বর রয়েছে ওর গায়ে। একেবারে একা একা ওকে আমরা ছেড়ে দিই কেমন করে?

ঐ দৃষ্টই আমারও মনে। সুরভাং যৌন থেকেই সার দিতে হ'ল। একটু পরে জিতেনই পুনরায় বললে, একজন আসল ডাক্তার দিয়ে ওকে পরীক্ষা না করালে কিছুই ঠিক করা যাবে না। সুরভাং চার্মোলির হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে হবেই। আর অন্ততঃ সে পর্যন্ত ওর সঙ্গে না গিয়ে আমাদেরও নিস্তার নেই।

তার মানে বনরীনাথ থেকে আরও দশ মাইল পিছিয়ে বাওরা। তাই যেতে হ'ল। ফিরে আবার বখন চার্মোলি গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। সেখানে নতুন ফাসাদ আবার। প্রথমে ত হাসপাতালে যেতেই চায় না বাহাজুর; বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেবার পর আমাদের জন্ত নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করল সে।

তখন একেবারে বিপরীত আচরণ তার। দুর্ঘটনা ঘটবার পর থেকেই ক্রমাগতই ত সে আমাদের অসুযোগ করে আসছিল তাকে ফেলে রেখে আমার নিজের গম্ভ্য পথে এগিয়ে বাবার জন্ত। সেই লোকটিরই এমি হ'ল এখন!

হাসপাতালের ঘরে মেঝের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় হুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কানতে কানতে বাহাজুর বললে, হমকে! ছোড়কর মত জায়ো বাবুজী—তব তো হম মর জায়েছে।

বা আশঙ্কা করেছিলাম তা নয়। আর যা ভাবি নি এ যে তাই।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতার বাসিন্দা আমি। জনকল্যাণ রাজ্যের রাজধানী যহানগরী কলকাতা। সেখানেও

শক্ত রোগীকে এ্যাম্বুলান্স পাড়ীতে চাপিয়ে বড় বড় হাসপাতালের দোরে দোরে ধরা দিয়েও কতবারই ত ভর্তি করতে পারি নি। এই অসম্ভাব্য পার্শ্বত্যা এলাকায় ছোট একটি হাসপাতালে অপরিচিত রাজী আমি পারব কি এই কুলিটাকে ভর্তি করতে।

এমনি একটি আশঙ্কাই মনে ছিল আমার।

সুরভাং বাহাজুরকে উপরে সড়কের ধারেই জিতেনের জিম্মায় রেখে একাই আমি নিচে নেমে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর করতে। সেখানে কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার সব আশঙ্কার নিরসন হ'ল।

ছোট হাসপাতাল, সীমিত আয়োজন। কিন্তু ওটাকে পরিচালনা করছে যে মন সেটা ছোট নয়।

রোগীর তেমন ভিড় যে ওখানে নেই সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। তবু সেটাকেই একমাত্র কারণ বলে মানতে পারি নে।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমার মুখ থেকে রোগীর ইতিহাস ও রোগের বর্ণনা শুনেই তৎক্ষণাৎ বললেন, নিয়ে আসুন রোগীকে, আমি এক্ষুণি ভর্তি করে নিচ্ছি।

যেমন কথা তেমন কাজ। ডাক্তার রোগী দেখছেন, সঙ্গে সঙ্গেই কেবাণী না কম্পাউণ্ডার আমার মুখ থেকে শুনে রোগীর নাম-ধাম ইত্যাদি ভর্তির খাতায় লিখে নিচ্ছেন। লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, ওর টাকাপরস কিছু আছে নাকি? থাকলে আপিসে জমা করে দেওয়াই নিরাপদ।

আমার নিজের একটি বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তাতে। বাহাজুরকে দ্বিতীয় বার আর জিজ্ঞাসা না করেই তার পাওনা সব টাকা তার নামে জমা করিয়ে কেবাণীর হাতে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

ততক্ষণে ডাক্তার রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করেছেন। স্টাট-পরা ডাক্তার রোগীর পাশে হাঁট পেড়ে বসে তাকে পরীক্ষা করছিলেন; হয়ে গেলে উঠে আমার কাছে এসে বললেন, বড় রকম কোন জখম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বুকটাই বা একটু খারাপ দেখছি। তা রেখে বান ওকে। এর পর যা করবার তা আমরাই করব।

আমি সসঙ্কোচে বললাম, লোকটি একে গরীব, তার নির্বাক্তব। দামী ওষুধ-ট্যুধ যদি লাগে—

লাগলে আমরাই দেব। হাসিমুখে বললেন ডাক্তার।

হাড়-এব ছবি-টবি যদি নিতে হয়?

দরকার হলে সে ব্যবস্থাও আমরাই করব।

তথাপি সংশয়ের দৃষ্টিতে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা আমরায় নাও যদি কিছু করি তা হলেও আপনি ওর জন্ত আর কি করবেন? বত ভাল মানুষই আপনি হোন না কেন, ডাক্তার ত আপনি নন!

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, না, আপনাকে অবিশ্বাস করি নি

আমি। শুধু ভাবছিলাম যে, ওর চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত কিছু টাকা আপনার কাছে যেবে বাব কি না।

কোন দরকার নেই।

ডাক্তার কথা ভাড়াও তাঁর মুখের হাসি ও হাতের ইঙ্গিতে আশ্বাস দিলেন আমাকে। তার পর আবার বললেন, মোটামুটি সব ব্যবস্থাই এখানে আছে। আর বা নেই তা এই দুর্গম স্থানে হাঁজার টাকা খরচ করলেও সম্ভবত পাওয়া বাবে না। সুতরাং দার্শনিকের মনোবৃত্তি নিয়ে ওকে বেধে বান এখানে। বদরীনাথ থেকে কিরবার পথে আশা করি যে, ওকে আপনারা সঙ্গে নিয়েই যেতে পারবেন—যদি তাই ইচ্ছা হয় আপনারদের।

অতদূর বাড়িয়ে তখন ভারতে পারছিলাম না আমি; আর বা ভাবছিলাম তা স্বল্প পরিচয়ের ক্ষেত্রে বলাও যায় না। সুতরাং ঘুরিয়ে বললাম, দেশেই কিবে যাচ্ছি আমরা। যে ঘস দেখে এলেন তাতে আবারও ঐ পথে চলবার সাহস হচ্ছে না।

তখন কিন্তু অজ্ঞান অনেকের মত ডাক্তারও বিস্মিত। আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এত কাছে থেকে কিবে বাবেন দর্শন না করেই? কেউ কি তা করে?

উত্তরে আবারও বললাম সেই সড়কের কথাই। কিন্তু ডাক্তার আশ্বাস দিলেন, সড়কের কথা ভেবে ভয় পাবেন না। আমাদের রাষ্ট্রপতির গৃহিণী আজই এই পথে বাচ্ছন বদরীনাথ দর্শন করতে। সুতরাং আর কি রাস্তা খারাপ থাকতে পারে? এখন সামনে এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন যে, এই গাড়োয়াল জিলাব সব ইঞ্জিনিয়ার আর সব মজুর ভাড়া পথ ঘেরামত করতে লেগে গিয়েছে।

বলতে বলতে একটু বেন বাজের হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের গুষ্ঠগ্রাস্তে।

হতেও পারে। লাল সাদার লাল রং মুছে দিলে কি হবে, যে বিষয় ও বিজ্ঞানের প্রতীক ঐ রং তার প্রয়োজনা আসে যে বৈষম্য থেকে তা ত দূর হয় নি। কারণ থাকলে কার্যকে ঠেকাবে কে? স্বাধীন ভারতে রাজারানী না থাকলেও রাজকীয় আড়ম্বর অব্যাহত রয়েছে বলে জনচিন্তের পূজীভূত অসঙ্খ্যে হয়ত এই সরকারী ডাক্তারের মনেও কমবেশী সংক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তখন নিজের সমস্তা নিয়েই রীতিমত বিস্মিত আমি। সুতরাং কথা আর বাড়িলাম না। ডাক্তারের মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়ে বাহাদুরের কাছে গেলাম বিদায় নিতে। 'আর তখনই আমি চলে যাচ্ছি শুনেই সে আবার আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে আর্ন্তকণ্ঠে বলে উঠল, আপ তো মেরে মাতা-পিতা হার, বাবুজী। মুঝকো ছোড়কর মত জায়ে।

আবার বেন ঘস নাহছে আমার চোপেন সামনে। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা আমার। কিন্তু জিতেন দেখি হাসছে। আমি বিস্মতভাবে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে হাসতে হাসতেই বললে, এটা প্রকৃতির পরিশোধ। এতদিন যে বেশ এড়িয়ে

এসেছেন আপনি, এই তার প্রতিকূল। পিতা-মাতা হবার দায় যে কি তা বুঝুন এখন।

ডাক্তারও দেখলাম যে হাসছেন। তিনিও একটু খোঁচা দিয়েই বললেন, কত বাজীর কত কুলিই ত এ পথে চলতে চলতে জখম হয়। আর সব বাজীই পথেই তাদের কেলে বেধে অল্প কুলি ভাড়া করে এগিয়ে যায়। আপনারা বখন সাধ করে উলটো আচরণ করেছেন তখন ও বেটা আপনারদের পেয়ে বসবে না ত কি!

তবে তার পরেই তিনি স্বয়ং এবং হাসপাতালের আর সব লোক বাহাদুরকেও বুঝাতে আরম্ভ করলেন। নানাভাবে তাঁরা আশ্বাস দিলেন ওকে। ডাক্তারের নিজের মুখের কথা এবং চোখের ইঙ্গিতে আমার সমস্তার সাময়িক একটা সমাধানও পেয়ে গেলাম আমি। সুতরাং বাহাদুরের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে আমি বললাম, আমরা একেবারে চলে যাচ্ছি নে বাহাদুর—উপরে যাচ্ছি নাওয়া-খাওয়ার জন্য। তা হয়ে গেলেই কিবে আসব আবার।

বাহাদুরের দৃষ্টি মুষ্টি থেকে আমার পা-খানিকে জড়িয়ে নিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। কিন্তু আমার নিজের মন আমাকে মুক্তি দিচ্ছে কোথায়?

আমি ঘটা পরে পরেই বাস ছাড়ছে। বেরিকে খুঁজি যেতে পারি এখন। তথাপি টিকেট ঘরের কাছেও যেতে পারলাম না।

জিতেনের মনেও বুঝি ঐ একই দৃশ্য চলছিল। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পারচারি করবার পর সে আমার কাছে এসে বিবস্ত কণ্ঠে বললে, ভালই হ'ত ওকে সোজা জিনপরে নিয়ে গেলে—ওর আপন জনের কাছে ওকে কেলে বেধে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে পারতাম আমরা।

তাতেই মনে পড়ে গেল আমার যে, দিন দুই পূর্বে এই চার্মোলিতে বসেই ক্রমবীর্ণ পিতার নাম-টিকানা আমার নোট বইতে টুকে নিয়েছিলাম আমি। তাড়াতাড়ি বই খুলে দেখলাম যে, ঠিকই আছে লেখাটা। তাই জিতেনকে দেখিয়ে বললাম, এই লোকটিকে একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানিয়ে দিলে হয় না? খবর পেলে সে আসতেও পারে এখানে।

একটু দেরিতে উত্তর দিল জিতেন। চিন্তিতমুখে আবারও কিছুক্ষণ পারচারি করবার পর সে পঙ্কীয়স্বরে বললে, তা হলে চিঠি নয়, 'ভাব' করতে হবে। আর বাস ভাড়াটাও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে সর্কাজমুন্দর হয়।

প্রস্তাবটি আমার কাছেও ভালই লেগেছিল। তদনুসারে পোষ্ট আপিসের কাজটা সেবে আসবার পর জিতেন উৎসাহ হয়ে বললে, এইবার বিবেকের কাছে বেকশ্রম খালাস আমরা। এবার চলুন ঐ পিপুলকুটির দিকেই। ওখান থেকে নতুন একটি কুলি নিয়ে কাল সকালে আবার বদরীনাথের পথে যাত্রা করা বাবে।

কিন্তু 'উন্মাদ জ্বদি নিরুদ্ভে'। আবারও বাধা পড়ল।

ভাঙা পথ যেসমত হয়েছে খবর পেয়েছি। বাহাদুর কুলির যে অচল দেহটা বোঝা হয়ে আমাদের পক্ষ করেছিল তাকেও কাঁধের উপর থেকে নামাতে পেরেছি। বিবেকের বাধাও আর নেই এবং আমার নিজের ভাঙা পায়েও বাধাটাকেও অতিক্রম করবার মত জোর এসে গিয়েছে আমার মনে। তথাপি দেখি যে পথ বন্ধ। এবার বৈকে বসল আমাদের শূণ্য পকেট।

হু'জনে হিসাব করে টাকা এনেছিলাম। কিন্তু হিসাবের অতিরিক্ত অর্থ ইতিমধ্যেই খরচ করে বসে আছি। যে কটি টাকা অবশিষ্ট আছে তা ঐ চারমৌলি থেকেই কলকাতার কিয়ে যাবার জন্তও বখেঁট নয়। এখন আবার দ্বিতীয় একটি কুলি নিয়ে অতিরিক্ত দিন সাতেকের জন্ত সামনের অনিশ্চিত পথে যাত্রা কয়ব কোন ভরসায়।

অল্প টাকা বার বার গুললে পরিস্রামে বুদ্ধি পায় কি না তাই পরখ করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু বুঝা চেষ্টা। নিরাশ হয়ে জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ও সাথটা এবারের মত শিকের তুলেই রাখতে হবে, কারণ ফুরিয়ে গিয়েছে।

টাকা না থাকার যে বুদ্ধি তা একেবারে অকাটা। জিতেনের মত বেরাড়া লোকও এবার আর তা খুঁজি করতে চেষ্টা করল না। উত্তরে বদরীনাথ পূর্বতল্লোয়ী দিকে কিছুক্ষণ উদ্যাস, বিষয় দুটোতে চেয়ে থাকবার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সে বললে, তবে কিয়ই চলুন। কোন পথ ধরবেন—চরিত্রার না কোটঘাটের?

দুটাই বাস—এই পথ। তবে চারমৌলি থেকে গাড়োয়াল জিলায় রাজধানী পৌঁড়ি হয়ে কোটঘাট বেল ষ্টেশনে যাবার পথ অন্ধকেরও বেশী নতুন হবে জেনে সেই পথে কিয়ে বাওয়াই ঠিক করলাম আমরা। তবে যাত্রা করবার পূর্বে আর একবার বাহাদুরকে দেখে আসতে হবে।

২৫

কিয়ই চলেছি—কোটঘাটের দিকেই।

আজ আর একটুও অনিশ্চয়তা নেই, কুহকিনী আশার বিভ্রান্তি মনের দিগন্তে একবারও ফুটে উঠেছে না। মনের মধ্যে আজ নির্দ্বয় সত্যের কঠিন উপলব্ধি—যাত্রা আমার বার্থ হয়েছে—দর্শনের পূর্বেই বদরীনারায়ণের মন্দিরের দিক থেকে একেবারে বিপরীত দিকে মুখ কিয়ে ক্রতগামী মোটর গাড়ীতে চড়ে সত্য সত্যই ঘরের পানে কিয়ে চলেছি এখন। জীবনের এই অপমৃত্যু বেলায় ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভেও আশার হাতছানি দেখতে পাই নে। যে দুর্গম পথ আর ব্যয়সাধ্য ভ্রমণ! অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পূর্ণ করবার জন্ত আর কি কোন দিন এই হিমালয়ে আসতে পারব।

এক একটি শূন্য, এক একটি উপত্যকা পায় হই, আর মনে হয় যে, জন্মের মতই পিছনে কেলে চললাম তাকে।

তবু মনে আজ কোভ নেই। সেই বোঝা কান্নাটা বুকের ভিতর থেকে কঠ পর্ষাদে আজ আর ঠেলে ঠেলে উঠেছে না।

গাড়ীতে চাপবার পূর্বে বাহাদুরকে আবার দেখে এসেছি। চোখের দেখা বই ত নয়—তখন ঘুমিয়ে ছিল সে। পা টিপে টিপে তার শরীর কাছে গিয়ে হৃদয় তার মুখখানি দেখেই আবার পা টিপে টিপেই ঘুম হয়ে এসেছি। ভালই হয়েছে তাতে—তার কান্না আর কানে শুনতে হয় নি। আর ভালই দেখেছি তাকে—বেশ শান্তিতেই ঘুমছিল সে। ডাক্তারও বলেছেন যে, সে ভালই আছে। হাড়গোড় নাকি ভাঙে নি—পায়ের কয়েকটি মাংসপেশী অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হয়ে সেদিন ঐ বিজ্ঞাত ঘটিয়েছিল, তার সঙ্গে আছে 'শক' আর একটু নিউমোনিয়া—এই পেনিসিলিনের যুগে থাকে রোগ বলেই বিবেচনা করা হয় না। দৃঢ় বিশ্বাসের গভীর স্বরে ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন আমাকে যে, তিন-চার দিনের মধ্যেই বাহাদুর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু মনে যে আমার কোভ নেই, ঐ আশ্বাসই তার একমাত্র কাণ্ড নয়। আমার হৃদয়ের পাত্রটি আরও অনেক উপাদানে পূর্ণ হয়ে আছে বলেই কোভ আর সেখানে প্রবেশ করবার পথ পায় নি। আশ্চর্য! দেবদর্শন যে আমার হয় নি তাই বেন এখন মানতে চায় না আমার মন।

না—ই বা পেলাম ছোট একটি মন্দিরের মধ্যে চতুর্ভুজ বিগ্ৰহের দর্শন। বিরাট বদরীনাথ ত আমাকে বিমুগ্ধ করেন নি। পথ চলতে চলতে দু'থেকে অনেকবারই দেখেছি তাঁর বলমল কীরীট-কুণ্ডল, তাঁর প্রশান্ত বয়ানে প্রসন্ন নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। পৌড়ি শহরে বাস থামবার পর আরও একবার দর্শন দিলেন বদরীনাথ।

নিখিল প্রভাতে তরুণ সূর্যের সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত দেখলাম অনেক ঘুরে অর্দ্ধরাত্রে আকার এবং প্রায় বায়ুমণ্ডলের বোধ করি অন্ধকোটা হিমালয়ই—চৌপাশ, ত্রিশূল এবং আরও কয়েকটি দুর্জয় শৃঙ্গকে পাশে নিয়ে কেন্দ্রবদরী উত্তর তীর্থই বেন আমাকে দর্শন দেবার জন্তই বিপুল গরিমা ও বিরাট মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মন্দির পর্ষাদে যেতে পারলেও আমার ছোট ছোট দুটি চশমা-পরা চোখ দিয়ে আর বেশী কি দেখতাম?

আর কেমন করে বলি আমি যে, তরঙ্গিত হিমালয়ের শিখরে শিখরে কেবল সূর্যের বিম্বয় হয়েই আমাকে তিনি দর্শন দিয়েছেন? খুব কাছে থেকেও হিমালয়ের যে অপরিমেয় ও অতুলনীয় শোভা দেখলাম দিনের পর দিন, তা কি ছিল কেবলই গাছ, মাটি, পাথর?

ইতিপূর্বে দেশ-বিদেশে কত দুঃখ, কত মায়ুখই ত দেখেছি। খুব কাছে থেকে দেখলেও তা ছিল বেন হেলগাড়ীতে চলতে চলতে দেখা—চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্ত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে তা, কিন্তু বিগত প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই হিমালয়েরই অসংখ্য শিখরে-কন্দরে উপত্যকার-দুর্গতাকার, অরণ্য-উপবনে, শিলায় ও সলিলে দুই চোখভরে য় দর্শন করেছি, তার কিছুই, এই এত দিন পরেও, কৈ হারিয়ে বা ফুরিয়ে যায় নি ত।

আগে কোন দিন বা অমুভব করি নি, এ পথে তাই যে

আমার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ঘূরে এ আকাশচুম্বী ত্রিশূল শৃঙ্খের মতই এও এক অনন্ত বিষয়, আর এ ত স্রষ্ট্রের নয়, আমার অন্তরেই যে অবিধান এর।

এবার আমার অবিরাম গতিপথে চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত সীমিত শক্তির আওতার মধ্যে হস্ত কণিকের জন্তই ধরা পড়েছিল যত দৃশ্য, যত ধ্বনি, যত রস তার সবই ত দেখছি যে স্থান-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে আমারই মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অবচেতন মনে প্রিয়মান স্মৃতির এক বিশৃঙ্খল স্তম্ভ নয় তা। টুকরো টুকরো দৃশ্য, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সাময়িক স্থল-স্থলের মত হিল্লোল ইন্দ্রিয়ের স্ফীর্ণ ধারণা, আমার অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ করে ফুল হয়ে ফুটেই কেবল উঠে নি, না জানি কোন নিপুণ মালাকারের কোমল অঙ্গুলির বাহুস্পর্শে অদৃশ্য এক স্বর্ণস্থলে গ্রথিত হয়ে নরন-মনোহর বিচিত্র একগাছা মালা হয়ে বিবাজ করছে দেখানে। মধু-মত্ত ভ্রমসম আমার লুক্ক মনের এখন পথে আশ্রয় তা—অনন্ত বিচরণক্ষেত্র।

সেই সব চড়াই-উত্তরাই, নিবিড় অরণ্য, কল্লোলিনী-স্রোতস্বিনী, আকাশচুম্বী পর্বতমালা, অমল-ধবল বন্যের তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র, অসীমের সাগর আমন্ত্রণ, ক্রোধের তাণ্ডব নৃত্য ও জীবনের জীলায়িত হিম্মোল—এখনও চোখ বুজলেই সবই ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

রূপ নয়, অপরূপও নয়। রূপে রূপে প্রতিরূপ যার, তিনিই ত জীবনের দেবতা বদরীনাথর। নিজের অজ্ঞান প্রতি পদ-

ক্ষেপেই জাগ্রত বদরীনাথকে চোখভরে দর্শন করেছি বলেই ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের এত প্রাণময় স্মৃতি আমার মনে।

এই তাঁর শাখত বিলাসক্ষেত্রে তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন সীমার মাঝে অসীমের, নিসর্গের কোলে অর্নৈসর্গিকের অভিব্যক্তি। তাই এখনও চোখ বুজলেই দেখছি সেই সব বালক-বৃদ্ধ-নয়নারীকেও, যারা আমার যাত্রাপথে তাঁদের সাময়িক সাহচর্য ও কণিকের প্রীতির স্ফীর্ণ বাতায়নপথে মাহুঘের নাহারণের বিপুল মহিমা বায় বায় আমার মনের চোখের সামনে প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। যে সৌরভ, যে হাসি, যে বেদনা পিছনে কেলে এলাম, মনে করেছিলাম তার সবই ত এখন দেখছি আমার মনের মন্দিরেই অক্ষয় হয়ে বিবাজ করছে। রক্ত্রে রক্ত্রে পরিপূর্ণ আমার স্মৃতির মধুচক্র। কোভ সেখানে ঠাই পাবে কোথায়?

“যখন নয়ন মুদ্রিয়া থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি”—বলে-ছিলেন বৈষ্ণব মহাজন। অতবড় দাবি করতে পারি নে আমি। তবে দর্শন হ’ল না বলে কোন কীকে মনে আমার একটু কোভ যদি জাগেও তা হলেও সান্ত্বনার অভাব হয় না। আমার মনের বীণায় তাতে একালের মহাজন মহাকাবির নতুন সুর তখনই বেজে ওঠে। একবার শুষ্ঠপ্রান্তেও উছলে উঠল তা।

পৌড়ি ছেড়ে আসবার পর জিতেনকে বিষয় দেখে তার এক-খানা হাত ধরে আমি বললাম:

“জীবনে যত পূজা হ’ল না সারা  
জানি কে জানি তাও হয় নি চারা।”

সমাপ্ত

## সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ স্মরণে

শ্রীপুষ্প দেবী

কিশোরী জীবনে তোমার লেখাটি ছিল মোর মনোরম  
অভিনব তব পৃথ ও লেখনী পাঠকের প্রিয়তম,  
তব লেখনীতে আঁকা অগ্রজ মহিমায় ভরা ছবি  
জনকের মত উজ্জল মুদ্রতি নিস্ত্রাভ শশী রবি।  
কল্প ধারার সম অন্তরে স্নেহধারা সঙ্গা ধরে  
ভাই-বোনদের বুকখানি তুমি আঁসায় দিলে যে ভরে,  
পরিহাস তব প্রলেপের মত জুড়াইয়া যায় ক্ষত  
স্নেহ মমতার মুগ্ধ প্রতীক হেরি মাথা ধর্যনত।  
পড়ি রাজপথ দিকশূন্য তব কাঁদিয়াছি কত দিন,  
শশীনাথ আর অমূল তরুণে মায়ালেন্দ্রোহা বোণ।  
বিদূষী ভার্যা তব লেখনীতে ছিল মিচ্ছ পরিণয়  
শিক্ষায় তার হবে উন্নতি অবনতি কভু নয়।

শিক্ষা লভিয়া নারীর মহিমা স্নান কভু নাহি হবে  
জননী রূপে প্রেরণীর রূপে চির আলোকিত হবে।  
ছদ্মবেশীর প্রতি আধারেতে স্নানিগুণ তব তুলি  
নির্মল সেই হাস্য ধারায় গিয়াছি আপন তুলি।  
অভিজ্ঞানের চিহ্ন তোমার পাঠকের বুক আঁকা  
আদর্শ তব মজল সাথে কল্যাণ মধু মাধা।  
দরশ তোমার মেলেনি জীবনে তবুও আমার মনে  
অগ্রজ রূপে চির অমলিন ভকতি শ্রদ্ধা সনে।  
চলে গেলে আজ ছাড়ি জগতে তবুও অমর তুমি  
শুধু আমি নয় তোমার তরেতে কাঁদিয়ে বদভূমি।



## মৌন অতীত

শ্রীসমর বসু

আমাকে অনুরোধ করেছ একটা গল্প লিখতে—যে গল্পের নায়িকা হবে তুমি। রবি ঠাকুরের সাধারণ মেয়ে মালতী ঠিক এই ধরনের অনুরোধ করেছিল শরৎবাবুকে। নিজের কথা অনেক বলেছিল মালতী, কেমন করে গল্প লিখতে হবে তাও বলে দিয়েছিল। তুমি কিন্তু সে সব কথা কিছুই বল নি। শুধু অনুরোধ জানিয়েছ, তোমাকে নিয়ে যেন একটা গল্প লিখি।

কিন্তু কতটুকুই বা তোমাকে আমি জানি? কতদিনই বা তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়? তবু ঐ অপরিচয়ের আড়ালে যেটুকু অজানা সেইখানেই আমার দৃষ্টি কমে। আর সেইখানটুকুতেই তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব।

দুপুরের একটা জনবিরল ট্রামের মধ্যে তোমাকে আমি প্রথম দেখি। আমার সেই দেখাটাকে আবিষ্কারও বলতে পার। আমি আবিষ্কার করি মাথা নীচু করে বসে-থাকা একটা মেয়েকে। হাতে কতকগুলো বই আর খাতা। খাতা থেকে জানতে পারি মেয়েটির নাম সুজাতা। পড়ে ইউনিভার্সিটিতে। বোধ হয় বাঙালী।—চোখে তার পুরু লেন্সের চশমা। অধিক লেখা-পড়া করার কুফলের সাক্ষী। এমন একটা মেয়ের হাতে দেখলাম আমারই লেখা একটা উপন্যাস সব্বন্ধে রক্ষিত। এমন মেয়েও উপন্যাস পড়ে। আর সে উপন্যাস আমারই লেখা। তাবল্যাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া যারা পড়ে তাদের যখন আকৃষ্ট করতে পেরেছে আমার লেখা, তখন নিশ্চয়ই সে লেখা...। যাক নিজের কথা আজ আর বলব না। তোমার কথাই বলি।

সুজাতার চশমা-খোলা চোখ আমি কোন দিনই দেখি নি। দেখলে হয়ত তার মনোবিশ্লেষণ অনেক খবরই পেতে পারতাম। কিন্তু তার হাতের লেখা দেখেছি। দেখেছি বেশ-বাসে তার কল্টিবন্ধ প্যারিপাট্য, আর লক্ষ্য করেছি তার কথা বলার ভঙ্গি।

ট্রামের মধ্যেই সুজাতা যখন জানতে পারল যে, তারই পাশে বসে আছে ঐ উপন্যাসটির রচয়িতা, তখন লাল হয়ে ওঠা তার সমস্ত মুখমণ্ডলে যে অন্তর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—অত্যন্ত প্রসঙ্গে তাকে অবদমন করে সে শুধু হাত তুলে নমস্কার জানাল। গোপালির বাঙা আকাশ যেন কাল

হয়ে উঠল হঠাৎ-ছেয়ে আপা নিবিড় মেঘে, আর সেই আকাশে নেমে এসে সন্ধ্যা—ঈষৎ লজ্জায় আনত শিরে।

ব্যবসায় পাবল্যাম, অন্তরে সুজাতা কত কোমল আর বাইরে তার কি নিষ্ঠুর কাঠিন্য। সুজাতা কী এমন পরিবেশে মানুষ হয়েছে যেখানে আন্তরিক স্বাভাবিকতা বাইরের শাসনে ক্ষুণ্ণ, ক্ষুণ্ণ। দেহে যার ঐ অটুট স্বাস্থ্য, ঠোট দুটো তার অত বিবর্ণ কেন! পড়তে ভাল লাগে বলে পড়ছে মেয়েটা—নাকি জোর করে ওকে পড়ানো হচ্ছে। এতখানি স্বাস্থ্য, এতখানি দারুণ—সে কি ছাত্রীতে সম্ভব!

আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে একটা ছোট ‘নোট-বুক’ বার করল সুজাতা। ভিজেন করল—আপনার ঠিকানা?

বললাম—একটা বারোয়ারী মেশে থাকি রাজে, সকাল-সন্ধ্যায় ছেলে-পড়াই, সারা দিন ঘুরে বেড়াই এখানে সেখানে—পত্র-পত্রিকার আপিসে আপিসে—কিংবা পাবলিশার্সদের স্বল্পপরিষদ ‘নিকতনে’। ঠিকানা বলতে যা বোঝায় সে বকম আমার কিছু নেই। তা ছাড়া ঠিকানা কেন চাইছেন সেটাও ত আমার জানা দরকার।

—নিশ্চয়ই। দৃঢ় জবাব সুজাতার।—লেখকদের ঠিকানা সংগ্রহ আমার একটা বাতিক। কি জানি, কাকে কখন কি প্রয়োজন হয়।—একটা মিষ্টি হাসি ওর ঠোটে লেগেছিল আর চোখে ছিল গভীর স্নিগ্ধতা। কিন্তু এতটুকু কৌতুহল ছিল না কাথাও, ছিল না এতটুকু আগ্রহ।

বললাম—চিঠি যদি দেন, পাবলিশার্সদের ঠিকানায় দেবেন—আমি পাব। কিন্তু দেখা যদি করতে আসেন হয় ত দেখা মিলবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই ওর সঙ্গে কেমন যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। ও শুধু আমার পার্শ্ববর্তিনী সহ-যাত্রিণী নয়, তার চেয়েও বেশি আরও কিছু বেশী। উপন্যাসের সেতু বেয়ে ও যেন আমার অনেক কাছে এসে গেছে।

কিছুকণ চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে পড়ল সুজাতা।—নমস্কার, এইখানেই আমি নামব।

সুজাতা গেলে গেল।—সেই রাতে সে চুলগুলো উড়ছিল। আচল্যামের বাড়ি—আর আমি তাই দেখছিলাম, যতকণ দেখা যায় ততকণ।...সুজাতা পথ হাঁটছে—না, বোধ হয় হাঁটছে না। স্থির, শান্ত। রাস্তার পাশে যেন



একটা খেত পাখর। একজন হুক ভান্ডারের হাতে গড়া উকলী—মোনালিসা!—কিংবা অস্ত্র কিছু।

মনে হ'ল, কিছু যেন ফেলে গেছে ও তুল করে, আর সেটা যেন আমিই কুড়িয়ে পেয়েছি। হয় ত ও আবার ডাক দেবে—হয় ত আবার দেখা হবে ওর সঙ্গে।...

দেখা হ'ল সীমাহের বাড়ী। সীমারই আঙ্গানে যেতে হয়েছিল অস্ত্র সমস্ত কর্মসূচী বর্জন করে—একট শনিবারের সন্ধ্যায়। সীমা আমার ভাগ্নী, বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। ওর দ্বারা-বৌদি সেটা মানে, ও কিন্তু তা মানতে চায় না। ও বলে—পাঠক আর লেখকের মধ্যে যে সখ্য সেটা বন্ধুত্বের, বিশেষ করে সে পাঠক যদি সমালোচক হয়। সুতরাং পরিবারে আমার স্থান যেখানেই হউক না কেন, লেখক হিসাবে আমি ওর বন্ধু।

সীমার সঙ্গে সুজাতার কবে থেকে আলাপ তা আমার জানার কথা নয়। সীমা ইউনিভার্সিটিতেও পড়ে না। তাই সুজাতাকে ওদের বাড়ী দেখে আমার বুঝতে দেয়ী হ'ল না যে ঘটনাটি নেহাত দুর্ঘটনা নয়, পূর্বা-পরিকল্পিত।

পড়ার ঘরে মজলিস বসল। আলোচ্য বিষয় আমার সেই উপস্তাস। সীমা যে 'বি-এ' বাংলা অনাসের ছাত্রী, এইটাই সে প্রমাণ করতে লাগল যুক্তির জাল বিস্তার করে আমার উপস্তাসকে নস্তাং করে দিয়ে। এম-এ ছাত্রী সুজাতা বললে, তোমার বিচার একদেশধরী। ওদের অ্যাকাডেমিক তর্কে-বিতর্কে আমার যে অংশটুকু ছিল সেটা শ্রোতার। তবুও আমার কাছ থেকে মত চাওয়া হ'ল। বললাম—সাহিত্য-সমালোচনায় সমকালের বাধা মস্ত বড় বাধা। সুতরাং ও প্রসঙ্গ রেখে অস্ত্র আলোচনা কর।

হাসি চাপবার জন্ত মুখ মুহুতে সুরু করল সুজাতা। আর সীমা হুইল গভীর হয়ে—এত আয়োজন বুঝি বার্ষিক হ'ল ওর।

সীমাকে চিনি, কিন্তু সুজাতাকে সেদিন নতুন করে চিনলাম। সারাজীবন ধরে পাশাপাশি থেকেও মেয়েদের নাকি চেনা যায় না। অথচ বেড় বণ্ডার মধ্যে সুজাতাকে চিনে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু সত্যি কি চিনতে পেরেছি? আলো দেখেছি, পড়ি, কিন্তু সে আলো অলস, না পুড়ছে।

সুজাতা হাসে, অনর্গল কথা বলতে পারে। উচ্ছাস, চঞ্চলতা, প্রাণপ্রাচুর্য্য উদ্ভাস হয়ে উঠে। সবই তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু সুজাতার হাসি যে দেখেছেই লক্ষ্য করেছে তার বাক-ভঙ্গি, সেই বুঝতে পারবে, বাক্য কাছে থেকেও সুজাতা কত সুবের। সুজাতা শোভিত, কি ১ সে শোভা দুব-দ্বিগুণের। কল্লোলিনীর কলরব সমুদ্রের প্রশান্তিতে শুধু গভীর নয়, কেমন যেন ধ্যাননিমগ্ন।

সুজাতার এই বৈচিত্র্য সবার পারস্পরিক সংগ্রাম হয়ত অবিরাম চলেছে তার অন্তরে, কিন্তু বাইরে সুজাতা শান্ত, সমাহিত, স্থির, মৌনী। ও যেন একটা শেষ-হয়ে-যাওয়া কবিতা। কথা বা ছিল কুড়িয়ে গেছে—বা আছে তা শুধু ভাববার।

তা হলে সুজাতার জীবন কি অভিশপ্ত! যে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ নেই, যে জীবন সামনের দিকে চলে না, একটি সীমার মধ্যে নিয়তই যা আবর্তিত হতে থাকে, যেখানে বৈচিত্র্যের প্রবেশ নিষেধ—সে জীবন অভিশপ্ত বৈকি।

কিন্তু সুজাতা অস্ত্র কথা বলে। ও বলে বাহ্যিক উচ্ছলতার জীবনের কথা ঢাকা পড়ে যায়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা বক্তব্য থাকে উচিত, জীবনের মধ্যেই যা ক্রমপ্রকাশ।

কথা বললে সুজাতার শুধু ঠোট নড়ে, চোখ নাচে না, মাথা ধোলে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোথাও কোনখানে এতটুকু ঢেউ তোলে না। আর তাতেই বুঝতে পারা যায় ও বা বলে তাতে খান নেই। নিরাম সোনা বেশী বাক্যকে হয় না।

—সীমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কি করে?—  
জিজ্ঞেস করি।

—সীমাকে জিজ্ঞেস করুন না,—উত্তর দেয় সুজাতা।  
ফুল থেকে ধরে-পড়া পাপড়ির মত আশ্চর্য্য নৈঃশব্দে বেরিয়ে আসে কথাগুলো ওর পাতলা ঠোট দুটো থেকে।

—কেন, আপনার বলতে বাধা কি?

—বলতে বাধা যাদের থাকে—বাধার যে কোনও কারণও তার দেখাতে পারে। সুতরাং ও উত্তরে আপনার আসল উত্তর মিলবে না।

—তবে কি আমি মনে করব, প্রস্তুত আপনাকে করা আমার উচিত হয় নি?

—ব্যক্তিগত প্রস্ন না করাই উচিত—এটা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। তবুও আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন তখন বুঝতে হবে ওর উদ্দেশ্য আপনার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যার জন্তে সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করতেও আপনি পরাধুষ হন নি।—'নেসেসিটি নো ল'।

সীমা এবার হেসে উঠল। বললে—ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ কর মায়া। পারবে না, তুমি কথাসিদ্ধী, আর উনি হলেন মিতভাষী। স্বল্প কথায় বক্তব্যকে উনি এমন কঠিন করে তুলবেন, কথার জালবুনও তুমি তার উত্তর দিতে পারবে না।

—সীমা যা বললে সত্যি?—আবার জিজ্ঞেস করি।



ଅବସୀ (ଶେଫାଳୀ, ଅନିତାହା)

ନୋଲ୍‌ସନ ଚାମ୍ପା

ବିଶେଷକାରୀ ଶାସ୍ତ୍ର



(ଏହା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି)



—সত্য কি মিথ্যা—সীমার উপর আপনার যা ধারণা তার উপরই তা নির্ভরশীল। ওখানে আমার কোনও মন্তব্য নেই—ধাঁকতেও পারে না।

বললাম, কথাই মাধ্যমেও এতটুকু অন্তরঙ্গতা পছন্দ করে না সূজাতা। সূজাতা হয়ত চায় না ওর সম্বন্ধে অল্প কেউ কোতূহলী হউক, ওর কথা আর পাঁচজনের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠুক। আলোচনা শুধু আলোচনাই হয়ে থাকে না বেশীকণ। ওর আলোচনাতেও ধরা পড়ে যায় অনেক কিছু—যা ধরতে দেওয়া চলে না। তাই কথাবার্তায় সূজাতা যেমন আত্ম-উদ্বাসীন, আচরণেও ঠিক তেমনি নৈর্দ্যক্তিক।

সূজাতার সঙ্গে আর কোনও দিনই দেখা হয় নি।...না, দেখা হয়েছিল—কলেজ ষ্ট্রাটের ফুটপাথে। রেলিঙে টাঙানো পুরণো বইগুলি দেখেছিলাম। অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল সূজাতা। হয়ত আমার দেখতে পায় নি, কিংবা দেখেও চিনতে পারে নি। ওর দোষ নেই। দোষ ওর চোখেও, পুরু চশমার যষ্টি নিয়ে থাকে পথ চলতে হয় তার উপর আর অতিমান করা চলে না। সূত্রাং আমাকেই কথা কইতে হ'ল—কী বই দেখছেন?

ওঃ, আপনি, নমস্কার। এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি। এসেছিলাম কলেজে।...একটা দর্শনের বই খুঁজছি। ভাল আছেন?

সূজাতার চোখ বইগুলির দিকে। কথা বলছে যুখে—কিন্তু চোখ খুঁজছে সেই বইটা। দেখলাম সূজাতার দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে কি গভীর ঐকান্তিকতা। স্থান-কাল-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সূজাতার সে অন্তঃসত্যই বিষয়ের।

আমার চোখে কিছুটা কাঁড়ালপনা হয়ত প্রকাশ পেয়েছিল—যা দেখে হেসেছিল সেই দোকানদার। কলেজ-বাগান ছুটি ছেলে, আরও হয়ত অনেক। একটু অপ্রস্তুত, একটু অন্তমনস্ক। ওপাশের ফুটপাথের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজতে চাওয়া—তার পর আবার সব ঠিক। বললাম—চলুন না, একটু কফি খেয়ে আসি।

নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রবল ইচ্ছাটাকে আর চেপে রাখতে পারলাম না। সূজাতাও রাজী হয়ে গেল। বাস্তব দিয়ে যারা বাচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে দেখলাম সূজাতাকে—বীর শাস্ত্র গতিতে একটা গভীর মরালছন্দ। অথচ বাস্তব লেগে ফুলে-গুঠা কালো চুলগুলিতে যেন অন্ধকার শয়তানের ডেট। সেখানে সবকিছু যেন আছড়ে পড়তে চায়—যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চায়।

আমরা পাশাপাশি হাঁটছি—মারখানে একটু ব্যবধান। গভীর নীরবতা। কলেজ স্কয়ারে একটা গাছের ডালে অনেক পাখী। কত কাছাকাছি তারা। কত চোঁচামিচি।

এরপর অনেক রাতে ভিড় করে আসবে ওদের বাগান। কালো অন্ধকার রাত। বাস্তব তবু আলো জ্বলবে। এই সন্ধ্যাটা পেরিয়ে রাত আর সেখানে আসবে না। এই সন্ধ্যাটা যেন অনন্ত সন্ধ্যা হয়ে বেঁচে থাকবে। এত সুখরতার মাঝে একটু মৌন অবসর।

কফি হাউস। সূজাতা পিছনে। দুটো চেয়ার সূজাতা সামনে। কফি, ধোঁয়া, গন্ধ। সূজাতার চশমা; চশমা ঢাকা চোখ। অবিচ্ছিন্ন চুল। সাধা স্ববধে কাপড়ের দন-সবুজ পাড়—সাপের মত জড়িয়ে আছে পাকে পাকে।

—আপনি বুঝি খুব কফি খান? আমি কিন্তু কফিতে অভ্যস্ত নই।—অত্যন্ত সহজ সূজাতার কণ্ঠস্বর। বিহ্বলতা নেই, বিমূঢ়তা নেই। আমার সঙ্গে তার কফি খাওয়া আজ বোধ হয় প্রথম নয়।

সন্ধ্যা বললাম, কবিতার মত এক টুকরো ইঙ্গিত ওর ঠোঁটের ডগায় কেঁপে উঠল। কিসেব ইঙ্গিত! একটু প্রশস্ত শোনার! হয়ত বা—বললাম—কফিতে অভ্যস্ত হওয়া ভাল নয়। তবে মাঝে মাঝে এই ধরনের অলস সন্ধ্যায় এক কাপ কফি নিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই ধোঁয়াব মধ্যে সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে কিছুকণের জন্য হারিয়ে ফেলতে।

—আর কী বই লিখলেন?—একটা রসঘন পরিবেশকে বোধ করি ইচ্ছে করেই ছিন্নভিন্ন করে দিল সূজাতা।

—কিছু না। উপভাস লিখতে বড় সময় লাগে। আমি ত আর নাম করা কেউ নই যে, বছরে ছ'চারটা উপভাস গড়গড় করে লিখে যাব। লিখতে গেলে ভাবতে হয় অনেক। ভাবতে গেলে দেখতে হয় অনেক কিছু। দেখতে গেলে ঘুরতে হয়, পড়তে হয়।

সূজাতা হেসে উঠল। বললে—আমায় ত দেখেছেন, আমায় ত জেনেছেন, অবশ্য পড়তে পেরেছেন কি না বলতে পারি না। তবে আমাকে নিয়েও গল্প লিখতে পারেন। লিখুন না একটা।

কফিতে একটু চিনি মেশাল সূজাতা। চামচেটা এগিয়ে দিল ...

একটা ক্লাস্ত কল্পপুষ্টিতা। একটা ঠাণ্ডা কুয়াশার আশ্রয়ণ।

সূজাতা কে ধীরে হারিয়ে গেল।

সূজাতার নীতীতকে খুঁজতে গিয়ে আমি ক্লাস্ত হয়েছি। তবু নিরুৎসাহি হই নি। সীমার কাছ থেকে জেনেছিলাম, সূজাতা ছদ্মবেশে গল্প লিখত। ওদের কলেজে ও 'পার্ট-টাইম' ক্লাস নেয়, আর সেই সন্ধ্যাই ওর সঙ্গে আলাপ।

সূজাতা বলে—আমিও ছাত্রী—তোমাদের বন্ধু। অধ্যাপিকা বলে আমাকে দূরে রেখে না।—সীমাদের তাই অতখানি স্পর্ধা, অতখানি অগ্রসর।

সুজাতা একা থাকে। লেডিজ হোটেলে যে হোষ্টেলেরও নিজেই সুপারিণ্টেন্ডেন্ট। সেখানকার অন্ত্য-বাসিনীদের লিখিত কোনও নিয়মপালন করতে হয় না। সুজাতার কণ্ঠবান্ধুশীলনেও প্রত্যেকটি মুহূর্ত, অকথিত নিয়মের এক একটি অনুচ্ছেদ। সুজাতা যেন যুক্তিবান নিয়মকানুন।

কিছু রক্তমাংস তার দেহে আছে—একথা সে কেমন করে ভুল থাকে! হৃদয়রক্তিকে না হয় দু'টি টিপে মারা যায়, কিন্তু রক্তমাংস!...কি গভীর আত্মপ্রকাশীল সুজাতা! কি পবিত্র তার সৌন্দর্যবোধ!

সুজাতার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় থাকে সে কথা কেউ জানে না। নামদাম হয়ত তাঁদের লেখা আছে ‘অপিস বেকার্ডে’; কিন্তু সুজাতার মুখে সে কথার উল্লেখ কেউ কোনদিন শোনে নি। শনি একদিন জিগ্যাস করেছিল। সুজাতা বলেছিল—একটা স্বয়ংস্বত মাল্লুষ তোমরা কেন কল্পনা করতে পার না। দেশ-কালের সঙ্গে পাত্রেব কি সম্বন্ধ তা বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্য অনেক কিছু ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন হয়—কিন্তু যতক্ষণ সেই ভাবে আমার সঙ্গে তোমরা পরিচিত হাত না চাচ্ছ, ততক্ষণ আমি একক এবং স্বয়ংস্বত, একথা এমন নিতে তোমাদের ক্ষতি কি?

তা হলে সুজাতার কি অতীত নেই? আজকের এই বর্তমান, বিবাহের যদিন অতীত হয়ে উঠবে সেদিনও কি

তার সমস্ত অতীতটা আমাদের কাছে ধরা দেবে না? সুজাতা যদি সুজাতাই হয়ে থাকবে তবে তাকে নিয়ে আর গল্প কেন?...

সেই স্বয়ংস্বত সুজাতা একদিন হোষ্টেল ছেড়ে চলে গল। কোথায় গেল—সে কথা কারও জানবার কথা নয়। শোনা গেল অনিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সে ছুটুও চেয়েছে কলেজ থেকে। হঠাৎ কেন তার এই অস্বাভাবিক ছুটি চাওয়া—সে কথাও চিঠিতে বলেছে সুজাতা।

একট মাত্র ছেলে তার, থাকত দার্জিলিং কোনও একটা আবাসিক স্কুলে করত পড়াশোনা। অসুস্থ হয়ে সেখান থেকে চলে এসেছে দেশের বাড়ীতে। ছেলের জ্যেষ্ঠামশাই জানিয়েছে যোগটা বোধ হয় যক্ষ্মা। সেবা করবার লোক নেই। তাই মাকে ছুটে যেতে হ'ল। যক্ষ্মারোগীর পাশে আর কে বসবে—মা ছাড়া? স্ত্রীও বসতে পারে—সে-বসাত বসেছিল সুজাতা ওর স্বামীর যখন ঐ অসুস্থই হয়। কিন্তু সে-বসাবার্ষ হয়েছে—স্বামীকে ফেরাতে পারে নি সুজাতা।

ভাণ্ডারের চিঠিটা পেয়ে হয়ত সুজাতার মনে পড়ে গেল সেই অতীতটাকে। সেই মরে-যাওয়া অতীতটা যাকে সে ভুলতে চায়, যাকে সে সহ্য করতে পারে না। দুবাস্তের সমুদ্র-গজ্ঞনের মত সেই অন্ধকার অতীতের গুহা থেকে একটা মর্মান্বস্ত ক্রন্দন ভেসে এল সুজাতার কানে। নাকি সুজাতা নিজেই কেঁদে উঠল!

## তোমার কূলে নদী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

বালির চরা পেরিয়ে এসাম, খোয়াই হলাম পার,  
এবার তোমার ভালবাসার অগাধে ডুব দিই;  
ধূসর ধূলা, নিরাশ হাওয়া—নাশা ডাব,  
হেঁচকে পথ আঁধার রাতে—যুক্তিকা পাড়  
এবার শুধু হৃদয়তরা গাহনে তুলিই।

পথের ধূলা জলছে দুবে পারের পানিতে,  
“জলকে চল” শব্দে এলে গাঁয়ের মেয়ে দাঁড়াই,  
কাঁদর ছেড়ে তীব্রের কাছে ডিঙিকে বেঁধে রেখে  
জলের ছেলে তৃষ্ণা নিয়ে জলেতে হাত বাড়ায়।

ছায়ার লেখা কাঁপছে দুব তালের বনে বনে,  
বাতাসে ভেসে চলেছে বক, নদীর বুকে ছায়া,  
ওপারে মাঠ অড়র ক্ষেত, এপারে বসে গোণে—  
একটি-দুটি জলছে তারা, একটি-দুটি মনে  
গহন কালো নদীর বুকে ছড়াল কি যে মায়া।

শুকনীর বালির চরা, মগ্ন ভীক ভাব,  
বিস্তকর এসেছি আমি তোমার কূলে নদী,  
শান্তি দাও, অতল প্রেম অগাধ ভালবাসা,  
যুক্তি দাও, হৃদয়ে শেষ লুপ্তি নিরবধি ॥

## জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

১

ভাবতীয় দর্শনে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ অত্যন্ত সাধন-প্রণালীরূপে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞান ও নিকামকর্ম সম্মেলিত ভাবে মুক্তির সাধক; এবং সেই দিক থেকে, নিকামকর্মও জ্ঞানেরই তায় সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষোপায়। বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যের “ঐপাখিক-ভেদাভেদবাদে” এই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানবাদী শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তে স্বভাবতঃই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদের কোনরূপ স্থান থাকতে পারে না। সেজন্য তিনি মোক্ষের ক্ষেত্রে নিকামকর্মের প্রকৃষ্ট স্থান ও দানের কথা বারংবার উদাহরণে স্বীকার করলেও, এমন কি, নিকাম-কর্মও যে জ্ঞানের তুল্য মূল্যবান, এবং জ্ঞানের তায়ই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন—সে কথা একবারও স্বীকার করে নেন নি। সেজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্বত্রই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করবার প্রচেষ্টা করেছেন নানা ভাবে, নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে।

গীতা-ভাষ্যেই শঙ্কর বিশেষ করে সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যেহেতু সমগ্র শ্রীমদ্-ভাগবতগীতাই একটি প্রকৃষ্টতম সাধন শাস্ত্র। সেজন্য গীতা-ভাষ্যেই শঙ্কর বিশদভাবে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদের বিষয় আলোচনা করেছেন।

গীতা-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবতরণিকায় শঙ্কর বলছেন যে, কারও কারও মতে, গীতায় জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে, সকল কর্ম পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানের সাধনা করলেই মোক্ষলাভ হতে পারে না—

“কিং তহি ? অগ্নিহোত্মাদি-শ্রোত-স্মার্ত-কর্ম-সহিতাং জ্ঞানাং কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্বান্ গীতান্ নিশ্চিতোদ্বৰ্ধ ইতি।” (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—অবতরণিকা)।

তবে কিসে হতে পারে ? অগ্নিহোত্মাদি প্রমুখ শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম-সমবিত জ্ঞান থেকেই কেবল মোক্ষলাভ হতে পারে, এবং এই হ’ল সমগ্র গীতার স্থিরীকৃত মতবাদ।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে শঙ্কর কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, গীতা-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায়।

প্রথমতঃ, গীতায় “সাংখ্য-বুদ্ধি” এবং “যোগ-বুদ্ধি”—এই

দু’ প্রকারের বুদ্ধি অনুযায়ী দুটি বিভিন্ন সাধন, উপায় বা, মার্গের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে—যথাঃ, প্রারম্ভ থেকেই জ্ঞান এবং নিকামকর্মের মাধ্যমে পরে জ্ঞান। সেজন্য যখন দুটি বিভিন্ন সাধনের বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন সেই দুটির সমুচ্চয়ের কোনরূপ প্রশ্নই ওঠে নেই। পূর্বেই বা বারংবার বলা হয়েছে, সাংখ্যমার্গের ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, কর্মের কোন স্থান পূর্বে বা পরে নেই। অপর পক্ষে, যোগমার্গের ক্ষেত্রেও নিকামকর্মের স্থান কেবল প্রারম্ভেই মাত্র, পরিশেষে নয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও কর্ম মোক্ষের প্রত্যক্ষসাধন নয়, প্রত্যক্ষসাধন হ’ল পূর্ববৎ কেবল জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নয়। সেজন্য জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় থেকে নয়, নিকামকর্ম-প্রসূত-শুদ্ধ-চিত্তে শ্রবণ-মনন-নিরীক্ষা-সন প্রসূত জ্ঞান থেকেই এক্ষেত্রেও মোক্ষ লাভ হয়।

“সাংখ্য-বুদ্ধিঃ যোগ-বুদ্ধিঞ্চ আশ্রিত্য হে মিত্তে বিভক্তে তগবতৈবোক্তে জ্ঞান-কর্মণোঃ কতৃত্বাকতৃত্বৈকত্বানেকত্ব-বুদ্ধ্যাপ্রয়োগঃ একপুরুষশ্রবণমন্তব্যং পরমহংসঃ।” (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)।

“সাংখ্য” এবং “যোগ” দুটি স্বতন্ত্র প্রণালী। প্রথমটি “জ্ঞান”, দ্বিতীয়টি “কর্ম”। প্রথমটি থাকে একত্ব জ্ঞান ও একত্ব জ্ঞান; দ্বিতীয়টিতে কতৃত্ব ও অনেকত্ব জ্ঞান। সেজন্য সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও কর্ম একই পুরুষের একত্রে থাকতে পারে না। এই নিরীক্ষণ করেই ভ্রান্তগবান্ এরূপ দুটি বিভিন্ন সাধনের নির্দেশ দান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান ও কর্মের এরূপ বিভাগ কেবল গীতায় কেন, অন্ত্রও প্রপঞ্চিত হয়েছে। যেমন, স্ত্রীবিখ্যাত শতপথ-ব্রাহ্মণে এই শিষ্টায় সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। এই শাস্ত্রে এরূপে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মসংপ্রদায়ক অবশানে, গুরুগৃহে বেদা, গন ও ধর্মবিচারের শেষে, গার্হস্থ্যপ্রম্যে প্রবেশোত্তর, যাজ্ঞাক “প্রাকৃত আত্মা” বলা হয়। এই “প্রাকৃত আত্মা” দৈব-লোক পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক—এই লোকত্রয়; দৈব-লোক—এই কামাভ্যাস; মাতৃলোক এবং দৈব-লোক—এই বিদ্যায় কামনা করে সকামকর্মে প্রবৃত্ত হয়। মাতৃলোক হ’ল যাগযজ্ঞাদি কর্ম, দৈব-লোক হ’ল

উপাসনা। প্রথমটির কল হ'ল পিতৃলোক, দ্বিতীয়টির কল হ'ল দেবলোক। এই ভাবে—

“অবিভা কামবত এব সর্বাণি কর্ম্মাণি শ্রোতাধীনি হশিতানি।” (গীতা-ভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)।

অবিভা ও কামসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত কর্ম্মসাধন করে। অপর পক্ষে, যিনি এই সকল কাম্যবস্তুর লাভে অভিলাষী নন, তিনি গাংহ্যাত্মম এবং সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

“তত্ত্বেন্দ্র-বিভাগ-বচনম্ অমুপপন্নং শ্রাৎ, যদি শ্রোতকর্ম্ম-জ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োহভিপ্রোভে: শ্রাদ্ ভগবতঃ।” (গীতা-ভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)।

যদি শ্রোত-কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ই মোক্ষসাধক হ'ত, তা' হলে তাদের মধ্যে এরূপ বিভাগ নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক।

এই ভাবে, গীতা এবং অস্ত্রাঙ্গ শ্রুতি-স্মৃতিতেও জ্ঞানমার্গ এবং কর্ম্মমার্গের মধ্যে প্রভেদ প্রপঞ্চিত করা হয়েছে বলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম দুটি স্বতন্ত্র সাধন, যাদের মধ্যে সমুচ্চয় অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অর্জুনের প্রশ্ন থেকেও জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাহ্য যে গীতার নিষ্পত্তি বস্তু নয়, তা' স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করছেন—

“জ্ঞানী চেৎ কর্ম্মগন্তে মতা বুদ্ধির্জানার্দন।

তৎ কিং কর্ম্মনি বোরে মাং নিষোজয়সি কেশব॥”

(গীতা, ৩-১)

“যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেয়ঃ, হে জনার্দন। তা হলে আমাকে এই বোর কর্ম্ম কি জন্ত নিয়োজিত করছ, হে কেশব?”

এবই উত্তরে শ্রীভগবান “সাংখ্য” ও “যোগের” পুনরুল্লেখ করে বলছেন :

“লোকেহস্মিন দ্বিবিধা নির্ঠা পুণ্য প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥”

(গীতা, ৩-২)

“সংসারে যে দু' প্রকারের মার্গ আছে, তা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, হে পার্শ্ব! তা হ'ল সাংখ্যদেব জ্ঞানমার্গ এবং যোগীদের কর্ম্মমার্গ।”

যদি জ্ঞান এবং কর্ম্ম একই মার্গ হয়, তাহলে উপরের প্রশ্নোত্তর ত অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থতঃ, অর্জুন আবাবকটি মূলীভূত প্রশ্নও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবানকে করছেন—

“সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পূর্নধোগং শাসমি।

যচ্ছ্য এতয়োবেকং তন্মে ব্রহ্মি স্থনিশ্চিতম্॥”

(গীতা, ৫-১)

“হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মমুঠান দুই-ই আমাকে করতে বলছ। কিন্তু এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, তা' আমাকে নিশ্চয় করে বল।

এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন—

“সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবৃত্তৌ।

তয়োস্ত কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টতে॥”

(গীতা, ৫-২)

“সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দুইই মুক্তির সাধন। কিন্তু সাধারণ জনদের পক্ষে সন্ন্যাস অপেক্ষা নিকাম কর্ম্মমুঠান শ্রেয়ঃ।”

এ ক্ষেত্রেও জ্ঞান ও কর্ম্ম একই মার্গ হলে, এই প্রশ্নোত্তর বুধা হয়ে দাঁড়ায়। যদি গীতা সত্যই জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়কেই মোক্ষসাধনরূপে নির্দিষ্ট করতেন, তাহলে তাদের মধ্যে মাত্র একটির বিষয়ে এরূপ প্রশ্ন হতে পারে কি করে? যেমন, বৈদ্য রোগীকে পিত্তপ্রশমনের জন্ত “মধুর ও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করবে”—এই বিধান দিলে, রোগী নিশ্চয়ই “মধুর ও শীতল দ্রব্যের মধ্যে কোনটি পিত্তনাশের উপায়, তা' আমাকে নিশ্চয় করে বলুন”—এরূপ অকারণ প্রশ্ন করবেন না, যেহেতু বৈদ্য পূর্বেই মধুর দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য উভয়কেই একই সঙ্গে পিত্তনাশের উপায়রূপে নির্দেশ করে দিয়েছেন। একই ভাবে, শ্রীভগবান যদি পূর্বে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কেই সম্মেলিত ভাবে মোক্ষের উপায়রূপে নির্দেশ করে থাকেন ত, পরে অর্জুন “কোনটি শ্রেয়, তা আমাকে নিশ্চিত করে বলুন”—এরূপ অনর্থক প্রশ্ন করবেন কেন?

“নাপি স্মার্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধে: সমুচ্চয়োহভিপ্রোভে বিভাগ-বচনাদি সর্বমুপপন্নম্,” (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয়-অধ্যায়—ভূমিকা)।

স্মৃতিশাস্ত্রাদি-বিহিত কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয়, যদি শ্রীভগবানের অভিপ্রোভ হত, তাহলে “সাংখ্য” ও “যোগের” মধ্যে এরূপ বিভাগ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ত নিশ্চয়ই।

পঞ্চমতঃ, যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, তা'ও অর্জুন স্বয়ং জানতেনই। তা হলে তিনি পুনরায় “তাহলে আমাকে এই বোর কর্ম্ম কি জন্ত নিয়োজিত করছ, হে কেশব?” (গীতা, ৩-১) এরূপ নিরর্থক প্রশ্ন করবেন কেন, যদি কর্ম্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায়ই হ'ত জ্ঞানের জ্ঞায়?

ষষ্ঠতঃ, যিনি অজ্ঞান অথবা বাগনা-কামনা বশতঃ সকাম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি “যোগ”মার্গ অবলম্বন করে, যজ্ঞ, দান ও তপস্শ্রা (১৮-৩) নিকাম ভাবে অমুঠান করতে পারলে, বিশুদ্ধ-চিত্ত হন। এরূপ, চিত্ত-বিশুদ্ধির কলে, ক্রমশঃ তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম যে অকর্তা, এই পরমার্থ-তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। তার কলে, তিনি



মোক্ষলাভ কবেম বলে, তাঁর আর অন্য কিছু প্রয়োজন থাকে না, কর্মেরও প্রয়োজন থাকে না। তা' সঙ্গেও তিনি অবশ্য লৌক-লিঙ্কার অন্ত পূর্ববৎ বস্ত্রসহকারে বিহিতকর্ম সম্পাদন করে চলেন। কিন্তু এই কর্ম সত্যই প্রবৃত্তিমূলক "কর্ম" নামের বোগাই নয়, সেজন্য বলা যেতে পারে যে, জ্ঞানী, জীবমুক্ত পুরুষে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় দেখা যায়। বস্তুতঃ, জ্ঞানী, জীবমুক্ত যে সম্পূর্ণরূপেই অকর্তা, তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। শ্রীভগবানের কলিত্রাচিত যুদ্ধাদি কর্ম বৈকল্প্য অবিদ্যা, বাসনা-কামনা, ফলভোগেচ্ছা, অভিমানাদি সহকারে অস্থিতি হয় নি বলে, প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি-লক্ষণ কর্ম নয়, জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করলেও দেখা যাবে যে, স্বর্গকামী যখন সেই কামনার বশবর্তী হ'য়ে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠান করতে আরম্ভ করেন, তখন কোন বিশেষ কারণবশতঃ অধঃপথে তাঁর কামনা বিনষ্ট হয়ে গেলেও তিনি সেই কর্ম বা যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ববৎ অবশ্য করেই চলেন; কিন্তু তা' সঙ্গেও তাঁর সেই কর্ম আর "কাম্য-কর্ম" থাকে না, "নিত্য-কর্ম" হয়ে দাঁড়ায়—।

"নিত্য-কাম্য-বৈভাগস্ত স্বাভাবিকত্বাভাবাৎ।" (আনন্দ-গিরি টীকা)। "নিত্য" ও "কাম্য" কর্মের মধ্যে কোন অলজ্য সীমা নেই।

একই ভাবে, জ্ঞানোদয়ের পরে কৃত কর্ম ও সাধারণ কাম্য কর্ম নয়, অথবা "কর্ম" পদ বাচ্যই নয়।

"বিষংপ্রবৃত্তীনাং কর্মভাসদম্" (আনন্দগিরি টীকা)। জ্ঞানিগণের কর্ম দৃশ্যতঃ কর্ম হলেও, প্রকৃত কর্মই নয়। সেজন্য জীবমুক্তের ক্ষেত্রেও জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না।

সপ্তমতঃ, রাজসি জনকের দৃষ্টান্তও জ্ঞানী বা জীবমুক্তের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রমাণিত করে না। তিনি যে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হয়েও ক্রতি-স্বতি-বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার একমাত্র কারণ হ'ল, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, লৌকলিঙ্কা। অথবা, যদি বলা হয় যে, জনক সত্যই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তা হলে তিনি যে চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্যই কেবল কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে, তা বলাই বাহুল্য।

এই ভাবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায় শঙ্কর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে—

"তন্ম্যাং গীতা-শাস্ত্রে দৈবমাত্রাণ্যপি শ্রোতেন ন্যার্তেন বা কর্মণা আত্মজ্ঞানস্ত সমুচ্চয়ো ন কেনচিদদর্শয়িতুং শক্যঃ।"

"তন্মাদ্ গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক-প্রাপ্তিঃ, ন কর্ম-সমুচ্চিভাৱিতি নিশ্চিতোহর্থঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)

"এই সব কারণে, গীতা-শাস্ত্রে যে শ্রোত ও ন্যার্ত-কর্মের সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের অল্প মাত্রাও সমুচ্চয় বিহিত হয়েছে, তা' কেহই দেখাতে পারবেন না।"

"এই সব কারণে, সুনিশ্চিত অর্থ এই যে, কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় দ্বারা নয়।"

## কামনা

শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজ মহিমায় পূত ঐ হৃদিখানি

সুরভিত হোক সবাঁকার ঘরে ঘরে

শুভ সে হৃদি আবরণ সম যেন

কালিমাতে ঢাকে অমৃতের নিখারৈ।

শত আঘাতেতে তার লাণ্যাবেধা

উজল হোক লক্ষী প্রতীক সম

দুঃখের মাঝে হয়ে অভুলন তাহা

সবাঁকার মাঝে থাকে যেন অনুপম।

আর কিছু আঁজ নেই মোর প্রার্থনা

শুধু এই ভাষা যা দিল তোমাতে বলে

সংসার হোক মহানের রূপ নিয়ে

মুরলিত হোক সবাঁকার হৃদি তলে

## অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৩৫

আশ্বিন শেষ হইয়া গিয়াছে, কাতিকেব মাঝমাঝি। গাঁয়ের পাশে যে মস্ত বড় টাঁড়টায় পাথর ভাঙ্গা হইতেছিল সেটা কখন জনশ্রুত, কেবল এখানে ওখানে ভূপাকার পাথর পড়িয়া আছে। পাথর ভাঙ্গার কাজ অবশ্য চলিতেছে, কিন্তু তাহা গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অথচ গাঁয়ের সীমানায়, রোজ অত দূরে গিয়া কাজ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া এ গাঁয়ের সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

বেকারের দল এখন মাঠে-বাটে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। রোদের তাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে, পশ্চিমের বাতাসে একটা ঠাণ্ডার আমেজ আসিয়াছে, মাঠ-বাট অরণ্যের রূপ এখন অপূর্ব, কিন্তু গাঁয়ের বেকারের দল এই রূপ দেখিতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, এক ক'ক পাথর মতই দানার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কুকিয়া একদিন কাঠ কুড়ায়, একদিন অলৌ শাকপাতা খুঁটিয়া আনে, আবার একদিন ধান ক্ষেতের আল খরিয়া মাঠের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনাবশ্যক বাগড়া-আসা করে। সেইদিন দুপুরবেলা গাঁয়ের অলি-গলি ঘুরিয়া সে মাঠে আসিয়া নামে, ধান গাছগুলি বড় হইয়া এখন ছড়া ছড়া ফসলের ভায়ে সুইয়া পড়িয়াছে। আলের সরু পথে চলিতে গেলে ধানের ছড়া আসিয়া গায়ে লাগে, কাঁচা ধানের মুহু-মুটি গন্ধে মন খুশী হইয়া ওঠে। কুকিয়া চুলিতে চলিতে নিজের মনেই বলে, “এটা কৈলাস সিং-এর ক্ষেত, এটা মাণিক পাঁড়ের ক্ষেত, এটা চমন গোপের ক্ষেত, এটা হরি মহন্তের ক্ষেত।” খানিক গিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াই, তাহার সামনে একখানা ক্ষেতের ধানে যেন গাঢ় হলুদের ছোপ লাগিয়াছে। হেঁট হইয়া একটা ছড়া হইতে ছুই-চারিটা ধান হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতেই সে বুঝিতে পারে ক্ষেতের ধান পাকিয়া গিয়াছে, এখন কাটিয়া ধরে তুলিলেই হয়। এই আকস্মিক আবিষ্কারে তাহার ভাবাক্রান্ত মন খায়ে খায়ে প্রসন্ন হইয়া ওঠে, কেন না ধান কাটিবার কাজে আবার তাহার ডাক পড়িবে। এইবার সে ভাণ করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, গাঁয়ের মাঝখানের নাবাল জমিগুলির ধান পাকিতে এখনও কিছুদিন বাকি আছে, কিন্তু উঁচু জমির কাতকা ধান অনেক ক্ষেতেই পাকিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষেত-পরিভ্রমণ শেষ করিয়া কুকিয়া গাঁয়ের গলিপথ ধরিয়া চলে। হঠাৎ পিছন হইতে কে যেন ডাকিয়া বলে, “ওগো পরসাদের ম’, কোথায় চলেছ গো?”

শুনিয়া ফিরিয়া তাকায় কুকিয়া, দেখে মতিগোপের বাড়ীর স্নায়ু হইতে মন্থ্যার বউ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সেদিকে কুকিয়া আগাইয়া যায়। মতিগোপের খরিহান অর্থাৎ ধান মাড়াই করিবার জায়গা তৈরী হইতেছে ২৫:৩০ হাত লম্বা এবং প্রায় ততখানি চওড়া এক ফালি জমির ধাস চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে, এবার পুরু করিয়া কাঁকর-শুভ্র ভাল মাটি বিছাইয়া গোবর দিয়া লেপিবার আয়োজন হইতেছে, মতিগোপের বাড়ীর মেয়েবা ও মন্থ্যার বউ সেই কাজেই নিযুক্ত। কুকিয়া আসিয়া সেইখানে দাঁড়ায়।

মন্থ্যার বউ বলে, “কোথায় যাচ্ছিস গো?”

কুকিয়া বলে, “অমনি ধুরে বেড়াচ্ছি—কাজ ত কিছু নেই।”

মন্থ্যার বউ বলে, “আমিও একেজো বসেছিলাম গো, কাল থেকে এই কাজে লেগেছি।”

কুকিয়া বসে, খরিহানের দিকে তাকাইয়া বলে, “আহা, বেশ পরিপাটি খরিহানটি হয়েছে।”

মন্থ্যার বউ-এর হাতের কাছে গোবর-মাটি আগাইয়া দিয়া মতিগোপের স্ত্রী বলে, “বেনোয়ারীর মায়ের কাজ খুব শাক, তাই ত ওকে ডাকি। দেখ না আমার বৌ-এর কাণ্ড, ঐ যে ওদিকটায় একটুখানি মাটি দিয়েছে, তারই কি ছিবি!”

বিত্রস্ত হইয়া কুকিয়া বলে, তা বেশ দিয়েছে—ছেলে-মাছুষ ত।”

কাছামাথা হাত নাড়িয়া মতিগোপের স্ত্রী বলে, “ছেলে-মাছুষ কাকে বল পরসাদের মা, চেহারা দেখে ওর বয়স বলতে পারবে না তুমি। কুড়ের কুড়ে হন্দ কুড়ে গো।”

প্রতিনিয়ত শান্তড়ার নিকট হইতে এই রকম প্রশংসা পাওয়া মেয়েটির অভ্যাস, তাই সে শুনিয়াও কিছু শোনে না। কুকিয়া এই অপ্রীতিকর আলোচনাটার মোর ঘুরাইবার জন্তে বলে, “তা কবে তোমরা ধান কাটছ গো।”

মতিগোপের স্ত্রী বলে, “পবন ক্ষেতে নামব গো পরসাদের মা, দু’খানা ক্ষেতের কাতকা ধান পেকেছে, তাড়াতাড়ি

কেটে বরে ভুলতে পারলে বাঁচি। রাতে আমার ঘুম হয় না গো।”

“কেন, এত ভাবনা কিসের?” প্রশ্ন করে কুকিয়া।

মতিগোপের স্ত্রী বলে, “ভাবনা কিসের বলছ পরশাদের মা, তা ভাবনা আছে বৈকি।” গলা ঝাটো করিয়া সে বলে, “এ সব ছিল না আমাদের গাঁয়ে, কিন্তু হচ্ছে আজকাল, বুঝলে পরশাদের মা? সেদিন গোবিন্দ মহন্তের ক্ষেত থেকে মাকুয়া চুরি হয়েছে, আজ খান চুরি হবে।”

কুকিয়ার ভিতরটা কে যেন সবলে চাপিয়া ধরে, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কোন কথা বলিতে পারে না। মতির স্ত্রী বলিয়া চলে, “আর দেবি করব না, পরশু ক্ষেতে নামব, তাই ত ধরিহান নিয়ে পড়েছি। ওগো, ও বউ, হাত তুলে বসে আছিস কেন? কুড়ের কুড়ে হদ কুড়ে, এ বউ আমার হাড় জালিয়ে থাকে।”

বউ হাত তুলিয়া মোটেই বসিয়াছিল না, কাজই করিতেছিল, তবু বোঁচা খাইয়া একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসে। কুকিয়া এই কঁাকে উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে “চলি গো বেনোয়ারীর মা।”

মল্লয়ার বউ হাত থামাইয়া বলে, “এই দেখ, যে কথা বলতে থাকলাম তাই বলা হ’ল না। ইয়াগা মহতোআইন, তোমরা ত ধানকাটুনী রাখবেই, তা পরশাদের মাকে বল না, ও ঝাটিয়ে মানুষ, কঁাকি জানে না।”

মতিগোপের স্ত্রীকে মহতোআইন বলিলে, বড়ই খুশী হয়, সে মুখ তুলিয়া বলে, “তা এস গো পরশাদের মা, পরশু আমরা ক্ষেতে নামব।”

“আসব গো মহতোআইন।” বলে কুকিয়া, তার পরে গলি ধরিয়া ধরেন দিকে চলে।

৩৬

ধানকাটা শুরু হইয়া গিয়াছে, এ একটা মহোৎসব, উৎসাহ ও হৈ-চৈ এর অন্ত নাই। যাহারা বড় গৃহস্থ তাহাদের ধান ক্ষেত হইতে গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া ক্যা-কো শব্দে ধরিহানে চলিয়াছে, ছোটখাটদের অল্প ধান মাথায় মাথায় চলিয়াছে, সব হইতে ক্ষেত, ক্ষেত হইতে ঘর, গৃহস্থের আনাগোনার অন্ত নাই। বউ-বিদের মাথায় বড় বড় ধানের বোঝা, ছোট ছেলেমেয়েরাও ধানের ছোট ছোট ঝাঁটি লইয়া আলপথ ধরিয়া টলিয়া টলিয়া কোন মতে চলিতেছে।

সন্ধ্যা লাগিতেই কুকিয়া কান্ডে ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া আসে। তিলকা আজকাল ঘরের অনেক কাজই করিয়া রাখে, কুকিয়া আসিয়া উল্লন ধরাইয়া ভাত রাঁধে। মতিগোপের ধান কাটা শেষ করিয়া সে কৈলাসমহন্তের ধান কাটিতেছে, আর সপ্তাহখানেক তাহার ধান কাটা চলিবে।

এখন তাহার সংসার অনেক স্বচ্ছল, হুম-ভাত জুটিতেছে। সেদিন সন্ধ্যায় সে উল্লনে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়াছে, এমন সময় মল্লয়ার বউ আসিয়া হাঁক দেয়—“কোথায় গো পরশাদের মা।”

কুকিয়া ঘরের ভিতর হইতে জবাব দেয়—“এস গো দিদি, ভেতবে এস।”

মল্লয়ার বউ ভিতরে আসিয়া উল্লনের ধারটিতে গিয়া বসে, কোলে তাহার বেনোয়ারী। কুকিয়া মুখ তুলিয়া বলে, “ক’দিন তোমাকে দেখি নি দিদি, কার ধান কাটছে?”

মল্লয়ার বউ বলে, “গোবিন্দ মহন্তের ধান কাটছি গো, সময় পাই নে দেখা করবার। সন্ধ্যার পরে সময় করে তাই আজ এলাম, বলি অ পরশাদের মা, তোমার কাছে রাতজরা আছে?”

“কেন গো, কার জর হ’ল?” প্রশ্ন করে কুকিয়া।

মল্লয়ার বউ বলে, “আজ ক’দিন থেকে আমার বেনোয়ারীর রাগের জর হচ্ছে গে, রাতজরা পেলে কোমরে বেধে দিতাম।”

কুকিয়া দুঃখিত হইয়া বসে, “ও জিনিস নাই কো দিদি।”

মল্লয়ার বউ বলে, “তোমরা ত এতাবৎ অনেক অমুখ-পস্তর, জড়িবুটি ঝাঁটাখাটি করলে, তাই ভাবলাম হয় ত তোমার কাছে পাব।”

বেনোয়ারীর মুখের দিকে তাকাইয়া কেরোসিনের ডিবার অল্প আলোতেও কুকিয়া দেখিতে পায় ছোট মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, সে দরদেব সঙ্গে বলে, “তাই ত গে, বড্ডই কাবু হয়ে পড়েছে।”

আঁচল সরাইয়া মল্লয়ার বউ বলে, “এই দেখ না বেনোয়ারীর গায়ে হাত দিবে, জর লেগেই আছে, ছাড়ছে না।”

বেনোয়ারীর শীর্ণ উলঙ্গ গায়ে হাত দিয়া কুকিয়া চমকিয়া ওঠে, গা-টা কি ভীষণ গরম! সে বলে, “আঁচলটা ভাল করে ঢাপা দাও দিদি, দেহটা যেন বাছার পুড়ে যাচ্ছে।”

বেনোয়ারীকে আঁচল দিয়া ভাল করিয়া ঢাকিয়া মল্লয়ার বউ বলে, “পারাদিন ক্ষেতে পড়ে থাকি, ভাল করে দেখতেও পারি নি ভাই।, বলেছিলাম, ধান কাটা শুরু হলে অস্বাণ মাসে তোকে পেট ভরে ভাত খেতে দেব, তা এই জবে ধরল।”

কুকিয়া বলে, “ভাল হয়ে যাবে দিদি, একটু সাবধানে দেখ।”

“তাই বল গো পরশাদের মা, তাই বল, বাছা আমার ভাল হয়ে উঠুক। চল এখন গো—রাত হ’ল।”

মহুয়ার বউ উঠিয়া দাঁড়ায়, কুকিয়াও ওঠে, সঙ্গে বরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ইহারই দিন দুই পরে সন্ধ্যায় কাজের শেষে মহুয়ার বাড়ীর পাশ দিয়া আসিতে কুকিয়া কান্নার আওয়াজ পাইয়া ধমকিয়া দাঁড়ায়। কান পাতিয়া শুনিতেই সে বুঝিতে পারে, সর্বাঙ্গ তাহার কাঁপিয়া ওঠে—দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়, আঁহা—এখনও বে বেনোয়ারীর শীর্ণ দেহটায় উদ্ভাপ হাতে লাগিয়া আছে। কুকিয়া সেখানে আর দাঁড়াইতে পারে না, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসে। মহুয়ার বাড়ী দূরে নয়, কান্নার আওয়াজ এখানেও তাহার কানে পৌঁছায়। রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হয় না, যখনই জাগে তখনই মহুয়ার জীব বিলাপ শুনিতে পায়। পরসাহকে বৃকের মধ্যে টানিয়া নিয়া তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দেয়।

সকালবেলা ধান কাটিতে মাঠে যায় কুকিয়া। গোবিন্দ মহন্তের বড় ক্ষেতটার দিকে একবার নজর পড়িতে কুকিয়া দেখে, ধানকাটুনীদের সঙ্গে মহুয়ার জীও ধান কাটিতেছে। কাল বাহার ছেলে মরিয়াছে আজ তাহাকে ধান কাটিতে দেখিয়া কুকিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। কুকিয়া ভাবে, এও কি সম্ভব, কিন্তু সে ত ভুল দেখিতেছে না, সত্যই মহুয়ার বউ ধান কাটিতেছে। কুকিয়া ধান কাটে আর মাঝে মাঝে মহুয়ার বউকে দেখে, অজ্ঞাত সকলের মত সেও আপনার কাজ স্মৃতি ভাবে করিয়া চলিয়াছে। কাজের শেষে বাড়ী ফিরিবার সময় কুকিয়ার ইচ্ছা হয়, একবার মহুয়ার বাড়ী যায়, কাছাকাছি আসিয়া আর বাইতে পারে না। সন্ধ্যা বনাইয়া আসিয়াছে, উহাদের বাড়ীতে এখনও আলো জলে নাই, কোন সাড়াশব্দও নাই, অন্ধকারে পোড়ো বাড়ীর মত মনে হয়।

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায় কুকিয়ার। হঠাৎ স্বপ্ন কান্নার আওয়াজ পাইয়া সে চমকিয়া ওঠে। মস্ত বড় গ্রাম-ধানায় এ সময় কেহ কোথাও আগিয়া নাই, কেবল একটি অন্ধকার ঘরে মৃত ছেলেকে স্মরণ করিয়া নিজাধীন মা কাঁদিতেছে। দিনের প্রহরগুলি তাহার আপনার নহে, এক মুঠি অগ্নের জন্তে তাহা বেচিতে হইয়াছে, যাত্রির প্রহর-গুলি তাহার নিজের, সেই সময়ে সকলের অগোচরে মহুয়ার বউ বেনোয়ারীকে ডাকিতেছে, “ওরে বেটা, বেটা আমার, কোথায় গেলি রে—কোথায় গেলি তুই।”

একটা ভয় কুকিয়ার মনের মধ্যে বনাইয়া আসে। তাহার পর প্রসাদ যদি বেনোয়ারীর মত একদিন চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেও কি বেনোয়ারীর মায়ের মত দিনে কাঁদিবারও অবসর পাইবে না? যাত্রির অন্ধকারে অমনি করিয়া কাঁদবে। না, তাহার পরসাহকে সে বাইতে

দিবে না, আঁচল দিয়া ছেলেকে সে ঢাকিয়া দেয়, দুই হাত দিয়া বৃকের মধ্যে টানিয়া নিয়া সমস্ত আপন হইতে রক্ষা করিতে চায়।

৩৭

সেদিন ধান কাটার কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে কুকিয়া তাহার আঙিনায় মেয়ে-গলার হাসি শুনিয়া ধমকিয়া দাঁড়ায়, দরজার কাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, বসিন্দা দুবে শাড়ী-পর্য্য একটা যুবতী হাত নাড়িয়া কি যেন বলিতেছে এবং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছে, সামনে দাঁড়াইয়া তিলকা হাঁ করিয়া শুনিতেছে। ব্যাপার কি বুঝিতে পারে না কুকিয়া, নিঃশব্দে আঙিনায় ঢোকে। তাহাকে দেখিয়া যুবতীর হাসি-গল্প থামিয়া যায়, পিছন হইতে একজন বলিয়া ওঠে, “এই যে এসেছ ভোঁলী, তোমার জন্তে এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি।”

চেনা গলার আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া ওঠে কুকিয়া, আড়ালে ছিল বলিয়া এই লোকটিকে সে আগে দেখিতে পায় নাই, আঁচলটা সংবত করিয়া জড়পড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ তুলিয়া তাকাইতেও সাহস হয় না। লোকটা একটু স্নেহের সঙ্গে বলে, “কি গো, আমাদের চিনতে পারলে না বুঝি।”

কুকিয়ার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হয় না, বুকটা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে।

তিলকা বলে, “গুলবা গো, গুলবা, কাতবাস থেকে ফিরে এসেছে।”

যুবতীটি এইবার কুকিয়ার সামনে আগাইয়া আসে, একগাল হাসিয়া বলে, “তোমাদের গাঁ দেখতে এলাম গো, ও আমাদের বললে, চল গো, আমাদের গাঁ দেখে আসবি, তাই এলাম।”

গুলবার দিকে তাকাইয়া সে আবার হাসিয়া ওঠে। কি জবাব দিবে কুকিয়া ভাবিয়া পায় না, কোন মতে বলে, “তাই বুঝি।”

কাঁচের একগোছা বেশমী চূড়িপর্য্য হাত নাড়িয়া যুবতী বলে, “তা সত্যি কথা বলব তাই, আমি কিন্তু এ গাঁয়ে দু’দিনও টিকতে পারব না।”

কুকিয়া একথার কোন জবাব দেয় না, তিলকা বিব্রত ভাবে বলে, “কেন গো, আমাদের গাঁ এত অপছন্দ হ’ল কেন?”

হাত নাড়িয়া যুবতী বলে, “পান না হলে আমার চলে না গো, সেই সকাল থেকে মুখে একটা পান দিই নাই।”

গুলবা মুকুবিব মত বলে, “আসল কথা, গাঁয়ে ত কখনও থাকে নি, তাই একটু কেমন কেমন ঠেকছে।”

তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, “তা গতি—যাব যেমন অভ্যাস।”

হেঁট হইয়া পায়ের ভারী মল ছুঁগাছা এক পাক ঘুরাইয়া দিয়া যুবতী গুলবাকে বলে, “চল গো, হেঁটে হেঁটে আমার পা ছুঁটো টন টন করছে।”

গুলবা আগাইয়া আসিয়া বলে, “চল হাঁটা হ’ল অনেক-বানি, অভ্যাস ত নেই।”

যুবতী আবার হাসিয়া ওঠে, ডুবে শাড়ীর জাঁচলটায় অনাবশ্যক একটা টান দেয়, গলার মোটা হাঁশুলি আর টাকা-গাঁধা মালাগাছ সেই অবশরে কণিকের জন্তে দেখা যায়।

গুলবার পিছনে যুবতী বাহির হইয়া গেলে কুকিয়া বলে, “বেশ ত বিয়ে করে এনেছে গো।”

ট্যাক হইতে খৈনির কোঁটা বাহির করিতে করিতে তিলকা বলে, “বিয়ে করে আনে নি, তবে ঐ হ’ল।”

বলিতে বলিতে খামিয়া যায় তিলকা, খৈনির টিপ মুখে ফেলিয়া দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকে। কুকিয়ার মুখে ভাব কঠিন হইয়া আসে, ঠোঁট উন্টাইয়া বলে, “যেমন দেবা তেমনি দেবী, তা কোন দেশের মেয়ে গো, কেমন কথা কয় বাঁকা বাঁকা।”

তিলকা বলে, “কোন দেশের কে জানে, বাব জায়গার ছত্রিশ জাতের লোক আমদানি কাতরাসে গো। তবে হ্যাঁ—বেশ চিহ্ন বাগিয়েছে, ওস্তাদ বটে গুলবা।”

কুকিয়া জবাব দেয় না, মুখ বাঁকাইয়া ঘরে গিয়া ঢোকে।

দিন দুই কুকিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখে তিলকা হোর গোড়ায় বসিয়া খৈনি টিপিতেছে। ঘরে ঢুকিয়া দ্বিধার অজিত দেড় পাইলা চাল হাঁড়িতে ঢালিয়া রাখিতে রাখিতে বলে, “বছরের মত ধানকাটুনীর কাজ শেষ হ’ল গো।”

তিলকা উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, “তাই ত বসে বসে ভাব-ছিলাম, গত বছর শীতকালভর লোকের কাজ জুটেছিল, এ বছর সবাইকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।”

জলের কলসীটায় হাত দিয়া কুকিয়া দেখে তাহাতে জল নাই, উত্তনের ধারে গিয়া দেখে সেখানে কাঠকুটো জড়ো করা নাই। কুকিয়া কাজে বাহির হইয়া গেলে সংসারের এইসব ছোটখাট কাজ তিলকা করিয়া রাখে, কুকিয়া তাই আশ্চর্য হইয়া বলে, “হ্যাঁগা, তুই বুঝি আজ বিকেলে বাড়ী ছিলিনে।”

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, “না গো—এই ত বন থেকে ফিরলাম।”

“বন—বনে কেন গিয়েছিলি?” প্রশ্ন করে কুকিয়া।

তিলকা বলে, “কাঠ আনতে গো।”

শুনিয়া কুকিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া যায়—গত রবিবারে তাহারা ছ’জনে বনে গিয়া মাশখানেক চলিবার মত কাঠকুটো আনিয়া রাখিয়াছে, আজ আবার হঠাৎ কাঠ আনিবার কি প্রয়োজন হইল সে বুঝিতে পারে না। রাস্তার গোছগাছ করিয়া উত্তনের ধারে বসিতেই তিলকাও আসিয়া কাছে বসে। জাল ঠেলিয়া দিতে দিতে কুকিয়া অল্পস্বপ্নের কণ্ঠে বলে, “কাঠ আনতে একা একা বনে কেন গেলি আজ?” কাল থেকে আমার ছুটি, কাল গেলে আমিও সঙ্গে যেতে পারতাম।”

ট্যাক হইতে খৈনির কোঁটা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিলকা বলে, “আমি পরন্তু কাতরাস যাচ্ছি গো—তাই কাঠকুটো কিছু এনে রাখলাম।”

পরম বিষয়ে তিলকার মুখের দিকে তাকাইয়া কুকিয়া বলে, “কাতরাস যাবি—কৈ, আগে ত বলিস নি?”

তিলকা বলে, “হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম গো। বেকাব হয়ে ঘরে বসে থাকলে ত চলবে না, তাই ভাবলুম ছ’মাস খাদে কয়লা কেটে আসি, গুলবা বললে, আজকাল মজুরির হার বেড়ে গেছে।”

গুলবার নাম শুনিবামাত্র কুকিয়ার ভিতরটা তিক্ত হইয়া ওঠে, বলে, “না, তোকে যেতে হবে না, তোর শরীর এখনও সারে নি, পারবি নে ওসব তাগতের কাজ।”

“পারব গো” বলে তিলকা, “পারব বৈকি, একটু পা টেনে এখনও চলি বটে, দেহে কিন্তু বল এসেছে।”

মাথা নাড়ে কুকিয়া, বলে, “না, যেতে হবে না।”

“তিনটে পেট তাহলে কি করে চলবে?” বলে তিলকা, “না, বাধা দ্বিগনে, তুই এখানে যা পারবি করবি, আমি গিয়ে কাজে লাগব, মাসে মাসে যা পারি পাঠাব।”

কুকিয়া নিশ্চক্ষে উত্তনে জাল ঠেলিতে থাকে—অনেকক্ষণ কিছুই বলে না, অতীত জীবনের ছবিগুলি হৃৎস্পন্দনের মত একে একে মনের মধ্যে ভাসিয়া ওঠে। হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া বলে, “তবে যা।”

কুকিয়ার চোখে ঘুম নাই, তিলকার পাশটিতে শুইয়া অনেক রাত পর্যন্ত সে কত কথা ভাবে, কয়লার খাদে তাহাদের অজ্ঞায় স্বপ্ন অনেককেই কাজ করিয়াছে, টাকা হোজগার করিয়া ঘরেও ফিরিয়াছে; আবার এমন ঘটনাও তা হামেশা ঘটিয়াছে—মরদ কামাই করিতে কাতরাস গেল, ঘরে বউ-ছেলে পথ চাহিয়া রহিল, মাস গেল, বছর গেল, মরদ আর ফিরিল না। কুকিয়ার বুক কাঁপিয়া ওঠে।

তিলকাও আজ জাগিয়া আছে। কল্পনা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন ছবি একটার পর

একটা আঁকিয়া চলে, কুকিয়া শুনিয়া যায়। টাকা বোজগার করিবে, পুরনো এই বরখানা মেয়ামত করিয়া নতুন করিয়া ছাইবে—বর্ধায় জল পড়িবে না, শীতে হাওয়া ঢুকিবে না। বছরে দু'খানা শাড়ী সে কুকিয়াকে দিবে, গলায় হাঁসুলি, হাতে বাজু গড়াইয়া দিবে। নিজের জন্তেও যথেষ্ট খরচ করিবে, একটা নতুন মাদল কিনিবে, লোকে দেখিয়া বলিবে, তিলকা সৌধীন বটে। গরীবের ঐশ্বৰ্যের স্বপ্ন, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিলকার স্বপ্ন মাঝে মাঝে কুকিয়াকেও আবিষ্ট করে, পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে—এ ত সহজ কথা নয়।

৩৮

কাল তিলকা কাতরাস রঙনা হইবে, আজ তাই কুকিয়া তিলকার ছেঁড়া কাপড় কাচাকুচি করিয়া সূচসূতার সাহায্যে ষাণাশা জোড়াতালি দিয়া শুছাইয়া রাখে। দু'খানা কাপড় আর গামছার একটা পোটলা বাঁধিলেই যাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে, তাই করিবার আর কিছুই নাই, ছেলেকে কোলের কাছে নিয়া সে দোরগোড়ায় বসিয়া থাকে। হঠাৎ তাহার অভ্যন্তর একা মনে হয়, সে যেন এই পরিচিত আবেষ্টন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, এতদূরে, যেন ডাকিলেও কাহারও সাড়া পাওয়া যাইবে না। তাড়াতাড়ি ছেলেকে সে বুকের আরও কাছে টানিয়া নেয়।

তিলকা আজ ভারি ব্যস্ত, সলাপরামর্শ করিতে বার বার গুলবার বাড়ী যায়। কুকিয়া ডাকিয়া বলে, “হ্যাঁগা, এত ছুটোছুটি করছিল কেন, একটু বস না থির হয়ে।”

অপ্রস্তুত হইয়া তিলকা কুকিয়ার পাশে বসিয়া পড়ে, বলে, “বলি তোকে তাহলে আসল কথাটা, শালা গুলবা ছ' বোতল মদ এনেছে, ওরা ছ'জনে খাবে। ছুঁড়িটা কিছুতেই ছাড়বে না, ধরেছে আমাদেরও এক চুমুক খেতে হবে।”

“ও, তাই বুঝি এত ঘুরঘুর করছিল, ছুঁড়িটার অনুরোধ কেলবি কি করে।” প্লেথের সঙ্গে বলে কুকিয়া।

তিলকা বিব্রত বোধ করে বলে, “কথাটা হচ্ছে, যাব ওদের সঙ্গে, কাজকর্ম জুটিয়ে দেবে ওরাই, তাই এখন একটু খাতির করে চলেছি।”

কুকিয়া তিলকার হাতখানা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলে, “মদেব নামে তুই বড্ড বেগামাল হয়ে পড়িস, বিদেশে গিয়ে ওসব বেশী খাসনে যেন।”

“হ্যাঁগে, মদ খেয়ে পরশা ওড়াবার অবস্থা আমার নাকি।”

ভনিয়া অনেকখানি আশ্রয় হয় কুকিয়া। তিলকা

উত্তিবার জন্তে উল্লেখ করে, একটু পরে বলে, “তা হলে ঝপ করে ঘুরে আসি ওদের বাড়ী থেকে—কি বলিস্?”

কুকিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে বলে, “না, না, এখন একটু বস, এত তাড়াতাড়ি কিসের, আমার বড্ড একা বোধ হচ্ছে গো।”

“ওরা কি ভাববে বল ত, বলে এলুম একুনি আসছি,” বলে তিলকা।

কুকিয়া সে কথাই কান দেয় না, তিলকার হাতখানার উপর গাল রাখিয়া বলে, “আমি একটা টাকা দিচ্ছি, তুই সন্ধ্যাবেলা এক বোতল মদ এনে খা—আমি ওদের সঙ্গে তোকে মদ খেতে দেব না।”

তিলকা হাসে, মাথা নাড়িয়া বলে, “অত মেহনতের পরশা গো, জলে ভিজ, বোদে পুড়ে পাখর ভেঙ্গে পরশা কামাই করেছিল, সে পরশা খরচ করে মদ খেতে বলিস নে। ওদের পরশায় আমোদ করব, সুযোগ পেয়েছি ছাড়ব কেন?”

যুক্তি অকাটা, কুকিয়া ধীরে ধীরে তিলকার হাত ছাড়িয়া দেয়।

তিলকা চলিয়া গেলে কুকিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া থাকে। গুলবার সঙ্গে তিলকার এ ঘনিষ্ঠতা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। ওই দূরে শাড়ী-পর ছুঁড়িটার প্রতি প্রথম হইতেই তাহার মন বিরূপ হইয়া আছে, কেমন চং করিয়া কথা বলে, অচেনা পুরুষের সামনে হি হি করিয়া হাসে—লজ্জা হয় না, কি বেহায়া! হঠাৎ কুকিয়া উঠিয়া ধরে গিয়া ঢোকে, কুলজি হইতে ছোট ভাঙ্গা আয়নাখানা লইয়া আঁচল দিয়া ভাল করিয়া পুঁছিয়া আবার বাহিরে আসে—অনেকদিন পরে মনোযোগ দিয়া সে নিজের মুখ দেখে। একরাশ ক্রক এলোমেলো চুলের মধ্যে শীর্ণ লাবণ্য-হীন মুখখানা দেখিয়া নিজের প্রতি অশ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া যায়, আয়নাখানা একপাশে ফেলিয়া দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

নেশা করিয়া সন্ধ্যার পর তিলকা বাড়ী ফেরে, মন তাহার স্মৃতিতে মশগুল। খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া সে অবিরাম আবোল-তাবোল বকিতে থাকে,—“এ ছুনিয়াটা বড় ভাল, কুকিয়া বড় ভাল, মনুষ্য বড় ভাল, সবু বড় ভাল, গুলবা বড় ভাল, গুলবার শাজাত ছুঁড়িটা বড় ভাল।” বকিতে বকিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত কুকিয়া তিলকার পাশে বসিয়া থাকে।

ভোরবেলা উঠিয়া কুকিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ময়লা ছেঁড়া শাড়ী ও খান দুই জীর্ণ কাঁধা মাথায় করিয়া বাঁধে যায়, সেগুলি কাটিয়া-কুচিয়া নান করিয়া বাড়ী ফেরে। আজ সে ভারি ব্যস্ত, ছুটোছুটি করিয়া এবাড়ী-ওবাড়ী যায়, তার পরে



একটু বিশেষ যত্নের সঙ্গে ব্যবহার পরিচালনা করিয়া বাগ্না চাপাইয়া দেয়। কাতরাসের গাড়ী মহাটাড় ট্রেনে অনেক রাতে আসে, তিলকারা তাই বিকালের দিকে বণ্ডনা হইবে, খাইয়া-দাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার সময়ও থাকিবে।

ছপুয় নাগাত খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তিলকা খাটিয়ার উপর বসিয়া খৈনি টেপে—কুকিয়ার কাজ তখনও শেষ হয় না। ঘরের যত হাঁড়িকুড়ি এক জায়গায় আনিয়া জড়ো করে, একখানা ছেঁড়া কাপড়ে সজ্জিত ছ'চার সের ধান-চাল চালিয়া পোঁটলা বাঁধে। তার পরে ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে পুরনো একেকজো ভাঙ্গা লঠনটা আনিয়া সামনে রাখে।

তিলকা এইবার উঠিয়া আসে, বলে, “এসব কি করছিল গো?”

কুকিয়া মুখ না ভুলিয়াই বলে, “কাতরাস যাবার ব্যবস্থা করছি।”

“অত ধান-চাল পোঁটলা করে বাঁধলি কেন, ও ত আমি সঙ্গে নেব না।” বলে তিলকা।

কুকিয়া হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তিলকার সামনে আসিয়া বলে, “ধান-চাল ক'টা সঙ্গে না নিলে খাব কি, আমরাও ত তোঁর সঙ্গে কাতরাস যাচ্ছি গো।”

তিলকা অবাক হইয়া যায়, কুকিয়া যে সঙ্গে বাইবার মতলব করিয়াছে তাহা সে ত জানে না, বলে, “কাতরাস যাবি—সে কি গো?”

“আমি এখানে একা থাকব না, আমিও যাব, তাই ত সব শুছিয়ে নিচ্ছি” বলে কুকিয়া।

তিলকা সজ্জয়ে বলে, “তুই কেপে গেলি নাকি, তুই কেন যাবি আমার সঙ্গে।”

মাথা নাড়িয়া কুকিয়া বলে, “আমি যাব।”

তিলকা বুঝাইয়া বলে, “বিশেষে যাচ্ছি, বলদিকি, তোকে নিয়ে কোথায় যাব; এসব পাগলামি ছাড়। আমি গিয়ে একটা আন্তানা করি, তার পরে একবার এসে তোকে নিয়ে যাব।”

তিলকা যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে কুকিয়ার বোধ ততই বাড়িয়া যায়। শেষটা তিলকা রাগিয়া ওঠে, ধমক দিয়া বলে, “না, তুই যেতে পারবি নে, আমি তোকে সঙ্গে নেব না।”

কুকিয়া নিঃশব্দে অনেকক্ষণ তিলকার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তার পরে ঘরের কোণটিতে গিয়া বসিয়া কঠিনভাবে বলে, “বেশ, আমি যাব না, বা, তোঁর বেখানে থুশী তুই বা।”

তিলকা নিতান্ত অসহ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

ইতিমধ্যে গুলবা ও তাহার সঙ্গিনী ট্রেনে বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া তিলকার আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়। গুলবা ডাকে, “কৈগো তিলকাবা, বেরিয়ে পড়, বেলা পড়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।”

ভিতর হইতে তিলকা কোন সাড়া দেয় না। গুলবার সঙ্গিনী দরজার কাছে আসিয়া ভিতরে উঁকি মারে, কুকিয়াকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া বলে, “ও পক্সাদের মা, এইবার পরসাদের বাপকে ছেড়ে দাও।”

কুকিয়া মুখ বুঝাইয়া বসে। তিলকা বিরক্তভাবে হাসিয়া বলে, “এই আসছি গো—একটু দাঁড়াও তোমরা, কাপড় আর গামছাখানা নিয়ে আসছি।”

কাপড় ও গামছাখানা কাঁধে কেলিয়া তিলকা কুকিয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কুকিয়া পড়িয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলে, “ওগো, বাপ করিস নে, যাবার সময় ভালভাবে একটা কথা ক। আমি ছ'মাস পরেই আবার ফিরে আসব, ভাবনা কি গো।”

কুকিয়া কাঁঠ হইয়া বসিয়া থাকে, কোন কথাই বলে না।

তিলকা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে, “আর ত দেবী করতে পারছি নে, ওরা হাঁক দিচ্ছে—আমি চলি গো।”

কুকিয়ার হাতখানা মুঠোর মধ্যে একবার ধরিয়া ব্যাধিত-চিত্তে আবার বলে, “সাবধানে থাকিস।”

তার পরে পরসাদকে চুমো খাইয়া ঘরের বাহির হইয়া আসে। রাগে, হুঃখে কুকিয়ার ভিতরে একটা ঝড় বহিয়া চলে, সে কিছু শুনিতেও পায় না, দেখিতেও পায় না।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার সজ্জিত ফিরিয়া আসে কুকিয়া তখন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে ত কোন সাড়াশব্দ নাই। তবে কি তিলকারা চলিয়া গিয়াছে? তাড়াতাড়ি সে ঘরের বাহিরে আসে, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পায় না। একটা প্রচণ্ড ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া ওঠে, তিলকা যদি আর একবার আসিয়া তাহার হাত ধরিত, তাহা হইলে এই অভিমান তাহার কোথায় ভাসিয়া যাইত। ছেলেকে কোলে ভুলিয়া লইয়া সে পথে বাহির হয়, গাঁয়ের অলিগলি ধরিয়া ছুটিয়া চলে। মাঠে আসিয়াও তাহাদের দেখিতে পায় না, সে নদীর পাড়ে আসিয়া দাঁড়ায়। ওপাড়ের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ তাহার চোখে পড়ে, অনেক দূরে, পথের শেষ বাক, অরণ্যের কোল ঘেঁষিয়া তিনটি মানুষকে দেখিতে পায়।

কুকিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে, “পরসাদের বাপ, পরসাদের বাপ গো।” কিন্তু সে ডাক অতদূরে পৌঁছায় না, দেখিতে দেখিতে অরণ্যের আড়ালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া



যায়। রুক্মিণীর ছুই পা ধর ধর করিয়া কাঁপিতে থাকে, সে ছুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে  
আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, পথের পাশে বসিয়া পড়ে; ধীরে ঘনাইয়া আসে।

গম্ভীর

## রমনা

### শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ঢাকার সন্নিকট রমনা বিখ্যাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক  
শ্রীযুক্ত স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার একবার বলিয়াছিলেন যে  
তিনি “রমনা” কথাটার অর্থ বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন  
কিন্তু কোনও সত্ত্বের পান নাই।

গ্রামের নাম সম্বন্ধে আলোচনাকালে মূর্শিদাবাদ জেলায় রমনা-  
বাগসরাই, রমনা বড়খাড়ি, রমনা চাঁদপুর, রমনা দাদপুর ও রমনা  
এংবারনগর বসন্তপুর প্রভৃতি নামের গ্রামের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।  
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত জেলায় কোনও “রমনা”র সাক্ষাৎ পাই নাই।  
এই “রমনা” কথাটির অর্থ কি?

আচার্য্য শ্রী বহুনাথ সরকার মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত উইলিয়ম  
আবডাইন প্রণীত লেটার মুবলস পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠা  
পাঠে জানিতে পারি যে ইংরাজিতে বাক্যকে ‘game preserve’  
বলে, অর্থাৎ শিকার উপযোগী জন্তুজানোয়ার পূর্ণ জঙ্গলের সমার্থ-  
বাচক শব্দ হইতেছে R A M N A বা রমনা।

তাহা হইলে ঢাকার রমনার এককালে শিকার উপযোগী জন্তু  
জানোয়ার পাওয়া যাইত এবং ঢাকার সুবেদার, নবাবরা তাহা  
শিকার করিতেন। ইংরাজী ১৯০৫ সনে বর্ধন পূর্ববঙ্গ ও আসামের  
রাজধানী স্থাপিত হয়, তখনও রমনা জঙ্গলাবৃত ছিল। এখনও  
কিছু কিছু জঙ্গল আশে-পাশে আছে।

মূর্শিদাবাদ জেলায় সাতটি রমনার সমাবেশ নবাবদের শিকার-  
প্রিয়তার প্রমাণ। তাহারা এই সব স্থানে চাষ আবাদ হইতে  
দেন নাই, শিকারের জন্ত স্থান বিরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে  
হয়। অতীত জেলায় “রমনা” না থাকা এবং কেবলমাত্র মূর্শিদাবাদ  
আমাদের অনুমানের সমর্থক। ইচ্ছাদের ভৌগোলিক অবস্থান—  
মূর্শিদাবাদ সহরের সান্নিধ্য ও আমাদের অনুমানের সমর্থক।

ইং ১৭০৪ সনে মূর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে দেওয়ানের  
কার্যালয় মূর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। পরে তিনি বাংলার নবাব  
নাজিম হইয়া দোদুল প্রত্যাপে বাংলা শাসন করেন। ইং ১৭৬৫

সনে ইংরাজদের দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা  
লোপ পায়। এই সময়ের মধ্যে এই সব ‘রমনা’র সৃষ্টি হইয়াছিল  
বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে যদি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ রাজস্ব  
বিভাগীয় পুরাতন কাগজপত্রাদি ও লোকমুখে প্রচলিত কিম্বদন্তী-  
সমূহ লইয়া আলোচনা করেন ত ভাল হয় এবং এই ‘রমনা’ সৃষ্টির  
প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

মূর্শিদাবাদ জেলায় ‘রমনা’ গ্রামের নাম ও আয়তন নিয়ে  
দেওয়া হইল। যথা :—

১। রমনা দাদপুর	— ২৩০ একর
২। রমনা চাঁদপুর	২,৫৭৫ ”
৩। রমনা এংবার নগর— বসন্তপুর	১,০৫৬ ”
৪। রমনা বাগসরাই	৯২ ”
৫। রমনা গোবরা	৪০৮ ”
৬। রমনা মহাদিপুর	৩৩৭ ”
৭। রমনা বড়খাড়ি	১১১১ ”

### গোকুল নগর

পশ্চিম বাংলায় গোকুলনগর নামে ১১টি গ্রাম আছে। বাঁকুড়া  
জেলায় ২টি, মেদিনীপুর জেলায় ৫টি, ২৪ পরগণায় ১টি, নদীয়ার  
২টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১টি। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর  
মহকুমার বিষ্ণুপুর শহর হইতে ১০ মাইল পূর্বে গোকুলনগর বলিয়া  
একটি গ্রাম আছে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ চইতে  
অধঃস্থান ৪৬শ পুরুষ হইতেছেন চন্দ্রমল্ল। ইনি ইং ১৪৬০ সাল  
হইতে ইং ১৫০১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই গ্রামে ইনি  
শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ ও তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদের  
নামে সেখানকার নামকরণ গোকুলনগর করেন। অনেক বলেন  
যে, এই মন্দিরই বিষ্ণুপুরের রাজাদের প্রাচীনতম মন্দির। পূর্বে  
এই স্থানের কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না।

## শেষ মিনতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

খেলা যখন ফুরিয়ে যাবে, বেলা শেষে নামবে অন্ধকার,  
মিলিয়ে যাবে এই জীবনের অর্থবহীন সমস্ত চাঁৎকার  
মহাশূন্যের মহামোনে—দোহাই, তখন নয়কো কোনো গোল;  
ঐ বেখানে নদীর তীরে বসুন্ধরার স্নিগ্ধ সবুজ কোল,  
'জলাঙ্গী'র ঐ জলের খারা দিন-রাত্তির কুলকুলিয়ে বয়---  
হোথায় মোরে শুইয়ে দিও। মাথার দিবি, অত্র কোথাও নয়।

তোমরা জানে, টাকার জন্তে ছিল নাকো এমন কিছু লোভ;  
রাজা-উজীর হই নি বলেও মনের মধ্যে ধুব ছিল না ক্লেভ;  
মনে হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করাই ঠিক:  
নারী-মায়াবী দুর্বলতায় মাঝে মাঝে ভুলেছিলাম দিক;  
অনেক কালো কৈদেছিলাম; জীবনভরীর ভেঙেছিল হাল;  
নোকা যখন ডুবুডুবু হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে মৃত্যুজাল  
সেই দয়ালের অহুগ্রহে। অহঙ্কারের আছে কোন দাম?  
কক্ৰণাময় ওগো ঠাকুর, পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম।

এই প্রসঙ্গে ইতি এখন। যে-কথাটি বলতে চাইছে প্রাণ  
সেটি হচ্ছে: মাটির প্রতি মজ্জাগত ছিল একটা টান।  
সেই প্রেমতে খাষ ছিল না; শহরেতে সুখ পাই নি তাই;  
পাষণ মক্কর বক্ষ ছেড়ে মনে হতো পালিয়ে কোথাও যাই।

গভীর ক'রে যা চাই মোরা অপূর্ণ কি রাখেন ভগবান?  
নিজের হাতে তৈরি করা তোমরা যদি দেখতে এ বাগান!  
পূর্বের দিকে একটি কুঠির বাড়ি টালির অতীত ছিন্নছিন্ন;  
কাজল-জলের স্বচ্ছধারা বয় অদূরে—'জলাঙ্গী' ওর নাম।  
দুর্ঝাষলের গালচোটেতে আঙিনাটি শ্রামল শোভন।  
বেড়ার ধারে কমলারঙের খোকো খোকো অজস্র 'বঙন';  
হলুদহস্তের ঝিল্লের ফুলে শঙ্খাবেলা চোখ জুড়িয়ে যায়;  
ঘরের মধ্যে আগিয়ে এসে 'বুগেনভিল্লা' যেন বলতে চায়:  
'ওগো বন্ধু, আছো কেমন?' রাতে গন্ধ মধুমালতীর;

শকাল থেকেই 'টিকোমা'তে ভিড় লেগেছে নানা অতিথির  
'ডালিম' ফুলের পেছালাতে মৌ-টুস্কির চলছে মধুপান;  
'লিলি'র কোমল দলগুলিতে কোন্ শিল্পীর তুলির এমন টান!  
টকটকে লাল জবায় দিল কে যে এমন বর্ণাঢ্য প্রলেপ!  
পুষ্পবনে স্পর্শভীক 'কামিনী'দের আলতো পদক্ষেপ;  
'টগদ'গুলো ডাগর ডাগর; 'গাঁদা'য় যেন গিনি সোনার বস্ত্র!  
দধিন হাওয়ায় ফুলে ফুলে 'করবী'দের নাচের কি বা ঢঙ!  
আতার গাছে ছাতাবেরা, শালিখগুলো কি যে বলে যায়!  
জটলা করে টেয়াগুলো, দৃষ্টি ফিঙে কি ভীষণ চোঁচায়!  
নারিকেলের ঝালর কাঁপে, পাতায় পাতায় মর্শ্বর মধুর!  
মাটির গন্ধ, তারার আলো, মাঠে মাঠে সোনালী বোদ্ধর!  
আকাশের ঐ কোমল নীলে রেশমী মেঘে উত্তরীর কার?  
তুমি মধুর, অনবদ্য! হে ধরণী, তুমি চমৎকার!  
তোমায় ভালোবেসেছিলাম, চেয়েছিলাম গগনের ঐ নীল!  
চেয়েছিলাম ধানের শ্রামল; আর কিছুতে ভরতো কি এ দিল?

ঘরের গিছে শাকসবজী—কুমড়া, কলা, কবলা, শসা, লাউ,  
কালো কালো মাকুড়া-বেগুন, ভাবি মিষ্টি! যত ইচ্ছে নাও;  
কাঁকড়াগুলো গুড়ের মতোই, মাচাতে সিম, বরবটি আর পুই,  
কাগ্‌চি লেবু ক' বুড়ি চাও? পুকুরেতে পাবে কাতলা-কুই;  
হঠাৎ রাতে কুটুম এলে বাবুড়াই নে—ফেলো ক্যাপলা জাল;  
গোলায় আছেন মা-লক্ষ্মী মোর—গোয়ালেতে আছে গভীর পাল;  
ধর্জুর গাছ এক-আধটা নয়—একালটা; কিনতে হয় না গুড়।  
পুত্র-কন্যা অনেকগুলি; গুড় কিনতেই হোতাম যে ফতুর।  
হাঁস-মুরগী কুড়ি গুণা—ডজন ডজন ডিম মাসে পাই,  
আম-কাঁঠালের বাগাম আছে; আছে আতা,পেঁপে ও জলপাই;  
ভামকুল আর লিচু আছে; আছে ফলসা এবং গোলাপজাম।  
বিলিতি-ফুলও পেয়ারা চাও? চাও নারিকেল,সকেদা,বাহাম?  
তাও পাবে। 'পশ্চিমেতে অনেকগুলো আছে বাঁশের ঝাড়;  
বাঁশ না হ'লে পাড়ার্গায়ে চক্ষে তুমি দেখবে অন্ধকার।

এমনি একটি গৃহস্থালি স্বরূপ, সহজ, সুন্দর  
 স্বপ্নে আমার নিত্য ছিল। হৃদয় আমার চায় নি আড়ম্বর।  
 রক্তে আমার ঢেউ তুলিত ঐ 'জলাঙ্গী'। ওরই আকর্ষণ  
 শত কাজের মাঝেও আমার কতবার যে করেছে উন্নয়ন।  
 কত প্রভাত-দুপুর-সন্ধ্যা ওরই বৃক জল-ধোলায় সুখ।  
 ভাসবো কখন শ্রোতের মুখে তারই লাগি থেকেছি উন্মুখ।  
 সেদিন কোথায় হাবিয়ে গেছে। বাজুর চরে গড়াগড়ির ঘুম।  
 জলাঙ্গী গো, বিহার এখন। চোখের পাতায় আসছে নেমে ঘুম।  
 তোমার তীরেই ঘুমতে চাই। শিররেতে একটি হুঁই-এর ঝাড়।  
 গন্ধ-ভরা অন্ধকারে বৃষ্টি ঝরে—সবন আঘাত।  
 কুসুমচূড়ার মঞ্জরীতে বসন্তকাল মাথাবে আঁবীর।  
 পুন্নিভ সে তরুণ্যে কি আরামের নিজা সুগভীর।  
 কহমচারি না লাগলে সত্যি পানসে লাগবে শ্রাবণ মাস ;  
 ভাদরে তো আপনা থেকেই তীরে তীরে হাসবে কত কাশ ;  
 শিউলি চুটো লাগিয়ে দিলে মন্দ হয় না ; শরতকালের ভোর  
 উঠবে ভরে সৌরভেতে। শীতের দিনে কি শোভা কুন্দর।  
 কান্তনে বাতাবীজুলে গন্ধে হিয়া করিবে উন্মাদ।  
 রোপণ করো একটি চাবা—পরশ ভরে হেবো আশীর্বাদ।  
 চৈতীরাতে হেনার সুবাস ঘূমের মাঝে তুলবে খুলীর ঢেউ ;  
 কাছাকাছি হাস্নাহানা তোমরা না হয় লাগিয়ে দিলে কেউ।

কি আরামে ঘুম হেবো যে। সারাবেলা পাখীর কলবব।  
 তেলাকুচোর পক কলে বুলবুলিহের ভোজের মহোৎসব।  
 কাঠবিড়ালীর 'চিড়িক্' 'চিড়িক্', বনকপোত কাঁদছে শোকাতুর,  
 সন্মানে পাছে 'বউ-কথা-কণ্ড' ডাকছে, কানে লাগছে কি মধুর।  
 হাঁড়িচাচার 'ঠাকা ঠাকা', কুকো পাখীর 'কুক্ কুক্ কুক্' ডাক ;  
 সুগন্ধি সঙ্গীতেভরা লেবুর ডালে মোমাছিহের চাক।  
 রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, কাছাকাছি পুচ্ছটি নাচায়।  
 মাঠের মধ্যে যেতে যেতে ব্যাকশেষালী ইতি-উতি চায়।  
 জোনাক-জলা রাতের কানন লক্ষহীরের পুষ্প সমাকুল।  
 ছায়াপথের দুধ-গজায় ভাসে তারার কত সোনার ফুল।  
 কালপুরুষের খড়্গা দোলে, বহুস্পতির দুটি কি উজ্জল।  
 জ্যোৎস্নারাতের 'পিউ কাঁহা'তে কোন বিরহীর ঝরে আঁধির জল।  
 এমনি একটা আবেষ্টনী ! এরই মাঝে অনন্ত বিশ্রাম !  
 জলাঙ্গী ঐ কুলকুলিয়ে গান শুনিবে বইছে অবিরাম।  
 হয়তো কেহ বলবে, পথিক, এইখানেতে বসো একটিবার।  
 একটি মাহুঘ ঘুমায় হেথা। জানো, বহু, পরিচয়টি তার ?  
 এমন কিছু জমকালো নয়। ক্রেটি ছিল স্বভাবে প্রচুর।  
 গুণের মধ্যে একটি ছিল—প্রাণে ছিল ভালোবাসার সুর।  
 উৎপীড়িত হৃর্কলেবে কহাচিত সে করেছে বর্জন।  
 সকল পাপের কমা প্রেমে। কমা তারে তোমরা পথিকজন।

## বিদ্যাচল

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যা-রাজমহলের এই মর্ত্য বীক। চাঁদ জলধর-বধে  
 গুর্বে উদয় ছুঁতে ত্রিভঙ্গ-বক্ষি ঠামে থাসিয়া-শিলঙে  
 কতকাল প্রসারিত।

দুব সোমনাথ থেকে ঐ চন্দ্রনাথে

যে ছিল অবিচ্ছিন্ন, চড়াই-উৎরাই তার আজ অধঃপাতে  
 ইতস্ততঃ কল্প হ'ল।

এরি কোলে-পিঠে সব গোত্রেরা জাতক,

লালিত-পালিত আর অগণিত সময়ের শ্রোতের স্নাতক।

হাঁটি-হাঁটি ধির-ধির সভ্যতার শৈশবেব বিলম্বিত ভাল

হয়ত বা স্ববিষের কুজহামা, ক্ষয়িষ্ণু প্রবীণ বৈকাল।

তবু সঁওতালী বাঁশী, ওড়াওঁ কীর্তন আজও সুরে সুরে গলে,

আদিম আর্ষের সেই মারাতী প্রাকৃত আগে। এস বিদ্যাচলে।

## বেগম পরী

শ্রীমতেন সিংহ

লাল পরী—নীল পরীর গল্প নয়। কোন যোগল বাদশার হারেমেব রূপসীর-নৃপুৰ নিকণ্ড শুনতে পাওয়া যাবে না।

তার বদলে খট-খট-খ—ট, খট খট খট-খ—ট। সেলাই কলের অবিশ্রান্ত ধ্বনি মুগ্ধবিত্ত করে রেখেছে মাটি দিয়ে গোল করে বাঁধানো অশ্বখ গাছটাকে। ঐ শব্দে একটাও পাখী সারাধিন বসে না গাছের ডালে। মানুষ বসে চুল কাটতে, দাড়ি কামাতে, হাত-পায়ের নখ ফেলতে ঐ বাঁধানো বেদীর ওপর। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামের বিচিত্র মানুষ।

ওরই মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে সেলাই-এর কল। সকাল থেকে সন্ধ্যারাজি পর্যন্ত নবী সেখের পা ছুটোর বিরাম নেই। নিকেলের চশমা চোখে একাগ্রমনে সে এঁকে দিচ্ছে উইপোকাকর মত সাধা সাধা সেলাই নানান জনের নানা পরিচ্ছদে।

মাধার পাগড়ী বেঁধে, নিলামে-কেনা কালো কোট পরে বিদেশীয়া হাজাম সান-পাথরে হাতের ক্ষুর বসতে বসতে এক একবার অন্তমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকে নবী সেখের দিকে। বাট বছর বয়স হ'ল নবী সেখের, প্রায় বিদেশীয়ারই সমবয়সী, তবু কেমন দিনরাত কিটকাট ছোকরাটি সেজে আছে নবী সেখ। বিদেশীয়ার চুল কাটা নবী সেখের পছন্দ হয় না আজকাল। বিদেশীয়ার বড় ছেলে শিউলাল চুল কাটে তার। চারি পাশটা মেশিন দিয়ে হুন্স করে ছেঁটে ওপরের পাংলা সাধা বড় চুলগুলো আঁচড়ে বসিয়ে দেয়। মনে মনে হাসি পায় বিদেশীয়ার, অথচ আসল ছোকরা বয়সে বিদেশীয়াই চুল কাটত নবী সেখের। মনে পড়ে চুল কাটার বদলে পরসা দিত না, দিত এক শিশি করে আতর। নবী সেখের বাবা দিলদার সেখ বেশমী কাপড় আর আতরের ব্যবসা করত। বাবুদের চুল কেটে বিদেশীয়া সেই আতর মাথিয়ে দিত কানে, গৌঁকে একটু একটু করে; তাতে বকশিস্ দিতেন বাবুবা।

বুঝতে পারে বিদেশীয়া, কেন নবী সেখ আজকাল মাধার চুলে কলপ দেয়, কালো কলপ নয়, মেহেদি রং-এর তামাটে কলপ, আর কেনই বা পরে লাল-কালো ডোর-কাটা কুমিজ, কড়া সবুজ বড় বড় চেকের লুঙ্গি। আরও বুঝতে পারে, কেমন করে অলস নবী সেখ, সওদাগর দিলদার সেখের

অপদার্থ ছেলে নবী সেখ, যার একটা জামা সেলাই করতে দশ দিন সময় লাগত, দিনে এখন দশ-বিশটা জামা অনায়াসে সেলাই করে দিতে পারে।

ধানার কনেটবল মহাবীর সিং বুক ধুলে বসে আছে, বুকের লোম কামাবে সে। বিদেশীয়ার দেহি দেখে অস্থির হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে ক্ষুরটাকে কোর্টের আস্তিনে বসে নিয়ে বিদেশীয়া আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে—‘বেগম পরী’।

মহাবীর সিং বলে—ক্যায়া ?

—কুছ নেহি, কুছ নেহি সিপাহী জী। চব্ চব্ করে বুকের লোমে ক্ষুরের টান মারে বিদেশীয়া। কেমন যেন উল্লাস জাগে ওর মহাবীর সিং-এর মাংসল বুকের লোমগুলোর ওপর ক্ষুর চালাতে।

ওদিকে মেশিনের একটানা শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। নবী সেখ এসে দাঁড়ায় বিদেশীয়ার কাছে, দেখে ওর ক্রিপ্র ক্ষুর চালনা। মহাবীর সিং উর্জ্বাচ্ছ হয়ে অসহায় চোখে চায় নবী সেখের মুখের দিকে—কাম বন্ধ কর দিয়ে থলিকা সাহাব ?

—হাঁ ভাই, খোড়া নাস্তা করনে যাতে হেঁ।

আড়চোখে চেয়ে দেখে বিদেশীয়া হাজাম। সামনের ছুটো সোনা-বাধানো দাঁতে হাসি ঝক্‌ঝক্‌ করছে নবী সেখের। সন্ধ্যা পথটা পার হয়ে যবে যায় নবী সেখ।

বিদেশীয়া এদিক ওদিক দেখে কিস্কিস্ করে বলে—লাল পরী নেহি, নীল পরী ভি নেহি, বেগম পরী।

—ক্যায়া পাগলাকা মাফিক বকতে হো ? দেখ ছোরা লাগ গিয়া। বর্ষবিন্দুর মত এক ফোঁটা লাল রক্ত ফুটে উঠল মহাবীর সিং-এর করদা বুকে।

—কুছ নেহি, কুছ নেহি, বলে তাজা রক্তবিন্দুটাকে মুছে দেয় বিদেশীয়া হাজাম।

বিদেশীয়া হাজাম এর জন্তে দায়ী কি না জানি না—কয়েক দিনের মধ্যে নানা জনের মুখে কথাটা গুঞ্জনিত হতে থাকে—বেগম পরী ! বেগম পরী ! কেও দেখে নি, কেও শোনে নি, অথচ নামটা শুঁকুত জাগায় সকলের মনে। জিড় বাড়ে অশ্বখ গাছের তলায়। বিদেশীয়া বা ডিন বাপ-বেটা মিলে কামিয়ে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা বসে বসে কামিজ, পাঞ্জাবী তৈরি করার নবী সেখের কাছে।

নবী সেখের কানেও হয়ত গেছে সে নাম কিন্তু সে নামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কি না মুখ ঘেঁষে বোঝা যায় না।

অখণ্ড পাছ দিয়ে ত্রিভুজাকারে তিনটি ঘর। দুটো বিদেশীয়ার একটা নবী সেখের। সামান্য জায়গাকে আঁকড়ে ধরে কোনরূপে ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে ঘর। তিন পুরুষ ধরে এই ছ'ঘর পশ্চিমা নাপিত ও মুসলমানের বাস বাংলার এই পল্লীটিতে। কিন্তু নবী সেখের পুরনো বাপের আমলের সে ঘর আর এখন নেই। দিলদার সেখের কোঠাবাড়ী ভেঙ্গে খুলিয়াছে হয়ে গেছে অনেকদিন, একপাশে একটা দেওয়াল আর কুরো ছাড়া সে আমলের চিহ্ন কিছু নেই। দিলদার সেখের ছেলে নবী সেখ অনেকবার ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছিল এখানে কিন্তু প্রতিবারেই নাকি সে বিফল হয়েছে। তিনবার তাকে বিয়ে করে বো আনতে দেখেছে এখানের লোক—কিন্তু বো দেখে নি কেও, নবী সেখ দেখতে হয় নি। বোরখার মুখ ঢেকে পর পর তিনটি বো এসেছে। তিনজনে একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে উপহার দিয়ে আবার পর পর পালিয়ে গেছে। কখন? কার সঙ্গে? সে কথা কেউ জানে না। কারণ প্রতিবারেই বো-পালানোর পরদিনই নবী সেখ ছেলে বা মেয়ে কোলে গ্রাম ত্যাগ করেছে। কোথায় মানুষ হ'ল ওর ছেলেমেয়ে, এখনি বা কোথায় আছে ওরা কেউ বলতে পারে না।

তিনটে বো পালানোর অনেকদিন পর আবার নবী সেখ কিরে এল এ গ্রামে। এবার সঙ্গে বো নয়, একটা সেলাই-এর কল। এসে দেখল ঘরদোর মাটিতে মিশেছে, সেখানে, গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে বিদেশীয়া হাজাম ধানের খামার করেছে। তার কুরোতলায় বাগন মাজছে, স্নান করছে নিউলাল হাজামের বো।

স্থানীয় মুন্সির হোকানের বারান্দায় সেলাই-কল বেখে নিজের কুরোতলায় এসে বসল নবী সেখ। বোশ হয় চারপাশে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মনে হ'ল এতদিনে অবস্থাপন্ন সওদাগর দিলদার সেখের ছেলে নবী সেখ দুববস্থায় পড়েছে। তার পরণে সাধা ছেঁড়া লুঙ্গি, ছেঁড়া কামিজের হাত, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিদেশীয়া হাজামের সঙ্গে তার কি কথা হ'ল কে জানে, কয়দিন পরেই দেখা গেল মুন্সির হোকানের দাওয়ান সেলাই-এর কল চালাচ্ছে নবী সেখ—আর রাত জেগে রাস্তার দিকে সোজা দেওয়াল টেনে একখানি ছোট ঘর তুলছে নিজের ভিটায়।

অদ্ভুত স্থপতি-শিল্পের প্রয়োগ করতে লাগল নবী সেখ তার এই ছোট ঘরখানি বানাতে। এ কোথাও সে শিখে এসেছিল কিংবা নিজের উর্ধ্ব মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা তা বলা

মুশিল। চারটে দেওয়ালে হাতের এক বৃত্ত-মাপের চারটে বুলবুলি ছাড়া আর কোথাও বইল না কোন কাঁক। ঘরজাটা কাটল পথের বিপরীত দিকে ঘরের এক কোণে। তবু সেখানেও কি কম সতর্কতা—ঘরজার সামনে পড়ল তিনটে দেওয়ালের বেড়। সেই বেড় অদূরে কুরোতলাটাকে পর্যন্ত মণ্ডলী করে দিয়ে ধরল। মনে হ'ল যে থাকবে সে ঘরে সে গোলকধাঁধার মত ঐ দেওয়ালের মধ্যেই ঘুরবে কিরবে—তার বাইরে বেরুতে পারবে না। বাইরেরও কোন চোখ কোন কাঁক দিয়েই দেওয়ালের মধ্যে ঢুটি পলাতে পারবে না।

বিদেশীয়া একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল নবী সেখকে—এমন করে ঘর তৈরী মানে কি তার? নবী সেখ চমকে একবার চেয়েছিল বিদেশীয়ার মুখের দিকে, তার পর ওর উর্দ্ধ ভাষায় কি একটা বলেছিল বুঝতে পারে নি হিন্দুস্থানী নাপিত। অবশেষে এত সতর্কতার কারণ কতকটা বোধ-পন্ন হ'ল বিদেশীয়ার কাছে। সজ্জার অন্ধকারে একদিন একটা বন্ধ-কপাট-ঘোড়ারগাড়ী এসে দাঁড়াল নবী সেখের দোরে। বিদেশীয়া দেখল ঘোড়ার গাড়ীর দোর খুলে নবী সেখ ভূতের মত আপাহমস্তক সাধা কাকে যেন হাত ধরে চুকিয়ে দিল তার সেই দেওয়ালের গোলকধাঁধার মধ্যে।

সকালবেলা বিদেশীয়া জিজ্ঞাসা করল নবী সেখকে, কাল কোন্ আয়া তোমারা ঘরমে?

নিলিপ্তভাবে জবাব দিল নবী সেখ—বেগম।

—বেগম। তোমারা জরুর? কিন্ন সাধি কিয়া তুম?

তেমনি নিস্কিয়ার চিন্তে নবী সেখ বাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

তার পর একে একে বিদেশীয়ার পুত্রবধু ও গ্রামের অনেক মেয়ে নবী সেখের ঘরে গিয়ে বেগমকে দেখে এল, আর বাইরে এসে যা প্রকাশ করল তাতে বিস্মিত হ'ল সবাই। ঔৎসুক্য ত বাড়লই সকলের, তা ছাড়া বুকের রক্তে ছোলা লাগল তরুণ পুরুষদের।

এমন রূপ, এমন গোলাপের মত টকটকে গায়ের রং তার নাকি কোন দিন দেখে নি। বয়স কুড়ি-একুশের বেশী নয়, অথচ ষাট বছরের বুড়ো নবী সেখ তার স্বামী হ'ল কেমন করে—কেমন করে ঐ কুৎসিত, বুড়ো দরিদ্র লোকটাকে স্বামীতে বরণ করল এ মেয়েটা, তাই নিয়ে অনেক দিন আলোচনা হ'ল মেয়ে মহলে। ক্রমে প্রকাশ পেল, রূপ শুধু নয়, গুণও আছে মেয়েটির। ঐ গোপনে অতি সন্তর্পণে সমস্ত সংসারের কাজ করে মেয়েটি, সেবা করে নবী সেখের, তার পর বাকি সময়টা হাতের সেলাই করে। হোকানে-কেনা দামী শালের উপর যে সেলাই থাকে তার

চেয়েও স্থল ও স্থলর বেগমের হাতের সেলাই। মেয়েদের হাত দিয়েই সে সেলাইয়ের নমুনা বার হ'ল বাইরে, পছন্দ হ'ল পুরুষদের। কিছুদিনের মধ্যে অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে বিছানার বালিশ, টেবিলের ঢাকা মেয়েদের জামা ভরে উঠল বেগমের হাতের স্থল মধুর হুঁচের কাছে। কি মোহ যেন লেগে থাকল সেলাইয়ের প্রতিটি সূতায়। তরুণেরা বালিশে মাথা দিয়ে সেলাইয়ের মাঝে অনুভব করল যেন কার সুরু সুরু চিকণ কালো চুল ও দু'টি চম্পকাসুলী বসিষ্ক-পরশ।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য কথা যা প্রকাশ পেল তা এই যে, মেয়েটির ভাষা দুর্কোথা। তা না হিন্দুস্থানী, না বাংলা—উর্দু ও বল চলে না সেটাকে। তাই মাথা নেড়ে ইসারায় তার সঙ্গে কথা কইতে হয়—অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না দেওয়ালের মত ভাষার অন্তরায়, তাই জানা যায় না, কোথায় তার বাপের বাড়ী, কোন দেশের মেয়ে সে। পেটিকার মত ঘরে চাপা রইল একটা রহস্য, আর তার মধুর সুগন্ধ সেলাইয়ের রূপ নিয়ে ছড়াতে লাগল বাইরে।

যার হাতের কাজ এমন অপূর্ব্ব না-জানি তার আঙ্গুল কত সুন্দর। দেখবার সাধ জেগেছিল হয়ত অনেক পুরুষের মনেই, কিন্তু কতজন তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখেছিল আর দেখবার চেষ্টা করেছিল তার হিসেব পাওয়া যায় নি, কিন্তু যেদিন বিদেশীরা তাকে প্রথম দেখল সেদিন হতেই মাটির দেওয়ালে আবদ্ধ এই মেয়েটির আলোচনার উপর আর একটা রহস্যের আবরণ পড়ল।

সেদিন ভোরের কুয়াশা তখনও পত্রহীন গাছের গায়ে গায়ে ছেঁড়া তুলার মত লেগে আছে, আকাশে দু'একটি তারা, আধখানা মরা চাঁদ তখনও জেগে আছে। সেই তন্দ্রাতুর, আবেশ-বিহীন প্রভাতে বিদেশীরা উঠেছে নবী সেখের দেওয়ালের পাশের নিম্ন গাছটার। নিম্নের দাঁতন ভাঙতে। কিন্তু উঠেই নিম্নের ডালে হিম হয়ে গেছে ও, কি দেখে ওর সারা শরীর থ্রু থ্রু করে কাঁপছে। এক চুল নড়বার জো নেই তার। সামান্য শব্দ হলেই যেন শব্দ ভেঙ্গে যাবে, ছিঁড়ে যাবে কুয়াশা। কুয়োতলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, ঐ কি নবী সেখের বেগম? সাধা ভোরের আবরণে ঢাকা একটা সম্পূর্ণ সাধা নয় নারী মুক্তি। পৃথিবীতে আলোর লজ্জা আসার আগেই ও নিজেকে নিরাবরণ করে স্নান করছে কুয়োর জলে কিংবা প্রত্নাষের স্নিগ্ধতায় কে জানে? কিন্তু সত্যিই কি অপক্লপ রূপ। বিদেশীরা হাকাম নিম্ন গাছে সমস্ত দেহটা মিলিয়ে দিয়ে যেন যুহুর্ন্তের জন্ত কোন রূপকথায় কল্পলোকে চলে গেল—যেখানে ওর অবচেতন

মনে এই ভোরবেলার কুয়াশার মত ছোটবেলার ভাষা ভাষা, আবহা কাহিনীগুলো সঞ্চিত ছিল। ওদিকে যেমন যেমন চাঁদের মুখ থেকে আলো সরে গিয়ে তাকে ফ্যাকাশে করে দিতে লাগল এ দিকে তেমনি এক একটি সুন্দর অঙ্গ সাধা কাপড়ের অন্তরালে ঢাকা পড়ল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিদেশীরা নেমে এল গাছ থেকে, মাটির উপর প্রথম ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে উচ্চারণ করল আপন মনে—বেগম পরী।

তার পর একটু পরিচিত থাকেই দেখে তাকেই বলে, লাল পরী নয়, নীল পরী নয়—বেগম পরী। চুল কাটতে, দাড়ি কামাতে বসে সে বলে ঐ একই কথা। কৌতুহলে লোকে ওকে জিজ্ঞাসা করে, কাঁচির কুচ কুচ শব্দের সঙ্গে তাল রেখে ফিস্ ফিস্ করে খুশীমত সাজিয়ে রহস্যময় করে বলে ও তার অভিজ্ঞতার কথা। যাদেরই সে কথা বলে, তাদেরই মনে অদ্ভুত একটা মোহ ছড়িয়ে দেয়। নবী সেখের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলে সে মোহ সারা দেহে কেমন একটা বিবশতা আনে; নিজের অজান্তেই পা দুটো কিসের ভাবে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। অস্বাভাবিক গাছের তলায় যত লোক বসে চুল কাটতে, সেলাইয়ের খন্দের ততই বাড়ে নবী সেখের। অনেকে চুল না বাড়লেও আসে, অকারণে বসে থাকে অন্তর চুল কাটা উপলক্ষ্য করে। চোখ দুটো নিবন্ধ রাখে সামনের ছোট ঘুলুঘুলিতে। ভেতরের কালো অঙ্গকারের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে ব্যাধা ধরে যায়, কখনও হয়ত যুহুর্ন্তের জন্ত মনে হয় এক বলক আবহা আলো যেন পড়ল সে গবাক্ষে—কার যেন হুটি কালো উৎসুক চোখ দুটির সঙ্গে এক হয়ে মিলে যেতে চায়।

কিন্তু এই বা ক'দিন ভাল লাগে? অবশেষে দু'একজন হুঃসাহসী পথ চলতে ঘুলুঘুলির উপর বাধল সুগন্ধী সাবান, সুবাসিত তেল, সিকের ক্রমাল। হুঃ হুঃ বৃকে অপেক্ষা করতে থাকে কখন সেগুলো কেমন করে উবে যায়। তার পরই হয়ত সুরু হবে একটা চাকল্য। ঐ ছোট্ট একটা ফাঁক, তাও হয়ত নবী সেখ দেবে বন্ধ করে। তেমন অবশ্য কিছুই ঘটল না। জিনিষগুলো কার মেহেদি রাঙা আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে কখন অদৃশ্য হয়ে গেল, নবী সেখ রইল তেমনি নিষ্কিয়ার। উৎসাহিত হয়ে উঠল প্রেম-নিবেদনকারীর দল—এবার হারেমের পরীকে জানাতে হবে নিজের পরিচয়। যারা এতদিন দল বেঁধে উপহার প্রতিযোগিতা সুরু করেছিল তারা একক হবার চেষ্টা করল। নিজে উৎসাহিত হলেও অল্পকি না না তরুণ মেয়ে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টায় মন দিল।

এর পর তরুণের বেগম পরীর মনজয়ের অভিযান কোন পথে এগিয়ে চলত কে জানে, কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল সেই লোকটা। সাড়ে ছ'ফিট লম্বা বৈভ্যের মত এক পাঠান।

সন্ধার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এল লোকটা, বোধ হয় তিন মাইল দূরের রেল-স্টেশন থেকে। এলে দাঁড়াল অশ্বখ পাছটার তলায়। নবী সেখ তখন দিনের কাজ শেষ করে মেশিন তুলে দিয়েছে ঘরে। হয়ত নমাজ পড়ছিল নবী সেখ। আর একটু পরেই ওর দেওয়ালের মধ্যে শব্দ বেজে উঠবে খট, খট—খ...ট।

গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে এক মনে ছোট ছ'কোয় ডামাক টানছিল বিদেশীয়া। লোকটাকে দেখে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল বিষয়ে। ভাল কাবলিওয়ালা। কিন্তু ঠিক কাবলিওয়ালা বলেও মনে হ'ল না। এদিক ওদিক ইতস্ততঃ চেয়ে লোকটা একেবারে বাঁধানো বেদীটার ওপর উঠে বিদেশীয়ার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। লোকটার ভাবভঙ্গ দেখে বিদেশীয়ার বড় ভয় হ'ল। সাদা সালায়াবের ওপর চকলেট রং-এর আঙ্গুর-লবিত কামিজ, নীল ভেলভেটের গায়ে সোনালী রং-এর চুম্বকি বশানো গুয়েস্ট-কোট আর কোমরে একটা লাল কাপড়ের চণ্ডা কোমরবন্ধ। মাথায় তাজ জড়িয়ে সবুজ রং এর পাগড়ি। কালো সুরমা টানা তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। লাড়িটি বোধ হয় সাদা—ঠিক বোঝা যায় না, মেহেদি রং-এ ছোপা। কিন্তু এসব দিকে আর বিদেশীয়ার লক্ষ্য নেই ওর দৃষ্টি আঁকে গেছে লোকটার কোমরবন্ধে গোঁজা চকচকে সাদা ছোবরা হাতলটার ওপর।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে প্রশ্ন করে আগন্তুক—নবী সেখের বাড়ী কোন্টা?

অদ্ভুত গলার স্বর। ওর গলায় কেউ যেন গুঁজে দিয়েছে কতকগুলো শব্দ কাঠের কুচি—সেগুলোকে অনারাসে ভেঙ্গে পিষে বেরিয়ে আসছে আওয়াজটা।

বিদেশীয়া কোন উত্তর না দিয়ে সোজা নেমে যায় গাছের বাঁধানো চত্বর থেকে, দ্রুত এসে দাঁড়ায় নবী সেখের বন্ধ টিনের দরজায়। স্তিমিত বয়লাবের কঁকে যেমন একটা আলোর আভা দেখা যায় ঠিক তেমনি একটা আভা নবী সেখের ঘুলঘুলি থেকে ভেসে আসছিল। বিদেশীয়ার ইচ্ছা লোকটাকে কিছু না বলেই নবী সেখকে ডেকে ধর—কিন্তু ভারী জুতোর শব্দ পেছন কিরে দেখে লোকটা সোজা তাকে অতুলবণ করে দেওয়ালের ঘুলঘুলিটার দ্বিধা হয়ে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা কচ্ছে। সেই অবস্থায় বিদেশীয়া ওকে সঙ্কুচিতভাবে জানায়—এইটাই নবী সেখের ঘর, ওকে ডেকে

দেবে কি বিদেশীয়া? ঘুলঘুলি থেকে মুখটা সরিয়ে একটা জলন্ত দৃষ্টি হানে লোকটা বিদেশীয়ার মুখে, বীবে অশ্বচ কড়া গলায় একটা অসম্মতিসূচক শব্দ করে। তারে জড়সড় হয়ে পিছু হটে দাঁড়ায় বিদেশীয়া। তার পরই লোকটা টিনের দরজার মাঝে একটা লাথি। বন্ বন্ করে সন্ধার শব্দ নিশ্চুতাতুক শুধু ছিঁড়েই যায় না, দরজাটাও খুলে যায় ঐ একটি আঘাতে। বিদেশীয়া চলেই আসছিল কিরে কিন্তু ওর গাছতলায় পা দেবার আগেই ভয়াবহ আতঙ্কে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠ আর্তনাহ করে উঠল। যেমন তীক্ষ্ণ, মিষ্ট তেমনি আতঙ্কে বীভৎস সে স্বর। ধর ধর করে বৃকের ভেতরটা কাপতে লাগল বিদেশীয়ার—এ বুঝি তার সেই ভোবের কুয়াশায় দেখা বেগম পরীর আর্তকণ্ঠ।

অনেক রাত অবধি বিছানায় শুয়ে কান খাড়া করে রইল বিদেশীয়া, কিন্তু না, আর দ্বিতীয়বার সে স্মৃষ্টি স্বর তার কানে বাজল না—সই সজে বাজল না সে রাতে অতি পরিচিত নবী সেখের মেশিনের শব্দবল্লব—খট-খট-খ...ট। বিদেশীয়া ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ ঘুমের বাবে এক সময় ওর মনে হ'ল সেই সাড়ে ছ'ফিট লম্বা পাঠানটা ভারী জুতোর শব্দ তুলে ওর বৃকের ওপর হাঁটছে। যন্ত্রণায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। ছোট জানালায় মুখ বেঁধে চাইল বাইরে। ত নও সে শুনছে সেই ভারী জুতোর শব্দ। টাঙের আলোয় অশ্বখ গাছের পাতাগুলোও স্থির হয়ে যেন শুনতে সই শব্দ। চোখ ঘষে আবার তাকাল সে, কোথা থেকে একটা দমকা গাওয়া এসে সমস্ত জ্যোৎস্নাটাকে জ্বলিয়ে দিল—টেউ-এ মত কাপতে লাগল স্নিগ্ধ সাদা আলো—বিবু বিবু করে চমকে উঠল গাছের পাতাগুলো, কিসু কিসু করে ওয়া যেন বলে দিল বিদেশীয়াকে যেখানে বাজছিল জুতোর শব্দ। প্রেমের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সোজা মাঠ ভেঙ্গে চলে যাচ্ছে সেই পাঠানটা। জানালা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল বিদেশীয়া।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেবী হ'ল বিদেশীয়ার। তার ক্ষৌরকশ্মের সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে বেরুতেই দেখল নবী সেখ অশ্বখ গাছের তলায় মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছে। এ যেন এক অস্ত্র নবী সেখ—বৃদ্ধ, ক্লান্ত, হতাশায় ক্লান্ত। মাথায় চুল বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান, উপরের কালো কলপ দেওয়া চুল সরে গিয়ে সাদা চুলগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে, চোখের কোণে অব্যক্ত যন্ত্রণার মত কিসের একটা কালো ছায়া ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, আজ তার সামনে সেলাই-এর কল নেই, মেই পাশে কাপড়ের স্তুপ।

বিদেশীয়া সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, গলায় শব্দ করে, কিন্তু নবী সেখ মুখ তুলে না। শেষে গায়ে হাত দেয় বিদেশীয়া,



নাড়া দেয় ওকে, বলে, নবী সেখ, এ ভাইয়া ছয়া ক্যায় ?  
কাম বন্ধ করকে এয়ায়া বৈঠা কঁাহে ?

অর্জু-করণ চোখ তুলে একবার নবী সেখ চায়  
বিদেশীয়ার দিকে, কিন্তু তখনি আবার সে চোখ নামিয়ে  
নেয়। অস্থির হয়ে ওঠে বিদেশীয়া—এখনি লোকজন এসে  
পড়বে তখন আর কিছুই জানা যাবে না। অথচ কাল রাত  
থেকে যে বহুস্তটা সঞ্চারিত হয়েছে বিদেশীয়ার মনে সেটা  
নবী সেখের চেহারা ও আচরণে দৃষ্টগণ বেড়ে উঠেছে।

সোজানুজি প্রশ্ন করে বিদেশীয়া—তোমায়া মিসিন্  
কাঁহা ?

এবার গাছটার হেলান দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নবী সেখ,  
নিজের ঘরটার দিকে চেয়ে বলে, মিসিন্ লে গিয়া।

—কোন, আরও কাছে সরে আসে বিদেশীয়া।

এর পর দু'জনেই বসিষ্ঠ হয়ে উঠে। দাঁড়িয়ে থাকতে  
থাকতে আবার মুখোমুখি বসে পড়ে। বেলা বাড়ে একটু  
একটু করে, কিন্তু সেদিকে ওদের জ্ঞান নেই। যারা  
আসে চুল কাটতে দাঁড়ি কামাতে, হাতের ও পায়ের নখ  
ফেলতে তারা এবে কি গোপন কথা যেন ফিস্ ফিস্ করে  
বলছে নবী সেখ বিদেশীয়া হাজামকে। যারা আসে কাপড়  
নিয়ে সেলাই করতে তারাও থাকে এক পাশে দাঁড়িয়ে।  
ওদের ভ্রমকে দেখে সবাই যেন বুঝতে পারে কিছু একটা  
বিপদ বাটেতে ওদের এবং সেটা সামান্য নয় মোটেই। যারা  
নবী সেখের পূর্নপূর্ণ দিকে চেয়ে থাকে তারা যেন আজ  
স্পষ্ট এক জোড় বিষয় কালো চোখের উজ্জ্বলতা অমৃতব  
করে।

ঐ কালো এক জোড়া চোখের বদলে দিবারাত্রির সঙ্গী  
সেলাই কলটাকে বিছায় দিতে হয়েছে। বিদেশীয়ার কাঁচির  
সঙ্গে ভাল বেধে সেলাইয়ের কলটা আজ আর খট খট করে  
বাজে না, কাঁচিটা তাই বার বার থেমে যায় বিদেশীয়ার  
হাতে, বেশুরো গানের মত চুল কাটার খেই হারিয়ে যায়।  
লোকটা কাবুলিওয়ালা নয়, কোথায় নাকি কাবুল দেশের  
কাছেই বেলুচিস্তান নামে একটা দেশ আছে—সেই দেশের  
লোক। কাল রাত্রে বিদেশীয়ার বুকে ভারী জুতার শব্দ  
তুলে নবী সেখের সেলাই কল নিয়ে টাঁদের আলোয় মাঠের  
পথ ধরে লোকটা চলে গেছে। চুল কাটতে কাটতে এক  
জায়গায় একটু বেশী কেটে ফেলে বিদেশীয়া—মেয়েমানুষকে  
গুরু-বাহুবের মত বিক্রী করা যায়, আবার কেনা যায় টাকা  
দিয়ে এমন কথা যে সে না শুনেছে তা নয়, কিন্তু পরী ?  
পরীও কি কিনতে পাওয়া যায় ?

পাঁচশত টাকা দাম বেগমপরীর, নবী সেখ বলেছে  
বিদেশীয়ারকে। কান্দীরের মেয়ে, অমৃত সেলাই জানে,

জানে ঘর-কন্নার সব কাজ—কঠিন পরিশ্রমী। এক ভোর-  
রাত্রে এসেছিল লোকটা ঐ পরীকে সঙ্গে নিয়ে—পরীর  
আপাদমস্তক বোরখায় ঢেকে। আঁখিরি বাজারে ছোট  
একটা খুপরি ভাড়া নিয়ে সেলাই করত নবী সেখ। সেই  
খুপিরি দরজায় আঘাত করল লোকটা। দরজা খুলতেই  
ব্যস্তভাবে তাকে বলল, মিজা একশত টাকা দাও আর এই  
মেয়েটিকে রাখ তার বদলে। সুবিস্তারে মেয়েটির গুণের  
কথা বলল, বোরখার আবরণ তুলে দেখাল রূপ। দেখে  
মুগ্ধ হয়ে গেল নবী সেখ। শুনল আরও বাকি চার শত  
টাকা দিয়ে দিলেই এই রূপ আর গুণের ভাগ্যটি চিরকালের  
মত নবী সেখের হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে এসে বাকি টাকা  
দে নিয়ে যাবে। টাকা দিতে অক্ষম হলে একশত টাকা  
ফেৎনে নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে হবে। চোখ থেকে  
ভাল করে ঘুমের রেশ উবে যাবার আগেই এমন একটা  
সোজানুজি প্রশ্নাব দুটো বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার সামনে  
এসে দাঁড়াতে কে জানত। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য—কেমন  
করে জানল লোকটা যে নবী সেখের কাছে মাত্র একশত  
টাকাই আছে আর সে টাকা সে অনেক দিন থেকে মানে  
তার আগেকার বেগম পালানোর পর থেকেই জমিয়েছে নতুন  
বেগমকে ঘরে তুলবার আশায় ? হয়ত বাজারে সব ধর  
আগেই সংগ্রহ করেছে লোকটা। কিন্তু তখন করবে কি  
নবী সেখ। একশত টাকা মজুত থাকলেও মানুষ কেনা-  
বেচার ব্যাপার, অনেক বিপদ, অনেক কামেলা। বাজারের  
লোক প্রশ্ন করবে, শেষে হয়ত পুলিশে টানাটানি শুরু হবে  
দেবে।—না না ওসব হবে না, বলতে গিয়ে একবার চাইল  
মেয়েটির দিকে। পাথরের মত স্থির হয়ে চোখ নত করে  
দাঁড়িয়ে আছে। যুগখানিতে যেন যাহ্ন আছে, বড় মায়া  
হ'ল। যত টাকাই খরচ করুক এমন নতুন বেগম আর  
আনতে পারবে না নবী সেখ তার এই বুড়ে বয়সে—তাছাড়া  
ভাল সেলাই জানে মেয়েটি—কান্দীরী সেলাই। লোকজন  
জাগার আগেই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। একশত টাকা  
হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।  
বাকি টাকার জন্তে আবার কবে আসবে সে কথাও বলতে  
ভুলে গেল।

কিন্তু মাসখানেক পরেই দেখা দিল লোকটা। তেমন  
আগের মত কাতর অসহায় যুতি নয়, বেশ উন্নত ভাব।  
এসেই বাকি চারশত টাকা চেয়ে বলল নবী সেখের কাছে।  
টাকা থাকলে হয়ত নবী সেখ দিয়ে দিত, কিন্তু কোথায়  
পাবে সে টাকা ? তখন যা বোজগার—দু'জনের খেতে-  
পরতেই ফুরিয়ে যায়। লোকটা কিন্তু, নাছোড়বন্দা। বলে  
হয় টাকা ফেল, নয়ত ফেরৎ দাও সওদা। সওদা ? বিদেশীয়া

শিউরে উঠেছিল শুনে। মানুষ শেষে হ'ল সওয়া ৭ কিন্তু বেগমকে ফিরে দিতে পারে না তখন নবী সেখ। এমনকি তাঁর প্রাণ গেলেনও নয়। সেই এক মাস সে শুনেছে, অনেক ঘেনেছে। বেগমের সাদা নিটোল মার্কেল পাখের মত পিঠে দেখেছে কাল কাল চাবুকের ছাপ। যে গায়ে ঠোনা মারলে রক্ত ঝরে সেখানে নৃশংস ভাবে, চাবুক পিটেছে লোকটা—রোজ রাতে মেয়েটি নিজের দেহ ভাড়া খাটাতে অস্বাকার করেছিল বলে। ঐ ভাবে রোজগার হ'ল না বলেই ত বাধ্য হয়ে বিক্রী করে দিয়ে গেল নবী সেখের কাছে। পাঁচশত টাকা দাম চেয়েছে, অথচ কাশ্মীরে লড়াইয়ের সময় মাত্র পাঁচ টাকায় সে কিনেছিল বেগমকে লুটেরেদের কাছ থেকে।

অনেক কষ্টে, অনেক কাকুতি-মিনতি করে কোরাণ ছুঁয়ে তিন মাস পর টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নবী সেখ কিরিয়েছিল লোকটাকে। দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল—বহু চেষ্টাতেও একটি পরমা জমল না হাতে। তখন নিরুপায় হয়ে দুবের গ্রামে এক আশ্রায়ার কাছে বেগমকে বেখে, মেরিনটা মাথায় তুলে তার পুরণো ভিটের পাশিয়ে এল নবী সেখ। ভেবেছিল লোকটা আর তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। কিন্তু হঠাৎ কাল রাতে সাক্ষাৎ যম-দুত্তের মত উপস্থিত হয়ে তার পাওনা দাবী করে বসল লোকটা। টাকা নেই বলায় বাস্তব, পেঁটরা ভাজল—সেখানে কিছু না পেয়ে এক হাতে চেপে ধরল সেলাইয়ের কল, অল্প হাতে বেগমের বুকের আঁচল। জিজ্ঞাসা করল নবী সেখকে, কোন্‌ লে যায়গা বাংলাও ৭ সেলাই কলটাও প্রাণের চেয়ে কিছু কম ছিল না নবী সেখের তবু বেগমের মুখের দিকে চেয়ে সে সেইটাই দেখিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও সে রেহাই পেল না। এক মাস পর আবার আসবে লোকটা। তার হিসেবে এখনও একশত টাকা বাকি রইল, সে টাকা দিতে না পারলে অল্প কোন কিছুর বিনিময়েই আর সে বেগমকে বেখে যাবে না।

উত্তেজিত হয়ে বিদেশীয়া পরামর্শ দিল পুলিশে খবর দিতে। নবী সেখ না পারে, বিদেশীয়া নিজে গিয়ে জানাবে দারোগা-সাহেবকে। দারোগা সাহেবের সে অতি পেয়াবের নাপিত—বিদেশীয়ার কথা শুনে না করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু নবী সেখ তাতে আশঙ্ক হ'ল না। সে

জানাল পুলিশে খবর দিলে লোকটা হয়ত সাজা পাবে, কিন্তু নবী সেখ নিজেও রেহাই পাবে না। বুঝতে পেরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বিদেশীয়া। কেমন বিমূঢ় ভাবে সেও নবী সেখের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর কোন সাহায্য বা উপায়ের পরামর্শ সেই মুহূর্তে তার মাথায় এল না।

এক মাস পরেই লোকটা আবার আসবে বাকি একশত টাকার জন্য। অক্ষয় দিন শুণে নবী সেখ, তার হারমে দিন শুণে বুঝি বেগম কিংবা গণনায় ভুল করে বসে কাজের চাপে। তারই হাতের সেলাই বেচে এখন নবী সেখের সংসার চলে। কশ্মীর নবী সেখ স্তানমুখে গাছতলায় বসে থাকে। গ্রামের লোক বিশেষ কিছু জানে না, তারা বিদেশীয়ার কাছে শোনে—দেবার দায়ে নবী সেখ সেলাইয়ের কল বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে। সেই কথাই বিশ্বাস করেছে সকলে।

পাখীরা এসে আবার বাসা বেঁধেছে অশ্বখ গাছের ডালে। সকালবেলা তাদের কলরবে আবার গাছটা যুথবিত হয়ে ওঠে। সকালবেলা অশ্বখের লাল লাল পাকা ফলে বাঁধান মাটির বেদিটা ভরে যায়। ভোরবেলা বাঁট দেয় আর ভাবে বিদেশীয়া হাজাম। বাবুদের কাছে এ বছর জমিটা আর বুঝি বন্দোবস্ত নেওয়া হ'ল না। নিজের জমানো টাকার এক একটি করে শুণে একশটা বার করে নিলে আর থাকে মাত্র পনরটা। মাত্র একশত টাকার জন্য—না না নবী সেখের জন্য নয়, নবী সেখ তার কে ৭ সাদা মার্কেলের মত পিঠে কাল চাবুকের ছাপ। একটা পিঠ শুধু চাবুকের হাত থেকে রক্ষা করা। লাল পদী নয়, নীল পদী নয়—বেগম পদীর পিঠ। তার সেই ভোরের কুয়াশায় দেখা বেগম পদী। সাড়ে ছ'ফিট পাঠানটা উল্লঙ্গ করে চামড়ার চাবুক পিটাচ্ছে তার সর্ব্বাঙ্গে—আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে নবী সেখ নয়—চীৎকার করে উঠে বিদেশীয়া—সেই সুন্দর রক্তাক্ত দেহটাকে লেহন করছে পাঁচটা শকুনে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় এমনি বার বার। টাকার খলিটা সন্তর্পণে বার করে আনে আর বার বার শুণতে থাকে। চক্চকে রূপার টাকাসুলো জানালায় তাঁদের আলোতে কেমন একটা সার্থকতার মায়ী ছড়িয়ে দেয় বিদেশীয়ার মনে। কল্পনায় এক একটি করে টাকা পড়তে থাকে বেগম পদীর সাদা পিঠে আর এক একটি কাল চাবুকের দাগ মুছে দেয়।

## পাতাগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আঁটপুর গ্রামের (জেলা হুগলী) উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক (বহুমুখী) বিভাগে সম্প্রতি পর পর কয়েকটি মনোজ্ঞ অমুষ্ঠান হইয়া গেল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়; ২০শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, আই-এ-এস (জমিদারী-উচ্ছেদ বিভাগের বিশেষ কর্মচারী) ও ত্রিনিবন্ধন বর্ডন, আই-এ-এস, (পঞ্চায়েৎ বিভাগের অধিকর্তা), প্রদর্শনীতে স্ব স্ব বিভাগের কার্যাবলী সন্ক্ষে ভাষণ দেন। তাঁহারা প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং এইরূপ গ্রামা-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে বলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী বিভাগের বার্ষিক পারি-তোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন হুগলী জেলায় শাসক, শ্রী এস. এন. বিশ্বাস, আই. এ. এস. এবং পুষ্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ। এই উপলক্ষে কলিকাতা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আঁটপুরে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই প্রদর্শনী এবং বিভাগের কার্যাবলী দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী বিভাগের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। বেঙ্গুড় মঠের স্বামী যুক্তানন্দজী মহারাজ ইহার পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ কার্যসূচী অবলম্বন করা হয়। স্বামিজী তাঁহার ভাষণে ছাত্রদের সন্ক্ষে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতঃই সং। কিন্তু বর্তমানকালে তাহাদের সমুখে অমুসরণ করার যোগ্য আদর্শ না থাকিতে এবং তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবার জন্ত উপযুক্ত পরিচালকের অভাব হওয়াতে, তাহাদের মন হইতে শৃঙ্খলা-বোধ ও আদর্শবাদ দূর হইয়া বাইতেছে। তিনি স্বামী প্রেমানন্দের জীবনী হইতে দুই-একটি শিক্ষাপ্রদ আখ্যান বলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীর পুষ্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনার শ্রীহিংগর বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, পৌরোহিত্য করেন এবং ভারতীয় বাহুবীরের নৃত্য-বিভাগের অধিকর্তা, অধ্যাপক নিখিলকুমার বসু, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীহিংগর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এইরূপ গ্রামা-প্রদর্শনীর সার্থকতা সন্ক্ষে বিশেষ ভাবে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ প্রদর্শনীকে 'প্রদর্শনী' না বলিয়া 'যেলা' বলাই সমীচীন। অধ্যাপক বসু মহোদয় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সন্ক্ষে অতি সহজ ও সরল ভাষায় এক শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে আগত সকলেই আঁট-পুরের যন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, দেবালয়, স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসার্থ অবলম্বনের সঙ্কল্পগ্রহণের স্থান প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হন। আঁটপুরের

ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির তাঁহারা প্রশংসা করেন। এই করদিন-কেবল যে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী সমাজের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার স্কার হইয়াছিল তাহা নহে, বয়স্কদেরও ইহার স্পর্শ লাগিয়াছিল। যাহারা এই সকল অমুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া-ছিলেন কিংবা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেই সবেল, অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে স্থানীয় জনসাধারণ বিম্বিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। এই ত গেল এক দিক্। এখন অপরদিকের কথা সংক্ষেপে বলি।

এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বলিলেই চলে। এখানে এই বৎসর স্থানে স্থানে ধানের কসল ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণ সামগ্রিক ভাবে উপকৃত হয় নাই। বর্তমানে ধানের মূল্য যোল-সত্তের টাকা মণ। একটু ভাল চাউলের মূল্য ত্রিশ টাকা মণ। পূর্বে সীতালাল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধানের চাষ এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা এখন হুমুপা। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবগুলিতে যোগদানের জন্ত কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্ত আমাকে কলিকাতা হইতে ভাল চাউল আনিতে হইয়াছিল। ইহাও অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত কয়েক বৎসর পর পর অনাবৃষ্টির জন্ত দেশে কলাগাছেরও অভাব ঘটয়াছে। কলা ত নাই-ই, কলার পাতাও পাওয়া যায় না। কলিকাতা হইতে কলাপাতা আনিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতেছি, এই অঞ্চলে কলমূল যথা, পেঁপে, কাগজী বা পাতি লেবু, কাঁচা লঙ্কা প্রভৃতিরও অভাব। এই সকল দ্রব্যও কলিকাতা হইতে আনিতে হইয়াছে। পুকুরে বড় মাছ নাই। এই বৎসর বর্ষার কালে আধসের-তিনপোয়া দুই-কাতলা জন্মিয়াছে। পল্লীঅঞ্চলে লোকে মাছ খাইতে আসে, কিন্তু তাহাও দিতে পারি নাই। আলুর কলন সন্তোষজনক; কিন্তু স্থানে স্থানে আলু যোগে আক্রান্ত। আলু-চাষীরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। শুনিলাম এইরূপ যোগাক্রান্ত আলু দুই টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। অগ্রান্ত তরিতরকারী ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সস্তা। কিন্তু এই সস্তাদরে তরিতরকারী বিক্রয় করিয়া ২৬.২৭. টাকা মণ দরে চাউল কেনা যায় কি? বলিতে ভুলিয়াছি, নারিকেল গাছ আছে, তাহাতে ডাব নাই। কলিকাতা হইতে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন খুলিয়া ডাবও খাওয়াইতে পারি নাই—হিসাব করিয়া খাওয়াইতে হইয়াছে। তাঁহারা গাছ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দেশে দুই-একটা পাকা রাস্তা হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের অভাবেরে রাস্তাঘাটের বধেই অভাব। অনেক স্থানেই জল পূর্ণ। পানীর জলবও অভাব আছে। পোককে গুদ খুঁজিয়া প্রাণধারণ করিতে ও দুধ নিতে হইতেছে। খড়ও ৫০ ৬০ টাকা কাহন। কাঁচা পণ্যও নাই বলিলেই চলে। টাকার ঘেড় সেস দুধ, তাহাও খাটি নহে। তাহাও আবার পাওয়া যায় না। দেশে পনেরো দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দৈনিক একশোয়া হিসাবেও দুধ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চিনিও দুস্ত্রাপ্য। ভেলী-গুড় দিয়া চা খাইতে হয়, চিনির দুস্ত্রাপ্যতার জন্ত। সকল দিকেই এইরূপ অবস্থা।

পল্লী-অঞ্চলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া বাইতেছে না। এই সম্বন্ধে সকলপ্রকার অনুন্নয়-বিনয়, প্রস্তাবের প্রতি কর্তৃপক্ষ মোটেই কান দিতেছেন না। অথচ তাঁহারা আইনের কড়াকড়ি জোরে চালাইতেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি যে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বয়স ৪৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া কয়েক মাস বেশী হইয়াছে। তাহাকে বি. টি. ট্রেনিং-এ যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অথচ সেই শিক্ষকের বি. টি. পড়িবার অগ্রহে খুবই বেশী, এবং বিদ্যালয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ট্রেনিং পাওয়া খুবই দরকার। আইনের কড়াকড়ির এইরূপ আরও উদাহরণ দিতে পারি।

পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ খুবই বাড়িয়াছে। কিন্তু মুঁন্সিপ হইতেছে, শিক্ষার বর্তমান বাস্তব কর্তন এই দুদিনে বহন করিতে পারে? স্থানীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে, বিদ্যালয়ের বেতন মকুব করিবার জন্ত কত ফরবিদায়ক কাকুতি-মিনতি শুনিতে হয়। কিন্তু এই

সমস্যা কোনও সমাধানই করিতে পারি না। নিয়ে একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিলাম :

মাননীয় আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

সম্পাদক মহাশয় সমীপে

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার ভ্রাতা জীমন্ অজিত-কুমার হালদার আপনায় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পড়িতেছে। আমি আজ ৩৪ বৎসর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী, উপার্জন করিবার আমার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। জমি-জমা অতি সামান্য, উহাতে পরিবারের দিনপাত হয় না। পোষা অনেকগুলি, আবার উহার উপর গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণে ঐ সামান্য জমি আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমার সরকার বাহাদুর ও স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ কিছু কিছু সাহায্য করেন। আমি অত্যন্ত গরীব, বেতন দিয়া পড়াইবার আমার আর শক্তি নাই। গত বৎসর ভ্রাতা টেট রিলিফে কিছু কাজ করিয়া টাকা যোগাড় করিয়া কিছু বেতন দিয়াছিল সেই কারণে আমার প্রার্থনা এই যে, বাহাতে গরীব ব্রাহ্মণের ভ্রাতাটি বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পায় তাহার প্রার্থনা জানাই। আপনি যদি আমার ভ্রাতার প্রতি বখেই দয়া প্রদর্শন না করেন তাহা হইলে চিরকাল মুখ করিয়া রাখিতে হয়।

ইতি—

বিনীত

পঞ্চানন হালদার

সাং বেলা

১৭২৬০

ভ্রাতালোক বক্ষাযোগে আক্রান্ত। এইরূপ ধরনের বহু চিঠি পাইয়া থাকি।



# অনুত্তর উত্তরচরিত

অধ্যাপক শ্রীভূগামোহন ভট্টাচার্য

ভবভূতির রচিত তিন খানা নাটকের মধ্যে 'উত্তরচরিত' শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয় :

উত্তরে রামচরিতে ভবভূতি বর্ণিত।

বনবাস প্রত্যগত রামের উত্তরকালীন জীবন-বৃত্তান্ত উত্তর-চরিতের বিষয়বস্তু। ভবভূতি তাঁর প্রথম রচনা 'মহাবীর চরিতে' রামের পূর্বজীবন চিত্রিত করেছেন। তদন্ত এই প্রথম রচনা শিষ্টসমাজে তখন আদর পায় নি তাই ক্ষুদ্র কবি তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'মালতীমাধবে'র গোড়ায় অভিমানভরে বলেছেন :

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথমম্ভাবজ্ঞাং

জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈব যত্নঃ।

উৎপত্তিতে মম তু কোহপি সমানমখ্যা

কালো হুয়ং নিবব'বিপুলা চ পৃথী।

'যাঁরা আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছেন, তাঁরা অনেক-কিছু জানেন, আমার এ প্রহাস তাঁদের জ্ঞানে নয়। আমার সমস্তরস লোক অংশ একদিন জন্মাবে, কারণ কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিশাল।'

উত্তরচরিত রচনাকালেও ভবভূতি প্রথম অবমাননার কথা ভুলতে পাবেন নি। তিনি বলেছেন—বান্ধবের সেরকেরা তাঁদের কর্তব্য করে বাবেন কিন্তু দুর্জনের নিন্দা থেকে পরিত্রাণের আশা করবেন না—সর্বধ' ব্যবহৃতবং কুতো হবচনীয়াত।

উত্তরচরিত গুণিগণের সমাদর লাভ করেছে, কবির অসামান্য নিখুঁত প্রতিভা নিম্নোক্ত রসনা স্তম্ভ করে দিয়েছে। পরিণতপ্রজ্ঞ ভবভূতি তাঁর সমস্ত কবিকৌশল প্রয়োগ করে এ নাটক সৃষ্টি করেছিলেন। ভাবের ঔদার্য, ভাষার আভিভাষ্যতা, ছন্দে বৈচিত্র্য উত্তরচরিত অতুলনীয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে করুণরসের এমন আলেখ্যচিত্রণ আর কোথাও দেখা যায় না। এর রসবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে পাষাণও অক্ষুণ্ণ বর্ণ করে, বজ্রহৃদয়ও বিগলিত হয় :

অপি ধ্রোবা যোদিতাপি দলতি বজ্রশ্চ হৃদয়ম।

বেশির ভাগ সংস্কৃত নাটকেই আখ্যানবস্তুর মুখ্য অবলম্বন হয় শৃঙ্গাররস কিংবা বীররস প্রণয়স্থান কিংবা যুদ্ধঘটনা।

এক এক ভবেদজী শৃঙ্গারোবীর এবং বা।

কিন্তু উত্তরচরিতের কবি করুণরস দিয়েই নাট্যসৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ রসের বর্ণনার তিনি অদ্বিতীয়—'কাকুণাং ভবভূতিরৈব তমুত্তে'। শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, বাৎসল্য, যৌক্তিক ও অকৃত রস কাকুণোর গুণীগাথনে ভবভূতির সহায়ক হয়েছে

মাত্র। তিনি প্রচলিত নাট্যনিয়মের বিরুদ্ধে দৃষ্ট জানিয়েই বেন ঘোষণা করেছেন—করুণরস ছাড়া রস নেই।

একে রসঃ করুণ এব নিমিস্তভেদাদ

ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাপ্রয়তে বিবর্তান।

আবর্তবদ দত্তবজ্রময়ান্ বিকারা

পাশ্চো যথা সলিলমেব হিতঃসমস্তম্।

এক করুণ রসই বিভিন্ন অবসরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন আবর্ত, বৃদ্ধন, তৎসঙ্গ সমস্তই এক জলের বিকার মাত্র, তেমন অন্যর সন্ততি এক করুণরসেই প্রকার ভেদ।

উত্তরচরিতে করুণরসের অন্তরালে কোথাও কোথাও প্রেমরসের প্রগল্ভ আবেগ দেখা যায়। ভবভূতি স্থানে স্থানে রামসীতার প্রণয়সঙ্গের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন, এমন দিয়েছেন বা আর কেউ দিতে পাবেন নি। কিন্তু তাতে তবলতার গন্ধ নেই, অসংবোধের অবকাশ নেই।

অযোধ্যার চিত্রশালার বনবাসজীবনের আলেখ্য দেখতে দেখতে রাম একদিন তাঁর নবীন দাম্পত্যের রসভরা বাক্সগুলির কথা স্মরণ করে সীতাকে বললেন :

কিমপি কিমপি মন্যং মন্যমাসত্তিযোগা

দবিরলিতকপোলং জল্লতোরফ্রমেণ।

অশিখিলপাশ্রয়স্ত ব্যাপুতৈকৈকদোক্ষো-

রবিদিতগতযামা বাঞ্ছিতং ব-বসীং।

নিবিড় আলিঙ্গনে আমাদের দুই বাহু আবদ্ধ থাকত, আমরা কপোলে কপোল মিশিয়ে অক্ষুণ্ণ গুল্লনে, অর্থহীন জল্লনার কাল কাটিয়ে দিতাম। এমনি প্রহরের পর প্রহর অতীত হয়ে যেত, আমাদের অজ্ঞাতসাহেই বাঞ্ছিত সমাপ্ত ঘটত।

চিত্রদর্শনের পর গভীরপরিভ্রাঙ্কিত সীতা রামের অঙ্গে অঙ্গ এলিয়ে দিলেন, আর প্রিয়তমার অঙ্গস্পর্শে প্রেমাকুল রামচন্দ্র এক অপূর্ণ ভাবাবেশে বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন :

প্রিয়ে কিমেতৎ

বিনিশ্চেতুং লক্যো ন শ্রুতমিতি বা হৃৎমিতি বা

প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিবিসর্গঃ কিমুদমঃ।

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমুচ্যস্রগণো

বিকারশ্চেতত্ত্বং ভ্রময়তি চ সমুদ্রীলয়তি চ।

প্রিয়ে এ'কি'ল? এ আমার স্মৃতি না হৃৎমতি নিশ্চিত বুঝতে পারছি না। এ কি আগরণ না স্বপ্ন, বিবেচ অজ্ঞতা না মনের

বিহ্বলতা। তোমার স্পর্শে স্পর্শে কেমন একটা আবেগ আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করে দিয়ে কখনও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, কখনও আবার উদ্ভূত করে তুলছে।

উত্তরচরিতের শৃঙ্গাররস সর্বত্রই লোকোত্তর প্রেমের পুতধারায় বয়ে চলেছে। তাতে কোন স্থানেই কাব্য বিক্ষোভের লেশমাত্র প্রকাশ পায় নি। ভবভূতি বলেছেন—পুণ্যশীল ব্যক্তি পবন ত্যাগের কলে নিবাবিল দাম্পত্য প্রেমের অধিকার লাভ করেন। সে প্রেম সুখে দুঃখে অচঞ্চল থাকে, অতাবে বৈভবে সর্বদাই অবস্থার অনুবর্তন করে, হৃদয়কে বিশ্রান্তিসুখ দান করে। বার্তিকা এম রসবেগ গ্রহণ করতে পারে না। বতই দিন যায়, ততই এ প্রেম নিখাদ স্নেহস্নায়ু পরিণত হয়।

অর্ঘ্যতঃ সুখদুঃখয়োবহুগুণ সর্বাশ্রয়স্থান  
বিশ্রামো হৃদয়স্ত যত্র জবসা যন্ত্রিন্নসার্বো রসঃ।  
কালেনাবরণাভ্যাস্তাৎ পরিণতে যৎ স্নেহস্নায়ু হিতং  
ভবঃ প্রেম সুমহত্তম কথমপোকাং তৎ প্রাপ্যতে।

এই ছিল ভবভূতির প্রেমের আদর্শ। রাসসীতার এমন প্রেমও বিচ্ছেদ ঘটল।

নিষ্ঠুর জনহতের বিচারে রাজপ্রাসাদে সীতার ঠাই হ'ল না। দ্বায় রাজকর্তব্য পালন করলেন, মর্ষগ্রস্থি ছিন্ন করে পত্নীকে নির্কাসন দিলেন। করুণরসের কুশল কবির শোকান্ত লেখনী সদা-হারান মিলনোৎসবের দুঃখশ্রুতির মধ্য দিয়ে রামের বিচ্ছেদ-বেদনাকে তীব্রতর করে তুলল। শৃঙ্গাররস করুণরসের গাঢ়তা সম্পাদনে সহায় হ'ল। বিরোধ-বিধুর রামচন্দ্রে আর্ন্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন।

হা হা দেবি স্মৃতি হৃদয়ঃ স্রংসতে দেহবকঃ  
শূন্যঃ মত্তে অগদবিরত জালমস্তজ্জালামি।  
সীলম্বন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতী বাস্তবাস্তা  
বিষম্ব মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ কয়োরি।

হায় দেবি। আমার হৃদয় বিনীর্ণ হচ্ছে, দেহবন্ধন শিথিল হয়ে আসছে, জগৎ শূন্য বোধ হচ্ছে, সজ্ঞাপ-জালার অবিবাহ দগ্ধ হচ্ছে। আমার অসহায় অন্তরাত্মা গহন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। চতুর্দিকে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মন্দভাগ্য আমি, এখন কি করি।

দুঃসহ বিরোধ-বাধার অভিভূত রাম আরও বললেন—  
দলতি হৃদয়ঃ পাতোবেগং বিধা তু ন ভিত্ততে  
বহতি বিকলঃ কারো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।  
অলয়তি তদুম্বর্ত্তাহঃ কয়োরি ন ভয়স্যাৎ  
প্রহরতি বিবিশ্বম্ভ্রষ্টো ন কুন্ততি জীবিতম্।

গুরুতর সজ্ঞাপে আমার হৃদয় দলিত হচ্ছে, অথচ বিধ্বস্ত হচ্ছে না; বিকল দেহবন্ধ মুছার অবশ হয়ে গেছে, কিন্তু বোধশক্তি হারায় নি; অস্তবাহে তদু দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভয়স্যাৎ হয় নি।

মর্ষগ্রষ্টী বিধাতা প্রহারে বিদ্ধ কচ্ছেন, কিন্তু জীবনমুত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করেন নি।

করুণ বর্ণনার কবির বাক্শৈলী সর্বত্র এমনই মর্ষ স্পর্শ করে। ভবভূতি ছিলেন বিনোদেব অধিবাসী, প্রায় পত্নীর বৈদর্ভী রচনা-রীতির প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু 'বস্ত্রবাক্' কবি বখন যে সৈসের অবতারণা করেছেন, তখন সে রসের উপযুক্ত ভাবের আশ্রয় নিরেছেন; মধুর, করুণ বা ভীষণ সমস্ত ভাবই ভাবামুগুণ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ভাবের এমন রসায়ন প্রয়োগ বেশি দেখা যায় না।

বালক লব বীরদর্পে রামের অশ্রমেধের অশ্র আটক করেছিলেন। সে অশ্র মোচনের জন্তে লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতু সসৈন্তে বাস্ত্রীকির তপোবনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় আপনজনের প্রথম দর্শনেই প্রাণে প্রাণে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর দৃষ্টি চায় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে, তার বাহু চায় প্রতিপক্ষকে পৃথাক করতে। ভবভূতি একই কবিতার মধ্যে কোমল ও কঠিন শব্দ গেঁথে দিয়ে দুটি বিরুদ্ধ ভাব এক সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

যথেন্দ্রবানলং ত্রজতি সমুপোড়ে কুমুদিনী  
তথৈবাস্মিন দৃষ্টিশ্রম কলহকামঃ পুনরয়ম।  
কণংকার্য ত্রুৎকণিষ্ঠ গুণগুঞ্জলগ কধু-  
ধৃতপ্রোমা বাহ্যিকচ বিকবালোদগরসঃ।

চন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনী যেমন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, এর দর্শনে আমার চোখও তেমনি তৃপ্তি বোধ করছে। কিন্তু যুদ্ধের উদ্যাপনায় বিদ্রুত বাহুবীর জ্যাক্সকারে শকারমান বিশাল ধনুটিব দিকে প্রসারিত হচ্ছে। ভাব ও ভাবের এমন সমঞ্জস প্রয়োগ অগ্ৰত দুর্লভ।

ভবভূতির রচনার গতি কখনও কান্তকোমল কখনও বা বীরোদ্ভূত কিন্তু বীররসের বর্ণনায় তাঁর ভাবা মণকন্ডের মতই উগ্র, বীরকন্ডের মতই ভয়ঙ্কর। কবি লবেয় সৈঙ্গনিধন দুস্তোর এক বর্ণনা দিচ্ছেন :

বে ভীষণ নির্ধোবে গিরিকুঞ্জের কুঞ্জরেবা কর্ণপীড়ার অস্থির হয়ে বৃংগন স্রুত করেছে, সেই জ্যানির্ধোব হুমুতিনিিনাদে আরও ক্ষীত হয়ে কেঁটে পড়ছে। মহাবীর লব সৈঙ্গদেব ছিন্নমুণ্ডে আর মুণ্ডহীন কবকে রণক্ষেত্র ছেয়ে ফেলছেন। মনে হচ্ছে বেন ভোজন-তৃপ্ত কৃতান্তের করাল বক্র থেকে অভ্রুস্ত খাঞ্জরাশি ভূতলে পড়িয়ে পড়ছে।

আগুজ্জগিরিকুঞ্জকুঞ্জরখটাবিশ্ভীর্ণকর্ণজয়ং  
জ্যানির্ধোবমম্ব হুমুভিহবৈবাগ্নাতমুজ্জ ভরনু।  
বেজ্জন্তেরবক্রগুণ্ডানিকরৈবৌবো বিধন্তে ভুব-  
স্থপাং কালকবালবক্র বিধসম্ব্যাকীর্ষমানা ইব।

যে ব্যক্তি 'কিরপি কিরপি মন্দম্'-এর মত যুগ্মযুগ্ম কবিতা লিখেছেন, তিনিই যে আমার 'বেজ্জন্তেরবক্রগুণ্ড' রচনা করেছেন এ বেন অসম্ভাব্য বলে মনে হয়। ভবভূতির হাতে তা সম্ভব হয়েছে। এখানেই তাঁর বৈদর্ভ্য।

ভবভূতির আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রকৃতিদেবীর কমনীর মাদুরীটুকু আশ্বাদন করেই ক্ষান্ত হন নি, তার ভরসার আকৃতির মহিমাও প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন এবং তাতেই যেন বেশি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় গোদাবরীমলিল কল কল ধ্বনিতে বয়ে যায় না, গদগদ নাদে গিরিগহ্বর মুখরিত করে। উত্তরচরিতে হরিণ-হংস-ময়ূরেষু সলিলে পিচক-ভল্লক-অজগরেরও স্থান আছে। ভবভূতির দণ্ডকাব্যণা একদিকে শ্রামলতার স্নিগ্ধ, অপর দিকে জীবনতার রুদ্ধ ( স্নিগ্ধ শ্রামা: কচিনপরতো জীবণাভোগ-

কক্ষা: ), ভূমিভাগ কোথাও নিঃশব্দ নিশ্চল, কোথাও বহুপঙ্কজ প্রোচুণ্ড যবে প্রধ্বনিত ( নিহুত্ৰুস্তিমিতা: কচিং কচিনপি প্রোচুণ্ড-সম্বননা: ) ।

উত্তরচরিতে স্থানে স্থানে বাগবাহুল্য দেখা যায়; স্থলবিশেষে কালিদাসের রচনার ছায়া পড়েছে সে কথাও সত্য; বস্তুবিজ্ঞান-কৌশলেও কালিদাসের অধিকতর উৎকর্ষ না মেনে উপায় নেই। কিন্তু ভাবের বিস্তৃত্য, ভাষার ওজস্বিত্য এবং কারুণ্য-সৃষ্টির হৃদয়গ্রাহিত্য ভবভূতি অসাধারণ।

## বিপিনবিহারী মেধাবী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

পণ্ডিতা রমাবাস্তির জন্ম-শত-বাষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রেব সুপ্রসিদ্ধ চিংপাবন ব্রাহ্মবংশীয়া এই রমণী বৈশ্ব-সাহা-সম্প্রদায়ভূক্ত বিপিনবিহারী মেধাবী ( এম, এ, বি, এল, ) নামক ব্রীহট্টবাসী জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা সর্বজনবিদিত। এই প্রতিলোম বিবাহে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায় এবং সমাজ তাঁহাদের উভয়কে জাতিচ্যুত করে। এই বিপিনবিহারী কে এবং কি ছিলেন, তৎসম্পর্কে আলোক-পাত করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার জন্ম-তারিখ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে জানি, তিনি ভাস্কর সুনন্দ্রমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সম-সাময়িক এবং তাঁহাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্তত্রয়াং খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ( আনুমানিক ১৮৫২ ইংরেজী হইতে ১৮৫৭ ইংরেজীর মধ্যে ) যে কোনও এক বৎসরে তাঁহার জন্ম হয়, ইহা আমরা মোটামুটি ধরিয়া নিতে পারি। অনুসন্ধিসূ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে কেহ যদি তাঁহার জন্ম-তারিখ আশাকে দিতে পারেন, তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কবিমগ্ন সাবডিভিশনের অন্তর্গত মধ্যাতকালি গ্রামে বিপিনবিহারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মাণিক্যদাস দাস। মাণিক্য অর্থগোঁরবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার উন্নত চরিত্র, তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাসিতার জগৎ বিখ্যাত ছিলেন। লাতু নিবাসী স্বনামধন্য যোন্দী গৌরীচরণ দাস অষ্টপতি, তাঁহার কন্যা স্তত্রয়াং সহিত মাণিক্যদাসের বিবাহ দেন। বিপিনবিহারীর গর্ভধারিণী মাতা স্তত্রয়াং তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। বিপিনবিহারী তেজস্বিতা ও সাহসে পিতৃমাতৃ-গুণের উত্তরাধিকারী

হন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যার্জনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। দরিদ্র পিতা অর্থবল না থাকায় তাঁহার শিক্ষার ভার বহন করিতে অসমর্থ হন। তাই বিপিনবিহারীকে ঘোর দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হইতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার কলিকাতা গমনের ইচ্ছা বলবতী হইল, কিন্তু কলিকাতা গমনের পাথেয়ের টাকা কোথায়? বিপিনবিহারী দমিয়ার পাজ নহেন। অর্থ উপার্জনের জন্য সুদূর আসাম অভিযুগে রওয়ানা হইলেন এবং সেখানে বহুকষ্টে স্বোপার্জিত অর্থে কোনরূপে শুধু পাঠের ব্যয়মাত্র সন্তুলানপূর্বক এক, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পাশ করিয়া তিনি গৌহাটি নন্দাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হন এবং শিক্ষাব্যবহার এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে দোখরাছি, তাঁহার নামের পাখে তারকাচিহ্ন দেওয়া আছে এবং নিচে লেখা আছে ( \* Indicates Honours in Arts. ) ব্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার পণ্ডিত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিয়াছেন, কঠিন রসায়নশাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষা দিয়া, বিপিনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিপিনবিহারী এম, এ, পরীক্ষা দিয়া "হল" হইতে বাহির হইয়া বাইতেছেন, আরও দুই-জন কলিকাতার এম, এ, পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়া তাঁহার আগে আগে বাইতেছিলেন, তাঁহারা পেছনে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনি শুনিলেন, কলিকাতায় একজন পরীক্ষার্থী আবেক জনকে বলিতেছেন, "আমার ধারে সিলেটের একটা বাজাল বসেছিল,



ব্যাটামেন্লে কিছুই লিখতে পারে নি।” বলা বাহুল্য, পরীক্ষার “হলে” ইহাদের সহিত বিপিনবাবুর পরিচয় হয়। এম, এ, -২ কল বাহির হইলে পর দেখা যায় তিনি প্রথমে তাহার বন্ধু-পরীক্ষার্থীর নিকটে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই পাশ করিতে পারেন নাই। বিপিনবাবু এই ঘটনা তাঁহার বনিষ্ট আত্মীয় ৮প্রজ্ঞানচরণ দাস অষ্টপতির নিকট ব্যক্ত করেন এবং প্রবন্ধ-লেখক প্রজ্ঞানবাবু হইতে এই তথ্য অবগত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অদ্ব্য উৎসাহ ও প্রাণপাত পরিশ্রম কখনও বিফল হইতে পারে না। গোঁহাটি নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক থাকাকালে তিনি বাংলা ভাষার ‘বসায়নের উপক্রমণিকা’ নামক এক সচিত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কলিকাতার জয়গোবিন্দ সোমের ছাপাখানায় (ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টিয়ান হেবল্ড প্রেস) ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির একটা বিশেষত্ব আছে। ইহার পবিত্রিষ্টে বিপিনবাবু কর্তৃক সকলিত বহু পারিভাষিক শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। তৎপূর্বে বসায়নশাস্ত্রের এরূপ পরিভাষা বঙ্গভাষায় আর কেহ আবিষ্কার করেন নাই। সুতরাং বিপিনবাবু এক্ষেত্রে শুধু পথপ্রদর্শক নহেন, বস্তুতঃ তাঁহার লিখিত ‘বসায়নের উপক্রমণিকা’ নামক সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থ তখনকার দিনে একক ও অবিভীয় বলিলে অতুক্তি করা হইবে না। বিপিনবাবু কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ভক্ত ব্রাহ্মমহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বয়ন বিলাত হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব-মণ্ডলীয় পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, বিপিনবিহারী তাহাতে স্ব-বচিতে একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। বিপিনবাবু তখন ব্রাহ্মসমাজভূক্ত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ও ডাক্তার সুনন্দীমোহন দাসের সহিত একযোগে সমাজ-সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কবিতা লেখা সবধে আরেকটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে নেহাং অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জীহট্টের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সম্পাদক কবি ৮প্যারীচরণ দাসের পদ্যগুস্তক ১ম ভাগ প্রকাশিত হইবার পবে বিপিনবাবু তাঁহাকে জানান, তিনি ইহার ২য় ভাগ রচনা করিবেন। প্যারীবাবু সানন্দচিত্তে ইহাতে অমুমতি দেন এবং স্বয়ং পদ্যগুস্তক ৩য় ভাগ প্রকাশিত করেন। নানা অনিবাধ্য কারণে বিপিনবিহারীর সজ্জন কার্যে পরিণত হয় নাই, তাঁহার অকাল-মৃত্যু ইহার অন্ততম কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ‘পদ্যগুস্তক’ ২য় ভাগ আর প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সঙ্গীতে বিশেষ অঙ্গবাগ ছিল। তিনি সুললিত কণ্ঠে ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ গাহিতে পারিতেন। যেখানে সঙ্গীতের আসর বসিত নিমন্ত্রিত হইলে তিনি তথায় বাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার আমার মেসোমহাশয় ৮বন্ধবিহারী দাস (জীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ পাথোয়াজ ও জীখোল-বাদক), তদীয় বন্ধু বিপিনবিহারীকে তাঁহার বাড়ীতে বাই-খেমটা পানেন

এক ঘরোয়া বৈঠকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই বৈঠকে ‘জীহট্ট-প্রকাশ’ সম্পাদক কবি প্যারীচরণ দাস এবং আরও তিন-চারজন সঙ্গীত-প্রিয় বন্ধু যাত্র উপস্থিত ছিলেন। কোঁতুলপূরবশ হইয়া বিপিনবিহারী বন্ধুর আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখেন, নর্ত্তকী পান গাহিতে গাহিতে বাবুদের সাক্ষাতে এক একবার অন্তর্জি করিয়া আসে আর বাবুবা বাব বা খুসী তাহাকে ‘পালা’ (বকশিশ) দিয়া রেহাই পান। কোনও বাবু উহা না দিলে নর্ত্তকী তাঁহার গা-ঘেসিবার চেষ্টা করে। আসরের এই অবস্থা দেখিয়া বিপিনবাবু প্রমাদ গণিলেন। খেমটা জীলোকটি তাঁহার কাছে কিছু না পাইয়া তাঁহার গা ঘেসিবার উপক্রম করে। তাঁহার হাতে একটা চাবুক ছিল। তিনি ঝরিতবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আচ্ছা করিয়া নর্ত্তকীকে চাবকাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া মেসোমহাশয়কে বলিলেন, “ভাই, পবিত্র সঙ্গীত-রসের নারকীয় রূপান্তর হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। আমার জীবনের আজ প্রথম অভিজ্ঞতা। আর জীবনে কখনও এমন আসরের ছায়া মাড়াইব না।” বিপিনবিহারী তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। জীবনে আর কখনও বাই-খেমটার আসরে বান নাই। এই ঘটনা আমার মেসোমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। বিপিনবাবু এক অত্যাস্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, বাহা সচরাচর খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে তাঁহার মুহুরিকে বসাইয়া একটা যোকদমার জবাব ডাকিয়া বাইতেছেন, অত্ৰদিকে ঠিক একই সঙ্গে একই সময়ে ঐদিন বিকালে যে একটা বিশেষ বিষয়ে সাধারণ বক্তৃতা দিবে, সেই সম্পর্কে আর একটি লোককে সেই বক্তৃত্যের বিষয়বস্তু ডাকিয়া বাইতেছেন। দুই দিকেই দুইটি লোকই দুইটি বিভিন্ন বিষয়ে ঠিক একই সময়ে ক্রতলিপি লিখিয়া বাইতেছে, অথচ ক্রতলিপিতাত্যব দুই বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তু ঠিকই আছে, কোনো দিকে কোনও ভুল হইতেছে না। এই শুণ অসামান্য দীপ্তি ও অনন্তসাধারণ বিভাবতার পরিচায়ক। আমার বয়স এখন ত্রিয়ার (৭৩) চলিতেছে। এই সুদীর্ঘ বয়সে একমাত্র মনোর পরমারাধা গুরুদেব জীজী ১০৮ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি সংসারত্যাগী উদ্ধবেতা সন্ন্যাসী—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। সে হিসাবে গৃহী বিপিনবিহারীর এই অত্যাস্চর্য্য ক্ষমতা কম গৌরবের পরিচায়ক নহে। সুবক্তা হিসাবেও তাঁহার বেশ নাম ছিল। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, “He (Bepin Behari) was one of the most successful students in the University from our District (Sylhet)” ব্রাহ্মসমাজের বিপিনবাবু এম-এ, বি-এল, পাশ করিয়া যখন জীহট্টে আসেন তখন সেখানে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও উদারনৈতিক ব্রাহ্মসমাজে ভীষণ আড়াআড়ি চলিতেছে। তখনকার দিনে কলিকাতা-প্রত্যাগত তেজস্বী হিন্দু বুকেয়া শুধু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, এই অভূহাতে তাঁহাদিগকে জীহট্টের হিন্দুসমাজ অপায়োজ্য করিয়া

রাখিয়াছে। পিতা পুত্রকে ভাগ্য কবিরাজেহন, কোষ্ঠ জাতা সহোদর কনিষ্ঠ জাতাকে ঘরে উঠিতে দেন নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত ভূবি ভূবি বর্তমান আছে। দলে দলে ঐহট্টের উদীয়মান তরুণেরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছে, বঙ্গদেশীয় হিন্দুদের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিপিনবিহারী ঐহট্টে আসার পর সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়িয়া তাল সামলাইতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে দল ছাড়িয়া হিন্দুসমাজে ভিড়িতে দেখিয়া তাঁহার সহকর্মী শ্রদ্ধের বিপিনক্ষে পাল, ডাঃ সুনন্দীমোহন দাস প্রভৃতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিপিনবিহারী সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিপিনক্ষে পাল তাঁর ঠিক পরেই ঐহট্ট ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিলেন। ইহার ঠিক পরেই বিপিনবিহারী আবার শ্রদ্ধের পালের যুক্তি খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্মের প্রাধান্য দেখাইয়া জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। এভাবে উভয়ের বাকযুদ্ধ ঐহট্টে বহুদিন চলিয়াছিল। ৩৭খ্রীস্টাব্দে সেন তখন স্কুলের ছাত্র। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, ঐহট্টের ছাত্র-সমাজ উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। তাহাঁরা বিপিন মেধাবীর নাম দিয়াছিল “তাজী” (তরেলার ঘোড়া) এবং বিপিন পালকে বলিত “টাটু” (টাটু ঘোড়া)। বিকালে দলে দলে ছেলেরা বাহির হইয়া একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিত, “আজ কার পাল বেড়াই, তাজী না টাটু?” স্তব্ধাং আমরা দেখিতে পাই, বিপিনবিহারী শুধু স্নেহলব্ধ ছিলেন না, সুবক্তাও ছিলেন। বিপিনবিহারী ঐহট্টে ব্রাহ্মসমাজ বৈষ্ণবসাহা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহাদের সহিত শৌণ্ডিক বা শুড়িদের কোন সম্পর্ক নাই। বিবাহাদি আদান-প্রদান চলে না। অল্পদিন আগে (সম্ভবতঃ বিগত এপ্রিল মাসে) দিল্লীর ‘হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড’ পত্রিকায় লেখা হয়, বিপিনবিহারী ‘হরিজন’ ছিলেন। সুখের বিষয়, এলা যে তারিখের উক্ত পত্রিকায় ঐহট্ট অনাথবন্ধু দাস মহাশয় এই মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৩৫৬ সনে আমি কলিকাতায় ছিলাম। তখন চণ্ডীচরণ বসাক এণ্ড সন্স কর্তৃক ১২৭, বসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ‘শতজীবনী’ নামক পুস্তকে দেখিয়াছি, প্রমুখ্য লিখিয়াছেন, বিপিনবিহারী জাতিতে সূত্রধর ছিলেন। তৎপূর্বে বাটীতে থাকা সময় আমার হাতে একখানা ‘সাহিত্য-সংবাদ’ পত্রিকা আসিয়া পড়ে। আমি তখন স্থানীয় প্রেসগার—‘প্রাইজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী’র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলাম। পত্রিকাখানা বতরুর মনে পড়ে, হাওড়ার ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ কার্যালয় হইতে বাহির হইত। তাহাতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (সম্ভবতঃ উপাধিকারী) এক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—মহারাজার ব্রাহ্মণ-কথা বিহীন হইয়াছে শুড়িকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সূত্রধর্য অদৃষ্টের সহিত মহাবাহুর অদৃষ্টের তুলনা করিয়াছেন। বিপিনবাবু হরিজন বা সূত্রধর বা শুড়ি ছিলেন না, ইহা সর্বজনবিদিত, স্তব্ধাং উপযুক্ত লেখকদের মন্তব্য নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা নিঃসন্দেহে

বলা বাইতে পারে। পণ্ডিতা মহাবাহুর সঙ্গে বিপিনবিহারীর বিবাহের সঠিক তারিখটা আমি সংগ্রহ করিতে আজও পারি নাই। বিবাহ বাকিপুরে হইয়াছিল। সেখানে গিয়া তখনকার দিনের Marriage Register খুজিলেই উহা পাওয়া যাইত, কিন্তু ভগ্নবাহ্য নিয়া আমি তথায় বাইতে পারি নাই। বিপিনক্ষে পালের মতে ইহা ১৮৮০ সনের শরৎকালে অল্পবয়স্ক হইয়া উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবসাহা সম্প্রদায়ের কুলগত উপাধি বর্তমান আছে। বিপিনবাবু উক্ত সম্প্রদায়ের ‘মেধাবী’ (ঐহট্টের ভাষায়) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই তিনি নামের শেষে কৌলিক উপাধি ‘মেধাবী’ ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিতকে বিবাহের পর বিপিনবাবু শিল্পে গিয়া ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার উনিশ মাসের বিবাহিত জীবন সুখে-সম্মানে অতিবাহিত হয়। ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় মহলে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি বিলাত গিয়া বারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮২ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ইহাধার পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিতা মহাবাহু ইনফুরেঞ্জার কাতর হইয়া শয্যাগতা ছিলেন। সেদিন কি কারণে পাচক (বার্চুর্স)-ও আসে নাই। আগের দিন বিপিনবিহারী অক্লিষ্ট হইতে একটা কঠিন যোগব্যায়াম করিয়া শয্যা আসিয়া দেখেন, পণ্ডিতার অবস্থা বেশ বাড়িয়াছে। নিজের ক্ষুধার পেট জলিতেছে, মেরে মনোরমকে খাওয়াইয়া শান্ত রাখিলেন। রান্ধা দিয়া এক চানাচুরওয়ালা বাইতে ছিল। তাহাকে ডাকিয়া ১/১ সের চানাচুর দিয়া সাক্ষাৎভোজন শেষ করিলেন—তিনি ভোজনবিলাসী ছিলেন, খুব খাইতে পারিতেন। সমস্ত রাত্রি ভেদবমি হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, Asiatic Cholera. বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে বাঁচান গেল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া গেল। পণ্ডিতা মহা ‘B. B., B. B.’ (তিনি বিপিনবিহারীকে এই নামে ডাকিতেন) ডাকিয়া কাদিতে কাদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মদীর পিতৃদেব ও ৩৭খ্রীস্টাব্দে দাস অষ্টপতি, বোগীর শয্যা-পার্শ্বে ছিলেন। তাঁহাদের কাছে বাল্যকালে এই মন্ত্রস্তব্ধ কাহিনী শুনিয়াছি। জাতিচ্যুত বিপিনবিহারীর শবদাহের জন্য কেহই আসে না। মহাপ্রাণ ৩৭য় হবিচরণ দাস বাহাহুর আগাইয়া আসিয়া শবদাহের ব্যবস্থা করিলেন। লেখকের পিতৃদেব, প্রহ্লাদ বাবু এবং আরও দুইজন উৎসাহী ছাত্র আসিয়া শেবকৃত্য সমাপন করিলেন। ইহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করািবার জন্য হিন্দুসমাজ কান-বুঝা করিতে লাগিল, কিন্তু পুণ্যলোক ৩৭য়বাহাহুর চেষ্টায় শববাহীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নাই। আমি বিপিনবিহারীর সংক্ষিপ্ত চরিত-চিত্র, ভগ্নবাহ্য নিয়া অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চিত্রকরের সাকল্য বা অসাকল্য পাঠক-পাঠিকার মতামতের উপর নির্ভর করে, আমি শুধু চিত্র-শিল্পী রাত্রি।

# অধিকার ও অনধিকার

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

একদিকে বিশাল বিশ্বের অক্ষুদ্র ঐশ্বর্য অত্রদিকে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বজনী-শক্তির বিবিধ সজ্জা—উভয়ে মিলিত হয়ে যে জটিল পরিবেশ ও উৎকট-সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার সমাধান, বিশ্লেষণ, ও সৃষ্ট বিনিয়োগ করবার অসম্য প্রচেষ্টা চলছে সত্য কিন্তু মানুষের লোভ ও হিংসা সমস্যাটিকে জটিলতর করে তুলেছে। তাই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লেগেই আছে—অধিকার ও অনধিকারের দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সংঘর্ষ। কলে, বিধিবদ্ধ সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পটভূমিতে যেন হয় যেন একটি বিধিবহির্ভূত অলিখিত শোষণ-ব্যবস্থা সমাজের প্রত্যেক সমর্থন না থাকলেও পরোক্ষ অনুমোদনে চলছে। তাতে যদি আবার শাসনব্যবস্থা যুগে যুগে তবে ব্যাটী ও সমষ্টিগত জীবন কলুষিত হয়ে, এতে বিশ্বাসের কি আছে। বর্তমানে এই দেশে সেই পরিস্থিতির নিঃস্রব আঘাতের সম্মুখীন হতে চলছে।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য—প্রকৃতির বৈচিত্র্য ছোটবেলা হতেই অঙ্কুরিত হতে থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বিকাশ লাভ করে। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশ তাকে ক্রমপরিণতির দিকে নিয়ে যায়—বাহিরের ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াও তার চিত্তবৃত্তি গঠনে কম কাজ করে না তা ভালই ইউক, আর মন্দই ইউক। ইঞ্জিয়-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মাসিক বৃত্তির উদ্দেশ্য ক্রমায় হতে থাকে। তার সুনীল অল্পবিস্তর মাতৃগর্ভ থেকেই আদৃত হয়। নিজের ভালমন্দ, সুখদুঃখ সে গর্ভভাঙার ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পর্কে অনুভব করতে থাকে। এই অনুভূতিই কালক্রমে জ্ঞানের উদ্বোধনের সহিত চিত্তবৈচিত্র্য রূপ ধারণ করে। দেহের পরিপুষ্টির সহিত মানসিক পরিপুষ্টি লাভ হয়। অব্যক্ত ব্যক্ত হয়। সুবিধা-অসুবিধার ধারণা হতে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ছাপ তার মনে পড়তে থাকে। সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি তার থেকে আরম্ভ হয়। যুক্তি, শক্তি ও মিথ্যার বলে মানুষ নিজের অধিকার আয়ত্ত করে, পরকে অনধিকারী করে। আবার অস্ত্রের উপর অস্ত্রের অত্যাচার নিজে মাথা পেতে নেয়। মাজাহীন স্বাধীনতা অনাচার ও বর্বরতারই পর্যায়সিত হয়। প্রকৃত পণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সংঘর্ষ এনে দেয়, কথা ও কাজে, চিন্তায় ও ক্ষমতায় ব্যবহারে। অধিকার ও অনধিকারের বধ্যবন্ধ বিচার নির্ভর করে মানবীয় ধর্মের সুসংগত অনুভূতি ও তা কার্যে পরিণত করবার নিঃস্বার্থ প্রেরণা, দৃঢ়তা ও স্বভাঙ্গ নিলোভের উপর। যে পর্বের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে, পর্বের সূখে সুখী হয়, পর্বের দৈন্ত-দুর্দশার সহানুভূতি-সম্পন্ন, সর্বোপরি সর্বব্যবস্থার অন্তরে বাহিরে এক অসমতার মধ্যেও সমতার ভূঁপ্তি বার মানসিক স্তরে বিদ্যাজ করে, সেই সমাজ, অর্থনীতি, বৈবরিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণের

অধিকার ও অনধিকারের মান বক্ষা করে চলতে পারে। কিন্তু এইরূপ লোক পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

গণতন্ত্রী বলে বতই আফালন করা বাক, আপাতদৃষ্টিতে উদার ও নিঃস্বার্থ বলে বতই আখ্যা দেওয়া ইউক, প্রত্যেক সংস্বে প্রাত্যহিক জীবনের নিদর্শনে ধরা পড়বে এক একজনের চরিত্র কি। তাই পূর্ণবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হলেও গণপ্রতিনিধি যে আত্ম-প্রতিনিধিত্ব স্তরে বিচলিত করছে তা খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে। গণমন যেখানে নেই গণতন্ত্র সেখানে আসতে পারে না। গণতন্ত্র এখনও অনেক দূরে—কবে আসবে জানি না। কলে যারা ক্ষমতার অধীন তাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে, জনসাধারণের প্রতিনিধি জনসাধারণকে জায়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, অবিচারে ও অনাচারে জর্জরিত করে। দিন দিন করের বোঝা বাড়ছে উন্নতির জন্ত—অবনত তাই হচ্ছে। তবু বলা হয় এরাই নির্বাচিত প্রতিনিধি। সংঘনা নেই, সিদ্ধির বড়াই করে।

আসল কথা, মানুষ বচনভঙ্গীতে বতই বড় বলে প্রতিভাত ইউক, প্রকৃত পক্ষে কার্যকলাপে ততটা নয়, তাই কথার পিঠে কথা বুনে কথার গল্পলাই সৃষ্টি করে, সমস্যা সমাধান করতে পারে না—আরও পারে না তার বৃত্তি লোভ, ক্ষমতা ও দুর্নীতির দুইরঙগত বলে। স্তরায় সকল সমস্যার গোড়ার সমস্যা হ'ল খাটি লোক তৈরি করা, শিক্ষা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সমন্বী লোকের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা। তা না হলে এই অধিকার-বঞ্চিত ও অত্যাচার-পীড়িত লোকের অসন্তোষবহিঃস্রব করবে সৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার বিচিত্র অবমান, তাদের কুশিক্ষা, দৈন্তদুর্দশা ও নৈতিক অবনতি, পণ্ডিত মনোভাবের প্রাণ্ডীভার সমাজচিত্রকে কলঙ্কিত করবে। সে কলঙ্ক ভাগ্যাত্মী ক্ষমতাদৃষ্ট অধিকারও মুখলী জীভ্রষ্ট করবে।

খাওয়া, পরা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যলাভ লোকের প্রাথমিক প্রয়োজন। এত প্রাচুর্য্যে মধ্যে অভাবব্রজের আর্দ্রনাভ বিচারসহ না হতে পারে ( কেন না, বিচার ত একতরফা ) তাতে পেট ভরবে না। অধিকার কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, আদায় করে নিতে হয় কারণ মানুষ যুগে যুগে উচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য দিলেও আদিম বর্বরতা থেকে সে নিভুতি পায় নি। দুঃখের বিষয়, যারা ক্ষমতা আদায় করল তাই আদায় বক্ষা হয়ে দাঁড়াল। এইরূপ ভাবেই পৃথিবীর বঙ্গমঞ্চে দলের পয় দল আসছে আর যাচ্ছে, কত উদার ও নিঃস্বার্থবাজ্ঞ কথার প্রোত নিঃসৃত হচ্ছে। ক্ষমতালোপুণ বিচিত্র বুদ্ধিবৈবিশ্য জীবনানর্শের ইতিহাস দেশে দেশে কি

বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনও আত্মশোষণ উক্ত আসনে আয়োজন করে সাধারণের হৃৎশায় কি স্বাধিকার, অত্যাচারের কি বৃত্তিকাল, অযোগ্যতার কি কারসাজি। ঠিকই বলেছেন বার্নার্ড শ—ভ্রমভার দুখোঁস-পরা পণ্ডই বাহুব।

বড় লোক তারাই বার্য শোষণ করলেও শোষিতরা বুকে না যে তারা শোষিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ শাসক তিনিই যিনি সুশাসন করতে পারেন, আর নাই পারেন, সাধারণের অর্থে সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করেন এবং জনসাধারণের অঙ্গ কত বড় বড় কথা আওড়ান নিজে তা অনুসরণ করেন আর নাই করেন। পৃথিবীতে ক্ষমতাবানরাই অধিকারের মালিক জনসাধারণের ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে তাহাদিগকে ক্ষমতা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তৎসঙ্গেও মুক্ত জনসাধারণে তাদের অধিকারের ইচ্ছা যোগায়। অতএব বিশ্বশান্তি অসম্ভব ও অবাস্তব। মানুষের মধ্যে যে ক্ষত্র আছে তা সর্বদা পরকে বঞ্চিত করতে চায়, শুধু কিছু সতর্কতা আছে বলে জনসাধারণের মধ্যে তার দৌরাত্ম্যের স্বাক্ষর সঞ্চিত হয়। কোন দেশেও শাস্তি বিদায় করতে পারে না যদি শাস্তি আসে তা মৃত্যুর মধ্যে অথবা বার্থ জীবনের নৈরাশ্রের মধ্যে। অস্তায় যে দেশের লোক বেশি সহ্য করে থাকে অন্ত্যস্ত-সারে, শাস্তি সে দেশেই বিদায় করে। ভারতীয় সংসদে সমাজতন্ত্রের ধাচে দেশ গঠন করতে হবে আইন পাল হরছে, কিন্তু মন্ত্রী-সংসদের সমস্তগণই বনিকতন্ত্রের প্রতীক। সংবিধানে জনসাধারণের অধিকারের বর্ণনা আছে। রাজ্য ও সংসদে আইনের পর আইন পাল করে, কখনও পর কখনও বার্থ্য কবে সে অধিকার ক্রমাগত সঞ্চিত হচ্ছে। আর বুদ্ধি না হতেই জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে বা কমান হচ্ছে, কলে দারিদ্র্য জনসাধারণের, সরকারী দপ্তরে উহার বাতাস লাগে না।

উদারতার মধ্য দিয়ে মানুষ ও অধিকার গড়ে ওঠে, কৃপণতার ও স্বার্থপরতার তা ধ্বংস করে। ইহার ফলে মানুষ-মানুষে জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষান্নি ধ্বংসিত হতে থাকে। কলে যেমন কীট থাকে, মানুষেও তেমন রিপু আছে। এই রিপুই কারণ-অকায়েন দূর হলে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে; মানুষ অভাবেই থাক, আর স্বভাবেই থাক, আদর্শ-জীবনের পরিশ্রেক্ষিতে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। ঘরে ঘরে গৃহযুদ্ধ যেমন হয়ে থাকে তেমন জাতিতে জাতিতে স্বার্থ, লোভ ও ক্ষমতার মোহে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছিল। রিপু স্বভাব অত্যাচার ও মানুষের চিরন্তন সাধী, তাই সন্ধি করলেও সন্ধি টিকে না, শান্তির আবহাওয়া স্থায়ী হয়ে যায়।

এক পক্ষের অকৃতদানে বখন অপর পক্ষ সুশিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে তখন অধিকারের প্রসন্ন আসে না, কারণ পাওনার চেয়ে সে বেশি পেয়ে, বসে। স্নেহবৎসল ও কর্তব্যপারায়ণ পিতামাতার চোঁটার ও দানে সন্তান মানুষ হয়। কত বিনিয় রক্তনীষাশন করে থাকে অভাবে ও অনাহারে, এমনকি প্রাণও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। সেই সন্তানই স্বার্থান্বিত হয়ে, নিজের অসুবিধাবোধে কত

সীড়ন করে থাকে অবস্থার হত। অস্তের কথা আর কি বলব। চাকবিহলে সেই সন্তানই 'দাসত্ব দাস'—প্রভু কথার ওঠে বসে। একটি হ'ল স্নেহমমতার প্রতিদান, অপরটি অর্থের বিনিময়। এইরূপ মানসিক ভাবে মানুষ বুঝে থাকে; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম খুব অল্প ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

অর্থ, সম্পদ, পদমর্যাদা—বাই হোক না কেন, মানুষের আসন সকলের ওপরে। এই মানুষকে বখন ঐশ্বর্যের কাছে পদ-দলিত হয় তখন সভ্যতা, শিক্ষা ও ভাষার চরিত্রের অবনতি ঘটবেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষত্রুটিই বৃহৎ অজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ছোট চারাগাছের মূল যদি কীটদষ্ট হয় তবে কি করে উহা বড় হবার রস আহরণ করবে?

সম্বন্ধ যেখানে ঘনিষ্ঠ, আঘাত সেখানে তীব্র হয়ে ওঠে। দোষ-ত্রুটির প্রসঙ্গে অধিকারভঙ্গের কথা ওঠে না। কেন না, স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিই সেখানে অস্তরে অস্তরে মিলনের সেতু। এইরূপ শিক্ষক ও ছাত্র আশ্রয় দেখেছি, পিতামাতা, পুত্র কন্যাও দেখেছি, আরও দেখেছি শাসক ও শাসিতের সদ্ভাবতা এবং সাধারণ মানুষ-মানুষে অন্তরঙ্গ ভাব। শিক্ষক, ছাত্র ও গুরুজনদের মধ্যে সম্বন্ধ আরও উন্নত হওয়া দরকার। শিক্ষক ও গুরুজনের বিরুদ্ধে দোষ-ত্রুটির অভিযোগে ধর্মঘট, অসম্মান, কর্তব্যে অবহেলা, অসংযম ও চরিত্রহীনতারই লক্ষণ। যেখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিনিয়াদ, চরিত্রগঠনের আদর্শ, মানুষের বীজ অঙ্কুরিত হবে সেখানে অশ্রদ্ধা ও কর্তব্যহীনতার অপরিণত মনের পেলব-কলিকা বিগড় হয়ে যায়, ফলে অন্তর্ভ পরিণতি সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতার ত্যাগ, উপেক্ষা ও কল্যাণবৃদ্ধির প্রয়োগই বেশি প্রয়োজন। সম্বন্ধের বাবধানে অধিকারের ঔচিত্য অনৌচিত্যের কথাই আগে, যদিও সে ক্ষেত্রে মানুষের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। সে বিবেচনা ও আদর্শ প্রায় বিদূষিত হচ্ছে। নগ্ন অস্বাধিকতা, বর্বরতা ও হুমুসহীনতা সর্বত্র বিষবাক্সে বিসর্পিত। একে ঘোষণা করতে পারে একমাত্র পিতামাতা, শিক্ষক, প্রতিবেশী ও শাসকশ্রেণী, তাদের স্নেহমমতা ও সংযত জীবনের কর্মাবলীর দৃষ্টান্তে ও শাসনের দরদে ও নিঃসুখতার।

জীব-জগতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও তার বিচিত্র গুণের সহিত অন্তরের কালিমারও রয়ে যাচ্ছে, তাই অনন্তসাধারণ গুণের অধিকারী হয়েও সে কর্তব্যের নীচ ও স্বার্থপর হতে পারে, অথবা মানুষকে কি না নিপীড়ন করে থাকে, তার উদাহরণ বিরল নহে। মানুষ এই সব যথেষ্টচারিতা ও অত্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই এর প্রতিবাদও অনেক সময় করে না অসহ্য না হলে।

নীতি মানুষের মধ্যে যেমন আছে পশু-জগতেও তেমন আছে, আবার সমাজের নিয়ন্ত্রণের লোকের মধ্যেও আছে। তবে মানুষের নীতি সুবিধা-অসুবিধা হিসাবে চলে। চোখের বাজো ও চোখের চুই করে অস্বার্থিতা পায় না, শুণ্ডাও শুণ্ডার বাড়ী শুণ্ডা করে নিষ্কৃতি পায় না, তারাও নিয়ম ও স্বার্থের বাধ্য। সুতরাং সত্যতাই প্রেমঃ।

আজ যাঁরা শিকারী, শিকার, শাসকবর্গ, যাঁরা ব্যবহার্য্যবী, কর্তব্য, ব্যবসায়ী, যাঁরা চলচ্চিত্রের পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, যাঁরা লোকানী, খাজনা ও ঐশ্বর্য্য প্রস্তুতকারক, যাঁরা রাজ্যের বস্ত্রী, কুটনীতিজ্ঞ, জাতিসংঘের সদস্য, ধর্ম্মগুরু, মোহান্ত— তাঁদের সকলের ভেতরে দেখা দরকার কারণ তাঁদের নীতিবিকৃত কার্য্য-কলাপের জন্য মনুষ্যসমাজ নিয়ন্ত্রণে নেমে বাবে। দৈহিক ও মানসিক দ্বাষ্ট্যহানি, দেশে দেশে মনোমালিন্য ও হানাহানি—বলতে কি, সর্ব্বভায়ে নীচতার আদর্শে ভাবী সম্ভাবনাদেরও জীবন কলুষিত হবে।

সুতরাং অধিকার ও অনধিকারের সহিত দারিদ্র্য ও কর্তব্য— কর্তব্য ও দারিদ্র্যের সহিত শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কর্তব্য সমাজের ওপর। আইনের জোরে যে নীতিবোধ ও সমাজগঠন করবার প্রয়াস তা হয় নির্জীব ও অমুপ্রেরণাহীন; আর অসং লোকের হাতে আইনও অকাজে হয়ে পড়ে। শান্তির ভয়ে কুপ্রবৃত্তি চাপা পড়তে পারে, তাতে চিন্তাশক্তি হয় না। ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু এই পরিবর্তন যদি মনুষ্যদের প্রকাশ্যে সহায়ক হয় তবে ভাল। যদি শিল্পায়নের সহিত পাশ্চাত্যের ধর্ম্মতীন ভীষন ও সামাজিক দুর্নীতির বক্তা বইতে থাকে তবে দেশ হয়ত ঐশ্বর্য্যশালী হবে—ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। সেই অবস্থা কোন ধর্ম্মশীল চিন্তানায়কের কাম্য নহে। আর এতে ভারতের ঐতিহ্য, সমাজ ও ধর্ম্ম দূলাবলুণ্ঠিত হবে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পূর্বে সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। মানুষ যদি তার প্রতিকার করতে না পারে বা না চায় তবে প্রকৃতি তার পরিশোধ নেবেই।

অভাববোধ সভ্যতার লক্ষণ, ইহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; বরং উচ্চ সভ্যতার বীজ বহন করে, উচ্চ আদর্শ রূপায়ণে যে অভাবের বোধ তা সাধনার দ্বারা বিশ্বের সংস্কৃতি ও শান্তির পথ বচনা করে। বস্তুনিষ্ঠ অভাবের তৃপ্তির অন্ত, লোভ ও হিংসা চরিতার্থ করবার জন্য এই ধর্ম্মতী কতবার বক্তা হইয়াছে, কত হত্যাকাণ্ড সজাট হইয়াছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মনুষ্যসমাজের কলাপে নিয়োজিত করলে উপকার হয় কিন্তু বাষ্ট্রনায়কদের হাতে এই বৈজ্ঞানিক আদিষ্কার—এটম ও হাইড্রোজেন বম্ব যে কি ভীতির সঞ্চার করেছে, দেশে দেশে কি অশান্তির ও অস্থিরতার কারণ হয়েছে তা তাদের শলাপবামর্শ ও নানা জুয়ে অল্পপ্রতিবোধ সাম্রাজ্যের আয়োজনে উপলব্ধি করা যায়।

অজ্ঞানের তৃপ্তি ধ্বংস আনে, সাধকের তৃপ্তি পূর্ণতার। বস্তু-নিষ্ঠ প্রবৃত্তির পথে অত্যাচার ও বন্দ অনিবার্য্য, বস্তু-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি বাগ্ধবোধহীন। ধর্ম্মজীবন বাগ্ধ দিলেও আপত্তিক জীবনে সংঘর্ষ প্রতিমুহূর্ত্তে দরকার। তা না হলে অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা প্রতিবোধ করা যায় না। ভোগের নেশা মানুষকে পীড়িত করে, ত্যাগের

আনন্দ মানুষকে শান্তি দেয়, কাহাকেও পীড়িত করে না। নিঃস্বার্থ ও জনস্বার্থে হিংসা লোভ সংবৃত্ত করা প্রয়োজন।

সৃষ্টির বৈচিত্র্যে কি একটি অধিকার রয়েছে—বাবীনের 'মানুষও সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যচাষী বা ঐচ্ছাচাষী লোকের নিকট আত্মবিসর্জন দিয়ে থাকে। এটা যেন স্বভাববিশিষ্ট চাঞ্চল্যিক দুর্বলতা। আমবা দেখছি সভ্যতা ও ক্ষমতাদুগ্ধ জাতিগুলি কি ভাবে অনগ্রসর জাতি-গুলির উপর অত্যাচার ও পরাধীনতার হুংসহ বেদনা চাপিয়ে দিচ্ছে, কুশাসন ও শোষণ চলছে অপ্রতিহত ভাবে এখনও এই বিশ শতাব্দীতে। আর অত্যাচারিত জাতিগুলি প্রতিবোধ করতে গিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তারা সমুদ্রতীরে ছেড়ে। অল্প দিকে সূর্য্যে অবস্থিত দেশগুলি যানবাহনের নৈকট্যের সুযোগে কি ভাবে সুরক্ষাশীল কুটনীতি ও ব্যবসার বলে পরদেশে স্থান সংহে, নিজেদের ক্ষমতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখবার জন্য কি অমানুষিক জঘন্য পরা অবলম্বন করেছে। নিজেদের বাঁচাবার জন্য দুর্বল জাতিগুলি তাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। পঞ্চাশের মৌলিক নীতি অহিংসা ও প্রেম যদি আরও করতে হয় তবে যে শিক্ষা, সাধনা ও শাসন প্রণালী থাকে দরকার তা পালন করবার জন্য সকল জাতির যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

অধিকার বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা শুধু সংলগ্ন, দুর্বলের কোথায়? মানুষ একনায়কত্ব চাচে না, চাচে না অত্যাচার, অবিচার। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারে বাস করতে চায়। মানবতার মধ্যে যে দুই শনি বন্দুগত হয়ে আছে, তাকে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণে দাবিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সহজ দুই বুদ্ধি—ক্ষমতার লালসা—ভোগের ও মর্য্যাদার নেশা বড় বড় লোক-দিগকেও বিভ্রান্ত করে থাকে। তারা চিন্তা করেন না—বা ইচ্ছা করে তুলে যান তাদের জীবনধারণের কত ভাবে অত্যাচার ও অন্যাচারের চিহ্ন প্রকটিত আছে।

সুতরাং সুন্দরের সহিত অসুন্দরের, সত্যের সহিত অসত্যের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, নীতির সহিত দুর্নীতির যে বৈষম্য সধক আছে—বা একই সঙ্গে প্রতি লোককে স্বর্গের শান্তি ও নরকের অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য করছে, আনন্দ ও নিরানন্দের, সুখ ও দুঃখের পারস্পর্য্যে, তার নিরসনকালে সার্বজনীন প্রচেষ্টা প্রয়োজন, পরস্পরকাতরতার আদর্শে সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শে, যাতে করে শিক্ষার বিনিয়োগ ও সুগঠিত হয়। স্বভাবজ স্বার্থ, লোভ, হিংসা ও স্বর্ধের জটিলতা উদ্বেগ বাধ করে দিতে উদ্ভত হবে। গণতন্ত্রে যদি প্রতিটি লোক তার অধিকার রক্ষাকালে সতর্ক না হয়, নিজের দারিদ্র্য ও কর্তব্য পালন না করে তবে সৃষ্টির লোকের ঐশ্বর্য্যতন্ত্রতা গণতন্ত্রের পথেই আশ্রয়, আর একনায়কত্বের পথেই আশ্রয়—আপায়ের সাধারণকে ব্যাধিত করবে—পীড়িত করবে জীবনের সর্ব্বভায়ে—শাসনের রাজদণ্ড বহাভর না দিয়ে নিষেধের মধ্যস্থতিক হতে জনসাধারণকে উত্তাক্ত করে তুলবে—বতই সাধিবার বচিত হোক, গণপ্রতিনিধি বতই কেন সভাকক্ষ উচ্চ হবে প্রতি-

ধনিত করে ফুলুক। বহুগুণ সমৃদ্ধির নামে বতই সুখস্বাদু কাণ্ডী ও দুঃখপহারী বড় বড় পবিত্রতার অলোরতন অর্ঘ্যত্ব, মুক ও মধ্যাহ্ন চরম ভোগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ কবডার বাজেট ও উচ্চমান- ও নিরীহ জনসাধারণের উপর চালিয়ে দিক।

## বিশ্ব কৃষি-মেলা

ত্ৰীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আজকাল কোন কিছু করতে গেলেই আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নইলে চাষী ভাইদের যে মেলা বসত একদিন নদীর ধারে কিংবা ছায়া স্নানবিড় গাঁয়ের মাঠে তা আজ আর গেরো বলে হয় নয়। শুধু পাড়া আর গ্রাম নয়, ছুনিয়া জোড়া দেশ যোগ দেয়। কৃষি-মেলার ইতিহাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই প্রথম বিশ্ব মেলা দেখলে বিশ্বাস না করে পারা যায় না—সত্যই কত বিচিত্র।

বস্তুত এ মেলা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এর কারণ এই নয় যে, ইতিহাসে প্রথম, নয় যে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি চৌদ্দটি দেশ যোগ দিয়েছে, এমনকি এও নয় যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার উদ্বোধন দিনে ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং “আমরিকী মেলার” দ্বারা উদ্বোধন করেছেন, প্রধান কারণ এই যে, সব প্রথম দেখতে পাওয়া গেল পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলি আমাদের থেকে কত এগিয়ে আছে।

আজ আমাদের পেটে অন্ন নেই, আবরণের নেই বস্ত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি সবটাতেই আমাদের ভাড়াডের বাড়-বাড়ন্ত, ফলে আন্তর্জাতিক সব রকমের সাহায্য-ছত্রের দোর-পোড়ায় লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। ভিক্ষাপাত্র লয়ে প্রাণটা কোন গতিকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু মানুষের সমাজে বেঁচে থাকতে মন চায় না। আমরা শুনেছি আমেরিকা শুধু কৃষি-কর্ম করে চারবেলাই পেট ভরে খায় না, পৃথিবীর আর দশটা দেশ—যেমন আমরা, তাদেরও কিছু কিছু যোগায়। রাশিয়াও কম যায় না। এরা সবাই আমাদের মতই হাত-পা-ওয়ালা মানুষ। মন্ত্র কিংবা যন্ত্র কিছুতেই ওদের বিশ্বাস নেই। তবে? ওরা বিজ্ঞানের পুজারী। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে এরূপ গ্রন্থদস্তা ভূমির সেবা করে। জননী বহুদূর শস্ত্রে, ফুলে, ফলে নিজে হাসেন আর সন্তানের সুখের সঙ্গে সহায় হন। ওদের মণ্ডপগুলি ঘুরে এলে বিস্মিত হতে হয়। গবেষণা আর ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে ওরা

বুজুকে পয়দন্ত করে চিরবিদায় দিতে সাফল্যের দোর-পোড়ায় উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের দৃষ্ট বোধবা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, “কৃষা নারকীয় এবং অবর্ণনীয় দুঃখের কারণ হয়ে পৃথিবীর বুকে বিবাক করেছে। এর শোধনে অগণিত শিশুর দেহ অস্থিচর্ম-দার হয়ে যাচ্ছে। পিতামাতার মন বিষাদ-কালিমায় লিপ্ত। যে জগদল পাখরের নিচে পিষ্ট হয়ে নিখিল বিদ্রোহ জেগে ওঠে সেই সব মেহনতি মানুষের মনে যারা অমানুষিক পরিশ্রমের তুলনায় ভোগ করে সামান্যই সেই, ‘কৃষা’ নামক শত্রুকে পৃথিবীর বুকে থেকে দূর করে দেওয়ার বৈজ্ঞানিক শক্তি আজ আমাদের করতলগত। আজ, এই মুহূর্তে, মানুষ যে বিস্তা ও হাতিয়ারে সজ্জিত আছে, তা দিয়ে বুজুকার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সেই সংগ্রাম চালিয়ে সফলতা অর্জন করতে সমর্থ, যা মানুষকে মহৎ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে।”

এমনিতে এ উক্তি বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু ওদের মণ্ডপটি ঘুরে এলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, অনু-পরমাণুর অপরিমিত শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে অসম্ভব কথা পৃথিবীর যে কোন ভাষার অভিধান থেকে চির-নির্বাসন দেওয়া যাবে। আড়াই লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে, আর সওয়া কোটি টাকা খরচ করে ওরা যে মেলা বসিয়েছে তা দেখলে মনে হয় আরব্যা উপত্যাকার কোন এক স্বপ্ন-রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। মণ্ডপের বাইরের দিকটা সোনালী গম্বুজ আর ফোয়ারা যোগল-যুগের দিন স্মরণ করায়। ভেতরে ঢুকে দেখতে পাওয়া যায় ওদের খামার-বাড়ী, পশুশালা, হাঁস-মুরগীর যন্ত্র, পরমাণুর শক্তি-প্রয়োগ। দেখতে দেখতে মনে হয় কবে আমরাও এমনি বিস্তালা হয়ে উঠতে পারব।

রাশিয়ানরাও কম যায় না। ওদের দেশের মতই বিশাল ভবনটির সামনে খোলা চত্তরে দেখা যায় আকাশভেদী পরম বিশ্বকর লুর্নিক। বরে ঢুকেতেই আছে স্পুটনিকগুলি। শুধু কৃষি নয়, শিল্পজগতে ওদের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত



হওয়া যায়। ওদের বৈজ্ঞানিক মানচিত্রটি খুব মজার। এ শুধু পটে লেখা নয়, কথাও কয়। কাকুর কিছু জানবার ইচ্ছে হলে ইংরেজী কিংবা হিন্দির বেকডিং-এ দেশের নানা প্রগতির কথা জানতে পারা যায়। শুধু তাই নয়, সপ্ত-বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পর বর্তমান মানচিত্রের যে সব পরিবর্তন হবে তাও জানিয়ে দেবে।

পরমাণবিক বিকিরণ (Nuclear Radiation) এবং রেডিও-আইসোটোপ কিতাবে কৃষি এবং জীব-বিজ্ঞা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে লাগাচ্ছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। গামা বিকিরণের (Gamma Radiation) সহায়তায় আলু সারা বছর ধরে নিখুঁত ভাবে রাখা যায়। কেমনা এতে শুধু পচনই বন্ধ হয় না, কোন রোগ বীজাণুও এর দ্বারা যেতে পারে না। একটা উদাহরণ মাত্র। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়বে সহস্র প্রকারের দর্শনীয় বস্তু, লক্ষ লক্ষ পরিসংখ্যান। সঙ্গে সঙ্গে চলছে সিনেমা। তার মারফৎ দেখতে পাওয়া যায় গ্রাম্য আর শহুরে জীবনের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখে নি। সুখ-ভোগ যা কিছু শহরে সম্ভব তা ওদের গ্রামেও বিদ্যমান। এ পরিবর্তন আসে নি মস্তুর বলে, সম্ভব হয়েছে শহর আর গ্রামবাসীদের যৌথ সহযোগিতায়।

চীনা ভবনটিও কম চিত্তাকর্ষক হয় নি। জার্মানদের ভবনে ঢুকলেই চোখে পড়ে য়েছে একটি গাভীর মূর্তি। দেহের সমস্ত কার্যকরী অংশগুলি এবং কি প্রক্রিয়ায় ওদের দেহে দুধ উৎপাদন হয় তা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু ওরা নয়, বিদেশাগত সবগুলি মণ্ডপ ঘুরলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে গোমাতা বলে যে শ্রদ্ধা আমরা প্রকাশ করতে চাই তা পুঁথিগত কু-সংস্কার মাত্র। কিন্তু ওরা তা অন্ধরে অন্ধরে মেনে চলে। শুধু গরু নয়, মানুষের প্রয়োজনীয় শবাব উপরই এদের সমান নজর। বিদেশাগত আর সব মণ্ডপই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান।

আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের আয়োজনও কম আকর্ষণীয় হয় নি। মজাগত আকর্ষণ যতই থাক না কেন, বিদেশীরা যে আমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী সে সত্য প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে কথা হচ্ছে “মহৎ দেখে কাঁদতে জানার” শিক্ষা আমাদের হয় তবেই বুঝব ভারত-কৃষক সমাজ বাদের প্রচেষ্টায় এ মেলা বসেছে তাদের উদ্দেশ্য সকল হয়েছে।

পাক্সারীদের মণ্ডপটি ওদের মতই ভাঙড়া, গোপুর্ম সহ রামেশ্বরমের মন্দির দেখিয়ে বাজি মাত করেছে মাজাজীরা। শাস্ত্র-সমাহিত বৌদ্ধ-মূর্তি বিহারী মণ্ডপ আলো করে আছে।

মহীশূরের বিধান-সৌধ, ভূবর্গ কাশ্মীর এবং ভারতের আর সব রাজ্যই দর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কৃতিগত বিকাশনে পশ্চিম বাংলার প্রাধান্ত অনস্বীকার্য। ঢুকেতেই চোখে পড়ে আমাদের পুঁথ-পুঁথবর্ষের ফেরাল-চিত্র। আরও ভেতরে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বনিষ্ঠ হয়ে ওঠে বাংলার মাটি, বাংলার জল। কৃষ্ণনগরের শিল্প বৈশিষ্ট্য এখানেও এভাবেই চূড়ায়। যে তিনটি নারীমূর্তি দেখলাম ধান ভানতে তা ভোলবার নয়।

রাজ্যগুলি ছাড়া আরও কত প্রতিষ্ঠান তাদের প্রচেষ্টা ও শাক্য কপায়িত করেছে তা বলতে গেলে একটা মোটা বই লিখতে হয়। সবই রঙিন, সবই মনোলোভা। কিন্তু তবুও একবেঁয়েমি আগত বৈকি, যদি না থাকত বেচা-কেনার হোকান, না থাকত ছোট্ট ইঞ্জিনটান। একটা প্রমোদ-ভ্রমণের রেলগাড়ী ও মোটর। কত খানাপিনার হোকান রসনা সিক্ত করেছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে চাষী ভাইদের নিয়ে এসে দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে অগ্রগতির বাহু-কাঠির রূপ। ওদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে নয়া পদ্ধতির প্রতি আস্থা। তা নইলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার একটা মোটা অংশ না খেয়ে মরবে আর সমাজের উপর তার প্রতি-ক্রিয়া হবে বিষময়। জোর-জবরদস্তি করে অবশ্য কিছুই করা উচিত হবে না। যে পথে ওরা চলে অভ্যস্ত তারই মাধ্যমে ওদের মনকে করে তুলতে হবে সংস্কার মুক্ত। পথ হওয়া চাই আমাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঝাপ খাওয়া। মেলা দেখে বাড়ী ফিরে গিয়ে যাতে ওরা পাড় প্রতিবেশীর কাছে বুঝিয়ে বলে ওরা কি দেখল এবং শিখল, তাতেও উৎসাহিত করতে হবে।

ক্ষেতের শস্য, গাছের ফল এবং তরিতরকারি সহজেই পচে নষ্ট হয়ে যায়। রান্না করা খাদ্যও তাই। এ সমস্ত জিনিস অনেক দিন ধরে গ্রহণোপযোগী অবস্থায় রাখাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন্দ্রীয় শাস্ত্র ও কারিগরি গবেষণাগারের দ্বারা ‘সপ্তাহব্যাপী খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষণের ব্যবস্থা’ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেলায় বিজ্ঞানমণ্ডপে এ কাজ চলছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই মেলা সংগঠিত হয়েছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে; দেখতে এসেছে অগণিত নর-নারী। কিন্তু কর্মজ্ঞত গ্রহণ না করলে এই বিরাট ব্যাপার পশুভ্রমের গ্রহসনে পরিণত হবে।



## দণ্ডকারণ্য

শ্রীকুমারজ্ঞান মল্লিক

আমরা বাব, বাবই বাব, দণ্ডকারণ্য,

সঙ্গে লব, বাঙলা দেশের পুণ্য ও পণ্য ।

বাঁধব 'মড়াই' ডাইনে বামে, বাঁধব সোনার বান,

আম কাঁঠাল ও নারিকেলের প্রকাণ্ড বাগান ।

কলাইব সেই মাটিতে শ্রেষ্ঠ ফসল ঢের—

সিঙাপুরী আনারস ও কমলা সিলেটের ।

অজনে পুঁই, পুনকো পালং কুমড়া শশা বিড়া,

পদ্মভরা দাঁড়ি হয়ে—মাছ ধরিবার ডিঙা ।

২

মানান বকম মাছ কেলিষ খিড়িকি পুকুরে,

ছিপটি হাতে, বসবো মোরা, দ্বিষ দুকুরে ।

বর্ষরিয়া ডাকবে ছইল—খেলবে বহৎ কুই,

আসবে ছুটে চাষী—সারা 'নিরুজ্জিল' তুঁই ।

ডিমভরা সব টাংরা পুঁটি ধরবো বাটা পোনা—

উলসিত ছেলেমেয়ের চলবে আনাপোনা ।

চরবে গাভী যুগ ডুবায় গ্রামল তৃণ পর—

মাছে ছুধে ভাতে রবে—মোদের বংশধর ।

৩

জানাবো এ পুনর্কাসন—নির্কাসন তো নয়—

ভয়ের মাঝে লুকিয়ে রাখেন হরিই বরাতন ।

থড়বো কেহ মুড়ি ভাজার খোলা খাপুরি—

বুনবো কেহ কুলো ডালা ঝাঁঝুরি বুড়ি,

বানাইব অম্বুতি কেউ—ঢাকাই পরোটা—

লাডু পেড়া বলবে দেখে 'পর নহে ওটা' ।

সরভাঙ্গা ও ছানাবড়া খইচুর ও ল্যাংচা—

নীতাতোগ ও মিহিহানা—যে চাহিবে বা ।

৪

গড়বো নুতন বিক্রমপুর, নুতন নবদ্বীপ—

'চন্দ্রনাথের' তালে দ্বিষ নুতন চাঁদের টিপ ।

বলাইব 'হস্তপাড়া' হস্তকেতে আনি—

'জনহানের' পীঠের কাছে তাঁর রাজেন্দ্রানী ।

সর্কহারী একেবারে নিঃশব্দ ও নিঃশেষ—

অরণ্যেতে মিলবে নুতন 'সব পেরেছির দেশ' ।

কেড়ে মিলে—কেলে এলাম—আকুল আঁর্ষি নীরে—

পরা এবং মেঘনাতে—বা—হেথায় পাব কিরে ।

৫

আবর্তিতে বাজবে কঁাসব বাংলা দেশের জোল—

শব্দ বন্টা ছলুরবে—বন্ধ উত্তরোল,

গড়বো সবে মহাভারত গড়বো রামায়ণ

হবে মহৎ দুখের সাথে দুখীদের মিলন ।

ঔবৎস ও চিন্তা এলো কাঠুরিয়ার দেশে,

চিনবে না কেউ এলো যে হাস্য অতি মলিন বেশে ।

লাহুনা ও বিড়ম্বনা পায় নি কিছু কম—

হেথায় যেন মেলে তাদের "স্বরভি আশ্রম" ।

৬

সবায় নিরে করবো যে ঘর বড়ই মনে সাধ

'জন্মাষ্টমীর' সে আনন্দ গড়বে নাক বাধ ।

হলভুলা মুষ্টি মায়ের বাংলা দেশের চড়ে—

তৈরি হবে চুম্বকি চুপী, বাঙতা এবং বঙে ।

লক্ষ্মী-পূজার সমারোহ এলন দেয়া বাড়ী—

মনসা ও বষ্টী-পূজা তুলতে কি গো পাবি ?

পৌষ আগলাবো, রোহ পোহাবো গড়বো পুলি-পিঠা—

পার্কণও যে মোদের কাছে ভিটার মত মিঠা ।

৭

জ্বেরা এবং হাপর যুগের দণ্ডকারণ্য—

শুণীগণের বাসে হবে নৈমিষারণ্য ।

সেখায় মোরা খুঁজবো নিতি দেব-দেবীদের পাঁজ,

পুণ্য সে সব পদধূলির কিছু কি নাই আজ ?

মুনি ঋষি যক্ষ রক্ষ সবাব অতিথি—

তাঁদের কৃপা তাঁদের আশিস মাগবো যে নিতি ।

ধূলা 'মুষ্টি সোনার' মুষ্টি—বরকে তপোবন—

করবো মোরা—লাগলো চোখে অমৃত অঙ্গন ।

৮

যে প্রতিভা ফুটেবে হেথা বল সকলে বল—

পূজবে মায়ে একশত আট দ্বিষে নীলোৎপল ।

অতি বিগুল সে ঐশ্বর্য একলা ভোগের নয়—

গোটা ভারত অংশ তাহার পাবে স্নানিষ্ঠর ।

অনাগত—ঈশ্বরের কথা এখনো অজাত—

জন্মগ্রহণ করবে হেথায় মহামানব কত ।

বিরাঠি তাদের অবস্থান ও মহাপ্রাণতায়—

টানবে সারা বিশ্বকে যে—যাছি সেই আশায় ।

## মুর্শিদাবাদ পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ শহর ও তাহার উপকণ্ঠ ঐতিহাসিকের নিকট তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। এখানেই বাংলায়, তথা ভারতের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়। আবার এই শহরের ছয়-সাত মাইল দক্ষিণে জেলার বর্তমান সদর বহরমপুরেই ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ উনবিংশ পন্যাতিক বাহিনীর বিজ্রোহে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭০৪ হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন বাংলায় রাজধানী ছিল এই মুর্শিদাবাদ। ১৭০১ সনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলায় দেওয়ান করিয়া পাঠান। তখন রাজধানী ছিল ঢাকায়। দেখানে সুবাদার শাহাজাদা আলিম ওসমানের সহিত বিরোধ হওয়ার মুর্শিদকুলি দেওয়ানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার রাজত্ব সর্বোচ্চ সম্ভব হইয়া সম্রাট তাঁহাকে পরে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর যোগল সাম্রাজ্য বণন চারিদিকেই ভাঙিয়া পড়িতে থাকে—তখন মুর্শিদকুলি দিল্লীতে রাজত্ব প্রেরণ বন্ধ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া বসেন। ১৭২৫ সনে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুলতা খাঁ মসনদে আরোহণ করেন। তাঁহার ক্রুর প্রজারাজ্য শাসক বাংলার মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে দুলভ। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সৎকরাজ খাঁ নবাব হন। কিন্তু তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য এক বড়বন্দ্র হয়। সৎকরাজের আত্মীয় আলিবর্দি খাঁ তখন পাটনায় শাসনকর্তা ছিলেন। বড়বন্দ্রকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া আলিবর্দি তেলিগাপড়ি ও সক্রিগলর পথে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে গিরিয়ার প্রান্তরে সৎকরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। নবাব-সৈন্যকে জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড়বন্দ্রকারীগণ পূর্বেই উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। যুদ্ধে সৎকরাজ নিহত হইলে আলিবর্দি মসনদ অধিকার করেন।

আলিবর্দি যোল বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় মারাঠাপন বায় বায় বাংলা আক্রমণ করে। মারাঠাবাহিনীর এক অংশ মুর্শিদাবাদের অপর পায়ে ডাহাপাড়ার উপস্থিত হয়। ভাগীরথী পার হইয়া মহিমাপুরে জগৎশেঠের বাড়ী লুণ্ঠন করে। দীর্ঘদিন মারাঠাগণের সহিত আলিবর্দির সংগ্রাম চলিতে থাকে। বহরমপুরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে মনকরার মারাঠাদের সহিত আলিবর্দির যুদ্ধ হয়। মারাঠা সৈন্যব্যক্তি ভাঙার পশ্চিমে এখানে আলিবর্দির বিশ্বাসঘাতকতার নিহত হন। বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া ও ৮ হাদশ লক্ষ টাকা চৌধ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইয়া আলিবর্দি অবশেষে মারাঠাগণের সহিত সন্ধি করিতে হয়। ১৭৫৬ আলিবর্দি পরলোকগমন করিলে তাঁহার শ্রিয় দৌড়িল

সিরাজউদ্দৌলা মসনদে আরোহণ করেন। এই অপরিণতবয়স্ক যুবক তাঁহার ঔরত্যা ও অত্যাচারে সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। মাতৃশাসা ঘসেটি বেগমের নিকট হইতে সতিঝিল প্রাসাদ কাড়িয়া লন ও তাঁহার সমস্ত ধনবস্তু আত্মসাৎ করেন। প্রধান সেনাপতি মীরজাকর, শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ, প্রধানমন্ত্রী দুলভরায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সভাসদগণকে প্রোক্ত দরবারেই অপমানিত করেন। ইংরেজদিগের সহিত সিরাজের সংঘর্ষ বাধিলে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ইঁহারা ইংরেজদিগের সহিত বড়বন্দ্র লিপ্ত হন। কলে, পলাশীক্ষেত্রে মীরজাকরের বিশ্বাসঘাতকতার সিরাজ পরাজিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হন। পথে রাজমহলের নিকট গুত হইয়া বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নীত হইলে মীরজাকর পুত্র মীরণের আদেশে জাকরাগঞ্জে মহম্মদীবগ সিরাজকে হত্যা করে। এদিকে ইংরেজরা বাংলার শূন্য মসনদে মীরজাকরকে বসাইয়া প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী হন। বশিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

বাংলায় ইতিহাসের এই অধ্যায়ের অনেক স্মৃতি-নিদর্শনই মুর্শিদাবাদ শহর ও শহরতলিতে ছড়াইয়া আছে। উহা দেখিতে অনেকেই মুর্শিদাবাদে আসেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নবাব প্যালেস বা হাজারদুয়ারী, কাটবার মুর্শিদকুলির ও খোসবাগে আলিবর্দি ও সিরাজের সমাধি দেখিয়াই তাঁহাদের কোঁতুল চরিতার্থ করেন। অনেকেই জানেন না যে, এই প্যালেস আধুনিক কালের, ইতিহাসের কোন চিহ্নই উহা বহন করে না। উনবিংশ-শতাব্দীর চতুর্থদশকে উহা নির্মিত হয় ও উহার স্থপতি কর্ণেল ডানকান ম্যাকলিওড ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এই প্যালেসেরই অতি সন্নিকটে—ইহার পাকসংলগ্ন বলিলেও চলে—মসজিদ ও মদিনার ঐতিহাসিক যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্যালেসের মাত্র কয়েক গজ উত্তরে অবস্থিত “মদিনা” সিরাজ-উদ্দৌলার নির্মিত ইমামবারাহই অংশ। কালের সর্কপ্রাসী স্পর্শ অবহেলা করিয়া ইহা এখনও দাঁড়াইয়া বহিয়াছে। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মসজিদটিও সিরাজের নির্মিত। মদিনার পূর্বে রক্ষিত—“বাক্সাওয়ারী” তোপ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ ফুট ও পরিধিতে ৭ ফুটেরও বেশী। সম্ভবতঃ দাপন হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে গৌড়ের কোন বাদশাহ উহার নির্মাতা। অথবা ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্তৃক আগায় হইতে আনিত ৬৭৫টি কামানের মধ্যে ইহা একটি হইতে পারে। প্যালেসের দক্ষিণ-পূর্বে চক-বাক্সায়ে নির্মিত প্রাচীরসংলগ্ন যে মসজিদটি এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় বহিয়াছে—ইহা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাকর পত্নী গণিবগব কর্তৃক নির্মিত হয়। এখানে পূর্বে মুর্শিদকুলির চমিশটি ভক্তমুখ

Audience Hall ছিল। এই চকবাজারের অনতিদূরে কুলেরিয়ার মুর্শিদকুলির প্রাসাদ ছিল। তাহার আর চিহ্নস্বাক্ষর নাই। কিন্তু সুলতান মাজার পূর্বে কুলেরিয়ার মসজিদ এখনও আছে—এবং এই মসজিদের সোপানাবলীর নিম্নেই একটি কক্ষে মুর্শিদকুলি গভী নসেরী বাহু বেগমের অস্তিমশায়া বিস্তৃত রহিয়াছে। মসজিদের প্রবেশদ্বারের উপর প্রস্তরকলকই ইহা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু পরিভ্রমণের বিষয় এই প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই সরকার পক্ষ করেন নাই। মসজিদের প্রবেশদ্বার ও সোপানাবলি কষ্টকাত্তরে জঙ্গলাকীর্ণ। মাদ্রাসের কথা দূরে, বঙ্গভ্রমণও সে পথে পথ পায় না। অচিরেই এই সমাধিস্থির কালের গর্ভে বিলীন হইবে। প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্ত আইন আমাদের আছে, কিন্তু মুর্শিদকুলির বেগমের সমাধির প্রতি এই অবহেলা কেন?

এই মুর্শিদাবাদ শহরেই নবাব সরকার বা চিবনিজার নিজস্বিত রহিয়াছেন। রেলওয়ে স্টেশনের অদূরেই নগিনাবাগে তাঁহার সমাধি। এই নগিনাবাগেই তাঁহার প্রাসাদ ছিল। সরকারী পরিচার্য্যর যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার মৃত্যু তৎক্ষণাৎ শব্দেরে মুর্শিদাবাদে লইয়া আসে ও গভীর রাত্রে অন্ধকার মধ্যেই উহা সমাধিস্থ করা হয়। নগিনাবাগ প্রাসাদের কোন চিহ্নই নাই। এমনকি মুর্শিদাবাদবাসী অধিকাংশ লোকই এই সমাধির সন্ধান পর্য্যন্ত জানেন না। সুতরাং বিষয় উহা বহুসংখ্যক ব্যক্তি হইতেছে। নিকটস্থ রাস্তার পার্শ্বে পথনির্দেশক কোনও ফলক থাকিলে উহা সাধারণের সুবিধিত হইত। এই সমাধির অল্প উত্তরে তাঁহার স্ত্রীর নির্মিত বেগম মসজিদ। মসজিদটিও ভাঙিয়া পড়িতেছে ও উহার চারিপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। উহার পশ্চিমে ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটি এই মহিলার সমাধি বলিয়া অনুমান হয়।

মুর্শিদাবাদের প্রায় এক মাইল পূর্বে বর্তমান স্টেট হাইওয়ের পাশে কাটবার মসজিদ। ইহার সোপানস্তম্ভের নিম্নে মুর্শিদকুলি-খাঁর সমাধি। এই মসজিদ ও সমাধি মুর্শিদকুলি নিজেই তৈরি করাইয়া বান। মসজিদটির পাঁচটি গম্বুজের মধ্যে মাঝের তিনটি সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কাটবার হুই ফার্ম দক্ষিণ-পূর্বে তোপখানা—এখানে জাহানকোবা তোপ আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে সতের ফুট ও পরিধিতে পাঁচ ফুট। উহা সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ঢাকার অনার্দীন কর্মকার কর্তৃক অষ্ট খাভুতে নির্মিত হয়।

নবাব প্যালেসের আর মাইল উত্তরে নশীপুর বাইবার পথের ধারে আজম নগর মসজিদ—মুর্শিদকুলির কত্যা আজিমুল্লাহর নির্মিত। মসজিদটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেলেও উহার সোপানাবলি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও তাহার নিম্নেই আজিমুল্লাহর সমাধি। গবর্ণমেন্ট হইতে ইহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। আরও এক মাইল উত্তরে জাকরাগঞ্জ। এখানে আলিবর্দি, সিদ্দিক ও মীরজাফর নবাব হইবার পূর্বে বাস করিতেন। এই জাকরাগঞ্জ প্রাসাদেই সিদ্দিককে সিংহাসনচ্যুত করিবার সকল মন্ত্রণাই গৃহীত হয়। ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস জীলোকের হস্ত-বেশে পালকি করিয়া এই জাকরাগঞ্জ প্রাসাদে আসেন। এখানেই মীরজাফর পুত্র মীরণের মস্তকে হাত রাধিয়া ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া ইংরেজদের সহিত অসীকারপালনের শপথ গ্রহণ করেন। এই Audience Hall কালের গর্ভে লীন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও আমরা উহা দেখিয়াছি। প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী উহা সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই কেন? মীরজাফর প্রকৃতির আবাসবাটী এখনও আছে। মীরণের বংশীয়গণ এখন এখানে বাস করে।

এই জাকরাগঞ্জ প্রাসাদে একটি কক্ষে হতভাগ্য সিদ্দিককে মীরণের আদেশে হত্যা করা হয়। সে স্থানটি এখনও দর্শককে দেখান হয়। এই দেউড়ীর বিপরীত দিকে রাস্তায় অপূর্ণ পার্শ্বে জাকরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র। এখানে মীরজাফর ও তাঁহার দুই স্ত্রী ববু বেগম ও মহিবেগমের সমাধি রহিয়াছে। জাকরাগঞ্জের অদূরে জগৎ শেঠদিগের প্রাসাদ ছিল। এখন গঙ্গাপার্শ্বে সম্পূর্ণ লীন হইয়াছে। এই শেঠ-পরিবার নবাবী আমলে বাংলার রাজনৈতিক সকল পটপরিবর্তনেই বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। সরকারীপন্থা সৈন্তগণকে জগৎশেঠই উৎকোচ প্রদানে আলিবর্দির অগ্রকূলে আনয়ন করেন। সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বড়-বল্লভ ও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজের সহিত বড়-বল্লভের অপরাধে এক জগৎশেঠ মীরকাশের কর্তৃক সুতানগে দণ্ডিত হয়।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে মুর্শিদাবাদের হুই মাইল দক্ষিণে খোসবাগ। এখানে এক আশ্চর্য্যবিকাির নীরব নির্জনতার মধ্যে আলিবর্দি ও তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিদ্দিক অস্তিমশায়া নির্মিত রহিয়াছে। আলিবর্দির পাশেই সিদ্দিকের সমাধি। তাঁহাদের পদতলে আলিবর্দি মহিবি ও লুৎফুল্লা শায়িতা। পদের হুইটি সমাধি আলিবর্দির হুই কতায়। খোসবাগের হুই মাইল উত্তরে ভাগীরথী তীরে ঘোশনীবাগে সুলতান সমাধি। ইহার উত্তরে সিদ্দিকের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ ও হীরাবিল ছিল, এখন গঙ্গাপার্শ্বে নিহিত।

নবাব প্যালেসের আর হুই মাইল দক্ষিণে মতিবিল। আলিবর্দির জাহাতি ঘসেটি বেগমের স্বামী, নোবাজেস মহম্মদ, এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে কিলের উপর তাঁহার প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। নোবাজেসের মৃত্যুর পর সিদ্দিক তাঁহার মাতৃশায় নিকট হইতে জোর করিয়া এই প্রাসাদ দখল করিয়া লন (১৭৫৬ অব:) ও তাঁহার ধনস্বত্ব আত্মসাৎ করেন। এই মতিবিল হইতেই সিদ্দিক চিবনিজার লইয়া পলায়িত হইয়া যিবকাশের ইংরেজ-বাহিনীর নিকট কাটোয়ার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এই মতিবিলেই ইংরেজদিগকে বাধা দিবার জন্ত সৈন্তসমাবেশ করেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। ইংরেজ সেনাপতি অ্যাডামস এখান হইতেই

যৌরজাকরকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ দিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বার হসনদে প্রেরিত করেন ( ১৭৬৩ অঃ )। ১৭৬৫ অব্দে ক্লাইভ মতিঝিলে থাকিয়া নবাবের সহিত দেওয়ানী হস্তাক্ষর করিবার আলাপ-আলোচনা করেন এবং ১৭৬৬ অব্দের মার্চ মাসে মতিঝিলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম 'গুণাহ' হইয়া রাজস্ব আদায় আরম্ভ হয়। নবাব দয়বাবে কোম্পানীর রেসিডেন্ট হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংস এখানেই থাকিতেন। সার জন শোরও কিছুকাল এখানে ছিলেন। মতিঝিল প্রাসাদের আর চিহ্নবাক্ত নাই। কিলের উপর একটি দালান দেখান হয়—যেখানে ক্লাইভ প্রভৃতি কোম্পানীর এজেন্টগণ বাস করিয়াছিলেন। মতিঝিল মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি বেটনীর মধ্যে নোয়াজেস মহম্মদ ও তাঁহার পালিত পুত্র সিদ্দিকের ভ্রাতা এক্সামুর্দোলায় সমাধি রহিয়াছে। মতিঝিলের দুই মাইল পূর্বে মরাক্ক মজিল। এখানে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের প্রথম অধিবেশন হইত।

মুর্শিদাবাদের চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে কাশিমবাজার। সে সময় ভাগীরথী খোসবাগের নিকট হইতে পূর্বমুখী হইয়া অধুনাভূতি একটি বাকি কাশিমবাজার ও কয়াসডাকার পাশ দিয়া আবার সৈকতাবাদের নিচে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথীর এই পরিত্যক্ত খাত এখন কাটিগঙ্গা নামে কথিত। এই কাটিগঙ্গার তীরে ইংরেজদিগের কুঠি ছিল। এখনও 'হাতার বাগান' মধ্যে এই রেসিডেন্সী খসড়া দেখা যায়। তৎকালে কাশিমবাজার শহর দৈর্ঘ্যে দুই মাইল বিস্তৃত ছিল ও জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে মালেরিয়ার কাশিমবাজার খস হইয়া যায়। রেসিডেন্সী সমুখের ইংরেজদিগের সমাধিক্ষেত্র। এখানে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথম স্ত্রী ও কস্তার সমাধি রহিয়াছে। 'সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্তি' বলিয়া ঘোষিত হইলেও এই সমাধিক্ষেত্র এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, ভিতরে প্রবেশ করা একরূপ অসাধ্য। কাশিমবাজার রেলস্টেশনের নিকটে ওলন্দাজদিগের সমাধিক্ষেত্র।

আরও পশ্চিমে সৈকতাবাদে আর্দেইনিয়ান গির্জা। এখানে বহু আর্দেইনিয়ান বণিক বাস করিত। শেখ আগা প্রেরণীর নামে এই গির্জা এখনও সেতাবাদ বাজার নামে পরিচিত। এই গির্জায় যেহী যাতার অতি সুন্দর একটি তৈলচিত্র ছিল। উহা এখন কলিকাতা আর্দেইনিয়ান চার্চে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গির্জাটি এখন সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সৈকতাবাদের উত্তরে কয়াসদিগের কুঠি ছিল। তাহার সকল চিহ্নই বিলুপ্ত হইলেও স্থানটি এখনও কয়াসডাকা নামে অভিহিত।

মুর্শিদাবাদের চার-পাঁচ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দ্বিতীয় ভবানী পূণ্যস্থতি-বিকল্পিত বয়ানগর। এখানে তাঁহার স্থাপিত ভবানীখর ও চৌবাংলা মন্দিরের স্থাপত্য বাংলায় শিল্পের একটি বিশেষ পর্যায়ের নিদর্শন। প্রাচীরপায়ে পোড়ান ইষ্টকে খোদাই করা রামায়ণ, মহাভারত, পুৰাণ কাহিনীর চিত্ররূপ ইহার বিশেষত্ব। প্রতিখানি ইটে চিত্রের এক একটি অংশ খোদাই করিয়া ইটগুলি পোড়ান পর তাহাদের স্তম্ভবৎ সরাবশে সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রাচীরপায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একরূপ ইষ্টক-চিত্র বাংলার বাহিরে বিরল।

মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্ণনার বাঙাঘাটির কথা বাদ দেওয়া চলে না। বহরমপুরের চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঙাঘাটি—সপ্তম শতাব্দীর রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্তব্যবর্ষ। চৈনিক পরিব্রাজক হুই-এন্-সাঙের রক্ত-মুক্তিকা বিহায় এখানেই ছিল। বাঙাঘাটি নাম আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে একটি স্তম্ভের কিয়দংশ খনন করান হইয়াছিল। একটি দালানের প্রাচীরের খানিকটা ও কতকগুলি terra-cotta মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু খননকার্য আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। এখানকার স্তম্ভগুলি খনন করিলে সে যুগের লুপ্ত ইতিহাসের উপর অনেকখানি আলোক-সম্পাত হইতে পারে।



## উগ্ৰ-স্মৃতি

শ্রীবেলা দেবী

পরিচর ত স্বল্পকালের, কিন্তু স্মৃতি এত বৃক্কেছা কেন? বেরনা  
এত বৃক্কেছাপানো কেন?

উনআশি বছরের জীবনে এই অল্প ক'টা দিনের ব্যাপ্তি আর  
কতটুকু? মহাকাশের বৃক্কে ত তা সামান্য একটি বিন্দুমান্ন!

তা হোক। কপিকের স্মৃতির মাধুর্য্যও কিছু কম নয়, মূল্যও  
কিছু কম নয়। তাই ত আজ মনের আঙ্গিনায় কত টুক্কো টুক্কো  
কথার ভিড়, প্রাণের তারে মিটি স্মৃতির বেশ।

প্রথম দিনের আলাপ 'সাহিত্যাতীর্থের' এক বিশেষ  
অধিবেশনে।

আমার 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলবেন।

'বলতে পারি, তবে একটি সর্ত্তে।'

'কি সর্ত্ত।'

তা হলে আপনাকেও আমার 'তুমি' বলতে হবে।

'সে কি? আমি যে আপনার চেয়ে অনেক ছোট, কি করে  
বলি, সে হয় না।'

'কেন হবে না। ইংরেজিতে ত এক You-তে কাজ চলে  
যায়। you মানে সাধারণতঃ আমরা বলি 'তুমি'। তবে আর  
এ বকমকের কেন?'

'কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকে।'

'বলতে বলতেই ঠিক হয়ে যাবে। কেমন যাকি ত?'

কি আর করা যায়। অগত্যা বলতেই হ'ল 'রাজি'।

কিন্তু মুখে যাকি হয়ে গেলেই ত হ'ল না। কাজের বেলার  
ক্রমাগতই ভুল হতে লাগল আর ক্রমাগত সংশোধন—

'উহ, তোমার ভুল হয়ে গেল কিন্তু। তুমি আমার আমার  
'আপনি' বলছ।'

'তাই ত। আচ্ছা, দেখ আর ভুল হবে না।'

থানিক পরেই। 'অন্ততঃ সাত-আট বছর বা আরও বেশি,  
আমি আপনার 'গল্পভারতীর' নিয়মিত পাঠক।'

হেসে বললেন, 'আবার তোমার ভুল হ'ল।' আর সঙ্গে সঙ্গে  
সংশোধন।

কবেই বস্তু হয়ে এল 'তুমি'। আর এই আপন করা 'তুমি'  
সংবাদটিই সঙ্গে বৃক্কে হ'ল যিট্ট একটি সম্পর্ক। 'দাহ'।

'দাহ। কেমন আহ?'

'না, হ'লিন বাবৎ শরীরটা তেমন ভাল না।'

'তুমি বস্তু পরিগ্রহ কর। এখন থেকে ষাটুনি একটু করিয়ে  
দাও।'

'কিন্তু পত্রিকাওয়ালাদের যে জোর তাগাদা, না করলে  
চলে না।'

'তার উপর বোঝাই ত দেখি সভ্যসমিতি একটা না একটা  
লেগেই আছে তোমার। শরীরের দোষ কি বল।'

'না, ওতে আমার শরীর ধারণ হয় না। জান ত, জলের মাছ  
জলেই ভাল থাকে। বরং ডাঙ্গায় থাকলেই মৃদ্বি।'

'আমরা এসে তোমাকে অসুস্থ শরীরে ব্যতিব্যস্ত করলাম ত।'

'না না' এবার সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। 'ভুল  
কর না, তোমরা আসাতে বরং সময়টা বেশ ভাল কাটল। নইলে  
বিছানায় শুয়ে নিজেই রোগী রোগী মনে হ'ত।'

আর একদিন কোন করে জানতে পারলাম তাঁর অর হয়েছে।  
কোনেই বললেন, 'আর কি। দিন ত বনিয়ে এসেছে। এবার  
বাবার জন্তে তৈরী হলেই হয়।'

সেদিনই বিকেলবেলা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়েই  
বললাম, 'কি, তোমার বস্তু দেহাক হয়েছে দেখছি।'

একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কিসের দেহাক।'

আমি বললাম, 'বয়সের দেহাক। সকালবেলা কোনে অমন  
বিচ্ছিন্ন ঠাট্টাগুলো করেছিলে কেন? এখনও ত আটের বয়ে  
পৌঁছও নি, তাই এত। পত্রিকার দেখতে পাওনা মানুষ একশ  
কুড়ি একশ পঁচিশ বছর বাঁচছে, আর একশ বছর ত মানুষ হামেশাই  
বাঁচছে। কাজেই তোমার দেহাক করবার মত বয়স এখনও  
হয় নি।'

তিনি হাসলেন। বললেন, 'আমি 'জ্যোতিষে' খুব বেশি  
বিশ্বাস করি না। কিন্তু পর পর তিন জন জ্যোতিষী আমার হাত  
দেখে বলেছেন আমার নাকি সাতাশি বছর পরমায়ু। এই তিন  
জনেই আর একটা কথা বলেছিলেন যেটা আমার জীবনে কলে  
গেছে। আচ্ছা, মনে হয় কি আমি আরও আট বছর বাঁচব?'

'নিশ্চয়ই বাঁচবে। আমিরা তার চাইতেও অনেক বেশি দিন  
তোমাকে ধরে রাখব। যেতেই দেব না।'

হায়বে। মানুষ জ্ঞেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তির হুঁকার টানে তার  
প্রিয়জনকে বেঁধে রাখতে চায়। বলে, 'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু  
নির্ধর্ম নিরতি সেকথা শোনে না। 'তবু যেতে দিতে হয়।'  
তাই তাঁর উনআশিতম জন্মদায়ক অগণিত অমর্য্যগীত অমর্য্যনিঃসৃত  
শতাব্দী কামনা তাঁকে আর হ'লি মাসও ধরে রাখতে পারল না।  
তিন তিন জন জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হয়ে গেল। সহজ সৎ  
মানুষটি, তাঁর প্রাণের আঙ্গিনায় ছোট-বড় সকলের জন্তই রয়েছে

উদার আদর্শ। তাঁর আন্তরিকতা সময়ের সীমা বেশে নির্ধারিত হ'ত না। ভেতরে অসাধারণ ছিলেন বলেই বুঝি তিনি বাইরে ছিলেন এক সাধারণ, স্নেহপ্রবণ যন আর একটি সুন্দর সাংখ্যিক ভাব। গত পূজার পর বিজয়ার প্রণাম করতে গেছিলাম। সে দিন ঘরে আর কেউ ছিল না। কত গল্প করলেন। বলছিলেন—‘আমার জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা কি জান?’

তার পর বললেন, ‘ছাত্র-জীবনে তিনি ঝামাপুকুবে এক যেসে থাকতেন, সেখানে তার এক দাদাও ছিলেন। যেস-বাড়ীর সামনে রাস্তা দিয়ে রোজ দু'টি ফুটকুটে ঘেরে ফুলে যেত। রোজই তিনি দেখতে পেতেন। আর কাছেই কোন বড়লোকের বাড়ীতে রাস্তা দিয়ে গানের আসর বসত। উপেক্ষনাথ সঙ্গীত-পিপাসু ছিলেন, গান শোনবার জন্য সেই বাড়ীর সামনে রাস্তায় তিনি রোজ পারচারি করতেন। কয়েক দিন এমনি কেটে গেলে একদিন বাড়ীর ভেতর থেকে গান শোনবার জন্য আমন্ত্রণ এল, কিন্তু সন্কেচ করে তিনি ভেতরে যান নি। তার পর ভাগলপুর চলে গেলে কিছুদিন পর তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। তখন তাঁর সেই দাদা তাঁকে বললেন, ‘ওরে উপীন, তোরা বিয়ে কার সঙ্গে ঠিক হয়েছে জানিস?’

‘কার সঙ্গে?’

‘সেই যে আমাদের যেসের সামনে দিয়ে দুটি ফুটকুটে ঘেরে ফুলে যেত, তার মধ্যে যেটি বড় ভাব সঙ্গে।’

‘তাই নাকি!’ তিনি অবাক।

‘আর তোরা স্বস্তর বাড়ী কোনটা জানিস?’

‘কোনটা?’

‘সেই যে গান শোনবার জন্য যে বাড়ীর সামনে পারচারি করতেন।’

‘এ্যা, সত্যি!’ তিনি আরও অবাক। (এই ঘটনাটি তিনি তাঁর কোন লেখার লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।)

‘কেমন, ঘটনাটা মজার নয়।’

আমরা হেসে উঠলাম। ঠিক সেই সময়ে দিদিমণি (উপেক্ষ-

নাথের স্ত্রী) ঘরে ঢুকলেন। তিনি তাঁকে দেখিয়ে বললেন, ‘এই যে, সেদিনের ফুটকুটে ঘেরেটি।’

আমরা আবার হেসে উঠলাম।

তার পর আরও কত কথা, সেই কথা সেই স্তর আজও যেন কানে এবং প্রাণে বাজছে। চলে আসার সময়ে তাঁর একটি বইয়ে নিজের হাতে আমায় নাম লিখে আমাকে দিয়ে বললেন, ‘এই নাও আমার বিজয়ার আশীর্বাদ।’

সত্যিই তাঁর আশীর্বাদ পেরেছিলাম। তাঁর প্রতিটি কথার প্রতিটি আচরণেই যেন পেতাম সেই আশীর্বাদের স্পর্শ।

৩১শে জাহ্নবীর পত্রিকাগুলি কাক-ডাকা ভোরেই সায়া শহরে ছড়িয়ে দিল ৩০শে জাহ্নবীর দুঃসংবাদ। সাহিত্যিক উপেক্ষনাথ নেই।

ছুটে গেলাম, পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করলাম, অশ্রু আর বাধা মানল না। সৌম্য প্রশান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কত দিনের কথা মনে পড়তে লাগল। সেই কষ্টের কানে বাজতে লাগল। মনে হ'ল একটা বিঘাট স্নেহের ছায়া যেন আমাদের মাথার উপর থেকে সরে গেল।

কত গুণী আর জাতীয় মেলা, কত ফুল আর মালায় স্তম্ভ, কত ভক্তি আর শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর অশ্রুজল, এর মধ্যে দিয়ে শব্দযাত্রা চলল কেওড়াতলা খাণানে। যথাবিহিত অমৃত্যুতানের পর সৌম্যমূর্তি দেহখানিকে চাপান হ'ল চিতাশয্যায়।

আর, কাষ্ঠময় চিতাশয্যা না জানি কি কঠিন।

কে একজন হৈকে বললেন, ‘ওরে, মাথাটা নিচু হয়ে পড়েছে, মাথার নিচে আর একখানা কাঠ দিয়ে দে।’

নাঃ, আর সহ্য করা যায় না, চোখের জল মুছতে মুছতে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

কালের প্রাণেপে তাঁর বিচ্ছেদজনিত ক্ষত হয়ত বা একদিন সায়েব কিন্তু তাঁকে হারিয়ে আমাদের যে ক্ষতি হ'ল তা কোনদিন পূরণ হবে না।





# আলোচনা



“ভারতের সংস্কৃতি”

উত্তর

শ্রীসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

আপনার জনপ্রিয় প্রবাসী পত্রিকার বর্তমান বর্ষের কাল্পনিক সংখ্যায় ৫৩৩ পৃষ্ঠার ভারতের সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে—শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় কলিত জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, “কলিত জ্যোতিষ জ্যোতিষীর অর্থাগম ও অঙ্গসংস্থানের অন্তর্গত রচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকারপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য মানুষের কোঁতুলও সেই পরিমাণে উগ্র। সেই কারণে, সেই দুর্কলভ্যায় কলিত জ্যোতিষ প্রাচ্য প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে নচেৎ জয়লগ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কোণী বিচার এবং বিবাহের ষোটক বিচার এক অন্ধ কুসংস্কারের পরিণাম এবং প্রতিকূল যাত্র। এ কুসংস্কার অবিলম্বে দূর করা কর্তব্য।” শ্রীসেনগুপ্ত মহাশয়ের কলিত জ্যোতিষ প্রবন্ধে এ উক্তি গ্রহণ করা কঠিন। জ্যোতিষশাস্ত্র ভারতের অতি প্রাচীন বিদ্যা এবং বেদাঙ্গসমূহের অন্তর্গত। বিজ্ঞান-নিরস্ত্রিত-জীবন, যুক্তিবাদী আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের বহু মনীষী আজও কলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই যে বিদ্যার গবেষণা অব্যাহত আছে, তাহা নিছক ধর্ম্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে এতদিনে কলিত জ্যোতিষ লুপ্ত হইয়া বাইত। মানুষ যেমন বড়, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যায় প্রতিরোধ করিতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আভাস পূর্নাঙ্কে পাইয়া সতর্ক হইতে পারে, সেইরূপ মানুষ তাহার প্রাক্তনকে অতিক্রম করিতে না পারিলেও কলিত জ্যোতিষের সাহায্যে ভাবী কলভোগের আভাস পাইয়া সতর্ক হইতে পারে ও অনিবার্য আঘাত কাটাইয়া উঠিবার জন্য বল সংগ্রহ করিতে পারে। এইখানেই কলিত জ্যোতিষের সার্থকতা। কলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তসমূহ সব সময়ে নিতুল হয় না, তার কারণ অজ্ঞাত সকল বিদ্যায় তার এই বিভার উৎকর্ষ লাভও বিভার্ণীর সাধনা সাপেক্ষ। বিভার্ণী যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করেন তাঁহার গণনাসমূহও ততটুকু পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়।

আজিও শুভপাড়া গ্রামের শ্রীসন্তোষনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মত জ্যোতিষী আছেন যাহারা অর্থ গ্রহণ করেন না, আত্মপ্রচার করেন না, জ্ঞানের জন্য ও জনহিতৈষিণীর জন্যই জ্যোতিষের অন্বেষণ করিয়া এই বিভার উচ্চ স্তর অধিগত করিয়াছেন। স্তব্ধতা যাহারা বৈদ্য, বেদাঙ্গ, ও বেদান্তের চর্চা করিতেছেন—তাঁহারা অর্থাগমের জন্যই তাহা করিতেছেন—একথা একান্ত অস্বাভাবিক।

প্রতিবাদের উত্তরে নিম্নে সংক্ষেপে এবং সবিনয়ে আবার যুক্তি-গুলি নিবেদন করিতেছি :—

১। ভূমিকম্প, বজা, আগ্নেয়গিরির প্রাব, প্লেগাদি মহামারী, জাহাজ-ডুবি, বেল-দুর্ঘটনা এবং হিরোসিমা নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির এককালীন মৃত্যু হইতে বুঝা যায় কোণীর বিচার কত ভিত্তিহীন।

২। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার guineapig-এর মত যে কোনও প্রাণীর কোণী করিয়া তাহার নিধন দ্বারা কোণীর বার্ষিক প্রমাণ করা যায়। অসংখ্য প্রাণী যন্ত্র ছাড়াই অহরহঃ খাদ্যার্থে নিহত হইতেছে। Slave-Trade-এর যুগে ও আটমিক যুগে এবং বাস্তবিক যুদ্ধে মানুষও প্রায় গিনিপিগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।

৩। যে কোন মহানগরীতে একই সময়ে বহু সন্তান প্রসূত হয়। তাহাদের ভাগ্যকল এক হয় না, হইতেও পারে না। অন্য কথা দূরে থাক প্রসূতির প্রসবের কাল এবং গর্ভস্থ জ্ঞান পূত্র কি কন্যা কিবা স্ত্রী হইবে তাহাও বলা যায় না।

৪। সন্তানের জন্মকালের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনির্দিষ্ট। জন্মযুগে পুং স্ত্রী বীজ মিলনের ফলে গর্ভ উৎপন্নের কালই প্রকৃত জন্মকাল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোনও সংজ্ঞা নাই। Placenta (ফল) অংশতঃ মাতার এবং অংশতঃ জন্মের অঙ্গজাত, অর্থাৎ ফল প্রসবের সময় রাখা হয় না। স্থান অস্থায়ী Equation of time হিসাবে সময় সংশোধনের কোনও প্রথা নাই। অবশ্য আবার প্রবন্ধের প্রতিপাত্ত যুক্তি অস্থায়ী তাহা থাকিলেও কোনও লাভ হইত না।

৫। সূর্য্যাপেক্ষা বৃহৎ অসংখ্য জ্যোতিষমণ্ডলী প্রকৃতির ক্রান্ত-পারী রথের সংক্রমণশীল চক্রের মত। সেজন্য গণিত-জ্যোতিষের দ্বারা সূর্য্যচক্রের গ্রহণ, ধুমকেতু, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতির সময় নির্ণয় করা যায়। মানুষের ভবিষ্যৎ জটিল এবং বহু কারণের উপর নির্ভর করে। তাই গীতা বলেন, “অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা...দৈব-কৈবল্য পঞ্চমম্” (১৮.১৪)। এই পাঁচটিই পরিবর্তনশীল, স্তব্ধতা তাহাদের কল অজ্ঞেয়।

৬। শাস্ত্র অর্থে বাহার দ্বারা আবদা শাসিত হই। ইহাও পরিবর্তনশীল। শ্রুতিশাস্ত্র তত্ত্ব যুগে প্রবন্ধের সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রুতির বাক্যযাত্রকেই সত্য ধরিলে,—“বেদা বিভিন্নাঃ স্তব্ধয়ো



বিভিন্না না সৌ মুনি যন্ত যতঃ ন ভিন্নম” বলিবার প্রয়োজন হইত না। বাহা হইতে প্রকৃত জানলাত হয় তাহাই বেদ অথবা বেদবৎ মাননীয়। কিন্তু বাহা কিছু স্মার্ত সংহিতায় লিখিত হইয়াছে তাহাই সত্য নহে, নচেৎ ‘সতীদাহ’ শিত-বিবাহ প্রভৃতি নিবারণের কোন প্রয়োজন হইত না।

কেবলং শাস্ত্রমাজিত্য ন কর্তব্যো নির্ণয়ঃ।

বুদ্ধিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রচারতে।

১। অসিদ্ধ লক্ষণ বিচারে, কলিত জ্যোতিষ ব্যবসায়ী অবশ্যেই প্রতিবিধানকল্পে গ্রহগণ, গ্রহশক্তি, যাহুলী কবচ

ব্যবণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা জ্যোতিষীয় অর্থগণন হয় কিন্তু জনসমাজ, দেশে, মনে এবং যত্নে কতিপয় হয় যাত্র। যথেষ্ট উপর ভগ্নরাখের দিকে না চাহিয়া, যথেষ্ট চক্রবর্তী দিকে চাহিয়া তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয় এবং তাহাতে আধ্যাত্মিক ব্যতিচার ঘটে। ফলে, একান্ত ভাবে, যাহুযের একমাত্র আশ্রয় পদমেধেরেই শরণ গ্রহণ করিতে লক্ষ্য হয়।

[ এ বিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না ]।

প্রবাসীর সম্পাদক

## তমসার ফুল

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

এ পৃথিবী নিঃস্ব হ'ল  
পূর্ণকৃত্ত শূন্য হ'ল তার।  
সুখাহারা রিক্তা ধরা  
ওষ্ঠপুটে তবু বায়েবার  
‘অমৃত এনেছি’ বলে  
কালকূট ধরেছে এ মুখে ;  
আমি তবু আশ্রহারা  
বুড়ুকার প্রথর কোঁড়কে  
চম্পক অঙ্গুলি হেরি  
নয়নাগ্রে হেরি নবালোক  
আশ্র সমর্পণ করি  
ভুলে গেছি অতীতের শোক।  
কতান্ত-শোণিতসিক্ত  
জড়া বসুধার কোলে কোলে

আমি তবু দেখে যাই  
একটি মে মধুলতা কোলে।  
বুকে তার গন্ধবহা  
আকর্ষণী ফুটে ওঠা ফুল  
এ দেখে আপন করি  
করে মোরে অধীর আকুল।  
তার দেহ-পরিমলে  
রিক্তা বসুধার রতিস্বাধ  
নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি  
কিবে পাই মনের আশ্রাদ।  
সে সমুজ্জ্বল ডুব দিয়ে  
জীবনেবে আজ তুলিলাম,  
আলোকভীর্ণের পথে  
তমসার ফুলই তুলিলাম।

# একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচ যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শব্দর সীতার  
পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে  
দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন  
না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোরা-  
লের ধুপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জল  
এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে!  
সানলাইটের কার্যকারী ও অফুরন্ত ফেনা  
কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং  
কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারে না!  
আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না  
কেন... আজই!



• সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জল করে

B. 267-X52 BG

হিন্দুস্থান লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

# গে'স্বামী তুলসীদাস ও 'রামচরিতমানস'

## শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়

'ভারতের অধিতীয় ভক্তকবি গো'স্বামী তুলসীদাস। তাঁহার অক্ষর সৃষ্টি 'রামচরিতমানস'। এই অমূল্য সাহিত্য-সম্পদকে কেবলমাত্র 'রামায়ণ' অখ্যা দান করিলে ইহার ব্যাপক সত্তাকে অনেকখানি ধ্বংস করা হইবে। ইহাকে বেদ, শ্রুতি, উপনিষদ, পুৰাণ ও যোগ-বার্শিষ্ঠ রামায়ণের সমন্বয়াক্ষর ধর্মমূলক ভক্তিগ্রন্থ বলিলেই এই মুগ-সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থের উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে।

অমর কবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' রচনাকালে বাস্তবিক রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই ইতিবৃত্তাংশ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—

"নানা পুরাণনিগমায়ম সম্মতং

বদ রামায়ণে নিগদিতং কচিদন্ততোহপি।"

পুরাণের মূলতত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে স্বীয় প্রতিভাবলে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারায় প্রবাহিত করিয়া তিনি উন্নত ও বলিষ্ঠ সামাজিক আদর্শের দিকনির্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রামায়ণের চতুর্থে 'শিব-ভাবানী' তত্ত্বের সাবলীল সমাবেশ গো'স্বামী তুলসীদাসের এক অভূতপূর্ব অবদান। ইহা পাঠক-সমাজকে একদিকে যেমন ভক্তিরূপে আদ্রুত করে, অত্রদিকে তেমনই সেই রস-বিভ্রবেষণের মাধ্যমে সর্বকালের এবং সর্বলোকের শাস্ত ও সনাতন ধর্মীর আবেদনকে সন্য জ্ঞাত রাখিয়া দেয়।

তুলসীদাস নামতত্ত্বের মহিমায় প্রোজ্জ্বল। তাঁহার এই নাম-তত্ত্বের স্বরূপ শিবতত্ত্বের মাধ্যমেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার রামতত্ত্ব সম্যকরূপে প্রণিধান করিতে হইলে সর্বভাগী শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। এইখানেই তাঁহার গ্রন্থ মৌলিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কারণ মূল-রামায়ণে 'শিবতত্ত্ব'র সন্ধান পাওয়া যায় না। অধ্যাস্ত-রামায়ণ হইতে কবি এই 'শিব-তত্ত্ব'র বীজ সংগ্রহ করিয়াছেন। তার পর জীবনব্যাপী সাধনার বলে সেই শিবতত্ত্বকে স্বীয় আধ্যাত্মিক অমুভূতির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ভক্তির উচ্চমার্গে। অবলীলাক্রমে নাম ও নামী একত্রী-ভূত হইয়া একক সত্তা পরিগ্রহ করিয়াছে।

যোগবার্শিষ্ঠ রামায়ণের অন্তর্গত 'রাম-বার্শিষ্ঠ-সংবাদ' অধ্যায়ে প্রোথিত তত্ত্বনিচয় জনসাধারণের মনে স্থায়ী বেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান অথবা আধ্যাত্মিকার অবতারণা করিয়া সেখানে গ্রন্থকার মূলতত্ত্ব হইতে অপসাদিত হইয়াছেন। বিভ্রবেষণগুলিও সহজবোধ্য নহে। তুলসীদাস সেই জটিল তত্ত্বের প্রোজ্জ্বল এবং সাবলীল সমাধান করিতে অসাধারণ সাক্ষালাভ করিয়াছেন ভবানীর প্রতি শিবের আচরণের

মাধ্যমে। তুলসী-রামায়ণের 'শিবতত্ত্বের' মর্ম্মকথা—ভক্ত কর্তৃক দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মে ভিতর দিয়া সন্তপ ও নিগুপের উপলব্ধিকরণ এবং ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে চরম ও পরম প্রাপ্তির সন্ধান-লাভ। যে মহাপুরুষের জীবনে এবশ্প্রকার উপলব্ধি এবং সন্ধান-প্রাপ্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তিনিই বিধাতা প্রেথিত ধর্ম্মাবতাবের প্রতীকস্বরূপ এবং এইরূপ আদর্শ পুরুষের পদবর্ণু স্পর্শে সমাজ তথা জাতি গানিমুক্ত হইয়া চরম সত্যতে প্রণিধান করিবার যোগ্যতা অর্জন করে।

তুলসীদাসকৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত কাকভূষণের মুখ-নিঃসৃত অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা লোকশিক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অপরিহার্য। সংশয় জর্জরিত মানবমন যুগে যুগে ইহার অভ্যন্তরস্থিত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা দেশকে কৃতকৃতার্থ করিতে পারেন। তাই তুলসীদাসের ক্ষয় নাই। রামায়ণের নন্দনকাননে তুলসীদাস চিনমনী পারিজাত বিশেষ। ভারতের কাব্যনিকূলে তিনি স্রষ্টিকালেরে জন্ম স্বর্গীয়, বর্গীয় এবং অভিনন্দনীয়।

এই মহাকবির পুণ্য আবির্ভাব-দিবস সম্পর্কে একাধিক মন্তব্য থাকিলেও ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া বাইতে পারে। প্রয়াগের অনতিদূরে বাদা জেলায় দাঙ্গপুত্র গ্রামে আত্মারাম দ্বয়ের গুহে তুলসীদেবীর গর্ভে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরজীবনে গো'স্বামী তুলসীদাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহার বাল্য নাম ছিল 'রামবোলা'।

বিবাহ কবির জীবনে আনয়ন করিয়াছিল ভোগের উদ্গাদনা। জীবনসঙ্গিনীকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার নারীত্বের রূপ-রসকে অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে গিয়া তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন স্বীয় ধর্ম্মপত্নী রত্নাবলীর নিকট। দীনবন্ধু পাঠকের এই মহীয়সী কহা স্বামীকে বিপথগামী হইতে দেখিয়া একদিন তৎ সনা-চ্ছলে বললেন—“অস্থিচর্ম্মর এই দেহের প্রতি তোমার এই অমুহুরাগে দিক্। যদি ইহার অর্ধেক অমুহুরাগ রামের প্রতি থাকিত তবে তোমাকে ভবদুঃখ ভোগ করিতে হইত না।” সাধী পত্নীর মুখনিঃসৃত এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশবানী শুনিয়া কবির জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত হইল। বৈরাগ্যের অনাশ্বানিতপূর্ব বিহ্বলতার কবি তৎক্ষণেই তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়া পড়েন। কালক্রমে আনন্দে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি চিত্রকূটে আগমন করেন এবং এই স্থানেই অলৌকিক সাধনার বলে নবদুর্কাদলস্তায়, নয়নাভিরাম রামচন্দ্রের সহিত কবির সাক্ষাৎলাভ

হটে। কিংবদন্তী আছে—এই অসম্ভাব্য সৌভাগ্য অর্জনের  
স্বাবহিত পথেই অধোধ্যায় গিয়া তিনি স্বয়ং শিব কর্তৃক 'রাম-  
চরিতমানস' রচনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

রামচরিতমানস ও তাহার অমর স্রষ্টা তুলসীদাসের জনপ্রিয়তা  
সম্পর্কে অধৈতবাদী দত্তী সন্ন্যাসী যথুন্দন সব্বভী মহাশয়ের শ্রদ্ধা  
মিশ্রিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

‘আনন্দকাননে হুসিন লজমন্তলসীতরুঃ  
কবিতা মঞ্জরী বস্ত রামভ্রমর-ভূষিতা।’

অর্থাৎ কালীকর্ণ আনন্দকাননে ভ্রমণশীল যে তুলসীবৃক্ষ তাহা  
স্বয়ং তুলসীদাস, তাঁহার রামচরিতমানসের কবিতা হইল সেই  
তুলসীবৃক্ষের মঞ্জরী আর সেই মঞ্জরীতে শোভা পাইতেছেন  
রামরূপী ভ্রমর।

সমকালীন যোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁহার রাজত্বশচিব  
তোডরমল্লও তুলসীদাসের ভক্তিমহিমা ভাৱে বাঁধা পড়িয়াছিলেন।

রামচন্দ্র কে এবং আদৌ তাঁহার পাখিৰ অস্তিত্ব ছিল কি না  
এ বিষয়ে তর্ক এবং সমালোচনার অন্ত নাই। “বিশ্বাসে মিলিয়ে  
বস্ত—তর্কে বহুদূর।” আলোচ্য প্রবন্ধে সে জটিল সমস্যা সমাধানে  
প্রবৃত্ত না হইয়া এই কথাই বলিব যে প্রাচীন মহাপুরুষদের প্রোথিত  
তত্ত্বকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের কালজরী ঐতিহ্য। যুগে  
যুগে ধূলিমলিন পৃথিবীর চত্বরকে ভাষ্য এবং প্রোচ্ছল করিয়া  
তুলিতে আবির্ভূত হইয়াছেন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথ  
লিখিয়াছেন :

“কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান  
অধোধ্যায় চেরে সত্য জেনে।  
...তাই সত্য বা রচিবে ভূমি  
ঘটে বা—তা সব সত্য নহে”

বিশ্বকবিৰ এই উক্তি আমাদের সমস্ত সংশয়-নিবসনে অগ্রনৃত।  
ভক্তের মানস-উদ্ভূত অধ্যাত্ম-রূপটিই ঈশ্বর। তিনি রাম, আবার  
তিনিই কৃষ্ণ। অশান্তির দাবানলে বিশ্বজগৎ যখন বিদগ্ধ—বন্দ্য,  
দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতার বিধে পৃথিবী যখন জর্জরিত, সেই  
সঙ্কটমুহুর্তে অসামান্য প্রতিভাশালী কবি বা লেখক লেখনীর অরি-  
ক্ষলিত হাতে লইয়া অবতীর্ণ হন বিশ্বসমগ্র। সমাধানের পটভূমিকার  
সার্বজনীন রামতত্ত্ব লইয়া নূতন সমাজ-গঠনের মাধ্যমে রামরাজ্যের  
উদায় পরিকল্পনার প্রাবৃত্ত করেন সমস্ত অঙ্গন-পতন, দোষ-ত্রুটি,  
হতাশা-নৈরাশ্য এবং দৈন্ত-দুর্দশাকে।

“ভায় কৃতায় অমথ আলসহ।  
নাম লপত মল্ল দিসি দসহ।  
অমিহি সো নাম রাম গুণগাথা।  
করউ নাই রঘুনাথহি মাথা।”

গোবিন্দী তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’ আমাদের কাছে সন্ধান  
দিয়াছে সেই আদর্শের যাহা ভক্তের প্রেমাক্রবির্ভোত ব্ধিকাত্তর  
অন্তরের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তুলসীদাসের  
রামচন্দ্র গুণাতীত, বিশ্বসুখদাতা, মঙ্গলবিধায়ক, ‘মানসমোহন’ এবং  
‘ভক্তজীবন’। রামের চেয়ে নামের প্রাধান্যই তাঁহার অন্তর-বোণার  
অমুদ্রণিত। রামনামের মধুর রসে মজিয়া গিয়া তাঁহার লেখনী-  
নির্ভরে নিঃসরিত হইয়াছে নামের বক্তা। রামের প্রেমে তুলসীদাসের  
রামনাম অপূর্ব ক্রিয়শীল হইয়াছে। এ প্রেম সাধারণের অমুভূতির  
গণ্ডী-বহিভূত। এ প্রেমে আবিলতা নাই, কলুষতা নাই,  
মালিন্যের লেশ নাই। এ প্রেমে মানুষকে তিল তিল করিয়া উর্ধ্বে  
উন্নিত করিয়া দেবলোকে প্রতিষ্ঠা করে। এ অমুভূতি দেবতাকে  
প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করিবার স্পর্ধা দান  
করে। এ প্রেমে সংশয় নাই, দ্বিধা নাই, অস্বাভাব্য নাই। এই  
একেশ্বরবাদী, শাস্ত, সার্বজনীন এবং চিরন্তন প্রেমই প্রতিফলিত  
হইয়াছে তুলসীদাসের ‘একমেবাধিতীয়ম্’ একতাব্যাক্তিতে। তাই  
তুলসীদাস অমর। তাই তাঁহার ‘রামচরিতমানস’ যুগস্রষ্টিকারী  
এবং কালজরী।

## দি ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া নিমিটেড

কোন : ২২—৩২৭২

গ্রাম : কৃষ্ণসখা

সেক্টর অফিস : ৩৬নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

কিঃ ডিপজিটে শতকরা ৫ ও সেভিংসে ২, হুদ দেওয়া হয়

আবায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল ছয় লক্ষ টাকার উপর

চোরায়মান :

জঃ ম্যানেজার :

শ্রীজগন্নাথ কোলে এম,পি, শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে

অফিস অফিস : (১) কলেজ চোরায় কলিঃ (২) বাঁকুড়া

## অগড়া

### শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

থাকে বলে আবার কাঁচকলার। সাপে আর নেউলের সবুজ। পাড়াপড়শীরা তিক্ত বিরক্ত। দু'টিতে রাত দিন অগড়া।

লক্ষ্মী ও সম্বতী। একই পাড়ার বাসিন্দে। একই বস্তীতে থাকে। কেউ কাকে নিন্দে না করে ভুলটুকু পরাঙ্ক স্পর্শ করে না। কেউ কারও ছায়া মাড়ায় না, দুটির বয়স অল্প, একজন বে'গা, কালো, আর একজন মোটা কসাঁ। ওদের স্বামীরা একই কারখানায় কাজ করে। দুজনের একই ড্রিপাটমেন্ট। আবার দুজনের মাইনেও একই, এক সঙ্গে আপিসে যায়, আবার এক সঙ্গে আপিস থেকে আসে, হাসি ঠাট্টা করে। একটি বিড়ি দুজনে ভাগ করে ধায়। এই সব মেয়েলী অগড়ার মধ্যে এরা নেই। এরা বাদ ও লক্ষণ। সকলেই বলে হরিহর জাম্বা! অথচ, ভাব নেই শুধু লক্ষ্মী ও সম্বতীর, কেউ জানে না তার কারণ, এ রক্ত ভেদ করা অসম্ভব।

দুজনের ঘর পাশাপাশি, এ-পাশের ঘরে থাকে লক্ষ্মী, ও-পাশের ঘরে থাকে সম্বতী, দু'জনেই নিঃসন্তান। একেবারে—ঝাড়া হাত পা। তথাপি এদের অগড়া। কিন্তু, এই অগড়া বিবাদের মধ্যেও দু'জনের কাজের একটু মিল দেখা যায়, সন্ধ্যা হলে দেখে লক্ষ্মী ঘরে ধুনা দিল। সম্বতীও তার দেপাদেপি ধুনা জ্বালাল নিজের ঘরে। লক্ষ্মী হয়ত, ঘর ঝাট দিয়ে গজাজল ছিটিয়ে দিল। সে সময় ঘরে বসে সম্বতী অল্প কাজ করছিল। লক্ষ্মীকে গজাজল দিতে দেখে, তার আর সহ্য হ'ল না। সে কাজ কেলে উঠে দাঁড়াল, ঘর ঝাট দিল, পরে গজাজল এনে ছিটিয়ে দিল এ-দিক ও-দিক। আড়চোখে লক্ষ্মী একবার দেখে নিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসল, তারপর নিজের কাজে মন দিল।

দু'জনেই উৎসুক নয়নে চেরে থাকে, কে কি করে দেখবার জ্ঞান, অথচ কেউ কারও নিকট ধরা দিতে চায় না, এই ভাবেই চলেছে ওদের দিন, মাস, বছর।

একদিন ভোরবেলায়, লক্ষ্মী জ্ঞান করতে গিয়েছে ঘাটে। ওদিকের একটা ঘরে নূতন ভাড়াটে এসেছে। তার ছোট্ট মেয়েটি ঘর ঝাট দিয়ে, তার জঞ্জালগুলো কেলে দিয়ে গেল লক্ষ্মীর দোরগোড়ায়। এ দিকে লক্ষ্মী জ্ঞান করে এসে দেখল, তার দোরগোড়ায় কতগুলো জঞ্জাল। একেই সে নোঙরা দেখতে পায় না, তার আবার তারই ঘরের নিকট। লক্ষ্মী গেল বেগে। সম্বতী তখন কাপড় নিয়ে ঘাটে চলছিল, তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মী চীৎকার করে উঠল, বলি, ও শতেকথাগী, ময়লা ফেলবার আর জায়গা পেলি নে।

আমার দোরগোড়ায় কেন, লা। বড় করে নিজের ঘরে বেগে দিলি নে কেন?

সম্বতীর বাঁওরা আর হ'ল না। সে খবকিয়ে দাঁড়িয়ে গজান করে উঠল, মর, মর, হতভাগী, আমি শতেকথাগী হব কেন, যে, যে কেলেছে তাকে শোনা গিয়ে শুটকী। সম্বতী লক্ষ্মীকে ওঁকী বলেই ডাকে।

লক্ষ্মীও কম নয়; সেও ফোস করে উঠল। কি, আমি শুটকী? বলি ও মুটকী, ও ভুতনী। যত বড় মুখ নয় হোর তত বড় কথা। বাবে বাবে জিব খসে বাবে। বলি মত মে'ক ভাল নয়-বে, ভাল নয়।

সম্বতীর স্বয়ং এবার নীচু পক্ষায় নেমে এল, বলল, বা—বা, শকুনের শাপে গরু মরে না।

দেখিস—মরে কিনা। বলেই লক্ষ্মী রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল।

বস্তীর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে ঘেঁটুবন। তারি এক ধারে একটা এদো পুকুর, পানো পাড়ে পুকুরটা বুজে গিয়েছে। বস্তীর ঘেরবা পানো সবিরে একটু জায়গা করে ঘাট বানিয়ে নিয়েছে, এখানে ঘেরবা কাপড় কাচে, বাসন মাজে, কেউ বা গা-ও ধোয়। পুকুরের ও-পাশে একটু দূরেই চটকল, ঐ কারখানার কাজ করে রাম ও লক্ষণ।

বছরের শেষ মাস। সংক্রান্তি। দিনেরও শেষ। সূর্য্য সবে পশ্চিমে হেলে পড়েছে, তার স্থান বশ্মি এসে পড়েছে এদো পুকুরের ঘাটে। সম্বতী বসে বাসন মাজছিল। তার অনাবৃত কস। পিঠের উপর ঘামের বিন্দু, তার উপর সূর্য্যের রশ্মি পড়ে মুক্তার মত জ্বল জ্বল করছে। ছোট ঘাট, একজন ভাল করে বসলে, আর একজন বসে কাজ করা কষ্টকর। জনশূন্য ঘাট, ঘাটের মাঝখানে বসে সম্বতী আরাম করে বাসন মাজছে।

এমন সময়, এক গাদা কাপড় নিয়ে লক্ষ্মী এসে ঘাটের উপর দাঁড়াল। সম্বতী তখনও বসে বাসন মাজছিল। লক্ষ্মী তীক্ষ্ণ নয়নে একবার সম্বতীকে দেখে নিল, পর মুহূর্ত্তেই সে চোঁচিয়ে উঠল, বলি, ও নবাবের বউ, তোম কাজ কি আজ শেষ হবে না? সেই সাত সকালে এসে ঘাট আগলিয়ে বসে আছিস, বলি, ঘাট কি, তোম বাবুর সম্পত্তি নাকি?

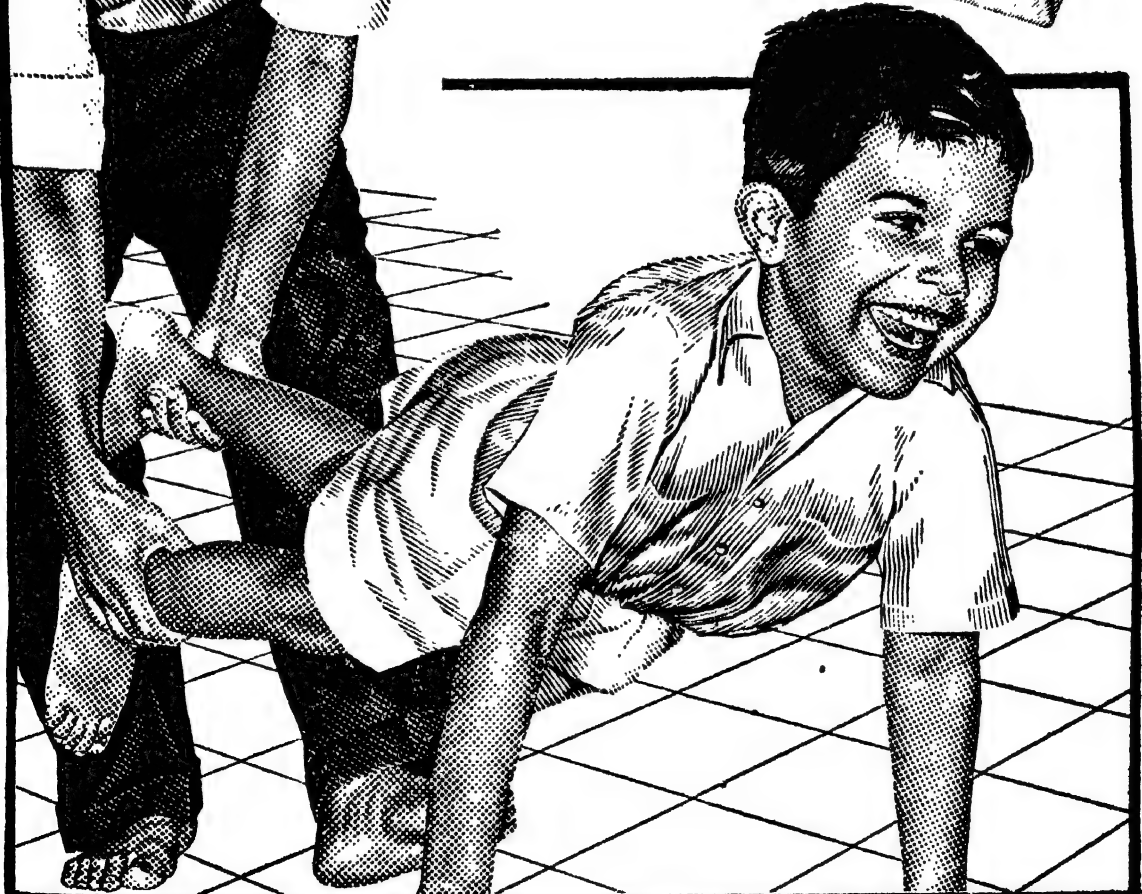
সম্বতী একমনে কাজ করছিল। লক্ষ্মীর আগমন সে টের পায় নি। হঠাৎ আক্রমণে, সে হকচকিয়ে গেল। সে মুখ

# যাঁর স্বাস্থ্য সশ্রদ্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করেন ।



যে পরিবারে ছেলেবুকে। সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবুয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবুয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা করবারে করে তোলে।





ঘুরিয়ে, ঠাঁত মুখ খিচিয়ে বলল, মুখ সাবলিয়ে কথা বলবি, শুটকী, ছোটলোকের ঘরে কোথাকার। ভজলোকের সঙ্গে কথা বলতে শেখ নি ?

ঘাটের উপর থেকে লক্ষ্মীর কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল। ইস, কত ভজলোক জানা আছে, ভজলোক যদি হবি, বাপ তুললি কেন ?

সরস্বতী বলল, তুই ত আগে বাপ তুললি, শুটকী।

লক্ষ্মী বলল, কেন শুটকী। নিজে মুটকী বলে এত অহঙ্কার, থাকবে না, ওরে ও গতর থাকবে না, দেখে নিস।

মুটকী কথাটা শুনে, সরস্বতী ভালবাসে, তাই নরম সুরে বলল, বা—বা, চেষ্টা নি। শকুনের শাপে গরু মরে না।

ঘাড় বেকিয়ে লক্ষ্মী বলল, দেখিস, শাপ কলে কি না ?

প্রতি উত্তরে, সরস্বতী কি যেন বলতে বাচ্ছিল। হঠাৎ ও-পারের চটকলের সিটি বেজে উঠল। শিকটের বদলীর সকেত। এক দল কর্জক বাবে, আর এক দল ছুটি পাবে। এই পুকুর-পাড়ের দুই দিকে দুইটি সুরু বাস্তা গিয়েছে। এবান থেকেই শ্রমিকরা বাবে আসবে। কেউ গাইবে, কেউ বা শিস দেবে, কেউ বা হাসি ঠাট্টা নিয়ে মজগল হয়ে পথ চলবে। তাদের ঝগড়া যদি এরা শুনে পায়, তবে এরা ভিড় জমিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ ঠাঁত বের করে হাসবে। কেউ বা অজ্ঞান ঠাট্টা-বিক্রম করবে। একটা বিল্লী কাণ্ড হবে। অতএব চুপ করে থাকাই ভাল। এর পরেই দেখা গেল, সরস্বতী ঘাটের দক্ষিণমুখে হয়ে বাসন মাজছে। আর লক্ষ্মী উত্তরমুখে হয়ে কাপড় কাচ্ছে। হুঁতনেই নীরব। দেখা গেল ওদিকে চটকল হতে সারি দিয়ে লোক চলে আসছে। শূণ্য পথ-ঘাট এখন সজীব হয়ে উঠল।

বস্তীর লোকেরা একটু অবাক হয়ে উঠল, ব্যাপার কি ! হঠাৎ বাড়ীটা এত শান্ত হ'ল কেন ? লক্ষ্মী ও সরস্বতী এত সভ্য হ'ল কেন করে ? লক্ষ্মীর সে কর্কশ কণ্ঠ আর নেই, সে একেবারে মাটির মাহুয। সেই রাতদিন ঝগড়া আর নেই, কেমন যেন একটু ধমধমে ভাব। ঘরের দরবার নিকট মরলা দেখলেও লক্ষ্মী চুপ করে থাকে, কেমন যেন বিমর্ষ ভাব। খায় না, দায়না—দিনরাত শুয়ে থাকে, সময় সময় ওঠে বসি করে। ঘর এখন নোঙরা হয়েই থাকে, সন্ধ্যায় সে ঘরে ধূনা গঙ্গাজল দেয় না।

সরস্বতী বসে বসে সবই লক্ষ্য করে, আড়চোখে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে, লক্ষ্মী দেখেও দেখে না, সে চুপ করেই থাকে, ঝগড়া করবার মতন শক্তি এখন ওর নেই।

ওপাশের ঘর হতে হিন্দুস্থানী বউটি বলল, লক্ষ্মীদির লেড়কা হবে। জান সরস্বতীদি, তাই খায় না, শুয়ে থাকে।

সরস্বতী বলল, জানি গো, জানি। এও এক বকম ঢং, লেড়কা আর কারও হয় না, এ হ'ল লোক দেখান। সকলকে জানাতে চায়, আমার লেড়কা হবে। শুটকীর লজ্জাও করে না—হিঃ হিঃ।

লক্ষ্মীর দুর্ভাগ্য দিন দিন বেড়েই চলেছে, শুকনো শরীর, আরও শুকনো হয়ে উঠল। এত বড় বস্তীতে এত ভাড়াটে, কেউ আসে

না, বোজখববও নেয় না, সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, সকলেরই ঘরসংসার আছে, দেখবার সময় কোথায় ?

লক্ষ্মীর ঘরদোর দেখে আগে লোকে হিংসে করত। বলত, তোমার ঘর কি পরিষ্কার দিদি। কোথাও নোংরা একটুও নেই। কিন্তু, আজ ঘরের কোণে কোণে ভজাল। লক্ষ্মী আজকাল কোন দিন বাস্তা করে, কোন দিন শরীর মন খারাপ থাকলে বাস্তা করে না। লক্ষ্মণ, এটা ওটা কিনে দেয় বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর বা প্রয়োজন সেবা, শুশ্রূষা তা হচ্ছে না। লক্ষ্মণ কোন দিন ভাতে ভাত সিদ্ধ করে দেয়, কোন দিন দেয় না। পুরুষ মাহুয, কল-কারখানা আছে। বাইরেও কাজে বেতে হয় একটু একটু। ঘরে থাকা তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব নয়।

সরস্বতী সবই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। মুখে কিছু বলে না। সে-ও যেন লক্ষ্মীর অবস্থা দেখে কেমন হয়ে গেছে। হাটতে গেলে তার পা টলে পড়ে। কিছু খেলেই ওরাক তুলে। কখন কখন ভড় ভড় করে বসি করে দেয়। দেখে দেখে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস কেলে—আহা ! বেচারী। কিন্তু চকুলজ্জায় কিছু করতে পারে না।

লক্ষ্মী একদিন কলতলা থেকে এসে দেখল। তার ঘরদোর কে যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে শুজিয়ে রেখেছে। দেখে প্রথমে সে হকচকিয়ে উঠল। আজ এক মাসের উপর তার ঘর নোঙরা। ঘুণা তার হচ্ছিল খুব। কিন্তু কে দেবে তার ঘর ঝাট দিয়ে, কাকে সে বলবে, কে কি বলবে। কাজ কি, তার চেয়ে থাক নোঙরা হয়ে। সূখের চেয়ে অশান্তিই তার ভাল। ঘরের অবস্থা দেখে, মনে মনে সে তৃপ্তি অনুভব করল। কিন্তু কে এই কাজ করল সে বুঝে উঠতে পারল না। এত বড় বস্তীতে কে এমন বাচ্চী আছে। ওকে না জানিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে চুপ চাপ চলে বাবে। লক্ষ্মী দোরগোড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। সে সময় হিন্দুস্থানী বউটি সেখান থেকে বাচ্ছিল। মুহূর্তে তাকে ডেকে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল, দিদি ! আমার ঘরদোর কে পরিষ্কার করেছে বলতে পার ?

হিন্দুস্থানী বউটি বলল, আমি ত কিছু বলতে পারবে না লক্ষ্মীদি। আমি বাস্তাঘরে ছিলাম।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি সবই বুঝি দিদি। আমি বোকা নই।

কা'কে তুমি সন্দেহ কর লক্ষ্মীদি ?

এ বস্তীতে কে এমন সুস্থদ আছে ভাই বে, আমার জন্ত খেটে মরবে ? এ করেছে আমার শত্রু ওই মুটকী।

সরস্বতী কান খাড়া করেই ছিল। কথাটা কানে যেতেই সে ঝড়ার দিয়ে উঠল, বলল, মরণ আর কি ? আমি বাব শুটকীর ঘর ঝাট দিবে। আমার গলায় দড়ি জোটে না পা।

হিন্দুস্থানী বউটি বলল, আহা ! ঝগড়া কর না দিদি। ও রোগা মাহুয কি বলতে কি বলছে।



ও গুটকী, আমার নাম বল কেন ?

চুপ কর দিদি। লক্ষ্মীদি ভাল হয়ে বাক, তার পর বত পায় ঠাড়া কর। বলে উত্তরের অপেক্ষার না থেকে হিন্দুস্থানী বউট জের কাজে চলে গেল। লক্ষ্মী ও সহস্বতী বার বা ঘর গিয়ে প্রবেশ করল।

লক্ষ্মীর মুখে ভীষণ অকচি। কোন জিনিসই খেতে পারে না। সহস্বতী একদিন শুনিয়া শুনিয়া হিন্দুস্থানী বউকে বলল, জান দিদি। আমার বড় বোন বগন প্রথম পোয়াতী, তিনিও ঠিক গুটকীর মতন কিছু খেতে পারত না। কেবল দিনরাত ওরাক, ঝরাক। শেষে কবরেজ এসে দেখে বললেন, ওকে কচি শশা, আর ঠাটা পেয়ারা এনে দাও। চিবুক। দেখবে মুখের অকচি আর নই। সত্যি বলছি দিদি। তোমাকে বলব কি দিদি, আমার বড় বোন ভাল হয়ে গেল। বলেই আড়চোখে একবার লক্ষ্মীর ঘেঁষে দিকে তাকাল।

এব কিছুদিন পর। লক্ষ্মী ঘরে ঢুকেই চমকিয়ে উঠল। কেবল ভিতর এক ডজন কচি শশা, আর কাটা পেয়ারা। হিন্দুস্থানী বউটকে ডেকে লক্ষ্মী বলল, দেখে যাও দিদি। দেখে যাও, আমার ক্রম কাণ্ড। এ সব রেশে দিয়ে চলে গেছে। আমি বেন কচি বুকী কিছু বুঝি নে। আমি সব বুঝি, হিন্দুস্থানী বউটি কথা শুনে গুটকী হাসল শুধু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে বলল, চুপ কর,

দিদি। আমার যদি সহস্বতীদি শুনতে পায় খ্যাচ খ্যাচ করবে।

মুখে ত ওর লাগাম নেই। বা খুশী বললেই হ'ল।

লক্ষ্মীও আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে শুয়ে যইল।

লক্ষ্মীর প্রসববেদনা উপস্থিত। লক্ষ্মণ ঘরে নেই। ডিউটি দিতে কারখানায় চলে গেছে। লক্ষ্মী পড়ে পড়ে ছটকট করছে, আর ককিয়ে ককিয়ে কান্দছে। থবথ শুনে বস্তীর ঘেরেরা ছুটে এল। সকলে একজ হয়ে বসে বসে জটলী করছে। কিন্তু প্রতিকার করবার চেষ্টা নেই। “কেউ বলছে আহা! বেচারী, কেউ বলছে—আমার দিদি এমন চরুছিল গো, শেষে হাসপাতালে দিতে হ'ল। কিন্তু সেখানে গিয়েও দিদি বাঁচল না। মরে গেল।”

এমন সময় ভিড় ঠেলে সহস্বতী এসে উপস্থিত হ'ল। তাকে আসতে দেখে অনেকেই পথ করে দিল। অনেকে আমার গা টোপা-টোপি করে হাসতে লাগল। সহস্বতী কাহারও দিকে তাকাল না। সোজা এসে লক্ষ্মীর মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে বসল। হিন্দুস্থানী বউট নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। তাকেই উদ্দেশ করে বলল, দিদি একটু কাজ করে দাও ভাই। পাঁচুর মাকে গিয়ে বল যে আমি ডাকছি। বেশী দেবি কর না দিদি, যাও।

পাঁচুর মা, হ'ল, এ পাড়ার ধাত্রী। এ পাড়ার বত জেলিভাবি-



আনন্দ ডিঙ্গারে  
ক.হোডের  
প্রসারিত সামগ্রী



ক.হোড ২৩ কাং • কলিকাতা-১০

কেস হয়, পাঁচু মা-ই করে। হিন্দুস্থানী বউটি তাকে ডাকতেই চলে গেল।

সরস্বতী আর একটি বউকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার বাবুটিকে একবার কারখানায় পাঠাও দিদি। লক্ষ্মণ ঠাকুরপোকে খবর দিক। শেষে আর একটি ঘেরেকে জুঁম দিল, যা ত বোন, আমার ঘরের উম্মেনের উপর পুরম হুধের বাটিটা আছে নিয়ে আর, ঘেরেটি ছুটে চলে গিয়ে হুধ নিয়ে এসে সরস্বতীর হাতে দিল।

লক্ষ্মী জানত এ হুধ সরস্বতীর। প্রতিদিন তার একটু হুধ না হলে চলে না। তাই লক্ষ্মী কীৎকণ্ঠে বাধা দিল, না না ও আমি খাব না।

সরস্বতী তাঁকে একটা ধমক দিয়ে বলল, কেব যদি মুখের উপর কথা বলবি শুটকী, সত্যি বলছি আমি চলে যাব। বলেই সম্মুখে লক্ষ্মীকে বসিয়ে দিয়ে একটু একটু করে পুরম হুধ খাইয়ে দিল। শেষে হুধ করে পুনরায় বলল, ইস। শরীরে কিছু নেইবে শুটকী। তকিরে একেবারে আমসি হয়ে গেছিস।

লক্ষ্মী বলল, আর খাব না দিদি।

সরস্বতী বলল, না না এটুকু খেয়ে নে ভাই। লক্ষ্মী আর প্রতিবাদ করল না। সে নিঃশব্দে হুধটুকু নিঃশেষ করে দিল।

রাত বারটার লক্ষ্মী একটি কজাবত প্রসব করল। প্রসবের সময় খুব কষ্ট পেয়েছিল।

সরস্বতীর বন্ধু ও পথো লক্ষ্মী একদিন স্নান হয়ে উঠল। আবার স্নান হয় কপড়া। এবারের লক্ষ্য ঘেরেটা। বলে, আহা কি ঘেরেই হয়েছে—শুটকীও ঘেরে আর কি হবে? শুটকীর ঘেরে পেতী। বলি, ও গতরখাকী, ঘেরেটার বড় করতে পারবিনি ত বিয়োলি কেন?

সরস্বতী এসে ঘেরেটাকে স্নান করিয়ে স্নান পবিরে চোখে কাজল দিয়ে চলে যায়।

সারাবাত্রি ঘেরেটা কান্দে। সরস্বতীর ঘুম আসে না। বার বার এসে দরজায় থাকা দেয়—আ দর হতচ্ছাড়ি! ঘেরে যে ককিরে মরে গেল! পালতে পাবি নে ত পেটে এনেছিলি কেন?

লক্ষ্মী শোনে: ধাতো দাঁত চেপে পড়ে থাকে।



স্বকমান্বিতাস্ব

স্বাদে ও

গুণে

অতুলনীয়।

লিলির লজেন্স

ছেলেমেয়েদের প্রিয়।

## ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস

ছোট গল্প বাংলা-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সহজতম শাখা হলেও ছোট গল্পের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে না। একজন বিখ্যাত ছোট গল্প লেখক ও অধ্যাপকের সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ করলেই এ কথার সত্যতা অস্বীকার্য হবে। বর্তমান প্রবন্ধে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

ছোট গল্প বললে, সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, যা ছোট এবং যা গল্প তাই ছোট গল্প, কিন্তু আকারে ছোট যে কোন কাহিনীকেই ছোট গল্প বলা যায় না। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মত ছোট গল্পেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সর্বজন স্বীকৃত। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকলে, আকারে ছোট হলেও কোন কাহিনী ছোট গল্প হয় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই আমাদের আলোচ্য।

এক সময়ে যে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কোন রচনাকে ছোট গল্প বলা চলত, এখন সেই সব বৈশিষ্ট্য না থাকলে কোন রচনাকে ছোট গল্প বলা যায় না। তা সত্ত্বেও ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি একই আছে। বরং বলা যায় যে, নতুন নতুন হ'য়েকটি লক্ষণ সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন যে সব লক্ষণ না থাকলে আজকের যুগে কোন রচনাকে সার্বিক ছোট গল্প বলা হয় না। আমরা এখন সেই সব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলির আলোচনা করে ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করব। Brander Matthews তাঁর Philosophy of Story-তে যে কথা বলেছেন :

"A true short story is something other and something more than a mere story which is short. A fine short story differs from the novel chiefly in its essential unity of impression. A short story has unity, as a novel cannot have it."

সে কথা সকলেরই জানা আছে। দেখা যায় যে, তিনি unity of impression-কেই ছোট গল্পের অপরিহার্য লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। Unity of impression-এর অর্থ ভাবের একত্ব। সুতরাং গল্পটি শেষ করার পর পাঠকের মনে একটি মাত্র ভাবই থাকবে বা গল্পের সমস্ত ঘটনা একটিমাত্র ভাবের সৃষ্টি করবে পাঠকের মনে। কাজেই পাঠকের মনে

একটিমাত্র ভাব সৃষ্টিয়ে তোলাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে, বোঝাই যায় যে, গল্পের আয়তন খুব বেশী বড় করবার কোন প্রয়োজন হয় না। সেই কারণেই ছোট গল্প ছোট হয়—অর্থাৎ ছোট হওয়াটা বড় কথা নয়—বড় কথা হ'ল একটিমাত্র ভাবের উদ্বেগ করা। সুবিশেষতঃ সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় বলেছিলেন, "বিচিত্র স্থল, দৃশ্য, বর্ষ, বিবাহ, উত্থান, পতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনাই অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্প রচনার কৌশলের কার্য।" যেহেতু জীবনের একটা ছোট ঘটনাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়াই গল্প রচনা কৌশলের কাজ, সেহেতুই ছোট গল্প ছোটই হয় কারণ একটা ছোট ঘটনা কত বেশী জায়গাই বা জুড়তে পারে। ওয়েবস্টার ডিক্সনারী ও এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে 'সাহিত্যে ছোট গল্প' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গল্পের সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, "A short story usually presenting the crisis of a single problem" এবং এর অনুবাদ করেছেন, "ছোট গল্পে একটি মাত্র সমস্যা সঙ্কট রূপে দেখানো হবে।" লক্ষ্য করবার বিষয়, একটি মাত্র সমস্যা অর্থাৎ অনেকগুলো সমস্যা নয়, দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্কট রূপ, সমগ্র রূপ নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, ছোট গল্প ছোট হয় বড় হয় না। অর্থাৎ ছোট গল্প আকারে বা আয়তনে ক্ষুদ্র হবে এবং সেই ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে জীবনের কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হয়ে উঠবে। বহু পুরাতন Bull's eye lantern-এর সেই উপমার কথা সবাই জানেন। তার আলো যেমন চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে সামান্য একটু স্থানকে আলোকিত করে তোলে উজ্জল ভাবে তেমনি ছোট গল্পও "নিজের বিশেষ বক্তব্যটি ছাড়া আর কিছুই বলবে না।" অর্থাৎ জীবনের বিশালতা থেকে একটি মাত্র ঘটনা বা একটি মাত্র মনোভাবকে নিয়ে তাকেই সৃষ্টিয়ে তুলবে ছোট গল্প—সমস্ত জীবনের কথা সে বলবে না। যদিও নবজনাথ চক্রবর্তী, "বাংলা ছোট গল্প—সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" গ্রন্থে বলেছেন, "অবশ্য গল্প লেখকের এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই, যে একটি মুহূর্তের ব্যাপার বা একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার কাহিনী রচনা করিতে হইবে। তাঁহার একাধিক ঘটনার সাহায্য লইতে পারেন, কিন্তু গল্পের

আগল ৩৭ ইয়ার গঠন কোশল ও রচনায়। যদি কেহ ক্ষুদ্র পরিবেশে সর্বাঙ্গ পরিধির মধ্যে বহু কিছু নিবিড় সন্নিবেশকে অভ্যুজ্জল পরিসমাপ্তির মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারেন তবে আর বেশী কি চাই? পাঠকগণ ইহার দিকে কেন আকৃষ্ট হইবেন না? সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনাবলী ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হইতে পারে না—এই মতবার তখন বাতিল হইয়া যাইবে। যদি কোন লেখক ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরেই জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারেন, তবে আপত্তির কোন হেতু নাই, কিন্তু ভাবের ঐক্য সঞ্চক্ষে সচেতন থাকিতে হইবে।” অর্থাৎ ঘটনা একই হউক বা একাধিকই হউক, আগতন ক্ষুদ্রই হউক বা বিশালই হউক একান্ত অপরিহার্য লক্ষণ হ’ল উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্য। এ ছুটি বজায় থাকলেই গল্প ছোট গল্পই হয়—না থাকলে হয় না।

ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবের ঐক্য হলেও তার আরও বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষতঃ আধুনিক সমালোচকদের মতে ছোট গল্পে ভাবের ঐক্যের চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয় হ’ল তার ইঙ্গিতধর্মিতা, বিবৃতিমূলকতা নয়। অর্থাৎ ভাবের ঐক্য বজায় রেখেও একটি কাহিনী কেবলমাত্র বিবৃত করলেই, আধুনিক বিচারে তাকে সার্থক ছোট গল্প বলা চলবে না। গল্প শেষ হবার পরেও পাঠককে সে নিয়ে ভাবতে হবে—পড়তে পড়তেও তাকে ভাবতে হবে, কারণ ছোট গল্পের লেখক সব কথা বিবৃতি করবেন না। তিনি কেবল ইঙ্গিত দিয়ে পাঠককে ভাবিয়ে তুলবেন। ছোট গল্পের যেখানে সূত্র, পাঠকের ভাবনার সূত্রও সেখানে কিন্তু ছোট গল্পের যেখানে শেষ, সেখানেই পাঠকের ভাবনার শেষ নয়। মনে পড়ে ববীন্দ্রনাথের ‘বর্ষাযাপন’ কবিতার সেই “অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাজ করি মনে হবে, শেষ হয়ে না হইল শেষ।” তাই ইঙ্গিত ধর্মিতাই ছোট গল্পের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু এই ইঙ্গিত কিসের ইঙ্গিত? যেহেতু সাহিত্য জীবনকে নিয়ে তাই সেই ইঙ্গিতও হ’ল জীবনেরই কোন নতুন সঞ্চক্ষে ইঙ্গিত। তাহলে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য এই দাঁড়াচ্ছে যে, ছোট গল্প একটি মাত্র ভাবকে প্রকাশ করবে, তার থাকবে একটি মাত্র বক্তব্য এবং এই ভাব, এই বক্তব্য লেখক তাঁর চারদিকের চার পাশের জীবন থেকে নেবেন। এই যে বক্তব্য বিষয় তার নির্বাচন এবং প্রকাশ লেখকের ব্যক্তিত্বকেও প্রকাশ করবে। অর্থাৎ যে ছোট গল্পে একটি মাত্র ভাব বধেই ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত তাও ছোট গল্প নয়, যদি না সেই ভাব জীবনেরই অংশ না হয় এবং তা লেখকের বক্তব্যকে প্রকাশ না করে।

মোটামুটি আধুনিক ছোট গল্প বলতে আমরা এই সব-

গুলিকেই বুঝি। অর্থাৎ একমুখী জীবনসচেতন ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশক ভাবের ইঙ্গিতধর্মী বা ব্যঙ্গনাময় প্রকাশই ছোট গল্প।

অবশ্য এ হ’ল আধুনিক ছোট গল্পের আকৃতি বিচার মাত্র—যাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ছোট গল্পের কায় পরিচিতি। আধুনিক ছোট গল্পের এ হ’ল অর্ধেকটা পরিচয় অর্থাৎ তাকে মনভাবে লেখা হবে। কি কি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য তার রচনাভঙ্গির মধ্যে থাকবে, এ তারই পরিচয়। কিন্তু ছোট গল্পকে ভাল করে বুঝতে গেলে জানতে হবে তার প্রকৃতিকেও। তার কায়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মার সঙ্গেও পরিচয় করার দরকার।

আধুনিক সমালোচকরা ছোট গল্পের আত্মা বলতে বুঝেছেন তার প্রগ্নধর্মিতাকে। “ছোট গল্পের ধর্মই হ’ল তার প্রগ্নমূলকতা। সে যেন একটির পর একটি জিজ্ঞাসাকে নয়-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে জীবনের দিকে জুড়ে দিতে থাকে।”—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জীবনের নানা দৃশ্য-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, ব্যভিচার—কেন হয়, কেন হবে, এই তার প্রশ্ন। লেখকের চিন্তা বা উপলব্ধি ও সমাজের বিধানে যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ছোট গল্পের লেখক তখন সমাজের বিধানের সঙ্গতির দিকে, যাথার্থ্যের দিকে তুলে ধরেন তাঁর প্রশ্নকে। এই প্রগ্নধর্মিতা না থাকলে আধুনিক সমালোচকদের মতে, আধুনিক যুগের ছোট গল্পের আত্মাই থাকে না।

আধুনিক সমালোচকদের মতে এই হ’ল ছোট গল্পের স্বরূপ। কিন্তু ছোট গল্পের প্রগ্নধর্মিতাই তার আত্মা কিনা এ সঞ্চক্ষে তর্ক উঠতে পারে। যেমন তর্ক উঠতে পারে ছোট গল্প, লেখকের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবে কিনা তাই নিয়ে। অবশ্য আমাদের বক্তব্য এ নয় যে, ছোট গল্প সমাজের বিধানের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তুলে ধরতে পারবে না অথবা ছোট গল্পে লেখকের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চারিত্রিক গঠন প্রভৃতি নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব তার প্রকাশ হতে পারবে না। হয় হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু হতেই হবে কিনা সে বিষয়ে আরও সাবধানে বিচার করা প্রয়োজন।

আমাদের মনে হয়, জীবনের কোন একটা খণ্ডাংশকে কিংবা মানুষের মনোজগতের একটা বিশেষ দিককে উজ্জল-বর্ণে চিত্রিত করে, সেই প্রকাশিতব্য ভাবটির একমুখী এবং ব্যঙ্গনাময় প্রকাশ ঘটতে পারলেই তা সার্থক ছোট গল্প হয়ে ওঠে—লেখকের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ না করলেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই সমাজের কাছে কোন প্রশ্ন উপস্থিতি করতে না পারলেও। যেমন ছোট গল্প ছোট হয় কারণ সে একটিমাত্র ভাবকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ছোট গল্পে একটি মাত্র ভাবের

প্রকাশই বড় কথা, আকারে ছোট হওয়াটা বড় কথা নয়। তেমনি, জীবনের একটি ঘটনা বা মনোজগতের একটি দিককে ইঙ্গিতময় করে, বিশেষভাবে প্রকাশ করতে গেলে তা পাঠকের কাছে প্রস্বেদ আকারে এসে উপস্থিত হতে পারে অর্থাৎ প্রস্বেদ হয়ে ওঠাটাই বড় কথা নয়—বড় কথা জীবনের খণ্ডাংশ বা মনোজগতের একটি বিশেষ দিকের ব্যক্তনাময় এবং সার্থক চিত্রণ। এইভাবেই বলা যায় যে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লেখকের রচনায় হতে পারে অথবা হওয়া খুবই সম্ভব, তাঁর রচনায় তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু যদি তা নাও হয় বা প্রকাশ নাও পায়, তা হলেও সেটা তত মারাত্মক অপরাধ নয়, যদি একটি মাত্র ভাবের ইঙ্গিতময় প্রকাশ সার্থকভাবে হয়ে থাকে।

অবশ্য এই প্রস্বেদলকতা বা প্রস্বেদমিতা ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ না হলেও একে ছোট গল্পের আধুনিক লক্ষণ বলা যেতে পারে। ছোট গল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথম যুগের ছোট গল্পে ভাবের একমুখীনতাও সর্বত্র রক্ষিত হ'ত না। তার পর ধীরে ধীরে ঐটাই হয়ে উঠল ছোট গল্প লেখকদের প্রধান লক্ষ্য। ধীরে ধীরে সামাজিক অবিচার আর অত্যাচারই যখন ছোট গল্প লেখকদের বর্ণিতব্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল তখন ঐদিক থেকেই লেখকেরা অঙ্গুলিসংকেত করতে লাগলেন আর তার থেকেই ছোট গল্পের আধুনিক লক্ষণ প্রস্বেদমিতা আবিস্কৃত হ'ল। এখন আবার ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে বিদেশী সাহিত্যের ছোটগল্পে প্রস্বেদমিতাও আর নেই। শুধু ব্যঙ্গনা দিয়ে শুধু ইঙ্গিত দিয়ে লেখকেরা প্রায় গীতি কবিতার ধরনে ছোট গল্প লিখছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এতদূর অগ্রসর হয় নি বলেই আমরা এই শ্রেণীর ছোট গল্পের আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকলাম। আসল কথা হ'ল এই যে, যুগে যুগে সাহিত্যের অন্তান্ত শাখার মতো ছোট গল্পেও বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই বিশেষ কোন ছোট গল্পকারের প্রতিভার পরিচয়

আলোচনাকালে সেই বিশেষ যুগের আদর্শের কথা মনে রেখে বিচার করলেই সুবিচার হবার সম্ভাবনা।

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে ও পরের মন্তব্যের স্বার্থার্থ অনুভূত হবে। ১৯৮০ সালের ত্রয়োদশ মাসে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ত্রীপু: (সম্ভবতঃ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা) রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম ছোট গল্প “মধুমতী” থেকে আরম্ভ করে আজকের অতি-আধুনিক ছোট গল্প-লেখকদের লেখা বিভিন্ন ছোট গল্প আলোচনা করলে আমরা এই দেখব যে, যেসব লেখক সামাজিক অত্যাচার আর উৎপীড়নকেই তাঁদের গল্পে বর্ণিতব্য বিষয় বলে ধরে নিয়েছেন, তাঁদের গল্পেই আমরা ছোট গল্পের আধুনিক লক্ষণ ঐ প্রস্বেদমিতাকে খুঁজে পাই। ব্যঙ্গনা বা ইঙ্গিত প্রায় সব উচ্চশ্রেণীর ছোট গল্পেই পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্বেদমিতা মোটেই সার্বজনীন লক্ষণ নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের সব ছোট গল্পেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামাজিক নিপীড়নের চিত্র তাঁর ছোট গল্পেও আছে, সেখানে তিনিও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সামাজিক বিধানের সজ্জিত দিকে তাঁর জলন্ত প্রশ্ন কিন্তু যেখানে তিনি “ছোট প্রাণ, ছোট ব্যাধা, ছোট ছোট হৃৎ-কথা নিত্যন্তই সহজ সরল” ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে কোন প্রশ্ন নেই—সেখানে “নিত্যন্তই সহজ সরল” জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ধরা যাক, শব্দচন্দ্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (আরও অনেক নামই করা যেতে পারে অবশ্য) কোন কোন ছোট গল্পের কথা। সেখানে জীবনের নানা সমস্যা, হৃৎ-কথা আর অত্যাচারের কথাই বর্ণিত তাই সেখানে নানা প্রশ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের লেখার মধ্যে। অর্থাৎ প্রস্বেদমিতা ছোট গল্পের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। লেখকের ব্যক্তিত্ব বা মানসিকতা-ভেদে তা ছোট গল্পে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু সার্থক ছোট গল্পে ভাবের একমুখীনতা ও ইঙ্গিতময়তা থাকতেই হবে। এই সব কারণেই আমাদের মতে, ভাবের ঐক্য ও ইঙ্গিতময়তাই ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা অপরিহার্য লক্ষণ।



# গুরুগরিচয়

বরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর—জীবনচরিত্র রায়।  
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩  
মহাত্মা পাকী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৫.৫০ টাকা।

বইখানি জীবনচরিত্র নয়। ঠিক জীবনস্মৃতিও বলা চলে না, কেননা জীবনস্মৃতিতে অনেক জনৈক স্মৃতিই বিগত থাকে। লেখক বলিতেছেন, “আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি—এ আমার আত্ম-মুকুতো রমেন্দ্রদর্শন।...বাক্যে আমার জীবনপ্রত্যয়ের সূর্যালোকে বর্ণনা করেছি, তাঁকেই আজ জীবনের গোখলি-আলোকে আবৃত্তি করে যাই।” ভূমিকার লেখক স্মৃতিতর্পণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, এ কথাটি প্রেমের কিছু পরিচয় প্রদান করে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অপূর্ণ। বিজ্ঞান ও দর্শনের দুই তত্ত্বগুলি তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া পাঠকের নিকট সহজ, সুন্দর, সুবোধ এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে তিনি অদ্বয়। তিনি বিখ্যাত শিকারি। বঙ্গী সাহিত্য পরিষৎ বলিতে প্রধানতঃ তাঁহার কথাই মনে আসে। প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহার মধ্যে একত্রে মিলিত হইয়াছিল। বৈদিক প্রবন্ধ-গুলি তাঁহার জিবেরী নাম সার্থক করিয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। এই পাণ্ডিত্যেই তাঁহার পরিচয় নয়। মাহুয হিসাবে তাঁহার তুলনা নাই। সংসারে এমন উদার, বহুবংশল, নিরঙ্কর, আত্মপ্রচার-বিমূহ মনীষীর সাক্ষাৎ কদাচিত্ মিলে। তাঁহার সমস্ত ভাব ও কর্মের মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশপ্রেম। বিজ্ঞা ও বিনয়ের সহিত দেশাস্বপোধ মিলিত হইয়া তাঁহাকে খাটি ভারতীয়, খাটি বাঙালী করিয়াছিল। সাহিত্য পরিষদে অহুষ্ঠিত রামেন্দ্র-সম্বন্ধনার ববীন্দ্রনাথ স্বচিহ্ন অভিনন্দনপত্রে লিখিয়াছিলেন, “সর্ব-জনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারার তোমার বহুগুণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার স্বর সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।”

প্রেমের রামেন্দ্র-স্মৃতিতর্পণের বিশেষভাবে অধিকারী। রামেন্দ্র-সুন্দর ছিলেন সবুকে তাঁহার মাতামহ। তাঁহার বন্ধণাবেক্ণে এবং অভিভাবক্ণে শিক্ষাভ্যাসের আশায় পৌত্র বীরেন্দ্রনারায়ণকে পিতামহ লালপোলায় প্রাতঃসংগীত মহাভাষা বোগীন্দ্রনারায়ণ—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন তাঁহার বয়স আট-নয় বৎসর। অংঘো নয়-দশ বৎসর অর্থাৎ বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে লেখক তাঁহার কাছেই মাহুয হইয়াছেন। রামেন্দ্র-সুন্দরের নিকট তিনি পুত্রাধিক স্নেহ লাভ করিয়াছেন। ছেলে-বেলার লালপোলায় দামোদর নামে এক পশ্চিমা ভৃত্য রামেন্দ্রসুন্দর

ও তৎপত্নী ইন্দুপ্রভা দেবীকে দেখাইয়া বলিত, এই তোমার নানা, ওই তোমার নানী। লেখক বলিতেছেন, “শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা আমার কাছে ওই নামেই চালু হয়ে গিয়েছিলেন।” তিনি বলিতেছেন :

“তায় অসীম বিভাবতা বোরবার বয়স তখন হয় নি।...তাই সাধারণ বালকের ঝাপসা চোখে তাঁকে দেখেছি, তায় সঙ্গে কথা বলেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, শুয়েছি, খেলাধুলা করেছি—তায় মধ্যে সেই অসাধারণকে খুঁজে পাওয়ার কোনও প্রয়াসই ছিল না।...এত কাছে পেয়েও যে বিরাটের সেই মহিয়ারে বুঝতে পারি নি সেই দুঃখই আজ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে।”

রামেন্দ্রসুন্দরের বিশাল জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করিবার যত পণ্ডিত হইত বা পাণ্ডা হইবে, কিন্তু যথোরা রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিবার মত লোক আর নাই। আমাদের সৌভাগ্য, লেখক তাঁহার বিভাবুদ্ধির আলোচনা করিতে না গিয়া মাহুযটিকে আঁকিয়াছেন। এইখানে প্রমুখ উল্লিখিত ববীন্দ্রনাথের উক্তিটি মনে পড়ে। একবার কবির আগমন-সংবাদে রামেন্দ্রসুন্দর অন্যতুতপাত্রেই বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, সে বিষয়ে খেরালই নাই। অল্পচর সে কথা মনে করাইয়া দিলে তিনি মহা অপ্রস্তুত। ববীন্দ্রনাথ বহুত করিয়াই বলিলেন, “পোশাকী রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা দেখতে চাই না, আটপোরে জিবেরী মশাইকেই আমাদের ভাল লাগে।” আটপোরে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিতে পাই বলিয়া লেখকের রচনা এত সুখপাঠ্য হইয়াছে। তাঁহার মাতৃভক্তি, কতাদের প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, সন্তানস্বানীরদেয় সহিত প্রীতিম্বন্ধ ব্যবহার, তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান, দেশপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি প্রমুখ বর্ণিত ঘটনাবলি হইতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন জ্ঞানতপস্বী, কাজেই সাংসারিক নির্লিপ্ততা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সময়মত রানাহারের কথা তাঁহার মনে থাকিত না, যদি তাঁহার হই ঘণ্টা আগাইয়া চলিত, নিজের দৌড়জীর বিবাহে ভবন বখন নানা উৎসবে মুখরিত তখনও তিনি পাঠনিমগ্ন। পাঠগৃহে তিনি অগতঃ-সংসার সবই ভুলিয়া হাইতেম। নাতনীর বিবাহের সময়ের কথা। “রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর কন্যাসে বসে কি একটা বিষয়ে পাতাখ পত্র পাতা লিখে চলেছেন। অন্যর থেকে হু-তিন বাহ স্ত্রী ইন্দুপ্রভা ডাক এসেছে।” ডাকে সাড়া নাই। “তবে এটা শু আর নুতন নয়। সারস্বতকুঞ্জের অধিবাসী রামেন্দ্রসুন্দরের সাংসারিক উদাসীত্বের প্রমাণ তিনি বহুবারই পেয়েছেন। আমার জিজ্ঞাস করলেন, বাইরের বই কেউ আছে কি-না। নাই জেনে নানী মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা না করে ছুটে এসে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করে বললেন—চোখ ছুটিতে বিপুল অভিযোগ :



তোমার কি কোন কালেই খুঁজে পাব না?—কলম খেঁদে গেল। চমকে উঠে অসহায় শিশুর মত চেয়ে রইলেন।” আর্থিক কষ্টটিও তিনি পোহাইতে চাহিতেন না। “সংসার খরচের টাকা নানীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। আর কিছু টাকাকড়ি তাঁর হাত-বাগেই রাখতেন। সাহায্যার্থীর ত অভাব ছিল না। কিছু না দিয়ে যেন তিনি তৃপ্তি পেতেন না।” কিন্তু বেখানে তাঁহার দারিদ্র্য সেখানে কোন ঊনাসীত ছিল না। নিম্নলিখিত কাহিনীটি তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিক প্রকাশ করে।

রামেন্দ্রসুন্দর তখন অত্যন্ত অসুস্থ। মাথার ব্যথার ভুগিতে-ছেন। ডাক্তার প্রাক্তর্জনের উপদেশ দিয়াছেন। “কথাটি আমার ঠাকুরদার কানে উঠতেই গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্য একটা গাড়ি তিন নানার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ...রামেন্দ্রসুন্দর দেখে-তনে সর্দিরিন্মাসে বললেন, রাজা বাহাদুর আমার জন্যে পাঠিয়েছেন। দু-একবার চেষ্টে হবে বই কি। এতে মাকে মাকে খোঁকায়ে নিয়ে সাহিত্য পরিষদে যাব। আমার ছাকড়া গাড়িই ভাল, কি বল খোঁকা? তোমার কি উচ্ছ্বাস, আমার বলে থাকবে, না ওই গাড়িতে উঠবে? প্রাণের আবেগে রামেন্দ্রসুন্দরের গা ছুঁয়ে বলে কেলসাম, জানই ত নান, তোমারই কথায় নিজেব হাতে কাপড় কাচি, জুতার কালি-বৃক্ষণ করি, মাথার আজ পর্যন্ত টেবি কাটা হুয়ে থাকে কোনও গন্ধতেল মাখি না, জামার আজ পর্যন্ত সেট পড়ে নি। সেই হালুসের ওই-সব জুড়ি গাড়িতে চড়া পোষার কিনা, তুমিই বল না? নাঃ, ও-সব হবে না, তোমার সঙ্গে আমিও ছাকড়া গাড়িতে যাব ...বরষের তুলনার আমি প্রবীণের মতই কথা বলতাম, এ অভ্যাসটা আমার এসেছিল নানার মত জানবুত প্রবীণের সঙ্গে থাকতাম বলে।”

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১৯ সনে স্বাস্থ্য ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর মধ্যেও একটা স্বার্থা, একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। “রবীন্দ্রনাথের উপাধি-বর্জনের সংবাদ পেয়েই বোগেশ্বরের শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে একবার শেষ কাছে পেতে চাইলেন। খবর পেয়েই কবিশঙ্কর ছুটে এলেন তাঁর বাড়িতে। ...রামেন্দ্রসুন্দর অসুস্থরোধ করলেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি খরঃ আপনার মুখে একবার তুলতে চাই। তিনিও নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বেব করে দৃষ্টকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি হুটে উঠল; জিবেদী-তাপসের মুখে। সর্বদা তাঁর উৎসাহের আবেগ। নির্বাপোদ্যুৎ প্রদীপের শিখা বৃষ্টি এমন করেই জলে ওঠে। কবিশঙ্কর বিদায় নিলেন। এদিকে রামেন্দ্র-সুন্দর তত্ত্বাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তত্ত্বা আর ভাঙল না।”

বীয়েন্দ্রনারায়ণ সুলেখক। শিকার-কাহিনী প্রভৃতি লিখিয়া তিনি লিপিকুলতার পরিচয় দিয়াছেন। এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এখন আন্তরিকতাপূর্ণ রচনার সাক্ষ্য সহজে মেলে না। গ্রন্থে বীয়েন্দ্রসুন্দর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পূর্ণ অসিতে বাহাদুর দেখিয়াছেন, দু-একটি বোকার টানে

তাঁহাদের চিত্তও গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে হুটাইয়া ছুটিয়াছেন। রচনা চিত্তবাহী। বলিবার ভিত্তি চমৎকার। পড়িতে বসিলে বইখানি শেষ না করিয়া থাকা যায় না। “যদে-বাইরে যাবেন্দ্রসুন্দর” বাঙালী পাঠকের নিকট সমাদরলাভ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পাতালপুরীর কাহিনী—শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিভোদর লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-২। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি কিশোরদের জন্য লেখা। এর কাহিনীও প্রসাদ বলিয়া এক কিশোরকে লইয়া। পিতৃ-মাতৃহীন দুটি ছেলে-মেরে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া তাহার এক মাসীর শরণাপন্ন হইল। ছেলেটি লেখাপড়া করিবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু লেখাপড়া করিবার কোক আছে। মাসীর অবস্থা ভাল নয়। তাই মেসোকে বিব্রত না করিয়া বোনটিকে মাসীর কাছে রাখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। কিশোর-মনে এই বে আবলম্বী হইবার চেষ্টা ইহাই তাহার জীবনে বিশেষ অধ্যায়। বড়লোকের নজরে পড়িয়া কাজ মিলিল বটে, কিন্তু সে কাজ তাহার পছন্দ হইল না। তাহার পড়িবার ইচ্ছা, কিন্তু সে সুযোগ পাইবে কোথায়? চোর-অপরাধে তাহার চাকরি গেল, সে প্রতিজ্ঞা করিল আর চাকরি করিবে না—স্বাধীনভাবে বা-হর করিবে। এই সময় এক কাগজের হকারের সহিত তাহার ভাব হইল, সেই তাহাকে তাহার বস্ত্রী বাড়িতে আশ্রয় দিল। এই অপাত্তের বস্ত্রী-জীবনের কাহিনীকেই বোধ হয় গ্রন্থকার পাতালপুরীর কাহিনী বলিয়াছেন। কাজের সুবিধা হইল না বলিয়া প্রসাদ এখন হইতেও চলিয়া গেল। ইহার পরই বইখানি আকস্মিক ভাবে শেষ হইয়াছে। প্রসাদ বাড়ী আসিয়া দেখিল মাসী মারা গিয়াছে, মেসোও বৈশিদিন রহিলেন না। বোনটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে একটি ছোট-খাট দোকান করিয়াছে। এবং দোকানে বসিয়া সে তাহার ছেলেটিকে পড়ায়। “তার আশা—জীবনে সে যা পেল না তার ছেলেটি হরত তা পাবে।” আমবাও বলিব, আহাদের বাহা পাইবার ছিল তাহা পাইলাম না।

শিশু-সাহিত্যিক বলিয়া খগেনবাবু নাম আছে। লিখিতে পারিলেই ছেলেদের বই লেখা যায় না। শিশুকাল বহু পশ্চাতে আয়ত্তা ফেলিয়া আসিয়াছি। সেদিনের মনকেও আর আমবা স্মরণে আনিতে পারি না। যিনি সেই মনটিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন, তিনিই পাবেন তাহাদের কথা শুধাইয়া বলিতে, তাহাদের মনের মত করিয়া বলা ইহা বড় সহজ কথা নহে। নিজেকে সেই অবস্থায় লইয়া বাইতে না পারিলে, একান্ত হইতে না পারিলে শিশু-সাহিত্য লেখা যায় না। সেইজন্যই আহাদের দেশে সত্যিকার শিশু-সাহিত্য বড় বৈশি পড়িয়া উঠিতে পাবে নাই। খগেনবাবু প্রবীণ হইলেও তিনি শিশুই রহিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার



হাতে-মুখে শিশুর খেলা ভাল কোটে। “পাতালপুরীর কাহিনী”র বৈশিষ্ট্য হইল এইখানেই। ভাষা সহজ সরল—নদীর বেগের মত তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথাও বাধা পায় নাই। বইখানি ছেলেদের ভাল লাগিবে।

অনেক মনের পাপড়ি ছুঁয়ে—ঈদিলীপ দাশগুপ্ত।  
দীপালী গ্রন্থালা। ১২৩১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা-৬।  
মূল্য ১'২৫ নয়া পয়সা।

আলোচ্য বইখানি কবিতার বই। আকারে ছোট, কিন্তু কবিতাগুলি সুচিন্তিত। আধুনিক কবিতার মধ্যে দিলীপ দাশ-ভট্টের নাম চিহ্নিত। নূতন কিছু কবিতার উদ্যাদনার কবি নিজেকে কোন বন্ধনের মধ্যেই বাঁধিতে চাহেন নাই—এ পরিচয় তাঁহার প্রতিটি লেখার মধ্যেই সুপরিষ্কৃত। কিন্তু এই নূতনের মোহই তাঁহাকে দিগ্বিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এই-জন্মই তাঁহার অস্থির-চিন্তে কোথাও দানা বাঁধিতে পারে নাই।

“আমার এই শান্তি-পারাবত  
অতুল-ঐশ্বর্য-খ্যাতি সুনাম অতিক্রম করে  
উড়ে চলেছে নতুন দিক-দিশারি হয়ে।  
হায়!...তবু আমরা কতটুকু  
ক্ষুদ্র গভীর সংকীর্ণতার মোহে  
গড়ছি প্রাচীর এবং প্রাসাদ!  
আর ঐ উড়ে চলেছে আমার পারাবত  
প্রান্তর থেকে প্রান্তরান্তরে।”

‘এই নতুন দিক-দিশারি হইয়া উড়িয়া চলাই’ তাঁহার প্রকৃতি। হিতপ্রাজ্ঞ হইতে পারিলে, কবির রচনা আরও বলিষ্ঠ হইতে পারিত। তথাপি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কবির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি সমাপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

কুরুপাণ্ডব—ঈশ্বরচন্দ্র দাশ। জ্ঞানচক্র প্রকাশনী।  
৩৪, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ১'২৫ নয়া পয়সা।  
আলোচ্য বইখানি সমগ্র মহাভারতের গল্পাংশ লইয়া শিশু-উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ছোট ছোট কথা, সরল কবিতা বলা সংস্করণ পরিচায়ক। লেখক সেই সংস্করণই পরিচয় দিয়াছেন আগাগোড়া। এই গল্পাংশ পড়িয়া শিশু-মনে মহাভারতের একটি ছাপ বহিয়া বাইবে। এই ছাপ দেওয়াই হইল আসল কাজ। আজকাল ছেলেরা রামায়ণ মহাভারত পড়ে না। এইরূপ সুখপাঠ্য গ্রন্থ পাইলে তাহাদের পড়িবার যোক হইবে। সুন্দর কবিতা গল্প বলায় শক্তি লেখকের আছে। ছেলেদের কাছে এ বই আদর পাইবে।

শ্রীগোতম সেন

গোপীচন্দ্রের গান—ডক্টর জ্ঞানভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ,  
পি-এইচ-ডি কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য  
৭শ টাকা।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে হইতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মনীষী সাধারণ জনসমাজে প্রসিদ্ধ গোপীচন্দ্রের কাহিনীর বিভিন্ন বাংলা রূপ শিক্ষিত সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ৩৫,৩৬ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় ডক্টর নীলেশচন্দ্র সেন, বিবেকবর ভট্টাচার্য্য ও বসন্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার তিনটি রূপ দুই খণ্ডে মনোজ্ঞ আকারে প্রকাশিত হইয়া বাংলায় সাহিত্যিক সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক দিন যাবৎ ইহা অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ এই কাহিনীর কোন সংস্করণই স্থলভ ছিল না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণটি এক খণ্ডে পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষিত বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণে পূর্বে সংস্করণের সামান্য কিছু কিছু অংশ অপ্রয়োজন বোধে পরিভাষ্য হইয়াছে—কিছু অংশ পরিমার্জিত হইয়াছে। নূতন সম্পাদক মহাশয় সংক্ষিপ্ত টীকা, শব্দার্থ সূচী ও একটি ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন। ভূমিকার নানা দিক হইতে গোপীচন্দ্রের গানের মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। গোপীচন্দ্র বিবরক প্রকাশিত অজ্ঞাত বাংলা রচনা’র তালিকার কাহিনীর অপর যে সমস্ত সংস্করণের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বর্তমান সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা বাহিনীর।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ড্যাগনের নিঃশ্বাস—প্রমোদ মিত্র। গ্রন্থ, কলিকাতা-৬।  
দাম ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রমোদবাবুর সাহিত্যিক পরিচয় নিম্নরোজন। শব্দচন্দ্র ও বনীন্দ্রোত্তর যুগে যে কয়জন দৃষ্টিমের লেখক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, প্রমোদ মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর। সমালোচ্য পুস্তকে দুইখানি ছোট কিশোর উপভাস স্থানলাভ করিয়াছে। ড্যাগনের নিঃশ্বাস তাঁর বহু পূর্বের লেখা—পিপড়ে পুয়াণ নতুন সংযোজন। বিভিন্ন পটভূমিকার লিখিত উপভাস দুখানি শুধু যে কিশোরদের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে তাহা নয় বরং দেবও প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগাইবে। প্রমোদবাবুর অপূর্ণ ভাষা ও পরিবেশ সৃষ্টির এমন এক সম্মোহন শক্তি আছে বাহা প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত টানিয়া লইয়া যায়।

জাতিস্মরণ কথা—শ্রীমূলচন্দ্র বসু। দি বাট্টীলা কোম্পানী, ৩ ম্যাজো লেন। কলিকাতা-১। দাম ৪'৭৫।

লেখক পবলোক এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাসী। বহু ঘটনা ও প্রমাণ সহ তাঁহার এই বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া বলাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ ঞ্জু

# দেশ-বিদেশের কথা

আটপুর পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনী—১৯৬০

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার আটপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতি কর্তৃক অমুষ্ঠিত পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনীর পৃথক্য-বিতরণ সভায় পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র তাহায় ভাষণে বলেন :

পাশ্চাত্তা শিক্ষা এবং বৈদেশিক শাসননীতির প্রভাবে একদিন গ্রামীণ জনসাধারণ দেশ ছাড়িয়া শহর অভিমুখে বওয়ানা হইয়া পড়ে ; শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলা এবং অবজ্ঞার গ্রামগুলি অশ্রুপান সঙ্গু হইয়া যায়। কিন্তু গ্রাম লইয়াই ত সমগ্র দেশের সামগ্রিক রূপ। গ্রামের সমৃদ্ধিই দেশের সমৃদ্ধি। তাই বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সকল জননারকই গ্রাম সংগঠনে ব্রতী হইতে আহ্বান জ্ঞাপন করেন। স্বাধীন হইবার পর সরকারী প্রচেষ্টাকে এইদিকে বহুলাংশে প্রসারিত করিলেও আজও শহরের শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ জীবনের প্রতি সাধারণের আকর্ষণ। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা না করিলে কৃষি-নির্ভর গ্রাম্য সমাজের প্রতি বর্তমান অশ্রদ্ধা থাকিয়া বাইবেই। তাই আজ গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রয়োজন ; প্রাচীন এবং আধুনিক ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পল্লীর উন্নয়নের আদর্শে এই প্রদর্শনী অমুপ্রানিত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন ইহাকে একটি বাৎসরিক ভ্রাম্যসায় পরিণত করিবার পক্ষপাতি নন। কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং অনী সকলেই গ্রাম উন্নয়নের দায়িত্ব সমান। এই প্রদর্শনীর ক্ষুদ্র প্রয়োজনের মধ্যে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের বিভিন্ন প্রচেষ্টার একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া বাইবে। হয়ত ইহার তুলনায় উন্নততর ব্যবস্থা প্রদর্শনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে য উদ্দেশ্য, উৎসাহ নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় আছে তাহার মূল্য অনেক।

এ প্রদর্শনীতে বোগদানের প্রেরণা আজ গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সকল বয়সের মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজাত জীবাদি কুটিয়-শিল্পের বিভিন্ন নমুনা বাহা এখানে প্রদর্শিত হইতেছে তাহার মধ্যে ইহার চিহ্ন বিস্তারিত।

আজকের সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক না থাকিলে কোন কল্যাণকর কার্য সম্পাদন সম্ভব নহে। এই প্রদর্শনীতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার নিদর্শনও আছে। সরকারী উন্নয়নমূলক এবং জাতিগঠনমূলক অনেক বিভাগই প্রদর্শনীতে ঠেল খুলিয়া উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের অগ্রসর লাভের ব্যাপারটি সাধারণের সমুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষির ফলন বৃদ্ধি করিতেছে তাহার সহিত পরিচিত হইতেছে সুদূর এই পল্লীগ্রামের অধিবাসী।

গ্রামের উন্নয়ন অল্প সব কিছুই উন্নতির সহিত বে অজ্ঞানী ভাবে জড়িত তাহা বুঝাইবার জন্য এই প্রদর্শনীর সঙ্গে পশু-প্রদর্শনী এবং দেশের ভবিষ্যৎ বাহানের উপর সেই সকল শিশুদের উপর প্রয়োজনীয় নজর দিবার জন্য শিশুমঙ্গল অমুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবান শিশুকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া প্রদর্শিত জীবের মধ্যে বাহাতে বৈচিত্র্য থাকে এবং তাহা মানুষী না হইয়া শিক্ষাপ্রদ হয়, সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের লক্ষ্য গতানুগতিক পদ্ধতি বর্জন করিয়া নানান পরীক্ষার মধ্য দিয়া বাহাতে গ্রামের মানুষ তাহার জমিদ ফলন বৃদ্ধি করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করে।

গ্রামোন্নয়ন উপত্যকা পদিকল্পনার সন্ধিহিত অঞ্চল হওয়ায় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল সেচের জল, কৃষি ফলন বৃদ্ধিই নহে কুটিয়-শিল্পেরও উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। আয়রা আশা করি আমাদের এই প্রদর্শনী সারা বৎসরের গ্রাম্য

**ডায়া-পেরসিন**  
 হজমশক্তি  
 বজায় রেখে  
 স্বাস্থ্যের  
 উন্নতি করে

**ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা**

মাহুবেব অৰ্ধনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়ক হইবে।

## বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবির

প্রায় বায় বছর পূর্বে নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে লোকসেবা শিবিরের উদ্বোধন হয়, অক্ষর তৃতীয়ায় পুণ্য তিথিতে। উহার জয়লগ্নে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা মৌলভী রেজাউল করিম এবং আচার্য্য সুবোধচন্দ্র লাহা। পথে পথে অৰ্ধ এবং গৃহনির্মাণের মাল-মসলা ভিক্ষা করিয়া কতিপয় কক্ষী একখানি বড় আটচালা গড়িয়া তুলেন। হৃৎকৃত্য নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া শিবিরের লোকসেবার কার্য চলিতে থাকে। দিগন্ত বধন ভয়সাজ্বর তখন স্বেচ্ছায় ধরিয়া লোকসেবা শিবির জনশিকার ক্ষেত্রে যে সকল কাজে অগ্রণী হইয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। ঈশ্বরের করুণা সহসা সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে নাহিয়া আসিল। শিক্ষা বিভাগের জন-দমনী কর্ণধার ডাঃ বীরেন্দ্রবোহন সেন কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবার জন্ত অর্থসাহায্য দান করিলেন। শূদ্র প্রান্তর ছাত্রদের কলমে আঁজ মুখ। নিম্ন বুদ্ধিাদি শিক্ষন মহাবিদ্যালয়ের কাজ ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। মহাবিদ্যালয়ের গৃহ, ছাত্রাবাস, গুরুপদী নির্মাণের পথে। আকলিক লাইব্রেরীটি গ্রামে গ্রামে জ্ঞানের অনন্ত পরিবেশন করিতেছে। নৈশ-বিদ্যালয়টিতে নানা বয়সের শিক্ষার্থীরা আসিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। বিজ্ঞানেয়া আসিয়া যাকে যাবে নানা বিষয়ে ভাবন দিয়া গ্রামবাসীদের প্রেরণা দিতেছেন। বায় বৎসর পূর্বে বাহা মুষ্টিমের আদর্শবাসীর স্বপ্ন ছিল আজ তাহা নানা কর্ণে পূর্ণবিত। নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিবিরের সংলগ্ন এক খণ্ড জমিতে পয়মহৎসেবের একটি মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে—এ কথা না বলিলে বর্ণনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বর্তমান বৎসবে ২৫শে জানুয়ারী জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী পণ্ডিত দিবসে খ্যাতনামা লেখক জীবোপেনশঙ্কর বাগল মহাশয় একটি সভায় স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ইহাতে তিনি জাতির দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি রূপে জীবজয়-লাল চট্টোপাধ্যায় পঞ্চায়েত সম্পর্কে পাকীজীর ভাবনায় বিশ্লেষণ করেন। ৩১শে জানুয়ারী মৌলভী রেজাউল করিম পাকীজীর শ্রুতিসভায় তাঁহার জীবন ও বাকী সম্পর্কে একটি মূল্যবান ভাষণ দেন।

## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার

### দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

শুভ ১লা ফাল্গুন, ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয় হলদে বকীর সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উদযাপিত হয়। প্রচেষ্টা ডাঃ জীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং পরিষৎ শাখায় স্থায়ী সভাপতি জীকুমারবিন্দু দাস সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিচাৰ্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নীর উদ্বোধন-সম্বোধনের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। পরিষৎ শাখায় সম্পাদক জীমানিকলাল সিংহের কার্য-বিবরণী পাঠের পর পরিষৎ শাখায় সংগ্রহশালার সংরক্ষণের জন্ত বাহায়া প্রাচীন নিদর্শনাদি দান বা সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরিষৎ শাখায় পদক হইতে প্রশংসা-পত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য পুরাকল্প সংগ্রহের জন্ত জীকুমার-কীর্তন পুঁথির আবিষ্কার বসন্তহস্তিনের নামাহুসায়ে পরিষৎ শাখা যে পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন উক্ত পদক এই সভায় স্থানীয় বিভাগের সমুদয়ের পরিদর্শক জীকণ্ঠব্রত কব মহাশয়কে প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডাঃ জীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষৎ শাখায় এই উদ্যমের প্রশংসা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সর্ব-সাধারণের প্রশংসনীয় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মধ্যযুগীয় জীবনধারণের ভগবৎ-চেতনা ও শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আধুনিক যুগে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি লাভ করিলেও ভগবৎ-ভক্তি জাতীয় কোন বিষয় কেন্দ্রীয় চেতনায় অভাবে নানা নিকে বিপর্য্য। প্রাচীন মধ্যযুগের লোকের সাহিত্য-প্রীতিও ছিল প্রচুর তাহার প্রমাণ পুঁথি ইত্যাদি প্রাচীন নিদর্শন নিরুপেক্ষীয় লোকের নিকটেই বেশী পাওয়া যায়। বরং সেই নিক দিয়া বর্তমানকালে শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত সাধারণ মাহুবেব কোন যোগ নাই বলিলেই চলে। নানা বিভেদের মধ্যে আধুনিককালে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে এই আব এক বিভেদ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সেই সমস্ত লুপ্তকৃতি উদ্ধার করিয়া জাতির জীবনধারণের মূলমন্ত্রটি আবিষ্কার করা পরিষদের মহান দায়িত্ব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন যে, শিল্প-সংস্কৃতিতে আকলিকতার ছাপ পড়ে। সেই আকলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতির স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। আধুনিককালে সমস্ত কিছু বলিকাতা কেন্দ্রিক। ইহা অস্বাভাবিক লক্ষণ। বিষ্ণুপুর একদা প্রাচীন সংস্কৃতির বেজ ছিল। শিল্প সংস্কৃতিতে বিষ্ণুপুরের আকলিক বৈশিষ্ট্য ছিল একদা। সেই বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারে মহান দায়িত্বের কথা শ্রবণ করাইয়া দিয়া ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণের উপসংহার করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণের পর জীকুমারবিন্দু দাস সভাপতির ভাষণ দান করেন। পরিষৎ শাখায় পদক হইতে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি মনপত্র দেওয়া হয়। জীকুমারদাস সরকারের উদ্বোধন সম্বোধনের পর সভার কার্য শেষ হয়। স্থানীয় বাহানন্দ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক যুগলীর অহুযোযে তিনি পদমিন কলেজে বক্তৃতা করেন।

সম্পাদক—জীকেন্দ্রানন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—জীনিবারচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লি., ১২০.২ আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা-১



















